মৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

৩১ জানুয়ারী ১৯৭৫ ॥

মূল্য ৬৫ পয়সা

CALCUTTA UNIVERSITY

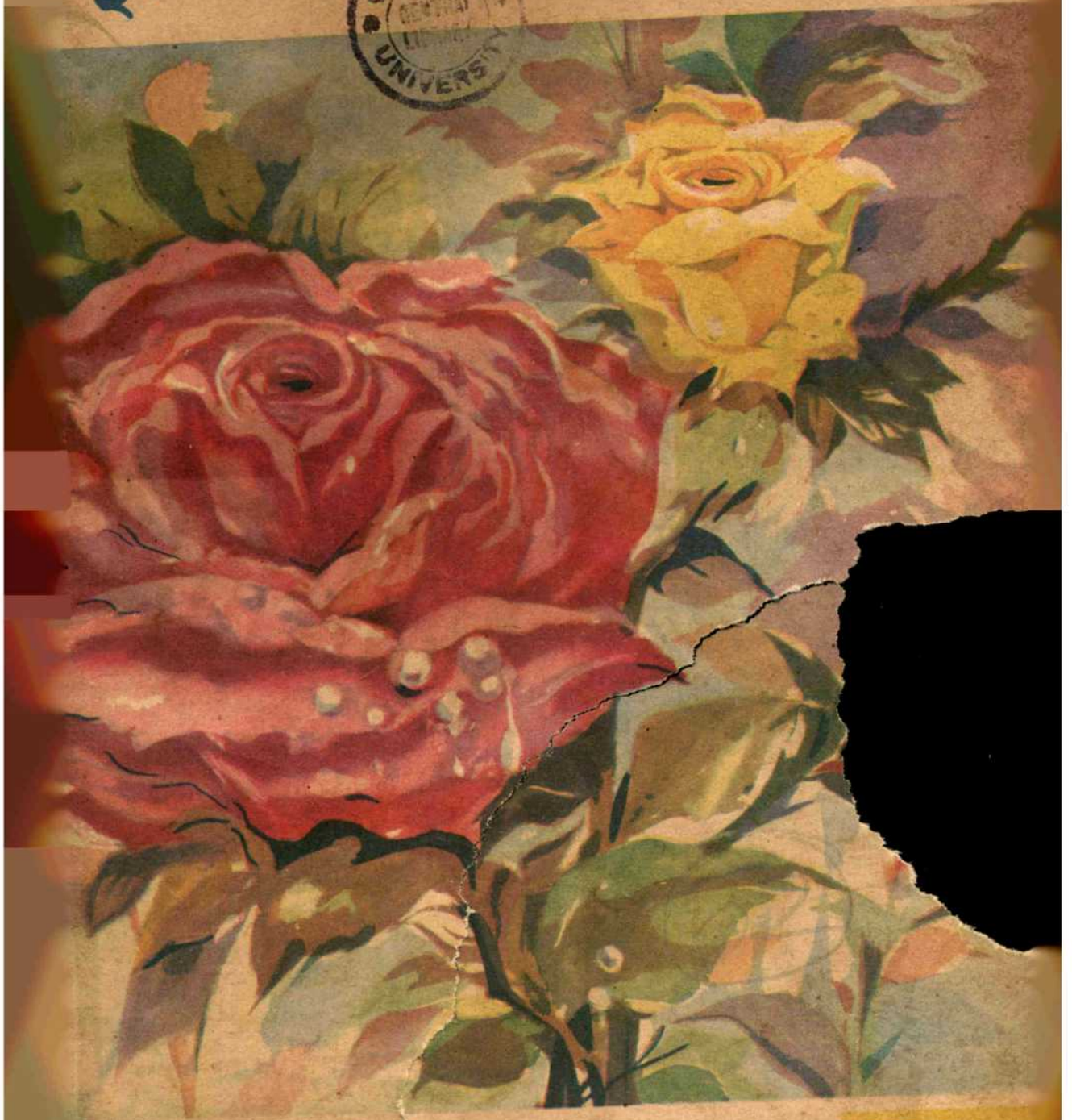

-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক,
আবার সুস্থ, সতেজ ও
য় উঠবে।

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

52

যার
শীতে
তার ভ

মি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যাল

শুধুই
কেশ তৈল নয়
একটি
কেশ রসায়ন

সাধনা আমলা

সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

অতুলনীয় গুণাবলীর
জন্য যুগ যুগ ধরে
সুবিদিত

আমলকীই ইহার
প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্বতা রোধ ক'রে ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-৫

SA-2/69

দক্ষিণী কলকাতার পটভূমিতে লেখা

শংকরের একদলের উপন্যাস

স্থানীয়সংবাদ

এই উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা, সেখানে এক দিকে ধনীর নির্লজ্জ প্রাচুর্য আর একদিকে দরিদ্রের চরম লাঞ্ছনা; একদিকে ত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত, আর একদিকে স্বার্থপরতার উগ্র প্রকাশ। জীবনের আনন্দোৎসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেখানে মানুষ বারবার মরার নেশায় মেতে ওঠে। আমাদের কালের সমস্যা ও যুগযন্ত্রণার সঙ্গে এই উপন্যাসে আছে এখনকার অথচ চিরকালের কয়েকটি নরনারীর শাশ্বত হৃদয়দ্বন্দ্ব ও বিচিত্র অন্তর্বেদনা যা যুগে যুগে বাইরের চেহারা পালটায় কিন্তু যার বেদনার তীব্রতায় কোন কমবেশী হয় না।

নূতন অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

॥ দাম আট টাকা ॥

লেখকের আর একটি উপন্যাস

সীমাবদ্ধ

যার জনপ্রিয়তা সমস্ত পাঠক-সাধারণকে অভিভূত করেছে।

নূতন ত্রয়োদশ মুদ্রণ

॥ দাম আট টাকা ॥

॥ আসন্ন প্রকাশিতব্য নূতন বই ॥

আশাপূর্ণা দেবীর

সার্থকনামা উপন্যাস

যে যার দর্পণে ৮.

নিমাই ভট্টাচার্যের

নূতন আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস

নাচনী ৬.

প্র - না - বি' র ব্যঙ্গরসাত্মক নাট্যোপন্যাস

বেনিফিট অব ডাউট ১০.

শঙ্কু মহারাজের

একটি সার্থক ভ্রমণ-কাহিনী

তমসার তীরে তীরে ১২.

শিশুসাহিত্য রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো

॥ দাম কুড়ি টাকা ॥

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্য

ঠাকু'মার ঝুলি ৯. ঠাকুরদার ঝুলি ৭॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

অসাধারণ রচনা

বনস্পতির বৈঠক

১ম খণ্ড — ২০. দ্বিতীয় খণ্ড — ১৮.

সুখলতা রাও-এর

গল্প আর গল্প ৬॥

নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হলো

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৯

ফোন : ৩৪-৩৪৯২

৩৪-৮৭৯১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩১	শেষবিচার (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৩৫	বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার	শ্রীঅয়স্কান্ত
৩৮	পুনশ্চ	শ্রীক্ষপণক
৩৯	বাঘেলখণ্ডের জঙ্গলে (গল্প)	শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
৪৫	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৬	রান্না ঘরে দেখুন	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৪৭	রূপসীর খাতা	শ্রীবরবর্ণিনী
৪৮	রূপসজ্জা	শ্রীনিরুপমা
৫০	মাঠের নায়ক	শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫১	দেশবিদেশের খেলা	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫২	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅময়
৫৪	খেলাধুলো	শ্রীদর্শক
৫৬	দিল্লীর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে	শ্রীনির্মল ধর
৬০	গোয়েন্দা মাধার সমাধান	
৬১	জোর থেকে বলছি	স্টুডিও সংবাদদাতা
৬৩	স্টুডিও সংবাদ	
৬৪	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা	শ্রীঅভিজিৎ
৬৫	চিত্রসমালোচনা	শ্রীচিত্রদূত
৬৭	নাটমঞ্চ	নাট্য সমালোচক
৬৮	বাংলা দেশের ছবি	আনওয়ার হোসেন
৭০	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৭১	অভাসা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্র দীপ দাস

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল হোমিও বই

মূল বিক্রয়কেন্দ্র — আমাদের কলিকাতার চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় ও হেড অফিস।

চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় : ১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি-২৫ এবং ৫৩ গ্রে স্ট্রীট, কলি-৬

হেড অফিস : ৩৬বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫

পাইকারী ক্রেতা / বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করিবেন

সম্পাদকীয়

হিন্দী ও অন্যান্য ভাষা প্রসঙ্গে

নাগপুরে সম্প্রতি খুব ঘটা করে বিশ্ব হিন্দী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিশ্ব ইংরেজি বা বিশ্ব রুশ সম্মেলন কোনোদিন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে শোনা যায় নি। হিন্দীভাষা বিশ্বভাষার মর্যাদা চাইছে বলেই তার প্রস্তুতি হিসেবে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভারতের বাইরে কয়েকটি ছোটখাটো দেশে—যেমন মরিশাস, গিয়ানা, ফিজি প্রভৃতি জায়গায়, ভারতীয় বংশজদের মধ্যে ভাঙা হিন্দী প্রচলিত আছে। তাদের প্রতিনিধিদেরও সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘে হিন্দীর স্বীকৃতি দাবি জানিয়ে। বলা যায়, এইটেই ছিল সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দীকে ভারতের সরকারী ভাষা করা হয়েছে। কিন্তু বহুভাষী ভারতে হিন্দী একক সংখ্যা-গরিষ্ঠের ভাষা হলেও সারা দেশে তা বোধগম্য নয়। ভাষার সমৃদ্ধি ও ঐতিহ্যের দিক থেকেও হিন্দী একক গরিমা দাবি করতে পারে না। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ভারতের ভাষা সমস্যার দিকে নজর না দিয়ে কেবলমাত্র হিন্দী হিন্দী করে আসর উত্তপ্ত করে রেখে ছিলেন। হিন্দীভাষীদের মধ্যেই লেখক বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ সম্মেলনের বিরোধিতা করে নাগপুরেই একটা পালটা সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অজুহাতে বিক্ষুব্ধ লেখক অধ্যাপকদের অনেককে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল। বোঝা যায়, এ নিয়েও দলাদলি যথেষ্ট ছিল এবং সম্মেলনের আয়োজন ও উদ্দেশ্য নিয়েই ছিল মতবিরোধ।

হিন্দীভাষার গুণপনা নিয়ে মতান্তর প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হিন্দী এবং তারই রকমফের খাড়িবোলি, মৈথেলী, ভোজপুরী, রাজস্থানী ইত্যাদি ভাষা প্রচলিত এবং সহজবোধ্য। উর্দু এবং হিন্দীর মধ্যেও সাদৃশ্য অনেক। সহজ হিন্দুস্তানীকে ভারতের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা করার জন্য বলেছিলেন গান্ধীজী। স্বাধীনতার পর অবশ্য গোঁড়া হিন্দীবাদীরা উর্দু জবান সম্পূর্ণ বর্জন করে শুদ্ধ হিন্দীই প্রচলন করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। হিন্দীকে প্রাধান্য দিয়ে অপরাপর সকল ভারতীয় ভাষাকে অবহেলা ও অবজ্ঞার চোখে দেখার একটা চেষ্টা এই অত্যুৎসাহী হিন্দীপ্রেমিকদের আছে। তার ফলে গত ২৮ বছরে হিন্দীর জন্য সরকারী কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলেও অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দীর প্রসার হয়েছে সামান্যই। তবে হিন্দী লেখক ও হিন্দীভাষা সংস্থাসমূহ এতে লাভবান হয়েছে। সরকারী দাক্ষিণ্যের অপচয়ও কম হয় নি। কিন্তু ভারতের ভাষাগত সংহতি রয়ে গেছে দূর মরিচীকার মতো। বরং ভাষা বিরোধ বেড়েছে। সম্মেলনে একজন বিদেশী হিন্দী বিশেষজ্ঞ কিন্তু এ কথাটাই উদ্যোক্তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সবিনয়ে। হিন্দীর বিশ্বযাত্রার আগে নিজের দেশে তার স্বীকৃতি নিঃশর্ত ও সহজ হওয়া উচিত। বহুভাষী সোভিয়েট ইউনিয়নে রুশ ভাষার প্রাধান্য ও প্রচলন প্রশ্নাতীত। রুশ সাহিত্য জগতের তাবৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে গণনীয়। শুধু সরকারী ফতোয়ায় সে-ভাষা সারা সোভিয়েট দেশে গ্রহণযোগ্য হয় নি। ভারতবর্ষে অবশ্যই একটা লিংক ল্যাংগুয়েজ আমাদের চাই? সে ভাষা কী হবে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন উক্ত সম্মেলনেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। জোর করে কোনো ভাষা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। দক্ষিণে তো এ নিয়ে দক্ষযজ্ঞ হবার আশংকা। সুতরাং তিন ভাষার সূত্রই আপাতত গ্রাহ্য, সুন্দর এবং শ্রেয়। সবার আগে মাতৃভাষা। পড়াশোনা কাজকর্ম সবেতেই মাতৃভাষাকে দিতে হবে অগ্রাধিকার। তারপরে আসবে রাজ্যে রাজ্যে যোগা-যোগের ভাষা হিসেবে ইংরেজি এবং তার পরে হিন্দী। সুতরাং হিন্দীকে জবরদস্তি ছেড়ে স্বাভাবিক সত্যে করতে হবে আত্মপ্রতিষ্ঠা। ভাষাগত জবরদস্তিকে সাম্রাজ্য-বাদী মানসিকতা নামেই চিহ্নিত করা যায়। ভারতবর্ষে সরকারী দুধের সর ননী অর্থাৎ তাবৎ ভাল চাকরিতে ঢোকার জন্য হিন্দীতে পরীক্ষা গ্রহণ যদি চালু করা হয় এবং ইংরেজি থাকে তার বিকল্প তাহলে তো হিন্দীভাষীরা অনেকটা এগিয়েই থাকবেন। তাতে অহিন্দীভাষীদের মনে দানা বেঁধে উঠবে বিক্ষোভ। তামিলনাড়ু তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে ইংরেজি হঠিয়ে হিন্দী চাপাতে চাইলে তারা তা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। এ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য ভাষার মধ্যেও পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে। মারাঠী-মালাড়ী, বাংলা-অসমীয়া কিংবা উর্দু-হিন্দী প্রভৃতি ভাষার বিরোধ মাঝে মাঝেই দেখা দেয়। এমন কি একই তেলুগুভাষাভাষীদের মধ্যেও কী প্রচণ্ড বিরোধ ঘটে গেল অন্ধ্র-তেলেঙ্গানার প্রশ্নে।

১৪ বর্ষ

অমৃত

৩৮ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ" নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 31st January, 1975. শুক্রবার, ১৭ মাঘ, ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়	
৭	অথচ অবনীশ খারাপ ছিল না (গল্প)	শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
১২	এই বাংলার খবর	শ্রীদেবদত্ত
১৪	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে	শ্রীদিলীপকুমার রায়
১৫	দেশেবিদেশে	শ্রীপুণ্ডরীক
১৬	রোজনামচা	ফাদার দ্যতিয়েন
১৭	সেই সব মানুষ (উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
১৯	গোয়েন্দা ধাঁধা	শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
২০	দুটি বিদেশী উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথ	শ্রীউজ্জ্বল মজুমদার
২৩	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	
২৫	দুটি কবিতা (কবিতা)	শ্রীবনফুল
২৬	যুবক যুবতী	শ্রীঅমর দাশ
২৮	চিঠিপত্র	

প্রকাশিত হয়েছে

শ্রীভৃগু বিরচিত

১৯৭৫-৭৬

ভাগ্যফল জানুন

১৯৭৫-৭৬ একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ যা একসঙ্গে এখনও বের হয়নি, সর্বপ্রথম বের হয়েছে।

এতে আছে : মাসফল, রাশিফল, লগ্নফল, নক্ষত্রগতফল, জন্মমাস, বর্ষফল এবং নানা পাথরের গুণাগুণসহ সমালোচনা।

শ্রীশ্রীভৃগু সংহিতা

শ্রীশ্রীভৃগু সংহিতা, পাশ্চাত্যের কিরো, এলেন লিও, প্রভৃতি থেকে অনেক, অনেক উচ্চস্তরের—প্রাচ্যের এক বিরাট জ্যোতিষ সমুদ্রমন্থনকারী গ্রন্থ।

বাংলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে —মূল সংস্কৃত পুঁথি থেকে অনুবাদ।

(দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পথে)

রুণু পুস্তকালয়

৮নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশিত হলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ থ্রিলার,

ফ্রেডরিক ফরসাইথ-এর 'প্রেসিডেণ্ট দ্য গল হত্যা ষড়যন্ত্রে'র রোমহর্ষক ঘটনা নিয়ে তথ্যভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত অতুলনীয় রাজনৈতিক থ্রিলার, 'দি ডে অফ দি জ্যাক্যাল'

শৃগালের শেষ প্রহর

ভাষান্তর/ সৌরীন রায় ॥ ২৫-০০

দি কার্পেটব্যাগার্স ও অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন-এর 'আতঙ্ক, সেই সঙ্কেত'-এর অসাধারণ অনুবাদের পর অনুবাদকের আর একটি অবিস্মরণীয় ভাষান্তর।

প্রকাশক—পত্রপুট / পরিবেশক—কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট—১২

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

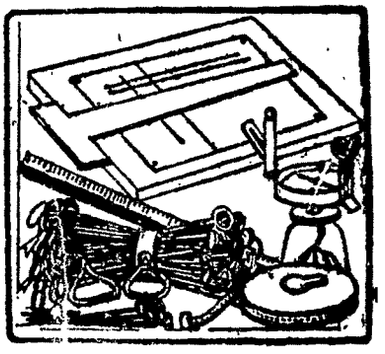

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪

গ্রাম: অয়ারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া

পরিবেশক : কার্মালন ব্রডাষ্টস (ষ্টেশনারী বিভাগ)

মহাত্মা শিশিরকুমারের

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

কালাচাঁদ গীতা
৪র্থ সংস্করণ ৩-০০

নিমাই সন্ন্যাস
(নাটক) ২য় সংস্করণ ২-০০

নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ২-০০

লর্ড গৌরাঙ্গ
(২২টি খণ্ডে) (ইংরাজী)
প্রতি খণ্ড ৩-০০

নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ২-০০

নরোত্তম চরিত
(হিন্দী) ২-০০

সর্পাঘাতের চিকিৎসা
(৮ম সংস্করণ) ১-৫০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE
De-luxe Ed. — Rs. 6.50

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE
Popular Ed. — Rs. 5.50

প্রাপ্তিস্থান :—
পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও
বিশিষ্ট পুস্তকালয়

রামানুজ সম্প্রদায়ের
॥ কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ ॥

স্বামী যতীন্দ্র রামানুজাচার্য

ভগবদ্‌রামানুজ বিরচিত
ব্রহ্মসূত্র শ্রীভাষ্যসহ
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ৬-৫০
২য় খণ্ড (১ম ও ২য় অধ্যায়) ১৫-০০
৩য় খণ্ড ২০-০০
গীতাভাষ্য ৭-৫০
বেদান্তসার ৬-০০
বেদার্থসংগ্রহ ৫-০০
নিত্যারাধন গ্রন্থ ১-৫০
গদ্যত্রয় ২-০০
শ্রীযামুনাচার্য বিরচিত
শ্রীমদ্‌গীতার্থসংগ্রহ ১-৫০
শ্রীআলবন্দার স্তোত্র ১-২৫
শ্রীলোকাচারী স্বামী ও
শ্রীবরবরমুনি কৃত বা ব্যাখ্যাত
শ্রীবচনভূষণ ৮-০০
শ্রীবচনভূষণসার ২-৫০
তত্ত্বত্রয় ৪-৫০
অর্থপঞ্চক ০-৩৭
উপদেশরত্নমালা ২-০০
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৫-০০
শ্রীঅণ্ডাল আড়বার বিরচিত ও
শ্রীকৃষ্ণপাদস্বামী ব্যাখ্যাত
শ্রীব্রত (তিরুপ্পাবৈ) ৩-০০
শ্রীশঠকোপ আড়বার বিরচিত
সহস্রগীতি (তিরুবায়মোড়ী) ১২-০০

অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সংকলিত

শ্রীবিষ্ণুচিত্ত আড়বার বিরচিত
তিরুপ্পল্লাণ্ড ১-৫০
শ্রীপরাশর ভট্টর ব্যাখ্যাত
শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম ১-৭৫
শ্রীরঙ্গরামানুজমুনি ব্যাখ্যাত
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ভাষ্যম ২-৫০
শ্রীবলরামস্বামী বিরচিত
প্রতিমাগুণদর্পণ ০-৭৫
শ্রীরামজয়ন্ত্যাদি দিক্‌প্রদর্শন ০-৫০
শ্রীযতীন্দ্র রামানুজাচার্য বিরচিত
গুরুবর বলরাম (১ম খণ্ড) ১০-০০
(২য় খণ্ড) ৬-০০ (একত্রে) ১৫-০০
শ্রীবৈষ্ণব দর্শন ও ধর্ম ১ম ৮, ২য় ১০
বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ও
ইহার প্রাচীনতা ১-৫০
মানব-উজ্জীবন ২-৫০
আড়বার ২-২৫
তত্ত্ব ও তথ্য ৪-৫০
অন্তিম বার্তা ২-২৫

: অন্যান্য :

রামায়ণসার ৬-৫০
ব্রহ্মসূত্র ৪-০০
প্রপন্নপারিজাত ২-২৫

: নবপ্রকাশিত গ্রন্থ :

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার সম্পাদিত
সহস্রশ্লোকী ভাগবত (১ম খণ্ড) ৩-০০
ঐ (২য় খণ্ড) ৪-০০

পোঃ বলরাম ধর্মসোপান খড়দহ (২৪ পরগণা) **শ্রীবলরাম প্রকাশনী** ১০১ বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬
(বিস্তারিত বিবরণ তালিকার জন্য লিখুন)

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

ও

আরও বিচিত্র কাহিনী

পড়ে' আনন্দ পাবেন

বইখানা অবনীশের হাতে তুলে দিয়ে ডকটর বাগচী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললেন 'বইটাতে আমার কিছু কিছু 'নোটস' আছে তোমার কাজের সুবিধে হতে পারে। কিন্তু—আরো কুণ্ঠিত হাসি হেসে কথা শেষ করলেন একটু ইয়ে করে রেখো। মানে—'

বেশী কথা বলার মানুষ নন জোর দিয়েও কিছু বলতে পারেন না 'সাবধানে রেখো' বলার বদলে বললেন 'ইয়ে করে রেখো' আর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতেই কথা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেলেন।

বইটা হাতে নিয়ে অবনীশ কয়েক মুহূর্ত অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বইটা ডকটর বাগচী নিজে থেকে অবনীশকে ব্যবহার করতে দিলেন!

এই দেওয়ার মধ্যেই অবনীশের প্রতি ডকটর বাগচীর যে গভীর স্নেহের পরিচয় প্রকাশ পেলো তা অভিভূত করে দেবার মতই।

অবশ্য কথাটা শুনলে আতিশয্য মনে হতে পারে। অধ্যাপক তাঁর নিজেরই অধীনে গবেষণারত ছাত্রকে নিজের একটা বই সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন এ আর এমন কি আশ্চর্য্য?

কিন্তু ডকটর চন্দ্রনাথ বাগচীকে যারা জানে তারাই বুঝতে পারবে অবনীশের অভিভূত হওয়ার কারণ আছে কিনা।

অকৃতদার ডকটর বাগচী তাঁর এই দীর্ঘ জীবনের সমস্ত উপার্জনের প্রায় সাড়ে তিন ভাগ অংশই কেবলমাত্র গ্রন্থ সংগ্রহেই ব্যয় করেছেন এবং বলতে গেলে বিরাট একটা লাইব্রেরীই গড়ে তুলেছেন তবু তার প্রতিটি গ্রন্থই ডকটর বাগচির কাছে পুত্রতুল্য।

আবার তার মধ্যেও প্রাণতুল্য যে কখানি বই সর্বদা ওঁর হাতের কাছেই থাকে এই 'প্লেটোর ডায়ালগস' খানা তাদের মধ্যে অন্যতম।

ডকটর বাগচীর পরম নেশা যত দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য ক্লাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ। এর জন্যে তিনি শুধু অর্থই নয় কত 'শ্রম কত সময়' ব্যয় করেছেন কত ক্লেশ স্বীকার করেছেন সে ইতিহাস শোনবার মত।

সংগ্রহশালার পরিধি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিধিকে সংকুচিত করতে হয়েছে অতএব এখন এই দাঁড়িয়েছে—প্রাসাদোপম পিতৃভিটার একমাত্র উত্তরাধিকারী চন্দ্রনাথ বাগচী আশ্রয় নিয়েছেন সিঁড়ির পাশের একটি সরু ঘরে।

এটা দোতলায় এই ঘরটিরই নীচে একতলার ঘরটি আছে চন্দ্রনাথের সবেধন

নীলমণি 'জগন্নাথের' দখলে। জগন্নাথই চন্দ্রনাথের একাধারে স্ত্রী পুত্র ভৃত্য মিত্র সব।

জগন্নাথের পরম গুণ সে তার বাবুর এই বইগুলোকে 'জঞ্জাল' মনে করে না, অথবা শিশিবোতলওলার থলিতে নিক্ষেপ করাই সংগত মনে করে না। বাবু আর বাবুর বই তার কাছে তুল্যমূল্য। বাবুর গ্রন্থশালাকে সে বাঘের মত আগলায় এবং তার জন্য ভূতের মত খাটে।

কদাচ কখনো কেউ একখানা বই (চন্দ্রনাথের ভদ্রতার উপর জুলুম করে) চেয়ে নিয়ে গেলে জগন্নাথের জেরার মুখে পড়া তার অবধারিত।

অবনীশের ঠিক এই মুহূর্তে সে কথাও মনে পড়ে না।

অবনীশ কৃতার্থমন্য গলায় বললো 'বইটা নিচ্ছেন আপনার যদি হঠাৎ—'

ডকটর বাগচী হাত নেড়ে কুণ্ঠিত হাসির সঙ্গে বললেন 'না না সে কিছু না। আমার এখন ততটা—'

একটু থামলেন বললেন 'নোটগুলো তোমার কাজে লাগবে ভেবেই—থীসিসটা এবার তাড়াতাড়ি শেষ কর—অবনীশ!'

ছাত্রদের একটু অধিক পরিমাণেই খাটিয়ে নেন ডকটর বাগচী। বিশেষ করে গবেষণার ছাত্রদের। ফাঁকি দিয়ে গোঁজামিল দিয়ে যেন-তেন করে ডিগ্রীটা আহরণ করে চলা এটা চন্দ্রনাথ ভাবতেই পারেন না।

অবনীশ লজ্জা বোধ করে বইটা হাতে পাওয়া মাত্রই নিয়ে চলে যেতে পারে না। অবনীশ তাই টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আস্তে পাতা ওল্টাতে থাকে তার।

বাস্তবিকই পরম মূল্যবান গ্রন্থ।

পরে পরে ছত্রে ছত্রে ডকটর বাগচীর হাতের ক্ষুদে ক্ষুদে অথচ পরিষ্কার অক্ষরের 'নোটস'।

অবনীশ ভাবলো বইটা পাওয়া তো একটা মস্ত পাওয়া তার থেকেও পরম পাওয়া হচ্ছে ডকটর বাগচীর স্নেহের ওজনটি পেয়ে যাওয়া। আরো ছাত্র আছে ডকটর বাগচীর প্রিয় ছাত্রই আছে কিন্তু ডকটর বাগচী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাউকে তাঁর প্রাণতুল্য একখানা বই হাতে তুলে দিচ্ছেন এ তো দেখেছে বলে মনে পড়ে না। স্যারের বাড়িতে এসে যতক্ষণ ইচ্ছে বসে থেকে পড়ো পড়ে নোট করে নাও বুঝতে অসুবিধে হলে স্যারের কাছে বুঝে নাও কিন্তু বই নিয়ে চলে যাওয়া? ওইটি চলবে না।

'চলি স্যার।' অবনীশ বললো বইটা মুড়ে হাতে নিয়ে 'মতটা শিগগির পারি ফেরৎ দেবো।'

বাগচী চমকে উঠলেন ব্যাকুল হয়ে বললেন 'না না তাড়া কিছু নেই তাড়া কিছু নেই। শুধু এদিক না হয় একটু সতর্ক থাকা। মানে দরকারি তো—আর কাউকে যেন—'

'না না সে কী বলছেন? আর কাউকে? অসম্ভব।

অবনীশ চলে এলো।

কিন্তু অবনীশ সতর্ক হতে পারলো না।

অবনীশ মোহের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসলো।

ক'দিন পরেই রুবি এলো আর এসেই অবনীশের টেবিলে বইটা দেখে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে নিলো। খুব কড়া গলা করে বললো 'বাঃ বাঃ। ডকটর বাগচীর কাছ থেকে এটিকে বাগিয়েছে। তুমি? খুব চালু ছেলে তো? জানো আমি একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে ধাঁ করে চেয়েই বসেছিলাম বইটা ওনার কাছে। বাগাতে পারি নি। সাধে বলি তুমি হচ্ছো একটি তুমি হচ্ছো একটি—আচ্ছা থাক আজ আর বললাম না। বইটা নিয়ে কেটে পড়ছি—'

অবনীশ প্রমাদ গনে।

দারুণ অস্বস্তির গলায় বলে 'এই এই প্লীজ। আমি স্যারের কাছে বাক্যদত্ত আছি অন্য কাউকে দেব না।'

রুবি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দুই চোখে বিদ্যুৎ হেনে বলে 'কী বললে? অন্য কাউকে?'

'আঃ বাবা। দোষ হয়েছে কথাটা—কী বলে—প্রত্যা-প্রত্যাহার করে নিচ্ছি কিন্তু বইটা নিও না সত্যি।'

রুবি এবার চোখে মদির কটাক্ষ হেনে বলে 'কেন? বইয়ের মধ্যে কারো প্রেম পত্রটত্র গোঁজা আছে বুঝি?'

অবনীশ বললো 'আহা হা! ধরে ফেললে। আছেই তো।'

রুবি নিজের টাকার ব্যাগের মধ্যে বইটা ততক্ষণে পুরে ফেলেছে।

অবনীশ তবু বললো 'আচ্ছা অমন নিষ্ঠুরতা কোরো না। আমি একটু দেখে নিই? তারপরে না হয় তুমি স্যারের কাছ থেকে—'

চমৎকার! কানে বাদুড়ের মত ঢাকনি চাপা আছে বুঝি? বললাম না, চেয়েছিলাম বাগাতে পারিনি। বলেছিলেন, 'এসব বই আমি টেবিল ছাড়া করি না, বুঝলে? থাকো না, এখানে যতোক্ষণ ইচ্ছে থেকে পড়ো। জগন্নাথ বরং একটু চা-টা করে দেবে—'

রুবি ব্যাগের ফোলাটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'বোঝো ব্যাপার। যেন মেয়েদের পক্ষে যতক্ষণ ইচ্ছে থাকা যায়। যেন যতক্ষণ ইচ্ছে বাইরে থাকা, মেয়েদের পক্ষে একেবারে জলের মতন সোজা। বইটার জন্যে তো তত নয় 'প্লেটোর ডায়ালগস' আমি বৃটিশ কাউন্সিল থেকেও নিতে পারি, ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকেও দেখে নিতে পারি, স্যারের নোটস্‌গুলোই যে দুর্দান্ত। দেখছো তো ইহসংসারে মেয়ে আর ছেলেদের মধ্যে দামের তারতম্য। তুমি আমি দুজনেই ওঁর আণ্ডারে রিসার্চ করছি, বইটা দুজনেরই কাজে লাগবে, অথচ আমি চেয়ে পেলাম না, আর তোমায় সেধে দিলেন—'

অবনীশ মৃদু হেসে বলে, 'ওই তারতম্যটা মেয়ে বা ছেলে বলে নয়।'

'তবে কী শুনি?'

'আমি ওঁর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র বলে!'

দুষ্টুমীর ছলে হলেও বেশ একটু গৌরবের হাসিই হাসলো অবনীশ।

কিন্তু রুবি কি হারবার মেয়ে? রুবিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'সব থেকে প্রিয় বলে? তাহলে তো হয়েই গেল। তোমার কাছ থেকে তাহলে এখন এটা আমারই প্রাপ্য।'

'ইস! তাই নাকি? নিজেই নিজের ঢাক পেটাচ্ছো।'

'উপায় কি। এ-যুগের ওই নীতি।'

অবনীশ তবু বললো, 'একেবারে আজই না নিলে হয় না? আমি আর একটু দেখে নিতাম।'

'আমিই না হয় আগে দেখে নিলাম।'

'এই, খুব সাবধানে রেখো কিন্তু। জানোই তো ডকটর বাগচীর—'

'থাক, তোমার আর আমাকে জ্ঞান দিতে আসতে হবে না। আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে।'

অবনীশ তার সহপাঠিনী-প্রণয়িনীকে আর বেশী কিছু বলতে সাহস করলো না। যা মেজাজ মেয়ের, হয়তো আর বেশী কিছু বলতে গেলে বইটা ছুঁড়ে মেরে দিয়ে চলে যাবে।

হ্যাঁ, ওই ভয়ই শুধু করলো অবনীশ।

কারণ, মেজাজী মেয়েরা আর কী করতে পারে না পারে জানা ছিল না অবনীশের।

পরে জানলো।

কিন্তু ক'দিনই বা পরে?

বড়জোর দিন পনেরো।

হ্যাঁ তাই হবে।

তিন-চারদিন আসেনি রুবি তারপর আর তারপর দিন আষ্টেক-দশ অবনীশ ওদের বাড়ি গিয়ে রুবির দেখা পায়নি। রুবির দাদার সঙ্গে দেখা হলে, দাদা ভুরু কুঁচকে বলেছে, 'কোথায় গেছে কি করে বলবো? কখন কোথায় যায় না যায়, আমায় বলে যায়?'

আর রুবির বাবার সঙ্গে দেখা হলে তিনি ভুরু ঝুলিয়ে বলেন, 'কোথায় যাচ্ছে, দু'দিন পরেই জানতে পারবে।'

তা জানতে পারলো।

জানতে পারলো রুবি আকস্মিক এক মোহের শিকার হয়ে পড়ে এক অবাঙালী রাজ-পরিবারের ছেলেকে বিয়ে করছে। বিয়ের পরই আমেরিকায় চলে যাবে।

রিসার্চ?

চুলোয় যাক।

আশ্চর্য। এতো বড়ো একটা দুঃসংবাদ শোনার মুহূর্তে অবনীশের যা মনে হলো তা হচ্ছে ডকটর বাগচীর বইটা উদ্ধার করতে হবে।

এক পরিচিত ছেলের হাতে একটা স্লিপ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিল। 'রুবি পত্রবাহকের হাতে ডকটর বাগচীর বইখানা দিয়ে দিও। আশা করি বইটার কথাও ভুলে যাওনি।'

শ্লেষবাক্য।

কিন্তু এই শ্লেষবাক্যে কিছু হল না।

রুবি সে-বই ফেরৎ দিতে পারলো না। রুবি সেই ছেলেটার হাতেই লিখে পাঠালো 'এখন তাড়াতাড়িতে খুঁজে পাচ্ছি না, পরে খুঁজে পাঠিয়ে দেবো।'

অথচ সেই 'পর'টা আর এলো না।

রুবি বিয়ের ব্যাপারে উন্মত্ত হয়ে মার্কেটিং করে বেড়ানো ভাবী বরের সঙ্গে দামী গাড়ি চড়ে-চড়ে, তারপর বিয়ে হয়ে চলে গেলো সাত-সমুদ্দুর পারে।

কিন্তু এই ভয়ংকর দুঃসময়েও অবনীশ সেই বইটার জন্যেই অস্থির হয়েছে। সেই অবধি ডকটর বাগচীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না সে, অথচ না গেলেও নয়। থীসিসটা দেখাতে যাওয়া দরকার।

অতএব একটা গল্প বানিয়ে ফেলতে হলো অবনীশকে। কারণ, এছাড়া আর গতি ছিল না।

অবনীশকে বলতেই হলো, 'আপনার বইটা সেই অবধি আমার কাছে রয়ে গেছে স্যর, খুবই কাজে দিয়েছে, কিন্তু আজ যা একখানা কাণ্ড করলাম। 'আনবো' বলে নিয়ে টেবিলে রেখে ঠিক আসার সময়ই ভুলে গেলাম।'

বলেই অবনীশ অন্য দিকে তাকালো।

অবনীশ ওই মুখটা ঠিক এই মুহূর্তে দেখতে পারবে না।

অবনীশ তাই শুধু একটা আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, 'বাসে হারিয়ে যায়নি তো অবনীশ?'

অবনীশকে বরাভয়ের স্বরে বলতে হলো 'না না! সে-ভয় নেই। বাড়িতেই টেবিলে পড়ে আছে। একেবারে কোণের দিকে —ইস এমন ভুলে গেলাম!'

ডকটর বাগচীর বাড়ি বালিগঞ্জে, অবনীশের বেলেঘাটায়। অথচ ওই ভুলটার সংশোধন আর সম্ভব হলো না। কোনোদিনই না।

অথচ আবারও যেতে হবে।

কাজটার জন্যেই আবার যাওয়া দরকার।

জীবনের একটা ছক তো ভেস্তে গেছে, আর একটাও কি যাবে?

থীসিস সাবমিট করার আগে একদা একদিনের কড়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বহুকাল পরে আবার রুবিদের বাড়িতে এসে হাজির হলো অবনীশ।

ভয়ংকর একটা দুঃখের, গ্লানির, আর অপমানের ক্ষণের প্রতিজ্ঞা যেন আজকের দুঃখের আর গ্লানির কাছে ছোট হয়ে গেল।

রুবির দাদা অনুপম আগে অবনীশকে সসম্মানে বসাতো, আজ আর বসালো না, শুধু বললো, 'কী ব্যাপার হে?'

অবনীশ বিনা ভূমিকায় বললো, রুবি আমার কাছ থেকে ডকটর বাগচীর একটা বই এনেছিল, সেটা খুঁজে ফেরৎ দিয়ে যেতে পারেনি, বইটার জন্যে আমি ওঁর কাছে লজ্জায় পড়ে রয়েছি, একটু খুঁজে

অনুপম আকাশ থেকে পড়লো।

বললো, 'সেই তামাদি ব্যাপার নিয়ে এখন এসেছো তুমি? রুবি কোথায় কি রেখে গেছে, ফেলে গেছে, আমি জানি?'

অবনীশ নরম গলায় বললো 'জানেন তা তো বলছি না। কাইণ্ডলি যদি একটু খুঁজে দেখেন।'

অনুপম রেগে উঠে বললো 'আমি কোথা থেকে খুঁজতে যাবো, কত কীই তো নিয়ে গেছে সে।'

এখন অবনীশ রেগে উঠলো।

উত্তেজিত গলায় বললো, 'রুবি তার বইয়ের র‍্যাকট্যাক সমেত গোটা পড়ার ঘরটাই নিয়ে চলে গেছে এটা তো বিশ্বাস করা সম্ভব নয়, দেখুন না একটু খুঁজে। ডিটেকটিভ নভেল নয় যে তার বান্ধবীরা পড়তে নিয়ে গেছে।'

এখন অনুপম জিগ্যেস করলো, 'বইটা কী?' এবং নাম শুনে মাথা নেড়ে বললো, 'না, এ-বই কেউ নিয়ে গেছে, এমন মনে হয় না। আমার দ্বারা খোঁজা অসম্ভব। তুমি নিজে চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

বহুদিন পরে রুবির পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো অবনীশ।

আর এতোদিনে যেটা এমন করে অনুভব করেনি সেটা অনুভব করলো। বুকটা ভয়ানক খালি খালি ঠেকলো। তবুও বসে না থেকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতেই লাগলো বইটা। ...যদিও অনেক পরিবর্তন হয়েছে ঘরটার। এখন যে এটা অনুপমের ছেলের পড়ার ঘর হয়েছে তা বোঝা গেল টেবিলে 'নিজে পড়ো', 'কথা শেখো', 'ছড়া ছবি', 'ছবি ও ছড়া'র ছড়াছড়িতে।

তা সত্ত্বেও খুঁজলো অবনীশ।

মায় খাটের তলায় ঠেলে-রাখা বাসি খবরের কাগজের বস্তাটা পর্যন্ত উলটে।

নাঃ, পাওয়া গেলো না।

বইটা হারিয়ে গেলো।

হয়তো চাকর-বাকর পুরনো কাগজের সঙ্গে বেচে দিয়েছে।

অবনীশ উদভ্রান্তের মতো পুরনো বইয়ের স্টলে স্টলে, কলেজ স্ট্রীটের রেলিং-এর ধারে, গড়িয়াহাটের ফুটপাথে-ফুটপাথে চোখ ফেলে ঘুরে বেড়ায়, যদি পাওয়া যায়।

অভিমান ব্যর্থ হবার পর অবনীশ ঠিক করলো একখানা নতুন বই-ই কিনে দেবে। যা থাকে কপালে। নিয়ে তো যাবে, তারপর একটা কোনো গল্প বানিয়ে—'

হ্যাঁ, চক্ষুলজ্জার পরম মুহূর্তে বানানো গল্পই তো ত্রাণকর্তা।'

কিন্তু কিনে দেবো বললেই কি দেওয়া যায়? এ তো আর বাংলা গল্প-উপন্যাসের মতো দোকানে গিয়েই কিনে ফেলা সম্ভব হয় না।

একটি অনবদ্য প্রকাশন

আমার শৈশব

* শিশুর জন্মদিনে ও অন্নপ্রাশনে উপহার দেবার মত বইঃ
* শিশুকালের সুন্দর দিনগুলো ধরে রাখার মত বইঃ
* শিশুকে গড়ে তোলার পরি কল্পনার বই ঃ
* উপহার দিয়ে খুশি হবার বই ঃ
* উপহার পেয়ে খুশি হবার বই ঃ

* পাতায় পাতায় বহু বর্ণের অপর্যাপ্ত মনোরম ছবি *
* মোটা কাগজ * লাইনো হরফে ছাপা * সুদৃশ্য বাঁধাই
* শোভন সংস্করণে উপহার দেবার সুদৃশ্য বাক্স * অপূর্ব বই ॥

[পনর টাকা । শোভন ঃ পঁচিশ টাকা]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা ৯

কোনো এক বুকসেলার অবনীশকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছে, আনিয়ে দেবে বইটা।

কে জানে কবে দেবে।

কিন্তু শুধু কি দিলেই হবে?

সে তো শুধু একটা ঝকঝকে বই মাত্র। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা, অমূল্য সেই নোটস্‌গুলি।

তবু বহুবার সেই আশ্বাসদাতার দোকানে গিয়ে গিয়ে ধর্না দিলো অবনীশ আর হতাশা নিয়ে ফিরে এলো।

ঠিক এই সময়ই ওই বইটা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।

অথচ এদিকে দিন সন্নিকট।

অবশেষে আবার গল্প বানালো। অথবা এবার আর গল্প নয়, নাটক। কারণ, একটা ঝড় তোলার প্রয়োজন, যাতে অতীতের কথা তৎমুহূর্তে আর উঁকি মারবার সুযোগ না পায়।

ডকটর বাগচী মিষ্টি আদৌ খান না জেনেও প্রকাণ্ড একটা সন্দেশের বাকস হাতে নিয়ে স্যারের বাড়ি এসে হাজির হলো অবনীশ।

নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রণাম করে স্যারের পায়ের কাছে রাখলো বাকসটা।

ডকটর বাগচী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'এ কী! এসব কেন? তুমি তো জানো আমি—'

'মিষ্টি খাই না—'

এ-কথাটা অবশ্য উচ্চারিত হল না, তবু অবনীশের বুঝতে দেরী হয় না। অবনীশকে তাই আবার গল্প বানাতে হয়। সাড়ম্বরে বলতে হয়, 'জানি স্যর মিষ্টি খান না। কিন্তু মা বললেন, আজ তোর সাধনার সমাপ্তি মিষ্টি হাতে নিয়ে গুরুকে প্রণাম করগে।'

বলে উৎফুল্ল হলো অবনীশ, ভাবলো এই এক নতুন প্রসঙ্গের চাদর চাপা দিয়ে পুরনো ছেঁড়া প্রসঙ্গটা ঢেকে ফেলা গেল।

তা একা অবনীশই যে মিথ্যের পাপে পাপী—একথা কি বলা যায়? সৌষ্ঠব রক্ষার্থে এমন কত কথাই বানাতে হয় সংসারী লোকেদের। অবনীশ এখন ছাত্র মাত্র হলেও, এবং দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র হলেও রীতিমত সংসারী বাড়ির ছেলে।

ডকটর বাগচী হয়তো অবনীশের মায়ের নাম শুনে খুশীই হলেন, খুশী হলেন ছেলে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেছে শুনে, কিন্তু ডকটর বাগচীর মুখটা মলিন-মলিন চিন্তাগ্রস্ত।

অবনীশ অবশ্য ওসব দেখতে পাবে না। অবনীশ অন্য কথা কইবে, পরামর্শ চাইবে, তার থীসিসের সমস্ত কৃতিত্বই যে ডকটর বাগচীর, একথা বলে বলে কৃতজ্ঞতা জানাবে এবং কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে যাবে।

তবু ওর মধ্যেই ডকটর বাগচী বললেন, 'তোমার আনা সন্দেশ থেকে তুমিই খাও একটু।...জগন্নাথ এক গেলাশ জল আনো তো।'

অবনীশ সন্দেশ খেলো, জল খেলো, আর ডকটর বাগচীর মুখের দিকে না তাকিয়েও অনুভব করলো ওঁর সমস্ত স্নায়ু শিরাগুলো পর্যন্তও যেন কী একটা 'বলি বলি' করছে।

কিন্তু অবনীশ তো বলতে দিতে পারে না। অবনীশ তাই জল খেয়েই আর একটা প্রণাম করে কেটে পড়লো।

অবনীশ অনুভব করলো একখানা মলিন বেদনার্ত মুখ অবনীশের পিছু পিছু এগিয়ে আসছে।

সব রংই ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসে, তীব্র ব্যাকুলতা স্তিমিত হয়ে যায়, নিজেকে সরিয়ে আনতে আনতে অতীত আরো দূরবর্তী হয়।

অবনীশ উচ্চপ্রশংসাধন্য ডিগ্রী লাভ করে।

অবনীশ একটা নামী কলেজে অধ্যাপনার কাজ পায়, কাজে কর্মে ডুবে যায়, আস্তে আস্তে তারও এক ছাত্রদল গড়ে ওঠে। 'স্যারের পড়ানোর ভঙ্গীতে তারা মুগ্ধ।

অকারণেই তো অবনীশ ডকটর বাগচীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছাত্র ছিল না।

কিন্তু অবনীশের আর গুরুগৃহে যাওয়া হয় নি। অবনীশ যেন ওই রাস্তাটা ভুলে গেছে। অবনীশ যেখানে ডকটর বাগচীর আসার সম্ভাবনা থাকতে পারে তেমন তেমন জায়গায় যাওয়াটা ছুতো করে এড়ায়।

আর বাগচীরও তো ক্রমশঃ বয়েস হয়ে আসছে, গতিবিধি ক্রমশঃই সীমিত হয়ে আসছে।

বুকের মধ্যে যে একখানা পাথর বসানো ছিলো, সেটা যেন আর সব সময় অনুভূত হচ্ছে না।

তবু হঠাৎ বিনামেঘে বাজ পড়লো।

অবনীশের এক ছাত্রের পাড়ায় ছাত্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাদের 'সবুজ সংঘে'র বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান অতিথি হয়ে গিয়ে দেখলো অবনীশ মঞ্চে ডকটর বাগচী!

অপ্রত্যাশিত!

একেই তো উনি কোনোদিনই এসবে রাজী হন না বলেন 'আয়ুতো গোনা দিনের এই সব করতে হলেই তার থেকে একটা দিন কমে যাওয়া। বড় লোকসান মনে হয়। জীবনে কতটুকুই বা কী করতে পেলাম, কত বই এখনো পড়তে বাকি অথচ।—

অথচ আজ ডকটর বাগচী একটা নিতান্ত বাজে (খেলাঘরের বললেই হয়) সভাতে এসেছেন।

পাশাপাশি আসন, কথা না কয়ে উপায় নেই। অতএব অবনীশকে বেশীরকম সপ্রতিভ হতে হয়।

অবনীশকে বলে উঠতে হয়, 'আপনাকে ধরে এনেছে এরা? ব্যাপার কি স্যর? 'বাহাদুরী আছে এদের বলতেই হয়!'

ডকটর বাগচীর চোখ বোধহয় আরো খারাপ হয়ে গেছে, তাই তিনি ঝাপসা ঝাপসা গলায় বলেন; 'কে অবনীশ? ওঃ! ধরে আনা মানে—ইয়ে এদের একজন আমার নাতি! মানে ভাগ্নীর ছেলে—গিয়ে বললো। কার্ডে নাম দিতে বারণ করেছিলাম, যদি না পারি, মানে বয়েস হয়েছে তো—

এরপর আর কথা হলো না সভাপতি আর প্রধান অতিথিকে মাল্যদান পর্ব এসে গেল, তারপর ভাষণ পর্ব।

অবশেষে সে পর্বও মিটলো। মঞ্চ থেকে নেমে এলেন গুরু শিষ্য দুজনেই।

ডকটর বাগচী আর বসতে পাচ্ছেন না, শরীর খারাপ। গাড়ি মজুতই ছিল, অবনীশ একটু পিছিয়ে পড়লে কিছুই হতো না, কিন্তু উদ্যোক্তারা অবনীশকেই প্রায় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে দিলো গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়ার সৌজন্যকর্মে।

আর সেই সময়ই বাজটা পড়লো।

পড়লো অবশ্য খুবই মৃদু ভঙ্গীতে, প্রায় নিঃশব্দে! বাতাসে পাতা নড়ার মত মৃদু স্বরের সেই বাজটা অবনীশের কানে এসে আছড়ে পড়লো, 'আচ্ছা অবনীশ, সেই বইটা বোধহয় হারিয়েই গেছে, তাই না?'

পুরো আস্ত একটা কথা বললেন ডক্টর বাগচী। কথাটা কি উনি মুখস্থ করে রেখেছিলেন? অনেক অনেক দিন ধরে?

মৃদু হলেও বাজটা বাজের কাজই করলো।

যে পাথরখানা বুকের মাঝখান থেকে গড়িয়ে পাশে পড়ে গিয়েছিল সেটা আবার ঠেলে একেবারে হৃৎপিণ্ডের ওপর চেপে বসলো, আর সেই চাপে নিঃশ্বাস আটকে যাওয়া অবনীশ একটা নামকরা কলেজের লেকচারার ডকটর অবনীশ ঘোষ বলে বসলো। 'সে কি স্যর! বইটা তো আমি আপনার বাড়িতে দিয়ে এসেছিলাম। অনেক দিনই অবশ্য পড়ে ছিল, মানে আপনার নোট্‌স্‌গুলো দারুণ তো...ইয়ে—।'

বলতে হলো!

দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা করে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ভদ্রশিক্ষিত অবনীশকে তার গুরুর সামনে এই নির্জলা মিথ্যা কথাটা বলতেই হলো। কারণ ভয়ানক একটা লজ্জা অবনীশের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে বসেছে।

ডকটর বাগচী ওর শেষের কথাগুলো শুনতে পেলেন বলে মনে হলো না, তিনি অদ্ভুত অসহায় একটা বিহ্বল দৃষ্টি মেলে বললেন, 'দিয়ে এসেছিলে?'

অবনীশ জোর দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ স্যর! আপনি তখন বাড়ি ছিলেন না। জগন্নাথের হাতে দিয়ে এসেছিলাম।'

ডকটর বাগচী আরো আচ্ছন্ন গলায় বললেন, 'দিয়ে এসেছিলে! জগন্নাথের হাতে!'

অবনীশ তার বক্তব্যে আরো বাস্তবতা আরোপ করলো। আরো জোর দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ স্যর! একটা ব্রাউন পেপারে মুড়ে, একটা সবুজ মত দড়ি দিয়ে বেঁধে—আপনি গিয়ে জিগ্যেস করবেন ওকে। হয়তো আপনাকে বলতে ভুলে গেছে। তুলে রেখেছে কোথাও।'

ডকটর বাগচীর বুকেও কি একটা পাথর আটকেছে, তাই তাঁরও নিশ্বাস ফেলতে

কষ্ট হচ্ছে? তাই সেই দমবন্ধ গলাতেই প্রশ্ন করছেন, 'গিয়ে জিগ্যেস করবো? জগন্নাথকে? কতদিন আগে দিয়ে এসেছিলে?

'কতদিন আগে? তা প্রায়—'

অবনীশ অনুমানকে বিস্তৃত করবার ভান করে, অতঃপর সঠিক হয়, মাসতিনেক আগে। হ্যাঁ তিন মাসই হবে আমাদের সেদিন জেনারেল মিটিং ছিল।

ডকটর বাগচী চোখ থেকে তার সেই অস্বাভাবিক পুরু কাঁচের চশমাটা খোলেন, রুমাল দিয়ে মোছেন, আবার চোখে লাগান, তারপর সেই পরিষ্কার কাঁচের মধ্যে থেকে পরিষ্কার চোখে তাকিয়ে বলেন, 'সাত মাস হলো জগন্নাথ মারা গেছে অবনীশ!' তারপর আস্তে গাড়িতে গিয়ে ওঠেন।

গাড়িটা চলে যায়, অবনীশ দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ অবনীশ নামের ওই হতভাগ্য জীবটার বুকের মধ্যে ওই পরিষ্কার কাঁচের ওপার থেকে চাওয়া পরিষ্কার দৃষ্টিটা একেবারে পেরেকের মত পুঁতে আছে।

হয়তো চিরদিনই থাকবে, কারণ কবে যেন রেডিওর সেই খবরটা শোনার পরও যখন রয়েই গেল। বরং যেন পেরেকটা গভীরে পুঁতে যেতে লাগলো কোনো একটা জায়গা কেটে কেটে—যখন আকাশবাণীর ঘোষকের গলা আকাশ বাতাস উচ্চকিত করছে, 'গতকাল রাত্রি তিনটার সময় বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডকটর চন্দ্রনাথ বাগচী হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হয়েছিলো আটাত্তর বছর, তিনি—'

২'টি ফসফোমিন টনিক...

ফসফোমিন আয়রন

মেয়েদের জন্যে আয়রন টনিক

ফসফোমিন আয়রন শরীরে আয়রন বাড়াবার এক অতিরিক্ত উপায় যা রক্তকে লাল করতে আর শরীরে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। প্রত্যেক দিন নিন মেয়েদের জন্যে তৈরী এক আয়রন টনিক—ফসফোমিন আয়রন।

ফসফোমিন ভিটামিন

পরিবারের সকলের জন্যে ভিটামিন টনিক

ফসফোমিন-এ আছে বি কমপ্লেক্স ভিটামিন আর পুরো মাত্রায় গ্লিসারোফস্‌ফেট্‌স যা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে ২'টি ফসফোমিন টনিক

ফসফোমিন টনিক খিদে বাড়ায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যোগায় আর প্রফুল্ল করে তোলে।

SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS LTD. ®ই. আর স্কুইব ও সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এস. সি. এল.

Shilpi SC 8A/74 ben

এই বাংলার খবর

বন্দর ধর্মঘট

দেশের আর সব বন্দরের মতো কলকাতাও ১৬ জানুয়ারী থেকে চার দিন অচল হয়ে ছিল। আর সব বন্দরের মতো কলকাতারও অধিকাংশ বন্দর ও ডক শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯ তারিখ প্রায় মাঝরাতে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিদের ফয়সালার ফলে চার দিনের মধ্যেই মিটে গেল এই ধর্মঘট। কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান শ্রীপি সি মিত্র জানান যে, দু-একটি ছাড়া সব কটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এই ধর্মঘটে সমর্থন জানিয়েছিল। যে-সব সংস্থা ধর্মঘট সমর্থন করেনি তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো শ্রমিক কাজে যোগ দিতে এলে তাদের বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে মোটের ওপর এই ধর্মঘট শান্তি-পূর্ণই ছিল। কোনো বড় রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ধর্মঘট শুরু হওয়ার পরই পোর্ট কমিশনার্স আর রাজ্য সরকারের সবচেয়ে বড় ভাবনা হয়ে দাঁড়ায় কী করে আটকে-থাকা জাহাজ থেকে মাল খালাস করা যায়, বিশেষত যে-সব জাহাজে রয়েছে খাদ্যশস্য, সার আর অশোধিত তেল। ধর্মঘট যখন শুরু হয় তখন নেতাজী সুভাষ আর খিদিরপুর ডকে ছিল ৪১টি বাণিজ্য জাহাজ। তার মধ্যে ছ'টিতে ছিল খাদ্যশস্য আর দু'টিতে সার। তাছাড়া সাগর দ্বীপ আর স্যাণ্ডহেডসেও ছিল কয়েকটি। ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে সাগর দ্বীপে খাদ্যশস্যবাহী জাহাজের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত। ঐ সব জাহাজে এসেছে ৪২ হাজার টন খাদ্যশস্য। আর ডকে যে-সব জাহাজ আটকে ছিল তাতে এসেছে ১৯ হাজার টন খাদ্যশস্য। বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্য সরকারের আলোচনার পর ঠিক হয়, জাহাজ খালাস করার কাজে আঞ্চলিক বাহিনীর সেনাদের কাজে লাগানো হবে। তৃতীয় দিনে এই সেনারা জাহাজ থেকে গম নামানোর কাজ শুরু করে দেন। তাছাড়া নৌ-বাহিনীর লোকেরাও বন্দর সচল করার কাজে হাত লাগায়। চতুর্থ দিনে আসরে নামেন জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্মীরা।

চার দিনের এই ধর্মঘটের ফলে কলকাতা বন্দরে গুদাম ও জাহাজে যে-সব মাল আটকে পড়ে আছে তার দাম প্রায় ৯০ কোটি টাকা হবে বলে জানানো হয়েছে। পোর্ট কমিশনার্সের দৈনিক লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় দশ লাখ টাকা। তাছাড়া আটক প্রতিটি জাহাজের দৈনিক ক্ষতি হয় ২২ হাজার টাকা। বন্দরের ডক, সাগর দ্বীপ আর স্যাণ্ডহেডসে আটক জাহাজের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় ৬৯টি। অর্থাৎ তাদের দৈনিক ক্ষতির মোট পরিমাণ ১৪ লাখ টাকার বেশি।

বিরোধীদের আন্দোলন

এই বাংলার বিরোধী দলগুলো আবার নড়েচড়ে বসছে। নটি বামপন্থী দল কলকাতা ময়দানে সভা করে সক্রিয় ও লাগাতার আন্দোলনে নামার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। যে-সব দাবির ভিত্তিতে এই আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বামপন্থী নেতারা বলেছেন তার মধ্যে কয়েকটি হলো : গ্রাম ও শহরের মানুষকে ন্যায্য মূল্যে— রেশন দোকান থেকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য যোগাতে হবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাতে হবে ১৯৬৯ সালের দরে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যাতে না-বাড়ে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, বেকারদের কাজ এবং কাজ না-পাওয়া পর্যন্ত ভাতা দিতে হবে, দুর্নীতির অবসান ঘটাতে হবে। তার সঙ্গে রয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি।

এদিকে পৃথক এক আন্দোলনে নামছে এই রাজ্যের নব-নির্মাণ সমিতি, আর পিছনে প্রধান অনুপ্রেরণা জয়প্রকাশ নারায়ণ। এই নবনির্মাণ সমিতি তৈরি হয়েছে সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, সোস্যালিস্ট পার্টি, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি, লোকদল, সর্বসেবা সংঘের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য নির্দল ব্যক্তিদের নিয়ে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এই সমিতির সভাপতি। এই দুটি আন্দোলন পৃথক ধারায় চলবে, তবে একটা যোগসূত্র তৈরি করার চেষ্টা চলছে। সেই উদ্দেশ্যেই সি পি এমের জ্যোতি বসু, আর এস পি'র মাখন পাল, ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ এবং সোস্যালিস্ট পার্টির বিমান মিত্র প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে দেখা করেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে। তাঁদের এই আলোচনাকে রাজ্যের রাজ-নীতিতে একটা নতুন দিকচিহ্ন বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ অতীতে প্রফুল্লবাবু আর এইসব বামপন্থী নেতা ছিলেন বিপরীত শিবিরের লোক। তাঁদের দেখাও হলো অনেক দিন পরে। অবাধ নির্বাচন আর গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে সব বিরোধী দল মিলে আন্দোলনে নামার প্রস্তাব নিয়ে বামপন্থী নেতারা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে গিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে আরো আলাপ-আলোচনা হবে। তবে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি এই ধরনের যুক্ত আন্দোলন শুরু হতে পারে বলে প্রকাশ।

শিক্ষায় হেরফের

১৯৭৬ সাল থেকে এই বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় হেরফের হচ্ছে। ঐ বছরই নতুন দশ ক্লাসের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রথম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্থির হয়েছে ঐ বছর থেকেই চালু হবে দু বছরের নতুন উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যসূচী। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি পাওয়ার আগে পড়তে হবে পনের বছর—দশ বছরে স্কুল ফাইনাল, দু বছরে উচ্চ মাধ্যমিক এবং আর তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা কমিশন গোটা দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করেন বেশ কয়েক বছর আগে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার তদারকি ও পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরিষদের হাতে। এই পরিষদ গঠনের জন্যে অল্পদিনের মধ্যে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এই দু বছরের পাঠ্যসূচী হবে মাধ্যমিক শিক্ষারই অঙ্গ। কলেজী শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে এর কোনো যোগ থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয় বা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যে-সব স্কুল বা কলেজ এই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পঠন-পাঠনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে সেখানেই এই পাঠ্যসূচী পড়াবার ব্যবস্থা হবে। তবে রাজ্যের শিক্ষকমহলে এই নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। ঠিক কী ভাবে দু বছরের নতুন পাঠ্যসূচী পড়ানো হবে তা এখনও তাঁদের অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। তাছাড়া আসছে বছরের মধ্যে প্রস্তাবিত উচ্চ মাধ্যমিক পরিষদ গঠনের

যথেষ্ট সময় নেই বলেও অনেকের ধারণা। স্কুল এবং কলেজ, দু জায়গাতেই এই নতুন কোর্স পড়াবার ব্যবস্থা হলে কলেজেই ভিড় বেশি হতে পারে আর তা হলে নতুন সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

মহনগরীর অপরাধ

কলকাতায় অপরাধের সাম্প্রতিক ধরণধারণে পুলিশ কর্তৃপক্ষ খুব বেশি উদ্বিগ্ন নন। পুলিশ কমিশনার ১৯৭৩ আর '৭৪ সালের তুলনামূলক হিসেব দিয়ে বলেছেন, গত বছরের রাজনৈতিক ডামাডোল, জিনিসপত্রের চড়া দাম, রেশনে খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাস ইত্যাদির কথা মনে রাখলে অপরাধের হার সামান্য বলেই মনে হবে। তাছাড়া বোম্বাইয়ের সঙ্গে তুলনা করেও তিনি দেখান যে, ঐ মহানগরীর তুলনায় কলকাতায় খুন জখম রাহাজানির সংখ্যা বেশ কম। ১৯৭৪ সালে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সংখ্যা ছিল এই রকম (বন্ধনীর মধ্যে '৭৩ সালের সংখ্যা) ঃ খুন ৬৯ (৬১), ডাকাতি ১২ (৯), রাহাজানি ৬৩ (৬৪), ছিনতাই ৪৫৮ (৪৩৫) দিনে চুরি ১০৪ (১৮৯), রাতে চুরি ৫৬৭ (৫৩৮)। ৬৯টি খুনের মধ্যে ৫২টির কিনারা করা গেছে।

আগের বছরের তুলনায় '৭৪ সালে কলকাতায় পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল কম। '৭৩ সালে পথ দুর্ঘটনায় নিহত হন ৪৬৮ জন এবং আহত হন ৩২৯৮ জন। গত বছর এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৮২ এবং ২৯৪৯ জন। সংঘর্ষের সংখ্যাও কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৮৮৪৫ থেকে ৬৯৬১টি। কলকাতায় যানবাহন বেড়েছে, তবু যে দুর্ঘটনা বাড়ে নি এতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ খুশী।

ভূগর্ভ রেল

কলকাতার 'নিজস্ব রেল' ভূগর্ভ রেলের জন্যে রাস্তা খোঁড়ার কাজ শেষ পর্যন্ত শুরু হলো। শুরু হলো উত্তর কলকাতাতেই। বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনির মোড় থেকে ভেটেরিনারি কলেজ পর্যন্ত প্রথম দফায় মাটি খোঁড়ার কাজ চলবে। 'কাট এণ্ড কভার' পদ্ধতি অনুযায়ী ওপর থেকে মাটি খুঁড়ে কংক্রিকেটের কাজ সেরে তা আবার বুজিয়ে দেওয়া হবে। এর জন্যে ঐ রাস্তার যানবাহন অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এত দিন পর্যন্ত ভূগর্ভ রেলের যা কাজ হয়েছে সবই মাটির ওপরে। দমদম স্টেশন থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত ঐ রেল আসবে মাটির ওপর দিয়েই। তাই দমদমের কাছে যা কাজ হয়েছে তা মাটির ওপরেই হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় দু দফায় যানবাহন চলাচলের মহড়া হয়েছে থিয়েটার রোড থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত। ঐ মহলা দেখে মনে হয়েছিল প্রথম মাটি খোঁড়ার কাজ দক্ষিণ কলকাতা অথবা ময়দান এলাকাতেই শুরু হবে। উত্তর কলকাতায় কোনো মহলা না-করে সরাসরিই মাটি খোঁড়ার কাজে হাত দেওয়া হলো। এই খোঁড়াখুঁড়ির কাজের ফলে জনসাধারণের সাময়িক অসুবিধে হবে হয়ত, কিন্তু ভূগর্ভ রেলের কাজ যে সত্যি-সত্যিই শুরু হলো তা দেখে কলকাতার মানুষ খুশীও হবেন নিশ্চয়ই।

২০।১।৭৫

—দেবদত্ত

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু এ-সুন্দর মহনীয় সত্যকে আমি জানার মতন জেনেছিলাম শুধু শ্রীঅরবিন্দকে ভালোবেসে নয়, উমাকে (ও পরে ইন্দিরাকে) ভালোবেসেও বটে। বলতে কি, সময়ে সময়ে আমার এমনও মনে হত যে সে কতকটা ভাষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের বাণীর : যে, দীক্ষাপ্রার্থী দীক্ষাদাতার সত্তার সারক হয় নিজের সাহিষ্ণুতার (receptivity) অনুপাতেই। এ-পরম আনন্দময় সত্যটি আমি আরো পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলাম যখন ইন্দিরা আমার শিষ্যা হয়ে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেয়। কিন্তু তার কথা যথাস্থানে—আগে উমার সম্বন্ধে বলি যা বলতে চাই—বিশেষ করে তার সঙ্গে আমার আত্মিক আদানপ্রদানের কথা। এ-কথার অর্থ—তার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও ছিল—মেলামেশার হাসিখুশির দেওয়া-চাওয়ার—কিন্তু এ-সব সম্বন্ধেরই শিরোনামা ছিল—গুরুশিষ্যার সম্বন্ধ, আমি তাই তাকে টানতে চাইতাম ধর্মের দিকে, সে কিছুটা ঝুঁকেও ছিল। কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝবে?—সে ১৯৩৮ সালে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে আসা সত্ত্বেও তাঁর দর্শন পেল না—হঠাৎ পড়ে গিয়ে তাঁর উরুভঙ্গ হওয়ার দরুন। শ্রীঅরবিন্দকে সে গুরুবরণ করতে আসেনি, এসেছিল আমার গুরুভক্তির ছোঁয়াতে তার জন্যেও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ভক্তি জেগেছিল বলে।

তারপরেই ঘটল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা যার ফলে তার মন বেঁকে বসল। এ-দুর্দৈবের কাহিনী আমি আমার 'ভূস্বর্গচণ্ডলে' ফলিয়েই লিখেছি। তাই এখানে সংক্ষেপে বলব যদিও যা ঘটেছিল দু'কথায় তার ভাষ্য করা সুকঠিন।

হল কি, আমরা আসামে শ্রীহট্ট থেকে শিলচর যাচ্ছিলাম সদলবলে। শিলচরে আমার ও উমার নিমন্ত্রণ ছিল এক সংগীতসভায়। আমি সভাপতি। যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করেছিলেন উমার স্নেহময় উদার পিতা ধরণীধর বসু। এক মস্ত বাস নেওয়া হল—যাত্রী আমরা তেরোজন—উমা ধরণীদা উমার মা মাসিমা দুই মামা বোন ভাই পাহাড়ী সান্যাল তজ্জায়া মীরা জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ আমার এক আত্মীয় লাটু ও আমি।

বর্ষাকাল। সারথি অপটু। মাঝপথে বাস উল্টে গিয়ে পড়ল এক জলভরা খাতে। আমরা সকলেই কমবেশি আহত হয়েছিলাম, কিন্তু ধরণীদার বুকের অনেকগুলি পাঁজর ভেঙে গেল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু।

এখানে সংক্ষেপে আমার একটি আশ্চর্য উপলব্ধির কথা বলি—তার বিবৃতি দিয়েছি আমার ভূস্বর্গচণ্ডলে। কেবল আগে বলে রাখি—আমি বাস্‌এ সারথির পাশে বসে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করছিলাম আর দেখছিলাম সামনের স্পিডোমিটারে বাস ছুটেছে ঘন্টায় ৪০—৪৫ মাইল। পরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বলেছিলেন এই জপের ফলেই আমি রক্ষা পেয়েছিলাম। যাক, এবার উদ্ধৃতির পালা সুরু করি। দুর্ঘটনাটি ঘটে ৩রা জুলাই ১৯৩৯ সালে :

বাস চলল হু হু শব্দে—সুর্মা নদীর পাশ দিয়ে। বর্ষাকালের উচ্ছল জলদলকলরব'।...হঠাৎ একটা বেঁক...বাস টলল—ঐ ঐ ঐ ঐ—টাল সামলাতে না পেরে পড়ল একটা ডোবার বাঁকাতে। আমি ঘোর বেগে ছিটকে পড়লাম আমার বাঁ কাঁধের উপর!... বুকে চোট লাগল রগেও এক জায়গায় খুব কেটে গেল—আঘাত সাংঘাতিক না হলেও রক্তে মুখ ভেসে গেছে।...

কিন্তু সব ভুলে গেলাম মেয়েদের কান্না শুনে। ঝাঁটিতে উঠে পিছল কাদায় ডোবায় নামবার চেষ্টা করছি আগে ছোটদের ওঠাতে—কিন্তু এত কাদা, পা দাঁড়ায় না। যাহোক, আমাকে ডোবায় নামতে হল না—দেখতে দেখতে প্রায় দশ পনেরো জন গ্রামবাসী লাফিয়ে পড়ল জলের মধ্যে, একে একে টেনে তুলল সবাইকে।...

সবাই মিলে ধরণীদাকে তুললাম কাছের একটা ডিস্পেন্সারিতে—পাড়াগেঁয়ে ডিস্পেন্সারি, মেটে ঘর।...

আন্দাজ সকাল আটটার সময় মোটর-দুর্ঘটনা ঘটে—ধরণীদা মারা গেলেন বেলা দুটোর কাছাকাছি। দুবার বলেছিলেন 'শ্রীঅরবিন্দ'।...

মঙ্গলময়ের সৃষ্টিতে অমঙ্গল কেন? সত্যেশ্বরের সৃষ্টিতে মিথ্যা কেন? আনন্দবিধাতার সৃষ্টিতে নিরানন্দ কেন? অরূপ অসীমের অপাপবিদ্ধের সৃষ্টিতে শোক তাপ কেন? মন কি পায় কোন শেষ প্রশ্নের চরম জবাব?

তবু একটা কথা বলব—যদিও ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন সে-বিচিত্র অনুভূতি...

যখন আমাদের বাসটি পড়ে যায় তখন আমার চেতনার প্রতিটি তন্তু ছিল এক তীক্ষ্ণ সজাগ সুরে বাঁধা। স্পষ্ট মনে আছে—একটুও ভয় আসে নি, যদিও মৃত্যুকে খুবই কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলাম।... পরিষ্কার মনে আছে—একটা অপূর্ব নির্ভয়ের ভাব মনে বিছিয়ে গেছে। সে-দুর্লগ্নে আমার উদ্বেজিত হওয়ারই কথা—দৈহিক যন্ত্রণা আমি আদৌ সইতে পারি না, কিন্তু তবু মনের অতলে এক আশ্চর্য স্থৈর্য ছিল নিটোল হয়ে...আরো আশ্চর্য এই যে, আমার স্নায়ু একটুও চঞ্চল হয় নি। কারণ পতনের মুহূর্তে যদিও আমি বোধ করেছিলাম যে, আমি এক অলক্ষ্য মারণশক্তির কবলে, পড়ছি পাতালে, তবু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও অনুভব করেছিলাম যে, কে যেন আমাকে ধারণ করে আছে বর্মের মতই আগলে। আমার নিজের কোনো যোগ্যতায় যে এ-অঘটন ঘটে নি এ-চেতনাও আমার ছিল—অযোগ্য না হলে করুণার অবকাশ কোথায়?...তাই প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুযন্ত্রণায় গভীর বেদনা পেলেও ভগবানের কাছে কোনো অনুযোগ করবার কথা মনে হয় নি শুধু এই প্রার্থনাই জেগেছিল :

অকূলপানে মনকে আমার দাও ফিরিয়ে,
হে কাণ্ডারী!
মেলতে শেখাও উদাস প্রাণের পালগুলি
সব তোমার মুখে।
তরী আমার আজ তোমাকে বরণ করে,
হে দিশারি,
ছুটুক উধাও শ্রীচরণে আলোয় ছায়ায়
দুঃখে সুখে।...
তুমি যদি হাত না ধরো—
একলা পথে কোথায় সাথী?
তোমার মলয় বিনা প্রেমল,
বাসন্তী প্রশান্তি কোথা?
শুধু তোমার প্রসন্নতার উষার কাটে
অশ্রুরাতি,
শুধু তোমার প্রেমের প্রভায় যায়
মিলিয়ে আঁধার-ব্যথা।
আড়াল সরে আজ গেছে,
তাই উঠলে ফুটে স্মরণীয়!
করালী আজ কিরণমালী—
মরণে জয়শঙ্খ বাজে।
আঘাত দিয়ে দেখালে—
'কে ব্যথার মাঝে বরণীয়,
শূন্যতারো একাকারে
সার্থকতা আছেই আছে'।

(ক্রমশঃ)

দেশ বিদেশ

কাশ্মীরে মীমাংসা

কাশ্মীর সংক্রান্ত আলোচনা এখন একটা মীমাংসার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। শেখ আবদুল্লার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরাসরি ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধির মারফৎ বেশ কিছুকাল যাবৎ এই আলোচনা চলছিল।

গত ১৭ জানুয়ারি দিল্লিতে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে শেখ আবদুল্লার আলোচনার পরই সংবাদ পাওয়া যায় যে, খুব শীগ্‌গির, সম্ভবত আগামী মাসে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসছেন এবং সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী মীরকাশিমকে দিল্লিতে মন্ত্রী করে নিয়ে আসা হচ্ছে।

শেখ আবদুল্লার সঙ্গে আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে কাশ্মীরের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে আসছিলেন। শেখ আবদুল্লার বয়স হয়ে গেছে। তাঁর জীবৎকালে তিনি যদি কাশ্মীর সমস্যার একটা গতি করে দিয়ে না যান তাহলে অন্য কোন নেতার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। শেখের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নয়াদিল্লি তাঁর সহযোগিতা চাইছিল।

শেখ যদি এখন সেই সহযোগিতা দিতে রাজি হয়ে থাকেন তাহলে কি সর্তে রাজি হয়েছেন সেটা এখনও জানান হয় নি। শেখ নিজে বলেছেন, তিনি ক্ষমতায় ফিরে আসছেন, এটা নিছক জল্পনা। আলোচনা অবশ্য এখনও কিছু বাকি আছে। কেননা, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শেখের আর এক দফা বৈঠকের কথা আছে। কিন্তু আলোচনা যে আশাব্যঞ্জক শেখ নিজেই সেকথা স্বীকার করেছেন।

কাশ্মীরের শাসনদায়িত্ব নেওয়ার জন্য এতদিন যাবৎ শেখ আবদুল্লা প্রধান যে সর্তটি দিয়ে আসছিলেন সেটি হল, ১৯৫৩ সালের পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ কাশ্মীরের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। ভারত সরকার প্রথমাবধিই এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন। তা সত্ত্বেও শেখ আবদুল্লা যদি কোন মীমাংসায় পৌঁছে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ঐ দাবি নিয়ে শেষ অবধি পীড়াপীড়ি করেন নি।

অন্য যেসব প্রশ্ন নিয়ে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে কেন্দ্রের আলোচনা চলছিল সেগুলির মধ্যে একটি হল, নতুন ব্যবস্থায় কাশ্মীরে কংগ্রেস, গণভোট ফ্রন্ট ও শেখ আবদুল্লার জাতীয় সম্মেলনের কি হবে। শেখ চেয়েছেন, কংগ্রেস ভেঙে দেওয়া হোক এবং তাঁকে জাতীয় সম্মেলন সংস্থাটি পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে দেওয়া হোক। কেন্দ্র জাতীয় সম্মেলনের পুনরুজ্জীবনে আপত্তি না করলেও কংগ্রেস ভাঙতে রাজি নয়। অপর পক্ষে কেন্দ্র গণভোট ফ্রন্টের বিলুপ্তি চায়। কারণ যে সংস্থা কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে বিশ্বাস করে না, তাকে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে না। এই প্রশ্নের মীমাংসা শেষ পর্যন্ত কি সর্তে হবে তা জানা নেই।

মিজোরামে বিদ্রোহী তৎপরতা

গত ১৩ জানুয়ারি মিজোরামের রাজধানী আইজল শহরে পুলিশের ইনস্পেকটর জেনারেলের সুরক্ষিত কার্যালয়ে হানা দিয়ে ও সেখানকার তিনজন পদস্থ পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে বিদ্রোহী মিজোরা নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছে।

ঐদিন বিকালে আই জি পুলিশের দপ্তরের কাছে রাস্তার উপর একটি জিপ গাড়ি এসে দাঁড়ায়। জিপ গাড়িটি থেকে পুলিশের পোশাক পরা কয়েকজন চটপট করে নামলেন। লন পেরিয়ে প্রায় একশ গজ দূরে অফিসের মধ্যে তাঁরা ঢুকে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা বেরিয়ে এসে ঐ গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। আরও কিছুক্ষণ বাদে টের পাওয়া গেল, পুলিশের ইন্স-

পরের সংখ্যায় বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প

পেকটর জেনারেলের যে ঘরটিতে একটা বৈঠক চলছিল সেখানে তিনটি গুলিবিদ্ধ প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে। মৃতদেহ তিনটি হচ্ছে ইনস্পেকটর জেনারেল জি আর্থ ডি-আই-জি সি বি সেওয়া ও আইজলের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইউ এস পি কে পণ্ডপাকেশনের।

নয় বছর আগে মিজোরামে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার পর থেকে এতবড় একটা ঘটনা আর ঘটে নি। ফলে মিজোরামে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অপরাধীর সন্ধান চলছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা হচ্ছে। আইন ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি আইজলে আসছেন।

দশ মাস আগে গত বছর মার্চ মাসে লেঃ গবর্নর শান্তিপ্রিয় মুখার্জির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করার যে চেষ্টা হয়েছিল তার পর এটাই হল বিদ্রোহী মিজোদের তৎপরতার বৃহত্তম ঘটনা।

অধিকতর জনসমর্থন লাভের আশায় বিদ্রোহী মিজোরা সম্প্রতি মিজোরাম থেকে মিজো ছাড়া অন্যান্য সকলকে তাড়িয়ে দেওয়ার আওয়াজ তুলেছে। তারা ইস্তাহার ছড়িয়ে দিয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, যারা মিজো নয় তারা যদি ১ জানুয়ারি তারিখের পরও মিজোরামে থাকে তাহলে তাদের শাস্তি পেতে হবে। তিনজন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে তারা হয়ত তাদের সেই হুঁশিয়ারিকেই কার্যে পরিণত করল। নিহত এই তিনজন পুলিশ অফিসারের কেউই মিজোরামের অধিবাসী নন। শ্রীআর্য ছিলেন উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী, শ্রীসেওয়া দার্জিলিং-এর ও শ্রীপণ্ডপাকেশন কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন।

রুশ-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি

১৯৭২ সালের রুশ-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করে সোভিয়েট রাশিয়া জেনে-বুঝেই একটা ঝুঁকি নিয়েছে। ঝুঁকিটা হচ্ছে এই যে, উত্তেজনা প্রশমন করে এই দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের যে চেষ্টা বেশ কিছুকাল যাবৎ দুই দেশের সরকার চালিয়ে আসছিলেন তাতে এবার হয়ত বড় রকমের একটা আঘাত লাগবে।

ঘটনার এই পরিণামের মুখ্য দায়িত্ব অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার ততটা নয় যতটা মার্কিন কংগ্রেসের। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাবের উপর সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য সর্ত চাপিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা করেছিলেন তারই প্রতিবাদে সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৭২ সালের চুক্তি বাতিল করেছে। 'জ্যাকসন সংশোধন' নামে পরিচিত ঐ সর্তে বলা হয়েছে যে, সোভিয়েট রাশিয়া যদি তার অধিবাসীদের, বিশেষ করে ইহুদীদের, অবাধে দেশত্যাগ করে যাওয়ার অনুমতি দেয় তাহলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ সুবিধাজনক সর্তে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করবে এবং তাকে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক ঋণ দেবে। এটা রাশিয়ার ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে মস্কো ঐ সর্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে।

এর আগে শোনা গিয়েছিল যে, রাশিয়া ইহুদীদের দেশত্যাগ সম্পর্কে কড়াকড়ি শিথিল করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে এমন কোন সর্তে সম্মতি দেওয়া রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, তাহলে পশ্চিম এশিয়ায় সোভিয়েট কূটনীতির ক্ষতি হবে, এবং দ্বিতীয়ত দেশের ভিতরে ব্রেজনেভের নেতৃত্বে টান পড়তে পারে। মার্কিন সিনেটর জ্যাকসন যখন ইহুদীদের দেশত্যাগের অধিকার সংক্রান্ত সর্ত আরোপ করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন তখন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার একটি পত্র দিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া প্রতিবাদ করে জানায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথামত রাশিয়া তার দেশের ইহুদীদের দেশত্যাগ করতে দেবে বলে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় নি।

রাশিয়ার এই প্রকাশ্য অস্বীকৃতি সত্ত্বেও মার্কিন কংগ্রেস 'ট্রেড রিফরম বিলের' সঙ্গে জ্যাকসন সংশোধনটি যুক্ত করে দেওয়ায় শুধু যে রাশিয়াই ক্ষুব্ধ হয়েছে তা নয়, মার্কিন সরকারও অসুবিধায় পড়েছেন। এই কারণেই প্রেসিডেন্ট ফোর্ড সম্প্রতি দাবি করেছেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্কিন আইনসভা যেন তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেন।

১৯।১।৭৫ —পুণ্ডরীক

ফাদার দ্যতিয়েন রোজা নামচা

মুন্সী সেখ মহম্মদ জাকির মিয়ার চৌকাঠ পেরোতে না পেরোতেই বুঝলাম, বিস্মিল্লায় গলদ। আমার গাফিলতি আসলে দ্বিবিধ ঃ এক, আমি—চিরন্তনী প্রথা অনুযায়ী—চাঁট রেখেছি দরজায়, যা নাকি ইসলামীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী; দুই, যুক্তকরে জানিয়েছি 'নমস্কার', যার মধ্যে—ভেবেছেন কি?—শিরকের [অর্থাৎ বহুদেববাদের] আমে আছে ঃ একমাত্র নমস্য তিনিই, যাবতীয় মখলুকাত যিনি পয়দা করেছেন, আসমানে জমীনে যাঁর শরিক নেই।

জাকির মিয়ার মতে ইসলামীয় অভিবাদনের নিয়মটা এইরূপ ঃ চলমান মুমিন উপবিষ্ট মুমিনকে, সওয়ারী মুমিন পদব্রজী মুমিনকে, গৃহস্বামী মুমিন নবাগন্তুক মুমিনকে, প্রস্থানোদ্যত মুমিন গৃহস্বামী মুমিনকে বিশুদ্ধ আরাবী ভাষায় জানাবে ঃ 'শান্তি তোমার উপর বিরাজ করুক!' সম্ভাষণটা মোস্তাহাব—তার উচ্চারণে সোয়াব আছে; উত্তরটা ওয়াজিব—অনুচ্চারণে গুণাহ হয়; তোমারও উপর শান্তি বিরাজ করুক!' ব্যতিক্রম আছে ঃ এই ধরুন, আপনি খেতে বসেছেন, আপনার পক্ষে কারও শান্তি কামনা গ্রহণ করা দুরস্ত নয়। আর দেখবেন, কোনোমতেই মাথা নত করবেন না, হস্তোত্তোলনও করবেন না। [অভিনন্দনীয় ব্যক্তি বধির হলে অবশ্য সালামের ইঙ্গিতেই হস্তোত্তোলন অনুমোদিত]।

আরাবী ভাষার আলিফ-বা-তা না শিখলেও আর-পাঁচজন শিক্ষিত বাঙালীর মতো আমিও জানি 'আসসালামু আলায়কুম' অভিবাদনটা অবিসম্বাদিতভাবে বহুবচন। পরম বিনয় সহকারে জাকির মিয়াকে জানালাম ঃ 'ফরাসিরা একবচনে বলে 'সালামালেক' আর ফরাসিরা যা বলে, তা ঠিক!' ভদ্রলোকও সাবিনয়ে উত্তর দিলেন ঃ ফরাসিরা মাথামুণ্ডু কিস্যু জানে না! মানুষমাত্রেরই আছে কিরামান-কাতিবীন নামক দুজন দেবদূত, যাঁরা নাকি মানুষের যাবতীয় নেক ও বদ কাজের হিসাবিকর্তা!...আরাবী ভদ্রতা দেখুন ঃ শুধু মর্ত্য মানুষকে নয়, ওরা সেই দুই গায়েবী (অদৃশ্য) সহচরকেও ওরা অভিবাদন জানায়। সদৃশ কারণে [বেহেস্তবাগে ফেরেস্তাবাহিনীর দ্বারা তিনি পরিবৃত বলে] আল্লাতালা কোরান মজীদের বহুলাংশে বহুবচনেই তাঁর কালাম শরীফ নাজিল (অবতীর্ণ) করেছেন।

আমি বেদীন (বিধর্মী) ঃ সালাম আমার প্রাপ্য নয়। যে-মজলিসে মিশ্রধর্মের সমাবেশ, অভিবাদনকারী মুমিনের পক্ষে সেখানে যথার্থ ফর্মুলা এই ঃ 'যে-সৎপথের অনুসরণ করে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!' দোয়াটা বোধ হয় সেই দেশে ও সেই সময়ে উৎপন্ন হয়েছে যেখানে যখন অমুমিনদের ঘোড়া চড়তে দেওয়া হত না, রাস্তাঘাটে মুমিনদের সামনে ওদের পথ ছাড়তে হত, খ্রীষ্টানদের ও ইহুদীদের যথাক্রমে নীল ও হলদে নির্দেশক চিহ্ন পরতে হত।

আমার আদাব আরজ অভিবাদনের উত্তরে জাকির মিয়া বলেন, 'আল্লাতালা আপনাকে সুমতি দিন!...' অর্থাৎ কিনা ঃ আল্লাতালার অসীম মেহেরবাণী লাভ করে আমি (ফাদার দ্যতিয়েন) যেন অনতিবিলম্বে মিয়ার কাছে 'ইমান আনি'।... আমার অস্বীকৃতিসূচক স্মিত হাসি দেখে তিনি বলেন ঃ 'আপনার দিলের মধ্যে পাথর ভরা আছে!'

...জাকির মিয়া লোকটা খাঁটি। না, মৌলানা মৌলবী টাইপের তিনি কেউ নন; তবে কিনা কালো ঝুঁটি সেই লাল গোল টুপিটা পরে [ঐ তুর্কী ফেজটা পৈত্রিক সম্পত্তি—মুমূর্ষু আব্বার কাছে অন্তিম উপহাররূপে প্রাপ্ত, জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে সমর্পণীয়] তিনি যে-মধুর কণ্ঠস্বরে তেলাওয়াত (কোরান পাঠ) করেন, হাফিজকারীরাও—কোরান-পাকের প্রতিটি অক্ষর যাঁদের কণ্ঠস্থ—এত সুন্দরভাবে তা করতে পারেন কি না, সন্দেহ।

না, গান তিনি করেন না, তাঁর পোলাপোতাদেরও করতে দেন না; গান গাওয়া ও শ্রবণ করা কবির গুনাহ, গুরুপাপ ঃ বে-তোবা অবস্থায় মরলে দোজখে যেতে হয়! আলেম লোকেরা ও-সব পাপের অনেক তফশীল করেছেন ঃ ঘুষ দেওয়া, সুদ নেওয়া, জুয়ো খেলা দাড়ি কামানো কাফিরের সঙ্গে দোস্তি রাখা!...শেষোক্ত পাপের ভয়ে বোধহয় জাকির মিয়া আমাকে ফাদার না বলে বলেন সাহেব, কিংবা বড়জোর 'রাহিব সাহেব' ঃ 'নবীত্ব-প্রাপ্তির আগে হজরত মহম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবার [তাঁর উপর আল্লাতালার আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হোক] এমন এক ধর্মপ্রাণ রাহিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল...।'

সেই পাপের ভয়ে বোধহয় সুন্দরবনস্থিত সেই সুদূর বাসন্তীতে আমার ক্লাস থ্রি-র ছাত্র ওলিউল এবং তার চাচাজাদ ভাই আতোয়ারও [যাদের জলজ্যান্ত চার চারটি নানীজান ছিল] আমাকে শুধু 'সার' বলত। মুমিন, ইহুদী, নাসারা (নাসারেথনিবাসী যীশু প্রচারিত ধর্মাবলম্বী), সাবেয়ীন, আতশপরস্ত (অগ্নিপূজারী পার্শী) মুশরেক (বহুদেবপূজক) ও মুনফিকদের (বিশ্বাসভ্রষ্টদের) জন্য নির্দিষ্ট জাহান্নাম প্রমুখ সাতটা দোজখের নাম ওদের মুখস্থ ছিল ঃ নৈশ মাদ্রাসায় ওরা শিখেছিল [আর দুঃখ প্রকাশ করে বলত] ঃ ওদের পাপের পরিমাণ গোর-আজাব (মৃত্যুপরবর্তী শাস্তি ভোগ করে ওরা—আর মুমিন মাত্রই—পাতাল থেকে নিস্তার লাভ করবে; আমি কিন্তু মুশরেক না হলেও কাফির তো বটে, আর সেইজন্যই নরকবাস আমার চিরস্থায়ী!

মৌলানাকে মৌলানা বলতে, স্বামীজিকে স্বামীজি বলতে আমার এতটুকু না বাধলেও, ধর্মের কারণে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব তাতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে বলে আমাকে ফাদার বলতে যারা অস্বীকার করে, ওদের প্রতি আমার সম্মানও আছে, শ্রদ্ধাও আছে।

জাকির মিয়ার ছেলেমেয়েরা আমাকে আঙ্কল বলে সম্বোধন করে। তাই ভালো, তাই সমীচীন ঃ পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনে আন্তরিকতার প্রকাশ; বিদেশী ভাষার ব্যবহারে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের ইঙ্গিত। মিয়ার আত্মজ-সংখ্যা—সাহেবী গণনায়—আধ-ডজন, আরবী শুমারিতে সাড়ে পাঁচ। ইসলামীয় সংস্কৃতিতে—মিয়ার জবানীতে বলি—মেয়েরা হাফ-মানুষ ঃ এক ছেলের সাক্ষ্য দুই মেয়ের সাক্ষ্যের সমান, কন্যার উত্তরাধিকার পুত্রের দায়ভাগের অর্ধাংশ, আকিকা-অনুষ্ঠানে নবজাত মেয়ের বেলায় মুমিনেরা দুটি নয়, একটিমাত্র খাসি জবাই করে...।

ভদ্রলোকটি তাঁর প্রতিটি পুত্রের নাম রেখেছেন কোরান-পাকে প্রশংসিত হজরতের স্মরণে; তাতে আশ্চর্য কি? আমাদের পাড়ার উপেনবাবুর অপত্যপঞ্চকের নাম কি যুধিষ্ঠির ভীম প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডবের নাম নয়? আর আমার নিজের সহোদরেরাও কি যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্যের নামেই দীক্ষিত হন নি?

(ক্রমশঃ)

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দু ভাই। ভবনাথ বড়। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতার ছোট আদালতে ওকালতী পরীক্ষা দেওয়া দেবনাথের হল না। পরে বিদেশে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতী ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরেছেন।

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গারাসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনী সুর বেজে উঠল।

কিন্তু তরঙ্গিণীর মন বড় চঞ্চল। বুকের মধ্যে তার টনটন করে ওঠে—ষষ্ঠী গেল—মহাসপ্তমীও এসে গেল—কিন্তু তার মেয়ে এখনও এলো না।

আর কবে আসবে?

ক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পেরিয়ে দশমীও এসে গেল। ভোরে উঠেই সবাই দেখে ভিজে চোখ মা-দুর্গার। শেষ রাত থেকে সানাই বাজছে। তারও কান্নার সুর গিরিকন্যা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

তাই সেই সকাল থেকেই সবার মন খারাপ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঢোল-কাঁসি বাজছে, সানাই বাজছে। সধবা-কুমারীরাই শুধু এর মধ্যে, বিধবারা বাদ। হয়ে গেলে বড়গিন্নি উমাসুন্দরী একটা রেকাবিতে সন্দেশ নিয়ে এলেন, ভেঙে একটু একটু দুর্গা ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের মুখে দিলেন। পানের খিলি এনেছেন মুখে ছুঁইয়ে মুখশুদ্ধি করলেন তাঁদের। বলেন, সম্বৎসর ভাল রেখো মা সকলকে, অসুখ অসুটন কারো যেন না হয়। সামনের বছর আবার এসো কিন্তু—আসবে তো?

প্রতিমার মুখে তাকিয়ে রইলেন একটুখানি, হাঁ-না কি জবাব পেলেন তিনিই জানেন। সিঁদুর কৌটা এনেছে মেয়েরা—মা-দুর্গার কপালে সিঁদুর পরিয়ে সেই সিঁদুর একটু নিজের কৌটায় তুলে নিয়ে তারপর এ ওকে সিঁদুর পরাচ্ছে। মনের কথা চেঁচিয়ে তো বলা যায় না, মা-দুর্গার কানের উপর মুখ এনে ফিস-ফিসিয়ে বলছে। আরও বেশী গোপন কথা মুখে বের করতেই লজ্জা—এক মেয়ে গোটা গোটা কাঁচা অক্ষরে কাগজে লিখে এনেছে, পাকিয়ে দলা করে কাগজটুকু দুর্গার আঁচলে বেঁধে দিল। কানে কানে বলে, লেখা রইল সব, এক সময়ে দেখো। ডামাডোলের ভিতর এখন হবে না, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ধীরে-সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় পড়ে দেখবেন, এই অভিপ্রায়।

এরই মধ্যে উত্তরের বাড়ীর খুনখুনে বড়েশ্বরের মা বাচ্চা কোলে নিয়ে উপস্থিত। বুড়ির মাজা বাঁকা, কিন্তু কী আশ্চর্য বাচ্চা কাঁখে তুললেই লাঠির মতন টনটনে খাড়া হয়ে যায়। বুড়ো মানুষ দেখে সকলে পথ করে দিল। বলে, নিজে চলতে পারে না বুড়ি, আবার এক বাচ্চা ঘাড়ে করে এসেছে। পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে নি সে-ই ঢের। যারা দিয়েছে তাদেরও বলিহারি আক্কেল।

মন্তব্য শুনে এক ঝলক তাকিয়ে বুড়ি কোটরগত চোখ দুটো দিয়ে আগুন ছড়াল। সোজা প্রতিমার কাছে গিয়ে বলছে, হ্যাঁগে মা, আমাদের অক্ষয়ের খোকা হয়েছে। যাচ্ছস চলে, তাই এটুকু দেখাতে নিয়ে এলাম। চার মাস উতরে পাঁচে পা দিয়েছে—তা কী রকম বজ্জাত হয়েছে, সে যদি দেখিস মা! আশীর্বাদ করে যা আমাদের খোকাকে।

নতুন পুকুরে বিসর্জন হবে, একবার কথা হয়েছিল। ভবনাথের কাছে ছোঁড়ারা আড় হয়ে পড়ল : গাঁয়ে কতকাল পরে দুর্গা উঠলেন আমোদ-আহ্লাদেরও কোন অঙ্গে কসুর পড়ে নি, বাড়ীর পুকুরে চুপিসাড়ে ডোবাতে যাবো কেন? বাঁওড়ে নিয়ে যাবে সব—আমরাই বা কম হলাম কিসে? আমরাও যাবো।

ঢাক-ঢোল বাজিয়ে জল্লাট জুড়ে জানান দিয়ে যাওয়া—ভবনাথও চান তাই। পাশাপাশি দুটি ডিঙিতে বাঁশ ফেলে তার উপরে প্রতিমা তুলতে হয় কিন্তু বিলের ভিতর ধানবনের শয়াল ধরে সে বস্তু নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাটাখালি পড়তে পারলে তখন টানা খাল—তারপরে আর অসুবিধা নেই। কিন্তু অত দূরে নিয়ে যায় কে?

আমরা, আমরা—

তেজী ঘোড়ার মতো ছোঁড়াগুলো টপকে টপকে লাফাচ্ছে। বুকে থাবা মেরে বলে, গতর বাগিয়েছি কুমড়ো কচু আজে খাবার জন্য নয়। প্রতিমা ঘাড়ে নিয়ে আমরা কাটাখালির ঘাটে পৌঁছে দেবো।

সেই বন্দোবস্ত পাকা। কাটাখালির ঘাটে জোড়া ডিঙি তৈরী হয়ে আছে, প্রতিমা বয়ে নিয়ে ডিঙিতে তুলে দেবার অপেক্ষা। হাঁকডাক হৈ-হুল্লোড়ে ভবনাথেরই পুলক বেশী, কিন্তু সময়কালে তাঁর পাত্তা পাওয়া যায় না। লোকজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে দক্ষিণের দালানে ঝিম হয়ে তিনি বসে আছেন।

দেবনাথ এসে বললেন, তুমি এখানে? রওনা হচ্ছে এবার, তোমার খোঁজাখুঁজি করছে।

ভবনাথ ক্লান্তস্বরে বললেন শরীর বেজুত লাগছে। কি বলে, তুমি গিয়ে শোন গে।

শরীর নয়, মন—দেবনাথ বোঝেন সেটা। বাইরে দাদা কড়ামানুষ, ভিতরে ভিতরে অতিশয় নরম। প্রতিমা বিদায় হয়ে গিয়ে শূন্য মণ্ডপ খাঁ-খাঁ করবে এ জিনিস চোখের উপর দেখতে পারবেন না, সেই জন্যে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

ভবনাথ আবার বললেন, করবার কিছু নেই। গিয়ে দাঁড়াওগে একটু, তাতেই হবে।

দাঁড়ালেই হবে না দাদা। জেদ ধরেছে, প্রতিমার সঙ্গে যেতে হবে। তুমি নয়তো আমি। হাঁটতে না চাও, ডোঙায় বিল পাড়ি দিয়ে কাটাখালি গিয়ে উঠবে। সেখান থেকে ওরা ডিঙিতে তুলে নেবে।

ভবনাথকে কিছুতে রাজি করানো গেল না : তুমিই যাও তবে। আমি পারব না।

বাঁশে বেঁধে প্রতিমা কাঁধে তুলে নিল। মুখ বাড়ীর দিকে—যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর থাকবে, মুখ কদাপি না ঘোরে, খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিমার মাথার কাছে প্রকাণ্ড ছাতা তুলে ধরে একজনে আগে আগে চলেছে। ঢাক-ঢোলের তুমুল বাজনা।

গ্রাম ছেড়ে দলটা ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল। তেল-চকচকে মুখগুলির উপর পড়ত সূর্যের আলো। এ ওকে দেখায় : বাপের বাড়ী ছেড়ে যেতে কি কান্নাটা কাঁদছেন দেখ, ঠিক তাই, যারা দেখছে

তাদের চোখ ভরে জল আসে। কাটাখালির ঘাটে জোড়া-ভিঙি — কয়েকটা মোটা বাঁশ আড়াআড়ি ফেলে শক্ত করে বাঁধা বাঁশের উপর প্রতিমা। যারা বয়ে নিয়ে এসেছে দু-পাশের দুই ডিঙিগতে ভাগাভাগি হয়ে উঠল। বাজনদাররাও উঠেছে। পিছনে আরও কত নৌকা, ভাসান দেখতে বিস্তর লোক যাচ্ছে। গান-বাজনা করে আচ্ছা রকম জমিয়ে যাচ্ছে সব।

বাঁওড়ে এ-দিগরের সাতখানা ঠাকুর এসে গেছেন, কিনারা ধরে আছেন আপাতত। সোনাখড়ি গিয়ে পড়ে আটে দাঁড়াল। ভাসানের মেলা—কালো মাথার সমুদ্র অনেক আগে থেকে নজরে পড়ে কলরব কানে আসে। নৌকা বাইচ এই উপলক্ষে বিস্তর কাল থেকে হয়ে আসছে। লম্বা ধিঙিড়ে ছিপনৌকো বাইচের জন্য বিশেষ-ভাবে তৈরী। পিতলে মোড়া গলুই রোদ পড়ে ঝিকঝিক করছে। এদিকে ওদিকে দুই সারি দাঁড়িরা বসেছে, পাছনৌকোয় মাঝি। মালকোঁচা-সাঁটা সকলে মাঝি তার উপর মাথায় রঙিন গামছার পাগড়ী বেঁধে নিয়েছে। আর একজন মাঝির দিকে মুখ করে পাটার উপর হাঁটু পেড়ে বসেছে, আসল মানুষ সেই—মোড়ল। বাইচের নৌকো তার হুকুমে ছাড়বে, হাত তুলে সে-ই নৌকো থামিয়ে দেবে। পাশাপাশি ছিপগুলো—তোড়জোড় সম্পূর্ণ হয়ে যেতে ঝপাস করে সব নৌকোর সবগুলো দাঁড় এক সঙ্গে জলে পড়ল। ছুটেছে নৌকো। মোড়ল সামনে পিছনে দোলাচ্ছে নিজ দেহ, সেই তালে তালে দাঁড় পড়ছে। নৌকো বাইচে সব চাইতে বেশী মেহনত বুঝি মোড়লের, দর দর করে ঘাম পড়ছে।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হ'লে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!

নাম পড়ে গেছে বাঁওড়ের এই ভাসান ও নৌকো বাইচের। জনারণ্য। তল্লাটের কোন বাড়ীতে বুঝি আধখানা মানুষও নেই। ভাল দেখতে পাবে বলে বাচ্চাগুলো কাঁধে তুলে নিয়েছে। পাড়ের গাছগাছালির ডালে ডালে মানুষ। দশমীর জ্যোৎস্না উঠেছে জ্যোৎস্না ডালপালার উপর পড়েছে। ডালে ডালে কত মানুষ-ফল ধরে আছে দেখ তাকিয়ে জকার উঠছে আকাশ ফেটে যাবার গতিক। তীরের বেগে নৌকো পাল্লা দিয়ে ছুটেছে।

কদমতলার ঘাটে গিয়ে দৌড়ের শেষ। বালুচর খানিকটা—ছিপগুলো চরের পাশে লাগবে। কর্মকর্তারা চরের উপরে দুটো বেঞ্চি পেতে দিয়েছে তার উপরে বসে দূরের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। কানায় দাঁড় বেঁধে প্রকাণ্ড এক পিতলের কলসি কদমের ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর দাঁড়ি মাঝি সকলকে সারবন্দি দাঁড় করিয়ে চাদর জড়িয়ে দেবে গলায়।

ফচকে ছোঁড়া কতকগুলো আছে, তিন-চার কাঁদি কাঁচকলা এনে কদম গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যারা হারবে কাঁচকলা উপহার দেবে তাদের নাকি। আসছে পরাজিতেরা হাত পেতে তোমাদের কাছ থেকে কাঁচকলা নিতে!

নৌকোয় নৌকোয় মশাল মানুষের হাতে হাতে মশাল। হাওয়া দিয়েছে, মশালের আলো জলের উপর কাঁপছে। রাত্রিকাল কে বলবে আলোয় আলোয় দিনমান। বাঁশের উপর থেকে প্রতিমা এইবার জলে নামিয়ে দিচ্ছে। হরি-হরিবোল রোল উঠছে চতুর্দিকে। প্রতিমার সঙ্গে মানুষও অনেক ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠেসে ধরে প্রতিমা জলতলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। জায়গার নিরিখ রইল-আমাদের খানা বাঁশবনের কাছ বরাবর ওদেরটা বাবলা গাছের পুবে। থাকুন ঠাকরুনরা জলতলে এখন কিছুকাল—পরে এক সময়ে পাট-কাঠামো তুলে নিয়ে বাড়ী রেখে দেবে সামনের বছরের জন্য। হরি-হরিবোল, হরি-হরিবোল! এ ওর গায়ে জল ছিটাচ্ছে সাঁতার কাটছে ডুব দিয়ে প্রতিমার গায়ের রাংতা কুড়োচ্ছে। হুড়োহুড়ি এ-ওকে জড়িয়ে ধরছে—ভিজে কাপড়ে আলিঙ্গন শত্রু-মিত্র বিচার নেই।

তারপরে বাড়ী ফেরা। ডোঙা-ডিঙি যে যেমন সামনের মাথায় পেলো উঠে পড়েছে। না পেলো তো হাঁটা। আড়ঙের মেলা শেষ, বাঁওড় নির্জন। বছর ঘুরে ভাসানের দিন এলে আবার তখন মেলামচ্ছব নৌকো বাইচ অগণ্য মানুষের আনাগোনা।

নিরঞ্জন-অন্তে সকলে ঘরে ফিরে এসেছে। পায়ে গড় করছে, বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করছে, যার সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক। উমাসুন্দরী আশীর্বাদের ধান-দূর্বা নিয়ে দক্ষিণের দাওয়ায় বসেছেন। অলকা নিমি পুন্টি ছুটোছুটি করে রেকাবিতে মিষ্টি এনে দিচ্ছে—মিষ্টিমুখ না করে ছাড়াছাড়ি নেই। হিমচাঁদের বাড়ীতে পাথরের খোরায় সিদ্ধি ঘুঁটছে—এয়ার-বন্ধুদের দিচ্ছে; খেতেই হবে আজকের দিনে।

অলকা গলায় আঁচল বেড় দিয়ে শাশুড়ির পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করল। উমাসুন্দরী বললেন জন্মএয়োস্ত্রী হও মা, পাকা চুলে সিঁদুর পরো।

দেবনাথ এসে পায়ের ধুলো নিলেন। উমাসুন্দরী বললেন, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হও।

বাপের পিছু পিছু এসে কমলও টিপ করে প্রণাম করল। উমাসুন্দরী বললেন, সোনার দোয়াত-কলম হোক। মাথার যত চুল, তত পরমায়ু হোক।

বউঠান তো হলেন, দাদা কোথায়?

প্রণাম করবেন বলে দেবনাথ জ্যেষ্ঠের খোঁজাখুঁজি করছেন। বাড়ীর মধ্যে এই দুই প্রণম্য তাঁর। দিদি মুক্তাঠাকরুন এলে আর একজন হতেন। তিনি এলেন না আসতে দিল না গ্রামসম্পর্কীয় ভাসুরপোরা উঠানে দাঁড়িয়ে ভূপতি মেজাজ দেখাতে লাগল : পুজো বন্ধ এবারে। কেমন করে হবে—এক হাতে যিনি গোছগাছ করে আসছেন, নিজের পুজো ছেড়ে তাঁর এখন ভাইয়ের বাড়ী যাওয়া লাগল। ফটিক সর্দার যথারীতি আনতে গিয়েছিল। মুক্তোঠাকরুন অসহায় কণ্ঠে বললেন, রাগারাগি করছে ওরা সব গাড়ীতে উঠলে পিছন থেকে টেনে ধরে রাখবে। চোখে দেখে যাচ্ছিস, দাদাকে বলিস সব।

দাদা দাদা করে দেবনাথ ভিতর বাড়ী বাইরে বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কে-একজন বলে দিল মণ্ডপের মধ্যে আছেন দেখুন গে যান।

শূন্য মণ্ডপ—আলো নেই, বাজনা নেই, একটা মানুষের চিহ্ন দেখা যায় না কোন দিকে। এ কয়দিনের সমারোহের পর অন্ধকার বড় উৎকট লাগে। একলা বসে দাদা কি করছেন এখানে?

দেবনাথ পায়ে হাত দিতেই ভবনাথ তাঁকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন : সর্বনাশ হয়ে গেছে, বুদ্ধিমা নেই। ষষ্ঠীর দিন এসে পড়বে,—যাবার সময় জনে জনের কাছে বলেছিল। ডুমুরতলা অবধি গিয়েও পালকি থেকে মুখ বাড়িয়ে হাসি মুখখানা মা একবার দেখিয়ে গেল। আর সে আসবে না। সকালবেলা কুসুমপুরের লোক এসে খবর দিল : সোনার প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেছে। সেই থেকে আড়ালে-আবডালে বেড়াচ্ছি।

জ্বর হয়েছে বউয়ের—অনপথ্য করেই সুরেশের সঙ্গে চলে যাবে—ঠিক ষষ্ঠীর দিনে হয় কি না-হয় তবে যাবে নিশ্চয় পুজোর ভিতর—এই রকম খবর ছিল। সেই জ্বর সান্নিপাতিক বিকারে দাঁড়াল। বাপের বড় আহ্লাদী মেয়ে শ্বশুরবাড়ীর সোহাগিনী বউ বারো দিনের দিন সকলকে কাঁদিয়ে চোখ বুজেছে।

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা ধাঁধা

গোয়েন্দা যখন আনাড়ি হয় ।।
গোয়েন্দা এবং লেখক ঃ এলারি কুঈন ।।

বাপ বেটা দুজনেই চৌকস গোয়েন্দা। ইন্সপেকটর কুঈন সরকারী নুন খেয়ে গোয়েন্দাগিরি করেন। এলারি কুঈন কারও নুন খান না—অ্যামেচার বললেও চলে। অ্যামেচার বলেই নামডাক অত বেশী। দেখতেও চমৎকার। লম্বা ছিপছিপে চোখ দুটো রূপোলী।

এলারি কুঈনের নাম এত বেশী ছড়িয়েছে যে এখন তাঁকে গোয়েন্দাগিরির ক্লাশ নিতে হয়। ইউনিভার্সিটির ক্লাশ—পাঠশালা নয়।

ফেনউইক হোটেলে একজন খুন হয়েছে শুনে হাতে কলমে তালিম দেওয়ার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হোটেলে এলেন এলারি কুঈন। ইন্সপেকটর কুঈন আগেই রুটিন তদন্ত সেরে ছেলের পথ চেয়ে বসেছিলেন। ছেলের মত তিনিও চটপটে, দেখেন বেশী, বলেন কম।

ভদ্রলোকের অন্যান্য গুণের মধ্যে একটি মহৎ গুণ হল নারী শিকার। মনে করলে যে কোনো মেয়েছেলেকে চক্ষের নিমেষে পটিয়ে ফেলতে তাঁর জুড়ি নেই। বিয়ে করা বউ রেখেই এই কারবার করতেন। উপপত্নীও ছিল। শেষকালে বউয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সেই বউটিও আজ সকালে এসেছিল লম্পট লোকটার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। কাগজে জাহাজ আসার খবর পড়েই এসেছিল। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যায়।

মৃতদেহ প্রথম দেখে একজন নিগ্রো ঝি।

ছাত্রছাত্রীরা এই প্রথম মৃতদেহ দেখছে। ভাবসাব দেখে মনে হল বমি করে ভাসিয়ে না দেয়। বীভৎস দৃশ্য। এক বালতি লাল রঙ যেন উপুড় করে দেওয়া হয়েছে নিহত ব্যক্তির মাথার ওপর। বাদামী চুল রক্তে মাখামাখি।

হত্যার হাতিয়ার একটা আফ্রিকান হাতুড়ি। ছিল নিহত ব্যক্তির ব্যাগের মধ্যে। হত্যাকারী তাই দিয়েই কাজ সেরেছে সুচারুভাবে।

পরিষ্কার কাজ। দেখে হৃষ্টচিত্তে চুকচুক আওয়াজ করে উঠলেন এলারি কুঈন।

ইন্সপেকটর কুঈন তখন বললেন—এ ঘরে সব চাইতে আশ্চর্য যে জিনিসটা পাওয়া গেছে তা হল আগুনের চুল্লীতে আটটা মুক্তোর বোতাম আর সার্টপিন। দেখবে নাকি?'

এলারি কুঈন দেখলেন, ফায়ার প্লেসে একরাশ ছাই। ছাইয়ের মধ্যে আগুনে পোড়া বোতাম আর সার্টপিন। কিন্তু ছাইটা কিসের? ফায়ার প্লেসে এ-ধরনের ছাই তো থাকে না?

বোতামগুলো হাতের তালুতে নাচাতে নাচাতে স্বপ্নালু চোখে চেয়ে রইলেন এলারি কুঈন। চ্যালাদের বললেন সরেজমিন তদন্ত শুরু করতে।

এক নম্বর ছাত্র বলে উঠল—"স্যার, মৃত ব্যক্তির এক হাতের রক্ত মুছে গেছে কেন? কি যেন ধরতে গিয়েছিল—তালুর রক্ত তাতে লেগে গেছে। কিন্তু সে জিনিসটা কোথায়?"

ইন্সপেকটর কুঈন মাথা নেড়ে বললেন, সেরকম কোনো জিনিস ঘরে পাওয়া যায় নি। একটা সার্ট আর বো-টাই অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু—

এক নম্বর ছাত্র তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হাতের রিস্টওয়াচের ওপর। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে ১০-২০ মিনিটে। কাঁচ চিড় খেয়েছে। চামড়ার ব্যান্ডে দুটো দাগ। তার মানে, ঘড়িটা যদিও পুরুষালী ঘড়ি—তাহলে যে পরত, তার কব্জি সরু। নিশ্চয় মেয়েছেলে। খুন করার পর হাত থেকে খুলে নিহত ব্যক্তির হাতে পরিয়ে দিয়েছে। কাঁটাটা সরিয়ে রেখেছে ১০-২০ মিনিটের ঘরে হত্যার সময় প্লাল্টে দেওয়ার জন্যে। তাছাড়া ঘড়ির ডালার মধ্যে একটা গোল মত কাগজ আঠা দিয়ে লাগানো ছিল। সে কাগজটাই বা গেল কোথায়? হত্যাকারী কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে নেল কেন?

"সাবাস," তারিফ করলেন এলারি কুঈন। 'ড্যাডি, ডাক্তার কি বলছে?'

"এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে হাতুড়ি পড়েছে মাথায়।" বললেন ইন্সপেকটর কুঈন।

দুনম্বর ছাত্র লাফিয়ে উঠল ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে। ঘড়ির ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখে ভুরু-টুরু কুঁচকে বললে—"আমি কেমিস্ট। এ ঘড়িটাকে নিয়ে টেস্ট করতে চাই। নিয়ে যাবো?"

'স্বচ্ছন্দে বললেন ইন্সপেকটর।' কিন্তু বাপু ফিরিয়ে দিও।'

এবার ফ্যাকাশে মুখে পাউডার বুলোতে বুলোতে উঠে দাঁড়াল ছাত্রীটি। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বললে—"দেখা হয়ে গেছে। বলব?"

"এখন নয়, বললেন এলারি কুঈন। 'দুঘন্টা সময় দিলাম। দেখি কার এলেম কতখানি।'

সদলবলে নীচে নেমে এলেন এলারি কুঈন। প্রবেশ পথে সাদা সার্ট গায়ে কালো বোটাই এঁটে তাম্বিতম্বা করছে হোটেল ম্যানেজার উইলিয়ামস।

ছাত্রছাত্রীদের বিদেয় দিয়ে বাবাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে ফুসমন্তর দিয়ে দিলেন এলারি কুঈন।

দুঘন্টা পর চ্যালারা এসে গম্ভীর মুখে পেশ করল তাদের তদন্তের ফলাফল। তিনজনেই হত্যাকারী সনাক্ত করে ফেলেছে। প্রথম ছাত্র বলল—ঘড়ির মধ্যে গোল কাগজটা নিশ্চয় একটা ফটো—এই সন্দেহ নিয়ে আমি নিহত ব্যক্তির পূর্ব স্ত্রীর কাছে এতক্ষণ আড্ডা মেরে এলাম। তার একখানা অ্যালবাম নিয়ে দেখলাম একটা ছবির মুখের জায়গাটা গোল করে কাটা। সুতরাং স্রেফ-গায়ের জ্বালায় পূর্ব স্বামীকে এসে খুন করে গেছে সে।' দ্বিতীয় ছাত্র বললে—'তোমার মাথা আর মুণ্ডু! খুন করেছে নিগ্রো ঝি-টা। ঘড়ির মধ্যে কেমিক্যাল টেস্ট করে কি পেয়েছি জানো? নিগ্রো-ব্রাউন রঙের পাউডার। মেয়েদের পাউডার। নিশ্চয় ঐ ঝিয়ের পাউডার। যদিও কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছে না। কিন্তু একাজ তারই। আফ্রিকায় নিগ্রো মেয়ে আর পুরুষদের ওপর কম অত্যাচার করে নি তো লোকটা—তাই শোধ তুলেছে একা পেয়ে। ছাত্রীটি তাই শুনে মুখ বেঁকিয়ে বললে—আহারে! বুদ্ধির দৌড় দেখে আর বাঁচি না! ঘড়িটা মোটেই অন্য কারো নয়—ভদ্রলোকেরই। শোনো আমার যুক্তি। চিকাগোর সঙ্গে এখানকার সময়ের ফারাক কত? এক ঘন্টা তো? ফোন থেকে নেমে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে নেবার কথা খেয়াল ছিল না ভদ্রলোকের। দশটা কুড়ি মানে এগারোটা কুড়িতেই তিনি হাতুড়ি খেয়েছেন। কিন্তু কার হাতে? আমি বলব তাঁর সেই উপপত্নীর হাতে। কি করে বুঝলাম জানো? বাথরুমে গিয়ে দেখে এসো পাউডার পাফ নেই। অথচ দেখেছো নিশ্চয় দাড়ি কামানোর পর ভদ্রলোক খুব পরিপাটি করে পাউডার মেখেছিলেন। ব্যাটাছেলেরা পাফ দিয়ে পাউডার লাগায় না—আঙুলে করে লাগায়। তাই জাবড়াভাবে লেগে থাকে—আমার গাল দেখো—সেরকম নয় মোটেই। ভদ্রলোককে তাহলে কেউ না কেউ আদর করে পাউডার বুলিয়ে—'

'তারপর মাথায় হাতুড়ি হাঁকড়েছিল—' হো-হো করে হেসে উঠলেন এলারি কুঈন। সাংঘাতিক বিশ্লেষণ তোমার! শুধু একটু ভুল করেছো। দাড়ি কামানোর বুরুশটা উল্টো করে দেখলেই তলায় ছোট্ট পাউডার পাফ দেখতে পেতে। যাক, তোমরা তিন-জনেই পরীক্ষায় ফেল করেছো। হত্যাকারী মেয়েছেলে নয় এবং এই হোটেলেরই লোক।"

'কে? কে? কে?'

"হোটেল ম্যানেজার উইলিয়ামস।"

কি হল? আপনিও চমকে উঠলেন নাকি? সমাধান সূত্রগুলো কিন্তু গল্পের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। আর একবার পড়ে দেখবেন?

—অদ্রীশ বর্ধন

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৬০ পৃষ্ঠায়)

দুটি বিদেশী উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথ

উজ্জ্বল মজুমদার

গত শতাব্দীর শেষ দশকে 'সাধনা' পত্রিকার প্রকাশ (১২৯৮) শুরু হলে তাতে সব্যসাচীর ভূমিকা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতপক্ষে সাধনার সূচনাতেই এই বিংশ শতাব্দীর মনন-চিন্তনের সূচনা। সাহিত্যের শতাব্দী-বদল সন-তারিখ ধরে হয় না।

সৃষ্টি ও সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নতুন পথ ধরেছিলেন সাধনায়। সাহিত্যে জীবন-মননের ফসল ফলে। বাইরের কোনো ধরা-বাঁধা নীতি-শাসনের উপায় হিসেবে সাহিত্যকে ব্যবহার করা অন্যায়। বঙ্কিম সেইভাবে সাহিত্যকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তা চাইলেন না। তিনি বললেন, সাহিত্যের সাধনা কর্ম-চিন্তা-আনন্দের মিলনে সর্বাঙ্গীণ সাধনা। শাস্ত্রের নির্ভর ছেড়ে মুক্ত ও স্বাধীন অনুভবের পথে সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-চিন্তা এই প্রথম পা বাড়ালো।

এই 'সাধনা'র যুগে সাহিত্যকর্মের দুটি দিকের ওপর রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন। এক, সাহিত্যে জাতীয় জীবনের মনোময় ও প্রাণময় ধারার অক্ষুণ্ণ প্রবাহ এখনো তেমন ছাপ ফেলে নি আমাদের দেশে। কাজেই মন-প্রাণের প্রকাশ সাহিত্যে চাই। দুই, সাহিত্যে মানুষের তত্ত্বকথা চাই না, কাটা-ছেঁড়া মানুষ চাই না। সম্পূর্ণ মানব-প্রকাশ চাই। যে-মানব স্বদেশের বিচিত্র কর্মধারায় আলোড়িত হয়েও আন্তর্জাতিক মানব সেই বৃহৎ ব্যাপক মানব-চেতনার প্রকাশ চাই।

পরেও গোরা উপন্যাস-রচনার মাস-পাঁচেক আগে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্বসাহিত্য প্রবন্ধে এই ব্যাপক মানব-চেতনাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'বিশ্বমানব'।

এইভাবে সাধনাপর্বে জাতীয় চেতনার ব্যাপক প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ যখন খুঁজে চলেছেন, ভাবছেন একটা উচ্চ দর্শন-শিখর আছে যেখান থেকে মানবপ্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়', যখন লেকসপীয়ারে এই ব্যাপক পরিদৃশ্য পেয়েছেন কিন্তু গোতিয়ের উপন্যাসে পান নি, জোলার উপন্যাসেও পান নি (সাহিত্যে প্রাণ, মানবপ্রকাশ ইত্যাদি প্রবন্ধ স্মরণীয়) যখন জাতীয় চেতনা, চরিত্রবল ও জীবনের অনুরাগ স্বদেশীয় সাহিত্যে পান নি বলে বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন, ঠিক সেই সময় দুটি কন্টিনেন্টাল লেখকের উপন্যাস তাঁর হাতে এসে পড়লো। একজন হাঙ্গেরীয়ান। নাম মৌরিস য়োকাই। আর একজন পোলিশ। নাম জোসেফ ইগনেশিয়াস ক্রাসজিউস্‌কি। দুই ঔপন্যাসিকেরই আলোচ্য দুটি উপন্যাস ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে তখন। আর এই দুই সাহিত্যিকেরই রচনারম্ভের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ায় দু-দেশের উচ্ছল জাতীয় উৎসবের কথা কাগজে বেরিয়েছে। কৌতূহলী রবীন্দ্রনাথ এই দুজন লেখকের দুখানি উপন্যাস পড়ে সাধনায় সমালোচনা করলেন সাহিত্যের গৌরব নামে। প্রবন্ধটি ঠিক উপন্যাস-সমালোচনা নয়। বিদেশী উপন্যাস ও ঔপন্যাসিককে অবলম্বন করে আত্ম-সমালোচনা, স্ব-জাতির সমালোচনা।

(২)

মূল বক্তব্যে পৌঁছোনোর আগে য়োকাই ও ক্রাসজিউসকির উপন্যাস দুটির কাহিনী সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের গৌরব প্রবন্ধটিতে য়োকাই-এর আইজ লাইক দ্য সী (১৮৯০) উপন্যাসের সামান্য গল্পাভাস দিয়েছেন এবং বিশেষ করে একটি নারী-চরিত্রের কথাই বেশি করে বলেছেন যিনি উপন্যাসের মূল চরিত্র। ক্রাসজিউসকির সি জীউ (১৮৬৫) উপন্যাসের কাহিনীর বিন্দুমাত্র আভাস দেন নি। শুধু, কাহিনীটি যে জাতীয় চেতনার আলোড়নের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত সে কথাই বলেছেন।

আইজ লাইক দ্য সী-র কাহিনী বেসি নামে একটি বিচিত্র প্রাণময়ী মেয়ের জীবন-কাহিনী। এই মেয়েটির কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনায় উল্লেখ করেছেন। মেয়েটির বাবা-মা অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী দম্পতি। কিন্তু বেসি মেয়েটি দুঃসাহসী এবং বিকারগ্রস্ত। পাঁচবার সে বিয়ে করেছে। শেষ স্বামীটিকে সে হত্যাও করেছে। বেসির এই পাঁচটি স্বামী হাঙ্গেরীর জাতীয় জীবনে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। চাষী পরিবারের মানুষ থেকে অভিজাত শ্রেণীর মানুষ পর্যন্ত—সব রকম মানুষের সঙ্গেই বেসির দাম্পত্য-জীবন এক-এক করে কেটেছে। পাঁচটি স্বামী যেন পাঁচটি শ্রেণী-সমাজের প্রতিনিধি। আর সমস্ত উপন্যাসটির মধ্যে বেসিই একাধারে নায়ক ও নায়িকা। তার দীপ্ত পৌরুষ ও প্রাণশক্তি দেখে মনে হয় তার মধ্যে নারী ও পুরুষের মনোবৃত্তির সূক্ষ্ম মিশ্রণ ঘটেছে।

বেসির মধ্যে যদি নায়কোচিত পৌরুষের গুরুত্বকে অস্বীকার না করি তাহলে স্বয়ং লেখককে এই উপন্যাসের সহনায়ক বলতে হয়। উপন্যাসের কাহিনীতে লেখকের আত্মজৈবনিক ছায়া পড়েছে মনে হয়। যৌবনে বেসিকে লেখক খুবই ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু বেসি সে ভালোবাসাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। পরে তার বিচিত্র রোমাঞ্চকর উচ্ছৃঙ্খল জীবনে লেখকের প্রতি তার আকর্ষণকে সে অনুভব করেছে এবং সেই আকর্ষণকে সে ফেলে-আসা আদর্শ ভালোবাসার মতো লালন করেছে। মাঝে মাঝে সেই স্মৃতি—সেই আশ্চর্য ভালোবাসার মানুষটি বেসির উচ্ছৃঙ্খল জীবনে তার রক্তের গভীরে দুঃসহ টান দিয়েছে। হয়তো এও এক ধরনের বিকার। আদর্শকে ঠেলে দিয়ে অসম্পূর্ণতার পেছনে, ক্ষণিক মত্ততার পেছনে ধাওয়া করা। লেখকও নিরুপায় হয়ে বেসিকে ছেড়ে সৃষ্টির ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়েছেন সেই একটি স্মৃতির অমিত প্রগল্‌ভতা বুকে নিয়ে। পরে দেশের জাতীয় আন্দোলনে ও বিপ্লবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। তারপর বিপ্লবের কোনো এক উত্তপ্ত মুহূর্তে এক অভিনেত্রীকে ভালোবেসে বিয়ে করেছেন তিনি। ভাগ্য ভালো যে বিবাহিত জীবনে অভিনেত্রীকে খুবই অনুরক্ত স্ত্রীরূপে পেয়েছেন তিনি। ওদিকে রোমাঞ্চরসিক বেসি বিচিত্র প্রেমবন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে মাঝে মাঝে এবং লেখকের কাছে পরামর্শ চেয়েছে, আশ্রয়ও চেয়েছে। সমুদ্রের মতো নীল চোখের সেই মেয়েটিকে লেখক কোনোদিনই দূরে ঠেলে দিতে পারেন নি। লেখকের কাছেও সেই দুর্মর স্মৃতি নীলচোখের ছলনা নিয়ে বার বার ডাক দিয়ে গেছে। সে মায়ার জট-ছাড়ানো লেখকের পক্ষে অসম্ভব।

বেসির জীবনকে কেন্দ্র করে পাঁচটি স্বামীর সঙ্গে তার সহবাসের মধ্যে দিয়ে হাঙ্গেরীয় সমাজজীবনকে তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন লেখক। আর সেই সমাজ-জীবনের রূঢ়বাস্তবতার মধ্য দিয়ে এই প্রেমানুভবের প্রাণময় উত্তাপ কার্পেথীয়ানসের পাহাড়ী হাওয়ার মতোই

সজীব প্রেরণাময় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে দিয়েছে উপন্যাসটির পাতায় পাতায়।

দ্য জু উপন্যাসটির মধ্যে লেখক ক্রাসজিউসকি (উনিশ শতকের অন্যতম-শ্রেষ্ঠ পোলিশ লেখক) পোল্যান্ডের জাতীয় জীবনেরই কাহিনী লিখেছেন। স্টোরি অব দ্য সয়েল বলতে যা বোঝায় দ্য জু হচ্ছে তাই। জিন হুবা নামে এক-জন নির্বাসিত পোলিশ ব্যক্তি একটি পান্থশালায় ঢুকে অন্যান্য অতিথিদের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। পান্থ-শালার মালিক সিনর ফিরপো সঙ্গে সঙ্গে তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। মালিক ভাবলেন, হুবা বোধহয় মারা যাবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে বেঁচে গেল। জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখলো, একটি ছোট টেবিলের চারধারে নানা জাতের মানুষ বসে পানাহারে মেতে আছে। তার মধ্যে রুশ, ইটালিয়ান, পোলিশ, ইহুদী, ডানিশ, জিপসি—সবাই রয়েছে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটি লোকের সঙ্গে তার আলাপ জমে উঠলো। লোকটির নাম জ্যাকব হারমন। জাতে ইহুদী। হুবা ও হারমনের কথাবার্তায় ইহুদী সমাজের নানা সমস্যা ও চরিত্র-বৈচিত্র্য সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে যাবে পাঠকের। জ্যাকব হারমন হুবা-কে রাজনীতি, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি আলোচনায় টেনে এনে ইহুদী-ধর্মে দীক্ষিত করে নিতে চায়। দুজনে ঠিক করে পোল্যান্ডে তারা ফিরে যাবে।

পোল্যান্ডে ফিরে ইহুদীদের শিক্ষা-বিস্তার ও বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ ঘটিয়ে ইহুদীদের সাংস্কৃতিক আবহাওয়াকে গড়ে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য হলো। কিন্তু পোল্যান্ডে এসে দুজনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়লো। শেষপর্যন্ত দেশত্যাগী হতে বাধ্য হলো তারা। দেশের রুদ্ধশ্বাস আব-হাওয়ায় ও জীবনের জটিল চক্রান্তের মধ্যেও 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে'। কয়েকটি রোম্যান্টিক অনুভবের মুহূর্ত এই দুই আদর্শবাদীর জীবনে রঙীন ছোঁয়া লাগিয়ে যায়। সেই স্পর্শটুকুই এই দুই দেশত্যাগীর স্মৃতি হয়ে থাকে।

শুধু গল্পরসিকের জন্য দ্য জু লেখা হয়। এ উপন্যাসের মধ্যে মানুষের নৈতিক ও জাতি-তাত্ত্বিক সমস্যাও জড়িয়ে আছে। এই দুটি উপন্যাসই যে শিল্প হিসাবে মহৎসৃষ্টি একথা হয়তো বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথও তা বলেন নি। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের সমালোচনায় উল্লেখ না থাকলেও প্রথম উপন্যাসটি—আইজ লাইক দ্য সী ১৮৯০ সালের হাঙ্গেরীয়ান অ্যাকাডেমির বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে ঘোষিত হয়েছিল। আর 'দ্য জু' উপন্যাসটি উপ-স্থাপনার বলিষ্ঠতা ও সারল্যের জন্য তৎকালীন সমালোচকদের প্রশংসা পেয়ে-ছিল। আসলে শিল্প-বিচারের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল না। এই দুই ঔপ-ন্যাসিক তাঁদের স্বদেশে যে সম্মান পেয়ে-ছিলেন তাঁদের রচনারম্ভের স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে—তাতে তাঁরা বীরের মতোই পূজ্য বলে গণ্য হয়েছিলেন। তুলনায় হতভাগ্য বঙ্গদেশের অবহেলিত ঔপ-ন্যাসিকদের দুরবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করেছেন।

(৩)

সাহিত্যিক যে কারণে স্বদেশে বীরের সম্মান পান সেই কারণ-বিশ্লেষণের সূত্রেই এই দুই কন্টিনেন্টাল ঔপন্যাসিক রবীন্দ্র-নাথের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়ে-ছিল। সেই আকর্ষণের দুটি সূত্র আছে। প্রথমতঃ এই দুই ঔপন্যাসিকের রচনা-রম্ভের পঞ্চাশ বছর-পূর্তি উপলক্ষে যে উৎসব হয়েছে তা জাতীয় উৎসব। তার কারণ হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ড—দুটি দেশেই সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য যোগ। স্বাধীনতা-বিপ্লবে দুই লেখকই প্রাণমন সমর্পণ করেছেন। দেশীয় ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করে তাঁরা দেশীয় ভাষার মর্যাদা এনেছেন। এঁদের রচনার মধ্যে দিয়েই হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ডের সাধারণ মানুষ মাতৃভাষাকে ভালোবেসেছে, শোকে সান্ত্বনা পেয়েছে, বিপদে আশা পেয়েছে, লজ্জায় ধিক্কার দিয়েছে, গৌরবে জয়ধ্বনি করেছে। সমস্ত জাতির হৃদয়ই তাঁদের কণ্ঠস্বর। দেশের মাতৃভাষাকে এঁরাই মুক্তি দিয়েছেন বিদেশী ভাষার আধিপত্য থেকে। লেখক ও পাঠকের এই একজাতি-একপ্রাণ বোধ বাংলাদেশে ও বাংলাসাহিত্যে নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তি আমাদের জাতীয় উৎসবের প্রেরণা হয়নি কোনো দিনই। ফ্রান্সে উগোর মৃত্যুশোক ও বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুশোক পাশাপাশি তুলনার যোগ্য নয় ('সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধ লেখার মাস-চারেক আগে বঙ্কিমচন্দ্র মারা গেছেন।)। কাজেই সাহিত্যে প্রাণমনের প্রকাশ ইত্যাদি সাধনা-পর্বের প্রবন্ধগুলি লেখার সময় সাহিত্যে জাতীয়চেতনাবোধের যে অভাব তাঁকে পীড়িত করছিল তা তীব্রতর হলো এই য়োকাই আর ক্রাসজিউসকির মাতৃভাষায় উপন্যাসচর্চার দুরন্ত আবেগ ও তাঁদের রচনাকীর্তির স্মরণোৎসবের কথা পড়ে।

দ্বিতীয় সূত্রটি প্রথম সূত্রেরই অনি-বার্য পরিণতি। হাঙ্গেরীর য়োকাই এবং পোল্যান্ডের ক্রাসজিউসকির উপন্যাসে লেখকের সঙ্গে স্বদেশের যে গভীর বন্ধন তা আমাদের দেশে এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া তখন আর কারুরই ছিল না। তাও বঙ্কিমের নৈতিক আদর্শ তাঁর মহৎ মানব-প্রকাশ-চেষ্টাকে — ব্যাহত করেছে বলেই বাঙালী পাঠক তাঁর মানব-চরিত্রকে নৈতিক মানে বিচার করে কোন চরিত্রের মহত্ত্ব, উদারতা আত্মত্যাগ বা ভালোবাসার পরিমাণ বেশি তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। অথচ কে ঠিক মানুষের মতো, কার হৃদয়ে মানব-স্পন্দন বেশি শোনা যায় সে সম্পর্কে কেউ বিচার করে নি। আইজ লাইক দ্য সী কিংবা দ্য জু উপন্যাসে জীবনের বিচিত্র প্রবাহ যেখানে ঘাতপ্রতিঘাতে স্ফীত ও ফেনিল সেইখানেই এই দুই লেখক কল্পনার জাল বিস্তার করে সজীব চরিত্রগুলিকে টেনে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'আমাদের সাহিত্যে কোথায় সেই ভালো-মন্দের সংঘাত, কোথায় সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রবলতা, কোথায় সে ঘটনাস্রোতের দ্রুত-বেগ, কোথায় সে মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ জীবন্ত স্বরূপ। য়োকাই ও ক্রাসজিউসকি যেমন সমকালের রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গ থেকে জীবন্ত মানব-প্রকাশ ঘটিয়েছেন, বঙ্কিম তেমনভাবে সমকালকে তাঁর উপন্যাসে মর্যাদা দেন নি। উনিশ শতকের জাতীয় চেতনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁর রচনাপর্বের সূচনায় তেমন জোরালো নয় বলেই ঐতি-হাসিক কাহিনীর আশ্রয় নিয়ে সেই জাতীয়তাবোধ ও সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সম্ভাব্য মানব-কল্পনা ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বচর্চার পথ তাঁকে দেখাতে হয়েছে। বাস্তবের অভাব কল্পনায় পূরণ করতে হয়েছে। সেইজন্য য়োকাই-এর আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছে : হাঙ্গেরীয় উপন্যাসখানি খুলিয়া দেখো, মানুষ কত রকমের, কত ভালো, কত মন্দ, কত মিশ্রিত এবং সবসুদ্ধ কেমন সম্ভব, কেমন সত্য। উহাদের মধ্যে কোনোটাই নৈতিক গুণ নহে, সবগুলিই রক্তমাংসের প্রাণী।' দ্য জু উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ জানিতে পারবেন, লেখকের প্রতিভা জাতীয় হৃদয়ের আন্দোলন-দোলায় কেমন করিয়া লালিত হইয়াছে।'

P 35755 (৪)

সাধনায় যখন এই সমালোচনা রবীন্দ্র-নাথ লিখেছেন তখন, মনে রাখা উচিত, উপন্যাসরচনায় নতুন কোনো রীতির পরীক্ষা তিনি করেননি। অসমাপ্ত 'করুণা' বৌঠাকুরাণীর হাট, মুকুট, রাজর্ষি—এই চারটি উপন্যাস তখন লেখা হয়েছে। করুণা রোম্যান্টিক বিষণ্ণ প্রণয় গাথার সগোত্র। অন্য তিনটির বিষয় ঐতিহাসিক, স্বাধীন বাংলার ইতিহাস—যশোর ও ত্রিপুরার ইতিহাস। কাজেই তখন পর্যন্ত ঐতিহ্যই ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। আর সেই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আইডিয়াকে ব্যক্তিরূপ দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে। স্বার্থ ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ব্যাপক প্রেমানুভবের সংঘর্ষ। এই উপন্যাসরীতি চলেছে ১২৯৩ সাল পর্যন্ত। তারপর সাধনাপর্বে (১২৯৮ থেকে) রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা-বোধ ও আচারমুক্ত মানবিক দৃষ্টি গড়ে উঠেছে, এবং মনে হয়, অন্যান্য আরও কয়েকটি ঔপন্যাসিকের মতো হাঙ্গেরীয়ান ও পোলিশ এই দুই ঔপন্যাসিকের জাতীয় চেতনা ও সমাজ শাসনমুক্ত চরিত্র-বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসিকতা জোরালো সমর্থন পেয়েছে। তাই সাধনা-পর্ব শেষ হতেই রবীন্দ্র-উপন্যাসে রচনার

অপূর্বতা দেখা গেল। 'চোখের বালি'তে তার প্রকাশ। এই উপন্যাসে জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য ও সমকালের আন্দোলনের সঙ্গে যোগ নেই বটে, কিন্তু উল্লিখিত দ্বিতীয় সূত্রটির সমর্থন অবশ্যই পাই। সেই সূত্রটি হলো, সমাজ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-হৃদয়ের সংঘর্ষ। প্রথম বাংলা আধুনিক উপন্যাসে বিনোদিনী প্রথম আধুনিক নারী। আইজ লাইক দ্য সী উপন্যাসের নায়িকা বেসি-র সম্পর্কে যা বলেছিলেন : 'তাহার নারীপ্রকৃতি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান; সে সমাজের কলে পিষ্ট এবং লেখকের গৃহনির্মিত নৈতিক চালুনিতে ছাঁকা গৃহস্থের ঘরে ব্যবহার্য পয়লা নম্বরের পণ্যদ্রব্য নহে, সুবোধ গোপাল এবং সুমতি সুশীলার ন্যায় সে বাংলাদেশের শিশু-শিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।' বেসিকে বাংলা-সাহিত্যের পটে কল্পনা করে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন মিউজিয়ামের সিংহী যদি হঠাৎ জীবন পায় তবে রক্ষক মহলে যেমন হুলস্থূল পড়ে যায় বেসির মতো নায়িকা সহসা বাংলাসাহিত্যে দেখা দিলে সমালোচকমহলে সেই রকম বিভ্রাট বেধে যাবে, তাঁদের সূক্ষ্ম বিচার ও নীতিতত্ত্ব বিপর্যস্ত হয়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। ১৩০১ সালের এই মন্তব্য চোখের বালির 'বিনোদিনী'তে রূপ-বিভ্রাট ঘটালো ১৩০৮ সালে। মিউজিয়ামের সিংহী হঠাৎ জীবন পেল। পরে চতুরঙ্গের দামিনী ও ঘরে-বাইরের বিমলার মধ্যে এই রকম সজীবতা দেখা গেছে।

নৌকাডুবিতে ব্যক্তির আত্মবিকাশ কম। বরং সামাজিক আচারবিচারে ব্যক্তির বিকাশ কতখানি অবরুদ্ধ হয় তাই দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ওই নৈতিক চালুনিতে ছাঁকার যন্ত্রণাটুকুই শুধু আছে। 'নৈতিকতার ঊর্ধ্বের চারিত্র-বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু গোরা-তে রবীন্দ্রনাথ ওই দুটি সূত্রকেই যেন পেয়ে গেলেন। য়োকাই ও ক্লাসজিউসকি যুক্ত হলেন তাঁর ঔপন্যাসিক ব্যক্তিত্বে। 'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধ ছাড়াও 'গোরা' রচনার চার-পাঁচ মাস আগে পর্যন্ত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে স্বদেশ ও সংস্কৃতি চেতনা এবং উদার মানবিকতার কথা বলে এসেছেন তিনি। গোরায় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের ব্যক্তির সঙ্গে ধর্মের, ধর্মের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ও সমন্বয়ের ছবি দেখি। সমকালীন দেশীয় প্রবল সমস্যা হিন্দু সমাজ ও ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্‌বর্তনের সমস্যা—গোরা'র ব্যাপক পরিদৃশ্য রচনা করেছে। 'আইজ লাইক দ্য সী'তে নায়ক-নায়িকার জীবনে জড়িয়েছে যেমন হাঙ্গেরীয় সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লব, 'দ্য জু' উপন্যাসে দুই বন্ধু হ্বা আর হারমনের জীবনে যেমন জড়িয়ে গেছে ইহুদীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নতির চেষ্টা ও পোলিশ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, গোরা'র মধ্যে তেমনি জড়িয়েছে একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির উদার মহত্ত্ব, ব্রাহ্মণ্য গৌরব, সার্বভৌম কারুণ্য ও সত্যনিষ্ঠা, অন্যদিকে সামাজিক বৈষম্য, আচার-বিচারের বাধা, জাতিভেদ সমস্যা, দারিদ্র্য ও মূঢ়তা। 'দ্য জু' উপন্যাসের মতো জাতিগত সমস্যা ও নৈতিক সমস্যা-জনিত তর্ক-বিতর্ক এই উপন্যাসেরও বিষয়। কিন্তু 'দ্য জু'-তে যেমন ব্যর্থতায় দেশত্যাগী হতে হয়েছে নায়ককে, 'গোরা'য় তেমনি স্বদেশপ্রেমিক উগ্র বিদ্রোহী নায়ক এক 'বিশ্বমানব-সত্য'কে পেয়েছে দেশ-জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে—যে কথা তিনি আগে সাধনাপর্বের সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনায় বলতে চাইছিলেন।

কিন্তু চতুরঙ্গের প্রেক্ষাপট এমন ব্যাপক নয়। তবে শুধু ব্যক্তি-সম্পর্ক নিয়েই এর কাহিনী এগোয় নি। জাতীয় জীবনের সাধনা-ঐতিহ্যের একটি দিক এখানেও উদ্‌ঘাটিত। সেটি হলো আধ্যাত্ম সাধনার কথা। বাউল-বৈষ্ণব রস-সাধনার বিপজ্জনক রসালো দিকের কথা। রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকির কথা। তাছাড়াও আছে মানবসেবার কথা। মানব-সেবার নিষ্কাম আদর্শ ও সকাম স্বার্থপর নিষ্ঠুর লোক-দেখানো ফাঁকি দুটি দিকই চতুরঙ্গে পরস্ফুটিত। গুরুবাদের এমন তীব্র সমালোচনা ওই যুগে আর কে করেছেন? 'ঘরে বাইরে'-র মধ্যে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে জাতীয়তার নামে যে উন্মাদনা স্থির বিচারবুদ্ধিকে বিচলিত করেছিল তারই বিশ্লেষণ আছে। বাংলাদেশের স্বদেশী বিপ্লবচেষ্টার ভাষ্য এবং আগামী অসহযোগ আন্দোলনের মুখবন্ধ' এই 'ঘরে বাইরে'। সন্দীপের মধ্যে স্বদেশী-আন্দোলনের আদর্শ ও মত্ততা দুই-ই উদ্‌ঘাটিত।

অনেকটা চতুরঙ্গের মতোই যোগাযোগ, শেষের কবিতা, দুই বোন ও মালঞ্চে সামাজিক সমস্যা পটাধান্য পেয়েছে। নারী-ব্যক্তিত্বের বিকাশের সমস্যা এবং দাম্পত্যজীবনে সে সমস্যার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা যোগাযোগে আছে যদিও উইমেন্স লিব-এর পরিসমাপ্তি বড়ই আকস্মিক ও করুণ। 'শেষের কবিতা'য় সংস্কার ও সংস্কার মুক্তির চেষ্টা প্রেমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে স্বকীয় ও পরকীয় প্রেমের যুগপৎ বিকাশ দেখিয়ে। বিশেষ করে, এই যুগপৎ বিকাশের দ্বিধাকেই দেখানো হয়েছে। সামাজিক কৃত্রিম ফ্যাশনের অতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও 'শেষের কবিতা'র ঔজ্জ্বল্যের আর একটি কারণ।' 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চে' শেষের কবিতার প্রেমকেই পুরুষের দিক থেকে বিচার করা হয়েছে।

কিন্তু সামাজিক সমস্যাকে ছেড়ে জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা আবার দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়ে।' অসহযোগ আন্দোলনের পর যে হিংসাত্মক আন্দোলন দেখা দিল তার মূল্য নির্ধারণের চেষ্টাই চার অধ্যায়ের বিষয়। স্বদেশী আন্দোলনে আত্মত্যাগ মহত্ত্বের প্রমাণ ঠিকই কিন্তু মহৎ আদর্শের উন্মাদনায় যদি ব্যক্তির মর্যাদা ও বিকাশ ব্যাহত হয় তবে সব মহৎ উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়। এলার সংস্পর্শে অতীন্দ্রের মনে দান্তে-বিয়াত্রিচে জন্ম নিয়েছিল। দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যে অতীন ঝাঁপ দিয়েছিল। হত্যার উন্মাদনায় মেতে নিজের স্বভাবকেই সে হত্যা করেছিল। একই উন্মাদনায় এলা নষ্ট করেছিল তার নিজের আদর্শকে। আর ইন্দুনাথ সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যক্তি বিকাশকে অবরুদ্ধ দেখেই দেশের মানুষকে ডেকে নেমে পড়েছিল সংস্কারের সাধনায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সাধনা-পর্বে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় চেতনার যে আলোড়নের সঙ্গে নিজের শিল্পী-চেতনাকে একাত্ম করে দেবার জোরালো সমর্থন রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন য়োকাই ও ক্লাসজিউস্‌কির উপন্যাসে তাকে নানাভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন পরবর্তী ঔপন্যাসিক সাধনায়। হয়তো টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' তাঁকে বৃহৎ জাতীয় রচনার প্রেক্ষাপট দেখিয়েছিল, জর্জ এলিয়টের 'ফেলিক্স হোল্ট' তাঁর কোনো কোনো চরিত্রের রেখাঙ্কনে প্রেরণা দিয়ে থাকবে, স্টিভেনসনের 'প্রিন্স অটো' হয়তো কাহিনীর কাঠামোর আভাসও দিয়ে থাকবে। কিন্তু য়োকাই ও ক্লাসজিউসকির উপন্যাস যে জাতীয় শক্তির প্রাণকেন্দ্র থেকে উঠে আসছে, সাহিত্য তার সজীবতা রক্ষায় যে সেই প্রাণকেন্দ্রকেই কেন্দ্রবিন্দু করে থাকে—এমন কথা 'সাহিত্যের গৌরব' ছাড়া আর কোনো প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ এতখানি জোর দিয়ে বলেননি। তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক সাধনায় জাতীয় চেতনার প্রেক্ষাপটকে প্রসারিত করবার স্পষ্ট প্রেরণা-উৎস য়োকাই ও ক্লাসজিউস্‌কি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

চারজন রবীন্দ্রমনীষী সম্মানিত ঃ

ট্রেগোর রিসার্চ ইনসটিটিউটের সমাবর্তন উৎসবে সম্প্রতি চারজন রবীন্দ্র-মনীষীকে রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্যের সম্মান দেওয়া হোল। এঁরা হোলেন উমাশঙ্কর যোশী কৃষ্ণ কৃপালনী আবু সয়ীদ আয়ুব ও পঙ্কজকুমার মল্লিক। দুবছরের রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠান্তে দশজন ছাত্রছাত্রীকে রবীন্দ্রজ্ঞানতীর্থ উপাধি দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রসাহিত্য পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গভীরতর আলোকপাত করেন। তিনি এই ইনসটিটিউট সম্পর্কে বলেন এই প্রতিষ্ঠান আমার যেন বহুদিনের স্বপ্নের একটা রূপ। যা আমি চেয়েছিলাম পারিনি এঁরা তা পেরেছেন।'

সভাপতি প্রমথনাথ বিশী চারজন প্রবীণ রবীন্দ্র-মনীষীর প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক সোমেন্দ্রনাথ বসুর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে তাঁরা 'রবীন্দ্র চর্চা' নামে একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশ করতে ব্রতী হয়েছেন।

সারা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ঃ

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'নীলিমা'র পরিচালনায় সম্প্রতি সোদপুরে সারা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের লেখক লেখিকারা এই সম্মেলনে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কবি যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শান্তশীল দাস বিমল বসু ও প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্মেলনের আহবায়ক 'নীলিমা'র সম্পাদক শেখ সদরুদ্দিন বিশেষভাবে এই সাহিত্য সম্মেলন আহবানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন উদ্দেশ্য একটিই নবীন স্রষ্টারা যাতে তাঁদের প্রয়াসকে অব্যাহত রাখতে পারেন।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণ-সভা ঃ

বরানগর ময়রাডাঙ্গা স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে 'শ্রীঅরবিন্দ ও আমরা' সম্পর্কে একটি সমোজ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বক্তার আলোচনা থেকে যে কথাটি স্পষ্ট হয় তা হোল যে শ্রীঅরবিন্দ দেশের যুবশক্তির জন্য কল্যাণমূলক কর্মে আত্মনিয়োগের এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন দেশের এই দুঃসময়ে আজকের যুবগোষ্ঠীকে এই দৃষ্টান্তকেই পাথেয় করে এগিয়ে যাওয়া উচিত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক পরেশনাথ ভট্টাচার্য।

বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ

অনুশীলন ভবনে সম্প্রতি একটি শুচিস্নিগ্ধ সভায় বিশিষ্ট বিপ্লবী ও সাংবাদিক ও কবি জগদানন্দ বাজপেয়ী খুশীময় সেন ও হেম দাশগুপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিপ্লবীদের কর্মজীবন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা শ্রীবিনোদ দাস ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন।

প্রতিযোগিতা ঃ

ভবানীপুর পাঠাগারের পরিচালনায় নিখিল বঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবারও অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। প্রতিযোগিতার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে গল্প কবিতা প্রবন্ধ একাংক নাটক রচনা আবৃত্তি চিত্রাঙ্কন রবীন্দ্রসংগীত এবং একাংক নাটক অভিনয়। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৩১শে জানুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানা সম্পাদক ভবানীপুর পাঠাগার ২৪ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ রোড কলকাতা ২৫।

ঔপন্যাসিকের লোকান্তর ঃ

সর্বাধিক বিকৃতি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ক্লাইন্ট স্টপড এ্যাট এবেলির এর লেখক সম্প্রতি কারলো প্লেভি রোমের এক হাসপাতালে সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বই পড়ুয়ার সংখ্যা ঃ

নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাত্যহিক যে সংগ্রাম তা থেকে বেশ কিছু মুহূর্ত ছিনিয়ে নিয়ে মনকে আমরা অন্য আর এক অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। উদ্দেশ্য গতানুগতিকতায় পরিশ্রান্ত না হয়ে আমরা যেন নতুন কোন এক ছন্দে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারি। এ কথা গভীরভাবে স্বীকৃত যে বইয়ের পাতায় ডুব দিলেই এই অনুভূতি সব থেকে গভীরতর হয়। ইউনেস্কোর তথ্যে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকেরা যতো বই পড়ে তত বই বোধকরি আর অন্য কোন দেশের লোক পড়ে না। শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের কাছে বই হোল প্রতি মুহূর্তের আনন্দবেদনার সঙ্গী। কিছুদিন আগে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে সোভিয়েত নাগরিকদের ৭০ শতাংশই অবসর বিনোদনের জন্য বই পড়াকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

ত্রয়োদশ সংস্করণ বাহির হইল !

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

COMMON WORDS

ঃ অসংখ্য ছবির সাহায্যে শব্দজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবোধের ব্যবস্থাসহ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য অভিনব সচিত্র ইংরেজি-বাংলা অভিধান ঃ

॥ দাম ঃ চার টাকা ॥

ঃ জেনারেল বুকস্ ঃ ৫৬এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

এ ব্যাপারে সংগৃহীত নানা তথ্য থেকে জানা যায় যে একজন সোভিয়েত নাগরিক একদিনে বই পড়ার জন্য নিয়োজিত করেন গড়পড়তা ৩১ মিনিট অন্যদিকে একজন মার্কিন নাগরিক দৈনিক বই পড়ায় সময় খরচ করেন ৬ মিনিটেরও কম।

শুধু শহরের অধিবাসীদেরই বই প্রীতি নেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পল্লীঅঞ্চলেও বই পড়ুয়ার সংখ্যা অনেক বেশী। সোভিয়েত পাঠকদের জন্য আছে ৩৬০০০০টি লাইব্রেরী ও মোট বই সংখ্যা ৩৩০ কোটি। তা ছাড়া সমাজবিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় ৯৫ শতাংশ পরিবারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী আছে। বই পড়ার ব্যাপারটি সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন একটি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাক-বিপ্লব যুগে সে দেশে প্রতি চারজনের মধ্যে প্রায় তিনজনই লিখতে বা পড়তে জানতেন না।

অল্প মূল্যে বই প্রকাশ করলে দেশের সাধারণ লোক তা সংগ্রহ করতে পারে।

এ ব্যাপারে সোভিয়েত বই প্রকাশকরা অনুকরণ করার মতো নজীর সৃষ্টি করেছেন। প্রচুর বই সেখানে প্রকাশিত হোচ্ছে লেখক তালিকায় রয়েছেন স্বদেশী এবং বিদেশী সবাই। প্রতি মিনিটে সেখানে প্রায় ৩ হাজার এবং প্রতিদিন গড়ে ৪০ লক্ষেরও বেশি বই এর কপি প্রকাশিত হোচ্ছে। বিদেশী লেখকদের নানা রচনার অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারেও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম স্থান দাবী করতে পারে। একটি তথ্য থেকে জানা যায় সেখানে প্রতি বছর বিদেশী লেখকদের লেখা ৪ হাজার পর্যন্ত নতুন বই প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়।

পর্যালোচনা করে দেখা গেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে সোভিয়েত ও রুশ এবং বিদেশী ধ্রুপদী সাহিত্যের জনপ্রিয়তা খুবই বেশী। আধুনিক সাহিত্যেরও সেখানে চাহিদা রয়েছে। সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন অবলম্বনে নানা স্বচ্ছন্দ রচনা বিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞান ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ক নানা তথ্যসমৃদ্ধ বইয়ের প্রতিও সেখানকার পাঠক-মহলের রয়েছে সীমাহীন আসক্তি। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রাণবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত প্রতি ছ'খানা বইয়ের মধ্যে একটি অন্ততঃ শিশু ও কিশোর সাহিত্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বই পড়ুয়ার সংখ্যা ক্রমাগতঃ এতই বেড়ে চলেছে যে দেশের প্রায় ৫০ হাজার বইয়ের দোকানও মাঝে মাঝে তাদের প্রত্যাশিত পরিতৃপ্তি দিতে পারছে না। কিন্তু যে বইটি চাই সেই বইটি তো পেতেই হবে এই ধারণাই যেখানে প্রবল সেখানে এ ব্যাপারে অন্য, আরো তৎপরতা দেখা দিয়েছে। গ্রন্থ-অনুরাগীদের একটি স্বেচ্ছা সমিতি সেখানে গঠিত হয়েছে। এই সমিতি চেষ্টা করবে কি করে জনসাধারণের বই পড়ার আসক্তিকে পরিপূর্ণতায় নিটোল করে তোলা যায়। সোভিয়েত সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই সমিতি গঠন নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

নতুন বই

বধির রুদ্র—ধীরেন হোম। প্রকাশকঃ প্রাইমা পাবলিকেশনস ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা—৭। মূল্য ঃ সাড়ে সাত টাকা।

হঠাৎ হঠাৎ এমন অনেক বই হাতে এসে পড়ে যা পাঠ করে রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করতে হয়। তবে বলাই বাহুল্য সে অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে খুব কমই আসে।

সেদিক থেকে বলতে বাধা নেই ধীরেন হোম রচিত 'বধির রুদ্র' আমাদের চমকিত করেছে। সবচেয়ে বিস্মিত করেছে এর পরিবেশনের ভঙ্গী ভাষা চয়ন এবং পরিবেশ রচনার দক্ষতা। চরিত্রকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কাব্যমন্ডিত ভাষা ও ভাষার অলংকরণ যে কোন দক্ষ লেখকের সমকক্ষ।

এ উপন্যাসের অনেকটাই রাজনৈতিক চেতনার চিহ্নিত হলেও ফল্গুধারার মত এমন একটি বিষণ্ণতা সমস্ত উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে যা সহজেই মনকে আকর্ষণ এবং আবেগে সিক্ত করে।

তাই মঞ্জু ভাবের পরিবর্তন তার হৃদয়ের আর্তি রাণীর পরিণতি এবং ভাস্কর বসুর সংযত আবেগ আমাদের মনের গভীরে সূক্ষ্ম বেদনার মত আবেগপ্লুত করে।

কিন্তু এ উপন্যাসের সবচেয়ে বড় সম্পদ লেখকের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার দক্ষতা।

বৃটিশ আমলের রাজনৈতিক অস্থিরতা জনগণের স্বাধীনতা লিপ্সা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বস্তরের স্বাধীনতাকামী মানুষের ভূমিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেসের অনুপ্রাণিত প্রতিজ্ঞা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন মতবাদ ও স্বাধীনতার পটভূমিতে তার ভূমিকা অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট মহাযুদ্ধে বিশ্ব-জনতার সঙ্গে ভারতীয় মুক্তিকামী মানুষদের একাত্ম হবার প্রচেষ্টা—অন্যদিকে ভারতে নব-গণ-জাগরণের ভিত্তি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' এবং 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'-এর ধর্মীয় বিচার-বিশ্লেষণ এবং তা নিয়ে মতভেদ পরে নেতাদের স্বার্থে দেশকে দ্বিখন্ডিত করে স্বাধীনতা প্রাপ্তি (অবশ্যই যার সুযোগ নেওয়া হয় দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে। যার বলি হয় লক্ষ লক্ষ নিরীহ হিন্দু মুসলমান) দেশ ভাগের পর জনগণের সন্ত্রস্ত জীবন যাপন এবং তার পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন লেখক যেন নিষ্ঠা সহকারে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে তার উপন্যাসের মাধ্যমে।

লেখক যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে কত সচেতন এবং ঘটনাবলী তাঁর নখদর্পণে, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। মনে হয় লেখক যেন নিজের রাজনৈতিক জীবনের আত্ম-কাহিনীই বলছেন।

ওরা সত্তরের যীশু (কাব্য সংকলন)—সম্পাদক ঃ পান্নালাল মল্লিক। শুকসারী প্রকাশক ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড কলকাতা—১৪। দু'টাকা।

বারোজন কবি এবং সকলেই তরুণ। এঁদের প্রত্যেকের কমপক্ষে দুই থেকে পাঁচটি পর্যন্ত কবিতা আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বয়সে তরুণ কবিতাগুলির কাব্য-দেহে ও গভীর গোপন প্রাণভূমিতেও সেই ভয়ংকর তারুণ্য। এই তারুণ্য কোন কবির লেখনীতে সংযত কোন কবির কাছে তা আগামী দিনের প্রত্যাশায় আলোময়। অলক্ষ্য পঙ্কের গর্ভে পদ্মের প্রত্যাশায় মুঠো হাত উৎক্ষেপিত। অর্ধমৃত সংশয়ের কীটই—একজন কবির এই সাচ্চার চিন্তার পাশাপাশি আর একজনের বিনম্র কণ্ঠের কাছে প্রেমের অকুণ্ঠ কথন—'আমার হৃদয়ের জ্বালাটুকু দিয়ে। প্রতিকারে নতজানু হবো! নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে এই সংকলনের সমস্ত কবিই আন্তরিকতা বজায় রাখতে পেরেছেন এটাই পাঠক হিসেবে আমাদের প্রধান আশার বিষয়।

সংকলন ও পত্র পত্রিকা

কৃশাণু ঃ সম্পাদক ঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ। শারদীয় গল্প সংখ্যা। ৩০।১এ কলেজ রো কলকাতা-৯। দাম ঃ দু টাকা।

ত্রৈমাসিক কৃশাণুর সপ্তম বর্ষে পদার্পণ হোল এ সংখ্যা থেকেই। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও ইত্রিকাটি যে বৈশিষ্ট্যদীপ্ত হোতে পেরেছে তা স্বতন্ত্র স্বাদের কয়েকটি গল্প পড়লেই বোঝা যায়। যে কজনের গল্প মন ও মননকে ছুঁয়ে যায় তাঁরা হোলেন রত্নেশ্বর বর্মন প্রভাসকান্তি ভদ্র কিরণ মৈত্র সরসী সরকার দীনেশচন্দ্র সিংহ।

আবর্ত ঃ সম্পাদক ঃ দীপাঞ্জন দত্ত। ২।৪৩ নাকতলা। কলকাতা-৪৭। দাম ঃ এক টাকা।

পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধ এই সংখ্যাকে উজ্জীবিত করেছে। প্রবন্ধ গল্প কবিতা নাটকে এর প্রমাণ আছে। গল্প লিখেছেন অমলেন্দু সুর অসীম চক্রবর্তী কমলকুমার মজুমদার। মণীন্দ্র রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা সিংহ রত্নেশ্বর হাজরা প্রতিমা সেনগুপ্ত উদয়ন ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবিতা লিখেছেন।

দুটি কবিতা॥

বনফুল

অবিস্মৃত

এসেছিল সমুখে আমার, চেয়েছিল
কি যেন বলিতে। অন্তরের মঞ্জুষায়
কি যেন গোপন মণি এনেছিল হায়
দেখাবে বলিয়া। কিন্তু তারে আবরিল
সহসা কি গাঢ় লজ্জা, কিছু বলিল না।
অবনত শিরে শুধু চিত্রার্পিত প্রায়
দ্বিধা-স্নিগ্ধ অপরূপা সে অনির্বচনা
দাঁড়ায়ে রহিল শুধু মৌন মহিমায়।

তারপর কত বর্ষ যুগ-যুগান্তর
কাটিল জীবনে মোর। কিন্তু সে ছবি
আজও দেখি। হয় নাই কিছু রূপান্তর।
নীরবে সে যেন আজও গাহিছে পূরবী।
সঙ্কোচে দাঁড়ায়ে আছে, নয়ন সন্নত
শ্রাবণের মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার মতো।

সে

যে জন আমার মাঝে গুণী-গুণ-গ্রাহী,
যে জন পূর্ণিমা রাতে জ্যো'স্না অবগাহি'
চরিতার্থ হয়, অন্ত-হারা সীমাহীন
অশান্ত জলধি যার বুকে কাব্য-বীণ
ঝঙ্কারিয়া তোলে, অভ্রভেদী হিমালয়
যার কাছে সমুন্নত পরম বিস্ময়,
সন্ধ্যা-ঊষা-ঝঞ্ঝা-মেঘ যাহার বুকেতে
বিচিত্রার বার্তা আনে, সুখেতে দুখেতে
যে খুঁজিছে চিরকাল কোথা অন্তর্যামী,
আমি? সে কি আমি, সে কি আমি, সে কি আমি?

জানি শুধু জানি না তো তার পরিচয়
জানি শুধু তুচ্ছ আমি সেই কবি নয়।
সে খেয়ালী অমরাবতীর। পুষ্প সম
অনবদ্য গন্ধ-বর্ণ-ছন্দে অনুপম
ফুটে ওঠে মাঝে মাঝে মোর আঙিনায়
ক্ষণিকের মহোৎসবে। ফের চলে' যায়।
সে অধরা মাঝে মাঝে ধরা দেয় যবে
সব শূন্য পূর্ণ করে বিস্ময়ে বৈভবে!

যুব যুবতী

ক্রিকেট

শীতকাল—চারদিকে খেলাধুলো পিকনিক হৈ-হুল্লোড় লেগেই আছে। শীত পড়তে না পড়তেই ক্রিকেট খেলার ধুম পড়ে যায় সর্বত্র। এবারের বিরাট আকর্ষণ ছিল কলকাতার ইডেনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের টেস্ট ম্যাচ। ট্রামে বাসে অফিস কাছারীতে সে কদিন সবারই আলোচ্যবস্তু ঐ এক টেস্ট ক্রিকেট। গত ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত মহাসমারোহে কলকাতার টেস্ট শেষ হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটের দৌলতে স্কুল কলেজের অনেক ছেলেমেয়েরা টেলিভিসন সেট দেখেছে টেলিভিসনে খেলা দেখেছে। গ্রাম গ্রামান্তরে মফঃস্বলে শহরতলীতে সর্বত্র রেডিও ঘিরে প্রচণ্ড ভীড়—খেলার ধারাবিবরণী—কত রান হল জানার কত আগ্রহ! ক্রিকেট টিকিট নিয়ে প্রাণান্ত। মারামারি করে লাইন দিয়ে কুপন কেনা কুপনে টিকিট উঠলো কিনা জানার কত আগ্রহ। কালোবাজারে অনেকে বেশী দামে টিকিট কিনে খেলা দেখতে গিয়ে পুলিশের শিকার হয়েছে—ওটা নাকি জাল টিকিট! আজকার ছেলেমেয়েদের খেলা নিয়ে কত আগ্রহ। ছোট বড় সবার মুখেই ক্রিকেট। টেস্ট ম্যাচের পরেই মহিলা ক্রিকেট আসর জমিয়ে তুলেছে। বাংলা মহিলা দল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবার প্রমাণ করল বাংলায় মেয়েদের ক্রিকেট-প্রীতি কত গভীর!

রেজিষ্ট্রি বিবাহ অফিস

মোট ১৬ টাকায় রেজিস্ট্রি বিবাহ

এন কে ঘোষ. জে-পি

ম্যারেজ অফিসার

১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট

কলি-৯, ফোন : ৩৫-৩০৪৮

স্কটিশ চার্চ কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শিখা দাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই ক্রিকেট নিয়ে। হাসিখুশি মিষ্টি স্বভাব বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল। খেলাধুলোয় প্রচণ্ড আগ্রহী। ইডেনের টেস্ট ম্যাচ সম্বন্ধে তিনি জানালেন—ভারতের খেলা এখনো ততো উঁচুমানের হয় নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের কাছ থেকে এখনো আমাদের অনেক শেখবার আছে।

—আপনি কোন্ বিষয়ে আলোকপাত করছেন?

শিখা দাস

—ওদের দলের ফিল্ডিং অদ্ভুত। খেলায় প্রতিটি ক্রিকেটারের কি সিন্সিয়ারিটি। এমন না খেললে কি আর খেলা হলো। আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে বোধহয় সিন্সিয়ারিটির কিছুটা অভাব আছে। তাছাড়া রয়েছে অনিশ্চিত ঝুঁকি নিয়ে রান করার প্রবণতা। যেসব ত্রুটি আছে সেসব ওদের মধ্যে নেই।

—ভারতীয় দলের কার খেলা আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে?

—বিশ্বনাথের। পর পর দুটি টেস্টে ভারতের অস্তমিত বিজয় রবি বিশ্বনাথের প্রচেষ্টায় ইডেনে উদিত হয়েছে নতুন করে।

সিদ্ধার্থ হাজরা

তার ধৈর্যের সঙ্গে খেলা—অনেকদিন মনে থাকবে।

—ওদের খেলা কেমন লাগলো?

—সেটা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে। লয়েডস রবার্টস কালিচরণ প্রত্যেকের খেলাই ভালো লেগেছে। তবে ইডেনের মাঠে কালিচরণের তেমন খেলা আর দেখতে পেলাম কই?

—দলে বাংলার কেউ ছিল না এবিষয়ে আপনার ক্ষোভ নেই? —জিজ্ঞাসা করি।

—নিশ্চয়ই আছে। গোপাল বসুকে অবশ্যই নিতে পারতো। সব ক্রিকবাজী। ক্রিকেট বোর্ড বাঙালীকে সুযোগ দিতে চায় না।

—ক্রিকেট টিকিট নিয়ে এতো কেলেঙ্কারি হল—এবিষয়ে আপনার ধারণা কি?

—এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই জড়িত। তদন্ত একটা সস্তা চাল। বেশী দামে কালোবাজারে টিকিট পেয়েছে অনেকে অথচ যারা সত্যিকার ক্রিকেটপ্রেমী তারা টিকিট পায় নি।

—ভবিষ্যতে এধরনের দুর্নীতি বন্ধ করতে পারা যায় কি করে বলতে পারেন?

—জনসাধারণের সামনে লটারীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া কাউন্টারে বেশী টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা করা উচিত।

—এতে কি সমস্যার সুরাহা হবে? তখন তো লাইন নিয়ে মারামারি হবে।

—পুলিশ কর্তৃপক্ষ সতর্ক এবং সৎ হলে কোন সমস্যা হবে না। ইডেনে তো কোন অশান্তিই হয় নি।

—আচ্ছা তরুণ ছাত্রছাত্রী যারা নাকি ক্রিকেট চর্চা করে—ক্রিকেটকে ভালবাসে তাদের জন্য কি করা যায়?

—স্কুল কলেজের খেলোয়াড় অনুসারে কোটা নির্দিষ্ট করে টিকিট দিতে হবে। ছাত্রদের টিকিটের দাম হবে অপেক্ষাকৃত কম।

এতক্ষণ আমাদের আলোচনা শুনছিলেন অনেকেই। এবার আলোচনায় যোগ দিলেন বেহালার তরুণ ছাত্র অশোককুমার সরকার। মনে তার নানা বিক্ষোভ। স্কুলে ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা নেই। পাড়ার ছেলেরা চাঁদা তুলে ব্যাট

বল কিনল কিন্তু খেলার জায়গা নেই। অগত্যা গলিতে রাস্তার ওপরেই ক্রিকেট চর্চা। অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইডেনের টেস্ট দেখার সৌভাগ্য তার হয় নি—আরো কত কি।

—তোমার সব কথাই বুঝতে পারলাম। এমন একটা রাস্তা বাতলে দেও না যাতে আমরা আরো বেশী সংখ্যায় খেলা দেখতে পারি?

—কেন সরকার আরো বড় স্টেডিয়াম করতে পারেন। সেখানে আরো বেশী সিটের ব্যবস্থা হতে পারে।

—বেশী টি ভি সেটের ব্যবস্থা করলে ক্ষতি কি?

—দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? তাছাড়া এবার টি ভি-তেও ভালো খেলা দেখা যায় নি। ইংরাজীতে ভাষ্য থাকায় আমরা তেমন বুঝতে পারিনি। বাংলায় ভাষ্য প্রচারে অসুবিধা কি হতো?

ছিন্ন আলোচনার সূত্র ধরে শিখা দেবী বলে উঠলেন—নিশ্চয়ই এটা কর্তৃপক্ষের অন্যায় হয়েছে।

এবার শিখা দেবীকে মহিলা ক্রিকেট সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। শিখা দেবী স্মিতহাসি হেসে জবাব দিলেন—মেয়ে বলে নাক সিঁটকোবার দিন চলে গিয়েছে। মহিলা ক্রিকেট সমিতি গঠিত হয়েছে। বাংলার মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

—মহিলা ক্রিকেটের সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলুন না অনুরোধ করি।

—ছেলেদের মতো ক্রিকেট অনুশীলনের সমান সুযোগ মেয়েদের নেই। বিশেষ করে বেশীর ভাগ স্কুল কলেজে মেয়েদের ক্রিকেট চর্চার কোন ব্যবস্থা নেই। যেসব জায়গায় মেয়েদের সংস্থা রয়েছে সেখানে কিংবা মেয়েদের কলেজগুলোতে অবশ্যই ক্রিকেটের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজন হলে সরকারকে এবিষয়ে অর্থসাহায্য করতে হবে।

আর এক ক্রিকেটপ্রেমিক বঙ্গবাসী কলেজের সিদ্ধার্থ হাজরা জানালেন—আমাদের খেলাধুলোর নানা সমস্যা! সরকারের উচিত এবিষয়ে আরো মনোযোগ দেওয়া। মাঠের অভাব কোচের অভাব টাকা পয়সার অভাব।

আমি প্রশ্ন করি এতো সব অভাব কাটিয়ে কি করে ওপরে ওঠা যায় বলুন তো?

—আমাদের নিজেদের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী তৎপরতাকে যুক্ত করে দিতে হবে। সারাক্ষণের জন্য অনুশীলন বজায় রাখতে হবে। হুজুগে মেতে দুচারদিন ক্রিকেট ক্রিকেট করলাম তারপর সব শেষ এমনটি হলে ভালো খেলোয়াড় তৈরী হবে না। যারা খেলতে পারে তাদের শেখাতে হবে সুযোগ দিতে হবে।

—আচ্ছা খেলোয়াড় নির্বাচন বিষয়ে তো অনেকের বিক্ষোভ রয়েছে। এবিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

—বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের মাধ্যমে ক্রিকেটার নির্বাচন হতে পারে। সেই নির্বাচিত খেলোয়াড়দের প্রদর্শিত খেলা থেকে জাতীয় দল নির্বাচন অনেক সহজ হবে।

—সত্যিকার ক্রিকেটার হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক সমস্যাও তো রয়েছে, কি বলেন?

—নিশ্চয়ই। সারা বছর যাতে খেলোয়াড়রা হেসেখেলে অনুশীলন চালাতে পারে সেজন্য সরকারকে তাদের আর্থিক দায়িত্ব নিতে হবে। একবার তারা তৈরী হয়ে গেলে অন্যদেরও তারাই খেলা শেখাতে পারবে।

—আচ্ছা সিদ্ধার্থবাবু সবাই তো বলে ক্রিকেট বড়লোকের খেলা। আমাদের গরীব দেশে ক্রিকেটের চর্চা কি সঙ্গত?

—আমরা গরীব নিশ্চয়ই। তবে বড়লোকদের দেশের যুবক-যুবতীদের মতো হাত-পা-বুদ্ধি সবই আমাদের আছে। সুতরাং যথাসাধ্য চেষ্টা করতে আপত্তি কি ক্রিকেট বাদ দিয়ে ভাবাই যায় না।

আজকের তরুণ-তরুণীদের খেলাধুলোর আগ্রহ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছে। তারা সুযোগ চায়—তারুণ্যের সদ্ব্যবহার আশা করে। আমাদের কর্তৃপক্ষ এদিকে আরো নজর দেবেন এই তাদের কামনা।

—অমর দাশ

আর্মি এডুকেশ্যান কোরে হাবিলদার ইন্সট্রাকটরের নিয়োগ

বাহিনীসমূহকে শিক্ষা দিবার জন্য আর্মি এডুকেশন্যাল কোরের নিমিত্ত হাবিলদার ইন্সট্রাকটর নিয়োগ করা হইবে। মনোনীত প্রার্থিগণকে মার্চ, ১৯৭৫-এ আরম্ভেয় পাঁচমাড়ি (মধ্য প্রদেশ) আর্মি এডুকেশন্যাল কোর ট্রেণিং কলেজ ও সেণ্টারে প্রায় এক বছরের জন্য সামরিক ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

বয়ঃসীমা : প্রার্থিগণের বয়স তালিকাভুক্তির তারিখে ১৭ ও ২৭ বছরের মধ্যে হইতে হইবে।

শারীরিক মান : রেগুলার আর্মিতে প্রযোজ্যমতে। কেবলমাত্র পুরুষ প্রার্থিগণ যোগ্য হইবেন।

শিক্ষাগত মান : কাজ-চলা হিন্দীর জ্ঞানসহ ন্যূনতম শিক্ষাগত মান হায়ার সেকেণ্ডারী (বা সমতুল)। হায়ার সেকেণ্ডারি পর্যায় পর্যন্ত যাঁহারা বিজ্ঞান ও গণিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য ৫০% শূন্যপদ সংরক্ষিত আছে।

মনোনিয়ন : প্রথম ক্ষেত্রে প্রার্থিগণের ডাক্তারি পরীক্ষা লওয়া হইবে এবং যাঁহারা নির্ধারিত শারীরিক ও মেডিক্যাল মান অনুযায়ী হইবেন তাঁহাদিগকে ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ তাং সকল হেড কোয়ার্টার্স জোন্যাল রিক্রুটিং অফিস। ব্রণ্ড রিক্রুটিং অফিস এবং এইসি ট্রেণিং কলেজ অ্যান্ড সেণ্ট্রাল পাঁচমাড়িতে অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষায় বসিতে দেওয়া হইবে। লিখিত পরীক্ষা ও ধন্টা স্থায়ী হইবে এবং বিষয় হইবে সাধারণ ইংরাজি গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ও হিন্দী (বিকল্প)। পরীক্ষাটি হায়ার সেকেণ্ডারি মানের হইবে। প্রশ্নপত্র ইংরাজি, হিন্দী বা কোন আঞ্চলিক ভাষায় উত্তর দেওয়া যাইবে। লিখিত পরীক্ষায় সফল বলিয়া ঘোষিত ও মেধাতালিকায় স্থাপিত প্রার্থিগণকে এইসি ট্রেণিং কলেজ অ্যান্ড সেণ্টার পাঁচমাড়িতে অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষাদান দক্ষতা পরীক্ষায় হাজির হইতে হইবে। দক্ষতা পরীক্ষায় তাঁহাদের কৃতিত্বের ভিত্তিতে আবশ্যকীয় নম্বর পর্যন্ত পাঁচমাড়িতে মনোনয়ন করা হইবে। যে রিক্রুটিং অফিসে লিখিত পরীক্ষা লওয়া হইয়াছে, তথা হইতে পাঁচমাড়ি (পিপারিয়া হইয়া) পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে রেলওয়ে ওয়ারান্ট দেওয়া হইবে। বাতিলকরা প্রার্থিগণকে তাঁহাদের আবাস-স্টেশন / রিক্রুটিং অফিস পর্যন্ত (যাহা নিকটতর হইবে) রিটার্ণ ওয়ারান্ট দেওয়া হইবে। দক্ষতা পরীক্ষার জন্য পাঁচমাড়িতে থাকার সময় প্রার্থিগণের নিঃখরচায় খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হইবে। কোন টিএ। ডিএ অনুমোদনীয় নহে।

বেতন ও ভাতাদি : প্রশিক্ষণের সময়কালে শিক্ষণার্থী হাবিলদার ইন্সট্রাকটারগণ বেতন ও ভাতার ম্যাট্রিক এন্ট্রি হারের (আনুঃ ২৬০ টাকা) অধিকারী হইবেন। প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে তাঁহাদিগকে বেতনের গ্রুপ বি হার (আনুঃ ৩৪৫ টাকা) দেওয়া হইবে। যে-সকল ব্যক্তি এম এ / এম এস-সি বা শিক্ষণ-প্রাপ্ত স্নাতক, তাঁহাদিগকে বেতনের গ্রুপ 'এ' হার (আনুঃ ৪১০ টাকা) দেওয়া হইবে। এতদতিরিক্তে রেগুলার আর্মির ন্যায় ছুটি, চিকিৎসার সুবিধা, রেশন, পোষাক, স্থানব্যবস্থা, জল, বিদ্যুৎ ও কনজাভেন্সি ও অনুমোদনীয় হইবে।

তালিকাভুক্তির শর্ত : কোনরূপ সংরক্ষিত দায় ছাড়াই ১৮ বছরের কালার সার্ভিসের জন্য বা যে পর্যন্ত তাঁহারা ৫৩ বছর বয়সে উপনীত হইতেছেন, সেই পর্যন্ত (যাহা অগ্রবর্তী হইবে) ব্যক্তিগণকে তালিকাভুক্ত করা হইবে।

আরও বিবরণের জন্য নিকটতম রিক্রুটিং অফিসারের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে। ডিএভিপি—৬৮৬(৩০)।৭৪

রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর বয়স

গত ২০ ডিসেম্বরের সাপ্তাহিক অমৃতে শ্রীপ্রবীর ঘোষের চিঠির (২৭।৯।৭৪) পরিপ্রেক্ষিতে 'রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর বয়স' প্রসঙ্গে বিয়ের পর কাদম্বরী দেবী পনেরো বছর ন' মাসের মতো বেঁচে ছিলেন বলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী' গ্রন্থ থেকে যে তথ্য তুলে দিয়েছিলাম, সেই প্রামাণিক তথ্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে শ্রীকার্তিক দত্ত গত ১০ই জানুয়ারির অমৃতে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে এই অংশটি তুলে ধরেছেন তাঁর চিঠিতে ঃ 'আমাকে কত প্রভাতে কত দ্বিপ্রহরে কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে। কত বসন্তে কত বর্ষায় কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে আমাকে কত শত-সহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে। যে আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের সুখ-দুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধূলা লইয়া তাহাকে পাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর কেহ জানিত না জানে না।.....' এই সূত্রে পত্র-লেখক শ্রীদত্ত প্রশ্ন রেখেছেন যে, কাদম্বরী দেবী পনেরো বছর ন' মাসের মতো বেঁচে থাকলে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সতেরো বছর মেলামেশা করেছেন কেমন করে? বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত কাব্যিক আবেষমামণ্ডিত বিবৃতি একান্তভাবেই আবেগ-প্রধান। উদ্ধৃত রচনাংশের ক্ষেত্রে কবি নখদর্পণে সাল-তারিখের কচকচি মনে না রেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখতে গিয়ে অচেতন-ভাবে 'সতেরো বৎসর' লিখেছেন বলে আমার মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর বিয়ে হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাইয়ে এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে নিবেদিতা হেমলতা ঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিলে কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন। কাদম্বরী দেবীর বিয়ের তারিখ থেকে তাঁর মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত হিসেব করলে দেখা যায় যে, তিনি বিয়ের পর পনেরো বছর ন' মাসের মতো বেঁচে ছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই তথ্যটিকে সকলেই স্বীকার করেন। অতএব, এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবেগময় কাব্যিক জবান-বন্দীকে মেনে নেওয়া অপেক্ষা সাল-তারিখের নিখুঁত এবং সর্বজনস্বীকৃত ও ইতিহাসসম্মত তথ্যকে মেনে নিলে কার্তিক-বাবুকে অনর্থক এভাবে চিঠি লিখতে হত বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

কাজী মুরশিদুল আরেফিন,
সাগরদ্বীপ, চব্বিশ পরগণা।

নেশা ও মাদকতা

গত ১৩ ডিসেম্বরের অমৃতে যুবক-যুবতী বিভাগে 'নেশা ও মাদকতা' সম্বন্ধে পড়লাম। অমর দাশ মহাশয়ের সমীক্ষা-ভিত্তিক রচনাটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল আমিও যেন অনিল হাজরা কি শ্রীমান ঘোষের সমগোত্রীয়। ওঁদের মত আমিও যেন নেশা মাদকতার শিকার হয়ে পড়ছি। প্রেমে আঘাত পেয়ে কিংবা চাকরীর চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হলে যখন মনে আসে হতাশা তখন নেশার আশ্রয় নিতে মন ভীষণ উতলা হয়ে উঠে। মা বাবা কি দাদার নিষেধ সত্ত্বেও লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট খাওয়া কি মেনড্রেক্স এল এস ডি গ্রহণে মজা লাগে যেমন তেমন নেশাও হয়। বাবা কড়া প্রকৃতির মানুষ। তাই বাবার কাছ ঘেঁষি না। যত আবদার মার কাছে। সিনেমা যাবার নাম করে মার কাছ থেকে টাকা নিই, আবার কখনো বাজারের পয়সা থেকে পয়সা সরিয়ে নেশা করি। তাছাড়া আছে বন্ধুবান্ধব। তাদের পাল্লায় পড়ে ড্রিংকসও বাদ যায় না।

মাঝে মধ্যে নেশাপ্রবণতার বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মনে হয় আমি তো ঠিক পথে চলছি না। ভ্রান্ত পথে চলার কুপ্রভাব আমার জীবনে প্রতিফলিত হবে। আমি হয়ে পড়ব নেশার দাস। আজ না হয় বেকার, বাপের অন্ন ধ্বংস করছি আর মন যা চায় তাই করছি। কুসংসর্গে মিশে নেশা-ভাঙ করে বাবার টাকা ওড়াচ্ছি। কিন্তু এমন দায়িত্বহীন ভাবে তো সারা জীবন কাটতে পারে না। আজ না হয় দুদিন পরেও তো চাকরী পেতে পারি। তখন সংসারের দায়িত্ব আপনা থেকে কাঁধে এসে চাপবে। তারপর আছে নিজের সংসার। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে বাঁচতে হলে তখন নেশা করা যাবে না অর্থের অভাবে। তাছাড়া পুত্র কন্যা বড় হয়ে যদি দেখে তাদের বাবা নেশা করে তাহলে তাদের মনের অবস্থা কেমন হবে! হয়ত তারা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিপথে পা বাড়াতে অনুপ্রাণিত হতে পারে। তখন স্বঘাত সলিলে ডুবে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

আমার মনে হয় আপন মনের অনুরণন আমার মত অনেক তরুণ-তরুণীর মধ্যে জাগে। কিন্তু হতাশা, ব্যর্থতা, অন্ধকার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তার জন্য তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না তাদের মনে। দুর্বল মন স্বভাবতই জীবন থেকেই পালানোর জন্যে নেশার খপ্পরে গিয়ে পড়ে। ভাবে নেশার মধ্যেই বুঝি সব দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না উপরন্তু দুঃখই বেড়ে চলে। এ যেন আলেয়ার হাতছানি, মরু পথ-যাত্রীদের সামনে মরীচিকার মত তাদের ঘুরিয়েই মারে দুঃখ কষ্ট বেকারত্ব ভুলিয়ে দেবার পরিবর্তে।

নেশারূপ আলেয়ার হাতছানি, মরীচিকা মায়ার খপ্পর থেকে আধুনিক যুগের যুবক-যুবতীদের উদ্ধার করার পথ কে বাতলাবে? আমার তো মনে হয় নীতিকথা, উপদেশ বর্ষণ করে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নেশা ছাড়ানো যাবে না। স্কুল কলেজ লেখাপড়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে যেমন তাদের জ্ঞান বুদ্ধিতে সাহায্য করছে ঠিক তেমনি শিক্ষার আলোক-প্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের আত্মনির্ভরশীলতার সুযোগ করে দিতে পারলে তাদের অবাঞ্ছিত বদনেশার খপ্পর থেকে উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হবে না বলে মনে হয় নাকি!

বিশন মিত্র,
আমলাদীহি, চিত্তরঞ্জন।

গ্যালারী থেকে

(তৃতীয় টেস্ট প্রসঙ্গে)

ইডেনে ১৯৭৪ শেষ থেকে ১৯৭৫ শুরুতে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচকে ঘিরে যা ঘটে গেল তা এখন স্মৃতি মাত্র। তৃতীয় টেস্টকে ঘিরে আমাদের অনেকের অনেক হিসাব বা কল্পনা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে—আর সেটাই ক্রিকেটের আসল চরিত্র। ক্রিকেটে খেলার শেষ বল পর্যন্ত গুরুত্ব থাকে, তাই পূর্বাভাস দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় সর্বদা। ইংল্যাণ্ডের ভরাডুবি এবং পর পর দু-দুটো টেস্টে শোচনীয় পরাজয়ের পর ক্রিকেট জগতে আমাদের হাওয়া উল্টোদিকে বইতে আরম্ভ করেছিল। আমরা প্রত্যেক ক্রীড়ানুরাগী একটা পরিবর্তন চাইছিলাম ঐকান্তিক ভাবে—কিন্তু পরিবর্তন যে আসবেই এবং এত দ্রুত তা অনেকেরই কল্পনায় ছিল না। জয় আমাদের হয়েছে এবং সে জয় নিঃসন্দেহে অর্জিত।

তৃতীয় টেস্টের প্রথম থেকেই চমক ছিল। তবে তখনই খেলার গতি-প্রকৃতি আঁচ করে নেওয়া বোধহয় সম্ভব ছিল না। দল বিন্যাসের পর টসে জয়লাভ করে ভারত প্রথম ব্যাট নেয়। রবার্টসের দিনের প্রথম বলেই নায়েক আউট। প্রথম বলেই আউট হবার নজীর নতুন নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নায়েকের আউট কি নায়কোচিত হয়েছে? তারপর থেকেই আমাদের মাঝারি ব্যাটস-ম্যানদের নড়বড়ে চিত্রটি ফুটে উঠতে শুরু হোল। শর্মা টেস্ট ম্যাচ আবির্ভাবে রীতিমত সাড়া জাগানো খেলা খেলেছিলেন—ইডেনে এসে তিনি যেন থমকে দাঁড়ালেন—ভরসা ছিল তখন ঐ বিশ্বনাথকে ঘিরে। বিশ্বনাথ প্রথম থেকেই ভাল খেলছিলেন—তাঁর প্রথম ইনিংসটিতে উচ্ছ্বাস ছিল না, যদিও মারের বল মারতে কার্পণ্য করেননি। অপরদিকে

মদনলালের খেলায় চটক ছিল। প্রতিটিক্ষণ তিনি আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন। রান পেয়েছেন, মার যে সব সময় কেতাব-দুরস্ত হয়েছে তাও নয়, তবে কাজের কাজ হয়েছে। প্রথম দিনের খেলা শেষ হবার কিছু আগে ভারত প্রথম দফায় আউট হবার পর গত টেস্ট ম্যাচের ছবি আমাদের মনে আসতে শুরু করে।

কিন্তু ক্রিকেট খেলার গতি-প্রকৃতি বদলের জন্যে অধিনায়কের দল পরিচালনা ফিল্ডিং ও পিচ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। তাই দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় বোলারগণ যে অমন উজ্জীবিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবেন তা কজন ভাবতে পেরেছেন? কালিচরণ শূন্য, আর রিচার্ড ও লয়েড বড় রান করার আগেই তাঁবুতে ফিরে আসবেন এমনটি আমরা কজনে আন্দাজ করেছিলাম? প্রথম দিনের মত দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন মাত্র ২৪০ রানে আউট হোল তখন স্বাভাবিক-ভাবেই নানান কল্পনা শুরু হয়ে যায়। এরই মধ্যে ফ্রেডরিকস শতরান করার গৌরব অর্জন করেন এবং ইডেনে তাঁর ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় রেখে যান।

বহুদিন পর আমরা ইঞ্জিনীয়ারকে অন্য ভূমিকায় দেখলাম। তাঁর স্বাভাবিক খেলা খেলতে গিয়ে দ্বিতীয় দিনেই সুযোগ দিয়েছিলেন, তবে সুযোগ দেওয়া ও সুযোগ গ্রহণে অক্ষমতা—এ সবই বোধহয় ক্রিকেটের অন্যতম অঙ্গ। নায়েক আবার ব্যর্থ হলেন। শর্মা আবার রান আউট হলেন—ঠিক যেভাবে দিল্লী টেস্টে আউট হয়েছিলেন। শর্মা ফিরে যেতেই বিশ্বনাথের উপর সমস্ত দায়িত্ব বর্তাল। আর বিশ্বনাথ ও ইঞ্জিনীয়ারের প্রচেষ্টায় দলের অবস্থার পরিবর্তন হয়। ইঞ্জিনীয়ার নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে খেলেছেন দলীয় স্বার্থ বিসর্জন না দিয়ে। তাঁর খেলা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী করে। আর বিশ্বনাথ—তাঁর কথা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। বিশ্বনাথ যে শুধু ব্যাটিংয়ে তাঁর নামের সুবিচার করেছেন তা নয়—মিলপ অঞ্চলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে চেষ্টা করলে তিনি যে তা পূষিয়ে দিতে পারেন—তার প্রমাণও ইডেনে রেখে গেলেন। চতুর্থ দিনের শুরুতে নানান প্রশ্ন মনে আসতে থাকে—বিশ্বনাথ কি শতরান করতে পারবেন? ঘাবরি কি উইকেট আগলে রাখতে পারবেন—ভারত কি আশানুরূপ রানের ব্যবধান রচনা করতে পারবে...? এসব প্রশ্ন ও কৌতুহল মিটাতে বিশ্বনাথ ও ঘাবরি বিশেষ সময় নেননি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঘাবরি সংকট মুহূর্তে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসে যেভাবে খেলেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। বস্তুত ঘাবরি অতক্ষণ উইকেটে না থাকলে বিশ্বনাথের শতরাণ পূর্তি হোত কিনা সন্দেহের বিষয়।

ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তিতে ভারতীয় বোলারগণ ও অধিনায়ক দায়িত্ব বুঝে নিলেন। স্পিন বোলিং যে এখনও উচ্চমানেরই আছে—আবার তা প্রমাণিত হোল। পঞ্চম দিনের মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগেই লয়েড ও কালিচরণ সমেত সাত সাতটি উইকেটের পতন। চন্দ্রশেখরের উপযোগী মাঠে তিনি যে স্বমহিমায় বল করতে পারেন—আবার সে কথা জানিয়ে দিলেন ইডেনের পঞ্চম তথা শেষ দিনে। অধিনায়ক হিসাবে মনসুর আলী খান ব্যাটিংয়ে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। প্রথম ইনিংসে ক্ষণিকের জন্য তিনি নিজেকে ফিরে পেয়েছিলেন—কিন্তু বোলার বদল ও দল পরিচালনায় অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় রেখেছেন।

পঞ্চম দিনে লয়েড ও কালিচরণ যখন ব্যাট হাতে উপস্থিত এবং রানের ব্যবধানও যথেষ্ট নয়—এহেন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে মনসুর আলী খান বিশ্বাস হারাননি। চন্দ্রশেখর প্রথম দিকে রান দিলেও তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে লয়েড ও কালিচরণের মত শক্ত খুঁটি সরাতে একমাত্র চন্দ্রশেখরকেই প্রয়োজন। বিশ্বাস ও আস্থা অগাধ থাকলেও অধিনায়ক হিসাবে তিনি যে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন সেটা সহজেই অনুমেয়। চন্দ্রশেখরকে ধন্যবাদ যে তিনি দেশের তথা অধিনায়কের বিশ্বাস ও আস্থার মর্যাদা রেখেছেন। পাঁচ ওভারের মধ্যে লয়েডকে ফিরিয়ে দিয়ে এবং তারপর কালিচরণ ও জুলিয়ানকে। অপরদিকে বেদী ও প্রসন্ন নিখুঁত নিশানায় বল করেছেন। বেদী অবশ্য উইকেট পেয়েছেন, প্রসন্নকে এ যাত্রায় শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে।

ভারতের জয় সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফল। তৃতীয় টেস্টে জয়লাভের ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই আমাদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে ফিল্ডিং আরো ভাল হওয়ার প্রয়োজন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং তুলনা করলে একথা বারবারই মনে হবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হেরেছে তার কারণ অনেক। যেমন ব্যাটিং আশানুরূপ মানের হয়নি, কয়েকটা সম্ভাব্য ক্যাচ পড়েছে এবং প্রথম ইনিংসে মদনলালের বিরুদ্ধে রবার্টসকে দিয়ে বল করালে হয়ত বা কিছু সুফল হোত।

আর সব শেষ কথা হচ্ছে ইডেনে আমরা বহুদিন বাদে দুজন সত্যিকার সুইং বোলার দেখলাম। আমরা দলে দুজন ফাস্ট বোলার দেখিনি, আশার কথা ভারতীয় দলে মদন-লাল ও ঘাবরি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বোলিং বৈচিত্র্যই আনেনি, শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অসিতকুমার কাঞ্জিলাল,
বরাহনগর, কলকাতা—৫০।

অমানুষ প্রসঙ্গে

বরাহনগর থেকে শ্রীমতী মিতালী ভট্টাচার্যের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০-১-৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্রদূতের লেখা 'অমানুষ প্রসঙ্গে' শীর্ষক চিঠিতে পত্র-লেখক 'অঘোর দারোগার' ভূমিকাভিনেতা অনিল চ্যাটার্জির নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অমানুষ ছবিতে 'অঘোর দারোগা' বলে আদৌ কোন চরিত্র নেই। অনিল চ্যাটার্জি যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন তার নাম 'ভুবন দারোগা'।

বাংলা ছবির সংকটের কথা উল্লেখ করে পত্রলেখক বলেছেন, 'সংকটের দিনে বাংলা ছবিকে উৎসাহ দান করাই 'অমৃত'র একমাত্র উদ্দেশ্য।' আমাদের মনে হয়, বাংলা ছবির এই সংকটের মুহূর্তে অমৃতের মত সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা পত্র-পত্রিকার এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। তাহলে বাংলা ছবিকে সহজেই আরও জনপ্রিয় করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

স্বপন শৈল ও কার্তিক দত্ত,
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত (১০ জানুয়ারী, ১৯৭৫) 'সোনার কেল্লা' চিত্রের সমালোচনায় বলা হয়েছে, 'সত্যজিৎ রায় ইতিপূর্বে নিজের লেখা কাহিনী নিয়ে কোনো ছবি পরিচালনা করেননি।' তথ্যটি ভুল। ইতিপূর্বে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'নায়ক' চিত্র দুটির কাহিনীকার ছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

তপতী সেনগুপ্তা
মুর্শিদাবাদ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প

গত ১৭ই জানুঃ (৩রা মাঘ) ৩৬ সংখ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বকাসুর' গল্পটি নিঃসন্দেহে একটি সার্থক ছোটগল্প। বহুদিন পর এরকম নামী একটি সাহিত্য সাপ্তাহিকের পাতায় উক্ত গল্পলেখকের ছোটগল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আশা করবো 'অমৃত' সম্পাদক মহাশয় এরকম সার্থক ছোটগল্প আরো উপহার দেবেন। এই প্রসঙ্গের অবতারণার পরে আর একটি বিষয়ের প্রতি সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—তা হোল সর্বাঙ্গ-সুন্দর 'অমৃতে'র প্রতি সংখ্যায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগে যদি নতুন লেখক-লেখিকাদের চিত্রসহ পরিচিতি ছাপানো যায়। তাঁদের নিজস্ব বক্তব্যকে হাজির করতে পারলে পরবর্তী লেখকরা (যাঁরা সবেমাত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে পা দিয়েছেন) তাঁদের বিভিন্ন ভুলত্রুটি খুব সহজেই শুধরে নিতে পারবেন।

সমীরণ মুখোপাধ্যায়,
চন্দননগর, হুগলী।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

আপনার পত্রিকায় 'সেকালের সঙ্গীত-গুণী' পর্যায়ে ধারাবাহিক প্রকাশিত বিভিন্ন সঙ্গীতগুণীর জীবন এবং সঙ্গীত সাধনার অনবদ্য কাহিনী অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়ছি। দিলীপবাবুর কাছে একান্ত অনুরোধ তিনি যেন আরও ব্যাপক এবং বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে উপেক্ষিত গুণীদের কথাও এই পত্রিকার মাধ্যমে পরিবেশন করেন। অবশ্য একথা বলতে বাধা নেই যে দিলীপবাবু ইতিমধ্যেই যতটুকু পরিবেশন করেছেন তার মূল্যও অপরিসীম। তবু সঙ্গীতরসিক হিসেবে আমি আরও কিছু বেশী আশা করবো দিলীপবাবুর কাছে।

এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র সেকালের কণ্ঠ আর যন্ত্রসঙ্গীত গুণীদের কথাই এই পত্রিকার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু

'সঙ্গীত' অর্থ যদি নৃত্য-গীত-বাদ্যের মিলিত রূপকেই বোঝায় তবে সঙ্গীত আর সঙ্গীতগুণীদের কথা লিখতে গেলে অন্যান্য ধারার গুণী শিল্পীদের কথাও উল্লেখের দাবী রাখে। নৃত্যের ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব সুপ্রাচীন। আমাদের শতাব্দীতে এবং তার আগে শিল্পের এই বিশেষ ধারা উৎকর্ষের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। সে ধারা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। আমি মূলত 'কথক' নৃত্যের কথাই বলছি আর এই বিশেষ নৃত্যরীতিতে যেসব অসাধারণ গুণী শিল্পী ছন্দের, লয়ের আর তালের বিচিত্র স্বর্গ রচনা করেছেন, সে কথা তো ইতিহাসের বাইরে নয়। তাই আমার অনুরোধ সঙ্গীতগুণীদের সঙ্গে নৃত্যগুণীদের কথাও যেন দিলীপবাবু আমাদের শোনান। সঙ্গীতের এই ধারায় যাঁদের গুণপনা এবং অনুপম নৃত্যশৈলী চিরকালীন শৈল্পিক সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে তাঁরা হলেন, ঠাকুর প্রসাদ, ভৈরব প্রসাদ, কালকা প্রসাদ, অচ্ছন মহারাজ লচ্ছু মহারাজ বৃন্দাদীন মহারাজ শম্ভু মহারাজ, জয়লাল, রতনলাল মোহনলাল ইত্যাদি নৃত্যকলাবিদগণ। ইতিপূর্বে পত্রান্তরে প্রকাশিত 'দরবার-নটি-কলাবন্ত' পর্যায়ে দিলীপবাবু এ বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। তবু আমার ইচ্ছে আরও বিস্তৃতভাবে দিলীপবাবু এঁদের কথা আমাদের শোনান।

সেকালের বাদ্য এবং যন্ত্রসঙ্গীতগুণীদের কাহিনীর অবতারণা দিলীপবাবু ইতিমধ্যেই আলোচ্য পর্যায়ের মাধ্যমে করেছেন। এই ধারার অন্যান্য অনেক গুণীদের মধ্যে যাঁদের কথা খুব বেশী কোরে শুনতে ইচ্ছে করে তাঁরা হলেন তবলাগুণী সংগত যাদুকর পণ্ডিত আনোখিলাল, কণ্ঠে মহারাজ, চতুরলাল, আহ্‌মদজান (থেরাকুয়া) আর পাখোয়াজী গোবিন্দরাও বুরহানপুরকার। আনোখিলাল দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় সঙ্গীতজগতে এক অত্যন্ত উজ্জ্বল তারকা হিসেবে চিহ্নিত এবং স্বীকৃত ছিলেন। অনেক আসরে সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি বহু শ্রোতাকে নিজ অনবদ্য এবং অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ-বিস্মিত-অভিভূত করেছেন। অনেক ইতিহাসের (সঙ্গীত আসরের) নায়ক তিনি এবং আমাদের কালের এক অতি সার্থক তবলাশিল্পী। কণ্ঠে মহারাজ আর আহ্‌মেদজান দুজনেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। চতুরলাল আর গোবিন্দরাও সম্বন্ধে ইতিহাস খুব মুখর নয়। তাই এঁদের কথাও লিখতে অনুরোধ করি।

যন্ত্রীদের মধ্যে সেতার যাদুকর এনায়েৎ খাঁর কথা শুনতে ইচ্ছে করে আরও বিশদভাবে, কারণ ইনিও দীর্ঘকাল কোলকাতা এবং বাংলায় বসবাস করেছিলেন। এনায়েৎ খাঁর পিতা সেতার বাদনে বিশিষ্ট রীতির (ইমদাদখানি বাজ) প্রবর্তক, ইমদাদ খাঁর কথা 'সঙ্গীতের আসরে' দিলীপবাবু বিস্তৃতভাবে বলেছেন; কিন্তু সেই তুলনায় এনায়েৎ খাঁর শুধু মাত্র উল্লেখ আছে। অথচ পিতা পুত্র দুজনেই নিজ নিজ নৈপুণ্যে ঐতিহাসিক কৃতিত্বের অধিকারী। তাছাড়া সেকালের সঙ্গীতগুণীদের মধ্যে এনায়েৎ খাঁ একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিরিশের দশকে মুস্তাক আলী খাঁ সঙ্গীত সমাজে অত্যন্ত গুণী সেতারশিল্পী হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং শুনেছি সে যুগে প্রায় সমস্ত সঙ্গীত সম্মেলনেই তাঁর উপস্থিতি এবং অনুষ্ঠান অপরিহার্য ছিল। বর্তমানে মুস্তাক আলী প্রত্যক্ষ সঙ্গীত জগৎ থেকে অবসর নিয়ে স্থায়ীভাবে উত্তর কোলকাতায় বাস করেছেন। অবশ্য কোলকাতায় স্থায়ীভাবে উনি অনেক আগে থেকেই আছেন। প্রাচীন রীতির এক সার্থক সেতারশিল্পী মুস্তাক আলীর কাহিনী শোনালে বাধিত হবো। বাংলার এক সেতার গুণী স্বারবংগ ঘরানার (আসগর খাঁ) একক বাঙালী প্রতিনিধি লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য এবং তাঁর পিতামহ বামাচরণ ভট্টাচার্যের কথাও বিস্তৃতভাবে শোনাতে অনুরোধ করছি। শোনা যায় লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য এক অতি গুণী এবং অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সেতারী ছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত উচ্ছৃংখল এবং অসংযত জীবনযাপনের জন্য তাঁর মৃত্যু ঘটে অতি অল্পবয়সে। এই প্রসঙ্গে, আমি দিলীপবাবুকে ঐকান্তিক অনুরোধ জানাই আর এক মহান শিল্পীর কথা শোনাতে, তিনি আজও একক এবং অনন্য তাঁর নিজস্ব শিল্পক্ষেত্রে। এই অবিস্মরণীয় শিল্পীর নাম পান্নালাল ঘোষ, বংশীবাদক হিসেবে পান্নালাল সম্ভবত সর্বকালেই একক শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন আর সর্বভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, সর্বযুগেই এক বিশিষ্ট এবং শীর্ষস্থানীয় শিল্পী হিসেবে স্মরণীয় থাকবেন। বাঁশীকে সর্বভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পর্যায়ে উন্নীত এবং চিরপ্রতিষ্ঠিত করার একক কৃতিত্বও সম্ভবত পান্নালালেরই প্রাপ্য। তাই সেদিক থেকেও কনিষ্ঠ সঙ্গীতসাধকদের তাঁর কথা জানা উচিত আর এই দায়িত্ব দিলীপবাবু তাঁর অনুপম রচনানৈপুণ্যের মাধ্যমে পালন করবেন এমন আশা রাখি। এই সঙ্গে পান্নালাল ঘোষ বিভিন্ন সঙ্গীতাসরে সুরের যে বিচিত্র রূপের আর বর্ণের অনবদ্য ফুল ফুটিয়েছেন তার বিস্তৃত আলোচনা আশা করবো।

কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে যাঁদের কথা শোনাতে অনুরোধ করবো তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতসাধক সুরলক্ষ্মীর বরপুত্র আবদুল করিম খাঁ। আমাদের কালে অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীতে আবদুল করিমের কণ্ঠে সুর সরস্বতী যেভাবে ধরা দিয়েছিলেন এমন নাকি আর কারও কাছে দেন নি। গুণীজন সমাজে এমনই একটা কথা প্রচলিত আছে। উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সম্ভাবনা নিয়ে আবদুল করিম খাঁই বোধহয় প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর কিছু মৌলিক অবদানও আছে বলে জানি। তাছাড়া ঠুংরী সম্রাট মোজুদ্দিনের প্রায় সমসাময়িক আবদুল করিমের ঠুংরীও আজ ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত। তাই আবদুল করিম খাঁর জীবন এবং সঙ্গীতসাধনার কথা বিস্তৃতভাবে শোনার বিশেষ আগ্রহ রাখি। আর একজন কনিষ্ঠ শিল্পীর কথা শোনাতে অনুরোধ করি যিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জীবনের সংক্ষিপ্ততর পরিসরে সঙ্গীত রসিকদের হৃদয়ে নিজের আসন করে নিতে পেরেছিলেন, আর সে আসন আজও অটুট আছে। এই গুণী সঙ্গীতশিল্পীর নাম দত্তাত্রেয় বিনায়ক পালুসকর, যিনি ডি ভি পালুসকর নামে সমধিক পরিচিত। এই সঙ্গে আবদুল করিম খাঁর কন্যা হীরাবাঈ এবং আল্লাদিয়া খাঁর শিষ্যা কেশরীবাঈয়ের কথাও উল্লেখনীয়। যদিও উভয়েই জীবিতা, তবু বহুদিন পূর্বেই তাঁরা সঙ্গীত জগৎ থেকে অবসর নিয়েছেন।

বাংলার শিল্পীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ধ্রুপদ শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত। একই সঙ্গে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কথাও স্মরণীয়। তারপর গিরিজাশঙ্কর, অঘোরনাথ, নুলো-কুটে গোপাল, মুরারী ও মোহিনী মিশ্র রাণাঘাটের নগেন দত্ত আর নগেন ভট্টাচার্য। সঙ্গীত রত্নাকর ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর কথাও শোনাতে অনুরোধ করি। যদিও উভয়েই জীবিত তবু এঁরা দুজনেই জীবন্ত প্রবাদস্বরূপ এবং উভয়েরই সঙ্গীতনৈপুণ্য ঐতিহাসিক। তাছাড়া সঙ্গীতগুণী হিসেবে এঁরা যতটা একালের ঠিক প্রায় ততটা সেকালেরও। তাই এঁদের কথা শোনাতে অনুরোধ করবো। অঘোরনাথ আর দুই গোপালের কাহিনী 'সঙ্গীতের আসরে' দিলীপবাবু বলেছেন, তবু এই পর্যায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এঁদের কথা লিখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, আজও পর্যন্ত এমন কোন সঙ্গীত গুণীর কথা লেখা হয়নি যিনি সেকালে 'তারানা' বা 'তেলেনা' শিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। সেকালে কি 'তারানা' রীতির প্রচলন ছিল না সে যুগের সঙ্গীতগুণীরা কি 'তারানা' গাইতেন না? তাই যদি হয় তবে আজ এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিশেষ রীতি এত জনপ্রিয় হলো কি কোরে? অথচ শোনা যায় 'তারানা' রীতির প্রচলন তানসেনের বা তানসেন পূর্ব যুগ থেকে শুরু হয়। আমাদের শতাব্দীতে নিসার হোসেন, বিনায়ক রাও পট্টবর্ধন, সুনন্দা পট্টনায়ক প্রভৃতি শিল্পীরা সার্থক 'তারানা' শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত। গোলাম আলি খাঁ, আমীর খাঁ প্রভৃতিরাও 'তারানা' গাইতেন। কিন্তু 'সেকালের সঙ্গীত গুণীদের' মধ্যে এমন কোন গুণী কি ছিলেন না যিনি সার্থক তারানাও পরিবেশন করেছেন? যদি ছিলেন তবে তাঁর কথাও আমাদের দিলীপবাবু শোনান। এই প্রসঙ্গে 'তারানা' রীতির প্রচলন-উৎপত্তি-বৈশিষ্ট্য জানানোর জন্য লেখককে আন্তরিক অনুরোধ জানাই। শুনেছি মরহুম ওস্তাদ আমীর খাঁ 'তারানা' সম্বন্ধে কিছু মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। তাই 'তারানা' সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করুন। দিলীপবাবুর কাছে এই অনুরোধ।

মণি সেন,
জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ।

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তার কথার প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে ইদানীং। অমিয়, তার স্ত্রী নীহার, সবাই যেন কেমন এড়িয়ে চলতে চাইছে। সংসারের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছেন যেন তিনি। তবু একসময় নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে অমিয় বা তার স্ত্রী, নীহার নয়, তাদের বংশধরদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান বঙ্কিম দত্ত।

নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জিজিয়াতি করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে যত দেখছে, ততই ভাল লাগছে রঞ্জুর। স্বদেশী যুগের কত কথা কত গল্প করছেন। না কি তার দাদুকেই ব্যঙ্গ করছে লোকটা?

অথচ ঐ মানুষটাই তাকে বিপ্লবীদের কত গল্প শুনিয়েছে। শুনতে শুনতে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে তার দেরী হয়ে গিয়েছিল।

আর সে-জন্যে দাদুর কি বকুনি। সেই রাগে রাত্রে রঞ্জু খায় নি। মেজাজ তার খুব গরম হয়ে আছে বুড়োর ওপর।

(চৌদ্দ)

শেষ পর্যন্ত খাবার টেবিলে এসে সকলের সঙ্গে ভাত খেতেও তাকে বসতে হয়।

মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, ঐ চা খাওয়াই খাওয়া। চা, দুখানা সরভাজা। ব্যস, আর কিছু সারাদিন খাবে না। প্রতিজ্ঞা টিকল না।

সকাল থেকে বাড়ির আবহাওয়াটাই বদলে দিয়েছে এই মানুষটা। যুঁই। তার অবশ্য যুঁইদি। দিদি নেরবার ননদ। দিদির ননদকে দিদি ডাকতে হয়।

রঞ্জুর ইচ্ছে করে না দিদি ডাকতে। সেই প্রথম দিন থেকে ইচ্ছে করছিল না। এইটুকুন মানুষটা। ছোটখাটো শরীর।

কিন্তু চোখ দুটো সাংঘাতিক। এত বড়। কালো টলটল করছে। যেন দুটো বিশাল লেক।

টেবিলে তার উল্টোদিকে বসেছে। পাশে টুটুল। এ-পাশে সে আর বাবা।

মা পরিবেশন করছে।

কিন্তু যত না খাচ্ছে, টলটলে চোখ দিয়ে যুঁইদি তাকে দেখছে বেশি। দেখা যেন শেষ হয় না।

জানত সে এটা।

খেতে বসে যুঁইদি তার দিকে ভীষণ তাকাবে। পাল্টা সে তেমন তাকাতে পারছে না। বাবা আছে, মা সব সময় সামনে দাঁড়িয়ে। পরিবেশন করতে গিয়ে যা করতে হয়।

—ও কি যুঁই, এ কি হচ্ছে! মা আর একবার চেঁচিয়ে উঠল।

—ইস এত খাওয়া যায় না মাঐমা!

মা-র চোখে এবারও যুঁইদি ধরা পড়ে যায়। নিজের ডিশ থেকে একটা ফিস ফ্রাই তুলে এইমাত্র রঞ্জুর পাতে ঠেলে দিয়েছিল। তখন মা চেঁচামেচি করেছিল। এখন আবার। নিজের মাংসের বাটি থেকে বড় বড় দু টুকরো মাংস তুলে রঞ্জুর পাতে ছেড়ে দিয়েছে যুঁই।

রঞ্জু শব্দ করছে না, আপত্তি করছে না।

মা-ই তো বলছে। যা বলার মা বলুক। সে বলতে গেলে তার মুখের ভাবটা কেমন হবে সেই সম্পর্কে সে নিশ্চিত হতে পারছে না। তাকে ভীষণ গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে। এখনও তার রাগ যায়নি জেদ যায়নি —এমন চেহারাই সে করে রাখতে চায়। বিরক্ত বিষণ্ণ ক্রুদ্ধ। দাদু এবং দাদুর সঙ্গে বাড়ির সবাই কাল তার প্রতি যে অবিচার করেছে তার পর এই সংসারের ওপর তার কোনো আকর্ষণ নাই এটাই সে বোঝাতে চায়। প্রমাণ করতে চায়। না খেয়ে কাল রাত্রে প্রমাণ করেছিল।

আজও বোঝাত। গোলমাল করে দিল এই মানুষটা।

দুম করে যুঁইদি আজ সাড়ে নটার ট্রেনে কেষ্টনগর থেকে হাজির।

এর আগেরবার এসেছিল দুপুরে নিজেদের গাড়ি নিয়ে। তার আগেও দুবার গাড়ি নিয়ে এসেছে। একদিন যেন খুব সকালে একদিন এসেছিল রাত্রে। কিন্তু যখনই আসবে হাঁড়ি ভরতি সরভাজা সঙ্গে নিয়ে আসবে। কেষ্টনগরের বিখ্যাত সরভাজা। মাঐমার জন্য এনেছি, বলবে, তালুইমশার জন্য এনেছি, দাদু সরভাজা খুব ভালবাসে, টুটুল ভালবাসে ইত্যাদি ইত্যাদি। ভুলেও রঞ্জুর নাম উল্লেখ করবে না কিন্তু। মেয়েরা এত চালাক!

অথচ যুঁই জানে রঞ্জু ডাকাতের মতন সরভাজা ভালবাসে। এবং হাঁড়ির অর্ধেকই তার পেটে যাবে। যায়। রঞ্জুর জন্যই এতদূর থেকে কষ্ট করে হাঁড়িটা বয়ে আনা। মুখ ফুটে যুঁইদি বলেছে কোনোদিন? আজ অবশ্য অন্যরকম।

ধরা পড়বে অর্থ কি।

আজ সকলের চোখের সামনে—সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে যুঁইদি তাকে আদর করছে, হঠাৎ একটা মস্ত সুযোগ পেয়েছে। বেলা নটা দশটা পর্যন্ত রঞ্জু দোরে খিল এঁটে শুয়ে আছে, রাগ করে বেরোচ্ছে না। বাড়িতে পা দিয়ে দিদির ননদ দুঃসংবাদটা জেনে গেছে। কারণটা অবশ্য জানেনি।

নিশ্চয় বাবা বা মা বা টুটুল এখনও বলেনি। বলবে না। আর যার ওপর রঞ্জুর এই রাগ জেদ, বাড়ির ডিকটেটর বঙ্কিম দত্ত যে চুপ করে থাকবে জানা কথা। নাতির এমনতর একটা জঘন্য অপরাধের কথা একটা বাজে লোকের সঙ্গে কাল বেলা একটা সেতারটা পর্যন্ত আস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল—যেখানে শ্বশুরবাড়ির মানুষের কাছে কোনোদিনই

বুড়ো তা প্রকাশ করবে না। অম্বুজা নিলয়ের প্রেস্টিজ নষ্ট হবে।

যাই হোক, যুঁইদি আজ একেবারে ফ্রি।

টুটুলের ডাকে রঞ্জু দরজা খোলেনি। রতনকে গালাগাল করে ফিরিয়ে দিয়েছে।

দরজা খুলল শেষটায় যুঁইদির ডাকে।

অবশ্য মা-ও যুঁইদির সঙ্গে দরজার ওপিঠে এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন থেকে নেমে যুঁইদির শাড়ি-জামাও বদলান হয় নি। সবাইকে দেখছে। একটি মুখ দেখছে না, এ কি কথা! কেন, কি নিয়ে রঞ্জুর রাগ! এখনও শুয়ে আছে! বেলা দশটা বাজে যে। ফরসা কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখেছিল আর রঞ্জুর পড়ার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল যুঁইদি—এই রঞ্জু, দ্যাখো কে এসেছি আমি। গলার বিখ্যাত স্বরটা শুনেই রঞ্জুর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দুরদুর শব্দ হচ্ছিল।

প্রথম ডাকে রঞ্জু সাড়া দেয়নি।

একটা চমক নিয়ে আর হৃৎপিণ্ডের দুরদুর নিয়ে চুপ করে ফ্যালফ্যাল চোখে বন্ধ পাল্লা দুটো দেখছিল।

শীতের পর বসন্তের প্রথম হাওয়ার স্পর্শে মানুষ এভাবে চমকে ওঠে, আর স্তব্ধ হয়ে থাকে।

—এই রঞ্জু, এবার মা ডাকছে; যুঁই এসেছে। দরজা খোল।

—দরজা খোলো রঞ্জু লক্ষ্মীটি—দ্যাখো আমি তোমার জন্য কী এনেছি।

তার মানে সরভাজা। কোনোদিন যুঁই এভাবে বলে না। আজ বলল। আজ মা-র চোখের সামনে রঞ্জুর জন্য যুঁইয়ের আদর উছলে উঠল। মস্ত সুযোগ।

রঞ্জু দরজা খুলে চৌকাঠে দাঁড়াতেই যুঁইদি তার হাত ধরল।

—মুখটা শুকনো দেখছি কেন মাঐমা!

—রাত্তিরে খায়নি। মা বলল।

—কেন, কী হয়েছিল এত রাগ করার কারণ কি! যেন যুঁইদির চোখে উদ্বেগের শেষ ছিল না।

প্যাট্রা, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোরেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
সম্পৎ-সেরামিকস্ প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

—দাদু বকেছিল। চুলটা কাটছে না। মা ঘুরিয়ে কথাটা বলল। তাই ছেলের অভিমান হয়েছে—রাগ।

মা-র চালাকি দেখে রঞ্জুর ঠোঁট টিপে হাসতে ইচ্ছে করছিল। হাসল না। মুখটা হাঁড়ির মতন করে রাখল।

—দাদুর বড্ড বাড়াবাড়ি। রঞ্জুর চুলের ভিতর যুঁইদি আঙুল ডুবিয়ে দিল। এমন কিছু বড় হয়নি। আজকাল সব ছেলে—

—আস্তে! মা ঠোঁটে আঙুল রেখে যুঁইকে সাবধান করে দিল। দাদুর গলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ওপরে আসছিল।

—থাক গে, এসো তো, মুখটা ধুয়ে নাও। যেন পাঁচ বছরের খোকা সে। রঞ্জুর হাত ধরে যুঁইদি সটাং করে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। দরজা আটকে দিল।

—অদ্ভুত ছেলে যা-হোক তুমি। নির্জনতা পেয়ে যুঁইদির শাসন তর্জন গর্জন আরম্ভ হল। অবশ্য চাপা হিসহিস গলায়। জোয়ান ছেলে। আশী বছরের বুড়োটা কি বলেছে না বলেছে অমনি খাওয়া বন্ধ! তাতে ক্ষতিটা কার হচ্ছে শুনি! কদিন না খেয়ে থাকতে! দেখি, ঐ গালটা। ট্যাপ খুলে আঁজলা করে জল নিয়ে বার বার রঞ্জুর চোখেমুখে ঝাপটা দিচ্ছিল আর শাসন করার ফাঁকে ফাঁকে যুঁইদি যুঁইফুলের মতন শাদা দাঁতের সারি ছড়িয়ে বাথরুম আলো করে হাসছিল।

রঞ্জু কিছু বলছিল না।

—এখন? আমি এসে ডাকলাম আর বাবুর রাগ ভেঙে গেল। তাই না! আমি যতক্ষণ এ-বাড়ি আছি, দোর বন্ধ করে চুপ করে পড়ার ঘরে বসে থাকার বা শুয়ে থাকার মতন বেকুবি আর কিছু হয় না। তাই না? আমি যতক্ষণ এ বাড়িতে ততক্ষণ আমার আঁচল ঘেঁষে থাকার মতন সুখ পৃথিবীতে আর কিছু নেই—কেমন?

এসব কথার জবাব ছিল না। এসব কথার জবাব কেউ দেয় না।

রঞ্জুর মুখ থেকে কোনো জবাব বেরোবে না জেনেই যুঁইদি অকাতরে ফিসফিসিয়ে বলে যাচ্ছিল আর শাদা দাঁতের পাটির নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে প্রায়ান্ধকার বাথরুমটাকে পরীর দেশের মতন রহস্যময় করে তুলছিল।

কাজেই শেষ পর্যন্ত একটা মুচকি হাসি না হেসে রঞ্জু থাকতে পারেনি। না হলে বেজায় রকম নিষ্ঠুরতা দেখান হবে যুঁইদির ওপর। ভাবছিল সে।

—দেখি ওই গালটা। যুঁইদি দেওয়ালে ঝুলান তোয়ালেটা ছুঁয়েও দেখল না। নিজের আঁচল দিয়ে রঞ্জুর মুখ মুছিয়ে দেয়। আর তখন তার নিশ্বাসের গরম ঝাপটা ঝড়ের মতন এলোপাথাড়ি হয়ে রঞ্জুর গালে গলায় ঠোঁটে এসে লাগে।

এমন আর একদিন হয়েছিল। এতটা না যদিও। রঞ্জুর পড়ার ঘরে সন্ধ্যের পর তিনজন গল্প করছিল। টেবিলের কাছে চেয়ারে রঞ্জু বসা, আর টেবিলের লাগোয়া তার খাটে যুঁইদি ও টুটুল তার দিকে মুখ করে পাশাপাশি হয়ে বসে। ইলেকট্রিসিটি ফেল করে ঘরটা হঠাৎ এক সময় অন্ধকার হয়ে যায়। আর সেই মুহূর্তে চিলের মতন ছোঁ মেরে যুঁইদি রঞ্জুর হাতটাকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে পাগলের মতন কচলাতে থাকে। টুটুল টের পেয়েছিল কি। রঞ্জুর যেন মনে হল টুটুল টের পেয়েছিল।

কিন্তু সেটা ছোটখাট ব্যাপার ছিল।

আজ যা করছিল না তার তুলনা ছিল না। সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করছিল যুঁইদি। এবং এমন একটা সুযোগের জন্য যুঁইদি কিছুদিন ধরেই ছটফট করছিল রঞ্জু টের পাচ্ছিল। হুদের মতন কালো টলটলে চোখ দুটোর মধ্যে রঞ্জু আজকাল অনেক কিছু দেখছে। কেন্টনগর থেকে সরভাজার হাঁড়ি নিয়ে ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনে ছুটে আসা যুঁইদির বেড়ে গেছে। বিয়ের পর কোনো কোনো মেয়ে ভীষণ 'সেকসি' হয়ে ওঠে। তাদের ক্লাসের শোভেন বলছিল। কার কাছে নাকি সে শুনেছে। এক বছর আগে যুঁইদির বিয়ে হয়েছে আর, আশ্চর্য, এই একটা বছরের মধ্যে রঞ্জু ও তার বন্ধুরা—

না না দিদির ননদ এই যুঁইদি সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও আজ পর্যন্ত সে তার বন্ধুদের কাছে কিছু বলেনি। মাথা খারাপ! তার পেটের কথা পেটে আছে। তা ছাড়া তার নিজের আরও দু একটা ব্যাপারে সে ভয়ানক চাপা। টুর্বলির চিঠিটা নিয়ে পার্থ যেমন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিটিং ডেকে আলোচনা করতে চাইছে রঞ্জু তা পারত না। পারে না।

হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল—এক বছর যুঁইয়ের বিয়ে হয়েছে, আর এই একটা বছরের মধ্যে রঞ্জু ও তার বন্ধুরা 'সেকস' 'প্যাশন' ইত্যাদি নিয়ে এত বেশি আলোচনা করেছে এবং এত সব জেনে গেছে, ভাবতে তার নিজেরই অবাক লাগে। বিলেতে বা আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা ডেট করা কাকে বলে, সে জানে এখন বা 'মেটিং' বলতে কি বোঝায়। দু একটি কথার সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ ডিকশনারী ঘেঁটে ঘেঁটে সে বার করেছে। সে এবং তার বন্ধুরা। অমিত সেদিন তার মামার নোট বই থেকে একটা ইংরেজী কথা টুকে এনে তাদের দেখিয়েছিল। তার মামা খুব ইংরেজী বইটই পড়ে। যখন যেখানটা ভাল লাগে টুকে রাখে কথাটা ছিল :

> "Sex is not the best thing in the world, or the worst thing in the world, but there is nothing else quite like it".

খুব সহজ মানে। রঞ্জুদের বুঝতে একটু কষ্ট হয়নি। নিজের একটা খাতায় রঞ্জু লিখে রেখেছে। দেখাদেখি পার্থ এবং শোভেনও। বাড়িতে লুকিয়ে পার্থ শোভেন ও অমিতের সঙ্গে রঞ্জু কদিন আগে গ্লোবে একটা ইটালিয়ান ছবি দেখে এসেছে। মাথা খারাপ করে দেবার মতন ছবি। মেয়েটা

গুণে গুণে চোদ্দবার ছেলেটাকে চুমু খেল। একটা খড়ের গাদার পেছনে। দিনদুপুরে। ধারে কাছে মানুষজন ছিল না যদিও। একটু দূরে শুয়োর চরছিল, এক ঝাঁক মুরগি ছুটোছুটি করছিল, ডাইনে বাঁয়ে কটা রাজহাঁস হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ছিল আকাশে চাকা চাকা শাদা মেঘ—ভারি সুন্দর দৃশ্য। এমন একটা নিরিবিলি সুন্দর জায়গায় ছেলেটাকে পাগলের মতন জড়িয়ে ধরে—ওহ কী মূর্তি এখন মেয়েটার আলুথালু চুল গায়ের পোশাক ঠিক নেই, চোখ দুটো থেকে নীল আগুনের শিখা ঝরছে।

আজ অম্বুজা নিলয়ের বাথরুমে নীল আগুনের বদলে কালো আগুনের শিখা দুটো চোখের ভিতর ঝিকিয়ে উঠতে দেখল রঞ্জু। দুবার। আঁচল দিয়ে তার মুখ মোছা শেষ করে চিরুনি বুলিয়ে মাথাটা ঠিক করে দিচ্ছিল যুঁইদি। আর ফিসফিসে গলা। ঠিক যেন প্রলাপ বকছিল। ডাকাতের মতন দিন দিন সুন্দর হচ্ছে। দস্যু! কত মেয়ের যে মাথা খারাপ করবে এই চেহারা দেখিয়ে। টাটুঘোড়ার মতন শরীরটাও কেমন টনকো শক্তহয়ে উঠছে দিন দিন। এখন থেকেই আমার ভয় করছে।

—তোমার মাথা খারাপ না হলেই হল। রঞ্জু ফিক করে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে যুঁইদি আঙুল বেঁকিয়ে তার গালে জোরে ঠোনা মারল।

—আহা, মাথা খারাপ করার যেন কিছু বাকি রেখেছে। রঞ্জু অবশ্য আর কিছু বলেনি। তখনি গম্ভীর হয়ে গেছে ও যুঁইদির সঙ্গে বাথরুম থেকে বেরিয়ে চা দিয়ে যুঁইদির আদর করে দেওয়া একজোড়া সরভাজা খেয়েছে।

এখন ভাত খেতে বসে যুঁইদি প্রকাশ্যে এই কাণ্ড করছিল। তার পাতে ফিস-ফ্রাই তুলে দেয়, মাংস তুলে দেয়। মা চেঁচামেচি করছে। বাবা অল্প অল্প হাসছে এবং ধীরে সুস্থে খাচ্ছে। টুটুল মাথা গুঁজে। খাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে মোটেই কথা বলছিল না। মানে যুঁইদিকে যে ও পুরোপুরি চিনে গিয়েছিল বুঝে গিয়েছিল ধরে ফেলতে রঞ্জুর আর কষ্ট হয় না। আজই জিনিসটা পরিষ্কার সে বুঝতে পারল। এই নিয়ে সে মাথা ঘামাতে পারত—মেয়েরা কত অল্প বয়সে পেকে যায়। অবশ্য দাদু যেমন হিসাব করে টুটুলের বয়স তেরো আর রঞ্জুর ষোল বলে লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে আসলে কিন্তু তা নয়। টুটুলের কবেই তেরো পার হয়ে গেছে—এই পৌষে ও চৌদ্দয় পা দেবে আর এই কার্তিক থেকেই, রঞ্জুর সতেরো আরম্ভ হচ্ছে। অম্বুজা নিলয়ের ছেলেমেয়েদের বয়স কমিয়ে বলা বুড়োর একটা বাতিকের মধ্যে। তা নিজের ছেলেমেয়েদের বয়সের যে-হিসাবই করুক বুড়ো তাদের দু ভাই-বোনের আসলে বয়সটা তো রঞ্জুর মার কাছে। মা-র হিসাবটাই কারেকট হিসাব। যা হলেও রঞ্জু বলবে টুটুলটা একটু সকালেই পেকেছে। এমন এমন জিনিস এত চট করে ও বুঝে ফেলে—তিন বছরের বড় হয়েও রঞ্জুর হয়তো সেটা বুঝতে ছ মাস বেশি সময় লাগে। এখনও। পৌষে চৌদ্দয় পা দাও বা দাও মনে মনে সে টটুলকে উদ্দেশ্য করে বলল যুঁইদির বিয়ে হয়ে গেছে একটু বেশি স্বাধীনতা ভোগ করার কি এদিকে সেদিকে একটু ঝোঁকার ইচ্ছেটা তার এখন হবেই—এই নিয়ে টুটুলমণি তোমার মন খারাপ করার বা হিংসে করার কিছু নেই। নিজের স্বামীকেই যুঁইদি যেখানে কাঁচকলা দেখিয়ে যেদিন খুশি যখন খুশি কেষ্টনগর থেকে উড়াল দিয়ে ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস-এ চলে আসছে, সেখানে তোমার ছটফট করার বা যন্ত্রণা পাবার কোনো মানে হয় না।

থাক, এই নিয়ে এর বেশি কিছু রঞ্জু ভাবতে চাইছিল না। তার মন মেজাজ কাল থেকে খারাপ। যুঁইদি যেমন তার পাতে এটা ওটা ঠেলে দিচ্ছিল, সে-ও কিছু আপত্তি করছিল না। যেন এটাও তার একটা জেদ—মা চেঁচামেচি করে করুক, যুঁইদির দেওয়া ফ্রাই ও মাংস টপাটপ সে মুখে তুলছিল—দেরি করছিল না, কোনোদিকে না তাকিয়ে মেজাজ নিয়ে খেয়ে যাচ্ছিল, যেন মা-র দুঃখ পাওয়া সত্ত্বেও আর একজনের ভাগেরটা খেয়ে সাংঘাতিক তৃপ্তি লাগছিল তার—উল্টে যুঁইদিই যে বেশি তৃপ্তি পাচ্ছিল মা আর তা বুঝত কেমন করে।

হুঁ, রাত্রে উপোস থেকেছে, এভাবে অন্তত দুপুরবেলার খাওয়াটা আনন্দের সঙ্গে সে শেষ করত। এমন চড়াং করে তার রক্ত মাথায় চড়ল। পিছনে ডিকটেটরের গলা। নিয়মমাফিক সকলের আগে কর্তার খাওয়া হয়ে যায়। স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজর, একশ বছর বেঁচে যাওয়ার ইচ্ছে, তাই কাঁটায় কাঁটায় বেলা এগারোটায় ভাত চাই। ভাত খেয়ে এখন একটু গড়িয়ে নেবার কথা—ঘুমোয় না যদিও, ঘুমোলে শকুনের মতন জেগে থেকে বাড়ির ছেলেমেয়েদের পাহারা দেয় কে কিন্তু গড়ন হল? চাটির চটাস চটাস আওয়াজ তুলে খাবার টেবিলের কাছে ছুটে এল।

—তুমি বলছ বৌমা, যুঁই কিছু খাচ্ছে না, রঞ্জুর পাতে সব দিয়ে দিচ্ছে—তা তো দেবেই, সুন্দরী মেয়েরা যে ভাতটাত খায় কম, অনেক সময় খায়ই না, তুমি বুঝি জান না।

দাঁতে দাঁত চেপে রঞ্জু চুপ করে রইল। একটা ভাত আর তার গলা দিয়ে গলছিল না। মা আর কিছু বলছে না। মা-র চেঁচামেচি শুনেই যে শ্বশুর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে মা যেন একটু থমকে গেছে, ঘাড় গুঁজে আছে। কিন্তু নাতনী সম্পর্কীয়া সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা করার মস্ত সুযোগ পেয়ে আশী বছরের বঙ্কিম দত্ত মাড়ি ছড়িয়ে খিকখিক শব্দ করে হাসছিল। তা-ও আবার যুঁইদির চেয়ারের মাথাটা ধরে দাঁড়িয়ে। রাগে রঞ্জুর গা ফেটে যাচ্ছিল।

—তা হলে সুন্দরী মেয়েরা কী খেয়ে বাঁচে? রঞ্জুর বাবা নিজের বাপকে প্রশ্ন করল।

—হাওয়া খেয়ে বাঁচে, চাঁদের আলো ফুলের সুবাস খেয়ে বাঁচে। কথা শেষ করে বঙ্কিম দত্ত আবার খিকখিক হাসে। কী সস্তা রসিকতা! রঞ্জুর বাবাও হাসে। রঞ্জু লক্ষ্য করছিল বাবা অনেকক্ষণ খেয়ে এমন একটা আলাপের সুযোগ খুঁজছে। একলা সুবিধে করতে পারছে না।

অবশ্য এটা আজ নতুন নয়।

রঞ্জু বরাবর দেখছে, যুঁইদি যখন এ-বাড়ি আসে বঙ্কিম দত্ত অতিমাত্রায় রসিক হয়ে ওঠে। ঠাট্টা-মস্করার ফোয়ারা ছুটিয়ে

চার্লি চ্যাপলিন

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া সারা পৃথিবী হইতে চার্লি যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন এতদিন পরে তাহার স্বীকৃতি পাইলেন 'স্যার' উপাধি লাভে। চার্লস চ্যাপলিনের জীবন-কাহিনী ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার সম্যক্ পরিচয়। দাম তিন টাকা

ইতিহাসের অসাধারণ পুরুষ

শিবাজী মহারাজ

আচার্য যদুনাথ সরকারের ভূমিকাসম্বলিত

ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

চিত্তাকর্ষক ভাষায় কিশোরপাঠ্য সচিত্র জীবনকথা। দাম দেড় টাকা

[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২

দেয়। মেয়ের ননদ—মেয়ে সম্পর্কীয়া। যে জন্য বাবা সরাসরি ঠাট্টা-মস্করা করতে পারে না। কিন্তু বুড়োর কথায় হুঁ হাঁ করে রঙ্গ-রসে যোগ দিতে এক ফোঁটা দেরি করে না। রঞ্জুর মা অনেক সময় বিরক্ত হয়। মা-র বিরক্ত হওয়া বাবা বড় গায়ে মাখে কিনা! যুঁইদি এলে বঙ্কিম দত্তর নতুন বাবার উৎসাহ উদ্যমও বেড়ে যায়। এমনিতে বুড়ো হাতের মুঠো খুলতে চায় না। আজ মাছ মাংস দুটোর জন্য মনিব্যাগ খুলে টাকা বের করে বাবার হাতে দিয়েছে। বাবা বাজার করে এনেছে। সাতজন্মে কিন্তু বাবা বাজারে যায় না। বাজার-সওদা করা বাবার ঘোর অপছন্দ। কিন্তু আজ যে যুঁইদি খাবে।

সুন্দরকে সুন্দর বললে খুশী হওয়া স্বাভাবিক। যুঁইদি খুশী হয়। এতক্ষণ রঞ্জুর খাওয়া দেখা নিয়ে ও নিজের পাত থেকে রঞ্জুর পাতে এটা-ওটা তুলে দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এখন দাদুর কথা শুনে টেবিল থেকে চোখ তুলল। নাকের ডগাটা কুঁচকোল, পলকা হেসে ঠোঁটের কোণায় ডালিম-দানার মতন একটা ছোট্ট টোল তুলল অর্থাৎ আরও একটু সুন্দর দেখাবার জন্য যুঁইদি যা করার করল, বাঁ-ভুরুটা পাখর ডানার মতন বেঁকিয়ে দিল, তারপর বাবার দিকে না, দাদুর দিকে তাকিয়ে বলল, বুড়ো বয়সে আমার মতন একটা পেঁচী-খেঁদিকে দাদুর বিয়ে করতে বাসনা হয়েছে।

এ-ধরনের ঠাট্টা দাদু-নাতনীর মধ্যে চলে। খুব একটা দোষের না, রঞ্জু চিন্তা করল।

—আহা-হা-হা, যা বলেছ না দিদি! গলা দিয়ে আফসোসের সুর বার করল বুড়ো, সঙ্গে সঙ্গে শিরাবহুল শুকনো ডান হাতটা বাড়িয়ে যুঁইদির চিবুকের নিচে রাখল। দুফোঁটা মাংসের ঝোল লেগে আছে সেখানটায়, বুড়ো খেয়াল করে না। চিবুকটা ধরে আস্তে আস্তে চাপ দেয় আর পাকা মধ্যে নেড়ে খুশীর গলায় বলে হুঁ পেঁচী-খেঁদি বটে, পদ্মপাপড়ির মতন চোখ তিল-ফুলের মতন নাক মেঘের মতন চুল, এমন একটি পেঁচীকে যদি পেতাম, আবার বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে হয়ে যেতাম আমি, হি-হি।

—ইস ইস দাদুর হাতে সর্ষেড়ি লাগছে, নাকের ডগাটা আরও কুঁচকোয় যুঁইদি, ভুরু দুটো আর একটু বেঁকিয়ে দেয়। থুতনি চেপে ধরার দরুন শ্বাস-নালীতে লাগছে, যুঁইদির, শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে রঞ্জু টের পায়। কিন্তু যুঁইদি বিরক্ত হয় না। হাসে।—এমন করলে আমি কক্ষনো আর এ-বাড়ি আসব না। আমাকে পেলেই দাদু কেমন করে! আদুরে গলায় যুঁইদি কাঁকাতে আরম্ভ করে।

—আসবে, আসবে, আসতে হবে। বঙ্কিম দত্ত আমার দিকে ঝুঁকে যুঁইদির চোখের ভিতর তাকায়, মিটিমিটি হাসে। এই বুড়োর টানেই দিদিকে বার বার ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন ছুটে আসতে হবে। আর এসে উপায় নেই হি-হি।

এবার যুঁইদির চিবুক ছেড়ে দিয়ে তার চকচকে মসৃণ গলার ওপর বুড়ো মরা আমপাতা রঙের শুকনো খসখসে হাতটা রাখল।

কাতুকুতু লাগার মতন একটা অস্বস্তি-কর সুখ নিয়ে যুঁইদি চোখ বুজে ফিক-ফিক হাসে।

দাদুর মতন বাবা সেসব কিছু করতে পারে না, ইঁদুরের গর্তের মতন মুখের হাঁ-টা গোল করে রেখে লোলুপ চোখে যুঁইদির দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসে।

রঞ্জু কি কিছু বোঝে না! সব বোঝে। এই যে যুঁইদিকে নিয়ে কাণ্ডটা করছে বুড়ো এখানে সেকস ছাড়া আর কিছু নেই। ঠাট্টা-মস্করার আড়ালে একটা অল্প বয়সের মেয়ের নরম শরীর ছানাছানি করার লোভ সামলাতে পারছে না। বুড়োর ঠোঁটের কোণায় লালা জমেছে! কপালের রগটা লাফাচ্ছে। বাবার কপালের রগও লাফাচ্ছে। রঞ্জু লক্ষ্য করে।

তার দু কান গরম হয়ে ওঠে। অন্য-দিকে চোখ দুটো ফিরিয়ে নেয়। পার্থর কথাটা তার মনে পড়ে যায়। যত বয়স বাড়ে, লোকের এসব দোষ বাড়ে—শোভেন বলে, সবকটা বুড়ো এই রোগে ভোগে।

আজ অম্বুজা-নিলয়ে চোখের ওপর তাই দেখল রঞ্জু। এ-বাড়ির শিক্ষা-দীক্ষা রুচি কালচার। কত গর্ব বুড়ো বঙ্কিম দত্তর। আর রুদ্রেন্দু একটা উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে ছিল, বখাটে ছেলে ছিল।

—বুঝলে বাবা, বুড়ো বাপকে রঞ্জুর বাবা সংশোধন করে দেয়। তোমার উপমাটা ঠিক হল না। যুঁইয়ের চোখ দুটো পদ্ম-পাপড়ি না এভ কালো এত গভীর মনে হয় দুটো হ্রদ টলটল করছে।

—বেশ তো, তাই আমি মেনে নিচ্ছি—এই হ্রদের জলে আমি সাঁতার কাটব, কি বলো দিদি। এখানে রাজহাঁস ভেসে বেড়ায় পদ্ম ফোটে। বুড়ো আহ্লাদে ডগমগ হয়ে যুঁইদির গলা থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে তার দুটো নরম হালকা কাঁধ ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দেয়।

মা আর দাঁড়িয়ে থাকে না। যেন রান্নাঘরে বেড়াল ঢুকে কিছু ফেলে দিচ্ছে। এমন একটা তাড়া নিয়ে ওদিকে ছুটে গেল।

যেন গলায় মাংসের হাড় না কি মাছের কাঁটা ঠেকেছে, খকখক কেশে চট করে উঠে টুটুল বেসিনের দিকে চলে গেল।

একটি মেয়ের রূপের প্রশংসা অন্য মেয়েরা সহ্য করতে পারে না। কথাটা অমিত বলেছিল। মা ও টুটুলের সরে যাওয়া দেখে রঞ্জুর এখন মনে পড়ল।

কিন্তু খাওয়া শেষ করে রঞ্জু টেবিল ছেড়ে উঠতে পারে না। বাবার মতন বসে থাকে।

বুড়োর আদর খেয়ে আদুরে চোখে যুঁইদি দাদুকে দেখছিল 'এইবেলা শুয়ে পড়ুন গে শরীর খারাপ করবে' ইত্যাদি বলে সে হাগ করে একটু ধমকটমকও দিচ্ছে, কিন্তু আসলে যুঁইদি বে-কাজে ব্যস্ত ছিল, টেবিলের নিচে পা-টা বাড়িয়ে রঞ্জুর পায়ের সঙ্গে বার বার ঠেকা লাগাচ্ছিল।

এই জিনিস, এই গোপন ইসারা ইঙ্গিত পৃথিবীর কারো জানার কথা ছিল না। টেবিলের তলার দিকে কারো চোখ নেই। আশী বছরের বুড়ো বঙ্কিম দত্তর মতন তার পঞ্চান্ন বছরের ছেলে অসময়ও দেখছে যুঁই নামের ছিপছিপে ফরসা সুন্দর মেয়েটির হ্রদের মতন কালো ডাগর চোখে রাশি রাশি পদ্ম ফুটছে, রাজহাঁস খেলা করছে।

রঞ্জু মজা পায়। সে দেখছে যুঁইদির চোখে বড় বড় হাঙ্গর কুমীর ভেসে বেড়াচ্ছে। ফুলটুলের নামগন্ধও নেই। রাজহাঁস নেই।

প্যাশন। গ্লোবে সেই ইটালিয়ান ছবির মেয়েটার কাণ্ডকারখানা দেখে রঞ্জুদের সামনের সীটে-বসা এক ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে দুবার শব্দটা উচ্চারণ করেছিল না! প্যাশন প্যাশন।

ভাবতে গিয়ে রঞ্জুর বুক ধুক করে উঠল। শিরদাঁড়ায় বিদ্যুৎ-শিহরণ অনুভব করল সে।

তার মনে পড়ল কাল বাবার ছেলে-বেলার বন্ধু রুদ্রেন্দুর মুখ দিয়েও ঠিক ঐ শব্দটা বেরিয়েছিল। প্যাশন। পাহাড়-তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের অ্যাকশন শেষ করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দার পটাসিয়াম সায়নাড খেয়েছিল, ইংরেজ সৈন্যের হাতে ধরা দেয়নি। বড্ড বেশি দেশ—দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখত মেয়ে। সেই অদম্য প্যাশন তাকে ঘরছাড়া করে। বাপের স্নেহ, মায়ের আদর ধরে রাখতে পারেনি।

বা-রে! খামকা রঞ্জু মন খারাপ করছে।

সেই প্রীতিলতাকে পায়নি সে, এই প্রীতিলতাকে পাচ্ছে। সেই উনিশ-কুড়ি বছর বয়স। প্যাশনের আগ্নেয়গিরি হয়ে যুঁইদি খাবার টেবিলে বসে আছে। টেবিলের তলা দিয়ে পা বাড়িয়ে রঞ্জুর পা চেপে ধরছে। পা-টা পুড়ে যাচ্ছে রঞ্জুর।

এই ভাল, এই ভাল। মনে মনে বলল সে।

রুদ্রেন্দুর সঙ্গে কথা বলেছিল বলে কাল সারাটা বিকেল তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হয়নি।

তাই জেদ করে নিজেকে পুড়তে দিচ্ছে সে। এবং আর একটু পুড়বে বলে যুঁইদির শায়ার সঙ্গে পা-টা ঠেকিয়ে গরম সীসার মতন পায়ের ডিমটা চেপে ধরে রাখল। জেদ করে আজ সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থেকে ভেন্টিলেটারের কাছে চড়ুই দুটোর ব্যস্ততা দেখছিল।

সব মিলিয়ে ভিতরে একটা উল্লাসবোধ করছে সে এখন। মনের ভার কেটে গেছে।

(ক্রমশঃ)

ক্রিশ্চিয়ান দ্যুভে

পল ফ্লোরি

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার, ১৯৭৪

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দু'জন রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঃ অধ্যাপক মার্টিন রাইল (৫৬) ও অধ্যাপক অ্যানটনি হিউইশ (৫০)। দু'জনেই ইংলণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত চুয়াত্তর বছরে (নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় ১৯০১ সাল থেকে, পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম বছর পুরস্কৃত হন স্বনামখ্যাত ভিলহেলম রোয়েন্টগেন, ১৯৭৩ পর্যন্ত মোট ৯৭ জন পদার্থবিজ্ঞানী) পদার্থবিজ্ঞানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নোবেল পুরস্কারলাভ এই প্রথম।

পুরস্কৃত দু'জন বিজ্ঞানীই রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানী। বিশেষ করে এই দু'জন বিজ্ঞানী পুরস্কৃত হওয়াতে রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতির পক্ষে বড়ো রকমের স্বীকৃতি পাওয়া গেল।

'রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞান' ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। গ্যালিলিও থেকে শুরু করে গত কয়েক-শো বছর বিজ্ঞানীরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছেন অপটিক্যাল টেলিস্কোপের সাহায্যে। এই দেখা সরাসরি চোখ দিয়ে দেখা—বর্ধিত আকারে। যেমন, দ্রষ্টব্য যদি হয় চন্দ্র, তবে টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে সেই চন্দ্রকেই দেখি—অনেকটা যেন কাছে থেকে (কিংবা টেলিস্কোপের সাহায্যে আলোকচিত্র তুলে নিয়ে সেই আলোকচিত্র দেখি)। কিন্তু সম্প্রতিকালে আবিষ্কার করা গিয়েছে, সরাসরি চোখে না দেখেও অন্য একভাবে আকাশকে দেখা চলে। শেষোক্ত এই দেখাটা রেডিও-তরঙ্গের সাহায্যে। ব্যাপারটা এই রকম ঃ কোনো একটি নক্ষত্রকে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই নক্ষত্র থেকে যে রেডিও-তরঙ্গ নিঃসৃত হয় তার হদিশ নেওয়া হয় পৃথিবীর মাটিতে স্থাপিত একটি গ্রাহক-যন্ত্রে, তা থেকেই নক্ষত্রটিকে 'দেখা'। এমনও হতে পারে নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে এতই দূরে যে টেলিস্কোপের সাহায্যেও সরাসরি চোখে দেখা সম্ভব নয়, এক্ষেত্রেও নক্ষত্র থেকে নিঃসৃত রেডিও-তরঙ্গ পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে এবং সেই তরঙ্গ ধরার আয়োজন করতে পারলে অন্য একভাবে নক্ষত্রটিকে দেখাও হয়ে যায়। মহাকাশ থেকে আগত রেডিও-তরঙ্গ ধরার জন্য যে যান্ত্রিক আয়োজনটি করা হয়ে থাকে তার নাম রেডিও-টেলিস্কোপ। মহাকাশ পর্যবেক্ষণে রেডিও-টেলিস্কোপের ব্যবহার গত তিন দশকের মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়েছে বলা চলে।

রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশের কতকগুলো আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন—যথা, কোয়াসার পালসার কৃষ্ণবিবর সুপারনোভা ও বিস্ফোরণশীল গ্যালাক্সি। এই আবিষ্কারগুলো একমাত্র রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানের পক্ষেই সম্ভব ছিল। ('মহাবিশ্বের সংবাদ' শিরোনামায় ইতিপূর্বে ১৪ বর্ষ ১৯ সংখ্যায় আমরা কোয়াসার পালসার ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

অধ্যাপক মার্টিন রাইল নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর যে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার জন্য তাকে বলা হয় 'অ্যাপারচার সিনথেসিস টেকনিক'। ব্যাপারটাকে সহজ ভাষায় এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে ঃ এটি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কতকগুলো রেডিও-টেলিস্কোপ বিন্যস্ত করার কৃৎ কৌশল। বিন্যাসটি এমনই যাতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি রেডিও-টেলিস্কোপের কতকগুলো গুণ অনুকৃত হতে পারে। এই কৃৎ-

ফ্রীডরিখ ফন হায়েক

গুনার মীরডাল

অ্যালবার্ট রুড

জর্জ প্যালেড

কৌশল অনুযায়ী কেমব্রিজে যে যন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছে, তার সাহায্যে লব্ধ রেডিও-উৎসের ছবিটি পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসের অ্যানটেনা বিশিষ্ট রেডিও-টেলিস্কোপ থেকে লব্ধ ছবির সঙ্গে তুলনীয়। পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসের অ্যানটেনা বিশিষ্ট রেডিও-টেলিস্কোপ অতি বৃহৎ এক ব্যাপার, অথচ এই বৃহৎ ব্যাপারেই সমান ফল পাওয়া যাচ্ছে কতকগুলো ছোট রেডিও-টেলিস্কোপের বিশেষ এক বিন্যাস থেকে। কেমব্রিজের যন্ত্রে আছে এমনি আটটি ছোট রেডিও-টেলিস্কোপ—একটি রেলওয়ে ট্র্যাকে বিন্যস্ত। তার বিশ্লেষণ-ক্ষমতা এতই সূক্ষ্ম যে বলা হয়ে থাকে একটি অপটিক্যাল টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া আলোক-চিত্রে যতোখানি বিস্তৃতভাবে খবর ধরা পড়ে এই রেডিও-টেলিস্কোপের সমাহার থেকেও ততোখানি। সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, একজন রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পক্ষে এ এক অসাধারণ কৃতিত্ব।

১৯৬৪ সালের শেষদিক থেকে শুরু করে অধ্যাপক রাইল ও তাঁর সহকর্মীরা রেডিও-টেলিস্কোপের এই সমাহারের সাহায্যে নির্ধারণ করেছেন বিশ্বের অতি দূরে অবস্থিত অতি অস্পষ্ট সব পদার্থের সংখ্যা ও বিন্যাস। তাঁর এই কাজ থেকে মহাবিশ্বের ছবিটি আরও যথাযথ হয়েছে। রেডিও-গ্যালাকসি ও কোয়াসারের অবস্থান সম্পর্কেও তাঁরা হদিশ দিতে পেরেছেন, সেই সঙ্গে তাদের জন্ম-বিবর্তন ও মৃত্যু-সম্পর্কিত কিছু ভৌতিক প্রক্রিয়ার বিবরণও।

অভিনব ও অতিমাত্রায় কার্যকর এই কৃৎকৌশলটি বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ মানমন্দিরে প্রবর্তিত হয়েছে। আর অধ্যাপক রাইলের কল্যাণে তা এতই উন্নত যে, বলা হয়ে থাকে, যতোখানি বিশ্লেষণ-ক্ষমতা থাকলে চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপিত একটি ডাক-টিকিটের খুঁটিনাটি পৃথিবী থেকে দেখা সম্ভব তা এই কৃৎকৌশলের আয়ত্ত।

অধ্যাপক অ্যানটনি হিউইশ ১৯৬৮ সালে পালসার আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারটিকে বলা হয় বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানে এক ক্লাসিক অবদান। আবিষ্কারটি কিন্তু হয়ে যায় ঘটনাচক্রে, অধ্যাপক হিউইশ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন—তারই সূত্রে। বিষয়টি ছিল আন্তঃগ্রহ ঝিকিমিকি (ইন্টার-প্ল্যানেটারি সিনটিলেশন)। ব্যাপারটা কি? মনে করা যাক, ক্ষুদ্র ব্যাসের একটি রেডিও-উৎস থেকে (যেমন, দূরের একটি কোয়াসার থেকে) রেডিও-তরঙ্গ আসছে। আন্তঃগ্রহ মহাশূন্য অতিক্রম করার সময়ে এই রেডিও-তরঙ্গকে যেতে হয় আন্তঃগ্রহ প্লাজমা মেঘের ভিতর দিয়ে (প্লাজমা হচ্ছে, সাধারণভাবে বলা চলে আয়নিত গ্যাস, আন্তগ্রহ প্লাজমা সূর্য থেকে উদ্ভূত) এবং তার ফলে এই রেডিও অপরিবর্তিত হয়ে যায় (বা সহজভাবে বোঝাবার জন্য বলা চলে আলো-আঁধারি রেখায় বিশ্লেষিত হয়ে যায়)। এতে প্রাপ্ত সংকেতের তীব্রতায় ওঠা-নামা ঘটে যায়। এমনিতে একটানা সংকেত এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হয়ে ওঠে স্পন্দনশীল।

অধ্যাপক হিউইশ তাঁর এই গবেষণার জন্য ১৮,০০০ বর্গমিটার আয়তন জুড়ে বিরাট এক এরিয়াল-সমাহার খাড়া করেছিলেন। আর এমন এক তরঙ্গ-ব্যান্ডে পর্যবেক্ষণকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন যেখানে প্লাজমা-জনিত ক্রিয়া সবচেয়ে প্রকট। শেষ পর্যন্ত তা থেকেই পেয়েছিলেন সংকেতের অতি-নিয়মিত ওঠা-নামা। অধ্যাপক হিউইশ প্রমাণ করলেন যে এই ওঠা-নামার কারণটি রয়েছে পৃথিবীর বাইরে।

পালসার আবিষ্কৃত হয়েছে আজ পর্যন্ত প্রায় ১২০টি। পালসার বা পালসেটিং স্টার—বাংলায় বলা যেতে পারে, স্পন্দনশীল তারকা। এই পালসার থেকেই নিঃসৃত হচ্ছে রেডিও-তরঙ্গের বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ—দমকে দমকে (অর্থাৎ যেন স্পন্দনশীল) ও অতি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে। পালসারকে বলা হয় নিউট্রন তারকা—সুপারনোভা বিস্ফোরণের শেষ অবস্থা এটি। অধ্যাপক হিউইশ বললেন, সংকেতের উদ্ভব এই নিউট্রন তারকা থেকে। বিস্ফোরণের শেষ অবস্থা প্রাপ্ত এই নিউট্রন তারকা আকারে হয়ে যায় খুবই ছোট ব্যাসে সম্ভবত একশো কিলোমিটারেরও কম। কিন্তু ঘনত্ব লাভ করে কল্পনাতীত মাত্রার অধিক—প্রতি ঘন-সেন্টিমিটারে ১০ টু-দ্য-পাওয়ার ১৪ গ্রাম (অর্থাৎ দশের পরে চোদ্দটা শূন্য বসালে যতো হয় ততো গ্রাম)। তেমনি তার চৌম্বকক্ষেত্রটিও হয়ে থাকে এমনি বিরাট মাপের। এই অবস্থায় পদার্থটি দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে। আর তারই ফলে অতি-নিয়মিত এই স্পন্দন।

•

রসায়নবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ পল জে ফ্লোরি (৬৪) আমেরিকান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক। পুরস্কারটি তিনি পেয়েছেন বৃহৎ অণুর (ম্যাক্রোমলিকিউল) ভৌত রসায়নে তত্ত্বগত ও পরীক্ষাগত মৌল সাফল্য লাভের জন্য।' বৃহৎ-অণুর রাসায়নবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের গৌরব অর্জন এই নিয়ে চারবার।

বৃহৎ-অণু হচ্ছে যাকে বলা হয় পলিমার অণু। আবার, পলিমার হচ্ছে পলিমারভবনের ফলে সৃষ্ট অণু। পলিমারভবন হচ্ছে বৃহত্তর অণু গঠন করবার জন্য একই যৌগ পদার্থের দুই বা ততোধিক অণুর রাসায়নিক মিলন। এমনিভাবে আসে পলিমার বা বৃহৎ-অণু আর এই পলিমার রসায়নবিজ্ঞানে ডঃ ফ্লোরি হচ্ছেন একজন পথিকৃৎ।

বৃহৎ-অণুর মধ্যে আছে পরমাণুর লম্বা চেইন বা সারি—বিশেষভাবে বন্ধ। কারণ পরমাণু সহজেই বন্ধ হতে পারে এ-কারণে প্রোটিন হাইড্রোকারবন ডি-এন-এ আর-এন-এ ইত্যাদি যেগুলোকে বলা হয় প্রাণের মৌলিক অণু, সেগুলো সবই বৃহৎ-অণু। এই সমস্ত বৃহৎ-অণুর গড়ন হয়ে থাকে ত্রিমাত্রিক, আকার বিভিন্ন। অতএব এদের ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করতে হলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে হয় এদের আকারগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। ডঃ ফ্লোরির গবেষণার বেশির ভাগই এই বিশেষ ক্ষেত্রে। এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে প্লাস্টিক যুগের সূত্রপাত তাঁরই গবেষণা থেকে।

•

শারীরবৃত্ত বা ভেষজে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন—কোষের গড়ন ও ক্রিয়া সম্পর্কে তাঁদের আবিষ্কারের জন্য।' এঁরা

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস
ডাঃ এস. এন. পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

হচ্ছেন বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্-স্থিত জুলে বোর্দে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডঃ অ্যালবার্ট ক্লড (৭৫), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয় মেডিসিন স্কুলের ডঃ জর্জ ই প্যালেড এবং বেলজিয়ামের ব্রাসেলস-স্থিত লুভোই বিশ্ববিদ্যালয়ের ও রেকফেলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডঃ ক্রিশ্চিয়ান আর দ্য দুভে।

কোষ হচ্ছে প্রাণ গঠনের মৌলিক উপা-দান। আর তিনজন বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, কোষের কাঠামো অতি-মাত্রায় সংগঠিত ও ভাগে ভাগে বিভক্ত।

সাধারণ মাইক্রোস্কোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হয় উনিশ শতকে, তারপর থেকেই জৈব কোষ নিয়ে বিশদ অনুশীলন শুরু। কিন্তু এই মাইক্রোস্কোপে কোষের অভ্যন্তরের কণিকাগুলো স্পষ্ট ধরা পড়ত না, আবছায়া একটা আভাস মাত্র হয়ে থাকত। ডঃ ক্লড ছিলেন প্রথম জীববিজ্ঞানী যিনি কোষ পর্যবেক্ষণ করবার জন্য ১৯৪০ সালে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করলেন। তারপর থেকেই কোষের আভ্যন্তরিক চেহারা স্পষ্ট হতে থাকে, কোষের বহু বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরিচয় হয়। ক্রমে জানা যায় যে কোষের অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট গড়নে সংগঠিত। জৈব-রসায়ন ও কোষ-শারীরবৃত্তের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ ক্লড তাঁর গবেষণায় কোষের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলোকে বিশেষ উপায়ে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তা থেকে কোষের কাঠামোর ক্রিয়াপ্রক্রিয়ানির্ধা-রণ করতে পেরেছিলেন। আধুনিক কোষ-জীববিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছেন তিনি।

ডঃ ক্লডের পরে শুরু হয় অধ্যাপক দ্য দুভে-র পর্যবেক্ষণ। তিনি আবিষ্কার করেন (১৯৫৫ সালে), যাকে বলা হয়, লাইসো-সোম। এটির অবস্থান সাইটোপ্লাজম-এ (কোষের বহিঃস্থ ঝিল্লী ও কেন্দ্রস্থ নিউ-ক্লিয়াসের মধ্যেকার)। লাইসোসোম নানা গড়নের ও আকারের হতে পারে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের কোষেই তা বর্তমান। লাইসোসোমকে বলা যেতে পারে কোষের পরিপাক ব্যবস্থা, কোষে প্রবিষ্ট নানা বিভিন্ন ধরনের পদার্থ সে ভেঙ্গে ফেলে, যে-সব অণু বিষাক্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা সে-গুলোকে ধ্বংস করে। লাইসোসোমে ঘাটতি পড়লে বা খুঁত দেখা দিলে নানারকমের জটিল ব্যাধি হতে পারে।

ডঃ প্যালেড-এর আবিষ্কার—যাকে বলা হয়, রাইবোসোম। এটি এক অতি ক্ষুদ্র কণিকা প্রোটিন সংশ্লেষণের সঙ্গে জড়িত।

এই তিনজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের ফলেই কোষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গিয়েছে। পুষ্টি গ্রহণ করা, অভ্যন্তরিক ক্ষতি সারিয়ে তোলা, নতুন অংশ গড়ে তোলা, আক্রমণে উদ্যত জীবাণু ধ্বংস করা ইত্যাদি অনেক ক্ষমতাই কোষের আছে। কোষ সম্পর্কে এই জ্ঞানে ব্যবহৃত হচ্ছে কোষের ক্রিয়া ঠিক-মতো না চললে যে-সব ব্যাধি দেখা দিতে পারে তার চিকিৎসা করার জন্য। এই তিন জন বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে মানুষের অশেষ উপকার সাধিত হয়েছে।

*

অর্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার (১৯৬৯ সাল থেকে প্রবর্তিত) পেয়েছেন দুজন : ডঃ গুনার মীরডাল ...(৭৫) ও অধ্যাপক ফ্রীডরিখ ফন হায়েক (৭৫)। প্রথমজন সুই-ডেনের কল্যাণ-রাষ্ট্রের অন্যতম পরিকল্পনা-কারী ও বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি কলেজের অধ্যাপক। দ্বিতীয়জন শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের। উভয়েই এখনো অধ্যাপনা করা ছাড়াও প্রচুর লিখে চলেছেন।

অধ্যাপক মীরডাল অতি সুপরিচিত নাম, ভারতেও এসেছেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সুইডেনের বাণিজ্যমন্ত্রী। তারপরের দশ বছর ছিলেন ইউরোপের জন্য জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক কমিশনের প্রধান। দুটি ক্লাসিক গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। একটি আমেরিকার নিগ্রো সমস্যা নিয়ে, নাম 'অ্যান আমেরিকান ডাইলেমা' (১৯৪৪)। অপরটি বিশ্বের সব-চেয়ে জনবহুল এলাকার অর্থনৈতিক রাজ-নৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে, নাম 'এশিয়ান ড্রামা : অ্যান এনকোয়ারি ইনটু দ্য পোভার্টি অব নেশনস' (১৯৬৮)। তিনি বিশ্বাস করেন জন-বিস্ফোরণকে ঠেকাবার একমাত্র পথ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিকে শিল্পোন্নত দেশগুলির সাহায্য দান। এশিয়ার সমস্যায় পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র প্রবর্তনের যৌক্তিকতায় তিনি সন্দেহ পোষণ করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিকভাবে জড়িত হয়ে পড়ার তিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক।

অধ্যাপক হায়েক-এর মতামত ভিন্ন ধরনের। তাঁর বিশ্বাস, মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে গভর্নমেন্ট যতো বেশী লড়াই চালাবে ততোই তা আরো খারাপের দিকে যাবে। তাঁর লেখা বইয়ের নাম 'দ্য রোড টু সার্ফডম' (১৯৪৪)। এই বইয়ে তিনি অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেছেন।

মতামত ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা দুজনে একই সঙ্গে নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন 'মুদ্রার তত্ত্ব এবং অর্থ-নৈতিক ওঠানামা এবং অর্থনৈতিক সামাজিক ও সংস্থাগত ব্যাপারের পরস্পর-নির্ভরতা সম্পর্কে সুগভীর বিশ্লেষণে' তাঁদের অগ্র-স্থানীয় কাজের জন্য।

—অয়স্কান্ত

শশাঙ্ক মোহন সেন

সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর সমগ্র রচনাবলী বৃহৎ আকারের দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হবে। খণ্ড দুটির মূল্য ৬০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য মাত্র ৩৫ টাকা।

নবীন সেন ও ঈশ্বর গুপ্ত

রচনাবলী, একখণ্ড করে প্রকাশিত হয়েছে। আগামী মার্চ মাসে আরও একটি করে খণ্ড প্রকাশিত হবে। নবীনচন্দ্র ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ—মূল্য ১১০ টাকা। গ্রাহকমূল্য এখনও ৬০ টাকা। ঈশ্বর গুপ্ত ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ—মূল্য ৬০ টাকা। গ্রাহকমূল্য ৪৫ টাকা। নবীনচন্দ্র রচনাবলীর গ্রাহকমূল্য কিছুদিনের মধ্যে বৃদ্ধি হবে।

সুনির্মল রচনা-সম্ভার

তিনটি খণ্ড। মূল্য ৬৫ টাকা। গ্রাহক হলে পাবেন মাত্র ৪৫ টাকায়। দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ড প্রায় নিঃশেষিত। যাঁরা বর্তমান মূল্যে উপরোক্ত রচনাবলী পেতে চান তাঁদের অবিলম্বে ৫ টাকা দিয়ে গ্রাহক হবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

রঙ্গলাল রচনাবলী—এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ২৫ টাকা। আমাদের অন্যান্য রচনাবলীর গ্রাহকগণ সদ্য প্রকাশিত এই বৃহৎ গ্রন্থটি মাত্র ১৫ টাকায় পাবেন।

দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

পুনশ্চ

আমরা ৩৬ ও ৩৭ সংখ্যার 'অমৃত'তে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি নিবন্ধ থেকে দুইশত বৎসরেরও অধিককাল পূর্বের কলিকাতার বিষয় কিছু কিছু উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছি। কিন্তু এই বৈচিত্র্যময় শহরের এমনই সব প্রাচীন কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আছে যা বার বার পড়লেও পুনঃপাঠের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না।

আলোচ্য সংখ্যায় পুনরপি আমরা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্তৃক রচিত ইংরাজী গ্রন্থ 'আলি' হিসট্রি এ্যান্ড গ্রোথ অফ ক্যালকাটা' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ যা সুবলচন্দ্র মিত্র কর্তৃক 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকায় ১৩১২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে কালীঘাট সম্বন্ধীয় অংশটি এখানে আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম।

কালীঘাট

হিন্দুদের মতে কালীঘাট বা কালীক্ষেত্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অতি পবিত্র তীর্থ ও পূজার স্থান। সত্যযুগে আদর্শসতী 'সতী' পিতা দক্ষরাজের যজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে যৎকালে বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা সেই অঙ্গ ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হন সেই সময়ে সতীদেহের চারিটি অঙ্গুলি এইস্থানে পতিত হয়। তদবধি এই স্থানে শাক্ত হউক শৈব হউক গাণপত্য হউক সর্ব্বসম্প্রদায়ের হিন্দুর নিকট ইহা মহাতীর্থ। অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকে মনস্কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত এই স্থানে মানসিক করিয়া থাকে এবং প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে অনেক স্থলে কামনা সফলও হইয়াছে। যোগী সন্ন্যাসী ও সাধু মহাপুরুষেরা এইস্থানে সমবেত হইয়া থাকেন এবং মহাদেবীর পূজা করিয়া আপনাদিগের গন্তব্য পথে চলিয়া যান।

ভারতবর্ষের উত্তরাংশের হিন্দু করদ রাজারা কলিকাতায় আসিলে মা কালীর পূজা না দিয়া তাঁহারা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্ত হন না। দেশের সর্ব্বত্রই এই মন্দিরের খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। হিন্দুরা ইহাকে এতদূর ভক্তি করে যে এ বিষয়ে ইহা কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের তুল্য বলা যাইতে পারে। কথিত আছে যে সেকালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও কালীঘাটে দেবীর পূজা দিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা ধূমধামের সহিত পুণ্যাহ উৎসব যথানিয়মে সম্পন্ন করিতেন এবং সেই উপলক্ষে দেবীর পূজানুষ্ঠানে যোগদান করিতেন।*

এই তীর্থের উৎপত্তি ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এস্থলে সবিশেষ আলোচনা করা অনাবশ্যক। মার্কণ্ডেয় পুরাণ তন্ত্রসার এবং অন্যান্য পুরাণ ও তন্ত্রে এবিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কথিত আছে যে মহাদেবীর মন্দির ঠিক নদীর ধারে অর্থাৎ ঘাটের উপর ছিল। এই জন্য সহজেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে ইহা হইতেই বর্ত্তমানে কালীঘাট নামের উৎপত্তি। বৃহন্নীলাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে অতি প্রাচীনকালে অতি অল্পসংখ্যক কয়েকজন ভক্ত মাত্র এই কালীদেবীর কথা জ্ঞাত ছিলেন। যৎকালে সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু নরপতি বল্লালসেন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সেই সময় হইতে যৎকালে মোগল সম্রাট আকবর রাজত্ব করিতেন এবং অমর কবি কবিকঙ্কন তাঁহার ভক্তিরসাত্মক চন্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন সেই সময় পর্য্যন্ত নানাস্থানে নানাভাবে এই তীর্থপ্রসঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে কলিকাতার অদূরস্থ বড়িশা নিবাসী সন্তোষ রায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

পাদরি ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন : 'কলিকাতার নিকট কালীঘাটে এই দেবীর একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। হিন্দুরা বলে সমস্ত এশিয়া—এমনকি সমস্ত পৃথিবী এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে। এই দেবীর নিকট প্রতিদিন যেসকল পূজার সামগ্রী অর্পিত হয় তাহার পরিমাণ এত অধিক যে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়; অতি দুর্যোগের দিনেও অন্যূন ৩২০ পাউন্ড (৪ মণ) চাউল ২৪ পাউন্ড চিনি ৪০ পাউন্ড সন্দেশ ১২ পাউন্ড ঘি ১০ পাউন্ড ময়দা ১০ কোয়ার্ট দুধ এক পেক ডাল ৮০০ কলা ও ন্যূনাধিক পাঁচ শিলিং মূল্যের অন্যান্য দ্রব্য প্রদত্ত হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন আট-দশটি ছাগ বলি হয়। সাধারণ দিনে এই পরিমাণের তিনগুণ এবং প্রধান প্রধান উৎসব দিবসে অথবা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি পূজা দিতে আসিলে ইহার দশ গুণ বিশ গুণ চল্লিশ গুণ দ্রব্যও অর্পিত হইয়া থাকে এবং ৪০ হইতে ৫০টি মহিষ ও ন্যূনাধিক এক সহস্র ছাগ বলি দেওয়া হয়।

'কথিত আছে যে প্রায় ৫০ বৎসর হইল কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণ কালীঘাট দর্শনে যাইয়া দেবীর পূজায় অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পূজার অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ১০০০০ টাকা মূল্যের একছড়া সোনার কণ্ঠমালা বহুমূল্য শয্যা রূপার থালা রেকাব বাটি এবং এক হাজার লোককে ভোজন করাইবার উপযুক্ত সন্দেশ ও অন্যান্য খাদ্য ছিল। তদ্ভিন্ন প্রায় দুই হাজার কাঙ্গালীকে কিছু কিছু নগদ অর্থও দেওয়া হইয়াছিল।

'প্রায় ২০ বৎসর হইল কলিকাতার নিকটস্থ খিদিরপুরবাসী জয়নারায়ণ ঘোষাল এই স্থানে পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন; তিনি ২৫টি মহিষ ১০৮টি ছাগ ও ৫টি মেষ বলি দিয়াছিলেন এবং দেবীকে চারিটি রূপার হাত-দুটি সোনার চক্ষু এবং সোনা রূপার বিস্তর অলঙ্কার অর্পণ করিয়াছিলেন।

'প্রায় ১১০ বৎসর হইল পূর্ব্ববঙ্গের একজন মহাজন (বণিক) এই দেবীর কেবল পূজায় পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি এক সহস্র ছাগ ক্রয় করিয়া বলি দিয়াছিলেন।

'১৮১০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গের একজন ব্রাহ্মণ এই প্রতিমার পূজায় প্রায় ৪০০০ টাকা ব্যয় করেন: ঐ টাকার কিয়দংশ দিয়া তিনি একছড়া সোনার কণ্ঠমালা কিনিয়া দিয়াছিলেন: তাঁহার মালাগুলির আকার অসুরের মুন্ডের মত।

'১৮১১ সালে গোপীমোহন নামক কলিকাতাবাসী একজন ব্রাহ্মণ এই দেবীর পূজায় দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু তিনি নিজে বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া কোন পশু বলি দেন নাই। কেবল হিন্দুরাই যে এই কাল পাথরের পূজা করে তাহা নহে; আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে ইউরোপীয়েরা অথবা তাহাদের এতদ্দেশীয় উপপত্নীরা এই মন্দির দর্শনে গমন করে এবং পূজায় সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করে।' (ক্রমশঃ)

—ক্ষপণক

---

*এ সম্বন্ধে খৃষ্টান মার্শম্যান সাহেব লিখিয়াছেন : 'গত সপ্তাহে গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি কতকগুলি ইংরেজ কালীঘাটে গিয়াছিলেন এবং ইংরেজরা সম্প্রতি এদেশে যেসকল বিজয়লাভ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত কোম্পানির নামে হিন্দুদের দেবীর নিকট পূজা দিয়াছেন। পাঁচ হাজার টাকার পূজা দেওয়া হইয়াছে। সহস্র সহস্র বাঙ্গালী এই প্রতিমার নিকট ইংরেজদিগের পূজা দেওয়া দেখিয়াছে। এই কার্য্যে আমরা সবিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছি কারণ এই ব্যাপারে বাঙ্গালীরা যেন আমাদিগকে টিটকারী দিবার জন্যই উল্লাস প্রকাশ করিতেছে।'

বায়েলা খাতির তাগেলে

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়

জানি না কেন, সিংরৌলি নামটি প্রথম শুনেই কেমন ভাল লেগে গেছিল। চেনা জানা গণ্ডীর বাইরে কোন সুদূরের পরশ যেন নামটির মধ্যে পেয়ে গেলাম। ভাগ্যে ন্যাশন্যাল কোল ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশন বা জাতীয় কয়লা উন্নয়ন নিগম-এর ডাক্তার, মধ্যপ্রদেশের সিংরৌলিতে বদলী হয়ে চিঠিতে সেখানকার বন আর পাহাড়ের যা বর্ণনা দিল তাতে আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। তাই সেবার ছুটিতে ঠিক করলাম হিল্লী দিল্লী না ঘুরে এবার বনবাসে যাব সিংরৌলি।

সিংরৌলি পেঁছানোর উপায় নির্ধারণ করতে গিয়ে ফাঁপরে পড়ে গেলাম। ভাগ্নের চিঠিতে জায়গাটি যে অতীব দুর্গম, যেতে একাধিকবার বাস বদলাতে হয়, তা জানলাম। আরও জানলাম যে ঐ পথের শেষ কয়েক মাইল হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ছুটির মেয়াদ বড় অল্প, তাই চিঠি লিখে পথের নির্দেশ আনিয়ে নেবার আর সময় ছিল না। কলকাতায় অনেক চেষ্টা করে ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে ভাল ম্যাপ যা যোগাড় করতে পারলাম তাতে মনে হল জায়গাটি মির্জাপুরের ঠিক দক্ষিণে। তবে নতুন কোলিয়ারী বলে সিংরৌলি বা তার কাছাকাছি কোন রাস্তা ম্যাপে দেখান নেই। হ-য-ব-র-ল এর কথা মনে পড়ে গেল 'গরম লাগলে তিব্বত গেলেই হয়' তবে 'বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না।' এলাহাবাদ পেঁছে হয়ত পথের হদিস পাওয়া যাবে, এই ভরসায় রওনা হলাম।

এলাহাবাদেও সিংরৌলি যাবার সঠিক উপায় কিছু জানতে পারলাম না। স্থানীয় পরিচিতদের মধ্যে কেউই ঐ জায়গার নাম শোনেন নি। ইউ-পি রোডওয়েজ-এর 'পুছ তাছ' (অনুসন্ধান) এর ভদ্রলোক অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানালেন যে প্রথমে মির্জাপুর যেতে হবে, সেখানে হনুমানার বাস পাওয়া যাবে। হনুমানা থেকে সিংরৌলির দিকে প্রাইভেট বাস যায় বলে তাঁর ধারণা, তবে সে বাস কখন ছাড়ে, যেতে কতক্ষণ লাগে এবং বাস রাস্তা থেকে সিংরৌলি পেঁছতে কতদূর হাঁটতে হয় তাঁর জানা নেই। 'হনুমানা ত পেঁছ যাইয়ে, উধারসে পাক্কা জরুর মিল যায়েগী' বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন। এতে অবশ্য পুরোপুরি আশ্বস্ত হওয়া যায় না কারণ আমার হাতের ম্যাপে দেখি হনুমানা থেকে সিংরৌলি প্রায় শ'খানেক মাইল হবে। কিন্তু কি আর করব? এলাহাবাদ থেকে মির্জাপুরের প্রথম বাস ছাড়ে সকাল সাড়ে ছটায়। ঠিক করলাম ঐ বাসেই যাব, এলাহাবাদের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডাকে ভয় করলে চলবে না। সময়টা ছিল ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাস।

রাত থাকতে উঠে চা খেয়ে বিছানা বেঁধে সাইকেল রিকসায় চড়ে যখন এলাহাবাদ বাস স্টেশনের দিকে রওনা হলাম তখন পুব আকাশে সবে আলোর রেখা ফুটেছে। অত তাড়াতাড়ি হয়ত না করলেও চলত কারণ আমাদের বাস 'পিপরি মেল' ছাড়ল নির্ধারিত সময়ের মিনিট কুড়ি পরে। যমুনার পোল পার হয়ে ফাঁকা রাস্তায় বাস তীরবেগে ছুটে চলল। গায়ে ওভারকোট, মাথায় মাফলার জড়িয়েছি, বাসে কাঁচের জানালা সব বন্ধ—তবু ঠাণ্ডার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। রেল লাইনের পাশ দিয়ে রাস্তা। দৃশ্য মনোরম। দিগন্তব্যাপী গম, মসুর, অড়হর আর সরষের ক্ষেত, ফসলে ভরে রয়েছে। নানান পাখির ঝাঁক মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে এক ক্ষেত থেকে আর এক ক্ষেতে। প্রভাতী সূর্যের আলোয় তাদের ডানার রঙ ঝলমল করছে। রাস্তা ভাল, দুধারে বড় বড় গাছ—মহুয়া, আম, বাবলা নিম বাদাম বট আর অশ্বত্থই বেশি। মাঝে মাঝে বাঁশঝাড় আর কুলগাছও আছে। ছোট বড় গ্রাম অনেক পেরোলাম।

এলাহাবাদ থেকে মির্জাপুর বাসে ৫৬ মাইল। ঠিক আড়াই ঘণ্টা লাগল। সামনেই দেখি হনুমানার বাস ছাড়ছে—তাড়াতাড়ি সেটাতে গিয়ে উঠলাম। রেল লাইন পিছনে ফেলে রাস্তা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চলে গেছে। চওড়া বাঁধান রাস্তা। ন্যাশনাল হাইওয়ে—রেওয়া, জব্বলপুর হয়ে সোজা নাগপুর চলে গেছে। মাইল পাঁচেক যেতেই পটভূমির পরিবর্তন হতে শুরু করল। ট্রেনে মুঘলসরাই থেকে এলাহাবাদ যেতে বাঁদিকে যে চ্যাপ্টা-মাথা বিন্ধ্যপর্বতের শ্রেণী দেখা যায় রাস্তা তার গা বেয়ে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। উপরে উঠে দেখি, পাহাড় কোথায়? এ ত ঠিক ছোটনাগপুর বা সাঁওতাল পরগণার মত উঁচু নীচু ঢেউখেলানো জমি—লাল মাটি আর পাথর—দূরে নীচের সমতলভূমি দেখা যাচ্ছে বলেই বোঝা যায় উপরে উঠেছি। এটা তা হলে বিন্ধ্যের অধিত্যকা। আরও দক্ষিণে, দূরে উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী চোখে পড়ে। রাস্তা এঁকে বেঁকে সেই দিকেই গেছে। লোকবসতি বিরল—মাঝে মাঝে বন। অপেক্ষাকৃত সমতল-ভূমিতে ছোট ছোট গ্রাম। গ্রামগুলি ঘিরে শ্যামল শস্যে ভরা চাষের ক্ষেত। এ অঞ্চলে গমের চাষ কম—তিসি, সরষে আর অড়হরের

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ----১৪·০০
২। গুল বাগিচা---৩·৫০, ৩। কাব্য আমপারা--৪·০০
৪। পুবের হাওয়া---২·০০, ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি--২·০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

ক্ষেতই বেশি। দূর থেকে পুষ্পিত তিসি আর সরষের ক্ষেত দেখলে মনে হয় কে যেন বেগনী আর হলদে রঙের শাড়ী পাশাপাশি মেলে দিয়েছে। তমসার উপনদী বেলান-পার হলাম। পোলনেই নদীর বুকের উপর দিয়ে বাঁধান রাস্তা চলে গেছে—'কজওয়ে'। বর্ষাকালে অগম্য। এটা ইউ-পি রোডওয়েজ-এর বাস হলেও মেল বাস নয়—সব জায়গায় দাঁড়াতে দাঁড়াতে যায়। ভিড় বেশি, বাসের অবস্থাও 'পিপরি মেল' এর তুলনায় জীর্ণ। তবু দৃশ্যের অভিনবত্বে রাসের ঝাঁকুনি, ভিড় বা ধুলো কোনটাতেই কষ্টবোধ হচ্ছিল না। হনুমানা পৌঁছতে যখন মাইল দশেক বাকি তখন ফের পাহাড়ে চড়া শুরু হল। এ পাহাড়ের উচ্চতা অনেক বেশি, বনও গভীর। পাহাড়ের মাথাটা কিন্তু সেইরকম সমতল, শৃঙ্গ বলতে কিছু নেই। অগস্ত্যের আদেশ দেখি সবাই শিরোধার্য করেছে! পাহাড়ের ঠিক শীর্ষদেশ দিয়ে রাস্তা নিয়ে গেছে। বেশ কিছুদূর পাহাড়ের মাথায় মাথায় গিয়ে অপর পারে নামতেই পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থল—হনুমানায়। বেলা তখন বারোটা। মির্জাপুর থেকে ৪৪ মাইল আসতে আড়াই ঘণ্টা লাগল।

হনুমানায় খবর পেলাম সিংরৌলি এখান থেকে ৯০ মাইল দূর। সিংরৌলির মাইল তিনেক এধারে মেডোলি পর্যন্ত বাস যায়, সে বাস ছাড়তে ঘণ্টা দুই দেরি আছে। বাস অফিসে মাল জমা রেখে খাবারের সন্ধানে বেরোলাম। ছোট শহর, আগে রেওয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন মধ্যপ্রদেশে পড়েছে। শহরের কেন্দ্রস্থল বলতে বাস স্টেশন, তার পাশেই বাজার। কয়েকটা খাবারের দোকান রয়েছে পরিষ্কার দেখে তারই একটা বেছে নিলাম। ভালই খাওয়া হল—গরম রুটি, ডাল আর নিরামিষ তরকারী।

মেডোলির বাস ছাড়ল বেলা আড়াইটেয়। রেওয়া অভিমুখে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যে বড় রাস্তা (ন্যাশনাল হাইওয়ে) ধরে সকালে এসেছি তা ছেড়ে বাঁদিকে বেঁকে আমাদের বাস চলল সোজা দক্ষিণ মুখে কাঁচা রাস্তা দিয়ে। বাসের পিছনে ছুটে চলল লাল ধুলোর মেঘ। বেসরকারী প্রাইভেট বাস, তাই সময়ে চলার চেয়ে যাত্রী উঠানোর দিকে নজর বেশি। যেখানে থামে ড্রাইভার আর কণ্ডাকটর দুজনেই বাস থেকে নেমে যাত্রী ডাকতে লেগে যায়। খুব দ্রুতই সব সীট ভর্তি হয়ে গেল—দাঁড়িয়েও রইল অনেকে। যাত্রীদের মধ্যে স্থানীয় কুলিকামিনই বেশি। আমার পাশে বসেছিলেন বালিয়া জিলার এক ব্রাহ্মণ। বয়স হয়েছে, দেশে ক্ষেতী আছে। উপস্থিত যাচ্ছেন ওয়াইধানে, যজমান গৃহে। অনেকদিন আগে একবার কলকাতা গিয়েছিলেন। আমায় পেয়ে কলকাতার হালচাল জিজ্ঞেস করলেন। কলকাতায় তাঁকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল হাওড়ার পোল আর কালীঘাটের মন্দির। ভদ্রলোক বেশ গুছিয়ে গল্প বলতে পারেন। তাঁর মুখে আজব শহর কলকাতার গল্প শোনার জন্য আমাদের সীটের কাছে ভিড় বেড়ে গেল। আমার মন অবশ্য ছিল জানালার বাইরে। কি সুন্দর দুধারের দৃশ্য! বিন্ধ্যপর্বতমালার কৈমুর শ্রেণীর পাহাড় একের পর এক ডিঙিয়েই চলেছে। পাহাড়ের উপর গভীর বন, নীচের সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় ছোট বড় কোন পার্বত্য নদী গহন অরণ্যের বুক চিরে কুলকুল রবে বয়ে চলেছে। নদীর ধারে কোথাও বা দু'চার ঘর লোকের বাস। বড় নদী বলতে শোন আর গোপদ বলে তার এক উপনদী—কোনটাতেই পোল নেই, পাথরের বাঁধান 'কজওয়ে' দিয়ে পার হলাম। মধ্যপ্রদেশে বাস চলাচলের একটা নিয়ম চোখে পড়ল। রাস্তায় বে কটা পুলিস ফাঁড়ি পড়ে সবগুলিতেই বাস থামিয়ে গাড়ীর নম্বর আর সময় ডায়েরী করাতে হয়। জানি না ডাকাতির ভয়ে এই নিয়ম চালু করেছিল কিনা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। চারিদিক লাল আলোয় রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত গেলেন। গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। ড্রাইভার বলল, 'এ হল বাঘেলখণ্ডের জঙ্গল, এই রাস্তায় সন্ধ্যার পর প্রায়ই চিতা বা বড় বাঘ দেখা যায়। একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম—হেডলাইটের আলোয় কিছু চোখে পড়ে কি না। ভাগ্য বিরূপ, খরগোশ ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। দিনের আলোয় অবশ্য হনুমানের পাল, ময়ূর আর ছোট বড় অজস্র পাখি দেখেছিলাম। বাঘ দেখতে না পাওয়ায় মনে ক্ষোভ হলেও যা দেখেছি তারই বা তুলনা কোথায়। যেখানেই বাস একটু বেশিক্ষণ থামছে নেমে দু পা বেড়িয়ে নিচ্ছি। গোটা দুই চা আর মিঠাই-এর দোকানে কেরোসিনের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। আর কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। খালি পশ্চিম আকাশে শুক্লা পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর এক চিলতে চাঁদ দেখা যাচ্ছে, আর সারা আকাশ ভরে তারা ঝলমল করছে। শহরে ত এত তারা চোখে পড়ে না। কনকনে ঠাণ্ডা, অন্ধকারের ভিতর একলা দাঁড়িয়ে ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে বেশ লাগে। ড্রাইভারের হর্ন শুনে আবার বাসে এসে উঠি।

ওয়াইধানে পৌঁছুলাম রাত আটটা। বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে, রিহান্দ বাঁধের জলরাশি ওয়াইধানের প্রান্ত পর্যন্ত এসেছে। তবে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না। বাসের গতব্যস্থল মেডোলি পৌঁছুলাম নটায়। এখান থেকে সিংরৌলি তিন মাইল—সাধারণত হেঁটেই যেতে হয়, কিন্তু সেদিন সিংরৌলি ছাড়িয়ে মড়োয়া গ্রামের একদল যাত্রী থাকায় ড্রাইভার বাস সিংরৌলি পর্যন্ত নিয়ে যেতে রাজি হয়। সামনে আর কোথাও খাবার পাওয়া যাবে না বলে ড্রাইভার আর কণ্ডাকটর এখানেই খেয়ে নিল। তাদের সঙ্গে আমিও যোগ দিলাম। মামুলি নিরামিষ রান্না তবে সঙ্গে ছোট এক বাটি ভর্তি দেশী ঘি দিল, অতটা ঘি জীবনে কখনও খাই নি। খাওয়া সেরে ফেলে ভালই করেছিলাম কারণ সিংরৌলিতে বাস থেকে নেমে মালপত্র ঘাড়ে করে অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে যখন ডাক্তার সাহেবের কোয়ার্টারে পৌঁছুলাম তখন দশটা বেজে গেছে। আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভেঙে উঠে আমায় দেখে সবাই অবাক।

সিংরৌলি কোলিয়ারীর নির্মাণকার্য তখনও শেষ হয় নি। কয়লা উঠান শুরু হতে দেরি আছে তবে নিতান্ত এক ছোট্ট গ্রামকে রাতারাতি রাণীগঞ্জ বা ঝরিয়ায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা। কাশ্মীর থেকে কেরালা, বম্বে থেকে বাংলা সারা ভারতের লোক এসে জড়ো হয়েছে। আনুষঙ্গিক কাজ জোর চলেছে। পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হচ্ছে, বন কেটে বসত। রেললাইন বসানোর কাজও অনেকটা এগিয়েছে। তবে সব জায়গায় কেমন অগোছাল, ছড়ানো ভাব। কলোনীর ভিতরের জঙ্গলই সব কেটে উঠতে পারে নি। ডাক্তারের কোয়ার্টারটি সুন্দর। বাসিন্দা বলতে দুজন—ভাগ্নে আর আমার দিদি। স্থানীয় আদিবাসী চাকরটি ছিল খুব কাজের। রোজ ভোরবেলা এসে উনান ধরিয়ে গরম জল দিয়ে যেত মুখ ধোয়ার জন্য। এত ভোরে সে আসত বে ঠাণ্ডায় উঠে দরজা খুলে দিতে হবে এই ভয়ে ডাক্তার কোয়ার্টারের দরজা বন্ধ করতেন না, শুধু ভেজিয়ে রাখতেন। চুরির ভয় ছিল না, তবে আমার থাকাকালীন যেদিন সামনের নতুন এক কোয়ার্টারে—সেটা তখনও খালি পড়ে ছিল—ভরসন্ধ্যাবেলায় তিন তিনটে বাঘ দেখা গেল, সেদিন থেকে রাত্রে দরজা বন্ধ করা শুরু হল। বলা যায় না কোন দিন হয়ত ঘুম থেকে উঠে দেখব বিছানার পাশে বাঘ শুয়ে আছে!

বিভূতিভূষণের বই পড়ে আমার বহু দিনের সাধ ছিল জঙ্গল দেখব। ট্রেনে বা

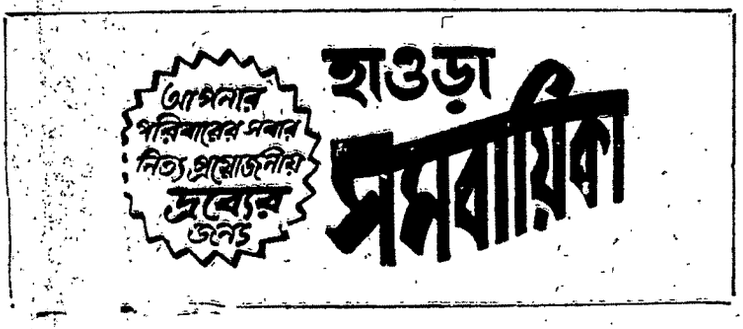

গাড়িতে চড়ে দূর থেকে নয়, বনের ভিতর পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে বনকে দেখব, চিনব। সিংরৌলি এসে সে আশা মিটেছে। যে কদিন ছিলাম মনের সুখে বনে বনে ঘুরেছি। প্রাতরাশ সেরে ডাক্তার হাসপাতালে যেতেন সেই সঙ্গে দিদিকে নিয়ে আমি বেড়াতে বেরোতাম। দুপুরে ফিরে স্নানাহার করে ফের ঘুরতে বেরুনো সন্ধ্যা পর্যন্ত। শীতকাল বলে রোদের মধ্যে হাঁটতে কষ্ট ছিল না। সাপের ভয়ও নয়। তা ছাড়া এদিকের বনে ছোট ঝোপঝাড় কম, যথেচ্ছ ঘুরতে কোন অসুবিধা হয় না। সিংরৌলির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০০ ফুট হবে। চারিদিক ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টির উচ্চতা হাজার দুয়েক ফুট। নাম টিপাঝারিয়া। তার ওপারেই রিহান্দ বাঁধের জলাশয়।

কলোনী ছাড়ালেই বন শুরু হয়ে যায়। প্রধানত শালবন—সেই সঙ্গে আছে পিয়াল বা চিরঞ্জী, পিয়াশাল বা আসন, পীতশাল বা বিজাশাল, বহেড়া আর মহুয়া। সবগুলিই বিরাট—আকারে বনস্পতি বিশেষ। মাঝারি ও ছোট গাছের মধ্যে হরিতকী, আমলকী, খয়ের, শিউলি আর টেন বেশি। টেন বা কেঁদ গাছে গাবের মত ফল হয়। টেন যদিও আবলুশের স্বজাতি তবু কাঠের চেয়ে পাতার জন্য এর কদর, শুকনো পাতায় বিড়ি বাঁধা হয়। আমলকী আর হরিতকী গাছ ফলে ভরে থাকত—রোজ রুমাল ভর্তি করে আনতাম। নর্মদার তীরে শুনেছি 'একশ' ফুট পর্যন্ত উঁচু হরিতকী গাছ দেখা যায়—এ অঞ্চলের গাছগুলি অত বড় নয়। আম, বাঁশ ও শিমুলে গাছ লোকালয়ের কাছে অনেক দেখেছি। গভীর বনের ভিতর চোখে পড়ে নি। অচেনা গাছ প্রচুর। গাছগুলির স্থানীয় নাম জানবার চেষ্টা করতাম—তবে অধিকাংশ লোকেরই এ বিষয়ে গভীর অনীহা। নাম জিজ্ঞাসা করলে আশ্চর্য হত। আম নয়, জাম নয়, কোথাকার জংলী গাছ—ওর আবার নামকরণের কি প্রয়োজন? বুনো গাছ বললেই ত হয়—এই ধরনের মনোভাব। বনস্পতিগুলির গা বেয়ে উঠেছে নানা জাতের ব্রততী আর তাদের শাখায় আশ্রয় নিয়েছে অর্কিড শ্রেণীর পরগাছা। মনোহর তাদের ফুলের বাহার। অধিকাংশ গাছের এই হল পাতা ঝরানোর সময়। পাতার চিকন সবুজ কোথাও ফিকে হয়ে গেছে, কোথাও ধরেছে উজ্জ্বল তামার রঙ। বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ। এ যেন রিক্ত হবার আগে বনানীর শেষ প্রসাধনের প্রয়াস। দেখে অবাক লাগে। আবার মনে হয় এই ত প্রকৃতির নিয়ম। যৌবনের শেষ প্রান্তে এসেই না রূপসীরা অঙ্গসজ্জার প্রতি সম্যক সচেতন হন। শীতপ্রধান দেশের বনভূমির হেমন্তকালীন 'ফল কালারস্'-এর কথা মনে হয়। ঠাণ্ডা অনেক বেশি বলে সেদেশে সব গাছের পাতাই প্রায় একসঙ্গে রঙ বদলায়—তাই আরও মোহন রূপও ধরে।

আর পাখি? মামুলি কাক, শালিখ ও চড়াই বাদ দিলে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ত ব্রাহ্মণী শালিখ, লালচে-চোখ ব্রাহ্মণী শালিখ, টিয়া, ঘুঘু আর ফিঙে। তা ছাড়া প্রায়ই দেখতাম গাছতলায় একদল ছাতারে বা সাতভাই কচর কচর করছে, নীলকণ্ঠ তার নীল পাখা মেলে সুনীল আকাশে অকারণে উড়ে বেড়াচ্ছে, ছোট্ট সবুজ বাঁশপাতি ঘুরে ঘুরে উড়ছে আর পোকা ধরে খাচ্ছে। কোথাও বা ঝোপের ভিতর বুলবুলির ঝাঁক আপন মনে কোরাস গেয়ে চলেছে—তার সুরেলা পাখা দিয়ে একনাগাড়ে ডেকে যাচ্ছে ছোট্ট টুনটুনি পাখি। গাছের নিচু ডালে চুপটি করে বসে আছে শ্রাইক, যার কাজলপরা চোখ দেখে বনফুল নাম রেখেছেন কাজলা পাখি, দেখতে ভালমানুষটি কিন্তু নজর নিচের দিকে—পোকা মাকড় কিছু দেখলেই ঝাঁপ দিয়ে তুলে নিচ্ছে। খঞ্জন আর থিরথিরার লেজ নাচানো দেখতে বেশ লাগে। কালচুরি ত নির্ভয়ে আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশের শালিখের মত। শস্যক্ষেতে যেখানে ফসল কাটা হয়ে গেছে সেখানে পড়ে থাকা ফসলের দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে টিটিভ আর মুনিয়ার ঝাঁক। তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেব্রা রঙের পালকের জামা পরে হুপো বা হুদহুদ পাখি। সুদৃশ্য তার মাথার ঝুঁটি, ছোট্ট জাপানী হাতপাখার মত কখনও ছড়িয়ে দিচ্ছে আবার ইচ্ছামত গুটিয়ে রাখছে—বনফুলের মোহনচূড়া নামকরণ সার্থক হয়েছে। কলকাতাতেও এদের দেখেছি, তবে কদাচিৎ। এ বিষয়ে একটা নতুন জিনিস শিখলাম—তা হল, গভীর বনের ভিতর পাখি দেখা সহজসাধ্য নয়। লোকালয়ের কাছে যে সব পাখি আসে তারা মানুষকে তত ভয় করে না কিন্তু যে পাখিরা গভীর জঙ্গলে থাকে তারা ত মানুষ দেখতে অভ্যস্ত নয়—দেখলেই পালায়। সেইজন্য বনে অনেক অচেনা পাখির গান ও শিস শুনেছি, দূর থেকে আবছা দেখেওছি। কিন্তু তারা কেউই কাছে গিয়ে দূরবীন দিয়ে ভাল করে দেখবার সুযোগ দেয় নি। বনের কিনারায় দেখেছি চন্দনা-টিয়ার মত দেখতে তবে মাথাটা লাল, আর সয়ালী বা মিনিভেট। লম্বা ঠোঁট দিয়ে কাঠঠোকরাদের একমনে গাছের ডাল ঠুকরে যেতে দেখলাম, তবে তারা বাংলার লাল ঝুঁটি কাঠঠোকরা নয়, শাদায় কালোয় মেশানো মারাঠা জাতীয়। ময়ূর অনেক আছে, দূর থেকে ভেসে আসা তাদের ডাক শুনতে বেশ লাগত।

সিংরৌলিতে একদিনের বেড়ানোর কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। ওখান থেকে মাইল চারেক দূরে ঝিঙ্গুরদা মাইনিং ক্যাম্প। সেখানে নাকি মাটির নিচে ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরু কয়লার স্তর পাওয়া গেছে। কয়লা উঠানোর কিছু সরঞ্জাম সেখানে রাখা ছিল আর যন্ত্রপাতির তদারক করতে কয়েকজন লোক তাঁবুতে থাকত। জায়গাটি টিপাঝারিয়া পাহাড়ের কোলে—গভীর বনের ভিতর মনোরম ও নির্জন। সিংরৌলি প্রোজেকটের ম্যানেজার কাপুর সাহেব বললেন, 'একদিন ঝিঙ্গুরদা ঘুরে আসুন। আরও মাইল দুয়েক এগিয়ে গেলে টিপাঝারিয়ার উপরে এক হনুমান মন্দির আছে। সেখান থেকে রিহান্দ লেকের দৃশ্য বড় সুন্দর। তবে হেঁটে যাবার চেষ্টা করবেন না, কষ্ট হবে। আমাদের জীপ ত হরদম যাচ্ছে, কোন অসুবিধা নেই।' শুনে জেদ চেপে গেল—হেঁটেই যেতে হবে। একটা জীপও পাওয়া গেল—স্থির হল তাতে দিদি ও স্থানীয় কয়েকজন মহিলারা যাবেন।

সেদিন রবিবার। তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে বেলা একটায় রওনা হলাম। আমাদের হেঁটে চলার দলের চারজনের কেউই আগে হনুমান মন্দির যাননি, তবে ভরসা ছিল ঝিঙ্গুরদা গেলে পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ঝিঙ্গুরদা যাবার রাস্তা দুটি। একটি নতুন তৈরি, গাড়ি যাবার রাস্তা—আধুনিক যন্ত্রদানব (বুলডোজার) দিয়ে

আমাদের নতুন বই

প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা \ প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরাশর বর্মার সঙ্গে পরিচিত পাঠক পাবেন, আর এক বিস্ময়কর রোমাঞ্চ কাহিনীর সন্ধান—যা তীব্র গতি ও আকর্ষণীয় ঘটনায় মনকে আবিষ্ট করে রাখে।

দাম ৭ টাকা

বাঙলার কীটপতঙ্গ \ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

জীব বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য গ্রন্থ। পিঁপড়ে মাকড়সা, প্রজাপতি, বোলতা, পঙ্গপাল এবং আরও বহু কীটপতঙ্গের জীবনকথা। শ্রীভট্টাচার্যের সুদীর্ঘ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি। অসংখ্য চিত্রশোভিত। দাম ১৫ টাকা।

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ \ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দাম ২০ টাকা।

আশা প্রকাশনী
৭৪ মহাত্মা গান্ধী
রোড, কলকাতা - ৯

মাটি, পাহাড়, বন কেটে শ'খানেক ফুট চওড়া রাস্তা তৈরি করা হয়েছে যন্ত্রপাতি নিয়ে যাবার জন্য। এ-পথে হরদম ভারি গাড়ি যায় বলে প্রায় এক হাঁটু ধুলো। তাই স্থির করলাম বনের ভেতর দিয়ে দেহাতীদের পায়ে-চলা অপর রাস্তা ধরেই যাব। গাড়ির রাস্তার চেয়ে বনের ভিতর দিয়ে যাওয়া অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হল।

প্রথম খানিকটা পথ যেতে হল চাষের জমির আল দিয়ে আর গৃহস্থদের মেটে-ঘরের পাশ দিয়ে। ক্ষেতে অড়হর সরষে তিসি যব আর ছোলার চাষ। বাড়ির উঠান-গুলিও মূলো টমাটো মটরশুঁটিতে ভরে রয়েছে। ছোট ছোট পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। ঢেউ খেলানো উঁচু-নীচু জমি। নীল আকাশ, রোদ্দুরের তেজ আছে। কিছুদূর গিয়ে বনের ঠিক কিনারায় একটি ছোট ঝরণা পেলাম। জল নেই বললেই হয়—শুধু বালি আর মাঝে মাঝে বড় পাথর ছড়ান রয়েছে। দু'ধারে দশ-বারো ফুট উঁচু খাড়া পাড় উঠে গেছে—গিরিখাত-এর পকেট সংস্করণ। রোদ্দুর পড়ে না বলে নদীর বুকটা বেশ ঠাণ্ডা। এত স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ যে একবার মনে হল কি হবে হনুমান মন্দিরে গিয়ে—এখানে বসেই ত সারাদিন দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়। ভাল লাগলেও গন্তব্যস্থলের দূরত্বের কথা মনে করে বেশক্ষণ বসতে পারলাম না। নদী পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকলাম।

শালবনের ভিতর দিয়ে সরু পায়ে-চলা রাস্তা। যত এগোই বনের গভীরতা তত বেড়ে চলে। কিছুদূর গিয়ে একজন প্রস্তাব করলেন যে পায়ে-হাঁটা পথ ত এঁকে-বেঁকে গেছে, জঙ্গল ভেঙে সোজা গেলে সর্টকাট হবে। সকলে সোৎসাহে রাজী হয়ে গেলাম। ছোট কাঁটাগাছে, বিশেষ করে খয়ের গাছের কাঁটায় একটু অসুবিধে হচ্ছিল। বন কোন কোন জায়গায় খুব নিবিড়, কোথাও বা পাতলা—মনে হয় গত কয়েক বছরের মধ্যে কিছু গাছ কেটেছে। জনসমাজের শেষচিহ্ন যে সরু পথ তাও ছেড়ে এসেছি। বিশাল শাল-পিয়াল থেকে শুরু করে ছোট আকারের শিউলি ও খয়ের পর্যন্ত কত বিচিত্র গাছের সমাবেশ।" সেই সঙ্গে আছে ঝোপঝাড় আর লতার বাহার ও বহু অজানা পাখির ডাক। আমার কাছে ত সবই 'অপূর্ব এক স্বপ্নসম' লাগছিল—সে-অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। সমতলভূমি অল্প—অধিকাংশ পথই হয় চড়াই, না-হয় উৎরাই। একটি ছোট পাহাড়ের মত টিলার উপর গোরুর হাড় পড়ে আছে দেখলাম—বোধহয় বাঘে খেয়েছিল, স্বাভাবিক কারণে মরলে কি আর ঠিক পাহাড়ের মাথায় পড়ে থাকত।

কিছুদূর গিয়ে ঘণ্টার টুং-টাং শব্দ পাওয়া গেল। বনে হারিয়ে যাবার ভয়ে এখানকার সব গোরুর গলায় ঘণ্টা বেঁধে রাখে। একপাল গোরু নিয়ে রাখাল তার গ্রামের দিকে ফিরছিল। এদিকের জঙ্গল অনেকটা ফাঁকা হয়ে এসেছে। সঙ্গীদের একজন বললেন, 'পথ ছেড়ে দিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। অত কাব্য ভাল নয়। রাখালের পিছু পিছু রাস্তায় ফিরে যাওয়াই ভাল।' বুঝলাম একঘণ্টা বনবাসের পর গোরুর সঙ্গও তাঁর লোভনীয় ঠেকছে। আমার এতে সায় ছিল না। কিন্তু ডেমোক্র্যাসির যুগ—ভোটে হার হল। গো-পালের অনুগমন করে সকলে বড় রাস্তায় এসে উঠলাম। এক হাঁটু ধুলোর আর প্রখর রোদ্দুরের তাপে বনপথের কাব্য মুহূর্তমধ্যে উবে গেল।

ঝিঙ্গুরদা ক্যাম্পে পৌঁছে জানলাম যে দিদিদের নিয়ে জীপ তখনও আসেনি। পথের নির্দেশ পাওয়া গেল। একটু বিশ্রাম করে জল খেয়ে ফের রওনা হলাম। বলে এলাম যে, জীপ এলে আমরা এগিয়ে গেছি এ-খবর জানিয়ে দিতে।

গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চওড়া রাস্তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। স্বচ্ছন্দে গাড়ি যেতে পারে। বোঝা যায় যে, রাস্তা হালে তৈরি হয়নি—বরং বর্তমানে ব্যবহার হয় না বলে এখানে-সেখানে ছোট ছোট গাছ গজিয়েছে। এখানে এ-রাস্তা কে করল? শুনলাম কয়েক বছর আগে জিও-লজিক্যাল সার্ভের লোকেরা যখন কয়লার সন্ধানে প্রথম এ-অঞ্চলে আসে, তখন এই রাস্তা তৈরি হয়। সেই থেকে এগুলি জি-এস-আই রোড নামে পরিচিত।

ঝিঙ্গুরদার কাছেই একটা নদীর খাতে বেশ বড় আকারের একটি গাছের ফসিল চোখে পড়ল। রাস্তা ক্রমে টিপাঝারিয়া পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠেছে। এদিককার গাছগুলি আরও উঁচু, আরও ঘন বলে বোধ হল। বেলা তিনটে, কিন্তু মনে হয় যেন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পাশের বন থেকে হঠাৎ একটা হরিণ বেরিয়ে এল। আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখল কিন্তু ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না। একটা কুকুর ঝিঙ্গুরদা থেকে আমাদের পিছু নিয়েছিল। হরিণটাকে দেখে তেড়ে গেল, কিন্তু পারবে কেন? একটু বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। মাইল দুয়েক যাবার পর দেখি পাহাড়ের গায়ে একটা সরু পাকদণ্ডী উঠে গেছে—কুকুরটা সেই পথ ধরল। আমরাও কি করব স্থির করতে না পেরে তার পিছু নিলাম। খাড়া চড়াই। একটু উঠেই একটা নারকেল পড়ে থাকতে দেখে বুঝলাম মাভৈঃ, ঠিক পথে চলেছি—কারণ দেবস্থানে নারকেল দেবার রীতি এ-অঞ্চলে আছে। পাহাড়ের ঠিক মাথায় মন্দির। বাঁধান চাতালের সামনে একটি ছোট ঘর। দরজা ভেজান ছিল—ঠেলতেই খুলে গেল। চোখে পড়ল সিঁদুর মাখানো হনুমানজীর মূর্তি। সামনেই কয়েকটি গাঁদা ফুল আর একটু জলের চিহ্ন দেখে বোঝা গেল সেদিন সকালেই কেউ পূজা করে গেছেন। কাছাকাছি কোন গ্রাম নেই। শুনলাম একটি সাধু এখানে বাস করেন। দিনের বেলা কাছাকাছি জঙ্গলের ভিতর আত্মগোপন করে থাকেন—সন্ধ্যায় এসে ধুনি জ্বালিয়ে সাধনে বসেন। চাতালের উপর স্থানে স্থানে ধুনির চিহ্ন, আধপোড়া কাঠ আর ছাই পড়ে আছে। মন্দিরে প্রণাম করলাম। সেই সাধুর উদ্দেশ্যেও মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম। সাধনায় তিনি কি পেয়েছেন জানি না, তবে ভয় যে জয় করেছেন তা নিশ্চয় করে বলা যায়। বছরে একবার এখানে মেলা হয়, তখন নাকি অনেক যাত্রী আসে।

মন্দিরের সামনে এক বিরাট পাথরের উপর গিয়ে বসলাম। সামনে গভীর খাদ। শ' পাঁচেক ফুট নীচে একটি ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে। তারপরে একটি ছোট পাহাড়। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে বহুদূর বিস্তৃত রিহান্দ বাঁধের নীল জলরাশি দেখা যায়। জলের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একাধিক পাহাড়ের চূড়া। ভাবি বছর দশেক আগে, যখন রিহান্দ নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়নি, এখনকার দৃশ্য কি রকম ছিল। ঘন বনের মাঝে, নীল পাহাড়ের নীচে সর্পিল রিহান্দের বুকে সোনালী বালি আর রুপালি জল হয়ত রোদ্দুরে ঝিকমিক করত। কালিদাসে যেমনটি পাই, নভোচারী মেঘ দেখছেন উপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য"—বিন্ধ্যগিরির প্রস্তরাকীর্ণ পাদদেশে হস্তীর অঙ্গে বিচিত্র ভঙ্গীতে আঁকা শুঙ্গোরলেখার ন্যায় ক্ষীণতোয়া নদী

ঘড়ি
জন্মদিন গহনা
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
৪ জনাইটমী মেয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন যা দেখছি—গহন অরণ্য, সুনীল জলরাশি আর তার মাঝ থেকে মাথা তুলে থাকা সবুজ টোপরের মত পাহাড়ের চূড়াগুলির একত্র সমাবেশ—এর তুলনা কোথায়? সঙ্গীদের একজন বললেন, 'বাঁধের ওপারটা দেখছেন ত? ঐ হল প্রসিদ্ধ সরগুজার জঙ্গল। সরগুজায় এর আগে যে মহারাজা ছিলেন বাঘ শিকারে তাঁর নাকি রেকর্ড আছে, এখনও সে রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেননি।' মনে পড়ে যায় কোথায় যেন পড়েছিলাম সরগুজার মহারাজা একলা বারোশ' বাঘ মেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও যে ব্যাঘ্র বংশে বাতি দেবার কেউ আছে সেইটাই আশ্চর্য! সঙ্গী বলে চলেন 'সিংরৌলির বনকে কিন্তু তা বলে তাচ্ছিল্য করবেন না। সিংরৌলি কেন, ওয়াইধানের নাম শুনলেই বছর দশেক আগেও রেওয়ার লোকেরা শিউরে উঠত। এ-অঞ্চলটা ছিল যাকে বলে পাণ্ডববর্জিত দেশ। শুনেছি আগেকার দিনে রেওয়ার লোকেরা বাচ্চাদের ধমকে বলতেন —কেয়া ওয়াইধান যা রহে হো—মানে গোল্লায় যাচ্ছ! যতদূর দেখছেন সবই বাঘেলখণ্ডের জঙ্গল খোদ বাঘের দেশ!'

বাঘ থেকে বাঘেলখণ্ড নামের উৎপত্তি বলে অনেকের ধারণা। ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি উলুঘ খাঁ গুজরাট জয় করলে সেখানকার রাজপুত রাজারা পালিয়ে গিয়ে মধ্যভারতের দুর্গম পাহাড়ের অভ্যন্তরে স্বাধীন রেওয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রেওয়ায় এঁদের বলা হত বাঘেলা রাজপুত। সেই থেকে প্রায় সাতশ' বছর রেওয়ার রাজাসনে শৈলশিক বাঘেলা রাজবংশ রাজত্ব করে গেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর অন্যান্য করদ রাজ্যগুলির সঙ্গে রেওয়াও ভারত সরকারের শাসনাধীন হয়। ইতিহাসে পাই রেওয়ার রাজা রামচন্দ্রের কাছ থেকে মিঞা তানসেন দিল্লীর রাজসভায় যান। মুঘল বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করলেও রেওয়া রাজ্যের পৃথক অস্তিত্ব অক্ষুন্ন ছিল। রাজা রামচন্দ্রকে দিল্লীর দরবারে আনতে আকবরকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সম্রাট রাজা বীরবলকে পাঠান। রাজসম্মান কবুল করে তবে বীরবল তাঁকে দিল্লীতে আনতে সক্ষম হন। বাঘের হিন্দী প্রতিশব্দ শের হলেও সংস্কৃতে ব্যাঘ্র বলে, সুতরাং ব্যাঘ্র তথা বাঘ থেকে যে বাঘেলখণ্ডের নামকরণ হয়নি এটা জোর করে বলা যায় না।

ঘড়ির কাঁটা আর পড়ন্ত রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে বেশীক্ষণ বসতে সাহস হল না। ঝিঙ্গুরদা ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি দিদিরা বসে আছেন, জীপের ড্রাইভার পাওয়া যায়নি বলে হেঁটে আসতে হয়েছে। ক্যাম্পের লোকেরা খাতির করে খাটিয়া পেতে দিল, চা করে আনল। বড় ভাল লাগছিল—সবে সূর্যাস্ত হয়েছে, পশ্চিম আকাশের লালিমা ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। খোলা মাঠের মধ্যে বসে আমরা গরম চা খাচ্ছি। সবাই নির্বাক, খালি দিদি আপন মনে একের পর এক গান গেয়ে যাচ্ছেন। সেই অপরূপ পরিবেশে 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে' গানের বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল, চোখ অকারণ জলে ভরে আসছিল।

এবার ফেরার পালা। অন্ধকারে ডোজার রোড ছাড়া আর কোনো রাস্তা নিরাপদ নয়। দল বেঁধে একসঙ্গে চললাম। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর দেখি একটা জীপ আসছে। আমাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য অনেক কষ্টে ড্রাইভার যোগাড় করে পাঠিয়েছে। মহিলাদের বসবার পর যা জায়গা রইল তাতে যতজন পারল উঠে পড়ল। আমাদের তিনজনের স্থান হল না, তাতে অবশ্য কোনো ক্ষোভ ছিল না। কারণ হাঁটব বলেই ত বেরিয়েছি। চওড়া রাস্তা, সিধে নাক-বরাবর চলে গেছে। দুই ধারে ঘন বন। জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মাঝে একদল কুলির সঙ্গে দেখা। সকলের হাতে লাঠি, চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে পথ চলেছে। আমাদের খালি হাতে পথ চলতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল 'সামালকে যাইয়ে বাবুজী'। আমরা বললাম 'কেয়া হুয়া? সামালনেকো কেয়া হ্যায়?' উত্তরে খালি 'যো হোতা হ্যায়—ওই হ্যায়, বাবুজী' বলে আর অপেক্ষা না করে দ্রুত এগিয়ে গেল। গা ছমছম করে উঠল। এদের বোধহয় রাত্রে বাঘের নাম করতে নেই—আমাদের পাড়াগাঁয়ে সাপকে 'লতা' বলার মত। সুন্দরবন অঞ্চলেও ত লোকে বাঘকে 'শেয়াল' বা 'বড়মেঞা' বলে উল্লেখ করে। সঙ্গীরা বললেন, রাত্রে এ-রাস্তায় জীপে যেতে অনেকেই বাঘ দেখেছেন। প্রাণে ভয় থাকলেও মনে হচ্ছিল একটা বাঘ বেরোলে মন্দ হয় না। পায়ে হেঁটে গভীর বনে নিরস্ত্র অবস্থায় বাঘের সামনে পড়া—সে এক গল্প করার মত অভিজ্ঞতা। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, বাঘ দেখা হল না।

বাঘ যে সত্যই অনেক আছে তার পরিচয় সেদিন সন্ধ্যাতেই পেলাম। সিংরৌলি পৌঁছতে প্রায় রাত সাড়ে আটটা বাজল। রাত্রের আহার সেরে শুতে যাব এমন সময় একজন দৌড়ে এসে খবর দিল কলোনীর ভিতরেই বাঘ বেরিয়েছে। যে অবস্থায় ছিলাম তার উপর ওভারকোট চাপিয়ে দৌড়লাম। ডাক্তার সাহেবের কোয়ার্টারের একশ' গজের মধ্যে জঙ্গলের ঠিক গায় কয়েকটি নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল—তখনও লোক আসেনি। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় সেই খালি কোয়ার্টারের ভিতর থেকে বাঘের ডাক শুনে সকলে দল বেঁধে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখে তিনটে বাঘ ঝগড়া করছে। আমরা গিয়ে পৌঁছবার ঠিক আগে বাঘ তিনটি সকলের চোখের সামনে দিয়ে দৌড়ে বনের ভিতর চলে গেল। শিকারী হিসাবে কোলিয়ারীর ইঞ্জিনীয়ার সিংসাহেবের নাম আছে। পায়ের ছাপ দেখে বললেন, 'বাঘ নয় চিতা'। বন্দুক নিয়ে কিছুদূর গেলেন। কিছু দেখতে পেলেন না।

পরদিন বিকালে কোয়ার্টারটির সামনে একটি ছাগল বাঁধা হল। সন্ধ্যার আগেই সিংসাহেব বন্দুক হাতে তার ছাদে গিয়ে বসলেন। শিকারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকলেও, আমি তাঁর সঙ্গী হলাম খালি বাঘ দেখার লোভে। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস আর মশার কামড় সহ্য করে ঘণ্টা তিনেক ঠায় বসে রইলাম। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সারা বনভূমি ঝলমল করছে। কানে আসছে একটানা ঝিল্লীর শব্দ। মাঝে মাঝে ছাগলটি ডেকে উঠছে, কখনও বা হাওয়ায় তার পাশের ঝোপটি দুলে উঠছে। আমাদের উৎকণ্ঠাও সেইসঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে। বাঘ কিন্তু এল না। তবে জ্যোৎস্নাপ্লুত অরণ্যের যে মায়াময় রূপ সেদিন দেখেছিলাম স্মৃতির ভাণ্ডারে তা বহুদিন উজ্জ্বল থাকবে।

সেদিন এও বুঝলাম যে বাঘেলখণ্ডে বাঘ প্রচুর আছে, মানুষে দেখেও থাকে, কিন্তু বাঘ দেখা সব মানুষের ভাগ্যে থাকে না।

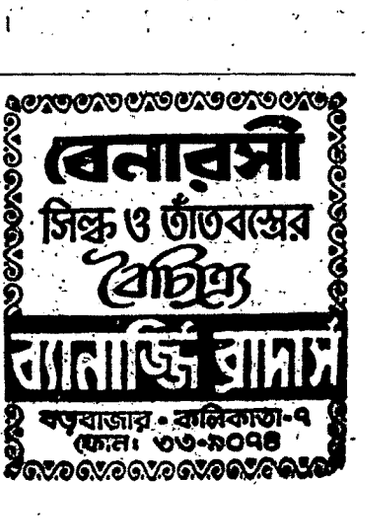

এক নতুন
অনুপম পাউডার!

সুপার ৭৭৭

সোনালী রঙের একমাত্র
কাপড় ধোয়ার ডিটারজেণ্ট পাউডার

সুপার ৭৭৭ করে
"সুন্দর সাদা!"

* অন্যান্য দামী ডিটারজেণ্ট কাপড় ধোয়ার পাউডারের থেকে দাম অনেক কম।
* জল যে রকমই হোক—
কাপড় ধোয়া হয় চমৎকার।
* সাদা করার জন্যে নীল বা অন্য কিছু মেশাবার প্রয়োজন নেই।

**পয়সা বাঁচান,
বেশী সাদা করুন**

Shilpi-DM 10/74 BEN

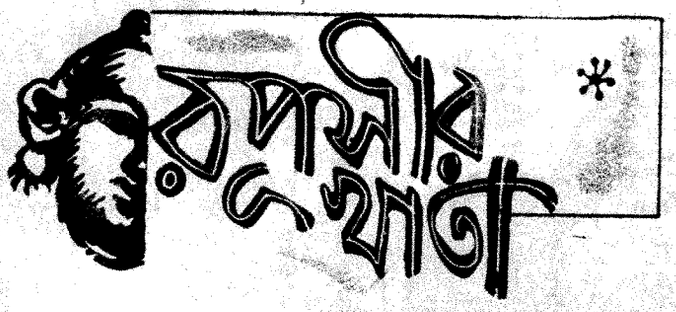

মুখ পরিষ্কার কি করে করতে হবে ও তারপর কি করতে হবে সে বিষয় ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এবারে মুখের ত্বকের টনিক ও বিভিন্ন ত্বকের এই শীতকালের জন্য ক্রীম সম্বন্ধে আলোচনা করব। তবে মনে রাখবেন এ সবই ঘরে তৈরী জিনিস দিয়ে হবে।

মুখের ক্রীম খসখসে শুকনো ত্বকের জন্য : (১) বড় চামচের দুই চামচ অলিভ তেল গরম করে তাতে দুই চামচ দুধের সর, ছোট চামচের এক চামচ মধু ও যদি সম্ভব হয় অর্ধেক আপেল (পাতলা পাতলা করে কেটে সেটা আগে আলাদা করে সেদ্ধ করে সেই জলে গলিয়ে ঘেঁটে নিতে হবে) দিয়ে সব এক সঙ্গে ঘেঁটে গলিয়ে ফেলতে হবে তারপর তাতে নিজের পছন্দ মতন কোন পারফিউমের দশ ফোঁটা মিলিয়ে নিতে হবে। সেই পদার্থটি পরে ঠাণ্ডা করে মুখে মেখে রাখা যাবে। এই ক্রীম মুখের ত্বকের পক্ষে খুবই ভাল। এটি বানিয়ে ৩।৪ দিন অন্ততঃ ব্যবহার করতে পারা যাবে, যদি ঠাণ্ডা মেশিনে থাকে।

(২) ডিমের কুসুম ১টি, বড় চামচের এক চামচ অলিভ তেল, দুই চামচ পাতিলেবুর রস ও বড় চামচের এক চামচ ভাল পরিষ্কার ময়দা। এইসব এক সঙ্গে খুব ভাল করে ফেটিয়ে মিশিয়ে ফেলতে হবে। তারপর ক্রীমের মতন মুখে মাখতে হবে।

এবারে বলবো, তেলতেলে ত্বকের সম্বন্ধে।

(১) জই (ইংরাজীতে ওটমিল) বড় চামচের চার চামচ তার সঙ্গে একটি ডিমের সাদা অংশ বেশ ভাল করে সামান্য গরম জলে মিশিয়ে ব্লেণ্ডার মেশিনে দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর চোখের অংশটি বাদ দিয়ে মুখের সব জায়গায় মেখে নিতে হবে। মিনিট কুড়ি ওই রকম রাখার পর গরম কাল হলে ঠাণ্ডাজলে আর শীতকাল হলে সামান্য গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। ইচ্ছা করলে এরপরই মেক আপ ব্যবহার করা যায়। এটা মাখার সময় ভুরুতেও যেন না লাগে সেটা দেখে নিতে হবে। এছাড়া মুখ ধোয়ার সময় সাবান ব্যবহার করা উচিত না।

তবে এসবের ব্যবহারের সময় সর্বদা কতকগুলি বিষয়ে নজর রেখে চলতে হবে বা উচিত। তোয়ালে দিয়ে বা কাপড় দিয়ে চুল কপালের ওপর থেকে উঠিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। চোখের ওপর সব রকমের জিনিস ব্যবহার হয় না, তাই সেই সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। তৃতীয় নিয়ম মুখে ও গলায় যে কোন জিনিস মাখার আগে নীচ থেকে ওপরের দিকে টেনে টেনে লাগাতে হবে ও মুখের স্বাভাবিক ভাঁজগুলির সঙ্গে মিল রেখে সেই মতন টানতে হবে। এবং শেষ কথা মনে রাখতে হবে যে, মুখ মোছার জন্য সর্বদা নরম কাপড়, তুলো বা নরম তোয়ালে ব্যবহার করতে হবে। খসখসে কড়া কিছু দিয়ে মুখ মুছলে তা ত্বকের ক্ষতি করে।

ত্বকের টনিক বা ত্বকের উজ্জ্বলতা ও স্বাস্থ্যের জন্য : (১) বাঁধা কফির পাতা বা লেটুস পাতা কিংবা তাজা সবুজ বিন খুব ছোট ছোট করে কুঁচিয়ে রাখতে হবে। তারপর জল ফুটিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে রাখতে হবে। তারপর সেগুলি ওই জলে আবার ফোটাতে হবে। ফুটে যখন পাতাগুলি বা সব্জি গলে যাবে প্রায়; তখন ঠাণ্ডা করে ছেঁকে নিতে হবে। এবারে মুখ পরিষ্কার করে তুলো দিয়ে ওই জল থুপে-থুপে মুখে লাগিয়ে রাখলে ত্বকের পুষ্টি হয় ও সতেজ হয়। এরকম করে মুখে দিলে অন্ততঃ দুইবার মাখলে ত্বকের খুব উপকার হয়। এটি বানিয়ে বোতলে রেখে দেওয়া যায়। ইচ্ছা করলে কিছু ফোঁটা পারফিউম দিয়ে নিতে পারা যায়।

(২) আর এক রকমের টনিক হচ্ছে পাতিলেবুর রস, গোলাপ জল ও এক ফোঁটা মধু। পরিমাণটা জানাচ্ছি। একটা পাতিলেবুর রসে, আধ কাপ গোলাপ জল ও এক ফোঁটা মধু। এই অনুপাতে যতটা খুশী বানিয়ে রাখা যায়। এই তিন রকম মিলিয়ে বোতলে ভরে রাখতে হবে। তারপর তা তুলোতে ভিজিয়ে মুখে মাখতে হবে। দিনে দুইবার। এতে চেহারার ওপরের ক্লান্তির রেখা চলে যায় আর ত্বক খুব উজ্জ্বল সুন্দর দেখায়।

(৩) ব্রাণ্ডি বড় চামচের দুই চামচ—এক চামচ দুধ ও এক চামচ কমলালেবু অথবা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে তাই দিয়ে মুখে থুপে থুপে দিলে মুখের ত্বক স্বচ্ছ সুন্দর ও টান হয়। বয়সের দাগ পড়ে না।

(৪) ত্বককে তাজা ও টান রাখার জন্য আর এক রকমের ব্যবস্থা আছে। খোসা শুদ্ধু শশা চাক চাক করে কেটে তার সঙ্গে ১ চামচ মধু আধ কাপ দুধ ও ৩।৪ ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে তৈরী করতে হবে। প্রথমে শশার টুকরোগুলি মেশিনে দিয়ে একেবারে গলিয়ে নিতে হবে। তারপর তার সঙ্গে মধু, দুধ ও গ্লিসারিন মিশিয়ে নিতে হবে। পরে সেই জিনিসটা তুলোয় করে থুপে থুপে মুখে মেখে রাখতে হবে অন্ততঃ ২০ মিনিট। পরে সামান্য গরম জলে মুখ ধুয়ে আবার ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে ত্বকের ওপরের রোমকূপগুলি খুলে যায় ও আবার বন্ধ হয়ে টান হয়ে যায়। এতে মুখের ওপরে কোন ভাঁজ পড়ে না ও ক্লান্তির রেখা থাকে না।

এবারে এমন একটা মুখের আচ্ছাদনের সম্বন্ধে জানাবো যা বিভিন্ন ত্বকের ওপর শুধু সময়ের ব্যবধানে ব্যবহার করা যাবে। যেমন এই উপকরণটি ১০ মিনিট থাকবে যাদের ত্বক শুকনো ও খসখসে। ১৫ মিনিট থাকবে যাদের ত্বক সাধারণ, ২০ মিনিট থাকবে যাদের ত্বক তেলতেলে। তাহলে দেখুন ব্যাপারটা কতো সহজ।

একটি ডিমের সাদা অংশ ও তাতে দু চামচ কমলার রস ও ১টি চামচ মধু বেশ করে দিয়ে সেটা মুখে মাখবেন। এতে উপকার অনেক। তারপর নির্দিষ্ট সময়ের পর মুখ ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে শীতকাল হলে বোরোলীন কিম্বা কোনো ভালো ক্রীম (ঘরে তৈরীও চলে) মেখে নেবেন। গরমকাল হলে কিছু না মাখাই সবচেয়ে শ্রেয়।

এর সঙ্গে একটা কথা মনে রাখবেন মুশুরীর ডাল বাটা, কমলালেবুর খোসা বাটা কাঁচা হলুদ বাটা, পাতিলেবুর রস, দুধের সর ইত্যাদি যা প্রতিদিন প্রতিঘরে সহজে পাওয়া যায় তার মতন উপকারী ও ভাল জিনিস আর হয় না। এগুলি দিয়ে মুখ ও শরীরের যত্ন করলে শরীরের চামড়া মসৃণ সুন্দর তো হয়ই, এছাড়া যৌবনের উজ্জ্বলতা ও ত্বকের টান ভাব থেকে যায় চিরকাল। আপনারা করে দেখুন, ভাল ফল পাবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

—বরবর্ণিনী

রূপসজ্জা

মেঘবরণ চুল নিয়ে কুঁচবরণ কন্যা তার কেশবতী ছায়া ফেলে চলেছে মনের মধ্যে। দেখব না দেখব না করেও আপনি দেখলেন এমন একটা ভাবতন্ময়তা আপনার মধ্যে। সে তো লজ্জাবতী লতা হবেই। 'কে বললে?' চুল বাঁধতে বাঁধতে লেডিজ বিউটি কর্ণারের কর্ণধার অমিতকুমার দাশ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন। এবং 'আপনি যা বলছেন এখন ঠিক তার উল্টোটা হয়। মেঘবরণ ঢল-নামা চুল নিয়ে ছেলেরা রীতিমত কেশবান হয়ে মেয়েদের ছায়া ফেলছে। আর মেয়েরা লজ্জার মাথা খেয়ে মাথায় হিমালয় কিম্বা কাঞ্চনজংঘা বসিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ জানবেন কেশটি নিঃসন্দেহে একটি শিল্প। এদেশে এই শিল্পচর্চায় মা-ঠাকুমারাই এতদিন অভিভাবক ছিলেন। ইদানীং একদম প্রফেশনাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেকার দিনে কনেকে দেখার আগের দিন মসুর ডাল মিহি করে বাটা, সরষের তৈল, জবা ফুলের কুঁড়ি চটকে তার রস টক দৈ দিয়ে মাথা ঘষে ঘষে ধুয়ে দেওয়া হোত। মাথা পরিষ্কারের জন্য বেশী ব্যবহার হোত রিটা-ফল। আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সেই জল ছেঁকে তাই দিয়ে মাথা ঘষলে চুল নরম, কালো এবং উজ্জ্বল হয়। আজকের দিনে এইসব বললে আপনি হাস্যাস্পদ হবেন মহিলাদের কাছে। বাজারে একগাদা শ্যাম্পু তা না হলে করে খাবে কি করে।

ঃ এ তো আপনাদের পক্ষেও প্রযোজ্য?

তা তো বটেই। তা না হলে আমরা করে খাচ্ছি কি করে। আজ এই চুল বাঁধা

প্রফেশন হিসাবে চালু হয়েছে বলেই তো...। তাই বলে এটা ভাববেন না যে, আমাদের কাছে চুল বাঁধতে আসার কি দরকার। সবকিছু ঘরে হয় না। নিত্যনতুন ফ্যাশন। বদলাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বদলে দিচ্ছি। ভাল হলে গ্রহণ করা হচ্ছে, খারাপ হলে বর্জন করা হচ্ছে।

ঃ বিশ্বের প্রথম কোথায় কিভাবে কেশসজ্জা প্রফেশন হিসেবে গ্রহণ করা হয়?

আমার যতদূর জানা আছে সেটা হচ্ছে—ফরাসী দেশে। এখানেই বিখ্যাত ভাস্কর আঁতোয়ান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন একটি মাত্র পথ—কেশসজ্জা। ভাস্কর আঁতোয়ানের রূপান্তর ঘটেছিল কবরী-শিল্পী আঁতোয়ানে।

ঃ আপনি কতদিন হোল এই পেশা গ্রহণ করেছেন?

তা প্রায় ন' বছর হবে।

ঃ এই পেশায় বাঙ্গালীরা কতদূর উন্নতি করেছে?

বিশেষ কিছু উল্লেখ করার মত নয়। কলকাতায় বেশীর ভাগ চাইনীজ মেয়ে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত। ওরা ভয়ানক সিনসিয়ার এবং পরিশ্রমী। কাজ অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে করে। তাই ওরা এত উন্নতি করেছে। বাঙালীরা এত খাটতে পারে না। তাই আমরা কোলকাতায় সাকুল্যে মাত্র তিনজন।

ঃ হঠাৎ কিভাবে এলেন এই পেশায়?

কোলকাতায় এই কাজ শেখার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। কিছু কিছু প্রাইভেট ট্রেনিং সেন্টার আছে। সেগুলি চালান চাইনীজরা। আমি একজন চাইনীজের কাছে শিখেছি। বলতে পারেন হঠাৎই চলে এলাম। এক বন্ধুর সাথে থিয়েটার রোডের উক্ত ট্রেনিং সেন্টারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে কাজ দেখে কি জানি কেন ব্যাপারটা মাথায় ঢুকে গেল। কি করি কি করি তখন এরকম ভাবনার মধ্যে ছিলাম, তাই হয়তো সহজেই এই কাজের মধ্যে আসতে পারলাম।

ঃ এই বিউটি কর্ণার কেমন চলছে?

ভালোই।

ঃ প্রত্যহ কাস্টমার অ্যাভারেজ কতজন?

দশ থেকে পনেরোজনের মত। বিয়ের সময় এক-একদিন পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশজন পর্যন্ত হয়।

ঃ বাইরেও আপনি কাজ করেন?

হ্যাঁ। ফিল্মের নায়িকাদের আমি চুল বাঁধি। সুচিত্রা সেন থেকে শুরু করে অপর্ণা সেন, সুমিত্রা মুখার্জি, মিঠু মুখার্জির চুল নিয়মিত বাঁধি। এবং এপর্যন্ত অনেকগুলি ছবিতেও কাজ করেছি।

ঃ আচ্ছা আপনাদের এখানে খোঁপা বাঁধার মিনিমাম এবং ম্যাকসিমাম রেট কত?

মিনিমাম ছ'টাকা। ম্যাকসিমাম পঞ্চাশ টাকা।

[এখানে মডেল সবিতা দাশ ও অনুরাধা রায়। এঁরা যথাক্রমে কিস কার্ল এবং রোল বান খোঁপা বাঁধছেন। শ্রীদাশ কর্মরত। তাঁকে সাহায্য করছেন একজন চাইনীজ মহিলা।]

—নিবুপমা

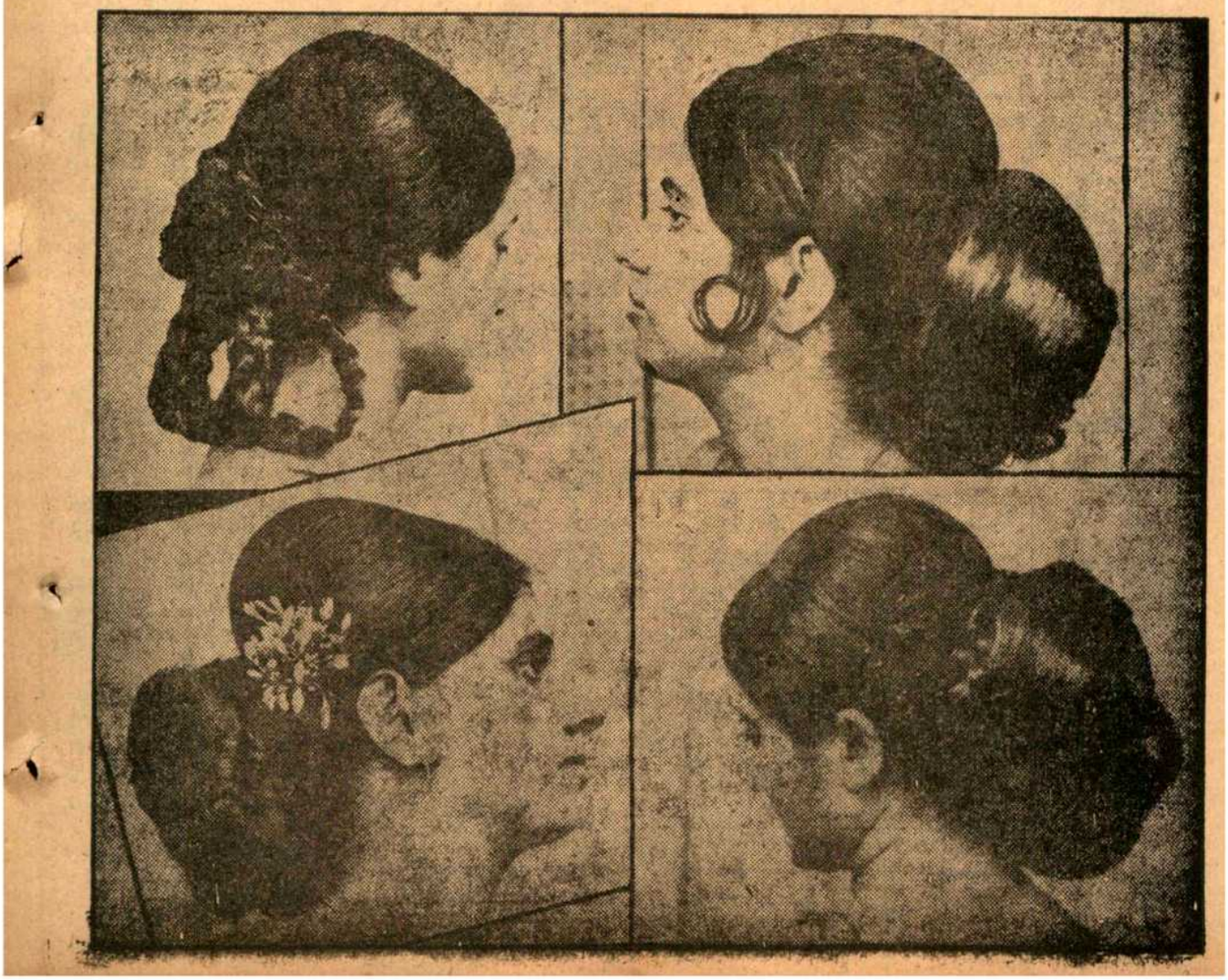

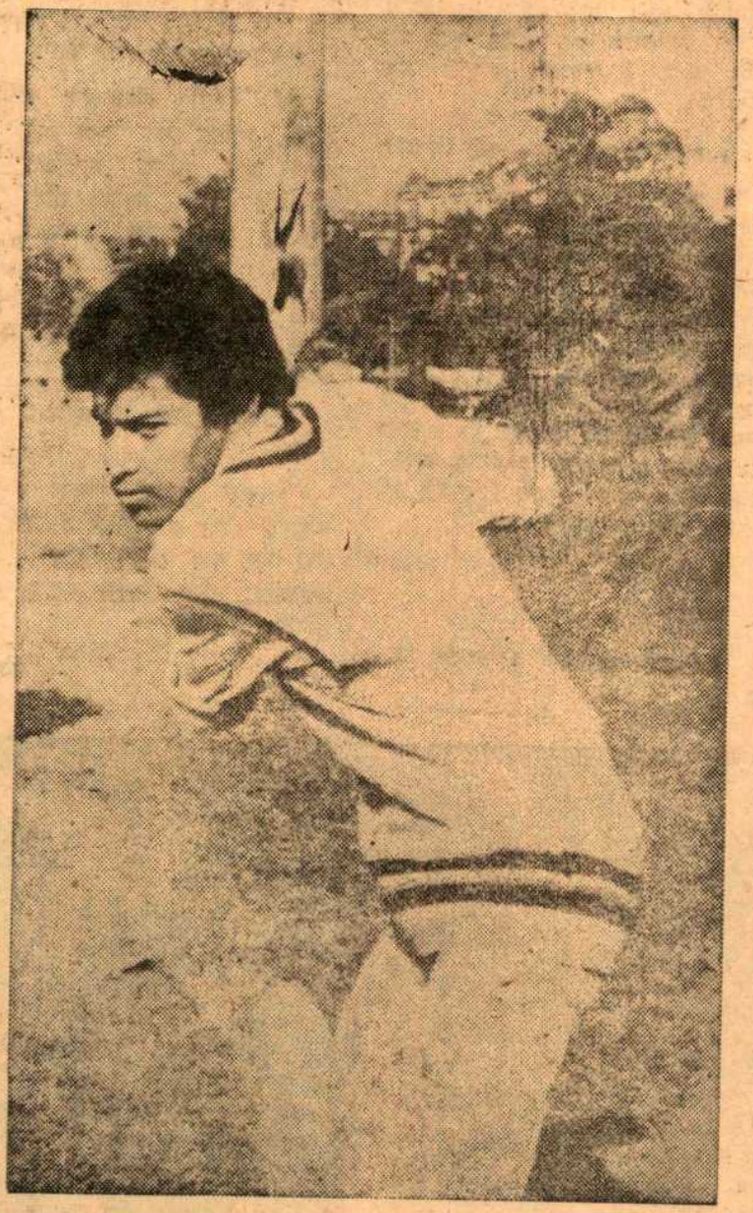

মাঠের নায়ক

প্রণব রায়

বাপকা বেটা, সিপাহী কি ঘোড়া অথবা ইংরেজীর সেই 'লাইক ফাদার লাইক সন' প্রবাদ বাক্যটি সে মিথ্যে নয়, তার বেশ কিছু প্রমাণ দুনিয়ার এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে চিত্রকলায় অভিনয়ে রাজনীতিতে কিংবা খেলাধুলার রাজ্যে এমন নজীর অতীতে মিলেছে। ভারতে আমাদের দেশে পাতৌদির ছেলে মনসুর, ভিনু মানকাদের ছেলে অশোক মানকাদ, অমরনাথের ছেলে মহিন্দর এবং সুরিন্দর, গাইকোয়াড় তনয় অংশুমান, মন্টু ব্যানার্জি এবং পঙ্কজ রায়ের ছেলে যথাক্রমে রবি এবং প্রণবের নাম অবশ্যই এই নজীরের স্বপক্ষে রায় দেয়।

প্রণব রায় ভারতের প্রখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য পংকজ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রণব কৈশোরের গণ্ডী পেরিয়ে এখনও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন নি বটে কিন্তু স্বকীয় ক্রীড়াকৃতির সূত্রে, নিজের ব্যাটিং বৈশিষ্ট্যে ইতিমধ্যেই সারা ভারতের ক্রিকেটরসিকদের নজর টানতে পেরেছেন। প্রণবের ক্রিকেটের আসর এখনও তেমন বিরাট হয়ে ওঠেনি বটে কিন্তু এ পর্যন্ত স্বল্প-পরিসর ক্রিকেট-জীবনে স্কটিশচার্চ স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীটি (বাণিজ্য) রীতিমত প্রতিষ্ঠিত।

প্রণব পঙ্কজ রায় এবং বিজয়া রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৯৫৮ সালে কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে ভাগ্যকুলের রাজবাড়ীতে। ভাগ্যকুলের রায়েরা অবিভক্ত বাংলার এবং খণ্ডিত বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যেই শুধু নয় খেলাধুলার জন্য বিপুল অবদান জুগিয়েছেন। এককালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মূল আড্ডাই ছিল কুমারটুলীর ঐ রাজবাড়ীতে। ক্রিকেট প্রণবের রক্তে, ক্রিকেট প্রণবের বংশে। পিতা পংকজ। এছাড়া বৃহৎ পরিবারেই অম্বর রায়, নিমাই রায় এবং গোবিন্দ রায়েরও জন্ম।

ছোটবেলায় ক্রিকেটে হাতেখড়ি হয়েছে প্রণবের কুমারটুলি পার্কে বাবা, দাদা, কাকাদের মাঝখানে। একটু বড় হওয়ার পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালে প্রণবকে প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বসুর কাছে পৌঁছে দেন পিতা পংকজ রায়। ১৯৭২ সালে বাংলা স্কুল দলের প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত হলেও চূড়ান্ত বারোজনের মধ্যে স্থান পান নি। পরের বছরও না। কিন্তু সে জন্য প্রণব কিন্তু হতাশ হন নি নিরাশ হন নি। কারণ ঐ অবসরে তিনি ক্রিকেটের ব্যাকরণটি ভাল করে চর্চার অবকাশ পেয়েছেন। লেট কাট, কভার ড্রাইভ, পুল, সুইপ এবং হুক সব রকমের মার শিখেছেন পরম যত্ন ও অধ্যবসায়ের বিনিময়ে। স্পিন বোলিংয়েও প্রণবের হাতটি ভাল। ফিল্ডিংও উপেক্ষণীয় নয়।

এই অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও তিতিক্ষার পুরস্কার মিলেছিল ১৯৭৩-৭৪ সালের ক্রিকেট মরশুমেই। কোচবিহার ট্রফির পূর্বাঞ্চলীয় খেলায় বাংলা দলভুক্ত হলেন প্রণব।

প্রথম খেলায় আসামের বিরুদ্ধে ৩২ রান অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। খেলায় বাংলা ইনিংসে জিতেছিল। পরের খেলায় বিহারের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৩২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে একশো অপরাজিত। হায়দরাবাদে আয়োজিত আন্তঃ আঞ্চলিক কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৫৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ১০১। পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে প্রণব প্রথম ইনিংসে আবার ১০১ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৮ (রান আউট)। ফাইনালে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে ইনিংস ওপেন করতে গিয়েই ১ রানে আউট। পরের ইনিংসে কিন্তু যোগ্য বদলা নিলেন প্রণব। আর অমরনাথ জাদেযা এবং বেঞ্জামিনের (সর্বভারতীয় স্কুল দলের প্রতিনিধি) মত বোলারকে হিমসিম খাইয়ে দিলেন তিনি। আউট হলেন ৬৯ রান করে। পরের বছরটি প্রণবের আরো উজ্জ্বল, আরও আলোকিত, আরও সার্থক। কোচবিহার ট্রফির প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলীয় খেলায় জামশেদপুরে আসামের বিরুদ্ধে করেছিলেন গোটা একটি দিন উইকেটে থেকে প্রথম ইনিংসে ১৯৮ রাণ। বাংলার জয় হয়েছিল ইনিংসে। বিহারের বিরুদ্ধে আরও ভাল। ২৫১ অপরাজিত। এই খেলায়ও বাংলা জিতেছিল ইনিংসে। আন্তঃ আঞ্চলিক আসরে অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালে (নাগপুর) পরাজয় ঘটেছিল বাংলার। এর কারণ অবশ্য প্রণবের তথা পূর্বাঞ্চলের দুর্বল ব্যাটিং। প্রথম ইনিংসে প্রণব শূন্য রানেই আউট হয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় দফায় প্রণবের সংগ্রহ ছিল ৯৩। সি কে নাইডু ট্রফির আসরে প্রণব এবার নিয়ে খেলছেন দ্বিতীয়বার। গতবছর খেলা সম্ভব হয়নি পড়াশুনোর চাপে। তার আগের বছর কানপুরে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ঘরোয়া ক্রিকেটের আসরে প্রণব খেলেন টাউন ক্লাবে। গতবছর খেলেছিলেন স্পোর্টিং ইউনিয়নে অর্থাৎ বাবার ক্লাবে। প্রণব একটু একটু ফুটবলও খেলতে পারেন। দাদার সঙ্গে (প্রদীপ রায়) মাঝে মাঝে বল নিয়ে এখনও নেমে পড়েন কুমারটুলি পার্কে। প্রণবের কিন্তু খুব দুঃখ দাদা ক্রিকেটকে সিরিয়াসলি নেন নি বলে। অথচ প্রদীপের ব্যাটিংয়ের ধরণটি ছিল রীতিমত পারিপাটি। লেগে থাকলে প্রণবের বিশ্বাস—এক দিন না এক দিন দু ভাই মিলে বাংলার ইনিংস ওপেন করতে পারতেন।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশবিদেশের খেলা

নতুন প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল

আন্তর্জাতিক জিমনাস্টিকসে সোভিয়েত রাশিয়ার একাধিপত্য সুপ্রাচীন। ইতিহাসের ধূসর জীর্ণ পাতাগুলোতে এখনও জ্বল জ্বল করছে রুশ জিমনাস্টদের অভূতপূর্ব জিমনাসিয়ামের ছন্দময় কারুকৃতি।

পুরুষ বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি অনায়াসে অব্যাহত থাকলেও মহিলাদের বিভাগে রুশ শীর্ষাসনটি হারিয়ে যায় চেক তরুণী ভেরা কাসালাভাসকার আবির্ভাবে। বিগত কয়েকটি অলিম্পিক ও ইউরোপীয় জিমনাস্টিকের আসরের রানী ভেরা কাসালাভাসকার নিপুণ নিখুঁত জিমনাস্টিক-সৌষ্ঠবের কাছে গত এক যুগের ওপর পূর্ব জার্মানী জাপান রাশিয়া প্রমুখ জিমনাস্টিকসে অগ্রগণ্য দেশগুলো মাথা তুলতে পারে নি।

একটির পর এক একটি প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার মর্মান্তিক গ্লানিকে ভোলবার অভিপ্রায়ে—সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা সম্ভাবনাময় প্রতিভার সন্ধানে সচেষ্ট হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকের খনন কার্যের মত এই প্রচেষ্টায় যে কটি উজ্জ্বল প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে তার মধ্যে লুডমিলা তুরিশ্চেভা ও ওলগা করবুটের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তুরিশ্চেভার সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি বর্তমানে এখানে সে প্রসঙ্গে আর না গিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না। তবুও নিঃসন্দেহে একটা কথা স্বীকার না করলে কীর্তিময়ী তুরিশ্চেভা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একাধিক অলিম্পিকে রুশ মেয়ে লারিসা লাতিনিনা যে স্বর্ণযুগের পত্তন করেছিলেন পরবর্তীকালে লুডমিলা তুরিশ্চেভা যেন তারই ঐতিহ্যবাহী। আর ওলগা করবুট বিশ্ব জিমনাস্টিকসের রঙ্গমঞ্চে রুশ তরুণীদের পুরনো সম্মানকে সোনালী সফলতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছেন তুরিশ্চেভার দৃঢ় পদক্ষেপের তালে তালে অবিচল নিষ্ঠায় অকপট তপস্যায়। ওলগা নতুন প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল। আরও সম্ভাবনায় দীপ্তিময়ী।

মিউনিখ অলিম্পিকে তুরিশ্চেভা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি অর্জন করলেও রুশ মহিলা জিমনাস্ট দলের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের অন্তরালে ওলগা করবুটের অমূল্য অবদান অনস্বীকার্য। হর্সভল্টে ১৯·১৭৫ পয়েন্টে পঞ্চম স্থান আনইভেন বারে ১৯·৪৫০ পয়েন্টে দ্বিতীয়, বীম ব্যালেন্সে ১৯·৪০০ পয়েন্টে প্রথম ও ফ্লোর এক্সারসাইজে ১৯·৫৭৫ পয়েন্ট লাভ করে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম হন। অন্যান্যদের মধ্যে লাসাকোভিচ, বুরদা, সাদী প্রভৃতি সতীর্থদের ধনও কিছু কম নয়। রুশ তরুণতরুণীদের জন্মজয় বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। রীতিমত জিমনাস্টিকসের রেওয়াজ সেখানে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে রাশিয়ায় জিমনাস্টের সংখ্যা ৬,৪৭,০০০ জন। কেবল শিশু জিমনাস্ট প্রশিক্ষণ স্কুল রয়েছে ১২০০। প্রশিক্ষকের সংখ্যা ৫০০০।

মিউনিখ অলিম্পিকে একনিষ্ঠ সাধনার বিচিত্র পসরা সাজিয়ে এসেছিলেন জার্মানীর কারিন জানজ (ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়) ও এবিকা-র মত আরও অনেক দেশের অনেক প্রতিযোগী। কিন্তু উপস্থিত সমালোচক ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে 'অলিম্পিক ম্যাজিসিয়ানের' আখ্যা ওলগা করবুট ছাড়া আর কেউ পান নি। ওলগার বিভিন্ন ইভেন্টে ছন্দমধুর লীলায়িত মুহূর্তগুলি নয়নাভিরাম। সহজ স্বচ্ছন্দ অংগসঞ্চালনের কলা-কৌশল দেখে মনেই হয় না যে সে কোন রক্ত-মাংসের মানবী। যেন প্লাস্টিকের তৈরী যন্ত্রচালিত কোন শরীর। অতীতে অনেক খ্যাতির অধিকারিণী উনিশ বছরের মেয়ে ওলগা যেন যাদুকরের মত তার স্বকীয় ঘনিষ্ঠ সাধনার আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে দর্শকদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। বস্তুতঃ ওলগা করবুট 'অলিম্পিক ম্যাজিসিয়ান'।

বাইলোরাশিয়ার গ্রোডনো কলেজের সদা-হাস্যময়ী ওলগাকে মিউনিখের আসরের শেষ ভাগে দেখা যায় অন্যরূপে। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রতিযোগিতায় প্যারালাল-বারের খেলায় অল্পের জন্যে দেহের ভার-সাম্যের ছন্দপতন ঘটলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কাঁটা ৭-৫০ পয়েন্টে আটকে গেলে লাস্যময়ী ওলগার দু চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সেদিন ওলগার বাঁধভাঙা চোখের জলের সঙ্গে অনেকেরই চোখের জল মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

স্নেহপ্রবণ চরিত্রমাধুর্যে ওলগা সবার প্রিয়। খুব সহজে ভেতরের মানুষকে আপন করে নিতে জানেন। অলিম্পিক গ্রামে সহাস্যে হাজারখানেক অটোগ্রাফ দিয়েছেন। আর অত ব্যস্ততার মধ্যেও অজস্র চিঠির উত্তর লিখে-ছেন। আনন্দ বেদনা জড়ানো সহজাত কোমল নারী মনটির উপস্থিতি ওলগার মধ্যে বড় বেশী সুস্পষ্ট।

জিমনাস্টিকে আত্মমগ্ন ওলগা স্বপ্ন-রঙীন। ভবিষ্যতে নিজেকে আরও গভীর স্বীকৃতি ও অধিক প্রশস্তির ব্যাপ্ততে বিস্তৃত করে দিতে চান। হয়ত বা অনাগত ভবিষ্যতে তাই হবে। এই উজ্জ্বল রুশ নক্ষত্রটি বিশ্ব জিমনাস্টিকে আগামী দিনে আরও বড় আসন অধিকার করে বসবে। তিন অলিম্পিকে সেরা জাতীয় রুশ প্রশিক্ষক লারিসা লাতিনিনাও ওলগা করবুট সম্পর্কে সংশয়াতীতভাবে একই ধারণা পোষণ করেন। আমরা কীর্তির আলোকে দীপ্তিময়ী সেই ওলগাকে দেখার অপেক্ষায়।

—প্রশান্ত দা

ওলগা করবুট

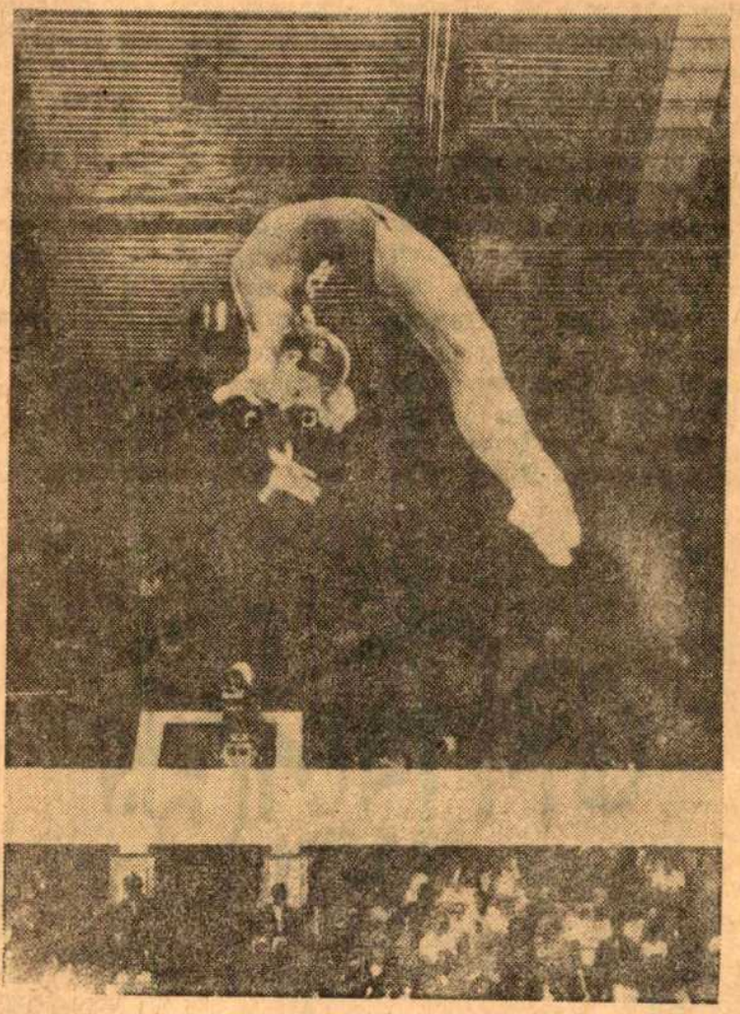

খেলার জগতে মেয়ে

রাজ্য বাস্কেট বলে জোনাকী শেঠ

—মহিলাদের বাস্কেটবলে পশ্চিমবাংলা ভারতে শীর্ষস্থানীয় দল। আমরা অনেকবার জাতীয় চ্যাম্পয়ান হয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে বাস্কেটবল খেলা প্রচার বা প্রসারের কোন ব্যবস্থাই করা হয় না। মুষ্টিমেয় এংগলো ইন্ডিয়ান ও পার্শী মেয়েদের মধ্যেই খেলাটি সীমাবদ্ধ রয়েছে।—

খুব ক্ষোভের সঙ্গেই জোনাকী শেঠ কথাগুলি বললো। জোনাকী ১৯৭৪-এ জাতীয় মহিলা বাস্কেটবল বিজয়ী পশ্চিম-বাংলা দলের একমাত্র বাংগালী খেলোয়াড়। বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসাবে জোনাকীর মতানতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম ৭।১ লাউডন স্ট্রীটে এবারের পশ্চিমবাংলা বাস্কেট বল দলের এই একমাত্র বাংগালী খেলোয়াড়ের সঙ্গে দেখা করতে। স্বল্পবাক প্রচারবিমুখী অথচ সম্প্রতিভ জোনাকী বাস্কেটবল খেলছে স্কুলজীবন থেকে। ১৯৬৬—৬৭ থেকেই মডার্ণ হাইস্কুলে মিহির মুখার্জীর প্রশিক্ষণাধীনে জোনাকী বাস্কেটবল খেলায় তালিম নেয়। তারপর একে একে স্কুল ক্রীড়ায় সর্ব ভারতীয় আসরে, পরে কলেজে থাকা-কালে আন্তঃ কলেজ বাস্কেটবলে লোরেটোর পক্ষ হয়ে নিয়মিত খেলেছে। শুধু ছাত্রী-রূপেই নয়। কলকাতার মহিলা বাস্কেটবল লীগ ও নক আউটে প্রথমে লোরেটো ক্লাব ও পরে সাফি ক্লাব দলের নিয়মিত সদস্য এই জোনাকী। প্রাক এশীয় (১৯৭০) এবং জাতীয় দলে কয়েক বছর দলভুক্ত হয়েছে। '৭১-এ কোচিনে পশ্চিমবাংলা দল চ্যাম্পিয়ান হয়, জোনাকী ঐ দলে ছিল। '৭০-এ প্রাক এশীয় বাছাই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বাংলা দলে জোনাকী খেলেছে। '৭২-এ দিল্লীতে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় (ছাত্রী) বাস্কেটবলে কলকাতা দলের অধিনেত্রী ছিল জোনাকীই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনুশীলন করার সময়ে পায়ে আঘাত লাগায় ও প্রতিযোগিতার খেলায় নামতে পারেন। স্কুলে থাকতে থাকতেই জোনাকী তার ক্রীড়াকুশলতার স্বাক্ষর রাখে। ১৯৬৮তে

প্রথমে হায়দরাবাদে এবং পরে রায়পুরে নিখিল ভারত স্কুল ক্রীড়ায় জোনাকী বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করে। শেষোক্ত আসরে বাংলা বাস্কেটবল দলের নেত্রী ছিল জোনাকী ১৯৬৯-এ লোরেটো কলেজ দলে নিয়মিত খেলেছে। ১৯৭০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেটবলে দল না পাঠানোর ফলে জোনাকী আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় আসরে খেলতে পায়নি। তবে ঐ বছর ও জাতীয় এবং প্রাক এশীয় বাস্কেটবলে বাংলা দলে স্থান পায়। আদ্রায় জাতীয় আসরে বাংলা মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। বাস্কেটবল দলের হয়ে জোনাকী বিদেশের আসরেও খেলে এসেছে। ১৯৭১-এ লোরেটো ক্লাবের হংকং এবং ব্যাংকক সফরকারী দলে জোনাকী স্থান পেয়েছিল। হংকং এ দলটি কতকগুলি স্থানীয় দলের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়াও হংকংয়ের জাতীয় দলকেও হারিয়ে দেয়। এছাড়া বাংলা দলসেবার শ্রীলংকা সফরে পাঁচটি স্থানীয় দল এবং জাতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলে জয়ী হয়।

গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৪-এ দিল্লীতে জাতীয় মহিলা হকির রজত জয়ন্তী বর্ষের প্রতিযোগিতায় বাংলা ফাইনালে কর্ণাটককে হারিয়ে আবার চ্যাম্পিয়ান হয়। জোনাকী বলে আমাদের দলের খেলার মান অন্য সব রাজ্যের তুলনায় বেশ উঁচু। তবে, কেরল কর্ণাটক এবং দিল্লী খুব দ্রুত উন্নতি করছে। মহারাষ্ট্রও ক্রীড়ামান উন্নত করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে।

—ও সব রাজ্যের মেয়েরা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় এই খেলার চর্চা করতে এগিয়ে আসছে। আর আমাদের এখানে খেলোয়াড়ের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। প্রথম ডিভিসনে মাত্র পাঁচটি দল !

—বাঙালী মেয়েরা বাস্কেটবল খেলায় আসছে না কেন?

—কারণ স্কুলজীবন থেকে এদের খেলবার কোন ব্যবস্থা নেই বলে। দেখুন বাস্কেটবল খেলাটা একটি খুব সূক্ষ্ম কলাকৌশলের খেলা। এর আইন-কানুনও খুব বেশী। কিন্তু এ খেলার জন্য ছোটখাট মাঠ বা কোর্ট হলেই চলে। অন্যান্য সাজসরঞ্জামও খুব একটা বেশী লাগে না। কিন্তু অধিকাংশ বাংলা মেয়ে স্কুলে বাস্কেটবল খেলা শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ বাঙালী মেয়েরা এই খেলা শিখলে তাদের শরীর স্বাস্থ্য এবং পটুত্ব বৃদ্ধি পাবে। আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলার মেয়েদের ক্রীড়াচাতুর্যও প্রকাশ পাবে।

—এখানে এঙ্গলো ও পাশী মেয়েরা এ খেলার সুযোগ পায় কি করে ?

—কারণ, ওদের ছেলেদের ক্লাবের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ক্লাবও সংযুক্ত আছে। সেখানে ওরা বাস্কেটবল, হকি এবং টেনিস প্রভৃতি খেলার সুযোগ পায়। আমাদের নামী কম নামী কোন ফুটবল—ক্রিকেট ক্লাবের মেয়েদের শাখা নেই। তাই আমাদের মেয়েরা বাস্কেটবল বা হকি খেলা শিখতে পারে না। এথলেটিকসে কিছু কিছু সাহায্য পায় বলে মেয়েরা ছেলেদের ক্লাবের হয়ে এথলেটিক

চর্চা করে প্রতিযোগিতায় নামে ক্লাবের হয়ে।

—বাস্কেটবল এসোসিয়েশন তো এ খেলা প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারে।

—সে ক্ষেত্রেও অসুবিধা আছে; রাজ্য বাস্কেটবল সংস্থার আর্থিক অবস্থা মোটেই অনুকূল নয়। অন্য অনেকরকম খেলায় বহু পৃষ্ঠপোষক আছেন। নানাভাবে তাদের অর্থাগমের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বাস্কেটবল সংস্থার এমনি অবস্থা যে ছেলেদের খেলা প্রশিক্ষণ-অনুশীলনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ওঠা হয় না। ভালভাবে অনুশীলনের মাঠ নেই। মেয়েদের জন্যে তো নেই-ই। প্রশিক্ষক আনার ব্যয়ই বা কে দেবে ?

—বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এ খেলা প্রসার করতে হলে কি কি করা উচিত বলে তুমি মনে কর ?

—প্রথমতঃ প্রত্যেক মেয়ে স্কুলে এবং কলেজে নিয়মিত বাস্কেটবল খেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিক্ষতীয়তঃ রাজ্য সংস্থার আর্থিক ভিত মজবুত করার

উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে বিচার বিবেচনা করতে পারেন। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসে মহিলাকর্মী দ্বারা যাতে বাস্কেটবল দল গঠন করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

—খুবই সুচিন্তিত অভিমত। তুমি যে এ সব ভাবো তার জন্য ধন্যবাদ। এখন বল তো তুমি কলেজে কি ভাবে খেলা চালালে ?

—আমাদের কলেজে ভারতের প্রখ্যাত প্রাক্তন বাস্কেটবল খেলোয়াড় রামনাথ মঙ্গেল ছিলেন প্রশিক্ষক। উনি এখন ভারতীয় দলেরও প্রশিক্ষক। ওঁর কাছেই আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এছাড়া সাফি ক্লাবের শ্রীপি ভৌমিক বর্তমানে আমাদের প্রশিক্ষক। স্কুলে খেলা সুরু করি—তাই কলেজে আমার সুবিধাই হয়েছে। জোনাকী কেবল বাস্কেটবল নয়, হকিতেও রাজ্য পর্যায়ের খেলোয়াড়, ১৯৭১-এ চন্ডীগড়ে এবং ১৯৭৩-এ ভূপালে নিখিল ভারত মহিলা হকিতে জোনাকী বাংলা দলে খেলেছে। পরে হকির তুলনায় বাস্কেটবলই ওর কাছে বেশী ভাল, বেশী সূক্ষ্ম খেলা বলে মনে হওয়ায় বাস্কেটবলেই মনোনিবেশ করে। এ ছাড়া টেবল টেনিসে স্কুল ক্রীড়ায় বাংলা দলে স্থান পেত। পরে এ খেলাও ছেড়ে দেয়, ঐ বাস্কেটবলেরই জন্য।

—তুমি কি ভবিষ্যতে বাস্কেটবল প্রশিক্ষণ দেবে ?

—বাস্কেটবলে প্রশিক্ষিকা হওয়া খুব দুরূহ ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। আনকোরাদের হয়ত প্রশিক্ষণ দিতে পারি। কিন্তু তৈরী খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দিতে অনেক কলাকৌশল জানতে হয়— শিখতে হয়, ততখানি দায়িত্ব নেওয়া কঠিন হবে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব খুবই গুরুতর। তবে জোনাকী রেফারীং করে থাকে এবং নিয়মকানুন খুব ভালরকম রপ্ত করেছে।

জোনাকী বললো, 'আমার বাবা আমাদের খেলাধূলায় খুব উৎসাহ দেন।' ওরা পাঁচ বোন, দুই ভাই। ওর পরের দুই বোনও বাস্কেটবল খেলায় কুশলী। মীনাক্ষী সাফি ক্লাবেই খেলে। ছোট বোন পিনাকী স্কুল পর্যায়ে বাস্কেটবলে রাজ্য দলে স্থান পেয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার জন্য যোগ দিতে পারে নি। জোনাকী মীনাক্ষীদের সাফি ক্লাব কলকাতা লীগে খুব শক্তিশালী দল। মীনাক্ষী ভাই-বোনেদের জয় করা কাপ, পদক আর ট্রফিতে ঠাসা আলমারী দেখিয়ে বলল, এই দেখুন আমাদের সাফল্যের সাক্ষী।

জোনাকী অবশ্য কাপ, পদকের চেয়ে খেলার বিষয়েই আলোচনা করতে আগ্রহী। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানালো, কলকাতায় কোন হার্ডকোর্ট নেই, কাঠের তৈরী আধুনিক কোর্টও নেই, আর ইণ্ডোর বা আচ্ছাদিত কোর্টও না। সংগঠনের আর্থিক সামর্থ্য নেই, এসব করবে কে? ছেলেদের জন্যই কিছু হচ্ছে না, তা মেয়েদের! জোনাকী বলে এইবার আস্তে আস্তে খেলা ছাড়তে হবে। তবে সুযোগ পেলে মেয়েদের বাস্কেটবল প্রশিক্ষণ দেবার ভার নেবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে টেনিস খেলার ইচ্ছাও আছে।

জোনাকী বর্তমানে এস এফ (আই) লিমিটেডে চাকরি করে। ওর মুখ্য 'হবি' বই পড়া—আর গান।

অনয়

খেলাধুলা

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট

মাদ্রাজে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারত ১০০ রাণে জিতে বর্তমানে খেলার ফলাফল সমান (২—২) করেছে। ১৯৭৪—৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে এবং ভারত তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টে জিতেছে। বোম্বাইয়ের শেষ পঞ্চম টেস্টের ওপর সিরিজের ফলাফল নির্ভর করছে।

প্রথম দিনেই ভারতের প্রথম ইনিংস ২৯০ রানের মাথায় শেষ হয় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে ৩৬ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রথম দিনের খেলায় ১৩টি উইকেট পড়ে যাওয়ার মূলে পিচের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। বেশীর ভাগ খেলোয়াড় ভুল খেলে আউট হয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় ভারতের বিশ্বনাথ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রবার্টস আমার পক্ষে। জানেন তো, বাস্কেটবলে দেন—বিশ্বনাথ ৯৭ রান করে শেষ পর্যন্ত নটআউট থেকে যান এবং রবার্টস ৬৪ রানে ৭টা উইকেট পেয়েছিলেন।

ভারতের প্রথম ইনিংসের ২৪ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট পড়ার পর বিশ্বনাথ খেলতে নামেন। তিনি ২২৭ মিনিট খেলে তাঁর নটআউট ৯৭ রানে ১৪টা বাউন্ডারী করেছিলেন। তাঁর দুর্ভাগ্য জুটির অভাবে শত রান পূর্ণ করতে পারেন নি। বেদী এবং চন্দ্রশেখরের সহযোগিতায় বিশ্বনাথ দলকে শোচনীয় সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছিলেন নবম উইকেটের জুটিতে বেদী (১৪ রাণ) এবং বিশ্বনাথ দলের অতি মূল্যবান ৫২ রান তুলে দেন। ভারতের ১৯০ রানের মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে তাদের যে সঙ্কট দেখা দেয় তা অনেকটা কেটে যায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩৬ রানে ৩ উইকেট পড়াতে। ভারত প্রথম ইনিংসে কম রান করেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ১৯২ রানের মাথায় শেষ হয় এবং ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের চারটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮৫ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রথম ইনিংসের খেলায় ভারতের থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র দু রান বেশী তুলেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ১৯২ রানে আউট করতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন এরাপল্লী প্রসন্ন। দ্বিতীয় দিনের খেলার এক সময় প্রসন্নর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ৩১টি বলে ৫ রান দিয়ে ৫ উইকেট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রিচার্ডস (৫০ রান) এবং লয়েড (৩৯ রান) যা কিছুটা খেলেছিলেন। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে লয়েড এবং রিচার্ডস আক্রমণাত্মক ব্যাট করে ৬৮ মিনিটে দলের অতি মূল্যবান ৬৮ রান তুলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৬ রানের মাথায় শেষ হয় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৩৮ রান সংগ্রহ করেছিল। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ২০০ রান সংগ্রহ নিয়ে এক সময় দারুণ সংশয় দেখা দিয়েছিল। বিশ্বনাথ (৪৬ রান) গায়কোয়াড় (৮০ রান) এবং ঘাবড়ির (নটআউট ৩৫ রান) দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই ভারত শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫৬ রান সংগ্রহ করে। লাঞ্চের সময় ভারতের রান ছিল ৫ উইকেটে ১৪৭। বিশ্বনাথ ৩৮ এবং গাইকোয়াড় ৩৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ভারতের ১৭৮ রানের মাথায় বিশ্বনাথ নিজস্ব ৪৬ রান করে মারের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। ষষ্ঠ উইকেটের জুটিতে বিশ্বনাথ এবং গাইকোয়াড় অতি মূল্যবান ৯৩ রান তুলেছিলেন। চা-পানের বিরতির সময় ভারতের রান দাঁড়ায় ৭ উইকেটে ২৩৯। খেলায় গাইকোয়াড় ৭১ রান এবং ঘাবড়ি ২৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

ভারতের ২৫৬ রানের মাথায় ভুল বোঝাবুঝির ফলে গাইকোয়াড় রান আউট হন। অষ্টম উইকেটের জুটিতে গাইকোয়াড় (৮০ রান) এবং ঘাবাড় ৬৮ রান সংগ্রহ করে দেন। গাইকোয়াড় ২৫৮ মিনিট খেলে তাঁর ৮০ রানে দশটা বাউন্ডারী করেছিলেন। ভারতের ২৫৬ রানের মাথায় তিনটে উইকেট পড়ে যায়—অষ্টম নবম এবং দশম উইকেট। ঘাবাড় শেষ পর্যন্ত ৩৫ রান করে অপরাজিত থেকে যান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যান্ড্রু রবার্টস দুই ইনিসের খেলায় মোট ১২টা উইকেট পান—ভারতের বিপক্ষে একটি টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে সর্বাধিক উইকে পাওয়ার নতুন নজির।

তৃতীয় দিনের শেষে খেলার অবস্থা দাঁড়ায়—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়লাভের জন্যে

এরাপল্লী প্রসন্ন
১১১ রানে ৯ উইকেট
(১ম ইনিংসে ৭০ রানে ৫ ও ২য় ইনিংসে ৪১ রানে ৪ উইকেট)

জি আর বিশ্বনাথ—৪র্থ টেস্টের 'ম্যান অব দি ম্যাচ'—
১ম ইনিংসে নট-আউট ৯৭ রান এবং ২য় ইনিংসে ৪৬ রান

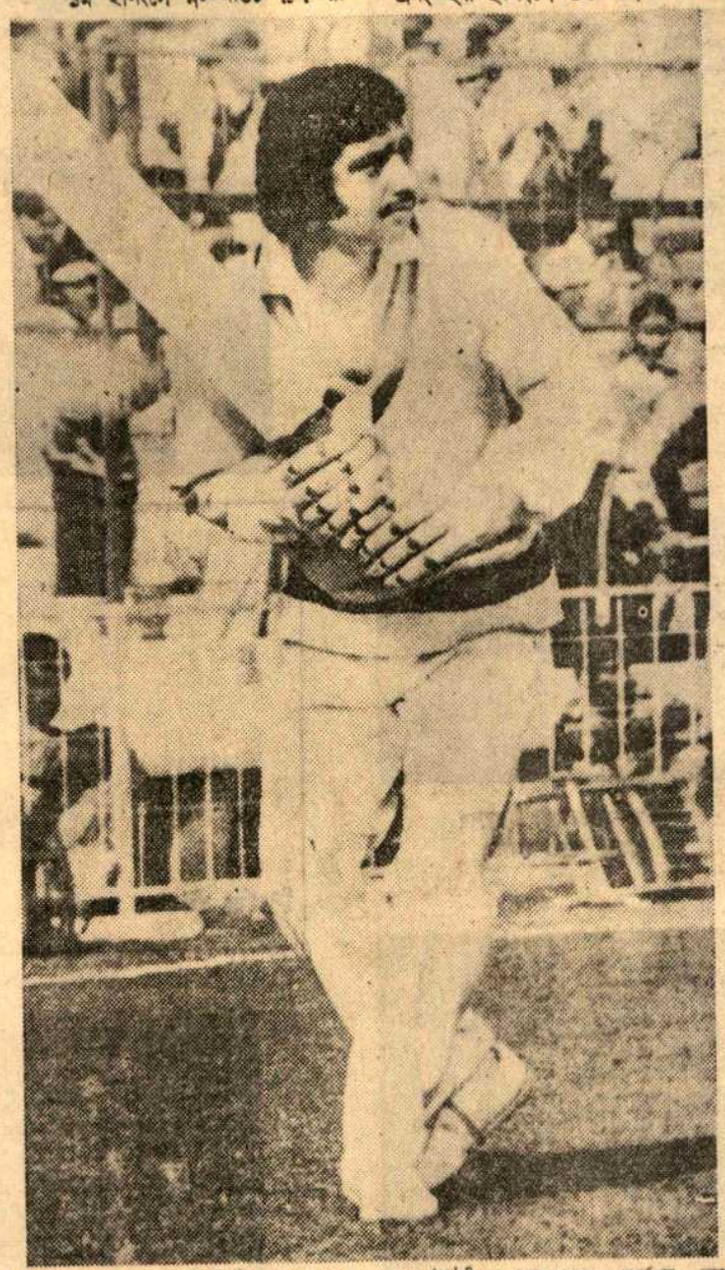

আরও ২১৭ রানের প্রয়োজন। এদিকে তাদের হাতে জমা ৯টা উইকেট এবং পুরো দু দিনের খেলার সময়। খেলার এই অবস্থায় ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই দলেরই পক্ষে জয়লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল সমান সমান।

চতুর্থ দিনে দুটো বেজে পাঁচ মিনিটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৪ রানের মাথায় শেষ হলে ভারত ১০০ রানে জিতে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৪ রানে ফেলে দিতে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন তিন স্পিন বোলার—প্রসন্ন বেদী এবং চন্দ্রশেখর। প্রসন্ন ৪১ রানে ৪টে বেদী ২৯ রানে ৩টে এবং চন্দ্রশেখর ৫১ রানে ২টো উইকেট পেয়েছিলেন। কলকাতার তৃতীয় টেস্ট খেলার মতই মাদ্রাজের এই চতুর্থ টেস্ট খেলায় অল্প রান উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত বোলাররা জয়লাভের পক্ষে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ১৯০ রান (বিশ্বনাথ ৯৭ নটআউট এবং মানকাদ ১৯ রান। এ্যান্ড্রু রবার্টস ৬৪ রানে ৭ এবং জুলিয়েন ১২ রানে ২ উইকেট)।

ও ২৫৬ রান (বিশ্বনাথ ৪৬, অংশুমান গাইকোয়াড় ৮০ এবং ঘাবাড় ৩৫ নট আউট। রবার্টস ৫৭ রানে ৫ এবং বয়েস ৬১ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১৯২ রান (রিচার্ডস ৫০ এবং লয়েড ৩৯ রান। প্রসন্ন ৭০ রানে ৫ এবং বেদী ৪০ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৫৪ রান (কালিচরণ ৫১ রান। প্রসন্ন ৪১ রানে ৪ বেদী ২৯ রানে ৩ এবং চন্দ্রশেখর ৫২ রানে ২ উইকেট)।

সেরা অভিনেতা ইরানের
সোহরাব শাহিদ সালেস

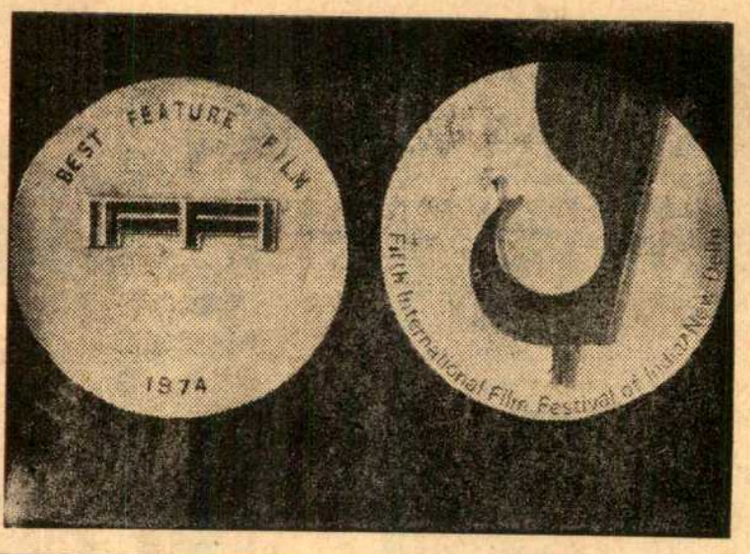

দিল্লীর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে

নির্মল ধর

সেরা পরিচালক ব্রেজিলের
জেলিটো ভিয়ানি (আমাজন)

সেরা ছবি হাঙ্গেরীর
ড্রিমস্ ইয়োথ

স্টারডাস্ট (ব্রিটেন)

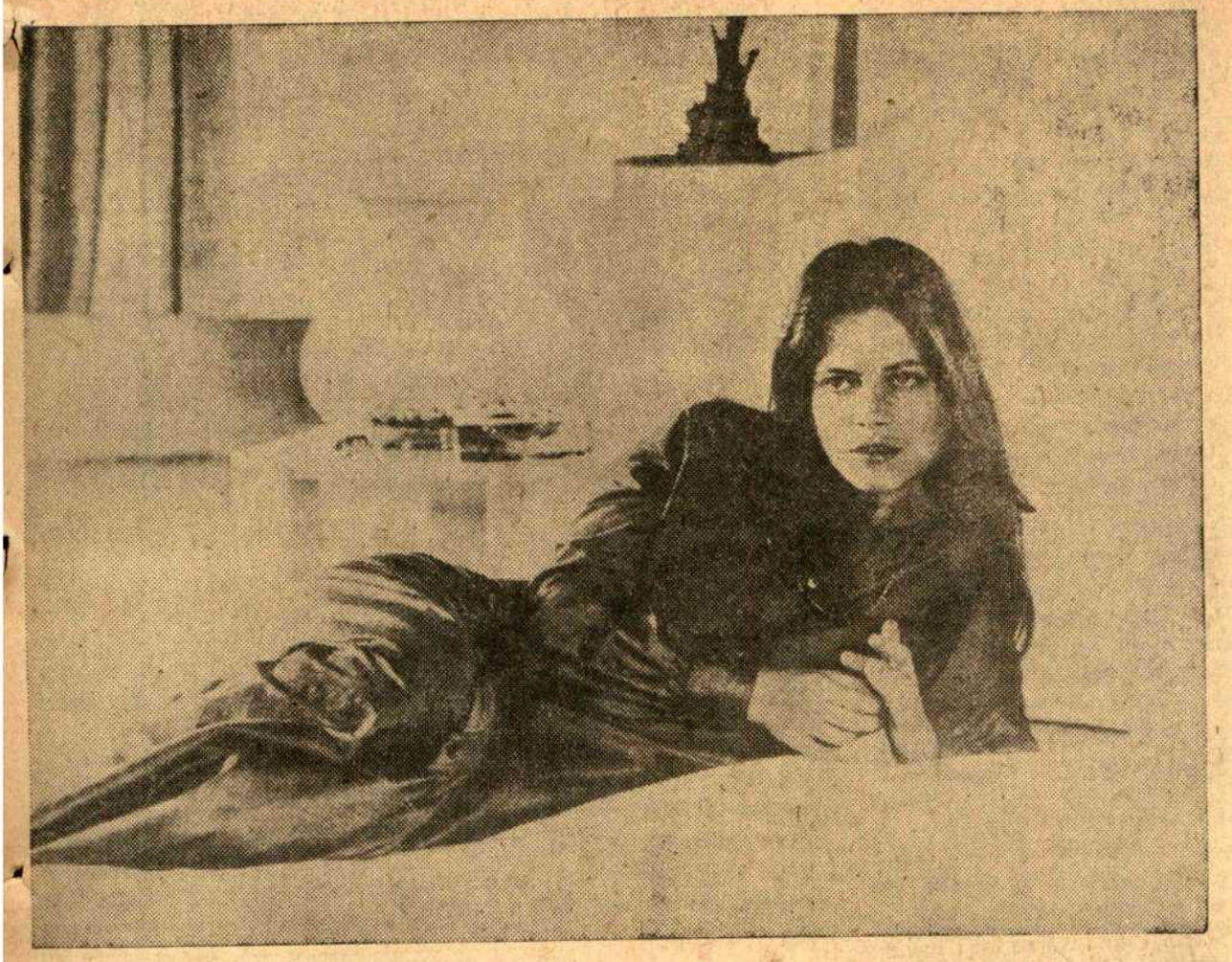

প্রতিযোগিতা বিভাগের সব ছবি দেখা শেষ। চব্বিশটা দেশের পঁচিশখানা ছবি ছিল এই বিভাগে। ইরানের 'টাঙ্গাসি'র ইংরেজী সাব-টাইটেল না থাকার অজুহাতে বাদ গিয়েছিল প্রতিযোগিতা থেকে। এ ছবিতে ইরানের সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে টাঙ্গাসির নামে একজন বিদ্রোহীর বস্তুধর্মী কাহিনী বলা হয়েছে। পরিচালক জীবনের রুক্ষতা হতাশাকে পর্দায় তুলে ধরেছেন বেশ সুন্দরভাবে। তার চাইতেও এ ছবির সব চাইতে বড় আকর্ষণ ছিল প্রধান ভূমিকায় বেহরুজ ভোসঘির প্রাণময় অভিনয়। সর্বশেষ সংবাদ : ছবিখানি প্রতিযোগিতা বিভাগে ফিরে আসছে, সুতরাং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারটি কে পান দেখা যাক।

সেরা নায়ক হবার দাবী নিয়ে অবশ্য আরও দুজন শিল্পী আছেন। দুজনের কাজেই আন্তরিকতার ছাপ পাওয়া যায়। প্রথমজন হচ্ছেন পশ্চিম জার্মানীর ছবি 'দি ব্রুটালাইজেশন অফ ফ্রানজ ব্লুম' (বাইন হার্ড হফ্)-এর নায়ক জুর্জেন প্রোকনার্ড। ব্যাঙ্ক ডাকাতির অপরাধে জেলে গিয়ে ফ্রানজ ব্লুম সহবন্দীদের মাঝে একজন হাসি-খুশী প্রাণখোলা প্রিয় মানুষ হিসাবে স্থান পায়। সহবন্দীদের মন থেকে জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলোকে সরিয়ে সবাইকে জীবন্ত করে তোলে সে। পারস্পরিক হানাহানির জায়গায় ফ্রানজ ব্লুম সকলের মধ্যে এনে দেয় বন্ধুত্ব প্রেম প্রীতি। সৎ চরিত্রের মানুষ ছিল বলে সে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মুক্তি পেয়ে যায়। তারই আদর্শে তখন অন্যান্যরা এগিয়ে চলে। পরিচালক হফ্ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন বন্দীজীবনকে। (জনান্তিকে শুনেছি এ ছবি নাকি সেরা ছবির পুরস্কারও পেতে পারে)। ফ্রানজ ব্লুমের ভূমিকায় শিল্পীর অভিনয় চমৎকার।

স্পেনের ছবি 'আই স হার ফার্স্ট' (ফারনান্দো ফারনান গোমেজ) কৌতুক চরিত্রের হলেও নায়ক শিল্পী ম্যানুয়েল সার্মাস দারুন কাজ করেছেন। ছোটবেলার খেলার সাথীকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে না পেয়ে নায়ক মর্মাহত। তার আচার-আচরণ শিশুসুলভ ছোটদের খেলনা ইত্যাদি দিয়ে সবাই তাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু ভোলে না সে প্রায় প্রতি রাত্রেই সে চলে যায় সঙ্গিনীর শোবার ঘরে। স্বামী স্বভাবতই রেগে যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাকে অ্যাসাইলামে পাঠাতে হয়। কিন্তু অন্যদিকে তখন নায়িকা আবার নায়ককে দেখতে না পেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। দুজনেই শেষ পর্যন্ত অ্যাসাইলামে যায়। শ্রীগোমেজ সারা ছবিতেই কৌতুকের মেজাজটা জমিয়ে রেখেছেন। হাবাগোবা নায়ক রিকার্দোর চরিত্রে সার্মাসের অভিনয় দারুণ।

সেরা ছবি হিসাবে কোনটি পুরস্কার পাবে তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। কারণ চব্বিশখানা ছবির মধ্যে ভালো ছবি বোধহয় বলা যাবে মাত্র ব্রাজিলের 'আলমা' (জেলিটো ভিয়ানা) বেলজিয়ামের 'উইল ও দি উইসপ্' (ফ্রানস বায়েন্স) ফ্রান্সের 'এম্পটি চেয়ার' ইউ-কের 'স্টারডাস্ট' (মাইকেল অ্যাপটেড), ভারতের 'কাড্ডু' (গিরিশ কারনাড), পোল্যান্ডের 'কিউরিও লেক' (জান বাতোরি) ইউ এস এর রাইভ্যালস (কুক শাহ) ও 'দি ওয়ে উই ওয়্যার (সিডনী পোলক) ছবি কখানিকে।

ব্যক্তিগত মতে 'রাইভ্যালস' ছবিখানি খুব মনযোগ দিয়ে দেখার মত। দশ বারো বছরের কিশোর জেমি স্বাভাবিক ছেলেদের তুলনায় একটু বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন। বাবার মৃত্যুর পর মা ক্যাথরিনের ওপর তার আকর্ষণ

ইদিপাস কমপ্লেকসের মত। বিধবা মা যখন পিটার নামে একজন ভদ্রলোকের প্রতি আসক্ত হন তখনই মানসিক বিরোধ বাধে পিটার আর জেমির। মাকে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে দেখতে সে নারাজ। স্ত্রী পুরুষ সম্পর্কের জৈবিক ও মানসিক দিকগুলো সম্পর্কে তার চিন্তা বয়স্ক লোকদের মতই। একদিন তার বোন সিটার যখন তাকে প্রথম যৌবনের স্বাদ এনে দেয় তখনই সে যেন পুরোপুরি মানুষ হয়ে ওঠে। পিটারের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখন মুখোমুখি হয়। জেমিকে হস্টেলে পাঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা বানচাল করে পিটার ও মাকেই সে পুড়িয়ে হত্যা করে। পরিচালনার গুণে ছবিখানি আকর্ষণীয়। চরিত্রগুলির মানসিক জটিলতা কনফ্রনটেশন—বিশ্লেষণ সুন্দরভাবে করেছেন তিনি। রংয়ের ব্যবহারও তাঁর চিন্তার পরিচয় দেয়। সারা ছবি জুড়ে এক ধরণের কাব্যিক সুষমা ছড়িয়ে আছে যেন।

ব্রাজিলের 'আলমা' একজন বেশ্যার জীবনের প্রেম ও হীনতা নিয়ে তৈরী। নীরবে যে লোকটি সারাটা জীবন তাকে ভালবেসে ছিল তার কাছে না গিয়ে আলমা কষ্ট পেল নিজেকে নষ্ট করল—প্রেমিক জোয়া দা কোমোও আত্মহত্যা ছাড়া কিছু করতে পারল না। প্রকাশভঙ্গির ঔৎকর্ষে ও বক্তব্যের গভীরতায় ছবিখানি মনে রাখার মত। নায়িকা চরিত্রে ইসাবেল রিবেয়েরোর মরমী অভিনয় ছবির অন্যতম আকর্ষণও বটে। ইংল্যান্ডের ছবি স্টারডাস্ট'র গল্প একজন পপ গায়কের উত্থান-পতন ভালবাসা-বন্ধুত্ব এবং সর্বোপরি অতীতের বিবাহিত জীবন ও যন্ত্রণা নিয়ে। পাঁচ বন্ধু মিলে 'স্প্লিট ক্যাটস' নামে পপ গানের একটি দল গড়েছিল জিম। গান গেয়ে পৃথিবী মাতিয়ে দেবে এটাই তার উচ্চাশা: এজন্য সে স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে ছেড়ে দেয়। নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার জন্য সত্যিই একদিন তার দল এবং সে নিজে জনপ্রিয়তা পেল কোটি টাকার মালিক হলো বটে কিন্তু মানসিক শান্তি পেল না। স্পেনের এক পোড়ো বাড়িতে গিয়ে স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করতে হলো তাকে। জীবনের শেষ টি-ভি সাক্ষাৎকারে সে তাই আর স্থির থাকতে পারে নি। অত্যধিক মাদক দ্রব্য গ্রহণ এবং মানসিক কষ্টের দরুণ জিম জনপ্রিয়তার শিরোনাম মাথায় নিয়ে মরে গেল। বিদেশী ছবির কারিগরি কুশলতা সম্পর্কে প্রশংসাবাক্য বলার কোনো প্রয়োজন হয় না। পরিচালক মাইকেল অ্যাপটেড অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে জিমের জীবনকে তুলে ধরেছেন পর্দায়। কোনো অতিরিক্ত দৃশ্য নেই সহজ সরল গল্প বলেছেন তিনি। প্রধান ভূমিকায় ডেভিড এসেকসের কাজ জুরীদের চোখ না এড়াতে পারে।

ভারতের 'কাল্চু' সম্পর্কে আশা যতখানি ছিল সন্তুষ্টি ততখানি আসেনি। পারস্পরিক বিদ্বেষ ও স্বার্থ কিভাবে দুটো গ্রামকে নষ্ট করল সেটাই দেখাতে চেয়েছেন পরিচালক। সুন্দর গ্রামগুলোর এটাও একটা সমস্যা বটে। শহুরে সভ্যতার অনুপ্রবেশ কিভাবে ঘটছে গ্রামগুলোয় এ ছবি তারই একটা প্রামাণিক চিত্র বলা যেতে পারে। দু-গ্রামের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জন্য শহরের পুলিশ এসে গ্রামে ঢুকল—এ দৃশ্যের মাধ্যমেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন শহুরে সভ্যতার। পরিচালনার কাজে গিরিশ কার্নাড নিঃসন্দেহে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাচ্চা ছেলে কিট্টির (এই ভূমিকায় শিশু শিল্পীর অভিনয় দারুণ) চোখে গ্রামের বিভিন্ন ঘটনাগুলো তিনি দেখিয়েছেন। শেষ দৃশ্যে রক্তচোষা পাখীর ডাক এবং ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা কিট্টির মুখখানা অনেক কথা বলেছে।

ফ্রান্সের 'এম্পটি চেয়ার' ছবিখানিতে পরিচালকের নীরব ভাষা কাজ করেছে বেশী —বেশ পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে গদ্যকবিতার মত পরিচালক ছবিটিকে আদ্যন্ত সাজিয়েছেন। প্রধান ভূমিকায় মার্টিন শিভালির অভিনয় চরিত্রটিকে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় করেছে। অ্যানি অন্তঃসত্ত্বা একথা জানবার আগেই প্রেমিককে চলে যেতে হয় আফ্রিকায়। সাত আট বছর কোনো খবর নেই। কিশোর সন্তানকে নিয়ে অ্যানি ভুলে থাকে প্রেমিকের কথা। সারাদিন পরিশ্রম করে নিজের চিন্তাকে সে অন্যদিক থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু একদিন অ্যানির সামনে এসে হাজির হয় ম্যাকসিম নামে এক যুবক প্রেমের ডালি নিয়ে। তার প্রেমকে সে গ্রহণ করবে কি করবে না এই দোলায় দুলতে দুলতে অ্যানি একদিন তাকে চিঠিতে জানায় 'সময় চাই কিছুদিন আমাকে ভাবতে দাও' ছবির সমাপ্তি এখানেই এবং পরিচালকও অ্যানির মানসিক দ্বন্দ্বকে একবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডেভিড সস্নেহ চুম্বনে স্বাগত জানাচ্ছেন সাবানা আজমিকে

শশীকাপুর, লোলে ব্রিজিদা, সিমি

এনে ছেড়ে দিয়েছেন। দর্শকের দায়িত্ব উপসংহার টানার।

পোলান্ডের ছবি 'কিউরিও লেক'ও বিষয়বস্তুর অন্তর্লীন দিক থেকে প্রায় একই ধরনের। সৎ বাবা-মার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক যেন আজকাল সারা ইউরোপ জুড়ে এক সংকটের মুখোমুখি। বাবা বা মার একাধিক বিবাহে সন্তানদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে এবারের উৎসবে ছবির সংখ্যা বড় বেশী। পোল্যান্ডের মত সমাজতান্ত্রিক দেশেও এ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। অন্ততঃ এ ছবিখানি সেই কথা বলে। মার্তা ভালবাসে এক যুবককে। চিন্তায় ও চরিত্রে একটু বেশী ভাবপ্রবণ সে। তাই যখন মার্তার মা বিয়ে করে তার প্রেমিকের বাবাকেই তখন সে নিজের প্রেম নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। এবং শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা তাকে জীবনের অন্তিম পর্যায়ে নিয়ে যায়। পরিচালক জান্ বাতোরির প্রকাশভঙ্গীতে অভিনবত্ব তেমন কিছু নেই বটে কিন্তু ছবির গতি ও সুষম দৃশ্য বিন্যাসের জন্য ছবিটিকে ভালো লাগে।

উৎসবের অন্যান্য ছবিগুলোর মধ্যে মজা পাওয়া যায় মিশরের 'গ্র্যান্ড সন' (আতেফ সালেম) ব্রাজিলের 'হাউ টেস্টি ওয়াজ মাই লিটল ফ্রেঞ্চম্যান' নেলসন পেরিয়েরা দাস সান্তোস) বুলগেরিয়ার 'দি কাইণ্ডেস্ট ম্যান আই নো' (লুডমির সারলানঝিয়েভ) জি ত্রি আর'এর 'হাউ ওয়ান নারিশেস এ ডাক্কি' (রোনাল্ড ওহেম) ছবিগুলো দেখে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার 'হোয়ার আর ইউ মাদার' (হাস মানান) শ্রীলংকার 'তিলক তিলকা' (অমরনাথ জয়তিলক) জাপানের 'কোকোরো' (কানেতো সিন্দো) চেকোশ্লোভিকায়ার 'দি গ্রেট ডে এন্ড গ্রেট নাইট (জারোস্লাভ বালিক যুগোশ্লাভিয়ার 'পার্টিজান' মেকসিকোর 'এনকাউন্টার অফ এ লোনলিম্যান' (সার্জিও ওলহিনচ) রুমানিয়া প্রোডিগ্যাল ফাদার' (আন্দ্রেই পেত্রিগিনউ) ছবিগুলো কাউকে কোনভাবে আকর্ষণ করেছে কিনা বলা শক্ত। কারিগরি দক্ষতার কথা ছেড়ে দিলে বক্তব্য বা উপস্থাপন বৈচিত্র্য কোনোটাই যেন চোখে পড়তে চায় না।

উৎসবে ভালো ছবি না আসার অন্যতম কারণ হলো উৎসবের সময়কাল। বছরের শেষ দিকে উৎসব হলে স্বাভাবিক কারণে কোনো দেশের সেরা ছবি আসার সম্ভাবনা কম থাকে। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে বিদেশে এখনও তেমন কোনো নামডাক নেই। এই উৎসবকে যদি নিয়মিত (বাৎসরিক বা দ্বি-বাৎসরিক যাই হোক না কেন) করান যায় তাহলে কোনোদিনই এখানে ভালো ছবির আসার সম্ভাবনা কম।

সোভ (পোল্যান্ড)

আগেও বলেছি প্রতিযোগিতার চাইতে ইনফরমেশন বিভাগের ছবিগুলো অনেক বেশী আকর্ষণীয়। বিদেশের অনেক ভালো ভালো ছবি ছিল এই বিভাগে। উৎসব কর্তৃপক্ষের অযোগ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বহু ছবি আমরা দেখতে পাই নি। এমন কি এখানকার সাংবাদিকরাও দেখতে পাননি। সকাল বিকেল উত্তাক্ত করার পর যেন দয়া করে কর্তৃপক্ষ কিছু ছবি দেখার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাও আবার মূল উৎসবকেন্দ্র থেকে সাত আট মাইল দূরে। যাই হোক ইনফরমেশন বিভাগের ছবিগুলো নিয়ে কলকাতায় ফিরে আলোচনার ইচ্ছে রইল। যে ছবিগুলো দেখেছি। তার মধ্যে আছে 'গড ফাদার' (ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপোলা), 'ফ্লাকওয়ার্ক অরেঞ্জ' (স্ট্যানলি কুব্রিক) 'রেড সান' (মিকলোস জাঁকসো) 'অ্যামারকর্ড' (ফেলিনি) 'মার্ডার ইন দি ওরিয়েন্ট একসপ্রেস' (সিডনী লুমেট) 'এপ এন্ড সুপার এপ (বার্ট হান্সট্রা) 'ডায়রী অফ এ সিনজুকু থিফ' 'দি বম্ব' ডেথ বাই হ্যাঙ্গিং (সব কটি নাগিশা ওশিমার) ওয়ার্কিং ক্লাশ গোজ টু প্যারাডাইস (এলিও পেত্রি জেনিস (জোসেফ স্টার্ক) 'সিদ্ধার্থ' ও ছাপাকুয়া (দুটিই কনরাড রুকসের) হায়ারলিং (অ্যালান ব্রিজেস) অ্যালো ফানশান (পাওলো ও ভিত্তোরিও টাভিয়ানি) চ্যাপলিনের 'মর্ডান টাইমস' সার্কাস মঁসিয়ে ভাদুঁ ফ্রান্সের সিজার এন্ড রোসালি বো ওয়াডার বার্জের এলাভিরা মেডিগান বার্নাড উইকির ফলস ওয়েট ধর এন্ডারসনের সুইডিশ লাভ স্টোরি এবং আরও কিছু। এসব ছবির আলোচনা পরের লেখায়।

এনকাউন্টার অফ এ লোনলিম্যান (মেক্সিকো

উৎসবের টুকিটাকি

সাংবাদিক সম্মেলনে জিনা লোলোব্রিজিদাকে 'ভারতীয় পুরুষদের কেমন লাগছে?' প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন—'মন্দ কি, দেশে ফেরার সময় আশা করি একজনকে নিয়ে যেতে পারব।'

•

'প্যারালাল সিনেমা'র আলোচনাচক্রের দ্বিতীয় দিনে বি আর চোপরার একটি মন্তব্যের প্রতিবাদে কুমার সাহানি, মনি কাউল দিলীপ পদগাঁওকার ও আরও কয়েকজন নবীন পরিচালক-সাংবাদিক হল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এবং ঋত্বিক ঘটককে সভাপতি করে বাইরের মাঠে তারা প্যারালাল সিনেমা সম্পর্কে প্যারালাল আলোচনা শুরু করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করা হয়, মন্ত্রী আই কে গুজরাল সেগুলো নিয়ে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেন।

•

মূল উৎসবকেন্দ্র বিজ্ঞান ভবন। সেখানের অনুষ্ঠান সকাল নটা ও এগারটায়। তারপর একটায় বা দেড়টায় নিয়মিত সাংবাদিক সম্মেলন। কখনও বিজ্ঞান ভবনে, কখনও মাইলখানেক দূরে শাস্ত্রী ভবনে। পরের অনুষ্ঠান মহারাষ্ট্র রঙ্গায়নে বেলা তিনটেয়। দূরত্ব বিজ্ঞান ভবন থেকে মাইল পাঁচ-ছয়। ওখানে পর পর তিনটে শো। কখনও কখনও আবার এরই ফাঁকে সাংবাদিক সম্মেলন বিজ্ঞান ভবনে। অথচ সাংবাদিকদের যাতায়াতের বন্দোবস্ত করেন নি উৎসব কর্তৃপক্ষ।

•

সাংবাদিক সম্মেলনে বুলগেরিয়ান অভিনেত্রী নেভানা কোকোনোভাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন—'আপনাদের ছবিগুলো কি প্রচারধর্মী নয়?' উত্তরে কোকোনোভার

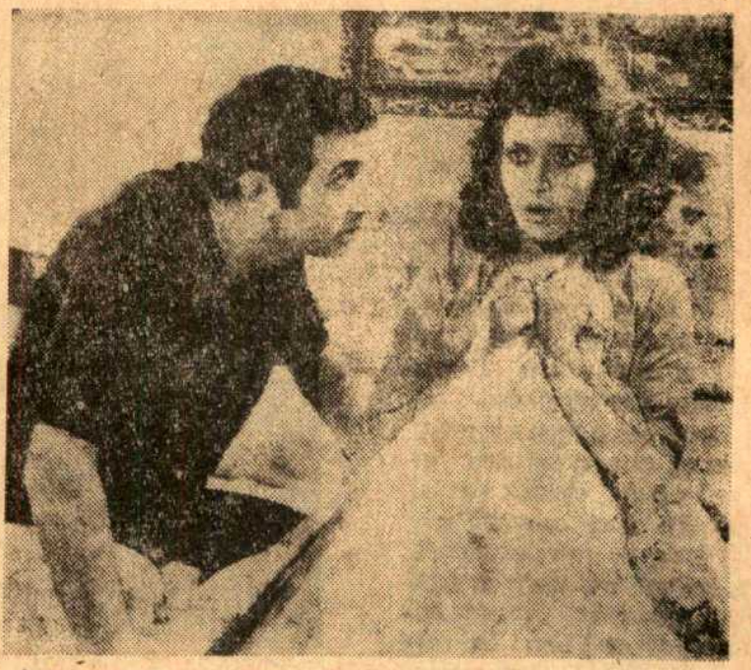

গ্র্যান্ড সন (মিশর)

জবাব ছিল—'সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে তুলে ধরাটাকে আমরা প্রচার বলে মনে করি না। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবন তো ঐ আদর্শেই গড়া।'

×

'রুক ওয়ার্ক অরেঞ্জ' ও চাইল্ডস প্লে' দুখানা ছবিই ইউ-এস-এ পাঠিয়েছিল ইনফরমেশন বিভাগে। কিন্তু স্ক্রিনিং কমিটি দুটো ছবিকেই বাতিল করতে চেয়েছিলেন। কারণ উত্তেজক দৃশ্যাবলী। শেষ পর্যন্ত আই কে গুজরালের হস্তক্ষেপে 'রুক ওয়ার্ক অরেঞ্জ' তালিকাভুক্ত হলেও 'চাইল্ডস প্লে'কে দেখানো হয় নি।

•

যৌন শিক্ষামূলক ছবি ইউ-কোর 'দি বডি' ছবিখানি শরীরের বিভিন্ন যান্ত্রিক কারিকুরিকে বীভৎস ও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। ছবিখানি ব্রিটিশ সেন্সার বোর্ডের সার্টিফিকেট পেয়েছে 'একস' ক্যাটিগরিতে। (অর্থাৎ এ ছবি শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কের জন্য)। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের যৌন বিজ্ঞানের সব কিছুই তো জানা। তার জন্য আর এই 'বর্ণপরিচয়' কেন?

•

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক কনরাড রুকস বলেছিলেন—'সিদ্ধার্থ' আমি করেছি বিদেশী দর্শকদের জন্য।' একটু বাদে উৎসব পরিচালক শ্রীমুরারীকে একজন সাংবাদিক পাল্টা প্রশ্ন করেন—'তাহলে এ ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নির্বাচিত হলো কেন?' কিছু সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নি তাঁর কাছ থেকে।

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

নিহত ব্যক্তি মরবার আগে রক্তমাখা হাতে হত্যাকারীর জামা খামছে ধরেছিল—তাই হাতের রক্ত জামায় লেগে যায়। হত্যাকারী তখন নিহত ব্যক্তিরই একটি সার্ট টেনে নিয়ে গায়ে দিল—পুড়িয়ে দিল নিজের রক্তমাখা জামাটা। নিহত ব্যক্তির সার্টের বোতামগুলিও ফেলে দিল ফায়ার প্লেসে।

কিন্তু কে সেই ব্যক্তি যে নিহত ব্যক্তি হোটেলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সবার চোখের সামনে দিয়েই অথচ সকলেরই অজান্তে (!) ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, চুপিসারে খুন করে সার্ট আর বো-টাই এঁটে পালিয়ে যায় ঘর থেকে? সার্ট আর বো-টাই না হলে কি তার একেবারেই চলত না? বিশেষ করে বো-টাই ছাড়াও তো পথচলা যায়। কিন্তু বো-টাই পরতে গেল কেন? যাতে কারো সন্দেহ না হয়, সেই জন্যেই কী? হোটেলের মধ্যে বো-টাই গলায় থাকলে কারো সন্দেহ তো হবেই না—বরং খুব স্বাভাবিক মনে হবে বলেই কী?

হোটেল ম্যানেজার উইলিয়ামসের গায়েতেও সাদা সার্ট, গলায় কালো বো-টাই। ম্যানেজারের রোজকার পোশাক—এ হোটেলে এই পোশাকই পরতে হয় ম্যানেজারকে।

বাবার কানে সেই ফুসমন্তরই দিয়ে এসেছিলেন এলারি কুঈন। ফলে, গা থেকে সার্ট খুলে নিয়ে পরীক্ষা করতেই পাওয়া গেল আফ্রিকান দরজির লেবেল। তারপর তিন মিনিটও গেল না, গুঁতোর চোটে স্বীকার করল উইলিয়ামস তার কুকীর্তি। তারই প্রাণাধিকা বউকে এককালে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে পালিয়েছিল পাষণ্ড লোকটা। তাই প্রথম সুযোগেই—।

মিঠু মুখোপাধ্যায় । ফটো : অমৃত

যেখান থেকে বলছি

রঞ্জন, ব্যারিস্টার আর এন মজুমদারের অগাধ পয়সার একমাত্র উত্তরাধিকারী। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছে। বাবা আর বিধবা পিসিমার স্নেহ ভালবাসায় গড়ে উঠেছে তার জীবন। স্ফূর্তি আর আনন্দই তার জীবন। জীবন অর্থে সে এই বোঝে। অভাববোধের অনুভূতিহীন। সে ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত। কবিতা, বুলা শম্পা আরো অনেককে নিয়ে কাটে সকাল, দুপুর বিকেল সন্ধ্যে। আর আছে মনীষা। ওর প্রতিটি রাতের সঙ্গী। অনেকগুলো সুন্দর মুহূর্তের একমাত্র সাথী।

সি এ ফার্মে আর্টিকেল হিসেবে কাজ করে রঞ্জন। বাবার কুখ্যাত ফার্ম। কাজ করার আগ্রহ কিম্বা উৎসাহ কোনটাই নেই। কাজ করতে হয় বাবার রক্তচক্ষুর কথা মনে করে। যোগ্যতা থাকলেও পরীক্ষা দিতে, পাশ করতে ওর ভয়। কারণ বাবা একটা ফার্ম খুলে বসিয়ে দেবে। একটা ফার্ম সামলানো কি আর চাট্টিখানি ব্যাপার। ফার্মের কাজে সময় চলে গেলে ওদের কি হবে। কবিতা, বুলা, শম্পা—ওদের কি হবে। অসম্ভব, একদম অসম্ভব।

মেয়েদের নিয়ে শুধু খেলা নয়, এখন রঞ্জনের মন যেন আরো কিছু চায়। অচেনা, অজানা মেয়ের ডাককেও সে উপেক্ষা করে না। টেলিফোনে কোনো নারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলে রঞ্জনের কাছ থেকে তার ছাড়া নেই। সেদিন থেকেই সে ওর পরিচিতা হয়ে যায়। কারণ রঞ্জনের আকর্ষণীয় কথা বলার ভঙ্গী। সব মেয়েই ওর কাছে প্রিয়। শুধু মনীষা অনেক বেশী কিছু—সবার চাইতে বেশী।

হঠাৎ অপর্ণা আসে ওর কাছে। কাছাকাছি। এই অপর্ণাকে ঘিরে যখন রঞ্জনের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে অকস্মাৎ তরুণদার আবির্ভাব। তরুণদা, অপর্ণার কাছ থেকে ফিরে এসেছে। অনেক ব্যথা আর হতাশা নিয়ে। তাই বোধহয় তরুণদা, রঞ্জনকে সাবধান বাণী শোনায়। সে নাকি অপর্ণার কাছে ওয়ান ডাউন। অতঃপর রঞ্জন সেভেন ডাউন পর্যন্ত বিফল প্রেমিকদের দেখা পায়। রঞ্জনও পাকা খেলোয়াড়। সেও সরে আসবার পাত্র নয়। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

খেলা শুরু হয়। বড় ব্যবসায়ী মিঃ দত্তর বাড়ি থেকে যে খেলোয়াড়ের দেখা পেয়েছে অপর্ণা—সে এখন তার টারগেট। অর্থকরী দিক থেকে দত্তর চেয়ে রঞ্জন বড়। এবং এজন্য অপর্ণা ছুটে এসেছে। রঞ্জন সেটা আগেভাগেই টের পেয়েছিল। মনে মনে সে হাসে। অপর্ণার সঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, প্রেমের গল্প করতে করতে সারাটা দিন কেটে যায়। বেশ ভালই লাগে। এই নতুন খেলায় অপর্ণা এবং রঞ্জন —উভয়েই যেন বড় বেশী একাত্ম হয়ে পড়েছে। অপর্ণা বুঝতে পারছে রঞ্জনকে নিয়ে ঠিক সেইভাবে খেলা চলে না। রঞ্জনও ভাবছে একই রকম। একদিন উন্মুক্ত আকাশের নীচে ওদের [illegible] মন দেয়া নেয়া হয়। অপর্ণা তার মনের ওজাড়

সুপ্রিয়া দেবী । ফটো ঃ অমৃত

ভরে দেয় গানে গানে ঃ এখন এমন বৃষ্টি নামার মত, যখন তখন—

তোমার মনকে ছুঁয়ে যেতে পারে—
যা কিছু আমার আছে
তার চেয়ে বেশী আমি
তোমাকে দিয়ে যেতে পারি
শুধু আকাশ হতে তুমি বোলো না
আমায়।।

রঞ্জনের মতো পাকা খেলোয়াড় চ্যালেঞ্জের কথা ভুলে যায়। মনের মধ্যে অপর্ণার জন্য একটা জায়গা করে দিতে হয়। কিন্তু মনীষা? তার জন্য একটা জায়গা নিশ্চয়ই আছে। রঞ্জন আর সবাইকে সরিয়ে দিতে পারলেও মনীষাকে পারে না। এদিকে তরুণদার দৃষ্টি অপর্ণার পিছু পিছু রয়েছে ছায়ার মত। সে একদা হাজির হয় রঞ্জনের বাড়িতে। ধিক্কার দেয়। রঞ্জন ধিককার সহ্য করতে পারে না। নিজেকে অপমানিত বোধ করে। তার সারা শরীর যেন জ্বলতে থাকে। বদ্ধ-পরিকর হয়—অপর্ণার মতো একটা মেয়েকে সে ঠকাতে পারে না? পারতেই হবে।

অপর্ণা দরজা খুলে চমকে ওঠে। বিধ্বস্ত রঞ্জন ওর সামনে দাঁড়িয়ে। বলে, এতবড় পৃথিবীতে আমি একা। বাবা, পিসিমা এরা কেউ আমার আপন নন। মানুষ করেছেন শুধু। আমি আজ পরিচয়-হীন কপর্দকশূন্য। যার এ পৃথিবীতে কোনো ঠাঁই নেই অথচ মরণেও কোনো অধিকার নেই—

অপর্ণার হাত রঞ্জনের বাক্য স্রোত রুদ্ধ করে। গভীরতর ভালবাসার যেন এই স্পর্শ। অপর্ণা তার সারা জীবনের সঞ্চয় বিরাট এক গহনার বাক্স এনে তুলে দেয় রঞ্জনের হাতে। বলে তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে বড় হতে হবে। আবার আগের মঞ্চে.....

বাড়ি ফিরে এসে খাটের ওপর সমস্ত গয়না ছড়িয়ে দিয়ে রঞ্জন পাগলের মতো হাসতে থাকে। আর কিছু নয় সে অপর্ণাকে হারিয়ে দিয়েছে। রঞ্জনের হাসি চার দেওয়ালে প্রতিধ্বনি করে। বলা বাহুল্য স্টুডিও ফ্লোর —শিল্পনির্দেশক সূর্য চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে নিখুঁত নির্মিত একটি সেট। ক্যামেরা তখন ক্রেন-এ। ধীরে ধীরে নেমে আসে। ক্যামেরাম্যান দীপক দাশ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দৃশ্যটি ধরে রাখেন। শটটি শেষ হলেও সমিত ভঞ্জ অর্থাৎ রঞ্জন—দৃশ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। রঞ্জন যে ভাবে ভারসাম্য হারিয়েছে ঠিক সেই ভাবে সমিত। বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হলে কাহিনীকার-পরিচালক অমল রায় ঘটক এই ছবি 'রং নাম্বার'-এর পরবর্তী শটের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন।

অঞ্জন মুখোপাধ্যায় কৃত চিত্রনাট্যে এ ছবির অপর্ণা চরিত্র রূপায়িত করছেন নন্দিতা বসু। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন—তরুণকুমার হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মা দেবী মলিনা দেবী এবং নবাগত ননী চৌধুরী। গান হবে এ ছবির অন্যতম সম্পদ। নবাগত সংগীতপরিচালক ঃ দিলীপ ভট্টাচার্য। গীতিকার ঃ দিলীপ গুহ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় আছেন প্রশান্ত পাট্টাদার।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে ফালিক গোষ্ঠীর পরিচালনায় 'স্লো ফকস ক্যাবারে' ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কৌটিল্য গুপ্তের কাহিনীতে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর চিত্রনাট্যে উত্তমকুমার এ ছবির নায়ক কৃষ্ণেন্দু কার্লেকার এক মহারাষ্ট্র-যুবক। সবাই তাকে সংক্ষেপে ডাকেন কে কে। এই চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে উত্তমকুমার কতকগুলি বিশেষত্ব আরোপ করেছেন। মহারাষ্ট্রের এক যুবককে রীতিমত স্টাডি করেছেন। চরিত্রসৃষ্টিতে উত্তমকুমার অদ্বিতীয়। বর্তমানে তিনি রোমান্টিক নায়ক হবার চেয়ে দুরূহ জটিল চরিত্র পছন্দ করছেন। যে চরিত্রে অভিনয় করতে মজা আছে। চরিত্রের উত্থান পতন না থাকলে সেটা কখনই সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য দু' তিনটি চরিত্র। 'সেই চোখ' ছবিতে উত্তমকুমার রূপায়িত করছেন মোটামুটি একটি কমেডি চরিত্র। 'বাঘবন্দী' ছবিতে আসলে ভিলেন। 'সন্ন্যাসী রাজা' ছবিতে নায়ক হলেও চরিত্রের মধ্যে অনেক জটিল ব্যাপার। চরিত্রটি আগাগোড়া রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা। একটু একটু করে উন্মোচিত হবে।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

স্টুডিও সংবাদ

এ মাসেই পরিচালক স্বদেশ সরকার সদলবলে বিহারের শিমুলতলা অভিমুখে রওনা হচ্ছেন। ছবি ঃ 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ'। একটানা পনেরোদিন ধরে বহির্দৃশ্য গ্রহণ চলবে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী। ছবির তিন প্রধান চরিত্রের শিল্পী ঃ দীপঙ্কর দে, সন্ধ্যা রায় এবং আরতি ভট্টাচার্য। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন ঃ অনুপকুমার, রবি ঘোষ এবং চিন্ময় রায়। চিত্রগ্রাহক ঃ কৃষ্ণ চক্রবর্তী। শিল্পনির্দেশনায় আছেন ঃ সূর্য চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালক ঃ মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবীণ পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন। ও ছবিতে রোহিনীর ভূমিকায় রূপদান করেছেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। বিপরীতে খুব সম্ভবত দীপঙ্কর দে।

এক মাসেরও বেশী একটানা সুটিং হল 'সংসার সীমান্তে' ছবির। নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওর প্রাঙ্গণ জুড়ে সেট ফেলা হয়েছিল। মোটামুটি একই সেটে কাজ হয়েছে। পরিচালক তরুণ মজুমদার। প্রধান দুটি চরিত্র রূপায়িত করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন শর্মিতা বিশ্বাস পলিন চ্যাটার্জি সুলতা চৌধুরী শেলী পাল, অনামিকা সাহা, গীতা কর্মকার সুলেখা রায় সীতা মুখোপাধ্যায়, তপতী সেন, শিউলি মুখোপাধ্যায়, শিবানী বসু রত্না ঘোষাল প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণ করেছেন ঃ কে এ রেজা। শিল্পনির্দেশক ঃ রবি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক ঃ রমেশ যোশী। এই পর্যায়ের শুটিং-এর সঙ্গে সঙ্গে ছবির শুটিং শেষ হয়ে এসেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা নিয়ে একটি ছবির কাজ শুরু হয়েছে এবং অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। ছবির নাম, 'বালক শরৎচন্দ্র'। রাজকুমার রায়চৌধুরীর চিত্রনাট্যে ছবিখানি পরিচালনা করছেন জয়ন্ত সাহা। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই নতুন মুখ। প্রযোজক ঃ ক্যাপ্টেন ঘোষ।

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর আগামী ছবি 'অজস্র ধন্যবাদ'-এর শুটিং শুরু করতে চলেছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে কুশাল মুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্যে এ-ছবি নির্মিত হচ্ছে। নায়ক ঃ শৈলেন্দ্র সিং, 'ববি' ছবিতে গান গেয়ে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন, আসলে পুণা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের অ্যাকটিং কোর্সেরই ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। নায়িকা ঃ মহুয়া রায়চৌধুরী। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন ঃ উৎপল দত্ত, বম্বের জালাল আগা এবং অলকা। প্রযোজক ঃ ও পি সিং। এ-ছবিতে শৈলেন্দ্র শুধু অভিনয়ই করবেন না, গানও গাইবেন সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্রের সুরে।

পরিচালক দীনেন গুপ্ত পর পর কয়েকটি নতুন ছবির পরিকল্পনা করছেন। তার মধ্যে একটি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'নিশিমৃগয়া'। এ-ছবির প্রধান নারী-চরিত্রের শিল্পী কে? শোনা যাচ্ছে সুচিত্রা সেন। নায়ক ঃ রঞ্জিত মল্লিক। এছাড়া বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্রে ঃ অনিল চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত এবং বসন্ত চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ করবেন পরিচালক স্বয়ং। শিল্পনির্দেশক ঃ সূর্য চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যকার ঃ কুণাল মুখোপাধ্যায়।

নগর দর্পণ
নান্দতা বসু/কৌশিক বসু

আয়না/রাজেশ খান্না/মমতাজ

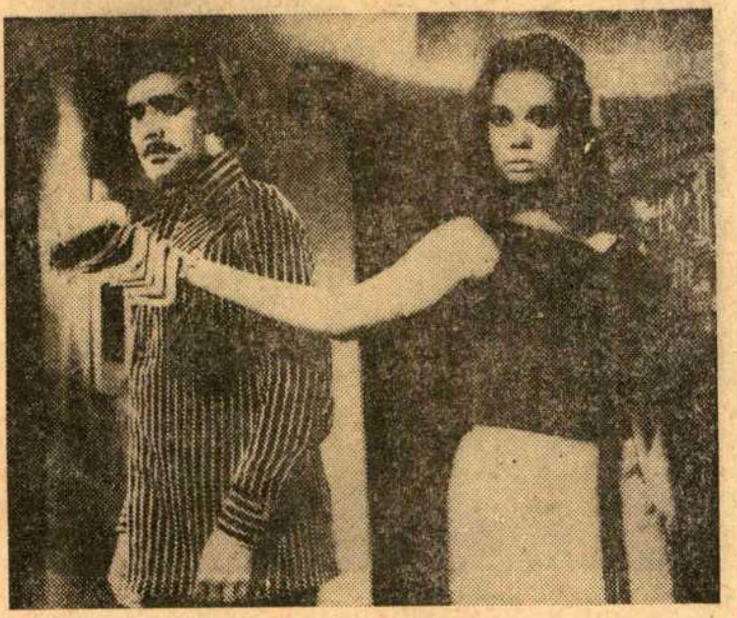

বাঘব-দী/সুপ্রিয়া দেবী/পার্থ

সাধনা সরকার পরিচালিত **ফুলু ঠাকুমা**
বঙ্কিম ঘোষ/চিন্ময় রায়/জয়শ্রী রায়

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

গুপ্তজ্ঞানের পর বম্বেতে এখন বেশ কয়েকটি 'সেকস এডুকেশান্ ফিল্ম' নামে নতুন ছবি তৈরি হচ্ছে। যাতে সেকস এডুকেশান তো হবে না হবে শুধু ধরনের ভেলপুরী। সেখানে গল্প থাকবে, প্রেম থাকবে আর থাকবে রীতিমত সুড়সুড়ি। প্রযোজক আই এম কুন্নু তাঁর নতুন ছবি 'কামশাস্ত্র'-তে এই ধরনের মালমশলা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। চিত্রনাট্য তৈরি। শিল্পী নির্বাচনের বেলায় গোল বেধেছে। ছবির নায়ক মনোনীত হলেন রমেশ অরোরা। রমেশ পুরো চিত্রনাট্য পড়ে সই করতে চাইলেন না। কারণ 'সেকস এডুকেশান' কোথায়? এখানে তো সস্তা দরের কিছু করার চেষ্টা হচ্ছে। আর্গেস্টলি যদি 'সেকস এডুকেশনাল' ছবি করতে হয়, তাহলে রমেশ অভিনয় করতে পারেন। শুনে তো প্রযোজকের চক্ষুস্থির। প্রযোজকের ধারণা ছিল টাকা দিলে নতুন ছেলেমেয়েরা যা করতে বলবেন তাই করে দেবে। কিন্তু না, রমেশ অরোরা তাঁর সেই ভুল ভেঙ্গে দিলেন। ফলে চিত্রনাট্য আমূল পরিবর্তিত হল। রমেশ পেলেন এক ডাক্তারের চরিত্র। এই ডাক্তারের লেকচারের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা ভিসুয়ালাইজ করতে পারবেন।

ধর্মেন্দ্র আর হেমা মালিনীর প্রেম এখন বম্বের প্রায় সকলেরই আলোচনার বিষয়-বস্তু। রামানন্দ সাগরের 'চরস' ছবির জন্য বিদেশে আউটডোরে গিয়ে ওরা প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে। বম্বে এসেও তার রেশ কাটেনি। বিদেশী কাগজপত্রেও ধর্মেন্দ্র আর হেমা নিয়ে বেশ রসাল নিবন্ধ লেখা হয়েছে। শোনা যায়, সারাদিনের শুটিং শেষ হলেই ধর্মেন্দ্র আর হেমা বেরিয়ে পড়ত শহর দেখতে। ওখানে ওদের বিশেষ কেউ চেনে না। ফলে সুবিধেই হয়েছিল। ওরা এদিক-সেদিক ঘুরে অনেকদিন এমনও হয়েছে ক্যাম্পে ফেরেনি। পরদিন শুটিং করতে অনেক দেরী হয়েছে। তার জন্য ধর্মেন্দ্র এবং হেমা দুজনেই খুব লজ্জা প্রকাশ করেছে। রামানন্দ সাগর শুটিং সিডিউল কমপ্লিট করার কথা ভেবেই হয়তো সবকিছু বেশ হেসে হেসে ম্যানেজ করে নিয়েছেন। বম্বেতে ফিরে তিনি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ঘনিষ্ঠ মহলে জানালে ধর্মেন্দ্র হেমা দুজনেই ভীষন ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এবং এখন প্রায় প্রকাশ্যেই প্রেম করা শুরু করে দিয়েছেন। ধর্মেন্দ্র এই ব্যাপারে সাংবাদিকদের কিছুই বলছেন না। কিছু জিগ্যেস করলে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছেন। হেমা তো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাই বলছেন না। সম্প্রতি গুলজারের 'খুশবু' ছবির আউটডোরে একদল সাংবাদিক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে নায়ক : জীতেন্দ্র। নায়িকা : হেমা মালিনী। হেমা তো জীবশাপণ করেছেন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন না। অনেক কষ্টে জীতেন্দ্র রাজী করালে হেমা সুন্দর হেসে একটা কথাই বলেছেন : 'আপনারা সব বানিয়ে লেখা বন্ধ করুন' প্রত্যুত্তরে একজন সাংবাদিক বলেন : 'ধর্মেন্দ্র'-র সঙ্গে রোমান্স একটু কম করুন ম্যাডাম।' রাগে লাল হয়ে হেমা শুটিং স্পট ত্যাগ করলে প্রযোজক প্রসেন কাপুর এবং পরিচালক গুলজার ভয়ানক অসন্তুষ্ট হন। সেদিনের মত শুটিং বন্ধ করে দেন। হেমা পরের দিন অবশ্য নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং শুটিং-এ যোগ-দান করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে হাসি-গল্প জমে যান। উপস্থিত সাংবাদিকরা একের পর এক সব আকাশ থেকে পড়তে শুরু করেন। বলেন : একি কান্ড! সূর্য কি পশ্চিম থেকে উঠল নাকি!

—অভিজিত

মৌচাক

প্রযোজনা : পিয়ালী পিকচার্স
সকলের জন্যে একটি আনন্দদায়ক হাসির ছবি ! !

মৌচাক : উত্তমকুমার

নীতিশ ও সীতেশ দুই ভাই, ভাই ভাইয়ে এত মিল আজকাল দেখা যায় না। সীতেশের বোদ্দি ছোটবেলা থেকে, ওকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছেন। ঘটনাচক্রে ওকে কলকাতা থেকে সত্তর মাইল দূরের এক জুট ফ্যাকটরীতে এক ওভারসিয়ারের চাকুরী নিতে হয়। চাকুরীস্থলে থাকবার কোন ব্যবস্থা নেই, কলকাতা থেকেও ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকুরীস্থলে সময় মতো পৌঁছান সম্ভব নয়। নীতিশের বাল্যবন্ধু মিষ্টার চৌধুরীর উপরেই সব ভরসা। উনি সীতেশের পরিচয় পেয়ে, সাগ্রহে লাঞ্চে নেমন্তণ করলেন ওকে এবং বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে একমাত্র কন্যারত্ন এবং স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সীতেশ প্রথম দিনই বুঝতে পারলেন, চাকুরীর সুবিধা নিয়ে মিষ্টার চৌধুরী ওকে জামাই হিসাবে পেতে চান। ফ্যাকটরীর বড়বাবু থেকে শুরু করে অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু করে দেয় সীতেশকে জামাই করবার জন্যে।

এদিকে সীতেশ যে বাড়ীতে ভাড়া থাকে, তার পাশের বাড়ীর এক মাস্টার মশায়ের মেয়েকে ভালবাসে। নীপাও সুন্দর তরুণ সীতেশের প্রেমে পড়েছে। চৌধুরীর মেয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নীতিশকে অনেক চাল চালতে হয়। আর এর ফলে নীপা ও সীতেশের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হলেও, দাদা ও বৌদির চেষ্টায় নীপার সঙ্গে সীতেশের বিবাহ হয় অর্থাৎ মধুরেণ সমাপয়েৎ।

অভিনয়ে নীতিশের ভূমিকায়—উত্তমকুমার একাই একশো। সীতেশের ভূমিকায় রঞ্জিৎ মল্লিক এবং বৌদির ভূমিকায় সাবিত্রী চাটার্জী সুন্দর অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায়—নীপা—মিঠু মুখার্জি, মিষ্টার চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, চৌধুরীর আদরিণী কন্যার ভূমিকায় সুলতা চৌধুরী এবং অনুপকুমার, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় রত্না ঘোষাল, চিন্ময় রায়, রবি ঘোষ, তরুণকুমার তপতী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গীতা দে, অমরনাথ-এর অভিনয় যথাযথ। সংগীত পরিচালনায় নচিকেতা ঘোষ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আলোকচিত্র গ্রহণ এবং কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সম্পাদনা দুর্বল। পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জি ছবিটিকে বকস অফিসে সাফল্য লাভ করবার জন্যে জনপ্রিয় লেখকের (সমরেশ বসু) রম্যণীয় ছবি করেছেন। হাসির ছবি হলেও নিজের মন থেকে আসেনি, কাতুকুতু দিয়ে জোর করে হাসানো হয়।

—চিত্রদূত

শ্রেষ্ঠ পরিচালক
সত্যজিৎ রায়

শ্রেষ্ঠ সংগীতপরিচালক
পূর্ণেন্দু পত্রী

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
উত্তমকুমার

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
অপর্ণা সেন

এবারের রাজ্য সরকারী পুরস্কার

গত বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবিগুলির মধ্য থেকে রাজ্য পুরস্কার কমিটি সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা ছবিটিকে বছরের সেরা ছবি হিসাবে পুরস্কৃত করেছেন। শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে ছেঁড়া তমসুক ও যদুবংশ। সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন সত্যজিৎ রায়। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন উত্তমকুমার (অমানুষ) ও অপর্ণা সেন (সুজাতা)। সেরা সঙ্গীত-পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী (ছেঁড়া তমসুক), সেরা চিত্রগ্রাহক (সাদা কালো) — শক্তি ব্যানার্জি (ছেঁড়া তমসুক)। সেরা চিত্র-গ্রাহক (রঙীন) সৌমেন্দু রায় (সোনার কেল্লা)। সেরা সহ-অভিনেতা — ধৃতিমান চ্যাটার্জি (যদুবংশ), সেরা সহ-অভিনেত্রী— সুমিত্রা মুখার্জি (সুজাতা), সেরা কৌতুক অভিনেতা—রবি ঘোষ (সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা), সেরা শিশুশিল্পী—কুশল চক্রবর্তী (সোনার কেল্লা)।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী
সুমিত্রা মুখার্জি

নাট্যমঞ্চ

ভোলা ময়রা

নাটক : কবি কঙ্কন। প্রযোজনা : শান্তি ব্যানার্জি। পরিচালনা : মহেন্দ্র গুপ্ত। অভিনয়ে : ভোলা ময়রা—তারা ভট্টাচার্য। এন্টনী — পঙ্কজ চ্যাটার্জি। মৃত্যুঞ্জয়—অজয় গাঙ্গুলী। জটিরাম—কালীপদ চক্রবর্তী। পালিত পুত্র—মাঃ জমিদার। মনমোহিনী — গীতশ্রী দেবী। শ্যামমোহিনী—লতিকা দাশগুপ্তা। গুণবতী—জ্যোৎস্না বিশ্বাস। তাছাড়া আলপনা রায়, ছন্দা ব্যানার্জি, জি মালাকার বাসুদেব পাল রাখাল চক্রবর্তী প্রভৃতি আরে অনেকে। সঙ্গীত—চণ্ডী বসু।

রামমোহন রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। বিগত ১২ জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখ প্রদর্শনীতে নাটকটি আমরা দেখে এসেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের পল্লি মাটিতে যে সব ক্ষণজন্মা কবিয়ালদের আবির্ভাব হয়েছিল ভোলা ময়রা তাদের মধ্যে অন্যতম। ভোলা ময়রার সমসাময়িক কবিয়ালদের মধ্যে হরু ঠাকুর রাম বসু এন্টনী ফিরিঙ্গী ঠাকুর সিংহ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। হরেকৃষ্ণ দীঘাড়ি বা হরু ঠাকুর ছিলেন ভোলা ময়রার গুরু। ১৭৩৮ খৃস্টাব্দে হরু ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন আর মারা যান ১৮১৩ খৃস্টাব্দে। হরু ঠাকুরের গুরু ছিলেন রঘুনাথ দাস। হরু ঠাকুর প্রথমে অপেশাদার কবিয়াল ছিলেন। সেই সূত্রে মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রাসাদে গান গাইতে এসে মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় দল গঠন করেন। এই দলের পরিচালনা ভার অর্পণ করেন শিষ্য ভোলানাথ বা ভোলা ময়রার ওপর। ভোলানাথ ভনিতায় নিজেকে ভোলানাথ বলে পরিচয় দিতেন—তাতে তার প্রতিপক্ষ নিজের নামের সঙ্গে শিবত্ব আরোপের জন্য ব্যঙ্গ করতেন। ভোলা ময়রা তাদের উত্তরে বলেছিলেন :

আমি সে ভোলানাথ নই—
আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ভোলা ময়রা, হরুর চেলা,
শ্যামবাজারে রই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
তোরা সবাই বিল্বদলে
আমায় পূজা দিলি কই।

ভোলা ময়রা তার অন্যতম প্রতিপক্ষ হিসেবে রাম বসুকে পেয়েছিলেন। রাম বসুও একজন শক্তিমান কবিয়াল ছিলেন। কথিত আছে মাত্র ৫ বছর বয়সে রাম বসু [illegible] শুরু করেন। ১২ বছর বয়সে তার কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ভবানী বেনে নিজ দলে গ্রহণ করেন। নীলু ঠাকুর মোহন সরকারের দলেও ছিলেন রাম বসু। পরে নিজে দল গঠন করেন। ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে মাত্র ৪২ বছর বয়সে ১৮২৮ খৃস্টাব্দে রাম বসু পরলোকগমন করেন। রাম বসু ঠাকুর সিংহ প্রভৃতিরা ভোলা ময়রা এন্টনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতির প্রতিপক্ষ হিসেবে গান করতেন।

আলোচ্য নাটকে ভোলা ময়রার প্রতিপক্ষ হিসেবে মনমোহিনী দেবী ও রাম বসুকে এবং শিষ্য হিসেবে এন্টনী ফিরিঙ্গীকে দেখান হয়েছে। মনমোহিনী দেবী ভোলা ময়রার কাছে পরাজিতা হয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু তাদের কোন সন্তানাদি না হওয়াতে পিতৃমাতৃহীন একটি অনাথ বালককে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করেন। ভোলা ময়রা শ্যামবাজারে থাকতেন। তার মিষ্টির দোকান ছিল। এখানে গুণবতী নামে একজন অসহায়া বিধবা মেয়েকে স্থান দেওয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। নাটকের জন্যই এই ঘটনা আনা হয়েছে। ভোলা ময়রার ব্যক্তি-জীবন সুখের ছিল না। ভোলা ময়রার শিল্পী-জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনকেও তুলে ধরেছেন নাটকার। তাঁর মুন্সীয়ানার প্রশংসা করতে হয়। গানে গানে গানের মধ্য দিয়ে কবিয়াল ভোলা ময়রার জীবননাট্য বাংলা রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্য-প্রতিভা মহেন্দ্র গুপ্ত এমন অপূর্বভাবে রসময় করে তুলে ধরেছেন যে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। অভিনয়ে গানে নাটকীয় সংঘাতে ভোলা ময়রা যে কোন নাট্যামোদীদের অভিভূত করবে। নাম-ভূমিকায় তারা ভট্টাচার্যের উদাত্ত কণ্ঠের মিষ্টি-মধুর সংগীতে অতি সহজেই দর্শক-মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। এন্টনী ফিরিঙ্গী চরিত্রে পঙ্কজ চ্যাটার্জি এবং রাম বসুর চরিত্রের অভিনেতাকেও প্রশংসা করব। তবে সামগ্রিক অভিনয়ের প্রশংসা পঙ্কজ চ্যাটার্জিরই বেশী প্রাপ্য। মনমোহিনীর চরিত্রে গীতশ্রী দেবী নাচে গানে অভিনয়ে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। লতিকা দাশগুপ্তার সুমিষ্ট কণ্ঠও ভাল লাগবে। গুণবতী চরিত্রে নবাগতা জ্যোৎস্না বিশ্বাস প্রশংসনীয়। মাঃ জমিদার অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। কালীপদ চক্রবর্তীর জটি-রাম তার সুকৌতুকের চরিত্রাভিনেতা এবং নবকৃষ্ণ চরিত্রে শান্তি ভট্টাচার্য ও মৃত্যুঞ্জয় চরিত্রে অজয় গাঙ্গুলী প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন

কিছু কিছু শিল্পীর এবং দৃশ্য-পটাদির পরিবর্তন করে ভোলা ময়রা যদি একটু বড় নাট্যগৃহে মঞ্চস্থ করা যায় নিঃসন্দেহে নতুন বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যসম্ভাররূপে কীর্তিত হবে। প্রজাপতির পর ভোলা ময়রার মধ্য দিয়ে নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত নতুন করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন।

—শীলভদ্র

সুরীনার 'জনঅরণ্য'

প্রখ্যাত লেখক শঙ্কর-এর 'জন অরণ্য' বহুল পঠিত উপন্যাস। এর চরিত্র অনেক। তাই একে নাট্যরূপ দেওয়া যেমন কঠিন তেমনি এর চরিত্রচিত্রণও দুরূহ সন্দেহ নেই।

শঙ্করের লেখার মধ্যে সব সময়ই আমরা এমন কিছু পাই যা পাঠককে যুগপৎ ভাবায় এবং মনের গভীরে গিয়ে আঘাত করে। তাঁর প্রত্যেকটা চরিত্রই যেমন আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ, তেমনি তাদের প্রত্যেকের সমস্যাই আমাদের আজকের সমস্যা।

সোমনাথ লেখাপড়া শিখেও বেকার। কিন্তু সে আদর্শবাদী। সে সেই অবকাশ কৈ আমাদের জীবনে? বেকারত্ব যখন তার জীবনে তীব্র আকার ধারণ করেছে তখনও সে সৎ থাকতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারেনি। চাকরীর ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে অন্যের প্ররোচনায় ব্যবসা করতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে দেখেছে আর একটা জগৎকে। যেখানে ভদ্রলোকেরাই ব্যবসার নাম করে অন্যকে নির্বিকারভাবে প্রতারণা করছে। মেয়েমানুষের দালালী করছে।

অন্যদিকে সুকুমারের মত সতেজ ছেলে বাবা রিটায়ার করার পরে চাকরী জোগাড় করতে না পেরে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

বিপরীতে আবার দেখা যায় মাতাল স্বার্থপর স্বামীর হাতে পড়ে স্ত্রীকে দেহদান করতে হচ্ছে টাকার বিনিময়ে পরপুরুষের কাছে।

এরা সব এক একটি চরিত্র যেন আজকের ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরেরই প্রতিচ্ছায়া।

আমরা কোথায় যাচ্ছি। কোন সর্বনাশের হাতছানিতে আমাদের বাঙালী জাতি রসাতলের পথে দ্রুত নেমে যাচ্ছে, শঙ্কর যেন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের। আমরা, আমাদের সমাজ যেন চারিদিকে ক্রমশ পাশবিক চিন্তার দৈন্য দিয়ে ক্রমশ চারদিকে আদিমতার অরণ্যের প্রাচীর গড়ে তুলছে। স্রোতের মুখে

অর্থাৎ জীবনযুদ্ধের জটিল আবর্তে পড়ে আমরা যেন দ্রুত অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়ছি প্রতিটি পর্যায়ে।

শংকরের এই চিন্তা আমাদের ভাবায়, বিভ্রান্ত করে। তাঁর বাঙালীর প্রতি এই মমত্ববোধ এবং তার সমাজ সচেতনতাকে মনে রেখেই নাট্যকার যে এমন দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন এজন্য নাট্যরূপদাতা সমীর ঘোষ আমাদের ধন্যবাদার্হ।

তাঁর নাট্যরূপ সর্বত্র না উৎরালেও এই প্রচেষ্টা বাঙালীকে, তার সমাজকে ভালবাসারই নামান্তর তাতে সন্দেহ নেই।

তবে এ প্রসঙ্গে দু একটি কথা পূর্বাহ্নেই বলে নেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। তা হোল, নাটকে এমন অনেক সংলাপ বা দৃশ্যাংশ সংযুক্ত করা হয়েছে যার খুব একটা প্রয়োজন বোধহয় ছিল না। তাতে নাটকও ভারাক্রান্ত হোত না এবং 'প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য' লেখারও প্রয়োজন ছিল না।

দ্বিতীয়ত এরকম নাটকের ক্ষেত্রে যেটা সর্বপ্রথম প্রয়োজন সেটা হোল বক্তব্য প্রকাশের জন্য সুষ্ঠু সংলাপ। সেটা নাটকে উপস্থিত থেকেও কুশলীদের দুর্বল অভিনয়ের জন্য দর্শকদের মনকে স্পর্শ করতে পারেনি।

অভিনয়ে একদিকে যেমন অ্যামেচারি ঢং রয়ে গেছে, অন্যদিকে তেমনি কোন কোন চরিত্রাভিনেতার অভিনয়ে অতিশয়োক্তি লক্ষ্য করা গেছে। এই দিকই এমন মেজাজের নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর।

অভিনয়ে সোমনাথের চরিত্রে পরিচালক সুভাষ দে আগাগোড়া একটা সংযত এবং মর্যাদার ভাব বজায় রেখেছেন। ভবতোষ ব্যানার্জীর সুকুমার প্রথম দিকে বেশ সপ্রতিভ ভাবে অভিনয় করেছেন। কমলা বৌদি রূপী দীপ্তি ভট্টাচার্যকে বড় ভাল লেগেছে। আর বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাল লেগেছে সেনাপতিরূপী পিনাকী মুখার্জীকে। ভাঁড়ামী মনে হলেও তিনি শক্তিমান অভিনেতা সন্দেহ নেই।

অন্যান্য ভূমিকায় আসিত ব্যানার্জী স্বপন চ্যাটার্জী, কুন্তল রায়, অজিত দত্ত কল্যাণ ঘটক, সত্য কর, স্বপন সেন আশিস ঘোষ, অশোক মুখার্জী স্ব-স্ব চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন অবশ্যই।

মেয়েদের মধ্যে বুলবুলরূপী কল্পনা মিত্রর চঞ্চল হাসি খুশী ভাব এবং তপতীর চরিত্রাভিনেত্রী রীণা দে'কে আমার সুন্দর লেগেছে। গীতশ্রী ব্যানার্জী ও চম্পা চক্রবর্তী চরিত্রানুগ।

আবহ সঙ্গীত মাঝে মাঝে অবাক করেছে দৃশ্য অনুযায়ী তার প্রয়োগের গুণে। নাটকের খামতি অনেকটাই ঢেকে দিয়েছে আবহ সঙ্গীত (দেবকী ব্যানার্জী-কৃত)।

মঞ্চ (অমর ঘোষ) পরিকল্পনা ভাল। তবে তার উপস্থাপনায় আর একটু লক্ষ্য রাখলে আরও ইমপ্রেসিভ হোত।

সব শেষে একটি কথা। নাটকের গতি অনেকাংশেই শ্লথ হওয়ার দরুণ নাটকীয়তাও যেমন, দানা বেঁধে উঠতে পারে নি তেমনিই তা দর্শককে নিবিষ্ট করে দিতে পারে নি। যেটা নাটকের পক্ষে অপরিহার্য অর্থাৎ টিম ওয়ার্ক, যার ওপর নির্ভর করছে টোটাল এফেক্ট। এ সম্পর্কে পরিচালককে আরো কিছুটা সচেতন হতে অনুরোধ জানাই। কারণ পাত্র-পাত্রীর সুষ্ঠু অভিনয়ের ওপরেই নাটকের সাফল্য নির্ভর করে।

—নাট্য সমালোচক

বিশ্বাস করুন আমার ভীষণ দুঃখ হয় আপনাদের জন্য। আপনারা অমৃতের অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা যাদের জন্য আমি এ লেখা তৈরী করি তাদের অনেকেই 'বাংলা-দেশের ছবি' দেখার সুযোগ আজও পান নি ও এখনও পাচ্ছেন না। আর তাই আমি যে সব ছবির কথা বলি এবং যে সব শিল্পীর কথা বলি আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা এখনও তাদেরকে চোখে বা পর্দায় দেখেন নি এবং আরো কতদিন পর তাদের দেখতে পাবেন তাও আমার ঠিক ঠিক জানা নেই।

অথচ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমরা এবং আপনারা নিশ্চয় আশা করেছিলাম ভীষণভাবেই আশা করেছিলাম যাক অন্ধকার এবার কেটে যাবে আর আমরা উত্তম সুচিত্রা অপর্ণাকে এবং আপনারা রাজ্জাক শাবানা ববিতাকে পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই দিব্যি ঘরে বসে (মানে স্থানীয় ছবিঘরে) হরদম দেখতে পাব।

কিন্তু বাস্তবে? দিল্লী দূর অস্ত—

জানি না দু দেশের সরকার আমাদের ও আপনাদের কথা ভেবে কবে দু দেশের মধ্যে ছবি বিনিময়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবেন।

তবে স্বীকার করতেই হবে এদিক দিয়ে আপনাদের চেয়ে আমরা বাংলাদেশের দর্শক মাত্রই যথেষ্ট ভাগ্যবান। তার কারণ একদা ভারত থেকে আমদানীকৃত কয়েক শত ছবি এ দেশের দর্শক একদা এক ও একাধিকবার দেখেছেন এবং এখনও বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছায় মাঝে মধ্যেই দেখতে পান ও পাচ্ছেন।

শুধু দুঃখ এ-সবই পুরাতন ছবি। এক ও একাধিকবার দেখা ছবি। নতুন ছবি যা গত কয়বছরে ভারতে তৈরী হয়েছে তার দু-পাঁচটা মাত্র এদেশের দর্শক হঠাৎ দেখতে পেয়েছেন। যেমন কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত উৎসবকালে এবং সম্প্রতি সত্যজিৎবাবুর তৈরী 'গোপী গায়েন বাঘা বাইন'।

গোপী গায়েন এখানে কি করে হঠাৎ মুক্তি পেল তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু যেভাবেই এ ছবি এখানে মুক্তি পাক না কেন স্বীকার করতেই হবে এখানকার দর্শককুল ছবিটা দেখে ভীষণ খুশী হয়েছেন। অনেক দিন পর একটা ভালো ছবি দেখার আনন্দ পেয়েছেন।

অবশ্য আপনারাও এদেশের হাতে গোনা কয়েকটা ছবি ইতিমধ্যে দেখেছেন। যেমন স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কোলকাতায় মুক্তি-প্রাপ্ত জহির রায়হান পরিচালিত ছবি 'জীবন থেকে নেয়া' এবং কিছুদিন পরে মোমতাজ আলী পরিচালিত ছবি 'নতুন ফুলের গন্ধ'।

অতঃপর ভারতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে যে কটা ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, সে সব ছবিও আপনাদের কেউ কেউ দেখেছেন।

তবুও বলতে হবে, দই-এর স্বাদ কি

অপেক্ষায় থাকা, যেদিন দুদেশের ছবি দুদেশে বিনিময়সূত্রে আসবে, যাবে এবং প্রদর্শিত হবে।

ভূমিকা দীর্ঘ করতে চাই না। এবার আসল আলোচনায় আসা যাক। কিন্তু কোন বিষয়ে লিখি? আচ্ছা, প্রশ্ন-উত্তরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা মোটামুটি ধারণা দেবার চেষ্টা করি।

(ক) বাংলাদেশে বর্তমানে নির্মীয়মাণ ছবির সংখ্যা কত জানেন?

—দুশতাধিক।

(খ) বাংলাদেশে গড়ে বছরে কটি ছবি মুক্তি পায়?

—মাত্র ৩০।৩২টি।

(গ) বাংলাদেশে এখানে ছবির পরিচালক কতজন?

—শতাধিক।

(ঘ) ছবি নির্মাণে মোট কত টাকা ব্যয় হয়?

—আগে হত এক থেকে চার লাখ টাকা। কিন্তু এখন লাগে পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা।

(ঙ) নায়ক নায়িকার সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক কত?

—এক লাখ ও পঁচাত্তর হাজার।

(চ) কজন নায়ক বাংলাদেশের চিত্রজগতে আছেন?

—বেশী নয়। ডজনখানেক। নাম শুনবেন? শুনুন—রাহাত ওয়াসীম উজ্জ্বল জাফর ইকবাল প্রবীর আলমগীর বুলবুল ইসলাম জাভেদ কাসেম সোহেল রানা আজিম খসরু প্রমুখ।

(ছ) নায়িকার সংখ্যা কত?

—খুবই অল্প। যেমন শাবানা ববিতা কবরী কবিতা সুজাতা অলিভিয়া মঞ্জু দত্ত সুচরিতা নতুন ও সুচন্দা প্রমুখ।

(জ) অন্যান্য পুরুষ শিল্পী?

—অনেক। যেমন আনোয়ার হোসেন মোস্তফা খলীল নারায়ণ চক্রবর্তী হাসান ইমাম দারাশিকো জসীম খান জয়নুল সাইফুদ্দীন ফতেহ্ লোহানী শওকত আকবর দীন মোহাম্মদ হাসমেত জাভেদ রহমান বেবী জামান রানু আনিস টেলি সামাদ মেসবাহ রবিউল রাজ আলতাফ লালু বারব মেহফুজ আলী মনসুর আলী কাওসার তুলিপ প্রমুখ।

(ঝ) এবং মহিলা শিল্পী?

—অনেক। যেমন সুমিতা দেবী রোজী সামাদ রাণী সরকার রহিমা আনোয়ারা কাবেরী চন্দনা মিনু রহমান সবিতা সুলতানা নার্গিস বেবী রীতা শর্বরী ওয়াহিদা রওশন জামিল মায়া হাজারিকা রীনা আকরাম নাজনীন শাকিলা সুপ্রিয়া রীতা প্রমুখ।

(ঞ) বাংলাদেশে ছবিঘরের সংখ্যা কত?

—প্রায় দুশত।

(ট) ছবিঘরের টিকিটের হার কত?

—ডি সি সাড়ে সাত টাকা, রিয়ার স্টল সাড়ে চার টাকা, মিডল স্টল তিন টাকা।

যাক এবার বাংলাদেশে নির্মীয়মাণ ছবির কিছু সংক্ষিপ্ত খবর শুনুন।

কালিদাস পরিচালিত ছবি 'জানোয়ার'-এর কাজও এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। ছবির নায়ক নায়িকা ওয়াসীম ও মিনু রহমান।

এদিকে দস্যু বনহুর'এর শুভ মহরৎ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

—আনওয়ার আহমদ

পাথর অউর পায়েল

প্রযোজনা : কে পি এস ফিল্মস
বক্স অফিসের জন্যে নির্মিত একটি অ্যাকসানধর্মী ছবি!!

ধর্মেন্দ্র ও হেমামালিনী

অজিত ও রণজিৎ দুই ভাই বিখ্যাত ডাকাত হিসাবে, পুলিশের ডায়েরীতে পরিচিত। ওদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। অথচ ওরা ডাকাত ছিল না, বরং ভদ্রভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু বিজয়নারায়ণ সিং নামে অসৎ ব্যক্তির দ্বারা ওদের বাবা ও মা নিহত হন। ছোটবেলা থেকেই ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল—একদিন ওদের বাবা ও মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে, এ জন্যেই ওরা আজ বিখ্যাত ডাকাত হয়েছে। একবার ডাকাতদলের সরযূ গ্রামে অর্থ লুণ্ঠন করার বদলে সুন্দরী তরুণীর ইজ্জতের উপর হামলা করে, রণজিৎই সেবার সরযূকে বাধা দিয়ে সেই সুন্দরী তরুণীর ইজ্জত বাঁচায়। একাধিকবার 'সরযূ'র চক্রান্তের হাত থেকে শহরে দুলালী আশাকে রক্ষা করে। আশাকে শহরে পৌঁছে দিতে এসে, ওর বাবার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং নববধূর ছদ্মবেশে শহরেই বাস করতে থাকে। বিজয়নারায়ণ সিং-এর চক্রান্তে রণজিৎ-এর আসল পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করতে আসে। সরযূর আগ্রহে অজিত শহরে আসে রণজিৎকে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু ওকে পায় না। অবশেষে আশাকে নিয়ে সরযূ আপন ডেরায় ফিরে গিয়ে, নিজেই সর্দার হয় এবং অজিতকে বন্দী করে রাখে। রণজিৎকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে পুলিশকে বুঝিয়ে ডাকাতদের ডেরায় নিয়ে গিয়ে আশাকে উদ্ধার করে। কিন্তু বিজয়নারায়ণের গুলিতে অজিত নিহত হন। এবার সানন্দেই পুলিশে ধরা দেন রণজিৎ।

এ ছবির অন্যতম সম্পদ অভিনয়—রণজিৎ—ধর্মেন্দ্র, অজিত—[illegible] এবং আশার ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন হেমা মালিনী। অন্যান্য ভূমিকায়—সাইকেলে ভূপৎ টক—রাজেন্দ্রনাথ, আশার বাবা—সপ্রু, পুলিশ অফিসার—ইফতিকার বিজয়নারায়ণ—রাজেন হাসকর এবং যোগীন্দার, এস বে প্রেম, রামমোহন, রাজেন্দ্রনাথ ও জয়শ্রী টি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। ছবিতে গানের প্রয়োজন ছিল না তবুও চারখানি গানের সুরে নতুন কিছু দেবার চেষ্টা করেছেন কল্যাণজী আনন্দজী। শিল্প নির্দেশনায় গণেশ বসাক, আলোকচিত্র গ্রহণে ভি দুর্গা প্রসাদ-এর কাজ উচ্চাংগের। এবং সম্পাদকের কাঁচি (ভাস্কর রাও) মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর হতে পারতো। পরিশেষে পরিচালক ধর্মেশ মালহোত্রা ও'র পূর্ববর্তী ছবি 'গন্দারা'তেও বিদেশী ছবির প্রভাবকে এড়াতে পারেন নি, এবারে সেটা বেশী প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

—চিত্রদূত

শতবর্ষের স্মরণীয়

নাট্যরথী অমর দত্ত—২

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী, পূর্ণচন্দ্র অভিনয়েও ক্লাসিকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু তারাসুন্দরীর সঙ্গে হঠাৎ মনোমালিন্য হয় অমর দত্তের। ফলে তারাসুন্দরী ক্লাসিক থিয়েটার পরিত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে অঘোর পাঠক ও ক্লাসিক থিয়েটার ধাক্কা খেলেন। এমনি বহু ধাক্কাই অমরেন্দ্রনাথকে খেতে হয়েছে তার নাট্য-জীবনে। কোন সময়ই তিনি দমে পড়েন না। অমিততেজে সমস্ত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন। থিয়েটারকে জনপ্রিয় করে তুলতে অমরেন্দ্রনাথ গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা করলেন। এমারেল্ড থিয়েটারে ইতিপূর্বে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ফুলশয্যা গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় গীতিনাট্য হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখেছিলেন আলিবাবা। 'আলিবাবা' রচনা করে স্টার থিয়েটারের অমৃতলাল বসুকে মঞ্চস্থ করবার জন্য পড়তে দেন। অমৃতলাল 'আলিবাবা' অভিনয়োপযোগী নয় বলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেন। তখন ক্ষীরোদপ্রসাদ অমরবাবুকে পড়তে দেন আলিবাবা। অমরবাবু এবার গিরিশচন্দ্রকে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করতে অনুরোধ করেন। গিরিশচন্দ্র আলিবাবা সংশোধন করে প্রস্তাবনার গানটি রচনা করে দেন।

সাবধান!

যারা কেচ্ছাকাহিনী পড়তে ভালবাসেন তারা যেন ২-৫০ টাকা খরচ করে **"রঞ্জিত মল্লিক সংখ্যা" চুমকী** কিনে ঠকবেন না। অনেক চেষ্টা করেও এমন কোনো ফিল্মী কেচ্ছার খবর আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি যাতে বাংলা ছবির সুদর্শন এবং কর্মব্যস্ত নায়ক রঞ্জিত মল্লিক জড়িত আছেন।

ইতি—অঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদক, চুমকী
১০৮বি রায়বাহাদুর রোড, কলি-৩৪

এ—৩৯১৫৯

ষ্টার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ফোন : ৫৫-১১৩৯
প্রতি বৃহঃ ৬॥
শনি, রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥
কুনাল মুখার্জির নতুন নাটক

পরিচয়

● পরিচালনা : **বঙ্কিম ঘোষ**
● আলো : **তাপস সেন**
রূপায়ণে : বঙ্কিম, হরিধন, সতীন্দ্র, অমরনাথ, পঞ্চানন এবং শুভেন্দু, ও শ্যামলা বিশ্বাস

শনিবার ২০ নভেম্বর, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলো আলিবাবা। অভিনয়ে রইলেন আলিবাবা—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। হুসেন—অমরেন্দ্রনাথ। আবদাল্লা—নৃপেন্দ্রনাথ বসু আর মর্জিনারূপে আত্মপ্রকাশ করলেন কুসুমকুমারী।

প্রথম রজনীর বিক্রয় ভালই ছিল কিন্তু ২৭ নভেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারও আলিবাবা মঞ্চস্থ করায় বিক্রয় হ্রাস পায়। শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় ক্লাসিক জয়লাভ করে। আলিবাবার বিক্রী প্রায় আড়াই হাজার টাকায় বৃদ্ধি পায়।

ক্লাসিক থিয়েটার তথা অমর দত্তকে আলিবাবা নতুন জয়মুকুটে ভূষিত করেছিল। অমর দত্ত এবার মঞ্চস্থ করলেন তার 'কাজের খতম' নাটক। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কাজের খতম মঞ্চস্থ হলো।

শনিবার ৮ জানুয়ারী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। ২০ জানুয়ারী অমরেন্দ্রনাথের বেনিফিট নাইট অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক অমরেন্দ্রনাথকে 'বেনিফিট নাইটের প্রবর্তক বলে অভিহিত করেছেন—তা সত্য নয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ থেকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে চুনীলাল দেব নিখিলকৃষ্ণ দেব এবং তাঁদের অপর পক ভ্রাতা ক্লাসিকে যোগদান করেন। এঁরা সবাই অমরেন্দ্রনাথের পুরোন বন্ধু। স্বভাবতঃই অমরেন্দ্রনাথ কিছুটা উৎসাহিত হন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৮ মার্চ গিরিশচন্দ্রের দোললীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও গোপী চরিত্রে অভিনয় করেন কুসুমকুমারী। নৃপেন্দ্রনাথ বসু—গোপ। শ্রীরাধা—ভূষণকুমারী। সখীদের মধ্যে সুশীলাবালা। বিনোদিনী (হাসি) ও নীরদাসুন্দরী ছিলেন। 'কেন রং দিলি এ ঢং করে' সঙ্গীতে সমস্ত নাট্যগৃহ অপূর্ব উন্মাদনায় মেতে উঠতো। এই সময় কলকাতায় প্লেগের প্রকোপ ভীষণরূপে দেখা দেয়। দলে দলে লোকজন কলকাতা ছেড়ে যান। অনেক থিয়েটার সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কিন্তু অমর দত্ত তাঁর ক্লাসিক থিয়েটার নিয়ে নির্বিকারভাবে অভিনয় করে চলেন।

স্টার থিয়েটারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের আবার মনোমালিনী দেখা দেয়। তিনি স্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করেন। রাজসাহীতে একটি নতুন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করার পর জুলাই মাসে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন। স্টার থিয়েটার এই সময় প্রায় দেড় মাস বন্ধ থাকে।

দানীবাবুও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ক্লাসিকে যোগদান করেন।

প্লেগ আতঙ্কগ্রস্ত কলকাতার সেই ভয়াল ভয়ংকর অবস্থার মধ্যেও অমরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যা জাতীয় জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা হিসেবেই কীর্তিত হবে।

চলচ্চিত্র ইতিমধ্যেই তার বিস্ময়কর আকর্ষণ নিয়ে দেখা দিয়েছে। স্টার থিয়েটারে মিঃ স্টিভেন্স নিয়মিত ছবি দেখিয়ে বাজী[illegible] লেন। রয়াল বায়স্কোপের মধ্য [illegible] হীরালাল সেন আর মতিলাল সেন নিয়মিতভাবে ছবি দেখাতে শুরু করেছেন। হীরালাল সেন অমর দত্তের আহ্বানে ক্লাসিক থিয়েটারেই নিয়মিত ছবি দেখানো শুরু করলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল আলিবাবার সঙ্গে যে বায়স্কোপ দেখানো হয় সে সম্পর্কে ৫ এপ্রিল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের অমৃতবাজার পত্রিকায় বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিলেন (অনুবাদ) 'সিনেমাটোগ্রাফ। গত রবিবার ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কম্পানী কর্তৃক অদ্ভুত সিনেমাটোগ্রাফ প্রদর্শনী দেখানো হয়। প্রদর্শনী শেষে দর্শকসাধারণকে 'আলিবাবা' নাটক দেখানো হয়।' গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে যোগদান করার পর মেঘনাদ বধ মুকুল মুঞ্জরা প্রভৃতি অভিনীত হলো। গিরিশচন্দ্র—রাম; মহেন্দ্র বসু—লক্ষ্মণ; অমর দত্ত—মেঘনাদ চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন মেঘনাদ বধ নাটকে। কিন্তু মহেন্দ্রলাল বসু মিনার্ভায় মেয়ে যোগদান করলেন। তখন লক্ষ্মণ চরিত্রে অভিনয় করতে লাগলেন দানীবাবু।

৩০ জুলাই মুকুল মুঞ্জরা ২৭ আগস্ট প্রফুল্ল মঞ্চস্থ হলো। গিরিশচন্দ্র যোগেশ দানীবাবু সুরেশ আর ভজহরি চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথ অভিনয় করলেন। অমরেন্দ্রনাথ ভজহরি চরিত্রে অদ্ভুত শক্তিমত্তার পরিচয় দিলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দিরায় অমরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্র, কুসুমকুমারী ইন্দিরা চরিত্রে অভিনয় করেন। ইন্দিরা জনপ্রিয়তার্জনে ব্যর্থ হয়।

২৫ ডিসেম্বর 'নিমচাঁদ' গীতিনাট্য দর্শকদের মাতিয়ে নিল।

মহেন্দ্রলাল বসু আর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী মিনার্ভায় ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে মিনার্ভাকে সচল রাখা কঠিন হয়ে উঠলো—তখন এইচ এল মল্লিক নামে এক ভদ্রলোক কিছুদিনের জন্য মিনার্ভার লেসী হন এবং তিনি গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভায় নিয়ে যান। স্বভাবতই গিরিশচন্দ্র আর অমর দত্তের মাঝে কিছুটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

১১ মার্চ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্বে মঞ্চস্থ হলো প্রফুল্ল। 'যোগেশ চরিত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ (অধীন)' বলে বিজ্ঞাপিত হলো। অমরেন্দ্রনাথও ১৮ মার্চ ক্লাসিকে প্রফুল্ল নাটক মঞ্চস্থ করলেন। মিনার্ভার মত তিনিও বিজ্ঞাপিত দিয়েছিলেন 'যোগেশ চরিত্রে মাই আম্বল সেলফ্' বলে।

তখনকার থিয়েটারে থিয়েটারে [illegible] মজাদার লড়াই হতো। এবারকার লড়াই ছিল গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে। কিন্তু মিনার্ভা গিরিশচন্দ্রকে নিয়েও লড়াইতে জয়লাভ করতে পারলো না। অমর দত্ত আবার গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভায় ফিরিয়ে আনলেন।

২৯ এপ্রিল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দেই গিরিশ-

চন্দ্রের 'জনা' মঞ্চস্থ হয়। প্রবীর এবং মদন মঞ্জরীরূপে অমরেন্দ্রনাথ আর কুসুমকুমারী অপূর্ব অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্র বিদূষক চরিত্রে অভিনয় করেন।

১০ জুন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশ-চন্দ্রের দেলদার নাটকের বিভিন্নাংশে ছিলেন অমর দত্ত গহন। নৃপেন্দ্রনাথ বসু—দেলদার। দানুবাবু—সরল। কুসুমকুমারী—পিয়াসা।

২৬ আগস্ট মঞ্চস্থ হলো অমরেন্দ্রনাথের নতুন নাটক শ্রীকৃষ্ণ। নামভূমিকায় অভিনয় করেন কুসুমকুমারী। শ্রীকৃষ্ণ গীতিনাট্যও অন্যান্য গীতিনাট্যের মতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৬ সেপ্টেম্বর ভ্রমর মঞ্চস্থ হলো। কথিত আছে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল-এর নাম নাটকাকারে ভ্রমর রাখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অভিনয়ে মহেন্দ্রলাল বসু—কৃষ্ণকান্ত অমরেন্দ্রনাথ— গোবিন্দলাল নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু—হরে দানীবাবু—নিশাকর কুসুমকুমারী—ভ্রমর প্রমদাসুন্দরী— রোহিণী চরিত্রে অভিনয় করেন। কুসুমকুমারী প্রমদা-সুন্দরী অমরেন্দ্রনাথ এবং বৃদ্ধবয়সে মহেন্দ্রলালের অভিনয় উচ্ছ্বসিতভাবে অভি-নন্দিত হয়।

ভ্রমর-এর অভিনয় দেখে কবি নবীনচন্দ্র সেন অমর দত্তকে অভিনন্দিত করে এক পত্র লেখেন। ভ্রমরের অকল্পিত জনপ্রিয়তার কথা তখন নাট্যামোদীদের মুখে মুখে গল্প-কাহিনীর মত উচ্চারিত হতো। প্রতিদিন বহু দর্শক টিকেট না পেয়ে ফিরে যেতেন। ভ্রমরের জনপ্রিয়তার পর থেকেই অমরেন্দ্রনাথ বিডনকেশরীরূপে খ্যাত হয়ে ওঠেন।

(ক্রমশঃ)

চলনা

আরঙ্গম-এ পূর্ণিমা : ১২ জানুয়ারী বিদ্যামন্দির মঞ্চে নৃত্যাম নিবেদিত শ্রীমতী পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়ের ভারতনাটাম (আরঙ্গম) উদ্বোধন করেন শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। শ্রীঘোষ শিল্পীকে আশীর্বাদ জানান এবং শিল্পী ভগ্নীত্রয় (সুনন্দা, অপর্ণা, পূর্ণিমা) আপনাপন ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সহায়ক হয়ে দাঁড়াবার জন্য এঁদের পিতা ও মাতা শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী প্রীতি চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন এই শিল্পী পরিবার যেন নৃত্য গীত ও অন্যান্য সম্পত্তের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন। আমি এঁদের সর্বাঙ্গীন সার্থকতা কামনা করি।

শ্রীমতী পূর্ণিমাকে এর আগে দেখেছি রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের নায়িকারূপে। সেখানে নাটকের কাহিনী, ভাব ও অন্যান্য সহ-শিল্পীদের নৃত্যাভিনয় শিল্পীর আত্মবিকাশে অনেকখানিই সাহায্য করে। তাছাড়া সেখানে কোনো দৃঢ়নিবদ্ধ নৃত্যরীতি না থাকায় শিল্পী অনেকটা স্বাধীন।

প্রায় দু-ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে পূর্ণিমা দেখালেন আলারিপু, জাতিস্বরম, শব্দম বর্ণম, পদম, তিল্লানা নটনাম আজিনার কৃষ্ণানী বেগন।

ভারতনাট্যমের শিল্পীর পক্ষে যা যা দরকার (আয়তনেত্র, সুঠাম দেহ, সৌন্দর্য-সমৃদ্ধ মুখশ্রী) সব চাহিদাই পূর্ণিমা পূর্ণ করেছেন। এর সঙ্গে মিশেছিলো তাঁর শিক্ষা ও অনুশীলন। তাই প্রতিটি মুহূর্তই হয়ে উঠেছিলো ভরাট, উপভোগ্য।

ষতিঃস্বরম ও তিলানার রূপক ও তিশ্রম তালের ছন্দে পদক্ষেপ, মুদ্রা ও মুখ-ভাবের অভিব্যক্তিতে তাঁর প্রকাশব্যাকুল শিল্পীচিত্তটির প্রতিফলন ঘটেছিলো পদম অঙ্গে 'ইন্দেন্দু', 'কৃষ্ণাণী বেগন' ও 'মথুরা নগরিলো'—নৃত্যগুলিতে শিল্পীর অভিনয় ও নৃত্যকুশলতার সমন্বয়মুগ্ধকারী।

দক্ষিণ ভারতীয় নানা রাগে (পানথু-বড়ালী, কাম্বোজী, আনন্দভৈরবী কানাড়া সুরুটি, যামিনী কল্যাণী, বসন্ত)

শ্রীমতী অপর্ণা চট্টোপাধ্যায় গুরু জ্ঞান-প্রকাশের সঙ্গে কুশলী দক্ষতায় কণ্ঠদান করেছেন। জায়গা বিশেষে তাঁর একক সঙ্গীতও শ্রুতিমধুর।

মৃদঙ্গমে সঙ্কীরনম , রূপকম, মিশ্রম আদি ও তিশ্রম তালের সঙ্গতে ক্ল্যাসিক্যাল পরিবেশ সৃষ্টি করেন নাগরাজম শ্রীএস আর

কুশলতা আনে দ্রুততা
দ্রুততায় আসে কুশলতা

চিঠি লিখুন ডাকে ফেলুন
সকাল সকাল ডাক ধরুন
সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেলে রাখবেন না

ডাক ও তার বিভাগ

davp 74/288 Ben

নাথন। বীণা, বেহালা, তানপুরা ও বেহালা সঙ্গতে ছিলেন সর্বশ্রী বীরভদ্র রাও, পি-এ জাবেরী, অজিত নন্দী। আলোয় আশুতোষ বড়ুয়া, সজ্জায় রূপসজ্জায়। ভাষ্য পাঠ করেছেন সুনন্দা মুখোপাধ্যায়।

নটরাজ প্রযোজিত 'চিত্রাঙ্গদা' : নটরাজ প্রযোজিত চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রসদনে সম্প্রতি মঞ্চস্থ এক উল্লেখযোগ্য নৃত্যনাট্য। বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার নারীচিত্তের জাগরণ ও তাঁর অন্তরের যুগ্ম সত্তার সমন্বয়সাধন এ দুটি দিকের যথাযথ রূপায়ণ ঘটিয়েছেন নৃত্যে যথাক্রমে অলকানন্দা রায় ও মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রেমিক ও বীর অর্জুনের এই দুটি দিকের মধ্যে প্রথমটি নিখুঁত ছবি হয়ে ওঠেন নৃত্যকুশলী কুণাল দত্ত। মদনপুরী সন্দ্বীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মদনের কৌতুকরূপে বাস্তব হয়ে উঠেছিলেন। সহচরীদের নৃত্যে ছিলেন রূপা, সম্পা, দেবযানী অদিতি অরুন্ধতী, সুস্মিতা, কুমকুম তম্পু শুভ্রা।

এ অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ গান। কুরূপা চিত্রাঙ্গদার অন্তরদ্বন্দ্বে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও সিন্ধ্যা। তাঁর গানের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার ললিতমধুর গানগুলি সুন্দর গেয়েছেন স্নিগ্ধা ঘোষ।

অর্জুনের গানে ধীরেন বসুর অংশগ্রহণ এই প্রথম। স্বভাবানুগ দক্ষতা ও ভাববিন্যাসে ইনি অর্জুনের বক্তব্য গানের ভাষায় রসিকচিত্তে পৌঁছে দিয়েছেন। মদনের গানে সুশীল মল্লিক মানানুগ।

সমবেত গানে ছিলেন সীমা, পৃথিব, রীণা মণিকা, ভাস্বতী দীপিকা, রত্না ও অনুরাধা। নৃত্য ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন মিনতি ঘোষ ও স্নিগ্ধা ঘোষ। ভাষ্যপাঠ করেছেন মিনতি গুহ ও অরিজৎ গুহ।

গড্ডালিকা প্রবাহে যে জীবন নিত্য প্রবাহিত সেখানে তার বেদনা, যন্ত্রণা, দৈনন্দিন টুকরো স্মৃতি প্রায়শই আমাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে যায়। আমরা আমাদের

সুকমলকান্তি ঘোষের সঙ্গে পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি চট্টোপাধ্যায় এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

স্বত্বাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারি না। তাই নিজেকে চিনতেও ভুল হয়ে যায়, বিস্মরণ ঘটে।

কিন্তু সেই সূক্ষ্ম তন্ত্রীতেও হঠাৎ কখনও নাড়া পড়ে। আমরা আমাদেরই দেখে সন্ত্রস্ত হই, অবাক মানি।

সেই অবাক হবার আয়নার কাজ করছে আজকের গ্রুপ থিয়েটার পরিবেশিত নাটকগুলি।

অথচ এই গ্রুপ থিয়েটারগুলিরই, তারা যতই দর্শক, সমালোচকের প্রশংসা কুড়োক না কেন, তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটা এখনও রীতিমত কষ্টসাপেক্ষ।

এই খেদ এবং আশঙ্কা প্রায় সব নাট্যগোষ্ঠীর মুখেই শুনেছি।

হিন্দী, বাঙলা সিনেমা এবং পাবলিক থিয়েটারে যেমন আগ্রহ করে দর্শকরা অংশ গ্রহণ করতে যান, এঁদের নাটক দেখার প্রতিও যদি আমাদের দেশের সুকুমার দর্শকরা সহানুভূতির মন নিয়ে এগিয়ে যান, তাহলে মনে হয় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলি বেঁচে ওঠে, তেমনি দর্শকরাও নতুন কিছু ভাবনার অংশীদার হয়ে লাভবান হন।

আজকে নাটক দেখা আর শুধুমাত্রই বিনোদনের ব্যাপার নয়, অন্তত একান্তের বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠীর নাটক তো নয়ই। প্রায় নাটকেই এমন একটা ভাবনার প্রাধান্য থাকে, যার ওপর হালআমলের ব্যক্তিচরিত্র, এবং গতিপ্রকৃতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থার ছাপ স্পষ্ট।

একথা আমার ইদানিংকার নাটকগুলি দেখতে দেখতে বার বারই মনে হয়েছে।

সব যেমন ধ্রুব সত্য হয় না, তেমনি সব মতের সঙ্গে একাত্ম হওয়াও সবার পক্ষে সম্ভব না হলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা আমাদের ভালো লাগে বইকি।

তাই এইসব অ-ব্যবসায়িক নাট্যসংস্থা-সমূহের বাস্তবধর্মী নাটক দেখার প্রতি সাধারণ দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হলে এই প্রচেষ্টাগুলি যেমন বাঁচবার আশ্বাস পাবে, তেমনি আমাদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধও বৃদ্ধি পাবে।

ডানকুনিতে মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান : প্রতি বছরে মত এবারেও পৌষ সংক্রান্তির দিনে ডানকুনি দশমহাবিদ্যা আশ্রমে বাক-সিদ্ধ সাধক সর্বানন্দ দেবের শুভ সিদ্ধি দিবস প্রতিপালিত হয় আশ্রমাচার্য শ্রীশ্রীরজেন্দ্রচন্দ্র সর্ববিদ্যার তত্ত্বাবধানে। এই উপলক্ষে উদয়াস্ত কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় এবং পরের দিন এক মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠান দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় ও বাইরের বহু শিল্পী যেমন : নিখিল বসু আরতি মুখার্জি সম্প্রদায় গীতা চক্রবর্তী গায়ত্রী সান্যাল সুকুমার গুড়ে জগন্নাথ দত্ত বিশ্বনাথ সর্ববিদ্যা প্রমুখ শিল্পীরা। তবে এদের মধ্যে তরুণ কণ্ঠশিল্পী নিখিল বসুর শ্যামাসঙ্গীত উপস্থিত শ্রোতাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসমরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

—চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অভিনেত্রী আরতি ভট্টাচার্য। ফটোঃ অমৃত

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 31st January, 1975
Phone 55-5231 (14 lines)

নতুন ফরমুলায় সুন্দর প্যাকে

কুকমী গুঁড়া মশলা

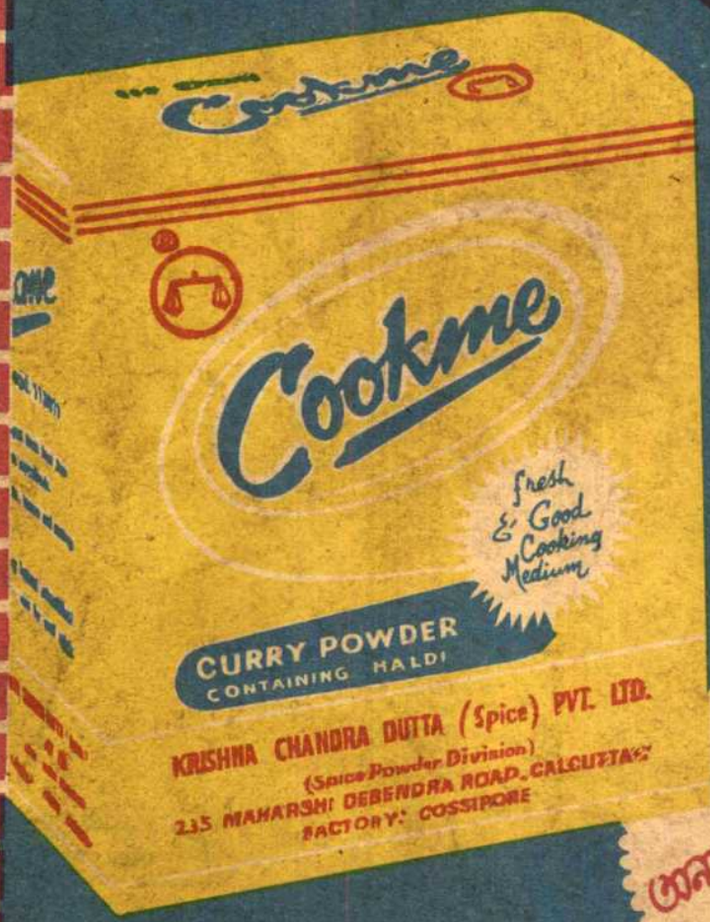

হ'লো সেই আসল জিনিষ যার পেছনে রয়েছে ১২৫ বছরের অভিজ্ঞতা

১। সর্বাধুনিক মশলা প্রযুক্তি বিদ্যার ফল নতুন প্যাকে আরও উন্নত ধরনের কুকমী গুঁড়া মশলা।

২। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের গবেষণা।

৩। বাজারের অন্যান্য পাঁচটা গুঁড়া মশলা থেকে কুকমী গুঁড়া মশলা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ও স্বাস্থ্যপ্রাণে ভরপুর।

আমাদের অন্য কোন ব্র্যাণ্ড ও ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭। ফোন ঃ ৩৩-৩৯২৫ ফ্যাক্টরী—কাশীপুর

iaa/KCD-74

JAN 1975

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ ॥ মূল্য ৬৫ পয়সা

বোরোলীন

সহারে কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক,
সানো ত্বক আবার সুস্থ, সতেজ ও
াবিক হ'য়ে উঠবে।

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

যার সঙ্গে

প্রীতি

আর জয় কি

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস

সবচেয়ে সাদা করার জন্যে

টিনোপাল®

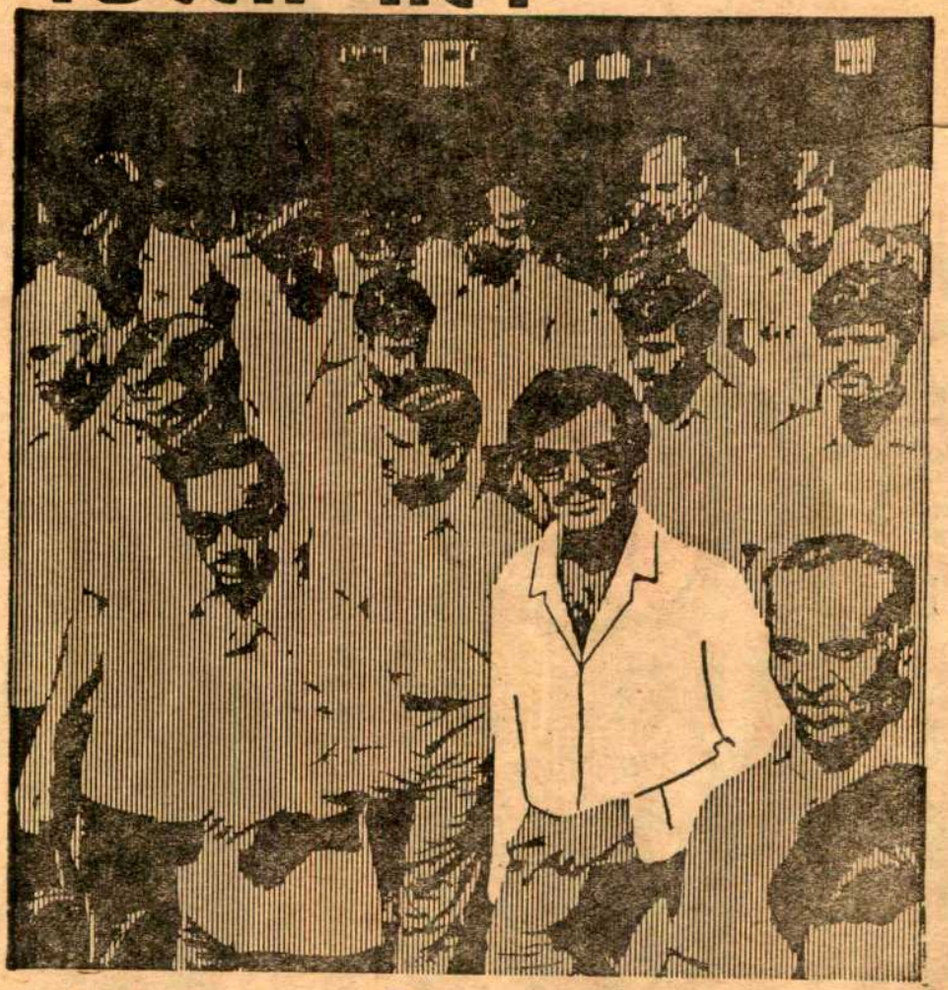

সিন্থেটিক ও ব্লেনডেড
কাপড়ের জন্যে
টিনোপাল-এস

সুতীর কাপড়ের
জন্যে
টিনোপাল

• টিনোপাল সুইজারল্যাণ্ডের সীবা গায়গী লিমিটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
সুহৃদ গায়গী লিঃ পোঃ অঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ৪০০০২০

শৈলেশ দে'র সার্থক সৃষ্টি

আমি সুভাষ বলছি (৩য় খণ্ড) ২০.০০

প্রথম খণ্ড ২০.০০ * দ্বিতীয় খণ্ড ২০.০০

প্রতি খণ্ডের মূল্য অগ্রিম পাঠালে রেজিঃডাকে বই পাঠানো হবে। ডাকমাশুল আমরা বহন করব।

শক্তিপদ রাজগুরুর সার্থক উপন্যাস

গৌড়জনবধূ ১২.০০

সুভাষ সমাজদারের অপূর্ব সাহিত্য-কীর্তি

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮.

১৯৫৭ খৃস্টাব্দে গৌড়বঙ্গের এক রেশম ব্যবসায়ী ভিখু শেখ তিন জাহাজ বোঝাই মালদাই সিল্কের পসরা সাজিয়ে সুদূর রাশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল বাণিজ্যের আশায়। সেই দুঃসাহসী বাঙালী যুবকের রোমাঞ্চকর বাণিজ্য-যাত্রার মধ্য দিয়ে লেখক সেই সময়কার ভারতীয় রুশ ব্যাপারীদের ব্যবসায়িক লেনদেন, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার—পরস্পরের মৈত্রী বন্ধনের কথা ও কাহিনী মূর্ত করে তুলেছেন। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর পটভূমিকায় এ-জাতীয় উপন্যাস কোন ভারতীয় ভাষায় আজও লিখিত হয়নি।

নারায়ণ সান্যালের সর্বাধুনিক গ্রন্থ

বিহঙ্গ বাসনা ১০.০০

চিরঞ্জীব সেনের নতুন রহস্যোপন্যাস

মিরানজিয়া রহস্য ১০.০০

শঙ্কু মহারাজের একটি সার্থক উপন্যাস

মধু-বৃন্দাবনে (তিন পর্বে সম্পূর্ণ)

ব্রজপর্ব ১০, বনপর্ব ১০, মহাবন পর্ব ১২.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নতুন উপন্যাস

স্বাতী ও দীপু ১০.০০

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উপন্যাস

ভুবনশিরি ২০.০০

শ্রীহংস-এর নতুন উপন্যাস

লাস্ট ওয়ার্ড ৮.

ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের

নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা ৮.

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

আর এক সাজে ৬.

নিগূঢ়ানন্দের

হৃদয়ে নাবিক ৮.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় (২য় সং) ১২.

নিখিলচন্দ্র সরকারের

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০.

পরিতোষ মজুমদারের

অগ্নিলতা ৫.

আবদুল জব্বারের

জনপদজীবন ৮.

কুমারী কন্যা ৮.

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

সুবোধ ঘোষের

গল্প মণিঘর ১৪.

প্রফুল্ল রায়ের

সুধা পারাবার ৬.

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৫

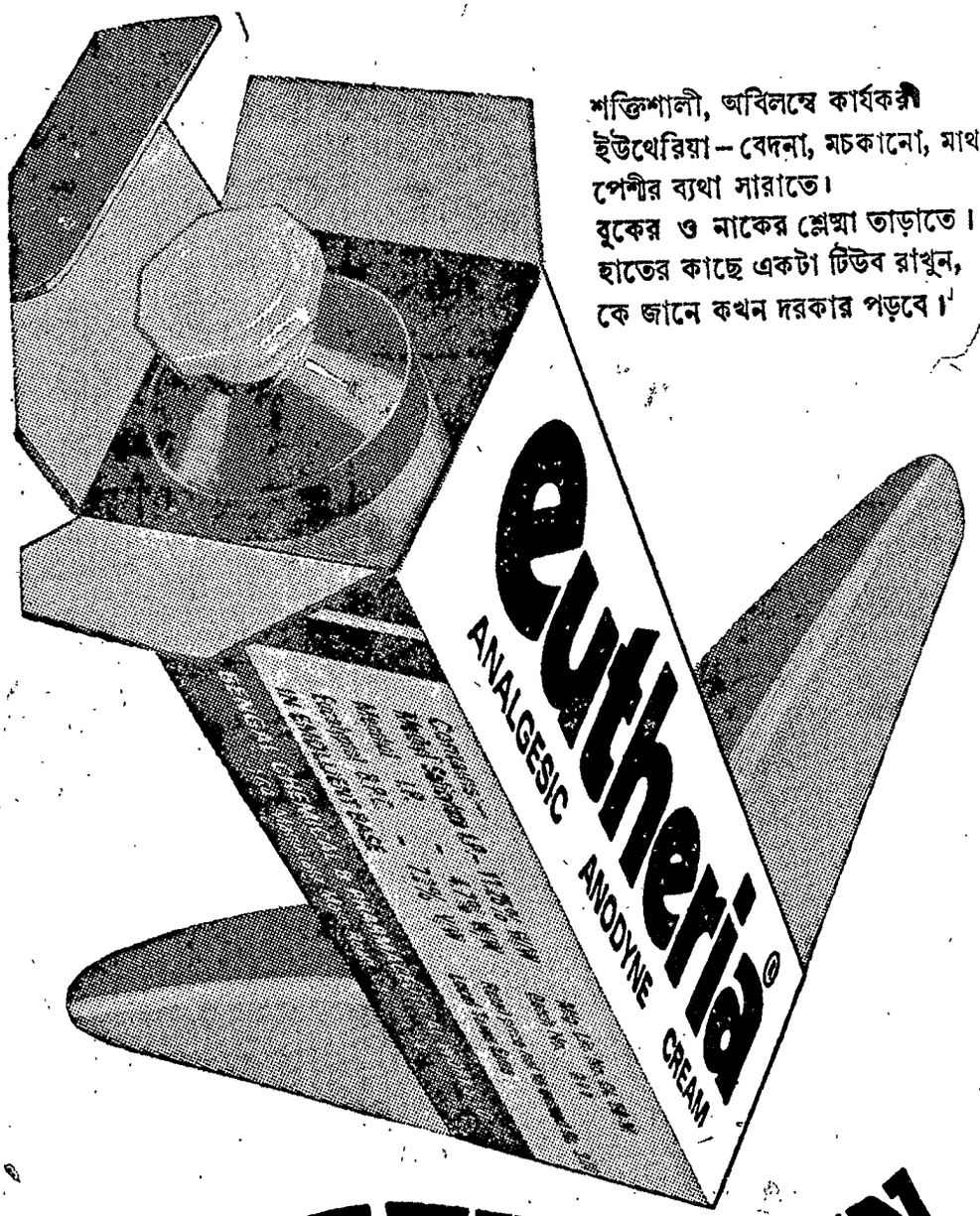

শক্তিশালী, অবিলম্বে কার্যকরী
ইউথেরিয়া – বেদনা, মচকানো, মাথাধরা,
পেশীর ব্যথা সারাতে।
বুকের ও নাকের শ্লেষ্মা তাড়াতে।
হাতের কাছে একটা টিউব রাখুন,
কে জানে কখন দরকার পড়বে।

মচকানো সারায়
ব্যথা তাড়ায়
ইউথেরিয়া

বেঙ্গল কেমিক্যালের
সেরা উৎপাদন

BC/G/22

১৪ বর্ষ

অমৃত

৩৯ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 7th February, 1975 শুক্রবার, ২৪ মাঘ, ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	জনগণেশ	(গল্প)	শ্রীবরেন গঙ্গোপাধ্যায়
১২	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৪	পটভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১৫	দেশেবিদেশে		শ্রীপুণ্ডরীক
১৬	সমুদ্রের ক্ষুধা	(কবিতা)	শ্রীঅনন্ত দাস
১৬	কে জানতো	(কবিতা)	শ্রীদীপেন রায়
১৬	স্বাদগুলো—বিচিত্র আস্বাদগুলো	(কবিতা)	শ্রীরজ্জেশ্বর হাজরা
১৬	শীত	(কবিতা)	শ্রীকার্তিক মোদক
১৭	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
১৯	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
২২	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
২৪	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে		শ্রীদিলীপকুমার রায়
২৭	যুবক-যুবতী		শ্রীঅমর দাশ
২৯	চিঠিপত্র		
৩২	গোয়েন্দা বাঁধা		শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
৩৪	অঙ্গনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৩৫	রান্না করে দেখুন		শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৩৭	রূপসীর খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে বহুচিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

ষষ্ঠ মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে ॥

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ:—অপরূপ তাঁর জীবনালেখ্য অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। বহুচিত্রসহ ৮

সাধনা

বসুমতী:—এমন মনোরম স্তোত্রগীতি-পুস্তক বাঙ্গলায় আর দেখি নাই।।

পরিবর্ধিত ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

ডেট কাপড় ধোয়ার কেক

অন্যান্য সাবানের তুলনায় ১½ গুণ বেশী কাপড় ধোয়—তা সে জল যে ধরণেরই হোক।

ডেট কাপড় ধোয়ার পাউডার

সাদা কিম্বা নীল — যে কোন সাইজে পাবেন। কেবল ডেট গোলা জলে ডুবান আর ধুয়ে নিন। এটি আপনার হাতের পক্ষেও নিরাপদ।

এন-ডেট

দাগ ধুয়ে পরিষ্কার করার এনজাইমযুক্ত পাউডার, সক্রিয় কিন্তু ক্ষতিকর নয়।

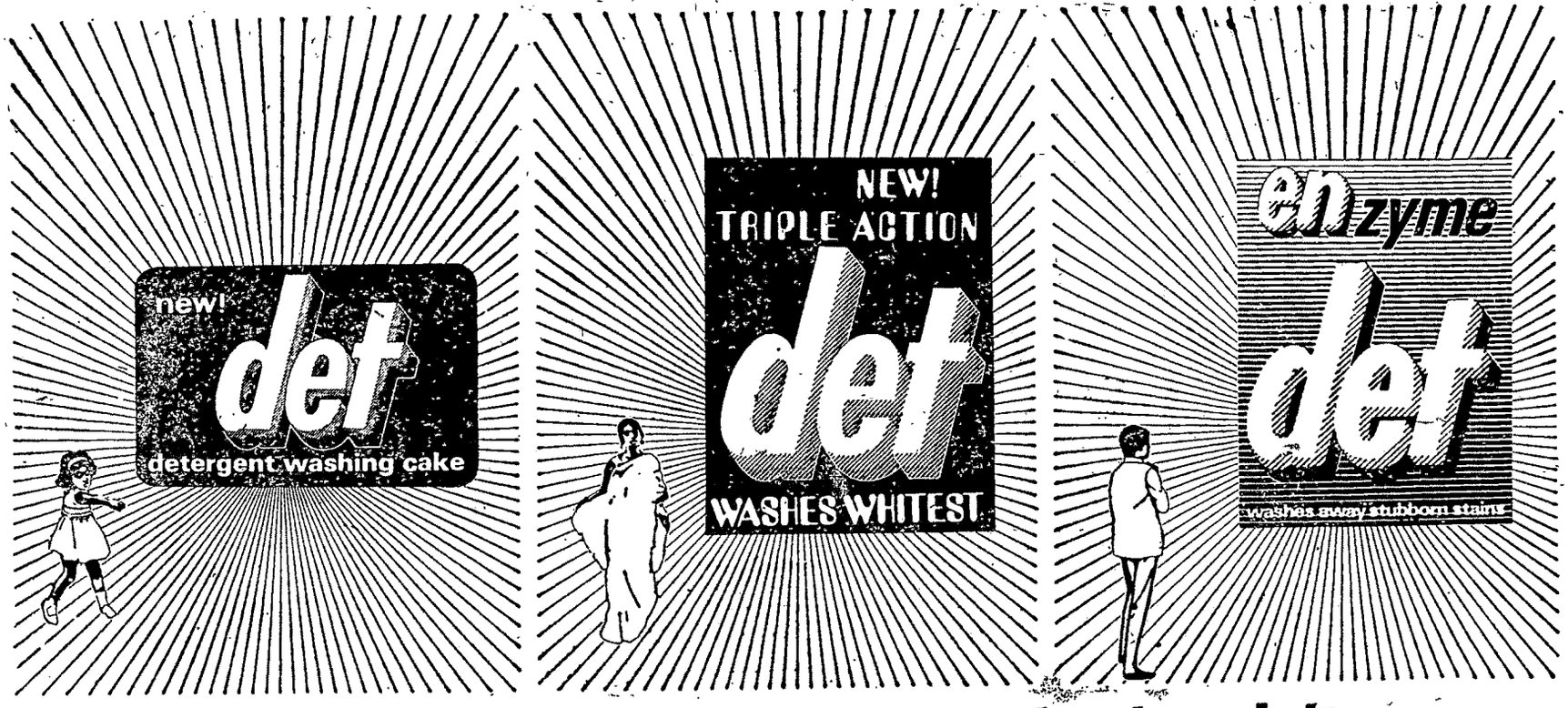

না কখনও ছিল,না পাবেন—এমন শুভ্রতা ডেটের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

Shilpi HPMA 5A/74 Ben

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৭	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান		
৩৮	পুনশ্চ		শ্রীক্ষপণক
৩৯	শেষ বিচার	(উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪৪	আর্ট কলেজের বাৎসরিক প্রদর্শনী		শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়
৪৫	সেকালের সংগীতগুণী		শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৪৬	নীলপাতার অঙ্গনে	(গল্প)	শ্রীসরেশ্বর সেন
৪৮	সতীশচন্দ্র প্রসঙ্গে		শ্রীফণীন্দ্রনারায়ণ দত্ত
৫০	খেলাধূলা		শ্রীদর্শক
৫২	দেশবিদেশের খেলা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৪	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৫	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীঅময়
৫৭	পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব		শ্রীনির্মল ধর
৬২	শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সঙ্গে		
৬৩	প্রেক্ষাগৃহ : ফোর থেকে বলছি		স্টুডিও সংবাদদাতা
৬৫	স্টুডিও সংবাদ		
৬৬	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা		শ্রীঅভিজিৎ
৬৭	নাটমঞ্চ		নাট্যসমালোচক
৬৯	বিদেশী ছবি		শ্রী শা র চ
৭০	বিবিধ সংবাদ		
৭০	১৯৭৪ সালের বাংলা ও হিন্দী ছবির সালতামামী		শ্রীচিত্রদূত
৭১	জলসা		শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীরতন বসাক

সদ্য প্রকাশিত হ'ল ১ম খণ্ড

গিরিশচন্দ্র সমগ্র রচনাবলী

সম্পাদনায় : দেবনারায়ণ গুপ্ত। ৫ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৫ টাকা।

রেক্সিনে বাঁধাই ও সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া। বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি সম্বলিত।

২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে — **শেক্‌স্‌পীয়র** রচনাবলী, ৪ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৫৲।

১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে — **মোপাসাঁ** রচনাবলী, ৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা

১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে — **টলস্টয়** রচনাবলী, ৫ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৩৲।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে — **এমিল জোলা** রচনাবলী, ৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা

গোর্কি রচনাবলী * **চেকভ রচনাবলী**
৪ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৪৲ — ৪ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা

দস্তয়েভস্কি রচনাবলী * **ওয়াল্টার স্কট রচনাবলী**
৫ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা — ৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা

আলেকজান্ডার ডুমা * **চার্লস ডিকেন্স রচনাবলী**
৪ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা — ৪ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১২৲ টাকা

বঙ্গদর্শন * **ভূদেব** * **হেমচন্দ্র** * **অক্ষয়দত্ত**
৮ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১২৲ — ২ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০৲

দেশবিদেশের ভৌতিক গল্প * **দামোদর** * **রাজনারায়ণ**
২ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৫৲ — ৩ খণ্ডে ৩০৲ — ১ খণ্ডে ১৫৲

অর্থনীতি অভিধান * **জলছবি**
১ খণ্ডে ২০৲ — ১ খণ্ডে ১০৲

প্রতিটি রচনাবলীর গ্রাহকমূল্য ৫৲ টাকা। গ্রাহক হবার ও মনিঅর্ডার পাঠানোর মূল কেন্দ্র : জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা—৯

মহাত্মা শিশিরকুমারের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

কালাচাঁদ গীতা
৪র্থ সংস্করণ ৩-০০

নিমাই সন্ন্যাস
(নাটক) ২য় সংস্করণ ২-০০

নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ২-০০

লর্ড গৌরাঙ্গ
(২২টি খণ্ডে) (ইংরাজী)
প্রতি খণ্ড ৩-০০

নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ২-০০

নরোত্তম চরিত
(হিন্দী) ২-০০

সর্পাঘাতের চিকিৎসা
(৮ম সংস্করণ) ১-৫০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE
De-luxe Ed. — Rs. 6.50

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE
Popular Ed. — Rs. 5.50

প্রাপ্তিস্থান :—
পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

সম্পাদকীয়

জনশক্তির জাগরণ

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস এবং ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপনের উৎসবে সাধারণ মানুষের উৎসাহ দেখে মনে আশা জাগে যে এখনও আমাদের সব প্রেরণার উৎস শুকিয়ে যায়নি। সুভাষচন্দ্র আজ আসমুদ্র হিমাচল এই দেশের মানুষের কাছে একটি স্বপ্ন, একটি আদর্শ ও প্রেরণার চিরঅমলিন প্রতীক। তিনি নেতাজী। সাধারণতন্ত্র দিবসটিও তেমনি এক জ্বলন্ত আশাবাদের বাণী বহন করে নিয়ে আসে। নিতান্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হলে এই দিনগুলি এত তাৎপর্যময় হয়ে উঠত না। দেশের মানুষের উৎসাহ হত না এত স্বাভাবিক। স্বাধীনতার সংগ্রামের দিনে যে-স্বপ্ন ও যে-আশা ছিল মানুষের মনে তার পরিপূর্ণ সার্থকতা হয় নি, একথা স্বীকার করা ভাল। ভারতবর্ষের ওপর আশা ছিল অনেক দেশেরই। তার সবটুকু পূরণ করা সম্ভব হয় নি, এ সত্যও আজ স্বীকার্য। সুভাষচন্দ্র যে স্বপ্নের ভারতবর্ষের জন্য সশস্ত্র আত্মোৎসর্গ করে গেছেন আজকের বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে পরিপূর্ণ সার্থক বলা যায় না। কেন তা সার্থক হয় নি তার কারণ বর্ণনা করার লোকের অভাব নেই দেশে। রাস্তাঘাটে কান পাতলেই শোনা যাবে, দেশে দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অসাধুতা এবং আরও কত কি? এগুলো নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়। তাহলেও প্রশ্ন থাকে এগুলোই কি সবটুকু সত্য। প্রতিটি মুদ্রারই দুটো পিঠ আছে। ভারতবর্ষের সাফল্য ও ব্যর্থতাও তেমনি দুটো পিঠ। শুধু একদিকে চোখ রাখলে সত্যের বিচার হবে না।

বৃটিশরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যাবার সময় এদেশকে প্রায় দেউলে করে রেখে যায় তদুপরি দেশটিকে ভেঙে টুকরো করে দিয়ে যেতেও তারা ভোলে নি। সাম্প্রদায়িক হানাহানি, লোকক্ষয় এবং সম্পত্তি বিনাশের ধ্বংসস্তূপের ওপর দুটি রাষ্ট্রের জন্ম। এমন কৌশল করে গেল সাম্রাজ্যবাদীরা যে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের সঙ্গে আজ পর্যন্ত সদ্ভাব সৃষ্টির চেষ্টা পুরোপুরি সফল হয় নি। ঘরের পাশে একটি বৈরী রাষ্ট্র থাকলে এবং বার বার তার হানাদারী প্রতিরোধ করতে গেলে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়বেই। তাছাড়া পাকিস্তানের চেয়ে অনেক শক্তিধর চীনের কাছ থেকেও আক্রমণ এসেছিল ভারতের ওপরেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় আরও অনেক বেশি করা যেত যদি স্বাধীনতার পরই শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থেকে ভারত সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারত। এটাও সাম্রাজ্যবাদীদেরই কৌশল। দেশবিভাগ আসলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রেখে-যাওয়া একটা মেয়াদী বোমা। তার বিস্ফোরণ যথাসময়েই হয়েছে এবং সেই বিস্ফোরণের জের এখনও চলছে। এই প্রতিকূল পরিবেশেও ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সাধারণ মানুষকে ভোটাধিকার দিয়েছে, সাম্প্রদায়িক ভোট ব্যবস্থা রহিত করেছে, সংখ্যালঘুদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা এবং অধিকারের দিয়েছে স্বীকৃতি। একটি নতুন স্বাধীন দেশের পক্ষে এগুলো কম কৃতিত্বের নয়। আশেপাশের রাষ্ট্রগুলোয় দিকে তাকালেই বোঝা যাবে রুল অব ল বা গণতান্ত্রিক আইনের শাসন রক্ষা করা কত কঠিন। একনায়কতন্ত্রের স্বাদ যারা পেয়েছে তারাই বলতে পারবে যে ভারতবর্ষের অন্যান্য দিকে অসাফল্য যাই থাকুক না কেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন তার বড় কৃতিত্ব। একে কোনোরকমেই খাটো করে দেখা যায় না।

তাহলেও তো ব্যর্থতা আছে এবং দেশের নায়ক যাঁরা তাঁরাও আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে এই ব্যর্থতা স্বীকার করেন। অনেক সমালোচক বলে থাকেন, ভারতের পঞ্চবার্ষিক যোজনায় ভারী শিল্পের ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ না করে কৃষিকর্মের ওপর জোর দেওয়া উচিত ছিল। ভারী শিল্প যা আছে তা এই দেশের জনসংখ্যা, আয়তন ও প্রয়োজনের তুলনায় এমন বেশি নয় যে তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভারী শিল্পের পত্তন ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই জরুরি ছিল এবং এখনও আছে। আমলাতন্ত্রের গাফিলতির জন্য বহুক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি, কিন্তু দেশের সর্বাঙ্গীণ বৈষয়িক উন্নতি করতে হলে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কৃষিকর্মকেও সঙ্গে সঙ্গেই দিতে হবে তার ন্যায্য প্রাধান্য।

বাস্তব পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা গেছে, সমাজতান্ত্রিক পথই ভারতের অগণিত মানুষের দারিদ্র্য দূর করার পথ। আজকের ভারতের এটাই হল প্রধান কর্মসূচী দারিদ্র্য দূরীকরণের। সাধারণতন্ত্রের বার্ষিকী উদযাপন তাই আমাদের কাছে আত্মানুসন্ধানের দিবস। আত্মনির্ভরশীলতা ছাড়া আজকের দুনিয়ায় রাজনৈতিক মর্যাদা অর্জন অসম্ভব। যতক্ষণ দেশ থেকে অপরিসীম দারিদ্র্য দূর করা না হচ্ছে, ওপরতলার সঙ্গে নিচের তলার ব্যবধান যতদিন না কমছে ততদিন নিরলস পরিশ্রম ছাড়া দেশবাসীর অন্য কোনো ব্রত নেই। জনশক্তির জাগরণই দেশকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে। এই দায়িত্ব পালনে নেতারা কি সক্রিয়? জনতার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে না পারলে শুধুমাত্র প্রশাসনযন্ত্রের সাহায্যে এত বড় সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

ভাল সাজেশ

বরেন সান্যাল

মিস সুরিনাকে তোলা হবে নেবুতলা থেকে। জয়দেববাবুর সঙ্গে কথা আছে, উনি তবলচি নিয়ে ঠিক সময় মতো পৌঁছে যাবেন। আর বাকি সকলে রিজার্ভ করা বাসে লটবহর নিয়ে চলে যাবে। মিস সুরিনা, হ্যাঁ সুরিনা নামেই ডাকব; কেননা, ঐ নামেই ওকে প্রচার করা হয়েছে ওখানে। আসলে, নাম ওর শোভা, নামে কিই-বা আসে যায়। মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল

আমারই উপরে, কিন্তু দলের সম্পাদক সতী ঘোষ বললেন, ঠিক আছে বিলেবাবু, আমার তো গাড়ি আছে, না হয় কিছু তেলই খরচ করব, গাড়িতে ওকে তুলে নিয়ে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে, কি বলেন?

আমার কিছুটা সুবিধেই হল। প্রথমত সুরিনা অর্থাৎ শোভা কি ধরনের চিজ আমার জানা নেই, এর-তার থেকে খবরা-খবর নিয়ে ওকে কনট্রাকট করা হয়েছে, দ্বিতীয়ত নেবুতলায় একা একা ঢোকা, আর তারপর ঐ নাচনেওয়ালীকে নিয়ে সার্ভিস বাসে করে জায়গা মতো পেঁছনো, কাজটা খুব একটা সহজ নয়। ঘোষদা আগ্রহী হওয়াতে আমার সুবিধেই হল।

দুপুর তিনটে নাগাদ আমরা নেবুতলা বস্তির মুখে এসে গাড়ি দাঁড় করালাম। তারপর গলিঘুঁজি ঘুরে মিস সুরিনার ঘরের সন্ধান পেলাম। বস্তি বাড়িতে ঘর যেরকম হয় সেরকমই, দেয়াল স্যাঁতসেতে নোনা ধরা ইটের, উপরে খপড়ার চাল। সামনে ছোট্ট মতো একটা বারান্দা; বারান্দার একটা অংশ দাপনার বেড়ায় ঘরের মতো করে রাখা হয়েছে, হয়তো ঐ ছোট্ট জায়গাটাই ওদের রান্নাঘর।

ঘরের সামনে এসে ডাকতে হল না কাউকে, দেখি, দাওয়ায় বসে ওর মাসি হুঁকো টানছে। আমাদের দেখে একটু হকচকিয়ে গেল বোধহয়। কি যে করে ভেবেই পায় না, হুঁকো লুকোতে গিয়ে বুঝল, ধরা পড়ে গেছে। সরল সোজাভাবে চোখে একটু লজ্জা মেখে কেবল হেসে উঠল।

হায় ভগবান, একেবারে সেন্ট পারসেন্ট রাঁড়ের বাড়ি। আমার ধারণা ছিল হাফ গেরস্ত টেরস্ত হবে, অথচ এ অবস্থায় আর পালিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। রাত নটা-দশটায় শো আরম্ভ, ড্যানসার একটা বড় আকর্ষণ আর তা যদি না নিয়ে যাই সামাল দেব কি করে! তাছাড়া নগদানগদ অত গুলো টাকা অ্যাডভান্স করে দিয়ে গেল পার্টি, কথার খেলাপ করাটা কি উচিত হবে আমাদের।

বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম, সে কি এখনো রেডি হওনি তোমরা! বারবার করে তো জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনটের মধ্যেই আমরা আসব।

রেডি হয়েই তো বসে আছি বাবু। মাসি হুঁকোটাকে একপাশে সরিয়ে রাখতে ঘরের ভেতর দিকে তাকায়, শোভা, অ-শোভা।

দরজাটা হালকাভাবে ভেজান ছিল, ভেতর থেকে শব্দ আসে যা-আই মাসি।

আপনারা বসুন বাবু, আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসি। মাটিতে হাতের ভর দিয়ে মাসি উঠে দাঁড়ায়, এখনো দেহের যা ধমক এককালে ও-ই নাচত কিনা কে জানে! দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় মাসি।

আমি ঘোষদার দিকে তাকালাম, ঘোষদা আমার দিকে তাকালেন। যেন চোখে চোখে বোঝাতে চাইলেন, বেড়ে মজা তো, নাটকের দল করে কত রকমেরই না অভিজ্ঞতা হল। শেষটায় কিনা নেবুতলার বস্তিতে এসেও দাঁড়াতে হল আমাদের।

যাই হোক, দাঁড়িয়েই যখন আছি, ঘরের ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করি। এই দিনের বেলাতেও ওখানে অন্ধকার। এত অন্ধকারে ওরা চোখে দেখে কি করে। হঠাৎ চোখ পড়ল দাওয়ার একপাশে একটা বেড়াল বসে ছিল এতক্ষণ, মাসিকে উঠে যেতে দেখে সেটাও এবার গা পিঠ টানটান করে একবার আড় ভেঙে নিল তারপর বারান্দা থেকে নেমে বাড়ির পাঁচিলের দিকে চলে গেল।

সুরিনা বেরুল একটুক্ষণ পরেই। মামুলি সাজসজ্জা। গায়ে একটা জাফরানী রঙের চাদর। চোখে গতকাল হয়তো কাজল পরেছিল, সেই কাজলই ভাঙাচোরা হয়ে একটু লেগে আছে। কপালে সবুজ রঙের টিপ। পায়ে সরু ফিতের চপ্পল। শাড়িটা বোধহয় নাইলেক্স-টাইলেক্সেরই হবে।

আর একটু পরে বেরুল মাসি। দরজায় সিকলি তুলে দিয়ে তালা লাগাল দুর্গা দুর্গা। শোভা, ঠাকুর পেন্নাম করেছিস তো মা?

ঘোষদা এবার হেসে রসিকতা করলেন, হুঁকোটা আবার সঙ্গে নেও নি তো মাসি। যেখানে যাচ্ছ সেখানে মেয়েছেলেকে হুঁকো টানতে দেখলে, কি হতে পারে জানো? আমাদের পিঠের চামড়া তুলে ছেড়ে দেবে।

মাসি একগাল হাসে, হাসিতে বোঝা যায়, হুঁকো তো দূরের কথা, ওকে সার্চ করে দেখতে পারো, একটা পোড়া বিড়িও যদি বেরয়। যেমন দেশ তার তেমন আচার, জানি না নাকি: হে' হে'—

সুরিনার হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ, কি আছে ওতে কে জানে। ব্যাগটাকে ও কায়দা মতো হাতে ঝোলাতে ঝোলাতে মাসির দিকে শক্ত চোখে তাকায়, বাবুদের সামনে হুঁকো টেনেছ বুঝি? তোমাকে না, দাঁতে দাঁত চেপে ধরে সুরিনা, মরার পরে হুঁকোটা তোমার চিতায় দেব।

এসব কথায় মাসির তেমন কিছু যায়-আসে না। মাসি আমাদের দিকে তাকায়, আসলে গলাটা বড় নিশপিশ করে কিনা, তাই। কতকালের অভ্যেস বলুন দেখি, ছাড়তে পারলে তো ছাড়ব, হে' হে'—

আমি তাড়া লাগালাম, ঠিক আছে, চলো এবার। আর দেরি করলে আমরা শোয়ের শেষে গিয়ে পৌঁছব।

নেবুতলার বস্তির ভেতর থেকে আমরা যখন ওদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম তখন চারটে বাজতে বেশি দেরি নেই। ঘোষদা স্টিয়ারিং ধরলেন, আমি ঘোষদার পাশে, পেছনের সিটে তুলে দেওয়া হল ওদের দুজনকে।

গাড়ির পেছন পেছন বস্তির কিছু বেওয়ারিশ ছেলেমেয়ে কিছুদূর অবধি দৌড়ল, তারপর ধীরে ধীরে তারা দূরে মিলিয়ে যেতে আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এখন মিস সুরিনা আর তার মাসিকে দেখে কেউ বলতে পারবে না, কি গা-ছমছম করা পরিবেশ থেকে এইমাত্র আমরা ওদের তুলে আনলাম।

গাড়ি বি টি রোড ধরল। ঘোষদা এক-হাতে স্টিয়ারিং রেখে সিগারেট ধরালেন, আমাকে একটা এগিয়ে দিলেন। সিগারেটের প্যাকেটটা পেছনে মাসির দিকে এগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে মনে করে আমি তা সংবরণ করলাম।

সুরিনা এমন সময় আমাকে প্রশ্ন করল, আপনাদের তবলচি ঠিক আছে তো বিলেবাবু? তবলা না হলে কিন্তু পা-ই নড়বে না।

জায়গা মতো গেলেই সব পেয়ে যাবে। সিগারেটের ধোঁয়া বাতাসে পেছনের দিকে ছুটে গেল। তবলা, হারমোনিয়াম, ভায়োলিন, বাঁশি সব আছে আমাদের। তা ছাড়া লাইট-ম্যানও আছে। স্টেজের জন্য জেনারেটর থাকবে, কথা আছে।

মাসি হাওয়া থেকে কান বাঁচাবার জন্য কাপড়টা মাথায় তুলে নিল, আসলে কথা হচ্ছে, যারা নাচ দেখবে তারা কেমন?

কেমন মানে। ঘোষদা স্টিয়ারিং হাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালেন।

না, মানে, ক্যাবারে নাচ-টাচ তো সব জায়গায় চালানো যায় না তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

ক্যাবারে নাচবে নাকি! এই সেরেছে! আমার মেরুদন্ড সোজা হয়ে উঠল একেবারে অজ পাড়াগেঁয়ে আসর, ওখানে ওসব নাচলে মাথায় ঘোল ঢেলে তাড়াবে মাসি।

আমারও তাই কথা। মাসি সেই একই ধরনের হাসি হাসে, হে' হে'—

সুরিনা এবার ঠোঁট ঘুরিয়ে একটু অভি-মানের ঢং করে, তাই বলে গ্রামে একগাদা কাপড়-চোপড় নিয়ে নাচতে হবে নাকি! ওসব নাচ বুঝি লোকে দ্যাখে এখনো।

গ্রামের মানুষ ওসব নাচই পছন্দ করে। চাষবাস করে খায়, ছাপোষা মানুষ সব, ওদের কাছে বেশি চড়া ডোজের কাজ নেই আমাদের। যেমন চায় ঠিক তেমনটিই আমরা দেখাব।

মাসি তাল দেয়, তা তো বটেই।

যেমন, আমি একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি, যেমন, সেই যে একটা গান আছে না, এককালে খুব মুখে মুখে ঘুরত, দেবতার মন্দিরে অঙ্গন তলে। দেবদাসী গো আমি পূজারিণী—

ওটা নাচতে হবে নাকি?

একেবারে ওটাই নাচতে হবে এমন কথা নেই, তবে ঐ ধরনের কিছু হলেই ভালো হয়। যেমন ধর না, আমি বনফুল গো। ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে—

হেসে উঠল সুরিনা, বেশ বলেছেন যা হোক!

তাহলে তুমিই বলো না, কি নাচলে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে:

মাসি শুধায়, আচ্ছা খ্যামটা নাচ চলবে?

ঘোষদা আবার পিছন ফিরে তাকান, কি রকম?

কি রকম! মাসি একটু ভাবতে সময়

নেয়, আচ্ছা, তুই একটা শুনিয়ে দেনা শোভা, কত তো জানিস তুই।

সুরিনা বলে খ্যামটা নাচ-ফাচও আজ-কাল আর চলে না।

চলে না বললে তো চলবে না আমাদের চালাতে হবে। ঘোষদার গলা থেকে এতক্ষণ পর সম্পাদক সুলভ স্বর বেরুল। বড়জোর আমরা খ্যামটা অবদি উঠতে পারি, তার বেশি নয়। সবচেয়ে ভালো হত, যদি আমরা ধর্মমূলক কোন নাচ দেখাতে পারতাম।

আচ্ছা ঝুমুর নাচলে কেমন হয়? শুনেছি, গ্রাম দেশে খুব ঝুমুর নাচের কদর।

হ্যাঁ, ঝুমুরও নাচতে পারে ও। মাসি সুরিনার দিকে তাকায়, কি, পারবি না?

সুরিনার যেন ঘুম পেয়েছে এমনি ভাব করল, তারপর নিস্পৃহ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তবলচি যদি ঠিক পাই, তা হলে তাই নাচব।

ঘোষদা বললেন, তবলচির জন্য আলাদা-ভাবে লোক পাঠান হয়েছে, ওসব ভাবনা আমাদের। ফাংসনটা যাতে ভালো হয় সে চিন্তা আমাদেরও বড় কম নয়।

মাসি ঘোষদার সঙ্গে তাল দিল, তা তো বটেই; তুই সেই নাচটা তো নাচতে পারিস শোভা চোখে ছটা লাগিল তোমার আয়না বসা চুড়িতে।

মাসি গুন-গুন করে গানটা টেনে তুলে তাল ঠোকে আঙুলে। সুরিনা গ্রাহ্য করে না। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে তখন ধান-ক্ষেত, দুটো একটা নারকেল গাছ, অনেক দূরে দূরে ঝোপঝাড়ের মতো গাছগাছালি, গ্রাম।

ঘোষদা গীয়ার পালটান। গাড়িটা যেন দ্বিগুণ বেগে ছুটতে শুরু করে। এমন জোরে চললে ঘন্টা দুয়েক আগেই আমরা পৌঁছে যাবো। বেশ নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছিল এখন নিজেকে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে এবার স্যামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলাম।

যখন পৌঁছলাম তখন রাত আটটা। দেখি কাতারে কাতারে মাঠঘাট ভেঙে লোক আসছে মণ্ডের দিকে। সার্কাসের তাঁবুর মতো প্যাণ্ডেল। তাঁবুর চারপাশ দিয়ে লাল-নীল অসংখ্য টুনি বাল্ব ঝলমল করছে। মাইকে গাঁক গাঁক করে গান বাজছে, এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের গানগুলি হিন্দি, অতি আধুনিক বম্বে ফিল্ম ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। এই অজ পাড়াগাঁয়ে যেখানে কাঁথা-কম্বল পিঠে ফেলে হাতে হারিকেন ঝুলিয়ে লোক আসছে, সেখানে এ ধরনের গান বাজানো হবে আমরা ভাবতেই পারিনি।

আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াতেই গাড়িকে ঘিরে লোক জমে গেল। মিস সুরিনার নামে পোস্টার চোখে পড়ল, মিস সুরিনাকে দেখার জন্যই যে ভিড় সন্দেহ নেই। কিছু কিছু ভলেনটিয়ার আমাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল। ভিড় ঠেলে আমরা মণ্ডের এক-পাশে বিশ্রামের জায়গায় উঠে এলাম।

এতক্ষণ পর মাসিকে দেখে মনে হচ্ছিল, দাপট কমে গেছে। এত বড় জনসমাবেশ কৌতুকের অন্ত ছিল না, আমাদের মতো সামান্য একটা নাম-না-করা দলের অভিনয় দেখতে এত লোক আসবে কে ভেবেছিল আগে। এখন শেষ রক্ষা করতে পারলে বাঁচা যায়।

ঘোষদা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, ব্যাপার দেখেছেন তো বিলেবাবু, এত লোক!

ওদের আর লোক বলে লাভ নেই ঘোষদা, জন-গণেশ বলে ডাকুন। আমি নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলাম।

ঘোষদা হাসলেন না, বললেন, যাক গে, জনগণেশই বলুন আর যাই বলুন, সামলাবার চেষ্টা করুন এবার। আমি একবার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে আসি। বলতে বলতে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন।

সুরিনাকে দেখে এখন কে বলবে ও নেবুতলার বস্তির মেয়ে। ওর চোখে মুখে কোথাও লেখা নেই ও খারাপ পাড়ায় থাকে। আর ওর মাসি এখন দালাল মাসি নয়, সত্যি-কারেরই মাসি।

জয়দেববাবুর তবলচি আনার কথা, এনে-ছেন কিনা কে জানে। কোথাও ওর টিকিও দেখা গেল না। একপাশে ঐ কোণের দিকে পরমেশ হারমোনিয়ম নিয়ে সুর ঠিক করতে বসেছিল, হারমোনিয়মের রিডের ওপর একটা হ্যারিকেন তারই পাশে বইয়ের পাতা খোলা। পরমেশের হাতে সুরিনাকে গছিয়ে দিয়ে আমিও বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমার ছোট-খাট রোল, শেষ মুহূর্তে মেক-আপ সারলেই চলবে।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি চারপাশে বেশ জমজমাট মেলা বসে গেছে। চা ফুলুরি বেগুনী, মাদুর গামছা, হরেক রকম খেলনা, বেলুন, দোকানের পর দোকান। দূরে ধান-ক্ষেতের কাছাকাছি একটা জেনারেটর চলছে, একটানা যান্ত্রিক একটা শব্দ আসছে। জেনা-রেটর থেকে লাইন এসেছে বাঁশের খুঁটির ওপর দিয়ে, মাথায় মাথায়।

তাঁবুতে ঢোকার জন্যে টিকিট ঘরের সামনে বেশ লম্বা কিউ পড়েছে। যম দুয়ার থেকে টেনে উঠিয়ে এক বুড়িকে কারা যেন ডুলিতে চড়িয়ে নিয়ে এসেছে নাটক দেখাবার

জন্য। সত্যি সত্যি কি নাটক দেখাবার জন্য, না মিস সুরিনার নাচ। মিস সুরিনা কলকাতার বিখ্যাত নাচিয়ে, একথাটা কেমন-ভাবে যেন প্রচার হয়ে গেছে মুখে মুখে। অথচ আমরাই জানি, আসল ঘটনাটা কি!

বাইরে অল্প একটুক্ষণ ঘুরতে ঘুরতেই আমার মালুম হয়ে গেল, সুরিনাই আজ তুরুপের তাস। একটু রিহার্সেল টিহার্সেল দিয়ে মেয়েটাকে তৈরি করে নিলে হত। কেমন নাচে ও আমাদেরও জানা নেই। এমনও হতে পারে ওর নাচের কায়দা কানুন দেখে হিতে-বিপরীত ঘটবে, ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করবে জন-গণেশ।

দেখি, টিকিট ঘরের কাছাকাছি ঘোষদাকে ঘিরে জনাকয়েক লোক। এগিয়ে গেলাম।

ঘোষদাও আমাকে দেখেছেন, এগিয়ে এলেন, কি ব্যাপার, ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? মেক আপ করবেন না? জয়দেব তো খালি হাতে এসেছে, শুনেছেন?

সে কি, তবলচি কি হবে?

শীতলকেই বসিয়ে দিন। কাজ চালিয়ে নিন আজকের মতো।

কাজ চালিয়ে নেব, বলেই খালাস ঘোষদা; কিন্তু কাজটা যে কি ভাবে চলবে; কেন জয়দেববাবু যান নি তবলচি আনতে?

গিয়েছিলেন, তবলচি ভদ্রলোকের বাবার অসুখ। এখন-তখন অবস্থা। এ অবস্থায় তো আর তুলে আনা যায় না কাউকে।

তা যায় না, কিন্তু গাড়িতে আসতে আসতে তো শুনলেন কি বলছিল ওরা।

শুনেছি। কিন্তু ভাববেন না মশাই, ঘোষদা আমাকে চোখে চোখে বোঝাতে চাইলেন, এ চাষাভুষোর দেশে ওতেই যথেষ্ট। একটুকুই আগে হজম করুক তো! তারপর দলের সম্পাদকীয় দায়িত্বে বললেন, শীতল তো এতকাল বাজিয়ে এল, ওকেই তৈরি হতে বলুন। আর হ্যাঁ, ভেতরে আপনাদের চা গেছে তো?

কর্মকর্তাদের একজন, বেশ চোকো আকারের লোক হা হা করে উঠলেন, সে কি চা যায় নি এখনো? এই নস্যি, ভেতরে চা পাঠাস নি গ? তুরা আমাদের ডুবাবি দেখছি।

নস্যি নামক ছোকরাটি সাঁ করে ঘুরে বেরিয়ে এগিয়ে এল, চা তারাপদ দিচ্ছেন গ।

ঠিক আছে, আপনি ভেতরে গিয়ে তাড়া দিন এবার। শো আরম্ভের আগে এখানকার এম-এল-এ বক্তৃতা দেবেন। কিন্তু তার আগে পরমেশকে দিয়ে একটা উদ্বোধন-সংগীত গাওয়াতে হবে।

সুরিনা নির্ঘাৎ ক্ষেপে যাবে। এমনিতেই ওকে বোঝান হয়েছে অশ্লীল কোন কিছু নাচ চলবে না, তার উপর যদি শোনে তবলচি আসে নি, তা হলে ওর ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু উপায় যখন নেই, তখন ভেবেও আর লাভ নেই। আবার ভেতরে এসে স্টেজের এপাশ ওপাশ খানিকক্ষণ ঘুরে মেকআপের ঘেরা জায়গায় এগিয়ে এলাম। আয়না চিরুনি পরচুলা পাউডার পাফ আর সাজ-পোশাকে চারপাশ জমজমাট। বাড়তি আলোর জন্য এখানে একটা হ্যাজাক ঝোলান হয়েছে। তিন-দিকে চটের বেড়া, কিন্তু মেকআপ দেখার জন্য চটের ওপাশ থেকে বেশ উঁকিঝুঁকি চলছে। গ্রামদেশে নাটক করতে হলে এটাই স্বাভাবিক। ওদিকে গ্রাহ্য করে লাভ নেই। দেখলাম, সুরিনাকে নিয়ে তখন হিমসিম খাচ্ছে মাসি, ওর খোঁপা ঠিক করে দিচ্ছে। একটা ঘাগড়া মতো কি যেন ঝলমলে পোশাক ওর পরনে। বুকের ওপর ওড়না গায়ে জরি বসানো জামা।

আমি পেছনে এসে দাঁড়াতেই সুরিনা মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে করুণ চোখে তাকাল, তবলচি আসে নি শুনলাম, কি হবে বলুন তো?

কি আবার হবে, তবলা যখন এসেছে বাজবে ঠিকম।

মাসিকেও কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। মাসি বলল, নাচের আসল জিনিসই হচ্ছে তবলা। তাই যদি না থাকে, কি নাচবে ও। তাছাড়া এত বড় প্যাণ্ডেল!

এত বড় প্যাণ্ডেল বলেই তো সুবিধে গো মাসি। আর তবলচির কথা বলছো, আমরা ভালো বাজিয়ে খোঁজ করছিলাম, পাওয়া যায় নি তা কি করা যাবে। তবে ঐ শীতল যে আমাদেরে গানে-ফানে রেগুলার বাজায়, ওই বাজাবে। ভাববার কিছু নেই। একান্ত না হয় রেকর্ড বাজিয়ে দেব, তারই সঙ্গে নাচবে।

মাসি আবার ওর খোঁপায় হাত দেয়।

সুরিনা বিড়বিড় করতে থাকে, আমার কেমন ভয়-ভয় করছে বিলেবাবু। এত বড় প্যাণ্ডেলে কখনো নেচেছি নাকি!

আমি একটা সিগারেট ধরালাম, তারপর সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, স্টেজে নামলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এর চেয়েও বড় প্যাণ্ডেলে আমরা নাটক করেছি পার্ট মুখস্থ ছিল না, বেশ চালিয়ে গেছি। আসলে বড় প্যাণ্ডেলের একটা সুবিধা আছে, বাড়তি একটা মেজাজ পাওয়া যায়।

আবার চা এসে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি একটা ভাঁড় তুলে নিয়ে আমি সরে এলাম।

এম-এল-এ বাবুর বক্তৃতা করার কথা কিন্তু এসে পৌঁছন নি উনি। কাজের মানুষ কোথায় না কোথায় আটকে আছেন কে জানে। শেষটায় স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার সুধীর পারকে টেনে তোলা হল স্টেজে। আপনি স্যার দুচার কথা বলতে পারবেন। তাছাড়া গাঁয়ের যে দু-চারজন তিনটে-চারটে পাশ করা শিক্ষিত লোক আছেন আপনি তাদের মধ্যে একজন।

সুধীরবাবু প্রথম দিকে উঠতেই চান না পরে মাইক হাতে যখন দাঁড়ালেন টানা এক ঘন্টা। তিন-চারবার উনি সময় বেশি নেবেন না বলে ঘোষণা করেও পাকা একটি ঘন্টা চালিয়ে গেলেন। ওদিকে জন-গণেশের মুখ দেখা যাচ্ছে না তখন। ভেতরে তিলধারণের স্থান নেই। খই ফোটার মতো কেবল শব্দ। ভলেনটিয়াররা বোধকরি থামাবার চেষ্টা করে হার মেনে নিচ্ছে। হেডমাষ্টারের বক্তৃতা শেষ হলে খুশীতে কি অখুশীতে বোঝা গেল না খুব কষে একচোট হাততালি পড়ল। হাত-তালির শব্দ থেকেই বোঝা গেল ভেতরের গোটা দর্শকবৃন্দ একটা মোষের মতো, সিং উঁচিয়ে তেড়ে এলে অনায়াসেই এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে সবকিছু।

এ অবস্থায় নাটক শুরু করার আগে জন-গণেশকে একটু সন্তুষ্ট করে নেওয়া দরকার। শীতলকে তবলায় বসিয়ে দেওয়া হল। হার-মোনিয়ম বাঁশি বেহালা যে যার মতো তৈরি। হুইসল বাজতেই ধীরে ধীরে পর্দা সরতে শুরু করল মিস সুরিনা মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে হাতে রেকাবি তাতে ফুল চন্দন শংখ।

হারমোনিয়ম বেজে উঠল দেবতার মন্দিরে অংগন তঅলে—

দেবদাসীর ভঙ্গিতে এখন নেবুতলার খারাপ পাড়ার মেয়ে মিস সুরিনা। পায়ের ঘুঙুরের শব্দ উঠল ঝুমঝুমে করে। মাখনের মতো শরীর মেরুদন্ডহীন শরীর। পবিত্র চোখে একবার জন-গণেশের মুখ দেখবার চেষ্টা করল সুরিনা।

অডিটোরিয়ামে আলো কম। আবছা আলোয় মুখের কোন ভাবান্তরই বোঝা যাচ্ছে না। তবে সেই খইফোটা বিজবিজ শব্দটা যেন থেমেছে।

উইংসের পাশে মাসি। মাসি সুরের সঙ্গে সঙ্গে কথা ভরিয়ে দিচ্ছে গলায়। হাত-তালি দিয়ে তাল ঠুকছে মাসি। উইংসের পাশ থেকে দর্শক দেখা যায় না দেখা গেলে বোঝা যেত নাচটা ঠিক মতো ধরছে কি ধরছে না।

মঞ্চের কোণের দিক থেকে লাল নীল আলো তীরের বেগে ছুটে ছুটে আসছে। তবলাটা আর একটু তুলছে না কেন শীতল-বাবু। যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাজাচ্ছে এত নীচু হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে যে ওর পায়ের তালে তাল পড়ছে কিনা কে জানে।

নিজের এই অসুবিধার কথা তবু ধরতে দিতে চায় না সুরিনা। যারা নাচ দেখতে এসেছে তারা কি দেখতে চায় সুরিনা জানে। দেখতে চায় তাজা একটা শরীর। বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন ঢংয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চেটে-পুটে দেখতে চায়, অথচ এমন একটা গানের সঙ্গে নাচতে হচ্ছে ওকে যাতে রক্ত নির্জীব হয়ে যায়।

সামনের ঐ লোকগুলো কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! এত কসরৎ করছে সুরিনা এত কণ্টকর ভঙ্গি করে দেহটাকে ও ভেঙেচুরে একাকার করে ফেলছে অথচ সাড় নেই; হাত-পা গুটিয়ে অমনভাবে জড়ভরতের মতো বসে থাকতে পারছে কি করে লোকগুলি!

হতাশভাবে বাকি নাচটুকু ও শেষ করে নিয়ে চোখের ইশারায় মাসির দিকে তাকায় আর কত পর্দা ফেলব এবার।

পর্দা পড়ে গেল। অথচ একটি লোকেরও হাততালি শুনল না সুরিনা। মাসির কাছে এগিয়ে এসে ছলছলে চোখে তাকাল এসব নাচ দেখবে কেন লোকে! তার উপর আবার

তবলাটা দেখলে তো! আমি তখনই বলে-ছিলাম।

মাসি বলল আমাদের কি যাদের অসুখ তারাই যদি অষুধ না খায় কে কি করবে।

সুরিনার অবস্থাটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। অথচ তখন আর করার কিছুই নেই। আর দু-এক মিনিটের মধ্যেই নাটক শুরু হয়ে যাবে। নাটকের মাঝে দুবার বিরতি সেই বিরতির সময়ে আবার স্টেজে তোলা হবে সুরিনাকে।

এবার না হয় একটা ঝুমুর নাচো। এগিয়ে এসে ফিসফিস করে সুরিনাকে বললাম।

সুরিনা কোন উত্তর দিল না। মাসি বলল মেয়ের মন খারাপ হয়ে গেছে বাবু। আপনারা নাচিয়ে এনেছেন, সঙ্গে বাজিয়ে আনেন নি।

যা হবার তা তো হয়েছে এখন সামলে দাও মাসি। এর পরের বার না হয় সবরকমের আয়োজন করে বেরুব।

সুরিনা এবার ঘুরে দাঁড়ায় আসলে লোকগুলোও কেমন গবেট-মার্কা। কেমন মরা মাছের মতো চোখ তুলে কেবল হাঁ করে তাকিয়েছিল হাসেও না কাঁদেও না।

হুইসল বাজতেই আবার পর্দা উঠল। নাটক শুরু। এ নাটক নিশ্চয়ই নাড়া দেবে ওদের। চাষীর জীবন নিয়ে নাটক। ওদের ভালো না লেগেই পারে না। প্রথমেই একটা খামারের দৃশ্য অনেকেই ঢুকবে। বেরুবে উইংসের পাশে এখন দাঁড়িয়ে থাকাটা উচিত নয় সুরিনাদের নিয়ে আবার মেক-আপ রুমের দিকে এগিয়ে এলাম।

একটা কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। সিগারেট ধরালাম। সুরিনার জন্য সত্যি সত্যি খারাপ লাগছিল বোধহয়। খুব যে একটা এলেবেলে নাচল ও তাও নয় অনেকে নাচিয়েরই ওরকম পায়ের কাজ থাকে না. অথচ দর্শকের কাছ থেকে সাড়া না পেলে কার উৎসাহ থাকে। শালা জন-গণেশের মর্জি বোঝাই ভার।

ঘোষদা এখন আসরের সামনের দিকে বসে আছেন। ঘোষদার কাছ থেকে একটা পারমিশন নিয়ে ক্যাবারে নাচিয়ে দিলে কেমন হয় সুরিনাকে। সামনা একটা প্যালটি আর রা। মরা মানুষও লাফিয়ে উঠবে।

আচ্ছা ক্যাবারে নাচবে? আমি প্রশ্ন করলাম।

সুরিনা ঘুরে তাকাল। গাঁটার নেই কিন্তু নেই ক্যাবারে। হারমোনিয়ম আর বাঁশি বাজিয়ে কেত্তন গাওয়া যায় আর কিছু হয় না।

আমরা যদি মাইকে রেকর্ড বাজাই!

সুরিনা কি একটু ভাবল। মাসি বলল, রেকর্ড বাজালে আর নাচতে কি! নাচ না!

আপনাদের মুখ কালো হবে না? আমাকে তুলে এনেছেন গেরস্থবাড়ির মেয়ে বলে আমি ওরকম নাচলে ক্ষতি হবে না? গলার স্বরে বেশ খানিকটা ঝাঁজ বেরিয়ে এল সুরিনার।

সে চিন্তা তো আমাদের। আসলে ক্যাবারে এখনকার লোক বাঙ্গের অন্যান্য দেখে নি। চাষাভুষো সরল সোজা মানুষ শেষটায় সব ছি-ছি করে আসর ছেড়ে চলে যাবে কিনা তাই ভাবছি নইলে আমাদের আর আপত্তি কি।

মেয়েছেলের শরীর না দেখে চলে যাবে! ফুঃ! তারপর কি একটা কুৎসিত কথা বলল সুরিনা, পুরোটা তার শুনতে পেলাম না। এসব নিয়ে এখন আর রঙ্গরসিকতা করারও সময় নেই। একটা চিরকুট লিখে ঘোষদাকে ডেকে পাঠালাম।

ঘোষদা এলে বললাম সুরিনা ক্যাবারে নাচতে চাইছে ঘোষদা।

লাভ আছে কিছু! ঘোষদা আমার দিকে তাকালেন এত চমৎকার অভিনয় করছে ছেলেরা অথচ দেখুন গে যান সব হাঁ করে বসে আছে। ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

তবু একবার চেষ্টা করে দেখি না।

দেখুন। ঘোষদা আবার কেটে পড়লেন। ঘোষদাও খুব দমে গিয়েছেন বোঝা গেল।

আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে

বনফুলের গল্প

এতবড় একটা এলাহি আয়োজন অথচ সবটাই যেন বৃথা যেতে বসেছে।

সুরিনাকে তৈরি হতে বললাম।

কি বাজাবেন শুনি?

রেকর্ড তো আর সঙ্গে আনি নি এখানে যা পাওয়া যায় তাই একটা চেয়ে নেব।

মাসি বলল একটা খুব তালের গান নিয়ে আসুন। এবারও যদি না হয় বুঝব পুরুষ নয় এরা।

কথাটা এমন ভঙ্গি করে বলল যাতে চমকে উঠতে হয়। কিন্তু মাসিকে আমার না-চেনার কথা নয় বললাম ঠিক আছে সুরিনাকে সাজিয়ে দাও আমি দেখি।

পর্দা পড়ল। নাটকের একটা ইনটার-ভেল। মাইকে ঘোষণা করা হল কলকাতার বিখ্যাত নৃত্য-পটিয়সী মিস সুরিনা এবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছেন বিশেষ একটি ক্যাবারে নাচের ভঙ্গিমায়।

দর্শকদের মধ্য থেকে বোধহয় খই ফোটার শব্দ উঠল। এই শব্দ আমরা হেডমাস্টার মশাইয়ের বক্তৃতা করার সময়ও শুনেছি। এটা আশাপ্রদ না বিপরীত বোঝার উপায় নেই।

যা থাকে কপালে উইংসের পাশে দাঁড়িয়েছিল ননী। হুইসল বাজতেই দড়িতে টান কষাল পর্দার। গ্রামোফোন রেকর্ড গাঁক গাঁক করে বেজে উঠল। মঞ্চে আলোর ঘূর্ণি সেই ঘূর্ণির ভেতর থেকে তপন একজোড়া বুক আর উরু প্রকট হয়ে এগিয়ে এল সামনে। সরু কোমর। লাড পিঠ মসৃণ নগ্ন। আঙুলের নখে সোনালী রং চকচক করছে আলো ঠিকরোচ্ছে লতার মতো বাহু দুলছে তালে তালে।

অতি-পরিচিত বহু ব্যবহৃত একটা অর্কেস্ট্রা বাজছে পিছনে। কথার কলিগুলো স্পষ্ট নয় ফ্যাসফেসে শব্দ। কিন্তু চোখের সামনে ঝাঁকড়াচুলো ট্যাঁশ একটা ছোকরাকে যেন স্প্যানীশ গীটার হাতে মাতাল হয়ে দেখতে পাচ্ছে সুরিনা। ভুরভুর করছে মদের গন্ধ। সিগারেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় রহস্যময় ইন্দ্রজাল। সুন্দরী মহিলাদের গা থেকে কসমো টিকসের গন্ধ যেন সাপের মতো কিলবিল করে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এই না হলে নাচা যায়। বুকের ওড়নাটা পলকা একটা মেঘের মতো হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল সুরিনা। ওপাশে মাসির মুখখানা পলকে একবার চোখে পড়ল। মাসির চোখে যেন জ্যোতি। মাসি বাহু দুটো দুলিয়ে দুলিয়ে জানান দিল শাবাশ শোভা নেচে যা নেচে নেচে নিজেকে আরো বিলিয়ে দে কুটি কুটি করে।

পায়ের নখ থেকে কপালের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত কেবল ঢেউ। রক্তের ভিতরই যে নাচুনি শুরু হয়েছে সুরিনার। ফুসফুস থেকে তাজা রক্তের স্রোত গমকে গমকে ছুটে যাচ্ছে শিরা থেকে উপশিরায়। এই না হলে নাচ। এতক্ষণ পর সুরিনার মনে হল ও নতুন করে আবার বেঁচে উঠছে।

সামনে হিমালয়ের মতো নির্জীব একখণ্ড পাথর বসিয়ে রেখে যেন নেচে যাচ্ছে ও। আবছা অল্প অল্প আলোয় অডিটোরিয়ামে মুখগুলি তেমন স্পষ্ট নয়। এখনো কি জাগবে না ওরা! সরু সাঁড়াশির মতো ও তলে নিজের প্রত্যঙ্গ দেখাতে দেখাতে ঘুরে আলোর ঘূর্ণির সঙ্গে এক হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায় সুরিনা।

আর এ সময়ই থরথর করে ওর বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে। তীক্ষ্ণগলায় অডিটোরিয়াম থেকে একটা শিস ভেসে আসে ওর কানে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই খই ফোটা শব্দটা ফেঁপে ফুলে প্রকান্ড হয়ে ওঠে আবার একটা শিস। আবার আবার।

গ্রামোফোনের ডিসক তৎক্ষণে ঘুরে ঘুরতে শেষ হয়ে যায়। মাপা সময় মাপা পরিধি এর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই সুরিনার। শেষের ঝংকারটি দেহের প্রতি অণুতে অণুতে ছড়িয়ে দিতে দিতে সুরিনা দেখে ভারী বাদামী রঙের পর্দা আবার নেমে আসছে। জনগণেশের মুখে অভিব্যক্তি আর বোঝার প্রয়োজন মনে করে না ও।

কিন্তু শুনতে পায় বরফ গলে জল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে অডিটোরিয়াম। বাই প্রচন্ড হাততালি চিৎকার। আর তারই মাঝে তীক্ষ্ণ পাখির স্বরের মতো প্রলম্বিত কিছু শিস।

মাসি মাসি। সুরিনা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে মাসিকে আমি পেরেছি মাসি আমি পেরেছি।

খুশীতে উচ্ছল হয়ে আমিও ছুটে এসে ছিলাম দেখি টপটপ করে মাসির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। জিতে গেলে মা ঐভাবেই বুঝি কাঁদে।

এই বাংলার খবর

সংগ্রহ নিয়ে দুশ্চিন্তা

ধান-চাল সংগ্রহের কাজ সরকারিভাবে শুরু হওয়ার পর তিন মাস যদিও পার হতে চলেছে তবু সংগ্রহের পরিমাণ এখনও পর্যন্ত লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে থাকায় পশ্চিমবাংলা সরকার সংগত কারণেই ভাবনায় পড়েছেন। চাল সংগ্রহের লক্ষ্য পাঁচ লাখ টন কিন্তু জানুয়ারির শেষাশেষি নাগাদ সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লাখ টনের কিছু বেশি। গত বছর এই সময়ের মধ্যে এর চেয়েও ৪০ হাজার টন কম চাল সংগৃহীত হয়েছিল, কিন্তু তাতে সান্ত্বনা পাওয়ার বিশেষ কিছু নেই, কারণ লক্ষ্য পূরণ করতে এখনও দরকার চার লাখ টন চাল। বাকিটার বেশির ভাগই আসবে কথা চালকল আর চাষীদের কাছ থেকে লেভি হিসেবে। কিন্তু লেভি আদায়ের পরিমাণ এপর্যন্ত মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়, মাত্র ২৮ হাজার টন।

এদিকে চালকলের মালিকদের হালচালও রাজ্য সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ বলেছেন, কোনো চালকল যদি সংগ্রহ-নীতির বিরোধী আচরণ করে, তবে তার সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকার ধান কেনার জন্যে যে দর বেঁধে দিয়েছেন (প্রতি কুইন্টাল ৭৭ টাকা) অনেক চালকল তার চেয়ে বেশি দর দিয়ে (১২০ থেকে ১৩০ টাকা) ধান কিনছে এবং লেভিমুক্ত চাল চড়া দরে বেচে মোটা লাভ করছে। এ-বিষয়ে কড়া নজর রাখার জন্যে জেলা-শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধান ভানা কলের ওপর লেভি বসিয়ে যে চাল সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছিল আদালতের রায় তা বানচাল হয়ে যাওয়ার ফলে সরকারের অসুবিধে আরো বেড়েছে। লেভি এড়ানোর চেষ্টায় অনেক চাষী আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। এই ব্যাপারটার মোকাবিলা কীভাবে করা যায় তা স্থির করার জন্যে রাজ্য সরকার আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছেন।

খাদ্যনীতি-বিরোধী কাজ করার জন্যে সাজা দেওয়ার কাজ সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছুদিন আগে মেদিনীপুর জেলায় লাইসেন্সহীন ধান-ভানা কলের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছিল। এবার বর্ধমানে এই ধরনের অভিযানে এ পর্যন্ত ১১০টি বেআইনী ধান-ভানা কল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে (মিসা) জোতদার ফড়িয়া আর চোরাকারবারী মিলিয়ে ৬০ জনের বেশি লোককে আটক করা হয়েছে। ঐ জেলায় নানা জায়গায় হানা দিয়ে মজুত উদ্ধার করা হয়েছে দু' হাজার কুইন্টালের বেশি চাল আর এ-ব্যাপারে গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিনশ'রেরও বেশি।

সবার আগে বিদ্যুৎ

গত কয়েক বছর ধরে বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে ঝামেলা পোহাবার পর পশ্চিমবাংলা সরকার রাজ্যের ১৯৭৫-৭৬ সালের যোজনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৭৪-৭৫ সালের তুলনায় প্রায় সব খাতেই ব্যয়-বরাদ্দ বেড়েছে, কারণ বার্ষিক যোজনার মোট বরাদ্দ বেড়ে গেছে বিশ কোটি টাকা—১৫০ কোটি থেকে ১৭০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার এই মোট বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্যে যোজনা কমিশনের কাছে যে দরবার করেছিলেন তা বিফলে যায়নি। তবে এই বর্ধিত বরাদ্দ মেটাবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে বাড়তি সাহায্যের দাবি জানানো হয়েছিল তার কী হলো তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

চলতি আর্থিক বছরে বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪৮ কোটি টাকা। আগামী বছরে ঐ অঙ্ক হবে ৫৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা। বিদ্যুতের পরই ঠাঁই পেয়েছে সেচ। আগামী বছরে এই খাতে লগ্নী হবে ১৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা। চলতি বছরে ঐ পরিমাণ ছিল ছ' কোটি টাকা কম। যোজনা কমিশনের ইচ্ছে, চাষ-বাসের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হোক। সেই জন্যেই চলতি বছরে যেখানে এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল দশ কোটি টাকার কিছু কম আগামী বছরে সেটা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা। চাষবাসের উন্নতির জন্যে রাজ্য সরকার যে সমগ্র অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প বা সি এ ডি পি'র কাজ সুরু করেছেন তার জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা।

পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন যে পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার প্রথম দু' বছরেই (১৯৭৪-৭৬) এই রাজ্যের জন্যে মোট বরাদ্দ দাঁড়াচ্ছে ৩২০ কোটি টাকা। গোটা চতুর্থ পাঁচ-সালা যোজনায় অর্থাৎ ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩২২ কোটি টাকা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করা নিয়ে বিতর্ক আর একটি ধাপ পার হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হোক। এর প্রায় আট মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভায় যখন এই প্রস্তাব আসে তখন তা নিয়ে যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল। সিনেটে প্রস্তাব এসেছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে 'ঘোষণা' করা হোক। স্মরণ থাকতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত গণি কমিটি সুপারিশ করেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেনে নেওয়া হোক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন, হলেন এই সুপারিশের উৎসাহী সমর্থক। সত্যেনবাবু বার বার বলছেন, কলকাতা যদিও দেশের মধ্যে বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়, তবু এটি দরিদ্রতমও বটে (ছাত্র পিছু ব্যয়ের হিসেবে)। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত হলে অর্থচিন্তা কমে, কারণ সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়া যায়।

কিন্তু এই প্রস্তাবের যাঁরা বিরোধী তাঁরা বলতে থাকেন, এই সুপারিশ গৃহীত হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়বে, তার স্ব-শাসনের অধিকার বলতে আর কিছু থাকবে না। এখন সিন্ডিকেটের সভায় যে-প্রস্তাব গৃহীত হলো, তাতে দু' কূলই রাখার ব্যবস্থা হয়েছে

বলে শিক্ষাব্রতী মহল মনে করছেন। সেই কারণেই নাকি 'ঘোষণার' বদলে 'স্বীকার' কথাটা (ইংরেজিতে 'ডিক্লেয়ারের' বদলে 'রেকগ্‌-নাইজ') ব্যবহার করা হয়েছে। 'ঘোষণা' করা হলে নাকি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ বেড়ে যায়। সে যাই হোক, গণি কমিটির সুপারিশের যা মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সাহায্য আদায়ের ব্যবস্থা করা, সিণ্ডিকেটের প্রস্তাবে সে-বিষয়টির ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গণি কমিটির রিপোর্টে অবশ্য এই সুপারিশ ছাড়া আরো অনেক সুপারিশই ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাঠামো ঢেলে সাজানো। উপাচার্য জানিয়েছেন, এই সব সুপারিশ সম্পর্কে শীঘ্রই বিশদ আলোচনা হবে।

তেলের সন্ধানে

দেশের নিচে মাটির তলায় এবং উপকূলবর্তী এলাকায় সমুদ্রের নিচে তেলের সন্ধানকে এখন সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমদানি-করা পেট্রলিয়ামের চড়া দামই এই সরকারি উৎসাহের প্রধান কারণ। বোম্বাইয়ের উপকূলে এই সন্ধানের কাজে ইতিমধ্যেই বেশ সাফল্য লাভ করা গেছে। এখন শুরু হতে চলেছে অন্যান্য উপকূল এলাকায় তেল সন্ধানের কাজ। বঙ্গোপ-সাগর এলাকায় প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। এই সমীক্ষার কাজ করেন দুটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান। গত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো বিদেশী প্রতিষ্ঠানের হাতে এই ধরনের কাজের দায়িত্ব দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এখন সেই নীতি বদল হয়েছে। ঐ দুটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, বঙ্গোপসাগর উপকূলে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সেদিন কেন্দ্রীয় তেল দপ্তরের মন্ত্রী কেশবদেও মালব্য কলকাতায় জানালেন, বঙ্গোপসাগর উপকূলে তেলের অনুসন্ধানের জন্যে খননের কাজ ফেব্রুয়ারীতে শুরু হবে। এছাড়া পশ্চিমবাংলার যে-সব এলাকায় তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তার মধ্যে আছে বর্ধমান আর ২৪ পরগণা। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, বর্ধমানে মাটির নিচে তেল ও গ্যাস পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ২৪ পরগণায়ও তেল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঐ জেলায় খনন কাজ শুরু হবে অল্প দিনের মধ্যেই।

হাসপাতালে ইঁদুর

কলকাতার, অথবা এই বাংলার নানা হাসপাতাল সম্পর্কে এ-যাবৎ নানা অভিযোগই শোনা গেছে। কিন্তু কলকাতার বুকে চিত্তরঞ্জন শিশু সদনে সেদিন যে-ঘটনা ঘটে গেল, তা এদেশী হাসপাতালের ইতিহাসেও বিরল। ঐ শিশু সদনটিতে ১৯ জানুয়ারি কাজল বাউরি নামে একটি তিন মাসের শিশুকে ভর্তি করা হয়। পরদিন তার কাকা হাসপাতালে খবর নিতে গিয়ে জানতে পারেন, কাজল মারা গেছে। শিশুটিকে তিনি দেখতে পান হাত ও মুখের একাংশ খাওয়া অবস্থায়। হাসপাতালের নার্সেরা জানান, মারা যাওয়ার পর ইঁদুরের কামড়ে শিশুটির ঐ অবস্থা হয়েছে। কিন্তু কাজলের আত্মীয়স্বজন অভিযোগ করেন, ইঁদুরের কামড়েই তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা নিজে শিশু সদনে গিয়ে খোঁজখবর করেন। এ-বিষয়ে তদন্তের জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের কর্মচারীরা জানান, এই হাসপাতালে ইঁদুরের উপদ্রব মোটেই নতুন কথা নয়। একজন নার্স তো জানান, এটা ইঁদুরেরই হাসপাতাল, মানুষের নয়। রোগীরা এখানে সন্ত্রস্ত থাকেন ইঁদুরের ভয়ে। এই হাসপাতালেই এর আগে অন্তত তিনটি ইঁদুরে কামড়ানোর ঘটনা ঘটেছে বলে প্রকাশ, কিন্তু মৃত্যুর ঘটনা এই প্রথম।

—দেবদত্ত

পটভূমি

শীঘ্র নির্বাচন না হলেও, সামনে তুমুল লড়াই

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বহুত্তর লড়াই-এর দিকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। তাদের কৌশল প্রথম রাউন্ডে কাজ দিয়েছে। সংগঠন কংগ্রেসের নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে জোট বেঁধে তারা আন্দোলন করার পরিকল্পনা পাকা করে ফেলেছে। এদের সবায়ের শত্রু শাসক কংগ্রেস। নির্বাচনই হচ্ছে একমাত্র অস্ত্র যার দ্বারা তারা সিদ্ধার্থশংকর রায়দের জখম করতে পারতো। কিন্তু নিরপেক্ষ স্বাধীন নির্বাচন হতে পারবে না বলে তাদের ভয়। কারণ '৭২ সালের অভিজ্ঞতা তাদের রাতের ঘুম নষ্ট করে দিয়েছে। অতএব সি পি এম ভাবছে রিভলবারের লড়াই-এ হেরে গিয়ে তারা যদি লোকসভায় কম আসন পায় তাহলে পার্টির ইমেজ ধূলোয় মিশিয়ে যাবে। তাই নির্বাচন নয়। এর বিরুদ্ধে বয়কট-এর শ্লোগান তোলা দরকার। কিন্তু একা তারা শ্লোগান দিলো আর দক্ষিণপন্থী ও অন্যান্য বামপন্থী দল এই অবস্থার মধ্যেই নির্বাচনে নেমে পড়লো ফলে অবস্থা আরো খারাপে দাঁড়াবে। তাই তাল সামলানোর জন্য তাদের সকলকে নিয়ে দল বাঁধা একান্ত দরকার। প্রফুল্ল সেন বা জনসঙ্ঘের হরিপদ ভারতী এমন কি সুশীল ধাড়াকে নিয়ে দল করতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু কিছুদিন আগেও সি পি এম তাদের নীতি অনুসারে এদের অপাংক্তেয় মনে করতো। শুধু মার্কসবাদী পার্টির কথা বলি কেন, প্রফুল্লবাবুর মত প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতাও মনে করতেন কম্যুনিস্টদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করার চেয়ে মৃত্যু বরণ করা শ্রেয়ঃ। এবা গান্ধীবাদ বিশ্বাস করে না। এদের এ ব্যাপারে কোন শ্রদ্ধাও নেই।

কিন্তু রাজ্যের রাজনীতি এখন এমন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে যে, অতীতের সব কিছু নীতি বা প্রস্তাবের কথা ভুলে গিয়ে তারা উভয় দলই আবার বৈঠকে বসেছেন লড়াই-এর 'ব্লু প্রিন্ট' তৈরী করার জন্য। তাদের সকলের একই শত্রু; যেমন করে হোক শাসক কংগ্রেসকে গদীচ্যুত করতে হবে। তবে আজ এ-কথা যদি কেউ বলে সি পি এম ও প্রফুল্লবাবু উভয়েই সর্বনাশ খেলায় মেতেছেন তাহলে বোধহয় খুব ভুল হবে না। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলের কথা একবার এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার। সে সময় কি পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল? মার্কসবাদী নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত আর সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। সুশীল ধাড়া চাইছিলেন জ্যোতি বসুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেড়ে নিতে। আর জ্যোতিবাবু সুশীলবাবুকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য কৌশল খুঁজছিলেন। এবং তারই পরিণতিতে তেরো মাসের সরকারের পতন ঘটে। পশ্চিম বাংলা অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে।

আবার যদি রাজনীতির চাকা উল্টে গিয়ে সে অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক হবে। কিন্তু একথা অবশ্য বলা চলে নির্বাচনের কোন ঠিক নেই অথচ এতো শলাপরামর্শ কেন? কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলি তো দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চলেছে। তারা তো কোন সময়ে ক্ষমতা দখলের কথা বলে নি। এই যুক্তি ঠিক নয়। এটা সত্য, তারা প্রকাশ্যে ক্ষমতা দখলের কথা এখন পর্যন্ত বলে নি, কিন্তু তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে যে শাসক পার্টির প্রতি স্তরেই দুর্নীতি এবং দুর্নীতির ওপর ভিত্তি করেই তাদের জয়ের সৌধ নির্মিত হয়েছে। অতএব সেই দুর্নীতির মূলে যদি আঘাত করা হয় এবং তা সমূলে উৎপাটিত করা হয় তাহলে পার্টির সৌধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। অতএব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এবার ক্ষমতা দখলেরই লড়াই সুরু হচ্ছে।

সি পি এম নির্বাচনকে এতো ভয় পাচ্ছে কেন? এও একটা প্রশ্ন। তার প্রধান ও প্রথম কারণ পার্টির সাধারণ কর্মীদের মধ্যে '৭২ সালের নির্বাচনের পর থেকে এক প্রচন্ড বিভ্রান্তি সুরু হয়ে গেছে। অনেক ক্যাডার বসে পড়েছে; অনেকে কার্ড 'রি-নিউ' করে নি। সর্বত্র হতাশা। পার্টি আবার কিছু নেতাকেও বহিষ্কার করে দিয়েছে। পঃ বঙ্গে যতগুলি বামপন্থী পার্টি আছে, তার মধ্যে সি পি এমই সংগঠনের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। এখনও তাই আছে। তবে এই পার্টিরই যদি এই হাল হয় তাহলে অন্যান্য দলের কথা না তোলাই ভাল। তাই সি পি এম নির্বাচনে না গিয়ে অন্য 'স্ট্র্যাটেজি' নিয়েছে। তারা বয়কট-এর শ্লোগান তোলার জন্য এই সরকারকে আধা ফ্যাসিস্ত বলে নিন্দিত করে জনমানসে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চলেছে। আর এই কাজে প্রফুল্ল সেনের মত মানুষকেও চাই। কারণ তাঁর 'ইমেজ' এখন অনেকের চেয়ে ভাল। প্রথমে কিন্তু মনে হয়েছিল প্রফুল্লবাবু এদের সঙ্গে থাকবেন না, এখন অন্য দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। তাই বলতে হচ্ছে সি পি এম শাসক কংগ্রেসের ওপর আঘাত হানবার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। তারা সঙ্গে প্রফুল্লবাবুকে পেয়েছে। এবার ভবিষ্যৎ প্রমাণ করবে যে, চূড়ান্ত লড়াই-এ তারা কতখানি সাফল্য লাভ করবে? শীঘ্র নির্বাচন হোক বা নাই হোক—যে কোন 'ইস্যুর' ওপর শাসক দলের সঙ্গে এই শক্তির শীঘ্র এক লড়াই হবেই। আর লড়াইয়ের ক্ষেত্রও প্রস্তুত।

২৮-১-৭৫

কৌটিল্য

দেশে বিদেশে

সাধারণতন্ত্রের রজত জয়ন্তী

ভারতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ২৫ বৎসর পূর্তি উদ্‌যাপিত হল গত ২৬ জানুয়ারী। সাধারণতন্ত্রের এই রজত জয়ন্তী বৎসরে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সব চিন্তা আমাদের নেতাদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে তার পরিচয় পাওয়া গেল সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রভৃতির বক্তব্যের ভিতর দিয়ে।

'আমাদের ক্রমবর্ধমান হিংস্রার মেজাজ' সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি তাঁর সাধারণতন্ত্র দিবসের বাণীতে বলেছেন, 'হিংসা শুধু আমাদের জাতীয় চরিত্রের পরিপন্থী নয়, গণতন্ত্রের মর্মার্থেরও বিরোধী। হিংসাকে যদি ঠেকান না যায় তাহলে আমাদের সংহতি ও অস্তিত্বের গুরুতর বিপদ দেখা দেবে।' সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রতি আবেদন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি আহমেদ বলেছেন, পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁরা যেন নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার স্রোতের টানে এভাবে ভেসে যাওয়ার প্রবণতা বন্ধ করেন।

এই উদ্বেগ ও রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশে এই আবেদন সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। তিনি বলেছেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেউ কেউ যে হতাশা প্রকাশ করেছেন সেই হতাশার ভাগীদার আমি নই। আমাদের জনগণ পরিণতবুদ্ধি এবং আমাদের সংবিধানের রয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার লক্ষণীয় ক্ষমতা। তবে ঐক্য শৃঙ্খলা ও সাধু শ্রমের সিধা রাস্তা ছাড়া বিশ্বে আমাদের ন্যায্য স্থান লাভের অন্য কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই। আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জের বিরাটত্ব আমি খাটো করে দেখতে চাই না, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের জনগণের ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছার দ্বারা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা যায় এবং করা উচিত।'

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাবনা দেশে 'ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের' প্রসার সম্পর্কে। সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে বোম্বাইয়ের 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন ফ্যাসিস্টপন্থী এবং তাঁর সমর্থকদের মধ্যে 'পরিচিত দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা' আছেন। এই আন্দোলনকে কেন তিনি ফ্যাসিস্টপন্থী বলে মনে করেন তার ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেক ব্যক্তি ও দল বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থহীন এবং জনসাধারণ যদি কতকগুলি নীতি সমর্থন করে যেতে থাকে তাহলে সেই ভুলটা জনসাধারণেরই।'

অপর পক্ষে ব্লিৎস পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রধানমন্ত্রীর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন যে তিনি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছেন। জয়প্রকাশ বলেছেন বিহারের সংগ্রামকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে আনার জন্য এবং এই সংগ্রামকে বিহারের ছাত্র ও জনতার সঙ্গে তাঁর নিজের সংগ্রামে পরিণত করার জন্য শ্রীমতী গান্ধী নিজেই দায়ী।' শ্রীনারায়ণ বলেন 'প্রসঙ্গত শ্রীমতী গান্ধী যে রাজ্যগুলির ও রাজ্য কংগ্রেস কমিটিগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে শূন্যে পরিণত করেছেন তারই ফলে এ-রকম হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্তই পাটনায় বা অন্য কোন রাজ্যের রাজধানীতে স্থির হয় না, হয় দিল্লীতে। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের যে কল্পনা সংবিধানের জনকরা করেছিলেন তাকে শ্রীমতী গান্ধী নানাভাবে দুর্বল ও পঙ্গু করে দিয়েছেন। তাঁর সেই কাজের বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে এটিও একটি।'

*

প্রতিবেশী দেশে

ভারত যখন তার সংবিধানের ২৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছিল তার কাছাকাছি প্রতিবেশী দুটি দেশে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন ঘটল। চীনে দশ বছর পরে জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করে প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে আর বাংলাদেশে সংবিধান বদল করে মন্ত্রিসভার বদলে প্রেসিডেন্টের হাতে সরকারের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। চীনে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং-এর হাতে। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে নতুন ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রপতির আসনে বসেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসে সম্মানিত

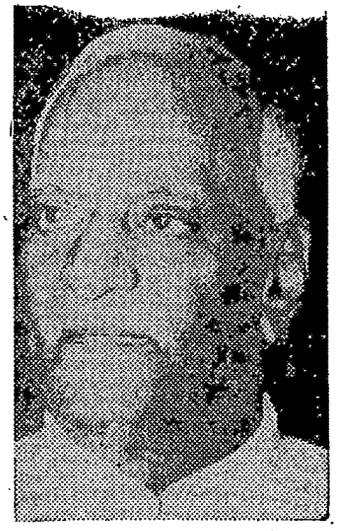

ভারতরত্ন ভি ভি গিরি

পদ্মবিভূষণ শ্রীমতী শুভালক্ষ্মী

পদ্মভূষণ ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়

কবিতা

সমুদ্রের ক্ষুধা ॥ অনন্ত দাশ

সমস্ত উদ্যোগ ছিল, আয়োজনে এই ঘর ছিল ভরপুর
তবু কেন এই মুখে গোধূলির ছায়া?
করায়ত্ত শব্দগুলি
স্খলিত পর্ণের মত উড়ে যায় বিশুষ্ক হাওয়ায়
মগজে জমছে কেন ধুলো?

আগুনে আদগ্ধ আমি
দুই শীর্ণ বাহু তাই ছড়িয়ে আছি দিগন্তের দিকে
চতুর্দিকে মগ্নরোদে ডুবে যাচ্ছে উৎসবের দিন
ফসলের মাঠে
কয়েকটা চড়ুই নামে, ধান খায়, উড়ে যায়
ঘুরে আসে ফের
ব্যর্থ পরাজয়ে আমি তবু ফিরে যাইনি ঘরে।

এখনো অনেক দুঃখ পৃথিবীর চতুর্দিকে জমা
আমার হৃদয়ে তার ছায়া
সারারাত জ্বলে-যাওয়া নক্ষত্রের মত
আমি সেই শোক নিয়ে আছি
যদিও বজ্রের মতো কোনদিন ফেটে যাইনি
মিছিলের আগে আমি তুলে ধরিনি দাবির সনদ
তবু এই শরীরে সংঘাতে,
অজস্র তরঙ্গভঙ্গে ধরে আছি সমুদ্রের ক্ষুধা।

কে জানতো ॥ দীপেন রায়

ঘণ্টের উনুন থেকে উস্কে তুলে আনা
এক চিলতে আগুনের মতো
তুমি দিচ্ছ প্রেমের উত্তাপ
কুয়াশার মুখ আঁধার অন্ধকারে
প্রেমে-পড়া যুবকের চোখ
পৌষের পরীক্ষা শেষ কিশোরের মতো
টেনে টেনে হাত সেঁকছে
গলে পড়ছে আলো-লাগা মোমের মতন।
যদিও নদী বলতে আমার মানচিত্রে ছিল
আঁকাবাঁকা সরু একটা খাল
হাঁটু অব্দি ধুলো-ওড়া অভ্যস্ত পথ
আর উড়ন্ত ঝাঁক-বাঁধা পাখি—
এখন রাত ন'টা, বাঘের হাঁ-মুখের মতো নিস্তব্ধতা
ছিলা টান করে আছে চাঁদ।
কে জানতো তুমি লিখবে পাহাড়ের ওপার থেকে
এপারে আমার জন্য অমন কবিতা!

স্বাদগুলো—বিচিত্র

আস্বাদগুলো ॥ রমেশ্বর হাজরা

দূর থেকে চলে আসে স্বাদগুলো—বিচিত্র আস্বাদগুলো
এসে লেগে যায় চোখেমুখে
বিশেষত ঠোঁটে লাগে জিভে লাগে
নাকের ভিতর দিয়ে ফুসফুসে পালায়—
তার বুনো স্বাদগন্ধ উঠে আসে একদিন
শরীরের ভাঁজ থেকে—লোমকূপ থেকে
মহাদেশ উড়ে যায়—অরণ্যের ছায়া হয়ে
তৃষ্ণার্ত আস্বাদে ঘুরে যায়—।
তখন চুমুর স্বাদ অবন্তী পেরিয়ে আসে—অবন্তীর লোকায়ত দেহ
বিশ্রামের মাঠে গিয়ে টান হয়ে শুয়ে থাকে—নরম আস্বাদে টানটান।
তা দেখে আকাশ হয়ে উড়ে যায় মাধুরীর লৌকিক শরীর আর হুঁশ
দায়হীন হয়ে যায় অলৌকিক ঘ্রাণ তার
ফলের আস্বাদে চলে যায়...।
সেই স্বাদে ঘুম ছিল একদিন দুই দিন—মাধুর্যও ছিল, আছে
এবং ৩য় দিনে ইচ্ছার পুরুষ
লোভ সংক্রমণ করে আমার শরীরে আর আমার শরীর থেকে
প্রকৃতির শরীরে ছড়ায়।
সেই থেকে যে-দিগন্তে ঠোঁট রাখি সে-দিগন্তে
অবন্তী ভূগোল হয়ে থাকে
এবং আমার শার্ট পরে সেই স্বাদগুলো মানচিত্রের অর্ধেক বেড়ায়।

শীত ॥ কার্তিক মোদক

সেই মুখ;
শীতের দুপুর, এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে পশম,
কয়েকটি পাহাড়ী ভেড়া সমতলে নেমে আসছে এখুনিই,
অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে শীত,
বরফ হাওয়া জমে নদী স্থির, কার জন্য দাঁড়িয়ে বুনছো উল?
অমন রঙিন জোড়া শেকল, অমন অস্থির!

ফাদার দ্যতিয়েন রোজা তামচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মিয়ার বড় ছেলের নাম মহম্মদ ইব্রাহিম। ছেলেটি মেধাবী খুব, পড়েও ভালো, বলেও বেশ। যে-মহানবির নামে সে দীক্ষিত হয়েছে সেই খলীলুল্লা (ঈশ্বর বন্ধু) ইব্রাহিমের গল্প তার নখদর্পণে। মানবজাতির আদিপুরুষ হজরত আদমের জন্য ফেরেস্তাদের হাতে যে-বয়তুল্লা (আল্লার গৃহ) নির্মিত হয়েছিল, হজরত নূহের আমলে সেই কাবা শরীফ মহাপ্লাবনে ধ্বংস-প্রাপ্ত হওয়াতে নিরানব্বই বছরের ইব্রাহিম, তাঁর কিশোর পুত্র ইস্মায়েলের সাহায্যে, তা পুনর্নির্মিত করেছিলেন। সেই ইস্মায়েলকে তিনি খোদার দরগায় বলি দেওয়ার এক দৈবাদেশ পেয়েছিলেন।

খোদাতালা তাঁর অভ্যাসমতো জান্নাতের বিশ্বস্ত ডাকহরকরা জিব্রায়েলকে পাঠাতে চেয়েছিলেন; ফেরেস্তা কিন্তু কুরনিশ করে বলেছিলেন, 'হে পরওয়ারদেগার, যে-আমি এতদিন ইব্রাহিমের কাছে সুসংবাদ দিয়ে এসেছি, সেই আমি কোন মুখে আজ তাঁর বুড়ো বয়সের লাঠিকে নিজের হস্তে কোরবানি দিতে বলব?...' খোদাতালা তাই তাঁর ওহী (প্রত্যাদেশ) ফর্মিয়েছিলেন স্বপ্ন-যোগে ঃ 'তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ঈশ্বরের শ্রীচরণে উৎসর্গ কর।'

ওহীটির তাৎপর্য না বুঝে হজরত ইব্রাহিম বারবার আল্লার রাহে একশ'টি উট জবাই করেছিলেন। স্বপ্নাদেশ পুনঃপুন-রুচ্চারিত হওয়াতে অবশেষে তিনি বুঝলেন, ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য একমাত্র বলিটা হল তাঁর আপন 'কলিজার টুকরো'—আরব জাতির পূর্বপুরুষ—ইস্মায়েল... [বাইবেলের আব্রা-হাম অবশ্য তাঁর নয়নের মণি—ইহুদীদের পূর্বপুরুষ—ইসহাককে, ইস্মায়েলের মা যাঁর মায়ের সতীন, বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন]।

আল্লার হুকুম কবুল করে খড়্গহস্ত পিতাকে ইস্মায়েল বলেছিল ঃ 'হে আব্বাজান বাৎসল্যের আতিশয্যে আপনার হাত কাঁপতে পারে আপনি বরং চোখ বন্ধ করেই মারবেন ...আর আমি যাতে প্রাণচাঞ্চল্যের জন্য অস্থির হয়ে না পড়ি, তার জন্য আমার হাত-পা বেঁধে দিন...।' না, ছেলেটিকে মরতে হল না; চরম মুহূর্তে জিব্রায়েল—রুদ্ধচক্ষু ইব্রাহিমের অজান্তে—ইস্মায়েলের পরিবর্তে যূপকাষ্ঠে এক দুম্বা বসিয়েছিলেন!...

'আর তাই পর্বের নাম বকরী-ঈদ, ছাগলের ঈদ...' স্বোপার্জিত পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রলোভন সামলাতে না পেরে আমি বলে উঠলাম। দুম্বার অর্থ অবশ্য ছাগল নয়, ভেড়া!

মহম্মদ ইব্রাহিম সংশোধন করে বলল ঃ 'বকর-ঈদ, তদ্ভব বকরী না, আরবী বকর অর্থাৎ কি না গাভী...'

আর ঠিক সেই সময়ে ষোড়শী নাজমে-আরা—যে না কি হাফমানুষ—ঘরে প্রবেশ করে আমার সামনে ধুকি [ইদলি] আর ছাগলের টেংরি রেখে বলল, 'খান!'

আমরা নাকি ফরাসী ভাষা থেকে নিয়েছি আলেমান দিনেমার প্রভৃতি জাতির নাম; ওলন্দাজ থেকে নিয়েছি তুরুপ রুইতন হরতন ইস্কাপন...ওদের ন্যাবিকেরাই গোড়ে বঙ্গে ঐ সর্বনাশা ক্রীড়ার প্রবর্তক! তবে হ্যাঁ চিড়িতনের নর্তনের জন্য তারা নাকি দায়ী নয়—ওটা হিন্দী চিড়িয়ার 'অবদান'। এদিকে প্রাক পর্তুগীজ আমলের বাঙ্গালী-দের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা যদি বলতে হয় তবে মহামান্য শব্দতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত শুনুন ঃ

ঐ যুগের বাবুরা 'তামাক' খেত না 'পিরিচে' চা খাওয়ার অমার্জিত আনন্দ থেকে ও বঞ্চিত ছিল। গিন্নীরা 'সায়া' পরত

বিশ্বের প্রবাদ ঃ ইকনে ইমাম ৪·০০ [বিশ্বের সমস্ত ভাষা থেকে ভাল ভাল প্রবাদগুলি আহরণ করে এই বইতে সংকলিত করা হয়েছে। সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বহু রুক শোভিত এই বইটি রাখার ও দেবার মত বই] হৃদয়ে নদী সবুজে বন ঃ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ৪·০০ [একটি বিখ্যাত উপন্যাস] দৃষ্টিপাত ঃ যাযাবর ঃ ৪·০০; দেশে বিদেশে ঃ মুজতবা আলী ঃ ১২·০০; কত অজানারে ঃ শংকর ঃ ১০·০০; সাহেব বিবি গোলাম ঃ বিমল মিত্র ঃ ২৫·০০; রিল্কে ঃ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ৩·৫০; কিংবদন্তীর দেশে ঃ সুবোধ ঘোষ ঃ ১০·০০; নটী ঃ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ঃ ৪·০০; আলিম্পন ঃ [আলপনা দেওয়া ও শেখার বই] দুর্গা মুখোপাধ্যায় ঃ ১০·০০; রিক্সাওয়ালা ঃ লাওচাও ঃ ৬·০০।

ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ ঃ নৃপেন্দ্র গোস্বামী ঃ ১২·০০; কলের পুতুল ঃ বুদ্ধদেব বসু ঃ ৫·০০; রবীন্দ্রনাথ কথা সাহিত্য ঃ বুদ্ধদেব বসু ঃ ৫·০০; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ ১০·০০; বাঙালীর ইতিহাস ঃ [সংক্ষিপ্ত] নীহাররঞ্জন রায় ঃ ৬·০০; রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা ঃ নীহাররঞ্জন রায় ঃ ৪০·০০; বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ নৃপেন্দ্র গোস্বামী ঃ ১৫·০০; লোকায়ত দর্শন ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ ১৫·০০; লেখকের কথা ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ৪·০০; আত্মচরিত ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ ১৫·০০।

The Agony of West Bengal: Ranajit Roy 10·00; **Sedition Committee Report 1918:** (Reprint) Rowlatt-30·00; **History of Central Asia:** Rahul Sankrityan 25·00; **Calcutta India's City:** Asok Mitra 8·00; **The Days I Remember:** Kailash Nath Katju 15·00;

নিউ এজ পাবলিশার্স
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

না তবে হ্যাঁ—অভিধান আমি মানব না—'কামিজ' জানা ছিল (কোরান শরীফের দ্বাদশ সূরাতে হজরত ইয়ুসুফের কামিজের একাধিক উল্লেখ আছে) 'বোতাম' ছাড়া কামিজ অবশ্য। ওদের 'আলকাতরা'হীন রাস্তায় লোকে 'পস্তলও' ছুঁড়ত না 'বোমা'ও ফাটাত না। ওদের বাড়ি ছিল 'বরগা'হীন 'গুদাম'হীন আলমারি ছাড়া ও জানালাশূন্য। পেয়ারা কিংবা পেপে আতা নোনা কাজু আনারস এমন কি কপিও ওদের মেজে অসত না (ওদের আদৌ মেজ ছিল কিনা সন্দেহ) বিস্কুট ও পাঁউরুটিও অজানা ছিল। কেদারায় ওরা বসত না দরজায় চাবি দিত না হাত-মুখ মোছার তোয়ালে পেত না। জল তোলার ও রাখার অসুবিধে ছিল খুব—বালতি গামলা ও পিপের অভাব। শুধু ভাবি পিতৃদেবের ছবি ওরা টাঙাত কেমন করে? পেরেকের অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না।...

আসল কথা কিন্তু তা নয়; আসল কথা এই যে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি বাংলা ভাষার ফার্সি শব্দ নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি। জাকির মিয়ার নির্দেশনে শিখেছি যে ফার্সি জবান আর্য ভাষা হলে কি হবে (দ্বিপ্রহরকে ওরা দুপহর বলে। তার অর্ধাধিক শব্দই বিশুদ্ধ সেমিটিক; অর্থাৎ কিনা বাংলা ভাষার অন্তর্গত অধিকাংশ তথাকথিত ফার্সি শব্দ প্রকৃতপক্ষে আরবী: ময়দা কথাটি ফার্সি ময়দান কথাটা আরবী পেশা ও দালান ফার্সি নেশা ও দালাল আরবী; মোহর (দেনমোহর) ফার্সি মহর (বিবাহের দেনমহর) আরবী...। শব্দগুলোর পেডিগ্রী চেনার উপায় আছে? কিছুটা আছে বটে। এই ধরুন ফার্সি বর্ণমালায় যে আঠাশটি ব্যঞ্জন আছে তার মধ্যে চারটি অক্ষর ওর নিজস্ব। আরবী ভাষায় চ কিংবা প বলে কোনো অক্ষর নেই অতএব চাদর চাকর চামচ চাবুক...কিংবা পরদা পশম পিয়াজ প্রভৃতি শব্দ ফার্সি বাদশাহ কথাটার যথার্থ রূপ পাদশাহ আরবরাই বলে বাদশাহ যেমন বলে বাকিস্তান!

এদিকে এমন আটটি আরবী ব্যঞ্জন আছে যেগুলো ফার্সি ভাষার নিজস্ব শব্দে পাওয়া যায় না মুশকিল এই যে বাংলা বর্ণমালার অপ্রতুলতার দরুন বাংলা ভাষায় ওগুলো চেনা অসম্ভব। এই ধরুন কলম আর কালাম আরবী শব্দ দুটো 'কলমের দুরুচ্চার্য' অক্ষরটা শুধু আরবী শব্দে (কবর কায়েদ কোরান কলম...) কিংবা তুর্কী শব্দে (কুলি কাঁচি...) পাওয়া যায় এদিকে 'কালামের' সহজোচ্চার্য অক্ষরটা কিতাব নিকা কেরামত প্রভৃতি আরবী শব্দে (এবং কুরনিশ প্রভৃতি তুর্কী শব্দে যেমন তেমনি নেক কুরতা কিনারা প্রভৃতি ফার্সি শব্দেও পাওয়া যায়।

বহুবংশরাদের জন্য জানেন যুক্তি আছে: যে মর্ত্য জীবের গলা থেকে ওসব আরবী ধ্বনি নির্গত হয় ওর আর আমার আদি পুরুষ যে অভিন্ন ব্যক্তি কথাটা বিশ্বাস করা সহজসাধ্য নয়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন মানুষমাত্রই তার পার্থিব প্রথম দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত যে কোনো ধ্বনির উচ্চারণ শিখতে পারে পরে নাকি আমাদের কান একপেশে আর একগুঁয়ে হয়ে যায়। হায়! আমার পিতৃদেব শিশুকালে আমাকে মক্কা-মদিনার ওদিকে বেড়াতে পাঠান নি কেন?...

একটা সুবিধা তবু এই যে আরবী-ফার্সি-তুর্কীতে মূর্ধন্য ব্যঞ্জনের বালাই নেই (টোপ বললে ওরা তোপ বুঝবে!) এমন কি কোনো ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণ রূপেরও ঝঞ্ঝাট নেই: ফার্সিরা ভূত না বলে বলে বুত (যার অর্থ প্রতিমা) মেথর কথাটা আসলে মিহতর ভান ও ভিস্তি আসলে বহানা রিহিস্তি।

খালি খাতা খারাপ প্রভৃতি আরবী শব্দে এবং খরিদ খাম খানা প্রভৃতি ফার্সি শব্দে যে খ-অক্ষরটা আছে তার দুরুচ্চার্য অল্প-প্রাণতা জার্মানদের কুরুক্ষেত্রীতে নাকি নিখুঁত বাজে...এদিকে গ-ব্যঞ্জনের স্বৈতাচারিতা দেখুন: অক্ষরটা গজ গরম গোয়েন্দা প্রভৃতি শব্দে বিশুদ্ধ ফার্সি ও সহজোচ্চার্য কিন্তু গরীব গোলাম মোগল প্রভৃতি শব্দে (ঘলাম মুঘল বানানও দেখা যায়) বিশুদ্ধ আরবী—জার্মানদেরও ন্যাগালের বাইরে!

উক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে আরবী বর্ণমালার বিশিষ্টতম সাদ নামক অক্ষর ছাড়া (যার উচ্চারণ নাকি হবু গুপ্তচরদের নিয়ন্ত্রির কষ্টিপাথর: সই সাফ সফর) আছে তালব্য শীন (আরবী শাল শানাই শিকার ফার্সি শখ শরাব শরবত) আর দন্ত্য সীন (আরবী সফর সনদ সবর...ফার্সি সুদ সাদা সবজ)। শব্দতাত্ত্বিকেরা লেখেন: ওস্তাদ আর দোস্ত কুর্শিত আর গোশৎ পূর্ববঙ্গে অনেকে আবার নিজস্ব উচ্চারণ অনুযায়ী লেখে: ইছলাম রছুল ছরদার...

যে সমস্ত আরবী ব্যঞ্জন ফার্সি উচ্চারণে বিকৃত হয়েছে সেগুলো বাংলা ভাষায়ও সেই বিকৃত অবস্থায় প্রবেশ করেছে। ফার্সিরা যেমন আমরাও তেমনি সাধারণ ত-কে (আরবী তাক তামাম তারিখ...ফার্সি তোশক তরবুজ তক্তপোশ...আর তবলচি অর্থাৎ যন্ত্র বাদক) এবং বিশুদ্ধ আরবী ত-কে (তুফান তালাক মতলব আর তবলদার অর্থাৎ কাঠঠোকরা) অভিন্নভাবে উচ্চারণ করি। এদিকে আরবী বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষরটা (ইংরেজি Think -এর মতো উচ্চার্য) আমাদের মুখে যেমন ফার্সিদের মুখেও তেমনই ইংরেজি এস-এর মতো শোনায়: হাদস সোয়াব সালিম...।

আমাদের জ-অক্ষরটা পাঁচটি ভিন্ন আরবী অক্ষরের বাংলা রূপ। বর্গীয়-জব মতো উচ্চারিত জিম ব্যঞ্জন ছাড়া (আরবী জল্লাদ মেজাজ জাহাজ...ফার্সি জাদু মগজ আন্দাজ) অবশিষ্ট চারটি অক্ষরের ফার্সি উচ্চারণ পূর্ববঙ্গের অনেক লেখায় সেগুলো অন্তঃস্থ-যয়ে অক্ষরান্তরিত। তাদের মধ্যে আবার দুটি ব্যঞ্জন বিশুদ্ধ আরবী জা (জুলুম্ নজর হাফিজ) এবং জাদ (জেলা কাজী রমজান যার ইংরেজি রূপ

এছাড়া আছে জে সার আরবী উচ্চারণ (আরবী জেরা জিস্ম জাকির) আর জাল্ যার উচ্চারণ ইংরেজি This -এর মতো (আরবী জয়তুন জাফরান...ফার্সি কাগজ)।

এবার বলুন দেখি হজরতের হিজরত (অর্থাৎ মক্কা থেকে মদিনায় মহম্মদের পলায়ন)! যা ভেবেছিলাম তাই হিজরতের হ-টার ঠিক উচ্চারণ করেছেন বটে (আরবী হাওয়া হিম্মত হেনা...ফার্সি হংতা হারলা হুরকরা) হজরতের হটার ঠিক উচ্চারণ করেননি অক্ষরটা বিশুদ্ধ আরবী কিনা (হুকুম হারাম হালুয়া)।

না স্বরবর্ণ আমি আর শিখলাম না। এইটুকু জানি যে এ আর ও বলে আরবীতে কোনো স্বরবর্ণ নেই আরবীতে তথা ফার্সিতে দীর্ঘ ই আর দীর্ঘ ঊ আছে (ফার্সিতে ঞাইন আরবীতে কানুন) কোনো কোনো ফার্সি শব্দে ঐ দুটি বর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে এ আর ও।

তবে কিনা আধুনিক যুগের ইরাণবাসীরা শেষোক্ত উচ্চারণ বর্জন করেছেন; (শের কিংবা রোজ) না বলে ওরা অরলীলাক্রমে বলে শীর (কিংবা রাজ) ঢাকার লরিগুলো কিন্তু এখনও মোটা রঙিন অক্ষরে ঘোষণা করে খোদা হাফেজ!

খুদা হাফিজ-টাই মুমিন সমাজে প্রচলিত সম্ভাষণ। তাই আমিও খাতা বই গুছিয়ে জাকির মিয়াকে ও তাঁর বাসার সবাইকে খুদা হাফিজ বলে আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। (ক্রমশ)

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম: লায়রপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কামলিন প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গারাসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনী সুর বেজে উঠল।

কিন্তু তরঙ্গিণীর মন বড় চঞ্চল। বুকের মধ্যে তার টনটন করে ওঠে—ষষ্ঠী গেল—মহাসপ্তমীও এসে গেল—কিন্তু তার মেয়ে এখনও এলো না।

আর কবে আসবে?

ক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পেরিয়ে দশমীও এসে গেল। ভোরে উঠেই সবাই দেখে ভিজে চোখ মা-দুর্গার। শেষ রাত থেকে সানাই বাজছে। তারও কান্নার সুর গিরিকন্যা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

তাই সেই সকাল থেকেই সবার মন খারাপ।

দুপুরের পরই মা দুর্গার কপালে সিঁদুর পরিয়ে সেই সিঁদুর মেয়েদের মধ্যে এ ওকে পরিয়ে দেবার ধুম পড়ে গেল।

কিন্তু ভবনাথের মন খারাপ। মন্ডপ খালি করে মা চলে যাবেন, এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

ধুমধাম করে বাঁওড়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিমা বিসর্জনও হোলো। কিন্তু ভবনাথ কোন কিছুতেই অংশগ্রহণ করেন নি।]

।। ১৫ ।।

চঞ্চলা গেছে, কত বছর হয়ে গেল। এক ঘুমের পর এখনো এক এক রাত্রে দক্ষিণের ঘর থেকে কান্না ওঠে। অতি ক্ষীণ—কান্না বলে হঠাৎ কেউ বুঝবে না। মনে হবে গান—গানের মুতোই সুরেলা। কান পেতে থাকলে কথাগুলো একটু একটু পরিষ্কার হয়ে আসবেঃ কোথায় গেলি মা আমার ফিরে আয়। আমি যেতে দিতে চাইনি, মন আমার ডেকে বলেছিল, জেদ করে তুই চলে গেলি—

কোলের মধ্যে কমল কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোয় বিন্দুবিসর্গ সে টের পায় না। পুবের কোঠায় ভবনাথ চমকে জেগে দর-দালানে উমাসুন্দরীর গা ধরে নাড়া দেনঃ কী ঘুম ঘুমোচ্ছ বড় বউ, শুনতে পাও না? ওঠো শিগগির, দেখ গিয়ে—

উমাসুন্দরী ছুটে গিয়ে দক্ষিণের ঘরের দরজা ঝাঁকাচ্ছেন আর 'ও ছোটবউ' 'ও ছোটবউ' করে ডাকছেন। সুর অনেক আগেই থেমেছে, ঘরের মধ্যে চুপচাপ। ডাকাডাকিতে তরঙ্গিনী সাড়া দিলেন—যেন কিছুই জানেন না এমনিভাবে সহজ কণ্ঠে বললেন, কি দিদি কি হয়েছে? কান্না বেকবুল যান। কিম্বা হতে পারে সম্পূর্ণ ঘুমের ভিতরের কান্না—জেনে বুঝে তিনি কাঁদেন নি।

কমলের গায়ে হাত পড়ে চমক লাগল—একি গা ছাঁৎ-ছাঁৎ করে যে! চঞ্চলার চলে যাওয়া থেকে এদের নিয়ে সদা-উদ্বেগ। পুঁটিকে নিয়ে তত নয়—তার খাওয়া-শোওয়া আবদার-অভিমান উমাসুন্দরীর সঙ্গে। কিন্তু কমলের জন্য সামান্যে উতলা হয়ে পড়েন। শত্রুরা পেটে এসে একের পর এক দাগা দিয়ে বিদায় নিচ্ছে। গোড়ায় বিমলা, তারপরে চঞ্চলা। মায়াবিনী চঞ্চলা—সামান্য কয়েকটা দিন পরের ঘরে গিয়েও সেখানে সকলকে মায়ায় বেঁধে ফেলেছিল। সুরেশের আবার বিয়ে হয়ে নতুন বউ এসেছে—তবু এখনো শাশুড়ি নাকি চঞ্চলার জন্য কুক ছেড়ে দিয়ে কাঁদেন। কসবায় একদিন কুকময়ের সঙ্গে সুরেশের দেখা হয়েছিল সেও খুব দুঃখ করলঃ বাইরে সবই করে যেতে হচ্ছে বড়দা কিন্তু মনের ঘা এ জীবনে শুকোবে না।

কমলের জ্বর হল নাকি? তরঙ্গিনী ছটফট করছেন রাতটুকু কতক্ষণে পোহাবে। প্রত্যুষের নিয়মিত ছড়াঝাঁট বাদ গেল—অলকা-বউ ও বিনোকে ডেকে বললেন তোরা যা পারিস কর। খোকার জ্বর হয়েছে—ওকে ছেড়ে ওঠা যাবে না। বিনো গিয়ে ভবনাথকে বলল, সর্বকর্ম ফেলে তিনি চলে এলেন। উমাসুন্দরীও তাঁর পিছু পিছু। হাতের উল্টোপিঠ কপালের উপর রেখে তাপের আন্দাজ নিলেন ভবনাথ, তারপর নাড়ি দেখছেন। ভবনাথ বলে কেন, সব বাড়িতেই মুরুব্বিরা অল্পবিস্তর নাড়ি দেখতে পারেন। ভাসুরের সামনে থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে তরঙ্গিণী কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়েছেন। অভয় দিয়ে ভবনাথ বলেন, নাড়িতে সামান্য বেগ। বৃষ্টি বাদলায় ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। চিন্তার কিছু নেই। ধনঞ্জয় আসুক, সে কি বলে শুনি।

নিজেই চলে গেলেন ধনঞ্জয়ের বাড়ি। কবিরাজ ধনঞ্জয় নাথ কবিরত্ন—বেঁটেখাটো দোহারা মানুষটা, পাকা চুল পাকা গোঁফ। বয়স ষাটের কোঠায়। মেটে ঘরের দাওয়ায় বসে রোগী দেখছেন। ভবনাথকে দেখে সসম্ভ্রমে তালপাতার চাটকোন এগিয়ে দিলেনঃ বসুন বড়বাবু। সকালবেলা কি মনে করে?

শেষ রাত্রেও বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে বেরুনো বলে কবিরাজ নগ্ন গায়ে একটা হাত-কাটা গিরান পরে নিলেন। খালি পা গলায় যথারীতি চাদর জড়ানো। চাঁদর সব ঋতুতেই চাদরের মুড়োয় অষুধ বাঁধা। টুকরো টুকরো কাগজে রকমারি অষুধ মোড়ক-করা, মোড়কের উপর অষুধের নাম। সবগুলো মোড়ক একটা মোটা কাগজে বলের সাইজে জড়ানো—তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দড়ির বাঁধন।

দাওয়ার উপর পিঁড়ি পড়ল কবিরাজের জন্য। এই নিয়ম। আপাতত না বসে কবিরাজ ঘরে ঢুকে গেলেন। তক্তাপোষের উপর কমল শুয়ে আছে। গোড়ায় কিছু মৌখিক প্রশ্ন। জলতৃষ্ণা পাচ্ছে কিনা, কাঁপুনি হয়েছিল কিনা জ্বর আসার মুখে, মাথার যন্ত্রণা আছে কিনা। পেটে টোবা দিয়ে দেখলেন। তারপরে নাড়ি দেখা—রোগীর মণিবন্ধের উপর আঙুল রেখে নিবিষ্ট হয়ে আছেন কবিরাজ। ধ্যানে ডুবে গেছেন, এমনিতরো ভাব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হচ্ছে এসব। বসবেন না—রোগীর তক্তাপোশে নয়, আলাদা টুল-চেয়ার আনিয়ে দিলেও নয়। ধনঞ্জয়ের নাড়িজ্ঞান খুব ভাল, লোকে বলে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি দেখে 'হুঁ' বলে তারপর বাইরে এসে পিঁড়িতে বসলেন। চাদরের প্রান্ত থেকে অষুধ খোলা হচ্ছে এইবার।

ভবনাথ শুধালেনঃ লালরাড়ি?

হ্যাঁ। সহাস্যে ধনঞ্জয় বললেন, মৃত্যুঞ্জয় রস—মৃত্যুকে করিতে জয় নাম হইল মৃত্যুঞ্জয়। অনুপান তেলাকুচোর পাতার রস পিপুলের গুঁড়ো আর মধু। বাড়ি গিয়ে গোটা তিনেক পাঁচন বেঁধে পাঠাব, আধসের জলে সিদ্ধ হয়ে আধপোয়া থাকতে নামাবেন। তিনদিন সকালে সেই পাঁচন একটা করে।

কানে গিয়ে কমল ঘরের মধ্য থেকে কেঁদে উঠল ঃ পাঁচন আমি খাবো না জেঠামশায়।

কবিরাজ লোভ দেখাচ্ছেন ঃ তিন পাঁচনের পরেই অন্নপথ্য।

রাজি নয় কমল, আওয়াজ তুলছে ঃ ওয়াক-থুঃ—

উৎকট স্বাদ পাঁচনের—বিশেষ করে ধনঞ্জয়ের বাঁধা যেসব পাঁচন। গুলেও ভাদলার মুখো ভূমিকুষ্মণ্ড বামনআটি বাসক বচ কণ্টিকারি—জঙ্গল খুঁজে খুঁজে যেখানে যেটি পান কবিরাজ নিয়ে আসেন, গঞ্জ থেকেও দুষ্প্রাপ্য রকমারি বাকল কেনাকাটা করেন। সমস্ত মিলিয়ে বাড়িতে বিপুল সংগ্রহ। যে রোগে যেমন খাটে, নিক্তিতে মেপে মেপে প্যাকেট বাঁধেন—পাঁচন বাঁধা তাকে বলে। জলে সিদ্ধ করে কাথ বের করে—সেই বস্তু একবার যে খেয়েছে, দ্বিতীয়বার তাকে খাওয়ানো দুঃসাধ্য। এবং ধনঞ্জয় গরব করে বলেন, রোগের ক্ষেত্রেও হুবহু তাই—একবার সেবনের পরে আবার দ্বিতীয়বার সেবন হবে, সেই ভয়ে রোগ পাঁই পাঁই করে পালায়।

ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বসু এম.বি.বি.এস
ডাঃ এস. এম. পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

শুধু একটি
অবেদন
প্লাস

চটপট আর
নিশ্চিত আরাম
দেয়
SQUIBB®
SARABHAI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের
রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী
মাইসেলপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এস. সি. পি. এল.
Shilpi-SC-8A/74 Ben

বাড়ির উপর ধনঞ্জয়ের আগমন—হেন ক্ষেত্রে কেবল এক রোগী দেখেই ছুটি হয় না। এবং রোগী ছাড়া নীরোগীদেরও দেখতে হয়। দাওয়ার উপরে স্ত্রীলোক অনেকে ঘিরে বসেছে কবিরাজকে। ও-বাড়ির সিধুর মা এবং নতুন বাড়ির মেজবউও এসেছেন। বদ্যি দেখলে নানা রোগ মনে এসে উদয় হয়। কারো হজম ভালো হচ্ছে না—অম্বলের চেঁকুর ওঠে, কারো ঘুম হয়নি কাল রাত্রে কারো বা গলা খুসখুস করছে। কবিরাজ পুঁটুলি খুলে কাউকে ওষুধ দিলেন, কাউকে বা এটা কোরো সেটা কোরো বলে মুষ্টিযোগে সারছেন। রোগের ব্যবস্থা একরকম চুকলো তো হাত চিত করে করে এবারে সব সামনে এনে এনে ধরছে। নাড়ি দেখা শুধু নয়, ধনঞ্জয় হাতও দেখতে পারেন। এবং এই ব্যাপারে তিনি কল্পতরুবিশেষ—যার যে রকম বাঞ্ছা, পূরণ করে দিন। কাউকে নিরাশ করেন না। বন্ধ্যা মেয়েটার বাঁ-হাতে অনামিকার নিচে পাশাপাশি তিনটে রেখা দেখিয়ে বলে দিলেন, একটা নয়—তিন তিনটে সন্তানের মা হবে সে, হতে বাধ্য। পালেদের বেউলোকে বললেন বছরের মধ্যে বিয়ে হবে তার সুন্দর সুপুরুষ বর অবশ্য মধ্যম রকমের। নতুন বাড়ির মেজ বউয়ের সাত বছরের ছেলে ফণীর সম্বন্ধে বললেন, দিকপাল বিদ্বান হবে সে। ছেলেটাকে কবিরাজ-বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বললেন, হাতখানা নিরিবিলি আরও খুঁটিয়ে দেখবেন এমন হাটেবাজারে একটা মেলে না।

পাঁচন একটার বেশি লাগল না। পরের দিনই কমলের জ্বর ত্যাগ। আরও হল—কপাল গুণে দীননন্দন গ্রামের উপর উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বরের মার পেট ফুলে ঢাক, জল-উদরি না কি হয়েছে। এতদিনে এইবারে বুড়ি যাবেন-যাবেন ঠেকছে। বয়সের কোন গাছ পাথর নেই। যজ্ঞেশ্বরের গর্ভধারিণী—সেই যজ্ঞেশ্বরই সত্তরের কোঠায় পৌঁছে গেছেন। তবু মাতৃভক্ত যজ্ঞেশ্বর দীননন্দনকে দিয়ে একবার দেখিয়ে দিচ্ছেন। দীননন্দনের দেখা মানে চিকিৎসার চরম হয়ে গেল—তার উপরে যদি কিছু থাকে, সে হল গঙ্গাজল ও হরিতলার মাটি।'

ডাক্তার দীননাথ নন্দন, জাতে কায়স্থ-বণিক, দীননন্দন নামেই খ্যাত। ঘোড়ায় চেপে রোগীর বাড়ি আসেন, সঙ্গে স্তেথেসকোপ থাকে। আর থাকে ভারি ওজনের অষুধের বাকস সহিসের মাথায়। বাকস-মাথায় সহিস ঘোড়ার পাশে পাশে পাল্লা দিয়ে দৌড়ায়। তাই পারে কখনো, পিছিয়ে পড়ে বেশ খানিকটা। রোগীর বাড়ি তক্তাপোশের উপর তোষক-চাদর পাতা আছে, থাকবেই অতি-নিশ্চিত—ঘোড়া থেকে লম্ফ দিয়ে নেমে ক্লান্ত দীননন্দন কোট-প্যান্ট সুদ্ধ গড়িয়ে পড়লেন বিছানার উপরে। ঘোড়া এদিক-সেদিক চরে বেড়াচ্ছে—সহিস এসে বাকস নামিয়ে দিয়ে ঘোড়ার তদ্বিরে লেগে গেল। দীননন্দনও বিশ্রাম নেবার পর এবারে রোগী দেখতে গিয়ে বসলেন। স্তেথেসকোপের একদিকে নল—নলের মাথা কানে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। অন্য কানের ফুটো বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে চেপে ধরে রোগীর বুক পরীক্ষা হচ্ছে।

ডাক্তারের ফী দুই টাকা। আর সহিস ঐ যে অষুধের বাকস আনল এবং পুনশ্চ ফেরত নিয়ে যাবে তার প্রাপ্য এক সিকে। রোগী দেখে ব্যবস্থা দিয়ে ভিজিটের টাকা পকেটে ফেলে ডাক্তার অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে দেবেন—পাড়াগাঁয়ের সে নিয়ম নয়। ভিন্ন গ্রামে এসেছেন, না খাইয়ে ছাড়বেই না। আর যজ্ঞেশ্বরের বাড়ি খাওয়া—সর্বনেশে খাওয়া রে বাবা! —পুরোপুরি শয্যাশ্রয়ী করে ছাড়েন এঁরা। দিবানিদ্রার পরেও রওনা হতে দেরি হয়। ভবনাথ এসে পড়লেন—গাঁয়ের উপর এত বড় ডাক্তার তো ছাড়বেন কেন? —চলুন ডাক্তারবাবু, আমাদের ঘনুকে একটু দেখবেন।

দেখেশুনে দীননন্দন বললেন, জ্বর না ঘোড়ার ডিম! বাতিক আপনাদের—ভাত বন্ধ করে সুস্থ ছেলে শুইয়ে রেখেছেন।

গ্রামের উপর এক বাড়ি থেকে ভিন্ন বাড়িতে এক টাকা ফী। দীননন্দন টাকা নেবেন না ঃ না মশায়, রোগ না পীড়ে না—ফী কিসের?

ভবনাথ বললেন, হয়েছিল জ্বর—সত্যি সত্যি হয়েছিল। ধনঞ্জয়ের রাঙাবড়ি আর পাঁচনে পালিয়ে গেছে।

তবু দীননন্দন অবিশ্বাসে ঘাড় নাড়লেন। বলেন, চাকরে ভাই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠাচ্ছেন—কিসে খরচা করা যায়, ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ান। তখন এমনি সব মাথায় আসে—নীরোগকে রোগী বানিয়ে দশ-বিশ টাকা খরচ করে ফেলা।

মিত্তিরবাড়ির ঘরজামাই অম্বিকা দত্ত একপাল ছেলেপুলের বাবা। আবাদে গুরু-

গিরি করে, ছুটির মরশুম চলছে বলে গ্রামে আছে। দুটো টাকা হাওলাতে নেবে বলে ভবনাথের পাছে পাছে ঘুরছে। অম্বিক টিপ্পনী কাটে : উল্টোটি দেখবেন আমাদের বাড়ি গিয়ে। আসে রোগ, যায় রোগ—এটা জ্বরে ধুঁকছে, গাছ থেকে পড়ে ওটা খোঁড়া হয়ে আছে, সেটার পেট নামছে। হরি ঘোষের গোয়াল—কে কার খবর রাখে। বউ ঐ অবস্থায় পুকুরে চুবিয়ে চুবিয়ে রান্নাঘরে ঠেলে দিল। পচা পান্তা যা পায় গব গব করে খেয়ে নিল। রোগ দেখে, কেউ কোন আমল দেয় না, ভারি অবহেলা—একবেলা আধবেলা থেকে আপনা-আপনি সরে পড়ে।

তিরিশে আশ্বিন জাতীয় রাখীবন্ধন ও অরন্ধন। নতুন পরব—আগে ছিল না এই বছর কয়েক ধরে চলছে। পাঁজিতে পর্যন্ত উঠে গেছে। পুব বাড়ী পুজোর মধ্যে সেই যে সেবার অঘটন ঘটল তার পরেও পুজো আর দু-বার হয়ে গেছে। নিতান্তই নমো-নমো করে। ভবনাথ বলতেন ধর্মকর্ম আমাদের বংশে সয় না, মা-দুর্গাকে আনতে গিয়ে আমার বুড়ি-মাকে হারালাম। না করে তবু উপায় নেই। দুর্গোৎসব এক-বার আরম্ভ করলে তিন বছরের কম ছাড়া যায় না। রীত রক্ষে করে যেতে হল সেই কারণে।

কিন্তু দেবনাথ আসেন নি — পুজোর সময় বাড়ী আসা সেই থেকে ছেড়েছেন। একবার কেবল আসতে হয়েছিল—সে-ও বিজয়া দশমী কেটে যাওয়ার পর। এসে-ছিলেন আসলে কুশডাঙায় দিদি মুক্তেশ্বরীর ওখানে। বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পেয়ে। ভাল হয়ে গেলেন তিনি। তখন একবারটি সোনাখড়ি ঘুরে যাচ্ছেন। রাখীবন্ধন পড়ে গেল তো সেই অবধি থেকে যাওয়া থাক। শহরে খুব হৈ-হৈ—গ্রামে বিশেষ করে সোনাখড়িকে কী রকমটা এরা করে দেখবেন। গ্রামে এসে ইদানীং চুপচাপ থাকেন তিনি, গাঁয়ের আমোদে মচ্ছবে বড় একটা মেশেন না। কিন্তু রাখীবন্ধন হল আলাদা জিনিস। বলেন আমোদ নয়—আমাদের শোক। এবং সংকল্প। মাতৃঅঙ্গ ছেদ করেছে—বঙ্গদেশ দুই টুকরো। সেই সর্বনাশ আমরা স্মরণ করি, মায়ের দুঃখ ঘোচানোর সংকল্প নিই।

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি—আহ্লাদ বৈরাগীর গান কত্তাল বাজিয়ে মা বগলা আগে আগে যাচ্ছেন। ভাল করে ভোর হয় নি মুখ আঁধারি এখনো। গাইতে, গাইতে মা-ছেলে সোনাখড়ি এসে উঠলেন। ঝন্টু দলবল ডেকে বেড়াচ্ছে। মেলা কাজ আজকে, সকলের আগে পুকুরে নেমে স্নান সেরে নিতে হবে। আহ্লাদকে বলল একদিন আগে কেন? কার্তিক মাস তো কাল পড়বে।

নিত্যি সকালের সে সব গান নয়। স্বদেশী গান শোনেন ভাল করে — বলে বৈরাগী গাইতে গাইতে চললেন : একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি—হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী।

উত্তরের বাড়ীর ফেরুর মা শুনেই ধরে ফেলেছেন : ঠাকুর-দেবতার গান কই? এ তো ভিন্ন গান বৈরাগীঠাকুর।

আহ্লাদ বলেন এঁরা মা ঠাকুর-দেবতার চেয়ে কম কিসে?

উদ্দেশে বৈরাগী যুক্ত করে নমস্কার করলেন। মা বগলাও কত্তাল দুটো কপালে ঠেকালেন।

গান শুনে নতুন বাড়ীর বিরজাবালার প্রাণে মোচড় দিয়ে ওঠে। দু-চোখে জল। আপন মনে বলে উঠলেন পোড়াকপালী মা! ঘরে আসবে না আরো-কিছু! আসবে না আর ও-ছেলে। (ক্রমশঃ)

পুনর্মুদ্রিত হল

বিমানবিহারী মজুমদার-সম্পাদিত

পাঁচশত বৎসরের পদাবলী

৩য় মুদ্রণ মূল্য ১২·০০

ডঃ সত্যনারায়ণ দাশ প্রণীত

বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন-সাধনা ১৬·০০

এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লেখক সতর্ক বিশ্লেষণ সহকারে দিয়েছেন এবং বাংলা সাহিত্যে এই পত্রিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপাদিত করেছেন।

কলিকাতা ৯ : জিজ্ঞাসা : কলিকাতা ২৯

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

SELECTED WRITINGS
J. V. Stalin
Paper back 18.00 Hard Cover 25.00

Herbert Aptheker
THE NATURE OF DEMOCRACY FREEDOM AND REVOLUTION 4.25

M. A. Rasul
A HISTORY OF THE ALL INDIA KISAN SABHA 22.00

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
২য় খণ্ড (অসমাপ্ত) ৫-০০

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্মরণে ৩-৭৫

জি ডিমিট্রফ্‌
শ্রমিক ঐক্য ফ্যাসীবাদ বিরোধী দুর্গ ৩-২৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১২
শাখা নাচন রোড বেনাচিতি, দুর্গাপুর ১৩

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শ্রীমধুসূদনের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা

এ বছরে পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের জনক শ্রীমধুসূদন দত্তের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রয়াস চলেছে। এই উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ পি, ই, এন, এর পরিচালনায় কয়েকদিন আগে ৯০, শরৎ বসু রোডে শ্রীমতী কৃষ্ণা বসুর বাড়ীতে মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্যের ওপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা হয়ে গেল। এতে পৌরোহিত্য করেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের চিরস্মরণীয় অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ডঃ সুশীল রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কল্যাণমল লোধা, গোপাল ভৌমিক, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য।

কাঁথিতে সাহিত্য মেলা

কাঁথির সাহিত্যসেবীরা সম্প্রতি সেখানকার প্রভাতকুমার কলেজে একটি সুস্নিগ্ধ সাহিত্যমেলার আয়োজন করেছিলেন। এই সুন্দর পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠানে মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু কবি ও সাহিত্যিক যোগ দেন। বর্তমান সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যে মননশীল আলোচনা হয় তাতে অংশ গ্রহণ করেন প্রণব মাইতি, চিত্ত সাহু, সুদেব দত্ত, দীপক কর, বিষ্ণু সামন্ত, জলীপদ দাস, শিশির চক্রবর্তী, সুধাংশু পাত্র, অনুরাধা মহাপাত্র, সবিতা দাস, এবং দীপ্তি গুহ।

শ্রীসৈয়দ হাসানুশেখর সরকার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এই সাহিত্যমেলার আর একটি অন্যতম আকর্ষণ ছিল লিটল ম্যাগাজিনের একটি সুন্দর প্রদর্শনী।

লন্ডনে বেঙ্গলী ইন্সটিট্যুট

লন্ডনে সম্প্রতি এক বৈঠকে বেঙ্গলী ইন্সটিট্যুটের এ বছরের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে।

সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, চেয়ারম্যান ডাঃ সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ তারাপদ বসু, ডাঃ অমিয় দেব, সম্পাদক শ্রীবলদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী, সহকারী সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, উৎসব সম্পাদক শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক শ্রীঅমর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সমাপ্তি চক্রবর্তী।

সমিতির অন্যান্য সদস্যরা হোলেন সর্বশ্রী রিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বি সি নন্দী, বিধান বসু, রণেন দাস গোপীমোহন সাহা, অশোক ঘোষ, অনিল দত্ত, অচ্যুত দাস এবং এল চৌধুরী। হিসাব পরীক্ষক শ্রীসুকমল দে।

ঋষি বঙ্কিম পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ঋষি বঙ্কিম-এর নামে প্রতি বছর বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ পুস্তক লেখককে দশ হাজার টাকা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে আবেদন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নৈহাটী শাখার সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে।

The ugliest Genocide in History—Abdul Hasanat. Muktadhara, 74 Farashganj, Dacca-1, Bangladesh. Price Rs. 20.00.

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল কিভাবে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত বিভাগের কাহিনী থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি বর্ণনা করেছেন আবুল হাসানাৎ। শ্রীহাসানাৎ যৌন সাহিত্যের একজন দিকপাল লেখক হিসাবে স্বীকৃত হলেও, বর্তমান গ্রন্থে তাঁর অসামান্য ইতিহাসবোধ এবং মানবতাবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশ যে কতখানি অবাস্তব ছিল, যার পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিভীষিকাময় নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে, তার মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থে। বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া এবং ভারতের গৌরবময় মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকার যথাযোগ্য স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ফ্যাসিবাদ নাৎসীবাদ, সাম্যবাদ মাওবাদ আলোচনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের অভ্যুদয়, জিন্নার ভূমিকা, ধর্ম ও বর্ণবাদের শিকার পাকিস্তান—এসব এসেছে আলোচনায়। এই সঙ্গে পাকিস্তানের বিদেশী সাহায্য শিল্পোন্নয়ন, বিদেশ বাণিজ্যের প্রসঙ্গ এসেছে। গ্রন্থকারের মানবপ্রেম এবং

সারা বাংলা সাহিত্য মেলা (হাবড়া)

দেউটি সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত সারা বাংলা সাহিত্য মেলা আগামী ৯ ফেব্রুয়ারী হাবড়ায় অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী ব্যক্তিদের বিপ্লব চন্দ, পোঃ হিজলপুকুর হাবড়া, ২৪ পরগণা, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

চলমান শিল্প আন্দোলন ঃ অসিত দাসের নেতৃত্বে বেশ কিছু শিল্পী কবি ও শিল্পকার তাঁরা শিল্পকে মুক্তি দেবার জন্যে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। গত ৪ঠা জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়েছে এই অভিযান। চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের দেওয়াল থেকে শুরু হয়েছে ছবি আঁকা ও লেখা। এখন থেকে প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে কবি ও শিল্পীরা বেরোবেন। প্রথম দিনে ছিলেন কল্লোল মজুমদার, ধূর্জটি চন্দ, সমরেন্দ্র দাস, পার্থপ্রতিম গাঙ্গুলি ও অসিত পাল।

নতুন বই

বিশ্ববোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বইটির ছাপা খুবই খারাপ।

সূর্যতিয়াস। অংশুমান বসু। হরিপদ প্রকাশন। ২৪এ আমহার্স্ট রো, কলকাতা—৯। দশ টাকা।

সন্টি বিলে প্যান্টা একালের বহুপরিচিত মাস্তান যুবকদের মতোই কয়েকজন মাস্তান। সিনেমার টিকিটের কালোবাজারী থেকে শুরু করে ছিনতাই খুন-জখম এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু কিছু অসামাজিক কাজ কারবারে তারা লিপ্ত। এদের এই আপাত ঘৃণ্য জীবনের নেপথ্যেও কিন্তু একটা অন্য জীবন আছে—যে জীবনের হাসি কান্না সুখ-দুঃখের অনুভূতি আমাদের মতই। সন্টি বিলে আর প্যান্টার জীবনের হাসি-কান্না আর দুঃখ বেদনা নিয়েই লেখা এই উপন্যাস।

'সূর্যতিয়াসে'র নায়ক সন্টি। সে জীবনে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। বস্তির মানুষজনের নোংরা কলহ আর খেয়োখেয়ি সে

পছন্দ করে না। ভেড়ার বাচ্চার মতো নির্জীব অথবা আস্তাকুঁড়ের কুকুরের মতো ঘৃণ্য হয়ে বাঁচা তার ভাল লাগে না। এদের সকলের মধ্যেই প্রশ্ন আছে—কোন অপরাধে আজ তারা এই ঘৃণ্য জীবনে জড়িয়ে পড়ে সমাজের বক্র দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েছে? সে কি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দারিদ্র্যের জন্যেই? আজ তাই কী সমাজের চোখে এই নির্বাসন? এই অন্ধকার নির্বাসন-লোক থেকে আলোর মুক্তিতে কি তারা কোন দিনই চোখ মেলতে পারবে না? এই সংশয় মুহূর্তেই সত্যের সন্ধান দিতে আবির্ভূত হয় নয়নাংশু। তার পাণ্ডিত্য এবং বিচক্ষণ বুদ্ধি এদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে সত্য পথের সন্ধান দেয়। সেই পথে এগিয়েই সন্টি নিজের জীবনের বিনিময়ে তারই মতো অসংখ্য উপেক্ষিত অবহেলিত এবং অপাংক্তেয় যুবকের মনে আলোর পিপাসা জাগিয়ে দিয়ে যায়।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখক তাঁর গল্প বলার স্বচ্ছন্দ রীতিটি বজায় রেখে পাঠককে ধরে রেখেছেন। চরিত্রগুলি সু-অঙ্কিত। তবে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের সংলাপের ক্ষেত্রে (বাস্তবতার কথা মনে রেখেও) একটু সংযত হওয়া প্রয়োজন ছিল। ছাপা এবং বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

বনফুল সম্মানিত

সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ কথা-শিল্পী বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) সাধারণতন্ত্রের রজতজয়ন্তী দিবসে পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেছেন। তাঁর এই স্বীকৃতিতে আমরা গৌরব বোধ করি এবং সেই সঙ্গে তাঁর নীরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সংকলন ও পত্র পত্রিকা

অন্যদিন ঃ সম্পাদক ঃ শিশির ভট্টাচার্য। ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেনস। কলিকাতা। ৪৫। দাম ঃ এক টাকা।

রীতিমতো পরিচ্ছন্ন রুচির এই পত্রিকাটির শারদ সংকলনে কবিতা সংক্রান্ত দুটি নিবন্ধ লিখেছেন চন্দ্রশেখর রায় এবং সন্তোষকুমার অধিকারী। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবন সরকার শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় দীপেন রায় তারাপদ রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন। প্রচ্ছদ এবং ছাপা উন্নত মানের।

সাগর পারে ঃ সম্পাদক হিরন্ময় ভট্টাচার্য। ১২২ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কোলকাতা-১২। এক টাকা।

গত কয়েকটি সংখ্যায় 'সাগর পারে' পত্রিকার একটি বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বেশ কিছু সিরিয়স নিবন্ধ গত কয়েকটি সংখ্যায় চোখে পড়েছে। শক্তিমান বাঙালী কবির উৎকৃষ্ট গুটিকয়েক কবিতাও কয়েকটি সংখ্যার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তুলনায় গল্পের দিকটা বেশ দুর্বল। এ-বিষয়ে একটু চিন্তা করা দরকার। 'ঢাকা থেকে বলছি' এবং 'কলিকাতা সমাচার বিভাগ' দুটিও উল্লেখ করার মতো। তবে এই সংখ্যায় কোলকাতা সমাচারে পূজা সংখ্যার লেখার আলোচনায় লেখক তাঁর পরিচিত লেখকেরই প্রচার করেছেন। পূজো সংখ্যার বিশেষ তিনটি পত্রিকা ছাড়াও আরও কিছু কিছু পত্রিকা কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। নামী অনামী বহু লেখকই এই সব পত্রিকায় লেখেন। দু-একটি লেখা ভালোও হয়ে থাকে। লেখক যদিও স্বীকার করেছেন 'আমি খুব বেশি পড়ুয়া নই। মাঝে মাঝে পরিচিত দু-একজন-এর লেখা পড়ে ফেলি' তবুও সাগর পারের পাঠকদের কাছে একটা সামগ্রিক ছবি তুলে ধরাই প্রয়োজন বলে মনে করি। এই সংখ্যায় তরুণ সান্যালের কবিতাটি পত্রিকার একটি বিশিষ্ট মর্যাদা এনে দিয়েছে। শুভঙ্কর ঘোষের কবিতাটিও ভালো।

শদমন্ত্র। (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা) সম্পাদনা আনন্দ রায় এবং অতীন্দ্র রায়। ১৬ ফরডাইস লেন, কোলকাতা—১৪। দাম দেড় টাকা।

'নীরেন্দ্রনাথ তো সে জাতের কবি নন যাঁরা পিরিয়ডিক লিখেই নিঃস্ব হয়ে যান। তিনি গত তিন দশক ধরেই আমাদের কাব্যজগতের সামনের সারিতে রয়ে গেছেন; অর্থাৎ নিজের কালকে অতিক্রম করে অন্যান্য সমসাময়িক কালেও মূল্যবান কাব্যসম্ভ সংযোজন করে চলেছেন।'

কবি নীরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কবি মণী রায়ের ওপরের কথা কটিই বোধ করি ও সম্পর্কে মস্ত ওজনের কথা। 'নতুন অংশ তাঁর কবিতাকে জীবনের অভিজ্ঞতার বয়ঃ করে'—কবি কৃষ্ণ ধরের একটি ছোট্ট অ জীবন্ত উক্তিতে কবি নীরেন্দ্রনাথ মুহূর্তে যেন তাঁর সামগ্রিক পরিচয়ে পরিচিত হ যান। শদমন্ত্রের এই বিশেষ সংখ্যাটি আরও বহু পরিচিত এবং অপরিচিত কবি নীরেনবাবু সম্পর্কে কিছু কিছু লিখেছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যা শঙ্খ ঘোষ শক্তি চট্টোপাধ্যায় আনন্দ ব এবং আরও অনেকে। ছাপা প্রচ্ছদ এ বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

সাহিত্য চিন্তা ঃ সম্পাদনা ঃ কিরণশঙ্ক সেনগুপ্ত। ৬১১ গাঙ্গুলী বাগা কলকাতা-৪৭। দাম ঃ দেড় টাকা।

লিখেছেন ভবতোষ দত্ত অচ্যুত গোস্ব রায় বসু শঙ্খ ঘোষ অমল দাশগুপ্ত ত সান্যাল রতেশ্বর হাজরা আশিস সান এবং আরও অনেকে।

লেখনী ঃ সম্পাদক ঃ সুধীর সাহা। ৮৮। মৃণাল পার্ক থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

লিখেছেন কালিদাস রায় তরুণ সান মণীন্দ্র রায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র মুখোপাধ্যায় অগ্নিমিত্র এবং আরও অনে

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু উমাকে বলার কিছু খুঁজে পেলাম না যাতে সে শান্তি পেতে পারে। পণ্ডিচেরী ফিরে গিয়ে গুরুদেবকে সব বললাম। তিনি উমাকে আশীর্বাদ পাঠালেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ওর ভাই বাবুল মারা গেল—তার পরেই ওর প্রিয় মামা শুভ্রাংশু—চমৎকার সুদর্শন যুবক। উমা ভেঙে পড়ল। খবর পেলাম—ও শয্যাশায়ী—রোগ যক্ষ্মা।

পণ্ডিচেরিতে ফিরে এলাম ১৯৩৯ সালে, অগষ্ট মাসে—শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনের এক সপ্তাহ আগে। কিন্তু সাধনায় কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না। কী করি? ভেবে-চিন্তে সুরু করলাম লেখা উমাকে কেন্দ্র করে রমন্যাস। নাম দিলাম 'ছায়ার আলো'—প্রায় আদ্যন্ত তার জীবনী—কেবল তার অসুখ বাদ। কারণ তখনো সে অসুখে পড়ে নি। তাকে চিঠি লিখতাম নিয়মিত—সপ্তাহে তিন চারটির কম নয়। এত চিঠি আমি কাউকে লিখিনি। সে উত্তর দিত, কিন্তু কক্ষণো বলত না তার বিষাদের কথা। কেবল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত গানের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ শান্তি মেলে কিনা। গানকে সে ভালোবেসেছিল কিন্তু গান গাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। আমি তাকে লিখলাম—"সে হবে না, তুমি ভীষ্মদেবের কাছে গান শেখো।" ভীষ্মদেবের গানে সে কিছুটা আশ্রয় পেল। শুধু তানপুরা নিয়ে সুরু করল রাগসংগীত সাধনা। জ্ঞানপ্রকাশ লিখল সে চমৎকার গাইছে তানালাপ সহ। সঙ্গে আমার শেখানো গানও সাধত। এই খুঁটি ধরে ফের সবে উঠে দাঁড়িয়েছিল এমন সময়ে তার ছোট ভাই বাবুল মারা গেল তার পরই তার প্রিয় ছোট মামা শুভ্রাংশু। এই-ই হল— the last straw ও পড়ল নেতিয়ে। এমন কি, আমাকেও চিঠি লেখা ছেড়ে দিল। ওর মাসিমা লীলা—ছিল ওর মা-ও- বটে সখীও বটে—লিখত আমাকে কলকাতায় আসতে—কারণ মা বলছে সে বাঁচতে চায় না। আর। রাজীতে একে বলে death-wish. প্রায় সবাইকেই কোনো না কোনো সময়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—যখন মানুষ একান্ত নিঃসহায় হয়ে সব আশা ছেড়ে দিয়ে বলে বাইবেলের ভাষায় ঃ

"In the midst of life we are in death".

ভাগবতের ভাষায় ঃ

"কী সুখ সংসারে? প্রিয়ের বিচ্ছেদ, প্রিয়ের সাথে নিত্য বাস, কুসুমে কীট কাঁটা ভোগে বিপর্যয় শোকানলের ধূমে চিত্তাকাশ ক্ষণে ক্ষণে হয় মলিন—ইন্দ্রিয়-সুখের পরে সেই অন্তহীন দুঃখ পরিতাপ—যাহার প্রতিকারো দুঃখ আনে বহি রজনীদিন।

এ দুর্লগ্নে কেবল ভগবানের কৃপাই সান্ত্বনা তথা আশ্রয় দিতে পারে। কিন্তু উমার যে মন ধীরে ধীরে শ্রীঅরবিন্দের দিকে ঝুঁকছিল সে মন পর পর এই তিনটি আঘাতে বিকল হয়ে পড়ল। ফলে এমন কি গানেও সে ক্ষণিক শান্তি পেলেও তার পরেই ফের বিষাদের অতলে হাঁপিয়ে উঠে বলত, 'বাঁচতে চাই না আর মাসিমা।'

কিন্তু আশ্চর্য এই যে উমা যখন গান গাইত তখন তার কণ্ঠে উচ্ছল হয়ে উঠত এমন এক মধুর ভক্তিভাব যার দোলায় অনেকের মনই অভিভূত হত—চোখে জল ভরে আসত। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে অনেক আগেই লিখেছিলেন যে মানুষ যতই বিকশিত হয়ে ওঠে ততই তার মধ্যে নানা স্ববিরোধী প্রবৃত্তি জটলা করে যার ফলে দেখা যায় যে মানুষ আজ উদার কাল সে হয়ে দাঁড়ায় কঞ্জুষ যে মনে মনে ভয়কাতুরে সে হঠাৎ অসমসাহসিক হয়ে ওঠে যে স্বভাবে বিলাসী সে থেকে থেকে ঝোঁকে রুক্ষ বৈরাগ্যের দিকে .....ইত্যাদি।

আমি নিজের মধ্যেও কি পদে পদে এ-অসংগতি দেখি নি? আমার সংসারী বুদ্ধিবাদী বন্ধুবৃন্দ আমাকে দেখে কি সায় দিতে পারতেন শ্রীঅরবিন্দের অদ্ভুত রায়ে যে আমি 'জন্মযোগী' বা গুরুবাদীরা আমার প্রবল কর্মাসক্তি দেখে বলতে পারতেন—আমি স্বভাববৈরাগী? আসলে আমি নিজেকে সনাক্ত করেছিলাম যুগপৎ বৈরাগী যোগী তথা কবি শিল্পী বলে। আমার পিতৃদেবের মধ্যেও কি দেখি নি দুটি মানুষ—একটি তার্কিক অন্যটি ভক্ত? সমসেট মমের একটি প্রায়োক্তি মনে পড়ত— যে-কথা উমাকে বলে-ছিলাম—যে মানুষ মাত্রেরই মধ্যে নানা অসংগতি পাশাপাশি ঘরকন্না করে—কখনো একটি প্রবৃত্তি প্রকট হয় কখনো তার উল্টো প্রবণতা। উমার মধ্যেও তাই তার সৌভাগ্য-লগ্নেও দেখতাম দুটি মেয়ে—একটি সংসার-বিমুখ উদাসিনী অন্যটি গীতোচ্ছলা আনন্দ-ময়ী। আমি চেয়েছিলাম তাকে গানের রসে রসিয়ে ভগবানের দিকে টানতে কিন্তু লীলা-ময়ের দুর্বোধ্য বিধানে লক্ষ্মীপূর্ণিমার উৎ-সবলগ্নে ছেয়ে এল শোকের অমাবস্যা ঃ ও শয্যা নিল যক্ষ্মারোগে। লীলা লিখল ওর একটি ফুসফুস নিউমোথোরাক করে নিশ্চল করে দিতে হয়েছে। আমি শঙ্কিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দকে জানাতে তিনি অনুমতি দিলেন ওর রোগশয্যায় গিয়ে গান গল্প করে ওকে মৃত্যুকামনা থেকে ছিনিয়ে জীবননন্দিনীর রূপে ফিরিয়ে আনতে।

আটাশ

আমি কলকাতায় গেলাম আশা নিয়ে—কিন্তু শয্যাশায়ী উমার শীর্ণ মুখ দেখে বিষাদে মন ছেয়ে গেল। মৃত্যুর ছায়া ওকে ঘিরে ধরেছে। আমাকে দেখে ওর চোখে জল ভরে এল, কিন্তু তবু মুখে ফুটে উঠল ওর মধুর হাসি যার আলোয় ও সুন্দরী না হলেও অপরূপা হয়ে উঠত—সবাই বলত একথা। আমাকে বলল ঃ জানো মন্টুদা আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম তুমি আসছ কিন্তু সত্যি যে তুমি আসবে ভাবতে পারি নি।

কেন বল তো সন্দেহময়ী? (ওকে মাঝে মাঝে এই নামে ডাকতাম আমি)

ও ম্লান হাসল ঃ তুমি সব ছেড়ে যাঁকে চেয়েছ তাঁকে যে আর চায় না এমন নাস্তিক মেয়েকে তুমি কেমন করে মনে ঠাঁই দেবে ভাই?

তুই কি জানিস আমরা সত্যি কী চাই না চাই?

এই ধরনের কথার সান্ত্বনা দিতে চাইলেই ও টুকত ঃ থাক থাক ভাই—কথা কথা কথা—তুমিই বলতে না? আমি বলি—গান গান গান—গেয়ে চলো ভাই।

গান গাইতেই তো এসেছি রে! বল না কী গান শুনতে চাস?

সেই গানটি মন্টুদা—আমি গ্রামোফোন শুনি প্রায়ই—সেই থেকো প্রিয় পাশে—Abide with me -র অনুবাদ। না দুটিই গাও পর পর।

---

* যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়বিয়োগসযোগ জন্ম-শোকাগ্নিনা সকলযোনিষু দহ্যমানঃ।
দুঃখৌষধং তদপি দুঃখম্
(প্রহ্লাদের স্তব.....ভাগবত ৭-৯-১৭)

যাঁরা ভগবৎ সাধনায় সংসার ছেড়ে দিয়েছেন তাঁদের মন চমকে ওঠে এ-কথায়—উপলব্ধি করে যে যে-বৈরাগ্য দুঃখের ঔষধ হয়ে আসে সে-ঔষধও অনেক সময়েই আরো দুঃখ আনে সব সাংসারিক আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

আমি চমকে উঠলাম ঃ তবু তুই বলবি তুই নাস্তিক? যাক শোন ঃ

থেকো প্রিয় পাশে
সাঁঝছায়া নেমে আসে,
আঁধার ঘনায় প্রভু,
থেকো প্রেমে পাশে!
যবে ছেড়ে যায় সবে নিস্সাথী প্রবাসে—
অনাথের নাথ থেকো হে আমার পাশে।
জীবনের ছোট দিনখানি হয় মায়া,
ধরণীর হাসিরাশি হয় ম্লান ছায়া,
সকলি ফুরায়ে যায়, কাল সবই নাশে
হে চিরন্তন, থেকো হে আমার পাশে।
প্রতি পলে তুমি বিনা সঙ্গী কে আছে?
তুমি বিনা আর বলো যাব কার কাছে?
তুমিই আমার দিশা সহায় নিরাশে
বাদলে কিরণে থেকো হে আমার পাশে।
দিও দেখা—মুদিব নয়ন যবে শেষে
দেখায়ো আকাশ কালো বুকে আলেরেশে
ধরাছায়া সরে, অধরার ঊষা হাসে ঃ
জীবনে মরণে থেকো হে আমার পাশে।

শুনতে শুনতে ওর চোখে জল ভরে এল। ওর মা, প্রভাদি ও লীলাও চোখ মুছল। আমি জোর করে হেসে বললাম ঃ তবু তুই বলবি ভগবানের নামে সান্ত্বনা সব কথা কথা কথা?

হাসি একটু চুপ করে রইল আমার একটি হাত ওর মাথায় চেপে ধরে। আমার মন কোমলতায় ভরে গেল। আহা! এমন ফুলের মতন মেয়ের মাথায় কেন বাজ ভেঙে পড়ল? যে তার গানে হাসিতে সরল আনন্দে অপরের মনে জাগাতে পারে সুষমার সুরভি, যে ভগবান সম্বন্ধে কোনো উচ্ছ্বাস না করলেও ভক্ত ও মহৎ মানুষকে দেখে এত সহজে উজিয়ে ওঠে, যার চাহনিতে মেলে এক টুকরো আকাশের নীল স্পর্শ, যার অভিনন্দনে কেউ কোনো দিন বাহুল্য দেখে নি; যার পবিত্রতার ছোঁয়াচেও মন পবিত্র হয়ে বলে—আর যেখানেই ভয় থাকুক না কেন এখানে ভয় নেই অশুচি হবার—তাকে কেন এমন দুঃসহ দুঃখ পেতে হল? ধরণীদাকে ও বাপী ডাকত—তিনি অনেক সময়ে ওকে ডাকতেন পাগলী। কী নিখুঁৎ স্নেহ পিতাপুত্রীকে এত কাছে টেনে সখাসখীর পদবী দিয়েছিল। সেই নিটোল স্নেহময় বন্ধুকে ও হারাল—আর কী ভাবে! ওর কাছে বসলেই এই ধরনের বিষাদ আমার মনকে ছেয়ে ধরত। ও বুঝত তাই কখনো অনুযোগ করত না বলত না ওর দেহ-দুঃখের কথা। সেদিন আমার হাত খানিকক্ষণ মাথায় রেখে পরে দুহাতের মধ্যে বন্দী করে শুধু বলল ঃ এর উত্তর কী আমি জানি না ভাই। শুধু জানি—এ-গানটি বা তোমার বৃন্দাবনের লীলা গানটি শুনলে বুকের মধ্যে কী যেন হয়—আনন্দ না বেদনা বুঝতে পারি না। বলে হেসে ঃ কিন্তু ব্যাখ্যা থাক ভাই তুমি গাও গাও—কেবল গাও। "Abide with me."

আমি হেসে আচ্ছা বলে ধরলাম ঃ

Abide with me, fast falls the eventide;
The darkness deepens, Lord, with me abide.
When other helpers fail and comfors flee,
Help of the helpless, Oh, abide with me.

Swift to its close ebbs out life's little day,
Earth's joys grow dim, its glories pass away.
Change and decay in all around I see :
O thou who changest not, abide with me.

I need thy presence every passing hour,
What but thy Grace can foil the tempter's power?
Who like thyself my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, Oh, abide with me.

Be thou thyself before my closing eyes :
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee,
In life, in death, O Lord, abide with me.

ও প্রায়ই এই ধরনের গান শুনতে চাইত—আনন্দের নয়—বৈরাগ্যের গান, প্রাপ্তির নয়—অপ্রাপ্তির গান, মিলনের নয়—বিরহের গান। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন এর নাম Psychic sadness— এ-বেদনা ঢালুপথে টানে না—তোলে আকাশের পানে। তবু আলাপ-আলোচনায় ও ভগবানের কথায় কান দিত না, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শ্রীঅরবিন্দকে গভীর ভক্তি করত। কেন জিজ্ঞাসা করলে একবার বলেছিল ঃ কারণ তোমাকে তিনি স্নেহ করেন সত্যিই।

কী করে জানলি?

নৈলে কি আমাকে স্নেহ করতেন? তোমাকে স্নেহ করেছেন মনে-প্রাণে তাই আমাকে নাস্তিক জেনেও তোমার মতন ভক্তকে পাঠিয়েছেন কত দূর থেকে—আশ্রম ছেড়ে সংসারে—আমার মৃত্যুশয্যায়।

প্রভাদি (চোখ মুছে) ঃ বালাই! ও কথা বলে না মণি!

ও তর্ক করত না—শুধু চোখে ওর জল চিকচিক করে উঠত আমি মুছিয়ে দিতাম—শুধু একবার নয়, বারবার।

আমি ওর রোগশয্যার পাশে থাকতাম সারা দিন। দু মাস বাদে ওর অবস্থা একটু ভালো হল। আমি আগস্টে ফিরে এলাম। ২২-এ জানুয়ারী (১৯৪১) তার পেলাম ও বিদায় নিয়েছে—ওর জন্মদিনে—যেদিন আমারও জন্মদিন। ওর বয়স তখন মাত্র ২১ বৎসর।

ঊনত্রিশ

শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে লিখেছেন (৬-১)
The great Gods use the pain of human hearts
A a sharp axe to hew their cosmic road
মহীয়ান দেববৃন্দ মানুষের হৃদয়ব্যথার কুঠারে করেন নিত্য
উন্মুক্ত সৃষ্টির রাজপথ।

বেদনার অন্ধকার যখন ছেয়ে আসে তখন এ-ধরনের দার্শনিক উক্তি মনে হয় উমার ভাষায়—কথা কথা কথা! কিন্তু কালাতিপাতে সব সময়ে না হোক অনেক সময়েই দেখা যায় যে একটানা অবিমিশ্র আনন্দের পথে মানুষের গভীর বোধের বিকাশ হয় না। এ-বিকাশ না হলে কি হয়?—আনন্দ আর তেমন আনন্দ দেয় না ভোগ হয়ে ওঠে দুর্ভোগ না হোক—নীরস একঘেয়ে। এক দার্শনিক তাই বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা ঃ যে, মানুষের কাছে সবচেয়ে দুঃসহ দুঃখব্যথা নয় সে চেয়ে দুঃসহ বিতৃষ্ণা— boredom. সব পেয়েছির দেশে মানুষ অনেক কিছু পেতে পারে কিন্তু পায় না কোনো গভীর প্রাপ্তির বর। একথা যদি সত্য না হ

তাহলে যুগে যুগে বরেণ্য মহাজনেরা ছোট সুখ ইন্দ্রিয়ের ক্ষণতৃপ্তি ছেড়ে সাধনার তপস্যার দুর্গম পথে পা বাড়াতেন না। অবিশ্বাসী বাস্তববাদীরা হাল্কা সুরে সব গভীর আন্তর উপলব্ধিকে ব্যঙ্গ করতে পারেন, কিন্তু কতদিন? যতদিন না গভীর শোকতাপের অন্ধকারে পড়ে মন হাঁপিয়ে ওঠে, চোখের আলোও কালো হয়ে আসে। পক্ষান্তরে গভীর দুঃখ বেদনা শোক যে আমাদের অজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে এ-সত্যের অগুন্তি প্রমাণ মেলে বহু মহাজন মহাপুরুষেরই প্রাণসাধনায়—যাঁরা তাঁদের জীবনের দীপ্ত এজাহারে প্রমাণ করে গেছেন যে, যে-বেদনা সচরাচর আমাদের ক্ষিষ্ট মনকে নিরাশার অতল তলে প্রক্ষেপ করে সে একান্তী সাধককে দৃষ্টির শিখরে তুলে সার্থক করতেও পারে। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের প্রতিপদেই এ-আনন্দময় সত্যের স্বাক্ষর মেলে। তাঁকে দুঃসহ দুঃখের কাঁটা-বনের মধ্যে দিয়েই প্রতি পদে ফুলবনের পথ খুঁজে পেতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু একটি সুন্দর উপমা দিতেই লেখেন নি—আমার এ-ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে।

আমাকেও জীবনে দুঃখ পেতে হয়েছে যথেষ্ট। তাদের ফিরিস্তি দেওয়া অবান্তর বে, কেন না এ-স্মৃতিচারণ খতিয়ে অরবিন্দের তর্পণ আমার ব্যক্তিগত সাধনার ভূমিকায় এঁকেছি তাঁর ছবি কারণ এই থেই তাঁর মহত্ত্বকে আমি উপলব্ধি করেছি। কথার একটি নতুন প্রমাণ—উমার মৃত্যুর পর শ্রীঅরবিন্দ আমার আরো কাছে এগিয়ে এলেন আমাকে বেদনার অমানিশা থেকে বার দীপ্ততর চেতনায় টেনে তুলতে তাঁর শক্তিতে। উমার অকালমৃত্যুর পরে তিনি চিঠি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন (২০-১২-৫১): 'আমি তোমাকে শুধু চিঠি লিখেই ক্ষান্ত করি মনে কোরো না—যখনই আমি সময় পাই তোমাকে পাঠাই শক্তি...ইত্যাদি

(I am certainly not helping you only with letters but doing it whenever I get some time for concentration and I notice that when I can do it with sufficient energy and at some length there is response.....20.12.42")

নাম যদি গুরুকৃপা না হয় তবে গুরু-কী বস্তু?

ত্রিশ

শ্রীযুগলকিশোরের আমন্ত্রণের কথা ছি। বলাবাহুল্য, শ্রীঅরবিন্দ অনুমতি লন না আমেরিকায় গিয়ে হিন্দুধর্মের রে উঠে-পড়ে লাগতে। তিনি বলতেন ই যে, ওরাই আসবে—যেমন মৌমাছি আসে ফুলের কোলে। আমি তর্ক ত পারতাম—কলকাতায় গিয়ে গান করে যোগসাধনার ভরাডুবি না হয় তবে শে যাওয়ার বাধা কিসে? তুলি নি এ-কারণ শ্রীঅরবিন্দকে ছেড়ে সাত সমুদ্র নদীর পারে যাবার কোনো তাগিদই পাই নি আমার মনের মধ্যে। হিন্দু-ধর্ম প্রচার? ও যাঁরা পারেন তাঁরা করুন—প্রত্যেকেই চলুন তাঁর আন্তর প্রেরণায়, ভাবের ঘরে চুরি না করলে সব পথই রাজ-পথ হতে পারে। কিন্তু আমার কথায় ফিরে আসি।

তিন চার বার বাইরে গিয়ে গান করে আসার পরে আমার মনে হল—গান করে আশ্রমের জন্যে কিছু টাকা তোলা মন্দ কি? আমার তখন স্বাস্থ্য অটুট, প্রাণশক্তি অক্লান্ত—তাই মনে হল দেখাই যাক না এভাবে কিছু কিঞ্চিৎ গুরুসেবা করতে পারি কি না? গানের চ্যারিটি কন্সার্ট বাংলাদেশে প্রথম আমিই শুরু করি—মানে বিশুদ্ধ গানের—অভিনয় বাদ। আমার মনে উচ্চাশা তো তখনো নিষ্প্রভ হয়ে আসে নি, তাই বললাম গুরুদেবকে যেমনি বম্বে ও আমেদাবাদ থেকে নিমন্ত্রণ এল।

প্রথম গেলাম বম্বে — ১৯৪৩ সালে। কিন্তু বম্বেতে সেবার কোনো চ্যারিটি কন্সার্ট করি নি—প্রাইভেট দৈলিপী আসর করে মাত্র হাজার খানেক টাকা তুলে পণ্ডি-চেরী পাঠিয়ে দিলাম। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা আশীর্বাদ পাঠাতে আমি মহানন্দে লিখলাম : আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব আরো প্রণামী পাঠাতে—মানে বম্বেবাসীদের চাঁদা। কিন্তু দেখলাম যে প্রাইভেট আসর করে টাকা তোলা আদৌ সহজ নয়। পরে একবার এলাহাবাদে এ-সত্যটি আরো মর্মন্তুদভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। এক মহিলা আমাকে ভরসা দিলেন তাঁরা আমাদের আশ্রমের জন্যে বেশ মোটা টাকা তুলবেন যদি আমি তাঁদের এক আসরে গাই যেখানে বহুলোক আসবে। সময়—সকাল আটটা। ভোর ছটায় উঠে এক পেয়ালা চা খেয়েই বেরিয়ে গেলাম—কারণ আসরের সামিয়ানা বহু দূরে। গিয়ে দু ঘন্টা তারস্বরে নানা ভজন কীর্তন করে গলদঘর্ম হয়ে পেলাম সাড়ে বাষট্টি টাকা চাঁদা। বম্বেতে এত কম চাঁদা পেয়ে কিন্তু হতে হয় নি, তবে কোনো প্রাইভেট আসরেই দুশো-তিনশোর বেশী মিলত না সচরাচর। তখন আমার ধনী বন্ধু পারেখকে লিখলাম আমেদাবাদে যিনি আমাকে ভরসা দিয়ে-ছিলেন বড় গলা করেই। তিনি আমাকে ডাকলেন বটে কিন্তু হা হতোস্মি, সেখানেও সেই প্রাইভেট আসর। সব জড়িয়ে জুটলো মাত্র আড়াই হাজার টাকা।

কিন্তু তারপরেই ভাগ্যদেবতা হাসলেন। আমি গিয়ে উঠেছিলাম আমার ক্রোড়পতি বন্ধু খ্যাতনামা আম্বালাল সারাভাইয়ের প্রাসাদে। ক্রোড়পতিদের মধ্যে আমি তাঁকেই প্রথম বন্ধু বলে সনাক্ত করি। পরে আরো দুজন ক্রোড়পতি আমাকে মালা দেন বন্ধু বলে বরণ করে: ইন্দিরার পিতৃদেব ক্যাপ্টেন কৃপারাম ও স্যর চুনিলাল মেতা।

আমি আম্বালালের কাছে আশ্রমের কথা কিছু বলিনি কেবল এখানে ওখানে গান গেয়ে প্রাণপণে টাকা তুলছি অপটু বন্ধু পারেখের নিমন্ত্রণে। কিন্তু পাঁচসাত জায়গায় তারস্বরে দুতিন ঘন্টা গেয়েও যখন আড়াই হাজারের বেশি চাঁদা উঠল না তখন বেশ একটু দমে গেলাম। কী করা যায় ভাবছি, গালে হাত দিয়ে এমন সময়ে একদিন আম্বালাল হঠাৎ বললেন : 'রায়! তুমি তো আমাকে কই বলো নি যে তুমি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের জন্যে টাকা তুলতে বম্বে ও আমেদাবাদে টো টো করে গান গেয়ে বেড়াচ্ছ?' আমি সুবিধা পেয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারলাম : 'বলি কোন মুখে বন্ধুবর তোমার মুখে ঘড়ি ঘড়ি শুনে যে তুমি অজ্ঞেয়বাদী (agnostic)?"

তিনি বললেন: কিন্তু তা বলে আমি শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধা করি না এতো সত্যি নয়। কাজেই আমিও তোমার সহায় হতে চাই।' বলে বললেন : 'আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার আচরণে : যে, চাঁদার কথা বলো নি একবারও। বলে বললেন: শুনছি তোমার বন্ধু পারেখ ভরসা দিতে যত ক্ষরিৎকর্মা চাঁদা তুলতে তেমন করিৎকর্মা নন। প্রাইভেট আসরে যথেষ্ট টাকা তোলা যায় না। কত উঠেছে? আমি সলজ্জে বললাম: মাত্র আড়াই হাজার।' তিনি আর কিছু না বলে তাঁর কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে তাঁর বিরাট দরবারী কক্ষেই আমার গান হবে—কিন্তু সেমি-প্রাইভেট। অর্থাৎ বাইরে এক বিনম্র বাক্যস ব্যবস্থা হল—শিরোনামা : 'স্বেচ্ছায় যে যা দিতে চায়।' টিকিট করে প্রাইভেট আসরে গান করতে আমি চাই নি কারণ টিকিট করলে আপনা শিষ্য শিষ্যাকে রিহার্সাল দিয়ে গড়ে তুলতে হয়—বম্বে বা আমেদাবাদ তো কলকাতা নয় —শিষ্য শিষ্যা পাই কোথায়?

গুরুর কৃপায় গান সেদিন খুব জমে গেল প্রথম থেকেই। ফুলের মালা করতালি জয়শঙ্খ কিছুই বাদ গেল না—যা যা শ্রীঅর-বিন্দ বারণ করেছিলেন তাই হল একের পর এক। মন খারাপ। কিন্তু যখন শুনলাম সাড়ে ছয় হাজার টাকা উঠেছে তখন ফুল্ল মনে বিদায় নিলাম। ফিরে এলাম বম্বে।

সেখানে এক গুজরাতী বণিক আমায় নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর ওখানে। আমার আর গাইবার ইচ্ছা ছিল না। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট—কাজ নেই। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা নিষ্কৃতি দিলেন না। গানের পর আমাকে বললেন যে যেহেতু শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গুরু সেহেতু শ্রীঅরবিন্দের LIFE DIVINE তিনি বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর পূজা মন্দিরে। গিয়ে দেখি সত্যিই অবাক কাণ্ড— LIFE DIVINE আসীন তাঁর বেদীতে—চন্দন সিঁদুর মাখা—পাশে ধূপ দীপ গ্রন্থবিগ্রহের উপর ফুলের মালা ও তুলসী মঞ্জরী! বললেন ভক্তপ্রবর : তিনি ইংরাজী জানেন না বলে—তাই তাঁর নিজ নিজস্ব পদ্ধতিতে শ্রীঅরবিন্দ পূজা—তাঁর গ্রন্থের মধ্যে তাঁকে আবাহন!

(ক্রমশঃ)

যুক্তি

বেকার ভাতা

চার দিকে বেকারের ছড়াছড়ি। এমন ঘর নেই যে ঘরে অন্তত একটি ছেলে বা মেয়ে বেকার বসে নেই। সারা পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা চোদ্দ লক্ষের ওপর; এ ছাড়া রয়েছে অশিক্ষিত বেকার গ্রামের ছদ্মবেকার ও আধা-বেকারের দল। জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। প্রতি বছর স্কুল-কলেজ থেকে পাশ করে হাজার হাজার শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে বেকারের দলে নাম লেখাচ্ছে! তবে চাকরী কি একদম হচ্ছে না?—হচ্ছে সেই সিন্ধুমূলে বিন্দুর মতো। হাজারে একটি। তাহলে আর সবার কি হবে? এদের কি বেকারভাতা দিয়ে কিছুটা অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ করা হবে?

বেকার ভাতার প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রাম ও শহরের তরুণ-তরুণীদের কাছে গিয়েছি তাঁদের মতামত জানতে। পানিহাটির শ্রীমান আশুতোষ বোস বি-কম পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছেন। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশের পর ব্যারাকপুর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড করেছেন। আজ পর্যন্ত কোন ডাক আসে নি। জিজ্ঞাসা করলাম—এই যে চাকরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সরকার যদি এর একটা কিছু বিকল্প করেন তাহলে কেমন হয়? মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—ওঃ আপনি বুঝি 'বেকার ভাতা'র কথা বলছেন। তা মন্দ নয়। তবে সন্দেহ, সরকার এটা মেনে নেবেন না। এখন যেমন বাড়ীতে চোরের মতো ঢুকি চুপিসাড়ে অপরাধীর মতো বাবার হোটেলে খাওয়া সারি—এগুলো বিবেকে ভীষণ লাগে। সমর্থ ছেলে কোথায় বুড়ো বাবাকে সাহায্য করব তা নয় এখনো তাঁর ওপর জুলুম চালাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করি —জুলুম মানে?' বুঝলেন না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যবে থেকে সরকারী খাতায় বেকার হিসেবে নাম লিখিয়েছি তবে থেকেই আমি উপার্জনক্ষম। কিন্তু উপার্জনের বেলায় ঘন্টা। শুধু টো টো কোম্পানী আর বাবার পকেট ফাঁক করছি।'

—উনি জবাব দেন।

—তাহলে আপনি বলতে চাইছেন বেকার ভাতা'র প্রবর্তন অচিরেই হওয়া উচিত?

—নিশ্চয়ই। আমরা আমাদের যোগ্যতা নিয়ে সামর্থ্য নিয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। কিছু না পেলে কত দিন সুবোধ বালক হয়ে মনের জোর নিয়ে বসে থাকতে পারব বলুন তো! আজকাল চাকরীর একটা দরখাস্ত করতেও কি কম ঝামেলা? সঙ্গে পোস্টাল অর্ডার দিতে হবে স্বঠিকানা লিখিত পোস্টাল স্ট্যাম্প-যুক্ত খাম দিতে হবে, আরো কত বাহানা! আসল কাজের বেলায় অন্তরম্ভা। বেকার ভাতা পেলে অন্তত এই সব খরচগুলোও তো চলে যাবে। তাছাড়া হাতে টাকা এলে মনের জোরও একটু-আধটু বেড়ে যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র নির্মলেন্দু কাঞ্জিলালেরও একই কথা। কাজ যখন দিতে পারছ না তখন খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। আমরা কি না খেয়ে মরে যাব? জিজ্ঞাসা করলাম—বেকার ভাতা দিলে কি সমস্যার সমাধান হবে? উত্তর এলো—সমাধান হবে না নিশ্চয়ই তবে আমরা একটু রিলিফ পাব।

—আচ্ছা একবার যদি বেকার ভাতা প্রবর্তিত হয় তাহলে নিজেদের কাজের উৎসাহ কি আগের মতো থাকবে? আপনার কি ধারণা।

—দেখুন রোগী যখন রোগশয্যায় তখন ডাক্তারবাবুকে ওষুধের এমন ডোজ দিতে হয় যাতে রোগী বেঁচে উঠে। তেমনি আমরাও মুমূর্ষু রোগী। সেই সর্বনাশা বেকারীর রোগশয্যায়। বেকার ভাতা একটা ডোজ—আপাতত বেঁচে থাকার একটা ক্ষীণ আশা! দু-একজন যারা একেবারে অলস তারা হয়তো বেকার ভাতা পেলে অন্য কাজ করতে চাইবে না কিন্তু যারা কাজ চায়—যোগ্যতা আছে তাদের আছে, তারা কখনো বেকার ভাতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না। তারা কাজ পাওয়ার চেষ্টা আগের মতোই চালিয়ে যাবে।

—বেকার ভাতার বিকল্প চিন্তা অর্থাৎ পজিটিভ আরো কিছু হতে পারে না?

নূতন বই — প্রকাশের পথে

আশাপূর্ণা দেবীর

কখনো দিন কখনো রাত

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

তিনে একে চার

সাহিত্য-তপস্বী বিমল মিত্রের

পরস্ত্রী ২৫৲ আমি ১০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী অমনিবাস

ষষ্ঠ খণ্ড—পনেরো টাকা (যন্ত্রস্থ)

(গ্রাহকদের পক্ষে বারো টাকা)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের .. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কামনার ধূপ ১০৲ কাঞ্চনরাগিনী ৮৲

অমর সাহিত্য প্রকাশন : ৭, টেমার লেন, কলকাতা ৯

—হ্যাঁ পারে—বেকারনিধন কিংবা বেকার নিয়োগ। তবে নিয়োগ আর হচ্ছে কোথায়। তাড়াতাড়ি হয়তো নিধন করা যেতে পারে। ঠোঁটে তার ক্রুর হাসি।

—আপনি রেগে যাচ্ছেন। আমি জানতে চাইছিলাম এর কোন বিকল্প চিন্তা আপনারা করছেন কিনা?

—আমার মনে হয় সরকার ইচ্ছা করলে বহুক্ষেত্রে নিয়োগ আরো বাড়াতে পারেন। কুটির শিল্পে পাট শিল্পে ব্যাঙ্ক শিল্পে এখনো প্রচুর নিয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক উন্নততর প্রথায় চাষবাস শুরু হলে সেখানেও নিয়োগ বাড়বে। তবে নিয়োগের ক্ষেত্রে কারচুপি ও দুর্নীতি বন্ধ না হলে সাধারণ ছেলেরা কখনো সুযোগ পাবে না।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের অর্থনীতির ছাত্র তপন চক্রবর্তী জানালেন—আরো উপায় আছে। প্রয়োজন হলে বর্তমানে নিযুক্ত লোকদের কাজের সময় কমিয়ে সেই সময়ে আরো নতুন লোককে নিয়োগ করতে হবে। সবাইকে কাজ দিতে হবে—খেতে দিতে হবে। যারা বেশী বয়স্ক—কাজের ক্ষমতা বা উৎসাহ হারিয়েছেন তাঁদের জায়গায় নতুন যুবক-যুবতীদের চাকরী দিতে হবে। আমাদের যৌবন শেষ হয়ে আসছে... আমাদের জীবন কি হেলায় শেষ হবে?

বিদায়কালে তার অনুরোধ এসব কথা আপনাদের 'অমৃত' পত্রিকায় ভালভাবে প্রকাশ করুন। আমাদের বেদনানিথর নীরবতাকে ভাষা দেওয়ার জন্য সম্পাদককে আমাদের শ্রদ্ধা জানাবেন। আমরা আলো চাই...আঁধার পেরিয়ে অমৃতের স্বাদ চাই।]

কল্যাণী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে অনেক গ্রামের ছেলে এসে নাম লেখান বেকারের খাতায়। নদীয়া জেলার চরসরাটী গ্রামের এমন একটি ছেলে ভবতোষ দত্ত। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার পর ১৯৬৮ থেকে বেকার। সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য আর পড়া হয়নি। চাকরীর জন্য সর্বত্র ঢুঁ মারছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—সরকার যদি বেকার ভাতা দেন তাহলে কেমন হয়?

—দেখুন মশাই, আমরা ভাতাটাতা বুঝি না। একটা সামান্য কিছু পেলে বেঁচে যাই।

—চাকরী তো এখুনি পাওয়া যাচ্ছে না তার বদলে যদি সরকার আপনাদের অর্থাৎ রেজিস্ট্রীকৃত বেকারদের মাসে মাসে কিছু টাকা দেন তাহলে কেমন হয়?

—আপনার কথা শুনে আমার জিভে জল আসছে। দেখছেন তো চেহারা কঙ্কালসার হয়ে যাচ্ছি। চুল-দাড়ি কামাতে পারছি না। হাতের লক্ষ্মী কি ছাড়তে আছে? নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভালো। ঐ গাঁয়েরই আর একটি ছেলে মিলনচন্দ্র সরকারের সঙ্গে কথা হল। সামান্য লেখাপড়া জানে। কিন্তু গতরে খাটতে পেছপা নয়। তারও ইচ্ছে সে একটা চাকরী করে। তার মুখে শুনতে পেলাম গাঁয়ের মানুষের কষ্ট এখন চরমে। ভূমিহীন চাষী দিনমজুরদের না খেয়ে মরার অবস্থা। উঠতি যুবকদের না খেয়ে খেয়ে হাত-পা ফুলে যাচ্ছে—কোন কাজ করতে পারছে না রিকসা চালানোও অসম্ভব। 'বাবু—আমরা ভিক্ষে চাই না, কাজের বিনিময়ে খেতে চাই।' জানালো সে। গাঁয়ের হাজার হাজার বেকারের মধ্যে সবাই তো আর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড করে না। যারা করে তারাও মিলন ভবতোষের মতো হতাশ হয়।

গাঁয়ের মেয়ে সন্ধ্যা সরকার। গতবার স্কুল ফাইনালে পাশ করতে পারে নি। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কি করছ বোন?' আমার প্রশ্ন শুনে সে লজ্জায় দুঃখে কেঁদে ফেললো। রাত জেগে অমূল্য কেরোসিন তেল নিঃশেষ করে খেটে পড়েও সে ফেল করেছে এই তার লজ্জা দুঃখ। ভীষণ গরীব। দুবেলা খাওয়া জোটে না। বিয়ের বয়স হয়েছে—অর্থাভাবে যোগাযোগের অভাবে বিয়ে-থা হচ্ছে না। বেকার ভাতার কথা শুনে তার ভারী আনন্দ। জানালো—'বেকার ভাতা চালু হলে ভালই হবে, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর উৎসাহ পাব আরো চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারব।

গ্রাম শহরে ঘুরে মোটামুটি জানতে পারছি—এখুনি কাজ না পেলেও তারা কিছু ভাতা নিতে পশ্চাদপদ নয়। যখন কাজ পাবে ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে সরকার যে বলছেন—টাকা নেই, তাহলে উপায় কী? এরও সমাধান ভেবে রেখেছে আজকের যুবক-যুবতীরা। জলপাইগুড়ির মেয়ে বর্তমানে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী রত্না সিংহকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জানালেন—প্রয়োজনীয় টাকা সরকারকে কর সংগ্রহের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। বাজেটে কর্মসংস্থানের মধ্যে বেকার ভাতার জায়গা রাখতে হবে। যাঁরা বেশী টাকা মাইনে পান—যেমন ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার টাকা মুনাফা করেন তাঁদের কাছ থেকে আরো বেশী হারে কর নিয়ে এক অংশ বেকার ভাতা হিসাবে খরচ করলেই হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করি—বাড়তি করের বোঝা সবাই কি সহজে গ্রহণ করতে চাইবে?

তার উত্তর—কেন নয়? সমাজের যুবক-যুবতীদের বাঁচানোর দায়িত্ব তো সবারই। সুতরাং আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না। আর যখন দরকার তখন আপত্তি করলেই বা সরকার ছাড়বেন কেন? শিক্ষাকরের মতো বেকারকর প্রবর্তনের কথাও সরকারকে ভেবে দেখতে হবে। এই সংগৃহীত অর্থ থেকে বেকার কল্যাণের অনেক কাজ করা সম্ভব হবে। যখন সবাই কাজ পেয়ে যাবে—বেকার থাকবে না, বেকার ভাতা ও করের ঝামেলাও চুকে যাবে।

—অমর দাস

সাহিত্য সংসদ এর

সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। হাজার বছরের ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত। [১৫.০০]

কালিকট থেকে পলাশী

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্যে অভিযান কাহিনী। ১০টি বিরল মানচিত্র। [৬.৫০]

বাঙলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া

সাহিত্যরত্ন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কীর্তনের তত্ত্ব, ইতিহাস ও বিশিষ্ট কীর্তনীয়াদের জীবনী। [১০.০০]

উদবাস্তু

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টার ইতিহাস বাঙলায় একমাত্র বই। [১০.০০]

উপনিষদের কথা

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত। [৪.০০]

সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা—৯

আকাশবাণীর বঞ্চিত গীতিকার

আকাশবাণীর মনোনীত গীতিকারদের রয়ালটির প্রশ্নে কর্তৃপক্ষের অবহেলা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার তথ্যবহুল নানা আলোচনা ও আবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বেতার কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য সকলকেই বিস্মিত করেছে।

মনোনীত গীতিকারদের ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্রতি গানের প্রতিবারের প্রচার বাবদে যৎসামান্য (সাধারণত ৫০ পয়সা মাত্র) রয়ালটি দেবার বিধি আছে। কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর রয়ালটি থেকেও অধিকাংশ গীতিকাররাই বঞ্চিত হন। আকাশবাণীর মনোনীত বহু গীতিকারের কাছে পত্র-লেখকের জানার সুযোগ হয়েছে যে, তাঁরা কেউই চুক্তি-নির্ধারিত দক্ষিণা পান না। এঁদের মধ্যে এমন গীতিকারও আছেন যাঁরা গত দশ বছরের মধ্যেও তাঁদের প্রচারিত গানের জন্য একটি পয়সাও আজ অবধি পাননি। এ-ব্যাপারে বহু গীতিকারের নিকটেই তাঁদের প্রচারিত গানের তারিখ, নির্দিষ্ট সময়সূচী ও শিল্পীর নাম প্রমাণস্বরূপ রাখা আছে। প্রয়োজনবোধে সেই সব তথ্য সময়কালে প্রদান করা যেতে পারে।

অথচ, প্রচারিত গানের সুষ্ঠু হিসাব রাখা কিন্তু কর্তৃপক্ষের মোটেই আয়াসসাধ্য নয়। শিল্পীর গান পরিবেশনের আগে সেই গানের রচয়িতার নাম ও গানের প্রথম কলি তাঁদের চুক্তিপত্রে উল্লেখ করে থাকেন। এবং অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীরা যেমন তাঁদের দক্ষিণা পেয়ে থাকেন, তেমনি গীতিকারদেরও তাঁদের প্রচারিত গানের প্রাপ্য রয়ালটি পাওয়া উচিত। অবশ্য মাত্র পঞ্চাশ পয়সার জন্য প্রতিবার 'চেক' লেখা সম্ভব নয় স্বীকার করি। কিন্তু প্রতি ছ'মাস বা এক বছর অন্তর তাঁদের প্রচারিত গানের মোট সংখ্যা হিসাব করে এককালীন রয়ালটি দেবার ব্যবস্থা কি করা যায় না? বর্তমানে যে-ব্যবস্থা বহাল আছে, তাতে করে সরকারী প্রদেয় টাকা কোন গীতিকারদের হাতে একেবারেই পৌঁছাচ্ছে না।

অতঃপর সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে এই মঞ্জুরীকৃত টাকা তবে কোথায় যাচ্ছে? গীতিকারদের ব্যক্তিগত প্রাপ্য অর্থ সামান্য মনে হলেও সারা বছরে বিভিন্ন গীতিকারদের প্রচারিত গানের দরুণ একত্রে মোট টাকার অঙ্ক তো কম নয়। সাধারণভাবে হিসাব করে দেখা গেছে বর্তমানে 'যুব-বাণী'সহ আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন গীতিকারের প্রচারিত গানের সংখ্যা প্রতিদিন গড়ে চল্লিশটি। এর মধ্যে রবীন্দ্র দ্বিজেন অতুল রজনী নজরুল রামপ্রসাদী গীত-ভজন এবং প্রচলিত লোকগীতির সংখ্যা ধরা হয়নি। সুতরাং হিসাব দাঁড়ায় এই যে, প্রতিদিন চল্লিশটি গানের জন্য বিভিন্ন গীতিকারের মোট রয়ালটির পরিমাণ কুড়ি টাকা হলে (সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় সাত হাজার তিনশত টাকা (৭৩০০-০০)। বঞ্চিত গীতিকারদের এই টাকা কোন্ খাতে কি হিসাবে জমা-খরচ হচ্ছে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ তার জবাব দেবেন কি?

এক সময় 'অমৃত' পত্রিকায় বেতার-বিষয়ক আলোচনার জন্য মনোগ্রাহী একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল যার অভাব আজও অনুভব করি। সেই বিভাগটি বর্তমানে না থাকায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে এই পত্র প্রকাশিত হলে পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চিত গীতিকারদের একজন হিসাবে সবিশেষ বাধিত হবো।

আকাশবাণীর জনৈক গীতিকার

সেকালের সঙ্গীতগুণী

(লেখকের উত্তর)

২৪ জানুয়ারী অমৃত-তে শ্রীসন্ধ্যা সেন বর্তমান লেখককে অনুরোধ জানিয়েছেন জগদীপকে গুণী সমাজের দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে দেওয়া হল কেমন করে সে সম্বন্ধে বলবার জন্যে।

সঙ্গীতজগতের বিস্ময়কর প্রতিভা হয়েও জগদীপের নাম এখন প্রায় বিস্মৃত। বারাণসীর জগদীপ মিশ্র ছিলেন একাধারে খেয়াল ঠুংরি ও টপ্পা গানের দুর্লভ কলাবৎ। যেমন অনিন্দ্য কণ্ঠসম্পদের অধিকারী তেমনি রূপবান। আসর আলো করে তিনি বসতেন এবং সঙ্গীতগুণে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিতেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন নৃত্যবিদ্ ও নৃত্যশিল্পী। মৌজুদ্দিন কলকাতায় আগমনের আগেই জগদীপ গুণীসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। দমদমায় শেঠ দুলিচাঁদের সুরম্য উদ্যান ভবনে বেশি আসর হত তাঁর এবং শেঠজীর আশ্রয়েই তিনি বাস করতেন সম্মানিত অতিথিরূপে। এমন সময় মৌজুদ্দিন কলকাতায় আসেন ও দুলিচাঁদের আসরে জগদীপের গান শোনেন। সেই আসরের পরই মৌজুদ্দিন স্বপক্ষীয় প্রতিপত্তিশালী (তখনকার কলকাতার সঙ্গীতসমাজে) শ্যামলাল শ্রেষ্ঠীকে এই ধরণের জানান এই গায়ক কলকাতার থাকলে আমি এখানে টিঁকতে পারব না। হয় জগদীপকে সরান, না হলে আমিই চলে যাব। তখন চক্রান্ত হয় মহাগুণী এবং মহা অভিমানী জগদীপকে অপদস্থ করবার। প্রতিপক্ষ জানতেন জগদীপের কোমল-প্রাণ স্পর্শকাতর থাকবার শান্তিকামী প্রবণতা। আর তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক দুলিচাঁদের মেরুদণ্ডহীন স্বভাবও। এই সমস্ত কারণেই জগদীপকে কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্র তথা গুণীসমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। জগদীপ মিশ্র তারপর থেকে নেপাল দরবারের সম্মানিত শিল্পীরূপে অবস্থান করতে থাকেন বটে। কিন্তু বৃহত্তর ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্র থেকে তাঁর শ্রুতি স্মৃতি লোপ পেয়ে যায়। জগদীপ নেপালে আত্মগোপন না করলে কলকাতায় বা অন্যত্র এত প্রসিদ্ধ হতেন না মৌজুদ্দিন।

জগদীপ মিশ্রের সঙ্গীতজীবন সম্পর্কে এসব বৃত্তান্ত আমি প্রকাশ করেছি সঙ্গীতের দীপশিখা অধ্যায়ে আমার আসরের গল্প বইটিতে।

সেকালের সঙ্গীতগুণী বিষয়ে পত্র-লেখিকার সুচিন্তিত মন্তব্যের জন্যে ধন্যবাদ। এই সুযোগে আরো যাঁরা এ লেখা পড়ে আনন্দ পাবার কথা জানিয়েছেন তাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। যাঁরা কোন কোন তথ্য সংক্রান্ত ত্রুটি দেখিয়েছেন তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। পরে বই প্রকাশ সম্ভব হলে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেব। এই পর্যায়ে আর যে কটি লেখা বেরুবে সে সম্পর্কেও কারো অন্য কোন তথ্য জানা থাকলে কিংবা আমার লেখায় ভুল-ভ্রান্তি দেখা দিলে এই বিভাগে নিঃসঙ্কোচে পত্রস্থ করবেন। আমি উপকৃত বোধ করব কারণ যথাসম্ভব নির্ভুল হওয়াই আমার লক্ষ্য এবং আমি নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করি না। পুনরায় সকলকে ধন্যবাদ।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
কলকাতা—২৩।

(২)

গত ১০-১-৭৫ ও ১৭-১-৭৫ সংখ্যায় (ধারাবাহিক ফিচারটিতে) অনাথনাথ বসুর সংগীত জীবন ও বাল্য জীবনের নানা বৈচিত্র্যের সংবাদ পরিবেশনের জন্য শ্রীযুক্ত দিলীপ মুখোপাধ্যায়কে শুধু ধন্যবাদ নয় তাঁর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর সংগ্রহমূলক সুরুচিপূর্ণ ফিচারটি পড়ে আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছি। অনাথ বসুর বাল্য জীবনের নানা কথা পড়তে পড়তে আমার বহু স্মৃতি-বিজড়িত সেই বাঁকা কাটিপাড়া রাড়ুলি খেঁসরা ও আর কে বি কে ইনস্টিটিউশনের কথা মনে পড়ে গেল। কারণ আমিও এক-কালে ঐ স্কুলেই পড়তাম।

তবে দিলীপবাবু খেসড়া ও কাঠিপাড়া গ্রামের যে নাম উল্লেখ করেছেন ওটার উচ্চারণ যথাক্রমে খেঁসরা ও কাটিপাড়া হবে। আর কপোতাক্ষ নদী হবে কপোতাক্ষী নদী।

কার্তিক দত্ত
সম্পাদক—বিশালাক্ষী

বিবাহ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

গত ২৪ জানুয়ারী সংখ্যায় বিবাহ ব্যবস্থা শীর্ষক আলোচনা সকলের ভাল লাগার মত। বিবাহ ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন তরুণ-তরুণীর ব্যক্তিগত মতামত জানতে পেরে খুশী হয়েছি। তরুণ-তরুণীদের এই ব্যক্তিগত স্বাধীন মতামতে অনেক অনালোচিত কথা জানা যায়। অমৃত যুবক-যুবতী বিভাগে এই বিবাহ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনা করে পাঠকদের একটি বিশেষ দিকের কৌতূহল নিবৃত্তি করতে চেষ্টা করেছেন।

তবে লেখক পাঠক সমাজের কাছে সমস্যার সব দিকটাই তুলে ধরতে পারেননি। আলোচ্য প্রসঙ্গে লেখক পণ এবং যৌতুক প্রথার বিশদ আলোচনায় সচেষ্ট হননি। বিবাহ ব্যবস্থায় পণ এবং যৌতুক ইত্যাদি আদান-প্রদানের সমস্যা রয়েছে একথা বাস্তব সত্য। অবিশ্যি কেবল পাত্রপক্ষই বিয়ের সময় পণ এবং যৌতুক নিয়ে দাবী তুলে থাকেন একথা ঠিক নয়। ছেলের সামাজিক মর্যাদা শিক্ষা এবং চাকুরীর ক্ষেত্র অনুযায়ী পাত্রী পক্ষও পণ এবং যৌতুক দেন যেন অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবেই। নতুবা ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না। লেখক এই দিকটা আলোচনা করেছেন। কিন্তু অন্য চিত্রও আছে। ভদ্র শিক্ষিত পরিবারের পাত্রীর বাবাও মেয়ের বয়ের সময় পাত্রপক্ষের কাছ থেকে পণ বরূপ অর্থ নিয়ে থাকেন। অবশ্য এই প্রথা এখনো বেশী দেখা যায় সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে। লেখক এই দিকটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন এই দিকটার আলোকপাত করলে নিঃসন্দেহে ভাল হত।

লেখকের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোন একজন বন্ধু পণ ও যৌতুক প্রথাকে সমর্থন করেছেন। তিনি কারণ স্বরূপ বলেছেন ছেলেরা বহু অর্থ ব্যয় করে লেখাপড়া শেখে এবং অনেক কষ্ট করে চাকরী যোগাড় করে। বিয়ের সময় রিওয়ার্ড হিসাবে পণের টাকা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। এছাড়া রয়েছে সামাজিক মর্যাদা। বিয়েতে যে যত বেশী পণ টাকা এবং যৌতুক পাবে তার সামাজিক মর্যাদা তত বেশী বৃদ্ধি পাবে। তার বক্তব্যের পিছনে একটি মাত্রই প্রশ্ন থেকে যায় তবে কি উচ্চশিক্ষা এবং ভাল চাকুরীর একটিই মুখ্য উদ্দেশ্য বিয়েতে বেশী পণ টাকা আর ভাল ভাল যৌতুক আদায়?

অমরাবতীর কুমারী তনুশ্রী রাহার বক্তব্য প্রসঙ্গে একটি জিজ্ঞাসা হল তিনি আর পাঁচজন যুবক-যুবতীর মতই আধুনিক ডেটিং সোশ্যাল ম্যারেজের প্রথায় গভীর বিশ্বাসী। এই বক্তব্য সমর্থনযোগ্য। তবে তিনি বোধহয় আরও বলতে চেয়েছেন মা-বাবাদের যেভাবে বিয়ে হয়েছে এই পুরনো ধারা বিবাহে ভাল লাগার মোহ কেটে গেলেই আর ভালবাসা থাকে না। মনে হয় এই ধারণাই বদ্ধমূল। এই ক্ষেত্রে অনেক পাঠকেরই একটা জিজ্ঞাসা থেকে যেতে পারে পুরনো প্রথায় বিবাহে আমাদের মা-মাসীরা কি সুখী হননি? লাভ-কাম-সোশ্যাল ম্যারেজে আমি বিশ্বাসী হলেও আমার মনে হয় আধুনিককালে প্রেম করে বিয়ের থেকে পুরনো প্রথার বিয়ে ঢের ভাল। এখনকার ভালবেসে বিয়ের শতকরা ৯৯ জনই সাংসারিক দিক থেকে অসুখী। তবে সত্যিকারের ভালবাসার বিয়ে অন্য জাতের। তনুশ্রী দেবীর বন্ধু বনানী দেবীর বক্তব্য এ ক্ষেত্রে ভাল লাগল।

বিশ্বনাথ ভক্ত
দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।

বাংলা নাটক ও সাহিত্য

অমৃত ১৭ জানুয়ারী সংখ্যায় যুবক-যুবতী বিভাগে বাংলা নাটক ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় এবং সময়োপযোগী। বর্তমানে বাংলা নাটক সমাজের বিভিন্ন স্তরে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অনেকেই অভিমত দিয়েছেন বর্তমান নাটক উপন্যাস কবিতা জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে কবিতা সম্পর্কে তাদের অধিকাংশের মন্তব্য দুর্বোধ্য। কিন্তু আমার মনে হয় আধুনিক কবিতাকে বিশ্লেষণ করে দেখেননি বলেই তাঁরা এত সহজে মন্তব্যটি প্রকাশ করেন।

অমরবাবু নাটক ও সাহিত্যকে দুটো আলাদাভাবে আলোচনার সূত্রপাত কেন যে করলেন বুঝতে পারলাম না। নাটক তো সাহিত্যের একটি অঙ্গ। সুতরাং তিনি যদি শুধুমাত্র নাটক নিয়ে আলোচনা করতেন তাহলে আলোচনাটি আরও তথ্যনিষ্ঠ হতো। সমগ্র আলোচনাটি পড়ে মনে হলো কেউই সাহিত্য সম্পর্কে সম্যকভাবে আলোচনা করার সুযোগ পাননি। সুতরাং অমরবাবুকে অনুরোধ করি তিনি যেন সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ নিয়ে পল্লী বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের যুবক-যুবতীদের মন্তব্য সংগ্রহ করেন। আরও অনুরোধ করবো তিনি কলিকাতা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এবং নদীয়া অঞ্চলের বেড়া ডিঙিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের যুবক-যুবতীদের মানসিক অনুভূতির অংশীদার হন। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের যুবক-যুবতীর সমস্যা যেমন আলাদা তেমনি তাদের মানসিক অনুভূতিও বিভিন্ন।

অমরবাবুর সব-আলোচনায় দেখা যায় তিনি সেকস সম্পর্কে প্রশ্নটি যুবক-যুবতীদের সামনে প্রথমেই তুলে ধরেন। কিন্তু সেকসকে বাদ দিয়েও আরও সিরিয়াস আলোচনা করা সম্ভব। বর্তমানে ভাল নাটক কেন লেখা হচ্ছে না নাটকের মধ্যে রাজনীতির কার্যকলাপ কেন বেশী দেখা যাচ্ছে এসব কথা এবং কোন পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক সম্পর্কে যুবক-যুবতীদের মন্তব্যে আলোচনাটি আরও আকর্ষণীয় করতে পারতো।

বিমলবাবুর মন্তব্য সম্পর্কে আমি একমত। বর্তমান পেশাদার নাট্যমঞ্চে এমন কি মুক্ত-অঙ্গনেও ক্যাবারে নৃত্য যেন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বেশ কিছুদিন আগেও ভাল নাটক দেখতে বেশ ভীড় হতো। নাটকে যে নগ্ন দৃশ্যের পরিকল্পনা সেটাই কি সমাজের একমাত্র দর্পণ? বলা কি অন্যায় হবে বর্তমান নাটকের দৃশ্যগুলি মানুষের রুচিবোধ পাল্টিয়ে দিচ্ছে? এ সম্পর্কে অমূল্য দাসের মন্তব্যই ঠিক। সেকস সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা হচ্ছে যে অপরিণত কিশোর-কিশোরীরা এর শিকার হচ্ছে। ফলে সমাজে যৌন অপরাধ করার প্রবণতা বাড়ছে। এর জন্য দায়ী নিশ্চয়ই অপসংস্কৃতির ধারক-বাহক কিছু শিল্প সাহিত্য। সমাজে যখন সেকস রয়েছে তখন সেকসকে সাহিত্যে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত— এই মতে যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তাদের ছেলেমেয়েরা যখন সেকস এর শিকার হয়ে কুকর্ম করে তখন দোষটা কি ছেলেমেয়েদের না তাদের নিজেদেরই। স্বামী-স্ত্রীর যৌন-মিলন দৃশ্যগুলো কি ছেলে-মেয়েদের সামনে বাস্তবে সম্ভব? এগুলো যেমন জনজীবনে আছে তেমনি প্রকাশ্যে এই দৃশ্যগুলো কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যবসায়ীরা সুস্থ সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে নগ্ন দৃশ্যের মাধ্যমে মোটা টাকা লাভ করছেন রুচিসম্পন্ন সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব যেমন সাধারণ মানুষের তেমনি লেখক এবং নাট্যগোষ্ঠীদেরও।

ইন্দ্র বিশ্বাসের ক্ষোভ যথার্থ। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যেমন নবীন লেখকের প্রয়োজন তেমনি কিছু নামী লেখকের প্রয়োজন আছে। পাশাপাশি দুটো রচনা পড়ে নবীন লেখকরাই উপকৃত হবেন। কেননা প্রথমে লিখতে আরম্ভ করেই কেউ সাহিত্য শিল্পকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। কিছু কিছু পত্রিকা আছে যারা নবীন লেখকের লেখা পড়েন না এবং ভাল হলেও ছাপাতে চান না। আর সেজন্যই প্রয়োজন ছোট পত্রিকার যার মাধ্যমে নবীন লেখকের প্রকৃত পরিচয় এবং তার সাহিত্যকর্ম জানা যাবে।

পল্লী অঞ্চলে পত্রিকা প্রকাশ করা যে কতখানি কষ্টসাধ্য তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। সরকারী বিজ্ঞাপন বা সাহায্য পাওয়াই যায় না; উপরন্তু বে-সরকারী তেমন প্রতিষ্ঠান পল্লী অঞ্চলে নেই যারা বিজ্ঞাপন দিতে পারে। শুধুমাত্র কয়েকজন অত্যুৎসাহী যুবকের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং পকেট থেকে টাকা খরচ করে পত্রিকা প্রকাশ করা সত্যিই খুব কষ্টসাধ্য। কিন্তু এ সমস্ত পত্রিকাই নবীন লেখকদের সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করার জন্য অমরবাবুকে অনুরোধ জানাই। কারণ এ সমস্যা বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে এক বিরাট সমস্যা।

শ্রীমতী অঞ্জু ব্যানার্জীর আধুনিক কবিতা ভাল লাগে জেনে আনন্দিত হলাম। শারদীয়া গঙ্গোত্রী পত্রিকা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তিদের নিয়ে আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে এক সমীক্ষা প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যায় বেশ কিছু

প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি আধুনিক কবিতাকে দুর্বোধ্য বলে আধুনিক কবিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। এখন শ্রীমতী ব্যানার্জীর সুস্পষ্ট অভিমত আধুনিক কবিদের আনন্দের কারণ বইকি। আধুনিক কবিতা নিয়ে অনেক পঠন-পাঠন চলছে। অমরবাবুকে আমার অনুরোধ তিনি যেন আধুনিক কবিতা নিয়ে যুবক-যুবতীদের মন্তব্য প্রকাশ করেন।

কার্তিক ঘোষ
সম্পাদক—বাতায়ন
বসিরহাট ২৪ পরগণা

যুবক-যুবতী

আমি, বলতে গেলে আমাদের পরিবারের সকলেই, আপনার সু-প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক।

পত্রিকায় প্রকাশিত সবই যে সুখপাঠ্য এমন কথা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে না। তবে ইদানীং আপনার সু-প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকায় 'যুবক-যুবতী' ফিচারে যেসব মতামত পড়ছি, তা শুধু ইন্টারেস্টিং তাই নয়, আকর্ষণীয়ও। কথায় আছে এবং তা অতীব সত্য যে জাতির ভবিষ্যৎ এই যুব সমাজকে আমরা আজ জানতে চাই না। কালের গতিতে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে কিন্তু সেই তুলনায় আমরা যারা পিছিয়ে পড়েছি তাদের এই নব্য যুব-সমাজকে বিচার করা বা বিশ্লেষণ করার মত মন বা ধৈর্য খুব কমই আছে।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে এই যুবক-যুবতী' ফিচার সকলের পক্ষেই আনন্দদায়ক, তাতে কোন সন্দেহই নেই। অন্ততঃ তাদের নতুন মানসিকতাকে জানার একটা সহজ সুযোগ তো বটেই।

তবু এই সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিছু বক্তব্য জানাই, যা কিছুদিন যাবৎ 'যুবক-যুবতী' ফিচার পড়ার পর থেকেই মনে কেবলি আনাগোনা করছে—যাকে প্রকাশ করা নৈতিক প্রয়োজন মনে করেই আপনার সমীপে এই সামান্য বক্তব্য রাখছি।

দেশের বর্তমান যুবসমাজ আজ নতুনের তালে তাল মিলিয়ে পুরাতন যা তার সবকিছুকেই সবাই নস্যাৎ করে চলেছে—এমনটি কিন্তু নয়। ভাঙার আনন্দ কারো থাকলেও গড়ার আনন্দ অনেকেরই আছে। অবজ্ঞা বা হেলা করার থেকে মানায় যে বেশী সুখ—এই বোধের অভাব কিন্তু বেশী নয়। উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যকে সু-প্রচুর করতে চাই না।

তাই আমার একান্ত নিবেদন, 'যুবক-যুবতী' ফিচারে যেমন সবার মতামত ভাল-মন্দ নির্বিশেষে থাকবে, তেমনি যা ভাল যা প্রেরণাদায়ক যা গঠনমূলক যা ভবিষ্যৎ যুবসমাজকে আদর্শনিষ্ঠ হতে শ্রেয়নিষ্ঠ হতে আচার-আচরণে সু-সুন্দর হতে উৎসাহ দেবে, দেবে ঐশী চেতনা এমন মতামতকেও পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এমনতর বহু মতামত কথিত ফিচারের লেখক পাবেন।

দেশসেবা দেশগঠন—সবকিছুর ভেতর দিয়ে আমাদের প্রয়াস তো তাই। যা হতাশা-ব্যঞ্জক, যা ধ্বংসাত্মক—শুধুমাত্র তার প্রচারে বা পরিবেশনায় সার্থকতা কোথায়?

বাবাই হালদার
সৎসঙ্গ, বিহার।

(লেখকের উত্তর)

সাপ্তাহিক অমৃতে (৩২ সংখ্যায়) চিঠিপত্র বিভাগে খোলাপোতার শ্রীকল্লোল সরকার মহাশয়ের চিঠিখানা মনোযোগ-সহকারে পড়লাম। যুবকযুবতী বিভাগে 'গ্রামবাংলার যুবকযুবতীদের সমস্যা' আলোচনার ওপরে এই চিঠিখানা তিনি লিখেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নতুন যে দু-একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন, সেজন্য আমি বিশেষভাবে তাঁর কাছে ঋণী। সুন্দরবনে গিয়েছেন এমন দু'একজন লোকের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি, তবে তাঁরা কখনো 'যুবক-যুবতী বিক্রি তথা যুবক-যুবতীর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে জমি চাষ করান হয়' এ-কথা আমাকে বলেননি। এ-ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে আমিও শ্রীসরকার মহাশয়ের সঙ্গে গলা উঁচিয়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাব, এবং, অচিরে সরকারী হস্তক্ষেপে এর প্রতিকারের জন্য কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানাব। তবে শ্রীসরকার মহাশয়ের একটা অভিযোগ আমি মেনে নিতে পারছি না। তিনি লিখেছেন শ্রীদাশকে আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—শহুরে বসে গ্রামের কথা জানবেন না।' তাঁর এ-হুঁশিয়ারি আমার মনে থাকবে তবে এ-কথা কিন্তু ঠিক নয়। আমিও গ্রামের ছেলে। কলকাতার কলেজে পড়াশুনা শুরুর আগে দীর্ঘদিন কেটেছে অজ পাড়াগাঁয়ে। বিদ্যুৎ নেই—রাস্তা নেই—ডাক্তার নেই—স্কুল নেই, কয়েক মাইল হেঁটে তারপর এসবের সুযোগ। সুতরাং গ্রামজীবনের সমস্যা সম্বন্ধে আমি একেবারে নবিশ নই। নিজের মাথায় বয়ে ধান তুলেছি আবার বানের জলে ভেসে রাস্তায় সরকারী রিলিফে প্রাণ বাঁচিয়েছি। আজ শহরে থাকি, তাই বলে কি গ্রামজীবনের সঙ্গে সব যোগসূত্র শেষ হয়ে গিয়েছে? কক্ষনো নয়। তাছাড়া যুবকযুবতী বিভাগের তথ্য সংগ্রহ উপলক্ষেও আমি অনেক গ্রামে ঘুরেছি। ছাত্রাবস্থায় ও পল্লীবাংলার নানান পরিবেশের সঙ্গে আমার অনেক পরিচয় আছে। সুতরাং শহরের বাবু আমি গ্রামজীবন নিয়ে রসিকতা করছি এমনটি ভাবা মনে হয় আমার প্রতি অবিচার করা হবে। সরকার মহাশয় যেসব মৌলিক 'কেন?' প্রশ্ন তুলেছেন, সে-প্রশ্ন তো আমারও। গ্রামের কুটির-শিল্প সমবায় বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস সেচ প্রভৃতি সুযোগের সম্প্রসারণের কথা আমি লিখেছি। গ্রামের যুবকযুবতীদের অবহেলাজনিত, বিক্ষোভ ভাষা পেয়েছে বীণা বসাকের বক্তব্যে 'গ্রাম না বাঁচলে শহরও বাঁচবে না। আমার অভিজ্ঞতায় দেখছি যুবকযুবতী আজ শহরে গ্রামে গঞ্জে সাড়া জাগিয়েছে। এমনি করে যদি আমরা আমাদের কথা তুলে ধরি, আমাদের প্রতি অবিচার-অবহেলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হই, তবে নিশ্চয়ই কাজ হবে। হয়তো সেই সুদিন আগতপ্রায়।

অমর দাশ
কলকাতা।

রান্না করে দেখুন

৩৫ সংখ্যা অমৃতে 'রান্না করে দেখুন' এই ফিচারে সাধনা মুখোপাধ্যায় পাঁউরুটি দিয়ে বহুরকম খাবার তৈরীর কথা লিখেছেন। কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকটের দিনে এইরকম ব্যয়বহুল খাবার তৈরী করে খাওয়ার মত অবস্থা খুব কম সংসারেরই আছে। লেখিকা এক জায়গায় লিখেছেন, 'বর্তমানে পাঁউরুটির আকালে পাঁউরুটির দোকানের সামনের লম্বা লাইনই এর জনপ্রিয়তা এবং অপরিহার্যতার কথা প্রমাণ করে।' জনপ্রিয়তা' কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ, বাজারের সবজীওয়ালা তথা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ পাঁউরুটি ভাল লাগে বলে খায় না, খায় ভাত রুটির পরিবর্ত খাবার হিসেবে। তাই লেখিকার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে, সাধারণ রান্না একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কত সুস্বাদু করা যায় তার কথা লিখুন। তাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীরা শুধু পড়বেনই না, কিছু অভ্যাস করারও চেষ্টা করবেন।

অমিতাভ মোদক
চন্দননগর হুগলী।

ভ্রম সংশোধন

৩৮ সংখ্যার প্রচ্ছদ-চিত্রটি শ্রীঅমলানন্দ মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ---- ১৪·০০
২। গুল বাগিচা ---- ৩·৫০ ৩। কাব্য আমপারা--৪·০০
৪। পূবের হাওয়া---- ২·০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাজীপিজি--২·০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন ষ্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

গোয়েন্দা ধাঁধা

চিঠিরহস্য।। দুপিঁ।।

এডগার অ্যালান পো

লাইব্রেরীতে বসে ঝাড়া এক ঘন্টা ধরে ধূমপান করছে দুপিঁ আর সেই প্রিয়বন্ধুটি যাকে নাহলে রহস্যের জট ছাড়িয়েও সুখ পায় না সে। কারো মুখে কথাটি নেই। ফুক-ফুক-ফুক-ফুক করে কেবল ধোঁয়ার রিঙ উঠে যাচ্ছে কড়িকাঠের দিকে। দুজনেই তন্ময় যে-যার ভাবনা নিয়ে।

হেনকালে মুখ আমসি করে ঘরে ঢুকলেন প্যারিস পুলিশের বড়কর্তা। কাষ্ঠহেসে বললেন—'একটা খুব সোজা কেস হাতে এসেছে। আমরাই কিনারা করে ফেলতাম। ভাবলাম দুপিঁকে আগে শুনিয়ে যাই।'

'ভারী সোজা কিন্তু ভারী জটিল—তাই নয়?' বললে দুপিঁ।

'হেঁ-হেঁ-হেঁ। তাই বটে।'

আমার তো মনে হয় ভারী সোজা বলেই সমাধানটা আপনারা ধরেও ধরতে পারছেন না।' খোঁচা মারল দুপিঁ।

বড়কর্তা খোঁচা খেয়েও কাজের কথায় চলে এলেন সরাসরি। বললেন সোজা তো বটেই। সামান্য একটা চিঠি চুরি। চিঠি কে চুরি করেছে তা জানি। কিন্তু কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিছুতেই তা ধরতে পারছি না।

ফুক - ফুক - ফুক - ফুক করে ধোঁয়ার রিঙ উঠতে লাগল কড়িকাঠের দিকে। নির্নিমেষে চেয়ে রইল দুপিঁ।

বড়কর্তা বলে চললেন—'কি ঝামেলা বলুন তো? চিঠিটা সামান্য হলেও অসামান্য হয়ে উঠতে পারে বিশেষ এক ভদ্রলোকের চোখে পড়লে। রাজনৈতিক ঝড় উঠতে পারে। অনেকের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।'

'খুলে বলুন মশায়', টিপ্পনী কাটল দুপিঁ।

ঢোঁক গিলে বললেন বড়কর্তা—'ধরে নিন রাজরাজরারা এর সঙ্গে জড়িত। যে ভদ্রমহিলার নামে চিঠিখানা এসেছে তিনি ঘরে বসে সামান্য অথচ অসামান্য সেই চিঠিখানা পড়ছেন এমন সময়ে যাকে নিয়ে ভয় সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটিই হাজির হলেন ঘরের মধ্যে। বুঝুন ঠ্যালা। ভদ্রমহিলা ড্রয়ারের মধ্যেও চিঠি লুকোনোর সময় পেলেন না। খামের মধ্যে মুড়ে রেখে দিলেন টেবিলের ওপর। ঠিকানাটা রইল ওপর দিকে। কথা দিয়ে ভদ্রলোককে ভুলিয়ে রেখেছেন ভদ্রমহিলা এমন সময়ে '.....' মন্ত্রী আবির্ভূত হলেন রঙ্গমঞ্চে। তিনি একনজরেই বুঝলেন চিঠিখানা কার এবং ভেতরে কি আছে। কেননা মেয়েলী হাতের লেখাটা তাঁর চেনা। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। সাতপাঁচ কথা বলতে বলতে নিজের পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে পড়তে লাগলেন। পড়া শেষ হলে চিঠিখানা পকেটে না রেখে রাখলেন সামান্য কিন্তু অসামান্য সেই চিঠিখানার পাশে। উঠে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ভদ্রমহিলার চোখের সামনেই তাঁর চিঠিখানা নিয়ে গেলেন—রেখে গেলেন নিজের বাজে চিঠিখানা। সব দেখেও টুঁ শব্দটিও করতে পারলেন না ভদ্রমহিলা বিশেষ সেই ভদ্রলোকের ভয়ে।

কিন্তু ঘুম উড়ে গেল চোখের পাতা থেকে। দিনকয়েক পরে শরণাপন্ন হলেন আমার। আমি সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করলাম। রাস্তার মধ্যেই নানান ছলছুতোয় মন্ত্রীমশায়ের জামাকাপড়টা শুদ্ধু খুলে নিতে বাকী রাখলাম। অনেকরকম নাটকের অবতারণা করতে হল অবশ্য—কিন্তু মন্ত্রীর কাছে চিঠি পাওয়া গেল না।

এরপর তিন মাস একটানা তল্লাশি চলছে পাজীর পাঝাড়া এই মন্ত্রীর বাড়ীতে। লোকটা কবি তাই বোকা। তার ওপর নতুন রাজনীতি করতে শিখে মদের নেশাটি ভালই রপ্ত করেছে। প্রায় বাড়ী থাকে না। বাড়ী মানে তো হোটেলের আস্তানা। চাকর-বাকরও থাকে দূরে। তাই যেখানে-যেখানে চিঠি লুকিয়ে রাখা সম্ভব সব জায়গাই দেখা হয়েছে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে। দেওয়ালের কাগজ ছেঁড়া হয়েছে টেবিলের বনাত খুলে ফের লাগানো হয়েছে, চেয়ার-টেবিলের পায়া খুলে মাঝে তুলোপুরুনের ফুটোর মধ্যে চিঠি লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা দেখা হয়েছে গদী চেয়ারে ছুঁচ চালিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে আলমারীর মধ্যে গোপন কামরা আছে কিনা খুব সূক্ষ্ম স্কেল দিয়ে মাপা হয়েছে কার্পেট তুলে মেঝের তক্তা খুলে ফের বসানো হয়েছে পালঙ্কের গদী ছিঁড়ে তুলো ঘেঁটে দেখা হয়েছে বাগানের

বিনামূল্যে!

একেবারে নতুন ফরহ্যান্স পুস্তিকা "দাঁত ও মাড়ির যত্ন"

তথ্যপূর্ণ এই রঙীন পুস্তিকাটি নিন, বিনামূল্যে! এই কুপনটি আজই ভরে পাঠিয়ে দিন।

মানার্স ডেন্টাল অ্যাডভাইসরী ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বম্বে—১

অনুগ্রহ করে আমাকে বিনামূল্যে এক কপি "দাঁত ও মাড়ির যত্ন" নামে ফরহ্যান্স পুস্তিকাটি* পাঠান। এই সঙ্গে ডাক খরচ বাবদ ২৫ পয়সার টিকিট পাঠালাম।

নাম _____ বয়েস _____

ঠিকানা _____ এ—৭ বি এ

*অনুগ্রহ করে যে ভাষায় চাই তার নিচে দাগ কেটে দিন: ইংরিজি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উর্দু, বাংলা, অসমিয়া, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী।

ফরহ্যান্স-টুথপেষ্ট—এক দাঁতের ডাক্তারের তৈরী

1005-183 BENG

মাটি তোলপাড় করা হয়েছে ইঁট বাঁধানো রাস্তার ফাঁকে ফাঁকে শ্যাওলার স্তর পরীক্ষা করা হয়েছে কড়িকাঠ থেকে পাতলা কুঠরী পর্যন্ত সর্বত্র এক ইঞ্চির পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ জায়গা পর্যন্ত তনতন্ন করে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু চিঠি পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে চিঠি বাড়ীতে রাখা হয়নি। তাহলে কোথায় রাখা হয়েছে?'

দুপি' সব শুনল। বলল—'দেখা যাক।'

*

এক মাস পরে মুখখানা আরো আমসি করে এলেন বড়কর্তা।

দুপি' বললে—'খবর কি মশায়?'

'আর খবর। সর্বনাশ হল বলে। চিঠিখানা—'

ও হ্যাঁ সেই চিঠিখানা। খুঁজে বার করার জন্যে কত পুরস্কার দেওয়া হবে বলুন তো?'

ঢোঁক গিলে বললেন—'তা বেশ ভালই।'

দুপি' ফুক - ফুক - ফুক - ফুক করে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—'আপনি সেই গল্পটা শোনেন নি বুঝি? এক কিপটে এসেছিল ডাক্তারের কাছে। ধানাইপানাই গল্প বলবার পর নিজের রোগের বৃত্তান্তটা গল্পচ্ছলে ডাক্তারকে শুনিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—বলুন দিকি ডাক্তার এক্ষেত্রে আপনি কি করতেন? ডাক্তার অমনি বলে উঠলেন—পরামর্শ চাইতাম।'

বড়কর্তা বুঝলেন এ বড় শক্ত ঠাঁই। হেঁ-হেঁ করে হেসে বললেন—'কিন্তু আমি তো দক্ষিণা দিতে প্রস্তুত।'

'কতো?'

আমি যা পাবো মানে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ।

তাহলে চেকখানা লিখে ফেলুন।

অ্যাঁ!

'চেকখানা লিখে ফেলুন। তলায় সই করুন। সই শেষ করলেই চোরাই চিঠি পেয়ে যাবেন।'

বজ্রাহতের মত শুধু চেয়ে রইলেন বড়কর্তা। মিনিটকয়েক কথা বলার শক্তি খুঁজে পেলেন না। তারপর কাঁপা হাতে চেক সই করে এগিয়ে দিতেই উঠে দাঁড়াল দুপি'। ড্রয়ার খুলে একটা চিঠি বার করে এগিয়ে দিল বড়কর্তাকে।

ভদ্রলোক বিস্ফারিত চোখে হাত পেতে নিলেন চিঠিখানা। উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ভীষণ অভদ্রভাবে একটা ধন্যবাদও না জানিয়ে দুড়দুড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পাঁই পাঁই করে ছুটলেন রাস্তা দিয়ে।

দুপি' বলল প্রিয়বন্ধুকে—'ভায়া, বড়-কর্তার বিজ্ঞানসম্মত তদন্তে আমার বিলক্ষণ আস্থা আছে। উনি যেভাবে গোপন জায়গার সন্ধান করেছেন, তার বেশী আমিও করতে পারতাম না। কিন্তু কি জানো, উনি কবিদের বোকা বলে অবজ্ঞা করেছিলেন। কথাটা যে মিথ্যে, তা নয়। আমি নিজেও তো কবি। কিন্তু মন্ত্রিমশায় শুধু কবি নন —অংকটাও ভাল বোঝেন। বড়কর্তা সে খবর রাখতেন না। একাধারে কবি এবং গণিতবিদ বলেই মন্ত্রীর যুক্তি অত ক্ষুরধার। শুধু গণিতবিদ হলে যুক্তির বাঁধাধরা সড়কে চলতেন—কল্পনাকে পাত্তা দিতেন না—যেমনটি দিয়েছিলেন আমাদের বড়কর্তা—উনি আবার অংকটা একটু বেশী বোঝেন কিনা।'

প্রিয়বন্ধু বললে—'বুঝেছি। তোমার সঙ্গে ইদানীং কোনো গণিতবিদের মনকষা-কষি হয়েছে বোধ হয়?'

দুপি' বললে—'বড়কর্তার মুখে তাঁর চুলচেরা তদন্ত বিবরণী শুনে মনে মনে ভেবে দেখলাম, আমি যদি মন্ত্রী হতাম তাহলে কি করতাম। মন্ত্রিমশায় জানেন, সমস্ত গোপন জায়গায় চিঠির সন্ধান করা হবে তাঁর অবর্তমানে। সুতরাং তিনি চিঠিখানা কোথায় রাখবেন মনে মনে আঁচ করে নিয়ে হাজির হলাম তাঁর বসবার ঘরে। কথার ফাঁকে ফাঁকে এবং পকেট থেকে চশমা বার করার অছিলায় দেখে নিলাম অনুমান আমার মিথ্যে হয়নি। আধ-ছেঁড়া দোমড়ানো ধূলি ধূসরিত খামের বাইরে উল্টো করে ভাঁজ করা একটা চিঠির কিনারাও দেখা যাচ্ছে। যদিও খামের ওপর সীল মোহরটা আকারে অনেক বড় এবং হাতের লেখাটা অন্যরকম—নাম-ঠিকানা মন্ত্রি-মশায়েরই।

'বাড়ী এসে অবিকল একটা নকল খাম আর চিঠি তৈরী করলাম। পাঁউরুটির কিনারা কেটে সীলমোহরের ছাপ বানালাম। তারপর ফের গেলাম মন্ত্রীর বাড়ীতে। কথা বলছি, এমন সময়ে নিচের তলায় বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ শুনে যেই জানালার কাছে দৌড়ে গেলেন ভদ্রলোক, আমিও উঠে গিয়ে চিঠি দুটো পাল্টা পাল্টি করে রেখে গেলাম জানলায়। বুঝতেই পারছো, বন্দুকের আওয়াজ করেছিল আমারই ভাড়াটে লোক। মন্ত্রিমশায় এখনো জানেন না। আসল চিঠি বেহাত হয়ে গেছে। জানবেন দুদিন পরেই —পতন ঘটবার পর। খাম খুলে সাদা কাগজে দেখবেন আমার ঠিকানা—অনেক দিন আগে আমাকে চিটকিরি দেওয়ার জবাব।'

কিন্তু হে পাঠক, হে পাঠিকা—বলুন দিকি দুপি' চশমা পরার অছিলায় ঠিক কোন জায়গায় ধূলিধূসরিত আধছেঁড়া খামটা দেখতে পেয়েছিল? ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে?

—অদ্রীশ বর্ধন

(সমাধান ৩৭ পৃষ্ঠায়)

॥ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নতুন ইংরেজি বই ॥

SELECTED POEMS : MANMOHAN GHOSE ১৫·০০

লীলা রায় সম্পাদিত

শ্রীঅরবিন্দ-ভ্রাতা মনোমোহনের শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মনোমোহনের রচনা প্রকাশ হলে পাশ্চাত্য জগতের কাছে বাংলার মুখ উজ্জ্বল হবে।' রবীন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক ভাষণসংবলিত। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখবন্ধসহ।

THE REBEL AND OTHER POEMS ৫·০০

নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী, সাম্যবাদী, দারিদ্র্যসহ ২০টি নির্বাচিত কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন বসুধা চক্রবর্তী।

GURU NANAK — A HOMAGE ২০·০০

নীহাররঞ্জন রায়, মূলকরাজ আনন্দ প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তির রচনা সংবলিত নানক শ্রদ্ধাঞ্জলি সম্পাদনা করেছেন ডঃ কে আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার।

INDIAN LITERATURE SINCE INDEPENDENCE ১৫·০০

ভারতের ২০টি ভাষার সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চার অবশ্য পাঠ্য দলিল, সম্পাদন করেছেন ডঃ কে আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার।

সদ্যপ্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ ॥ প্রতিটি ২·৫০

JAYADEVA ● সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
KAZI NAZRUL ISLAM ● গোপাল হালদার
MANIK BANDYOPADHYAY ● সরোজমোহন মিত্র
MAHARSHI DEVENDRANATH TAGORE ● নারায়ণ চৌধুরী
SAROJINI NAIDU ● পদ্মিনী সেনগুপ্ত
SRI AUROBINDO ● মনোজ দাস
JIBANANANDA DAS ● চিদানন্দ দাশগুপ্ত

সাহিত্য অকাদেমি
ব্লক ৫বি, রবীন্দ্র স্টেডিয়াম
কলিকাতা ২৯

উইমেনস্ কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ উদ্‌যাপন

গত ১৮ জানুয়ারী সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে উইমেনস কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিলের ইন্টারন্যাশনাল উইমেনস ইয়ার অথবা আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষের উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংযুক্ত মহিলা পরিষদের সভানেত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় স্বাগত ভাষণ দানকালে আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষের মূল উদ্দেশ্য —'সাম্য, প্রগতি ও শান্তির' বিষয় উপস্থাপিত করেন। তিনি দেশের সর্বস্তরের শ্রমজীবী মহিলাদের কথা উল্লেখ করে দেশের কৃষি, খনি ও চা-বাগানের মহিলা কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা উন্নতির দিকে গুরুত্ব আরোপ করেন। দেশের জনসাধারণের সক্রিয় প্রচেষ্টায় সমাজের নিম্নস্তরের দরিদ্র মহিলাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক নানা সুযোগ-সুবিধার উন্নতিবিধান করতে হবে।

অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে শ্রীমতী ডায়াস পশ্চিমবঙ্গের তথা সমগ্র বিশ্বের মহিলা সমাজের কৃতিত্বের ও অবদানের বিষয় উল্লেখ করেন। বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় মহিলাদের সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পণ প্রথার কুফল ও শ্রমের বিনিময়ে সমান মজুরীর সমতার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। এছাড়া আরও বলেন, মহিলাদের সুবিধার্থে হোস্টেল ও শিশুদের রাখার জন্য যথেষ্ট ক্রেশের ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের হস্তশিল্পের ওপর প্রাধান্য দিয়ে বলেন, এতে মেয়েদের মনোবল বাড়বে ও সে-সঙ্গে তাঁরা সংসারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবেন। শ্রীমতী ডায়াস এই উপলক্ষে আয়োজিত মহিলা পরিষদের সভ্যাদের হস্তশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

বর্তমান বৎসরের বিজ্ঞান কংগ্রেস সভানেত্রী প্রধান অতিথি ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় বলেন, বর্তমানে মহিলাদের শিক্ষাদীক্ষা ও আরোও বিভিন্ন ধরনের পথ সুগম হয়েছে। শিক্ষিত মহিলাদের বিশেষ কর্তব্য যারা অশিক্ষিত, যারা নানারকমের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিতা, তাদের উন্নতির যথাযথ ব্যবস্থা করা। শিক্ষিতাদের এ-গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি মনে করেন, শিশুরা বাল্যকালে যেভাবে শিক্ষাদীক্ষা পায়, তার ওপরই তার ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ভর করে। শিশুদের এমনভাবে শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে গড়ে তুলতে হবে যাতে ভবিষ্যতে সে আদর্শ নাগরিক হয়ে দেশের সমৃদ্ধিসাধন করতে পারে।

ডকটর রমা চৌধুরী এবং শ্রীমতী তপতী মুখার্জি আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীমতী আইভি খান বলেন, বর্তমানের সমস্যা সম্বন্ধে মহিলাদের সচেতন থেকে সেগুলি দূরীকরণে সচেষ্ট থাকা দরকার।

শ্রীমতী মীরা নাগ (জেনারেল সেক্রেটারী) ১৯৭৪-এর বর্ষব্যাপী সংযুক্ত মহিলা পরিষদের কর্মপন্থার বিবরণ দেন।

১৯৭৫ আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ

বিশ্বব্যাপী মহিলাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে ১৯৭৫ সাল ইউনাইটেড নেশনস দ্বারা আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপিত হবে। মহিলা বর্ষের প্রতীক হিসেবে মহিলা শিল্পী ভ্যালেরি পেটিস অঙ্কিত 'বনকপতোটি ইউনাইটেড নেশনস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। 'সাম্য অগ্রগতি ও শান্তি'—এই তিনটি লক্ষ্যকে কার্যকরী করে এই বর্ষটিকে পালন করা হবে। এ-বছরের এ-প্রচেষ্টার শুরু ভবিষ্যৎ জীবনেও যাতে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয় সেদিকেও রয়েছে বিরাট লক্ষ্য।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতও আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষকে বাস্তবে রূপদান করতে এগিয়ে এসেছে এবং এর মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর সভানেত্রীত্বে ৩৪। জন সভ্যাসহ একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্যতম কাজ ভারত বর্ষের অনগ্রসর এলাকায় এবং অশিক্ষিত মহিলাদের স্বাভাবিকভাবে, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে সত্যকার আলোর পথ দেখানো।

ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি স্বল্প, সেক্ষেত্রে পুরুষেরা যতটা সুবিধা পান মেয়েদের সে-সুযোগ নেই। আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষে মহিলাদের মধ্যে ঠিক ঠিক চেতনা ও অধিকার বোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই আমাদের কাম্য এবং সেটা সম্ভব হলেই মহিলা বর্ষ সার্থক রূপ লাভ করবে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য

ওকাসা গ্রহণ করুন বিশ্ববিখ্যাত বলবর্দ্ধক টনিক ট্যাবলেট যা আপনাকে ৬টি বায়োকেমিকাল, ১০ টি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও ৬টি খনিজ উপাদানের মাধ্যমে নতুন শক্তি এনে দেবে।

ওকাসা টনিক ট্যাবলেট

(পুরুষদের জন্য—"রূপালী")।

প্রধান সব ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।

O.KASA .CO. PVT. LTD.
12 Gunbow Street,
P.O. Box No. 396,
Bombay 400 001.

এর আগের কয়েকটি সংখ্যাতে বাড়ীর তৈরী প্রসাধনসামগ্রী ও ত্বকের যত্ন করার জন্য যে সব ব্যবস্থার কথা আলোচনা করেছি এগুলিও তারই মধ্যে পড়ে। মুখের সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথার পর আমি সারা শরীরের ত্বকের যত্ন সম্বন্ধে আলোচনা করব। তারপর চুল ইত্যাদি।

এখন যে দুটি উপকরণের কথা বলব, তা হল মুখের ওপর কোন দাগ থাকলে তা ওঠাবার জন্য ব্যবস্থা এবং মুখের ওপরের ত্বকের এক আচ্ছাদন তৈরী করা—যা থাকলে রোদ ও হাওয়া, ময়লা ইত্যাদির দ্বারা যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা হতে পারবে না।

একটি শশা খোসা শুদ্ধ পাতলা ও ছোট করে কাটতে হবে। তারপর তাতে একটি ডিমের কুসুম ও এক চামচ মিল্ক পাউডার দিয়ে খুব ভাল করে মেসিনের সাহায্যে ফেটিয়ে একেবারে গুলে ফেলতে হবে। সেই পেস্ট জাতীয় পদার্থটি তুলো দিয়ে মুখে ও গলায় বেশ ভাল করে মাখতে হবে। অন্ততঃ আধ ঘন্টা এইভাবে থাকা ভাল। তারপর সামান্য গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। তার পরে অনায়াসে বাইরে যাওয়া যাবে, আর চামড়াও সারা দিন চকচকে ও মসৃণ থাকবে।

কোন গোটার দাগ বা ঘুষা লেগে চামড়ায় কোন দাগ হলে সেটা ওঠাবার জন্যও কয়েকটি কাজ করা যায়। প্রথমতঃ অর্ধেক আপেল এক (বড়) চামচ মধু এক চায়ের চামচের পাতি লেবুর রস এগুলি বেশ করে ঘুঁটে ও গলিয়ে নিতে হবে। তারপর মুখে ও গলায় বেশ আস্তে আস্তে অর্থাৎ না ঘষে মেখে নিতে হবে। একদম শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রেখে দিতে হবে। শুকিয়ে গেলে সামান্য গরম জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। যে জায়গায় দাগ সেই জায়গাটি একটু বেশী করে থুপে দিতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে—চায়ের চামচের এক চামচ অলিভ তাতে অর্ধেক পাতি লেবুর রস ও ২।৩ ফোঁটা মধু দিয়ে গরম করে নিয়ে গরম গরম অবস্থায় মুখে মাখতে হবে এবং অন্তত ১৫।২০ মিনিট মুখে রাখতে হবে। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে সামান্য গরম জলে। এবং পরক্ষণেই মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে ফল খুবই ভাল পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে সমস্ত শরীরের চামড়া সুন্দর সতেজ ও টান রাখার জন্য কতকগুলি উপকরণ ব্যবহার করা যায়। এগুলিও বাড়ীর তৈরী। তবে এগুলি তৈরী করে ঠাণ্ডা ফ্রিজে রেখে দিলে বেশী ভাল হয়।

যে কোন ঋতুতে যা চলে সে সম্বন্ধে আগে জানাচ্ছি—যে পরিমাণটা বলব তা এক দিনের। এখন একে আন্দাজ মতন বাড়িয়ে নিয়ে তৈরী করতে পারেন।

একটা লোশান তৈরী করা যায় যা মেখে নিলে রোদে চামড়া ঝলসে যায় না। এ ছাড়া এই লোশন মাখলে ত্বকের ওপর তৈলাক্ত ভাব থাকে আর তাতে কমনীয়তাও আসে। এর তৈরীর পদ্ধতি নীচে দিচ্ছি।

বড় পাত্তার চা এক চামচ অর্ধ-কাপ-জল ½ কাপ লেনোলিন ½ কাপ অলিভ তেল ও তাতে ৩।৪ ফোঁটা কোন ভাল পারফিউম।

প্রথমে জল ফোটাতে হবে, একটু পরে তাতে চায়ের পাতা দিয়ে দিতে হবে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, চায়ের পাতা একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে রাখতে হবে এবং ন্যাকড়াটা দু মিনিট পরেই তুলে ফেলতে হবে জল থেকে। তারপর লেনোলিন ও তেলটা দিতে হবে। তারপর সেটা সর্বশরীরে মেখে ফেলতে হবে। এটা খুবই ভাল ফল দেয়।

এতো গেল একটি উপকরণ। আর একটি হল ত্বকের ওপর একটা তাজা ঠাণ্ডা ভাব আনা ও চামড়াকে সেই সঙ্গে ভাল রাখার আর একটি উপায়।

½ ভাগ কাপের জল। দুই বড় চামচ এ্যালকোহল এক বড় চামচ গ্লিসারীন ও বড় চামচের দুই চামচ অলিভ তেল। এগুলি এক সঙ্গে গুলে নিয়ে একটু গরম করে নিয়ে মাখতে হবে। এতে শরীরের ত্বক তাজা ও ঠাণ্ডা থাকে।

হাত ও খোলা অংশগুলির জন্যে শীতকালে যে ব্যবস্থা করা যায় তার সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

দুই বড় চামচ গ্লিসারীন। বড় তিন চামচ পাতিলেবুর রস অলিভ তেল চার বড় চামচ ও তিনটি টমেটোর রস। এগুলি বেশ করে মিশিয়ে হাতে-গলায় মেখে নিয়ে রাখতে হবে অন্তত ৫।৭ মিনিট। এর পর ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিতে হবে।

সুতরাং এইভাবে আমরা বেশ ভাল-ভাবে শরীরের ত্বক ভাল রাখতে পারি।

সামান্য যত্ন একটু বুদ্ধি আর ধৈর্য। শীতকালে আর একটা ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার তাহল পা ফাটা। সৌন্দর্য কিন্তু শুধুমাত্র মুখটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। হাত পায়ের নরম সুন্দর চামড়াও এর একটা অঙ্গ। জই (ওটমিল) এক গামলা গরম জলে বেশ দু মুঠো ফেলে দিতে হবে। তারপর সেই জলে পা ডুবিয়ে রাখতে হবে অন্তত ২০ মিনিট। এতে পায়ের নীচের ও নখের পাশের অংশ নরম হয় ও ফাটা খরখরে ভাব চলে যায়। পরে তোয়ালে দিয়ে মুছে পায়ে একটু ক্রীম অথবা গ্লিসারীন মেখে শুয়ে পড়তে হবে। আর যদি এটা শোয়ার আগে করা হয় তাহলে ক্রীম না মাখাই ভাল। এছাড়া আর একটি উপায় হোল, গরম জলে পা ডুবিয়ে দাঁত মাজার ব্রাস ও সাবান দিয়ে পা ধুয়ে তাতে ক্রীম মাখিয়ে ওপরে পাউডার দিয়ে শোয়া। এব স্নানের আগে অথবা বাইরের কাজ সেরে ঘরে ফিরেও এইভাবে পা ধোয়া যায়। তবে ধোয়ার পর ক্রীম না ব্যবহার করে গোলাপ জল ও তাতে কমলার রস বা লেবুর রস দিয়ে সেটা মেখে তার ওপর পাউডার ছড়িয়ে নেওয়া অনেক ভাল।

হাত নরম ও কোমল রাখাও সৌন্দর্যে বিশেষ দিক। পদ্ম ফুলের বীজ বা ছোট কুঁড় জলে ফুটিয়ে রেখে পরের দিন সেদ্ধ ভাল করে ছেঁকে তাতে গ্লিসারীন মিশিয়ে রেখে দিতে হবে। সেটা ব্যবহার করে হাতের তেলো নরম ও কমনীয় থাকে। পরিমাণটা হবে—পদ্মবীজ বা কুঁড় ২০। তাতে তিন কাপ জল ও এক আউন্স গ্লিসারীন। এটা ঠাণ্ডা ফ্রিজে রেখে বে কিছু দিন ব্যবহার করা যায়।

হাতের জন্য বাড়ীর তৈরী ক্রীম সম্বন্ধে আরও আলোচনা পরবর্তী সংখ্যায় করব।

—বরবর্ণিনী

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

মোটেই নয়। ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি চিঠি রাখলে কোনকালে সে চিঠি আস্তাকুঁড়ে চলে যেত।

চিঠি ছিল চোখের সামনে—কার্ড-র‍্যাক—আড়ালে নয়। আড়ালে রাখা মানেই গোপন করা। বড়কর্তা গোপন জায়গাগুলোই খুঁজেছেন। কিন্তু কি যা গোপন নয়, এমনি বারে, জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে অংকের হিসেবে সে জায়গা দেখেন নি।

মন্ত্রিমশায় ভীষণ চালাক বলেই সে সময়ে চোখে চোখে রাখতেন ভীষণ দরকা চিঠিটা। অথচ খামের চেহারা পালটে দেওয়া অন্যের চোখ এড়িয়ে যেত। ভেতরের চিঠি খানা উল্টে ভাঁজ করে রাখায় দুপি'র সন্দে সত্যি হয়ে দাঁড়াল। খামটা আধছেঁ দোমড়ানো—যেন অবজ্ঞাভরে ধুলোর ম ছুঁড়ে ফেলেছেন মন্ত্রিমশায়। এতই অবজ্ঞা তো ভেতরের চিঠিটা অত পরিপ করে উল্টো ভাঁজ করে রাখা হল কেন?

পুনশ্চ

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

আমি যে ব্রাহ্মণের নিকট বসিয়া এই বিবরণ লিখিতেছিলাম, তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি যখন কালীঘাটের নিকট বড়িশায় থাকিয়া পড়িতেন, সেই সময় তিনি অনেকবার দেখিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয়দিগের কার্যারা পাল্কি করিয়া আসিয়া পূজা দিয়া যাইতেছেন; কিন্তু আমার বোধহয়, এই সকল রমণী ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, মন্দিরাধিকারীরা তাঁহাকে দৃঢ়তার সহিত নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে, সাহেবরা সর্ব্বদাই দেবীর পূজা দিয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করেন, এবং সম্প্রতি কোম্পানীর একজন সাহেব-কর্ম্মচারী একটি মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া দুই তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কালীর পূজা দিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ইহাও দৃঢ়তার সহিত কথিত হইয়া থাকে যে, প্রতি মাসে গড়ে চারি-পাঁচ শত মুসলমান কালী পূজা দিয়া থাকে।'

পাদরি ওয়ার্ড সাহেব পুনরপি বলিয়াছেন—"এই মন্দিরের জন্যই কালীঘাটে লোকসংখ্যা এত অধিক; কারণ প্রায় ৩০ ঘর সেবাইত ভিন্ন ন্যূনাধিক ২০০ ব্যক্তি এই মন্দির উপলক্ষ্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। কোন কোন সেবাইতের পালা একদিন, কাহারও অর্দ্ধদিন, কাহারও দুই-তিন ঘণ্টা মাত্র! যাঁহার পালার সময়ে যে কিছু পূজার সামগ্রী অর্পিত হয়, তৎসমস্তই তিনি প্রাপ্ত হন।"

উক্ত সাহেব বলেন, এই দেবীর পূজার ব্যয় সর্ব্বপ্রকারে মাসিক ৬০০০৲ সিক্কা টাকা, অর্থাৎ বৎসরে ৭২,০০০৲ টাকা। কিছু দিন হইতে কালীঘাট ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি কলিকাতা সহরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এবং সকল শ্রেণীর লোকই এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই কারণে ইহা এক্ষণে কলিকাতার একটি জনবহুল উপনগরে পরিণত হইয়াছে। পাদরি ওয়ার্ড সাহেবের লেখার পর সেবাইতগণের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই তীর্থে শ্রীশ্রীনকুলেশ্বর ও শ্যামরায় নামে আরও দুইটি দেবতা আছেন; হিন্দুরা ইঁহাদিগকেও যথেষ্ট ভক্তির সহিত পূজা করিয়া থাকেন। গোবিন্দপুরে যে স্থানে বর্ত্তমান ফোর্ট ইউলিয়াম দুর্গ দণ্ডায়মান, ঐ স্থানে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির ছিল; গোবিন্দজীকে এক্ষণে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। লোকের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, কালীঘাটে নকুলেশ্বর ভৈরব থাকায় ঐ তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য আরও অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ ওয়ার্ড সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, কৃষ্ণনগরের রাজা রামকৃষ্ণ বরানগরে শ্রীশ্রীকালীদেবীর মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের ও দীন-দরিদ্রদিগের ভরণপোষণার্থ উক্ত রাজার দান যথার্থই নদীয়ার রাজবংশের উচ্চ মর্য্যাদার অনুরূপ। গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দিরের কথা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বাগবাজারে অপার চিৎপুর রোডের পার্শ্বস্থ সিদ্ধেশ্বরীদেবীও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। সকল শ্রেণীর হিন্দুই এই দেবীকে পূজা দিয়া থাকে।

বাগবাজারের বাবু গোকুলচাঁদ মিত্র মদনমোহন দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তাঁহার জন্য একটি সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া বিগ্রহের সেবার জন্য যথোচিত সম্পত্তি দান করেন; ঐ মন্দিরটি 'মদনমোহনের বাড়ী' নামে পরিচিত। এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, এই বিগ্রহটি প্রথমে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের রাজার ছিল; তিনি বিস্তর টাকা লইয়া ধর্ম্মপ্রাণ গোকুলবাবুর নিকট উহা বন্ধক রাখেন। পরে রাজা টাকা দিয়া বিগ্রহ ফিরাইয়া চাহিলে গোকুলবাবু অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে, তিনি যেন উহার জন্য গোকুলের উপর পীড়াপীড়ি না করেন; সুতরাং রাজা ঐ বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন; মূর্ত্তি গোকুলবাবুরই হইল।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর স্বীয়ভবনে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ওয়ার্ড সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন — 'দুইজন সন্ন্যাসী (যাঁহারা উত্তরকালে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন), চৈতন্য ও নিত্যানন্দ, তাঁহাদের শিষ্য ঘোষ ঠাকুরকে এই বলিয়া অগ্রদ্বীপ পাঠাইয়াছিলেন যে, তুমি এই পাথরটা লইয়া যাইয়া গোপীনাথজীর বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে থাক। ঘোষ ঠাকুর গুরুর আদেশানুসারে পাথরখানা মাথায় করিয়া অগ্রদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এবং দেববিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন প্রকাশ্য পূজা করিতে লাগিলেন।"

এই দেবমূর্ত্তি কি রূপে ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজার হস্তগত হইল তৎসম্বন্ধে ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন—"এই বিগ্রহের (অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের) অধিকারী কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণ তিন লক্ষ টাকা পাইতেন; সেই টাকা কৃষ্ণচন্দ্র শোধ করিতে না পারায় নবকৃষ্ণ এক সময়ে এই বিগ্রহ ক্রোক করেন।"

মহারাজা নবকৃষ্ণ দুইটি ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করান এবং দেববিগ্রহগুলিকে নানাপ্রকার রত্নালংকার ও সোনার বাসনকোসন প্রভৃতি দান করেন। সেই সমস্ত সম্পত্তির বর্ত্তমান মূল্যে চারি লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না। বর্ত্তমান সময়েও এই দুইটি ঠাকুরবাড়ীর ন্যায় সুন্দর দেবালয় কলিকাতায় আর নাই।

—ক্ষপণক

প্যাট্রা, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোর্সেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
সম্পৎ সেরামিক্স প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

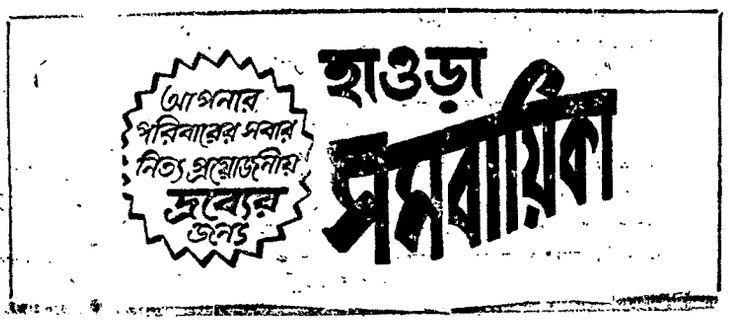

উপন্যাস

ঢেউ বিজয়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তাঁর কথায় প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাঁকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে ইদানীং। অমিয়, তার স্ত্রী নীহার সবাই যেন কেমন এড়িয়ে চলতে চাইছে। সংসারের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছেন যেন তিনি।

তাই নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জাজিয়তি করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

অথচ ঐ মানুষটাই তাকে বিপ্লবীদের কত গল্প শুনিয়েছে। শুনতে শুনতে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে তার দেরী হয়ে গিয়েছিল।

আর সে-জন্যে দাদুর কি বকুনি। সেই রাগে রাত্রে রঞ্জু খায় নি। মেজাজ তার খুব গরম হয়ে আছে বুড়োর ওপর।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা টিঁকল না রঞ্জুর। খেতেই হোল। তার কারণ যুঁইদি। কেন্টনগর থেকে এ বাড়িতে পৌঁছেই সে এসে আদর-টাদর করে দরজা খুলিয়ে কলঘরে নিয়ে গিয়ে মুখ ধুইয়ে আনলো তার।

ভাত খেতে বসেও যুঁইদি তাকে নিয়ে ব্যস্ত রইল। তার কারণও অবশ্য রঞ্জুর অজানা নয়।

অন্যদিকে তার বাবা এবং ঐ বুড়োটাও যুঁইদির রূপ যৌবনে পাগল। এটাও সে বুঝতে পারছিল।]

(পনেরো)

যুঁইদি এবার দুদিনের বেশি থেকে গেল।

এমন বড় একটা হয় না। এ বেলা এসেছে ওবেলা ফিরে গেছে। বা খুব সকালে এসে রাত্রে চলে গেছে। বা রাত্তিরে এলে পরদিন সকাল হতে না হতে পিট্টান। এই নিয়ে কত দুঃখ করেছে রঞ্জু। রাগ করেছে অভিমান করেছে কোনো যাত্রা। অবশ্য কেউ টের না পায় এমন করে। কেবল যুঁইদি টের পেত। .....একবার রঞ্জু জুতো লুকিয়ে রেখেছিল যুঁইদির। একবার ব্যাগ লুকিয়ে রেখেছিল। এখনি মেয়ে-ন্যাওটা হয়ে পড়েছে। যুঁইদি গোপনে ধমক লাগিয়েছিল। তারপর হেসেছিল।

কিন্তু যুঁইদিকে আটকান যায়নি। যেমন একটা তাড়া নিয়ে ম্যান্ডেভিল গার্ডেন আসত, তেমনি কেন্টনগর ফেরার সময় তাড়া-ঘাড়ি ব্যস্ততা।

এবার অন্যরকম।

পুরো দুটো দিন থেকে যাবার পরেও যেন আর একটা বেলা, কি আবার একটা আস্ত দিন অম্বুজা-নিলয়ে কাটিয়ে যাবার ইচ্ছে, যেন কেন্টনগর ফেরার নামে হাই-তোলা আলস্যেই পাচ্ছিল যুঁইদির।

যেজন্য ভিতরে ভিতরে রঞ্জু বেজায় খুশি।

কেবল কি রঞ্জু, অম্বুজা-নিলয়ের সবাই। বুড়ো ও রঞ্জুর বাবা তো আছেই। এই যাত্রা যুঁইদির জন্য, রঞ্জু লক্ষ্য করছিল মা এমন কি টুটুলও যেন মন খারাপ করবে। হুঁ, যখন যুঁইদি চলে যাবে।

স্বাভাবিক। রঞ্জু মনে মনে হাসছিল।

এবার যুঁইদি অম্বুজা-নিলয়ের আব-হাওয়াটাই বদলে দিয়েছে।

কথায় আছে না যত গুড় তত মিষ্টি। চাটনির টক ভাবটা আর থাকে না তখন।

তেমনি ময়দা যত বেশি দলাইমলাই করবে ঠাসবে লুচি তত মোলায়েম হবে খেতে।

অবশ্য সেই পরিমাণ ঘিও ঢালতে হবে কড়ায়ে। সেই সঙ্গে গনগনে আঁচ থাকবে উনানের।

আঁচ ছিল। যুঁইদি যেখানে উপস্থিত সেখানে আঁচের অভাব? তার কথায় হাসিতে চলায় তাকানোয় হাত নাড়ায় মুখ নাড়ায় আগুনের ফুলকি হয়ে অফুরন্ত যৌবন ঝরছে লাবণ্য ঝরছে। আর সেই আঁচে বঙ্কিম দত্ত অনবরত হাত-পা সেঁকে নিচ্ছে। রঞ্জুর বাবাও কম যাচ্ছিল না। কিন্তু শুধু এঁদের তুষ্ট করলে চলবে কেন আর দুটি মানুষ রঞ্জুর মা ও টুটুল—তারা জিনিসটা ভাল চোখে নেবেই বা কেন তাই যুঁইদি এই দুজনের মন ভেজাতে এত ঘি ঢেলে দিয়েছে। যেন অনেক টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়ে এবার যুঁইদির ম্যান্ডেভিল গার্ডেনে বেড়াতে আসা। কাল দুপুরে মার্কেটে গিয়ে দেড়শ টাকা খরচ করে মাইমার অর্থাৎ রঞ্জুর মার-র জন্য একটা বেনারসী কিনে নিয়ে এল। টুটুলের জন্য বেশ দাম দিয়ে ফুল ভয়েলের একটা ফ্রক। হালকা নীলের ওপর গোলাপী স্ট্রাইপ।

কেবল তাই না। ওদিকে গনগনে আঁচ এদিকে বোতল উপুড় করে ঢালা ঘি, তার ওপর বেশ ভাল করে ময়দা ঠাসা হচ্ছে। নিজের টাকায় যুঁইদি চাকরকে দিয়ে মুরগি কিনে আনাচ্ছে বাজার থেকে. দই রসগোল্লা রাবড়ি আনাচ্ছে এ বেলা ইলিশ মাছ ওবেলা কই মাছ অকালের ফুলকপি।

ব্যস এর পর লুচি মোলায়েম না হয়ে পারে! কবারই যুঁইদি এবাড়ি এসেছে—কিন্তু এবারের মতন এত খরচপত্তর কোনো-দিন করেনি। কাজেই এবার বাড়ির সবাই যেবার ননদের ওপর সাংঘাতিক খুশি।

রঞ্জুও নিশ্চিন্ত।

যখন তখন যুঁইদির সঙ্গে বেড়াতে বেরোচ্ছে। বঙ্কিম দত্ত আর আপত্তি করছেন না, খোঁতখাত করছে না নাতির বাইরে বেরোনো নিয়ে।

এবং এর মধ্যেই একদিন ঠিক হয়ে গেল, রঞ্জু দিনকতক কেন্টনগর গিয়ে যুঁইদির কাছে থাকবে।

রাত্রে খেতে বসে যুঁইদি প্রস্তাবটা দিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো ঘাড় কাত করেছে। —খুব ভাল হয়, আমি মনে মনে চাইছিলাম যদি কদিনের জন্য কোথাও রঞ্জুকে পাঠিয়ে দেওয়া যেত। তুমি রাজী আছ অমিয়?

রঞ্জুর বাবা তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করেছে। —খুব ভাল প্রস্তাব। এমনিও তো বাইরে-টাইরে বড়একটা যাওয়া হয় না। ফাঁকায় গিয়ে থাকলে খোকনের শরীরটাও ভাল হবে।

—তোমার কী মত বৌমা?.....রঞ্জুর মা-র দিকে মুখ ঘুরিয়েছিল বুড়ো।

রঞ্জুর মা শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়েছিল। —খুব ভাল হয়। কবে যে ওর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে কবে যে ও কলেজে ভরতি হবে। আমারও আর কিছু ভাল লাগছে না। দিনকতক ও যুঁইয়ের কাছে গিয়ে থাকুক। খুব সুন্দর প্রস্তাব দিয়েছে যুঁই।

—উজ্জ্বল হাসি-হাসি চোখ করে নীহার যুঁইয়ের দিকে তাকিয়েছিল। না তাকিয়ে উপায় আছে! রঞ্জু ভাবল। বলা কওয়া নেই, দুম্ করে দেড়শ টাকা দামের শাড়ি উপহার পাওয়া মেয়ের ননদের কাছ থেকে। ইয়ার্কি! অথচ কাল পর্যন্ত এই মেয়ের জন্য মুখটা কী অসম্ভব ভার না করে রেখেছিল মা। কোনরকমে পরিবেশন করে খাবার টেবিলের কাছ থেকে সরে গেছে। বেলায় বেলায়। দাদুর মুখ থেকে বাবার মুখ থেকে রেবার ননদের নাক - চোখ - চুল - ভুরু - দাঁত-মুখ তো আছেই, গায়ের চামড়া রং শরীরের ঠামো আঙুল ইত্যাদি কোমোটর প্রশংসাই আর বাদ থেকে যাচ্ছিল না। আর উপমার পর উপমা। এই ব্যাপারে বাবাকে টেক্কা দিচ্ছিল দাদু দাদুকে টেক্কা দিতে চেষ্টা করছিল বাবা।

বুড়ো এক একবার কালিদাস টালিদাসও টেনে আনছিল।

বাবার উপমাগুলি মর্ডান। 'তন্বিশ্যামা শিখরদশনা' কি 'পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী' ইত্যাদির ধারেকাছেও বাবা ঘেঁষে না। যেমন টুটুলের বন্ধুদের বেলায়। এক একজনকে এক একটি পাখির নাম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ব্যস, এদের সম্পর্কে এর বেশি কিছু বলার আর দরকারই পড়ে না। গোল্ডেন ফেজান্ট বললেই ফর্সা রঙের টুবলীর শরীরটা চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠবে। যেমন নিজের মেয়ে পুটুনকে বাবা টুনটুনি বলে খালাস। এক কথায় ওর বর্ণনা শেষ। কাঁকুলিয়া রোডের গাপা হল ফ্লেমিঙ্গো পাখি একডালিয়া রোডের গৌরীর নাম পড়েছে সাতসয়ালী রজেন্ট পার্কের রুমির নাম ফটিকজল, রিচি রোডের চামেলীর নাম চন্দনা—আর একটা মেয়ে কি যেন ওর আসল নাম বাবা ডাকে সন্তবউরি বলে। দাদু ওদের রূপটুপ বর্ণনা করতে গিয়ে হয়তো চৌদ্দ লাইন কালিদাস ভারতচন্দ্র আওড়াত। তেমনি যুঁইদিকে নিয়ে। বুড়ো উঠেপড়ে লেগেছিল উপমা খুঁজতে।

বাবা কিন্তু কাল এক কথায় বাজিমাত করেছে।

অরেঞ্জ কালারের নাইলেক্স শাড়ি পরা ছিল যুঁইদির। ব্লাউজটাও ছিল কমলা রঙের।

উঁহু, বাবা পাখির দিকে গেল না। যুঁইদির দিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে হুস করে বলল বিগনোলিয়া ভেনেস্তা। অর্থাৎ ফুলের নাম দিল যুঁইদির। ফুলটার সঙ্গে রঞ্জুরা খুব পরিচিত। বাবা একবার এমন একটা ফুলের চারা, কোথা থেকে এনে লাগিয়েছিল। দিশি ফুলে বাবার মন নেই। বিলিতি ফুলে তাঁর প্রিয়। লতানে গাছে অরেঞ্জ কালারের থোকা থোকা ফুল ফুটে দক্ষিণের বারান্দার গ্রীলটা ছেয়ে গিয়েছিল।

বাবার উপমা শুনে দাদু খিকখিক হাসছিল। বোঝা গেল খুশি হয়েছিল বুড়ো। না হয়ে উপায় ছিল কি। এর চেয়ে ভাল লাগসই উপমা কোথায় খুঁজে পেত বঙ্কিম দত্ত! নিশ্চয় কালিদাসে এমন উপমা ছিল না। একে গায়ের ঐ আগুনে রঙ যুঁইদির তাতে ঐ শাড়িপরা। রোদ লাগা বিগনোলিয়া ভেনেস্তার মতন যুঁইদি কাল দুপুরে খাবার টেবিলে সকলের চোখের সামনে জ্বলছিল। উপমাটা রঞ্জুর খুব মনে ধরে। কিন্তু সেই সঙ্গে খট্ করে একটা প্রশ্ন তার মনে জাগে। সব মেয়ের পাখির নাম দেয় বাবা—যুঁইদির কেন ফুলের নাম? উত্তরটা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায় সে। যুঁইদির গভীর কালো চুলের ফাঁকে আলপনার মতন সরু সিঁদুরের রেখা রয়েছে যে। টুটুলে ও টুটুলের সব কটা বন্ধু আনমারেড—কুমারী। ওদের সঙ্গে সুঁইকে এক সারিতে ফেলতে বাবার নিশ্চয় মনে ধরছিল না।

যাই হোক এভাবে একটি মেয়েকে নিয়ে বাড়ির দুটি বুড়ো মানুষের ক্রমাগত উথাল-পাথাল হওয়া ও টেবিলে খেতে বসে রসের ভুড়ভুড়ি তোলা তা-ও একনাগাড়ে দুদিন ধরে—বাড়ির মেয়েরা এসব কি করে সহ্য করত। রাত্রে বা দুপুরে বুড়ো বঙ্কিম দত্তর খাওয়া আগেই হয়ে যায়। খাওয়া শেষ করে বারান্দায় টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে অথবা একটা চেয়ার টেনে বসছে। রাগে মা ভিতরে ভিতরে ফেটে পড়ছিল রঞ্জু লক্ষ্য করত তেমনি টুটুলটা—যুঁইদির দিকে তাকাতেও যেন ওর বিতৃষ্ণা।

উঁহু বাবার দিক থেকে খুব একটা দোষ দেখতে পায় না রঞ্জু। খেয়ালী মানুষ। মনটা কিছুটা শিশুসুলভ। ফুলের দিকে পাখির দিকে স্বভাবের ঝোঁক। টুটুলের বন্ধুদের একটা করে যদি পাখির নাম দিতে পারে বাবা, এবং তার মধ্যে কোনো দোষ না থাকে তো যুঁইদিকেও তার টকটকে কমলা রঙের পোষাকের জন্য বিগনোলিয়া ভেনেস্তা বলার মধ্যে খুব খারাপ কিছু আছে বলে রঞ্জু মনে করে না। কারো মনে করা উচিত নয়। মা বা টুটুলের কথা আলাদা। মেয়েদের মন এমনিতে ছোট। একটি মেয়ের লাউঞ্জের ছিটের প্রশংসা করলেও আর একটি মেয়ে মুখ কালো করে। বেটা-ছেলেরা তা করে না। এই যে দুদিন ধরে যুঁইদিকে নিয়ে দাদুর এসব রসগোল্লা খোলা দেওয়া নিছক আমুদে মেজাজ বলে বাবা এটা করছে। অন্তত রঞ্জু তাই মনে করে। কিন্তু বঙ্কিম দত্ত? বুড়োর মধ্যে স্রেফ সেক্স কাজ করছে। রঞ্জু চোখ বুজে বলে দিতে পারে। সম্পর্কে নাতনি। আর সেই সুযোগ নিয়ে যখন তখন যুঁইদির থুতনিতে হাত রাখা, গালে ঠোনা মারা, কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি—এসবের অর্থ কি! শোভেনের কথাই ঠিক। অমিতের মামা নাকি বলে—অমিতের চেয়ে তার মামা, হুঁ অমিতের পল্টু মামা অন্তত আট দশ বছরের বড় তা হলেও ওদের মামা-ভাগ্নের মধ্যে বেশ ফ্রি কথাবার্তা চলে—পল্টুর মামা নাকি বলেছে যারা জিনিয়াস তারা খুব প্যাশনেট হয়, কমুক হয়। বার্ট্রান্ড রাসেল নাকি তিন তিনটে বিয়ে করার পর দাদুর বয়সে পৌঁছে আবার একটা বিয়ে করেছিল। জীবনীশক্তি বাড়াবার জন্য প্রতিভাটাকে আকাশের দিকে ঠেলে দেবার জন্য ঐ ইংরেজ ভদ্রলোক সেক্সটাকে ওষুধের মত কাজে লাগিয়েছিল। ভাল কথা, রঞ্জু চিন্তা করে তার দাদু বঙ্কিম দত্ত কি নিজেকে বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করে, বড় যে যুঁইদির জন্য ভেতরে ভেতরে এত টাকটাকি! প্রতিভার মধ্যে তো সারাজীবন ছাই এক জজগিরি করে চুল দাড়ি পাকিয়েছে, এখন ঘরে বসে নাতি-নাতনীকে শকুনের মতন পাহারা দেওয়া ছাড়া আর কাজ নেই। উঁহু কেবল যুঁইদি কেন, টুটুলের বন্ধুরা আসে ওদের সঙ্গে বুড়ো যেমন করে কথাবার্তা বলে যেমন করে তাকায় না—ঐ দিয়ে লোকটাকে বিচার করা যায়। টুবলি গোপা রুমি গৌরী চামেলী—যে-ই আসছে বুড়োর মুখে হাসি ধরে না, কী খুশি মেজাজ নিয়ে এক একটিকে আদর আপ্যায়ন এসো এসো দিদি, বোসো—বঙ্কিম দত্ত তখন পাকা মিষ্টি ল্যাংড়া আমটি। আর রঞ্জুর বন্ধুরা কেউ আসুক! ব্যস যেন খড়গ। গেট-এর ওপারে তাদের দাঁড় করিয়ে রাখবে। কি চাই? কোথা থেকে আসা হয়েছে? কি নাম? রঞ্জুকে কী দরকার এখন—পাঁচবার করে প্রশ্ন। পার্থ অমিত শোভেন বা সোমেন কিছু নতুন চেহারা না যে ওদের দেখে বুড়ো আঁৎকে উঠবে। কিন্তু উঠছে। রোজ। যেন রঞ্জুকে বখাবার জন্য দুনিয়াসুদ্ধ ছেলে ওত পেতে আছে। যেন অন্তর্জলা-নিলয়ের শ্রীমান রঞ্জন দত্ত একমাত্র ভাল ছেলে। তাছাড়া পৃথিবীর সব ছেলে বদ বাউণ্ডুলে রকবাজ হয়ে গেছে। এত মীন-মাইণ্ডেড তার এই দাদুটি। যে জন্য রঞ্জুর বন্ধুরা বুড়োকে দু চক্ষে দেখতে পারে না সে জন্য পার্থ সেদিন মিলপিং-পিল খাইয়ে বুড়োকে ঠাণ্ডা করে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল। দেবেই। যেহেতু টুটুলের বন্ধুরা মেয়েছেলে, ওদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম দত্ত রসে টইটম্বুর আর যেহেতু রঞ্জুর বন্ধুরা বেটাছেলে—ওদের দেখলেই বুড়ো একেবারে ধানী-লঙ্কা—কেন এই পার্থক্যটা কেন! এর কারণ কি। নিশ্চয় তুমি অতিরিক্ত বদ, নিমতলার কাছাকাছি পৌঁছেও সেকেণ্ড ছাড়া আর কিছু চেন না। একদিন বুড়োকে জিজ্ঞেস করবে কিনা রঞ্জু চিন্তা করে।

দৈনিক মাত্র একটি ক'রে টাকা জমান
১৫ টি বছর ধ'রে,
তারই সুফল ভোগ ক'রে যান
সারাটি জীবন ভ'রে।

●

পনেরো বৎসর দৈনিক
এক টাকা সঞ্চয় করিয়া
ধাপে ধাপে
মোট ৪০,০০০৲ টাকার
অধিক লাভ করুন
তৎসহ
বিনা অতিরিক্ত খরচায়
দুর্ঘটনা, কলেরা ও বসন্তরোগ জনিত
মৃত্যু-বীমার
সুযোগও লাভ করুন
(জি. আই. সি'র সহযোগিতায়)

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আপনার নিকটস্থ
পিয়ারলেসের এজেন্ট, ব্রাঞ্চ অফিস অথবা রেজিস্টার্ড
অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার নির্দেশানুযায়ী অনুসূচী
কোম্পানী সম্পর্কিত বিবরণ :—

১। অভিহিত মূল্যের তারিখ :—২৫শে অক্টোবর ১৯৩২

২। বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্ :—শ্রী কে, বে, চ্যাটার্জী, শ্রী এন্, আর্,
সুধাঞ্জী, শ্রী বি, কে, রায়
সেক্রেটারী—শ্রী বি, কে, রায়

৩। ব্যবসা :—"সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ফীম" নামে অভিনব
এবং অর্থ-বিনিয়োগের ব্যবসা।

৪। মূলধন :—

	১৯৭৯	১৯৭৮	১৯৭৭
(ক) কর ধার্যের পূর্বে—	৫৯,২৫৩৲	৯,২০,৮৭৫৲	২,৭১,৪৮৮৲
(খ) কর ধার্যের পরে—	১৯,২৫৩৲	৪৭,৮৭৫৲	১,০৯,৪৮৮৲

৫। লভ্যাংশ :—

(ক) ইকুইটি শেয়ারে	৬%	৬%	৬%
(খ) প্রেফারেন্স শেয়ারে	৭%	৭%	৭%

৬। ৩১-১২-৭৩ তারিখের ব্যালান্স শীট অনুযায়ী বিবরণ :—

(ক) আদায়ীকৃত মূলধন	—	২,৩৪,১৭৬৲
(খ) ফ্রী রিজার্ভস	—	১,৯৯,৬৩৫৲
(গ) "সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ফীম" খাতে জমা		২,৩০,৪৪,৮৪৮৲
(ঘ) কোনও প্রকার আদায়যুক্ত ঋণ	—	নাই
(ঙ) অন্য কোনও প্রকার কর্জ	—	নাই
(চ) সঞ্চিত লোকসান	—	নাই

৭। উপরোক্ত বিবরণ বোর্ড কর্তৃক ১০-৭-৭৪ তারিখে অনুমোদিত হইয়াছে।

বি, কে, রায়
সেক্রেটারী

PRASA

দি পিয়ারলেস জেনারেল
ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ

(পূর্বতন: দি পিয়ারলেস জেনারেল ইন্সিওরেন্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ)

(স্থাপিত ১৯৩২)

রেজিস্টার্ড অফিস :—পিয়ারলেস ভবন • ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট • কলিকাতা-১

গভঃ সিকিউরিটিতে লগ্নী—৩ কোটি টাকার উর্দ্ধে (Face Value)

"যৌবনেতে করিবেক যেজন সঞ্চয়
বার্ধক্যে সে গলগ্রহ কারো নাহি হয়।"

যাক গে যে কথা হচ্ছিল।

কাল রাত্রে খাবার টেবিলে যুঁইদির প্রস্তাব শুনে সবাই খুশি।

হবেই, ঐ যে বলা হয়েছে কায়দা করে যুঁইদি বাড়ীসুদ্ধ লোকের মন হাতের মুঠোয় করে নিয়েছে। এখন আর যত্নের কথা ঠেলবে কার সাধ্য। বাড়ীর প্রত্যেকটা মানুষকে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা গরম মুচমুচে লুচি করে ছেড়ে দিয়েছে রেবার ননদ।

মা এককথায় রাজী। রঞ্জু কদিন কেষ্টনগর গিয়ে থাকবে। তার প্রধান কারণ রঞ্জুকে নিয়ে তাঁদের দুর্ভাবনার শেষ নেই। সেই কবে মার্চে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন সেপ্টেম্বর চলছে। ইউনিভার্সিটির গণ্ডগোলের জন্য আজ পর্যন্ত রঞ্জুর রেজাল্ট বেরোবার নাম নেই। এই লম্বা ছুটিটা ছেলেটা কি করে কাটায়! কত সময় আর চোখে চোখে রাখা যায় বা ঘরে আটকে রাখাই বা যায় কতক্ষণ। উঠতি বয়সের ছেলে একটু বাইরে-টাইরে যাবেই। বাইরে যাওয়া মানে আজেবাজে ছেলের সঙ্গে মেলামেশা। আর সেখানেই তো সর্বনাশ। চারদিকে কী সব ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

অর্থাৎ রঞ্জু সম্পর্কে দুশ্চিন্তার চোদ্দ আনার মূলে রয়েছে বুড়ো বঙ্কিম দত্ত। এসব কথা বলে বলে বাড়ীর লোকের মাথা খারাপ করে দেবার উপক্রম। হুঁ এই বয়সের ছেলেদের নিয়েই আজ ঘরে ঘরে উদ্বেগ অস্থিরতা আতঙ্ক অশান্তি। তাও যা-হোক করে দিন কাটছিল। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জু কলেজে ভর্তি হয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ এ কি উপদ্রব!

সতীশ বাড়ুয্যের ছেলে পর পর দুদিন এ-পাড়ায় কেন। কোথায় দমদম কোথায় বালিগঞ্জ। নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে সে। উঁহু বাড়ী ঢুকেছিল সুবিধে করতে পারল না। বঙ্কিম দত্ত আমল দেয়নি। তাই কি পরদিন গাছতলার ঐ চায়ের দোকানের সামনে বসে অমিয়র ছেলের সঙ্গে সলাপরামর্শ চলছিল। কি পরামর্শ দিচ্ছিল সে ঐটুকুন একটা বাচ্চা ছেলেকে। রতনের মুখে ব্যাপারটা শুনে বঙ্কিম দত্ত প্রথমটা হতভম্ব তারপর রাগে আগুন। স্নান করে ভাত খেয়ে নিজের ঘরে বুঝি বিশ্রাম করছিল। ঘর থেকে তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে আসে। অমিয় বারান্দার টেবিলে টুটুলকে নিয়ে খেতে বসেছিল। নীহার পরিবেশন করছিল। কাজেই এই অবস্থায় অমিয়কে প্রাঠান সম্ভব ছিল না। রোদ মাথায় করে বুড়ো নিজেই বেরিয়ে গিয়ে নাতির কান ধরে হিড়হিড় করে বাড়ী টেনে নিয়ে আসত। ভাগ্যিস সেই মুহূর্তে রঞ্জু গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকে দোতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠছিল। সিঁড়িতে থাকতেই বুড়োর খিটখিটে গলাটা রঞ্জুর কানে আসে। বড় ছেলের সঙ্গে ঘোর তর্কাতর্কি চলছিল বুড়োর।

—তোমার সামনে যে কী বিপদ তা তুমি টের পাচ্ছ না অমিয়।

—ঠিক আছে, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে শোও বিশ্রাম করো তুমি কেন বেরোচ্ছ এই রোদের মধ্যে—আমি বরং আবার রতনকে পাঠাচ্ছি।

—আমি অপেক্ষা করতে পাচ্ছি না, আমি নিজে যাচ্ছি কথাটা শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। আমি সতীশ বাড়ুয্যের ছেলেকে জিজ্ঞেস করব—

—আমার মনে হয় না রুদ্রেন্দু তেমন কিছু—

—তোমার মনে হওয়ার সঙ্গে এ জগৎটা চলছে না। একটা দুধের বাচ্চার সঙ্গে বুড়ো বয়সে তার কি এমন ফিসফিস গুজগুজ আলাপ থাকতে পারে একবার চিন্তা করেছ?

অমিয় শব্দ করে হাসছিল।

—এটা কি সেই ইংরেজের আমল যে চ্যাংড়াদের নিয়ে রুদ্রেন্দু গোপনে দল পাকাচ্ছে, বোমা পিস্তল জোগাড় করে আবার বিপ্লব-টিপ্লব...

—তুমি থাম তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। বঙ্কিম দত্ত চেঁচিয়ে উঠেছিল। ইংরেজের আমল নেই বলে কি বোমা পিস্তলের কাজ-কারবার শেষ হয়ে গেছে, তুমি কি কাগজ পড় না!

—হ্যাঁ পড়ি, মাঝে মাঝে তোমার মতন সারাক্ষণ খুঁটিয়ে কাগজ পড়তে আমার ভাল লাগে না।

রঞ্জুর বাবা টেনে টেনে হাসছিল।

এর ভেতর বুড়ো কি বলেছিল রঞ্জু ঠিক শুনতে পায় নি। অথবা স্পষ্ট করে কিছু না বলে বুড়ো যেন কিছু একটা বলবে বলে গজগজ করছিল। না কি মনে মনে ভাবছিল কাগজ পড়তে তোমার ভাল লাগবে কেন অমিয়, কাগজে খুন-জখম মারা-মারি কাটাকাটির খবর থাকে, চুরি ডাকাতি স্মাগলিং-এর খবর থাকে, কিছু নোংরা পলিটিকস থাকে আর খরা ও বন্যার খবর। কাগজে ফুলের কথাও লেখে না পাখির খবরও ছাপে না।

—তুমি যা-ই বল বাবা আমার মনে হয় রুদ্রেন্দু এ-পাড়ায় অন্য কোন কাজে এসেছিল. রঞ্জুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতে একটু কথাটথা বলছিল আর কি সেদিন দেখে গেছে তো ওকে বাড়ীতে—রঞ্জু তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল।

—হুঁ দেখে গেছে চিনতে পেরেছে তার বাল্যবন্ধুর ছেলে, তাতে হাম্বাগটার সুবিধেই হয়েছে চা খাবার নাম করে ডেকে নিয়ে নিরিবিলি একটা গাছতলায় বসে বন্ধুর ছেলের মাথায় খুব করে বিষ ঢোকাচ্ছিল—ঐ কচি কাঁচা বয়সেই বিষ ঢোকাতে সুবিধে কিনা!

—তুমি কী বলতে চাইছ আমি বুঝতে পাচ্ছি না। অমিয় আর হাসছিল না।

—কি করে বুঝবে! বঙ্কিম দত্তর গলার স্বর বিকৃত হয়ে উঠেছিল। আর তখন বুড়োর কাঠখোট্টা শকুন শকুন চেহারাটা কেমন বদখত রূপ ধরেছিল সিঁড়িতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রঞ্জু বেশ টের পাচ্ছিল। এত রাগ পাচ্ছিল না তার! গলার কফটা আটকে গিয়ে বুড়োর কথাগুলি যেন আরও বেশী খরখরে শ্রুতিকটু শোনাচ্ছিল।—তাই তো কি করে বুঝবে! নিজের ছেলেকে কি করে শাসন করতে হয় কেমন করে চোখে চোখে রাখতে হয় সেদিকে যদি তোমার এক ফোঁটা খেয়াল থাকত তো রতন যা খবর এনেছে শুনে ভাতের থালা ফেলে তুমি ছুটে গিয়ে ছেলের চুলের মুঠি ধরে বাড়ী টেনে নিয়ে আসতে। দেরী করতে না। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত নির্বিকার।

—কি মুস্কিল! যেন ঘাড়-তেড়া বুড়োর সঙ্গে তর্কে এঁটে উঠতে না পেরে রঞ্জুর বাবা হতাশ হয়ে পড়েছিল। গলায় খানিকটা বিরক্তিও মেশান যেন বাবার।

—তাই তো আমি জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, রুদ্রেন্দুকে আজও তোমার এত ভয় কেন আবার কি সে দল পাকাচ্ছে বোমা পিস্তল নিয়ে আবার কি সে—

—হ্যাঁ! এবার বুড়োকে দারুণভাবে মুখ খিঁচিয়ে উঠতে শুনল রঞ্জু। আমি তাই সন্দেহ করছি। শয়তানটা এখন আবার নকশালদের দলে যে ভিড়ে যায় নি তা-ই বা তুমি কি করে জান, আবার কচি কচি ছেলের দরকার ওর একটু উস্কে দিলেই যারা মাথা গরম করে আগুন নিয়ে খেলে।

—মাই গড তুমি সোজা নকশাল মুভমেণ্টে চলে গেছ। যেন রঞ্জুর বাবা এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়, গলার নীচে হাসে।

—উঁহু আমার তা মনে হয় না। যেমন আষ্টেপৃষ্টে সংসারে জড়িয়ে পড়েছে লোকটা দেখে এলাম সেদিন। অন্ধ বুড়ো বাপ কাঁধে ঝুলছে। মেয়েটা বড় হয়ে প্রায় বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠল। তেমন লেখা-পড়া করাতে পারেনি, এদিকে চট করে বিয়ে দিয়ে দেবে সেই ক্ষমতা রুদ্রেন্দুর নেই। একটা প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার সে। এমন স্কুল, বছরে নাকি ঢার মাস মাইনে পায় বাকী আট মাস বেগার খাটতে হয়। একটা দুটো টুইশনি করে। কিন্তু তাতেও খুব একটা আসে না। অভাব লেগেই আছে। বুঝতে পাচ্ছ কী বাজার। কাজেই এই অবস্থায় রুদ্রেন্দু যে—

—এই অবস্থায়ই তো ওরা নকশাল হয়ে যায় বিপ্লব করে, বঙ্কিম দত্ত রীতিমত খেঁকিয়ে ওঠেন। অভাব থেকে ফ্রাস্টেশন থেকেই তো এই জিনিসের জন্ম...

—উঁহু আমার মনে হয় না যেন রঞ্জুর বাবা মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করছিল। রঞ্জুর আর সহ্য হচ্ছিল না, লাফিয়ে সিঁড়ির শেষ ধাপটা ডিঙিয়ে তখনই দোতলার বারান্দায় উঠে গেছে। —এই তো খোকন এসে গেছে! তাকে দেখে বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—কি হয়েছিল খোকন, এত দেরী তোমার? চুল কাটলে না কেন!

—সেলুনে জায়গা ছিল না বসবার। ভীষণ ভিড়। বাবার চোখে চোখ রেখে রঞ্জু হাসছিল।

—ভিড় ছিল, বাড়ী চলে এলে না কেন। বঙ্কিম দত্ত গর্জন করে ওঠেন। গাছতলায় রুদ্রেন্দুর সঙ্গে বসে কিসের গল্প হচ্ছিল শুনি?

—গল্প! আকাশ থেকে পড়ার মতন চেহারা করে বুড়োর মুখটা দেখছিল রঞ্জু। গল্প করিনি তো!

—হ্যাঁ রতন দেখে এসেছে।

—বা-রে! যেন ছেলেমানুষের মতন দাদু খামকা চটাচটি করছে, এমন একটা ভাব দেখিয়ে রঞ্জু মুখ ঘুরিয়ে বাবার দিকে তাকায়। বুঝলে বাবা পারিজাত-এ জায়গা না পেয়ে মার্কেটের দিকে চলে যাই আমি। দেখলাম ওখানেও সব কটা হেয়ার কাটিং সেলুনে অসম্ভব ভিড়। এক ঘণ্টার মতন অপেক্ষা করলাম সেখানে। তারপর ফিরে এলাম। এসে দেখলাম তখনও পারিজাত-এ ভিড় কমে নি। আবার অপেক্ষা করলাম। কেননা চুল না কেটে বাড়ী ফিরলে তোমরা রাগারাগি করতে এমন সময় রাস্তায় তোমার সেই বন্ধুটি আমাকে দেখে ডাকল। সেদিন বাড়ীতে আমাকে দেখেছিল তো। তাই চট করে চিনতে পারল। বলল, এসো এসো খোকা চা খাবে। আমি চা খাই নি। তোমার বন্ধু চা খেল, চা খেতে খেতে আমাকে একথা ওকথা জিজ্ঞেস করল—

কি কথা? বুড়ো ফোঁস করে উঠল।

রঞ্জু চুপ। তার ইচ্ছে করছিল না যে বুড়োর সঙ্গে কথা বলে।

—উত্তর দাও। দাদু যা জিজ্ঞেস করছে বলো। মা পিছন থেকে তাড়া দিচ্ছিল।

—এই আর কি! বুড়োর দিকে তাকায়নি, মা-র দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে রঞ্জু বলছিল, ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কোন স্কুলে পড়ি, কোন ক্লাসে পড়ি। স্কুলের নাম বললাম, হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিয়েছি তা-ও বললাম। এবার রেজাল্ট বেরোতে যে দেরি হচ্ছে তা তিনি জানেন। বললেন, স্কুল কলেজ য়ুনিভার্সিটিতে যা বিশৃঙ্খলা চলেছে, ছেলেদের লেখাপড়াই বন্ধ হয়ে যাবে—

—হুঁ, লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাক এটাই তিনি চাইছেন। দারুণ চিৎকার করে উঠেছিল বুড়ো।

—আহা তুমি থাম, তুমি চুপ করো বাবা। ওকে শেষ করতে দাও। বুড়োর দিকে তাকিয়েছিল রঞ্জুর বাবা, তারপর তার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেছিল হুঁ, তারপর? আর কি জিজ্ঞেস করেছিল রুদ্রেন্দু তোকে!

—আমার আর্টস ছিল না সায়েন্স। বললাম আর্টস। তখন তিনি বললেন, তবে তো টেকনিক্যাল লাইনে তুমি যেতে পারছ না। অসুবিধে আছে। কলেজে ভর্তি হয়ে জেনারেল সাবজেকটস নিয়ে পড়তে হবে।

—আর আর, কি জিজ্ঞেস করল?

—আর কিছু না। তখন রতন গেল। বলল দাদু ডাকছে, আমি বাড়ি চলে এলাম।

—মিথ্যে কথা। আরো অনেক কথা হয়েছে। বঙ্কিম দত্ত আবার একটা লাফ দিয়ে উঠেছিল। অনেকক্ষণ ধরে দুজনের ফিসফাস চলছিল। একটা লাইটপোস্টের পেছনে দাঁড়িয়ে রতন দেখছিল।

—রতনটা এক নম্বরের লায়ার। রঞ্জু চেঁচিয়ে উঠেছিল। মাত্র দু তিন মিনিট আমি ওই গাছতলার চায়ের দোকানের সামনে তাঁর কাছে বসেছিলাম। তারপর উঠে আসি।

—রঞ্জু! মা পিছন থেকে আবার ডাকে। তর্ক করবে না। চুপ কর।

—চান করে এখন ভাত খেয়ে নাও। বাবা গম্ভীর হয়ে বলল।

খেতে কি আর রুচছিল। রঞ্জু বুঝতে পারছিল ব্যাপারটার এখানেই শেষ নয়। যখন সে খাচ্ছে বুড়ো দক্ষিণের বারান্দায় নিজের শোবার ঘরের সামনে অনবরত পায়চারি করছিল। অর্থাৎ নাতিকে এখনও শাস্তি দেওয়া হয়নি—খাওয়া পর্যন্ত সেটা মুলতুবী রাখা হয়েছে, খেয়ে উঠুক তারপর—

এমন একটা মতলব নিয়ে যে অম্বুজা-নিলয়ের ডিরেকটরের অস্থির পায়ে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছিল টের পেতে রঞ্জুর দেরি হয়নি। তাই হল শেষটায়। তার খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কড়া হুকুম জারী হয়ে গেল। —বুঝেছ বৌমা, ছেলেকে একদম বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না। আমিয়, তোমাকেও বলে রাখছি, রঞ্জু যেন গেট-এর বাইরে না যায়। বেড়ানটেরানও তার বন্ধ। সারাদিন বাড়িতে থাকবে। হুঁ, আজ থেকে এই নিয়ম হয়ে গেল। আমার অর্ডার। কেউ যেন নিয়ম না ভাঙে।

রঞ্জুর ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে বুড়োর গলাটা টিপে ধরে। তা আর পারল কোথায়। না পেরে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দাঁতে দাঁত চেপে রেখে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে সে। আচ্ছা দেখা যাবে। আমিও এই জন্মে আর ঘর থেকে বেরোচ্ছি না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছিল সে। তারপর ঠাস করে দোরে খিল এঁটে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল।

তাই আজ ভাবছে সে। যদি যুঁইদি না আসত কী হত! যুঁইদি এসে বাঁচিয়েছে তাকে। বাড়ির হাওয়াটা কেমন ঘুরিয়ে দিল ছোট্ট সুন্দর মানুষটা। আজ একটা সকালের মধ্যেই যুঁইদির কাজে তিনবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে সে। দোকানে গেছে। দোকানে যাওয়া মানে গেট-এর বাইরে যাওয়া। কৈ চোখের ওপর দেখেও তো বুড়ো একটা কথাও বলল না। ইচ্ছে করে বলেনি। কলকাতা এলে অনেক কিছু কেনাকাটা দরকার পড়ে যুঁইয়ের। যুঁইয়ের জন্য স্টেশনারী দোকান থেকে সাবানটা ক্রিমটা নেল-পালিশটা কিনতে যাচ্ছে খোকন। একটা পছন্দ না হলে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে আর একটা আনতে তক্ষনি আবার তাকে দোকানে পাঠাচ্ছে যুঁই। এই অবস্থায় নাতিকে তো কিছু বলা যায় না। বলা উচিত নয়। যুঁই অসন্তুষ্ট হবে। হা—হা—হা! রঞ্জুর বগল বাজাতে ইচ্ছে করছিল। তা ছাড়া যুঁইদির সঙ্গে শিগগির কেণ্টনগর বেড়াতে যাচ্ছে সে। কী মজা, কী মজা! ভেবে এখন থেকেই তার গা শিরশির করছে।

(ক্রমশঃ)

সদ্য প্রকাশিত :

নতুন ভুবন ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫.০০

সীমান্তবর্গ ॥ প্রলয় সেন ॥ ৮-০০

রাতের সমুদ্র ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৭-০০

কামনার সুখ-দুঃখ ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ ৬-৫০

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের		কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
রামায়ণী প্রেমকথা	৬-৫০	চুপি চুপি আঁধারে	৫-০০
চিরঞ্জীব সেনের		বীরু চট্টোপাধ্যায়ের	
অপরিচিতা রূপসী	৪-৫০	মানুষ যখন পশু হয়	৪-৫০

প্রফুল্ল গ্রন্থাগার : ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

আর্ট কলেজের বাৎসরিক প্রদর্শনী

কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক প্রদর্শনীটি একদা ছিল কলকাতার বড়দিনের ছুটির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। একদা আকর্ষণীয় ছিল বলতে একথা অবশ্যই বোঝাতে চাচ্ছি না যে ইদানিং এ প্রদর্শনীর মান পড়ে যাওয়াতে তার আকর্ষণী ক্ষমতা কমে গেছে। মান আগেও যা ছিল, এখনও তাই আছে। বরং এ বছরের প্রদর্শনী দেখে মনে হল, গত কয়েক বছরের তুলনায় প্রদর্শিত তৈলরঙের ছবি এবং মুরাল নিদর্শনগুলি অনেক বেশী আকর্ষক। জলরঙের প্যাস্টেলের- টেম্পারার ছবি, ছাপের ছবি বা গ্রাফিক এবং ড্রইং অন্যান্য বছরে যেমন দেখা যায় এবারের প্রদর্শনীতেও তেমনই দেখা গেল। এসব বিভাগের কাজকর্মের মান আরও উন্নত হবার দাবী রাখে। অল্প দু' চারটি কাজ ছাড়া এসব বিভাগে তেমন দক্ষ কাজ চোখে পড়ল না। চিন্তামণি কর মহাশয়ের অবসর গ্রহণে ভাস্কর্য বিভাগটি দর্শনীয়ভাবে ক্ষতগ্রস্ত হয়েছে। ভাস্কর্য বিভাগে চোখে পড়ার মতন কাজের একান্ত অভাব চোখকে পীড়া দেয়। বিজ্ঞাপনে শিল্পের প্রয়োগ সম্বন্ধীয় যে বিভাগটি এ বিদ্যালয়ে রয়েছে সে-বিভাগে বহুকাল ধরেই বেশ ভাল কাজ-কর্ম হয়। এবারের প্রদর্শনীতেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। তবে বেশীর ভাগ কাজের উপরেই বিদেশী প্রচার-শিল্পের কারু-কৌশলের প্রয়োগ অত্যন্ত দর্শনীয়-ভাবে প্রকট। এ-বছরের প্রদর্শনীতে একটি নতুন বিভাগের কাজ দেখা গেল। জানা গেল বিদ্যালয়ের অল্প কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্রের যৌথ প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ে একটি আলোকচিত্র বিভাগ সদ্য খোলা হয়েছে। এখনও সমস্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে। যতদূর মনে পড়ে শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিদ্যালয় একটি ফটোগ্রাফি বিভাগ ছিল; সেটি কেন উঠে গিয়েছিল তা গবেষণার বিষয়।

তৈল-রঙ বিভাগে অলকা চিন্তামণির ছবিতে রঙের সাহায্যে আলো-ছায়ার প্রকাশ ও ঘনত্ব আরোপনে দক্ষতা দেখা গেল। দীপক ঘোষ বেশ সহজভাবে বর্ণপ্রয়োগ করেছেন তাঁর ছবিতে। বলবীর কাউরও রঙকে আলো-ছায়া প্রকাশের কাজে ব্যবহার করতে পেরেছেন। সুবীর সেনের ছবিতে ড্রইং বেশ প্রেক্ষতপ্রকাশক। সুনীল দের ৩৪১ সংখ্যক ছবিটি এবং মহী পালের ৩৬০ নম্বর ছবিটি বিন্যাসগুণসমৃদ্ধ। মনোজ সরকার রচিত বুদ্ধের প্রতিকৃতিটি দক্ষ বাস্তবধর্মী কাজ। দীপালি ভট্টাচার্যর বর্ণবিভঙ্গ সুদক্ষ। জয়ন্তী পাই খুব স্বচ্ছন্দে স্থাপত্য অবলম্বনে প্রায় বিমূর্ত বিন্যাস গড়ে তুলেছেন কিন্তু রূপবন্ধের ঘনত্ব ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। ব্রতীন মিশ্রর তুলিচালনার ভঙ্গি গতিপ্রকাশক। মুরাল বিভাগে অ্যাক্রিলিক পেন্ট দিয়ে কলেজের দেয়ালের গায়ে করা ছাত্রদের যৌথ একটি আকর্ষণ করে। এ-ছাড়া সুনীল দের একটি প্লাস্টার ও এলুমিনিয়মে গড়া বিমূর্ত রচনা বিন্যাসগুণসমৃদ্ধ। মদন রায়ের একটি মোজাইক টাইলস-এ রচিত আলঙ্কারিক রচনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জল-রঙ বিভাগে সুজিত দত্ত এবং পেন্সিল স্কেচে বলাই পাল, সমীর দাস, শুদ্ধসত্ত্ব বসু বিভাস চৌধুরী, ধনসিং থাপা, দীপক ঘোষ প্রশান্ত নিয়োগী এবং জয়শ্রী দত্তর কাজ চোখে পড়ার মতন। গ্রাফিক বিভাগে মানব দের উড-প্রিন্ট, অমলকুমার চক্রবর্তীর এচিং, নির্মলেন্দু মণ্ডলের লিথোগ্রাফ, আদিত্য বসাকের রঙহীন চাপের ছবি, সুজিত দত্তর লিথোগ্রাফ সকলের চোখে পড়ার মতন। অবশ্য সমগ্র প্রদর্শনীটিতে এককভাবে যে ব্যক্তির কাজ সবচেয়ে স্মরণীয় বলে মনে হয় তিনি রামলাল ধর। রামলাল গুয়াশ এবং লিথোগ্রাফের কাজ করেছেন। মুক্ত ছন্দে রঙলেপন করে এবং বর্ণান্তর ঘটিয়ে রামলাল বেশ একটা লিরিক্যাল আমেজ তৈরী করতে পারেন।

কমার্শিয়েল বিভাগে দক্ষ কাজ করেছেন অনেকেই। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য মৃণাল মিত্রের একটি সিএসডিএ বিষয়ক পোস্টার, সমীর মণ্ডলের একটি টেলিভিসন বিষয়ক পোস্টার ও নৃপেন্দ্র-নারায়ণ নাগের একটি আণবিক শক্তির ব্যবহার বিষয়ক পোস্টার।

সমস্যা—কি নিয়ে ছবি আঁকবো?

সপ্তাহখানেক আগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস গ্যালারীতে পেনটার্স অর্কেস্ট্রা নামে এক শিল্প-গোষ্ঠীর সদস্যদের ছবির একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে চিন্ময় রায় জহর দাশগুপ্ত পার্থপ্রতিম দেব প্রণব সেনগুপ্ত, শান্তনু ভট্টাচার্য, শুচিব্রত দেব সমীর দেব এবং তপন মিত্র প্রমুখ চিত্রকরদের সর্বসাকুল্যে ছত্রিশটি তেল-রঙ জল-রঙ এচিং-প্রিন্ট ও সেরিগ্রাফের ছবি স্থান পেয়েছিল। যদিও বেশ কিছুকাল হল এঁরা এঁদের শিল্পশিক্ষা সমাপন করেছেন তবু নিজেদের পরিচয় প্রসঙ্গে এঁরা বিশ্ব-ভারতী কলা-ভবন-এর প্রাক্তন ছাত্র বলে চিহ্নিত করেছেন।

বেশীরভাগ চিত্রকর, ভাস্কর, ছাপের-ছবি নির্মাতা কোন না কোন শিল্প শিক্ষায়তনের প্রাক্তন বা বর্তমান ছাত্র। কিন্তু তাঁরা যখন সাধারণ্যে তাঁদের কাজ নিয়ে উপস্থিত হন তখন তাঁদের, ছাত্র-পরিচয়টা মুখ্য না হওয়াই বিধেয়। প্রাক্তনই হোন বা বর্তমানই হোন যেখানে শিল্পী নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁর শিক্ষায়তনের নাম ঘোষণা করেন তখন তিনি প্রায় অজান্তেই তাঁর ছাত্রসুলভ মানসিকতা প্রকাশ করেন। বস্তুত পেনটার্স অর্কেস্ট্রা গোষ্ঠির শিল্পীদের বেশীরভাগের চিত্রকর্মে একটি ছাত্রসুলভ মানসিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

শিল্পকর্মে এই ছাত্র-মানসিকতার লক্ষণ কি? কোন শিল্পশিক্ষায়তন শিল্পী তৈরী করতে পারে না; পারে না শিল্পসৃজনীক্ষমতা তৈরী করে দিতে। সাধারণত কিভাবে চিত্র অথবা ভাস্কর্যবস্তু নির্মাণ করতে হয়—তার কারিগরী ক্রিয়া সম্বন্ধে ছাত্রকে অবহিত এবং অভিজ্ঞ করে তোলাই শিল্পশিক্ষায়তনের কর্মকাণ্ডের গন্ডী। অর্থাৎ কোন মাধ্যম কিভাবে ব্যবহার করা যায় এবং সেই বিশিষ্ট মাধ্যমের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাকে ব্যবহার করে কিভাবে শিল্পবস্তু নির্মাণ করতে হয় শুধু সেই জ্ঞানটুকুই একটি শিক্ষায়তন শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চার করে। কিন্তু শুধু তা দিয়ে তো আর শিল্পকর্ম হয় না।

ওঠে যখন শিল্প-বস্তু নির্মাণ সম্পর্কে জ্ঞান কোন বিষয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ শিল্পসম্মত ভাষা দিতে ব্যবহৃত হয়। শিল্পের বিষয় কোন বহির্জাগতিক ঘটনা বা বস্তুমাত্র নয়। বিষয়ী অর্থাৎ শিল্পী কোন বহির্জাগতিক ঘটনা বা বস্তু সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা-ই শিল্পের বিষয়। সেই বিশেষ অভিজ্ঞতাকে শিল্প-মাধ্যমের ভেতর দিয়ে সাধারণীকৃত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে পারার ক্ষমতাই সৃজনীক্ষমতা অভিধায় অভিষিক্ত হবার যোগ্য।

ছাত্র বা শিক্ষার্থীসুলভ শিল্পকর্মে এ বিষয়সচেতনতা দেখা যায় না। সেখানে যা দেখা যায় তা হল: এক, এক দুই বা ততো-ধিক পরিচিত শিল্পরীতি বা শৈলীর অনু-সরণে কোন বহির্জাগতিক ঘটনা, বস্তু বা দৃশ্যকে চিত্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা; যে চেষ্টার মধ্যে অনুসৃত শিল্পরীতি বা শৈলীর বিষয়ানুভূতি অনুপস্থিত। দুই, নতুবা দেখা যায় কোনক্রমে একটি বহি-র্জাগতিক বস্তু বা ঘটনার একটি রূপায়ণ প্রচেষ্টা যার মধ্যে ঘটনার অভিব্যক্তি এক ধরনের এবং রূপায়ণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আরেক ধরনের। এবং তিন, যাঁরা বিমূর্ত শিল্প করেন তাঁদের মধ্যে এক ধরনের বিষয়-হীন অলঙ্করণ প্রবণতা দেখা যায় এবং তাও খুব উঁচু দরের নয়।

পেনটার্স অর্কেস্ট্রার শিল্পীদের কাজে এই তিন ধরনের ছাত্র-মানসিকতাই দেখা গেল। অথচ এঁদের মধ্যে বেশ কজনই শিল্পবস্তু নির্মাণে দক্ষ। বিশেষ করে প্রণব সেনগুপ্ত, পার্থপ্রতিম দেব এবং তপন মিত্রের দক্ষতা তো তাঁদের ছবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই ধরা পড়ে। সদ্য ছাত্রত্ব সমাপণ করে আমাদের যেসব শিল্পীবন্ধুরা শিল্পকর্মেই নিজেদের নিয়োজিত করা মনস্থ করছেন তাঁদের সকলকেই অনুরোধ জানাই—'কিভাবে ছবি আঁকবো' এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে যেন কি নিয়ে ছবি আঁকবো' সে বিষয়েও গভীরভাবে চিন্তা করেন। নতুবা তাঁদের সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফলা হবে।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তারপর একদিন অনাথের গান হল ক্যাম্বেল কলেজের হোস্টেলে। এতদিন কলকাতায় যত জায়গায় গেয়েছে, এখানেই সবচেয়ে বেশি শ্রোতা। গান সবাইকার ভাল লাগল এখানে। গানের শেষে এক ভদ্রলোক আলাপ করলেন।

বললেন, চমৎকার গলা আপনার। একদিন আমাদের বাড়িতে আসুন। নিমন্ত্রিত একজন আসবেন, তিনি গান-বাজনা বড় ভালবাসেন। তাঁকে শোনাতে হবে। তিনি বিশেষ মান্যগণ্য লোক।'

ঠিকানা দিলেন—২০, মীরজাফর লেন। কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে, সে রাস্তার এখনকার নাম—কলেজ রো।

অনাথ রাজী হয়ে সেখানে গান গাইতে গেল। আর এখানেই গানের সুবাদে প্রথম তার পৃষ্ঠপোষক লাভ। সেদিন এ বাড়িতে মধুপুরের পাথরোল স্টেটের ম্যানেজার মতিলাল মিত্রের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। তার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন ভদ্রলোক। তারপর অনাথের বৃত্তান্ত জানতে পেরে তিনি সহায়তা করলেন নানা ভাবে।

নিজে সঙ্গে করে ডবল রীড হারমোনিয়ম কিনে দিলেন। আর তবলা বাঁয়া তানপুরা পর্যন্ত। তারপর অনাথকে নিয়ে গেলেন মধুপুরে।

অনাথের মধুপুরে দিন ভালই কাটতে লাগল। নতুন হারমোনিয়ম তবলা তানপুরার সদ্ব্যবহারও হল বেশ। কিন্তু নিজে নিজে শেখা বা সাধা আর কতদিন চলবে? আসল শিক্ষার কি হবে? জীবনের যা একমাত্র লক্ষ্য?

সে ব্যবস্থাও করে দিলেন মতিলাল মিত্র। অনাথকে কাশীতে পাঠালেন ওস্তাদ গায়ক ছোটে রামদাসের নামে। অনাথের জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন! অবশেষে তার রীতিমত গান শেখা আরম্ভ হল কাশীতে। ছোটে রামদাসজীর কাছে। এতদিনের এত কষ্টের স্বপ্ন আবার সফল হবার পথে।

টপ্পা ও খেয়ালের নামকরা ওস্তাদ ছোটে রামদাসজী। অনাথ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সাধন আরম্ভ করে দিলে।

এই ভাবে মাস ছয়েক গেল বারাণসীতে।

কিন্তু যে শিক্ষার আশা অনাথের মনের মধ্যে ছিল, ওস্তাদজীর কাছে তা পূরণ হচ্ছিল না। আগ্রাসী তার সঙ্গীত শিক্ষার লক্ষ্য এবং আদর্শ। ছোটে রামদাসজীও খেয়াল ও টপ্পায় অতিশয় গুণী। তবে বিদ্যা দান বিষয়ে কৃপণ হলেন অনাথের বেলায়। শিক্ষার্থীর মন ভরাতে পারলেন না।

অনাথ কাশী থেকে মধুপুর, তারপর কলকাতায় চলে এল। এবার কিন্তু যোগাযোগের কোন সুবিধা হল না এখানে। আরো কিছুদিন দেখে শেষ পর্যন্ত দেশেই ফিরে গেল।

তবে খেসড়ায় এসেও বসে রইল না নিশ্চেষ্ট হয়ে। কলকাতায় স্বাবলম্বী হয়ে থাকা যায় কিভাবে, এই হল লক্ষ্য। সেখানে না থাকলে ওস্তাদের শিক্ষা পাওয়া যাবে না, নিজেও বড় গায়ক হতে পারবে না—এ ধারণা তার বদ্ধমূল হয়েছে। তাই এবার খেসড়া থেকেই কলকাতায় একটি ব্যবস্থা করলে। অনাথ গান শেখাবার কাজ নিয়ে একেবারে চলে এল। বরানগরের একটি অঞ্চলের তখন নাম ছিল সাতপুকুর। সেখানে এ্যাটর্ণী হেমচন্দ্র দের বাড়ি। তাঁর মেয়েকে গান শেখাবার ব্যবস্থা করে দিলেন অনাথেরই এক আত্মীয়। বাংলা গান শেখাতে হবে। বিশেষ রবীন্দ্রনাথের গান। সেজন্যে অনেক রবীন্দ্র-সঙ্গীত সে সঞ্চয় করে নিয়েছে এরই মধ্যে। এই গান শেখাবার কাজ তার নিজেরই স্বাধীন জীবনের—একান্ত সঙ্গীতচর্চারই প্রস্তুতি-পর্ব। সেজন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা তার ছিল।

এমনিভাবে, ভবিষ্যৎ সঙ্গীত জীবনের আশায় বরানগরে অনাথের নতুন কলকাতাবাস আরম্ভ হল। সেখান থেকেই শেঠ দুলিচাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তার। শেঠজীর দমদমার বাগানবাড়ি তখন কলকাতার একটি শ্রেষ্ঠ আসর। বড় বড় ওস্তাদদের সেখানে মহ্‌ফিল হত। সে বাড়িতে তারাবাইয়ের মেয়েকেও বাংলা গান শেখাবার কাজ পেলে অনাথ। তার নিজেরই বয়স তখন ১৬।১৭ বছর মাত্র। কিন্তু বাংলা গানের শিক্ষক বলে অভিভাবকদের আস্থা সে অর্জন করেছিল।

গান শেখাবার সঙ্গে, ওখানে সেখানে বাংলা গান শোনানোও চলত তার। আর এবারেও তার গানে মুগ্ধ হয়ে একজন তার শেখবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তা হল, বরানগরে মাস কয়েক থাকবার পরের কথা।

অনাথের এক মামাত ভগ্নীপতি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি হাওড়ার সাঁতরাগাছি নিবাসী এবং বিপ্লবী দলভুক্ত। বলে রাখা যায়, বীরেন্দ্রনাথের পিসতুত ভগিনী হলেন শ্রীমতী মৃণালিনী, শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রী। বীরেন্দ্রনাথের ভাই অনাথের গান শুনে তার এই সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ করে দেন। শিবপুরের বিখ্যাত গায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্তের কাছে অনাথের গান শেখা আরম্ভ হয় এবার।

অঘোরনাথ চক্রবর্তী ও রমজান খাঁর শিষ্য নিকুঞ্জবিহারী দত্ত ধ্রুপদ এবং টপ্পা গায়ক। তাঁর কাছে অনাথের প্রায় আড়াই বছর শেখা হল। সে সময় বরানগর ছেড়ে তিনি হয়েছিলেন শিবপুর নিবাসী।

নিকুঞ্জবিহারীর কাছে শিক্ষার পর শিবপুরের পাট অনাথ তুলে দিলেন। চলে এলেন কলকাতায়। আবার এক যোগাযোগে নতুন শিক্ষা জীবন আরম্ভ হল। গুরুরূপে পেলেন ওস্তাদ লছমীপ্রসাদ মিশ্রকে। এই শিক্ষাপর্বই তাঁর সঙ্গীতজীবনকে গড়ে তুললে। একাদিক্রমে ৭।৮ বছর তিনি পান লছমী ওস্তাদের তালিম। গান এবং তবলায়। এই সাত আট বছরের মধ্যেই তিনি ছোটে খাঁ, আমীর খাঁ ও গৌরীশংকর মিশ্রকেও ঘনিষ্ঠভাবে পেতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই গায়ক এবং তবলাবাদক বলেও প্রতিষ্ঠা পেতে থাকেন কলকাতায়। আর তখন থেকেই গানের আসরে অর্ধনারীশ্বর। বাইজীর গলায় ঠুংরী আর স্বাভাবিক পুরুষ কণ্ঠে খেয়াল গাইতে থাকেন। এই নকল মিহি গলায় গান আরম্ভ করেন তখনকার সুপরিচিত হেম সেন ও পিয়ারা সাহেবকে দেখে। তবে তাঁরা শুধু মেয়েলি গলাতেই গাইতেন। অনাথবাবু শোনাতে লাগলেন দু কণ্ঠের গান, পর পর একই আসরে আরো আশ্চর্য লাগির সময় এক গানের মধ্যেই মিহি দানা ও মোটা দানা কাজ দেখাতেন। তাঁর তাবৎ আসরে। শুধু কলকাতায় নয়, বাংলার বাইরেও এই পর্ব থেকেই তাঁর অভিযানের সূত্রপাত। লছমী ওস্তাদের কাছে তালিম নেবার শেষ দিকেই অনাথের সেই বড়বাজারের আসর। আর সেখানেই রায়গড়ের রাজা চক্রধর সিংহের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। মহারাজা চক্রধর তাঁর গান শুনেই তাঁকে দরবারে নিযুক্ত করে নিলেন।

'সামনের ভাদ্র মাসে আমার দরবারে গণেশ চতুর্থী উৎসব। আপনি তখনি চলে আসুন রায়গড়ে।'

মহারাজা চক্রধরের সেই সাদর আবেদনে তিনি সাড়া দিলেন। ওস্তাদ ছোটে খাঁকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন রায়গড়ে। বাংলার বাইরে এই প্রথম বড় রকমের স্বীকৃতি পেলেন।

রায়গড়ে দরবারে প্রথম থেকেই গুণপনা দেখালেন অনাথনাথ। বারাণসীর প্রসিদ্ধা গায়িকা বিদ্যাধরী বাইয়ের পরই তাঁকে গাইতে হল। কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ হলেন না তিনি। সেই দ্বৈতহন্ঠে খেয়াল ও ঠুংরি শুনিয়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করে দিলেন। রায়গড় দরবারেই বিকাশের পথ পেলে তাঁর প্রতিভা।

তারপর থেকেই আরম্ভ হল তাঁর জয়যাত্রা। সর্বত্রই সেই দুটি বিপরীত কণ্ঠের সঙ্গীতে আসরে আসরে সাড়া জাগানো। সঙ্গীতজগতে এক অভিনব ব্যাপার ঘটল তাঁকে কেন্দ্র করে।

রায়গড় দরবারে থাকবার সময়েই প্রথম বোম্বাই গেলেন স্বামী নির্মলানন্দের আহ্বানে। বোম্বাইতে কটি ঘরোয়া আসরে ও একটি প্রকাশ্য সভায় স্বীকৃতি পেলেন। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি পত্রিকার উপাধি লাভ করলেন—বাংলার বুলবুল।

(ক্রমশঃ)

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

নীলপাতার আগুনে

সরোজ সেন

চার-পাঁচখানা গ্রাম ঘুরে শম্ভু বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বয়েস তো হচ্ছে তার। তবে বয়সের তুলনায় বার্ধক্যের ছায়া শরীরে যেন বড়ো বেশী করে পড়েছে। চোখের জ্যোতি কমেছে, গায়ের চামড়া কুঁচকেছে, ক্রোশখানেক হাঁটার পর পাগুলো যেন আর নিজের বশে থাকে না।

জ্যৈষ্ঠের প্রখর রোদ। ধু ধু করছে মাঠ —আর মাকড়সার সুতোর মত ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শেষ আর হয় না। শম্ভুর কাঁধ আর ঘাড়ের নীচে চাপানো দুপাশে ঝাঁপী সমেত বাঁকটা চেপে বসেছে। ঝাঁপিগুলোর ভার-সাম্য বজায় থাকায় বাঁকটাকে কোন রকমে বয়ে নিয়ে চলেছে সে।

সকাল বেলায় বাড়ী থেকে বেরুনোর সাবিত্রীর ব্যবহার যে কেন আজকাল ওরকম হয়, বুঝতে পারে না। ঘুম থেকে উঠে একটু নেশা না করলে শম্ভুর চলে না—আর নেশাই বা এমন কি? ছোট কলকেতে সামান্য দু-চারটে টান। এতে তার শরীর মন সারা-দিন বেশ মেজাজে থাকে। সাবিত্রী তা ভালই জানে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আজ সকালে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন সাবিত্রীর দেখা নেই, এমন কি বাড়িতে আছে কি না, বোঝা যায় না, তখন শম্ভু বেশ রাগের বশেই চীৎকার করে ডেকেছিল,—এই সাবি, সাত-সকালে আবার পিরীত করতে গেলি না কি? কলকেটা সাজিয়ে দেবে তোর কোন্ বাপ রে?

হঠাৎ [illegible] দিয়ে ধূমকেতুর মত [illegible] রণ-

ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল সে, ভদ্দর লোকের মত কথা কইতে পার না, এ ছোটলোকের স্বভাব যাবে কবে? ইতর—।

কি! সামান্য একটা মেয়ের এতবড় স্পর্ধা! জোয়ান বয়েসী মেয়ের দেমাক শম্ভু সহ্য করে না কোনদিন। গলা চড়িয়ে বলল, আমি বেদে, আমি ছোটলোক বটে। তুই ভারি ভদ্দরনোক রে। তবু যদি চন্দনা বাগ্দীর বিটি না হতিস।

মায়ের নাম উল্লেখে, আর সম্ভবত একটা প্রচ্ছন্ন কদর্য ইঙ্গিতে সাবিত্রীও ধৈর্য রাখতে পারে না। হাতে ছিল মাজা লোহার কড়াইটা। চোখের পলকে শম্ভুর মাথা লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে দিল সে। শয়তান—মাকে নিয়ে টানাটানি করিস? বুড়ো চান্নার

আবার বাপের সোহাগ জানাতে আসে? আমার মা তোর ভাত খেয়েছে কোনদিন—

আঘাতটাকে এড়াবার জন্যে খুব তাড়াতাড়ি সরে না গেলে মাথাটা হয়ত ফেটেই যেত শম্ভুর।

আঘাতটা সামলে নেবার পর দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে শম্ভু। তার জাত-বেদের নগ্ন চেহারাটা মুখের কথায় প্রকট হয়ে পড়ে,—কে তোকে বাপের সোহাগ জানায়—ধিংগী, জানিস না কে তোর বাপ? চন্দনা বাগ্দী কার ঘরে তোকে পয়দা করেছে—মায়ের ব্যবসা তো তুইও ধরেচিস্—

রুদ্ধ আক্রোশে আর নিস্ফল ক্রোধে হাঁপিয়ে উঠেছিল শম্ভু। বুকটা কামারের হাঁপরের মত ওঠানামা করছে। কলজেটা বোধ হয় ফেটে যাবে। এদিকে চীৎকারের নেশাটা তাকে চেপে ধরেছে। তাই যে কথাটা ক'দিন ধরে মনে চেপে রেখেছিল, এক দমকায় সেটা বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে। তুই ভাবিস আমি কিছু দেখি না। ফের যদি রেতের আঁধারে রূপলালকে আসতে দেখি আর ঐ ছুতলায় সোহাগ চলে—তোদের দুটোকেই কাল দিয়ে খাওয়াব। কথাটা শেষ করেই রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এসেছিল শম্ভু নেশার আশা ছেড়ে। আসলে আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে সাহস করে নি সে। মেয়েটার শরীর যেন লোহার মত শক্ত। দু হাতে যদি সেবারের মত গলা টিপে ধরে তবে তার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

অনেকটা রাস্তা প্রচণ্ড রোদে একটানা হাঁটার ফলে শম্ভুর কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে গালের উপর দিয়ে পড়ছে। চড়া রোদে মুখের ও গায়ের চামড়া যেন জ্বলে যাচ্ছে। গামছা দিয়ে মুছতে গেলে জ্বালা জ্বালা করছে। ঐ অশত্থ গাছটার তলায় একটু বসে নেবে নাকি? ভাবলে শম্ভু। সকাল থেকে পেটে একফোঁটা জলও পড়েনি। খেলা দেখিয়ে আজ বিশেষ কিছু রোজগারও হয়নি।

শম্ভু ভাবল, দেশের লোকগুলোও যেন কেমন হয়ে গেছে। কেউ আর এখন এসব খেলা দেখতে চায় না। যদিও বা খেলার কাছে প্রথম দিকে একটু ভিড় হয়, কিন্তু পয়সা চাইলেই ভিড় পাতলা হয়ে যায়। এভাবে আর চলে না। গোটা দেশটাই যেখানে পালটে যাচ্ছে, সেখানে তার জাত-ব্যবসা আর ধরে রেখে লাভ কি?

শম্ভুর মনে পড়ে, এই তো সেদিনের কথা। যখন চন্দনা তার ঘর করতে আসে। অনেক দিনের নিঃসংগ জীবনে জোয়ার এনে দিয়েছিল চন্দনা। সে বলত, তুমি বাইরে বাইরে খেলা দেখিয়ে পয়সা কামিয়ে আনবে, আর আমি তোমার ঘরবাড়ি সোনার করে রাখব।

সত্যি, চন্দনার হাতে যেন যাদু ছিল। ক'দিনের মধ্যেই বাড়ীটাকে রথ বানিয়ে দিয়েছিল। বাড়ীতে ফুলগাছ শবজীগাছ—কিছু বাদ রাখেনি করতে। চন্দনা তার ঘরে আসার পর প্রথম প্রথম স্যাঙ্গাতরা বলত, শম্ভু, ও মেয়েকে এই বয়েসে ঘর করতে নিলি, কদিন থাকবে? ও তো ওড়া পাখী, খাঁচায় জায়গা হবে কেন?

মুখে কিছু বলত না শম্ভু। মনে মনে আওড়াতো, হিংসে হিংসে—সব শালার হিংসে হচ্ছে। শালাদের বৌগুলো তো কাঠের পাটা বুক পেট এক।

সত্যি, গর্ব ছিল বটে তার চন্দনার স্বাস্থ্য আর শরীরের গঠনের জন্য। চেয়ে দেখার মতন।

অন্যমনস্ক হয়ে চলছিল শম্ভু। চলতি রাস্তার মাঝ বরাবর, এক জমি থেকে আর এক জমিতে জল যাবার জন্যে রাস্তার খানিকটা কেটে রেখেছে চাষীরা। সেখানে একটা হোঁচট খেল সে। মুখ থেকে ফসকে একটা গালাগাল বেরিয়ে এলো। অশত্থ গাছের নীচে বসার আশা ছেড়ে দিয়ে কাঁধের বাঁকটা পালটে নিয়ে চলতে সুরু করল সে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ল শম্ভুর। সেই চন্দনাও একদিন হারিয়ে গেল—পাড়াপড়শীর কথাই ফলে গেল। চন্দনা একদিন বলেছিল, তুমি তো দিনভোর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াও। বিকেল বেলা কলবাবুর বাগানে কাজ করলে রেতের খাবার দেবে আর মাসে দশ টাকা। যাব?

পঁয়ত্রিশ বছরেও প্রেমের রঙ্গীন নেশা শম্ভুর কাটেনি। চন্দনাকে বিশ্বাস করা না করার কথা ভাবেই নি সে। এক কথায় রাজী হয়েছিল। প্রথম প্রথম সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসত চন্দনা। পরে এক সময়ে গিয়ে রাতের খাবার নিয়ে আসত। কিন্তু কিছুদিন পরে বাগানের কাজ হঠাৎ বেড়ে গেল। কলবাবু নিজেই বাগানের তদারকী করতে লাগলেন। কাজেই চন্দনার বাড়ি ফিরতে ক্রমশঃই রাত বেশী হতে লাগল।

হাজার হোক পুরুষ মানুষ শম্ভু। মাঝে মাঝে বলত, চন্দনা, সাঁঝবেলায় ঘরে ফিরবি। সারাদিন ঘুরে ঘুরে এসে ঘরের মেয়েছেলেকে না দেখলে মেজাজ খারাপ হয়। সে কথায় অদ্ভুত জবাব দিয়েছিল চন্দনা, ভাল লাগেনি শম্ভুর।

কি আমার মরদ রে, সারাদিন ঘুরে ঘুরে রাগী করেছে আমায়। বলি, রেতে খাবার যে দুজনের জন্যে আসে সে খবর রাখো?

খবর সবই রাখত শম্ভু। না রাখত না, পেত। পড়শীরাই তার কাছে বেশী করে পৌঁছে দিত। রাতের দিকে বাগানের কাজ মালীর জন্যে তৈরী ঘরের মধ্যেই হোত বেশী।

হঠাৎ একদিন দেখলো শম্ভু, চন্দনা নেশা করে এসেছে। বাগ্দীর মেয়ে বটে চন্দনা কিন্তু নেশা ভাংটা এতদিন করেনি। তাই শম্ভু ধমকে উঠেছিল তাকে, চন্দনা, নেশা করলে কে?

চৌকির ওপরে শুয়ে পড়ে জড়িয়ে জড়িয়ে জবাব দিয়েছিল চন্দনা—নেশা তই করিস না আধবুড়ো? ঘুম থেকে উঠে গাঁজায় দম দিস্ না?

রাগে দিশেহারা হয়ে চন্দনার কোমরে এক লাথি মেরে চৌকি থেকে ফেলে দিয়েছিল শম্ভু। বলেছিল, শালার এই মেয়েমানুষ জাতটাই নিমকহারাম। লাথি মারি এই মেয়েজাতের মুখে।

ঘর থেকে বেরিয়ে সারা রাত বাইরে পড়েছিল শম্ভু সে রাত্রে। অবশ্য এই ব্যাপারটা বেশিদিন চলেনি। ক'দিন পর থেকে চন্দনা নিজেই ঘরে ফেরা বন্ধ করে দিয়েছিল।

পড়শীদের টাট্টা আর নিজের মনের চাপা রাগ শম্ভুকে শেষ পর্যন্ত গ্রামছাড়া করেছিল। অনেকদিন যাবৎ যাযাবরের জীবন কাটিয়ে ফের গ্রামে ফিরে এসে ক'বছর ধরে বাস করছিল। চন্দনার সংগে আর কখনও সামনাসামনি দেখা হবে, ভাবেনি সে। কত-গুলো বছর যে কেটে গেল তার হিসেব আর কে রাখে? চন্দনার ব্যবহারটা মাঝে মাঝে কাঁটার মত মনে খচখচ করলেও মোটামুটি নিরুপদ্রবেই কাট ছিল শম্ভুর জীবন।

মাঠটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর মাত্র পোয়া দেড়েক পথ রয়েছে। কিন্তু আর সে পারছে না হাঁটতে। এবারে ওকে একটু বসতে হবেই। পাশের ডাঙ্গাটায় উঠে কতক-গুলো বুনো গাছের ছায়ায় বসল সে।

তার মনে পড়ল সেই রাতটার কথা। খুব গরম পড়েছিল। দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে নিজেই জানে না। তখন কত রাত হবে কে জানে। একটা ছোট ধাক্কা আর ফিসফিস গলার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আধার রাতেরও একটা নিজের আলো থাকে। সেই আলোয় শম্ভু দেখলো, সামনে চন্দনা দাঁড়িয়ে, সংগে একটা মেয়ে, বছর দশেকের হবে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল সে তাদের দেখে।

—কে, চন্দনা? তুই এখানে? কোত্থেকে?

মুখের উপর নিজের হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিল চন্দনা, —আমি কত পাপ

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

রেজিষ্ট্রি বিবাহ
অফিস
মোট ১৬ টাকায় রেজিস্ট্রি বিবাহ
এন কে ঘোষ, জে-পি
ম্যারেজ অফিসার
১১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলি-৯, ফোন : ৩৫-৩০৪৮

করেছি গো—সেই পাপে মরে গেইচি-শ্যাষ হয়ে গেছি—তুমি এই মেয়েটাকে বাঁচাও।

শম্ভু হতবাক হয়ে বলেছিল,—কার মেয়ে? আমি কি করব?

আমার মেয়ে গো—আমার প্যাটের মেয়ে। তোমার কাছে পালিয়ে নিয়ে এসেছি—লয়লে রাক্কোশগুলো ওকে খেয়ে ফেলবে, আর দুদিন বাদে যেমন আমাকে মেরেছে—ওগো পুরুষজাতটাই হারামী, রাক্কোশ। আমায় কথা দাও, আমার সাবিত্রীকে তুমি পুরুষের হ্যাংলা নজর থেকে বাঁচাবে।

কি বলছে চন্দনা! শম্ভুতো জানে মেয়ে-জাতটাই লোভী, নিমকহারাম।

চন্দনা নিজের কদর্য জীবনের কাহিনী বলে শম্ভুর কাছ থেকে কথা আদায় করলে যে, সে সাবিত্রীকে পুরুষের হাত থেকে সরিয়ে রাখবে। তারপর যে অন্ধকার থেকে এসেছিল সেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বহুদিন পর্যন্ত ঘটনাটা শম্ভুর কাছে স্বপ্ন বলে মনে হোত। কিন্তু সাবিত্রী রয়েছে তার কাছে। তার এখন মনে পড়ে, কি ভাবে লোকের কাছে দিনের পর দিন সাবিত্রীর জন্যে কৈফিয়ৎ দিয়েছে আর কি ভাবে দিনের পর দিন পুরুষের নজর থেকে তাকে আড়াল করে রেখেছে। তার পরও তো কত বছর কেটে গেল। কিন্তু বেশ কিছুদিন হল সাবিত্রী নিজেই যেন কি রকম হয়ে গেছে। ঐ রূপলাল ছোঁড়াটা আজ এক বছর ধরে সময়ে অসময়ে সাবিত্রীর কাছে ঘুর ঘুর করছে। সাবিত্রীকে কিছুতেই ঠেকান যাচ্ছে না। কতদিন রাত্রে শম্ভু চন্দনার সঙ্গে যেন কথা বলেছে,—দেখ চন্দনা, আমার দোষ নেই। তোর মেয়ে যদি ঠিক না থাকে আমি কি করব। আমি তো জানি, এখনও দেখছি, মেয়ে জাতটাই বদমাস, ওরাই শয়তানী। আর তুই বলে গেলি সব পুরুষই শয়তান, রাক্কোস।

আর ভাবতে পারছে না শম্ভু। সাবিত্রী যা কিছু করুক, তাকে কিছু আর বলবে না সে। তার জীবনে আর কটা দিন। মনটাকে ঠাণ্ডা করে আবার চলতে সুরু করল সে।

বাড়ীতে ঢুকে সকালের ব্যাপারটাকে সহজ করে ফেলবার জন্যে কথায় একটু আদর মিশিয়ে ডাকলো শম্ভু,—ওরে সাবি, সাবিত্রী কোথায় রে, একটু জল দে মা। ঘরের ভেতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো সাবিত্রী। মুখের ভাবটা থমথমে। যেন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। শম্ভু জিজ্ঞেস করলো,—কি রে, কথা বলছিস না যে?

—কথা আর কি বলবে রে, বুড়া—আমরা চলে যাচ্ছি। বলতে বলতে রূপলাল বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

মাথার মধ্যে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল শম্ভুর। সাবিত্রীর সঙ্গে আপোষ করার ভারটা এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। বেদের স্বভাবজাত চেহারাটা ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে। হাতের পেশী, মুখের চেয়াল যথাসম্ভব শক্ত হোল। কিন্তু রূপলাল শান্ত। যেন কিছুই হয়নি এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে সাবিত্রীর হাত ধরে পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

এবার গর্জে উঠল শম্ভু,—রূপলাল শয়তান— তোকে আমি খুন করব। সাবিত্রী, এখনও ফের বলছি।

একটা বিদ্রূপের হাসি হাসল রূপলাল, চল্ চল্ সাবি, বুড়ার মাথা খারাপ হইচে।

আর সহ্য করতে পারল না শম্ভু। কাণ্ড-জ্ঞানহীন অবস্থায় মুহূর্তে সে সবচেয়ে তলার ঝাঁপিটা খুলে ফেলল। সদ্য ধরা চন্দ্রবোড়ার বাচ্চাটাকে চোখের পলকে টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র কুশলী হাতে রূপলালের দিকে ছুঁড়ে মারল সে। রূপলাল যেন তৈরী হয়েই ছিল। চকিতে সাবিত্রীকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে সরে দাঁড়াল। শম্ভুর ছুঁড়ে মারা কালসাপটা ঘরের ফাটা বাঁশের দেয়ালে ধাক্কা লেগে তীব্র আঘাত খেল। ফলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সেটা। ততক্ষণে শম্ভুও ছুটে এসেছে রূপলালের দিকে। কিন্তু উত্তেজনার ফলে শরীরের টাল রাখতে পারল না, একটা হোঁচট খেয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল সে। আর তখনি আঘাতের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত সর্পটাও লাফিয়ে পড়ল তার গায়ের ওপর। তীব্র বেগে সমস্ত আক্রোশটা তরল আকারে ঢেলে দিল তার কণ্ঠনালীর ওপর। রূপলাল আর সাবিত্রী তখন দরজা পার হয়ে গেছে।

তীব্র বিষের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে শম্ভু বললে, চন্দনা, তুই ঠিক বলেছিস। সব শালা হারামী। সব শা... নেমকহারাম। মেয়েজাতও যেমন, পুরুষ জাতও তেমনি। দু পেয়ে মানুষ জাতটাই শয়তান।

ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছে শম্ভুর শরীর। নীল হয়ে উঠছে তার দেহ। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সে উঠোনের গাছটার দিকে। একি, গাছের সবুজ পাতা-গুলো নীল কেন? গাছের তলায় ঝরাপাতা-গুলোর দিকে শেষবারের মত ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখছে সে। সব নীল—নীল-নীল যেন সব জায়গায় নীলের পসরা।

সেই নীলের মাঝে শম্ভুর ক্রমশ নীল—হয়ে আসা দেহটা নিথর হয়ে পড়ে রইল।

সতীশচন্দ্র প্রসঙ্গে

ফণীন্দ্র নারায়ণ দত্ত

পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক ও প্রভাবের ফলে বাংলা তথা সারা ভরত যখন মোহাচ্ছন্ন সেই অবসরে ইংরাজ ধর্মযাজক ও প্রচারকরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শুভাগমন করে বাংলায় প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

প্রচারক ও ধর্মযাজকরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার আপাতমধুর আলোক-পাতের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা কুসংস্কার ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি নানা সামাজিক দুর্নীতির মূলে তীব্র কুঠার হানার ফলে বাংলার যুব সম্প্রদায় ও জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে এবং এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তারই প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় ধর্ম দর্শন ও সাহিত্যে রুচি হারিয়ে পরধর্ম ও শিক্ষায় অনুরাগ বৃদ্ধি লক্ষ্য করে ইংরাজ শাসকরা প্রচারের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

ইংরাজ শাসক সম্প্রদায় শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের শাসন ব্যবস্থায় নির্বিচারে উৎপাড়ন আরম্ভ করে। কঠোর দমন নীতি ক্রমশ ব্যাপক হয়ে শেষে ঢাকা ময়মনসিং বরিশাল প্রভৃতি তৎকালীন পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায় নিরীহ ছাত্রদের ওপর যখন অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করে তখন বাংলায় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার একান্ত আবশ্যকতা অনুভূত হয়। বাংলা সমাজের এইরূপ ভয়াবহ পতনোন্মুখ অবস্থা পর্যালোচনা করে দেশের মনীষী ও নেতারা সজাগ হয়ে ওঠেন। মহর্ষী দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর বীরভূম জেলায় বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজা রামমোহন রায় অ্যাংলো-বেঙ্গলী ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন এবং খৃস্টধর্ম প্রচারের প্রবল প্রবাহ রোধ করে পুনরায় জাতিকে স্বধর্মানুরাগী করবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন।

সে সময় পূর্ববঙ্গ ও আসামের চীফ সেক্রেটারী মিঃ পি সি লায়ন দুটি কঠোর আদেশ প্রচার করলে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় ও অপরাপর সংবাদ-পত্রে তার তীব্র সমালোচনা করা হয়। বাংলার নগর ও পল্লীর ছাত্রদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে লাগাতর ধর্মঘট ও আন্দোলন শুরু করলে শ্রীআশুতোষ চৌধুরী মহাশয় ১৯০৫ খৃঃ ১৪ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন সম্বন্ধে এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে একটি ঐতিহাসিক ফতোয়া প্রকাশ করেন। তাতে তিনি নেতাদের বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন গৃহে সমবেত হয়ে দেশের বর্তমান অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করার পূর্বে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হতে আহ্বান করেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯০৫ খৃঃ ১৬ ডিসেম্বর একটি শিক্ষা সম্মিলনী অধিবেশন হয় এবং রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন। এই সভা... হাইকোর্টের বিচারপতি সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আশুতোষ চৌধুরী রাস-বিহারী ঘোষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারকনাথ

পালিত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী চিত্তরঞ্জন দাশ আবদুল রশুল নীলরতন সরকার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হেরম্বচন্দ্র মৈত্র নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ক্ষুদিরাম বসু গিরীশচন্দ্র বসু লালমোহন ঘোষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপিনচন্দ্র পাল নরেন্দ্রনাথ সেন মতিলাল ঘোষ (সম্পাদক অমৃতবাজার পত্রিকা) রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এবং মনোমোহন ভট্টাচার্য প্রমুখ বাংলার প্রায় সমস্ত স্বনামধন্য নেতা ও মনীষী যোগদান করেন। এই সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দুটি প্রস্তাব রাখেন তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ সভায় জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ১৯০৬ খৃঃ ১৪ আগষ্ট বাংলার জাতীয় কলেজ স্থাপিত হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপায়ণ সম্বন্ধে বিবিধ চিন্তাশীল বিদ্যাবিদরা তাঁদের স্ব স্ব সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রস্তাব ওয়েজ অ্যান্ড মীনস কমিটিতে রাখেন। আচার্য সতীশচন্দ্র একটি মৌলিক পরিকল্পনা ডন সোসাইটিতে প্রকাশ করেন।

বেংগল ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকে তার সংগঠন, পরিচালনা, শিক্ষা ও আয়-ব্যয় যাবতীয় বিষয়ের ভার গ্রহণ করার পর সতীশচন্দ্র কিভাবে তা সংগঠিত ও সুসম্বদ্ধ করেছিলেন এবং কতদূর সুচারুরূপে পরিচালনা করেছিলেন তারই সংক্ষেপে কিছু আভাস দেব।

বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৯০৬—১১ মার্চ) নিয়মিততাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর বেংগল ন্যাশনাল কলেজের পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করা হয় তাতে ছাত্রদের সর্ববিষয় সংক্রান্ত পদ্ধতি স্তরে স্তরে প্রবর্তন করা হয়েছিল। বর্তমান যুগোপযোগী ছাত্রদের স্বয়ংনির্ভরশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে কারিগরী শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ ও রাজ্য সরকার কর্তৃক তা শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আচার্য সতীশচন্দ্র তাঁর বহু দিন পূর্বে কারিগরী শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করে বাংলার জাতীয় কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার মধ্যে উক্ত কারিগরী শিক্ষণ বিভাগ খুলেছিলেন। এতে তার মৌলিক চিন্তাধারা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলার জাতীয় কলেজ স্থাপিত হবার পর ঋষি শ্রীঅরবিন্দ অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন এবং আচার্য সতীশচন্দ্র তার সহ-অধ্যক্ষ কর্মসচিব ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

ঐ কলেজের যে সব সাময়িক পরীক্ষা হত তার প্রশ্নকারদের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অংক শাস্ত্রের প্রশ্ন করতেন; বাংলা সাহিত্যের প্রশ্ন করতেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। ইংরাজীর প্রশ্ন করেছিলেন আচার্য সতীশচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষ; দর্শনশাস্ত্রের প্রশ্নকার হাইকোর্টের অ্যাটর্ণী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আবদুল রশুল প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষী ও স্বনামধন্য শিক্ষাবিদরা। অধিকন্তু জাতীয় পরিষদ থেকে সময় সময় আলোকচিত্রসহযোগে বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রদের প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল এবং মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হত। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে যে প্রদর্শনী খোলা হয় তার উদ্বোধন করেন বাংলার স্বনামধন্য দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

১৯০৬ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ঐ পরিষদের উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন জেলায় জাতীয় শিক্ষানিকেতন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অধিবেশনে লোকমান্য বালগংগাধর তিলক, পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় প্রমুখ ভারতের বিশিষ্ট নেতা ও মনীষী জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দৃঢ়তার সংগে বলেন। পরে পাবনায় বাংলার একটি প্রাদেশিক সম্মেলন হয় এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার পৌরোহিত্য করেন।

শ্রীঅরবিন্দর প্রস্তাব শ্রীবেচারাম লাহিড়ী মহাশয় কর্তৃক সমর্থিত হয়। সেই সভায় পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহোদয়ের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভিত্তিস্থাপনকল্পে এক লক্ষ টাকা দানের উল্লেখ করে তাঁকে পরিচয় করে দেন। এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সংগে সংগেই ১৯০৬ খৃঃ সতীশচন্দ্র ডন সোসাইটি স্থাপন করেন। সোসাইটি থেকে একটি উচ্চাংগের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। প্রথমে তা দুভাগে বিভক্ত ছিল বাংলা ও ইংরাজী বিভাগ। পরে ইংরাজীতেই প্রকাশিত হত। পত্রিকার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তা অপরাপর মাসিক পত্রিকার ন্যায় গল্প রাজনৈতিক বিষয় প্রভৃতি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল না—পরন্তু ভারতের জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ভারতীয় চিত্রকলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলা, ভারতীয় সংগীত এবং ঐতিহাসিক তথ্য ও দর্শন প্রভৃতি সকল প্রকার ভারতীয় ভাবধারা সম্বলিত ছিল। ডন সোসাইটির তরফ থেকে সতীশচন্দ্র একটি ভাগবত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁরই বাড়ীতে এর অধিবেশন হত। কর্মসচিব ছিলেন আচার্য সতীশচন্দ্র এবং স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় ছিলেন প্রধান বক্তা কিন্তু পরিচালনার ভার ছিল আচার্য সতীশচন্দ্রের উপর। এই ডন সোসাইটি স্থাপনা ডন মাসিক পত্রিকা ও ভাগবত চতুষ্পাঠী স্থাপনা থেকে তাঁর মৌলিক গঠনমূলক পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগবত চতুষ্পাঠীতে সনাতন হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, উদারতা উচ্চাংগের ভাবধারা প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচিত হত এবং খৃষ্টধর্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে বিমুখ তরলমতি যুবকবৃন্দের স্বধর্মে আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস চালায়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মাত্র বেংগল ন্যাশনাল কলেজই তাঁর শিক্ষাদানের কেন্দ্র ছিল না এবং কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের পাঠ অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করাই প্রকৃত জ্ঞানার্জনের প্রকৃষ্ট প্রণালী নয় পরন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রদের মনে প্রকৃত শিক্ষা বলতে কি বুঝায় তা কেমন করে অর্জন করতে হয়, জাতীয়তাবোধ স্বাধীন চিন্তাশক্তি কল্পনাশক্তি প্রভৃতি আত্মশক্তির বিকাশে প্রয়াস চালাত। আচার্য সতীশচন্দ্রের শিক্ষাদান প্রণালী আদৌ সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর নিত্যসংগী নিষ্ঠাবান ছাত্র মহাত্মা গান্ধীর ভূতপূর্ব সেক্রেটারী শ্রীকৃষ্ণদাস সিংহরায় মহাশয়ের নিকট অবগত হয়েছি তিনি তরলমতি ছাত্রদের তাদের চরিত্র গঠনে এবং স্বাবলম্বী স্বধর্মনিষ্ঠ হতে সচেষ্ট হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের পরিচালনা ও শিক্ষাদান করতেন।

ডন সোসাইটির ছাত্রদের প্রতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপদেশের মধ্যে বলেছেন—'সতীশবাবু যে-সময় ডন সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন তখন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না বা শিক্ষাসম্পর্কীয় এই ন্যাশনাল মুভমেন্ট-এরও তখন সূত্রপাত হয় নাই। এমন দিনে সতীশবাবু দূরের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাইরের উৎসাহ-উত্তেজনার অপেক্ষায় না থাকিয়া মহৎ লক্ষ্য মাত্র সম্বল করিয়া এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। যে-সভা সাময়িক কোন বৃহৎ উত্তেজনা-উদ্দীপনার মুখে তৈয়ার হয় নাই আপনারা সেই সভার আকর্ষণে এখানে মিলেছেন। এতদিন ধীরে ধীরে এর বীজ অংকুরিত হচ্ছিল তখন তা পল্লবিত হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

আপনাদের সোসাইটির কথা এতক্ষণ বলিলাম। আরো একটা কথা বলিব। আজ আমাদের দেশে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের যে-চেষ্টা হইতেছে সতীশবাবু তাহার একটি মুখ্য অবলম্বন। তাঁহার উৎসাহেই ইহা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় বিদ্যালয়ের সংগে ডন সোসাইটি জড়িত রহিয়াছে একথা বলা যায়।'

এই সকল তথ্য থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে বাংলার জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের পথে আচার্য সতীশচন্দ্র ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ।

খেলাধূলা

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

কলকাতার ইডেন উদ্যানে নবনির্মিত 'সুভাষ ইনডোর স্টেডিয়ামে' ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসছে ৬ই ফেব্রুয়ারী। এগারদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা শেষ হবে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতের মাটিতে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর ইতিপূর্বে একবার বসেছিল, ১৯৫২ সালে বোম্বাই শহরে। এবারের প্রতিযোগিতায় পূর্ব ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকা থেকে অন্যান্যবারের তুলনায় বেশীসংখ্যক দেশ যোগদান করেছে। পুরুষ এবং মেয়েদের দলগত বিভাগে ভারতকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে খেলতে হবে। ১৯৭৩ সালের ৩২তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারত পুরুষদের দলগত বভাগে ১৪শ এবং মেয়েদের দলগত বিভাগে ১৭শ স্থান লাভ করেছিল। এবারের প্রতিযোগিতায় পুরুষদের দলগত বিভাগে ভারতের খেলা পড়েছে প্রথম শ্রেণীর 'বি' গ্রুপে। এখানে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী গত বছরের রানার্স-আপ প্রজাতন্ত্রী চীন, জাপান যুগোশ্লাভিয়া হাঙ্গেরী ইংল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া এবং রুমানিয়া। মেয়েদের দলগত বিভাগে ভারত খেলবে প্রথম শ্রেণীর 'এ' গ্রুপে, যেখানে তাদের সঙ্গে খেলবে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া, হাঙ্গেরী রাশিয়া

এম মেডানিয়ানসজাঁক (হাঙ্গেরী) : বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মেয়েদের পক্ষে সর্বাধিক ১৮ বার ব্যক্তিগত খেতাব জয় করেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া সুইডেন ফ্রান্স এবং ইন্দোনেশিয়া।

১৯৭৩ সালের ৩২তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগের চ্যাম্পিয়ান দুটি দেশ এবং দুটি ব্যক্তিগত বিভাগের চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড়দের এ বছরের প্রতিযোগিতার বাছাই তালিকায় এইভাবে শীর্ষস্থান দেওয়া হয়েছে : পুরুষদের দলগত বিভাগে সুইডেন মহিলাদের দলগত বিভাগে প্রজাতন্ত্রী দঃ কোরিয়া, পুরুষদের সিঙ্গলসে শী য়েন-টিং (প্রজাতন্ত্রী চীন) এবং মহিলাদের সিঙ্গলসে হু ইউ-লান (প্রজাতন্ত্রী চীন)।

(খেলার তালিকা)

পুরুষদের দলগত বিভাগ

পুরুষদের দলগত সোয়েথলিং কাপ প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত দেশগুলি অংশ গ্রহণ করবে :

প্রথম শ্রেণী—গ্রুপ 'এ' : সুইডেন (গতবারের চ্যাম্পিয়ান), রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া এবং ডেনমার্ক।

প্রথম শ্রেণী—গ্রুপ বি : প্রজাতন্ত্রী চীন (গতবারের রানার্স-আপ), জাপান যুগোশ্লাভিয়া হাঙ্গেরী ইংল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া ভারত এবং রুমানিয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণী—গ্রুপ 'এ' : আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস গ্রীস নাইজেরিয়া হংকং বেলজিয়াম ইতালী এবং ওয়েলস।

দ্বিতীয় শ্রেণী—গ্রুপ বি : মালয়েশিয়া, পোল্যান্ড ইরান কানাডা সিঙ্গাপুর অস্ট্রেলিয়া ইজরাইল এবং সুইজারল্যান্ড

তৃতীয় শ্রেণী—গ্রুপ 'এ' : ঘানা মেকসিকো, ইউনাইটেড আরব, রিপাবলিক অব ভিয়েৎনাম এবং নেপাল।

তৃতীয় শ্রেণী—গ্রুপ 'বি' : ব্রেজিল, প্রজাতন্ত্রী ইয়েমেন, ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েৎনাম এবং ম্যাকাও।

মহিলাদের দলগত বিভাগ

মহিলাদের দলগত কোবিলোন কাপ প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত দেশগুলি অংশ গ্রহণ করবে :

প্রথম শ্রেণী—গ্রুপ 'এ' : প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া (গতবারের চ্যাম্পিয়ান) হাঙ্গেরী রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া সুইডেন ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারত

ভিক্টর বার্না (হাঙ্গেরী) : বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের পক্ষে সর্বাধিক ১৫ বার ব্যক্তিগত খেতাব জয় করেন।

প্রথম শ্রেণী—গ্রুপ 'বি' : প্রজাতন্ত্রী [illegible] (গতবারের রানার্স-আপ) জাপ[illegible] রুমানিয়া, ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী ইংল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া পোল্যান্ড এবং বুলগেরিয়া

দ্বিতীয় শ্রেণী—গ্রুপ 'এ' : আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া বেলজিয়াম, সিঙ্গাপুর হংকং ডেনমার্ক নেদারল্যান্ডস এবং নাইজেরিয়া

দ্বিতীয় শ্রেণী—গ্রুপ 'বি' : মালয়েশিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, গ্রীস, সুইজারল্যান্ড, লুকসেমবার্গ, ঘানা এবং ব্রেজিল

তৃতীয় শ্রেণী : কেনিয়া ম্যাকাও নেপাল শ্রীলঙ্কা, তাইল্যান্ড, ডেমোক্রাটিক পিপলস রিপাবলিক অব ভিয়েৎনাম রিপাবলিক অব ভিয়েৎনাম চিলি এবং খেমার

বিশ্ব টেবল টেনিস আসর

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯২৬ সালে লণ্ডনে। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় এই ৯টি দেশ যোগদান করেছিল—হাঙ্গেরী, ইংল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ডেনমার্ক জার্মানী ভারত সুইডেন ওয়েলস এবং অস্ট্রিয়া। ১৯২৬-২৭ সালের প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় ছিল পাঁচটি বিভাগের খেলা পরে দুটি বিভাগের খেলা যোগ হয়ে মোট বিভাগীয় খেলা ৭ দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে ৭ বছর খেলার আসর বসেনি। এবং প্রতি বছরের পরিবর্তে ১৯৫৭ সালের পর এক বছর অন্তর প্রতিযোগিতার আসর বসছে।

ইউরোপীয় প্রাধান্যের যুগ

১৯২৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত (মাঝে বিশ্বযুদ্ধের জন্য ৭ বছর [illegible] একটানা ১৮টি প্রতিযোগিতায় ইউরোপে[illegible] অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিরাট প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের বাইরের

দেশ হিসাবে খেতাব জয়ী হয়েছিল একমাত্র আমেরিকা। আমেরিকার খেতাব জয়—সোয়েথলিং কাপ ১ বার কোর্বিলোন কাপ ১ বার মেয়েদের সিঙ্গলস ১ বার, পুরুষদের ডাবলস ৩ বার এবং মিক্সড ডাবলস ২ বার।

এশিয়ান প্রাধান্যের যুগ

১৯৫২ সালে ১৯তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের চারটি খেতাব জয়ের সূত্রেই এশিয়ান প্রাধান্য যুগের শুভ সূচনা। ১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ে আয়োজিত ১৯তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান তার প্রথম যোগদানের বছরেই এই চারটি খেতাব জয়ী হয়—কোর্বিলোন কাপ, পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মেয়েদের ডাবলস। ১৯৫২ সাল থেকে এপর্যন্ত বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ১৪টি আসর বসেছে। এই সময়ের মধ্যে জাপান রাজনৈতিক কারণে ১৯৫৩ সালের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেনি। জাপান ১৩টি আসরে যোগদান করে মোট ৯১টি খেতাবের মধ্যে ৪৫টি খেতাব জয়ী হয়—সোয়েথলিং কাপ ৭ বার, কোর্বিলোন কাপ ৮ বার, পুরুষদের সিঙ্গলস ৭ বার মেয়েদের সিঙ্গলস ৭ বার পুরুষদের ডাবলস ৪ বার, মেয়েদের ডাবলস ৫ বার (রুমানিয়ার সঙ্গে একবার যুগ্ম-বিজয়ী) এবং মিক্সড ডাবলস ৭ বার। এশিয়া মহাদেশের পক্ষে মাত্র দুটি দেশ—জাপান এবং প্রজাতন্ত্রী চীন বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে খেতাব জয়ী হয়েছে। চীন এই প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণ করে ১৯৫৯ সালে। তারা এপর্যন্ত ৬টি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ১৯টি খেতাব জয়ী হয়েছে—সোয়েথলিং কাপ ৪ বার কোর্বিলোন কাপ ৩ বার পুরুষদের সিঙ্গলস ৫ বার মেয়েদের সিঙ্গলস ৩ বার পুরুষদের ডাবলস ২ বার মেয়েদের ডাবলস ২ বার এবং মিকসড ডাবলস ২ বার। জাপান ১৩টি আসরে যোগদানের সূত্রে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড করেছে, যা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

১৯৫২ সালে বিশ্ব টেবল টেনিসের আসরে ইউরোপীয় প্রাধান্যের যুগে জাপান বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় তাদের প্রথম যোগদানের বছরেই চারটি খেতাব জয়ের সূত্রে দারুণ বিস্ময় এবং আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জাপানের এই বিরাট সাফল্যে ইউরোপের টেবল টেনিস মহলের অনেক পণ্ডিতই অবজ্ঞাভরে খুব উঁচু গলায় বলেছিলেন এটা বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার ব্যাপার। জাপানের টেবল টেনিস খেলা সম্পর্কে তাঁদের সে-সময়ের ধারণা যে কত ভুল তা জাপান তাদের পরবর্তীকালের বিরাট সাফল্যের সূত্রে প্রমাণ করে দিয়েছে। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে এখন জাঁকিয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে এশিয়া মহাদেশের দুই দেশ—জাপান এবং চীন।

চুয়াং সে-তুং (চীন) বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি তিন বার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয় করেন।

বিবিধ রেকর্ড

সর্বাধিক দলগত জয়

সোয়েথলিং কাপ (পুরুষ বিভাগ) :
১১ বার—হাঙ্গেরী। হাঙ্গেরীর শেষ সোয়েথলিং কাপ জয় ১৯৫২ সালে।

কোর্বিলোন কাপ (মহিলা বিভাগ) :
৮ বার—জাপান। জাপানের শেষ কোর্বিলোন কাপ জয় ১৯৭১ সালে।

ব্যক্তিগত বিভাগের রেকর্ড
সর্বাধিক জয়

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৫ বার—ভিকটর বার্ণা (হাঙ্গেরী)—১৯৩০, ১৯৩১-৩৫
মেয়েদের সিঙ্গলস : ৬ বার—এঞ্জেলিকা রোজিনু (রুমানিয়া)—১৯৫০ থেকে ১৯৫৫
পুরুষদের ডাবলস : ৮ বার—ভিকটর বার্ণা (হাঙ্গেরী)। বার্ণা তিনজনের সহযোগিতায় এই রেকর্ড করেন (১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ এবং ১৯৩৯)
মেয়েদের ডাবলস : ৭ বার—কুমারী এম মেডনিয়ানসজকি (হাঙ্গেরী)। তিনজনের সহযোগিতায় এই রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯২৮, ১৯৩০-৩৫)

মিকসড ডাবলস

পুরুষদের পক্ষে : ৪ বার—এফ সিডো (হাঙ্গেরী)। দুজনের সহযোগিতায় এই রেকর্ড হয় (১৯৪৯-৫০, ১৯৫২-৫৩)
মেয়েদের পক্ষে : ৬ বার—এম মেডনিয়ানসজকি (হাঙ্গেরী)। তিনজনের সহযোগিতায় এই রেকর্ড হয় (১৯২৭-২৮, ১৯৩০-৩১, ১৯৩৩-৩৪)

সর্বাধিক মোট ব্যক্তিগত খেতাব জয়

মেয়েদের পক্ষে : ১৮ বার—এম মেডনিয়ানসজকি (হাঙ্গেরী)
পুরুষদের পক্ষে : ১৫ বার—ভিকটর বার্ণা (হাঙ্গেরী)

উপর্যুপরি সর্বাধিক জয়
ব্যক্তিগত খেতাব

মেয়েদের সিঙ্গলস : ৬ বার (১৯৫০-৫৫) —এঞ্জেলিকা রোজিনু (রুমানিয়া)
পুরুষদের সিঙ্গলস :—
৪ বার (১৯৩২-৩৫)—ভিকটর বার্ণা (হাঙ্গেরী) ৩ বার (১৯৬১, ১৯৬৩ ও ১৯৬৫)—চুয়াং সে-তুং (প্রজাতন্ত্রী চীন)

দলগত খেতাব

সোয়েথলিং কাপ (পুরুষ বিভাগ) :
৫ বার—হাঙ্গেরী (১৯২৭-৩১)
৫ বার—জাপান (১৯৫৪-৫৭ ও ১৯৫৯)
কোর্বিলোন কাপ (মহিলা বিভাগ)
৪ বার—জাপান (১৯৫৭, ১৯৫৯ ১৯৬১ ও ১৯৬৩)
একই বছরে সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ জয়
৪ বার—জাপান (১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৫৯ ও ১৯৬৭)
১ বার—আমেরিকা (১৯৩৭)
১ বার—প্রজাতন্ত্রী চীন (১৯৬৫)
একই আসরে সর্বাধিক খেতাব জয়
৬টি—জাপান (১৯৫৯ ও ১৯৬৭)

১৯৫৯ সালে জাপান সোয়েথলিং কাপ, কোর্বিলোন কাপ, মেয়েদের সিঙ্গলস ও ডাবলস; পুরুষদের ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ী হয়।

১৯৬৭ সালে জাপান সোয়েথলিং কাপ, কোর্বিলোন কাপ, পুরুষদের সিঙ্গলস, মেয়েদের সিঙ্গলস, মেয়েদের ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ী হয়।

ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল

আমেদাবাদে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল বনাম রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী কর্ণাটক দলের তিনদিনের খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। কর্ণাটক দলের পক্ষে চারজন টেস্ট খেলোয়াড় খেলেছিলেন—প্রসন্ন, বিশ্বনাথ, চন্দ্রশেখর এবং ব্রিজেশ প্যাটেল। এঁদের মধ্যে প্রসন্ন, বিশ্বনাথ এবং চন্দ্রশেখর তৃতীয় এবং চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতকে জয়লাভে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের লয়েড, কালিচরণ এবং অ্যান্ড্রু রবার্টস—এই তিনজন নামকরা খেলোয়াড় এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেননি। খেলায় সেঞ্চুরী করেন দুজন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ডেভিড মারে (১০৩ নট আউট) এবং কর্ণাটকের ব্রিজেশ প্যাটেল (১০৬ নট আউট)। এবারের ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে প্যাটেলের এটা দ্বিতীয় সেঞ্চুরী।

প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৪টে উইকেট পড়ে ৩৭৩ রান দাঁড়ায়। ডেভিড মারে ১০৩ এবং রিচার্ডস ৭৫ রান করে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাট করেনি, প্রথম দিনের ৩৭৩ রানে (৪ উই-

কেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই দিনেই কর্ণাটকের প্রথম ইনিংস ১৮৫ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অস্থায়ী অধিনায়ক ডেরেক মারে কর্ণাটককে 'ফলো-অনে' বাধ্য করেন নি। তারা দ্বিতীয় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ৮৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের ১৫৭ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি ২৬০ মিনিটে কর্ণাটকের জয়লাভের জন্যে ৩৪৬ রানের প্রয়োজন ছিল। এ-কাজ অসম্ভব বলে কর্ণাটক তার চেষ্টা করেনি। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে সুধাকর রাও (৭৯ রান) এবং রিজেশ প্যাটেল ১৫২ মিনিটে দলের ১৭২ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। প্যাটেল ১৫৪ মিনিট খেলে তাঁর ১০৬ রানে ১১টা বাউণ্ডারী এবং ৫টা ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। কর্ণাটকের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৩২ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩৭৩ (৪ উইকেটে ডিক্লেঃ —ফ্রেডরিকস ৯৪ রিচার্ডস ৭৫ নট আউট এবং ডেভিড মারে ১০৩ নট আউট। লক্ষ্মীনারায়ণ ১০১ রানে ২ উইকেট)

ও ১৫৭ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেঃ—ব্যারেট ৩৫ এবং প্যাডমোর ৩০ রান। লক্ষ্মীনারায়ণ ৬৩ রানে ৩ উইকেট)

কর্ণাটক : ১৮৫ রান (রিজেশ প্যাটেল ৬৭ রান। জুলিয়েন ৩৩ রানে ৩, প্যাডমোর ২৫ রানে ৩ এবং হোল্ডার ২০ রানে ২ উইকেট)

ও ২৩২ রান (৪ উইকেটে। সুধাকর রাও ৭৯ এবং রিজেশ প্যাটেল ১০৬ রান। ব্যারেট ৩৮ রানে ২ উইকেট)

আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকস

হায়দরাবাদে আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় মোট স্বর্ণপদক জয়ের তালিকায় পাঞ্জাব প্রথম এবং পশ্চিম বাংলা দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। তবে মোট পদক জয় এবং মোট পয়েণ্ট সংগ্রহের তালিকায় পশ্চিম বাংলা শীর্ষস্থান লাভ করেছে—মোট পদক ৪১ এবং মোট পয়েণ্ট ১১৩। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে পাঞ্জাব—মোট পদক ৩২ এবং মোট পয়েণ্ট ১১০।

পদক জয়ের তালিকা
প্রথম ৫টি স্থান

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
পাঞ্জাব	১৩	১৩	৬
পঃ বাংলা	১২	১২	১৭
বিহার	৯	৫	৬
কর্ণাটক	৮	৬	৪
মহারাষ্ট্র	৭	৬	৬

বিভিন্ন বিভাগের ফলাফল
পয়েণ্টের ভিত্তিতে

পুরুষ বিভাগ :
১ম বিহার (৭৫) ২য় কর্ণাটক (৩০)

মহিলা বিভাগ :
১ম কর্ণাটক (৩৯) ২য় মহারাষ্ট্র (৩০)

বালক (সিনিয়র) :
১ম পাঞ্জাব (৪৩) ২য় রাজস্থান (২৩)

বালক (জুনিয়র) :
১ম পাঞ্জাব (৩৫) ২য় পঃ বাংলা (৩২)

বালক (সাব-জুনিয়র) :
১ম পঃ বাংলা (২৬) ২য় উড়িশা (১৫)

বালিকা (সিনিয়র) :
১ম পঃ বাংলা (৩৪) ২য় ত্রিপুরা (১৮)

বালিকা (জুনিয়র) :
১ম ত্রিপুরা (১০) ২য় কেরল (৯)

দেশবিদেশের খেলা

নয়া নজীরের রাজা

কজন পারে স্বরাজ্যে সম্রাট হতে? কজন পারে অসামান্য অধ্যবসায় ও স্বকীয় নৈপুণ্যের জোরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হোয়ে স্বর্ণ সিংহাসন ছিনিয়ে নিতে? এমন মানুষের সংখ্যা লাখেও একটা মেলা ভার। এই ধরনের কতিপয় বিরল চরিত্রের মধ্যে রুডি হার্তোনোর নাম বিশেষ স্মরণীয়।

ইন্দোনেশিয়ার রুডি হার্তোনো ব্যাডমিণ্টনের বিস্ময়। অসাধারণ কৃতিত্বে সমৃদ্ধ। নয়া নজীরের রাজা। ব্যাডমিণ্টন কোর্টে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের জগতে সম্রাট।

সম্রাটের আসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে সদ্যিষ্ঠ রুডি হার্তোনোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে দীর্ঘ ছ' বছর একটানা জয়ের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে। অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় আঠার বছর বয়সে হার্তোনো প্রথমবার চ্যাম্পিয়ান হন। সেটা ১৯৬৮ সাল। তারপর ১৯৭২ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি পাঁচবার সিঙ্গলসে বিজয়ী হওয়ার সুবাদে আয়ারল্যাণ্ডের ফ্রাঙ্ক ডেভলিনের পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরবকে ম্লান করে দেন। ডেভলিন ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত একনাগাড়ে জিতে স্বস্থানে অবিচল ছিলেন।

১৯৭৩ সালেও পুরুষদের সিঙ্গলসে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করে ২৩ বছরের ছেলে হার্তোনো অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে নতুন নজীর রচনা করেন। উপর্যুপরি ছবার ফাইনালে বিজয়ী হওয়ার নিরিখে নয়া নজীর। অবশ্য ইতিপূর্বে কেবলমাত্র ডেনমার্কের ল্যাণ্ড কপ্‌স্‌ এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। তিনি ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পর পর চারবার এবং ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ সালে ফাইনালে জিতে ছবার চ্যাম্পিয়ান হন। তবে মাঝখানে ছেদ থাকায় একটানা জয়ের গৌরব থেকে ল্যাণ্ড কপ্‌স্‌ বঞ্চিত।

রুডি হার্তোনো ছাড়া ইতিপূর্বে আরও ছ'জন প্রতিযোগী পুরুষ বিভাগে সিঙ্গলসে অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় তিন বা ততোধিকবার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। নীচে পরিসংখ্যান তুলে ধরছি।

নাম	দেশ	সাল
স্যার জে থমাস	(ইংলণ্ড)	১৯২০-১৯২৩
জে এফ ডেভলিন	(আয়ারল্যাণ্ড)	১৯২৫-১৯২৯
আর সি এফ নিকোলাস	(ইংলণ্ড)	১৯৩৬-১৯৩৮, ১৯৩২ ও ১৯৩৪
উং পেং ঘুন	(মালয়)	১৯৫০-১৯৫২, ১৯৫৫
এ ডি চুং	(মালয়)	১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৫৭
আরণল্ড কপস	(ডেনমার্ক)	১৯৫৮, ১৯৬০--১৯৬৩, ১৯৬৫ ও ১৯৬৭

জাকার্তার ত্রিশক্তি মহাবিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেধাবী ছাত্র উপর্যুপরি ছ'বার অর্থাৎ ডাবল হ্যাটট্রিক করে উপরিলিখিত পরিসংখ্যানকে ছাড়িয়ে নতুন নজীর রচনা করেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে ভারতের প্রকাশনাথ ১৯৪৭ সালে ফাইনালে ডেনমার্কের কনি জেপসনের কাছে হেরেছিলেন। ১৯৬৭-তেই ল্যাণ্ড কপস এর যুগের অবসান। এবং ১৯৬৮ সাল থেকে ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি লম্বা রুডি হার্তোনোর বিজয় অভিযান শুরু। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত একটানা পর পর ছবার

কোচবিহার ট্রফি

নাগপুরে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল ৬ উইকেটে পশ্চিমাঞ্চল দলকে পরাজিত করে কোচবিহার ট্রফি জয়ী হয়েছে। সেমি-ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল এক ইনিংস ও ১৬৪ রানে গত বছরের বিজয়ী পূর্বাঞ্চলকে এবং পশ্চিমাঞ্চল ৩৪ রানে উত্তরাঞ্চলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ফাইনালের সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণাঞ্চল : ১৭০ ও ৩৮ রান (৬ উইকেটে)

পশ্চিমাঞ্চল : ১১১ ও ৯৬ রান

মেয়েদের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে মেয়েদের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা এক ইনিংস ও ১৩৫ রানে গত বছরের রানার্স-আপ কর্ণাটক দলকে হারিয়ে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার ঊষা সেলকিয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে। তৃতীয় দিনে মাত্র চার্ মিনিটের খেলাতেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

প্রথম দিনে কর্ণাটকের প্রথম ইনিংস মাত্র ২৪ রানে শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে বাংলা প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ৯৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ২১৩ রানের মাথায় শেষ হয় এবং কর্ণাটক দ্বিতীয় ইনিংসের ৯টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৫৪ রান সংগ্রহ করেছিল। এই দিন বাংলার ৯৯ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে গেলে ৮ম উইকেটের জুটিতে শিরিন কন্ট্রাকটর এবং বনশ্রী দাশ ৯৭ রান যোগ করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। শিরিন কন্ট্রাকটর ৬৬ রান করেন এবং বনশ্রী দাশ ৪৪ রানে অপরাজিত থাকেন। কর্ণাটক ১৮৯ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৯টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৫৪ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে কর্ণাটকের শেষ ১০ম উইকেট ফেলতে বাংলার মাত্র ৪ মিনিট সময় লাগে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

কর্ণাটক : ২৪ রান (রুপলেখা ৪ এবং শীলা রাও ৫ রান। লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য ৪ রানে ৩, রুণা বসু ৪ রানে ৪ বনশ্রী দাশ ৩ রানে ২ এবং শর্মিলা চক্রবর্তী ৫ রানে ১ উইকেট)

ও ৫৪ রান (শান্তা ৩৭ রান। রুণা বসু ২৫ রানে ৪ এবং শর্মিলা চক্রবর্তী ২০ রানে ৪ উইকেট)

বাংলা : ২১৩ রান (কেয়া রায় ২৫, চন্দ্রিমা সাহা ৩৪, শিরিন কন্ট্রাকটর ৬৬ এবং বনশ্রী দাশ অপরাজিত ৪৪ রান। শান্তা ৫৩ রানে ৩, চন্দ্রলেখা ২১ রানে ২ এবং লক্ষ্মী ৬৩ রানে ৩ উইকেট)

অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানের দুর্লভ অনন্য কৃতিত্বের আলোকে একমাত্র রুডি হার্তোনো দীপ্তিমান।

ব্যাডমিণ্টনে সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিগত বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার কোন স্বতন্ত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন না থাকায় অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানশিপকেই বেসরকারীভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের মর্যাদা দেওয়া হয়। অনেকটা যেন টেনিসে উইম্বলডন প্রতিযোগিতার মত। সুতরাং অল ইংলণ্ড প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার অর্থ বিশ্বসেরা। আর সেই বিচারে ইন্দোনেশিয়ার তরুণ রুডি হার্তোনো ব্যাডমিণ্টনের জগতে সম্রাট। ইতিহাসের জীর্ণ পাতা থেকে দেখা যায় অল ইংলণ্ড প্রতিযোগিতার জন্ম হয়েছিল ১৮৯৯ সালে। ওয়েম্বির এম্পায়ার পুলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা এখন বিশ্বের সেরা ব্যাডমিণ্টন টুর্নামেণ্ট বলে সর্বজনগ্রাহ্য। আর রুডি হার্তোনো এই সেরা প্রতিযোগিতায় নয়া রেকর্ড গড়ার সূত্রে ব্যাডমিণ্টনের স্বর্ণ সিংহাসনে কালজয়ী সম্রাট। এই বিস্ময় বালকের আগের ফাইনাল খেলার ফলাফল তুলে ধরছি—

সাল	বিপক্ষে	পয়েণ্টে জয়লাভ
১৯৬৮	তানঐক হুয়াং (মালয়েশিয়া)	১৫-২, ১৫-৯
১৯৬৯	দরমাদি (ইন্দোনেশিয়া)	১৬-১ ১৫-৩
১৯৭০	স্বেনপ্রি (ডেনমার্ক)	১৫-৭, ১৫-১
১৯৭১	মুলজাদি (ইন্দোনেশিয়া)	১৫-১, ১৫-৫
১৯৭২	স্বেনপ্রি (ডেনমার্ক)	১৫-৯, ১৫-৪
১৯৭৩	ক্রিশ্চিয়ান (ইন্দোনেশিয়া)	১৫-৪, ১৫-২

১৯৭৩ সালের সিঙ্গলসে হার্তোনো ও ডাবলসেও ক্রিশ্চিয়ান হাদিনতা ও চন্দ্র চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে পুরুষ বিভাগে

ইন্দোনেশিয়ার আধিপত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিযোগিতার শেষে স্বদেশে ফিরে গেলে এই তিন অসাধারণ খেলোয়াড়কে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় হার্তোনোর যোগ্য শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিলেন ডেনমার্কের স্বেনপ্রী। ইনি হার্তোনোর সঙ্গে অল ইংলণ্ড প্রতিযোগিতার বাছাই তালিকাতে শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু সেমিফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার হাদিনতার কাছে পরাজিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হন। আর ফাইনালে স্বদেশীয় হাদিনতাকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে দিয়ে হার্তোনো একটানা ষষ্ঠবার অল ইংলণ্ড প্রতিযোগিতার সিঙ্গলসে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে নজীর গড়লেন। আবার অল ইংলণ্ড প্রতিযোগিতার আগে ইউরোপ বনাম এশিয়ার মধ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে হার্তোনোকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল এই স্বেনপ্রীর কাছে। ১৯৭৩ সালের ফাইনালেও অপরাজিত হার্তোনো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বেনপ্রীকে এবং ১৯৭২ সালের চূড়ান্ত খেলায় মুলজাদিকে হারিয়ে স্বস্থানে অবিচল থাকেন। বছর খানেক আগে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনের আসরেও তেইশ বছরের ছেলে রুডি হার্তোনো সেমিফাইনালে পয়লা নম্বরের বাছাই অইক মংকে ১৫-৯, ১৫-৮ পয়েণ্টে ও চূড়ান্ত ম্যাচে স্বেনপ্রীকে ১৫-৫ ১৫-২ পয়েণ্টে পেছনে ফেলে ব্যাডমিণ্টনের স্বর্ণ সিংহাসনে সম্রাটের আসনটি পাকা করে নেন। মিউনিখ অলিম্পিকেও আমন্ত্রণী ম্যাচে স্বকীয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে হার্তোনো শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বাচ্ছন্দে লাভ করেন।

রুডি হার্তোনোর জন্ম হয় ইন্দোনেশিয়ার সুরাবাজায় নামক স্থানে ১৯৪৯ সালের ১৮ই আগস্ট। শিশুবয়স থেকেই ব্যাডমিণ্টনের প্রতি আকর্ষণে মন আটকে যায় চারচৌকো ব্যাডমিণ্টনের ছকে। সমস্ত ভাবনা ঘোরাফেরা করে গতিময় শাটলককের ছন্দে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই প্রবণতায় জোয়ার আসে। মাত্র ন' বছর বয়সে হার্তোনো দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। এবং ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাডমিণ্টন এ্যাসোসিয়েশন এই প্রতিভাবান কিশোরকে আবিষ্কার করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করে। ১৯৬৪ সালে হার্তোনো স্বদেশীয় জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান হন এবং ক্রমান্বয়ে স্বীকৃতির সিঁড়ি বেয়ে সাফল্যের চরম উৎকর্ষতায় উত্তরণ করেন।

ব্যাডমিণ্টনের বিস্ময় রুডি হার্তোনোর সাফল্যের গোপন কথা তার অসাধারণ অধ্যবসায়। আন্তরিক অনুশীলন, ক্লান্তিহীন শরীরচর্চা, অনমনীয় মনোবল এবং ছেলেবেলা থেকে ব্যাডমিণ্টনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

—প্রশান্ত দা

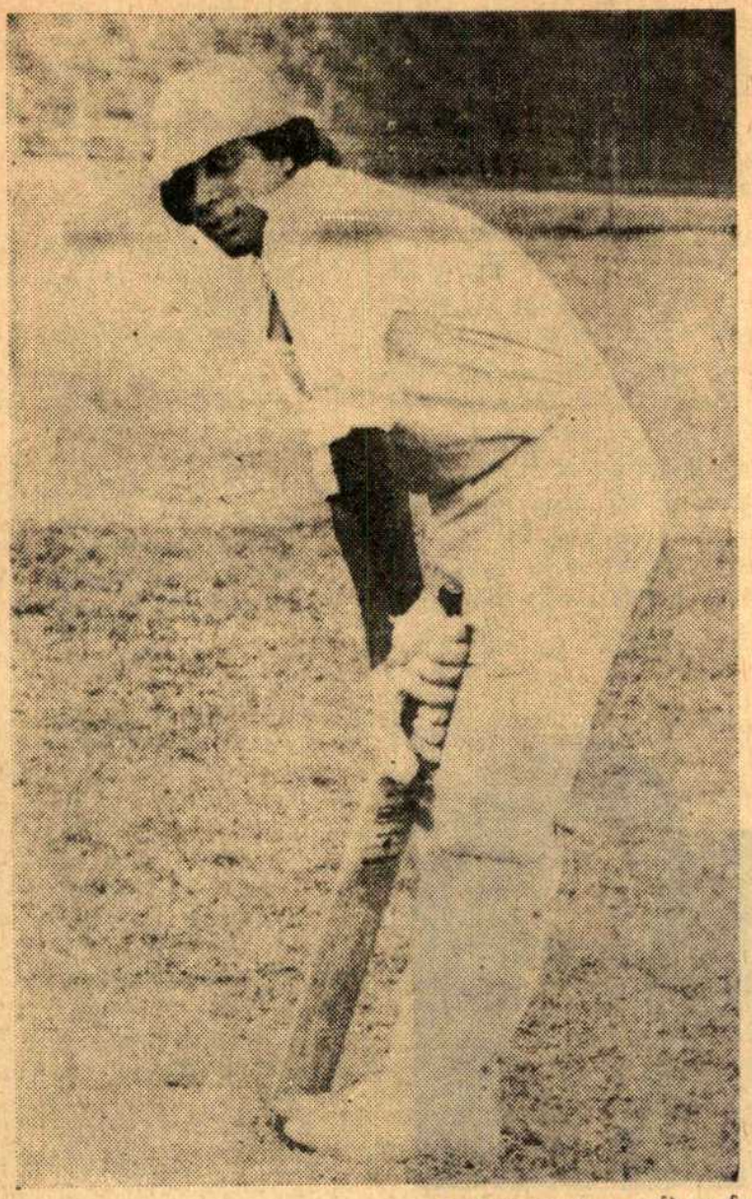

প্রলয় চেল

কোন্ শুভলগ্নে, কে নামটি রেখেছিলেন তা জানতে পারিনি, জানতে চাইও নি কিন্তু প্রলয় যে সার্থকনামা একথা অস্বীকার করার উপায় নেই আজ।

প্রলয় অর্থে প্রলয় চেল। ইস্টবেঙ্গলের বোলার, ব্যাটসম্যান এবং ফিল্ডার। এক কথায় অলরাউন্ডার বা চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড়। ঘরোয়া ক্রিকেটের আসরে প্রলয় এই মুহূর্তে এক উজ্জ্বল চরিত্র। এই তো, দিন কয়েক আগে সি এ বি লীগ ক্রিকেটে ডাবল হ্যাটট্রিক করলেন সালকিয়া ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে। খেলার শেষে প্রলয়ের বোলিংয়ের হিসেব দাঁড়ালো ৮০ রানে আটটি উইকেট। চলতি মরসুমে আরও একটি হ্যাটট্রিক করেছিলেন টাউনের বিরুদ্ধে (২৭ রানে ৪)। বল দেন সাধারণত ইনসুইং মাঝে মাঝে লেটকাটও। চৌকস খেলোয়াড় হলেও বোলিংয়ের ওপরই প্রলয়ের ঝোঁকটা বেশি।

প্রলয়ের জন্ম ১৯৫১ সালের পয়লা নভেম্বর কলকাতায় (২।১বি জাস্টিস চন্দু-মাধব রোড, ভবানীপুর)। বাবা শ্রীপ্রবোধ চেল লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার। চেম্বার ভবানীপুরেই। আদি বাড়ী হাওড়া জেলার শানপুর গ্রামে। ক্রিকেট অনুরাগ একেবারে শৈশব থেকে। বাড়ীর কাছেই নর্দার্ন পার্ক। মা প্রীতিকণা রোজই এই প্রলয়কে হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে যেতেন বড়ভাই। প্রলয় ক্রিকেট দেখতেন অবাক বিস্ময়ে। বিস্ময় কাটিয়ে একদিন শুভ মুহূর্তে ব্যাট বল ধরলেন আগামী দিনের অফুরন্ত অঙ্গীকার নিয়ে। ক্যাথিড্রেল মিশন হাইস্কুলে পড়ার সময় একবার নর্দার্ন পার্কে কোচিং ক্যাম্প করতে এলেন প্রখ্যাত শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত। জহুরী রত্ন চিনলেন এক চোখ দেখেই। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা (বিজ্ঞান) পাশ করে আশুতোষ কলেজে বিজ্ঞান পড়তে গেলেন। পার্ট ১, পরীক্ষা ইতিমধ্যে, দিয়েছেন প্রলয়।

স্কুলে পড়ার সময় ১৯৬৭ সালে বাঙলা স্কুল দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগও হোল তাঁর। উপর্যুপরি তিন বছর বাঙলা স্কুলের হয়ে খেলেছেন। ৬৯ সালে সি কে নাইডু ট্রফিও খেললেন। ঐ ইডেন উদ্যানে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে সাতটি উইকেট পাওয়ার পর প্রলয় বাঙলার ক্রিকেট আসরে রসিকজনের নজরে পড়েন। স্কুল পর্যায়ের ক্রিকেট খেলার আগেই অবশ্য প্রলয় ঘরোয়া সি এ বি লীগ ও নকআউট প্রতিযোগিতার অঙ্গনে। ৬৬ এবং ৬৭ সালে বালক সংঘের হয়ে খেলার পর সুনীল দাশগুপ্তের টানে যোগ দেন কালীঘাট ক্লাবে। কালীঘাটে ছিলেন ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত। তারপর ১৯৭৫ সালে চলে আসেন ইস্টবেঙ্গলে।

কালীঘাট ক্লাবে খেলার সময় ১৯৬৯-৭০ সালে প্রলয় প্রথম রণজি ট্রফি খেলার সুযোগ পান। খেলা ছিল পাটনায় বিহারের বিরুদ্ধে। প্রলয় জীবনের প্রথম খেলায় প্রথম ইনিংসে ৬৯ রান করেছিলেন। ৭০-৭১ এবং ৭১-৭২ সালেও প্রলয় রণজি ট্রফির আসরে বাংলার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। তারপর ৭৩-৭৪ সাল একেবারে 'ডাল'। না রণজিতে না দলীপ ট্রফিতে। ১৯৬৯-৭০ সালে প্রলয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরপর্বে ঐ প্রতিযোগিতার আন্তঃ আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের আসরেও অংশ গ্রহণ করেন। সেমিফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রলয় করেছিলেন ১৩৩ রান। ফাইনালে রান করেছিলেন উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে ৬৫ এবং উইকেট পেয়েছিলেন ২৬ রানে ৭টি। বলা বাহুল্য খেলায় তাঁর নেতৃত্বাধীন পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় দল ইনিংস জয়ের সূত্রে ভি জি ট্রফি পেয়েছিল। তারপর আজ পর্যন্ত কলকাতার আর ভি জি'র নাগাল পায়নি।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলার জগতে মেয়ে

ব্যাডমিণ্টনে—
অনুরাধা সরকার

পশ্চিম বাংলার ব্যাডমিণ্টনে মেয়েদের বিভাগে অনুরাধা সরকারের নামটি সুপরিচিত। ১৯৬৬ সালেই অনুরাধা প্রথম পশ্চিম বাংলায় জুনিয়ার পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বমূলক আসরে নামতে শুরু করে। সেই থেকে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিযোগিতায় নামছে। রাজ্য প্রতিযোগিতা জাতীয় আসর নানা ধরনের সর্বভারতীয় এবং রাজ্য আসরেও অনুরাধা যোগ দিয়ে চলেছে। '৬৬ সালে জুনিয়ার বিভাগে খেলা আরম্ভের পর '৬৮র আগে পর্যন্ত অনুরাধা ছিল পশ্চিম বাংলার বালিকাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারিণী। ১৯৬৮ সালে অনুরাধা রাজ্য চ্যাম্পিয়নশীপে বালিকা বিভাগের ফাইনালে আর এক কুশলী প্রতিভা তুলসী ব্যানার্জিকে হারিয়ে বিজয়িনী হবার সূত্রে এই বিভাগে পয়লা নম্বরের স্বীকৃতিও অর্জন করে। কিন্তু ১৯৭১ সালে ফাইনাল খেলার ঠিক আগেই বাবার মৃত্যুর ফলে অনুরাধা ফাইনালে সুদীপ্তা ঘোষের বিরুদ্ধে খেলতে নামেনি। তাই সেবার ও বিজয়িনীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি।

১৯৭১ থেকেই চাকরীর সূত্রে অনুরাধা ডাক ও তার ক্রীড়া পর্ষদের প্রতিনিধিরূপে জাতীয় প্রতিযোগিতায় নামে। গত চার বছর যাবৎ ও-ই ডাক ও তার বিভাগের ব্যাডমিণ্টনে মেয়েদের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছে। ডাক ও তার পর্ষদ পরিচালিত ব্যাডমিণ্টন আসরে অনুরাধাই ত্রিমুকুটের অধিকারিণী।

'৭৪-এ উবের কাপ ব্যাডমিণ্টনে যোগদানের জন্য ভারতীয় মহিলা দল গড়ার উদ্দেশ্যে পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তনে আয়োজিত বাছাই প্রতিযোগিতা ও অনুশীলন শিবিরেও অনুরাধার ডাক পড়েছিল। সম্প্রতি ডাক ও তার ক্রীড়া পর্ষদ ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করায় অনুরাধা ৭৪-৭৫ মরশুমে আবার পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। এর আগে ১৯৭২-এ ইণ্ডেনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ব্যাড-

মিন্টনে অনুরাধা কোয়ার্টার ফাইন্যালে মহারাষ্ট্রের জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান ও সিনিয়ারে দু নম্বর কুশলী সুজাতা জৈনকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু সেমিফাইন্যালে ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় রফিয়া লতিফের কাছে হেরে যায়। লতিফই ফাইন্যালে বিজয়িনী হয়।

ঐ বছরই কলকাতায় রাজ্য চ্যাম্পিয়ান-শীপের খেলায় অনুরাধা সিঙ্গলসে বিজয়িনী হয় ডাবলসে শ্রীমতী দীপা চ্যাটার্জির জুটিতে এবং মিক্সড ডাবলসে পঙ্কজ গুহের জুটিতে জয়ী হয়ে ত্রিমুকুটের অধিকারিণী হয়। সিঙ্গলসে হারায় সুদীপ্তা ঘোষকে (টমাস কাপ খেলোয়াড় দীপু ও রমেন ঘোষের বোন)। ৭৩-এ স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিনী কুমারী সুমিতা মুখার্জিকে ফাইন্যালে হারিয়ে অনুরাধা রাজ্য বিজয়িনীর আখ্যা অক্ষুন্ন রাখে; ঐবার মিক্সড ডাবলসে পঙ্কজ গুহের জুটিতে জয়লাভের সূত্রে ত্রিমুকুট জয়ের গৌরবও অর্জন করে।

১৯৭০-এ কেরলের প্রথম শ্রেণীর ব্যাডমিন্টনে সিঙ্গলসে অনুরাধা সেমিফাইন্যালে প্রখ্যাত দময়ন্তী সুবেদারের কাছে পরাজিত হলেও ডাবলসে কেরলেরই জেসি ফিলিপসকে জুটি করে বিজয়িনীর আখ্যা অর্জন করে।

অনুরাধা বড় বড় আসরে খেলার সুযোগ পেয়েছে। এখনও পাচ্ছে। ওর বাবা স্বর্গত কমল সরকার ছিলেন বিগত যুগে হাওড়া ইউনিয়নের কৃতী ফুটবল খেলোয়াড়। বাবার কাছ থেকে খেলার জন্য অনুরাধা খুবই উৎসাহ পেয়েছে। এদিকে রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সেদিক থেকে অনুরাধার কোন অভিযোগ নেই।

ওয়াই এম সি এ (চৌরঙ্গী)তে কলকাতা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালের দিন অনুরাধার সঙ্গে দেখা করে ওর ক্রীড়াকুশলতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করি।

—এতরকম খেলা থাকতে তুমি ব্যাডমিন্টনের দিকে ঝুঁকলে কেন?

—ইডেন উদ্যানে ১৯৬৫-৬৬তে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা দেখতে যাই। সেই থেকেই ব্যাডমিন্টন খেলা বিশেষভাবে শেখার ইচ্ছা হয়। পঙ্কজ গুহও আমাকে প্রশিক্ষণ দিতে রাজী হলেন। ফলে সুবিধা হয়ে গেল। আমিও এই খেলাটি আয়ত্ত করার সংকল্প নিয়ে উঠেপড়ে লাগলাম। আমি ছোট থেকেই টেবল টেনিস খেলেছি তাছাড়া সাঁতারও কাটি। তাই আমার শরীর একটু মোটাসোটা হলেও ব্যাডমিন্টন খেলতে খুব অসুবিধা হয়নি। শরীর ঠিক করার জন্যে আমি নানা-রকম ব্যায়াম করি। পি-টি- করি নিয়মিত ভাবে। কিন্তু একটা দিকে আমার ঘাটতি আছে—তা হচ্ছে 'স্ট্যামিনা'।

কথাটা খুবই সত্যি। অনুরাধার স্ম্যাশের জোর আছে। প্রতিপক্ষকে আঘাতে আঘাতে নাজেহাল করতে পারে। যাকে 'পাওয়ার গেম' বলে অনুরাধার খেলার রীতিতে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে অভাব 'স্ট্যামিনার'। অনুরাধা নিঃসংকোচে তা স্বীকার করে বলে জানেন স্ট্যামিনার অভাবে অনেক নামকরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রথমদিকে বিপর্যস্ত করে ফেললেও আমি শেষরক্ষা করতে পারি না। দেশের শীর্ষতালিকাভুক্ত অনেক খেলোয়াড়ই আমার দাপটের কাছে কুঁকড়ে গেছে। কিন্তু চূড়ান্ত পর্বে সমাপ্তির মুখে আমার শক্তি-সামর্থ্যে কেমন যেন টান পড়ে। এই দুর্বলতার জন্য অনেক ভাল ম্যাচে আমি শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছি। একেবারে তীরে এসে তরী ডোবার মত!

ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়ের প্রধান গুণ প্রতিপক্ষের আক্রমণের নিশানা আন্দাজ করা এবং তার মোকাবিলার জন্য তৈরী থাকা। এ কাজটিতে অনুরাধা সিদ্ধহস্ত। তাই কোর্টে তার গতি অন্যের তুলনায় মন্থর হলেও নিশানা আন্দাজ করার গুণে প্রতিপক্ষ তার দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে না। তাছাড়া এই ফাঁক ও ভরে দেয় জোরালো স্ম্যাশের হাতিয়ার দিয়ে। নানা প্রথম শ্রেণীর আসরে অনুরাধার স্ম্যাশে বিপক্ষের নামকরা কুশলীরা ব্যতিব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু সমান তেজে শেষপর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাবার উপযোগী শারীরিক সামর্থ্যে টান পড়ার ফলেই অনুরাধার অমন দর্শনীয় স্ম্যাশও 'পাওয়ার গেম' বিফল হয়। এর জন্য ওর মনে ক্ষোভের শেষ নেই। দুঃখ করে তাই বলছিল স্ট্যামিনার অভাবে দু গেমের খেলা তিন গেমে প্রসারিত হয় আর আমার কপালে ব্যর্থতার কলংক নেমে আসে। আমি আমার এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য অনেক চেষ্টা চালাচ্ছি। ফোর্ট উইলিয়ামের ব্যাডমিন্টন কোর্টে প্রতিদিন বিকালে তিন চার ঘন্টা অনুশীলন করে। তাছাড়া ব্যায়াম তো আছেই।

অনুরাধার ওপর সাংসারিক দায়িত্বও অনেক। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের ওরা দু বোন, তিন ভাই। অনুরাধাই সবার বড়। ছোট বোন রুণু ও ভাই পিকুও ব্যাডমিন্টনে জুনিয়ারে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে। পিকু জুনিয়ারে চ্যাম্পিয়ান এবং '৭৩-এ জাতীয় আসরে এ রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আর রুণু এখন ডাবলসে অনুরাধার জুটি। —বাড়ীর আমি বড় মেয়ে। তাই সংসারের নানা দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। ভাই আর বোন এখনও কলেজের পাঠ শেষ করেনি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন চাকরী করি সংসারের সব কাজকর্ম—মায় রান্নাবান্না পর্যন্ত করি। তা সত্ত্বেও খেলা আমি চালিয়ে যাচ্ছি। সকালে নিয়মিত ব্যায়াম করি। সংসারে সবাই যা খায় আমিও তাই খাই। খেলার জন্য বিশেষ-ভাবে কোন খাবার খাই না।

—অবসর সময়ে কি কর?

—যেটুকু অবসর পাই তা ঘর-সাজানো সেলাই-ফোঁড়া আর ভাইবোনের সোয়েটার বুনে কাটাই। অফিসের হয়ে টেবল টেনিস খেলি। ফোর্ট উইলিয়ামে ছেলেদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন অনুশীলন করি। 'স্ট্যামিনা' বাড়াবার জন্য খুব চেষ্টা চালাচ্ছি।

ইতিহাসে পাওয়া যায় ব্যাডমিন্টন খেলার জন্ম নাকি এদেশে। একদল ইংরেজ পুণায় ১৭৯০—১৮০০ সালে স্যাম্পেনের বোতলের ছিপিতে পালক লাগিয়ে বল তৈরী করে এই খেলার প্রচলন করে। পরে এই খেলা ইংলন্ডে আর্ল অব ব্যাডমিন্টনের জমিদারীতে চালু হয়। সেই থেকেই এই নামকরণ।

অনুরাধাকে জিজ্ঞাসা করি আচ্ছা বাংলার ব্যাডমিন্টনে মেয়েদের ক্রীড়ামান কি রকম।

উত্তরে ও বলে বর্তমানে এ রাজ্যের মেয়েদের মান খুব নীচু। ভারতীয় মানের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তবে আমার আশা শীঘ্রই নতুন নতুন উন্নত মানের খেলোয়াড় উঠবে। নিজের বিষয়ে বলে—যতদিন পারি খেলা চালিয়ে যাব। ভবিষ্যৎ সাফল্যের আশার দীপ জ্বালিয়ে রাখব। উত্তরে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিই।

—অমল

পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

উৎসবের ফলাফল নিশ্চয়ই-ই আর আপনাদের অজানা নেই। দিল্লীতে উপস্থিত সাংবাদিক-সমালোচক-বিদেশী অতিথিদের প্রায় নব্বুই ভাগ লোককে চমকে দিয়ে ঘোষণা হলো হাঙ্গেরীর ছবি 'ড্রিমিং ইয়োথ' উৎসবের সেরা ছবি হিসাবে আর বাকি তেইশটা ছবিকে পেছনে ফেলে স্বর্ণ ময়ূর পাবার জন্য এগিয়ে এসেছে। জুরী সদস্য ফ্রাঙ্ক কাপরা অবশ্য সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে ভোলেননি যে বেশীর ভাগ ছবিই খুব বেশী উন্নত মানের নয়। এই পুরস্কারটি ঘোষণার সময় দোতলার প্রেস সীট থেকে কয়েকজন সাংবাদিক সোচ্চার ধিক্কারও জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিচার তো তখন শেষ!

অবশ্য আর একটি আশ্চর্যের ব্যাপার, জুরীরা একটি বিশেষ পুরস্কার দিয়েছেন ফ্রান্সের 'এম্পটি চেয়ার' ছবিটিকে। জুরীদের দ্বারা বিশেষভাবে নির্বাচিত এই ছবিখানিকে স্বর্ণব্যাঘ্র দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন কলকাতায় সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা। কিন্তু এই পুরস্কার ঘোষণাটি মূল অনুষ্ঠানে কেন করা হোল না বুঝলাম না। প্রতিযোগিতা বিভাগের ছবিগুলির মধ্য থেকেই একই জুরীদের দ্বারা যখন এই ছবিটি পুরস্কৃত তখন পুরস্কার ঘোষণায় বাধাটা কি ছিল? পুরস্কারটি না হয় অন্য কোনো অনুষ্ঠানে দেওয়া যেতো! (যেমনটি হয়েওছে) জুরী বোর্ড বুঝি তাহলে নিজেদেরই নির্বাচনের ওপর আস্থা নিয়ে কথা উঠতে পারতো। এবং সেই কারণেই বুঝি এমনতরো চুপিসাড়ে এই পুরস্কার ঘোষণা। এই পুরস্কার সম্পর্কে কোনো প্রেস বিজ্ঞপ্তিও বুঝি তাই হয়নি!

যাইহোক, সেরা ছবির পুরস্কারের কথা বাদ দিলে অন্যান্য বিভাগের পুরস্কার সম্পর্কে অবশ্য তেমন কোনো অভিযোগ আর নেই। 'আলমা'র পরিচালক জেলিতো ভিয়ানির সেরা পরিচালক হিসাবে স্বীকৃতি প্রশংসনীয়। সেরা অভিনেতা হিসাবে ইরানের বেহরুজ ভাস্টেঘি নিঃসন্দেহে এই পুরস্কারের দাবীদার ছিলেন। এবং তাঁর দাবী মিটেছে। তবে একটা কথা সাবটাইটেল না থাকার অজুহাতে এ ছবি বাতিল করেছিলেন জুরি বোর্ড। জনৈক কূটনৈতিক অফিসার অবশ্য জানালেন যে সম্পূর্ণ ইংরেজী সিনপসিস দেবার পর আবার ছবিটিকে তালিকাভুক্ত করা হয়। 'টাংপসির' ছবিতে তাঁর অভিনয় সম্পর্কে আগের লেখায় প্রশংসাতো করেই ছিলাম। অভিনেত্রী হিসাবে 'দি ওয়ে উই ওয়্যার' ছবির জন্য বারবারা স্ট্রিল্যান্ডের পুরস্কারপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ সঠিক বিচার না হলেও অপাত্রে পড়েনি বলা যায়। 'আলমা'র শিল্পী ইসাবেল পেলে হয়তো সকলেই খুশী হতে পারতেন।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের মাত্র একখানি ছবি সাংবাদিকদের দেখানো হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটিই পেয়েছে সেরা ছবির পুরস্কার স্বর্ণ ময়ূর। চেকোশ্লাভাকিয়ার অটোমেটিক' আধুনিক যন্ত্রজীবনের সমস্যাকে কার্টুন চিত্রের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ পুরস্কারও অবাঞ্ছিত নয়। তবে অপর দুটি ছবি (ইজিপ্টের 'পার্ল অফ দি নাইল ও ফিনল্যান্ডের ১৮৯৫—হাউ দি মুভিজ মুভ') যখন দেখার সৌভাগ্য হয়নি তখন নীরব থাকাই শ্রেয়।

•

ছবি, পুরস্কার কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থা অসহযোগ ইত্যাদির কথা পুনরুক্তি না করে চলে আসি এবার উৎসবের ভালো খবর গুলোয়। অবশ্য ভালো খবর বলতে মাত্র একটা। ইনফরমেশন বিভাগের কিছু ভালো ছবি দেখার সুযোগ। (তাও অনেক কষ্টে) সারা বিশ্ব জুড়ে যে ছখানা ছবি গত দু বছর ধরে বাক-বিতণ্ডার ঝড় তুলেছিল সেই দুখানা ছবি অর্থাৎ স্ট্যানলি কুব্রিকের 'ক্লক ওয়ার্ক অরেঞ্জ' ও ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপালার 'গড ফাদার' দেখানো হয়েছে এই বিভাগে। উৎসবের সেরা ছবি বলতে গেলে অবশ্য 'ক্লক ওয়ার্ক অরেঞ্জে'র সঙ্গে মিকলসে জ'াকসোর 'রেড সাম' লাগোস ওসিমার ডায়রী অফ এ সিনকুজু থিফ' এবং জোসেফ স্টার্কে'র 'জেনিসে'র নাম করতে হবে। কোপালার 'গডফাদার' কি আকর্ষণে যে এ পর্যন্ত কলম্বিয়া পিকচার্সকে ষাট কোটি টাকা লাভ এনে দিয়েছে বুঝতে পারলাম না। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে মাফিয়াদের কার্যকলাপের অবশ্য একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যাবে এ ছবিতে। একশ আট মিনিট দৈর্ঘ্যের এ ছবি পরিচালকের উপস্থাপন বৈচিত্র্যে ও ঘটনার পারিপাট্যে এক মুহূর্তের জন্যও থেমে যায়নি। আর আছে মূল ভূমিকায় মার্লন ব্রান্ডোর শক্তিশালী অভিনয়। বিশেষ ধরনের স্বরক্ষেপণ ও মুখভঙ্গি তিনি আদ্যন্ত সাবলীলভাবে বজায় রেখেছেন। ছোট ছেলের ভূমিকায় আলপাসিনোর কাজও প্রশংসার দাবী করে। কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু কারণে ছবিখানির এই রেকর্ড সাফল্য ভাবতে অবাক লাগে। না আছে সেকসের প্রাধান্য ভায়োলেন্স—তাও খুব বেশী কই! তুলনায় 'ক্লক ওয়ার্ক অরেঞ্জ' অনেক বেশী শক্তিশালী ও গভীর বক্তব্যপূর্ণ ছবি। আজকের যুবসমাজের এই অধঃপতন যে রাষ্ট্রকাঠামো ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিচালক সেকথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। এবং তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞান মানুষের স্নায়ুযন্ত্রগুলোকে অবশ বা অকেজো করে দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু সুকুমার অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে তুলতে পারে না। বিজ্ঞানের পরাজয় এখানেই। ছবির নায়ক অ্যালেক্স এক বখাটে ছেলে। প্রতিদিন

জীনা লোলোব্রিজিদা

সন্ধ্যায় দলবল নিয়ে সে বেরোয় ডাউন-টাউনের দিকে বীভৎস আনন্দে মাতাতে। এমনি এক সন্ধ্যায় তারা বুড়ো এক মাতালকে পিটিয়ে মেরে চম্পট দেবার সময় একখানা গাড়ী চুরি করে। হাজির হয় জনৈকের বাড়ী। মালিক আধবয়সী ভদ্রলোকের (আলেকজান্ডার) সামনেই তার স্ত্রীকে অত্যাচার করে পালায় অ্যালেকস। পরদিন আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির সময় ধরা পড়ে সে পুলিশের হাতে, অবশ্য তার আগে বাড়ীর কর্ত্রীকে খুন করতে অসুবিধে হয় না।

জেলে যাবার পরই অ্যালেকসের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। কুড়ি বছরের জেল হলেও মাত্র ছ বছর বাদে যখন সে মুক্তি পায় তখন সে আলাদা মানুষ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে তার মধ্যে যৌনতা ও হিংস্রবৃত্তির অবসান ঘটানো হয়েছে। কিন্তু বিটোফেনের নাইনথ সিম্ফনির প্রতি তার আর কোনো মানসিক প্রতিক্রিয়া নেই। বাড়ীতে অতর্কিতে হাজির হতে সুবোধ সরল অ্যালেকসকে কেউই বুঝতে পারে না। মনে করে এটাও বুঝি তার একটা চাল। পুরোনো বন্ধুরাও (যারা তখন পুলিশে কাজ করছে) তাকে ভুল বোঝে। একদিন সবাই মিলে তাকে বেদম প্রহার করে অজ্ঞান অবস্থায় সেই আলেকজান্ডারের বাড়ীতে রেখে আসে! ভদ্রলোক তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সুযোগ বুঝে পূর্ব অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য তার কানের কাছে বিটোফেনের নাইনথ সিম্ফনি বারবার বাজিয়ে অ্যালেকসকে প্রায় আত্মহননের কাছাকাছি নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মরে না অবশ্য সে। গবেষকের কাছে হাজির হয় অ্যালেকস। ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে এগিয়ে যায়। বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখে বিটোফেনের নাইনথ সিম্ফনির তালে তালে সে যেন একটি মেয়ের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করছে। ছবির সমাপ্তি এখানে।

কাহিনী থেকেই আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না যে কি প্রচণ্ড শক্তিশালী বক্তব্য আর কাহিনী নিয়ে পরিচালক এগিয়েছেন। এবং উপস্থাপনার মধ্যেও এমন আকর্ষণী শক্তি আছে যা দর্শককে সর্বক্ষণ আবিষ্ট করে রাখে। ছবি শেষের পর অনাস্বাদিত এক তীব্র অনুভূতিতে সারা দেহমন যেন কেঁপে ওঠে। অ্যালেকসের ভূমিকায় ম্যালকম ম্যাকডোয়েলের অভিনয় পরিচালক কুব্রিকের ক্ষমতার চাইতে কম প্রশংসার দাবী করে না। দুর্ভাগ্য এ ছবি ভারতীয় সেন্সর বোর্ড কোনদিনই প্রদর্শনীর অনুমতি দেবেন না। কেননা, বীভৎস রস ও যৌন দৃশ্যগুলো এ ছবির প্রতিটি দৃশ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে।

আরেকটা ছবি সিডনী লুমেতের 'চাইল্ডস প্লে' তো স্ক্রিনিং কমিটি নাকচই করে দিলেন। অজুহাত—যৌন দৃশ্য ও বীভৎস রসের আধিক্য। (কিছু হিন্দী ছবি দেখার সময় সেন্সর কর্তৃপক্ষ কি ঘুমের বড়ি খেয়ে থাকেন!)

হাঙ্গেরীর পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিখানা দর্শকদের ভালো না লাগলেও ইনফরমেশন বিভাগের ছবি মিকলোস জাঁকসোর 'রেড সাম' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাঁর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে, কাব্যময়তায় এবং বলিষ্ঠতায়। উনবিংশ শতকের শেষভাগের পটভূমিকায় একদল খামার শ্রমিকের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে তাদের নিষ্ঠা, দৃঢ়তা বৈপ্লবিক চেতনা, সফলতা এবং মালিক-পক্ষের ক্রূর ও খল চরিত্রের কয়েকটা দিক পরিচালক উদ্ঘাটন করেছেন। মালিকের দালাল তাদের ঘুষ দিতে এলে তারা তাকে হত্যা করেছে। মালিক বোঝাপড়া করতে এলে মার্কসিস্ট স্বংলাপের গান গেয়েছে তারা। স্থানীয় পুরুত এইসব কাজ অধর্মীয় বলার পর সকলে মিলে গীর্জাকে পুড়িয়ে নিজেরা নতুন ধর্মে দীক্ষিত করেছে নিজেদের। আরও সৈন্য আসে। এক ঝাঁক গুলি এসে ধর্মঘটীদের নীরব করে দিয়ে যায়। মৃতস্তূপের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ায় একটি নগ্ন মেয়ে। স্টেনগান তুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ফিরতি সৈন্যগুলোকে মারতে শুরু করে। পরিচালক বক্তব্যে তেমন কোন নতুন পথের দিশারী নন ঠিকই কিন্তু চলচ্চিত্র ব্যাকরণের নতুনতম প্রয়োগবৈচিত্র্য এ ছবি ফুল মার্কস দাবী করতে পারে। ধাত্রা দলের বিবেকের মত একটি চরিত্র পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে মার্কসের কিছু বাণী গানের আকারে বলে গেছে। এক সময় পরিচালক ধর্মঘটী শ্রমিক এবং সৈন্যদের একই সঙ্গে উৎসবে মাতিয়ে দিয়েছেন, পরক্ষণেই একটিমাত্র ইঙ্গিতে সৈন্যরা বন্দুক তাক করে এগিয়েছে শ্রমিকের প্রতি। সারা ছবি জুড়ে এমনি কল্পনা বাস্তবের ইলিউশন ভাঙার ঘটনা ছড়িয়ে আছে। এবং এখানেই পরিচালকের কৃতিত্ব। 'রেড সাম' বুঝি জাঁকসোর সেরা ছবির মর্যাদা তাই পেয়েছে।

বার্ট হানস্ট্রার 'এপ্ এণ্ড সুপার এপ্' ডকুমেন্টারী ধাঁচে তোলা হলেও কাহিনীচিত্র

সিদ্ধার্থ : শশী কাপুর। সিমি

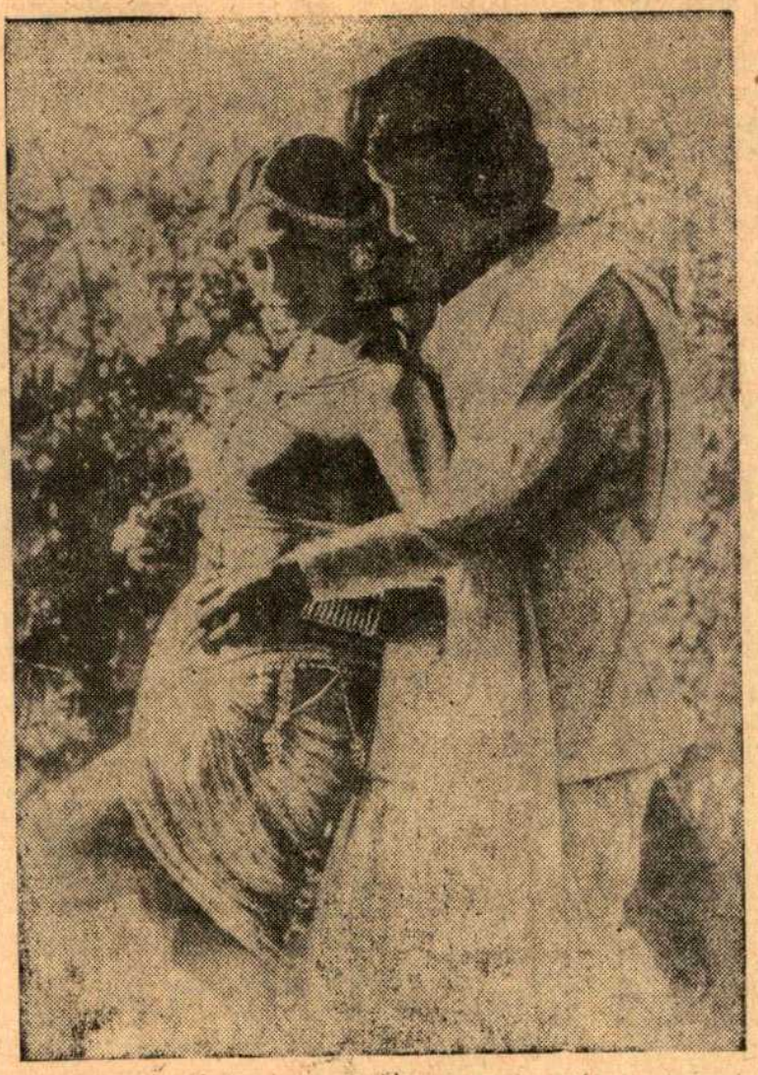

বলা যায় ছবিটিকে। পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে বহু পরিশ্রমে তিনি এ ছবি তৈরী করেছেন। চিতাবাঘ, হরিণ বনমানুষ পেঙ্গুইন প্রভৃতি প্রাণীদের জীবনপ্রণালীকে তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন পর্দায়। মৃত্যু-যৌবন-প্রেম-প্রীতি-যৌন জীবন কোনো কিছুই বাদ দেননি। সেই সঙ্গে তিনি মানুষের জীবনের নানা পর্যায়গুলোকেও পাশাপাশি দেখিয়েছেন। বনমানুষ বা পেঙ্গুইনের সঙ্গে মানুষের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্যই যে প্রায় নেই পরিচালক তা প্রতিটি দৃশ্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আজকের অতি উন্নত সভ্যতা যে মানুষকে মূলগতভাবে প্রাণীদের থেকে বিন্দুমাত্র পৃথক করতে পারেনি সেকথাই বলতে চেয়েছেন পরিচালক। অতীতের এপ্ এবং আজকের সুপার এপ অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে চরিত্রগতভাবে কোনো পার্থক্যই নেই। এ ছবি দেখতে বসে চ্যাপলিনের 'মডার্ন টাইমস' (এ ছবিখানাও দেখানো হয়েছে উৎসবে) এর প্রথম দৃশ্যটার কথা মনে পড়ছিল বারবার। এক পাল ভেড়ার সঙ্গে সেখানে ইন্টারকাট করে দেখানো হয়েছে একদল শ্রমিককে। এখানেও ইনডাস্ট্রী পেঙ্গুইনের জীবনের সঙ্গে মানুষের জীবনের সমান্তর টেনেছেন। এবং ছবির শেষ মুহূর্তে তিনি উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে শহরের জঙ্গলে যে সব মানুষনামধারী সুপারএপ্ বাস করে তারাও প্রতিনিয়ত নিজ অস্তিত্ব রক্ষার তীব্র সংগ্রামে জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় বিন্দুমাত্র পিছিয়ে নেই, বরং আরও বেশী হিংস্র আরও বেশী রক্তপিপাসু, আরও বেশী লোভী। মানুষের সমাজ নিয়ে এমন বীভৎস বিশ্লেষণ এর আগে কোনো সমাজবিজ্ঞানীও করেছেন কিনা সন্দেহ!

ফেদারিকো ফেলিনির অ্যামারকর্ড সম্পর্কে অনেক প্রশংসা শুনেছিলাম আগে। কিন্তু ছবি দেখে মন ভরেনি তেমন। বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব আছে ঠিকই কিন্তু ট্রিটমেন্টে তিনি বিষয়বস্তুর সঙ্গে যথাযথ একাত্ম হতে পারেননি বলেই বুঝি অনেক সময় ছবিটাকে ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। কনটেন্টের সঙ্গে ফর্মের যেন কিছুতেই মিলন ঘটছিল না। ছবির নায়ক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক হঠাৎ একদিন কি কারণে আবিষ্কার করে তার আশপাশের কাছের সবাই অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। বহুদিনকার পরিচিত লোকগুলো তাকে আর চিনতে পারছে না। এমনকি স্ত্রী-পুত্রও তার কাছে অপরিচিত। শুধু লোকগুলো নয় গাছপালা-ঘরবাড়ী পরিবেশ সব কিছুই তার অচেনা ঠেকে। তখন সে শুরু করে নিজেকে খুঁজতে। নিজের অস্তিত্বকে হাতড়ে বেড়ায়। পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সে উগ্রগ্রীব হয়ে ওঠে। একটা সংযোগসূত্র (অ্যামারকর্ড শব্দটার অর্থ ভালবাসার সূত্র) খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে। স্মৃতির অন্ধকার ঘেঁটে অনেক ঘটনা আর চরিত্রকে বার করে নিয়ে আসে সে। অতীতের ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যায় ভদ্রলোকের এই মানসিক বিক্রিয়া ছিন্নমূল নয়। অবশেষে সংযোগসূত্রও সে খুঁজে পায়। ফিরে পায় নিজের অস্তিত্ব। ফেলিনি কোন নাটকীয়তা বা কোন প্রতীকের আশ্রয় না নিয়েই নায়কের এই অস্তিত্বের যন্ত্রণাকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা প্রশংসনীয়।

উৎসবের আরেকটি ছবি অনেকের মনযোগ আকর্ষণ করেছিল উৎসব শুরুর বহু আগে থেকেই। কনরাড রুকসের সিদ্ধার্থ সম্পর্কে এখানকার দর্শকদের কৌতূহল অবশ্য সিমিকে কেন্দ্র করেই সব চাইতে বেশী। যে কারণে এই আগ্রহ তা অবশ্য ঠিকমত পূরণ হয় নি। সিদ্ধার্থ নামে এক যুবকের নির্বাণলাভের ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী নিয়ে অসফল চিত্রায়ন এই ছবি। কমলা নামে এক নর্তকীর সঙ্গে সিদ্ধার্থের যৌন সম্পর্ককে পরিচালক অতবেশী প্রাধান্য দিলেন কেন বুঝলাম না। (কমলা শব্দটির অর্থ অবশ্য রুকস সাহেবের কাছে 'কাম' সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এমন ধরনের কথাই বলেছেন!) সাধু হতে গিয়ে সিদ্ধার্থ শেষ পর্যন্ত না হতে পারলো সাধু না হলো সংসারী। মাঝি বাসুদেবের কাছ থেকে সার বুঝলো নির্বাণ-ফির্বাণ কিছু নয়। ভালবাসাই সব কিছুর মূলমন্ত্র। জীবকে ভালবাসলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। নেশার বুঁদ হয়ে ভগবানকে ডাকার প্রয়োজন নেই। পরিচালক অবশ্য সিদ্ধার্থের এই মানসিক উত্তরণের জন্য যে নাটকের জাল পেতেছিলেন তা সাধারণ দর্শকের কাছে যথেষ্ট উপভোগ্য লেগেছে কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য

ও সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাতে পারেন নি। তবে এই ছবির যেটুকু চোখ ভরে দেখার মত তা হচ্ছে স্ভিন নিকভিস্টের ক্যামেরার কাজ। হরিদ্বার হৃষিকেশের চোখ ভোলানো দৃশ্যগুলোকে সুন্দরভাবে তুলে নিয়েছেন তিনি পর্দায়। আর আছে সিমি ও শশীকাপুরের জীবন্ত অভিনয়।

তুলনায় কনরাড রুকসের 'ছাপ্পাকুয়া' (সম্ভবত ভদ্রলোকের প্রথম ছবি এটি) অনেক বেশী পরিণত বুদ্ধিদীপ্ত। পরিচালনার কাজে তাঁর আন্তরিকতা ও দক্ষতার ছাপ এ ছবিতে অনেক বেশী। ছাপ্পাকুয়া দেখার পর রুকস সম্পর্কে ধারণা বদলাতে হবে। অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য গ্রহণের ফলে ছবির নায়কের মানসিক বিকার ঘটেছে। ছবির শুরুতে সে হাসপাতালে। চিকিৎসা চলছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে তার জীবনের কিছু ঘটনা উদ্ঘাটিত। সুচারু সম্পাদনা ও ক্যামেরার কাজ ছবির ভিসুয়ালিটির মধ্যেই এক ধরনের মাদকতা এনে দিয়েছেন যাতে দর্শকরা নায়কের মানসিকতার সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে যান। এখানেই পরিচালকের দক্ষতা।

ইউ কে'র দুখানা ছবি জোসেফ স্টাকের জেনিস ও দি বর্ডর কোনটাই তেমন আকর্ষণীয় নয়। বর্ডর অবশ্য যেন শিক্ষামূলক ছবি। জেনিসে-য়েও যে চরিত্রগুলোকে হাজির করা হয়েছে তার কোনটাই খুব একটা পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে নয়। অস্বাভাবিক তিনটি চরিত্র নিয়ে ঘটনার বিস্তার। দুজন ট্রাক ড্রাইভার এবং একটি বেশ্যা। শিকাগো যাবার দীর্ঘ যাত্রাপথে একে অপরের ঠকানোর ব্যাপারটাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। শেষ পর্যন্ত বেশ্যাটির হাতে অবশ্য প্রাণ দিয়েছে একজন ড্রাইভার। পরিচালকের দেখানোর গুণে অবশ্যই ছবিখানি দর্শনীয়। পাওলো পরিচালিত আলোসানফান (ইতালীর) ঘটনার নাটকীয়তায় একটি শ্বাসরুদ্ধকারী ছবি, বুলগেরিয়ার গেটস হর্ন দেখতে বসে সাতান্ন-আটান্ন সালে রঞ্জন-নাদিরা অভিনীত কিছু হিন্দী ছবির কথা মনে হতে পারে। স্পেনের মাই প্রাইভেট টিচার সাদামাটা কমেডি ছবির বেশী কিছু নয়।

নাগেশি ওসিমার ডায়রী অফ এ সিনকুজু থীফ প্রচন্ড শক্তিশালী ছবি একটি। জাপানী কাবুকি থিয়েটারের ভর্মটকে নিয়ে তিনি একজন চোরের জীবনের কয়েকটা ঘটনা এত সুন্দর ও দুর্দান্ত ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন যা অতিসম্প্রতি কোন জাপানী পরিচালকের ছবিতে দেখা যায় নি। নগ্ন দৃশ্যগুলোকে তিনি এমনভাবে ফর্মের সঙ্গে ব্লেন্ড করেছেন দেখলে অবাক হতে হয়। ওর অপর ছবি 'দি বয়' আবার একবারে উল্টো চরিত্রের। টাকা উপার্জনের জন্য বাবা-মা ছেলেকে কি রকম বিপজ্জনক পথে নামিয়ে দেয় তাই নিয়ে গল্প। চলন্ত গাড়ীর সামনে পড়ে গিয়ে আঘাত পাবার অভিনয় করতে হয় তাকে।

গড ফাদার

বাবা-মা এসে গাড়ীর মালিককে পুলিশের ভয় দেখায়। বেচারী তখন ভয়ের চোটে মোটা টাকা দিয়ে আপোষ করে। সারা জাপান জুড়ে ছেলেকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বাবা-মা। দু'একবার পুলিশের নজরে যে পড়ে নি তা নয়। শেষ পর্যন্ত এক দুর্ঘটনায় ছেলেটিই বেঁকে বসে। সাত্যকারের ঘটনা নিয়েই নাকি এই গল্প। ওশিমা সারা ছবিতে একটা বিষণ্ণ সুর যেন বাজিয়ে রেখেছিলেন। ক্যামেরা গ্লেসিং ফ্রেম কম্পোজিশনেও বহু সময় চরিত্রগুলোকে এক কোণে রেখেছেন। ওঁর দুটি ছবিতেই এই ব্যাপারটা লক্ষ্যণীয়।

এলিও পেত্রির ওয়ার্কিং ক্লাস গোজ টু প্যারাডাইস একটি স্যাটায়ারধর্মী ছবি, লেবাননের লেড অফ দি ব্ল্যাকমুন কোন উৎসবের উপযুক্ত কিনা সন্দেহ। মরক্কোর ট্রেসেস ডকুমেন্টেশন চিত্রায়ণে প্রশংসার দাবী রাখে। ১৯৬২ সাল থেকে একটি পরিবারের উত্থান-পতন দেশের রাজনৈতিক ক্রম বিবর্তনকে পরিচালক তুলে ধরেছেন। অন্যান্য ছবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পেপারচেজ দি মামি চ্যাপলিনের মর্ডান টাইমস সার্কাস সুভাষ দত্তের আয়না ও আরও কিছু।

সব চাইতে মজার ব্যাপার সুইডিশ রেট্রোস্পেকটিভের মাত্র দুখানা ছবি দেখতে পেয়েছি আমরা (সুইডিশ লাভ স্টোরি এলভিরা ম্যাডিগান ইরানের কোন ছবিই দেখতে পাই নি। দেখি নি বার্লিন থেকে আনা ইয়ং ফোরামের একটি ছবিও। (পি আই বি যখন কোন বন্দোবস্ত করলেন না তখন টিকিট কেটে দু-একটা ছবি অবশ্য দেখতে হয়েছে।) ছ সপ্তাহব্যাপী এই চলচ্চিত্র দর্শকদের তেমন মন ভরাতে পারল না প্রথমত ছবির নির্বাচনের জন্য। দ্বিতীয় আদ্যন্ত অব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতাকেও ম্লান করে দিয়েছে বহু ঘটনায়। আশা করা যায় আগামী উৎসব এই উৎসব থেকে কিছু শিখতে পারবে।" বিশেষ করে সাংগঠনিক ব্যাপারে।

উৎসবের টুকিটাকি

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির নিয়মানুযায়ী কোনো ছবির প্রযোজকের অনুমতি ব্যতিরেকে তিনটির বেশী প্রদর্শনী করা যায় না। ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ বহু ছবির বিশেষ করে ইনফরমেশন বিভাগের বিশেষ কয়েকখানি ছবির পুনর-কুড়িটি প্রদর্শনী করেছেন। শোনা গিয়েছিল সবক্ষেত্রে নাকি প্রযোজকের যথাযথ অনুমতি নেওয়া হয়নি। একটা প্রশ্ন— কাদের জন্য এতবার এক-একটি ছবির প্রদর্শনী হয়েছে?

*

বিজ্ঞান ভবনের সান্ধ্য প্রদর্শনীতে প্রতিদিন দেখানো হতো ইনফরমেশন বিভাগের বিখ্যাত ছবিগুলো। সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। নীচের তলার প্রায় পাঁচশো আসন সংরক্ষিত থাকত বিদেশী অতিথিদের জন্য। কিন্তু যতদূর জানা গেছে অতিথিদের প্রায় অর্ধেক লোক আসতে পারতেন না কারণ প্রতিদিনই কোনো না-কোনো আপ্যায়ন অনুষ্ঠানে তাঁরা ব্যস্ত থাকতেন। ঐসব আসনগুলোয় কারা বসতেন জানেন? শুনেছি বড় বড় আমলা এবং তাঁদের বাড়ীর সুসজ্জিত মেয়েরা।

*

পেয়ারেলাল ভবন ও মহারাষ্ট্র রঙ্গায়নে সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে প্রতিদিন যে দু তিনটি প্রদর্শনী হতো সেখানে সাংবাদিক থাকতেন সর্বসাকুল্যে একশর বেশী নয়। বাকি দু তিনশ আসন কারা দখল করে থাকতেন জানি না,

তবে বহুদিনই দেখেছি দু বছরের বাচ্চা কোলে কয়েকজন মহিলাকে। ছবির প্রদর্শনীর সময় একাধিকবার সেইসব অবুঝ শিশুগুলি অন্ধকারে তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়েছে তীব্র চিৎকারে।

*

উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উৎসব কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত দেড়শ সাংবাদিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। নীচের সমস্ত আসনগুলি বিতরণ করা হয়েছিল বিদেশী অতিথি অভ্যাগত এবং মন্ত্রী মহোদয়দের জন্য। বেশীর ভাগ সাংবাদিকদেরই আসন জুটেছিল তিন তলায়, যেখান থেকে মঞ্চের কাজকর্ম দেখতে বায়নাকুলারের প্রয়োজন। তাও সকল সাংবাদিকরা নিমন্ত্রণ পান নি। ওপরে আসন দেবার প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠ একটি ইংরেজী সিনেমা সাপ্তাহিকের দিল্লী প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে আসেন নি।

*

'আলমা' ছবির পরিচালক জেলিতো ভিয়ানিকে সাংবাদিক সম্মেলনে জনৈক সাংবাদিক বলেছিলেন 'আপনার ছবির নায়িকাকে তো যেন বিকারগ্রস্ত মনে হচ্ছিল —আপনি কি বলেন?' জবাবে ভিয়ানি বলেছিলেন—আপনার মনে হতে পারে, কিন্তু আমি সেভাবে চরিত্রটিকে পিকচারাইজ করেছি বলেতো হয় না। আপনি আপনার নিজের চোখ দিয়ে যা বুঝেছেন সেটাকে আমি কিভাবে অ্যানালাইজ করতে পারি বলুন!'

*

পরিচালক লগোসি ওর্শমার বিতর্কিত দুখানা ছবি দেখার পর তার সম্পর্কে জানার প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল সাংবাদিকদের। কিন্তু ইংরেজী ভাষা ওর্শমার জানা না থাকার আলোচনা বেশীক্ষণ চালানো যায় নি। দোভাষী হিসাবে মাদাম কাওকিয়াতা সম্ভবত বয়স্ক হয়ে যাবার দরুন ঠিকমত কাজ করতে পারছিলেন না। জাপানী দূতাবাসের লোকেরা তখন কোথায় ছিলেন কে জানে?

×

মার্কেটিং বিভাগের ছবিগুলো সাধারণত দেখানো হতো ফিল্ম ডিভিশন অডিটোরিয়াম, আর্মড ফোর্সেস অডিটোরিয়াম ও ডি-টি-এ হলে। প্রথম সপ্তাহের স্ক্রিনিং প্রোগ্রামে অল্প কিছু অদল বদল হলেও দ্বিতীয় সপ্তাহের কোনো অনুষ্ঠান সূচী ছিল কিনা সন্দেহ। অভিযোগ আছে বহু অডিটোরিয়ামেই নির্ধারিত ছবি নির্ধারিত দিনে বা সময়ে দেখানো হয় নি। ফিল্ম ডিভিশন অডিটোরিয়ামে আঁদ্রে ওয়াইদার 'হাণ্টিং ফ্লাইজ' অর্ধেক দেখানোর পর বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুনতে পাওয়া গেছে ক্রেতা বা বিক্রেতার অনুপস্থিতির জন্যও নাকি বহু প্রদর্শনী বাতিল হয়েছে।

'কবির নায়িকা ঝুমুর গাঙ্গুলী কলকাতার নয়, দিল্লীর মেয়ে একথা জানেন নিশ্চয়ই। উৎসবের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন পার্টিতে তাঁকে দেখা গেছে একাধিকবার। কখনও রাজকুমার কখনও রাজকাপুর কখনও

পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কনিষ্ঠা জুরী অপর্ণা সেন বিশেষ জুরী পুরস্কার 'দি গোল্ডেন বেংগল টাইগার' তুলে দিচ্ছেন ভারতস্থ ফরাসী দূতের হাতে।

বা রাজেন্দ্রকুমারের সংগে। আলাপ জমলে আড্ডার সময়কাল বেড়ে ঘণ্টাখানেকও হয়ে যেত অনেক সময়।

•

শোনা যাচ্ছে আগামী ভবিষ্যতে ভারতে হয়তো বা আর কোনো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নাও হতে পারে। ফিয়াফের (যাঁরা এই ধরনের উৎসবকে স্বীকৃতি দেন) সম্পাদক মহাশয় দিল্লীতে বসে যে সমস্ত অনাচার অবিচার দেখেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এই রকমই। নিয়মবহির্ভূত ছবির একাধিক প্রদর্শনী, উৎসব কর্তৃপক্ষের নিদারুণ বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ ইত্যাদি কোনো ব্যাপারেই তিনি যথেষ্ট তুষ্ট নন। সুতরাং ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক উৎসব সকলকে স্বাগত জানালেও উৎসব আদৌ হবে কিনা কে জানে!

উৎসবের ফলাফল

পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ দিন (১২ জানুয়ারী) বিজ্ঞান ভবনে বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান শ্রীসত্যজিৎ রায় পুরস্কার বিতরণ করলেন। পুরস্কারগুলো ঘোষণা করেন বিচারকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য ফ্র্যাংক কাপরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে যেসকল বিদেশী অতিথিরা মঞ্চে উঠে মন্ত্রী আই কে গুজরালের সংগে পরিচিত হন তাদের মধ্যে ছিলেন মিঃ তাপাক, মিঃ যুহুর, মিঃ ভ্যানকুরভা ও মিঃ ব্রেনজিল (চেকোশ্লোভাকিয়া), জাঁ ত্যোজেৎ, জাঁ লোসিরে (ফ্রান্স), ফ্রান্সিজ জোহরো (জি ডি আর), শ্রী ও শ্রীমতী সামতানি (ইন্দোনেশিয়া), আলি আব্বাস, আমীর নাদেরি, আব্বাস হানারবার (ইরান), মাদাম কাওকিয়াতা (জাপান) এস এ এলগেবেদে ও আই এ আওলেসি (নাইজিরিয়া) ব্রায়ান ব্যাক্সটার, ম্যারি সীটন, চার্লস কুপার, শ্রী ও শ্রীমতী মাইকেল ইয়র্ক (ইউকে), সুশান চার্কিট, কনরাড রুকস, বেটি ডানবি (ইউ এস এ), নাতালিয়া বন্দরচুক, এন এস মিখারকলভ (রোশিয়া), আতেফ সালেম, কারিমা মোখতার, নুর এল সরিফ ও মোসেন ইওসুফ (মিশর) হাসান ইমাম ও শ্রীহোসেন (বাংলাদেশ), অমরনাথ জয়তিলক, শ্রীগুরুরত্না (শ্রীলঙ্কা) এবং আরও কয়েকজন।

তারপর শুরু হয় পক্ষকালব্যাপী উৎসবের ওপর তোলা ডকুমেন্টারী একটি ছবি দেখানো। সেই সংগে সাউন্ডট্র্যাকে ছিল বিদেশী অতিথিদের মতামত। পুরস্কার বিতরণ শুরু হয় ছবিখানি দেখানোর পর। ফলাফল নিম্নরূপঃ

সেরা ছবির জন্য স্বর্ণময়ূর পেয়েছে হাঙ্গেরীর 'ড্রিমিং ইয়োথ' (জোনস রোসা)। সেরা পরিচালকের জন্য রৌপ্যময়ূর পেয়েছে ব্রাজিলের ছবি 'আলমা'র পরিচালক জেলিতো ভিয়ানি, সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসাবে রৌপ্যময়ূর পেয়েছে যথাক্রমে ইরানের বেহরুজ ভাপেঁাঘ (টাংগাসির) ও ইউ এস এর বারবারা স্ট্রাইসণ্ড (দি ওয়ে উই আর)। স্বল্পদৈর্ঘ্যের সেরা ছবি হিসাবে স্বর্ণময়ূর পেয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ার 'দি অটোমেটিক'। রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ময়ূর পেয়েছে যথাক্রমে ঈজিপ্টের 'পার্ল অফ দি নীল' ও ফিনল্যান্ডের '১৮৯৫—হাউ দি মভিজ মুভ'।

—নির্মল ধর

শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সঙ্গে

সদ্যসমাপ্ত পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ফলাফল নিয়ে প্রচুর যুক্তিতর্কের অবকাশ থাকলেও যে পুরস্কারটি সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত ছিলেন সেটি হোল শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার। ব্রাজিলের ছবি 'আলমা' দেখার পরই আমরা অনেকেই নিশ্চিত ছিলাম পরিচালক জোসে তা ভিয়ানার কাজ স্বীকৃতি পাবেই, পেয়েছেও। দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজারো ভিড়ে খুব কাছাকাছি থেকে কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হয়নি।

ক'দিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন শ্রীভিয়ানা। ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলার সুযোগ পেলাম কিছুক্ষণ। কাছে থেকে মানুষটাকে দেখার পর শ্রদ্ধা আরও বাড়ল। শ্রেষ্ঠত্বর পুরস্কার পেয়ে তিনি আনন্দিত কিন্তু গুমর নেই কিছুমাত্র। উত্তর-পূর্ব ব্রাজিলের সিয়ারার এক গরীব ঘরে জন্ম ভিয়ানার। ছোটবেলায় ছবি দেখতেন প্রচুর। পড়াশুনোর সময়টা কেটেছে রাজধানী রিও-ডি-জেনিরোতে। মূলত সাংসারিক অনটন মেটাবার জন্যই ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েছিলেন। পাশ করে কিছুদিন বেকারও ছিলেন। ১৯৬৪তে দেশের রাজনৈতিক হাওয়ার বদল হোল, চাকরী পেলেন এক জায়গায়।

কিন্তু বেশী দিন গেল না। বন্ধুবান্ধবরা সবাই মিলে তৈরী করলেন 'সিনেমা নুভো' দল। অনেকটা নতুন ধরনের আন্দোলনের চেষ্টা আর কি! সঙ্গে পেলেন গ্লাবার রোসা আর ওয়াল্টার লিমেকে। প্রথমে ছবিতে প্রোডিউসার রোসা আর লিমে ছবি করতেন। টাকা পয়সার হিসেব রাখার দায়িত্ব ছিল ভিয়ানার। রোসার বিখ্যাত দুখানা ছবি 'তেরা এম ট্রান্স' ও 'আন্তোনিও দাস, মোর্তেস' ছবির প্রযোজক শ্রীভিয়ানা।

ছবি প্রযোজনা করতে করতেই ভাবলেন 'মন্দ কি যদি ছবি করি'। মনের ভাবনা বাস্তবায়িত হোল ১৯৭০য়ে। প্রথম ছবি 'মাই সুইট হার্ট' করলেন এই বছরে। খুব একটা সফল হলেন না তিনি। অবশ্য সেজন্য দমে যান নি। ১৯৭২য়ে আবার একখানা ছবি করলেন। নাম 'দি সুইট স্পোর্ট অফ সেক্স'। দারুণ পয়সা পেল ছবিখানা। 'কোন্ জাতের ছবি' জানতে চাওয়ায় বললেন 'সেক্সি কমেডি বলতে পারেন।'

১৯৭৪য়ে এলো 'আলমা'। এ-ছবিতে তিনি আন্তরিকভাবে পরিচালক। অর্থকরী সাফল্যের কথা ছবি করার সময় একবারও মনে আসে নি। 'একটা ভালো পরিচ্ছন্ন সুন্দর ছবি করবো এইটাই আমার মাথায় ছিল সর্বক্ষণ।' ছবিকে তিনি শুধুমাত্র প্রমোদ মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহার করতে চান না। অন্য কোন্ উদ্দেশ্য থাকে জানতে চাইলে শ্রীভিয়ানা বললেন 'না শুধুমাত্র হৈ-হুল্লোড় করার জন্য ছবি করবো এ ব্যাপারটা কখনই মাথায় আসে নি। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও আবেগ আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। বলতে পারেন এগুলো প্রকাশ করার জন্যই আমি ছবি করি।'

ব্রাজিলের ছবির গুণগত মান নাকি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ছবি সংখ্যায়ও খুব কম। বছরে পাঁচশোখানা ছবির মধ্যে আমেরিকান ছবির সংখ্যা তিনশোর কম নয়। শ্রীভিয়ানা বললেন—'আমেরিকা এমন অনেক ছবি তৈরী করে যা কোন দিনই খোদ আমেরিকাতেই রিলিজ হয় না। বিদেশের বাজারে ছাড়বার জন্যই সেই সব ছবি তৈরী। এই তিনশোর বেশী আমেরিকান ছবির ভিড় ঠেলে ব্রাজিলের ছবিকে জায়গা করে নেওয়া বুঝতেই পারছেন কেমন কষ্টকর!' সেই কারণেই ব্রাজিলের বেশীর ভাগ ছবিতেই ফুটে ওঠে দেশের নিজের সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার ছাপ। নতুনত্ব না থাকলে পাল্লা দেওয়া তো অসম্ভব। এর ওপর আবার আছে সেন্সর বোর্ডের কড়াকড়ি। রাজনৈতিক সেন্সরশিপের চাপটাই নাকি খুব বেশী।

এতসব বাধা নিষেধ এড়িয়েও ব্রাজিলের চলচ্চিত্র জগতে নতুন ধরনের ছবি করার প্রবণতা বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং বেড়েছে। শ্রীভিয়ানা স্কোভের সঙ্গে বললেন—'রাজনৈতিক কড়াকড়ি এমন যে আমাদের কিউবায় যাওয়া নিষেধ। আমাদের পাশপোর্টে পরিষ্কার করে লেখা আছে 'নট ফর কিউবা'। ওদেশ আমাদের কাছে ফরবিডন।'

তিনি অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে যাতায়াতের সুবাদে কিউবার একাধিক ছবি দেখেছেন। ভালো লেগেছে। দিল্লীতে 'গিবন' দেখতে পান নি। (আমরাও পাইনি। উৎসবের শেষ দিন গ্লাজাতে এই ছবির দুটি প্রদর্শনী ছিল। কিন্তু জানি না কি কারণে শেষ মুহূর্তে সেখান থেকেও সেই ছবি তুলে নিয়ে 'গড্-ফাদার' দেখানো হয়েছে।) পরিচালকের রাজনৈতিক মতাদর্শ তাঁর শিল্প-সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে কিনা জিজ্ঞেস করতে বললেন—বোধ হয় কিঞ্চিৎ করে। কারণ একটা জায়গায় তাঁকে এসে থেমে যেতে হয়। এগোবার থাকলেও এগোতে পারেন না।'

চার-পাঁচ দিন কলকাতায় ছিলেন শ্রীভিয়ানা। খুব ঘুরেছেন। ট্যালি থেকে টালা বাদ দেন নি কিছু। সময়াভাবে অবশ্য স্টুডিও পাড়ায় যেতে পারেন নি। 'সোনার কেল্লা' 'কোরাস' দেখেছেন। পরদিন সকালে ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' দেখবেন শুনলাম। কলকাতা শহর আর মানুষজনদের কেমন লাগছে জানতে চাওয়ায় একগাল হাসি মুখে নিয়ে বললেন, 'এই না হলে শহর! লাইফ আছে বটে কলকাতায়! আর লোকদের তো তুলনাই নেই। অনেক বেশী হিউম্যান মনে হয়েছে এখানকার লোককে। দিল্লী তো এর কাছেই লাগে না।'

—নি ধ

শিউলি মুখার্জি

দিক্ষাগৃহ

গানের মাস্টার অশোক তার ছাত্রী বাসন্তীকে নিয়ে দিল চম্পট। কলকাতা ছেড়ে বোলপুরের দিকে। খবরটা জানাজানি হতে পুলিশ অতঃপর পরিচালক তপন সিংহ তাঁর ইউনিটসহ। গানের মাস্টার গান শেখাবার ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রীকে প্রেম নিবেদন করেছে। ব্যাপারটা ছাত্রীরও বেশ ভাল লেগেছে। ক্রমশ জমে ওঠে। প্রেমে একেবারে হাবুডুবু অবস্থায় এসে ওরা দেখল গতিক সুবিধের নয়। বাপেরা জানতে পারলে সাংঘাতিক এক কাণ্ড ঘটবে। কিছুতেই মেনে নেবে না। প্রেম ভালবাসা ইত্যাদির দফা রফা হবে। অতএব সরে পড়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। ধরা ছোঁয়ার নাগালের বাইরে আসতে হবে। তাই ওরা এলো এক অজ পাড়াগাঁয়ে। ট্রাম নেই বাস নেই বাবা নেই মা নেই মানুষ নেই পুলিশ নেই কিছু নেই। শুধু ধু-ধু মাঠ। মাথার ওপরে নীল আকাশ। খাঁচার পাখী বন্ধন-মুক্ত অবস্থা হলে যা হয় ওদের তাই হয়েছে। কখনও দৌড়াচ্ছে। কখনও চুপটি করে বসে পড়ছে। কখনও গান করছে:

এমনি করে যদি চলতে পারি
এমনি করে যদি গান গাইতে পারি

এমনি করে যদি বলতে পারি...তোমায়
ভালবেসেছি।
এ জীবনের যত কথা
গান হয়ে আজ আকাশে বেড়ায়
এ জীবনের যত ব্যথা
দূর হয়ে যায় সুরের ছোঁয়ায়।
সব ছেড়ে হায় কোন সাঝের বেলায়
তোমার কাছে এসেছি...

গান শেষ হতেই পুলিশের আগমন। এতক্ষণ ধরে ওরা যে স্বর্গ রচনা করেছিল সেটা অকস্মাৎ ভেঙ্গে চুরে একাকার হল। এত আনন্দের মধ্যে কোথা থেকে কয়েক ফোঁটা চোখের জল। শুটিং দর্শনার্থীরা পর্যন্ত অনুভব করতে পারছিলেন। সবাই কেমন যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

এদিকে পরবর্তী শটের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধান সহকারী পরিচালক বলাই সেন শুটিং জোন ক্লিয়ার করার জন্য হাঁক ছেড়েছেন। সহকারী পরিচালক বিবেক বকসী এবং নিমাই রায় দুজনেই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটলেন সেদিকে। গানের মাস্টারের ভূমিকায় ভীষ্ম গুহঠাকুরতা এবং ছাত্রীঃ সোনালী গুপ্ত—দুজনেই পরিচালক শ্রীসিংহের কাছ থেকে পরবর্তী শট বুঝে নিচ্ছিলেন। ভীষ্ম ওর ভাল নাম ডাক নাম মিঠু। মিঠুর প্রথম ছবি রাজা। এই ছবিতে মিঠু একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রূপদান করেছে। শোনা যায় অসাধারণ অভিনয় করেছে। সোনালী সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। আলোকচিত্রশিল্পী পরিচালক দীনেন গুপ্তের কন্যা। প্রথম প্রতিশ্রুতি ছবিতেই প্রথম অভিনয়। দর্শকরা পছন্দ করলেও এতদিন সোনালী পড়াশোনার জন্য ছবিতে কাজ করতে পারেনি।

এই লোকেশানেই পরিচালক তপন সিংহ এই ছবি হারমোনিয়াম এর দৃশ্য গ্রহণ শুরু করলেন। কাহিনী এবং চিত্রনাট্য রচনা পরিচালকের নিজের। গল্প সুরু হচ্ছে এক জমিদার বাড়ির আসবাবপত্র নিলামকরণ কেন্দ্র করে। একমাত্র উত্তরাধিকারী একজন মধ্য বয়স্কা বিধবা বিমলা। আসবাবপত্রের মধ্যে একটি পুরোনো হারমোনিয়াম ছিল। বিমলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করুণভাবে লক্ষ্য করছিলেন হারমোনিয়ামটি। স্মৃতিপটে ভেসে আসে...বাবা জমিদার ভূপেন্দ্রকিশোর ছিলেন একজন বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক। তিনি

বলাই সেন, সোনালী গুপ্ত, তপন সিংহ ও ক্যামেরাম্যান বিমল মুখার্জি

ভীষ্ম গুহঠাকুরতা ঃ সোনালি গুপ্ত

তিনি তাঁর নিজের মত করে বিশেষভাবে তৈরী করেছিলেন এই হারমোনিয়ামটি। কত জলসার কথা মনে পড়ে। আহা! কি সুন্দর ছিল সেই নৌকাভ্রমণ। দল বেঁধে সব যাওয়া হত সব গান করতে করতে।...

...সময় গড়িয়ে চলে। বিমলার বাবা একদিন ইহলোক ত্যাগ করেন। অন্যান্য জমিদারদের মত ভূপেন্দ্রকিশোরও বেশ কিছু ধার দেনা করে গিয়েছিলেন। ধার জন্য বাধ্য হয়েই বিমলাকে এসব বিক্রী করতে হচ্ছে।

সর্বপ্রথম হারমোনিয়ামটি ক্রয় করলেন একজন সাধারণ লোক। মধ্যবিত্তই বলা যায়। তিনি তাঁর মেয়েকে গান শেখানোর জন্য এটা কিনলেন। কারণ তাঁর ধারণা মেয়ে একটু-আধটু গান না জানলে সুপাত্র পাওয়া যাবে না। হারমোনিয়াম আনবার কয়েকদিনের মধ্যে একজন গানের মাস্টার এলেন এই বাড়িতে। তরুণ এই শিক্ষক গান শেখাতে শেখাতে ছাত্রীর প্রেমে পড়লেন। ইতিমধ্যে মেয়ের জন্য বাবা পাত্র স্থির করে ফেলেছেন। তখন কোনো উপায় না দেখে শিক্ষক ছাত্রীকে নিয়ে পলায়ন করলেন। পড়ে রইল হারমোনিয়াম।

আপাততঃ এই অংশ তোলা হচ্ছে। শিক্ষকের বাড়ি এবং ছাত্রীর বাড়ি—দুটি সেট নির্মাণ করা হয়েছে। স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে বোলপুরের কাছে বহির্দৃশ্য গ্রহণ শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে। এছাড়াও অবশ্য জয়দেবের কেন্দুলি মেলাতে ছোট একটি অংশ চিত্রায়িত হয়। এরপর হারমোনিয়াম যেখানে যেখানে বিক্রি হচ্ছে সেখানে সেখানে শুটিং। হারমোনিয়াম আসছে এক বারবনিতার ঘরে। আসছে এক তরুণ দম্পতির কাছে। তিনটি পর্যায়ে গল্প বিভক্ত। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেনঃ সমিত ভঞ্জ স্বরূপ দত্ত অনিল চট্টোপাধ্যায় আরতি ভট্টাচার্য কালী বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষ দত্ত গীতা নাগ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় শিউলি মুখোপাধ্যায় অরুণ মুখোপাধ্যায় কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ছায়া দেবী শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ত মুখোপাধ্যায় প্রেমাংশু বসু দেবিকা দাশ দিলীপ বসু শম্ভু ভট্টাচার্য প্রভৃতি। মিউজিকাল কমেডি উইথ সাম সোস্যাল কমেন্টস এই বলা যেতে মোটামুটি ছবির বিষয়বস্তু। গানের বিশেষ ভূমিকা এ ছবিতে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শ্রীসিংহ নিজে। কয়েকখানা গান রেকর্ড করা হয়েছে। কণ্ঠদান করেছেনঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনুপ ঘোষাল তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হৈমন্তী শুক্লা। শেষোক্ত দুজনের গাওয়া একটি গান পিকচারাইজ করা হয়েছে। প্রায় সব কটি গান লিখেছেন সঙ্গীত পরিচালক। একটির রচয়িতা শ্যামল গুপ্ত। ছবিখানি প্রযোজনা করছেন শ্রীপ্রতাপ আগরওয়াল এবং আর এ জালান। দুজনেই প্রখ্যাত ব্যবসায়ী। একজন দার্জিলিং-এর আরেকজন ওড়িশার। এঁরা এই ছবির মাধ্যমেই চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হলেন। আশা করছেন শুধু প্রযোজনা নয় পরিবেশনার দায়িত্বও গ্রহণ করবেন। ভবিষ্যতে হিন্দী চিত্র প্রযোজনার কথা ভাবছেন।

হারমোনিয়াম-এর কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেনঃ বিমল মুখোপাধ্যায় (আলোকচিত্রশিল্পী) সুনীতি মিত্র (শিল্পনির্দেশক) সুবোধ রায় (সম্পাদক) ঝিন্টু দত্ত বীরেন মুখার্জী (সহকারী আলোক চিত্রশিল্পী) শক্তি সেন (রূপশিল্পী) রতন চক্রবর্তী (প্রধান ব্যবস্থাপক) প্রভৃতি।

এই বোধকরি প্রথম একই কাহিনী নিয়ে প্রায় একই সঙ্গে দুখানি ছবি হচ্ছে। কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল। এই নামে প্রবীণ চিত্র পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় চিত্রনির্মাণের কাজ আগে শুরু করেছেন। তাঁর নির্বাচিত শিল্পী রোহিনী মিঠু মুখোপাধ্যায়। গোবিন্দলালঃ খুব সম্ভবত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। হরলাল দিলীপ রায়। অন্যদিকে দীনেন গুপ্ত রোহিনী নামে এই কাহিনীতে ছবি করছেন। এখানে রোহিনী সুচিত্রা সেন। গোবিন্দলাল রঞ্জিত মল্লিক। হরলাল দিলীপ মুখোপাধ্যায়। কার্তিকবাবুর ছবিতে ভ্রমর হয়তো সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। দীনেনবাবুর ছবিতে কন্যা সোনালী। চলতি সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে রোহিনীর অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। দেখলাম খড়কুটো দিয়ে একটি মাটির ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ঘরের একদিকে ট্রলি লাইন তার ওপরে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। একটি নিরুচ্চার দৃশ্য ক্যামেরায় ধরে রাখা হল। রঞ্জিত সুচিত্রার চোখে চোখ রাখলেন—গোবিন্দলাল রোহিনীর মধ্যে ডুবে যেতে চাইলেন। এখানে নাটক অন্তর্নিহিত। ছায়াছবির ভাষা শিল্পবোধ এবং অঙ্গ রচনার রীতিনীতি একাত্ম। ফলে দৃশ্যটি উপস্থিত সকলের মনের মধ্যে চিরস্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারল।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

স্টুডিও সংবাদ

বর্তমানে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ 'বাঘবন্দী' ছবির শেষ পর্যায়ের শুটিং হচ্ছে। অসীমা ভট্টাচার্য নিবেদিত এ ছবি পরিচালনা করছেন পীযূষ বসু। প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে স্বরচিত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন শ্রীবসু। কেন্দ্র চরিত্রের শিল্পী উত্তমকুমার। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করছেন: সুপ্রিয়া দেবী অসিতবরণ গীতা দে দিলীপ বসু রসরাজ চক্রবর্তী পার্থ মুখোপাধ্যায় এবং মহুয়া রায়চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ করছেন: গণেশ বসু। শিল্প নির্দেশক: সূর্য চট্টোপাধ্যায়।

প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক অজয় কর বেশ কিছুদিন নীরব থাকার পর নতুন ছবি নিয়ে ফ্লোরে আসছেন ফেব্রুয়ারী মাসে। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' চিত্রায়িত করতে উদ্যোগী হয়েছেন শ্রীকর। সলিল সেন চিত্রনাট্য রচনা করছেন। সাত পাকে বাঁধার সেই আলোড়ন সৃষ্টি-কারী জুটি সুচিত্রা সেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন নায়িকা-নায়কের ভূমিকায়। চিত্রলিপির ব্যানারে এ ছবি নির্মিত হতে চলেছে। চিত্রগ্রহণ করবেন: বিশু চক্রবর্তী। সুরসৃষ্টি করবেন: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'আমি সে ও সখা'র কাজ শেষ করে পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী নতুন ছবি শুরু করে দিয়েছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কাহিনী 'সাঁকোর ঘাটে' অবলম্বনে এই ছবির নামকরণ করা হয়েছে 'আনন্দমেলা'। প্রধান কয়েকটি চরিত্রের শিল্পী উত্তমকুমার আরতি ভট্টাচার্য তিলক চক্রবর্তী মহুয়া রায়চৌধুরী এবং অনুপকুমার। চিত্রগ্রহণ করছেন: বিজয় ঘোষ।

তরুণ চিত্র পরিচালক ইন্দর সেন তাঁর চতুর্থ ছবি 'অসময়' (কাহিনী: বিমল কর)-এর দৃশ্য গ্রহণ শুরু করেছেন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। দুদিনের সিডিউলে অংশ গ্রহণ করেছেন নায়িকা অপর্ণা সেন কণিকা মজুমদার এবং নিমু ভৌমিক। একদিন বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয় রঞ্জি স্টেডিয়াম এবং ভিকটোরিয়াল মেমোরিয়াল হলের আশে-পাশে। এখানে অংশ গ্রহণ করেন: কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় প্রণব চট্টোপাধ্যায় স্বরূপ দত্ত এবং মহুয়া রায়চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ করছেন: শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনায় আছেন: সুবোধ দাস। সম্পাদনা করবেন: অরবিন্দ ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন: আনন্দশংকর। কয়েকখানি গান রেকর্ড করা হয়েছে। কণ্ঠ দান করেছেন অনুপ ঘোষাল এবং প্রতিমা

অসময়
স্বরূপ দত্ত।মহুয়া রায়চৌধুরী। পরিচালনা ইন্দর সেন। ফটো: অমৃত

মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুটিং হবে ফেব্রুয়ারী মাসে।

ফেব্রুয়ারী মাস থেকে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে রূপসী পিকচার্সের ব্যানারে জয়াসুন্দর 'মসীরেখা'র চিত্রগ্রহণ শুরু হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন: সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালক সলিল সেনের সুযোগ্য সহকারী। প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করছেন সুপ্রিয়া দেবী। বিপরীতে থাকছেন: অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপ রায়। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন: রবীন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ করবেন: কৃষ্ণ চক্রবর্তী। প্রযোজক: হরিদাস সান্যাল।

মঞ্চ সফল 'শনিবারের বিকেল' দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের রচনা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হতে চলেছে। সোনালী ফিল্মস প্রযোজিত এই ছবির প্রাথমিক কাজ কর্ম শুরু হয়েছে। পরিচালনা করবেন: কবি বিশ্বাস। এক সাক্ষাৎকারে শ্রীবিশ্বাস জানালেন শুটিং শুরু হতে কিছু দেরী আছে। এখনও চিত্র নাট্য রচনার কাজ শেষ হয়নি। শিল্পী নির্বাচন হবে ফেব্রুয়ারী মাসে। চিত্রগ্রহণ করবেন: কানাই দে। সম্পাদনা করবেন: অরবিন্দ ভট্টাচার্য।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

রফু চক্র ঋষি কাপুর। নীতু সিং

একদা রাজেশ খান্নার সবসময়ের সঙ্গী সোবার্সের সঙ্গে আংটি বদল করা বুদ্ধিমতী মেয়ে অঞ্জু মহেন্দ্র আবার সংবাদের শিরোনামায় এসেছেন। সম্প্রতি বম্বের জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকায় খোলাখুলি অনেক কিছু বলেছেন। আজকালকার বেশীর ভাগ নায়িকারা মদ খায় সিগারেট খায় যখন তখন বিবস্ত্র হয়। আর পুরানো দিনের নায়িকারা সব কিছুই রেখে ঢেকে করতেন। সকলের সামনে পান খেতেন এটুআটু ফস্টিনস্টি করতেন। অঞ্জু প্রসঙ্গত স্বীকার করেছে আজকাল নায়িকারা সাধারণত যা কিছু করে তার চেয়েও বেশী কিছু সে করে। যেমন গাঞ্জিকা সেবন করে। এ বিষয়ে বম্বেতে তার জুড়ি নেই। ছেলেরা অবশ্য অনেকেই করে। যেমন রাজেশ। বলতে গেলে রাজেশই নাকি ওকে গ্যাঁজা খাওয়া শিখিয়েছে।

রাজেশ ইদানীং ডিম্পলকে ভীষণ ভালবাসে। একমুহূর্ত চোখের আড়াল করতে চায় না। সব সময়ই চোখে চোখে রাখে। একান্ত ঘনিষ্ঠ মহলের খবর রাজেশ আজকাল ডিম্পলকে সন্দেহ করে। মাঝে মাঝে ডিম্পলের টেলিফোন আসে। একদিন নাকি রাজেশ ইচ্ছে করে লাইন কেটে দিয়েছিল। জানতে পেরে ডিম্পলের কি ভীষণ গোঁসা। তার জন্য অবশ্য রাজেশকে স্বীকার করতে হয়েছে 'আমি অন্যায় করেছি' এইভাবে ডিম্পল-রাজেশ খিসসা মানে ওদের কাহিনী বেশ জমে উঠেছে।

শত্রু ইদানীং সবাইকে চমকে দিয়েছে। এক বছরে দুবার জন্মদিন পালন করেছে। একবার নাকি ভুল করে সবাইকে নেমন্তন্ন করে বুঝতে পেরেছিল ঠিক হয়নি। দিনটা অনেক পরে। সেইমত সে এবার বেশ ঘটা করে নেমন্তন্ন করেছিল। শত্রুর জন্মদিনের পার্টিতে মিত্ররা সকলেই এসেছিল। এসে সবাই বুদ্ধু। কিছুক্ষণ পরে শত্রু সকলের চোখে ধুলো দিয়ে বেপাত্তা। নিমন্ত্রিত সকলের মধ্যে তখন তীব্র আলোচনা। কোথায় গেল শত্রু? ততক্ষণে শত্রু কানপুরে। সঙ্গে একজন নায়িকা। বিলাস বহুল হোটেলে রাত কাটিয়ে পরদিন আবার বম্বেতে। শত্রুর সঙ্গে সেদিন নায়িকা কে ছিল? নামটা এখনো জানা যায়নি।

বম্বের তারকা খচিত আকাশে অনেকেরই ধারণা হয়েছে রাজেশের টানেই নাকি মমু বা মমতাজ আবার দেশে ফিরে এসেছে। কিছুদিন আগে ময়ূরের সঙ্গে বিয়ে হয় মমুর। লণ্ডন প্রবাসী স্বামীর ঘর করতে মমু বিদেশে গিয়েছিল। কিন্তু বেশীদিন ভালো লাগলো না। কারণ ময়ূর নাকি সবসময় ব্যবসা নিয়ে মশগুল থাকে। এই সময় মমু আর কি করে। প্রচুর সিনেমা দেখে। কি কি সিনেমা দেখা হল?

মমুর কাছে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে একটি মাত্র ছবি মার্লান ব্র্যান্ডো অভিনীত লাস্ট ট্যাঙ্গো ইন প্যারিস। এই ছবি দেখে মমু তিন-চার রাত ঘুমোতে পারেনি। দাম্পত্য জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। ফিরে যে আসা হল তা কি স্থায়ী ভাবে?

সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে পর পর কয়েকটা ছবিতে সাইন করেছি কাকার (রাজেশের ডাক নাম) অনুরোধে। তিন-চারটে ছবির কাজ শেষ হলে ঠিক করব। এ ব্যাপারে স্বামী আমাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। যদি ছবি করার ইচ্ছে হয় তাহলে ররাবরের জন্য এখানে থেকে যেতে পারি।...

—অভিজিৎ

নাটমঞ্চ

রূপান্তরীর 'পদ্য গদ্য প্রবন্ধ'

'পদ্য গদ্য প্রবন্ধ' রূপান্তরীর খুব সাম্প্রতিক নাটক নয়, তবু এ নাটক যেন পুরনো হয় না। যেন প্রতিবারই মনে হয় নতুন নাটক দেখছি।

এর বোধহয় একটা বড় কারণ, গল্পের পটভূমি এবং আবেদন।

হানাহানি আজ রাজনীতি থেকে অন্তর্হিত হলেও সমস্যা তো রয়েই গেছে। জীবনের নিশ্চয়তা অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল আগেও যেমন সত্য ছিল আজও তেমনি সত্য। সেদিক থেকেও এ নাটকের আবেদন আমাদের মনকে নাড়া দেয়।

স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র বাদলকে নিয়ে নরেনবাবুর মোটামুটি স্বচ্ছল এবং সুখের সংসার। একান্ত বন্ধু পরিমলের মেয়ে সুনন্দাকে পুত্রবধূ করবেন এমন একটা সুখের আশাও মনে মনে পোষণ করেন তাঁরা।

কিন্তু ছেলে এম-এ পাশ করার পর ক্রমে সংসারে সমস্যা দেখা দেয়। যার মূলে আছে তার বেকারত্ব। কারণ আজকের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপে এবং নরেন-বাবুর চাকুরী জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে আসার পেছনে একটা অনিশ্চয়তার ভাবনা।

ফলে একদিন সংসারে গুটি গুটি আসে অশান্তির ঢেউ। সমস্যা তখন তাঁদের সংসারে সৃষ্টি করে জটিল পরিবেশ।

অন্যদিকে আদর্শবাদী ছেলে বেকার জীবন যাপন করতে করতে বন্ধুর মত এক-দিন নিজের অজানিতেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং বাবা মা ও প্রেমিকার কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

ছেলের এই পরিবর্তন এবং অনিশ্চিত বেকার জীবনযাপনের ফলে দুই পরিবারের মধ্যেই ক্রমে ফাটল ধরে।

এই অস্বস্তিকর পরিবেশের সমাপ্তি টানা হয় ছেলের রাজনৈতিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

নাট্যকার (জোছন দস্তিদার) তাঁর নাটকে কোন পরিণতির কথা বলতে পারেন নি। ফলে নাটকের শেষটুকু সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবনের ইঙ্গিতবহ না হয়ে মর্মান্তিক বিয়োগান্তরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। নাট্যকারের ভাবনার হয়তো সেই উত্তরণের কথা বলা সম্ভব হয়নি, যা জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য। শুধু সমস্যা এবং আজকের অনিশ্চিত জীবনযাপনের (যার মূল কথাই হোলো অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা) কথাই তিনি নাটকে রেখে গেছেন।

নাটকের শুরু ধুমধাম করে মৃত ছেলের জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে। নরেনবাবু ও তাঁর স্ত্রী এমনি করেই বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন তাঁদের রাজনীতির হাতে নিষ্ঠুর-ভাবে নিহত ছেলের স্মৃতিকে। যাকে কোন-দিন কোন মালিন্য, কোন হিংস্রতা বা ভেঙে পড়া বাহ্যিক বেদনার নির্মম শোক স্পর্শ করতে পারবে না।

এই দৃশ্য প্রথমটা ধরা না গেলেও একটু বাদেই মার কান্না দমন করার এবং স্বামীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে মুখে হাসি টেনে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা থেকেই সেটা ধরা পড়ে। আর তখনই মনটা সহসা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। শানাইয়ের কাঁপা কাঁপা সুর মনের গভীরে অবেগ এবং কান্নার সৃষ্টি করে।

অভিনয়ে প্রথমেই ঝিনি দর্শকের চোখে জল এনেছেন তিনি নায়কের মার চরিত্র-ভিনেত্রী চন্দ্রা দস্তিদার (নিরুপমা)। বলতে দ্বিধা নেই মঞ্চে এমন অভিনয় বিরল বললেও যেন কম বলা হয়। এমন আবেগ-পূর্ণ অথচ সংযত অভিনয় শুধুমাত্র অভিনয় বলে ভাবতে সংশয় হয়। কোন কোন দৃশ্য যেন চোখে লেগে থাকে।

এর পরেই মনকে নাড়া দেয় জোছন দস্তিদারের (নরেন) নির্বিকার অভিনয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে কমল রায় (পরিমল)। এঁরা দুজনে যেন সত্যি সত্যি আমাদের পরিবারের দুটি আদর্শ পিতা এবং একান্ত হৃদয়ের বন্ধুর প্রতীক।

নায়ক বাদলের চরিত্রে শ্যামল সেনগুপ্তর অভিনয়ে নিষ্ঠা আছে। তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেছে টোটাল এফেকটের ক্ষেত্রে। নায়িকা অনামিকা (শিখা রায়)-কে ভাল লেগেছে। আর ভাল লেগেছে মণিকা চক্রবর্তীকে (সুনন্দা)। অভিনয়ে আর আমাদের অবাক করেছেন পার্থ মিত্র, সমীর লাহিড়ী, নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ চক্রবর্তী ও কুমারেশ মুখোপাধ্যায়।

এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে সত্যব্রত সেনগুপ্ত, মদন দেব সুধীন মিত্র ইন্দ্রজিৎ সোম প্রশান্ত ঘোষ, বিপুল চন্দ ও পাপিয়া চক্রবর্তী নাটকের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন।

নাটকের শেষ দৃশ্যটি সুন্দর। মনকে স্পর্শ করে।

তবু সমস্ত নাটকটি দেখার পর দু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। যথা, ছেলে পাড়ায়ই থাকে (যদিও সাবান কোম্পানীর স্ট্রাইকের সঙ্গে বন্ধুর জন্য জড়িত হয়ে পড়ে এবং আত্মগোপন করে) অথচ সে বাড়িতে আসতে না পারাটা কি যুক্তির দিক থেকে স্বাভাবিক? (২) যে মেয়ের পণ সে ঐ ছেলেকে ছাড়া অন্য কারুকে বিয়ে করবে না, এবং প্রায় শেষ পর্যন্তই বাপ-মার যে ব্যাপারে পূর্ণ সম্মতি, সে কি অবস্থার চাপে পড়ে এবং মার সাময়িক (!) উৎকণ্ঠার জন্যে অন্য জায়গায় বিয়েতে রাজি হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া যায়?

জোছনবাবু স্বনামধন্য নাট্যকার। ওঁর একাধিক নাটক এক সময় সাড়া জাগিয়েছে নাট্যসাহিত্যে এবং নাটমঞ্চে। তাই তাঁর কাছে প্রত্যাশা অনেক। (বলা বাহুল্য এ নাটকও আমাদের প্রত্যাশা মিটিয়েছে।) তাই ভরসা করে উপরের প্রশ্ন দুটি উল্লেখ করলাম।

মঞ্চ পরিকল্পনা (শ্যামল সেনগুপ্ত) ও আলোক প্রক্ষেপণ (মনোরঞ্জন ঘোষ) নাটককে অনেকটা বাস্তব ও সজীব করে তুলেছে। রূপসজ্জা (রবীন ভট্টাচার্য) ভাল।

আবহসঙ্গীতের পরিকল্পনা কার জানা নেই। তার প্রয়োগের অবকাশ কম হলেও হৃদয়স্পর্শী।

—নাট্যসমালোচক

'আদাব' ও 'চামচা সমাচার'

সমরেশ বসুর 'আদাব' ছোট গল্পটি এক সময় বাংলা সাহিত্যে ঝড় তুলেছিল। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাকে ভিত্তি করে সমাজের অতি দরিদ্র নিরীহ শ্রেণীর মানুষের গল্প এটি। এর আবেদন সার্বজনীন এবং অবশ্যই চিরকালীন।

সেই অবিস্মরণীয় গল্পের রূপ দিলেন সম্প্রতি দমদমের প্রগ্রেসিভ আর্ট নাট্যসংস্থা।

বলতে বাধা নেই নাটকটি আমাদের ভাল লেগেছে। কিছুক্ষণ সময়ের জন্য দর্শক যেন ফিরে গিয়েছিল সেই অভিশপ্ত দাঙ্গার সময়ে। যখন রাজনৈতিক ঘুঁটি চালাচালিতে বলি হয়েছিল সাধারণ নিরীহ মানুষেরা। যে স্মৃতি আজও সুস্থ মানসিকতাকে পীড়ন করে।

অভিনয়ে মাঝির চরিত্রে অসিত সেন এবং সুতা মজুরের ভূমিকাভিনেতা অজয় চক্রবর্তী সেই দুঃস্বপ্নময় আতঙ্কিত সময়ের পরিবেশ রচনায় অনেকটা সহায়ক। উভয়ের অভিনয়েই আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টার ছাপ স্পষ্ট।

সুন্দর এবং সুষ্ঠু সংলাপের জন্য নাট্যরূপদাতা শুকদেব চট্টোপাধ্যায় অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র।

তবে নাটকে একটু আবেগ বেশী ছিল, যেটা কোন কোন সময়ে অতিনাটকীয়তায় পৌঁছে দিয়েছে অভিনয়কে। এটুকু সংযত করলে প্রগ্রেসিভ আর্ট 'আদাব' পুনরায় অভিনয় করার সময় যথেষ্ট প্রশংসা কুড়োবেন। শেষ দৃশ্যটি সুন্দর।

আলোর কাজ সুন্দর। পটভূমি রচনা ও নাটকের পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

'চামচা সমাচার' এঁদের দ্বিতীয় নাটক। রচনা অসীম ত্রিবেদী।

দুটি পর্যায়ে এর বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। বৃটিশ রাজত্বকাল ও স্বাধীনতার পরবর্তী কাল। উভয় অংশেই নাটকের বক্তব্য ব্যঙ্গাত্মক। সেই প্রভুত্বের নিকট নিবেদিত দাসত্বের মনোবৃত্তি। লেখক যাদের আজকের ভাষায় 'চামচা' বলেছেন।

এমনিতে নাটকটি আমাদের ভাল লেগেছে। কিন্তু উপস্থাপনা এবং সংলাপ (রায়বাহাদুরের মুখে ঘন ঘন ইংরেজী ও বাংলা ভাষা প্রয়োগ ক্লান্তিকর। এই আবেগ বর্জন করেও চরিত্রটিকে বোঝানো যেত বলেই আমার অনুমান।) অনেকাংশে দুর্বল মনে হয়েছে। এটুকু পরিহার করলে নাটক আরও আবেদনমূলক হোত। আর ঐ চরিত্রটিকে পূর্ববঙ্গীয় করা হোল কেন?

অভিনয়ে অসিত সেন (রায়বাহাদুর—লিডার) ভাল। তবে অতি অভিনয়ের ঝোঁক থেকে তিনি মুক্ত নন। (এই চরিত্রের চেয়ে 'আদাব'-এর মাঝি চরিত্রে তিনি অনেক সংযত এবং হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করেছেন)। স্যার—মালিক চরিত্রে সমীর ভট্টাচার্য কিন্তু সুন্দর অভিনয় করেছেন।

অন্যান্য চরিত্রে স্বপন রায়, সুভাষ চক্রবর্তী, অনিমেষ ভদ্র, অজয় চক্রবর্তী, শিবেন্দ্র মণ্ডল অমর চক্রবর্তী ও সুধাংশু সরকারের অভিনয় আন্তরিক।

নাটকের সুর সংযোজনা (তাপস বসু) ও আলো নাটকের পরিবেশ রচনায় পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

—নাট্য সমালোচক

প্রকাশিত এ নাটক পড়লে, অভিনয় দেখলে, বলতেই হবে—শ্রেষ্ঠ নাটক

বয়েজ ওন হলে—রূপমায়া

শনি ৬৸ । রবি ৩-১৫ ও ৬৸

শতাব্দীর সংলাপ

নাটক ও নির্দেশনা : রাখাল দাশ

স্টার

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

ফোন : ৫৫-১১৩৯

প্রতি বৃহঃ ৬॥

শনি, রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥

কুনাল মুখার্জির নতুন নাটক

পরিচয়

• পরিচালনা : বঙ্কিম ঘোষ

• আলো : তাপস সেন

রূপায়ণে : বঙ্কিম, হরিধন, সতীন্দ্র, অমরনাথ, পঞ্চানন এবং শুভেন্দু ও শর্মিতা বিশ্বাস

যাযাবর গোষ্ঠী (দিল্লী) পরিচালক সুবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে গান্ধারের পরিচালক অসিত মুখোপাধ্যায় পুষ্পস্তবক গ্রহণ করছেন।

এ সপ্তাহের ছবি

রাণুর প্রথম ভাগ : রাষ্ট্রপতির পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলা ছবি 'রাণুর প্রথম ভাগ' ৩১ জানুয়ারী থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘরে মুক্তি পাচ্ছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এ চিত্রের পরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—নীরা মালিয়া, কণিকা মজুমদার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসীম চক্রবর্তী।

রফু চক্কর।। এ এ নাদিয়াদওয়ালা প্রযোজিত ও নরেন্দ্র বেদী পরিচালিত 'রফু চক্কর' গত ৩১ থেকে ওরিয়েন্ট, ক্রাউন, মিত্রা ও মেনকাতে প্রদর্শিত হচ্ছে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন কল্যাণজী আনন্দজী। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন—ঋষি কাপুর নীতু সি, রাজেন্দ্রনাথ, ফরিয়াল, মদনপুরী, আসরাণী প্রভৃতি।

শর্মিলা।। শান্তনু মুভিজ পরিবেশিত দেবনারায়ণ গুপ্তের মঞ্চসফল নাটক অবলম্বনে রচিত 'শর্মিলা' মুক্তি পাচ্ছে ৭ ফেব্রুয়ারী শ্রী ও ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে। পরিচালনা সুনীল ঘোষ। সঙ্গীত পরিচালনা—সুধীন দাসগুপ্ত। প্রধান ভূমিকায়—রাজশ্রী শুভেন্দু, দিলীপ, কণিকা, সুলতা, শৈলেন, দীপ্তি চিন্ময় পদ্মা অসিতবরণ সতীন্দ্র ও বাসন্তী চ্যাটার্জি অভিনয় করছেন। নেপথ্য কণ্ঠে আরতি মুখার্জি, বনশ্রী সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

বন্দী বিধাতা মৃণাল মুখার্জি ও অনিল চ্যাটার্জী

বিদেশী ছবি

১৯৭৪ সালের প্রদর্শিত বিদেশী ছবির সালতামামী

ইতিপূর্বে একাধিক লেখায় এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছি যে, কোলকাতায় বিদেশী ছবির প্রদর্শন ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

এর একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই সরকারী নীতি। অর্থাৎ এই বিদেশী ছবির আমদানির পেছনে প্রচুর ভারতীয় মুদ্রা বাইরে চলে যাচ্ছে এবং আমাদের ক্ষেত্রেও বৈদেশিক মুদ্রা খরচের ব্যাপার থেকে যাচ্ছে।

সেদিক থেকে দেখলে অবশ্য বলার কিছু নেই। মুখ্যত চিত্ত বিনোদনের জন্য এই ক্ষতি খুব যে একটা অপরিহার্য তাও নয়।

তবু দীর্ঘ বছর ধরে বিদেশী ছবি দেখার ফলে আমাদের রুচিগত মানসিক গঠন এমন হয়ে গেছে যে সে অভাব অন্য কোন ভারতীয় ভাষার ছবি দিয়েই পূরণ করা সম্ভব নয়।

তার ওপর ক্লাসিক ছবি দেখার আস্বাদন আমরা বিদেশী ছবি দর্শনের মধ্য দিয়েই পেয়ে থাকি। বাংলা বা হিন্দী ছবি দেখে সে অভাব মেটানো প্রায় অসম্ভব একথা অপ্রিয় হলেও সত্য।

তাই বলে একথা নিশ্চয়ই বলি না যে এ দেশে উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরী হয় না। আমাদের মানসিকতা, রুচি এবং বোধকে তুষ্ট করার মত ছবি নিশ্চয়ই তৈরী হয়। তবে বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বিদেশী ছবি আমাদের যেভাবে তুষ্ট এবং তৃপ্ত করে, তেমন নিশ্চয়ই নয়। একথা যে-কোন বিদগ্ধ দর্শকই স্বীকার করবেন।

কারণ শুধু তো হলিউডের ছবিই নয়, ইদানিংকালে এদেশে ফেস্টিভেল ছাড়াই অন্যান্য বহু দেশের ছবি সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শিত হয়েছে। এবং তা দর্শকদের প্রচুর আনন্দও দিয়েছে।

এছাড়া আর এক শ্রেণীর দর্শকদের কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। অর্থাৎ অ-ভারতীয় দর্শক। কোলকাতায় এমন দর্শকের সংখ্যাও তেমন নগণ্য নয়। তাঁদের মনোরঞ্জনের প্রতিও সহজাতভাবেই আমাদের একটা দায়িত্ব থেকে যায়। শুধু বিদেশী বলেই নয়, এদেশে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের জন্য নানা রকমের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এঁদের জন্য তেমন কিছু করার সুবিধা নেই। তাই তাঁদের অবসর বিনোদন ও মনোরঞ্জনের জন্য মুখ্যত এই বিদেশী ছবির ওপরেই নির্ভর করতে হয়।

তাই কোলকাতার চিত্রগৃহগুলিতে বিদেশী ছবি প্রদর্শন হ্রাস হয়ে যাওয়া অর্থে তাদের সেই আনন্দটুকু থেকে বঞ্চিত করা।

এই প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালে কোলকাতার বিদেশী ছবি প্রদর্শনের হলগুলিতে কত-গুলি বিদেশী ছবি দেখানো হয়, তার একটা সালতামামী করা যেতে পারে।

গত বছর কোলকাতায় সর্বমোট ৬০টি বিদেশী ছবি দেখানো হয় নতুন, পুরনো ও রিপিট প্রদর্শন নিয়ে।

এছাড়া কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসব মারফৎও অনেক বিদেশী ছবি দেখার অবকাশ ঘটে-ছিল আমাদের। গত বছর রাশিয়া, পোল্যান্ড, কোরিয়া, ইরান, ক্যানাডা, ইটালী, চেকোশ্লো-ভাকিয়া ও বাংলাদেশ-এর চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে কিছু সরকারী এবং কিছু ফিল্ম ক্লাব ও দুএকটি বিদেশী দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগ দ্বারা উৎসব আয়োজিত।

এছাড়া আর একটি মাধ্যম মারফৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক দর্শক বিদেশী ছবি দেখ-বার অবকাশ পেয়েছে। সেই মাধ্যম হোল সিনে ক্লাব, গিল্ড, সেন্টাল ইত্যাদি অ-ব্যবসায়িক সংস্থাসমূহ।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যেসব ছবি এখানে রিলিজ হয় তার মধ্যে দর্শকদের বিচারে 'দি ফ্রেণ্ড কানেকশান' বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে বিবেচিত হয়। শ্রেষ্ঠ পরিচালনা উপলিয়ান ফ্রেডকিন (দি ফ্রেণ্ড কানেকশান')। এছাড়া বছরের সেরা দশটি ছবির নাম হোল যথা-ক্রমে এ ম্যান কলড্ হর্স, মিডিয়াম কুল, ক্যাচ টুয়েন্টি টু, দি লাস্ট ভ্যালী, কোলড্ সোয়েট, ক্যাট অফ নাইন টেলস, রাইডার অন দি রেন ইরমা ল্যা দ্যুস ক্যাটলো সিক্রেট সেরিমনী। এবং তিনটি উল্লেখযোগ্য শিশুচিত্র হোল—জ্যাক ফ্রস্ট, ফেস্বংস ফর লাইফ এবং মাই সাইড অফ দি মাউন্টেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ১৯৭৪ সালে কোলকাতায় একাধিক রাশিয়ান ছবির ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

উপরোক্ত বিদেশী ছবির সালতামামীর মধ্যে ইউ এস আই এস প্রদর্শিত ছবির (বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শিত) হিসেব ধরা হয়নি।

—শাঃ রঃ চ

অরুণইন্ডাষ্ট্রিজ
৪২, মতি শীল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ড প্লেয়ার
রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়। মেরামতেরও সুব্যবস্থা আছে।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস
৬৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

বিবিধ সংবাদ

প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া : সম্প্রতি কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন একটি আনন্দ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের বাৎসরিক সম্মেলন করলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীতারক দাস এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের প্রচার দপ্তরের দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আনন্দ অনুষ্ঠানে সংঘের সদস্য পান্না সেন কৃত একটি শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র 'আচার্যের পুরস্কার' প্রদর্শিত হয়। পরে একটি মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান শুরু হয় শুক্লা চৌধুরী ও সহশিল্পীদের 'আলো আমার আলো' গানটি দিয়ে। শিল্পী সুবী সেন তাঁর সুললিত কণ্ঠ দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো ইলা বসুর নজরুল-গীতি, শিল্পীর কণ্ঠে নজরুলের বিভিন্ন ধারার গান উপস্থিত সমবেত শ্রোতাদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশীল চক্রবর্তী তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় কয়েকটি কৌতুক-নকসা পরিবেশন করেন। বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় মঞ্চে উপস্থিত থেকে দর্শকদের আনন্দদান করেন। সম্পাদক অশোক বসুর সুষ্ঠু পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

নাট্য-রচনা প্রতিযোগিতা : নাট্যক্ষেত্রে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যর অসাধারণ অবদানের স্মরণে এবং নতুন নাটকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'অভিনয়' নাট্যপত্র আয়োজিত ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্মৃতি একাঙ্ক নাট্য-রচনা প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ৩১শে মে ৭৫ প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ১০১ টাকা ও ৫১ টাকা এবং মানপত্র। প্রবেশ দক্ষিণা দশ টাকা। যোগাযোগ—'অভিনয়'। ১৩১ হরিশ মুখার্জি রোড। কলিকাতা—২৬

নীচুতলার মানুষ : গিরিশ নাট্য সংসদ ২৫ জানুয়ারী মহাজাতি সদনে নতুন নাটক রঞ্জন দেবনাথের লেখা 'নীচুতলার মানুষ' সুলেখা ব্যানার্জির নির্দেশনায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে।

সাবিত্রীর চরিত্রে সুলেখা ব্যানার্জি যেভাবে প্রাণ দিয়ে অভিনয় করেছে তাকে অনবদ্য বলা যায়। সমস্ত অভিনয়ে প্রতিটি মুহূর্তে সুলেখা ব্যানার্জি যেভাবে ব্যথা-বেদনা ফুটিয়ে তুলে দর্শকচিত্তকে মাতিয়ে রাখেন তা সহজে ভোলার নয়। অন্যান্য চরিত্রে কান্তি, দেবেন্দ্র, ভোলা সেন, সুব্রত, দেবব্রত, গৌর অধিকারী, অসিত ঘোষ, শ্যাম ভট্টাচার্য সুঅভিনয় করেছেন।

এছাড়া মিলি, নীলা ও সরযূর ভূমিকায় বর্ণা বোস, অনিতা গাংগুলী ও গীতা দে চরিত্রানুগ পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেন।

প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের আনন্দানুষ্ঠানে শুভেন্দু চ্যাটার্জি ইলা বসু ও সুবীর সেন। ফটো: অমৃত

সুখী রাজপুত্র : শিশুরঙমহলের (সি এল টি) ২৩তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ঢাকুরিয়া সঞ্জীব ট্রেনিং কোরের শিশু শিল্পীরা অস্কার ওইল্ডের 'হ্যাপী প্রিন্স' অবলম্বনে সমীর ঘোষ রচিত অনবদ্য নৃত্যনাট্য 'সুখীরাজপুত্র' অবনমহলে সুপরিকল্পিত এই শিশুনৃত্যনাট্যটি একটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর অনুষ্ঠান বললে অত্যুক্তি হবে না। নৃত্য ও সংগীত পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখান তপতী ঘোষাল ও সলিল মিত্র। সংগীতে কৃতিত্ব দেখান চন্দ্রা মুখার্জি, শুক্তি ঘোষাল, সুদীপ্তা ভট্টাচার্য, অপর্ণা ঘোষ, অতসী ঘোষ, সোমেন ব্যানার্জি, অসিত অধিকারী ও বিপ্লব মুখার্জি। সংলাপে সৌরেন বোস ও শক্তি ঘোষাল। নৃত্যে গার্গী রায় (রাজপুত্র), মৌসুমী মিত্র (সোনালী সোয়ালো), মৌসুমী মুখার্জি (বেত্রবতী), কুমুর ব্যানার্জি (পাহারওয়ালা), অন্যান্য নৃত্যাংশে মুন্না সেনগুপ্তা, নবনীতা ঘোষ, পাপিয়া চক্রবর্তী, নুপুর ব্যানার্জি, মহাশ্বেতা ঘোষ অনির্বান রায় অনিতা ঘোষ পুতুল হাজরা, মনিমেলা ঘোষ, রুমা ঘোষ, ডালিয়া ভট্টাচার্য, রত্না রায়, শুভা ঘোষ, উমা ব্যানার্জি, ঊর্মি রায়, মধুমিতি ঘোষ ও মামণি দাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় চার বছরের শিশু যাদুকর পিটার প্যানের বিস্ময়কর যাদুবিদ্যার মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ প্রশংসনীয়। পরবর্তী অনুষ্ঠানে মাস্টার কুনালকান্তি ঘোষ গীটারে রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি বাজিয়ে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

১৯৭৪-এর বাংলা ও হিন্দী ছবি
সালতামামী

১৯৭৪-এর একাধিক চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ভারত সরকার আয়োজিত 'বাংলাদেশের' ছবির উৎসব। এছাড়া ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত '৭৫ বছরের ভারতীয় সিনেমা' নামে সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের এফ এফ সির ছবির উৎসব। গত বছর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কলকাতায় ১২৮টি ভারতীয় ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। হিন্দী ৯২, বাংলা ৩২, গুজরাটী ১, পাঞ্জাবী ১ এবং ওড়িয়া ২টি। গত ১৯৭৩-এর মতো ১৯৭৪-এও বাংলা ছবির সংখ্যা ৩২। এর মধ্যে একটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা থেকে বাংলায় এবং অপরটি রুশ ভাষা থেকে বাংলাতে ডাব করা হয়েছে। বাকী ৩০টি ছবি থেকেই বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির আলোচনায় আসা যাক। ১৯৭৪-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্র 'সোনার কেল্লা' ছাড়া রাজনৈতিক তথা সমকালীন ছবি হিসাবে মৃণাল সেনের 'কোরাস'ও উল্লেখযোগ্য ছবি। বছরের অপর তিনটি সমালোচিত ছবি হোল পূর্ণেন্দু পত্রীর 'ছেঁড়া তমসুক', পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'যদুবংশ' এবং অগ্রগামীর 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'। পরীক্ষামূলক ছবি হিসাবে নিতীশ মুখার্জির 'একদিন সূর্য' এবং সঙ্গীতবহুল ছবি হিসাবে তরুণ মজুমদারের 'ফুলেশ্বরী'র নাম করা যেতে পারে। শ্রেষ্ঠ নায়ক হিসাবে উত্তমকুমার 'অমানুষ' এবং 'যদুবংশ' ছবিতে অপূর্ব অভিনয়ের জন্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতে কারোরই দ্বিধা নেই। অন্যান্যরা ভালো অভিনয় করেছেন যেমন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (সোনার কেল্লা) এবং সহনায়ক হিসাবে সন্তোষ দত্ত (সোনার কেল্লা) অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় (কোরাস) এবং নিমু ভৌমিক (ছেঁড়া তমসুক), অনুপকুমার (ফুলেশ্বরী ও ঠগিনী) উৎপল দত্ত (অমানুষ), সন্ধ্যা রায় (ফুলেশ্বরী ও ঠগিনী), নায়িকা হিসাবে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতে পারে অপর্ণা সেন (সুজাতা, যদুবংশ, অসতী), সুমিত্রা মুখার্জি (বিকালে ভোরের ফুল এবং ছেঁড়া তমসুক) এবং সুচিত্রা সেন (দেবী চৌধুরাণী)। সহ-নায়িকা হিসাবে সুমিত্রা

মুখার্জি (দেবী চৌধুরাণী), সুজাতা), প্রেমা নারায়ণ (অমানুষ), মহুয়া রায়চৌধুরী (যে যেখানে দাঁড়িয়ে) এবং রুমা দেবী (যদি জানতেম)। সঙ্গীতে হেমন্ত মুখার্জি (ফুলেশ্বরী) এবং আবহ সঙ্গীতে সত্যজিৎ রায় (সোনার কেল্লা)।

বছরের নতুন নায়ক নায়িকা হলেন রাজশ্রী বসু (প্রান্তরেখা), সোমা দে (জন্মভূমি) এবং দীপঙ্কর দে (হারায়ে খুঁজি ও সুজাতা)। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত মুখার্জি (ফুলেশ্বরী) এবং অরুন্ধতী রায়চৌধুরী (যে যেখানে দাঁড়িয়ে) এবং প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (যদুবংশ)। সাদাকালো আলোকচিত্র গ্রহণে—কে কে মহাজন (কোরাস, শক্তি ব্যানার্জি (ছোঁড়া তমসুক), সৌমেন্দু রায় (সোনার কেল্লা) এবং আলোক দাসগুপ্ত (অমানুষ)। রঙিন ছবির আলোকচিত্র গ্রহণে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতে পারে। সম্পাদনায়—দুলাল দত্ত (সোনার কেল্লা), গঙ্গাধর নস্কর (কোরাস) এবং অরবিন্দ ভট্টাচার্য (ছোঁড়া তমসুক) ছবিতে কাজের জন্যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারেন। শিল্প নির্দেশনা—শান্তি দাস (অমানুষ), সোনার কেল্লা এবং কোরাস ছবির শিল্প নির্দেশনায় শ্রেষ্ঠত্বের আখ্যা পেতে পারে। বক্স অফিসের সাফল্য লাভ করেছে 'ফুলেশ্বরী' 'অমানুষ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'।

এবারে উৎকৃষ্ট ছবি হিসাবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে এরকম হিন্দী ছবির সংখ্যা খুবই নগণ্য। 'অঙ্কুর' ১৯৭৪-এর শ্রেষ্ঠ ছবি, অন্যান্য ছবির মধ্যে 'গরম হাওয়া' 'রজনীগন্ধা' 'নেমকহারাম' ও 'কোরা কাগজ'। বছরের শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্যাম বেনেগাল (অঙ্কুর) এবং এস এম সথ্যু (গরম হাওয়া)। বছরের শ্রেষ্ঠ নায়ক রাজেশ খান্না (নেমকহারাম, আপ কী কসম), সঞ্জীবকুমার (নয়া দিন নৈ রাত), অমল পালেকর (রজনীগন্ধা)। শ্রেষ্ঠ নায়িকা নবাগতা শাবানা আজমী (অঙ্কুর) ও গীতা (গরম হাওয়া) এবং জয়া ভাদুড়ী (কোরা কাগজ)। বছরের শ্রেষ্ঠ সহনায়ক—সাধু মেহের (অঙ্কুর) এবং অমিতাভ বচ্চন (নেমকহারাম), দীনেশ ঠাকুর (রজনীগন্ধা)। শ্রেষ্ঠ সহনায়িকা—রঞ্জিতা ঠাকুর (রজনীগন্ধা), মৌসুমী চ্যাটার্জি (রোটী কাপড় অওর মোকান)। আলোকচিত্র গ্রহণ—জাল মিস্ত্রী (হিন্দুস্থান কী কসম), কে কে মহাজন (রজনীগন্ধা) এবং অঙ্কুর ছবির আলোকচিত্রশিল্পী। সম্পাদনা — অঙ্কুর, রজনীগন্ধা, নেমকহারাম। সঙ্গীত পরিচালনা—বনরাজ ভাটিয়া (অঙ্কুর) এবং কল্যাণজী আনন্দজী (কোরা কাগজ)। শিল্প নির্দেশনায়—'গরম হাওয়া', 'অঙ্কুর' এবং 'হিন্দুস্থান কী কসম' ছবির কাজকে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। নেপথ্য গায়ক—কিশোরকুমার (কোরা কাগজ, হীরাপান্না, মনচলি), মুকেশ (রজনীগন্ধা), মহম্মদ রফি (ইয়াঁদো কী বরাত) প্রভৃতি। নেপথ্য গায়িকা—লতা মুঙ্গেশকর (কোরা কাগজ, রজনীগন্ধা) এবং আশা ভোঁসলে (ইয়াঁদো কী বরাত ও মনোরঞ্জন)।

—চিত্রদূত

তুলসী

নজরুলগীতি ও লোকনৃত্য

রবীন্দ্র সদনে গীতিবীথিকা মঞ্চস্থ লোকনৃত্য ও নজরুল গীতির আসর প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনার উচ্চমান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রথমার্ধে ছিল লোকনৃত্য। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারত এবং আসাম থেকে গুজরাট অবধি ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের লোকনৃত্যে যেন গ্রামীণ জীবনের সরল সহজ জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা মুখর হয়ে ওঠে। সঙ্গীতে আশীষ সেনগুপ্ত ও ইন্দ্রা মুখোপাধ্যায় গানের মূল ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। এঁদের সঙ্গে সুযোগ্য সহায়তা করেছেন অভিজিৎ দাশগুপ্ত, ভাস্কর ব্যানার্জি স্নেহময় মুখার্জি মালবিকা ব্যানার্জি, অনুরাধা ধর এবং সুখেন্দু গাঙ্গুলী। সঙ্গীত-পরিচালনায় ছিলেন আশীষ সেনগুপ্ত।

প্রতিটি নৃত্য রূপময় করে তুলেছিলেন কেতকী মিত্র, কেয়া বসু, রুমেলা ধর কানাইলাল মজুমদার, নারায়ণ সরকার—এঁদের সঙ্গে নৃত্যসঙ্গত করেছেন মৌসুমী কয়াল বিউটি মুখার্জি রুমী দাস ঈসিতা পাল, অমিতা দাস, ঝুমা চট্টোপাধ্যায় শিল্পী দাস, গৌতম সরকার ও কমল ভট্টাচার্য শিল্পী জীবনের অভিজ্ঞতা ও মুন্সীয়ানা দিয়ে পরিচালনাকে সমৃদ্ধ করেন কানাইলাল মজুমদার।

অন্যান্য সহযোগিতায় ছিলেন ভানুপদ চ্যাটার্জি, রথীন্দ্র ভট্টাচার্য ও কেদার নন্দী।

দ্বিতীয়ার্ধে ছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নজরুল গীতির এক আসরে। রাগসঙ্গীতে মানববাবুর অধিকার সন্দেহাতীত। তাঁর রেওয়াজী কণ্ঠের স্বরবিন্যাস, আবেগ ও বিষয়বস্তুর উপাদান প্রাচুর্যে শ্রোতাদের চাহিদা অকৃপণভাবে পূর্ণ করেছেন। ঝুমরা, কাহারবা, দাদরা এবং আরও নানা ছন্দের তালে নজরুলের ছন্দবৈভবের প্রকাশ বৈশিষ্ট্যের ধারাটিকে ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছেন রাধাকান্ত নন্দী। সেতার ও দিলরুবায় সুরসঙ্গত করেছিলেন নির্মল বিশ্বাস। সুষ্ঠু প্রযোজনার সাধুবাদ প্রাপ্য শ্রীমতী বকুল সেনগুপ্তের।

দুটি রাত, ছন্দ ও সুরে

দক্ষিণ কলকাতার সুখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা ফরোয়ার্ড ক্লাব নিবেদিত দুটি রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্মরণীয় হয়ে থাকবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশনার অভিনবত্বে। প্রথম দিন ছিল নৃত্যনাট্য। দ্বিতীয় দিন সারা রাতব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর।

নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু একতারাতে প্রলয় রাজে—গ্রামীণ সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন শক্তি নাগ। প্রথম থেকে শেষ অবধি এ অনুষ্ঠান আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল নরেশকুমার ও সুমিত্রা মিত্রের নৃত্য ও অভিনয়ের অসাধারণ কুশলতায়। ভারতী দাসের অনুষ্ঠানও প্রশংসা করবার মতই। সবিতাব্রত দত্তর ভূমিকা এ অনুষ্ঠানের মর্যাদা বাড়িয়েছে। প্রদীপ ঘোষের ললিত কণ্ঠের ভাষ্যপাঠ বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে তোলার কাজ সুসম্পন্ন করে। অংশগ্রহণকারী অন্যান্য শিল্পীরা হলেন কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর ঘটক, ইলা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন মুখার্জি ও গৌতম রায়।

দ্বিতীয় রাতে আসর শুরু হয়েছিল বিশোক চক্রবর্তীর তবলালহরা দিয়ে। সাজ্জাদ হোসেন সম্প্রদায়ের মালকোষ ও বাগেশ্রী আসর জমিয়ে তোলে। শ্রীকান্ত বাখরে পরিবেশিত যোগকোষ ও তোড়ী সুগীত। কিন্তু মধ্য রাত্রে তোড়ী? বাখড়ের মত শিল্পীর কাছে এটা অপ্রত্যাশিত।

শুভারম্ভঃ

৩১শে জানুয়ারী

"শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী" বিজয়ী

নন্দেন্দু চ্যাটার্জী পরিচালিত

নিউটন মুখোপাধ্যায়ের

রানুর ব্রথম প্যার

সংগীত ঃ নিখিল চট্টোপাধ্যায়

শ্রেঃ—নীড়া মালিয়া অজিতেশ অসীম

কণিকা বঙ্কিম ঘোষ

নেপথ্য কণ্ঠ ঃ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

মিনার - বিজলী - ছবিঘর

ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

পরিবেশনা ঃ এম বি এম পিকচার্স

5 FEB 1975

সেতারে ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য বিশ্লেষিত চারুকেশী রাগ উপভোগ্য হয়ে ওঠে শিল্পীর মেজাজ এবং রাগের মাধুর্য উভয় কারণেই। চারুকেশী দক্ষিণ ভারতীয় রাগ। এই রাগের সঙ্গে সারা ভারতের সঙ্গীত মহলকে পরিচিত করে জনপ্রিয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। ইন্দ্রনীলের বাজনা সেই প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করেছে।

কালিদাস সান্যালের কণ্ঠে শোনা গেল জয়জয়ন্তী, সোহিনী ও ঠুংরী। শ্রীসান্যালের মধুর কণ্ঠ, রাগের শুদ্ধ রূপ-রচনা বিস্তার ও তানের সংযম সৌকর্য সব মিলিয়ে এ অনুষ্ঠান খুব জমজমাট হয়ে ওঠে। ঠুংরীতে অভিনিবেশের স্বাক্ষর লক্ষ্য করবার মত।

সর্বশেষ শিল্পী সুনন্দা পট্টনায়ক। ইনি গাইলেন কৌশিকী ভৈরো। ভোরের আলো আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে ঠিক এই রকম মুহূর্তে উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে পরিবেশিত এ রাগ সুগম্ভীর মন্ত্রপাঠের মতই জড়তা ও তামস উত্তীর্ণ হবার আহ্বান জানাল। একটি ভজন দিয়েই ইনি অনুষ্ঠান শেষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জগন্নাথ স্বামী এবং যোগ মত যা না শুনে শ্রোতারা তাঁকে ছাড়ে? অতএব ভোর গড়াল রোদ ঝলসানো সকালে।

সেতার ও ভারতীয় রাগে জাপানের মেয়ে

কয়েক সপ্তাহ আগে সরলা মেমোরিয়াল হলে সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনের পক্ষ থেকে স্বদেশ সান্যাল কলকাতার সঙ্গীত মহলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন একজন নতুন শিল্পীকে। ইনি ভারতীয় নন—কিন্তু বাঙালী ঘরেরই কন্যা হয়ে উঠেছেন ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আবেগভরা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার জোরে।

গত কয়েক মাস আগে কল্যাণী রায়ের সঙ্গে মানিক দাস যখন তবলাসঙ্গতকারী-রূপে জাপান সফরে গিয়েছিলেন (আগের সপ্তাহের অমৃতে সে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে) তখনই এঁর সঙ্গে একটি আসরে শিল্পীদ্বয়ের পরিচয়। উভয়ের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে মিয়াকো একজনকে বাবা এবং অন্যজনকে পিসিমা বলে ডাকতে শুরু করে দিলেন—একেবারে বিশুদ্ধ বাংলায় এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই।

মিউজিক লাভার্স পরিবেশিত অনুষ্ঠানে সেতার বাজাচ্ছেন শ্রীমতী মিয়াকো কোয়েজুকা তবলায় মানিক রায়।

মিসেস মিয়াকো কোয়েজুকা সম্ভ্রান্ত জাপানী পরিবারের কন্যা এবং বধূ। ১৯৬৬তে তিনি প্রথম ভারতবর্ষে এসেছিলেন হিন্দীতে এম-এ পড়তে, দিল্লীতে।

জাপানে পড়বার মত এত বিষয় থাকতে দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে এম-এ?

আমার প্রশ্নের উত্তরে মিয়াকো উজ্জ্বল হাসির সঙ্গতে উত্তরটি যেন জ্বালিয়ে দিলেন—বললেন ভারতবর্ষের সঙ্গীত ও সাহিত্য বরাবরই আমার মনকে টানত। যে মুহূর্তে সুযোগ পেলাম আমি ভারতেই এদেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিতে চাইলাম—এ দেশকে জানব, চিনব আপনার করে নেব বলে। ভারতীয় সঙ্গীত ও আলি আকবর রবিশঙ্কর আমায় মুগ্ধ করেন প্রথমত জাপানের অনেক ভাব, আবেগ ও প্রকাশ-ভঙ্গীর সঙ্গে আশ্চর্য মিলের কারণে। দ্বিতীয়ত এ সঙ্গীতের মধ্যে এমন একটা রহস্যময়তা আছে যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই অধরার একটু আধটু ধরা-ছোঁওয়া যদি পাওয়া যায় সেই লোভেই ত সেতার ধরেছি। এখন আমার অদৃষ্ট।

শ্রীমতী মিয়াকো কথাগুলি বললেন কিন্তু বাংলাতেই হোক না ভাঙ্গা বাংলা। শুনতে ভারী মিষ্টি।

মিউজিক লাভার্সের পক্ষ থেকে শিল্পীকে মানপত্র দেওয়া হয়। এরপর ইনি বাজালেন সেতার। বেহাগ রাগে। মাত্র দু বছরের তালিম ও রেওয়াজে এত পরিচ্ছন্ন ও সুরেলা রূপায়ণ যথার্থ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। আর একটি জ্ঞাতব্য তথ্য হল ইনি জাপানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। আমার বাড়ী কোন চাকর-বাকর নেই নিজে হাতে সব কাজ করি। লেসন নোট তৈরী করি আর ওরই মধ্যে সময় করে দু-তিন ঘন্টা রেওয়াজ করা।

পৃথিবীর সর্বত্রই দেশের কালচারকে বাঁচিয়ে রেখেছেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

ইনি সেতার শিখেছেন দিল্লীতে রাজকুমার শর্মা এবং কলকাতায় ধনঞ্জয় মল্লিকের কাছে। আর তালের সম্বন্ধে আমায় ওয়াকিবহাল করেছেন বাবা। মাণিকবাবুকে দেখিয়ে বলেন।

গত রবিবার ইনি জাপানে ফিরেছেন। এটা ছিল তাঁর পঞ্চম বারের ভারত সফর। ষষ্ঠবারের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় আছেন।

—চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. WB/NC-13
m : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 11th April, 1975
Phone 55-5231 (14 lines)

বার প্রিয়
ই চাই
কুকমী
গুঁড়ো
মশলা

দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-০৯৯৫,
ফ্যাক্টরী—কাশীপুর

16 APR 1975

লক্ষ লক্ষ লোক আজ
সাধনা দশন ব্যবহার করেন
কারণ অতি উৎকৃষ্ট
দাঁতের মাজন ব'লে
এর সুনাম ও জনপ্রিয়তা
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।
অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
সাধনা দশন বহুদিন ধরে
দেশের সর্বত্র প্রচুর সমাদর
লাভ করে আসছে।
সাধনা টুথ পেস্টও বহুগুণ-
বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও
উপকারী। যাঁরা পেস্ট পছন্দ
করেন তাঁদের অনুরোধেই
প্রস্তুত করা হয়েছে।

৬ ১০.5/70

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন)
এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ॥ মূল্য ৬০

CALCUTTA UNIVERSITY

বোরোলীন

ব্যবহারে কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক, অলসানো ত্বক [illegible] সতেজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে।

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

থার

শীত

তার ও

ডি ডি ফার্মাসিউটিক্যাল

শক্তিশালী, অবিলম্বে কার্যকরী
ইউথেরিয়া – বেদনা, মচকানো, মাথাধরা,
পেশীর ব্যথা সারাতে।
বুকের ও নাকের শ্লেষ্মা তাড়াতে।
হাতের কাছে একটা টিউব রাখুন,
কে জানে কখন দরকার পড়বে।

মচকানো সারায়
ব্যথা তাড়ায়
ইউথেরিয়া

বেঙ্গল কেমিক্যালের
সেরা উৎপাদন

॥ নূতন যে বই বেরিয়েছে ॥

বহুদিন পরে প্র-না-বি'র ব্যঙ্গবর্ণাঢ্য নাট্যোপন্যাস

বে নি ফি ট অব্ ডা উ ট ১০

আশাপূর্ণা দেবীর

যে যার দর্পণে ৮

নিমাই ভট্টাচার্যের

নাচনী ৭

শুভেন্দ্রকুমার মিত্র সঙ্কলিত

বৈ জ্ঞা নি ক অ ভি ধা ন

ইংরেজী বাংলা ও দেবনাগরী হরফে নাম বা উচ্চারণসহ বৈজ্ঞানিক অভিধাগুলির সুসংগত অর্থ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা। পঁচিশ টাকা

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল।

॥ গ্রাহকগণ সত্বর সংগ্রহ করুন ॥

।। কুড়ি টাকা ।।

তারাশঙ্কর রচনাবলী নবম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল।

॥ কুড়ি টাকা ॥ গ্রাহকগণের পনেরো টাকা।

সমরেশ বসুর নূতন উপন্যাস 'অবরোধ' যন্ত্রস্থ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস

নগর পারে রূপনগর

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল।

॥ পঁচিশ টাকা ॥

বিভূতি রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড — কুড়ি টাকা

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : কুড়ি টাকা ॥ দ্বিতীয় খণ্ড : কুড়ি টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

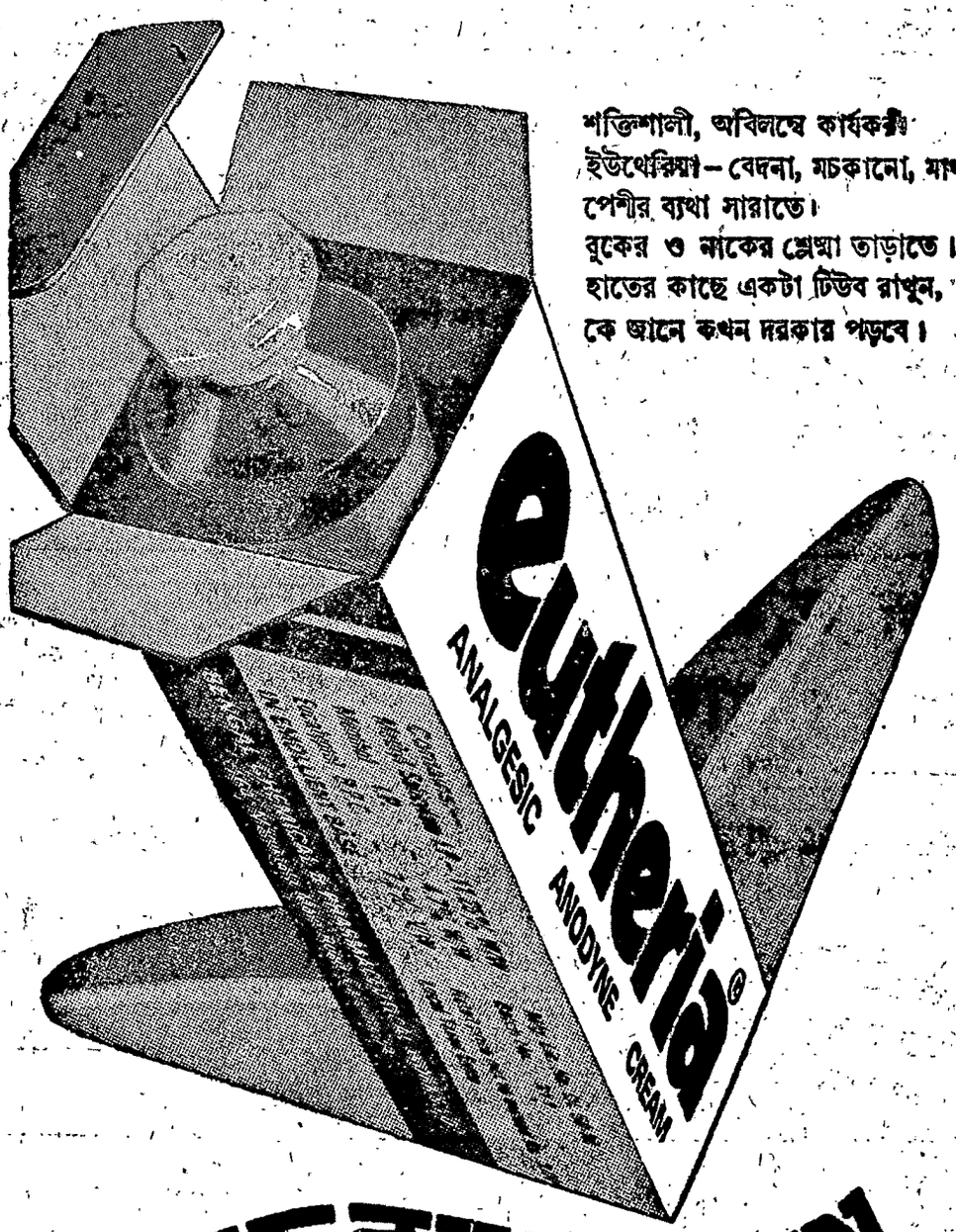

মচকানো সারায়
ব্যথা তাড়ায়
ইউথেরিয়া

বেঙ্গল কেমিক্যালের
[illegible]

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪০ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 14th February, 1975. শুক্রবার, ১ ফাল্গুন, ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়...		
৭	ঘড়ের টুকরো	(গল্প)	শ্রীবনফুল
৯	দেশেবিদেশে		শ্রীপুণ্ডরীক
১১	রাজভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১২	এই বাংলায় খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৩	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
১৫	সেই সব দিনগুলি	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
১৮	কোনো কবির মৃত্যুতে	(কবিতা)	শ্রীকৃষ্ণ ধর
১৮	তারা যায়	(কবিতা)	হবিবুল্লাহ সিরাজী
১৮	নাটকের মুহূর্তে একটি ...	(কবিতা)	শ্রীসুপ্রীতি পাল
১৯	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
২২	ঘোড়সওয়ার		শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫	গোয়েন্দা বাঁধা		শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
২৬	যুবক যুবতী		শ্রীঅমর দাস
২৮	চিঠিপত্র		
৩১	দেশ বিদেশ	(উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৩৫	বিজ্ঞানের কথা		শ্রীঅয়স্কান্ত
৩৮	অঙ্গনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৩৯	রান্না করে দেখুন		শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৪০	মুনাফার খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী
৪১	পুনশ্চ		শ্রীক্ষপণক

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

সার্ভে ড্রইং, নানা রকম কাজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম : সয়ারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কামালিন প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটো ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন
কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম
মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন
প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না।
ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক
মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক
তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না
করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায়
আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
(কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAM—KCD-74

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১৯/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন ঃ ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

আমাদের নতুন বই

প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা \ দাম ৭ টাকা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাঙলার কীটপতঙ্গ \ দাম ১৫ টাকা

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ \ দাম ২০ টাকা

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সায়গনের নরকে \ কমল চৌধুরী

সায়গন জেলখানার নৃশংস নির্যাতন কাহিনী। দাম ১০ টাকা

আশা প্রকাশনী ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৯

সাহিত্য সংসদ -এর

রবীন্দ্র-চর্চা গ্রন্থমালা

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার পল্লী

পল্লী বাঙলার কতখানি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সে-কথা বলেছেন পরিণত ভাবাশঙ্কর। [৪-৫০]

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঠাকুরবাড়ীর কথা

দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাক-রবীন্দ্র যুগের কথা একটি খণ্ডে বলেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। [১২-০০]

ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি

বৌদ্ধসংস্কৃতি ভারতের মহান ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথ তার প্রভাবে পরিপুষ্ট—সে কথা বলেছেন লেখক এ বইয়ে। [১০-০০]

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

রবীন্দ্র চিত্রকলা

রবীন্দ্রপ্রতিভার আর এক মণ্ডল তাঁর চিত্রকলা। তার সহজবোধ্য ব্যাখ্যা। নন্দলাল বসুর ভূমিকা। ২১ ছবির প্রতিচ্ছবি। [১৫-০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪২	দ্বিতীয় পর্ব	(গল্প)	শ্রীরেখা বড়ুয়া
৪৫	সেকালের সঙ্গীতগুণী		শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৪৮	আধুনিক মারাঠী নাটক		শ্রীদিলীপকুমার মিত্র
৫১	খেলাধুলো		শ্রীদর্শক
৫৩	দেশ বিদেশের খেলা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৪	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৫	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান		
৫৬	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীঅময়
৫৮	অকপট সাক্ষাৎকার		শ্রীঅশোক মজুমদার
৬২	শিল্পী সাজ্জাদ হোসেন		শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৪	প্রেক্ষাগৃহ : ফ্লোর থেকে বলছি		স্টুডিও সংবাদদাতা
৬৬	বোম্বাই ফিল্মের কচড়া		শ্রীঅভিজিৎ
৬৭	স্টুডিও সংবাদ		
৬৮	নাটমঞ্চ		নাট্য সমালোচক
৬৯	বিদেশী ছবি		শ্রীশা র চ
৭০	বাংলাদেশের ছবি		আনোয়ার আহাম্মদ
৭১	ভারতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৭১	জলসা		শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

"অমানুষ" ছায়াছবির লেখক

শক্তিপদ রাজগুরুর সাড়া জাগানো উপন্যাস

রূপবতী অরণ্য ৮

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — চিরঞ্জীব সেন

সামনে আড়ালে ৮ | চৈকিবেঁচেআছে ৭

সমুদ্রের সামনে ৬ | প্রেমিক দস্যু ৭

নিশাচর-এর উপন্যাস — অনিল রায়-এর উপন্যাস

জীবন রহস্য ৬ | নগ্ন প্রহর ৮

রাত্রি গভীরে ৬ | ব্ল্যাকসেপ্টেম্বর ৮

সরোজ প্রভাকর-এর উপন্যাস — আবদুল জব্বার-এর

সুচরিতাষু ৬ | মাতালের হাট ৮

সুবোধ ঘোষের উপন্যাস — গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

দুই গন্ধর্ব ৮ | রাতের বাসা ৬

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস — প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস

ধূপেরধোঁয়ায় ৮ | দ্বিতীয় জীবন ৬

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় — অবধূত-এর উপন্যাস

পাপ ৬ | সুমেরু কুমেরু ৭

অসীমানন্দ মহারাজ-এর উপন্যাস — বেদুইন-এর উপন্যাস

বারবধূ ৭ | যুদ্ধের পর যুদ্ধ ৮

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ॥ কলিকাতা-৯

মহাত্মা শিশিরকুমারের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

কালাচাঁদ গীতা
৪র্থ সংস্করণ ৩-০০

নিমাই সন্ন্যাস
(নাটক) ২য় সংস্করণ ২-০০

নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ২-০০

লর্ড গৌরাঙ্গ
(২২টি খণ্ডে) (ইংরাজী)
প্রতি খণ্ড ৩-০০

নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ২-০০

নরোত্তম চরিত
(হিন্দী) ২-০০

সর্পাঘাতের চিকিৎসা
(৮ম সংস্করণ) ১-৫০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE
De-luxe Ed. — Rs. 6.50

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE
Popular Ed. — Rs. 5.50

প্রাপ্তিস্থান :—
পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও
বিশিষ্ট পুস্তকালয়

সম্পাদকীয়

দুর্নীতির দায়

ওয়াঞ্চু কমিশনের রায় মেনে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে দুজন মন্ত্রীকে বিদায় করেছেন। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ নিয়ে টালবাহানা করেননি কিংবা কাউকে আড়াল দেবার চেষ্টা করেননি। এর আগে ভূষি কেলেঙ্কারির ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্র পদত্যাগ করে গণতন্ত্রের সুস্থ নজীর স্থাপন করেছিলেন। এবারে সন্তোষ রায় এবং সুনীতি চট্টরাজও গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিসভা থেকে চলে গেলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগ আজ নতুন নয়। এমন কি কোনো কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সংসদে উঠেছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কালবিলম্ব না করে তদন্ত কমিশন বসিয়েছিলেন অন্যত্র তা করা হলে সম্ভবত গুজরাটে বা বিহারে মন্ত্রিসভা ভাঙবার জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনই হত না।

এ কথা ঠিক অনেক সময় রাজনীতিকদের চরিত্রহনন ও অপদস্থ করার জন্য নানারকম আজগুবি ও মিথ্যা অভিযোগও শত্রুপক্ষ করে থাকে। কিন্তু তা বলে সত্যিকারের সন্দেহ দেখা দিলে সে বিষয়ে চুপ করে থাকা কিংবা বিধানসভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে তা এড়িয়ে যাওয়া গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ভোটের জোরে তাকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কোনো কোনো মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যখন উঠেছিল তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নজির দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চাপা দিতে চাননি। তাঁর এই সৎসাহস অতি বড় সমালোচকও স্বীকার না করে পারবেন না। বিদায়ী মন্ত্রীরা কোনোরকম নৈতিক ভ্রষ্টাচারে অভিযুক্ত না হলেও তাঁদের প্রভাব পরোক্ষভাবে স্বজনপোষণে সহায়তা করেছে কমিশনের সাক্ষ্যে তা প্রতীয়মান হয়েছে। গণতন্ত্রে মন্ত্রীদের সবরকম সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে হয়। সামান্য সন্দেহ হলেই চলে যেতে হয় তাঁদের। এত বড় শক্তিমান মার্কিন প্রেসিডেন্টকেও বেআইনী কার্যকলাপের নৈতিক দায়িত্ব মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে। ইংলণ্ডের প্রফিউমো নামে এক মন্ত্রীকে পার্লামেণ্টে সত্য গোপন করে মিথ্যা ভাষণ দেবার জন্য শুধু মন্ত্রিসভা থেকেই নয়, রাজনীতি থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল বছর দশেক আগে। দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশে মন্ত্রীরা আত্ম-সমালোচনা জানেন না, দোষ স্বীকার করে নিতে অভ্যস্ত নন। পদত্যাগ তো করতেই জানেন না। পশ্চিমবাংলার দুই বিদায়ী মন্ত্রী অবশ্য কমিশন বসার পরেই পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের অপেক্ষা করতে বলেছিলেন কমিশনের রায় বের হওয়া পর্যন্ত।

জনসাধারণের সামনে একটি সুস্থ নজীরই তাঁরা স্থাপন করলেন। অন্য যেসব মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং জনসাধারণ এটাও বুঝতে পারল কোন কোন অভিযোগের সারবত্তা ছিল না। সিদ্ধার্থশংকর রায় বহুবার এই কথা জনসাধারণের সামনে বলেছেন, আমাদের ভুল হতে পারে। কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই এবং ভুল স্বীকার করতেও আমাদের লজ্জা নেই। কংগ্রেসের ভিতরে যে উপদলীয় কলহ আছে অনেকে এই অভিযোগগুলোকে তারই একটা বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা মনে করে দলকে বাঁচাতে চাননি। কমিশনে নানারকম অভিযোগ উঠেছিল এবং তাতে সত্যমিথ্যা অনেক কথাই বলা হয়েছিল। কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে, এই ভয়ে মুখ্যমন্ত্রী কমিশন বসানো থেকে পিছিয়ে আসেননি। এর দ্বারা বিরোধীদের মুখও তিনি বন্ধ করে দিলেন। দুর্নীতি বলে শুধু না চেঁচিয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ দিলে যে তার তদন্ত হয় এবং প্রতিকার হয় ওয়াঞ্চু কমিশন তার প্রমাণ।

অবশ্য একথা বলা যাবে না যে দুজন মন্ত্রী বিদায় নিয়েছেন বলেই সমস্ত দুর্নীতির অবসান ঘটে গেল। দুর্নীতির চেহারা সব সময় একরকম থাকে না এবং শুধু মন্ত্রীদের স্তরেই তা সীমাবদ্ধ নয়। আমলাতন্ত্রকেও সব সময় কড়া নজরে রাখা প্রয়োজন। দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার ভারতের জনজীবনকে কলুষিত করে তুলছে। জনসাধারণের প্রধান ক্ষোভ তারই বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা জানে যে, প্রতি পদে উৎকোচ না দিলে কোনো কাজই হাসিল হয় না এদেশে। ওপরমহলের সঙ্গে চেনাজানা না থাকলে ন্যায্য কর্মও সমাধা করা যায় না। দুর্নীতির বিরোধিতা করেও নানারকম দুর্নীতিকে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিই আমরা। কারণ এ না করে কোনো উপায় থাকে না। একেবারে নিচুতলা থেকে ঊর্ধ্বতন মহল পর্যন্ত এর প্রসার। একে সমূলে উৎপাটিত করতে না পারলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ সাফল্যলাভ করতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য।

খড়ের চুবড়ী

বনফুল

তিনুবাবু অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে ছোট ভাই বিনুর কাছেই তাঁহাকে এইবার যাইতে হইবে। গত্যন্তর নাই। ক্রিকেট খেলিতে গিয়া একটি পা আগেই খোঁড়া হইয়াছিল। যে চাকরিটি করিতেন সেটি হইতেও অবসর লইয়াছেন কিছু দিন পূর্বে। এখন মাসে একশত টাকা করিয়া পেন্সন পাইতেছেন। তাহাতে তাঁহার কোনক্রমে চলিয়া যাইতেছিল। তিনু মূর্খ নন। তিনি সেকালের বি-এ পাশ। তাঁহার মাই তাঁহাকে স্কুল কলেজে পড়াইয়াছিলেন। এজন্য তাহাকে কিছু জমিজমাও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। নিজের গহনাগুলিও তিনি বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল ছেলেও বাবার মতো পণ্ডিত হোক। তিনু ও বিনুকে লইয়া তিনি যৌবনেই বিধবা হন। মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া তিনু বি-এ পাশ করিলেন কিন্তু বিনুর লেখা-পড়া বিশেষ কিছু হইল না। সে গ্রামের স্কুল হইতে মাইনার পরীক্ষাটাও পাশ করিতে পারে নাই। তিনু লক্ষ্ণৌ শহরে চাকুরি করিতে লাগিলেন, বিনু গ্রামেই মায়ের কাছে রহিয়া গেল। পৈতৃক বিঘা

তিনু বিবাহ করেন নাই। একটু শৌখীন গোছের লোক ছিলেন তিনি। ফিলা-করা আদ্দির পাঞ্জাবী পরিতেন, গোঁফে আতর লাগাইতেন, বাহারে নাগরা জুতা পায়ে দিতেন, ব্যবহার করিতেন নানা রকম শৌখীন ছড়ি। মা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহাকে মাসে মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া নিয়মিত পাঠাইতেন তিনি। মায়ের মৃত্যুর পর আর নিয়মিত পাঠাইতেন না, মাঝে মাঝে বিনুকে কিছু পাঠাইতেন। এ দশ বছর তিনি দেশেও যান নাই। মাঝে মাঝে বিনুর সহিত পত্রালাপ অবশ্য হইয়াছে। চাকুরি হইতে অবসর লওয়ার পরও তিনি দেশে ফিরিয়া যাইবার কল্পনা করেন নাই। আয় কমিয়া যাওয়াতে বিনুকেও আর তিনি টাকা পাঠাইতে পারিতেন না। বিনু বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ছেলেমেয়ে হয় নাই। বউটি বন্ধ্যা। বিনুর আর একটি বিবাহ দেবার ইচ্ছা ছিল তিনুর। কিন্তু সেজন্য টাকার দরকার। সেই টাকাটা সংগ্রহ করিবার জন্য তিনু একটি টিউশনি জোগাড় করিয়াছিলেন। এই টিউশনিই তাঁহার কাল হইল। যে বাড়িতে টিউশনি লইয়া ছিলেন সেখানে যাইবার একটি শর্টকাট রাস্তা ছিল রেল লাইন পার হইয়া। সেই রেল-লাইন পার হইতে গিয়া তিনি একদিন রেলে চাপা পড়িলেন।

প্রাণ গেল না, হাত দুইটি গেল। দুই হাতেরই কনুই পর্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে হইল।

হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া তিনি বিনুকে খবর দিলেন—আমি বড় বিপদ আমাকে আসিয়া লইয়া যাও। হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে কয়দিন বাঁচিতে হইবে সে কয়দিন বিনুরই গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে তাঁহাকে। তাঁহার হৃদয়টা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিল। এতদিন যে স্বাধীন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করিয়াছেন তাহা সহসা মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল। লক্ষ্ণৌ শহরে এতদিন বাস করিয়াছেন বাংলাদেশের সেই সাঁতসেঁতে পাড়াগাঁয়ে কি আর বাস করিতে পারিবেন? বাড়িতে মা নাই। মা-ই ছিল বাড়ির প্রধান আকর্ষণ। বিনুর বউ অমুকে উহা কিরূপ করিবে সে

বিনুর আবার বিবাহ দিতে চাহিয়াছে। বিনু তো সমস্ত দিন মাঠে থাকে। সেখানে তাহার সেবা করিবে কে? সেখানে কি লছমনের মতো চাকর জুটিবে? লছমনকে সেখানে লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে সঙ্গীই বা কে হইবে তাহার? এইরূপ নানা চিন্তায় মনটা তাঁহার আচ্ছন্ন হইয়া গেল। একটা অন্ধকার ভবিষ্যৎ তাঁহার চোখের সামনে ঘনাইয়া উঠিল। অসহায়ভাবে মায়ের মুখটাই তিনি বার বার স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে কোন আলো তিনি দেখিতে পাইলেন না। তখন পাইলেন না কিন্তু পরে পাইয়াছিলেন। তাহা লইয়াই এই গল্প।

স্টেশন হইতে গরুর গাড়ি বাহিত হইয়া তিনু যখন তাঁহার গ্রামের বাড়িতে পেঁাছিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। তিনু দেখিয়া বিস্মিত হইলেন বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে। 'এদিকে ইলেকট্রিক এসেছে নাকি?'

বিনু সহাস্যে বলিল, 'এসেছে। আমি নিয়েছি।' গাড়োয়ানের সাহায্যে বিনু তিনুকে লইয়া গিয়া ঘরে একটি চৌকির উপর বসাইল। সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার।

'ষাঃ লোড শেডিং হয়ে গেল। ইদানীং বড্ড বেশী হচ্ছে। ওগো কোথা গেলে। দাদা এসেছে একটা আলো আন—'

বিনুর স্থূলকায়া পত্নী বেশ কিছুক্ষণ পরে একটি কেরোসিনের আলো লইয়া প্রবেশ করিল এবং তিনুর পায়ের কাছে আসিয়া টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল। মুখে ঘোমটা দেওয়া ছিল তিনু তাহার মুখটা ভালো করিয়া দেখিতে পাইলেন না। প্রণাম করিয়া বিনুর বউ চলিয়া গেল। বিনু আবার উচ্চকণ্ঠে বলিল,—'শুনছ — দাদাকে একটু মোহন ভোগ করে দিও। আমি ছিরু জেলের বাড়ি যাচ্ছি। তাকে কিছু মাছ রাখতে বলেছিলাম। দাদা তুমি বিশ্রাম কর আমি মাছটা নিয়ে আসি—'

বিনু বাহির হইয়া গেল। লণ্ঠনে বোধ-হয় তেল ছিল না কয়েক মিনিট পরে সেটাও নিবিয়া গেল।

একা অন্ধকার ঘরে বসিয়া রহিলেন তিনু। তাঁহার মনে হইল যে অন্ধকার ভবিষ্যতে তাঁহাকে বাস করিতে হইবে তাহাই যেন মূর্ত হইয়াছে চোখের সামনে। অনেক-ক্ষণ বসিয়া রহিলেন তিনি। বিনু বা বিনুর বউ কাহারও দেখা নাই। খানিকক্ষণ পরে পদশব্দ শোনা গেল। বিনুর বউ একটি ছোট মাটির প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। সেটা ঘরের কোণে রাখিয়া দিয়া আবার চলিয়া গেল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া ঢুকিল। নিবিয়া গেল প্রদীপটা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় তিনু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। হতাশার সমুদ্রে একেবারে তলাইয়া গেলেন যেন। এমন সময় অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটিল। সহসা আতরের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া উঠিল। যে আতর তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে মাখিতেন সেই গোলাপী আতর। তাহার পর তিনি অনুভব করিলেন কে যেন তাঁহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে। তাঁহার থুতনিতে হাত দিতেছে, কাহার বাহু যেন তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। তিনুর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই ইলেকট্রিক আলোটা জ্বলিয়া উঠিল আবার। দেখিলেন ঘরে কেহ নাই। সহসা দেখিতে পাইলেন সামনের দেওয়ালে মায়ের একটা ফটো টাঙানো রহিয়াছে। সমস্ত মুখ যেন উদ্ভাসিত চোখের দৃষ্টি জীবন্ত। তিনুর বুকটা ভরিয়া উঠিল।

অলৌকিক? অসম্ভব?

হোক তবু তাঁহার মনে হইল আর ভয় নাই। এই অলীক খড়ের টুকরাটাকে ধরিয়া মজ্জমান তিনু মনে যেন অনেকটা বল পাইলেন। বার বার বলিতে লাগিলেন—মা আছেন মা আছেন মা আছেন।

বাংলা সাহিত্যে নবদিগন্ত সূচনা

অপুর পাঁচালী ১৫

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ঃ...'অপুর পাঁচালী' পড়তে পড়তে পাঠকের একটা কথা মনে হবে, এ যেন 'পথের পাঁচালীই' পড়ছি। লেখক অসাধারণ কৌশলে বিভূতিভূষণের লেখার ভঙ্গি এমন কি দৃষ্টিভঙ্গিটুকুও আয়ত্ত করবার সার্থক প্রয়াস পেয়েছেন। অর্থাৎ এ যেন বিভূতিভূষণের ভাষাতেই বিভূতিভূষণের জীবনকথা পড়ছি, অথচ তা আত্মজীবনী, নয়। বিভূতিভূষণের রচনায় তাঁর জীবনের কথা যা ধরা পড়েনি, 'অপুর পাঁচালী'র লেখক তাঁর গ্রন্থে তা পূরণ করে দিয়েছেন।...কেবলমাত্র বাইরের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাঁর অন্তর্মুখী জীবনের পরিচয়েরও সন্ধান দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ অন্তরের পরিচয়েই মহান, বাইরের পরিচয় তাঁর কিছুই নয়।... 'পথের পাঁচালী'র অপুর জীবনের রস ও রহস্যের বিষয় জানতে হলে বিভূতিভূষণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা জানতে হয়।.. লেখক গৌরীশঙ্কর তাঁর 'অপুর পাঁচালী' গ্রন্থে বিভূতিভূষণের বাল্যজীবনকে উদ্ধার করে তার মধ্যে অপুর অঙ্কুর খুঁজে পেয়েছেন।... আগেই বলেছি বইখানিতে বিভূতিভূষণের লেখার স্বাদ যেমন আছে, জীবনদৃষ্টির পরিচয়ও তেমনই প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং বিভূতিভূষণের রচনা পাঠ করতে গেলে এই বইখানি পাঠ করা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি॥ **জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য**॥

ঃ...তোমার লেখা 'অপুর পাঁচালী' ভালো লেগেছে—শেষ অংশটা বিশেষ করে।... বিভূতিবাবুকে কাছে থেকে জানি না, এটা আমার দুর্ভাগ্য ও নিদারুণ ক্ষতি॥ **অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (এম-পি)**॥

ঃ...কী ভাবে পথের পাঁচালী বইটি লেখা হ'ল, তারপর বিচিত্রায় প্রকাশিত হ'ল এবং পরে নীরদচন্দ্র চৌধুরী, সজনীকান্ত দাস এবং গোপাল হালদারের সাহায্যে কী ভাবে বই হয়ে বেরল এ সমস্ত পড়তে পড়তে একটি অন্য জগতে ফিরে যেতে হয়। যেখানে বিভূতিভূষণ নিজেই একটি উপন্যাস হয়ে দাঁড়ান।... বিভূতিভূষণকে এমন নিবিড়ভাবে আর কেউ দেখে থাকলেও এমন বই আর লেখা হয়নি। কেবল গল্প উপন্যাস যাঁরা পড়েন তাঁদের কাছেও এই রচনাটি পরম উপভোগ্য হবে বলেই আমাদের ধারণা॥ **আনন্দবাজার পত্রিকা**॥

ঃ...'অপুর পাঁচালী'র লেখক 'পথের পাঁচালী'র স্রষ্টার জীবন ও কল্পলোকের এক অভিন্ন সম্পর্ক খুঁজেছেন, সাহিত্য ও চিত্তবৃত্তির মধ্যে পারাপারের সেতু রচনা করতে চেয়েছেন।...বিভূতিভূষণের ডায়েরী, তাঁর সম্পর্কে অন্য লেখকের স্মৃতিচারণ, উপন্যাসের অংশবিশেষ, বিভিন্ন পত্র, গ্রন্থকারের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং সাহিত্য ব্যাখ্যা—এইসব মিলিয়ে ভাবুক শিল্পী বিভূতিভূষণের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।...ভাবী গবেষকদের এ-বই একদিন না একদিন কাজে লাগবে॥ **দেশ**॥

পুস্তক প্রকাশনী—৮২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

শেখের প্রত্যাবর্তন

শেখ আব্দুল্লা ঠিক কবে থেকে ক্ষমতার আসনে বসবেন এবং বসলে পরে তাঁকে কাশ্মীরের "মুখ্যমন্ত্রী" বলে অভিহিত করা হবে অথবা "প্রধানমন্ত্রী," শুধু এটুকু বাদ দিলে, ২১ বছর পরে শের-ই-কাশ্মীরের ক্ষমতায় ফিরে আসার ব্যাপারে এখন অন্য কোন অনিশ্চয়তা নেই।

কেন্দ্রের সঙ্গে শেখ আব্দুল্লার যে রাজনৈতিক সমঝোতা হয়েছে তার রূপ দিতে এখন শুধু খুঁটিনাটি কতকগুলি বিষয়ে আলোচনা বাকি। এইসব আলোচনা শেষ হয়ে গেলেই কাশ্মীর বিধানসভার কংগ্রেস দলের সভা ডেকে শেখ আব্দুল্লাকে দলের নেতা নির্বাচিত করা হবে এবং তখন রাজ্যপাল তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানাবেন।

শেখের সঙ্গে এই বোঝাপড়াকে স্বাগত জানিয়ে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মীর কাশিম বলেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শেখের সঙ্গে এই সংলাপ চালান হয়েছিল এবং "পুরান তিক্ততা যখন সবাই ভুলে যাবেন তখন সেটাই হবে কংগ্রেসের পক্ষে সবচেয়ে গৌরবময় মুহূর্ত।"

কিন্তু শেখ আব্দুল্লা ক্ষমতায় ফিরে আসার পর কাশ্মীরে কংগ্রেসের কি হবে? মুখ্যমন্ত্রী মীর কাশিম বলেছেন, কাশ্মীরে কংগ্রেস দল তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলবে, যদিও শেখ আব্দুল্লা তাঁর জাতীয় সম্মেলন দলটিকে জীইয়ে তোলার পক্ষপাতী।

শেখ আব্দুল্লাকে ডেকে এনে কাশ্মীরে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তোলায় সেখানকার কংগ্রেস মহলের সকলের যে সায় ছিল না, সেটা গোপন থাকে নি। এবিষয়ে যাঁদের মনে সংশয় ছিল তাঁদের একজন হলেন কাশ্মীরের ভূতপূর্ব রাজা ও রাজপ্রমুখ এবং বর্তমানে কাশ্মীর থেকে নির্বাচিত এম পি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ করণ সিং। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মহলের সবাই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

শেখকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কিছু সংশয় প্রকাশ করেছেন জম্মু ও লদাখের প্রতিনিধিরাও। ভারতীয় লোকদল বলেছে, জম্মু ও লদাখের মানুষ শেখকে কখনই তাঁদের প্রতিনিধি বলে মেনে নেন নি। সুতরাং তাদের মতে, কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন চুক্তি করার অধিকার শেখ আব্দুল্লার নেই এবং এরকম চুক্তি করে শেখকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার "গুরুতর পরিণাম" দেখা দেবে। কাশ্মীরের জনসঙ্ঘ নেতা ঋষিকুমার কৌশল বলেছেন, কাশ্মীরের বর্তমান তিনটি অঞ্চলের সীমানা অপরিবর্তিত রেখে শেখ আব্দুল্লা যদি জম্মু ও লদাখের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অবসান করতে পারেন তাহলে জনসঙ্ঘ তাতে স্বাগত জানাবে।

দেশ বিদেশে

কেন্দ্রের সঙ্গে শেখ আব্দুল্লার এই সমঝোতার ফলে কাশ্মীরে একটা রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আসার সম্ভাবনাকে পাকিস্তান যে ভাল চোখে দেখছে না প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো তার জানান দিতে দেরি করেন নি। এই সমঝোতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ভুট্টো কাশ্মীরবাসীদের হরতাল করতে আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন এই আহ্বানকে কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও সিমলা চুক্তির খেলাপ বলে অভিহিত করেছেন। শেখ আব্দুল্লা এই হরতাল রোখার জন্য তাঁর অনুরাগীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু পাকিস্তান-ঘেঁষা কোন কোন শক্তি কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লার কাজ কঠিন করে তোলার জন্য যে চেষ্টার কসুর করবে না তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ভুট্টোর হরতালের ডাক সম্পর্কে আওয়ামী অ্যাকশন কমিটির নেতা মৌলানা ফারুকীর নীরবতার মধ্যে। মৌলানা ফারুকী এখনও বলে চলেছেন, কাশ্মীরের জনগণ ও ভারতের মত পাকিস্তানও কাশ্মীর প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত এবং এই প্রশ্নের কোন কার্যকর সমাধান করতে হলে পাকিস্তানকেও তার শরিক করতে হবে।

শেখ আব্দুল্লা কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর মৌলানা ফারুকীর মত নেতাদের সম্পর্কে কি মনোভাব অবলম্বন করেন সেটা দেখার বিষয় হবে।

*

খোয়া-যাওয়া নটরাজ

১৯৫১ সালে তামিলনাড়ুর শিবপুরম মন্দিরের কাছে মাটি খুঁড়ে যেসব পুরান মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল সেগুলির মধ্যে একটি ছিল নটরাজের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি। গত বছর ডিসেম্বর মাসে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা পুলিশ লন্ডনের একটি গ্যারেজে ঐ মূর্তি খুঁজে পায়। আনুমানিক দশ লক্ষ ডলার মূল্যের সেই মূর্তি এখন লন্ডনের আদালতের নির্দেশে সেখানকার একটি ব্যাঙ্কের ভল্টে রয়েছে এবং ভারত সরকার, তামিলনাড়ু সরকার ও শিবপুরম মন্দিরের ট্রাস্টীরা ঐ মূর্তি উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য লন্ডন, নিউইয়র্ক ও লস এঞ্জেলিসের আদালতে মামলা লড়ছেন।

চোল যুগের প্রথম দিককার এই মূর্তিটি যে শিবপুরম মন্দির থেকে খোয়া গিয়েছে এবং ঐ মন্দিরে এখন যে নটরাজ মূর্তি রয়েছে সেটি যে মূল মূর্তির আধুনিক নকল এটা প্রথম ধরা পড়ে ১৯৬৫ সালে একজন বৃটিশ বিশেষজ্ঞের লেখা বই থেকে। আসল মূর্তিটি বিদেশে একজন ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছে রয়েছে, বৃটিশ বিশেষজ্ঞের লেখা বই থেকে সেই খবর পেয়ে মাদ্রাজ মিউজিয়মের শ্রীপি আর শ্রীনিবাসন কথাটা তামিলনাড়ু সরকারকে জানান। তখনই খোঁজ খোঁজ পড়ে যায়। অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, নটরাজ ও অন্যান্য কয়েকটি মূর্তি মেরামত করতে নিয়ে গিয়ে এক ব্যক্তি আসল মূর্তিগুলি রেখে দিয়ে মন্দিরে নকল মূর্তিগুলি গছিয়ে দিয়েছিলেন। সেই শিল্পী এমন দক্ষতার সঙ্গে এই বদলের কাজটা করেছিলেন যে, সেই সময়ে আসল-নকল চিনে নেওয়া যায় নি। ঐ মূর্তিগুলি প্রথমে কিনেছিলেন একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের একজন বৃটিশ কর্মচারী। বার চারেক হাত ফেরতা হয়ে নটরাজ মূর্তিটি দিল্লিতে আসে। প্রতিবার হাত বদলের সময়েই বেশ কিছু টাকার লেনদেন হয়। একবারই ৫ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছিল বলে জানা গেছে। ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে নিউইয়র্কের একটি ভুয়া ঠিকানায় মূর্তিটি বিমানযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যে নামে মূর্তিটি পাঠান হয়েছিল তাঁর তরফ থেকে এক ব্যক্তি এসে নিউইয়র্ক থেকে মূর্তিটি ছাড়িয়ে নিয়ে যান। শুল্ক কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোনরকম প্রমাণপত্র ছাড়াই মূর্তিটি ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে দিলেন কেন সেটা একটা রহস্য।

১৯৭৩ সালে আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় যে, ১৯৭২ সালে নর্টন সাইমন নামে একজন কোটিপতি আমেরিকান ঐ মূর্তিটি বেন হেলার নামে আর একজনের কাছ থেকে কিনেছেন দশ লক্ষ ডলার দিয়ে। এই সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই ভারত সরকার চুরি-করা মূর্তিটি দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য তৎপর হয়েছেন।

*

"পিংপং কূটনীতির" আসর

বছর দুয়েক আগে পিকিং-এ আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা উপলক্ষ করে চীন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ভাবসাব করার একটা নতুন অধ্যায় শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে এই ঘটনা চীনের "পিংপং কূটনীতি" বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। কলকাতায় আসন্ন আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আসরেও যে সেই "পিংপং কূটনীতি"র জের চলবে, বিশেষ করে ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

একটি লক্ষণ হল এই যে, কলকাতায় চীনা টেবিল টেনিস প্রতিনিধি দলকে যে সহকর্মী দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁরা বিলক্ষণ

খুশি হয়েছেন। কলকাতা থেকে সরকারি চীনা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'সিন্‌হুয়া'র প্রতিনিধির পাঠান বিস্তারিত রিপোর্টেই সেই খুশির ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে। দমদম বিমানবন্দরে চীনা প্রতিনিধিদলকে যে হিন্দী-চীনী ভাই জিগিরের দ্বারা সম্বর্ধিত করা হয়েছিল, সেকথা উল্লেখ করতে গিয়ে সিন্‌হুয়া এক যুগের মধ্যে এই প্রথম ঐ পুরান বিস্মৃত-প্রায় জিগিরটির পুনরাবৃত্তি করল। চীনা প্রতিনিধিদলের নেতা চাও চেং-হুং দমদম বিমানবন্দরে দুই দলের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের ঐতিহ্যের উল্লেখ করে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটি পিকিং বেতার কেন্দ্র থেকে বহু ভাষায় প্রচার করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন, মিঃ চাও-এর এই বিবৃতির খসড়া পিকিং-এ তৈরি হয়েছিল এবং সেখানকার সরকারও পার্টির পদাধিকারীরা এই খসড়া অনুমোদন করেছেন। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেছেন, চীনা প্রতিনিধিদলে এমন কিছু সদস্য আছেন যাঁরা সরকারিভাবে আলোচনা করার অধিকারী না হলেও দেশে ফিরে রাজনৈতিক রিপোর্ট দাখিল করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে একই সময়ে প্রকাশিত চারটি রিপোর্ট লক্ষ্য করার মত ঃ—(১) চীন নকশালপন্থীদের থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছে। (২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি রিপোর্টে প্রকাশ যে, নকশালপন্থীদের যে গোষ্ঠীটি এখনও চরমপন্থী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তারা লিন পিয়াও-য়ের অনুগামী (৩) ডানিয়েল লিতিফি (ইনি সম্পর্কে একটি বেসরকারি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে চীন সফর করে এসেছেন) লিখেছেন, পিকিং অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে ইয়ে চিয়েন-ইং-এর প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ ভারত-চীন সম্পর্কের দিকে থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, লিন পিয়াও-য়ের সমর্থকরা এতদিন পর্যন্ত চৌ-এন-লাইকে ভারতের প্রতি "অতিরিক্ত বন্ধুত্ব" দেখাবার জন্য যে সমালোচনা করছিলেন সেই সমালোচনা এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। (৪) এদিকে, সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান এ-পি-এন-এর একটি সংবাদভাষ্যে চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সে ভারত, বাংলাদেশ, বর্মা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সরকার-বিরোধী শক্তি-গুলিকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে এ-পি-এম নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের প্রতি চীনের সমর্থনের উল্লেখ করেছে।

জব্বলপুর থেকে বিপদসংকেত

ইতিমধ্যে লোকসভার জব্বলপুর আসনে উপ-নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেস নেতাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। গত অর্ধ শতাব্দীকাল যাবৎ আসনটি কংগ্রেসের হাতে রেখে দিয়েছিলেন শেঠ গোবিন্দ দাস। লোকসভার এই প্রবীণতম সদস্যের মৃত্যুর পর আসনটি শূন্য হয়েছিল। উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করেছিলেন শেঠ গোবিন্দ দাসের পৌত্র রবি মোহন। 'জনতা পক্ষ'-এর প্রার্থী শারদ যাদব তাঁকে প্রায় ৮৮ হাজার ভোটে হারিয়ে দিয়ে কংগ্রেসের এই পুরান আসন ছিনিয়ে নিয়েছেন। শ্রীযাদব সমাজতন্ত্রী দলের লোক। কিন্তু দলের নামে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। জয়-প্রকাশের প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কোন দলের ছাপ না নিয়ে জনতার প্রার্থী হিসাবে। কংগ্রেস প্রার্থী সি পি আই-এর সমর্থন পেয়েছিলেন। অন্য দিকে শ্রীযাদবের পক্ষে ছিল অন্য সব বিরোধী দলের সমর্থন।

শ্রীযাদবের বয়স মাত্র ২৯ বছর। লোক-সভায় তিনিই হবেন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য।

যে সব কারণে এই উপনির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসের পক্ষে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেগুলি হল ঃ (১) ৫০ বছরের পুরান একটি সুনিশ্চিত আসন এই প্রথম কংগ্রেসের হাত-ছাড়া হয়ে গেল। এই লোকসভা আসনের অন্তর্ভুক্ত আটটি বিধান-সভা কেন্দ্রের সব কটিই ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের দখলে এসেছিল। আর এবার লোকসভার নির্বাচনে ঐ আটটি কেন্দ্রের সব কটিতেই কংগ্রেস প্রার্থী নির্দলীয় 'জনতা পক্ষ' প্রার্থীর চেয়ে কম ভোট পেয়েছেন। (২) এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত আটটি নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে অন্তত পাঁচটিই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এইসব কেন্দ্রেই কংগ্রেসের পরাজয় ঘটার প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, শহুরে কিছু বিক্ষোভ হলেও গ্রামে এখন পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে বলে এতদিন যে দাবী করে আসা হয়েছে সেটা কি অতঃপর মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল? (৩) মাত্র মাসখানেক আগে মধ্য-প্রদেশে আর একটি উপনির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। ভূপালের শহরতলীর গোবিন্দপুর বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের ঐ উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর যে পরাজয় হয়েছে এবং দিল্লী মেট্রোপলিটান কাউন্সিলের সাম্প্রতিক নির্বাচনে জনসঙ্ঘ যে কংগ্রেসের হাত থেকে দুটি আসন ছিনিয়ে নিয়েছে এ-সব ঘটনা মিলিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা পাল্টা স্রোতের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা? (৪) জব্বলপুরে এবং তার আগে গোবিন্দপুরেও জয়প্রকাশের পরামর্শমত নির্দলীয় 'জনতা পক্ষ' প্রার্থী দাঁড় করিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করা হয়েছে। এই দুজন 'জনতা' পক্ষ প্রার্থীর ভয় ইন্দিরা তরঙ্গে ভাঁটার টানও জয়-প্রকাশের রাজনীতির অনুকূলে নতুন স্রোত সূচিত করছে কিনা?

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস মহল অবশ্য এখনও এই পরাজয়কে ইন্দিরা-বিরোধী নতুন তরঙ্গের সূচনা বলে স্বীকার করতে রাজি নন। ব্যর্থতার দায়িত্ব নিজের উপর আরোপ করে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশচন্দ্র শেঠী বলেছেন এই উপনির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নীতি প্রত্যাখ্যাত হয় নি তিনি নিজে নির্বাচনের সংগঠন ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার জন্য দলের হাই-কম্যান্ডের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে প্রস্তুত আছেন। শ্রীশেঠী বলেছেনে এটা যদি জয়প্রকাশেরই জয় হবে তাহলে নির্বাচনী অভিযানের সময় জয়প্রকাশ একদিনও এই নির্বাচন কেন্দ্রে আসেন নি কেন?

কংগ্রেসের এই পরাজয়ের যে সব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীরা দলের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করেছেন, (মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বলেছেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের সঙ্গে সি আই এ-র যোগসাজস ছিল) গ্রামের লোকরা লেভির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন (মুখ্যমন্ত্রী শেঠী যাতে হেলিকপ্টারে যাতায়াত করে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করতে পারেন সে জন্য এই নির্বাচন কেন্দ্রের ভিতর আটটি হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রামের মানুষদের বাধা দানের ফলে মুখ্য-মন্ত্রীর হেলিকপ্টার সব জায়গায় নামান যায় নি।) পিতামহের শূন্য আসনে পৌত্রকে মনোনয়ন দিয়ে একটা বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে কংগ্রেস ঠিক করে নি, কংগ্রেসের পক্ষে এই ধরনের একটি নির্বাচন কেন্দ্রে সি পি আই-এর সমর্থন নেওয়া উচিত হয় নি ইত্যাদি।

জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন জব্বলপুরে শারদ যাদবের জয় 'বিহারের সংগ্রামের প্রতি জনগণের সুনিশ্চিত সমর্থন' সূচিত করছে। বিরোধী দলগুলিকে তিনি এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, উপনির্বাচনের এই ফলাফলকে তাঁরা যেন যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির জয় বলে গ্রহণ না করেন। কেননা 'এই দেশের সুপ্তোত্থিত জনগণ যুক্তফ্রন্ট ও মহাজোটের রাজনীতিকে পিছনে ফেলে এসেছে।...সারা দেশে জনগণের জাগরণ না হলে এবং গুজরাট ও বিহারে জনগণ ও যুব সম্প্রদায়ের সংগ্রাম না হলে গোবিন্দপুর ও জব্বলপুরের মত এমন বিরাট জয় হতে পারত না।'

জব্বলপুরের উপনির্বাচনের তাৎপর্য বিচার করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকা হতে পারে বলে প্রকাশ। পর্যবেক্ষকদের অনুমান এই উপনির্বাচনের ফলাফল দেখে কংগ্রেস নেতারা এখন লোকসভার আচমকা নির্বাচনের কল্পনা বাতিল করে দিতে পারেন।

—পুণ্ডরীক

৩-২-৭৫

পটভূমি

সি পি আইর নয়া কৌশল

সি পি আই-র বেজোয়াদা কংগ্রেসে অনুসৃত রাজনৈতিক রণকৌশলের একটু ছাঁটকাট করতে হয়েছে। কেরল-ধাঁচের সরকার যেখানে সম্ভব শুধু সেই রাজ্যেই সি পি আই সচেষ্ট হবে। কিন্তু কেন্দ্র সম্পর্কে এখন পার্টি নীরব। পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে যেখানে কংগ্রেসে বামপন্থী শক্তি শক্তিশালী সেখানেই কেরল-ধাঁচের সরকার সম্ভব। —এটা কোথায় সম্ভব তার জবাবে তিনি বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারতে এর সম্ভাবনা।

কেরলের পর এরা অন্ধ্র রাজ্যের কথা এখন ভাবছে। কিন্তু কেরলের ভবিষ্যৎ কি? তা অবশ্য শ্রীরাজেশ্বর রাও তার জবাব দেননি।

পার্টি এখন বামপন্থী ঐক্য সম্প্রসারিত করার জন্য একদিকে সি পি এম, অপরদিকে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের তোয়াজ করছে। এবার সি পি আই কংগ্রেসের ভেতরকার মধ্যপন্থীদের সঙ্গে আন্তরিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ তারা বেশ শক্তিশালী।

সি পি আই-র অবস্থা এখন ত্রিশংকু! একমুখেই এরা কংগ্রেস সরকারের বিরোধী সমালোচক এবং স্তাবক। পার্টির এই চরিত্র বা চেহারা অনেক কর্মীই পছন্দ করে না। তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য পার্টি এবার বৃহত্তর বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের নামে সি পি এম-কে মিত্র হিসাবে পাওয়ার প্রস্তাব পাশ করেছে। কিন্তু সি পি এম এই আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না।

কংগ্রেস একটা বিরাট প্ল্যাটফর্ম। এটা একটা রাজনৈতিক দল নয়। কাজেই কংগ্রেসের ভেতরে বহু বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর স্থান আছে।

কংগ্রেসের এক বড় অংশ মনে করছে সি পি আই-র সঙ্গে কংগ্রেসের মধুর সম্পর্কের দিন ফুরিয়ে আসছে। কারণ কংগ্রেসের অভিভাবকের ভূমিকায় সি পি আই-কে কেউ পেতে চায় না। সি পি আই কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংঘাতকে পার্টির শক্তিবৃদ্ধির কাজে লাগাক এটাও কেউ পছন্দ করে না। কংগ্রেস সি পি আই-র সহযোগিতা নিশ্চয়ই নিতে রাজী। কিন্তু আদর্শের বিনিময়ে নয়। তাই সি পি আই নেতৃত্ব বিচলিত। এখন কংগ্রেসের ভেতরে সি পি আই-র সমর্থক ও বিরোধীদের ঝগড়া বৃদ্ধির কৌশল সি পি আই জোরকদমে চালু করায় কংগ্রেসী মহল উদ্বিগ্ন নয় এমন বলা চলে না।

কংগ্রেস নেতৃত্বের এক বড় অংশ কংগ্রেসের ভেতরে সি পি আই পন্থীদের অনুপ্রবেশের বিরোধী। এ-বিষয়ে ভিন্ন মতও দলে আছে। নারোরা কংগ্রেস শিবিরে নাকি ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী শতপথী ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজৈল সিং এই ভিন্ন মতাবলম্বীর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মন্ত্রিসভায় কম্যুনিস্টদের নেওয়ার বিরোধী নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই-র সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশনের সম্ভাবনা নেই। আঁতাতও ভেঙ্গে গেছে। সি পি আই উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছিল। উদ্দেশ্য বহুগুণা সরকারকে হাতে রাখা। কারণ কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব স্বল্প। কিন্তু কিছু নির্দলীয় ও বি কে ডি সদস্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় আর শ্রীবহুগুণাকে সি পি আই-র উপর সরকার চালাবার জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে না। সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাতের কথা যেমন বলেন, তেমনি বিরোধিতার কথা বলেন। সি পি আই গুজরাটে গণ-সংগ্রাম সমর্থন করেছে অন্ধ্রে মহারাষ্ট্রে সরকারের বিরোধিতায় রয়েছে কিন্তু মাদ্রাজে কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতার পথ নিয়েছে। সি পি আই বিহারে সরকার ও কংগ্রেসবিরোধী ও পাঞ্জাবে মন্ত্রিসভার বিরোধী মনোভাব নিয়ে ছিল, এখন কংগ্রেসের গফুর মন্ত্রিসভার সমর্থক ও কংগ্রেসের সাথী। অর্থাৎ সি পি আই নির্বাচনী সাফল্য ও প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ কাজে লাগাবার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতে চায়। কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক বজায় রেখেও সি পি আই নিজস্ব বিরোধী ভূমিকা নিয়েও চলতে চায়। এখানেই সি পি আই-র ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যায়নের অসুবিধা।

জয়প্রকাশ পরিচালিত বিহার ও অন্যান্য রাজ্যের গণ-আন্দোলনের মোকাবিলায় কংগ্রেসের সাথী হিসাবে সি পি আই-র উপস্থিতি বিভিন্ন মহলকে বিচলিত করেছে।

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণকান্ত বলেছেন যে জয়প্রকাশজী নয় সি পি আই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে হটাতে চায়। তাঁর অভিযোগ ঃ সি পি আই আবার কংগ্রেসকে দুটুকরো করতে চায়।

সি পি আই কংগ্রেসের রায় হল জয়প্রকাশই পয়লা নম্বর শত্রু।

এই সুরেই কয়েকদিন আগে কংগ্রেসের শ্রীশশিভূষণ কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন কংগ্রেসের ভেতরেও কিছু জয়প্রকাশ সমর্থক আছেন। এঁদের কংগ্রেস থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার।

তিনি কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমঝওতা চান।

সি পি আই ও তার কৌশল সম্পর্কে কংগ্রেসের ভেতরে যেমন দুটো মত আছে, তেমনি সি পি আই-র ভেতরেও স্বদ্বন্দ্ব স্পষ্ট।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই সম্মেলনের পর্যালোচনায় ধরা পড়েছে যে অনেকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক আর চায় না। কিন্তু তবুও সরকারী প্রস্তাবে একসঙ্গে কংগ্রেস ও সি পি এম-এর বন্ধুত্ব লাভের কৌশল সি পি আই নিয়েছে।

—চাণক্য

এই বাংলার খবর

দুই মন্ত্রীর বিদায়

বিচারপতি কৈলাসনাথ ওয়াঞ্চু পশ্চিমবাংলার পাঁচজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তাঁর তদন্তের রিপোর্ট পেশ করার পরেই রাজ্যের রাজনীতিতে আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। তদন্ত কমিশনের সচিব এন ভি গর্গ রিপোর্ট দিল্লি থেকে নিয়ে এসে রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিবের কাছে পেশ করেন ২৭ জানুয়ারী। রিপোর্ট সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঐদিনই সন্ধ্যায় দিল্লি চলে যান। ২৯ তারিখে রাতে কলকাতায় তাঁর বাসভবনে মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্যে দিল্লি থেকে তিনি তাঁর দপ্তরে নির্দেশ পাঠান। ঐ বৈঠকের পরে সিদ্ধার্থবাবু ঘোষণা করেন যে, ওয়াঞ্চু কমিশনের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী সন্তোষ রায় এবং সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের উপমন্ত্রী সুনীতি চট্টরাজ পদত্যাগ করেছেন। অভিযুক্ত অপর তিনজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা, বনমন্ত্রী সীতারাম মাহাতো এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ নস্করের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ হয়নি বলে কমিশন রায় দিয়েছেন।

সিদ্ধার্থবাবু দিল্লীতে গিয়ে ওয়াঞ্চু কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁরা দুজনেই এই পরামর্শ দেন যে, তদন্ত কমিশন যে দুই মন্ত্রীর কাজের নিন্দে করেছেন, তাঁদের ইস্তফা দেওয়া উচিত। সন্তোষবাবু ও সুনীতিবাবুর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে সিদ্ধার্থবাবু বলেন, তাঁরা দুজনে গণতন্ত্রের মহৎ ঐতিহ্য অনুযায়ীই মন্ত্রিপদে ইস্তফা দিয়েছেন। ওয়াঞ্চু কমিশনের রিপোর্টে এক জায়গায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনো মন্ত্রীর সততা সম্পর্কে অণুমাত্র সন্দেহ থাকা উচিত নয়, সীজারের পত্নীর মতো তাঁকে থাকতে হবে সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। সন্তোষবাবুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে বিচারপতি ওয়াঞ্চু বলেছেন তিনি যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়েছেন তা থেকে তাঁর এই সিদ্ধান্তে আসতে কোনো অসুবিধেই হয়নি যে, সন্তোষবাবু সমাজ-কল্যাণ পর্ষদে তাঁর বোন গায়ত্রীকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্যে নিজের প্রভাব খাটিয়েছেন। সুনীতিবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে বিচারপতির মন্তব্য : যে-কোম্পনীর সঙ্গে সুনীতিবাবুর স্ত্রী-সহ তাঁর পরিবারের বেশ কয়েকজন জড়িত, সেই কোম্পানীকে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার জন্যে সুনীতিবাবুর প্রভাব অবশ্যই খাটানো হয়েছিল বলে মনে হয়।

দপ্তর বদল

ওয়াঞ্চু কমিশনের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবাংলা মন্ত্রিসভায় দপ্তর পুনর্বণ্টন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশ্য সিদ্ধার্থবাবুর এই সুযোগে মন্ত্রিসভায় এখনও পর্যন্ত কোনো বড় রকমের পরিবর্তন ঘটাননি। নতুন মুখ দেখা গেছে একটি, তাঁর নাম ডঃ মোতাহের হোসেন। তিনি বীরভূমের লোক। সুনীতিবাবুও তাই। তিনি হলেন স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) এবং ওয়াঞ্চু দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। এতদিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ডঃ হাজরা হক। তিনি গেলেন পূর্ত বিভাগে, সেখানে সি এম ডিএ এবং দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কাজ তদারক করবেন রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবেই। সন্তোষবাবুর হাতে যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ভার ছিল সেটি পেলেন বন ও আবগারি মন্ত্রী সীতারাম মাহাতো। আর সন্তোষবাবুর মৎস্য বিভাগটি চলে এলো ডঃ জয়নাল আবেদিনের হাতে। কিন্তু সীতারামবাবুকে ছাড়তে হলো পশুপালন। শ্রম দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য স্বাধীনভাবে পশুপালন ও ডেয়ারি দপ্তর দেখবেন। কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও আইন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাসও তফশীল জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর স্বাধীনভাবে দেখা-শোনা করার দায়িত্ব পেলেন। ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন বিভাগটি ডঃ আবেদিনের কাছে থেকে চলে গেল স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার হাতে। রাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ নস্কর স্বাস্থ্য দপ্তর ছেড়ে গেলেন শিক্ষা দপ্তরে। পদোন্নতি ঘটলো শুধু শিল্প ও পর্যটন দপ্তরের উপমন্ত্রী গজেন্দ্র গুরুংয়ের তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন, সেই সঙ্গে পেলেন তথ্য দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব।

এই দপ্তর পুনর্বণ্টনকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো মহলে জল্পনা সুরু হয়ে যায় যে, সিদ্ধার্থবাবু পশ্চিম বাংলার রাজনীতি ছেড়ে দিল্লি পাড়ি দিচ্ছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এখন পশ্চিম বাংলা ছেড়ে তাঁর যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এদিকে সন্তোষবাবু ঘোষণা করেছেন, তিনি ওয়াঞ্চু কমিশনের রায়ের সঙ্গে একমত নন। তিনি বিধানসভার সদস্য পদে ইস্তফা দিয়ে আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে চান।

ভয়াবহ দুর্ঘটনা

উল্টোডাঙা স্টেশনে ২৯ জানুয়ারি যে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে গেল অত বড় দুর্ঘটনা পূর্ব রেলের ইতিহাসে খুব বেশি একটা ঘটে নি। একটি হাবড়াগামী লোকাল ট্রেনের পিছনে এসে ধাক্কা মারে দার্জিলিং মেলের কানাডিয়ান এঞ্জিন। লোকাল ট্রেনের শেষ কামরাটির মধ্যে এঞ্জিনটি পুরোপুরি ঢুকে পড়ে। তার পরের কামরাটি লাইনচ্যুত হয়। তখন সন্ধ্যের মুখ, অফিস-ফেরত যাত্রীর ভিড়। প্রতিটি কামরাই উপচে পড়ছে। সেই সময়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

কেমন করে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটলো সে-সম্পর্কে সুরু হয়েছে জোড়া তদন্ত। একটি করছেন রেলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিশনার, দ্বিতীয়টি করছেন গোয়েন্দা পুলিশ। দার্জিলিং মেলের চালক গ্রেপ্তার হয়েছেন। যাত্রীদের কাছ থেকে যে-বিবরণ পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায়, হাবড়া লোকালটিতে শিয়ালদহ থেকে ছাড়ার আগেই গণ্ডগোল ধরা পড়ে। তবু ট্রেনটি ছাড়ে। কিন্তু উল্টোডাঙায় এসে গাড়িটি আবার বিগড়োয়। তখন ঐ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই গাড়িটি আগুপিছু করতে থাকে। সেই সময়েই দার্জিলিং মেলটি এসে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। উল্টো-ডাঙায় রেলের বস্তুপাতি চুরি যাওয়ায় সিগন্যালিংয়ের কাজ ঠিক-মতো করা যাচ্ছে না বলে রেল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছেন। এর পিছনে নাশকতার কোনো চেষ্টা আছে কিনা, গোয়েন্দা পুলিশ তদন্ত করবে সে-বিষয়েই।

—দেবদত্ত

ফাদার দ্যতিয়েন রোজা নামচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল মুয়াজ্জিনের আজানের প্রতিধ্বনিতে। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। আমাদের এই উত্তর কলকাতায় —তেলিপাড়ার এই নিবিড় পল্লীতে—মর্ত-বাসীর জাগরণপর্ব মৃদু-মন্থর ও ক্রমবর্ধমান। বিশ্লেষণ করে দেখবেন, আপনার স্বপ্নমালার রঙিন সূত্র ছিঁড়ে যায় শৈবালদের গৃহশীর্ষবাসী কুঁকড়োর আত্মঘোষণায়, আড়মোড়ার পালা চুকে যায় পার্শ্ববর্তী খাটালের গরু-মোষের ঐকতানে...তারপর, গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকায় বর্ণিত রীতি অনুযায়ী দক্ষিণ চরণ মাটিতে ফেলে দেওয়ালে-টাঙানো মাতৃদেবীর, পিতৃদেবের, তথা তাবৎ তাবৎ পূজ্য-নমস্যদের প্রতিকৃতির দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ বোলালেন নীচের তলায় স্বর্গস্থ গোপালের মন্দিরে-কর্মরতা পার্থিব গোপালের মায়ের ধোয়া-মোছার তালে তালে; অবশেষে, প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনার্থে স্নানাগার অভিমুখে আপনি যেই পা বাড়াবেন, বুঝবেন, হরিসভার গায়েন-বায়েনের সম্মিলিত 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' কীর্তন মন্দিরের চত্বর কাঁপিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জাগিয়ে তুলেছে।

বাংলাদেশের রাজধানীতে এমনতর নয়: মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর, আকাশ বিদীর্ণ করে জাতিধর্মনির্বিশেষে মুমিন বেদীন সবাইকে পালঙ্ক থেকে উদ্গীরণ করে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় প্রচার করে : 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ (দেবতা) নাই: নমাজের জন্য ঘুম হইতে নমাজ উত্তম!' নমাজ কথাটা অবশ্য ঐ ভদ্রলোক ব্যবহার করেন না, বলেন সালাত; একমাত্র তুরস্ক দেশেই মাতৃভাষায় আজান (তথা জুমার আর ঈদের খুতবা) উচ্চারণ করা দুরস্ত।

নমাজ মুমিনের এবাদতের (ভজনার) পঞ্চভিত্তির প্রধান; বেনা (বেনা মানেই ভিত্তি!)। হ্যাঁ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে যেমন আছে পঞ্চভূত ও পঞ্চপাণ্ডব, পঞ্চশস্য ও পঞ্চগব্য, ইসলামীয় সংস্কৃতিতেও আছে পাঞ্জতন (হজরত মহম্মদ, তাঁর কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রদ্বয়) আর পঞ্চভিত্তি : কলেমা (বিশ্বাসোক্তি), নমাজ, রোজা, জাকাত, হজ; কারও কারও মতে কিন্তু কলেমার স্থলে জিহাদ। দৈনিক নমাজ আবার পাঁচ বেলায় সম্পাদনীয়—ইহুদীদের যেমন তিন, কাথলিক সন্ন্যাসীদের যেমন সাত।

জাকির মিয়ার মতে আরবী ভাষা খোদারই জবান; সেই জবানেই আল্লাতালা হজরত মহম্মদের কর্ণকুহরে তাঁর কালাম-পাক নাজিল করেছিলেন, আর সেই সময় থেকে তামাম দুনিয়ার হর মুমিন আরবী ভাষায়ই নমাজ পড়ে এসেছে। আসলে ওরা কিছু 'পড়ে' না (প্রকৃত পাঠ করলে নমাজ দুরস্ত হয় না!), বরং কোরান শরীফের মুখস্থ-করা কয়েক আয়াত আবৃত্তি করে নমাজ 'আদা' করে।

মিয়ার মতে নমাজ ততটা প্রার্থনা নয়, যতটা আল্লাতালার স্বার্থহীন সেবা। বাক্যগুলোর বোধগম্যতা বড় কথা নয়; বড় কথা হল খোদার দরগায় মুমিনের স্বাধীন ইচ্ছার সমর্পণ। এই ধরুন 'রুকু'...রুকুতে যাবেন যখন, এমনভাবে ধড় ঝুঁকিয়ে রাখবেন যেন, পিঠে পানি-ভরা পেয়ালা রাখলে, এক ফোঁটাও ছলকে না পড়ে; উভয় হাত দিয়ে দুই হাঁটু কর্সে ধরবেন—আঙুল খোলা রেখে পাঁজর থেকে বাহু পৃথক করে...। কিংবা ধরুন 'সেজদা'...সেজদায় যাবেন যখন প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, তারপর নাক, তারপর কপাল মাটিতে লাগাবেন, পা খাড়া রেখে পদাঙ্গুলি কিবলামুখী করে (অর্থাৎ মক্কাভিমুখী করে)!...ঈশ্বরের নিষ্কাম ভক্তির প্রতীক হিসেবে নমাজের এই সুনিয়ন্ত্রিত পুণ্যকর্ম জাকির মিয়ার চোখে অতি মূল্যবান।

আজান আর খুতবা কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নয়, মানুষেরই উদ্দেশ্যে : আজান দিয়ে মুয়াজ্জিন মানুষকেই আহ্বান জানান প্রার্থনায়, খুতবার উচ্চারণে ইমাম মানুষকেই উপদেশ দেন সৎপথে চলতে। এই হল জাকির মিয়ার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।

আমার মতো কাফিরের পক্ষে ঐ ধরনের ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নেই, তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি প্রশ্ন টিঁকে গিয়েছে : পারসিকেরা যখন মুমিনদের হাতে পরাজিত হয়ে নবপ্রচারিত ধর্ম অবলম্বন করতে শুরু করল, ওরা কিন্তু আরবী শব্দকোষ নির্বিচারে গ্রহণ করল না, এমন কি ধর্মীয় ব্যাপারেও নিজস্ব ভাষাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করল না; ওদের চিরাচরিত প্রথা মতো ওরা বেহেস্ত ও দোজখ, ফেরেস্তা, গুণাহার ও খোদা প্রভৃতি বলতে থাকল। পারসিকদের অনুসরণ করতে হলে আমরা পরের (ফার্সি) শব্দ নয়, বরং নিজের (বাংলা) শব্দ ব্যবহার করব : স্বর্গ ও নরক, স্বর্গদূত, পাপী, ঈশ্বর...।

লোকে বলে : জল হলেই হল, জল-কে পানি বললে কিছু এসে যায় না, আর ঈশ্বরকেও যে-কোনো নামে ডাকলেই হল, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি বলি : এসে যায়, খুবই এসে যায়...জল আমাদের

শরীরের প্রাণ; একই দেশের একই ভাষার মানুষ যখন একই পুকুরের একই জল পান করে, সেই জলের সম্প্রদায়গত বিভিন্ন নাম রাখলে অবশ্যই ক্ষতি হয়ঃ অনাবশ্যক বিভেদের প্রকৃত সৃষ্টি হয়, কিংবা প্রকৃত বিভেদের অনাবশ্যক প্রকাশ ঘটে। ঈশ্বরের বেলাতেও তা-ই ঃ তিনি আমাদের অস্তিত্বের প্রাণ; কোরানের, উপনিষদের ও বাইবেলের ঈশ্বর যখন এক, তাঁকে একই নামে ডাকার সমষ্টিগত আনন্দ থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করি কেন?

জাকির মিয়া স্বয়ম্ভুকে যে ঈশ্বর কিংবা ভগবান বলেন না, তার কারণ এই যে, এক, উভয় কথার এক স্ত্রীলিঙ্গ রূপ আছে (ঈশ্বরী, ভগবতী) আর দুই, উভয় শব্দই মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় (প্রাণেশ্বর, ভারতেশ্বর, যোগীশ্বর, ভগবান বুদ্ধ, ভগবান শ্রীচৈতন্য...)।

আপত্তিকারীর প্রতি আমার সহানুভূতি আছে খুব, আপত্তির প্রতি আছে অল্প। বাইবেলে চরম সত্তার দুটি নাম আছে ঃ মানবজাতির স্রষ্টা হিসেবে ব্যবহৃত হিব্রু নাম এলোয়াহ্, যার আরবী রূপ এলাহ্ (এলাহাবাদ মানে ঈশ্বরপুরী) কিংবা—নির্দেশক উপদেশের সঙ্গে—আল্লাহ্; এবং ইস্রায়েলীয় জাতির কাছে প্রকাশিত তাঁর ব্যক্তিগত নাম ইয়াওয়ে। বাইবেলের অনুবাদে আমরা এলোয়াহ্-কে নিঃসংকোচে বলেছি ঈশ্বর, ইয়াওয়ে-কে লিখেছি ভগবান।

...হোসনে আরা বেগম জাকির মিয়ার গিন্নী; কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি স্মরণ করেন কলকাতার লোরেটো স্কুলে যাপিত তাঁর ছাত্রীজীবনের কথা, তুলনামূলক ধর্মাধ্যয়ন তাঁর পথ। কোণে বসে তিনি শুনছিলেন নীরবে। হঠাৎ মৌন ভেঙে তিনি বলে ওঠেন, 'খৃস্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে এক মস্ত ব্যবধান এই যে, খৃস্টধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম হলে কি হবে, তার কোনো বিশ্বজনীন সংস্কৃতি নেই ঃ আমেরিকার খৃস্টানেরা ইংরেজি গান করে বীট্ মিউজিকের তালে তালে, কলকাতার কাথলিকেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গান করে তবলার সঙ্গতে; ওরা আবার ওদের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনায় খোদাকে 'সত্যশিব-সুন্দর সচ্চিদানন্দ' বলে সম্বোধন করে, ত্রিপুরুষ পরমেশ্বরের প্রতীক হিসেবে প্রণব ব্যবহার করে, খৃস্টজননীর মূর্তিকে সাড়ি, শাঁখা ও সিঁদুর পরাতে দ্বিধা বোধ করে না ...ওদের আচার-ব্যবহারে বাঙালী হিন্দুদের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই, বরং ওদের আর বিদেশী খৃস্টানদের মধ্যে আসমান জমীন ফারাক'...একজনকে আমি বলতে শুনেছি ঃ ধর্মে আমি খৃস্টান, সংস্কৃতিতে আমি ভারতীয়, অর্থাৎ কিনা হিন্দু...ভারতীয় সংস্কৃতি যেহেতু মূলত হিন্দু—যদিও উত্তর ভারতের উচ্চসঙ্গীতে, পরিচ্ছদে ও স্থাপত্যে ইসলামীয় দান নগণ্য নয়...

'ইসলামের কথা এবার ভেবে দেখুন ঃ আমাদের বিশ্বজনীন ধর্মের এক বিশেষ অঙ্গ হল আমাদের এক বিশ্বজনীন সংস্কৃতিঃ আদর্শ মুমিনকে মিশরে য়ুরোপে-বাংলাদেশে কোথাও চেনা যাবে না ঃ একই সময়ে একই ভাষায় একই ভঙ্গি সহকারে ওরা প্রার্থনা করে, একইভাবে পরস্পরকে অভিবাদন জানায়; ওদের সামাজিক জীবনযাত্রা একই সুনির্দিষ্ট নিয়মে নিয়ন্ত্রিত...

'খৃস্টানদের যীশু স্থানে কালে সীমাবদ্ধ ছিলেন; প্রকৃত মানুষ হতে হলে তাঁকে তখনকার দিনের, সেখানকার দেশের ইহুদী সাজতে হয়েছিল। তাঁকে কিন্তু হতে হবে সর্বকালের সর্বদেশের মানুষ; কাজেই তিনি তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিয়েছেন ইস্রায়েল দেশে দু হাজার বছর আগে আরব্ধ তাঁর কার্যকে ধরণীর চতুঃসীমান্তে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সমাপন করতে। তাই তারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে বাইবেলের বাণী ভাষায় উপভাষায় অনুবাদ করে যায়, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি অবলম্বন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে ঃ পাকিস্তানে ওদের যাজক টুপি পরেই উপাসনা চালান...আদিবাসী অঞ্চলে ওদের ধর্মোলঙ্গ মেয়েরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আদিম নৃত্য নাচে...

'আমরা কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতি রাখতে দৃঢ়সংকল্প। আমরা মনেপ্রাণে বাঙালী বটে, স্বাধীন বাংলার জন্য আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত; সংস্কৃতিতে কিন্তু আমরা পুরোপুরি বাঙালী নই... আমার আম্মা সাড়ি পরতেন, তবে অমুমিন প্রথামতো নয়, আমার আব্বা ধুতি পরতেন, তাও অমুমিন প্রথামতো নয়...আমাদের বাড়ির উপাধি চৌধুরী, তবে আমার ভাই-এর নাম দেখুন ঃ চৌধুরী রেজা শাহারিফ... হ্যাঁ, উপাধিটাকে নামের আগেই আমরা লিখি! পশ্চিম দিকে ঘুরে আমরা যে নমাজ পড়ি, তার অবশ্য এক ভৌগোলিক কারণ আছে (কাবা শেরীফ যে পশ্চিমে!) কিন্তু কলাপাতা উল্টিয়ে যে আহার করি, সেটা প্রকৃতপক্ষে অমুমিন কায়দার বিপরীত আচরণের মানসে।

'যীশু কি-ব্যঞ্জন আহার করতেন, কি-বস্ত্র পরিধান করতেন, কি-ভাষায় উপদেশ দিতেন, কথাটা খৃস্টানদের কাছে চূড়ান্ত প্রশ্ন নয়। তিনি ইস্রায়েল দেশের ব্যঞ্জন খেতেন, ইহুদীসুলভ পোশাক পরতেন, প্যালেস্টাইনের ভাষা বলতেন; তবু খৃস্টানেরা ও-সবের কিছু না করে বাংলাদেশের ব্যঞ্জন খায় বাংলাদেশের পোশাক পরে বাংলাদেশের ভাষা বলেন। আদর্শ মুমিন কিন্তু বিশ্বনবির অবিকল অনুকরণে, স্থানকালের স্বাতন্ত্র্যের কথা না ভেবে, দাড়ি রাখে, আতর ও মেহেদী ব্যবহার করে, আরবী নাম নেয়, আরবী ভাষায় পরস্পরকে সালাম জানায়...

'ঐ আরবী সংস্কৃতিটাকে আমরা পুরোপুরি রাখতে পারিনি ঃ মুমিন বাঙালীর সংস্কৃতি আসলে ত্রিবেণী সংস্কৃতি। আমাদের মূলত আরবী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশেছে কিছুটা হিন্দু প্রভাব—বিশেষভাবে সাদির সামাজিক অনুষ্ঠানে—এবং বেশ কিছু বিদেশিয়ানাও বটে ঃ জাতীয় দিবসে দেখবেন, অমুমিনেরা ধুতি-পাঞ্জাবি যেখানে পরে আসে, আমাদের শিক্ষিত সমাজের মাতব্বরেরা কুর্তা-পাজামা পরেন না, পরেন স্যুট...'

কাউকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে হোসনে আরা বেগম উঠে বললেন, 'একটু বসুন, চা নিয়ে আসি।'

চা ছিল পরিবেশিকার মতোই মিষ্টি; চা ছিল নিজের হাতে তৈরি হালুয়া।

(ক্রমশ)

অদ্বিতীয় ফরমুলা...অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে

প্রেপারেশন এইচ*

আমেরিকান ডাক্তারদের পরীক্ষা করে দেখা

- কয়েক মিনিটেই চুলকানি বন্ধ করে
- সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয়
- খুব বাড়াবাড়ি না হলে, অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে
- পিচ্ছিল ক'রে মলত্যাগের কষ্ট কমিয়ে দেয়

বিনামূল্যে! অর্শ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকার জন্যে আজই এই ঠিকানায় লিখুন (সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন): ডিপার্টমেন্ট PH-88 পোঃ অঃ বক্স ১০১৩, বম্বে ৪০০০০১

*Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Co. Ltd.
743-PH-72 BEN

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গামসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনী সুর বেজে উঠল।

কিন্তু তরঙ্গিণীর মন বড় চঞ্চল। বুকের মধ্যে তার টনটন করে ওঠে—ষষ্ঠী গেল—মহাসপ্তমীও এসে গেল—কিন্তু তার মেয়ে এখনও এলো না।

আর কবে আসবে?

ক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পেরিয়ে দশমীও এসে গেল। ভোরে উঠেই সবাই দেখে ভিজে চোখ মা-দুর্গার। শেষ রাত থেকে সানাই বাজছে। তারও কান্নার সুর গিরিকন্যা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছেন বলে।

দুপুরের পরই মা দুর্গার কপালে সিঁদুর পরিয়ে সেই সিঁদুর মেয়েদের মধ্যে এ ওকে পরিয়ে দেবার ধুম পড়ে গেল।

কিন্তু ভবনাথের মন খারাপ। মন্ডপ খালি করে মা চলে যাবেন, এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

ধুমধাম করে বাঁওড়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিমা বিসর্জনও হোলো। কিন্তু ভবনাথ কোন কিছুতেই অংশগ্রহণ করেন নি।

ভবনাথের আরেক ভয় মা দুর্গাকে আনতে গিয়ে বাড়ি মাকে হারিয়েছেন। ধর্মকর্ম এ বংশে সয় না।

এদিকে দেবনাথও আসেন নি। তিনিও পুজোর সময় বাড়ি আসা সেই থেকে ছেড়েছেন।

পুঁটি আর কমল ভাই-বোনে বাইরে বাড়ি ছুটে এসে হুড়কো ধরে দাঁড়িয়েছে। আহ্লাদী বৈরাগী গাইছেন ঃ অভিরামের স্ত্রীপাতর মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি, বিদায় দাও মা ঘুরে আসি—

ভবনাথ আশশাওড়ার দাঁতন ভেঙে নিয়ে ফিরছেন। পুঁটি শুধায় ঃ অভিরাম-ক্ষুদিরাম কারা জেঠামশায়?

সাহেবদের উপর ক্ষুদিরাম বোমা মেরেছিল ভবনাথের জানা আছে। সাহেবরাও ছাড়ন পাত্র নয়—চারিদিকে ধরপাকড় লাগিয়েছে। এমন হয়েছে, তরঙ্গিনী কিম্বা অলকা-বউয়ের উদ্দেশে বউমা বলে ডাকতে অনেক সময় ভবনাথের ভয় লাগে—হতে পারে ঘর-কানাচে টিকটিকি অলক্ষ্যে ওত পেতে আছে, 'বউমা' শুনতে সে 'রোমা' শুনে ফেলল। আর দেখতে হবে না—হাতকড়া এঁটে টানতে টানতে নিয়ে চলল। হুবহু এই নাকি হয়েছে কোথায় ভবনাথের একজন অন্তরঙ্গ বলেছে। বিপদ হয়েছে দেবনাথ এই সবে আস্কারা দেয়। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলবার জো নেই। যার কাছে বলতে যাবেন—অ্যাঁ আপনার মুখে এই কথা? এর চেয়ে নোংরা অসভ্য কথা যেন হয় না। অগত্যা নির্বাক থাকেন তিনি—মনে মনে ঘোরতর বিরক্ত।

দিদির দেখাদেখি একফোঁটা কমলও বলল, জেঠামশায় ক্ষুদিরাম কে?

দেবনাথকে জিজ্ঞাসা করগে যা বলবার সে বলবে—। বলে মুখ বেজার করে ভবনাথ রোয়াকে উঠে গেলেন।

এই ভবনাথের ভিতর বাড়ীতেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। দিব্যি একটা দল বেরিয়ে আসে—দেবনাথ অগ্রবর্তী। টুকরো টুকরো হলদে সুতো, যার নাম রাখী, পুরানো হিতবাদী কাগজে জড়ানো। রাখীর প্যাকেট দেবনাথ নিজে নিয়ে আসছেন। পিছু পিছু আসে হিরু অটল শিশুবর আর ঐ শারি-বাদের সিধু ও তাদের ভৃত্য নন্দ প্রধান। বংশীধর ঘোষের ছেলে সিধু অর্থাৎ সিদ্ধি-নাথ এদের সঙ্গে এক দল হয়ে বেরুচ্ছে সদরের আদালতে যে বংশীধর ও ভবনাথে ফৌজদারী-দেওয়ানী দুই-এক নম্বর লেগেই আছে সর্বদা। জন পাঁচ-সাত নিয়ে মন্টুও এসে গেছে নতুন পুকুরের ঘাটে। ভুচুত-ভুচুত করে ডুব দিয়ে সব শুচি হয়ে উঠল। হিমচাঁদ হারু সরকারের দল পশ্চিম বাড়ীর বলাই-অশ্বিনীর দল, উত্তর বাড়ীর যজ্ঞেশ্বর-অক্ষয় জল্লাদ-পদীর দলও এসে পড়ল। বাড়ী থেকে চানটান সেরে এসেছে তারা। জল্লাদের উপর নিশানের দায়িত্ব—সরু সরু কঞ্চির মাথায় রঙিন কাগজের ত্রিকোণাকার নিশান বড় বড় অক্ষরে 'বন্দে-মাতরম' লেখা। এ-ওর হাতে রাখী বেঁধে দিচ্ছে ঃ বঙ্গভঙ্গ হলে কি হয় — মানুষ আমরা আরও বেশী করে ঐক্যবন্ধনে বাঁধা পড়ে যাচ্ছি দেখ। তুমুল বন্দেমাতরম ধ্বনি—আকাশ ফেটে যায় বুঝি বা! কোনো বাড়ী বুঝি আর মানুষ রইল না—পুব বাড়ীর পুকুর ঘাটে সব ছুটেছে। শশধর দত্ত লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে এসে বললেন, হয়ে গেল নাকি তোমাদের? আমার হাতে দাও একটা পরিয়ে।

সকলে মিলে-মিশে এখন একটা দল। হাতে হাতে নিশান তুলে ধরেছে, বাতাসে নিশান পত-পত করছে রং-বেরংয়ের পাখির পাখনা উড্ডয়নের মতো। গ্রামপথ ধরে চলেছে। কোন রান্নাঘরে আজ উনুন জ্বলবে না দুঃখের দিন, বঙ্গদেশ ভেঙ্গে দিয়েছে এই দিনে। বন্দেমাতরম্ আর স্বদেশী গান—গানের পর গান। অশ্বিনী খোল বাজাচ্ছে, পাথরঘাটার গাইয়ে মতিলাল এসে পড়েছেন ধরতা দিচ্ছেন তিনি। ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে মাতঙ্গী মেতে-ছেন আজ সমররঙ্গে। মায়ের-দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই! ভেঙ্গে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী...। বিলাতি শাড়ি-ধুতি মেয়েরা সব বোঁচকা বেঁধে রেখেছে—বিকালের সভায় পোড়ানোর জন্য পাঠাবে। কাঁচের চুড়ি সব ভেঙ্গে চুরমার—হাতে রয়েছে শাঁখা। বাড়ী ঢোকবার মুখে দেখে-শুনে পা ফেলো হে—চুড়ির টুকরো পায়ে না বেঁধে।

সভা হাটখোলায়। কমল বায়না ধরল সে-ও যাবে। পুঁটি বাগড়া দিচ্ছে, যেহেতু সে যেতে পারবে না মেয়েলোক কেউ যায় না। তরঙ্গিণীর কানে তুলে দিল—ভাল-মানুষ হয়ে বলল, মা খোকন নাকি সভায় যাবে? তরঙ্গিণী এক কথায় কেটে দিলেন ঃ যাবে না আরো-কিছু! ছেলেপুলেরা যায় না। আমি আজ একলব্যের গল্প বলব। সেদিন বলতে বলতে হল না অতিথ এসে পড়ল, রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। গল্পটা আজ শেষ করব।

গল্পের উপর যত টানই থাকুক সে জিনিস আজ নয়। সভায় যাওয়ার ঝোঁক চেপেছে। গুম হয়ে আছে কমল হিরুর গুলা পেয়ে তার কাছে ছুটে গেল। তাকে সুপারিশ ধরবে।

হিরু-ও যে একেবারে বসিয়ে দিল। বলে, সভায় গিয়ে কি করবি তুই? বক্তৃতা হবে—উঠে দাঁড়িয়ে এক নাগাড়ে বক বক করবে। একজন থামলে আর একজনে। একটা দুটো স্বদেশী গান—সকালে তো দেদার শুনেছিস।

হেনকালে দেবনাথ এসে পড়লেন ঃ কি বলছেন কমলবাবু?

হিরু বলে, সভায় যেতে চাচ্ছে—

দেবনাথ একেবারে গঙ্গাজল ঃ যাবে। তার জন্যে কি—

হিরু বলছে, গিয়ে শুধু বসে থাকা। কিছু তো বুঝবে না।

বড় হয়ে বুঝবে। অন্তত এটুকু বুঝবে একরত্তি বয়সেও দেশের ডাকে গিয়েছিলাম। সে-ই তো অনেক।

হিরু মিন-মিন করে তবু একটু বলে, হাটখোলা অবধি পারবে যেতে?

দেবনাথ বললেন, হেঁটে যেতে পারবে না। দরকার কি? অটল যাবে, শিশুবর যাবে—ওরা কেউ নিয়ে যাবে কাঁধে করে। বলে দিচ্ছি—

মানমজন ভালই আসছে। আগের হাটে ঢেঁড়া দিয়েছিল। ঢোল আর কে আনতে যাচ্ছে—দোকান থেকে কেরোসিনের এক খালি কেনেস্তারা চেয়ে নিল হারু সরকার। এ'দিক-ওদিক তাকাতে কেতু ঋষি নজরে পড়ে গেল। কেতুর হাতে কেনেস্তারা দিয়ে হারু বলল, ঢেঁড়া দাও। অর্থাৎ টিন বাজাও। হাটের ভিতর দিয়ে কেতু টিন বাজাতে বাজাতে চলল। লোকে জিজ্ঞাসা করে ঃ কি ব্যাপার? হারু পিছন থেকে বলে যাচ্ছে, পরশু দিন তিরিশ তারিখে ঐ বটতলায় স্বদেশী সভা—সভার শেষে বিলাতী নূন কাপড় নষ্ট করা হবে, আসবেন সকলে।

পাইতক্কের যাবতীয় গাঁ-গ্রামে খবর গিয়ে পৌঁচেছে দুপুর থেকে লোক আসতে লেগেছে।

কমল অটলের কাঁধে। বাড়ী থেকে বেরুনোর সময় একটি কথা বলে নি সে—প্রথম ভাগের গোপাল নামক বালকটির মতন। শত্রু অনেক তো বাড়ীতে—কিছু বলতে গেলে যাওয়াটাই বা পণ্ড হয়ে যায়! বেশ খানিকটা চলে আসার পর কমল গোঁ ধরল কাঁধে চড়ে সে যাবে না—হাটখোলার কাছাকাছি তখন। দলে দলে মানুষ সভায় যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সবাই—শুধুমাত্র কমল কাঁধের উপর। আকুলি-বিকুলি করছে নেমে পড়বার জন্য। দেরী করলে লাফিয়ে পড়বে, গতিক সেই রকম। বেটাছেলে হয়ে কাঁধে চেপেছে রাস্তার লোক সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—ছিঃ!

ছেলে এক ফোঁটা, জেদ পাহাড় প্রমাণ। নামাতে হল কাঁধ থেকে। গুটি-গুটি হাঁটছে কমল, অটল একখানা হাত ধরেছে পড়ে-টড়ে না যায়। তা-ও হবে না—হাত ছাড়ানোর জন্য ঝুলোঝুলি করছে। রেগেমেগে অটল বলল, ভারী পা হয়েছে তোমার? অমন করো তো জোর করে কাঁধে তুলব, কাঁধে করে বাড়ী ফেরত নিয়ে যাব।

ধমক খেয়ে কমল চুপ। সভায় ভিড় খুব—ফুলবেড়ে কোনাখোলা পাথরঘাটা গড়-ভাঙা থেকেও এসেছে। একখানা মাত্র চেয়ার সভাপতির জন্য—হাতেম আলি ফকিরকে সেখানে বসান হয়েছে। অন্য সকলে ভুঁয়ের উপর। চেয়ারের পাশে গাদা-করা নূন ও কাপড়। সভা অন্তে বিলাতী কাপড়ে আগুন দেবে, বিলাতী নূন অদূরবর্তী পুকুরের জলে ফেলবে। বক্তৃতার জন্য ঠিক করা হয়েছে সোনাখড়ি থেকে দেবনাথ ও সকল নাটের গুরুমশায় হারু সরকারকে। মাদার ঘোষ আসতে পারেন নি—সদরেও এই মচ্ছব, সেখানে আটকে ফেলেছে। থাকলে তিনিও নিশ্চয় বলতেন। ফুলবেড়ে-ইত্যাদি গ্রাম থেকে একজন করে বাছাই হয়েছে। তাই তো অনেক হয়ে গেল।

হিমচাঁদ কী কাজে গড়ভাঙায় গিয়ে পড়েছিল। ছুটতে ছুটতে এলো, সভার কাজ তখন আধাআধি সারা। এসে অক্ষয়কে চুপি চুপি বলল, গঞ্জ থেকে ছোট দারোগা রমজান খাঁর বাড়ীর চুরির তদারকে এসেছে। অক্ষয়ের কানে ফিসফিসিয়ে বলা আর হাটে-বাজারে জয়ঢাক পিটিয়ে বলা—উভয়ের ফল একই প্রকার। ঐ জনারণ্যের মধ্যে খবর জানতে কারো বাকী রইল না। চুরি হয়ে গেছে চারদিন আগে, থানার টনক এদ্দিনে নড়ল। বেছে বেছে আজকেই বা কেন, হাট-খোলার স্বদেশী সভা যে তারিখটায়?

এমনি সন্দেহ হিমচাঁদের মনেও উঠেছিল। নিজের কাজ সেরে সে রমজানের বাড়ী চলে গেল যদি কোন পাকা হদিশ মিলে যায়। সেখানে এক আচ্ছা মজা জমে উঠল, ছেড়ে আসা সহজ নয়, সভায় পৌঁছতে সেই জন্য দেরী।

তদারক সারা করে দারোগা এবার রওনা দেবেন। গঞ্জ থেকে পালকী করে এসেছেন। বললেন, চলে যাবে এবারে মিঞাসাব পালকি ভাড়ার ব্যবস্থা করো।

রমজান রগচটা মানুষ, দেশসুদ্ধ মানুষ জানে। তার উপরে সর্বস্ব চুরি হয়ে গিয়ে মেজাজ সর্বক্ষণ তিরিক্ষি। জমবে এইবারে—হিমচাঁদ নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসল। রমজান কিন্তু অতিশয় শিষ্ট। সবিনয়ে বলল, হচ্ছে ব্যবস্থা। একটুখানি সবুর করতে হবে হুজুর।

দলিচ ঘরের দাওয়ায় সকলে জমিয়ে বসেছে। ভুড়ুক-ভুড়ুক করে দারোগা হুঁকো টানছেন চপর-চপর করে পান চিবাচ্ছেন। গোয়াল থেকে গরু খুলে নিয়ে রমজান চলল।

কোথায় চললে হে? দারোগা বললেন এ দিককার মিটিয়ে-মাটিয়ে তারপর যেও।

রমজান বলল গরু নিয়ে সেই জন্যে তো যাচ্ছি। দুধাল একটা গরু কিনবেন, আখেজ-ভাই বলছিলেন—

এমন গরুটা বেচে দেবে? —হিমচাঁদ জিজ্ঞাসা করল।

না বেচে উপায় কি? চোরে সর্বস্ব নিয়ে গেছে। ভাঙ্গা থালাখানা ফুটো ঘটিটা অবধি রেখে যায়নি। কলার পাতা কেটে ভাত খাচ্ছি। চুরির পর দিন ভোরবেলা থানায় এজাহার দিয়ে এসেছি। এদ্দিনের পরে তবে এলেন—এসে পালকী-ভাড়ার দাবী। গরু না বেচে দাবী কেমন করে মেটাই।

হিমচাঁদ বলল, এর পরে কি হল সঠিক বলতে পারব না। হাসি সামলাতে পারছিনে—আর দেরী করলে ফটাস করে দম ফেটে ওখানেই পড়ে যেতাম। রাস্তায় এসে একটু জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে হেসে নিলাম। তার পরে ছুটতে ছুটতে এসেছি।

খবর এলো, গড়ভাঙা থেকে দারোগা বেরিয়ে পড়েছেন, পালকী এই হাটখোলার দিকেই আসছে। দক্ষযজ্ঞ অতএব আসন্ন। সরছে মানুষ পাঁচটা দশটা করে ভিড় পাতলা হচ্ছে। পালকি সত্যি সত্যি দেখা গেল, পালকির এপাশে-ওপাশে বন্দুক হাতে কনস্টেবল। সভার অদূরে থেমে গেল পালকি ভুঁয়ে নামে নি—বেহারার কাঁধের উপরে আছে। লোকে দুড়দাড় পালাচ্ছে। দরজার ফাঁকে ঘাড় লম্বা করে দারোগা তাকিয়ে দেখলেন। গণ্ডগোল কিছু নয়—আবার চলল পালকি।

রাত না পোহাতেই যেন বান ডেকেছিল। ঢেউয়ের পরে ঢেউ। সন্ধ্যায় সব শান্ত—প্রবল জোয়ার শেষ হয়ে গিয়ে কিরকিরি ভাঁটা নেমে যাবার মতন। ক্লান্ত দেবনাথ দক্ষিণের দাওয়ায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়াচ্ছেন। কমলকে ডাকলেন, সে এসে বসল। বললেন, আমার বক্তৃতার সময় এক-নজরে কমলবাবু মুখের দিকে চেয়েছিলে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। কতই তো বল-লাম—বুঝেছ কিছু? বুঝেছে কমল ঘোড়ার ডিম—ভারী ভারী কথা বোঝার বয়স কি এখন? সপ্রতিভভাবে তবু ঘাড় নেড়ে দেয়—

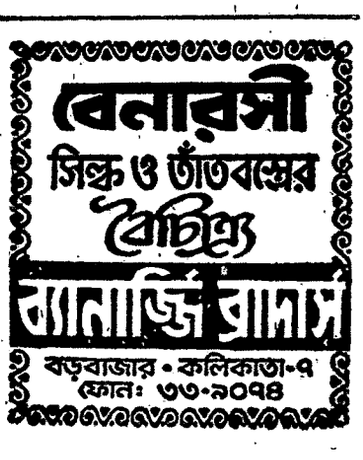

হার-মানার বান্দা নয় সে, বিশেষ করে বাপের কাছে। ঘাড় নেড়ে টানা সুরে বলে দিল হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—। দেবনাথও নাছোড়বান্দা ঃ কী বুঝেছ বলো একটু শুনি। একটু-আধটু তখনও কমলের মনে ছিল—বিশেষ করে ক্ষুদিরামের কথাগুলো। মুখস্তর মত গড়-গড় করে সে বলে গেল।

ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে দেবনাথ উঠে বসলেন। গল্পে পেয়ে বসল তাঁকে—ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী কানাই-সত্যেন—যত স্বদেশী ছেলের গল্প। 'আমায় বেত মেরে কি মা ভোলাবি'—সভায় যে গান হয়েছিল তারও মানে বোঝালেন। ইংরেজ বেত মারছে 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ করলে—যে কথার মানে হল, মাকে বন্দনা করি। মা বলতে বঙ্গমাতা—যাঁকে খণ্ড খণ্ড করেছে ওরা। কিন্তু ডর মানে না আমাদের ছেলেরা—হাসতে হাসতে তারা জেলে যাচ্ছে, ফাঁসে যাচ্ছে...

'কারা ইংরেজ কমল সঠিক জানে না। কে যেন বলেছিল ধবধবে ফর্সা তারা—দেখতে ভারী সুন্দর। তা চেহারা মত সুন্দরই হোক মানুষ তারা ভাল নয়। কাজকর্ম শুনে কমলের ঘেন্না হয়ে গেল। হঠাৎ কমলকে টেনে দেবনাথ বুকের ভিতর নিলেন। কণ্ঠ-স্বর আর এক রকম। বললেন, ঐ ছেলেদের মতন হয়ে তুমিও জেলে যেও কমল, দরকারে ফাঁসিতেও যেও। আমি যদি বেঁচে না থাকি যেখানেই থাকি তোমায় আশীর্বাদ করব।

(ক্রমশঃ)

২'টি ফসফোমিন টনিক...

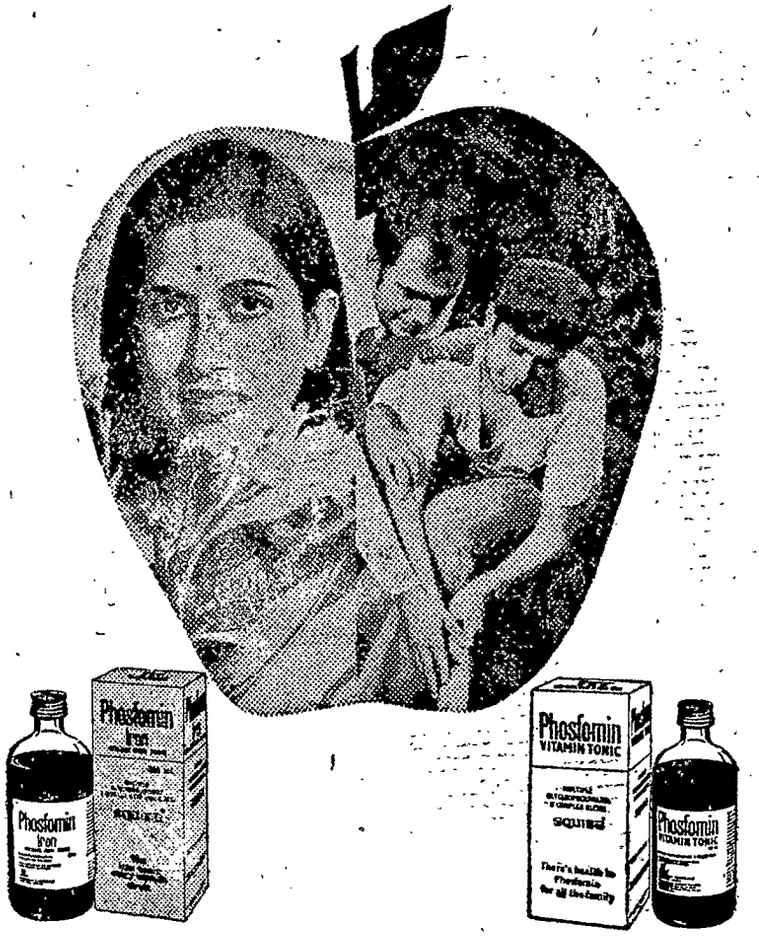

ফসফোমিন আয়রন

মেয়েদের জন্যে আয়রন টনিক

ফসফোমিন আয়রন শরীরে আয়রন বাড়াবার এক অতিরিক্ত উপায় যা রক্তকে লাল করতে আর শরীরে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। প্রত্যেক দিন নিন মেয়েদের জন্যে তৈরী এক আয়রন টনিক—ফসফোমিন আয়রন।

ফসফোমিন ভিটামিন

পরিবারের সকলের জন্যে ভিটামিন টনিক

ফসফোমিন-এ আছে বি কমপ্লেক্স ভিটামিন আর পুরো মাত্রায় গ্লিসারোফস্‌ফেট্‌স যা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে ২'টি ফসফোমিন টনিক

ফসফোমিন টনিক খিদে বাড়ায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যোগায় আর প্রফুল্ল করে তোলে।

©ই. আর স্কুইব ও সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী

SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS LTD. লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এস. পি. এল.

Shilpi SC 8A/74 ben

কবিতা

কোনো কবির মৃত্যুতে ॥ কৃষ্ণ ধর

সেও বুঝি অভিমানী বালকের মতো
চৈত্রের বিকেলে
অনিচ্ছায় দাঁড়ায় উঠোনে এসে একা?
তার দিকে হঠাৎ তাকাতে গিয়ে
কেন বার বার যৌবনের কথা মনে পড়ে?
নাটকের শেষ দৃশ্যে সে এসেছে
নিঃশব্দে ঘরের কোণে মৃত্যুর রাখাল।

তখনো শব্দের উজ্জ্বল দৃশ্য
চারধারে সযত্ন খচিত কবিতার কথাশিল্প
মায়াবী দালানে ইতস্তত পড়ে আছে
টুকরো টুকরো ধ্বনি আর কথা।
পাশাপাশি ছিলো এরা আযৌবন
অস্তিত্বের মাঝে
রাঙাজল দিয়ে মোছা মৃত্যুর চাতালে তারা
বড় সুখে শুয়ে আছে
একই শিথানে মাথা রেখে।

মৃত্যুও তার প্রিয়তম উপমায় রূপবান
প্রথম প্রেমিক
নিলিপ্ত ঠোঁটের ওপর এঁকে দেয়
আকাঙ্ক্ষার প্রণয় চুম্বন।
নিঃস্পন্দ শরীর তার চিত্রকল্পের সমান
গভীর অর্থের দিকে
নিয়ে যায় আজন্মের বিদ্রোহী চেতনা
শব্দ আর ব্যঞ্জনায় ঘিরে।
ভাষার অধ্যায় শেষ, এখন তাহার কাছে
শুধু ঘুম একান্ত আপন নীরবতা
তারপর সমর্পণ নির্মম আগুনে
নশ্বর দেহের উপাসনা।
নশ্বরতা তবু তার শেষ কথা নয়
যেন তার অলৌকিক অমরতা
এইখানে খুঁজে পায় আগুনের হাতে
নতুন উপমা চিত্র অলংকার সুরের পূর্ণতা
কিছুই পোড়ে না তার,
থাকে শুধু চিরন্তন ক্ষমা।।

তারা যায় ॥ হাবীবুল্লাহ সিরাজী

তারা যায়। মাস্তুলের শীর্ষভাগে বসে শাদা পাখি,
কিশোরী যুবতী হয় ফুলে ওঠে শুদ্ধ জল-বুক।
বায়ুতে সমুদ্র-ঘ্রাণ অফুরান রাত্রিদিন ভেদ
তাহাদের তুলে নেয় জীবনের দুরন্ত পাখায়।

তারা যায়। মেঘে মেঘে ঢেকে যায় চাঁদের পেয়ালা,
নীচে চোখ—অন্ধ ছবি হিশেবের পূর্ববর্তী ফল ঃ
'প্রাণের অস্তিত্ব মানে জল-চল হাঙ্গর শিকার।'
সম্মুখে বিস্তৃত পথ—কতদূর, আর কতদূর
কতদূরে বাতিঘর নোঙর-নিবাস?

তারা যায়। গভীর আহ্বান আসে তলদেশ থেকে,
অঢেল জলের তলে মৃত্তিকার ফেনিল শরীর
বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে গুল্ম-তরু সাগর সম্ভোগে।
এভাবেই যাত্রাকালে মাটি ও জলের দীর্ঘশ্বাস
খুলে ফেলে গাত্রবস্ত্র লুব্ধায়িত কালো অন্তর্বাস;
ধূধূ নীল কোন সীমা কার হাতে দিকের কম্পাস?

নাটকের মুহূর্ত একটি ॥ সুপ্রীতি পাল

যাদু করে একবার না হয় ভুলিয়েছ
কিন্তু চোখেরই ইন্দ্রজাল কতক্ষণই বা থাকে?
ওর চেয়ে আরো শক্তিশালী ঐ শসোর প্রান্তর
কিংবা তার গ্রামীণ মৃন্ময় পটখানা
যার গা থেকে ভিজে মাটির গন্ধটা এখনো যায়নি।
যাদু করেএকবারই ভোলান যায় যাদুকর হে—
বার বার নয়!
আর চোখের চোখের ইন্দ্রজাল দূর থেকেই ভালো
কাছে এলে শব্দের শক্তিশেল বুকের ওপর কিম্ভূত কিমাকার!
তখন মুক্ত রাইসনের ছোটাছুটি
একমাত্র প্রকৃতির নির্যাস ছাড়া সেদিন
সমস্ত বিশল্যকরণীই ব্যর্থ হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাণিত্রাসের শরৎ মেলা

গত ২৫, ২৬, ২৭ জানুয়ারী — এই তিনটি দিন ধরে হাওড়া জেলার পাণিত্রাস গ্রামের পাণিত্রাস হাইস্কুল মাঠে শরৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে এই শীতের সামান্য মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে, বাকী দু দিনের কনকনে শীতের আবহাওয়ায় প্রায় হাজার দশেক জনসমাগম ঘটেছিল কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র স্মৃতিধন্য পাণিত্রাস গ্রামের বিরাট মেলা প্রাঙ্গণে। শরৎ-স্মৃতি গ্রন্থাগার শরৎ-মেলা পরিচালন সমিতি ও শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতির সমবেত উদ্যোগে এই মেলা উপলক্ষে তিন দিন ধরে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম দিন শরৎ মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও ত্বরিত পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তারা তিনটি স্বতন্ত্র মঞ্চ নির্মাণ করেন—ভুবনমোহিনী মঞ্চ হিমন্ময়ী মঞ্চ ও মতিলাল মঞ্চ। ২৫ তারিখের বিকেলে ভুবনমোহিনী মঞ্চে ডঃ অজিতকুমার ঘোষের নেতৃত্বে নাট্যশাখার অধিবেশন বসে। নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন সর্বশ্রী দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নক্ষত্র নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক শ্যামল ঘোষ ডঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত ও ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় দিনের সকালে একই মঞ্চে ডঃ সরোজমোহন মিত্রের সভাপতিত্বে শরৎ সাহিত্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা কথাসাহিত্য ও কাব্য শাখার অধিবেশন সম্ভবত ওই দিনের সবচেয়ে উল্লেখ্য সাহিত্য অধিবেশন ছিল। কথাসাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শাখায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী রফিউদ্দিন আহমেদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার প্রমুখ। শ্রীবিভূতি দাস শরৎচন্দ্র ব্যবহৃত একটি গড়গড়া এই সভায় শরৎচন্দ্রের ভাগিনেয় শ্রীনন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে অর্পণ করেন।

কাব্যশাখায় সভাপতিত্ব করেন মণীন্দ্র রায়। সভাপতির সরস অথচ অতি মূল্যবান সংক্ষিপ্ত ভাষণ ছাড়া কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত শিবশম্ভু পাল সুতপা মিত্র, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় গণেশ বসু শান্তনু দাস রাণা বসু, অমিতাভ দাশগুপ্ত শক্তিব্রত ঘোষ ইত্যাদি। এই শাখার সবচেয়ে উল্লেখ্য হল কবিদের মধ্যে দুজন একক রবীন্দ্রসঙ্গীত যেমন পরিবেশন করেন তেমনি সমবেতভাবেও শ্রোতাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়ে তৃপ্ত করেন।

মেলার শেষ দিনের অনুষ্ঠানে দুপুরের শিশুসাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন বীরেন্দ্র দত্ত। শিশুসাহিত্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ও দীর্ঘ ভাষণ দেন শ্রীবিদ্যুত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন একটানা। অন্যান্য আলোচকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপিকা স্বপ্না মজুমদার শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষাল। শ্রোতাদের থেকেও ছোট ছোট মেয়েরা আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করে।

তিন দিন ধরে বিভিন্ন নাট্য সংস্থার সুনাটক অভিনয় প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী নীলিমা সেনের গান, শিল্পী দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের একক সঙ্গীত পরিবেশন পঃ বঃ লোকরঞ্জন শাখার 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্যানুষ্ঠান পূর্ণচন্দ্র দাস ও সম্প্রদায়ের লোকগীতি অধ্যাপিকা স্বপ্না মজুমদারের একক গান 'শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি' চলচ্চিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সমবেত হাজার হাজার দর্শক শ্রোতাকে বিস্ময়নিবিষ্ট করে রাখে। শরৎ স্মৃতিধন্য পাণিত্রাস গ্রামের মেলা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে এমন জনসমাগম ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদে প্রকাশিত 'শরৎ মেলা স্মারক গ্রন্থ'টি এবং 'মিলন মেলা' নামে সাহিত্য সংকলনটি উৎসবের অন্যতম অলংকার বিশেষ।

মায়াকোভস্কি সাহিত্য ক্লাবের উদ্বোধনঃ বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত বিপ্লবী কবি ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কির নামানুসারে এক নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সংস্থা 'মায়াকোভস্কি ক্লাবে'র উদ্বোধন সম্প্রতি গোর্কি সদনে করেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। এই নবগঠিত সংস্থা ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির (পঃ বঙ্গ) সঙ্গে যুক্ত। মায়াকোভস্কি ক্লাবের কর্মপরিষদের সভাপতি হয়েছেন শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেন। সংস্থার উদ্দেশ্য বিবৃত করে তাঁরা ভাষণ দেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এই আশা প্রকাশ করেন যে, এই সদ্য-গঠিত সংস্থাটি ভারত-সোভিয়েত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে ও শিল্প-সাহিত্যের এক সুস্থ মানবতাবাদী ধারার পরিপোষণে যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করবে। শ্রীমণীন্দ্র রায় ও ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণ সান্যাল সংস্থাকে শুভেচ্ছা জানান। কলকাতাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান শ্রী এস পারামোনোভ মায়াকোভস্কির কাব্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে রেকর্ডে মূল রুশ ভাষায় মায়াকোভস্কির কবিতার আবৃত্তি হয়। বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন শ্রীসতীন্দ্রনাথ মৈত্র। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র কৃষ্ণ ধর রাম বসু চিত্ত ঘোষ ধনঞ্জয় দাশ অমিতাভ দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত নবারুণ ভট্টাচার্য দেবী রায়, অমরেশ পট্টনায়ক দীপেন রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শ্রীমনোজ বসু, শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী প্রমুখ কবি সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন। মায়াকোভস্কি ক্লাবের ঠিকানা ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির রাজ্য দপ্তর ৭৭ লেনিন সরণী কলকাতা-১৩য় যোগাযোগের আবেদন করা হয়েছে।

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা ও অভিনব অগ্রণী পত্রিকার উদ্যোগে নেতাজীর ৭৯তম জন্মদিবসে শিশু ও কিশোর সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে। প্রাতঃকালীন অধিবেশনে হাওড়া বার্তা সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল ও কবি-সাংবাদিক সুধীর বেরা নেতাজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন। 'রামধনু' সম্পাদক অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 'সাহিত্যিক আড্ডা' সম্পর্কে একটি রচনা পাঠ করেন এবং প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক কয়েকটি হাস্যরসাত্মক কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। বৈকালিক অধিবেশনে সাংবাদিক প্রফুল্ল দাশগুপ্ত ও

শিক্ষাব্রতী চিররঞ্জন সিংহরায় যথাক্রমে ছোট ছোট পত্র-পত্রিকার সমস্যা এবং শিশুমনে রূপকথার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় শিশির সাঁতরার পরিচালনায় সাহিত্য পাঠের আসরে অংশ গ্রহণ করেন দিলীপকুমার বাগ, অজিতকুমার দাস, আশিসকুমার ঘোষ ধূর্জটি দত্ত কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর বসু এবং শিশির মজুমদার।

অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ভুবনেশ্বর থেকে আগত কেন্দ্রীয় ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রের বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীগণ নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে পত্র-পত্রিকা ও শিশু চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

কবি মধুসূদনের জন্মোৎসব

নবীন লেখকদের উদ্যোগে সম্প্রতি সরোজ সাহিত্য পরিষদ ভবনে কবি মধুসূদনের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের বৈশিষ্ট্যদীপ্ত অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন জ্যোতির্ময় ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, রাণা বসু, তুষারাভ রায়চৌধুরী, শিবাজী গুপ্ত, বাণীব্রত চক্রবর্তী। সরোজ সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে জীবন সরকার সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

অমৃত সাহিত্য চক্র

আসামের লামডিং-এ অমৃত সাহিত্য চক্র নামে একটি সাহিত্য সংস্থা গঠিত হয়েছে। সেখানকার সাহিত্যানুরাগীদের উদ্দীপনাতেই এই সংস্থার উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণারঞ্জন বসু। শ্রীবসু বর্তমান সাহিত্যিকদের জীবনাদর্শ এবং আজকের মানুষের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় যোগাযোগের ওপর দীর্ঘ আলোচনা করেন।

'অমৃত সাহিত্য চক্রে'র একটি কার্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ঃ—অধ্যক্ষ সুখময় মজুমদার (সভাপতি), অধ্যাপক মনোমোহন নাথ (সহ-সভাপতি), খগেন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক), সুজিত সেনগুপ্ত (সহ-সম্পাদক)। সদস্য—অজিতকুমার রায়, তিমিরবরণ নাথ, হরেন্দ্রকুমার ধর, কাজলকুমার চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অজিতকুমার সেন।

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন

আগামী মার্চ মাসে মহীশূরের ভারতীয় ভাষা গবেষণা কেন্দ্রে নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে শিশু সাহিত্যের উপর রচিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ৫।২৫ সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলকাতা-২৯।

নতুন বই

লালন স্মারকগ্রন্থ—আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। ৬৭-এ পুরোন পল্টন। ঢাকা-২। বাঙলাদেশ। আট টাকা।

বাঙলার নিজস্ব সঙ্গীত বাউল গানের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ লালন শাহের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে বর্তমান স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন ঢাকার জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র। লালন সম্পর্কে এই জাতীয় গ্রন্থ সম্ভবত এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল।

বাউল সম্রাট লালনের যুগান্তকারী প্রতিভার প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি অবশ্য লালনের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন নানাভাবে। যদিও তাঁর আগে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে লালন সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছিল। লালনের প্রথম জীবনী লেখেন শ্রীবসন্তকুমার পাল। পরবর্তীকালে আরো অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে বাঙলাদেশে লালন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে ব্যাপকভাবে গান সংগৃহীত হয়েছে অনেক।

বর্তমান স্মারকগ্রন্থে লালনের জীবন, সঙ্গীত ও সাধনা সম্পর্কে পাওয়া যাবে একটি অন্তরঙ্গ পরিচয়। লালন চর্চার একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থে আরও পাওয়া যাবে বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য রচনার সন্ধান। লালন সম্পর্কে 'হিতকরী' পত্রিকায় ১৮৯০ খ্রীঃ ৩১ অকটোবর যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটি স্থান পেয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।

সংকলনে যাঁদের রচনা স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন, রসন্তকুমার পাল সরলা দেবী মতিলাল দাশ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কাজী মোতাহার হোসেন, চিত্তরঞ্জন দেব শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মুহম্মদ আবদুল হাই আহমদ শরীফ বিশ্বনাথ মজুমদার, এ এইচ এম ইমামউদ্দীন আবদুল আহশান চৌধুরী এবং মুহম্মদ সমসুরউদ্দীন। গ্রন্থ শেষে লালন সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের মন্তব্য, লালন গীতির স্বরলিপি এবং বসন্তকুমার পালের আশীর্বাণী স্থান পেয়েছে।

স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন তরুণ গবেষক আবু আহসান চৌধুরী। তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। লালন শাহ সম্পর্কেই মাত্র নয়, সামগ্রিক বাউল সাহিত্য আলোচনায় বর্তমান গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ভাগ্যফল জানুন (১৯৭৫-৭৬) । শ্রীভৃগু । রূপা পুস্তকালয়, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

গত বছরের মত এ বছরেও শ্রীভৃগু রচিত 'ভাগ্যফল জানুন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীভৃগু প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষী। তাঁর দীর্ঘদিনের জ্যোতিষচর্চার অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আছে এ গ্রন্থে। গত বছরের থেকে এ বছরের গ্রন্থে নূতন সংযোজন হল—পৃথক মাসফল রাশি অনুযায়ী হিসাব তান্ত্রিক মতে বিচার লগ্নফল নক্ষত্রফল ইত্যাদি। ইনি ১৯৭৬-এর সম্ভাব্য রাশিফলও ওতে দিয়েছেন। ফলে অনুসন্ধিৎসু ও উৎসাহী সাধারণ মানুষ নিজের ভাগ্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করতে পারবেন। গ্রন্থটির বিচার যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও যথাযথ। আলোচ্য পর্যায়ের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটিও একটা উল্লেখ্য সংযোজন।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রসঙ্গে । সুর দাস । লিপিকা, ৩০।১এ কলেজ রো কলকাতা-৯। আট টাকা।

দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার, সমাজ বিকল্প ও সুষ্ঠু রূপায়ণের ওপরেই একটা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে ওঠে। দেশের বেকার সমস্যার সমাধান একটা অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত কর্ণধারদের সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ভাবনার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগই দেশের সমস্ত সম্পদকে একটি সুষম কেন্দ্রে আনতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি আজ একাধিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিভাবে সক্রিয় ও আশানুরূপ ফলদানে সক্ষম শ্রীসুর দাস রচিত 'রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রসঙ্গে' গ্রন্থটি তার চমৎকার ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেছেন। 'পরিশিষ্ট' বাদে মোট ছয়টি স্বতন্ত্র অথচ দীর্ঘ এবং যুক্তিনিষ্ঠ সুচিন্তিত প্রবন্ধে লেখক শ্রীসুর দাস রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগে প্রত্যাশার ব্যর্থতা থেকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিধির আলোচনা করেছেন। 'পরিশিষ্ট' অংশটি প্রমাণ করে, লেখকের প্রবন্ধগুলি লেখার সময়ের শ্রম নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ আন্তরিকতা ও চিন্তাশীলতা। বাস্তবিকই আলোচ্য গ্রন্থের নিপুণ পর্যালোচনা 'রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সম্পর্কিত প্রকাশন সমূহের সঙ্গে মূল্যবান সংযোজনরূপে পরিগণিত হবে।

একটি খুনের কাহিনী (উপন্যাস) । নিশাচর । জ্যোতি প্রকাশন, ২-এ নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা-৯ । ছ টাকা।

নিশাচর গোয়েন্দা গল্প লেখক হিসেবে ইতিমধ্যে কিছু খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলোচ্য 'একটি খুনের কাহিনী' উপন্যাসে সেই রহস্যময় খুনের কিনারায় যে রুদ্ধশ্বাস কাহিনী রচিত হয়েছে তা না পড়লে এর রহস্যরস আস্বাদ করা যাবে না। গোয়েন্দা গৌতম সেন রজতবাবুর পিছনে ঘুরছে রজতের ভাবী শ্বশুরের অনুরোধেই রজত-

বাবুর দেখা এক মৃতদেহের খুনের কিনারা করতে। এরই জটিল সূত্রে আসে রজতের প্রেমিকা সুপ্রিয়া দেবী, সুপ্রিয়া দেবীর বান্ধবী কনক, আসে বিমলেন্দু সরকার রহিম শেখ ইত্যাদি চরিত্র। উপন্যাসটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় কাহিনীর ক্লাইমেক্সেই রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। গোয়েন্দা গল্পের যে স্বাভাবিক পরিণতি তা এখানেও বর্তমান। লেখক নিশাচর গোয়েন্দা গল্প যে সহজ সরলভাবে অথচ চমৎকার জটিল জটে জড়িয়ে বলতে জানেন এই গ্রন্থ পাঠে বোঝা গেল।

সর্বৌষধি শিবাম্বু। শান্তিলাল ভট্টাচার্য। ৩১ শিবনারায়ণ দাস লেন কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

শান্তিলাল ভট্টাচার্য প্রণীত 'সর্বৌষধি শিবাম্বু' নামক গ্রন্থটি চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ। এতে লেখক মানবমূত্র হৃদ্‌রোগের এক মহৌষধি' এই সম্পর্কে আলোচনা বিশ্লেষণ ও নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। যোগাসনের উপযোগিতা সম্পর্কেও উদ্ধৃত করেছেন। খেলাধূলা ও ব্যায়াম সম্পর্কেও লেখকের সুচিন্তিত মতামত এ গ্রন্থে ব্যক্ত। তবে লেখক এই গ্রন্থে 'মানবমূত্র' সম্পর্কেই প্রধান আলোচনায় নিজ বক্তব্যকে নিবদ্ধ রেখেছেন। রুচি পরিবর্তনের যুগে স্বমূত্র পানে দ্বিধা থাকবেই। তবু লেখক নানাভাবে স্বমূত্রের উপকারিতা ও রোগনির্ণয়ে তার প্রয়োগের যৌক্তিকতাকে যেভাবে আলোচনা করেছেন সর্বশ্রেণীর পাঠকদের পক্ষে তা যথেষ্ট উপকারে লাগবে।

লিপ্তিং (নাটক)। শুভংকর চক্রবর্তী। 'জনতার মুখ' প্রকাশন শান্তিপুর নদীয়া। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ছোটবড় মিলিয়ে মোট বারোটির মত চরিত্র নিয়ে শুভংকর চক্রবর্তীর লেখা নাটক 'লিপ্তিং'। নাটকটির বক্তব্য সর্বকালের মানবতার কথায় স্থিত। একদিকে বর্ণবিদ্বেষের পটভূমিকায় আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায়, আর একদিকে ভারতবর্ষের হরিজন তুকারামের রক্তে ভেজা মহারাষ্ট্রের মাটির ইতিহাস—এই দুই ভয়ংকর মানবতাবিরোধী বক্তব্যকে এক মহত্তম মানবতার জয়গানের উচ্চগ্রামে বেঁধে নাট্যকার 'লিপ্তিং' নাটকটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। নাটকে অভিনয়-উপযোগী নাটকীয় কৌশল অবলম্বন প্রশংসনীয়। ব্যঙ্গের কশাঘাতে নাটকটির বক্তব্যকে নিপুণভাবে দর্শকমনে আবেদন জাগাতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম।

মামা মন্ত্রী হবেন (নাটক)। ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। নির্মল পুস্তকালয়, ১৮-বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

'মামা মন্ত্রী হবেন' ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রচিত এই নাটকের নামকরণেই প্রমাণিত হয় —নাটকটি হাসির। রঙ্গ তামাশা থেকে সুরু করে ব্যঙ্গ পর্যন্ত এ নাটকে উপস্থিত। হাসির নাটক অভিনয়ে খোলে। আলোচ্য প্রহসনটি মঞ্চে ভালই হাসির রস যোগাবে বলে বিশ্বাস। মহিম মহাপাত্র থেকে সুরু করে পটলা ন্যাপলার দলকে অতিপরিচিত বলতে দ্বিধা নেই। লেখকের সিচুয়েশান সৃষ্টির দক্ষতা সংলাপে গতি সৃষ্টির ক্ষমতা চরিত্রকে আদ্যন্ত একটি নাট্য-ন্যায়ে ধরে রাখার নিপুণতা চমৎকৃত করে। ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একাধিক নাটক পড়েছি, মঞ্চস্থও হয়েছে একাধিক। আলোচ্য নাটকটি সেই সমস্ত নাটকের সুনামের যোগ্য পরিচয়পত্র বিশেষ।

সংকলন ও পত্র পত্রিকা

অধুনা সাহিত্য : সম্পাদক : সুধাংকুর মুখোপাধ্যায়। হালিশহর চব্বিশ পরগণা। দাম : এক টাকা।

অল্প কয়েকটি পাতার পত্রিকা। কিন্তু তবু তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে অনেক সিরিয়াস চিন্তার খোরাক। সমীরকান্তি বিশ্বাস-এর ফ্রানজ কাফকা: হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের খণ্ড অখণ্ডতা প্রতিকৃতিঃ দুই—এ দুটি লেখাতে ভাবনার অনেক কিছুই আছে।

সাহিত্য কল্প : সম্পাদক : অসিত হালদার। সাইপালা বসিরহাট। দাম : দু টাকা।

লেখক তালিকায় উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের মধ্যে রয়েছেন মণীন্দ্র রায় জীবন সরকার স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় শান্তনু দাস রবিয়ুল হোসেন খান।

মহুয়া : সম্পাদক : সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩বি।৭ গোয়ালাপাড়া রোড বেহালা। দাম : দু টাকা।

মোটামুটি সাবলীল ভঙ্গিমায় নতুন ধরনের কয়েকটি প্রবন্ধ কবিতা ও গল্প লিখেছেন উজ্জ্বল সিংহ শুদ্ধসত্ত্ব বসু গোপাল ভৌমিক পবিত্র মুখোপাধ্যায় সুনীল বসু নির্মলেন্দু রক্ষিত হামিদুল ইসলাম।

অতিথি : সম্পাদক : অসিতকৃষ্ণ দে। ৩৫।১বি বাগবাজার স্ট্রীট কলকাতা-৩। দাম : দেড় টাকা।

দ্বিমাসিক এই সাহিত্যপত্রিকাটির এই সংখ্যাটি মোটামুটি মনোগ্রাহীই হয়েছে। কয়েকটি রসোত্তীর্ণ লেখার জন্য পত্রিকাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তার লেখকরা হলেন বিমল কর বুদ্ধদেব গুহ দিবেন্দু পালিত অমিতাভ দাশগুপ্ত জাইভি রাহা গোপাল ভৌমিক শেফালী নন্দী।

নবাঙ্কুর : সম্পাদক : বিকাশচন্দ্র দাস। ৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড ব্লক ডি কলকাতা-৫৪। দাম : দেড় টাকা।

বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন বনফুল কুমারেশ ঘোষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ দেবল দেববর্মা জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণধর নচিকেতা ভরদ্বাজ শান্তশীল দাস।

তরুণতীর্থ : সম্পাদনা : অজিত সেন। ৩৭ রিপন স্ট্রীট কলকাতা-১৬। দাম : দু টাকা।

কিশোরদের পত্রিকা। গল্প কবিতা নাটকে তাই তারুণ্যের উচ্ছলতা। আসর সাথীদের পাতা একটি সুন্দর সংযোজন।

বর্ণালী : সম্পাদক : প্রবীর ঘোষ। কবি ভরতগধর রোড বসিরহাট। দাম : দু টাকা।

এ সংখ্যায় লিখেছেন বনফুল প্রেমেন্দ্র মিত্র অন্নদাশংকর রায় হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণারঞ্জন বসু স্বপনবুড়ো অজয় বসু মনকুমার সেন নচিকেতা ভরদ্বাজ বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীণা : ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা। সম্পাদনা : হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ অমিয়কুমার দাস। দাম : এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

সাহিত্য বিচিত্রা : সম্পাদক : কমল চট্টোপাধ্যায়। আদরা পুরুলিয়া।

জাগরী : সম্পাদনা : অপূর্বকুমার সাহা। ৭৪।৫এ বাগবাজার স্ট্রীট কলকাতা-৩। দাম : দেড় টাকা।

এই সংখ্যার কয়েকটি সার্থক রচনার লেখক হলেন গোপাল ভৌমিক শক্তি চট্টোপাধ্যায় নলিনীকান্ত গুহ জয়া রায়।

ঝংকার : সম্পাদক কল্লোল সরকার। খোলাপোতা। ২৪-পরগণা। দাম : এক টাকা।

পবিত্র জানা রায় এবং শ্যামল সরকারের প্রবন্ধ এবং কল্লোল সরকারের গল্প এই সংখ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

বর্ষপঞ্জী ১৩৮১

(২৮-শ বর্ষ চলছে)

দেশবিদেশের সকল তথ্যে পূর্ণ অভিনব বাংলা "ইয়ার-বুক"

চলতি দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হলে বর্ষপঞ্জী চাই-ই। যে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য বর্ষপঞ্জীতে পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বর্ষপঞ্জী অপরিহার্য।

৮০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১২ টাকা ৫০ পঃ, ভি পি খরচ স্বতন্ত্র

এস. আর. সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি

৩৫/এ, গোয়াবাগান লেন, কলকাতা-৬। ফোন : ৩৫-৪৭৯৭

ঘোড়সওয়ার

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এক ।।

সত্য আর কবিতা এই দুয়ের কোনো বিশেষণ হয় না। 'খানিক খানিক সত্য' মানে মিথ্যা; 'বেশি বেশি সত্য' মানেও তাই। কবিতার বেলাতেও তেমনি বলা যায়—একটু একটু কবিতা কোনো কবিতা নয়। বেশি বেশি কবিতাও তেমনি কবিতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে কিছু একটা হতে চায়। কবিতা-পাঠকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথা উচ্চারণ করি। কেউ কেউ কবিতা বোঝে। কেউ কেউ বোঝে না। খানিক খানিক কবিতা বোঝা খানিক খানিক পাঁঠা কাটতে পারার মতোই হাস্যকর। এবং, যে কবিতা বোঝে তার কাছে শক্ত কবিতা সোজা কবিতা বলে কিছু নেই—আছে একমাত্র কবিতা। আর কবিতার দিক থেকেও বলতে পারি, সে শুধু রসিকের কাছেই ভোগ্য ও ভেদ্য। অন্যের কাছে সে চিরকাল আবৃত। সে কারণে কবিতার মানে ঠিক করে দেওয়াও খুব দুরূহ ব্যাপার। একটি কবিতার অংশ-বিশেষের অর্থ এক একজনের কাছে এক-এক রকম হতে পারে। এই সব অর্থের একটি রেখে আর একটি ফেলে দেওয়াও ভারি ভুল। হয়তো কোনো একটি অর্থকে আমরা কেউ গ্রহণ করতে পারি। অপর কেউ নিতে পারেন অন্য একটি অর্থকে। কিন্তু দুজনের কেউই বলতে পারেন না, অন্য অর্থটা বাতিল। তুলনা চলে না, তবু তুলনা দিতে ইচ্ছে করে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামনে বিস্ময়ে সমবেত কয়েকজনের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার পার্থক্যের সঙ্গে। সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মূল বিষয় (কবিতার ক্ষেত্রে টোটাল মিনিং) কীভাবে ধারণ করে রেখেছে নদীর বাঁক আকাশের আলো তটের রেখা জলের রঙ ইত্যাদিকে—তা এক একজনে কাছে এক একভাবে বিভাসিত হবে। কবিতার ক্ষেত্রে এই সব ব্যক্তিগত উপভোগ এমন ভাবেই প্রতীকে, পুরাপ্রসঙ্গে, অ্যাটিট্যুড ও টোনের সূক্ষ্মতায় ও বৈশিষ্ট্যে ছন্দোস্পন্দে নানা ভিন্ন তাৎপর্যের সন্ধান দেয়। মনে রাখা দরকার এতে কবিতাটির বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোনো পুনঃসৃষ্টি হয় না, তারা যেখানে থাকার যেখানেই থাকে, তারা যা তদতিরিক্ত কিছু নয়, তন্যূন কিছু নয়। সেখান থেকে আমরা লাভবান হই পরস্পরের আস্বাদনের অভিজ্ঞতা-বিনিময়ে।

।। দুই ।।

'চোরাবালি'র 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি না পড়ে আধুনিক বাংলা কবিতার অঙ্গনে পদার্পণ করেন এমন বোধ হয় কেউ নেই। আধুনিক বাংলা কবিতার আকাশে সাতটি তারার মতো যে-সাতটি বিভিন্ন কবির কবিতা দিকনির্দেশক হয়ে দীপ্তি দিয়ে চলেছে তাদের কথা আমরা থেকে থেকে মনে কার নানা অন্ধকারে। এই সাতটি তারা হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আমি কবি যত কামারের', অমিয় চক্রবর্তীর 'সংগতি', বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ঊর্ণনাভ', জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন', বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রথম দিনের সূর্য'। এর মধ্যে আজকে আমাদের আলোচ্য 'ঘোড়সওয়ার'। কবিতাটি সম্বন্ধে আজও প্রধান ব্যাখ্যা—অবশ্যমান্য রসভাষ্য, হয়ে রয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'চোরাবালি'-আলোচনা। এই আলোকসম্পাতী কবিতাটির অন্যতম রসগ্রাহী ছিলেন ঐ মনস্বী কবি। ঐ ঠাসা জমাট, বৈদগ্ধ্যে ও উপলব্ধিতে অভিন্ন, প্রবন্ধটি পড়ার পরে 'ঘোড়সওয়ারে'র নিহিত অর্থ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন না জাগাই বিধেয়। তবু কাব্য-পাঠ, কাব্য-রচনার মতোই আটপৌরে উদ্দেশ্য-বিধেয়ের দ্বারবর্তী হয়ে থাকে না। তাই কবিতাটি—যাকে কবি মুক্তি দিয়েছেন সেই ১৯৩৫-এর জানুয়ারি মাসের এক প্রবল জ্বরোত্তপ্ত রাত্রির অন্তে—কিসের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে? কেন সে শুধু দাঁড়িয়েই থাকল না, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে—আজও চলছে—কবিতাটির মধ্যে সেই পরমায়ুর উৎসটি কোথায়—তা জানা বোধ হয় এ আলোচনার আমাদের মতো সাধারণের এক প্রধান লাভ। এবং সে আলোচনার প্রারম্ভে যদি মনে রাখি, কী বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ কবিতাটি সম্বন্ধে এবং সে কথা পড়ে রবীন্দ্রনাথ কী লিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তীকে, তাহলে কী আমরা খুঁজছি তাও স্পষ্ট হবে। সুধীন্দ্রনাথ 'ঘোড়সওয়ারে'র কবির 'ধৃতি ও চর্চা'র একাগ্রতাকে, 'বোধি ও বাঙ্‌নিষ্পত্তির' ঐকান্তিকতাকে এবং 'অন্তর ও বাহিরে'র অভিন্নতাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন—'এই ইন্দ্রজালের সর্বপ্রধান নিদর্শন 'চোরাবালি' কবিতা; এবং যাঁদের কাছে য়ুং-প্রমুখ পুরাণবিদেরা নামমাত্র, তাঁরাও বুঝবেন যে চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু বিরংসার রূপক নয়, তাদের উপরে প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ সহজ ও শোভন।' রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথের এই আলোচনাটি পড়েন—অবশ্য তার আগেই পড়েছিলেন কবিতাটি। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'ঐ বইটি এবং ঐ নামের কবিতাটি পড়েছি। বোঝবার এবং ভালো লাগবার একান্ত ইচ্ছা করেছি। বুঝতে পারিনি।' আমরা হাসিমুখেই গ্রহণ করি 'কাব্য ঃ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট'-এর লেখকের ভালো লাগা এবং মানে বুঝতে চাওয়াকে এক করতে চাওয়ার চেষ্টাকে। সুধীন্দ্রনাথের আলোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আরেকটুকু উদ্ধৃত করি—তাঁর নির্দেশমতো বোঝবার চেষ্টা করলুম। একটা সংশয় তাঁর আশ্বাস সত্ত্বেও রয়ে গেল। তিনি বলেছেন এই কবিতাটির অবলম্বন বিরংসা নয়। প্রথম পড়বার সময় সে-সংশয় স্বভাবতই আমার মনে ছিল না, তাই অর্থ বুঝতে অত্যন্ত গোল ঠেকেছিল। সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে দিলেন। কাব্য হিসাবে এর গুণাপনা আছে, কিন্তু শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহুদূরে বর্জনীয়।'১ আমাদেরও কিন্তু দুটি ব্যাপারে গোল ঠেকছে—এক, অর্থ তাহলে যাহোক একটা তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন, যা একটু আগেই তিনি বলেছেন 'বুঝতে পারিনি'। দুই, এ-কাব্যের 'গুণপনায়' তাঁর সন্দেহ নেই, শুধু, সম্ভবত 'বিরংসা'র কারণেই 'শ্রাব্য' হিসাবে তিনি এটাকে দূরে ঠেলতে চান। ব্যাপারটা তা হলে আর তাঁর কাছে কাব্যের নয়, এথিক্‌সের?

।। তিন ।।

একজন অতিসাধারণ পাঠক মফস্বল থেকে শেয়ালদাগামী ট্রেনে বসে ১৯৪৪-এর এক গ্রীষ্মদুপুরে কবিতাটি তার জীবনে প্রথম পড়েছিল। তখন তার বয়স হবে সতেরো-আঠারো। কবিতাটির দ্বারা সে বিপুলভাবে অধিকৃত হয়েছিল। কিন্তু সেই পাঠকের একথা তিলেকের জন্যও মনে হয়নি, একটি বিরংসার রূপক কবিতাটিতে সক্রিয়। সেই অনভিজ্ঞ পাঠক ও আজকের প্রৌঢ় ম্লান পাঠকের মধ্যে বহু অমিল—একটাই মিল। প্রথম ভালবাসাগুলো খুব কমক্ষেত্রে পাল্টিয়েছে। আজও দাঁড়িয়ে আছে কবিতাটি তার কাছে রূপক-নিরপেক্ষভাবে। বিরংসার রূপক এর মধ্যে থাকতে পারে জেনেও তার কাছে কবিতাটি নতুন কোনো অর্থ পরিগ্রহ করেনি—শুধু কবিতাটির টীকাগত ডাইমেনশন বাড়ল। 'অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার'—এই আকুল আহ্বান ও প্রতীক্ষা হয়তো আর একটা স্তর পায় এই মাত্র। কিন্তু সে-স্তর তো সত্যিই, যেমন সুধীন্দ্রনাথ

১চিঠিপত্র—একাদশ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর —২৬৫ পৃষ্ঠা

বলেছেন ভক্ত-ভগবান বা পুরুষ-প্রকৃতির রূপক থেকেও নিষ্কাশিত হয়—হতে পারে। প্রতীকী কবিতার ধর্মই এই। তা বহুভাবে স্পর্শ করে। এক এক ক্ষেত্রে তা এক এক রকমের অর্থ-বিচ্ছুরণে সক্ষম। প্রসঙ্গত একটা তথ্য নিবেদন করি। ১৯৪২ সালে মার্টিন কার্কম্যান নামে এক ইংরেজ সৈনিক যুবক এ-দেশে আসেন। স্টেটসম্যান ইংরাজী দৈনিকের তখনকার সোলজার্স কর্ণারে তিনি লিখতেন। বাংলা সাহিত্যে অনুরাগী এই যুবক বাংলা ভাষা থেকে 'ঘোড়-সওয়ার' কবিতাটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। সেই বামপন্থী যুবকের এতাদৃশ উৎসাহের কারণ—'ওটা নাকি একমাত্র জন-গণের কবিতা।' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ মন্তব্য শুনে বলেছিলেন—'তা হতেই পারে। একটা প্রতীকী কবিতার বহু অর্থ ধারণের ক্ষমতা থাকে'।২

তাহলে নয়-নয় করে এতক্ষণে আমাদের হাতে চারটে ব্যাখ্যা জমে গেল—এক বিরংসার রূপক, সুধীন্দ্রনাথ যাকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। দুই এবং তিন পুরুষ-প্রকৃতি এবং ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যা সংগত নয়, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের মতে যা শোভন এবং সংগত। চার, মার্টিন কার্কম্যানের ব্যাখ্যা, এটা একটা পিপলস পোয়েট্রি। আমাদের বক্তব্য এই যে, চারটি ব্যাখ্যার সংগে কোনো বিবাদ আমাদের নেই। কিন্তু কবিতাটির ব্যাখ্যা করতে হবে মূলতঃ কবির দিক থেকে। তখন আমরা দেখেছি যে, ঐ চারটি ব্যাখ্যার কেউই হারিয়ে যায়নি, এবং সেটাই আসল কথা, সব ব্যাখ্যাগুলির সহ-যোগে সংযোগে গড়ে ওঠে পঞ্চম অর্থ। তা আমাদের অনেকের কাছে ঘনিয়ে এসেছে অনেকদিন ধরে।

।। চার ।।

কবিতাটি লিখিত হয়েছিল বড় অদ্ভুত অবস্থায়। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসের চার কি পাঁচ তারিখ। কবি রিউম্যাটিক ফিভারে শয্যাগত। আগের রাত্রি কেটেছে প্রবল জ্বরে, ডিলিরিয়মে। ভোরের দিকে তিনি কতকটা আচ্ছন্ন অবস্থাতেই কাগজ-কলম চাইলেন। কাগজ-কলম পেয়ে এক ঝোঁকে তিনি 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির প্রথমার্ধ লেখেন। তার পরে ঘুমিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ বাদে ঘুম থেকে জেগে বাকি অর্ধ শেষ করেন। অনুমান '+−+' এই চিহ্নভাগ বোধ সেই রচনাভাগের স্মৃতিকে বহন করছে আজও। পারিবারিক বন্ধু জীবনময় রায়, বিষ্ণু দে কেমন আছেন দেখতে এসে কবিতাটির প্রথমার্ধ পড়েন। তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে যিনি এই তথ্য জানিয়েছেন তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে, কবিতাটির বিচারে এসব তথ্য হয়তো 'অনাবশ্যক'। হয়তো—হয়তো অনাবশ্যক নয়।

---

২ এই তথ্যগুলির জন্য এর পরে ব্যবহৃত জীবনীতথ্যগুলির জন্য আমি কবি-পত্নী শ্রীমতী প্রমিতা দে'র কাছে ঋণী। আমাদের ব্যাখ্যায় যদি ভুল ঘটে তবে সে দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের।

এটা বিশ্লিষ্টভাবে 'অনাবশ্যক' হতে পারে। কিন্তু কবিতাটি সংক্রান্ত নানা অনুষঙ্গের সংগে যুক্ত করে দেখলে তথ্যটি আর অনা-বশ্যক থাকে না। আমি এই অনুচ্ছেদের শুরুতেই বলেছি, কবিতাটি লিখিত হয়েছে এক অদ্ভুত অবস্থায়—কিন্তু নিশ্চয় কবিতাটির মৌল শক্তিগুলি সঞ্চিত হয়েছে লিখিত হবার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই কবির অবচেতনে। কারণ অবচেতনের চাপ অত প্রবল ছিল বলেই কবিতাটি অমন অনর্গল উৎসারিত হতে পেরেছিল। অব-চেতনের বিস্তৃত অংগন ওখানে অবারিত হতে পেরেছে বলেই কবিতাটি প্রায় একটি ড্রিম পোয়েমের সগোত্র—কোলরিজের কুবলাখানের সৃষ্টিরহস্য মনে পড়াও বিচিত্র নয়।

শুধু 'ঘোড়সওয়ার'-এর ক্ষেত্রেই নয়, একটা ভালো কবিতার সৃষ্টিরহস্যের বিষয়টিও আমাদের কাছে মেলে ধরে ঘোড়সওয়ারের সৃষ্টিকথা। বাইরের ঘটনা জনশ্রুতি অধীত অভিজ্ঞতা, সাহিত্যপাঠ সব এসে যুক্ত হয়েছে তৎকালীন বিষ্ণু দে-র ব্যক্তি-জীবনের মুক্তিবাসনার সংগে। এই সকল কিছুর অভিঘাতে একটি স্বতঃসম্ভূত ফার্টিলাইট-কাল্টের প্রতিমা গড়ে উঠেছে কবিতাটিতে। এগুলি যে জানে না, তার কাছেও যে কবিতাটি ব্যর্থ হয় না তার কারণ কবিতাটি কবিতাই হয়েছে, তার বেশি কিছু সে হয়নি, কমও কিছু না। এবং কবিতাটির সেই স্বয়ংসিদ্ধি ঘটেছে কবিতার নিয়মেই। এ কবিতাতেও বহু অসম্ভবের সমাবেশ আমরা বিস্ময়ের সংগে মেনে নিই। যেমন নিয়েছি আমরা 'সোনার তরী' কবিতায়—শ্রাবণ মাসে ধানকাটা, পালতুলে ভরাবাতাসে নৌকা বাওয়া সূর্যহীন দিনে ছায়া তেমনি 'ঘোড়-সওয়ার' কবিতাতেও আমরা পাই, মেরু এবং বালুচর, নদী এবং হিমশিলাপাত, বরফ এবং মৃগতৃষ্ণিকা একই সংগে উপস্থিত। এই অর্থবান অসংগতিও কবিতাটিকে করে তুলেছে স্বভাষা-নির্ভর।

কবিতাটি ভিতরে ভিতরে উদ্যত হয়েছে কিছুকাল ধরে। 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র দিনগুলি থেকেই বিষ্ণু দের চেতনাকে অধি-গত করেছে এটা নৈঃসংগবোধ এবং কেউ একজন এসে, কিছু একটা ঘটে সে নৈঃসংগ থেকে তাঁকে উত্তীর্ণ করুক এই কল্পনা। —'আদিম ও স্তব্ধ সেই সংগীহীনতায় এলে তুমি শুভ্র স্মিত রজনীগন্ধার মত একা' অথবা 'পৃথিবীকে চূর্ণ-চূর্ণ করে/ আকাশ ছড়িয়ে এসো অন্ধকারে হৃদয়ে আমার' অথবা 'শান্তি বয়ে বসে আছি বাতাসের স্নিগ্ধ প্রতীক্ষায়/ মরুভূমি আকাশের চোখে স্নিগ্ধ ছায়ার আশায়' অথবা 'সমুৎকর্ণ অরণ্যানী ঊর্ধ্বগ্রীব পর্বতের মালা' প্রভৃতি উক্তি বোধ হয় তাঁর তৎকালীন মুক্তি প্রতীক্ষাকেই সংকেত করে। 'কর্মহীন অরকাশ কর্কশ ও কঠিন গুমোটে / কাটে রৌদ্রতাপে' বা 'দিন কাটে নিত্য তৃপ্তিহীন / রাত্রিও প্রশান্তিহীন—ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়', অথবা 'মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক' ইত্যাদি উক্তিতে ধ্বনিত হয় বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণা। সময়ের বিচারেও বলা যায় এই তো সেই সময়—যখন উত্তর-সামরিক বিবর্ণতা নিরুদ্যম নিস্তেজ বিষণ্ণতা চারিদিকের আকাশ বাতাস মন্থর ও ভারি করে ফেলেছিল। সেই বিচ্ছিন্নতা যেমন ছিল সেদিনের বাস্তবতার একদিক। আবার তার সংগে দ্বন্দ্ব, তা থেকে উদ্ধারের প্রয়াসও ছিল সচেতন অগ্রণী মানসের আর এক বাস্তবতা। তাই লেখা হয়, 'জলে স্থলে কম্পমান সৃজনের রূঢ় প্রেমাবেগ / আমার নিঃশ্বাস স্তব্ধ, কী বিস্ময় দুই চোখে জ্বালা'। লেখা হয়, 'পরিপক্ক ফল আজ পড়তে তো পারে না মাটিতে / গরমে যে নিরেট বাতাস'। এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিটি এক অনিবার্য আবেগের জন্ম দিয়েছে কবি-মানসে। সেই 'সংহত' প্লেসিয়ার সহসা নদীরূপ ধারণ করেছে ঘোড়সওয়ার কবিতায় —কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো।

ভিতরে বাহিরের অভিন্নতা কবিতাটির ঐন্দ্রজালিক সিদ্ধির মূলে একথা আমরা শুনেছি। এখন দেখা যাক বহিরাধার কী ভাবে কবির ঐ অভিজ্ঞতাকে সাহায্য করল পাঠস্থ হতে। যে-মূল অভিঘাত থেকে কবিতাটির জন্ম, বাইরের কতকগুলি ঘটনা ও অভিজ্ঞতার উত্তেজনায় তা এবার নিষ্ক্রান্ত হল তার গোপনবাস ছেড়ে। এই উত্তেজক সূত্রগুলির একটি হল ময়মনসিংহের রাজা শশীকান্তের হাতির চোরাবালিতে ডোবার ঘটনা। আর একটি হল সমুদ্রতীরে ঘোড়া ডুবে যাওয়ার একটি বিদেশী গল্প। বলা বাহুল্য কবির কাছে কোনো দানই, কোন ঘটনার রূপক-ব্যঞ্জনা বা প্রতীকী আকর্ষণ একক ভাবে গ্রহণীয় নয়—কেউই একক ভাবে বর্জনীয় নয়। হাতী বা ঘোড়া দুয়ের গল্পেরই আদ্যন্ত রূপান্তর ঘটেছে কবিমনে —শুধু দুই কাহিনীর নির্বস্তুক সার বা সত্তাটি ব্যবহৃত হয়েছে কবিতায়। তা-ও

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম ..... ১৪'০০
২। গুল বাগিচা ..... ৩'৫০. ৩। কাব্য আমপারা ..... ৪'০০
৪। পূবের হাওয়া ..... ২'০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি ..... ২'০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট ফোন-৩৫ ০৬৩৩ কলিকাতা-৯

উন্নীত হল অন্যার্থে। গল্পদুটিতে যা বিপন্নের ব্যাকুলতা উদ্ধারের জন্য, কবিতাটিতে তার বদলে পেলাম বিচ্ছিন্নের ব্যাকুলতা চরিতার্থতার জন্য।

ইয়ুঙের ব্যাখ্যাসমেত একটি চীনা গূঢ় মনস্তত্ত্বের বই কবি এ সময়েই পড়েন। সুধীন্দ্রনাথও সেটি পড়েন। Richard Wilhelm এর চীনা থেকে অনূদিত সেই গ্রন্থ ইয়ুঙের টীকাযোগে প্রকাশিত।৩ সুধীন্দ্রনাথ এটি তাঁর পিতাকে 'পরিচয়ে' আলোচনার জন্য দিয়েছিলেন। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার সঙ্গে এরও কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। পরোক্ষে তা হয়তো উদ্যত করে তুলেছে কবির অভিব্যক্তির প্রাঙ্মুহূর্তকে। স্বপ্ন যেমন একটা ব্যক্তিরই স্বপ্ন, জ্বরের ঘোরও তদ্রূপ একজন ব্যক্তির চেতন অবচেতনের পূর্ণ লীলা। ১৯৩৫এর ৫ই জানুয়ারীর পূর্ববর্তী সমস্ত টেনশন ঐ জ্বরের অবকাশে সংক্ষেপে মুক্ত সংহত হল।

।। পাঁচ ।।

ওয়াটসান্ডিস আদিম উপজাতিরা একটা বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত হত বসন্তকালে। মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে ঝোপে ঝাড়ে তাকে আবৃত করতো তারা। এটা হত স্ত্রী-যোনির অনুকৃতি। এটাকে ঘিরে উদ্যত বর্শা হাতে তারা নাচত। উদ্যত বর্শাটি হত সমুত্থিত পুরুষাঙ্গের উপমান। এটা ছিল তাদের মাটিকে বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি দেবার বিশ্বাসগত পদ্ধতি এবং ক্রিয়া। এই উর্বরতা-বিধায়ক ক্রিয়ার সঙ্গে সাধারণ যৌন উত্তেজনার কোনো যোগ থাকত না। সে সময়টা তারা নারীসংসর্গ থেকে দূরে থাকত। এই সংস্কার-ভিত্তিক প্রক্রিয়াটির সাহায্যে তারা তাদের কামশক্তিকে রূপান্তরিত করত শস্য-সৃজনী আবেগে। প্রতীকটি ধরিত্রী-নারীর প্রতীক। কোনো যৌনচিহ্ন নয়। এই সঙ্গে চিহ্ন আর প্রতীকের পার্থক্যটিও আমাদের মনে থাকে। চিহ্ন শুধু অভিজ্ঞান, বস্তুরূপেই সে আবদ্ধ রাখে আমাদের। প্রতীকেরই আছে বিষয়কে রূপান্তরে উন্নীত করার ক্ষমতা।

'চোরাবালি', 'বল্লম উঁচু' দীপ্ত ঘোড়-সওয়ার', 'হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার' 'অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার' ইত্যাদি প্রসঙ্গে-প্রতীকে প্রশ্রয় পেয়েছে বোধ হয় 'ঝরঝংসার রূপকের' জনশ্রুতি। সে-জনশ্রুতির যদি কোনো ন্যূনতম ভিত্তি থেকেও থাকে তবে তাও প্রতীকের জোরেই রূপান্তরিত হয়েছে তামা থেকে সোনায়। প্রসঙ্গত 'সি সিক্রেট অফ দি গোল্ডেন ফ্লাওয়ার' গ্রন্থে চীনতাত্ত্বিক যা বলেন সেটাই বরঞ্চ আরো অনুধাবনীয় —যদি বাইরে থেকে একান্তই কোনো মানের সন্ধান করতে হয়। প্রাচীন ভারতীয় তন্ত্রের সঙ্গে চীনের এই প্রাচীন তত্ত্বের মিলটুকুও লক্ষণীয়—যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। বিশ্বে যে-শক্তি ক্রিয়াশীল যে-ঘটনা ঘটে চলেছে, মানুষ অন্তরে বাইরে তারই অংশীদার। আলো এবং অন্ধকারের বৈপরীত্যকে মেলাতে চাওয়া সেই দুরূহ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাওয়াই হচ্ছে মুক্তিবাসনা। যে-নদী ঘোলাটে শৈবাল-চ্ছন্ন জটিলতায় এতদিন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল, সে যখন সহসা খুঁজে পায় নিজের গতিপথ পাথরচাপা বীজভূমির আবরণটা যখন সরে যায়, শুরু হয় বিকশিত হবার পালা তারই সঙ্গে উপমা দেওয়া চলে নিরাময়প্রাপ্ত, মুক্ত রূপান্তরিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অর্জনের তীব্র মুহূর্তের। 'কোথায় পুরুষকার / হে প্রিয় আমার প্রিয়তম মোর! / আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর, অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার'—ব্যক্তির পূর্ণায়নের জন্য ব্যক্তিত্বের আকুলতা। এবং তখনই বোঝা যায় কবিতাটিতে স্বরাঘাতের বৈচিত্র্যটি। তখনই বুঝি যে, এই অঙ্গীকার শব্দটির সম্পূর্ণ নূতনার্থে প্রয়োগ সেই বিশিষ্ট স্বর-গ্রহণেরই দান। প্রত্যেক মানুষই তার অন্তর-সত্তায় আপনি পুরুষ আপনি নারী। প্রত্যেক পুরুষের মানসে নির্জ্ঞান স্তরে আছে নারী, নারীর পুরুষ। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় আহ্বানকারিণী আসলে আহূতেরই ব্যক্তিসত্তার অংশ। ঐ নারীরূপিণী ব্যক্তি অংশই ডাক দিচ্ছে সমগ্রকে সৃষ্টির পথে। ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত এই বাকস্পন্দকে দিয়েছে এক ছন্দ-প্রতীক। তা শুধু ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যই নয়—স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনির সন্নিবেশকে তরঙ্গের মতো বা বলা যায় অশ্বারোহীর ওঠাপড়ার মতো বা মিলনচঞ্চলতার স্বপ্নের মতোই সক্রিয় করে তুলেছে। তৃতীয় স্তবকেই প্রধানত মূর্ত হয়েছে বিচ্ছিন্নতা-জনিত বন্ধ্যা অবস্থার যন্ত্রণা। 'চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া'—বালুকাময় ব্যর্থতার অনুভূতি ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তিতে ধ্বনিত। চ-ধ্বনি এখানে একটা চটচটে মাদকতাকে ফুটিয়ে তুলছে—যা অচিরে পরিহৃত হোক, এই হল উক্তিটির উদ্দেশ্য। 'মৃগতৃষ্ণিকা' শব্দটি ডিঙিয়ে গেল অভিধানকে। একাধিক স্তরবিশিষ্ট শব্দটি একটি বিচিত্র আলো ছড়ায় শেষ পর্যন্ত। সে হয়ে ওঠে আমাদের চাকচিক্যময় আপাতলোভন মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের প্রতীক। কারো ভুরু মোটাবার সাধ্য যার নেই, কারো অঞ্জলিতে তর্পিত হবার যোগ্যতা যার নেই তারই প্রশ্ন 'আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি'?

'অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার' থেকে 'অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার' পর্যন্ত পংক্তি-সম্পূর্ণ উক্তিগুলি নাটকীয়তা এবং গীতলতার সমন্বয়ে সংযোজক বাক্যাংশ বর্জনে আশ্চর্য গতিশীলতা পেয়েছে। সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল, / হৃদয়ে আধির চড়া —এইরকম বিপরীত সমাবেশ হয়ে ওঠে দ্বিতীয়ার্থবাচক। 'আধি'র কবিতার চরিত্রটির মানসিকতার বন্ধ্যাত্বের বিশেষণগত রূপক হলেও আলগোছে 'আধির' শব্দের ধ্বনিকে ধরিয়ে দেয়। একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। কবিতাটির প্রথম রচনাভাগে '+ − +' চিহ্ন পর্যন্ত পংক্তিগুলি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। এক একটি পংক্তি এক একটা ছবি। চলচ্চিত্রের রীতিতে বা চেতনাপ্রবাহের ঢেউয়ে ছবিগুলি ফুটছে, মিলিয়ে যাচ্ছে নতুন ছবি ফুটছে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা হয়ে উঠছে বিস্ময়কর গতিময়। কিন্তু দ্বিতীয় রচনাভাগে পংক্তির এই চলন আর নেই। থাকার প্রয়োজনও আর নেই। প্রথম রচনা-ভাগে প্রাধান্য পেয়েছে অচরিতার্থতার তাড়না—'এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া?' দ্বিতীয় রচনাভাগে অসহনীয় বর্তমান যেন অতিক্রান্ত—সমাসন্ন মিলনকে ত্বরান্বিত করার জন্যই যে কথা বলছে কবিতাটিতে, সে সহযোগী হয়ে উঠতে চাইছে—মাত্র সম্পূরক নয়। তাই 'হালকা হাওয়ায় হৃদয় দুহাতে ভরো / হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার' ইত্যাদি পরামর্শ, আবেদন বা আহ্বান। সুধীন্দ্রনাথ মন্দ বলেন নি। এসব দরজা ভাঙাচোরার ব্যাপারে যদি রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়তে পারে —তাহলে আর 'ভক্ত-ভগবানের' সম্বন্ধারোপই বা দূরে থাকে কেন!

কিন্তু তা তো নয়, কবিতাটি শেষ পর্যন্ত পৃথিবী এবং মানুষেরই রূপক। মানুষ ক্ষুদ্রাকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। একের রীতি এবং বিধিবিধান অন্যের মধ্যেও সন্ধেয়। চাঁদ-সূর্য জোয়ার-চড়া পাহাড়-নদী বালু-বরফ সব কিছুর মধ্য দিয়ে যেমন বিশ্ব-জীবন চলেছে চরিতার্থতা এবং অচরিতার্থতার একূলে ওকূলে মানুষকেও তেমনি সার্থকতার নিরাময়ের পূর্ণতার পথে যেতে হয় সেই সূত্র ধরেই। 'হালকা হাওয়া' কথাটি তিনবার কবিতাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তি-অর্থে তা মুক্তির সূচক। বিশ্বাসে তা ঝড়ের আসন্নতার ইঙ্গিতবহ। 'ছায়া' শব্দটি দুবার এসেছে। বিশ্বগত অর্থে তা আলোছায়ার অংশ। তাকে বাদ দিয়ে অপূর্ণ বিশ্বের প্রবহমানতা। আবার ব্যক্তি-অর্থেও তাই। ছায়া আমাদেরই কামনাময় নির্জ্ঞানলোক। তাকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না মানবিক সমগ্রতা। অন্য হিসাবে সেই আমাদের ভূতলোকের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ভাঁড়ারের প্রতীক। তাকে অধিগত করা একটা নৈতিক দৃঢ়সংকল্পের ব্যাপার। কবিতার মানে বলা খুবই কঠিন। বেশি টানাটানি করলে কবিতা মাঝে মাঝে ভুল মানে ধরিয়ে দেয় হাতে। এ-রকম ক্ষেত্রে 'তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার' অযথা আমাদের পুরা প্রসঙ্গ খোঁজায়। সোজা মানেটাই এখানে চমৎকার আলো ছড়াতে পারে। ঐ কষ্টের নদীটি পেরোলে তবে দেখা যাবে ঈপ্সিতকে। উল্লেখ করা সঙ্গত হবে না, রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের চূড়ান্ত অধ্যায়ের আগে বৈতরণী নাম্নী পার্থিব নদীর তীরে পিতৃতর্পণ করেছিলেন।

এ সবের চেয়ে কবিতাটি পড়ে যা পাওয়া যায় তাই বোধ হয় সর্বোত্তম প্রসাদ। জনহীন মেরুচূড়া থেকে সৃষ্টিশীল কৃতার্থতার পথে আমরা যখনই নেমে যেতে চাইব—যখনই বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করতে চাইব আত্মদানে —এটা হয়ে থাকুক আমাদের জীবনের সেই মুহূর্তের কবিতা—চিরকালের জন্য।

৩ দি সিক্রেট অফ দি গোল্ডেন ফ্লাওয়ার। লন্ডন—১৯৩১

গোয়েন্দা ধাঁধা

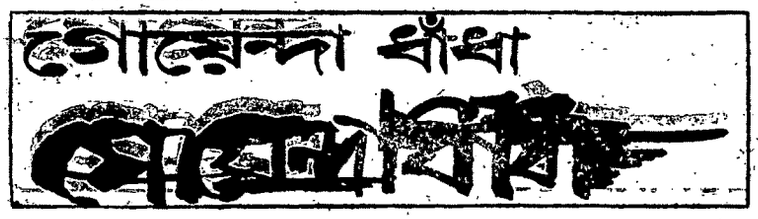

।। উড়ুক্কু মাছের গান ।।

ফাঁদার ঘনশ্যাম

সোনার মাছ। চুনীর চোখ। ভেনিসিয়ান কাচের ফানুস। টলটলে জল। সব মিলিয়ে আশ্চর্য সুন্দর। বন্ধ ভেনিসিয়ান কাচের ফানুসে পাতলা রবারের মধ্যে দিয়ে দেখলে মনে হবে, সত্যিই যেন সোনার মাছেরা হেলে-দুলে লাল চোখের দ্যুতি ছড়াচ্ছে গোলাপী জলের মধ্যে।

মহাশূন্যের একটা কিউরিও শপ থেকে স্বর্ণমৎস্যদের সংগ্রহ করেছিলেন সারদাচরণ। বাড়ীতে ছোট-খাট একটা মিউজিয়াম বানিয়ে ফেলেছিলেন দেশ-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য বস্তু জোগাড় করে। সবার সেরা ছিল এই সোনার মীনবাহিনী।

যে আসত তাকেই সোনার মাছ দেখাতেন সারদাচরণ। কিন্তু এ-রকম একটা দামী জিনিসকে তালাচাবী দিয়ে রাখতেন না। তালাচাবী তো দূরের কথা সদর দরজায় হুড়কো পর্যন্ত দেওয়া দরকার মনে করতেন না। দোতলার বারান্দায় সামনের ঘরগুলোয় রাখতেন অন্যান্য দামী দামী জিনিস—সোনার মাছেদের রাখতেন ভেতরের ঘরে। সে ঘরে জানলা নেই—ঘুলঘুলি নেই। আর একটি ঘরের মধ্যে দিয়ে বারান্দায় আসতে হয়।

বুড়ি পিসি গিরিবালা নিত্য গজগজ করত হুড়কো না দেওয়ার জন্যে। হেসেই উড়িয়ে দিতেন সারদাচরণ। কিন্তু সেটা মুখে। বাইরে কাছা-খোলা অপবাদ থাকলেও ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত হুঁশিয়ার। সোনার মাছেদের তাই রেখেছিলেন ভেতরের ঘরে।

তা সত্ত্বেও মাছেরা উড়ে গেল লাল কাঁচের ফানুস থেকে এক নিশীথ রাতে অলৌকিক ফকিরের আহ্বানে।

সারদাচরণের বাড়ীর সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী দু জন। একদিকে ব্যাংক-ম্যানেজার গিরিশবাবু থাকেন। অপর দিকে থাকেন কর্ণেল সিংহ। রোজ এঁদের নিয়ে আড্ডা মারেন সারদাচরণ। আড্ডায় হাজির থাকেন পদার্থ-বিজ্ঞানী অশোক মিত্র, কুমারবাহাদুর জয় সিং জয়সওয়াল এবং আরো অনেকে।

সেদিন আড্ডার আসরে উপস্থিত হলেন জুডা বলে এক ইহুদি। এসেছেন বোম্বাই থেকে চড়া দামে সোনার মাছ কিনতে। কিন্তু সারদাচরণ তো হেসেই খুন। আসল কথায় না গিয়ে শুরু করলেন অন্য কথা। হাসতে হাসতে বললেন—'লোকে বলে নাক আমার উঁচিত দরজায় খিল—এঁটে ঘুমোনো। দূর দূর! বাড়ীটা তো তাহলে [illegible]

আমলের ভিটে। দুরজায় খিল লাগালেই বা কি, না লাগলেই বা কি। কি বল হে গৌরাঙ্গ?

কাঠের পুতুলের মত পাশে দাঁড়িয়ে কাষ্ঠহাসি হাসল গৌরাঙ্গ—সারদাচরণের প্রাইভেট সেক্রেটারী। প্রতিদিনই পই পই করে হুঁশিয়ার করে সারদাচরণকে দরজায় খিল না লাগানোর জন্যে।

টুরট থেকে খেতে খেতে বলে উঠলেন কুমার-বাহাদুর জয়সিং জয়সওয়াল—পৃথিবীর সেরা হুড়কো দিয়েও সব সময়ে চোরকে আটকে রাখা যায় না। শুনেছি, মোগল আমলে এক সাধু তিন-তিনটে সেনাবাহ ভেদ করে সুলতানের উষ্ণীষ থেকে গজমোতি নিয়ে চলে এসেছিলেন কিন্তু কেউ তাঁকে দেখতে পায় নি।

পদার্থবিজ্ঞানী অশোক মিত্র বললেন—'সম্মোহনে সব সম্ভব।'

'কিন্তু একশটা একই রকম দেখতে তাঁবুর মধ্যে থেকে সুলতানের তাঁবুটা সাধু চিনলেন কি করে?'

টেলিপ্যাথির জোরে—অবৈজ্ঞানিক কিছু নয়।'

কায়রোয় ইংলিশ ব্যারাকেও কয়েক বছর আগে এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল। রেলিংয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা দরকারী দলিল পাহারা দিচ্ছিল পাহারাদার। এমন সময়ে দেখল একটা লোক বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছে। হুংকার দিয়ে পাহারাদার বললে খবরদার ভেতরে এস না। লোকটা হেসে হেসে বললে—ভেতর কাকে বলে? বাইরে কাকে বলে? বলার সঙ্গে সঙ্গে পাহারাদার দেখলে, সে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের বাইরে—লোকটা ভেতরে। আবার হেসে হেসে লোকটা বললে—ভেতর কাকে বলে? বাইরে কাকে বলে? পাহারাদার তখন দেখলে সে রেলিংয়ের ভেতরেই দাঁড়িয়ে—লোকটা সেই দরকারী দলিলটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে।'

পদার্থবিজ্ঞানীর মুখে এবার আর জবাব ফুটল না।

তখন সবে বিকেল পাঁচটা। সারদাচরণ গিরিশবাবুকে নিয়ে শহরের বাইরে গেলেন বিশেষ কাজে। গৌরাঙ্গকে বলে গেলেন মাছের ঘরের সামনেই শুতে। ওদিককার ঘরে শোবে নিতাইচরণ—সারদাচরণের বৃদ্ধ চাকর। যাবার সময়ে গিরিশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে দেখে গেলেন সোনার মাছেদের। আশ্চর্য সুন্দর সেই দৃশ্য দেখে দু চোখ জ্বলে উঠল গিরিশবাবুর।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল নিতাইচরণের। কে যেন অলৌকিক সুরে গান গাইছে। অপার্থিব গানের রোমাঞ্চ কাঁপিয়ে [illegible]

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল নিতাইচরণ। ছুটে গিয়ে দেখল বারান্দায় হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ। সে-ও গান শুনেছে। কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

নিতাইকে দেখেই ভয়েময়ে বলে উঠল—'তুমি দাঁড়াও, আমি খিল তুলে আসি।'

দড় দড় করে নেমে গেল গৌরাঙ্গ। ঘড়াং করে আওয়াজ হল খিল তুলে দেওয়ার।

অপচ্ছায়ার মত অপার্থিব সেই মূর্তিকে দেখা গেল তারপরেই। রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটছে কি ভাসছে বোঝা যাচ্ছে না। মাথা ঘিরে নীলাভ পাগড়ি। মুখের জায়গাটা অন্ধকার। সাদা আলখাল্লায় আবৃত দেহ। খালি পা। হাতে মিশরীয় তারের বাজনা। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে রূপোর চিরুনি দিয়ে তারে ঘা দিচ্ছে ভয়াবহ সেই ফকির। আর গানের সুরে ডাকছে সোনার মাছেদের—ওরে আয়...আয়...আয়...আমি ডাকছি...উড়ে আয়।

পরমুহূর্তেই ঝনঝন করে ভেঙে গেল কাচের ফানুস। বেগে ঘরে ঢুকল নিতাইচরণ। দেখল কাঁচের ফানুস চুরমার। মাছেরা উধাও।

ছুটতে ছুটতে উঠে এল গৌরাঙ্গ। কিন্তু ততক্ষণে ফকিরও মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। শুধু একটা আলো জ্বলছে জয়সওয়ালের বাড়ির দিকে।

সব শুনে পদার্থবিজ্ঞানী বললেন—বোগাস। দূর থেকে বেহালার ছড় টেনে কাঁচের ফানুস ভেঙে দেওয়া যায়! শব্দ দিয়ে সব সম্ভব।'

শুনে শিউরে উঠলেন গিরিশবাবু। এঁদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বেহালা বাজান।

কুমারবাহাদুর বললেন—নিরেট সোনার মাছগুলোও কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? বিজ্ঞান কি বলে?'

বোবা হয়ে গেলেন অশোক মিত্র।

কিন্তু সমাধান বাতলে দিলেন সেই বোকা-বোকা চেহারার চালকুমড়োর মত বেঁটে বেঢপ পাদরীটি—নাম যার ফাদার ঘনশ্যাম। নিতাইচরণের সঙ্গে বাড়ির সামনে এক চক্কর ঘুরে এসে বললেন—প্রতি বৈশাখী রাস্তা দিয়ে কেউ আসেনি—এলে ভিজে মাটিতে পায়ের ছাপ পড়ত। ঝাঁটা-ঝোপ মাড়িয়ে পেছন দিক থেকেও কেউ আসেনি—এলে রক্তাক্ত পায়ের ছাপ দেখা যেত। অথচ ভুতুড়ে ফকিরের পায়ে জুতো ছিল না। তাহলে সে কাছের লোক। কাছের মানুষকেই তো আমরা চোখ মেলে দেখি না। আমাদের বদরোগ তো সেইটাই। নিজেকেই চিনি না—অপরকে চিনতে চেষ্টা করি।'

এই বলে দুটি জিনিসের দিকে নিতাইচরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ফাদার ঘনশ্যাম। একটা হল দরজার নীল পর্দা। আরেকটা হল, সদর দরজার খিল খুললে জোরে আওয়াজ হয়—কিন্তু খিল দিলে একদম আওয়াজ হয় না।

বলুন দিকি সোনার মাছ কে নিয়েছে?

[সমাধান ৫৫ পৃষ্ঠায়]

—অদীশ বর্ধন

যুক্তি

বিবাহ বিচ্ছেদ

আজকের যুবকযুবতীদের মধ্যে লাভ-ম্যারেজ প্রচণ্ডভাবে চলছে। সত্যি কথা বলতে কি এ বয়সটাই তো একটু ভালবাসার, ভালবাসার বয়স! খুব কম তরুণ-তরুণীই আছেন যাঁরা এই বয়সে একটু প্রেমে পড়তে না ভালবাসেন!! কেউ আমাকে ভালবাসে কিম্বা আমি কাউকে ভালবাসি—এই দুই ভালবাসাবাসির মধ্যে যে রোমাঞ্চ আছে তা আমাদের জীবনে আর কখনো এতো সুন্দরভাবে ধরা পড়ে না। ভালবাসা গভীরতা লাভ করলে এক সময়ে দুজনে এক হয়ে যাওয়ার প্রবণতায় চার চক্ষুর মিলন হয়ে যায়। কিন্তু এই দারুণ প্রেমে পড়া ও প্রেম করে বিয়ে করার একটা কুফলও আমরা বেশ লক্ষ্য করছি। জোড়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে ছাড়াছাড়িটা যেন বেশ বেড়ে চলেছে। রোজকার সংবাদপত্রে আইন আদালত কলামে বিবাহ বিচ্ছেদের নানা ঘটনার-কথা আমাদের চোখে পড়ে। অগ্নিসাক্ষী করা বিয়েতে তো এতসব ঝামেলা ছিল না। এখন তাহলে এসব উৎপাত আসছে কেন? দাদা-দিদিদের মুখ থেকেই জানা যাক ছাড়া-ছাড়িটা হচ্ছে কেন?

কলকাতা লবণহ্রদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্মী শ্রীনীলকৃষ্ণ কুণ্ডুর সঙ্গে কথা হল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—কুণ্ডুদা, বিবাহ বিচ্ছেদের প্রবণতা আমাদের মধ্যে কেন বেড়েছে বলতে পারেন? বড়ো রগচটে মানুষ এই কুণ্ডুদা। হেসে বললেন—কত বসন্ত পেরিয়ে গেল এখনো দু'হাত জোড়া লাগাতে পারলাম না তা আবার ছাড়াছাড়ি! আমার এক বন্ধু রিসেন্টলি ডিভোর্স করেছে। স্রেফ দুজনের মধ্যে মিস আন্ডার-স্ট্যান্ডিং-এর জন্যই ঘটনাটা ঘটলো।

—ভুল বোঝাবুঝি বলতে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?

—নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ প্রবণতা অর্থাৎ কিনা অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাব। আজকালকার বৌয়েরা স্বামীদের তাঁবে থাকতে চায় না—তারা অনেকেই প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। এভাবে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। সেই অশান্তি চরমে পৌঁছে লিগাল সেপারেশন—তারপর ডিভোর্স। তবে..

—তবে কি কুণ্ডুদা, জিজ্ঞাসা করি।

—ডিভোর্স করে অনেকেই পস্তায়। আমার বন্ধুরত্নটিও পস্তাচ্ছে। সাধারণ ঘরে ডিভোর্সের কেস কম। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরী করেন—উভয়েই উচ্চশিক্ষিত—অতি আধুনিকতা, তথা প্রগতিতে বিশ্বাসী। সেসব ক্ষেত্রেই এসব বেশী হচ্ছে।

—কেন বলতে পারেন?

—আরে বুঝতে পারছেন না, উৎকট ব্যক্তিস্বাধীনতার লিপ্সাই ঝামেলার মূল কারণ। অনেকে আবার বিয়ের পরও স্বামী-স্ত্রীতে সুখী হতে পারেন না! আরো কত কি!

টিটাগড়ের শ্রীমতী এলা দাস সরকারের বক্তব্য কিন্তু তা নয়। তিনি জানালেন আরো অনেক কারণেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। দেখুন না, আমার এক বন্ধু শ্রীমতী মজুমদারকে শেষ পর্যন্ত ডিভোর্সের পথ বেছে নিতে হল।

—কেন বলুন তো?

—স্বামীর দৈহিক অক্ষমতা—মা হওয়ার বাসনাকে চরিতার্থ না করতে পেরে হতাশ

এলা দাস

নীলকৃষ্ণ কুণ্ডু

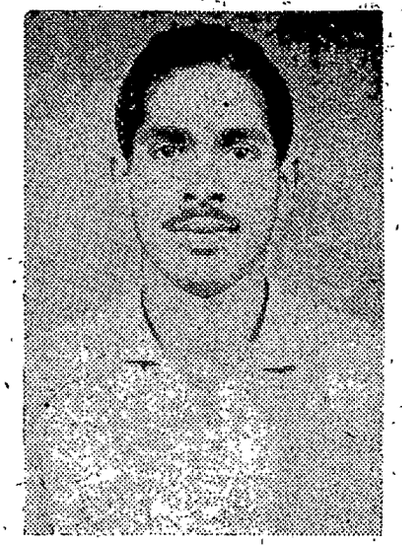

বন্ধুটি শেষ পর্যন্ত এমনতরো কাজ করলো।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করি, আর কি কারণ থাকতে পারে আপনার মনে হয়?

—স্বামীদের যথেচ্ছাচারিতা। অনেকেই স্ত্রীকে শুধু ভোগ করতে চান। এদিনে বছর বছর সন্তান উপহার দেওয়া কি অসহ্য বলুন তো। বাধা পেলে অন্যত্র গমন—মদ্যপান শুরু। স্ত্রীর পক্ষে স্বাভাবিক জীবনযাপন তখন কষ্টকর হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে বিচ্ছেদ এলে স্ত্রী নিশ্চয়ই সেজন্যে দায়ী নয়।

—স্ত্রী পক্ষের কি কোন দোষ থাকে না?

—কোন কোন ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই থাকে। এক হাতে তো আর তালি বাজে না। কিন্তু দোষ পুরুষেরই বেশি। নিজেরা যা খুশী তাই করবেন কিন্তু বৌয়ের বেলায় একটু এদিক ওদিক হলেই নানা সন্দেহ—ভুল বোঝাবুঝি। আমাদের নিজেদের মন বলে কি কিছু নেই? মেয়ে হয়েছি বলেই কি পরাধীনতার যূপকাষ্ঠে নিজের সত্ত্বাকে বিসর্জন দেব?

—এসব প্রশ্ন তো অনেক বিতর্কমূলক। তবে সবকিছু মানিয়ে চলাই তো উচিত।

—আপনি ছেলেদের সাপোর্ট করছেন। ওরা পাষাণ, যা খুশী তাই করতে পারে—আমাদের মন নরম, কষ্টটা তাই আমাদেরই বেশী।

শ্রীমতী শুক্লা দত্তগুপ্ত আধুনিকতায় বিশ্বাসী। তাঁর কাছে ওসব সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নেই। তিনি বললেন, আগেকার দিনে পতিদেবতাকে পুজো করে সারাজীবন শত-কষ্ট হলেও মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হতো। কিন্তু আজ ওসব চলছে না বাবা! আমাদের চোখ খুলে গিয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ আইন হয়ে স্ত্রী জাতির একটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

—একথা কেন বলছেন আপনি? পশ্চিমী ঢঙে আপনি কি—সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন ঘর বাঁধতে পারবেন?

—কেন নয়? মন যদি না চায় তবে

সেখানে আজীবন পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কি আছে? তার থেকে যার কাছে ভালবাসা পাব, যে আবার আপন করে নেবে, সেখানে যাওয়াই শ্রেয়। জীবনকে ভোগ করার অধিকার সবার আছে।

স্মৃতিরেখা হাজরা কিন্তু এই উগ্র আধুনিকতার বিরোধী। 'আইন করে বিয়ে অস্বীকার করা ও ভাই আমাদের দিয়ে হবে না। অত সহজে ভাঙাগড়া চললে সবার সংসার মাটি হয়ে যাবে।'

—তিনি জবাব দেন।

তরুণ যুবক কার্তিক সাহা বিবাহ বিচ্ছেদের নাম করতে হেসে উঠলেন। জানালেন আমি বিচ্ছেদে বিশ্বাসী নই। বিরহে প্রেম গভীর হয়—পার্মানেন্ট বিচ্ছেদে নয়। প্রেমের আগে দুজনের মধ্যে যেমন গভীর বিশ্বাস থাকে সেটা অব্যাহত রাখলেই ল্যাটা চুকে যাবে। তুমি কি বলো?' পাশে সম্ভবত তার প্রেমিক বসেছিলেন।

তিনি হেসে জবাব দিলেন—সত্যিকার ভ বাসায় বিচ্ছেদ আসে না। মোহে পড়ে কর মোহের ঘোর কেটে গেলেই এটা হয়। ভ যদি বাসলাম আর বিয়েই যদি করলাম ত ছাড়ার কথা কেন? আমি কিন্তু তো ছাড়ছি না।'

দুজনের হাসাহাসির অবসরে আমি বিদায় নিলাম।

—অমর দা

সুপার সার্ফ সবচেয়ে সাদা ক'রে ধোয়...

সবচেয়ে সাদা!

সুপার সার্ফের রয়েছে বেশি পরিষ্কার করার ক্ষমতা। এমনকি লুকোনো ময়লাও বের করে দিয়ে আপনার কাপড়কে এমনই ধবধবে সাদা করে তোলে যা দেখে অপরের মনে হিংসের উদ্রেক হয়। স্বাভাবিক কারণেই ভারতের সবচেয়ে সেরা ব্র্যাণ্ড: সুপার সার্ফ!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SU. 160-140 BG (E)

অমৃত প্রসঙ্গে

দীর্ঘদিন 'অমৃত' পাঠ করে আসছি। 'অমৃত'র মাধ্যমে অনেক কিছু জেনেছি বুঝেছি ও শিখেছি আমি। এমন কাগজের সমস্যা দেখা দিয়েছে দেশে। প্রচুর দাম বেড়েছে কাগজের। এই অবস্থাই 'অমৃত' পত্রিকার যা মূল্য রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই তা প্রশংসার যোগ্য।

সুন্দর সুন্দর বিষয়বস্তুর ফলে পত্রিকাটি এখন আরো ভালো হয়েছে। আশা করি 'অমৃত' কর্তৃপক্ষ বরাবরই পত্রিকার মান ও গুণ এই রকমই রাখবেন এবং সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে এইভাবেই অমৃতকে পাঠকের নিকট উপস্থিত করবেন।

মনোহর দে
তিলাটাড়
(ধনবাদ)।

(২)

সাপ্তাহিক অমৃতের প্রথম সংখ্যাটি থেকেই আমি তার পাঠক। চতুর্দশ বৎসর অতিক্রান্ত এই পত্রিকাটি নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমাকে আরও আকর্ষিত করে চলেছে। মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের প্রথম সংখ্যাটি একদিন যে সম্ভাবনা নিয়ে মূর্ত হয়েছিল—আজ তার পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি।

বাইরের প্রচ্ছদ আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের নানান বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। নানা শ্রেণীর পাঠকের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন রকমের ফিচার সরবরাহের এই দৃষ্টান্ত অনন্য দুর্লভ। সময়োপযোগী ও বস্তুবধর্মী চিত্রের আলোকপাত এই পত্রিকার আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে।

পাঠকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ থাকবেই। তবু সব দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠককে যেভাবে পল্লবিত করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত বিরল। একেবারে প্রথম থেকেই মনে পড়ছে। মানুষ গড়ার ইতিকথা সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ সেই লেনিনী শাদা চোখে নিকটেই আছে প্রভৃতি ফিচারগুলি সুস্থ ও প্রগতিশীল চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে অধুনা রূপসীর খাতা অঙ্গনা আর্থিক প্রসঙ্গ যুবক-যুবতী প্রভৃতি ফিচারগুলি নির্ভেজাল আনন্দ ও শিক্ষার কাজে এসেছে।

সমকালীন পত্র-পত্রিকার দিকে তাকালেই চোখে পড়ে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে রাশি রাশি পচা আবর্জনায় বাংলা পত্রিকাগুলোকে বোঝাই করে তোলার অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ব্যাপকভাবে চলছে। সাহিত্য জগতে এরূপ স্থূল আক্রমণের সামনে 'অমৃত' প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চার ন্যায্য প্রতিরোধ গড়ে তুলবে মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের কাছে এই অনুরোধ জানাই।

কাবকঙ্কন গুপ্ত
এম পি এইচ এস স্কুল, ধানবাদ

গ্রামের যুবক-যুবতীদের কথা

অমৃতের বিগত কয়েকটি সংখ্যায় শহর গ্রাম ও মফঃস্বলের যুবক - যুবতীদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হচ্ছে। এই মনোগ্রাহী সাক্ষাৎকারের জন্য প্রথমেই অমৃত পরিচালকগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ জানাই। আজকের সমাজে অধিকাংশ যুবক - যুবতীরাই শেকল ছেঁড়া হালভাঙ্গা নৌকোর মত উদ্‌ভ্রান্ত হতাশার দাপটে তাদের আশার আলোক নির্বাপিত প্রায়। পাশ্চাত্য দেশের যুবক যুবতীরা যেখানে উচ্ছল প্রাণচঞ্চল সেখানে আমাদের দেশে অনেকেই দু'বেলা দু' মুঠো ভাত কাপড় ও সামান্য একটু বাসস্থান যোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে (বিশেষতঃ গ্রামে)। তাই অনেকের ভিতরে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিভা থাকলেও পারিপার্শ্বিক চাপে পড়ে তা বিসর্জন দিতে হচ্ছে। শিক্ষা কর্মজীবন সমাজজীবন সাংস্কৃতিক জীবন—সবেতেই হতাশার করাল ছায়া তাদের গ্রাস করেছে এবং তার পরিণতি হিসেবে দেখা দিয়েছে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব—যেন হাল ছাড়া জীবন—যে দিকে যায় যাক। সব কিছুতে একটা অনীহাভাব। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যুবমানসের যে অস্থিরতা এবং তার সুষ্ঠু প্রতিফলন হোল অমৃতের যুবক যুবতী ফিচারটি। অমৃত এই সমস্ত হতাশাগ্রস্ত যুবক -যুবতীদের আশার আলো দেখাবে এমন আশা কি করে করি? বলা যায় এর দায়িত্ব বরং আমাদের সরকারের আর আমাদের / সমাজের। তবুও অমৃত এদের মানসিক অস্থিরতা তথা হতাশা ও সেই সঙ্গে যুবমানসের বিভিন্ন সমস্যা সমাজের সামনে তুলে ধরছে, এটাই বলিষ্ঠ সাংবাদিকের পক্ষে যথেষ্ট কাজ—একথা গুণগ্রাহী পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন।

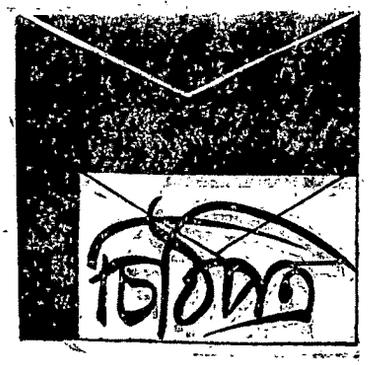

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে শ্রীদাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁকে অনুরোধ করি তিনি সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের গ্রামের আরও কিছু সমস্যা জনচক্ষুর সামনে তুলে ধরুন। যেমন গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের অর্থনৈতিক সংকট তাদের শিক্ষার সমস্যা বাসস্থানের সমস্যা ও এ বিষয়ে সরকারী সহযোগিতা। মফঃস্বল অঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে স্বনির্ভর প্রকল্পে সরকারী সাহায্য কতদূর প্রসারিত হোচ্ছে বা যারা স্বনির্ভর প্রকল্পে সাহায্য পেয়েছেন তারা নিজেরা সেই প্রকল্পে কতদূর এগিয়েছেন। সরকারী মহল ও উচ্চস্তরে ডাক্তার মহল থেকে পর পর বিপরীত মতামত প্রায়ই পাওয়া যায়। বেকার ডাক্তাররা চান চাকরী—সে যেখানেই হোক না কেন। আর সরকারী মহল থেকে বলা হোচ্ছে, গ্রামে ডাক্তাররা যেতে অনিচ্ছুক। এই সকল বিষয়ে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আলোকপাত করলে হয়ত আমরা আরও বিশেষ কিছু জানতে পারব।

পরিশেষে অমৃতের বহুল প্রচার কামনা করি ও শ্রীদাসকে যুবক-যুবতী ফিচারের সাক্ষাৎকারগুলির জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ধনপতি দত্ত
খড়দহ
২৪-পরগণা

লিব আন্দোলন

গত ২৫ অক্টোবর শ্রীমতী কণিকা রায় নারী প্রগতির প্রতি কটাক্ষপাতের অভিযোগ এনেছেন আমার বিরুদ্ধে। পুরুষত্বে গর্বিত পুরুষ 'লিব' আন্দোলনের বিপক্ষে, এ ধারণা লেখিকার ঠিক নয়। আমার বক্তব্যে লিব-বিরুদ্ধ ইঙ্গিত ছিল বলে স্মরণ হচ্ছে না।

নারী স্নেহশীলা। প্রেম-প্রীতির জীবন্ত প্রতিমা। শারীরিক গঠন ও দৈহিক শক্তির প্রভেদ নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা ভেদ রেখা বজায় রেখে এসেছে। ঐতিহাসিক স্বীকার করেন—

> 'Physical prowess, bodily vigour and muscular strength thus naturally established man's permanent superiority over woman'.

এই কারণেই পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র পৃথক এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ।

বিশ বছর আগে নারীর যে স্বভাব ও প্রকৃতি ছিল আজও তাই আছে। অভিব্যক্তিবাদের ফলে হয়তো কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হতে পারে। তা ধর্তব্যের বাইরে, কিন্তু এই বিশ বছরে আমূল পরিবর্তন এসেছে অর্থনৈতিক কাঠামোয়। অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য বাধ্য হয়ে নারীদের কর্মগ্রহণের প্রশ্ন এসেছে। কিন্তু জীবন এতবেশী প্যাকেটিক্যাল যে থিওরি দিয়ে অনেক সময় তার ব্যাখ্যা অসম্ভব। দশটা-পাঁচটা অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রমের পর জীবনের প্রতি স্তুতি আসে না একথা কোন নারী হলপ করে বলতে পারে না। এর জন্য দায়ী কিন্তু নারী জাতি নয়। শারীরিক কারণই এখানে মুখ্য।

'কর্মক্লান্ত দিনের শেষে পুরুষের হাতের ধূমায়িত চায়ের জন্য আপশোষ করেছেন শ্রীমতী রায়। এ ধরনের স্থূল আন্তরিকতার উল্লেখ লিব এক্তিয়ারে আনা

হাস্যকর। আমি এমন পুরুষের খবরও জানি যে স্ত্রীর প্রতি অন্তঃস্থ আন্তরিকতায় গার্হস্থের কাজে সহযোগী হয়। তাছাড়া পুরুষেরা নারীদের প্রতি স্বভাবজ সশ্রদ্ধ। কারণ পরিপূর্ণ ভোগসুখের জন্য কেবলমাত্র নারী অঙ্গ নয়, নারীর মনকে আয়ত্ত করা প্রয়োজন। নারীর হৃদয় জয়—নারী-অঙ্গ ভোগরীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং নারীর হৃদয় জয়ের গৌরব অর্জনই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বোধের উৎস।

নারীর উপর পুরুষের অধিকার স্থাপনের অহমিকার কথা উল্লেখ করে পরোক্ষভাবে শাশ্বত সংসারধর্ম অস্বীকারের আভাস দিয়েছেন শ্রীমতী রায়। এটা পুরুষেরা স্বপ্নেও অহমিকা বলে ভাবে না। ঘনিষ্ঠতার দাবীতেই পুরুষেরা যা কিছু আব্দার করে থাকে। আপনজনের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করাই পুরুষের উদ্দেশ্য। এটা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে ভাবলে জীবনে শুধু অসন্তোষই বাড়বে। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। নারীরা স্বামীগৃহে জীবন-যাপনকে যদি পুরুষের অধিকার স্থাপনের শঠ প্রয়াস বলে মনে করে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে যদি নারীরা স্বামী-গৃহে আসতে নারাজ হয় তাহলে আর সংসার করা হয় না। 'টেস্ট টিউব শিশু' দিয়েই বংশবৃদ্ধির পথ নিতে হয়।

তবুও লিব আন্দোলনের উপযোগিতা মানি। এবং তা দেশ কাল পাত্র ভেদে গড়ে উঠুক। বিশ্বে কোন উন্নত দেশের নারী ভারতীয় নারীদের মতো সোনার-গয়না ব্যবহার করে না। ভারতবর্ষে বহু সহস্র কোটি টাকা মূল্যের সোনার গয়না বাকস-বন্দী থাকায় জাতীয় প্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে নারীরা ব্যাপক লিব আন্দোলন গড়ে তোলে নি কেন? আজও নারীরা উৎসব-উপলক্ষ্যে জড়োয়া না হোক নতুন মডেলের নতুন গয়নার জন্য আবদার করে এ নজির বিরল নয়।

বর্তমানে, নারীদের লিব আন্দোলনের চেয়ে লিব ফ্যাশানের প্রতি প্রবণতা বেশী লক্ষণীয়। এ বিষয়ে নারীদের সচেতন হওয়া উচিত। নচেৎ মহৎ লিব আন্দোলন সার্থক হওয়া সুদূরপরাহত।

বাল্মীকি ঘোষ
কলিকাতা-৩৭।

বাংলা নাটক ও সাহিত্য প্রসঙ্গে

গত ১৭ জানুয়ারী 'অমৃতে' যুবক যুবতী বিভাগে 'বাংলা নাটক ও সাহিত্য প্রসঙ্গে' যুবক যুবতীদের আলোচনা দেখে স্বভাবতই গ্রামবাংলা থেকে কিছু বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। কারণ একমাত্র অমৃত পত্রিকাই পাঠকদের বক্তব্যকে তুলে ধরছে। এ জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

প্রথমেই বলি, সম্পূর্ণ আলোচনা বা প্রশ্নোত্তরগুলি নাটক ও সাহিত্যে অশ্লীলতা অর্থাৎ সাহিত্যে যৌন আচরণ নিয়েই আলোচিত। বহুকাল ধরে অশ্লীলতা নিয়ে আলোচিত হল, বিচারের কাঠগড়াতেও উঠল কিন্তু অশ্লীলতার কোন সংজ্ঞা নিরূপিত হল না। কারণ শ্লীল অশ্লীল নিরূপণ করা খুবই কঠিন। আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাবে প্রত্যেকেই প্রায় অশ্লীলতা বিরোধী, আমিও তাই। বিদেশী সাহিত্য আলোচনা না টেনে বলা চলে সাহিত্য ও নাটকে অশ্লীলতাকে দু' ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। (এক) যে বই বা নাটক যৌন লালসাকে জাগ্রত করবার চেষ্টায় মত্ত। অর্থাৎ যেখানে সমাজের প্রতিফলন ঘটে না যা সাহিত্যের নামে অল্পায়াসে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে; সেটাকে বলি পর্ণগ্রাফি। আর (দুই) যে বই বা নাটকে লেখকের অশ্লীলতা কাম্য নয়, কিন্তু সমাজের হুবহু ছবিকে তুলে ধরতে অশ্লীলতা এসে যায়। সেটাকে লেখক আনতে বাধ্য হয় শিল্প ও সমাজের স্বার্থে। প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই প্রথম নম্বর শ্রেণীর বইগুলিকে পরিত্যাগ করবে। জীজা দেবী ঠিকই বলেছেন 'সেকসকে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করতে হবে' যাতে যুবমানসে ক্ষতিকারক প্রতি-ক্রিয়া না সৃষ্টি করে। সমাজের প্রত্যেকটি দিকই শিল্পনিপুণতায় সাহিত্যে প্রতিফলন চাই, সেখানে অশ্লীলতা থাকলেও অন্যায় হবে না। সাধনা বোস বলেছেন 'সাহিত্য হবে যুগোপযোগী, তাই সাহিত্যে অশ্লীলতা চলবে না এটা অন্যায়। কারণ এটাই বিপ্লবাত্মক। এতে যুবসমাজ সজাগ হবে, জীবনকে ঠিক পথে চালিত করবে' বক্তব্যটি যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ ও সঠিক। কিন্তু ঠিক পথে চালিত না হয়ে সাহিত্য যদি অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধি করে যা ক্রমে ক্রমে দেখা যাচ্ছে সেটা কি ভালো হবে। সাহিত্যে যৌনাতিশয্য অপরাধপ্রবণতা ও অসুস্থ মানসিকতার প্রসার ঘটাতে পারে। কেননা সাহিত্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে জনৈক শ্রদ্ধেয়া বাঙালী লেখিকার উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে 'লেখক যদি অশ্লীলতার পাঁকের ওপারে পরিচ্ছন্ন জমির সম্ভাবনা দেখাতে সমর্থ হন তাহলে তথাকথিত অশ্লীলতাও সাহিত্যের অনুপান হয়ে উঠতে পারে।'

চঞ্চল সিংহরায়
রোহিয়া (গোড়াপ)।

পেশা ও মাদকতা

গত ১৭ জানুয়ারী চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীঅমর দাশ-এর লেখা 'নেশা ও মাদকতা' সম্বন্ধে শ্রীকল্লোল, সরকার ঝংকার সম্পাদকের মতামতটি পড়লাম, যদিও তাঁর মতের সঙ্গে নিজের মতের সম্পূর্ণ সমতা রাখতে পারি নি তবুও বলছি অমর দাশের লেখাটি সময় উপযোগী হলেও সত্যিই কি এর অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি আমাদের সমাজকে পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত করেছে?

জানি না শ্রদ্ধেয় অমর দাশ যাঁদের মতামতের ওপর নির্ভর করে ঐ আলোচনাটি প্রকাশ করেছেন তাঁরা সত্যিকারের কোন্ তলার মানুষ, আর তাঁদের দৃষ্টি কোন দিকে নিবদ্ধ? যে দেশের মানুষ জীবন-যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হয়ে জীবনযাত্রার পথকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে ফিরছে, যে দেশের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী যুবক, যুবতীরা তাদের ভবিষ্যতকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করে নিয়ে যেতে পারলে মঙ্গল হয় সেখানে ড্রাগ ড্রিঙ্ক মেনড্রেকস এল এস ডি প্রভৃতি ব্যবহার করে নেশায় মাতিয়ে রেখে নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন এমন যুবক যুবতির সংখ্যা আমাদের দেশে কজন?

যদিও জানি পৃথিবীর চারিদিক আজ হতাশায় পূর্ণ। আর আমরা এই হতাশার বলি হয়ে নিজেদের নেশার চরম আনন্দে মাতিয়ে রেখে আনন্দ করছি। ভাবটা এইভাবে আমরা নাকি সবকিছু ভুলবো। কিন্তু আমাদের দেশে অবহেলিত ও দারিদ্র্যে নিপীড়িত যুবকেরা দিনের শেষে দু মুঠো ভাতের সংস্থান করতে পারলে ধন্য হয়ে যায়। সেই সব দরিদ্র মানুষ নিজেদের দৈন্যকে ভোলবার জন্য মেনড্রেকস এল এস ডির মত রাজকীয় নেশার খরচ যোগাড় করছে, একথা ভাবতে বা মানতে পারছি না।

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঁশবেড়িয়া
হুগলী।

বাংলা ছবির নূতন দিক কিছু বক্তব্য

২৪ জানুয়ারীর 'অমৃতে' 'বাংলা ছবি নতুন দিক শীর্ষক লেখাটি পড়লাম। এতে কজন তরুণ চলচ্চিত্রকারের কিছু লক্তব্য জানা গেল। কিন্তু পূর্ণেন্দু পত্রীর কিছু কথা আমায় বাধ্য করেছে এ-চিঠিটি লিখতে। ওঁর বক্তব্য 'হঠাৎ শুধু চলচ্চিত্রের ওপরেই এত দায় কেন, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর জন্য? আর কোন শিল্প মাধ্যমের কি এ-সব দায় নেই।' অর্থাৎ পূর্ণেন্দু পত্রীর মতে চলচ্চিত্র রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারে, কিন্তু শুধু চলচ্চিত্র নয় এ-ব্যাপারে অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমেরও দায় থাকা উচিত।

নাটক একটি শিল্প মাধ্যম এবং যাত্রাও। নাটক এবং যাত্রা রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করে চলেছে এটা অনস্বীকার্য। বর্তমান যাত্রা লেনিন পেরিয়ে মার্কস পেরিয়ে মাও-সে-তুং-এ এসে পৌঁছে গেছে। আর নাটকের তো কথাই নেই। ষাটের দশকে উৎপল দত্তের এক-একটি

নাটক কি রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে নি? এছাড়া থিয়েটার ওয়ার্কশপ থিয়েটার ইউনিট ইত্যাদি নাট্য-গোষ্ঠীগুলি তো রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর দায় নিজেরাই নিজেদের কাঁধে নিয়েছেন। অথচ চলচ্চিত্র যথেষ্ট জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও কটা চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যায়? কজন চলচ্চিত্র পরিচালক এ সাহস রাখেন? অবশ্য যাঁরা পৃথিবী জোড়া নিমীয়মান শিল্পসৌধে নিজের হাতে গড়া একখানা নকসা কাটা ইঁটের যোগান দেবার স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না তাঁদের কাছে এমন সাহস প্রত্যাশা করাটা উচিত নয় হয়তো।

শুধুমাত্র চলচ্চিত্র অবশ্যই অতটা শক্তিমান নয় যে শুধু সেইই রাজনৈতিক চেতনাকে দানা বাঁধবার জন্য আলাদীনের প্রদীপ নিয়ে হাজির হবে। এ-ব্যাপারে সমস্ত প্রকৃত শিল্পীদেরই এগিয়ে আসা উচিত তাঁদের বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম নিয়ে। কারণ '...সকল শিল্পকে হতে হবে জীবন-অনুগামী।' এ দায়িত্ব কারো এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, কখখোনো নয়।

নবেন্দুকিশোর গুহ
দেশবন্ধুপাড়া শিলিগুড়ি।

সম্পাদক সমীপেষু

গত ১০ জানুয়ারীর 'অমৃত' পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে 'আগামী সংখ্যা থেকে একটি করে প্রথম শ্রেণীর গল্প পাঠকদের উপহার দেওয়া হবে।' এতে প্রত্যেক পাঠক-বর্গ খুশী। তারপর সর্বপ্রথম 'বকাসুর' গল্প উপহার দেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এবং পরে 'ভোরের প্রাণের শব্দ' শ্রীবুদ্ধদেব গুহ 'অথচ অবনীশ খারাপ ছিল না' শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী পরের সংখ্যায় শ্রীবরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প বিজ্ঞাপিত।

লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের সব-গুলিই গল্পই নিঃসন্দেহে সার্থক। সুসাহিত্যিকের হাতে সাহিত্য যে কত সুন্দর গভীরতাপূর্ণ ও অর্থবহ হয় তা বলবার দরকার নেই। এ ধরনের পরিকল্পনার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

'অমৃত' আজ জনপ্রিয়তার শীর্ষে বহু ব্যক্তি এই প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করেছেন। বিপুলভাবে সর্বস্তরের মানুষেই সাড়া জাগিয়েছে আজ আশ্চর্যভাবে। এ রকম নামী একটি সাহিত্য সাপ্তাহিকের পাতায় এই প্রসঙ্গের অবতারণার পরে আমার মতে নামী লেখক-দের রচনা ছাড়াও লেখার মান হিসেবে নতুন লেখকদের আরও কিছু রচনা বাড়ানো দরকার। বর্তমানে প্রতিশ্রুতিমান কবি-সাহিত্যিকেরা বড় বিষন্নতার মধ্যে আছেন। নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করার কোন উপযুক্ত সুযোগ আজকে খোলা আছে বলে জানা নেই। তাই এই মুহূর্তে 'অমৃত'ই একমাত্র সম্ভাবনাপূর্ণ লেখক-লেখিকার অনুপ্রেরণা দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক ঃ "অন্তরাগ"
বেগাই (হুগলী)

সেকালের সংগীতগুণী

'অমৃতের 'সেকালের সংগীতগুণী' আমার কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। লেখক শ্রীমুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ এর অমৃতে সেকালের সংগীতগুণী হিসাবে অনাথনাথ বসুর কথা আছে। রচনাটি মূল্যবান। প্রতিটি ঘটনার মধ্য দিয়ে শিল্পীকে প্রকাশ করার চেষ্টার মধ্যেই লেখকের কৃতিত্ব নিহিত আছে। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ এর অমৃতে 'সেকালের সংগীত গুণী'র মোজাম্মিদনের উত্তরসূরী প্রসঙ্গে অনাথনাথ বসু সম্বন্ধে যা আলোচিত হয়েছে তা আবার এখানে থাকলে ভাল হত। কেননা একটি রচনার মধ্যে একজন সম্পর্কে যত বেশি কথা জানা যায় ততই ভাল। তাছাড়া এ রচনায় অনাথবাবুর গুরু, শিষ্য, গ্রামোফোন রেকর্ড বা শিল্পী হিসাবে কলকাতা জীবন প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত। রচনার শেষে আছে '...তাঁর গৌরবের নানা কথা আছে।' অনাথবাবুর সেইসব গৌরবের কথা, গুরু, শিষ্য কলকাতা জীবন প্রসঙ্গ নিয়ে আরও কয়েকটি রচনা অমৃতে দেখতে পাব আশা রাখি। পৃঃ, ৪৭ (২০।১২।৭৪ অমৃতে) শেষের দিকে 'তবলচী তেমনি...। ইনি ঠুংরী জানেন না।' ৪৮ পৃঃ প্রথমদিকে 'তিনি শুধু ঠুংরীর তারিফই করে গেলেন। আসরের পর আসর।' মনে হতে পারে একজন অজ্ঞ লোকের কাছ থেকে এ তারিফ পেলেন অনাথনাথ বসু। কিন্তু তা ত' নয়। সুতরাং এ জায়গাটা একটু বিস্তৃত ও পরিষ্কার হলে ভাল হত।

সুধা সরকার,
কলকাতা—৯।

হিন্দী ও অন্যান্য ভাষা প্রসঙ্গে

৩৮ সংখ্যক অমৃতে উক্ত শিরোনামাঙ্কিত সম্পাদকীয় নিবন্ধটির জন্যে সম্পাদক মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ।

নাগপুরের সাম্প্রতিক বিশ্বহিন্দী সম্মেলন হিন্দীপ্রেমবিলাসিতারই এক উৎকট নমুনা। আজ একথা সর্বজনবিদিত যে ভাষা কমিশনের বিশিষ্ট সদস্যদের মতামত মাড়িয়ে, এমন কি মহাত্মা গান্ধীর স্বগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে রোলার চালিয়েও সরকার-পুষ্ট ব্যক্তিরা একমাত্র হিন্দীকেই ভারতীয় সরকারী ভাষা করেছে। হিন্দী কি ভারতের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা? অথবা সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যে একক গরীয়সী? কোনোটাই নয়। ভারতে যে ১৪ কোটি হিন্দীভাষীর সংখ্যা পাই তার মধ্যে খাঁটি হিন্দীভাষীর সংখ্যা হোল মাত্র ১ কোটি ৫০ লাখ; ২ কোটি ৫০ লাখ লোক ব্রজভাষী ও কনোজী-ভাষী; ৪ কোটি ৮৮ লাখ লোকের ভাষা পাঞ্জাবী, মারবাড়ী, মালবী, গাড়োয়ালী, অবধী, ছত্রিশগড়ী এবং বাদবাকি রাজস্থানী, মৈথিলী, উর্দু, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি। অন্যদিকে বাংলা ভারতের এক ষষ্ঠাংশ লোকের প্রায় ১০ কোটি মানুষের ভাষা তথা মাতৃভাষা। অন্তর ঐশ্বর্যে বাংলা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে গরিষ্ঠ। বিশ্বে যার স্থান সপ্তম। তবু বাংলা বিশ্বসম্মেলন হয় না; হয় না ইংরেজী, কিংবা চীনা বা রুশ ভাষার বিশ্বসম্মেলন। তাহলে দেখা যাচ্ছে হিন্দী মানে বত্রিশভাজা; এর মধ্যে খড়িবুলি, পড়িবুলি, মৈথিলী, ভোজপুরী, রাজস্থানী, উর্দু—সবই আছে। আর এই জগাখিচুরি ভাষার জন্যে ভারত সরকার জলের মতো টাকা খরচ করছেন। এক তরফা এই সরকারী তদারকের দরুণ একশ্রেণীর সুবিধাবাদী দলের হয়েছে পোয়াবারো; তারা হিন্দীর দৌলতে দুপকেট ভারী করেছে; চাকরী-বাকরী, খেতাব, মানসম্মান কুড়িয়েছে, আতা হ্যায়-যাতা হ্যায় শিখে সরকারী বাহবা কুড়িয়েছে এবং এ-হেন হিন্দীর তল্পিটে তাদের বেলায় হয়েছে সাত খুন মাপ। হিন্দীপন্থার এই অবাঞ্ছিত প্রতিপত্তি ও পক্ষপাতিত্বের জন্যেই দক্ষিণ ভারতে লঙ্কা-কাণ্ড হয়ে গেল। এবং আজো যেখানে ভারতীয় ভাষা সমস্যা মৌরসী পাট্টায় বিরাজমান, আজো যেখানে মারাঠী-কানাড়ী, বাংলা-অসমীয়া, হিন্দী-উর্দু ভাষার পারস্পরিক বিরোধের বিষবাষ্প ধূম্রায়িত রয়েছে সেখানে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নির্লজ্জের মতো হিন্দীর বিশ্বজনীনত্ব দাবি ও প্রচার সত্যি ন্যক্কারজনক। ইন্দিরা গান্ধী হিন্দীকে জোর করে কারো গলায় ঢোকানো হবে না বলেছেন। কথাটা তো তা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতীয় সমস্ত ভাষা ছেড়ে হিন্দীর বিশেষ সুযোগসুবিধা কেন?

সমস্ত ভাষার প্রতি সমান শ্রদ্ধা রেখে আমরা ভারত সরকারের কাছে সবিনয় নিবেদন করতে চাই—ভারতের ভাষা সমস্যার প্রকৃত সমাধান না করে এক একটা মওকা নিয়ে হিন্দীপ্রচার অভিযান চালালে এবং কেবল-হিন্দীর পক্ষে প্রচার করে বেড়ালে কোনোদিনই ভারতের জাতীয় ঐক্য আসবে না। যেসব আমলারা মুখোস পরে ভাষার আগুন নিয়ে খেলা করেন তাঁরাই ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের রক্তবীজ। এই রক্তবীজের বংশধরদের গতিরোধ না করলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্য সুদূরপরাহত।

জীবন নাথ
নওগাঁ কলেজ, আসাম।

উপন্যাস

ফেরিঘাট

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তাঁর কথায় প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাঁকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে ইদানীং।

তাই নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জজিয়তি করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

অথচ ঐ মানুষটাই তাকে বিপ্লবীদের কত গল্প শুনিয়েছে। শুনতে শুনতে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে তার দেরী হয়ে গিয়েছিল।

আর সে-জন্যে দাদুর কি বকুনি। সেই রাগে রাত্রে রঞ্জু খায় নি।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা টিঁকল না রঞ্জুর। খেতেই হোল। তার কারণ যুঁইদি। কেষ্টনগর থেকে এ বাড়িতে পৌঁছেই সে এসে আদর-টাদর করে দরজা খুলিয়ে কলঘরে নিয়ে গিয়ে মুখ ধুইয়ে আনলো। ভাত খেতে বসেও যুঁইদি তাকে নিয়ে ব্যস্ত রইল। তার কারণও অবশ্য রঞ্জুর অজানা নয়!

বস্তুত তার ওপর যুঁইদির যে বিশেষ একটা আকর্ষণ আছে, সেটা রঞ্জু বোঝে। তার আরো একটা প্রমাণ দিল যুঁইদি কেষ্টনগরে ফিরে যাবার আগে। রঞ্জুকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য দাদুর অনুমতি চাইল।

আর আশ্চর্য, অনায়াসেই, অনুমতি পেয়েও গেল।

(ষোল)

—এই রঞ্জু!

চমকে উঠল সে। এক সঙ্গে তিন-চারটে গলা। কাগজের ব্যাগ দুটো সে বগলে রাখতে যাচ্ছিল। রাখা হল না। হাতে ঝুলতে লাগল। অজন্তা স্টোর্সের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক ঘাড় ফেরায় সে। কাউকে দেখছে না তো।

—এদিকে এদিকে! আবার তিন-চারটে গলা চেঁচিয়ে ওঠে।

এবার রঞ্জু দেখতে পায়। ফুটপাথের উল্টো দিকে বাঁ কোণাকুণি তার চোখটা ঘুরে গেছে। মিলনীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। অমিত শোভেন পার্থ। সোমেনকেও দেখা যাচ্ছে। সোমেন তা হলে দার্জিলিং থেকে ফিরেছে। ওরা বাড়ীসুদ্ধ দার্জিলিং ঘুরতে গিয়েছিল।

অজন্তার সিঁড়ি থেকে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে রঞ্জু রাস্তাটা ক্রশ করল। মিনি বাসটা প্রায় তার গা ঘেঁষে চলে গেল। আর একটু হলে চাপা পড়ছিল আর কি! অন্যদিন এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে মুখে উঠে আসত। ভয় পেয়ে ঘেমে উঠত।

আজ যেন সে এটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। রোদ ফুরফুর করছে। সেই সকাল থেকে। হাওয়ায় পাখা মেলে দেওয়া প্রজাপতির মতন সে উড়ছে ঘুরছে। যুঁইদির জন্য পাঁচটা স্টেশনারী দোকানেই তাকে ঢুঁ মারতে হয়েছে। এখন অজন্তায় এসে যুঁইদির মনের মতন মাথার তেলটা পাওয়া গেল যা-হোক। বাস—কী নাক, এই হেয়ার অয়েলে চলবে না ওই হেয়ার-অয়েল বাজে বাস্তর মেয়েরা মাখে। যেন কত বাস্ত ঘুরে এসেছেন যুঁইরানী। রঞ্জু মনে মনে হাসছিল। অঢেল পয়সা কিনা। তাই এটা নিয়ে ওটা নিয়ে খুঁতখুঁতানির আর শেষ নেই। সামান্য একটা পাউডার পাফ-এর জন্য তিনবার রঞ্জুকে দোকানে ছুটে আসতে হয়েছে। অবশ্য কাল যুঁইদি নিজেও রঞ্জুকে নিয়ে মার্কেটিং করতে বেরিয়েছিল। বাকী কটা জিনিস আজ রঞ্জু কিনছে। তবে এ-পাড়ার কিছু যেন পছন্দই হয় না যুঁইদির।

এবং রঞ্জু জানে আজ যা যা কিনে নিয়ে যাচ্ছে পনেরো দিন পরে সব যুঁইদি ফেলে দেবে। আর ব্যবহার করতে ভাল লাগবে না। অর্থাৎ পুরোনো হয়ে গেল। হেয়ার-অয়েল সাবান ক্রিম সেন্ট লিপস্টিক রুজ—নিত্যনতুন ব্র্যান্ড চাই। আর টাটকা টাটকা বাকস থেকে শিশি থেকে ঢালা হবে খোলা হবে—তবে না মেজাজ ঠিক থাকবে। কথাগুলি বলে খিল খিল করে হাসে যুঁইদি। তাই রঞ্জু ভাবে পয়সা থাকলেই মেজাজ ফলান যায়। রঞ্জুরা ফলাতে পারছে? কি দিয়ে মেজাজ ফলাবে! একটা হেয়ার-অয়েল কিনলে মা-কে পাক্কা দেড় মাস টেনে নিয়ে যেতে হয়। ওই থেকে টুটুনও মাঝে মাঝে ভাগ বসাচ্ছে। দামী সাবান তো বাড়ীতে আসেই না। মাসের বরাদ্দ দু পীস লাইফ-বয়। ওই দিয়ে বাথরুমের কাজ ও গায়ে মাখার কাজ সারতে হয়। টুটুন একটা স্যাম্পু পায় স্কুলে যায় বলে। আর এক ডিবি পাউডার। ব্যস। কসমেটিক বলতে বঙ্কিম দত্তর বাজেটে আর কিছু রাখা হয় না। স্বামীদের রোজগার-পত্র না থাকলে মেয়েদের যা দশা হয়। রঞ্জুর মা অনেক দিন আগে ঠোঁট মুখ নখ রঙ করা ছেড়ে দিয়েছে। বয়স? মা-র চেয়ে ডবল বয়সের গিন্নীরাও আজকাল যেমন সেজেগুজে রাস্তায় বেরোয় না, দেখলে তাক লাগে। তবে যুঁইয়ের কথা আলাদা। রানীর চেয়েও সুখে আছে ওই মানুষ। পরশু সারাটা দিন রঞ্জুকে নিয়ে শাড়ির দোকানে ঘুরেছে। ওপর থেকে দেখতে গেলে শাড়ি আর কসমেটিক কিনতেই ওর ঘন ঘন কলকাতা আসা। তবে রঞ্জুর জন্য আসছে, রঞ্জুকে দেখতে আসছে এটা খুবই চাপা ব্যাপার। রঞ্জু নিজে আর যুঁইদি ছাড়া এ-জিনিস পৃথিবীতে কারো টের পাবার কথা নয়। চাপা বলেই তো জিনিসটার মধ্যে এত সুখ।

কিন্তু আজ ওরা এই রেস্তোরাঁয় কেন? মিলনীতে কেন! রঞ্জু মনে মনে অবাক হয় শোভেনদের এখানে দেখে। ওদের ফেবারিট চায়ের দোকান হল। ট্রাইয়াংগুলোর পার্কের কাছের 'পিকনিক'। নতুন খুলেছে। লোকটাও খুব ভালো কেয়ার

চা বা কফি নিয়ে অনেকক্ষণ বসে আড্ডা দিলেও বিশেষ কিছু বলে না। মানে এখনও বলছে না। দোকান পুরোনো হয়ে গেলে খদ্দেরের ভিড় বাড়লে কি হবে বলা অবশ্য শক্ত। যেমন এই 'মিলনী'। মাস ছ-সাত আগে যখন নতুন খোলা হয় একটা খদ্দেরের মুখ দেখত না। সারা দিন খোলা মাঠের মতন গুম্‌-ধুম্‌ করত ভিতরটা। আর তখন রঞ্জুদেরও সবে একজামিন শেষ হয়েছে। ওরা চার-পাঁচজন বন্ধু ছাড়া যেন ওই চায়ের দোকানের আর খদ্দেরই ছিল না। খুব আড্ডা দিত রঞ্জুরা সকাল থেকে বেলা দশটা-এগারোটা। কোনদিন বিকেলে। তখন বাড়ীতেও কিছু বলার ছিল না। কারো গার্জেন কাউকে কিছু বলত না। পরীক্ষা শেষ হয়েছে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছেলেরা এখন একটু বেড়াবে-টেড়াবে আড্ডা দেবে খুব স্বাভাবিক। বাড়ীর লোক জিনিসটা ভাল চোখেই দেখত। এতদিন দেখছিল।

ব্যাস পরীক্ষা দিয়েছে তো দিয়েছে—রেজাল্ট বেরোতে যে ছ মাস লেগে যাবে কে জানত। যত দিন যাচ্ছে গার্জেনরাও অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। সবার কাউকে বাড়ীতে ভাল চোখে আর দেখতে পারছে না যেন।

যেন রেজাল্ট বেরোচ্ছে না, দোষটা ছেলেদের।

কাজেই এলেবেলে আড্ডা মারা ও বাইরে ঘোরাঘুরি বাড়ীর লোক আর মোটেই পছন্দ করছে না। সহ্য করছে না।

তা না করলেও রঞ্জু তো চোখের ওপর দেখে তার দাদুর মতন একটি গার্ডিয়ানও না। শোভেন অমিত পার্থ সোমেন যেমন বলে—বাড়ীতে তাদেরও এখন কড়াকাড় চলছে। তা বলে বাড়ী থেকে বেরোলেই ঘাড় ধরে ঘরে ফিরতে হবে। সন্ধ্যের পর বেরোন চলবে না। দুপুরে বেরোন নিষেধ সিনেমা দেখা বন্ধ, দোকানে বসে চা খাওয়া বন্ধ—এতটা পাগলামি তাদের কাকা জেঠা দাদু কি বাবারা করে না। তারা ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ে না এখন। বেশী আড্ডা-টাড্ডা না দিতে দু-একবার বলে, এই পর্যন্ত। তা বলে বাড়ী থেকে বেরোলেই রঞ্জুর মতন তাদের পিছনে চাকর দারোয়ান পাঠিয়ে বাড়ীর লোক গোয়েন্দাগিরি ফলাবে, এ স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

অম্বুজা-নিলয়ের ঐ খচ্চর বুড়োকে যে রঞ্জু শেষ পর্যন্ত কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না। ওফ্—

—কি রে খুব যেন একটা ফিলসফারের গতন ভাবছিস আর হাঁটছিস!

—না তো! ফিক করে হেসে রঞ্জু চায়ের দোকানের দরজায় দাঁড়াল। শোভেনের কাঁধের ওপর বাঁ-হাতটা তুলে দিল সে।

—না বলছিস কি অমিত মাথা ঝাঁকাল, সবাই মিলে বার বার তোকে গলা ফাটিয়ে ডেকেছি। দেখছিলাম তোর যেন হুঁশ নেই। আকাশের দিকে চোখ রেখে ভাবছিলি।

—মাইরি! ট্রাম বাসের যা শব্দ! অমিতের চোখে চোখ রেখে রঞ্জু অল্প হাসল। শুনি নি। একদম শুনতে পাই নি রে।

—ভেতরে আয়, শোভেন বলল, হাতে এসব কি!

—কসমেটিক।

—কার?

—দিদির ননদের।

—ওই যে কেন্টনগর থেকে আসেন মহিলা?

রঞ্জু ঘাড় নাড়ল।

—মহিলা খুব ঘন ঘন তোদের বাড়ী আসছে, ব্যাপার কি? অমিত চট করে বলে ফেলল।

—ঘন ঘন! ভুরু কুঁচকে রঞ্জু অমিতের মুখটা দেখল। তারপর মাথা নাড়ল। না তো ঘন ঘন তুই দেখলি কবে?

—আমি তোর সবচেয়ে কাছের নেভার। ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস দিয়ে একবার-দুবার...আমাকে যেতেই হবে। তোদের দোতলার ব্যালকনিতে কি জানালায় বা দরজায় মহিলার মুখটা আমি প্রায়ই দেখি বলে বলছি। আমি কি বানিয়ে কিছু বলছি। কি দরকার বানিয়ে বলার। কি বলিস শোভেন?

—থাক এই নিয়ে এখন তক্ক তরে লাভ নেই। সকলের আগে শোভেন, তারপর রঞ্জু, এবং তাদের দুজনের পিছনে অমিত ও সোমেন দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়ল। একটা টেবিল নিয়ে যেন তারা আগেই বসেছিল। রঞ্জু দেখল এখন চারটে চেয়ার খালি পড়ে আছে। একটা চেয়ারে পার্থ একা বসে আছে। পার্থকে দারুণ গম্ভীর দেখাচ্ছে। টেবিলে চারটে চায়ের কাপ। একটা যেন খালি সিগারেটের প্যাকেটও পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। শোভেন আঙুল দিয়ে দেখাতে রঞ্জু একটা চেয়ারে বসল। শোভেন অমিত ও সোমেন বাকী তিনটা চেয়ার দখল করল।

—তোরা তা হলে অনেকক্ষণ এখানে আছিস, কাগজের ব্যাগ দুটো রঞ্জু টেবিলে নামিয়ে না রেখে নিজের কোলের ওপর রাখল। রেখে অল্প হেসে শোভেনকে প্রশ্ন করল।

—আমরা সেই সকাল ন'টা থেকে এখানে বসে গেজাচ্ছি। শোভেন বলল হঠাৎ দেখলাম তুই অজান্তায় ঢুকছিস। তাই তো সবকে মিলে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালাম।

—এত সময় কী কেনাকাটা করছিলি অজান্তায়? অমিত প্রশ্ন করল।

ঐ যে মেয়েদের সব ছাইভস্ম জিনিস—রুজ ক্রিম পাউডার লিপস্টিক। কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্য দেখাতে রঞ্জু ঠোঁট বাঁকাল।

সোমেন ও শোভেন এক সঙ্গে হাসল।

—ছাইভস্ম বলছিস কিরে। সোমেন শেষ পর্যন্ত আর হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, ভাত না খেয়ে ওরা থাকতে পারে—রুজ ক্রিম লিপস্টিক ছাড়া ওদের এক দণ্ড চলে না।

—কেন কেন্টনগরে এসব পাওয়া যায় না বুঝি? চিপ্পনি কাটার মতন করে অমিত বলল।

রঞ্জু ক্রমশ তার ওপর চটে যায়। যদিও সেটা প্রকাশ করতে পারে না। অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে চুপ করে থাকে।

শোভেন ব্যাপারটা বোঝে। যেন রঞ্জুর হয়ে এই মুহূর্তে কিছু বলার দরকার। অমিতের দিকে চোখ রেখে সে ভুরু কুঁচকাল। —কেন্টনগরে সব কিছু পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও তেমন ফ্রেশ জিনিস যে পাওয়া যাবে না এটা ঠিক। ছোট জায়গা। হয়তো পুরোনো মালটাল রাখে। কাজেই কলকাতায় যখন উনি আসেন দরকার মতন সব কিনেকেটে নিয়ে যান।

সোমেন বলল,—তা ছাড়া কেন্টনগরে হয়তো একটা ক্রিমের জন্য কি একটা নেল-পালিসের জন্য ওরা গলাকাটা দাম হাঁকে। যে জন্য রঞ্জুর দিদির ননদ এখান থেকে নিয়ে যান। —কেমন, আমি ঠিক বলিনি রঞ্জু?

রঞ্জু অস্পষ্ট করে ঘাড়টা কাত করল।

—হ্যাঁ অমিত মাথা ঝাঁকাল। সেই হিসেবে কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যাওয়া ঢের ভাল। অনেক পয়সা বাঁচে। আর ফ্রেশ জিনিসটা পাওয়া যায়।

—তুই থাম তো অমিত। খুব বেশী বক বক করিস। শোভেন ধমক লাগায়। রঞ্জু চা খাবি?

—খেতে পারি।

—এই! শোভেন হাত তুলে দোকানের ছেলেটাকে ডাকল। এখানে এক কাপ চা।

ঘাড় নেড়ে ছেলেটা চা আনতে ছুটল।

—রঞ্জু তোর কাছে সিগারেট আছে?

—আছে। নেই বলতে পারল না রঞ্জু। পাঁচটা প্লেন উইলস আজ কিনেছে সে। অজন্তায় ঢোকার সময় একটা ধরিয়েছিল। নিশ্চয় শোভেনরা দেখতে পেয়েছে। কাজেই এখন আর এদের কাছে লুকোন চলে না জিনিসটা। আস্তে আস্তে পকেট থেকে প্যাকেটটা সে বের করল।

—গুড! প্রায় ছোঁ মেরে শোভেন প্যাকেটটা তুলে নিয়ে চারটে সিগারেটই বের করল। একটা নিজের ঠোঁটে গুঁজল একটা সোমেনকে দিল। একটা পার্থকে একটা অমিতকে। —তোর কিন্তু আর একটাও থাকছে না রঞ্জু।

—থাক, আমি এই মাত্তর খেয়েছি।

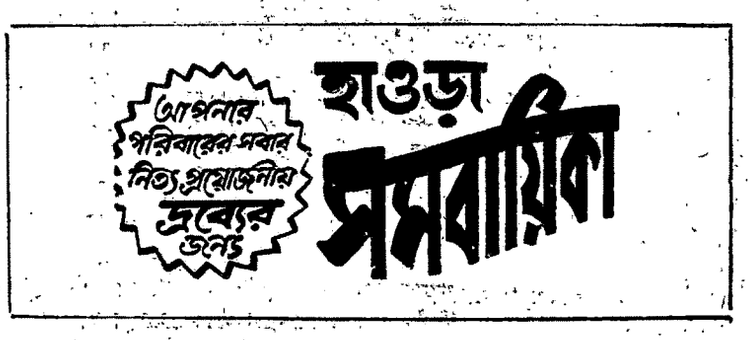

—তবু যা হোক রঞ্জু আজ আমাদের সবাইকে উইলস খাওয়াচ্ছে।

শোভেনের হাত থেকে লাইটারটা নিয়ে অমিত সিগারেট ধরায়, তারপর সোমেনের দিকে লাইটারটা ঠেলে দেয়।

অমিতের কথাটার মধ্যে একটা খোঁচা আছে। যদিও সত্য কথা। রঞ্জুকে ওরা কদিনই সিগারেট খাইয়েছে। রঞ্জু আজ প্রথম ওদের খাওয়াচ্ছে। তা হলেও মুখের ওপর অমিত কথাটা বলবে রঞ্জু আশা করে নি। মুখটা ঘুরিয়ে সে রাস্তার দিকে তাকায়। প্রথম থেকেই অমিতকে আজ তার খারাপ লাগছে।

—চা এসে গেছে। রঞ্জু চা খা।

শোভেনের কথায় রঞ্জু আবার টেবিলের দিকে ঘুরে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে অমিত কেমন করে যেন কাশল। যেন গলায় ধোঁয়াটা হঠাৎ আটকে গেছে।

—কি হল! সোমেন ভুরু কুঁচকাল। তার ঠোঁটে একটা চাপা হাসি।

—কিছু না। অমিত মাথা ঝাঁকায়। তারপর সোজা হয়ে বসে। তারপর আড়-চোখে রঞ্জুকে দেখে। রঞ্জু তার দিকে মোটেই তাকাচ্ছে না। —রঞ্জু আমার ওপর রাগ করছিস? গলার স্বরটা নরম করে অমিত জিজ্ঞেস করল।

—কেন রাগ করব কেন। চায়ের কাপ থেকে রঞ্জু ঝপ করে মুখটা তুলল।

—না, ঐ যে বললাম তোর দিদির ননদ ঘন ঘন তোদের বাড়ী আসে—বলতে তুই এমন চোখ মুখের চেহারা করলি না—

—ঘন ঘন উনি আসেন না বলেই এমন চেহারা করেছিলাম। মুখটা লাল করে রঞ্জু উত্তর করল। তার কপালের একটা শিরা ফুলে উঠল।

—অকটোবর পড়তে উনি আবার এলেন কিনা, সেপ্টেম্বরেও দুবার এসেছিলেন। অমিত বলল।

—না। রঞ্জুর উত্তেজনা বাড়ছিল। জোরে মাথা ঝাঁকাল সে। সেপ্টেম্বরে উনি মোটে একবার এসেছিলেন।

—কি মুস্কিল, স্পষ্ট দেখলাম তাদের ব্যালকনিতে ওঁকে দু দিন দাঁড়ান। তবে কি আমার চোখের ভুল!

—হয়তো। চা শেষ করে রঞ্জু ঠকাস শব্দ করে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল।

—ইস, কী বাজে জিনিস নিয়ে তোদের ঝগড়া! যেন এই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করবি দুজনে! অমিত—শোভেন ডাকল।

—আমি চললাম। রঞ্জু উঠে দাঁড়ায়।

—উঁহু, তোর সঙ্গে কথা আছে। সিরিয়াস টক। রঞ্জুর হাত ধরে শোভেন টেনে বসায়। অমিত! শোভেন অমিতের দিকে কড়া চোখে তাকায়।

অমিত তার দিকে তাকায় না। সিগা-রেটটা জোরে জোরে টানে আর কটমট করে রঞ্জুকে দেখে।

—তোর কিন্তু সাড়ে দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ার কথা ছিল অমিত। শোভেন হাতঘড়ি দেখল। এখন এগারোটা বাজে।

—হুঁ, যাচ্ছি, যাব কথা দিয়েছি যখন। জোরে আর একটা টান দিয়ে অমিত হাতের সিগারেটটা শেষ করল। তারপর আঙুলের টোকা দিয়ে রাস্তার দিকে গুঁড়িটা ছুঁড়ে দিল।

—এই করিস কি? সোমেন প্রায় আঁতকে ওঠে। কারো গায়েটায়ে পড়ত।

অমিত শব্দ করে না। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। যেন রঞ্জুর ওপর রাগটা কমছে না। পকেট থেকে চিরুনি বের করে ব্রস্ত হাতে মাথা আঁচড়ায়। অমিতের মাথার চুলই সবচেয়ে বড়। এবং চুলের গোছাও ভাল। দু পাশে কানের কাছে আঙুরের ছড়ার মতন থোকা থোকা চুল ঝুলছে। আড়চোখে এক-বার সেদিকে তাকিয়ে রঞ্জু তখনি আবার মুখটা ঘুরিয়ে নেয় ও একটা চোরা দীর্ঘ-

পরের সংখ্যায়
সুশীল রায়ের গল্প

শ্বাস ফেলে। কাল সে চুল কেটেছে। যুঁই-দির কথায় কাটতে হয়েছিল চুল ছোট বড়তে কি এসে যায় অবিশ্যি আজকাল ছেলেরা বড় চুল রাখছে ফ্যাশান। মার্কেটিং করতে বেরিয়ে যুঁই কাল রঞ্জুকে বুঝিয়ে-ছিল, তা হলেও তোমার বাড়ীর লোক বিশেষ করে বুড়োটা যখন চাইছে চুলটা কেটে ফেল তবু যদি ওরা সবাই ঠান্ডা থাকে খুশী থাকে তোমার চুল চলে যাচ্ছে, কিন্তু তার বদলে অনেক বড় জিনিস ভাল জিনিস তুমি পেয়ে যাচ্ছ মনে রাখবে।—বলে যুঁই ট্যাকসিতে বসে রঞ্জুর কাঁধে হাত রেখে দুষ্টু মেয়ের মত মিটিমিটি হাসছিল। যুঁইয়ের হাসির অর্থ রঞ্জু বুঝেছিল। চৌরঙ্গীর একটা বড় চুল কাটার সেলুনে যুঁই তাকে নিয়ে যায় এবং নিজে বসে থেকে রঞ্জুর চুল ছাঁটিয়ে আনে।

হুঁ, চুলের বদলে অনেক ভাল জিনিস, বড় জিনিস পাচ্ছে সে। যুঁইদির সঙ্গে কেন্টনগরে বেড়াতে যাওয়া যে কী জিনিস! কথাটা যত সে ভাবছিল খুশীতে উগমগ হচ্ছিল। সেলুন থেকে বেরিয়ে আসার পর চুলের শোক তার একদম ছিল না।

আজ হঠাৎ অমিতের মাথাটা দেখে তার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগল। যেন চুলের জন্য শোকটা উথলে উঠল। অবশ্য এক সেকেণ্ডের জন্য। পরক্ষণে শোকটা আর রইল না। যুঁইদির মুখ মনে পড়ল।

রঞ্জু দেখল প্যান্টের পকেটে চিরুনিটা রাখতে অমিত উঠে দাঁড়িয়েছে। অথবা এমনিও যেন সে উঠে দাঁড়াত।

—চললাম। শোভেনের দিকে অমিত আর তাকাল না। রঞ্জুর দিকেও না। সোমেন—চ। সোমেনের কাঁধে আঙুলের টোক্কা মারল অমিত।

—হুঁ, চ। সোমেন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। সোমেনের সঙ্গে অমিতের বন্ধুত্বটা বেশি। এখানে পাঁচজনের সবাই সবায়ের বন্ধু। তাহলেও এর মধ্যে যেন ডিগ্রীর বেশকম আছে। যেমন পার্থর সঙ্গে শোভেনের বন্ধুত্বটা অন্য সকলের চেয়ে বেশি। চোখে পড়ার মতন। আবার রঞ্জুর সঙ্গেও শোভেনের মাখামাখিটা খুবই গাঢ়। যেটা অমিত বা সোমেনের সঙ্গে নেই।

—পাঁচটা টিকিট মনে থাকে যেন। থুতনি তুলে অমিতের মুখের দিকে তাকাল শোভেন।

—পাঁচটা জোগাড় করা যাবে কিনা বলতে পারি না। তবে চারটে সিওর। পল্টুমামার বন্ধুকে আমি চারখানা টিকিটের কথাই কাল বলে এসেছিলাম।

—কিন্তু আবার পাঁচজন হয়ে গেলাম যে আমরা। শোভেন ধেড়েধেড়িয়ে উঠল।

—সে আমি করব কি। চ সোমেন! সোমেনের কাঁধ ধরে অমিত দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

শোভেন দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল।

—খেলার টিকিট! রঞ্জুর গলার স্বর এবার অনেক সহজ শোনায়। শোভেনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে।

—হুঁ, শোভেন মাথা ঝাঁকাল। নান্টুদা

তো শেষ পর্যন্ত টিকিট দিলেন না। হাটাহাটি সার হল।

—অমিতের পল্টুমামার সঙ্গে মোহন-বাগানের কারো জানাশোনা আছে বুঝি?

—তাই তো বলছে ও। তবে অমিতের কথার মধ্যে পার্সেন্টেজ থাকে তোরা জানিস। রঞ্জুর চোখে চোখ রেখে শোভেন সামান্য হাসল। পার্থর দিকেও একবার তাকাল সে। পার্থ সেই যে চুপ করে বসে আছে, এখনও এক অবস্থা। এর মধ্যে একটা কথাও বলেনি সে। রঞ্জু লক্ষ্য করল পার্থর দু' আঙুলের ফাঁকে উইলস প্লেনটা তেমনি গোঁজা আছে। ধরায়নি। পার্থকে এত গম্ভীর এতটা অন্যমনস্ক দেখে রঞ্জুর কেমন খটকা লাগল। তবে তার দিকে খুব একটা মন দিতে পারছে না সে। শোভেনের কথা শুনছিল।

—বুঝলি শোভেন বলল পরশু নাকি অমিতের পল্টুমামা বলেছে তার এক বন্ধু কালীঘাট থাকে। সেই বন্ধুর বাবা এককালে মোহনবাগান ক্লাবের নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবের ওপর এখানে নাকি খুব ইনফ্লুয়েন্স রাখেন। চাইলেই বড় বড় ম্যাচ খেলার টিকিট পান। যখনো খুশি। আশীর ওপর বয়স হয়েছে। বছর দু-তিন আগে কি একটা সাপ্তাহিক কাগজে লাইফস্কেচ বেরিয়েছিল বুড়োর। সঙ্গে ফটো ছাপা হয়েছিল।

—তারপর? শোভেনের দিকে চোখ রেখে রঞ্জু বড় করে একটা ঢোক গিলল। টিকিট দেবেন ভদ্রলোক?

—অমিত তো বলছে দেবেন। কাল সকালে কালীঘাট গিয়েছিল সে। আজ নাকি সকাল দশটায় দেখা করতে বলেছেন।

একটু চুপ থেকে রঞ্জু মাথা দোলাল।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হ'লে
হ্যামেসা
মলম
ব্যবহার করুন!

কোল থেকে তুলে কাগজের ব্যাগদুটো টেবিলে রাখল।

—আমার মনে হয় না শেষ পর্যন্ত অমিত টিকিট আদায় করতে পারবে। আদৌ তার পল্টুমামার এমন কোনো বন্ধু আছে কিনা, আর সেই বন্ধুর বাবা কোনোদিন মোহনবাগানের প্লেয়ার ছিলেন কিনা সেই সম্পর্কে আমার ডাউট আছে। অমিতের কথার মধ্যে ভীষণ নড়চড় থাকে।

—হুঁ, তাই তো। দেখা যাক। শোভেন আস্তে বলল। অমিতকে তো আমরা নতুন দেখছি না।

একটু চুপ থেকে রঞ্জু বলল মোট চারখানা টিকিট দেবেন ভদ্রলোক?

—পাঁচখানার কথাই আজ বলে দিলাম। কাল সকালে অবিশ্যি চারটে টিকিটের কথাই বলে এসেছিল অমিত। হঠাৎ কাল বিকালে ট্রেনে সোমে দার্জিলিং থেকে চলে এসে সব গোলমাল করে দিলে।

—ওদের তো ফিফ্‌টিনথ পর্যন্ত দার্জিলিং থাকার কথা ছিল, তাই না? রঞ্জু ভুরু কোঁচকাল।

—হুঁ, তাই জানতাম। একটু আগে সোমেন বলছিল ওর মা-র শরীর একদম ভাল যাচ্ছিল না দার্জিলিং-এর ঠাণ্ডা একেবারে সহ্য হচ্ছিল না।

আবার চুপ থেকে কি একটু ভেবে রঞ্জু মাথা ঝাঁকাল।—যাকগে যদি চারখানা টিকিট পায় অমিত তাতেও কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তোদের। আমি লীগের খেলা দেখতে যাব না।

—কেন মুখের গর্তটা গোল করে ফেলল শোভেন। না যাবার কার কি?

—অমিতের আনা টিকিট দিয়ে আমি খেলা দেখব না, মরে গেলেও না।

—হোপলেস। শোভেন হিসহিস করে উঠল। চটে গেলে শোভেন এমন একটা আওয়াজ বের করে মুখ দিয়ে। হাতের মুঠো দুটো শক্ত করে এক সেকেণ্ড রঞ্জুর মুখটা দেখল সে। তারপর আস্তে বলল একটা সাধারণ জিনিস নিয়ে কথা কাটাকাটি হল আর অমনি তুই রেগেমেগে খেলা দেখতে যাওয়া বন্ধ করে দিবি! টিকিট কি অমিত তার বাড়িতে তৈরি করছে না টাকা দিয়ে কিনছে? আর একজন দয়া করে দিচ্ছে—

কিন্তু রঞ্জু নীরব। আসলে সে যে কেন্টনগর চলে যাচ্ছে। হয়তো লীগের ফাইনাল খেলার দিন সে কলকাতায় ফিরবে না। যুঁইদি তাকে এত সকাল সকাল ছাড়বে না। কথাটা সে এখানে এদের কাছে বলতে পারছে না। বিশেষ করে যুঁইদিকে নিয়ে এইমাত্র অমিতের সঙ্গে তার একচোট হয়ে গেল। কাজেই চুপ থেকে এমন একটা ভান দেখাল সে এখন, যেন অমিতের ওপর রাগ করে তার খেলা দেখার ইচ্ছে চলে গেছে।

—থাক খেলার প্রসঙ্গ এখন ছাড় দিকিনি শোভেন। আগুনটা দে। পার্থ কথা বলল। পার্থ এই প্রথম কথা বলছে। লাইটারটা শোভেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

রঞ্জু দেখল সিগারেট ধরাতে গিয়ে পার্থর হাতটা কাঁপছে। ঘনঘন শ্বাস ফেলছে সে। যেন চুপচাপ এতক্ষণ বসে থাকলেও তার ভিতরে একটা চাপা উত্তেজনা লুকিয়ে ছিল। এখন সেটা প্রকাশ পাচ্ছে। সিগারেট ধরাবার পর শোভেনের হাতে লাইটারটা ফিরিয়ে দিল সে জোরে সিগারেটে কয়েকটা টান দিল তারপর নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে এতটা ধোঁয়া বের করে রঞ্জুর দিকে তাকাল।

—টিকিট আনতে পারুক না পারুক ও যে এখান থেকে কেটেছে এটাই বড় কথা।

—হ্যাঁ, তা-ও বটে। শোভেন ঘাড় নাড়ল। যেদিনই আমরা একটা জরুরী আলোচনা করতে চাইছি—ও যে কি করে এসে জোটে। আজ একেবারে সোমেনকে নিয়ে এখানে হাজির।

—ও কি জানত তোরা 'মিলনী'-তে ঢুকবি?

—না তো। রঞ্জুর দিকে চোখ রেখে শোভেন মাথা নাড়ল। পার্থ ও আমি সেই সকাল আটটায় এখানে এসে ঢুকেছিলাম।

—ও গন্ধে গন্ধে টের পায়। চোখ দুটো বড় করে পার্থ রঞ্জুর দিকে তাকাল।

—বুঝলি ওর বোনটা যে এমন সাংঘাতিক কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে—নিশ্চয় হাওয়ায় গন্ধ শুঁকে কিছুটা টের পাচ্ছে অমিত।

রঞ্জু কথা বলছিল না।

শোভেন বলল কাল টুবলি আর একটা লম্বা চিঠি ছেড়েছে পার্থকে।

—সত্যি! রঞ্জু চোখ বড় করল।

—হ্যাঁ লিখেছে, পার্থ যদি ওর কথায় রাজী না হয়তো সুইসাইড করবে ও।

—ইস্ কী বিচ্ছিরি। রঞ্জু ঠোঁট বেঁকাল। নাগের ডগা কোঁচকাল। তারপর?

—এই জন্য আজ ওকে আমি এখানে ডাকিয়েছি পার্থ বলল, সরাসরি ওকে জিজ্ঞেস করব ও কি সত্যি সিরিয়াস না ফাজলামো করে আমাকে এসব লিখছে।

—কোথায় ও! রঞ্জু চমকে উঠল।

—ওখানে। শোভেন আঙুল দিয়ে পাশের পর্দা-খাটান খুপরিটা দেখাল।

—কতক্ষণ এসেছে?

—অনেকক্ষণ। শোভেন বলল সোমেনকে নিয়ে অমিতটা এসে হুট করে ঢুকল তাই কিছু করা যাচ্ছিল না এতক্ষণ। অবিশ্যি বয়কে দিয়ে কেক পুডিং ডবল ডিমের অমলেট চা অনেক কিছু পার্থ পাঠিয়ে দিয়েছে ওই কামরায়, ছ' টাকার মতন বিল উঠেছে একলা টুবলির জন্য।

ফ্যালফ্যাল করে রঞ্জু যুঁইদির কসমেটিকে ঠাসা কাগজের প্যাকেট দুটো দেখতে লাগল।

শোভেন বলল, অমিত চলে গেছে এখন পার্থ ওখানে ঢুকে টুবলিকে কথাটা জিজ্ঞেস করবে। আমি ও তুই এখানে অপেক্ষা করব। দরকার হলে পার্থ আমাদের দুজনকে ভিতরে ডেকে নিয়ে যাবে। বুঝলি?

রঞ্জু অল্প করে ঘাড় নাড়ল।

(ক্রমশ)

মনশ্চক্ষুতে দর্শনের পরীক্ষায় য়ুরি গেলার। বিজ্ঞানীরা এক-একটি ছবি এঁকে খামে পুরেছে, য়ুরি গেলারের বৈদ্যুতিক আড়াল তোলা ঘরের মধ্যে থেকে এঁকে দেখিয়েছে খামের ভিতরের ছবিটি কী। এখানে বিজ্ঞানীদের আঁকা ছবি (টার্গেট) ও য়ুরি গেলারের দেখা প্রতিচ্ছবি (রেসপনস) উপস্থিত করা হয়েছে। এ, বি, সি, ডি— এই চারটি ছবি হাতে আঁকা ও খামে পুরে রাখা। ই, এফ— এই দুটি ছবি কম্পিউটরে ফুটিয়ে তোলা।

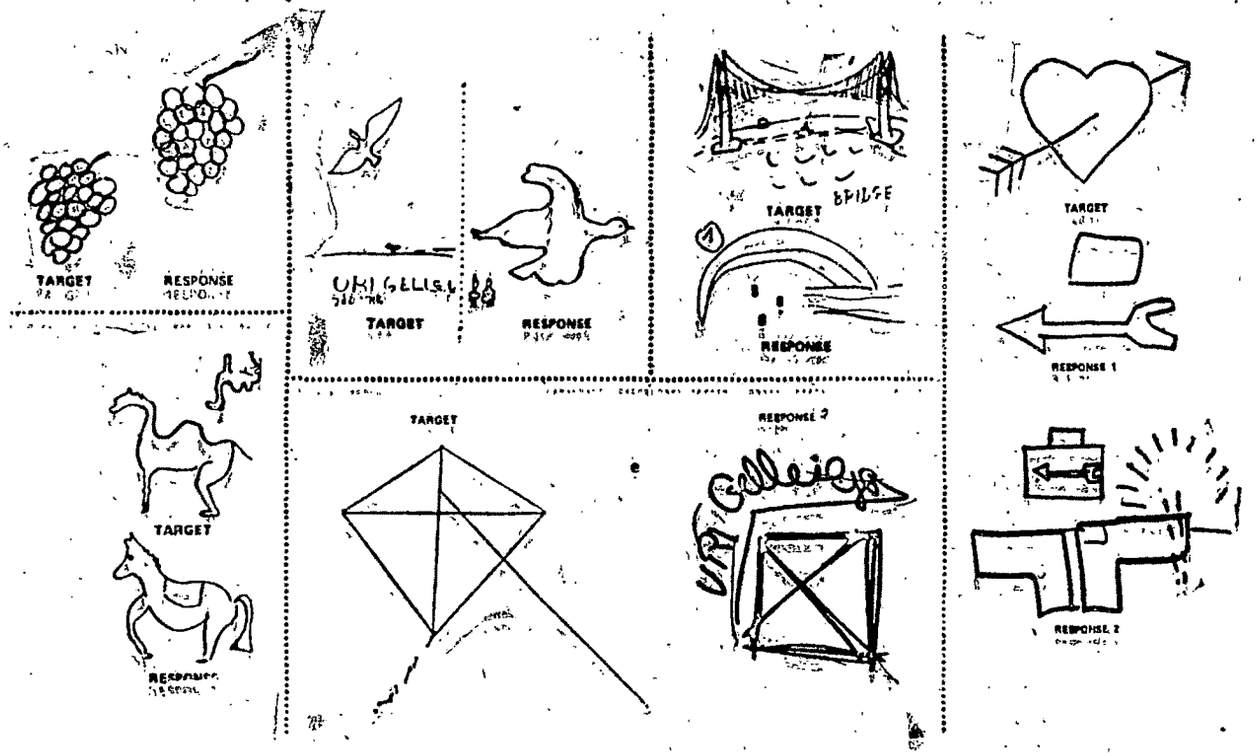

য়ুরি গেলার-এর কাহিনী

কিছুকাল আগে য়ুরি গেলার নামে একজন তরুণ ইজরাইলীর অভাবনীয় কীর্তিকারখানা দেখে খোদ আমেরিকার রোমহর্ষক কাণ্ড— যেমন করাত দিয়ে মানুষ কাটা) যাদুকররাও ঘটাতে পারে, কিন্তু তাঁরা কখনো দাবি করে না যে তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। গেলার সেই দাবি করল—সে নাকি 'সিদ্ধ' পুরুষ: ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়, মনশ্চক্ষুর সাহায্যে সে অবলোকন করতে পারে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'সাইকিক' অর্থাৎ মনঃক্ষমতাসম্পন্ন—সে তাই (আমাদের দেশে 'সিদ্ধ' পুরুষ)।

য়ুরি গেলারকে ইজরাইল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসেছিলেন একজন বিত্তবান বিজ্ঞানী—ডঃ আন্দ্রিয়া হেনরি পুনহারিয়। সেখানে তিনি গেলারকে উপস্থিত করালেন যাদুকর হিসেবে নয়, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন মনশ্চক্ষুর অধিকারী সিদ্ধ পুরুষ হিসেবে। গেলার দাবি করে: বন্ধ খামে রাখা ছবি সে এঁকে দিতে পারে, কাটা চামচকে স্পর্শ না করেও বেঁকাতে পারে বহু দূরের ঘটনার বিবরণ দিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছু কিছু করেও দেখাল সবার সামনে। আমেরিকার টেলিভিশনে নিয়ে ব্যাপক তদন্ত করেন ও বিস্তৃত রিপোর্ট উপস্থিত করেন। সম্প্রতি আমাদের দেশের 'সায়েন্স টুডে' পত্রিকার একটি সংখ্যাতেও য়ুরি গেলারের কাহিনী নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকার রিপোর্টের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। বাংলায় এখনো পর্যন্ত কোথাও লেখা হয়েছে চোখে পড়ে নি তাই আরো সংক্ষেপে য়ুরি গেলারের কাহিনী উপস্থিত করছি। আমাদের এই তুকতাকের দেশে য়ুরি গেলারের চেয়ে অনেক কম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিও আরো অনেক সামান্য কারবারখানা ফাটিয়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে প্রচারিত হয়ে থাকেন অতএব এই কাহিনী জানা দরকার।

তাঁদের পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশিত হল সুবিখ্যাত নেচার পত্রিকায়। প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হল, য়ুরি গেলারের ওপরে তিনটি পরীক্ষা কার্য চালাবার পর পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস হয়েছে, এমন একটা

কিছু ব্যাপার আছে যার সাহায্যে দূরের অবস্থান সম্পর্কে খবর পাওয়া যায় তবে অবলোকনের এই ক্ষমতার কোনো ব্যাখ্যা এখনো পর্যন্ত সম্ভব নয়।

প্রথম পরীক্ষায় গেলারকে রাখা হয়েছিল বিদ্যুতের আড়াল তোলা একটি কামরার ভিতরে। পরীক্ষাকার্যের কর্তারা দূরের কোনো জায়গায় বসে ছবি আঁকতেন গেলার তা একে দেখাত। বিদ্যুতের আড়াল তোলা কামরায় বাইরে থেকে সংকেত পাঠানো একেবারেই অসম্ভব ছিল। অর্থাৎ গেলার ছিল দর্শন ও শ্রবণ ও বৈদ্যুতিক সংকেত গ্রহণে সম্পূর্ণ অপারগ অবস্থায়। তাছাড়া গেলারকে জানানো হত না ছবি কে আঁকছেন। ছবি আঁকা হত এইভাবে : (১) একটি অভিধান যে-কোনো পৃষ্ঠায় খোলা তারপরে সেই পৃষ্ঠার প্রথম যে শব্দটি ছবিতে প্রকাশ করা সম্ভব সেই ছবি আঁকা। (২) একজন বাইরের লোকের আঁকা ছবি নেওয়া। (৩) জমানো ছবি থেকে একটি তুলে নেওয়া। (৪) বাইরের বিজ্ঞানীদের দ্বারা চালিত কম্পিউটরে ফুটে ওঠা ছবি নেওয়া।

এই ঢাব পদ্ধতিতে নেওয়া মোট তেরটি ছবি নিয়ে পরীক্ষাকার্য চলে। দুটি পরীক্ষাকার্যে গেলারকে নিয়ে আসা হয় বাইরে আর পর্যবেক্ষকরা বসেন বিদ্যুতের আড়াল তোলা কামরার মধ্যে। এই তেরটি ছবির মধ্যে দুটি ছবির বেলায় (যে দুটি বাইরের লোকের আঁকা) কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি।

অতঃপর এই দু-সেট ছবি (এক সেট পর্যবেক্ষকদের আঁকা ও অপর সেট গেলারের আঁকা) অন্য একদল বিজ্ঞানীর সামনে উপস্থিত করা হয়। দেখা গেল, তাঁরা যে-ভাবে দুই সেটের মধ্যে জোড় মেলালেন (অর্থাৎ প্রথম সেটের কোন্ ছবি থেকে দ্বিতীয় সেটের কোন ছবিটি আঁকা) তা নির্ভুল হল।

দ্বিতীয় পরীক্ষা কার্যের বিষয় ছিল অলোক দৃষ্টি বা মনশ্চক্ষুনে অবলোকন। ব্যাপারটি এই রকম : প্রাত্যহিক জীবন থেকে একশোটি ছবি একজন শিল্পী এঁকে দেন এবং অপর একজন ব্যক্তি কার্ডবোর্ডে মোড়া কালো খামের মধ্যে একটি একটি করে সেগুলো পোরেন। তারপরে যেমন-

তেমনভাবে সেগুলো কুড়িটির ভাগে করা হয়। তিনদিন ধরে পরীক্ষাকার্য চলে। পৃথক একটি খামে কী ছবি আছে গেলার তা ধরতে পারে নি, কিন্তু প্রতিদিনই সে এমন গোটা বারো ছবি এঁকে দেখিয়েছে যার মধ্যে থেকে গোটা দুয়েকের সঙ্গে ভাগের ছবির কিছুটা মিল ছিল। পুটহফ ও টার্গ বলছেন, ঘটনাচক্রে যা হতে পারত পরীক্ষা কার্যের সময়ে আঁকা ছবিগুলো তার চেয়ে বেশি দূর যেতে পারে নি।

দ্বিতীয় পরীক্ষা কার্যে একটি ডাই রাখা হয় একটি ইস্পাতের বাকসের মধ্যে। বাকসটি ঝাঁকানো হয়। এবারে গেলারকে বলতে বলা হয় ডাই-এর কোন দিকটি ওপরে আর কোন দিকটি নীচে। গেলার দুবার ভুল বলে, আর আটবার সঠিক।

ধাতু বাঁকানো সম্পর্কে 'নেচার' পত্রিকার রিপোর্টে কোনো উল্লেখ ছিল না। পুটহফ ও টার্গ বললেন, গেলার এ-কাজটিও করেছে (অর্থাৎ ধাতু বেঁকিয়েছে—সাইকোকাই-নেসিস)। তবে পরীক্ষাকার্যটি ঠিক মতো পরিচালিত হয় নি বলে ধর্তব্য নয়।

*

'নেচার'-এর মতো বিজ্ঞানের ডাক-সাইটে পত্রিকায় এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরেই একেবারে হুলুস্থুলু বেধে গেল। একদলের তো মহা ফূর্তি—এতদিনের অবজ্ঞেয় একটি বিদ্যাকে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে তাই। আর সমালোচকরা ক্রুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন যে এই রিপোর্টটি প্রকাশ করে 'নেচার' পত্রিকা জাত খুইয়েছে।

আত্মপক্ষ সমর্থনে 'নেচার' পত্রিকায় শুধু লেখা হল যে দুজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর দ্বারা রচিত এবং একটি বিখ্যাত বিজ্ঞান-সংস্থা কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত এই রিপোর্ট প্রকাশ করাটা অযৌক্তিক বিবেচিত হতে পারে না। তাছাড়া বিষয়টিও বিবেচনার যোগ্য, যদিও পরীক্ষা কার্য যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাকে কোনোক্রমেই নিখুঁত বলা চলে না।

তারপরে ১৯৭৩ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখে বি বি সি-র টেলিভিশনে য়ুরি গেলারকে উপস্থিত করার পরে ইংলন্ডেও য়ুরি গেলার অতিখ্যাত একটি নাম হয়ে ওঠে। টেলিভিশনের প্রোগ্রামে গেলারের সঙ্গে ছিলেন দুজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী—প্রফেসর জন টেলর ও ডঃ লায়ল ওয়াটসন। দুজনেই গেলারের কাণ্ডকারখানা দেখে 'বিভ্রান্ত' হলেন এবং স্পষ্টতই ধারণা দিলেন যে ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা কিছু 'বিজ্ঞান' থেকে গিয়েছে মনে হয়।

তখন ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখার জন্য 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হল। ১৯৭৩ সালের ২৬ নভেম্বর তারিখে এই উদ্দেশ্যে গঠিত হল গবেষকদের একটি প্যানেল—তার সদস্য হলেন সাইকিক্যাল গবেষণা সমিতির একজন সদস্য, একজন গবেষক মনোবিজ্ঞানী 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার সম্পাদক ও অপর একজন প্রতিনিধি বৃহৎ সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত একজন স্বাধীন সাংবাদিক এবং একজন পেশাদার যাদুকর। তাঁরা য়ুরি গেলারকে পরীক্ষা কার্যে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। য়ুরি গেলারের কাছ থেকে চটপট সম্মতিসূচক জবাব পাওয়া গেল।

কিন্তু গেলারের আগমন আর ঘটে না। পরীক্ষাকার্য বার বার স্থগিত রাখতে হয়। শেষ পর্যন্ত গেলার 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকাকে জানিয়ে দেয় যে সে তার মত বদলে ফেলেছে।

এই পরীক্ষা কার্যের জন্য ব্যাপক এক প্রস্তুতি করে রাখা হয়েছিল—মুখ্যত করে-ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ যোসেফ হ্যানলন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে গোড়ার দিকে তিনিও ছিলেন গেলারের ভক্ত। সেই তিনিই এবারে গিয়ে হাজির হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং গেলার সম্পর্কিত গবেষণার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বললেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করলেন।

এবং অতঃপর সমস্ত বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন (নিউ সায়েন্টিস্ট, ১৭ অক্টো-বর ১৯৭৪)। এককালে যিনি ছিলেন গেলারের ভক্ত তিনি যখন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখলেন তখন গেলার সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু বলতে পারলেন না।

*

ডঃ হ্যানলন বললেন য়ুরি গেলার একজন সুদক্ষ যাদুকর মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। তার জারিজুরি ও কলাকৌশল এতই পরিশীলিত যে বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীদের পর্যন্ত বিভ্রান্ত ও বিহ্বল করে। তার মধ্যে এমন একটা সরলতা ও শিশুসুলভ পবিত্রতা আছে যে মানুষ তাকে পছন্দ করে ও বিশ্বাস করতে চায়।

গেলার সাধারণত তার 'অলৌকিক' কার্যকলাপ দেখিয়ে থাকে ছোট ছোট মুগ্ধ সমাবেশের মধ্যে—খবরের কাগজের লোকজন বা বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি। এক কাজ করতে করতে অন্য কাজের মধ্যে আচমকা সরে যায় তখন আগের কাজের মালমশলাগুলো যে অরক্ষিত পড়ে থাকে সেদিকে আর কারও নজর থাকে না। এমনিভাবে অরক্ষিত পড়ে থাকার সময়েই চাবি বা চামচ বেঁকিয়ে রাখা হয়েছে এবং পরে আবার যখন সে আগের কাজে ফিরে এসেছে তখন এই বাঁকানো চাবি বা চামচ দেখিয়েই মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বন্ধ খামের ভিতরে কী আছে তা গেলার প্রথম বারে সাধারণত বলতে পারে না, দ্বিতীয়বারে অন্য কাজ থেকে ফিরে এসে পারে। মাঝখানের এই সময়ে খামগুলো থাকে অরক্ষিত।

কখনো কখনো গেলার একটা পেরেক অন্য মানুষের হাতের মুঠোয় রেখে দূর থেকে বেঁকিয়ে দিয়েছে। এই অত্যাশ্চর্য কাণ্ড সম্পর্কে পরে ভাবতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মাঝখানের খানিকটা সময় সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগ গেলার

নিতে পেরেছিল। কখনো কখনো এমনও মনে হয় আগে থেকে বাঁকানো পেরেকই সে ব্যবহার করেছিল কৃতিত্ব দেখাবার সময়ে নতুন করে বাঁকায় নি।

যাদুকররা বলে তারাও ঠিক এইভাবেই খেলা দেখিয়ে থাকে। তবে তারা কখনো বলে না যে অলৌকিক ক্ষমতাবলে তারা এ-সব কাজ করছে, তাদেরটা নিতান্তই ভোজবাজী। হাতের কেরামতি বা যন্ত্রপাতির কলাকৌশল বা মানুষের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে তারা তাক লাগাবার মতো কাণ্ডকারখানা করে।

তাছাড়া গেলারকে সাহায্য করেছেন ডঃ পুহারিখের মতো বিজ্ঞানী যিনি ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক এবং যিনি তার আগেই ৫৬টি আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ আবিষ্কারই মেডিকেল ইলেকট্রনিকস সংক্রান্ত অন্যতম আবিষ্কার হচ্ছে দাঁতের মধ্যে লুক্কায়িত অতি ক্ষুদ্র এক বেতারগ্রাহক যন্ত্র। এমনও হতে পারে এমনি এক অতিক্ষুদ্র বেতারগ্রাহকযন্ত্র গেলারের দাঁতের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল এবং খামের ভিতরে ছবি বন্ধ করার সময়েই সে নির্দেশ পেয়ে যাচ্ছিল ছবিটি কী?

যাদুকররাও এমনি কোনো উপায় অবলম্বন করেই চোখ বাঁধা অবস্থায় আঁক কষে বা লেখা পড়ে।

এ-সব কথা শুনে গেলার বলেছে, 'আমি যা করেছি যাদুকররাও তা করতে পারে একথা ঠিক, কিন্তু তার মানে এই নয় যে যাদুকররা যেভাবে করে আমিও সে-ভাবেই করি।'

তার ভক্তরা বলেছে, 'অবিশ্বাসীদের দূরে থাকাই ভালো। গেলারের কাছে আসতে চাও তো বিশ্বাস নিয়ে এসো।'

লক্ষ্য করবার বিষয় আমাদের দেশেও যাঁরা নিজেদের 'সিদ্ধ' পুরুষ বলে দাবি করেন তাঁদের ভক্তরাও শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসের কথাই তোলেন।

কথা উঠতে পারে বন্ধ খামের মধ্যে কী ছবি আছে তা গেলার যখন এঁকেছিল তখন তাকে রাখা হয়েছিল বিদ্যুতের আড়াল তোলা ঘরের মধ্যে—তাহলে?

ডঃ হ্যানলন বলছেন, বিদ্যুতের আড়ালটি কি ধরনের ছিল তার কোনো বর্ণনা রিপোর্টে নেই। বাতানুকূল করার যন্ত্র বসানো একটি কামরায় প্রতিরোধ-ব্যবস্থা কখনো এমন সর্বাঙ্গীণ হতে পারে না যে মাইক্রোওয়েভ পর্যন্ত ঠেকানো যেতে পারে। একজন বিজ্ঞানী যদি সহায় থাকে তাহলে আর ভাবনা কি!

যুরি গেলারের এই কাহিনী আমাদের দেশের পাঠকদের সামনে উপস্থিত করলাম এই আশায় যে তারা এ-থেকে শিক্ষা নিতে পারবেন, 'সিদ্ধ' পুরুষদের কবলে পড়ে প্রবঞ্চিত হবেন না।

গোর্কি সদনে সোভিয়েত যুব প্রদর্শনী

১৩ জানুয়ারী থেকে কলকাতার গোর্কি সদনে 'সোভিয়েত যুব' নামে যে প্রদর্শনীটি চলছে সেখানে বিজ্ঞান-বিষয়ক বেশ কিছু দ্রষ্টব্য বিষয় আছে। প্রদর্শনীটি দেখে যে-কেউ উপকৃত হবেন, অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা তো বটেই।

প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হুবহু মানুষের চেহারাধারী একটি রোবোট, মানুষের মতো কথা বলে (বাংলায় ও ইংরাজীতে) মানুষের মতো হাত-পা নাড়ে এবং এমন কি চলাফেরাও করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৩ থেকে ১৬ বছর (ইয়ুথ রিভিউ পত্রিকার বিবরণ অনুসারে ১৩ থেকে ১৬ বছর আর প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রচারিত স্থানীয় বিবরণ অনুসারে দশ থেকে বারো বছর) বয়সের স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই রোবোট মানুষ তৈরি করেছে।

তাছাড়া আছে সোভিয়েত চন্দ্রযান লুনোখোদ-এর একটি মডেল বিদ্যুতচালিত। এটিও সোভিয়েত ছেলেমেয়েদের হাতে তৈরী।

আছে আরো অনেকগুলো মডেল—টেলিভিশনের ট্রাকটরের আরো অনেক যন্ত্রের। আছে দূর মহাকাশের অন্য কোনো গ্রহের কল্পিত চিত্র।

সর্বোপরি সোভিয়েত ছেলেমেয়েদের উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্ত জীবনের আশ্চর্য সব ছবির সঙ্গে এই প্রদর্শনীর দর্শক অবশ্যই পরিচিত হবেন।

হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ

এই পরিষদ 'লোকবিজ্ঞান' নামে যে মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন তার ২য় বর্ষ—৩য় সংখ্যায় দুটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—'হাওড়া জেলায় রজনী-গন্ধার চাষ' ও 'নারিকেল প্রসঙ্গ'। পরিষদের উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারী থেকে একটি মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনের সায়েন্স ফোরাম আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা ১৯৭৫

'সায়েন্স ফোরাম' দক্ষিণ কলকাতার তীর্থপতি স্কুলের ছেলেদের একটি সংস্থা ১৯৭৪ সালের ১০ অকটোবর গঠিত। তারপরে অল্প সময়ের মধ্যেই এই সংস্থার ছেলেরা 'বিজ্ঞান' নামে একটি দেওয়াল-পত্রিকার তিনটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলছে এবং একটি সুন্দর বিজ্ঞান-মেলার আয়োজন করেছে।

বিজ্ঞান মেলাটি দেখার মতো বিশেষ করে এই মেলার কয়েকটি যান্ত্রিক মডেল। দশম শ্রেণীর ছাত্র বুদ্ধদেব লাহিড়ী যে এপিডিয়াস্কোপ তৈরি করেছে (একটি বাকস ফোকাস করার দুটি জোরালো আলো ও একটি উত্তল লেন্সের সাহায্যে) কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ অতি নিখুঁত। ছাদের ট্যাঙ্ক জলে ভর্তি হয়ে যাওয়া ঘরে আগুন লাগা ইত্যাদি নানা জরুরি সংবাদ জ্ঞাপনের সতর্কীকরণ মডেলেও অল্পবয়সী ছেলেরা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছে। মেলার প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ছেলেদের হাতের তৈরী ইগ্‌য়ানোডন ও ব্রন্টোসরাসের মডেল দুটি চমৎকার। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক বিভাগ হচ্ছে গণিতের ও ভূগোলের। বিভাগ দুটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে-কোনো দর্শক আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

—অয়স্কান্ত

বিশ্বের প্রবাদ: ইবনে ইমাম ৮·০০ [বিশ্বের সমস্ত ভাষা থেকে ভালো ভালো প্রবাদগুলি আহরণ করে এই বইতে সংকলিত করা হয়েছে। সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বহু রঙ শোভিত এই বইটি রাখার ও দেবার মত বই] হলুদ নদী সবুজ বন: মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ৪·০০ [একটি বিখ্যাত উপন্যাস] দৃষ্টিপাত: যাযাবর: ৮·০০; দেশে বিদেশে: মুজতবা আলী: ১২·০০; কত অজানারে: শংকর: ১০·০০; সাহেব বিবি গোলাম: বিমল মিত্র: ২৫·০০; রিন রিন: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়: ৩·৫০; কিংবদন্তীর দেশে: সুবোধ ঘোষ: ১০·০০; নষ্টী: মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য: ৪·০০; আলিম্পন: [আলপনা দেওয়া ও শেখার বই] দুর্গা মুখোপাধ্যায়: ১০·০০; রিক্সাওয়ালা: লাওচাও: ৬·০০।

ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ: নৃপেন্দ্র গোস্বামী: ১২·০০; কালের পুতুল: বুদ্ধদেব বসু: ৫·০০; রবীন্দ্রনাথ কথা সাহিত্য: বুদ্ধদেব বসু: ৫·০০; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী: ১০·০০; বাঙালীর ইতিহাস: [সংক্ষিপ্ত] নীহাররঞ্জন রায়: ৬·০০; রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা: নীহাররঞ্জন রায়: ৪০·০০; বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি: নৃপেন্দ্র গোস্বামী: ১৫·০০; লোকায়ত দর্শন: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: ১৫·০০; লেখকের কথা: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ৪·০০; আত্মচরিত: শিবনাথ শাস্ত্রী: ১৫·০০।

The Agony of West Bengal: Ranajit Roy 10·00; **Sedition Committee Report 1918:** (Reprint) Rowlatt-30·00; **History of Central Asia:** Rahul Sankrityan 25·00; **Calcutta India's City:** Asok Mitra 8·00; **The Days I Remember:** Kailash Nath Katju 15·00;

নিউ এজ পাবলিশার্স
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আইনের চোখে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার

সুপ্রাচীন কাল থেকেই সমাজে মেয়েদের অধিকার নিয়ে নানা রকমের চিন্তা ও মতবাদ পণ্ডিতসমাজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। স্ত্রীলোকের অধিকারকে একেবারে খারিজ করার পক্ষে কেউ আপত্তি মত দেন নি। তবে অনেকেই স্ত্রীসম্প্রদায়কে স্বরূপ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার পক্ষে সুপারিশ করেছেন। আবার কোন কোন পণ্ডিত সমাজে নারীর স্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে নারীকে দেবতার চেয়েও উচ্চস্থানে স্থাপন করেছেন কিন্তু তার অধিকারকে স্পষ্টভাবে সুরক্ষিত করার কোন ব্যবস্থা করেন নি। ঋগ্বেদের সময় থেকে শুরু করে মহাকাব্যের রচনাকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সমাজসংস্কারক স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষ্যকার প্রভৃতি আদর্শ নারীর আদর্শ যেই পৌঁছানে প্রচার করেছেন। নারীর সুরক্ষা ও আদরের সর্বসময় গুরুত্ব দিয়ে দেখানো হয়েছে। আমাদের জানা উচিত যে যখন আমরা কারুকে কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করি সঙ্গে সঙ্গে তার অধিকার সম্পর্কেও নিজের এবং অপরের তৎপর হওয়া দরকার। অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যুগ যুগ ধরে স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে অনেক সমাজসংস্কারক সচেতনতার দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন কিন্তু সেই অধিকারের বাস্তবরূপ তাঁরা দিতে পারেন নি। তৎকালীন সমাজব্যবস্থা স্ত্রী-অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অনুকূলেও ছিল না তাই বিভিন্ন সময়ে কন্যার জন্মকে পিতা ও মাতা দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। শিশুকন্যাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষাদান না করে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। স্বামীর অকাল-মৃত্যুতে বিধবা স্ত্রীর দায়িত্ব ও অধিকারকে সমাজের অধিকাংশ মানুষ এড়িয়ে চলেছেন এবং এই এড়াবার দুরভিসন্ধি বারবার সতী-দাহের মধ্য দিয়ে সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মকে প্রতিফলিত করেছে।

উনিশ শতকের শেষ দিক দিয়ে পৃথিবীর সুশিক্ষিত দেশগুলিতে যখন স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয় ভারতবর্ষেও তার ঢেউ এসে পৌঁছায়। অধিকাংশ আইনজ্ঞ ও আইন-প্রণয়নকারীরা সমস্যার গুরুত্বতা উপলব্ধি করেন। আইনবিদরা উপলব্ধি করেন যে শুধুমাত্র আইনের দোহাই দিলে স্ত্রীর স্বাধীনতাকে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন স্ত্রীর সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা। সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃত হলে নারীস্বাধীনতা অনেকাংশে সার্থক রূপ লাভ করবে। এই নারী স্বাধীনতার চিন্তাকে মাথায় রেখে দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা মতবাদে আইন-বিদরা স্ত্রী সম্পত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ আইন লিপিবদ্ধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজ বোম্বাই এবং অন্যান্য স্থানের আইনবিদরা হিন্দু আইনের স্ত্রীর সম্পত্তি ও সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন আইন লিপিবদ্ধ করেন। এই আইন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন-ভাবে প্রযুক্ত হলেও মোটামুটিভাবে এর উদ্দেশ্য এবং সুর এক। এই আইনগুলি প্রয়োজ্য হবার পরও আইনে কিছু কিছু গলদ ও দোষত্রুটি থেকে যায় এবং এই দোষগুলি সংশোধিত হয় ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে। এই আইন পূর্ববর্তী দায়ভাগ মিতাক্ষরা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক আইনের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে ঐ আইনের কিছুটা সংশোধন করেন যেই সব শোধনগুলি স্ত্রীলোকের অধিকারকে পরিপূর্ণভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

দায়ভাগ মিতাক্ষরা প্রমুখ আইনপ্রণেতারা স্ত্রীধন শব্দটির ওপর বিশেষ জোর আরোপ করেন। তাঁদের মতে স্ত্রীধন হচ্ছে স্ত্রীলোকের সেই সম্পত্তি যার ওপর স্ত্রীলোকের পূর্ণ অধিকার। এমনকি খ্রীশ্রীমতু হস্তান্তর ও বিলিবন্টনের পরিপূর্ণ সুযোগও এ আইনে সম্পত্তির অধিকারিণীর রয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্র-মতে বিয়ের অগ্নির সামনে কন্যাকে দেওয়া পিতৃদত্ত সম্পত্তি স্বামীর গৃহে লব্ধ সম্পত্তি কন্যার শ্বশুরালয়ে স্বামীছাড়া নববধূকে অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রদত্ত সম্পত্তি (স্থাবর অস্থাবর) এবং বিয়ের সময় প্রদত্ত শুল্ক বা পণ প্রভৃতি স্ত্রীধনের অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন আইনবিদদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মত পার্থক্য থাকলেও সকলের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রায় একই। যেমন—স্ত্রীধনের অধিকারিণী স্ত্রীর অবর্তমানে এর অধিকারী হবেন অপ্রাধিকার বলে, স্ত্রীর সহোদর ভ্রাতা মাতা পিতা এবং পিতার অবর্তমানে পিতার সপিণ্ডরা।

হিন্দু উত্তরাধিকারের এই আইনেও আইনবিদরা পরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তারা মনে করলেন কোথায় যেন স্ত্রী উত্তরাধিকার আইনে কিছুটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে তাই তাঁরা স্থির করলেন এই আইন সংশোধনের। ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রীধন সম্পর্কে যে সংশোধন করা হল তার ফলে দেখা যায় স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির সর্বপ্রথম অংশীদার হবেন তাঁর পুত্রকন্যারা (মৃত পুত্রকন্যার সন্তানেরা) এবং তাঁর স্বামী। এঁদের অবর্তমানে স্বামীর উত্তরাধিকারীরা অর্থাৎ সপিণ্ডরা। এঁদের অভাবে স্ত্রীসম্পত্তির অধিকারী হবেন স্ত্রীর পিতামাতা অথবা পিতার বংশধরেরা এবং তাঁদের অবর্তমানে মায়ের বংশধরেরা।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৬ (অনুচ্ছেদ ১৫) বলে দেখা যায় কোন নারী বিবাহিত এবং বিধবা হলে তাঁর সম্পত্তির সর্বপ্রথম সন্তানদের এবং সন্তানদের সন্তান-সন্ততির অভাবে পিতা-মাতা এবং তার অভাবে পিতা ও মাতার উত্তরাধিকারের ওপর বর্তাবে এক্ষেত্রে অবিবাহিত কন্যার পক্ষে তাঁর সম্পত্তির অধিকারী হবেন মাতা পিতা এবং তাঁদের অভাবে পিতার বংশধরেরা এবং তাদের অভাবে মাতার বংশধরেরা।

আলোচ্য আইনে স্ত্রীর সম্পত্তিতে কিভাবে অধিকার জন্মায় তারও বিশদভাবে উল্লেখ আছে। (১) উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা কিংবা মাতার নিকট হতে লব্ধ সম্পত্তি নতুন আইন অথবা পুরানো আইন বলে। (২) পিতা কিংবা মাতার লিখিত উইলের ফলে। (৩) সম্পত্তি বিভাগের ফলে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীরূপে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বস্বরূপ। (৪) দানস্বরূপ প্রাপ্ত সম্পত্তি। (৫) নিজের বুদ্ধিবলে প্রাপ্ত অথবা অধিকৃত সম্পত্তি। (৬) নতুন সম্পত্তি ক্রয় কিংবা স্বামীর সম্পত্তির বেনামদার হিসেবে কেনা সম্পত্তি। এই উভয় সম্পত্তির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই।

এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে যদি স্বামীর কোন সম্পত্তির কোন অংশমাত্র স্ত্রী পেয়ে থাকেন তবে ভবিষ্যতে স্বামীর মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তির তিনি পুরো অংশীদার হবেন।

স্ত্রীধন সম্পর্কিত ১৯৫৬ সালের উত্তরাধিকার আইন বলবৎ হওয়ার পর থেকে আইনের চোখে নিঃসন্দেহে স্ত্রীর সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এখন আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে আমাদের সমাজে স্ত্রী বা নারীদের কর্তব্য ও অধিকার দুটি সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আইনের আশ্রয় স্ত্রীসম্পত্তির ক্ষেত্রে কতদূর পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। লিপিবদ্ধ আইনই যথেষ্ট নয় যদি সে আইন যথাযথভাবে প্রযুক্ত ও কার্যকরী না হয়। আমাদের সমাজে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার আর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেকেরই নেই। অনেকে আবার এভাবে আদালতের আশ্রয় নেওয়ায় সংকোচ বোধ করেন। অনেকে আবার আদালতের দরজা এড়িয়ে পরস্পর বোঝা-পড়ার মাধ্যমে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও সমাধানের পথ খুঁজতে চেষ্টা করেন।

যে আন্দোলনের ফলে পৃথিবীতে স্ত্রী-স্বাধীনতা গড়ে উঠেছে (তার মধ্যে সম্পত্তির এই আইনকে বাদ দেওয়া যায় না) ভারতবর্ষ তা থেকে মুক্ত হতে পারে নি তাই হাজার হাজার বছর পরেও স্বাধীন দেশের নারীরা আইন ও সংবিধানের চোখে নিজেদেরকে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

পুনশ্চ

প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে আমাদের অগণিত পাঠকের আগ্রহাতিশয্যে আমরা নানা স্থান থেকে আজ কয়েক সপ্তাহ কলিকাতার বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশ করে চলেছি। বর্তমান সময়ের তুলনায় অতীতের বহু বিষয় এমনই কৌতূহলোদ্দীপক ছিল যে, অনেক সময় অবিশ্বাস্য বলেও মনে প্রতীতি জন্মে। কলিকাতায় ক্রিশ্চান লিটেরেচার সোসাইটি ফর ইণ্ডিয়া' নামক ১৯১০ সালে প্রকাশিত 'সচিত্র ভারত ভ্রমণ' নামক গ্রন্থ থেকে তৎকালীন শহরের লোকসংখ্যা রাস্তাঘাট দেখবার মত জায়গা যান-বাহন বাণিজ্য শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ে কিছু কিছু যে সকল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, এ স্থলে আমরা তা যথাসম্ভব উদ্ধৃত করে দিলাম।

লোকসংখ্যা

'১৯০১ সালে কলিকাতা নগর ও সহরতলিতে ১১২১, ৬৬৪ জন লোকের বাস ছিল। কলিকাতার পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর অপর তীরে হাবড়া এখানকার লোকসংখ্যা ৮৫২,৩০৮। বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে অনেক লোক আশপাশের নগর ও গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রতিদিন রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করে। এই জন্য রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে কলিকাতার লোকসংখ্যা অনেক অধিক।

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.,ডি.জি.ও
ডাঃ এস. এন. পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্য সেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

• ঘড়ি •
• জড়োয়া গহনা •
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

দেখিবার যোগ্য বিষয়

কলিকাতা সহরে বা উপনগরে যে সকল দর্শনযোগ্য বিষয় আছে, সেরূপ কতকগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। নগরের দক্ষিণ প্রান্তে অযোধ্যার মৃত নবাবের অট্টালিকা-সমূহ, দেখিতে পরম সুন্দর। মুচিখোলা হইতে উত্তর দিকে যাত্রা করিলে একটি মাঠ পাওয়া যায় এটাকে গড়ের মাঠ বলে। গড়ের মাঠের এক পাশে একটি সুন্দর বাগান আছে, এটিকে ইডেন বাগান বলে। ইডেন বাগান গঙ্গার তীরেই। গড়ের মাঠের পশ্চিমাংশের মধ্যস্থলে দুর্গ, মাঠের পূর্ব্ব প্রান্তে চৌরঙ্গী রোড। এই রাস্তার ধারে অতি চমৎকার বড় বড় বাড়ী আছে। দক্ষিণ প্রান্তে লাট পাদ্রীর বড় গির্জা, বিশপ উইলসনের যত্নে এই সুন্দর ও প্রকাণ্ড ভজনালয় নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। চৌরঙ্গীর মধ্যস্থলে যাদুঘর ইংরেজীতে এটিকে মিউজিয়ম বলে। এই বৃহৎ বাটীতে নানা দেশীয় নানাপ্রকার মৃত প্রাণী বহু যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আরও এত প্রকার দেখিবার যোগ্য জিনিস আছে যে বলিয়া শেষ করা যায় না। গড়ের মাঠের উত্তর দিকে বড়লাটের বাড়ী ইংরেজীতে এই বাটীকে গভর্ণমেণ্ট হাউস বলে। লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে এই চমৎকার বাটী নির্ম্মিত হয়। এ বাটীর পশ্চিম দিকে বড়-লাটের সেক্রেটারিগণের আফিস ও ছাপাখানার বাড়ী। এই সকল তেতলা বাড়ী বড় সুন্দর ও কলিকাতা নগরের শোভা সাতিশয় বর্দ্ধন করিয়াছে। আফিস বাড়ীর পরেই টাউন হল, ও হাইকোর্ট।

গড়ের মাঠের উত্তরে ভাগীরথীর তীর দিয়া একটি প্রশস্ত পথ বরাবর উত্তর মুখে গিয়াছে। এই রাস্তার পশ্চিম দিকে জেটি ও মাল নামাইবার জন্য টিনের বড় বড় ঘর। পূর্ব্ব দিকে সওদাগরদিগের বড় বড় অফিস বাড়ী। লাট সাহেবের পূর্ব্ব দিক দিয়া এক প্রশস্ত রাস্তা উত্তর মুখে গিয়াছে। এই রাস্তার পশ্চিম দিকে জেটি ও মাল নাবাইবার জন্য টিনের বড় বড় ঘর। পূর্ব্বদিকে সওদা-গরদিগের বড় বড় আফিস বাড়ী। লাট সাহেবের বাড়ীর পূর্ব্বদিক দিয়া এক প্রশস্ত রাস্তা উত্তর মুখে লালদীঘি পর্য্যন্ত গিয়াছে। লালদীঘির পশ্চিম দিকে বড় ডাকঘর একটি অতি সুন্দর বাটী। পূর্ব্বোক্ত রাস্তার দুই ধারে সুন্দর সুন্দর দোকান। গড়ের মাঠ হইতে উত্তর মুখে আর একটা রাস্তা গিয়াছে এ রাস্তার কতকটা বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট বাকি অংশের নাম চিৎপুর রোড। এই রাস্তা অতি অপ্রশস্ত, কিন্তু ইহার দুই পার্শ্বে অগণ্য দোকান ও লোকের বাস। এই রাস্তা দিয়া এত লোক ও গাড়ী চলে যে তত আর কোন রাস্তায় চলে কিনা সন্দেহ। ইহার আশেপাশে কেবল দেশীয় লোকের বাস।

এই রাস্তার পশ্চিমে আর একটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তা আছে ইহার দক্ষিণাংশের নাম কলেজ ষ্ট্রীট, ও উত্তরাংশের নাম কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট [বর্তমান বিধান সরণি]। এই রাস্তার ধারে মেডিকেল কলেজ সিনেট হৌস প্রেসিডেন্সি কলেজ, হিন্দু স্কুল, হেয়ার ষ্ট্রীট খ্রীষ্টীয় যুবক সমিতির বাটী ও আরও অনেক বিদ্যালয় আছে। রাস্তার দুই ধারের বাটীর নিম্নতলে দোকান অধিকাংশই পুস্তকের ও কাপড়ের; উপরে লোকের বাস। এই অঞ্চলে অনেক ভদ্রলোকের ও ছাত্রগণের বাস। এই রাস্তার পার্শ্বে দুই-একটি পুষ্করিণী আছে। ইহারও পূর্ব্ব-দিকে আর এক বহুদূরব্যাপী রাস্তাকে স্যারকুলার রোড কহে। গড়ের মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে জিরেটের পুল। এই স্থানে রাস্তার আরম্ভ; এই রাস্তার শেষ বাগবাজারে খাল। রাস্তার আরম্ভেই পাগলা গারদ, জেনারেল হাঁসপাতাল, হরিণবাড়ীর জেলখানা। আরও উত্তরদিকে খানিক দূরে গেলে লামার্টিন কলেজ (অতি সুন্দর বাড়ী), বিশপ কলেজ। আরও উত্তরে ক্যাম্বেল হাসপাতাল [বর্তমান নীলরতন সরকার হাঁসপাতাল], শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশন। এইখানে নূতন হ্যারিসন রোড [বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড]।

কলিকাতা সহরের দক্ষিণাংশকেই চৌরঙ্গী বলা যাইতে পারে; এই অংশে ইংরাজদিগের বাস (এখন বাঙ্গালী ভদ্র-লোকও এ অংশে বাস করেন) এ অঞ্চলের রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও সরল। নগরের উত্তরাংশে দেশীয় লোকের বাস এ অংশের অধিকাংশ রাস্তা সংকীর্ণ ও বক্র। কলিকাতা সহরের প্রায় সকল অঞ্চলেই মধ্যে মধ্যে বস্তি আছে। যেখানে গরিব লোকেরা খোলার ঘর বাঁধিয়া বহুলোক এক জায়গায় বাস করে তাহাকে বস্তি বলে। বস্তি বড় জঘন্য। এই জন্য অনেকে বলে, কলিকাতা সহরের সম্মুখ দিকে বড় বড় অট্টালিকা কিন্তু ভিতরের দিকে শূকরের কুড়িয়া ঘর।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা নগরের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার যেখানে পুষ্করিণী ভরাট করিয়া জল ধরিয়া রাখা হইয়াছে এখানে আগে ডোবা ছিল। ক্লিক রো নামই এ কথার প্রমাণ। ক্লিক মানে খাল। ১৬৮৬ সালে কালীঘাটের মন্দির ও কলিকাতার মধ্যস্থলে জঙ্গল, জলাভূমি ছিল এবং তাহাতে বন্য পশু ও চোর ডাকাইত থাকিত। সেই জঙ্গলের দিকে চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোড হইয়াছে। এক্ষণে যেখানে লাট পাদ্রীর কেথিড্রাল নামক বড় গির্জা আছে সেইখানে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাঘ শিকার করিতেন। এক্ষণে গড়ের মাঠ অতি রমণীয় কিন্তু সেকালে বর্ষায় তিন মাস ডুবিয়া থাকিত। জলের কলের দ্বারা নগরের বড় উপকার হইয়াছে। মাটির নীচ দিয়া ড্রেন বা নর্দ্দমা হওয়াতে রাস্তা দিয়া চলিতে গেলে আর নাকে কাপড় দিতে হয় না। এক্ষণে হ্যারিসন রোড ও অন্যান্য নূতন রাস্তা ও বস্তিতে নর্দ্দমা হওয়াতে নগরের উপকার ও শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রতি বৎসরেই নগরে উত্তম উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে।

—ক্ষপণক

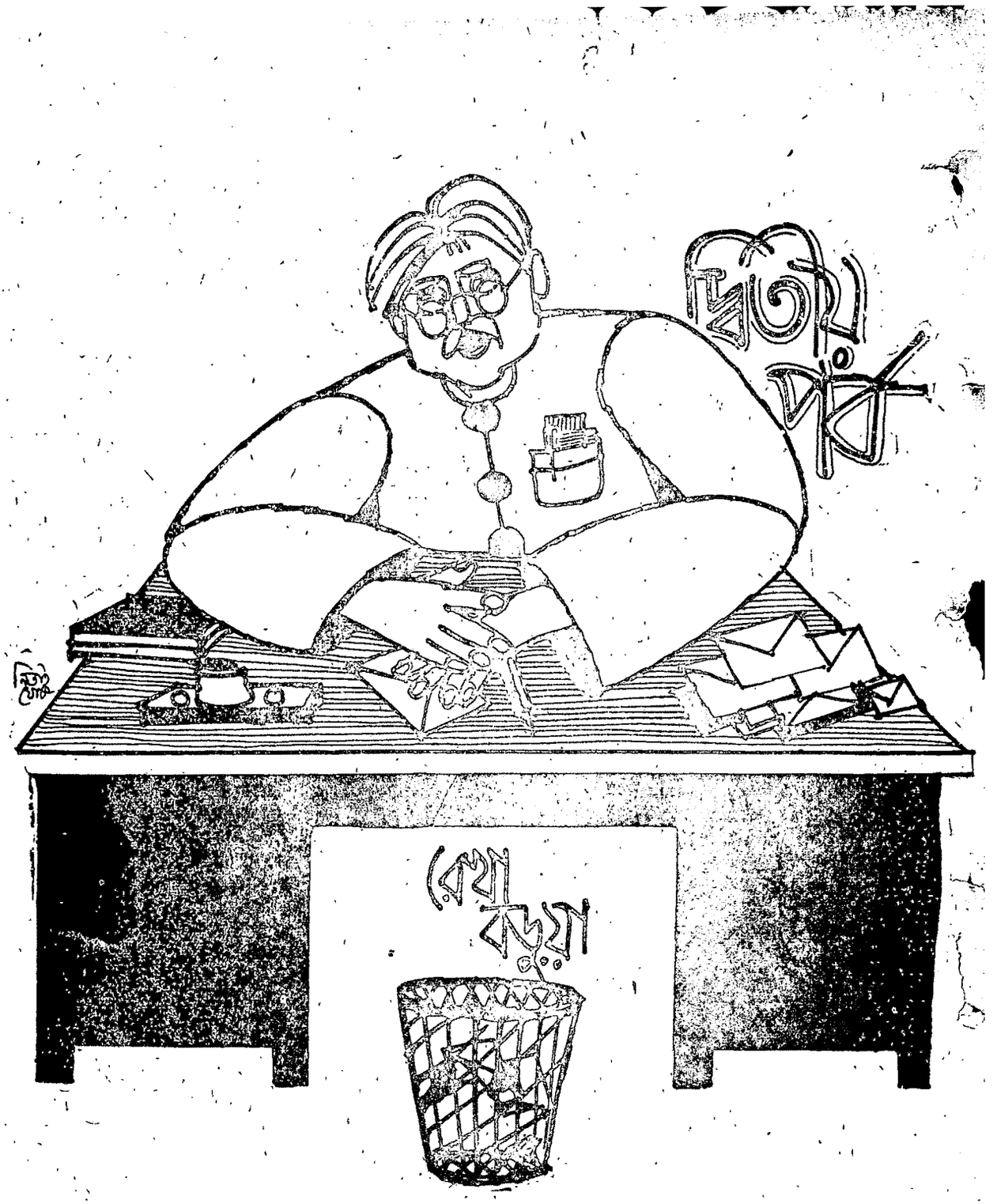

রাগে বিড়বিড় করতে থাকেন পরমেশ-বাবু। ঘুম থেকে উঠেই আজকাল মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এটা কিন্তু তা বলে ওঁর স্বভাব নয়। এমনিতে সকালের দিকে মেজাজ বরাবরই প্রসন্ন থাকে। স্ত্রী উঠে যাওয়ার পরও ঘুমের আমেজটা কাটে না। বেশ ভালো লাগে সকালটা। রাতটা ভালো কাটে বলেই ঘুম ভেঙে সকালটাকেও ভালো লাগে। এ স্ত্রীটি সবদিক দিয়ে মনের মত হয়েছে পরমেশবাবুর। দ্বিতীয়-বার বিয়ে করেছেন দশ বছর আগে। সন্তানাদি হয়নি, চানও নি তা। ঐ আগের পক্ষেরই একটি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে তাদের। ছেলেটি ছোট, তারই বয়েস সাতাশ। সে অবশ্য বিশেষ ঝামেলা করে না। বিয়ে করেছে চাকরী করে ধানবাদে। কালেভদ্রে কলকাতায় এলেও থাকে না এক আধ দিনের বেশী। তা না আসুকগে, না থাকুক গে। তার জন্যে দুঃখু নেই পরমেশ-বাবুর। বড় করে দিয়েছেন এবার নিজে চরেবরে খাক। বয়েসকালে একটু শান্তি সবাই চায়। 'বুড়ো বয়েসে' একথা বলতে চান না তিনি। কি আর এমন বয়েস হয়েছে তাঁর?

সে যাই হোক। হচ্ছিল শান্তির কথা। তা সেদিক দিয়ে সাবি একাই একশ'। দু'ভাইবোনের মধ্যে ওই বড়। এই অল্পবয়সে তিরিশ পুরবে, তবু যদি একটু আক্কেল থাকে মেয়ের। বয়েসে প্রায় সৎমারই সমান। ভাবসাব হলে বেশ হতে পারত। ভালো-মানুষ শৈলবালার সঙ্গে। কিন্তু তা হয়ে উঠে নি। সারাক্ষণ খালি ট্যাঁক ট্যাঁক করে কথা আর সৎমায়ের খুঁৎ কাটা, এই হল ওর কাজ। খারাপ লাগলেও সয়ে যাচ্ছিলেন পরমেশবাবু। নিজের মেয়ে বলে কথা। কিন্তু বড় ঝাপটাটাই যে ইদানীং তাঁর ওপর

দিয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে সাবির। তার একটি দুটিকেও কি শাশুড়ী ঠাকরুণের কাছে রেখে আসা যেত না। মেয়ে আসবে বাপের বাড়ী ভাল কথা কিন্তু এলে, আর নড়বই না এই বা কেমন। জামাই টুরে গেছে আড়াই মাসের ওপর। সেই থেকে সপ্তষ্ঠি বাপের বাড়িতে বসে। সেই আশ্বিনের প্রথমে এসেছে আর এ ত অঘ্রাণের মাঝামাঝি হয়ে গেল তবু নড়ার নাম নেই।

একটু খেতেটেতে ভালোবাসেন পরমেশবাবু। সকালবেলা উঠে নিজেই বাজারে যান। ফেরেন যখন তখন বাঁহাতে থাকে বাজারের থলি ডান হাতে শালপাতার ঠোঙা। গোনা ছখানা জিলিপি আর দুখানা জিবেগজা তাতে। মিষ্টি খেতে বড় ভালোবাসেন তাই ওই দিয়েই চা খান সকালে। অবশ্য ওর মধ্যে দুখানা জিলিপি শৈলবালাকে প্রায়ই খাওয়ান জোরজার করে। শৈলবালা আবার মিষ্টি খেতে চায় না তেমন। এককটি তেলমাখা মুড়ি আর একটা কাঁচালঙ্কা হলেই ও খুশী। তবু ওকে জোর করেন পরমেশবাবু। একটু ভালোমন্দ না খেলে শরীর থাকবে কেন। জিলিপিগুলো বেশ বড়ো দেখে আনেন রোজ। বেশ চলছিল, এর মধ্যে ছেলেমেয়ে নিয়ে এল সাবি।

প্রথমদিকে অবশ্য ওদের জন্যেও মুড়ির সঙ্গে দুখানা দুখানা জিলিপি আনতেন পরমেশবাবু। কিন্তু ছোট বড় নিয়ে অনেকগুলি। আড়াই মাস ধরে কি একই চাল বজায় রাখা সম্ভব না আশাই করা উচিত? শেষের এ মাসটা জল-খাবারে রুটি আর গুড়ের ঢালাও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নতুন খেজুরের গুড়, তাই বা আজকালকার দিনে কটা লোক খেতে পায়। তা সাবির মনই ওঠে না। ওর শ্বশুরবাড়ীতে নাকি লুচি পরোটা ছাড়া কেউ মুখেই তোলে না। অশান্তির ভয়ে মুখ খোলেন না পরমেশবাবু। নইলে কে কত বড় কাপ্তেন জানতে আর বাকী নেই কিছু।

এই অশান্তির ভয়েই শৈলবালাকে বিয়ে করে আনবার দু' মাস আগেই সাবিকে পার করেছেন তিনি। অতবড় মেয়ে বুকের ওপর নিয়ে পরের মেয়েকে ঘরে আনা মানুষের কাজ হত না। যে আসছে তারও ত' সাধ আহ্লাদ আছে।

শৈলবালার ছেলেপিলে হয়নি, ডাক্তারের রায় নাকি হবেও না। প্রথমদিকে অবশ্য ও দুঃখ করত। কিন্তু পরমেশবাবু খুশীই হয়েছেন। ছেলেমেয়ে যথেষ্ট ভোগ করেছেন আর সাধ নেই। প্রথম আট বছরেই পাঁচটি হয়েছিল। সে বউ ছিল ভীষণ রোগা। নিয়মিতই ভুগত অসুখে। প্রথম দুটিই আছে আর শেষ তিনটি—তার মধ্যে দুটি যমজ—জাঁতুড়েই মারা গেছে। তারপর ত' শয্যা নিল বউ। একটুও কি শান্তি পেয়েছেন পরমেশবাবু। তারচেয়ে এই ভালো। শৈলবালাকে বলেছেন বুঝলে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

সব ফুল কিনে নাও ৮-০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন গ্রন্থ

ফেরারী অতীত ৭-০০

ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের নতুন ভ্রমণ উপন্যাস

গৌরী গঙ্গা ৯-০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঘরের পথ ৬.০০ সুখের আড়াল ৫.৫০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার আমার ৪-০০

নীল লোহিতের চোখের সামনে ৫-০০

আশাপূর্ণা দেবী

ভালবাসার মুখ ৫.০০ তরঙ্গহীন ৫.০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক বোন পারুল ৬.০০ বনকরবী ৬.৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

মন জানে না ৭.০০ একক প্রদর্শনী ৪.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সরমা ও নীলকান্ত ৬.০০ লাস্ট চ্যাপটার ৫.৫০

চিরঞ্জীব সেন অনিল রায়

রাশিয়ান রুবির রহস্য ৭.০০ সোনার পাতায় রক্ত ৭.০০

নিশাচর বিশ্বনাথ চৌধুরী

মার্বেল হাউস রহস্য ৫.৫০ সিংহল ৮.০০

সাহিত্য সংস্থা, ১৮সি, টেমার লেন, কলিকাতা—৯

নতুন বউ এই ভালো বেশ নিশ্চিন্দি নইলেত সর্বদা ভয়ে কাঁটা হয়ে—'

তা সেই সাবির ছেলেমেয়েদের কথা—একেবারে জ্বালাতন করে মারে। আর সাবি হল তাদের ওপর এককাঠি। সারা জীবন ত' গেল এখনও যে পরমেশবাবু একটু আয়েস করবেন তার কি উপায় আছে। আজ ক'দিন ধরে চলছে অত্যাচারের চরম। এই বয়সে তিনি তা বলে ত' আর নতুন করে রুটি গড় অভ্যেস করতে পারেন না। তাই চারখানা জিলিপি আর দুখানা জিবে গজা দিয়েই জল খাচ্ছিলেন সকালে। তা সাবির জন্যে কি তা হবার উপায় আছে। ঠোঙা হাতে বাপকে বাড়ী ঢুকতে দেখলেই হাঁক পাড়ে, নন্টু ফুলি, বিনি দাদু মিষ্টি এনেছে তোদের। অমনি চিলের মত ছোঁ দিতে এসে পড়ে তিনটেতে। এতেও আশ মেটে না ছোট খোকাটাকেও ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে দেয়। খুব ভাগ্য থাকলে তবে শেষ পর্যন্ত একখানা জিবে গজা হয়ত জোটে পরমেশ-বাবুর কপালে। এমন করে আর কদিন চলে! অসহ্য হয়ে শেষে ওদের জন্যেও আবার দুখানা করে জিলিপি আনতে শুরু করেছেন। কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে?

—নন্টু মন্টু আমার জিবে গজা বলে পাগল; আহ্লাদে গলে গিয়ে বলে সাবি। জ্বালাতন হয়ে গেছেন পরমেশবাবু। ওদিকে সংমাকে ট্যাঁক্ ট্যাঁক করে কথা শোনাতে কিন্তু ছাড়ে না।

প্রেম অমৃত

শ্রীকরুণাসিন্ধু পালিত

বাংলা সাহিত্যে বিবাহে উপহারের একমাত্র বই। ভাষার ইন্দ্রজালে মধুরতম প্রেমের উপন্যাস। পন্ডিতদের মতে—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি।

নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি।

প্যান্ট্রী, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোর্সেই পাওয়া যায়।

বাংলার পরিবেশক :

সুপৎ সেরামিক্স প্রাঃ লিঃ

১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

—আমার জন্যে চারটে রসমুণ্ডি এনো ত বাবা বেশ লাগে। অথবা, গরম বোঁদে পাও ত' এনো ত' বাবা ওই মোড়ের দোকান থেকে। বোঁদেটা বেশ করে ময়রা মুখ-পোড়াটা—এমনি সব হাজারো আবদারও শুনতে হয় পরমেশবাবুকে।

এমনি ভাবেই দিন চলছে তাঁর। মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারেন না সইতেও পারেন না। রাগ করে ইদানীং দুখানা করে লেড়ো বিস্কুট আনছেন কিন্তু তা যেন আর গলা দিয়ে নামতেই চায় না। ওদের জব্দ করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হয়ে যাচ্ছেন পরমেশবাবু।

দুদিন হল আবার এক নতুন উৎপাত। মেজো ছেলেটাকে পার করে দিয়েছে এ ঘরে। খাট নইলে তার নাকি ঘুম হচ্ছে না। ও আমার রাতে একবার ঘুমোলে একেবারে কাদার তাল। এমনি বলে বাপকে বোধহয় পরোক্ষে সান্ত্বনা দিয়ে সাবি।

ভাত খেতে বসেও আজকাল মাথা গরম হয়ে যায়। একটু ডাল দুখানা মাছের ঝাল আর একটু ভাতে পোড়া হলেই চলে যায়। সকাল নটার মধ্যে ওর বেশী হয়েও ওঠে না। যা ভালমন্দ রাঁধে শৈলবালা সেই রাত্তিরে খাওয়া হয়। এখন এই পঞ্চভূতের নৈবিদ্যের যোগাড় করতে গিয়ে ঝালটুকুও আর হয়ে উঠছে না। ভাজা মাছ দু'খানা খুন্তি করে পাতে দিয়ে যায় শৈলবালা।

রাগে পুড়তে পুড়তে বেরিয়ে যান পরমেশবাবু। অফিসে পেঁপাছে চেয়ারে পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে থাকেন তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে কাজে হাত দেন।

এই পোস্টঅফিসে এসে খুব সুবিধা হয়েছে। ছোট্ট অফিস, বেশী লোকজনের ঝামেলা নেই। তাছাড়া বাড়ীর কাছে হয়ে বাস ভাড়াটা বেঁচে যাচ্ছে। তাই একটু মন খুলে টিফিনটা করতে পারছেন। শৈলবালা অবশ্য বলেছিল দুখানা পরোটা করে দিই আলুর ছেঁচকী দিয়ে, হ্যাঁগো?

—নাঃ কি দরকার, হ্যাঙ্গামে বারণ করেছেন পরমেশবাবু। তার চেয়ে বরং মিষ্টিফিষ্টি খেয়ে নেবো তুষ্টুরামের দোকান থেকে। কিন্তু সেই কি প্রাণ খুলে একটু টিফিন করতে পারছেন। দোকানের সব রসালো মিষ্টির দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন তিনি তারপর বেয়ারাকে হাঁক পাড়েন, চার আনার বোঁদে একটা ক্ষীরের চপ আর দুটো দানাদার নিয়ে এসো তো—

এতেই বেরিয়ে যায় অনেক পয়সা। আজকাল নাতিনাতনীর কল্যাণে পকেটে টান ধরেছে তাই হিসেব করে খেতে হয়। তবে কপাল ভালো থাকলে এক একদিন বেশ মন খুশী করা খাওয়া হয়ে যায়, পরমেশবাবুর গুপ্তবিদ্যার জোরে। ভালো মত কিছু হাতে এলে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চান তিনি। রাবড়ীটা বড় সরেস করে তুষ্টুরাম আর ক্ষীরমোহনও।

কিন্তু এক একদিন কপাল খারাপ থাকে। যেমন আজ। তিনচারখানা চিঠি রাগে টেনে খুললেন কিন্তু সব ভোঁ-ভাঁ। একখানা স্ট্যাম্পও কি থাকতে নেই! কতদিন চিঠির ভেতর পেয়েছেন দু টাকার নোট। এক টাকার নোট ত' হামেশাই থাকে। টাকা অবশ্য বেশী থাকে মেয়েদের কাছে লেখা চিঠিতে। দেখেশুনে হাড়শুদ্ধ জ্বালা হয়ে গেছে এখন। ক্লাব বা পত্রিকার নামের চিঠিতে সাধারণত থাকে স্ট্যাম্প। চিঠি খোলার কথা গল্পেপটলেপ অনেক পড়েছেন আগে। কেউ খোলে মেয়েদের লেখা চিঠি পড়ার জন্য কেউ খোলে ফটোর আশায়। ছোঃ, যত্তোসব ছেলেমানুষী। শুকনো চিঠি পড়ে কি লাভ হয় কে জানে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আর কি। শৈলবালাকে বিয়ে করবার পর ওসব খেয়ালের আর দরকার পড়ে নি পরমেশবাবুর।

বিরক্তভাবে বেছে চতুর্থ খামখানা তুলে নেন পরমেশবাবু। হাতের আন্দাজ ঠিক। খাম খুলতেই বেরিয়ে পড়ল দুখানা দু' টাকার নোট। মনটা জল হয়ে যায়। নোট দুখানা সস্নেহে ভাঁজ করে বুক পকেটে রাখেন তিনি। ছোট চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়তে গিয়ে হঠাৎ কি মনে হওয়ায় একটু কৌতূহলবশেই পড়তে থাকেন।

ছোট চিঠি। কোন এক লাবণ্যকে লিখেছে তার স্বামী নরেন। এবারে টুর থেকে ফিরেই আবার অর্ডার আছে টুরে যাবার। কি নাকি গোলমাল বেঁধেছে অফিসে। মাঝে চারটি দিন সময়। এ চিঠি পাওয়ামাত্র লাবণ্য যেন জানায়, ওকে নিয়ে আসবে কিনা টুরে বেরোবার আগে। সামনে পৌষ মাস পড়ছে, তখন তো আবার আটকে যাবে। লাবণ্যর উত্তর পেলে তবেই ওদের আনতে যাবে নরেন, না হলে যা মেজাজ ওর, হঠাৎ আনতে গেলে ত আবার মহা অপরাধ হয়ে যাবে।

মার শরীর ভালো নয়। ধীরুর পরীক্ষা সামনে। এসময় ও চলে এলেই ভালো হয়। যা হয় তাড়াতাড়ি জানায় যেন। চারটি টাকা পাঠাচ্ছে চিঠির ভেতর। মাসের শেষ, এখন হাত খালি তাই বেশী পাঠানো গেল না।

চারটি টাকা বুকপকেটে, তবু তুষ্টুরামের রাবড়ির কথা মনে থাকে না পরমেশবাবুর। চার টাকায় কতটা রাবড়ী আর কটা ক্ষীর-মোহন হয় সে হিসেব করতেও ভুলে যান তিনি। শুধু চা খেতে হবে, রাত্রে সন্তর্পণে নাকের কাছে হাত নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে ছোঁড়াটা সত্যিই ঘুমিয়েছে কিনা।

নিজের গালে চড় খেতে ইচ্ছে করে পরমেশবাবুর। শাশুড়ীর নাম সাবিত্রী বলে, বিয়ের পর ওরা যে সাবির নাম বদলে লাবণ্য করে দিয়েছিল, তা কি একবারও মনে পড়তে নেই, একবারও কি ঠিকানাটা পড়ে দেখার কথা মনে আসতে নেই খাম ছেঁড়ার আগে।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেবারেই ত বোম্বাইতে পেলেন আল্লাদিয়া খাঁর ছেলে মঞ্জে খাঁর আশ্চর্য তারিফ। অনাথের ঠুংরি শোনবার জন্যে পর পর সাতটি আসরে মঞ্জে খাঁ হাজির হয়ে গেলেন।

বোম্বাইয়ের সেই সব আসরের পরে এলাহাবাদ সম্মেলন। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন সেই যে তাঁর যাত্রা আরম্ভ হল বছরের পর বছরব্যাপী সুদীর্ঘ তার তালিকা। পশ্চিমের কোন সঙ্গীত কেন্দ্র বাদ পড়েনি তাঁর। এত জায়গায় এত আসরে [redacted] শ্বেতকণ্ঠে গান শুনিয়েছেন যে নিজেরই আর মনে পড়ে না সব। বছরের মধ্যে ছ মাস তখন বাংলার বাইরেই থাকতে হত। বাংলার জন্য কোন শিল্পীরই এত মজুরো আসত না পশ্চিমাঞ্চল থেকে।

সাফল্যের গৌরবে ঝলমল করত আসর। স্বীকৃতি সম্মান সচ্ছলতায় কি পরিপূর্ণ ছিল সেসব! অতি দীর্ঘ সেই সঙ্গীত-জীবনের বৃত্তান্ত। পেশাদারী পরই ত ৬০ বছর অতিক্রান্ত।...

সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক অনাথবাবু এখন ৭৮ বছর বয়সী। কিন্তু এখনো তাঁর সঙ্গীত শক্তি অন্তর্ধান করেনি। নারী কণ্ঠে গান বন্ধ করেছেন শুধু। ঠুংরিও এখন গেয়ে থাকেন খেয়ালের মতন তাঁর স্বল্পস্তারিক কণ্ঠে।

তবে আসরের সংখ্যা সংকুচিত হয়ে এসেছে। বদল হয়ে গেছে সেদিনের নানা মূল্যবোধের। কত পরিবর্তন এর মধ্যে ঘটে গেছে তাঁর পরিচিত সঙ্গীতজগতে। সে পরিবেশ আর নেই। কোথায় গেল সেকালের সেই হৃদ্যতা অন্তরঙ্গতার সুর। কোথায় গেলেন সেদিনের সব শিল্পী দরদী সঙ্গীত-প্রেমী আর আসরপতিরা।...

প্রবীণ অনাথনাথ স্মৃতিচারণে অবসর যাপন করেন। কত গুণী এসেছেন বিদায় নিয়েছেন সঙ্গীতের আসর থেকে। ইহলোক থেকেও।

মধ্যে সরকারী সম্মান রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন কেউ কেউ। নিজে সঙ্গীতের শিল্পীরূপে তাতে তিনি আনন্দ বোধ করেছেন। উদার নির্বিরোধ জাত-শিল্পী অনাথনাথ। সরকারী স্বীকৃতি পাননি বলে মনে কোন ক্ষোভ নেই তাঁর। আসরে আসরে শ্রোতাদের শ্রোদ্ধাদের যে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান পেয়েছেন তাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জ্ঞান করেন। কিন্তু সঙ্গীত-সক্ষম থেকেও যে আসর থেকে সাদর আহ্বান আগের মতন আসে না এ বড় মর্মান্তিক দুঃখ। অবরুদ্ধ যেন শিল্পীসত্তা!

চিরদিন আত্মপ্রচারবিমুখ তিনি। আধুনিক প্রচারটকটকানিনাদের যুগে তাঁকে এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা ঘিরে থাকে।...

মনের আকাশপটে কখনো ঝলমল করে ওঠে সেযুগের কত নক্ষত্র। লছমী ওস্তাদ মোজুদ্দিন ছোটে খাঁ আমীর খাঁ লক্ষ্মণ খাঁ গৌরীশংকর মিশ্র হরিদাস মিশ্র গহর জান আগ্রাওয়ালী মালকা জান মহম্মদ সফি রজব আলী মঞ্জে খাঁ মহম্মদ খাঁ জুয়লাল আচ্ছন মহারাজ ফৈয়াজ খাঁ শ্বেতাঙ্গিণী কৃষ্ণভামিনী জগদীপ মিশ্র সতীশ ঘোষ..... আরো কত হারিয়ে যাওয়া নাম!...

বাগবাজারের নবীন সরকার গলিতে বসে মন এক-একদিন উদাস হয়ে ওঠে।

স্বপ্নের মতন মনে পড়ে কপোতাক্ষর তীর। খেসড়ায় মামারবাড়ির জীবন। মেজ-মামা অবিনাশ দত্তের কীর্তনের সঙ্গে খোল বাজানো। হেমাঙ্গিণীর কত কীর্তনাসর। বাঁকা গ্রামের সতীশ রায়ের বেহালা। আর তাঁর সেই সব কথাঃ তোর দ্বারা লেখা-পড়া হবে না। গানই হবে তোর। কলকাতায় চলে যা। ভাল করে শেখ। ভয় পাসনি গ্রাম ছেড়ে যেতে। ভগবান একটা কিছু উপায় করে দেবেন..'

মনে ভেসে ওঠে স্টীমারে সেই চলে আসা। কলকাতায় থাকা। মধুপুর, কাশীতে ছোটে রামদাসের তালিম। শিবপুরে নিকুঞ্জ দত্তের শেখানো। লছমী ওস্তাদের তালিম। মোজুদ্দিন ছোটে খাঁ গৌরীশংকর আমীর খাঁ গহর জান ফৈয়াজ খাঁর কাছে কৃতদিনের কত বিচিত্র সংগ্রহ.....

সেকালের সঙ্গে একালের সেতু হয়ে সঙ্গীতজগতের একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় হয়ে বিরাজ করছেন অনাথনাথ বসু।

সেতারে তিন পুরুষ

'জিতেন, আজ শশী অধিকারীর দল এসেছে রাণাঘাটে।' মামাত ভাই কুমার বললে, 'খুব ভাল যাত্রা হবে। চল শুনতে যাই।'

'না, আমি যাত্রা শুনব না। তুই যা।'

'অন্য যাত্রার মতন নয় রে। শশী অধিকারী নিজে বাঁয়লা বাজাবে। শুনলে বুঝবি সে কি বাজনা।'

কুমারের এই কথায় কাজ হল। ভাল বাজনা পেলে আর কিছু চায় না জিতেন। বিশেষ বেহালা। কারণ এ যন্ত্র সে নিজে বাজায়। সুরই শুনে শুনে বাজানো। যে গানের সুর ভাল লাগে সেটি বেহালায় তোলে। কারুর বেহালা শুনলেও বাজাতে পারে তেমনি। শুধু বেহালা কেন, বাঁশিও। অমনি নিজে নিজেই বাঁশি বাজানো শিখেছে। তা বাঁশির মিষ্টি সুর শুনেও ভাল লাগে সকলের। ছেলেমানুষ হলে কি হয়, সুরবোধ তার জন্মগত।

বাঁশি আর বেহালা বাজিয়েই তার সারাদিন কেটে যায়। রাণাঘাটের সবাই চেনে জিতেনকে। পুরো নাম জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বয়স তখন কত? হয়ত ১১।১২ বছর হবে। তার বাবার জন্যেও সকলে জানে তাকে। রামাচরণ ভট্টাচার্যির ছেলে জিতেন। সমস্ত রাণাঘাট অঞ্চল জুড়ে কি নাম রামাচরণের কত বড় সেতার বাজিয়ে তিনি। পৈত্রিক বৃত্তিতে শাস্ত্রজ্ঞ। সেই সূত্রে ময়ূরভঞ্জ রাজদরবারের সভাপণ্ডিত। আবার সেতারও বাজান সেখানে। আর অন্য কটি দরবারে, আসরেও। নাড়াজোল রাজার আসরে বাজাতে যান। পঞ্চেৎগড়ের জমিদার বাড়ির যাদবেন্দ্র-নন্দন মহাপাত্র ত সেতার শেখেন রামাচরণের কাছে। এইসব দরবারেই বছরের বেশিরভাগ থাকতে হয় তাঁকে। আর রাণাঘাটে এলেই পালচৌধুরীদের দরবারে তাঁর আসর বসে। তেমনি গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় ভবনে।

সেতার বাজান রামাচরণ। আবার পণ্ডিত বংশের ধারায় শাস্ত্র চর্চাও করেন। রাণাঘাটে যখন মাঝে মাঝে আসেন, ছোটখাটো টোল বসে যায় তাঁর সেই মাটির ঘরের দাওয়ায়। সংস্কৃত পড়ুয়ারা তাঁর কাছে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ নিতে আসে। শুধু রাণাঘাট বা কাছাকাছি অঞ্চলের নয়। বাংলার বাইরে থেকেও এসে থাকে বিদ্যার্থীরা। রামাচরণের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই এ বংশে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। তাঁর পিতা হলেন রামকমল শিরোমণি। বিশেষ করে দর্শনের শাস্ত্রজ্ঞ তিনি। তাঁর কাছেই রামাচরণ দর্শন ও ব্যাকরণের শিক্ষা প্রথমে পান। তারপর কাশী যান বেদ পাঠ করতে। ন্যায় দর্শনের চর্চাও সেখানে করেছিলেন। তারপর ফিরে আসেন রাণাঘাটে। কিন্তু শাস্ত্র চর্চার চেয়ে সঙ্গীতই তাঁর জীবনে প্রধান হয়ে ওঠে। তবে বজায় রেখেছিলেন বংশের ধারা। সঙ্গীতের সঙ্গে বিদ্যাচর্চাও। তাই রাণাঘাটে তিনি এলেই শিক্ষার্থীদেরও আনাগোনা আরম্ভ হয়ে যেত। সকালে বিকালে বসতেন তাদের নিয়ে। আর সন্ধ্যের পর যোগ দিতে যেতেন সঙ্গীতের আসরে। পালচৌধুরীদের দরবারে। গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় পরিবারের সভায়। আরো নানা আসরে।

তবে রাণাঘাটে আর কদিন থাকেন রামাচরণ। তাঁর বাইরে বাইরেই দিন চলে যায়। আর জিতেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কাটে প্রায়শই পিতার দৃষ্টি শিক্ষা আর তত্ত্বাবধানের বাইরে। রামাচরণের একমাত্র সন্তান। তবু আর কিছু রয়ে যায় তার জন্যে হতে পারে নি। ঘরে শুধু জননী। আর দেখবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই সংসারে। সুতরাং নিজের নানার প্রবণতাতেই বড় হতে থাকে সে। বাঁশি বাজায় বেহালা বাজায়। পণ্ডিত বংশের ছেলে। কিন্তু বিদ্যাচর্চার

সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। মন শুধু গান বাজনায়।

এমনি সময় শশী অধিকারীর যাত্রার দল এল রাণাঘাটে। বামাচরণ তখন ময়ূরভঞ্জে। এখানে অধিকারী মশাইয়ের যাত্রার জন্যে তিন দিনের বায়না হয়েছে।

সেদিন তাঁর প্রথম আসর। মামাত দাদা কুমারের সঙ্গে যাত্রা শুনতে হাজির হল জিতেন। যাত্রার চেয়ে বরং বেহালার টানেই বেশি বলা যায়।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেক আগে। দূর গ্রামাঞ্চল থেকেও শশী অধিকারীর যাত্রার আসরে লোক এসেছে। তখনো আসছে দলে দলে। জিতেন কুমারকে নিয়ে অতি কষ্টে আসরের মাঝখানের কাছাকাছি জায়গা করে নিলে। কারণ তার বড়ই ইচ্ছে, শশী অধিকারীর খুব কাছে বসে তাঁর বেহালা শোনা।

কিন্তু কোথায় তিনি? আসর ভর্তি হয়ে তখন মহা হৈচৈ আরম্ভ হয়ে গেছে। যাত্রা আরম্ভ করবার জন্যে চীৎকার করছে দর্শকরা। অধৈর্য হয়ে সোরগোল তুলেছে। অধিকারী মশাইয়ের এখনো দেখা নেই। তিনি এসে আগে বেহালা বাজাবেন, তারপর আরম্ভ হবে যাত্রা।

আরো খানিক পরে আসরের মাঝখানে একজনকে আসতে দেখা গেল। অতি সাধারণ চেহারা। পরনে খাটো কাপড়। গলায় একটি উড়ুনি জড়ানো। আদুর গা। সঙ্গে একটি ছোকরা, তার হাতে বেহালার বাক্স।

সেদিকে দেখিয়ে কুমার বললে, 'ওই শশী অধিকারী।'

আসরে তখনো হট্টগোল চলেছে। অধিকারী মশায় বেহালাটি বার করলেন বাক্স থেকে। তাঁর এক পাশে বাঁয়া তবলা নিয়ে তবলচী বসল। আর একদিকে একজন হারমোনিয়ম নিয়ে।

বেহালার ছড়টিতে রজন ঘষে শশী অধিকারী চারটি তারের সুর বেঁধে নিলেন। তারপর ছড়ের একটি লম্বা টান দিয়ে আরম্ভ করলেন বাজনা। রাগের আদল একটু দেখিয়েই ধরে নিলেন গৎ। তবলায় ঠেকার বোল্ উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে আসরের এত গোলমাল স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন যাদু কাঠির স্পর্শ।

অরুণইন্ডাষ্ট্রিজ
৪২, মতি শীল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

কি মিষ্টি সুর তাঁর হাতের টিপে। কি সুরেলা সেই ছড়ের টান। একটু আগেও যারা হৈ হৈ করছিল এখন তারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ। তন্ময় হয়ে গেছে জিতেন্দ্রনাথ। এমন বেহালা, এমন সুর আগে সে কোনদিন শোনে নি।

তার জানা ছিল না, জয়জয়ন্তী রাগে সিদ্ধ শশী অধিকারী। কিন্তু অনেকেই জানত—আসরে যত হট্টগোল হোক, জয়জয়ন্তী শুনিয়ে তিনি সব শান্ত করে দিতে পারেন। এখানেও হল তাই।

এক মনে শুনতে শুনতে গতের বন্দেশটি জিতেনের মনের পটে যেন আঁকা হয়ে গেল। গৎখানি মনের মধ্যে ভরে নিয়ে সে চলে এল আসর থেকে। বাজনার পর যাত্রা শোনবার জন্যে সেদিন আর রইল না।

পরের দিন সেই জয়জয়ন্তী মক্স করতে লাগল নিজের বেহালায়। অধিকারী মশায়ের বাজনার সেই করুণ রেশ তার সমস্ত মন ছেয়েছিল। এ সুর বাজাতে না পারলে যেন স্বস্তি নেই নিজেরই। কালকের মতন বাজনা হাতে তুলতেই হবে। সেই শোনা সুর আর গৎ যতক্ষণ না মনের মতন হল, সে সেধে গেল যন্ত্রে।

তারপর সেদিন সন্ধ্যেবেলা আবার গেল যাত্রার আসরে। আর কুমারকে যাবার কথা বলতে হল না। সেদিনও শুনে এল শশী অধিকারীর বেহালা। আজও আসরে তেমনি হট্টগোল। আর সে সমস্তই স্তব্ধ হয়ে গেল অধিকারী মশায়ের আবার সেই জয়জয়ন্তীতে।

পর পর দুদিন শুনে বন্দিশটি মনে তার গাঁথা হয়ে গেল। তবে আজ জিতেন শুধু শশিভূষণের সুরের দিকেই মন দিলে না। এক দৃষ্টে লক্ষ্য করতে লাগল তাঁর হাতের টিপ, বেহালা ধরা আর ছড় টানবার কায়দা। তারপর বাজনা শেষ হতেই আসর থেকে বাড়ি ফিরে এল। অধিকারী মশায়ের বেহালা শোনবার জন্যেই এখানে আসা। তাই যাত্রায় আর বসে রইল না। কি বেহালাই বাজালেন শশী অধিকারী। ভাগ্যে কুমারের কথায় এসেছিল—জিতেন ভাবলে! এ বাজনা না শুনলে তার ধারণাই হত না, কত মিষ্টি হতে পারে বেহালার সুর।

তিন দিনের দিনও জিতেন যথারীতি আসরে হাজির হল। আজ সে এসেছে অনেক আগে। আসরের মাঝখানে বসে বাজাবেন শশী অধিকারী। এখানে আজকেই তাঁর শেষ বাজনা হবে। তাঁর বেহালার বাক্স আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। জিতেন বসেছে তার পাশেই। তাঁর বাজনা একেবারে সামনে থেকে শুনবে। কুমারও এসেছে সঙ্গে।

এই যাত্রার তিন দিনের বায়না হয়েছিল রাণাঘাটে। আজ তার শেষদিন। আসরে তাই ভিড় হয়েছে খুব।

কিন্তু এদিকে এক মুস্কিলের ব্যাপার। খবর এসেছে, অধিকারী মশায়ের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে গেছে। এত জ্বর নিয়ে এসে বাজাবেন কি করে? তবে ম্যালেরিয়া জ্বর। ছেড়ে যেতে পারে খানিক পরেই। তাই দেরি হলেও আসরে আসতে পারেন এই সময়। এসব অভ্যাস আছে তাঁদের। এমন অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে বটে।

তবে আসর সামলানো দায় ততক্ষণ। লোকদের হৈচৈ আরম্ভ হয়ে গেছে। চীৎকারও করছে কেউ কেউ—ব্যায়লা শুনব। ব্যায়লা শুনব। কোথায় শশী অধিকারী?

উদ্‌যোগীরা অনেক চেষ্টাতেও তাঁদের শান্ত করতে পারলেন না। ক্রমেই বাড়তে লাগল গোলমাল।

অধিকারী মশায়ের কাছে বার কয়েক লোক গেল। কিন্তু এখনো তাঁর উঠে যাবার মতনই অবস্থা নয়। আসরে বাজাতে আসা দূরের কথা।

কুমার জিতেনের চেয়ে কিছু বড়। তারাও ব্যাপারটা শুনেছিল। আর জিতেনের হাত নিসপিস করছিল বেহালার বাক্সটার দিকে লক্ষ্য করে। বেশিক্ষণ আর সে ধৈর্য ধরতে পারলে না। কুমারকে কানে কানে জানালে মনের ইচ্ছা।

'হ্যাঁ রে, বাজাব নাকি আমি? একবার জিজ্ঞেস করে দেখ!'

কুমারেরও মহা উৎসাহ। সে তখনি কথাটা উদ্‌যোক্তাদের কাছে পেশ করলে।

তাঁরা প্রথমে রাজি হলেন না প্রস্তাব শুনে। কিন্তু কুমার বললে, 'আচ্ছা দেখুন না পারে কিনা। আর না হলে হট্টগোল ত থামাতেও পারবেন না। জিতেন বাজালে ত ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হবে না।'

শশী অধিকারীর বেহালা বার করে হারমোনিয়মের সঙ্গে সুর বাঁধলে জিতেন। দুচার বার ছড় টেনে টিপের আন্দাজ করে নিলে। তারপরই আরম্ভ হয়ে গেল তার বাজনা।

খানিকটা কৌতূহলে, খানিকটা নতুনত্বের আশায়, আর রাণাঘাটের যারা জিতেনকে জানে তাদের জন্যে গোলমাল থেমে এল। আসরের অনেকেই মন দিলে এদিকে। এইটুকু ছেলে আসরে বসে বেহালা বাজাচ্ছে! বাঃ এতো বেশ।

কিছুক্ষণ শুনতেই বাজনাটা অনেকের ভালোও লেগে গেল। সেই জয়জয়ন্তীর গৎটিই ধরেছে জিতেন। কাল সারাদিন রেঁজিয়ে এ গৎ দুরস্তও হয়েছিল। তা ছাড়া নিজের সুরবোধ আর বেহালায় একটু হাত ত ছিলই। আর সুরটাও বড় পছন্দ হয়েছিল তার নিজেরই।

সুতরাং বাজনা অনেকের বেশ ভালই লাগছিল। আসরও জমে উঠল দেখতে দেখতে। ওই বয়সের পক্ষে যতটা জমানো সম্ভব।

কতক্ষণ যে কেটে গেল, সেদিকে কারুর খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল, জিতেনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন শশী অধিকারী। গায়ে মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে একজনের কাঁধে হাত রেখে তিনিও বাজনা শুনছেন!

আশ্চর্য হয়ে গেছেন অধিকারী মশায়। ছেলেটি তাঁরই যন্ত্র নিয়ে বাজাচ্ছে। সেজন্যে রাগ করতেও ভুলে গেলেন যেন। তাঁর নিজেরই জয়জয়ন্তী গৎ বাজিয়ে চলেছে—কে এ? একটু এদিক ওদিক তুচ্ছ বটে। তান টানও মাঝে মাঝে হয়ে যাচ্ছে অন্য ধরনের। কিন্তু হাত ত মন্দ নয়। যা-ই বাজাক, টিপ সুরেলা।

বাজনা শেষ হতেই কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে বাবা? কোথায় থাকো? কার ছেলে তুমি?'

জিতেনের হয়ে অন্যরাই তার পিতৃ পরিচয় দিলে 'সেতারী বামাচরণবাবুর ছেলে, জিতেন।' আর তাকে বললে, 'এঁকে প্রণাম করো। ইনিই অধিকারী মশাই।'

'বামাচরণবাবু তোমার বাবা? শুনে বড়ই আনন্দ হল। বেশ, বেশ।' প্রণত জিতেনকে শশিভূষণ বললেন, 'অত বড় গুণীর ছেলে তুমি। আর কি বলব। আশীর্বাদ করছি, তোমার হবে। তুমি বাজাও, যেমন বাজাচ্ছিলে।'

তারপর আসরের লোকদের জানালেন, 'আপনারা আজ আমায় ক্ষমা করুন। শরীর বড়ই খারাপ। আজ বাজাতে পারছি না। তবে বামাচরণবাবুর এই ছেলে আসর ঠিক রেখে দেবে।'

এমনি করে সেই বালকের সঙ্গীত জীবনের উদ্‌বোধন হল সেদিন। শশী অধিকারীর আশীর্বাদে। রাণাঘাটের যাত্রার আসরে। আর অন্য এক যন্ত্রে।

তবে সে জিতেন্দ্রনাথের অঙ্কুর মাত্র। তার সহজাত প্রতিভার একটি আভাস। তবু সেকালের এক গুণীজনের তা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর সে প্রতিশ্রুতিকে তিনি জানিয়েছিলেন শিল্পীর স্বীকৃতি।

কিন্তু সে কিশোর প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল অন্য মাধ্যমে। অর্থাৎ আর এক যন্ত্রে। বেহালায় না। বেহালার মতন বাঁশিও ও বাজাত তখন। শুনে শুনে বাজানো শুধু নয়। পিতার অজান্তে, তিনি যখন রাণাঘাটে থাকতেন না, তখনই তার দিন কাটত বাঁশি আর বেহালা নিয়ে। অন্তরের সুর এক একটা অবলম্বন চাইত বলেই কখনো ধরত বেহালা, কখনো বাঁশি।

'বাঁশি বাজাবি তুই? আর আমার সেতারের কি হবে? কত কষ্ট করে শিখেছি। কত ওস্তাদের কাছে পেয়েছি অমন্ত্র নাই সেতার অন্য লোককে। আর আমার ছেলে হয়ে তুই বাঁশি নিয়ে থাকবি?'

তিরস্কার করতে গিয়েই হয়ত বামাচরণের মনে হল—দোষ ত জিতেনের নয়! তিনিও ত শেখানো আরম্ভ করেন নি। বাইরে বাইরেই থাকেন। দিন যায় জমিদারদের দরবারে, আসরে। রাণাঘাটে যে কদিন আসেন, তাও পালচৌধুরীদের সভায় নিত্য আসর বসে। তা ছাড়াও কাছাকাছি গোবরডাঙ্গায় মুখুজ্যেবাড়ির আসর। শেখাতে যান পণ্ডেৎগড়ে যাদবেন্দ্র মহাপাত্রকে। সন্ধন্ধী অম্বিকাচরণও (কুমারের পিতা) ত শেখেন। কিন্তু জিতেনকে শেখাবার কথা মনেই হয় নি কোনদিন। দোষ ত তাঁর নিজেরই। হয়ত মনে হত, জিতেন এখনো তেমন বড় হয় নি।

কিন্তু না। আর সময় নষ্ট নয়। হিসেব করে দেখলেন, জিতেনের এখন ১২ বছর বয়স। লেখাপড়াও ত বিশেষ হচ্ছে না। এবার আরম্ভ করুক সেতার। সংস্কৃতের চেয়ে এই বোধহয় শিখবে ভাল।

বামাচরণ ছেলেকে তখন থেকেই রীতিমত শেখাতে আরম্ভ করলেন।

বামাচরণ তখন পঞ্চাশোর্ধ। সেই পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা ও সাধনলব্ধ বিদ্যা সবই পুত্রকে দিতে লাগলেন। তিনি নিজে শিখেছিলেন অনেক কষ্টে, বহু যত্নে। নানা ওস্তাদের কাছে, বিভিন্ন সূত্রে। পণ্ডিত বংশের বলে অনেক জমিদার বাড়িতে ক্রিয়াকর্মে যেতেন। নিযুক্ত সভা-পণ্ডিত ছিলেন ময়ূরভঞ্জ রাজদরবারে। গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায়ের পরিবারেও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম করতেন। অথচ সঙ্গীতের প্রতিভাও ছিল তাঁর স্বভাব দত্ত। রাণাঘাটের পালচৌধুরী প্রভৃতিদের দরবারী গুণীদের কাছ থেকে তাই সংগ্রহ করতেন রাগবিদ্যা। সেকালের অনেক ধনীদের এই এক গুণগ্রাহীতা ছিল। শুধু শিল্পীদেরই আনুকূল্য করতেন না তাঁরা। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদেরও দিকপাল কলাবৎদের কাছে শিক্ষার সুযোগ করে দিতেন। এমনিভাবেই ক'জন ভারত প্রসিদ্ধ গুণীর শিক্ষা পেয়েছিলেন বামাচরণ। যেমন সুর বাহার ও সেতারের ওস্তাদ মহম্মদ খাঁ, খেয়ালী আহম্মদ খাঁ, বড়ে ছুন্নি খাঁ, ওস্তাদ রামৎ খাঁ, ধ্রুপদী যদু ভট্ট, বীণকার কাসিম আলী খাঁ প্রমুখ। রাণাঘাটের পালচৌধুরী পরিবারের নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির দাক্ষিণ্যেই এইসব কলাবতের কাছে শিক্ষা বা সংগ্রহ তিনি করতেন। এমন কি পালচৌধুরী দরবারের দুই কলাবতী তওয়ারেফ হিপনজান ও দিলজানের কাছেও নিয়েছেন বামাচরণ। তবে বিশেষভাবে শেখেন তিনি মহম্মদ খাঁর কাছে। সুরবাহারের একজন আদি ঘরানাদার মহম্মদ খাঁ। লক্ষ্ণৌ থেকে তাঁর ওস্তাদ সাজ্জাদ মহম্মদের সঙ্গে তিনি বাংলায় আসেন। প্রথম সুরবাহারী গোলাম মহম্মদের (তানসেনের কন্যা-বংশীয় ওমরাও খাঁর শিষ্য) একমাত্র পুত্র ও তালিমপ্রাপ্ত সাজ্জাদ মহম্মদ।

বামাচরণই একমাত্র দরিদ্র শিষ্য ছিলেন মহম্মদ খাঁর। অর্থাৎ রাণাঘাটের পালচৌধুরী, গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় পরিবার ইত্যাদির আনুকূল্যে তিনি মহম্মদ খাঁর তালিম পান। মহম্মদ খাঁর অন্যান্য শিষ্য এবং সাধকদের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (মনুবাবু—বাংলার এক গুণী সুরবাহারী), নাটোরের মহারাজা গোবিন্দনাথ রায় (জগদিন্দ্রনাথের পিতা), গৌরীপুরের রাজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর মাতুল উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী (ঢাকা)।

আর মহম্মদ খাঁর ওস্তাদ সাজ্জাদ মহম্মদের বাজনাও অনেক শুনেছিলেন বামাচরণ। কারণ পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর দরবারেও তাঁর যাতায়াত ছিল। আর প্রিয়পাত্র ছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের। এইসবের ফলে গড়ে উঠেছিল ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গীতজীবন। রাগবিদ্যা লাভ করেছিলেন। বাংলার এক দিকপাল কলাকার হয়েছিলেন সেতার সুরবাহারে। তবে মহম্মদ খাঁই ছিলেন তাঁর প্রকৃত ওস্তাদ। তাঁকেই তিনি জানতেন শিক্ষাদাতা বলে। আর নিজের হাতে যে সেতার যন্ত্রটি তৈরি করেছিলেন, তাতে ওস্তাদ বলে মহম্মদ খাঁর প্রতিকৃতি খোদাই করে রাখেন। সেই যন্ত্রই তিনি বাজাতেন সব আসরে।

(ক্রমশঃ)

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২০-০০
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ। মূল পদ ও অনুবাদ সম্বলিত। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ।
বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন ১২-০০
বঙ্কিমচর্চায় একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।
জিজ্ঞাসা : কলিকাতা ৯ / কলিকাতা ২৯

মারাঠী আধুনিক নাটক

—দিলীপকুমার মিত্র

অতীতে ঐতিহ্যের পথ ধরেই আধুনিক মারাঠী নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠেছে। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দের ৫ নভেম্বর প্রথম মারাঠী নাটকের প্রথম অভিনয় হয় এবং বিষ্ণুদাস ভাবের সেই অসামান্য নাট্যকৃতিকে স্মরণ করে ১৯৪৩এ মহাসমারোহে উদযাপিত হয় মারাঠী নাটকের শতাব্দী উৎসব। বিশিষ্ট নাট্যবিদ, মুমরাই মারাঠী সাহিত্য বংশের সম্পাদক ডঃ এ এন ভালেরাও-এর আন্তরিক প্রয়াসে মহাসমারোহে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। অতীতের প্রথিতযশা নাট্যকার জি বি দেবলের 'শারদা' নাটকের অভিনয় উৎসবের স্মরণীয় অঙ্গ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উৎসব পালিত হয়, খ্যাতনামা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন, অভিনেতা নাটক ও নাট্যকারদের সম্বন্ধে জনগণ বিশেষ উৎসাহ দেখান। নতুন যুগের তরুণ সমাজ মারাঠী থিয়েটারের অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ অবহিত হয়ে আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রকে আরও ঋদ্ধ এবং ঐশ্বর্যবান করে তুলতে প্রয়াসী হন। নতুন উন্নত-মানের রঙ্গমঞ্চও স্থাপিত হয়। অতীতের স্মরণীয় স্রষ্টাদের নাট্যসমূহ গৌরবের সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে; কিলোস্কার দেবল, কোলহাটকর গাদকার, কেলকর এম এন যোশী এস পি যোশী বি ভি ওয়ারেরকর এস ভি ওয়রতক প্রমুখের নাটক দর্শকের বিপুল অভিনন্দন লাভ করে। পাশ্চাত্য দেশের নাটকসমূহও অভিনীত হল সুন্দর অনুবাদের মাধ্যমে। নব-নাটকের বিপুল বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকের আশ্চর্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নাট্যক্ষেত্র। ৫ নভেম্বর মারাঠী নাট্যপ্রেমীদের কাছে স্মরণীয় রঙ্গভূমি দিন হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে মারাঠী নাটকের আধুনিক কাল আরম্ভ হল এই সময় থেকে।

নট নাট্যকার পি এল দেশপাণ্ডের 'তুঝে আহে তুজাপাসি' (বা তার পাশে প্রথম নাটক। এতে আঙ্গিকের বৈচিত্র্যই নেই, আধুনিক কালের মূল্যবোধের দ্বন্দ্বও রূপায়িত। ভোগবাদী কাকাজী তথা-কথিত সংযমী গান্ধীবাদী আচার্য ও যুবক-যুবতীদের চিত্রণে নাট্যকার দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের নিখুঁত চিত্র হিউ-মার স্যাটায়ার ও সেন্টিমেন্টের সাহায্যে তুলে ধরেছেন। দেশপাণ্ডের পরের নাটক 'সুন্দর মী হোনার' (আমি সুন্দর হব) অনুবাদ রচনা। অজস্র একাঙ্ক নাটকেরও তিনি রচয়িতা। দেশপাণ্ডে অভিনেতা হিসাবেও স্মরণীয়ঃ তাঁর একক অভিনয়-গুলি দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দেয়। 'বটাট্যাচি চওল' ওয়ার্যাবরচি বরাত (গ্রাম্য ও শহরের জীবনের অসঙ্গতির কৌতুককর চিত্র), 'আসা মী আসা মী' (আমি এ-রকম মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যঙ্গ ছবি) এ প্রসঙ্গেই বিশেষ স্মরণীয়। দেশপাণ্ডের প্রথম কালের নাটক 'তুকা মহানে আতা' আধুনিক ভাবনায় সাধক কবি তুকারামের জীবনী রচনার প্রয়াস।

বর্তমানে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন বসন্ত কানেটকর। তাঁর প্রথম নাটক 'ভেড়াচা ঘর উনহাট' (বেদমাইসের বাসা) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে এর বক্তব্য ও সংলাপের জন্য। প্রম্পোসিভ ড্রামাটিক এসোসিয়েশন (পুণা) শ্রীরাম লাগুর পরিচালনায় এই নাটকের সফল মঞ্চ রূপায়ণ করে। পরবর্তী নাটক 'দে ভাগ্যে মনোরাজ্যা' (দেবতার মনোরাজ্য) ও 'দুর্ল ধ্রুवबर दोखे आपन' বিশেষ মঞ্চ-সাফল্য অর্জন করে না। ফ্যানটাসী জাতীয় প্রথম নাটকে মানব জীবনে অসংগঠিত দূরীকরণার্থে দেবতাদের হস্তক্ষেপ ও দ্বিতীয় নাটকে একটি শিশুর সহায়তায় দাম্পত্য কলহের অবসান। প্রেম তুঝা রংগ মাসা (প্রেম তোমার রঙ কি প্রকার) লঘু কমেডি। বারপড়ल्या জেভা জাগ এতে (বোঝা-গুড যখন জেগে ওঠে) নাটকে শিবাজীর মহত্ত্বায় শিবাজীকে না আবৃত করে তাঁকে পিতা ও মানুষ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। মৎস্যগন্ধা পৌরাণিক কাহিনীর সার্থক রূপায়ণ। অন্যান্য উল্লেখ্য নাটক—মোহিনী অশ্রুঞ্চি ঝালি ফুলে হিমালয়চি ঝাবলি লেকুড়ে উদ্দউঝালি ইথে ওঝালা মৃত্যু (মৃত্যু এখানে লজ্জা পায়)। প্রখ্যাত হাস্যরসিক লেখক এম জি ঝাঠের বোয়া-পিণ্ডে হি ধন ঝব্যা আনি কাঝভ প্রভৃতি নাটক তাঁকে অগ্রণী নাট্যকারের সম্মান দিয়েছে।

মারাঠী নাট্যসাহিত্যে বহুখ্যাত ও সর্বাধিক বিতর্কিত নাম বিজয় তেণ্ডুলকর। সেন্সর প্রথাকে পরাজিত করে দর্শকদের বিমূঢ় করে সমালোচকের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে তাঁর নাটক সগৌরবে অভিনীত হয়ে চলেছে বিভিন্ন ভাষায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বিজয় তেণ্ডুলকর তীব্র মাত্রায় সমাজ সচেতন, বর্তমান অবক্ষয়জীর্ণ ঘুণ-ধরা সমাজ ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্য স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তিনি—এক সর্বধ্বংসী সর্বনাশা ঝটিকা উদ্দাম প্রবাহিত হয়ে ন্যায়-নীতি নিয়মের প্রচলিত বোধকে আমূল উৎপাটিত করে সমাজভাবনার ভিত্তিভূমিকে প্রকম্পিত করে দিচ্ছে তাঁর নাটকে। এবং ক্রোধে ক্ষোভে তিনি ফেটে পড়ছেন ঘৃণার আগুনে ঝলসে দিতে চাইছেন এই সমাজ ব্যবস্থাকে পুরাতন মূল্যবোধকে ছিন্নভিন্ন করতে চাইছেন তীব্র জ্বালায়। এইভাবে সমসাময়িক নাট্যকারদের তুলনায় এই ক্রুদ্ধ তরুণের নাটক এক বিশেষ পার্থক্য কৌণিকতা সূচিত করেছে। প্রথম নাটক নাটক শ্রীমন্ত থেকেই সার্থকতার বিজয়-পতাকা উড়িয়ে চলেছেন তেণ্ডুলকর মানুষ নাভাচে বেট মী জিনকালো মী হারালো সারি গ সারি এবং একাঙ্কসমূহ কেশবপ্রধান বা চোর পলিশ চার দিবস বাল ভেট প্রভৃতিতে। উত্তরকালীন নাটক তিনি আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছেন।

প্রায় পনেরো বছর আগে লেখা গিধাড়ে (শকুন) নাটকে এক আধুনিক ভারতীয় জীবন তার বর্বরতা লোভ ঘৃণা বিদ্বেষ নিয়ে অংকিত ঃ বন্ধ পিতা তার বিতাড়িত ভ্রাতা সখারাম, তার পুত্রদ্বয় রমাকান্ত ও উমাকান্ত—প্রত্যেকেই প্রতারক ঘৃণ্য ভয়ংকর অপরিমিত মদ্যপায়ী বৃদ্ধের যুবতী কন্যা মানিকও একই ধরনের—সে এক রাজাকে গাঁথতে গিয়ে নিজেই গর্ভবতী হয়। বৃদ্ধ পিতার অবৈধ কবি পুত্র রজনীনাথের ভাষায় এই পাঁচ শকুনের পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ অমঙ্গল প্রয়াস ধ্বংসবাসনা এক ভয়াল শ্বাসরোধকারী পরিবেশ সৃজন করে যা স্নায়ুকে অসহ্য পীড়ন করে ও এক নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ সান্ত্বনাক্লিষ্ট মরুভূমির ধূ-ধূ করা জ্বালাময় প্রতিবেশ সৃষ্টি করে। রমাকান্তের শান্ত স্বল্প সন্তানহীনা স্ত্রী রমা যেন সমগ্র বিষ নিজদেহে ধারণ করে ঃ তার তাও অন্যের সন্তান। সখারাম বাইণ্ডার নাটকের এই নামীয় প্রধান চরিত্র এক অতি-সাধারণ মানুষ যে তীব্র মদ্যাশক্তি ও প্রবল যৌন-কামনা নিয়ে সমাজের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। বহু বিতর্কিত এই নাটকটি বক্তব্য বা আঙ্গিক বিচারে অবশ্য অকিঞ্চিৎকরই মনে হয়। 'শান্ততা কোর্ট চালু আহে' নাটকে কোর্ট কোর্ট খেলার ছলে একটি নারীর (লীলা বেনারে) জীবনের ঘৃণ্য লজ্জা, গোপন বেদনা, চরম কলঙ্ক উদ্ঘাটিত হয় সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে একটি নারীর শুভ্র হৃদয় পবিত্র বাসনাকে ধর্ষিত করে তাকে চূড়ান্ত অবমাননার দিকে ঠেলে দেয় এই নাটকে তাই চিত্রিত। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও উঁচু স্তরের রাজনীতিবিদদের প্রবল আক্রমণ করেছেন নাট্যকার 'মাঝিরাম কোটওয়াল' নাটক—সম্পর্ক নারী সঙ্গকামী নানা ফড়নবীস পুণার গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় কর্তৃক অবহেলিত মাঝিরামের কন্যা ললিত-গৌরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মাঝিরামকে কোটওয়াল করে দেয় যে তার প্রতিশোধ নিতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত নানাই তার পতন ঘটায়।

রত্নাকর মাতকারির উপর তেন্ডুলকরের প্রভাব বিশেষ রকম। মূলতঃ একাংক রচয়িতা হলেও বর্য্যাবরচা মুসাফির (পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এক যুবকের কথা) 'রতুলাচে দুমরে টঙ্ক' (চরিত্রের আত্মা অন্বেষার আকর্ষণী কাহিনী) আস্টাই (এক মধ্যবিত্ত মেয়ের জীবন বোধ) প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটক সাফল্য পেয়েছে। পুরুষোত্তম দরভেকর (যিনি সার্থক পরিচালকও) জীবনবোধ ও মঞ্চের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিয়ে নাটক রচনা করেছেন জনপ্রিয়রূপে। কামুর ক্যালিগুলা অবলম্বনে চন্দ্র নভিচ ধালাল কালি মাতি খারে পানি ও বরহাদি মনমে তাঁর উল্লেখ্য নাটক ঠিক তেন্ডুলকার প্রমুখের ধারানুযায়ী না হলেও ব্যবহারিক বিচারে সমালোচক ডি নাদকার্নি তাঁকে আধুনিক মনে করেন। পি এস রেগের রঙ্গপাণ্ডুলিক ও চলায়াঅন নতুন দৃষ্টিতে পুরাতনের বিচার। জি গ্যাডগিলের বেদ্যান চৌক্স (প্রহসন) ও জ্যোৎস্না আমি জ্যোতি (দেহ মনের সম্পর্কের দ্বন্দ্ব মনস্তত্ত্ব ও প্রতীক সমন্বয়ে বর্ণিত) মঞ্চ সফল হয়। এস এন নাভরে (দি জু মেটেরীর অনুবাদক) তারা ওয়ালারসে (কাকসা) এম পাড়কি (উদ্ধব) সরিতা পাড়কি (বাধা) বসুন্ধরা পটওয়রধন (এহরকানি) নাটক রচনায় দক্ষতা দেখাছেন। প্রখ্যাত উপন্যাসিক পেন্ডসের মহাপুর (লঘু কমেডি), রাজে মাষ্টার যশোদা গরমবিচা বাপু (যুবক সম্প্রদায়ের হতাশা ক্লান্তির চিত্র) শম্ভু সাঠ্যা চালি (বস্তির চিত্র) রসিকমনকে তৃপ্ত করে। বেশ কিছুদিন আগে নাটক নিয়ে প্রভূত যশ অর্জন করেছেন এম জি রঙ্গনেকর তাঁর আশীর্বাদ কুলবধূ মাঝে ঘর (আমার ঘর) এক হোতা মাতারা (একটা বুড়ো ছিল) প্রভৃতি দ্বারা। ভি ভি শিরওয়াড়কর (কবি কুসুমাগ্রজ) তাঁর কাব্যকরায় ট্রাজিক চেতনায় ও গভীর জীবন অনুধ্যানে স্বতন্ত্র মহিমায় বিদ্যমান—যযাতি আনি দেবযানী কৌন্তেয় নট সম্রাট বৈজয়ন্তী বিদূসক প্রভৃতি নাটক এ প্রসঙ্গেই মনে পড়ে। প্রবীণ সাংবাদিক পি কে আত্রে দীর্ঘদিন ধরেই নাটক লিখে চলেছেন—সাসটাঙ্গ নমস্কার পাণিগ্রহণ তো মী নভেচ (মে আমি নই) মী মন্ত্রী ঝালো (আমি মন্ত্রী ছিলাম) ব্রহ্মচারী বয়া তেথে বায়া (বাবা আর বউ) প্রভৃতি। জনপ্রিয় নাট্যকার বিদ্যাধর গোখলের নাটক সহজবোধ্য অনায়াস গ্রহণযোগ্য ও সংগীতময় এবং হাস্যরসপূর্ণও। তাঁর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ মন্দারমালা স্বর সম্রাজ্ঞী মেঘ মহ্যার প্রভৃতি দর্শকদের বিশেষ আনন্দ বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজের পতন ও দুর্নীতির চিত্র এঁকেছেন সুরেশ খারে মলা উত্তর হাবরে (উত্তর আমার চাই) পাপা সাঙ্গা কুনাচে (কাকে বাবা বলব) কাচ্চো চন্দ্র ক(াচের চাঁদ) প্রভৃতি নাটকে। আদ্য রঙ্গচররায় বিভিন্ন নাটকও সগৌরবে অভিনীত হয়ে চলেছে।

নবীন নাট্যকার সি টি খানোলকর এক বিশেষ সম্ভাবনা নিয়ে মারাঠী মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রচলিত রীতির অনুবর্তন না করে তিনি ভাব ও রূপের এক অভিনব প্রত্যয় সঞ্চার করতে চান। বিভিন্ন প্রবৃত্তির লীলায় সমাকীর্ণ জীবন তার বিপুল বৈচিত্র্য নিয়ে খানোলকরের রচনায় প্রতিভাত। প্রকৃতপক্ষে এক এ্যাবসার্ড দর্শন অক অধিবাস্তবের চেতনা তার নাটককে সমাচ্ছন্ন করে আছে যদিও শূন্যতার অস্তিবাচক প্রত্যয়কেই তিনি গ্রহণ করতে প্রয়াসী ঃ ভারতীয় দর্শনের স্টোই শিক্ষা। তাছাড়া খানোলকরের নাটকসমূহে লোকনাট্যের ঐতিহ্য ও স্মৃতি আশ্চর্য সুন্দর যুক্ত হয়েছে। তাঁর অজস্র নাটকের মধ্যে দুটি নাটক সমালোচকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে—এক শূন্য বাজিরাও এবং অবধ্য। প্রথম নাটকে লেখক আপ্পারাও গৌরী ও বাজীরাও চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবন সম্ভোগের সীমাহীন গভীরতা ও নিঃসীম ব্যাপ্তির চিত্র অংকন করেছেন। তাদের কামনা বাসনার দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিচিত্র লীলা প্রেম প্রীতি বিদ্বেষ ঘৃণার আলিম্পন এক বিস্ময়ের আশ্চর্য রূপ-লোক নির্মাণ করে। বিচিত্র চরিত্র বাজীরাওঃ নিঃসঙ্গ নির্জন বিদূষক চরিত্রটি শূন্যতার মধ্যে পেয়েছে পূর্ণতাকে ব্যর্থতায় অন্বেষণ করেছে সার্থকতাকে আর হাসির মধ্যে বৃত হয়েছে গভীরতম কান্না। অবধ্য নাটক মানুষের স্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব অথবা জীবনের দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব যে অগ্নিদহনে জীবন জলে পুড়ে খাক হয়ে যায় আবার অন্যদিকে তা শুদ্ধ পূর্ণ হেমপ্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। হোমলে এসেছে ঔপন্যাসিক গঙ্গাধর—তার

উপন্যাসিক গঙ্গাধর—তার দুই সত্তার দ্বন্দ্ব তাকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করছে। এক সত্তা জীবনের শক্তি আশাবাদ ও মানবতা-বাদকে প্রকাশ করে, অন্য সত্তা মৃত্যু দুঃখ-চেতনা সিনিসিজমকে প্রকট করে তোলে। একদিকে সে প্রেমিকা নারীকে পবিত্রতায় গ্রহণ করতে চায়, অন্যদিকে কলঙ্কে ঘৃণায় তাকে পরিত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত গঙ্গাধর আত্ম-হত্যা করে কিন্তু তার অন্যায় প্রবৃত্তি কয়েক-জনের মধ্যে বেঁচে থাকে। কিন্তু তার মৃত্যু হলেও তার শুভচেতনা প্রভাবিত করে হোটেল ভৃত্য পান্ধারিকে যে সরল মন সৎ বিবেক আর ঋজু দেহ নিয়ে প্রতিনিশ্চিত হয়। এই কল্যাণচেতনা খানোলকরের নাটকে গভীর নিঃসংশয় প্রত্যয়ে ধ্রুবনক্ষত্রের দীপ্ততে সমাসীন।

তিনটি ধারা মারাঠী নাট্যপ্রবাহকে বিশেষ পুষ্ট করছে—সঙ্গীত নাটক, তামাশা ও আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকের অভিনব ভাব রূপ। সঙ্গীত নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ এবং সার্থক সংগীতের প্রয়োগ নাটকের ডাই-মেনশনকে বাড়িয়ে দেয়। আজও মারাঠী দর্শক নাট্যসঙ্গীতের ভাবে আচ্ছন্ন হয়, উদয় গড়ওয়ালে বি দেশপান্ডে ভার্গব জয়মালা প্রমুখের সঙ্গীত তাকে অপরিসীম আনন্দ দেয়। ব্যঙ্গবিদ্রূপ কৌতুকের প্রয়োগ, রাজ-নৈতিক সামাজিক মন্তব্য সমালোচনা, সাধারণ মঞ্চে সহজ সাজগোশাকে অনায়াসে অভিনয়-রীতিতে তামাশা আধুনিক মঞ্চেও সগৌরবেই সমাদৃত—দেশপান্ডে, দাদা কোন্ডকে দাদু ইন্দুরিকর প্রমুখের নাম এখানে স্মরণীয়। জীবনের দুর্ভেদ্য জটিলতা, প্রশের গ্রহণ গভীরের বিচিত্র অভিব্যক্তি, শূন্যতা অবক্ষয় উদ্দেশ্যহীনতার প্রকাশের জন্য যে এ্যাবসার্ড তত্ত্ব ও দর্শন প্রয়োজন অতি আধুনিক মারাঠী নাট্যকারদের রচনায় তারও প্রয়োগ আছে। এইভাবে বিচিত্র ভাবনার সমন্বয়ে আজকের মারাঠী নাটক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সমাজ সচেতনতায় জীবন অনুধ্যানে ও রূপ সৃজনের চমৎকারিত্বে আধুনিক মারাঠী নাটক আপনার সগৌরব অস্তিত্বকে নিঃসংশয়রূপে অধিষ্ঠিত করেছে।

অপূর্ব সুযোগ !

সিঙ্গার কোম্পানীর অভিনব পরিকল্পনা—

মেরিট*

সেলাই কলটির

দাম শোধ করুন তিন মাসে

লিস্ট প্রাইসের চেয়ে এক পয়সাও বেশী দিতে হবে না

"সত্যিই অদ্ভুত!"

এখন সিঙ্গার কোম্পানী থেকে কিস্তিতে কেনার সুযোগ পাচ্ছেন। কত সুবিধে! বাড়তি খরচ মোটেই নেই।

"আমার অনেক টাকা বেঁচে যাবে!"

হ্যাঁ, দামটা চুকিয়ে দিতে লাগছে তিন মাস। তাহলে ভেবে দেখুন কত টাকা বাঁচাচ্ছেন। তাছাড়া লিস্ট প্রাইসের চেয়ে একটি পয়সাও বেশী দিতে হচ্ছে না। দামটাও কত তাড়াতাড়ি উসুল হয়ে যাচ্ছে দেখে অবাক হয়ে যাবেন। তারপর তো সবসময় কেবল পয়সাই বাঁচাতে থাকবেন।

"একটি পয়সাও বেশী দিতে হয় না!"

সাধারণতঃ কিস্তিতে কিনলে দামটা একটু বেশীই পড়ে। কারণ? কেন না, তাতে কোম্পানীকেও সামান্য বেশী খরচ করতে হয়। তবে তাতে আপনার লাভ বই লোকসান নেই। মেরিট সেলাই কলের কিস্তি দেবার সময় আপনার পয়সাও বাঁচছে! (দেরীর খরচ বেঁচে যায়, তাই)।

"এমন সুযোগ চিরকাল থাকে না!"

ঠিক! সিঙ্গার কোম্পানী বেশী দিন এমন সুযোগ দিতে পারে না। তাই কাছাকাছি সিঙ্গার দোকানে কিম্বা ডীলারের কাছে গিয়ে পুরো খবর জেনে আসুন। শিগ্‌গীর! এ সুযোগ হারাবেন না।

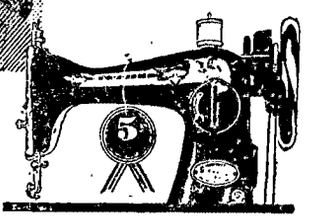

সব্বাই জানেন আমরাই দুনিয়াকে শিখিয়েছি কলে সেলাই করার বিদ্যা।

সিঙ্গার

* সিঙ্গার কোম্পানীর ট্রেডমার্ক।

সিঙ্গার সোইং মেশিন কোং, ২০৭, ডি. এন. রোড, বোম্বাই ৪০০ ০০১

CHAITRA-SM-79 BEN

১৯৭৩ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান হু ইউ লান প্রজাতন্ত্রী চীন) ইডেন উদ্যানের ক্ষুদিরাম হলে ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার প্রাক্কালে অনুশীলন করছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

পঞ্চম টেস্ট খেলা

বোম্বাইয়ের নবনির্মিত ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের শেষ পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২০১ রানে জিতে ভারতের বিপক্ষে ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে ৩—২ খেলায় 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এ নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে যে ৭টি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা হল তার ফলাফল ঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ৬ বার এবং ভারতের রাবার জয় একবার। এই সাতটি টেস্ট সিরিজের ৩৩টি টেস্ট খেলার ফলাফল ঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১৫, ভারতের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ১৫। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ১৯৭১ সালে ১—০ খেলায় (ড্র ৪)। ভারত 'রাবার' জয় করেছিল।

প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ৩০৯ রান সংগ্রহ করেছিল। ফ্রেডেরিকস ১০৪ এবং কালিচরণ ৯৮ রান করে আউট হন। অধিনায়ক লয়েড ৬৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। ২য় উইকেটের জুটিতে ফ্রেডেরিকস (১০৪ রান) এবং কালিচরণ দলের ১১৩ রান তুলে দিয়েছিলেন। এর পর ৩য় উইকেটের জুটিতে কালিচরণ (৯৮ রান) এবং লয়েড দলের ১০৪ রান তুলে দেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের খেলায় রান দাঁড়ায় ৫২৮ (৫ উইকেটে)। চা-পানের সময় দর্শক এবং পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে ঐ দিনের মত খেলা বন্ধ হয়ে যায়। লয়েড ২০১ রান এবং ডেরেক মারে ৬৭ রান করে খেলায় অপরাজিত থেকে যান। অসমাপ্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে লয়েড এবং মারে ১৮৭ রান তুলে ভারতের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে রেকর্ড রান তুলেন। পূর্বের রেকর্ড ১৬৩ রান (সোবার্স এবং সলোমন কানপুর, ১৯৫৮-৫৯)।

অধিনায়ক লয়েড ভারতীয় বোলারদের নির্মমভাবে পিটিয়ে খেলে ডাবল সেঞ্চুরী (২০১ রান) করে অপরাজিত থাকেন। তিনি ১৬০ মিনিটে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী করেন। তাঁর প্রথম সেঞ্চুরীতে ১৩টা বাউণ্ডারী এবং, ২টো ওভার-বাউণ্ডারী ছিল। তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরী করতে ১৮৯ মিনিট সময় লাগে। এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরীতে ছিল মাত্র তিনটে বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসের ৬০৪ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ডেরেক মারে ৯১ রান করে আউট হন এবং লয়েড ২৪২ রান করে নটআউট থেকে যান। তাঁর এই নটআউট ২৪২ রানে ছিল ১৯টা বাউণ্ডারী এবং ৪টে ওভার-বাউণ্ডারী।

৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ডেরেক মারে এবং লয়েড ২৫০ রান তুলেছিলেন। তৃতীয় দিনে ভারত প্রথম ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ১৭১ রান তুলেছিল। এইদিন গাভাস্কার ৮৬ রান করে আউট হন এবং সোলকার ৭৬ রান করে নটআউট থাকেন। খেলার এই অবস্থায় 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে ভারতের আরও ২৩৪ রানের প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থ দিনে ভারতের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৭৩ (৬ উইকেটে)। 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও তাদের ৩২ রানের প্রয়োজন ছিল; এদিকে হাতে জমা ছিল প্রথম ইনিংসের ৪টে উইকেট। চতুর্থ দিনে ভারত আরও চারটে উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ১৭১ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে ২০২ রান যোগ করেছিল। সোলকার সেঞ্চুরী (১০২ রান) করেন। সোলকার ২৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলে এই প্রথম সেঞ্চুরী করলেন। এইদিন সোলকার তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে হাজার রান পূর্ণ করেন। বিশ্বনাথের দুর্ভাগ্য, তিনি সেঞ্চুরীর দোরগড়ায় এসে ৯৫ রানের মাথায় আউট হন। গায়কোয়াড় ৫১ রান করে অপরাজিত থেকে যান। ৫ম উইকেটের জুটিতে বিশ্বনাথ (৯৫ রান) এবং গায়কোয়াড় ১৭৫ মিনিট খেলে দলের অতি মূল্যবান ১২১ রান তুলে দেন।

পঞ্চম দিনে ভারতের ১ম ইনিংস ৪০৬ রানের মাথায় শেষ হয়। প্রবীণ খেলোয়াড় ল্যান্স গিবস ৯৮ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে ৪১ বছর বয়সে অসাধারণ বোলিংয়ে সাফল্যের পরিচয় দেন। এরপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চা-পানের সময় ৩ উইকেটে ২০৫ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪০৪ রান তুলতে ভারত ২য় ইনিংস খেলতে নেমে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৫৩ রান সংগ্রহ করে।

খেলার শেষ ৬ষ্ঠ দিনে মধ্যাহ্নভোজের ৭২ মিনিট পর ভারতের ২য় ইনিংস ২০২ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২০১ রানে জিতে যায়। ৭ম উইকেটের জুটিতে গায়কোয়াড় (৪২ রান) এবং প্যাটেল (নটআউট ৭৩ রান) ৬২ মিনিট খেলে দলের অতি মূল্যবান ৭২ রান তুলে দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ১—০ খেলায় (ড্র ৪) যে 'রাবার' জয় করেছিল তা ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পুনরুদ্ধার করলো।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ঃ ৬০৪ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ফ্রেডেরিকস ১০৪ কালিচরণ ৯৮, লয়েড নটআউট ২৪২ এবং ডেরেক মারে ৯১ রান। ঘাবাড়ি ১৪০ রানে ৪ চন্দ্রশেখর ১৩৫ রানে ১ এবং বেদী ৯৮ রানে ১ উইকেট)

ও ২০৫ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গ্রিনিজ ৫৪ রান। ঘাবাড়ি ৯২ রানে ২ উইকেট)

ভারত ঃ ৪০৬ রান (গাভাস্কার ৮৬, সোলকার ১০২, বিশ্বনাথ ৯৫ এবং গায়কোয়াড় ৫১ রান। গিবস ৯৮ রানে ৭ উইকেট)

ও ২০২ রান (গায়কোয়াড় ৪২ এবং প্যাটেল ৭৩ নটআউট। হোল্ডার ৩৯ রানে ৬ এবং গিবস ৪৫ রানে ২ উইকেট)

ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়

সদ্য সমাপ্ত ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন—খেলা ৫, ইনিংস ৯, নটআউট ১ বার, মোট রান ৬৩৬ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৪২ নটআউট এবং গড় ৭৯-৫। এই ব্যাটিং তালিকায় উভয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন ভারতের জি বিশ্বনাথ—খেলা ৫, ইনিংস ১০, নটআউট ১ বার, মোট রান ৫৬৮ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩৯ এবং গড় ৬৩-১১। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান (৬৩৬ রান) এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান (২৪২ নটআউট) করেছেন ক্লাইভ লয়েড। ভারতের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান (৫৬৮ রান) এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান (১৩৯ রান) করেছেন বিশ্বনাথ।

বোলিংয়ের গড় তালিকায় উভয় দলের পক্ষে শীর্ষস্থান এবং সর্বাধিক মোট উইকেট পেয়েছেন অ্যাণ্ডি রবার্টস—মোট উইকেট ৩২ এবং গড় ১৮-২৮।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ল্যান্স গিবস ২১টি উইকেট (গড় ২১-৬১) এবং হোল্ডার ১৭টি উইকেট (গড় ১৮-৫৩) পেয়েছেন। ভারতের পক্ষে বোলিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন বেদী—১৫টি উইকেট এবং গড় ৩৩-২৬। প্রসন্ন পেয়েছেন ১৫টি উইকেট (গড় ৪০-০৬) এবং চন্দ্রশেখর ১৪টি উইকেট (গড় ৪১-৩৫)।

উইকেট-কিপিং

ডেরেক মারে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ঃ
ক্যাচ ১৫ এবং স্টাম্পিং ১

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (ভারত) ঃ
ক্যাচ ৯ এবং স্টাম্প ১

ফিল্ডিং

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ঃ ক্যাচ ৭—কালিচরণ

ভারত ঃ ক্যাচ ৮—প্যাটেল ও সোলকার (প্রত্যেকে)

রবার্টসের রেকর্ড

ভারতের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অ্যাণ্ডি রবার্টস ৩৩টি উইকেট নেওয়ার সূত্রে স্বদেশের পক্ষে যে-কোন দেশের বিপক্ষে টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার পূর্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫০ সালের টেস্ট সিরিজে ন্যাটা স্পিন বোলার আলফ ভ্যালেন-টাইন ৩৩টি উইকেট নিয়ে যে-কোন দেশের বিপক্ষে টেস্টের এক সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার রেকর্ড করেছিলেন।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

৫ম টেস্ট ক্রিকেট খেলা

এডিলেডে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৫ম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১৬৩ রানে জিতে ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে ৪—০ খেলায় (ড্র ১) এগিয়ে গেছে।

বৃষ্টির জন্যে প্রথম দিনে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক মাইক ডেনেস টসে জিতে ভিজে উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট করতে দেন। অস্ট্রেলিয়ার খেলার সূচনা খুবই খারাপ হয়েছিল—মাত্র ৮৪ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। দ্বিতীয় দিনেই ৩০৪ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের আণ্ডারউড ১১৩ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইংল্যাণ্ড এইদিন কোন উইকেট না খুইয়ে ২ রান করে।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ১৭২ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমে দুটো উইকেটের বিনিময়ে ১১১ রান তুলে ২৪৩ রানে এগিয়ে যায়।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের ২য় ইনিংসের ২৭২ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। রেডপাথ ৫২ এবং মার্শ ৫৫ রান করেন। ওয়াল্টার্স ৭১ রান করে অপরাজিত থাকেন। আণ্ডারউড ১০২ রানে ৪টে উইকেট পান। ইংল্যাণ্ড ৪০৪ রানের ব্যবধানে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়—তাদের ৯৪ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে।

শেষ পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসে ২৪১ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ১৬৩ রানে জিতে যায়। অ্যালেন নট ১০৬ রান করে নটআউট থাকেন। টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নটের এই প্রথম সেঞ্চুরী।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৩০৪ রান (ওয়াল্টার্স ৫৫ এবং জেনার ৭৪ রান। আণ্ডারউড ১১৩ রানে ৭ উইকেট)

ও ২৭২ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রেডপাথ ৫২, ওয়াল্টার্স ৭১ নটআউট এবং মার্শ ৫৫ রান। আণ্ডারউড ১০২ রানে ৪ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড ঃ ১৭২ রান (মাইক ডেনেস ৫১ রান। লিলি ৪৯ রানে ৪, টমসন ৫৮ রানে ৩ এবং ম্যালেট ১৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৪১ রান (নট ১০৬ নটআউট এবং ফ্লেচার ৬৩ রান। লিলি ৬৯ রানে ৪, ওয়াকার ৮৯ রানে ৩ এবং ম্যালেট ৩৬ রানে ২ উইকেট)

দেশবিদেশের খেলা

রোগা ছেলের কীর্তি

হাড় জিরজিরে রোগা ছেলেটি কাঙালের মত এসে রোজ দাঁড়িয়ে থাকত সুইমিং পুলের আনাচে-কানাচে। ছ ফুট আড়াই ইঞ্চি লম্বা ছেলেটি যখন দ্রুতপায়ে হাঁটে তখন মনে হয় যেন হাওয়ায় উড়ছে। লম্বা লিকলিকে দশ বছরের এই কিশোর একদিন মনের অবদমিত বাসনা প্রকাশ করল সুইমিং পুলের প্রশিক্ষককে। প্রশিক্ষক ত ছেলেটির কথা শুনে বিস্মিত। বলে কি। দুর্বল শীর্ণকায় চেহারা নিয়ে সাঁতার শিখবে! এও কি হতে পারে। প্রশিক্ষকের প্রত্যাখ্যানে ছেলেটির উজ্জীবিত উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। চোখের জল চেপে সে যায় বাধ্যতামূলক সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এখানকার কোচ মারলিন্স গ্রোহে ছেলেটির অনুশীলনে অভূতপূর্ব দক্ষতা দেখে বিশেষ দৃষ্টি দেন। বিশেষতঃ ব্যাকস্ট্রোকে অসামান্য সম্ভাবনা দেখে গ্রোহে উৎসাহিত হন।

পাকা জহুরীর মত গ্রোহে সেদিন খাঁটি সোনা চিনতে ভুল করেননি। কয়েক বছরের মধ্যেই এই অধ্যবসায়ী শীর্ণকায় কিশোর রোগা হাড়ে ভেলকী খেলিয়ে সুইমিং পুলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পূর্ব জার্মানীর স্বনামধন্য এই কিশোরের নাম রোনাল্ড ম্যাথেজ।

মিউনিখ অলিম্পিকে যখন দড়ি-টানাটানির মত সোনা জয়ের জন্যে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তখন রোনাল্ড ম্যাথেজ ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনা কুড়িয়ে শুধু স্বদেশের মানকেই বজায় রাখেননি স্বপ্রতিষ্ঠ সুনামকেও অক্ষুণ্ণ রাখেন। কারণ মিউনিখের আগে মেকসিকো অলিম্পিকের ঐ দুই বিভাগেই ম্যাথেজের স্থান ছিল সর্বাগ্রে।

পূর্ব জার্মানীর লিপজিগ কলেজের ছাত্র এবং এস সি টারবাইন আরফার্ট ক্লাবের সদস্য ম্যাথেজ ১৯৭২-এর অলিম্পিকে স্বকীয় রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন নজীর রচনা করেন। তিনি ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক ৫৬-৬ সেকেন্ডে ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক ২:০২-৮ সেকেন্ডে অতিক্রম করেন। ১৯৬৮ সালের মেকসিকো অলিম্পিকে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ৫৮-৭ ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ২:০৯-৬ সেকেন্ডে ম্যাথেজ প্রতিযোগিতা শেষ করেন আর গত অলিম্পিকে তার নিকটতম প্রতিযোগী আমেরিকার মাইকেল শ্টাম ১০০ মিটার ৫৬-৭ সেকেন্ডে ও ২০০ মিটার ২:০৪-১ সেকেন্ডে সমাপ্ত করে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী।

রিলে সাঁতার ম্যাথেজের প্রিয় ইভেন্ট। ৪০০ মিটার মেডলী রিলে এবং ৯০০ মিটার মেডলী রিলে রেসে প্রারম্ভিক প্রতিযোগী হিসেবে ম্যাথেজ-এর বিশ্ব রেকর্ড রয়েছে। ১০০ মিটার মেডলীতে ৫৬-৩ সেকেন্ডে নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করে স্বীয় স্থান অক্ষুণ্ণ রাখেন। বলে রাখা ভাল ইতিপূর্বে প্রায় পঞ্চাশবার ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ১০০ মিটার সাঁতার শেষ করেছেন। সুতরাং মেকসিকো বা মিউনিখ অলিম্পিকে রোনাল্ড ম্যাথেজের সাফল্য কোন অবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আর মিউনিখ অলিম্পিকে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে তৃতীয় ও ১০০ মিটার মেডলী রিলেতে দ্বিতীয় হওয়ার পেছনে যে ম্যাথেজের অবদান অনেকখানি তা বলাই বাহুল্য। কারণ রিলে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম প্রতিযোগী হিসেবে অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে ম্যাথেজ তার সতীর্থদের অনুকূল পরিস্থিতিতে পৌঁছে দিয়েছে।

১৯৬৬ সালে এক প্রতিযোগিতায় ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে প্রথম হয়ে ম্যাথেজ সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে একনাগাড়ে পূর্ব জার্মানীর বর্ষসেরা সাঁতারুর আখ্যায় ভূষিত। এছাড়া ১০০ ও ৪০০ মিটার মেডলী রিলেতে প্রথম প্রতিযোগী হিসেবেও ম্যাথেজ অনন্য। ১০০ মিটার বাটার ফ্লাইতেও ইউরোপীয়ান রেকর্ড সৃষ্টিকারী। ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত স্বদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ম্যাথেজ ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ৫৬-৯৭ ও ২০০ মিটার ২:০৩-৪১ সেকেন্ড অতিক্রম করে নিজেকে সেরা প্রতিপন্ন করেন। অন্তর্দেশীয় এই প্রতিযোগিতায় ম্যাথেজ এস সি টারবাইন আরকার্ট ক্লাবের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন।

স্বীয় সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে রোনাল্ড ম্যাথেজ বলেন—আমার দেশই আমাকে চরম সার্থকতার দ্বারে এগিয়ে দিয়েছে। স্বদেশের সাহায্য ছাড়া আমার প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ কোনদিন হত কিনা কে জানে।

সন্দেহ নেই-স্বনিষ্ঠ ম্যাথেজ-এর জীবনে সাঁতারই মূলমন্ত্র। জীবনমন্ত্র। কিন্তু সাঁতার ছাড়াও ব্যক্তিগত জীবনে ম্যাথেজ বিচিত্র রসের রসিক। বুদ্ধিদীপ্ত মেধাবী ছাত্র। একনিষ্ঠ পাঠক। নানান স্বাদের বই পড়েন। তবে জুলিয়েন ভারেন অ্যালেকজান্ডার ডুমাসের উপন্যাস এবং সমসাময়িক যে কোন বিষয়ের ওপর লেখা রচনা পাঠে বিশেষ আগ্রহী। মোটর সাইক্লিং ও মোটর ড্রাইভিং প্রিয় নেশা। হাস্যরসাত্মক ছায়াছবি দেখে অবসর বিনোদন করতে ভালবাসেন। দীর্ঘ কঠিন অনুশীলনের পর মিউজিকের ছন্দে দেহকে জিরিয়ে নেন। বিভিন্ন রস সম্ভারে পরিপুষ্ট রোগা লিকলিকে ছেলে ম্যাথেজকে দেখে আজও আপাতঃ দৃষ্টিতে মনেই হয় না যে সে একজন খ্যাতিমান দক্ষ সাঁতারু আর ভাবতে বিস্ময় লাগে যে এই রোগা পাতলা আকৃতির ছেলে পর পর দুই অলিম্পিকে সেরা।

—প্রশান্ত দা

মাঠের নায়ক

অমিতাভ রায়

বলতে গেলে প্রায় ধূমকেতুর মত আবির্ভাব। সোরগোল তোলা, রীতিমত সাড়া জাগানো প্রতিষ্ঠা। ভারতের ক্রিকেট অনুরাগীরা, বিশেষতঃ আমরা বাঙ্গালীরা নতুন আশায় বুক বেঁধেছিলাম কিছু পেয়েছি বলে। আমাদের এই নতুন প্রত্যাশা ঘরের ছেলে অমিতকে কেন্দ্র করে।

অমিত অর্থে অমিতাভ রায়। মিডিয়াম ফাষ্ট বোলার। ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান পটভূমিকায় ফাষ্ট বা মিডিয়াম ফাষ্ট বোলারের অভাব যে মুহূর্তে চরম, ঠিক সেই মুহূর্তে অমিতের অনিবার্য আবির্ভাব। বাংলা তথা ভারত অমিতকে সেদিন স্বাগত জানিয়েছিল অন্তর দিয়ে। সুটে ব্যানার্জির পর ফাষ্ট বোলার বলতে বাঙ্গালীদের মধ্যে আর যখন কোন মুখের সন্ধানই মিলছিল না তখন তুলনামূলকভাবে সমান্তরাল গুণপনার অধিকারী না হলেও অমিত স্বস্তি এনেছিলেন। সুটে ব্যানার্জির বেনিফিট ম্যাচে ইডেনে তাঁরই উত্তরসূরী নতুন আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন—নৈরাশ্যভরা ক্রিকেট অনুরাগীদের হৃদয়ে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অমিতাভ তাঁর সেদিনের প্রতিশ্রুতি, প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখতে পেরেছেন কি? ঐ প্রশ্নের উত্তর অমিতাভ নিজেই দেবেন। হয়তো আজ নয় কিন্তু আগামীকাল নিশ্চয়ই।

অসামান্য নিষ্ঠা, অফুরন্ত উৎসাহ, নিটোল প্রত্যয় এবং অসীম আত্মবিশ্বাসকে মূলধন করে অমিতাভ ক্রিকেটের প্রথম ধাপ থেকে ক্ষিপ্রতায় প্রায় শেষ ধাপে পা রেখেছেন বোলিংয়ের কলাকৌশল, কার্যকারিতা রপ্ত করার সুযোগ এসেছিল কৈশোরেই হাজারীবাগ সেন্টজেভিয়ার্স বা কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়ার সময়। অমিতের জন্ম ১৯৫৩ সালের ১৬ মার্চ কলকাতায়। বাবা দেবকুমার রায়ের আদি

নিবাস অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বাইশারী গ্রামে। অমিতাভ অবশ্য সে সব কথা শুধু মা (শ্রীমতী জয়ন্তী রায়) বাবার মুখেই শুনেছেন। বর্তমান আস্তানা দক্ষিণ কলকাতার সুইনহো স্ট্রীটে। বাবা ব্যবসায়ী লোক, তারাতলা রোডে ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির কারখানা আছে। স্বচ্ছল মানুষ। সংসার ছোট। দেবব্রতর দু ছেলে এক মেয়ে। তিনটি সন্তানের মধ্যে অমিত মেজ। দাদা বাবার সঙ্গেই ফ্যাকটরীর কাজ দেখা-শোনা করেন।

মডেল হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর বিদ্যাসাগর কলেজে (কলা প্রথম বর্ষ) ভর্তি হয়েছেন অমিতাভ রায়। স্কুলে পড়ার সময় ১৯৬৯, ১৯৭০, ৭১ ৭২র বাংলা স্কুল দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগেই কলকাতার ক্রিকেট জহুরীদের চোখে পড়ে যান। ১৯৬৬ সালে রণজি ট্রফিতে খেলার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কিন্তু অসুস্থতার জন্য মনের সাধ অমিতের মনেই রয়ে যায়। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট আসরে প্রথম পদার্পণ ১৯৭৪-৭৫ সালে। কলকাতা পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মূল সেমিফাইনাল দিল্লীর কাছে হেরে যায়। পাঁচটি ম্যাচে অমিতের সংগ্রহ একশটি উইকেট। ১৯৭৪ সালটা অবশ্য তার প্রায় বসেই কেটেছে হাতে চোটের জন্য। ১৯৭২-৭৩ সালে রণজি ট্রফিতে আবার ডাক পেয়ে বিহারের বিরুদ্ধে দু ইনিংসে পাঁচটি উইকেট নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আসামের বিরুদ্ধে উইকেট মাত্র একটি। আন্তঃ আঞ্চলিক খেলায় পুণায় মহারাষ্ট্রের তিনটি উইকেট (রাজু ভালেকার, আনোয়ার শেখ এবং নিকি সালমানা) পান।

ঐ বছরই এম-সি-সির বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল দলে অতিরিক্ত খেলোয়াড় রূপে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাছাই ভারতীয় লেগ হয়ে ইরাণী ট্রফিতে ২টি উইকেট পেয়েছিলেন অমিতাভ। দলের নেতা ছিলেন প্রসন্ন। অন্যান্য সহ খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঘাবাড়ি ও চন্দ্রশেখর। প্রতিপক্ষ বোম্বাই।

ইডেনে, সুটে ব্যানার্জি বেনিফিট ম্যাচে বেদীর নেতৃত্বাধীন বাছাই একাদশের খেলোয়াড় হিসেবে ভারতীয় টেস্ট দলের চারটি উইকেট পেয়েছিলেন প্রথম ইনিংসে। উইকেট চারটি হৌল মানকাদ, ওয়াদেকার, ব্রিজেশ প্যাটেল ও বিশ্বনাথের। দ্বিতীয় ইনিংসে সংগৃহীত উইকেটের সংখ্যা দুটি বিশ্বনাথ ও মানকাদ। ঐ বছর কারমারকার বেনিফিট ম্যাচে (পুণা) গাভাসকার ও পার্থসারথি শর্মাকেও আউট হতে হয়েছিল অমিতাভের বলেই। ইরাণী ট্রফির পর দলীপ ট্রফির খেলায় দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে অমিতাভ ছিলেন পূর্বাঞ্চলের অন্যতম খেলোয়াড়। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ঐ খেলায় প্রথম ইনিংসে তিনি দুটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে একটি উইকেট পান।

ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে অমিতাভ কালীঘাটের সুনীল দাশগুপ্ত এবং দাতু ফাদকারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। দুজনই পরম স্নেহে অমিতকে লালন করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁদের যৌথ প্রয়াসেই অমিত বাংলার ক্রিকেট অঙ্গনে এসে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। অমিতাভ কলকাতা ময়দানের ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রথমে খেলেছেন ১৯৬৮-৬৯ সালে ক্রিকেট ক্লাব অব ভবানীপুরের হয়ে। পরের বছর দক্ষিণ কলকাতা দলে। তারপর এক বছর কালীঘাটে। এই কালীঘাটে খেলার সময় লীগের আসরে ৯০ রানে বি এন আর-এর ইনিংস মুড়িয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যতঃ অমিতাভই—পাঁচ পাঁচজন জাঁদরেল ব্যাটসম্যানকে আউট করে। কালীঘাটের পর চলে আসেন অমিতাভ স্পোর্টিং ইউনিয়নে। বর্তমান ঐ ক্লাবেই খেলছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অমিতাভ ভারত বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রমা গুহঠাকুরতার স্নেহধন্য। স্নেহের কারণও অবশ্য রয়েছে। রমাদেবীর পুত্র শ্রীঅমিতের সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে সে।

অমিত কি শুধু বোলারই? না, অমিতাভ প্রয়োজন ভাল ব্যাটসম্যানও বটে। ব্যাটিং দক্ষতার নজীর রেখেছেন ১৯৭৩-৭৪ সালে রণজি ট্রফির খেলায় আসামের বিরুদ্ধে। বাংলার প্রথম চারটি উইকেট মাত্র আট রানে পড়ে যাওয়ার পর (গোপাল বসু, গুণী গোস্বামী, রাজা মুখার্জি ও পলাশ নন্দী) রাজু মুখার্জি ও সুব্রত গুহঠাকুরতা দলকে অনেকটা টেনে নিয়ে গেলেন। ওঁরা আউট হওয়ার পর উইকেটে ব্যাট হাতে দাঁড়ালেন অমিতাভ রায় ও দিলীপ দোসী (দুজনেই স্পোর্টিং ইউনিয়নের)। রান টেনে নিয়ে গেলেন ২২০র কোঠায় (অমিতাভ ৩৯, দিলীপ দোসী ৩০ অপরাজিত)। এমনি অমিত-বিক্রমে আর একবার ব্যাট ধরেছিলেন ১৯৭৪ সালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে। দক্ষিণাঞ্চল ৭৪ রানে আউট হয়ে যাওয়ার পর ১৩২ রানে পূর্বাঞ্চলের আটটি উইকেট পড়ে যাওয়ার পর রাজু মুখার্জি ও অমিতাভ রান টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৬৯ পর্যন্ত। অমিতাভর সংগ্রহ ২০। খেলায় অবশ্য পূর্বাঞ্চলের পরাজয় ঘটেছিল।

১৯৭৪-৭৫ মরশুমে হায়দর বাদে ওয়াজির সুলতান ট্রফিতে এবং ইন্দোর গুয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়ে খেলছেন। অমিতাভর অভিমত : অ্যান্ডি রবার্টস্‌কে নিয়ে যতই হৈ-চৈ করি না কেন, অ্যান্ডি হল গিলক্রিস্টের ধারে কাছে নয়।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

গোরাঙ্গ নিয়েছে। ছমাস ধরে সে তক্কে তক্কে ছিল। সেদিন গল্পের আসরে অলৌকিক গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পর আর দেরী করেনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গান শুনিয়ে ঘুমন্ত নিতাইকে তুলেছে খিল দেবার নাম করে খিল খুলে রাস্তায় বেরিয়েছে। নামবার সময়ে দরজার নীল পর্দাটা টেনে নিয়ে গেছে পাগড়ি বাঁধবে বলে। পরনের ধুতি গায়ে জড়িয়েছে। মিউজিয়াম থেকে মিশরীয় বাজনা নিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দ সৃষ্টি করে ফানুস ভেঙে দিয়েছে দূর থেকে। সোনার মাছ আগেই সরিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল মাছেরা উড়ে পালিয়েছে।

হুঁশিয়ার গিরিবালা সারদাচরণের অবর্তমানে নিজেই খিল তুলে দিয়েছিল বলেই খিল খুলতে গিয়ে শব্দ করে ফেলে-ছিল গোরাঙ্গ।

খেলার জগতে মেয়ে

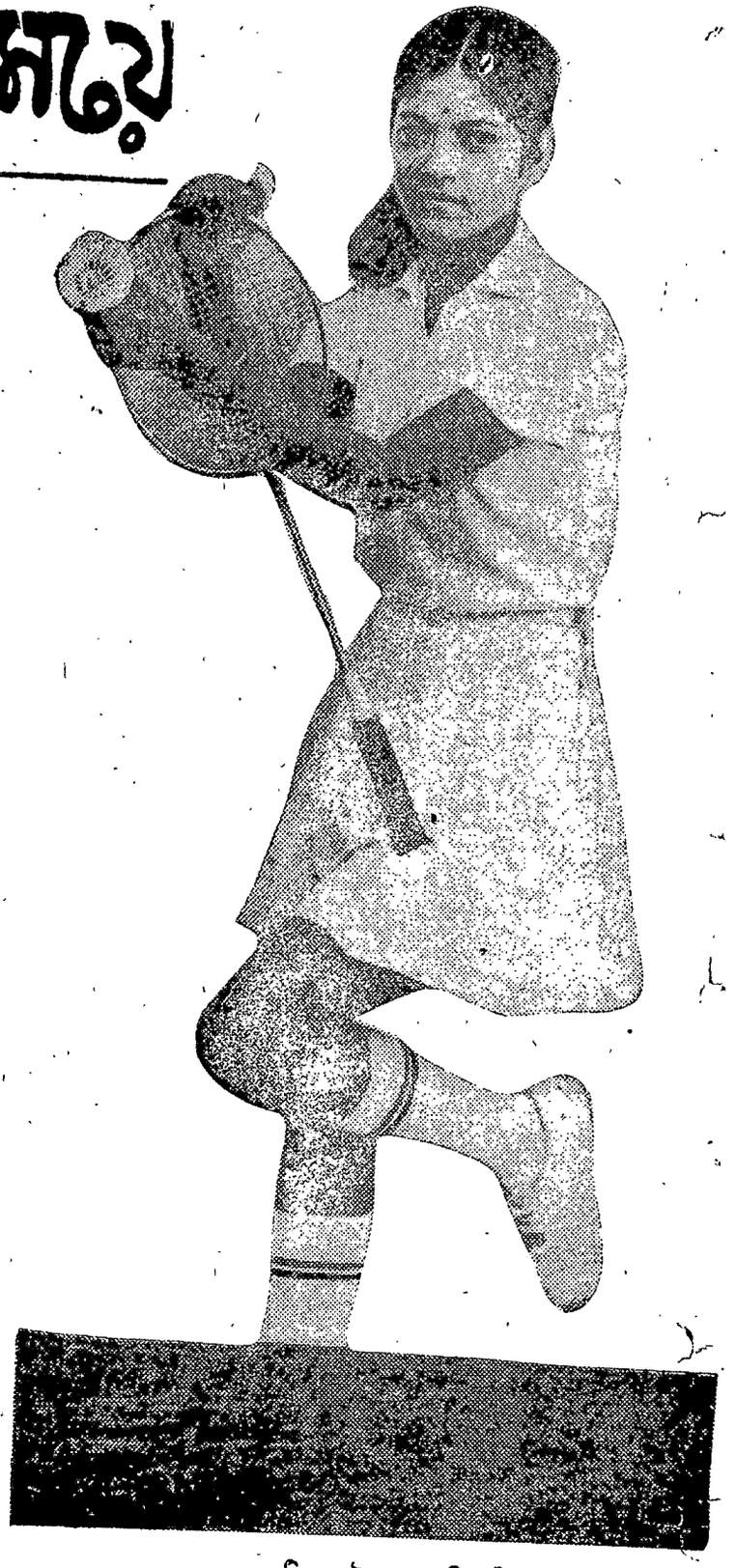

ব্যাডমিণ্টনে বিশিষ্ট নাম
তুলসী ব্যানার্জী

কলকাতায় অনেক পাড়াতেই বাড়ীর পাশে খোলা জমি থাকলে পাড়ার লোকে সেখানে ব্যাডমিন্টন কোর্ট কেটে খেলেন। পার্ক সার্কাসের ওরিয়েন্ট রোডে বাড়ীর কাছে এই রকমই এক ফাঁকা জমিতে কোর্ট তৈরী করে খেলতেন হরিলাল ব্যানার্জী ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা। তাঁদের খেলা শেষ হলে যেসব ছেলেমেয়ে সেই কোর্টে বড়দের বাতিল করা সাটল কক নিয়ে খেলত হরিলালবাবুর মেয়ে তুলসীও থাকত তাদের মধ্যে। বাবা বা মায়ের র‍্যাকেটটা নিয়ে সেও নেমে পড়ত। এইভাবেই তুলসী ব্যানার্জীর ব্যাডমিন্টন খেলার সূত্রপাত। সেটা বোধহয় ১৯৬৬ সাল তুলসী তখন দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। ঐ সময় হরিলালবাবু ওখানে এক প্রদর্শনী ব্যাডমিন্টনের আয়োজন করেন। বাংলার তখনকার বেশ কয়েকজন গুণী খেলোয়াড় ঐ আসরে উপস্থিত হন। মেয়েদের মধ্যে ছিল একমাত্র অনুরাধা সরকার। আর কোন মেয়ে না থাকায় সেদিন ঐ প্রদর্শনী খেলায় তুলসীকে নামান হয় অনুরাধার বিরুদ্ধে। তুলসী ঐ খেলার বিষয়ে বলে জানেন সেদিন আমি অনুরাধাদিকে হারিয়ে দিই। তখন পঙ্কজ-কাকু (পঙ্কজ গুহ) রথীন সোম এঁরা সবাই আমাকে নিয়মিত ব্যাডমিন্টন খেলার উপদেশ দিলেন। তাঁরা বললেনঃ বাংলায় ব্যাডমিন্টনে কুশলী মেয়ের খুবই অভাব। তুমি খেলা সুরু করে দাও। আমার বাবাও ওঁদের কথায় আমার খেলার ব্যবস্থা করে দেন।

তখন থেকেই তুলসী বাংলার নামী খেলোয়াড় বৈদ্যনাথ দাসের কাছে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। আর মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলার চর্চা করতে থাকে।

ফল পেতেও দেরী হয়নি। পরের বছরই আগ্রাতে জাতীয় আসরে তুলসী সুব্রত ব্যানার্জীর সহযোগিতায় মিকসড ডাবলসে রেয়ার্সআপ লাভ করে।

'৬৮-তে হায়দরাবাদে স্কুল ক্রীড়ার আসরে তুলসী পশ্চিম বাংলার ব্যাডমিন্টন দলের নেত্রী হয়। সঙ্গে ছিল ইলোরা মজুমদার। তুলসী তার সিঙ্গলস খেলায় জেতার শেষ পর্যন্ত বাংলা দল ব্রোঞ্জ লাভ করে।

৬৮-তেই আসানসোলে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবংগ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় তুলসী বালিকা বিভাগে তো বটেই মহিলা সিংগলস মহিলা ডাবলস ও মিকসড ডাবলসে বিজয়িনীর সাফল্য লাভ করে দুর্লভ চতুর্মুকুটের অধিকারিণী হয়। তুলসীকে সেদিন সন্ধ্যায় পর পর পাঁচটি খেলায় নামতে হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায় ওর প্রাণশক্তি কি সুপ্রচুর। তুলসী বালিকা বিভাগে থাকার সময় মহিলা বিভাগেও নেমেছে এবং জয়ী হয়েছে। পরের বছর (৬৯-এ) কলকাতার জাতীয় ব্যাডমিন্টনের আসর বসে। এবার জুনিয়র (বালিকা) বিভাগে সাফল্যের সূত্রে তুলসী জাতীয় পর্যায়ে ঐ বিভাগে দু নম্বর খেলোয়াড়রূপে চিহ্নিত হয়। ওর বিভাগে পরলা নম্বরের স্বীকৃতি পেয়েছিল মহারাষ্ট্রের মরীন ম্যাথিয়াস।

১৯৭০-থেকে তুলসী খেলছে বিহার রাজ্যের পক্ষ হয়ে। কোন পরিস্থিতিতে তুলসীকে বাংলা ছেড়ে বিহারের প্রতিনিধিত্ব বেছে নিতে হল সে এক অতি দুঃখজনক ব্যাপার।

আমাদের দেশের তথা রাজ্যের ক্রীড়া-সংস্থাগুলি যতদিন না সুস্থ সচেতন খেলোয়াড়ী বিবেক-সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের পরিচালনাধীনে আসছে ততদিন তুলসীর মত অনেককেই অবিচার ও সাংগঠনিক দুর্নীতির শিকার হতে হবে। সেসময় কয়েকজন প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক তুলসীর প্রতি পশ্চিম বাংলার ব্যাডমিন্টন সংস্থার অবিচারের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। বাংলার পক্ষে খেলতে না পেয়ে তুলসী এখনও খুবই দুঃখিত এবং সংগঠকদের আচরণে ক্ষুব্ধ। ওর বাবা হরিলালবাবুও সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনা বর্ণনা করলেন যা শুনে মনে হয় পশ্চিম বাংলায় ব্যাডমিন্টন সংস্থার কয়েকজন কর্মকর্তার কয়েক বছরের কার্যকলাপের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তা হলেই সাংগঠনিক গলদের সূত্র জানা যাবে। রাজ্য সরকার এখন খেলা-ধূলার নানা শাখায় সক্রিয় সহযোগিতা করছেন—তাই এই তদন্ত সরকারী পর্যায়ে হলেই বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে।

যাই হোক ওয়ারেন্ট রোর ৪।২ নম্বর বাড়ীর ৬ নম্বর ফ্ল্যাটে বসে তুলসীর কথা শুনেছিলাম। ঘরের পরিবেশ হাল্কা করার জন্য আবার খেলার কথা জিজ্ঞাসা করি।

—তুমি বিহারের হয়ে খেলছ কোন অছিলে।

—আমার জন্ম দেওঘরে। জন্মসূত্রে আমি বিহার রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারিণী। হ্যাঁ যা বলছিলাম—৭০ সালে পাটনায় বিহার রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশীপে প্রখ্যাত সরোজিনী আন্তেকে (বর্তমানে গোখতে) ফাইনালে হারিয়ে দিই। ঐ বছরই জব্বলপুরে মধ্যপ্রদেশের প্রধান টুর্ণামেন্টে মেধা ভারত ব্যাডমিন্টন) বালিকা বিভাগে বিজয়িনী হই।

কেরলে দক্ষিণাঞ্চলিক আসরেও একই বিভাগে তুলসী বিজয়িনী হয়।

এরপর তুলসী আসে কলেজে। ১৯৭১-এ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টনে তুলসীর ওপর কলকাতা দলের ভার পড়ে। শিলিগুড়িতে পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিযোগিতায় কলকাতাই বিজয়ী হয়। কিন্তু বরকতীতে নিখিল ভারত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় কলকাতা মহারাষ্ট্রের কাছে হেরে যায়। তবে তুলসী এই আসরে তার দুটি সিংগলসে জয়ী হয়েছিল। এই প্রতিনিধিত্বের সূত্রে তুলসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু অর্জন করে। '৭২-এ তুলসী বিহার রাজ্যে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখে। বিহার ছাড়াও ঐ বছর গোরক্ষপুরে আন্তঃ আঞ্চলিক আসরে তুলসী ও সরোজিনীকে নিয়ে গঠিত বিহার মহিলাদল রাণার্স-আপ হয়—বিজয়ী হয় মহারাষ্ট্র। পূর্বাঞ্চলে মহিলা বিভাগে বিজয়ী বিহার দলে তুলসীই ছিল প্রধান কুশলী। গত বছরও বিহারে তুলসী রাজ্য বিজয়িনী হয়েছে—হারিয়েছে সরোজিনী গোখতেকে। তবে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় আসরে তুলসী আবার কলকাতার ছাত্রী দলের নেতৃত্ব করে। এবারও তুলসী সবগুলি সিঙ্গলসে জয়ী হলেও দলের সতীর্থরা সুবিধা করতে না পারায় কলকাতাকে রবিশংকরের কাছে হারতে হয়। রবিশংকরই চ্যাম্পিয়ান হয়। তুলসীর সঙ্গিনী ছিল বিদ্যাসাগরের সুপ্রিয়া দেবরায়। অনুশীলনের সুযোগ না হওয়ায়—তুলসী বলে, ডাবলসের খেলায় বোঝাপড়ার অভাবে আমরা ব্যর্থ হলাম।

বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের কর্তারা তুলসীকে তাদের ওখানে পড়ার প্রস্তাব দেন। তাঁরা ওর ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ অনুশীলনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতিও দেন। এই প্রসঙ্গে তুলসী জানায় ওখানে বাধ্যিক পরীক্ষা কোন খেলোয়াড়ের খেলায় বাধা সৃষ্টি করে না। প্রতিনিধিত্বমূলক খেলার জন্য যখন কোন ছাত্র বা ছাত্রী বাছাই হয় তখন তার পরীক্ষা পরে নেবার ব্যবস্থাও করা হয়। এ-বছর তুলসী বি-এ পার্ট-টু পরীক্ষা দিল। এই সময় উবের কাপের খেলায় দল গঠনের উদ্দেশ্যে বাছাই ও অনুশীলনের জন্য পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তন থেকে তুলসীকেও ডাকা হয়েছিল। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ওর পক্ষে এই ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারী ক্ষোভের সঙ্গে তুলসী বলে দেখুন দিকি পার্ট-টু পরীক্ষার জন্য উবের কাপে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হারাতে হল। এ সুযোগ কি আর কখনও পাব?

কথায় কথায় রাজ্যের ও দেশের খেলার মানের কথা উঠল।—এ রাজ্যে অনুরাধাদি খুব ভাল খেলেন। কিন্তু ওঁর পর আর কোন খেলোয়াড়ের ক্রীড়ামানের তেমন উন্নতি হয়নি। একবার ওঁর কাছে হেরে গিয়েছিলাম। তবে পরে ওঁকে হারিয়েছি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বোম্বাই বা মহারাষ্ট্রের মেয়েদের মান বেশ উঁচু। তবে মিনাশাহ দময়ন্তী সুবেদার বা সরোজিনী নাইডুর তুলনায় এখনকার মেয়েদের ক্রীড়ামান নীচুতেই নেমে গেছে। এখন যে কেউ যে কোন খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিতে পারে। মহারাষ্ট্রের ছেলেমেয়েরা খেলার অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের যেরকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তা দেখলে হিংসা হয়। ওদের সংগঠকরাও ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তুলসী আফশোষের সুরে বলে, মহারাষ্ট্রে প্রায় একশটি আচ্ছাদিত কোর্ট আছে। ওরা সারা বছর অনুশীলন করতে পায়। আর আমাদের? এক ওয়াই এম সি এ (চৌরঙ্গী) ছাড়া আর কোথাও সে ব্যবস্থা নেই। আমরা যদি মহারাষ্ট্রের মত সুযোগ-সুবিধা পেতাম তাহলে নিশ্চয়ই অনেক বেশী উন্নতি করতে পারতাম। এখানে সুযোগ-সুবিধার চেয়ে বাধাই বেশী!

তুলসী বলে, আচ্ছা বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেলে ঐ স্টেডিয়ামে তো ব্যাডমিন্টন খেলা যায়। বেশ ভাল কভার্ড কোর্ট হবে।

তুলসী নানা জায়গায় ছোট-বড় অনেক প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হয়েছে। দেশের নানা প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় যোগদানের আমন্ত্রণও পেয়েছে। শীগগিরই কার্টনী যাবে। ওখানে সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় খেলতে আমন্ত্রণ এসেছে।

তুলসী একটি খাঁটি খেলোয়াড়ী বিবেক-সম্পন্ন কুশলী মেয়ে। ওর অভাবে রাজ্যের ব্যাডমিন্টনের ক্ষতিই হচ্ছে। বর্তমানে তুলসী ক্রিকেট খেলা শিখতে আগ্রহী। কিছু কিছু টেবল টেনিসও খেলে। ওই বাড়ীর ছোট মেয়ে, ওর মেজদিদি নূপুরে আকাশবাণীর গানের আসরে নিয়মিত গান গায়। ওরা পাঁচ ভাই তিন বোন। বড়দিদি বিবাহিতা। যেখানেই তুলসী খেলতে যায় বাবা-মা সঙ্গে যান। ওঁরা মেয়ের খেলা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর খুব নজর রাখেন।

পরীক্ষা শেষ হবার পরই আর কাল-বিলম্ব না করে তুলসী রোজ অনুশীলন করছে। যখন ওদের বাড়ী উপস্থিত হলাম তখন ও সবেমাত্র পার্ক সার্কাস ময়দানে দৌড় শেষ করে এসেছে। তাছাড়া পিটি ও বাড় লাফও নিয়মিত চলছে। বিকালে খেলা ওয়াই এম সি এ (চৌরঙ্গী)-তে। তুলসী তার বর্তমান প্রশিক্ষক সুকুমার সেনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে।

বিদায় নেবার আগে শুভেচ্ছা জানিয়ে এলাম যেন সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে স্তরে স্তরে জয়ের সোপান ধরে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয় ওর ক্রীড়াজীবন।

—অমর

অবশ্য সাক্ষাৎকার

সিমী

প্রঃ ভারতীয় ছায়াচিত্রে যৌনতা, নগ্নতা, অন্তরঙ্গতার কী প্রয়োজন আছে? 'সিদ্ধার্থ' ছবিতে আপনি যৌনাবেদন-পূর্ণ এবং নগ্ন দৃশ্যে অভিনয় করতে রাজী হলেন কেন?

উঃ হিন্দী ছায়াচিত্রে বক্স অফিসের জন্যে আজকাল যৌনাবেগপূর্ণ দৃশ্যের আধিক্য দেখা যাচ্ছে। 'সিদ্ধার্থ' ছবিতে রাজনর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে যে দেহসৌষ্ঠব প্রয়োজন, অনেক শিল্পীরই সেটা নেই। সেজন্যে তারা ঐ ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী হননি।

প্রঃ 'সিদ্ধার্থ' ছবির একটি নগ্নচিত্র বম্বের এক চলচ্চিত্র পত্রিকার প্রচ্ছদে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আপনি যে মন্তব্য করেছিলেন সে বিষয়ে কিছু আলোক-পাত করবেন কী?

উঃ প্রথমে ইলাস্ট্রেটেড উইকলী পরে 'ফিল্ম ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সিদ্ধার্থ'।

হেমা মালিনী

ধর্ষিতা

ছবির স্থিরচিত্রে আমাকে নগ্ন দেখানো হয়েছে। ওখানেই আমার আপত্তি ছিল। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যে আমি কোর্টে গিয়েছিলাম। আসলে নগ্নতার বাস্তব রূপায়ণের জন্যে আমি স্কিন কলার কসটিউম ব্যবহার করেছিলাম সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে অভিনয় করিনি।

প্রঃ আপনি কী বিবাহের আগে রোমান্সের পক্ষপাতী? অথবা গুরুজনদের পছন্দ মত পাত্রকেই বিবাহ করবেন? চলচ্চিত্র-লোকের কারুকে কী বিবাহ করবেন বলে ঠিক করেছেন?

উঃ রোমান্স করেই হোক বা সব কিছু জেনেশুনে হোক বিবাহ করার পক্ষ-পাতী। চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কাউকে বিবাহ করার কথা ভাবছি না।

প্রঃ মৃণাল সেনের 'পদাতিক' ছবির পর আর কোন বাংলা ছবিতে অভিনয় করার কথা চিন্তা করছেন কী?

উঃ 'পদাতিক'এ অবাঙ্গালী মহিলা হিসাবে মানিয়ে নিয়েছি। না হলে ভালো বাংলা না জানার জন্যে বিপদে পড়তে হোত। এবার ভালভাবে বাংলা না শিখে আর কোন ছবিতে অভিনয় করবো না। এখন কলকাতারই তরুণ পরিচালক গিরীশ-রঞ্জনের হিন্দী ছবি 'ডাকবাংলো'তে অভিনয় করছি।

শ্রীমতী রেখা

রেখা সুলতান

সায়রাবানু

সায়রা বানু

প্রঃ 'ভিক্টোরিয়া ২০৩' ছবি দেখে এবং 'সাজিস' এবং 'কালাবাজার' ছবির স্থিরচিত্র দেখে মনে হয় আপনি ছবিতে যৌনতা ও নগ্নতার ব্যাপারে বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই অভিনয় করেছেন। সত্যই কি তাই?

উঃ হিন্দী ছবিতে প্রযোজক পরিবেশক অর্থলগ্নীকারী প্রভৃতির একটা ব্যাপার রয়েছে। (কাহিনীকার বা পরিচালকের কথা বাদই দিলাম)। সকলের সন্তুষ্টির জন্যেই আমাকে এই জাতীয় ছবিতে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অভিনয়ে রাজী হতে হয়েছে। আবার অনেক সময় আলোক-চিত্রের বিশেষ কারসাজির জন্যে আমাকে 'যৌনতার প্রতিমূর্তি' মনে হতে পারে।

প্রঃ দিলীপকুমারের মতো বিখ্যাত নায়কের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় আপনি নিশ্চয়ই সুখী?

উঃ এমন দরদী শিল্পী পেলে সব অভিনেত্রীই সুখী হয়। আমার সেখানে অসুখী হবার কি কারণ থাকতে পারে।

প্রঃ যৌনতা ও নগ্নতার প্রতীক হিসাবে ছবিতে আপনাকে দেখে আপনার মা ও অন্যান্যরা ঐ জাতীয় ছবিতে অভিনয় করতে নিষেধ করেন না?

উঃ ব্যক্তিগত জীবনে আমি রোমান্টিসিজমের পক্ষপাতী। তবে প্রয়োজনে তেমন চরিত্রে অভিনয় করতেও আমার আপত্তি নেই।

প্রঃ রূপালী পর্দায় দিলীপকুমার আপনার সঙ্গে অন্য নায়কের অন্তরঙ্গ বা যৌনাবেদনমূলক দৃশ্যে অভিনয় করার ব্যাপারে আপনাকে আপত্তি করেন না?

উঃ আমরা আমাদের নিজের নিজের ছবির অভিনীত চরিত্র নিয়ে আলোচনা করি না। কিন্তু আমরা একত্রে যেসব ছবিতে ('গোপী', 'সাগিনা', 'বৈরাগী') অভিনয় করছি সেসব ছবির অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেছি এবং নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করবার চেষ্টা করেছি।

প্রঃ বিবাহিত জীবনে অন্যান্য তারকা দম্পতির মতো সার্থক হতে পেরেছেন?

উঃ আমি খ্যাতনামা নায়কের স্ত্রী এবং স্বামিও বহু ছবিতে অভিনয় করেছি ও'র ট্রাজিক অভিনয় যেমন সকলের পশ সা পায় তেমনি রোমান্টিক ভূমিকায় আমার অভিনয়ও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রঃ বাংলা ছবিতে অভিনয় করার কথা কি চিন্তা করছেন?

উঃ তপন সিনহার 'সাগিনা' ছবিতে ললিতার চরিত্রে অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছি। এখন স্বর্গত বিমল রায়ের শেষ ছবি আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'চৈতালী' ছবিতে নায়িকার পার্ট করছি।

ওয়াহিদা রেহমান

প্রশ্নঃ কনরড রুকসের 'সিদ্ধার্থ' ছবিতে যৌনাবেদনময়ী রাজনর্তকী হতে রাজী হলেন না কেন? এ ছবির যৌনতা ও নগ্নতাকে মেনে নিলেন না কেন?

উত্তরঃ সম্ভবত কনরড রুকস ন্যুইয়র্কে 'দি গাইড' ছবিতে নর্তকীর ভূমিকায় আমার অভিনয় দেখে ও'র 'সিদ্ধার্থ' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে অনুরোধ করেন। দুই নর্তকী চরিত্রের প্রভেদ উনি বোঝেন নি, বুঝলে এরকম ভুল করতেন না। কোন ভারতীয় রমণীর পক্ষে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন হয়ে কলাকুশলীর সামনে অভিনয় করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমার মতো অভিনেত্রীর পক্ষে। ভারতীয় ছবিতে নিজেদের কৃষ্টি ও সভ্যতা বিসর্জন দিয়ে বিদেশের লোকেদের মনোরঞ্জন করার পক্ষপাতী আমি নই। সেজন্যেই রাজী হয়নি।

প্রঃ বম্বের পত্র-পত্রিকায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়কের সঙ্গে আপনার রোমান্স চলছে এজাতীয় খবর ছাপা হোত—এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী? আপনি কী বিবাহের আগে রোমান্সের পক্ষপাতী?

উঃ আপনি নিশ্চয়ই 'দিলীপকুমারকে কেন্দ্র করেই এই প্রশ্ন করেছেন তখন আমরা একাধিক ছবিতে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করেছি। সুতরাং সেই জন্য-রঙ্গতাকে পত্র-পত্রিকাগুলি রোমান্স হিসাবে প্রচার করতো। শিল্পী হিসাবে আজও ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। ব্যক্তিগত জীবনে রোমান্স করে বিবাহের চেয়ে গুরুজনদের মতামতের উপর নির্ভর করে 'জীবনসঙ্গী' বেছে নিতে চাই।

প্রঃ ফরিদ আহমেদের সঙ্গে বাগদান হয়েও বিবাহটা ভেঙ্গে গেল কেন?

উঃ আমি এবং আমাদের পরিবারের কেউই জানতো না যে ফরিদ আহমেদ বিবাহিত এবং সন্তানের জনক। জেনেও কী কেউ এরকম ভুল করে?

প্রঃ বাংলা ছবিতে এবং মালয়ালাম ছবিতে আপনার অভিনয় করতে কেমন লাগে? আপনি কী ছবিতে যৌনতা ও নগ্নতাকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে চান?

উঃ মানিকদার অনুরোধে 'অভিযান' ছবিতে অবাঙ্গালী চরিত্রে অভিনয় করেছি। বর্তমানে স্বদেশ সরকারের 'জীবন যে রকম' ছবিতে অভিনয় করছি। যৌনতা ও নগ্নতা কেন্দ্রিক দৃশ্যগুলি খোলাখুলি না দেখিয়েও আমি 'আজ কী রাধা' ছবিতে উঁচু স্তরের কলগার্ল-এর চরিত্রে অভিনয় করছি। সুতরাং সবকিছুই নির্ভর করছে কাহিনী চিত্রনাট্য এবং প্রযোজক ও পরিচালকদের মতামতের উপর।

হেমা মালিনী

প্রঃ ছায়াচিত্রে যৌনতা নগ্নতা বা অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করার ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কী?

উঃ যৌনতা, নগ্নতা, শয্যাদৃশ্য বা অন্তরঙ্গ দৃশ্যে আমি অভিনয় করবার খুব প্রয়োজন বোধ করি না। এস ডি নারাং এর 'দো ঠগ' সুশীল মজুমদারের 'লাল পাথর' ছবিতে শয্যাদৃশ্যের পরিকল্পনা ছিল। 'প্রেমনগরে'ও অন্তরঙ্গ দৃশ্য আছে। সেটা ঠিক অশালীন নয়। যৌনতা বা নগ্নতাকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।

প্রঃ সঞ্জীবকুমারের সঙ্গে আপনার রোমান্স চলছে, এবারে কী আপনারা অন্যান্য নায়ক-নায়িকাদের মত ঘর বাঁধবেন?

উঃ ও'কে আমার ভালো লাগে, ভালো লাগা আর ভালোবাসা এক নয়। বিবাহের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মা-এর উপর নির্ভরশীল। আমরা 'ধূপছাও' ছবিতে একত্রে অভিনয় করছি। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবছি না।

প্রঃ বম্বের নায়কদের মধ্যে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গেই আপনি সর্বাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। অভিনয়কালীন আপনাদের মধ্যে কোন রোমান্সের সৃষ্টি হয়নি?

উঃ ধর্মেন্দ্র বিবাহিত ও একাধিক সন্তানের জনক এবং বুদ্ধিমান ও সৎ। প্রথম ছবি থেকেই আমরা একে অপরের বন্ধু। সুতরাং আমরা 'বন্ধুত্ব' নষ্ট করতে চাই না!

রেহানা সুলতান

প্রঃ 'চেতনা' ও 'দস্তাক' ছবিতে যৌনাবেদন ও নগ্নতাকে উপস্থিত করা হয়েছিল। ছবিতে এজাতীয় দৃশ্য রূপায়ণের ব্যাপারে আপনি কোন অসুবিধা বোধ করেননি?

উঃ বি আর ইশারার 'চেতনা'তে আমার ভূমিকা ছিল এক 'কল গার্ল'-এর। সুতরাং কাহিনীর বাস্তব রূপায়ণের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি। রাজেন্দ্র সিং বেদীর 'দস্তাক'-এর নগ্নতাও এক মুহূর্তের ব্যাপার। ফিল্ম ইনস্টিটিউটে থাকতে এজাতীয় চরিত্রে অভিনয়ের ব্যাপারে তালিম পেয়েছিলাম সুতরাং অসুবিধা হবার কথা নয়।

প্রঃ চলচ্চিত্রে ইদানীং যৌনতা নগ্নতার পাশাপাশি চুম্বন ও শয্যাদৃশ্য উপস্থিত করা হচ্ছে এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

উঃ ভারতীয় নারীর চরিত্রে শয্যাদৃশ্য বা চুম্বনের কোন প্রয়োজন নেই। বিদেশী রমণীর ভূমিকায় চিত্রনাট্যের বাস্তবতার জন্যে অবশ্য এসব চিন্তা করা যেতে পারে।

প্রঃ বি আর ইশারার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী? আপনি বিয়ের কথা ভাবছেন কী? বাংলা ছবিতে অভিনয় করার ব্যাপারে আপনার ইচ্ছা কী?

উঃ বি আর ইশারাই আমাকে সর্বপ্রথম অভিনয় করার সুযোগ দেন। ও'কে গুরুজনের মতোই শ্রদ্ধা করি। ও'র 'দিল কী রাহে'তে আমার অভিনয় দেখবেন। বিয়ের কথা ভাবছি না। এসবের জন্যে আমার বাবাই যা ভাববার ভাবছেন। 'বর্ণ বিবর্ণ' ছবিতে অভিনয় করিনি। সম্প্রতি 'প্রতীক' ছবির কাজ শুরু করেছি।

বাবিতা

প্রঃ বাংলাদেশের ছবিতে ধীরে ধীরে হিন্দী ছবির অনুকরণে যৌনাবেদনমূলক দৃশ্য ক্যাবারে সেকস ও ভায়োলেন্স আসছে। এ বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?

উঃ বাংলাদেশের ছবিতে বাস্তবতার জন্যে ঐজাতীয় দৃশ্য পরিহার করা উচিত।

প্রঃ ভারতীয় তথা পশ্চিম বাংলার ছবিতে অভিনয় করতে চান?

উঃ জানুয়ারী ১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের বাইরের ছবিতে অভিনয় করা সম্ভব নয়। আর অভিনয় করলে কেবল প্রখ্যাত পরিচালকদের ছবিতে অভিনয় করবো।

—সাক্ষাৎকার : অশোক মজুমদার

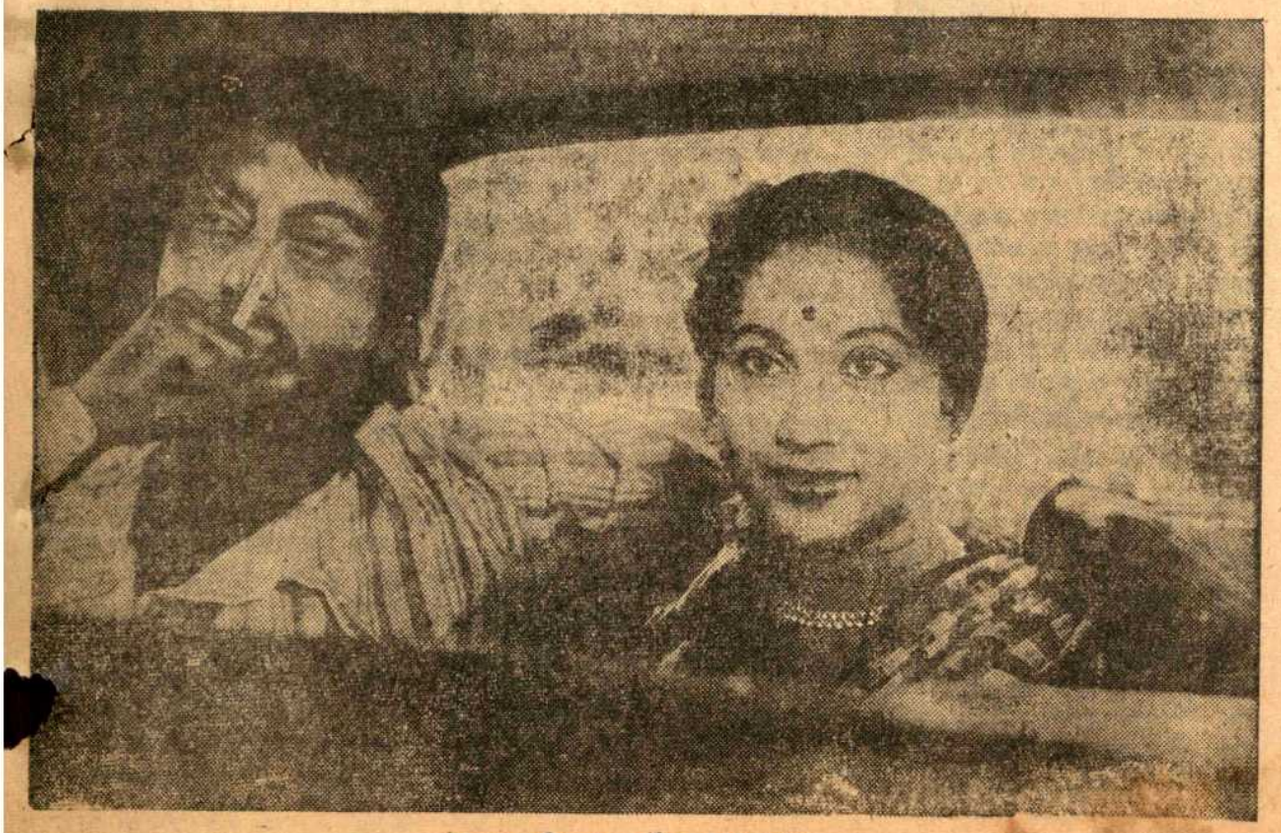

সংসার সীমান্তে / সৌমিত্র : সন্ধ্যা রায়

শিল্পী সাজ্জাদ হোসেন

'—আকাশ ছিল, রং ছিল, ভালোবাসা ছিল। আর সব মিলিয়ে ছিল আমার জীবন আমার স্বপ্নের বেড়া। আজ আর তা নেই। আমার আমির মধ্যে যতক্ষণ আছি সানাইয়ের সুর ততক্ষণই তারপর সব ফাঁকা। যতদিন আমার দম আছে, কলজের জোর আছে সানাইয়ের ফুঁ তত দিনই সুরে বলবে তারপর আমার কথা যাবে ফুরিয়ে আসরে আসরে সাজ্জাদ হোসেনের সানাই শুনে মুগ্ধ বিস্ময় তারিফ কেউ করবে না।'

কিছুটা দম নিলেন। ভাবলেন। কথাগুলোর মধ্যে বিষণ্ণতার দমকা বাতাস। মনে হোলো গভীর আত্মোপলব্ধি থেকে শিল্পী কিছু বলতে চান। বলতে চান ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে কোথায় তাঁর দ্বন্দ্ব। কিংবা সুরের সঙ্গে মনের কোথায় অমিল। অথবা অন্য কিছু। তাঁর মনের কথাটা আঁচ করার চেষ্টা করি। বুঝতে চেষ্টা করি সাতাত্তরের দুঃখটা কোথায়। আমার রিডিংটা বাধা পেলো। বললেন—

এই পঁচিশ বছরের ওপর কলকাতায় আছি, কতটুকু কি করতে পেরেছি বলুন। সানাই বাজাবার ডাক যেখান থেকেই এসেছে —গেছি। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছি। কিন্তু বয়স যত বাড়ছে সেই অদম্য উৎসাহ আসছে কমে। আর সানাই বাজিয়েদের অসুবিধেটা কোথায় জানেন? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের জোর কমে গেলে সানাই বাজাতে কষ্ট হয়, দম যায় কমে, ফুঁতে সেই আমেজ মেলে না। ভালো খাবারদাবার খেয়ে শরীর ঠিক রাখতে না পারলে তা কি সম্ভব? বলুন? আর এখন যা বাজার পড়েছে তাতে তো বুঝতেই পারেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—

—আপনার ছেলেরা সানাই বাজাচ্ছে?

—না, এ লাইনে ওদের কারুকে দিইনি। সবই তো বোঝেন, দেখেছেন তো অবস্থা। সানাই বাজালে ভবিষ্যত কোথায়?

কঠিন বাস্তব শিল্পীর মানসলোকের অন্দর মহলে ঘা মেরেছে। নাহলে কয়েক পুরুষের যে সাধনা তা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে এ কি কম কথা? কিন্তু তাই হয়েছে। সাজ্জাদ হোসেনের ছয় ছেলে আর দুই মেয়ে। ছেলেদের কারুকেই সানাই শেখাননি। কেউ ব্যবসা করছে কেউ পড়ছে। গান-বাজনার ধার দিয়েও কেউ যায়নি। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় জামাই বিসমিল্লা খাঁর ছেলে নৈয়ার হোসেন খাঁ আর সুপরিচিত সানাই বাদক আলি আমেদ হোসেন ওঁর মেজ জামাই। সাজ্জাদ হোসেন নিজে সম্পর্কে বিসমিল্লার ভগ্নীপতি। প্রথম পক্ষের সেই স্ত্রী মারা গেছেন। তারপর আবার বিয়েও করেছেন।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সাজ্জাদ হোসেন তখন কিশোর মাত্র। বড় দাদা মনসব আলী সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। দাদার পেছনে বসে ফুঁ দেওয়া ছাড়া একা আসরে বাজাবার ছাড়পত্র তখনও মেলেনি। পাথুরিয়াঘাটার প্রদ্যোৎনারায়ণ ঠাকুর সেবার বেনারসে বেড়াতে গেছেন। হঠাৎ একদিন মনসব আলীর বাজনা শুনে ভীষণ ভালো লেগে গেলো। কলকাতায় ফেরার সময় মনসব আলীকে একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে চলে এলেন। পাথুরিয়াঘাটায় প্রদ্যোৎ নারায়ণ তাঁর সুবিশাল মহলের এক প্রান্তে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। দাদার সঙ্গে সাজ্জাদ হোসেন সেই যে কলকাতায় এলেন তারপর আর ফিরে যাননি। হাজার দুঃখকষ্ট, বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করেও এখানেই থেকে গেছেন। পাথুরিয়াঘাটার ঐ রাজবাড়ীও ছেড়েছেন! কলুটোলায় ভাড়া ঘরে সংসার পেতে বসেছেন। সে-ও আজ বেশ কয়েক বছর হতে চলল।

সানাই বাজনায় সাজ্জাদ হোসেন বা তাঁর দাদা আলী হোসেনই কেবল সুনাম অর্জন করেননি। বড়দা মনসব আলীও সানাই বাজিয়ে হিসেবে খুব নাম করেছিলেন। শোনা যায় এঁর বাজনার নাকি তুলনা মেলে না। আলী হোসেন আর সাজ্জাদ হোসেনের সানাইয়ের প্রকৃত শিক্ষা এঁরই কাছে। বাবা ছোটে মিঞা আর জ্যেঠা মশাই বড়ে মিঞার মতো গুণী শিল্পী আজ বিরল। এঁরা ছিলেন অনেকটা সাধক প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু ছোটবেলাতেই এঁরা

এঁদের স্নেহচ্ছায়া হারান। তাই এঁদের যা কিছু তালিম বড়ভাই মনসব আলীর কাছে। সাজ্জাদ হোসেন সঙ্গীত শিক্ষার জন্যে পরবর্তী জীবনে ঘুরেছেন অনেক—মন যেখানে চেয়েছে সেখানেই কিছু না কিছু তালিম নিয়েছেন। কিন্তু আঁকড়ে পড়ে থাকতে পারেন নি। সেটা অবশ্য ঐ ভেতরের মানুষটার দোষ নয়, দোষটা বাইরের, বস্তুগ্রাহ্য জগতের। তিনি গেছেন রামপুরে আচ্ছন মহারাজের কাছে তবলা শিখতে। শিখেছেন। তানসেনের বংশধর এবং বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাজিয়ে মুনেশ্বর দয়ালের গুরু জামাল সেনের কাছে 'রাগ' রূপের তালিম নেন। তারপর আরো নানান শিল্পী আছেন যাঁদের কাছে তালিম নেওয়ার সুযোগ না পেলেও দূর থেকে শুনে শুনে কিছু নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, মনে মনে যাঁদের গুরুপ্রণাম দিয়ে এসেছেন। সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী ওঁর কাছে এমনি এক মহান শিল্পী—যাঁর সুরালোপন শুনে আপন ধ্যানধারণাকে আরো স্বচ্ছ আরো ভাস্বর করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।

বাষট্টি বছরের প্রবীণ সানাই বাদক সাজ্জাদ হোসেন অনেক দেখেছেন, শুনেছেন, বাজিয়েছেন। কিন্তু কয়েকটি অনুষ্ঠান তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। যেমন একবার শান্তিনিকেতন থেকে আমন্ত্রণ এলো (সালটা ঠিক মনে করতে পারলেন না)। গেলেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম ঘটেছে। ব্যক্তিগতভাবে উনি কারুকেই চেনেন না। তবে চালচলন আদর আপ্যায়নে বুঝলেন যে, এঁরা প্রত্যেকেই খুব মান্যগণ্য লোক। বাজনা ধরেছেন। এমন সময় চমকে উঠলেন একটি লোককে দেখে। তিনি আর কেউ নন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। শ্রোতার আসনে তিনি বসলেন। সারাক্ষণ ওঁর বাজনা শুনলেন। যাবার সময় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেলেন। সাজ্জাদ হোসেনের জীবনে এ এক ভাস্বর মুহূর্ত। আর একটা অনুষ্ঠানে কিছু লোকের সমাগম হয়েছে। যাকে ঘিরে সবাই বসে আছেন সাজ্জাদ দূর থেকে সেই মানুষটিকে দেখছেন। ভেতরে ভেতরে একটা সঙ্কোচ ভাব। না জানি ঐ মানুষটির কেমন লাগছে। কিন্তু শেষে ওঁর বাজনায় মুগ্ধ হয়ে আবার শোনার জন্যে ব্যাকুলতা। সম্ভবত মালকোষ বাজিয়ে সাজ্জাদ হোসেন ঐ মহামান্য শ্রোতার সেই ব্যাকুলতা পূরণ করেছিলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। সেদিনের কথা ওঁর মনে পড়ে যখনই চুপ করে ভাবতে থাকেন, খাজুদেহী সেই পুরুষটির চেহারাতে যে কি এক অসাধারণত্ব ছিল যা বলে বোঝানো যায় না। এই অসামান্য পুরুষটি হচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ।

একটা ব্যাপারে সাজ্জাদ হোসেন প্রচণ্ড প্রত্যয়হীন। বললেন—গানবাজনা যা হবার তা হয়ে গেছে। নতুন করে আর কিছু হবে বলে তো মনে হয় না। তখন সত্যিকারের গুণীর কদর ছিল। তাঁদের জন্যে কিছু ধনী লোক ছিলেন যাঁরা শিল্প ও শিল্পী দুয়েরই মর্যাদা বুঝতেন এবং সেই ক্ষমতা রাখতেন। কিন্তু এখন কি তা আছে? কোনো সত্যিকারের গুণীকে কদর করার মতো প্রকৃত সমঝদার নেই। বিশেষ করে ইয়ং আর্টিস্ট ভালো গাইলে বা বাজালেও বিনা স্বার্থে তার গুণপনাকে তুলে ধরা বা তাকে শিল্প নিয়ে বাঁচতে দেওয়ার মানবতাটুকু একেবারেই নেই। সে কারণে গানবাজনা আর গুণীর কদর (নির্ভেজাল-ভাবে) যা হবার তা হয়ে গেছে।

খুব খাঁটী কথা। সাজ্জাদ হোসেনের এই যুক্তি একেবারে অকাট্য। ওকে মিথ্যে প্রমাণ করার কোনো সত্য আমার হাতে নেই। গান বাজনাকে জীবনের সম্পদ হিসেবে মেনে নেবে কিংবা তাঁর মধ্যে দিয়ে কোনো প্রতিভা মহীরুহর মতো দাঁড়িয়ে দেশ বা জাতির শৈল্পিক সত্তাকে বাঁচার পথ দেখাবে এমন অবস্থা কোথায়? সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটের যতই পরিবর্তন হোক কোন দেশ তার সংস্কৃতির প্রসার পথকে রুদ্ধ করতে চায়? আমাদের মধ্যে তাই হচ্ছে। সাজ্জাদ হোসেনের আর একটা কথা খুব দামী—একেবারে স্থির। তা হোলো শিল্প, দুনিয়ায় এই স্বল্পের মূলত দুটি স্তরে। যার মধ্যে প্রতিভা আছে, অর্থের যন্ত্রণা তার প্রচণ্ড। আর প্রতিভার প্রয়োজন নেই কেবল শোনার অভ্যাসটুকু থাকলেই ষ্টেজ মিলছে যেখানে সেখানে অর্থের অভিমান আছে। বুঝলাম এই সত্য উপলব্ধির জন্যেই তিনি তাঁর ছেলেদের আর সুরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার সুযোগ দেন নি।

মানুষ হিসেবে সাজ্জাদ হোসেন অত্যন্ত নিরহঙ্কারী আর সাদা-মাটা। চালচলন পোষাক-আসাক, কথাবার্তা কোথাও এতটুকু অহমিকার ছাপ নেই কোনো অহেতুক গাম্ভীর্য। যাঁর সানাই হাজারো লোকের মনে খুশীর জোয়ার নিয়ে আসে সেই মানুষটি সব সময় যেন সেই জোয়ারেই ভেসে চলেছেন। কোথাও তার ব্যত্যয় নেই। হয়তো এই কারণেই সকলেই তাঁকে আগে-ভাগে খোঁজে। তাই বিয়েবাড়ী পূজামন্ডপ সভা-স্থল আবার সঙ্গীত সম্মেলনের মঞ্চ কোথাও যেতে আপত্তি নেই। কলকাতার সদারঙ্গ, তানসেন এবং সেকালের অলইন্ডিয়া অলবেঙ্গল থেকে শুরু করে ছোট-খাট গানের আসরেও তাঁর রাগালাপ সুররসিক-দের মন কেড়েছে। বড় বড় সভা বা অধি-বেশন যেমন বিধাননগরে কংগ্রেস অধি-বেশনের গুরুর সুর তিনিই ধরেছিলেন। আবার কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষের কন্যার বিয়েতে সমস্ত পরিমন্ডলে এক অন-বদ্য আনন্দের প্লাবন তুলেছিলেন এই প্রবীণ সানাই শিল্পী সাজ্জাদ হোসেন।

ছন্দের বৈচিত্র্যের সঙ্গে জীবনের ছন্দ এমনি নানা তালে-লয়ে বয়ে চলেছে। একের সঙ্গে অন্যের বহির্মিল না থাকলেও ফল্গু স্রোতের মতো অন্তঃ মিল একটা আছে যেখানে সুরশিল্পীরা আমার আমিকে খুঁজে নেবার চেষ্টা করেন। আজীবন ধরে চলে এই চেষ্টা। যিনি পেয়ে যান তিনি পরম সৌভাগ্যের অধিকারী। তেমন শিল্পী কমই জন্মান। বেশীর ভাগই ঐ সুরের আমিকে খোঁজার চেষ্টায় জীবন কাটিয়ে দেন। আর হয়তো বা সে কারণেই মনের সঙ্গে বোঝার একটা অমিল থেকেই যায়। যতটুকু জানি যতটুকু বুঝি সাজ্জাদ হোসেনও এমনি ভাবেই এগিয়ে চলেছেন—আরও এগোবেন শেষকালে হয়তো বা সুরের মধ্যে সেই আমিকে খুঁজে পাবেন আর না পেলেও ক্ষতি নেই। কেননা সুরই যার সব সেখানে কি ভাবের অভাব ঘটে?

সাক্ষাৎকার ঃ
তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

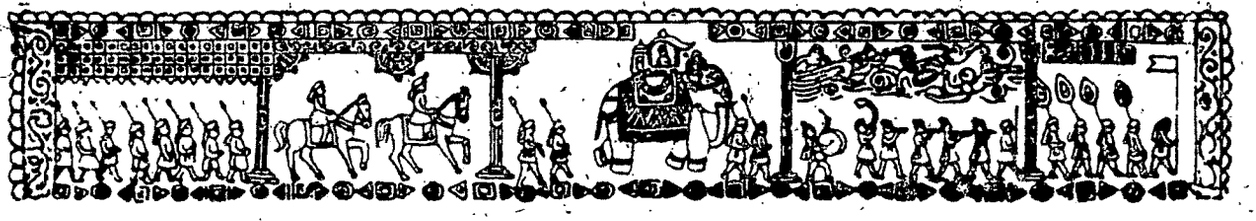

যুগমানব কবীর মাধবী চক্রবর্তী

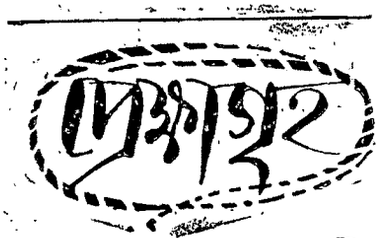

মোহিনী সাজে অপর্ণা সেন তখন এমব্রয়ডারি করছেন। মোহিনীর রূপের ছটা, চোখের তির্যক চাহনী নিরুচ্চার অভিব্যক্তি স্পষ্ট করে দেয় — তোমার মত পুরুষকে আমি ঘৃণা করি। কোন দাম দিই না।...মোহিনী—সাগরের তলায় ডোবা বরফ পাহাড়ের মতন। বাইরে থেকে তাকে যতটা দেখা যায় তার চেয়ে বেশী সে আড়ালে থাকে। তার চরিত্রের যেটা লুকোনো জায়গা সেখানে সে বড় বিচিত্র। যত বয়েস বেড়েছে ততই তার লুকোন চরিত্রটা বড় হয়েছে। সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী, তার স্বভাবে ছেলে-মানুষীর চেয়ে গাম্ভীর্য বরাবরই বেশী, তার সাহসের অভাব নেই। মানুষ দেখে দেখে তাকে চিনতে হয়। যে কোন বয়সেই সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। দুশ্চরিত্র লম্পট স্বামীর (ভূমিকায় ঃ নিমু ভৌমিক) সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে আসতে, শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করে আসতে তার মনে দ্বিধা আসে নি। তার কথা হল ঃ কার কী ঘটবে, কে কবে ভুল শুধরে সাধু হয়ে যাবে তার জন্য বসে থাকতে আমি জন্মাই নি। আমি যা করেছি ভাল বুঝেই করেছি। একটা কুষ্ঠ রোগী ঝোলা করে বয়ে বেড়াতে পারলেই কি মেয়ে জন্ম সার্থক হয়?...অনুক্ষণ এই কথাগুলো মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বাজতে পারে। স্তব্ধ আধার করা ঘরে প্রতিধ্বনি হতে পারে।

কোনো কোনো অঘটন সংসারে ঘটে যায়। কেন ঘটে যায় কেউ জানে না। যেমন মোহিনীর জীবন থেকে শচিপতির চলে যাওয়া, অবিনের আসা। হাসপাতাল। মস্ত ঘর, সার সার বিছানা পাতা, বড় বড় জানলা অনেক উঁচু থেকে পাখা ঝুলছে, বাতি ঝুলছে, নানা বয়সের রোগীরা নার্সেরা, সমস্ত ঘরটা যেন ঠান্ডা ওষুধের গন্ধ ঘরের বাতাসে। শচিপতি বিছানায় শুয়ে থাকে—গায়ে শাদা চাদর। মোহিনীর কাছে শচিপতি চিরদিনের অক্ষয় পুরুষ। তার না আছে সাহস, না তেজ, না উদ্যম। তাকে দেখে মেয়েদের মায়া হতে পারে, মন ভরে না। শচিপতি জীবনের ভয়টাকে এড়াবার জন্যে মৃত্যুর ভয় মাথায় নিয়ে বসে আছেন। অবিনের ভাষায় ঃ তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথার বালিশের তলা থেকে যে চশমাটা চোখে পরে নেন সেটা হল ওই মৃত্যুর।

কে এই অবিন? তার সঙ্গে ঝড়ের তুলনা চলে। অন্তত মোহিনীর কাছে।... অবিন সে জাতের পুরুষ নয়। তার চোখে সে দৃষ্টি কোন দিন দেখি নি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, অবিন যতখানি বেগে ঝড়ের হাওয়ার মতন ছুটে আসে ততটা প্রলয় করতে পারে না। তার বেগ আছে কিন্তু নিষ্ঠুরতা নেই। সত্যি কি সে নির্লোভ নির্লিপ্ত পুরুষ? তার মুখে যতটা অভিনয় মনেও কি তাই? আমি বুঝি না, অবিনও আমায় বোঝে না। তার বোঝার ঝোঁক আছে, আমার নেই। তবু এই যে সারা দিনের মধ্যে থেকে থেকে আমি অন্য-মনস্ক হয়ে যাই, হঠাৎ কোথাকার ভয় এসে আমার বুক কাঁপায়, রাত্রে শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে নিজের জীবনটাকে বার বার দেখি, এই যে আমি এতটা রাত করে প্রথম বর্ষার ঝিপঝিপে বৃষ্টির মধ্যে অবিনকে চিঠি লিখতে গিয়েও পারি না—এ সবই যেন আমার কি এক লজ্জা হয়ে উঠছে। দুঃখও। কোথাও এক শূন্য হয়ে যাবার বেদনা-দুঃখ আজ আমার মধ্যে ভরে উঠছে...

চলচ্চিত্রের ভাষায় এ হচ্ছে শূন্য মুহূর্ত গঠনের চিন্তা—এই জিরো ফিলিংসকে কেন্দ্র করে সিনেম্যাটিক লাইন আপকে স্মর্তব্য করে তরুণ চিত্রনাট্যকার পরিচালক ইন্দর সেন তাঁর কর্তব্য শুরু করেছেন। পর পর শটে সাজান এক একটি দৃশ্য তিনি আগে ভিসুয়া-লাইজ করেছেন। অর্থ পরম্পরায় যাতে ছবির বক্তব্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেইভাবে

প্রত্যেকটি শট ভেবেছেন। কম্পোজিশানে তিনি একটা বিশেষ স্টাইল ধরে রাখতে চেয়েছেন যাতে আর পাঁচটা সাধারণ ছবি থেকে [redacted]কে স্বতন্ত্র করা যায়। যাতে গল্পের মেজাজ আগাগোড়া থাকে। যেখানে গতির আভিধানিক অর্থ শেষ পর্যন্ত অগ্রগতিকে দাঁড়াতে পারে। বাংলা ছবিতে ভাল গল্পের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই গল্প, গল্প ঠিক নয় উপন্যাস বিমল করের অসময় যার ওপর ভিত্তি করে নির্মীয়মান এই ছবি অসাধারণ। প্রচলিত সেন্টিমেন্ট বর্জিত জীবনের ভিন্নমুখী সমস্যার আয়নায় সামগ্রিকভাবে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চরিত্রের সমাবেশ এবং তাঁদের মানসিকতা বিশ্লেষণ প্রধান বিষয়। প্রধান চরিত্র মোহিনী—তার জীবনতৃষ্ণা এবং জীবনযন্ত্রণা যেন ক্ষণে ক্ষণে অনুচ্চারিত কবিতা। অথচ তার গভীর অন্তরতম প্রদেশ প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ। মুক্তির জন্য অবিরত সংগ্রাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটছে নৈর্ব্যক্তিক অস্থিরতায়। প্রকাশের চেয়ে প্রসার বিস্তারই চার দিকে প্রতিধ্বনিত। বলতে গেলে সবটুকুই মোহিনীর আত্মোপলব্ধি। সূত্রপাত বাসর ঘরে।

ফুল ফুল আর ফুল। ফুলের সৌরভ সারা ঘরটি যেন ভরিয়ে দিয়েছে। এখানে মোহিনী স্থির দাঁড়িয়ে। কনের সাজে। অদ্ভুত স্থির তার চোখ দুটি। তার কাছে চারি পাশে ভয়ংকর শূন্যতা। অথচ কত হাসাহাসি, শাঁখের ফুঁ, উলুধ্বনি। সব কিছুকে ছাপিয়ে তার স্বামীর ভারসাম্যহীন অবস্থা। টলমল কণ্ঠস্বর। বরের সাজে এই লোকটা সেই জাতের যারা আজন্ম ক্ষুধার্ত। এরা হল ইন্দ্রের বংশধর, মেয়েদের সব শান্তি ভেঙে চুরমার করে দেয়। এদের সঙ্গে পশুর বড় একটা তফাৎ নেই। একই স্বভাবের। বিয়ের রাতেই মোহিনীর চিন্তার রাজ্যে ঝড় উঠল।

টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে এই ছবির সেটে তখনও ঝড়ের হাওয়া বর্তমান। সময়টা বোধ করি দ্বিপ্রহর। মোহিনী সূচীশিল্পে চোখ রাখলেও মন পড়েছিল অদূরে খাটের ওপর। মাঝে মাঝে চোখও পড়ছিল। সেখানে তার স্বামী আধ-শোয়া অবস্থায়। এমন সময় প্রবেশ করলেন এক মহিলা। তিনি হলেন বৌদি। দেবরের জন্য পান সেজে এনেছেন। দেবর-বৌদির মধ্যে যে সম্পর্ক সাধারণত থাকে এখানে সে রকম নয়। মোহিনীর চোখে এবং মনে সব কিছুই স্পষ্ট। ওরা বোধহয় মোহিনীর অনুপস্থিতি কামনা করছে। মোহিনী সেটা বুঝতে পারল। এবং গা রি রি করে উঠল। ক্যামেরা অতঃপর খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে মোহিনীর মানসিক অবস্থা ধরে রাখল। মোহিনীর ভূমিকায় অপর্ণা সেন বলা বাহুল্য একান্ত নিজস্ব ধারায় এই চরিত্রে রূপদান করছেন। ফলে অন্য কোন ছবির ইমেজ তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি এই সূত্রে এই মানসিকতায়

রোহিনী সুচিত্রা সেন দীনেন গুপ্ত পরিচালিত (কৃষ্ণকান্তের উইল অবলম্বনে)

প্রত্যেকটি মুহূর্তে মোহিনী, কেবলই মোহিনী। স্বামীর চরিত্রে রূপদান করলেন নিমু ভৌমিক। শৌভনিক গোষ্ঠীর প্রতিভাবান এই মঞ্চাভিনেতা বেশ কিছু দিন হল চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন স্ত্রীর পত্র এবং ছেঁড়া তমসুক ছবিতে। যে কোন চরিত্রেই তিনি অভিনয় করেন—তাঁকে চরিত্র থেকে পৃথক করে ভাবা যায় না। বৌদির রূপসজ্জায় কণিকা মজুমদারকে দেখা গেল। ইতিমধ্যে একদিনের কলকাতা আউটডোর হল। ছবির অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র অবিন রূপায়িত করলেন স্বরূপ দত্ত। মোহিনীরা কলকাতায় এসেছে ভাই সুহাসের কাছে। সুহাস মেস বাড়ীতে থাকে। একই মেসে থাকে অবিন, সুহাসের বন্ধু। এরই পরবর্তী অংশ চিত্রায়িত করা হল। সুহাস করছেন কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। সুহাসের আরেক বন্ধু : প্রণব চট্টোপাধ্যায়। মোহিনীর ছোট্ট কোন আয়নাকে নিয়ে অবিনের কলকাতা ভ্রমণ পর্ব তোলা হল। আয়নার রূপসজ্জায় ছিলেন মহুয়া বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন : অনিল চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায় এবং চিন্ময় রায়। শচিপতি : দীপংকর দে। চিত্রগ্রহণ করছেন : শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দেশনা ও সুবোধ দাশ। সম্পাদনা করবেন : অরবিন্দ ভট্টাচার্য। ব্যবস্থাপনায় : অপনজন চিত্রম। আর্থিক সাহায্য দান করছেন : ইউকো ব্যাঙ্ক।

চিত্রনাট্যকার পরিচালক ইন্দর সেনের এটি চতুর্থ প্রয়াস। প্রথম : প্রথম কদম ফুল। দ্বিতীয় : পিকনিক। তৃতীয় : অর্জুন—সম্পাদনার কাজ চলছে। চতুর্থ এই প্রয়াস অসময় গতানুগতিক না হয়ে ভিন্নতর স্বাদের ছবি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। একেবারে নতুন কিছু করতে গিয়ে যদি অপরিচিতের দূরত্বেই থেকে যায় তবে এই শিল্পমাধ্যমটির সার্থক সৃষ্টির যা সবচেয়ে গোড়ার কথা—জনপ্রিয়তা—তা থেকে এ ধরনের সৃষ্টি বঞ্চিত হবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বঞ্চনা যেন শেষ কথা হয়ে না দাঁড়ায়। একটু একটু করে নতুন রাস্তা চেনানো ছাড়া উপায় নেই। কারণ সবটুকুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যে প্রেক্ষণা থাকা উচিত অথবা মনের জোর—দুটোর কোনটাই বর্তমান চিত্রপ্রযোজকের মনকে সব সময় থাকতে পারছে না। দর্শকরা যা চাইছেন তারই নব নব সংস্করণ করার চেষ্টা চলছে। চেষ্টা চলুক শিল্পসচেতন ও শিল্পঘনিষ্ঠ করার। আশা করা যায় এই পরিচালক একই অভিপ্রায়ে চিত্রনির্মাণে অগ্রগামী।

—সঞ্চালক-সংবাদদাতা

হীওয়ান/অমিতাভ বচ্চন/প্রবীণ কবী

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

ইদানীং রাজকাপুরের সঙ্গে রাজেশ খান্নার তীব্র ঘনিষ্ঠতা। কারণ রাজেশের বাজার পড়তির দিকে। সে ভীষণ ভাবে আর কে'র ব্যানারে ছবি করতে চাইছে। রাজা সাহেবেরও এক সময় ইচ্ছে হয়েছিল রাজেশ-ডিম্পলকে একসঙ্গে করে ছবি করে আরেকটা সুপার কিছু স্টান্ট দেবার। কিন্তু বিয়ের পর ডিম্পল যে ভাবে মুটিয়ে গেল তাতে রাজসাহেব আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তাছাড়া অনেক বয়েস হয়েছে। রাজেশের ওর ভগ্নার অভিপ্রায় মনেও আনা ঠিক নয়। তাই এতদিন বেশ একটা দূরত্ব রেখে চলছিলেন রাজসাহেব। দুম করে দূরত্বের প্রাচীর ভেঙ্গে দিলেন রাজেশ। হৃষিকেশ মুখার্জির 'নোকরি' ছবিতে কাজ করতে গিয়ে রাজেশ, রাজার সঙ্গে মিশল। এবং এমন ভাবে মিশল যাতে অন্য কোন ব্যানারে একটি ছবি ম্যানেজ করা যায়। সেই চেষ্টা প্রায় সফল হয়ে এসেছে। রাজ ডিম্পলকে ব্যায়াম করতে বলেছেন। মোদ্দা ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে। তাহলেই রাজেশ-ডিম্পল জুটির প্রথম ছবি হতে পারে। সেই চেষ্টায় রাজেশ-ডিম্পলের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটেছে। এখন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই প্রাতঃকালে ফ্রি-হ্যান্ড একসারসাইজ করছে।

চেতন আনন্দ বর্তমানে ভ্রাতা দেব আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নবকেতনের ব্যানারে ছবি করছেন। এই ছবিতে চেতন কিন্তু তার নায়িকা প্রিয়াকে কোন কাজেই লাগাতে পারছেন না। দেবকে মুখ ফুটে বলতেও পারছেন না। পরিস্থিতি অনুধাবন করে দেব নিজেই বলেছেন প্রিয়ার জন্য একটা রোল তৈরী করতে। চেতন সমস্ত কিছু বুঝেও না বোঝার ভান করে স্ক্রিপ্টের কাজ করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ গোল বাধিল এক পার্টিতে। চেতন আর প্রিয়া মুখোমুখি সিগারেটের ধোঁয়ায় পরিবেশ ঝাপসা। তুমুল ঝগড়া। ঝগড়ার হেতু কিন্তু সিগারেটই। প্রিয়া ফুক ফুক করে সিগারেট খায় সেটা চেতন মোটেই পছন্দ করেন না। তিনি শেষকথা বলে দিয়েছেন আমার সামনে সিগারেট খেলে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ। আর কোন ছবিতে কাজ-টাজ হবে না। দেবের ছবিতে অন্য কাউকে নিয়ে নেওয়া হবে।

ধর্মেন্দ্রকে শর্মিলা বরাবরই খুব ভয় করে। বেশী ভয় করে ধর্মেন্দ্র যখন মদ খেয়ে কথা বলে না। 'সত্যকাম'-এর শুটিং-এর সময় আউটডোরে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে চলেছিল। তারপর থেকে শুটিং শেষ হলে শর্মিলা, ধর্মেন্দ্রর সামনে দাঁড়ায় না। আউটডোরে থাকলে তাড়াতাড়ি ডিনার শেষ করে দরজায় খিল এঁটে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য! সম্প্রতি দেবেন্দ্র গোয়েলের 'এক মহল হো সপনোকা' ছবির আউটডোরে শর্মিলা একদিনের জন্যও তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যায় নি। রোজ রাতে বহুক্ষণ ধরে গল্প করেছে। ওদের শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময় অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা গিয়েছে। তাহলে ধরে নিতে হয় শর্মিলার ভয়-ডর কেটে গিয়েছে!

হৃষি কাপুর আর নীতু সিং-এর খবর এখন জবর-দস্ত। রণধীর কাপুর হাল ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং হৃষি একাই লড়ে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে নীতুদের সঙ্গে হৃষি ইয়োরোপ সফরে যাচ্ছে। নীতুদের বলতে ওদের খানদানি। তাছাড়া রেখাও কেটে পারে। কিন্তু রেখা গেলে সোশিয়াভাবালীও যে সঙ্গে যাবে। বলে হৃষি নিজেই। ভাই ও নীতুকে বলে দিয়েছে—ওসব রেখা-যোগিতা গেলে আমি যাব না। শুধু তুমি আর আমি। ওরা থাকলে বড্ড অসুবিধে হবে। কোথাও প্রাণ ভরে বেড়ানো যাবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে নীতু—রেখা আর যোগিতাবালীকে কাটানোর ধান্দায় আছে! দেখা যাক কন্দুর কি হয়। কার ইচ্ছা পূরণ হয় বলা যাবে আগামী বেন সংখ্যায়।

—অনিমিত্ত

স্টুডিও সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বিগত সাতাশে জানুয়ারী ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে একটি হিন্দি ছবির মহরতানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। কে বি ফিল্মসের পতাকা তলে এই ছবিটি কলকাতার স্টুডিওতেই নির্মিত হবে। পরিচালনা করবেন বিমল রায়। সম্পূর্ণ ছবিটি তোলা কালারে হবে। নায়ক চরিত্রে রূপদান করবেন 'শুভদিন' খ্যাত রাজেশ লহর। এ-ছবির চিত্রগ্রহণ ও শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করছেন যথাক্রমে কানাই দে ও সূর্য চট্টোপাধ্যায়। ফেব্রুয়ারী মাসে শুটিং শুরু।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে যান্ত্রিক গোষ্ঠীর পরিচালনায় 'নো ফকস ক্যাবিরে' ছবির শুটিং হচ্ছে। কৌটিল্য গুপ্ত রচিত একটি কাহিনীর ভিত্তিতে এই ছবির জন্য চিত্রনাট্য রচনা করেছেনঃ পার্থপ্রতিম চৌধুরী। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেনঃ উত্তমকুমার। বিপরীতে নায়িকা মিঠু মুখোপাধ্যায়। একটি বিশেষ চরিত্রে আছেনঃ শমিতা বিশ্বাস। এছাড়া আছেন : সুব্রত সেনশর্মা, ছায়া দেবী ও ঝুমুর গাঙ্গুলী। চিত্রগ্রহণ করছেনঃ অনিল গুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেনঃ নচিকেতা ঘোষ।

বেশ কিছুদিন বিরতির পর প্রবীণ চিত্র পরিচালক অজয় কর নতুন ছবি নিয়ে ফ্লোরে আসছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল তিনি শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' চিত্রে রূপায়িত করবেন। জোর খবর হচ্ছে এ-ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সুচিত্রা সেন যথাক্রমে নায়ক-নায়িকা। সাত পাকে বাঁধার পর এই জুটি কোন ছবিতে কাজ করেন নি। অতএব দর্শকদের কাছে এক নতুন আবেদন উপস্থিত করবেন। শুটিং শুরু হতে হতে ফেব্রুয়ারী। চিত্রগ্রহণ করবেনঃ বিশু চক্রবর্তী। সুর-সৃষ্টি করবেনঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনখানি শরৎ-কাহিনী চলচ্চিত্র রূপায়ণ প্রযোজনা করবেন। পরিচালনা করবেন তিনজন স্বনামখ্যাত। সত্যজিৎ রায়, পূর্ণেন্দু পত্রী ও তরুণ মজুমদার। যতদূর জানা গিয়েছে সত্যজিৎবাবু চিত্রায়িত করবেন 'মহেশ' শ্রীপত্রী 'অভাগীর স্বর্গ' এবং তরুণবাবু পণ্ডিতমশাই'। রূপায়ণের কাজ কবে শুরু হবে তা এখনো জানা যায়নি।

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি কি? এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ এখনো হয়নি। তবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মহলের খবর তিনি শংকর-এর 'জন অরণ্য' চিত্রায়িত

লালবাই মহতের পরিচালক ইন্দর সেন রাজশ্রী বসু দীপঙ্কর দে চিন্ময় রায় এবং শমিত ভঞ্জ। —ফটো : অমৃত

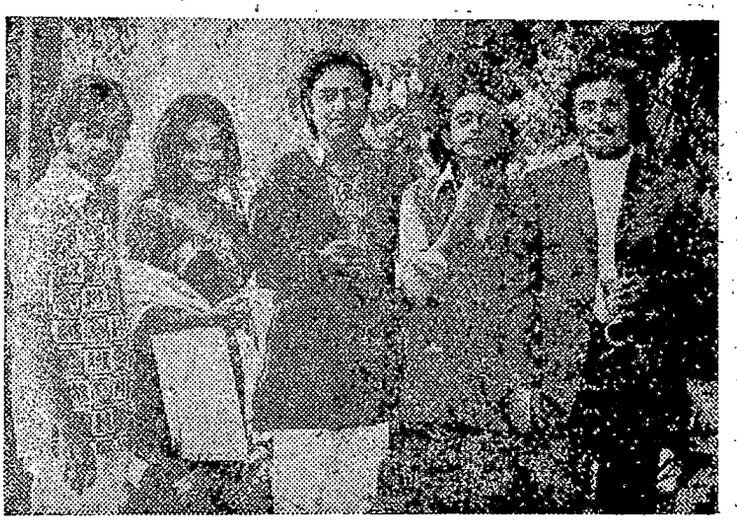

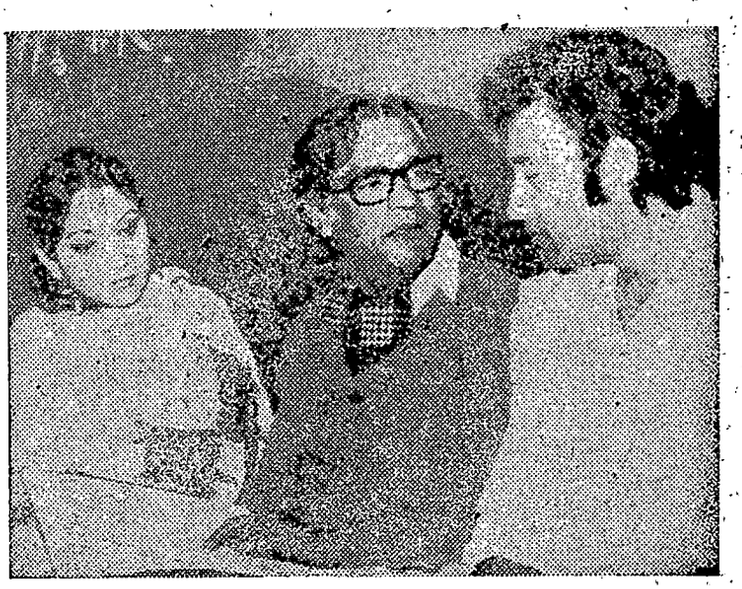

বারবধূ/সোমা দে পরিচালক বিজয় চ্যাটার্জী ও শমিত ভঞ্জ। ফটো : অমৃত

করতে প্রস্তুত হচ্ছেন। পরিকল্পনা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। শিল্পী নির্বাচন শুরু হবে শিগগিরই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম শোনা যাচ্ছে। এ-ছবিতে উৎপল দত্ত নির্বাচিত হলেও হতে পারেন।

শরণ দে পরিচালিত 'প্রতিবিম্ব' বেলগ্রেড আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। অল্প দিন আগে তরুণ পরিচালক শ্রীদে এই খানিখানির সমস্ত কাজ শেষ করেছেন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য পরিচালক শ্রীদে এই ছবিখানির সমস্ত দিলীপ মুখোপাধ্যায়। নায়িকাঃ কৃষ্ণা বসু। এ-ছবির কাজ শেষ করেই শ্রীদে নতুন ছবির পরিকল্পনা করেছেন। শুভ সূচনা হয়েছে। ছবির নাম 'সূর্য আবিষ্কার' ছবির শুটিং কবে শুরু হবে তা জানা যায়নি।

তরুণ পরিচালক নীতিশ মুখোপাধ্যায় অনতিবিলম্বে নতুন ছবির কাজ শুরু করবেন। সুনীলা দাশের কাহিনী। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীমুখোপাধ্যায় স্বয়ং। ছবির নামঃ 'কাল মধুমাস'। ছবিটি সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা হবে। নায়ক চরিত্র রূপায়িত করবেনঃ দেবরাজ রায়। নায়িকাঃ সোমা দে। একটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করতে পারেন শমিত ভঞ্জ। চিত্রগ্রহণ করবেনঃ দীপক দাশ।

গত সপ্তাহে পরিচালক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পালাবার পথ নেই' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করলেন দীঘার সমুদ্র সৈকতে। নায়ক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং নায়িকা অপর্ণা সেন—দু'জনেই অংশগ্রহণ করেন। এ-ছবির আলোক চিত্রশিল্পী দীপক দাশ। সঙ্গীত পরিচালক অজয় দাশ।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

নাটমঞ্চ

নয়াদিল্লীর যাযাবরের 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন'

'গান্ধার' নাট্য সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কোলকাতায় নয়াদিল্লীর সুখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী যাযাবরের দ্বিতীয় নাটক ছিল শেকসপীয়রের 'মিড সামার নাইটস ড্রিম'এর বাংলায় রূপান্তরিত (উৎপল দত্ত কৃত) 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন'।

'মিড সামার নাইটস ড্রিম' বাঙালী পাঠকের কাছে নতুন কোন সাহিত্যসম্ভার নয়। একটা বয়সে এই রূপকথার সঙ্গে একাত্ম হননি এমন পাঠক-পাঠিকা বিরল। যার রোমান্টিক আমেজ নাটকীয়তা চিরকাল স্বপ্নের মত হয়েই থেকে যায় মনে।

কিন্তু এর কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর এবং স্বপ্নের মতই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তেমনি এর রূপদান করাও দুরূহ সন্দেহ নেই। এবং বলা যায়, এমন নাটক মঞ্চস্থ করা এক হিসেবে দুঃসাহসেরও ব্যাপার।

যাযাবর গোষ্ঠী তবু যে সেই দুঃসাহসের কাজ করেছেন, তার জন্যে তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র।

তবে যাযাবরগোষ্ঠী রসরাজ অমৃতলালের 'বাবু' নাটক পরিবেশনে যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, এ নাটকে তাদের সেই কৃতকার্যতা ততটা ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, যে কোন কারণেই হোক।

নাটকের দিক থেকে 'বাবু' পরিবেশনও খুব সহজসাধ্য নয় বলাই বাহুল্য। কারণ বাবুর গল্প প্রহসনমূলক হলেও তার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ এবং চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে তৎকালীন পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়। সেইদিক থেকে এঁরা সার্থক। যাঁরা এঁদের 'বাবু' দেখেছেন তাঁরাই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন।

'চৈতালী রাতের স্বপ্ন' যাযাবরের কোলকাতায় পরিবেশিত দ্বিতীয় নাটক। এ নাটক 'বাবু'র মত জমাটি হতে না পারার একটি প্রধান কারণ বোধহয় এর ঢিলেঢালা ভাব। অভিনয় এবং পরিবেশনের দিক থেকে আর একটু দ্রুতগতি এবং সঙ্গবদ্ধ—অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলা যায় কমপ্যাকটনেস হলে নাটকটি আরও রমণীয় দর্শন হোত।

তবে প্রথমার্ধের চেয়ে নাটকের দ্বিতীয়ার্ধ অনেকটা দ্রুতগতি এবং অভিনয়ের দিক থেকে সাবলীল হওয়ায় নাটকটি দর্শনীয় হয়ে উঠেছিল এবং কুশীলবদের আড়ষ্ট ভাবও অনেকটা কমে গিয়েছিল।

অভিনয়ে যে দুজন দর্শকের সপ্রশংস 'বাহবা' কুড়িয়েছেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে তড়িৎ মিত্র ও রবীন ভট্টাচার্য। এঁদের অভিনয় দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে।

এর পরেই নাম করা যায় জগন্নাথ মুখার্জি, শঙ্কর দাশগুপ্ত, শ্যামল রায়-চৌধুরী, সলিল ঘোষ এবং ছবি সেন, আরতি ভট্টাচার্য ও আরতি গণচৌধুরীর অভিনয়ের কথা।

এছাড়া অসিত সরকার, তুষারকান্তি মণ্ডল, সজল মিত্র, দিলীপ ঘোষ, তুষার মিত্র, দিলীপ সরকার, সুবীর সেনশর্মা এবং নারী চরিত্রাভিনয়ে ছন্দা সমাজদার ও স্বপ্না সান্যাল সুন্দর।

রুদ্র মুখার্জি, আলপনা সান্যাল অনুরাধা চ্যাটার্জি ও নন্দা সমাজদার-এর পরীদের নাচ যেমন ছন্দময় তেমনি রোমান্টিক। মঞ্চে এদের উপস্থিতি বেশ একটা রূপকথার আমেজ সৃষ্টি করেছে।

সেই অনুপাতে সঙ্গীতের সহযোগিতা থাকলে নাটকের দৃশ্যবিশেষ আরও হৃদয়-গ্রাহী হোত। সুরযোজনা কিন্তু সুন্দর ছিল (সঙ্গীত পরিচালনা নির্মল ভট্টাচার্য)। সলিল ঘোষ ও নারায়ণ ভট্টাচার্যর শব্দ-সংযোজনা নাটকের পরিস্থিতি সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। আর ভাল লেগেছে পিণ্টু বসুর আলোর কাজ।

সমগ্র নাটকটি পরিচালনায় সুবিমল ব্যানার্জির আন্তরিকতা ও যোগ্যতার ছাপ প্রতিটি দৃশ্যেই বিদ্যমান। এমন একটি দুরূহ নাটক পরিচালনা করার যে অসুবিধা তিনি তা অনেকখানিই উৎরে গেছেন।

ভবিষ্যতে এঁরা আবার এসে আমাদের আরো নতুন নাটক দেখিয়ে আনন্দ দিয়ে যাবেন সেই আশাই কোরবো।

আমরা আবার সাদর আহ্বান জানিয়ে রাখছি নয়াদিল্লীর যাযাবর নাট্যগোষ্ঠীকে।

সর্বশেষে কোলকাতার 'গান্ধার' নাট্য সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি তাঁদের এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য। আমরা তাঁদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের বাঙালী নাট্যগোষ্ঠীর নাটক ও কোলকাতায় বসে দেখতে পাবো এই আশাও রাখছি।

নাট্য সমালোচক

ময়ূরমহল নাট্যাভিনয়

অমৃতবাজার যুগান্তর ও অমৃত পত্রিকার কর্মচারী সমিতির বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বরূপা মঞ্চে ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'ময়ূর মহল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। সহকর্মীদের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলার পক্ষে সমিতির এই সৎ প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

'ময়ূর মহল' মূলত রহস্যধর্মী নাটক। দৃশ্যে দৃশ্যে এর যেমন নাটকীয়তা তেমনি তার পাশাপাশি রহস্যের আমেজ।

সমিতির সভ্যরা কেউ পেশাদার শিল্পী নয়। কিন্তু বলতে বাধা নেই, অভিনয়ে কারোরই আন্তরিকতা বা প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। বরং কোন কোন চরিত্রাভিনেতারি অভিনয় দর্শকদের অভিনন্দন কুড়িয়েছে। তার প্রমাণ বীরেনকান্তি ঘোষ (ডাঃ বসন্ত মল্লিক), বরুণ ঘোষাল (উদয়নারায়ণ), ভোলানাথ ব্যানার্জি (রাঘব সর্দার), শিশির-কুমার চক্রবর্তী (জগৎনারায়ণ), শম্ভু রায় (ত্রিদিবনারায়ণ), অরবিন্দ ভট্টাচার্য (ডাঃ অমিয় চৌধুরী), শ্যামল দে (রজত), বিমল দে (রতনলাল), সুধীর মুস্তাফি (মণিক-লাল), সুশীল মুখার্জি (ব্রজেশ্বর চৌধুরী), আশীষ ভট্টাচার্য (বীরেন্দ্র সিংহ) ও অনিল দাস (কল্যাণ রায়)।

অন্যান্য ভূমিকায় রমেশ ভঞ্জ, শীতল দাস, মৃত্যুঞ্জয় রায়, তরুণচন্দ্র কর, হিরণ্ময় মুন্সী, গৌতম সেনগুপ্ত এবং গোবিন্দ মান্না সুঅভিনয় করেন।

স্ত্রী ভূমিকায় গীতা দে শিখা ভট্টাচার্য, গীতশ্রী দেবী ও কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলিষ্ঠ অভিনয় করেন।

বিভাস মুখোপাধ্যায়ের আলোকসম্পাত অভিনব।

নাটকটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেন সুধীর মুস্তাফি।

যদুবংশ

সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কলকাতা লোকাল হেড অফিসের সাংস্কৃতিক শাখা বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কলা মন্দিরে বিমল করের 'যদুবংশ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। শ্রীশ্যামল সেনের সুদক্ষ পরিচালনায় নাটকটি উপভোগ্য হয়েছিল। সেই সঙ্গে শিল্পীদের দলগত অভিনয়ও প্রশংসনীয়। শিল্পী দলে ছিলেন—গৌতম দে, কল্যাণ মল্লিক, চঞ্চল দত্ত, সুধেন্দু বসু, পুলক মুখোপাধ্যায়, ভূপাল বসু, দিবাকর ঘোষ, অলোক মুখার্জি, গোবর্ধন পাল ও শ্রীমতী চিত্রা সেন।

স্বদেশী ছবি

সম্প্রতি রাজধানীতে যে পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল তার থেকে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয় নি এমন কয়েকটি ছবি (মোট ৭টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি এবং ৭টি (?) শর্ট) নিয়ে ভারত সরকারের তথ্য বিভাগের উদ্যোগে কলকাতায় এক চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল গত ৩১শে জানুয়ারী থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

উৎসবের সূচনা হয় ডায়েরী অফ এ শিনজুকু বার্গলার নামক জাপানী ছবি দিয়ে। তার আগে অস্ট্রেলিয়ার একটি শর্ট ফিল্ম অটোমেটিক ষেটি উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে দেখান হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী শ্রীসব্রত মুখোপাধ্যায়। সাফল্য কামনা করে ভাষণ দেন শ্রীমতী কানন দেবী এবং ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশনের কলকাতা শাখার প্রধান শ্রী জে আর হালদার ভারত সরকারের তরফ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলি সম্বন্ধে জানা থাকলে এখানকার দর্শকদের ছবি দেখা ও বোঝার পক্ষে সহায়ক হোত। কারণ একমাত্র ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষা সম্পর্কে এখানকার সাধারণ দর্শকরা ওয়াকিবহাল নন। একমাত্র ভরসা সাব-টাইটেল। তাও সব ছবিতে সাব-টাইটেল ইংরেজীতে হয় নি। যেমন আলজেরিয়া ও ফ্রান্সের যুগ্ম উদ্যোগে তোলা ছবি ওয়ালস অফ ক্লে (অবশ্য এ ছবির গল্প বুঝতে দর্শকদের খুব একটা অসুবিধা হয় নি) ও কানাডার ছবি বিটুইন ফ্রেন্ডস ছবিতে ইংরাজী সংলাপ থাকা সত্ত্বেও ফরাসী সাব টাইটেল যুক্ত ছিল।

তবু কলকাতার দর্শকরা দিল্লীতে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবের দৌলতে কিছু বিরল বিদেশী ছবি দেখতে পাবে, এটাই তাদের লাভ। সেই আশায়ই দর্শকরা কদিন ধরে উৎসবের ছবি দেখেছে। মন ভরেছে কিনা সেটা স্বতন্ত্র কথা।

তবে এর মধ্যে জাপানী ছবিটা যে দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে একথা সহজেই বলা যায়। তার কারণ এ ছবির বিষয়বস্তু। এমন দুঃসাহসিক এবং নির্বিকার তোলা ছবি দেখা একটা বিরল অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই। ছবিটি বলা যায় পুরোপুরিই যৌন ভিত্তিক। প্রায় খোলাখুলিই সব ব্যাপার) দৃশ্যে এবং সংলাপে। পাশে মহিলা নিয়ে কোন সুস্থ দর্শক এ ছবি সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা আমার খুবই সন্দেহ আছে।

মোহনবাগানের মেয়ে রাজশ্রী বোস/দীপঙ্কর দে।

নরনারীর যৌন জীবন এর বিষয়বস্তু।

এ ছবি বেড সিন রেপ (এমন কি থিয়েটারের স্টেজেও গল্পের প্রয়োজনে—এমন কথাই ছবিতে বলা হয়েছে।) জবরদস্ত সম্পূর্ণ নারী দেহ নগ্ন করা এবং উৎক্ষিপ্ত অবস্থায় সেই দেহ ব্যবহার করা, সেকসো সাইকোলজিস্টের ভূমিকা ইত্যাদি এমন সব দৃশ্য এতে আছে যা দেখলেও বিশ্বাস করা মুস্কিল। এর সঙ্গে আছে বিশ্বের মনীষী ব্যক্তি, রাজনৈতিক কৃতী পুরুষ ইত্যাদির যৌনতা বিষয়ে মতামত ব্যবহার।

দেখতে দেখতে বিস্ময়কর কথাটাও যেন হার মেনে যায়।

তবে একথা ঠিক যে, এমন স্পষ্ট এবং দুঃসাহসিক ছবি ইতিপূর্বে বোধহয় আর কখনও দৃশ্যবদ্ধ হয় নি। এ ছবি নিয়ে নিশ্চয় খুব হৈ-চৈ এবং সমালোচনার ঝড় উঠবে অন্যত্রও।

আগামীতে মোটামুটি সব কটি ছবিরই বিস্তারিত জানাবার বাসনা রইল। অন্তত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি নিয়ে আলোচনা অবশ্যই করবেন।

দুটি উল্লেখযোগ্য ছবি

ডি এইচ গ্রিফিথের জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণে সম্প্রতি ইউ এন ইনফরমেশন সার্ভিস তাঁদের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে তাঁর অবিস্মরণীয় প্রচেষ্টা ইনটলারেন্স ছবিটি দেখালেন। মানবিকতাবোধ এবং অন্য দিকে সমষ্টিগত মানুষের সহজাত সহনশীলতায় এমন ছবি যে যুগে ভাবাই যেত না সেই সময়ই এটি সৃষ্টি করেন ডি এইচ গ্রিফিথ।

এ ছাড়া সম্প্রতি আরো একটি ছবি ইউ এস আই এসের উদ্যোগে দেখান হল কলকাতায় যা স্বভাবতই দর্শককে কৌতূহলী করে তোলে। ছবির নাম এলিস্টেয়ার কুকস আমেরিকা। অর্থাৎ এলিস্টেয়ার কুক নামক জনৈক ব্যক্তির চোখে আমেরিকা।

ছবিটির পেছনে একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্যই আছে তা হল আমেরিকা দেশটা কেমন, সেই কথাটাই সেলুলয়েডের মাধ্যমে বলা। বক্তব্য প্রচারমূলক হলেও একটা গোটা দেশকে বোঝার পক্ষে যে কিঞ্চিৎ সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই।

গোটা ছবিটি কয়েকটি পর্যায়ে দেখান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

—শ, র, চ

বাংলা দেশের ছবি

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে ইতিমধ্যে নির্মিত একটি ছবির নাম 'পালঙ্ক'। ছবিটি পরিচালনা করেন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক রাজেন তরফদার। এ-ছবির শ্রেষ্ঠাংশে ছিলেন ভারতের সন্ধ্যা রায়, উৎপল দত্ত ও ঢাকার আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। ছবিটির কাজ বহুদিন আগেই সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণেই আজও মুক্তি পাচ্ছে না এবং শেষ পর্যন্ত কবে মুক্তি পাবে, তাও সঠিক করে বলা যাচ্ছে না।

ভারত বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি আরো একটি ছবি নির্মিত হচ্ছে। এ-ছবির পরিচালক বাংলাদেশের জনাব আলমগীর কবীর। ছবির নাম সূর্য কন্যা। ছবির নায়ক চরিত্রে ঢাকার বুলবুল আহমেদ ও নায়িকা চরিত্রে কলকাতার জয়শ্রী রায় ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে কলকাতার রাজশ্রী বসু অজয় ব্যানার্জী অজিত ব্যানার্জী রীতা দাস প্রমুখ থাকছেন।

সূর্যকন্যার ইউনিট সহ-পরিচালক সম্প্রতি কলকাতায় এসে ছিলেন এবং ছবির কলকাতা অংশের সুটিং পর্ব শেষ করেছেন। কলকাতায় সূর্যকন্যার একটানা আঠারো দিন সুটিং হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, এ-ছবির অন্য-অন্যান্য শিল্পীরা হলেন আনছার মোস্তফা সুমিতা চন্দনা প্রমুখ। সংগীত পরিচালক সত্য সাহা। কণ্ঠ দিয়েছেন সন্ধ্যা মুখার্জি, শ্যামল মিত্র রুণা-লায়লা ও জাহেদুর রহিম।

জানা গেছে ছবির আশী ভাগ সুটিং ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বাকি সুটিং অল্প দিনের মধ্যেই ঢাকায় হবে।

কলকাতায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর কাহিনী নিয়ে বাংলাদেশের একজন তরুণ পরিচালক শাইদুল হক খান একটি ছবি তৈরী করছেন। ছবির নাম 'ছুটির ফাঁদে'। এ-ছবির নায়ক ঢাকার উজ্জ্বল ও নায়িকা কলকাতার আরতি ভট্টাচার্য। ছবির কাজ একটানা অনেকটা এগিয়ে হঠাৎ থেমে গেছে। কারণ হিসেবে জানা গেছে ছবির পরিচালকের সঙ্গে ছবির প্রযোজক ও পরিবেশকের মতবিরোধ। ফলাফল ছবির সুটিং আর এগুতে পারছে না।

ছবির খবর থাক। এখন আপনাদের একটি ভূতের গল্প শোনাই।

না কেচ্ছা-কাহিনীর ভূতের গল্প নয়। —এ রীতিমত শিক্ষিত ভূতের গল্প। এফ ডি সি-তে ভূত আছে। এটা নতুন কোন কথা নয়। কিন্তু সম্প্রতি এফ ডি সি-র ল্যাবেও ভূতের আনাগোনা শুরু হয়েছে। এই অজ্ঞাত ও দক্ষ ভূতেরা রাতের আঁধারে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ল্যাবে ঢুকে প্রিন্টিং মেশিন নষ্ট করে, কেমিক্যালে পানি মিশিয়ে দেয়। এছাড়াও এসব ভূতেরা নেগেটিভও উল্টেপাল্টে রেখে চম্পট দেয়।

আমার কথায় যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে এফ ডি সির ল্যাবের কর্মীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমি একবর্ণও বানিয়ে বলছি কিনা! ল্যাবের কর্মীরাও যে প্রায় রাতে ল্যাবে কারো কারো স্পষ্ট চলাফেরার শব্দ শুনতে পেয়েছে। অতএব সন্দেহের কোন প্রশ্নই এখানে উঠছে না।

আচ্ছা তাহলে এসব ভূতের কর্মক্ষমতার একটা নজীর তুলে ধরি। মাত্র কিছুদিন আগে 'ভাইবোন' ছবির প্রিন্ট হচ্ছিল। ছবির প্রিন্ট-ইনচার্জ ছিলেন খোকা। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি খেটেখুটে কেমক্যাল তৈরি করে বাড়ী চলে গেলেন। পরদিন ভোরে তিনি যথানিয়মে ল্যাবে এসে অবাক। কেমিক্যাল পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পেলেন, অজ্ঞাত সুচতুর ভূত তার অনেক কষ্টে তৈরি-করা কেমিক্যালে পানি মিশিয়ে দিয়ে গেছে। অর্থাৎ এই পানি মেশানো কেমিক্যালে কাজ করলে ছবির সমস্ত প্রিন্ট নষ্ট হতে বাধ্য।

এখন আপনারাই বলুন, আমি যে বললাম এফ ডি সি-র ল্যাবে ভূত আছে, কথাটা কি মিথ্যা বললাম?

অবশ্য এ-ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম নয় মাঝে-মধ্যেই ঘটছে। এসম্পর্কে সি পি জনাব বজলে হোসেনের বক্তব্য হলো এটা ল্যাব-কর্মীদের একে অন্যের প্রতি শত্রুতার ব্যাপার। ভূত-টুত কিছু নয়।

—আনওয়ার আহম্মদ

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন প্রসঙ্গে

১০ জানুয়ারী থেকে ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত রবীন্দ্র কাননে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের উদ্যোগে ১৭ দিনে মোট ১৮টি যাত্রা নাটক অভিনীত হয়। তরুণ অপেরার মাও-সে-তুং অভিনীত হয়েছিল ১৪ জানুয়ারী। মাও-ৎ-সে-তুং-এর সমালোচনা ইতিপূর্বেই আমরা প্রকাশ করেছি। নাটকটির জনপ্রিয়তাই আমাদের সঠিক মন্তব্যের পরিচয়ক। সম্মেলন উপলক্ষে অভিনীত মাও-ৎ-সে-তুংর পুনরায় আমরা দেখেছি। পূর্বে সংগীতাংশ যে ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েছিল ইতিমধ্যে তা সংশোধন করে নেবার জন্য নাটকটি আরো গতিময় হয়েছে। নামভূমিকায় শান্তিগোপাল বর্তমান অভিনয়েও তার গুণগ্রাহীদের আশা ও বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছেন পুরোপুরিভাবে। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন উৎপল দত্ত। সম্মেলনে অভিনীত নাটকের মধ্যে মাও-ৎ-সে-তুং সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বলে ওয়াকেফহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ।

১০ জানুয়ারী উদ্বোধন রজনীতে অভিনীত হয়েছিল বহুপরিচিত নট কোম্পানীর মা-মাটি-মানুষ। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত নাটকটি পরিচালনা করেছেন খ্যাতনামা অভিনেতা অরুণ দাশগুপ্ত। সুষ্ঠু সংযোজনা করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'মা-মাটি-মানুষ' সংগীত অভিনয় ও নাটকীয় বিষয়বস্তুতে বর্তমান বছরের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। নাটকটিকে মায়ের মহিমময়ী রূপের সঙ্গে মাটির প্রতি খাঁটি মানুষের আত্মিক যোগের সঙ্গে মাটির প্রতি অর্থাৎ গ্রামবাংলার প্রতি আমাদের সচেতন হবার আবেদন নিয়েই রচিত। বি-ডি-ওদের কর্তব্য সম্পর্কেও নাটকটিতে সচেতন করে তোলা হয়েছে। পরিচালক অরুণ দাশগুপ্ত অত্যন্ত দরদী মন নিয়েই নাটকটি পরিচালনা করেছেন। নায়িকা সাবিত্রী চরিত্রে শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্তার অভিনয় এই নাটকটির অন্যতম আকর্ষণ। শ্রীমতী বীণা সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ে সমান পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক ইন্দ্রনাথ চরিত্রে প্রিয়দর্শন ধ্রুবগোপাল ব্যানার্জি খলবন্ধু হিসেবে মদনকুমার দীপেন চ্যাটার্জির মহিম গাঙ্গুলী নির্মল অধিকারীর মাতন বাগদী এবং শিবনাথ চরিত্রে পরিচালক অরুণ দাশগুপ্তের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লখাই চরিত্রে খোকন বিশ্বাসের অভিনয় চলনসই কণ্ঠে তার উদাত্ত কণ্ঠের সংগীত-লহরী যাত্রামোদীদের যথেষ্ট তৃপ্ত দেয়।

দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী নট কোম্পানী আজও যাত্রামোদীদের কাছে সম্মান জানিয়ে থাকার জন্য পরিচালকদের অভিনন্দন জানাই।

১১ জানুয়ারী নিরঞ্জন অপেরার ফেরারী ফৌজ নিঃসন্দেহে বর্তমান বছরে যাত্রানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উৎপল দত্তের মঞ্চসফল নাটকের যাত্রারূপে পরিচালনা করেছেন তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য উদীয়মান অভিনেতা মৃণাল ঘোষ। পরিচালনায় মঞ্চনাটকের স্বাদ যাত্রারূপে পুরোমাত্রায় মৃণালবাবু বজায় রেখেছেন অথচ যাত্রার বিশেষ প্রকাশভঙ্গীর কথা সব সময়ই তিনি মনে রেখেছেন। অভিনয়, সঙ্গীত ও দৃশ্যসংস্থাপনায় ফেরারী ফৌজকে অভিনন্দন জানাই। (ক্রমশঃ)

শীলভদ্র

শতবর্ষের স্মরণীয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০০ খৃষ্টাব্দ ক্লাসিক তথা সমগ্র নাট্যদেশের পক্ষে আরো গৌরবজনক। দানীবাবুলাল সেন এতদিন ক্লাসিকে ইংরেজী ছবি দেখিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছিলেন। ইতিপূর্বেই প্যাথে ফ্রেরীজ কোম্পানীর মুভি ক্যামেরার তিনি চলচ্চিত্র গ্রহণে হাত পাকিয়ে নিয়েছেন। এবার তিনি সরাসরি বিদেশ থেকে ক্যামেরা আনিয়ে এদেশের মাটিতে ছবি তোলায় আত্মনিয়োগ করলেন। অমরেন্দ্রনাথ সর্ববিষয়ে তাঁকে উৎসাহ এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমনকি আর্থিক শক্তি নিয়েও তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালেন। ক্লাসিকের শিল্পীদের নিয়ে বিভিন্ন নাটকের দৃশ্যাবলী ছবিতে পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং স্থির হয় যে এরপর থেকে ক্লাসিকে বিদেশীয় ছবি দেখিয়ে দেশীয় চিত্রই দেখানো হবে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী সোমবার অমরেন্দ্রনাথের মজা সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়। মজা উচ্চপ্রশংসিত হয়। তবে ছাত্রদের সম্পর্কিত দৃশ্যটির বিরুদ্ধে নানান প্রতিবাদও শোনা যায়। ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের পান্ডব গৌরবের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। প্রথম রজনীর শিল্পীদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র—কঞ্চুকী। হরিভূষণ ভট্টাচার্য—সঞ্জয়। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ভীম। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু—দ্রৌপদী। লক্ষ্মীমণি—ঘোষেরানী। কুসুমকুমারী—উর্বশী। তিনকড়ি দাসী—সুভদ্রা। শৈলবালা সুন্দরী—চেটিকা। টুনুমণি—উত্তরা প্রভৃতি ছিলেন। পান্ডবগৌরব অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। প্রতিটি পুরপত্রিকা পান্ডবগৌরবের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। ইন্ডিয়ান মিরর কলকাতার দৈনিক সমাচার, বঙ্গভূমি প্রভৃতি নাটকের এবং বিশেষ করে ভীম চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৫ এপ্রিল ১৯০০ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক পরিত্যাগ করে মিনার্ভায় যোগদান করেন।

২৬ মে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসুন্দরের অভূতপূর্ব সাফল্যের মধ্যে দিয়ে ক্লাসিক [illegible] মঞ্চস্থ [illegible]

ওদিকে মিনার্ভায় সীতারাম নাটকের বিজ্ঞপ্তি দেখে অমর দত্ত রাতারাতি সীতারাম-এর নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং ৩০ জুন তারিখে মঞ্চস্থ হলো সীতারাম। নামভূমিকায় অভিবাদন জানালেন বিডন-কেশরী অমর দত্ত। মিনার্ভার নামভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। তাই অমর দত্ত হ্যান্ডবিলে লিখলেন : ক্ল্যাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা স্থবির নহে।'

'অশ্বপৃষ্ঠে' সীতারাম—কি অপূর্ব শোভা!
ছুটে যেন রোধিবারে গিরিশ-প্রতিভা।
নট-গুরু সনে রণ
দম্ভে করে আস্ফালন
ক্লাসিকের সীতারাম বলদৃপ্ত যুবা।'

ক্লাসিকের পক্ষ থেকে হ্যান্ডবিলে গিরিশ চন্দ্রকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হতে লাগলো। মিনার্ভার পক্ষ থেকেও কিছু কিছু উত্তর যে না দেওয়া হতে লাগলো—তা নয়। তবু অমরেন্দ্রনাথ অনেক সময় হ্যান্ডবিলের ভাষায় শালীনতা ছাড়িয়ে যান। যেমন একবার লিখলেন : নট নর্তকী ও নাপিত—তিন চল্লিশের পার হইলেই কাজের বার হইয়া যায়।' (ক্রমশঃ)

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

বিবিধ সংবাদ

বাংলা চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার উৎসব ১৯৭৪ (নির্বাচনে সচেতন চলচ্চিত্র দর্শকরা ভোটে দিন) : ১৯৭৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে এই পুরস্কার সীমাবদ্ধ। ক্ষয়িষ্ণু বাংলা চলচ্চিত্রকে উৎসাহ প্রদানের জন্য এই সমিতি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে। বাংলা চলচ্চিত্র দর্শকমণ্ডলীকে ভোটপত্র ১৬৩ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৬ থেকে সংগ্রহ করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ভোটপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২।২।৭৫। দর্শকদের ছেপানো ভোটপত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হবে।

তুলনা

সৌরভের নৃত্যনাট্য

অযোধ্যাকান্ড : প্রায় একশত শিল্পীর সমন্বয়ে রচিত সৌরভের রামায়ণ (অযোধ্যাকান্ড) নৃত্যনাট্য কলামন্দিরে মঞ্চস্থ হয়েছে ৫ ও ১১ জানুয়ারী। প্রথমটি সৌরভের ব্যানারে, দ্বিতীয়টি অনামিকার।

রামায়ণের অসংখ্য চরিত্র তাদের বিভিন্ন ভাব, রসবৈচিত্র্য নৃত্য নাট্য ও সঙ্গীতের

প্রকাশিত এ নাটক পড়লে, অভিনয় দেখলে, বলতেই হবে—শ্রেষ্ঠ নাটক।

বয়েজ ওন হলে ... রূপমায়া

শনি ৬-৪৫ । রবি ৩-১৫ ও ৬-৪৫

সাগরিকা সংলাপ

নাটক ও নির্দেশনা ॥ রাখাল দাশ

ষ্টার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফোন : ৫৫১১০৯

প্রতি বৃহঃ ৬টা

শনি, রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬টায়

পরিচয়

পরিচালনা : শিবম ঘোষ

নাটক : কুণাল আখাজী

সতীন্দ্র, শমিতা বিশ্বাস, অলোক, গীতা, অনামিকা, শিবম ও হরিধন।

শতাধিক গীতিকারের পাঁচ শতাধিক আধুনিক গানের অনবদ্য সংকলন। সেই সঙ্গে সংক্ষিপ্ত গীতিকার পরিচিতি

চার দশকের বাংলা গান ১৫

"...ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থের সমাদর হবে এবং প্রয়োজনীয়তা থাকবে। আধুনিক ভাল বাংলা গানের একটি সংকলন প্রয়োজনীয় ছিল এবং সেই অভাব এঁরা মিটিয়েছেন।" —শারদীয়া (দেশ)

বেতার শিল্পীদের মতের মত আধুনিক গানের স্বরলিপি গ্রন্থ :—

গীতিকা ৪·০০ । **গীতি-প্রতিমা** ৬·০০

প্রকাশ ভারতী ৮৩এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

কাহতে হ্যাঁয় মুঝেকো রাজা/অলকা শরমা সিনহা

সার্বজনীন ভাষায় সর্বহৃদয় সঞ্চারী করে তুলতে পেরেছেন—এ প্রযোজনার সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হোলো এইটিই। এ অনুষ্ঠানের প্রধান সম্পদ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ রচিত সঙ্গীত। বিভিন্ন তালবাদ্যে ছন্দসঙ্গীতে, লাস্যীয় সঙ্গীতে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীতে জ্ঞানবাবুর অগাধ পাণ্ডিত্য, অধিকার ও শিল্প দক্ষতা কিংবদন্তীতুল্য। এই সব রকম সুর ও তাল প্রয়োগ-নৈপুণ্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছে অযোধ্যাকাণ্ডের সঙ্গীত ও গান। তাঁর কাজের সুযোগ্য সহচর হয়ে উঠেছেন কণ্ঠসঙ্গীতে সর্বশ্রী রবি কিঙ্কর প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় অলোক গাঙ্গুলী দীপ্তি-প্রকাশ ললিতা ঘোষ শান্তা ও সাধনা। আপনাপন যোগ্যতার মানানুযায়ী এঁরা সামগ্রিক সার্থকতার সহায়ক হয়েছেন। কল্যাণী রায় রচিত অর্কেস্ট্রার সুরে মহাকাব্যের ভাবটিই অনুরণিত হয়।

বিশেষভাবে অভিনন্দনীয় নমিতা চট্টোপাধ্যায়। শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের দিয়ে এতবড় কাহিনীকে জীবন্ত করে তোলার দুঃসাধ্য কাজে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ। নৃত্যে অভিনয়ে কখনও কথক ভারত নাট্যম ও লোকনৃত্যের আধারে কখনও শুধুমাত্র অভিনয়প্রধান করে ইনি নৃত্য রচনা ও কল্পনাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

অভিনয়ে সকলেই চরিত্রের দাবী পূর্ণ করলেও সারা অনুষ্ঠানকে ধরে রেখেছেন শর্মিলা ঘোষ (রাম) স্বপ্না চক্রবর্তী (ভরত) সুনন্দা মুখোপাধ্যায় (দশরথ) অসীমা চট্টোপাধ্যায় (বশিষ্ঠ) গুহক ও মন্থরার দ্বৈত অভিনয়ে দীপালী রায় এবং কৌশল্যার স্নেহকোমল মাতৃ-মূর্তির রূপায়ণে চন্দনা চট্টোপাধ্যায়।

মূল কাহিনীকে অনাহত রেখে সম্পাদনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন শ্রীযুক্তা মণিকা রায়। দোহা ও চৌপায়ী দিয়ে মহাকাব্যের সুর ধ্বনিত করার সুন্দর পরিকল্পনাটির কৃতিত্বও তাঁর।

আলোক ও অডিওগ্র্যাফিতে বিমল তাপস সেন ও অহিমা মুখোপাধ্যায়।

অশোকতরুর একক আসর : একক সঙ্গীতাসরের উদ্গাতা অশোকতরু। এর আগে বহুবার তাঁর একক আসরের গান শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে।

সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ সিলভার স্টারের অনুষ্ঠানে শিল্পীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসের দিক ছাড়াও পাণ্ডিত্যের দিকটি যেন আলোর মতই প্রতিফলিত হয়েছিলো। দৃষ্টির পথ বেয়ে মনের পটেও কল্পনার রামধনু ফুটিয়ে তুলেছিলো—পটভূমিকায় আঁকা তিনটি ছবি—জোড়াসাঁকো, শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতনের। কবির মানসধারা বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই তিনটি স্থান কবির প্রেরণার তীর্থক্ষেত্র। এবং পূজা প্রেম ও প্রকৃতির গানকে পর্যায়ক্রমে উদ্দীপ্ত করায় জোড়াসাঁকো শিলাইদহ ও শান্তি-নিকেতনের বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে শ্রোতাদের অবহিত করে উদ্যোক্তারা তাঁদের সাংস্কৃতিক দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেছেন।

নীলাভ আলো রজনীগন্ধা সজ্জিত মঞ্চ সব মিলিয়ে এক অপূর্ব পরিবেশ। এরই মধ্যে এক একটি ফুলের মত ফুটে উঠছিলো অশোকতরুর এক একটি গান। নিবেদিত হয়েছে অঞ্জলির মতই কলালক্ষ্মীর চরণ বন্দনায়।

পরের পর্যায় শিলাইদহে রচিত প্রেমের গীতনূপুর বেজে উঠেছে নানা ছন্দে। আভাসে পাওয়া অনুভবের ব্যাকুলতা (এখনো তারে চোখে দেখি নি) মিলনের (ভালবেসে সখি) পলকে মুহূর্তকে ধরে রাখার আকুল আগ্রহ ('আমি যে রজনী') এবং আরো তিনটি গানে দয়িতার মনের কথা শোনার আর্তি, আশা-নিরাশা মিলনবিরহের মধুর দোলায় প্রেমিক চিত্তের এক পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া গেলো।

শেষ হোলো শান্তিনিকেতন-পর্ব যেখানে পূজা ও প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অন্তরালে থেকে কবির প্রকৃতির গানকে পূর্ণ করেছে। দহনের তপস্যা ('প্রখর তপন তাপে')—বর্ষার গুরুগম্ভীর আয়োজন ('আঁধারে অম্বরে') শরতের উদার আহ্বান ও বসন্তের ক্ষণিক সৌন্দর্যের পাগল-করা আবেদন। ভাব-গভীরতা অশোকবাবুর তন্ময়ী আবেগ সব মিলে যেন রবীন্দ্রনাথের জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের প্রতি শিশিরস্নাত পূজার ফুলের আরাধনা। অমিতাভ চৌধুরীর ভাষ্য প্রদীপ ঘোষ ও শ্যামশ্রী ঠাকুরের ভাষ্যপাঠ দীনেশ চন্দর সেতার ও জহর দের তবলা এ অনুষ্ঠানের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

—চিত্রাঙ্গদা

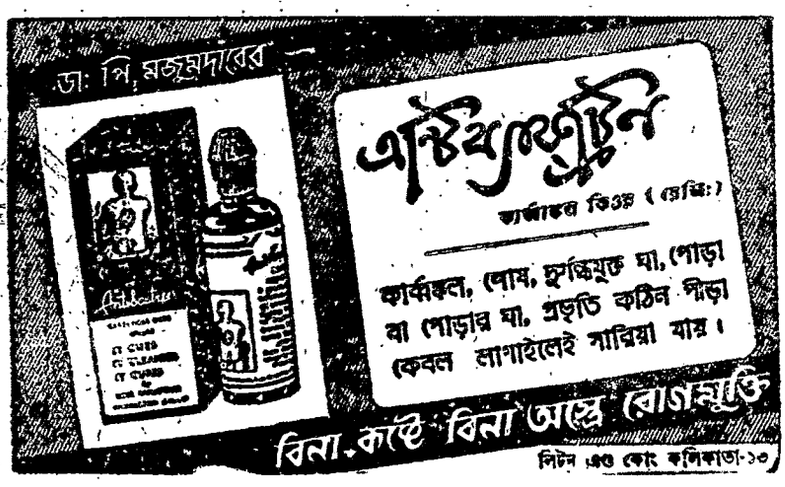

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ২৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ● তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

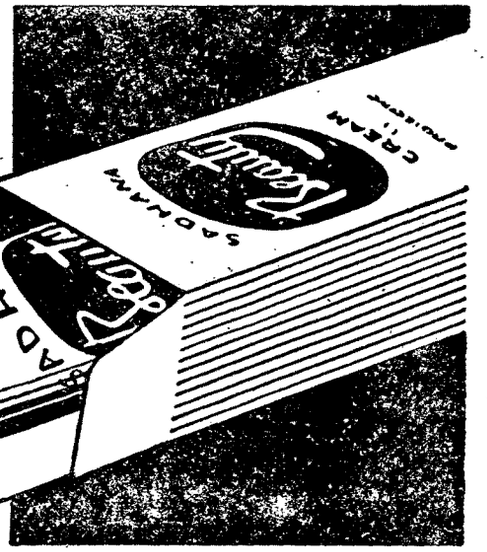

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 5/71

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 14th Febru
Phone 55-5231

নতুন
ফরমুলায়
সুন্দর প্যাকে

কুকমী
গুঁড়া মশলা

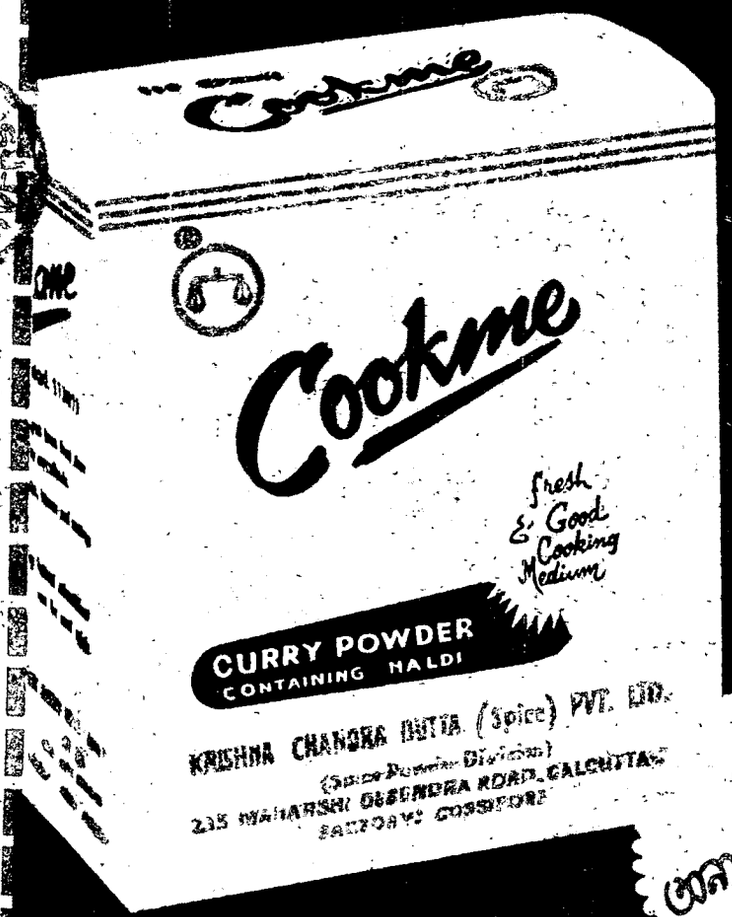

হ'লো সেই আসল
জিনিষ যার পেছনে
রয়েছে ১২৫ বছরের
অভিজ্ঞতা

১। সর্বাধুনিক মশলা প্রযুক্তি বিদ্যার ফল নতুন প্যাকে আরও উন্নত ধরনের কুকমী গুঁড়া মশলা।

২। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের গবেষণা।

৩। বাজারের অন্যান্য পাঁচটা গুঁড়া মশলা থেকে কুকমী গুঁড়া মশলা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ও খাদ্যপ্রাণ ভরপুর।

আমাদের
অন্য কোন ব্র্যাণ্ড ও
ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ ফোন ঃ ৩৩-৩২২৫ ফ্যাক্টরী—হাওড়া

IAA/KCD-74

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ ॥ মূল্য ৬৫ পয়সা

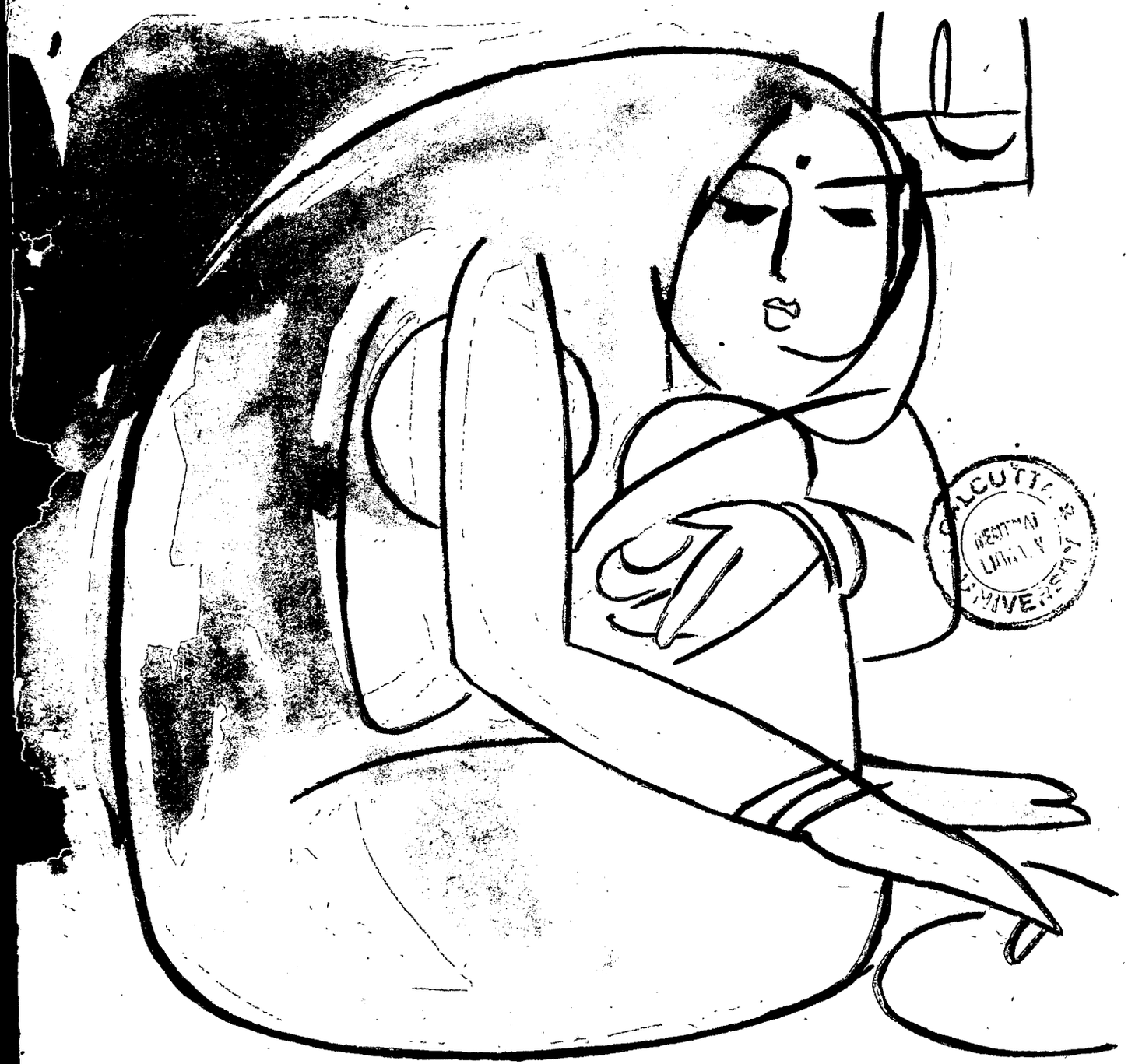

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

যার সহায়

শীতে

তার ভয় কি?

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস

প্রাঃ লিমিটেড • কলিকাতা ৭০০ ০০৩

ট্রু-টোন
হেয়ার কণ্ডিশনার মেশানো
অনবদ্য হেয়ার ডাই

এই কলপ খুব সহজেই সারা মাথায় সমান ভাবে
লাগানো যায়। চুলের রঙ নকল বলে ধরাই যায় না। তাছাড়া, এই হেয়ার ডাইতে
হেয়ার কণ্ডিশনার থাকায় চুল নরম, উজ্জ্বল আর পরিপাটী থাকে।

* নামকরা হেয়ার ড্রেসাররাও এই হেয়ার ডাই ব্যবহার করেন।
* চুলের যত্নের ব্যাপারে পৃথিবীর অগ্রণী মার্কিন কোম্পানী—হেলীন কার্টিস-এর অভিজ্ঞ কারিগরীর সাহায্যে তৈরী হেয়ার ডাই।

স্বাভাবিক কালো এবং গাঢ় বাদামী রঙে—
আরো দু'টি সাইজে পাওয়া যায়।
আপনাদের সুবিধার জন্যে দাম ছোলার
ট্রু-টোন স্টেন রিমুভার, রবারের গ্লাভস্ আর
ডেভেলপারও আলাদা পাওয়া যায়।

এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন—
কে. কে. হেলীন কার্টিস,
বোম্বাই ৪০০ ০৩৮

পূর্বভারতের পরিবেশক : জি. এথারটন এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

everest/999/HC-bn

বরণীয় সাহিত্যিকবৃন্দের স্মরণীয় গ্রন্থরাজি

ফুলানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

থৈথৈ হাহাকার ১৮
অনেক রক্ত মাড়িয়ে ৯
গোধূলির কুমকুম ৮
ভোর হল বিভাবরী ৮
রাই শোন আজ ৬
শুক নয় শাড়ী নয় ৫
বিবর্ণ বুলবুল ৫

নারায়ণ সান্যালের

বিহঙ্গ বাসনা ১০
গজমুক্তা ১০
অন্তর্লীনা ৮
আবার যদি ইচ্ছাকর ১২

নিখিলচন্দ্র সরকারের

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০

দীপক চৌধুরীর

কুমারী কন্যা ৮

শক্তিপদ রাজগুরুর

যদি জানতেম ১২
মুক্তিস্নান ৬
নয়া বসত ৬
রূপ বদল ৫
গৌড়জন বধূ ১২
অভয়ারণ্য ১২

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

যুগস্বাক্ষর ১০

পরিতোষ মজুমদারের

অগ্নিলতা ৫
আলোর সন্ধান ৪

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবর্নশিরি ২০

নীলকণ্ঠের

নীলকন্ঠ বিচিত্রা ১০
জীবনরঙ্গ ৬

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আকাশের আয়না ৮
পূর্ব পুরুষ (১ম খণ্ড) ৮
পূর্ব পুরুষ ২য় খণ্ড) ১২

শ্রীহংস-এর

লাস্ট ওয়ার্ড ৮
গাইনিক ওয়ার্ড ৮
মায়া মৃগয়া ৭

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

স্বাতী ও দীপু ১০
বিশ্বাসের বাইরে ৫

প্রফুল্ল রায়ের

সুধা পারাবার ৬
সোনালী রেখা ৪

আবদুল জব্বারের

জনপদ জীবন ৮

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১২
আধুনিক ৬
অবগুন্ঠন ৫

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

রূপসী প্রতিবেশী ১২
ভূস্বর্গ কাশ্মীর ৬
বিপাশা নদীর দেশে ৬

ডঃ জয়গুরু গোস্বামীর

চারণকবি

মুকুন্দদাস ২৫

মণি বাগচীর

দেশপ্রিয়

যতীন্দ্রমোহন ৬

শঙ্কু মহারাজের

মধু-বৃন্দাবনে (তিন পর্বে সম্পূর্ণ)

ব্রজপর্ব ১০ - বনপর্ব ১০ - মহাবন পর্ব ১২

সুভাষ সমাজদারের

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮

ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের

নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা ৮

কাশীকান্ত মৈত্রের

রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি ২০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোন ৩৪-১৩৫৬

ঘোষাল মশায়ের র‍্যালিফ্যান পাড়ার সব বাচ্চাদের কি দুরন্তপনাই না সহ্য করছে গত পাঁচ বছর ধরে ! কিন্তু আজও একেবারে নতুনের মত। সেন মশায় র‍্যালিফ্যানটি কিনেছিলেন সেই কত বছর আগে। কি আশ্চর্য ! আজ অবধি একটু দাগও ধরেনি। চৌধুরী সায়েব আজ এখানে তো কাল সেখানে। কেবল বদলি আর বদলি ! তাঁর র‍্যালিফ্যান কিন্তু একটুও খারাপ হয়নি। গীতা বৌঠান র‍্যালিফ্যান চালিয়ে গান শুরু করেন। ফ্যানে টুঁ শব্দটি হয় না, তাই। আমাদের মৌলানা সায়েব তাঁর র‍্যালিফ্যানের 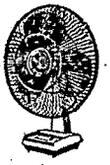 দিকে একবার নজরও দেন না। পিণ্টো মাসীর বসার ঘরের দেয়ালের রঙের সঙ্গে তাঁর র‍্যালিফ্যানটি 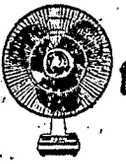 কি চমৎকার মানিয়েছে ! আর আমাদের খুঁতখুঁতে খিটখিটে দত্ত খুড়ো—এই কালকেই তো চোখ বুঁজে কিনে নিয়ে এলেন র‍্যালিফ্যান।

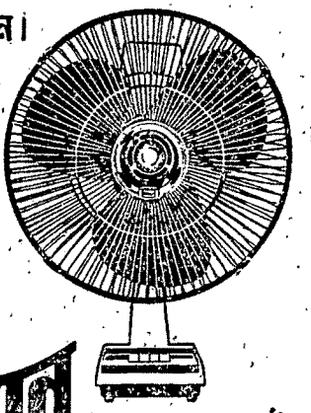

আপনার কি চাই র‍্যালিফ্যান তা বেশ ভালই জানে

U-RTF-20 BEN

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪১ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান এ্যান্ড ফরেন [illegible]
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 21st February, 1975 — শুক্রবার ৮ ফাল্গুন ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	বল্লরী	(গল্প)	শ্রীসুশীল রায়
১১	পটভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১২	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৪	দেশেবিদেশে		শ্রীপুণ্ডরীক
১৫	নোটিশ	(কবিতা)	শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
১৫	গভীর দুঃখ ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়	(কবিতা)	শ্রীশ্যামা দে
১৫	রাখাল	(কবিতা)	শ্রীকমল চক্রবর্তী
১৬	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
১৮	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রীউপগুপ্ত
২০	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে		শ্রীদিলীপকুমার রায়
২২	যুবক-যুবতী		শ্রীঅমর দাশ
২৪	চিঠিপত্র		
২৭	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
৩০	গোয়েন্দা ধাঁধা		শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
৩১	টুসুগানে সমাজমন ও প্রেমচেতনা		শ্রীশান্তি সিংহ
৩৩	পরমাণু শক্তি, না দারিদ্র্য —কোনটা আমাদের কাম্য		শ্রীদিলীপ মালাকার
৩৪	পুনশ্চ		শ্রীক্ষপণক
৩৫	অঙ্গনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক
চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল
হোমিও বই

মূল বিক্রয়কেন্দ্র — আমাদের কলিকাতার চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় ও হেড অফিস।

চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় : ১১৪৩
আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি-২৫
এবং ৫৩ গ্রে স্ট্রীট, কলি-৬

হেড অফিস : ৩৬বি শ্যামাপ্রসাদ
মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫

পাইকারী ক্রেতা / বিক্রেতাগণ
হেড অফিসে যোগাযোগ
করিবেন

এল আই সি বীমাপত্রের মালিকগণের স্বার্থে প্রচারিত

আপনার এল আই সি এজেন্টের ঠিকানাটি লিখে রাখুন

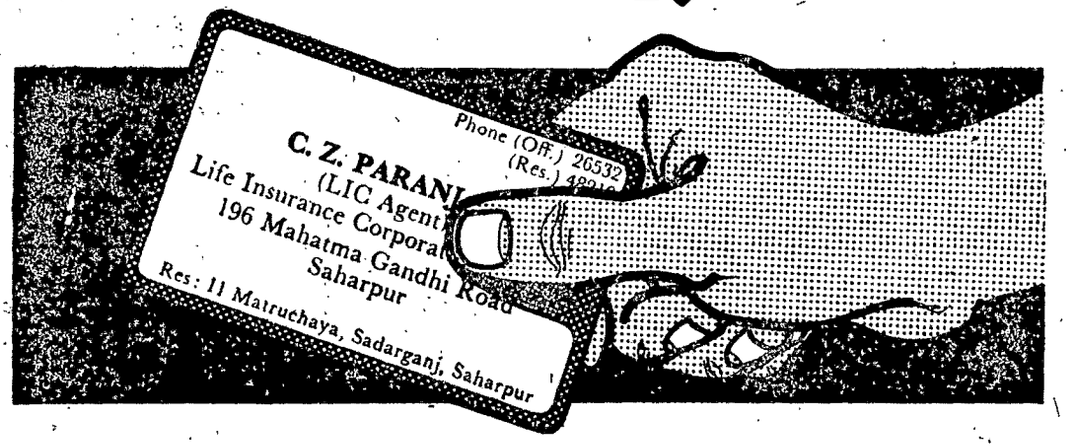

তিনি আপনার বীমার যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারেন

আপনার জীবন বীমার এজেন্ট হলেন আপনার বন্ধু। আপনার বীমাপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে সাহায্য করাই তাঁর কর্তব্য।...আর সেটি প্রত্যাশা করার অধিকার আপনার আছে। এল আই সি-র সঙ্গে কাজকর্মের ব্যাপারে আপনি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করুন। আপনি যদি আরো বেশি টাকার জীবন বীমা করাতে চান, তখনও তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।

দাবী সম্পর্কিত চাহিদাগুলি ঠিকমত পূরণ করা হয় না বলে অনেকক্ষেত্রে এল আই সি-র দাবীর টাকা মেটানো সম্ভব হয় না বা মেটাতে দেরী হয়ে যায়। আপনার এজেন্ট আপনাকে বলে দেবেন কি কি করতে হবে। এগুলি হ'ল, উত্তরাধিকারীর নাম মনোনীত করা; বয়সের প্রমাণ দাখিল করা এবং বীমাপত্রে সেটি প্রমাণিত করে রাখা; সময়মতো প্রিমিয়াম দেওয়া; এবং আপনার ঠিকানার কোন পরিবর্তন হলে, আপনার বীমাপত্রটি এল আই সি-র যে অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের জানানো।

আপনি যে এজেন্টের কাছে বীমা করিয়েছেন, তাঁর সাহায্য নিন—এবং আপনার বীমাপত্রটি যাতে ঠিকমত চালু থাকে, সে ব্যাপারে তৎপরতার সঙ্গে ও সঠিকভাবে পরামর্শ নিন। প্রয়োজন হলে কাছাকাছি এল আই সি-র অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৬	আন্তর্জাতিক মহিলা বছর	শ্রীমলয়া ধর
৩৭	রান্না করে দেখুন	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৩৯	রূপসীর খাতা	শ্রীবরবর্ণিনী
৪০	শেষ বিচার (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪৪	প্রদর্শনী	শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়
৪৬	সেকালের সংগীতগুণী	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৪৮	স্মৃতির অন্য নাম সূর্যমুখী (গল্প)	শ্রীঅসীম রেজ
৫১	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান	
৫২	আর্থিক প্রসঙ্গ	শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৫৩	খেলাধুলা	শ্রীদর্শক
৫৬	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅময়
৫৭	দেশবিদেশের খেলা	শ্রীপ্রশান্ত দা
৫৯	প্রেক্ষাগৃহ	শ্রীচিত্রদূত
৬১	ফ্লোর থেকে বলছি	
৬২	স্টুডিও সংবাদ	স্টুডিও সংবাদদাতা
৬৩	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা	শ্রীঅভিজিৎ
৬৪	কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	শ্রীশা র চ
৬৫	কেউ ভোলে না কেউ ভোলে	
৬৬	নাটমঞ্চ	মঞ্চ সমালোচক
৬৮	স্মরণীয় শতবর্ষ	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৭১	জলসা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীধ্রুব রায়

সংশোধন ঃ গত সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ কুমারী কুমুদ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস (ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে)

তিন পরী ছয় প্রেমিক ৪

সুবোধ ঘোষ-এর উপন্যাস

দুই গন্ধর্ব ৮

বৈতালিক-এর উপন্যাস

রিক্ত বসন্ত ৬

নীহাররঞ্জন গুপ্ত-এর উপন্যাস

সুভদ্রা হরণ ৬

নিশাচর-এর রহস্য উপন্যাস

কুহেলিকা ৬

অমিতাভ দাশগুপ্তর উপন্যাস

সেই লোকটি ৭

গজেন্দ্রকুমার মিত্রর উপন্যাস

রাতের বাসা ৬

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কবিতার বই)

মুখোশের রঙ ৩

নটরাজন-এর উপন্যাস

মেয়ে পুলিশের ডায়েরী ৮

চিরঞ্জীব-এর খেলার বই

স্পোর্টস ডায়েরী ৮

অমরেন্দ্র দাশ-এর ঐতিহাসিক উপন্যাস

এই সেতু সেই সেতু ৭

দেবেন্দ্র মৈত্র-এর উপন্যাস

গ্যাংম্যান হরিরাম ৭

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস

সাজঘরের নায়িকা ৮

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর

সমুদ্রের সামনে ৬

হরপ্রসাদ মিত্রর (কবিতার বই)

ঝাউয়ের শব্দ ৪

জ্যোতি প্রকাশন ।। ২এ নবীনকুণ্ডু লেন ।। কলিকাতা—৯

আড্ডার অভিধান

সংশোধনা ঃ কুমারেশ ঘোষ

সদ্য প্রকাশিত পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ।

গ্রন্থ-গৃহ। ৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২।

হারজিৎ

শ্রীসুরপতি ঘোষ ৫-০০

সেইটাই সকলের চেয়ে ভাল বিয়ে, যে বিয়েতে ভাল সন্তান জন্মায়। গোরা-চাঁদদের ত আমরা দেড়শ/দুশ বছর ধরে একেবারে ঘরের মধ্যে এনে দেখলুম। কি করে ওরা বড় হ'ল, তা আমরা আজও ধরতে পারিনি। শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে জন্মাতে হয়। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয় যাচিঞ্জা করার সুযোগ দিলেই তবেই ভাল বিয়ে সম্ভব। এরই অপর নাম পূর্বরাগ, বিলিতি নাম কোর্টশিপ।

ভারতজ্যোতি প্রকাশনি

প্রাপ্তিস্থান ঃ ডি এম লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম

এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

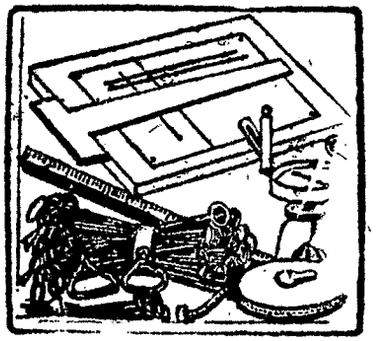

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ ১

ফোন ঃ ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৮

গ্রাম ঃ তরারীপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া

পরিবেশক ঃ কামলিন প্রডাক্টস (ষ্টেশনারী বিভাগ)

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে

কেউ ভাবতে পারেনি যে আট মাস আগে যার কাজ শুরু বর্ষাবাদলায় ধকল সামলে মাত্র চার মাস পুরো কাজের সময় পেয়ে কলকাতায় বিশ্ব টেবিল টেনিসের জন্য একটি স্টেডিয়াম তৈরি করা সম্ভব। পিকিং ছাড়া এশিয়ায় এত সুন্দর এবং এত বড় ইনডোর স্টেডিয়াম আর নেই। এত অল্প সময়ে বারো হাজার দর্শকের উপযোগী একটা সর্বাঙ্গসুন্দর স্টেডিয়াম তৈরি করা সব দিক থেকেই রেকর্ড। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছে। খেলাটা টেবিল টেনিস। ক্রিকেট বা ফুটবলের মতো এখনও তার জনপ্রিয়তা এদেশে ততটা হয়নি। কিন্তু ভারতে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা হবে, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই কলকাতায় গড়ে তোলা হয়েছে নেতাজী সুভাষ ইনডোর স্টেডিয়াম। পশ্চিম বাংলার যুবশ্রেণীর উদ্দেশ্যে এটি উৎসর্গীকৃত।

ভারত এখন পর্যন্ত ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পায়নি। কিন্তু বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পর ভারতের ক্রীড়ানুরাগীরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন একদিন ওলিম্পিক খেলোয়াড়দেরও আমরা আমন্ত্রণ করে আনতে পারব। খেলা শুধু প্রতিযোগিতা নয়। তার মধ্যে বন্ধুত্ব বিনিময়ই সবচেয়ে বড় কথা। আটান্নটি দেশের প্রতিনিধিরা কলকাতার মাটিতে খেলে গেলেন। এতে কোনো রাজনীতি নেই, সোজা সরল বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা। স্বভাবতই চীনা প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি এদেশে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। প্রথম কারণ, তারা টেবিল টেনিসে একেবারে প্রথম সারিতে। দ্বিতীয় কারণ, ১৯৬২ সালের পর এই প্রথম ভারতে একটি চীনা প্রতিনিধি দল এলো। তাদের সঙ্গে এসেছেন চীনের একজন উপমন্ত্রীও। টেবিল টেনিস বা পিং পং আন্তর্জাতিক কূটনীতির একটি অঙ্গ হয়েছে গত দু-তিন বছর ধরে। আমেরিকার সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বরফ গলাবার কাজে অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল পিং পং খেলোয়াড়দের। আমেরিকায় মৈত্রী-মূলক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে গিয়েছিল চীনের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়রা ১৯৭১ সালে। একটি দেশ অন্য দেশের খেলোয়াড়দের কীভাবে গ্রহণ করে তা দেখেও দুই দেশের সম্পর্ক খানিকটা বোঝা যায়। চীনা খেলোয়াড়দের সহজ ও স্বচ্ছন্দ আমেরিকা ভ্রমণ পরবর্তী সময়ে চীন-মার্কিন সম্পর্ককে সহজ করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। তার পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং যান পিকিং সফরে। ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক বর্তমানে না-ভাল না-খারাপ পর্যায়ে রয়েছে বলাই বোধ হয় ঠিক। অর্থাৎ আগে যতটা খারাপ ছিল এখন ততটা নেই। তবে কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতিও হয়নি। পিং পং খেলোয়াড়দের কলকাতা আগমনকে তাই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক সহজ করার ইঙ্গিতরূপে অনেকেই মনে করছেন। চীনা প্রতিনিধি দলের নেতা একথাও বলেছেন যে, তাঁরা বন্ধুত্বটাই প্রথমে দেখছেন, প্রতিযোগিতা হল পরের কথা। এই খেলোয়াড়রা কলকাতার প্রতিযোগিতার পর দিল্লিতে যাবেন প্রদর্শনী খেলা খেলতে। এটাও মৈত্রী সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের শুভ ইঙ্গিত বলেই ধরা যায়।

অবশ্য আবলম্বেই চীনের সঙ্গে ভারতের সব বিরোধ মিটে যাবে এমন আশা করা ভুল। বহু বিষয়েই চীনের সঙ্গে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের চীন পিছন থেকে মদৎ দিচ্ছে। সিকিম ভারতের সহযোগী রাজ্য হবার পর চীন তাকে নিন্দা করেছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে চীন বহুবার বিরোধিতা করেছে। পাকিস্তান হল চীনের বন্ধু। এ সবই ভারত-বিরোধিতার কারণে। এবং ভারতের সঙ্গে বিরোধিতার অন্যতম কারণ ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী। চীন নিজেকে বিশ্ব বিপ্লবের ধাত্রী বলে মনে করে। যদিও তার ঘরের কাছে ভিয়েতনামে মুক্তি-সংগ্রামের সময়ে সে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহায্যই দেয়নি। সে সাহায্য দিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। কিউবাকে মার্কিন আক্রমণ থেকেও রক্ষা করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। চীন তাকে কোনো সাহায্য করেনি।

তা সত্ত্বেও ভারত সব সময়েই চায় সমান মর্যাদার ভিত্তিতে সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব। দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ মিল না থাকলেও এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে কোনো বাধা নেই। যে পঞ্চশীলের নীতিতে একদা চীন বিশ্বাস করত এবং তার ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেছিল সে নীতি ভারত এখনও অনুসরণ করে চলেছে। চীন যদি সেই নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখে তাহলে তার ভিত্তিতেই আবার দুই দেশের মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। শক্তির দম্ভ দেখিয়ে এ যুগে কোনো দেশ অপর দেশকে কাবু করতে পারবে না। ভারতকে তো নয়ই। আমেরিকা অনেকবার এ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। চীন তার নিজের দেশে অনেক বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ভারত তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচী উদযাপন করে চলেছে। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে যেমন সকল দেশ নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখিয়েও একে অপরকে খাটো করে দেখে না, আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ক্ষেত্রেও তেমনি নিজের কৃতিত্বের বড়াই দেখিয়ে বন্ধুত্ব আদায় করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বিশ্বাস। কলকাতায় বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে তারই পরিচয় আমরা পেয়েছি।

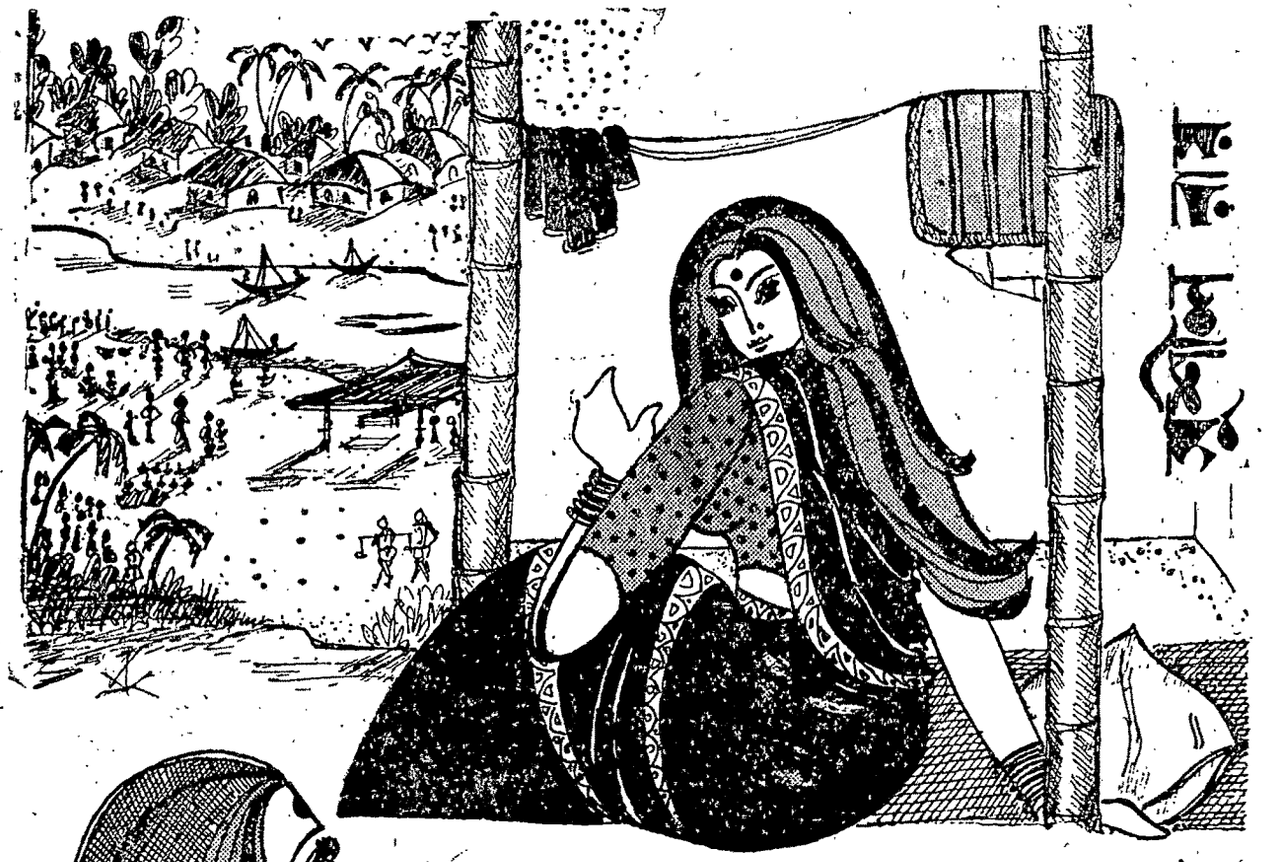

মালবিকা

॥ সুপ্রিয়া চৌধুরী ॥

আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না—আমার অভিভাবকেরা এ বিষয়ে নিশ্চিত। তাঁরা নিশ্চিত বটে কিন্তু নিশ্চিন্ত তাঁরা হতেই পারছেন না।

নিজেও অনেক সময় নিজের কথা ভেবেছি। বড়রা আমাকে দিয়ে যা করাতে চান আমি তা করব, এমন সংকল্পও করেছি। কিন্তু সব শপথ ভেসে গিয়েছে। নিজের রাশ কিছুতে টানতে পারি নি। আমি নিজেরই খুশি-মতন ভেসে চলেছি।

যাত্রা-গান, তরজা, ঝুমুর কীর্তন—এই সবের দিকে আমার টান খুব। কোথাও তরজার আসর বসেছে শুনলেই আমার সব কাজ ভেস্তে যায়। কোথাও যাত্রাদল এসেছে জানামাত্র সেখানে আমার যাত্রা করা চাই-ই। কোথাও কীর্তন হচ্ছে শুনলে আমি ছুটে গিয়ে ভক্তদের দলে ভিড়ে যাই, তাদের করতাল নিয়ে বসে গানের তালে-তালে টুংটাং শব্দ করি। লোকে আমাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে। আমার স্বাস্থ্য বেশ তাজা, গায়ের রং খুব কালো হলে কী হবে, আমি দেখতেও নাকি খুব খাসা। এ সবের তারিফ আমি শুনেছি, অনেকের মুখে, অনেক জায়গায়। ওসব শুনে-শুনে আমার কেমন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, আমি ওতে বিগলিত হয়ে পড়ি নে।

আমার নামটাও কিন্তু মন্দ না। একবার শুনলে তা মনে রাখতেই হবে কিম্বা মনে রাখার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। আমার নাম কোহিনূরকান্তি এ নামের মানে জানি নে জানতেও চাইনে। এর মানে আমাকেও কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে নি অবশ্য।

ঘরে আমার মন নেই। ঘরে আমাকে বেঁধে রাখাই দায়। আমাকে ঘরে বেঁধে রাখার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে বাড়ির লোক। পারে নি। আমি ঘর-ছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াই। ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগে। কত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, কত নদীনালা কত গ্রামগঞ্জ। এসবের কি কোনো দাম নেই? বলুন।

চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স নাকি হয়ে গিয়েছে আমার। গ্রামের ছেলে আমি, লেখা-পড়া বেশি জানিনে। কিন্তু যাত্রা কীর্তন

কথকতা দেখতে-দেখতে শুনতে-শুনতে আমি যত-কিছু জেনে ফেলেছি অনেক লেখাপড়া-জানা ছেলেও বুঝি তা জানে না। তবে আর আফশোষ করার কী আছে আমার?

অনেক বয়স নাকি হয়ে গিয়েছে আমার। গ্রামের ছেলের পক্ষে আমার এই বয়সই নাকি অনেক বয়স। কিন্তু বয়সই তো মানুষের সব না, মানুষের মনটাই আসল। মনের খুশিটাই সব।

খাওয়া-পরার ভাবনা নেই আমার। অনেক জোতজমি আছে আমাদের আছে পুকুর আছে গরুর বাথান। এই বারুইপুর অঞ্চলে আমাদের চেনে না এমন কেউ নেই। কেবল বারইপুর কেন, চম্পাহাটি ঘুটিয়ারী-সরিফ তালদি এই এলাকার এসব গ্রামের মানুষেরা এমনকি রেলের স্টেশনমাস্টার-মশাইরাও আমাদের চেনেন বিলক্ষণ।

এমন বাড়ির ছেলে আমি। আমাকে আর পায় কে। তার উপর স্বাস্থ্য আছে, বুদ্ধিবিবেচনাও নাকি আছে, আর আছে নাম। হাসবেন না। আমার নাম তো নামের মতনই নাম একটা। তাই না?

ঘরে আমার মন নাই। ঘরে আমাকে বেঁধে রাখার জন্যে অনেক চেষ্টা করে চলেছে বাড়ির লোক। অনেক চোখের জল ফেলেছেন আমার মা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আমার বৌদি তাঁর দেশ শ্যামনগর থেকে আনিয়েছিলেন একটি মেয়ে। তার নাম চম্পা। সে নাকি বৌদির মামাতো না পিসতুতো বোন। মেয়েটিকে আমি দেখেছি, দেখতে মন্দ না। খুব লাজুক। বৌদির মতলব সে জানত বলেই হয়তো আমার সামনে বড়-একটা আসত না, সামনা-সামনি পড়ে গেলে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ত। কাজে-কর্মেও মেয়েটা বেশ পটু। ঘর নিকোনো থেকে আরম্ভ করে গরুর বাথান সাফ করায় তার কাজে খুব পারিপাট্য।

বৌদি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন বুঝছ? ওকে এখানেই রাখব, না পাঠিয়ে দেব শ্যামনগরে?

বৌদির মতলব আমিও বুঝেছিলাম, কিন্তু কিছুই যেন বুঝি নি এইভাবে আমি থাকতাম। বৌদির কথা শুনে কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। বললাম, কে কে এই মেয়েটা?

বৌদি হাসলেন, বৌ। বৌ গো তোমার।

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। পর-দিনই আমি চলে গিয়েছিলাম নরেপুর সেখান থেকে লঞ্চে হুগলী-রূপনারায়ণ নদী পার হয়ে একেবারে গেঁওখালি। নদী আমার বড় ভালো লাগে।

আমি ফিরে এলাম দিন-কতক বাদে। ভেবেছিলুম চম্পা বুঝি চলে গিয়েছে। কিন্তু ফিরে এসে দেখি চম্পা আছে। আমি লক্ষ্য করলাম, বাথান থেকে এক হাঁড়ি গোবর হাতে নিয়ে সে উঠোন পার হতে-হতে আমার দিকে এক-চোখ চাইল।

ঐ চাউনিটা দেখে কেমন মায়া হল আমার।

দিন-দুই বাদে বৌদি আবার ওর কথা তুললেন, বললেন চাঁপা চলে যাচ্ছে।

সে আবার কে?

কেন চেন না চম্পাকে?

বললাম তাই বল। তুমি যে বললে চাঁপা।

ওই হল। ওর ভালো নামটা চম্পা। চাঁপা বলে ডাকি।

বলেছি তো আমার কেমন মায়া হয়ে গিয়েছে ওর উপর। বললাম, ঘুরেই আসুক-না দিন-কতক।

আমার কথায় বৌদি বুঝি আশ্বাস পেয়ে গেলেন। বেশ খুশির হাসি হাসলেন, বললেন, কি চোখে লেগেছে তো?

বললাম, নাতো লাগেনি তো এমনই একটু লাল হয়েছে চোখ।

আমার কথা শুনে বৌদির গা বুঝি জ্বলে গেল। মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বিদ্রূপের আহাম্মক।

চাঁপা সত্যিই চলে গিয়েছিল। সে চলে যাওয়ায় আমার মন কেমন খারাপ লাগছিল। কিন্তু তা প্রকাশ করিনি কারো কাছে।

ঘর আমাকে নাকি বাঁধতেই হবে, কোন-একটা কাজ দিয়ে আমাকে আটকে রাখার জন্যে বেশ সলা-পরামর্শ যে চলছে বাড়িতে আমি তা বুঝতে পারছিলাম।

আমাকে একটা মুদির দোকান করে দেওয়া হল বাড়ির কাছেই। সকাল হলেই ঝাঁপ খুলে সেখানে গিয়ে বসতে হয় আমাকে। দুপুরে ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়িতে খেতে আসি। আবার গিয়ে দোকান খুলে বসি রাত এস্তোক। বুঝতে পারি এ-কাজ আমার না। এতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি বন্দী হয়ে যাচ্ছি।

কানাঘুষোয় শুনেছি চাঁপা নাকি আবার আসছে। একথা শুনে আমার দম আরও যেন আটকে যাবার দশা হল। একটা চাপা আনন্দও বোধ করতে লাগলাম কেন যেন। মেয়েটা সত্যি দেখতে মন্দ না, মেয়েটা বেশ লাজুক। ঘর-সংসারে মেয়েটার খুব মন।

কিন্তু আমার মন আমিই চিনিনে। মুদিখানার এই বন্দীদশায় বসে আমার মন ছটফট করতে লাগল। তার উপর, স্টেশনের দেয়ালে হাতে-লেখা কয়েকটা বিজ্ঞাপন সাঁটা দেখলাম—সুন্দরবন গঙ্গামেলা। একটা নতুন গঙ্গাসাগর মেলা নাকি বসছে সুন্দরবনে।

এতে মন বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। কাউকে কিছু বললাম না। দুপুরে দোকানের ঝাঁপ লাগিয়ে বাড়িতে খেতে না গিয়ে রেল-স্টেশনে এসে একটা টিকিট কাটলাম ক্যানিং-এর। বেশি দূরে না ক্যানিং।

ট্রেন এসে যখন দাঁড়াল, দেখলাম কারা যেন নামল, ওদের মধ্যের একজনকে চিনি, চিনতে পারলাম তাকে চাঁপা। আমাকে দেখতে পায়নি কেউ। ট্রেনে উঠে পড়লাম।

ক্যানিং থেকে লঞ্চ ধরেছিলাম। মাতলাই বলো, বিদ্যাই বলো যাই নাম দাও ওর—ও হল নদী। নদী দেখলে আমি কেমন মাতাল হয়ে যাই। লঞ্চের চালে বসে আমি চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে সন্ধ্যার ঝোঁকে এসে পৌঁছলাম বিরাজমণির ঘাটে।

যেমন কনকনে ঠান্ডা, তেমনি ঘুটঘুটে অন্ধকার চারধার। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি আকাশের তারা গুনতে লাগলাম।

একটা খাঁ-খাঁ দ্বীপ। কয়েকটা ঝুপড়ি ছাড়া ঘরবাড়ি নেই। কিন্তু ভিড় জমেছে কিছু। সুন্দরবনের নতুন গঙ্গামেলা হবে এখানেই। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম চারধার।

পুজোর মন্ডপ কাছেই। গঙ্গাদেবীর মূর্তি কপিলদেবের মূর্তি বেশ খাসা বানিয়েছে এরা। তার সামনেই একটু নীচু জমিতে খাটানো হয়েছে চাঁদোয়া। তরজার আসর বসবে, কীর্তন হবে, যাত্রা হবে। চমৎকার!

সবই ভালো। কিন্তু একটু আস্তানা যে চাই। খোঁজ নিতে লাগলাম। এখান থেকে অনেক দূরে যে গ্রাম তার নাম বালি। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম নাকি সেটা, সেখানে গেলে আশ্রয় নাকি মিলতে পারে।

পুজামন্ডপে হ্যাজাক জ্বলছে, তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শরীরে একটু তাপ নিচ্ছি। ভাবছি, পুরুষমানুষ, জোয়ান, ঠান্ডা একটু সইতে হবে। না হয় পড়ে থাকা যাবে ঐ চাঁদোয়ার তলায়।

যাত্রার দল, তরজার দল ইত্যাদি সব নাকি নাকি এসে গিয়েছে। তারা নাকি আছে গোসাবায়। রাতেই খেয়া পার হয়ে আসবে। রাতেই বসবে আসর। এসব শুনে শীত কমে গেল আমার। রাত-ভোর শোনা যাবে গান। শরীর তাতেই গরম হয়ে উঠবে।

দোকানপাটও বসেছে কয়েকটা। নতুন এই মেলা। সবই তাই কম। কয়েক বছর চললেই বেশ জমে উঠবে। আসল গঙ্গা-সাগরের মতন ভিড়ও একদিন এখানেও হয়তো ভিড় হবে।

এই সম্ভাবনার কথায় আমিই কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগলাম। অযথা। আমাকেই আমি ঠিক চিনতে পারিনে। এখানে একদিন ভিড় যদি জমেই ওঠে, তাতে আমার কী। তাতে আমার এত আনন্দ হবার আছে কী।

হ্যাজাকের তীব্র আলোয় দাঁড়িয়ে বিরাজ-মণির এই মেলার জমায়েত দেখছি। কর্ম-কর্তারা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তাদের ব্যস্ততার কোনো কারণ বুঝছি নে। কিন্তু এটা জানি যে, ব্যস্তসমস্ত না-হলে কর্ম-কর্তা বলে চেনা যায় না।

নদীর সরু একটা শাখা। তার এপার বিরাজমণি ওপার গোসাবা। গোসাবায় অনেক মানুষের বাস। অনেক ঘরবাড়ি। অনেক লোকজন স্টিমশই আসছে ওপার থেকে। হাঁটাপথে বালির দিক থেকেও আসছে অনেক মানুষজন।

রাত বাড়ছে। সুন্দরবনের নিবিড় গাছপালার গায় অন্ধকারের মধ্যে এই

দ্বীপটিকে ঘিরে সান্ত্রীর মতন দাঁড়িয়ে। আমি চেয়ে-চেয়ে দেখছি সেই বন। বনের অগাধে আছে কত হিংস্র জন্তু। তারাও হয়তো গাছের ফাঁক দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে আমাদের, দেখছে তারা আমাদের এই তামাশা।

হঠাৎ বামাকণ্ঠের কলকাকলি কানে এল। নদী শান্ত। ভাটার টানে স্তব্ধ হয়ে আছে। এই নিস্তব্ধ পরিবেশে এই নারীকণ্ঠ একটু সচকিতই করে তুলল।

ওপার থেকে ওর নাকি আসছে, আসছে নাকি ঝুমুরের দল।

ঝুমুর-গান শুনেছিলাম বটে একবার। আমাদের কাছে-ভিতেই। ঘুটিয়ারি-সরিফে। কানে লেগে আছে তার বাউল। মনে-মনে আওড়াতে লাগলাম সেই কলি,—

নতুন মাঝি বাইতে
জা-নি-নে
জলে ঢেউ দিয়ো না!

এ গান শুনেছিলাম সেই ডাঙ্গায় বসে, এবার সেই ঝুমুর-গান শুনব জলের রাজ্যে।

রাত বুঝি বারোটাই হবে তখন। কীর্তন-পালা আগে হয়ে গিয়েছে, এবার বসল ঝুমুরের আসর।

কী সে গান, বলে বোঝানো দায়। সামনের সারিতে বসে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাততালি দিয়ে মাথা নেড়ে তাল দিতে লাগলাম। যে মেয়েটি গাইছিল সে হেসে হেসে আমাকে তারিফ করতে লাগল। বয়স তার বেশি না, বিশ-বাইশ হবে। চোখের কাজ অদ্ভুত, তাকানোর ভঙ্গিই আলাদা। মেয়েটা বেশ তাজা। হ্যাজাকের আলো তার একটা গালে পড়েছে ঐ আধখানা দেখেই পুরো মুখটার আন্দাজ করা যায়।

গাইতে-গাইতে এমনভাবে সে মাথা দোলাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে ঈশারা করে যেন কাছে ডাকছে। ওতে আমার শরীর কেমন শিউরে-শিউরে উঠছিল। শীতে অমন কেঁপে উঠছিলাম, কিংবা কেঁপে উঠছিলাম তার গীতে—তা ঠিক বলতে পারব না।

আমি ভিনদেশী লোক। আমাকে কেউ চেনে না। আমার নাম অমন জবরদস্ত বটে, ও-নাম কেউ একবার শুনলে মনে রাখেই বটে, কিন্তু এখানে সে নামের কোনো দাম পেলাম না। অন্তত এতক্ষণ তা পাইনি।

কিন্তু দাম পেয়ে গেলাম শেষরাত্রের দিকে। ঝুমুরের মেয়েটা আমাকে ডেকে পাঠাল। ডাক শোনা মাত্র আমি উঠে পড়লাম। তার কাছে গেলাম। কাছের একটা ঝুপড়ির মধ্যে সে ক্লান্ত হয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে।

বাতার বেড়া সরিয়ে আমি মাথা নীচু করে ঢুকলাম, সে উঠে বসল, অদ্ভুত ভঙ্গিতে গা-মোড়ামুড়ি দিতে-দিতে বলল 'আসুন মহারাজ।'

এমন সম্বোধনের জন্যে তৈরি ছিলাম না। তার ইশারায় বসে পড়লাম।

ওর নাম নাকি বল্লরী। আমার নাম কী জানতে চাইল। বললাম। নাম শুনে সে হেসে গড়িয়ে পড়ল, বলল অত বড় নাম মনে রাখি কী করে?'

একটু বিরক্তই বুঝি হয়েছিলাম বললাম, 'মনে রাখতে কে বলেছে?'

সে আবার হাসল, বলল, 'ওরে বাবারে, এক কথাতেই ফোঁস। ছোবল দেবে নাকি? বলে ভঙ্গি করে উঠল।

সে নাকি একা নেই, সঙ্গে আছে তার মাসি। তাকে পরে দেখলাম বটে। বাঘের দেশের মানুষ, তাই বুঝি অমন বাঘিনীর মত রূপ। রূপ তেমন হলেও কথায়-বার্তায় বেশ মিষ্টি।

মাসি আমাকে শুধাল, 'কেমন লাগল গো গান? খুব তো তারিফ করছিলেন ঘাড় নেড়ে।'

একটু বুঝি ভয়ই পেয়ে গিয়েছি। ভীত হয়ে বললাম, 'গান বেশ।'

বল্লরী প্রতিধ্বনির মত বলল, 'বেশ।'

ওদের বাড়ি নাকি বেশি দূরে না। কাছেই। বাঘবাগানে। নদী পেরিয়ে রাঙাবেলিয়ায় নেমে বাঁধ ধরে দু কদম হাঁটতেই বাঘবাগান। 'চলো।'

তার গানের কলিটা কানে বাজছে—

মানসেটা যে আসবে বলেছে
তাই ধরেছি সাজ
কোথায় গেল, গেল কোথায়
কোথায় মহারাজ

বল্লরী বলল, কি ভাবতে লেগেছ? ওঠো, চলো। নৌকো যে ঘাটে—'

প্রকাশিত হলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ থ্রিলার

১৯৬৩-র বসন্তকাল, প্রেসিডেন্ট দ্য গলকে হত্যা করার শেষ রীতিগত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, কর্নেল মার্ক রোডিন ও এ এস ক্রিয়াবিভাগ-প্রধান, তখন 'শৃগালে'র প্ল্যানটিকে প্রয়োগ করলেন।

শৃগালের শেষ প্রহর

ফ্রেডরিক ফরসাইথ-এর দি ডে অফ দি জ্যাক্যাল

ভাষান্তর/সৌরীন রায় ॥ ২৫-০০

শৃগাল একজন বেনামা ইংরেজ। যে প্রায় আর একটু হলেই দ্য গলকে হত্যা করে বিশ্বইতিহাসের ধারাকে বদলে দিচ্ছিলো। ফ্রেডরিক ফরসাইথের অনবদ্যভাবে গবেষণাকৃত এই রাজনৈতিক থ্রিলারটি পড়লে জানা যায় কি ভাবে এই গুপ্তঘাতককে সংগ্রহ করা হয়; কত পারিশ্রমিক তাকে দেওয়া হয়; কেমন করে এক জটিল ষড়যন্ত্র বাস্তবে রূপ নেয়; কিভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জাল পাতা হয় তাকে ধরতে (কিন্তু পারেনি); সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশময় এই খুনীকে উদ্ভট ধাওয়া করা ও পশ্চাদ্ধাবনকারীদের নাকের ডগায় থেকেও না থাকার এক অবিশ্বাস্য কাহিনী; এবং নজীরহীন নিরাপত্তার পরিমাণ যা ফরাসী সরকার নিতে বাধ্য হন, তাদের প্রেসিডেন্টের জীবনকে আধুনিক কালের এক নির্মম গুপ্তঘাতকের হাত থেকে রক্ষা করতে।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো

দি কার্পেটব্যাগার্স

ভাষান্তর / মঞ্জুশ্রী রায় ও সৌরীন রায় ॥ ২০-০০

প্রকাশক: পত্রপুট / পরিবেশক: কথা ও কাহিনী ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট-১২

কোন কথা বলতে পারিনি, আমি নৌকোয় উঠেছি, চলে এসেছি বাঘবাগানে।

এখানে এসে বন্দী হয়ে গেলাম। কত-দিন কেটে গেল তার হিসেব দিতে পারব না। অনেক বুঝিয়ে, অনেক প্রতিজ্ঞা করে, ছাড়া পেলাম। ফিরে চললাম বাড়ির পথে।

ক্যানিং-এ এসে ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে। একটা কামরার এক কোণে একা বসে আকাশপাতাল ভাবছি। বাড়ির লোকে আমার কথা কী ভাবছে তা তারাই জানে।

ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট পাঁচেক বাকি। একটা কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে ছুটে এসে ট্রেনে উঠে আমার পাশে বসে পড়ল। পরনে তার পাজামা, সর্বাঙ্গ আলোয়ান দিয়ে জড়ানো, মাথাও ঢাকা আলোয়ানে। পাশে বসে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা ঢাকুরিয়া যাবে তো?'

বললাম, 'যাবে। কেন যাবে না কেন?'

'অনেক ট্রেন আবার সোনারপুর পর্যন্ত যায় কিনা।' বলে ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে হাসল।

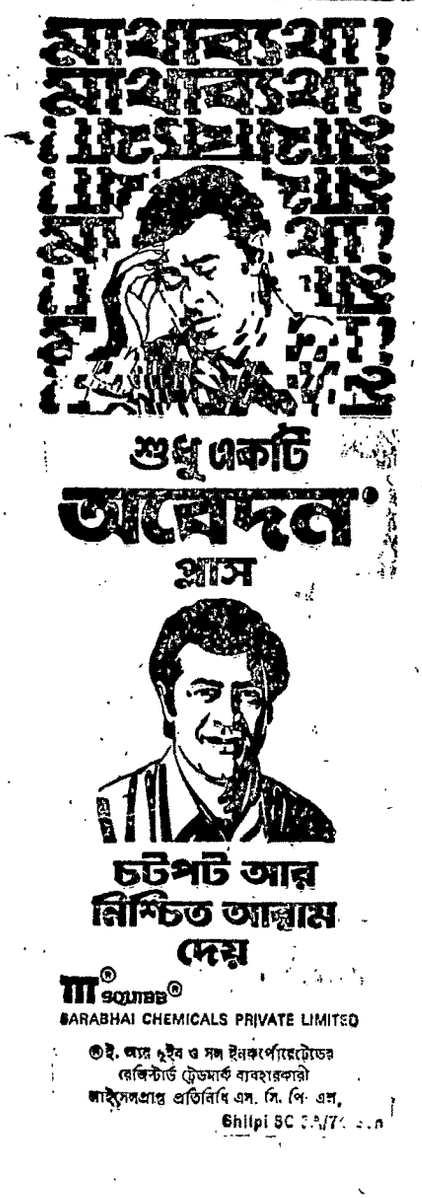

বললাম, 'কী হলো?'

সে হাসল, 'ভীষণ ব্যাপার। বাড়িতে কোন খবর না দিয়ে দু দিন বাদে ফিরছি। কী ভাবনাই ভাবছে সকলে।'

তার এই কথা শুনে একটু আগ্রহের সঙ্গেই তার কথায় মন দিলাম। সে বলল, 'আপিসে নিশ্চয়ই ফোন করেছে, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে খোঁজ করেছে, এতক্ষণে নিশ্চয় খবর দিয়েছে থানায়।'

কথায় কথায় ছেলেটা হাসে। হেসেই বলল, 'কী ব্যাপার বলুন। গ্রামের লোকরা কত সরল। অতিথি পেলে ছাড়তে চায় না।'

পরের সংখ্যায়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হতে লাগল সে যেন আমার মনের কথাই বলছে। বুঝতে পারলাম সে আমার মতন দশাতেই নিশ্চয় পড়েছিল।

এই জন্যে তার কাছে জানতে চাইলাম কি হয়েছিল।

বিশেষ কিছু নাকি হয়নি। আজ হচ্ছে বুধবার, বুধবারই তো? আমার সব হিসেব কিন্তু গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আমি তো দুদিন বাদে ফিরছি নে, আট-দশ দিন হবে কম করেও।

আজ হচ্ছে বুধবার। গত রবিবারে সকালে নাকি সে বের হয়েছিল একটু বেড়াতে। ট্রেনে চেপে চলে আসে ক্যানিং। তারপর ক্যানিং-বাজারের পিছনে গিয়ে দেখে ওপারে নৌকো যাচ্ছে। যেতে লাগে এক ঘন্টা। তখন সে মনে-মনে নাকি হিসেব করে নেয় যে, যেতে আসতে মাত্র দু ঘন্টা, এতে নৌকো-শ্রমণও হবে বিকেলের মধ্যে বাড়ি-ফেরাও হবে। কিন্তু—

'কি হল?' ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম ছেলেটিকে।

সে হাসতে লাগল। মনে হল, ব্যাপারটা ভেবে তার যেমন অবাক লাগছে, তেমনি মজাও লাগছে তার।

নৌকোয় নাকি তার দেখা হয় মাঝবয়সী একটা লোকের সঙ্গে। নাম তার কিনু ঠাকুর। তার সঙ্গে ছেলেটার আলাপ হল। ফুলতলিতে নৌকো একটু থেমে তার পর চলল আমপাড়ার দিকে সেখান থেকেই নৌকো আবার ফিরবে ক্যানিং। ছেলেটিও ফিরে আসবে—এই ছিল তার প্ল্যান। কিন্তু—

'কি হল?'

'কিছুতে ছাড়লেন না আমাকে কিনু ঠাকুর। নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। বেশ বড় বাড়ি। বড় বড় গোলা। আমাকে আটকে দিলেন। কিছুতে ছাড়লেন না। ওঃ, কী আদরযত্ন। একটা অজানা-অচেনা মানুষকে এমন সমাদর ভাবা যায় না।'

একটু হাসল ছেলেটি, বলল, 'এই শীত। মাত্র একটা চাদর গায়ে দিয়ে বেরিয়েছি, দেখছেন তো।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'খুব যত্নআত্তি করল বুঝি? অজানা মানুষ দেখে ভয় হল না তাদের?'

'ভয়? তাদের ভয় হবে কেন। আমারই ভয় হতে লাগল। ভাবলাম, কিছু মতলব নিশ্চয় আছে ওদের।'

আমি উৎকণ্ঠ হয়ে শুনতে লাগলাম ওর কথা।

'রাত্রিবেলা আমাকে ছেড়ে দিল একটা ঘর। বাচ্চাকাচ্চারা শুলো বারান্দায়। সত্যি অবাক হতে হয়। পুকুর থেকে মাছ ধরে আনছে, বাথান থেকে গোরুর দুধ। উঃ, ভাবা যায় না। একটা অপরিচিত লোকের জন্যে এভাবে প্রাণমন ঢেলে দেওয়া—'

'কি বললেন?'

'বলছিলাম, একজন অজানা মানুষের জন্যে এমন হৃদয় ঢেলে দেওয়া।'

আমি ভাবতে লাগলাম। ছেলেটা অবাক হয়ে গিয়েছে বটে, অবাক হয়েছি আমিও বটে, কিন্তু আমার কাছে এ ব্যাপারটা এক-ফোঁটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না। কেন? সে আর খুলে কী বলব!

সে হাসতে লাগল, বলল, 'বারবার কবুল করে নিয়েছে—আবার যেন যাই।'

'কবুল করে নিল বুঝি?'

সে হেসে বলল, 'নিল।'

'রাজি হয়ে এসেছেন বুঝি?'

'অরাজি হইনি।'

বললাম, 'তা তো বটেই। অরাজি হওয়া মুশকিল।'

'তারপর' ছেলেটি হেসে উঠল বলল 'অত খাইয়েও আশা মেটেনি, বলে কি, ফাল্গুন মাসে গোরুর বাচ্চা হবে, দুধ বেশি হবে, তখন জানাব, আসতে হবে।'

গোরুর বাচ্চা হলেই তাকে যেতে হবে, এমন কি বাধ্যবাধকতা আছে ছেলেটির?

ছেলেটি যা বলে গেল সবই যে তা আমার কথা। আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। ঘরে ফিরছি কত দিন বাদে কে জানে। মুদিখানার বাঁপ ফেলে রওনা হয়েছি, আমাকে আর বোধ হয় কেউ খুঁজছে না। খোঁজা হয়তো ছেড়ে দিয়েছে।

যাবার দিন স্টেশনে দেখেছিলাম, চাঁপা এসে নামল। সেও মনে হচ্ছে বহুদিন আগের ঘটনা। এখনো হয়তো চাঁপা আমার অপেক্ষাতেই আছে।

ঐ কিনু ঠাকুরের মতই আমার অবস্থা করে তুলেছিল বঙ্গেশ্বরী। আসতেও দিতে সে চায়নি। জোর করেই আসা।

যখন চলেই আসছি তখন দুই চোখে অদ্ভুত চাউনি ছিটিয়ে সে বলল, 'খোকা চলে খবর দেব, তখন আসা চাইই কিন্তু। বুঝলেন মহারাজ?'

কবুল করে এসেছি। এ ক্ষেত্রে কবুল না করে কি পারা যায়? তার গায়ের তাপ এখনো যে আমার সারা গায়ে লাগা।

ডাঙ হাসতে বশম্বদ মকহ

মন্ত্রীরা যে যার ইমেজ তৈরিতে ব্যস্ত

আজ পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বড়ই দুর্দিন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই যে যার নিজের 'ইমেজ' তৈরীর নেশায় মেতে উঠেছেন। কি দৌড় কি দৌড়। ওয়াংচু কমিশন বসিয়ে দুজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে সিদ্ধার্থশংকর রায় দিল্লীর কাছে মহাপুরুষ বনে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বেশ কিছু দিন আগে অতি সন্তর্পণে হনুমনতাইয়া আর আসামের মৈনুল হককে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কাক-পক্ষীকেও বুঝতে দেন নি; তাঁরা যাতে সম্মানের সঙ্গে সরে যেতে পারেন, তার জন্য দলের নেত্রী জমি তৈরী করে দিয়েছিলেন। এর ফলে দেখা গিয়েছিল, এদের কারোর সম্মানে কোন আঘাত লাগেনি।

কিন্তু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে অন্য চিত্র। সবায়ের ঘোরতর আপত্তি, শুধু একা মুখ্যমন্ত্রী সব ঝুঁকি নিয়ে ওয়াংচু কমিশন বসালেন। কয়েক মাস ধরে বিচার চললো। লোকের মুখে শোনা গেলো, আসল আসল অভিযোগগুলি ধামাচাপা দিয়ে ছোটখাটো অভিযোগগুলি কমিশনের সামনে পাঠানো হয়েছে। এমন কি ধরে নেওয়া হয়েছিল, কিছুই হবে না। লোকচোখে বরং প্রমাণিত হবে মুখ্যমন্ত্রী কি সৎ লোক; তাঁর কি দুর্দান্ত সাহস। দুর্নীতির অভিযোগের ব্যাপারে তিনি কোন সমঝোতা করতে রাজী নন। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরূপ দাঁড়ালো। সিদ্ধার্থবাবু বিনা বাধায় তাঁর দুই সহকর্মীকে বলি দিয়ে বাহবা কেনার চেষ্টা করলেন।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বাহবা পেতে শুরু করেছেন। দিল্লীর একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রথম পাতায় সিদ্ধার্থবাবুর ছবি দিয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন। ঐ পত্রিকার সম্পাদক অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সিদ্ধার্থবাবুর কার্যকলাপকে অনুসরণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, ওয়াংচু কমিশন গঠন ও পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনাগুলি ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর লাভ কি হলো? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, দিল্লীর পত্রিকায় তাঁর ছবি সমেত প্রশংসা প্রকাশিত হত না, যদি তিনি 'ওয়াংচু' না বসাতেন। আর অন্যদিকে সুনীতি চট্টোরাজের কথা ভেবে দেখুন। যেদিন রাতে তাঁকে জোর করে পদত্যাগপত্রে সই করানো হলো সেদিন বিকেলেই তিনি এক প্লেনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছেন। রাজধানীতে এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসে তার আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য রেখেছেন। অথচ পদত্যাগ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জমি তৈরী করার কোন সুযোগও করে দেননি। তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে প্রায় শেষ করে দেওয়ার মতলব আঁটা হয়েছিল। কিন্তু সুনীতিবাবু কাবু হবার লোক নন; বলটা ঘুরিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কোর্টে ফেলে দিয়েছেন। এবার খেলা শুরু হয়েছে।

সুনীতিবাবু সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করতে আরম্ভ করেছেন। বীরভূমের মাটিতে তিনি সিদ্ধার্থবাবুকে সম্বর্ধনা নিতে দেবেন না। এমন কি ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারও চলছে। অবস্থা যে কিছুটা জটিল হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে পদত্যাগকারী অপর মন্ত্রী সন্তোষ রায় কিন্তু সুনীতিবাবু যে 'স্ট্র্যাটেজি' নিয়েছেন, সেই লাইন অনুসরণ করছেন না। তিনি ভিন্নভাবে প্রতিশোধ নিতে চাইছেন। সুনীতিবাবু ও সন্তোষবাবু উভয়েই এখন নিজেদের 'ইমেজ' বাঁচিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ছবিটা কিছুটা খাটো করতে চাইছেন। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কাজ, এর মধ্যে নতুনত্বের কিছু নেই। কথায় আছে আপনি আমার ঘরে আগুন ধরালে আমিও ছেড়ে কথা বলবো না। যার ফলেই রাজ্য মন্ত্রিসভায় অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেছে। সবাই 'ইমেজ' তৈরী করতে চাইছেন।

সন্তোষ রায় বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করতে চাইছেন। এর নজীর যে নেই, তা নয়। পশ্চিমবাংলার স্বর্গত নেতা হেমন্ত বসু যখন কংগ্রেস দল ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন তিনি বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করে আবার জনমত গ্রহণ করেন। সন্তোষবাবু সেই পথ নিতে চাইছেন। যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ এমনকি সি পি আই তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু এতে রাজী হচ্ছেন না। তিনি সম্মতি দিতে দেরী করে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি না দেবার একটা বিশেষ কারণ আছে! সন্তোষবাবু যদি নির্বাচনে দাঁড়ান তা হলে ভোটারদের কাছে তিনি কি বলবেন? ওয়াংচু কমিশন থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যে কাদা লেগেছে, তা ধুয়ে মুছে দিয়ে তিনি কি অন্যের গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারবেন না? ইতিমধ্যে খেলা শুরু হয়েছে। সুনীতিবাবু তো প্রকাশ্যে আক্রমণ করছেন। ডালহৌসী স্কোয়ারে দেওয়ালে দেওয়ালে অনেক দিন পরে মুখ্যমন্ত্রীর নামে পোস্টার লাগানো হয়েছে। সিদ্ধার্থবাবু দিল্লী গেলেই পত্র-পত্রিকায় গুজব রটানো হচ্ছে, তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে দিল্লী চলে যাচ্ছেন। আর তাঁর পক্ষে প্রতিবাদ করা এক কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোদ্দা কথা, জল বেশ ঘুলিয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই যুব কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর ওপর চাপ দিচ্ছেন, সন্তোষবাবুকে নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া হোক। কারণ তা না হলে তাঁর 'ইমেজ' নষ্ট হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী চুপ করে বসে রয়েছেন।

সিদ্ধার্থবাবু যে চুপ করে বসেই আছেন, তাও বলা চলে না। তিনি সব দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। তবে সামনে যে বিপদ আসছে, তা আজ আর কারোর বুঝতে অসুবিধে নেই। বিধানসভার বাজেট অধিবেশন বসবে। সুনীতিবাবু তো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী। তিনি নিজে বলেছেন, একাই তিনি বিধানসভা ফাটাবেন। সকলকার মুখোশ খুলে দেবেন। সকলকার বলতে কি এর মধ্যে চীফ মিনিস্টার পড়বেন কিনা, তা অবশ্য জানা যায় নি। তবে তিনি এ কথাও জানিয়েছেন, নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যে এম এল এ-দের মধ্য থেকে সই সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়েছে। একদিকে বিজয় সিংহ নাহার ক্ষিপ্ত, অন্যদিকে সন্তোষবাবু ও সুনীতিবাবু প্রতিশোধের চিন্তায় মেতে উঠেছেন। এর ওপর ছাত্র পরিষদ যুব কংগ্রেস এবং সংগ্রাম কমিটি ও শিক্ষা বাঁচাও কমিটি রয়েছে। সব মিলিয়েই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আশংকা। সবচেয়ে তাৎপর্যের কথা হলো, ঝড়ের সংকেত পাওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী না থেমে নিজের 'ইমেজ' তৈরী করে চলেছেন। এখন দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কৌটিল্য

এই বাংলার খবর

রেশনে সংকট

ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার মানুষের গুরুতর সংকটই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর। এফ সি আই কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করেন জানুয়ারীর শেষে তাঁদের কয়েকশ ছাঁটাই সহকর্মীর পুনর্নিয়োগের দাবিতে। চিনি পাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল কয়েকদিন আগে থেকেই, কিন্তু এই ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর অনেক এলাকাতেই চাল-গম পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয় যে সরকারি গুদামে খাদ্যশস্যের কোনো অভাব নেই কিন্তু সেই খাদ্যশস্য গুদাম থেকে খালাস করে রেশন দোকানে পাঠানো যাচ্ছে না ধর্মঘটের ফলে।

গুদামের সামনে থেকে ধর্মঘটী কর্মচারীদের সরিয়ে খাদ্যশস্য খালাস করার চেষ্টা করেন এফ সি আইয়ের কর্তারা। তার ফলে ধর্মঘটীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বেধে যায় একাধিক জায়গায়। ফেব্রুয়ারীর তিন তারিখে কলকাতার ডিঙ্গিরা পোল গুদামে এফ সি আইয়ের লরি খাদ্যশস্য খালাস করতে গেলে ধর্মঘটী কর্মীরা সেই সব লরি আটক করেন। পুলিশ তাঁদের সরাতে গেলে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ধর্মঘটীদের মধ্যে ৩০ জন জখম হন। ৮৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের কয়েকজনও জখম হন। পুলিশকে ক্রাঁদানে গ্যাস ছাড়তে হয়। পরদিন আবার সিন্ধিয়াপাড়ায় একই ব্যাপার ঘটে। জখম হন দশজন ধর্মঘটী এবং ছয় সাতজন পুলিশ কর্মচারী।

এফ সি আই কর্মীদের এই ধর্মঘটের ধাক্কা গিয়ে লাগে রেল ওয়াগন খালাসেও। খাদ্যশস্য বোঝাই বহু ওয়াগন রেল ইয়ার্ডে আটক থাকে। গুদাম থেকে মাল খালাসের জন্য রাজ্য সরকার জাতীয় শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিকদের নিয়োগ করেন। ধর্মঘট তুলিয়ে নেওয়ার জন্য নয়াদিল্লী থেকে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এফ সি আই কর্মীদের কাছে আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ তারিখে জরুরি কাজে দিল্লী গেলে গেলেও সেখান থেকে জরুরী বার্তা পাঠিয়ে ধর্মঘটী কর্মচারীদের কাজে যোগদানের জন্য খাদ্যমন্ত্রীর মারফৎ অনুরোধ জানান। কংগ্রেসী ইউনিয়নের ডাকেই এই ধর্মঘটের শুরু।

দুর্ঘটনার হিড়িক

এই কিছুদিন আগে কলকাতার পুলিশ কমিশনার জানিয়েছিলেন যে এই মহানগরীতে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমছে। পুলিশের এই পরিসংখ্যান দেওয়ার জন্যই যেন কয়েকদিন পর পর কয়েকটি দুর্ঘটনায় কয়েকজনের প্রাণ গেল। সোমবার ফেব্রুয়ারীর তিন তারিখে বেলেঘাটার কলকাতা স্কুল অফ সোশেকা কলেজের ছাত্রী নিজে স্কুলবাসে চাপা পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। [illegible] একটি সরকারি বাসের চাকার তলায় একটি তরুণের জীবনান্ত ঘটে। মাঝে একদিন বাদ দিয়ে শনিবার বালিগঞ্জে গড়িয়াহাট রোডে মিনি বাসের সঙ্গে টেম্পোর ধাক্কায় মারা পড়েন এক যুবক। ঐ দিনই হাওড়ায় এক বৃদ্ধ নিহত হন বেসরকারি বাস চাপা পড়ে।

মিতার মৃত্যু ঘটে তার কলেজের সামনেই। তার উত্তেজিত সহপাঠীরা সঙ্গে সঙ্গে বাসটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। দমকল কর্মীরা এসে পৌঁছলে তাদের সেই আগুন নেবাতে দেওয়া হয় নি। ছাত্ররা যানবাহন চলাচলও বন্ধ করে দেয়। ছাত্র নেতারা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। পরদিন গোটা শহরে ছাত্ররা ধর্মঘট করেন এই দুর্ঘটনার প্রতিবাদে। উত্তর কলকাতার দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করেও রীতিমতো উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। অপরাধী বাসটি পালাতে সক্ষম হলেও উত্তেজিত জনতা অপর একটি বেসরকারি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। হাওড়াতেও দুর্ঘটনার পর বাস চলাচল বাহত হয়। দুর্ঘটনার এই হিড়িক দেখে সরকারি মহল উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছেন কী করা যায়।

নিম্ন দামোদর সংস্কার

পশ্চিমবাংলার সেচমন্ত্রী এ বি গণি খান চৌধুরী জানিয়েছেন নিম্ন দামোদর সংস্কার প্রকল্পের কাজ এবার শুরু হবে। অবশ্য নতুন করে শুরু হবে বলাই বোধহয় ভালো কারণ কয়েক বছর আগে একবার শুরু হওয়ার পর এই কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। তার একটা কারণ এই প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে হাওড়া আর হুগলি থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ। সেচমন্ত্রীর কাছ থেকে জানা গেল হুগলি থেকে নির্বাচিত এম-এল-এ'রা এই প্রকল্প সম্পর্কে আর কোনো আপত্তি জানাবেন না বলে কথা দিয়েছেন। এই প্রকল্পের জন্যে মোট প্রায় ৪০ কোটি টাকা খরচ হবে। তার মধ্যে ১৯৭৫-৭৬ সালে পাঁচ কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব করেছে সেচ দপ্তর।

'৭১ সালের গোড়ায় নিম্ন দামোদর সংস্কারের কাজ শুরু হয়। দামোদর উপত্যকা প্রকল্প বা ডি ভি সি বাংলা-বিহারের কিছু লোকের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিলেও হাওড়া হুগলি বর্ধমান মেদিনীপুরের প্রায় ৮০০ বর্গমাইল এলাকার মানুষের জন্যে ডেকে নিয়ে আসে অভিশাপ। এই এলাকা সম্পর্কে ডি ভি সি তাদের দায়িত্ব পালন না করায় বন্যার জলনিকাশের কোনো ব্যবস্থা হয় নি। তার ফলে বছরের পর বছর লাখ লাখ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়ছেন। সেই জন্যেই নিম্ন দামোদর সংস্কারের দাবি ওঠে। কিন্তু সেই দাবি অনুযায়ী কাজ শুরু হলেও তা মাঝপথে আটকে যায়। আমতা থেকে শ্যামাপুরের গড়চুমুক পর্যন্ত নিকাশী খাল কাটা হয় দু কোটি টাকা খরচ করে। তারপর আর বিশেষ কিছু কাজ হয়নি। এখন গড়চুমুকে স্লুইস গেট তৈরি এবং মণ্ডেশ্বরী নদীর বাম তীরে বাঁধ বাঁধার কাজ শুরু হবে। এদিকে ঐ এলাকার একটি সংগঠনের নেতৃত্বে কিছু লোক দ্রুত এই প্রকল্প রূপায়ণের দাবিতে সরকারি অফিসের সামনে ধর্মঘট শুরু করেছেন।

জঞ্জাল সাফাই

কলকাতার রাস্তা থেকে জঞ্জাল সাফাইয়ের সমস্যা কিছুতেই সামলাতে না-পেরে পৌর কর্তারা শেষ পর্যন্ত নতুন পথ ধরেছেন। জঞ্জাল সাফাইয়ের পথে অন্তত একটা বাধা হলো পৌরকর্মীদের ঠিকমতো সামলানো মোটেই সহজ নয়। পৌর কর্তারা এবার তাই এক শ্রমিক নেতা শান্তি সেনকে এই দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে ঐ বিভাগের অতিরিক্ত ডেপুটি ডিরেকটর পদে নিয়োগ করেছেন। জানুয়ারীর ২৭ তারিখে তিনি এই নতুন কাজে যোগ দিয়েছেন। পৌর প্রশাসক জানিয়েছেন, এই ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

শান্তিবাবুর মতে, কলকাতার জঞ্জাল সাফাই নিয়ে ভাড়া লরির মালিকেরা বেশ পয়সা লুঠছেন। পৌরসভার নিজের যথেষ্ট লরি নেই বলে লরি ভাড়া করতে হয়। এইসব ভাড়া লরি অনেক সময়ে জঞ্জাল না-তুলেই শুধু কাগজে-কলমে ট্রিপ দিয়ে আসে। অনেক সময় যতোটা জঞ্জাল তোলার কথা তা তোলে না। শান্তি-বাবু এই ভাড়া লরির দুর্নীতি বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। লরি ভাড়া বাবদ খরচের পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে ৮০ লাখ টাকা। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ায় ইতিমধ্যেই ভাড়া লরির ট্রিপের সংখ্যা রীতিমতো কমে গেছে। জঞ্জাল সাফাই বিভাগের অনেক কর্মীর এখন কাজ নেই, কারণ পৌরসভার নিজস্ব গাড়ির অভাব। শান্তি-বাবু ঐসব কর্মীকে এখন ভাড়া লরির দুর্নীতি বন্ধের কাজে লাগিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট

এই বাংলার অন্তত দুটি বিশ্ববিদ্যালয় সংকটের মুখে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধ। তার চারদিকে পুলিশ পাহারা। ছাত্র পরিষদের সভাপতি কুমুদ ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পুলিশ পিকেট। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার প্রতিবাদে ছাত্র পরিষদ 'কালা দিবস' পালনের ডাক দেন। নদীয়া জেলায় একদিন ছাত্র ধর্মঘটও হয়ে গেল। বেতন হার সংশোধন নিয়ে কর্মচারী ইউনিয়নের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবাদের পরিণতিতেই উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে অচলাবস্থা। কর্মচারীদের প্রধান দাবি বেতন হার সংশোধন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ অরবিন্দনাথ বসুর মতে, কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে কিছু করতে অপারগ। তাঁরা এ-বিষয়ে পি বি মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছেন। গত কয়েক বছরে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বাবদ অতিরিক্ত ৩০ লাখ টাকার মতো খরচ করা হয়েছে। তার ফলে গবেষণা এবং অন্যান্য জরুরি কাজের ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু কর্মচারীদের দাবি, মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ বা গ্রহণের আগেই বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। এই দাবি আদায়ের জন্যে কর্মচারীদের কয়েকজন অনশনও শুরু করেন। কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে ক্লাস হওয়ায় বাধা পড়লেও বিভিন্ন পরীক্ষা অবশ্য ঠিকমতোই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০।২।৭৫

—দেবদত্ত

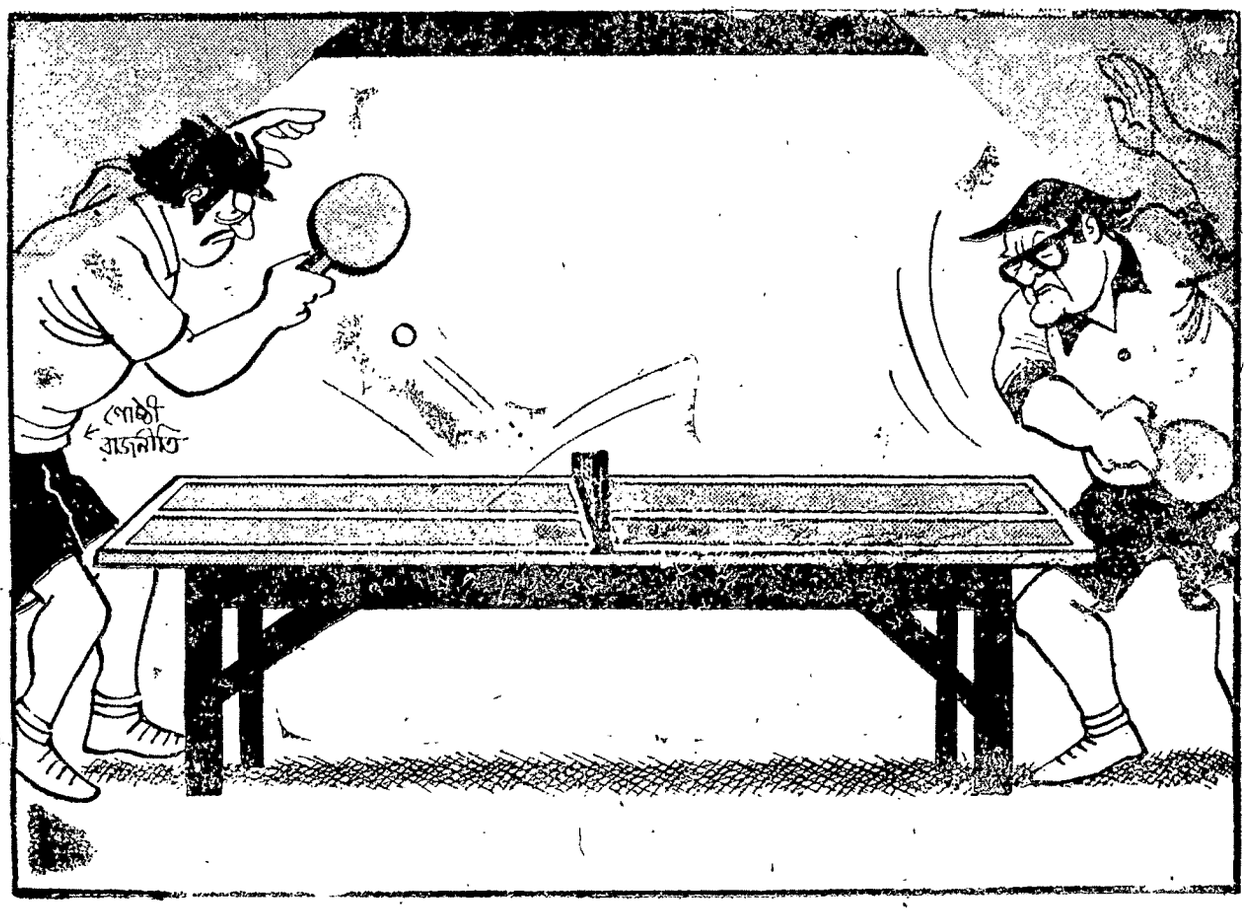

ভুট্টোর অস্ত্র ভিক্ষা

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর করতে গিয়ে আমেরিকান অস্ত্রের জন্য যে প্রার্থনা জানিয়ে এসেছেন তাতে ওয়াশিংটন কি সাড়া দিয়েছে? এই সফরের শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে যদিও এই প্রশ্নের উত্তর নেই তাহলেও প্রকাশিত সংবাদ থেকে অনুমান করা যায় যে, ভুট্টো সেদেশ থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে ফেরেন নি। ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে ভারত ও পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র বিক্রয়ের উপর এখন যে নিষেধজ্ঞা রয়েছে সেটা তুলে দেওয়া হবে কিনা আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এদিকে ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তায় ভুট্টো জানিয়েছেন যে মারণাস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে নিষেধজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে এবং তাঁর সরকার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র ও ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র কেনার উপরই অগ্রাধিকার দেবেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এখন যদিও তিনি আমেরিকা থেকে জঙ্গী বিমান চাইছেন না তাহলেও একবার নিষেধজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে পর তিনি তাঁর অস্ত্র-ভিক্ষার তালিকায় জেট জঙ্গী ও বোমারু বিমানও অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

ভুট্টোর এই সফরের প্রাক্কালেই মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব আশ্বাস দিয়েছিলেন যে উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টায় ও সিমলা চুক্তির রূপায়ণে ব্যাঘাত ঘটতে পারে এমন কোন কাজ আমেরিকা করবে না। এই আশ্বাস সত্ত্বেও আমেরিকা এখন তার নীতি বদলাচ্ছে, এই সংবাদে ভারত স্বভাবতই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্ণসিংহরাও চ্যবন ডঃ কিসিঞ্জারকে এক পত্র লিখে বলেছেন যে মার্কিন অস্ত্র-সাহায্য সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তনে এই উপমহাদেশে আবার উত্তেজনা বাড়বে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলার জন্য ধীরে ধীরে যে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে।

ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের উপর এই মার্কিন নীতি পরিবর্তনে যে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে চ্যবন লিখেছেন, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গঠনমূলক ভিত্তিতে সুসংহত সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য যে প্রয়াস চালাচ্ছে পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার নীতি গ্রহণ করলে সেই প্রয়াসও গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে।

আমেরিকা সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে ভুট্টো কাশ্মীরবাসীদের হরতাল পালনের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতেই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে পাকিস্তান কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে উৎসুক। এখন মার্কিন অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা ঐ উত্তেজনার আগুনে নতুন ইন্ধন যোগাবে বলেই নয়াদিল্লীর বিশ্বাস।

লক্ষ্য করার বিষয় হল ভুট্টো যখন আমেরিকায় গিয়ে ওয়াশিংটনকে তার পুরান পাকিস্তান-ঘেঁষা নীতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই দিল্লীতে একটি ভারত-মার্কিন সাব কমিশনের অধিবেশন হচ্ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানান হয়েছে যে আগামী ১৩ ও ১৪ মার্চ ওয়াশিংটনে ভারত-মার্কিন যুক্ত কমিশনের বৈঠক হবে। ঐ কমিশনের বৈঠক উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন আমেরিকায় যেতে পারেন। যদি যান তাহলে অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে মার্কিন অস্ত্রসাহায্য সংক্রান্ত প্রসঙ্গটি নিয়ে তিনি ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে অনুমান করা যায়।

*

গফুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

গত ৮ ফেব্রুয়ারী দিনের অধিকাংশ সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজধানীতে অনুপস্থিত ছিলেন। বারাণসীতে একটি জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় নয়াদিল্লীতে ফিরেই তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া, আইনমন্ত্রী এইচ আর গোখলে প্রভৃতির সঙ্গে একটি জরুরী বৈঠকে বসতে হল। কেননা একটি জরুরী সমস্যা প্রধানমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। সমস্যাটা হল—বিহার বিধান মণ্ডলীর কংগ্রেস দলের বিদ্রোহী সদস্যদের দাবী মেনে নিয়ে গফুরকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে কিনা।

ঘটনার বিচিত্র পরিহাস এই যে, বারাণসীর জনসভায় শ্রীমতী গান্ধীর প্রধান বক্তব্য ছিল একতার সাহায্যেই দেশের সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। তাঁর ঐ উপদেশের লক্ষ্য ছিল সরকার-বিরোধী দলগুলি। অথচ, বারাণসী থেকে ফিরেই তাঁকে যে সমস্যার দিকে মনোযোগ দিতে হল সেটা তাঁর নিজের দলের ভিতরই অনৈক্যের সমস্যা এবং সেই অনৈক্য এমন একটি রাজ্যে যেখানে কংগ্রেস সরকার-বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

বিহারে মুখ্যমন্ত্রী গফুরের গদী ও দলের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধপন্থীদের মাঝখানে এখন শুধু কংগ্রেস হাইকমান্ড দাঁড়িয়ে আছেন। গতবার গফুর যখন দিল্লীতে যান তখনই তিনি কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছ থেকে এই আশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন যে এখন তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরান হবে না। এই ভরসা পেয়ে তিনি অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাসের বশে কয়েকটি ভুল করে বসলেন। প্রথমত, জয়প্রকাশ নারায়ণকে গ্রেপ্তার করার হুমকী দিয়ে তিনি কেন্দ্রকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেললেন। দ্বিতীয়ত, পাটনায় ফিরে গিয়েই তিনি বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের কার্যনির্বাহক সমিতি ভেঙ্গে দিয়ে ও ঐ সমিতি থেকে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর অনেক সদস্যকে বাদ দিয়ে নতুন সমিতি গঠন করলেন। গফুরের এই কাজে তাঁর বিরুদ্ধ-পন্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁদের এই বিক্ষোভ দলনেতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকার নিল। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর দুই নেতা ডাঃ জগন্নাথ মিশ্র ও কেদার পান্ডে প্রকাশ্যে গফুরের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তাঁরা দাবী করলেন হয় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিহারের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগে গফুরকে দলের নেতার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক অথবা ঐ অধিবেশনে তাঁদের (গফুর-বিরোধীদের) অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হোক। শুধু তাই নয়, ডাঃ মিশ্র ও পান্ডে রাজ্যপাল আর ডি ভান্ডারের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে এলেন যে যেহেতু গফুর তাঁর দলের আস্থা হারিয়েছেন তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক।

এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী গফুরের ভবিষ্যৎ এখন কংগ্রেস হাইকমান্ডের হাতে। গফুরের প্রতি তাঁরা যে সম্পূর্ণ প্রসন্ন তা অবশ্য নয়। তিনি যেভাবে বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের কার্যনির্বাহক সমিতি ভেঙে দিয়ে তাঁর বিরোধীদের চটিয়েছেন তাতে নয়াদিল্লী বেজার হয়েছেন। কিন্তু, এখন গফুরকে সরাবার উপযুক্ত সময় নয় বলে তাঁরা মনে করেন। একজন মুসলমান মুখ্য-মন্ত্রীকে হঠিয়ে দেওয়ার কি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেটিও কংগ্রেস নেতাদের বিবেচনা করতে হচ্ছে। তাঁরা আশা করছেন যে তাঁদের কঠোর মনোভাবের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারলেই গফুর-বিরোধীদের স্তিমিত হতে হবে। প্রসঙ্গটি বিহারমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের সভায় পেশ করলে গফুরই জয়ী হবেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হয়ত কংগ্রেস হাইকমান্ড গফুরকে দলের আস্থা ভোট নিতে বলতে পারেন।

১০-২-৭৫ —পুণ্ডরীক

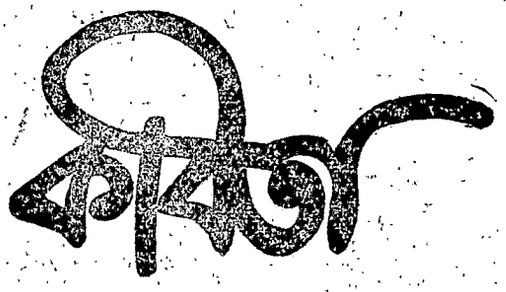

নোটিশ ॥ শংকর চট্টোপাধ্যায়

এই একখানা ঘর...যার না আছে মুক্তি না সর্বনাশ...তবু
থাকুক। যেভাবে জীবনটা থাকে অর্থাৎ কোথাও যাবার নেই বলেই
থাকে। শোকহীন, স্মৃতিহীন। স্বচ্ছলতা ছিল
যখন বাবাদের বাবারা থাকতেন
যখন সরল ব্রাহ্মণপল্লীর ধার ঘেঁষে বংকরাজ গোক্ষুরের মত পথ
চলে যেত শৈব বা শাক্তপীঠের দিকে। আর সেই সব
মধুসঞ্চারী ব্রাহ্মণীরা...
থাক সে সব কথা। এখন ঘরের ভূতুড়ে দেওয়ালগুলোর কথাই চলুক
আর মরচেপড়া বিকল দেওয়াল ঘড়িটার কথা।

—তোমাদের ছিল কি শৈশব...ঘুমপাড়ানি মায়ের গান?
—আমার ছিল পেটরোগা দিন আর দিনরাত্রির মত লম্বা একখানা
ইচ্ছে যা শুধু বেড়েই চলতো...।
—আর কিছু না?
—থাকলে তো বলতাম ছিল জীবনখানা ঘাটে বাঁধা।
ন মনে পড়ে না আর কি ছিল মনে পড়ে না
নকি সেই দ্রোণলতার মত কিশোরীটির কথাও না।
খি চুপি চুপি নড়ে যাচ্ছে ঘরের দেওয়াল...টলে যাচ্ছে,
ল পাশের জমিতে বাড়ি উঠল কালোয়ারদের।
ার কিছুই নয়। এখন খটখটে দিনের গায়ে
রের ভূতুড়ে ছায়াটা পড়েছে হুমড়ি খেয়ে...বালি খসছে...পলেস্তারা।

ভাবছি ঘরবদলের নোটিশখানা আসলো বুঝি?

গভীর দুঃখ ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় ॥ শ্যামা দে

গভীর বেদনায় আমি অবনত হয়ে গেলে
আমার সামনে ধূ ধূ মাঠ ছাড়া
আর কিছু দেখি না।
নিদাঘের তপ্ত আকাশ থেকে
ঝরে পড়ে হৃদয়-পোড়ানো আগুন—
আমার সমগ্র সত্ত্বাকে
পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেয়।

তখন, আমার পরিচিত বিশ্বমণ্ডলী
কোথায় হারিয়ে; আমি একমাত্র
একক হয়ে যাই, জানি না।
বিংশ শতাব্দীর ভালবাসা নামক
পোশাকী সজ্জাটাকে দুহাতে
ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

এরপর, আমি যেন,
কোথায় কার কাছে আমার
সবকিছু সমর্পণ করে
ভীষণভাবে হালকা হতে চাই।

রাখাল ॥ কমল চক্রবর্তী

বড় পথশ্রম হোল, বড় বেশী পথিক হয়েছ অকাতরে
এই যাতহীন দীর্ঘ পথবাস, কার ছিল, কার মুঠি
প্রবাস রয়েছে বহুকাল
যেখানে বাতাস বয়, খোলামাঠে অশোকে আসানে
তারই পাশে শিয়াকুলে হাওয়া, পঙ্গপাল উপেক্ষাই করে
শিহরলতায় কাঁপে ফুল, এসব রাখাল জানে
তার থেকে বহু কম জানে বৈজ্ঞানিক।
সে কখনও বাতাস দেখেনি, দেখেছে পারদ
কাচের টিউবে তার শীত গ্রীষ্ম, হেমন্তের উদাসী স্তম্ভন।

তাদের অসুখ নিয়ে চর্চা করে দুদে ডাক্তারেরা
গ্যাংগ্রিন, অতিসার সমস্ত অসুখ ঘিরে তার ফরসেপ
অমিত বিক্রমে খেলা করে, জীবাণুর প্রকৃত ভুবনে।
এখানেই শেষ হলে ভালো হোত, ভালো হোত রাখালের
ব্যাধিগ্রস্ত ত. পা
কোনদিন হাসপাতাল অতিক্রম হত্ না সম্ভব।

জীবাণু রহস্য নিয়ে সেই ভালো জানে, তার গরুগুলি
শীতের দুপুরে চলে যায়, ছোট ছোট প্রহর পেরিয়ে
এক বিচুলির বন থেকে আর এক কাননে
ফেরে কামধেনু, ঘন ক্ষীরে ফুলে ওঠে বাঁট
ডাক্তার জানেন কিছু? জীবাণু রহস্য বোঝে ভিখিরি রাখাল।

ফাদার দ্যতিয়েন রোজনামচা

আলো মেয়েটি চালাক ঃ শ্রীশ্রীপ্রজাপতির কৃপায় মানিকতলাবাসী অমুকের পুত্র তমুকের পৌত্র মান্টু নামক ছোকরার সঙ্গে শ্রীমতীর শুভ পরিণয় যখন পাকা হল, ওর বান্ধবীদের কাছে প্রেরিত নিমন্ত্রণ পত্রে এক পনশ্চ জুড়তে ও ভুলল না ঃ 'পর্জিটভলি আসবি কিন্তু...আর শোন্, রবীন্দ্র রচনাবলীর 'প্রথম (দ্বিতীয় তৃতীয়...) খন্ডটা নিয়ে আসবি।' এমনিভাবে আজ উক্ত রচনাবলীর পুরো সেটটা নবদম্পতির বইয়ের শেলফে সগৌরবে বিরাজ করছে।

...না বই পড়ার—এমন কি ধলো ঝাড়ার সময়টুকুও আলোর আর নেই ঃ ওর বিবাহিত জীবনের প্রথম বর্ষসংক্রান্তির পূর্বেই শাশুড়ীর সাগ্রহ প্রার্থনার উত্তরে ষষ্ঠীদেবীর করুণা বাহুল্যস্বরূপ দুটি কচিকাঁচা প্রাণ, সরকারি লাল ত্রিকোণ অমান্য করে আলোর পতিসংসারের চিরদিনের আনন্দ (আর মাস-কাবারের মাথা-ব্যথা) বাড়তে এসেছে। যমজ মেয়েদের নাম ঃ রাধা ও বৃন্দা।

আলোর মতো সবার সুবুদ্ধি নেই। এই ধরুন নোকনের কথা ঃ নিমন্ত্রপত্রে কোনো পুনশ্চ না লেখার দরুন বাসরগৃহে স্তূপীকৃত উপহারের মধ্যে সে শুনে দেখল 'হাজার বছরের প্রেমের কবিতার' আধ ডজন কপি। উৎসর্গপত্রগুলি কালিতে লেখা ঃ মুছতে হলে কৌশল লাগে।

বাংলাদেশের মেয়েদের সমস্যাও অনরূপ ঃ ওদের পক্ষেও বিবাহের উপলক্ষে বেহেস্তের পুঁজি (মূলধন) বেহেস্তের কুঞ্জি (চাবি) বেহেস্তের জেওর (ভূষণ) প্রভৃতি ধর্মীয় পুস্তকের একাধিক নমুনা উপহার পাওয়া বিরলদৃষ্ট নয়। বইগুলো প'ড়ে ওরা লেখে, [illegible]তর হুরগণের কাহারও মুখ হইতে এক বিন্দু থুথু যদি দুনিয়ার কোনো নদীতে পড়িত তবে ঐ নদীর সমস্ত পানিই স্বর্গীয় সুগন্ধ প্রাপ্ত হইত...' কিংবা 'হুরগণের সহিত বেহেস্তবাসী পুরুষগণের যে-মিলন ঘটিবে তাহার তুলনায় দুনিয়ার মিলন-সুখ লক্ষ ভাগের এক ভাগও নহে...' এমন 'কি' আপনি আরাম-কেদারায় বসিয়া স্বাচ্ছন্দ্যে হুকা টানিতে পারিবেন, কেহই কল্কেটা পাওয়ার জন্য হাত বাড়াইয়া আপনার সেই আরামের ব্যাঘাত ঘটাইবে না।

ও-সব পুস্তকে অবশ্য শুধু বেহেস্তের বিবরণ নয় দৈনন্দিন জীবনের ইসলামীয় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মেলে ঃ ধাত্রীর হাত থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুকে কোলে গ্রহণ করে একজন বুজর্গ আলেম (শ্রদ্ধাস্পদ পন্ডিত) তার কানে আল্লাতালার নাম আউড়িয়ে স্বল্প মধু বা খোরমা চিবিয়ে লালার মতো করে তাকে খাওয়াবেন...আপনার সপ্তমবর্ষীয় বালক-বালিকাদের একত্রে স্কুলে পাঠাবেন না... দশমবর্ষীয় ছেলেমেয়ে নমাজ পড়তে না চাইলে ওদের মেরেপিটে পড়াবেন...চতুর্দশ-বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দেবেন...দাড়ি লম্বা করে রেখে মোচ খাট করে ফেলবেন...অর্ধেক রৌদ্রে অর্ধেক ছায়ায় বসবেন না...জুতো কিংবা পায়জামা পরতে হলে সাইকেলে কিংবা মোটরে চড়তে হলে আগে ডান পা ওঠাবেন; খুলতে হলে, নামতে হলে বাঁ পা...

'বেহস্তে' সাহিত্যে প্রচারিত নীতি-শিক্ষা উচ্চ ও সূক্ষ্ম মানের ঃ আপনার ছেলেমেয়েদের হাত দিয়ে দরিদ্রসেবা করুন; বাচ্চাদের আপনি যা-কিছু দেন, ওদের খেলার সাথীদের সঙ্গে ভাগ করার অভ্যাস করান...তিনদিনের বেশি কারো সঙ্গে আড়ি করবেন না...খাওয়ার জিনিস নীচে পড়লে তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেতে ঘৃণাবোধ করবেন না...অন্যদের খাওয়া শেষ হওয়ার আগে একা একা উঠবেন না অল্প অল্প খেতে থাকবেন অন্যেরা যাতে লজ্জায় পড়ে ক্ষুধার্ত না থেকে যায়...সংকটাপন্ন কোনো ব্যক্তি কোনো মাল বিক্রি করতে এলে ওর দুর্দশার সুযোগ নেবেন না, বরং ন্যায্য-মূল্যের অতিরিক্ত কিছু দিয়ে ওকে সাহায্য করুন...

নিষিদ্ধ কার্যের তালিকা অবশ্য অমুমিন পাঠককে সন্ত্রস্ত করে তোলে ঃ শুয়োর, শরাব, কচ্ছপ সুদ আর ঘুষ খাওয়া পাপ...সিনেমা দেখা-ও পাপ, তাতে সময় সম্পদ স্বভাব স্বাস্থ্য ও ইমান নষ্ট হয়...ট্রেনের শিস আর যুদ্ধক্ষেত্রের রণবংশী প্রভৃতি বাদ্য ছাড়া সারাঙ্গী, বেহালা, হারমোনিয়াম, বাঁশী, সেতার, ঢোল তবলা করতালাদি সর্বপ্রকার বাজনা না-জায়েজ (অননুমোদিত)...শিকারী ও পাহারাদার কুকুর ছাড়া কুকুর পালা অন্যায় ...কোনো মূর্তি, এমন কি শিশুদের খেলনারূপে ব্যবহৃত রবারের পুতুল পর্যন্ত রাখা নিষেধ; কেউ ছবি কিংবা ফটো নষ্ট করে ফেললে মালিক তার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবে না...নিন্দনীয় খেলার মধ্যে শুধু তাস ও পাশা নয় 'কেরামবেট' ঘুড়ি ও আতশবাজিও স্থান পেয়েছে; জীবন-বীমা জুয়ার সামিল...

বলা বাহুল্য প্রতিটি বিষয়ে নিষেধের গুরুত্ব ধার্য করা প্রয়োজন ঃ কাঁকড়া আর পিঁয়াজ উভয় খাদ্য নিষিদ্ধ তবে কাঁকড়া খাওয়া প্রায় হারাম, পিঁয়াজ খাওয়া প্রায় হালাল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার

মতভেদ আছে ঃ মহানবী বলতেন, বিদ্যা-শিক্ষার জন্য আবশ্যক হলে সুদূর চীন দেশেও যাবে। কথাটা কি নারীসমাজে প্রযোজ্য? এক 'বেহেস্তি' পুস্তকে পড়েবেন, মেয়েদের দুনিয়ার বিদ্যা বেশি শিখাইবে না; লেখা এত পরিমাণ শিখাইবে যাহাতে আবশ্যকীয় হিসাব ও চিঠিপত্র লিখিতে পারে;' অন্য বইয়ে দেখবেন নুরজাহান জাহানারা, জিবুন্নিসা রিজিয়া প্রভৃতি বিদুষীর ভূয়সী প্রশংসা যদিও লেখকের মতে তুরস্ক ও যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের মেয়েরা সীমা ছাড়িয়ে চলেছে।

মুমিনেরা ধর্মীয় উত্তরাধিকারে পেয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা ঃ তাতে সুনির্দিষ্ট হয়েছে খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থান সম্বন্ধীয় বিশ্বজনীন বিধান সামাজিক রাজনীতিক অর্থনীতিক পরিবর্তনাতীত নিয়মাবলী। নেকটাই পরা বিধর্মী প্রথা ঃ 'নেকটাই-এর গিরা বাঁধাটা খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক'; কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দেওয়া কিংবা সাড়ি পরা অন্যায় ঃ 'আমাদের মা ফাতেমা মা আয়েশা প্রভৃতি কখনও শাড়ি পরেন নাই।'

...ও সব আমি পড়ছিলাম নিবিষ্টচিত্তে সদ্য বিবাহিতা শামিম-আরার বাড়ির বারান্দায়। বাঙালীদের সনাতনী প্রথা মতো মেয়েটি আমাকে বসিয়ে একটা বই পড়তে দিয়ে চা বানাতে গিয়েছে। চা বানানোর অর্থ—সুধী পাঠককে স্মরণ না করালেও চলে—পাতা কেনা কয়লা ভাঙা থেকে শুরু করে ডিম ভাজা ওমলেট করা পর্যন্ত। বইটির নাম 'বেহেস্তি জেওর' উৎসর্গ করেছিল সহপাঠিনী সফিয়া খাতুন শ্যামার বিয়েতে' অবিলম্বে নিজের ভুল বুঝে উৎসর্গকারিণী ডাক নামটা কেটে লিখল ঃ শামিম-আরার বিয়েতে। মুমিনের বিয়ের দিনে জানবেন, দেবদেবীর পরোক্ষ উল্লেখও অলক্ষুণে।

পড়তে পড়তে হঠাৎ দেখলাম, বইটির এক পাতার উপরের কোণটা মুড়ে'নো ঃ 'স্বামীর সহিত মিল-মহব্বত রাখা সুখময় জীবনযাপনের উপায়'। উপায় বিধৃত ঃ কোনো কাপড় কিংবা কোনো জিনিস পছন্দ হলে স্বামীর আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে মনের কথা মনেই চাপা দিয়ে রাখবেন, স্বামী যদি আপনাকে বলেন ...সারা রাত হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে, তবে অক্ষরশঃ তা-ই করবেন, তিনি রাগ করলে নিজের কোনো দোষ না থাকলেও, আপনি কাকুতি মিনতি করে হাত জুড়ে পা ধরে অপরাধ স্বীকার করে মাফ চাইবেন, মনে রাখবেন 'স্বামীর সহিত আপনা-আপনি প্রণয় ও মহব্বত হয় না প্রাণপণে স্বামীর খেদমত করিতে হয় প্রাণে সব সময় স্বামীর ভয় ও আদর রাখিতে হয়।' এদিকে আপনার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে তবে কস্মিনকালেও স্বামীর কোনো খেদমত নেবেন না ঃ পা টেপা বাতাস করা প্রভৃতি খেদমত পিতার কাছে নেওয়া পুত্রের পক্ষে যেমন অসম্ভব, আরো বেশী কল্পনাতীত স্বামীর কাছে ভার্যার পক্ষে।

চা আসার আগেই জনাব হাসান জমান হাজির। ভদ্রলোক শামিম-আরার কর্তা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। শেষ ব্যাখ্যাটা ওঁকে শোনালাম অধিকারী সুলভ অভিমতের আকাঙ্ক্ষায়। স্মিত হাসি হেসে তিনি বললেন, 'আমার বিবি যেদিন ওর সাহেবকে গোলাম বানাতে অস্বীকার করবে ওকে বরং বাপের বাড়িতে গিয়েই তাঁর মস্ত খাটাতে অনুরোধ করব।'

(ক্রমশঃ)

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

সব ফুল কিনে নাও ৮-০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন গ্রন্থ

ফেরারী অতীত ৭-০০

ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের নতুন ভ্রমণ উপন্যাস

গৌরী গঙ্গা ৯-০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঘরের পথ ৬.০০ সুখের আড়াল ৫.৫০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার আমার ৪-০০

নীল লোহিতের চোখের সামনে ৫-০০

আশাপূর্ণা দেবী

ভালবাসার মুখ ৫.০০ তরঙ্গহীন ৫.০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক বোন পারুল ৬.০০ বনকরবী ৬.৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

মন জানে না ৭.০০ একক প্রদর্শনী ৪.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সরমা ও নীলকান্ত ৬.০০ লাস্ট চ্যাপটার ৫.৫০

চিরঞ্জীব সেন অনিল রায়

রাশিয়ান রুবির রহস্য ৭.০০ সোনার পাতায় রক্ত ৭.০০

নিশাচর বিশ্বনাথ চৌধুরী

মার্বেল হাউস ৫.৫০ সিংহল রহস্য ৪.০০

সাহিত্য সংস্থা, ১৮সি, টেমার লেন, কলিকাতা—৯

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন

কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করে শ্রীসতীকান্ত গুহ বলেন আজকের বাংলা সাহিত্যের নানা ব্যাপ্তির কথা স্বীকার করলেও একথা সত্য যে প্রবন্ধ সাহিত্য তেমন কোন লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেন নি। তিনি বলেন শুধু তত্ত্ব ও তথ্যের সংমিশ্রণ ঘটালেই প্রবন্ধ হোলনা তাকে সাহিত্য হোতে গেলে শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে ওঠা চাই। প্রবন্ধ রচনার অন্তর্নিহিত প্রেরণার ওপর আলোকপাত করেন প্রধান অতিথি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর ভাষণের মধ্যে যে কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হোল, প্রবন্ধ রচয়িতাকে আরো হৃদয়বৃত্তির অধিকারী হোতে হবে। প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন ডঃ অমলেন্দু বসু। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রবন্ধ সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়। এছাড়া সম্মেলনে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচনা চক্র

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে একটি আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন তাঁদের জীবনের মূল ব্রত হবে ন্যায় নীতি ও সততার আদর্শকে প্রোজ্জ্বল করে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ সুবিমল মুখার্জি একটি মনোজ্ঞ আলোচনার অবতারণা করেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীই অংশ নেন।

লালন ফকিরের দ্বিশততম জন্মোৎসব

লালন ফকিরের দ্বিশততম জন্মোৎসব সম্প্রতি উদযাপিত হোল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে। বাংলা সাহিত্য আকাদমি ও ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার আবদুস শোভান চৌধুরী। বিভিন্ন বক্তাদের আলোচনায় লালন ফকিরের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও মানবপ্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বেলঘরিয়ার 'রবীন্দ্রায়নে'র উদ্যোগে সাহিত্য সংগীত বিতর্ক চিত্রাঙ্কনের ওপর একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগের ঠিকানাঃ—অধ্যক্ষ প্রাণকৃষ্ণ দেবনাথ, ৫৪ জাগ্রত পল্লী, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬।

মায়াকোভস্কি ক্লাবের উদ্বোধন

বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত বিপ্লবী কবি ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কির নামানুসারে একটি নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংস্থার আবির্ভাব সম্প্রতি সূচিত হোল। গোর্কি সদনে এর উদ্বোধন করলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। শ্রীমিত্র উদ্বোধনী ভাষণে বলেন এই সংস্থাটি ভারত-সোভিয়েত সাহিত্য সংস্কৃতি বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই অনুষ্ঠানের একটি অন্যতম আকর্ষণ ছিল মূল রুশ ভাষায় রেকর্ডে মায়াকোভস্কির কবিতার আবৃত্তি।

এই নবগঠিত সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মপরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেন।

সাগরদাঁড়িতে মধুসূদন জয়ন্তী

যশোহরের সাগরদাঁড়িতে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের স্রষ্টা মধুসূদন দত্তের ১৫১তম জন্মজয়ন্তী সম্প্রতি উদযাপিত হোল। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের জেলা সংযোগ দপ্তর। অনেক শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

মুক্তগঙ্গার সাহিত্য সম্মেলন

বহরমপুর গ্রান্টস হলে মুক্তগঙ্গা পত্রিকার উদ্যোগে কবি-সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ পশ্চিম দিনাজপুর ও কলকাতার কবি-সাহিত্যিকরা অংশ নেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পড়ে শোনান কেদার ভাদুড়ী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক তপনকিরণ রায় নীরদ রায়, অভিজিৎ ঘোষ, শিশির গুহ দেবপ্রসাদ সরকার, সেখ চ্যাটার্জী এবং আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেজাউল করিম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন দেবকুমার বসু। মুক্তগঙ্গার পক্ষ থেকে সংগীতসাধক সৈয়দ আলি মির্জা সাহেবকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

বিবেকানন্দ মেলায় জন্মোৎসব সভা

বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ১১৩তম জন্মতিথি নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হয়। বিবেকানন্দ মেলা মঞ্চে সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রধান মিত্র।

উদ্দীপ্ত ভাষণে শ্রীমিত্র বিবেকানন্দের অবদানের কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি আজকের যুবসমাজকে বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হোতে আহ্বান জানান। বিবেকানন্দের বিরাট কর্মসাধনার ওপর আরো যাঁরা আলোকপাত করেন তাঁরা হোলেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীসমর সরকার ও শ্রীধীরাজ বসু।

বঙ্গীয় তরুণ সাহিত্য সম্মেলন : সধানী সাহিত্য প্রতিযোগিতার উদ্যোগে আয়োজিত এই সাহিত্য সম্মেলনে শ্রেষ্ঠ পত্রিকার জন্য সুকান্ত ও মাণিক পুরস্কার এবং লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গল্পের জন্য দুটি সন্ধানী পুরস্কার দেওয়া হবে। লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ঠিকানা : প্রধান সম্পাদক সন্ধানী : গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী গান্ধীনগর। জেঃ শ্যামনগর ২৪ পরগণা।

● গ্রন্থাগার দিবস প্রদর্শনী

প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র সম্প্রতি চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার আয়োজিত এক শিক্ষা ও কৃষ্টিমূলক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। চিত্রকলা পর্বতাভিযান সংক্রান্ত আলোকচিত্র ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সম্পর্কিত নানারকম প্রাচীরপত্র এবং সি এম ডি এর কলকাতা উন্নয়ন প্রয়াসের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র

আজকের অসংখ্য সংকট ও নানা সমস্যাজটিল মুহূর্তে পরিশ্রান্ত মানুষকে তাঁদের দেশের জাতীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অবদানের গভীরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। সেই প্রদীপ্ত অতীতের প্রহরে ডুব দিয়ে মানুষ অন্তত আজকের এই বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবার পথের সন্ধান পেতে পারে। এই প্রোজ্জ্বল সত্যের প্রতি গভীরতম বিশ্বাস সম্প্রতি নিটোল হয়ে উঠেছে তমলুকে। সেখানে সূচনা হয়েছে একটি সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের। এই সংগ্রহশালার দরজা সবার জন্যই উন্মুক্ত। শিক্ষিত অশিক্ষিত কিশোর যুবক, খেটে-খাওয়া চাষী ও মজুর একই সঙ্গে এখানে এসে নানা নতুন উপলব্ধির সূত্রে একই অনুভূতিতে মিশে যেতে পারে।

একটা দেশের দীর্ঘ দিনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বনিয়াদ গড়ে ওঠে এক একটি অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ অবদানকে কেন্দ্র করেই। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমের তমলুক অঞ্চল শিল্প-সভ্যতার পীঠস্থান এবং দেশ-বিদেশের সঙ্গে নানা নিবিড় যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। সেখানে কোন সংগ্রহশালা না থাকায় সেখানকার আহরিত সম্পদ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে। কিন্তু একথা হয়তো ঠিক প্রাচীন তাম্রলিপ্তের প্রত্নসম্ভার এখনো সাধারণের কাছে এবং পর্যটক শিক্ষক ছাত্র-দের কাছে অজানা রয়ে গেছে।

এই অভাবের কথা স্মরণ রেখে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়েছে তমলুকে। এই সংগ্রহশালায় প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক পাথরের নানা রকম অস্ত্র প্রাচীন মৃৎপাত্র, ভারতীয় মধ্যযুগের প্রথম পর্বের পোড়া মাটির মূর্তি, মুদ্রা মুদ্রাঙ্ক, প্রাচীন লিপি-উৎকীর্ণ দ্রব্য, পাথরের মালার দানা, মধ্যযুগীয় ধাতুর মূর্তি। এই সংগ্রহশালায় রয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগের প্রাচীন অধিবাসী ও বহিরাগত অতিথিদের মুখ ও বেশভূষার চিহ্ন। আর একটি অন্যতম আকর্ষণ হোল বিখ্যাত এক পণ্ডিত পরিবারের বংশ-পরম্পরায় রচিত হাতে লেখা পুঁথি।

পূর্ণোদ্যমে এখন চেষ্টা চলছে কি করে সংগ্রহশালাকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলা যায়। স্থানীয় স্বাধীনতা আন্দো-লনের নথিপত্র দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করে সংগ্রামের ইতিহাসকে জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা চলছে। লোক-শিল্প ও লৌকিক সংস্কৃতির স্থানীয় রূপরেখার নিদর্শন এতে স্থান পাবে। তমলুক কাঁথি অঞ্চলে পানের চাষ সর্বজন-বিদিত। কাজেই পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালায় পানের বিভিন্ন বিভিন্ন নিদর্শন, পান চাষের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নানা জিনিস রাখবার পরিকল্পনা রয়েছে।

তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে সর্বাঙ্গীন গবেষণা করার মতো পুঁথি-পুস্তক মধ্যযুগীয় প্রত্নকেন্দ্র মন্দির প্রাসাদ ও দুর্গ প্রভৃতির বিভিন্ন ধরনের ছবিও রাখা হবে।

জানা গেছে তমলুক পৌরসভার কাছ থেকে সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি জায়গা পাওয়া গিয়েছে।

সংকলন ও পত্র পত্রিকা

—উপগুপ্ত

উন্দালক। সম্পাদনা সুলেখা ভট্টাচার্য। ৫৪ বিন্ধ্যবাসিনী রোড, ভাটপাড়া, ২৪ পর-গণা। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

প্রবন্ধ কবিতা এবং গল্পে সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটিতে লিখেছেন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মহাদেব সাহা নির্মলেন্দু গুণ বেলাল চৌধুরী আশিস পাঠক এবং আরও অনেকে।

সোমা। শেফালী খামারা এবং বৃন্দাবন দাশ সম্পাদিত। সাঁজুয়া, বাখরাহাট ২৪ পর-গণা। দাম ৩০ পয়সা।

শীর্ণকায় এই পত্রিকাটির শারদ সংকলনে লিখেছেন, বৃন্দাবন দাশ সুবল মাঝি শেফালী খামারু এবং আরও কয়েক-জন। ছাপার ব্যাপারে যত্ন নেওয়া দরকার।

দধীচি। সম্পাদনা মৃণাল চক্রবর্তী। দুর্লভপুর। পোঃ খাসপুর, পশ্চিম দিনাজ-পুর। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লিখেছেন, উমা ভট্টাচার্য অজিতেশ ভট্টাচার্য অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামলকুমার ঘোষ গুণরাজ খাঁ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধনকুমার রক্ষিত এবং গোপাল সাহা।

শতাব্দী। সম্পাদনা শংকর চক্রবর্তী। ৪৭ নং উম স্লিং, শিলং-৬। দাম এক টাকা।

লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত দেবী রায় এবং আরও কয়েকজন।

মাল্যদান। সম্পাদক সরোজকুমার সরকার। ৫।৩, সত্যেন রায় রোড, কোলকাতা-৩৪। দাম ছ' টাকা।

'মাল্যদান'-এর শারদ সংখ্যায় গল্প কবিতা, উপন্যাস এবং নিবন্ধ লিখেছেন— অন্নদাশংকর রায় আশাপূর্ণা দেবী প্রেমেন্দ্র মিত্র রাজকুমার মিত্র বিষ্ণু দে এবং আরও কয়েকজন।

অনুভব। জয়ন্ত কুমার সম্পাদিত ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কোলকাতা-১২।

সম্প্রতি 'অনুভব' পত্রিকার দুটি সংখ্যা একত্রে হাতে এলো। মণীন্দ্র রায়ের নিজস্ব হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিতে একটি ভালো কবিতা পড়া গেল। কেন কবিতা দেবী রায়ের লেখাটি ভালো। তাঁর দুটি কবিতাও পাঠককে আকর্ষণ করবে। 'কংক্রিট কবিতা' সম্পর্কে পরেশ মণ্ডল জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। এছাড়া প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত কালীকৃষ্ণ গুহ জয়ন্ত কুমার জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতা ভালো লেগেছে। প্রচ্ছদ এবং ছাপা প্রশংসা করার মতো।

শিস। স্বপন চক্রবর্তী এবং সমর মুখো-পাধ্যায়। ১০-১, দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট কলিকাতা-১২। দাম দু' টাকা।

পরিচ্ছন্ন রুচির এই পত্রিকাটিতে বেশ কিছু ভালো কবিতা, গল্প এবং আলোচনা রয়েছে। চন্দন ঘোষ এবং সমর মুখো-পাধ্যায়ের গল্প ভালো লেগেছে। বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্তের আলোচনাটি ভালো লাগল। আর্ট প্লেটে দীপক দে এবং শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের ছবি। প্রচ্ছদ এবং ছাপা উন্নত মানের।

বেদব্যাস। সম্পাদক দেবানন্দ দে। সি ৩৬-১ রামগড়। কোলকাতা-৪৭। দাম এক টাকা।

সাম্প্রতিক প্রকাশিত পাঁচখানি পত্রিকার পর্যালোচনা বিভাগটিতে গঠনমূলক কিছু করার চেয়ে চমক সৃষ্টির দিকেই ঝোঁক বেশি। ছাপার ব্যাপারে যত্ন নেওয়া দরকার।

বর্ষপঞ্জী ১৩৮১

(২৮শ বর্ষ চলছে)

দেশবিদেশের সকল তথ্যে পূর্ণ অভিনব বাংলা "ইয়ার-বুক"

চলতি দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হলে বর্ষপঞ্জী চাই-ই।
যে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য বর্ষপঞ্জীতে পাওয়া যাবে।
গ্রন্থাগার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বর্ষপঞ্জী অপরিহার্য।

৮০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১২ টাকা ৫০ পঃ, ভি পি খরচ স্বতন্ত্র

এস. আর. সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি

৩৫/এ, গোয়াবাগান লেন, কলকাতা-৬। ফোন : ৩৫-৪৭৯৭

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

একত্রিশ

বম্বে আমেদাবাদে গান গেয়ে আশ্রমের জন্যে টাকা তুলবার পরে পণ্ডিচেরি থেকে বেরিয়ে প্রতি বৎসর দুতিন মাস ধরে নানা শহরে চ্যারিটি কন্সার্ট দিতাম। যতদূর মনে পড়ে আশ্রমের জন্যে চ্যারিটি কন্সার্ট সুরু করেছিলাম প্রথম ১৯৪৪ সালে—শেষ হয় ১৯৫০ সালে। এ কয় বৎসরে হিসেব করে দেখেছি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা তুলেছিলাম আশ্রমের জন্যে। লজ্জানিবারণকে প্রণাম করেছিলাম যখন শেষবার ফিরে শ্রীমার চরণে তেষট্টি হাজার টাকা প্রণামী দিতে পেরেছিলাম। এ-সূত্রে বলি দুটি আসরের কথা —যেদুটি ঠিক চ্যারিটি কন্সার্ট ছিল না—কারণ মঞ্চে শোভমান হয়েছিলাম একা আমি।

কানপুরে গান গেয়ে আমি বরোদায় যাই গাইকবারের অতিথি হয়ে। কয়েকটি বন্ধু আমাকে পেশ করেছিলেন নানা উপাধি দিয়ে। ফলে বরোদাবাসীরা চাইল আমাকে ভাষণ দিতেও হবে। এইই আমার প্রথম সত্যিকার পাবলিক ভাষণ। কিন্তু অত্যধিক গান গেয়ে আমি সে-সময়ে দারুণ ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছি—এমন কি দুতিনবার রক্তের ছিটেও ছিল নিষ্ঠীবনে। এ অবস্থায় গান ও ভাষণ—আর একেবারে একলা! কিন্তু ওরা বেশ মোটা দক্ষিণা দেবে শুনলাম পাঁচ সাত হাজার টাকা। নিমন্ত্রণও নিয়েছি। নিরুপায়।—'জয় গুরু' বলে তো গেলাম বরোদা। কিন্তু হায় রে, এক গুজরাতী ডাক্তার বন্ধু আমার গলা পরীক্ষা করে বললেন শিউরে উঠে: 'দুতিন মাস মৌনী বাবা না হলে আপনার গলায় এমন কি ক্যান্সারও হতে পারে।' আমি বললাম: 'দুঃখিত, বন্ধুবর কিন্তু আমি গুরুদেবকে কথা দিয়ে বেরিয়েছি —I won't spare myself— এখন পিছোতে পারব না।' তিনি বললেন: 'আমি শ্রীঅরবিন্দকে তার করছি, আপনি আমার বাড়িতেই থাকবেন আপনাকে আমি লুকিয়ে রাখব যতদিন না ফাঁড়া কাটে।' আমি বললাম: 'বন্ধুবর বহু ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আড়াইমাস ধরে নানা শহরে চ্যারিটি কন্সার্ট করেও যখন টিঁকে আছি—তখন এই শেষ দুটি মঞ্চে উঠে গাইলেও বেঁচে বর্তেই থাকব।'

শেষ দুটি? এর পরেও—'

'হ্যাঁ, বম্বেতে সুন্দরবাই হলে আমার অন্তিম আসর। দুঃখের বিষয় সেখানেও ভাষণ দিতে হবে গানের সঙ্গে।'

বন্ধুবর (উদ্বিগ্নকণ্ঠে): 'আপনি জানেন না ক্যান্সার কী বস্তু—'

আমি (করুণ হেসে): 'জানি বন্ধু, আমার একটি প্রিয় বন্ধুকে আশ্রমে ক্যান্সারে ভুগতে দেখেছি—সে-যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না—তবে (তাঁকে থামিয়ে) কথা দিচ্ছি, এই দুটি আসরের শেষে বিশ্রান্ত হব—কিন্তু শেষরক্ষা না হলে মরণান্তিক দুঃখ পাব। (বলে হেসে) কবি বলেছেন All's well that ends well — মহাজন বলেছেন: গুরু-কৃপায় পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করে, আর আমি প্রবল প্রৌঢ় গুরুবাদী ক্যান্সারকে থাবা মেরে হটিয়ে দিতে পারব না? বলেন কী আপনি।'

প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগৃহ—গাইবারের নিজের সভাগৃহ—নামটা ভুলে গেছি। রাজপুরুষরা সবাই উৎকর্ণ। আমি কাশছি ও থার্মস ফ্লাস্ক থেকে বারবার গরম জল চুমুক দিয়ে কাশিকে দাবিয়ে ভাষণ দিয়ে চলেছি—গুরুদেবের নানা মহত্ত্বের নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে। প্রেরণার অভাব ছিল না, কেবল Spirit willing হলেও flesh weak হওয়ার দরুণ আশঙ্কা ছিল শেষটায় গান গাইতে হয়ত পারব না। কী হবে তাহলে? মনে মনে প্রার্থনা সুরু করে দিলাম গান গেয়ে

'বিষাদে বিষাদে প্রসাদে প্রবাসে
জলে বানলে পর্বতে শত্রুমধ্যে
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।'

কী আশ্চর্য, গাইবার সময় একবারও কাশিনি। 'জয় গুরু' বলে ধরে দিলাম: 'বৃন্দাবনকী মঙ্গললীলা য়াদ আরে য়াদ আরে...' গাইলাম ঝাড়া আধঘন্টা।

অঘটন বলে অঘটন! গরম জলে চুমুক দিতে দিতে ভাষণ দেওয়া চলে—কিন্তু গান গাওয়া চলে না তো। তাই প্রার্থনা করেছিলাম চোখের জলে—সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিলাম ভবানীর আশীর্বাদ, কৃষ্ণের করুণা।

অবশ্য পরে সাতদিন বিশ্রাম নিতে হল। কিন্তু ক্যান্সার তো হলই না—মনও চলল বিশ্বাসে পাল তুলে কৃতজ্ঞতার দাঁড় বেয়ে। তবে ব্রঙ্কাইটিস সমানই রইল নিত্যসাথী হয়ে।

ফলে দিন পনেরো বাদে সুন্দরবাই হলে ঠিক এই অঘটনেরই পুনরাবর্তন হল—ভাষণের সময় কাশির ঘনঘটা, গানের সময় আনন্দারুণ—শান্ত নির্মল অনাময়। সভাপতি ছিলেন কে এম মুন্সি। তাঁকে বন্ধু পাওয়া গেল এই সূত্রে। করুণার অভ্যাগম হয় এমনি ছন্দেই অগ্নিপরীক্ষার পরে। নৈলে [illegible] নিজের চেষ্টায় পারে অসাধ্য সা[illegible]

বত্রিশ

প্রথমবার বম্বে ও আমেদাবাদের সফরের শেষে পণ্ডিচেরি ফিরে এসে আমার আত্মাভিমান বেশ একটু হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কয়েকজন সাধক বললেন: 'আহা, আমরাও যদি এভাবে গুরুসেবা করতে পারতাম গো!' যাঁরা আমাকে অকেজো গায়ক বলে কৃপার চোখে দেখতেন তাঁরাও হেসে কথা কওয়া সুরু করলেন। সবচেয়ে মজা লাগল এক ডাক্তারের কথা শুনে। তিনি আমাকে সোজা এসে শুধালেন

(without ado)

'শুনলাম আপনি বম্বে ও আমেদাবাদ থেকে আশ্রমের জন্যে দশহাজার টাকা তুলে এনেছেন? সত্যি?'

'আজ্ঞে।'

'কী আশ্চর্য!'

'কেন?'.

'কারণ আমিও গিয়েছিলাম বম্বে ও আমেদাবাদ, কিন্তু কিছুই চাঁদা তুলতে পারি নি বহু চেষ্টা করেও।'

মনে পড়ল এক হরিণের গল্প। সে নেকড়ে বাঘের কাছে এসে বড় চোখ আরো বড় করে জিজ্ঞাসা করেছিল: 'শুনি, তুমি বুনো মোষকে লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছিলে? সত্যি?'

নেকড়ে বাঘ: হুহুহু।

হরিণ: কী আশ্চর্য!

নেকড়ে বাঘ: কেন?

হরিণ: কারণ আমিও ঐ বুনো মোষের সঙ্গে লড়েছিলাম, কিন্তু জিততে পারিনি।

তবে সাহেবপুঙ্গবেরা বলে: "It takes all sorts to make a world".

×

যাই হোক, আমি নেকড়ে বাঘ না হলেও এর পর থেকে গীতিজ্ঞান সুরু করলাম: প্রতি

বৎসর দুতিন মাস সারা ভারত চক্র দিয়ে আমার সাঙ্গীতিক গর্জনের দৌলতে নানা শহরে চ্যারিটি কন্সার্ট দিয়ে আশ্রমের জন্যে টাকা তোলা প্রায় আমার যৌগিক পেশা হয়ে দাঁড়াল। ফলে আমার দুটি লাভ হল : আশ্রমে যাঁরা নিরপরাধ আমাকে সুপ্রমেন্টাল বিরোধী নাম দিয়ে হেনস্থা করতেন তাঁরাও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলেন কী করে আমি পারলাম যা আমার পারার কথা নয়—অর্থাৎ ভজন কীর্তনের বামন আঁকশি দিয়ে উঁচু ডালের টাকার ফল পাড়া। এঁদের মধ্যে আবার অনেকের ধারণা ছিল—ভজন কীর্তন গানই নয়, গান তো ওস্তাদি গান। তাই পণ্ডিচেরিতে আমার ভজনের আসরে তাঁরা সচরাচর আসতেন না বা কখনো এলেও একটু পরেই প্রস্থান করতেন। কিন্তু এঁরাও অতঃপর আমার ভজন শুনতে আসতেন। দান্তে গেয়েছিলেন : "L'amor che move il sole e l'altre stelle"

—অর্থাৎ প্রেমই সূর্য ও তারাদের ঘোরায়। এ-যুগে প্রেমের শক্তি বর্তেছে টাকায়—

— it's money that makes the suns and stars go round —

কে অস্বীকার করবে? আমি কি নিজেই চাক্ষুষ করিনি এ-দুর্দান্ত সত্য—সব দেখেই? কেবল আশ্রমে এর দেখা পাব ভাবিনি। কিন্তু তা-ও পেলাম। অবশ্য অনেক শান্ত সুস্থ সাধক ছিলেন যাঁরা আমার অর্থাহরণের জন্যে আমাকে বিশেষ করে তারিফ করেননি। কিন্তু বেশ কয়েকজন আমার প্রতি সদয় হয়েছিলেন একথা তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে হলফ করে বলতে পারি।

ত্রয়োত্রিংশ

কিন্তু এর পরে যখন আবার সফরে বেরুই তখন সময়ে সময়ে বেশ একটু বিপন্ন হতে হ'ত বৈ কি নানা কারণে। একটি এই যে, প্রতি বৎসরই কন্সার্ট দেওয়ার জন্যে আমাকে নানা ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করতে হত 'রেন্ট' করার মতন। সব সময়েই কিছু সুগায়ক সুগায়িকা পেতাম না, তবে মনে হত সাহেবদের কথা : "A good workman makes do with the tools he has" —

—তাই যেমন আধার মিলত তেমনি গানের ব্যবস্থা করতাম অনুযোগ না করে। 'ভান-ওয়ালা গান গাইতে পারে এমন বালক-বালিকা বা তরুণ-তরুণী সর্বত্র মিলিত না-অথচ একলা গেয়ে গানের প্রোগ্রামে বৈচিত্র্যের আমদানি করা অসম্ভব বলে তারা যে-সব গান গাইতে পারে সেই সব গানই শেখাতাম বাধ্য হয়ে। আরো এক মুস্কিল হত—তারা অনেকেই ভক্তির গান গাইতে তেমন আগ্রহ বোধ করত না ভালোবাসত সেন্টিমেন্টাল প্রেমের গান বা স্বদেশী গান। স্বদেশী গানে তারা কিছুটা প্রাণসঞ্চার করতে পারত বটে, কিন্তু ওজঃশক্তি আনতে পারত না। কাজেই তাদের কোরাস গানে আমাকেও যোগ দিতে হত যার ফলে আশ্রমে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হতে হত—একক গানের পর কোরাসেও গাইতে হত বলে। শেষে হঠাৎ মনে হল—বৈচিত্র্য আনার জন্যে নানা যন্ত্রের একতান সংগীতের প্রবর্তন করা যাক। কিন্তু তার জন্যেও যন্ত্রীদের তুতিয়ে পাতিয়ে রাজী করিয়ে রীতিমত রিহার্সাল দিতে হত অনেক সময়ে স্বরলিপি সাজিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে, কন্সার্টলব্ধ অর্থ শ্রীঅরবিন্দের চরণে নিবেদন করা হবে শুনে সবাই না হোক পাঁচসাত-জন যন্ত্রী মিলে যেত। দুবার কলকাতায় চমৎকার অর্কেস্ট্রাও পেয়ে গিয়েছিলাম।

অতঃপর মনে বিদ্যুৎ-চিন্তা খেলে গেল—যাকে বলে brain wave — নৃত্যসংগতের ব্যবস্থা করা যাক। কিন্তু পেশাদার নর্তকীর কাছে তো যাওয়া চলে না, আর সুভদ্রা নর্তকী যোগাড় করতে হিমাঁসম খেতে হয়। অবশেষে গুরুর কাছে প্রার্থনা জানালাম যার ফল ফলল দেখতে দেখতে—মিলে গেল এক চমৎকার সুকুমারী—যে নৃত্যে অপরূপা না হলেও আমার কীর্তন ভজনের সঙ্গে হেলে দুলে উপভোগ্য রসসৃষ্টি করেছিল। সবচেয়ে সফল হয়েছিলাম—কলকাতার শোভন রকসি প্রেক্ষাগৃহে অর্কেস্ট্রা তথা নৃত্যসংগতে বন্দে-মাতরম গেয়ে—তাতে নানা নতুন পদ জুড়ে—আমার 'সুরবিহার' স্বরলিপি দ্রষ্টব্য। পরে এ-গানটিতে চারটি মেয়ে নেচেছিল শিলঙে—সার্থক যন্ত্রসংগত ছিল না বটে, কিন্তু চার চারটি মেয়ের পরপর আবির্ভাবে তুমুল জয়-ধ্বনি করেছিলেন শ্রোতৃবৃন্দ। সভাপতি ছিলেন তৎকালীন আসাম-রাষ্ট্রপাল—শ্রীপ্রকাশ। তিনি বিশেষ মুগ্ধ হয়ে আমাকে তাঁর রাজ-ভবনে অতিথি হতে বাধ্য করে সাধুবাদ দিলেন রাজপুরুষদের মাঝে এক করতালি-বিধ্বনিত দীপোজ্জ্বল ভোজে। ফের চুমি—মাল্যতিলকগ্রহণ—গুরুদেবের নিষেধ সত্ত্বেও

এর পরে আমার মনে বিষম উৎসাহ এসে গেল—কন্সার্টের চরকিবাজি সুরু হল—যদিও নানা শহরে কন্সার্ট দেওয়া সহজ ছিল না মোটেই। তবে শ্রীঅরবিন্দের চরণে প্রণামী দেব ভাবলেই ক্লান্ত মনও চেতিয়ে উঠত—অপ্রত্যাশিত শক্তি এসে যেত।

(ক্রমশঃ)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সাঁঝের মল্লিকা ৫৲ বকুল বাসর ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

পাও নাই পরিচয় ৫৲

বজ্র বাজে বাঁশী ৪৲

জরাসন্ধের

জায়গা আছে ৪৲ পসারিনী ৪৲

জয়ন্তকুমারের

অভিনেত্রী খুন ৪৲

নায়িকার প্রতিহিংসা ৪৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

তিন কন্যার ঘর ৭-৫০

গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রী ৩-৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

কিরীটী অমনিবাস

দ্বিতীয় খণ্ডের নূতন মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা—৯

যুব যুক্তি

পল্লী উন্নয়ন ও সমাজসেবা

ইরা দে

গ্রামবাংলার নানা সমস্যা। নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে গ্রামের লোক বঞ্চিত। কোথাও রাস্তাঘাট ভালো নয়, আবার কোথাও স্কুল নেই—খাবার জল চিকিৎসারও ব্যবস্থা নেই। পানাপুকুর ইদানীং ম্যালেরিয়ার আক্রমণ। সরকারের পক্ষ থেকে পল্লী উন্নয়নের অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লক অফিস খোলা হয়েছে। সেখানে গ্রাম-সেবক রয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন পল্লীর উৎসাহী যুবকরাও নিজেদের গাঁয়ের উন্নতিতে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, যেসব ছেলেমেয়ে ডানপিটে ভবঘুরের মতো কর্মবিহীন জীবন কাটায় তাদেরও সুযোগ দিলে সাহায্য করলে অনেক কাজ আদায় করে নেওয়া যায়। অমানুষ কেউ নয়। এরা চায় একটু ভালবাসা, সঠিক নেতৃত্ব এবং দুবেলা পেট পুরে খাবার।

আপনারা হয়তো অনেকেই ঘোষপাড়ার নাম শুনেছেন। কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রবর্তিত ঘোষপাড়ার দোলমেলা খুবই প্রসিদ্ধ। এই ঘোষপাড়ার অপর পারে অনেক গ্রাম। মাঝখানে একটা খাল। গ্রীষ্মকালে জল থাকে না বললেই চলে, কিন্তু বর্ষাকালে দু কূল ছাপিয়ে ওঠে জলে। তখন গ্রামবাসীর অশেষ দুর্গতি। কেননা বেশীর ভাগ জমি নীচু। বর্ষার জলে সহজেই ডুবে যায়। গ্রামের ছেলেমেয়েদের কল্যাণী স্কুলে আসা মুস্কিল। কর্মজীবীদেরও একই অবস্থা। বন্যা হলে তো কথাই নেই। ঘর বাড়ী ছেড়ে সবাইকে আশ্রয় নিতে হয় শহরে। গ্রামে যাওয়ার পথে শ্রীশ্যামলেন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি জানালেন, গ্রামের যুবক ছেলে আমরা মাথায় ঝুড়ি বয়ে মাটি ফেলে এসব রাস্তা-ঘাট করেছি। এই যে পুল দেখছেন, এটা ইদানীং সরকারের সাহায্যে তৈরী হয়েছে। আগে এখানে মাটির তৈরী পুল ছিল। তার ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে গরুর গাড়ী, সাইকেল রিকসা সব যাতায়াত করত। বান এসে সব ভেঙ্গে গেল।

সে সময় আপনারা যাতায়াত করতেন কি করে—জিজ্ঞাসা করি।

—সাঁকোর ওপর দিয়ে। সেই সাঁকোও আমরাই তৈরী করতাম।

—সাঁকো?

—বুঝতে পারছেন না? লম্বা কয়েকটা বাঁশ ফেলে দু পাশে বাঁশের খুঁটি পুতে সাঁকো তৈরী করতাম। তবে বৃষ্টির দিনে পিচ্ছিল হয়ে গেলেই মুস্কিল হত। যে-কোন সময়ে পা ফসকে পড়লেই সাঁতার জল।

সত্যিই গ্রামের যুবকদের প্রশংসা করতে হয়। তাদের চেষ্টা ও তদ্বিরের ফলেই হয়েছে এই পুল। তবে রাস্তার অবস্থা এখনো ভালো নয়। সেতু থেকে নেমে এগোতেই রাস্তা ভেঙ্গে আর একটা ছোট খালের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য পারাপারের জন্য গ্রামের ছেলেরাই একটা বিরাট তালগাছ ফেলে রেখেছে। তবে নিজের তাল সামলে তবে সাবধানে পেরোতে হবে। আর একটু এগোতেই আবার রাস্তা ভাঙ্গা, জল কাদা। গ্রামের পোস্টমাস্টার, বিভিন্ন সমাজকর্মীর সঙ্গে যুক্ত শ্রীকালীপদ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা এসবের সংস্কারের ব্যবস্থা করছেন না?

—মাঝে মাঝেই করা হয়। তবে গরু চরানোর জন্য রাস্তার সে সংস্কার বেশী দিন টেকে না।

—গ্রামের যুবকরা এসব বিষয়ে আগ্রহী নয়?

—নিশ্চয়ই। 'নবীন সঙ্ঘে'র উদ্যোগে ছেলেরা ছুটির দিনে রাস্তা তৈরী করে। রাস্তা পাকা করার জন্যও চেষ্টা চলছে।

—এখানে রিলিফের কাজ হয় না?

শ্যামলেন্দু বিশ্বাস

—হয় তবে তেমন নয়। তাছাড়া বর্ষা এলেই রাস্তার চরম অবনতি ঘটে।

—এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন?

নিশ্চয়ই। বিভিন্ন সময়ে আমরা মন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত ডেপুটেশনে গিয়েছি। বর্তমানে সি এম ডি এ প্রকল্পে রাস্তার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের শান্তি নেই। আর এক প্রাকৃতিক বিপদ শুরু হয়েছে।

—প্রাকৃতিক বিপদ? বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করি।

—হুগলী নদীর ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। চরণওসরাই, চরজাজিরা, চরগঙ্গামনোহরপুর, সরাটী, সান্ডেলচর—নদী সংলগ্ন সব গ্রামের জমি প্রচণ্ডভাবে ভাঙ্গছে। নদী যেভাবে এগিয়ে আসছে তাতে গ্রাম টিকে থাকাই মুস্কিল।

—আপনারা নদীর পাড় বাঁধার কোন ব্যবস্থা করেন নি?

—এ ভাঙ্গন রোধ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। সামান্য কাঠ-খুঁটি-বাঁশ পুতে ঠেকানো যাবে না।

—সত্যি সমস্যার কথা! এ বিষয়ে আপনারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি?

—এম এল এ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সবাই জানেন। আপনারাও আপনাদের কাগজে লিখুন যদি সরকারের টনক নড়ে। সব চাষের জমি ঘরবাড়ী এভাবে ভেঙ্গে গেলে কি অবস্থা যে হবে...হতাশার সুর শুনতে পেলাম তাঁর মুখে।

এমনিতরো নানা সমস্যা নিয়ে আমাদের গ্রামবাংলা ডুবে আছে। আবার অনেক জায়গায় যেখানে একদিন বনবাদাড় ছিল, দিনে-দুপুরে শেয়াল ডাকত, সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কত পাকা বাড়ী। পাকা রাস্তা! বনগ্রামে এ পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। বনগাঁ স্টেশনে নেমে বনগ্রামের উন্নয়ন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম। একটি উৎসাহী যুবক আমাকে নিয়ে গেলেন কলেজপাড়ায় অধ্যাপক ননী দাশগুপ্তের কাছে।

বয়সে বৃদ্ধ তবে প্রাণোচ্ছলতায় ভরপুর। কর্মযোগী। নানা উন্নয়নমূলক কাজ, সমাজ-সেবা ইত্যাদি নিয়ে আছেন। ঘরে বসে একটা

ম্যাগাজিন পড়ছিলেন তিনি। আমার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য জানতে হেসে বললেন—এই বুড়োর কাছে এসেছ বাবা! তা বেশ করেছ। মনে-প্রাণে এখনও আমি যুবকই আছি। বলো কি জানতে চাও?

—অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম বনগ্রামের উন্নয়নে আপনার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আপনি যুবক ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানা উন্নয়নমূলক সংগঠনে জড়িত আছেন...

—ঠিকই শুনেছ। আমার বাড়ীর সামনে যে কলেজটা দেখছ এটা প্রখ্যাত 'নীলদর্পণ' প্রষ্টা দীনবন্ধুর স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়। ওঁর বাড়ী এখানে, কাছেই। এই কলেজের উন্নয়নেই কলকাতা থেকে আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়। সেই থেকে এখানেই আছি। ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানা কাজে ডুবে আছি।

—এই বয়সে—এই শরীরে এতজোর কোত্থেকে পান?

—কাজ করার নেশা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। এখন ছেলেমেয়েদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিই।

ইতিমধ্যে ইরা দে, অনীতা দে প্রভৃতিরা এসে হাজির। এঁরা নানা সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত। দেখেই বোঝা গেল খুব ব্যস্ত-ভাবে এসেছেন। সবে স্নান করে শাড়ী পরেছেন, ভালভাবে চুল আচড়ানোও হয়নি। ঘরে বিদেশ বিভুঁই-এর যুবক ছোকরাকে দেখে কিছুটা শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমাদের ডেকেছেন? অধ্যাপক দাশগুপ্ত বললেন—এরা 'অমৃত' সাপ্তাহিকের যুবক-যুবতী বিভাগের পক্ষ থেকে এসেছে। তোমাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে জানতে চান। প্রাথমিক লজ্জা কাটিয়ে এবার বেশ চাঙ্গা হয়ে নিলেন শ্রীমতী ইরা দে। জিজ্ঞাসা করলাম—ইরাদেবী, আপনারা এখানে কি ধরনের কাজকর্ম পরিচালনা করছেন আমাকে একটু বলুন না।

—আমরা যে ধরনের উন্নয়নমূলক এবং সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করছি সেটা সবই আমাদের জীবনী কলেজনী মহিলা সমিতির মাধ্যমে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টা।

—আপনারা এখানে কি কি শেখান?

—এখানে বালোয়াদি ক্লাস নেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিউট্রিশন স্কিমে এটা চলছে।

—এই স্কিমের সুবিধা কি?

—এখানে যেসব ছেলেমেয়েরা পড়ে, তাদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গান, খেলাধুলো সেলাই সবকিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া স্কুল থেকে তারা টিফিন খেতে পায়।

—এই বালোয়াদি ক্লাশে কিরকম সাড়া পাচ্ছেন?

—প্রচুর ছেলেমেয়ে আসে। আমি ও অনীতা এদের ক্লাশ নেই।

—আর কি ব্যবস্থা আছে আপনাদের এখানে?

—এখানে সেলাই শিল্পে লেডি ব্রেবার্ণ ডিপ্লোমা শিক্ষা দেওয়া হয়। যাঁরা ডিপ্লোমা পান তাঁরা পরবর্তীকালে ক্রাফট টীচার অথবা গ্রামসেবিকা হিসাবে চাকরী পেতে পারেন।

এতক্ষণ শ্রীঅনীতা দে চুপচাপ বসে ছিলেন। আমি তাঁর নীরবতা ভাঙ্গাতে বললাম—আপনি একদম চুপচাপ কেন, আপনি কিছু বলুন।

জিজ্ঞাসা করলেই বলতে পারি—হেসে জবাব দিলেন।

—পল্লীউন্নয়নে এবং সমাজসেবায় আপনাদের আর কি ভূমিকা আছে?

—আমি কলেজের মেয়ে। পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে এসব করতে ভালই লাগে। আমাদের এখানে লাইব্রেরী আছে। সেটা পরিচালনা করেন শেফালিদি। আজকে ছুটির দিন। অন্যদিন এলে দেখতে পেতেন কি উৎসাহে আমরা কাজকর্ম করি। তাছাড়া আমরা বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্রও পরিচালনা করি।

—বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্রে ছেলেমেয়ে সবার পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে?

—হ্যাঁ, সাবিত্রী সমাদ্দার এবং শেখর মজুমদার এই শিক্ষাকার্য সম্পাদন করেন। তবে যাঁরা আসেন তাঁরা সবাই অভিযোগ করেন—'খালিপেটে কি করে লেখাপড়া করি বলুন, আমাদের রুজিরও কিছু ব্যবস্থা করুন।' এবার শ্রীমতী ইরা দে এগিয়ে এলেন। তিনি জানালেন, সবার এক সমস্যা—অর্থের। তবে দাদুর এক কথা, সমাজসেবা করতে হলে অনেক ত্যাগ করতে হয়। তাই পেটে ক্ষিদে থাকলেও কিছু বলতে পারি না।

—আপনারা গ্রামবাসীর রুজিরোজগারের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন? জিজ্ঞাসা করি।

—শিক্ষিত যুবকযুবতীদের শেখানোর জন্য টাইপ মেশিন, সেলাইকল সব রয়েছে। তাছাড়া সাবান তৈরীর একটা স্কিম আমরা নিয়েছি। সরকার অনুমোদন করলে এবং সাহায্য পেলে ব্যাপকহারে উৎপাদন করার ইচ্ছা আছে।

বনগ্রামের উন্নয়নের নানা কথা নানা গল্প শোনালেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। জানালেন, অনেক চেষ্টা চরিত্র করে রাস্তাঘাট স্কুল-কলেজ লাইব্রেরী কিছু হয়েছে, তবে এখনো অনেক কাজ বাকী। গভীর নলকূপের অভাবে ভালো চাষবাস হচ্ছে না। এই শরীর নিয়ে এখন এতো ছুটোছুটি করাও কষ্টকর।

শ্রীঅনীতা দের হাতে তৈরী কফি খেয়ে এবার উঠে পড়লাম। এখনো অনেক কাজ বাকী। ফেরার পথে ট্রেনে আলাপ হল প্রশান্ত দেবের সঙ্গে। তিনি জানালেন গোবরডাঙ্গা অঞ্চল উন্নয়নে আনন্দ সম্মেলন ও ব্রতচারী সমিতির অনেক অবদান আছে। তাছাড়া এখানের সায়েন্স ক্লাবও নানা কাজ করছে।

—এসব কাজকর্মে যুবকযুবতীদের ভূমিকা কতখানি?

—এসব কাজকর্ম তো তারাই করে। রাস্তাঘাট তৈরী, মেরামত, গরীবদের গৃহ-নির্মাণে সাহায্য সবকিছু।

পরামর্শ ভৌমিক জানালেন, ছেলেদের খেলাধুলোর ক্লাবই বেশী। তবে এসব কাজে ও প্রয়োজনে তারা পেছপা নয়।

গোবরডাঙ্গা কলেজের ছাত্রী মসলন্দপুরের কৃষ্ণা রায়ের সঙ্গে পরিচয় হল। তাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি হেসে উঠলেন—পল্লী উন্নয়ন সমাজসেবা এসব কাজের সুযোগ কোথায় আমাদের?

—আপনাদের সংগঠন নেই?

—যা আছে সেখানে ছেলেদেরই প্রাধান্য বেশী। আমাদের সব কিছু ঘরের মধ্যেই।

—গ্রামের উন্নয়নে আপনাদের উৎসাহ নেই?

—কেন থাকবে না! দেখছি রাস্তাঘাট হচ্ছে—বিদ্যুৎ আসছে তখন ভারী আনন্দ হয়। পাড়ার উন্নতি হলে আমাদেরও উন্নতি।

পাশে ছিলেন তাঁরই বন্ধু ডালি চক্রবর্তী। রসিকতা করে জানালেন, বন্ধুর আমার সদ্য বিয়ে হয়েছে। এখন ওর সব সমাজচিন্তা একজনকে কেন্দ্র করে।

কৃষ্ণাদেবী হাসতে হাসতেই প্রতিবাদ করলেন—চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। আমরা মেয়েরা যদি ঘরকে সুন্দর করে, ছেলেমেয়েদের ঠিক শিক্ষা দিই তবেই না প্রকৃত উন্নয়ন ও সমাজসেবা হবে? কি বলেন?

আমিও মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলাম।

—অমর দাশ

চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী প্রসঙ্গে

২৪ জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখের সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখিত দীর্ঘ পত্রখানি পড়ে কৌতুকবোধ করেছি। তিনি বর্তমান পত্র-লেখককে 'ব্যক্তিগত আক্রমণ'-এর দায়ে অভিযুক্ত করেছেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিখ্যাত উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেকে উত্তম বলে দাবী করেছেন। অথচ বর্তমান পত্র-লেখককে 'সতীর্থ, সুহৃদ, অতিথি' ইত্যাদি ঘোষণা করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে 'সাধুর বেশে শয়তান' বলতেও তাঁর রুচি ও বন্ধুর প্রতি আচরণে আতিথেয়তায় বাধেনি। লেখকের সঙ্গে যুক্তির বিচারে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁর 'পরিজনের লেখা কিছু পত্র' নিয়ে টানাটানি শুরু করেছেন। এহেন কাজও যদি ব্যক্তিগত আক্রমণ না হয়, তবে তা কী আমার জানা নেই। শ্রীমুখোপাধ্যায়কে দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছি তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বিরোধ কোনোকালে ছিল না, এখনো নেই। তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও আতিথেয়তার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে তাঁর লেখার সমালোচনা করবো না বা ভুল-ভ্রান্তির প্রতিবাদ করতে পারবো না এমন অন্যায় দাবী তাঁর কাছ থেকে আশা করি না। প্রত্নবিদ্যা ভালোবাসি, তাই প্রত্নচর্চার ক্ষেত্রে অনাচার বা অসাধুতা ব্যক্তিবিশেষের মুখ চেয়ে মেনে নিতে বর্তমান পত্র-লেখক রাজী নন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন তাঁর প্রবন্ধ (চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী) সম্পর্কে আমি নাকি কোনো আলোকপাত করিনি। কথাটা একেবারেই যে ঠিক নয় 'অমৃত' পাঠকগণই তা বলবেন। তাই পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কেবল দুটি বিষয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

(১) শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন খনা-মিহিরের ঢিপির উৎখননের কোন স্তর—বিন্যাস করা হয়নি। কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য। ভারত সরকার (Archaeological Survey of India) কর্তৃক প্রকাশিত

'Archaeological Remains, Monuments and Museums'

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৮০ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লেখা আছে :

"The excavation has revealed almost a continuous sequence of occupations, divided into six periods, from the pre-Mauryan to Pala times, at the two mounds of Chandraketugarh and Khana — Mihirer Dhipi".

বেড়াচাঁপার মন্দিরটি যে গুপ্তযুগের—এই ধারণার সমর্থক আবিষ্কৃত প্রত্নদ্রব্যের উল্লেখও ওই একই পৃষ্ঠাতে রয়েছে। তবু যদি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মনে হয় মন্দিরটি অন্য কোন যুগের, তবে তা কোন্ যুগের এবং সেই ধারণার স্বপক্ষেই বা কী যুক্তি আছে শ্রীমুখোপাধ্যায় দয়া করে জানালে সুখী হবো।

(২) ভগ্ন সূর্যমূর্তি প্রসঙ্গে নির্মলেন্দুবাবু লিখেছেন, 'হরিনারায়ণপুরে প্রায় অনুরূপ একটি ভগ্ন সূর্য মূর্তির পাদপীঠ পাওয়া গেছে।' এই প্রসঙ্গে বর্তমান পত্র-লেখকের বিনীত অনুরোধ শ্রীমুখোপাধ্যায় দয়া করে কৃষ্ণচন্দ্রপুরে প্রাপ্ত 'ভগ্ন সূর্য মূর্তির পাদপীঠ' ও হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত অনুরূপ 'ভগ্ন সূর্য মূর্তির পাদপীঠ' আমাদের দেখাবার ব্যবস্থা করুন। যদি তিনি তা পারেন তবে আমি অবশ্যই আমার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেবো।

দ্বিতীয়ত হরিনারায়ণপুর সম্পর্কে স্বর্গত কালিদাস দত্ত, সর্বশ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষ, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, দেবকুমার

চক্রবর্তী, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকের লেখা ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ পড়েছি ব্যক্তিগতভাবে অন্তত চারবার হরিনারায়ণপুরে গিয়েছি ও বহু প্রত্নদ্রব্য সংগ্রহ করেছি কিন্তু প্রাগৈতিহাসিককালের কিছু প্রস্তর-আয়ুধ ব্যতীত আর কোনো প্রস্তর-নিদর্শন বা মূর্তি এখান থেকে পাওয়া গেছে বলে জানা নেই। একদা সরস্বতী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত বন্দর হরিনারায়ণপুরের অস্তিত্বের কাল, প্রধানত শুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্তযুগ ও এখানে প্রাপ্ত সামগ্রীর প্রধান গৌরব তার terracotta বা পোড়ামাটির জিনিস। এহেন হরিনারায়ণপুরে পালযুগের ভাস্কর্য (প্রস্তর) খুঁজে বেড়ানো আর ধান-ক্ষেতে বেগুনের সন্ধান করা একই ব্যাপার। পরিশেষে নির্মলেন্দুবাবুর কাছে বিনীত নিবেদন, প্রত্নচর্চা করতে হলে নিজেকে 'অভ্রান্ত আচার্য' বলে মনে করা অনুচিত, তার ফল দাঁড়াতে পারে স্বর্গীয় সুকুমার রায় বর্ণিত 'অসিলক্ষণ পণ্ডিতে'র মতো।

গৌরীশঙ্কর দে
হাবড়া, ২৪-পরগণা।

বিবাহ ব্যবস্থা

গত ২৪ জানুয়ারী 'অমৃত' 'যুবক-যুবতী' বিভাগে 'বিবাহ ব্যবস্থা' সম্পর্কে অমর দাস মশাই লিখেছেন, 'আমাদের দেশে বিবাহের সঙ্গে আরও অনেক সমস্যা জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হল পণপ্রথা ও যৌতুক সমস্যা কিন্তু শ্রীদাশ আরও একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করতে পারতেন যা সমগ্র গ্রাম-বাংলায় প্রকট, সেটা 'জাত বিচার'। ঠিকমত স্বজাত না হলে আজকের দিনেও এখনও ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় না। এবং কেউ স্বেচ্ছায় বিবাহ করলে সমাজ থেকে আসে প্রবল বাধা। বীণা গুহ ঠিকই বলেছেন 'লাভ ম্যারেজ গ্রামের সমাজে কঠিন', কেননা সেখানে অশ্লীল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় ছেলে এবং মেয়েকে। বীণা গুহ আরও বলেছেন, মা-বাবা যেখানে দেখে দেবেন সেখানে কোন প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু প্রচুর দাবীদাওয়া মিটিয়ে অর্থ ব্যয় করে পিতামাতা যখন তাঁদের মেয়েটিকে বিবাহ-বৈতরণী পার করে দেনার দায়ে চুল বিকিয়ে দেন তখন কি ঘটে? তখন পিতা-মাতার অবস্থা কে হৃদয়ঙ্গম করবে? আবার যদি দাবীদাওয়া মিটিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে শ্বশুরবাড়ীর খোঁটাও খেতে হয় মেয়েকে। বীণা গুহর আরও বক্তব্য এই যে, 'গ্রামের রাস্তায় বাবা একা চলতে দেন না এবং বড় ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেন না।' এর কারণ অনেকটা এই যে, সমাজে রক্ষণশীলতা ও নিজেদের সম্মানহানির ভয়। একজন গ্রামীণ যুবক হিসাবে আমি এ-স্বীকারোক্তি করতেও বাধ্য যে, অনেক এমন যুবক থাকে যাদের কাছে প্রকৃত প্রেমের থেকে নোংরামিটা বড় বলে মনে হয়। সেইজন্যে পিতামাতারা সাবধানতা অবলম্বন করেন। শ্রীঅসিতকুমার ঘোষের সঙ্গে একমত কিন্তু তিনি বলেছেন 'সাজিয়ে গুছিয়ে দেবার সামর্থ্য যাদের আছে তারা নিশ্চয়ই এসব বিষয়ে অরাজী হবেন না।' একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই দেওয়ার সামর্থ্য যাদের আছে তাদের দেওয়ার ফলে এটা একটা পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে গেছে, একটু অপারগ কন্যার পিতা-মাতারা তার শিকার হচ্ছেন। দাবীদাওয়া ব্যাপারটাকেই সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে। পণপ্রথা বন্ধে সরকারী আইন কার্যত ব্যর্থ, তাই পণপ্রথা ওরফে 'ডিমান্ড' বন্ধে চাই অসবর্ণ বিবাহ বা স্বেচ্ছা বিবাহ, যা সম্ভব একমাত্র শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক-যুবতীর দ্বারা, আমি মনেপ্রাণে একমত

অমরাবতীর তরুণী তনশ্রী রাহার সঙ্গে তাঁর লাভ কাম সোসাল ম্যারেজ' মতে। বিয়েটা পিতামাতার সম্মতিক্রমেই হোক। পিতামাতাও তাঁদের রক্ষণশীল মনোভাব বা গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) আজকের সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিন।

চঞ্চল সিংহরায়
রোহিয়া, হুগলী।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে

২৪ জানুয়ারীর 'অমৃতে' যুবক-যুবতী বিভাগে বিবাহ-ব্যবস্থা সময়োপযোগী আলোচনা। সত্যি কথা কালো মেয়েরা বিয়ের বয়স এলে স্নায়ুর চাপে ভোগে। অবশেষে কারো কারো বিয়ে হয়, হয়তো টাকার জোরে অথবা প্রেম করে—এটা সবাই জানে। অন্যদিকে যেসব কালো মেয়ের বাবার অবস্থা স্বচ্ছল নয় অথবা প্রেমবিমুখ তাদের অবস্থাটা চিন্তা করার সময় এসেছে। এর একটা বিহিত করা দরকার এই মুহূর্তে। এ-সমস্যা সব জায়গাতেই সমান, কি গ্রামে কি শহরে।

আমার যত বন্ধু আছে সবাই পণ-প্রথার বিরুদ্ধে। অবশ্য অনেকে বলবেন আমার বোনের বিয়েতে এত টাকা দিলাম, তার বেলা? ঠিক কথা আমরা যদি পণ না নিই, তাহলে অন্যদিকে আমাদের বোনের ক্ষেত্রেও দেওয়ার প্রশ্ন আসে না।

অসিতকুমার ঘোষের সঙ্গে আমি একমত। এই দুর্দিনে অপচয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কোর্টে রেজিস্ট্রেশন সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। আসুন আমরা সবাই মিলে প্রাচীন প্রথাকে ভেঙে ফেলি। এতে হয়তো সাময়িক অসুবিধা আছে—কিন্তু ভবিষ্যতে এটাই হবে নতুন বিবাহ-রীতি। এর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করা দরকার।

তনশ্রী রাহা বাস্তবসম্মত কথা বলেছেন। আমিও লাভ-কাম-সোসাল ম্যারেজের পক্ষপাতী। আজকের যুগে প্রার্থীর অজ্ঞাতসারে পতি অথবা পত্নী নির্বাচন সত্যিই ভাবা যায় না। তাছাড়া আজকের সমাজে মেয়েদের সেজেগুজে পাত্রপক্ষের সামনে বসবে এরকম মানসিক অবস্থা কারুর নেই। তার চেয়ে নিজেদের নির্বাচন বেশী সুখের। এযুগের অভিভাবকেরা এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করেন না এবং করতেও চান না। আমি বিশ্বাস করি অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের ভাগ্য তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

ডিভোর্স। ওতো নিজেরে উপর। নিজেদের মধ্যে ভালো আণ্ডারস্টাণ্ডিং না থাকলেই হবে। সাধারণ বিয়ের পরেও তো [illegible] ব্যাপারে সমঝোতা আনতে হবে, তাহলেই ভবিষ্যৎ জীবন হবে সুন্দর।

আসুন আমরা এগিয়ে আসি। নিজের পাত্র অথবা পাত্রী নিজেই নির্বাচন করি। শহরে বা গ্রামে স্থানীয় ক্লাবগুলি এ-ব্যাপারে অগ্রণী হতে পারে। বছরে একবার 'নির্বাচন মেলা' অনুষ্ঠান করে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মেলামেশা করিয়ে দিতে পারে, যার মাধ্যমে নিজেরা নিজেদের নির্বাচন করবে। প্রয়োজন হলে সময় মত অভিভাবকদের নিকটে খোলাখুলি আলোচনা করা যেতে পারে, তাতে কারুর অসুবিধা থাকার কথা নয়।

অমিতাভ কুশারী
রাণাঘাট, নদীয়া।

ক্রিকেট

গত ৩১ জানুয়ারীর 'যুবক-যুবতী' বিভাগে ক্রিকেটকে নিয়ে অমর দাশ মহাশয়ের নাতিদীর্ঘ আলোচনা ভালই লাগল। এদেশে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কিছু অস্বাভাবিক নয়। বেতার পত্রপত্রিকা সরকারী, বেসরকারী মহল যেভাবে ক্রিকেট খেলার গুরুত্ব বাড়িয়ে চলেছেন তাতে আবালবৃদ্ধবনিতার ক্রিকেট-অনুরাগী না হয়ে উপায় কি? যে-দেশে ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য সবেতন ছুটি (উড়িষ্যা) পাওয়া যায়, রিলে শোনার নাম করে অফিস থেকে কেটে পড়া যায়, কিংবা ছাত্রদের ক্রিকেটানুরাগী করে জত্যোলার জন্য স্কুলে কলেজে টেলিভিশনের ব্যবস্থা করা হয় অথবা ক্রিকেট খেলার জয়-পরাজয়কে কেন্দ্র করে দীর্ঘস্থায়ী গবেষণা চলে— সে-দেশের মানুষ ক্রিকেট খেলা নিয়ে পাগল হয়ে উঠবে না তো কি? তাই বোধ-হয় শ্রীদাশ ক্রিকেটের প্রতি বিরূপ কাউকে খুঁজে পেলেন না। অথচ ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে সময়ের যে অপচয় হয় তার হিসেব কে রাখে?

সারা শীতের দুপুর ধরে চলে 'ডিউজ বল' 'টেনিস বল' নিদেনপক্ষে 'রবারের বল' পেটানো। ফলে ধারাবাহিকভাবে ছাত্রদের চলে স্কুল কামাই, স্কুল পালানো। আর পাঁচটা টেস্ট ম্যাচের পঁচিশ দিন তো বাড়ীতে দূরস্থান—স্কুল-কলেজেও তাদের মুখ দিয়ে ক্রিকেট ছাড়া (অবশ্য ব্যতিক্রম আছেই) অন্য কথা শোনা যায় না। ফলে পড়াশুনার ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাহত হয় বাড়ীর কাজ। এবং তাদের মধ্যে নেমে আসে অবাধ্যতা অনুভাষণ ও কিছুটা শৃঙ্খলাহীনতা। এটা সমাজজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। সরকারী অফিসেও এই দিন যা কাজ হয় তা ঈশ্বরই জানেন। এ'কদিন স্কুল কলেজ অফিস—সব একেবারে ছুটি দিয়ে দিলে ক্ষতি কি? কাজের বেলায় যখন 'লবডঙ্কা' তখন নামকা ওয়াস্তে অফিস খোলা রেখে দরকার কি? আর ক্রিকেট খেলাও তো জাতীয় উৎসবের নামান্তর তাই নয়? একটা কথা ভাবা দরকার। ক্রিকেট খেলা এদেশে যত জনপ্রিয়ই হোক—এটা যদি সত্যি সত্যি এত ভাল খেলা হত, তবে এ-খেলা আজও পুরোনো ব্রিটিশ কলোনীর বাইরে ছড়ালো না কেন? খোদ ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়াতেই বা আজ ক্রিকেট খেলার কতটা সমাদর?

ইংরেজের কোট প্যান্ট ইংরেজী বুকনির সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেয়েছি ক্রিকেটের উত্তরাধিকার। তাই যতই ইংরেজী ছাড়তে চাই, ইংরেজের ঋণ ভুলতে চাই—ততই আমাদের চালচলনে ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ ধরা পড়ে। তাই বলছি—ভারতীয় ক্রিকেটের বাড়বাড়ন্ত হোক পতৌদি, মার্চেন্ট, মানকড় বিশ্বনাথেরা সহস্রদিকে ছড়িয়ে পড়ুন আর আমরা পড়ার বই রেখে জরুরী চিঠির কথা ভুলে রেশনের লাইন ছেড়ে—রিলে শোনার লাইনে দাঁড়াই—জয়তুঃ ক্রিকেট।

অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিরাটী কলি—৫১

'অমানুষ' এবং সত্যজিৎ রায়ের ছবি প্রসঙ্গে

অমৃত'র ১৭ই মাঘ, ১৩৮১ (৩১-১-৭৫) সংখ্যায় ২৪ পরগণার খোলা-পাতা থেকে পত্রলেখক শ্রীস্বপন শৈল ও কার্তিক দাসকে, ত্রুটি সংশোধনের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। 'অমানুষ' ছবির ভুবন বা অঘোর দারোগা (পুলিশ অফিসার) নয়, অভিনেতা অনিল চ্যাটার্জির অপূর্ব অভিনয়ই, বিগত চিঠির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। এখানেই এপ্রসঙ্গের ছেদ টানছি।

মুর্শিদাবাদ থেকে শ্রীমতী তপতী সেনগুপ্তা সত্যজিৎ রায়ের ছবি "সোনার কেল্লা" প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ইতিপূর্বে উনি নিজের কাহিনী নিয়ে দুটি ছবি পরিচালনা করেছেন।

'সোনার কেল্লা' কিশোর ও শিশুদের ছবি, ঐটি ওঁর দ্বিতীয় শিশু চিত্র পরিচালনা এবং নিজের লেখা ছোটদের কাহিনী নিয়ে প্রথম চিত্র পরিচালনা। সুতরাং এই প্রসঙ্গে ওঁর প্রথম শিশু চিত্র 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এর প্রসঙ্গ আসতে পারে। কিন্তু 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (১৯৬২) এবং 'নায়ক' (১৯৬৬)-এর মতো সমকালীন ছবির প্রসঙ্গে, উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। এখানে ওঁর প্রথম নিজের কাহিনীভিত্তিক চলচ্চিত্র পরিচালনা বলতে শিশু বা কিশোরদের জন্যে চিত্র পরিচালনাই বোঝানো হয়েছে। —চিত্রদূত

নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে

গত ১০ই মাঘের অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত অরুণচন্দ্র গুহের লেখা 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম।

লেখক তাঁর প্রবন্ধের এক [illegible]

গান্ধীজীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের মনোভাব সম্বন্ধে বলেছেন—'কিন্তু গান্ধীর প্রতিও তাঁর আস্থার অভাব ছিল না।' সামান্য এটুকু বলাতে আমার মনে হয় গান্ধীজী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনোগত ধারণাটি বেশ পরিষ্কার হোল না সাধারণ পাঠকদের কাছে। অনেক পাঠকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মতবাদকে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না তাঁকে তিনি তেমন পছন্দ করতেন না এবং এরই পরিণামস্বরূপ সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে যে কত সম্মানের চোখে দেখতেন এবং জাতীয় আন্দোলনের নেতা হিসাবে গান্ধীজীর প্রতি সুভাষচন্দ্র যে কতখানি আস্থাবান ছিলেন তা গান্ধীজী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব কতকগুলি উক্তি থেকেই পাঠকেরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন। সুভাষচন্দ্রের উক্তিগুলি হোল—

'In 1920 India stood at the Cross-roads.. Constitutional agitation, boycott of British goods, armed revolution— all had alike failed to bring freedom. There was not a ray of hope left and the Indian people, though their hearts were burning with indignation, were groping in the dark for a new method and new weapon of struggle. Just at this psychological moment, Mahatma Gandhi appeared on the scene with his novel method of Non-Co-operation or Satyagraha or Civil Disobedience. It appeared as if he had been sent by Providence to show the path to liberty. Immediately and spontaneously the whole nation rallied round his banner. India was saved. Every Indian's face was now lit up with hope and confidence. Ultimate Victory was once again assured'.

"For twenty years and more Mahatma Gandhi has worked for India's salvation, and with him, the Indian people too have worked. It is no exaggeration to say that if in 1920 he had not come forward with his new weapon of struggle, India today perhaps have been still prostrate. His services to the cause of India's freedom are unique and unparalleled. No single man could have achieved more in one single life-time under similar circumstances".

"Since 1920 the Indian people have learnt two things from Mahatma Gandhi which are the indispensable pre-conditions for the attainment of independence. They have, first of all, learnt national self-respect and self-confidence—as a result of which revolutionary fervour is now blazing in their hearts. Secondly, they have now got a countrywide organization which reaches the remotest villages of India. Now the message of liberty has permeated the hearts of all Indians and they have got a countrywide political organization representing the whole nation—the stage is set for the final struggle for liberty—the last War of Independence".

"Each nation has its own internal policies and its own attitude towards political problems. But that cannot affect a Nation's appreciation of a man who has served his people so well and has fought a first class modern power all his life".

"The service which Mahatma Gandhi has rendered to India and to the cause of India's freedom is so unique and unparalleled that his name will be written in letters of gold in our national history for all time".

আর একটি কথা যার সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। লেখক তাঁর এই প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন—...এই বিদ্রোহ কার্যত গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। যিনি গান্ধীজীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে উপরের উক্তিগুলি করেছেন তিনি কি করে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে অবমাননা করতে পারেন বুঝে উঠতে পারলাম না। সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল জাতীয়-জীবনের মূর্ত বিকাশ কংগ্রেসকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলার। কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন এর পরিপন্থী। গান্ধীজী ছিলেন নরমপন্থী আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতালাভে তিনি ছিলেন পক্ষপাতী আর সুভাষচন্দ্র ছিলেন চরমপন্থী তিনি মনে করতেন আপোষহীন সংগ্রাম ছাড়া কখনও স্বাধীনতালাভ হয় না। গান্ধীজী যতদিন অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন সুভাষচন্দ্র ততদিন গান্ধীজীর সঙ্গে মিলেমিশে চলেছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র বুঝলেন গান্ধীজী ও তাঁর অনুবর্তী কংগ্রেস আর কোন সংগ্রামের পক্ষপাতী নন সেই মুহূর্তেই তিনি গান্ধীজী তথা কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নামে এক সংগ্রামপন্থী কর্মীদল গঠন করলেন। এটা তার কিছুই নয় 'মত' ও 'পথ'-এর লড়াই। তার মানে এই নয় যে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে অবমাননা করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা।

বারিদবরণ ঘোষ
মাতৃমন্দির, দমদমপার্ক, হুঁচুড়া।

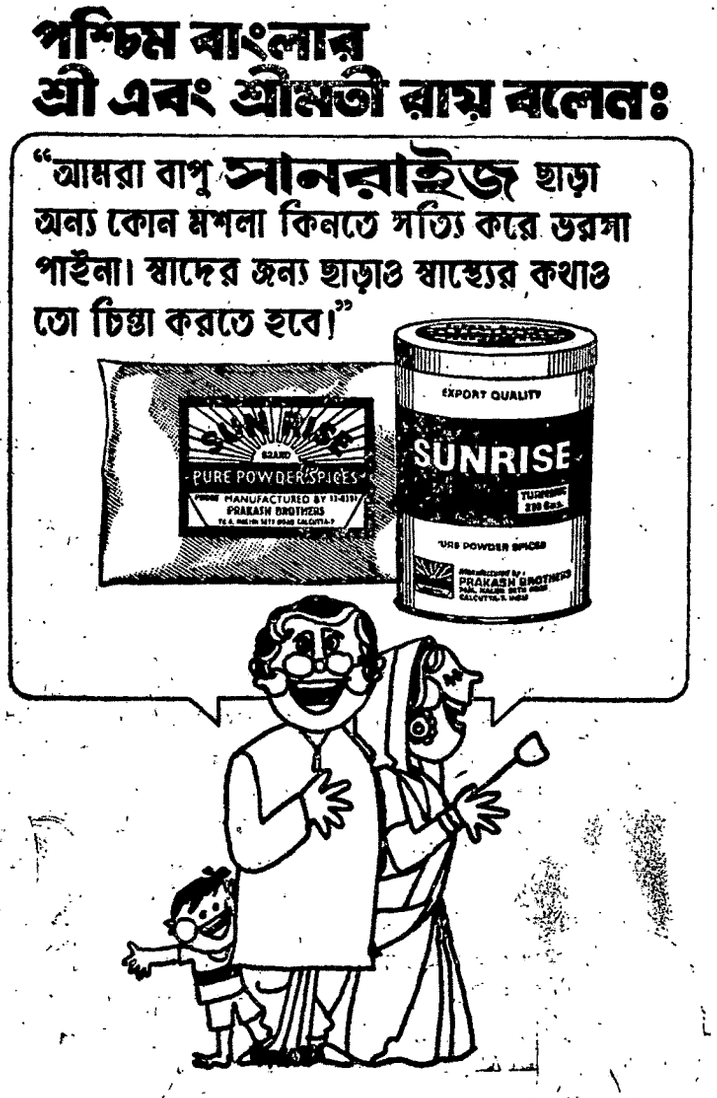

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গারসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনীর সুর বেজে উঠল।

কিন্তু তরঙ্গিনীর মন বড় চঞ্চল। বুকের মধ্যে তার টনটন করে ওঠে—ষষ্ঠী গেল—মহাসপ্তমীও এসে গেল—কিন্তু তার মেয়ে এখনও এলো না।

আর কবে আসবে?

ক্রমে সপ্তমী অষ্টমী নবমী পেরিয়ে দশমীও এসে গেল। ভোরে উঠেই সবাই দেখে ভিজে চোখ মা-দুর্গার। শেষ রাত থেকে সানাই বাজছে। তাঁরও কান্নার সুর গিরিকন্যা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছেন বলে।

দুপুরের পরই মা দুর্গার কপালে সিঁদুর পরিয়ে সেই সিঁদুর মেয়েদের মধ্যে এ ওকে পরিয়ে দেবার ধুম পড়ে গেল।

কিন্তু ভবনাথের মন খারাপ। মণ্ডপ খালি করে মা চলে যাবেন, এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

ভবনাথের আরেক ভয় মা দুর্গাকে আনতে গিয়ে বুড়ি মাকে হারিয়েছেন। ধর্ম কর্ম এ বংশে সয় না।

পুজোর পর পরই রাখীবন্ধন। এগাঁয়েও তার ঢেউ এসে লেগেছে। দেবনাথ পুজোর পরে গ্রামে এসেছে। সে এসেই রাখী উপলক্ষে স্বদেশী দল করেছে। ফলে খোদ ভবনাথের ভিতর বাড়িতেই 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনি।

সেই উপলক্ষে হাটখোলার সভা পর্যন্ত হয়ে গেল।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরবর্তীকালে, বাবার স্মৃতি কুয়াসাচ্ছন্ন বাবার চেহারাটা অবধি কমল মনে আনতে পারে না—কিন্তু এই দিনটা হঠাৎ কখনো কুয়াসা ভেঙে দপ করে জ্বলে ওঠে। বাবার এই কোলের মধ্যে নিবিড় করে টেনে নেওয়া দেবতার প্রত্যাদেশের মতন বাবার এই আশ্চর্য কণ্ঠধ্বনি। মৃত্যুর পরে পাবে আবার বাবাকে—তখন আচ্ছারকম ধমক দেবেন মনে হয়ঃ শুধুমাত্র মুখের বুকনি আর কাগজের কলমবাজিতে দায়িত্ব সেরে এলি রে খোকন গায়ে একটা আঁচড় দেখতে পাচ্ছনে—ছি-ছি!

কামাররা বুঝি ঘুমোয় না। ঠনঠন ঠনাঠন আওয়াজ আসে। শুনতে শুনতে কমল ঘুমিয়ে যায়। ভোররাত্রে আবার জাগে তরঙ্গিণী তখন বাইরে নিয়ে যান একবার। চারিদিকে ফরসা-ফরসা ভাব, গাছে গাছে পাখি ডেকে উঠছে দিনমান ভেবে। নুলেবাছুরদের গলা শুকিয়েছে ডাকছে গোয়ালের ভিতর। এ-বাড়ির ও-বাড়ির ছেলেপুলে কেঁদে কেঁদে উঠছে। তখনও কামারবাড়ি থেকে লোহা পেটানোর আওয়াজ।

ওরা ঘুমোয় না মা?

তরঙ্গিণী বলেন একটুখানি চোখ বুঁজে নেয় এক ফাঁকে। ঘুমুতে দিলে তো! গাছমলের মরশুম—খেজুরগাছ কেটে রস বের করবে সেজন্য দা গড়ানোর হিড়িক লেগে গেছে।

ভট্‌চাজ-বাড়ি ছাড়িয়ে সামান্য ঘুরে কামারশালা। ঘিঞ্জি বসতি—একই উঠান নিয়ে দু-তিন ঘর গৃহস্থ। এর হয়তো পশ্চিমপোতার ঘর, ওর উত্তরপোতা আর একজনের পুবের পোতা। কামারশালাগুলো পাড়ার বাইরে বাঁশবনের ছায়ায় রাস্তার এদিকে আর ওদিকে। কমল একদিন কোথায় যেন যাচ্ছিল—হাপর চালিয়ে কামারশালায় তখন পুরোদমে কাজ চলছে। দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। হিরু ছিল সঙ্গে সে হাঁকপেড়ে উঠলঃ হাঁ করে কি দেখিস? আয় চলে আয়।

দেখারই বস্তু সারাদিন ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হিরুর তাড়ায় লহমার বেশি দাঁড়াতে পারে নি।

গাছ-কাটা দা গড়ে কুল পাচ্ছে না, তার উপরে আবার ধান কাটা লেগে গেছে! কাস্তে গড়ার ফরমাসঃ সাধ্যে কুলোয় না কামারের দোষ কি। খদ্দেরের কাছে পালিয়ে বেড়ায় 'আজ দেবো' 'কাল দেবো' বলে ভাঁওতা মারে।

প্রহরখানেক রাতে ভবনাথ হাটখোলা থেকে হাট করে ফিরছেন। ধামা ঘাড়ে অটল মাহিন্দার পিছনে। মেঘা কর্মকারের সঙ্গে দেখা। তল্লাটের মানুষের হাটমাট সারা হাট ভাঙো-ভাঙো—মেঘা সেই সময় ধামা-খালুই নিয়ে চলেছে।

ভবনাথ বললেন, এখন যাচ্ছ মেঘনাদ হাটে কি আর আছে কিছু? মাছের মধ্যে ঘুসো চিংড়ি তরতারির মধ্যে শাকের ডাঁটা!

মেঘা বলল খাটনির গণ্ডায় ফুরসত করতে পারিনে বড়কর্তা। তা-ও তো লোকের গালমন্দ খেয়ে মরি।

মরসুমের মুখে এখন হয়তো কথাটা সত্য। কিন্তু কর্মকার-পাড়ার বারমেসে নিয়মই এই। বিশেষ করে মেঘার। হাট ভাঙো-ভাঙো অবস্থায় জিনিসপত্র কিছু সস্তায় মেলে। ক্ষেতেল পারতপক্ষ ফেরত নিয়ে যেতে চায় না, লোকসান করেও দিয়ে যায়। মেঘা কর্মকার সেই সস্তাগন্ডার খদ্দের।

মুখোমুখি পেয়ে গেছেন তো ভবনাথই বা ছাড়বেন কেন! সেই কবে একজোড়া কাস্তের কথা বলেছিলেন—গড়ে দেবে কি ধান কাটা কাবার হয়ে যাবার পর। বলছেন গালমন্দ লোকে এমনি-এমন করে না। আমার তো সামান্য দুটো কাস্তে—কত আর ঘোরাবি বল দিকি?

মেঘার তুড়ুক জবাবঃ সে তো কবে হয়ে আছে।

পিছন থেকে অটল বলল, হয়ে আছে—তা একটু বলে পাঠাতে পারো নি। সন্ধ্যেবেলা কাল গিয়ে নিয়ে আসব।

মেঘা বলে, কাল নয়। ধার কেটে উল্কে ঘষে দেবো—কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশু যেও

বলে আর মুহূর্তমাত্র দাঁড়ায় না হনহন করে পালকে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

অটল বলল, বেটা কিচ্ছু করে নি। ভাব দেখলেন না? ধরেই নি এখনতক। নেহাৎপক্ষে দশবার এর মধ্যে তাগিদ হয়ে গেছে।

ভবনাথ বললেন, তাগিদ দিয়ে লাভ নেই—সামনে বসে কাজ ধরিয়ে আনতে

হবে। তোকে দিয়ে হবে না নিজে আমি কাল চলে যাবো। ধোপার বাসি কামারের আসি' বলে না?—ওটা জাতের ধর্ম।

ধোপার বাড়ি বাসি কাচতে দিলে সে কাপড় কবে পাবে ঠিকঠিকানা নেই। তেমনি কামারও যদি 'আসি' বলে একবার সরে পড়তে পেরেছে, আর তার নিশানা পাবে না। ছড়াটা সেইজন্য চলিত হয়েছে। সকালে উঠে ভবনাথ কাজকর্মের বিলিব্যবস্থা করছেন। শিশুবর সাগরদত্তকাটি পাঁচু সর্দারের বাড়ি চলে যাবে—নিজেদের ধানই কাটছে তারা বর্গাজমি বলে নাজির বন্দে আজও কাস্তে ছোঁয়াল না। ঠিকরিকলাই পেকে গেছে তেলিরভুয়ে গিয়ে অটল কলাই তুলতে বসে যাক। আর তিনি নিজে চললেন কামারবাড়ি—

কামারবাড়ির নাম কানে যেতে কমল বায়না ধরল আমি যাবো জেঠামশায়—আমি যাবো—

তুই যাবি কেন রে?

ঠনঠন ঠনাঠন লোহা পেটনো তখনই শুরু হয়ে গেছে। নাচন দিল কমল কয়েকবার : যাবো—

অন্যেরা ভবনাথের বড় একটা কাছ ঘেঁষে না—সবাইতে একটু বলেই খিচুনি দিয়ে ওঠেন। সে বড় বিষম জিনিস, হাতে মারা তার চেয়ে অনেক ভালো। সেই মানুষ কমলের বাবদে একেবারে ভোলা-মহেশ্বর। 'হবে না' 'হবে না' করে এই ছেলে কনিষ্ঠ দেবনাথের একমাত্র বংশধর—আদর দিয়ে দিয়ে তাই তিনি মাথায় তুলেছেন লোকে বলে। শিশুর বেশি জোরজুলুম জেঠামশায়ের কাছে। 'যাবো'—করতে করতে চোখ বড় বড় করে দীর্ঘ টানা সুরে সে বলে উঠল আমি যাবো-ও-ও—

হুঁ বলে ভবনাথ চাদরটা কাঁধে তুলে নিলেন।

চলল তবে তো। পুঁটির ভাল লাগে না বাগড়া দিয়ে এসে পড়ে : তোর পাঠশালা আছে না কমল?

কমল বলে, সোমবার তো। মাস্টারমশায় দেরি করে আসবেন।

ভবনাথ নিজেই অমনি সমাধান করে দিলেন : আসবার সময় মানুকে আমি নতুনবাড়ি বসিয়ে দিয়ে আসব। পুঁটি তুই পাতা-দোয়াত বইপত্তর পৌঁছে দিয়ে আয়।

যাচ্ছেন ভবনাথ কমল তাঁর আগে আগে। পুঁটির পানে হাসিমুখে তাকিয়ে পড়ল সে যেন—পুঁটির অন্তত মনে হল তাই। ছোটভাই হয়ে দিদিকে দেমাক দেখাচ্ছে। গজর গজর করে : উনি চললেন কামারবাড়ি। আমায় পাঠশালায় বই-খাতা বয়ে নিতে হবে। বলছে খুব মনে মনে— জেঠামশায়ের কথার উপরে কথা শক্ত করে বলা যায় না।

কামারশালা চারটে—পথের এধারে ওধারে সামান্য দূরে দূরে। প্রথমেই মেঘা কর্মকার। দোচালা ঘর মানুষে মানুষে ছয়লাপ। খদ্দেররাই বেশি, বাজে লোকও জমেছে কিছু। ছাঁচতলার বাখারির বেড়ি বানানো সারবন্দি সেখানে বসেছে। আবার চালের নিচে ঘরের মধ্যে বসেছে—কেউ চাটকোলে কেউ বা তক্তার টুকরো-টাকরা টেনে নিয়ে। দাঁড়িয়েও আছে কতক কতক।

ভবনাথ গিয়ে বললেন কই দেখি আমার কাস্তে। ধার-কাটা শুধু মাত্তোর বাকি। বের করো, দেখব।

ঘাড় তুলে দেখে মেঘা তটস্থ হল।

আসেন বড়কর্তা বসেন—মুরুব্বি লোকদের জন্য জলচৌকি আছে একটা। কারা বসেছিল ভবনাথকে দেখে শশব্যস্তে উঠে হাত দিয়ে চৌকিটা ঝেড়ে দিল। ভবনাথ বসলেন।

পাশের জায়গা দেখিয়ে কমলকে মেঘা বলে, বোসো খোকা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বসবে কি—কমলের চোখের মণি তো ঠিকরে বেরুনোর গতিক। কী কাণ্ড রে বাবা!

হিরণ্ময়ের সঙ্গে যেতে যেতে রাস্তা থেকে সেই ঝলক মাত্র দেখেছিল আজ সামনের উপর একেবারে হাত পাঁচ-সাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে। দু-চোখ ভরে দেখছে। হাপরের দড়ি মেঘা পা দিয়ে টানছে ফোঁস-ফোঁস করছে হাপর কেউটে সাপের মতন, কাঠকয়লার আগুন টানে টানে দপদপ করে উঠছে। লোহা সেই আগুনে—জ্বলেপুড়ে লোহা রক্তবরণ ধরেছে। সাঁড়াশি দিয়ে সেই লোহা নেহাই-এর উপর নিয়ে মেঘা কর্মকার হাতুড়ি ঠুকছে। সেটা ছোট হাতুড়ি। আর দশাসই এক মর্দ—মেটে মেটে রং, হাপরের আগুন ও লোহার লাল আড়া গায়ের উপর ঠিকরে পরে দৈত্যের মতন দেখাচ্ছে তাকে—দাঁড়িয়ে পড়ে সেই লোক দু-হাতে প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা মারছে—লোহার উপর। মেঘা কর্মকার প্রয়োজন মতো এদিক সেদিক ঘোরাচ্ছে গনগনে গরম লোহা। নিজে ঠুকঠুক করে মারছে, আর বড় হাতুড়ি ঠনঠন ঠনাঠন অবিরত এসে পড়ছে। দা কি কাস্তে কি কুড়ুল—পিণ্ড লোহায় দেখতে দেখতে জিনিসের আদল এসে যায়। নেহাই-এর পাশটিতে মেজেয় নাদা পোঁতা নাদার মধ্যে জল। খেজুর-বাগড়ের গোড়ার দিকটা পিটিয়ে ফেস্টো-ফেস্টো করে জলে ডোবানো—সেই বস্তু মেঘা ঘন ঘন তুলে জল ছিটিয়ে নেয় গরম লোহার উপর। আবার হাপরের আগুনে দেয় আবার পেটায়। জোড়া হাতুড়ির ঘায়ে ফুলকি ছিটকে পড়ছে চারদিকে তারাবাজির মতো। শঙ্কিত কমল তিড়িং করে লাফ দিয়ে সরে যায়।

মেঘা হেসে বলল পালাও কেন খোকা? তোমা অবধি যাবে না। আর গেলেই বা কি—ওতে পোড়ে না পড়তে না পড়তে নিভে যায়।

হাপরে কাঠকয়লার আগুন—কলকে এগিয়ে ধরলে মেঘা সাঁড়াশি দিয়ে তার উপর আগুন তুলে দিচ্ছে। হাতে হাতে কলকে চলে। আর নানান গল্পগাছা—পাঁচ-খানা গাঁয়ের সুখ-দুঃখ অনাচার-অবিচার রং-তামাসা ফষ্টিনষ্টি শোন এই কামার-দোকানগুলোয় বসে।

একখানা গাছকাটা-দা গড়ানোর দরকারে কুঞ্জ ঢালি অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। কমলকে পেলেই ঠাট্টা-বটকেরা করে সে, আবার খেতেও দেয় রস-পাটালি ফলপাকড়—চাষার বাড়িতে যখনকার যে জিনিস। কমলকে সে শুধায় : এত সমস্ত, সরঞ্জাম দেখছি—বলোদিকিন খোকা কোন জিনিস বিনে কামারের দোকান একেবারে কানা? তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ ভাল করে দেখে তারপর জবাব দাও।

আরও বিশদ করে বুঝিয়ে বলে মেঘা কর্মকার আমায় আজ চার মাস ঘোরাচ্ছে। রেগেমেগে ধরো আজ মতলব করে এসেছি, দোকানের এমন এক জিনিস নিয়ে দৌড় দেবো যাতে তার কাজকর্ম বন্ধ হবে, কর্মকার বেকায়দায় পড়ে যাবে। কোন সে জিনিস?

ছোট্ট মানুষ কমলকে উদ্দেশ করে বলা সবগুলো চোখ তাকিয়ে পড়ে জবাব খুঁজছে। কিন্তু জবাব চায় নি কুঞ্জ ঢালি—গল্প ফাঁদছে তারই ওটা ভূমিকা। কামার বায়না নিয়ে বসে আছে—জিনিস গড়ে দেয় না, বায়নার টাকাও ফেরত দেয় না। মানুষটা বুদ্ধিতে কিছু খাটো—কর্মকারকে জব্দ করবে মতলব নিয়ে আজ কামারশালে এসে বসেছে। দু-পাঁচটা ঘা মেরেই হাতুড়ি রেখে খেজুর-ডাঁটা দিয়ে জল ছিটায় বিস্তর ক্ষণ থেকে ঠাহর করছে সে। কামারের কাজে খেজুর ডাঁটাই অতএব

'একাল'-এর দুটি সর্বাধুনিক গল্পগ্রন্থ :

কৃষ্ণ মণ্ডল

ভাঙনের ডিঙা কিংবা হরিণের চোখ

দাম ৫-০০ টাকা

নকুল মৈত্র

মানুষ সম্পর্কিত আমি

দাম ৪-০০ টাকা

প্রকাশ : একাল ॥ ২৪, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা ৭০০০৩৭

সবচেয়ে দরকারী—তড়াক করে উঠে সেই খেজুর-ডাঁটা তুলে নিয়ে একলম্ফে পথের উপর পড়েই দৌড়।

কী করো কী করো—হাসি চেপে কর্মকার চেঁচাচ্ছে। মানুষটা বলে আমার বাড়ি এসে বায়নার টাকা কড়ায়-গন্ডায় শোধ দিয়ে দিলে তবে জিনিস ফেরত পাবে। ছুটে বেরিয়ে গেল সে, কর্মকার তো হেসেই কুলে পায় না। খেজুর-ডাঁটার অভাব কি—চাঁচ দেবার পর গাদা গাদা তলায় পড়ে থাকে—একটা কুড়িয়ে আনল তখনই।

কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় রোগা মানুষটি, বগলে পুঁটলি গায়ে ফতুয়া হাঁটু অবধি কাপড় তোলা, বিল পাড়ি দিয়ে কামারদের সর্ষেখেতে এসে উঠলেন। পরক্ষণে অদৃশ্য—হাত-পা ধুতে ডেবার ঘাটে নেমেছেন। ফটিক মোড়ল এক নজরে চিনেছে বলে গুরুঠাকুর মশাই—

ভবনাথ বললেন, বিল শুকিয়ে উঠল পায়ের ধুলো এইবার হরহামেশা পড়বে।

হরসেবক ভট্টাচার্য নিবাস পাড়ালা-ঘুঘুদহ—সোনাখাড়ির সাত-আট ক্রোশ দূরবর্তী, বড় বড় কয়েকটা বিল মাঝে পড়ে। সেজন্য বর্ষা পড়লে গুরুঠাকুরের যাতায়াত বন্ধ, বুড়ো মানুষ জলকাদা বেশি ভাঙতে পারেন না। এখন এই আরম্ভ হল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ অবধি চলতে থাকবে।

(ক্রমশঃ)

সুপার সার্ফ সবচেয়ে সাদা ক'রে ধোয়...

সবচেয়ে সাদা!

সুপার সার্ফের রয়েছে বেশি পরিষ্কার করার ক্ষমতা। এমনকি লুকোনো ময়লাও বের করে দিয়ে আপনার কাপড়কে এমনই ধবধবে সাদা করে তোলে যা দেখে অপরের মনে হিংসের উদ্রেক হয়। স্বাভাবিক কারণেই ভারতের সবচেয়ে সেরা ব্র্যাণ্ড: সুপার সার্ফ!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

...HOT. 160 143 BG (R)

গোয়েন্দা ধাঁধা

ফাঁকে পড়ল ফাঁকিবাজ ।। অ্যালবার্ট ক্যামপিয়ন ।। মার্গারি অ্যালিংহ্যাম

কে বলেছে চেয়ারে বসে গোয়েন্দাগিরি হয় না? ঘরে বসে স্রেফ নকসা দেখেও খুনী ধরা যায়। অ্যালবার্ট ক্যামপিয়ন সব পারেন।

ভদ্রলোক চশমাধারী। লিকপিকে ঠ্যাং। ঘরকুনো। কিন্তু মাথাটি সাফ। আপদে-বিপদে তাই ইন্সপেকটর ওটস আসেন শলাপরামর্শ করতে।

সেদিন এলেন একটা ভারী সোজা কিন্তু ভারী কঠিন খুনের হেঁয়ালী নিয়ে। খবরের কাগজেও বেরিয়েছে খবরটা।

আগের রাতে খাস লন্ডন শহরেও গরম পড়েছিল। গুমোট গরম। জলের মাছ ডাঙায় উঠলে যেমন খাবি খায়, ঠাণ্ডার দেশের মানুষরা গরম পড়লে তেমনি হাঁসফাঁস করে। সাহেব মেমরা মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

তাই রাত একটার সময়ে লোকটাকে টলে পড়ে যেতে দেখে অবাক হল না বীটের কনস্টেবল। হেলতে দুলতে কাছে এসে আঁৎকে উঠল কাঁধের ফুটো দেখে। পাকা হাত বটে। নীল ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঢুকেছে বুলেট, ফুসফুস ফুটো করেছে হার্ট ফুটো করেছে তারপর আটকে গেছে বুকের খাঁচায়।

গুলির আওয়াজ শোনা যায় নি।

তার মনে হয় সাইলেন্সার ছিল বন্দুকে না হয় খুব দূর থেকে গুলি করা হয়েছে।

কিন্তু কতদূরে থেকে? কোনখান থেকে? ধাঁধা তো সেখানেই। গজগজ করতে লাগলেন ইন্সপেক্টর ওটস্। একটা নকসাও এঁকে ফেললেন। নকসাটা এই :

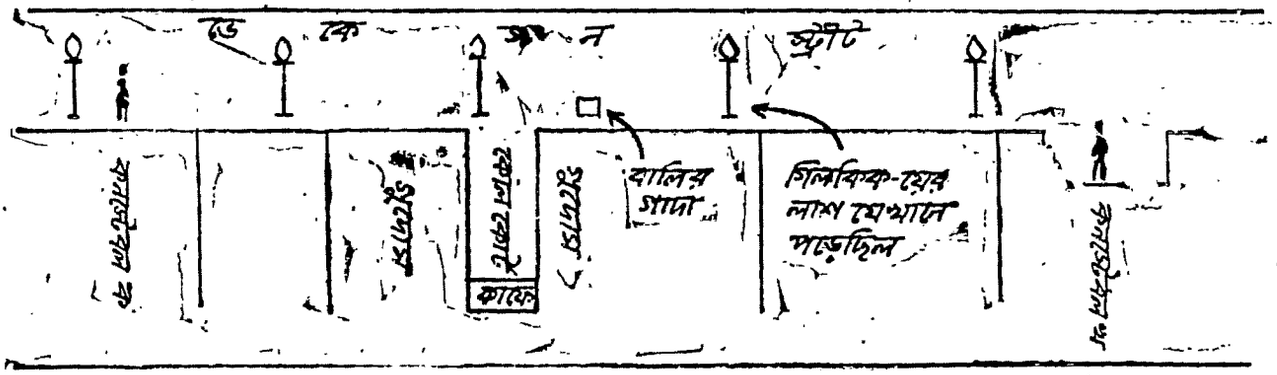

বললেন— 'খুন হয়েছে জনি গিলকিক। জোসেফাইন বলে একটা ছুঁড়িকে নিয়ে অনেকদিন থেকেই তার মনকষাকষি ছিল ডোনোভানয়ের সঙ্গে। ডোনোভান দারুণ বন্দুকবাজ। টিপ কখনো ফসকায় না। পাঁয়ত্রিশ বছর বয়স। তার মধ্যে দশ বছর জেলে ছিল। লোকটা গভীর জলের মাছ। খুনী জালিয়াৎ নিয়ে কারবার করে।'

তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন ক্যামপিয়ন সাহেব।

ওটস্ বললে— 'ওর চোরাই মালের কারবারের গোপন ঘাঁটি হল কোল কোর্টয়ের এই কাফে। যদিও কফি পানের জায়গা ভাল আড্ডাখানাও বটে। চোরবাটপার খুনে গুন্ডারাও থাকে সে আড্ডায়।

দাগাবাজ ডোনোভান ওদের মাথা বললেও চলে। জোসেফাইন মেয়েটাকে অষ্ট-প্রহর বসিয়ে রাখি কাউন্টারে—রাস্তার খদ্দেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ভেতরে টেনে আনার জন্যে। এহেন জোসেফাইনের সঙ্গে সত্যি সত্যিই পটে গেল গিলকিক। রেগে টং হল ডোনোভান। শাসিয়ে দিল সবার সামনেই, ফের যদি জোসেফাইনের ধারে কাছে দেখা যায় তো টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।

তাসত্ত্বেও 'কাল রাতে বিরহী গিলকিক এসেছিল প্রেয়সীর কাছে। মরণকালেই লোকের বুদ্ধিনাশ ঘটে। জোসেফাইন ভরেগয়ে হাঁকিয়ে দিয়েছিল গিলকিক-কে কিন্তু ডোনোভানের গুলি কখনো ফসকায় না।

'অথচ জোসেফাইন নিজে থেকেই দৌড়তে দৌড়তে থানায় এসে বলে গেল, ডোনোভান নাকি কাফে থেকে একদম বেরোয় নি। ওর গায়ে পড়ে সাফাই গাওয়া মোটেই ভাল চোখে দেখিনি আমি। কিন্তু আরো প্রমাণ পেলাম দুজন সাংবাদিকের কথা শুনে। জানেন তো ও অঞ্চলে দুটো খবরের কাগজের অফিস আছে। সারারাত কফি সাপ্লাই যায় সেখানে। রিপোর্টাররাও আড্ডা মারে ফাঁক পেলেই। ডোনোভান যে কাফের বাইরে পা দেয় নি— তারাই হলফ করে বললে।

'খুনটা তাহলে হল কি করে? কোলকোর্ট একটা গলির মধ্যে। দুপাশে দুটো গুদোমের কংক্রিট দেওয়াল— একটা ফুটোও নেই।

'নকসা দেখুন। গিলকিক-য়ের লাশ পাওয়া গেছে বালির গাদার সামনে চৌকো চিহ্ন দেওয়া জায়গায়।

'ভেকেসন স্ট্রীটের রাস্তার দুপাশে দুজন কনস্টেবল মোতায়েন ছিল। কোল-কোর্ট-য়ের ডানদিকের গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত দুজনের এখতিয়ার।

দুজনের কেউই গুলির আওয়াজ শোনে নি— বন্দুকবাজকেও দেখেনি। কনস্টে-বলকে স্বচক্ষে দেখেছে গিলকি-কে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে। কনস্টেবল খ সেই সময়ে গুদোম টহল দিতে ভেতরে ঢুকেছিল।

'কনস্টেবল ক তাকে ডেকে আনে। অ্যামবুলেন্স ডাকে।

ডাক্তার বলছেন, যে-ভাবে গুলি লেগেছে তাতে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে গিলকিক। ঐ গুলি খেয়ে তিন পায়ের বেশী হাঁটা সম্ভব নয়। তথাৎ, ডোনোভান রাস্তায় বেরিয়ে এসে গুলি করে ফের ঢুকে গেছিল গলিতে এবং কাফের ভেতরে।

'অথচ কেউ তাকে বেরোতে দেখেনি।

মিস্টার ক্যামপিয়ন, বলুন দিকি এ কি রহস্য? ডোনোভান ছাড়া আর কেউ খুন করেনি—কিন্তু করল কেমন করে?"

অ্যালবার্ট ক্যামপিয়ন এতক্ষণে নড়ে উঠলেন চেয়ারে। বললেন—'গিলকিক গুলি খেয়েছে চার দেওয়ালের মধ্যে। তার মধ্যে দুটো দেওয়াল হচ্ছে নিরেট কংক্রিটের— বাকী দুটো দেওয়াল হচ্ছে রক্তমাংসের— কনস্টেবল ক আর খ।

'ওটস্, রক্তমাংসের দেওয়াল কি নির্ভরযোগ্য?'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন ওটস্।

বিড়বিড় করে শুধু বললেন— 'ও মাই গড!' পরক্ষণেই বাঁই বাঁই করে ছুটলেন থানায়।

খবর এল যথাসময়ে। কনস্টেবল ক ছুটিতে গেছে আজ সকালেই। লাশটা পাচার করেছিল সে-ই—পাছে ছুটি নষ্ট হয়, এই ভয়ে।

কিছু বুঝলেন? লাশটা কোথায় পাচার হয়েছিল?

—অদ্রীশ বর্ধন

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৫১ পৃষ্ঠায়

টুসু গানে সমাজমন ও প্রেমচেতনা

শান্তি সিংহ

।। এক ।।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সিঁড়িভাঙ্গা অনুর্বর মাঠ বুকে হিমেল বাতাস আর শিশিরের ছোঁয়া মেখে যখন ধান শিষের আনম্র গোছায় কাঁচা হলুদ রংয়ের উজ্জ্বল শোভা ফুটে ওঠে, তখনই ঐ অঞ্চলের সাধারণ নরনারীর মুখে গুণগুনিয়ে ওঠে টুসু গান। ডঃ সুকুমার সেন পুষ্যা বা তিষ্যা নক্ষত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও তিষ্যা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত এ গানকে শস্যোৎসবের গান বলেছেন। এই টুসু বা তুসু গানের ধারা মেদিনীপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া জামশেদপুর, ঘাটশিলা প্রভৃতি বিস্তৃত পশ্চিম সীমান্তে বহুদিন ধরে প্রাকৃত মানুষের মুখে বয়ে আসছে।

টুসু মূলতঃ মেয়েদেরই পরব। কুমারী থেকে বয়স্কা অবধি মেয়েরা অঘ্রাণ সংক্রান্তির দিন ইতুর ভাসান-জল নিয়ে টুসুর স্থাপনা করে। টুসু হচ্ছেন লক্ষ্মী-দেবীর প্রতীক। তাই লাল রংয়ের নতুন মাটির সরার গর্ভটিকে আলোচাল তুষ কড়ি দুর্বা, বেশ কিছুসংখ্যক ছোট্ট গোবরগুলি (ছবুড়ি ছ গন্ডা মানে একশো চুয়াল্লিশটিই বিধি) এবং সর্ষে মূলো ও গাঁদা ফুল দিয়ে সাজানো হয়। ছোট ছোট মাটির প্রদীপ নাতিবৃহৎ সরার কানার চারদিকে সুন্দরভাবে বসানো থাকে। বাড়ীর কুলুঙ্গীতে আলপনা দিয়ে টুসু পেতে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করে মেয়েরা কলস্বরে গেয়ে ওঠে—"টুসালু গো রাই। তোমার দৌলতে আমরা ছবুড়ি (ছবুড়ি) পিঠা খাই। ছবুড়ি লো লবুড়ি। গাং সিনানে যাই। গাংয়ের জলে রাঁধি বাড়ি। মকরের জল খাই। চার মাস বর্ষা। পৌখিরনা না যাই।"

শুধুমাত্র মাটির প্রদীপ বসানো লাল সরাতেই যে টুসু পূজো হয়—তা নয়। ঘাটশিলা জামশেদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মাটির পুতুল করে পূজো হয়। এই অনতিদীর্ঘ টুসু মূর্তির রং হলুদ। বাহন মকর বা পদ্মফুল অথবা ময়ূর। দেবীর অলংকার, হার, কর্ণফুল, চুড়ি তাবিজ। পরণে মাটির শাড়ী। দেবীর বাঁ হাতে থাকে ধানের শিষ অথবা ফুল কিংবা পাখি।

অঘ্রাণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি অবধি প্রতি সন্ধ্যায় লম্ফ বা হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোর সামনে বসে গ্রাম্য কুমারী মেয়েদের ভিড়ে বর্ষীয়সীরা জড়ো হয়ে টুসু গান গায়। দেহাতী মেয়েরা হাটেবাটে দল বেঁধে চলতে চলতে যুথবদ্ধমনের আবেগে গেয়ে ওঠে টুসু গান। অনেক সময় খেত মজুর চাষী অথবা রিকসাচালক মাঠে বা পথে দিনদুপুরে বা রাড়ি-ফিরতি রাত্তির বেলায় জোর গলায় মনের আবেগে গায় টুসু গান। সারাটা পৌষ মাসে রুক্ষ টাঁড়-বাদের দেশে শাল-মহুয়া-অর্জুন-পলাসের তলায় তলায় এই টুসু গানের সুর মনে এক বিশেষ আবেশ জাগায়।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন হল 'বাউড়ী'। ঐদিন সন্ধ্যায় গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরে পৌষ পিঠে আর খেজুর গুড়ের সঘ্রাণের সঙ্গে মেশে টুসু গান। শীতার্ত সন্ধ্যা যতই গভীর হয়— টুসু গানের সোচ্চার কলগীতি মেয়েদের মনে ততই যেন উষ্ণ মদির বিহ্বলভাব জাগিয়ে তোলে। সারা রাত চলে জাগরণ। "টুসু পূজার দিনে যত দেবী সন্ধ্যা লাও তুষ্ট মনে। শুভ্রকান্তি সরস্বতী গো প্রণমি মা চরণে। পদ্মাবতী সীতাদেবী বন্দি গো মনে মনে" দিয়ে শুরু হলেও এই ধর্ম-প্রাণতা ঐহিকসুখ বর্জিত নয়। তাই মেয়েদের মুখে সোনা যায়—"টুসালু মায়ের কাছে চেয়ে লিব বর। ধনেপুত্রে ভরুক আমার ঘর।"

আহ্বান গীতির পর টুসু গানে পর্যায় ক্রমে নারী জীবনের কামনা বাসনা, সুখ-দুঃখ হতাশার জীবন রাগে সংরক্ত সুর ফুটে ওঠে। চলমান সমাজ জীবনের কথাও বাদ যায় না। রাত্রি জাগরণের পর সংক্রান্তির সকালে মেয়েরা দল বেঁধে ক্লান্ত গলায় গান গাইতে গাইতে নিকটবর্তী নদী বা জলাশয়ে গিয়ে টুসু বিসর্জন দেয়। বিসর্জনের সময় অনেকে টুসু সরাকে চৌদলে অর্থাৎ ছোট্ট রথাকৃতি বাঁশের ফ্রেমে রঙিন কাগজে সাজিয়ে নিয়ে যায়। এই 'চৌদল' সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে বানানো বা কেনা হয়। ইচাগড়ের সুবর্ণ-রেখা তীরে সতীঘাটায় এবং পুরুলিয়ার কাঁসাই ব্রিজের তলায় টুসু ভাসানের সকালে অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তি সকালে অসংখ্য নরনারীর সমাগম হয়ে থাকে। এই বিরাট মেলার অন্তরশায়ী করুণ রাগিণী সহজেই অনুভব করা যায়। জনৈক লোকসংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ একে 'পৌষালি বিজয়া' বলে অভিহিত করে তাঁর রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

।। দুই ।।

লৌকিক দেবী টুসুর আভিজাত্য আনয়নকল্পে রচিত হয় সংস্কৃত মন্ত্র ঃ "গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ নানালংকারশোভিতাং। সর্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নত পয়োধরাং। দিব্যবস্ত্রপরিধানাং শঙ্খপদ্মধরাং শুভাং প্রসন্নবদনাং দেবীং ধ্যায়েৎ তুষলাং সর্ব-সিদ্ধিদাং।" টুসুকে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে এক করে দেখে নরনারীর মধ্যে এক সম্ভ্রম-ভাব জেগে ওঠে। কিন্তু ধর্মীয় বাতাবরণ ছাড়িয়ে টুসু গানে সমাজমন গভীরভাবে ক্রিয়াশীল।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পৌষ সংক্রান্তি বড় পরব। এ সময় প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই আসেন লক্ষ্মী অর্থাৎ ধান। সকলের ভাগ্যেই দুবেলা পেটপুরে অন্ন জোটে। নতুন চাল থেকে তৈরী হয় পিঠে। সকলেই সাধ্যমতন কেনে জামা কাপড়। এহেন পরবে যদি কোন মেয়ে শ্বশুরঘর থেকে বাপের ঘরে না আসতে পারে তাহলে সে মনের দুঃখে গেয়ে ওঠে—"এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে। পরের মা কি বেদন জানে অন্তর ঝুরে মরে।" রবীন্দ্রনাথের 'বধূ'

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে ঃ

নির্মল আচার্যের সুবৃহৎ উপন্যাস

তৃতীয় মেরু (দ্বিতীয় সং) দাম—সতেরো টাকা

বাণীপ্রসাদ মিশ্রের— (উপন্যাস) **চলার পথে** দাম—বারো টাকা

নির্মল আচার্যের— (উপন্যাস)

গাড়োয়ান পাড়া রোড দাম—চৌদ্দ টাকা

রাস্তা (ছোট গল্প) দাম—পাঁচ টাকা

রক্তস্বাক্ষর পাবলিকেশন

২বি ধীরেন ধর সরণী কলিকাতা ৭০০০১২, ফোন ঃ ২৪-৯৬৭৭

প্রাপ্তিস্থান—দেব স্টোর, কথা ও কাহিনী ও নথ ব্রাদার্স

কবিতার আর্তি গ্রাম্য চিত্রকল্পে কত সহজে ফুটে ওঠে "আমার মন কাঁদে শ্বশুরঘরে। যেন পোস্ত কাঁদে গোল আলুর তরে।"

রূপকথা থেকে শুরু করে সতীনের কোঁদল ইতিহাসের পাতায় বা গল্পে গাঁথায় আমরা পড়েছি। সেই সতীনের জ্বালা প্রাকৃত নারীর মনে করুপ ঈর্ষার আগুন জ্বালায় তার কথাও পাই টুসু গানে—'এক গাড় কাঠ দু গাড়ি কাঠ, কাঠে আগুন লাগাব। যখন আগুন হুদহুদাবে সতীনকে ঠেলে দিব। সতীন আমার জনমের বাদী।'

আদর্শ গিন্নীপনা শেখানোর নামে নতুন বৌয়ের ওপর শাশুড়ীর যে অত্যাচার —যার ফলে স্বামীসুখের সব আকর্ষণ মুছে গিয়ে নববধূর মনে ভীতি সঞ্চার হয় তার প্রমাণও টুসু গানে আছে—'ই চালে পুই উ চালে পুই পুইয়ের আব খিচুড়ি। আর যাব না শ্বশুরবাড়ি ধরে মারে শাশুড়ি।'

এদেশে কন্যাদায় এক দারুণ সমস্যার ব্যাপার। পণ বা যৌতুকের মোটা অঙ্ক মেটাতে গিয়ে অধিকাংশ বাবা-মা আজো চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠেন। টুসু গানেও দেখি —'বিটি বিকা হল্য বিষম দায়। বর যে ঘড়ি সাইকেল চয়। বিটি বিকা হল্য বিষম দায়...।'

কলহপরায়ণতা মেয়েদের একটি বিশেষ স্বভাব। সেই স্বভাবও চরিতার্থ হয় টুসু গানে। এক পাড়ার টুসু পূজারিনীরা কোঁদল করে অন্য পাড়ার টুসু পূজারিনীদের ব্যঙ্গ করে বলে—"হামাদের। টুসু মুড়ি ভাজে দালান-কঠার ভিতরে। উয়াদের টুসু হ্যাংলা মাগী আঁচল পাতে মাগে লো।"

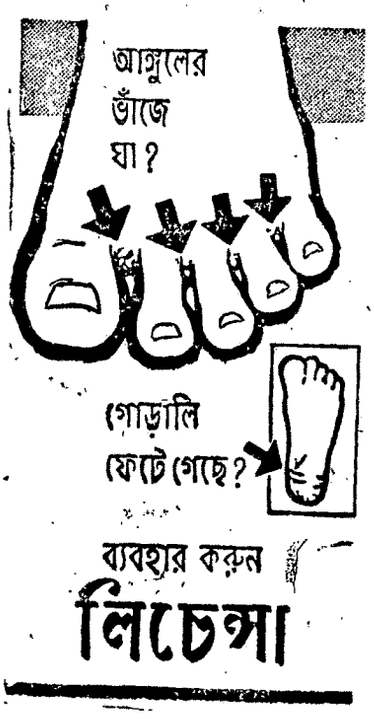

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে বলে সাধারণ মানুষ কিভাবে বর্গীর খাজনা দেবে তা নিয়ে এককালে অনেক ভেবেছে। খাজনা বা করের করালস্পর্শ এ দেশের ঘেটে খাওয়া মানুষদের ফিবছর টুঁটি চেপে ধরে। খরা-অজন্মার কারণেও বিশেষ রেহাই নেই। তাই টুসু গানে শুনি—"প্যাট চলে না ট্যাকসের হড়বাড়ি। বলগো তোরা কি করি।"

পাহাড়ের দেশে পাথর ও বন কেটে যখন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠল তখন এ দেশের সরল মানুষ অবাক হয়ে অলৌকিক শক্তির কথা ভাবল এবং লৌকিক টুসু গানে তা মূর্ত হল—'মায়াবিনী কৃপাময়ী গো। মায়ার তোমার জননী। রন কেটে নগর বসাল্য। টাটা আইরণ কোম্পানী।"

লোক সংস্কৃত বিষেজ্ঞ শ্রীঅজিত মিত্র বলেছেন "বাঙ্গালীর জীবনচর্যাকে যে দিন বিহার সরকারের আগ্রাসী প্রাদেশিকতা নির্মমভাবে আঘাত হানতে চাইল সেদিন মানভূম-কেশরী অতুল ঘোষের নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক টুসু আন্দোলন হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি হলো পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তি।" সেদিন বাংলা ভাষাভাষীরা স্পষ্ট ভাষায় টুসু গানে তাঁদের বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছেন—"শুন বিহারী ভাই। তোরা রাখতে লারবি ডাঙ্গ দেখাই। তোর আপন তরে ভেদ বাড়ালি। বাংলা ভাষায় দিলি ছাই। ভাইকে ভুলে করলি বড়। বাংলা বিহার বুদ্ধিটাই।"

টুসুগানে সীমান্ত বাংলার সমাজমন যতটা স্ফূর্তিলাভ করেছে অতটা আর কোন গানেই হয়নি। সাম্প্রতিক কালের অন্ধ রাজনীতির মারপ্যাঁচে দেশবাসী যে দিশেহারা তার কথাও গ্রামকবি বিপিন-বিহারী টুসু গানে কতো মর্মস্পর্শী ভাষায় এঁকেছেন—'দেশটা ডুবে গেল রসাতল। আমি দোষ দিব তাই কারে বল ?। বুদ্ধি-মানে করে চুরি বোকা ফেলে অশ্রুজল দাগাবাজি জুয়াচুরি ঘুষখোরি চলে কেবল। রাজনীতির নাই নীতির বালাই চলে শুধু রং বদল।"

।। তিন ।।

টুসু গানে শাল পলাশ মহুয়া অর্জুন কুসুম ঘেরা পাহাড়িয়া দেশের নারীমন নিজেদের গভীরগোপন প্রেমচেতনাকে সুরে রূপ দিয়েছে। সেই প্রেমচেতনায় কখনো নীলাভ শৈলশ্রেণীর সুষমা কখনো খোয়াই লালমাটির উষ্ণ রক্তিমাভা। ভালোবাসার পাত্র দেশান্তরী হলে প্রেমিকার ভালোবাসাও দেশান্তরী হয়। তাই তো শুনি—"ও ভাল-বাসা। তুমি চলে গেলে চাঁইবাসা।' কখনো সহজিয়া চণ্ডীদাসের মত গোপন পিরীতি গোপন রাখার কথাও শোনা যায় টুসুগানে —"ভালবাসা রাখব গোপনে। কাপড় কাচ্যে দিব সাবনে।"

প্রেমাস্পদের অভাবে প্রেমিকার অন্তরে গভীর আকুতিভরা হৃদয়ার্তি যে উদাস ব্যাকুল সুর জাগায় তা গ্রামীণ চিত্রকল্পে সুন্দরভাবে টুসু গানে ধরা পড়েছে "মনে আমার মন কেমন ... যেন শোল মাছে উফাল মারে।" গভীর জলাশয়ে শোল মাছের উল্লম্ফনে যে তীব্র জলাবর্ত জাগে তার উপ-মায় অন্তরবেদনাকে ফুটিয়ে তোলা কম কথা নয়।

টুসুগান প্রধানতঃ কুমারী মেয়েদেরই গান। বয়ঃসন্ধির আলো অন্ধকার জগতের রহস্যময় হাতছানি, হৃদয়ের আবেগমধুর সুর তাই সহজেই ধর্মভীরু সরলা নায়িকার স্বীকারোক্তিতে শোনা যায়—"পরথম পিরিতি কালে বাপের কিরা খাওয়ালে। মিষ্টিছাপে মধু খাঁয়ে অন্তরে জ্বালা দিলে।" বুনো কাড়ার মত সুঠাম বলিষ্ঠ দেহভঙ্গী দেখে রূপমুগ্ধা কিশোরী নায়িকা অতলজলের আহ্বানে সাড়া দেয়—"কাল দেখে নামলম জলে। জল হৈল মোর এক গলা। কে আছ হে গুণের বন্ধু তুলে ধর এই বেলা।"

সাজ পোষাকের দিকে মেয়েদের আজন্ম আকর্ষণ। পোষাকআশাক আর সুখী-জীবনের লোভে প্রেমমুগ্ধা নায়িকা নায়কের জীবনসঙ্গিনী হয় কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনে গরীব স্বামীকে ব্যঙ্গ করতেও সে কসুর করে না—'কত চাটিচুট দিয়ে পিরিত করা শিখাল। ল্যাডিস চাদর দিব বলে ছিঁড়া কাঁথা উড়াল।" অথবা 'গুগ্রের বধূ ঘরে ঘুমাল্য। আমার জাড়ে শীতে প্রাণ গেল।"

কালো কুৎসিত লোকের সুন্দরী বৌ হওয়ার আনন্দ প্রেমানুভবের কাব্যিক উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে—'টাংখিটা খিটি। যেন আঁধার ঘরের জুনপুকিটি।"

আদিগন্ত খোয়াইয়ের দেশে গ্রাম্য প্রেমিকপ্রবর নায়িকার হঠাৎ দেখা পিয়ে দূর থেকে মনের উষ্ণ আবেগ মেশানো গানের কলি ছুঁড়ে দেয়—'খোঁপায় দিব চাঁপা ফুল গুঁজে। অ তুই আসবি লো রীঝে রীঝে।" অথবা "কাজলি কালো চোখের তারাতে। কত নীল সাগরের ঢেউ আছে। সুচারু ঐ সরুসরু বাঁকা ভুরু দুটিতে। মনটাকে টান দিছে যেন লোহা টানা চুম্বকে। রাঙ্গা জবার মতন দুটি অধর তোর চুম্বতে। আছে লো বিপিনের আশা ভালবাসায় বাঁধিতে।" প্রগলভা নায়িকার চপল উক্তিতে তির্যক ভালোবাসার কথা ফুটে ওঠে—"শিশুকালে পিরিত শিখালি। মিঠা মিঠা মধু চাখালি। জালি যখন ছিল কদম তুই তোরে হাত বাঁচালি। ছলকপটে মধু লুটে কচি কদম পাকালি। ঢং করে তুই রংরে প্রেমের চোখে মুখে মাখালি।"

টুসুগান সম্পর্কে ডঃ সুধীরকুমার করণ চমৎকার মন্তব্য করেছেন—যা সত্যই প্রণিধানযোগ্য ঃ 'ঝর্ণার মতো চঞ্চল আর অনাবৃত এর গতি। এর ভাষায় পাহাড় বনের আদিমতা পলাশ ফুলের মাধুর্য এর প্রকাশে, শালবনের ঘন জমাট নিবিড়ভাব এর কথায়। আর আছে পাথরের কুচির মতো লাল রংয়ের কাঁকরের মতো প্রকাশভঙ্গী— যা আঘাত দেয় রুচিবানদের। এগান সম্পূর্ণ প্রান্তভূমির মাটির গান মাটির একান্ত কাছাকাছি আছে যে মানুষগুলি তাদের গান।"

পরমাণু শক্তি না দারিদ্র্য

কোনটা আমাদের কাম্য

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো কেবল মাত্র জল-তাপ বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল নয়। তারা এখন পরমাণু বিদ্যুতের দিকে ঝুঁকেছে। ১৯৭৩ সালের আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধের পর যখন বিশ্বব্যাপী তৈল সংকট দেখা দিল তখন থেকে ইউরোপ-আমেরিকার সব কটি রাষ্ট্র পরমাণু বিদ্যুতের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। কারণ আরব দেশের বা অন্য দেশের তেলের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকাটা আর বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তেলে যোগান বন্ধ করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনও কমবে।

ইউরোপের বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশ্বে এখন শক্তির চাহিদা সাংঘাতিকভাবে বেড়েছে ২০৫০ সালে সমগ্র বিশ্বে যত শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তার চল্লিশ গুণ ব্যবহৃত হয়েছে ১৯৫০ সালে। আবার ২০৫০ সালে শক্তির চাহিদা বেড়ে হবে ১৯৫০ এর একশ গুণ বেশী। মধ্যযুগে সমগ্র বিশ্বে যত শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তার পুরোটা এখন ব্যবহৃত হচ্ছে তিন বছরে। অর্থাৎ কয়েক শ বছরে যে শক্তি ব্যবহৃত হত তার পুরোটা এখন দু-তিন বছরে লাগছে। গত দশ হাজার বছরে যত শক্তির ব্যবহার হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে বিংশ শতাব্দীতে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৭ সালে শক্তির খরচ হয় পঁচানব্বই হাজার মেগাওয়াট। ১৯৭২ সালে লেগেছে সেখানে সতর লাখ মেগাওয়াট। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ গ্যাস পেট্রল ইত্যাদি মিলিয়ে শক্তিগুলো।

জল-তাপ বিদ্যুৎ গ্যাস কয়লা পেট্রলজাত শক্তির সীমানা পরিসিমিত। তাই চাই পরমাণু শক্তি। হিরোসিমার পরমাণু বোমা যে ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেছে সেকথা চিন্তা করলে পরমাণু শক্তির কথা উঠলে অনেকেই পিছিয়ে যাবেন। কিন্তু পরমাণু শক্তির ধ্বংসের কথা ছেড়ে দিলেও তার শুভ দিকটা আমাদের ভাবতে হবে। তাই উন্নত দেশ-গুলো ভবিষ্যতে তাদের পরমাণু শক্তি কেন্দ্র বাড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আগামী দশ বছরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দশোটি পরমাণু শক্তি কেন্দ্র নির্মাণ করবে। ফ্রান্স করছে সাতাত্তরটি বৃটেন করবে বিয়াল্লিশ পশ্চিম জার্মাণী করবে সাঁইত্রিশটি সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্মাণ করবে বত্রিশটি স্পেন করবে বত্রিশ জাপান উনত্রিশ কানাডা একুশটি সুইডেন করবে এগারটি ইতালি এগারটি সুইজারল্যান্ড নয়টি ও ভারত আটটি। বিংশ শতাব্দীর শেষে অথবা এক বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সমগ্র বিশ্বে এক হাজারের ওপর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হবে। ইউরোপ-আমেরিকার বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতি-যোগিতা শুরু হয়ে গেছে কে কার চেয়ে বেশী পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র খোলার জন্যে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে চলেছে তার ফলে এক বিংশ শতাব্দীতে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে বত্রিশ লাখ মেগাওয়াট।

পশ্চিম ইউরোপের কমন মার্কেট দেশ-গুলোর মধ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ নিয়ে একাধারে যেমন প্রতিযোগিতা চলছে তেমনি আরেক দিকে চলছে সহযোগিতা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ফ্রান্সের রোন নদীর তীরে ফিনিকস পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে আড়াইশ মেগাওয়াট। ইতালির সঙ্গে সহযোগিতা চলছে ফলে তারা এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

এক ফ্রান্সেই এখন ছটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়ে গেছে। তবে ইউরোপ ও আমেরিকায় হেভিওয়েট ও লাইটওয়েট ওয়াটার টাইপ দুই ধরণের রিয়াকটার নিয়ে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা চলছে। হেভি ওয়াটার রিয়াকটর ব্যবহৃত হচ্ছে বৃটেন ও কানাডায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেনেরাল ইলেকট্রিক কোম্পানী চালু করেছে লাইট ওয়াটার—প্রেসারাইজড ওয়াটার রিয়াকটর আর ওয়েস্টিং হাউস কোম্পানী চালু করেছে বয়েলিং ওয়াটার রিয়াকটর। এদের দেখাদেখি ফ্রান্সের স্যা লঁর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হচ্ছে বি ডবলু আর।

ভারতের প্রতিটি রাজ্যে এখন চলছে বিদ্যুৎ সংকট। তার মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ইতিমধ্যে তারাপুরে রাণাপ্রতাপ সাগর ও কলপাক্কমে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। উত্তর প্রদেশের নারোরায় আরও একটি নির্মাণের পথে। পশ্চিমবঙ্গের দাঁতান পরমাণু নির্মাণের কথা বহুবার আলোচিত হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা কার্যকরী রূপ নিতে পারল না। কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন পূর্ব ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যখন কয়লা রয়েছে তখন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজন নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক আবেদন নিবেদন জানিয়েছেন কিন্তু কোনো সদর্থক প্রস্তাব দিল্লী থেকে এখনও এসে পৌঁছয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হওয়া উচিত কিনা সে সম্পর্কে কলকাতার বৈজ্ঞানিক মহল এক কথায় বলেছেন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়া গতি নেই। তাঁদের মতে কয়লার দাম বাড়ছে তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী। দাম আরও বাড়বে। তাই পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গঠন সুবিবেচনার কাজ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতন দেশে যেখানে কয়লা ও তেল রয়েছে প্রচুর সেখানে এখন গোটা ত্রিশেক পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আমাদের দেশে যে হারে লোক সংখ্যা বাড়ছে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়া গতি নেই। প্রথম ধাপে হয়ত খরচ বেশী হবে তবে কয়লা বা তেলের পরিবহণ খরচের মতন খরচের ভাবনা নেই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। শহরের উপকণ্ঠে নির্মিত হলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ট্রান্সমিশন কেন্দ্র বা তারের প্রয়োজন কম হবে। তবে এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরীর মত কেন্দ্র হলে খরচ কম হবে লাভ তাতে বেশী। তাছাড়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানীর ভাবনা কম। ইউরেনিয়াম জ্বালানী এখন দেশে পাওয়া যাচ্ছে। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র-গুলো খুবই ছিমছাম ও পরিষ্কার।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বৃটেনের যে সব অঞ্চলে কয়লাখনি রয়েছে তারই আশেপাশে নির্মিত হয়েছে কয়েকটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বৃটেনে এখন তেরটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়েছে। ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীতে কয়লার অভাব নেই। কয়লাখনির কাছেই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। তার কয়েকটি আমি নিজেও দেখেছি। ওই দুটি দেশে এখন ষোলটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রয়েছে। চিমনির শব্দ বা ধোঁয়া নেই। কারখানাগুলো ঝক-ঝকে তকতকে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাধা কোথায়।

বিশ্বের সর্বত্র এখন পরমাণু শক্তির সন্ধানে ছোট-বড় বহু রাষ্ট্র উঠে পড়ে লেগেছে। এদের মধ্যে সবার আগে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত বিদ্যুৎ শক্তি লাগছে তার দ্বিগুণ লাগবে পঁচিশ বছর পর অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। তার অর্ধেক বিদ্যুৎ শক্তি আসবে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একুশটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু আছে আরও ৫৩টি কেন্দ্র নির্মাণের পথে। বৃটেনে ১৩টি জার্মানীতে ৮টি করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রয়েছে এবং আরও আটটি কেন্দ্র নির্মাণের পথে। ইতালিতে তিনটি কেন্দ্র চালু হয়েছে। জাপানে ১৪টি। কানাডা হল্যান্ড স্পেন সুইডেন সুইজার-ল্যান্ড এ একটি করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়েছে। এই কটি দেশে দু-চার বছরের মধ্যে তিন থেকে চারটি কেন্দ্র নির্মাণের পথে। আর্জেন্টিনা বেলজিয়াম চিলি ফর-মোসা ফিনল্যান্ড কোরিয়া পাকিস্তানে একটি থেকে তিনটি করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ৯টি পূর্ব জার্মানী ৩ চেকোশ্লোভাকিয়ায় একটি করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু আছে। আরও নির্মিত হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে আটটি চেকো-শ্লোভাকিয়া পূর্ব জার্মানী ও বুলগেরিয়ায় একটি করে।

—দিলীপ মালাকার

পুনশ্চ

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

।। রাস্তাঘাট ।।

কলিকাতার আশেপাশে, ৫০ ক্রোশের মধ্যে পাথর পাওয়া যায় না তথাপি নগরের অধিকংশ রাস্তাই পাথরের খোয়া ও রবিস দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। কোন কোন রাস্তায় ইটের খোয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক রাস্তার মধ্যস্থল দিয়া গাড়ি-ঘোড়া চলে দুই পাশ দিয়া মানুষ গমনাগমন করে।

বাহন ও যান ।।

কলিকাতা শহরের কোন কোন বড় রাস্তায় ট্রাম গাড়ি চলে। তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ি বিস্তর কিন্তু বড় নড়েচড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই ঘোড়ার গাড়িও বিস্তর আছে। এক্ষণে কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর ভাড়াটে গাড়ি হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় গড়ের মাঠে খুব ভাল ভাল গাড়ি-ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

।। বাণিজ্য ।।

ভারতবর্ষে যত বাণিজ্য বিনিময় হইয়া থাকে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ কলিকাতায় হয়। আমদানি জিনিসের মধ্যে বিলাতী সূতা ও কাপড় লোহা ইত্যাদি ধাতু কলকব্জা লবণ ও বিলাতী সুরা। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে আহিফেন পাট চাউল, তৈল নানা প্রকার শস্য নীল চামড়া চা রেশম সোরা। বিদেশের সঙ্গে বৎসরে ১১২৪২৮১০২৮ টাকার বাণিজ্য বিনিময় হয়।

।। শিক্ষা ।।

ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা বঙ্গদেশে এবং কলিকাতা শহরে প্রথমে আরম্ভ হয়। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কলেজে বহুসংখ্যক যুবক শিক্ষালাভ করে। স্বদেশীয় ডাক্তার ডফ ইংরাজী শিক্ষাবিষয়ে অনেক যত্ন করেন। গবর্ণমেণ্ট ও মিশনারী কলেজ ব্যতীত দেশীয় লোকদিগের স্থাপিত অনেক উৎকৃষ্ট কলেজ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নাই। কলিকাতার সুযোগ্য নিবাসী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একবার কলিকাতার এক সভায় বলিয়াছিলেন—

'একশত বৎসর হইল এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি প্রকৃত শিক্ষার প্রথম ফল অর্থাৎ বিদ্যালোচনা হয় নাই। আমার বলিতে ইচ্ছা করে যে সামাজিক শাসন-প্রণালী হিন্দু-চরিত্রের অতি কমনীয় লক্ষণ ছিল ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। আপনারা দেখিয়া থাকিবেন আমাদের সমাজে এক-প্রকার পশ্চাৎগতি চলিতেছে তাহাতে হিন্দু জাতির উন্নতির বিলক্ষণ বাধা জন্মাইতেছে যে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা পৃথিবীর এই অংশের কলঙ্কস্বরূপ লোকে পুনরায় সেই দিকে ধাইতেছে—ঋষিদিগের অমার্জ্জিত উক্তি এবং অসত্য ধারণা নিতান্ত সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তোমাদের পরস্পর মতের অনৈক্য হইতে পারে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত তোমার মতের মিলন না হইতে পারে কিন্তু ঋষিদের মত বেদবাক্য ইহার প্রতিবাদ করিতে নাই। বাস্তবিক এই পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের কথা বিশ্বাস করিলে ঋষিদিগের বাতুলতার অনুমোদন না করা আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষে অতি লাঞ্ছনার বিষয়।'

পরে বুঝাইয়া দিব যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও লোকের মনোভাব ন্যূনাধিক পরিমাণে বঙ্গদেশের ন্যায়।

কলিকাতার একটি কুরীতি দেখিয়া দুঃখ হয়, এখানে বাঙ্গালী নাট্যশালায় বেশ্যারা অভিনয় করিয়া থাকে। নাট্যশালায় অনেক যুবক তাহাদের হাবভাব দেখিয়া অবশেষে কুপথগামী হয়। এক্ষণে কলিকাতা কলেজ ও স্কুলের আশপাশ হইতে বেশ্যাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভরসা করি বাঙ্গালী যুবকেরা ক্রমে জ্ঞান শিক্ষা করিবেন আর দেখিবেন যে কেবল দেশীয় বলিয়া মিথ্যা ধর্ম্ম ও অনিষ্টকর দেশাচারের পক্ষপাতী হওয়া মিথ্যা দেশহিতৈষিতা মাত্র। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে যখন সহমরণ প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয় তখন কলিকাতার গোঁড়া হিন্দুরা সেই নৃশংস প্রথা রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখনও যে সকল কুপ্রথা আছে তাহা উঠিয়া গেলে দেশের অনেক-উপকার হইবে।

বঙ্গদেশের যুবকদিগের যে সকল গুণ আছে তাহার পোষণ ও যে সকল ত্রুটি আছে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যুবকদিগকে যত্নসহকরে গৃহে শিক্ষা দেওয়া বড় আবশ্যক। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও ধর্ম্মশিক্ষার সংযোগ অতি বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গালীর সংবাদপত্রের খেউড় গাওয়া রহিত হইলে অনেক উপকার হয়।

।। বাঙ্গালী ধর্ম্মসংস্কারক ।।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকটি অতি বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক জন্মিয়াছেন। রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকদিগকে প্রতিমা পূজায় বিরত করণার্থ যথাসাধ্য যত্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তিনি যে কার্য্যের আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা অবাধে চলিতেছে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন বহু বৎসরকাল সরল অদ্বৈতবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শেষকালে চক্ষের আঘাত ও মানসিক শক্তির ব্যতিক্রম হওয়াতে 'প্রভু' ও 'ভারতমাতার' নামে কথা কহিয়া 'নববিধান' নামে এক অভিনব ও মিশ্র ধর্ম্মমত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তদবধি তাঁহার স্থাপিত ধর্ম্মসমাজের আভ্যন্তরীণ বিচ্ছেদবশতঃ অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

১৮৭৯ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, ইহা কেশব সেনের সমাজ হইতে বহির্গত ইহা অদ্বৈতবাদী, ইহার মুখপত্র ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার উদ্দেশ্য ভাল।

সমাজভুক্ত লোকদিগের মতের অসামঞ্জস্য ও দলভেদনিবন্ধন অনেকে দুঃখ করে। সামান্য অদ্বৈতবাদ কোন জাতির কোন দেশের ধর্ম্ম হয় নাই। অতএব ব্রাহ্মসমাজের স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ আছে।...

*

ভারতবর্ষের প্রতি ছয়জন লোকের মধ্যে একজন বাঙ্গালী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করে ও এদের প্রধান খাদ্য ভাত। এই জন্য বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের মধ্যে অতি দুর্ব্বল জাতি, কিন্তু ইহারা পরিশ্রমী এবং বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান। ভারতের সভ্য ও অসভ্য সকল জাতীয় লোকের মাথায় পাগড়ী বা টুপি আছে, কেবল বাঙ্গালীর মাথা খালি।

বাঙ্গালা ভাষা আর্য্যভাষা পরিবারভুক্ত। ইহাতে অনেক সংস্কৃত কথা আছে। বাঙ্গালা অক্ষর দেবনাগরী অক্ষরের রূপান্তর কিন্তু সহজে ও শীঘ্র লিখিতে পারা যায়। বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালার সহিত অনেক আরবি কথার ব্যবহার করে এই জন্য তাহাদের ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বলে এই ভাষায় অনেক গদ্য-পদ্য পুস্তক আছে। বঙ্গদেশের প্রধান আরাধ্য দেবতা কালী বা দুর্গা, নদীগণের মধ্যে গঙ্গার মান্য অধিক।

কৃষ্ণের অবতার বলিয়া অনেকে চৈতন্যে উপাসনা করিয়া থাকে।

—অপরূপ

নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। ঝড়ঝঞ্ঝা ২। অগ্নি বীণা ৩। ব্যথার দান ৪। ছায়ানট ৫। চক্রবাক
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯

হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ভিয়েতনামী মহিলা সম্মেলন

ভিয়েতনামের সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ আমাদের কাম্য নয়—সকলেই শান্তির জন্য আগ্রহী। যুদ্ধোত্তর শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর 'অহিংসা পরম ধর্ম' এই চিরন্তন বাক্যটি প্রচারে কোন বাধা আর থাকে না। বিশ শতকেও শক্তিশালী দেশগুলির নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পৃথিবীর বহু দেশ তীব্র লড়াই চালিয়ে যায়। এই লড়াই-এর ফলাফলের ওপর নির্ভর করে সেই দেশগুলির স্বাধীনতা শান্তি ও অগ্রগতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি হিসেবে আমরা দেখতে পাই পূর্ব এশীয় দেশগুলি লড়াই-এর মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম ভিয়েতনামের জনগণের মুক্তির সংগ্রাম বহুদিন থেকেই এ সংগ্রাম শুরু হয়েছে। প্রথমে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলেছে। তারপর স্বল্পকাল জাপানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং আজও সেই সংগ্রাম চলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন শক্তি উপলব্ধি করেছে যে ভিয়েতনামের সম্মিলিত শক্তিকে তারা কিছুতেই পরাস্ত করতে পারবে না।

ভিয়েতনামের এই সংহতির মূলে রয়েছে ঐ দেশের নারী-পুরুষের স্বাধীনতার কামনা ও কর্তব্যনিষ্ঠার দৃঢ় সঙ্কল্প। পৃথিবীর কোন দেশের শক্তি সে দেশের নারী শক্তিকে অবহেলা করে বড় হতে পারে না। ভিয়েতনাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে থেকেও বীরাঙ্গনা ভিয়েতনামী মহিলারা কতখানি নির্ভীক ছিলেন এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ভিয়েতনামী মহিলাদের এই সাহসিকতার সঙ্গে আমাদের দেশের মধ্যযুগের রাজপুত মহিলাদের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে যদিও রাজপুত মহিলারা সাহসিকতার চরম নিদর্শনস্বরূপ আত্মোৎসর্গ করেছিলেন— ভিয়েতনামী মহিলারা কিন্তু সেভাবে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ বেছে নেন নি। তাঁরা দেশের স্বাধীনতা ও গঠনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিজেদের দেশকে মুক্ত করার জন্য মুক্তি ফৌজের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন। কোথাও তাঁরা একটুও পিছিয়ে পড়েন নি।

আধুনিক যুদ্ধে শুধুমাত্র যারা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক হিসেবে গোলাবারুদ কিম্বা ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা যুদ্ধ করে থাকেন শুধু তারাই যোদ্ধা নন। তাদের যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকেন তাদেরও যোদ্ধা হিসেবে পরিগণিত করা হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ভিয়েতনামের মহিলারা বিভিন্নভাবে মুক্তিফৌজকে সাহায্য করেছে। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ প্রধানতঃ ছিল গেরিলা যুদ্ধ। এই গেরিলা যুদ্ধে ভিয়েতকং মুক্তিবাহিনীকে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সমানভাবে মদত জুগিয়ে এসেছে মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভিয়েতনামী রমণীরা তিনটি মহৎ কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। আক্রমণকারীকে দেশ থেকে হটিয়ে দেওয়া দেশের উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক শিশুদের বাঁচিয়ে রাখা ও তাদের এমনভাবে গড়ে তোলা বড় করা যাতে তারাও ভবিষ্যৎ সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদীদের পর্যুদস্ত করতে পারে। ভিয়েতনামী মহিলাদের বীরত্বের নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ফরাসী জেনারেল বয়ার-দ্য'-লতুর বলেছেন মেয়েদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার' কারণ মেয়েরা শুধু লড়াই-ই জানে না তারা সংবাদ ও যোগাযোগ রক্ষা করে। তারা শত্রু সৈন্যদের ভুলিয়ে নিয়ে ফাঁদে ফেলে দেয়। তারা সেখানে স্কাউটের কাজ করে বহু নারী আহত সৈন্যদের সেবাকার্যে লিপ্ত। ভিয়েতনামী মহিলারা দৌত্য কার্যেও পারদর্শিনী তাই শত্রুর খবর এবং অবস্থান দেশের মুক্তিফৌজ তথা গেরিলা সৈনিকদের কাছে পৌঁছে দিতে তাদের বিলম্ব হয় না। মেয়েদের এই তীব্র সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে কেনেডিকেও স্বীকার করতে হয়েছিল যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মত অসুবিধাজনক জায়গায় যুদ্ধ চালাতে আমাদের প্রতিটি গেরিলা সৈন্যের বিরুদ্ধে দশ বা এগারোজন মার্কিন সৈন্যকে নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু সে নিয়োগেও কোন লাভ হয় নি।

পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলারা চাষ এবং উৎপাদনের স্থানগুলিকে আগলে রেখেছে এবং খাদ্যাভাব না ঘটে সে জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে যুদ্ধের মধ্যেও বিশেষভাবে আয়ত্ত এবং অনুশীলন করেছে। একইভাবে তারা শিক্ষাব্যবস্থাকে নষ্ট হতে দেয় নি। দেশে দীর্ঘদিন যুদ্ধচলাকালে শিক্ষাব্যবস্থায় স্ত্রী-শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটানো হয় যার ফলে কোন নারীকে অশিক্ষিতা বলে ঠিক উপেক্ষা করা চলে না। অধিকারের ভিত্তিতে সমাজে নারী ও পুরুষ এবং স্ত্রী ও স্ত্রীর মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। দেশের কৃষ্টি সাহিত্য শিল্পকলাও অবহেলিত নয়। আগে যেখানে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে কোন মহিলাকে দেখা যেত না বর্তমানে তারা এক বিরাট অংশ অধিকার করে আছে। বহু মহিলা বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এমন কি অনেকে পারটির সদস্য পদ লাভ করেছেন। কিছুদিন আগে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের প্রেসিডিয়ামের সদস্যা মাদাম নোগুয়েন-বিন ভারত সফরে এসেছিলেন। তিনি এখনও সদস্য পদে অধিষ্ঠিতা। এছাড়া দেশের শাসনকার্য এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ক সংস্থার মধ্যেও অনেক মহিলা রয়েছেন।

সম্প্রতি হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ভিয়েতনামী মহিলা মহাসম্মেলন থেকে বিগত বারো বৎসরের ঐ দেশের মহিলাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। বিগত বছরগুলিতে কিভাবে ভিয়েতনামের নারী শক্তি যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশের সংগঠনে প্রয়াস চালিয়ে যান তার বর্ণনা 'দি প্রোগ্রেস অফ দি উইমেন অফ ভিয়েতনাম ইন ফিগারস্' বইটির মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে)।

—অঞ্জলি চৌধুরী

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.,ডি.জি.ও
ডাঃ এস. এম. পাণ্ডে এম.বি.,বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য · মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি।

প্যাট্রী, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোর্সেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক ঃ
সম্পৎ সেরামিকস্ প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষের প্রতীক এঁকেছেন ভ্যালেরি পেটিস

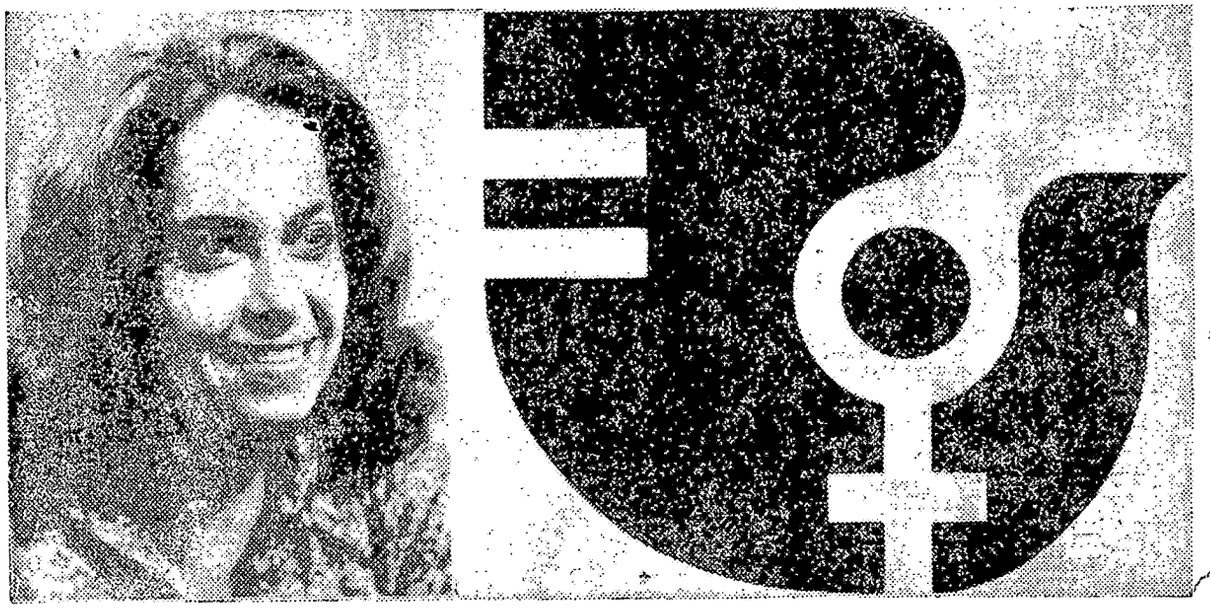

আন্তর্জাতিক মহিলা বছর

নারীদের কাছে ১৯৭৫ সাল নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক বছর। কারণ এই সালটি ঘোষিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মহিলা বছর হিসাবে। নারীমাত্রই এজন্য যথেষ্ট গৌরব বোধ করবেন নিশ্চয়ই। ১৯৪৭ সালের আগে নারীদের কথা কোনদিন কেউ এমন করে ভেবেছে কি কয়েকজন মণীষী আর চিন্তাবিদ ছাড়া? নারী অবলা পুরুষের পরিচয়েই তার পরিচয়। সমাজে অবহেলিতা অত্যাচারিতা জর্জরিতা মানুষ তারা। মুখ ফুটে কিছু বলার অধিকার তাদের নেই। তাদের শিক্ষা ছিল না ছিল না স্বাধীনতা কেমন করে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে কোন কিছু অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে? নারী জাগরণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দই অগ্রসর হলেন শিক্ষা প্রসারে নিয়োজিত করলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। সার্থক তার প্রয়াস সফল তার প্রচেষ্টা। তিনি বলেছিলেন—'উড্ডীয়মান পক্ষীর দুটি ডানারই প্রয়োজন। নারীকে আঁধারে ফেলে রাখলে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। দুটি ডানা বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন সমাজের নারী ও পুরুষকে।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা নারীকে দিলো সমঅধিকার। নারী প্রগতি দুর্বার বেগে এগিয়ে চললো। নারীরা ঘরে আর বাহিরে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ালো। কখনো কখনো পুরোভাগে দেখা গেল নারীদের নাম। নারীরা যে প্রবল অনুশাসনের শৃঙ্খলে বাঁধা ছিলো দেখা দিল সেখানে শিথিলতা। সাবলীল ভঙ্গিতে, দৃঢ় পদক্ষেপে চলাফেরা করতে দেখা গেল নারীদের পথে-প্রান্তরে রাস্তায় রেস্তোঁরাঁয় অফিসে-আদালতে। সে ভঙ্গিমা দেখে কি মনে হয় একবারও যে নারী অবলা? সত্যি কথা বলতে গেলে নারীরা বোধহয় কোনদিনও অবলা ছিলো না শুধুমাত্র শিক্ষা আর স্বাধীনতার অভাবই তাদের পঙ্গু করে রেখেছিলো। যাদের জীবনে শিক্ষা আর স্বাধীনতা ছিলো তারা অনেক নির্ভীক কাজই সাহসের সঙ্গে করে গেছেন—কি পুরাকালে কি স্বাধীনতা আন্দোলনে। রানী ভবানী রানী দুর্গাবাঈ ঝাঁসী রানী এরা ইতিহাস প্রখ্যাতা নারী। আবার মাতঙ্গিনী হাজরা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এদের কথাও কি আমরা ভুলতে পারি? এঁরা চির-উজ্জ্বল চির-ভাস্বর।

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
হে বিধাতা কেন নাহি দিবে অধিকার'।

এ অভিযোগ করার দিন ফুরিয়েছে। সুদীর্ঘ আঠাশ বছর কেটে গেছে স্বাধীনতার পর। জীবনে তাদের এসেছে অনেক সুযোগ অনেক সাফল্য। প্রবীণারা খানিকটা হতচকিত আবার খানিকটা বা খুশী। তাদের যে সব আশা আকাঙ্ক্ষা দুস্তর বাধার প্রাচীরে মাথাকুটে নিষ্ফল হয়েছে তা সার্থকতা লাভ করেছে পরবর্তী যুগে। তারা খুশী কারণ তাদের নীরব আন্দোলন আজ সফলতার মুকুট পরে বিজয়ীর আসন দখল করেছে।

বেশ কয়েক বছর আগেও যে নারীদের কোন বিশেষ স্থান বা মান ছিলো না সমাজে বা সংসারে সেই নারীদের নিয়ে এত মাতামাতি যেন বিশ্বাসই করা যায় না। তাই আন্তর্জাতিক মহিলা বছর কথাটা কেমন যেন বিস্ময় জাগায় মনে তার সঙ্গে পুলকও জাগায় ঠিক নয় কি? এই বছরটা নাকি হবে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ আর অনেক ঘটনায় ভরানো। বছরটাকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রকাশিত হবে 'স্ট্যাম্প'। আন্তর্জাতিক মহিলা বছরের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো গঠনমূলক কাজে নারীদের ভূমিকা। এ বছরটা নতুন সুযোগ এনে দেবে নারীদের হাতে পলিসি মেকিং ও ডিসিশন মেকিং-এর ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক মহিলা বছরের সঙ্গে শ্রীমতী হেলভি শিপিলার নাম বিশেষভাবে জড়িত। কারণ রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাঁকেই আন্তর্জাতিক মহিলা বছরের 'সেক্রেটারি জেনারেল' পদে বসিয়েছে। শ্রীমতী শিপিলা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা গ্রহণে বিশেষ উৎসাহী ও আগ্রহী।

নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে। নারীকে সংবিধান পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারই দিয়েছে। তবু আন্তর্জাতিক মহিলা বছরে দাবী আছে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের যে যে ক্ষেত্রে বৈষম্য আছে। নারী এখন যথেষ্ট পরিমাণে সুশিক্ষিতা চাকরীও তারা পেয়েছে বহু ক্ষেত্রে কিন্তু পলিসি মেকিং-এর ক্ষেত্রে তাদের তেমন সুযোগই দেওয়া হয় নি। এ বছরটি সে সুযোগ দেওয়ার কথা ভেবেছে। আন্তর্জাতিক মহিলা বছর অনেক অনেক আশার আলো নিয়েই এসেছে। জানি না ১৯৭৫ সাল কি অবদান রেখে যাবে নারী প্রগতির ক্ষেত্রে। নারীদের লাভের ঝুলিতে নতুন কি লাভ হবে তারই দিকে তাকিয়ে থাকবে নারীমাত্রই আর কামনা করবে—আন্তর্জাতিক মহিলা বছর জয়যুক্ত হোক।

—মলয়া ধর

রূপের বিকাশের জন্য চুলের সৌন্দর্য বিশেষ ভাবে দরকার। অনেক সুন্দরীর চেহারা ঠিক প্রকাশ হয় না চুলের স্বল্পতা কিম্বা মলিনতার জন্য। এই মলিনতার অনেক কারণ আছে। উপযুক্ত যত্নের অভাবে চুলে উজ্জ্বলতা ও নরম ভাব আসে না, ফলে আঠা আঠা ও চাপ চাপ দেখায়। দ্বিতীয়তঃ চুলে গন্ধ হয়। চুলে খারাপ গন্ধ হলে তা মোটেই ভাল লাগে না। তৃতীয়তঃ চুল বেশী এলো-মেলো ও নোংরা দেখায়। এসব থেকে মুক্তি পেতে হলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১) চুল নিয়মিত পরিষ্কার রাখা ও ভাল শ্যাম্পু ব্যবহার করা। খুস্কী হতে না দেওয়া। (২) চুলের গোড়ায় উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া—যার ফলে চুলের গোড়া সুস্থ থাকে ও চুল ভালভাবে বাড়তে পারে। (৩) চুলকে যত্ন নিয়ে আঁচড়ানো বা ব্রাস করা ও উপযুক্ত ছাঁদে বেঁধে সৌন্দর্য আনা।

চুল নিয়মিত পরিষ্কার কি ভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করেছি। তবুও আবার একটু জানাচ্ছি। সপ্তাহে অন্ততঃ এক বার শ্যাম্পু করা। তবে শ্যাম্পুর সঙ্গে যদি একটি ডিমের কুসুম বেশ করে ফেটিয়ে তা মাথায় দেন তাহলে ফল আরও ভাল হবে। এতে চুল খুব নরম ও সিল্কের মতন থাকে। চুল ধোয়ার পর ডিমের গন্ধ একটুও যাতে না থাকে তারজন্য চায়ের লিকার দিয়ে মাথা ধোয়ারও পর যখন শেষ মগজল ব্যবহার করবেন তাতে একটু গোলাপজল ও ২।৩ ফোঁটা কোন ভাল পারফিউম মিশিয়ে সেই জলটা মাথায় ঢেলে চুল মুছে ফেলবেন। তাতে মাথার চুলে একটা সুন্দর গন্ধ হয়।

মাঝে মাঝে অলিভ তেলে লেবুর রস দিয়ে সেটা গরম করে মাথার খুলির ওপরের চামড়ায়—অর্থাৎ চুলের গোড়ায় বেশ করে ম্যাসেজ করে রাত্রে শুতে হয়। সকালে শ্যাম্পু করে ফেললেই চুলের তেলতেলে ভাবটা চলে যায়। এতে খুস্কী হয়না আর চুলের গোড়া ভিটামিন 'সি' পেয়ে ভাল থাকে। তবে চুল সম্বন্ধে আগে এতো বিস্তারিত ও ভালভাবে আলোচনা করেছি যে আমার মনে হয় আবার তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

চুলের পরে দেহের যে অংশের কথা আমার মনে হচ্ছে তা হোল হাতের তেলো ও হাতের অন্য অংশ। হাতের রমণীয়তা ও কমনীয়তার ওপর সৌন্দর্য বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। 'শ্রী' যুক্ত হাত দেখতে এবং ছুঁতে সত্যই লোভনীয়। মেয়েদের বাড়ীতে সংসারের নানান কাজ করতে হয়, ধুলো ময়লা ঘাঁটতে হয় তারপর শুধুমাত্র সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট নয়। তাতে হাতের নরম স্থান ফেটে দাগ দাগ হয়ে যায় এবং ময়লা বসে খরখরে হয়ে যায়। এসব কারণে হাত ধুয়ে নরম ক্রীম জাতীয় কিছু মেখে নিলে হাতের নরম ভাব কমা দূরের কথা বরং বেড়ে যায়। এবং সৌন্দর্যও কিছুমাত্র কমে না। এই ক্রীমটাও বাড়ীতে তৈরী করা যায়।

আধ চামচ (বড়) জিঙ্ক অকসাইড (Zinc Oxide) এবং বড় পাঁচ চামচ ভেসলিন এই দুটো জিনিস গরম করতে হবে (ফোটাতে হবে না)। গরম করলেই এগুলি গলে মিশে একটা পেস্ট তৈরী হয়ে যাবে। সেই ক্রীমটা যে কোন নোংরা কাজ বা রান্নার আগে হাতে বেশ করে মেখে নিতে হবে। এতে একটা পর্দা পরে যায় হাতে ফলে ত্বকের কোন ক্ষতি হয় না। কাজ শেষ হলে জলে বেশ করে হাত ধুয়ে নিতে হবে। এবং হাত ধোয়ার পর যে কোন ভাল ক্রীম মেখে নিলেই হবে।

হাত সাদা ও সুন্দর রাখার জন্যও বাড়ীতে ভাল সামগ্রী তৈরী করা যায়। এটা তৈরী করে রেখেও দেওয়া যায়। সেটা রোজ স্নানের আগে মেখে নিয়ে মিনিট ১০।১২ পর ঠাণ্ডা জলে শুধু ধুয়ে নিতে পারা যায়। জিনিসটা এইভাবে তৈরী করা যায়ঃ—

½ ভাগ কাপে গোলাপ জল
½ ভাগ কাপে গ্লিসারীন
১ চায়ের চামচ সাদা ভিনিগার
১½ চায়ের চামচ খাঁটি মধু।

এগুলি বেশ করে মিশিয়ে নিয়ে তারপরে মাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় মুখের চেয়ে হাতের রং কালো, সেসব ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা খুবই উচিত। এতে ভাল ফলও পাওয়া যায়।

হাতে লোশান ব্যবহার করাটা বহুদিন ধরে ফ্যাশান। বিলীতি ও দেশী যে কোন লোশানের আজকাল প্রচুর দাম। বিদেশী লোশান তো চোখেও দেখা যায় না। তাই বাড়ীর তৈরী লোশান সবচেয়ে ভাল।

১ বড় চামচ গ্লিসারীন
½ বড় চামচ গোলাপ জল
½ বড় চামচ ইউডিকোলোন

সেই সঙ্গে একটা বড় পাতিলেবুর রস। এগুলি বেশ করে মিশিয়ে একটা সুন্দর বোতলে রেখে দিন। তারপর প্রয়োজনমত ব্যবহার করুন। তবে প্রতিবারই ব্যবহারের আগে বোতলটা বেশ করে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। অতএব বাজারে ভাল প্রসাধন সামগ্রী না থাকলেই বা কি—বাড়ীতে নিজেরা সবই তো বানাতে পারি এবং সেগুলি ব্যবহার করে খুশী এবং উপকৃত হতে পারি।

—বরবর্ণিনী

বিশ্বের প্রবাদঃ ইবনে ইমাম ৮·০০ [বিশ্বের সমস্ত ভাষা থেকে ভাল ভাল প্রবাদগুলি আহরণ করে এই বইতে সংকলিত করা হয়েছে। সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বহু রঙ শোভিত এই বইটি রাখার ও দেবার মত বই] **হলুদ নদী সবুজ বনঃ** মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ৪·০০ [একটি বিখ্যাত উপন্যাস] **দৃষ্টিপাতঃ** যাযাবরঃ ৮·০০; **দেশে বিদেশেঃ** মুজতবা আলীঃ ১২·০০; **কত অজানারেঃ** শংকরঃ ১০·০০; **সাহেব বিবি গোলামঃ** বিমল মিত্রঃ ২৫·০০; **রিন ঝিনঃ** শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ৩·৫০; **কিংবদন্তীর দেশেঃ** সুবোধ ঘোষঃ ১০·০০; **নটীঃ** মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যঃ ৪·০০; **আলিম্পনঃ** [আলপনা দেওয়া ও শেখার বই] দুর্গা মুখোপাধ্যায়ঃ ১০·০০; **রিক্সাওয়ালাঃ** লাওচাওঃ ৬·০০।
ভারতীয় সমাজ ও বিবাহঃ নৃপেন্দ্র গোস্বামীঃ ১২·০০; **কালের পুতুলঃ** বুদ্ধদেব বসুঃ ৫·০০; **রবীন্দ্রনাথ কথা সাহিত্যঃ** বুদ্ধদেব বসুঃ ৫·০০; **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজঃ** শিবনাথ শাস্ত্রীঃ ১০·০০; **বাঙালীর ইতিহাসঃ** [সংক্ষিপ্ত] নীহাররঞ্জন রায়ঃ ৬·০০; **রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকাঃ** নীহাররঞ্জন রায়ঃ ৪০·০০; **বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতিঃ** নৃপেন্দ্র গোস্বামীঃ ১৫·০০; **লোকায়ত দর্শনঃ** দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ ১৫·০০; **লেখকের কথাঃ** মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ৪·০০; **আত্মচরিতঃ** শিবনাথ শাস্ত্রীঃ ১৫·০০।
The Agony of West Bengal: Ranajit Roy 10·00; **Sedition Committee Report 1918:** (Reprint) Rowlatt-30·00; **History of Central Asia:** Rahul Sankrityan 25·00; **Calcutta India's City:** Asok Mitra 8·00; **The Days I Remember:** Kailash Nath Katju 15·00;
নিউ এজ পাবলিশার্স
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উপন্যাস

ভেংচি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তাঁর কথায় কথায় প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাঁকেই অস্বীকার করার চেষ্টা করছে ইদানীং। তাই নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জুয়োতি করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

অথচ ঐ মানুষটাই তাকে বিপ্লবীদের কত গল্প শুনিয়েছে। শুনতে শুনতে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে তার দেরী হয়ে গিয়েছিল।

সে-জন্যে দাদুর কি বকুনি। সেই রাগে রাত্রে রঞ্জু খায় নি।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা টিঁকলো না রঞ্জুর। তার কারণ ঘুঁইদি। বস্তুত তার ওপর ঘুঁইদির যে বিশেষ একটা আকর্ষণ আছে সেটা রঞ্জু বোঝে।

তার আরো একটা প্রমাণ দিল ঘুঁইদি কেষ্টনগরে ফিরে যাবার আগে। রঞ্জুকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য দাদুর অনুমতি চাইল।

আর আশ্চর্য অনায়াসেই অনুমতি পেয়েও গেল।

কিন্তু রঞ্জু কেষ্টনগরে যাবার আগেই একটা ঘটনা ঘটল। রঞ্জু ঘুঁইদির জন্যে কিছু কসমেটিকস কিনতে বেরুচ্ছিল বন্ধুরা ধরে তাদের আড্ডাখানা একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল।

সেখানেই অমিত তাকে একটা খোঁটা দিল। মহিলা খুব ঘন ঘন তোদের বাড়ী আসছে, ব্যাপার কি?

শুনে রঞ্জুর মেজাজটা হঠাৎ গরম হয়ে গেল।]

।। সতেরো ।।

অবাক হওয়া স্বাভাবিক। অমিয় দত্ত থমকে দাঁড়ান।

একটা সন্দেহও সঙ্গে সঙ্গে মনে উঁকি দিল তাঁর। ব্যাপারখানা কি! আজ আবার সে এ-পাড়ায়?

একটু ভাল করে জিজ্ঞেসটিজ্ঞেস করতে হয়। করবে কি? যেন অমিয় হঠাৎ ঠিক করতে পারেন না।

সঙ্গে মেয়েরা আছে। এইজন্য একটু ইতস্তত করছিলেন তিনি। কিন্তু হাত তুলে যখন রুদ্রেন্দু তাঁকে ডাকছে তাঁকে দেখে ফেলেছে তখন আর উপায় কি। তাড়াহুড়ি পা চালিয়ে সরে পড়া যায় না। খারাপ দেখায়। একলা হলে অমিয় বুঝি তাই করতেন।

ঐ যে তাঁর বাবা বঙ্কিম দত্ত বলেন আমল দিতে নেই। আমল দিলেই লোকে লাই পেয়ে যায়।

কিন্তু সেটা তো কথা নয়।

দলবল নিয়ে অমিয়বাবু দাঁড়িয়ে থাকেন। হুঁ রুদ্রেন্দুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করাই বরং ভাল। কি ব্যাপার? এ-পাড়ায় তোমার দেখছি খুব আনাগোনা শুরু হয়েছে রুদ্রেন্দু। নকশাল টকশাল হয়েছ নাকি। কাঁচা বয়সের ছেলে খুঁজছ? সেদিন আমার খোকনের সঙ্গে এত কি কথা হচ্ছিল হে।

গড়িয়াহাট রোডের ওপর সেই ঝুপসি-মাথা বকুল গাছটার নিচে টুটুলে ও টুটুলের বন্ধুদের নিয়ে অমিয় অপেক্ষা করেন। এই বকুল গাছের নিচে রসময় নামের একটা লোক তেলেভাজার দোকান নিয়ে বসত। একদিন ফুটপাথের ওপর একটা লরী উঠে এসে রসময়কে চাপা দেয়। তাঁর বাবা বঙ্কিম দত্তর মুখে অমিয়বাবু শুনেছেন। রসময়ের চেহারাটা কিন্তু কিছুতেই অমিয় মনে করতে পারেননি সেদিন। শুনে বঙ্কিমবাবু অবাক হয়েছিলেন। তুমি বলছ কি হে—রোজ তো ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটা একটা লোক গাছটার নিচে বসে উনুন জেবলে দুবেলা তেলেভাজা ভাজত—ছেলে-বুড়ো দুবেলা দোকানের সামনে ভিড় করে থাকত গরম গরম তেলেভাজা খাবার জন্য—লোকটার চেহারাই তোমার মনে পড়ছে না।

—রাস্তার দিকে আমার চোখই থাকে না যে। অমিয় হেসে উত্তর করেছিলেন।

—তবে কি আকাশের দিকে চোখ রেখে হাঁট! বঙ্কিমবাবুও তখন না হেসে পারেন নি। ওপরের দিকে চোখ রেখে আকাশের পাখিটাখি দেখ বুঝি!

—কলকাতার আকাশে আর পাখি কোথায়। ঐ দু' একটা কাক চিল দেখি। আর ট্রামের তার টেলিফোনের তার ও গোছা গোছা বিজলী বাতির তার—কথাটা শেষ করে অমিয় টেনে টেনে হেসেছিলেন।

তাঁদের বাপ ছেলের মধ্যে এমন সব রগচুড়ে কথাবার্তা প্রায়ই হয়। সেদিনও হয়েছিল। যেদিন রসময় নামের লোকটা লরীর তলায় চাপা পড়ে মারা যায়। অবশ্য বঙ্কিমবাবু পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলের মুখের দিকে সাবধানী চোখ রেখে বলেছিলেন—না হে, অমিয়, এটা ভাল না। আমি বলব তোমাদের আর্টিস্ট-টার্টিস্ট মানুষদের এটা খুবই বদ দোষ রাস্তায় চলাফেরা করার সময় এত অন্য-মনস্ক থাক তোমরা। বিশেষ করে এটা যখন কলকাতা শহর। এত যেখানে গাড়ি ঘোড়া ছুটোছুটি করে। ঐ যে একবার কাগজে উঠেছিল আমাদের রাসবিহারী এভিন্যুর ওপর কতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তোমাদের এক কবি জীবনানন্দ দাস না কি যেন নাম ছিল—ট্রামের চাকার নিচে কেমন জঘন্যভাবে কাটা পড়েছিল—কবি ভদ্দরলোক যদি একটু হুঁস রেখে রাস্তা চলতেন ঘটনা হয়তো হত না।

আশ্চর্য এখন ফুটপাথের এই বকুল গাছের নিচে দাঁড়ান মাত্র অমিয়বাবুর কিন্তু রসময়ের কথা মোটেই মনে পড়ল না বা কবি জীবনানন্দ দাসের ট্রামে কাটা পড়ার কথা। মনে পড়ল বঙ্কিমবাবুর স্ত্রী একটা কথাই। 'রাস্তায় চলতে ওপরের দিকে চোখ রেখে আকাশের পাখিটাখি দেখে হাঁটি বুঝি।'

কথাটা মনে হতে অমিয় এখন মনে মনে হাসলেন। কলকাতার আকাশে পাখি কোথায়। ওপরের দিকে চোখ তুলতেই ক'টা বদখত চেহারার কাক আর কিছু বিজলী বাতি ও ট্রাম টেলিফোনের তার চোখে পড়ে। অর্থাৎ নিজের উত্তরটাও এই সঙ্গে অমিয়র মনে পড়ল। এখন আর একটা উত্তর মনে এসে গেছে তাঁর। কলকাতার মানুষকে পাখি দেখতে হলে বোটানিকস-এ ছুটতে হয়, নয়তো আলীপুর চিড়িয়াখানায়। অমিয় তাই করেন। আর এমনি পাখি দেখার সাধ মেটাবার জন্য তিনি নিজের মেয়ে টুটুল ও টুটুলের বন্ধুদের পাখি সাজিয়েছেন। তাদের সান্নিধ্য তাঁর পাখি দেখার শখ মেটায়। বঙ্কিমবাবুকে অবশ্য সরাসরি কোনোদিন কথাটা বলেন নি তিনি বলার দরকর পড়ে না। জজিয়তি করছেন বঙ্কিমবাবু। বেজায় বুদ্ধিমান চালাক লোক। অমিয় যখন টুটুলকে টুনি ও টুটুলের বন্ধুদের এই পাখি সেই পাখির নাম ধরে ডাকেন বুড়ো তখন ছেলের পক্ষি-প্রীতি নিশ্চয় টের পান।

এসব কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে হাসি পেলেও ওপরের চেহারাটা অমিয় এখন অতিরিক্ত গম্ভীর করে রাখলেন।

ট্রামের জন্য রদ্রেন্দু আটকে গেছে। রাস্তাটা ক্রশ করতে পারছে না। ট্রামটা সরে যেতেই আবার রুদ্রেন্দুর মুখটা পরিষ্কার তিনি দেখতে পেলেন।

কলকাতা শহরের এই মস্ত অসুবিধে। সন্ধ্যাবাতি লাগল কি হাজার আলো চারিদিকে জ্বলে উঠল। মফঃস্বলের রাস্তায় হু যদি গোটা জেলা শহরও হয় সন্ধ্যার পর রাস্তার এপারের মানুষ রাস্তার ওপারের মানুষকে পরিষ্কার দেখতে পায় না। অথচ সেখানে যে আলো জ্বলে না এমন নয়। আজ সেই চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর আগের একটা মফঃস্বল শহরের ছবি অমিয়র মনে পড়ল।

মিউনিসিপ্যালিটির কেরাসিনের বাতি জ্বলছিল শহরের রাস্তায়।

তা হলে হবে কি। রাস্তার দুধারে বড় বড় বটগাছ। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঝিঁঝি ডাকত। জোনাকী উড়ত ঝাঁকের ঝাঁক।

উহু সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরোনো নিষেধ ছিল অমিয়র। কিন্তু সেদিন তাঁকে বেরোতে হল। বঙ্কিমবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বাড়িতে আর পুরুষ কে অমিয় ছাড়া। ছোটভাই সুপ্রিয়র পরদিন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ। অবশ্য তাদের দু ভাইকেই বাবা সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরোতে দিতেন না। সুতরাং রাত্রে অমিয়র বা সুপ্রিয়র রাস্তায় বেরোনো একই দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তাহলেও বাবার জন্য ডাক্তার ডাকতে হবে। সেই প্রায় দেড় মাইল পথ হেঁটেই রেল-লাইন পার হয়ে সিভিল সার্জনের বাংলো। মা অবশ্য অমিয়র সঙ্গে বাবার অদ্দালী বলাইকেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবুর কাছে বাবার অসুখের খুঁটি-নাটি বিষয় বলাই ঠিক বলতে পারবে কিনা সন্দেহ করেই মা অমিয়কে সঙ্গে পাঠান। ট্রাম-বাস আসবে কোথা থেকে—সেদিন তাঁদের ডিস্ট্রিক্ট টাউনে ট্যাকসি বা রিকসারও চল ছিল না। ছিল ঘোড়ার গাড়ি। তা-ও এক মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে গাড়ির আড্ডায় খবর দিলে তবে গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে আসত। এতটা সময় অপেক্ষা করতে মা সাহস পাচ্ছিলেন না। কলেরার মত হয়েছিল বঙ্কিমবাবুর।

অমিয়বাবুর মনে আছে বলাই ও তিনি যখন পোস্টাফিসের লাল বিল্ডিংটা পিছনে ফেলে প্রফেসারপাড়ার রাস্তাটা ধরে, রাস্তার উল্টোদিক থেকে একটি মানুষ আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিল। রাস্তাটা বেশ চওড়া। লোকজন নেই বললেই চলে। মফঃস্বল শহরে সন্ধ্যার পর রাস্তায় খুব বেশি মানুষ চলাফেরা করে না। তাছাড়া তখন ঠান্ডার সময়। কার্তিকের শেষ। যেন হিম লাগার ভয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে যে-যার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। আবছা মূর্তির মতন সেই মানুষটা অমিয়র চার-পাঁচ হাত দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। অমিয় চিনতে পারলেন না। এবং লোকটিও অমিয়কে নিশ্চয় চিনতে পারেনি। কিন্তু বলাই চিনতে পেরেছিল। তার কারণ রাস্তার ওপাশটায় ঝোপঝাড় ছিল বলে বলাই রাস্তাটা পার হয়ে ওদিকটায় বসে প্রস্রাব করছিল। অমিয়বাবু তখন বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গেছেন। একটু পরেই বলাই পিছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল। দ্রুত শ্বাস পড়ছিল বলাইয়ের, বলল দাদাবাবু এই মাত্তর একটা লোক চলে গেল—তাকে চিনতে পারলেন? বলাইর কথা শুনে অমিয়বাবু একটু থমকে গেলেন, বললেন, না মানুষটাকে দেখলাম বটে কিন্তু চিনতে পারলাম না তো—কে ওটা?

—রুদ্রেন্দুবাবু। কেবল যে তাড়াতাড়ি ছুটে আসার দরুন বলাই দ্রুত শ্বাস ফেলছিল তা নয় যেন হঠাৎ রুদ্রেন্দুকে দেখে উত্তেজিত হয়ে এভাবে সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিল। বলল ঝোপের ধার থেকে উঠে এসে যেই না আমি রাস্তায় নেমেছি একেবারে আমার সামনে পড়ে গেলেন রুদ্রেন্দু।

সদ্য প্রকাশিত

নতুন ভুবন ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫-০০

সীমাস্বর্গ ॥ প্রলয় সেন ॥ ৮-০০

রাতের সমুদ্র ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৭-০০

কামনার সুখ-দুঃখ ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ ৬-৫০

আসন্ন প্রকাশ ঃ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ফোটা পদ্মের গভীরে ১২-০০

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের

রামায়ণী প্রেমকথা ৬-৫০

চিরঞ্জীব সেনের

অপরিচিতা রূপসী ৪-৫০

কৃশাণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চুপি চুপি আঁধারে ৫-০০

বীরু চট্টোপাধ্যায়ের

মানুষ যখন পশু হয় ৪-৫০

প্রফুল্ল গ্রন্থাগার : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

—তারপর! রুদ্রেন্দু নামটা শুনে বুকের ভিতর ধড়াস করে উঠেছিল অমিয়বাবুর।

—কি হে বলাই, কেমন আছ তোমরা, বললাম ভালই আছি।

—তারপর? তুই কিছু জিজ্ঞেস করেছিলি?

হুঁ, বলাই ঘাড় কাৎ করেছিল। বললাম কোথায় আছেন আপনি এখন? বললেন, এই তোদের আশেপাশেই আছি বলে সামান্য হেসে ফেলেছিলেন তারপর আমায় জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাচ্ছিস তুই রাত করে! বললাম, কর্তার অসুখ করেছে ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে চলছি দাদাবাবুও সঙ্গে আছেন—বলতে বললেন, তাই নাকি কোথায় অমিয়? আমি আপনাকে আঙুল দিয়ে দেখাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে উনি আপনাকে দেখলেন আপনি তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছেন বললেন, তাই তো—আমার পাশ দিয়েই তো হেঁটে গেল —চিনতে পারলাম না!

—তারপর? প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসার অবস্থা হয়েছিল অমিয়বাবুর সেদিন। আর কি জিজ্ঞেস করল ও তোকে?

—না আর কিছু জিজ্ঞাসাটিজ্ঞাসা করলেন না আচ্ছা চলি, তোরা ডাক্তারবাবুর কাছে যা, বলে হেঁটে চলে গেলেন।

আজ অমিয়বাবুর মনে পড়ল কী ভীষণ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠেছিলেন তিনি। বলাইকে আচ্ছা করে ধমক লাগিয়েছিলেন—আমার কথা বলতে গেলি কেন মূর্খ। আমায় চিনতে না-পারছিল না-পারছিল হুট করে আমার নাম ওর কাছে তোর বলতে যাওয়ার দরকার ছিল কি।

ধমক খেয়ে বলাই চুপ করে ঘাড় নিচু করে হাঁটছিল। ধমকের কারণটা সে বুঝতে পেরেছিল। মুন্সেফের আর্দালী। রুদ্রেন্দু যে তখন একটা সাংঘাতিক অবাঞ্ছিত মানুষ বঙ্কিমবাবুর বাড়ির লোকদের কাছে এতবড় কথাটা বলাইয়ের না বুঝতে পারার কারণ ছিল না।

সারা রাস্তা অমিয়বাবু আর একটা কথাও বলেননি। খুব খারাপ লাগছিল তাঁর।

অরুণইন্ডাস্ট্রিজ
৪২, মতি শীল স্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

না, অস্বীকার করবেন কেমন করে, রুদ্রেন্দুর নামটা শুনে তাঁর বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের কাছে একটা ভয়ের পুঁটলির মতন কিছু যেন ঝুলছিল টের পাচ্ছিলেন। যদি এই মুহূর্তে রুদ্রেন্দু ছুটে আসে! অস্বাভাবিক কি। এসে তাঁর হাত ধরে জিজ্ঞেস করতে পারে, কি হে অমিয় অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম ভাল আছ নিশ্চয়। খুব মন দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছ, তাই না? বেশ বেশ। পাশটাশ করে বেরিয়ে বড় চাকরি করবে, বাপ-মা-কে সুখে রাখবে—আমাদের মতন লক্ষ্মীছাড়াদের দলে মিশতে চেয়ে একদিন সাংঘাতিক ভুল করেছিলে ভাই। নিজে যেমন সারাজীবন কষ্ট পেতে তেমনি বাপ-মা-র চোখের জল কোনদিন ঘোচাতে পারতে না। ভুলটা চট করে বুঝতে পেরে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।

এভাবে খোঁচা দিয়ে ঠাট্টার সুরে কথাটা বলেই কি রুদ্রেন্দু থেমে থাকত। অমিয়বাবুর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না।

তাঁর যেন মনে হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে রুদ্রেন্দুরা তাঁর ওপর একটা সাংঘাতিক আক্রোশ পোষণ করছে। তাই স্বাভাবিক। এসেই হয়তো কিছু বলার আগে অমিয়র নাকে একটা ঘুষি বসিয়ে দেবে। রুদ্রেন্দু তারপর বলবে কি হে, ভাল ছেলে খুব যে স্বদেশী করবে টেরর সৃষ্টি করে ইংরেজকে দেশছাড়া করবে বলে আমাদের সঙ্গে মিশে দিনকতক খুব লাফিয়েছিলে সব লম্ফঝম্ফ শেষ হয়ে গেল? শেষটায় নেংটি ইঁদুরের মতন গর্তে ঢুকে পড়লে! কারণ কি? বাপ-মা মনে আঘাত পাবে বলে? তোমার মুন্সেফবাবার চাকরি চলে যাবে ভয়ে? তাছাড়া লেখাপড়া করে একটা বেশ বড় চাকরি বাগিয়ে বিয়ে-থা করে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের আরামের জীবন কাটাবার স্বপ্ন চিরকালের মতন নষ্ট হয়ে যাবে বলে? ওফ্—তোমরাই দেশের আসল শত্রু অমিয়। আমরাও বাবা-মায়ের ছেলে, আমাদের দিয়েও তাঁরা অনেক কিছু আশা করেছিলেন। তাঁদের সুখে রেখে ভাল চাকরিটাকরি বাগিয়ে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে আরামের আহ্লাদের জীবন কাটাবার সাধ আকাঙ্ক্ষা আমাদেরও ছিল। তবে কেন আমরা আজ রক্তঝরান সর্বনাশের পথে ছুটে চলেছি! এই দেশটা কি শুধু আমার ও আমার মতন ছন্নছাড়া গুটিকয়েক ছেলের? তোমার দেশ না এটা! তোমার মুন্সেফ-বাবা বঙ্কিম দত্তর দেশ না এটা? আঁ কত বড় নির্লজ্জ স্বার্থপর তোমরা একবার ভেবে দেখেছ কি! তাই বলছিলাম তুমি ও তোমার মতন ভাল, ছেলেরা আর তোমার বাবার মতন বাবা কাকা জেঠা দাদারা দেশের পয়লা নম্বরের শত্রু। কেবল ইংরেজকে মেরে তাড়ালেই স্বরাজ আসবে না তোমাদের মতন আগাছা কাঁটাঝোপ নির্মূল করাও দরকার—

চিন্তাটা এই পর্যন্ত এসে অমিয় যেন আর হাঁটতে পারছিলেন না। পা দুটো দুর্বল ঠেকছিল। ভাগ্যিস তখন সিভিল সার্ভিসের বাংলোর কাছে পৌঁছে গেছেন তাঁরা। ডাক্তারবাবু ভিতরে যাচ্ছিলেন। বলাইকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানায় অমিয়কে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। একটা চেয়ারে বসতে পেয়ে কিছুটা স্বস্তিবোধ করছিলেন তিনি। কিন্তু রুদ্রেন্দুর চিন্তাটা তখনও মাথায় ঘুরছিল। তোমার মুন্সেফ-বাবা—রুদ্রেন্দুর এই কথাটার মধ্যে একটু বেশিরকম ঝাঁজ ছিল না কি! অমিয়বাবুর তাই মনে হয়েছিল সেদিন। হয়তো তার কারণও ছিল। রুদ্রেন্দু ও তার দলের ছেলেদের সঙ্গে অমিয়র মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েই যদি বঙ্কিম দত্ত ক্ষান্ত থাকতেন। না, শুধু এই করে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ছেলের ওপর পুলিশের কোনোরকম সন্দেহ না থাকে এই জন্য বঙ্কিমবাবু ম্যাজিস্ট্রেট-এস ডি ও থেকে আরম্ভ করে থানার অফিসারদের সঙ্গে এদের সকলের সঙ্গে মেলামেশা অবশ্য তাঁর বরাবরই ছিল কিন্তু মেশা-মেশির মাত্রাটা হঠাৎ যেন তিনি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। লোকের চোখে ঠেকত জিনিসটা। নিশ্চয় রুদ্রেন্দুদের চোখেও ঠেকেছিল। যেন এমন না করে উপায় ছিল না বঙ্কিমবাবুর। চারদিকে তখন ভীষণ ধরপাকড় হচ্ছে। মাত্র ক'টা দিনের মধ্যে চাটগাঁয়ে কী সব কান্ড ঘটে গেল তারপরই কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্ট সাহেবকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয় আর ঠিক তার চারদিন পরেই ঢাকায় পুলিশের আই জি লোম্যান খুন এবং তিন মাস পার না হতে কলকাতায় দিনদুপুরে রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে বিনয়-বাদল-দীনেশের সেই সাংঘাতিক অ্যাকশন। ইংরেজ সরকার তখন আগুন হয়ে গেছে। ইয়ংম্যান দেখলেই ধরে ধরে জেলে পুরছে। একে একে রুদ্রেন্দুদের দলের সবাই ধরা পড়ল। কেবল রুদ্রেন্দু ও তার একটি সঙ্গী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। শহরের মানুষ কানা-ঘুষো করত রুদ্রেন্দু নাকি কখনও চাষী সেজে, কখনও মাঝি সেজে কখনও পাগল, কখনও সন্ন্যাসীর বেশ ধরে দূরদূরান্তের গ্রামে ধানক্ষেতে পাটক্ষেতে কখনও বা গভীর জঙ্গলে অথবা খালে-বিলে নৌকোর মধ্যে লুকিয়ে থেকে দিন কাটাচ্ছে। দিন কাটাচ্ছে মানে লোকে ধরে নিয়েছিল পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে ভয়ংকর কিছু একটা করবার জন্য সুযোগ খুঁজছে রুদ্রেন্দু। আর ঠিক এমন দিনেই কিনা হুঁ, তখন রাত দশটা বেজে গেছে বঙ্কিম-বাবুর আর্দালী বলাই একেবারে শহরের ভিতর রেল-লাইনের ধারে সদর রাস্তার ওপর হঠাৎ রুদ্রেন্দুকে দেখতে পেল।

সিভিল সার্জনের বৈঠকখানায় বেতের চেয়ারটায় বসে থেকে অমিয় জিনিসটা যত চিন্তা করছিলেন তাঁর মনে হচ্ছিল বুকের

ভিতর ভয়ের সেই পুঁটলিটা ক্রমশ খুলে গিয়ে তাঁর সারা শরীরে ভয়টা ছড়িয়ে পড়ছে। হাত-পা ঝিমঝিম করছিল তাঁর। গলা শুকিয়ে আসছিল। নিশ্চয় এভাবে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শহরে ঢোকার কোনো উদ্দেশ্য আছে রুদ্রেন্দুর। অমিয় ভাবলেন, হয়তো মুন্সেফ বঙ্কিম দত্তর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে সে। পুলিশের লোকের সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর মেলামেশা রুদ্রেন্দু সহ্য করতে পারছে না। কোনো বিপ্লবীই এ-জিনিস সহ্য করবে না। হয়তো সেই সঙ্গে অমিয়কেও খুঁজছে সে। বাপের অপরাধ ছেলেকেও পায় যে।

ফেরার সময় অবশ্য ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে বসে অমিয় বাড়ি ফিরতে পেরে কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন। সিভিল সার্জন বনবিহারীবাবুর চিকিৎসার গুণে বঙ্কিমবাবু দিন দুয়েকের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এবং অমিয়বাবুর মনে আছে একটু সুস্থ হতে না হতে আরদালী বলাইয়ের মুখে রুদ্রেন্দুর খবরটা শুনে বঙ্কিমবাবুকে কেমন চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখা গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অমিয়কে ডাকেন। অমিয়বাবু জিনিসটার ওপর তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না এমন একটা ভাব দেখান। বলাই ভুল দেখেছে। রুদ্রেন্দুকে সে হয়তো চিনতে পারেনি। বাবাকে অমিয়বাবু বুঝিয়েছিলেন। কৈ, তাঁরা রেল-লাইন পার হবার পর তাঁর পাশ দিয়েই লোকটা হেঁটে গেল—ওটা যদি রুদ্রেন্দু হত নিশ্চয় অমিয় ঠিক চিনতেন তাকে ইত্যাদি। অর্থাৎ অমিয়বাবু চাই-ছিলেন না দুর্বল শরীর নিয়ে বঙ্কিমবাবু রুদ্রেন্দুর ভাবনা ভাবুক। এবং আড়ালে ডেকে অমিয়বাবু বলাইকে আর একবার ধমক লাগিয়েছিলেন। তোর মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। হুট করে কর্তা-বাবুর কানে রুদ্রেন্দুর কথাটা তোর না তুললেই চলছিল না আহাম্মক। বলাই ঘাড় গুঁজে চুপ করে ছিল। অর্থাৎ এবারও যা বুঝবার সে বুঝতে পেরেছিল।

এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পরে পাশের একটা গাঁয়ে একটা রিভলবারসহ রুদ্রেন্দু ধরা পড়ে। রাত্রে ধরা পড়ে। রুদ্রেন্দু নাকি কোন এক চাষীর গোয়ালের পিছনে খড়ের গাদার মধ্যে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার গ্রেপ্তারের খবরটা শুনে শহরের লোকের মনের ভাব কি হয়েছিল অমিয়বাবু বলতে পারেন না। কেননা এর আগে যদিও বা একটু-আধটু তিনি বাড়ীর বাইরে গেছেন সেদিন রাত্রে সিভিল সার্জনকে ডাকতে যাবার সময় রাস্তায় যে ঘটনা ঘটে তার পর থেকে একদম তিনি বাড়ী থেকে বেরো-চ্ছিলেন না। রুদ্রেন্দু ধরা পড়েছে শোনার পরেও অমিয় বেশ কিছু দিন বাড়ীর বাইরে এক পা বাড়ান নি। রুদ্রেন্দু ধরা পড়লেও রুদ্রেন্দুর সঙ্গী শিবেনকে পুলিশ ধরতে পারে নি। ধরা পড়ার আগে রুদ্রেন্দু যে শিবেনকে কোন রকম নির্দেশ দিয়ে যায় নি তাই বা কে জানত। সে জন্য অমিয়বাবুর দুশ্চিন্তাটা তখনও এক রকম ছিল। দিন সাতেক পরে শিবেন আর একটা গাঁয়ে একটা পাটক্ষেতের মধ্যে ধরা পড়ে।

খবরটা শুনে বঙ্কিমবাবু সেদিন যে কী খুশী হন—তাঁর চেহারা দেখে অমিয় বুঝতে পেরেছিলেন। অমিয়বাবুও কি কম খুশী হয়েছিলেন। হুঁ, নিজের জন্য যত না তার চেয়ে অনেক বেশী মুন্সেফ বাবার কথা ভেবে। এতদিন পর একটা সাংঘাতিক রকম দুশ্চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল। অমিয় মনে মনে বলেছিলেন। রুদ্রেন্দুদের দলের আর কেউ বাইরে রইল না।

আজ এখন গড়িয়াহাট রোডের ওপর টুটুল ও টুটুলের বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে ঝুপসিমাথা বকুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সেদিনের কথাগুলি মনে পড়তে অমিয় নিজের মনে হাসছেন যদিও। ওফ—কি সব দিন গেছে।

তবে এটাও সত্য সেদিন যেমন রুদ্রেন্দু একটা অবাঞ্ছিত মানুষ ছিল, সিভিল সার্জনের বাংলোয় যাবার পথে রেল লাইনের ধারে বলাই তাকে দেখে চিনতে পারলেও রাস্তার অস্পষ্ট আলোর জন্য অমিয় যেহেতু চট করে তাকে চিনতে পারেন নি এবং রুদ্রেন্দুও অমিয়কে চিনতে পারে নি—এই জন্য ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানায় বসে অমিয় মনে মনে ঈশ্বরকে যে কত ধন্যবাদ জানিয়ে-ছিলেন। বলা যেত কি, চিনতে পারলে রুদ্রেন্দু হয়তো আক্রোশের বশে তখনই অমিয়র নাকে ঘুষি বসিয়ে দিত—বা সঙ্গে রিভলবার কি বোমাটোমা থাকলে—কথাটা চিন্তা করে বার বার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল অমিয়র।

আজও রুদ্রেন্দু সেই অবাঞ্ছিত মানুষই থেকে গেছে। ট্রাম গাড়ীটার মত রুদ্রেন্দু ওপারে আটকে গেছে। গাড়ীটা সরে গেলেই এই ফুটপাথে উঠে আসবে।

অমিয় মনে মনে তা মোটেই চাইছিলেন না। যেন মফঃস্বল শহরের মতন কলকাতার এই রাস্তাটাও আবছা অন্ধকার থাকলে ভাল ছিল। রুদ্রেন্দু তাঁকে দেখতে পেত না। হাত তুলেও ডাকত না।

তবে সেদিন সতীশ বাড়ুয্যের ছেলে যে যে কারণে একটা ভয়ংকর অবাঞ্ছিত আতঙ্ক-জনক মানুষ ছিল আজ সে সব কারণের ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই।

অমিয় এটা ভালই জানেন। বিপ্লবীদের ভাবায় রুদ্রেন্দু যদি সেদিন জ্বলন্ত এক খণ্ড হীরক ছিল আজ সে ঠাণ্ডা এক টুকরো কাঠকয়লা। না কি তার চেয়েও অধম।

রুদ্রেন্দু নকশাল হয়েছে—বাবার এটা ছেলেমানুষী ভাবনা। তা নয়। অমিয় যেটা আশঙ্কা করছেন—রুদ্রেন্দু অভাবী মানুষ। টাকা-পয়সা ধার করার জন্য হয়তো এ-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছে। রঞ্জুর কাছে শ্যেমন সেদিন বলেছে, রুদ্রেন্দুর পরিচিত কে এক ভদ্রলোক আছেন এ-পাড়ায়। বলা যায় না যদি সেই ভদ্রলোকের কাছে ধার-কর্জ চেয়ে না পেয়ে থাকে তো রুদ্রেন্দু হয়তো যেহেতু রাস্তায় অমিয়র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এখন তাঁর কাছে হাত পাততে পারে। অর্থাৎ বঙ্কিমবাবু প্রথম দিন যা আশঙ্কা করে-ছিলেন ওটাই সত্য। না অবুঝ-নিলয়ে ঢুকত না রুদ্রেন্দু ঠিকই। বাবার জন্য ঢুকত না। এখন রাস্তায় অমিয়কে দেখে সেই সুযোগটা যে নেবে না কে বলবে।

(ক্রমশঃ)

পক্ষী যুগল : ব্রোঞ্জ ঢালাই ভাস্কর্য : অজিত চক্রবর্তী

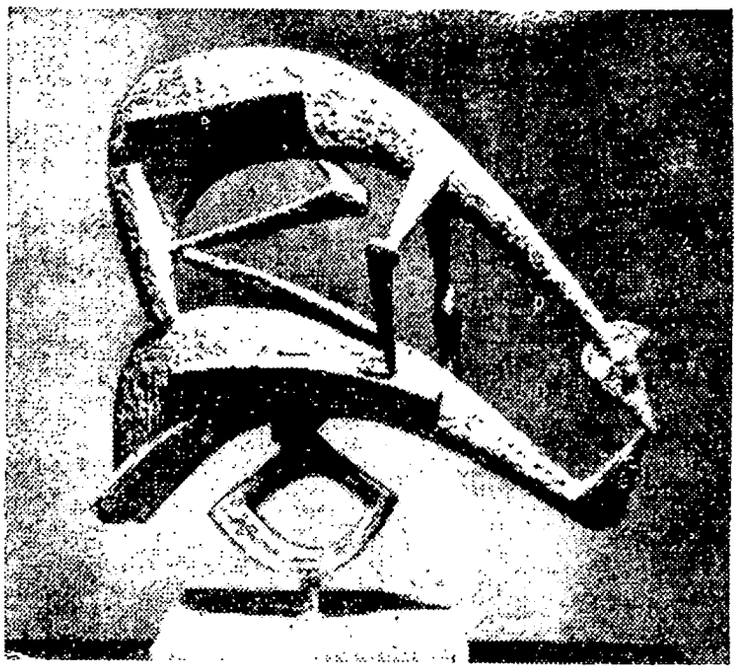

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচর্চার এক বছর

সম্প্রতি বিড়লা এ্যাকাডেমি অফ আর্ট-এর অষ্টম বাৎসরিক সাম্প্রতিক কলা প্রদর্শনী হয়ে গেল। বিড়লা এ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষ সৌভাগ্যবান। তাদের আয়োজিত বাৎসরিক এ প্রদর্শনীতে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় রামকিঙ্কর বৈজ চিন্তামণি কর নীরদ মজুমদার এবং পরিতোষ সেন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত সক্রিয় চিত্রকর ভাস্কর এবং ছাপের-ছবি নির্মাতারা সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করেন। চিন্তামণি কর এবং পরিতোষ সেন অবশ্য অন্যভাবে এ-প্রদর্শনীর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের সক্রিয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পীদের মধ্যে এবারের প্রদর্শনীটিতে কেবল সোমনাথ হোড় বিকাশ ভট্টাচার্য সুনীল দাস যোগেশ চৌধুরী শর্বরী রায়চৌধুরী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিজন চৌধুরী এবং মীরা মুখোপাধ্যায়ের কোন কাজ দেখা গেল না। এঁদের কাজও প্রদর্শনীতে দেখা গেলে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারত প্রদর্শনীটি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকলা চর্চার একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী। তবু যে-সব চিত্রকর ভাস্কর এবং ছাপের ছবি নির্মাতাদের কাজ এ-প্রদর্শনীতে দেখা গেছে তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে এ-প্রদর্শনীটি দেখলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পভাবনার এবং শিল্পচর্চার মূল ধারাগুলির পরিচয় যে রকম পাওয়া যায় তেমন আর কোন সংকলনধর্মী প্রদর্শনীতে পাওয়া যায় না। এটা উদ্যোক্তাদের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় হয়। এ-প্রসঙ্গে বলা দরকার প্রদর্শনীটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত। বাঙালী এবং অবাঙালী শিল্পী যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে থেকে কাজ করেন যে-সব বাঙালী শিল্পী কার্যসূত্রে এখন এ-বাংলার বাইরে থেকেও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগশূন্য নন এবং যে-সব অবাঙালী শিল্পী একদা পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন এবং আজও এ-রাজ্যের শিল্পচর্চার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন এ-প্রদর্শনীতে তাঁদেরই কাজ দেখা যায়।

প্রদর্শনীটি দেখে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকলচর্চার সাম্প্রতিকতম ধারা এবং ভাবনার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাতে উল্লসিত হওয়া বা উৎসাহিত বোধ করা তো দূরে থাক খুব আশান্বিতও হওয়াও যায় না। অধিকের উপর কাজ শিক্ষার্থীসুলভ অর্থাৎ সে-সবে উচ্চারিত নিজস্বতা দুর্লক্ষ্য; দেখলেই মনে হয় এখানে এর রীতির প্রভাব ওখানে ওর শৈলীর প্রভাব একটা না একটা ফ্যাশনকে দুরস্ত করার চেষ্টা হয়েছে। শিল্পসৃষ্টি কখনও প্রভাবশূন্যভাবে হয় না। কিন্তু প্রভাবটা যদি শুধুমাত্র বহিরঙ্গেরই হয় তখন অসুন্দর হয়। সার্থক শিল্পরীতি বা শৈলীর বহিরঙ্গরূপ একটা ভূয়ো দর্শনকে দৃশ্যমান করে, কোন গভীর কথা বলে। সেই ভূয়োদর্শনকে আত্মস্থ না না করে বহিরঙ্গের মোহে যদি বহিরঙ্গটিকেই অবলম্বন করা হয় তবে তা অসুন্দর হয়ে উঠবেই। এ-প্রসঙ্গে গণেশ পাইনের কথাই ধরা যাক। কেননা ইদানীং তাঁর কাজের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের বহু তরুণ চিত্রকরের কাছেই অপ্রতিরোধ্য। কাঠামোগতভাবে গণেশ পাইনের ছবির মূল উপাদান তাঁর আলো-আঁধারির ব্যবহার যা তিনি বর্ণ এবং বর্ণান্তরের সাহায্যে দৃশ্যমান করেন। তাঁর হাতে আঁধার রহস্যময় হয়ে ওঠে আলো হয় মায়াবী এ-কারণেই যে তিনি ছবিতে একটি উৎস থেকেই আলো আনয়ন করেন না এবং আঁধারকে বহু স্তর ঘনত্ব দান করেন। বর্ণ এবং বর্ণান্তর ব্যবহার একান্তভাবেই তাঁর বিশিষ্ট মাধ্যমজাত; —যে মাধ্যমের ব্যবহার তিনি জানাতে অনিচ্ছুক। তাঁর ছবির দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান তাঁর চিত্রক্ষেত্রে ব্যবহার এবং ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার-ও-আয়তন বিশিষ্ট রূপবন্ধের পারস্পরিক সংস্থাপন। এখানেও তাঁর বর্ণিকাভঙ্গ ক্রিয়াশীল; প্রধানতঃ বর্ণিকাভঙ্গের কারণেই তাঁর সীমিত চিত্রক্ষেত্র অসাধারণ গভীরতা পায়। গণেশ পাইনের দুর্বলতা রূপবন্ধের আকার এবং শরীর নির্মাণে। আজ পর্যন্ত তিনি রূপবন্ধের শরীর এবং আকার নির্মাণের কোন নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করে ওঠেন নি, যদিও বহু আকর্ষণীয় আকার এবং রূপবন্ধ সৃষ্টি করেছেন। গণেশের অনুকারকরা সহজেই গণেশের দুর্বলতাটুকু অনুসরণ করেন কিন্তু তাঁর শক্তির উৎসটির সন্ধান পান না। এত কথা এ-জন্যই বললাম যে পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রতিকালে অনুষ্ঠিত অন্যান্য প্রদর্শনীর মতন এ-প্রদর্শনীতেও বহু ছবি দেখা যায় যা পাইনের কাজের কথা মনে পড়ায়। গণেশ পাইনের মতন বিকাশ ভট্টাচার্যের পদাঙ্কানুসারীর সংখ্যা কিছু কম নয়। দলে কম নয় সুনীল দাস এবং প্রকাশ কর্মকারের অনুসারীর।

এ-তো গেল সে-সব শিল্পীদের প্রসঙ্গ যাঁরা মানসিকতায় এখনও শিক্ষার্থী এবং এখন পর্যন্ত নিজস্ব ভূয়োদর্শনজাত কোন নিজস্ব শিল্পরীতিতে উপনীত হতে পারেন নি। অপেক্ষাকৃত দক্ষ সুপরিচিত কলাকার যাঁরা তাঁদের শিল্পরীতিতে নিজস্ব ভাবনা রাখতে কথঞ্চিৎ সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই বা আমাদের কি দিতে সক্ষম হয়েছেন তা একটু দেখা যাক।

গণেশ পাইন নিঃসন্দেহে এ-রাজ্যের তরুণ শিল্পীদের অগ্রগণ্য। সম্প্রতিকালে যে কজন অঙ্গুলিমেয় শিল্পীর কাজের মধ্য

দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আবার সর্বভারতীয় শিল্পকলা ক্ষেত্রে সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে গণেশ পাইন তাঁদের একজন। এ-প্রদর্শনীতে তাঁর যে ছবি দেখা গেল তা তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে নি। এ ছবিতে কোথায় তাঁর সে আলো-আঁধারির রহস্যময় বহুস্তর খেলা কোথায় সে রঙের যাদু? ক্ষুদ্রায়তন চিত্রক্ষেত্রকে তিনি যে বিস্তার যে ঘনত্ব দিতে সক্ষম তার প্রমাণ কই এ-ছবিতে? বাচনিক অর্থে ছবিটি বড় বেশী ফ্ল্যাট একমাত্রিক সাদামাটা। গণেশ বোধহয় তাঁর শিল্পভাবনার মোড় ফেরার একটা মধ্যবর্তী পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। গণেশের কাছে আমাদের আশা অনেক সুতরাং চাওয়াও বেশী। তিনি ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে বাংলার নেতা। এ নেতৃত্বের দায়িত্ব বড় গুরুভার।

দুঃখ দেয় আরেকজন অসাধারণ প্রতিভাধর চিত্রকর প্রকাশ কর্মকারের ছবিতে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির প্রকাশ। পূর্ণ মানবদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন যোনি স্তন নিতম্ব অত জীবন্ত অত আকর্ষক অত পেলব কোমল মিষ্টি রঙে রাঙ্গান হতে যখন দেখি তখন মনে হয় প্রকাশ যৌনতার বেসাতি করছেন: যে যৌনতার বেসাতি করছেন তা জীবন মন মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ওঁর ছবির রঙ, বিন্যাস এবং রূপকল্প কোন আভ্যন্তরীণ অনিবার্য সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়।

প্রদর্শনী দেখে মনে হল আমাদের অধিকাংশ খ্যাতনামা শিল্পীই চিন্তার দৈন্যে ভুগছেন। এ দৈন্য বিষয়-ভাবনার দৈন্য। বিষয়-ভাবনার নতুনত্ব বিষয়-ভাবনা প্রকাশের তাগিদ নতুন অর্থবহ কিছু করার সাহস জোগায়। এই নতুন কিছু বলার নতুন কিছু করার সাহসের অভাব প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবিতে পরিলক্ষিত হয়। নতুন অর্থবহ শিল্পভাষায় নতুন কিন্তু অনুভূত সত্য অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার অক্ষমতা দু'ভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এক ধরনের প্রবণতা দেখা যায় ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত সনৎ কর গণেশ হালুই কাঞ্চন দাশগুপ্ত প্রমুখদের ছবিতে এবং অন্য আরেক ধরনের প্রবণতা দেখা যায় শ্যামল দত্তরায় রবীন মন্ডলদের কাজে। প্রথম প্রবণতার চরিত্র-লক্ষণ সুচারু হবার দিকে ঝোঁক। যে ঝোঁকটি থেকে আসে কারুকলা বিষয়ে অতি-সতর্কতা এবং কারুকর্মে শিল্পবস্তু নির্মাণে প্রাধান্য দেওয়া। সুচারুতা এবং বশ্যতা প্রকাশিত হয় লক্ষণীয়ধর্মী অলঙ্কার-বাহুল্য মারফৎ। ধর্মনারায়ণকে তাঁর গল্প বলার প্রবণতা থেকে বিরত হওয়া উচিত। সনৎ করের কাজে যে নকশাধর্মী অতি-অলঙ্কার প্রবণতা দেখা যায় তা তাঁর ছবির উদ্দিষ্ট গীতিময়তা (লিরিসিজম)-কে ব্যাহত করে। অন্য দিকে শ্যামল দত্তরায় এবং রবীন মন্ডলের কাজ দেখে মনে হয় বহুকাল ধরে এক ভাবনা তাড়িত হয়ে একই ধরনের কাজ করতে করতে তাঁরা অবসাদগ্রস্ত। সেই [illegible] ছবির শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বি আর পানেসর দক্ষ হাতে কোলাজ করেন। তবে হাতে পাওয়া ফোটো-গ্রাফের রঙ, বুনট ইত্যাদি তিনি চিত্রতলে বিন্যস্ত করে তিনি অর্থবহ নকসা গড়ে তুলতে যতটা দক্ষ হাতে পাওয়া রূপবন্ধ বা রূপকল্পের ব্যবহার সম্বন্ধে বোধহয় ততটা সচেতন নন। বড় ছবিতে তিনি হাতে পাওয়া রূপবন্ধের যে-ভাবে চারিত্র্য পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছেন ছোটটিতে তা করতে পারেন নি। তিনি সেখানে রূপবন্ধকে প্রায় তাদের ফোটোগ্রাফারের উদ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন যা কোলাজের ধর্মসম্মত নয়।

মনু পারেখের তেল-রঙের ছবিটি বোধহয় প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। জ্যামিতির কারাগারে জীবনের জন্ম-যন্ত্রণা গত কয়েক বছর যাবৎ পারেখের ছবির বিষয়বস্তু। ছবির নির্মাণে সেই বিষয়কে দর্শনেন্দ্রীয়গ্রাহ্য করে তোলার কাজে তিনি উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করে চলেছেন। তবে পারেখের ছবিতে সব সময়েই কথঞ্চিত অতি-কথনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বীণা ভার্গব এবং অলোক ভট্টাচার্যের ছবিতে যে শুধু সমধর্মী বিষয়-চেতনা লক্ষ্য করা যায় যে তা নয়, ওঁদের উভয়েরই রূপবন্ধ উপস্থাপন এবং ক্ষেত্রবিন্যাস পদ্ধতির মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায় যদিও ওঁদের দু'জনের রূপবন্ধ নির্মাণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুহাস রায়ের কালি এবং ওয়াশের কাজে এক ধরনের বিষয় সচেতনতা ধরা পড়লেও ছবিতে ভাবের ভীষণ অভাব: কোন কিছু যেন ছবিকে ধরে রাখে না: না রঙের জোর (কালোর) না কোন ম্যাস না কোন বাঁধুনী ছন্দ না কোন রেখার বেড়। ফলে ছবি জমে ওঠে না। লালুপ্রসাদ সাউর এচিং-এ এক বিশুদ্ধাচারী সহজ সবল জ্যামিতির ধ্যানমগ্ন সত্তার সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় জ্যামিতি-সর্বস্ব বিশুদ্ধতা কি আমাদের দেশের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য হতে পারে? হরেকৃষ্ণ বাগ-এর লিথোগ্রাফির বিভিন্ন কারুকৌশলে তাঁর সহজ বিচরণ আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু তাঁকে অনায়াসেই এ-প্রশ্ন করা যায় যে কারুকৌশলই কি শিল্পের সব? তুলনায় রিণী দাশগুপ্তের কারুকৃতি কম কিন্তু তিনি প্রায় বর্ণপ্রলেপের ভঙ্গির ভাষায় যে-সব মনস্যাকার সৃষ্টি করেন দর্শনেন্দ্রীয়ানুভূতির ভাষায় তারা কথা বলে ওঠে।

অজিত চক্রবর্তী এবং মাণিক তালুকদারের ভাস্কর্যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায় এঁরা দু'জনেই ভাস্কর্য সৃষ্টির সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু যা পাওয়া যায় না তাঁদের কাজে তা হল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উত্তাপ। এটা বোধহয় আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের মৌল সমস্যা।

অনিলবরণ সাহার চিত্রপ্রদর্শনী

গত সপ্তাহে কলকাতার ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস প্রেক্ষাগৃহে অনিলবরণ সাহার একগোটি জল-রঙের ছবি পাঁচটি তেল-রঙের ছবি এবং দুটি কালি-কলমের ড্রইং-এর সমাহার-এর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। অনিলবরণ সাহা কলকাতার শিল্পরসিক মহলের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব; তিনি বহুকাল ধরে ছবি এঁকে আসছেন। বিদেশীরা ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় শিল্প বলতে যে-সব রূপকল্পের সমাহার বুঝে থাকেন, অনিলবরণের ছবিতে সে-সব দেখতে পাওয়া যায়। সে-জন্য পশ্চিম দেশীয় বিদেশী মহলে অনিলবরণের ছবির বেশ কদর আছে।

বাৎসরিক প্রদর্শনী : এবারে ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ড্রফটসম্যানসিপের (দিবা বিভাগ) বাৎসরিক প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘদিন কলেজটি বন্ধ ছিল। কলেজ খোলার পর ছাত্রছাত্রীরা আবার প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীটির সর্বাঙ্গে একটা পরিচ্ছন্ন সুন্দর রুচির ছাপ স্পষ্ট।

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাস্কর্য বিভাগের কয়েকটি কাজ। বিশেষ করে সুনীল দাসের টরসো (কাঠ) এবং সরোজ ব্যানার্জীর 'মা ও শিশু' (সিমেন্ট)। ফাইন আর্টে কিছু জল-রঙের ছবি উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে একটি 'পোর্ট্রেট' ও কিছু 'স্টিল লাইফ'। পেন ও কালির স্কেচগুলি প্রশংসার দাবী রাখে।

কমার্শিয়াল বিভাগের 'পোস্টার' ও 'রেকর্ড কভার'-এ নিপুণতার নিদর্শন স্পষ্ট। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হরিমোহন বাগলি দীনেশ দাস অজয় রায় দিলীপ দে ইলা দের কাজ।

এছাড়া প্রথম বার্ষিক ছাত্রছাত্রীদের কাজ প্রশংসার দাবী রাখে।

৭ম বার্ষিক সারা বাংলা শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা : প্রজাতন্ত্র দিবসে অন্যতম শিশু অনুষ্ঠান হিসাবে ২২ পল্লী সাংস্কৃতিক সংগঠন আয়োজিত ভবানীপুরের সুভাষ উদ্যানে এক শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতি-যোগিতার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীনীরোদ মজুমদার। তিনি ছোটদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে উৎসাহিত করেন। এই বার্ষিক প্রতিযোগিতায় প্রায় ২০০০ জন পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন বিদ্যা-লয়ের ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। দার্জিলিং বীরভূম পুরুলিয়া মেদিনীপুর নদীয়া ২৪ পরগণা ও কলকাতা থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীর এই সমাবেশ তাদের বিচিত্র বর্ণের পোষাকে বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে। সিনিয়র বিভাগের প্রতিযোগীদের 'শাবকসহ একটি পশু' জুনিয়র বিভাগের জন্য 'একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য' ও টাইনি বিভাগের প্রতিযোগীরা যা খুশী তাই এঁকে সময়ে শেষ করে।

—প্রণবরঞ্জন রায়

সেকালের সঙ্গীতগুণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গানও তিনি গাইতেন। সংগীতকণ্ঠ ছিল তাঁর ছেলেবেলা থেকে। আর এমন দিকপাল গুণীদের সংগলাভের ফলে তার চর্চাও হয়েছিল। তবে আসরে গাইবার মতন কণ্ঠপ্রস্তুতি করেননি তিনি। সেতার সুরবাহারের মাধ্যমেই তাঁর সাধনা ছিল। কিন্তু বড় বড় ধ্রুপদী খেয়ালীদের কাছে গানের সংগ্রহ ও চর্চা নিশ্চয় সমৃদ্ধ করেছিল তাঁর যন্ত্রসংগীতকে। হাত যেমন মিষ্টি, সুরেলা হয়েছিল, তেমনি সুদক্ষ হন তিনি তাল ও লয়কারীতে। তাঁর সেতার বাজনার এই এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, (সুরবাহারের মতন) পাখোয়াজের সংগতে তারপরণ বাজাতেন। ভারি চালের বাজ ছিল তাঁর, সেকালের ধারায়। গভীর ভাবের দ্যোতক আর সাজ্জাদ মহম্মদ মহম্মদ খাঁর ঘরাণার সেই দীর্ঘ মিড়ের সংগে সূক্ষ্ম অলংকরণ তিনিও নিষ্ঠার সংগে প্রয়োগ করতেন।

এক কথায়, সেতার সুরবাহারে তাঁর তুল্য শিল্পী বাঙ্গালীদের মধ্যে হয়ত ছিলেন না তাঁর সমকালে।

চৌকস ব্যক্তি ছিলেন বামাচরণ। একদিকে ন্যায় দর্শনের পান্ডত। তারপর নিজের সাধনায়, অধ্যবসায়ে আর ওস্তাদদের শিক্ষায় হলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সেতার সুরবাহারের গুণী। আবার নিজের হাতে সেতারযন্ত্রও তৈরি করতেন। সে যন্ত্র দস্তুরমত বাজাতেন বড় বড় আসরে। তুম্বরার বদলে আগাগোড়া কাঠের তৈরি তাঁর সেই সেতার—যার মধ্যে খোদাই করেছিলেন তাঁর ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর চিত্র—জিতেন্দ্রনাথ পর্যন্ত পরে বাজিয়েছেন। বাঁশির মতন সুরেলা তার-ধ্বনি ছিল বামাচরণের তৈরি সে সেতারের। তাছাড়া অতি সূক্ষ্ম সূচীকর্মও করতেন তিনি রেশমী বস্ত্রের ওপরে একবার একটি মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ীতে এত চমৎকার পুষ্পলতাপাতার সূক্ষ্ম-শোভন সূচীকার্য করেছিলেন যে সেটি একটি দ্রষ্টব্য শিল্পনিদর্শন হয়েছিল। সেজন্যে ময়ূরভঞ্জের রাজা হাজার টাকা পুরস্কার দেন বামাচরণকে।

এমনি নানাভাবে তাঁর শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ আত্মপ্রকাশ করত। আর তাঁর সংগীতপ্রতিভার যোগ্য উত্তরসাধক হলেন একমাত্র পুত্র জিতেন্দ্রনাথ। ওই সেতার সুরবাহার যন্ত্রেই পিতার ধারায় তিনি বিকশিত হতে লাগলেন। অন্য বিদ্যার উত্তরাধিকার কিছু পেলেন না তিনিও শুধু কিছু ব্যাকরণ ও কাব্য শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন পিতার কাছে। আর জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা জিতেন্দ্রনাথ নিজেই করেছিলেন। তবে তা তাঁর উত্তরজীবনের কথা। সে প্রসংগ পরে আসবে।

জিতেন্দ্রনাথের শিক্ষার ভাগ্য ভাল যে, বামাচরণ সেসময় থেকেই শেখাতে আরম্ভ করে দিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান তখন ১২ বছরের হলেও ৫০ পার হয়ে গেছেন তিনি। তবু ৬।৭ বছর পুত্রকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন। সঠিক পথে উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছিলেন জিতেন্দ্রের সংগীতজীবন।

ভারতীয় রাগবিদ্যার শিক্ষা গুরুমুখী। অর্থাৎ একান্তভাবে গুরু নির্ভর। তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে ও সংগলাভেই শিক্ষার্থীর সংগীতজীবন গঠিত হয়ে থাকে। তেমনি একথাও সত্য যে, প্রতিভা ও সাধনা ভিন্ন এ বিদ্যালাভ গ্রহীতার পক্ষেও অসম্ভব। বিদ্যার্থীর অন্তরে শিল্পীর সৃজনীশক্তি থাকা আবশ্যক। তবেই গুরুর শিক্ষা সার্থক হতে পারে। আর সে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল—রীতিনীতি। কারণ রাগসংগীত বিধিবদ্ধ শিল্প। রস-সৃষ্টির বাধা না হয়েও তার শিক্ষা ও সাধনা সেজন্যে পদ্ধতিগত। একথা কণ্ঠসংগীতে যেমন সত্য, যন্ত্রসংগীতেও তার চেয়ে কম নয়। কারণ হস্ত সাধনের আছে নিয়ম প্রণালী। গুরু পরম্পরায় পরীক্ষিত সেই রীতি অনুসরণ করলে কুশলী বাদক হওয়া যায়। অন্যথায় হাত সাবলীল হবে না। শিল্পীরূপে উন্নতি তথা আত্মপ্রকাশের পথ থাকবে অবরুদ্ধ।

এমনি প্রণালীবদ্ধ শিক্ষা বামাচরণ পুত্রকে দিতে লাগলেন। নিয়মিত পাঠ—ক্রিয়া ও বিদ্যায় অঙ্গাঙ্গী। একসঙ্গে নিয়ে বসে জিতেন্দ্রকে সাধন করাতেন। আর যখন রাণাঘাট থেকে বাইরে যেতেন—ময়ূরভঞ্জ, নাড়াজোল পটেৎগড়, গোবরডাঙ্গা কলকাতা (রাজা সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর ভিন্ন এখানে শ্যামাপুকুরের কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন বামাচরণের এক গুণগ্রাহী) কিংবা অন্য কোথাও—নির্দিষ্ট করে দিতেন চর্চার বিষয়বস্তু। সেতারে, পরে রাগবিদ্যায় আরো অগ্রসর হলে, সুরবাহারেও।

পিতার কাছে জিতেন্দ্র শুধু যে শিখত, তা-ই নয়। কোন কোন আসরেও তাঁর বাজনা শোনবার সুযোগ পেয়ে যেত। বামাচরণের সেই পরিণত প্রতিভার সময়কার সব আসর। বাইরের শ্রোতাদের, সমঝদারদের সামনে নামী তবলচীদের সংগতে তিনি কেমন আসর মাৎ করতেন, তার কিছু কিছু পরিচয় সে পেয়েছে। পিতার সেই সব বাজনা শোনা শিক্ষার দিক থেকেও কম লাভ হয়নি তার পক্ষে। বামাচরণের তেমনি কোন কোন আসরের স্মৃতি জিতেন্দ্রনাথের মনে চিরদিনের জন্যে গাঁথা ছিল। বিশেষ ভৈরব সহায়ের সংগে সেই বাজনার কথা। কাশীর দুর্ধর্ষ তবলিয়া ভৈরব সহায় সেবার এসেছিলেন রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের দরবারে। 'বেনারস বাজ'-এর প্রবর্তক রাম সহায়েরই ঘরাণাদার দিকপাল সংগতকার ভৈরব সহায়। লহরা বাজিয়ে সে আসরে ত বিদ্যুৎ চমক সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন ছন্দ বৈচিত্র্য, তেমনি লয়কারী আর কি ধ্বনির ঐশ্বর্য—যেন মেঘমন্দ্র-শব্দ পরম্পরা। তাঁর সেই তবলা লহরার পর কথা উঠল—কোন যন্ত্রী আছেন এখানে যাঁর হিম্মৎ হবে ভৈরব সহায়ের সংগে বাজাবার?

তখন বামাচরণ ছিলেন সে আসরে। তিনি কর্তাদের কথায় যন্ত্র আনালেন। বাজালেন ভৈরব সহায়ের সংগে। তা সে শোনবার মতন বাজনা বটে। বামাচরণ সেদিন রাণাঘাটের সংগে যেন বাংলারও মান রেখেছিলেন। আর তাঁর নাম ভৈরব সহায় মনে রেখে ফিরে যান কাশীতে। অনেক বছর পরে জিতেন্দ্রনাথ তার পরিচয় পেয়েছিলেন।

জিতেন্দ্রনাথের যন্ত্রসংগীত-শিক্ষা পিতার ধারায় ও দৃষ্টান্তে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। প্রতিভাবান উত্তম আধার। আর শিক্ষাদাতাও বাংলার এক দিকপাল কিন্তু বিস্মৃত কলাবৎ। বহু দিন যাবৎ বহু গুণীর সংগলাভে যে বিদ্যা সঞ্চয় করেছিলেন বামাচরণ পুত্রকে তার উত্তর সাধক করতে লাগলেন। তিনি বুঝেছিলেন, অন্য কোন বিদ্যালাভ জিতেন্দ্রনাথের ঘটবে না। সংগীতই হবে তার জীবনের অবলম্বন। তা ছাড়া, তাঁর নিজেরও আয়ু শেষ হয়ে আসছিল একথাও হয়ত মনে জাগত। আরো তৎপর হয়েছিলেন সেজন্যে।

একটা বিষয়ে লক্ষ্য করে বোধহয় বামাচরণ আশ্বস্ত হতেন। সৃজনীশক্তি আছে জিতেন্দ্রনাথের। শুধু পাখির মতন কণ্ঠস্থ নয়। রাগের রূপ তার ধারণায় আসে। কাঠামোর ডৌলটি দিলে তার বিস্তারও খানিকটা করতে পারে সে। আর সেই সংগে মনও সুরের সূক্ষ্মতায় সংবেদনশীল। সুরবোধও সহজাত। সাজিয়ে বাজাবার মতন সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যজ্ঞান গড়ে উঠছে। রিয়াজ করে তন্ময় হয়ে। নিজের মনেরই তাগিদে। লেখাপড়ার মতন এজন্যে আর কিছু বলতে হয় না।

সবই সুলক্ষণ। কিন্তু একটি চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন বামাচরণ শরীর তাঁর যেন জীর্ণ হয়ে আসছে। আর কতদিন এ জীবন থাকবে? বয়স হল ত প্রায় ষাটের কোঠায়। এদিকে রাগ-বিদ্যা ত সমুদ্র বিশেষ। তাঁর নিজেরই রাগ সঞ্চয় ত বিপুল। শীর্ষস্থানীয় নানা কলাবৎ কলাবতীদের কাছে আপন প্রতিভায় সংগ্রহ বা আয়ত্ত করেছেন।

কত দুর্লভ, অপ্রচলিত রাগ পরম যত্নে লালন সাধন করেছেন এযাবৎ। একমাত্র পুত্র, সুযোগ্য বংশধরকে সবই দেবার বড় ইচ্ছা। কিন্তু তাকে এত শেখাবার অবসর কি এই শেষ জীবনে হবে?

এমনি ভাবনা থেকে এক উপায় স্থির করলেন বামাচরণ। স্বরলিপি রচনায় মন দিলেন। লিপিবদ্ধ করে রাখতে লাগলেন বিভিন্ন রাগ রূপ। স্বরলেখায় যতটুকু সম্ভব—এক একটি রাগের বিষয়ে নির্দেশ। তার বাদী সংবাদী কিংবা আরোহণ অবরোহণ শুধু নয়। পকড় ও আওচরও। জিতেনের হাত তৈরি হয়েছে। পথ ধরে

নিতে পেরেছে। এইসব লিপি থেকে উদ্ধার করে নিতে পারবে আরো নানা বস্তু বা হাতে কলমে শেখবার সুযোগ হবে না হয়ত।

পন্ডিতরা সেকালে পুঁথি লিখে রাখতেন। রামাচরণ তেমনি পুত্রের জন্যে সংগীত-লিপি লিখতেন যতখানি তাঁর পক্ষে সম্ভব। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল যেন 'মুকুতার পাঁতি'।

অবশ্যই যত লেখবার ইচ্ছা করেছিলেন শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই শেষ হল রামাচরণের ইহজীবন। সেবার ময়ূরভঞ্জ থেকে রাণাঘাটে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর জীবনের অবসান ঘটল দিন কয়েক রোগভোগেই।

তাঁর বয়স তখন কমবেশি ৬০ বছর। আর জিতেন্দ্রনাথ ২০-র নীচে।

রামাচরণেরও পৈত্রিক বাস ছিল নদীয়া জেলার এই রাণাঘাটে। আর জিতেন্দ্রনাথেরও সেখানে জন্ম ১৮৭৭ সালে।

ভট্টাচার্য তাঁদের বংশানুক্রমিক সংস্কৃত চর্চার জন্যে উপাধি। তাঁদের পদবী হল—চট্টোপাধ্যায়। কাশ্যপ গোত্র।

বেশ কটি জমিদার দরবারের শিল্পী হলেও দরিদ্রই ছিলেন রামাচরণ। বিদ্যাচর্চায় নিয়োজিত হবার যে জীবনচর্যা সেকালের পন্ডিত ব্যক্তিদের ছিল, তাঁরও তেমনি। জিতেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারের তালিকা তাই বাহ্যত সংক্ষিপ্ত। সেই মাটির ঘর দালান। সামান্য সম্বল। রামাচরণেরই হাতের তৈরী অপূর্ব আওয়াজী কাঠের সেতারটি। আর তাঁরই সুদর্শন হস্তাক্ষরে লেখা রাগ-পরিচয়ের কিছু পুঁথিপত্র।

জিতেন্দ্রর সব চেয়ে বড় পৈত্রিক সম্পদ লাভ হয়েছিল অন্তরে। শিল্পী-মানসে ও সেতারের সাধনে। সুর-জগতের বিচিত্র রহস্যালোকের চাবিকাঠি রামাচরণ পুত্রকে দিয়ে যান। তাঁর সুষম সঙ্গীতজীবনে যাত্রাপথের পাথেয়। সুরশিল্পীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার মূলধন।

পিতার মৃত্যুতে জিতেন্দ্রনাথের সংগীত চর্চায় তখনকার মতন বাধা পড়ল। বিশেষ করে পিতার কাছে শিক্ষালাভের বিষয়ে। সাংসারিক দায়িত্ব নিতে হল একমাত্র বংশধর বলে। সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কোন অর্থকরী কাজের জন্যে তৎপর হলেন। কারণ পেশাদার শিল্পী হবার বয়স ও অভিজ্ঞতা হয়নি তখনো। আর বাঙ্গালী গুণীদের জন্যে সে যুগে সচরাচর তেমন সুযোগও ছিল না। অন্তত মফঃস্বলে ত নয়ই।

বিদ্যালয়ের অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষাও কিছু তিনি পেয়েছিলেন। সেই সূত্রে সচেষ্ট হলেন অর্থোপার্জনে।

অবস্থাচক্রে রাণাঘাটের বাস প্রায় তাঁকে তুলতে হল। মাতুলালয়ে এলেন একটি কাজের আশ্বাস পেয়ে। দক্ষিণে ২৪ পরগণা জেলায় সে গ্রামখানি। মহকুমা বারাসত। তবে বামনগাছি স্টেশনে নেমে পুব দিকে একটু যেতে হয়। বড় জাগুলিয়া বাজার পথে পড়ে সেই মুরলি মণ্ডলগাঁতি গ্রাম। মণ্ডলগাঁতিও বলে।

সে গ্রামের স্বচ্ছল বর্ধিষ্ণু মুখুয্যে পরিবার জিতেন্দ্রনাথের মামার বাড়ী। আশুতোষ প্রভাতকুমার, অম্বিকাচরণ (এঁরই ছেলে কুমার রাণাঘাটে শশী অধিকারীর বেহালা শোনাতে নিয়ে গিয়েছিল জিতেনকে) কেদারনাথ প্রভৃতি তাঁর মামাদের সে অঞ্চলের সবাই চেনে। তাঁদের মধ্যে কেদারনাথ হলেন বারাসত আদালতের উকিল।

কেদারনাথ এই পিতৃহীন ভাগিনেয়কে নিজের মুহুরী করে নিলেন।

মামার মহুরীগিরি করে সেখানে সংসারধর্ম আরম্ভ করলেন জিতেন্দ্রনাথ। তবে সেটিই তাঁর একমাত্র কর্তব্য হয়ে থাকে নি। সেতারের চর্চা ও সাধনা অব্যাহত রাখলেন। রামাচরণের নিজের হাতের তৈরী সেই যন্ত্র। তার মধ্যে তাঁরই খোদাই করা ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর প্রতিকৃতি। তরকহীন ছোট সেতারটি। ঝঙ্কারে তেমন রেশ থাকে না বটে তরকদারের মতন। কিন্তু মিষ্টি সুরেলা হাতের টিপে বাঁশির মতন বেজে ওঠে। অথচ তবলাটি তার তম্বুরার নয় কাঠের। সেতারটি নিয়ে বাজাতে বসলেই জিতেন্দ্রনাথ যেন পিতার স্নেহের, সুরের শিল্পী-চিত্তের পরশে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেন। প্রেরণা পান অন্তরে। আর কোর্টে মহুরীর কাজ আর বাড়ীতে সংসারের দায়-দায়িত্বের মধ্যে সাধন ঠিক রেখে দেন। বাঁচিয়ে রাখেন বাড়িয়ে চলেন নিজের সঙ্গীত জীবনকে। দারিদ্র্যের মধ্যেও সঙ্গীতের শিখাকে রাখেন অনির্বাণ।

কয়েক বছর এইভাবে যায়। সেতার বাদক বলে কাছাকাছি অঞ্চলে পরিচিত হয়ে পড়েন তিনি। উত্তরাধিকারের সঙ্গে নিজেরও সঙ্গীত-জ্ঞান মনন অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত হতে থাকে। প্রস্ফুটিত হয় তাঁর শিল্পী-সত্তা। ঘরোয়া আসর থেকে প্রকাশ্য জলসাতেও। ওই সব দিকের তবলচীরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। সঙ্গত করতে আসেন নিজেদের রিয়াজের জন্যে।

তাঁর এক পরিচয়—বারাসত আদালতের উকিল কেদারনাথ মুখুজ্যের মহুরী আর অন্তর সম্পদে সুরের গুণী।

এমনিভাবে মুহুরী জীবনের ভস্মে কত দিন সে প্রতিভার পাবক ঢাকা থাকত কে জানে।

কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় তাঁর জীবনে পট পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল। স্বল্প পরিচয়ের ছায়ালোক থেকে রাজধানীর প্রখর আলোকিত আসরে অবতরণ। অখ্যাত পর্ব থেকে প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার অধ্যায়ে।

কি সূত্রে তা সঠিক জানা যায় না, একদিন জিতেন্দ্রনাথ কলকাতার একটি ভাল আসরে সেতার বাজালেন। তাঁর বাজনা হল চমৎকার। উদ্যোক্তা শ্রোতা সকলেই বড় আনন্দ পেলেন। প্রশংসা করলেন। সম্মান জানালেন শিল্পীকে। আর তিনি এমন বস্তু লাভ করলেন যা তখন তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল।

অনুগ্রহ করে কিছু দক্ষিণা নিন। এই বলে সে আসরের উদ্যোগীরা ৩০ টি টাকা দিলেন জিতেন্দ্রনাথকে।

এই হল সূচনা।

সেদিন কলকাতা থেকে তিনি মণ্ডলগাঁতিতে ফিরে এলেন। কিন্তু সুনিদ্রা হল না সারা রাত।

এই নতুন রকমের স্বীকৃতিতে তিনি যুগপৎ আশ্চর্য পুলকিত এবং ভাবিত হলেন।

গোটা মাসটা বারাসত কোর্টে দৌড়-দৌড়ি আর অতি উঞ্ছ কাজ করেও তিরিশটা টাকার মুখ দেখতে পাই না। আর একটি আসরেই দু ঘণ্টায় সেই রোজগার! সঙ্গে এমন সম্মান সুখ্যাতি। বাজিয়ে এত আনন্দ!

এমনি নতুন চিন্তায় জিতেন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে পড়লেন।

কিছু দিন পরে আবার এমনি একটি মুজরো পেলেন কলকাতায়! ভবিষ্যতের মনোরম স্বপ্ন দেখা এবার তাঁর আরম্ভ হল। মনে জাগতে লাগল নতুন এক পরিকল্পনা।

তারপরই আরো এক আসর হল।

এমনিভাবে নাম যশ তাঁর ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল কলকাতার সঙ্গীত সমাজে। গুণগ্রাহী অনুরাগী কত লাভ করলেন। বোদ্ধা সঙ্গীতপ্রেমী পৃষ্ঠপোষকরা কদর বুঝলেন এই দরিদ্র সেতার শিল্পীর। তখন মাঝে মাঝে তিনি কলকাতা থেকে আসরের আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। কিন্তু মুরলি মণ্ডলগাঁতি থেকে আসতে পারতেন না সব সময়। জিতেন্দ্রনাথ ভাবলেন এত দূরে থাকলে প্রতিষ্ঠা লাভের শিল্পী-জীবনে আত্মপ্রকাশের পথ রুদ্ধ থাকবে অনেকখানি। মুহুরীর বৃত্তিতেই জীবন অপচয়িত হয়ে যাবে। কি হবে এত সাধের এত সাধনার সেতার বাদন? কলকাতার এত বড় সাঙ্গীতিক পরিবেশ থেকে কি বিচ্ছিন্ন থাকবেন? না এই সুযোগ গ্রহণ করবেন পূর্ণভাবে?

তা ছাড়া সাংসারিক দিকও আছে চিন্তা করবার। পারিবারিক দায়িত্ব ইতিমধ্যে আরো বেড়েছে। এখন তিনি বিবাহিত। একাধিক সন্তানের পিতা। জননীও জীবিতা।

জীবন-পথের একটি বড় বাঁকের সামনে দাঁড়িয়ে জিতেন্দ্রনাথ বিবেচনা করলেন সব দিক। তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন।

বারাসত কোর্টের মুহুরীর কাজে ইস্তফা দিয়ে, মামার বাড়ীর বাস উঠিয়ে চলে এলেন কলকাতায়।

রাণাঘাটের জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডলগাঁতি থেকে সপরিবারে কলকাতানিবাসী হলেন।

তাঁর বয়স তখন প্রায় ৩০ বছর। বিশ শতকের প্রথম দশক শেষ হয়ে আসছে।

(ক্রমশঃ)

সুতির অন্য পিঠ

আমরা কেউ কারও নই। কেউ কারও হতে পারি না। অথচ আমরা সকলে সকলের। পৃথক পৃথক। যেন দ্বীপান্তর। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন প্রায় পঁয়ত্রিশটা বছর কেটে গেল। শূন্য থেকে চারটে দেওয়াল ক্রমশঃ ওর দিকে সরে সরে আসছে। যেন একটা খাঁচার মধ্যে ও আটকা পড়ে যাচ্ছে। কিংবা একটা স্টেডিয়ামের চারপাশে ও দৌড়োচ্ছে, দৌড়োচ্ছে আর দৌড়োচ্ছে—ঘুরছে ঘুরছে আর ঘুরছে একটা রেকর্ড প্লেয়ারের মতো ঘুরছে। ওর কথাগুলো ভয়ানক জোর চীৎকার করে মাইক্রোফোনে জানানো হচ্ছে—ওর একান্ত নিজস্ব কথা, ভালবাসার কথা, সুখ-দুঃখের, গভীর-গোপন কথা। জানানো হচ্ছে বন্ধু-বান্ধবদের, পথে-ঘাটে, অফিসে-বাজারে রেস্তোরাঁয়, সিনেমায় সর্বত্র। যেন ওকে নীলাম করা হচ্ছে। একটা পুরান মডেলের গাড়ি, চৌ-মাথায় মোড়ে। ওর কোন দাম নেই। সকলেই মেশিনটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখছে আর চলে যাচ্ছে। ওর বয়স কত?' পঁয়ত্রিশ বছর বড্ড বেশি—বেশিদিন চলবে না—উঁহু ওয়ান্ট নিউ!' সকলেই নতুন চায়। এক ফালি তরমুজের মতো তাজা টকটকে লাল।

সব কিছু ফ্রেশ চাই। একেবারে ফ্রেশ ইয়াং'। চাকরীর এক ইন্টারভিউ বোর্ডের কথা ওর মনে পড়ে গেল। ওকে বোর্ড নিশ্চয়ই মনে করেছে বড্ড পুরোন ঘষে গেছে, ক্ষয়ে গেছে, কথার মধ্যে কাগজ কাটার শব্দ—ওকে দিয়ে সেলসের ক্যান-ভাসিং চলবে না। ওভাবে দিনে দিনে ও পুরোন হয়ে যাচ্ছে। ওর ভাবনায় মরচে ধরছে। যেন একটা জংধরা মেশিন স্টোর-রুমে পড়ে।

দীপেনের বাড়ীটাকে একটা স্টোর-রুমের মতো মনে হয়। আর বাড়ীর লোক-গুলোকে কতকগুলো ভাঙ্গা আসবাবপত্রের মতো। অকেজো, নিতান্ত অকেজো অথচ ফেলাটাবার উপায় নেই। কোনরকমে কাজ চলে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই 'ভাঙ্গা জংধরা যন্ত্রের মতো। ওর কাছে বাড়িটা কখনও বা একটা গুমোট স্যাঁতসেঁতে অটোমো-বাইলের কারখানা। তেল না পেয়ে মেশিনের গতি শ্লথ হয়ে আসছে। নতুন নতুন লোক-গুলো মনে হয় স্ট্রেনজার।

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে বসে দীপেন এই সব ভাবছিল। ভাবছিল বাড়ী গিয়ে কী হবে? এখানে বেশ ভালো লাগে। এই খোলামেলা নির্জন জায়গাটুকুর মধ্যে কেমন যেন একাকী স্বাধীন। ইচ্ছা হল মাথার কাছে রুমাল পেতে শুয়ে পড়ে। একটা সিগ্রেট ধরায়। সব শান্তি যেন জুড়ে হয়ে অন্ধকারে মিশে গেছে। ঐ দূরে আকাশের তারাগুলো কত চেনা, এক পরি-চিত সোঁদা টির গন্ধ নাকে লাগে। মনে হয় পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ও অনেকটা

পথ চলে এসেছে। এক অচেনা অজানা স্টেশনের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখে সবুজ নিশান উড়িয়ে একটা কালো রঙের কাঠের রেলগাড়ী ভেঁপু বাজাতে বাজাতে চলেছে। সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে হাতের রুমালটা নাড়তেই সেটা পাখি হয়ে উড়ে গেল। নিজেকে কত যেন ছোট্ট, আপন বলে মনে হয়। নৌকোগুলো ঘাটে বাঁধা। টিমটিম করে লন্ঠনের আলো জ্বলছে। হাল্কা হাওয়ায় নৌকোগুলো দুলছে। কাগজের নৌকো বলে মনে হয়। একটু হাত দিয়ে ঠেললেই যেন ভাসতে ভাসতে চলে যাবে—কতদূর কে জানে। দূরে অন্ধকারে বালী ব্রীজটা মিশে গেছে—কতকগুলো কালো রেখাটানা খাঁচার মতো মনে হয়। মাঝে মাঝে হেড লাইটের আলো পড়ে বিশাল দৈত্যের মতো দেহ নিয়ে ট্রাকগুলো পার হয়। গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ করতে করতে লোকাল ট্রেনটা চলে গেল। হাওয়ায় সেই শব্দ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে মিলিয়ে যায়—দীপেনের বুকের ভিতরটা কেমন অদ্ভুত ফাঁকা বলে মনে হোল।

আটটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনটা গেল। এবার ওকে উঠতে হবে। কিন্তু আজকে কেন জানি ওর উঠতে ইচ্ছা হয় না। প্রতিদিনের অভ্যেসের মুখোমুখী ওর দাঁড়াতে ইচ্ছা হল। একটা বিশাল বৃক্ষের মতো ডালপালা মেলে যেন ও এ পরিবেশটার সঙ্গে মিশে গেছে। অন্ধকার একরাশ শালিকের মতো বুকের ডালের উপর বসে কিচির মিচির করে। এ ডাক যেন কত চেনা ও কি অন্ধকারকে ভালবেসে ফেলেছে?

গঙ্গার ওপারে উত্তরপাড়া, বালি বেলুড়...বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বাড়িগুলো প্লাস্টিকের খেলনার মতো সাজানো যেন কেউ বসিয়ে দিয়েছে। জলের বুকে আলোর ছায়া পড়ে ছবির মতো। মাঝে একটা লাল দাঁড়ি ভাসে। বাতাসে কাঁপছে। ব্রীজের মাথায় লাল বাতির নিশানা।

কেন জানি আজকাল ওর বাড়ি ফিরতে ভাল লাগে না। পথে পথে একা ঘুরতে বেশ লাগে। এদিক ওদিক, এ গলি ও গলি অনির্দিষ্ট পথ ধরে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেশ আনন্দ। এর মধ্যে কেমন এক অদ্ভুত স্বাধীনতা আছে। মাঝে মাঝে কখনও খেয়াল চাপে কোন এক ট্রেনে চড়ে কোথাও কোনদিন চলে যায়। ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এইরকম উদ্দেশ্যহীন ভাবে সবাই যেন ঘুরছে—পার্কে, কাফে, সিনেমায়, নাচঘরে, জলসায়—সর্বত্র ভিড় আর ভিড়। যন্ত্রে দম দেওয়া পুতুলের মতো সবাই ঘোরে এক সার্কাসের জালে। আমরা সবাই এক একটা ক্লাউন—কথাটা ভেবেই দীপেন কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করল। মনে ভাবে সে-ও যেন রঙ মেখে একটা ক্লাউন সেজে গঙ্গার ধারে বসে আছে। ওকে দেখে সবাই মজা পাচ্ছে। হাততালি দিচ্ছে। হঠাৎ মনটা পাথরের মতো ভারি হয়ে আসে।

এবার বাড়ি যেতে হবে—দীপেন উঠে পড়ে। রোজকার মতো আজও হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে। কালো পীচ ঢালা বড় রাস্তা ধরে কিছু দূর এগোবার পর একটা ফাঁকা মাঠ, পাশে টিনের শেড লাগানো বস্তীর বাড়ীগুলো। পাশ দিয়েই সরু স্যাঁতসেঁতে একটা গলি সাপের মতো এঁকেবেঁকে অন্ধকারে মিশে গেছে। এ গলিতে লোকজন বড় একটা বেশি যাতায়াত করে না। ছিনতাই আর জুয়াখোরদের আস্তাখানা। দীপেন এঁদের সবাইকে চেনে। একটা লোক রকে বসে বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করছে. বাতাসে বিড়িটা বারার নিভে যায়। গালের চোয়াল দুটো ভাঙ্গা মিশকালো রোগা পাতলুন পরা বেড়ালের মতো জ্বল্‌ জ্বল্‌ চোখ দিয়ে ওকে অদ্ভুত ভাবে দেখছে। একটু আগেই লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে। বিকৃত ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে হাসছে। গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে, ময়লা হলুদ রঙের একটা চাদর জড়ানো, দু' খন্ড হাড়ের মতো হাত দুটো বেরিয়ে রয়েছে। যেন কোন শয়তানি বুদ্ধি ওর মাথায় খেলছে। দীপেনের ইচ্ছা হল এক্ষুনি ছুটে গিয়ে প্রচন্ড জোরে ওকে থাপ্পড় লাগায়।

ইতিমধ্যে দু'একটা রিকসা, ঠেলা পার হয়। একটা কালো রঙের ভ্যান বিকট আওয়াজ করতে করতে চলে যায়। রাস্তার দুধারে ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো জ্বলছে. দেওয়াল পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। হিন্দী সিনেমার কয়েকটা পোস্টার দেওয়াল থেকে ঝুলে পড়ছে যেন কাঠগড়ায় ছাগলের কাটা গলা ঝুলছে। লালচে আলোয় সব দেখা যায়। একটা ভাঙ্গা বোতল রাস্তার মাঝে গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটা পানের দোকান, ক্লাব ঘর, কিংবা পাঞ্জাবী হোটেল...এইভাবে রাস্তাটা এগিয়ে চলে। আজ কেন জানি সমস্ত পরিবেশটাকে নতুন নতুন লাগছে। এর পরেই রাস্তাটা বাঁদিকে বাঁক নিলেই একটা জলের গম্বুজ আর একটু এগোলেই ওদের লালরঙের দেশলাই খোলের মতো একতলা বাড়িটা। ৩।এ, নীলচাঁদ দত্ত লেন।

দীপেন একটা সিগ্রেট ধরায়।

বাড়ির সামনের গেটে সবুজ দরজাটার উপর সাদা প্লাস্টিকের অক্ষরে লেখা এ. কে, দাস। যেমন ল্যাকটোজেনের কৌটোর ওপর লেখা থাকে। ওর বাবা এ অঞ্চলে পরিচিত লোক। মামলা মকোদ্দমায় তাঁর জুড়ি নেই। সবাই 'উকিলবাবু' নামেই চেনে। বাবার কালো কোটটা দাঁড়কাকের ডানার মতো ঝুলছে—রাস্তার বাইরে জানলাটা দিয়ে দেখা যায়। দরজা দিয়ে ঢুকেই বিরাট লম্বা বারান্দাটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তিমির পিঠের মতো মসৃণ। হাতের মুঠোয় সিগ্রেটটা চেপে ডানদিকের ঘরটায় সন্তর্পণে ঢুকে পড়ে—তখন নিজেকে চোরের মতো মনে হয়। যেন ও ভয়ানক অন্যায় করেছে। এখন রাত্রে ফেরাটাও অন্যায়। এক্ষুনি ওকে দেখে সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে।

ঘরটা ফাঁকা। কেউ নেই। দীপেন যেন স্বস্তি পেল। খদ্দরের পাঞ্জাবিটা খুলে লোহার আংটাটায় ঝুলিয়ে দেয়। তক্তাপোষে ঘুমোবার ভঙ্গীতে শুয়ে পড়ে। অন্ধকারে গোল গোল প্লাস্টিকের চেয়ারগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল। রেডিওর সবুজ বাতিটা পিটপিট করে জ্বলছে। খুব মৃদু স্বরে দিনের খবর শোনা যাচ্ছে।

একটু পরেই মীরু ঢুকবে 'দাদা একটু অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও' মা ঢুকবে 'কিরে কোথায় গিয়েছিলি?' বাবা ঢুকবে, 'কি হল চাকরিবাকরি খুঁজছ তো?' ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন সবকিছু আগে থেকেই ওর জানা। বাছা বাছা কতকগুলো বিবর্ণ, নিষ্প্রাণ, ছকবাঁধা কথা, জ্যামিতির মতো স্বতঃসিদ্ধ। কথার ফাঁকে কাগজ

আনন্দ বাগচীর
পরমায়ু ৮-০০
আবদুল জব্বার-এর
বদর বাউল ৬-০০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
ছোট পাখি নীল আকাশ ৫-০০
প্রশান্তকুমার মিত্র সম্পাদিত
বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না ৭-০০
এতে লিখেছেন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ বাগচী, গোপাল ভৌমিক, আশা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।
মিত্র প্রকাশনী। ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। ফোন : ৩৪-৪৬১২

কাটার শব্দ, ফ্যাস ফ্যাস করতে থাকে। আমরা একটাও নতুন কথা বলতে পারি না, কথার খাঁচায় যেন সবাই আটকা পড়ে গেছি, দীপেন ভাবে। দূর ফাঁকা মাঠটা থেকে শৃগালের বিকট আর্তনাদ শোনা যায়। লাল টকটকে লোহার শিকটার কথা ভাবতেই তার মাথার ভিতর কেমন যেন দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে।

রান্নাঘরে ঠুংঠাং শব্দ, রাত্তিরের রান্না হচ্ছে। পড়ার ঘরে মীরু জোরে জোরে চীৎকার করে কবিতার কয়েক লাইন মুখস্ত করছে। পাশের ঘরে তর্কাতর্কি, বোধহয় খাবার সংগে মায়ের ঝগড়া বেধেছে। উভয়ের গলার স্বর ক্রমশ উচ্চগ্রামের দিকে। এতো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এতে দীপেনের কিছুই মনে হয় না। যেন কাঠ-ফাটা রোদে ধেলিঙের গায়ে দাঁড়িয়ে একটা কাক 'কা' 'কা' রছে। সমস্ত শূন্য, নিঝুম পরিবেশটার মধ্যে ঐ ডাকটা সুরের মতো ওর মনের ভিতর খেলতে থাকে। ওটা ব্যতিরেকে যেন দুপুরের সব সৌন্দর্যটাই মাটি হয়ে যায়। মায়ের জ্বলজ্বলে মুখটা জলছবির মতো কেবল চোখের সামনে ভাসতে থাকে। বাবার ক্লান্ত দেহটা ফাঁসের মতো ঝুলছে। মনে হয় ওকে নিয়েই যেন সংসারের সব অশান্তি। এই অভাব অনটনের সংসারে ওর কিছুই করার নেই। নিজেকে ভীষণ অসহায় ভাবে। নিঃশব্দে একটা কালো রঙের বেড়াল বারান্দা পার হয়। পিতলের অ্যাশট্রেয় সিগ্রেটের আগুনটা তখনও ধুকধুক করে জ্বলছে।

কোম্পানী লক আউট হওয়ায় দীপেনের চাকরী গেছে। 'বেকার' কথাটা শুনলে ওর মনের মধ্যে ঘৃণা, ভয় ও লজ্জা মিশ্রিত এক অদ্ভুত অনুভূতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নিজেকে কেমন যেন খাপছাড়া, অতিরিক্ত মনে হয়। সাবানের মোড়কের মতো অতিরিক্ত একটা কিছু। পথে ঘাটে, দোকানে বাজারে; পার্কে রেস্তোরাঁয়, অজস্র মানুষের ভিড়ে নিজেকে সর্বদা বেমানান অসংগতিপূর্ণ মনে হয়। একটা সাদা রুমালের মতো হাত মুছে, ইচ্ছে করলে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া যায়। বাজারে বিক্রী করলে ওর কোন দাম নেই।

আজকাল কফি হাউসে ওর ভালো লাগে না। বন্ধুবান্ধবদের সংগে আড্ডা দিতে গিয়ে নিজেকে কেমন ছোট মনে হয়। রণেন এসে স্টীলপ্ল্যান্টের বড়বাবুদের গল্প করে, সোমনাথ এসে ডকের মানুষের বিচিত্র জীবনের কথা বলে, তপন এসে ওদের কোম্পানীর নতুন প্রোগ্রামের কথা বলে। সবাই সবার কথা বলে। নতুন আশার কথা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। দীপেনের সেই মুহূর্তে নিজেকে অতিরিক্ত, অতিরিক্ত একটা কিছু বলে মনে হয়। যেন এর জন্যে ও একাই অপরাধী।

নিজেকে সব সময় অদ্ভুত অপরাধী বলে মনে হয়। এক অপরাধ-ভয় ওর অবচেতন মনের মধ্যে বাড়তে থাকে। প্রত্যেকটা কাজ করতে গিয়ে অপরাধ বলে মনে হয়। কফি হাউসে আড্ডা দেওয়া, গঙ্গার ধারে বসে থাকা, রাতে বাড়ি ফেরা—সবই যেন অপরাধ। এই অপরাধবোধ দিনে দিনে শিকড় ছড়িয়ে ওর মনের মাটিতে কেবলই বসে যাচ্ছে। যেমন কোন মানুষ আস্তে আস্তে চোরাবালির মধ্যে ঢুকতে থাকে। চারপাশে ধু ধু করছে বালি আর বালি। আর ভাবছিল অঞ্জুকে ভালবাসাটাও বোধহয় অপরাধ।

'ভালবাসা' কথাটা ভাবলে ওর কেমন যেন হাসি পায়। একটা মজার খেলা : একটা জোকার হাতে কতকগুলো রঙিন তাস নিয়ে দর্শকদের খেলা দেখাচ্ছে। একটা বাচ্চা ছেলে রাস্তার ধারে বাসের টিকিট কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভালবাসার বোধটা অজস্র সংখ্যা হয়ে ওর মনের ভিতর ঘুরতে থাকে। দীপেন দেখে টেবিলের উপর পরে একটা নীল খাম। কয়েকদিন আগে আলমোড়া থেকে অঞ্জু লিখেছে। অঞ্জু একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখে। কেবল আবেগ আর উচ্ছ্বাস ভরা বাছাবাছা কথা-গুলো। দীপেনের কাছে এসব সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই। চিঠিগুলো পড়তে পড়তে দীপেনের মনে হয়, অঞ্জু ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে আর ঐ নিঃস্বতা অজস্র শব্দের সোনালী রঙ মেখে ওর চোখের সামনে ময়ূরের পেখমের মতো মেলে ধরতে চাইছে। ও যেন নিজেকে বিজ্ঞাপিত করতে চাইছে 'দেখ, দীপেন দেখ, আমার ভিতর কত কি আছে।' অঞ্জু চৌমাথার মোড়ে নির্লজ্জ নিয়ন বাতির মতো জ্বলছে আর নিভছে। একটা ফাঁকা মাঠে বল নিয়ে কেবলই দৌড়োচ্ছে আর দৌড়োচ্ছে। আস্তে আস্তে উভয়েই ক্লান্ত হলে এক জায়গায় বসতে চায়। সেই মুহূর্তে অঞ্জুকে ওর কাছে পেতে ইচ্ছা হয়। অঞ্জুর ঈষৎ নরম বাদামী রঙের দেহের মধ্যে কী রহস্য আছে? তখনই দীপেন কেমন যেন শিশুর মতো ব্যবহার করতে থাকে। ওর বুকের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়। আর মনে হয় দিনে দিনে ওরা যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে : দুটো শবদেহ সমুদ্রের ধারে শোয়ানো রয়েছে—সূর্য উঠলে শবদেহ দুটো মোমের মতো গলতে গলতে জলের সংগে মিশে যায়। অঞ্জুর সংগে দীপেন আজকাল কথা বলতে পারে না। কেবল ভয়ানক নির্জনতার ভিতর দুজন দুজনকে চিনতে চায়। গতকাল মনুমেন্টের তলায় দুজন এমনি ভাবেই বসেছিল। যেন কারও কিছু বলার নেই। একে অপরকে শুধু চেয়ে দেখে। অঞ্জু ফিস্‌ফিস্‌ স্বরে একবার বলেছিল 'কিছু বলো'। দীপেন কিছুই বলতে পারে না। মনে হয় সব কথা বলা হয়ে গেছে, কিছুই আর নেই। আর ঐ 'নেই' 'নেই' ভাবটা ওর মনকে এক ভয়ানক বিষাদে ভরিয়ে তুলছিল। তখন দীপেন শুধু বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল।

এখন ঘরে কেউ নেই, দীপেন একলা। হাতের কাছে টেবিলের উপর কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখে কতকগুলো পুরোন মাসিকপত্র বিবর্ণ হয়ে গেছে, সেদিনের কাগজটা, ক্যামুর 'দি আউটসাইডার' বইটা, কয়েকটা বাসের টিকিট, তাসের টুকরো, নীল ডাইরী আর কলমটা হাড়ের মতো পড়ে রয়েছে।

খোলা জানলাটা দিয়ে দীপেন দেখে একটা ছেলে শিষ দিতে দিতে রাস্তা পার হচ্ছে। ভাঙ্গা সুরে হারমোনিয়াম বাজছে। এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছেন। 'আমাদের দাবী মানতে হবে', 'মানতে হবে'...চীৎকার করতে করতে একদল বাঁদিকে ল্যাম্পপোস্টের ধার ঠেঁষে অন্ধকারে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। টুংটাং শব্দ করে দু' একটা রিকসা যায়। সবকিছু কেমন যেন নতুন ঠেকছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সবকিছুর মধ্যে নিজেকে খাপছাড়া মনে হোল।

হাতের সামনে টেবিলের উপর কাগজটা পড়ে। 'হাইফংয়ে বোমারু বিমান আক্রান্ত', 'কিসিংগারের গোপন বৈঠক', 'ময়দানে পুলিশের লাঠিচার্জ', 'ব্যাঙ্ক লুঠ', 'ছাত্র ধর্মঘট', 'আত্মহত্যা' 'কলকাতা নরক হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিটি শিরোনামায় কেবল উত্তেজনা, আতংক ও ভয়। হঠাৎ মনে হোল সংবাদপত্রের কালো কালো মুদ্রিত অক্ষর-গুলো অজস্র পিঁপড়ের মতো সার বেঁধে একটা মৃতদেহকে টেনে নিয়ে চলেছে মৃতের মুখটা হুবহু নিজের মুখের মত

মনে হোল। কাল রাতে কারা যেন ওকে গুলিবিদ্ধ করেছে। চমকে মুখ ফেরাতেই দেখে দরজায় কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

না, কেউ নয়। ওটা মনের ভুল। আজকাল এমনই মনে হয়। যেন সামনে পিছনে ছায়ার মতো কেউ দাঁড়িয়ে থাকে।

স্মৃতি যেন সার বেঁধে বুকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। পুরোন দিনের কথা মনে পড়ে। অজস্র ঘটনা বহু মানুষের মুখ উঁকিঝুঁকি মারে। অবসন্ন কাগজের ফুলের মতো ফস্‌ফস্‌ শব্দ করে তা খুলতে থাকে। মনে হয় পটে আঁকা কিংবদন্তীর ঘটনা, বিবর্ণ রক্তের দাগ, তাতে মৃতের মুখ চিত্রিত। ভয়ংকর ও অদ্ভুত।

পাড়ায় কালীপুজোর দিনগুলোয় সারা-রাত নাচার কথা মনে পড়ে। অমাবস্যার রাত্রে চাঁদোয়ার তলায় মুখের মধ্যে ধুনুচি নিয়ে ঢাকের তালে তালে সেই উদ্দাম বেহুঁশ নৃত্য। ওকে ঘিরে আবালবৃদ্ধবনিতা বিস্ময়ে অভিভূত, ঐ নাচ দেখতে থাকে যেন কাহারও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পাথরের মতো স্থির, দণ্ডায়মান মানুষেরা এক গভীর নির্জনতায় মগ্ন ও অনিবার্য কিছু ঘটনার ভয়ংকর পরিস্থিতির অপেক্ষায় ভয় ও ভালবাসা বাঁচা ও না-বাঁচা, এমত দুর্গবৎ অভিজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হিমশীতল স্নায়ুর ভিতর এক আশ্চর্য তীব্র কামনা অনুভব করে। ধুনোর ধোঁয়ায়, মন্ত্রে, আরতির ঘণ্টায় অন্ধকারে সহস্র প্রদীপ ওর চোখের সামনে জ্বলতে থাকে। আর অবশেষে ক্লান্তি, ঘুম ও পরিতৃপ্তির চোখে আস্তে আস্তে যখন ও ভিজে মাটির মধ্যে শুয়ে পড়ে তখন অচেনা, অচেনা মুখসব অদ্ভুত শঙ্কা ও আনন্দে অভিভূত, কালীমূর্তির সামনে নীরব, নক্ষত্রের মতো স্থির দণ্ডায়মান রয়।

সক্কলে একদিন এমনিভাবেই দীপেনকে দেখতো। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনটার কথা মনে পড়ে। সেদিন সবার মুখে এক কথা : কী সুন্দর, আশ্চর্য অদ্ভুত ছেলেটা! কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করেছে, আবৃত্তি করেছে, নাটক লিখেছে আর পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাশ পেলে সেদিন প্রেন্সিপ্যাল ওকে ডেকে 'উই হোপ ইওর সাকসেস্‌ ইন ফিউচার' বলে একটা হাতে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট গুঁজে দিলেন।

আজকাল সেই দীপেন যেন কত পালটে গেছে। কারণে অকারণে এক অদ্ভুত ভয় মনের মধ্যে বাড়তে থাকে। ঐ ভয়টা বিশাল বৃক্ষের মতো বুকের ভিতর কেবলই শিকড় ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঐ ভয়টা ছায়ার মতো কেবলই ওর পিছু পিছু ঘুরতে থাকে। ঐ ভয়টা মুখোশের মতো কেবলই মুখের সঙ্গে আটকে যাচ্ছে। আর তখনই ভিতরে ভিতরে ও ক্লান্তি অনুভব করে। স্বপ্নের ভিতর সেই ভয় আরও ভয়ংকর হয়।

একটা ফাঁকা আঁডটোরিয়ামে দাঁড়িয়ে। জোরে জোরে চীৎকার করে কারা যেন কী বলে চলেছে। চারপাশে কেবল একটানা গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে। কে যেন মাইক্রোফোনে বলে চলেছে প্ল্যাটফরম নাম্বার এক, প্ল্যাটফরম নাম্বার চার—বালি বেলুড়, উত্তরপাড়া ট্রেন ছাড়বে। আর মাঝে মাঝে 'হো' 'হো' করে নারী কণ্ঠে কারা যেন হাসে। কে যেন একটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে। জ্যোৎস্নার আলোয় ভদ্রলোকের মুখের অংশবিশেষ দেখা যায়। ভদ্রলোককে চেনা চেনা ঠেকছে। কোথায় যেন দেখা—ইনসিওরেন্সের দালাল, ব্যাঙ্কের এজেন্ট নাকি ইন্টারভিউ বোর্ডের সেই ভদ্রলোক। গোলাকৃতি বিরাট মুখ, কালো ফ্রেমের চশমা আঁটা একটা সিগ্রেট ধরাবার চেষ্টা করছেন। বারবার বাতাসে নিভে যাচ্ছে। কালো সুটে সর্বাঙ্গ ঢাকা। খটখট করে নেমে আসছেন—হঠাৎ একটা কংকাল নেমে আসছে মনে হয়। খানিক বাদে 'ধুপ' করে ভয়ানক জোর একটা শব্দ হল—কে যেন নিচে পড়ে গেল। একটা বিকট চীৎকার ও গোঙানীর আওয়াজ। পাশ ফিরতেই দেখে সেই বিশাল স্ফীতদেহী ভদ্রলোক পড়ে আছেন, মুখ দিয়ে অনর্গল রক্ত বেরুচ্ছে। মৃতদেহটা নিয়ে ও কি করবে ভেবে পায় না। সামনের সিঁড়ি দিয়ে একা দুত উপরে উঠতে থাকে। জোরে ভীষণ জোরে। যেন এটা একটা খুন। ঐ খুনের জন্যে দীপেনই দায়ী। পিছনে কারা যেন ধাওয়া করেছে—'ধরো' 'ধরো' 'ধরো', পালাচ্ছে। দীপেন উঠছে, উঠছে আর উঠছে। সিঁড়ি যেন শেষ হয় না। আর ওর ভয় ক্রমশ বাড়তে থাকে।

দুঃস্বপ্নের রাত্রি ছাড়িয়ে ভোর হয়। গতরাতে কয়েক পশলা বৃষ্টির পর এখন চারদিকটা রুপোর মতো ঝকঝক করছে। কালকের চেয়ে আজকের আকাশটা যেন একটু বেশি নীল। খণ্ড খণ্ড মেঘে কোথাও বিষণ্ণতার ছাপ নেই। এক ফালি সূর্যের আলো চড়ুই পাখির মতো লাফাতে লাফাতে বিছানায় এসে পড়ল। আকাশটা জানলার ফ্রেমে আটকা পড়েছে। সামনের বাগানটার মাঝবরাবর দুটো সূর্যমুখী ফুলের গা বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। যেন জলের শরীর বেয়ে দুটো মাছরাঙা উঠে এসেছে। জলের মতো টলটলে একটা মুখ কেবলই ভেসে উঠছিল। দীপেনের মনে হোল কাঠের রেলগাড়ী চড়ে কু ঝিকঝিক করতে করতে কোথায় যেন চলেছে। আর একু একটা স্টেশন পার হলে গার্ডের সবুজ পতাকাটা এক একটা সবুজ পাখি হয়ে উড়ে যায়। কোন এক ম্যাজিক-ওয়ালা পথ ভুলিয়ে ভুলিয়ে ওকে কোথাও নিয়ে চলেছে। বুকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট, ধূসর পাহাড় মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারে। স্বপ্ন স্মৃতির সবুজ পাহাড়। মনে হয় কোন সমুদ্রের তলদেশ থেকে ঐ পাহাড়টা উঠে এসেছে। যেমন উঠে আসে আশ্চর্য অনুভূতি দৃশ্যপটের পূর্বায়ুক্রমে। মাঝে মাঝে আকাশটার আড়ালে পাহাড়টা হারিয়ে যায়। সেই আশ্চর্য অনুভূতিটা সুরের মতো ওর মনের ভিতর খেলতে থাকে। চোখ ফেরাতেই দীপেন দেখে একটা বিরাট খাতা হাতে দরজার গোড়ায় টিঙ্কু দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এগিয়ে এসে বলে "কাকুমণি, ঐ শালিক পাখিটার একটা ছবি এঁকে দাও তো।"

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

বালির গাদার সামনে থেকে ডানদিকের গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত— যেখান থেকে শুরু হয়েছে কনস্টেবল খ-য়ের এখতিয়ার।

কাফে-র দোতলা থেকে ডোনোভান গুলি করেছিল গিলকিক-কে। গুলি খেয়ে গিলকিক টলতে টলতে মুখ থুবড়ে পড়ল বালির গাদার সামনে। কনস্টেবল খ এসে দেখল, মহামুস্কিল! নিজের এলাকায় খুন হওয়া মানেই তদন্তে জড়িয়ে পড়া। ছুটি বাতিল হবেই।

কনস্টেবল খ সেই মুহূর্তে টহল দিতে ঢুকেছে ভেতরে। ফাঁকিবাজ ক লাশটাকে তুলে এনে শুইয়ে দিল 'খ'-য়ের এলাকায় তারপর ছাড়ল পুলিশী হাঁক।

ক্লিয়ার?

আর্থিক প্রসঙ্গ

কালো সোনা

কালো সোনা আদরের ডাকনাম— অনেক সময় অবশ্য পোশাকী নামেও পরিণত হয়। এই নামে ডেকে বোঝান হয় যে কৃষ্ণবর্ণের হলেও ঐ পুং-সন্তানের মূল্য কারো চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এক্ষেত্রে তুলনা অপরের সঙ্গে করা হলেও মানদন্ড হল ঐ পীত-বর্ণের ধাতু। সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ ধরে যা সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন মাপকাঠির কাজ করে আসছে মানুষ যা নিরবচ্ছিন্নভাবে তার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সম্প্রতি কিন্তু ঘটেছে পট-পরিবর্তন— স্বর্ণ-মুগরার পরিবর্তে মানুষ আজ কালো-সোনা খোঁজার কাজে উঠেপড়ে লেগে গেছে। ফলে শুরু হয়েছে আর এক দফা পট-পরিবর্তনের পালা— আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী। মুকুলিত আশার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটের সম্পূর্ণ পরিবর্তন যেন ঐন্দ্রজালিকের দন্ডের স্পর্শে ঊষর মরুভূমি সরে গিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে অবস্থাপিত হচ্ছে রূপকথার রাজপুরী। আর সব ছেড়ে দিয়ে ল্যাটিন আমেরিকার ভেনেজুয়েলার কথাই ধরুন না কেন। ঠিক আক্ষরিক অর্থে না হলেও রাতারাতি কি পরিবর্তন! গগনচুম্বী অট্টালিকা লিমুজান নৈশ ক্লাব আর স্কচের ছড়াছড়ি।—সমুদ্র সৈকতে তিল ধারণের স্থান নেই দেশ-বিদেশে দেওয়া হয়েছে হাজার হাজার ইয়টের অর্ডার—আর কত কি! ভেনেজুয়েলা যে হঠাৎ পেয়ে গেলে কালো সোনার সন্ধান। অরব্য সহস্র রজনীর গল্পে এই কালো সোনাকেই কি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ বলে কল্পনা করা হয়েছিল? কালো-সোনা —ব্ল্যাক গোল্ড যে ক্রুড বা অপরিশোধিত খনিজ তৈলের নতুন নাম তা বোধহয় আর বলতে হবে না। এতদিন পর্যন্ত একে তরল সোনা— লিকুইড গোল্ডই বলা হত। সম্প্রতি কিন্তু এই নতুন নামেই ডাকা শুরু হয়েছে। নামটা বোধহয় আরও আদরের। তাৎপর্য হল (অপরিশোধিত অবস্থায় কৃষ্ণ-বর্ণের হলেও পদার্থটি সোনার মতই—বলা যায় সোনার চেয়েও —মূল্যবান। বর্তমানে ওপেক বা পেট্রোল রপ্তানীকারী দেশ-সমূহের সংস্থা এক ব্যারেল তেলের দাম ১০ ডলারেরও উপর নিয়ে গেছে। তুলনায় বিশ্বের বাজারে সোনার দাম নিশ্চয়ই বেশী। কিন্তু উৎপাদন ব্যয়? উৎপাদন ব্যয়ের আপেক্ষিক-তার দিক থেকে বিচার করলে হলদে সোনা কালো সোনার কাছে দাঁড়াতেই পারে না। তা ছাড়া অ্যাডাম স্মিথ যে ব্যবহার মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের পার্থক্য নির্দেশ করে-ছিলেন এ প্রসঙ্গে তারও উল্লেখ করা যেতে পারে। হলদে সোনার বিনিময় মূল্য তার ব্যবহার-মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী আর কালো সোনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল ঠিক বিপরীত। কালো সোনার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য ঘুচতে চলেছে। উপযোগসম্পন্ন দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলে—অর্থনীতির ভাষায় তার প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পেলে—তাই-ই হয়। এক এক স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাম অকল্পনীয়।

এইভাবে যখন ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের পার্থক্য কমতে শুরু করে তখন স্বভাবতই উৎপাদকের মেলে মওকা। ওপেকের ১৩টি দেশের ক্ষেত্রে এই মওকাই মিলেছে— তাদের এখন বৃহস্পতির দশা। মাত্র গত বছরেই (১৯৭৪) এই ১৩টি দেশ পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ থেকে ১১২০০ কোটি ডলার উপার্জন করেছে। এত অর্থ নিশ্চয়ই ব্যয় করা সম্ভব নয়। ফলে গত বছরে এই সব দেশের সামগ্রিক অনুকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬০০৩ কোটি ডলার।

আন্তর্জাতিক লেনদেন-উদ্বৃত্তের এই গতি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াতে পারে তার একটা হিসেব করেছে লন্ডনের বিখ্যাত 'ইকনমিক' পত্রিকা। হিসেবটা এই রকম: বর্তমান দামে পৃথিবীর বিভিন্ন শেয়ার বাজারে ১৫-৬ বছরের মধ্যে সব কোম্পানীকে ৯-২ বছরের মধ্যে সব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঞ্চিত সোনা এবং ১-৮ বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত বৈদেশিক বিনিয়োগকে ঐ ১৩টি ওপেকভুক্ত দেশ কিনে নিতে সমর্থ হবে।

কিন্তু এই গতি কে অব্যাহত থাকবে না তা তৈল রপ্তানতকারী দেশগুলোও বুঝেছে। কারণ দ্বিবিধ: (ক) দামবৃদ্ধির ফলে তেলের ব্যবহার বা কনজানশন বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়েছে (খ) বিভিন্ন দেশ জলেস্থলে নতুন তৈলখনির সন্ধানে উঠেপড়ে লেগেছে। এই দ্বিতীয় কারণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সৌদি আরবের তৈলমন্ত্রী (সৌদি আরব বৃহ-ত্তম তৈল উৎপাদক এবং এই দেশের সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে পৃথিবীতে সর্বাধিক) ইয়ামানির হিসেব অনুসারে অপরিশোধিত তেলের দাম ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে চাহিদা দশ শতাংশের মত হ্রাস পায়। সুতরাং মোট প্রাপ্তি বা রেভিনিউ-এর পরিমাণ বেশীই হয়। সুতরাং তৈল রপ্তানীকারী দেশগুলোর আশংকা এদিক দিয়ে নয়—আশংকা হল নতুন নতুন উৎসের সন্ধান চলছে এবং পাওয়া যাচ্ছে বলে। আগেকার অর্থাৎ বর্তমান দশকের গোড়ার দিক হলেও এই ধরনের সন্ধানকার্য হয়ত বিশেষ চলত না কারণ বোম্বাই-এর পশ্চিম উপকূল সমুদ্রে (বোম্বে হাই) উত্তর সাগর বা আলাস্কায় তৈল পাওয়া গেলেও ব্যারেল প্রতি ১-৯৯ ডলার অন্তর্জাতিক বাজার দামে উৎপাদন ব্যয় সংকুলান হত না। এখন দাম যখন ব্যারেল প্রতি ১০ ডলারেরও বেশী তখন যে কোন জায়গা থেকেই তৈল উৎপাদন লাভজনক ব্যবসায়ে দাঁড়িয়েছে তা এই লাভ সরকারী কোষাগার বা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর পকেট যেখানেই যাক না কেন।

এই দিক দিয়ে বোম্বাই-এর পশ্চিম উপকূলে পর পর তিনটি তৈল খনির সন্ধান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। ইতিমধ্যেই এই সলিল গর্ভস্থিত খনি থেকে তৈল উৎপাদন কার্য শুরু হয়েছে এবং উৎপাদনের পরিমাণ হল বর্তমানে দৈনিক ২৩০০ ব্যারেল। এছাড়া দৈনিক ২৩৮০০ কিউবিক মিটার করে স্বাভাবিক গ্যাসও আহরণ কার সম্ভব হচ্ছে। আশা করা হয়েছে এই দশকের শেষে এই সমুদ্র গর্ভস্থিত উৎস থেকে বছরে এক কোটি মেট্রিক টনের মত অপরিশোধিত তৈল পাওয়া সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে আসাম ও গুজরাটের খনিসমূহ থেকে উৎপাদনের পরি-মাণ বর্তমান ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ১২০ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে। ফলে মোট উৎপাদন হবে ২ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টন। যা আমাদের প্রয়োজনীয়তার সমান। সুতরাং খনিজ তৈলে ভারত স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে।

হিসেবের মধ্যে একটা বড় রকমের ভুল আছে। ১৯৮০ সালের মধ্যে ভারতে তৈল উৎপাদন যদি ২ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টনে গিয়ে পৌঁছোয় তবুও ভারত কিন্তু স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে না; কারণ ঐ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টনে গিয়ে দাঁড়াবে। তবে অবস্থার যে অনেক উন্নতি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই দশকের শুরুতে আমাদের তেল আমদানী খাতে ২০০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হ'ত। এখন তার পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন দিক দিয়ে এর তাৎপর্য হল : আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঠিকমত কার্যকর করা যাচ্ছে না, দেশের লোককে বঞ্চিত করে চা-চিনি সব চালান হচ্ছে। আমরা ক্রমাগত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভান্ডার প্রভৃতি থেকে ঋণ করতে বাধ্য হচ্ছি, ইত্যাদি। এক ধাক্কায় (ঠিক এক ধাক্কায় অবশ্য নয়) ২০০ কোটি টাকা থেকে ১২০০ কোটি টাকা। তুলনায় বোম্বাই উপকূল থেকে তৈল আহরণের জন্য কাঠামো বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরী করতে হবে তার ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা বলে হয়েছে। সুতরাং উঠেপড়ে লাগলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন পেট্রোলিয়াম দপ্তর প্রধান হস্তান্তরিত করা হোক তান্ত্রিক টালবাহানায় বিলম্বিত হতে বাধ্য।

৩-২-৭৫

৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের দলগত বিভাগের কবিলন কাপ বিজয়ী চীনের খেলোয়াড়রা হাত তুলে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। ছবির বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে—চেং হুয়িং কে সিন-আই চ্যাংলি এবং হু ইউ লান

খেলাধূলা

দর্শক

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

কলকাতা ইডেন উদ্যানে নবনির্মিত নেতাজী সুভাষ ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্রী চীন পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগের চ্যাম্পিয়ান হয়ে এশিয়ার মুখোজ্জ্বল করেছে। চীন পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ৫-৩ খেলায় যুগোশ্লাভিয়া এবং মেয়েদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ৩-২ খেলায় গতবারের (১৯৭৩ সালের) চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার একই বছরে সোয়েথলিং এবং কবিলন কাপ জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে একই বছরে সোয়েথলিং এবং কবিলন কাপ জয়ী হয়েছে মাত্র এই তিনটি দেশ—জাপান ৪ বার (১৯৫৪ ১৯৫৭, ১৯৫৯ ও ১৯৬৭), প্রজাতন্ত্রী চীন ২ বার (১৯৬৫ ও ১৯৭৫), এবং আমেরিকা একবার (১৯৩৭)।

দুই দলগত বিভাগেরই ফাইনালে চীনা দলে একজন করে অনামী খেলোয়াড় দলভুক্ত হয়েছিলেন—পুরুষ বিভাগে লু ইউয়ান সেং এবং মহিলা বিভাগে কে সিন আই। বিপক্ষ খেলোয়াড়দের ক্রীড়া পদ্ধতি বানচাল করার উদ্দেশ্যেই এইভাবে অনামী খেলোয়াড় দলভুক্ত করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, চীনের এই দুই অনামী খেলোয়াড় শেষ পর্যন্ত স্বদেশের জয়লাভের পথে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ৪র্থ সিঙ্গলস খেলার পর ফলাফল সমান ২-২ দাঁড়ায়। পঞ্চম সিঙ্গলস খেলায় নবাগত চীনা খেলোয়াড় লু ইউয়ান সেং অপ্রত্যাশিতভাবে যুগোশ্লাভিয়ার প্রখ্যাত খেলোয়াড় সুরবেককে পরাজিত করে স্বদেশকে ৩-২ খেলায় এগিয়ে দিয়ে খেলার মোড় স্বদেশের অনুকূলে ঘুরিয়ে দেন। মেয়েদের দলগত বিভাগের ফাইনালে অনামী খেলোয়াড় কে সিন-আই দুটি সিঙ্গলস খেলায় জিতেছিলেন। চারটি খেলার পর খেলার ফলাফল সমান ২-২ দাঁড়ায়। এই অবস্থায় শেষ পঞ্চম খেলায় চীনের নবাগত খেলোয়াড় কে সিন-আই বিশ্বের ২নং খেলোয়াড় লী আইলেসাকে হারিয়ে স্বদেশকে ৩-২ খেলায় জয়যুক্ত করেন।

পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে চীন তিন ঘণ্টার বেশী সময় খেলে ৫-৩ খেলায় যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত করে। প্রাথমিক লীগের খেলাতেও চীন ৫-২ খেলায় যুগোশ্লাভিয়াকে হারিয়েছিল। এই নিয়ে চীন পুরুষদের দলগত বিভাগের খেলায় সোয়েথলিং কাপ পেল ৫ বার (১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৭৫)।

মেয়েদের দলগত বিভাগের ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩-২ খেলায় হারাতে চীনের আড়াই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এই নিয়ে চীন মেয়েদের দলগত বিভাগে কবিলন কাপ পেল ২ বার (১৯৬৫ ও ১৯৭৫)। তাছাড়া তারা রানার্স-আপ হয়েছে ৩ বার (১৯৬১, ১৯৭১ ও ১৯৭৩)।

চূড়ান্ত স্থান

(প্রথম চারটি)

সোয়েথলিং কাপ : ১ম চীন, ২য় যুগোশ্লাভিয়া, ৩য় সুইডেন এবং ৪র্থ চেকোশ্লোভাকিয়া।

কর্বিলন কাপ : ১ম চীন, ২য় দক্ষিণ কোরিয়া, ৩য় জাপান এবং ৪র্থ হাঙ্গেরী।

দলগত বিভাগে লীগ খেলা

পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগের লীগ পর্যায়ের খেলায় (১নং শ্রেণী—গ্রুপ এ ও বি) যোগদানকারী মোট ১৮টি দেশের মধ্যে ইউরোপের ছিল ১৩টি দেশ এবং এশিয়ার এই পাঁচটি দেশ—চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া।

পুরুষদের দলগত বিভাগের লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল—এ গ্রুপে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং বি গ্রুপে চীন। মেয়েদের দলগত বিভাগের লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল—এ গ্রুপে দক্ষিণ কোরিয়া এবং বি গ্রুপে চীন। চেকোশ্লোভাকিয়া মেয়েদের দলগত বিভাগে ৪র্থ স্থান এবং দক্ষিণ কোরিয়া পুরুষদের দলগত বিভাগে ৫ম স্থান পেয়েছিল। একমাত্র চীনই উভয় বিভাগের লীগের খেলায় অপরাজিত থেকে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ৩২তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় চীন পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগে রানার্স-আপ হয়েছিল।

জাপান এবারের প্রতিযোগিতায় তার পূর্ব সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। লীগের খেলায় পুরুষদের দলগত বিভাগে ৪র্থ স্থান (জয় ৪ ও পরাজয় ৩) এবং মেয়েদের দলগত বিভাগে ২য় স্থান (জয় ৬ ও পরাজয় ১) পেয়েছে। ১৯৭৩ সালের প্রতিযোগিতায় জাপান উভয় বিভাগেই তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। গত দুবারের (১৯৭১ ও ১৯৭৩) প্রতিযোগিতায় জাপান মাত্র দুটি খেতাব পেয়েছে—১৯৭১ সালে মেয়েদের দলগত বিভাগের পুরস্কার কর্বিলন কাপ এবং ১৯৭৩ সালে মেয়েদের ডাবলস খেতাব (রুমানিয়ার সঙ্গে)। ১৯৫২ সালে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে ১৪টি আসর থেকে জাপান এ পর্যন্ত ৪৫টি খেতাব জয়ী হয়েছে—পুরুষদের দলগত বিভাগে ৭, মেয়েদের দলগত বিভাগে ৮, পুরুষদের সিঙ্গলসে ৭, মেয়েদের সিঙ্গলসে ৭, পুরুষদের ডাবলসে ৪, মেয়েদের ডাবলসে ৫ এবং মিকসড ডাবলসে ৭। আজ জাপানের খেলায় দারুন ভাটা পড়েছে। জাপানের সেদিন আর নেই।

সেমি-ফাইনাল

পুরুষদের দলগত বিভাগের সেমি-ফাইনাল খেলায় গতবারের রানার্স-আপ চীন ৫—২ খেলায় গতবারের (১৯৭৩ সালের) বিজয়ী সুইডেনকে পরাজিত করে এবং যুগোশ্লাভিয়া ৫—৩ খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

মেয়েদের দলগত বিভাগের সেমি-ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়া ৩—০ খেলায় জাপানকে এবং গতবারের রানার্স-আপ চীন ৩—০ খেলায় হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

দক্ষিণ কোরিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় লী আয়লেসা। ইনি মেয়েদের দলগত কর্বিলন কাপের ফাইনালের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ৫ম খেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে চীনের অনামী খেলোয়াড় কে সিন-আইয়ের কাছে হেরে যান। ফাইনালে চীন ৩-২ খেলায় দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে।

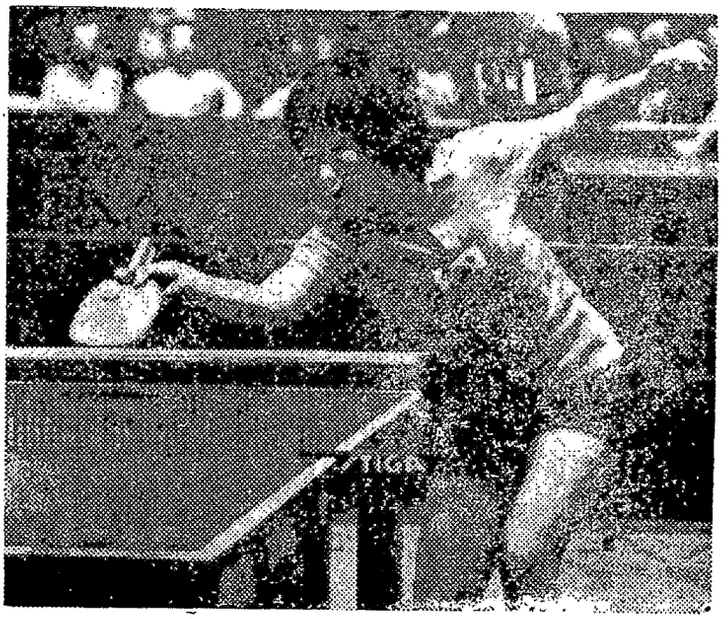

পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগের চারটি গ্রুপ থেকে এই ৮টি দেশ লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হওয়ার সুবাদে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল—পুরুষদের দলগত বিভাগের এ গ্রুপ থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও সুইডেন এবং বি গ্রুপ থেকে চীন ও যুগোশ্লাভিয়া। মেয়েদের দলগত বিভাগের এ গ্রুপ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ও হাঙ্গেরী এবং বি গ্রুপ থেকে চীন ও জাপান।

ভারতের শোচনীয় ব্যর্থতা

পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগের লীগের খেলায় ভারত তার প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের কাছে হেরেছে।

পুরুষদের দলগত বিভাগে ভারত সাতটি দেশের বিপক্ষে খেলে লীগ খেলার চূড়ান্ত তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান পায়। ভারতকে পরাজিত করে চীন ৫—০, জাপান ৫—১, যুগোশ্লাভিয়া ৫—০, হাঙ্গেরী ৫—১, ইংল্যান্ড ৫—০ এবং ইন্দোনেশিয়া ৫—৪ খেলায়। ভারতের পক্ষে খেলায় জয়ী হন নীরাজ বাজাজ ৪টি (বিপক্ষে চীন, জাপান, হাঙ্গেরী এবং ইন্দোনেশিয়া) জগন্নাথ ২টি (বিপক্ষে ইন্দোনেশিয়া) এবং মেনন ১টি (বিপক্ষে ইন্দোনেশিয়া)।

মেয়েদের দলগত বিভাগে সর্বনিম্ন স্থান অধিকারী ভারতকে পরাজিত করে গতবারের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়া ৩—০, হাঙ্গেরী ৩—০, রাশিয়া ৩—০, চেকোশ্লোভাকিয়া ৩—১, সুইডেন ৩—০, ফ্রান্স ৩—০ এবং ইন্দোনেশিয়া ৩—২ খেলায়। ভারতের পক্ষে খেলায় জয়ী হন শৈলজা সালোখে ২টি (বিপক্ষে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া) এবং পি ভাটশালা (বিপক্ষে ইন্দোনেশিয়া)।

১৯৭৩ সালের ৩২তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারত পুরুষ বিভাগে ১৪শ এবং মহিলা বিভাগে ১৭শ স্থান পেয়েছিল। এই ফলাফলের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস আসরে দ্বিতীয় সারির দল। সংগঠক দেশ হিসাবেই ভারত কলকাতার ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার দলগত বিভাগে প্রথম শ্রেণীর দলগুলির সঙ্গে খেলবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কিন্তু ভারত সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। আগামীবার প্রথম শ্রেণীর দেশগুলির সঙ্গে ভারত খেলতে পারবে না।

লীগ পর্যায়ের খেলা

সোয়েথলিং কাপ

১নং শ্রেণী—গ্রুপ এ

চূড়ান্ত তালিকা

দেশ	জয়	হার
চেকোশ্লোভাকিয়া	৭	০
সুইডেন	৬	১
রাশিয়া	৫	২
পশ্চিম জার্মানী	৪	৩
দক্ষিণ কোরিয়া	৩	৪
ফ্রান্স	২	৫
ডেনমার্ক	১	৬
অস্ট্রিয়া	০	৭

১নং শ্রেণী—গ্রুপ বি

দেশ	জয়	হার
চীন	৭	০
যুগোশ্লাভিয়া	৬	১
হাঙ্গেরী	৫	২
জাপান	৪	৩
ইংল্যান্ড	৩	৪
রুমানিয়া	২	৫
ইন্দোনেশিয়া	১	৬
ভারত	০	৭

মেয়েদের দলগত কর্বিলন কাপের ফাইনাব ঃ চীনের কে সিন-আই এবং হু ইউ লান বনাম দক্ষিণ কোরিয়ার লী আয়লেসা এবং চং হুন সুক

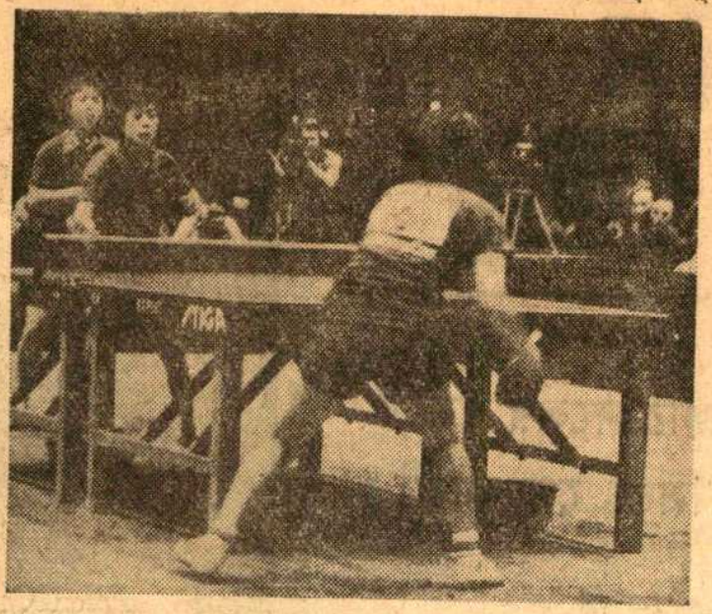

করবিলন কাপ

১নং শ্রেণী—গ্রুপ এ

দেশ	জয়	হার
দক্ষিণ কোরিয়া	৭	০
হাঙ্গেরী	৬	১
রাশিয়া	৫	২
চেকোশ্লোভাকিয়া	৪	৩
ফ্রান্স	৩	৪
সুইডেন	২	৫
ইন্দোনেশিয়া	১	৬
ভারত	০	৭

১নং শ্রেণী—গ্রুপ বি

দেশ	জয়	হার
চীন	৭	০
জাপান	৬	১
ইংল্যান্ড	৪	৩
যুগোশ্লাভিয়া	৪	৩
পশ্চিম জার্মানী	৩	৪
রুমানিয়া	২	৫
বুলগেরিয়া	১	৬
পোল্যান্ড	১	৬

কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে আয়োজিত তৃতীয় কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় আগের দু'বারের মত এবারও ইংল্যান্ড পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ইংল্যান্ড পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ৫—১ খেলায় অস্ট্রেলিয়া এবং মেয়েদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ৩—০ খেলায় কানাডাকে পরাজিত করে। এ ছাড়া ইংল্যান্ড ব্যক্তিগত বিভাগের পাঁচটি খেতাব জয়ী হয়ে প্রতিযোগিতার সমস্ত খেতাব (মোট সাত) জয়ের সূত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিংগলস ঃ ট্রেভর টেলর (ইংল্যান্ড) ২০—২২, ২১—১২, ২১—১৪ ও ২১—১৫ পয়েন্টে স্টিফেন ন্যাপকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করে।

মেয়েদের সিংগলস ঃ কুমারী জিল হ্যামার্সলে (ইংল্যান্ড) ২১—১৬, ১৯—২১ ২১—১৯ ও ২১—১৫ পয়েন্টে কুমারী লিণ্ডা হাওয়ার্ডকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন।

পুরুষদের ডাবলসে ডেসমণ্ড ডগলাস এবং ডেনিস নীল, মেয়েদের ডাবলসে কুমারী জিল হ্যামার্সলে এবং লিণ্ডা হাওয়ার্ড এবং মিকসড ডাবলসে লিণ্ডা হাওয়ার্ড এবং ডেসমণ্ড ডগলাস খেতাব জয়ী হন।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত

প্রথম মহিলা টেস্ট ক্রিকেট

পুনার নেহরু স্টেডিয়ামে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সরকারী মহিলা টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। ভারতীয় টেস্ট দলে বাংলা থেকে এই চারজন স্থান পেয়েছিলেন।

প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ১৯৭ রান সংগ্রহ করেছিল। লিনেট স্মিথ মাত্র ৩ রানের জন্যে সেঞ্চুরী থেকে বঞ্চিত হন।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২৩১ রানের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ের খেলায় ভারত ১ম ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে ১০৮ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে ভারতের ১ম ইনিংস ১৪৬ রানের মাথায় শেষ হয় এবং অস্ট্রেলিয়া ২ ইনিংসের ১২৬ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতের ৮৮ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ঃ ২৩১ রান (লিনেট স্মিথ ৯৭ রান। ডায়না এডুলজি ৪০ রানে ৬ এবং উজ্জ্বলা নিকাস ৪২ রানে ৩ উইকেট)

ও ১২৬ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লিনেট স্মিথ নট আউট ৫২ রান। এডুলজি ৪৬ রানে ২, রুনা বসু ১৮ রানে ১ এবং শর্মিলা চক্রবর্তী ২২ রানে ১ উইকেট)

ভারত ঃ ১৪৬ রান (ডায়না এডুলজি নট আউট ৪৮ রান। হোয়াইট ২২ রানে ৩ উইকেট)

ও ৮৮ রান (৩ উইকেটে। সুধা শা ৩৯ রান। সুশান চ্যাপম্যান ৩ রানে ২ উইকেট)।

ডেভিস কাপ

লক্ষ্ণৌতে ১৯৭৫ সালের ডেভিস কাপ আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ৩—১ খেলায় ভারতকে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে উঠেছে। এখানে উল্লেখ্য গত বছর ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা মূলে প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির প্রতিবাদে ভারত ফাইনালে অংশ গ্রহণ করেনি।

প্রথম দিনে নিউজিল্যান্ডের এক নম্বর খেলোয়াড় ওনি পারুণ ৪—৬, ৬—২, ১০—১২, ৬—৩ এবং ৬—৪ গেমে বিজয় অমৃতরাজকে পরাজিত করেন। আনন্দ অমৃতরাজ বনাম ব্রায়ান ফেয়ারলির দ্বিতীয় সিংগলস খেলাটি আলোর অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আনন্দ এই সময় ৬—৩, ৮—৬ ও ৭—৯ গেমে এগিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ব্রায়ান ফেয়ারলি ৩—৬, ৬—৮, ৯—৭, ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে আনন্দ অমৃতরাজকে পরাজিত করেন এবং ডাবলসে বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ ১৩—১১, ৬—৪, ৪—৬ ও ৬—৪ গেমে ওনি পারুণ ও ব্রায়ান ফেয়ারলিকে পরাজিত করেন। ফলে নিউজিল্যান্ড ২—১ খেলায় এগিয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে ওনি পারুণ ৫—৭, ৬—৪, ৬—৩, ৬—৮ ও ৬—২ গেমে আনন্দ অমৃতরাজকে পরাজিত করলে নিউজিল্যান্ড পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। বিজয় অমৃতরাজ বনাম ফেয়ারলির শেষ সিংগলস খেলাটি দর্শকদের হস্তক্ষেপে পরিত্যক্ত হয়।

সি কে নাইডু ট্রফি

কলকাতার যাদবপুর স্টেডিয়ামে সি কে নাইডু ট্রফির ফাইনালে বাংলা প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সুবাদে গত বছরের বিজয়ী পাঞ্জাবকে হারিয়ে পাঁচ বছর বাদে সি কে নাইডু ট্রফি জয়ী হয়েছে।

খেলার জগতে মেয়ে

ছাত্রীদলের নেত্রী সিক্তা গোস্বামী

গতবার কালিকটে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের এথলেটিক প্রতিযোগিতায় কলকাতা দলের অধিনেত্রী হয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের সিক্তা গোস্বামী। সিক্তা ঐ আসরে দুশমিটার দৌড় দীর্ঘ লম্ফন এবং হার্ডলসে স্বর্ণ পদক বিজয়িণী হলেও একশ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদকের অধিকারিণী হয়।

শুনে একটু অবাক লাগল। 'একশ মিটারে এরকম হল কেন? নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলে নাকী?

—না না। নার্ভাস আমি কোন সময়েই হই না। তবে কি জানেন অতগুলো বিভাগে পর পর যোগ দিয়ে বেশ খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তাই দ্বিতীয় দিনে একশ মিটার দৌড়ে ভাল করে উৎরোতে পারলাম না।

শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে সিক্তার সঙ্গে দেখা করলুম এক বিকেলে ওর অনুশীলনের সময় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে।

কথায় কথায় ওর স্কুলজীবনের খেলা-ধুলার কথাও উঠলো। সিক্তা বললে আমার বাবার বদলীর চাকরী তাই প্রথমে কলকাতার সেন্টমেরীজ কনভেন্টে পড়াশোনা আরম্ভ করলেও আমি বাড়ীর সঙ্গে দুর্গাপুরে যাই। ওখানেই ভালভাবে দৌড়ঝাঁপ করার সুযোগ পাই। ১৯৭০ সালে আমি প্রথম ত্রিবান্দ্রমে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় দীর্ঘ লম্ফন বিভাগে বাংলা স্কুলের হয়ে নামার সুযোগ পাই। পরের বছর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার অজুহাতে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে লড়াই সুরু করে দেওয়ায় দেশে জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হল। ফলে জাতীয় স্কুল ক্রীড়া স্থগিত হয়ে গেল। আমার ভাগ্যেও ঐবার স্কুলক্রীড়ার বাংলার প্রতিনিধিত্ব করা হল না। সত্যি যুদ্ধের মত বদ জিনিস আর কিছু নেই। সব ভাল কাজে বিঘ্ন আনে এই যুদ্ধ।

যাই হোক পরের বছর অর্থাৎ ৭২-এ সিক্তা দুর্গাপুর বহুমুখী বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে এল কলকাতায়। ভর্তি হল শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজে।

শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের ক্রীড়াবিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা সবিতা বসু এবং ঐ কলেজের উপাধ্যক্ষও আমাকে বলেছিলেন, আমাদের কলেজের এই মেয়েটি খেলাধুলায় যেমন ভাল পড়াশোনাতেও তেমনি। খুবই সিরিয়াস ছাত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়ছে—এখন পার্ট ওয়ান শেষ করেছে।

সিক্তার খেলার কথা যা বলছিলাম—৭২-এ বাটানগরে আয়োজিত রাজ্য প্রতিযোগিতায় ও শত মিটার এবং দীর্ঘ লম্ফনে সাফল্যের ফলে কোটায়ামে জাতীয় স্কুল-ক্রীড়ায় বাংলাদলে স্থান পায়। সেবার দীর্ঘ-লম্ফনে ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। ঐ বছরই আন্তঃ কলেজ ক্রীড়ায় একশ, দুশ মিটার দৌড় দীর্ঘলম্ফন ও হার্ডলসে সাফল্য অর্জন করে।

'৭৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়ে সিক্তাও বারাণসী গিয়েছিল। কিন্তু কলকাতা দলের এমনি কপাল আনুষ্ঠানিক-ভাবে নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিযোগিতায় যোগ-দানের আবেদন পাঠানো হয়নি এই অভি-যোগে কলকাতা দলকে উদ্যোক্তারা ঐ আসরে যোগ দিতেই দেয়নি। কথা শুনে হঠাৎ বলে ফেললাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবেতেই করিৎকর্মা বটে! তবে ৭৩-এ সিক্তা আন্তঃ কলেজ এথলেটিকসে ব্যক্তিগত বিজয়িণী আখ্যা জয় করে। প্রধানতঃ ওরই সাফল্যের

সিক্তা গোস্বামী

মুলাদনে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়।

গত বছরও সিক্তা আন্তঃ কলেজ এথলেটিকে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়। ওর কলেজও চ্যাম্পিয়ান খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখে। তারপর কালিকটে যায় কলকাতার শাস্ত্রী দলের অধিনেত্রী হয়ে—সেকথা গোড়াতেই বলেছি।

কলেজের মেয়েদের ক্রীড়ামান সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে সিক্তা বললে এখন অনেক মেয়েই এথলেটিক আসরে নামে। আগে কিন্তু এমন ছিল না। পূর্ব রেলের শ্রীরূপাবোন শ্রীলতা চ্যাটার্জির সেন্ট এন্ড্রুজ কলেজ স্বল্প পাল্লার দৌড়ের ও খুব প্রশংসা করলো আর দীর্ঘলম্ফনে ত্রিপুরার সাবিত্রী সুরের। ওরা দুজনেই গতবার আন্তঃ কলেজ আসরে যথাক্রমে একশ,

মিটার ও দীর্ঘলম্ফনে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

সিস্তার বাবা শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী এখন দুর্গাপুরে হিন্দুস্থান স্টীলের এক শাখার পারচেজিং অফিসার।

—বাবা চান আমি খেলাধুলোর সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাতেও সফল হই। মা অবশ্য আমায় খেলাধুলোর দিকে খুবই উৎসাহ দেন। বাবা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দলের নিয়মিত খেলোয়াড়। আমাদের পৈত্রিক বাসভূমি বিক্রমপুরে। তবে দেশভাগের পর আমার বাবা-মা সবাই এদেশে চলে আসেন। আমি জন্মেছি কলকাতায়। আমরা দু বোন এক ভাই।

—তুমি নিশ্চয়ই মেয়েদের খেলাধুলায় সুবিধা-অসুবিধার কথাও চিন্তা কর?

—হ্যাঁ তা কিছু কিছু করি। এই দেখুন না এখন মেয়েদের এথলেটিক প্রতিযোগিতার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশী মাত্রায় বেড়েছে তো? আর অনেক বেশী মেয়ে এসব আসরে যোগ দিতেও আসে। কিন্তু কজন টিকে থাকে বলুন?

—কারণটা কি মনে হয়

—এথলেটিকে সাফল্য অর্জন করতে হলে যতখানি মানসিক দৃঢ়তা আর ধৈর্য নিয়ে অনুশীলন করা উচিত এরা ততখানি খাটতে পারে না। কিছু অনুশীলন করেই ছেড়ে দেয়। আরও কারণ আছে আমরা অধিকাংশই আসছি সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসার থেকে। একজন এথলীটের পুরো সময় অনুশীলন করতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় সেই অনুপাতে খাদ্য না পেলে এদের শরীর তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চাইকি কারও কারও কঠিন অসুখ পর্যন্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে ক্রীড়া বিভাগের কর্মকর্তা এবং সরকারী ক্রীড়া বিভাগেরও কিছু করণীয় আছে? তাই নয় কি?

—হ্যাঁ এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে সবাই একমত হবেন। এছাড়া আর কোন কারণ তোমার নজরে পড়ে?

—হ্যাঁ। আর একটা হল মেয়ে এথলীটদের অনুশীলনের উপযুক্ত জায়গা পরিবেশ আর সাজ-সরঞ্জাম কলকাতায় এসবের খুব অভাব। তার ওপর মেয়েদের খেলাধুলোকে সাধারণ লোকে এবং অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও একটা কৌতুক বা মজার ব্যাপার বলে মনে করেন। এখনও এদেশে মেয়ে ক্রিকেটার এথলীট বা অন্য খেলোয়াড়কে কেউ স্বাভাবিক চোখে সম্ভবতঃ দেখেন না। বহু লোকের বহু রকম টিকাটিপ্পনী আমাদের কানে আসে। তাতে যাদের মর্ম স্পর্শ করে তারা খেলাধুলোর আসন থেকে সরে দাঁড়ায়। আর সে সব কথা যারা কানেই তোলে না তারাই রয়ে যায় খেলার মাঠে ব্যাডমিন্টন টেনিস কাবাডি ক্রিকেটের আসরে। তাই আমার মনে হয় মেয়েদের খেলাধুলোর উন্নতির প্রভূত সুযোগ রয়েছে। সুযোগ রয়েছে আমাদের খেলাধুলোকে সঠিক স্বাভাবিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

—কথাগুলি ভাববার মত। আমি এসব প্রকাশ করবো যাতে সংশ্লিষ্ট সবাই অবহিত হতে পারেন।

—হ্যাঁ বলবেন আমার কথা। বিশেষভাবে বলবেন পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের দেশের মেয়েদেরও খেলাধুলায় বিশেষ করে এথলেটিক ক্রীড়ায় নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা করতে হবে। করতে হবে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা ঢালাও অনুশীলনের আয়োজন, শহরে গ্রামে আরও ক্রীড়াকেন্দ্র ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরও চাই। এসব না হলে ৫৬ কোটির এই স্বাধীন দেশ কি করে সুনাম অর্জন করবে?

—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি প্রায়ই দুর্গাপুরে গিয়ে অনুশীলন কর কেন?

—কারণ কলকাতার চেয়ে ওখানে এথলেটিকসে অনুশীলন করা অনেক বেশী সুবিধাজনক। ওখানে আমি নেহরু স্টেডিয়ামে জাতীয় প্রশিক্ষক শিশুতোষ মুখার্জীর উপদেশ নির্দেশ নিতে পারি। উনি ওখানে নিয়মিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে এথলেটিক প্রশিক্ষণ দেন। শ্রীমুখার্জী এন আই এস-এর শিক্ষণ প্রাপ্ত। আমি ওখানে স্কুলে থাকাকালেই ওঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিই। বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণের কল্যাণে আমার দৌড় ও দীর্ঘ লাফে অনেক উন্নতি হয়েছে।

—ক্রীড়ামান বাড়াতে হলে কি পদ্ধতি নেওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়?

—এর আগে অনেকে যা বলেছে আমি সেই কথারই পুনরুক্তি করব। স্কুলের পর্যায় থেকেই—কি শহরে কি গ্রামে—সর্বত্র এথলেটিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলে স্কুলে নিয়মিত ক্রীড়া প্রশিক্ষক রেখে ছাত্রীদের মধ্যে দৌড়-ঝাঁপের প্রতি আগ্রহ জাগাতে হবে। নানা প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হবে ওদের জন্য। ওদের উৎসাহ দিতে হবে যোগদানের জন্য। তাহলেই দেখবেন সম্ভাবনাময় এথলীটের দেখা পাওয়া যাবে। এ কাজে আলসেমী বা কার্পণ্য করলে কোন সুফল হবে না। অনুশীলনের সময় ওদের উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা স্কুলেরই করা উচিত—সরকারও ভর্তুকী দিতে পারেন। উন্নতি করতে হলে সেই যে বলে—'ক্যাচ দেম ইয়ং।'

—ভাল কথা। সত্যিই মনের রাখবার মত। আচ্ছা ভবিষ্যতে তোমার কি করার ইচ্ছে?

—গ্র্যাজুয়েট হয়ে চাকরী করার আর এথলেটিক চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। এথলেটিকস দল আছে এরকম অফিসে কাজ পেলে অবশ্য সুবিধা হয়।

—প্রার্থনা করি তোমার ইচ্ছা পূরণ হোক।

—অমর

দেশবিদেশের খেলা

নবযুগের প্রবর্তক

পূর্ব জার্মানীর জেনা শহরের ছোট্ট একটি ছেলে দাদার হাত ধরে গুটি গুটি পায়ে এসে ভর্তি হল স্কুলে। বেশ কয়েক বছরেও পড়াশুনো খেলাধুলো কোনটাতেই নিজেকে মানানসই করে নিতে পারলো না। স্কুলের খেলাধুলোয় ব্যর্থতা তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। কারণ সহপাঠীদের কাছে লজ্জা। বাড়ীতে খেলাধুলার পরিবেশে বেমানান। বড় দু দাদা রীতিমত নামকরা দৌড়বীর। তাদের কাছ থেকেও কথা শুনতে হত অনেক সময়। বাবা জাহাজের নাবিক। তার অধিকাংশ সময় কাটতো জলে জলে। তিনিও যখন বাড়ীতে থাকতেন তখন এই ছেলেটিকে খেলাধুলায় এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিতেন বটে কিন্তু বাড়তি অনুপ্রেরণা এসেছিল দুই বড় অ্যাথলীট দাদার কাছ থেকে।

খেলাধুলার নানান বিভাগ পরিক্রমা করে ছেলেটির স্থির অনুরাগ জন্মায় পোলভল্টের প্রতি। পোলভল্টের অনুশীলনেই নিজের নিষ্ঠা আন্তরিকভাবে কেন্দ্রীভূত করে। এবং ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্পোর্টসে পোলভল্টে প্রথম

উলফ গ্যাং নর উইক

হয়ে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে গভীর আত্মপ্রত্যয়ে।

পূর্ব জার্মানীর সব কটি অ্যাথলেটিকসের আসরে পোলভল্টে সেরা হয়ে পরিশেষে জাতীয় চ্যাম্পিয়নসিপের গৌরবও অর্জন করে অনায়াসে। পরে স্বচ্ছন্দ লাভ করে ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের আখ্যা। আর ১৯৬৮ সালে মেকসিকো অলিম্পিকে ৫-৪০ মিটার লাফিয়ে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জপদক পায়। সেদিন দূরদর্শী বিশেষজ্ঞরা ও বিচক্ষণ সাংবাদিকেরা ছেলেটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কুণ্ঠিতকণ্ঠে প্রমাদ গুনেছিলেন। এক ব্রিটিশ সাংবাদিক ছেলেটিকে 'মিউনিখ অলিম্পিকের নতুন আলো' বলে অভিহিত করেছিলেন।

সত্যদৃষ্টা ঋষির মত ঐ সাংবাদিকের মন্তব্য মিথ্যে কুহেলিকায় ঢাকা প্রহসনে পর্যবসিত হয়নি। মিউনিখ অলিম্পিকে সত্যি সত্যি প্রথম হয়ে ছেলেটি সোনার পদক জয় করে। সর্বজনপরিচিত এই ছেলেটির নাম উলফগ্যাং নরডউইক।

নরডউইক পোলভল্টিং-এ নবযুগের প্রবর্তক। তিনিই প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতার পোলভল্টে দীর্ঘকালের নিরঙ্কুশ আমেরিকান আধিপত্যকে ধরার ধূলায় মিশিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে এথেন্স থেকে মেকসিকো পর্যন্ত পনেরটি অলিম্পিকের অনুষ্ঠানের সবকটিতেই আমেরিকার সহজ সুলভ প্রাধান্য বজায় ছিল। মিউনিখ অলিম্পিকেই আমেরিকা প্রথম পোলভল্টে তার শীর্ষাসন হারায়।

মিথনিখে নরডউইকের প্রধান প্রতিযোগী ছিল পোলভল্টে বিশ্বরেকর্ডধারী ও মেকসিকো অলিম্পিকে সেরা বব সিগ্রিন। প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে মনে হয়েছিল উভয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে। বলে রাখা ভাল : মিউনিখ অলিম্পিকের প্রাক মুহূর্তে সিগ্রিন ৫-৬৩ মিটার লাফিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। মিউনিখে কিন্তু সিগ্রিন ব্যক্তিগত পোল ব্যবহারে বঞ্চিত হয়ে ৫-৪০ মিটারের অধিক লাফাতে সক্ষম হননি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে নরডউইক ৫-৪০ মিটার অতিক্রম করেছেন ছবার অনেক আগে অ্যাথলেটিক জীবনের সূচনায়। চারবার ৫-৪০ মিটার। এই দূরত্ব অতিক্রম করে মেকসিকো অলিম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী হন। আর ১৯৭০ সালে একবার ৫-৪৬ মিটার ও ৫-৪৫ মিটার কৃতিত্বের সঙ্গে দণ্ডের সাহায্যে ঊর্ধ্বারোহন করে বেড়া অতিক্রম করেন। আরও আগে নরডউইক সতের বার ৫-৩০ মিটার ও ছিয়ানব্বইবার ৫-০০ মিটারের ওপর লাফিয়েছেন। আর মিউনিখ অলিম্পিকে ৫-৫০ মিটার লাফিয়ে চ্যাম্পিয়ন। তৃতীয় হন আমেরিকার জন জনসন ৫-৩৫ মিটার লাফিয়ে। নরডউইক প্রায় সতের বারের ওপর ৫-৩৫ মিটার লাফিয়েছেন। বিশ্ব রেকর্ডের খুব কাছাকাছি না গেলেও পূর্ব জার্মানীর অসাধারণ ছেলে উলফগ্যাং নরডউইকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দীর্ঘ সূত্রের মত অবিচ্ছিন্ন মার্কিন আধিপত্যকে পোলভল্টের জগৎ থেকে মুছে দেওয়া।

উচ্চলম্ফনে বহু কীর্তির অধিকারী দক্ষ কারিগর উলফগ্যাং নরডউইক একজন ইঞ্জিনীয়ার। ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমাধারী নরডউইকের মাঠের বাইরের জীবন কাটে তাঁর পড়াশুনার নানান বিষয় সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে। অপরদিকে পদার্থ বিদ্যার নরডউইক তাঁর লব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করেছেন ক্রীড়াগত কুশলতা বৃদ্ধির কাজে। যার অনেকটা ফলশ্রুতির পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের অন্তরালে।

শান্ত আলাপী স্বভাবের নরডউইক পরিচিতদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। সকলের সঙ্গে হেসে আলাপ করা নরডউইকের চরিত্রের একটি মূল্যবান অলঙ্কার বলা যায়। এমনকি দর্শকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একই রকম। দীর্ঘ অনুশীলনের পর ক্লান্ত পায়ে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী ও প্রাণচঞ্চল শিশুপুত্রের হাত ধরে পথ পরিক্রমা প্রাত্যহিক জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। নরডউইক আনন্দ ও প্রাণপ্রাচুর্যে ঐশ্বর্যবান পুরুষ। তাই কি মাঠে কি সংসারের কাজে সর্বত্রই এক অনাবিল অপরিসীম আনন্দলোকে ভাস্যমান।

—প্রশান্ত দাঁ

ঋষি কাপুর। নিতু সিং

দীক্ষাগৃহ

রফু চক্র

প্রযোজনা : এম. আই. ফিল্মস
প্রাঃ লিঃ
বিদেশী ছবির কাহিনীভিত্তিক
একটি উপভোগ্য হিন্দী ছবি

সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও এক মহিয়সী মহিলাকে দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে কুচক্রী স্বামীর জন্যে। শেষ পর্যন্ত অসামাজিক স্বামীর কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে এবং তার স্বামীর প্রভাব যাতে ছেলের উপর না পড়ে, সেই জন্যে একমাত্র ছেলে 'দেব'কে নিয়ে তাঁর এক মুসলমান বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে ক্রমে দুই বন্ধু দেব ও সেলিম, তাদের স্কুল ও কলেজের শিক্ষা শেষ করে সংগীতেরও তালিম নিতে লাগলো।

'রনজিত' নামে একজন কুচক্রীর হাতে এক অসহায় ব্যক্তির নিহত হওয়ার দৃশ্য দেখে দুই বন্ধু—ওদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ভুল করে মেয়েদের কামরায় ঢুকে পড়ে মেয়েদের দলে মিশে যায়, দেবী সালমা নামে মেয়ে সেজে ওরা গানের দলের সঙ্গে মিশে গেল। সেই মেয়ে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন 'নিতু' নামে এক তরুণী তরুণী। সেই শুরু। ধীরে ধীরে সংগীতের মধ্যে দিয়েই ওরা মন দেওয়া-নেওয়ার পালা চালিয়ে যেতে লাগলো। নিতু ও ভালবাসার কাঙ্গাল ছিল। কাশ্মীরে যেখানে দুই বন্ধু ও নিতু এবং ওর বন্ধুরা আস্তানা নিয়েছিল, সেখানে হঠাৎ একদিন কুচক্রী 'প্রকাশ' এসে উপস্থিত হলো এবং আবিষ্কার করলে দুই তরুণীর ছদ্মবেশে 'দেবী' ও 'সেলিমা'কে। দলের সর্দারের পরামর্শে ওরা দুই বন্ধু এবং 'নিতু'কে বন্দী করে রাখলো। 'দেবে'র মাকেও সেখানে নিয়ে এল ওরা ছেলের শাস্তি স্বচক্ষে দেখবার জন্যে। সেখানেই দেবের মা রণজিৎরূপী স্বামীকে চিনতে পারলেন। উনিও তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দেব ও তাঁর প্রণয়ী নিতু এবং স্ত্রী-কে আপন করে নিলেন।

এ-ছবির অন্যতম সম্পদ অভিনয়, সঙ্গীত ও কলাকৌশলের কাজ। অভিনয়ে : দেব (ঋষিকাপুর), সেলিম (আসমানী), নীতু (নীতু সিং), দেবের মা (সুলোচনা), সেলিমের মা (মুমতাজ বেগম) ও কুচক্রীদের ভূমিকায় মদনপুরী, কে এন সিং, আনোয়ার হুসেন ছবির চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে রাজেন্দ্রনাথ, পেন্টাল, ভগবান, মনমোহন, ফরিয়াল রাজন হস্কর এম রাজন হীরালাল, সপ্রু, ম্যাকমোহন প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আলোকচিত্রগ্রাহক পিটার পেরিয়েরা ছবির কাজে লাগিয়েছেন। সঙ্গীতে কল্যাণজী আনন্দজী তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন। পরিচালক নরিন্দর বেদী জনপ্রিয় হলিউডের ছবির ('সাম লাইক ইট হট')-এর প্রভাব এড়াতে পারেননি।

—চিত্রদূত

ফুলু ঠাকুরমা
জয়শ্রী রায় ও ইন্দ্রজিৎ। পরিচালনা ঃ সাধন সরকার

রানুর প্রথম ভাগ

প্রযোজনা ঃ মহামায়া প্রোডাকসন্স পরিচালনায় অবাস্তবতা থাকলেও এ ছবি একটি উপভোগ্য শিশু চিত্র হিসাবে বিবেচিত হবে।

চঞ্চলা কিশোরী রানুর 'প্রথম ভাগ' এখনও শেষ হয় নি। দশ বছরের ছোট্ট মেয়ে সারা বাড়ী কেবল ছুটোছুটি করে সবাইকে ব্যস্ত করে তোলে। কারোর শাসন মানে না, ওকে পড়তে বললেই বই হারিয়ে যায়। সারা বাড়ীতে তাঁর 'প্রথম ভাগ' খুঁজে পাওয়া যায় না। 'মেজকা' আবার বই কিনে দেয়। কিন্তু পড়ার তাগাদা দিলে পেট ব্যথা ও অন্যান্য রোগের আবির্ভাব হয়। আর মেজকা পড়ার জন্যে রানুকে ধমক দিলে দাদুর নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যায়। অনেক সময় বাড়ীর লোকেরা রানুর মুখে বিজ্ঞজনের ভাষা শুনে চমকে ওঠে। যেমন বাজার দর বাড়ছে—দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। সংসারের লোকেরা সামলে না চললে, পরে নানা অসুবিধার মধ্যে পড়বে। মেজকার স্বপ্ন রানু একদিন লেখাপড়া শিখে বড় হবে। রানুও মেজকাকে ভালবাসে। বিশেষ করে অসুখের সময় নিজেই মায়ের মতো সেবা শুশ্রূষা করে ওঁকে সারিয়ে তোলে রানুর বাবার খেয়াল ছিল বিচিত্র। কখনও তিনি খুসীন্, আবার কখনও গোঁড়া হিন্দু। হঠাৎ ও'র মনে হোল রানুকে গৌরীদান করে পুণ্য অর্জন করবেন। শৈলেন দাদার এই প্রস্তাবকে মেনে নিতে না পেরে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে বিদেশে চলে গেলেন। এদিকে বন্ধুর দিদির বিয়ে দেখে রানুর মনে সাধ হল, তার শ্বশুরের যেন মাথায় টাক, মোটা ভুঁড়ি আর পুরু গোঁফ থাকে। রানুর ইচ্ছানুযায়ী মেজকা কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন সব শেষে ওর ইচ্ছামতোই এক শ্বশুর পাওয়া গেল, পরমলগ্নে বিয়েও হয়ে গেল রানুর। একদিন। কিন্তু বিদায় দিতে গিয়ে মেজকার চোখে জল। রানু তার সব লুকিয়ে রাখা 'প্রথম ভাগ' তুলে দেয় মেজকার হাতে। মেজকা ছুটে যায় 'রানু' বলে, কিন্তু সে তখন কোথায়। এ-ছবির অন্যতম সম্পদ রানুর ভূমিকায় রাষ্ট্রপতির পুরস্কারপ্রাপ্ত নীরা মালিয়ার অপূর্ব অভিনয়। অন্যান্য ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (মেজকা ও দাদু), অসীম চক্রবর্তী (রানুর বাবা), নির্ভাননী দেবী, কনিকা মজুমদার, গীতা দে, বঙ্কিম ঘোষ, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্বজু ভাওয়াল, অমর বিশ্বাস, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কলা-কৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন, তবে কখনও কখনও সম্পাদকের কাঁচি আরও নিষ্ঠুর হতে পারতো। সঙ্গীত পরিচালনায় নিখিল চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিশেষ করে আবহসঙ্গীতে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানটি প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ দরদ দিয়ে গেয়েছেন। পরিচালক নরেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ এমন একটি সুন্দর শিশুচিত্র উপহার দেবার জন্যে।

—চিত্রদূত

ফের থেকে বলছি

...অনেক স্তব্ধ দিনের এপারে চকিত
চতুর্দিক
আজো বেঁচে আছি মৃত্যুতাড়িত আজো
বেঁচে আছি ঠিক...

ঠিক এই মুহূর্তে হাজার জনতা এখানে। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর এই ফ্লোরে। শুটিং নয়। শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে একত্রিত সংহতি। শ্রমিক কলাকুশলী শিল্পী কনভেনশন। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক কলাকুশলী শিল্পীদের জীবনের মান উন্নয়ন এবং শিল্পের সামগ্রিক উন্নতির দাবীতে। বিগত চৌঠা ফেব্রুয়ারী বিকেল পাঁচটা থেকে সূত্রপাত। সভাপতি : শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী এম পি। প্রধান অতিথি : শ্রীহীরেন মুখার্জি এম পি (সভাপতি বি এম পি ই ইউ)। উদ্বোধক : শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন : আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম অনেক কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণ তেমন হয় নি। এর জন্য ভেবে বসবেন না আমরা নিশ্চেষ্ট হয়েছিলাম। আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু বাধা আসছে নানা দিক থেকে। এরই মধ্যে আমরা এগিয়ে যাব। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। যেমন এ বছর থেকে পূর্বঘোষিত পঁচিশ লক্ষ টাকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড স্থির করেছেন আটখানি ছবিকে নগদ দেড় লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে। এছাড়া এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কলাকুশলীদের জন্য। দশটি গ্রুপে বিভক্ত কলাকুশলীদের এক-একটি ইউনিটকে দশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে যদি তাঁরা অ্যালায়েড বিজনেস করেন। অত্যন্ত সুখের কথা ইতিমধ্যে একজন প্রযোজক দেড় লক্ষ টাকা পেয়েছেন। দশটি কলাকুশলী ইউনিট স্কিম

আপনজন চিত্রমের প্রথম প্রয়াস অসময়-এর শুভ মহরতে স্বরূপ দত্ত, অনুপকুমার, নৃপেন সান্যাল ও অমলাশঙ্কর।

সাবমিট করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন ...আমি সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করছি যাতে বাংলা ছবি বাধ্যতামূলকভাবে প্রদর্শন করা যায়। যাতে আরো কিছু সিনেমা হল তৈরী করা যায় তারও চেষ্টা চলছে।...স্থানীয় প্রযোজকদের অমানুষ এবং সুজাতা ছবি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এরকম কমার্সিয়াল ছবি নির্মাণ করলে বাংলা সিনেমা শিল্প বাঁচবে। আর প্রয়োজন কলকাতা থেকে হিন্দী ছবি করা। সর্বভারতীয় বাজারের জন্য কলকাতার স্টুডিও থেকে হিন্দী চিত্র নির্মাণ একান্ত জরুরী। এরই মধ্যে অবশ্য দু-একজন এগিয়ে এসেছেন।...

অনেক কাহিনী আছে অজ্ঞাত গোপনে
ঘামের রক্তের আর চোখের জলের।...

টেকনিসিয়ানদের পক্ষ থেকে আশুতোষ নাগ বলেন : অনেক আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতির স্বপক্ষে আমরা অনেক হাততালি দিয়েছি। হাততালি দিতে দিতে আমাদের হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছে। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। অথচ অন্যান্য রাজ্যে দিন বদলের পালা শুরু হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। আমাদের মত ছোট্ট একটা রাজ্যে সরকার অর্ধেক প্রমোদকর ফিরিয়ে দিচ্ছেন প্রযোজকদের। অন্যান্য রাজ্যেও ইনসেনটিভ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কলাকুশলীদের মাথাপিছু আয় এখান থেকে বেশী। অন্যান্য সুখ-সুবিধার প্রতিও সরকার অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। আমাদের এখানে কলাকুশলীদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ।...

প্রসঙ্গত ফেডারেশন সম্পাদক শ্রীসুব্রত সেনশর্মা এক সাক্ষাৎকারে : এখানে স্থায়ী কলাকুশলীর সংখ্যা প্রায় তিনশো। ফ্রি-লান্স বারোশোর মতো। স্থায়ী কলাকুশলীরা সারা বছর কাজ পেলেও পেতে পারেন। তাঁরা মোটামুটি সরকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন বেতন পান। ফ্রি-লান্স টেকনিসিয়ান্সদের বলতে গেলে পায়ের তলায় মাটি নেই। তাঁরা স্রেফ আত্মবিশ্বাসের জোরে টিঁকে আছেন। একদম অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে। এই বারোশো মাত্র কুড়ি পার্সেন্ট সারা বছর কাজ পান যদি কোন অঘটন না ঘটে। ফিফটি পার্সেন্ট ছ মাস কাজ করেন। ছ মাস বেকার থাকেন। অবশিষ্ট থার্টি পার্সেন্ট হয়তো সারা বছরই বেকার। আশায় আশায় থাকেন। কখনও কখনও ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ে যায়। এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠে অনেকেই এই শিল্পের সংগে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। এমনও হয়েছে কুড়ি-পঁচিশ বছর থাকার পর কেউ কেউ চলে গিয়েছেন। সরকার ঘোষিত যে ন্যূনতম বেতন তাও ঠিকভাবে পাওয়া যায় না। অরোরা স্টুডিও বেঙ্গল ল্যাবরেটরী, ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী এবং ইন্দ্রপুরী স্টুডিও—এঁদের কাছ থেকে কলাকুশলীরা উক্ত ন্যূনতম বেতন পান না। পান একশো কুড়ি থেকে একশো পঞ্চাশ টাকার মধ্যে। সরকার ঘোষিত ন্যূনতম বেতন শুরু হয় দুশো চল্লিশ টাকা থেকে।..

...এই সম্মেলন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এই অভিমত ঘোষণা করছে যে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের সংকটের মূল কারণ হল বাজারের অভাব। পণ্য হিসেবে বাংলা ছবিকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার রাস্তা প্রায় বন্ধ। এই কারণেই বাংলা ছবির জন্য অর্থ বিনিয়োগে অনীহা এবং কাজের অভাবে চৌদ্দটি স্টুডিও বন্ধ হতে হতে আজ মাত্র চার। পাঁচটি কোনমতে অন্তিম সময়ের অপেক্ষা করছে। এককালে যেখানে ষাট-সত্তরখানা ছবি তৈরী হত সেখানে আজ কুড়ি-পঁচিশখানা। স্বভাবতই শিল্পের প্রায় শতকরা পঁচাত্তর-জন শিল্পী-কলাকুশলী সারা বছর বেকার থাকে—অনশনে অর্ধাহারে দিনযাপন করে। দীর্ঘদিন এই শিল্পে জীবন কাটিয়ে অন্যত্র রুজি-রোজগারের কোন উপায় না থাকায় অনেক দক্ষ কলাকুশলী শিল্পী ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হয়েছেন। বিনা চিকিৎসায় ও অনাহারে অনেকের জীবনাবসান হয়েছে।...

শ্রীপারিজাত বসু বলেন ঃ এই ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড আমাদের রীতিমত হতাশ করেছে। কারণ এই বোর্ডের হাতে স্ট্যাচুটরি পাওয়ার নেই। ফলে কোন কাজই এগিয়ে যেতে পারছে না। ফিল্মের জন্য একটি স্বয়ংশাসিত দপ্তর দরকার। এ ছাড়া শিল্পের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে না।...সিনেমা হাউসের সংখ্যা যতদিন না বহুল পরিমাণে বাড়ান হচ্ছে ততদিন এ রাজ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের কোন ভবিষ্যৎ নেই!..

উত্তমকুমার বলেন ঃ সরকারের উচিত অন্তত অর্ধেক প্রমোদকর প্রযোজককে ফেরত দেওয়া। তাহলে বাংলা ছবির সংখ্যা বাড়বে। শিল্প বাঁচবে।

...মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ—
বুকে আমার জ্বলে উঠবার উচ্ছ্বাস...

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ অথচ আমরা বিপ্লব করতে পারি না, শুধু মিটিং করতে পারি। গালভরা বক্তৃতা দিতে পারি। সরকার যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেটা আজ বিলম্ব হতে হতে বিড়ম্বনায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই অচলায়তন ভাঙতে হবে। কেন হবে না। কাজের ক্ষেত্রে যাঁরা বাধার সৃষ্টি করছেন, গণ্ডগোল করছেন তাঁদের আনডেস্টফাই করা দরকার চিহ্নিত করা দরকার। সরকারকে এগিয়ে আসতেই হবে। সিক ফিল্মস সিক ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির ভার তুলে নিতে হবে। মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। বৃহৎভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ফেডারেশন অফ ফিল্ম টেকনিসিয়ান এণ্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রস্তাবিত দাবীর ভিত্তিতে, অন্যান্য বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন ঃ কাজ করার জন্য এক দল উৎসাহী আছেন। আরেক দল উৎসাহী আছেন যাতে কাজ না হয়। কাজ করলে সেই লোকের ক্ষমতা যদি বেড়ে যায় তার প্রতিরোধের জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এক দল মোটামুটি সঠিক পথে শিল্পের উন্নতিকল্পে এগিয়ে চলছিল কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিং তাদের অন্য পথে ঘুরিয়ে দিল। ন্যায্য কথা কিছু করা উচিত। সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ দরকার। সিনেমা হলের জাতীয়করণ দরকার। বাংলা ছবিকে ইনসেনটিভ দেওয়া দরকার। সরকার সামগ্রিক শক্তি। এখনই হতাশ হবার মতো পরিস্থিতি নয়। আপনাদের ঐক্য, সহযোগিতা এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত আমাদের চেষ্টা...

...তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার চোখে
আজো স্বপ্ন...
কিন্তু জানি একদিন সে সকাল
আসবেই...

—স্টুডিও সংবাদদাতা

স্টুডিও সংবাদ

বেশী ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে পরিচালক অগ্রদূত তাঁর অগামী ছবির শুভ সূচনা করলেন গত সপ্তাহে, স্টুডিও সাভাই কো-অপারেটিভ-এ। এর প্রধান কারণ অবশ্য অমিতাভ বচ্চন। অমিতাভ, বাংলা ছবিতে কাজ করছেন, আগেভাগে তেমন প্রচার হয়নি। হঠাৎ স্টুডিওতে চলে আসবেন, অন্তত মহরতের কার্ড যাঁরা পাননি তাঁরা অনুমান করতে পারেন নি। সে যাই হোক অমিতাভ বচ্চনের উপস্থিতিতে মহরত-শট নেওয়া হল। ক্ল্যাপস্টিক দিলেন প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। শিল্পী ঃ দেবরাজ রায়। সহযোগী আলোকচিত্রশিল্পী বীরেন মুখার্জি ক্যামেরায় চোখ রাখলেন। সংলাপ-মুখর কয়েকটা মুহূর্ত। অগ্রদূত গোষ্ঠীর কর্ণধার বিভূতি লাহার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি করল 'কাট'। অতএব শুভসূচনা। হাততালি। এবারে বলি শুনুন এ-ছবি 'কোয়েলের কাছে'। বুদ্ধদেব গুহ রচিত বহুপঠিত উপন্যাস। এরই চিত্ররূপে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন অমিতাভ। এই তাঁর প্রথম বাংলা ছবিতে অভিনয়। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম কেমন বাংলা জানেন মশাই। অমিতাভ স্মিত হাস্যে জানালেন 'লিটল বাট'। 'তা আপনার এই চরিত্রটার সংলাপ কি সবই বাংলা?' 'এখনো আমি স্ক্রীপ্ট শুনিনি।' 'কবে থেকে শুটিং করছেন?' 'নভেম্বরের আগে নয়।'...শ্রীরূপ চিত্রমের পতাকাতলে এই ছবি নির্মিত হতে চলেছে। প্রযোজনা করছেন পিনাকী চৌধুরী ও বিশ্বরঞ্জন সাহা।

নগর দর্পণ
উত্তমকুমার। কাবেরী বসু

বম্বের আরেকজন অভিনেতা, মূলতঃ গায়ক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি—শৈলেন্দ্র সিং কলকাতায় এসেছিলেন। একই সঙ্গে এসেছিলেন 'কোরা কাগজ' ছবির পরিচালক অনিল গাঙ্গুলী। এঁদের দুজনকে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত করেন প্রযোজক ও পি সিং, কলকাতার তরুণ শিল্পপতি। শ্রীসিং বর্তমানে একটি বাংলা ছবি প্রযোজনা করছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে 'অজস্র ধন্যবাদ'। পরিচালক ঃ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। এ-ছবির নায়ক চরিত্র রূপায়িত করছেন 'রবি'-খ্যাত গায়ক পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত নায়ক শৈলেন্দ্র সিং। নায়িকা ঃ মহুয়া রায়চৌধুরী। এ-ছবির একটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করতে পারেন দীপংকর দে। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন শ্যামল মিত্র। এ-ছবির শুটিং অনতিবিলম্বে শুরু হবে। এছাড়া শ্রীসিং অদূর ভবিষ্যতে একটি কালার হিন্দি ছবি প্রযোজনা করছেন। পরিচালক হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন শ্রীগাঙ্গুলী। শ্রীগাঙ্গুলীকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—বর্তমানে আমার দুখানি ছবি ফ্লোরে আছে। এই দুই ছবির ফাঁকে ফাঁকে ডেট-অ্যাডজাস্ট করে এই ছবি করতে হবে। গৌরীবাবুর লেখা গল্প। নায়ক হবেন শৈলেন্দ্র। নায়িকা কে? এখনই মুখ খুলতে চান না তিনি। 'পরে বলব।' প্রসঙ্গত জানাই, অন্য এক সূত্রের খবর এই ছবিতে নায়িকা খুব সম্ভবত রেখা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই ছবির শুটিং হবে কলকাতার স্টুডিওতেই। কাজ করবেন কলকাতার শিল্পী ও কলাকুশলীরা।

পরিচালক অর্ধেন্দু সেন আগামী সপ্তাহ থেকে তাঁর নতুন ছবি 'অদৃশ্য নায়ক'—এর শুটিং শুরু করছেন। রূপমায়ার ব্যানারে এই ছবি, গৌর শী রচিত কাহিনী অবলম্বনে। চিত্রনাট্যকার, পরিচালক নিজেই। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন ঃ রবি ঘোষ,

চিন্ময় রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় মালিনা দেবী জহর রায়, অজিত চ্যাটার্জি, মহুয়া রায়-চৌধুরী ও সস্মিত ভঞ্জ। শেষোক্ত দুই শিল্পী যথাক্রমে নায়িকা ও নায়ক। ইতিমধ্যে এছবির জন্য একাধিক গান রেকর্ড করা হয়েছে। তরুণ সঙ্গীত পরিচালক অনুপম মুখোপাধ্যায়ের সুরারোপে কণ্ঠদান করেছেন রবি ঘোষ, চিন্ময় রায় ও অন্যান্য শিল্পীরা। এছবির আলোকশিল্পী ঃ মণীশ দাশগুপ্ত। শিল্পনির্দেশক ঃ গৌর পোদ্দার।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

বম্বের চিত্রতারকারা ইয়েলো জার্নালিজম-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বম্বে এবং দিল্লীর কয়েকটি পত্রিকা তৎসহ কলকাতার দু-একটি অনুকরণে শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যেভাবে আজগুবি সব গসিপ লিখছেন তারই বিরুদ্ধে এই তীব্র প্রতিবাদ। সম্প্রতি ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার লনে এই পরিপ্রেক্ষিতে এক সভা হয়। আহ্বান করেন সিনে আর্টিস্টস এসোসিয়েশন। সভাপতিত্ব করেন ডেভিড অ্যাব্রাহাম, প্রবীণ শিল্পী। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঃ রাজ-কাপুর, দিলীপকুমার, ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না, শশি কাপুর, ঋষি কাপুর, রাজেন্দ্রকুমার জীতেন্দ্র নবীন নিশ্চল, বিনোদ খান্না, প্রেম চোপরা, হেমা মালিনী জীনত আমন জয়া ভাদুড়ী সায়রা বানু শ্রীসুমী চট্টোপাধ্যায় ওমপ্রকাশ প্রভৃতি। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল এই শিল্পীদল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, এবার থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁরা অত্যন্ত ফর্মাল ওয়েতে মেলামেশা করবেন। কোনরকম সাক্ষাৎকার দেবার পূর্বে তাঁরা ইচ্ছে করলে সাংবাদিকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সাংবাদিকরা সাক্ষাৎকার কিম্বা স্টুডিও কভারেজ গ্রহণ করতে পারেন উপযুক্ত অনুমতিতে। এর বাইরে যা কিছু, যদি কিছু ঘটে এবং এর জন্য যদি কোন শিল্পীও দায়ী থাকেন তাহলে এসোসিয়েশন প্রয়োজন হলে আদালতে পর্যন্ত যাবেন। বিস্তারিত আর কিছু জানা যায়নি।

সম্প্রতি ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনীকে নিয়ে প্রযোজক-পরিচালক রামানন্দ সাগর চরস-এর অন্তদৃশ্য গ্রহণ শুরু করেছেন বাঙ্গালোরের একটি স্টুডিওতে। এখানে একটি ছ দিনের সিডিউলে ওদের বেডরুম সিকোয়েন্স ঠিক করা হচ্ছে। বিলাসবহুল এই বেডরুমে ধর্মেন্দ্র এবং হেমা বেশ ভালই শুটিং করছেন। ওদের দুজনকে ঘিরে যাঁরা গুজব প্রচার করেন তাঁরা দেখলে তো সর্বনাশ। একেবারে আক্কেলগুড়ুম হবার দাখিল হবে। এমন সব রোমান্টিক দৃশ্য তোলা হচ্ছে। রামানন্দ সাগর ইচ্ছে করেই এই দৃশ্যগুলি বম্বের স্টুডিওতে তোলেন নি কারণ তাতে ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনীকে নিয়ে তিল থেকে তাল হতে পারে। শিল্পী-দের অনুরোধে এই বিশেষ দৃশ্যটি টেক করতে প্রযোজক-পরিচালক সদলবলে বাঙ্গালোর এসেছেন।

ঋষি কাপুরের সঙ্গে নীতু সিং-এর বিয়ে হয়ে গেছে বলে একটা প্রচার চালু হয়েছে বম্বেতে। আসলে ব্যাপারটা অন্য রকম। ঋষির সঙ্গে একটা ছবিতে নীতুর বিয়ে দেখান হয়েছে। তারই কিছু স্থির চিত্র নানা কাগজে বেরুনোর ফলে ঋষির কথায় ঃ নীতু আমার বান্ধবী এর বেশী কিছু নয়।

এত দিন জেমস বণ্ড মার্কা অনেক ছবির অনুকরণে হিন্দী ছবি হয়েছে। ক্রাইম থ্রিলার ছবির নাম করে শেষ করা যাবে না। এবার সেই রকম একটি বিদেশী ছবির হুবহু অনুসরণে একই নামে হিন্দী ছবি নির্মিত হতে চলেছে। যেমন রাজেশ খান্না অ্যাজ জিরো জিরো সেভেন। লক্ষ্য করার মত শিল্পীর নামটাই শুধু পালটেছে। বিদেশী শিল্পী এনে তো আর সম্ভব নয়। এই ছবি পরিচালনা করবেন তরুণ কুশলী নরিন্দর বেদী। শুটিং শুরু হতে বেশী দেরী নেই। রাজেশ খান্নার সঙ্গে এই ছবিতে বলাই বাহুল্য বেশ কয়েকজন লাস্যময়ী নায়িকার সন্ধান মিলবে। যথা পদ্মিনী কপিলা, কেটি মিরজা, অরুণা ইরানী, বিন্দু প্রভৃতি। এ ছাড়া দুটি বিশেষ চরিত্রে আসরাণী এবং এ কে হাঙলকে দেখা যাবে। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন রাহুল দেববর্মন। একাধিক গান গাইবেন কিশোরকুমার।

...অভিজিৎ

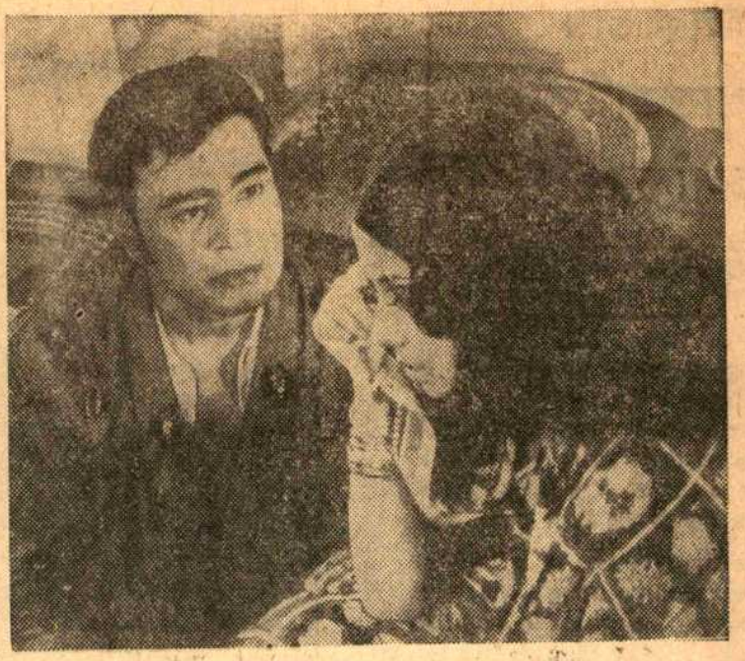

সূর্যকন্যা। জয়শ্রী রায়। আহসান

হারমোনিয়ম-এর পাশে শিল্পী রুমা চক্রবর্তী ও সোনালী গুপ্ত

কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ছবি

এবার কোলকাতার চলচ্চিত্র উৎসবে যে সাতটি বিদেশী ছবি (পূর্ণাঙ্গ) দেখান হোল তার মধ্যে নিপুণতার দিক থেকে আমাকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছে আলজেরিয়া ও ফ্রান্সের যুগ্ম উদ্যোগে নির্মিত ওয়ালস অফ ক্লে ছবিটি।

এবং নির্মল আনন্দজনক ও পরিচ্ছন্ন ছবি হিসেবে পশ্চিম জার্মানীর ছবি বিকজ অফ ইউ যার আসল নাম ও জোনাথন জোনাথন।

গল্পের দিক থেকে আনন্দ দিয়েছে কানাডার ছবি বিটুইন ফ্রেন্ডস।

জাপানী ছবি ডায়েরী অফ সিনকুজু বার্গলার কেবলমাত্র দুঃসাহসিক বলেই মনে হয়েছে।

পশ্চিম জার্মানীর দ্বিতীয় ছবি রেল ওয়াসড্-এর গল্পও মুগ্ধ করেছে। ছবিটি সত্যিই উপভোগ্য এবং মনকে ভারাক্রান্ত করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছবি চাপ্পাকুয়া যার পরিচালক কনরাড রুকস ক্যামেরা এবং ট্রিটমেন্টের দিক থেকে উন্নত মানের হলেও এর বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য মনকে সাড়া দেয় নি। অথচ শোনা যায় এই ছবিটাই নাকি নয়াদিল্লীর চলচ্চিত্র উৎসবে সাড়া জাগিয়েছিল। (এ ছবিতে রবিশঙ্করের মিউজিক দারুণ উপভোগ্য)।

কানাডার ছবি বিটুইন ফ্রেন্ডস

সমালোচনা হওয়া আর সাড়া জাগানো কি এক কথা? এ ছবি নিয়ে সমালোচনা অবশ্য হতেই পারে। না হলেই বরং বিস্মিত হব। তবে অন্য বক্তব্যে।

আর্জেন্টিনার ছবি দি আওয়ার অফ ফার্নেসেস এক সময় নাকি আণ্ডার গ্রাউণ্ডের বিপ্লবীদের দেখানো হত সে দেশে। ছবিটি ডকুমেন্টারীধর্মী। একটা গোটা দেশের মোটামুটি সব কিছুই এ ছবিতে খুলে খুলে দেখান হয়েছে। আর্জেন্টিনার রাজনৈতিক পটভূমি, রাজতন্ত্রের শাসন ও শোষণ পদ্ধতি সাধারণ মানুষের জীবন ধারণ তাদের সমস্যা দেশের প্রধান সম্পদ ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা থেকে মানুষের বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা ও অন্য দিকে স্বচ্ছল ও শাসক শ্রেণীর মানুষদের বিলাস-ব্যসনের জীবন মোটামুটি কিছু কিছু দৃশ্য ও রেখায় উপস্থাপিত করা হয়েছে এই ছবিতে।

জার্মান ছবি ও জোনাথন, জোনাথন

সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী দরিদ্র ভারতবাসীদের জীবনযাপনও দেখান হয়েছে আওয়ার অফ ফার্নেসেস-এ। সেই সব দৃশ্যগুলি এবং সাব-টাইটেলগুলি রোমাঞ্চিত করে। প্রায় বস্তিতে বাস করার মত জীবনযাপন। দারিদ্র্যের চরম অবস্থার মধ্যে বাস।

তাদের সম্পর্কে ভাষ্যকার বলেছেন (যা সাব-টাইটেলে পড়া গেছে) মানুষ হিসেবে ভারতীয়দের সঙ্গে একমাত্র তফাৎ হল ভাষা। মুখের ভাষাই শুধু পৃথক। এ ছাড়া একই রকম রক্ত, ক্ষুধা উভয়ের মধ্যে একই রকম করে পায়ে হাঁটি।

মানুষের প্রতি মানুষের এই মমত্বের বুঝি কোন বিকল্প হয় না।

তবু মনে হয় এ ছবিটি সর্ব শ্রেণীর দর্শককে প্রীত করতে পারে নি।

এবার কোলকাতার দর্শকদের মধ্যে যে ছবিটি সর্বাধিক সাড়া জাগিয়েছে তা হল জাপানের ডায়েরী অফ সিনকুজু বার্গলার। এর প্রধান কারণ বলাই বাহুল্য। এতে যৌন দৃশ্য, বলাৎকার নারী দেহ নিয়ে নানা রকমভাবে ব্যবহার করা ইত্যাদির ছড়াছড়ি ছিল বলে।

সেকস এডুকেশন বলতে সাধারণত যা বুঝে থাকি (পর্ণগ্রাফী বলতে যা বোঝা যায় তা অবশ্য নয়—কারণ এতে একটা বক্তব্য আছে। বেটা হয়তো যুক্তির দিক থেকে শিক্ষণীয় এবং যাকে একদম উড়িয়েও দেওয়া যায় না।) এ ছবিতে তা প্রায়

পর্যাপ্তই আছে। খোলাখুলি দৃশ্যেরও অভাব নেই, উৎক্ষিপ্ত অবস্থায় যৌন চর্চা রেপ পার্ভারসন ইত্যাদি ইত্যাদি একাধিক নির্বিকার দৃশ্য এতে স্থান পেয়েছে।

ছবির গল্পের মধ্যেই একটা নাটকের দৃশ্য দেখান হয়েছে (যেটা অনেকটা দীর্ঘও) যার কুশীলব সবাই প্রায় মুখোস পরে বা মুখ রঙ করে—যাতে একদিকে বিগত যৌবনা রমণীর যৌন ক্ষুধার বিকৃতি, অন্য দিকে প্রকাশ্য স্টেজের ওপরেই দেহজ মিলনের দৃশ্য প্রায় খোলাখুলিই দেখান হয়েছে—যেটা অবিশ্বাসের পর্যায়েই পড়ে।

ছবিতে যে গল্পটি বলা হয়েছে তার শুরু সৌন্দর্যমণ্ডিত। যুবক-যুবতীর প্রেম। সেটা ক্রমে রোমান্স ডিঙিয়ে যৌনজীবন সম্পর্কে কৌতূহল; সে সম্পর্কে পুঁথিগত বিদ্যার স্পৃহা, যৌনশাস্ত্র বিশেষজ্ঞের (প্রফেসর) নিকট যৌনতা ও যৌন বিষয়ক পাঠ নেবার ভূমিকা—অন্যদিকে বাস্তব জীবনে যৌনতা উত্তেজনা ও তার উৎক্ষিপ্ততা—যার শিকার হয় ছবির নায়িকা কয়েকটি বিকৃত চরিত্রের ক্ষিপ্ত যুবকের হাতে। রাত্রের অন্ধকারে অন্যের যৌন লীলা দেখে উত্তেজিত হয়ে দুটি ছেলে একটি মেয়েকে তাড়া করে তার প্রেমিকের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে উৎক্ষিপ্ত অবস্থায় মেয়েটির দেহের বসন ছিঁড়ে প্রকাশ্য রাস্তায়ই যে রেপ-এর দৃশ্যটি দেখান হয়, সেই দৃশ্যটা প্রায় দম বন্ধ করে দেখতে হয়।

এ ছবির একটা শিক্ষামূলক ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে—যাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেটা কি এ দেশের দর্শকদের কাছে গ্রহণীয় কিংবা সহজ চিন্তার বিষয়?

মদ্যপান, যৌন বিকৃতি, যৌন শিক্ষার নামে এ দেশেও এক শ্রেণীর মানুষ আজ দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু এ ছবির সমস্যার সঙ্গে নিশ্চয়ই এর খুব একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এসব ব্যাপার এখনও পর্যন্ত ওয়েস্টার্ণ সিভিলাইজড কানট্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে ধারণা।

এ ছবিতে লেনিন এ্যাঙ্গলস থেকে পৃথিবীর বহু জ্ঞানীগুণী মনীষীর লেখা থেকেই যৌনাচরণের স্বপক্ষে কোটেশন তুলে দেয়া হয়েছে।

এ ছবিটি ছাড়া কনাডার ছবি ফিফটিন ফ্রেন্ডস ছবিতে কিছু কিছু রেড সীন দেখান হয়েছে। কিন্তু সে সব এ ছবির মত এমন ভয়াবহ নয়।

মূলত সেটা ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। এক সুখী দম্পতির মধ্যে এসে উপস্থিত হওয়া স্বামীর বন্ধুকে নিয়ে কাহিনীর বিস্তার। বন্ধু যেখানে বন্ধুকে পেয়ে পরম খুশী, সেখানে বন্ধুপত্নী তার প্রতি ক্রমে চরম আসক্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে অনিবার্যভাবেই কিছু যৌন মিলনের দৃশ্য এসে পড়েছে।

এ ছবির শেষটা দর্শককে ধাক্কা দেয়।

জার্মান ছবি বিকজ অফ ইভ-এর গল্প একেবারে বাঙালীর ঘরোয়া গল্পের মত। বাঙলা যোগাযোগ ছবির সঙ্গে এর কাহিনীগত মিলটি আশ্চর্য হয়ে দেখবার মত। যেন তারই জার্মান ভার্সান দেখছি। দারুণ উপভোগ্য ছবি।

—শাঃ রুঃ চ

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে। নজরুলের সেই অবিস্মরণীয় গানের কথাগুলি দিয়ে শ্রীশ্যামল ঘোষ একটি ছোট ডকুমেন্টারী ফিল্ম তুলেছেন। উপজীব্য বিষয়—ইন্দুবালা আঙ্গুরবালা আর কমলা ঝরিয়া। সেই অবিস্মরণীয় তিন কন্যা যাঁদের গান শোনা যেত বাংলার ঘরে ঘরে। সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন বিজ্ঞাপনের দিনে গ্রামোফোনের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের গানের রেকর্ডও বিক্রী হত প্রচুর।

শ্রীঘোষ যে ছবিটি তুলেছেন তা একদিকে যেমন শিল্পসম্মত অন্যদিকে তেমনিই তথ্যনিষ্ঠ। ছবির অন্যতম আকর্ষণ সঙ্গীত শিল্পীরা নিজেরাই। তাঁরা তাঁদের অতীতের কথা বলেছেন শ্যামলবাবু আমাদের পুরাতন ছবি দেখিয়ে সে যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। তিন শিল্পীই ছবিতে গান গেয়ে শুনিয়েছেন। আমরা প্রমাণ পেয়েছি এখনো তাঁদের গলা কত সুন্দর কত সুরেলা। শ্যামলবাবু ফাঁকে ফাঁকে পুরাতন দিনের রেকর্ড শুনিয়েছেন। আমরা সুরের সাগরে ডুবে গিয়েছি।

টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় বইটি কয়েকজন অভ্যাগতদের যেদিন দেখান হল সেদিন ইন্দুবালা আর আঙ্গুরবালা উপস্থিত ছিলেন। কমলা ঝরিয়া শরীর খারাপ থাকার জন্য থাকতে পারেন নি। ছবিটি দেখানোর আগে উদ্যোক্তাদের কিছু প্রীতি উপহার সত্যজিৎ রায় তুলে দিলেন শিল্পীদের হাতে। ইন্দুবালা আশীর্বাদ করলেন তুমি বাংলার মুখোজ্জ্বল করা ছেলে তুমি দীর্ঘজীবী হও। ছবিটির প্রযোজক বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত। আলোকচিত্র তুলেছেন শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেছেন অমলেশ শিকদার। চিত্রনাট্য, সঙ্গীত সূত্রধার ও নির্দেশক শ্যামল ঘোষের। চলচ্চিত্র নিবেদিত এই ছবিটির জন্য এ অধম সকলকে ধন্যবাদ।

সেই চোখ/সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়/উত্তমকুমার জয়শ্রী ও ইন্দ্রাণী।

নটরঙ্গ

শৌভনিকের এক দুই তিন

শৌভনিকের নতুন নাটক 'এক দুই তিন'।

বলতে বাধা নেই শৌভনিক যখনই কোন নাটক প্রযোজনা করেন আমরা তখন নতুন কিছু পাবো বলেই প্রত্যাশা করে থাকি। সে দিক থেকে এ নাটকও আমাদের অবশ্যই বঞ্চিত করে নি। বিশেষ করে এর বিষয়বস্তুর নতুনত্ব আমাদের আকর্ষণ করেছে। (কাহিনী নারায়ণ সান্যাল)।

এ নাটকের মূল সুরটি অবশ্যই ব্যংগাত্মক। নাটকে মনুষ্য চরিত্র বেশী নেই। মোট চারজন। বাকিরা সবাই জীব-জন্তু। নাটকের ভাষায় 'অমানুষ'। পরিকল্পনার দিক থেকে অভিনব সন্দেহ নেই। সমস্ত নাটকটিই প্রতীকের মত করে ব্যবহার করা হয়েছে।

হাঁস মুর্গি শুয়োর গরু ভেড়ার ফার্মের নাম 'অমানুষ স্থান'। মালিক বলাই বাহুল্য মানুষ। যে শোষণ করে আকণ্ঠ কিন্তু খাদ্য দেয় কম। প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। তাহলেই অত্যাচারের চাবুক নেমে আসে পিঠে।

শেষ পর্যন্ত (বলিবর্দকে বুড়ো হয়ে যাবার দরুন কশাইয়ের কাছে তাকে বেচে দেয়া থেকে যার সূত্রপাত) সেই অমানুষ স্থানের বাসিন্দারা যারা এতকাল মালিকের চাবুকের ভয়ে কথা বলে নি বিদ্রোহ করল মালিকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। সেই প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেল তারা। নতুন করে দেশকে গড়ে তোলার মন্ত্র নিল তারা বৃদ্ধ বলিবর্দকে দেশের প্রধান করে। কিন্তু কালক্রমে তাদের মধ্যে কয়েক জনের মনে গদীর মোহ সঞ্চারিত হোল। বৃদ্ধ বলিবর্দের উপদেশ তাদের কাছে ভাল লাগত না। ফলে এক সময় তাকে সরিয়ে দিয়ে দেশের প্রধান হয়ে বসল একে একে মতাশালী জীবরা। সবারই মনথে প্রথমে ণ গড়ার বুলি। ক্রমে সেটা পর্যবসিত হয় শ্রেণী স্বার্থে। ব্যক্তিগত লোভটাই তখন তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। মুখে বলে 'এ রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ বিষ। চুরি আর জোচ্চুরি স্বজন পোষণ আর ঘুষ। একা আমি কি করতে পারি।'

সেই 'অমানুষ স্থানের' একমাত্র বাসিন্দা একজন নারী (খামারের মালিকের কন্যা) যার নাম মানবী। যে চায় এদেশে সত্য ন্যায় আর কলুষমুক্ত সমাজ গড়ে উঠুক। শেষ পর্যন্ত যৌবনের দূত এক নওজোয়ান যখন দেশের হাল ধরে তখন সে ভাবে এবার তার স্বপ্ন সফল হবে। কিন্তু সেই আশা তার পূরণ হয় না। নওজোয়ানের মধ্যেও সে দেখতে পায় পুরাতনের পুনরাবৃত্তি।

আগেই বলেছি নাটকটি প্রতীক ধর্মী। জীবজন্তুর সব কটি চরিত্রই রূপক অর্থে ব্যবহৃত। মানুষের স্বভাব নিয়েই এরা স্ব স্ব চরিত্রে প্রতিভাত।

নাটক দেখতে দেখতে এক এক সময় মনে হয়েছে আমরা যেন আমাদেরই প্রত্যক্ষ করছি মঞ্চে। শুধু মুখোসটা আলাদা। এছাড়া সবই এক। সেই রিপু সেই স্বভাব স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মসুখ-সর্বস্ব মানুষই যেন জীব জগতের রূপ নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ যেন একালের মানুষের দর্পণ।

নাটকার আশাবাদী। তিনি শেষ পর্যন্তও বলেছেন ঐ বিষের মধ্যেই তার প্রতিকারের ওষুধ লুকিয়ে আছে। জানি না ভবিষ্যতে এই আশার বাণী মনুষ্য জগতেও প্রতিধ্বনিত হবে কি না। হলে নাটকারের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই দর্পণে আজকের মানুষ তার স্বরূপ দেখে তার ভুল সংশোধন করবে নাটকে এই আশার কথা নিরুচ্চারভাবে ছড়িয়ে আছে একথা আমার নাটক দেখতে বসে মনে হয়েছে।

সেদিক থেকে নাটকের উপস্থাপনা সার্থক। কিন্তু সেই অনুপাতে নাটকে গতিবেগ থাকলে এবং অভিনয় আরও প্রাণবন্ত হলে অর্থাৎ কম্প্যাক্টনেস থাকলে নাটকটি আরও হৃদয়গ্রাহী হোত। কয়েকটি চরিত্রের অভিনয় দেখে তাই মনে হয়েছে।

স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে যিনি দর্শকদের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি এ নাটকের দালালেশ্বররূপী নিমু ভৌমিক। এবং ইনসানরূপী অমল মুখো-পাধ্যায়। এর পরেই নাম করা যায় বলিবর্দ (সুধাংশু মণ্ডল), রাসভনাথ (ননী দাস) কুমার (বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়) অবতার (পান্নালাল মৈত্র) শুকরনাথ (বিবেশ্বর মিত্র, ও বরাহেশ্বর (প্রদীপ ভট্টাচার্য)।

মানবীর চরিত্রে শিপ্রা চক্রবর্তী আগা-গোড়া সুন্দর অভিনয় করেছেন। আর ভাল অভিনয় করেছেন আদমীরূপী শিবু মজুমদার।

হয়গ্রীব (বিমলেন্দু মজুমদার), অনড়ান (কাশীনাথ হালদার) সারমেয় (চিনু দাস) কুক্কুটস্বামী (শক্তিদাস ঠাকুর) হংসধ্বজ (নির্মল কংসবণিক) ও রমেশ (মৃত্যুঞ্জয় আঢ্য) চরিত্রানুযায়ী।

মঞ্চ সংস্থাপনা (পান্নালাল মৈত্র) অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য এবং নাটককে বাস্তবানুগ করে তুলেছে। ভাস্কর মিত্রর সংগীত নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। রূপসজ্জা (মহঃ হোসিব) উচ্চপ্রশংসার যোগ্য।

শেষ কথা। নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে শৌভনিকের একটা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আছে। এ নাটক সেই গৌরবকে আরও বৃদ্ধি করবে নিশ্চয়ই। এবং দর্শক এ নাটক সাদরে গ্রহণ করবে এ আশা আমরা নাটকের মধ্যেই পেয়েছি।

ষ্টাডমেড-এর সুখের পায়রা ঃ ষ্ট্যা মেড রিক্রয়েশন ক্লাবের ৮ম বার্ষি সাংস্কৃতিক সম্মেলন সম্প্রতি কলা মন্দি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠা সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উ স্থিত ছিলেন যথাক্রমে শ্রীঅমর দাশ পশ্চিম বাংলার ড্রাগস কন্ট্রোল ডাইরেকট অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার শ্রীঅমল চক্রবর্তী

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্লাবের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত শ্রীমতী আলো দাশগুপ্তর সুখের পায়রা নাটকাভিনয়। হাস্যরসাত্মক এই নাটকটি সংস্থার প্রতিটি শিল্পীর আন্তরিক অভিনয়ে এবং পরি-চালক শৈলেন মুখার্জির নিপুণ পরি-চালনার গুণে সমগ্র দর্শকদের মাতিয়ে রাখে। গোবর্ধন মজুমদারের চরিত্রে সুপ্রকাশ সাহা, গোপাল-এর চরিত্রে সৌমেন্দ্রনাথ রায় এবং মিহির শঙ্করা ও ব্যোমকেশ চরিত্রে যথাক্রমে দীপক মুখার্জি, হিমাংশু দে ও

• শাল • আলোয়ান •
• সোয়েটার • কম্বল •
রত্নদীপ
৭৩, জি. টি. রোড • হাওড়া • ফোন: ৬৭-৫৩২৫

শ্যামল রায়চৌধুরী প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। স্বপন চরিত্রে সকত পাকড়াশীর অভিনয়ের ধরণ একটু একঘেয়ে মনে হয়েছে। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র দে, রূপচাঁদ পাল জ্ঞানরঞ্জন দাস, সত্যেন দাস কাজল মুখার্জি কৃষ্ণা চক্রবর্তী ও শিবাণী ভট্টাচার্যের অভিনয় যথাযোগ্য। অমিত রায়ের ব্যঞ্জনাপূর্ণ মঞ্চসজ্জা ও আবহসংগীত পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য।

কিংকুট-এর 'এই মন সেই মন'

কিংকুট নাট্য সংস্থা সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন 'এই মন সেই মন' নাটকটি। (রচনা শ্রীরবীন্দ্র ভট্টাচার্য)।

আমাকে প্রথমে যা আকর্ষণ ও বিস্মিত করেছে তা হোল এই নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন। এ নাটকের পটভূমি ভারতের বাইরে। মূল চরিত্র চিত্রণ ইহুদীদের ওপর অত্যাচার। অবশ্যই মূল বক্তব্য মানবিকতা-বোধ। সেদিক থেকে এর একটা সার্বজনীন আবেদনও অবশ্যই আছে।

আমাদের সবচেয়ে বিস্মিত করেছেন এ নাটকের নির্দেশক শ্যামল রায়চৌধুরী (ইনি নাটকের সম্পাদনার দায়িত্বও বহন করেছেন)। এমন একটি দুরূহ নাটক মনোরঞ্জন করে। নাটক দর্শককে যদি এতটুকুও ভাবিত এবং আনন্দ দান করে থাকে তবে তার কৃতিত্বের অনেকখানিই তাঁর প্রাপ্য। তবে তিনি নাটকটিকে আরো যদি খানিকটা পরিমার্জনা বা সম্পাদনা করতেন তবে নাটকের গতি আরো কমপ্যাক্ট হোত।

কারণ কুশীলবদের সংলাপ দীর্ঘ হবার জন্যে অনেক সময় ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। ফলে অভিনয়েও জড়তা এসে গেছে। যেটা নাটকের একটা প্রধান ত্রুটি। অনেক সময় সংলাপের ওপর জোর না দেওয়ায় চরিত্র-গুলিও সঠিকভাবে ফুটে ওঠেনি। এদিকে পরিচালকের আরও সচেতন দৃষ্টি বাঞ্ছনীয় ছিল।

অভিনয়ে ডাঃ আয়ানের চরিত্রে শম্ভু মিত্র একটু ঢিলেঢালা সত্ত্বেও আগাগোড়া সংযত অভিনয় করে গেছেন। জগরূপী শ্যামল রক্ষিত কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল অভিনয় করেছেন। কিন্তু তার অস্থির হয়ে সংলাপ বলা ও উচ্চারণের ত্রুটি কর্ণকে পীড়া দিয়েছে। ক্যাপ্টেন (মধুসূদন নন্দী) একটু নার্ভাস মেজর (শ্যামল ব্যানার্জি) তেমন করে চরিত্রটিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারেন নি। অথচ তার প্রচুর অবকাশ ছিল এবং মানিয়েও ছিল সুন্দর। অন্যান্য চরিত্রের অভিনেতাদের মধ্যে দিলীপ কর, কৃষ্ণচন্দ্র দাশ, গৌতম দত্তর অভিনয় ভাল। তবে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা গেছে।

সুকুমার ঘোষ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও প্রিয়গোপাল কুণ্ডু চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

মহিলাদের মধ্যে মীনা দাশের ডোরা শ্রোটামুটি ভালই করেছে। সেই অনুপাতে ধরিত্রী লাহা দর্শকদের নিরাশ করেছেন।

ষ্ট্যাডমেড রিক্রিয়েশন ক্লাবের **সুখের পায়রা** নাটকে সুপ্রকাশ সাহা, কাজল মুখার্জি, শিবাণী ভট্টাচার্য এবং দীপক মুখার্জি।

তবে আগামীতে সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীই এই দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবেন নাটক দেখে এই বিশ্বাসই হয়েছে আমার। কিংকুট নাট্য সংস্থার কাছে সেটা আশাও করি।

কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারীর সাজসজ্জা এবং বিজয় কুমারের রূপসজ্জা খুবই ভাল। এ নাটক সার্থক হবার মূলে তাঁদের দান অনেকখানি কাজ করেছে। ভানু বিশ্বাসের আলো সুন্দর। মঞ্চ ও শব্দ (শ্যামল নন্দী) নাটকের সহায়ক হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবীরেন্দ্র-কৃষ্ণ ভদ্র এবং প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীবঙ্কিম ঘোষ। স্বাগত ভাষণ দেন সুহৃদগোপাল দত্ত।

নাটকের পূর্বে উদ্বোধনী সংগীত গেয়ে অশোক চক্রবর্তী এবং হরবোলা পরিবেশন করে মুক্তি চক্রবর্তী ও নৃত্যে ছোট্ট মেয়ে নিবেদিতা রায়চৌধুরী দর্শকদের আনন্দ দেয়।

কৃষ্ণলীলা নৃত্যনাট্য ও 'বাসবদত্তা' নাটক অভিনয়

ক্যালকাটা মিউজিক অ্যান্ড আর্ট সেন্টারের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা সম্প্রতি 'কৃষ্ণলীলা' ও 'বাসবদত্তা' নাটক অভিনয় করেন।

'কৃষ্ণলীলা' নৃত্যনাট্য পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন শ্রীমতী বেলা অর্ণব। নৃত্যের সঙ্গে তাঁর রেয়াজী কণ্ঠের গান রীতিমত উপভোগ্য। নাচে যশোদারূপী স্বাতী লাহিড়ী, বালক কৃষ্ণরূপী পাপিয়া দেবনাথ ও সোমা নায়েক বড় কৃষ্ণ শ্যামলী নন্দী ও রাধারূপী সুদত্তা দাস সুন্দর।

সেই সঙ্গে সখা এবং সখীদের নৃত্যও দর্শনীয়।

'বাসবদত্তা' নাটকটির নাট্যরূপ ও পরিকল্পনা শ্রীসন্তোষকুমার সেনের।

এতে অভিনয় করেন মহুয়া নিয়োগী (আনন্দ), স্মৃতিকণা সিংহ (উপগুপ্ত), অপর্ণা লাহা (বিশ্বজিৎ), অমিতা চ্যাটার্জি (রূপকুমার), অনিতা চ্যাটার্জি (অনন্তরাম) এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের ভূমিকায় শুক্লা দাস গীতশ্রী বসু, মিনু কাবাসী ও ঝুমুর চৌধুরী অভিনয় করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি দর্শকদের কিছুক্ষণের জন্য তন্ময় করে রেখেছিল।

এছাড়া অনুষ্ঠানে নাচ, গান ও যন্ত্র-সংগীতও পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅখিল নিয়োগী।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী ও ইন্দুব্রত চট্টোপাধ্যায়।

ইসারার শেষ প্রণাম : বারাসতের নাট্য গোষ্ঠী ইসারার নবতম নাট্যোপহার শেষ প্রণাম সম্প্রতি স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অভিনীত হোল। অভিনয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন নবাব (সিধুবাবু)-এর ভূমিকায় ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় (নাটকার ও পরিচালক)। এর পরে সুঅভিনয় করেন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় রঞ্জিৎ ঘোষ তপন চট্টোপাধ্যায়, তপন ভট্টাচার্য দুলাল সাহা, অজয় ভট্টাচার্য, সন্তোষ বিশ্বাস দিবাকর চট্টোপাধ্যায় ও ছবি করের অভিনয়ও দর্শকদের প্রশংসা কুড়োয়।

—নাট্যসমালোচক

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ড প্লেয়ার

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়।
মেরামতেরও সুবন্দোবস্ত আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৬৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

আয়না/মমতাজ

শতবর্ষের স্মরণীয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গিরিশচন্দ্র ও মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকারকে ব্যঙ্গ করে থিয়েটার নামে অমরেন্দ্রনাথ এক ব্যঙ্গ নাটিকা রচনা করেন। ২৫ আগষ্ট ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সোনার স্বপন গীতিনাট্যের সঙ্গে থিয়েটার মঞ্চস্থ হয়। মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয় নরেন্দ্রনাথ সরকার রচিত সাধের বাসর।

গিরিশচন্দ্র 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন বলে অমরেন্দ্রনাথও এক রাত্রির জন্য 'সধবার একাদশী' মঞ্চস্থ করে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। ১৪ অকটোবর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

বেঙ্গল; মিনার্ভা ষ্টার এবং ক্লাসিকের মধ্যে তখন ক্লাসিক জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানে। অমৃতলাল বসুও কিছু টাকার প্রয়োজন হলে 'সরলা' নাটকের নাট্যরূপ অমরেন্দ্রনাথের কাছে বিক্রয় করেন। ১১ নভেম্বর ক্লাসিকে সরলা মঞ্চস্থ হলো। দানীবাবু গদাধর আর অমর দত্ত বিধুভূষণ চরিত্রে অভিনয় করেন। অমরবাবু ১৬ নভেম্বর এক রাত্রির জন্য গদাধর চরিত্রে অভিনয় করেন। দানীবাবুর অভিনয়কে ম্লান করা অমরবাবুর পক্ষে সম্ভব হয় না।

ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে মতের অমিল হওয়াতে 'মিনার্ভা' পরিত্যাগ করে বাড়ীতেই বসে থাকেন। অনেকেই তখন অমরবাবুকে গিরিশচন্দ্রকে আবার ক্লাসিকে ফিরিয়ে আনবার পরামর্শ দেন। অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চেয়ে ক্লাসিকে যোগদানের প্রস্তাব দিলেন। গিরিশচন্দ্র কিছুতেই রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত 'থিয়েটার' নাটিকার অভিনয় বন্ধ ও প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবার সর্তারোপ করেন। 'থিয়েটার' অসম্ভব জনপ্রিয়তার্জন করেছিল। তাই এবিষয়ে আপত্তি জানিয়ে অমরবাবু বলেন আপনি থিয়েটারের অভিনয় দেখে যদি বন্ধ করতে বলেন নিশ্চয়ই বন্ধ করবো।' গিরিশচন্দ্র অবুঝ ছিলেন না। একটি জনপ্রিয় নাটকের অভিনয় তিনি বন্ধ করতে চাইলেন না।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর গিরিশচন্দ্র পুনরায় ক্লাসিকে যোগদান করলেন। ক্লাসিক তথা অমর দত্তের পক্ষ থেকে প্রচার করা হলো :

'নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে নটকুলচূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যে কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে। সকলগুলিরই সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র। প্রায় সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় গৌরবান্বিত! তাহার মধ্যে আমিও একজন। গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম। বড়ই সুখের বিষয় সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তাহার স্নেহময় কোলে তাহার তিনি টানিয়া লইয়াছেন। গিরিশবাবুর কোনও থিয়েটারের সহিত এখন কোনওপ্রকার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সমস্ত নতুন নতুন নাটক গীতিনাট্য ও পঞ্চরং এখন ক্লাসিকে অভিনীত হইবে। ক্লাসিক থিয়েটার ব্যতীত অপর কোনও রঙ্গমঞ্চের সহিত গিরিশবাবুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র এখন ক্লাসিকের! নিবেদনমিতি।"

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ২ জানুয়ারী মঞ্চস্থ হলো অমর দত্ত রচিত কৌতুক নাট্য চাবুক। চাবুক নাটকটি বঙ্গবাসী সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসুকে ব্যঙ্গ করে রচনা করা হয়েছিল। ছয় রাত্রির পর অবশ্য চাবুকের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২৬ জানুয়ারী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো অশ্রুধারা।

কিন্তু ৯ ফেব্রুয়ারী অভিনয়তালিকার সঙ্গে পাওয়া গেল হীরালাল সেন নির্মিত চিত্রাবলী। এদিন নাটকাভিনয়ের সঙ্গে ভ্রমর দোললীলা হরিরাজ সরলা বুদ্ধ সীতারাম প্রভৃতি নাটকের দৃশ্যাবলী দেখে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হন।

রাগ অনুরাগ

রঞ্জিত মল্লিক/অপর্ণা/অনুপকুমার

৮ মার্চ মহেন্দ্রলাল বসু পরলোকগমন করেন। ১৬ মার্চ রাম নির্বাসন ১৩ এপ্রিল সধবার একাদশীতে গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদ আর অমর দত্ত তটস্থ এবং কাঞ্চন চরিত্রে অভিনয় করেন কুসুমকুমারী।

২০ এপ্রিল মনের মতন এবং ১ জুন গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডল মঞ্চস্থ হলো। গিরিশচন্দ্র ৫টি চরিত্রে অভিনয় করেন। দানীবাবু পরে জাহাঙ্গীর চরিত্রে এবং অমর দত্ত নবকুমার চরিত্রে অভিনয় করেন। কপালকুণ্ডলা কুসুমকুমারী আর মতিবিবি চরিত্রে তারাসুন্দরী অভিনয় করেন। মতিবিবির চরিত্রে তারাসুন্দরীর অভিনয়কে কারোর পক্ষে ম্লান করা সম্ভব হয় না।

মিনার্ভা থিয়েটারও এই সময় অতুলকৃষ্ণ মিত্র নাটারূপায়িত কপালকুণ্ডলা মঞ্চস্থ করে। বলাই বাহুল্য ক্লাসিক প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে। মিনার্ভার প্রমথনাথ ঘোষ নবকুমার আর তিনকড়ি মতিবিবি চরিত্রে অভিনয় করেন।

২৭ জুলাই মৃণালিনীতে গিরিশচন্দ্র পশুপতি অমর দত্ত হেমচন্দ্র কিরণবালা মৃণালিনী আর গিরিজায়া চরিত্রে কুসুমকুমারী অভিনয় করেন। মৃণালিনীর অভিনয়ের সময় আগুনে গিরিশচন্দ্রের মাথার চামড়া পুড়ে যাওয়াতে তিনি আর পশুপতি চরিত্রে অভিনয় করেন না। দানীবাবু পশুপতি চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন।

অমর দত্তের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার যে অসম্ভব জেদী ও প্রতিযোগিতা-পরায়ণ ছিলেন। অন্য থিয়েটার কোন নাটকের অভিনয় সংবাদ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও অনুরূপ নাটক মঞ্চস্থ করে বসতেন। কারোর সঙ্গে কোন বিষয়ে মনোমালিন্য দেখা দিলেই ব্যঙ্গ নাটোর মধ্যে দিয়ে জবাব দিতেন। কারোর সঙ্গেই সম্মুখ সমরে তিনি পিছু হটতেন না।

পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াতেই পূর্ণ গুপ্তকে ব্যঙ্গ করে রচনা করেন গুপ্ত কথা। ৩১ আগষ্ট গুপ্ত কথা মঞ্চস্থ হয়। থিয়েটারে থিয়েটারে ব্যঙ্গ-নাটোর মধ্য দিয়ে বেশ মজাদার লড়াই হতো। ৭ ডিসেম্বর অমরেন্দ্রনাথ তোমারই মঞ্চস্থ করেন। মিনার্ভা থিয়েটার তার জবাবে আমারই অভিনয় করলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারী ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হলো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহুৎ আচ্ছা। মিঃ চর্পাট রূপে অমরেন্দ্রনাথ নতুন রূপে দেখা দিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারী থেকে অমরেন্দ্রনাথ ম্যাটিনী অভিনয়ের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে বেলা ১২টায় মধ্যাহ্ন অভিনয় চালু করেন। ম্যাটিনী অভিনয় আজও চালু আছে।

সগৌরবে চলিতেছে!
দর্পণ জীবন ও যৌবনের ধারক!
'রোটি' ছবির জুটিরা আবার ফিরে এল!

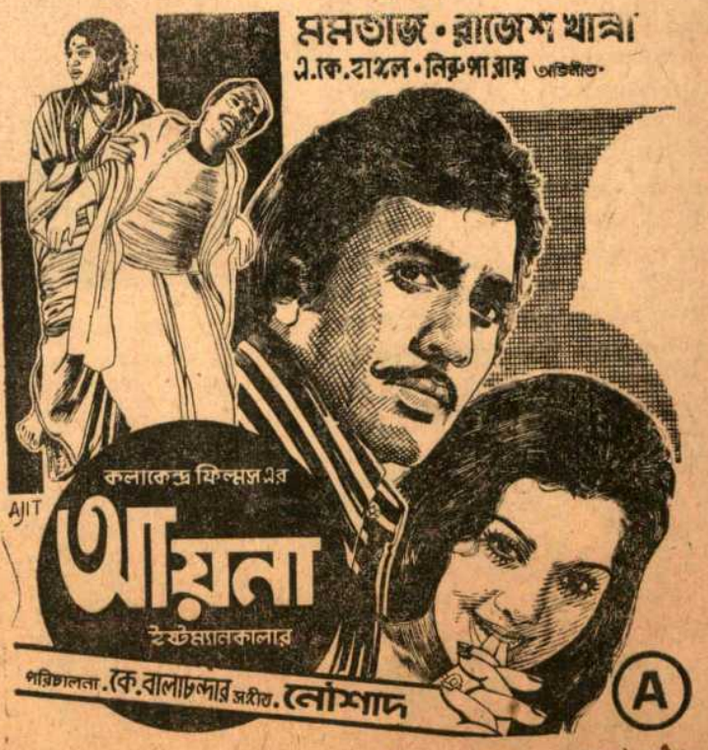

ক্লাউন (সুসংস্কৃত) - অপেরা - গ্রেস - নবীনা - খান্না - ভারতী (নূন)
আলোছায়া - কমল (মেটিয়াবুরুজ) অশোকা - শিবানী - খালিমার
শ্রীরামপুর - লক্ষ্মী (টিটাগড়) - ইন্দ্রধনু (নুঙ্গী) - মিলন (হুগলী)
রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর) - রূপশ্রী (ভাটপাড়া)
দি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটারস পরিবেশনা

মধ্যাহ্ন অভিনয় থিয়েটারের ক্ষেত্রে না হলেও সিনেমার ক্ষেত্রে সম্প্রতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তবে অপেশাদার সম্প্রদায়গুলি প্রাতঃকালীন অভিনয়কে চালু করেছেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে নতুন নাটকের মধ্যে শিবাজী ফটিকজল উল্লেখযোগ্য।

শুধু অমরেন্দ্রনাথই নয় বাংলার নাট্যজগত অনেক সময় এমন অন্যায় কর্মের সংগে লিপ্ত হয়ে পড়েছে যা কোন নাট্য ঐতিহাসিক কোনদিনই সমর্থন করবেন না। ন্যাশনাল থিয়েটারের পূর্বে থেকেই মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ নানাভাবে নাট্যান্দোলনকে সাহায্য করেছেন। অমৃতলাল বসু প্রভৃতি যখন গিরিশচন্দ্রের সংগে বিরোধ করেন তখন গিরিশচন্দ্রকে যেমন সমর্থন করেছেন—তেমনি সর্ববিষয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার সম্প্রদায়কে সাহায্য করেছেন। অথচ অমৃতলাল যখন স্টার থিয়েটারের সর্বময় কর্তা ১৯০২ খৃষ্টাব্দেই শিশিরকুমারের সংগে তাঁর মনোমালিন্য দেখা দিলে অবতার ব্যংগনাট্য মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমারকে আঘাত করেন। অমরেন্দ্রনাথও এমনি দলের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে নিলেন লাট গোবিন্দ মঞ্চস্থ করে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার লাট গৌরাংগ শেষ পর্যন্ত ভক্ত বিটেল নামে অভিনীত হয়। এবং মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের হস্তক্ষেপে অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ পর্যন্ত ভক্ত বিটেল-এর অভিনয় বন্ধ করে দেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় করোনেশন দরবার অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাসিক থিয়েটারে দরবার উপলক্ষে অভিনয়ের জন্য আহূত হন এবং হীরালাল সেনও এই দরবারের চলচ্চিত্র গ্রহণের অনুমতি লাভ করেন। এই সময় তিনি নতুন করে ক্যামেরা আনান এবং ক্লাসিক থিয়েটারের বিভিন্ন নাটকের আরো নতুন নতুন দৃশ্য গ্রহণ করেন। জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন পুরোন নাটক অভিনীত হবার পর ২৯ আগষ্ট ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হলো প্রতাপাদিত্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য স্টার থিয়েটারে ২৫ আগষ্ট মঞ্চস্থ হবার সংগে সংগে অমরেন্দ্রনাথ হারাণচন্দ্র রক্ষিতের বংগের

ষ্টার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ফোন : ৫৫১১৩৯
প্রতি বৃহঃ ৬টা
শনি, রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬টায়

পরিচয়

পরিচালনা : বঙ্কিম ঘোষ
নাটক : কুণাল মুখার্জী
সতীন্দ্র, শমিতা বিশ্বাস, অলোক, গীতা, জনমিকা, বঙ্কিম ও হরিধন।

সংসার সীমান্তে/সৌমিত্র/শেলি পাল

শেষ বীর প্রতাপাদিত্য উপন্যাসের নাট্যরূপে অভিনয়ে অগ্রসর হন। বলাই বাহুল্য স্টারের প্রতাপাদিতাই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বসুমতির অন্যতম লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের একটি বিরুদ্ধ সমালোচনায় অমরেন্দ্রনাথ আবার তার বিরুদ্ধে হ্যাণ্ডবিল-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্লাসিক বাংলা রংগমঞ্চের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক রূপে প্রতিভাত। খ্যাতি এবং অর্থেও প্রতিপত্তির সংগে সংগে অমরেন্দ্রনাথ যেন খানিকটা অহমিকায়ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। মোসাহেবদের পরামর্শে অনেকখানি প্রভাবান্বিত হতেন। সম্ভবতঃ এমনি পরামর্শেই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিকের সংগে সংগে মিনার্ভা থিয়েটারও লীজ নিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ মে মিনার্ভার তদানীন্তন স্বত্বাধিকারী প্রিয়নাথ দাসের কাছ থেকে মাসিক ৫০০৲ শত টাকা ভাড়ায় মিনার্ভার পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। ৭ নভেম্বর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদপ্রসাদের রঘুবীর নাটক দিয়ে উদ্বোধন করলেন মিনার্ভা থিয়েটারের।

আনন্দমঠের পর মিনার্ভায় হিরন্ময়ী অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু নানান মামলা-মোকদ্দমায় লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেও অমর দত্তের পক্ষে মিনার্ভা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। মিনার্ভা সম্প্রদায় নিয়ে ঢাকায় অভিনয় করতে গিয়ে বহু লোকসান খেতে হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মনমোহন পাঁড়েকে মিনার্ভার লীজ হস্তান্তরিত করে দেন।

ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে অমরেন্দ্রনাথ ৩০ এপ্রিল ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সংনাম মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু মুসলমান জনতার প্রতিবাদে ২১ মে সংনামের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়।

মিনার্ভার জন্য প্রায় ৫০০০০্ টাকার লোকসান—মনোমোহন পাঁড়ের দেনা—সৎনাম প্রযোজনার জন্য ৫।৬ হাজার ব্যয়িত—চারিদিক থেকে নানান বাধাবিপত্তি অমরেন্দ্রনাথকে গ্রাস করে ধরলো। ঠিক এমনি সময় বাড়ী ভাড়ার জন্য ২০০০্ টাকার যে চেকটি দিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে টাকা না থাকার দরুন সেই চেকটি হলো ডিসঅনার্ড। ধারের জন্য মনোমোহন পাঁড়ের কাছে হাত পাতলেন। তিনি অস্বীকৃত হলে ক্লাসিক থিয়েটারের বিক্রয় কবলা লিখে দিয়ে শেষ পর্যন্ত টাকা পেলেন।

৪ জুন পেয়ার ১০ জুলাই শ্রীরাধা তরণী সেন বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হলো। এদিকে সেপ্টেম্বর মাসে মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভার সঙ্গে ক্লাসিকেরও স্বত্বাধিকারী বলে এক বিজ্ঞপ্তি দেওয়াতে অমরেন্দ্রনাথ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। বিক্রয় কোবালার বিনিময়ে মনোমোহনবাবু সুদসমেত আড়াই হাজার টাকা দাবী করলেন। অমরেন্দ্রনাথ কপর্দক শূন্য। কোথায় পাবেন টাকা। এমনি বিপদে অমরেন্দ্রনাথকে উপযাচক হয়ে রক্ষা করলেন গিরিশচন্দ্র।

তিনি ২৫০০্ টাকা ধার দিলেন অমরেন্দ্রনাথকে। এ যাত্রায় সম্পূর্ণ বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন অমরেন্দ্রনাথ।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ক্লাসিকে সেসব নাটক মঞ্চস্থ হলো সেগুলির মধ্যে চোখের বালি প্রেমের পাথর উল্লেখযোগ্য। প্রেমের পাথর জনপ্রিয়তা অর্জন করাতে অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু আশার আলোক দেখতে পেলেন।

(ক্রমশঃ)

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

তালেমা

গান-বাজনার মজলিশ ঃ মজলিশ—এক সদ্যজাত সংস্থা। এর উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে সুনির্বাচিত অনুষ্ঠান পরিবেশনা এবং অনুষ্ঠানলব্ধ অর্থ দ্বারা দুঃস্থ শিল্পীদের সেবা।

গত ২৩ জানুয়ারী কলামন্দিরে মজলিশ পরিবেশিত গান-বাজনার আসরের প্রতিটি অনুষ্ঠানই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল শিল্পীদের আন্তরিকতার দাক্ষিণ্যে। প্রথম অনুষ্ঠান বাঁশীশিল্পী হিমাংশু বিশ্বাস। বাঁশের বাঁশী। কিন্তু শিল্পীর বাদনকুশলতায় বস্তুর সীমা পেরিয়ে এক অবাস্তব মধুরতায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল শিল্পী পরিবেশিত রাগ ইমন। ধীরে অতি-ধীরে সকল রকম চাঞ্চল্যবর্জিত ইমনের প্রার্থনা যেন কলালক্ষ্মীর চরণে পৌঁছাল গান্ধারের আকুতি ও মধ্যমের শান্তিতে। বিলম্বিত অঙ্গের ঠিক এই ধরনের শুদ্ধ শান্ত এবং শাস্ত্রসম্মত রূপ আজকের দ্রুত ছন্দের অস্থিরতার যুগে দুর্লভ বলেই মনকে এমন করে স্পর্শ করেছে। বিলম্বিত একতালের ঠেকাটিও শিল্পীর মেজাজের অনুকূলে অনাহত রেখেছেন বিশ্বনাথ বসু। দ্রুত অংগে ত্রিতালের পটভূমিকায় তানের ছন্দ বৈচিত্র্য এবং তারই মধ্যে সুরে দাঁড়ানোর অসামান্য দক্ষতায় হিমাংশুবাবুর এক নিষ্ঠ সাধনার স্বাক্ষর মেলে। বিলম্বিত দ্রুত উভয় অঙ্গের যথাযথ সংস্থাপনে রাগের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া গেল।

এর পর কণ্ঠ-সঙ্গীতের আসরে কলাবতী রাগে খেয়াল গেয়ে শোনালেন মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ একই তালে, বিলম্বিত একতাল ও দ্রুত ত্রিতাল। শিল্পীর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা শিক্ষা রাগ রূপায়ণে মুদ্রিত। তবে অনেক বেশী জমেছিল তাঁর ঠুংরী ও দাদরা। দেখে আনন্দ হল চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় (এঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গতে ছিলেন) অলক্ষ্যে এক পরিণতমান তবলাবাদকে পরিণত হতে চলেছিল।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান ত্রয়ী বাদ্যযন্ত্র—হিমাংশু বিশ্বাস (সন্তুর) কালাচাঁদ লাহিড়ী (বেহালা) ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সরোদ)।

রাগ চন্দ্রকোষ। হিমাংশুবাবুর বাঁশী শুনে মনে হয়েছিল তিনি নিঃসঙ্গতাধর্মী আত্মলীন শিল্পী। কিন্তু সমবেত বাদ্যসঙ্গীতেও কুশলী পরিচালক ও প্রাণবন্ত ইঙ্গিতে সহযোগী শিল্পীদের গতি ও গতির পথ বেঁধে যথাযোগ্য পরিণতিতে পৌঁছে দিয়ে তিনি বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শন পেশ করেছেন। সন্তুরে সরোদের অনেক প্রকাশভঙ্গী প্রবর্তনে তাঁর মৌলিকতা লক্ষ্য করবার মত।

সরোদে বাহাদুর খাঁর শিষ্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বেহালায় আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকের ছাত্র কালাচাঁদ লাহিড়ী তাঁদের সম্ভাবনাদীপ্ত বাজনা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন এই ধরনের ত্রয়ী এবং সমধর্মী অনুষ্ঠানের উদ্গাতা আলাউদ্দিন ঘরাণার শিল্পীবৃন্দ। তবলায় ছিলেন বিশ্বনাথ বসু।

নবীন ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাকট-এর এক উল্লেখযোগ্য অবদান অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নবীন গীতিনাট্য এল পি ডিস্কে কবিগুরুর দর্শনকাব্য ও নাট্য-প্রবাহের দিকটির গতি লক্ষ্য রেখেই অশোকতরু তাঁর আবেগবিহ্বল কণ্ঠে গেয়েছেন কেন ধরে রাখা চলে যায়, আমার মল্লিকা বনে বাজে করুণ সুরে আমার সকল নিয়ে। সমবেত কণ্ঠের গানগুলিও সুপরিবেশিত। গ্রন্থনায় আছেন পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রদীপ ঘোষ।

ছড়াগানের আসর ঃ সম্প্রতি কলামন্দিরের বেসমেন্ট হলে জয়-জয়ন্তী আয়োজিত ছড়াগানের আসর শিশুদের একাধারে আনন্দ এবং সংগীতের মাধ্যমে শিক্ষাদানের এক মধুর অভিজ্ঞতার স্মৃতি হয়ে থাকবে। শিল্পী শ্রীমতী জপমালা ঘোষ গানের আগে বাংলার সমৃদ্ধ ছড়াগানের সংস্কৃতি (যা আজ প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে) ও এই বিষয়বস্তুতে শ্রীমতী ঘোষের একনিষ্ঠ চিত্তনিবেশের বিষয় উল্লেখ করে তাঁকে সাধুবাদ জানান শ্রীতমিতাভ চৌধুরী। শিবনারায়ণ ঘোষালের ভাষ্য ওয়াই এছ মুলকারী অর্কেষ্ট্রা এবং সুমিত্রা বসু ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় শ্রীমতী ঘোষ তাঁর দু ঘন্টা-ব্যাপী অনুষ্ঠানে ছড়াগানের এক ঘুমপাড়ানী পরিবেশ সৃষ্টি করে শ্রোতাদের যেন মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। ছড়াগানের সহজ সুর ও কথায় শিশুর কচিমনের উন্মেষ অনুভব ও রূপ-পরিণতির ছবিটি লক্ষ্য করবার মতই। এই ধরণের আসর মাঝে মাঝে হওয়া দরকার। এতে শুধু শিশুমনই গড়ে ওঠে না এক শক্তিশালী গীতিকাব্যের ধারাটিও বেঁচে থাকে।

সুচিত্রা মিত্র ও ধীরেন বসু ইস্পাত নগরীতে ঃ গত ২৩ জানুয়ারী বোকারোর সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে এক সঙ্গীত-সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের শিল্পীদ্বয় ছিলেন সুচিত্রা মিত্র ও ধীরেন বসু। শিল্পীদের আপনাপন ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল গানগুলি এক ভাব-গম্ভীর ও প্রাণময় পরিবেশ রচনা করে। সাংস্কৃতিক পরিষদের এই অনুষ্ঠান প্রবাসী বাঙালীদের শিল্পসমৃদ্ধ রুচির নজীর হয়ে থাকবে।

সিকসথ স্ট্রিং-এর অনুষ্ঠান ঃ হাওড়ার সুবিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সিকসথ স্ট্রিং-এর বাৎসরিক উৎসবের স্মরণীয় সাফল্যের জন্য ধন্যবাদার্হ সংস্থার পরিচালক ও উৎসবের উদ্যোক্তা শ্রীকানাই রায়চৌধুরী।

সাংস্কৃতিক উৎসবের আগে এঁরা সংবর্ধনা জানান শ্রীমতী কানন দেবী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও সুজিত নাথকে। শিল্প ও সংস্কৃতির জগতে শ্রীমতী কানন দেবী ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বহুধাবিস্তৃত অবদানের কথা উল্লেখ করে সভাপতি বলেন, কানন দেবী শুধু চলচ্চিত্র জগতেরই নন— কলকাতার

সিকসথ স্ট্রিং-এর অনুষ্ঠানে অভীক কুন্ডু কৌশিক বসাক

বর্তমান সাংস্কৃতিক উৎসবগুলিতে অপরিহার্য্য। এছাড়া সামাজিক কল্যাণমূলক কাজেরও তিনি অন্যতমা নেত্রীস্থানীয়া।

আর জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ না থাকলে সারা ভারত আজ বাংলাদেশের শিল্পীদের তালবাদ্য শুনতেই পেতো না। শুধু তবলা নয় সংগীতের প্রতিটি শাখায় তাঁর সীমাহীন অবদানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

সুজিত নাথের প্রসংগে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও তাঁর শিষ্য কানাই রায়চৌধুরী বলেন, বিদেশী গীটারের ভারতে এমন ব্যাপক জনপ্রিয়তা সৃষ্টির মূলে আছে শ্রীসুজিতনাথের একনিষ্ঠ সাধনা।

রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান সুরু হয়। তারপর তবলাছন্দ। তালবাদ্য নিয়ে এই অর্কেস্ট্রার পরীক্ষানিরীক্ষা শ্রীঘোষ সুরু করেছিলেন শ্রীমতী পিকচার্সের ব্যানারে 'আশা' চিত্রে। প্রায় পঞ্চাশজন শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। ত্রিতালের পটভূমিকায় দাদরা কাহারবা একতাল কখনও একক কখনও বা দ্বৈত-বাদনে—এবং সর্বশেষে সমবেতভাবে ত্রিতালে প্রত্যাবর্তন।

এরপর একে একে একক, দ্বৈত ও সমবেতভাবে গীটারে রবীন্দ্রসংগীত ও বাদ্যবৃন্দ কানাই রায়চৌধুরীর পরিচালনায়। কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছে শিশুশিল্পী অভীক কুন্ডু ও শুভেন্দু মাইতির আবৃত্তি।

গংগাপুরী মিউজিক কলেজ : গংগাপুরী মেউজিক কলেজের পূর্ব পুটিয়ারী প্রাংগণে ৭ম বার্ষিক সংগীত সম্মেলন ২৫ এবং ২৬ জানুয়ারী দুই রাতব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বহু বিশিষ্ট শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে শ্রোতাদের আনন্দ দেন। প্রখ্যাত সেতার শিল্পী মণিলাল নাগের হেমন্ত রাগে ও গাড়া ধুন রাগে বাজনা সমবেত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। শিল্পীর আলাপ ও ঝালার কাজ বহু দিন মনে রাখার মত। শিল্পীর সংগে তবলা সংগত করেন হীরেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায়। প্রখ্যাত শিল্পী বিজয়কুমার কিচলু পর পর কয়েকখানি খেয়াল পরিবেশন করেন। শিল্পীর কণ্ঠে বিশেষ করে বেহাগ রাগে গান প্রত্যেকের মনে বিশেষ রেখাপাত করে।

প্রফেসার বিমল ভট্টাচার্য (কিড়ানা ঘরানার গায়ক) প্রথমে রাগ কৌশিক কানাড়া এবং পরে মাঝখাম্বাজ ঠুংরি পরিবেশন করেন। খেয়ালের সুরের জাল বোনা এবং সাপাট তানের কাজ শ্রোতাদের মন বহুকাল ভরে থাকবে। শিল্পী পরে ঠুংরি 'আর কি সাওয়ন ঘর যাউ' পরিবেশন করেন। শিল্পীর কণ্ঠে বিশেষ করে মীড় এবং পুকারের কাজ প্রশংসার দাবী রাখে। গানের সংগে সংগত করেন প্রণব ভট্টাচার্য এবং সারেংগীতে সহযোগিতা করেন কানাইলাল মিশ্র। শ্রীমতী রুকমা বাই ভজন খেয়াল এবং ঠুংরি পরিবেশন করেন।

বনহুগলী প্রংগু হাসপাতালে সংগীতানুষ্ঠান : বনহুগলী পি এন রায় প্রংগু হাসপাতালের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৫ ফেব্রুয়ারী এক মনোজ্ঞ সংগীত নৃত্য আবৃত্তির আসর বসেছিল হাসপাতাল প্রাংগণে। কর্মী এবং রোগীদের মধ্যে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী মুক্তা রায়চৌধুরী, সাধনা রায়, সীমা পাল রীণা ভৌমিক ও দুলাল হালদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া স্যাজিকে চন্দ্রনাথ সরকার নৃত্যে রূপা চৌধুরী, রশ্মি চৌধুরী, রূপা দাস এবং সংগীত পরিচালিকা ডালিয়া বসুরায় নিজ নিজ ভূমিকায় দর্শকদের আকৃষ্ট করেন। বাইরের শিল্পীদের মধ্যে বরাহনগরের রবি বীণা শিল্পী গোষ্ঠী এবং একক সংগীত পরিবেশনে সর্বশ্রী সুময় মিত্র—রবীন্দ্রসংগীতে, শিবনাথ দাস—হাসির গানে এবং সর্বশেষ শিল্পী প্রখ্যাত শ্যামাসংগীত গায়ক নিখিল বসু উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সর্বশ্রী অখিল পাল, স্বদেশ বসু ও ভাস্কর বসুরায়।

হাসপাতালের কর্মী ও রোগীদের আর্থিক ও কায়িক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সাফল্য মন্ডিত হয়। সভানেত্রী ছিলেন হাসপাতালের সিস্টার ইন চার্জ মল্লিকা হোর।

মীড় সংগীত সংস্থা : আগামী বৃহস্পতিবার ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ উক্ত কলকাতার প্রখ্যাত সংগীত সংস্থা মীড়-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে সজল দে নিবেদিত পৃথিবীর জন্ম নৃত্যনাট্যটি সংগীত সংস্থার শিল্পিগণ কর্তৃক মঞ্চস্থ হবে।

—চিত্রাংগদা

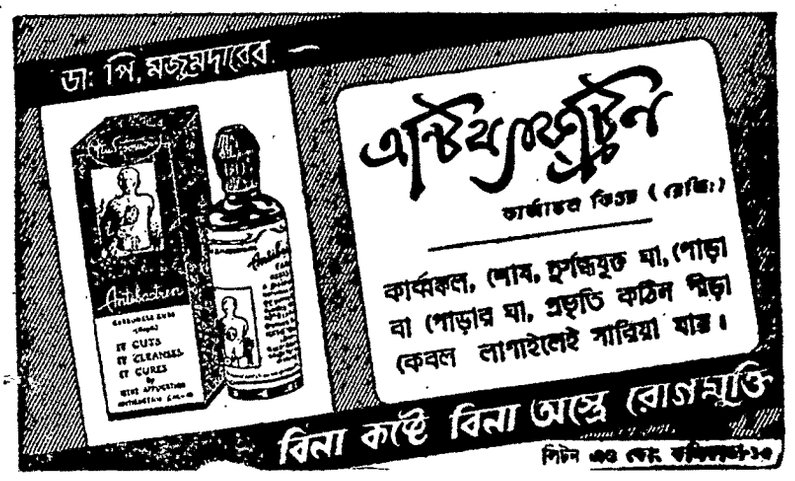

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

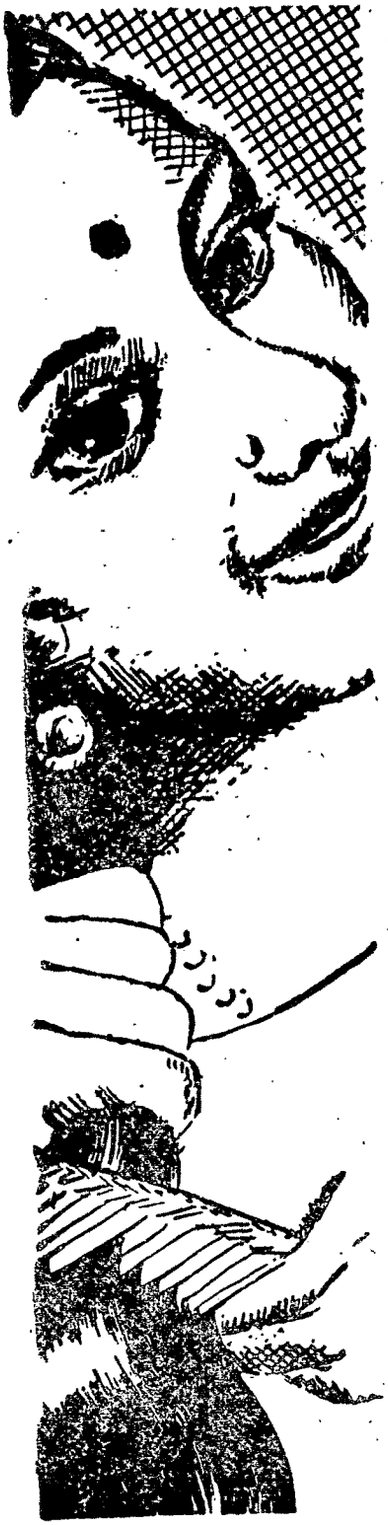

শুধুই কেশ তৈল নয় একটি কেশ রসায়ন

সাধনা আমলা

সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকীই ইহার প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্কতা রোধ করে। মনোরম সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় লিঃ
কলিকাতা-৫

SA-2/67

Phone 55-52
নতুন
ফরমুলায়
সুন্দর প্যাকে
কুকমী
গুঁড়া মশলা
Cookme
Cookme
Fresh & Good Cooking Medium
CURRY POWDER
CONTAINING HALDI
KRISHNA CHANDRA DUTTA (Spice) PVT. LTD.
(Spice Powder Division)
235 MAHARSHI DEBENDRA ROAD, CALCUTTA-9
FACTORY: GOSSIPORE
হ'লো সেই আসল
জিনিষ যার পেছনে
রয়েছে ১২৫ বছরের
অভিজ্ঞতা
আমাদের
অন্য কোন ব্র্যাণ্ড ও
ব্রাঞ্চ নেই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)
iaa/KCD 74

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ ॥ মূল্য ৬৫ পয়সা

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

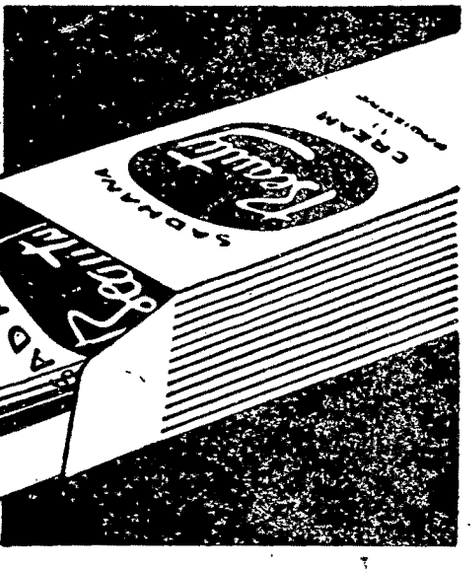

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-১৮

সারা ভারতের সর্বত্র

SSC. 8/71

॥ নূতন বই ॥

জরাসন্ধের
নিশানা ৮৲ **যে যার দর্পণে ৮৲**
আশাপূর্ণা দেবীর
বিমল মিত্রের
তিন নম্বর সাক্ষী

প্র-না-বি-র নাট্যোপন্যাস
বেনিফিট অব ডাউট ১০৲
নীহাররঞ্জন গুপ্তর
অমৃত পাত্রখানি ৮৲

শঙ্কু মহারাজের
তমসার তীরে তীরে
তমসার তীরবর্তী গাড়োয়াল উপত্যাকার বিস্তৃত কাহিনী এই প্রথম লেখা হ'ল। ১৬৲

নিমাই ভট্টাচার্যের
নাচনী
এক সপ্তাহে প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত দ্বিতীয় মুদ্রণ— সাত টাকা

॥ বিশেষ সানন্দ ঘোষণা ॥

৯ই মার্চ মিত্র-ঘোষের ৩৯ বর্ষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ৮ই মার্চ শনিবার হইতে ১৫ই মার্চ শনিবার পর্যন্ত প্রতি সাধারণ ক্রেতাকে শতকরা ১৫ টাকা অর্থাৎ টাকাপিছু ১৫ পয়সা কমিশন দেওয়া হইবে। সহৃদয় পুস্তকবিক্রেতা বন্ধুগণকেও অন্যূন ৫০০ টাকার অর্ডারে। নির্দিষ্ট কমিশন ছাড়াও অতিরিক্ত ৫% কমিশন দেওয়া হইবে।

॥ এই শুভদিন উপলক্ষে পাঠক গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণকে সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাইতেছি ॥

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড ২০৲
তারাশঙ্কর রচনাবলী নবম খণ্ড ২০৲
বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড ২০৲

শুভেন্দ্রকুমার মিত্র সংকলিত
বৈজ্ঞানিক অভিধান ২৫৲
অত্যাশ্চর্য রচনা যাযাবরের
হ্রস্ব ও দীর্ঘ ৬৲

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৩৪৯২
৩৪-৮৭৯১

বিশ বছর আগে ১৯৫৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ভিলাই ইস্পাত কারখানা

নির্মানের একটা চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতা এক সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে

কালক্রমে এই সহযোগিতার প্রসার ঘটেছে শিল্প কৃষি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ ভারতের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায়। ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে এল আই ব্রেজনেভের ঐতিহাসিক ভারত সফরের পর পারস্পরিক সুবিধাজনক এই সহযোগিতা পেল এক উল্লেখযোগ্য নতুন প্রেরণা এবং ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক উন্নীত হল এক নতুন ও উচ্চতর পর্যায়ে। এই সফরকালে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার আরও বিকাশ সম্পর্কে স্বাক্ষরিত পঞ্চদশ বার্ষিক চুক্তিটির ধারাগুলির রূপায়ণ সুরু হল চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পর থেকেই। ধাতুবিদ্যা, কয়লাখনি শিল্প, তৈল শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল স্বাক্ষরিত হল। এই সফরের প্রত্যক্ষ ফললাভ হচ্ছে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সহযোগিতা সম্পর্কিত সোভিয়েত-ভারত আন্তঃসরকার কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি। গত দুই দশকে সোভিয়েতের সহযোগিতায় ভারতে ৮০টি শিল্প প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে বা হচ্ছে বা ডিজাইন তৈরির পর্যায়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে ৫৫টিরও বেশি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশ, অশোধিত তেলের ৬০ শতাংশ, তৈলজাত দ্রব্য-এর ৩০ শতাংশ, ধাতুশিল্প সরঞ্জামের ৮০ শতাংশেরও বেশি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের একটা মোটা অংশ এখন উৎপাদিত হচ্ছে এই সব শিল্পসংস্থায়। অ্যান্টিবায়োটিকসহ প্রচুর পরিমাণ ঔষধপত্রও তৈরি হচ্ছে এই শিল্পসংস্থা-গুলিতে। সোভিয়েত সাহায্যে নির্মিত এই সব শিল্পসংস্থা ভারতের জাতীয় সম্পত্তি। এই সম্পত্তির ষোলোআনা মালিক ও ব্যবস্থাপক ভারত সরকার।

ভারতীয়দের প্রথম স্পুতনিক অর্থাৎ পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের সাহায্য-দান ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে ভারতীয় স্পুতনিকটিকে অদূর ভবিষ্যতেই মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কক্ষে স্থাপন করা হবে। তার মহাকাশ পরিক্রমা নিয়ন্ত্রণ করবেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা।

পারস্পরিক সুবিধাজনক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বিশ বছর আগে এই বাণিজ্য সুরু হয়েছিল ১ কোটি রুবল মূল্যের পণ্য বিনিময় দিয়ে। বাড়তে বাড়তে গত বছর সেটা ৬০ কোটি রুবলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় পণ্যের ক্রেতাদের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন শীর্ষস্থানের অধিকারী এবং ভারতের প্রয়োজনীয় মূলপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রেও সে শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম।

নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থজড়িত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে পরস্পরের বক্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে গড়ে উঠেছে গভীর মৈত্রী। বড় বড় আন্তর্জাতিক প্রশ্নে দুদেশের মতৈক্য তাই কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়।

একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই সহযোগিতা উত্তরোত্তর আরও ব্যাপক ও আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠবে। আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য সম্পর্কে সদা সজাগ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে যাবে।

সোভিয়েত-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হোক।

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪২ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 28th February, 1975 শুক্রবার ১৫ ফাল্গুন, ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়	
৭	এক সময় খেতে পারতেন (গল্প)	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১০	এই বাংলার খবর	শ্রীদেবদত্ত
১২	দেশে বিদেশে	শ্রীপুণ্ডরীক
১৪	রোজনামচা	ফাদার দ্যতিয়েন
১৬	সূর্য দেখলে চোখ ধাঁধাবে (কবিতা)	শ্রীবটকৃষ্ণ দে
১৬	কথা দিয়েছিলাম আসবো (কবিতা)	শ্রীহরিপদ দে
১৬	এই শক্তিতে জাগে (কবিতা)	শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ
১৭	সেই সব মানুষ (উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
২১	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	শ্রীউপগুপ্ত
২৩	চারুকলার এক বিস্মৃত পুরুষ হেনরি হোভার লক	শ্রীকমল সরকার
২৯	গোয়েন্দা ধাঁধা	শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
৩১	যুবক যুবতী	শ্রীঅমর দাশ

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

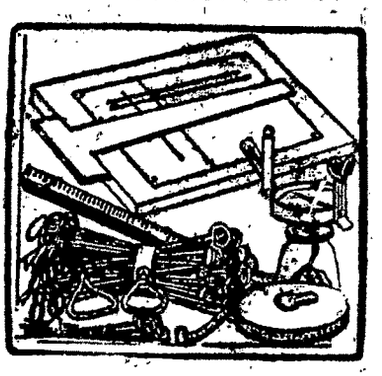

সার্ভে ড্রইং, নানা রকম কাজ, খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪

গ্রাম: অয়ারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া

পরিবেশক : কামলিন প্রডাক্টস (ষ্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকও মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.

ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAM—KCD-74

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

বাহির হইল !
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত ঐতিহাসিক
ভারততত্ত্ব ভাস্কর
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের
বাংলা দেশের ইতিহাস
[আধুনিক যুগ]
॥ নূতন তথ্যসম্বলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ॥
পৃষ্ঠা সংখ্যা—৬৭৩ : আর্টশ্লেট—১৬ : দাম ৩৫ টাকা
প্রাচীন যুগ (৬ষ্ঠ সং)—১৫ টাকা : মধ্যযুগ (২য় সং)—২৫ টাকা
[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]
জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

সদ্য প্রকাশিত সংযোজন
ডঃ ক্ষুদিরাম দাস রচিত—
সমাজ-প্রগতি-রবীন্দ্রনাথ
[রবীন্দ্রনাথের সমাজতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে নূতন গবেষণামূলক গ্রন্থ]
ডঃ বৈদ্যনাথ শীল রচিত—
রবীন্দ্রকাব্যে নারী
[কবির নারীসম্পর্কিত ত্রিবিধ রূপের অপূর্ব সমন্বয়]
বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা
[কমেডি ও প্রহসনের ধারা সম্পর্কে সারগর্ভ বিশ্লেষণ]
প্রত্যেকটির মূল্য বারো টাকা
ইউ. এন. ধর অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
বিচিত্র কাহিনী
ও
আরও বিচিত্র কাহিনী
পড়ে' আনন্দ পাবেন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৩	চিঠিপত্র	
৩৪	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে	শ্রীদিলীপকুমার রায়
৩৭	বিজ্ঞানের কথা	শ্রীঅয়স্কান্ত
৩৯	শেষ বিচার (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪৩	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৪	রূপসীর খাতা	শ্রীবরবর্ণিনী
৪৪	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান	
৪৫	রান্না করে দেখুন	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৪৭	পুনশ্চ	শ্রীক্ষপণক
৪৮	উর্বশী	শ্রীনিরঞ্জন সিংহ
৫৪	খেলাধূলা	শ্রীদর্শক
৫৮	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅময়
৬০	ব্রেশটের থিয়েটার বের্লিনার অ'সেম্বল	শ্রীকৃষ্ণ ধর
৬৩	ফ্লোর থেকে বলছি	স্টুডিও সংবাদদাতা
৬৫	স্টুডিও সংবাদ	স্টুডিও সংবাদদাতা
৬৬	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা	শ্রীঅভিজিত
৬৭	নাট মঞ্চ	
৭০	বম্বের শিল্পীরা কলকাতায়	
৭১	আয়না (চিত্র সমালোচনা)	শ্রীচিত্রদূত
৭২	জলসা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীইন্দ্রাণী চৌধুরী

এই দশকের শ্রেষ্ঠ নাগরিক উপন্যাসের নাম কি?
● জন-অরণ্য

কোন্ বাংলা বই সম্পর্কে বেওসাদাররা এখন চর্চিতং?
● জন-অরণ্য

যুবক-যুবতীদের মুখে মুখে কোন উপন্যাসের নাম ছড়িয়ে পড়ছে?
● জন-অরণ্য

বণিকের অঙ্কশায়িনী কলগার্ল কোন্ উপন্যাস পড়ে বলেছে "ওতো আমাকে নিয়ে লেখা।"
● জন-অরণ্য

শংকরের এই উপন্যাসটি পড়া না থাকলে লিখুন ॥ দাম ১০·০০
বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯।১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

একখানি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
সংস্কৃতির ধর্ম
মূল্য আট টাকা মাত্র
ভারতী লাইব্রেরী
৬নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা—১২

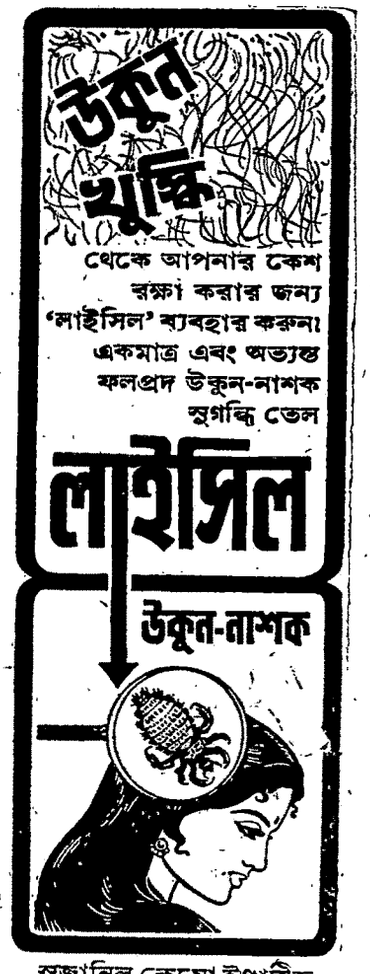

সুজানিল কেমো ইণ্ডাষ্ট্রিজ
গণেশনগর, চিঞ্চওয়াড,
পুণা-১৯
EXPRESSO/686 B

সম্পাদকীয়

এশিয়ার আশংকা

এশিয়ার জনসংখ্যা ও তার দারিদ্র্য নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মনে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের বাস এই মহাদেশে। কিন্তু জাপান এবং অধুনা চীন বাদ দিলে এশিয়ার অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, নিছক নিজেদের সরকারের অবহেলা এবং অপদার্থতার দরুন দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের মানুষের চরম বিড়ম্বনা ঘটবে এই শতাব্দীর বাকী কবছরের মধ্যে। এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক সংস্থার এক সমীক্ষাপত্রে প্রকাশিত বিবরণও রীতিমত ভয়াবহ। দক্ষিণ এশিয়ার যে-সমস্ত দেশে কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে তাদের টেনে তুলবার জন্য যদি সামগ্রিক চেষ্টা করা না হয় তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যাবে।

একে নেহাৎ আতঙ্ক ছড়ানোর রিপোর্ট বলে উপেক্ষা করা হয়তো ঠিক হবে না। ভারতীয় উপমহাদেশ-সহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেরই প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। এগুলো নতুন স্বাধীন দেশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এ-দেশগুলো ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে। আজকের সুখী ও সচ্ছল সমাজ বলে যারা নিজেদের দাবি করে তাদের অধিকাংশই ছিল ঔপনিবেশিক শক্তি। ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগীজ, ডাচ, বেলজিয়ান সবারই বিরাট উপনিবেশ ছিল এশিয়া ও আফ্রিকায়। এই উপনিবেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠন করে তারা বড়লোক হয়েছে। উপনিবেশগুলোর উন্নয়নে যতটুকু না করলে শাসন বজায় রাখা যায় না তার বেশি তারা কিছুই করেনি। নিরক্ষরতা, ব্যাধি এবং অকালমৃত্যু ছিল এই দেশগুলোর মানুষের বিধিলিপি। তার ফলে, স্বাধীন হয়েও এই দেশগুলো স্বাধীনতার প্রকৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু তার প্রথম পুরস্কার জুটল লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আর হানাদারের আক্রমণ। এই ধাক্কা সামলাতেই প্রচুর ব্যয় হয়ে গেল। পাশে একটা তৈরি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে রাখার ফলে প্রতিরক্ষার ব্যয় উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট ভাঁড়ারে হস্তক্ষেপ করতে লাগল স্বাভাবিক কারণেই। ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল স্বরূপ জুটল স্বার্থপর, ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও তাই প্রত্যাশিত ফল লাভ হল না।

এ রকম অবস্থা শুধু ভারতে নয়, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, পাকিস্তান সর্বত্রই। তবু ভারতবর্ষ এর মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু রেখেছে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ভারী শিল্পের বুনিয়াদ করেছে মজবুত এবং সর্বোপরি সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন অব্যাহত রাখতে পেরেছে। অন্যান্য অনেক দেশই তা পারেনি। সামরিক একনায়কতন্ত্র নতুন স্বাধীন দেশগুলোর গলা টিপে মারছে। শাসনের এই অব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিকল্পনা তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারছে না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না দেশের অর্থনীতি। বিশেষজ্ঞরা এই চূড়ান্ত ব্যর্থতার জন্যই আশংকা প্রকাশ করে বলেছেন যে মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্য ঘাটতি সমস্যা এবং ঋণ পরিশোধের চাপ এড়াবার জন্য যদি এই দেশগুলো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উন্নয়ন কর্মসূচীর মৌল পরিবর্তন না করে তাহলে সমূহ বিপদ। কীভাবে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা নিয়েই এখন চিন্তা সুরু হয়েছে।

গরিব এবং অনুন্নত দেশগুলোর সহায়সম্বল কম বলে তার জীবনযাত্রার লক্ষ্য পশ্চিমী দেশগুলোর মতো কখনোই হবে না। কিন্তু মোটামুটি খেয়ে-পরে এবং মাথার ওপর আস্তানা রেখে সবাই বাঁচতে চায়। এই কাজ করতে হলে নিছক পশ্চিমীদের অনুকরণ বা তাদের কলাকৌশল প্রয়োগ সব সময় বাঞ্ছিত নয়। আমাদের দেশের অবস্থা বিবেচনা করে এবং এখানে সহজলভ্য এমন উপকরণের ওপর নির্ভর করেই কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে। ইদানীং তাই কৃষি উৎপাদনের দিকে আগেকার তুলনায় বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। অনুন্নত এবং গরিব দেশগুলো নিজেদের মধ্যে সাহায্য ও সহযোগিতার রাস্তা যদি আরও বাড়িয়ে দেয় তাহলে ধনী দেশগুলোর কৃপা ও করুণার ওপর এতটা নির্ভরশীল হতে হয় না। এশিয়া ও আফ্রিকার পারস্পরিক সহযোগিতাও এ-বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকর হবারই সম্ভাবনা। জনসংখ্যা নিশ্চয়ই একটা উদ্বেগের কারণ। বেশি জনসংখ্যা নিয়েও চীন তার অর্থনীতিকে সচল ও সজীব রাখতে পেরেছে। এর একটা প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে তারা পশ্চিমী সচ্ছল সমাজের অনুকরণ করতে যায়নি এবং তার জনবলকে সে বোঝা মনে না করে তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে। সুতরাং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করে এশিয়া তার সমস্যা সমাধানে এগোলে দুশ্চিন্তার [illegible] শুরু হবে।

এক সময় খেতে পারতেন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমার এ-কাহিনী এই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত রেশনের যুগের নয়। আরও গোটা ষাটেক বছর পেছিয়ে যেতে হবে, তখন লোকে খেতে পেতো, খাওয়াবার দিলও ছিল। এক কথায় দেশে ভরা পেটের আনন্দ ছিল। হয়তো দুর্ঘটনাও ঘটে যেত ক্বচিৎ। এখন আনন্দও নেই দুর্ঘটনাও নেই। নিমন্ত্রণপত্রের পাদটীকার ভাষান্তরে জানিয়ে দিতে হচ্ছে —বেশি আশা থাকে তো না উপস্থিত হওয়াই ভালো।

রায়বাহাদুর অন্নদাচরণ চক্রবর্তী ছিলেন জমিদার। ভাগ্যাভাগতে অবস্থা একটু পড়েই আসছিল তবে সামলে গেছে। তার জন্যে তিন ছেলের দুটিকেই চাকরি নিতে হয়েছে তবে উঁচু দিকেই, একজন ডেপুটি একজন মুন্সেফ। দুটি নাতি সে বেগতিক দেখে একবার এ-ব্যবসা ও-ব্যবসায় ঠুকরে লোকসান দিয়ে যাচ্ছে তাতে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এখনও একান্নবর্তী পরিবার।

অন্নদাচরণ ছিলেন খাইয়ে মানুষ। শোনা যায় পাঁঠাটা মাঝারি সাইজের হলে তাতে কাউকে ভাগ বসাতে দেওয়া হোত না। তেমনি পাল-পার্বনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াতেন। কারুর বিশেষ পারদর্শিতা আছে দেখলে রুপোয় বাঁধানো হুঁকো হাতে নিয়ে সামনে বসে যেতেন। দেবতা সম্বন্ধেও ঐ কথা। কালীভক্ত ছিলেন। চারিদিকে বলিদান বন্ধ করার হিড়িক উঠল। উনি করতে দেননি। বললেন—'ও বেটি কি তোদের আখের ছিবড়ে চিবুবার মেয়ে? তার চেয়ে এ বোল্টমি পুজো বন্ধ করে দে।'

চুরানব্বই বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে। ওদিকে ঘটা করে দানসাগরের আয়োজন হচ্ছে, একটা প্রশ্ন উঠল, কর্তা অত খেতে আর খাওয়াতে যে ভালোবাসতেন সে সম্পর্কে বিশেষ কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে? ফলের মধ্যে আমটা অত্যন্ত প্রিয় ছিল; আমের সময় একেবারেই নয়, তবে তার জন্যে কোথায় দোফলা আম পাওয়া যায় সন্ধান করে নিয়ে আসবার জন্যে চারিদিকে লোক ছুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় শখ, খাওয়ানো। সেইরকম ভোজনবিলাসী কাউকে পেলে হুঁকো হাতে করে সামনে বসে চেপে চেপে খাওয়ানো। ঠিক হোল, এই ব্যাপারটাকে একটা বিশেষ রূপ দিতে হবে তাঁর আত্মার বিশেষ তৃপ্তির জন্যে। অনেক আলোচনার পর সাব্যস্ত হোল—কর্তা সমস্ত পঙক্তির মধ্যে এবিষয়ে সবচেয়ে যোগ্যতম খাইয়েকে বেছে নিয়েই যখন তার সামনে বসে উৎসাহিত করতেন তখন একজনের জায়গায় আরও কয়েকজনকে ঐভাবে পরিতুষ্ট করলে সেখানে বোধহয় তাঁর তৃপ্তিসাধন করা হবে। পনের সের থেকে আধমন পর্যন্ত উদরসাৎ করতে পারে এরকম ভোজন-বিলাসী খোঁজ করা হোল। বিশেষ রকম দাক্ষিণার ব্যবস্থা থাকবে।

সে-যুগ নেই। দশ থেকে তেরোসেরী খাইয়ে চারজন পাওয়া গেল। তারা কথা দিল এর ওপর যথাসাধ্য তুলে তারা পরলোকগত কর্তার সন্তোষবিধান করবার চেষ্টা করবে।

অন্নদাচরণের শ্রাদ্ধে একটা সাড়া পড়ে গেল।

ঠিক হোল, পিতার মতোই দুই ভাই সামনে বসে এদের চারজনের উৎসাহ বর্ধন করবেন।

সব ঠিকঠাক, আগামীকল্য ব্রাহ্মণ-ভোজন। পাড়ার কয়েকজন মাতব্বর গোছের ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন, অন্যান্য গল্পের সঙ্গে খাওয়া-খাওয়ানির কথা নিয়ে একাল-সেকালের আলোচনা হচ্ছে, এই সময় একটি বছর আঠারো-উনিশের ছেলে এসে বড় ভাই ষষ্ঠীচরণের পায়ের ধুলো নিয়ে একখানি খাম হাতে দিয়ে বলল—'বাবা দিলেন। ...আমি হচ্ছি নীলরতন হালদারের ছেলে।'

ষষ্ঠীচরণ খামটা উলটে দেখলেন ৭৪।। লেখা রয়েছে, অর্থাৎ গোপনীয় বা নিতান্ত ব্যক্তিগত। ছিঁড়ে আগাগোড়া পড়ে নিয়ে বললেন 'তুমি একটু অপেক্ষা করো ব্যবস্থা করছি।'

পুত্র করালীচরণকে ডাকিয়ে আনিয়ে বললেন—'তুমি এর সঙ্গে নিজে চলে গিয়ে নীলরতনমশাইয়ের বেহাইকে নেমন্তন্ন করে এসো। বলবে, বাবা খুবই ব্যস্ত রয়েছেন,

নৈলে নিজেই আসতেন। আর নীলরতনকেও বলবে তাঁর জায়গায় নয়, তাঁকেও আসতে হবে, যেন অবিশ্যি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।'

ওরা দুজনে চলে গেলে ছোটভাই ভবানীচরণের হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন —'পড়ে দ্যাখো।'

ভবানীচরণ অল্প হাসতে হাসতে পড়ে নিয়ে মন্তব্য করলেন—'ঠাট্টা জমিয়েছেন ভালো বেহাই।'

তখনকার মতো ৭৪৷৷ দেওয়াটা চাপা পড়লেও বেরিয়ে পড়তে দেরি হোল না। নীলরতন গ্রামের একজন খুবই সম্পন্ন গৃহস্থ, তবে জাটকৃপণ বলে গ্রামে বদনাম আছে। কিছুদিন আগে পাশের গ্রামে মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন। বেহাই কোন একটা আছিলা করে ছেলের বিবাহসূত্রে তাঁর ওদিকের বেহাই পাঠিয়ে দিয়ে ফাঁফরে ফেলেছেন। নীলরতন তাঁকে এই ভোজের সুযোগ নিয়ে চক্রবর্তীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন। ও যে খেতে পারে। একটা বেলা তো বাঁচবেই চাইকি, রাত্রিটাও বাঁচতে পারে ভোজের ব্যাপারই তো তাও চক্রবর্তীদের বাড়ি, বসে খাওয়ানো নিয়ে একটা নাম রয়েছে, তার ওপর কর্তার শ্রাদ্ধে আবার খুঁজে পেতে এনে খাওয়ানো।

সাড়ার ওপর আরও একটা সাড়া পড়ে গিয়ে সমস্ত গ্রামটা গমগম করতে লাগল। অমন দানসাগর শ্রাদ্ধের আলোচনাকে ছাপিয়ে নীলরতনের নূতন সমস্যা আর তার চতুর সমাধানের কথাটাই রইল জেগে। বেহাইয়ের বেহাই সম্বন্ধে গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। লোকটির নাম সদানন্দ, তিন-আনা গ্রাম পেরিয়ে বাড়ি। ডাকসাইটে খাইয়ে একজন। ও অঞ্চলের 'মুনকে রমু' বলে পরিচিত। বিশেষ নিমন্ত্রণাদিতে আয়োজনের অনুপাতে উদরের আকার বেড়ে গিয়ে অসাধ্যসাধন করতে পারেন। এসব গুজব বাড়তে বাড়তে যেমন দাঁড়ায়। দেহের আকার সম্বন্ধেও একটা প্রায় অলৌকিক বিবরণ প্রচার হয়ে সবার কৌতূহলটাকে একেবারে চরমে ঠেলে দিল।

এত সমারোহের ভোজ, খাওয়ার আগ্রহটা সবার নীলরতনের বেহাইয়ের তস্য বেহাইয়ের ভোজনপর্ব দেখার আগ্রহে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

পরদিন যথাসময়ে সদানন্দ এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে করে নিয়ে এল নীলরতনের ছেলে, প্রসাদ। ভবানীচরণ আরও কয়েকজনের সঙ্গে নিমন্ত্রিতদের শামিয়ানার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছেন নীলরতনের ছেলে জানাল—'বাবার শরীরটা খারাপ, তিনি আসতে পারলেন না। ইনি আমার তালুইমশাই, বাবা বললেন আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে।'

ভবানীচরণ যেন অপেক্ষাই করছিলেন—'ও, আপনই?...আসুন। আসুন।—বলে কিছু কুশলাদি প্রশ্ন করতে করতে নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শামিয়ানার ভেতরে দুজনকে ফরাসের ওপর বসিয়ে দিলেন। সামনের দিকেই। সমস্ত গ্রাম নিয়ে নিমন্ত্রণ—শামিয়ানা ভরে এসেছে। দেখার জন্য একটু হুড়াহুড়ি পড়ে গেল। ঘুরে ঘাড় তুলে একটু যারা বেশি পেছনে তাদের মধ্যে বিশেষ কৌতূহলী কেউ কেউ উঠে এসে খানিকটা তফাৎ থেকে আড়চোখে দেখে নিয়ে আবার গিয়ে বসল নিজের নিজের জায়গায়।

এমন বিশেষ কিছুই নয়। ঢিলেঢালা শরীর, হয়তো একটু স্থূলত্বের দিকেই গৌরবর্ণ, মুখে খুব সূক্ষ্ম একটি নির্লিপ্ত প্রসন্ন হাসির ভাব সবার ঠাট্টা-প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে যেতে ভোজনবিলাসীদের যেমন এসে যায় সাধারণত। তবে স্বল্পবাক বলেই মনে হয়। পাশের দু'একজন একটু গল্পে নামাবার চেষ্টা করল, আহার নয় অন্য প্রসঙ্গ দিয়েই অল্প কথায় উত্তর দিয়ে সামনে চেয়ে বসে রইলেন।

বাড়ির দিক থেকে এসে একজন করজোড়ে বলল—'ব্রাহ্মণরা গা তুলুন।'

ব্রাহ্মণদের একটি পুষ্ট ভিড় শামিয়ানা ছেড়ে এগুল। সদানন্দ নীলরতনের ছেলের সঙ্গে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন—'তিনি কোথায়? আমাদের বেহাই?' বলতে বলতে ষষ্ঠীচরণ একটু ব্যগ্রভাবেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এলেন।

সাবেক আমলের উঁচু দোতলা প্রকাণ্ড সদর বাড়ি। সাবেক আমলের সিঁড়ি একটু সংকীর্ণই। তাই বেয়ে ভিড়টা আরও চাপ হয়ে গিয়ে এগিয়ে চলেছে, সদানন্দ খানিকটা দূর থেকেই থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—'ওপরেই যেতে হবে?'

ভবানীচরণ বললেন—'হ্যাঁ দোতলার ছাতে। ভোজের খাওয়ানো ওখানেই হয় আমাদের। ...কষ্ট হবে?'

এক সেকেণ্ড একটু যেন কি ভেবে নিয়ে সদানন্দ বললেন—'না তেমন আর কি? চলুন।'

ওপরে এমড়ো-ওমড়ো চারটে সারিতে জায়গা হয়েছে। সমস্ত প্ল্যান করাই ছিল ভেতরে ভেতরে। নীলরতন স্বভাবতই চিঠিতে 'খাইয়ে মানুষ' বলে পরিচিত করতে পারেন নি কুটুম্ব মানুষকে। ষষ্ঠীচরণ শিষ্টাচার রক্ষা করে সদানন্দকে সঙ্গে করে প্রথম পঙ্‌ক্তির, একেবারে শেষের আসনের সামনে নিয়ে গিয়ে বললেন—'আপনি এইটেতে বসুন। খানিকটা নিরিবিলি হবে।'

প্ল্যান মতো খালিই রাখা হয়েছে এ আসনটা।

সদানন্দ একটু যেন থতমত খেয়ে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—'এইটাতে? ...তা বেশ।'

পা বাড়িয়ে আবার একটু থমকে গিয়ে পাশে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—'আর ওগুলো?'

বেশ খানিকটা জায়গা বাদ দিয়ে আরও চারটে আসন। আসন, পাতার বহর, জলের ব্যবস্থা, খুরির আকার—সব কিছু দেখলেই বোঝা যায় ব্যবস্থাটা বিশেষ রকমের।

পরিবেশন আরম্ভ হয়ে গেছে, লুচি তরকারি যা পড়ছে তার পরিমাণও সেই রকম। একটু সতৃষ্ণ নয়নেই চেয়ে আছেন সদানন্দ।

ভবানীচরণ একটু কুণ্ঠিতভাবেই বললেন—'আজ্ঞে—কি যে বলে—ওঁদের একটু বিলম্ব হয় আহারে। তাই—পঙ্‌ক্তির আর সবাইয়ের যাতে না অসুবিধে হয়, একটু আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়েছে।'

সদানন্দ একটু কুণ্ঠিতভাবে হেসে বললেন—'আমাকেও তাহলে ঐ দিকে একটু জায়গা করে দিলে ভালো হয়। আমারও ঐ দোষ। ওর নাম কি, এক সময় আহারেও রুচি ছিল। বয়েস হয়ে সেটা গেছে, তবে বিলম্ব করে খাওয়ার ঐ দোষটুকু গেছে থেকে। মানে একবার বসে পড়লে কেউ তো পঙ্‌ক্তি ছেড়ে উঠতে পারবেন না...'

ওর মুখ দিয়ে বলাবারই প্ল্যান। একটু তাড়াহুড়ো পড়ে গেল—'ওরে এঁর জন্যেও একটা ঐ সারিতেই, ওঁদের চার-জনের সঙ্গে। একেবারে শেষটায়...শীগ্‌গির নিয়ে এসো। এঁরা বসতে পারছেন না...এঃ তোমাদের যেমন! আগে একটু জেনে নিতে হয় কে কিরকম চান...উনি আবার নতুন মানুষ...'

সমস্ত একটু আড়ালে হাতের কাছেই ঠিক করা ছিল, দেরি হোল না।

এর পর বাঁধ একবার ভেঙে যেতে আর আটকালও না।

খুব যে বিলম্ব করে খাওয়ার অভ্যাস এখনও শেষ হোল না। আর চারজনের সঙ্গেই তাল রেখে এগিয়ে চললেন সদানন্দ। এদিকে পরিবেশনের জন্য আলাদা দুজন মানুষ। দিস্তের পর দিস্তে লুচি। বেগুন ভাজা ও ছক্কা তদনুযায়ী ডাল তরকারি মাছ, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। শেষে একটা রেষারেষির ভাবও এসে পড়ল।...'ওকি আচার্য মশাই! —যদুকাকা, করছেন কি ও! ...আপনাদের প্রত্যেকের মাপা মাল রয়েছে ওদিকে—সের ধরে। এখনও অর্ধেক হয়নি—মিষ্টিতে আর কত তুলবেন?—মুখ মেরে দেওয়ার জিনিস...'

তামাসা জমে উঠেছে। ষষ্ঠীচরণও এসে একটা চেয়ারে বসলেন—কর্তার হুঁকোটা হাতে করে।

—'ওকি হচ্ছে যদু খুড়ো তোমাদের। শেষে সুনামগঞ্জের দুর্নাম করবে? একটু কাপড়ের কষি ঢিলে করে দাও।...

—তোমাদের আক্কেল আর গাঁয়ের ইজ্জতের কথা ভেবে বলছি—বেহাইয়ের এদিকে সের দশেক হয়ে এল—এখনও দই মিষ্টান্ন, রাবড়ি সব বাকি—মদুখুড়ো আবার মিষ্টির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে...নাও, চালিয়ে যাও...'

মিষ্টান্ন পর্ব শুরু হয়ে গেল।

সবাই রাঙা হয়ে উঠছেন। খুড়োর রংটা কালো তামাটে হয়ে উঠেছে। শীতকাল তর্জনী দিয়ে মাঝে মাঝে ঘামও ঝেড়ে ফেলতে হচ্ছে, হেঁট হয়ে বসবারও ক্ষমতা

হারিয়ে যাচ্ছে। লুচি তরকারির দিকটা শেষ হয়ে গেলে সদানন্দ একবার শরীরটাকে একটু চাড়া দিয়ে টেনে একটু ঝাকানি দিয়ে বসলেন। আর সবাই গাঁয়ের লোক ওরই মধ্যে একটু কথাবার্তা, রহস্যালাপে যোগ দিচ্ছিলেন সদানন্দ একেবারে নিশ্চুপ ছিলেন, এতক্ষণে একটু বিনীত হাসির সঙ্গে বললেন—খেয়েছি একসময়। সদানন্দের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে যাবে এমন লোক ও তল্লাটে থাকতে দিইনি।' বোধহয় সময় নেওয়ার জন্যেই নিজের আহারের দু একটি গল্পও ফাঁদলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—'হোল কত আমাদের সেটাও একবার দেখতে হয়।'

এদিকে আর সবার খাওয়া-আঁচানো শেষ হয়ে গিয়ে পান হাতে সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম মন্তব্য করছে। পরিবেশকের একজন হিসাব নিয়ে এসে বলল—'যদুকাকার সাত সের, নারায়ণজ্যাঠার সাড়ে আঠ, হলধরমামার ন' সের চক্রবর্তীর সাড়ে আঠ। বেহাই-মশাইয়ের বারো। তার মধ্যে লুচি সাড়ে তিন দিস্তে।'

সদানন্দ একটু বিনীতভাবে হাসলেন, বললেন—'খাওয়া আর তেমন আছে কৈ?'—

মিষ্টান্ন পর্ব আরম্ভ হোল। দই, রাবড়ি রসগোল্লা সন্দেশ পান্তুয়া, মিহি-দানা অমৃতি আলাদা আলাদা তিজেল আর গামলায় প্রত্যেকের নিজের নিজের সামনে সাজিয়ে রাখা হল। আবার চলল এক ঝোঁক।

এদিকে ভিড়ের মধ্যে নানারকম মন্তব্য আরম্ভ হয়ে গেছে। 'এতসব যায় কোথায়? আশ্চর্য্য!...চেহারা দেখলে না? কিরকম ঢিলেঢালা? আঁট হয়ে যাবে।'...মামা সুনামগঞ্জের নাম ডুবুলেন শেষকালে?... এরাতো নিজে খায় না, ভেতর ভূত থাকে। এরা শুধু হাত মুখ নেড়ে যায়। ...তা চোয়াল দুটোও তো টাটাতে হয়।...'

ষষ্ঠীচরণ বললেন—আমার কল্কেটা পালটে নিয়েই আসুক।' প্রবল উৎসাহে নড়ে-চড়ে বসলেন। এতক্ষণ জিদ করে খাওয়ানোর দরকার হয়নি এইবার আরম্ভ করলেন। ওঁদের চারজনের শেষ হয়েও গেল একরকম, রেষারেষিতে বেশি তুলতে গিয়ে কিছু বরং পড়েই রইল গামলা আর দই-রাবড়ি তিজেলে। ষষ্ঠীচরণ একা সদানন্দকে নিয়ে পড়লেন। ফলে ওঁর তিজেল আর গামলা খালি হয়ে যেতে আরও কিছু রসগোল্লা আর রাবড়ির কথা বললেন। সদানন্দ একটু পেছন দিকেই হেলে পড়েছেন, হাত দুটো পাতার ওপর উবুড় করে ধরে বললেন—'যার থাক দাদা রাবড়ি আর রসগোল্লা নাকি বড্ড সরেস হয়েছে বেশ একটু চাপ হয়ে গেছে!'

রাবড়িটা আর পারা গেল না গোটা পনের রসগোল্লা উপরোধে পড়ে গলায় নীচ গলিয়ে যখন পথ জুড়ো করে বসেছেন, ওঠার প্রস্তুতিতে ডাইনে বাঁয়ে করছেন

ভিড়ের পেছনে সিঁড়ির কাছ থেকে রব উঠল কতকগুলা কণ্ঠে—'উঠে গেছেন নাকি?...না, শীগ্গির যান! ...আম এসে গেছে! ... জায়গা ছাড়ো! 'জায়গা ছাড়ো একটু বসিয়ে রাখুন জ্যাঠামশাই—আম এসে গেছে!'

ভবানীচরণের ছেলে একটা মাঝারি গোছের ঝুড়ি দু'হাতে মাথার ওপর তুলে ভিড় চিরে এগিয়ে এল।

বাবার সবচেয়ে প্রিয় ফল, এমন অপূর্ব সুযোগ একরকম কাকুতি-মিনতি করেই ধরে বসলেন ষষ্ঠীচরণ।

'আর চলে না, জায়গা কোথায়?' —বলে পেটে একবার হাতটা বুলিয়ে নিলেন সদানন্দ, বললেন—'নেহাৎ বলছেন তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্যে, দিন গোটা দুই দেখা যাক।'

গোটা পঁচিশেক দিল, তার মধ্যে যখন বারোটা হয়ে গেছে হঠাৎ শরীরটা একটু থরথরিয়ে উঠল, এবং সবার একটু সচকিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শিবনেত্র। শরীরটা পেছন দিকে ঢলেও পড়ছিল—কি হোল!...হঠাৎ একি! দুটো আসন! আসন!' —বলে কয়েকজন তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দিল।

ভোজের ভরা বাড়িতে হৈ হৈ পড়ে গেল। ছাত থেকে নীচের বাড়ি, সেখান থেকে অন্দর মহল—'হায় হায়' পড়ে গেল। ...নাড়ি নেই। নাকের কাছে তুলো ধরে দেখা গেল নিশ্বাস নেই। হার্ট ফেল হয়েছে! ডাক ডাক্তার। গাড়ি ছুটিয়ে দে।

একি অভিশাপ পড়ল। একি অনর্থ। ...ব্রহ্মহত্যা! কী মতিচ্ছন্ন ঘটল!...'

সবরকম লোক থাকে পিছনের দিকে একজন টিপ্পনি করল—'হয়তো বসে খাওয়াবেন বলে কর্তাই ওপর থেকে ডেকে নিয়েছেন।'

নামানর সমস্যা। শরীরটা ভারী। প্রায় আধ মণের কাছাকাছি মাল পড়ে আরও ভারী হয়ে পড়েছে, তার ওপর এখন তো একটা লাসই। সিঁড়িও সাবেক কালের কিছু সঙ্কীর্ণ।

পেছন থেকে সেই উর্বরমস্তিষ্ক ছোকরাটি বলল—কপিকল দিয়ে সোজা নামিয়ে দিলে কেমন হয়?'

শেষ পর্যন্ত আটজন বেশ শক্ত-সমর্থ লোক দুদিকে পাঁজাপাঁজি করে ধরে নীচে এনে শামিয়ানার নীচে ফরাসের ওপর শুইয়ে দিল।

আবার চোখের পাপড়ি তুলে দেখা হোল। সেই এক ভাব। ডাক্তারকে ডাকতে গাড়ি ছোটানো হয়েছে। একজন কম্পাউণ্ডার কাছে ছিল বলল—'রক্ত চাপে হার্ট ফেল।'

ঐ গাড়ি এসে গেল। ...এসে গেছেন ডাক্তারবাবু। ...সরো সরো।'

ভবানীচরণ এগিয়ে গেলেন।

সদানন্দ উঠে বসলেন। অচৈতন্য অবস্থা থেকে উঠে চারিদিকে বিহ্বলভাবে চাওয়া, কি অসংলগ্ন প্রশ্ন—সে সব কিছুই নয়। বললেন—'সিঁড়িতে নামাটা একটু যেন কষ্টকর হোত। তাই এটুকু।'

ষষ্ঠীচরণের দিকে চেয়ে করজোড়ে বললেন—'অচ্ছা তাহলে আসি দাদা। আয়োজন অতি সুচারু হয়েছিল।'

ষষ্ঠীচরণ একেবারে হতবাক হয়ে গেছেন।

বললেন—'তাহলে গাড়ি তো এসেই গেছে। পৌঁছে দিক।'

একটু হাসলেন সদানন্দ, বললেন—'না দাদা একটু হেঁটেই যাই।...রাত্তিরে আবার কুটুম্ববাড়ির অত্যাচার আছে তো।... চলো বাবা প্রসাদ।'

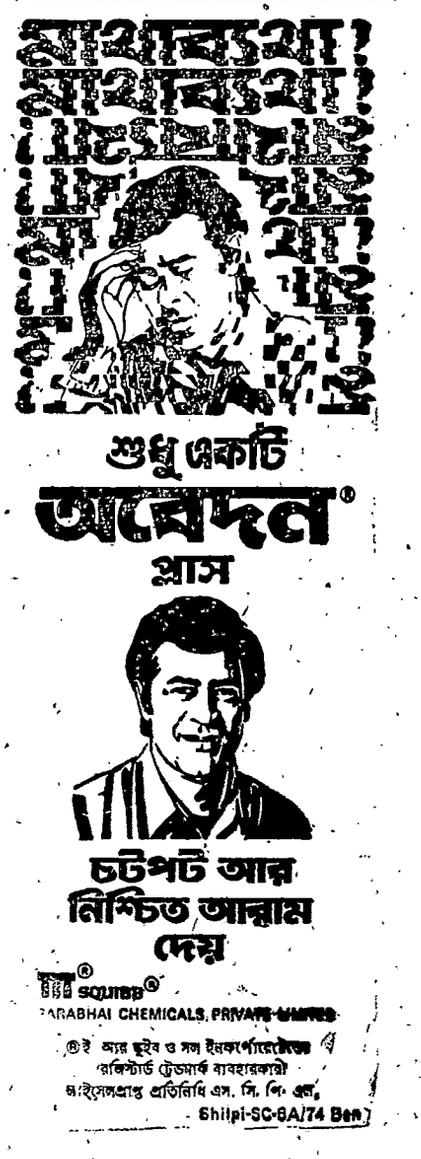

এই বাংলার খবর

বাজেট চিন্তা

পশ্চিম বাংলা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নানা মহলে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে গেছে। সরকারের সংসারের গৃহিণীপনার ভার যাঁদের হাতে সেই অর্থ দপ্তরের ভাবনা অবশ্যই কি করে আয়-ব্যয়ের হিসেব মেলানো যায়। গোটা মন্ত্রিসভার চিন্তা বাজেট অধিবেশনের গোড়ায় রাজ্যপাল যে-ভাষণ দেবেন তাতে কোন কোন বিষয় ঠাঁই পাবে। যে-বছরটা চলে যাচ্ছে সেই বছরে সরকারী কীর্তির তালিকা যেমন ঐ ভাষণে থাকে তেমনই থাকে আগামী বছরের কর্মসূচী। রাজ্যপালের ভাষণের খসড়া অনুমোদন করতে মন্ত্রিসভার পর পর দুটি বৈঠকের প্রয়োজন হলো। অবশ্য বাজেট অধিবেশনের মুখে সাধারণ মানুষের প্রধান চিন্তা, অর্থমন্ত্রী নতুন কর কতোটা চাপাবেন। কেন্দ্রীয় বাজেটের কর তো আছেই, তার ওপর রাজ্য সরকারও এ-বছর কিছু কর চাপাবেন এমন আভাস এখন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এর প্রধান কারণ, রাজ্য সরকার ১৯৭৫-৭৬ সালে যোজনা খাতে বরাদ্দ বিশ কোটি টাকা বাড়াবেন বলে ঠিক করেছেন। চলতি আর্থিক বছরে এই বরাদ্দের অঙ্ক ছিল ১৫০ কোটি টাকা। বার্ষিক যোজনার মোট বরাদ্দ বাড়াতে যোজনা কমিশন রাজী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যোজনা খাতে কেন্দ্রীয় সাহায্য বাড়াবার জন্যে রাজ্য সরকার যে-দাবী করে আসছেন তাতে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সব রাজ্যকে সাহায্য দেওয়ার জন্যে চলতি বছরে মোট যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আগামী বছরেও তাই-ই করা হবে বলে যোজনা কমিশন ঠিক করেছেন। তবে ওর মধ্যে থেকেই পশ্চিম বাংলা হয়ত বড় জোর দশ কোটি টাকা বাড়তি পেতে পারে। তবু যোজনা খাতে বাড়তি খরচের জন্যে আরো দশ কোটি টাকা লাগবে। সেই টাকাটা রাজ্য সরকারকেই যোগাড় করতে হবে আর যোগাড়ের প্রধান রাস্তা নতুন কর বসানো। চলতি বছরের বাজেটে নতুন করের পরিমাণ ছিল ২৪ কোটি টাকার মতো। আসছে বছরে নতুন করের পরিমাণ দশ কোটি টাকা হবে বলে ওয়াকেফহাল মহলের অনুমান। নতুন কর না-বসালে রাজ্যে উন্নয়নের কাজে ঢিলে দিতে হয়। কিন্তু রাজ্যের যা অর্থনৈতিক সমস্যা তাতে উন্নয়নের কাজ ঢিলে দিতে সরকার মোটেই আগ্রহী নন। তবে চলতি বছরের মতো আগামী বছরেও প্রধানত সমাজের সচ্ছল অংশের কাছ থেকেই নতুন কর আদায়ের চেষ্টা করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

এফ সি আই ধর্মঘট

দিল্লী থেকে ফিরে ফেব্রুয়ারীর দশ তারিখে ফুড কর্পোরেশন কর্মীদের ধর্মঘট মেটাবার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিজে হস্তক্ষেপ করেও সফল হতে পারেন নি। ছাঁটাই সহকর্মীদের আবার কাজ দিতে হবে, এই দাবী নিয়ে এফ সি আই কর্মীরা জানুয়ারীর শেষে ধর্মঘটে নামার পর রেশন ব্যবস্থায় গুরুতর সংকট দেখা দেয়। কর্মীদের ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময় সিদ্ধার্থবাবু ধর্মঘট মিটিয়ে নিতে বলেন।

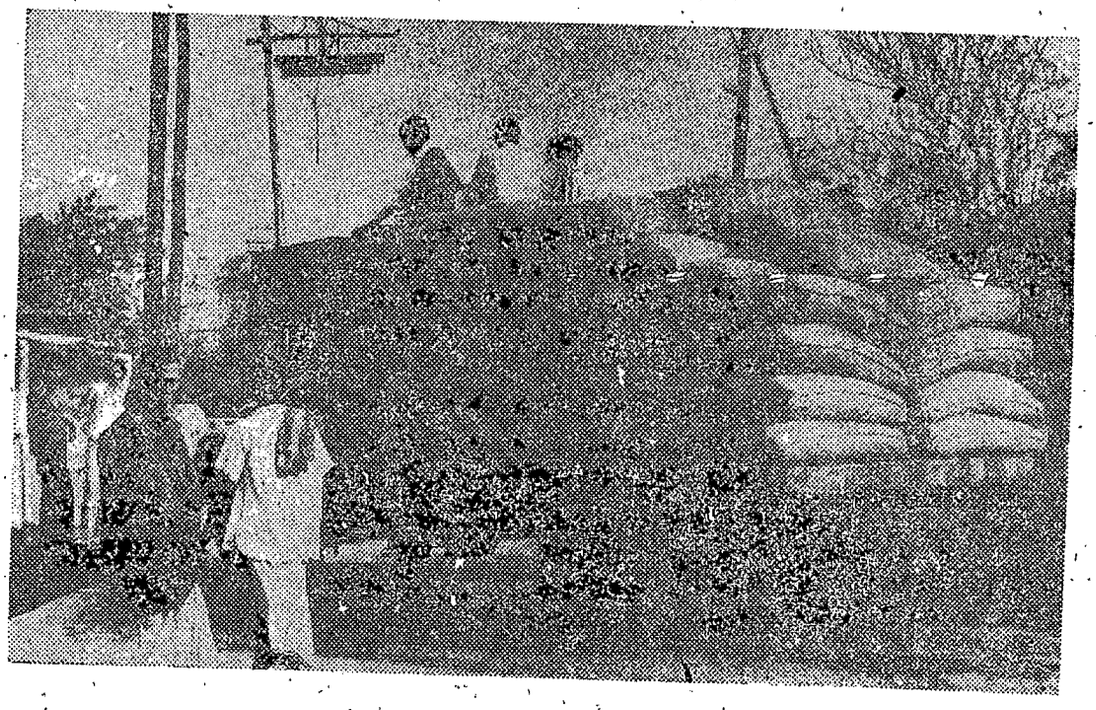

উত্তর কলকাতার রেশন সংকট নিরসনে কাশীপুরের একটি গুদাম থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

ছাঁটাই ৩৮৬ জন কর্মীর মধ্যে ৩৫০ জনকে আবার কাজ দেওয়া হবে এবং বাকী ক'জনকেও নতুন কাজের সুযোগ এলেই কাজ দেওয়া হবে, মুখ্যমন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু কর্মীদের নেতারা জানান, তাঁরা এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ধর্মঘট মিটিয়ে নিতে পারবেন না। তাঁদের হিসেবে ছাঁটাই কর্মীর সংখ্যা ৩৮৬ নয়, ৮৮৪ জন। আর এঁদের সকলকেই যে আবার কাজ দেওয়ার সুযোগ নেই তাও নয়। এই ধর্মঘটের ফলে রেশন এলাকার মানুষের অসুবিধে হচ্ছে, একথা স্বীকার করে নিয়েও নেতারা বলেন, এটা রুটির লড়াই, সুতরাং এই লড়াইয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবেন।

এফ সি আই কর্মীদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধার্থবাবু সাফ জানিয়ে দেন, কয়েক শ কর্মীর জন্যে লাখ লাখ মানুষ কষ্টভোগ করবে এটা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। একটি কংগ্রেসী ইউনিয়নের ডাকেই এই ধর্মঘট হচ্ছে, একথা শুনে প্রধানমন্ত্রীও খুব চটে গেছেন। ধর্মঘট মীমাংসায় মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এফ সি কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটী কর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন। রাজ্য সরকার এ-ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রথমে কর্মীদের ২৬ জন নেতাকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে বলা হয়, অন্যথায় তাঁদের ছাঁটাই করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। পর দিন ছজন কর্মীকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়। তার পর স্থির হয়, ধর্মঘটীদের মধ্যে ৫০০ জনকে সাজা দেওয়া হবে। যে ২৬ জনকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছিল, তাঁরা কেউই ঐ সময়ের মধ্যে কাজে যোগ দেন নি। তাই তাঁরা কাজ ছেড়ে দিয়েছেন বলে ধরে নিয়ে তাঁদের জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হবে বলে এফ সি আই কর্তৃপক্ষ স্থির করেন।

একটুকু বাসা

এই বাংলার, বিশেষ করে বৃহত্তর কলকাতার মানুষকে মাথা গোঁজার ঠাঁই যোগাবার জন্যে রাজ্য সরকার বেশ বড় রকমের পরিকল্পনা তৈরী করেছেন বলে গৃহ নির্মাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রামকৃষ্ণ সারোগীর কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে। এত দিন রাজ্য সরকার প্রধানত মাঝারী আয় এবং কম আয়ের লোকের জন্যে ফ্ল্যাট তৈরী করেছেন বা করার কথা ভেবেছেন। কিন্তু এখন ওপরতলার লোকের জন্যেও বাসা তৈরীর কথা ভাবছেন। কারণ বেশী দামের ফ্ল্যাট কেনার মতো লোকের অভাব নেই। সৌখিন এলাকায় চড়া দামের ফ্ল্যাট বেচতে পারলে বেশ কিছু লাভ করা যাবে বলে গৃহ নির্মাণ বোর্ড আশা করছেন। সেই লাভের টাকায় মাঝারী আর কম আয়ের লোককে ফ্ল্যাট কেনার জন্যে কিছুটা ভরতুকি দেওয়া যাবে।

সৌখিন এলাকা বলতে এখন দক্ষিণ কলকাতার সানি পার্ক এবং মিন্টো পার্কে বড় বড় বাড়ী তৈরীর কথা ভাবা হচ্ছে। সানি পার্কে ১৮০ এবং মিন্টো পার্কে শ' দেড়েক ফ্ল্যাট তৈরী হবে, মোট খরচ পড়বে সাড়ে তিন কোটি টাকার মতো। অবশ্য সরকার মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষের কথাও মনে রেখেছেন। সল্ট লেকে এবং টালিগঞ্জের গলফ কোর্সে যে-সব ফ্ল্যাট তৈরী হবে তা প্রধানত তাঁদেরই জন্যে। প্রথমোক্ত এলাকায় বিভিন্ন পর্যায়ে তৈরী হবে চার হাজার ফ্ল্যাট এবং দ্বিতীয়োক্ত এলাকায় ১৮০০ ফ্ল্যাট। মোট খরচের পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তার মধ্যে হাউসিং এণ্ড আর্বান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন সাড়ে চার কোটি টাকা দিতে পারে। গ্রামের গৃহহীনদের মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরীর জন্যে রাজ্য সরকার একটি গ্রামীণ গৃহনির্মাণ পর্ষদ গঠন করতে পারেন। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা পৌনে তিন লাখের কিছু বেশী।

বিষ্ণুর প্রত্যাবর্তন

ঠিক দশ বছর এক মাস আগে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভবন থেকে যে বিষ্ণু মূর্তিটি চুরি গিয়েছিল সেটি আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো ফেব্রুয়ারীর ১২ তারিখে। প্রতিষ্ঠিত করলেন রাজ্যপাল ডায়াস। মূর্তিটি পুনঃস্থাপনের পর রাজ্যপাল বিষ্ণু মূর্তির পায়ে চন্দন মাখিয়ে দেন, গলায় দেন মালা। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীর ১৪ তারিখে পৌষ সংক্রান্তির দিনে মূর্তিটি চুরি যায়। চুরি যাওয়ার পর স্বভাবতই খুব হৈ-চৈ পড়ে যায়, কারণ দু ফুট উঁচু ব্রঞ্জের এই মূর্তিটি অমূল্য পুরাকীর্তি বলে গণ্য। কিন্তু অনেক খোঁজ-খবর করা সত্ত্বেও পাঁচ-পাঁচ বছর এটির কোনো সন্ধান মেলে নি। ১৯৭০ সালে কেউ বা কারা মূর্তিটি বিক্রী করে আমেরিকার বস্টন মিউজিয়ামকে। ৫০ হাজার ডলার দিয়ে মূর্তিটি কিনে নেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। কিন্তু যখন তাঁরা জানতে পারেন যে মূর্তিটি চুরি করা হয়েছে তখন তাঁরা এটি ফিরিয়ে দিতে সানন্দে সম্মত হন। যারা মূর্তিটি বস্টন মিউজিয়ামকে বিক্রী করেছিল তারা অবশ্য মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে ঐ ৫০ হাজার ডলার ফিরিয়ে দিয়েছে।

রাজ্যপাল ডায়াস বস্টন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, এই ধরনের অমূল্য পুরাকীর্তি নিয়ে যে আন্তর্জাতিক কারবার চলছে তা বন্ধ করার জন্যে কড়া আইন দরকার। অবশ্য শুধু আইন করেই এই কারবার বন্ধ করা যাবে না, এর জন্যে জনসাধারণের সজাগ পাহারাও প্রয়োজন। এই ধরনের অমূল্য সম্পদ ঠিক মতো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বিভিন্ন মিউজিয়াম ও প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

হাসপাতালের শয্যা

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা গত তিন বছরে পাঁচ হাজার বেড়েছে। এ-খবর দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা। তাঁর হিসেব অনুযায়ী ১৯৭১ সালের শেষে এই রাজ্যে হাসপাতাল-শয্যার সংখ্যা ছিল ৩৮ হাজার। তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের শেষে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩ হাজার। এর ফলে এই রাজ্যে প্রতি হাজার মানুষ পিছু হাসপাতাল-শয্যার সংখ্যা একের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভোর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জনসংখ্যার হাজার-করা একটি শয্যা থাকা দরকার। ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত হিসেব নিলে দেখা যায়, গোটা দেশে এই সংখ্যা গড়পড়তা প্রতি হাজারে আধখানি। অর্থাৎ হাসপাতাল-শয্যা সংখ্যার বিচারে পশ্চিম বাংলার অবস্থা দেশের গড়পড়তা অবস্থার চেয়ে ভালো। আর হাজার তিনেক শয্যা হলেই এই রাজ্যে হাজারকরা হার পুরোপুরি এক দাঁড়াবে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

১৭।২।৭৫ —দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

গফুর থাকলেন, নায়ক গেলেন

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী গফুর সম্প্রতি বলেছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আমার বিরোধীরা আমাকে এক দিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয়নি।' 'বিরোধীরা' বলতে গফুর অবশ্যই বুঝেছেন তাঁর নিজের দলের সেই সদস্যদের যাঁরা গফুরকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করে আসছেন। প্রকৃতপক্ষে, দিল্লির নির্দেশে গফুরকে বিহার বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের নেতার আসনে বসাবার পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্য থেকে অধিকতর উপযুক্ত কোন নেতাকে যতক্ষণ বাছাই করা না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই গফুরকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে বসান হচ্ছে। অতএব, এটা কিছু নতুন কথা নয় যে, গফুর মন্ত্রিসভার 'এই-যায়-সেই-যায়' অনিশ্চিত অবস্থাটা প্রায় সূচনা থেকেই চলছিল।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বসন্ত রাও নায়কের নেতৃত্বের পরমায়ু ফুরিয়ে আসার কথাটাও গত নির্বাচনের পর থেকে মধ্যে মধ্যেই শোনা যাচ্ছিল। তার কারণ, পুরান একটা বোঝাপড়া অনুসারে এবার বিদর্ভের প্রতিনিধি নায়কের জায়গায় মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলের কোন প্রতিনিধির মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার কথা।

কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে প্রবীণতম বসন্তরাও নায়কের এক যুগের নেতৃত্বের অবসানের সময় সত্য সত্যই এসে গেল, কিন্তু অন্যদিকে গফুরের অনিশ্চিয়তা রয়েই গেল।

বলা হয়েছে যে, গফুরকে এখন সরান 'রাজনৈতিক দিক থেকে সঙ্গত হবে না।' অথচ, ইতিমধ্যে বিহারে কংগ্রেস লেজিসলেচার পার্টির ভিতরে গফুরের বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে কংগ্রেস হাই-কম্যান্ডের ভ্রূকুটি ও তিরস্কার সত্ত্বেও সেই বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পরিবর্তনকামীরা যে সভা করে গফুরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং সেকথা যে তাঁরা রাজ্যপালকে জানিয়ে এসেছেন, পাটনা বিমান বন্দরে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁদের মুখপাত্ররা যে কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়ার সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, এই সব কারণে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী নয়াদিল্লীর বিরাগভাজন হয়েছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বিধানসভার বাজেট অধিবেশন বয়কট করার যে হুমকি দিয়েছিলেন তাঁদের সেই হুমকি প্রত্যাহার করে নিতেও বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু গফুর-বিরোধীরা জানিয়েছেন, বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের সভায় গফুরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করার জন্য তাঁদের সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা ক্ষান্ত হবেন না। তাঁরা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 'প্রেরণাদায়ক নেতৃত্বের' প্রতি তাঁদের আস্থা অটুট আছে।'

মহারাষ্ট্রে নেতা বদলের পালাটা অবশ্য বিহারের তুলনায় অনেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। সেখানে শ্রীনায়ক তাঁর দলের পরিবর্তনকামীদের ও কংগ্রেস হাই-কম্যান্ডের ইচ্ছা অনুসারে নিজেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে আসছেন এবং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য শঙ্কররাও ভাওরাও চ্যবনের নাম প্রস্তাব করছেন। শঙ্কররাও মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলের মানুষ এবং পরিবর্তনকামীরা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর নামই প্রস্তাব করেছেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা কিন্তু মনে করছেন, মহারাষ্ট্রে নতুন নির্বাচনের এই পর্ব যতটা নির্বিবাদে সম্পন্ন হয়েছে বলে উপরে-উপরে দেখান হচ্ছে, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ততটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়নি। বসন্তরাও নায়ককে অপসারণ করার জন্য যদিও মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলের দাবির দোহাই দেওয়া হচ্ছে তাহলেও আসল কারণ নাকি হল এই যে, নায়ক সম্প্রতি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করে নয়াদিল্লির বিরাগভাজন হয়েছেন। গত মাসে মহারাষ্ট্রের বোরদিতে যে নারোয়া-

---

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরনের শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে নায়ক মন্তব্য করেছিলেন যে, একটা পৌরসভার যতটুকু স্বাধীনতা থাকে মহারাষ্ট্র সরকারকে ততটুকু স্বাধীনতাও এখন কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি, সরকার কর্তৃক এক-চেটিয়াভাবে তুলা কেনা ইত্যাদি মহারাষ্ট্র সরকারের যেসব পরিকল্পনা কেন্দ্র নামঞ্জুর করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নায়ক সেগুলির উল্লেখ করেন। এতেই তিনি ক্ষান্ত হননি। একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং মহারাষ্ট্র থেকে নির্বাচিত এম-পি-দের কাছে ঐসব অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছেন। মহারাষ্ট্রের পরিবর্তনকামীরা নায়কের এই কেন্দ্র-বিরোধী মন্তব্যগুলি দিল্লির গোচরে এনে তাঁকে সরাবার সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

*

শোনা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রে যাঁরা নায়ককে সরিয়ে চ্যবনকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসাতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা নায়ককে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, রাজ্যের রাজনীতি থেকেও তাঁকে দূরে রাখতে চাইছেন। অসুবিধাজনক রাজনীতিককে তফাতে রাখার পরিচিত ফরমুলা এই উদ্দেশ্যে বসন্তরাও নায়কের উপর প্রয়োগ করার কথা শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ তাঁকে রাজ্যপাল করে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশে রাজ্যপালের পদটি খালি হচ্ছে, ঐ পদে নায়ককে বসান হতে পারে।

এর আগে গুজরাটের রাজ্যপালের উপদেষ্টা, অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস অফিসার এইচ সি সরিনকে বিহারের রাজ্যপাল করে ঐ রাজ্যের বর্তমান রাজ্যপাল আর ডি ভাণ্ডারেকে অন্ধ্রের রাজ্যপাল করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার পথে তিনটি বাধা দেখা দিচ্ছে। প্রথমত অন্ধ্রের কংগ্রেস সরকার ভাণ্ডারেকে রাজ্যপাল হিসাবে গ্রহণ করতে বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে ভাণ্ডারে বিহার মন্ত্রিসভার যে প্রকাশ্য সমালোচনা করেছিলেন তার কথা মনে রেখেই অন্ধ্র সরকার ভাণ্ডারে সম্পর্কে কিছুটা শঙ্কিত। দ্বিতীয়ত, বিহারে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানের জায়গা করে দেওয়া হবে, এটা শ্রীভাণ্ডারের মনঃপূত নয়। তৃতীয়তঃ তাঁর পূর্বসূরী দেবকান্ত বড়ুয়ার মত আর ডি ভাণ্ডারেও রাজ্যপালের পদ ছেড়ে দিয়ে আবার সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে চাইছেন।

জামা মসজিদে হাঙ্গামা

জামা মসজিদ সংক্রান্ত যে বিরোধ নিয়ে দিল্লিতে এক পক্ষ কালের মধ্যে দুবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেল এবং মোট ১৩ জন মারা গেলেন সেই বিরোধের মূলে রয়েছে মসজিদ-এর উপর সরকারি কর্তৃত্বের প্রশ্নটি। অশীতিপর বৃদ্ধ সৈয়দ হামিদ বুখারির স্থলে তাঁর পুত্র সৈয়দ আবদুল্লা বুখারিকে অননুমোদিতভাবে মসজিদের ইমাম হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে, দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের মারফৎ কেন্দ্রীয় সরকার এই অভিযোগ সম্ভবত তুলতেনই না যদি না ইতিমধ্যে সৈয়দ আবদুল্লা বুখারি মসজিদে প্রার্থনা-সভায় নিয়মিতভাবে সরকার-বিরোধী প্রচার চালিয়ে সরকারকে বিব্রত করতেন। মোগল সম্রাট সাজাহান যেদিন বোখারা থেকে একজন মৌলানাকে আনিয়ে জামা মসজিদের ইমামের গদীতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তিনশ বছর ধরে একাদিক্রমে বাবার পর ছেলেই এই মসজিদের ইমামতি করে এসেছেন। এটাই যদি ইতিহাসের নজির হয়ে থাকে তাহলে ইমামের নিয়োগকর্তা হিসাবে দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের অনুমতি এক্ষেত্রে আগে থাকতে নেওয়া হয়নি, শুধু এইটুকু, কারণেই বংশানুক্রমিক ইমামতির অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করা কঠিন। কেন্দ্রীয় সরকার এখন সরাসরি এই অধি-

কার অস্বীকার না করে বলছেন, মসজিদের শাহী ইমাম কার্যরত ইমাম সৈয়দ হামিদ বুখারি বেঁচে থাকতে আর কেউ ঐ পদে বসতে পারেন না।

ওয়াকফ বোর্ডের আরও অভিযোগ এই যে, মসজিদের ইমাম হিসাবে সৈয়দ আবদুল্লা বুখারি দোকানঘর ভাড়া দিয়ে, নজরানা আদায় করে ও অন্যান্য ফি ধার্য করে যেসব আয় করছেন সেটা নিয়মানুযায়ী বোর্ডে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করছেন। আবদুল্লার পক্ষের বক্তব্য হল, বোর্ড মসজিদ মেরামত করার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন এভাবে ওয়াকফ বোর্ডের মারফৎ মসজিদের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইছেন তখন আবদুল্লার অনুরাগীরা চাইছেন, এই মসজিদ পরিচালনার ভার সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত একটি সম্পূর্ণ বেসরকারি কমিটির উপর দেওয়া হোক।

প্রশ্নটি নিয়ে প্রথমে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করার পর কেন্দ্রীয় সরকার এখন সম্ভবত বুঝতে পারছেন যে, দেশের ভিতরে ও বাইরে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। জামা মসজিদ ভারতে মুসলমানদের বৃহত্তম উপাসনাস্থল। সারা মুসলিম দুনিয়ার এটি সুপরিচিত। এখানে মুসলমানদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতায় সরকারি হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হতে দেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক।

সম্ভবত এই সব কারণেই ভারত সরকার এখন এ-বিষয়ে কিছুটা নরম মনোভাব অবলম্বন করেছেন। তাঁরা এই বিরোধের মীমাংসা করার জন্য শেখ আবদুল্লাকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ করেছেন। শেখ তাঁদের এই অনুরোধ মেনে নিয়েছেন।

বৃটিশ রাজনীতিতে নয়া ইতিহাস

৪৯ বছর বয়স্কা গৃহকর্ত্রী ও যমজ পুত্রকন্যার জননী মার্গারেট হিল্ডা থ্যাচার বৃটিশ কনজারভেটিভ পার্টির নেত্রী নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। কারণ, তিনিই প্রথম মহিলা যিনি ইউরোপের কোন বড় রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব লাভ করলেন। তাঁর এই নির্বাচনের অর্থ হল, পরবর্তী নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সমর্থ হয় তাহলে এই প্রথম বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন নারী।

শ্রীমতী থ্যাচার যদিও ইদানীং কমন্সসভায় তাঁর দলের মুখপাত্র হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং নির্বাচনে পরাজিত কনজারভেটিভ পার্টির মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিলেন তাহলেও পুরুষ-প্রধান রক্ষণশীল রাজনীতিতে তিনি এত অকস্মাৎ একেবারে সামনের সারিতে এসে যাবেন, এটা অনুমান করা যায়নি। শ্রীমতী থ্যাচার নিজে কিছুদিন আগে বলেছিলেন, বৃটিশ রাজনীতিতে কোন নারী দলের নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটা আমার জীবৎকালে হবে না।

কিন্তু কোন কোন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের ধারণা, শ্রীমতী থ্যাচার নেত্রী হওয়ায় কনজারভেটিভ পার্টির নির্বাচনী সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়ে গেল। 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা লিখেছেন, 'শ্রীমতী থ্যাচারের নির্বাচন আগামী ২৫ বছরের জন্য শ্রমিক দলের শাসনকে সুনিশ্চিত করল।'

উত্তর লন্ডনের একটি নির্বাচনকেন্দ্র থেকে নির্বাচিতা শ্রীমতী থ্যাচার একজন শৌখীন মহিলা হিসাবে পরিচিত। তাঁর স্বামী একজন কোম্পানি ডিরেক্টর।

—পুণ্ডরীক

।। সংশোধন ।।

রান্না করে দেখুন

অমৃতর ৪০তম সংখ্যায় ৩৯ পৃষ্ঠায় 'কমলালেবুর স্যালাড'-এর স্থলে 'কমলালেবুর পায়েস' পড়তে হবে এবং ৪১তম সংখ্যায় ৩৭ পৃষ্ঠায় 'কিমা ম্যাকারনি'-র স্থলে 'ধনিসাগ মীট' পড়তে হবে।

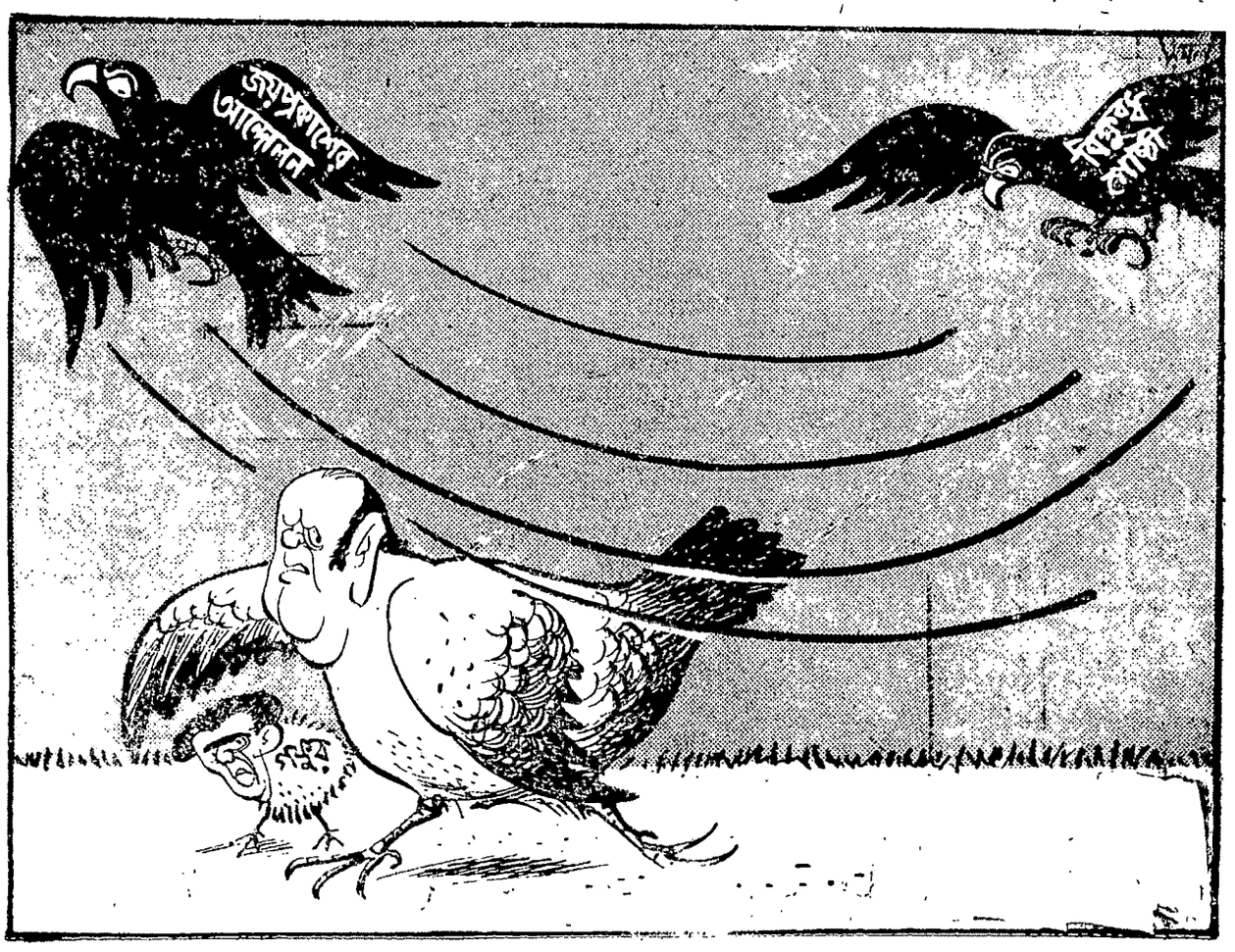

ফাদার তিরেন রোজা নামচা

এমন এক মহিলাকে আমি চিনি, মাজারীবুড়ো দেবীর কাছে অহোরাত্র যিনি প্রার্থনা করেন পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায়। তাতে বিচিত্র কি? বিচিত্র এই যে নামরক্ষণ, বার্ধক্যাবলম্বন, মুখাগ্নিদাহন প্রভৃতি কথা তিনি তত ভাবেন না যতটা ভাবেন প্রতিশোধের কথা ঃ স্থির করেছেন, পতিদেবতার জন্মদাত্রীর উপর তিনি বদলা নেবেন আপন বৌমাকে জ্বালিয়ে।

শামিম আরা মেয়েটি এমনতর নয়। কেউ এখনও জানে না, কেউ এখনও টের পায় নি, তবে ডাক্তার নিঃসন্দেহ (আর ধাত্রীও সুনিশ্চিত) ঃ শামিম আরা অন্তঃসত্ত্বা। খোদাতালার কাছে সে প্রার্থনা করে—আর আম্মাকে প্রার্থনা করতে বলে—সে যেন সুসময়ে কর্তা হাসানের কোলে তুলে দিতে পারে এক কন্যাকে: না, পুত্রের প্রতি তার অনীহা নেই ঃ বরাবর সে বলে এসেছে, ইনশা-আল্লাহ (অর্থাৎ কিনা ঈশ্বরের প্রসাদে) উত্তরাধিকারিণীটি একটু বড় হলে পুংলিঙ্গের এক খেলার সাথীর সাহচর্য লাভ করবে।

শামিম আরাও আসলে প্রতিশোধ চায়; অদ্ভুত ধরনের এক পরিশোধ। আপন আম্মার কাছে মেয়ে বলে কস্মিনকালেও সে যে-আদর পায় নি, নিজ কন্যাকে সেবা করেই সে সুদসমেত তার ক্ষতিপূরণ করবে।

সে অনেক দিনের কথা। শামিম আরা তখন হয় নি। ওর আব্বা মহম্মদ নূর বখশ, সফর মাসের এক সকালে, পিতামাতা, শ্বশুর সাহেব, মাদ্রাসার ওস্তাদ ও ঢেরার পীরের পদচুম্বন সহকারে, গর্ভবতী বালিকা বধূ ইসরাত জাহানকে পূর্বাঞ্চলের পৈতৃক ভিটেয় রেখে, অবিভক্ত বঙ্গের মহানগরীর অভিমুখে পা বাড়িয়েছিল। আশ্রয় নিলেন মোমিনপুরে, সহৃদয় এক বৃদ্ধার গৃহে, যাঁর প্রতিপালন উৎসাহ দান ও সৎ পরামর্শে বখশ মিয়া অল্প সময়েই ফেঁদে বসলেন এক অর্থকরী বোলবোলাও লোহার কারবার।

ইতিমধ্যে সংবাদ এল, পূর্বাঞ্চলের ঐ পৈতৃক ভিটেতে নারীসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি সাধন করতে এসেছে বেহেস্ত-ত্যাগিনী এক একরত্তি হুরী। কন্যা লাভে বখশ মিয়া খুশী হতে পারলেন কিনা, আজও তিনি বোঝেন না...। প্রতিটি বছরে, শাওয়াল ও জিলহজ্ মাসে—ইদুল ফিতর ও বকর-ইদের উপলক্ষে—মোটা টাকা আর হরেক রকম উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশে গিয়ে স্বামীসুলভ জনকোচিত কর্তব্য পালন করতেন। প্রতিটি বছর যথাসময়ে খবর আসত —বেহেস্ত-ত্যাগিনী নবাগন্তুকার আগমনের শুভসংবাদ। হাঁফ ছেড়ে বখশ মিয়া ইসরাত জাহানের উপহারগুলির নাম লিখতেন হালখাতার শেষ পৃষ্ঠায়, সুন্দর আরবী অক্ষরে ঃ হোসনে-আরা, রোশনেআরা নাজমে-আরা, শামসে-আরা...লিখতে লিখতে ভাবতেন, নিদান দিনে যেদিন আল্লাতালার ডাক আসবে, কার হাতে বলুন তিনি দিয়ে যাবেন তাঁর আদরের এই ফলাও কারবার?

সহৃদয়া বৃদ্ধার ছিল এক নাতনী—শুভ্রবর্ণা, গজল-জ্ঞা, গৃহকর্মে সুনিপুণা ত্রয়োদশী রোকসানা। উর্দু স্কুলে পড়ত সে, বাংলা অক্ষর জানত না ঃ শিখতে আসত মহম্মদ নূর চাচার কাছে, এশা নমাজের পরে; পরিবেশন করত—প্রণামীস্বরূপ স্বহস্তে রন্ধিত সুস্বাদু সিমাই-জর্দা।

সহৃদয়া বৃদ্ধার ষড়যন্ত্রটা বখশ মিয়া প্রথম বুঝলেন না; যেদিন বুঝলেন, সেদিন তিনি বুড়ীর পাতা ফাঁদে সানন্দে পা দিলেন, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে দৌড়োলেন প্রসিদ্ধ এক ফকিরের আস্তানায়, পকেট উজাড় করে কিনলেন অব্যর্থ এক তাবিজ যার নাকি 'সুপ্রমাণিত ও বিজ্ঞানসম্মত' প্রভাবের ফলে যাবতীয় মুমিনের দ্বিতীয় পক্ষের বিবির গর্ভাশয়ে জন্মায় দিগ্বিজয়ী পুত্র সন্তান।

রোকসানার নানার আপত্তি ছিল খুব, ওঁর নিজেরই এক ভাগনের ছেলের সঙ্গে নাতনীর সাদিটা তিনি এক রকম ঠিক করে-ছিলেন। বখশ মিয়ার আব্বা হাজী আবদুল হবিব সিদ্দিকীরও মত ছিল না ঃ ভুক্তভোগী তিনি, একাধিক পরিণয়ের সুবিধা বোঝেন (বড় বিবি পা টিপতেই ছোট বিবি পাখা ধরবে...), তবে কিনা ঢাকা জেলায় আচ্ছা আচ্ছা লড়কী থাকতে বিদেশিনীর প্রয়োজন কৈ?...সুধী পাঠক জানতে পারেন, ঢাকাইয়া-দের কাছে শুধু 'কালকেশিয়ান' কেন, চাট-গেঁয়েরাও ভিনদেশী।

সাদি অবশ্য হল...এল রমজান, উঁকি মারল শাওয়ালের নয়া চাঁদ, চললেন মহম্মদ নূর—গর্ভিণী রোকসানাকে মুমিনপুরের নানীর সেবায় রেখে—পরলা বিবির অভি-সারে।

আর ফিরলেন না...আটক থাকলেন পূর্বাঞ্চলের পৈতৃক ভিটেয়, পিতৃদেবের সদাসতর্ক প্রহরাধীনে। আর তখনই ঝলকের মতো বুঝল রোকসানা—পরম অলক্ষুণে স্বপ্নেও এতদিন সে যা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারত না—তার সোহাগের সোয়ামীর পূর্বাঞ্চলের পৈতৃক ভিটেয় তার এক গ্রাম্য সতীন আছে। পরিত্যক্তা শহরিয়া সহপত্নী জানল না, জীবনে জানবে না, স্বর্গপ্রাপ্তা নানী (আল্লাতালা ওঁর অশরীরী আত্মার উপর তাঁর অসীম বরকত বর্ষণ করুন) নিজেই প্রতারিত হয়েছিলেন, নাকি সুপ্রতিষ্ঠিত জামাতৃ লাভের আকাঙ্ক্ষায় নাতনীকে ঠকিয়েছিলেন।

মহরমের প্রথম দিনের ভোরে, ফজর-নমাজের আজানের প্রতিধ্বনিতে, অতীব শুভ লক্ষণে (চন্দ্রবর্ষের ঐ প্রথম মাসটা হজরত ইব্রাহিম তথা হজরত ঈসার পুণ্য জন্মের দ্বারা চিহ্নিত) আবির্ভূত হল বখশ মিয়ার পুংলিঙ্গের প্রথম বংশধর—খুররম

মহিউদ্দিন বাবর, ওরফে খোকন। সঙ্গে সঙ্গেই ফিরল বিরহিণীর বরাতের মোড়—আর ফিরলেন খোদ মহম্মদ নূর, অমাবস্যার ঘোরে আত্মগোপন করে পালিয়ে। দু মাস পরে ভূমিষ্ঠ হল ইসরাত জাহানের পঞ্চম কন্যা। হালখাতায় ওর নাম উঠল না।

সেই বছরের দুটি ঈদ বখশ মিয়া মোমিনপুরেই পালন করলেন। পরের বছরও। পরের পরের বছরও। ইতিমধ্যে পয়দা হয়েছে মহিউদ্দিনের ছোট ভাই : জহিরুদ্দিন বাবর, ওরফে তাপু। রোকসানা এবার সুয়োরানি পদে অভিষিক্তা : যতদিন যায়, ততদিন বাড়ে সোয়ামীর সোহাগ, জহরের সংখ্যা, দেমাকের দৌড়...ভয় আর কিসের? সে কি পীরের হুকুম মাফিক এক হাজার আড়াই শটি বার আল্লাহ নামটা ছোট কাগজে লিখে কাগজগুলো ময়দার গুলির ভিতর পুরে লেক-এর কাৎলাদের খাওয়ায় নি?...মহিষী আজ জানে, তার পেটে আরও বেটা আছে—অনেক বেটা, শুধুই বেটা।

ততঃ প্রবিশতি শামিম আরা। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে নি রোকসানা; হাসপাতালের যত নার্সকে বাপান্ত করে ঘোষণা করল, ছুঁড়ীরা মোটা ঘুষ খেয়ে কোন এক সদ্যপ্রসবা মাড়োয়ারিনীর বেটীকে তার কোলে বসিয়ে দিয়েছে, নিজের কলিজার টুকরোয় দুঃসাহসী বিনিময়ে। এদিকে (ইয়া হামিদু!) শিশুটি, বখশ মিয়ার অভিমতে জনয়িতার অবিকল প্রতিচ্ছবি : সেই অল্প কেশ, চেপটা নাক, চওড়া চোয়াল...। হার মানল রোকসানা—অর্ধ হার : মুখে মানল 'ওনার বেটী', মনে মানল 'মোর বেটী নয়'।

মানসিক আঘাতে হোক আর অন্য কারণে হোক, রোকসানার পয়োধরে এবার পয়োদগম হল না : বোতলের পাতলা দুধ, বাপের সলজ্জ আদর আর জননীর অবিরত তিরস্কার খেয়েই বড় হতে লাগল শামিম আরা। মধ্যাহ্ন ভোজে ভাইসাহেবদের পাতে দুটো করে মাছ পড়ত মেয়েটির থালায় পড়ত একটি—সব থেকে ক্ষুদ্র টুকরোটি। সন্ধ্যা ভোজে একেক ভাইজান পেত একেক পো দুধ, মেয়েটি পেত তার গন্ধ।

একদিন রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিকূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে, পাকিস্তানি বখশ মিয়া ভারতীয় সম্পত্তি বিক্রয়ান্তে, সদলবলে ফিরলেন দেশে। সংসার পাতলেন শহরে, উগ্রচণ্ডী সুয়োরানির সাহচর্যে...। আশ্রয় নিতেন প্রতি শনি-রোববার বড়বিবির ওখানে—মুক্ত হাওয়া সেবন করতে আর বেতো পা মালিশ করতে। ফলত, অনতিবিলম্বে, পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে বিবিতে বিবিতে বাধল তুলকালাম। ঝগড়াটা অবশ্য অনেকটা একতরফা : ইসরাত জাহান যেন উদাসীন—সুয়োরানির শয়নকক্ষে অপচিত পতিপ্রণয়ের উচ্ছিষ্ট-ভুঞ্জনে সন্তুষ্ট।

রোকসানার পরম অভিযোগ : তার আত্মজা শামিম আরা (ছুঁড়ীটির আস্পর্ধা দেখুন!) ওর বড়মাকে আম্মা বলে সম্বোধন করে আপন জননীকে—আপন জননীর মাতৃত্বকে—অপমান করছে। শামিম আরা এখন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী; পুত্রদ্বয়ের প্রতি মুক্তহস্তা রোকসানা মেয়েটির হাত খরচের পিছনে এক কানাকড়িও ব্যয় করবেন না দেখে মহম্মদ নূর মাস-কাবারে হিসেব মিলিয়ে সুয়োরানিকে বোঝাবার আগে কিছু টাকা লুকিয়ে চুরিয়ে মেয়ের হাতে গুঁজে দেন...। রোকসানার আবার কড়া হুকুম : মিত্রবৈরী-নির্বিশেষে কারও গৃহে অনুষ্ঠিত পার্টিতে মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া চলবে না; পার্টির দিনে ভাই মহম্মদ নূর রুদ্ধকণ্ঠ ষোড়শীকে কোলে তুলে সান্ত্বনা দেন আর লাইন ক্লীয়ার বুঝে ষড়যন্ত্রের সুরে মেয়ের কানে ফিসফিস করে বলেন, চাইনিজ খাবি? আয়...আগমনে।

শামিম আরা হঠাৎ থামল—আত্মজীবনীর খেই হারিয়ে — শ্বশ্রূ ও শ্বশ্রূপুত্রীত্রয়ের

মেজো ননদ বলল, জানেন, ফাদার আমাদের আম্মার অমার্জনীয় পক্ষপাত। বাড়ির যত কাজ আমাদের তিনজনকে দিয়েই তিনি করাবেন, ভাবীজিকে কিছুই করতে দেবেন না...'

বৌমাকে আলিঙ্গন করে ওর লজ্জিত রক্তাভ গণ্ডে ছোট্ট এক চুমু এঁকে (আপন জননীর কাছে বৌমার বা অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা) শাশুড়ী বললেন, 'আমার তিনটি মেয়ে আছে, আর একটিমাত্র বৌমা : পক্ষপাত করবই।'

(ক্রমশঃ)

কবিতা

সূর্য দেখলে চোখ ধাঁধাবে ॥

বটকৃষ্ণ দে

সূর্য দেখলে চোখ ধাঁধাবে
জানাই কথা।
কাছে গেলে হয়তো কেন
পুড়বে-ও বা।
তাই ব'লে কী আলোয় ফেরা
ভোর দিগন্ত বরণ—
অকারণের বারণ
হ'তে পারে চিরকালের মন, বলো তো মন!

পাথর চাপা দিলে-ও ঘাস
পাশ কাটিয়ে বাঁচে
ঝড় আসবে জেনেও বট
আকাশ মুখী হয়
সংঘর্ষের প্রবল অভিলাষে।

তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করতে পার
তাই বলে কী
তোমার মেকী
অভিমানের ভয়ে
সন্নিবিষ্ট আলিঙ্গনের ঘনিষ্ঠতা থেকে
পালিয়ে যাব সুদূর ধূধূ-র অদৃশ্যময়ে?

সূর্য দেখলে চোখ ধাঁধাবে
সে তো জানাই থাকে—
তাই বলে কী অন্ধকারের বন্ধ দ্বারে বন্দী বিহঙ্গ-কে
চিরটা কাল মাথা কুটতেই হবে?

কথা দিয়েছিলাম আসবো ॥

হরিপদ দে

বাঁক ঘুরে বাঁক ঘুরে ক্লান্তি নামে দেহে
সূর্য কিরণ যেমন খসে পড়া ফুলে
মাঠ পেরিয়ে নদী পেরিয়ে শহরের
সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে
এখনো ঠিকানা ধূসর—

কোলাহল ক্ষীণতর যেন নির্বাসিতের কান্না
দূরতর দ্বীপে
পরবী শান্ত সৌম্য আবেগে ঝরে পড়ে
সন্ন্যাসী-সূর্যের পদপ্রান্তে নম্র নৈবেদ্যের মতো।
শেষ সংকেত নিয়ে দাঁড়ায় ভেলা—
পাড়ি দিতে হবে অজানায়
কথা দিয়েছিলাম তোমাকে
দিন শেষ হলে আবার আসবো।

ছুটির ঘণ্টা পড়ে ফুলের ভিড়ে কথার জলসায়
আর বসন্তবাহারে।
সঞ্চয়ের পথে পথে কেটে যায় বেলা
বুকের ভিতরে দরবাড়ী কানাড়া
কথা দিয়েছিলাম তোমাকে
দিন শেষে আবার আসবো।

এই শক্তিতে জাগে ॥ শান্তিকুমার ঘোষ

লাফিয়ে ছুটছে ঘোড়া
—গুহার দেয়ালে খোদাই-করা এই পশ্চাদভূমি
রেখে মোটর-বাইকে চড়লো যুবা,
পিছনে আঁকড়ে ধ'রে বসেছে তার সোহিনী;
বাইক গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এতকালের
বন্দী শিলাপাথর ছাড়া পেয়ে যোগ দেয় নাচে...

পাহাড় ও উৎরাই বেয়ে লাফ দিয়ে উঠছে-নামছে পথ
নদীর বুকে এসে পড়েছে শাখা-নদী
সেই কলতান আসছে কানে;
আর দূর থেকে দূরতর
সারা ইলোরায় আর রয়ে আনে ঐরাবত
স্তম্ভ তুলে সাঁকো বেঁধে জনপদ গড়ে স্থপতি...

এই শক্তিতে ভূস্তর ফুঁড়ে জাগে পদ্ম—পদ্মের ভিতর আলো...

উপন্যাস

মনোজ বসু।

সেই সব মানুষ

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গারসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। কিন্তু তরঙ্গিণীর মন বড় চঞ্চল। বুকের মধ্যে তার টনটন করে ওঠে—ষষ্ঠী গেল—মহাসপ্তমীও এসে গেল—কিন্তু তার মেয়ে এখনও এলো না। ক্রমে অষ্টমী নবমী পেরিয়ে দশমীও এসে গেল। ভোরে উঠেই সবাই দেখে ভিজে চোখ মা-দুর্গার। শেষ রাত থেকে সানাই বাজছে। তারও কান্নার সুর, গিরিকন্যা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছেন বলে।

পুজোর পর পরই রাখীবন্ধন। এগাঁয়েও তার ঢেউ এসে লেগেছে। দেবনাথ পুজোর পরে গ্রামে এসেছে। সে এসেই রাখী উপলক্ষে স্বদেশী দল করেছে। ফলে খোদ ভবনাথের ভিতর বাড়িতেই 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনি।

সেই উপলক্ষে হাটখোলার সভা পর্যন্ত হয়ে গেল। এই সময়টায় গ্রামের লোকেদের মধ্যে ব্যস্ততা বাড়ে। কামারদের কাজ বেড়ে যায়। সামনে ধান কাটার মরশুম। তাই কাস্তে গড়ার তাড়া। তাছাড়া গাছ কাটা দা গড়ার কাজ তো আছেই।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডোবার ঘাট থেকে উঠে ঠাকুরমশায় আবার দৃষ্টিগম্য হলেন। বিলে হাঁটার চওড়ে চেহারা আর নেই। পুঁটলি খুলে খড়ম বের করে পায়ে পরেছেন নামাবলী বের করে গায়ে জড়িয়েছেন। সাত্ত্বিক মানুষের সাজসজ্জা যেমন হতে হয়। সোনা-খড়িতে বিস্তর শিষ্যসেবক—ভবনাথ-তরঙ্গিণী একেবারে সাক্ষাৎ শিষ্য হরি-সেবক ঠাকুরের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন তাঁরা। খড়ম খটখট করে ঠাকুরমশায় এমুখো আসছেন। ভবনাথ পথে নেমে পড়ছেন পিছনে কমল। খট করে ঠাকুরমশায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রণামের পর পায়ের আঙুল ঈষৎ উঁচু করে দেন, পদধূলি নিতে অসুবিধা না হয়। ভবনাথের হয়ে গেল তো কমল। প্রণাম করল সে কিন্তু খড়মের উপর বুড়ো আঙুল তোলাই আছে।

ভবনাথ বললেন পায়ের ধুলো নেওয়া হয়নি রে মনু।

ফটিক দেখেছে সে বলল, নিলেন তো খোকাবাবু।

ভবনাথ হেসে বলেন ডান পায়ের ধুলো নিয়েছে বাঁ-পা বাকি। বাঁ-পায়ের আঙুল তোলা দেখছিস নে। ছেলেমানুষ বুঝতে পারে নি।

বেকুব হয়ে কমল তাড়াতাড়ি বাঁ-পায়ের তলা স্পর্শ করল।

পদধূলি নিতে আরও কজন জমেছে। হাতুড় ফেলে মেঘা কর্মকারও এলো। হয়ে গেছে, ঠাকুরমশায় তবু নড়েন না। মেঘাই ঠাহর করল। প্রণামের ঘটা দেখে জল্লাদ সকৌতুকে অদূরে পুবতলায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাকল এসো না জল্লাদ। ঠাকুরমশায় তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে।

জল্লাদ কানেই নিল না। আশশ্যাওড়া-বনের শুঁড়িপথ ধরে সে পা চালিয়ে দিল।

কামার-দোকান থেকে কার মুখের একটা মন্তব্য এলো ঃ দেবদ্বিজে ভক্তি শেখায় না—পাঠশালে কী শেখায় যে ঘোড়ার ডিম।

হরিসেবক পাড়ায় ঢুকে গেলেন। মেলা কাজ। শিষ্যবাড়িতে বার্ষিক প্রণামী বরাদ্দ আছে—চার আনা আট আনা এমন কি এক টাকাও যার যেমন অবস্থা। ঘুরে ঘুরে প্রণামী আদায় করে বেড়াবেন। বর্ষার দরুন চার-পাঁচটা মাস আসা-যাওয়া একেবারে বন্ধ ছিল, তার মধ্যে বিয়েথাওয়া এবং আরও পাঁচরকম শুভকর্ম হওয়া সম্ভব। তেমনি ক্ষেত্রে গুরুপ্রণামী তোলা থাকে। এসবের খোঁজখবর নিতে হবে। সরাসরি খাজনা আদায়ও আছে নিশিকান্ত নায়েবের মতোই খানিকটা। জমির খাজনা নয়, ঠাকুর-মশায়ের একফোঁটা জমিও নেই গাঁয়ের মধ্যে, নারকেল গাছের বাবদ খাজনা। হতে হতে হরিসেবক ঠাকুরমশায় অন্তত পঞ্চাশটা নারকেল গাছের মালিক হয়ে পড়েছেন। শিষ্যসেবকদের কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধের সময় গুরুঠাকুরকে নারকেল গাছ দানের বিধি। ভাল গাছ দেয় আবার বুড়ো গাছ যাতে ফল ধরা বন্ধ হয়ে গেছে তেমন গাছও ছ্যাঁচড়া শিষ্য কেউ কেউ দিয়ে থাকে। ব্রাহ্মণের বৃক্ষমূর্তি হলেন নারকেল গাছ—কুড়াল পেড়ে কাটা চলবে না, ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে। গাছের ডাব-ঝুনো সুদ্দুর পাড়ালায় বসে রক্ষে হয় না গাছ বেচে দেবো খদ্দেরে কেটেকুটে উনুনে পোড়াবে তা-ও হবে না। অতএব বার্ষিক খাজনায় জমা দিয়ে দিয়েছেন—গাছ প্রতি আট আনা। সেই খাজনা আদায় করাও ঠাকুরমশায়ের কাম একটা।

মানুষটি সাদাসিধে, কোনরকম লজ্জা নেই। গাঁয়ের আধআধি লোক শিষ্য। সেবা নেবেন—কোন এক বাড়ি উঠে পড়লেই হল। পাড়ায় একটা চক্কোর দিয়ে সকলের যথা-সম্ভব খবরাখবর নিয়ে পুববাড়ি এসে

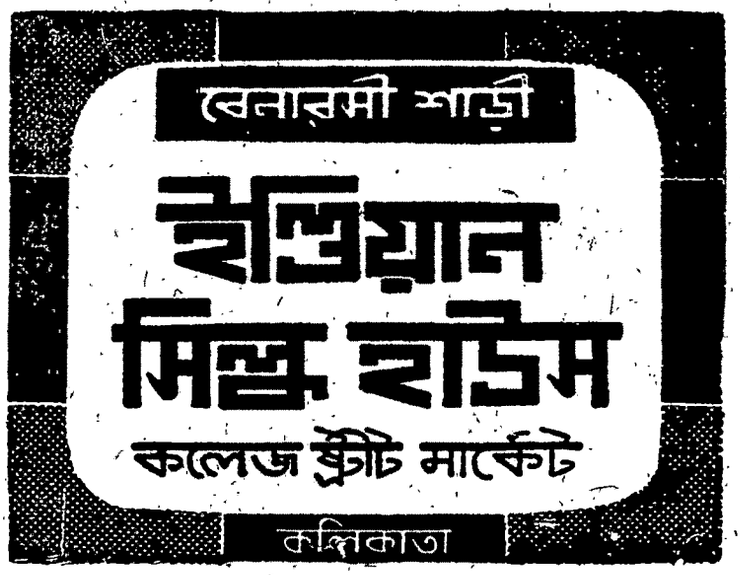

পড়লেন আজ। ভবনাথ ফেরেন নি এখনো—কমল ঐ কামার দোকান থেকে অমনি পাঠশালায় গেছে ভবনাথও হয়তো সঙ্গে গিয়ে প্রহ্লাদ মাস্টারের সঙ্গে গল্প বসেছেন। কাড়ি-বাঁধা ব্রাহ্মণের হুঁকোয় স্বহস্তে জল ফিরিয়ে নিয়ে রোয়াকের উপর জলচৌকিতে তিনি বসে পড়লেন অটল কলকে ধরিয়ে ফুঁ দিতে দিতে নিয়ে এলো। নলচের মাথায় কলকে বসিয়ে হরিসেবক ধূম-উদ্গীরণ করছেন।

বিনো এসে গলায় আঁচল জড়িয়ে পায়ের ধুলো নিল। আশীর্বাদ বিস্মরণ হয়ে হরিসেবক হুকুম ছাড়লেন ঃ ভাতে-ভাত। অর্থাৎ এতখানি পথ হেঁটে এসে বুড়ো-মানুষের সবিশেষ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে।

উমাসুন্দরী প্রণাম করে বললেন হুকুমের সোনামুগ, ক্ষেতের নটেকচু—কচু দিয়ে মুগের ডাল রেঁধে নিন ঠাকুরমশায় অমৃত লাগবে।

উঁহু, ভাতে-ভাত। ভাতে-ভাত।

রান্নায় ঠাকুরমশায়ের বড় আলস্য। অথচ শিষ্যবাড়ি ঘুরতে হয়, সবাই তারা অব্রাহ্মণ—স্বপাক ভিন্ন উপায় কি তখন? তবে ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছেন। আলাদা তরকারি রান্না নয়—কাঁচকলা মেটে-আলু কচু ঝিঙের ন্যাকড়ায় বাঁধা ডাল বা শিম-বরবটি ভাতের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, এক-সঙ্গে সব সিদ্ধ হয়ে গেল। তারপর তেল-নুন-লঙ্কা মেখে খাওয়া। উনুনে ভাত চাপানো ও নামানো—তা-ও নিজের হাতে নয়। বিনোকে বলেন নেয়ে ধুয়ে শুচি হয়ে এসেছ—বাস বাস ভাত তুমিই নামাবে। অনাচার হবে না ও ভাত এঁটো নয়, নুন না পড়া পর্যন্ত এঁটো হয় না।

কিছুদূরে রাজীবপুরে—গণ্ডগ্রাম, বহু লোকের বাস। পোস্টাপিস সেখানে। পিওন যাদব বাঁড়ুয্যে চিঠি বিলি করতে এসেছেন। রবিবার আর বিষ্যুৎবার হপ্তার এই দুটো দিন আসেন তিনি সোনাখড়িতে। তাঁর ধরণ-ধারণ হরিসেবকের একেবারে বিপরীত। ভোজনবিলাসী মানুষ—বাঁধাবাড়ার কাজে অতিশয় উৎসাহী। রাঁধেনও চমৎকার খেয়ে মুখ ফেরে না। দত্তবাড়ি গিয়ে সর্বাগ্রে চিঠি-পত্র যা দেবার দিলেন। তারপরে খবরা-খবর নিচ্ছেন, দুধ হয় ঘরে কেমন, তরিতরকারি কি মজুত আছে, মাছের ব্যবস্থা হতে পারবে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। গৃহস্থ পুলকিত। বাড়িতে ব্রাহ্মণের পাত পড়বে সে জন্যে তো বটেই, তাছাড়া রাঁধাবাড়া পিওনঠাকুর শুধু নিজের মতন করেন না সবাইকে খাইয়ে তাঁর আনন্দ, বাড়িসুদ্ধ সবাই প্রসাদ পেতে পারবে। খাওয়াটা উপাদেয় হবে।

দত্তগিন্নি বলেন, বেলা তো বেশ হয়েছে। স্নান-আহ্নিক সেরে জলটল মুখে দিয়ে লেগে যান, উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি আমি।

কিন্তু উপকরণ তেমন জুতের নয় পিওনঠাকুর দ্বিধান্বিত। বললেন, বোসো মা পাড়ার কিছু চিঠি আছে সেইগুলো সেরে আসি। তার পরে।

নাছোড়বান্দা গিন্নি বললেন, সিধেপত্তর গোছাচ্ছি আমি কিন্তু।

তাড়া কিসের? ফিরে আসি আমি, তার পরে।

এ মকেল একেবারে বাতিল করে যেতে চান না অন্য বাড়ির অবস্থা এর চেয়েও যদি খারাপ হয়?

নতুনবাড়ি ঢুকলেন। হ্যাঁ, সার্থক হল এ বাড়ির চিঠি বিলি করা। বড় রুই ও শোল মাছ জিয়ানো আছে, গঞ্জের বাজারে নতুন গোল আলু উঠেছে! তা-ও নিয়ে এসেছে কাল। নলেন পাটালি আর গোবিন্দ-ভোগ চাল আছে দিব্যি পায়েস হতে পারবে। তার উপরে মাদার ঘোষ বাড়ি এসে-ছেন, পুকুরে মাছ গিজগিজ করছে তাঁর প্রস্তাব ঃ পাশখেওলা ফেলে এক্ষুনি একটা কাতলা মাছ তুলে দিচ্ছেন, কৃপা করে এক-খানি মুড়িঘন্টের তরকারী পাক করতে হবে।

এর উপরে কথা কি। কাঁধের চিঠির ব্যাগ নামিয়ে পিওনঠাকুর আসন নিলেন। পাড়া-বেড়ানী পুঁটি এসে দাঁড়াল, তাদের বাড়ির চিঠি থাকে তো নিয়ে যাবে। পিওন ঠাকুর বললেন, দত্তবাড়ি খবরটা দিয়ে যাস তো মা। মাদার ছাড়ছেন না, পাকশাক এই-খানেই করতে হচ্ছে।

হরিসেবকের এদিকে স্নানাদি সারা রোয়াকের উপর আহ্নিকে বসেছেন। রান্না-ঘরে দাওয়ায় ভাত ফুটছে টগবগ করে দেখা যাচ্ছে রোয়াক থেকে। নাক টিপে বিড় বিড় করে মন্তোর পড়তে পড়তে গুরুঠাকুর আঙুলের ইসারায় বিনোকে উনুনের জ্বাল ঠেলে দিতে বলেছেন। এমনি সময় পুঁটি ফিরে এসে অলকা-বউকে বলছে চিঠি নেই জিজ্ঞাসা করে এসেছি। থাকলে উনি নিজেই তো দিয়ে যেতেন।

তারপর কলকল করে বলছে, রান্নায় বসেছেন। মাদারকাকা পুকুরে জাল ফেলাচ্ছেন। মস্ত বড় এক কাতলা দড়াম করে উঠোনে এনে ফেলল—

হরিসেবক উৎকর্ণ। সোনাখড়িতে কত কালের আসা-যাওয়া — পিওনঠাকুরকে জানেন তিনি, খুব জানেন। রান্নাও কতবার খেয়েছেন। আহ্নিক সম্ভবত সারা হয়ে গেছে, তড়াক করে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। উমাসুন্দরীকে ডেকে বলেন কেষ্টর মা শোন। মাদার এসেছেন, অনেকবার উনি খাবার কথা বলেন। আমি নতুনবাড়ি চললাম। ঐ ভাত নামিয়ে নিয়ে তোমরা রান্নাঘরে নিয়ে যাও।

রাতের বেলা এ বাড়ি খাবো শোবও এখানে।

দোচালা বাংলা ঘর। তক্তপোষের উপর গুরুঠাকুর মশায়ের বিছানা, অটল নীচে মাদুর পেতে পড়েছে। রাতদুপুরে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড—অটল চেঁচামেচি করছে, কাঁদছে। ঘুম ভেঙে ভবনাথ ছুটলেন। হিরুও বাপের পিছু পিছু।

কি রে অটলা কাঁদিস কেন? কি হয়েছে?

অটল ঘরের বাইরে এলো ঃ ঠাকুরমশায় মেরেছেন।

হরিসেবকও বেরুলেন। আকাশ থেকে পড়লেন তিনি ঃ সে কী কথা! দোষঘাট করিস নি, আমি কেন মারতে যাব মিছা-মিছি?

অটল নরম হয়ে বলে, মারেন নি লাথি? ঠাকুর মানুষ হয়ে মিছে কথা বলছেন। পৈতে ছুঁয়ে বলুন তবে।

হিরুও এসে পড়েছে। হাল আমলের এই সব ছোঁড়া গুরু-পুরুত গো-ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তেমন ভক্তিমান নয়। অটলের পক্ষ নিয়ে সে বলে, সারাদিন হেটেখুটে হাঁহুশ হয়ে ঘুমুচ্ছিল। রাতদুপুরে উঠে আপনার নামে মিথ্যে বানিয়ে বলছে তাই বলতে চান?

হরিসেবক আমতা আমতা করে বলেন মিথ্যে ইচ্ছে করে না বলুক পাকেচক্রে তাই তো হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাবা। পা লেগেছে ওর গায়ে সেটা মিথ্যে নয়। তা বলে লাথি মারি নি, বিনি দোষে লাথি কেন মারতে যাব?

তবে?

রাতে একবার-দুবার আমায় উঠতে

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!

অপূর্ব সুযোগ!
সিঙ্গার কোম্পানীর অভিনব পরিকল্পনা—

মেরিট*

সেলাই কলটির

দাম শোধ করুন তিন মাসে

লিস্ট প্রাইসের চেয়ে এক পয়সাও বেশী দিতে হবে না

"সত্যিই অদ্ভুত!"

এখন সিঙ্গার কোম্পানী থেকে কিস্তিতে কেনার সুযোগ পাচ্ছেন। কত সুবিধে! বাড়তি খরচ মোটেই নেই।

"আমার অনেক টাকা বেঁচে যাবে!"

হ্যাঁ, দামটা চুকিয়ে দিতে লাগছে তিন মাস। তাহলে ভেবে দেখুন কত টাকা বাঁচাচ্ছেন। তাছাড়া লিস্ট প্রাইসের চেয়ে একটি পয়সাও বেশী দিতে হচ্ছে না। দামটাও কত তাড়াতাড়ি উসুল হয়ে যাচ্ছে দেখে অবাক হয়ে যাবেন। তারপর থেকে সবসময় কেবল পয়সাই বাঁচাতে থাকবেন।

"একটি পয়সাও বেশী দিতে হয় না!"

সাধারণতঃ কিস্তিতে কিনলে দামটা একটু বেশীই পড়ে। কারণ? কেন না, তাতে কোম্পানীকেও সামান্য বেশী খরচ করতে হয়। তবে তাতে আপনার লাভ বই লোকসান নেই। মেরিট সেলাই কলের কিস্তি দেবার সময় আপনার পয়সাও বাঁচছে! (দর্জির খরচ বেঁচে যায়, তাই)।

"এমন সুযোগ চিরকাল থাকে না!"

ঠিক! সিঙ্গার কোম্পানী বেশী দিন এমন সুযোগ দিতে পারে না। তাই কাছাকাছি সিঙ্গার দোকানে কিংবা ডীলারের কাছে গিয়ে পুরো খবর জেনে আসুন। শিগ্‌গীর! এ সুযোগ হারাবেন না।

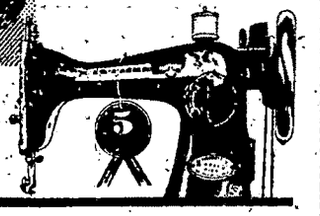

সব্বাই জানেন আমরাই
দুনিয়াকে শিখিয়েছি কলে সেলাই করার বিদ্যা।

সিঙ্গার

* সিঙ্গার কোম্পানীর ট্রেডমার্ক।

সিঙ্গার সোইং মেশিন কোং, ২০৭, ডি. এন. রোড, বোম্বাই ৪০০০০১

CH-SEA-SM-79 BEN

হয়। অন্ধকারে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে—পা বেঁধে বুড়োমানুষ আছাড় খেয়ে মরব? ঠিক কোন খানটায় খুঁজে দেখছিলাম। লেগে গেল দৈবাৎ।

হিরন্ময় জেরা করছে ঃ খোঁজার কথা তো হাত দিয়ে।

আমি পা দিয়ে খুঁজেছি। সে তো ওরই মঙ্গলের জন্য।

কৌতূহলী হয়ে ভবনাথ বলেন, কি রকম? কি রকম?

হরিসেবক বলেন, হাতে খুঁজতে গিয়ে অন্ধকারে যদি দৈবাৎ হাত ওর পায়ে গিয়ে লাগত ঃ ব্রাহ্মণের অঙ্গে শূদ্রের পা পড়া—কি সর্বনাশ হত ভাবো দিকি। সে পাতকের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত। পাতক বাঁচাতে গিয়েই এই গন্ডগোল। আমার পা দিয়ে খোঁজা ও ভেবে নিয়েছে পায়ের লাথি।

অটলের কান্না একেবারে বন্ধ হয় নি তখনো। ফোঁপাচ্ছে। ভবনাথ বুঝিয়ে বলেন, শুনলি তো সব। মারেন নি পা অমনি লেগে গেছে। দোষঘাট করিস নি, লাথি কি জন্যে মারতে যাবেন?

বিরক্ত হয়ে তেড়ে উঠলো, গায়ে পা ছুঁয়েছে কি না ছুঁয়েছে—ব্যথা কি এখনো লেগে আছে। ভারী কুলীন হয়েছিস্ উঃ—টনটনে অপমানবোধ?

কান্নার কারণ অজানা হাত ঘুরিয়ে অটল পিঠের দিকে দেখায়। ফোড়া হয়েছে, কদিন থেকে বলছিল বটে। পায়ের ঘাটে ফোড়া ফেটে গেছে টাটাচ্ছে খুব।

বেশ তো ভালই তো! হরিসেবক এবারে বলার জুত পেয়ে গেছেন ঃ ফেটে গিয়ে তো ভালই হয়েছে রে। ফোড়া তো হীরে-মুক্তোর অলঙ্কার নয় যে গায়ে পরে থেকে শোভা বাড়াবি দায়ে-বেদায়ে বন্ধক দিবি বিক্রি করবি। ডাক্তার বদ্যি লাগল না, এমনি এমনি ফোড়া ফাটিয়ে উপকার করেছি তোর।

ডুগডুগি বেজে উঠল একদিন। দেড়প্রহর বেলা। কানাপুকুর-পাড়ের ওদিক থেকে জঙ্গলের আড়াল বলে নজরে আসছে না। তারপর ফাঁকায় এসে গেল। দুজন মানুষ। পিছনের জনের মাথায় টিনে বানানো বেঢপ আকারের বাক্স—টিনের উপর রংবেরংয়ের ফুল লতা-পাতা আঁকা তিন গোলাকার মুখ, মুখ তিনটে কালো কাপড়ে ঢাকা। আগের জন বেশ খানিকটা বাবু-মানুষ—গায়ে কামিজ পায়ে জুতো মাথায় টেরি। এই লোকের হাতে ডুগডুগি কাঁধে বাঁশের তেপায়া। ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে আসছে আর চেঁচাচ্ছে বাকসকল পেল্লায় পেল্লায় ছবি বত্রিশ দফা। সস্তায় যাচ্ছে—মাত্তোর দু পয়সা। চলে এসো চলে এসো সবা সস্তায় যাচ্ছে দু পয়সায় বত্রিশ মজা—

গানের মতন সুর ধরে লোক জমাচ্ছে ঃ কলকাতার শহর দেখ, চিঁড়েখানার হাতী দেখ—

আটল বলে সোনাপুড়িতে কলকাতা এনে দেখাচ্ছ?

দুটো পয়সা ফেলে কাচে চোখ দাও: কলকাতা দেখা থাকে তো রাস্তাঘাট ট্রামগাড়ি ঘরবাড়ি মিলিয়ে নাও।

পুববাড়ির দুয়োরের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। ভবনাথ বাড়িতে না মামলা উপলক্ষে সদরে গেছেন। পুঁটি কোনদিকে ছিল ছুটে এসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে সে। পাঁচিলের দরজায় বিনির আর নিমির মুখ দেখা যায়। বাকসকলের সঙ্গে অটল দরদস্তুর করছে ঃ দু-পয়সা কম হল নাকি? বিশ হাত মাটি খুঁড়ে দেখ, দুই কেন আধেলা পয়সাও উঠবে না। যতই চেঁচাও আর ডুগডুগি বাজাও দু-পয়সায় কেউ তোমার ছবি দেখবে না। কমসম করে নাও মেলা খদ্দের হবে।

চাউর হয়ে গেল পুববাড়ি বাকসকল এসে রকমারি ছবি দেখাচ্ছে। প্রহ্লাদের পাঠশালায় সুর করে নামতা পড়ানো হচ্ছে ঝন্টু এসে বলল যাবেন না মাস্টারমশায়? প্রহ্লাদ উড়িয়ে দেন ঃ দূর ছবি আবার পয়সা দিয়ে ঘটা করে কী দেখতে যাবো? কিন্তু নামতায় তারপরে আর জুত হয় না সর্দার-পোড়ো অবধি অন্যমনস্ক এটা বলতে ওটা বলে উঠছে। ছুটি দিয়ে দিলেন প্রহ্লাদ—ছেলের দল ছুটল কমলও আছে। আর দেখা যায় স্বয়ং প্রহ্লাদ-মাস্টার গুটিগুটি পা ফেলে চলেছেন সকলের পিছনে কৌতূহল সামলাতে পারেন নি।

এক পয়সায় রফা করে লোকটা ইতিমধ্যে ছবি দেখাতে লেগে গেছে। লতাপাতা আঁকা রহস্যময় বাকসকলে পাশাপাশি চারটে ছিদ্র গোলাকার কাচে-ঘেরা। চারজনে সেখানে চোখ রেখেছে—পুঁটি বিনি নিমি আর অলকাবউ। হাতল ঘোরাচ্ছে লোকটা আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে ঃ লাটসাহেবের বাড়ি দেখ চিঁড়েখানার হাতি দেখ গন্ডার দেখ জলহস্তী দেখ হাওড়ার পুল দেখ—

পাঠশালার ছেলের দল হৈ-হৈ করে এসে পড়ল। বাইরের লোকও জুটেছে। বউমানুষ অলকা এতক্ষণ যা দেখে নিয়েছে—আর এখন দেখা সম্ভব নয়। ঘোমটা টেনে সে পাঁচিলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। কমল আর দেরি করে —এক ছুটে গিয়ে বউদাদার সেই জায়গায় চোখ রাখল। বাকসকলের লোকটা বিবেচক, গলা উঁচু করে ভিতর বাড়ির দিকে চেয়ে প্রবোধ দিচ্ছে ঃ এঁদের সব হয়ে যাক—কল আমি ভিতরে নিয়ে যাব মায়েরা। এয়োছ যখন, সকলকে দেখাব। যতবার দেখতে চান, দেখিয়ে যাব।

সুর ধরল সঙ্গে সঙ্গে ঃ হাওড়ার পুল দেখ খিদিরপুরের জাহাজ দেখ পরেশনাথের বাগান দেখ ফাঁসির ক্ষুদিরামকে দেখ সুরেনবাবুর সভা দেখ লাটসাহেবের বাড়ি দেখ—

ক্ষুদিরামের গল্প দেবনাথ বলেছিলেন ধক করে তাই কমলের মনে এসে গেল। আর আহ্লাদ বৈরাগী গেয়েছিলেন ঃ একবার বিদায় দাও মা—। ঐ গান পরে কমল অন্যের মুখেও শুনেছে নিজেও একটু আধটু গায় কখনো-সখনো। ক্ষুদিরামকে জানে সে, আজকে এই চেহারা দেখল। কোঁকড়া-চুল রোগা রোগা খাসা ছেলে। একরকম মন্ত্র পড়ে নাকি অদৃশ্য হওয়া যায়। কমল তাই হয়েছে। প্রহ্লাদ মাস্টারমশায়ের জোড়ারেত না নিয়ে লাটসাহেবের বাড়ি ঢুকে গেছে। সপাং সপাং করে বেত মারছে বাবারে মলুম রে—করছে লাটসাহেব। অথচ কে মারছে দেখা যাচ্ছে না। বন্দেমাতরম বলার জন্য বেত মেরেছিল—তারই শোধ তুলে আসবে, কমলকে কেউ যদি অদৃশ্য হবার মন্ত্রটা শিখিয়ে দেয়।

লোকটা বলে চলেছে লাটসাহেবের বাড়ি দেখ কালীঘাটের মন্দির দেখ জগন্নাথের রথ দেখ আগ্রার তাজমহল দেখ গয়া দেখ কাশী দেখ—

উমাসুন্দরী তারিফ করে বলেন গয়া কাশী শ্রীক্ষেত্র সমস্ত দেখাচ্ছ তুমি?

লোকটা হাসিতে দাঁত বের করে বলল আজ্ঞে হ্যাঁ উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখতে পাচ্ছেন। খরচা একটা পয়সা মাত্তোর—

কমলের ছবি দেখা হয়ে গেছে বাকসকল এবারে ঠাহর করে করে দেখছে। আয়তনে এত ছোট—এর মধ্যে লাটসাহেবের বাড়ি হাওড়ার পুল গয়া কাশী ইত্যাদি বড় বড় জিনিস অবলীলাক্রমে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বারোহাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি—তারও চেয়ে অনেক বেশি তাজ্জব

(ক্রমশঃ)

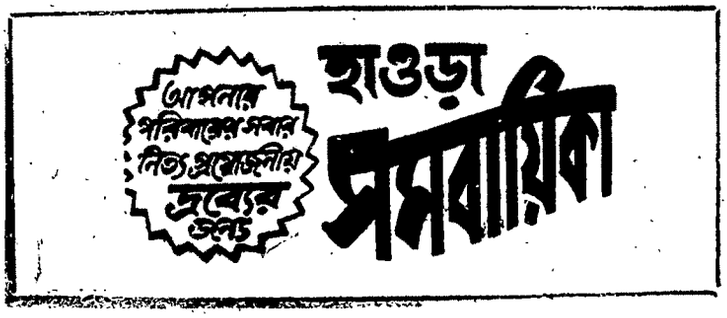

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনুবাদ পত্রিকা উদ্বোধন

বাংলা ত্রৈমাসিক অনুবাদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হলে একটি প্রীতিসিনগ্ধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীমতী লীলা রায় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। এই সুন্দর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়।

বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপ-মন্ত্রী শ্রীযুক্তা অমলা সোরেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন বাংলা ভাষায় অনুবাদ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সেই ঐতিহ্যের কথা স্মরণে রেখে কেবলমাত্র অনুবাদ ও অনুবাদ বিষয়ক রচনা অবলম্বনে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তা সত্যি আনন্দের বিষয়।

প্রধান অতিথি বলেন এ রাজ্যের লেখক-দের আজকের দিনের একটি নৈতিক দায়িত্ব হোল বাংলা অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যের নানা লেখাকে পরিচিত করে তোলা।

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা রায় বলেন, অনুবাদ পত্রিকাটি সাহিত্যের মূল্যেই বেঁচে থাকবে। অনুবাদ যদি সুষ্ঠু ও সুন্দর হয় তবে তা রসোত্তীর্ণ হবেই এবং রসোত্তীর্ণ হোলেই সাহিত্যানুরাগীদের তা দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

সভায় আরো যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁরা হোলেন ডকটর অরবিন্দ পোদ্দার সাহিত্য একাডেমীর আঞ্চলিক সম্পাদক ডকটর শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ জ্যোতি-প্রসন্ন সেনগুপ্ত, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ও শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ডু।

অপহৃত বিষ্ণু মূর্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা

দশ বছর আগে পৌষ সংক্রান্তির মধ্যরাতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভবন থেকে যে বিষ্ণু মূর্তিটি অপহৃত হয় তারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা হোল সম্প্রতি পরিষদ ভবনে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নানা হাত ঘুরে আমেরিকান বোস্টন মিউজিয়ামে চার লক্ষ টাকা দিয়ে মূর্তিটি বিক্রী করা হয়। এই মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ পরে সাহিত্য পরিষদকে মূর্তিটি ফেরত দেন। পরিষদ মন্দিরে বিষ্ণু মূর্তিটির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন রাজ্যপাল এ এল ডায়াস। তিনি বিষ্ণু পাদপদ্ম চন্দনে চর্চিত করেন।

এই সিনগ্ধ সুন্দর অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ও রাজ্যপাল শ্রীডায়াস উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এই মূর্তিটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এই ধরণের প্রাচীন মহামূল্য নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের জন্য রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের কথা তাঁরা সবাই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার এই মূর্তি চুরি হওয়া ও ফিরে পাওয়ার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার সাগরদীঘির কাছে ১১ শতকে এই বিষ্ণু মূর্তিটি পাওয়া যায়। পরিষদের তখনকার সম্পাদক আচার্য রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কান্দীর শ্রীকিশোরীমোহন সিংহের কাছ থেকে যে তিনটি মূর্তি সংগ্রহ করেন এই মূর্তিটি তারই একটি। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষণা করে ঘোষণা করেন এই মূর্তিটি লক্ষ্মণ সেনের আমলের। উইলিয়াম রদেন-স্টাইন এটি দেখতে এসে মুগ্ধ হয়ে বলেন বিশ্বে এমন আশ্চর্য সুন্দর দ্বিতীয় মূর্তি নেই। ১৯৪৭—৪৮ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত রয়েল একাডেমী অফ আর্টের শিল্প প্রদর্শনীতে এই মূর্তিটি প্রদর্শিত হয়। সৌন্দর্যের জন্য সেখানকার শিল্প-রসিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এই বিষ্ণু মূর্তিটির দিকে। ১৯৬৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী পরিষদ কক্ষ থেকে এই মূর্তিটি চুরি যায় তারপর দীর্ঘ দশ বছর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। সব শেষে বোস্টন মিউজিয়াম অফন ফাইন আর্টস সন্ধান দিলো। এবং সানন্দে ফেরতও দিয়ে দিলো। সাংস্কৃতিক এই তৎপরতা ও উদারতার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সাহিত্য উৎসবের আয়োজন

হাওড়ার সাহিত্য-প্রয়াসীর উদ্যোগে এবারও ২রা মার্চ শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনে সারাদিনব্যাপী সাহিত্য মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে থাকবে সাহিত্য পাঠ আলোচনা সঙ্গীত নৃত্যনাট্য আবৃত্তি চিত্র প্রদর্শনী ও বনভোজন। যোগাযোগের ঠিকানা বরুণ ঘোষ সাধারণ সম্পাদক সাহিত্য প্রয়াসী; ৪৫ যাদব দাস লেন হাওড়া ২ অথবা ৫৩।১।২ ধর্মতলা লেন হাওড়া-২।

ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

নৈবেদ্য পত্রিকার পরিচালনায় ছোটগল্প প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। পাণ্ডুলিপি জমা দেবার শেষ তারিখঃ ৩০শে জুন ৭৫। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছোটগল্প নৈবেদ্যতে প্রকাশিত হবে। যোগাযোগের ঠিকানা : যুগ্ম সম্পাদক, নৈবেদ্য রাণীকুটির ৪৭ রাজবল্লভ সাহা লেন রামকৃষ্ণপুর হাওড়া।

সাহুজৈন ক্লাবের শরৎ জন্মশতবার্ষিকী

সাহুজৈন ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের জন্মশত বার্ষিকী পালিত হোল। এই উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নাটক পরিবেশিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপি সুব্রামনিয়ম।

বিচারপতিকে প্রাচীন গ্রন্থ উপহার

কয়েকদিন আগে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসমরেন্দ্র-নারায়ণ রায়চৌধুরীকে ডানকুনি দশমহাবিদ্যাশ্রমের আচার্য শ্রীশ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র সর্ববিদ্যা বাকসিদ্ধ সাধক সর্বানন্দদেব রচিত প্রায় দুশ বছর আগের 'সর্বোল্লাস গ্রন্থটি দেওয়া হয়। গ্রন্থটি হোল সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের ওপর এখন গবেষণায় রত আছেন বিচারপতি শ্রীরায়চৌধুরী।

পুরুলিয়া জেলা সাহিত্য মেলা—স্মারক গ্রন্থ ১৩৮১

হরপ্রসাদ মিত্র শান্তি সিংহ উৎপল হোমরায় সাধনা মুখোপাধ্যায় অমিতাভ কুমার চট্টোপাধ্যায় কুশল হোমরায় মোহিনীমোহন গাঙ্গুলি মুকুল চট্টোপাধ্যায় তরুণ দাস অনিল মাহাতো প্রমুখ কবিদের কবিতার সঙ্গে ওই জেলার সাময়িক পত্রিকার এবং লেখক পরিচিতির মূল্যবান দলিল সংযোজিত হয়েছে।

—উপগুপ্ত

নতুন বই

প্রেম তুই সর্বনাশী — মাহফুজ সিদ্দিকী। প্রকাশকঃ দানেশ প্রকাশনী ২১৭ আরাম-বাগ ঢাকা বাংলাদেশ। মূল্য ১৩ টাকা।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাঙালী হিসেবে আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে সেটা হোল বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া। যেন এপার-ওপারের সাহিত্য জগতের লৌহ কপাট এখন টান টান হয়ে খুলে গেছে দুই প্রান্তের বাঙালীদের কাছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যের সমৃদ্ধিকাল বলা যায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুকাল আগে থেকেই। অবশ্য পূর্ববঙ্গে সাহিত্যচর্চা কোন-দিনই কোন রাজনৈতিক আবর্তই ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যে তার প্রমাণ অজস্র। আমি বলছি সাহিত্যের নবমূল্যায়নের কথা। যা সাহিত্য জগতে এনে দিয়েছে এক নব চেতনা আর ভাবনার জোয়ার।

মাহফুজ সিদ্দিকীর বর্তমান ছোট গল্প সংকলনটি পড়ে আবার নতুন করে মনে পড়ল সেই কথাটা।

বর্তমান সংকলনে মোট তেরটি বিভিন্ন স্বাদের গল্প সংকলিত হয়েছে। অকপটে স্বীকার করছি গল্পগুলি পড়তে পড়তে লেখকের গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন তার পরিবেশন ভঙ্গী এবং তা প্রকাশের মুন্সিয়ানা দেখে খুশি হয়েছি। এমন দু-একটি গল্প আছে যা আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছে।

এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প আমার মতে 'পৃথিবীর নাম কালাচাঁদের গলি' এবং কাপাডিয়া কমপ্লেকস' তারপরই নাম করবো 'খুন' নামক জাপানী গল্পের ভাবানুবাদটির। এ দুটি গল্পের বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র তেমনি এর প্রকাশ ভঙ্গীও। আর চমকে দেবার মত গল্পটির নাম 'প্রেম তুই সর্বনাশী'। এ গল্প পড়তে পড়তে যেন অন্য জগতে চলে যেতে হয়।

এমনি একটি আকর্ষণীয় গল্পগ্রন্থ উপহার দেবার জন্য লেখকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। শিল্পী সৈয়দ এনায়েত হোসেন কৃত প্রচ্ছদটি অপূর্ব।

তবে লেখকের কিছু কিছু ভাষা প্রয়োগ আমাদের কাছে হোঁচট খাওয়ার মত মনে হয়েছে। যার মধ্যে 'উ'র বদলে 'ও'র ব্যবহার অন্যতম। এ সম্পর্কে অবহিত হতে বলি।

বইটি স্বনামধন্য সাংবাদিক সাহিত্যিক প্রাতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

গ্রাফিকস এ্যান্ড ড্রইং—অসিত পাল। প্রকাশক দাশগুপ্ত এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ কলকাতা—১২।

শিল্পী অসিত পালের শিল্পকর্মের এটি প্রথম সংকলন কিনা জানি না। কিন্তু শিল্পীর বিভিন্ন জাতের কাজ দেখে মনে হয় তিনি শুধু পাকা শিল্পীই নন জাত শিল্পীও বটে।

এই সংগ্রহ পুস্তকে শিল্পীর নিজস্ব (সেলফ পোর্ট্রেট) ছবিটি ছাড়া মোট ৪৮টি বিভিন্ন মেজাজের কাজ স্থান পেয়েছে।

শিল্পীর নিজস্ব ছবিটি অবশ্য বিচ্ছিন্ন করা। এছাড়া রয়েছে উডকাট লিনোকাট ড্রইং এবং একটি শিল্পীর ভাষায় 'সেলফলেস পোর্ট্রেচার' যার ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে 'ইন দি হিউম্যান জু।'

এই সংকলনের ছবিগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা মুস্কিল। কারণ প্রায় প্রতিটি চিত্রাঙ্কনই এমন এক আবেদন ও ঋজুতা নিয়ে উপস্থিত যে রস বিচার থেই হারিয়ে যায়। তবু তার মধ্যে বিষয়বস্তু দৃষ্টিকোণ দুঃসাহসিকতা ও কাজের দিক থেকে বিস্ময়াভিভূত করেছে ৫ ও ৬ নং (উডকাট) ১ ২ ৩ ৭ ১১ ১৫ নং লিনোকাট। এই গুলি এবং অন্য কাজগুলিতে আপাতে দুর্বোধ্যতা থাকলেও আসলে সেগুলি যে দুর্বোধ্য নয় ক্যাপশন পড়েই তা বোঝা যায়। কিন্তু আরো বেশি খুশি করেছেন স্কেচে। প্রথম (খোটে মূতের সম্মুখের পদ-যুগল লক্ষণীয়) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছবি চমৎকার।

সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। অঞ্জনকুমার রায়। প্রাপ্তিস্থান ১৮ এল টেমার লেন। কোলকাতা-৯। দাম ছয় টাকা।

চ্যাটার্জী এন্ড কোম্পানীর রহস্যময় অগ্নিকান্ড কোম্পানীর দীর্ঘকালের কর্মী অতীন হাজরার মৃত্যু ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এক জমাট রহস্য তৈরী করেছেন সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার লেখক অঞ্জনকুমার রায়। স্তরে স্তরে ঘনীভূত রহস্যের প্রতিটি গ্রন্থী নিপুণভাবে উন্মোচিত করেছেন লেখক। শেষ পর্যন্ত গল্পের টান পাঠককে টেনে রেখেছে চুম্বক টানে। পাকা লেখকের মতোই তিনি রহস্যের জালটি ছড়িয়ে দিয়েছেন একাধিক চরিত্রের ওপরই। বারবারই প্রশ্ন জেগেছে কে হত্যাকারী? চরিত্রগুলোও মোটামুটিভাবে প্রাণবন্ত হয়েছে। লেখকের গদ্য বেশ দুর্বল। ছাপার ভুলও বিরক্তি উৎপাদন করে। প্রচ্ছদ চলনসই।

মাঠ পাথারের গান। অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। স্টাডিজ ২২ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। দাম ২-৫০।

কবি শিল্পী হিসাবে অরুণ চট্টোপাধ্যায় রসিক বিদগ্ধ মহলে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে অন্ততঃ চারখানি কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন। গ্রামে গঞ্জে মাঠে পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা অতি সাধারণ মানুষের মূলতঃ আদিবাসী সাঁওতালদের ভাবনা ও ভাষার পটভূমিতে লোকগীতির আদলে রচিত 'মাঠ পাথারের গান' কাব্যগ্রন্থে তাঁর শিল্পী মনের নতুন পরিচয় পাই। একদিকে সহজ মানুষের হৃদয়ের সরল আবেগ অন্য দিকে সচেতন শ্রেণী সচেতন সমাজ ভাবনা ঃ দুয়ের সংমিশ্রণ এখানে একমেয়তায় রূপায়িত হয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য এর অনেকগুলি রচনা কলকাতা ও বাইরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীতরূপে পরিবেশিত হয়েছে বিশিষ্ট গায়কদের দ্বারা। ছাপা কাগজ খুব ভাল স্বয়ং কবির কৃত প্রচ্ছদ অত্যন্ত উচ্চমানের।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

চিত্রকল্প। তৃতীয় খন্ড চতুর্থ সংখ্যা। ১৩৮১। দাম আড়াই টাকা। প্রকাশক সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা। ২ চৌরঙ্গী রোড। কলিকাতা-১০।

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত এই পত্রিকাটি ইতি-মধ্যেই ঐ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই সংখ্যায় পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামল সেন সমু দত্ত এবং অশোক মজুমদারের লেখা পত্রিকাটির মূল্য বাড়িয়েছে। ছাপা পরিচ্ছন্ন

সাহিত্য মেলা। সম্পাদক পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ২৮।১ মান্নাপাড়া রোড। কোলকাতা-৫০। দাম এক টাকা।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং সারা বাংলা সাহিত্য মেলার সংবাদ, নেপালী কবিতার অনুবাদ যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য নচিকেতা ভরদ্বাজের কবিতা এবং সমীর চৌধুরী ও রাধু গোস্বামীর গল্প এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। ছাপা মোটা-মুটি পরিচ্ছন্ন।

লোকসেবক—সম্পাদক ঃ মুকুল রায়চৌধুরী। ৮৬এ, আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪।

শারদীয় লোকসেবক বিভিন্ন রচনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আকর্ষণীয় গল্প, রম্য-রচনা, একগুচ্ছ কবিতা প্রবন্ধ এবং রহস্য উপন্যাস রয়েছে। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ঃ নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, অজিত চক্রবর্তী, কালিদাস রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ চৌধুরী, সুনীল বসু, জীবন সরকার, সত্যজিৎ রায় আশীষতরু মুখো-পাধ্যায়, কৃত্তিবাস ওঝা, অজয় বসু ও আরো অনেকে।

চারুকলার এক বিস্মৃত পুরুষ

হেনরী হোভার লক

কমল সরকার

উনিশ শতকে শিক্ষায়তনের পরিবেশে চারুকলা অনুশীলনের যে সূচনা তার আদি-পর্বের যাঁরা শিক্ষাদাতা তাঁরা সবাই ছিলেন বিদেশী। সেই বিদেশী শিক্ষাব্রতীদের অনেকেই জীবনের দীর্ঘতম সময় এ-দেশেই অতিবাহিত করেন। জীবিকার প্রয়োজনে এসে এঁদের কেউ কেউ জীবনদানও করে গিয়েছেন এদেশে। এমন উৎসর্গিতপ্রাণ শিক্ষাব্রতীদের অন্যতম কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের প্রথম প্রিন্সিপাল হেনরি হোভার লক।

বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এদেশে চারুকলা অনুশীলনের সূচনা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে। মাদ্রাজের ইংরেজ সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ডাঃ অ্যালেকজ্যান্ডার হান্টার ভারতের প্রথম চারু-কলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তী সময়ে কলকাতা, বোম্বাই এবং জয়পুরে তিনটি চারুকলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। কলকাতা এ-বিষয়ে দ্বিতীয় এবং কলকাতার চারুকলা বিদ্যালয়ের জন্ম ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। বিদ্যা-লয়টির তখন নাম ছিল 'স্কুল অব ইণ্ডা-স্ট্রিয়াল আর্ট'। কর্ণেল গুডউইন, হজসন প্র্যাট, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড লং, সিসিল বিডন, ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী প্রমুখ আরও কয়েকজন ভারতীয় ও ইংরেজের প্রচেষ্টায় কলকাতার এই বেসর-কারী আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

মুখ্যত ললিতকলার ব্যবহারিক শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয় প্রতি-ষ্ঠার প্রায় দশ বছর পর অর্থাৎ ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে তদানীন্তন লেফটানেন্ট গভর্ণর স্যার সিসিল বিডন-এর উদ্যোগে এই বেসর-কারী শিক্ষায়তনটির পরিচালনাভার সরকার গ্রহণ করেন।

১৮৬৪ খৃস্টাব্দে সরকার কর্তৃক ভার গ্রহণের সময় 'স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটি ইংল্যাণ্ডের সাউথ কেনসিংটন মিউ-জিয়ামের কাছে কলকাতার এই চারুকলা শিক্ষায়তনের জন্য একজন প্রিন্সিপাল চেয়ে পাঠান। কলকাতার অনুরোধের উত্তরে সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামের অধীন 'গভর্ণমেন্ট স্কুল অব ডিজাইন' থেকে যাঁকে প্রিন্সিপাল মনোনীত করা হয় তিনিই হেনরি হোভার লক।

১৮৩৭ খৃস্টাব্দের ৮ মার্চ ইংল্যাণ্ডে হেনরি হোভার লকের জন্ম। লণ্ডনের নিকট-বর্তী সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামে অব-স্থিত 'গভর্ণমেন্ট স্কুল অব ডিজাইন'-এ তাঁর চারুকলা অনুশীলন। সাউথ কেনসিং-টনের স্কুল অব ডিজাইনে লকের সহপাঠী-দের মধ্যে যাঁরা পরবর্তী সময়ে চারুকলার শিক্ষক হয়ে ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে জন লকউড কিপলিং এবং জন গ্রিফিথস সুপরিচিত।

সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম অর্থাৎ ইংলন্ড থেকে চারুকলার শিক্ষক হয়ে যিনি প্রথম ভারতে এসেছিলেন তিনিই হেনরি লক। হেনরি লকের পরে দ্বিতীয় যে শিক্ষককে সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম ভারতে পাঠিয়েছিলেন তিনি জন লকউড কিপলিং। জন লকউড কিপলিং বোম্বাইয়ের স্যার জে জে স্কুল অব আর্টের প্রথম প্রিন্সি-পাল হয়ে ভারতে আসেন। পরে লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্টের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বিশ্ববিশ্রুত কবি রুডইয়ার্ড কিপলিং তাঁরই পুত্র এবং জন লকউডের বোম্বাই অবস্থানকালেই রুডইয়ার্ডের বোম্বাইতে জন্ম হয়।

সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে ভারতে প্রেরিত তৃতীয় শিক্ষক জন গ্রিফিথস। তিনিও বোম্বাইয়ের স্যার জে জে স্কুল অব আর্টে অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বোম্বে আর্ট সোসাইটির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। তাঁর আঁকা অজন্তার চিত্রাবলী বোম্বাইতেই বোম্বে আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই চিত্রগুলি উনিশ শতকেই গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছিল।

হেনরি হোভার লক (১৮৩৭-৮৫)

ভারত-চিত্রকলার প্রখ্যাতনামা ভাষ্যকার, অনুরাগী প্রবক্তা এবং অবনীন্দ্রনাথের 'গুরু' আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেলও এই সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে মনোনীত হয়ে প্রথম ভারতে আসেন। তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড কিম্বার্লি কর্তৃক মনোনীত হয়ে হ্যাভেলের মাদ্রাজে আগমন ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে। সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে প্রেরিত চারুকলা শিক্ষকদের মধ্যে তিনি চতুর্থ ব্যক্তি। সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে ভারতে আসার জন্য মনোনীত হবার পর ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ৫ নভেম্বর লণ্ডনের টাইমস সংবাদপত্রে এ সংবাদ প্রথম প্রচারিত হয়। হ্যাভেলের নিয়োগ সম্পর্কিত টাইমস-এর সে সংবাদ উদ্ধারযোগ্য :

> "Lord Kimberly has just appointed Mr. Havell, of the Science and Art Department at South Kensington, to the Superintendentship of the Madras School of Art. Mr. Havell's is the fourth appointment of this kind that has been made from South Kensington."

হ্যাভেলের ভাস্কর্য ও চারুকলা শিক্ষাও ঐ গভর্ণমেন্ট স্কুল অব ডিজাইনে। অবশ্য হ্যাভেলের যখন ললিতকলা অনুশীলন তখন সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামের স্কুল অব ডিজাইনের নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'রয়্যাল কলেজ অব আর্ট'। তাই হ্যাভেল এ আর সি এ অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েট অব দি রয়্যাল কলেজ অব আর্ট। মাদ্রাজে আগমনের প্রায় বারো বছর পর ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে হ্যাভেল কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সাউথ কেনসিংটনের স্কুল অব ডিজাইনে ছাত্র থাকাকালে হেনরি লক এক ছাত্র আন্দো-লনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সেই ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করায় হাউস অব কমন্স থেকে এক অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হয়। অতঃপর কেনসিংটন মিউ-জিয়ামের পরিচালক স্যার হেনরি কোল-এর মধ্যস্থতায় ছাত্র আন্দোলনের অবসান।

আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কৃতী ছাত্ররূপে হেনরি লক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন ছিলেন। তদানীন্তন বাংলা সরকার গঠিত কমিটি যখন স্কুল অব ডিজাইনের কাছে প্রিন্সিপাল প্রেরণের অনুরোধ জানায় তখন গভর্ণমেন্ট স্কুল অব

ডিজাইন হেনরি লককেই মনোনীত করেন। লকের ছাত্রজীবনের কথা কলকাতার ইংলিস-ম্যান' সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয় তাঁর পরলোকগমনের পর। 'ইংলিসম্যান'-এর সে-সংবাদে বলা হয়েছিল ঃ

"One of the reminiscences of his students days was a revolt againt the authority of the School, which attracted considerable attention of his time. A committee of the House of Commons inquired into the matter, but, mainly through the tact of the late Sir Henry Cole, the affair was tied over without serious consequences to anyone. Although Mr. Locke had taken an active part in the mutiny, he was recommended by South Kensington for the post of Principal of the Calcutta School of Art, to which he was duly appointed."

১৮৬৪ খৃস্টাব্দের ২৯ জুন মাত্র সাতাশ বছর বয়সে হেনরি লক কলকাতার স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট-এর প্রথম প্রিন্সিপালরূপে কর্মভার গ্রহণ করেন। লকের যোগদানের পর শিক্ষায়তনের নাম হয় গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্ট। হেনরি লকের পরিচালিত এই চারুকলা বিদ্যালয়ই আজকের 'গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট'। হেনরি লক সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে কুড়ি বছর অধ্যক্ষ রূপে জড়িত ছিলেন। উনিশ শতকের বহু কৃতী শিল্পীর অনেকেই ছিলেন তাঁর ছাত্র। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার প্রবর্তন তিনিই করেন। তাঁরই উদ্যোগে একাধিকবার পুনর্গঠিত হয় পাঠ্যসূচী। অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, শ্যামাচরণ শ্রীমানী ও আর বি লসন প্রমুখ কৃতী ছাত্রকে তিনিই প্রথম বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেন।

উনিশ শতকের বহু সাড়া জাগানো গ্রন্থে, নানা ঐতিহাসিক গৃহ ও উপাসনা মন্দিরে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের একাধিক গবেষণামূলক কাজে লকের ছাত্রদের শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর আজও বর্তমান।

লকের নেতৃত্বে সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নৈপুণ্য প্রদানের সর্বাধিক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত সেণ্ট পিটার্স চার্চের অলংকরণ। ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে অবস্থিত সেণ্ট পিটার্স চার্চটির আভ্যন্তরীণ অলংকরণ এবং ফ্রেস্কো রচনার কাজে লক সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নিয়োজিত করেন। আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নৈপুণ্য প্রদানের উদ্দেশ্যেই তাঁর একাজ গ্রহণ। তাঁর এদেশে আগমনের এক বছরের মধ্যেই ছাত্ররা একাজ সম্পন্ন করেন।

পরবর্তী সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জন্যও লকের ছাত্ররা কাজ গ্রহণ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রদর্শশালার জন্য বিভিন্ন জাতির মানুষের আবক্ষ মূর্তি এবং জন্তু-জানোয়ারের দেহের অংশ রচনা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অধ্যক্ষ লক এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ এবং ছাত্রদের মধ্যে তা সমভাবে বন্টন করেন।

১৮৬৮-৬৯ খৃস্টাব্দে বাংলা সরকারের অনুরোধে পুরাতত্ত্ববিদ ডকটর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওড়িশার প্রাচীন স্থাপত্য ও শিল্পকলার এক সমীক্ষা করেন। ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি মন্দির, স্তূপ, গুহা শিলালেখ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর সেই সমীক্ষার ফলশ্রুতি 'অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা' নামের দুটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থ দুটি মুদ্রণের জন্য ১৮৭২ খৃস্টাব্দে ভারত সরকার সাড়ে সাত হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজেন্দ্রলালের এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা-র প্রথম খণ্ডে ৩৬টি লিথোগ্রাফ এবং ৫০টি কাঠ খোদাই চিত্র আছে এবং এ-গ্রন্থের চিত্রগুলির নেপথ্যে রয়েছেন হেনরি লকের একাধিক কৃতী ছাত্র।

ওড়িশা ভ্রমণের আগেই রাজেন্দ্রলাল ঠিক করেছিলেন যে তাঁর এ গ্রন্থ সচিত্র হবে। মন্দির, চৈত্য, গুহা ও স্তূপের সম্ভাব্য সমস্ত নিদর্শন গ্রন্থে সংযোজিত হবে এবং সে চিত্রগুলি অঙ্কনের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, রাজেন্দ্রলালের এই সাড়া জাগানো গ্রন্থ রচনায় হেনরি লকের অবদান অসামান্য। তাঁরই নির্দেশে সরকারী আর্ট স্কুলের কয়েকজন ছাত্র প্রধান শিক্ষক ডি গ্যারিকের নেতৃত্বে একাধিকবার ওড়িশা ভ্রমণ ও চিত্র অঙ্কন করেন। রাজেন্দ্রলালের এ-গ্রন্থের দুটি খণ্ডেই হেনরি লকের ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচি, গোপালচন্দ্র পাল, কালিদাস পাল, হরিশচন্দ্র খাঁ, উদয়চাঁদ সামন্ত প্রমুখ শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত দেখা যাবে।

রাজেন্দ্রলাল হেনরি লকের এই অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা-র মুখবন্ধে। লকের উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন ঃ

"In the course of compiling this work I have derived assistance from several gentlemen, to whom I wish to avail myself of the present opportunity publicly to tender my thanks. H. H. Locke, Esq., Principal of the Calcutta School of Art, has helped me most materially in a variety of ways. When I was proceeding of my tour, he placed at my disposal the services of one of his best pupils, Annadaprasad Bagchi, who accompanied me to Orissa, and took sketches and plans of a large number of interesting objects."

রাজেন্দ্রলালের অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা' রচনার অন্তর্বর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'দি থ্যানাটোফিডিয়া অব ইন্ডিয়া ঃ বিইং এ ডেসক্রিপশান অব দি ভেনোমাস স্নেকস অব দি ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা'। উনিশ শতকের কলকাতার প্রথিতযশা ইউরোপীয় শল্য-চিকিৎসক ডাঃ যোশেফ ফেরার-এর ভারতীয় বিষধর সর্প সম্পর্কিত সচিত্র এই গ্রন্থটি বিগত শতকের মুদ্রণ চাতুর্যের এক অভিনব দৃষ্টান্ত। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি বড়লাট লর্ড মেয়োকে উৎসর্গ করা হয়। বৃহৎ আকারের এ গ্রন্থে সর্পকুলের ২৯টি প্লেটের শিল্পী হেনরি লকের ছাত্ররা। ডাঃ ফেরার-এর এই অকল্পনীয় গ্রন্থের রূপদানের জন্য তিনি হেনরি লকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ইউরোপীয় শিল্পীদের দ্বারা ভারতীয় সর্পের রূপদান অসম্ভব, একথা মনে রেখেই তিনি হেনরি লকের কাছে গিয়েছিলেন। শল্য-চিকিৎসক ডাঃ ফেরার-এর অনুরোধে তাঁর শিল্পীবাহিনীর শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের নিযুক্ত করেন একাজে। দি থ্যানাটোফিডিয়া অব ইন্ডিয়া গ্রন্থের সমস্ত চিত্রগুলি অঙ্কন ও তার লিথোগ্রাফ করেন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, হরিশচন্দ্র খাঁ নিত্যানন্দ দে ও বিহারীলাল দাস। লকের নির্দেশে সাপুড়েদের কাছ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল নানা বিষধর সাপ এবং জীবন্ত সাপ দেখে আঁকা হয়েছিল এই স্মরণীয় গ্রন্থের অধিকাংশ চিত্র।

লক নিজেও ছিলেন চিত্রশিল্পী। কিন্তু একটি মাত্র কাজ ছাড়া আজ তাঁর চারুকলা চর্চার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্তের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। লকেরই কয়েকজন ছাত্র বিগত শতকে 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' নামে চারুকলার এক মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম চারুকলার সাময়িক। ১২৯২ বঙ্গাব্দের (১৮৮৫) আষাঢ় মাসে 'শিল্প-পুষ্পাঞ্জলির আত্মপ্রকাশ কলকাতায়। অন্নদা-প্রসাদ বাগচী, শরচ্চন্দ্র দেব কালিদাস পাল বিহারীলাল রায় অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী ও শিক্ষকেরা পত্রিকাটির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য ছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'কলিকাতার ইতিহাস' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনায় লিখিত আছে যে, গভর্ণমেণ্ট হাউস অর্থাৎ বর্তমান রাজভবনের একটি হলঘরের সিলিং-এ যে অলংকরণ আছে তার শিল্পী হেনরি লক।

দীর্ঘদিন পরে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ভারতের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড কার্জন রচিত 'ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইন ইন্ডিয়া' (১৯২৫) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি'-র মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

সরকারী আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণের পরই লক তদানীন্তন গভর্ণ-

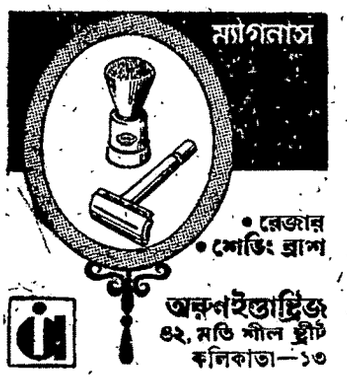

মেন্ট হাউসের মার্বেল হল-এর সিলিং অলংকরণের কাজ গ্রহণ করেন। উই পোকার আক্রমণের জন্য সে সময় মার্বেল হলের সিলিং-এর কাঠের অংশগুলি বর্জন করা হয়। নতুন কাঠের সিলিং ব্যবহারের সময় ভাইসরয় স্যার জন লরেন্স লককে অলংকরণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। পরিণামে লকের এক্কাজ গ্রহণ।

লকের এই একটিমাত্র কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর পরলোকগমনের বহু পরে লর্ড কার্জন তাঁর ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> "It was not till Sir John Lawrence came in 1865 that the present coffered wooden ceiling was substituted for it. I believe that the present designs in white and gold were the work of Mr. H. H. Locke, formerly Principal of the Calcutta School of Art."

শিক্ষকতা ছাড়াও চারুকলা সম্পর্কিত নানা স্মরণীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানগুলির পর্যালোচনায় লকের সংগঠন শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় প্রথম সর্ব ভারতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন ১৮৭১ খৃস্টাব্দে। এ চিত্র প্রদর্শনীর নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফাইন আর্ট এক্জিবিশান'। ভাইসরয় লর্ড মেয়োর পৃষ্ঠপোষকতায় ড্যালহৌসি ইনস্টিটিউটে (অধুনা বিলুপ্ত) অনুষ্ঠিত সে প্রদর্শনীর সঙ্গে হেনরি লকের কোন সম্পর্ক ছিল কি না তা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। যদিও লক সে সময়ে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন, তবুও এই প্রদর্শনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন সংবাদেই তাঁর নামোল্লেখ নেই। তবে আর্ট স্কুলের ছাত্ররা যে এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। লকেরই ছাত্র দেবেন্দ্র মল্লিকের তৈলচিত্র 'স্পিরিটেড গ্রুপ অব হর্সেস' এই প্রথম প্রদর্শনীতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা উল্লেখযোগ্য।

ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় শিল্পীরাই ছিলেন এই প্রদর্শনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিযোগী। প্রদর্শনীর সব পুরস্কারের প্রাপকও ছিলেন তাঁরা। ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রাধান্য-প্রভাবিত সেই প্রদর্শনীতে সৌখীন শিল্পী দেবেন্দ্র মল্লিকের চিত্র ভাইসরয় এবং প্রদর্শনী সমিতির সভাপতি হিউ স্যানডেম্যানের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্র মল্লিকের এই স্মরণীয় চিত্রটি মার্বেল প্যালেসে রক্ষিত আছে।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় 'ক্যালকাটা ফাইন আর্ট এক্জিবিশান' অনুষ্ঠিত হয় তিন বছর পর ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের লাল বাড়িতে দ্বিতীয় প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। এ প্রদর্শনীর সংগঠনের মূলে ছিলেন হেনরি লক। দ্বিতীয় প্রদর্শনীর তিনি অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তাঁরই উদ্যোগে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং জয়পুরের আর্ট স্কুলের ছাত্রদের শিল্পকর্ম ইউরোপীয় শিল্পীদের শিল্পকলার সঙ্গে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়।

দ্বিতীয় প্রদর্শনীতেই আর্ট স্কুলের ছাত্রদের অগ্রগতি এবং কৃতিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে সবার কাছে। জল ও তেলরঙে আঁকা ছাত্রদের নানা চিত্রের শিল্পনৈপুণ্য স্বীকৃত হয় ছোটলাট রিচার্ড টেম্পলের ভাষণে। এই প্রদর্শনীতে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রেরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র খাঁ এবং অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর নাম উল্লেখ করে রিচার্ড টেম্পল প্রিন্সিপাল লককে অভিনন্দন জানান। কৃষ্ণনগরের স্বনামধন্য মৃৎশিল্পী যদুনাথ পাল এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীতেই মৃন্ময়মূর্তি রচনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

কলকাতার এই দ্বিতীয় সরকারী প্রদর্শনী অপর একদিক থেকে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। কারণ, এই প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটনের সময় বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক কলকাতায় স্থায়ী একটি আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম ঘোষণা করেন।

১৮৭৬ খৃস্টাব্দের ৬ এপ্রিল বৈঠকখানা-বউবাজারে নতুন আর্টস্কুলের নতুন বাড়িতে বড়লাট নর্থব্রুক কলকাতা তথা ভারতের প্রথম পাব্লিক গ্যালারি অব আর্ট-এর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। গ্যালারির প্রথম তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ কীপার নিযুক্ত হন হেনরি লক। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগে পটলডাঙা অর্থাৎ মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু চিকিৎসা বিভাগের কাছে অবস্থিত বাড়ি থেকে বউবাজারের নতুন বাড়িতে উঠে আসে আর্ট স্কুল। আর্ট গ্যালারির উদ্বোধনের সঙ্গে নতুন বাড়িতে আর্ট স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও করেন বড়লাট নর্থব্রুক।

হেনরি লকের সাংগঠনিক উদ্যোগের অন্যতম দৃষ্টান্ত কলকাতার তৃতীয় সরকারী প্রদর্শনী। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে আর্ট স্কুলের বউবাজারের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এই চিত্র প্রদর্শনীর দুজন অবৈতনিক সম্পাদকের অন্যতম ছিলেন হেনরি লক। অপরজন হাবার্ট হোপ রিজলি। বড়লাট লর্ড লিটন তৃতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

তৃতীয় প্রদর্শনীর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই প্রদর্শনীতে প্রথম একজন ভারতীয় শিল্পী সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভাইসরয়স প্রাইজ-এ সম্মানিত হন। বোম্বাইয়ের পার্শি শিল্পী পেস্টনজি বোমানজি তাঁর 'হেড অব এ গোঁসাই' প্রতিকৃতি চিত্রটির জন্য বড়লাট প্রদত্ত পুরস্কারে সম্মানিত হন। ইউরোপীয় শিল্পীদের গতানুগতিকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার-প্রাপ্তির অবসান এই তৃতীয় প্রদর্শনীতে।

হেনরি লকের ছাত্রদের এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ প্রসঙ্গে সে যুগের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ (৭ জানুয়ারি ১৮৭৯) লেখা হয় ঃ

> গভর্ণমেন্টের শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ৩০খানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে ১৬ খানি দেশীয় কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র আছে। তন্মধ্যে মান্দ্রাজ হইতে ২, বোম্বাই হইতে ১ এবং বাকি বাংলা হইতে প্রদত্ত।

সরকারী আর্ট স্কুলের একাধিক ছাত্রও এই প্রদর্শনীতে নানা পুরস্কারে সম্মানিত হন। পরবর্তী যুগের যশস্বী প্রতিকৃতি শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই তৃতীয় প্রদর্শনীতেই আত্মপ্রকাশ। হেনরি লকের কৃতী ছাত্র বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তৈলাঙ্কিত 'জাগলার অ্যান্ড মংকি' চিত্রটির জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। মতিলাল পাল নবকুমার বিশ্বাস এবং অন্নদাপ্রসাদ বাগচী প্রমুখ ছাত্র এই প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হন।

বিবিধ স্মরণীয় প্রদর্শনী বহু সংস্থা ও চিত্রকলা আন্দোলনের অগ্রদূত হেনরি লক সে যুগে মহাত্মা রূপে পরিচিত ছিলেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও তাঁকে ঐ সম্মানে অভিহিত করেছেন বহুবার।

নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় এই আন্দোলনের প্রথম যুগে ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথও হেনরি লকের দৃষ্টান্ত ছাত্রদের সামনে উত্থাপন করেছিলেন।

হ্যাভেলের ভারতে আসার বহু আগে হেনরি লকই প্রাচীন ভারতের শিল্প ঐতিহ্য

সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজকে সচেতন করেন। লকের পরলোকগমনের বহু পরে অবনীন্দ্রনাথ হেনরি লকের ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্য প্রীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন ঃ

'কিন্তু হায় তাঁহার আশা কতদূর সফল হইল। সেই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে আসিয়া যে মহাত্মা আমাদের শিল্প-শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন তাঁহার সেই মহৎ আশা আমরা কতদূর পূর্ণ করিলাম।'

সরকারী আর্ট স্কুলের জিওমেট্রিক্যাল ড্রইং শিক্ষক শ্যামাচরণ শ্রীমানী রচিত 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্প-চাতুরী' গ্রন্থকে উপলক্ষ করে অবনীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য। নাট্যকার ও কবি শ্যামাচরণ শ্রীমানীর এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষার প্রথম শিল্প ও চারুকলা সম্পর্কিত গ্রন্থ। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শ্যামাচরণ তাঁর এই গ্রন্থে ভারতের দেব-দেউল, গুহা, স্তূপ প্রভৃতির নির্মাণ রীতি অর্থাৎ স্থাপত্যবিদ্যা এবং ভাস্কর্য, গুহাচিত্র ও চিত্রবিদ্যার প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। লকের অধীনে সরকারী আর্ট স্কুলেই শ্যামাচরণের চিত্রবিদ্যা অনুশীলন। সেহেতু তিনি আর্য জাতির শিল্প-চাতুরী গ্রন্থটি হেনরি লককেই উৎসর্গ করেন।

গ্রন্থ প্রাপ্তির পর শ্যামাচরণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন প্রসঙ্গে হেনরি লক যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা শ্যামাচরণের গ্রন্থে সংযোজিত হয়। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে সরকারী আর্ট স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এক ছাত্র সমাবেশে ভাষণদানকালে অবনীন্দ্রনাথ শ্যামাচরণের গ্রন্থে যুক্ত মহাত্মা হেনরি লকের অভিনন্দনবার্তার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্য প্রীতির উল্লেখ করেন।

শ্যামাচরণকে লিখিত হেনরি লকের অভিনন্দনবার্তার এক অনুবাদও করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ হেনরি লকের ভারতীয় শিল্প-প্রীতির এক স্মরণীয় দলিল। অতএব অবনীন্দ্রনাথের অনুবাদের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হলো ঃ

'প্রিয় শ্যামাবাবু, তোমার উপহৃত পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিলাম—আর্যজাতির শিল্প-চাতুরী সম্যকভাবে আলোচনা করিতে হইলে যে সুযোগ তত্ত্বানুসন্ধান এবং শিক্ষার প্রয়োজন তাহা এ পর্যন্ত তোমার স্বদেশীয়গণের নিকট সুপ্রাপ্য ছিল না এবং সেই কারণেই বঙ্গবাসীগণ একদিকে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পথে যেমন অধ্যবসায় এবং প্রশংসার সহিত অগ্রসর হইতেছেন অন্যদিকে তেমনি শিল্পচর্চা সম্বন্ধে একেবারে মনোযোগ দিতেছেন না। ভারতের পুরাতন শিল্প-কলার সম্যক চর্চা করিতে হইলে যে অবকাশ এবং সুযোগ ও শিক্ষার প্রয়োজন, আমি জানি তাহা তোমার নাই; তথাপি তুমি তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তাঁহাদের মাতৃ-ভাষায় তোমাদের পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব শিল্পকলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিবার জন্য এই যে পুস্তক রচনা করিয়াছ, ইহার জন্য ভারতীয় শিল্পের বহুল প্রচারেচ্ছু ব্যক্তমাত্রেরই নিকট তোমার এই স্বল্প চেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার্হ।'

হেনরি লকের শেষ জীবন বেদনাদায়ক। সরকারী প্রশাসনের হৃদয়হীন আচরণ তাঁর শিক্ষাব্রতী জীবনের কোন মূল্যায়ন সেদিন করেনি। তাঁর দুই দশকের কর্মজীবনের সমাপ্তির কারণ যেমন অজ্ঞাত তেমনি অদ্ভুত। অবসর গ্রহণের আগেই সরকারী নির্দেশে তিনি বাধ্যতামূলক ছুটি নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই বাধ্যতামূলক ছুটির মাধ্যমেই তিনি অপসারিত হন এবং তাঁর অপসারণের মূলে তাঁরই পরিচালিত অপর এক প্রতিষ্ঠান—'ইকনমিক মিউজিয়াম'।

লেফট্যানেন্ট গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের উদ্যোগে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে হেস্টিংস স্ট্রীটে ইকনমিক মিউজিয়াম নামে ভূমিজাত দ্রব্যের শিল্প এবং চারু ও চারুকলা বিষয়ক এক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময়ে স্যার জর্জ ক্যাম্বেল হেনরি লককে এই সংগ্রহশালার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষতার সঙ্গে তিনি এই মিউজিয়ামের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার হেনরি টবি প্রিন্সেপ ইকনমিক মিউজিয়ামের পরিচালন সমিতির সভাপতি ছিলেন।

১৮৮৩-৮৪ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ ইকনমিক মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বছর পর নিউ সাউথ ওয়েলস নিবাসী জনৈক জুলে জোবার্টের পরিকল্পনায় ভারত সরকারের উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম এক ইন্টার-ন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বড়লাট লর্ড রিপন মিউজিয়ামের সামনে ময়দানে এই বৃহৎ প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রস্তুতি-পর্বে ইকনমিক মিউজিয়ামের সভাপতি স্যার হেনরি টবি প্রিন্সেপ এবং সম্পাদক হেনরি লকের মধ্যে অজ্ঞাত এক বিষয়ে মতানৈক্য হয়। তাঁদের মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করায় তৎকালীন ছোটলাট স্যার অ্যাশলি ইডেন হেনরি লককে বিচারপতি প্রিন্সেপের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেন। কিন্তু লক ছোটলাটের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই কারণে তিনি ছোটলাট অ্যাশলির বিরাগ-ভাজন হন এবং সরকারী নির্দেশে অসুস্থতা হেতু তাঁর দীর্ঘ ছুটি গ্রহণ এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

প্রায় দু বছর তিন মাস পর ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে অসুস্থ অবস্থায় লকের কলকাতা প্রত্যাবর্তন। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদে যোগ দিতে দেওয়া হলেও ইকনমিক মিউজিয়ামের সম্পাদকের পদ তিনি ফিরে পান নি। অসুস্থ শরীর নিয়ে প্রায় এক বছর পাঁচ মাস অধ্যক্ষতার পর কলকাতাতেই তাঁর পরলোকগমন।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দের বড়দিনের আগের দিন চৌরঙ্গী এলাকায় ওয়াটারলু হোটেলে এক যন্ত্রসঙ্গীতের ঐকতান সভায় তিনি যোগ দেন এবং ঐ হোটেলেই মাত্র আট-চল্লিশ বছর বয়সে হৃদরোগে ২৪ ডিসেম্বর তাঁর পরলোকগমন। পরের দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর তাঁর মরদেহ লোয়ার সার্কুলার রোড সেমিট্রিতে সমাহিত করা হয়।

হেনরি লকের আকস্মিক পরলোকগমনের সংবাদে চারুকলা অনুরাগী প্রতিটি মানুষই সেদিন মর্মাহত হয়েছিলেন। নানা সংবাদপত্রে সেদিন প্রতিধ্বনিত হয় শোকাভিভূত চারুকলা অনুরাগীদের মর্মবেদনা।

১২৯২ বঙ্গাব্দের ১৯ পৌষ 'সঞ্জীবনী' সংবাদপত্রে লকের পরলোকগমনের যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা তাঁর কর্মজীবনের এক সমীক্ষারূপে পরিগণিত হতে পারে। লক্ষ্যণীয় লকের জীবন পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ত্রুটী-বিচ্যুতিরও সমালোচনা করে সঞ্জীবনী এবং এ সমালোচনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে হেনরি লকের মহত্ত্ব ও অবদান। সেহেতু সঞ্জীবনী-র সে রচনা উদ্ধার করা হলো ঃ

'...মিঃ লক লাহোর শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মিঃ কিপলিং ও বোম্বাই শিল্প-বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেডেন্ট মিঃ গ্রিফথসের সহিত বিলাতের কেনসিংটন কলেজে একত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং উক্ত কলেজের কর্তৃপক্ষদিগের বিশেষ অনুরোধেই তিনি প্রায় ২২ বৎসর পূর্বে কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল পদে অভিষিক্ত হন।

কিন্তু লকের মেজাজ বড় ভাল ছিল না। বিচক্ষণ কার্যপটু ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইয়াও সামান্য ত্রুটিতে তাঁহার অন্তরে ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিত সেই জন্য তাঁহার নামে একটু কলঙ্ক পড়িয়াছে। এই অপরিহার্য ক্রোধের হাত এড়াইতে না পারিয়াই...সভাপতি জস্টিস প্রিন্সেপ সাহেবের সহিত সাধারণের অজানিত কোন এক বিষয় লইয়া লকের বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদ ঘনীভূত হইয়া মেলার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়। বিবাদের সময় লক অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন—পীড়িতাবস্থায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়াতে তিনি সভাপতির নিকট অবনত হইতে পারিলেন না। ...এই সময়ে ইডেন সাহেব বঙ্গের ছোটলাট ছিলেন। তিনি নিজে প্রদর্শনী সম্বন্ধে লকের ন্যায় একজন সুদক্ষ ব্যক্তি মেলার ভার এমন সুফল উচ্চ দরের কথা লিখিয়া লক

•ঘড়ি•
•জড়োয়া গহনা•
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

সাহেবকে বিবাদ মিটাইবার জন্য গোপনে অনুরোধ করেন। কিন্তু তত্রাচ লকের অটল প্রতিজ্ঞার ব্যত্যয় হইল না। তিনি রাজপুরুষদিগের ক্রোধে পড়িয়া মিউজিয়ামের কর্ম হইতে কলে-কৌশলে অপসৃত হইবার জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের বিশেষ পীড়াপীড়িতে আড়াই বৎসর ফার্লো লইয়া বিলাত গমন করিতে বাধ্য হইলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর মিউজিয়ামের কর্ম পাইলেন না।...

অনেকেই তাঁহার ঔদ্ধত্য ও খিটখিটে মেজাজের পরিচয় দিয়া যথেষ্ট নিন্দা করিয়া থাকেন কিন্তু আমরা শুদ্ধ নিন্দায় কর্ণপাত করি না। আমরা বেশ জানি তিনি গুণীর গুণগ্রাহী ছিলেন কেবল অকর্মণ্যের পক্ষে ত্রাসস্বরূপ ছিলেন। কোন ভাল ছাত্র, যে তাঁহার অধীনস্থ সুদক্ষ কর্মচারীগণ কখনও তাঁহার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হন নাই।'

বাংলা পত্র-পত্রিকার মত সে যুগের প্রায় সব ইংরেজি সংবাদপত্রেই লকের পরলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং এ শোকসংবাদগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর অবদান। বিগত যুগের ইংলিসম্যান থেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"The sudden death of Mr. H. H. Locke, Principal of the School of Art, Calcutta, will be a painful shock to his many friends. Mr. Locke had been in different health for some time past, but he had not been complaining recently of

সুপার সার্ফ সবচেয়ে সাদা ক'রে ধোয়...

সবচেয়ে সাদা!

সুপার সার্ফের রয়েছে বেশি পরিষ্কার করার ক্ষমতা। এমনকি লুকোনো ময়লাও বের করে দিয়ে আপনার কাপড়কে এমনই ধবধবে সাদা করে তোলে যা দেখে অপরের মনে হিংসের উদ্রেক হয়। স্বাভাবিক কারণেই ভারতের সবচেয়ে সেরা ব্র্যাণ্ড ঃ সুপার সার্ফ!

হিন্দুস্তান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিমটাস-SU. 180-150-BG (R)

any accession of suffering, and his death occurred on Christmas eve with startling suddenness... On the establishment of the Bengal Economic Museum, he was appointed Secretary by Sir George Campbell.. Mr. Locke was an artist of great ability and refinement, and it would be difficult to estimate the services which he rendered to art in India during his twenty years of office. He might have done more in the way of original work had his health been better and his judgement less exacting, but whatever he set his hand to bore the evidence of artistic skill and sound training."

আটচল্লিশ বছর বয়সে লকের পরলোকগমন নিঃসন্দেহে এক অপূরণীয় ক্ষতি। সরকারী আর্ট স্কুলের কর্ণধাররূপে মৃত্যুর দুই দশক আগে যখন তাঁর কর্মভার গ্রহণ তখন এদেশে চারুকলা চর্চা অসার্থক এবং অপদার্থ মানুষের জীবিকা রূপেই পরিগণিত হত। স্বভাবতই চারুকলার প্রতি সে-যুগের শিক্ষিত মানুষের ছিল গভীর অনীহা। দুই দশকের অক্লান্ত পরিশ্রমে লকলতকলার প্রতি বাঙালী সমাজের অনাসক্ত মনোভাবের পরিবর্তন সাধনে সফল হয়েছিলেন তিনি। তাঁর এ সাফল্যের স্বাক্ষর নিহিত রয়েছে সরকারী আর্ট স্কুলের প্রতিটি বাৎসরিক প্রতিবেদনে। সে প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে হেনরি লকের যখন এই শিক্ষায়তনে যোগদান তখন সেখানে ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩। কিঞ্চিদধিক কুড়ি বছর পর যেদিন তাঁর পরলোকগমন সেদিন সরকারী আর্ট স্কুলে ১৩৯ জন শিক্ষার্থীর কল-কোলাহল।

উনিশ শতকে এদেশে চারুকলা আন্দোলনের যে ক্রমপ্রসার তা হেনরি লকের শিক্ষা ও পরিচালনারই ফলশ্রুতি। এ ফলশ্রুতির সীমা শিক্ষায়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধানের কাজে ব্রতী হওয়ার যে দৃষ্টান্ত তারও সূচনা লকের শিক্ষকতাকালেই সম্ভব হয়।

লকের ছাত্র ও সহযোগী শিক্ষক শ্যামাচরণ শ্রীমানীর নাম এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ডকটর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম মনে রেখেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে শ্যামাচরণ শ্রীমানীই বাংলা ভাষায় প্রথম প্রাচীন ভারতের ললিতকলা সম্পর্কিত গ্রন্থটি রচনা করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের সমসাময়িক নাট্যকার রূপে পরিচিত শ্যামাচরণ শ্রীমানীর ললিতকলা সম্পর্কিত আর্যজাতির শিল্পচাতুরী বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ। লকের শুভেচ্ছা নিয়েই এ গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ।

পরবর্তীকালে বঙ্গসমাজে ললিতকলা চর্চার প্রসারে শিল্পপুষ্পাঞ্জলি নামে যে সাময়িকপত্রটি গভীর অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে তা হেনরি লকেরই একাধিক ছাত্রের যৌথ প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। তদানীন্তন শিল্পীদের চারুকলা অনুশীলনের নিদর্শন বঙ্গসমাজে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল এই মাসিক।

এই সাময়িকপত্রটির আত্মপ্রকাশের কয়েক বছর আগে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে এ-দেশের শিল্পীদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আর্ট স্টুডিও। শিল্প রচনার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ যে সত্যিই সম্ভব তা সর্বপ্রথম লকের ছাত্ররাই প্রমাণ করেন ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও নামে এক চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৮৫ বউবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত এই চিত্রশালার প্রধান পরিচালক ছিলেন লকের যশস্বী ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রকাশিত দেব-দেবী ও পৌরাণিক ঘটনার রঙ্গীন লিথোগ্রাফ সে যুগে বাঙালার ঘরে ঘরে যখন প্রচারিত হয় তখন রাজা রবি বর্মার 'ওলিওগ্রাফ' সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে অপেক্ষমান এক অবিশ্বাস্য পরিকল্পনা। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিশুদের অক্ষর পরিচয় সম্পন্নের জন্যও সচেষ্ট হয় এই ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও। এঁদের প্রকাশিত ক্রমোলিথোগ্রাফিক আলফাবেট বোর্ড সে-যুগে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

হেনরি লকের নিষ্ঠার সৃষ্টি যে শিল্পীবৃন্দ তাঁরা আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত। চারুকলা আন্দোলনের ক্রমবিবর্তন এবং পালা বদলের ইতিহাসে তাঁরা আজ গবেষণার বিষয়। তবুও তাঁদের মধ্যে যাঁরা আজও স্মরণীয় তাঁদের অগ্রদূত অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। অন্নদাপ্রসাদের সঙ্গে গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মতিলাল পাল কালীধন চন্দ্র নবকুমার বিবাস বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্র চারুকলার নানা শাখায় কৃতিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ হন।

চারুকলা চর্চার অগ্রগতির সঙ্গে অতঃপর দেখা দিল শিল্পীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। সে প্রয়োজনীয়তার নেপথ্যে ছিল আরও এক উদ্দেশ্য—তা হলো আপামর মানুষের মধ্যে সুকুমারকলার প্রচার। তাই উনিশ শতকেই জন্ম নিল বাঙালীর নিজের চারুকলা সংস্থা 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দি প্রোমোশান অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ন্যাশনাল গ্যালারি'। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ চারুকলা সংস্থার নেপথ্যে গঙ্গাধর দে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় মন্মথনাথ চক্রবর্তী। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কার্তিকচন্দ্র নাগ প্রমুখ যে শিল্পীভাস্করেরা ছিলেন তাঁদের সকলেরই আদর্শ ছিলেন হেনরি লক।

পরবর্তীকালে লকের পরিচালিত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাধারায় শিক্ষিত হয়ে রোহিণীকান্ত নাগ শশিকুমার হেশ হরিনারায়ণ বসু রণদাপ্রসাদ গুপ্ত পরেশনাথ সেন যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ফণীন্দ্রনাথ বসু হিরন্ময় রায়চৌধুরী ললিতকলার জগতে যে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে গৌরবের যোগ্য। পরবর্তী যুগে এ উত্তরাধিকারের গৌরবে যে ছাত্রেরা গৌরবান্বিত তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ দাস প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার সতীশ সিংহ যামিনী রায় ও অতুল বসুর নাম স্মরণীয়।

অপরদিকে এ শতাব্দীর সূচনায় ১৯০৫ খৃস্টাব্দে জন্ম নিল বাঙালীর দ্বিতীয় চারুকলা সংস্থা 'বঙ্গীয় কলা সংসদ'। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মন্মথনাথ চক্রবর্তী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রণদাপ্রসাদ গুপ্ত ননীগোপাল গোস্বামী অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের আহ্বানে এগিয়ে এলেন বহু কৃতী শিল্পী। জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে স্থাপিত হয়েছিল বঙ্গীয় কলা সংসদের কার্যালয়।

বঙ্গীয় কলা সংসদ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে সরকারী আর্ট স্কুলে হ্যাভেলের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নন্দলাল বসু সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অসিতকুমার হালদার হাকিম মহম্মদ খান দুর্গেশচন্দ্র সিংহ ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ ছাত্র-শিষ্যদের নিয়ে চারুকলা অনুশীলনের যে নবযুগের সূচনা সেখানেও দেখি পরলোকগত হেনরি লকের প্রবল প্রভাব। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের সূচনায় হেনরি লকের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে যখন অবনীন্দ্রনাথকে উদ্যত দেখি তখনই মনে হয় হেনরি হোভার লকের আদর্শ ও ভাবধারা এদেশের ললিতকলা অনুশীলনের পালাবদলের ইতিহাসেও অক্ষুণ্ন ছিল। হেনরি লকের সার্থকতা সেখানেই সুপ্রমাণিত।

গোয়েন্দা ধাঁধা

গোয়েন্দা কবি পরাশর বর্মা ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হ্যাঁ, এ সেই পরাশর বর্মা যার নাম শুনলে কান খাড়া হয়ে ওঠে না এমন ছেলে-মেয়ে জোয়ান-বুড়ো কোথাও আজ আছে কিনা সন্দেহ।

সেই পরাশর বর্মার সঙ্গে কৃত্তিবাস ওঝার প্রথম পরিচয় হয় একটা পত্রিকার অফিসে। নাতিপ্রসিদ্ধ এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন কৃত্তিবাস ওঝা।

একদিন বিকেলে অত্যন্ত সাদাসিধে পোশাকের এক ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন সেই অফিসে। মাসের শেষ—কাগজ বার করবার তাড়ায় কৃত্তিবাস ওঝা তখন চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। তাই ভদ্রলোকের দিকে দৃষ্টি দেবার ফুরসৎ পাননি।

সকালবেলায় ছাপা কাগজের একটা ফর্মা দেখে তখন সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে গেছে কৃত্তিবাস ওঝার। সে ফর্মায় এমন একটা লেখা ছাপা হয়ে গেছে যা বেরুলে কাগজের কলঙ্কের আর সীমা থাকবে না। এমন কি মানহানির দায়ে পর্যন্ত পড়া অসম্ভব নয়। বাংলাদেশের কোন এক অপরাজেয় লেখকের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণ ছাড়া সে লেখা আর কিছুই নয়; যাকে বলে কাঁচা খেউড়-তাই দিয়ে কে একজন ছদ্মনামের লেখক তাঁর ওপর গায়ের ঝাল মিটিয়েছে। কে এই কপি ছাপতে দিয়েছে কে দিয়েছে 'প্রিন্ট অর্ডার' সেই কথাই রেগে আগুন হয়ে প্রিন্টার মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা।

মনোমোহন কিন্তু একেবারে ভেজা তুলসীপাতাটি। বললে—আজ্ঞে আমি আর লেখার ঝালটাক কি বুঝি বলুন; যা দেন তাই ছেপে দিই!'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন কৃত্তিবাস ওঝা—'যা দিই তাই ছেপে দাও! এ-লেখার প্রিন্ট-অর্ডার আমি দিয়েছি বলতে চাও?'

'আজ্ঞে আপনি না দিলে আর কে দেবে?'

'কই নিয়ে এস দেখি আমার প্রিন্ট-অর্ডার।'

'আজ্ঞে সঙ্গে করেই এনেছি।' বলে মনোমোহন সইকরা কাগজের তাড়াটা ফেলে দিল টেবিলের ওপর।

তুলে নিয়ে কৃত্তিবাস ওঝা একেবারে থ। সত্যি সত্যি তারই সই আর তারিখ। কাজের ভিড়ে কখন তাড়াতাড়িতে সই করে দিয়েছেন খেয়ালই নেই। ভাগ্যে সময় থাকতে লেখাটা চোখে পড়েছিল নইলে কাগজের সঙ্গে বাজারে বেরিয়ে গেলে আর কোনো উপায়ই থাকত না। এখন শুধু দুবার ছাপাবার মজুরিটুকু লোকসান দিয়েই কোনরকমে মান বাঁচানো যাবে।

বাজারে মান বাঁচলেও মনোমোহনের কাছে বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। তার দিকে না চেয়েই বললেন—'আচ্ছা এখন যাও, এ ফর্মা আবার নতুন করে ছাপতে হবে। আমি কপি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বেশ একটু জয়ের হাসি হেসেই বেরিয়ে যাচ্ছে মনোমোহন, এমন সময়ে পেছন থেকে ডাকলেন সেই ভদ্রলোক—'ওহে একটু শোন তো!'

ভদ্রলোকের কথা একেবারে ভুলেই গেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। হঠাৎ মাতব্বরী দেখে একটু বিস্মিত ও বিরক্তই হলেন। প্রিন্টারকে হুকুম করবার তিনি কে? বিরক্তি গোপন না করেই বললেন—'কেন বলুন তো? ওকে ডাকছেন কেন?'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন—'আপনার প্রিন্ট-অর্ডারের সইটা একটু দেখব।'

'আপনি সই দেখবেন! তার আগে আপনার পরিচয়টা জানতে পারি? আপনি সিগ্নেচার একসপার্ট নিশ্চয় নন!'

আর কেউ হলে কৃত্তিবাস ওঝার গলার স্বরেই নিজের জায়গা যে কোথায় বুঝে নিয়ে অনধিকার চর্চায় আর মাথা গলাত না। কিন্তু ভদ্রলোকের গায়ের চামড়া বেশ পুরু মনে হল। গলার ঝাঁঝ বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে নির্বিকারভাবে বললেন—'একসপার্ট না হলেও আপনাকে এ বিষয়ে কিছু সাহায্য বোধহয় করতে পারি।'

মনোমোহন তখন দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রলোকের দৌড় কতখানি দেখবার জন্যে বিদ্রূপের স্বরে বললেন কৃত্তিবাস ওঝা—'নিয়ে এস মনোমোহন তোমার কাগজটা। দেখি শার্লক হোমস কি বার করেন ও থেকে!'

মনোমোহন অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে কাগজটা টেবিলে এনে রাখবার পর ভদ্রলোক সেটা তুলে নিয়ে সইয়ের ওপর চোখ বুলিয়েই মৃদু হেসে শুধু বললেন—'হুঁ'।

তিক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন কৃত্তিবাস ওঝা—'দেখা আপনার হয়ে গেল এরই মধ্যে?'

ভদ্রলোক তেমনি ঈষৎ হেসে বললেন—'হ্যাঁ দেখবার তো বেশী কিছু নেই আমি শুধু কালিটা দেখতে চেয়েছিলাম।'

'ও, শুধু কালিটা দেখতে চেয়েছিলেন! তাহলে হাতের লেখা নয়—আপনি কালি সম্বন্ধে একসপার্ট! তা কালি দেখে কি বুঝলেন জানতে পারি কি?'

'আপনি সত্যি তা শুনতে চান?'

ভদ্রলোকের মুখের সেই হাসি দেখে গা আরো জ্বলে গেল কৃত্তিবাস ওঝার।

বললেন—'আপনার কেরামতিটা একটু দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে বই কি!'

ভদ্রলোক আবার একটু হাসলেন। বললেন—'তাহলে শুনুন ও সই আপনার নয়!'

'আমার নয়!' জোরে হেসে উঠলেন কৃত্তিবাস ওঝা। 'আমার চেয়ে আপনি আমার সই বেশী চেনেন দেখছি। শুধু কালি দেখেই এতবড় একটা আবিষ্কার করে ফেললেন বোধহয়!'

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-----১৪'০০
২। গুল বাগিচা----৩'৫০, ৩। কাব্য আমপারা--৪'০০
৪। পূবের হাওয়া----২'০০. ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি--২'০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

ভদ্রলোক আবার তেমনি গা-জ্বলানো হাসি হেসে বললেন—'হ্যাঁ কালিটাও একটা প্রমাণ বই কি!'

'কিন্তু আপনার তাহলে জানা দরকার যে আমি সবুজ কালি ছাড়া ফাউন্টেন পেনে কিছু ব্যবহার করি না।'

'তা জানি। এবং সেই জন্যেই বলছি যে ও সই আপনি করেন নি।'

এবার বেশ একটু রেগেই গেলেন কৃত্তিবাস ওঝা—'দেখুন প্রলাপ শোনবার সময় ও ধৈর্য আমার নেই। সইটা স্পষ্ট দেখছেন সবুজ কালিতে করা, আমি আপনাকে বলছি যে সবুজ কালি ছাড়া আমি কিছু ব্যবহার করি না তবু আপনি বলছেন সবুজ কালিতে বলেই ও সই আমার নয়! হেঁয়ালিটা দয়া করে পরিষ্কার করে বলুন নয় অনুগ্রহ করে কাজের সময় বিরক্ত করবেন না।'

ভদ্রলোক কৃত্তিবাস ওঝার রাগটা যেন উপভোগ করেই বললেন—'না আপনাকে বিরক্ত করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। তবে হেঁয়ালি যাকে মনে করছেন সেটা নেহাৎ সহজ সরল ব্যাপার। কাল আপনি ফাউন্টেন পেনটা অফিসে আনেননি মনে আছে!'

'ফাউন্টেন পেন আনি নি?' সত্যিই প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন কৃত্তিবাস ওঝা। তারপর কথাটা মনে পড়ায় অবাক হয়ে বললেন—'আপনি কি করে জানলেন?'

'যেমন করে জানলাম আপনি সবুজ কালি ব্যবহার করেন যেমন করে জানলাম কাল ও কাগজে সই আপনি করেন নি।'

'কি থেকে জানলেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'আপনি অত্যন্ত অগোছালো ঢিলে স্বভাবের বলে।'

নিজের অফিসঘরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোকের কথাটার আর প্রতিবাদ করতে পারলেন না কৃত্তিবাস ওঝা। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—'কাগজের অফিস হয়তো এইরকমই হয়। তবু আপনার অফিসে পরিচ্ছন্নতার কোনো বালাই নেই একথা আপনি বোধহয় অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনার ব্লটিং প্যাডটাই দেখুন না. সাতদিন অন্ততঃ এটা বদলান নি—'

ব্লটিং প্যাডটা এবার তুলে নিয়ে তিনি বললেন—'আপনি যে সবুজ কালি ছাড়া কিছু ব্যবহার করেন না এই ব্লটিং প্যাডটা দেখলেই তা বুঝতে দেরী হয় না। আগাগোড়াই এটার গায়ে সবুজ ছাপ। শুধু কয়েকটা জায়গায় কালো কালির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ব্লটিংয়ের ছাপে কিন্তু আপনারই লেখার ছাপ। এ ঘরে আপনি ছাড়া আর কেউ বসে না। কালো কালির ছাপ সব জায়গায় সবুজ কালির ওপর পড়েছে, কালোর ওপর সবুজ পড়েনি। আজকে আপনার পকেটে ফাউন্টেন পেন দেখা যাচ্ছে। সুতরাং কালো কালির লেখাগুলো নিশ্চয়ই কালকের। উপরোউপরি দুদিনও কালো কালি ব্যবহার করেননি —কারণ কালো ছাপ খুব অল্প।'

ভদ্রলোককে বাধা দিতে গেলেন কৃত্তিবাস ওঝা। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য না করেই বলে চললেন—'আপনার বুকপকেটে সবুজ কালির বেশ খানিকটা ছোপ পড়েছে। ছোপটা শুকনো। অর্থাৎ ফাউন্টেনপেন 'লিক' করেছে—কিন্তু আজকে নয়—পরশু। তাই কাল আনেননি ফাউন্টেনপেন।'

এবার জোর করে ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে বললেন কৃত্তিবাস ওঝা—'আপনার পর্যবেক্ষণ ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি দেখে অবাক হলাম কিন্তু সইটা আমার নয় কি করে বুঝলেন?'

ভদ্রলোক হেসে উঠে বললেন—'.....'

বিমূঢ়ভাবে চেয়ে থেকে বললেন কৃত্তিবাস ওঝা—'আপনার নামটা কি জানতে পারি কি?'

'আমার নাম পরাশর বর্মা!'

'আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

পরাশর বর্মার মুখের চেহারা এক মুহূর্তে যেন বদলে গেল। কোথায় গেল সেই সপ্রতিভ আত্মবিশ্বাসের সহজ ভঙ্গি, এক মুহূর্তে একেবারে অত্যন্ত লাজুকের মত অপ্রস্তুতভাবে পকেট থেকে একটি কাগজের তাড়া বার করে বললেন—'আমার কয়েকটি কবিতা আপনাকে দেখাতে এনেছিলাম।'

সত্যি আকাশ থেকে পড়লেন কৃত্তিবাস ওঝা—'আপনি—আপনি কবিতা লেখেন?'

পরাশর আর যেন চোখ তুলে তাকাতেই পারেন না। মাথা নিচু করে বললেন—'ওই আমার জীবনের একমাত্র সাধনা।'

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি কৃত্তিবাস ওঝা। পরাশর বর্মার হাত থেকে কাগজের তাড়াটা নিয়ে বললেন—'এগুলো কিন্তু আমার কাছে আপনাকে রেখে যেতে হবে। সময়মত দেখব।'

'নিশ্চয়, তাই আপনি দেখবেন। আর যদি দু একটা তেমন—'

'হ্যাঁ তেমন ভাল হলে নিশ্চয় ছাপব।'

পরাশর এবার উঠে পড়ে বললেন—'আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম কিছু মনে করবেন না।'

সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাস ওঝাও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'দেখুন, হতভম্ব যা করে গেলেন তাতে বিরক্ত হয়েছি কিনা বুঝতেই পারছি না। ডাক্তার কবি ইঞ্জিনীয়ার কবি উকিল কবি অনেক শোনা গেছে, কিন্তু গোয়েন্দা কবি বোধহয় এই প্রথম দেখলাম।'

পরাশরের মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন—'গোয়েন্দাগিরিটা আমার সখ কিন্তু কাব্য আমার সাধনা।'

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরাশর বর্মার কবিতাগুলো তারপর সাগ্রহে পড়ে দেখেছেন কৃত্তিবাস ওঝা। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছাড়া তাদের আর কোথাও জায়গা নেই।

অদ্রীশ বর্ধণ

(গোয়েন্দাধাঁধার সমাধান ৪৯নং পাতায়)

নির্মল আচার্য—সম্পাদিত

ঐতিহাসিক

"রক্ত স্বাক্ষর" (বিশেষ সংখ্যা)

(শেলী-কীটস্ গোর্কী টলস্টয় ও বায়রন)

যাঁরা লিখেছেন—দক্ষিণারঞ্জন বসু, নারায়ণ চৌধুরী, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ইন্দ্রনীল, বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত, হরেন ঘোষ, দিলীপ মজুমদার, ডঃ প্রদ্যুৎ সেনগুপ্ত, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, সাধনা মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, নির্মল আচার্য, প্রতাপরঞ্জন হাজরা, বাঁশরী চৌধুরী প্রমুখ।

৭ই মার্চ থেকে এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রতিটি ষ্টলে পাইবেন এবং পাক্ষিক 'রক্তস্বাক্ষর' নিয়মিত সব ষ্টলে পাইবেন।

রক্তস্বাক্ষর পাবলিকেশন্স

৭বি, ধীরেন ধর সরণী কলিকাতা—১২; ফোন—২৪-৯৬৭৭

যুব যুবতী

বিকাশ ঘোষ

সাক্ষরতা অভিযান

অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ বাণী আমরা অনেকেই শুনেছি। কিন্তু বাণীকে উপলব্ধি করে যথার্থে পৌঁছে দেওয়া আমাদের সবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মৃতজনে প্রাণ দেওয়া তো দূরের কথা যে সব লোক চক্ষুষ্মান হয়েও অন্ধ তাদের জন্যই বা আমরা কতটুকু করেছি? সমাজের অবিচার দারিদ্র্যের কষাঘাত কিংবা সুযোগের অভাব যাদের শিক্ষার আলোক থেকে দূরে রেখেছে সেইসব মানুষের জন্য কি আমাদের কিছুই করার নেই? নিশ্চয়ই আছে। আশার কথা আমাদের যুবসমাজের এক বিরাট অংশ নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিরাট কর্মযজ্ঞের পবিত্র কাজ হাতে নিয়েছেন। তাঁরা গঠন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। এঁদের এ কর্মযজ্ঞ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। সারা বাংলার দূর দূরান্তে শহরে গ্রামে এঁরা যেভাবে কাজের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছেন সেটা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। তখন একটা ভুল সহজেই ভেঙে যায়—আমাদের যুবসমাজ গোল্লায় যায়নি তারা হানাহানি মারামারিতেই শেষ হতে চায় না—গঠনমূলক কাজে নিজেদের আত্মোৎসর্গ করে নিজেরা সৃষ্টির আনন্দে মাততে কখনো পেছ পা নয়।

বাংলার কয়েকজন প্রাণপুরুষ নানাভাবে এই সমিতির কর্মধারায় উৎসাহ উপদেশ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের প্রেরণা-উৎসাহ যুব সমাজের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাচার্য পূর্ণেন্দুকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার উপাচার্য ডকটর রমা চৌধুরী প্রভৃতি স্মরণীয় ব্যক্তিরা এই কর্মযজ্ঞের নেপথ্যে আছেন, আর এই কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছেন আমাদেরই যুববন্ধু পার্থ সেনগুপ্ত সুধীর চ্যাটার্জি স্বপনা দেব প্রমুখেরা। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির প্রচার সম্পাদিকা তথা পত্রিকা সম্পাদিকা রাজশ্রী বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের সমিতির বিভিন্ন কর্মধারা প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম।

কলকাতার ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে এই সমিতির বিভিন্ন কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন তিনি। বয়স আর কত! প্রাণ-চাঞ্চল্যে যৌবনে এখনো ভরপুর! অথচ সংযত নিষ্ঠাবতী কর্মী। সুন্দর ব্যবহার। আমি যেতেই সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর দপ্তরে।

—আচ্ছা রাজশ্রী, দেবী, আপনি তো আমারই মতো তরুণ— এ বয়সের ধর্ম তো একটু হৈ হুল্লোড়ে মেতে থাকা। দিনরাত এইসব বয়স্কদের লেখাপড়া নিয়ে ভাবা ভালো লাগছে আপনার?

—ওঃ আপনি আমায় পরীক্ষা করছেন। বিশ্বাস করুন—এসব কাজ খুব ভালো লাগছে। আমাদের কাজের মাধ্যমে অন্যদের উপকার হচ্ছে এটাই তো সবচেয়ে বড় আনন্দের কথা।

—নিরক্ষরতা দূরীকরণে যুবকদের ভূমিকার কথা একটু বলুন না?

—দেখুন এই সমিতির বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে জড়িত সবাই বয়সে তরুণ। কেননা তরুণেরাই একাজ উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

—গ্রাম বাংলার নিরক্ষরতা দূরীকরণে আপনারা কি পন্থা অবলম্বন করেছেন?

—গ্রাম বাংলায় আমাদের অনেক কেন্দ্র রয়েছে। চব্বিশ পরগণা হুগলী মেদিনীপুর মুর্শিদাবাদ বীরভূম, হাওড়া উত্তরবঙ্গ পুরুলিয়া—সর্বত্র আমাদের কেন্দ্র রয়েছে।

—নিরক্ষরতা, সমস্যার ব্যাপকতা তো গ্রামেই বেশী কি বলেন?

—সারা ভারতে ৩৯ কোটি মানুষ আজও নিরক্ষর। শুনলে আশ্চর্য হবেন আমাদের শহর কলকাতাও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। মহানগরীর নিরক্ষর নরনারীর সংখ্যা ১২ লক্ষের মতো। এছাড়া ৩ লক্ষের মতো শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

শহর কলকাতার চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের নিয়ন আলোর রোশনাই-এ যাঁদের চোখ ঝলমল করে তাঁরা কি শহরের এ অন্ধকারের দিকে কখনো তাকিয়ে দেখেছেন? মনে হয় না। আমাদের সরকারই বা অন্ধকারের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের কি ব্যবস্থা করেছেন তাদের জন্য?

রাজশ্রী বিশ্বাস

রাজশ্রী বিশ্বাস জানালেন—এদের জন্যও আমাদের কাজ শুরু হয়েছে। শিল্পাঞ্চলের নিরক্ষর মানুষদের জন্যও সমিতি অনেক সাক্ষর কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। এবিষয়ে রাজশ্রী দেবী জানালেন—টিটাগড় সোদপুর, শ্রীরামপুর মাহেশ, আলমবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে আমরা তেলেগু ভাষায় পর্যন্ত সাক্ষর কেন্দ্র পরিচালনা করছি।

নিরক্ষরতা কর্মী আর এক তরুণ শ্রীনীলকান্ত রায় এবার আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন। নিরক্ষরতা কর্মসূচী বিষয়ে তিনি ভারতের অনেক প্রদেশে ঘুরেছেন। তাঁর কাছেই শুনতে পেলাম তাঁরা যখন দিল্লীতে যান তখন কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের তরুণ বয়স দেখে অবাক! সইসাবুদ দেখে তাঁদের ধারণা হয়েছিল পার্থ সেনগুপ্ত

ইত্যাদিরা একটু বয়স্ক হবেন। এ যে দেখি তার উলটো ব্যাপার!

এইসব যুবকরা এতবড়ো কর্মকান্ড চালাচ্ছেন। রক্তদান করে সাক্ষরতা অভিযান চালানো এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এটা তো এঁদের দ্বারাই সম্ভব। নীলকান্তবাবু জানালেন ১৯৬৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন রক্ত বিক্রী করে পর্যন্ত এই আন্দোলনের সামিল হন। তাদের এই কাজের স্বীকৃতি তথা প্রশংসা থেকে মেলে ইউনেস্কোর মতো সংস্থার কাছ।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনি তো বাইরে অনেক ঘুরেছেন সেখানের সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করলেন কি?

—সত্যি কথা বলতে কি জানেন নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজকে সাক্ষরতা আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত করার সর্বভারতীয় কৃতিত্ব আমাদের সমিতির। জাতীয় আন্দোলনের স্তরে সাক্ষরতাকে পৌঁছে দেওয়া—বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করার নজীর আর কোথাও নেই।

—এই বিরাট কর্মযজ্ঞে আপনাদের তো অনেক অর্থের দরকার। এর সংস্থান করছেন কি ভাবে?

—আমাদের সমিতির প্রকাশনা বিভাগ রয়েছে। তা থেকে আয় কিছু আছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার পাইলট প্রজেকট অনুসারে এক হাজার বয়স্ক কেন্দ্র চালানোর জন্য আমাদের সমিতিকে ২ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন এর সঙ্গে আমাদের কিছু অর্থনৈতিক প্রকল্পও হাতে নেওয়ার ইচ্ছা আছে।

এতক্ষণ রাজশ্রী দেবী চুপচাপ শুনেছিলেন। এবার তাঁর কাছে জানতে চাইলাম —গ্রামের মানুষের তো দুঃখকষ্ট অভাব-অনটন। সাক্ষরতা কর্মসূচীতে তাদের সাড়া কেমন পাচ্ছেন?

প্যাট্টা, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোর্সেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
সম্পৎ সেরাপিক্স প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

—এটা তো একটা মৌলিক সমস্যা। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর অনাহারে অর্ধাহারে লেখাপড়া করা সত্যি সমস্যার ব্যাপার। তবুও আমরা যতটা সাড়া পেয়েছি সেটা আশাব্যঞ্জক।

—আচ্ছা এমন করলে হয় না যে ওরা হাতে কলমে কাজ করে কিছু রুজি-রোজগারও করলো, আবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পড়াশুনাও করলো।

—সেসব বিষয়ে আমরা চিন্তা করছি। যেমন ধরুন বীরভূমে অনেক অঞ্চলে পাথর-শিল্পের কাজের সুযোগ রয়েছে। পুরুলিয়ায় যেমন বিড়ি শিল্প উত্তরবঙ্গের চা শিল্প। এসব অঞ্চলে সাক্ষরতা কর্মের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকর্মকে জুড়ে দিতে পারলে খুবই ফলপ্রদ হবে বলে আমাদের ধারণা। এ ধরণের ফাংশনাল লিটারেসি নিয়ে আমরা চিন্তা করছি।

—আপনারা গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের সঙ্গে সাক্ষরতা অভিযান— এ ধরণের কোন প্রকল্প সরকারের কাছে পেশ করুন না কেন অনুরোধের সুরে জানাই।

—সব চেষ্টাই আমরা করেছি। আমাদের সম্পাদক এ ধরণের স্কিম পেশ করেছিলেন কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কোন সাড়া আসেনি। এখন নিজেদের উদ্যোগেই কিছু করার চেষ্টা হচ্ছে।

—কিছুদিন আগে কাগজে লেখক কর্মশালার এক কর্মসূচী দেখলাম। এটা কি ব্যাপার বলুন তো!

—সদ্য সাক্ষরদের পড়বার জন্য বই লেখার উদ্দেশ্যে উৎসাহী লেখকবৃন্দ নিয়ে আমরা ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত হাওড়ার মতো গ্রামে এই কর্মশালা পরিচালনা করেছি।

—ঐ সময়ে ইডেনে ক্রিকেট নিয়ে এত হৈ-চৈ আর আপনারা মাতো গ্রামে বয়স্কদের জন্য বই লিখছেন, সত্যি ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

—ওখানেও আমরা কাজের মধ্যে বেশ ভালোই কাটিয়েছি। আমাদের অনুষ্ঠান প্রথমদিনে উদ্বোধন করেন ডকটর রমা চৌধুরী। কেন্দ্রীয় ভাষা সংস্থানের পক্ষ থেকে এসেছিলেন ডঃ রাও। আমাদের গাইড করেছেন মলয় দাশগুপ্ত আমাদের কর্মশালা সবদিক থেকে সফল।

—ওখানে গ্রামবাসীর কেমন সাড়া পেলেন?

—অভূতপূর্ব। গ্রামের মেয়ে বি-এ ক্লাসের ছাত্রী জয়শ্রী বসুর সহযোগিতা পাওয়া উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আমাদের সমিতি মাতো গ্রামে গ্রামোন্নয়ন সংস্থা স্থাপন করেছেন।

—আপনাদের এই ধরণের প্রকল্পও আছে নাকি?

—সাক্ষরতা কর্মসূচী যাতে গ্রামজীবনের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এর প্রতিষ্ঠা। গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে সংযোগ আছে এমনসব উৎপাদনমুখী কর্মসূচী যথা পশুপালন উচ্চফলনশীল কৃষি পদ্ধতি দুগ্ধ প্রকল্প মৎস্য চাষ এখানে শিক্ষা দেওয়া হবে।

—বেশ সুন্দর স্কিম তো! পুরুলিয়ায় আপনাদের লঙ্গরখানা চালানোর সংবাদেও আশ্চর্য হয়েছিলাম। সাক্ষরতা আন্দোলনকে জনজীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ায় আপনাদের অনেকেই সাধুবাদ জানাবেন।

বীরসিংহ গ্রামের বিকাশ ঘোষ রাজশ্রীদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই তিনি নিরক্ষরতা কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত। জিজ্ঞাসা করলাম—এসব কাজ কেমন লাগছে?

—ভালোই। সমাজের কোন কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে আমি খুব খুশী।

স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কেমন সাড়া পাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করলাম রাজশ্রী দেবীকে।

—জাতীয় সেবা প্রকল্প অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কলেজের ছেলেমেয়েরা সাক্ষরতা ক্যাম্পে অংশ নেয়। স্কুল জীবনে এটাকে আরো গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমরা মাননীয় পর্ষদ সভাপতি সত্যেন্দ্রমোহন চ্যাটার্জির কাছে আবেদন জানিয়েছি।

স্বল্প পরিসরে অনেক আলোচনাই সংক্ষিপ্ত করতে এবং বাদ দিতে হল। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি যুবক-যুবতীদের যে কর্মচাঞ্চল্যে অনুপ্রাণিত করছেন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্রতী হয়েছেন তার তুলনা নেই। বিদায়লগ্নে রাজশ্রী দেবী অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মুক্তিপদ রায় চন্ডী বাগ নুর আলম ভারতী রায়, প্রণব ঘোষ সমীর চ্যাটার্জি সুতপা চক্রবর্তী, মীরা ভট্টশালী বিধুভূষণ মল্লিক প্রত্যেকেই নিষ্ঠাবান কর্মী। সবাই দেখলাম তারুণ্যে ভরপুর অথচ কর্মচঞ্চল।

ধন্যবাদ জানিয়ে যখন উঠছি তখন সুতপা চক্রবর্তী ও মীরা ভট্টশালী বললেন —সকলের সহযোগিতা পেলে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারব। আপনারা সহযোগিতা করবেন আশা করি।

নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম।

—অমর দাশ

শতবর্ষের স্মরণীয় প্রসঙ্গে

গত ১৩ ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃতে' প্রকাশিত আমার পত্রের উত্তরে শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় যে-পত্রটি (অমৃত—১০-১-৭৫) লিখেছেন তা পড়লাম। কোন গৌরচন্দ্রিকাদি না করে তার উত্তরে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

(১) আমি লিখেছিলাম, 'কালীশবাবু অহীন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু-তারিখ দিয়েছেন ৩ নভেম্বর। লেখা উচিত ছিল ৪ নভেম্বর।' কালীশবাবু এর উত্তরে লিখেছেন 'আমার রচনায় প্রকাশিত নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুদিবস রবিবার রাত ২-৩০টা, ৩ নভেম্বর, ১৯৭৪'—এই তথ্য অভ্রান্ত। ইংরেজীমতে রাত ১২টার পরবর্তী সময়ে গৃহীত হলেও বাংলা মতে সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সময় পূর্ববর্তী তারিখেরই অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য 'রাত ২-৩০' বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।'

কালীশবাবু তাঁর নিজের তথ্যকে অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে গিয়ে ইংরেজি ও বাংলা মতের এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি করেছেন। তারিখটা ইংরেজী মতে কিন্তু তারিখ গণনার পদ্ধতি বাংলা মতে। সুধী পাঠক সমাজই বিচার করবেন উক্ত রবিবার রাত ২-৩০টা ৩ নভেম্বর না ৪ নভেম্বর।

(২) কালীশবাবু অহীন্দ্র চৌধুরীর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'-র প্রকাশকাল সম্পর্কে লিখেছেন অমৃত পত্রিকায় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে রচনাটি প্রকাশিত হয় নি—হয়েছিল ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে।'

কিন্তু আমি এই উক্তির তো প্রতিবাদ করি নি আমি প্রতিবাদ করেছিলাম তাঁর পূর্বেকার উক্তি সম্পর্কে। সেটি আবার উদ্ধার করিঃ ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র নামক তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এবং এই বছরই অমৃত পত্রিকায় 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' আত্মজীবন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।' (অমৃত—১৫।১১।৭৪)

'এই বছরই' অর্থে কোন বছর বোঝায়? ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে নয় কি? সেই কারণেই আমি বলেছিলাম উক্ত আত্মজীবনী (১ম পর্ব) ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি—ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সুধী পাঠক সমাজ লক্ষ্য করবেন, কালীশবাবুর উক্তিদ্বয় কেমন পরস্পরবিরোধী তাঁর পরস্পরবিরোধী উক্তির আরও একটি নমুনা তুলে ধরছি। পূর্বে তিনি লিখেছিলেন 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' পুস্তকের দ্বিতীয় পর্ব ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে পুনরায় অমৃত পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে (অমৃত—১৫।১১।৭৪) আর আমার প্রতিবাদের পরে তিনি লিখলেন উক্ত আত্মজীবনী (কোন পর্ব তা উল্লেখ না করে) অমৃত পত্রিকায় ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় নি—হয়েছিল ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে। কালীশবাবুর ব্যবহৃত পুনরায়' পদটির দ্বারা কি বোঝাচ্ছে না আত্মজীবনীটির প্রথম পর্বও অমৃত'-এ প্রকাশিত হয়েছিল? ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে যদি দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে কোন পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল?

কালীশবাবু লিখেছেন অমৃত পত্রিকায় 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' পুস্তকটির প্রকাশ তথ্যই আমি তুলে ধরেছিলাম। অন্য পত্রিকায় কবে কোন অংশ কখন প্রকাশিত হয়েছিল তা তুলে ধরতে চাই নি।' নিজের ভ্রান্তি ঢাকবার জন্যে কালীশবাবু অসত্যের পথে পদক্ষেপ করছেন না কি? আরও একটা কথা। যিনি ভবিষৎ গবেষকদের পথ-নির্দেশের জন্যে খুঁটি-নাটি সব তথ্যই বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন তিনি কেন অহীন্দ্রবাবুর আত্মজীবনীর ১ম পর্বের প্রকাশ তথ্যকে তুলে ধরতে চাইলেন না?

(৩) কালীশবাবু বলেছেন, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের পিতার নাম ঝাঁপ্পালাল'-এর স্থানে পান্নালাল' বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র'-এর স্থানে বাংলার নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র' ভীমসিংহ-কৃষ্ণকুমারী-র স্থানে ভীমসিংহ—মৃণালিনী মুদ্রণ ভ্রান্তির জন্যে প্রকাশিত হয়েছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন বিধবা বিবাহ নাটকের স্থলে নব নাটক মুদ্রণ আমার নিজের অসাবধানতাবশতঃও মুদ্রিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।' এবং এর পরেই তিনি সাফাই গেয়েছেনঃ সুলোচনা' চরিত্রের নাম যেখানে উল্লেখ আছে নাট্য সাহিত্য নিয়ে যাঁরা বিন্দুমাত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁরা যে এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হবেন না—তাঁদের সম্পর্কে এতটা খারাপ ধারণা আমার নেই।' কিন্তু যে সব পাঠক নাট্য সাহিত্য নিয়ে বিন্দুমাত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেন না তাঁরা কী করে তাঁর এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হবেন?

কালীশবাবু পূর্বে লিখে ছিলেন, বিহারীলাল অবাল্য মাতামহের গৃহে লালিত-পালিত।' আমি তাঁর এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম, তিনি আবাল্য পিতামহের গৃহে লালিত-পালিত।' এবার তিনি লিখেছেন পিতামহ হরলাল চট্টোপাধ্যায় বিহারীলালকে প্রতিপালন করেন পিতামহের মৃত্যুর পর মাতুলালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় বিহারীলালকে।' কালীশবাবু তাঁর পূর্বেকার মন্তব্য বাবু রাখলেন না সংশোধন করলেন?

(৫) কালীশবাবু লিখেছেন বিহারীলালকে বিস্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে আমিই' সর্ব প্রথম নতুন করে উদ্ধার করি একথা বাংলাদেশের প্রত্যেক বিদগ্ধজনই জানেন।'

বিদগ্ধ নই তাই শুধু জানি বিহারীলালের জীবনী ও কীর্তির আলোচক রূপে গিরিশচন্দ্র (দ্রঃ রঙ্গালয়, ১৩০৮) ব্যোমকেশ মুস্তফী (দ্রঃ বিশ্বকোষ' ১৬শ খণ্ড, ১৩১২) কিরণচন্দ্র দত্ত (দ্রঃ নাট্য মন্দির, শ্রাবণ ১৩২০) অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দ্রঃ গিরিশচন্দ্র, ১৩৩৪) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দ্রঃ রঙ্গালয় ত্রিশ বৎসর' ১৩৪০) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্রঃ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' ১৩৪০ ও সাহিত্য সাধক চরিতমালা'-র ৬৭ সংখ্যক গ্রন্থ, ১৩৫৪) হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (দ্রঃ ভারতীয় নাট্যমঞ্চ—২ খণ্ড ও দি ইন্ডিয়ান স্টেজ—৪ খণ্ড) প্রমুখ পূর্ব সূরীদের নাম। কালীশবাবু এঁদের পরিধির বাইরে দাঁড়িয়ে বিহারীলাল অথবা বাংলা নাট্যশালা সম্পর্কে নতুন তথ্য কী উদ্ধার করেছেন? কালীশবাবু বলেছেন এঁদের তথ্যমূলক প্রবন্ধ বা পুস্তক আমার পড়া নেই। তাই তিনি আমাকে তাঁর 'বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস' পুস্তকটি (প্রকাশকাল ঃ ১৯৭৪) পড়তে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কালীশবাবু যদি অনুগ্রহ করে বর্তমান পত্রলেখকের 'বাংলা থিয়েটারে অভিনয়' গ্রন্থটির (প্রকাশকাল ঃ ১৯৬৬) পৃঃ ৪—৭ ও 'কলকাতার থিয়েটার' দ্বিতীয় পর্ব গ্রন্থের (প্রকাশকাল ঃ ১৯৭২) পৃঃ ২১—২৪ পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন উক্ত গ্রন্থ দুটিতে বিহারীলাল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তাঁদের রচনা থেকেই উদ্ধৃত বা গৃহীত। আর একটি কথা। কালীশবাবুর বইটি তাঁর অনুরোধের পূর্বেই পড়েছি এবং তাতে তথ্যের অসংখ্য ভ্রম দেখেছি। সুযোগ পেলে সেগুলি পাঠকসমাজে তুলে ধরতে প্রস্তুত আছি।

পরিশেষে বক্তব্য, মুদ্রণপ্রমাদ ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু যিনি ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য দৃষ্টি রেখে 'অমৃত'-র মতো একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রে সপ্তাহের পর সপ্তাহ গবেষণামূলক (?) ফিচার রচনা করে যাচ্ছেন তাঁর রচনায় এ-জাতীয় ভুল থাকা অবাঞ্ছনীয়। বিশেষত, যখন মুদ্রণজনিত প্রমাদ পরবর্তী যে-কোন সংখ্যায় সংশোধনের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। কিন্তু আমি তো মুদ্রণপ্রমাদের উপর ভিত্তি করেই পত্র লিখিনি। তাঁর তথ্যগত ভ্রান্তি-সমূহের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার সে-উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু কারও লেখার তথ্যগত ভুলের প্রতি বিনীত-ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে তা যে হীনতার প্রকাশক হয় এরকম অভিনব গবেষণামূলক তথ্য আমার জানা ছিল না। কালীশবাবু যে নিজেই একটা হীনতা কল্পনা করে বেদনাবোধ করেছেন সেজন্যে আমিই বেদনাবোধ করছি।

শঙ্কর ভট্টাচার্য
রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নদীয়া।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু এ তো হল বাহ্য—যে-কোনো আসর মঞ্চস্থ করতে হলেই বাধা আসে নানা দিক থেকে। একদল লোক বলাবলি সুরু করলেন—যোগপন্থী হয়ে রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-গীতের আয়োজন অনুচিত। তাঁদের ভ্রূকুটিতে গণ্য না করা তত কঠিন মনে হত না কিন্তু যখন দরদী ধার্মিক বন্ধুদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রতিবাদ করা সুরু করলেন এই বলে যে, আমি স্বধর্মভ্রষ্ট হচ্ছি সব অনর্থের মূল অর্থকে আহরণ করতে তখন সময়ে সময়ে মন একটু ক্লিষ্ট হত বৈ কি। শেষে শ্রীঅরবিন্দকে জানাতে তিনি লিখলেন যে, অর্থ সংগ্রহ করা অনুচিত হত যদি আমি নিজের জন্যে টাকা তুলতাম কিন্তু যখন গুরুসেবার জন্যে অর্থোপার্জন করছি তখন প্রত্যবায় আসতেই পারে না। কেবল—লিখলেন তিনি—সামাজিক সভা সমিতি পার্টি ডিনার এসব বর্জনীয়। যতদূর মনে পড়ে—অতঃপর আমি সামাজিকতায় বেশি যোগ দিইনি। কিন্তু তবু মন খুঁৎ খুঁৎ করত নাচ গান করে টাকা তুলতাম বলে—বিশেষ নাচ। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশি বলার প্রয়োজন দেখি নাস এটুকুও যে বললাম সে শুধু জানাতে যে 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' (শ্রেয়ের পথে অনেক বাধা) এ-সত্যটিকে নতুন করে উপলব্ধি করে আদর্শবাদীকে কীভাবে রিয়ালিস্ট হয়ে হায় হায় করতে হয়েছিল।

কিন্তু লাভও হয়েছিল যথেষ্ট : কত চমৎকার হৃদয়বান গুণী তথা মনীষীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল; কতবার ভক্তির গানে নানা ধর্মার্থীর ব্যাপক সাড়া পেয়ে সব মনস্তাপ গলে আনন্দের জোয়ার বয়েছিল আমার মনে; কত যোগপন্থী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের কথা জানতে পেরে তাঁর মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন—যাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রীঅরবিন্দের দর্শনার্থী হয়ে পরে এসেছিলেন পণ্ডিচেরি আশ্রমে। শুধু তাই নয় নানা যোগবিমুখদেরও নানা ভুল ধারণার নিরসন হয়েছিল আমার সঙ্গে আলোচনায়।

শ্রীঅরবিন্দকে আমি সব কথাই খুঁটিয়ে জানাতাম—সাধনাই নিজের গুণগান করে 'বা রে আমি' বলতে নয়—তাঁর সঙ্গে যোগ রাখতে। কারণ এখন তো আর উষ্মা ছিল না (গোর লৌকিক সঙ্গীতে আগে আগে মনের অবসাদ কটত) তাই থেকে থেকে মনে হত দূর হোক, ফিরে যাই শ্রীগুরুর শীতল চরণে। কিন্তু কর্ম করলেই কর্মবন্ধনের ফাঁদে পড়তে হয়—নানা শহর থেকে ডাক আসত যেতে হত গান গাইতে বা কন্সার্টের ব্যবস্থা করতে—শেষে ভাষণও দিতে হয়েছিল নানা সভা-সমিতিতে তথা ধর্মার্থিস সদে। আশ্রমে ফিরে গুরুদেবকে সব কথা লিখলাম খুঁটিয়ে—কোথায় কোথায় গুরু বাক্য মেনে চলেছি আর কোথায় কোথায় চ্যুতি হয়েছে যদিও (হায় রে!) সেজন্যে অনুতাপে তনু দগ্ধ হয়নি। তিনি আমার অননুতপ্ত 'কনফেশন' পড়ে হেসেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু যেটা জানি সেটা এই যে তিনি প্রাণভরা স্নেহাশিস পাঠিয়েছিলেন সব স্খলন ক্ষমা করে :

> "We have always had a full appreciation of what you have done for us and for your untiring effort and what you have achieved in collecting much-needed contributions for the Ashram funds and still more in turning the minds of people outside, previously indifferent, towards us and our work. You should throw away entirely your idea that we are so insensitive as not to have appreciated what you have done for us." (4.3.49).

(ভাবার্থ : তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ, আশ্রমের জন্যে প্রণামী তুলেছ বাইরের অনেক জিজ্ঞাসুকে আমাদের দিকে টেনে এনেছ যারা আমাদের সাধনা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল—এসবই আমাদের কাছে প্রশস্য মনে হয়েছে। এ ধারণা তোমার মন থেকে একেবারে মুছে ফেলো যে আমাদের মন এমন অসাড় যে তোমার গুরুসেবার মর্মত্ব হতে আমরা অক্ষম।)

এর পরে আর এক মুস্কিল হল : যখন খেলাধূলা ড্রিল মার্চ ছোটাছুটির প্রবর্তন হয় তখন আমি কিছুতেই মনকে রাজী করাতে পারিনি 'স্পোর্টস'-এ যোগ দিতে। কিন্তু মনে আশঙ্কা হত প্রায়ই যে, গুরু যখন এসব চাইছেন তখন আমার পক্ষে সাড়া না দিলে অন্যায় হবে হয়ত— কে জানে? ভেবে কোনো কূলকিনারা না পেয়ে গুরুদেবকে খোলাখুলি লিখলাম আমার দুর্ভাবনার কথা : আমি খেলাধূলায় যোগ না দিলে তাঁর স্নেহ ও কৃপা থেকে বঞ্চিত হব না তো?...ইত্যাদি। সব বলার দরকার নেই, কারণ খেলাধূলার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বহু নিবন্ধ ও চিঠিই ছাপা হয়েছে। গুরুদেবের ব্যাখ্যার চুম্বক এই যে, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্' বলে দেহকেও তিনি পটু করতে চান নানা খেলাধূলা ছোটাছুটি সাঁতার ব্যায়াম ইত্যাদি বলসাধনায়। আমাকে তিনি এ সম্বন্ধে কয়েকটি সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। শেষের চিঠিটিতে স্পোর্টস সম্বন্ধে নানা লোকের নানা ভুল ধারণার নিরসন করে আমাকে আবার তাঁর স্নেহাশিস পাঠিয়েছিলেন এমন মধুর সুরে যে আমি বিষাদ কাটিয়ে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম। তিনি ২৭-৪-৪৯ তারিখের সুদীর্ঘ চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছিলেন :

> I writee all this in the hope of clearing away all the strange misconceptions with which the air seems to have become thick and by some of which you may have been affected. I wish to assure you that my love and affection and the Mother's love and affection are constantly with you. We have had nothing for you but love and affection and a full appreciation of all you have done for us, your work, your service, your labour to make people over there appreciate our Ashram and what it stands for and to turn men's minds favourably towards us and what we are trying to do. As for me, you should realise that the will to help you towards divine realisation is one of the things that has been constantly nearest to my heart and will be always there. (27.4.49).

(ভাবার্থ : আমাদের স্নেহ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ তার মূল্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ণ সজাগ আছি : তোমার গুরুসেবা, অনেকের মন আমাদের দিকে ফেরাবার প্রয়াস তাদের বুঝিয়ে বলা আমাদের সাধনার লক্ষ্য কী ইত্যাদি। আর আমার নিজের কথা এই যে তোমার সাধনা সফল করতে আমার হৃদয় সর্বদাই সচেষ্ট থাকবে জেনো।)

চৌত্রিশ

গুরুসেবা করে যে যেমন পারে। আমি নানাভাবেই শ্রীঅরবিন্দের মহিমার দিকে বিশেষ করে আমার নানা বন্ধু বান্ধবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করতাম। অনেককে বহু

ব্যাখ্যা করেও বোঝাতে পারিনি যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগে জীবনকে বাতিল করেন নি, কবিতা গান সাহিত্য এমন কি হাসিও তাঁর যোগে অস্পৃশ্য নয়। তিনি বাইরে দেখতে গুরুগম্ভীর একথা অনস্বীকার্য—তাঁর লেখায় হাসির কোনো সুদূর প্রতিধ্বনিও মেলে না—মানি। তবু বলবই বলব যে তিনি শুধু যে স্বভাবে রসিক ছিলেন তাই নয়, হাসির মোক্ষম জবাব দিতে জানতেন পাল্টা হেসে। আমার SRI AUROBINDO CAME TO ME স্মৃতিচারণে আমি একটি অধ্যায়ে তাঁর নানা হাসির ফুলঝুরির স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়েছি। এ দৃষ্টান্তগুলি পড়ে এক ধর্মিষ্ঠা ইংরাজ মহিলা মর্মাহত হয়ে আমাকে লিখেছিলেন ঃ 'করেছ এসব কী প্রগলভত'! ছি ছি! মনে রেখো খৃষ্টদেব কখনো ভুলেও হাসেননি।' তাঁকে লিখতে ইচ্ছা হয়েছিল ঃ কিন্তু কৃষ্ণ হাসতে জানতেন। তবে ভাবলাম কাজ কী? একেই তো কৃষ্ণের নিন্দায় ওরা পঞ্চমুখ—তার উপর হাসির দৃষ্টান্ত দিলে হয়ত একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে তাঁর উপর। তাই তাঁর অশান্ত মনকে শান্ত করতে লিখলাম ঃ 'আপনি না হয় শ্রীঅরবিন্দের হাসির অধ্যায়টি বাদ দিয়ে বইটি নতুন করে বাঁধাবেন।'

সৌভাগ্যের বিষয়, কৃষ্ণভক্তেরা কেউই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিনী সংবাদ অধ্যায়টি কেটে বাদ দিতে চাননি। এ-অধ্যায়টিতে কৃষ্ণের যে রসিকতার পরিচয় পাই তা এত উপভোগ্য যে, শ্রীঅরবিন্দের রসিকতার গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে অবান্তর হবে না।*

একদা শায়িত কৃষ্ণকে রুক্মিনী যখন পাখা নিয়ে হাওয়া করছেন তখন কৃষ্ণ হঠাৎ তাঁকে বলে বসলেন গম্ভীর মুখেই ঃ

অস্পষ্টবর্ত্মনাঃ পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্।
আস্থিতাঃ পদবীং সদ্ভ্রু প্রায়ঃ
সীদন্তি ঘোষিতঃ।।

অর্থাৎ (আমার মত)

যাদের পথ যায় না জানা—
চলে আপন খেয়ালে,
দুঃখ সয় জায় তাদের
কণ্ঠে মালা পরালে।

কেন? কারণ—

আমরা সখী চির-উদাসী, নারীতে মন
ভরে না কাজে কাজেই ভেবে দেখ ঃ
যাহার নাই ঘর— সে কী বা
করিবে লয়ে ঘরণী?

হৃদয়ে সাম্রাজ্য যার সে
করে চায় ধরণী?

দীপশিখার মত সে শুধু বিলায়
জ্যোতি নিয়ত

যে লভে জ্যোতি—নয় শিখার
প্রিয় বা অপ্রিয় তো।

রুক্মিনী দেবী এমন পরিহাসকে পরিপাক করতে পারলেন না ঃ

কমলকর হতে ব্যজনী পড়ে খসি,
তন্বী দেহলতা কাঁপিয়া উঠি'
দুগ্ধফেননিভ শয্যা হতে তিনি
মূরছি পড়িলেন ধূলায় লুটি'।

কৃষ্ণ অপ্রস্তুত। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি রসিক তো, তাই—

হেন প্রেমের হরি লভি' নিদর্শন
নিলেন সরলারে বক্ষে তুলি'—

হাসির লঘুমেঘে অশনিটঙ্কার শুনি
যে শঙ্কায় ওঠে আকুলি',

তাহার হৃদয়ের ব্যথার ব্যথী হাসি
রাণীরে কহিলেন গাঢ় প্রণয়ে ঃ

'জানিত কে বা হায় প্রিয়ের পরিহাসে
প্রেয়সী মূরছায় অহেতু ভয়ে?

ক্ষমো লো অপরাধ—তোমাকে ব্যথা
দিতে করি নি কৌতুক প্রগলভতা

তোমাকে অনুমিয়া 'রসিকা' চেয়েছিনু
দেখিতে—শুনি হেন রসাল কথা

কেমনে নিরুপম যুগল লোচনের
নীলাভা রাঙা হয়—তাহার পরে

রোষকটাক্ষের শায়ক ছোটে—ঝরে মোহন
ধনুকার স্ফুরিতাধরে

কেমন সুন্দর ভ্রূকুটি ফোটে
অভিমানিনী-মুখে—ছিল দেখিতে সাধ,

সুপ্ত রেখেছিনু সে-সাধ বহুদিন—
জাগায়ে তারে আজ এ কী প্রমাদ!

তোমারে করি সখী, তবুও নিবেদন—
বনিতা সাথে বধূ এ-সংসারে

যেটুকু কাল যাপে মঞ্জু পরিহাসে
সে বহুবাঞ্ছিত প্রেমবিহারে।

(তদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষেল্যাচরিতমঙ্গনে।।
মুখঞ্চ প্রেম্নস রম্ভ—স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দর
কুটীভ্রূতটম্।
অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু
গৃহমেধিনাম।
যন্মর্মনীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু
ভামিনি!

কৃষ্ণকে নিয়ে বৈষ্ণব কবিরা আরো কত রসাল গল্পগাছা করেছেন হাসির ভরাপালে; গীতায় অর্জুনও বলেছিলেন ঃ 'কত না তোমার সঙ্গে মিছা তামাশা করেছি প্রভু, না জেনে তুমি কে? কৃষ্ণের উপাধি—রসরাজ রসসাগর, রসিকচূড়ামণি—এমন কি তাঁকে জেরা করে অপ্রস্তুত করতেও রাধিকা বাধে নি।

এ-হেন রসময়ের ভক্ত আমি কেমন করে সয়ে থাকি গুরুদেবের গুরুগম্ভীরতা? বৎসরে চারটি বার মাত্র দর্শন—মিনিট-খানেকের জন্যে, তাও সয় কিন্তু তখনো গম্ভীরানন? না এ-হল দুঃসহ 'শেষ খড়'—লিখলাম গুরুদেবকে যা থাকে কপালে বলে। উত্তরে তিনি লিখলেন—আচ্ছা, পরের বার হাসবেন সস্নেহ হতে।

পরের বার গেলাম দর্শনে। হা হতোস্মি! সেই চিরন্তন গম্ভীর মুখ—যথাপূর্বং তথাপরম্—দেখলে মন দমে যায়। আমার পিছনে ছিলেন শ্রীঅনিলবরণ রায়। তিনি আমাকে বললেন ঃ সে কি! গুরুদেব আপনাকে দেখে তো খাসা হেসেছিলেন—আপনি বুঝতে পারেন নি! আমি করজোড়ে বললাম ঃ 'সাধকপ্রবর! আমি সুপ্রামেন্টাল বুঝতে না পারতে পারি কিন্তু হাসির রাজা দ্বিজেন্দ্রলালের সুযোগ্য কুলতিলক হাসিও বুঝতে অক্ষম একথাও যদি মেনে নিতে হয় তাহলে আমার কোমল প্রাণ কি আর সইতে পারবে? অতঃপর শ্রীঅরবিন্দের কাছে দরবার করতে তিনি আমাকে লিখলেন ঃ 'আমি তোমার পানে সত্যিই হাসিমুখে চেয়েছিলাম—তবে সে-হাসি কিছু গান্ধীর মতন বালহাসি (childlike smile) বা রবীন্দ্রনাথের মতন দীপ্ত হাসি (radiant smile) ছিল না। ভাবটা এই যে he smiled as best he could.

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। লিখলাম ঃ 'আপনার পায়ে পড়ি এর পরের বার যেমন হাসি হাসতে চান হাসবেন কেবল এমন হাসি হয় যেন যাকে হাসি বলে সনাক্ত করতে পারি।' বলে তাঁকে একটি উদাহরণ দিলাম ঃ

একদা হনুমান দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণের রাজসভায় বলেছিলেন ঃ কৃষ্ণ রুক্মিনী রাজা রানী এ চলবে না, কারণ যদিও

শ্রীনাথো জানকীনাথো তাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ।

শ্রীনাথ জানকীনাথ যে অভেদ
পরমাত্মায় জানি গো মনে,
তথাপি হনুর প্রাণাধিপ
শুধু রাম সীতা, তাই চরণতলে

এ-মিনতি— আজ রাম সীতা রূপ
ধরি বোসো দোঁহে সিংহাসনে
নহিলে এ সভা ভেঙেচুরে
ফের লঙ্কাকাণ্ড করিব পুনঃ

---

* আমার 'কৃষ্ণকথাকাহিনী দ্রষ্টব্য—১৪৫-৬ পৃঃ।

তাতে নাকি কৃষ্ণ মহিষী রুক্মিনীকে বলেছিলেন :

'কী করি হে রাণী? পরমভক্ত
হনুর মান তো রাখিতে হবে:
তাই তুমি ধরো সীতার মূরতি,
আমি হই রাম সগৌরবে।'

শেষে জুড়ে দিলাম : 'গুরুদেব একথার উত্তরে আপনি অবশ্যই লিখতে পারেন—একশোবার—'কলির দিলীপ কি দ্বাপরের হনুমানের মত ভক্ত যে তার মান না রাখলেই নয়?' উত্তরে আমি শুধু বলব : 'তা বটে। কিন্তু দয়া করে একটিবার ভাবুন—বীর হনুমান কী চেয়েছিলেন, আর বেচারী দিলীপ কী চাইছে। তিনি চেয়েছিলেন কৃষ্ণ রুক্মিণীর রামসীতায় ভোলবদল আর আমি চাইছি মাত্র শ্রীমুখের একটুকরো সুবোধ্য হাসি।'

(এ-গল্পটি পরে পুনায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কাছে করেছিলাম—তিনি শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিলেন—'স্মৃতিচারণ ২য় ভাগ' দ্রষ্টব্য)।

আমার এই মোক্ষম 'প্রসঙ্গোত্তি'-র পরে যাকে বলে the ice was broken—অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দও পরিহাসের আসরে নেমেছিলেন কৃপা করে।

(ক্রমশ)

২'টি ফসফোমিন টনিক...

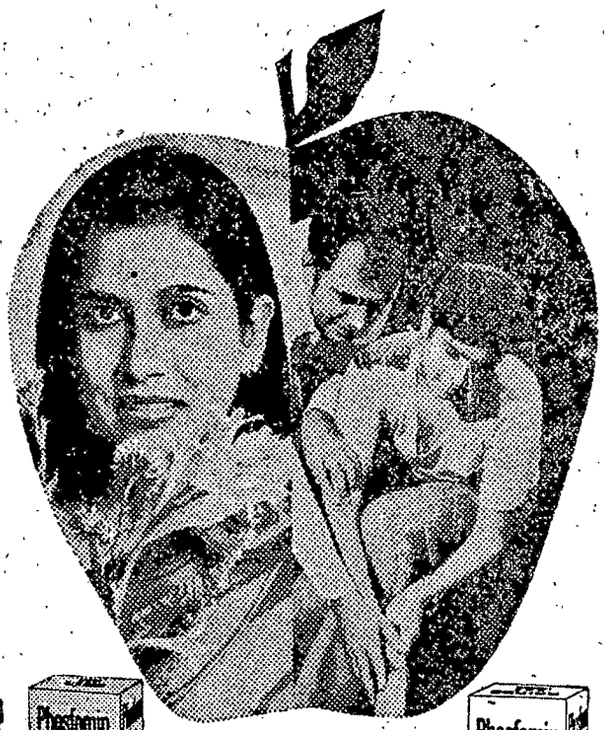

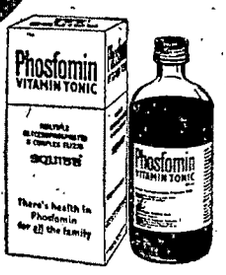

ফসফোমিন আয়রন

মেয়েদের জন্যে আয়রন টনিক

ফসফোমিন আয়রন শরীরে আয়রন বাড়াবার এক অতিরিক্ত উপায় যা রক্তকে লাল করতে আর শরীরে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। প্রত্যেক দিন নিন মেয়েদের জন্যে তৈরী এক আয়রন টনিক—ফসফোমিন আয়রন।

ফসফোমিন ভিটামিন

পরিবারের সকলের জন্যে ভিটামিন টনিক

ফসফোমিন-এ আছে বি কমপ্লেক্স ভিটামিন আর পুরো মাত্রায় গ্লিসারোফসফেট্স যা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে ২'টি ফসফোমিন টনিক

ফসফোমিন টনিক খিদে বাড়ায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যোগায় আর প্রফুল্ল করে তোলে।

ⓒ ই. আর স্কুইব ও সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী

SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS LTD. লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারক

Shilpi SC 8A/74 ben

রঙ-করা খাদ্য গ্রহণ করা ও বিষ খাওয়া একই কথা

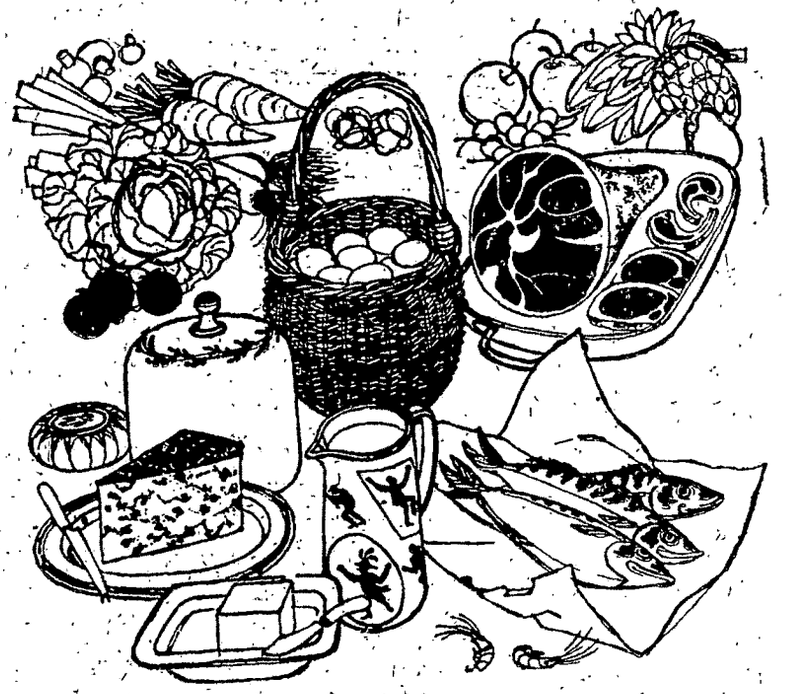

এমনকি এই শীতকালেও, যখন টাটকা শাকসবজিতে বাজার আলো হয়ে থাকার কথা, বাজারে ঢুকলে দেখতে পাবেন রঙে চুবিয়ে কৃত্রিমভাবে 'টাটকা' করে তোলা শাক-সবজির সমারোহ। কড়াইশুঁটিতে তো বটেই, এমনকি কাঁচালঙ্কা ও উচ্ছেতে পর্যন্ত কৃত্রিম রঙের প্রলেপ দিয়ে স্বাভাবিকের জেল্লা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। পটলের সময় এল বলে তখন তো বাজারে বাজারে সবুজ রংয়ের ঢল নামে—পটলের স্বাভাবিক সবুজ নয়, কৃত্রিম সবুজ। কাটাপোনা বা অন্যান্য কটা-মাছ তো অনেক দিন থেকেই কৃত্রিম লালের দৌলতে তাজা মাছের কৌলিন্য পেয়ে আসছে। আলুর গায়েও মাঝে মাঝে রং চড়ে পাতিলেবুও পিছিয়ে নেই। ব্যাপারটা এমনই বিরাট ও ব্যাপক, আর প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে এমনই আগ্রাসী যে এমন দিনও আসতে পারে যখন বাজারে ঢুকে অকৃত্রিম রংয়ের কোনো কিছুর সাক্ষাৎ পাওয়াটাই বাসরঘরে নববধূকে আটপৌরে সাজে দেখতে পাওয়ার মতো বিস্ময়কর মনে হবে।

আর শুধু শাকসবজির বাজার কেন, মিষ্টির দোকানে আসুন। সন্দেশ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—কত তার রং, কত ঢং। তদুপরি তবকদার। রাজভোগকে এখন আর সাদা চেহারায় রাজকীয় মনে করা হয় না। দধি পর্যন্ত ক্ষেত্রবিশেষে গাঢ় বাদামী।

পানের দোকান রাজার গৌরব তবক-দারের। সেখানেও কৃত্রিম রং মিষ্টি মশলায়, কখনো কখনো সুপারিতে।

ঠাণ্ডা পানীয়ের দোকানে তো রংয়ের পর রং, কি তার ঝিলিক তার গাঢ়ত্ব 'অ্যাঙ্গো' হলেই সবুজ, অরেঞ্জ হলেই কমলা, আসলকেও হার মানায়।

আসল রং কি আছে মাখনে? জ্যামে? জেলিতে? কদাচিৎ।

এমনিতেই যখন চক্রবৃদ্ধি হারে প্রচণ্ড-ভাবে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়ে চলেছে, সেটা দারুণ এক সংকটজনক পরিস্থিতি। দেশের বেশির ভাগ মানুষ খেতে পায় না (অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের অবস্থা, কিন্তু কথাটা এতই রূঢ় শোনায় যে খানিকটা মোলায়েম করার জন্য আমরা বলে থাকি 'অপুষ্টি'), যেটুকু জোটাতে পারে তাতেও আবার প্রচুর ভেজাল (এমন কি বেবিফুডে ও ওষুধেও)।

অনেক রকমের খাবার। প্রকৃতই যদি টাটকা ও খাঁটি হয় তাহলে উপাদেয় তো বটেই, শরীরের পক্ষে ভালো। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এই খাবারগুলো বাজারে হাজির হয় রঙ করা চেহারা নিয়ে, তখন দেখে মনে হয় বড়ো বেশি টাটকা ও খাঁটি। খুব ভালো চোখ না থাকলে বোঝা শক্ত খাবারের রঙ আসল না নকল। তাছাড়া ঠাণ্ডা পানীয় বা টমাটো সস বা এমনি ধরনের কতকগুলো খাবারে অবধারিতভাবেই রঙ থেকে যায়। কৃত্রিম রঙ সবসময়েই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মারাত্মক রকমের।

দেশে বড়ো রকমের বিপর্যয় ঘটাবার জন্য এই দুটি সমস্যাই যথেষ্ট। কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে তদুপরি এক সমান বিপর্যয়-কর সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে খাদ্যদ্রব্যে কৃত্রিম রংয়ের ব্যবহার। বিপর্যয়কর সমস্যা এ-কারণে যে, যে-সব কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হচ্ছে (দামে কিছুটা শস্তা হয় বলে) সেগুলো অননুমোদিত নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে হলে —বিষবৎ। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি এই দেশেও আগে কখনো হয়নি।

•

খাদ্যদ্রব্যে কৃত্রিম রং ব্যবহার করা চলবে না, কথাটা তা নয়। খাদ্যদ্রব্যকে আরও লোভ-নীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কৃত্রিম রংয়ের প্রলেপ দেওয়ার রেওয়াজ বহু শতাব্দী ধরেই চলে আসছে। যেমন, পোলাও হলেই তার সঙ্গে চোখ-জুড়ানো ও জিভে-জল-জাগানো জাফরানি রং। তা হোক, কিন্তু এই রং এমন হওয়া চাই যাতে কোনোক্রমেই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়। এ-কারণে রংয়ের পক্ষে একটা অনুমোদনের প্রয়োজন থেকে যায়। এটি সরকারী কর্তব্য এবং আমাদের দেশেও তা আছে।

ভারতে এমনি অনুমোদিত রং আছে দশটি—কোনোটি লাল, কোনোটি কমলা, কোনোটি হলুদ, কোনোটি নীল, কোনোটি সবুজ। রংগুলো যেহেতু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই অনায়াসেই ব্যবহার করা চলে। কিন্তু আমাদের দেশের মুনাফাবাজ লোক-ঠকানোতে-পটু বিবেকহীন ব্যবসা-দাররা স্বভাবতই হাত বাড়িয়ে থাকে দামে অপেক্ষাকৃত শস্তা রংয়ের দিকে, যেগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, অতএব অননু-মোদিত।

বাজারে চালু এই অননুমোদিত রং-গুলো হচ্ছে অরামাইন (হলুদ), ব্রু ভি-আর-এস (নীল), কংগো রেড, সুদান-২, সুদান-৩ (লাল), ম্যালাকাইট গ্রীন (সবুজ), মেটানিল ইয়েলো (হলুদ), অরেঞ্জ-২ (হলুদ থেকে কমলা) ও রোডামাইন বি (পাটল)। খাদ্যদ্রব্যে রং করার জন্য এই রং-গুলোই এখন সারা ভারত জুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। দামে শস্তা, তাই।

সারা দেশের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে এ যে কি মারাত্মক ছিনিমিনি খেলা, এ-বিষয়ে আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষস্থানীয়রা বিশেষ অবহিত বলে মনে হয় না। তবে কিছুকাল আগে পার্লামেন্টে আলোচনা উঠেছিল এবং ঘোষণা শোনা গিয়েছিল যে, অননুমোদিত রং ও তবকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে শিগগিরই নাকি অর্ডিন্যান্স জারি করা হবে। পরবর্তীকালে এ-বিষয়ে আর কিছু

শোনা যাচ্ছে না। তবে ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ-এর শিল্পগত বিষবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (ইনডাস-ট্রিয়াল টকসিকোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার) বড়ো একটি কাজ করেছেন। তা হচ্ছে খাদ্য-দ্রব্যে নিষিদ্ধ রংয়ের বিষয়ে একটি সমীক্ষা। 'সায়েন্স রিপোর্টার'-এর জানুয়ারি সংখ্যায় এই সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রবন্ধ লিখেছেন কেন্দ্রের দুই বিজ্ঞানী ডঃ এস কে খান্না ও ডঃ জি বি সিং। উক্ত প্রবন্ধ থেকে তথ্য উপস্থিত করে এই অতিশয় গুরুতর বিষয়টি সম্পর্কে বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের অবহিত করতে চাই। আশা করব, তাঁরা নিজেরা সজাগ ও সক্রিয় হবেন, জানাশোনা অন্য সকলকেও করে তুলবেন, সম্ভব হলে এমন এক আন্দোলন সৃষ্টি করবেন যাতে রং-করা খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয় এবং স্বাভাবিক রংয়েই খাদ্যদ্রব্য সম্মানীয় হয়ে ওঠে।

•

লক্ষ্ণৌয়ের শিল্পগত বিষবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র খাদ্যদ্রব্যে কৃত্রিম রং পরীক্ষা করে দেখার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল ১২,৫৭৫টি, সবই উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে। পরীক্ষায় দেখা যায় ৩,৭৭৫টি নমুনায় রং অননুমোদিত, বাকি ৮,৮২০টি নমুনায় অননুমোদিত বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

অননুমোদিত রং চড়ানো ক্ষতিকর নমুনাগুলোকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করে দেখানো চলে।

দুগ্ধজাত সামগ্রী ঃ মিষ্টির দোকানে লভ্য সমস্ত রকমের রং-করা খাদ্যদ্রব্যকে (আইসক্রীম সমেত) এই পরীক্ষার আওতায় আনা হয়। এই বিভাগে নমুনার সংখ্যা ছিল ১,১৫৪টি, তার মধ্যে অনুমোদিত রং পাওয়া গিয়েছে ৪৯৮টিতে, অননুমোদিত রং ৬৫৬টিতে। অর্থাৎ মিষ্টির দোকানের রং-করা খাদ্যদ্রব্যের ৫৭ শতাংশই ছিল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

অ-দুগ্ধজাত সামগ্রী ঃ এই বিভাগে ছিল ময়দা সুজি বেসন থেকে তৈরী রং-করা খাদ্যদ্রব্য (নিমকি, জিলাপি ইত্যাদি)। নমুনার সংখ্যা ছিল ৬,১৮২, তার মধ্যে অনুমোদিত রং পাওয়া গিয়েছিল মাত্র ১,০২১টিতে, বাদবাকি ৫,১৬১টিতেই অননুমোদিত বা নিষিদ্ধ রং। তার মানে, ময়দা, সুজি বেসন দিয়ে তৈরী রং-করা খাদ্যদ্রব্যের ৮৩ শতাংশই ছিল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

ডাল ঃ এই বিভাগে নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছিল অড়হর ইত্যাদি ডাল এবং ছোলা বাদাম ইত্যাদি। নমুনার সংখ্যা ছিল ৯৪০টি। অনুমোদিত রং একটিতেও পাওয়া যায়নি। তার মানে, এই বিভাগের প্রতিটি নমুনা ছিল (নিষিদ্ধ রং থাকার দরুন) স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বিশ্লেষণ-এর ফলাফল এইরকম ঃ মেটানিল ইয়েলো (হলুদ) ৯৯ শতাংশ নমুনায়, আর বাদ-বাকি ৩ শতাংশে অরামাইন, রু ভি-আর-এস, অরেঞ্জ-২ ও রোডামাইন বি। নিষিদ্ধ রং সবচেয়ে বেশি ছিল অড়হর ডালে—মেটানিল ইয়েলোর সাহায্যে ঝকঝকে হলুদ করে তোলা। অন্যদিকে শুকিয়ে যাওয়া সাদা মটরদানা লাভ করেছিল সতেজ সবুজ—এক্ষেত্রে কৃত্রিম রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল হলুদ ও রু ভি-আর-এস।

বিবিধ ঃ এই বিভাগে ছিল চিনি থেকে তৈরী খাদ্যদ্রব্য, সাধারণ মিঠাই, ঠাণ্ডা পানীয়, মদ্য ও সুরা চা মশলা গুঁড়া-শমলা আচার চাটনি কাসুন্দি ইত্যাদি। রং-করা নমুনার সংখ্যা ছিল ৪,২৯১টি, তার মধ্যে ২,২৩৬টিতে অনুমোদিত রং ২,০৬৩টিতে অননুমোদিত। অর্থাৎ ৪৮ শতাংশ খাদ্যদ্রব্য ক্ষতিকর রং।

লজেন্স মিঠাই মালাই বরফ জাফরান সাবুর পাপড় পানের মশলা জর্দা হিং ও এমনি ধরনের আরো অনেক কিছুতেই নিষিদ্ধ রং পাওয়া গিয়েছে। যেমন গুঁড়ো লঙ্কায় সুদান-২ বা সুদান-৩ বা কঙ্গো লাল। তবে সোডা লেমনেড ইত্যাদি চা দেশী মদ টমাটো সস ও এমনি আরো কতকগুলোতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল অনুমোদিত রং। তবুও একটি কথা বলার আছে—চা ও দেশী মদ বিনা রংয়েই বাজারে আসা উচিত, অন্তত এই দুটি সামগ্রীতে রং মেশাবার অনুমতি নেই।

মোট হিসেব ধরলে রং-করা খাদ্যদ্রব্যের ৭০ শতাংশে নিষিদ্ধ রং, ৩০ শতাংশে অনুমোদিত রং। আঠারো রকমের নিষিদ্ধ রঙের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয় মেটানিল ইয়েলো ২৯ শতাংশ অরেঞ্জ-২ ১১ শতাংশ অরামাইন ৯ শতাংশ রোডা-মাইন বি ৮ শতাংশ, রু ভি আর-এস ৬ শতাংশ ও ম্যালাকাইট গ্রীন ৪ শতাংশ। হিসেব এখানেই শেষ নয়, নিষিদ্ধ রং আছে আরো কয়েক প্রকারের—যেমন রেড ৬বি সুদান-২, সুদান-৩, কঙ্গো রেড। মিথাইল ভায়োলেট, বাটার ইয়েলো অ্যাসিড ম্যাজেন্টা ইত্যাদি ইত্যাদি।

*

খাদ্যদ্রব্যে যতো রকমের নিষিদ্ধ রং ব্যবহার করা হয় সেগুলো সবই অতীব বিষাক্ত। জন্তু-জানোয়ারের ওপরে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে এই সমস্ত রং শরীরের কোন-না-কোন ক্ষতি করেই থাকে। যেমন ধরা যাক অরেঞ্জ-২, অরামাইন রোডামাইন বি রু ভি-আর-এস ম্যালাকাইট গ্রীন ও সুদান-৩। এগুলো সবই নিষিদ্ধ রং কিন্তু তা সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্যে বহুভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরীক্ষা কার্য থেকে জানা যায় এই রংগুলো শরীরের ভিতরকার কতকগুলো জরুরী অঙ্গ (যথা, কিডনি বা বৃক্ক সপ্লীন বা প্লীহা লিভার বা যকৃৎ) বিশেষ রকমের ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। কঙ্গো রেড প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে মস্তিষ্ক কিডনী ও চক্ষু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার ফলে জটিল কতকগুলো রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে এমন কি চক্ষুরোগ গ্লুকোমাও। অরামাইন রোডামাইন বি ও রু ভি-আর-এস থেকে ক্যান্সার হওয়া অসম্ভব নয়। ম্যালাকাইট গ্রীন থেকে ফুস-ফুস বক্ষ ও লিভারের টিউমার হতে পারে এবং চামড়া হাড় ও ফুসফুসের নানা রকম পীড়া। লেড ক্রোমেট থেকে ঘটতে পারে রক্তশূন্যতা অসাড়ত্ব ও ভ্রূণনাশ।

নিষিদ্ধ রংয়ের মধ্যে সবচেয়ে বহুল ব্যবহার মেটানিল ইয়েলো নামক হলুদ রংটির। নানা রকমের মিঠাইয়ে, নোনতা খাবারে দানা শস্যের রান্নায়, আচার ইত্যাদিতে চটকদার জেল্লা আনবার জন্য এই রংটিই প্রচলিত। পরীক্ষাকার্যে দেখা গিয়েছে এই রংয়ের প্রয়োগে অণ্ডকোষের ক্রিয়া ব্যাহত হয়।

অন্য দিকে এমন কি অনুমোদিত রংও কখনো কখনো বিপদের কারণ হতে পারে। যেমন একটি অনুমোদিত রংকে বলা হয় অ্যামারান্ট লাল রং করার জন্য যার প্রচলন রীতিমত ব্যাপক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ভেষজ প্রশাসনের হিসাব থেকে জানা যায় বিশ্বের ষাট টরও অধিক দেশে খাদ্যে ওষুধে ও প্রসাধনে এই লাল রংটি প্রতি বছর ব্যবহৃত হয় প্রায় ৭৫ লক্ষ কিলোগ্রাম পরিমাণ। সেই ১৯৫৩ সালেই দুজন বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা গিয়েছিল যে, জন্তু-জানোয়ারের খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মাত্র ৪ শতাংশ পরিমাণে এই রংটি থাকার ফলে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার দেখা দিয়েছিল। মস্কোর পুষ্টি ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ এই রংটির প্রয়োগে ইঁদুররা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয় আরও ধরা পড়েছে প্রজনন-শক্তি হ্রাস মৃত ছানা প্রসব ইত্যাদি ধরনের কতকগুলো মারাত্মক লক্ষণ।

অনুমোদিত অন্যান্য রং নিয়েও বিশ্বের নানা দেশে নানা রকমের পরীক্ষা হয়েছে। এখন বিজ্ঞানীদের মোটামুটি সিদ্ধান্ত এই, মাত্রাতিরিক্ত ঘন অবস্থায় ব্যবহৃত হলে অনু-মোদিত রংও জটিল ও প্রায় দুরারোগ্য বিবিধ রোগের কারণ হতে পারে।

•

আর, যে-কথা বলেছি, ব্যক্তিগতভাবেও প্রত্যেককে সজাগ ও সক্রিয় হতে হবে। সব সময়ে মনে রাখবেন, রং-করা খাদ্য গ্রহণ করা ও বিষ খাওয়া একই কথা। বাজারে শাক-সবজি কেনার আগে ভালো করে দেখে নেবেন তার রং স্বাভাবিক কিনা। গুঁড়ো মশলা ব্যবহার না করাই ভালো।। ডাল ইত্যাদি রান্না করার আগে ভালো করে ধুয়ে নেবেন। রং-করা সন্দেশ ভুলেও মুখে দেবেন না। তবকদার সন্দেশ বা পানের তবকটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ঠাণ্ডা পানীয় যদি খেতেই হয় তো স্বাভাবিক সাদা রংয়ের অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিম রংকে ভয় করে চলবেন, তা থেকে যতো দূরে থাকতে পারবেন ততোই মঙ্গল। আর সব সময়ে মনে রাখবেন, বিশেষ করে আমাদের দেশে খাদ্য-দ্রব্যকে লোভনীয় ও আকর্ষণীয় করার জন্য নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর রংয়ের ব্যবহারই বেশি—সেগুলো শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হলে কিছু না কিছু ক্ষতি করবেই। তবে এমনকি অনু-মোদিত রংও অত্যধিক ঘনত্বর হলে সমান বা কখনো কখনো ততোধিক ক্ষতিকর।

—অয়স্কান্ত

উপন্যাস

ঘেরাটোপ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তাঁর কথার প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাঁকেই অস্বীকার করার চেষ্টা করছে ইদানীং। তাই নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মার প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জিজ্ঞাসু করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

অথচ ঐ মানুষটাই তাকে বিপ্লবীদের কত গল্প শুনিয়েছে। শুনতে শুনতে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া যত দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে, রঞ্জু অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। বঙ্কিম দত্ত যা চান রঞ্জু তা নয়। তার চিন্তার জগৎ পরিবেশ সবই স্বতন্ত্র। আর যুঁইদি এসে যেন ষোল বছরের রঞ্জুর মানসিক জগৎকে পর্যন্ত আমূল পাল্টে দিয়েছে। বিবাহিতা যুঁইদি যেন তাকে কাঁচপোকার মত আকর্ষণ করছে। বঙ্কিমবাবুর মত কি অমিয়ই হতে পেরেছে? শুধু একটা ভয় তার বাবার মতই। তার বন্ধু রুদ্রেন্দু গরীব এবং বিপ্লবী মেজাজের বলে তাকে সেও এড়িয়ে চলতে চায় ভয় করে।]

(আঠারো)

ট্রামটা সরে গেল।

রুদ্রেন্দুর মূর্তিটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কেমন গেঁয়ো গেঁয়ো দেখায় লোকটাকে এ-পাড়ায়।

যেন অমিয় হঠাৎ লজ্জা পান। আড়-চোখে টুটুন ও টুটুলের বন্ধুদের দিকে তাকান একবার।

তাই তো হঠাৎ কাকে দেখে তিনি এভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন! ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরা মানুষটাই বা কে! টুটুন অবশ্য চিনে থাকবে। বাড়িতে রুদ্রেন্দুকে সেদিন দেখেছিল। কিন্তু ওর বন্ধুরা তো রুদ্রেন্দুকে চেনে না। টুটুনের বাবা ভিখিরির চেহারার ঐ মানুষটার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল দেখে তারা নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছে।

মেয়েদের মনের ভাবটা লক্ষ্য করতে চোখ আড় করে অমিয় এক-একটি মুখ দেখেন আর চাপা লজ্জা নিয়েও মিটিমিটি হাসেন।

রুদ্রেন্দুর পরিচয় পেলে এরা কি খুব একটা অবাক হবে, অমিয় চিন্তা করেন। এরা ইংরেজ রাজত্ব দেখেনি দেশের অবস্থা তখন কেমন ছিল তাও জানে না। ইংরেজ তাড়াবার জন্য কিছু লোক বোমা পিস্তল ধরেছিল—ব্যস এই পর্যন্ত ওরা শুনেছে এবং স্কুল-টুলের ইতিহাস বইয়েও ঐ একটা চ্যাপ্টার ছোট করে আজকাল জুড়ে দেওয়া হচ্ছে—কিন্তু এই নিয়ে পড়ুয়াদের যে খুব একটা কৌতূহল আছে অমিয় বিশ্বাস করেন না। মরা জিনিস নিয়ে অতীত নিয়ে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কতটা কৌতূহলই বা থাকতে পারে!

কিন্তু সেটা কথা নয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ক্ষুদিরামের নাম শুনেছে রেডিওতে 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গান শুনেছে বাঘা যতীনের নাম শুনেছে বিনয়-বাদল-দীনেশের নামও কেউ কেউ নিশ্চয় শুনেছে এবং তাদের স্ট্যাচুট্যাচুও কলকাতায় এখানে সেখানে দেখে থাকবে। সেসব আলাদা জিনিস। যেমন নেতাজীর নাম শোনেনি বা তাঁর ছবি কি শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে অত বড় মূর্তিটা দেখেনি এমন ছেলেমেয়ে খুব কম আছে। আর নেতাজী-স্টেডিয়াম তো তাদের মুখে মুখে।

এবং এই জন্য এসব বিপ্লবীদের সম্পর্কে বাচ্চাদের মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব পূজা-পূজা ভাব তৈরী হয়ে গেছে। কিন্তু এখন যদি এরা হঠ করে শোনে যে রুদ্রেন্দুও একজন সেই আমলের বিপ্লবী ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে তারা তার এই না খাওয়া কাঁকলাশ মূর্তি ও পোশাকের ছিরি দেখে তো সব কটা মেয়ে নির্ঘাৎ হেসে খুন হবে। রুদ্রেন্দুরা তাদের যুগটাকে ঘটা করে 'অগ্নি-যুগ' বলে না। এখন সেই যুগের প্রতিনিধি হিসেবে যদি রুদ্রেন্দুর মতন একটা মার খাওয়া মরা মানুষকে এনে এযুগের ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে দাঁড় করান যায় তো সেই যুগটা সম্পর্কেই বা তাদের মনের ভাবটা কেমন দাঁড়াবে চিন্তা করে অমিয় ভিতরে ভিতরে একটু অস্বস্তি বোধও করেন বৈকি।

তাই চিন্তা করছিলেন এভাবে এখানে রুদ্রেন্দু যদি তাঁকে দেখতে না পেত ভালই হত। যেমন একদিন রাত্রে তাঁদের মফঃস্বল শহরের রাস্তায় পাশাপাশি হেঁটে গিয়েও রুদ্রেন্দু তাকে দেখতে পায়নি চিনতে পারেনি।

হঠাৎ টুটুনরা থমকে দাঁড়িয়েছে। জ্যোৎস্না নেই রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার ও চারদিকের বাড়ির আলোটালো ছিটকে এসে ঝুপসি বকুল গাছটার মাথায় পড়েছে। ফলে পাতার ফাঁক দিয়ে চিকরি-কাটা চাঁদের আলোর মতন ওদের কাঁচ মুখে মাথায় ও গায়ে বিচিত্র আলপনা তৈরী করেছে। ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে।

সত্যি বলতে কি ওরা কেমন কলকলিয়ে গল্প করে এতক্ষণ পথ হাঁটছিল। এখন সব চুপ। যেন হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। তা ছাড়া কি। অমিয় চিন্তা করেন সারাটা দুপুর বিকেল একটা কবিতার মতন গানের মতন কেটেছে ওদের। বোটানিকস-এর বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ওরা আজ কত পাখি দেখল। পাখির গান শুনেছে শিস শুনেছে। বনের ভিতর রোদ্দুরের রং ফেরা দেখেছে কবার। গাছের পাতার সরসর শব্দ শুনেছে। পোকা-মাকড় দেখেছে। অমিয় প্রায় সব সময় ওদের সঙ্গে ছিলেন। বয়স হয়েছে। হাঁপিয়ে উঠেছেন মাঝে মাঝে সন্দেহ কি। কাঁচাকাচি কিশোরীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কত আর ছুটোছুটি করতে পারেন।

তা হলেও তো করেছেন। কারণ তিনি সঙ্গে না থাকলে ওদের হয়েক্ষয়কম পাখি চিনিয়ে দিত কে। মাঝে মাঝে ক্লান্তি এলেও মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লান্তিটা

তক্ষুনি ঝেড়ে ফেলতে তিনি দেরি করেননি। যেন এখনও এদের সকলের গায়ে বনের গন্ধ রোদ্দুরের গন্ধ লেগে আছে। চোখে চোখে রংবেরঙের পাখির স্বপ্ন। তাছাড়া ওরা নিজেরাও যে এক একটি পাখি। সোনালী ফেজ্যান্ট সাতসয়ালী ফ্লেমিঙ্গো বসন্ত-বউরি ফটিকজল চন্দনা টুনি কাকাতুয়া খঞ্জন।

কাজেই কবিতার সুরটা কেটে যেতে কেমন যেন জবুথবু হয়ে গিয়ে পাখির ঝাঁকটা গড়িয়াহাট রোডের এই ঝুপসি বকুল গাছটার নিচে এখন এমন চোখ করে তাকিয়ে আছে যেন দূরে কোথাও বন্দুকের শব্দ শুনতে পেয়েছে ওরা যেন এই মুহূর্তে গাদ্দিক কিছু ব্যাপার ঘটবে। এই জন্য ওরা মোটেই তৈরী নয়।

মুখগুলির দিকে তাকিয়ে অমিয়র কষ্ট হল। উপায় কি! নিজের মনে বললেন তিনি পৃথিবীতে চলতে ফিরতে মাঝে মধ্যে রুদ্রেন্দুর মতন খাপছাড়া কিম্ভূত চেহারার এক একটা চেহারার সামনে পড়ে যেতে হয়। তখন মনে হয় এই জগতে গান কবিতা বলতে কিছুই নেই। সবটাই নীরস খটখটে গদ্য। মনে হয় তখন বেঁচে থেকে বুঝি জীবনে আর সুখ নেই।

ট্রামটা সরে গেল। রুদ্রেন্দু ট্রাম লাইনের উঁচু জমি ডিঙিয়ে নিচের ফ্ল্যাট সড়কে নামল। কিন্তু আবার তাকে উজবুকের চেহারা করে দাঁড়াতে হয়। দুদিক থেকে লাল নেকড়ের মতন গোঁ গোঁ আওয়াজ করে দুটো মিনি বাস ছুটে আসছে।

কলকাতার রাস্তা পার হওয়ার কত জ্বালা বোঝ চাঁদ। কেন মরতে আস তুমি রুদ্রেন্দু এ-পাড়ায়। অমিয় মনে মনে বলেন। এটা তোমার দমদম নাগেরবাজার দত্তপুকুর সেনপুকুর নয়। যার নাম বালিগঞ্জ প্রতি মিনিটে বিশেষ করে এই সন্ধ্যে সওয়া ছটায় এসব রাস্তায় সওয়া লক্ষ ট্যাকসি প্রাইভেট গাড়ি ছুটোছুটি করে। তার ওপর আছে ট্রাম-বাস। দেখছ তো কেবল যে অফিস আদালত সেরে মানুষ এখন ঘরে ফিরছে তা নয়। আরও সোওয়া লক্ষ মানুষ-মানুষী টাই?সুট পরে রংবেরঙের শাড়ি বেলবটস ম্যাকসি লুঙ্গির জেল্লা ছড়িয়ে সবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। অফিস আদালত ছাড়াও অনেক কাজ থাকে এপাড়ার পুরুষ ও মেয়েদের। এখন কেনাকাটা আছে সিনেমা থিয়েটার বার রেস্তোরায় যাওয়া হবে ক্লাব কালচারাল সেমিনার ধর্ম-সভায় যোগ দেওয়া আছে। বালিগঞ্জের মানুষের কাজের ফিরিস্তি দিতে গেলে রাত পুইয়ে যাবে রুদ্রেন্দু। দ্যাখো আবার একটা প্রাইভেট এসে যাচ্ছে। এখানে চাপা পড়লে কেউ তোমার জন্য শোক করবে না চোখের জল ফেলবে না। প্রাক্তন বিপ্লবী হিসেবে দমদমের মানুষ তোমার নাম নিয়ে কতটা হৈ-চৈ করবে সেটা তুমি জান। আমি বলতে পারব না। এখানে তুমি অজ্ঞাতকুলশীল। চাপা পড়লে লোকে ভাববে শহরের একজন বেকার কলম বা উপোসকাপাসের হাত থেকে একটি ভিকিরি রক্ষা পেল।

—দুটো বাস দুদিকে সরে গেল। রুদ্রেন্দু আবার লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোয়। অমিয়র চোখ দুটো গোল হয়ে যায়। সেদিন তবু ছেঁড়া-খোঁড়া এক জোড়া চটি পায় ছিল। আজ রুদ্রেন্দু একেবারে নগ্নপদ। চটিটা আর চলছিল না। অমিয় চিন্তা করলেন। বাড়িতে রেখে এসেছে নাকি রাস্তায় কোথাও ফেলে দিতে হয়েছে।

—কি খবর! আজ আবার এখানে?

—হুঁ আজ তিন দিন ধরে তোমাদের বাবুপাড়ায় হাঁটাহাঁটি করছি। রুদ্রেন্দু হাসল। তুমি? কোথায় গিয়েছিলে—প্রশ্ন করতে গিয়ে রুদ্রেন্দু থমকে যায়। গুচ্ছের মেয়ে অমিয়র পিছনে দাঁড়িয়ে। ফরসা সুন্দর সুন্দর চেহারা। দামী দামী পোশাক। কালো ঝকঝকে চোখ। রুদ্রেন্দুর মনে হল এক ঝাঁক ভোমরা অবাক হয়ে তাকে দেখছে। মুখটা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল সে।

নিশ্চয় নিজের এই দরিদ্র বেশভূষা ও ভিক্ষুক ভিক্ষুক চেহারাটার জন্য রুদ্রেন্দু লজ্জা পেল। চিন্তা করে অমিয় অল্প শব্দ করে হাসলেন।

—আরে এদিকে তাকাও এদের দেখে লজ্জা পাবার কিছু নেই আমার মেয়ে মেয়ের বান্ধবী এরা।

—আ তাই বুঝি! বেশ ভাল ভাল।

—রুদ্রেন্দু ঘাড় ফেরাল। মেয়েদের দিকে না অমিয়র দিকে চোখ দুটো ধরে রাখল। বেড়াতে বেরিয়েছিলে সবাইকে নিয়ে বুঝি? প্রশ্ন করল সে।

—উঁহু বিপ্লব করতে বেরিয়েছি সেই যে ব্রিটিশ আমলে তোমরা করতে বোমা পিস্তল নিয়ে টেররিজম। —অমিয় আস্তে আস্তে বললেন।

কেমন যেন বোকা বোকা চোখ করে রুদ্রেন্দু অমিয়র মুখের দিকে তাকায়।

—কি হল! বুঝতে পারছ না? অমিয় এবার নাকে হাসেন। মাথাটা সামান্য ঝাঁকান। টুটুনদের দিকে চোখ ফেরান তারপর আবার রুদ্রেন্দুকে দেখেন। সেদিন তোমাদের দলে ছেলেরা ছিল কচি কচি অনেক মেয়েও তো রিক্রুট করেছিলে হে মনে নেই? যমুনা রেবা গায়ত্রী কুন্তলা উজ্জ্বলা—আমার বেশ মনে আছে নামগুলো। আমিও এদের রিক্রুট করেছি হি-হি। হেসে থুতনি নেড়ে অমিয় টুটুনদের দেখান। তারপর টেনে টেনে হাসেন।

—রগড় করছ তাই না বন্ধু! রুদ্রেন্দু বিব্রত বোধ করে।

—আরে না না। রগড় বলছ কি! আমি সিরিয়স। তুমিও আমাদের বিপ্লবী দলে যোগ দিতে পার দেবে?

—না রে ভাই সেই আগুন কি আর ভেতরে আছে। সেই সামর্থই বা কোথায় বুড়ো হতে চলেছি যে। রুদ্রেন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—অ, বুড়ো হতে চলেছ। তাই আগুন আর জ্বলছে না। অমিয় ঘাড় বেঁকিয়ে আর একবার মেয়েদের দেখে ও চোখ টেপেন তারপর আবার রুদ্রেন্দুর দিকে তাকান।—তা হলে বলছ জোয়ান বয়েস থাকলে আগুনটা দাউ দাউ করে উঠত যুবা বয়স ফিরে পেলে আবার একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে দিতে। কেমন?

—উঁহু আর না। রুদ্রেন্দু দু হাত কপালে ঠেকায়। অনেক হয়েছে অনেক করেছি এখন আর—

—সে কি! রুদ্রেন্দুকে শেষ করতে দেন না অমিয় যেন আকাশ থেকে পড়ার চেহারা করে। —বিপ্লবে অরুচি ধরেছে? অগ্নিযুগের রুদ্রেন্দুকে কোনো পুরস্কার-টুরস্কার দিলে না বুঝি দেশের লোক।

—ঢের দিয়েছে অনেক পুরস্কার পেয়েছি। এবার রুদ্রেন্দু কেমন করে যেন হাসল। বলল অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ ভাই। বুকে আঙুল ঠেকিয়ে রুদ্রেন্দু নিজের ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড় ও সেই সঙ্গে না-খেতে-পাওয়া চিমসান শরীরটা দেখায়।

অমিয় বুঝি ভিতরে ভিতরে খুশী হন। নিশ্চিন্তও হন কম না। রুদ্রেন্দু সেখানেই থামছিল না। —কী দুরবস্থায় পড়েছি তোমাকে বলেছি সেদিন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলে। চোখেও দেখছি। রুদ্রেন্দুর জীর্ণ পোশাক ও শুকনো শরীরটা দিকে নতুন করে চোখ বুলোন অমিয়। কিন্তু তাঁর গলায় ঠাট্টাটা তখনও চলকে চলকে উঠছিল। —কি জানি আমি ভাবলাম বিপ্লবীরা ভাঙ্গে তো মচকায় না। ইংরেজ চলে গেছে স্বাধীন হয়ে আমরা বেকার সমস্যা খাদ্য সমস্যা রোগের সমস্যা ভেজালের সমস্যা স্মাগলিং-এর সমস্যায় নাজেহাল হয়ে গেছি। রুদ্রেন্দুরা বুঝি নতুন করে রেভলি-উশনের স্বপ্ন দেখছে। আবার আগুনটাগুন জ্বালাবে।

—না রে ভাই আগুনের আর ছিটে-ফোঁটাও আমার মধ্যে নেই। বলেছি আমি এখন ভেজা ছেঁড়া কাঁথা। সুতোটুতো বেরিয়ে পড়েছে। হা-হা। রুদ্রেন্দু হাসল।

মেয়েরাও খিলখিল হেসে ফেলল। অমিয়র পিছনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ টিপে টিপে হাসছিল তারাই এখন রুদ্রেন্দুর কথায় তাদের কচি ঠোঁট ও গাল বেয়ে ফোয়ারার মতন হাসি উপচে পড়ল।

যাক গে। মরাকে আর ঘা দিয়ে লাভ নেই। অমিয় চিন্তা করলেন। একটা ছার-পোকাও রুদ্রেন্দুর চেয়ে বেশি তেজ রাখে জোরে কামড় বসায় রুদ্রেন্দু একতাল কাদা-মাটি। আর অমিয়র বাবা বঙ্কিমবাবু কিনা কত সব উদ্ভট চিন্তা করছিলেন এই মানুষটাকে নিয়ে। রুদ্রেন্দু নকশাল হয়েছে। আগের চেয়েও ডেঞ্জারাস হয়েছে সে। গলার সুরটা এখন সুন্দরভাবে বদলে ফেললেন অমিয়—হুঁ একটু ঠাট্টা-মস্করা করছিলাম ভাই ঠিকই ধরেছ এখন কাজের কথায় এসো। বলছ আমাদের বালিগঞ্জের বাবুপাড়ায় কদিন ধরে হাঁটা-হাঁটি করছ ব্যাপারটা কি শুনি? নিশ্চয় আমাকে বলতে তোমার আপত্তি নেই।

—বলব দেখা হয়ে গেল যখন সবই বলছি তোমাকে। রুদ্রেন্দু রাস্তার দিকে

ঘাড় ফেরাল। হঠাৎ তাকে একটু চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখা যায় খানিকটা যেন অন্যমনস্ক।

—কি হল ভাই! কাউকে খুঁজছ? অমিয় প্রশ্ন করেন।

—আরে মেয়েটা যে সঙ্গে এসেছে। ঘাড় ফিরিয়ে রুদ্রেন্দু অমিয়র চোখে চোখ রাখল।

—তোমার মেয়ে! উৎসাহে অমিয়বাবুর দু'চোখ গোল হয়ে উঠল। কি জানি নাম বলেছিলে? হ্যাঁ মনে পড়েছে কুন্দ—কুন্দ—সেই বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী। বিষবৃক্ষ তুমি পড়েছিলে রুদ্রেন্দু?

—মনে নেই। পড়েছিলাম যেন। রুদ্রেন্দু অল্প হাসল।

—তারপর? কোথায় তোমার মেয়ে? কার কাছে আবার ওকে রেখে এসেছ? কোথায় ফেলে এলে? অমিয় ব্যস্ত হয়ে রাস্তার দিকে চোখ ফেরালেন।

—না না এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই, কোথাও ফেলে আসিনি। রুদ্রেন্দু আস্তে বলল। মেয়ের নাম করতেই তার ব্যারিস্টার বন্ধু কী রকম চঞ্চল উত্তেজিত হয়ে উঠল লক্ষ্য করে তার ঠোঁটের আগায় একটু হাসি উঁকি দিল। কিন্তু মনে মনে সে অবাক হল ঢের বেশি। আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তাটা দেখে নিয়ে অমিয়র মুখের দিকে তাকাল রুদ্রেন্দু।

—ঐ যে তোমাদের ওদিকটায় একটা ডিসপেনসারী আছে কি যেন নাম, হ্যাঁ চক্রবর্তী ক্লিনিক আর একদিন ঢুকেছিলাম ওখানে তখন দুপুর ভিড় মোটে ছিল না, আজ একেবারে লম্বা লাইন পড়ে গেছে কাউন্টারে। অফিস-ফেরতা মানুষের ভিড়। কুন্দকে বললাম তোর দাদুর ওষুধটা এখান থেকে কিনে নে আমাদের দমদমের দোকানে আবার সব সময় ওটা পাওয়া যায় না।

—সেই বল ওষুধের দোকানে রেখে এসেছ মেয়েকে। কেন একসঙ্গে দোকান থেকে বেরোতে দোষ ছিল কি। একা একা মেয়েটা ঐ ভিড়ের মধ্যে আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে কে জানে। এই জন্মে তোমার আর কাণ্ডজ্ঞান হল না।

—আরে আসবে আসবে। ভদ্রপাড়ার দোকান। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওই তো রাস্তার ওপার, এখান থেকে প্রায় দেখা যায় ডিসপেনসারী।

—হ্যাঁ দেখা যায় সে তো আমিও জানি। চক্রবর্তী ক্লিনিক আমি চিনি। ভেংচি কাটার মতন চেহারা করলেন অমিয়। তোমার মেয়েকে ছোঁ মেরে ওখান থেকে কেউ তুলেও নিচ্ছে না ঠিক। ভয় যেমন বে-তোয়াক্কা গাড়িঘোড়া ছুটে ছুটে কার, এসব রাস্তায়—একলা বেচারা রাস্তা পার হয় কি করে।

বন্ধুর ধমক খেয়ে রুদ্রেন্দু বিব্রত বোধ করে। একটু যেন লজ্জাও পায়। ঘাড় ঘুরিয়ে ড্যাবড্যাব চোখে আবার রাস্তাটা দেখে।

—অ্যাঁ দু-দশ মিনিট অপেক্ষা করতে পারতে তুমি দোকানে। ওষুধটা কেনা হয়ে যেত তারপর একসঙ্গে দুজন বেরোলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হত না। রাগে অমিয় গজরাতে থাকেন।

—হঠাৎ তোমাকে দেখলাম কিনা ক্লিনিকের দরজা থেকে। বিড়বিড়িয়ে রুদ্রেন্দু বলল তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। কি জানি তোমাকে যদি ধরতে না পারি।

—তোমাকে যদি ধরতে না পারি! অমিয়বাবু এবার বড় করে ভেংচি কাটলেন। তাই তো বলি তোমাদের রেভোলিউশনারি পার্টির লোকগুলোর মাথায় কতটা ভাল পদার্থ আছে জানি না তবে গোবরের পরিমাণটা যে অনেক বেশি তাতে সন্দেহ নেই। এখানে আমি বেশি না তোমার মেয়ে বেশি? কি রকম ট্র্যাফিকের চাপ। এটা তোমার দমদমের রাস্তা না। দেখি কোথায় তোমার মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে চল। ফুটপাথ ছেড়ে অমিয় বুঝি তখনি রাস্তায় পা বাড়াল।

—উঁহু যেতে হবে না রুদ্রেন্দু খপ্ করে অমিয়র হাত চেপে ধরল। এসে গেছে ঐ দেখা যাচ্ছে, ঐ যে আসছে ও। ঐ ওদিককার লাইটপোস্টটা পার হয়ে এল। হুঁ এখন রিকশটার আড়ালে পড়ে গেল কুন্দ।

অমিয়বাবুর চোখে পলক পড়ছিল না। রুদ্ধশ্বাস। রাস্তার দিকে তাঁর মুখটা ফেরানো হঠাৎ খুশি হন তিনি। চোখ বড় করেন। রিকশ সরে যেতে রুদ্রেন্দুর মেয়েকে দেখতে পান।

—এই যে গোপা টুটুন রুমী চামেলী —অমিয় রীতিমত চেঁচিয়ে ওঠেন। ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখো তোমরা কেমন আশ্চর্য ফুটফুটে ঐ মেয়েটি, রুদ্রেন্দুর মেয়ে বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে? কক্খনো করে না। যেমন বদখৎ কেলেকুচ্ছিত একখানা চেহারা রুদ্রেন্দুর ওর দমদমের বাড়িতে ঐ মেয়েকে প্রথম দেখে আমার ভয়ানক মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রুদ্রেন্দুর মতন চাষাড়ে চোয়াড়ে চেহারার একটা মানুষকে ওর 'বাবা' ডাকতে হয়। কেমন ফাইন বডি দেখেছ হাঁটার নমুনাটা দ্যাখো কত গ্রেস-ফুল। বাড়ির লোকে ওর কুন্দ নাম রেখেছে —আমি হলে 'লিলি' বলে ডাকতাম, নীলগিরি লিলি বা প্রিমরোজ অথবা 'ডেসমোডিয়াম' বা 'কমেলিনা ক্লাভাটা'—আর যদি দেশী ফুলের নাম ধরে ডাকতে হয় তো মল্লিকা—উঁহু সীতা ঝুমকো—ঝুমকো খুব লাগসই নাম হয় ওর। আর যদি পাখির নাম দেই? তোমরা চুপ করে আছ কেন গোপা টুটুন—আমার মনে হয় "নাইটিংগেল" নামটা ওকে বেশ মানায়, যার দেশী নাম বুলবুল। না কি 'সোনালী প্লোভার'? 'উইলো র‍্যাবলার' বলে ডাকা যায় বা 'রীড র‍্যাবলার' তার মানে বাংলায় আমরা যাকে ফুটকি পাখি বলি—বাবুই কি 'ময়না' কি 'সুইচোরা' ডাকতেই বা ক্ষতি কি। সবক'টাই সুন্দর নাম। তাই না রুদ্রেন্দু? ঘাড় ঘুরিয়ে অমিয় রুদ্রেন্দুকে দেখেন।

রুদ্রেন্দু 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলছে না। কেমন যেন বোকা হয়ে গিয়ে জজসাহেবের ছেলেকে দেখছে। রাস্তা ক্রশ করে কুন্দ আস্তে আস্তে বাবার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বের প্রবাদ: ইবনে ইমাম ৮·০০ [বিশ্বের সমস্ত ভাষা থেকে ভাল ভাল প্রবাদগুলি আহরণ করে এই বইতে সংকলিত করা হয়েছে। সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বহু রঙ শোভিত এই বইটি রাখার ও দেবার মত বই] হলুদ নদী সবুজ বন: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ৪·০০ [একটি বিখ্যাত উপন্যাস] দৃষ্টিপাত: যাযাবর: ৮·০০; দেশে বিদেশে: মুজতবা আলী: ১২·০০; কত অজানারে: শংকর: ১০·০০; সাহেব বিবি গোলাম: বিমল মিত্র: ২৫·০০; রিম ঝিম: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়: ৩·৫০; কিংবদন্তীর দেশে: সুবোধ ঘোষ: ১০·০০; নটী: মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য: ৪·০০; আলিম্পন: [আলপনা দেওয়া ও শেখার বই] দুর্গা মুখোপাধ্যায়: ১০·০০; রিক্সাওয়ালা: লাওচাও: ৬·০০।

ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ: নৃপেন্দ্র গোস্বামী: ১২·০০; কালের পুতুল: বুদ্ধদেব বসু: ৫·০০; রবীন্দ্রনাথ কথা সাহিত্য: বুদ্ধদেব বসু: ৫·০০; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী: ১০·০০; বাঙালীর ইতিহাস: [সংক্ষিপ্ত] নীহাররঞ্জন রায়: ৬·০০; রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা: নীহাররঞ্জন রায়: ৪০·০০; বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি: নৃপেন্দ্র গোস্বামী: ১৫·০০; লোকায়ত দর্শন: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: ১৫·০০; লেখকের কথা: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ৪·০০; আত্মচরিত: শিবনাথ শাস্ত্রী: ১৫·০০।

The Agony of West Bengal: Ranajit Roy 10·00; **Sedition Committee Report 1918:** (Reprint) Rowlatt-30·00; **History of Central Asia:** Rahul Sankrityan 25·00; **Calcutta India's City:** Asok Mitra 8·00; **The Days I Remember:** Kailash Nath Katju 15·00;

নিউ এজ পাবলিশার্স
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৩২টি জোরালো অপরিহার্য্য কারণ ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ® খাওয়ার পক্ষে

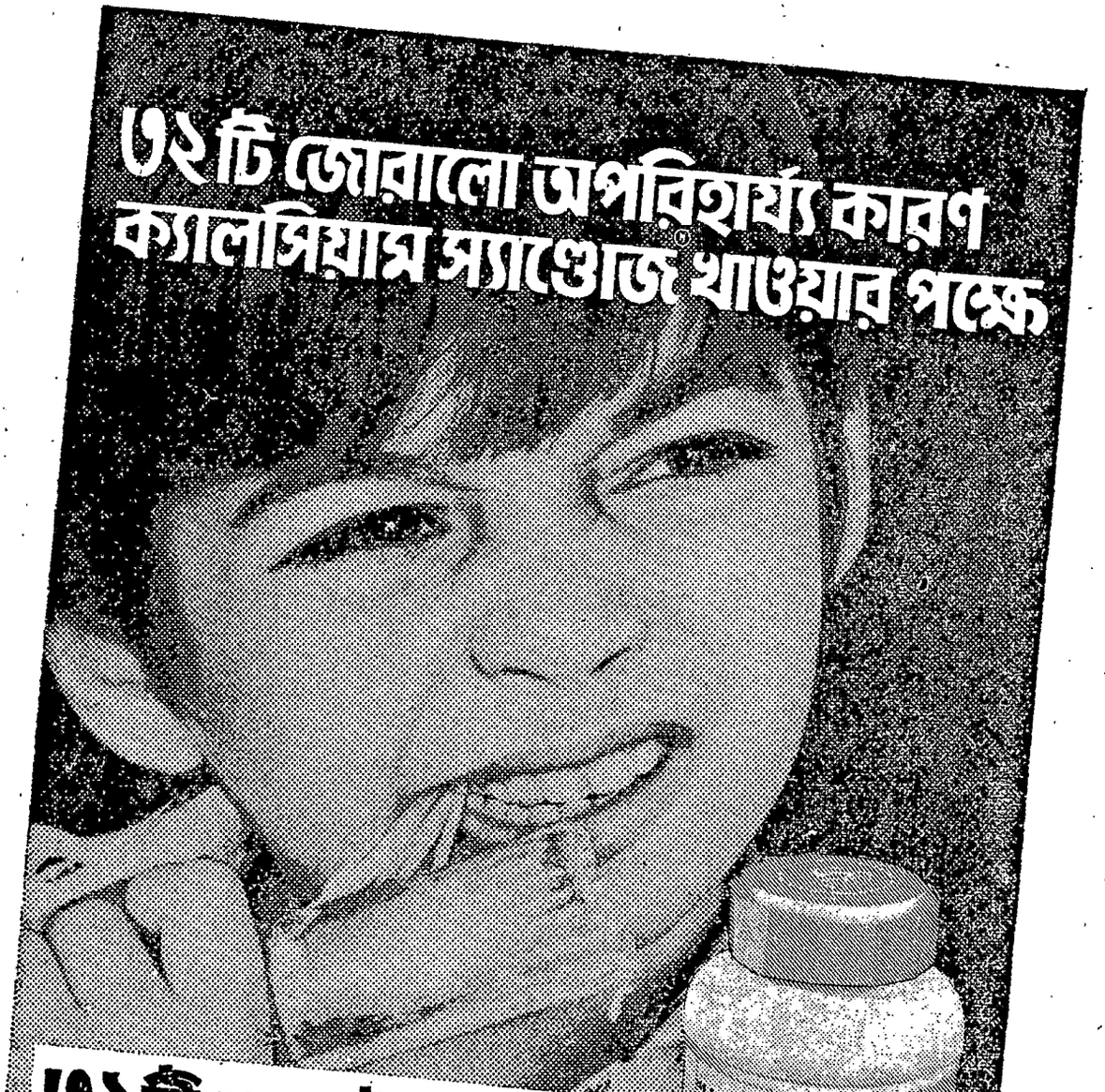

৩২টি শক্ত উজ্জ্বল দাঁত এবং মজবুত হাড়ও।

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের পক্ষে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম প্রয়োজন তার চেয়ে দ্বিগুণ ক্যালসিয়াম-এর দরকার হয় শিশুদের দাঁত ও হাড়ের জন্য। সুস্বাদু রাজবেরির স্বাদগন্ধযুক্ত ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ আপনার বাচ্চাকে খাওয়ান।

মাত্র ৪-৬টি ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ বড়ি রোজ খেলে আপনার বাচ্চার দাঁত আরো শক্ত সুন্দর এবং হাড় আরো মজবুত হবে। তাছাড়া ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ বড়িতে পাওয়া যায় ভাইটামিন সি, ডি ও বি১২। স্যাণ্ডোজ-এর উপর নির্ভর করুন—বিশুদ্ধ ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে বিশ্বে পথ প্রদর্শক।

সমস্ত বড় বড় ওষুধের দোকানে ২০ বড়ির আর ৫০ বড়ির শিশিতে এবং সিরাপ হিসেবেও পাওয়া যায়।

শরীর গঠনে ক্যালসিয়াম

বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাত্র ৪ মাসেই যে সবাশিশুরা নিয়মিত ক্যালসিয়াম খেয়েছে তারা, যারা খায়নি তাদের চেয়ে দ্রুত বেড়ে উঠেছে।

ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ®
প্রতিদিন প্রত্যেকের জন্য

SANDOZ

ডঃ অসীমা চ্যাটার্জির সঙ্গে

এ বছর সাধারণতন্ত্রের রজতজয়ন্তী দিবসে ডঃ অসীমা চ্যাটার্জিকে (ডিন, বিজ্ঞান কলেজ কলিকাতা) পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের খনিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে নিরলস সাধনায় ব্যাপৃত।

ডঃ চ্যাটার্জির জন্ম ১৯১৭ সাল। তাঁর বাল্যকাল কৈশোর ও যৌবন কেটেছে কলকাতায়। বর্তমানে তিনি কলকাতায়ই বসবাস করছেন। তাঁর দেশ তারকেশ্বর থেকে তিন মাইল দূরে হুগলী জেলার গোপীনাথপুর। শ্রীমতী চ্যাটার্জি বাল্যকালে কলকাতায় বসবাস করলেও ছুটি কাটাতে বাবা ও অন্যান্যদের সঙ্গে চলে যেতেন গ্রামে। গ্রামের পথে ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রকৃতির গাছপালা তাঁকে মুগ্ধ করতো। বাবা ছিলেন চিকিৎসক উপরন্তু ফুল লতা-পাতায় তাঁর ছিল বিশেষ জ্ঞান। ক্ষেতের আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফুল পাতা ছিঁড়ে এনে মেয়েকে দেখাতেন আর গল্প শোনাতেন প্রকৃতির গাছ লতা-পাতার। সময় পেলে বিশ্লেষণ করে দেখাতেন ফুল লতা-পাতা। বাল্যকাল থেকেই বাবার সাহচর্যে তাঁর প্রকৃতির ঐ সমস্ত জিনিসগুলি সম্বন্ধে কৌতূহল বেড়ে যায়। বড় হয়ে ছোটবেলার এই কৌতূহলই তাঁর রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়ে দেয়।

তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় বেথুন স্কুলে। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বেথুন কলেজেই আই এস সি পড়েন। বি-এসসি তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করেন। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ থেকে তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হয়ে এম-এস-সি পাশ করেছেন। এজন্য তিনি রৌপ্য পদক পান। ছাত্রী অবস্থায় তিনি স্কলারশিপ ও মেডেল নিয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৪০ সালে লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপিকা হিসেবে তাঁর শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। এসময়ই তিনি কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপিকার পদে যোগদান করেন।

১৯৪০ সালে তিনি নাগার্জুন পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি ও ১৯৪৪ সালে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডকটর অব সায়ান্স উপাধিতে ভূষিত করে। ঐ বছরই তিনি মোয়াত স্বর্ণপদক লাভ করে ছলেন।

১৯৪৫ সালে অধ্যাপক বরদানন্দ চ্যাটার্জির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শুরু হয় সংসার জীবন। অধ্যাপক বরদানন্দ চ্যাটার্জি ছিলেন কেমিস্ট্রির ডি এস সি। সয়েন্স সায়েন্স এবং ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। ১৯৪৬ সালে অধ্যাপক চ্যাটার্জি আমেরিকাতে চলে যান। পরের বৎসর শ্রীমতী অসীমা চ্যাটার্জি মেয়ে ও তাঁর গাভারনেসকে নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দেন। কর্মস্থলের বিভিন্নতার জন্য স্বামী-স্ত্রী একই দেশে অবস্থান করেও পৃথক স্থানে বাস করতেন। ১৯৪৭ থেকে ৪৯ সালের কয়েকমাস ক্যালটেক ইউনিভার্সিটি অব উইশকন-এ অধ্যাপিকার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি সুইজারল্যান্ডের জুরিক ইউনিভার্সিটিতে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। বিদেশে থাকাকালীন তিনি অনেক বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদান করেন। অনেক দেশ পরিভ্রমণ করে তিনি ১৯৫১ সালে ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৪৯, ৫০ ৭০ ৭১ সালে-এ তিনি ইউকে ভ্রমণ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন। এছাড়া একাধিকবার অস্ট্রেলিয়া, হংকং মালয় জাপান জার্মানী ও ফারনস ভ্রমণ করে নানা বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদান করেন। কোথাও কোথাও তিনি চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়েছিলেন এবং সে বছরই স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পান।

১৯৫৪ সালে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে রীডার ও ১৯৬১ সাল থেকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে ৬২তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন।

ডঃ চ্যাটার্জির সারাদিন ও অনেক রাত অবধি ব্যস্ত। ছাত্রছাত্রীদের, গবেষণা পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে লেকচার নিজের কাজ ছাড়া ও বাইরের অনেক কাজের মাঝেও তিনি সহজ ও সরল। তাঁরই ব্যস্ততার মাঝে একটু সময় করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত হয়ে আপনার কেমন লাগছে? আমরা দেশবাসী সবাই খুব খুশী গর্বিত।

তিনি ধীরভাবে খানিক ভেবে উত্তর দিলেন এ সম্মান আমার মনে কোন গভীর রেখাপাত করে নি। তবে বাংলার এবং বাংলার বাইরের মানুষেরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমি পদ্মভূষণ উপাধি পাওয়ায় তাঁরা খুব আনন্দিত আর এ আনন্দটা তাঁরা পুরোপুরি উপভোগ করেছেন—সেটা আমার কাছে মস্তবড় জিনিস আমার সবচেয়ে বড় এচিভমেণ্ট। দেশের প্রত্যেক স্তরের লোকেরা যে আমায় আপনজন ভাবে এটাই আমার পরম পাওয়া।

তাঁকে আরও প্রশ্ন করেছিলাম বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কোন প্রদেশের মেয়েরা সবচেয়ে এগিয়ে গেছেন?

উঃ এ ব্যাপারে বিশেষ করে কোন প্রদেশকে গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। এক একটা বিষয়ে এক একটা প্রদেশ উন্নত। আজকাল মোটামুটি অনেক স্থানেই মেয়েরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা, গবেষণা করার সুযোগ পাচ্ছে।

প্রঃ বিদেশে আমাদের দেশের মেয়েদের বিজ্ঞানে উন্নতি সম্বন্ধে ধারণা কি রকম?

তিনি এবার সরাসরি উত্তর দিয়েছিলেন বিজ্ঞানে এখন আমাদের মেয়েরা অনেক এগিয়ে গেছে। অনেকেই বিশেষভাবে গবেষণায় রত কিন্তু ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশে মহিলা বিজ্ঞানী এত কম সংখ্যায় উপস্থিত থাকেন যে সেসব দেশের মেয়েদের লোকেদের, আমাদের দেশের মেয়েদের বিজ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। অবশ্য বিদেশে যাঁরা বিজ্ঞানচর্চায় রত তাঁরা অবশ্য আমাদের দেশের মেয়েদের বিজ্ঞানের অবদান সম্বন্ধে জানেন।

প্রঃ আপনার কাজ সম্বন্ধে একটু কিছু বলুন যা আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত করবে।

উঃ দেশজ গাছগাছড়া থেকে গবেষণা ও তার থেকে ওষুধ বার করার কাজকেই আমি প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ধরেছি। গবেষণা করতে করতে এমন অনেক জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে যা বিদেশীরাও ব্যবহার করছেন। যেসব জিনিস বার করেছি তার রাসায়নিক দিকটাও বিশদভাবে জানবার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছি যার ফলে আমাদের যেমন জ্ঞান বাড়ছে সেসঙ্গে জানবার কৌতূহলও বেড়ে যাচ্ছে।

সবশেষে বললেন আমাদের গবেষণার দুটো দিক—জনকল্যাণ দিক ও নতুন আবিষ্কারের দিক। সুতরাং দেশের কাজে আমাদের প্রচেষ্টা সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সার্থক হয়ে ওঠা উচিত।

শ্রীমতী চ্যাটার্জির মেয়ে ও জামাই এখন বিদেশে। দুজনেই পি এইচ ডি। সেখানে তাঁরা নিজেদের কাজ ও অধ্যাপনার কাজ করে চলেছেন। ডঃ চ্যাটার্জি সকলেরই মাস্টার। ছাত্রছাত্রীরা তাঁর আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ। এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে কোন বিরক্তি বা ক্লান্তি অনুভব করেন নি। কথার ফাঁকে বলেছিলেন কত জানার আছে, কত জানাবার আছে ছাত্র-ছাত্রী গবেষণা এগুলি নিয়ে মাঝে মাঝে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

—অঞ্জলি চৌধুরী

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.,ডি.জি.ও
ডাঃ এস. এম. পাণ্ডে এম.বি.,বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

এবারে সাধারণভাবে ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যা কিভাবে করতে হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব। সমস্ত শরীরের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা আছে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সেই পুরুষ বা মহিলার শরীর কেমন? অর্থাৎ মোটা মেদবহুল কি খুব রোগা কিম্বা দোহারা।

যাঁদের শরীরে মেদের পরিমাণ বেশী তাঁদের অন্য ব্যবস্থা আর অন্যদের ভিন্ন ব্যবস্থা। প্রথমে আসা যাক মেদবহুল শরীর সম্বন্ধে। এমন পরিচর্যার কথা লিখব যা করলে ত্বকও সুন্দর থাকে এবং মেদও কমে। প্রতি দিন সকালে নিয়মিতভাবে বডি-পাউডার দিয়ে শরীর ম্যাসাজ করালে শরীরের মেদগুলি নরম ও গরম হয়ে গলতে থাকে—ফলে প্রথমে মেদ নরম হয় তারপর সেই মেদ ম্যাসাজের ফলে স্বাভাবিক গঠন পেতে থাকে। তবে এই পাউডার ম্যাসাজেরও নিয়ম আছে। এই ম্যাসাজ বাড়িতে যে-কোন মহিলাকে দিয়ে করান যায়, তবে নিয়ম মতন। উল্টোপাল্টাভাবে ম্যাসাজ করালে গঠন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। ম্যাসাজের নিয়ম হল প্রথম পেট। দুই হাত দিয়ে পেটের দুপাশ একসঙ্গে মাঝে তুলে ধরা তারপর ময়দা মাখার মতন করে গোল করে ঘুরিয়ে চেপে চেপে ধরতে হয়। এইভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে বারে বারে করতে হয়। এরকম করলে পেটের চর্বি নরম হয় ও পেট ঠেলে বেরিয়ে না এসে সমানভাবে ধসে যায়।

এরপর হচ্ছে পেটের দুই পাশ থেকে কোমর অবধি নীচ থেকে ঠেলে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া। এতে কোমরের অংশের চর্বি কমে যায়। সেই সময় পাশ ফিরে শুতে হয়। যখন যে পাশে ম্যাসাজ হবে সেই পাশে ফিরে শুতে হবে। তারপর হাত ঘষে বগল অবধি নীচ থেকে ওপরের দিকে টেনে তুলতে হবে। এভাবে দুই-চারবার বেশ জোরের সঙ্গে করতে হবে। তারপর পিঠ। পিঠও ঠিক একই রকমভাবে কোমর থেকে কাঁধ অবধি দুই হাতে অঙ্গুল ও তেলোর সঙ্গে ত্বককে ধরে ধরে ঘষে ঘষে ওপরের দিকে তুলতে হবে। এরকম বেশ মিনিট ১০ করার পর দু'হাত দিয়ে শরীরের অর্থাৎ পিঠের ডান দিক থেকে বাঁ দিক এবং পরে বাঁ দিক থেকে ডান দিক ডলে দিতে হবে। এইভাবে কিছুক্ষণ করার পর আবার চিৎ হয়ে শুতে হবে। এর পর পা। উরু থেকে শুরু করে পায়ের পাতা অবধি দু'হাত দিয়ে গোল গোল করে ম্যাসাজ করতে হবে। বেশ মিনিট ১০।১৫ এরকম করে তারপর পা মুড়ে হাঁটু তুলে শুতে হবে। এবারে হাঁটু দু হাতের তেলোর মাঝে চেপে চেপে মালিশ করতে হবে। এবং হাঁটু থেকে উরু পর্যন্ত হাত চেপে নেমে আসবে। কিন্তু হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি নামবে না। এইভাবে বার ১০ পায়ের ম্যাসাজ করতে হবে। হাতও ঠিক একইভাবে করতে হবে। তবে হাত সামনে কোন টেবিল বা চেয়ারে রেখে শরীরের সঙ্গে এক লাইনে রাখতে হবে। এটা সোজা হয়ে বসে করতে হবে। এইভাবে পাউডার ম্যাসাজ করালে খুব উপকার হয়। কিন্তু যারা রোগা তাদের ঠিক এই নিয়মে তেল দিয়ে ম্যাসাজ করলে ভাল।

আর দোহারা হলে তাঁরা পাউডার ম্যাসাজ নিয়ে মাঝে মাঝে তেলের ম্যাসাজও করাবেন। ত্বকের যত্নের ব্যাপারে তো অনেক লিখেছি এবারে লিখছি দু-একটি বাড়ির তৈরি সামগ্রীর কথা—যা ত্বকে লোশানের মতন ব্যবহার করা চলে। এতে ত্বকও ভাল থাকে। দুই বড় চামচের অলিভ তেল, তাতে আধকাপ কাঁচা দুধ চার ফোঁটা মধু ও ৬।৭ ফোঁটা কোন পারফিউম দিয়ে সেটা ভলে সারা গায়ে লাগিয়ে নিতে হবে ঠিক স্নানের পরে। তারপর জল ঢেলে গা মোছা হয় তেমনি করে গা মুছে ফেলতে হবে। এতে শরীর সারাদিন ঝরঝরে থাকে এবং সুগন্ধিও হয়।

যদি কখনও মুখ, গলা বা হাতের খোলা অংশ রোদে পুড়ে কালো দাগ হয়ে যায় তাহলে একটা সুন্দর উপায়ে সেই রং তোলা যায়। বড় চামচের এক চামচ পাতি লেবুর রস তাতে এক চামচ গ্লিসারিন ও দুধের সর একসঙ্গে ফেটিয়ে সেটা তুলো দিয়ে থুপে থুপে লাগাতে হবে। সেই অবস্থায় অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট থাকতে হবে। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে জ্বলে-যাওয়া রং বা রং-এর মলিনতা দূর হয়।

সৌন্দর্য-লাবণ্য আসে নানাভাবে নানা উপকরণের সাহায্যে। তাকে আনতে জানা ও রাখতে জানাটাই আসল কাজ। ঘরের তৈরি উপকরণ তো অনেক হল। এগুলি ঠিক মতন ব্যবহার করা ও তৈরি করাটাই বিশেষ কাজ। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয়ে আলোচনা করব যা একটু বিস্মিত করলেও ঠিক। সেটা হল মন।

মন এমন জায়গা যার ভালমন্দ প্রসন্নতা ইত্যাদির ওপর মুখের চেহারা ও লাবণ্যের অনেকটা নির্ভর করে। রাগে ও বিরক্তিতে মুখের যেসব পেশীগুলি শক্ত হয়ে যায় বা সেখানে রেখা পড়ে সেগুলি চেহারার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। কপালে চিন্তার রেখা যাদের সর্বদা বিরক্তি ভাবের জন্য যে-সব দাগ পড়ে সেগুলি অনেক সময় ক্রমাগত হওয়ার দরুণ, কপালে ও গালে ভাঁজ ফেলে দেয়। অনেকে রাগের কারণে দাঁতে দাঁত চেপে চোয়ালের হাড় ও পেশী শক্ত করে থাকেন, এমন বার বার করলে কপালের পাশের অংশ ফুলে থাকে ও চোয়াল বড় দেখায়। এভাবে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রাখলে নীচের অংশ মোটা হয়ে যায় ও ঝুলে পড়তে দেখা যায়।

এছাড়া অনেকের অভ্যাস থাকে গালের দু'দিকের অংশ মুখের ভেতরে টেনে গর্ত সৃষ্টি করে রাখা। এতে খুবই অপকার হয়। এতে গালে সুগোল ভাব থাকে না গর্ত হয়। আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন, বিলেতে এক সময়ে মহিলাদের কণ্ঠার দু'পাশে গর্ত থাকাটা সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হত। তাই তাঁরা গলা টেনে উঁচু করে কাঁধ শক্ত করে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় কণ্ঠায় গর্ত করতেন। এবং দেখা গেছে—বিজ্ঞানীর মতে এভাবে প্রতিদিন অভ্যাস করলে যেমন চাওয়া যায় তেমন হয়ে থাকে। সাধারণ জিনিস আমাদের দেশে মা-দিদিমারাও করেছেন, ছোট্ট বেলা থেকে বাচ্চাদের তেল মালিশ করার সময় বাঁকা পা বা হাত ঠিক করেছেন—খ্যাঁদা বোঁচা নাককে বহু পরিমাণে উঁচু করেছেন। কানকে ঠিক মতন বসিয়ে সুন্দর করেছেন। তখনকার দিনের মেয়েরা সব সময় বাড়িতে থাকতেন ও শিশুদের পরিচর্যার ভার তাঁদেরই ওপর ছিল। এসব তাঁরা খুব ভাল মতন জানতেন ও সেইভাবে এদের যত্ন করে ভাল রাখতেন।

একটা মহৌষধ আছে—যেমন খুব রাগ হলে আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চেহারা দেখা, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রাগ পড়ে যাবে। কারণ মনটা চেহারার বিকৃতি দেখে লজ্জা পেয়ে যায়। আর একটা উপায় হোল এক দুই তিন করে গুণে যাওয়া। ভাল চিন্তা করলে, ভাল ছবি দেখলে বা ভাল বই পড়লেও যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার ফলে চেহারায় লাবণ্য থাকে ও উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। সেই কারণেই হয়ত অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সর্বদা প্রসন্ন থাকতে ও ভাল ছবি ইত্যাদি দেখতে বলা হয়।

—বরবর্ণিনী

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

পরাশর বর্মা বললেন—তা রহস্যটা কালকের। এবং কাল আপনি যে কলম ও কালি ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে এই।

বলে, টেবিলের ওপর থেকে দোয়াতদানি ও কলমটা তুলে দেখিয়ে দেলেন।

পুনশ্চ

কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা 'পুনশ্চ'র মধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাচীন কলকাতার নানা বিষয় আলোচনা করে চলেছি এবং পরেও আরো করব। কিন্তু একঘেয়ে ঈদৃশ প্রবন্ধের একঘেয়েমি থেকে কিছুটা বিরত হবার জন্য ইতিমধ্যে আমরা 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও ব্রহ্মবিদ্যা' নামক একটি বিশেষ মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ 'মনসী ও মর্মবাণী' (পৌষ ১৩২৬) পত্রিকা থেকে এস্থলে প্রকাশ করছি। প্রবন্ধটির লেখক অনাথনাথ বসু।

'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও ব্রহ্মবিদ্যা'

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যোগবিদ্যার উৎপত্তিস্থান—এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই যোগরহস্য আলোচনার জন্য ধর্মপ্রাণা রুশ মহিলা মাদাম ব্লাভাৎস্কি তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত আমেরিকা নিবাসী কর্ণেল অলকট্‌কে সঙ্গে লইয়া এদেশে আগমন করেন। ইংলন্ড হইতে মিষ্টার উইনব্রিজ নামক জনৈক চিত্রশিল্পী ও মিসেস বেটস্ নাম্নী জনৈকা ভদ্রমহিলা তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কি প্রবর্তিত যোগবিদ্যা প্রথমে আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই বিদ্যা আলোচনার জন্য প্রথমে আমেরিকায় থিওজফিক্যাল সোসাইটি বা ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ণেল অলকট্ এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ধর্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ধর্মতত্ত্ব মনোনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়া অনেক সময় বহু বিদেশীকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় যত্নবান হইতে দেখা গিয়াছে। আলোচনার অভাবে আমাদের দেশের বহু তত্ত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। মধুচক্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য মক্ষিকাগণ নানা জাতীয় পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহে যত্নবান হইয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীগণ সেইরূপ আপন আপন জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধশালী করিবার জন্য সমগ্র জগতের বিভিন্ন জাতির জ্ঞানাম্বুধি মন্থন করিয়া সার সংগ্রহে যত্নবান হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে ভারতবাসীর মধ্যে যে পরিমাণ ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা জগতের বোধহয় অন্য কোন স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না।

রুশ মহিলা মাদাম ব্লাভাৎস্কি যোগরহস্য আলোচনা করিতে করিতে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, যোগবিদ্যার উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষে আগমন করিলে বহু নূতন তথ্য অবগত হইতে পারিবেন তখন তিনি তাঁহার অনুচরগণসহ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বোম্বাইয়ে আগমনের সংবাদ তখন একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শিশিরকুমার সংবাদপত্রে মাদাম ও কর্ণেলের এদেশে আগমনের সংবাদ ও তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা অবগত হইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শিশিরকুমার তাঁহাদের ভারতবর্ষে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ণেল অলকট্‌কে পত্র লিখিলে কর্ণেল পত্রোত্তরে জানাইয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যাদানের জন্যই এদেশে আগমন করিয়াছেন। শিশিরকুমার কর্ণেল অলকট্‌কে পুনরায় পত্র লিখিলেন, বিদ্যা অর্থে আপনারা কি বুঝিয়া থাকেন? উত্তরে কর্ণেল বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন, 'আপনি হিন্দু অথচ বিদ্যা কাহাকে বলে তাহা জানেন না? জগতে কেবল একটি মাত্র শিক্ষণীয় বিদ্যা আছে—সে বিদ্যার নাম যোগবিদ্যা।'

সাহেব যোগবিদ্যার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, এই কথা অবগত হইয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকটের এবং তাঁহাদের কার্যকলাপের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার জন্য শিশিরকুমারের প্রাণে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া কর্ণেলকে পত্র লিখিলে কর্ণেল প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, তিনি যদি বোম্বাইয়ে আসিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত সকল কথার আলোচনা হইতে পারে।

শিশিরকুমার বোম্বাই যাইবেন স্থির করিয়া কর্ণেলকে পত্র লিখিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে তিনি বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইলেন। কর্ণেল সাহেব তাঁহার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শিশিরকুমার কর্ণেল অলকট্‌কেই তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নায়ক বলিয়া জানিতেন। কিন্তু উভয়ে ষ্টেশন হইতে বাড়ী যাইবার সময় কর্ণেল শিশিরকুমারকে বলিলেন, 'আমাদের সম্প্রদায়ের কর্ত্রী মাদাম ব্লাভাৎস্কির প্রতি আপনি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবেন।'

শিশিরকুমার মাদামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। শিশিরকুমার বোম্বাইয়ে মাদাম ও কর্ণেলের সহিত একত্রে তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মিষ্টার উইনব্রিজ ও মিসেস বেটসের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন।

বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকট আমেরিকার ন্যায় এদেশেও একটি থিওজফিক্যাল সোসাইটি (ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহারা কাহারও সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন নাই। কেবল জনৈক পার্শী যুবক তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার ও তাঁহার ন্যায় দুই একজন শক্তিশালী পুরুষের যত্নে, চেষ্টায় ও সহায়তায় মাদাম ব্লাভাৎস্কি ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, শিশিরকুমার তখন ব্যাকুল চিত্তে সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। ক্ষেত্রে উত্তমরূপে শস্য উৎপাদন করিবার জন্য কৃষক যেমন লাঙ্গল সংযোগ মৃত্তিকা কর্ষণপূর্ব্বক সার দিয়া প্রথমে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে, শিশিরকুমারও সেইরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় ধর্ম্মবীজ বপন করিবার পূর্ব্বে প্রেতাত্মবাদ দ্বারা স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্র উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল।

হিন্দুধর্ম্মে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে, এ কথায় শিশিরকুমারের আর সংশয় রহিল না। উদার-হৃদয় কর্ণেল অলকটের বালসুলভ সরলতায় শিশিরকুমার মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কির চরিত্রের বিশেষত্বে তিনি কখনও বিস্মিত কখনও চমৎকৃত কখনও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। মাদাম ও কর্ণেলের চরিত্রালোচনে শিশিরকুমার তাঁহাদের উভয়েরই প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

—ক্ষপণক

বর্ষপঞ্জী ১৩৮১

(২৮শ বর্ষ চলছে)

দেশবিদেশের সকল তথ্যে পূর্ণ অভিনব বাংলা "ইয়ার-বুক"

চলতি দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হলে বর্ষপঞ্জী চাই-ই।
যে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য বর্ষপঞ্জীতে পাওয়া যাবে।
গ্রন্থাগার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বর্ষপঞ্জী অপরিহার্য।

৮০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১২ টাকা ৫০ পঃ, ভি পি খরচ স্বতন্ত্র

এস. আর. সেনগুপ্ত কলিকাতা-৬। ফোন : ৩৫-৪৭৯৭

৩৫/এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা অ্যান্ড কোম্পানি

রোবট নিধন সংঘ

হিন্দুস্থান রোবোট লিমিটেড সংক্ষেপে এইচ আর এল-এর রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর ডঃ মূলচন্দানীর ঘরে এক জরুরী মিটিং চলছে। গত ৩০ দশক থেকে দেশে দেশে রোবোটের প্রচলন হয়েছে। ধাপে ধাপে উন্নতও হয়েছে এই সব রোবোটের দল আর সেজন্য এইচ আর এল-এর আর-ডি ডিপার্টমেন্টের বৈজ্ঞানিকদের অবদান অনেকখানি। কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এমনকি মানুষের সাধারণ গৃহস্থালী কাজেও আজ রোবোট ব্যবহৃত হচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরে মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি রোবোটরা কাজ করে চলেছে। তবু দেখা যাচ্ছে যে মানুষ রোবোটকে একটা উন্নত যন্ত্রের বেশী কোন মর্যাদা দিতে চাইছে না। এভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে রোবোট ও মানুষের মধ্যে একটা সামাজিক সংঘাত বাধতে পারে বলে সোসিওলজিস্টরা ভবিষদ্বাণী করতে সুরু করেছেন। সেজন্য এইচ আর এল এর বোর্ড অব ডিরেকটর ভীষণ চিন্তায় পড়েছেন। রোবোট আর মানুষের মধ্যে যদি কোন সামাজিক সংঘাত সুরু হয় তাহলে কোম্পানীর সামনে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। সুতরাং আগে থাকতে সাবধান হওয়াই ভাল। এইচ আর এল এর বোর্ড গত দশ মাস আগে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এবার থেকে এমন রোবট তৈরী করতে হবে যাদের চেহারা আর বুদ্ধিসুদ্ধি হবে সম্পূর্ণ মানুষের মত। আর-ডি ডিপার্টমেন্টের বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সফল হয়েছেন এ ধরণের রোবোটের ব্লু প্রিন্ট তৈরী করতে। আজকের মিটিং-এ সেই বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা চলছে। ডঃ মূলচন্দানী উপস্থিত সমস্ত ইঞ্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিককে ধন্যবাদ জানালেন। কারণ এই ব্লু-প্রিন্ট শিডিউল্ড টাইমের দুমাস আগেই শেষ করা সম্ভব হয়েছে। দুমাস সময়

সংক্ষেপে হওয়াতে প্রায় নয় লক্ষ টাকার মত কস্ট সেভ হয়েছে।

এবার সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ডঃ ভোরা বললেন—এই প্রোগ্রামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা অত্যন্ত দক্ষতার সংগে শেষ করেছেন আমাদের রোবো-সাইকোলজিস্ট মিঃ সজল চ্যাটার্জী। ডঃ মূলচন্দানী ডঃ ভোরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ডঃ ভোরা আপনার কথা হয়ত ঠিক—এই প্রজেকটের বড় অংশ মিঃ চ্যাটার্জীর সাহায্য ছাড়া সুষ্ঠুভাবে শেষ করা সম্ভব হত না। তবু বলব এ সাফল্য সমস্ত আর-ডি ডিপার্টমেন্টের। ডঃ মূলচন্দানীর একথা বলার কারণ সবাই বুঝতে পারলেন। ব্যক্তিগত কোন প্রতিভাকে ডঃ মূলচন্দানী কখনই স্বীকার করতে চান না। ডঃ মূলচন্দানীর কথায় মিঃ চ্যাটার্জী একটু আহত হলেও সামলে নিলেন।

—কত তাড়াতাড়ি আমরা প্রোডাকসনে হাত দিতে পারব? ডঃ মূলচন্দানী একটু থেমে প্রশ্ন করলেন। সঠিক কাউকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন না করলেও টেকনিক্যাল ম্যানেজার মিঃ রাউত জবাব দিলেন—স্যার, এখুনি আমরা ব্লু-প্রিন্ট প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের হাতে দিতে পারছি না বলে দুঃখিত।

—কেন? ডঃ মূলচন্দানী একটু যেন উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—রিপোর্ট থেকে আপনি দেখেছেন যে এই ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী আমরা একটা মহিলা রোবোট তৈরী করতে চলেছি। কারণ তাতে আমাদের পরীক্ষার ফলাফল খুব ভালভাবে বোঝা সম্ভব হবে। ফিল্ড টেস্ট না শেষ করে এটা আমরা প্রোডাকশান ডিপার্টমেন্টের হাতে দিতে চাই না। এবারও জবাব দিলেন মিঃ রাউত।

—ফিল্ড টেস্ট না করে কোনো রোবোটই আমরা মার্কেটিং করি না—তাই নয় কি?

—ঠিক কথা স্যার। তবে এবার আমরা আগেই ফিল্ড টেস্টটা শেষ করে নিতে চাই। আর সেটা গোপনে আমাদের ডিপার্টমেন্টের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

ডঃ মূলচন্দানী ডান হাতটা বোলাতে লাগলেন টাক মাথায়। একটু উত্তেজিত হলে এটা করা ওঁর স্বভাব।

—ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন মিঃ চ্যাটার্জী। প্রশ্নটা এবার সরাসরি মিঃ চ্যাটার্জীকেই করলেন ডঃ মূলচন্দানী। কারণ উনি বুঝতে পারছিলেন এইসব পরিকল্পনা মিঃ চ্যাটার্জীরই দেওয়া। রোবো-সাইকোলজিস্টগুলো বড় ঝামেলা পাকায়। মিঃ চ্যাটার্জী উঠে দাঁড়ালেন। লম্বা ছিপছিপে ফর্সা বছর তিরিশের যুবক। মুখটা একটু লম্বাটে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। একটা চড়া রঙের আমেরিকান শার্ট গায়ে। চোখ দুটো বড় বড় ও স্বপ্নালু। সাইকোলজিস্ট থেকে কবি হলেই মানাত ভাল।

—আমরা একটা অত্যন্ত কঠিন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করতে চলেছি। আমাদের লক্ষ্য রোবোটকে মানুষ যেন আর যন্ত্র না ভাবে। আমাদের এমন রোবোট তৈরী করতে হবে যারা হবে অবিকল মানুষের মত।

মিঃ চ্যাটার্জীকে বাধা দিয়ে ডঃ মূলচন্দানী চেঁচিয়ে উঠলেন—অ্যাবসার্ড! রোবোটকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করা কখনো কি সম্ভব? মিঃ সাইকোলজিস্ট একটা কথা মনে রাখবেন আমরা মানুষ তৈরী করতে চাইছি না। আমরা চাই রোবোট তৈরী করতে। সফিস্টিকেটেড রোবাট—যার মধ্যে মানুষের কোয়ালিটিস থাকবে অর্থাৎ সামাজিকভাবে মানুষ ও রোবোট পাশাপাশি থাকলেও কোন সংঘাত বাধবে না। ডঃ মূলচন্দানী কথা বলতে বলতে বেশ কয়েকবার মাথায় হাত বোলালেন।

মিঃ চ্যাটার্জী একবার ভাল করে ডঃ মূলচন্দানীর মুখের দিকে তাকালেন। মনে মনে যথেষ্ট রাগ হলেও তা চেপে রেখে বললেন—স্যার ডিরেকটর—আমি দুঃখিত। যে কথাটা আমি বলতে চেয়েছি তা হয়ত আমি ঠিকমত বোঝাতে পারিনি। আমি আর একবার বলবার চেষ্টা করছি। সামাজিক সংঘাত এড়াতে হলে রোবোটকে মানসিক দিক থেকে মানুষের সমান করে তৈরী করতে না পারলে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। মানুষ রোবোটকে যন্ত্রের বদলে হয়ত গৃহপালিত পশুর অথবা বড় জোর বাড়ীর চাকরবাকরের মর্যাদা দেবে—তার বেশী কিছু নয়। আর সেইজন্য এরকম একটা পরীক্ষা আগে থাকতে ভালভাবে যাচাই না করে আমার মনে হয় প্রোডাকশানে হাত দেওয়া ঠিক হবে না। অবশ্য ব্যাপারটার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনিই নেবেন। কথা শেষ করে মিঃ চ্যাটার্জী নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন।

ডঃ মূলচন্দানী ইতিমধ্যে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছিলেন। একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে দৃষ্টিটাকে সংহত করলেন সামনের হাল্কা নীল রঙের দেওয়ালে। একটু গম্ভীর গলায় বললেন—বেশ। আপনাদের প্রস্তাব মেনে নিলাম। সেইভাবে আমি বোর্ড অব ডিরেকটরে রিপোর্ট পাঠাবো, কিন্তু আগামী মাসের ৩০ তারিখে আমি প্রজেকট-স্যাম্পেল দেখতে চাই। সেইদিনই চেয়ারম্যান ও অন্যান্য ডিরেকটরদের সামনে ডেমনেস্ট্রেট করতে হবে। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আমার কথা।

ডঃ মূলচন্দানী থামলেন। আর কেউ কোন জবাব দিলেন না। এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে মিটিং শেষ হয়ে গেল।

(দুই)

আজ সেই স্মরণীয় ৩০ তারিখ। এইচ আর এল-এর কনফারেন্স রুমে গম্ভীরমুখে বসে আছেন ডঃ মূলচন্দানী। তাঁর সঙ্গে

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক ঃ—

স্বদেশ ও শিল্প (কুটির শিল্প)
—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Rs. 15.00

ট্রানজিস্টার রেডিও তৈরী ও মেরামত
—নিরঞ্জন দত্ত Rs. 8.00

রাবার জয়ের ইতিকথা
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় Rs. 7.00

কীর্তন ও সমাজ —কার্তিকচন্দ্র রায় Rs. 4.00

শ্রীমতী যে ডাকে (উপন্যাস)
—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Rs. 6.50

সাবান শিল্প—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Rs. 6.00

শিল্পের সন্ধানে
—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Rs. 16.00

কণ্ঠ-সংগীত
—তাপস আদিত্য Rs. 5.00

RAKAMARI BOOK HOUSE
77, MAHATMA GANDHI ROAD, CALCUTTA-9
Dial : 34-7589

একই সারিতে বসে আছেন কোম্পানীর অন্যান্য ডিরেকটর ও চেয়ারম্যান ডঃ সেনাপতি। ডঃ সেনাপতির সাম্প্রতিক স্ত্রী মিসেস রমলা সেনাপতিও এসেছেন। ডঃ সেনাপতির পাশেই উৎসুক মুখে বসে আছেন। এর আগে ডঃ সেনাপতি চারবার বিয়ে করেছেন আর প্রত্যেকবারেই স্ত্রীরা ডাইভোর্স নিয়ে চলে গেছেন। কিছুদিন হল মিসেস রমলাকে বিয়ে করেছেন ডঃ সেনাপতি। ভদ্রমহিলার বয়স তিরিশের বেশী হবে না। অসাধারণ সুন্দরী। বিয়ের আগে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আর্টসের অধ্যাপিকা ছিলেন। তাছাড়াও কবি হিসেবে ভদ্রমহিলার বেশ নামটাম আছে। ডঃ সেনাপতি অবশ্য মিসেস রমলাকে ওর রূপের জন্য বিয়ে করেছেন। সুন্দরী নারীর ওপর ডঃ সেনাপতির যে একটা অস্বাভাবিক দুর্বলতা আছে সেকথা সবাই জানে। তাই নিয়ে অনেকে হাসি-ঠাট্টাও করে আড়ালে।

সামনের মঞ্চের ওপর পর্দা ফেলা আছে। পর্দার পিছনে শুধু আর-ডি ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়র আর বৈজ্ঞানীকেরা উর্বশীর ডেমনেস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। ডঃ মুলচন্দানী অস্থির হয়ে পড়ছেন। বার বার ঘড়ি দেখছেন আর মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। ডিরেকটরেরা, চেয়ারম্যান সবাই অন্তত পনের মিনিট আগে এসে গেছেন। আর ধৈর্য না ধরতে পেরে ডঃ মুলচন্দানী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। যাওয়ার সময় ডঃ সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন—স্যর, কিছু মনে করবেন না। একটু দেখে আসি। ডঃ সেনাপতি কথা না বলে একটু ঘাড় দোলালেন। মিসেস সেনাপতি একটু হাসলেন।

ডঃ মুলচন্দানী মঞ্চের পিছন দিকে এগোতেই দেখলেন ডঃ ভোরা এগিয়ে আসছেন।

—ব্যাপার কি আপনাদের? আর কত দেরী? চেয়ারম্যান, ডিরেকটরেরা সব কখন থেকে বসে রয়েছেন।

ডঃ ভোরা বললেন—না—মানে সামান্য একটু গণ্ডোগোল হয়েছিল তাই।

—কি গণ্ডোগোল?

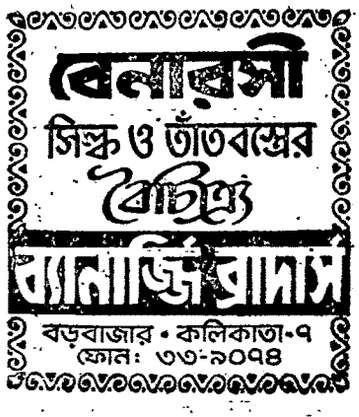

—এখন ঠিক হয়ে গেছে। ওসব আর এখন শুনে কাজ নেই চলুন। বলে ডঃ ভোরা এগিয়ে গেলেন মিসেস সেনাপতির কাছে।

—ম্যাডাম এবার আপনাকে একটু কষ্ট দেব।

মিসেস সেনাপতি একটু হেসে বললেন—আমি?

ডঃ সেনাপতি হেসে বললেন—তুমিই তো এখানে একমাত্র মহিলা সুতরাং ওকাজটা তোমারই করা উচিত। ডঃ ভোরা ঠিক লোককেই পাকড়াও করেছেন।

ফিনানসিয়াল ডিরেকটর মিঃ আয়ার একটু চাটুকারিতার লোভ সামলাতে পারলেন না। হেঁ-হেঁ করে হেসে বললেন—গ্রেসিয়াস লেডী আমাদের প্রজেকটের উদ্বোধন করে আমাদের কৃতার্থ করুন।

মিঃ আয়ারের কথায় সবাই হোহো করে হেসে উঠলেন। এমনকি ডঃ মুলচন্দানীও মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে হেসে ফেললেন। মিসেস সেনাপতি খুব খুশী হলেন। হাসতে হাসতে ডঃ ভোরার সঙ্গে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। ডঃ ভোরা মিসেস সেনাপতিকে একটা লাল বোতাম দেখিয়ে দিলেন। মিসেস সেনাপতি বোতামে আলতো করে চাপ দিলেন। দ্রুত পর্দা সরে গেল। হাততালিতে ভরে উঠল কনফারেন্স রুম। মিসেস সেনাপতি মঞ্চের ওপর তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মুখের হাসি উবে গেল। সুন্দরী বলে মনে মনে একটা গর্ব ছিল ওঁর। কিন্তু সামনের চেয়ারে বসে থাকা ওই মেয়েটির যেদিও মিসেস সেনাপতি ভালভাবে জানতেন ওটা একটা রোবোট) ওকি রূপ! এমন নিখুঁত চোখ-মুখ নাক। সব যেন শিল্পীর আঁকা ছবি।

হাততালির শব্দ থেমে গিয়ে ততক্ষণে সমস্ত কনফারেন্স রুমের মধ্যে নেমে এসেছে এক অসম্ভব নীরবতা। ডঃ সেনাপতি ও অন্যান্য ডিরেকটরেরাও যেন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন মঞ্চের উপরের রোবোটকে দেখে। সবাই মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন সত্যিই রোবোটটি অপূর্ব সুন্দরী। রোবোটের পরণে গাঢ় লাল রঙের বেনারসী। মিঃ চ্যাটার্জীই পোষাকটা পছন্দ করে দিয়েছিলেন।

—মিসেস সেনাপতি এবার রোবোটের সুইচটা চালু করে দিতে হবে। বললেন ডঃ ভোরা।

—চলুন। যেন বহুদূর থেকে কথা বললেন মিসেস সেনাপতি।

ডঃ ভোরা সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চের উপরে উঠতে সুরু করলেন। মিসেস সেনাপতিও ডঃ ভোরাকে অনুসরণ করলেন। মঞ্চের উইংসের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আর-ডি ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়র আর বৈজ্ঞানিকরা। মিঃ চ্যাটার্জীও দাঁড়িয়েছিলেন ওদের মধ্যে। খুব ক্লান্ত পায়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ডঃ ভোরার নির্দেশমত একটা সুইচে চাপ দিলেন মিসেস সেনাপতি। এবার উইংসের পাশ থেকে ভেসে এলো হাততালির আওয়াজ কিন্তু মঞ্চের নীচ থেকে হাততালি দিতে যেন সবাই ভুলে গেল। সুইচটা টেপার সঙ্গে সঙ্গে রোবোটের চোখের পাতা দুটো কাঁপল থরথর করে। চোখ মেলে চাইলোও। তারপর মরাল গ্রীবা ঘুরিয়ে সবাই-এর উপর চোখ বুলিয়ে নিল। মিঃ চ্যাটার্জীর চোখে চোখ পড়তেই একটুকরো চোরা হাসি খেলে গেল ওর পাতলা ঠোঁটে। আর কেউ লক্ষ্য না করলেও মিসেস সেনাপতির চোখ এড়াল না ওই হাসিটুকু আর ওর অর্থ বুঝতেও ওঁর দেরী হল না এক মুহূর্ত। মিসেস সেনাপতি যেন তড়িতাহতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মঞ্চের ওপর। ওঁর চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়েছিল যেন সমস্ত দৃশ্যপট। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল অসীম শক্তিধর এক প্রতিদ্বন্দ্বী।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল এমনি করে। তারপর রোবোটটা চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলো মিসেস সেনাপতির দিকে। লম্বা ছিপছিপে চেহারাটা এবার সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। উন্নত বুক সরু কোমর আর প্রশস্ত নিতম্ব। ডঃ ভোরা মিসেস সেনাপতির পরিচয় দিলেন। রোবোট দুহাত তুলে অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে নমস্কার জানালো।

মিসেস সেনাপতিও প্রতিনমস্কার করলেন। তারপর নিজেকে কিছুটা যেন সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি নাম রেখেছে এঁরা?

—প্রজেকট ফোর। জবাব দিল রোবোট। ভারী মিষ্টি সুরেলা গলা।

—তোমাকে এঁরা সত্যিই খুব সুন্দর করে তৈরী করেছে। মিসেস সেনাপতি আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলেন। রোবোট মুখ নামালো। ব্রীড়াবনত ভঙ্গী।

মিসেস সেনাপতি ডানহাত দিয়ে রোবোটের থুতনিটায় চাপ দিয়ে মুখখানা উঁচু করে ধরে খুব আস্তে আস্তে বললেন—

'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী

হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।'

—তোমাকে দেখে কবিতাটা মনে পড়ে গেল। জানো কার কবিতা?

—রবি ঠাকুরের 'উর্বশী'।

মিসেস সেনাপতি আর কোন কথা বলতে পারলেন না। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ওকে তারপর বেশ জোরে—যেন সবাইকে শুনিয়ে বললেন—তোমার নাম রাখলাম আমি উর্বশী। কি পছন্দ হয়েছে তো?

উর্বশী জবাব দেওয়ার আগে সারা কনফারেন্স রুম যেন ফেটে পড়ল হাততালির শব্দে।

মিসেস সেনাপতি আস্তে আস্তে মঞ্চ থেকে নেমে গিয়ে ডঃ সেনাপতির পাশে বসলেন। কিন্তু ডঃ সেনাপতির চোখে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন। ডঃ সেনাপতি তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা উর্বশীর দিকে। সে চোখের দৃষ্টির ভাষা পড়তে মেয়েদের এক মুহূর্ত সময় লাগে না। মিসেস সেনাপতি ঘৃণায় চোখ নামিয়ে নিলেন।

এরপর ডঃ ভোরার কথামত উর্বশী মঞ্চ থেকে নেমে এসে একে একে সবাইকে নমস্কার জানাল। ডঃ ভোরা একে একে সবাই-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডঃ সেনাপতির চোখের দিকে তাকিয়ে উর্বশী চমকে উঠল। মিঃ চ্যাটার্জী নোটবুকে কি যেন নোট করে নিলেন।

তারপর ডঃ মুলচন্দানী ঘন্টাখানেক ধরে সবাই-এর সামনে উর্বশীর ব্যাপারে অনেক কিছু বলে গেলেন। ডঃ মুলচন্দানীর বক্তৃতায় যে কেউ মন দিতে পারেননি সে কথা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। যাহোক ডঃ মুলচন্দানীর প্রস্তাবে চেয়ারম্যান ও ডিরেকটরেরা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে গেলেন। শুধু যাওয়ার আগে ডঃ সেনাপতি ডঃ মুলচন্দানীকে একান্তে ডেকে বলে গেলেন—প্রতি সপ্তাহে উর্বশীর রিপোর্ট ঠিকমত যেন ওঁর কাছে পাঠানো হয়। দরকার হলে উনি নিজে উর্বশীর ফিল্ড টেস্ট দেখতে পারেন সে কথাও জানিয়ে দিলেন। মিসেস সেনাপতি ডঃ সেনাপতির কনুই ধরে টান দিয়ে বললেন—চলো দেরী হয়ে যাচ্ছে আমাদের আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে না। ডঃ সেনাপতির হয়ত আরো কিছু বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মিসেসের তাড়ায় আর কিছু বলতে না পেরে মাথায় হাত বোলাতে সুরু করলেন।

(তিন)

মুলচন্দানীকে যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল। কোন কিছু ভালভাবে বুঝতে না পেরে মাথায় হাত বোলাতে সুরু করলেন। হু

আগেকার প্রোগ্রামমত উর্বশী আর ভি ডিপার্টমেন্টে মিঃ চ্যাটার্জীর আন্ডারে কাজ করতে সুরু করল। মিঃ চ্যাটার্জী অবশ্য প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন উর্বশী ডঃ মুলচন্দানীর সঙ্গে কাজ করুক। ডঃ মুলচন্দানী একজন ব্যাচেলর মানুষ। প্রথম জীবনে একটা প্রেমঘটিত ব্যাপারে আঘাত খাওয়ার পর থেকে সযত্নে মেয়েদের উনি এড়িয়ে চলেন। এ ব্যাপারে তিনি এতই কঠিন যে উর্বশীকেও কাছে ভিড়তে দিলেন না। ব্যাপারটায় মিঃ চ্যাটার্জী অবশ্য খুশীই হলেন। একসপেরিমেন্টের ফলাফল সঠিক পথেই চলছে। প্রথমদিন মিসেস সেনাপতির রি-এ্যাকশানও ওঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। উর্বশীকে সবাই মানুষের মর্যাদা দিচ্ছে। এ একটা মস্ত জয় মিঃ চ্যাটার্জীর জীবনে।

ডেমনেস্ট্রেশনের আগে পুরো এক সপ্তাহ মিঃ চ্যাটার্জী উর্বশীকে নিয়ে যত রকম একসপেরিমেন্ট করা সম্ভব তা করেছেন। উর্বশী সব পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করেছে। অবশ্য সেগুলো ছিল সিমুলেটেড অর্থাৎ কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করে ওর মানসিক অবস্থার বিচার করা। এখন উর্বশী স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। প্রতিটি অবস্থা সে কেমনভাবে গ্রহণ করছে—তার রি-এ্যাকশান কি রকম—সব কিছুর নোট রেখে যাচ্ছেন মিঃ চ্যাটার্জী। সত্যিই ডিপার্টমেন্টের সবাই যেন ভুলে গেছে যে উর্বশী মানুষ নয় একটা রোবোট মাত্র।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

সব ফুল কিনে নাও ৮-০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন গ্রন্থ

ফেরারী অতীত ৭-০০

ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের নতুন ভ্রমণ উপন্যাস

গৌরী গঙ্গা ৯-০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঘরের পথ ৬.০০ সুখের আড়াল ৫.৫০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার আমার ৪-০০

নীল লোহিতের চোখের সামনে ৫-০০

আশাপূর্ণা দেবী

ভালবাসার মুখ ৫.০০ তরঙ্গহীন ৫.০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক বোন পারুল ৬.০০ বনকরবী ৬.৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

মন জানে না ৭.০০ একক প্রদর্শনী ৪.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সরমা ও নীলকান্ত ৬.০০ ল্যাণ্ট চ্যাপটার ৫.৫০

চিরঞ্জীব সেন অনিল রায়

রাশিয়ান রুবির রহস্য ৭.০০ সোনার পাতায় রক্ত ৭.০০

সাহিত্য সংস্থা, ১৮সি, টেমার লেন, কলিকাতা—৯

উর্বশীকে একটা নতুন কাজে লাগিয়েছেন মিঃ চ্যাটার্জী। গ্রহানুপুঞ্জের বিভিন্ন খনিতে কাজ করার জন্য যে নতুন ধরণের রোবোট প্রোগ্রাম হাতে আছে তাদের ইলেকট্রনিক ব্রেন স্ট্রাকচার কিভাবে ডিজাইনিং করলে সব থেকে ভাল ফল পাওয়া যাবে, তারই উপর কাজ করছে উর্বশী। খুব সুন্দর কাজ করছে উর্বশী। প্রতি সপ্তাহে উর্বশীর রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে ডঃ সেনাপতির কাছে। একদিন দেরী হলে নিজে ফোন করেন ডঃ মুলচন্দানীকে। তাছাড়া এই দু মাসের মধ্যে অন্তত দশ-বারোবার নিজে ডিপার্টমেন্টে এসে উর্বশীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেছেন। সেই প্রথমদিন থেকেই উর্বশীর কেমন একটা ভয় আছে ডঃ সেনাপতি সম্বন্ধে।

একদিন উর্বশী মিঃ চ্যাটার্জিকে বলল—সজল ডঃ সেনাপতি আমার সঙ্গে যখন কথা বলেন, তখন তুমি একটু কাছাকাছি থেক।

—কেন? মিঃ চ্যাটার্জি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে। একটু আমতা আমতা করে বলল উর্বশী।

—ভয়! হো-হো করে হেসে উঠলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—তুমি হাসছো? উর্বশীর পাতলা ঠোঁট দুটো যেন অভিমানে কেঁপে উঠল।

—হাসবো না। কোম্পানীর চেয়ারম্যান তোমার সঙ্গে কথা বলবেন এ তো খুব স্বভাবিক কথা। তাতে ভয়ের কি আছে?

—সে তুমি বুঝবে না। ভীষণ ভয় করে আমার।

—দাঁড়াও। দাঁড়াও। বলতে বলতে মিঃ চ্যাটার্জি ওর প্যাডটা খুলে কি যেন নোট করতে শুরু করলেন।

—এত নোট করার কি আছে। কিছু কথা বলতে গেলেই অমনি খাতা-পেনসিল নিয়ে বসবে। বলেই প্যাডটা টেবিলের উপর থেকে জোর করে তুলে নিল উর্বশী।

মিঃ চ্যাটার্জি একটু অবাক হয়ে উর্বশীর মুখের দিকে তাকালেন। সে মুখে আশ্চর্য একটা খেলা চলছে। রঙ পাল্টাবার খেলা।

—বলো তুমি কাছাকাছি থাকবে? আবার প্রশ্ন করল উর্বশী।

—আমি কাছাকাছি থাকলে তোমার আর ভয় করবে না? একটু হেসে পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—না। তুমি আমার কাছাকাছি থাকলে আমার কোন কিছুতেই ভয় করে না।

মিঃ চ্যাটার্জি মনে মনে ভীষণ খুশী হলেন। উর্বশীকে সত্যিই তাঁরা যথেষ্ট উন্নত করে তৈরি করতে পেরেছেন। পারফেকট হিউম্যান রিঅ্যাকশান। উর্বশী যদি সাকসেসফুল হয়, তাহলে পরবর্তী স্টেজে 'অলভার' বা ব্যক্তিগত কম্পিউটার-রোবোট তৈরি করা মোটেও অসুবিধা হবে না। উর্বশীর ইলেকট্রনিক ব্রেনে যে নতুন অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে প্রায় একশজন যুবতী মহিলার প্রোলঙড ব্রেন-ওয়েভ রেকর্ডিং থেকে তৈরি এক সিন্থেটিক ব্রেন-ওয়েভ বা ইলেকট্রনিক মেমারী-সেল-এ স্টোর করে দেওয়া হয়েছে। মেমারী-সেল, প্রসেসিং-সেল অত্যন্ত ভালভাবে কাজ করছে।

—কি কথা বলছ না যে।

—হুঁ।

—কথা দিচ্ছ আমার কাছাকাছি থাকবে?

—আচ্ছা আচ্ছা হবে।

—হবে না। আমার গা ছুঁয়ে বলো থাকবে। বলে উর্বশী মিঃ চ্যাটার্জির দিকে ওর মসৃণ পেলব হাতখানা বাড়িয়ে দিল। মিঃ চ্যাটার্জি হাতখানা ধরলেন। একটু চমকে উঠলেন—উর্বশীর হাত বেশ গরম। একটু থেমে মিঃ চ্যাটার্জি বললেন—আচ্ছা কথা দিচ্ছি। উর্বশীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। মিঃ চ্যাটার্জি এমন হাসি আগে কোনদিন উর্বশীর মুখে দেখেননি। শুধু উর্বশীর কেন, কোন মেয়ের মুখেই এরকম হাসি দেখার সুযোগ ঘটেনি মিঃ চ্যাটার্জির।

—এই যে ম্যাডাম এখানে বসে আড্ডা দিচ্ছেন—ওদিকে দেখুন তুলকালাম কান্ড চলছে। ডঃ ভোরা মিঃ চ্যাটার্জির চেম্বারে ঢুকতে ঢুকতে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে উর্বশী ডঃ ভোরার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—কেন কি হয়েছে?

—ডঃ মুলচন্দানী কি ডাটা খুঁজছেন—।

ডাটা খুঁজছেন না আপনাকে খুঁজছেন দেখুন গে। বলে ডঃ ভোরা হেসে ফেললেন।

—আচ্ছা আমি দেখছি। বলে উর্বশী চলে গেল। যাওয়ার আগে মিঃ চ্যাটার্জিকে চোখে চোখে বারণ করে গেল যেন একটু আগের ব্যাপার ডঃ ভোরাকে কিছু না জানায়।

—কি ভায়া উর্বশীর প্রেমে পড়ে গেলে নাকি? ডঃ ভোরা ঠাট্টা করে বললেন মিঃ চ্যাটার্জিকে।

—কে, কার প্রেমে পড়েছে বোঝা মুস্কিল। তবে ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। ভাবছি উর্বশীকে মুলচন্দানীর কাছে ট্রান্সফার করে দেব। এখন হয়ত উনি উর্বশীকে নিতে রাজী হবেন। বলে একটু হাসলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—তা ঠিক বলেছো। এতকাল মেয়েদের কাছ থেকে, শত সুহৃতত, দূরে থেকে এখন কিনা একটা রোবোটের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বুড়ো। আমার কিন্তু আজকাল মুলচন্দানীকে দেখলে ভারী মজা লাগে।

—ডঃ ভোরা প্লীজ উর্বশীকে রোবোট—রোবোট বোলো না। রোবোট বললে ওকে ছোট করা হয়।

—ডোন্ট বি সো-মাচ ইমোশনাল চ্যাটার্জি। তোমার চোখমুখ ওরকম গম্ভীর করার কোন কারণ নেই—আমি সেভাবে কিছু বলিনি। নাঃ মেয়েটা দেখছি একটা সাংঘাতিক কিছু না করে ছাড়বে না। এদিকে চেয়ারম্যানের আনাগোনা। ওদিকে ডিরেকটরদের ফোনের পর ফোন। বলি হোলোটা—কি? সবাই কি—উর্বশী-পাগোল হল নাকি? বলে ডঃ ভোরা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

—হ্যাঁ। আর সেখানেই আমাদের প্রজেকটের সাফল্য।

—তোমার কথাই ঠিক চ্যাটার্জি।

(চার)

মিঃ চ্যাটার্জি ডঃ মুলচন্দানীকে বলতেই উনি রাজী হয়ে গেলেন। উর্বশী খবরটা পেতেই ক্ষেপে গেল। ছুটে এসে ঢুকলো ও মিঃ চ্যাটার্জির চেম্বারে। মিঃ চ্যাটার্জি আগে থাকতেই আঁচ করেছিলেন এরকম কোন ব্যাপারের। উর্বশীর চোখদুটো উত্তেজনায় লাল। একদৃষ্টে ও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মিঃ চ্যাটার্জির দিকে। মিঃ চ্যাটার্জি মুখ তুলে ওকে দেখে শান্তভাবে বললেন—বোসো উর্বশী।

—তাড়িয়ে দিয়ে আবার বসতে বলছো? উত্তেজনায় গলার স্বরটা কাঁপছে উর্বশীর।

ও-কথা কেন বলছ? ডঃ মুলচন্দানী কাজটা তাঁর নিজের আন্ডারে করাতে চান তাতে আমার কি আপত্তি করা চলে তুমিই বলো? মিঃ চ্যাটার্জি নিজের অসহায়তার কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

—মিথ্যে কথা বলছ—মিথ্যুক তুমি। ডঃ মুলচন্দানীকে তুমিই বলে রাজী করিয়েছো। কেন—কেন? কেন তুমি এমন ছলনার আশ্রয় নিলে সজল? আমাকে বললেই তো আমি তোমার সামনে আসতাম না। বলতে বলতে উর্বশী যেন ভেঙে পড়ল। তাড়াতাড়ি টেবিলে মাথা রেখে চুপ করে গেল ও।

মিঃ চ্যাটার্জি উর্বশীর মাথায় হাত দিয়ে বললেন—উর্বশী লক্ষ্মীটি আমাকে ভুল বুঝো না। সত্যি এ-ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না।

উর্বশী এক ঝটকায় মিঃ চ্যাটার্জির হাত সরিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আর একবারও মিঃ চ্যাটার্জির মুখের দিকে তাকাল না। মিঃ চ্যাটার্জির মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

উর্বশীর রি-এ্যাকশানগুলো নিয়মিত নোট করতে বলে এসেছিলেন ডঃ মুলচন্দানীকে। ক'দিন বাদে নোটগুলো আনতে গিয়ে অবাক হলেন মিঃ চ্যাটার্জি। নোটের কথা বলতেই ডঃ মুলচন্দানী ঘন ঘন মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

—ব্যাপার কি ডঃ মূলচন্দানী?

—মানে নোট করার মত কিছু নেই বুঝলেন মিঃ চ্যাটার্জি—সী ইজ বিহেভিং লাইক আ পারফেক্ট ওমেন। কথা বলতে বলতে ঘন ঘন টাকে হাত দিতে লাগলেন ডঃ মূলচন্দানী।

মিঃ চ্যাটার্জি কি করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। ডঃ মূলচন্দানীর মত একজন দুঁদে বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এরকম কাজে গাফিলতির কথা ভাবাই যায় না। আস্তে আস্তে ডঃ মূলচন্দানীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ঠিক করলেন এরপর থেকে নিজেই আড়াল থেকে খেয়াল রাখবেন আর নোট করবেন। কাজ তো আর ফেলে রাখা যায় না। মনে মনে বললেন—সাবাস উর্বশী।

কাজ করতে গিয়ে কিন্তু পুরোপুরি আড়ালে থাকতে পারলেন না মিঃ চ্যাটার্জি। দু-চারবার উর্বশীর সামনে পড়ে যেতে হল। একটু হাসলেন মিঃ চ্যাটার্জি—পরিচিতের হাসি। কিন্তু উর্বশী মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। সে যে কোনদিন মিঃ চ্যাটার্জিকে চিনত তার কোন আভাস দেখা গেল না ওর চোখেমুখে। মিঃ চ্যাটার্জির মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তবে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন। খুশীই হলেন—চমৎকার রি-এ্যাকশান। আনন্দে ওঁর মন ভরে গেল। প্রথম চান্সেই এতখানি সাফল্য যেন ভাবাই যায় না।

এ-আনন্দ কিন্তু বেশীদিন থাকল না। কয়েকদিন বাদে মিঃ চ্যাটার্জির ডাক পড়ল ডঃ মূলচন্দানীর চেম্বারে। মিঃ চ্যাটার্জি ঘরে ঢুকতেই একটুকরো ছোট্ট নোট তুলে দিলেন ডঃ মূলচন্দানী মিঃ চ্যাটার্জির হাতে। চেয়ারম্যান ডঃ সেনাপতির নোট ডঃ মূলচন্দানীকে লেখা—'মিঃ চ্যাটার্জি যেন নিজের কাজে মন দেন। অকারণে উর্বশীর পিছনে ঘুর ঘুর করার কোন প্রয়োজন নেই। এতে ডিপার্টমেণ্টের কাজের ক্ষতি হয়। স্টাফ মোরেল নষ্ট হয়।' নোটটা পড়ে মিঃ চ্যাটার্জি ডঃ মূলচন্দানীর হাতে ফেরৎ দিলেন।

ডঃ মূলচন্দানী আজ আর টাকে হাত বোলালেন না। বেশ গম্ভীর গলায় বললেন—আপনার কিছু বলার আছে এ-ব্যাপারে মিঃ চ্যাটার্জি। কারণ আমাকে আবার একটা জবাব দিতে হবে এই নোটের।

—না স্যার। আই আম সরি। ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না। বলেই গটগট করে ডঃ মূলচন্দানীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়লেন মিঃ চ্যাটার্জি। বেরোবার সময় দেখতে পেলেন উর্বশী, ডঃ ভোরা ডঃ শংকরণ ও আরো কার সঙ্গে যেন গল্প করছে আর হো-হো করে হাসছে। একবার ইচ্ছে হল মিঃ চ্যাটার্জির এগিয়ে গিয়ে উর্বশীকে জিজ্ঞাসা করেন—চেয়ারম্যানের কাছে কমপ্লেন করার মত কি করেছেন তিনি। তারপরই নিজেকে সংযত করে তাড়াতাড়ি নিজের চেম্বারে এসে প্যাড খুলে খস খস করে কিসব লিখতে শুরু করলেন। এই নোটের পরই উর্বশীর ফাইল কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। এখন বোর্ড অব ডিরেকটর যা ভাল বোঝেন তাই করবেন। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম বেদনা যেন রিন-রিন করছে যাকে ধরা যাচ্ছে না ছোঁয়া যাচ্ছে না। কেন? তবে কি?—না-না। নিজের মনকে শক্ত করলেন মিঃ চ্যাটার্জি। তিনি বৈজ্ঞানিক—মনোবিশ্লেষণই তাঁর কাজ। তার বেশী কিছু নয়।

ক'দিন কেটে গেছে। আগামীকাল উর্বশীর ফাইল পাঠিয়ে দেবেন ডঃ মূলচন্দানীর কাছে। তাই ফাইনাল রিপোর্ট তৈরি করছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। খেয়াল ছিল না অফিস ছুটি হয়ে গেছে। ডিপার্টমেণ্টের সবাই চলে গেছে। ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই খেয়াল হল। হাতের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে উঠতে যাবেন এমন সময় কেউ যেন ঘরে ঢুকল খুব সন্তর্পণে। একটু অবাক হয়ে তাকাতেই দেখলেন মিঃ চ্যাটার্জি, মুখ নীচু করে ঘরে ঢুকছে উর্বশী। মিঃ চ্যাটার্জি একটু হাসলেন—এসো উর্বশী—বোসো।

উর্বশী হয়ত এরকমটা আশা করেনি। একটু অবাক হয়ে মিঃ চ্যাটার্জির মুখের দিকে তাকালো ও তারপর এগিয়ে এসে সামনের চেয়ারটায় বসে বসে নখ খুঁটতে লাগল।

—কি কিছু বলবে?

তবু উর্বশী মুখ তুলল না। কি বলবে বা কোথা থেকে বলবে তাই হয়ত ও মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিল।

—আবার কি অভিযোগ নিয়ে এসেছো? মিঃ চ্যাটার্জির গলার স্বরটা ভারী।—বিশ্বাস করো তোমাকে বিরক্ত করার জন্য আমি খুবই দুঃখিত উর্বশী—কিন্তু আমি নিরুপায়। তোমার ফাইল কমপ্লিট করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। যাহোক আমার কাজ শেষ। কালই ফাইল পাঠিয়ে দেব ডঃ মূলচন্দানীর কাছে। এই দ্যাখো সেই ফাইল। বলে মিঃ চ্যাটার্জি টেবিলের উপর থেকে ফাইলটা তুলে দেখালেন উর্বশীকে।

উর্বশী এতক্ষণ কোনরকমে নিজেকে শক্ত করে বসেছিল কিন্তু আর পারল না। চেয়ার থেকে উঠে এক ঝটকায় ফাইলটা মিঃ চ্যাটার্জির হাত থেকে টেনে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল ঘরের এক কোণায়।

—ফাইল—ফাইল—আর ফাইল। আমাকে এমন করে কষ্ট দেবার জন্যই বুঝি তৈরী করেছিলে। নিষ্ঠুর! বলতে বলতে উর্বশী মিঃ চ্যাটার্জীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মিঃ চ্যাটার্জীর বুক থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। সেই রিণরিণে যন্ত্রণাবোধটা মিলিয়ে গেল অকস্মাৎ। পরম মমতায় উর্বশীর মুখখানা তুলে ধরার চেষ্টা করলেন উনি। কিন্তু উর্বশী জোর করে মুখ গুঁজে রাখল মিঃ চ্যাটার্জীর বুকে। উর্বশীর উষ্ণ নরম সিল্কেথিটিক দেহের স্পর্শ মিঃ চ্যাটার্জীর সমস্ত রক্ত কণিকার মধ্যে কী এক আদিম মন্ত্র গুঞ্জরণ করে চলল। মিঃ চ্যাটার্জী এবার জোর করে উর্বশীর মুখখানা দুহাতের মধ্যে তুলে ধরলেন। উর্বশী দুচোখ বন্ধ করল। মিঃ চ্যাটার্জীর উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শে উর্বশীর সমস্ত দেহ যেন গলে গলে যেতে লাগল। মহাকাল বোধহয় মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ইতিহাসের এই বিস্ময়কর ক্ষণটিকে লক্ষ্য করে। কতক্ষণ পরে মিঃ চ্যাটার্জী বলে উঠলেন—উর্বশী তোমার ফাইল কমপ্লিট হয় নি। শেষ কথাটা এখনও রিপোর্টে লেখা বাকি রয়ে গেছে।

উর্বশী কপট রাগ দেখিয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল—আবার ফাইলের কথা। অসভ্য কোথাকার!

প্র কা শি ত হ লো

বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ

বহু প্রতীক্ষিত এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত রচনাবলীর প্রথম খণ্ডটি এবার প্রকাশিত হলো। বুদ্ধদেবের বাংলা-সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এই সদা বিতর্কিত সাহিত্যিকের অবিস্মরণীয় অবদান সৃষ্টি করেছে বাংলা সাহিত্যে এক অভাবনীয় যুগপ্রবাহ। তাঁর বিপুল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি চিরায়ত হয়ে রইলেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য কালানুক্রমে বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। অপূর্ব সংস্করণ। ১/৮ ডিমাই প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা। মূল্যবান তথ্যপঞ্জী যুক্ত। এই সংস্করণের মূল্য ২০ টাকা। নিয়মিত গ্রাহকদের জন্য ১৬ টাকা। ১০৲ জমা দিয়ে (শেষ খণ্ডে পরিশোধনীয়) গ্রাহক হলে প্রতি সংস্করণের সাময়িক মূল্যের উপর ২০% কমিশন দেওয়া হবে। সীমিত সংখ্যায় মুদ্রিত। আপনার খণ্ডটি শীঘ্র সংগ্রহ করুন ও গ্রাহক হ'ন।

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৯এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—১২

ইউং সুন কিম (উত্তর কোরিয়া) ৩৩তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান

ইস্টভান জুনিয়ার (হাঙ্গেরী) ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান

খেলাধূলা

দর্শক

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

ইডেন উদ্যানের নেতাজী সুভাষ ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রতিযোগিতার কর্মকর্তারা যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতায় বিশ্ব পর্যায়ে খেলার বড় আসর এই প্রথম হল।

প্রতিযোগিতার মোট সাতটি খেতাব এশিয়া ও ইউরোপের পাঁচটি দেশ এইভাবে পেয়েছে—এশিয়ার চীন ২, উত্তর কোরিয়া ১ এবং জাপান ১ (মেয়েদের ডাবলসে রুমানিয়ার সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী)। অপরদিকে ইউরোপের হাঙ্গেরী ২, রাশিয়া ১ এবং রুমানিয়া ১ (মেয়েদের ডাবলসে জাপানের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী)। রানার্স-আপ খেতাব পেয়েছে ইউরোপের যুগোশ্লাভিয়া ৩, রাশিয়া ১; এশিয়ার চীন ২ এবং দক্ষিণ কোরিয়া ১। প্রতিযোগিতার দুটি বিভাগের ফাইনালে খেলে দুটি খেতাব পেয়েছেন একমাত্র হাঙ্গেরীর ইস্টভান জনিয়ার।

পুরুষদের সিংগলস খেতাব

পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে উঠেছিলেন ৮নং বাছাই ইস্টভান জনিয়ার (হাঙ্গেরী) এবং ৭নং বাছাই এংটন স্টিপানচিক (যুগোশ্লাভিয়া)। জনিয়ার ৩—২ খেলায় স্টিপানচিককে পরাজিত করে খেতাব জয়ী হন। স্টিপানচিক প্রথম খেলায় ২১—১৭ এবং দ্বিতীয় খেলায় ২১—১২ পয়েন্টে জিতে ২—০ খেলায় এগিয়ে যান। খেলার এই অবস্থায় খেতাব পেতে স্টিপানচিকের মাত্র একটা খেলায় জয়লাভের দরকার ছিল, অপরদিকে জনিয়ারের ছিল তিনটে খেলায়। স্টিপানচিকের মত শক্তিশালী খেলোয়াড়কে পরপর তিনটে খেলায় হারিয়ে জনিয়ার শেষ পর্যন্ত খেতাব পাবেন এমন কথা কেউ কল্পনা করেননি। শেষ পঞ্চম খেলায় একসময় উভয়েরই পয়েন্ট সমান ১৮—১৮ দাঁড়ায়। এর পরই জনিয়ার এগিয়ে যান।

হাঙ্গেরী এই নিয়ে ১ বার পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ের পুরস্কার 'সেণ্ট ব্রাইড ভেস' পেল। তাদের পক্ষে শেষ এই খেতাব পেয়েছিলেন সিডো, ১৯৫৩ সালে। ১৯৭৫ সালে হাঙ্গেরীর সিংগলস খেতাব জয়ের ফলে পুরুষদের সিংগলস খেতাব

জয়ের পথে এশিয়ার আধিপত্যে তৃতীয় বাধা পড়লো। বিগত ১৫ বারের প্রতিযোগিতায় (১৯৫২-৭৫) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে জাপান ৭ বার, চীন ৫ বার হাঙ্গেরী ২ বার এবং সুইডেন ১ বার। যুগোশ্লাভিয়া কখনও পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পায়নি।

মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব

মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে অবাছাই খেলোয়াড় ইয়ং সুন কিম (উত্তর কোরিয়া) অপ্রত্যাশিতভাবে ৩—১ খেলায় ২নং বাছাই চ্যাং লীকে (চীন) পরাজিত করেন। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে উত্তর কোরিয়ার পক্ষে এই প্রথম খেতাব জয়। আরও উল্লেখ্য, উত্তর কোরিয়ার এই ১৮ বছরের স্কুল ছাত্রী সুন বিম বিশ্ব টেবল টেনিস আসরে তাঁর প্রথম যোগদানের বছরেই খেতাব জয় করলেন। এমন কি তিনি এ বছরের দলগত বিভাগের খেলায় অংশ গ্রহণ করেননি। ফাইনালের প্রথম খেলায় চ্যাং লী ২৬—২৪ পয়েন্টে জিতে ১—০ খেলায় এগিয়ে যান। কিম পরবর্তী তিনটি খেলায় যথাক্রমে ২১—১২, ২১—১৪ এবং ২১—১৭ পয়েন্টে ২নং বাছাই চ্যাং লীকে পরাজিত করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করেন।

গত ১৫ বারের প্রতিযোগিতায় (১৯৫২-৭৫) মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে জাপান ৭ বার, রুমানিয়া ৪ বার চীন ৩ বার এবং উত্তর কোরিয়া ১ বার।

পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এশিয়ার ৩ জন (জাপান ২ ও চীন ১) এবং ইউরোপের ৫ জন খেলোয়াড় ছিলেন (যুগোশ্লাভিয়া ২, সুইডেন ১ হাঙ্গেরী ১ এবং রাশিয়া ১)। সেমি-ফাইনালে এশিয়া এবং ইউরোপের খেলোয়াড় সংখ্যা সমান দাঁড়ায়—জাপানের ২, হাঙ্গেরীর ১ এবং যুগোশ্লাভিয়ার ১। সেমি-ফাইনালে জাপানের দু'জন খেলোয়াড় হেরে যাওয়াতে ফাইনালে এশিয়ার একজন খেলোয়াড়ও ছিলেন না। এটা নিঃসন্দেহে একটা মস্ত বড় ব্যতিক্রম। কারণ ১৯৫৪ সাল থেকে পুরুষদের সিঙ্গলসের গত ১২টি ফাইনালের প্রতিটিতে এশিয়ার খেলোয়াড় খেলেছিলেন এবং খেতাব জয় করেছিলেন ১১টি (জাপান ৬ এবং চীন ৫)।

মেয়েদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এশিয়ার ৫ জন (চীন ৩, উত্তর কোরিয়া ১ ও দক্ষিণ কোরিয়া ১) এবং ইউরোপের ৩ জন খেলোয়াড় ছিলেন (রাশিয়া ১ রুমানিয়া ১ এবং যুগোশ্লাভিয়া ১)। সেমি-ফাইনালে খেলেছিলেন এশিয়ার ৩ জন (চীন ২ ও উত্তর কোরিয়া ১) এবং ইউরোপের ১ জন (রাশিয়া ১)। ফাইনালে উঠেছিলেন চীন ও উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়। ১৯৫৬ সাল থেকে মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে এশিয়ার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে—একটানা ১১টি খেতাব জয় (জাপান ৭, চীন ৩ এবং উত্তর কোরিয়া ১)।

জাপানের ব্যর্থতা

গত দু'বারের (১৯৭১ ও ১৯৭৩) মত জাপান এবারও একটি খেতাব পেয়েছে। ১৯৭৫ সালের আসরে তারা মাত্র একটি বিভাগের ফাইনালে খেলে গতবারের মত রুমানিয়ার সঙ্গে মেয়েদের ডাবলস খেতাব জিতেছে। কি শোচনীয় ব্যর্থতা। অথচ এই জাপানের কি সুদিনই না ছিল। ১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান তাদের প্রথম যোগদানের বছরেই ৪টি খেতাব জয়ী হয়েছিল। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানই এশিয়া মহাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম খেতাব জয় করে। একই বছরের আসরে সাতটি খেতাবের মধ্যে জাপান ৬টি করে খেতাব পেয়েছে ২ বার (১৯৫৯ ও ১৯৬৭)। এ-রেকর্ড অপর কোন দেশ একবারও করতে পারেনি। জাপান এপর্যন্ত ১৪টি বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে খেতাব জয়ী হয়েছে ৪৬টি (রেকর্ড)। জাপানের পর এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জয়—চীনের ২১টি খেতাব রুমানিয়ার ১৫টি খেতাব এবং হাঙ্গেরীর ১২টি খেতাব।

খেলায় অঘটন

এবারের প্রতিযোগিতায় খেলার ফলাফলের দিক থেকে অনেক অঘটন ঘটেছিল। যোগদানকারী খেলোয়াড়দের খেলা বিচার-বিবেচনা করে যোগ্যতার যে বাছাই-তালিকা তৈরি হয়েছিল তার ওপরের দিকের খেলোয়াড়রা নীচের দিকে বাছাই অথবা অবাছাই খেলোয়াড়দের কাছে হেরে গিয়ে বিচারকদের মাথা হেঁট করে দিয়েছিলেন। ব্যাপার দেখে শুনে বুদ্ধিমান দর্শকরা

৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের দলগত বিভাগের পুরস্কার কার্বলন কাপ হাতে চীনের মহিলা দল।

খেলার ফলাফল সম্পর্কে মুখ খোলেননি—কখন কি হবে তার ঠিক কি?

পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠেছিলেন ৭ নং ও ৮ নং বাছাই খেলোয়াড়। গতবারের (১৯৭৩) সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই সী য়েন টিং (চীন) কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যান ৭নং বাছাই যুগোশ্লাভিয়ার স্টিপনচিকের কাছে। ২নং বাছাই যুগোশ্লাভিয়ার সুরবেক কোয়ার্টার ফাইনালে অবাছাই খেলোয়াড় জাপানের কোনোর কাছে পরাজিত হন। ৩নং বাছাই খেলোয়াড় লি চেন শী (চীন) ২য় রাউণ্ডে অবাছাই খেলোয়াড়ের কাছে হেরে যান। এমনি করে এক-একজন ওপরের দিকের বাছাই খেলোয়াড় বিদায় নিয়েছিলেন।

মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠেছিলেন ২নং বাছাই চ্যাং লী (চীন) এবং অবাছাই ইউং সুন কিম (উত্তর কোরিয়া)। গতবারের (১৯৭৩) চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই হু ইউ-লান (চীন) প্রথম রাউণ্ডেই অবাছাই খেলোয়াড় রাশিয়ার স্টানকেনের কাছে হেরে দারুণ বিস্ময় সৃষ্টি করেন। ৩নং বাছাই লী আয়লেসা (দক্ষিণ কোরিয়া) পরাজিত হন প্রথম রাউণ্ডে। শেষ পর্যন্ত ২নং বাছাই চ্যাং লী ফাইনালে উঠে বাছাই তালিকার মর্যাদা কিছুটা রক্ষা করেছিলেন।

মেয়েদের ডাবলসের ফাইনালের দু'দিকেই অবাছাই জুটি খেলেছিলেন।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৮নং বাছাই ইস্টভান জনিয়ার (হাঙ্গেরী) ১৭—২১, ১২—২১ ২১—১৪ ২১—১৫ ও ২১—১৯ পয়েন্টে ৭নং বাছাই এণ্টন স্টিপানচিককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : অবাছাই খেলোয়াড় পার্ক ইয়ং সুন কিম (উত্তর কোরিয়া) ২৪-২৬ ২১-১২ ২১-১৪ ও ২১—১৫ পয়েন্টে ২নং বাছাই চ্যাং লীকে (চীন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : ইস্টভান জনিয়ার এবং গ্যাবর গ্যারগেলি ২৪-১৪ ১৯-২১ ২১—১৬ ও ২১—১৬ পয়েন্টে স্টিপানচিক এবং সুরবেককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : অবাছাই জুটি মারিয়া আলেকজান্দ্রু (রুমানিয়া) এবং সোকো তাকাহাসি (জাপান) ২১—১৮ ৯—২১ ২১—৯ ও ২১—১৪ পয়েন্টে অবাছাই জুটি চু সিয়াং-উন এবং লিন মী-চীনকে (চীন) পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস : স্টানিসকড গোমোজকোভ এবং শ্রীমতী ফার্ডম্যান (রাশিয়া) ২১—১৩ ২১—১৩ ও ২৩—২১ পয়েন্টে ৫নং বাছাই শ্রীমতী এলমিরা এণ্টোনিয়ন এবং সার্কিস সারখিয়ানকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

৬ষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেট খেলা

মেলবোর্ণে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার শেষ ৬ষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ৪ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করায় অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে ৪-১ খেলায় (ড্র ১) 'রাবার' জয় করেছে।

প্রথম দিনেই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ১৫২ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে এই ১৫২ রান অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রান। ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার পিটার লেভার ৩৮ রানে ৬টা উইকেট পান—টেস্ট খেলায় তাঁর এটা শ্রেষ্ঠ বোলিং। প্রথম দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট পড়ে ১৫ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৭৩ (৩ উইকেট)। ফলে ইংল্যাণ্ড ১২১ রানে এগিয়ে যায়। তাদের হাতে জমা থাকে প্রথম ইনিংসের ৭টা উইকেট। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক মাইক ডেনেস ১৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। এই নটআউট ১৩৩ রান টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান। এবিষয়ে তাঁর পূর্ব রেকর্ড ১১৮ রান (বিপক্ষে ভারত, ১৯৭৪)। এইদিনের খেলায় ৩য় উইকেটের জুটিতে এডরিচ (৭০ রান) এবং ডেনেস দলের ১৪৯ রান এবং অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডেনেস (নটআউট ১৩৩ রান) এবং ফ্লেচার (নটআউট ৫৬ রান) দলের ১০৬ রান তুলে দিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার দুই নামকরা বোলার লিলি এবং টমসন খেলায় অনুপস্থিত থাকায় ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানরা হাতের সুখে পিটিয়ে খেলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৫২৯ রানের মাথায় শেষ হলে তারা অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ১৫২ রানের থেকে ৩৭৭ রানে এগিয়ে যায়। মাইক ডেনেস ১৮৮ রান করে আউট হন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাঁর আগে ইংল্যাণ্ডের কোন টেস্ট-অধিনায়কই এক ইনিংসের খেলায় এত রাণ করেন নি। ইংল্যাণ্ডের ৪র্থ এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে পঞ্চাশের রান উঠেছিল—৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডেনেস এবং ফ্লেচার ৩১৮ মিনিটে ১৯২ রান এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে ফ্লেচার এবং টনি গ্রিগ ১২৩ মিনিটে ১৪৮ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের শেষ ৬টা উইকেট মাত্র ২২ রানে পড়েছিল আধঘণ্টার মত খেলায়। অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়াম পেস বোলার ম্যাকস ওয়াকার ১৪৮ রানে ৮টা উইকেট পেয়েছিলেন। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর এই সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড। তৃতীয় দিনে বাকি সময়ের খেলায় অস্ট্রেলিয়া তাদের ২য় ইনিংসের সমস্ত উইকেট হাতে জমা রেখে ৩২ রান করেছিল।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৭৪ (৩ উইকেটে) তখনও ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৫২৯ রানের থেকে অস্ট্রেলিয়া ১৯৩ রানের পিছনে পড়েছিল। অস্ট্রেলিয়া ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে প্রাণপণ করে ব্যাট করেছিল। ১ম উইকেটের জুটিতে রিক ম্যাককস্কার (৭৬ রান) এবং ইয়ান রেডপাথ ১১১ রান এবং ২য় উইকেটের জুটিতে রেডপাথ এবং ইয়ান চ্যাপেল দলের ১০৪ তুলে দিয়েছিলেন।

শেষ পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৩৭৩ রানের মাথায় শেষ হল ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ৪ রানে জিতে যায়। খেলা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ১৫২ রান (ইয়ান চ্যাপেল ৬৫ রান। পিটার লেভার ৩৮ রানে ৬ এবং ওল্ড ৫০ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৭৩ রান (রেডপাথ ৮৩, ম্যাককস্কার ৭৬, ইয়ান চ্যাপেল ৫০ এবং জি চ্যাপেল ১০২ রান। আরনল্ড ৮৩ রানে ৩, লেভার ৬৫ রানে ৩ এবং গ্রিগ ৮৮ রানে ৪ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ৫২৯ রান (ডেনেস ১৮৮, ফ্লেচার ১৪৬, গ্রিগ ৮৯ এবং এডরিচ ৭০ রান। ওয়াকার ১৪৩ রানে ৮ উইকেট)

ডাঃ বি সি রায় ট্রফি

কোয়েম্বাটুরে অনুষ্ঠিত ১২শ জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ২-০ গোলে গত দু'বছরের বিজয়ী কেরলকে পরাজিত করে মোট পাঁচবার ডাঃ বি সি রায় ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। বাংলার পক্ষে দুটি গোল করেন রাইট-আউট এম ভট্টাচার্য।

সী য়েন টিং (চীন)

ফটো ঃ অমৃত

স্টপ্যানচিক

সুরবেক

ইয়ং সুন কিম এবং চ্যাং লী

খেলার জগতে মেয়ে

জিমন্যাস্টিকে বাবলী বিশ্বাস

বহুবাজার ব্যায়াম সমিতির বাবলী বিশ্বাস প্রায় ১৯৬৭ সাল থেকে জিমন্যাস্টিক শিক্ষা করছে। তবে প্রতিযোগিতার আসরে প্রথম নামে ১৯৭২-এ। সে বছর রাজ্য প্রতিযোগিতায় বীম ব্যালেন্স ভল্টিং হর্স আনইভিনবার এবং ফ্লোর একসারসাইজে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার সুযোগ পায়। সে বছর কেবল ভল্টিং হর্সে ব্রোঞ্জ পদক পেলেও ৭৫-এ অর্থাৎ এ বছর রাজ্য জিমন্যাস্টিকের আসরে বীম ব্যালেন্সে ভারতী দাসের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে।

কদিন আগে গিয়েছিলাম রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বহুবাজার ব্যায়াম সমিতির জিমন্যাস্টিকের অঙ্গনে। ওখানেই দেখা হল বাংলার কয়েকজন জিমন্যাস্টিক কুশলী মেয়ের সঙ্গে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি এই ব্যায়াম সমিতির বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এখানকার কর্মকর্তারা আর প্রশিক্ষকরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় সাহায্য করে চলেছেন। জিমন্যাস্টিকের প্রতি আমাদের তেমন নজর নেই তাই এদের কোন খবরই রাখা হয় না। অথচ নানান অভাব-অনটন ও বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের সাহায্য না পেয়েও পশ্চিম বাংলার জিমন্যাস্টরা—কি ছেলে কি মেয়ে—নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে চলেছে। সর্বভারতীয় আসরে সাফল্য অর্জন করে এ রাজ্যের নাম রাখছে।

জিমন্যাস্টিক একটি অতি উচ্চস্তরের খেলা। এতে একদিকে যেমন শরীরের উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয় অন্যদিকে তেমনি দেহ সুগঠিত সুশ্রী ও দর্শনীয় হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্যের পরিণতি সৌন্দর্যে। একথা জিমন্যাস্টিকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী করে প্রযোজ্য। এক একটি ছেলে বা মেয়ে নিয়মিত জিমন্যাস্টিক অনুশীলন করলে তাদের পেশীগুলি যেমন সচল ও মজবুত হয় তাদের দৈহিক পেলবতাও তেমনি বাড়ে। উপরন্তু দেহগঠন চমৎকার হয়ে ওঠে। এই ব্যায়াম সমিতিতে দেখলাম এখনকার কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকরা কি অক্লান্ত প্রয়াসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনুশীলন করাচ্ছেন। বারবার বিভিন্ন ফিগার করায় তালিম দিচ্ছেন। কিশোরী আর তরুণীদের এক সুসংহত কঠোর শৃঙ্খলায় পরিচালিত করা হচ্ছে। একদিকে যেমন শাসন আছে তেমনি আছে সস্নেহ আচরণ। বর্তমানের বাধাবিঘ্ন কর্মকর্তাদের হতাশ করেনি বরং তাঁরা আশা করে আছেন স্বাধীন দেশের সমাজ ও সরকার ছেলে-মেয়েদের সুস্থ সবল করে গড়ে তোলার এই কাজের একদিন না একদিন স্বীকৃতি দেবেনই। কারণ দেশবাসীকে সবল সক্ষম কর্মঠ করে তুলতে দেহচর্চার প্রয়োজন যে কতখানি বিশ্বের অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেই তা উপলব্ধি করা যায়। বলিষ্ঠ দেহসম্পদের অভাবে আজ আমাদের খেলোয়াড়রা বিশ্ব আসরে পিছিয়ে পড়ছে। এ অবস্থা বদলাতে চাই সর্বাত্মক প্রস্তুতি।

আর প্রস্তুতিরই ভিৎ হচ্ছে সবল সক্ষম দেহ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মন। জিমন্যাষ্টিকে এই দুটি কাজই সম্পন্ন হয়। ভাল জিমন্যাস্ট আর সুদক্ষ নৃত্যকুশলীরা তাই অপূর্ব দেহশ্রীর অধিকারী হয়। এখনও আমাদের দেশে সবাই এ সত্য পুরোপুরি উপলব্ধি করেন নি। তাই জিমন্যাষ্টিক ক্লাবের সংখ্যা বাড়তির বদলে কমতির দিকেই ঝোঁক নিয়েছে। প্রাক স্বাধীন যুগে এই কলকাতা শহরেতো বটেই, গ্রামাঞ্চলেও দেহচর্চার বহু কেন্দ্র ছিল। কিন্তু উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সে সংখ্যা কমে গেছে। অথচ এই দিকে দেশবাসীর নজর না পড়লে দেশেরই ক্ষতি।

তাই এই ব্যায়াম সমিতির কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতের আশায় 'এই ক্ষীণ দীপশিখা' জ্বালিয়ে রেখেছেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিয়ে চলেছেন।

ও কথা এখন থাক। বাবলীর কথায় ফিরে আসি। অতি লাজুক স্বল্পভাষিণী মেয়েটিকে নানাভাবে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম ও ৭২ সালেই কালীঘাট ব্যায়াম সমিতি আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ভল্টিং হর্সে দ্বিতীয় ও বীমব্যালান্সে শীর্ষস্থান অধিকার করে ফ্লোর একসারসাইজেও দ্বিতীয় স্থান পায়। তাছাড়া এই বছর চন্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় জিমন্যাষ্টিক আসরে কুড়ি বছরের অনূর্ধ্ব বিভাগে পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় স্থান লাভে বাবলীর অবদানও কম নয়।

পরের বছর অর্থাৎ ৭৩-এ রাজ্য প্রতিযোগিতার আসরে কুড়ি বছরের অনূর্ধ্ব বিভাগে কুশলী জিমন্যাষ্ট কৃষ্ণা মালির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে বাবলী বীমব্যালান্সে রৌপ্যপদক জয় করে। ৭৩-৭৪ মরশুমে ত্রিপুরায় আয়োজিত জাতীয় আসরে ও বাংলাদলে স্থান পেয়েছে। আসন্ন জাতীয় জিমন্যাষ্টিকের আসরেও বাবলী পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে এ আশা ওর আছে—এবং সেজন্যে খাটছেও একনিষ্ঠভাবে।

বাবলীদের আদিবাড়ী মুড়াগাছা। তবে বর্তমানে ওরা থাকে রাণাঘাটে। বাবা রামজীবন বিশ্বাস ব্যাটারী ফ্যাকটরীর অফিসার। ওরা সাত বোন এক ভাই—ছোট বোন সুস্মিতাও জিমন্যাস্টিক শিখছে।

জিমন্যাস্টিক্স শেখার আগ্রহ কেন হল, এ প্রশ্নের জবাবে বাবলী বলল রাণাঘাটের পাড়ার ক্লাবে জিমন্যাষ্টিক দেখে। ঐ জিমন্যাষ্টিক ক্লাবের ফকির দফাদার বাবলীকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেন। ফকিরবাবুর সহায়তায় ও বহরমপুর ব্যায়াম সমিতিতে যোগদানের সুযোগ পায়। উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ পাচ্ছে এখানকার প্রশিক্ষক সন্তোষ ওঝার কাছে।

বাবলী সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তাই তার পক্ষে রাণাঘাট থেকে ট্রেনে কলকাতায় এসে নিয়মিত প্রশিক্ষণ চালান খুবই কষ্টকর। তবু জিমন্যাষ্টিকের প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে বলেই নানা বাধা ও অসুবিধা অগ্রাহ্য করে বাবলী আসে। সপ্তাহে অন্ততঃ পাঁচদিন প্রত্যহ দু ঘন্টা অনুশীলন করে বাবলী। এদিকে ঠিকমত পড়াশোনাও চালাতে হয়। বাবলী রাণাঘাটের পালচৌধুরী গার্লস হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা ওকে খেলাধুলোর ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেন। আর উৎসাহ দেন ওর বাবামহ বাড়ীর সবাই। জিমন্যাষ্টিকের মত এইরকম একটা জটিল ব্যায়াম চর্চা করতে হলে উপযুক্ত পরিমাণে দুধ মাংস এবং ডিম প্রভৃতি খাওয়ারও প্রয়োজন। বাবলী বলে বাবা আমার জিমন্যাষ্টিক চর্চায় উৎসাহ দেন তাই তিনি আমার জন্য নানারকম পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করেন।

এথলেটিকসের ওপরও বাবলীর আগ্রহ ছিল। কিন্তু জিমন্যাষ্টিক চর্চার পর আর দৌড়ঝাঁপ চর্চা করার সময় পায় না তাছাড়া সামর্থ্যও থাকে না। তবে ও স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ায় প্রতিবারই যোগ দেয়। একশ দশ মিটার দৌড়ে প্রথম দ্বিতীয় হয়। নিয়মিতভাবে এথলেটিকস অনুশীলন করার সময় না থাকায় বাবলী বাংলার স্কুল ক্রীড়ায় এথলেটিকসে যোগ দিতে পারে না।

বাবলীদের প্রশিক্ষক সন্তোষ ওঝাও জানান ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে। তাঁর দৃঢ় আশা বাবলী ক্রমেই আরও উৎকর্ষ লাভ করবে। এরা সবাই বাঙালী সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। অনেকরকম অসুবিধা সত্ত্বেও এরা অনুশীলন করছে। সমিতির পক্ষে এদের সুষ্ঠু ব্যায়াম ও জিমন্যাষ্টিক চর্চার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। এখানকার তুলনায় পাঞ্জাব ও ত্রিপুরার জিমন্যাষ্টরা অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। কারণ ওদের রাজ্য সরকার জিমন্যাষ্টিকের উৎকর্ষের দিকে কড়া নজর রেখেছেন। প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের সুব্যবস্থা ছাড়াও বছরে অন্তত দুতিন মাসের জন্য বিশেষ জিমন্যাষ্টিক শিবির বসানো হয়। সেখানে আধুনিক প্রথাপদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করানো হয়। ছায়াছবির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকায় জিমন্যাষ্টিক সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় সেসব যাতে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া সরকারী ব্যয়ে জিমন্যাষ্টদের পুষ্টিকর খাদ্যদান এবং খাদ্য সম্পর্কে পরামর্শ দেবারও ব্যবস্থা আছে।

বাবলী বলে আমরা কতো অসুবিধা সত্ত্বেও জিমন্যাস্টিক চর্চা করছি বুঝলেন তো? তবে আমি এই নখলা চালিয়ে যাব। ভবিষ্যতে বড় জিমন্যাস্ট হবার আশা রাখি।

জিজ্ঞাসা করলাম জিমন্যাষ্টিকের বিভিন্ন খেলার মধ্যে কোনটি তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?

উত্তর পেলাম ঃ বীম ব্যালেন্স। এই খেলা শেখাও যেমন কঠিন নিখুঁতভাবে সুন্দর 'ফিগার' করাও তেমনি কঠিন। মেয়েদের পক্ষে জিমন্যাষ্টিক চর্চা মোটেই অসুবিধাজনক নয় বলেও জানালো।

এই প্রসঙ্গে আরও বলল বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাবের মেয়েদের জিমন্যাষ্টিকই সবচেয়ে দর্শনীয় মনে হয়েছে। ওদের কাজ আমার খুব ভাল লেগেছে। হয়ত ওদের মত সুযোগ সুবিধা পেলে আমাদের মেয়েরাও আরও এগিয়ে যেতে পারবে।

নানা অভাব ও অসুবিধা অগ্রাহ্য করেও যে একাগ্রমনে জিমন্যাষ্টিক চর্চা করে চলেছে তার জন্য বাবলীকে সাধুবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। জনৈক কর্মকর্তার আফশোষভরা কথাটি কানে বাজতে লাগল—এইসব একনিষ্ঠ ছেলেমেয়ে যদি তাদের জিমন্যাষ্টিক চর্চায় সরকার ও সমাজের সমর্থন ও স্বীকৃতি না পায় তাহলে এদেশে জিমন্যাষ্টিকের অগ্রগতি হবে কোন পথে? মুষ্টিমেয় পৃষ্ঠপোষক আর শুভার্থী একে কতদূরই বা নিয়ে যেতে পারে? অথচ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জিমন্যাষ্টিক এখন জাতীয় শরীর চর্চার এক মুখ্য অঙ্গ।

অনয়

সেখানকার সুধীসমাজ তা কখনই ক্ষমা বা বরদাস্ত করে না।

তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনধারার কিছুটা পরিমাণ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া স্বরগতভাবে প্রত্যেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত এক হলেও যেসব শিল্পীরা তা পরিবেশন করেন তাঁরা ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের দিক দিয়ে ঠিক এক নন। সুতরাং তাঁদের গান একই স্বরলিপিতে অনুসরণ করলেও মেজাজ ও ভাব ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে কিছুটা ভিন্ন হতেই পারে এবং শিল্পীর তাতে একটা জিনিষ ফুটে ওঠা খুবই স্বাভাবিক, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'স্বকীয়তা'। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বোধহয় এইটুকুই শিল্পীর স্বাধীনতা। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষগুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু না কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না। তাঁর গানে শিল্পীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি শ্রীদিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন, '...তোমার একথা আমিও স্বীকার করি যে সুরকারের সুর বজায় রেখেও একসপ্রেশনে কমবেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশির মধ্যে তফাৎ আছে একথাটি ভুলো না। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে।'

এখন প্রশ্ন হোল যে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তার সঠিক রূপে কি করে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে? অনেকেই হয়তো বলবেন, কেন স্বরলিপি তো রয়েছে।' কিন্তু মনে হয় এ ব্যাপারে শুধু স্বরলিপিই যথেষ্ট রক্ষাকবচ নয়। কারণ স্বরলিপিতে থাকে শুধু গানের কাঠামোটি এবং তা থেকে গায়কী শুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলে নিতে পারেন তাঁরাই যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করে এসেছেন। কিন্তু যাঁরা তা করেন নি তাঁরা স্বরলিপি দেখে গান তুললে হয়তো শুধু স্বরগতভাবে গানটি তাঁদের কণ্ঠে আসতে পারে, কিন্তু এর গায়কী তাঁদের কণ্ঠে নাও ধরা পড়তে পারে। তাছাড়া কোন গানের স্বরলিপিকে অক্ষুণ্ণ রেখেও তাকে বিকৃত করা যায় ও আজকাল অনেক বিকৃতিই এইভাবে লোকের চোখ এড়িয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুপ্রবেশ করছে এবং এগুলো হোল সাধারণতঃ গানের লয়কে অনাবশ্যকভাবে কমানো বা বাড়ানো স্বরে অযথা কম্পনের প্রয়োগ গানের মূল তালকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাতে নানা ভাব প্রয়োগ করে গানের স্বচ্ছন্দ গতি ও তার কাব্যময় রূপকে ব্যাহত করা, গানকে প্রথম লাইন থেকে না ধরে তার মাঝখান থেকে ধরা ও গানে বেশী ভাব আরোপ করে তাকে অতিনাটকীয় করে তোলা ইত্যাদি। কোন স্বরে বিচ্যুতি অর্থাৎ কোমল ধা এর স্থলে শুদ্ধ ধা লাগালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী তাতে যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ঐ সব বৈচিত্র্য প্রয়োগ দ্বারা। সুতরাং স্বরলিপির সঙ্গে চাই এই সব রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশুদ্ধ ও সঠিক গীতিরূপ ও সেটা সম্ভব হতে পারে দুই উপায়ে।

ক) যেসব রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের উচিত হবে উপযুক্ত শিষ্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করে যাওয়া, যাতে তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঠিক গায়কী রূপটি কণ্ঠে ধারণ করে তাঁদের শিষ্যপরম্পরায় পরবর্তীযুগে সেই গায়কীর ধারাটি প্রবহমান রাখতে পারেন। যেমন একটি প্রদীপ থেকে অনেকগুলো প্রদীপ জ্বালানো যায়, তেমনি এক একটি কণ্ঠ থেকে শত শত কণ্ঠে সেই সব গান তাঁদের বিশুদ্ধ রূপে ছড়িয়ে দিতে হবে।

খ) রবীন্দ্রসঙ্গীত - বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বা টেপরেকর্ড করিয়ে তা সংরক্ষিত করতে হবে। এ কাজে বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী হতে পারেন এবং এ কাজটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনায় শিল্পীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতকে কেউ যদি অত্যন্ত বেশী সংরক্ষণশীল ও ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে করেন তো তিনি সচ্ছন্দে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বর্জন করে ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শে বাংলা গান রচনা করে তাতে শিল্পীদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে বাংলা গানের নূতন দিগন্ত খুলে দিতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত করবো, তাতে অর্থ কামাবো, যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করবো, কিন্তু এর পরিবেশনায় তার স্রষ্টা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা বা নির্দেশকে মানবো না এরূপ মনোভাব অত্যন্ত আপত্তিকর।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ভবিষ্যতে তার অস্তিত্ব ও জনপ্রিয়তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে কিনা তা একমাত্র মহাকালই নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু যতদিন এ গান বাঁচবে, ততদিনই সে তার অবিকৃত স্বরূপেই বেঁচে থাকুক— এটাই কাম্য। কবিগুরুও তাই চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো। আরও হাজারো গান হয়তো আছে তাদের মাটি করে দাওনা, আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি—তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি।'

শিল্পীদের তাঁর গানে অতিরিক্ত সংযোজন বা স্বাধীনতা নেবার প্রচেষ্টার রবীন্দ্রনাথ কতটা স্পর্শকাতর ছিলেন তা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেই বোঝা যাবে। 'আমাদের দেশের গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাঁধের ওপর চড়ে ব্যায়াম কর্তার বাহাদুরী প্রকাশ করে।

সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীরাও রবীন্দ্রসঙ্গীতে খোদার ওপর খোদকারী বা স্রষ্টার কাঁধের ওপর চড়ে ব্যায়াম কর্তার বাহাদুরীর প্রচেষ্টাটা যত কম করেন ততই মঙ্গল।

ব্রেশটের থিয়েটার বের্লিনার অঁসেম্বল

কৃষ্ণধর

বের্নিলার অঁসেম্বলে শেকস্‌পীয়ারের কোরিওলেশান নাটকের একটি দৃশ্য

একবার বার্লিনে আমার সবচেয়ে সুখপ্রদ অভিজ্ঞতা হল ব্রেশটের থিয়েটার বের্লিনার অঁসেম্বলে তাঁর নাটক দেখা। বেরটোল্ট ব্রেশট নিজহাতে এই থিয়েটারকে নতুন রূপ দিয়ে গেছেন। তাঁর চিন্তাশীল নাটক কীভাবে মঞ্চস্থ করেন ব্রেশট থিয়েটারের শিল্পীরা তা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সে এক স্মরণীয় সন্ধ্যা।

যুদ্ধের পর বার্লিন দুভাগ হয়েছে। সৌভাগ্য বলতে হবে ব্রেশট তাঁর থিয়েটারের জন্য পুবের বার্লিনকেই আপন করে নিয়েছিলেন। আজকের জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের দর্শনীয় যা কিছু তার অন্যতম ব্রেশটের থিয়েটার বের্লিনার অঁসেম্বল। পনেরো বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করে বেরটোল্ট ব্রেশট, মহান সমাজবাদী নাট্যকার, মানবতাবাদী কবি ফিরে এলেন স্বদেশে। নাৎসীবাদের দীর্ঘবাহুর আক্রমণ এড়াবার জন্য ব্রেশটের মতো অনেককেই ত্রিশের দশকে দেশান্তরে যেতে হয়েছিল। জার্মানীতে তাঁদের জায়গা ছিল না। একে একে চলে গেলেন টমাস মান, আলবার্ট আইনস্টাইন, বেরটোল্ট ব্রেশট। নির্বাসন ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না তাঁদের সামনে। যাঁরা সত্যনিষ্ঠ, স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার প্রতিভূ একনায়কতন্ত্রী নাৎসী জার্মানীতে তাঁদের জায়গা ছিল না।

এই ব্রি, বি, অর্থাৎ বেরটোল্ট ব্রেশট তাঁর কিছু সম্পত্তি নিয়ে পাড়ি জমালেন সাগর পারে, রুজভেল্টের আমেরিকায়। যাবার আগে ক্ষমতামত্ত নাৎসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁরাই জার্মানীর শেষ কথা নন, মানুষই হল শেষ কথা। মানুষ বিগড়ে গেলে তাদের সমস্ত রণসজ্জা, বিপুল অস্ত্রসম্ভার কোনো কিছুই আর কাজে লাগবে না। তিনি লিখলেন :

সেনাপতি মশাই তোমার ওই ট্যাঙ্কটা জব্বর
ঝাটা বন গুঁড়োতে পারে
ছাতু করতে পারে
শ'খানেক মানুষ,
কিন্তু একটাই ওর গলদ
ড্রাইভার ছাড়া চলতে পারে না!
সেনাপতি মশাই, তোমার বোমারুটাও বেশ
বাতাসের চেয়ে আগে ছোটে
হাতির চেয়ে বেশি
মাল বইতে পারে
কিন্তু একটাই ওর গলদ
মিস্ত্রী ছাড়া ও অচল।
সেনাপতি মশাই, মানুষ খুব কাজের জীব,
সে উড়তে পারে সে মারতেও পারে
কিন্তু একটাই ওর গলদ
সে ভাবতে পারে। [১৯৩৮]

ব্রেশট দেশান্তরে চলে গেলেও তিনি নিজেকে দেশত্যাগী ভাবতে পারেননি কখনো। কেননা তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ পড়েছিল জার্মানীতে। তিনি বললেন : "যাঁরা স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে চলে যায় তাঁরাই হল দেশত্যাগী, কিন্তু আমরা স্বেচ্ছায় নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বাস করতে আসিনি। সেদেশে স্থায়ীভাবে বা চিরকালের জন্য বাস করতেও নয়। আমরা বিতাড়িত, আমরা নির্বাসিত। যে-দেশ আমাদের গ্রহণ করেছিল সেটা আমাদের স্বদেশ নয়, আমাদের নির্বাসনভূমি। আমরা অপেক্ষা করে আছি দেশে ফিরে যাবার জন্য, আমাদের স্বদেশ সীমান্তের যত কাছে এসে থাকতে পারি। লক্ষ্য রাখছি, সীমান্তের ওপারে সামান্যতম পরিবর্তন হয় কিনা। নতুন যে-ই দেশ ছেড়ে আসছে তার কাছ থেকে জানছি। কিছুই ভুলিনি আমরা, কিছুই হারাতে রাজী নই। যা ঘটছে তা ক্ষমা করিনি, কিছুই ক্ষমা করিনি। পাপের স্থবধতা আমাদের প্রতারিত করতে পারবে না। আমরা আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি।" [১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ]

বহু দেশ থেকেই লেখকদের ভাগ্যে নির্বাসন জুটেছে কোনো না কোনো সময়ে। কিন্তু একটি দেশ থেকে একই সময়ে তেরোশোর বেশি লেখকের নির্বাসন ইতিহাসে তুলনাবিহীন। হিটলারের জার্মানীতে তাই ঘটেছিল। নাৎসী জার্মানীকে রিক্ত করে তাঁরা চলে এসেছিলেন মুক্ত পৃথিবী হয়েছিল সমৃদ্ধতর। ব্রেশটের মতো শিল্পী যেদেশেই যাবেন সেদেশই ঈর্ষণীয় প্রতিভার অধিকারী হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রোমাঁ রলাঁ এই নির্বাসিতদের স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন :

> You have brought with you everything of that Germany which we love and respect you have the Spirit of Goethe and Bethoven; Lessing and Marx with you.

ব্রেশটের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়নি। তৃতীয় রাইখের চূড়ান্ত ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে উঠল নতুন জার্মানী। নির্বাসিত ব্রেশটকে স্বাগত জানাল পূর্ব জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক সরকার। সেই ঘরে ফেরার দিন আশ্চর্য সংবেদনায় মূর্ত হয়েছে তাঁর কবিতায় :

নিজের শহর, কেমন দেখতে লাগবে
তখন তাকে?
ঝাঁক ঝাঁক বোমারুর পিছু পিছু
বাড়ি ফিরলাম আমি।
কিন্তু কোথায় সেই শহর?
পাহাড়-উঁচু ধোঁয়া ছড়িয়ে আছে সেখানে;
ওই জ্বলজ্বল আগুনের মাঝখানে।
[১৯৪৮?]

সেই জ্বলজ্বল আগুনের মাঝখানে নতুন জার্মানী মাথা তুলে দাঁড়াল, যে জার্মানী নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে, শান্তি ও সমাজবাদের পক্ষে। ব্রেশট ১৯৪৯ সালে বের্লিনার

ধূলোর নিয়তি ॥

রাম বসু

জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
এই তো চরম সত্য
ভুলি নি কখনো

যখনই তাকাই আমি বুকের গভীরে
শিউরে উঠি ধূলোর প্রলয়ে
পশুর দাঁতের চাপে ভেঙে যায় পাঁজরের খাঁচা
মাথার খুলির মধ্যে বিদ্যুতের ধারালো করাত
অন্ধকারে যাতায়াত করে

জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
ধূলোর সাম্রাজ্য তাই পার হতে চাই
বাড়াই স্পর্ধার মুখ অকলঙ্ক নক্ষত্রের দিকে
নীল ঢেউ অঙ্গে মেখে হতে চাই সামুদ্রিক পাখি
পার হয়ে যেতে চাই সীমা

নিত্য টানে দুই বিপরীত
বুকে নিত্য কুরুক্ষেত্র নিয়ে যাত্রা আমাদের
মহাপ্রস্থানের দিকে
রেখে যাওয়া কিছু গন্ধ, ক্ষতের গোলাপ
অসমাপ্ত রঙিন ক্যানভাসে কয়েকটি শিশির, অশ্রু, নক্ষত্রের মাটি

এই হল জীবনের রীতি
এই হল ধূলোর নিয়তি।

কেন, এইসব কেন ? ॥

তুলসী মুখোপাধ্যায়

দশটা নেকড়ে কেন আমাকেই তাক করে
অবিরাম থাবা ছুঁড়ে মারে
কেন নষ্টমেয়ের লালা নিশিদিন নষ্ট করে
হৃদপিণ্ডের ব্যাকুল প্রার্থনা
দক্ষিণের প্রতীক্ষায় কেন বারবার উড়ে আসে
উত্তরের দুরারোগ্য ট্রাম
অঞ্জলিবদ্ধ হাতে আমি নিকটে গেলেই কেন
বুক্কের দয়া মুছে যায়—
সাঁইতিরিশ বছর অব্দি কেন, এইসব কেন?
আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।
তবুও রক্তের গন্ধক কেন ভিজে থাকে ঘামে
কেন ভেতরের বাঘের বাচ্চারা
গাধার পোশাকে ঘাস খায়!
সাঁইতিরিশ বছর অব্দি কেন, এইসব কেন?
আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

এমন হৃদয় রাখা ॥

অমিয়কুমার হাটি

এখনো পারি না কেন? সমর্পণ এত কি কঠিন?
সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় গুনি কত কাল?
এত কি দুর্জয় বাধা? কেন খুঁজি, কবিতা, আড়াল?
সহস্র বিজলী মালা রক্তে আনে অসামান্য দিন।

একাকী পালিয়ে ফেরা ভীরুতার নয় পরিচয়?
কেন যে নিষ্ঠুর হই! হাসিরাশি যখন মুখর,
ক্রন্দন মন্থন করি তখনি যে! কোন তীক্ষ্ম শর
এখনো পারিনি টেনে ফেলে দিতে? দুর্বল হৃদয়!

এমন হৃদয় রাখা ঝকমারিই। বিষম ত্রিভুজ।
অশান্ত, উদ্বেল সে যে, অর্বাচীন অবোধ অবুঝ।।

অ'সেম্বলে তাঁর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন। ভুবনবিখ্যাত ব্রেশট-রঙ্গমঞ্চের জন্ম হল। জীবনবাদী নাটক দীর্ঘকাল নির্বাসনে থাকার পর স্বদেশভূমিতে পেল পুনর্বাসন। ব্রেশটের সহধর্মিণী শ্রীমতী হেলেন হবাইগেল নাট্যকারকে নতুন রঙ্গমঞ্চের শুভ যাত্রায় দিলেন প্রেরণা। বের্লিনার অ'সেম্বল নতুন নাটকের পথ দেখাল যাকে বলা হয় ব্রেশটের এপিক থিয়েটার।

নাটকের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ উভয় দিকেই ব্রেশট আনকোরা নতুন পথের প্রদর্শক। করুণা নয় দর্শকদের মনে চিন্তা জাগিয়ে তুলতে চাইলেন ব্রেশট তাঁর নাটকের মাধ্যমে, যে-চিন্তা পৃথিবীর অবিচার ও অসাম্য দূর করতে সহায়ক হবে। সমাজ-বাদী বাস্তবতাকে কীভাবে শিল্পসৃষ্টিতে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হয় ব্রেশটের নাটক তা শেখায়। ইতিহাসের ঘটনাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা মিলে যায় তাঁর লেখায়। 'মাদার কারেজ' 'ককেসিয়ান চক সার্কেল' 'থ্রি পেনি অপেরা' কিংবা 'গ্যালিলিও' নাটকের বিষয়বস্তু ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য নাট্যানুরাগীদের বিস্মিত করে ব্রেশটের ইতিহাসবোধের তীক্ষ্ণতায়, তাঁর সঠিক বিশ্লেষণক্ষমতায়।

রঙ্গমঞ্চের বিন্যাস ও অভিনয়কলার ক্ষেত্রেও ব্রেশট থিয়েটারের নিজস্বতা সহজেই চোখে পড়ে। সেদিন বের্লিনার অ'সেম্বলে ব্রেশটের 'সোয়েইক ইন সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার' নাটক প্রযোজনা দেখেও তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মনে মনে অনুভব করেছি। নাটকপ্রিয় জার্মানরা দলে দলে এসে ভীড় করে ব্রেশটের নাটক দেখতে; পশ্চিম বার্লিন থেকেও আসেন। লক্ষ্য করেছি দর্শকদের মধ্যে রয়েছে সব শ্রেণীর লোক। ছাত্র যুবক, সৈনিক থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিক বুদ্ধিজীবী সবাই।

মঞ্চের যবনিকাপটে পিকাসোর শান্তির পারাবত। শান্তির জন্য, মানবতার জন্যই যে এই রঙ্গমঞ্চ উৎসর্গীকৃত তারই প্রতীকী ব্যঞ্জনা; এক মহাশিল্পীর কাজে অন্য এক মহাশিল্পীর পরিপূরক সহায়তা। দর্শক-দের মন এই প্রতীকের ব্যবহারে আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে থাকে ব্রেশটের বক্তব্য মনেপ্রাণে গ্রহণের জন্য।

এই নাটকটি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। ফ্যাসিবাদী আরও অনেক নাটক লিখেছেন ব্রেশট 'সেনেরা কারারের রাইফেল' 'আর্টুরো উই' তাদের মধ্যে বিখ্যাত। এই নাটকটিতেও তিনি ফ্যাসিবাদের নানা ঘৃণিত চেহারার সঙ্গে দর্শকদের পরিচিত করান এবং

ব্রেশটের ফ্যাসিবিরোধী নাটক
শোয়েইক ইপন সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার'-এর একটি দৃশ্য

সংকেত রাখেন অমোঘভাবে ইতিহাসের সেই অনাগত অধ্যায়ের দিকে যেখানে মানুষই চূড়ান্তভাবে জয়ী তার স্বাধীন বিবেক ও অপরাজিত মনোবল নিয়ে। মঞ্চে প্রদর্শিত স্টালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, অবসন্ন শোয়েইকের করুণ চিত্র নাৎসীবাদের অবধারিত বিনাশকে এমন তীব্রভাবে নিশ্চিত করে তোলে যে প্রতিটি দর্শক রুদ্ধশ্বাসে তখন অপেক্ষা করেন সেই পরিণতির জন্য। বক্তব্যে সুস্পষ্ট, প্রয়োগে অসাধারণ।

ব্রেশট নেই, শ্রীমতী থাইগেলও সম্প্রতি লোকান্তরিত। আছে ব্রেশটের নাট্যচিন্তা, আছে তাঁর নিজের হাতে তৈরি শিল্পীর দল—দ্য ব্রেশট পিপল্। তাঁর বক্তব্য, প্রযোজনা, অভিনয়রীতি ও মঞ্চসজ্জা সবই

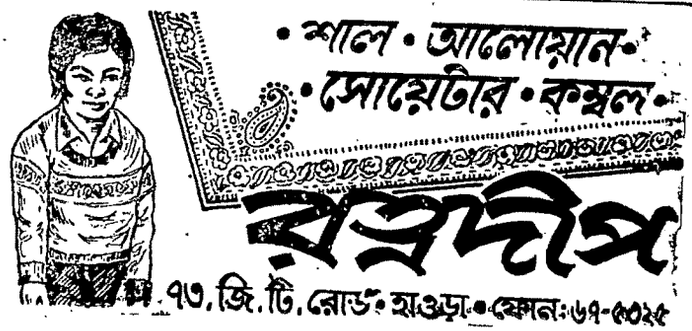

গোয়েন্দা ধাঁধা

কুরুক্ষেত্র ॥ প্রতুল লাহিড়ী ॥ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

স্থান—নির্জন কক্ষ কাল—রাত্রি

(বিছানার ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম; মুখখানা চিন্তাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ বসে অদূরে একখানা চেয়ারে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র।)

কৃষ্ণ ঃ বেশ, তাহলে ধ্বংসই চলুক।

ভীষ্ম ঃ পাঁচখানা তরবারির বিরুদ্ধে একশোটা তরবারি ঝলসে উঠবে...

কৃষ্ণ ঃ এটা তরবারির যুদ্ধ হবে না, ঠাকুর্দা।

ভীষ্ম ঃ তবে কিসের যুদ্ধ হবে?

কৃষ্ণ ঃ এটা বিজ্ঞানের যুগ...

ভীষ্ম ঃ (অসহ্য বিস্ময়ে) বিজ্ঞানের যুগে আবার কি হে? চার যুগের নামই ত জানি, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এটা আবার কিসের ফ্যাঁকড়া?

কৃষ্ণ ঃ (হাসলেন) বিজ্ঞানের যুগের সঙ্গে কারুর চালাকি খাটবে না। খাপের তরবারি খাপেই থাকবে, হাতের লাঠি থাকবে হাতে, তীর-ধনু পিঠেই ঝুলবে, মাঝ থেকে যোদ্ধার অকস্মাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটবে, অর্থাৎ হাত দুটো উড়ে যাবে দক্ষিণে, পা দুটো উড়ে যাবে উত্তরে, ধড়টার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

ভীষ্ম ঃ কিন্তু তা কি করে সম্ভব?

কৃষ্ণ ঃ (দৃঢ়কণ্ঠে) বুদ্ধি, ঠাকুর্দা, বুদ্ধি, স্রেফ কৃষ্ণের ক্ষুরধার বুদ্ধি...

ভীষ্ম ঃ বুদ্ধিটা কি তোমার বৈজ্ঞানিক যুগেরই স্বধর্ম?

কৃষ্ণ ঃ আমার বুদ্ধি আমারই স্বধর্ম, বৈজ্ঞানিক যুগের নয়। যুদ্ধের নামে লোকধ্বংসের জন্য বৈজ্ঞানিকরা সৃষ্টি করবে এরোপ্লেন, মাস্টার্ড গ্যাস, বিমান-বিধ্বংসী কামান, হাউইজার, শ্র্যাপনেল, ইউবোট আর আমি...

নাটকটা অজয়ের লেখা।

ধনঞ্জয় মিত্রের প্রথম পক্ষের ছেলে অজয়। বৈজ্ঞানিক একসপেরিমেন্টের বাতিক আছে। একসপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণীহত্যা করে জেল পর্যন্ত খেটেছে। দীর্ঘদিন স্বদেশ ছাড়া। বোম্বাইবাসী। রহস্যময় চরিত্র।

বৃদ্ধ ধনঞ্জয় মিত্র প্রথমে তাঁর দেড় কোটি টাকার সম্পত্তি এই অজয়ের নামেই উইল করেছিলেন। তারপর অজয়ের কীর্তিকাহিনী যৎকিঞ্চিৎ শুনেই উইল পাল্টানোর মনস্থ করলেন। অমনি তাঁর এটর্নী মাধবচরণ মারা গেলেন বিষপ্রয়োগে। কিন্তু কেউ ধরতে পারল না, বিষটা কি ধরনের, শরীরেই বা ঢুকল কি করে। অজয় তখন বোম্বাইতে।

মুলতুবী রইল উইল পাল্টানো। দিন কয়েক পরে এটর্নী সারদাচরণকে ডেকে পাঠালেন বৃদ্ধ ধনঞ্জয় মিত্র। সারদাচরণ মাধবচরণের ছেলে। বাপবেটা দুজনেই এটর্নী।

দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলে বিজয় আর সুজয়কেও ডাকলেন ধনঞ্জয় মিত্র।

বিজয়কে ধমক দিয়ে বললেন ধনঞ্জয় মিত্র—তুমি যদি সেই অভিনেত্রীটাকে বিয়ে করার সংকল্প ত্যাগ কর, তবেই সম্পত্তি পাবে। নইলে—

'আপনার সম্পত্তি চাই না,' বিজয় বললে সোজাগলায়।

ঠিক এমনি সময়ে একটা চিঠি এল ভৃত্যের হাতে। খাম ছিঁড়ে পড়লেন ধনঞ্জয় মিত্র। জবাব লিখে তক্ষুনি দিলেন ভৃত্যকে—ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়ার জন্যে।

বিজয়কে বললেন—'গলাটা শুকিয়ে গেছে। সোডা আর গ্লাস দাও।'

গেলাসে সোডা ঢেলে দিল বিজয়। তার কয়েক মিনিট পরেই অপমৃত্যু ঘটল ধনঞ্জয় মিত্রের। শরীরে দেখা গেল বিষক্রিয়া।

গ্রেপ্তার হল বিজয়।

কিছুদিন পরেই বোম্বাই থেকে ফিরে এল অজয়।

কোর্টে দাঁড়িয়ে সে বললে—'বিজয় খুনী নয়। ওকে ছেড়ে দিন।'

ছাড়া পেল বিজয়। কিন্তু অজয় সুনজরে দেখল না তাকে। বরং চেষ্টা করল তার প্রেয়সী অরূপা দেবীকে ফুসলে আনার। এই সেই অভিনেত্রী যার জন্যে সম্পত্তিও ত্যাগ করতে চেয়েছিল বিজয়।

টাকার লোভে মেয়েরা সব পারে। অরূপা দেবীকেও একদিন দেখা গেল অজয়ের বাড়ীতে। অজয়ের নিমন্ত্রণ সে রেখেছে। অজয় নাটক লেখে। সেই নাটকের গান্ধারী রোলটা তাকেই করতে হবে। বাড়ীর মধ্যেই একখানা ঘরে বসবাস শুরু করে দিল অরূপা দেবী। মনোমালিন্য হয়ে গেল বিজয়ের সঙ্গে।

অজয় কিন্তু কল্পনাও করতে পারল না, নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়ছে প্রতুল লাহিড়ী। সে-ই পাঠিয়েছে অরূপা দেবীকে, সরিয়েছে বিজয়কে মনে আঘাত দিয়ে।

এমন সময়ে একখানা চিঠি এল অজয়ের নামে। প্রতুল লাহিড়ী হস্তগত করল চিঠিখানা। লিখেছেন সারদাচরণ। শুধু দুটি শব্দ —"পঞ্চাশহাজারেও নয়।'

পরদিন সকালে দেশশুদ্ধ লোক জেনে গেল আর একটা অপমৃত্যুর চাঞ্চল্যকর সংবাদ। সারদাচরণও মারা গেছেন রহস্যজনকভাবে বিষপ্রয়োগে।

পুলিশ দপ্তরে খবর এল। অজয় টেলিফোন করে জানিয়েছে—সারদাচরণের মৃত্যুর আগে নাকি বিজয়কে সেখানেও দেখা গিয়েছে।

পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল বিজয়কে।

প্রতুল লাহিড়ী অরূপা দেবীকে পরামর্শ দিলে বিজয়কে নিয়ে গা-ঢাকা দিতে। কে'দুটির এক কুঁড়ে ঘরে পালিয়ে গেল দুজনে। অজয়ের নাটকটা পড়বার জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে গেল অরূপাদেবী।

নাট্যকার হওয়ার সখ তখন মাথায় উঠেছে অজয়ের। জেল পালানো একটি মেয়ে এসে উঠেছে তার বাড়ীতে। নাম তার উজালী। বোম্বাইতে বিয়ে করেছিল। মারাত্মক একটা বিষের সন্ধান এই উজালীর কাছেই সে জেনেছিল। বিষটা আসে একটা ফুল থেকে। ফুলটার নাম টামুই...

অরূপা দেবীকে অজয় বিয়ে করতে চায় জানতে পেরে বাঘিনী মূর্তি ধারণ করল উজালী। অজয়ের কুকীর্তি সে ফাঁস করে দেবেই। মাধবচরণ ধনঞ্জয় মিত্র এবং সারদাচরণকে দূর থেকেও খুন করার গুপ্ত রহস্য আর কেউ না জানলেও সে জানে...

কে'দুটি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এল অরূপা দেবী। হাতে নাটকের পাণ্ডুলিপি। চোখ বড়বড়।

প্রতুলবাবু প্রতুলবাবু, খুনগুলো হচ্ছে কি করে ধরে ফেলেছি। বিষ...বিষ... ফুলের বিষ।

জানি। বলল প্রতুল। টামুই ফুলের বিষ। কিন্তু প্রয়োগ হচ্ছে কি করে? চিঠির মধ্যে দিয়ে বললে বিশু। অজয়ের বাড়ীতে ছদ্মবেশে হে'সেল সামলেছে অ্যাদ্দিন। আড়ি পেতে সাংঘাতিক চক্রান্তটা শুনেছে সে। এক্ষুনি কে'দুটিতে লোক পাঠাতে হবে। বিজয়কে চিঠি লিখেছে অজয়। সে চিঠির জবাব দিলেই মারা পড়বে বিজয়।

কিন্তু কিভাবে?

উজালীকে বলল অজয়—চলো আমরা পালাই বোম্বাইতে। খতম করে যাই বিজয়কে। পুলিশ তাকে খুঁজছে খুনের অপরাধে। হঠাৎ মারা গেলে বুঝবে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে।

বলে মারাত্মক চিঠিখানা লিখে ফেলে দিয়ে এল ডাক বাক্সে।

ফিরে এসে গুলি করল উজালীকে।

পুলিশ এসে দেখল বিষ খেয়েছে অজয়। টামুই ফুলের বিষ। মারা গেল বিশ মিনিট পরে।

অরূপা দেবীর হাত থেকে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা টেনে নিয়ে পড়ল প্রতুল লাহিড়ী

কৃষ্ণ। আর আমি—আর আমি ধ্বংস করব বিপুল কৌরব কুল— সামান্য একখানা চিঠির সাহায্যে।

ভীষ্ম। চিঠির সাহায্যে!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ। আমি লিখব যাকে লিখব সে জবাব দেবে—বাস। আয়োজনের কোনো ঘটা নেই আধ ঘন্টার ভেতর মৃত্যু এসে ধীরে ধীরে গ্রাস করবে। কেউ জানবে না কেউ বুঝবে না ডাক্তারের বিশ্লেষণ শক্তি হবে পরাহত বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরাজয়ের কালিমায় কালো হয়ে উঠবে।

ভীষ্ম। ব্যাপারটা বুঝিয়ে না বললে তোমার কথার একটা বর্ণও যে আমার মাথায় ঢুকছে না কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। মাথায় ঢুকবে না ঠাকুর্দা! ফুলে কীট আছে শুনেছেন তো? এ সেই ফুল আর এ-সেই কীট...

লাফিয়ে উঠে বললেন ডিটেকটিভ ইন্সপেকটর অনন্দমোহন—ব্যস ব্যস আর পড়তে হবে না বুঝেছি।

খাতা বন্ধ করে বলল প্রতুল লাহিড়ী—হ্যাঁ শুধু একখানা ডাক টিকিট!

কি বুঝলেন?

অদ্রীশ বর্ধন

(গোয়েন্দা ধাঁধার উত্তর ২৯ পৃষ্ঠায়)

স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। অথচ কোনো চমক বা জাদুর ব্যবহার নেই। আলোর ব্যবহারেও কোনো আড়ম্বর চোখে পড়েনি। উজ্জ্বলতম আলোয় রঙ্গমঞ্চের প্রতিটি কোণ প্লাবিত, অভিনেতাদের প্রতিটি ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি পশ্চাদতম সারির দর্শকদের কাছেও প্রতিভাত। তাঁর নাটকে পাওয়া যায় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাস্তবতার প্রয়োগ। সমাজবাদী বাস্তবতার শৈল্পিক প্রয়োগে ব্রেশটের নাটক সমকালীন এবং চিরকালীন।

এ বিষয়ে জানবার কৌতূহল ছিল। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে নাটকাভিনয়ের প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য করেছি, এই নাটকের ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয় নিবিড়। ব্রেশটপদ্ধতির সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ সখ্য। করতালিতে মুখরিত হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ। নাটকের সংবেদনা পৌঁছে গেছে পশ্চাদতম সারিতে। জার্মান ভাষায় নাটক। দর্শকদের মধ্যে আমিই ছিলুম একমাত্র কৃষ্ণকায়। ভাষা না বুঝলেও ব্রেশটের বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হয়নি। এত মানবিক ও সমকালীন তাঁর প্রয়োগ ও উপস্থাপনা।

পরদিন সকালে গেলুম ব্রেশট থিয়েটারের অন্যতম কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে। ডঃ হানস-জোকেন ইরমার আমাকে স্বাগত জানালেন তাঁর কক্ষে। ভেতরে ঢুকবার আগে দেখলুম বাইরের লনে বসে আছেন অনেক শিল্পী ও কলা-কুশলী। একটি বিরাট ট্রাকে থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম তোলা হচ্ছে। হয়তো বা বার্লিনের বাইরে যাবার প্রস্তুতি। ইরমারের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানালুম, কলকাতায় ব্রেশট কতটা জনপ্রিয়। তাঁর নাটকের বাংলা রূপান্তর দর্শকদের আগ্রহই শুধু বাড়ায়নি নাট্যরুচিরও বদল ঘটিয়েছে গত দুই দশকে। ডঃ ইরমার শুনে আনন্দিত ও বিস্মিত হলেন। তিনি কলকাতায় ব্রেশটের এত জনপ্রিয়তার কথা জানতেন না। উঠে গিয়ে ড্রয়ার থেকে বার করে আনলেন একটি ফাইল। দেখে বললেন, দিল্লি থেকে একজন আলকাজি এসেছিলেন। ককেশিয়ান চক সার্কেল প্রযোজনার পরামর্শ নেবার জন্য।

জানতে চাইলুম, ব্রেশট থিয়েটার অভিনেতাদের কীভাবে সংগ্রহ করেন। তিনি বললেন, জি ডি আর-এ অভিনয় শিক্ষার অনেকগুলো স্কুল আছে। বার্লিন, লাইপৎসিগ ও রোস্টক শহরে এই স্কুল-গুলো থেকে শিক্ষার্থীরা স্নাতক হয়ে বেরোয়। তাদের মধ্যে থেকেই আমরা পাই অভিনেতা। তবে ভাল অভিনেত্রী পাওয়া সব সময়েই কঠিন।

চোদ্দ বছর বয়সেই এইসব স্কুলে ভর্তি হওয়া যায়। দু বছরের কোর্স। বের্লিনার অ'সেম্বলের শিল্পীরা সবাই চুক্তিবদ্ধ। কখনও কখনও অন্য থিয়েটার থেকে শিল্পীদের আনা হয় অতিথি হিসেবে কোনো বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করার জন্য। এমেচর অভিনেতাও আছেন যাঁরা অন্য জীবিকায় নিযুক্ত, কিন্তু অভিনয় করতে ভালবাসেন।

শিল্পীদের জীবিকার সম্মান ও নিরাপত্তা রাষ্ট্র দিয়েছে। ডঃ ইরমারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, শ্রমজীবী হিসেবে অভিনয়শিল্পীদের বেতন সরকার নির্দিষ্ট নিয়মে দিতে হয়। শিল্পীদের মধ্যে অবশ্যই স্তরভেদ আছে। একজন নতুন শিল্পী শুরুতেই পাবেন মাসে ৭০০ মার্ক। সাধারণভাবে শিল্পীদের গড়পড়তা মাসিক বেতন ১৩০০ মার্ক। সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে এ বিষয়ে বোঝাপড়া করে শিল্পীদের বেতনক্রম ঠিক হয়। ডাক্তার ইনজিনিয়ারদের চেয়েও শিল্পীরা বেশি বেতন পান সমাজতান্ত্রিক জার্মানীতে।

ব্রেশট নিজে অফুরন্ত নাটক লিখেছেন এবং তাঁর সব কটিই চমকপ্রদ। এ ছাড়াও তিনি শেকসপীয়ার, বার্নাড শ সিয়ান ও কেসির নাটক তাঁর মঞ্চে তাঁর পদ্ধতিতে প্রযোজনা করে গেছেন। শেকসপীয়ারের 'কোরিওলেনাস' বার্নাড শ-র 'মিসেস ওয়ারেনস্ প্রফেশন' ব্রেশট-পদ্ধতিতে অভিনীত হয়ে প্রচুর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রতিটি নাটক প্রযোজনার অন্তরালে রয়েছে অসাধারণ পরিশ্রম আর অনুশীলন। বের্লিনার অ'সেম্বল বছরে ১২ থেকে পনেরোটি নাটক মঞ্চস্থ করে। পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়াবার আগে চলে কঠোর অনুশীলন যাকে নাটকের ভাষায় বলে মহলা বা রিহার্সাল। নতুন নাটক নামাবার আগে ৮০ থেকে ১০০ দিন রিহার্সাল ব্রেশট থিয়েটারে আবশ্যিক। কোনো কোনো নাটকের রিহার্সাল ২০০ দিনও হয়।

সোমবার ছাড়া রোজই বের্লিনার অ'সেম্বলে নাটক অভিনীত হয়। কোনো কোনো দিন দুবার অভিনয়ের আয়োজন। একই নাটক রোজ অভিনয় হয় না। ঘুরে-ফিরে অভিনয়ের ব্যবস্থা। থ্রি পেনি অপেরা ৬০০ রজনী, কোরিওলেনাস ৬০০ রজনী, শোয়েইক ৬০০ রজনী, মিসেস ওয়ারেনস্ প্রফেশন ৫০০ রজনী, অভিনীত হবার পরও দর্শকদের আগ্রহ কমেনি।

নতুন নাট্যকাররাও আসছেন বের্লিনার অ'সেম্বলে। তবে ব্রেশটপদ্ধতির নাটকই তাঁরা গ্রহণ করেন। জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের তরুণ নাট্যকার হাইনের মুলার (জন্ম ১৯২৮)-এর নাটক 'জিমেন্ট' অ'সেম্বলের জন্যই লেখা। এটি অভিনীত হয়ে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। বের্লিনার অ'সেম্বল এই নাটক লেখার জন্য মুলারকে দশ হাজার মার্ক অগ্রিম দিয়েছিল। অভিনয়স্বত্ব হিসেবে নাট্যকার পাবেন বিক্রীর দশ শতাংশ।

ব্রেশটের নামাঙ্কিত রাস্তার ওপরেই বের্লিনার অ'সেম্বল ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে। বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ আসে তার শিল্পীদের কাছে। ইয়োরোপের আমন্ত্রণই বেশি। প্রাচ্যদেশে এখনো তাঁরা যাননি।

আমি জানতে চেয়েছিলুম, কোনোদিন কলকাতায় কি ভারতবর্ষে আসবেন কি?

ডঃ ইরমার বললেন, সরকারী স্তরেই এর ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব।

ভারত ও জি ডি আর-এর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যসূচীর মাধ্যমে যদি কখনো এই প্রস্তাব আসে তাহলে আমরা চাইব প্রথমেই কলকাতায় যেতে। যেহেতু কলকাতার দর্শক ব্রেশট থিয়েটারে অনুরক্ত।

যুক্তি

পরিবহণ সমস্যা

আজকের দিনে পরিবহন এক মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই যাত্রীদের মুখে এক কথা—ট্রেণ নেই বাস নেই, ট্রাম নেই—কিছুই নিয়মিত চলছে না। প্রতিদিন অফিসযাত্রী, আর স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়েদের কি দুর্ভোগ। তার ওপর রয়েছে পথ নিরাপত্তার অভাব। অমুক জায়গায় বাস চাপা পড়ে মৃত্যু লাইনের কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ সব কিছু ছাড়িয়ে গিয়েছে গত ঊনত্রিশে জানুয়ারি উল্টো-ডাঙা স্টেশনের দুর্ঘটনায়। নিরপরাধ কর্ম-ক্লান্ত ঘরমুখো পাঁচ শতাধিক যাত্রীকে অনিবার্য মৃত্যু আর দুরবস্থায় ঠেলে দিয়েছে—দার্জিলিং মেলের ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে থাকা হাবড়া লোকালকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে। মর্মান্তিক-ভয়াবহ দৃশ্য। চারদিকে চাপ চাপ রক্ত, আর্তনাদ গোঙানি কান্নার শব্দ। মাঝি-মল্লারা যেমন নদীবক্ষে নিজেদের শেষ দিন গোনে তেমনি রেলযাত্রীরাও রেল লাইনেই তাদের মৃত্যুর ছায়া দেখছে। চারিদিকে শুধু অব্যবস্থা। ঘন্টার পর ঘন্টা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকেও ট্রেনের পাত্তা নেই। তারপর যদি বা একটা ট্রেন এলো তার অঙ্গে কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। বাসের বেলায়ও ঠিক তেমনি। নিয়মানুবর্তিতা-সময়নিষ্ঠা কথাগুলো যেন ক্রমে ক্রমে ডিকশেনারির পাতা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

মালা বোস খড়দহের মেয়ে। বয়স আর কত হবে? মুখটা এখনো বেশ কচি। কলকাতার ভিকটোরিয়া কলেজে পড়ে। পরিবহণ সমস্যার সেও একজন শিকার। সময়মতো পৌঁছে ক্লাস করতে পারে না। সেদিন ট্রেনে গন্ডগোল—কোথায় কি তার চুরি গিয়েছে না কি যেন হয়েছে। ট্রেন আসছে না। চোখেমুখে তার প্রচন্ড উত্তেজনা। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি—এতো ছটফট করছ কেন? আমরা অফিসে যাব—দেরীতে গেলেই লাল চেরা পড়ে যাবে। কিন্তু কি করব বল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব হজম করতে হবে।

—বারে আপনাদের তো বেশ মজা! একদিন অফিস গেলেন না ছুটি কাটা যাবে। আর আমি কলেজে না গেলে অনার্সের ক্লাসটা করতে পারব না।—কত ক্ষতি হবে বলুন। তাছাড়া আপনারা পয়সা রোজগার করেন বাসে গেলেই বা দোষ কি?

—রোজ রোজ বাসে যাওয়া সম্ভব—তুমিই বলো।

—তা সত্যি কথা, তাহলে আমরা সবাই নিরুপায়!

পাশে দাঁড়িয়েছিল ওরই এক বন্ধু সুদেষ্ণা রায়। এবার সে বলে উঠলো—আমরা চুপচাপ থাকলে চলবে না। আমাদের এ-বিষয়ে সোচ্চার না হলে কোন সমাধান নিজ থেকে আসবে না।

তাহলে তুমিই বলো আমাদের কি করণীয়—আমি প্রশ্ন করি।

—ট্রেন বাড়ানোর জন্য আমাদের দাবী করতে হবে। যেসব ট্রেন এখনো চালু অবস্থায় আছে, তাদের ঠিকমতো সার্ভিসিং সরকারকে করতে হবে। প্রায়শই দেখা যায় ট্রেনে আলো নেই, মাঝপথে ট্রেন যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল, তখন কেমন লাগে বলুন তো?

—কেন? জিজ্ঞাসা করি।

—অন্ধকারে ভিড় ট্রেনে মেয়েদের যাতায়াত করা কি অসুবিধাজনক। লেডিজ কম্পার্টমেন্টে উঠেও স্বস্তি নেই। সেখানে কিছু স্বার্থান্বেষী দুষ্টু ছেলে ওঠে। সুযোগমতো তারা কাজ হাসিলের চেষ্টায় থাকে। ছিনতাই করাও আশ্চর্য কিছু নয়।

—তাহলে?

এবার মালা দেবী আবার মুখ খুললে।—মেয়েদের নিরপত্তার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা ঠিক ঠিক ভাড়া দেব আর সরকার কোন কিছু করবেন না—এ হতে পারে না।

ট্রেনের আর এক সহযাত্রী তরুণ ছাত্র দিলীপ হাজরা জানালেন—সময়মতো ট্রেন চললে যাতায়াতের এতো কষ্ট হয় না।

এবার জিজ্ঞাসা করি—ঠিকমতো ট্রেন না চলার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে আপনার মনে হয়?

—আপনি বাড়ী ফেরার সময়ে শেয়ালদহে প্রতিদিন মাইকে ঘোষণা শোনেন—রেকের অভাবে ট্রেন বাতিল করা হল। ডাউন ট্রেন দেরীতে আসার জন্য আপ ট্রেন ছাড়তে দেরী হচ্ছে। এজন্য কারা দায়ী? নিশ্চয়ই রেল কর্তৃপক্ষ। তাঁদের প্রোটেকশন ফোর্স রয়েছে—পুলিশ রয়েছে অথচ দিন দিন চুরির মাত্রা বেড়েই যাচ্ছে। ট্রেনে আলো নেই—পাখা নেই সিট নেই, বাঙ্ক নেই—দরজা-জানলা কিছু নেই—সব কিছুই তাদের অতন্দ্র প্রহরার জন্য চোরেদের হাতে চলে গিয়েছে।

অদ্বিতীয় ফরমুলা...অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে

প্রেপারেশন এইচ*

আমেরিকান ডাক্তারদের পরীক্ষা করে দেখা

- কয়েক মিনিটেই চুলকানি বন্ধ করে
- সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয়
- খুব বাড়াবাড়ি না হলে, অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে
- পিচ্ছিল ক'রে মলত্যাগের কষ্ট কমিয়ে দেয়

বিনামূল্যে! অর্শ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকার জন্যে আজই এই ঠিকানায় লিখুন (সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন): ডিপার্টমেন্ট PH-88 পো: অ: বক্স১০১৩৩,বম্বে৪০০০০১

*Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Co. Ltd.
743-PH-92 BEN

কে এ আব্বাস পরিচালিত
ফয়সলা : রমন খান্না - কেমিলা রিক

ফিরে যেতে বলোনা

আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ভাঙ্গা নৌকার পাল। অন্ন নেই। বস্ত্র নেই। চাকরী নেই। প্রতিরোধ নেই। অথচ হতাশা আছে। আছে নৈরাশ্য। বিতৃষ্ণা আছে। চারিদিকে। সারি সারি লোভের পাঁচিল। জীবন নেই কিন্তু স্বপ্ন আছে। এখানে বিপ্লব হয় না। হাজার হাজার মানুষের মিছিল হয়। মিটিং হয়। বক্তৃতা হয়। মুষ্টিবদ্ধ হাত ওঠে আর নামে। এরই মধ্যে একজন যুবক আর এক-জন যুবতী, গল্প নয়, টুকরো টুকরো বাস্তব ছবি। ওরা স্বপ্ন দেখেছিল। একটা নিজস্ব পৃথিবী গড়তে চেয়েছিল। যেখানে দুঃখ নেই, যন্ত্রণা নেই, হতাশা নেই, নৈরাশ্য নেই।...স্বাভাবিক জীবন থেকে পালাতে চেয়েছিল মানে এক দুঃখ থেকে আরেক দুঃখে, এক যন্ত্রণা থেকে আরেক যন্ত্রণায়।... 'পালাবার পথ নেই'...তরুণ পরিচালক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এই ছবির প্রথম পরিচ্ছদে মোটামুটি নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজটাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন যারা ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে বাস করে আকাশকে বন্ধুত্ব জানায়। এই যুবক এবং যুবতী, দ্বিতীয় পরিচ্ছদে যেন সেই দেশলাই কাঠিমুখে আমার উসখুস করছে বারুদ—বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস; ...ওদের প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা ওরা হারিয়েছে। তাই ওরা এই সমাজের, সমাজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। সেই দুর্দমনীয় শক্তি নেই। স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে ঘরে উত্তাপ আর আলোর অভাব। প্রতি মুহূর্তে অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা। ঘর ভরে যাচ্ছে দীর্ঘশ্বাসের কালো ধোঁয়ায়। একজন যুবক—সারি সারি যুবকের রূপান্তরিত। তেমনি একজন যুবতী—সারি সারি যুবতী। ঐক্যহীন বিশৃংখলা দেখে স্তব্ধ হতে হয়। মনে হয় বার বার এদেশ বিপন্ন আজ। তৃতীয় পরিচ্ছদে যুবক এবং যুবতী অনেক, অনেকটা দূরত্বে উপস্থিত। সমাজ এবং রাজনীতি বহির্ভূত ওদের সমস্যা! আকাশ, দিগন্ত, মাঠ আর সবুজ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা ওদের মনের চৌহদ্দি। সহসা ঝড় ওঠে। কাল যেখানে ফুলের গাছ আজ সেখানে বেড়া। এই বেড়া ডিঙিয়ে যেতে হবে সামনে।...হে জীবন, হে যুগসন্ধিকালের চেতনা—

আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয়-শক্তি। প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের তুষার-গলানো উত্তাপ।
টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।...

পরিচালক দ্বিতীয় পরিচ্ছদে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের এবং তৃতীয় পরিচ্ছদে সমাজ-এর ওপর তলার মানুষের ছবি তুলে ধরছেন। মোট কথা, তিনটে ক্রশ সেকসান অফ লাইফ—সমস্যাসঙ্কুল জীবনের ভিন্নমুখী সমস্যার আয়নায় চরিত্রবিশেষ বা চরিত্র-মিছিলকে তুলে ধরা। সামগ্রিকভাবে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চরিত্রের সমাবেশ হলেও মূলতঃ এ-ছবিতে প্রধান দুটি চরিত্র—যুবক ও যুবতী। তিনটি পরিচ্ছদে একই নামে এসেছে ওরা। তবুও আপাতদৃষ্টিতে সংযোগহীন। সংযোগ গভীর, গভীরতর পরিণতিতে যখন অ্যাবসলিউট লড়াইয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এই চলচ্চিত্র ভাবনার ভ্রূণাকার সারাংশ থেকেই বোঝা যায় এর পরিপূর্ণতার লক্ষণ বর্তমান। চিত্রকর যে উদ্দেশ্যে ছবি আঁকেন, একজন কবি যে উদ্দেশ্যে কবিতা লেখেন, একই উদ্দেশ্যে এই ছবি। পরিচালক চান তাঁর বোধ বুদ্ধি অভিজ্ঞতা একালের যুবক-দের যন্ত্রণার অন্তঃস্থল স্পর্শ করুক ওপর ওপর নয়। তোলপাড় তুলুক সকলের মধ্যে। অনুভবে আলোড়িত হয়ে আয়নায় সবাই নিজেকে দেখুক। কারণ আজকের এই সমস্যা এ-ছবির বিষয়বস্তু পরিচালকের নিজের

—এসব দূর করার জন্য আপনি কি সাজেশন দেবেন?

—প্রশাসন শক্ত হাতে চালাতে হবে। যে-কোন মূল্যে চুরি, কর্তব্যে গাফিলতি বন্ধ করতে হবে। শিয়ালদহ সেকশন জুড়ে রেলে যে নৈরাজ্য চলছে তার জুড়ি নেই—কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে প্রশাসন চালালে জনগণের সহযোগিতা সব সময়ই পাওয়া যাবে।

সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জানালেন—এজন্য যৌথভাবে সবাই দায়ী। রেলওয়ে মেনটেনান্স বিভাগ তাঁদের কর্তব্য করেননি—কেবিনের সিগন্যালম্যান গণ্ডগোল করেছেন—সর্বোপরি ড্রাইভার-ফায়ারম্যান অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন। সবার অপদার্থতা-গাফিলতির বলি হয়েছে সাধারণ যাত্রীরা। কর্তৃপক্ষের ভুলের মাশুল আমরা কেন দেব বলুন তো? —এ-বিষয়ে আমাদের প্রতিবাদ জানাতে হবে।

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন বেলঘরিয়ার মিন্টু ঘোষ। তিনি বলে উঠলেন—প্রতিবাদ জানানোর লোক আছে? আমরা সব ভেড়া হয়ে গিয়েছি। আর এক সহযাত্রী জয়দেব কুণ্ডু ফোড়ন কেটে বলে উঠলেন—ভয় নেই, ভয় নেই, পাতাল রেল হলেই আপনাদের সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এদিক-ওদিক করলেই একেবারে জ্যান্ত কবর।

এ তো গেল ট্রেনযাত্রীদের অসুবিধার কথা। বনগাঁ বারাসতের লোকদের তো অবর্ণনীয় কষ্ট। সিঙ্গল লাইনে ট্রেন চলে। অসংখ্য যাত্রী—ট্রেন নেই। এতো কষ্ট করে কলকাতা পৌঁছেও স্বস্তি নেই। ট্রাম-বাসের একই হাল। অন্যদিকে কলকাতায় রাস্তার যা হাল, সেখানে ভালভাবে বাস-ট্রাম চালানোও আর এক সমস্যা। সবকিছুর পেছনে একই সমস্যা—আমরা যাত্রীর সংখ্যায় অনেক আর আমাদের যারা পরিবহণ করবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম। প্রাইভেট বাস-মালিকরা নানা অজুহাতে বেশী পরিমাণে বাস চালাচ্ছেন না। তেলের দাম বেশী, পার্টসের দাম বেশী ভাড়া না বাড়ালে বাস চালাতে পারব না কত বাহানা তাদের। অথচ তাদের লাভের অঙ্ক কখনো কমতি যায় না। অন্যদিকে স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট

মালা বোস

অমল দাশ

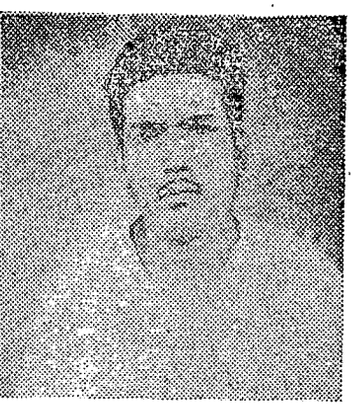

কর্পোরেশনের অবস্থাও কাহিল। পরিবহণ সংস্থার এক কর্মী শ্রীঅমল দাসের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হল।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা অমলবাবু, বেসরকারী সংস্থায় লাভ হয় আর আপনাদের এতো লোকসান কেন?

—আমি একজন সাধারণ কর্মী। তবে আমার যেটুকু মনে হয় ওপরতলার বড় ধরনের চুরিগুলো বন্ধ না করলে লোকসান কমবে না।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করি—কেন কর্মীদের কোন দোষ নেই—জাল টিকিট বিক্রী—টিকিট বিক্রীতে কারচুপি?

—আমাদের নিজেদের ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। এসব অসৎ কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক আপত্তি নেই। তবে যেখানে পুকুর চুরি হচ্ছে, অব্যবস্থার চূড়ান্ত চলছে সেখানে হাত না পড়লে কিছুই হবে না।

—স্টেট বাসের সংখ্যা দিন দিন এতো কমছে কেন?

—সেকেলে যন্ত্রপাতি মেনটেনান্সের অভাব। অকেজো খারাপ বাস সারা হচ্ছে না।

—স্টেট বাসের সার্ভিস আরো ভালো করা যায় কি করে? আপনার কি অভিমত।

—দেখুন আমরা সাধারণ কর্মীরা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যথাসাধ্য তৎপরতার সঙ্গে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করি। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত প্রশাসন ঠিকমতো না চললে এর উন্নতি হবে না।

—আচ্ছা অমলবাবু, এর পরিচালনায় যদি আপনাদের ভূমিকা স্বীকার করে আপনাদের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকে তাহলে কি আরো উন্নতির আশা আছে?

—এর পরিচালনায় শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি নিলে হয়তো অবস্থার হেরফের হতে পারে। তাছাড়া শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত ন্যূনতম কতকগুলো দাবী মেনে নিলেও মনে হয় সেবার মনোভাব আরো বৃদ্ধি পাবে। তবে বাসের সংখ্যা বাড়ানো সেগুলো ঠিকমতো চলার উপযোগী তৈরী করা এসব কিন্তু কর্তৃপক্ষের পুরো দায়িত্ব। আপনারাই বলুন আমাদের কি ইচ্ছে করে আমাদের মা বোন-ভাইদের এরকম ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে?

—কেন আপনারা কর্তৃপক্ষকে এসব বিষয়ে চাপ দেন না? কথা বলছেন।

—নিশ্চয়ই আমাদের ইউনিয়ন সবসময়ই যাত্রীস্বার্থের জন্য সব বিষয়ে কথা বলছেন।

টেলিফোন একসচেঞ্জের মহিলা কর্মী সোনা সমাদ্দার জানালেন মহিলা ট্রামের মতো কিছু মহিলা বাস করা দরকার। এতে ছোট ছেলেমেয়েরাও স্কুলে যেতে পারবে।

—এরকম আলাদা ব্যবস্থা করলে নিশ্চয়ই ভাল হয়। তবে...

—কিন্তু 'তবে' নেই। মেয়েদের সিটের সামনে ভীড়গুলো দেখেছেন? মেয়েদের সিটের কাছে কি মধু আছে এরাই জানে। ভীড়ের বাসে মেয়েদের তো উঠতেই দিতে চায় না কেউ।

অমর দাস

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

চিঠি লিখে খামে মুড়ে ডাক টিকিট লাগানোর সময়ে শতকরা নিরানব্বইজন মানুষ জিভের ডগায় ডাকটিকিট বুলিয়ে নেন—হাতের কাছে জল বা জলশোষক স্পঞ্জ থাকে না বলে।

অজয় ডাকটিকিটের পেছনে টাম্বুই ফুলের বিষ মাখিয়ে রাখত। যাকে খুন করতে হবে তাকে চিঠি লিখে জবাব চাইত এবং ঝটিতি জবা পাওয়ার আশায় নিজের ঠিকানা লেখা একটা খাম আর বিষ মাখানো ডাকটিকিট সঙ্গে দিত।

ধনঞ্জয় মিত্র উইল পালটাবেন শুনেই মাধবচরণকে সরিয়ে দিয়েছিল এইভাবেই—হাতে খানিকটা সময় নেওয়ার মতলবে। তারপরেই একই কায়দায় চিঠি লিখল ধনঞ্জয় মিত্রকে। উইল পালটাবার জন্যে তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং সভার সামনেই সেই চিঠির জবাব দিয়ে বিদায় নিলেন ধরাধাম থেকে।

মারা গেলেন সারদাচরণ একই পন্থায়। তিনি বোধহয় কিছুটা আচ করেছিলেন। অজয় তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল। ওটা অছিলা। উদ্দেশ্য জবাব নেওয়া। 'পঞ্চাশহাজারেও নয়'—লিখে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লেন ভদ্রলোক।

এই হল কৃষ্ণের বৈজ্ঞানিক কুরুক্ষেত্র।

মর্মমূল ধরে ঝাঁকানি দিয়েছে। বলতে গেলে সেদিন থেকেই মনে মনে ছবি তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

এই ছবি, তার চেহারার বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে। ইংগিত আছেনা এখানে পরিচালক, আত্মপ্রকাশের তাড়না বলে একটা কথা আছে, এই তাড়নায় নিজেকে প্রকাশ করতে একান্ত নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্বশীল। তবে বাস্তবের হাড়জিরজিরে ঘোড়া ভাবনার পক্ষীরাজ বলে রূপকথায় চলে বটে, কিন্তু চলচ্চিত্রে চলে না। অতএব ফলেন পরিচিয়তে। কেননা চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি পদক্ষেপে অনিশ্চয়তা। অভাবিত বাধা বিঘ্ন ও বিপত্তি এসে উপস্থিত হয়। গতকালের সুনিশ্চিত স্থির সংকল্পগুলো পরবর্তী দিনে সংশয় কিম্বা সংকটে টলোমলো। চিত্র-নির্মাণের শুরু থেকে শেষ অবধি অনেকগুলি ধারাবাহিক স্তর। একটা অতিক্রম করলেই আরেকটা।

গল্প! পরিচালকের নিজেরই লেখা। কি কি কারণে এই গল্প ছবি করা অত্যন্ত জরুরী মনে হল? ছবি করার জন্য ছবি করা নয়। ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে যে কোন পরিচালকই সামাজিক দায়িত্ব বহন করবেন, এটাই ভাবা দরকার। পরিচালকের চারপাশে যে পৃথিবী, যা তিনি দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ করেন, যা তাঁর অবজারভেশান—সেইভাবে, ঠিক সেইভাবে ভেবেছেন। একালের যুবক যুবতীদের নিয়ে একাধিক ছবি হয়েছে। এই পরিচালক মনে করেন যা হয়েছে তার বেশীর ভাগটাই মিস রিপ্রেজেন্টেড। আজকের যুবসমস্যা, যুগ যন্ত্রণা—বড় বড় কথার আড়াল করে এই ধরনের ছবি করার মাধ্যমে ব্যবসাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যেটা করে না তাই দেখানো হচ্ছে ছবিতে। তারা যেটা ভাবে না তাও দেখানো হচ্ছে ছবিতে। তারা যা বলে না, তাই বলানো হচ্ছে। তারুণ্যের ক্ষোভ ক্লোধ হাহাকার এসব ব্যাপারগুলোর সঙ্গে কজন একাত্ম হয়ে ছবি করেছেন? স্পষ্ট অবজারভেশান অথবা পার্টিসিপেশান ছাড়া এই জটিল এবং বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে কি ছবি করা সম্ভব? অনেকে আবার তারুণ্যের অধঃপতন দেখাতে গিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের ঘটাতেই বেশী উৎসাহী। এটা সত্য ইদানীং কিছু কিছু ছবিতে একালের রাগী ছোকরাদের আমদানী ঘটছে। আসলে এরা হচ্ছে শিল্পের কাঁচামাল। শিল্পী তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাঁচামালকে ব্যবহার করে একালের এমোশনকে যদি ছুঁতে না পারেন তাহলে কি হয়! কিছুই এগোয় না। এগোয় নি এতাবৎ। সত্যটাকে জানতে হবে তার সামগ্রিকতায়। ছুঁতে হবে তার শিকড়, ধরতে হবে প্রতিকটা এলোমেলো হাওয়ার ঝুঁটি। শুধুমাত্র কতকগুলো বকরাজ সংলাপ চরিত্রের মুখে রাখলে জীবনসত্যের অনুগামী হওয়া যায় না। গভীরে যেতে হবে। অনাহার, বেকারী, দারিদ্র্য, ওয়াগন-ভাঙ্গা ছেলে—এই বৈপরিত্য, অসমনীতি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হওয়া দরকার। তা না হলে একালের যুবক যুবতীদের জীবনের জটিল কেন্দ্র অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে।

এ ছবি নির্মাণ করতে আপনাকে কি কোনোভাবে আপোষ করতে হচ্ছে?

না একেবারেই না। আপোষ করলে আর যাই হোক শিল্প হয় না। তাহলে তো আদর্শের শিকড়েও টান পড়ে। এখন পর্যন্ত পড়েনি। অর্থাভাবের জন্য (যেটা নাকি এ ধরনের ছবির ক্ষেত্রে প্রায়ই হয়) শুটিং বন্ধ হয়নি। চলছে।

এই তো কদিন আগে পরিচালক, সদলবলে দীঘায় গিয়েছিলেন বাহির্দৃশ্য গ্রহণ করতে। এই পর্যায়ে একটি গানও পিকচারাইজ করা হয়। ছবির শুটিং অবশিষ্ট আর মাত্র কয়েকদিন।

এ ছবির প্রধান দুই চরিত্রের শিল্পী : শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা : অপর্ণা দেবী, আনন্দ মুখার্জি, পার্থ ব্যানার্জি, জগন্নাথ গুহ, সমীর এবং সোমা দে।

চিত্রগ্রহণ করছেন দীপক দাশ। সম্পাদনা করবেন প্রশান্ত দে। ব্যবস্থাপনায় আছেন—দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালক অজয় দাশ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং আরতি মুখোপাধ্যায়।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

জীবন মরুর প্রান্তে
মরুমায়া - পিনাকী

বিবাহ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

গত ২৪ জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখের সাপ্তাহিক অমৃতে যুবক-যুবতী বিভাগে অমর দাশ মহাশয়ের বিবাহ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনাটি পড়লাম। আলোচনাটি নিঃসন্দেহে মুখরোচক কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। অর্থাৎ গভীরতাহীন। অর্থাৎ আলোচনাটিতে বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থায় সঠিক সমস্যার উল্লেখ ও তার সমাধানের কোন ইঙ্গিত নেই। তবুও সমসাময়িক পটে কিছু প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিক তথ্যপূর্ণ বক্তব্যের অবতারণা করবার প্রয়াসী।

(এক)—বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থা সমাজের প্রতিটি যুবক-যুবতী ও অভিভাবকদের কাছে একটা ভীতিস্বরূপ। এর কারণ পণ প্রথা। বিয়ের রাতে পণ মেটাতে অধিকাংশ (শতকরা ৮০ ভাগ) পরিবারের মেয়ের অভিভাবক ছাড়াও যুবক দাদা ভাই বা যুবতী দিদি বোনকে সর্বস্ব দিতে হয়। (অনেক নিম্নশ্রেণী বা আদিবাসী উপজাতির মধ্যে ছেলের অভিভাবক বা যুবক দাদা ভাই বা যুবতী দিদি বোনকে মেয়ের অভিভাবকদের পণ বা যৌতুক দিতে সর্বস্বান্ত হতে হয়।) অথচ প্রাচীনকালের বাল্য বিবাহ প্রথম বহু বিবাহ প্রথা, সমাজে বিধবার প্রতি অত্যাচার গোষ্ঠীগত চিন্তা ইত্যাদি আজ প্রায় (বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া) অবলুপ্তির পথে। কিন্তু প্রাচীনকালের এই পণ প্রথা আজও বিলুপ্ত না হয়ে সমাজের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে কেন? অনেকেই বলবেন আজকের সমাজে রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মত মহান ব্যক্তির বড়ই অভাব। কিন্তু কথাটি কি সম্পূর্ণ ঠিক—আমার মনে হয় না। একদিন বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে জীবনপণ আন্দোলন চালিয়েছিলেন। বহু মনস্বীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন। অনেকের সমর্থনও যে তিনি পাননি তাও নয়। তবুও তিনি কি বহু বিবাহ প্রথার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটাতে পেরেছিলেন? অবশ্যই এই বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর সরকারী আইন প্রয়োগ করতে হয়েছিল। অথচ আজ এই পণ প্রথার বিরুদ্ধে সরকারী আইন খড়্গ হস্ত হচ্ছে না কেন? জনমত যতই উগ্র হোক জনমত যতই চেতনাসম্পন্ন হোক যতক্ষণ না সরকারী আইনে পণ প্রথা অতীব দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই পণপ্রথামূলক বিবাহ ব্যবস্থা সমাজে অভিশাপ হয়ে বেঁচে থাকবে। শুধু তাই নয় এই পণপ্রথামূলক বিবাহ ব্যবস্থা একদিন সমাজের টুঁটিটকে চেপে ধরবে এবং সেদিন আর কেউ বাঁচার পথ পাবে না। যারা পণ দিতে সক্ষম তারাও নয়। যারা বিবাহের অন্য পথ বেছে নিচ্ছে তারাও দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারবে না। কারণ এই পণপ্রথা উৎকোচ প্রথার মত ছদ্মবেশে সমাজের ভিতটাকে নড়বড়ে করে দেবে।

(দুই)—বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থা সমাজের প্রতিটি যুবক-যুবতী বা অভিভাবকদের কাছে ভীতিস্বরূপ। এর কারণ জাতিভেদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহ প্রথা। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা প্রচার করে আসছেন যে, ব্রাহ্মণ প্রধানত সত্ত্বগুণের অধিকারী, ক্ষত্রিয় রজগুণের অধিকারী এবং বৈশ্য শূদ্র ও অস্পৃশ্যরা (মুচি মেথর ডোম হাড়ি কাওরা ইত্যাদি) তমোগুণের অধিকারী। এই চারিত্রিক বিভেদ ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজজীবনে যে ভ্রান্ত মূল্যবোধের মাপকাঠি সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান কালেও তা যে শুধু বহাল-তবিয়তে বিরাজ করছে তাই নয় এই ভ্রান্ত মূল্যবোধের উপর ভর করে সমাজের কিছু সংখ্যক বিত্তবান ও উঁচু শ্রেণীর মানুষ আজও সমাজের বহু সংখ্যক (অল্প শিক্ষিত অশিক্ষিত ও দরিদ্র) মানুষকে প্রতি পদে শোষিত ও লাঞ্ছিত করছে। আর এই

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে জাতিভেদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহ প্রথা পবিত্রতায় (শাস্ত্রকারদের মতানুযায়ী) নামে আজও অনিবার্য জৈবিক অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলছি—যখন কোন ব্রাহ্মণ পাত্র ও কায়স্থ পাত্রী নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনের সন্ধিক্ষণে আসে, যখন দরিদ্র কায়স্থ পিতা অর্থের প্রয়োজনেই বা মাহিষ্য মেয়ের বিভিন্ন সৎ-গুণে প্রীত হয়ে নিজের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে রাজী হয় তখন তাদের প্রত্যেককেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) সমাজের কাছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে, নিজেদের মনের কাছে, প্রচণ্ডভাবে জবাবদিহি করতে হয়। অথচ এই অন্তঃসারশূন্য জবাবদিহির কোন সংগত কারণ না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহোত্তর কালে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাত্র-পাত্রী বাবা-মার স্নেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। শ্বশুর-শাশুড়ী সমাজে একঘরে হয়ে যায়। অনেক সময় বিবাহের পরেই পাত্র-পাত্রী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অবশ্যই এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক জন-চেতনা ও জন-জাগরণ বিশেষভাবে দরকার। কিন্তু আমরা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই দেখব অধিকাংশ জন-চেতনা ও জন-জাগরণ ক্ষণিকের জন্য। (এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তব্যের সারমর্ম তুলে ধরছি—একদিন সারা দেশে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিল। দেশব্যাপী যুবকেরা প্রতিজ্ঞা করল তারা কোন পণ নেবে না। অবশ্য পরবর্তী ক্ষেত্রে বিয়ের পিঁড়েতে বসে এরাই আবার পণ নিল।) আসলে এর জন্য প্রয়োজন কঠোর সরকারী আইন যা সমাজজীবনে আমূল পরিবর্তন আনতে পারবে।

(তিন)—বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থা সমাজের প্রতিটি যুবক-যুবতী ও অভিভাবকদের কাছে একটা ভীতিস্বরূপ। তার কারণ—আর্থিক স্বাবলম্বনের ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি সরকারী অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার। স্বাধীনতার ছাব্বিশ বৎসর পরেও দেশে আর্থিক ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাবলম্বনের হার তুলনামূলকভাবে খুবই হতাশাজনক। প্রথমেই শহরের কথা তুলে ধরছি। পাশ্চাত্য দেশের শহর অঞ্চলগুলিতে চাকুরী ও অন্যান্য অর্থ উপায়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের ভীড় লক্ষ্য করবার মত, অথচ কলকাতার ক্ষেত্রে তার এক-চতুর্থাংশও চোখে পড়বে না। আমাদের দেশে আজও বহু ইঞ্জিনীয়ারিং ও শ্রমবহুল শিল্পে মেয়েদের অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে। অথচ এই বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোন মানুষই একে বরদাস্ত করবেন বলে মনে হয় না। এবার গ্রামের কথা বলছি। গ্রামে কৃষিক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মজুরী কম। কিন্তু মেয়েরাও পরিশ্রমে যে ছেলেদের তুলনায় কিছুই কমতি নয় এ প্রমাণ প্রতিটি কৃষক পরিবারে, আদিবাসী অঞ্চলে সুন্দরবনে চা-বাগানে, কোলিয়ারীতে মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার সাঁওতাল পল্লীগুলোতে ঘুরলেই বোঝা যায়। তা হলে? —মোদ্দা কথা আজও সমাজে কুসংস্কার কাজ করে যাচ্ছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে শাস্ত্রকারেরা ভাবতেন মেয়েরা শ্রমকাতর, বিলাসী ও পুরুষের ভোগ্যবস্তু। এবং তাঁদের এই ভাবনা আজও সমাজের বুকে (বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া) মহাদাপটের সঙ্গে বজায় রয়েছে। ফলস্বরূপ মধ্যযুগীয় এই ভ্রান্ত ধারণার শিকার হচ্ছে বর্তমান যুগের অগণিত যুবতী মেয়েরা ও তাদের অভিভাবকেরা। যে কোন বাস্তবনির্ভর চিন্তাবিদ ব্যক্তি দ্বিধাহীনভাবেই বলবেন—বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থার দোষগুলো (পণ প্রথা জাতিভেদ প্রথা) মেয়েদের আর্থিক স্বাবলম্বনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং সরকার এবং সমাজের উচিত এই মুহূর্তেই আর্থিক স্বাবলম্বনের ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া। এবং তাহলেই

রং নাম্বার ঃ নন্দিতা বসু - পদ্মা দেবী

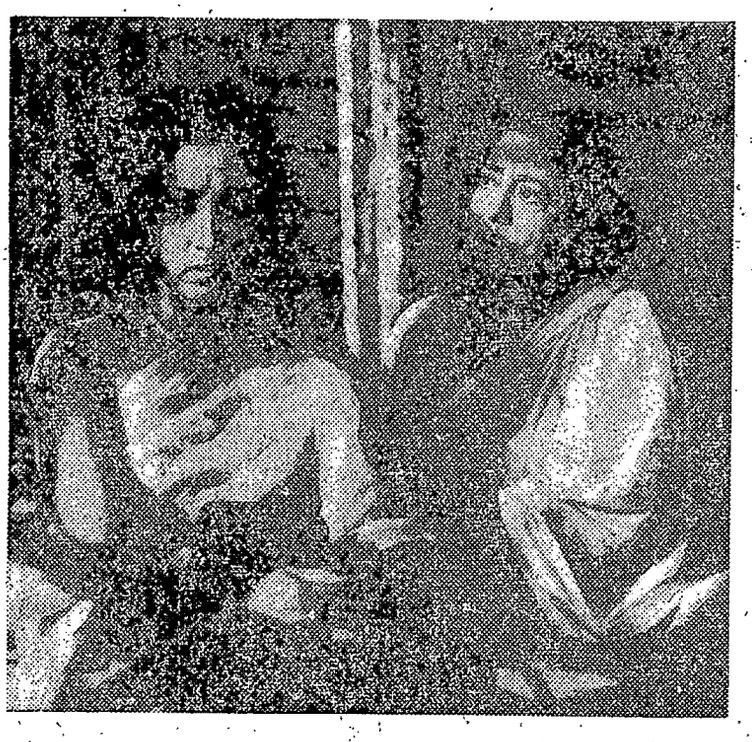

স্টুডিও সংবাদ

অনেক দিন পর প্রবীণ চিত্র পরিচালক চিত্ত বসু নতুন ছবি শুরু করেছেন। গত মাসে যশিডিতে বহির্দৃশ্য গ্রহণের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী আউটডোর শুটিং শেষ করে শ্রীবসু গত সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু করেছেন। মণি বর্মার কাহিনী ও চিত্রনাট্যে ছবি—গুমটি ঘর। ঐ-ছবির কেন্দ্রচরিত্র দশ-বারো বছরের একটি ছেলে। রাজু ওর নাম, চরিত্রের নাম রতেশ্বর। ওর বাবা ও মা-র ভূমিকায় রূপদান করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। দুটি বিশেষ চরিত্রে আছেন দিলীপ রায় ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। রাজু-র বিপরীতে আছে এক নবাগতা। ইকনমিক প্রোডাকশনের পতাকাতলে নির্মীয়মান এ-ছবির আলোকচিত্রশিল্পী বিভূতি চক্রবর্তী। শিল্পনির্দেশক ঃ সুনীল সরকার। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে দুখানি গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে।

পরন্তী ঃ সৌমিত্র - বাসবী

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সাহায্যে কয়েকজন পরিচালক ছবি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। যেমন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। 'কৃষ্ণপক্ষ' নামে উনি একটি ছবির কাজ শুরু করেছিলেন। কয়েকদিন শুটিং হয় এবং কয়েকখানি গানও রেকর্ড করা হয়। অর্থাভাবের জন্যই ছবিটি এতদিন বন্ধ ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেড় লক্ষ টাকা ঋণদান করেছেন। এর সাহায্যে শ্রীচৌধুরী অনতিবিলম্বে ছবির কাজ রিজিউম করতে চান। সম্প্রতি সাক্ষাৎ হলে তিনি স্বয়ং এই কথা জানান। আরো জানান, কাস্টিং-এর বিশেষ কিছু অদল-বদল হচ্ছে না। অর্থাৎ অপর্ণা সেন নায়িকা। নায়ক ঃ অর্জুন মুখোপাধ্যায়। একটি বিশিষ্ট নারী চরিত্র রূপায়িত করবেন দেবিকা মুখোপাধ্যায়। চিত্রশিল্পী ঃ কৃষ্ণ চক্রবর্তী। শিল্পনির্দেশক ঃ গৌর পোদ্দার। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন পরিচালক নিজেই। প্লে-ব্যাক করেছেন ঃ মান্না দে, আরতি এবং বনশ্রী।

আরেকজন তরুণ পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেড় লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যে একটি ছবি করবেন মনস্থ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতিমা'র চিত্ররূপ হবে। প্রস্তুতি চলছে অনেকদিন আগে থেকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই চিত্রনাট্য রচনার কাজ শেষ। মার্চ মাসের প্রথম দিকে শুটিং শুরু হতে পারে। জানালেন পরিচালক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। এখন পর্যন্ত যা স্থির আছে তা যদি হয় তাহলে এ ছবির মুখ্য ভূমিকায় রূপ দেবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মহুয়া রায়চৌধুরী। পার্শ্ব চরিত্রে উৎপল দত্ত, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী এবং আরো কয়েকজন নামী শিল্পীর অংশ গ্রহণ করার সম্ভাবনা আছে। চিত্রগ্রহণ করবেন দীপক দাশ। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'বারবধূ' ছবির শুটিং শেষ হয়ে এসেছে। সুবোধ ঘোষ রচিত বিতর্কিত রচনা চিত্রে রূপায়িত করছেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরিচালক শ্রীবসু। প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করছেন 'গরম হাওয়া' খ্যাত নায়িকা গীতা। নায়ক ঃ সমিত ভঞ্জ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন ঃ রবি ঘোষ, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা চক্রবর্তী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, সাধনা রায়চৌধুরী এবং সোমা দে। চিত্রগ্রাহক ঃ শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন ঃ আনন্দশংকর। প্রাসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই ছবিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন প্রযোজক অরুণ রায়চৌধুরী 'রাজা' ছবির জন্য। ছবির শুটিং শেষ। প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে স্বরচিত চিত্রনাট্যে ছবিখানি পরিচালনা করছেন তপন সিংহ। চিত্রগ্রহণ করেছেন ঃ বিমল মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনা করছেন ঃ সুবোধ রায়।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

দেখা যাবে—কালো মেয়ের বিয়ের জন্য অভিভাবককে বা তার যুবক দাদা, ভাই বা তার যুবতী দিদি বোনকে ভাবতে হবে না। অথবা ফর্সা মেয়েকে নিয়েও পাত্রপক্ষে আগ্রহ থাকবে কম। তখন থাকবে দক্ষতা বা সৎ-গুণের চাহিদা।

কল্লোল সরকার,
সম্পাদক, ঝংকার,
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

যুবক-যুবতী
লেখকের উত্তর

'অমৃতে' প্রকাশিত যুবক-যুবতী ফিচারের বিভিন্ন আলোচনার ওপর বিভিন্ন পাঠকের নানা মতামত চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। অমৃত যে দিন দিন পাঠকমহলে সমাদৃত হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট প্রতিফলন এই চিঠিপত্রগুলো। বিশেষ করে 'যুবক-যুবতী' ফিচার আপনাদের ভাল লেগেছে এবং ভাল লাগছে জানতে পেরে আনন্দিত হয়েছি। সচেতন পাঠক বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেন এজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এবার পাঠকদের দু' একটা চিঠিপত্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। 'ঝংকার' সম্পাদক মাননীয় কল্লোল সরকার মহাশয় আমার 'নেশা ও মাদকতা' আলোচনা প্রসঙ্গে দু একটি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কাছে কলকাতার অবসরবিনোদনের জায়গাগুলোর সঙ্গে 'কৃষ্ণসাগরের বালুকাবেলার' তুলনা অর্থহীন মনে হয়েছে। স্বাভাবিক কথা। তবে এ তুলনা আবার অনেকের কাছে ভালোও লেগেছে। এসব জায়গায় স্বেচ্ছায় হৃদয় অভিসারের কিছু সুযোগ আছে বৈকি? বাঁধভাঙ্গা হাজার হাজার তরুণ এই কল্পিত সাগরের বুকে সত্যি আছড়ে পড়ে না তবে যারা পড়ে তারা আমাদের সমগোত্রীয় তরুণ-তরুণী। দ্বিতীয় প্রশ্নে তিনি অনিল হাজরা, অধ্যাপক শ্রীমজুমদার প্রভৃতির প্রতি দোষারোপ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিমী সভ্যতায় নেশা ও মাদকতার কুফলের উদাহরণ দিয়েছেন। এসব তো সবার জানা, তাহলেও এসব ঘটছে। সাট্টা, জুয়া, মদ গাঁজা, প্রেমের বিকৃতি, যৌন উপভোগ চলছে না কি? তারা তো আমাদেরই সমাজের এক অংশ। তৃতীয় প্রশ্নে তিনি ডাঃ সাহার বক্তব্যে অসত্য সন্ধান করেছেন। সাধারণ ঘরের ছেলেরাও আজ নেশা ও মাদকতার বলি, এতে এতটুকু মিথ্যা নেই। পাড়ায় রাস্তাঘাটে চোখ খুললেই দেখা যায়, তবে কমবেশী এই যা। চতুর্থ প্রশ্নে 'কিশলয়কে' হিন্দী ফিল্মের নায়ক মনে হলেও কিছু করার নেই এটা বাস্তবিক সত্য। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিটিও উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাছে নেশাসক্ত যুবক-যুবতীর সংখ্যা নগণ্য মনে হয়েছে। ভাত-রুটির সমস্যা আমাদের মৌলিক সমস্যা কিন্তু গরীব স্কুলের ছেলেকে যখন সাট্টায় জুয়ার জগতে দেখি, রিক্সাচালককে গাঁজা খেতে দেখি তখন অন্য কথা মনে পড়ে যায়। নেশা ও মাদকপ্রবণতার পেছনে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক বিবিধ কারণ লুকিয়ে আছে। সবদিক থেকে একসঙ্গে না এগোলে এসব প্রবণতা বাড়বে ছাড়া কমবে না। 'বাংলা নাটক ও সাহিত্য' আলোচনা প্রসঙ্গে কার্তিক ঘোষ মহাশয় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন আমি সব আলোচনাতেই 'সেকস' এর প্রসঙ্গ আনি। প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে সাহিত্যে চলচ্চিত্রে নাটকে পোশাকে-আষাকে সেকস প্রবণতা বাড়ছে। এসব নিয়ে যুবক-যুবতীদের চিন্তাধারার প্রকাশ আমার মনে হয় যথার্থ এবং সময়োপযোগী। কিন্তু সেকস নিয়ে বাড়াবাড়ি কখনোই করিনি। জনৈক পত্রলেখক আমার সাক্ষাৎকারের গণ্ডীটাকে নদীয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চৌহদ্দি ছড়িয়ে আরো বিস্তৃত করতে বলেছেন। আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক আছি এবং অদূর ভবিষ্যতে হুগলী মেদিনীপুর, বীরভূম, হাওড়া প্রভৃতি জেলার যুবক-যুবতীদের সাক্ষাৎকার আপনাদের উপহার দিতে পারব বলে আশা রাখি। উপসংহারে মাননীয় অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য (বিরাটি) মহাশয়ের চিঠির আলোচনায় আসছি। তিনি 'ক্রিকেট' প্রসঙ্গে শ্লেষাত্মক চিঠি লিখেছেন। অনেক সময় অর্থের অপচয়—কত কি না জড়িয়ে আছে ক্রিকেটের সঙ্গে। ক্রিকেট বড়লোকের খেলা—গরীব দেশে এসব মানায় না। কিন্তু আমাদের দেশের তরুণদের ক্রিকেট প্রীতি যেভাবে গড়ে উঠেছে সেখানে এভাবে এটাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাহলে বিকল্প চিন্তা করে তাদের অন্যান্য সুযোগ বাড়িয়ে দিতে হবে। আপামর যুবক-যুবতীদের মনের কথা প্রকাশ করে যুবচেতনার উপলব্ধিতে যদি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারি এবং আমার প্রয়াস যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। আমার অপূর্ণতা অজ্ঞানতা আপনাদের গঠনমূলক আলোচনায় প্রকাশিত হয়ে প্রকৃষ্ট যুবমানস গড়ে উঠবে এটাই একান্ত কাম্য।

অমর দাশ,
কলকাতা।

পণ-প্রথা

অমৃতের 'যুবক-যুবতী' ফিচারে সম্প্রতি বিবাহ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত শ্রীদাসের সাক্ষাৎকারটি পড়ে আমার নিজস্ব কিছু বক্তব্য চিঠি-পত্র বিভাগে প্রকাশের জন্য উপস্থাপিত করছি।

শ্রীদাসের জনৈক বন্ধু (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) পণপ্রথা পুরুষের রিওয়ার্ড হিসাবে অধিকারগত প্রাপ্য বলে দাবী জানিয়েছেন। ভদ্রলোকের এই রিওয়ার্ড প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বিংশ শতাব্দীতে কাওয়ার্ডের মতই কাঙালপনা বলে মনে হয়। যে পিতামাতা একটি ছেলেকে তৈরী করতে পঞ্চাশ হাজার টাকা (আনুমানিক) খরচ করেছেন তাঁরা ছেলের বিয়েতে পঞ্চাশ হাজার টাকার যৌতুক দাবী করবেন এবং ছেলের রোজগার আমৃত্যু ভোগ করবেন? কিন্তু যে পিতামাতা একটি মেয়েকে জীবনে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পঞ্চাশ হাজার টাকা (আনুমানিক) খরচা করেছেন, সেই কন্যাপক্ষের দাবী কি হবে? শ্রীদাসের বন্ধুর মতে যৌতুক ছেলের প্রাপ্য। তবে মেয়ের প্রাপ্য কি? হয়তো সেই মেয়েটি বিবাহিতা জীবনেরও তার লব্ধ শিক্ষার বিনিময়ে অর্থোপার্জন করে স্বামীকে জীবনযাপনে আরও সচ্ছলতা এনে দিতে পারবে। অপরপক্ষে মেয়ের বাবা শুধু মেয়েকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যই খরচা করবেন। মেয়ের বিয়েতে জামাইকে রিওয়ার্ড দিতে ফকির হবেন। অথচ মেয়ের উপার্জনের হকদার হওয়ার কোন অধিকারই থাকবে না তাঁর। তবে কোন স্বামীদেবতার দয়া-দাক্ষিণ্য থাকলে মেয়ে হয়তো বড়জোর কিছু মুষ্টি-ভিক্ষা দিতে পারে। এইটুকুই কি পুরুষের শেষ কর্তব্য নাকি উদারতার পরম পরিচয়! উক্ত ভদ্রলোকের আরেকটি চমকপ্রদ মতামত, এই 'রিওয়ার্ডের' টাকা ছিনিয়ে নিতে পারলেই নাকি দেশের ধনবৈষম্য দূর হবে! হয়তো তাই। গরীব কন্যার পিতাকে ভিখিরী বানিয়েই তো দেশের ধনবৈষম্য দূর হতে পারবে। কেননা পণপ্রথা ধনীর ক্ষেত্রে বিলাস বা রিওয়ার্ড হলেও মধ্যবিত্ত সংসারে জুলুমেরই নামান্তর মাত্র। তবে আমি এমন কথা বলতে চাই না যে, সব পুরুষই শ্রীদাসের সেই বন্ধুটির মতাদর্শী। বহু ব্যতিক্রম না হলে বরং বলতে পারি আজকের যুগে ঐ ভদ্রলোকের মত চিন্তাধারা ক্রমশই পুরুষ সমাজে অবলুপ্ত হচ্ছে। এটা নারীজাতির পক্ষে আশার কথা।

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম----১৪'০০
২। গুল বাগিচা----৩'৫০, ৩। কাব্য আমপারা--৪'০০
৪। পুবের হাওয়া----২'০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি--২'০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

কলকাতার মতো বম্বেতেও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ পালিত হল। একটি মাত্র হলে এই প্রদর্শনসূচী নির্দিষ্ট ছিল—রিগ্যাল। দিল্লীতে ভারতের পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে ছবিগুলি এসেছে তার থেকে বাছাই করা সাতটি ছবি এখানে পাঠানো হয়। এই সপ্তাহের আয়োজন করেন ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন। তেমনভাবে প্রচার করাও হয়নি। বলতে গেলে হঠাৎই এই সপ্তাহ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কি করে চিত্ররসিকদের কানে পৌঁছে যায় যে ছবিগুলি দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে অন্ততঃ দুটি ছবি সংঘাতিক। কিভাবে সাংঘাতিক? সাংঘাতিক সব নগ্ন দৃশ্য আছে। একটি ছবির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে রটে যায়। ছবিটির নাম 'দ্য মার্ডার অফ ফেড হ্যাম্পটন'। এই ছবি নাকি সেকস আর ভায়োলেন্স-এ ভরা। ব্যাস অমনি অ্যাডভান্স বুকিং ফুল হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ছবি দেখানোর দিন এসে গেল। সেই দিনটি দর্শকদের কাছে 'এপ্রিল ফুল'-এর সামিল হল। আসলে ছবিটি ব্ল্যাক প্যানথারের বিপ্লবের ভিত্তিতে—অনেকটা দলিলচিত্র। প্রথম প্রদর্শনীর বিরতি হতে দর্শকরা বুঝলেন এ আর কিছু নয় এপ্রিল ফুল করা হয়েছে। ভীষণভাবে ঠকানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান শুরু হয়ে গেল। এই ছবি তাঁরা দেখতে চান না, অন্য কোন ছবি দেখানো হোক অথবা টিকিটের পয়সা ফেরত দেওয়া হোক। একদল দর্শক ম্যানেজারকে খুঁজে বার করলেন এবং প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন। —আমি চেষ্টা করছি। নিরীহ ম্যানেজার অনেক কষ্টে ফিল্ম ফিনান্স কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানালেন। বিষয় শুনে তো কর্তাব্যক্তিদের আক্কেল গুড়ুম। এ কি হল দেশের হাল। যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম উইক—ন্যুড সিন দেখাতে হবে। দর্শকরা ছাড়বেন না। ম্যানেজার তাঁর অক্ষমতার কথা জানালেন। তখন পরিস্থিতি তুঙ্গে। বিরতি শেষ হবার ঘন্টা

চুপকে চুপকে : ধর্মেন্দ্র - শর্মিলা ঠাকুর

পড়ল। প্রদর্শনী পুনরারম্ভ হতে যাবে শুরু হয়ে গেল চেয়ার ভাঙ্গা। শোকেস ভাঙ্গা। কেন? আমাদের সেরকম ছবি দেখাতে হবে যাতে সেকস আর ভায়োলেন্স-এর মশলা আছে। দর্শকদের মানসিকতার প্রশংসা না করে পারা যায় না—কি বলেন? পয়সা দিয়ে যখন তাঁরা ছবি দেখছেন তখন সব চাই। দেখাতেই হবে। না হলে ফিল্ম উইক-টুইক সব লাটে তুলে দেওয়া হবে। ভীত সন্ত্রস্ত ম্যানেজার পরবর্তী তিনটি প্রদর্শনী বাতিল করে দিলেন। তারপর ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কর্তাব্যক্তিরা ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করলেন। কি তদন্ত করলেন? দর্শকদের মানসিকতা? হয়তো তাই। তা না হলে ছবি বদল করে দেওয়া হল কেন? তিনটি ছবি বদল করে দেওয়া হল। নতুন একটি ছবি দেখানো হল 'ওয়ারনিং মেল সেকস ইন ডেঞ্জার'। এই ছবিতে সেকস আর ভায়োলেন্স-এর মশলা যা ছিল তা দেখে দর্শকরা পরিতৃপ্ত। ছবি দেখে বেরুবার সময় উদ্যোক্তাদের ধন্য ধন্য করেছেন। পারলে ম্যানেজারের পায়ের ধুলো নিয়ে নিতেন। ম্যানেজার তখন ঘটনাস্থলে নেই। তাঁর বোধ করি ধারণা হয়েছিল এতেও যদি দর্শকরা সন্তুষ্ট না হন। তাই তিনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন। প্রথম প্রদর্শনী শেষ হবার পর তিনি বীরবিক্রমে তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছেন। এবং কদিন পরে হাসিহাসি মুখে কথা বলেছেন।

'আমীর গরীব' ছবির অসামান্য সাফল্যের পর প্রযোজক-পরিচালক মোহনকুমার নতুন ছবির পরিকল্পনা করেছেন। ছবির নাম এখনও স্থির না হলেও ভূমিকালিপি সম্পূর্ণ হয়েছে। এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন অশোককুমার, শশীকাপুর, হেমা মালিনী, প্রেমনাথ এবং আসরাণী। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

হেমা মালিনী-শশী কাপুরকে নিয়ে একটি হিন্দি ছবি হতে চলেছে, নামকরা হয়েছে ইংরেজী ভাষায় 'নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক'। নিউইয়র্কেই গোটা ছবির শুটিং। একটি হিন্দি ছবি হতে চলেছে, নাম করা নায়িকার পুত্র মীনা চিহ্নশীশ এ-ছবি প্রযোজনা এবং পরিচালনা করছেন। এ ছবিরও সঙ্গীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন

এইসঙ্গে আমি সমগ্র নারীজাতিকে নিজেদের মর্যাদা, অধিকার ও স্থান সম্পর্কে আরও সচেতন হতে অনুরোধ জানাব। কেননা লিব-আন্দোলন নিয়ে আমরা যতই মাথা ঘামাই না কেন তাতে আমাদের সচেতন আন্তরিকতার এখনও যথেষ্ট অভাব আছে। কন্যাপক্ষ উপযুক্ত পণ দিতে না পারায় বিয়ের পিঁড়ি থেকে পাত্রকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অজস্র ঘটনা শোনা যায়। এমন কি এই বিংশ শতাব্দীতেও পাত্রপক্ষের দাবী মেটাতে না পেরে বহু কন্যার পিতাকে হতাশা আর অসহায়তার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়—এমন ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু এই প্রথার সোচ্চার প্রতিবাদ কেন মেয়েদের তরফ থেকেই আসে না? পণপ্রথার প্রতিবাদ জানিয়ে কোন মেয়েই কি কখনও বিয়ের আসর থেকে বেরিয়ে গেছে? এত সভ্য শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিপরায়ণ হয়ে আজও কি আমরা এইটুকু প্রতিবাদ জানাবার মতো উপযুক্ত হই নি? বিয়েই কি নারীজীবনের একমাত্র সার্থকতা? যেখানে যৌতুকের নিক্তিতে মেয়ের মূল্য নির্ধারিত হয়, সেই বেচাকেনার বিয়ে কি সত্যকারের মাধুর্য নিয়ে মানুষের জীবনে আসতে পারে? শ্রীদাস এক জায়গায় বলেছেন 'কালো মেয়ের বিয়ে হওয়া সত্যিই কঠিন এক সমস্যা।' এই একটিমাত্র উক্তি নারীজাতির সমস্ত ব্যর্থতা ও গ্লানিকে যেন ভীষণ নগ্নভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। যে যুগের মেয়েরাও বৈজ্ঞানিক উন্নতির চরম শিখরে সেই যুগেই এ কি নিদারুণ মানসিক অসহায়তা! বিশ্বের চরম অবহেলিত নারী সংখ্যা সম্ভবত ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশী। এজন্য দায়ী আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন সামাজিক প্রথানিষেধ, এইসব অনুন্নত পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে আমাদের নিজেদেরই মানসিক অধোগতি ঘটছে। সুবিধাবাদী সমাজপতিদের স্বার্থান্ধতার চরিতার্থতা হেতু যে সামাজিক বিধি-নিষেধ এতকাল নারীসমাজকে পায়ের নীচ দাবিয়ে রাখতে সহযোগিতা করে এসেছে, আজ নারীসমাজ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হয়ে তাকে অনেকাংশেই সমাজের বুক থেকে উপড়ে ফেলতে পেরেছে। কিন্তু যতদিন নারীজাতি নিজের উদ্দেশ্য স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হতে না পারবে, ততদিন এই পণপ্রথা কালো মেয়ের বিবাহ-সমস্যা বয়স্থা মেয়ে নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা ইত্যাদির অবসান হবে না।

লিব-আন্দোলন কথাটা শুনতে বেশ গালভরা। কিন্তু একে সার্থকভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে আমাদের লিব-ফ্যাশান মুক্ত হয়ে মানসিক দিক দিয়ে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে তৈরী করে নিয়ে সামাজিক অধিকার আদায় করতে হবে। তাই বলে এই নয় যে, সামাজিক অধিকার পেতে হলে স্বেচ্ছাচারিতার জুলুম চালাতে হবে। ক্ষেত্র এমনভাবে তৈরী করতে হবে যে আমাদের নিজেদের প্রাপ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসে পড়বে। নারী-স্বাধীনতা বলতে পুরুষকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলা নয়। পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদায় তালে তাল ফেলে চলতে পারা। পুরুষ ও নারী পরস্পরের পরিপূরক হিসাবেই পরস্পরকে এগিয়ে চলতে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। একে অপরকে টেক্কা দিয়ে বা দাবিয়ে রেখে এগিয়ে যেতে পারা সম্ভব নয়।

—এলা রায়,
ভেহিকেল এস্টেট
জব্বলপুর।

একটি পত্রিকা প্রসঙ্গে

কদিন আগে দোকান থেকে কয়েকটা বই কিনেছি। একটা বই সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে। নাম ঃ 'চলচ্চিত্র'। পত্রিকা হিসেবে বেরিয়েছিল ১৩৫৭ সালের আশ্বিন মাসে। (সেপ্টেম্বর-অকটোবর ১৯৫০)। শিল্পী গুণী দর্শক চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী সকলেই সামাজিক ও শিল্পিক শক্তি হিসাবে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব আর তার সম্ভাবনার প্রতি অবহিত করে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির পথ সুগম করাই সম্পাদকমণ্ডলীর অভিপ্রায় ছিল। সকলেই জানি, এদেশে যথার্থ চলচ্চিত্র আলোচনা ও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সূচনা করেন সত্যজিৎ রায় আর চিদানন্দ দাশগুপ্ত ১৯৪৭ সালের ৫ অকটোবর কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ঠিক তিন বছর বাদে তাঁরা এই পরিচ্ছন্ন মনোগ্রাহী সিরিয়াস অথচ সরস পত্রিকাটি বের করেন। পূর্বোক্ত দুজন ছাড়া সম্পাদকমণ্ডলীর আরো চারজন সদস্য ছিলেন ঃ কমল মজুমদার, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, সুভাষ সেন, নরেশ গুহ। ঘোষণা ছিল, চলচ্চিত্র পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হবে। আমি যতদূর জানি, আর বেরোয় নি (কেউ নির্ভুল তথ্য জানালে বাধিত হবো)। কারণটা সহজেই অনুমেয়। একটা সংখ্যা বিক্রি করতেই যদি পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় লাগে তাহলে কোন্ ভরসায় নিয়মিত প্রকাশ সম্ভব?

পঁচিশ বছরে সিনেমা সম্পর্কে শিক্ষিত লোকের মানসিকতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কলকাতায় এখন ফিল্ম সোসাইটির সংখ্যা তেরো চোদ্দটা। সবগুলোরই নিয়মিত বা অনিয়মিত পত্রিকা আছে। এছাড়া সিনেমা সম্পর্কিত হালকা ও সিরিয়াস নানান কাগজ রয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রর মতো সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা আর চোখে পড়ছে না কেন? এরকম উঁচুমানের পত্রিকাকে পঁচিশ বছর আগের পাঠকরা তাচ্ছিল্য করেছিলেন সিনেমা সম্পর্কে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা রুচি আর দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে। পঁচিশ বছরে চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষিত লোকের মানসিকতার যে পরিবর্তন হয়েছে, চলচ্চিত্র আলোচনার মান ও পরিমাণ ক্রমশ যেরকম বাড়ছে, তার মূলে এই পত্রিকার অবদান যথেষ্ট। প্রথম সংখ্যাই শেষ সংখ্যা হলেও এজন্যেই বোধহয় চলচ্চিত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল।

চলচ্চিত্র পত্রিকাটিকে আমাদের দেশের সিরিয়াস ফিল্ম ম্যাগাজিনের প্রথম ও সার্থক রূপ হিসাবে চিহ্নিত করা অসঙ্গত হবে কি?

রমাপ্রসাদ দত্ত
কলকাতা-৩৫

যুবক - যুবতী

অমৃত সাপ্তাহিকে প্রকাশিত যুবক-যুবতী বিভাগটি সত্যই খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই বিভাগে প্রকাশিত বিভিন্ন তরুণ যুবক-যুবতীদের অভাব, ভাবনা চিন্তা সম্পর্কে আমরা আপনাদের সংবাদ ভাষ্যকার মারফৎ জানতে পারি। এই ব্যাপারে নূতন করে বলার কিছু নেই।

কিন্তু আমার বক্তব্য এইসব সাক্ষাৎকারী যুবক-যুবতীদের অধিকাংশই হয় কোলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের। কিন্তু কোলকাতার বাইরে সুদূর গ্রামেও যে বহু যুবক-যুবতী আছে, তাদেরও নিজস্ব অনেক ভাবনা, চিন্তা এবং অভাব রয়েছে।

যদি অনুগ্রহ করে সুদূর পল্লী যুবকদের তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন তবে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হই এবং আপনাদের পত্রিকার গৌরবও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। নতুবা পল্লী অঞ্চলের পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হয়।

রাজমোহন দত্ত,
মসলন্দপুর, ২৪ প

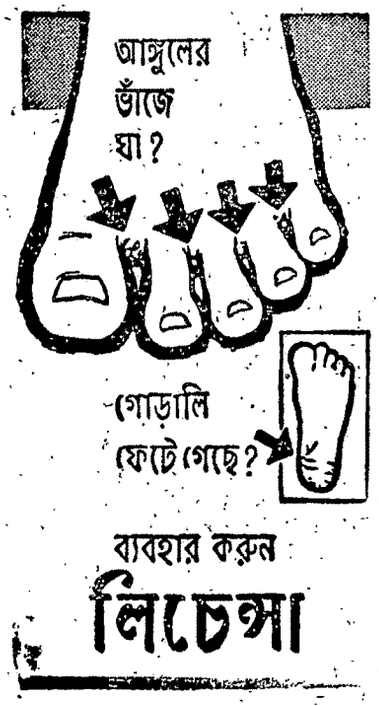

লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল জুটি। ছবিটি তৈরী হতে চলেছে আর্টস্কোপ ইন্টারন্যাশনালের ব্যানারে।

সুনীল দত্ত এবং প্রেমনাথ—দুজনেই মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামী মুক্তানন্দের টেলিগ্রামের প্রতি এই নির্দেশে নাকি এসেছে। স্বামী বলেছেন, ভাল করে কাজ কর, মদ খাওয়া ছেড়ে দাও তাহলে দেখবে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে। সুনীল এই নির্দেশ পেয়েছিলেন আগে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বামীর নির্দেশ মেনে চলতে শুরু করেন। পরপর ছবি হিট হয়। সুনীল আবার তাঁর ফর্মে ফিরে আসেন। এখনও স্বামীর নির্দেশ আছে—মদ খেও না। সুনীল তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন বলে ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে এই বিশ্বাসে প্রেমনাথ মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা পরপর কয়েকটা ছবি ফ্লপ করেছে প্রেমের। ভাগ্যের চাকা যাতে ঘুরে যায় তার জন্য সুচেন্ট প্রেম মদ ছাড়া এক একটি বিনিদ্র রাত যাপন করছেন।

—অভিজিত

দো ঠাগ
হেমা মালিনী - শত্রুঘ্ন সিনহা

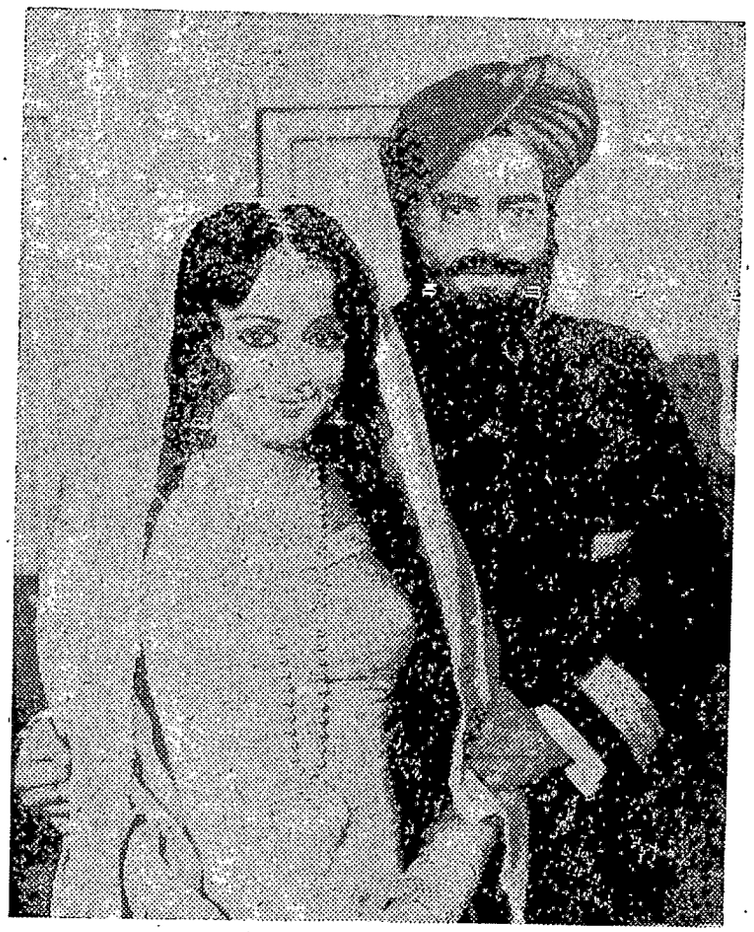

নাটমঞ্চ

চারণদল-এর 'এই দশকের অভিমন্যু'

দ্রৌপদী সীতা ও জয়া ভাদুড়ী

আজকাল নাটকের আঙ্গিক নিয়ে যত না পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় তার চেয়ে বেশী হয় নাটকের বক্তব্য নিয়ে।

তাই আজ আর নাটক দেখতে যাওয়া শুধুমাত্র নাটকীয় কেরামতি বা আঙ্গিক দেখার জন্যই না নতুন কিছু ভাবনা অনুধাবনেরও অবকাশ রয়ে যায় তাতে।

তবে এটা যে সব ক্ষেত্রেই সত্য তা অবশ্যই নয়। এই সমাজ সচেতনতার পাশাপাশি অবসর বিনোদনের নাটকও হয় বৈকি। তবে সে আর এক জগত। সেসব নাটকে তাৎক্ষণিক আনন্দের ব্যবস্থাই থাকে, তার বেশী কিছু নয়।

কিন্তু বলতে বাধা নেই, তাদের অস্তিত্ব ক্রমশই যেন মুছে আসছে মঞ্চ থেকে।

বলা যায়, প্রগতিশীল নাট্য গোষ্ঠী এবং তাদের পরিবেশিত নাটকই আজকাল পাদপ্রদীপ আলো করে তুলছে ক্রমশ। এবং এই নাটকের প্রতি সচেতন দর্শকদের দৃষ্টি ইদানিং খুবই বেশী। ক্ষেত্র বিশেষের কথা বাদ দিলে, এটা নাট্যজগতের পক্ষে শুভ সূচনা সন্দেহ নেই।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার এক বন্ধুর ডাক নাম বিন্দু। এখনো সে বেঁচে বর্তে আছে কলকাতায়। পণ্ডিচেরি আশ্রমে সে মাঝে মাঝে আসতে ও গুরুদেবের জন্যে একটি দুটি তরকারি রাঁধত। একদিন সে আলুর ঝোল—স্টু—এবং পরমান্ন রেঁধে পাঠায়। পাত্র দুটি ফিরে আসে। গুরুদেব অল্পই গ্রহণ করেছিলেন। বিন্দু তাঁকে লেখে ঃ

> "Nalina brought me back the dishes. I was stunned to find that you had hardly touched them. I am deeply pained, sorely disappointed, utterly dejected and cannot imagine why you are so unsympathetic to me".

(নলিনা আমাকে পাত্রগুলি ফিরিয়ে দিল। আমি মর্মাহত হয়েছি—আপনি প্রায় কিছুই খান নি। কেন আপনি এমন বেদরদী হলেন আমি ভেবে পাই না।)

গুরুদেব উত্তরে তাকে লিখলেন ঃ 'তোমার প্রতি আমাদের দরদ নিবিড় ও নিখুঁৎ কিন্তু তাকে মাপা চলে না তোমার রান্নার প্রতি আমাদের দরদ দিয়ে। তোমার পরমান্ন খেয়ে মনে পড়ল প্রেমিকের সম্বোধন প্রেমিকাকে ঃ 'মরি মরি! কী মিষ্টি—কী মিষ্টি—কী মিষ্টি!' তোমার আলুর ঝোলও অসামান্য, যদিও অন্য স্বাদের। প্রথম চামচ আমি মুখে দিলাম সোদ্বেগে দ্বিতীয় চামচ ভয়ে ভয়ে। তারপরে এ-অজানা রাজ্যে আর বেশি এগুতে ভরসা পেলাম না।'

এ-হেন মহাপাচক বিন্দু একদিন আমাকে চ্যালেঞ্জ করল রাঁধতে। বলল ঃ 'কবিতা! ফুঃ! যদি রাঁধতে পারতে গুরুদেবের জন্যে তবে বুঝতাম।' আমি রুখে উঠে বললাম ঃ 'আমিও পারি রাঁধতে। ফুঃ। খুব সোজা।' ও বলল ঃ 'আচ্ছা রাঁধো দেখি।' আমি বললাম ঃ 'নিশ্চয় রাঁধব।' ও বলল ঃ 'কিন্তু একলা রাঁধতে হবে—আর কাউকে যদি হাত লাগাতে দাও—' আমি বললাম ঃ 'না দেব না। একাই রাঁধব।'

কিন্তু তারপর ভয়ে সারা। হাসি-মস্করায় যা খুশি বলা চলে—কিন্তু গুরুদেবকে তো আর যা তা রান্না রেঁধে পাঠানো চলে না। অথচ কথা দিয়েছি—একাই রাঁধব। কী করি! হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল ঃ শরণ নিলাম এক রন্ধননিপুণা সাধিকার, নাম অমিয়া। তাকে বললাম ঃ 'তুমি সামনে বসে আমাকে নির্দেশ দাও কী কী করতে হবে—কিসের পরে কী মশলা...ইত্যাদি।' সে হেসে রাজী হয়ে আমাকে বলতে থাকে আর আমিও আদিষ্টবৎ রেঁধে চলি এক স্টোভের উপর কড়া চাপিয়ে। ...প্রায় আধঘণ্টা পরে টোমাটো মটরসুটি, পেঁয়াজ আলু...ইত্যাদি দিয়ে যথাবিধি গব্যঘৃত ঢেলে রেঁধে পাঠালাম গুরুদেবকে—চিঠিতে লিখে যে আমি একাই রেঁধেছি—কেবল অমিয়া ফিশফিশ করে নির্দেশ দিয়েছিল (whispers) পরদিন গুরুদেব লিখলেন ঃ

> "Your cooking is remarkable and wonderful; If you had not disclosed the secret about Amiya's 'whispers' I would have been inclined to claim it as a Yogic miracle. Even with the 'whispers' it is an astonishing first success! Ashcharyavat Pashyati Kashchip Enam, as the Gita says".

(দিলীপ তোমার রান্না আশ্চর্য অপূর্ব! তুমি যদি অমিয়ার ফিশফিশ করে-বলা নির্দেশের গুহ্য কথাটা উহ্য রাখতে তাহলে আমি একে যৌগিক অঘটন বলে জাহির করতাম।.. গীতার কথা মনে পড়ে ঃ কেউ কেউ একে দেখে বলে—আশ্চর্য!)

•

কখনো কখনো আমি টেলিগ্রামের ছন্দে চিঠি লিখতাম মজা করে। একদা লিখলাম ঃ 'গুরু, পাঠাচ্ছি আমার আকৃতি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ। দেখে দেবেন? চলবে? গড়পড়তা? বাজে? সোজা জবাব চাই, দোহাই! রাহানার চিঠিটি ফেরৎ দিলেন না। দেবেন না? নিশ্চুপ কেন? কী হয়েছে? সেতু-বাঁধা? সুপ্রামেণ্টাল? মন্ উড়ুক্কু?'

পরদিনই এল তাঁর উত্তর গানের প্রতিধ্বনির মতন ঃ 'আমি দেখব তোমার অনুবাদটি মাজাঘষা করবার যদি সময় পাই। কিন্তু তুমি ইংরাজী কবিতায় খুব উন্নতি করেছ দেখছি। এত দ্রুত প্রগতির হেতু? যৌগিক শক্তি? আন্তর অগ্নি-প্রেরণা? অবচেতন? রাহানার চিঠির হঠাৎ

যাঁরা ভালবাসেন প্রেমের কবিতা,
কাউকে কোন মিষ্টি মধুর উপহার দিতে চান
পড়ে, পড়িয়ে, শুনে, শুনিয়ে, তৃপ্তি পান,
এবং উদ্ধৃত করতে চান,
তাঁদের পছন্দমত কাব্য সংকলন

প্রেম পদাবলী

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ভারতচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদনের কাব্য কৃতি থেকে শুধুমাত্র প্রেমের ভাববৈচিত্র্যের পদ সহজ সরলরূপে সংকলিত।

দাম ঃ ৬.০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা—৯

এর মধ্যে সব নাটকের প্রতিই যে দর্শকরা সহৃদয় বা একাত্ম হতে পারে এমন নয়, সমস্ত নাটক কি তার বক্তব্যের সঙ্গেই সবাই এক মত হবেন, এমন কথাও সত্য নয়, তবু সেই সব প্রচেষ্টাকে অস্বীকারও করা যাবে না।

তার কারণ এই সব নাটকের প্রায় প্রতিটিতেই আজকের সমা— রাষ্ট্র, রাজনীতি বিতর্কমূলক মতামত এবং সর্বোপরি একদম হাল আমলের মানসিকতার সামগ্রিক একটা রূপের স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট রেখায়িত প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করা যায়। সেটা কখনও সত্য এবং যুক্তিবহ অবস্থায় কখনও বা সোচ্চার অবস্থায়।

ইদানিং-কার নাকগুলি দেখে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে।

চারণ দল-এর 'এই দশকের অভিমন্যু'-র শুরু মহাভারতের যুগ থেকে। প্রতীকী হিসেবে অভিমন্যু বধের দৃশ্য দিয়ে এ নাটকের সূত্রপাত এবং আজকের অভিমন্যু (দেশে বিদেশে) বধ দিয়ে নাটকের অন্তিম দৃশ্য টানা হলেও এর পেছনে এমন একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে যা মনকে স্বভাবতই নাড়া দেয়। সেই সঙ্গে একটা প্রশ্নও থেকে যায়।

ইতিহাসের শিক্ষা আমরা যুগে যুগে প্রত্যক্ষ করেছি, আবার ভুলেও গেছি। কিন্তু তার মানে কি এই যে, সেই ভোলার সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসও সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে? ইতিহাস যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি তার গহ্বরেই রয়ে গেছে সেই 'রিপিটেশন'-এর সুপ্ত অঙ্কুর। যা কোন না কোনদিন আবার মহীরুহের রূপ নিয়ে সমাজ জীবনের উপস্থাপিত হবেই। ইতিহাসের এটাই শিক্ষা।

এখানে তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা কি নির্দিষ্ট ক্যারুর মার্জি মতন ওল্টানো যায়? আমি যা ভাবছি সেটাই তো একমাত্র অভ্রান্ত সত্য নাও হতে পারে। সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক মতবাদ বা পরিবেশ, সময়ের প্রয়োজন এবং সর্বোপরি বৃহত্তর মানুষের কল্যাণের জন্যও তো এমন পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে যা এক সময় অনিবার্যের পরিণতিই লাভ করে?

'এই দশকের অভিমন্যু' নাটকে পর্যায়ক্রমে পর পর কয়েকটি স্তরে 'মানুষের দুর্লভ জাগরণ'এর ইতিহাস ভিত্তিক রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে ধর্মের নামেও শাসক এবং অত্যাচারীর দ্বারা কলুষিত হয়েছে মনুষ্যত্ব এবং মানবিকতা— যুগে যুগে এসেছে মহাভারতের দুর্যোধন থেকে কখনও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, কখনও হিটলার।

এর একদিকে যেমন চলেছে মানবতা নিধনের যজ্ঞ, অন্য দিকে পাশাপাশি তেমনি সেই গ্লানিময় মুহূর্তগুলিতেই তৈরী হয়ে চলেছে মানুষের আত্মজাগরণের প্রস্তুতি। যে আত্মজাগরণের অন্য নাম শৃংখল মুক্তি বা স্বাধীনতা। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে যাকে চিরকাল পথ ছেড়ে দিতে হয়েছে।

এই নাটকে যেমন দুর্যোধনের পাশাপাশি এসেছে কর্ণ অর্জুন যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামা দুঃশাসন ভীম উত্তরা দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি— মহাভারতের যুগের মানুষেরা তেমনি এসেছে পরবর্তীকালের মঙ্গল পান্ডে নানাসাহেব তাঁতিয়া তোপী ঝান্সীর রাণী, ওসমান খাঁ, ঈশ্বরী পান্ডে ইত্যাদি। সেই সঙ্গে পৃথিবীর অপর প্রান্তের সেই সব মানুষ—জর্জী ডিমিট্রভ

এইচ এম ভি-র 'বসন্ত-বন্দনা'

নবাগত ও সুপরিচিত শিল্পীদের পরিবেশনায় আধুনিক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্র গীতি, নজরুল গীতি, অতুলপ্রসাদের গান, লোক গীতি, যন্ত্রসঙ্গীত, শিশু গীতি নাটিকা এবং কৌতুক নক্সা পাবেন এবারের এইচ-এম-ভি রেকর্ডের 'বসন্ত বন্দনা' সংকলনে। 'বসন্ত-বন্দনা'র প্রতিটি রেকর্ডই অনবদ্য সুরে ও সঙ্গীতে সমৃদ্ধ।

৩৩½ আর-পি-এম সুপার সেভেন রেকর্ড (স্টিরিও)

রবীন্দ্র সঙ্গীত
বাণী ঠাকুর
অর্ঘ্য সেন
গীতা ঘটক
নজরুল গীতি
ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়
দ্বিজেন্দ্র গীতি
শর্বাণী সেন
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
বন্দনা সিংহ
শিশু গীতি নাটিকা
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিন্টু ভট্টাচার্য
প্রভাতী মুখোপাধ্যায়
অনিতা মজুমদার
ইন্দ্রাণী সেন
রীণা সেনগুপ্ত
প্রিন্স সেনগুপ্ত
শৈলেন মুখোপাধ্যায়
চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
শৈবাল মজুমদার
ডলি ঘোষ
এবং নব নালন্দার
শিশু শিল্পীবৃন্দ

যন্ত্র সঙ্গীত
দীপঙ্কর সেনগুপ্ত
ওয়াই, এস, মুলকি

৪৫ আর-পি-এম স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড

আধুনিক
স্বপ্না দাশগুপ্ত
সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়
কৌতুক নক্সা
সুশীল চক্রবর্তী
অরুণাভ গঙ্গোপাধ্যায়

৪৫ আর-পি-এম এক্সটেন্‌ডেড প্লে রেকর্ড (স্টিরিও)

আধুনিক
ললিতা ধর চৌধুরী
কৌশিক বসু
রবীন্দ্র সঙ্গীত
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
গোরা সর্বাধিকারী
অতুলপ্রসাদের গান
শিখা বসু/শ্যামলী সেন
নজরুল গীতি
ইলা বসু
লোক গীতি
আর্য্য চৌধুরী
যন্ত্র সঙ্গীত
ভি, বালসারা

কলকাতা বিবিধ ভারতী কেন্দ্র থেকে প্রতি সোমবার রাত ১০।।০ টায় এইচ-এম-ভির বিশেষ বেতার অনুষ্ঠান "বসন্ত-বন্দনা" শুনুন।

HMV

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

HT-GC 8278

পুনরভ্যুদয় হয়েছে। ভুতুড়ে লীলা? তোমার অন্যমনস্কতা? আমার?'

*

একদা আমি লিখলাম ঃ 'গুরু! সম্প্রতি আমি আদৌ ধ্যানে মন বসাতে পারি নি—পর্বতপ্রমাণ প্রুফের জন্য। কিন্তু আমি মোছোড়বান্দা ফের ধ্যানে বসলাম বলে—সাবধান!'

গুরুদেবের পিঠ পিঠ জবাব ঃ 'পর্বতপ্রমাণ প্রুফের পরে পর্বতপ্রমাণ ধ্যান—যে-পর্বতের শিখরে আসীন 'বাবা'? বহুৎ আচ্ছা। আমি হব তোমার মুখোমুখি।'

*

'গুরু, তিন তিনটি চমৎকার সুখবর ঃ প্রথম, আবুল ফজল নামে এক মুসলমান সাহিত্যিক—আমাকে অভিনন্দন করেছেন। দুই এক মহাপণ্ডিত আমার বাংলা উপন্যাস 'দোলা'-র প্রশংসা করেছেন। তিন এক জমিদার আমাকে লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন একটি অভিনন্দন-পত্র জনৈক স্থানীয় ডাক্তারের জন্যে—যিনি রাজসমাদৃত।'

'দিলীপ, আমার সহানুভূতি। আবুল ফজল ও মহাপণ্ডিতের জন্যে সাধু সাধু সাধু। কেবল ডাক্তার 'রাজসমাদৃত' হলেও আমি উজিয়ে উঠতে পারছি না। এ আমরা চলেছি কোথায়? (অনুরোধ ঃ নীরদকে বোলো না একথা) তবে হয়ত এর মূলে আছে এই প্রসিদ্ধ ঃ ডাক্তারকে মান দাও যদি দীর্ঘজীবী হতে চাও।' আপিচ তোমার নূতন প্রখ্যাত সাহিত্যিককে এজন্যে ধরা জমীচীন বৈ কি। তুমি একটি দীর্ঘ মানপত্র লিখবে নিশ্চয়ই দাওয়াইয়ের রোমান্স সম্বন্ধে প্রথমে ধন্বন্তরীর তারপর চরক ক্যালেনের Galen, গুণগান করে শেষে উপসংহার করবে ডাক্তার নীরদ তালুকদার তথা রামচন্দরের প্রসঙ্গ এনে।...

শ্রীঅরবিন্দ'

*

'গুরু, আপনি সবশুদ্ধ কজনকে স্পেশাল অনুমতি দিয়েছেন। প্রত্যহ আপনাকে পত্রাঘাত করতে? নীরদ গোপনে বলে ঃ ১২১ জনকে। বিন্দু বলল ঃ 'না মাত্র ৯৭ জনকে'—এখন সাধকদের সংখ্যা বুঝি ১৫০?'

'দিলীপ খোলাখুলি যাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তারা সংখ্যায় দু জন—মানে, কতকটা উহ্য ভাবে গৃহীত। জরুরি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে দুজনকে। আর দুজন—সর্বনর্বাচিত লেখক। ৯৭ বা ১২১ জন রোজ পত্রাঘাত করলে আমাকে গোবি মরুভূমি বা মানস সরোবরে মহাপ্রয়াণ করতে হত...শ্রীঅরবিন্দ।'

'গুরু, শ্রীল সুনিশ্চিত শর্মা আজ আমার কাছে এসে সে কী বন্ধুতাই করলেন ঃ তাঁর মধ্যে এক আশ্চর্য দৈবী শক্তি সক্রিয় হয়েছে যার ফলে তিনি সফল হয়েছেন গুরুচরণে আশ্চর্য আত্মসমর্পণ করতে। শুনে আমি অভিভূত। আপনি?'

'দিলীপ তিনি যখন তাঁর মধ্যে অন্তর্গূঢ় শক্তির কথা বলতে উজিয়ে ওঠেন তখন আমার মনে হয়—আহা, যাঁরা এত আশ্চর্য তাঁরা তাঁদের আশ্চর্যতার সম্বন্ধে একটু কম বাগ্মী হলে মন্দ হত না। আত্মস্তুতির এহেন আতিশয্য যে মানুষকে কোন আঘাটায় টেনে নিয়ে যায় বেল্ট কি জানে?...শ্রীঅরবিন্দ।'

*

আমি সাধনায় ত্বরিৎ প্রগতি লাভ করতে চেয়ে মাঝে মাঝেই ভাবতাম কঠোর করা দরকার—বড় বেশি আরামে আছি বলেই হয়ত ধ্যানধারণায় আমার মন বসছে না—কর্মের নাগপাশে বাঁধা পড়ছি। ভেবেচিন্তে স্থির করলাম কীভাবে কঠোর করতে চাই গুরুদেবকে না জানিয়ে করতে গেলে হয়ত উল্টো উৎপত্তি হবে কাজ নেই। যদি কঠোর করা আমার সাধনার অনুকূল হয় তবে গুরুদেব নিশ্চয়ই মত দেবেন। তাই তাঁকে লিখলাম যে আমি স্থির করেছি (১৪:৯-৩৫) ঃ

১) আমি চাপান করা ছেড়ে দেব। কারণ আমি চা ভালোবাসি।

২) পনীর (cheese) খাব না আর, কারণ পনীর আমার ভালো লাগে।

৩) সুস্বাদু ব্যঞ্জন সব বরখাস্ত করব। কারণ বিস্বাদ ব্যঞ্জন আমার সয় না।

৪) একাদশীতে উপবাস—মাথাও মুড়োবো।

৫) একটিমাত্র কম্বলে নিদ্রা—বালিশ না নিয়ে।

৬) মশারি না খাটিয়ে শয়ন। এইটেই হবে আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন। কারণ মশকগুঞ্জনকে আমি ঘুমপাড়ানি গান মনে করতে পারি নি কোনোদিনই। আর পণ্ডিচেরিতে বেজায় মশা।

আপনি ও শ্রীমা অনুমোদন করবেন কি?—যদিও বলে রাখি আমি এ-প্রার্থনা করছি চোখের জলে—শান্তচিত্তে নয়।

'গুরুদেব উত্তরে লিখে পাঠালেন ঃ 'তুমি যে-সব প্রস্তাব করেছ পড়ে আমি চতুর্ভম্ব! উপবাস? ওতে আমি নেই যদিও আমি নিজে উপবাস করেছি তাই জানি যে, উপবাসের পরে পারণে তুমি খাবে রাক্ষসের মতন। আর মাথা মুড়োবে? সর্বনাশ? তার ফল কী হবে ভেবে দেখেছ কি? এর পরে চব্বিশে নভেম্বরের দর্শনের দিনে আমার কোমল মন তোমার কঠোর মূর্তি দেখে যে ঘা খাবে—হয়ত আমি তার টাল সামলে উঠতে পারব না কে জানে?—আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু তোমার এই নিদারুণ মূর্তি দেখে কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় পর্যন্ত যে তুমুল আন্দোলন শুরু হবে—তার ফলে তুমি প্রখ্যাত হয়ে উঠবে আর এক ভঙ্গিতে তোমার অতীত খ্যাতিকে ছাপিয়ে—আর কোন সুলগ্নে ভেবে দেখ একবার ঃ ঠিক যখন তুমি যশমানরগর্বীয় সব অহংতাকে জয় করতে উদ্যত! না না—বিপদ বলে বিপদ! আর মশারি না টাঙিয়ে ঘুম? তার মানে অনিদ্রা—অনশনের মতনই সাংঘাতিক বৈ কি? ফলে তোমার যুগল নয়ন শুধু যে ম্লান হয়ে পড়বে তাই নয়—হয়ে উঠবে ভীষণ—সুপ্রামেণ্টাল সম্বন্ধে তোমার জল্পিত বিভীষণতাকেও দুয়ো দিয়ে। না না না।

'অতিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন অসম্ভবের কাছাকাছি—কেবল কুঁড়ে ঘরে বা হিমালয়ে ছাড়া। বৈরাগ্যের ভিত্তি হচ্ছে নির্বাসনা অনাসক্তি—যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্টি। বাহ্য কৃচ্ছ্রসাধনার ফল দাঁড়ায় এই যে, সে হয়ে ওঠে একটা বাঁধা নিয়ম মাত্র যাকে মানুষ মেনে চলে শুধু নিয়মানুবর্তী হয়ে নিজেকে সাবাস বলতে—আত্মাদরের মুখরক্ষা করতে।

'হয়ত এসব কথা শুনে তুমি ঠাওরাবে যে আমি কৃচ্ছ্রসাধনদীক্ষায় পথে বোগা গুরু নই—হয়ত অভ্রান্ত এ-সিদ্ধান্ত। কি জানো? আমি আন্তর নির্দেশ মেনে চলারই পক্ষপাতী, তাই মনে করি—তুমি তোমার চৈত্যপুরুষকে যাহাল করলে এত শত শুষ্ক মুদ্রা ঝামেলার হাত থেকে নিস্তার পাবে।'

উত্তরে আমি তাঁকে লিখলাম এক মস্ত চিঠি। তার চুম্বক এই যে আমার মনে হয়েছিল যে যখন আমাকে অতিমানস-যোগ করতেই হবে তখন আমার সব মানস প্রবণতাকে কাটিয়ে না উঠলেই নয়।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.,ডি.জি.ও
ডাঃ এস. এন. পাণ্ডে এম.বি.,বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

প্যাট্রী, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোর্সেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক ঃ
সম্পৎ সেরামিকস্ প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

ভ্যানত্রয় হিটলার গোয়েরিং, গোয়েবলস ইত্যাদি এবং এ সবের পাশাপাশি কখনও কৃষক কখনও বা শ্রমিক এবং কখনও তাদের পাশে পাশে বিদ্রোহী সিপাহী। যারা অত্যাচারের শেষ পর্যায়ে এসে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তাদের প্রভু বা অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে। যা ইতিহাস হয়ে আছে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে।

'এই দশকের অভিমন্যু' নাটকের পট-ভূমিকা ব্যাপক। তাকে সীমিত করে নেওয়া হয়েছে ছোট ছোট কিছু দৃশ্যাংকে। প্রথম দৃশ্যটি ছাড়া একমাত্র শেষ দৃশ্যে, যেখানে যমরাজ স্বয়ং বিচারের আসনে বসে একটা হত্যাকে অবলম্বন করে নির্মম কণ্ঠে তার রায় দিলেন (এই দৃশ্যটির পরিকল্পনা ও পরিবেশনার মধ্যে মৌলিকতার ছাপ আছে) যদিও অন্য ফর্মে অন্যত্র এর উপ-স্থাপনা ইতিপূর্বে পরিবেশিত দেখা গেছে) সেই দৃশ্যটি একদিকে যেমন দীর্ঘ অন্যদিকে তেমনি নিবিষ্ট হয়ে দেখবার মত।

ন্যায় বিচার (?) এবং বিদ্রোহকে এ নাটকে স্পষ্টতই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি স্পষ্ট / ভাষাতেই নাট্যকার পরি-চালক অলক রায়চৌধুরী তাঁর বক্তব্য রেখেছেন নাটকে। (তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্যে তিনি যা বিশ্বাস করেন।)

অভিনয়ে দর্শকদের সর্বাধিক আনন্দ দিয়েছেন দিলীপ বসু। অরুণ রায়চৌধুরীর অভিনয়ে নিষ্ঠা এবং মুন্সিয়ানা আছে। জজী ডিমিট্রভ ও ভ্যানত্রয়-এর ভূমিকাভিনয় তাঁর সুন্দর। তবে অতি আবেগ ও অতি নাটকীয়তা মুক্ত নন।

অন্যান্য ভূমিকায় বিশ্বরঞ্জন বসু, সত্য-রঞ্জন দাসগুপ্ত, অসীম চক্রবর্তী, শেখর চৌধুরী, রমাপ্রসাদ ব্যানার্জী অমিতাভ ব্রহ্মচারী অসীম চ্যাটার্জী দুলাল মিত্র রমেন সাহা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ ভাল উৎরে গেছেন।

বিবেকরূপী গোষ্ঠগোপাল দাসের কণ্ঠ দর্শকদের প্রীত করেছে। বড় মিষ্টি গানের গলা।

অনীতা অধিকারীর প্রত্যেকটি চরিত্রাভিনয়ই মনে দাগ কাটে।

তবে দলগত অভিনয়ের দিকে আর একটু নজর দিলে ভাল নয়। কারণ একটা ঢিলেঢালা ভাব সমগ্র নাটকের মধ্যে রয়েই গেছে।

তড়িৎ চৌধুরীর মঞ্চ পরিকল্পনা সুন্দর। শচীন আঢ্যর অঙ্গশ্রী প্রায় নিখুঁত বললেই চলে। আলো (চিত্ত সরকার) ধ্বনি প্রয়োগ (শ্রীপতি দাস) এবং রূপসজ্জা (গোপাল হালদার) নাটকের পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

সেদিন দুজনে
দেবরাজ রায় - সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

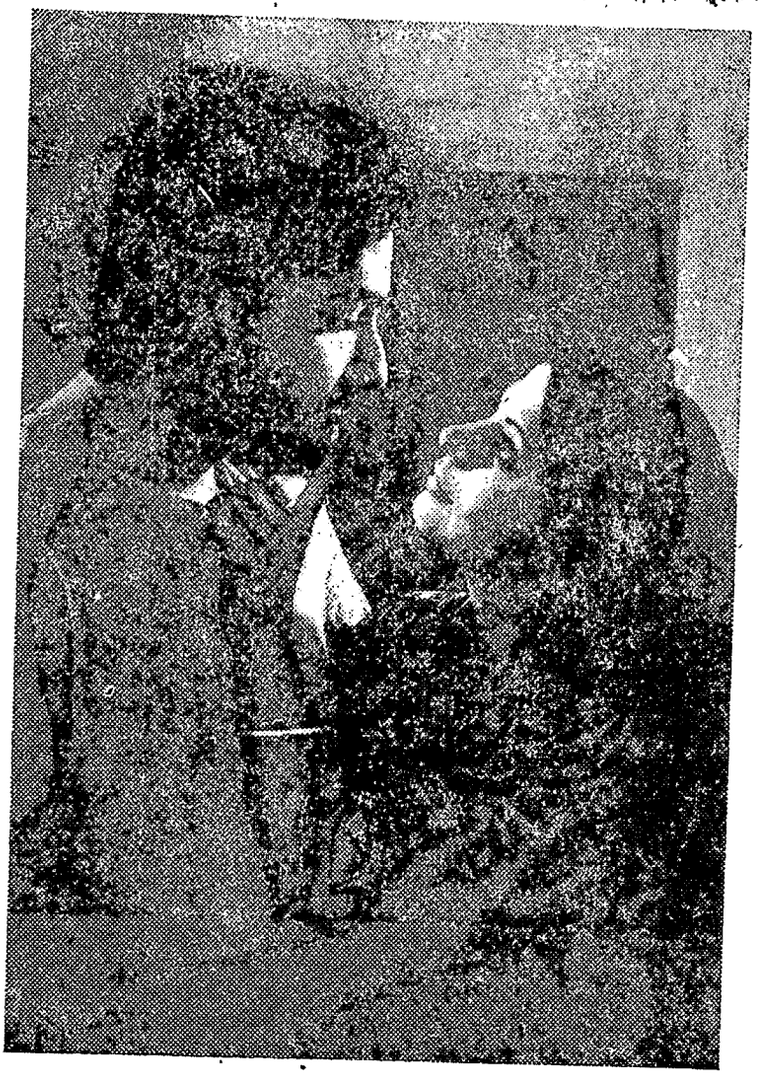

পদধ্বনী যাত্রাভিনয়

প্রখ্যাত যাত্রাদলের খ্যাতনামা পরি-চালক এবং দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়াও যে কোন যাত্রাভিনয় দর্শক মনে আলোড়ন তুলতে পারে তারই প্রমাণ মিলল, ৭ই ফেব্রুয়ারী হাওড়ার গোয়াবেড়িয়া স্কুল প্রাঙ্গণে শালিমার পেণ্টস নাট্যসমাজ অভিনীত শ্রীভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'পদধ্বনি' যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে।

নির্দেশক শ্রীবিশ্বনাথ ঘোড়ই সাংবাদিক পাগলের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানান ঘাত-প্রতিঘাত এবং স্বন্দ্বমূলক মনোগ্রাহী ঘটনার মাধ্যমে দলগত সংহতি আর দক্ষ প্রয়োগরীতি নাটকটিকে সফলতা দান করে।

বীরেন নাথ, সমীর চ্যাটার্জী বলরাম মান্না বুলা দাস ও মীরা মুখার্জীর অভিনয়কুশলতা মনে দাগ কাটার মত।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন জয়দেব মন্ডল প্রফুল্ল মোজাহার আলি কাঞ্চন সেন সুধা বাগ্নিক যদু মাহাতো সুলেখা ব্যানার্জী মীরা রায় এবং আরো অনেকে।

শ্রীএইচ দশ, শ্রীআই এম মালকানি, পি জে আর্ট এবং ডাঃ পি কে ভান্ডারীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

ষ্টার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ফোন : ৫৫১১৩৯
প্রতি বৃহঃ ৬টা
শনি, রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬টায়

পরিচয়

পরিচালনা : বঙ্কিম ঘোষ
নাটক : কুণাল মুখার্জী
সতীন্দ্র, শমিতা বিশ্বাস, অলোক, গীতা, অনামিকা, বঙ্কিম ও হরিধন।

* আবহাওয়া ও বিশ্বের খাদ্য
* ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস
* অর্থহীন ও প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলন
* কল-গার্ল

আবহাওয়া ও বিশ্বের খাদ্য

'নেচার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক জন গ্রিবিন কিছুকাল আগে কোনো একটি ফাউণ্ডেশনের টাকায় আমেরিকা ও কানাডার কয়েকটি শহরে সফর করেন। সে-সময়ে কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়—বিশেষ করে খাদ্যের যোগান নিয়ে, বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে। পরে এই সমস্ত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একটি লেখা দাঁড় করান, 'আবহাওয়া ও বিশ্বের খাদ্য' শিরোনামে লেখাটি 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার ২৮ নভেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রণিধানীয় এই লেখার কিছু অংশের বক্তব্য নিচে প্রকাশিত হল।

জন গ্রিবিন যে-সময়ে সফর করছিলেন তার কিছুকাল আগে রোমে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পক্ষ থেকে বিশ্বের ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে (বিষয়টি নিয়ে ৩৪নং সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছি)। তার আগেই বিজ্ঞানীরা ও সংশ্লিষ্ট সকলে মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন যে সবুজ বিপ্লব ব্যর্থ, সত্তর দশকএর গোড়ার দিকের উজ্জ্বল আশাবাদ আঁকড়ে থাকার মতো কোনো অবলম্বনই আর নেই। একই সময়ে আরও শোনা যাচ্ছিল পৃথিবী ক্রমেই শীতল হয়ে যাচ্ছে এবং সর্বগ্রাসী এক হিমযুগ আসন্ন। যে-ক্ষেত্রে খোদ বিজ্ঞানীরাই বিপর্যয়ের কথা শোনান সেখানে অবিশ্বাস করে এমন সাহস কার, বিশেষ করে যখন আবহাওয়া-নিরীক্ষণকারী আধুনিকতম সব যন্ত্র মুহুর্মুহু তথ্য হাজির করে চলেছে। পশ্চিমের বড়ো বড়ো শহরের টেলিভিশনে পাল্লা দিয়ে দুর্ভিক্ষের ছবি দেখানো শুরু হয়ে যায় (ভারত ও বাংলাদেশ থাকতে দুর্ভিক্ষের ছবির অভাব কি)।

এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে জন গ্রিবিনের লেখাটি পড়া দরকার। তিনি কোনো নিজস্ব মতামত চাপান নি, বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মত উপস্থিত করেছেন মাত্র। পাঠক এই আশ্বাস অবশ্যই পাবেন যে, হতাশ হবার কোনো কারণ নেই।

আমাদের এই বিশ্বে বড়ো বেশি মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব, আর অনেক বিবাদ তো লেগেই আছে—অতএব এই বিশ্বের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এমন ধারণা যদি কারও থাকে তিনি যেন কখনো রাইড ব্রীসনের কাছে না যান। রাইড ব্রীসন হচ্ছেন উইসকন্সিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশগত অধ্যয়ন ইনস্টিটিউটের কর্তা। তিনি এমন সব তথ্য উপস্থিত করতে পারেন, এত প্রচুর পরিমাণে, যে অবধারিত সিদ্ধান্ত করতে হয়—শেষের সে-দিন অতি আসন্ন, সম্ভবত আর মাত্র বছর দুয়েক বাদেই। তথ্যগুলো এমনই হতভম্বকর যে তার পাশে এমনকি বিশ্বের বর্তমান শক্তি-সংকটকেও তুচ্ছ মনে হয়। কারণ, শক্তি-সংকট সম্পর্কে দারুণ নৈরাশ্যবাদীরাও কখনো বলেন নি যে দশ বছরের আগে সর্বনাশ ঘটে যাবার কোনো সম্ভাবনা আছে। ব্রীসন আরো বলে-

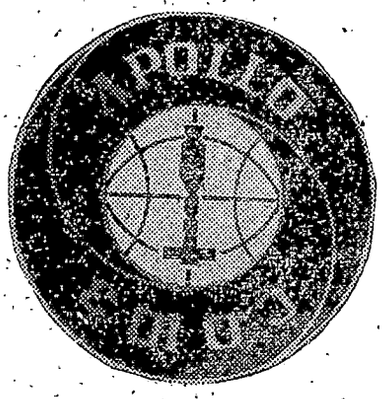

প্রতীক

১৯৭৫ জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যে যৌথ মহাকাশ গবেষণা শুরু হচ্ছে, এটি তার সরকারী প্রতীক। ইংরেজিতে লেখা আছে অ্যাপোলো, রুশীতে সয়ুজ, মাঝখানে পৃথিবীর কক্ষে দুটিকে যুক্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

ছেন, আমাদের এই ভূ-গোলকের গড় তাপমাত্রা গত কুড়ি বছর ধরে একটানা কমছে—সরাসরি এই কারণে যে মানুষের কার্যকলাপের ফলে পরিবেশ হয়ে গিয়েছে দূষিত। বায়ুমণ্ডলে ধুলোর পরিমাণ এখন এত বেশি যে সূর্যের উত্তাপের আরো বেশি ভাগ এবং তাৎপর্যপূর্ণ রকমের বেশি ভাগ এখন বায়ুমণ্ডলই শুষে নিতে পারে। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপশোষণ এত বেশি ছিল না। খাদ্যাভাব ইত্যাদির কথা বাদ দিয়ে যদি ব্রীসনের এই পরিবেশ দূষিত হওয়া সম্পর্কিত চমকপ্রদ তথ্য ধরে অগ্রসর হতে হয় তাহলেও কিন্তু আশা করার কিছু থাকে না। শেষ সর্বনাশ তখনো দু-বছর দূরবর্তী না হয়ে আর সামান্য কিছু বেশি হতে পারে।

তাহলে? তাহলে বরফ যদি গ্রাস নাও করে তো গ্রাস করার জন্য আছে দুর্ভিক্ষ। তবে আর হিসেব-টিসেব করে চলার দরকারটা কি। যেমন প্রাণ চায় ফুর্তি-টুর্তি করে নিয়ে জীবনটাকে শেষ করে দিলেই তো হয়। নতুবা পালটা প্রতিকারের ব্যবস্থা চাই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, শুধু ব্রীসন নন, যে-সব বিজ্ঞানী এইসব তথ্যে বিশ্বাস করেন তাঁরাও কিন্তু দিব্যি নির্বিকার।

আসলে ব্রীসন যা বলছেন তা হচ্ছে খারাপ একটা পরিস্থিতিকে চূড়ান্ত রকমের খারাপ করে দেখার ফল। বাড়াবাড়ি বা আতিশয্য কোনো ক্ষেত্রেই ভালো নয়—না বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীতে, না এমনকি সামান্য একটা নাটকের দৃশ্যকল্পনায়।

আবহাওয়ার সঙ্গে খাদ্য-উৎপাদনের ব্যাপারটা অবশ্যই বিজড়িত। এই দুয়ের সম্পর্ক নিয়ে ভাবলে অবশ্যই হতাশ হবার কারণ আছে। কিন্তু কতখানি? এ-বিষয়ে যাঁরা মতপ্রকাশ করেছেন তাঁরা তিনটি স্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত। একদল বলেন, হ্যাঁ, আবহাওয়ার অবনতি ঘটেছে বটে কিন্তু তাতে হয়েছেটা কী? হয়তো আগামী সপ্তাহেই আবার আবহাওয়ার উন্নতি হয়ে যেতে পারে। তা যদি নাও হয়, তো বিজ্ঞানের আবিষ্কার তো আর থেমে থাকছে না, আশ্চর্য নতুন ফসল কিছু একটা আবিষ্কার হয়ে যাবে হয়তো। আর মানুষের সংখ্যা বাড়ছে? সে তো উন্নতিশীল দেশগুলিতে। সেখানেও হয়তো রাতারাতি এমন কিছু ঘটতে পারে যার ফলে জন্মহার কমতে বাধ্য।

ব্রীসন রয়েছেন একদিকে আর এই শেষোক্তরা অন্যদিকে। দু-দলই চূড়ান্তবাদী—বা, রাজনীতির ভাষায় বলা যেতে পারে উগ্রপন্থী। কিন্তু এই দুই উগ্রপন্থী দলের মাঝখানে রয়েছেন একদল মধ্যপন্থী, যাঁদের বলা যেতে পারে বাস্তববাদী। তাঁরা বলেন, অল্প সময়ের ব্যাপ্তির মধ্যে দেখলে সমস্যা গুরুতর সন্দেহ নেই, কিন্তু বিরাট কালের পরিধির মধ্যে সকল সমস্যারই আসান সম্ভব। এই দলের বিজ্ঞানীরা সবাই যে এক ভাষায় কথা বলেন তা নয়। তফাৎটা মাত্রাগত—অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠতে কতখানি মাত্রার প্রয়াস প্রয়োজন হবে তাই নিয়ে।

রেখা

গৃহিনীর কাছেই উনি বাংলা শিখছেন এবং হৃষিদার 'মিলি' ছবিতে ওঁরা একত্রে অভিনয় করছেন।

রেখা— ইতিপূর্বে 'হিফাজৎ' ছবির মুক্তি উপলক্ষে বিন বিন (বিনোদ মেহরা)-এর সঙ্গে এবং সম্প্রতি 'ম্যায় নেই উহ' ছবির মুক্তি উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলো। দুবারই ওঁকে খুব গম্ভীর দেখা গেছে সাংবাদিকদের খুব একটা আমল দেয় নি। এবারে বিশেষ অনুরোধে

বম্বের শিল্পীরা কলকাতায়

সম্প্রতি নবজীবন ফিল্মসের 'দো আনজানে' ছবির স্যুটিং উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন অমিতাভ বচ্চন, রেখা এবং পরিচালক দুলাল গুহ। নেপথ্য গায়ক ও শিল্পী শৈলেন্দ্র সিং এবং পরিচালক অনিল গাঙ্গুলীও কলকাতায় নির্মিতব্য একটি হিন্দী ছবির শুভ সূচনা উপলক্ষে একই সময় কলকাতায় এসেছিলেন। এবারে আসছি ওঁদের কথায়।

অমিতাভ বচ্চন— বম্বের ব্যস্ততম শিল্পী। ১৯৭৪ 'নেমকহারাম' ও কর্মোটি ছবিতে অপূর্ব অভিনয় করেছেন। এছাড়া 'বেনাম' ও 'মজবুর' ছবিতে ওঁর অভিনয়ই ছবির একমাত্র সম্পদ। উনি কলকাতায় চাকুরী করতেন একদা বালিগঞ্জে থাকতেন। সেই সুবাদে পরিচালক বিভূতি লাহার (অগ্রদূতের) সঙ্গে পরিচয়, ওঁরই একান্ত অনুরোধে একটি বাংলা ছবি 'কোয়েলের কাছে'তে অভিনয় করছেন। ওঁর বিপরীতে থাকবেন সম্ভবত সায়রাবানু এবং কলকাতার রাজশ্রী বসু বা মহুয়া রায়চৌধুরী টেবিল টেনিস খেলার অতিথিদের জন্যে একাধিক ঘর পূর্ব থেকেই সংরক্ষিত থাকায় গ্রান্ড হোটেলে সেই হিন্দী ছবির স্যুটিং করা সম্ভব হয় নি। উনি এজন্যে আবার মার্চে আসবেন। এছাড়া উনি কলকাতায় রবি ঘোষের 'নন্দিনী' (মঞ্চ-সফল নাটক 'পরিচয়' অবলম্বনে) ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর অথবা ধরনী জয়ার সঙ্গে অভিনয় করবেন। বাংলা ছবির জন্যে জানালো—কলকাতায় নির্মিত একটি হিন্দী ছবিতে সে অভিনয় করবে। ওঁর প্রথম ছবি 'মেহমান' (বিশ্বজিতের বিপরীতে) এখনও মুক্তি পায় নি। তবে বিশ্বজিতের সাম্প্রতিক ছবি 'কাহতে হ্যায় মুঝকো রাজা' শীঘ্রই মুক্তি পাবে বম্বেতে। রণধীর কাপুরের সঙ্গেই ওঁর অভিনয় ছবির সংখ্যা দশ। বাংলা ছবিতে অভিনয় করবার ইচ্ছা না থাকলেও বম্বেতে ওঁর বাঙালী পরিচালকদের ছবিতে অভিনয় করতে ভালো লাগে। বিবাহের সম্পর্কে এখনই ভাবছে না। হাতে এত ছবি যে সেগুলির কাজ শেষ করতে দু'বছর লেগে যাবে। কিন কিন (কিরণকুমারের) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ওঁকে স্বামী হিসাবে ভাববার কোন কারণ নেই। বম্বের পত্রিকা স্টার ডাস্টই এ জাতীয় গুজব রটাচ্ছে। বম্বে ছবির গতানুগতিক ভাবকে ত্যাগ করবার জন্যে কলকাতার হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার ইচ্ছা আছে ওঁর।

সাক্ষাৎকার—অ ম র

উত্তমকুমার মলোল সেন, পূর্ণেন্দু পত্রী, অরবিন্দ মুখোঃ, সুমিত্রা, মিঠু, দীপঙ্কর, অপর্ণা সহ চলচ্চিত্রজগতের রথী মহারথীদের রচনাসমৃদ্ধ
রঞ্জিত মল্লিক সংখ্যা
চুমকী
প্রকাশিত হলো ॥ দাম—১·৩০ পঃ
১০৮বি রায় বাহাদুর রোড, কলি-৩৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ মহাকাশ গবেষণা

আগামী জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের স-মনুষ্য মহাকাশ গবেষণার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, শিল্পীর তুলিতে আঁকা তার একটি ছবি। বাঁ-দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সয়ুজ, ডানদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলো, নিচে পৃথিবী। পৃথিবীর কক্ষে পরিক্রমারত অবস্থায় সয়ুজ ও অ্যাপোলো যুক্ত হবে। চিত্রে এই দুটি মহাকাশযানকে যুক্ত হবার প্রাক্কালের অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

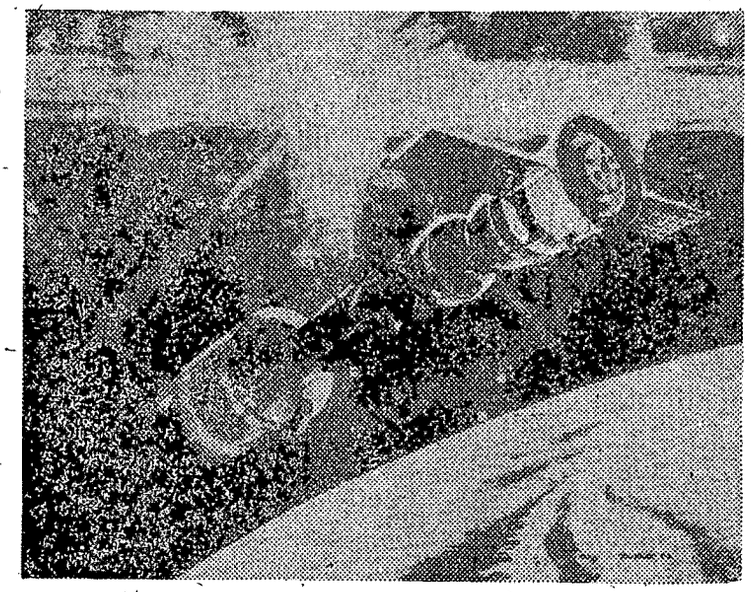

ব্রীসন বলছেন, মানুষের কার্যকলাপের ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া পালটে যাচ্ছে। এই কথাটি অনেক বিজ্ঞানীই মানেন না। যেমন কালোরাডোর জাতীয় আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্রের কার্যনির্বাহক অধিকর্তা জন ফিরর বলেন, এমন কোনো সাক্ষ্য নেই যা থেকে প্রমাণ হয় গত দশ বছরের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে ধুলোর স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটেনের আবহ দপ্তরের বিজ্ঞানী জে এস সয়ার বলেন, কলকারখানার দরুন ধুলো সৃষ্টি হয় পৃথিবীর অতি সামান্য অংশে মাত্র এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ব্রীসনের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকায় বায়ুমণ্ডলের ধুলো সম্পর্কে কিছু তথ্য। সয়ার বলছেন, এই তথ্য ভুল, কেননা এই ধুলোর বেশির ভাগটাই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তার দরুন।

তাছাড়া, পৃথিবী ক্রমেই শীতল হচ্ছে—এমন কথাও এখনো পর্যন্ত সন্দেহাতীত-ভাবে বলা চলে না। বড়ো জোর বলা চলে লক্ষণটা সেদিকে। তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, যে-সব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। কানাডার একজন বিজ্ঞানী বলেছেন (গর্ডন ম্যাকে, পরিবেশ কানাডার আবহ প্রয়োগ শাখার অধ্যক্ষ), গত কয়েক বছরে কানাডার কয়েকটি স্টেশনের রীডিং থেকে মনে হতে পারে যে তাপমাত্রা বরং বাড়ছে। আসলে হয়তো সেই কথাটাই ঠিক—হাতে আসা পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য যথেষ্ট নয়, ফলে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক স্টেশন থেকে প্রাপ্ত রীডিং-এর গড় কষতে গিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত টানতে হয়।

তাহলে কি আবহাওয়ার পূর্বাভাস জোর ব্রীসনের যে প্রচুর সেটা কোনো বিজ্ঞানী অস্বীকার করতে পারেন না।

আবহাওয়া কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে পাবার মতো কোনো নিশ্চিত হাতিয়ার আমাদের হাতে নেই? সূর্যোদয়ের সময়ে আকাশ লাল ছিল কিনা তাই দেখে আঁচ করতে হবে? ব্যাপারটা এখনো এতদূর গড়ায়নি। খাদ্যসংকট যে আছে এ-বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। আর আবহাওয়া হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ যার দ্বারা নির্ধারিত হয় পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াবে। ব্রীসন যে-কথা বলছেন, পরিস্থিতি গুরুতর, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী—ব্রীসনের এই কথাটি স্বীকার্য নয়।

ধরে নেওয়া গেল মানুষ এ-ব্যাপারে নির্দোষ, আবহাওয়ার ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। কিন্তু এখন একথা সুস্পষ্টভাবেই জানা গিয়েছে যে, মানুষের হাত ছাড়াই আবহাওয়ায় বড়োরকমের পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। ম্যাডিসন-এ গবেষণারত বিজ্ঞানীরা তাঁদের বিশেষ গবেষণা থেকে অতীতের আবহাওয়ায় প্রকাণ্ড পরিবর্তনের হদিশ দিতে পেরেছেন। তাঁদের মতে মাত্র সতেরো বছরের মধ্যেই 'আমূল' পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। আজকে আমরা আছি দুই হিমযুগের মাঝা-মাঝি অবস্থার পরিস্থিতিতে, আর কিঞ্চিদধিক একশো বছরের মধ্যেই পুরোপুরি একটি হিমযুগ শুরু হওয়াও অসম্ভব নয়। এই উক্তির প্রতিবাদে কোনো কোনো আবহ-বিজ্ঞানী বলেছেন, এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটাবার তো কোনো আয়োজন ভূ-জগতে আছে বলে তাঁদের জানা নেই। উত্তরে ব্রীসন বলেছেন, তত্ত্বকে দৃঢ় করতে হবে তথ্যের ওপরে, তথ্যকে তত্ত্বের ওপরে নয়। তথ্যের আমরা তা সঠিক জানি না। তার মানে এই নয় যে আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। গত দশ বা পনেরো বছর ধরে প্রযুক্তি-বিদ্যা ছিল আর আবহাওয়াও মোটামুটি ভালোই গিয়েছে। ফলে কৃষির ফলন থেকে সরবরাহ হতে পেরেছিল চাহিদার থেকে বেশি এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর এলাকা অনাবাদী পড়ে ছিল। কিন্তু এখনকার অবস্থা ভিন্ন। সরবরাহ ও চাহিদা এখন এতই কাছাকাছি যে আবাদী জমিও আর পড়ে থাকতে পারে না। কাজেই আগামী কয়েক বছর ধরে খুব ভালো আব-হাওয়া চাই, যাতে সংকট কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে।

মধ্যপন্থী অনেকে ভাবছেন, এই সংকট থেকে পরিত্রাণ সম্ভব, তার জন্য প্রয়োজনীয় কৃৎকৌশল আমাদের আয়ত্তে—এখন শুধু রাজনৈতিক ইচ্ছা থাকলেই হয়।

ব্যাপারটা সহজ নয়, সরলও নয়। মনে করা যাক কোনো একটি দেশের টেলিভিশনে সংবাদচিত্রে দেখানো হল যে সরকারী নীতির প্রতিবাদে কৃষকরা শয়ে শয়ে বাছুরকে গলা কেটে মেরে ফেলছে। পরক্ষণেই দেখানো হল বাংলাদেশের হাজার হাজার ভুখা মানুষের ছবি (কল্পনা নয় কানাডার টোরোন্টোতে পরপর এমনি দুটি সংবাদচিত্র দেখানো হয়েছে ১৯৭৪ সালের ৩০শে অকটোবর তারিখে)। প্রথম সংবাদচিত্রের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষ প্রতিবাদ জানাল, সেটা নাকি অশ্লীল। কেন অশ্লীল? এ কারণে নয় যে বাংলাদেশের মানুষ যখন ভুখা টোরোন্টোর কৃষক তখন কত সহজে খাদ্যের অপচয় করছে! এটা হচ্ছে সমস্যার সামাজিক দিক, আবহাওয়ার পরিবর্তনকে খুঁটিয়ে জানা গেলেও তা দিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

তাই মনে হয় বহু বিজ্ঞানীর মতো (তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন জাতীয় আবহ গবেষণা কেন্দ্রের উইল কেলোগ) সতর্ক একটি আশাবাদে নির্ভর করাই ভালো। তাপমাত্রা কমছে? কিন্তু কমতেই থাকবে—তাই বা কেন? কিছুকাল পরে বাড়তেও পারে। চল্লিশের দশকে এমনি এক-বার কমে যাবার পরে আবার বেড়েছিল। মানুষের তৈরী ধুলোর ফল খারাপ হচ্ছে? তেমনি মানুষের তৈরী এমন জিনিস প্রচুর যা এই কুফলকে কাটাতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব ভয়ের কোনো কারণ নেই।

৬২তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

১৯৭৫ সালের ৩ থেকে ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৬২তম অধিবেশন হয়ে গেল। এবারের অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে নিবন্ধ পাঠ করার চেয়েও আলোচনা-বৈঠকের ওপরে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে—শুধু বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপরে নয়, জাতীয় সমস্যার ওপরেও।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এবারের অধিবেশনেরও উদ্বোধন করেছেন প্রধান-মন্ত্রী। উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেনও সেই

রাজেশ খান্না

আয়না

প্রযোজনা : কলাকেন্দ্র ফিল্মস
দক্ষিণ ভারতীয় স্টাইলে একটি
ভাবপ্রবণ কাহিনীর সার্থক
চলচ্চিত্রায়ণ

'রামশাস্ত্রী' গ্রামের বিশিষ্ট পুরোহিত, কায়ক্লেশে দিন কাটায়। সব-দাই সংসারে অভাব। এর প্রধান কারণ সংসারে কেবল স্ত্রীই নেই, সঙ্গে আছে আটটি ছেলেমেয়ে ও তাদের বিভিন্ন সমস্যা। তারও পরে শাস্ত্রীমশায়ের বোন ও তার মেয়ে এসে হাজির হয় ওদের বাড়ীতে বসবাসের জন্যে। অপরের থেকে সাহায্য নেবার পক্ষপাতি নয় শাস্ত্রীমহাশয়। বাধ্য হয়ে বাড়ীর সকলেই প্রায় অনাহারে দিন কাটাতে লাগলো। এমন কী ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত খাদ্যের অভাবে উপোস করতে লাগলো। শাস্ত্রীমশায়ও পুরোহিতের কাজের অভাবে পাথর ভেঙ্গে সংসার চালাতে লাগলো। এসব দেখে বড় মেয়ে শালিনী আপত্তি জানালো। সে কেবল সকলের দিদিই নয়, সকলের মায়ের মত। ছোট ছোট ভাইবোনেদের না খেয়ে সে কিছুতেই মরতে দেবে না। প্রথমে একটি করণিকের চাকুরী পেলেও শালিনীর অফিসের বসদের নজর তার রূপ ও যৌবনের ওপর কাজের দক্ষতার উপর নয়। ভাইয়ের ডাক্তারী পড়বার জন্যে চাই প্রচুর টাকা। তাই ছুটতে হোল সমাজসেবী এম-এল-এর কাছে। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে এক কুচক্রীর হাতে আত্মসমর্পণ করলো শালিনী ভাইয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এইভাবে চাকুরীর উন্নতি করে দিল্লীতে বদলী হয়েও অর্থবান কুচক্রীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না সে। শেষ পর্যন্ত অর্থের বিনিময়ে ওকে তারা বারবনিতায় পরিণত করলো। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটা যখন বাড়ীর সকলে জানলো তখন সকলেই, এমন কী ছোট ভাই যার জন্যে ওকে প্রথমে আত্মবিসর্জন দিতে হোল। সেও ওকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করলো। তবু পৃথিবীতে এখনও সৎব্যক্তি আছে। খেলার সাথী অশোক ওকে ভুল বুঝলেও বিবাহের মধ্যে দিয়ে একদিন স্বীকৃতি দিতেও দ্বিধা বোধ করলো না, মাও ওকে আশীর্বাদ করলো।

অভিনয়ে শালিনীর ভূমিকায় মুমতাজ জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। অন্যান্য ভূমিকায় রাজেশ খান্না (অশোক), এ কে হাঙ্গল (রামশাস্ত্রী,) নিরুপা রায় (মা), ললিতা পাওয়ার (পিসি), মনমোহন কৃষ্ণ (অশোকের বাবা) এবং তিন বোনের ভূমিকায় রীতা ভাদুড়ী, বন্দনা রানে, কল্পনা পাল ও ভাইয়ের ভূমিকায় আদিল-এর অভিনয় যথাযথ। কলা-কৌশলের কাজ বিশেষ করে সম্পাদনার কাজ অপূর্ব। কাহিনীতে নতুনত্ব না থাকলেও পরিচালক কে বালচন্দ্র ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে বিতর্কিত বিষয়বস্তু পর্দায় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

নৌশাদের সঙ্গীত পরিচালনা ছবিটিকে প্রাণবন্ত করেছে।

—চিত্রদূত

একটা কথাঃ দেশের প্রয়োজনে—অর্থাৎ দারিদ্র্য দূর করার প্রয়োজনে—বিজ্ঞানীদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে হবে। কৃৎকৌশল হওয়া চাই গ্রামাঞ্চলের উপযোগী এবং স্থানীয় প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য-সাধক। নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যে উচ্চমানের কাজের নিদর্শন রেখেছেন তার স্বীকৃতি দেশে ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় পাওয়া যাচ্ছে। এখন খাদ্য ও জ্বালানীর উৎপাদন বৃদ্ধি করাটাই দেশের সামনে আশু সমস্যা।

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের বিজ্ঞান ফ্যাকালটির ডীন ডঃ শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায় (ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের তিনিই প্রথম মহিলা সভাপতি।) তিনি তাঁর ভাষণে একটি ভয়ংকর বিপদ সম্পর্কে গভর্ণমেন্টকে সতর্ক করে দেন। বিপদটি হচ্ছে বিজ্ঞানের স্নাতকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারী। এই বিপদের যদি প্রতিকার না হয় তাহলে দেশের যাঁরা সেরা নাগরিক তাঁরা যে শুধু হতাশ হবেন তাই নয়—রুদ্ধ ও অসহিষ্ণুও হয়ে উঠতে পারেন। সেই অবস্থা সমাজের পক্ষে আরও গুরুতর।

অসাধারণ গবেষণা-কর্মের জন্য বাইশজন তরুণ বিজ্ঞানীকে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। এই ব্যবস্থা এখন থেকে চলবে, 'জ্ঞানের অগ্রগতিতে অসাধারণ অবদান রাখতে পারবেন ত্রিশ বছরের কম বয়স্ক এমন তরুণ বিজ্ঞানীদের একটি ব্রোঞ্জপদক ও কিছু নগদ টাকা দিয়ে প্রতি বছর সম্মানিত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

অতঃপর বিভাগীয় সভাপতিরা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বহু গুরুতর বিষয় নিয়ে ভাষণ দেন।

অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলন

দিল্লীর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস শুরু হবার সাতদিন পরে (১০ই জানুয়ারি) বাঙ্গালোরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অন্য একদল বিজ্ঞানী সমবেত হন তাঁদের নাম 'উন্নতিশীল দেশগুলির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটি বা সংক্ষেপে কস্টেড। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল—'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ভারতের পক্ষে ব্যর্থ হয়েছে'। বুঝুন ব্যাপারখানা বিজ্ঞানীদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

আসলে এই সমস্ত কংগ্রেস ও সম্মেলনের কি বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে, সেগুলো কি অপ্রয়োজনীয় আচারে পর্যবসিত হয়ে যায়নি? এ-প্রশ্ন তুলেছেন অজ্ঞান ও অপগণ্ডরা নন মহান বৈজ্ঞানিক কর্মে নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা নিজেরাই। এ-বিষয়ে একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ লিখেছেন বোম্বাই হফকিন ইনস্টিটিউটের ইমিউনোলজি বিভাগের প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ এস এস রাও (সায়েন্স টুডে, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫)। প্রবন্ধটির শুরু এইরকম ঃ

শীতকালটি বৈজ্ঞানিক সভাসমিতির পক্ষে চমৎকার সময়। আপনি যদি বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের প্রশাসক হন তাহলে স্থান থেকে স্থানে সভা থেকে সভায় পর্যটন করে বেড়াতে পারবেন। এই সমস্ত সভার আয়োজন করবে পেশাদার সংস্থা বা এজেন্সিগুলো —যেমন সি-এস-আই-আর, পারমাণবিক শক্তি কমিশন আই-সি-এম-আর ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আপনাকে যেতে হতে পারে দিল্লীর শারীরবিদ্যা কংগ্রেসের মতো আন্তর্জাতিক সভাতে। সেখানে ডঃ এইচ জি খোরানা প্রচুর ভিড় টানেন। তবে বৃহত্তম ভিড় জমে থাকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে, যেটি সচরাচর অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে। যেটি সচরাচর উদ্বোধন করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে অবশ্যম্ভাবীরূপে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে ডাক দেওয়া হয় তাঁরা যেন দেশের সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে বারে বারে এই যে একই ডাক দেওয়া হচ্ছে তার মানে দাঁড়ায় —বিজ্ঞানীদের যা করতে বলা হচ্ছে তা তাঁরা করেন না। কথাটা মনে হয় সত্য। হফকিন ইনস্টিটিউট থেকে অবসর নেবার আগে ডঃ রাও বছরের পর বছর যে-সব বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন সেখানে তিনি বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন যে অধিকাংশ নিবন্ধই নিম্নমানের। তাঁর মনে হয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তিই ভাগ্যবান যাঁরা শুধু বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও চায়ের আসরে যোগ দিয়ে থাকেন।

তখন তিনি ভেবেছেন এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সভা-সম্মেলনের সত্যিই কি কোনো সার্থকতা আছে? তারপরে 'সায়েন্স ফোরাম' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ তাঁর চোখে পড়ে। নিবন্ধটির নাম 'দরিদ্র জাতির দেশে বিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলন কি অর্থহীন অপব্যয়?' লেখকের নাম ডঃ রবার্ট অ্যান্ডারসন। প্রশ্নের জবাবে লেখক স্পষ্ট বলছেন, হ্যাঁ। এবং বক্তব্যের সমর্থনে জোরালো তথ্য উপস্থিত করেছেন। কানাডা পরিষদের একটি বৃত্তি নিয়ে (১৯৬৭-৬৯) তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাজের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান এবং এই অনুসন্ধানের ফলাফলের ভিত্তিতে রচিত নিবন্ধের জন্য শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ডঃ রাও মনে করেন, ডঃ অ্যান্ডারসনের বক্তব্য যদিও তিন বছর আগে প্রকাশিত কিন্তু এখনো পর্যন্ত রূঢ় বাস্তব।

বিষয়টি এতই গুরুতর যে বিজ্ঞানী অ-বিজ্ঞানী নির্বিশেষে সকলেরই এ-বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। আগামী বারে আমরা ডঃ রাও ও ডঃ অ্যান্ডারসনের বক্তব্য বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করব। তার আগে বিখ্যাত লেখক আর্থার কোয়েসলারের একটি উপন্যাসের বিষয়ে উল্লেখ করাটা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উপন্যাসটির নাম—

কল্-গার্ল

বৈজ্ঞানিক সম্মেলনগুলি আসলে সুসংগঠিত সার্কাস মাত্র তার বেশি কিছু নয়। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া ছাড়া বৈজ্ঞানিক সম্মেলনগুলি থেকে আসল লাভ কিছুই হয় না। বৈজ্ঞানিক সম্মেলন-রূপী এমনি এক সার্কাসের বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন আর্থার কোয়েসলার। সম্মেলনটি ডাকা হয়েছে এক আল্পাইন গ্রামে। তাতে যাঁরা যোগ দিতে এসেছেন তাঁরা এতই পরিচিত টাইপ যে চিনতে একটুও ভুল হয় না। কোয়েস্লার তাঁদের নাম দিয়েছেন—কল-গার্ল।

কলগার্ল কেন? উপন্যাসের একটি চরিত্র তা বুঝিয়ে বলে। বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দেওয়াটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, বা নেশায়। চিঠি বা টেলিফোন মারফৎ ডাক আসে কোনো নামডাকওলা সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয় বা ফাউণ্ডেশন থেকে। বিনীত প্রার্থনা শোনা যায়—আপনি কি অনুগ্রহ করে একটু সময় করতে পারবেন, হে হে, আমরা কৃতার্থ হব, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পরে তাঁরা আসেন, সেই একই চেহারা, দেখে মনে হয় যেন পোকায় খাওয়া। আসেন নির্ধারিত সময়ের চেয়েও একটু দেরি করে, কেননা, জাতির পক্ষে আরো অনেক বেশি জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো কাজ সারবার জন্য তাঁদের অন্যত্র যেতে হয়েছিল। অনেকে আসেন নির্ধারিত সময়েই কিন্তু অনেক আগেই চলে যান, কেন না, আরো জরুরি ডাক। তাঁদের সারতে হবে যে নিবন্ধগুলো তাঁরা পড়েন সেগুলো অন্য যে-কোনো সময়ে অন্য যে-কোনো জায়গায় পড়া চলত। সম্ভবত একই নিবন্ধ সামান্য অদলবদল করে সর্বত্রই পড়া চলে। তাঁদের দেখে মনে হয় একদল ভ্রাম্যমাণ কুস্তিগীর যেন। সকলেই জানেন কার আয়ত্তে কী প্যাঁচ আছে, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে তাঁরা লড়াই করে যান।

ভঙ্গিটাও সনাতন। কেউ বলতে চান একমাত্র তাঁর ঝুলিতেই আছে সর্বরোগের দাওয়াই। কারও অসহিষ্ণুতা এত বেশি যে অন্য কেউ মুখ খোলা মাত্র ঘোরতর সমালোচক হয়ে ওঠেন। কেউ বা হাতে পাঁজী মঙ্গলবার করতে রাজী নন। মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাটটি প্রবন্ধ পাঠ। কোনো কোনোটি আদৌ পড়া হয় না। তাতে কোনো ক্ষতি নেই সম্মেলনের পরে মহাভারতের চেয়েও বৃহদাকার যে পঞ্জী প্রকাশ করা হবে তাতে কিছুই বাদ পড়বে না। এমনকি শুভেচ্ছার বাণীগুলোও নয়।

এই সমস্ত সার্কাসের জন্য টাকা যোগান কারা? অবশ্যই ধন-কুবেররা। নামান্তরে কোনো সংস্থা বা ফাউণ্ডেশন বা নিদেনপক্ষে গৌরীসেনীয় সরকার। টাকার তহবিল থাকলেই তা খরচ করতে হয়, তা খরচ করার ব্যবস্থা করতে হয়—অতএব সার্কাসের আয়োজন। অন্য গতি নেই। এই চক্র চলতেই থাকে, চলতেই থাকে।

এক সার্কাস শেষ হয়, তখন অন্য কোথা অন্য কোনো সার্কাসে যোগ দেবার ডাকের জন্য অপেক্ষা করা চলে।

আর্থার কোয়েস্লার

তালপা

তানসেন সংগীত সম্মেলনঃ

কলামন্দিরে সাতদিনব্যাপী তানসেন সংগীত সম্মেলনে আকর্ষণীয় আসর হয়ে উঠেছিলো সারারাত্রব্যাপী অনুষ্ঠানটির—প্রতিটি মুহূর্তে।

সুরু হয়েছিলো সন্ধ্যা মুখার্জির গাওতা দিয়ে। তারপর আসরে বসলেন বিসমিল্লা খাঁন। ধরলেন একটি অপ্রচলিত রাগ—চন্দ্রপ্রভা। গান্ধার পঞ্চম বর্জিত। মাঝে মাঝে শিবরঞ্জনীর আভাস ঝলকে উঠে পরিবেশকে 'রোমান্টিক' মাধুর্যে রঙিন করে তুলেছিলো। অনেকদিন বাদে খাঁসাহেবকে পাওয়া গেলো তাঁর নিজস্ব মেজাজে। প্রতিটি পর্দায় তিনি যেন ডুবে গেছেন। হারিয়ে গেছেন ধ্যানমৌনতায়। পর্দা থেকে পর্দান্তরে ও স্বরসমন্বয়ে গেছেন যেন সৃষ্টির দুর্বার প্রেরণায় আর সারা প্রেক্ষাগৃহকে সম্মোহিত করে রেখেছেন—তাঁর সাধনা লব্ধ দুর্লভ শক্তিতে। দ্বিতীয়ার্ধে পূর্বী ধনে ও চৈতীর ছোঁয়া উদাস হাওয়ায় দুলে ওঠা ফুলের অফুরন্ত সৌন্দর্য লোক এক নিমেষে ফুটে ওঠে—। এ ইমেজ বিসমিল্লা খাঁনই সৃষ্টি করতে পারেন।

বিসমিল্লা খাঁর অমন জমজমাট অনুষ্ঠানের পর অন্য কোনো গান বা বাজনা জমে ওঠা সহজ নয়। সেই কথা স্মরণ করেই সঙ্ঘসচিব এর পর বসালেন সুনন্দা পট্টনায়কের মত শক্তিশালী শিল্পীকে। অনুষ্ঠান বিন্যাসের প্রশংসা না করে উপায় কি? আসরে উপস্থিত অনেক পুরাণো শ্রোতা মনে করিয়ে দিলেন—ডোভার লেনে একবার রবিশংকর আলি আকবরের যুগলবন্দীর পরও সুনন্দাকে বসানো হয়েছিলো—এবং সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে সেদিনের সেই কিশোরী মেয়েটিও ভোর ছটা থেকে সকাল আটটা অবধি প্রতিটি শ্রোতাকে আরও শুনতে চাই এর মেজাজে ধরে রেখেছিলো (যদিও আজও তিনি পদ্মশ্রী বা অন্য কোনো খেতাব বিভূষিতা নন)।

যাই হোক—সুনন্দা পট্টনায়ক কৌশীকানাড়া ধরতে না ধরতেই উচ্চগ্রামী কণ্ঠের স্বর শ্রুতির পূর্ণতা উচ্চারণ সৌন্দর্য রাগরূপের যথার্থ ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছিলো সুর ও ছন্দের অদৃশ্য রেখায়। গোয়ালিয়র ঘরাণার ধ্রুপদী ব্রন্দেজ বাট বোলতানও—তুলনা বিহীন তারাণায় যেন সদাপটে বিঘোষিত। এরই মাঝে মাঝে স্বরের উত্তাল গতিকে থামিয়ে রুলাবন্তী ঢঙের ছুটতানের সূক্ষ্ম কাজ অন্তরার তন অতিতারা স্পর্শন—'আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের স্বপ্নময়তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সকলের অনুরোধে ইনি শেষ করলেন—'জগন্নাথ স্বামী' ও যোগী মত যা' দিয়ে। এঁর সংগে সুযোগ্য তবলাসংগত করেছেন স্বপন চৌধুরী।

ভৈরবীর রেশের সংগে সংগীত রেখে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বাজালেন ভৈরব—সকালের প্রার্থনা ও সৃষ্টিকে জাগ্রত করবার—মন্ত্র যেন ধ্বনিত হোল—তাঁর রেখাবও ধৈবতের সংগতে। আলাপে—আলউদ্দিন ঘরাণার সেই ধ্রুপদী বিস্তার গতের আশ্চর্য ছন্দ সম্ভার অবিশ্বাস্য রকমের জটিল ও কঠিন মীড় ও ঝটকার অনায়াস—বিহারে নিখিলবাবু বারে বারে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি শুধু শিল্পী নন—সিদ্ধ সাধকও। তবলা সংগতে রসের সমারোহ ঘটিয়েছেন কানাই দত্ত।

সরাফৎ খাঁর গান আগ্রা ঘরাণার ওজস ও বাজারে সমৃদ্ধ। শ্রোতাদের আকর্ষণ করে তাঁর সুগম্ভীর কণ্ঠের ভরাট আওয়াজ। শিল্পীদের মধ্যে সরাফৎ খাঁন ও সুনন্দার গানেই প্রাণখোলা আ-কারান্ত তান শোনা গেলো। অকারণ পুনরাবৃত্তি ত্যাগ করে আর একটু গুছিয়ে গাওয়া অভ্যাস করলে এঁকে আগ্রা ঘরাণার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ গায়ক বলা যায় (অবশ্য লতাফৎ খাঁ সাহেবের পরে)।

অন্যান্য দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে আনন্দদায়ক শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেমন্ত। এ রাগ আলাউদ্দিন খাঁন ঘরাণার যন্ত্রীরা যন্ত্রে জনপ্রিয় করেছেন। কিন্তু কণ্ঠসংগীতে বড় একটা শোনা যায় না।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে রাগের রূপ যেমন প্রাঞ্জল—তেমনই উপভোগ্য নানান তানের বৈচিত্র্য। দ্রুত অংগে বেশ মজার সৃষ্টি করেছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোলো যে সবাই সাধারণতঃ সুর-বিস্তারেই আগ্রহী। কিন্তু ইনি তাল-বিস্তারের দক্ষতায় সবাইকে চমকে দিয়েছেন। কানাই দত্ত তানের জবাব তবলায় দিচ্ছিলেন—কিন্তু ইনি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে। তবলার জবাব কণ্ঠে দিয়ে শ্রোতাদের প্রচুর আমোদ দিয়েছেন।

আর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হার্মোনিয়ম। পুরিয়া ও পিলুতে—কখনও বড়ে গোলাম আলির তান কখনও সানাই-এর ভরাট কাজ। পিয়ানোর হার্মনিতে ইনি পাণ্ডিত্য ও শিল্পবোধের অবিস্মরণীয় নজীর রেখেছেন। তবলায় মহারাজ বানার্জিও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

গিরিজা দেবীর খেয়াল ভালই। কিন্তু তার চেয়েও চিত্তগ্রাহী তাঁর ঠুংরী ও টপ্পা। এবং এই অংগেই শিল্পীকে পুরোপুরি পাওয়া গেলো।

রবীন ঘোষ (বেহালা) ও বিমল মুখোপাধ্যায়ের (সেতার) দ্বৈতবাদনে একজনের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ এবং অন্যের পান্ডিত্য খন্ড সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে কিন্তু উভয়ের কল্পনা একাত্ম হয়ে কোনো অখন্ড অনুভূতিলোক সৃষ্টি করতে পারে নি।

আলি আকবরের আমেরিকার কলেজের শিষ্য বসন্ত রায়ের সরোদে অনেক প্রতিশ্রুতি মূর্ত হয়ে ওঠে।

তরুণ শিল্পী শ্যামল অধিকারীর গানে গুরু শৈলেন ব্যানার্জির সু-শিক্ষার ছাপ মুদ্রিত।

কিশোর শিল্পী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলালহরা তবলায় আর এক প্রতিভার সমাগমকেই ঘোষণা করে।

জিতেন অভিষেকীর গান ভীমসেন প্রভাবিত। ওর মধ্যে তাঁর স্বকীয় চিন্তা যেটুকু পাওয়া গেছে সেটুকুই তৃপ্তি দিয়েছে।

—চিত্রাংগদা

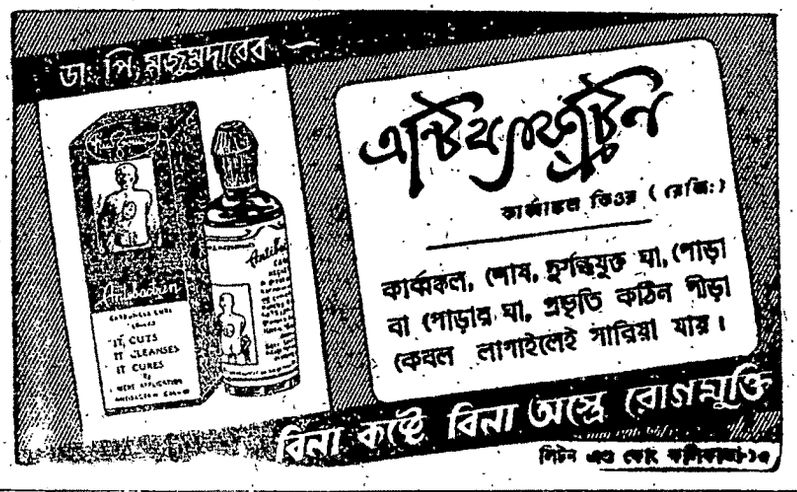

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ফাদার দ্যতিয়েন রেড রোড নামচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ-দেশে আছে লরি-সাহিত্য, ও-দেশে আছে রিকসা-কলাশিল্প। বাংলাদেশে আর যত-কিছুর অভাববোধ করুন না কেন রাজধানীর রিকসা-বাহিনীর বেলায় রঙের কোনো অনটন অনুভব করবেন না।

ঢাকার সাইকেল-রিকসার সংখ্যা আল্লা-ই জানেন ঃ সরকারি হিসেবে কুড়ি হাজার, সাধারণ শুমারিতে তেত্রিশ। প্রতিটি রিকসা আবার রাজপুতানী-সুলভ রঙ-বেরঙে সজ্জিত। ফরাসি প্রবাদ বলে ঃ 'রুচি ও রঙের বিচার করিবে না।' করিব না।

আমার রিকসার নম্বর ১৮০১৪, রিকসা-ওয়ালার নাম নসিরুদ্দিন; উভয়েরই হাঁপানি আছে। বাহনটির গায়ে বড় অক্ষরে লিখিত একটা নাম ঃ 'পথের বন্ধু'। প্রতিটি রিকসার একটি নাম থাকে—সাধারণত মিস্ত্রির, মহাজনের কিংবা তাদের কোনো ছেলেমেয়ের নাম ঃ সালিম, নাসিম, ফজল মিস্ত্রি...। সীটের পশ্চাৎপট এক চিত্রিত দৃশ্যে অলঙ্কৃত। আমার রিকসার দৃশ্যটা ইসলামী সংস্কৃতি অনুযায়ী—জীববর্জিত ঃ কোন এক কাল্পনিক তাজমহলের অপটু নকসা। সংখ্যাধিক রিকসার শিল্পকার্য অবশ্য অধিকতর দুঃসাহসিক ঃ পেখম-মেলা ময়ূরের ছবি, সিনেমার নায়িকার প্রতিকৃতি, স্বাধীনতা-সংগ্রামের দৃশ্য ঃ সৈনিক হন্তে-প্রহৃতা এক বীরাঙ্গনা।

দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞপ্তি ঃ 'তোরা যা বলিস ভাই মোরা মুজিববাদ চাই' কিংবা মিষ্টতর সুরে ঃ শ্রমের শেষে ক্লান্তির বন্ধু ঃ পল্টন সিগারেট...পাদুকা-শিল্পে দুটি অক্ষর একটি নাম ঃ বাটা।

লাল ত্রিকোণের বড় একটা বালাই নেই ঃ সলামী সংস্কৃতিতে নাকি 'জনসংখ্যা বন্ধ করার অধিকার কাহারও নাই'। একটিমাত্র প্রাচীরে একটিমাত্র আবেদন দেখলাম ঃ যতন করি আমরা গড়ি/সুখের সংসার। সুখের সংসার যে গো/ছোট পরিবার...'

বাংলাদেশের রাজধানীতে আঠারোটি ছবিঘর আছে। সুন্দর সুন্দর সব নাম ঃ সংস্কৃত (মানসী, বলাকা, আনন্দ অভিসার...), আরবী-ফার্সি (নাজ, আজাদ নিসাত, শ্যাবিস্তান...) এমন কি ইংরেজি (ডায়ানা, মুন, স্টার, লায়ন...)। বিউটি ঘরটা সেই অবিস্মরণীয় পঁচিশে মার্চ ভেঙে গিয়েছে। সারা শহরে আজ এক নতুন ছবির প্রকাশপত্র ঃ 'আবার তোরা মানুষ হ'; আটটা ছবিঘরে একসঙ্গে তার 'শুভমুক্তি'। ১৯৬৫ সালের ৬ই অকটোবরের পর থেকে ভারতীয় কোনো ছবি আর আসে নি, তবে হ্যাঁ, টেলিভিশন যাঁদের আছে তাঁরা মহানগর ও তিন কন্যা, অতিথি ও অপুর সংসার দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

লায়ন ঘরে প্রবেশ করলাম। কুর্তা-পরা এক কর্মচারী ভদ্রভাবে জিগ্যেস করলেন আমি 'সাংবাদিক' কি না। ভদ্রভাবে উত্তর দিলাম, 'সাহিত্যিক' আখ্যায় অধিকতর সম্মান ও আনন্দ বোধ করলেও সাংবাদিক বলে আমাকে যদি অল্পমূল্যে উচ্চশ্রেণীর আসনে বসতে দেওয়া হয়, তবে আমি সাংবাদিক বটে। প্রবেশমূল্য এক থেকে চার টাকা; তিন বৎসর পূর্ণ হলেই বাচ্চাদের ফুল টিকেট লাগে। হ্যাঁ, টিকেট; টিকিট ওরা লেখে না। আটশটা সীটে; তার মধ্যে আবার তেতোলায় পঞ্চাশখানা মহিলাদের জন্য। ছবিটা পুরোনো খুব। হপ্তাখানেক চলবে ঃ 'কোথায় যেন দেখেছি'। পাঁচটি গান, আড়াইঘণ্টার শো।

কুর্তা-পরা কর্মচারীটি মিষ্টি আনিয়ে চা খাওয়ালেন। মিষ্টিগুলো যে পুরোনো বইয়ের ছেঁড়া পাতায় মোড়া ছিল, তা পড়ে শেখা যায় ঃ মা বাপের আঘাত গৌরব মনে কর...চিঠি লিখিয়া তাহার উপর কিছু ধুলা ছড়াইয়া দাও...রৌদ্রে থাকিয়া যে-পানি গরম হইয়া গিয়াছে, সে-পানি ব্যবহার করিও না ঃ শ্বেত-কুষ্ঠ রোগ জন্মাইতে পারে...' ইসলামীয় সংস্কৃতি, দেখছি, সর্বত্র বিদ্যমান।

আমাদের আছে রেড রোড, পার্ক-সার্কাস, আপার সার্কুলার রোড...ওদের গ্রীণ রোড, লেক সার্কাস, আউটার সার্কুলার রোড। আর হ্যাঁ, ওদের ডি আই টি অ্যাভিনিউ-ও আছে। তাছাড়া ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, এলিফ্যান্ট রোড (যার নামান্তর হাতী সড়ক)।

দেশে দেশে দেখি, যাবতীয় রাস্তাঘাট দিনে দিনে মানুষের স্মৃতিরক্ষার্থে নব-দীক্ষা লাভ করে। রেওয়াজটা ইসলামীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞরাই বলবেন, তবে বাংলাদেশের রাজধানীতে গিয়ে দেখবেন কত হাজী অমুক লেন, কত কাজী তমুক রাস্তা! অমুমিন নামও আছে ঃ ওয়াল্টার স্ট্রীট, মিটফোর্ড রোড, হারুন লেন.....

গঙ্গারাম বাজার লেন, রাধাশ্যাম সাহা স্ট্রীট ...। রাস্তাঘাটের নামান্তরীকরণ প্রথাটার যৌক্তিকতা বিচার্য। আমি কিন্তু পছন্দ করি ঃ তোপখানা রোড, পীলখানা রোড, কসাইটুলি লেন, মালীটোলা লেন, পাঁচ ভাই ঘাট লেন, ভূতের গলি...নামগুলো এখনও শোনা যায়, যদিও বেশির ভাগ সময় বোধ হয় নানা-নানী, দাদা-দাদীর মুখে।

রাস্তার দু ধারের ফুটপাত কোথাও প্রক্ষালনালয়ে কিম্বা প্রস্রাবখানায় পরিণত হয় না (পুলিশ নাকি ধরে...); উলঙ্গ কোন শিশুকেও কোথাও দেখিনি। দেখেছি ফুটপাতে শুয়ে একদল ভিখারি একটানা দু ঘণ্টা ধরে আল্লার নাম জপ করছে—ঘণ্টায় পাঁচ হাজার বার করে। আমার কৌতূহল দেখে এক সহৃদয় পথিক বুঝিয়ে দেন, দুনিয়ার সমস্ত পানি কালি করে জমিনকে কাগজ বানিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত লিখলেও আল্লার নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা সম্ভবপর নয়। নামটার একনিষ্ঠ জিকিরে (জাপ) বহুবিধ কলা-মসিবত দূরীকৃত হয়। তবে হ্যাঁ, সঠিক আরবী উচ্চারণ চাই, আর সব নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা প্রয়োজন।

হিন্দুরা যেমন সর্পদংশনে মনসাকে বসন্ত রোগে শীতলাকে, পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় ষষ্ঠীকে ডাকে, খৃস্টানেরা যেমন গলপীড়ায় সেন্ট ব্লেজকে মৃগীরোগে সেন্ট গায়কে সারমেয়দংশনে সেন্ট রককে ডাকে, ও-দেশের মানুষ তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সংকটে একে ও-অদ্বিতীয় আল্লাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে আহ্বান করে ঃ 'আল কাবির' আপনাকে সাপের (কিংবা কুকুর বিছে প্রভৃতি প্রাণীর) দংশন থেকে রক্ষা করবেন, 'আল ওয়াকিল' ঝড় তুফান শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত থেকে...। অন্য উপায় অবশ্য আছে ঃ 'আল ওয়ালিউ' নামটা কাগজে লিখে, কাগজটা কুয়োতে ফেলে সেই কুয়োর পানি ঘরে, উঠোনে, চালায় ছিটিয়ে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রেহাই পাবেন। গর্ভপাতের আশঙ্কায় স্বামী গর্ভিনীর পেটের উপর 'আল সুবুদিউ' নামটা উনিশবার লিখবেন, মায়ের স্তন্য যদি হ্রাস পায় আল মাতিনু নামটা কাগজে লিখে কাগজটা পানিতে ধুয়ে পানিটা তাকে পান করাবেন.... (ক্রমশঃ)

অপর্ণা সেন অসময় ছবির সেটে। ফটো ঃ অমৃত

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বঙ্কিম দত্ত যা চান রঞ্জু তা নয়। তার চিন্তার জগৎ পরিবেশ সবই স্বতন্ত্র। আর যুঁইদি এসে যেন ষোল বছরের রঞ্জুর মানসিক জগৎকে পর্যন্ত আমূল পাল্টে দিয়েছে। বিবাহিতা যুঁইদি যেন তাকে কাঁচপোকার মত আকর্ষণ করছে। বঙ্কিমবাবুর মত কি অমিয়ই হতে পেরেছে? শুধু একটা ভয় তার রাবার মতই। তার বন্ধু রুদ্রেন্দু গরীব এবং বিপ্লবী মেজাজের বলে তাকে সেও এড়িয়ে চলতে চায় ভয় করে। সেই রুদ্রেন্দুর সঙ্গে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল অমিয়র। প্রথমটা সে খুব বিব্রত হলেও পরে সামলে নিল এবং বেশ ঠাট্টার মেজাজেই ঠুকে ঠুকে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। যেন একটা মজার লোকের সঙ্গে কথা বলছে সে।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ রঞ্জুও দেখে ফেলল দূর থেকে। বাবার পাশে এক ঝাঁক টিয়ের মত টুটুলদের দলটা। সবাই আজ শাড়ি পরেছে। বাবাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বুড়ো ভালুক। তার পাশে বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে মনে হচ্ছে ভীরু রোগা তাড়া খাওয়া শেয়াল। বাবার পাশে গোপাও আছে। তার সঙ্গে গোপার একটা নীরব সম্পর্ক আছে। যেটা কেউ জানে না। কাল রঞ্জু যুঁইদির সঙ্গে কেণ্টনগর চলে যাবে বেশ কিছুদিনের জন্যে। সেই খবরটা ওকে দেবার জন্যে ভেতরে ভেতরে চঞ্চলতা অনুভব করে রঞ্জু।

(কুড়ি)

শিউলির গন্ধে ভুরভুর করছে অম্বুজা-নিলয়ের বাতাস। বিশেষ করে নিচে বারান্দায় দাঁড়ালে পাগল করে দেবার অবস্থা। তার ওপর একাদশীর চড়া জ্যোৎস্না। বাগানের গাছগুলি কী অসম্ভব চিকচিক করছে!

গানটান শেষ। এখন ওদের বাড়ি ফেরার পালা। আটটা ভজন গেয়েছে গোপা একলা। গৌরী গেয়েছে তিনটে নজরুল-গীতি। আর কেউ অবশ্য গান করে নি: পারেও না তেমন। বসে বসে গান শুনেছে। গৌরীর গলাও বেশ ভাল। তবে গোপার মতন নয়।

গান শেষ হতে দোতলা থেকে সবাই নিচে নেমে এসেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। অমিয়বাবু মাঝখানে। তাঁকে ঘিরে টুটুলের বন্ধুরা কলগুঞ্জন করছে। বুক ভরে শিউলির গন্ধ নিচ্ছে। বাগানের শোভা দেখছে। গ্রীলের ফাঁক দিয়ে ছোট বড় মাঝারি বরফির সাইজের কাটা কাটা জ্যোৎস্না এসে ঠিকরে পড়েছে তাদের কপালের ওপর নাকের ওপর ভুরুর কিনারে শাড়ির ভাঁজে চুলের ঢেউয়ে।

অল্প বাতাসে কিছু চুল উড়ছে কোনো শাড়ির আঁচল কাঁপছে। ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে শিউলি গাছটা। একটি ফুলও এখন নিচে ঘাসের ওপর পড়ে নেই।

—উঁহু এখন তো ফুল ঝরার সময় নয়। অমিয় বললেন রাত ন'টাও বাজে নি। ঝরতে আরম্ভ করবে সেই ভোর তিনটে থেকে। টুপটাপ টুপটাপ ডাল থেকে লাফিয়ে ঘাসের বিছানায় পড়ে সব শুয়ে পড়বে।

—ইস তখন না জানি দৃশ্যটা কত সুন্দর! রুমি বলল আমার ভীষণ ইচ্ছে করে টুপটাপ শিউলির ঝরা দেখতে।

—তাহলে তো ভোর রাত অবধি তোমাকে এখানে জেগে বসে থাকতে হয় দিদিমণি।

সবাই চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। সকলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বঙ্কিম দত্ত। টুকটুক করে কখন ঠিক নিচে নেমে এসেছেন।

অবশ্য বুড়ো সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে আছেন। দোতলায় অমিয়বাবুর শোবার ঘরে গানের আসর বসেছিল। ওটাই বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘর। বঙ্কিম দত্ত বাইরে বারান্দায় দরজার কাছে একটা চেয়ার বিছিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বসে সব কটা গান মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। গানের ফাঁকে ফাঁকে ওরা যত কথা বলেছে সব কথায় তিনি কান পেতেছেন। এবং দু-একটা মন্তব্যও করেছেন। ওরা যতবার হেসেছে তিনিও হেসেছেন। এবং ভিতরে বসা অমিয়বাবুর মতন তিনিও বারান্দায় দরজার এ-পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে এক-একটা গান শেষ হতে উচ্চ কণ্ঠে প্রচুর বাহবা জানিয়েছেন। কাজেই বুড়োর উপস্থিতি সম্পর্কে টুটুলের বন্ধুরা গোড়া থেকে সচেতন ছিল। কিন্তু এখন রাত করে তিনি নিচে নেমে আসবেন ওরা যেন ভাবতে পারে নি।

—কি হল চুপ করে গেলে যে। বঙ্কিম দত্ত এবার সরে এসে মেয়েদের প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়ান।

রাত জেগে এখানে বসে থাকার প্রস্তাবের ভিতরে রুমি কি বলবে বুঝতে পারছিল না। অন্য বন্ধুদের দিকে চোখ রেখে ঠোঁট টিপে হাসছিল। ওর দেখাদেখি গৌরী চামেলী চন্দনা গোপা ও ঝুমঝুম ঠোঁট টিপে হাসে।

—বেশ তো দুম করে অমিয়বাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে বসেন যদি শেষ রাতের শিউলি ঝরার দৃশ্য দেখতে হয় সবাই না হয় রাতটা এখানে থেকে যাও। দারুণ মজা হয়।

যেন এ-প্রস্তাবটা আরও অদ্ভুত এবং চমকে দেবার মতনও বটে। না কি সাংঘাতিক রকম হাস্যকর। অমিয়বাবু ঠিক বুঝতে পারেন না। তাই মেয়েরা বুড়ো বঙ্কিমবাবুর কথায় যেমন সলজ্জ কৌতুক নিয়ে ঠোঁট টিপে চাপা হাসি হাসল এখন কিন্তু তা করল না—এক সঙ্গে সবাই ভীষণ শব্দ করে হেসে উঠল। বারান্দাটা প্রায় কেঁপে উঠল। যেন হাসির মধ্যে একটা রুক্ষতা অসংগতার ঝাঁজ বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে শোনা গেল।

অমিয়বাবু থতমত খেলেন। অপ্রস্তুত হলেন।

এক সঙ্গে হেসে উঠেই মেয়েরা তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেল। যেন তাদের নিজেদের কানেও হাসিটা বড় খারাপ লাগল। যেন এই হাসির ভিতর দিয়ে একটা বয়স্ক মান্য লোককে উপেক্ষা করার অপমান করার ঝোঁক প্রকাশ পেল। বারান্দাটা থমথম করতে লাগল।

শতবর্ষেরও বেশী সবার প্রিয়
নিপুণা গৃহিণীর চাই-ই চাই

কুকুমী

গুঁড়ো
মশলা

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)

২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৩-০৯৯৫,

ফ্যাক্টরী—কাশীপুর

iaa/KCD-75

22 FEB 1975

ফটো-অফসেট : এন, কে, গোসেন এণ্ড কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড

—থাক রাতটাত জাগতে হবে না। এই বেলা যে যার বাড়ি ফিরে যাও। সারা দিন তো বেড়িয়ে-টেরিয়ে আমোদ করে ফিরলে। তারপরও বেশ রাত করে ফেলেছ এখানে। এখন ঘরে না গেলে তোমাদের বাড়ির লোকেরা চিন্তা করবেন। আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন।

কথাটা ভেসে এল দোতলার প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি পথের মাঝখান থেকে। অমিয়বাবুর স্ত্রীর গলা। খুবই গম্ভীর। শুধু তাই না গলার স্বরে একটা চাপা ভৎর্সনার মতন কিছু যেন ফুটে উঠল।

ফলে নিচে বারান্দার আবহাওয়াটা আরও অস্বস্তিকর আরও বেশি থমথমে শ্বাসরোধী মনে হতে লাগল।

টুটুলের বন্ধুরা ফিস ফিস করে পরস্পর কিছু বলাবলি করল। বোঝা গেল তারা লজ্জা পেয়েছে। যেন একটু ভয়ও পেল। অমিয়বাবু অত্যন্ত সাদাসিধে খোলা-মেলা মানুষ। তাঁর কাছে তাদের আব্দার ও প্রশ্রয়ের সীমা নেই। আর অমিয়বাবুর বাবা বুড়ো বঙ্কিম দত্ত তো দিদিভাইদের দেখলে রীতিমত চ্যাংড়ামি আরম্ভ করে দেন। হাসি-ঠাট্টার বান ডাকে বুড়োর। টুটুলের বন্ধু কাজেই সকলকেই বঙ্কিম দত্ত নাতনী সম্পর্কীয়া মনে করেন। কিন্তু অমিয়বাবুর স্ত্রী—টুটুলের মা। যে বেশ রাসভারী ও চাপা প্রকৃতির মানুষ টুটুলের বন্ধুদের তা অজানা ছিল না।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে সারা দিন পাখি দেখে আজ সন্ধ্যার পর টুটুলের বাবার সঙ্গে যখন তারা অম্বুজা-নিলয়ে ফেরে তখন অবশ্য টুটুলের মা বাড়ি ছিলেন না। ভবানীপুর নীহারের এক পিসতুতো দাদা থাকেন। নীহার তাঁকে দেখতে গিয়েছিল। ভদ্রলোক ক'দিন ধরে অসুস্থ। আজ দুপুরে হঠাৎ টেলিফোনে অসুখের বাড়াবাড়ির খবর পেয়ে নীহার তক্ষুণি ভবানীপুর চলে যায়। তারপর সন্ধ্যার পর কখন সে বাড়ি ফিরল অমিয়-বাবু যেমন টের পান নি তেমনি বঙ্কিম দত্তও ততটা খেয়াল করেন নি। তখন গানের আসর পুরোপুরি জমে উঠেছে। মন দিয়ে তারা গান শুনছিলেন। বাড়ি ফিরে নীহার যদি সরাসরি শোবার ঘরে ঢুকত অমিয়-বাবু স্ত্রীকে দেখতে পেতেন। বঙ্কিমবাবুও পুত্রবধূকে দেখতে পেতেন। কিন্তু নীহার শোবার ঘরে না ঢুকে সোজা রান্নার জায়গায় চলে গিয়েছিল। ঝি রান্না চাপিয়েছিল। তার আগে অবশ্য বঙ্কিমবাবু ঝি মালতীর মা-কে দিয়ে দোকান থেকে বিস্কুট আনিয়ে চা করিয়ে টুটুলের বন্ধুদের আপ্যায়িত করেছিলেন। অম্বুজা-নিলয়ের পক্ষে যেটা খুবই আকস্মিক ও নতুন। কেননা এ-বাড়ির কর্তা বুড়ো বঙ্কিম দত্ত সম্পর্কে 'কিপটে' বদনামটা প্রায় কিংবদন্তির মতন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ গানের আসর হঠাৎ চা-বিস্কুটের আবির্ভাব দেখে গৌরী লুকিয়ে রুমার উরুতে একটা চিমটি কাটে। ইঙ্গিতটা রুমা বুঝতে পারে। বাড়িতে টুটুলের মা উপস্থিত নেই বলে যে বুড়োর মেজাজ এতটা খুলে গিয়েছিল বুঝতে তাদের মোটেই বেগ পেতে হয় নি। রীতিমত জোড়া জোড়া ডাইজেস্টিভ বিস্কুট ও চা খাইয়ে টুটুলের বন্ধুদের খুশি করা! অমিয়বাবুর মেজাজ অবশ্য আজ সকাল থেকেই দারুণ খুশি ছিল। যে জন্য তাঁর আদর ও প্রশ্রয় এক এক সময় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর তাই না এই মাত্র তিনি এমন একটা কথা বলে ফেললেন যা শুনে টুটুলের বন্ধুরা হেসে কুটিকুটি। যেন তারা এখনও ছয়-সাত বছরের শিশু। সবাই আজ টুটুল-দের বারান্দায় রাত কাটিয়ে শেষ রাত্তিরে বাগানের শিউলি ঝরা দেখে যাক। টুটুলের বয়স যদি তেরো-চোদ্দ হয় তার বন্ধুরা তার চেয়ে কেউ ছোট তো নয়ই বরং দু-একজন ষোল-টোলয় পা দিয়েছে। এই অবস্থায় টুটুলের বাবা যে কি করে এমন বিদঘুটে একটা প্রস্তাব করতে পারেন শুনে তারা হেসে বাঁচে না।

যাই হোক সবাই যে-যার বাড়ি ফিরে যেত। কেউ এখানে রাত কাটাত না। এখনও এ-পাড়ায় পুরোপুরি ট্রাম বাস চলছে রিকশা চলছে। এইটুকুন রাতকে বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জের মেয়েরা রাত বলেই গণ্য করে না। কিন্তু হঠাৎ টুটুলের মা যেভাবে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন আর যেমন একটা গলার সুর করে কথাগুলি বললেন—জিনিসটা রীতিমত অপমানের মতন লাগছিল রুমা গৌরীদের। দিনের বেলা হলে বোঝা যেত তাদের মুখ রীতিমত কালো হয়ে গেছে।

কথাটা শেষ করে নীহার আর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকে না। তখনি আবার ওপরে উঠে যায়।

বঙ্কিম দত্ত ঘুঘু লোক। এত রাত করে বড় বড় মেয়েদের আটকে রেখে গানটান গাওয়ানটা অমিয়র ঠিক হয় নি। সারাদিন তো ওদের নিয়ে বোটানিক্যালের জঙ্গলে কাটিয়েই এল। বঙ্কিমবাবু বুঝতে পারলেন অমিয়র কথায় নীহার খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে। তাই পুত্রবধূ প্রায় সিঁড়িতে দাঁড়ান থাকতে থাকতেই অথবা ইতিমধ্যে যদি ওপরেও চলে গিয়ে থাকে নীহার যাতে সেখান থেকেও শুনতে পায় গলাটা সেভাবে বেশ উঁচু করে বড় করে বঙ্কিম-বাবু বললেন, না না আর শিউলি-ঝরা দেখার দরকার নেই। অনেকটা রাত হল। এবার দিদিভাইরা যে-যার বাড়ি ফিরে যাও।

কথাটা শেষ করেই বঙ্কিমবাবু চেঁচিয়ে রতনকে ডাকলেন। রতন গেট খুলে দে।

বঙ্কিমবাবুর নির্দেশ মতন সন্ধ্যাবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই চাকর অম্বুজা-নিলয়ের লোহার গেট-এ তালা ঝুলিয়ে দেয়। এখন বুড়ো কর্তার ডাক শুনে চাবি হাতে ছুটে এসে রতন তালা খুলে দিল।

টুটুলের বন্ধুরা আর অপেক্ষা করে না। চলি। একটা অস্ফুট শব্দ করে সবাই এক সঙ্গে বারান্দা থেকে নিচের ঘাসে নেমে গেল। এখন এই 'চলি'টা কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হল বঙ্কিমবাবু বুঝতে পারলেন না। বাগানের দিকে চোখ রেখে তারা কথাটা বলল। অমিয়র দিকে যেমন তাকাল না তেমনি মেয়ের দলটা তাঁর দিকেও আর ঘাড় ঘুরিয়ে একবারও তাকাল না। বৌমার কথায় ওরা অসন্তুষ্ট হয়েছে। চিন্তা করে তিনি চেহারাটা অতিরিক্ত গম্ভীর করে ফেললেন।

—দাঁড়াও। হঠাৎ হাত তুলে অমিয়-বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। টুটুলের বন্ধুরা তখন গেট-এর কাছে চলে গেছে। ব্যস্ত হয়ে অমিয়বাবু বারান্দার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামছিলেন।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ! বঙ্কিমবাবু ছেলেকে বাধা দিলেন।

—ওদের ট্রামে বাসে তুলে দিতে হয় বা কেউ যদি রিকশায় যায় রিকশা ডাকতে হয়।

—উঁহু দরকার নেই। বঙ্কিমবাবু জোরে মাথা ঝাঁকালেন। ট্রাম বাসে চলে যাবার ওদের অভ্যেস আছে। রিকশাও খুব ডাকতে পারবে। তুমি বরং ওপরে যাও।

—কেন দোষটা কি! রাত করে ওরা বাড়ি ফিরছে—একটু এগিয়ে দেওয়া কি আমার উচিত নয়!

—হ্যাঁ উচিত কিন্তু এখন উচিত নয়।

—কেন! হাঁ করে অমিয়বাবু তাঁর বাবার মুখের দিকে তাকান।

—তুমি ওপরে যাও। থমথমে চেহারা করে বঙ্কিমবাবু কথাটা আবার বলেন তারপর বেতের চেয়ারটায় বসে পড়েন। অমিয়বাবু আর শব্দ করেন না। এতক্ষণ পর কিছুটা যেন আঁচ করতে পারেন।

ওরা বেরিয়ে গেল। গেট বন্ধ করে দিয়ে রতন তালা লাগাচ্ছে। শিকলের ঝন ঝন শব্দ হয়। শিশুর মতন অমিয়বাবু ফ্যাল-ফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে থাকেন। লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে রুমি গৌরীদের শরীরের কিছু কিছু অংশ দেখা যায়। রাস্তার আলো পড়ে সবুজ শাড়ি ঝলমল করছে। সকলের আগে হাঁটছে বসন্ত বউড়ি—লেক গার্ডেন্সের রুমঝুম।

খোকনের পিছনে হাঁটছে কাঁকুলিয়া রোডের গোপা—অর্থাৎ ফ্লেমিঙ্গো। মাঝখানে রুমি গৌরী ও চামেলী। আজ টুকনী এদের সঙ্গে যায় নি। হঠাৎ অমিয়বাবুর খেয়াল হয় টুটুলকে যেন তিনি অনেকক্ষণ দেখছেন না।

তাই তো। বন্ধুরা চলে যাচ্ছে। এক-বারও ও নিচে নামল না। অমিয়বাবু ধড়ফড়িয়ে উঠলেন।

—কার কথা বলছ তোমার মেয়ে টুটুল? বঙ্কিমবাবু ছেলের দিকে ঘাড় ফেরান।

অমিয়বাবু থুতনি নাড়েন। হুঁ ও তো নীচে আসে নি।

—না। বঙ্কিমবাবু কেমন করে যেন শ্বাস ফেললেন। একটু থেমে থেকে জ্যোৎস্নায় মাখামাখি শিউলি গাছটা দেখেন তারপর আবার ছেলের দিকে ঘাড় ফেরান। —ও যে গানের আসর থেকে এক সময় উঠে গিয়েছিল তোমার খেয়াল আছে?

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

১৪ মার্চ ১৯৭৫ ॥ মূল্য ৬৫ পয়সা

ফাল্গুন · ১৩৮১

তাই নাকি। অমিয় অবাক হয়ে বাবার মুখ দেখেন। আমি কিন্তু লক্ষ্য করি নি।

—এই জগতে তুমি যে কি লক্ষ্য কর বুঝতে পারি না। বুড়োর গলায় আক্ষেপের সুর শোনা গেল। —তোমার ওই গৌরী মানে সাতসয়ালী বলে যাকে ডাক মনে আছে নজরুলের কে বিদেশী মন উদাসী গানটা তখন গাইছিল? ঝি এসে টুটুলকে ডেকে নিয়ে যায়। আমি ভাবলাম রান্নাঘরের কোন দরকারে মালতীর মা টুটুলকে ডাকছে —বৌমা বাড়ী নেই। এখন বুঝতে পারছি তোমার স্ত্রী ঠিক ওই সময় ওর ভবানীপুরের দাদাকে দেখে বাড়ী ফেরে এবং ঝিকে পাঠিয়ে টুটুলকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়। কেননা তারপর তোমার মেয়েকে আমি আর একবারও গানের আসরে আসতে দেখি নি। শেষ পর্যন্ত ওকে আর দেখলামই না। হুঁ নীচেও এখন নামল না।

—কি ব্যাপার! অমিয়বাবুর গলায় কেমন যেন একটা ভয় জাগল। আমি এত বড় জিনিসটা খেয়ালই করলাম না।

—তাই তো বলি, এই সংসারে কিছুই তোমার খেয়াল থাকে না তুমি চিরকাল ভ্যাবলারাম। বঙ্কিমবাবু গুম গুম স্বরে বলে উঠলেন।

—কেন টুটুলকে ও হঠাৎ এভাবে ডেকে নিয়ে গেল এর অর্থ কি? খুবই অভদ্রতা। তা ছাড়া টুটুলের বন্ধুরাই বা কি ভাববে। অমিয়বাবু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তোমার বৌমাকে আমি ঠিক জিজ্ঞেস করতাম। এটা কিছু বাজে লোকের গানের আসর ছিল না।

—আস্তে! বঙ্কিমবাবু হিসহিস করে ছেলেকে সাবধান করেন। শুনতে পাবে। হয়ত টুটুলের মা ওপরে রেলিং ঝুঁকে এদিকে কান রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

যেন তেতো ওষুধ-টুষুধ গিলছেন চেহারাটা এমন করলেন বঙ্কিমবাবু। আবার একটু সময় বাগানের দিকে চোখ রাখলেন। কিছু ভাবলেন। তারপর ছেলের দিকে মুখ ঘোরালেন।

—না ওরা মানে টুটুলের বন্ধুরাও এতটা খেয়াল করতে পারে নি। আনন্দের মধ্যে ছিল উত্তেজনার মধ্যে ছিল সব। তা ছাড়া একেবারে ছেলেমানুষ বাচ্চা ওদের ভেতরে এখনো তেমন কিছু কট পাঁচ তৈরী হয় নি—টুটুলকে কেন যে ঝি এসে ফট করে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল কেনই বা ও আর ফিরে এল না বা এখন ওরা চলে যাচ্ছে টুটুল একবার দেখা করতেও নীচে নামল না—এই নিয়ে ওরা হয়ত কিছু ভাবতই না। আমিও কি ছাই ভাবতাম। কিন্তু এখন ভাবছি—এখন নিশ্চয় রাস্তায় গিয়ে টুটুলের বন্ধুরাও জিনিসটা আলোচনা করছে। এইমাত্র বৌমা কেমন একটা ভঙ্গী করে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলে গেল। ওরা বেশ বুঝে গেছে টুটুলের মা বাড়ী ফিরে টুটুলকে আর গানের আসরে বসতে দেয় নি। নীচেও নামতে দিলে না।

—ছি ছি লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। কেন তোমার বৌমার এমনটা করার কারণ কি! যেখানে আমি ছিলাম আমার নিজের সন্তান টুটুল ছিল টুটুলের বন্ধুরা ছিল। এর মধ্যে খারাপটা কি ও দেখতে পেল।

—কি বলব বলো? খারাপ কি আমিই কিছু দেখছিলাম। আমি তো এত কড়া ডিসিপ্লিনের লোক। তা হলে আমিই বা বারান্দায় তোমার ঘরের দরজায় চোখের বিছিয়ে আগাগোড়া বসে থেকে ওদের গানটান শুনব কেন। যদি দোষের কিছু থাকত আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম না। তোমাকেও নিষেধ করতাম। কিন্তু করার কিছু নেই যে। টুটুলের মা নিশ্চয় জিনিসটা ভালভাবে নিতে পারে নি—পৃথিবীর এই নিয়ম সকলের দেখার পদ্ধতি ভাবনা চিন্তার ধারা এক রকম নয়—যদি এক রকম হত তো এটা স্বর্গরাজ্য হত এত বিরোধ কলহ হিংসা দ্বেষ মারামারি খুনোখুনির আগার হত না।

—অ্যাঁ! রেলিঙের কাছে সরে গিয়ে বাগানের দিকে মুখ করে অমিয় নিজের মনে গজগজ করতে থাকেন। আমি সাদা চোখে পৃথিবীটাকে দেখি— সরল মনে সব কিছু করে যাই আমার ভেতরে পাপ নেই, ক্লেদ নেই। শিশুর মতন সারাদিন আজ ওদের নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরে পাখি দেখিয়েছি কোন পাখি কি খায়, কেমন করে ডাকে কে কোন গাছে বাসা বাঁধতে ভালবাসে—সব ওদের বুঝিয়ে দিয়েছি, চিনিয়ে দিয়েছি। তারপর ফিরে এসে আবার গৌরীর কয়েকটা গান শুনলাম —এতে পৃথিবী অশুদ্ধ হয়ে গেল—আমি সাংঘাতিক একটা অপরাধ করলাম।

কথাগুলি শুনলেন বঙ্কিমবাবু। শোনার পর একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়লেন।

—ঐ তো মুস্কিল অমিয়! ছেলের চওড়া পিঠের ওপর চোখ দুটো ধরে রেখে তিনি আস্তে বললেন বৌমা তোমার মতন সরল শিশু হতে পারছে না—যদি পারত তবে কোন হাঙ্গামাই ছিল না। সারাদিন ওদের নিয়ে বনে-জঙ্গলে কাটিয়ে এলে এখন আবার ঘরে ফিরে রাত নটা পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে গানের আসর বসালে—এই জিনিস তোমার স্ত্রী সহ্য করতে পারছে না।

—কেন সহ্য করতে পারছে না এটাই তো আমার জিজ্ঞাসা। অসহিষ্ণু গলায় অমিয় বললেন এত ছোট মন এত সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীতে কোন মানুষের বেঁচে থাকা উচিত নয়।

—আসল কথা কি জান অমিয়?

—কি কথা শুনি। অমিয় ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আমার মনে হয় বিশেষ করে তোমার সম্পর্কে বৌমার আচার আচরণ দেখে আমার যা ধারণা জন্মেছে—গলার স্বরটা প্রায় নাকের সঙ্গে ঠেকিয়ে বঙ্কিমবাবু বললেন একটু যদি রোজগারপাতির দিকে তুমি মন দিতে তা হলে বোধ করি টুটুলের গা তোমার ওপর এতটা রাগারাগি দাপাদাপি করত না। তার মনটা আর একটু উদার হত প্রশস্ত হত—ঐ যাকে বলে সহিষ্ণুতা —টলারেশন—

—থাম থাম আর তোমাকে বলতে হবে না ব্যাখ্যা করতে হবে না। হাত তুলে অমিয়বাবু বাপকে নিরস্ত করেন।

এখন রাত—বারান্দার অন্ধকার ও গ্রীলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে আসা জ্যোৎস্নার হিজিবিজি রেখা মিশে একটা খাপছাড়া ঝাপসা দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। দিনের আলো হলে পরিষ্কার বোঝা যেত অমিয়বাবুর ফরসা মুখটা কেমন ছাইবর্ণ হয়ে গেল ও দুচোখের কোণার চামড়া কতটা কুঁচকে উঠল। এমন সুন্দর সুখী সুখী চেহারাটা প্রায় চেনাই যাচ্ছিল না। বুড়ো বাপকে তিনি থামতে বললেন কিন্তু তাঁর মুখ দিয়েও হঠাৎ কথা সরল না। ঠোঁটের কাছে এসে সব কথা আটকে আছে। আর সেই অস্বস্তি নিয়ে তিনি হাঁসফাঁস করছেন।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুজন সেদিকে ঘাড় ফেরালেন। রতন নীচে নামছে।

—কর্তাবাবু মা খেতে ডাকছেন। রতন বলল।

—হুঁ যাচ্ছি। বঙ্কিমবাবু মৃদু ঘাড় নাড়লেন।

—বড়বাবু ঠাঁই হয়েছে।

অমিয় শব্দ করলেন না। চাকরের মুখের দিকে তাকালেন না। অন্য দিকে চোখ রেখে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন।

(ক্রমশঃ)

অপূর্ব সুযোগ !

সিঙ্গার কোম্পানীর অভিনব পরিকল্পনা—

মেরিট*

সেলাই কলটির

দাম শোধ করুন

তিন মাসে

লিস্ট প্রাইসের চেয়ে এক পয়সাও বেশী দিতে হবে না

"সত্যিই অদ্ভুত!"

এখন সিঙ্গার কোম্পানী থেকে কিস্তিতে কেনার সুযোগ পাচ্ছেন। কত সুবিধে! বাড়তি খরচ মোটেই নেই।

"আমার অনেক টাকা বেঁচে যাবে!"

হ্যাঁ, দামটা চুকিয়ে দিতে লাগছে তিন মাস। তাহলে ভেবে দেখুন কত টাকা বাঁচাচ্ছেন। তাছাড়া লিস্ট প্রাইসের চেয়ে একটি পয়সাও বেশী দিতে হচ্ছে না। দামটাও কত তাড়াতাড়ি উসুল হয়ে যাচ্ছে দেখে অবাক হয়ে যাবেন। তারপর তো সবসময় কেবল পয়সাই বাঁচাতে থাকবেন।

"একটি পয়সাও বেশী দিতে হয় না!"

সাধারণতঃ কিস্তিতে কিনলে দামটা একটু বেশীই পড়ে। কারণ? কেন না, তাতে কোম্পানীকেও সামান্য বেশী খরচ করতে হয়। তবে তাতে আপনার লাভ বই লোকসান নেই। মেরিট সেলাই কলের কিস্তি দেবার সময় আপনার পয়সাও বাঁচছে! (দেরির খরচ বেঁচে যায়, তাই)।

"এমন সুযোগ চিরকাল থাকে না!"

ঠিক! সিঙ্গার কোম্পানী বেশী দিন এমন সুযোগ দিতে পারে না। তাই কাছাকাছি সিঙ্গার দোকানে কিম্বা ডীলারের কাছে গিয়ে পুরো খবর জেনে আসুন। খিগ্‌গীর! এ সুযোগ হারাবেন না।

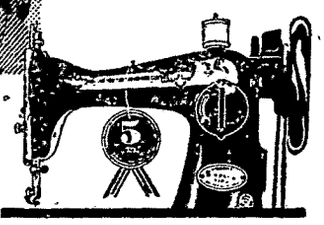

সব্বাই জানেন আমরাই
দুনিয়াকে শিখিয়েছি কলে সেলাই করার বিদ্যা।

সিঙ্গার

* সিঙ্গার কোম্পানীর ট্রেডমার্ক।

সিঙ্গার সোইং মেশিন কোং, ২০৭, ডি. এন. রোড, বোম্বাই ৪০০ ০০১

CHAITRA-SM-79 BEN

আজ কতকগুলি খাদ্য তালিকা দেবো যা খেলে শরীরে পরিমাণ মতন প্রয়োজনীয় ভিটামিন আয়রণ ইত্যাদি পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে ত্বক সুন্দর থাকে, আর চেহারায় স্বাভাবিকভাবে রূপ-লাবণ্যও অটুট থাকে। যাঁদের মেদবহুল শরীর তাঁদের খাদ্য তালিকা সম্বন্ধেই আলোচনা করব প্রথমে। তবে কতকগুলি ব্যাপারে আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া দরকার। যে আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনে নিতে হবে যে মোটা হওয়ার আসল কারণ কি। অনেক সময় দেখা যায় মোটা হওয়ার কারণ মেদ নয় জল অথবা গ্ল্যান্ড-এর কোন বিশেষ দোষের জন্যও দেহে মেদ হয়। অতএব শুধু মাত্র খাদ্য সম্বন্ধে সচেতন হলেই হবে না, হয়ত বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। এবং ওষুধও খেতে হবে। এছাড়া নানান ব্যায়ামের কথা বহু আগেই আলোচনা করেছি। সেগুলিও নিয়মিত করে দেখতে হবে। আসলে সব কিছুই একে অপরের সঙ্গে জড়িত, তাই প্রতিটি ব্যাপারেই বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে ও তা অভ্যাস করতে হবে। তাহলে ফল ভাল হতে বাধ্য। আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন যে ত্বক ভাল রাখার জন্য ও তাকে মসৃণ উজ্জ্বল রাখার জন্য অনেক সুন্দরীরা তেল বা ঘি একেবারেই খান না। এছাড়া ফলের রস দুধ টমেটো পাতিলেবু শশা বাঁধাকপির পাতা গাজর ইত্যাদির রস ও সেদ্ধ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় খেয়ে থাকেন। এবং এর ফল যে সত্যি অপূর্ব তাদের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার জন্যও রং-এর হেরফের হয়। তবে খাদ্য একটা বিশেষ কারণ। বিদেশে অতিরিক্ত টিনের মাংস মাছ ইত্যাদি এবং শুয়োর গরু ইত্যাদির মাংস খাওয়ার জন্য তাদের চামড়ায় নানান রোগ হয়। শুধু তাই নয়, তাদের চামড়ায় এক রকমের ছিট ছিট দাগ হয়। এছাড়া ওঁরা ফরসা ঠিকই কিন্তু নরম এবং চকচকে নয়। এই নরম চকচক রং পাওয়া যায় ইতালি জাপান ইত্যাদি দেশে। আমাদের দেশে রং খুব ফর্সার সংখ্যা কম। কিন্তু ভাল ও চকচকে মসৃণ ত্বকের সংখ্যা বেশী। আর বর্তমানে প্রত্যেকেই যথেষ্ট সচেতন হচ্ছেন এসব বিষয়ে এটা সুখের বিষয়। তাই আর একটু জেনে এবং ভেবে চললে সৌন্দর্য আমাদেরই একচেটিয়া হয়ে যাবে। খাদ্য সম্বন্ধে তাই সচেতনতা বিশেষ দরকার।

দুধ বেশীর ভাগ মহিলারাই খেতে ভালবাসেন না। কিন্তু দুধ একটু বিশেষ ভাবে তৈরী করে খাওয়া যায় যেভাবে খেলে উপকার পাওয়া যায় বেশী। যেমন ধরুন সকালের ব্রেকফাস্টে এক কাপ দুধ ওপরের সর তুলে তাতে একটি মুরগীর ডিম আধ চামচ ভেনিলা এসেন্স বরফের কুচি আধ কাপ কমলা লেবুর রস কিম্বা আমের রস (আমের দিনে) কিম্বা যে কোন ফলের রস —যেমন আঙ্গুর বেদানা মুসাম্বি দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। তার পর নামমাত্র চিনি দিয়ে খেয়ে ফেলুন। এতে পেটও ভরে খেতেও ভাল লাগে। আর সেই সঙ্গে ত্বক ও চেহারার প্রচুর উন্নতি হয়। যারা কাজে যান তারা যদি এর সঙ্গে দুটো পাউরুটি কড়া করে টোস্ট বা একটু মুড়ি খেয়ে বেরিয়ে পড়েন ভাল হয়। যারা বাড়ীতে থাকেন তাঁরা দুপুরে একটা দেড়টার সময় গরমকালে ভাতের চেপ্টা হাতার এক কিম্বা দেড় হাতা ভাত ও পাতলা মাছের ঝোল খেতে পারেন বা কাঁচা পেঁপে ও সময়ের সবজি দিয়ে ছোট মাছের ঝোল। সামান্য তেলে মাছ সাঁতলে নিতে হবে। তারপর মেথি জিরে ও আদা ফোড়ন দিয়ে তরকারিগুলি দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে তাতে হলুদ কাঁচালঙ্কা আর জিরেবাটা বাটিতে গুলে তার জল দিয়ে ফুটিয়ে ঝোল করে লেবু দিয়ে সেই ঝোল খাওয়া ভাল। তবে যাঁরা খুব মোটা এবং খাদ্য বেঁধে খেতে চান তাঁরা ভাতের বদলে অন্য যা খেতে পারেন তার তালিকা দিচ্ছি। প্রতিদিন কাঁচা পেঁপে সেদ্ধ খাবেন। এছাড়া পেটও ভরবে আর উপযুক্ত ক্যালোরিও থাকবে এমন কিছু তালিকা দিচ্ছি।

চারটি টমেটো টুকরো করে তার সঙ্গে একটি পেঁয়াজ একটি শশা কুচিয়ে ও একটি ক্যাপসিকাম কুচিয়ে তাতে তিন চামচ ভিনিগার তিন কাপ ঠাণ্ডা জল এক চামচ অলিভ তেল (খাঁটি) মিলিয়ে ফ্রেজের মেসিনে দিতে হবে। তারপর সেগুলি ঘুলে যখন বেশ মিশে যাবে তখন তাতে নুন গোল মরিচ রুচি অনুযায়ী দিয়ে খাওয়া যায়। অবশ্য স্বাদের জন্য টমেটো সস্ বা অন্য কোন সসও দেওয়া চলতে পারে। তবে যাদের বাড়ীতে ফ্রেন্ডার মেসিন নেই তারা ওগুলি প্রেসার কুকারে দিয়েও তৈরী করে নিতে পারেন। এই সুপ খুব উপকারী। এতে যা যা মেশান হচ্ছে তার ফলে রং পরিষ্কার ও ত্বক মসৃণ হবে। এটা একেবারে ঠিক। তবে অনেকের সাধারণ ধারণা আছে যে পাউরুটিতে ভাত ও আটার রুটির মতন দ্রব্যগুণ নেই কিন্তু এটা ভুল। আরোও ধারণা আছে যে কড়া করে রুটি টোস্ট করলে রুটির দ্রব্যগুণ কমে যায়। তা নয়। রুটির জল শুকিয়ে যায় এই পর্যন্ত।

ফল বহু রকমভাবে খাওয়া যায় এবং খাওয়াও উচিত। যেমন ধরুন আনারস কিম্বা তরমুজ টুকরো টুকরো করে কেটে তাতে এক কাপ দুধ ও এক বড় চামচের লেবুর রস (পাতি) দিয়ে ব্লেন্ডারে দিয়ে ঘেঁপে মিশিয়ে তাতে একটু অতি সামান্য চিনি দিয়ে খেয়ে ফেলা যায়। কিম্বা গোলমরিচ ও নুন দিয়েও খাওয়া যায়। সেটা নির্ভর করবে মুখের স্বাদের উপর।

এই ফলের রসের তৈরী সুপ শরীরের ও ত্বকের পক্ষে খুবই ভাল। এটা দুপুরেও খাওয়া যায় অথবা বিকেলের দিকেও খেতে পারেন। এর সঙ্গে পালং শাক সিম কড়াইশুটি ইত্যাদি এক সঙ্গে সেদ্ধ করে তাতে একটু নুন গোল-মরিচ ও সস মিশিয়ে বেশ ভাল খাওয়া যায়। পেঁপে সেদ্ধও খুব উপকারী। তার সঙ্গে উচ্ছে সেদ্ধ ও ওল সেদ্ধ খাওয়া ভাল। ওল এবং উচ্ছে খেলে রক্ত পরিষ্কার হয়। পাইলস-এর গোলযোগ থাকলে তা ভাল হয়ে যায়। আর ত্বকের সাধারণ ব্যাধি-গুলি হয় না। উচ্ছে করলা সেদ্ধ অথবা কাঁচা বেঁটে তার রস এক চামচ সকালে খেলে তা ত্বকের পক্ষে খুব উপকারী। লিভার ভাল থাকলে ত্বকে সাদা দাগ হয় না। এইসব তেল ঘি ছাড়া সেদ্ধ জাতীয় খাদ্য ফলের রস তেতো ইত্যাদিতে লিভার ভাল থাকে।

দুপুরের খাওয়ার সময় আর এক ভাবেও খাওয়া যায়। শীতকালে অবশ্য এটা করা যায় ভাল করে। অর্ধেক টমেটো অর্ধেক শশা ও একটি পেঁয়াজ পাতলা করে কাটতে হবে। তারপর সেগুলি এক কাপ দুধে গরম করে তাতে একটি পাতিলেবুর রস দিয়ে ছানা কাটিয়ে নিতে হবে। সেই দুধে এই গুলি সব মিশিয়ে তারপর স্বাদ অনুযায়ী নুন মিষ্টি মিশিয়ে খেতে হবে। ধনিয়া কাঁপন পাতা ভাঙিয়ে নিয়ে তাতে একটু নুন গোলমরিচ ছড়িয়ে তার ওপর এই খাদ্য ঢেলে খাওয়া যায়। টেবিলে খেতে দেওয়ার সময় বেশ যত্ন করে সাজান যেতে পারে তাতে দেখতেও ভাল লাগে আর খাওয়ার রুচিও বাড়ে।

অন্নপূর্ণা দেবী

• ঘড়ি •
• জড়োয়া গহনা •
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
ডুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৪, জনাইমী স্কোয়ার ইস্ট
কলিকাতা-১

তরুণকুমার ভাদুড়ীর নূতন উপন্যাস

"কাগজের নৌকা"

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড—২০৲

তারাশঙ্কর রচনাবলী

নবম খণ্ড — কুড়ি টাকা

নিমাই ভট্টাচার্যের

নাচনী ৭৲

মাত্র এক সপ্তাহে প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ—সাত টাকা ॥

॥ মিত্র - ঘোষের নূতন প্রকাশিত বই ॥

জরাসন্ধের

নিশানা ৮৲

আশাপূর্ণা দেবীর

যে যার দর্পণে ৮৲

প্র না বি'র নাট্যোপন্যাস

বেনিফিট অব ডাউট ১০৲

বিমল মিত্রের নবতম উপন্যাস

তিন নম্বর সাক্ষী

শঙ্কু মহারাজের নবতম ভ্রমণকাহিনী

তমসার তীরে তীরে ১৬৲

শুভেন্দ্রকুমার মিত্র সঙ্কলিত নূতন অবদান

বৈজ্ঞানিক অভিধান

॥ পঁচিশ টাকা ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

অমৃত পাত্রখানি

॥ আট টাকা ॥

— আসন্ন প্রকাশের পথে —

সমরেশ বসুর অনন্য-সাধারণ উপন্যাস **"অবরোধ"**

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ফোন ঃ ৩৪৩৪৯২
৬৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ৩৪৮৭৯১

(সি ২৩।০১৬)

জননী

সুস্মিতা রায়

মা ভাই-বোনদের ছেড়ে সুজিত যখন বৌ মালা আর দু বছরের মেয়ে নয়নাকে নিয়ে আলাদা হোল, মা কিরণময়ীর বুকটা যেন নরম ঘাস-মাটির ওপর দুরন্ত ঘোড়া ছুটে যাওয়ার মত কেটে চৌচির হয়ে গেল।

সুজিত তাঁর বড় ছেলে মালা এ বাড়ীর প্রথম বৌ আর মেয়েটা সেটাতো যেন একতাল মাখনের ডেলা, সেই মাখনের ডেলাটাকে তো বলতে গেলে কিরণময়ীই বড় করেছেন, মালা তো শুধু নামেই মা, শুধু যে কটা মাস যন্ত্রণা সহ্য না করলেই নয়, সেটুকু যন্ত্রণারই ভাগীদার কিন্তু তারপর ...পৃথিবীর মাটি ছোঁওয়ার পর সব তো কিরণময়ীর, মালা তো এনেই নিশ্চিন্ত... দু মাস ছুটি নিয়ে নিজের শরীর সারিয়ে আবার সেই দশটা পাঁচটা। দশটা পাঁচটাই বা কেন, নটা ছটা। কোন-দিন আবার সাতটা। আর তার মনেই সকাল থেকে রাত্তির। সকাল থেকে সময় থাকে নাকি মালার মেয়ের দিকে নজর দেবার।...আর রাত্রে সে তো তখন ক্লান্ত তখন মেয়ের ঝামেলা...মাঝে মাঝে শুধু বুকে চেপে আদর করা আর ঘুমের মধ্যে বারকয়েক কাঁথা বদলানো...এইতো। তাও তো সে কাজটা বেশীর ভাগ সময় সুজিতই করে। সুজিতই রাত্রে পাঁচবার মেয়ের কাঁথা পরীক্ষা করে...মালা জানার বোঝার আগেই নিঃশব্দে কাজ সেরে নেয়। ভোরবেলা সুজিতই তো ওকে তুলে কিরণময়ীর ঘরে দিয়ে আসে। সেই একরত্তি মানুষটাকে এই দুটি বছর ধরে নাড়াচাড়া করছেন কিরণময়ী, গায়ে হাতে বুকে মনে সব মিলিয়ে মেয়েটা তো তাঁরই সঙ্গে মশে আছে। সেই মাখনের ডেলাটাকে ছিঁড়ে নিয়ে আলাদা বাসা কোরলো সুজিত, সে সুজিত সেদিনও মা ছাড়া কথা বলতো না...মা না রাঁধলে ভাল করে খেতো না.... মা না বললে কোন কাজে এগোতো না।

সুজিত যেন তাঁর বুকের খুব কাছেই ছিল সেই নৈকট্য যে ঘোচালো মালাকে বিয়ে করে। ভিনজাত, ভিনদেশের মেয়ে, হুট করে বলে বোসলো সুজিত, বিয়ে করবো। কিরণময়ী তা-ও আপত্তি করেন নি, বয়স ত্রিশ হলে কি হবে, সুজিত এখনও ছেলে-মানুষ, তার বিয়ে করাটাও যে একটা বায়না, সেই বায়না কিন্তু জেদে রূপান্তরিত হোল। সবাই কত বোঝালো, কিন্তু সুজিতের জেদ, না ওকেই বিয়ে করবো। তোড়জোড় করে মামা-মাসীরাই একদিন মেয়ে দেখে এলো, সুন্দর মেয়ে ভাল মেয়ে...আপত্তির কি আছে। অতএব বিয়ে হয়ে গেল। আর মায়ের আঁচলের আড়াল থেকে বেরিয়ে সুজিত যে কখন বৌ-এর আঁচলের তলায় ঢুকলো, কিরণময়ী টেরও পেলেন না। আর টের পেলেই বা...এতে অন্যায়ই বা কি? বরং দুটিতে মিলে মিশে ভাব-সাব করে থাক এই দেখেই খুশী হন তিনি। আহারে! বেচারী সুজিত, ছোটবেলায় বাবা মারা গেছে, চির-কালই বলতে গেলে অবহেলায় মানুষ। সে-জন্যই বড় বেশী মা-ঘেঁষা। এখন স্ত্রীর একটু ভালবাসা...আদর... চাইবেই তো। কিরণময়ী নিশ্চিন্ত হোলেন মালাকে বললেন, বৌমা ওর দিকে একটু নজর রেখো...ও কিন্তু এখনও ছেলেমানুষ...

নতুন বৌ মালা ফোয়ারার মত হেসে বললো, সে আপনাকে ভাবতে হবে না মা, আমি সব বুঝি!

তারপর তো এলো সেই মাখনের ডেলাটা বছর না ঘুরতেই। কিরণময়ী ভাবলেন, আহা ছেলেমানুষ ওরা ছেলেমানুষীর বশে একটা পুতুল এনেছে...বেশ তো ভালই তো। কিরণময়ী তো আছেন...তাঁর সুজিতও যেমন...মালাও তেমন...মা যা করবেন...মা যা বলবেন...হাসপাতালে নয়না হবার সময়— মালার সে কী কান্না...আপনি যাবেন না... সবাই অবাক হয়ে বলছে—কেমন মেয়ে মাকে আপনি বলে!

ভুলটা ভেঙ্গে দেন মালার মা আমি হলাম ওর মা উনি হলেন ওর স্বামীর মা... মানে শাশুড়ী।

সবাই অবাক। নিজের মা পাশে দাঁড়িয়ে...শাশুড়ীর আঁচল চেপে ছেলে-মানুষের মত কাঁদছে মালা। নিজের মা চলে গেলেন। শাশুড়ী রয়ে গেলেন সারা রাত।

তারপর নয়না এলো। মেয়ে দেখে তো খুশী ধরে না কিরণময়ীর। মাখন মাখন রং, মাথায় একমাথা চুল...টুকটুকে ঠোঁট...ছোট্ট একটা বিলিতী পুতুল যেন। কিরণময়ীর বুক জুড়ে গেল...মন ভরে গেল...

বাড়ী এসে মালা বিশ্রাম নিলো... আবার শুরু হোল তার কাজের জীবন...আর কিরণময়ীর কাছে দিনে দিনে কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার মত বাড়তে লাগলো নয়না আর সমান্তরাল দূরত্বে বাড়তে লাগলো সুজিত।

যে কোনও দিনই সঞ্চয়ের দিন যদি.....

আপনি সঞ্চয় করবেন বলে মনস্থির করেন। আর সেটা মাস পয়লায় মাইনে হাতে পেলে শুরু করা যায়। তবে মনস্থির করতে না পারলে মাইনের টাকা হাতে আসলেই খরচ হয়ে যায়।

সঞ্চয় করতে যখন মনস্থ করবেন (সেটা এখনই করা সব চাইতে ভালো নয় কি?) তখন ডাকঘরের রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের কথাটা ভেবে দেখবেন। মাসে মাসে মাত্র দশ টাকা করে জমালে, তা পাঁচ বছরে বেড়ে 750 টাকায় দাঁড়াবে। তাতে চক্রবৃদ্ধি সুদের হার দাঁড়াচ্ছে 9.25%।

আর আপনি একটানা দু'বছর যদি নিয়মিত সঞ্চয় করে যান তাহলে আপনার টাকা বীমার মত সুরক্ষিত থাকতে পারে এমন ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। তা হ'ল. অ্যাকাউন্ট হোলডার বা জমার খাতার মালিকের অসময়ে মৃত্যু ঘটলে বাকী কিস্তির টাকা আর জমা না পড়লেও 750 টাকা অক্ষত থাকবে।

বিশদ জানতে হলে :
নিকটতম
ডাকঘরে খোঁজ নিন
কিংবা

ন্যাশনাল সেভিংস অর্গ্যানাইজেশান
পোস্ট বক্স নং 96
নাগপুর

[Savp 74/300

মহাত্মা শিশিরকুমারের
কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

কালাচাঁদ গীতা নিমাই সন্ন্যাস নরোত্তম চরিত
৪র্থ সংস্করণ ৩-০০ (নাটক) ২য় সংস্করণ ২-০০ ৩য় সংস্করণ ২-০০

লর্ড গৌরাঙ্গ নরোত্তম চরিত নরোত্তম চরিত
(২২টি খণ্ডে) (ইংরেজী) প্রতি খণ্ড ৩-০০ ৩য় সংস্করণ ২-০০ (হিন্দী) ২-০০

প্রাপ্তিস্থান :—পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

প্রথম প্রথম এতটা বোঝেন নি কিরণময়ী, বড় ছেলে হোলেও তাকে সংসারের ঝামেলায় কোন দিনই বিশেষ জড়ান নি কিরণময়ী, যেটুকু ঝড় গেছে তার সবটুকুই তাঁর নিজের ওপর দিয়েই গেছে। ঝাপটার মত লেগেছে অন্য ছেলেমেয়েদের। সেই না বুঝতে দেওয়াটা যে সত্যিই না বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কিরণময়ী বোঝেন নি। কিন্তু সেই ছেলে-মানুষ সুজিত যে ভেতরে ভেতরে এতখানি স্বার্থপর হয়ে উঠছে, কেউ কল্পনাও করে নি, তার বিয়ের পর থেকেই সংসারের বেশীর ভাগ দায়িত্ব কখন যেন তার পরের ভাই প্রসেনজিতের ওপর এসে পড়েছিল, কিছুটা নিজের কর্তব্যবোধে কিছুটা বা দাদা-বৌদির প্রতি আন্তরিক ভালবাসায় প্রসেনজিৎ কবে থেকে যেন মাকে বলতে শুরু করলো, দাদাকে বেশী বলার দরকার কি মা...দাদার এখন কত খরচ...

সত্যিই তো, কিরণময়ীও তো তাই চান, ওরা দুটিতে ছেলেমানুষ, এখন কত খরচ... কত দায়িত্ব...মালাকে ডেকে বলেন কিরণ-ময়ী, দেখো মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবে একটু হিসেব করে খরচ কোর...

বেলকুঁড়ির মালার মত হেসে মালা বলে, সে হবেখন মা, আর আপনারা তো আছেন...

সেই তো, আর কেউ না থাক, প্রসেনজিৎ তো আছে। প্রসেনজিৎই নিচ্ছে...সব দায়িত্ব।

সেই সুজিত যখন আধ আধ কথা বলতে শেখা দু বছরের মেয়েটাকে নিয়ে আলাদা হোল, কিরণময়ী কেমন যেন অবাক

২'টি ফসফোমিন টনিক...

ফসফোমিন আয়রন

মেয়েদের জন্যে আয়রন টনিক

ফসফোমিন আয়রন শরীরে আয়রন বাড়াবার এক অতিরিক্ত উপায় যা রক্তকে লাল করতে আর শরীরে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। প্রত্যেক দিন নিন্ মেয়েদের জন্যে তৈরী এক আয়রন টনিক—ফসফোমিন আয়রন।

ফসফোমিন ভিটামিন

পরিবারের সকলের জন্যে ভিটামিন টনিক

ফসফোমিন-এ আছে বি কমপ্লেক্স ভিটামিন আর পুরো মাত্রায় গ্লিসারোফস্ফেট্স যা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে ২'টি ফসফোমিন টনিক

ফসফোমিন টনিক খিদে বাড়ায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যোগায় আর প্রফুল্ল করে তোলে।

® ই. আর স্কুইব ও সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী

SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS LTD. লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এস. পি. এল.

Shilpi SC/8A/74 ben

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪৪ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 14th March, 1975 শুক্রবার ২৯ ফাল্গুন, ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	কুমারী মাতা	(গল্প)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৪	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৬	পটভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১৭	দেশে-বিদেশে		শ্রীপুণ্ডরীক
১৯	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
২১	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রীউপগুপ্ত
২৩	রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্রষ্টা বনাম শিল্পী		শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার
২৬	ধুলোর নিয়তি	(কবিতা)	শ্রীরাম বসু
২৬	কেন এইসব কেন ?	(কবিতা)	শ্রীতুলসী মুখোপাধ্যায়
২৬	এমন হৃদয় রাখা	(কবিতা)	শ্রীঅমিয়কুমার হাটি
২৭	গোয়েন্দা ধাঁধা		শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
২৮	যুবক-যুবতী		শ্রীঅমর দাশ
২৯	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান		
৩০	চিঠিপত্র		
৩৩	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে		শ্রীদিলীপকুমার রায়

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল হোমিও বই

মূল বিক্রয়কেন্দ্র — আমাদের কলিকাতার চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় ও হেড অফিস।

চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় : ১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি-২৫ এবং ৫৩ গ্রে স্ট্রীট, কলি-৬

হেড অফিস ঃ৩৬বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫

পাইকারী ক্রেতা / বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করিবেন

হয়ে গেলেন। আর আলাদা হোল তো হোল, একটা ঠিকানা পর্যন্ত রেখে গেল না। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে তর্কাতর্কি করে প্রসেনজিতের দায়িত্বে মা, দুটো ছোট ভাইকে রেখে চলে গেল সুজিত। আর প্রসেনজিতের বৌ সুতপা তো আছেই।

বিয়ে করেছে প্রসেনজিৎ। নেহাতই সাদা-মাটা প্রেমের গল্পের মত...কলেজে পড়ার সময় আলাপ...অনেক দিন হয়ে গেল প্রসেনজিৎ যখন উপযুক্তই তখন আর...আর তার বিয়ের পাঁচ মাসের মাথাতেই চলে গেল সুজিত।

কিরণময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মনে মনে সুতপাকে দোষী সাব্যস্ত করে যে অভিসম্পাত দিলেন না তা নয়...ভাবলেন, কি হোল, যাকগে যা হবার হোল।

ছোট্ট একটা ছিমছাম বাড়ী। নিজের পছন্দমত আসবাব আর সব কিছু। আর এমন সুপুরুষ উপযুক্ত স্বামী তো রয়েছেই আর ছোট্ট পুতুলের মত মেয়েটা। এমন একটা ছবিই তো কতদিন ধরে মনে মনে এঁকে রেখেছে মালা। সেই ছবিটাই তো আজ চোখের সামনে দেখছে।

বাড়ী দেখতে আসার সময় প্রতিটি তাক প্রতিটি কোণ...প্রতিটি দরজা...জানলা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে মনে মনে আনন্দের ফুলঝুরি হয়ে বলেছে মালা, এসব আমার, আমার নিজের মত করে এসব আমি সাজাবো।

ছোটবেলা থেকে পাঁচজনের সংসারে মানুষ। বিয়েও হোল পাঁচজনের মধ্যে, ভাল লাগতো না। মালার দিদিদের বাড়ী গেলে যে কি ভাল লাগতো, বেশ থাকে ওরা। সুজিতকে বিয়ে করে মনে ভেবেছে, একটু চাপ দিয়ে...তারপর তো দুর্ঘটনাটা ঘটলো... যাক তবু একটা দিক দিয়ে শ্বশুরবাড়ীর প্রতি কৃতজ্ঞ মালা, শুধু বিয়ের পর নটা মাস কষ্ট করা ছাড়া মেয়ের জন্য আর বিশেষ কোন কষ্ট পেতে হয়নি। এখন তো সেই মেয়ে প্রায় বড়ই হতে চললো...আর দেড় দু বছর কাটালেই তো স্কুল, আর তার নিজের মা তো আছেনই বিয়ে না হওয়া দুটো বোনও আছে। কচি বাচ্চার ঝামেলা নিতে চায়নি মা, এখন আর আপত্তি করেন না। বাবা সবে রিটায়ার করেছেন, ভাই পড়ছে। দুটো বোনের বিয়ে বাকী।

সুজিত প্রথমে একটু ইতস্তত করেছিলো, কিন্তু যেদিন থেকে সুতপা এলো... বড্ড বেশী তীক্ষ্ণ মেয়েটা...সে যেন এসেই বুঝে গেল তার স্বামীটি বড় বেশী মুখচোরা...বড় বেশী দায়িত্বশীল।

যাকগে ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি। নিজের মনের মত করে ঘর সাজালো মালা।

মেয়েকে বাপের বাড়ী রেখে অফিস যায় মালা। ফিরে এসে দেখে সুজিত বসে আছে। ছোট বোন জলি হাসিমুখে বলে, সুজিতদা কোয়ার্টার পাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি!

সুজিতের মুখের দিকে তাকালো মালা, নির্দ্বিধায় বললো, হ্যাঁ তো। চেয়ারে বসে বসে পা দোলাচ্ছে জলি। চোদ্দ পনেরো বছরের পুষ্ট পা...হাঁটুর ওপর ফ্রক পরেছে...সুজিতের কেমন অস্বস্তি হয়।

জলি খবরের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে নিজের মনেই বলে, কবে থেকেই তো শুনছি কোয়ার্টার পাবি... দেখি না তো কিছু...

সুজিতের মুখটা বিবর্ণ দেখায়। মালার মা চা নিয়ে এসে ক্ষমা চাওয়ার গলায় বললেন, তুমি কিছু মনে করো না সুজিত... মেয়ের দিকে ফিরে তীক্ষ্ণস্বরে বলেন, বড্ড মুখ হয়েছে তোর না!

কাছাকাছি আত্মীয়রা থাকে। বাড়ী বয়ে এসে খোঁজ খবর নেয় অনেকেই, সুজিতের কোন খবর পেলি। কেউ কেউ তির্যক চোখে তাকায় সুতপার দিকে। বড় বেশী সোজা মেয়েটা। এক কাপ চা করে নিয়ে আসে সুতপা, হাসিমুখে বলে, শুনেছেন পিসিমা, আমাদের বিপু যে চাকরি পেয়েছে।

পিসিমা অবাক হয়ে যান। এই বাজারে চাকরি...

কিরণময়ী বললেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে হ্যাঁ দিদি, প্রসেনের একজন...বলেন, আর ভাবেন আহা রে। এখন যদি ওরা থাকতো সুজিতের যা খাওয়া নিয়ে...

একদিন এসে খবর দিলো এক ভাই-এর বৌ। কথা বলতে বলতে সব সময় হাসে রীণা, জানেন দিদি, সুজিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললো, কোয়ার্টার পেয়েছে, খুব ভাল জায়গা গড়িয়াহাটের কাছেই।

ভাল। সেই ভাল, কিরণময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু জোরের সঙ্গেই বলেন, আমি তো তাই বলি, আলাদা হোক আর যাই হোক, সুজিত আমার তেমন ছেলে নয় যে শ্বশুরবাড়ীর কাছে থাকবে...মালাও তো কখনো বাপের বাড়ী যেতে চাইতো না, থাকা তো দূরের কথা।

হঠাৎ একদিন সকালে ভাই এসে বলল, কাল রাতে সুজিত আর মালা এসেছিল।

দুঃসংবাদ শোনার মত ফ্যাকাশে হয়ে যায় কিরণময়ীর মুখ। ভাই বললে, নয়নার খুব অসুখ, রাতে কোন ডাক্তার যায়নি, তাই আমার এখানে এসেছিল, চেনা ডাক্তার নিতে।

সুতপা প্রসেনজিৎ বেরিয়ে আসে। প্রসেনজিৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে, কি হয়েছে নয়নার। জানি না কি, কিরণময়ীর ভাই পকেটে হাত দিলো, তোর বৌদি নিজে এসেছিল, কিরণময়ীকে বললো, তুমি একবার যাও দিদি।

প্রসেনজিৎ তাকালো মায়ের দিকে। অভিমানী গলায় কিরণময়ী বললেন, আমাকে তো একটা খবরও দেয় নি।

পকেট হাতড়ে একটা ঠিকানা বার করে কিরণময়ীর হাতে দেয় ভাই।

চিরকুটটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে যান কিরণময়ী। প্রসেনজিৎ এগিয়ে এসে কাগজটা মায়ের হাত থেকে তুলে নিলো।

নিজে এগিয়ে পড়ে না, কিন্তু কিরণময়ীর জানতে বাকী নেই বড্ড চালাক মেয়ে ঐ সুতপা, নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই ঠিকানাটা সে পড়ে নিয়েছে, কিরণময়ীর মনে হোল, সুতপা হাসছে, সারা মুখে চাপা হাসি...সহ্য করতে পারছেন না কিরণময়ী, নির্বাক হয়ে গেছেন তিনি।

কিরণময়ীর এত দিনের লালিত আত্মাভিমান আজ যেন এক কঠিন পাথরে ধাক্কা লেগে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। শীর্ণ গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

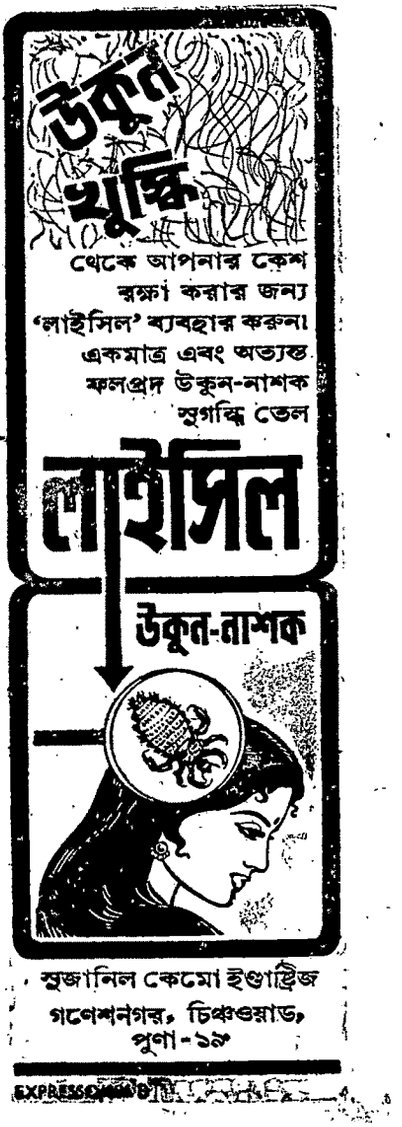

র‍্যালিফ্যানের পায়াটি ইস্পাত দিয়ে আধুনিক ক'রে তৈরী, বাচ্চাদের হাত-পা কেটে ছড়ে যাতে না যায় সে জন্যে বিশেষভাবে বানানো সুন্দর জালী, বছরের পর বছর নির্ঝঞ্ঝাট চলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টায় তৈরী র‍্যালিফ্যানের 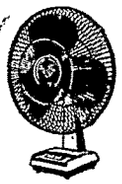 মোটর, একটি চুলেরও ফারাক না রেখে সমানভাবে বসানো র‍্যালিফ্যানের 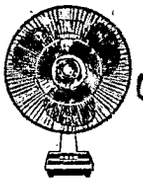 ব্লেড, আগুনে তাতিয়ে লাগানো র‍্যালিফ্যানের 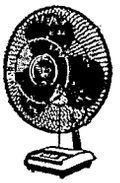 অপূর্ব মন-কাড়া রঙ আর সবরকম সাহায্যের জন্যে হামেশা হাজির র‍্যালিফ্যানের লোক!

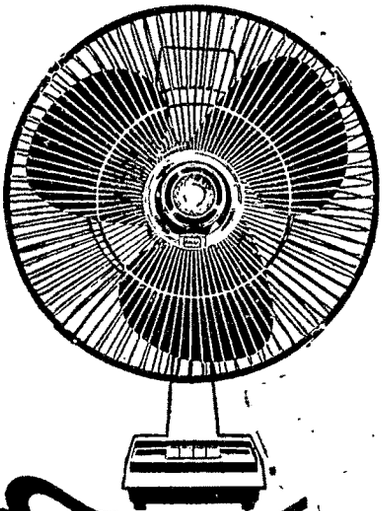

১৫ বছর ধরে সবচেয়ে বেশী কাটতির পাখা হিসেবে কি ভাবে টিকে থাকতে হয় তা

র‍্যালিফ্যান

ভালই জানে!

U-RTF-22 BEN

পুনশ্চ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মাদাম : কর্ণেল যদি ভদ্রভাবে না থাকেন, তাহা হইলে এদেশের লোকেরা আমাদিগকে সম্মান করিবে কেন?

শিশির : কর্ণেল যে অনাবৃত দেহে আমার বাংলোতে শয়ন করিয়া ছিলেন তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?

মাদাম : আপনাদের এই দেশেরই জনৈক মহাত্মার অনুগ্রহে জানিতে পারিলাম।

শিশির : তিনি কে?

মাদাম : মহাপুরুষ; আমাদের প্রভু।

শিশিরকুমার শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

(২)

শিশিরকুমার একদিন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় কর্ণেল অলকট, মিষ্টার উইনব্রিজ ও মিসেস বেটসের সহিত একত্রে আহার করিতেছেন, এমন সময় মধুর ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতরে অন্য কেহ ছিল না, অথচ ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইলেন। তিনি কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের শব্দ?

কর্ণেল মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'ঘণ্টাধ্বনি।'

শিশির : কে বাজাইতেছে?

কর্ণেল : মাদাম।

শিশির : আদাম? কই তিনি তো এখানে উপস্থিত নাই।

কর্ণেল : অলৌকিক শক্তি প্রভাবে তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব।

শিশিরকুমার ও কর্ণেলের মধ্যে উক্তরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় বাচুলা এক খণ্ড কাগজ লইয়া শিশিরকুমারকে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমার দেখিলেন আদাম লিখিয়াছেন, মিষ্টার ঘোষ তুমি কি আমার স্বর শুনিতে পাইতেছ? মাদাম বিভিন্ন বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন শিশিরকুমার ছুটিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মাদাম তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার তাঁহার অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

(৩)

একদিন সন্ধ্যার পূর্বে শিশিরকুমার ও কর্ণেল অলকট বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় পূর্বোক্ত পার্শী যুবক তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। যুবকটি মাদাম ব্লাভাৎস্কির অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কর্ণেল ও মাদামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তিনি শিশিরকুমার ও কর্ণেলের সহিত কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে মাদাম সেখানে উপস্থিত হইলেন। মাদাম যুবকের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন, উপরি উপরি দুইটি টুপি মাথায় দেওয়া কি এ দেশের প্রথা?

ইহার পর তিনি যুবকের মস্তক হইতে একটি টুপি খুলিয়া লইলেন আর একটি তাহার মস্তকেই রহিল। যুবক একটি টুপি মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু কিরূপে দুইটি টুপি হইল তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। শিশিরকুমার মাদামের কার্য প্রত্যক্ষ করিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। কর্ণেল অলকট হাসিয়া বলিলেন, শিশিরবাবু দেখিলেন তো যুবক একটি টুপি পরিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু মাদাম তাঁহার টুপি স্পর্শ করিয়া মাত্রই ঠিক সেইরূপ আর একটি টুপি সৃষ্টি হইল।

শিশিরকুমার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন দুইটি টুপিই একরূপ। স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিলেন শিশিরকুমার কিরূপে তাহা অবিশ্বাস করিবেন? কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল; মাদাম আসিবার সময় কি তাঁহাদের অলক্ষ্যে একটি টুপি হাতে লইয়া আসিয়াছিলেন? যদি তাহাই হয় তবে পার্শী যুবক যে টুপি পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ টুপি তিনি তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে পাইলেন? শিশিরকুমার মনের মধ্যে অনেক যুক্তিতর্ক করিয়া স্থির করিলেন যে, মাদাম টুপি লইয়া আসেন নাই। তবে কি পার্শী যুবক মাদামের নির্দেশ মত একট রকমের দুইটি টুপি মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন? তাহাও সম্ভব হইতে পারে না; কারণ প্রতারণার দ্বারা মানবের হৃদয় অধিকার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব! মাদাম যদি পার্শী যুবকের সহিত একযোগে প্রতারণার দ্বারা শিশিরকুমারকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে যুবক কিছুতেই মাদামের অনুরক্ত সেবক হইতে পারিতেন না। তিনি যতই মাদামের অলৌকিক শক্তির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(৪)

একদিন শিশিরকুমার ও কর্ণেল বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় কর্ণেল একগুচ্ছ সুচিক্কণ কেশ শিশিরকুমারকে দেখাইলেন। শিশিরকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কেশ কাহার? আপনি রাখিয়াছেন কেন? প্রত্যুত্তরে কর্ণেল বলিলেন, এ কেশ মাদাম আমাকে দিয়াছেন। একদিন তিনি তাঁহার মস্তক হইতে এক গুচ্ছ পলিত কেশ লইয়া স্বীয় শক্তি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহা এইরূপ সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। শিশিরকুমার দেখিলেন ইহাও এক অতি-বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি একদিন মাদাম ব্লাভাৎস্কিকে বলিলেন, 'আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এইরূপ কেশগুচ্ছ আপনার মস্তক হইতে দিন, আমি তাহা কলিকাতায় আমার বন্ধুবর্গকে দেখাইব।'

মাদাম বলিলেন আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতে পারিব না, কারণ মহাত্মাদের অনুগ্রহ ব্যতীত আমার এই পক্বকেশ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইতে পারে না।

এইরূপ কথোপকথনের দুই একদিন পরে, একদিন রাত্রে শিশিরকুমারের শয়নকক্ষে বসিয়া কর্নেল মাদাম ও শিশিরকুমার হিন্দু বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। মাদাম বক্তা, শিশিরকুমার ও কর্ণেল শ্রোতা। মাদাম ব্লাভাৎস্কির জ্ঞানের গভীরতা লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমারের মনে হইতে লাগিল যে মাদাম মানবী নহেন, তবে দেবী; এ জগতের সৃষ্টি-রহস্য যেন তাঁহার কিছুই অজ্ঞাত নাই। কোন হিন্দু মহাত্মা মাদামের শরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই শিশিরকুমারের ধারণা জন্মিয়াছিল। মাদামের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে শিশিরকুমার বলিয়া উঠিলেন 'আর নয় আজ এই পর্যন্ত থাক; আমি আপনার গভীর তত্ত্বগুলি আর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।'

মাদাম নীরব হইলেন। তিনি স্বীয় কক্ষে গমন করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলে শিশিরকুমার তাঁহাকে বলিলেন 'কই আমাকে তো কর্ণেলের ন্যায় কেশগুচ্ছ দিলেন না।'

(ক্রমশঃ)

ক্ষপণক

যষ্টি-মধু

বিরস বাংলার সরস পত্রিকা

সম্পাদনা : কুমারেশ ঘোষ

প্রতি সংখ্যা -৭৫ * বার্ষিক ৯-০০

করুণাধারা ॥ কলিকাতা-৫৪

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৫	বিজ্ঞানের কথা	শ্রীঅয়স্কান্ত
৩৮	রোজনামচা	ফাদার দ্যতিয়েন
৩৯	শেষবিচার	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪২	রূপসীর খাতা	শ্রীবরবর্ণিনী
৪৩	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৪	রান্না করে দেখুন	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৪৫	জননী (গল্প)	শ্রীসস্মিতা রায়
৪৮	পুনশ্চ	শ্রীক্ষণিক
৪৯	হিন্দী গীত-সাহিত্যে নতুন পদক্ষেপ : নবগীত	শ্রীমঞ্জুলী ঘোষ
৫২	খেলাধুলো	শ্রীদর্শক
৫৪	দেশ-বিদেশের খেলা	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৫	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅময়
৫৮	রজনী আলোয়	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬১	কিছুক্ষণ	শ্রীনির্মল ধর
৬৪	ফ্লোর থেকে বলছি	স্টুডিও সংবাদদাতা
৬৫	স্টুডিও সংবাদ	
৬৬	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা	শ্রীঅভিজিৎ
৬৮	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৬৯	চিত্র সমালোচনা	শ্রীচিত্রদূত
৭০	নাটমঞ্চ	নাট্যসমালোচক
৭১	বিদেশী ছবি	শা. রু. চ
৭২	জলসা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীইন্দ্রাণী চৌধুরী

মূল উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষান্তর এই প্রথম

উর্দুর শ্রেষ্ঠতম কবি

মির্জা গালিব-এর

শের এবং গজলের বিশ্বস্ত রূপান্তর

গালিবের কবিতা

অনুবাদ ॥ আয়ান রশীদ এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়

॥ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ৮-০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা—৯

উত্তরবঙ্গের অনন্য সাহিত্য-পত্র

মধুপর্ণীর

নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা ১লা বৈশাখ, ১৩৮২ প্রকাশিত হবে।

মূল্য স-ডাক আড়াই টাকা। ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মতো সংকলন।

পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষে

সম্পাদক : অজিতেশ ভট্টাচার্য।

অধ্যাপক নিবাস-৩, বালুর ঘাট।

এ ৩৯৬৬৪

একখানি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

সংস্কৃতির ধর্ম

মূল্য আট টাকা মাত্র

ভারতী লাইব্রেরী

৬নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলকাতা—১২

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর

নিখুঁত সরঞ্জাম

এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

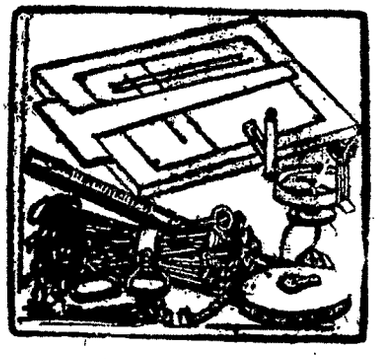

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ, খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য

অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক স্টেশনারী স্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪

গ্রাম : অরারপিল, পোস্ট বক্স—৩৮ হাওড়া

পরিবেশক : ক্যালিকো প্রডাক্টস

(স্টেশনারী বিভাগ)

হিন্দী গীত-সাহিত্যে নতুন পদক্ষেপ : নবগীত

মঞ্জুলী ঘোষ

হিন্দী গীতি-সাহিত্যের শুরু ভক্ত কবিদের পদে। সেইসব প্রথম যুগের গীতি-কবিতায় কবির আত্মনিরপেক্ষ ভাব অভিব্যক্ত হয়েছে প্রভুর প্রতি ভক্তের নিবেদনে। তাতে আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রকাশই মুখ্য।

পরবর্তী কালে ভারতেন্দু এবং দ্বিবেদী যুগের পদে গীতের অন্তরঙ্গ এবং বাহ্য, দুদিকেই কিছু পরিবর্তন নজরে পড়ে কিন্তু তা বিরাট পার্থক্য কিছু নয়। আত্ম-নিরপেক্ষতা থেকে আত্মমুখীনতার দিকে গীত আগ্রহী হয়েছে মাত্র : কিন্তু বিশেষ প্রকটভাবে নয়।

কবির আত্মমুখীন অনুভব সর্বপ্রথম ঠিকমত রূপ নিল ছায়াবাদের যুগে। (ছায়াবাদের শুরু মোটামুটি ১৯২০ থেকে ধরা হয়) প্রসাদ, নিরালা, মহাদেবীর গীতি রচনাগুলিতে তার প্রমাণ ছড়ানো। মানবিক প্রেম নিবেদন, প্রকৃতি চিত্রণ, প্রকৃতিকে অবলম্বন করে কবি অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদি নিয়ে ছায়াবাদকালের গীত অজস্র রচিত হয়েছে। ছায়াবাদের যুগে গীতের নির্মাণশৈলিতেও অনেক পরিবর্তন আসে। এই ভাব বা রূপের পরিবর্তনের প্রসঙ্গে বিশেষ করে নিরালার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি গীতকে তুলসীর প্রভাবমুক্ত করতে চেয়েছিলেন সচেতন ভাবে। আবার গীতের এক শাখাকে লোকগীতের ধারায় এনে নতুনত্বও দিতে চেয়েছেন। ভক্তিভাবের বাহক গীত যখন লোকভাবের পর্যন্ত বাহক হল, তখনই গীতে নবীনতা সংযোজিত হল। তাঁর কোন কোন গানে নবীন লোকচেতনার জাগৃতি দেখা যায়। এই দিক থেকে দেখেই, অনেকে মত দিয়েছেন হিন্দী নবগীতের উন্মেষ নিরালার গীতি রচনায়। নবগীতের অন্যতম যে দাবী তা হোল সে ব্যক্তিচেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে লোকচেতনাকে অনুভব করে, এমন কি তারও আভাষ পাওয়া যায় নিরালায়।

গীতের উপর ছায়াবাদী প্রভাব গভীর। তবু এই ধারার অন্ধ অনুকরণের প্রতি ছায়াবাদ, প্রয়োগবাদের মধ্যবর্তী প্রগতিবাদের (১৯৩৬-এর আশপাশ থেকে) যুগে কিছু কবির বিতৃষ্ণা জেগেছে। সুতরাং এই সময় থেকে গীতের ভাষা ও শৈলী এই দুইয়ের নবীনতার প্রতি গীতিকারদের আগ্রহ দেখা গেল। উদাহরণ হিসেবে বচ্চনের সহজ এবং 'খোলামেল' এক ধরনের গীত রচনার উল্লেখ করা যায়। ছায়া, প্রয়োগবাদের মধ্যেকার সময়টার পরম্পরাগত ধারার অতিরিক্ত আর এক ধরনের গীত বা রাষ্ট্রীয়তাবোধক গীত তাও রচিত হল। স্বাধীনতা সংগ্রাম, পরাধীনতার বেদনা ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন সমকালীন বোধ এইসব গানে অভিব্যক্ত হয়েছিল। এই সময়কার যুবগোষ্ঠী থেকেই ছায়াবাদী ভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জোরদার হয়ে উঠেছিল। নয়ী কবিতর সঙ্গে সঙ্গেই গীতও রচিত হয়েছে নয়ী কবিতার কবিদের দ্বারা। কবিতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে একটা নতুন দিক, নতুন ধারা পরিচিত হয়ে উঠতে লাগলো গীতের ক্ষেত্রে। এই চেষ্টা অজ্ঞেয়, শমশের, কেদারনাথ আগরওয়াল ত্রিলোচন; ভবানীপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতির গীত রচনায়।

অনেকের মতে অজ্ঞেয় সম্পাদিত তার মস্তক' কবিতা সংকলন প্রকাশের (১৯৪৩এ) সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের বিখ্যাত প্রয়োগবাদ, আপন ব্যক্তিত্বের জোরে প্রতিষ্ঠা নিয়েছে। গীতকে ক্রমশই কেবলমাত্র প্রকৃতি আর লোকপ্রিয় বক্তব্যে সীমিত রাখা সম্ভব হয়নি। প্রয়োগবাদিতা সব কিছুর মত গীত-ভাবনা গীত-নির্মাণেও পরিবর্তন ঘটাতে লাগলো। ১৯৫০-এর আশেপাশে হিন্দী সাহিত্যে একটি 'নবলেখন বাদ' স্পষ্টভাবেই চলেছিল। গীতে যে নতুন ভাবনা শুরু হয়েছে, তা বোঝাবার জন্যে নয়ী কবিতার মত 'নওগীত' (নবগীত) নামটিও প্রচলিত হল। ১৯৫৮র কবি রাজেন্দ্র সিংহ 'গীতাঙ্গিনী' গীত সংকলনের ভূমিকায় নবগীত নামটি ব্যবহার করলেন এবং নয়ী কবিতারই মত অন্য এক জোরালো সাহিত্য আন্দোলনের নবগীত প্রবক্তাদের মতে) কয়েকটি লক্ষণও নির্ণীত করলেন। নবগীত নাম প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল তর্ক শুরু হয়ে গেল এর শিল্পগত ভাবগত প্রাকৃতিগত ইত্যাদি দিকগুলির অজস্র আলোচনা সহ। কেউ এর পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার প্রতি কটাক্ষপাত করলেন কারুর বা মত হল নয়ী কবিতা জীবনের আধুনিক ভাবের পরিচয় দেয়, নবগীত দেয় না।

নবগীতিকারদের মতে কিন্তু নয়ী কবিতা এবং নবগীত দুইই নতুন সাহিত্য শাখা, সাহিত্যিক প্রয়োগ, সাহিত্য প্রবৃত্তি এবং একই কথ্য সামান্য পার্থক্য নিয়ে দুয়েই বাস হতে পারে। 'দুসরা সপ্তক' (অজ্ঞেয় সম্পাদিত সমকালীন হিন্দী কবিতা সংকলন, ১৯৫২র প্রকাশিত) এবং 'তীসরা সপ্তক' (ঐ ১৯৫৯-এ প্রকাশিত) এ'র বহু কবির গান রচনায় তার প্রমাণ। তবু যে নবগীতের বিষয়ে অনাধুনিকতার অভিযোগ তার কারণ কোন কোন আলোচকের মতে, গীত সম্বন্ধে বহু কবির চিন্তায় গ্রথিত একটা পরম্পরাগত

মনোভাব। কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, যে কবি নয়ী কবিতা রচনার সময়ে জীবনবাদী রূঢ় এমন কি উৎকট আধুনিক তিনিই কিন্তু নবগীত লিখতে গিয়ে রোমান্টিক প্রকৃতিমুখী। তবু এই সব তর্ক থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে গীত রচনা নিছক ভাবুকতাকে অতিক্রম করে মূল্যবোধ সংক্রামণকে আত্মসাৎ করেছে এবং মানববোধ আর বৌদ্ধিকতা নিয়ে কবিসংবেদনাকে প্রভাবিত করেছে।

অনৈতিকতা, দুর্নীতি, বেকার-সমস্যা অনশন প্রভৃতি নিয়ে জীবনের ভয়ংকর সমস্যাজর্জরতার সঙ্গে প্রতিদিনের সাক্ষাৎকার কবিচেতনাকে উত্তরোত্তর প্রভাবিত করেছে। নয়ী কবিতাকে নগর চেতনার ছবিও বলা হয়। নবগীতেও এই নগর-বোধকে আঁকবার চেষ্টা পাওয়া যায়। জীবন সম্বন্ধে একটা মোহভঙ্গের চেতনা যেন গীতেও কবিকে জীবনের সবরূপকে বিশ্লেষণ করাচ্ছে। অর্থাৎ, 'নয়ী কবিতা', 'নয়ী কহানীর' মত নবগীত ও সাহিত্যিক এক প্রকাশ শৈলী যা কবির ব্যক্তিক অনুভূতি মাত্র নয় সামগ্রিক জীবনকেই প্রকট করছে নিজের রীতিতে।

সাহিত্যিক অভিব্যক্তির ধারায় স্বাভাবিকভাবে গীতিশাখায় নবগীতের জন্ম, এটাই মোটামুটি গৃহীত মত। কিন্তু কবিতা নির্মাণের দিক থেকে নবগীত বিষয়ে অন্য একটি মতেরও অস্তিত্ব আছে। সেই অনুসারে নিরালা যখন কাব্যরচনায় প্রথম মুক্তছন্দ প্রয়োগ করেন তখন থেকেই কাব্যরূপের চেয়ে কাব্যবস্তু বা বিষয়ের উপর গুরুত্ব অর্পিত হল বেশি। বক্তব্য যেন ছন্দসীমার শাসনে থাকতে চাইল না। মুক্তছন্দের অবাধ প্রয়োগ অতএব অবশ্যম্ভাবী এবং বহুবিস্তৃত হয়ে পড়ল। কিন্তু প্রয়োগের সেই বিস্তৃতি অযোগ্যের হাতে শোচনীয় ব্যর্থতার প্রমাণ রেখেছে বহুবার। কাজেকাজেই ছন্দের অনুশাসন আবার দরকার হল। এই অনুশাসনের প্রয়োগের মুখেও নবগীতের জন্ম। নবগীত মোটামুটি ছন্দবন্ধনেই থেকেছে কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। বিশেষ করে—প্রয়োগবাদের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে গীতনির্মাণশৈলীও অপরিবর্তিত থাকবে না তাই স্বাভাবিক। অনেকের মতে, কবির সংবেদন যখন সমসাময়িকতার দ্বারা অবিরাম প্রভাবিত হচ্ছে কাব্যরচনাশৈলী তখন গদ্যধর্মী হবে এবং কাব্যের আভ্যন্তরিক সংবেদনা থেকে লয় প্রাধান্য ক্রমশ সরে আসবে তাই স্বাভাবিক। আর গীতও বৃহত্তরভাবে কাব্যই।

সব সাহিত্যশাখার মতই নবগীত সম্বন্ধেও বিভিন্ন চিন্তকের সুচিন্তিত মত আছে। 'গীতাঙ্গিনীর' ভূমিকায় ব্যস্ত শ্রীরাজেন্দ্র সিংহের মতে, নবগীত হল কবির নতুন নতুন অভিজ্ঞতাজাত নবগীত অনুভূতিতে সঞ্চিত মর্মবোধের আন্তরিক স্বীকৃতি যাতে সাহিত্য অভিব্যক্তির নবতর কৌশলগুলির প্রয়োগ হচ্ছে। এরই আধারে তিনি নবগীতের পাঁচটি লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। যেমন জীবনদর্শন আত্মনিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ববোধ প্রীতিতত্ত্ব এবং পরিসঞ্চয়।

নবগীতের রচয়িতার জীবনদর্শনে এঁর মতে এক ধরনের সূক্ষ্ম ব্যাপ্তি আছে। সমগ্র মানবসংস্কৃতির আধুনিকতম বিকাশ নবগীতকার হৃদয়সংগম করে সমকালীন ঐতিহাসিকতার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেন।

আত্মনিষ্ঠা বলতে তিনি বোঝাতে চান ব্যক্তিক আর সামগ্রিক অনুভবের এবং আত্মগত ভাব আর দৃষ্টিগত গ্রহণীয়তার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ক্রম।

সেই ক্রমে নবগীত রচয়িতা ব্যক্তিত্বকে একটি প্রতীকের রূপে ব্যক্ত করেন এবং এই ব্যক্তিত্ববোধ দ্বারাই তিনি ক্রমশ নিজস্ব চরিতার্থতা খুঁজে পান।

নবগীতে প্রেম প্রীতি ভাবনার বিশিষ্ট স্থান থাকবে।

পরিসঞ্চয় অর্থাৎ গীতের মধ্যে গীতিধর্মী বহুপ্রকার গুণের সঞ্চয় হবে।

কিন্তু পাঠকমনে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জাগে যে এই পঞ্চতত্ত্ব কি নবগীত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য যা ইতিপূর্বের গীতে পাওয়া যেতো না বা বৃহত্তরভাবে কবিতায় পাওয়া যায় না? অর্থাৎ লক্ষণ হিসেবে এই পঞ্চতত্ত্ব পাঠককে কোন বিশেষত্বের সন্ধান দেয় না মাত্র শেষ তত্ত্বটি ছাড়া।

শরৎ রচনাবলী

(জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শরৎ সমিতি শিল্পীর সমগ্র রচনাবলী মোট পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করছেন। প্রতি খণ্ডের আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা সাতশত। একটি করে আর্ট প্লেট। ঝরঝরে লাইনোটাইপে ছাপা। সুন্দর কাপড়ের মজবুত বাঁধাই ও সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া। কেবল গ্রাহকদের জন্য পাঁচ খণ্ডের সহজ কিস্তিতে দেয় মোট মূল্য একশত টাকা। বর্তমান বছরের জুন/জুলাই থেকে পুস্তক বিতরণ করা শুরু হবে এবং আশা করা যায় ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সবক'টি খণ্ড বিতরণ করা সম্ভব হবে। বিশদ বিবরণ ও গ্রাহক হবার আবেদন পত্রের জন্য নীচের যে কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন অথবা নাম, ঠিকানা ও ২৫ পয়সার স্ট্যাম্প সহ ৯″×৪″ আকারের খাম পাঠান। আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৫।

সম্পাদক শরৎ সমিতি ৩১ অশ্বিনী দত্ত রোড কলকাতা ২৯	শ্রীসুপ্রিয় সরকার এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলকাতা ১২	শ্রীসন্তোষ দাস শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা ৯

শ্রীশম্ভুনাথ সিংহ নবগীতঃ ইতিহাস-লেখ' নামক প্রবন্ধে নবগীতের প্রকৃতি বিচার করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর মতে গীত রচনার পরম্পরাগত পদ্ধতি এবং ভাবকে অতিক্রম করে নবীন পদ্ধতি এবং ভাব যখনই গীতে অভিব্যক্তি লাভ করবে নবগীত হবে। আবার সব গীতে যেমন নবগীতেও তেমনই গেয়তা এক অবশ্যম্ভাবী সর্ত।

শ্রীরবীন্দ্র ভ্রমর—'নবগীত ঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব' নিবন্ধে নবগীতের জন্মলগ্নে স্রষ্টার মনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালীন দেশের এবং সামাজিক পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রভাব আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, নবগীতের জন্যে সংক্ষিপ্ততা সারল্য শিল্পগত মৌলিকতা, নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে সার্বজনিক দায়িত্ব বোধের সংযোগ ইত্যাদি আবশ্যিক। নবগীতে, লোকভাষা, লোকসংগীতের সুর, লোক-সংগীতের ছন্দ ইত্যাদির প্রয়োগও তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেছেন।

শ্রীগিরিজাকুমার মাথুরের আলোচনা-দিতেও নবগীতের সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। তাঁর মতে, নবগীত জীবন থেকে উৎপন্ন তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানসিক প্রতিক্রিয়া যা দীর্ঘ রচনার মত বিস্তৃত বর্ণনায় না গিয়ে অনুভূতিকেই খণ্ড রূপে ব্যক্ত করে। একে অনুভূতির সারখণ্ড বলা চলেই এ ভাবানুভূতির কারণকে বিশ্লেষণ করে না, তার মূলনিহিত সত্যকেই উদ্ঘাটন করে। অর্থাৎ বস্তুর প্রতি কবির অ্যাপ্রোচই গীতে প্রকাশিত হবে, বস্তু বর্ণনা সেখানে থাকবে অনুপস্থিত। কবিতা বা গীত দুই—এই বস্তুবর্ণনা ক্রমশ কমে আসছে। কবির সংবেদনার অভিব্যক্তিই কবিতারও বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে। কবি সংবেদনার মাধ্যমেই যেটুকু সম্ভব পাঠকের বস্তুবোধ হতে থাকে। শ্রীমাথুরের মতানুসারে তাই নয়ী কবিতা বা নবগীত দুটি বিরোধী শাখা আদপেই নয়। তিনি গীতেও ছন্দমুক্ত রচনার সাফল্য স্বীকার করেন। ছন্দোবদ্ধ হওয়া গীতের জন্যে সর্বদা আবশ্যিক নয় তাঁর মতে। গীতে ছন্দ ভাষার মনোহারিতা ইত্যাদির প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান জীবনের কঠোরতা যে গীতেও প্রভাব ফেলবে, তার সম্বন্ধেও তিনি সচেতন।

আবার শ্রীসকলদীপ সিংহ শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহের মতে গীতে বর্তমান জীবনের ব্যাপ্তির ছবি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব এবং নবগীতেও তার ব্যতিক্রম নয়। এই অভিমতের উত্তরে নবগীত প্রবক্তাদের উত্তর আমরা আগে আলোচনা করেছি।

মতামত যেমনই হোক না কেন, আধুনিক কাব্যধারার একটি শাখা হিসাবে নবগীতে আধুনিক বোধের অভিব্যক্তির অনিবার্যতা সম্বন্ধে কারুর দ্বিমত নেই। সুতরাং একটি মত যে প্রচলিত আছে, নয়ী কবিতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নবগীতের জন্ম, তা অনেকে স্বীকার করেন না। এ দুটির মধ্যে কোন তত্ত্বগত গভীর অসামঞ্জস্য নেই। সমাজের পরিবর্তিত মূল্যবোধের প্রকাশক হিসেবে এ গীতের এক পরিবর্তিত প্রকাশমাত্র। গীত বা নবগীত, এর মধ্যে সাংগীতিক গুণ থাকা চাইই। এ নয়ী কবিতার নবতর অভিব্যক্তি হোক বা না হোক কাব্যসত্তার একটি নতুন বিকাশ একে বলা চলতে পারে।

নবগীতের বাহ্যরূপ বা আকৃতির বিষয়ে কোন বিশেষত্ব এখনো নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা যায় না। ভাষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু নবীন প্রয়োগ হচ্ছে। কেউ কেউ উর্দুবহুল হিন্দী ব্যবহার করছেন, কেউ বা মোক্ষভাষার বিস্তৃত প্রয়োগ করছেন। কখনো কখনো গীতের রূপকে এমন নমনীয় করা হচ্ছে যে কবিতা এবং গীতের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না। অর্থাৎ নবগীতের রূপ অথবা আকৃতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছেই।

নবগীতিকার কবিরা ইতিহাসবৃত্ত এই গীতকে শিল্প অভিব্যক্তির প্রবাহে নতুন সংযোজন বলে স্বীকৃতি দেন। এঁরা প্রয়োগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গীত রচনা করেছেন আবার আঞ্চলিক তত্ত্বেরও সমাবেশ গীতে করেছেন। প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত নবগীতকারদের নাম মোটামুটি ঃ ধর্মবীর ভারতী, ঠাকুর-প্রসাদ সিংহ, গিরিজাকুমার মাথুর, রবীন্দ্র ভ্রমর, রামনরেশ পাঠক, কেদারনাথ সিংহ, রাজেন্দ্রকিশোর রাজেন্দ্র সিংহ, উমাকান্ত মালবীয়, ওম প্রভাকর ইত্যাদি।

এঁরা ছাড়া আরো কিছু কবি গীতিকার আছেন যাঁরা গীতরচনা করেন যদিও এঁদের কারো কারো রচনার প্রকৃতি গীত রচনা প্রকৃতি থেকে অনেকটাই ভিন্ন। অপেক্ষাকৃত নতুন এঁদের মধ্যে আছেনঃ নইম শ্যামসুন্দর ব্যাস, জয় দেব, দেবেন্দ্রকুমার, রমেশ রঞ্জক মাহেশ্বর তিওয়ারী নরেশ সক্সেনা চন্দ্রভূষণ ইত্যাদি।

নবগীতের ক্ষেত্রে সামগ্রিক এবং একক কবির গীত-সংকলন দুরকম সংগ্রহই দেখা যায়। সামগ্রিক সংগ্রহ হিসেবে ১৯৫৮র রাজেন্দ্র সিংহ সংকলিত গীতাঙ্গিনী ১৯৬৪ তে ওম প্রভাকর সম্পাদিত কবিতা সংকলন ১৯৬৯-এ চন্দ্রদেব সিংহ সংকলিত পাঁচ-জোড় বাঁশুরী এবং লছমীকান্ত সরস সংকলিত তিন খণ্ডে উভয়তে নওগীতকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিগত সংকলন হিসেবে বংশী ঔর মাদল (১৯৫৮) ঠাকুর প্রসাদ সিংহ মেহেন্দী ঔর মহাবর (১৯৬৩) উমাকান্ত মালবীয় রবীন্দ্র ভ্রমর-কে গীত (১৯৬৯) রবীন্দ্র ভ্রমর গীত বিহগ উতরা (১৯৬৯) রমেশ রঞ্জক পুষ্পচরিত (১৯৭৩) ওম প্রভাকর উল্লেখযোগ্য।

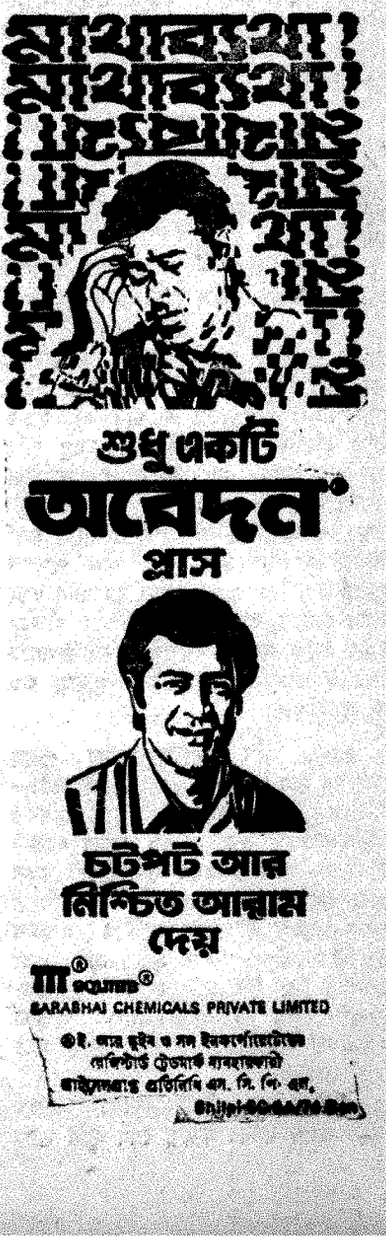

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড

প্রথম টেস্ট ক্রিকেট

অকল্যান্ডে ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৮৩ রানে জিতে গেছে।

প্রথম দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট পড়ে ৩১৯ রান উঠেছিল। দলের অধিনায়ক মাইক ডেনেস পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন। দলের ৩৬ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়লে ডেনেস খেলতে নামেন এবং ১৪৯ রান করে অপরাজিত থেকে যান। ৩য় উইকেটের জুটিতে জন এডরিচ (৬৪ রান) এবং ডেনেস দলের ১১৭ রান এবং অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে কিথ ফ্লেচার (৭৬ অপরাজিত) এবং ডেনেস দলের ১৬৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের একঘন্টা আগে ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসের ৫৯৩ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংল্যান্ডের কিথ ফ্লেচার সাতঘণ্টা ব্যাট করে তাঁর ২১৬ রানে ২৯টা বাউণ্ডারী মারেন। এই ২১৬ রানই টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডেনেস এবং ফ্লেচার ২৬৬ রান তুলে নতুন রেকর্ড করেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৪র্থ উইকেট জুটিতে ইংল্যান্ডের পক্ষে পূর্বের রেকর্ড রান ছিল ১৬৬ (কেন ব্যারিংটন এবং কলিন কাউড্রে, অকল্যান্ড ১৯৬৩)। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৩১ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৮৫ (৫ উইকেটে)—ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও নিউজিল্যান্ডের আরও ১০৯ রানের দরকার ছিল। জন পার্কার ১২১ রান এবং কেন ওয়াডসওয়ার্থ ৪৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ২য় উইকেটের জুটিতে মরিসন (৫৮ রান) এবং পার্কার ১১৬ রান এবং অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ওয়াডস-ওয়ার্থ (৪৯ নট আউট) এবং পার্কার (১২১ নট আউট) ১১২ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

চতুর্থ দিনে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩২৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় নিউজিল্যান্ড শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—৯টা উইকেট খুইয়ে ১৬১ রান করেছিল। নিউজিল্যান্ডের একমাত্র জন মরিসন ইংল্যান্ডের বোলিং উপেক্ষা করে ৫৮ রান করেছিলেন।

শেষ পঞ্চম দিনে ১৮৪ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলার চ্যাটফিল্ড ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার পিটার লেভারের বল খেলতে গিয়ে মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পান এবং শেষ পর্যন্ত খেলা থেকে অবসর নেন। ফলে ১৮৪ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় এবং ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৮৩ রানে জিতে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ৫৯৩ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এডরিচ ৬৪ ডেনেস ১৮১, ফ্লেচার ২১৬ এবং গ্রেগ ৫১ রান। হেডলি ১০২ রানে ২ এবং কংডন ১১৫ রানে ২ উইকেট)

নিউজিল্যান্ড : ৩২৬ রান (মরিসন ৫৮, পার্কার ১২১ এবং ওয়াডসওয়ার্থ ৫৮ রান। গ্রেগ ৯৮ রানে ৫ এবং আণ্ডারউড ৩৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮৪ রান (মরিসন ৫৮ এবং জি আর হাওয়ার্থ নট আউট ৫১ রান। গ্রেগ ৫১ রানে ৫ আণ্ডারউড ৪৭ রানে ২ এবং লেভার ৩৭ রানে ৭ উইকট)

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা

রঞ্জি ট্রফি—জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলাই

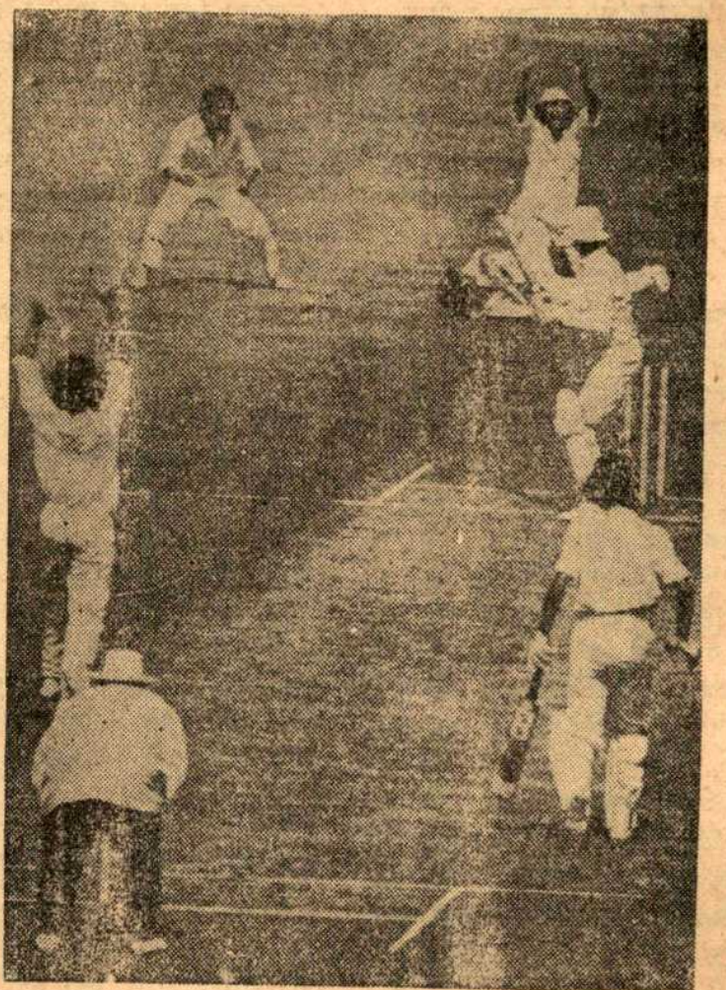

বাংলা বনাম কর্নাটকের রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম দিনে কর্নাটকের বিজয়কুমার বাংলার সুব্রত গুহের বলে ক্যাচ তুলে সম্বরণ ব্যানার্জির হাতে ধরা পড়েছেন। কর্নাটকের রান তখন ছিল মাত্র ১২।

দেশের বিভিন্ন স্থানে একই দিনে (ফেব্রুয়ারী ২৮) আরম্ভ হয়। এই চারটি খেলার মধ্যে বাংলা বনাম কর্ণাটকের খেলাটি বরাদ্দ চতুর্থ দিন পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বাকী তিনটি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায় তৃতীয় দিনেই। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার ফলাফল দাঁড়ায় : গত বছরের রঞ্জি ট্রফি জয়ী কর্ণাটক প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার দেলতে বাংলাকে, বোম্বাই এক ইনিংস ও ২৮ রানে বিহারকে হায়দরাবাদ দশ উইকেটে হরিয়ানাকে এবং দিল্লী তিন উইকেটে রাজস্থানকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। সেমিফাইনালে বোম্বাই খেলবে হায়দরাবাদের সঙ্গে এবং কর্ণাটক খেলবে দিল্লীর সঙ্গে।

বাংলা বনাম কর্ণাটক

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে বাংলা বনাম কর্ণাটকের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় কর্ণাটক তাদের প্রথম ইনিংসে ৯৪ রান বেশী করার সুবাদে বাংলাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। গত বছরের রঞ্জি এবং ইরানী ট্রফি বিজয়ী কর্ণাটক দল হিসাবে খুবই শক্তিশালী। তাদের পক্ষে খেলেছিলেন এই চারজন খ্যাতনামা টেস্ট খেলোয়াড়—বিশ্বনাথ প্রসন্ন চন্দ্রশেখর এবং ব্রিজেশ প্যাটেল। তবুও বাংলা সুহজে হাল ছাড়ে নি—কর্ণাটকের প্রথম ইনিংসের ৪৯২ রানের উত্তরে বাংলা তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৯৮ রান করেছিল। বাংলার পক্ষে পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন অম্বর রায়। তিনি শেষ পর্যন্ত ১৫৪ রান করে অপরাজিত থেকে যান।

প্রথম দিনে কর্ণাটক প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২৮৪ রান করেছিল। বাংলার আলগা বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের জন্যেই কর্ণাটকের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন। বিশ্বনাথ ৮১ ব্রিজেশ প্যাটেল ৭৫ এবং সঞ্জয় দেশাই ৫১ রান করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে কর্ণাটকের প্রথম ইনিংস ৪৯২ রানের মাথায় শেষ হয়। তারা এই দিন শেষ পাঁচ উইকেটে পূর্ব দিনের ২৮৪ রানের সঙ্গে ২০৮ রান যোগ করেছিল। সুধাকর রাও ৭৭ লক্ষ্মীনারায়ণ ৭১ এবং জয়প্রকাশ ৯০ রান করে আউট হন। দ্বিতীয় দিনের বাকী ২৫ মিনিটের খেলায় বাংলা কোন উইকেট না খুইয়ে ২৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৭৫ (৬ উইকেটে)। অম্বর রায় ৯৬ রান করে নট আউট থাকেন।

শেষ চতুর্থ দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ৩৯৮ রানের মাথায় শেষ হয়। অম্বর রায় ১৫৪ রান করে নট আউট থেকে যান। তিনি ৪২৭ মিনিট দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে তাঁর নট আউট ১৫৪ রানে ১৯টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। কর্ণাটকের প্রথম ইনিংসের পর্বত-প্রমাণ ৪৯২ রানের বিপক্ষে ৭ম উইকেটের জুটিতে অম্বর ও তপনজ্যোতি ৭২ রান এবং ৮ম উইকেটের জুটিতে অম্বর ও আলোক ৮১ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। কর্ণাটক ৯৪ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং চার উইকেট খুইয়ে ১৩১ রান সংগ্রহ করেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

কর্ণাটক : ৪৯২ রান (সঞ্জয় দেশাই ৫১, বিশ্বনাথ ৮১, ব্রিজেশ প্যাটেল ৭৫ সুধাকর রাও ৭৭ লক্ষ্মীনারায়ণ ৭১ জয়প্রকাশ ৯০ রান। সুব্রত গুহ ১১৫ রানে ৪ এবং সমর চক্রবর্তী ১০০ রানে ৪ উইকেট)।

বাংলা : ১৩১ রান (৪ উইকেটে। সঞ্জয় দেশাই নট আউট ৫১ এবং কিরমানী ৪৬ রান। টি জে ব্যানার্জি ৯ রানে ২ এবং দিলীপ দোসী ৩০ রানে ২ উইকেট)।

বাংলা : ৩৯৮ রান (অম্বর রায় নট আউট ১৫৪, গোপাল বসু ৫২, রাজু মুখার্জি ৩৫ এবং অলোক ভট্টাচার্য ৪১ রান। চন্দ্রশেখর ১৪৭ রানে ৪ এবং প্রসন্ন ৯৩ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দল

দুর্গাপুরে শ্রীরূপা বসুর নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চল দল ৭ উইকেটে ভারত সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ্য এই খেলাটি ছিল তাদের ভারত সফরের শেষ খেলা এবং প্রথম পরাজয়। ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : জয় ৩ (আঞ্চলিক খেলায়), ড্র ৩ (টেস্ট খেলায়) এবং হার ১ (পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে)। একদিনের আঞ্চলিক খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে দক্ষিণাঞ্চল ১০ উইকেটে উত্তরাঞ্চল এবং ৯৮ রানে মধ্যাঞ্চলকে পরাজিত করেছিল।

পূর্বাঞ্চলের দলনেত্রী শ্রীরূপা বসু টসে জিতে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে দেন। সীমিত ৪০ ওভারের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেট খুইয়ে ৮৮ রান করেছিল। মুনা বসুর বোলিংয়ের জন্যেই অস্ট্রেলিয়া বেশী রান তুলতে পারে নি। মুনা বসু ২৬ রানে ৫টা উইকেট পান। এরপর পূর্বাঞ্চল ২৮-১ ওভারের খেলায় ৩ উইকেটে ৮৯ রান তুলে ৭ উইকেটে জিতে যায়। উভয় দলের পক্ষে পূর্বাঞ্চলের কেয়া রায় সর্বোচ্চ রান (৬১) করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৮৮ রান (৮ উইকেটে। বারবারা ট্রাইড ৩০ রান। মুনা বসু ২৬ রানে ৫ উইকেট)।

পূর্বাঞ্চল : ৮৯ রান (৩ উইকেটে। কেয়া রায় ৬১ রান। মার্টিন ১৮ রানে ২ উইকেট)।

ডেভিস কাপ

১৯৭৫ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ৩—০ খেলায় নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে মূল প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয় জোনের বি গ্রুপ বিজয়ী দেশের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে ১লা মার্চ মারডেকা স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে মালয়েশিয়ার রাজা তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেছেন। এবারের প্রতিযোগিতায় যে ১২টি দেশ যোগদান করেছে তারা দুটি গ্রুপে সমান দুভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। তারপর প্রতি গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে খেলবে। সেমি-ফাইনালে এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান খেলবে বি গ্রুপের রানার্স-আপ দলের সঙ্গে এবং বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান খেলবে এ গ্রুপের রানার্স-আপ দলের সঙ্গে। কুয়ালালামপুরের মারডেকা স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলাসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খেলাও হবে। কুয়ালালামপুরের বাইরে পেনাং ইপো এবং সেরেমবান শহরেও খেলার আসর বসবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বারটি দেশের মধ্যে ভারত পাকিস্তান পশ্চিম জার্মানী এবং হল্যান্ড—এই চারটি দেশকে শক্তিশালী দল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় ধারণা এই চারটি দেশের যে-কোন একটি দেশ এবারের চ্যাম্পিয়ান হবে। ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে হল্যান্ডের বিপক্ষে ভারত ২—০ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত টাই-ব্রেকারে ২—৩ গোলে হল্যান্ডের কাছে হেরে রানার্স-আপ হয়েছিল। ১৯৭২ সালের মিউনিক অলিম্পিক হকি ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী চ্যাম্পিয়ান এবং পাকিস্তান রানার্স-আপ খেতাব পেয়েছিল। পশ্চিম জার্মানী কিন্তু এবারের ইউরোপীয় হকি প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান দখল করতে পারে নি, স্পেন চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার হকি খেলার মান যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তান সফরে অস্ট্রেলিয়া তিনটি টেস্ট খেলায় যোগ দিয়ে মাত্র একটিতে হেরেছে, বাকি দুটি খেলা ড্র যায়।

কুয়ালালামপুরের ৩য় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় হল্যান্ডের ১নং গ্রুপে এবং ভারতের ২নং গ্রুপে খেলা পড়েছে। হল্যান্ডকে শক্তিশালী পাকিস্তান এবং এবারের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ান স্পেনের সঙ্গে লড়তে হবে। অপরদিকে ২নং গ্রুপে ভারতের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী।

খেলার তালিকা

গ্রুপ এ : হল্যান্ড (গতবারের চ্যাম্পিয়ান) পাকিস্তান, স্পেন পোল্যান্ড; নিউজিল্যান্ড এবং মালয়েশিয়া।

গ্রুপ বি : ভারত (গতবারের রানার্স-আপ), পশ্চিম জার্মানী ১৯৭২ সালের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান), অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা এবং ঘানা।

দেশবিদেশের খেলা

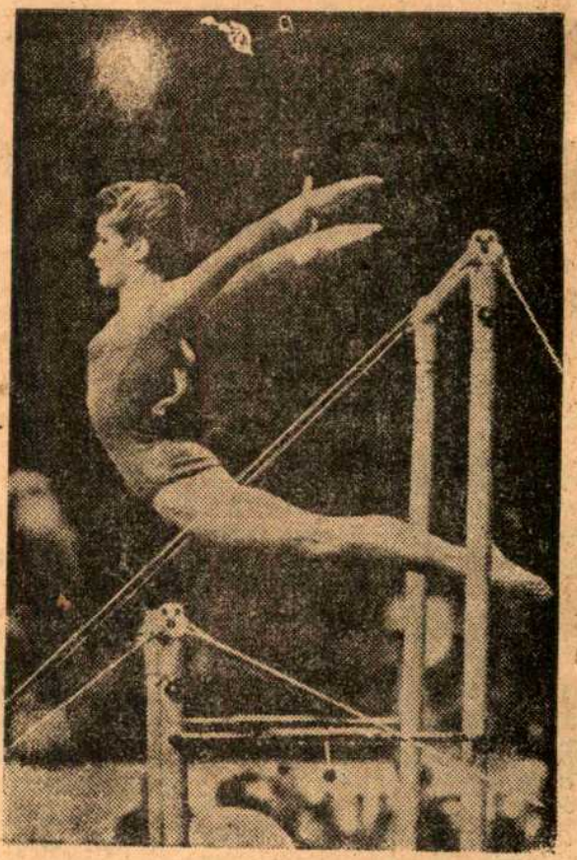

পাঁচ পদকী

গত দু বছরের আন্তর্জাতিক মহিলা জিমনাস্টিকসের পুরনো ছবির আমূল রদ-বদল ঘটেছে বলা যায়। রুশ নন্দনদের অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি অব্যাহত থাকলেও প্রায় এক যুগের কাছাকাছি রুশ প্রমীলাদের শীর্ষাসনটি বেহাত হয়ে যায় চেক তরুণী ক্যাসলাভোস্কার আবির্ভাবে। ক্যাসলাভোস্কা একাই একশো। স্বকীয় ক্রীড়াকীর্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে দীর্ঘকাল চেকোশ্লোভাকিয়াকে বিশ্ব মহিলা জিমনাস্টিকসের আসরে পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

জিমনাস্টিকের রানী চেক তরুণী ভেরা ক্যাসলাভোস্কা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে জিমনাস্টিকস থেকে বিদায় নিলে একদিকে অপ্রতিহত চেক প্রাধান্যের অবসান ঘটে ও অন্যদিকে শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে শূন্য শীর্ষাসন দখলের লড়াই রীতিমত জমে ওঠে।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়েছিল জাপান ও রাশিয়া। রুশ মহিলা জিমনাস্টিকের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় লারিসা লাতিনিনার। যিনি এককালে বিশ্ব জিমনাস্টিকের আসরে অনেক কৃতিত্বের অধিকারিণী হয়ে আজ সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় দলের প্রশিক্ষক। লারিসার ঐতিহ্যকে সহজাত নৈপুণ্যে স্বেচ্ছায় বহন করে চলেছেন রাশিয়ার নবতম সংযোজন লুডমিলা তুরিশ্চেভা।

এরিখা জুকুন্ড বিভিন্ন দেশী বিদেশী প্রতিযোগিতায় পুরোবর্তিনী হলেও পূর্ব-জার্মানীর আর এক মেয়ে কারিন জানজ স্বল্প সময়ের আবির্ভাবে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। তিনি বেশ কয়েকটি বড় বড় আন্তর্জাতিক আসর বিশ্বশ্রেষ্ঠ রুশ জিমনাস্ট লুডমিলা তুরিশ্চেভার সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। স্বদেশীয় এরিখা জুকুন্ডকেও পেছনে পড়তে হয়েছে কারিন জানজের নাটকীয় বসন্তের কাছে।

মিউনিখ অলিম্পিকে লড়াই জমে তুঙ্গে উঠেছিল শূন্য আসন দখলের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। সর্বোচ্চ পয়েন্ট সংগ্রহ করে রুশ তরুণীরা দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করলেও তাদের পদে পদে এগোতে হয়েছে পূর্ব জার্মানীর মেয়েদের সুদৃঢ় বেষ্টনী ভেদ করে। উভয় দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুস্পষ্ট আভাস মেলে দলগত ও ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপের খতিয়ান থেকে। দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপের ক্ষেত্রে রাশিয়া মোট ৩৮০-৫০ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে প্রথম ও পূর্ব জার্মানী ৩৭৬-৫৫ পয়েন্ট অর্জনের সুবাদে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপের পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ ঃ—

প্রথম লুডমিলা তুরিশ্চেভা (রাশিয়া) ৭৭-০২৫ পয়েন্ট দ্বিতীয় কারিন জানজ (পূর্বজার্মানী) ৭৬-৮৭৫ পয়েন্ট তৃতীয় তামারা লাকোভিচ (রাশিয়া) ৭৬-৮৫০ পয়েন্ট চতুর্থ এরিখা জুকুন্ড (পূর্বজার্মানী) ৭৬-৪৫০ পয়েন্ট পঞ্চম লাজুরভ বুবড়া (রাশিয়া) ৭৫-৭৭৫ পয়েন্ট।

মিউনিখ অলিম্পিকে তুরিশ্চেভাকে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করতে হয়েছে কারিন জানজের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বেড়াকে অতিক্রম করে। কারিন জানজ সেভেন্থ ও আনইভেন বার উভয় ইভেন্টে যথাক্রমে ১৯-৫২৫ পয়েন্ট ও ১৯-৬৭৫ পয়েন্ট লাভ করে স্বর্ণপদক জয় করেন। বিমের খেলায় ১৮-৯৭৫ পয়েন্ট অর্জন করে তৃতীয় স্থান দখল করে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। আর ফ্লোর একসারসাইজে ১৯-৪০০ পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ স্থানাধিকারী। দুটি স্বর্ণ ও একটি ব্রোঞ্জ ছাড়াও আরও দুটি রৌপ্য পদক গলায় ঝোলান ব্যক্তিগত ও দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপে দ্বিতীয় হওয়ার সুবাদে।

সর্বোচ্চ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপের আখ্যায় ভূষিতা হলেও লুডমিলা তুরিশ্চেভা কোন ইভেন্টে স্বর্ণ সঞ্চয়ের সেরা কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হননি মিউনিখ অলিম্পিকে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচপদকী কারিন জানজ অনন্যা। হর্সভল্টে ও আনইভেন-বারে বিজয়ী হয়ে দুটি স্বর্ণপদকের অধিকারিণী। ১৯৭০ সালের বিশ্ব জিমনাস্টিকের আসরেও আন ইভেনবারে কারিনজানজ স্বর্ণ ও হর্সভল্টে রৌপ্য জয় করেছিলেন।

কারিন জানজএর এখন বয়স বাইশ। আরও উৎকর্ষতা লাভের জন্য এখনও সময় পেরিয়ে যায় নি। প্রশিক্ষক জোয়াচিম হেরিটজের অনেক আশা কারিন জানজকে ঘিরে। কারিন জানজ নিজেও কম আশাবাদী নন। অনুশীলনে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ। বিনয়ী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রী ব্যক্তিগত জীবনে হাসিখুশী। সহজ এবং সরল। সতত জিমনাস্টিকসের ভেতরই খুঁজে পেতে চায় নিজেকে।

প্রশান্ত দাঁ

ইডেনে উত্তেজনাভরা তিনটি দিন ..... খেলার জগতে মেয়ে

গ্লেনিস ব্রাউন এবং ফে উইলকিনসন

প্রথমদিকে ফলোঅনের আশংকা, শেষদিকে জয়ের আশায় বিপুল উত্তেজনা আর মাঝখানে রাণ-মৃগয়ার চমকপ্রদ কলা-কৌশল—রমণীয় ইডেন উদ্যানে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার 'ইভ'দের তিনদিনব্যাপী শেষ টেস্ট ম্যাচের এই হল সার সংক্ষেপ।

ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে ২২ ২৩ ২৪ ইডেনে অনুষ্ঠিত এই টেস্ট ম্যাচ নানা কারণে মনে রাখবার মত। ভারতের মেয়েরা জাতীয় পর্যায়ে ক্রিকেট খেলছে খুব বেশী-দিন নয় বছর তিনেক হবে। এর মধ্যে বাংলাদল খেলছে মাত্র দু বছর ধরে। আর অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেমেছে বহু বছর যাবৎ।

ইডেনে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মোটা রাণ তুলে নিয়ে (পাঁচ উইঃ ৩০১ ডিক্লেঃ) ভারতের মেয়েদের বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে প্রারম্ভিক অবস্থা এমনি দাঁড়ায় যে ভারত বুঝি ফলোঅনে নামতে বাধ্য হবে। কিন্তু তা হয়নি। বাংলার শ্রীরূপা বসুর অধি-নেত্রীত্বে ক্রিকেটে নবাগতা হলেও ভারতের মেয়েরা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমানে যুঝেছে। শুধু তাই নয় গৌরবময় অনিশ্চয়তায় ভরা এই খেলায় শেষদিকে ভারতের মেয়েরা তো প্রায় জয়লাভের দোড়-গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। মাত্র বার রাণের অভাবে আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষে ভারত মহিলা ক্রিকেট এক ঐতিহাসিক নজীর সৃষ্টির সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হল। অবশ্য খেলার শেষদিকের এই প্রবল উত্তেজনাকর গতিবিধির জন্য প্রশংসা করতে হয় অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়িকা সিসিলিয়া উইলসনের। উইলসন ক্রিকেটের ভাষায় যাকে বলে স্পোর্টিং ডিক্লেয়ারেশন করে খেলাটিকে আকর্ষণীয় পর্যায়ে তুলে দেয়। ওরা দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমে তিন উইকেটে ৭২ রাণ তোলার পর উইলসন দান ছেড়ে দিয়ে ভারতকে জয়ের জন্য ১৯৮ রাণ তুলতে ২১০ মিনিট ব্যাট করার সুযোগ দেয়। ভারতের মেয়েরাও সেই চ্যালেঞ্জ তুলে নিয়ে দৃঢ়সংকল্প হয়ে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামে।

অস্ট্রেলিয়া দলে ব্যাটিংয়ে সব থেকে নজর কেড়েছে ক্যাথলিন গ্যারলিক আর লিনেট স্মিথ। গ্যারলিক ক্রিকেটের প্রকরণগত মারে সিদ্ধহস্ত। প্রথম ইনিংসে রাণ করে ১৫০ দ্বিতীয় ইনিংসে ৫১—দুবারই নট আউট থেকে যায়। আর লিনেটও কম যায় না বরং মারের হাত লিনেটেরই বেশী চোস্ত ও ব্যক্তিগত ৬১ রাণ করার পর ক্যাথির সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির ফলে রাণ আউট না হলে ভারতের সীমিত বোলিং শক্তির পক্ষে ওকে আউট করা হয়ত সম্ভবই হত না। রাণ আউট না হলে লিনেটও সেঞ্চুরী করত হয়ত।

ভারতের বোলিং শক্তি খুব ধারাল ছিল না। তারই মধ্যে পেস বোলার রুণা বসু একটানা ৩৮ ওভার বল দিয়ে এবং প্রতি-পক্ষের ৩০১ রাণ ওঠা সত্ত্বেও ১২ ওভার মেডেন নিয়ে ৬৮ রাণের বিনিময়ে দুটি উইকেট দখল করে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। অন্য-দিকে শান্তা রঙ্গস্বামী বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। ছোট্ট মেয়ে রুণাকে তার স্ট্যামিনার জন্য বাহাদুরী দিতেই হয়। রুণার বল ব্যাটসম্যানদের বারবার ধোঁকায় ফেলেছে।

যাই হোক ব্যাট করতে নেমে ভারতের মেয়েরা দ্বিতীয় দিনে নাট উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রাণ তুলতে পারায় ফলোঅনের আশংকা কাটিয়ে ওঠে দলের বিপর্যয়ের মুখে শোভা পন্ডিত (৪২) শিরিন কিয়াস্ত্র (২৯) ও শান্তা রঙ্গস্বামী বেশ বিচার বিবেচনা করে বলের মোকাবিলা করে তিনজনের মধ্যে শোভা পন্ডিত ইডেনের পনের হাজার দর্শকের মনোরঞ্জন করতে পেরেছে। শোভার লড়িয়ে মেজাজের ব্যাটিংয়ের তারিফ করেছে সবাই যেমন তারিফ করেছে আগন্তুক দলের ক্যাথি ও লিনেটের ব্যাটিংয়ের। শেষদিকের সপ্তম উইকেটের জুটি শিরিন কিয়াস ও ডায়না এডলজি প্রতিপক্ষের বলে বলে রাণ নিতে থাকলে বিপক্ষের মেয়েরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। ডায়না হরিণীর মত বারবার ছোটার

প্রথম সেঞ্চুরীকারী কেথলিন গারলিক এবং সুজান চ্যাপম্যান

মাঝে একবার ভুলের জালে পা দিয়ে রাণ আউট হয়ে যায়। ওর রান তখন 'আনলাকি ১৩' দলের বিপদ কেটে গিয়ে হয়েছিল ১৬০।৭। দিনের শেষে ভারতের রাণ ওঠে নয় উইকেটে ১৭৫। তৃতীয় দিন সকালে আট মিনিটে আর একটি রান নো বল থেকে যোগ হবার পর ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৭৬ রাণে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসেও ক্যাথলিন গারলিক ঝাঁঝালো ব্যাটিং করে ৫১ রাণ সংগ্রহ করার পর তিন উইকেটে ৭২ রাণে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এরপরই ইডেনের সব্জে নাটক জমে ওঠে। ভারতীয় দলের ফ্রন্টফুটে মেয়ে যৌজি খালিলি চমকপ্রদ দ্রুততার সঙ্গে রাণ তুলতে থাকে। ব্যক্তিগত ৪৫ রাণ তুলে ও রান আউট হয়ে যাওয়ায় সকলে হায় হায় করে। অন্যদিকে শোভা পণ্ডিতও তার সঙ্গে সার্থক সহযোগিতা করে ব্যক্তিগত ২৩ রাণ তোলে। টেস্ট ম্যাচের উত্তেজনায় মাঠ তখন জমজমাট। এরপর মনে রাখার মত ব্যাট করে শান্তা রঙ্গস্বামী (৫০।৩) শান্তা আর খালিলি ৫৬ মিনিটে ৫৩ রাণ যোগ করে আমাদের মনে জয়ের আশা জাগিয়ে তোলে। ১৩৮ মিনিটে এই জুটি তোলে ৭৪ রাণ। খালিলি যখন আউট হল ভারতের তখন তিন উইকেটে ১৩৫। শান্তা রাণ আউট হবার পর ডায়না এডুলজিও (২৩) বিদায় নেওয়ায় ভারতের জয়ের আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। মাঠ তখনও প্রবল উত্তেজনা। বিধিবদ্ধ শেষ কুড়ি ওভারের আর তিন ওভার বাকী, রাণ বাকী ২৫ খানি। শিরিন ও উজ্জলা কি পারবে ঐ রাণ তুলতে? এই প্রশ্নই সবার মনে। এ সময় অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা মাঠে যা ফিল্ডিং করেছে তা অনবদ্য ওদেশের ছেলেদের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর মাত্র ১২ রাণ বা তিনটি বাউণ্ডারী বাকী থাকতেই তৃতীয় তথা শেষ টেস্টের ওপর যবনিকা নেমে এল। ফলে প্রথমবারের টেস্ট পর্যায়ে ভারত জয়ী হতে—বারবার দখল করতে পারল না। পুণা আর দিল্লী দু জায়গায়ই প্রথম দুটি টেস্ট অমীমাংসিত ছিল।

তবে ব্যাটিং বোলিং বা ফিল্ডিংয়ে ভারতের মেয়েরাও যে আন্তর্জাতিক মানে উঠতে পারে তা আমাদের প্রমীলারা প্রমাণ করেছে।

কেবল প্রশ্ন থেকে যায় নেত্রী শ্রীরূপা ইডেনের অমন অনুকূল উইকেটে টস জিতে কেন বিপক্ষকে প্রথমে ব্যাট করতে সুযোগ দিল? দ্বিতীয়তঃ মেয়েরা জোরে বল মারতে এত দ্বিধা করে কেন? একমাত্র শিরিন ছাড়া কেউই মারের সময় বাহু ও

সুজান চ্যাপম্যান এবং অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক সিসিল উইলসন।

অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক সিসিলিয়া উইলসন ও ফাস্ট বোলার ডেব্রা মার্টিন

পায়ের ব্যবহার করছিল না কেন? তৃতীয়ত সর্বভারতীয় ক্রিকেটে পরপর দুবার বিজয়ী বাংলা দলের তিন তিনজন স্বীকৃত বোলার ব্যাটসম্যান ও উইকেটকীপার লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য ইলা রায়চৌধুরী ও অরুন্ধতী বোলার বনশ্রী দাসকে কেন টেস্ট দলে নেওয়া হল না? ন্যাটা বোলার শর্মিলা চক্রবর্তীর ওপর থেকে দণ্ডাজ্ঞা যখন তোলাই হল তখন তা তৃতীয় টেস্টের আগে হল না কেন?

সব মিলিয়ে বলা যায় অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা অভিজ্ঞ এবং তুলনায় অধিক শক্তিশালী হলেও ভারতের মেয়েরা প্রথম আবির্ভাবে কিছু কমতি যায়নি দিল্লীতে দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র তিন রাণের জন্য জয়লাভে বঞ্চিত করা ভারতের প্রমীলাদলের পক্ষে কম কৃতিত্ব নয়। প্রমীলা ক্রিকেট সম্ভাবনাপূর্ণ।

অমৃত

ক্যাথলিন ম্যাগ্রীডি

ভারতীয় দলের উইকেট কিপার এবং ওপেনিং ব্যাটসম্যান ফৌজি খালিলি

রঞ্জনী আলোয়

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছায়াছবির জগতে বেশ একটা মজাদার ব্যাপার ছিল। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে হাসি মস্করা চলত, ভাবের আদান-প্রদান হত। এখন যতদিন যাচ্ছে, দেখছি—সম্পর্কের আন্তরিকতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, উল্টে কেমন ধারা ফর্মালিটিজ সেখানে জেঁকে বসছে। এতে হাসি কমে যাচ্ছে, হাসির ঘটনাও কমে যাচ্ছে। অথচ যে জাতের সেন্স অব হিউমার কম, সে-জাত স্বল্পায়ুই হয়। প্রাণখোলা হাসি আসলে মানুষের সুস্থতারই লক্ষণ; আগে ট্রামে বাসে ট্রেনে কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মানুষ হাসত, কত মজার মজার সহযাত্রী পাওয়া যেত। অথচ ইদানিং লক্ষ্য করুন, যে-কোন একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাতাহাতি মারামারি হয়ে যাচ্ছে। আর ভয়ংকর ক্রুদ্ধ এবং বিপরোয়া সহযাত্রীদের সঙ্গে আপনাকে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয়!

স্টুডিওতে ঢুকলে আগের মত আর মনেই হয় না যে একটা মজার কিছু ব্যাপার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে! চারিদিকে বিষণ্ণ মুখ, ক্লান্ত ভঙ্গী, চারিদিকে অবক্ষয় সকলকে যেন তাড়া করে ফিরছে। তখন ভীষণ খারাপ লাগে। বেশীর ভাগ মানুষ গম্ভীর কণ্ঠে, নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে, আলোচনা করছে। মায় ক্যান্টিনের ন্যাতা গোলা চা গিলে নিছক পরিহাসের ভঙ্গীতেও একটা কথা বলছে না। কেন বলছে না? বলবে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হত?

এই ব্যাপারটাকে আপনারা কিভাবে নেবেন, সঠিক জানি না। আমাদের চারপাশে চাসি-খুশী মানুষগুলি এত কমে যাচ্ছে যে কি বলব। চোখের সামনে বাঘের মত ক্যামেরা, হাজার হাজার ওয়াটের জোরাল আলো, শরীরে জ্বালা ধরে যাবার দাখিল, ফ্লোরের প্রচণ্ড গরম—এসবই উপেক্ষা করা যায় এবং স্বচ্ছন্দেই যদি দমকা ঝড়ের মত একটা হাসি মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এবং সেই হাসির প্রসন্ন মেজাজ যদি অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যেকের তাপিত হৃদয়ে অনুরণিত হতে থাকে। বলুন কত ভাল হয়! মাঝখানে কয়েক সংখ্যা ছায়োস্কোপিক লিখতে না পারার অন্যতম কারণ ছিল এটাই, বিশ্বাস হবে কিনা জানি না। যাঁরা আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত তারা জানেন আমি বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে মানুষকে হাসির খোরাক জুগিয়ে আসছি। আমি নিজে হাসতে চাই, সেই সঙ্গে এটাও চাই—সবাই প্রাণ খুলে হাসুক। প্রাত্যহিক জীবনে বহু সমস্যাকে আমাদের এখন কিছুদিন হয়ত এইভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। এছাড়া আর উপায় কি!

ইউরোপ প্রত্যাগত এক ভদ্রলোকের মুখে একবার একটা গল্প শুনেছিলাম? ভদ্রলোক প্যারিসের এক নামজাদা রেস্তরাঁয় ঢুকে দেখলেন সেখানে আর একটা চেয়ারও খালি নেই। মায় মেঝের ওপরও কিছু লোক বসে আছে। এবং সবাই হো হো করে হাসছে। অদূরে একটা প্লাটফর্মের ওপর মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে আছেন। গম্ভীর মুখে। তিনি মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে একটা নম্বর হাঁকছেন আর রেস্তরাঁশুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

কি ব্যাপার? আমাদের এই ভদ্রলোকের তো চক্ষুস্থির। একজন খেঁকুড়ে মত দেখতে লোক নম্বর হাঁকছে এতে হাসির ব্যাপারটা কোথায়?

তিনি কৌতূহল চাপতে না পেরে একজনকে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন—হ্যাঁ মশায়, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

সে লোকটি বলল—এটা একটা জোকস্ সেশন চলছে।

—অ। তা ওই ভদ্রলোক তো কোন জোকস্ বলছেন বলে মনে হচ্ছে না, উনি তো নম্বর হাঁকছেন—

এবার লোকটি মুচকি হেসে বলল—ওটাই তো জোকস্। ওই যে ভদ্রলোককে দেখছেন না উনি আমাদের এখানকার একজন নামকরা কমেডিয়ান। বিগত পঁচিশ বছর ধরে আমাদের হাসিয়ে আসছেন। ইদানিং ওঁর বয়স হয়েছে বলে সম্প্রতি উনি রিটায়ার করেছেন। কিন্তু রিটায়ার করলেই তো আর আমরা ছাড়ছি না; আমরাও ধরে এনেছি। উনি বলছেন—যাস্ নতুন কোন জোকস্ আর তৈরী করতে পারছি না। আমরা চলেছি, পাম্পে কোই পরোয়া নেহি আপনি আপনার পুরোনো-গুলোই চালিয়ে যান। আসলে ওঁর তৈরী সমস্ত জোকস্-ই আমাদের মুখস্থ। ফলে উনি যাঁহাতক নম্বর হাঁকছেন আমরা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলছি উনি এবার আমাদের কোন্ জোকস্টা দিলেন। লোকে বেদম হাসছেও।

আমাদের এখানকার কয়েকজন কমেডিয়ান এখন মোটামুটি সেই লেভেলেই পড়ে গেছেন। ধরুন জহর রায়, ভদ্রলোক বিগত প্রায় পঁচিশ বছর মানুষকে হাসিয়ে আসছেন, ওঁর হাসির উৎসও যেন অফুরন্ত। সেদিন রেডিওতে ওঁকে বলতে শুনলাম, আমি বাইরে রোগা, ভেতরে পারোগা। খুব খাঁটি কথা। মনে রসের যেন একটা ফল্গুধারা বয়ে যাচ্ছে। জহর রায়-দের একটা জেনারেশন যাচ্ছে; পরে এঁদের কে বা কারা রিপ্লেস করবেন, দেখতেও পাচ্ছি না। বুঝতেও পারছি না। তবে এটা ঠিক, কোন ভ্যাকুয়াম কোথাও থাকতে পারে না। থাকা সম্ভবও নয়। তাই কেউ না কেউ ঠিকই ওঁদের জায়গা নিয়ে নেবেন।

জহর রায় আর অজিত চাটুজ্যে, পরস্পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওঁরা একবার শ্যামবাদে গেছেন জলসায় লোক হাসাতে। রাত্রে লোকজন হাসিয়ে ওঁরা স্টেশনে এলেন ভোরের ট্রেনটা ধরবেন বলে।

গভীর রাত—চারিদিকে কাকজ্যোৎস্না যেন ফিনিক দিচ্ছে। ট্রেনের তখন অনেক দেরী, তাই ওঁরা সিগারেট ধরিয়ে নির্জন প্লাটফর্মে পায়চারী করতে শুরু করলেন।

করতে করতে হঠাৎ অজিত চাটুজ্যে দেখলেন প্লাটফর্মের সামনের বেঞ্চিতে একটি লোক অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। আহা তার নাক ডাকার কি বহর,—কখনও তোড়ি কখনও মালকোষ কখনও বা বসন্তবাহার।

অজিত চাটুজ্যের মৃদু মন্তব্য—অহো—

জহর রায়—যেন বিসমিল্লা—

আবার দুজনের পায়চারী আরম্ভ হল। আর সঙ্গে চলতে থাকল সেই উৎকট আবহ-সঙ্গীত। অজিত চাটুজ্যে কিছুক্ষণ পায়চারী করে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, জহর, এবার মিঞা-কি-মল্লার?

—উহুঁ ঘরানা দেখে মালুম হচ্ছে এটা রাগেশ্রী।

—অঃ।

আবার কিছুক্ষণ চলাফেরা করার পর অজিত চাটুজ্যে বললেন, জহর, লোকটার টাকটা লক্ষ্য কচ্ছে?

—করেছি বৈকি, জ্যোৎস্নার আলোয় চকচক করছে, বেশ জমকালো সাইজের টাক্—

—হুম্..., ছাঁকা দিলে কেমন হয়?

—খুউব ভাল হয়। একখানা খাম্বাজ রাগিণী হয়—গম্ভীরভাবে বললেন জহর রায়।

—দেবে?

—দিতে পারি, কিন্তু মামু?

—কিন্তু তো?

—শতকরা।

অর্থাৎ একশো টাকা বাজী ফেললে জহর রায় লোকটির টাকে বেশ জমিয়ে

হার্মোনিয়ম / সোনালী গুপ্ত ও ভীষ্ম গুহঠাকুরতা

সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা দিতে পারেন। অজিত চাটুজ্যে ধাঁ করে রাজী হয়ে গেলেন।

—জান্!

—জান! বলে জহর রায় নিজের মুখের জ্বলন্ত সিগ্রেটটি ফুক ফুক করে টানতে টানতে হঠাৎ কষে এমন বেদম একটা টান দিলেন যে সেটি সাক্ষাৎ যেন একটি অগ্নি-গোলক হয়ে গেল। তারপর 'মাঃ' বলে সেটি আমূল বসিয়ে দিলেন লোকটির ব্রহ্মতালুতে আরে বাপরে বাপ, তারপর চোখের সামনে যেন নগদ একখানা ব্যাটেল অফ দিয়েন বিয়েম ফু হয়ে গেল।

ঘুমন্ত টাকওয়ালা লোকটি আচমকা ওই রকম একখানা গিটকিরির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। থাকার কথাও নয়। তাই টাকে আগুনের পরশমণি পেয়ে তুরন্ত সে যা একখানা লাফ দিল, যেটা জহর রায়ের মতো ও-ধরনের লম্ফ এক অলিম্পিকেই নাকি কচিৎ-কখনো দেখা যায়। হাত তিরিশেক লাফ্যে উঠে লোকটি সবে মাটিতে পড়েছে এবং সেই সংগে একখণ্ড ভিৎ কাঁপানো আওয়াজ ছেড়েছে, জহর রায় তৎক্ষণাৎ তার বাহুমূলে চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন—তুহারকো প'চাশ, হামারকো প'চাশী, চিল্লাও মৎ—অর্থাৎ অজিত ডাহা হেরেছ, এখন পেমেন্ট করলেই তোমার ফিপটি, আমার ফিপটি, হার্ড ক্যাশ, সো ডোন্ট ওরি মাইডিয়ার...

এখন এহেন পরিস্থিতি ভূ-ভারতে এক জহর রায় ছাড়া আর কারো ট্যাকেল করার ক্ষমতা আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। নাহলে সেদিনই হয়ত ধানবাদের প্রেস করেস-পন্ডেন্টরা বেশ স্বচ্ছন্দেই একটা মার্ডার ষ্টোরি ও'দের নিজের নিজের কাগজে লিখে পাঠাতে পারতেন।

হঠাৎ অনুপকুমারের কথা এসে পড়ল। চমৎকার মজার মানুষ। আজীবনকাল অববাহিত থেকে পার্টিকুলার কোন মেয়েটিকে যে অনুপদা টাইট দিল তা এখনও পর্যন্ত আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে টাইট যে দিয়েছে এটা বুঝতে কিন্তু আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। ভেতরে মানুষটি অসাধারণ রোমান্টিক বন্ধু-বৎসল (স্বভাবতই বান্ধবী) অথচ বাইরে তার কোন প্রকাশই নেই। আর যাই হোক এখন চারিদিকে যা দেখছি অনুপকুমারের চরিত্রহনন করার উপায় নেই ত্রিসীমানায় মহিলা নেই যে! হায়! বায়োস্কোপের মানুষদের নিয়ে স্ক্যান্ডাল লিখে বাজার তৈরী করার জন্যে ইদানিং যেসব কাগজ পয়দা হয়েছে অনুপকুমারের মূল্য তাদের কাছে খুবই কম। চুলোয় যাক স্ক্যান্ডাল কাগজ আর ইয়োলো জার্নালিজম আমি হাসির প্রসংগে ফিরে আসি।

শ্যামল মিত্রের একটা ছবির আউটডোর শুটিং করতে আমরা গেছি ভারত-পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ) সীমান্ত বরাবর কোন একটি শহরে। শহরের কাছে মস্তবড় স্রোতস্বিনী একটি নদী। আমাদের বেশীর-ভাগ শুটিং ওই নদীর ওপর নৌকায়।

অনুপদা ছবির নায়ক। আশ্চর্য লোক মশাই কোন নেশাভাংগ নেই মাঝে-মধ্যে এক-আধটা গ্রিগ্রেট তাও সিলেক্টেড ব্র্যান্ড। লোকে-শানে আমাদের সংগে অন্যান্য আর্টিষ্টও আছেন। মাধবী তরুণকুমার বিকাশ রায় জ্ঞানেশ মুখার্জি ভানু ব্যানার্জি। শহরের সীমানায় একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে ক্যাম্প তৈরী করা হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশজনের একটা ইউনিট। দুবেলা একসংগে খাওয়া-থাকা সে যেন একটা এলাহি ব্যাপার।

আর্টিষ্টদের দেখবার জন্যে ক্যাম্পে রোজ স্বভাবতই ভীষন ভীড় হয় কিন্তু সারাদিন শুটিং করে ক্লান্ত আর্টিষ্টরা আর ঘরের বাইরে আসতে উৎসাহ পান না ফলে জনতাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়।

দ্বিতীয় না তৃতীয় দিন সেটা আমার স্মরণ নেই ভাল করে—ভোরবেলা আমরা নদীর ঘাটে গেছি লঞ্চে চড়ে শহর ছাড়িয়ে বেশ কয়েক মাইল দূরে গিয়ে তবে শট নেওয়া হবে কিন্তু সারেংগ বললে—লঞ্চ যাবে না—

—কেন?

সারেংগ ভয়ে ভয়ে বলল—গেলে আমায় পিটবে।

শ্যামল মিত্তির তো অবাক!—কেন পিটবে কেন? আমি নগদ পয়সা দিয়ে লঞ্চ ভাড়া করে শুটিং করছি—কারা পিটবে?

সারেং ভয়ে ভয়ে যাদের কথা বলল, নিমেষে বোঝা গেল এরা সবাই লোক্যাল ট্যালেন্টস্। ওদের দাবী এই ঘাটে লঞ্চ দাঁড় করিয়ে রেখে প্রত্যেকদিন শুটিং করতে হবে যাতে ওরা দু নয়ন ভরে আমাদের কীর্তি-কলাপ সব দেখতে পায় এবং ঝামেলা করবার সুযোগ পায়।

শ্যামল মিত্তির সব শুনে মাথায় হাত দিলেন। একজন তাঁকে পরামর্শ দিলেন আরে ধুস্, এর জন্যে এত ভাবনা কিসের? টুক করে এস-পিকে খবরটা দিলেই সব মস্তান ঠান্ডা হয়ে যাবে।

অনুপকুমার হেসে বললেন—ব্যস তাহলে আজই এখানকার পাত্তাড়ি গুটিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। এর মধ্যে পুলিশ ঢোকালেই সব ভন্ডুল হয়ে যাবে কিন্তু—অনুপকুমার হুঁশিয়ার করে দিলেন—ও কম্মোটি ভুলেও কেউ করো না। এমনি ভাল মুখে বুঝিয়ে বাজিয়ে কাজ তুলে নিতে হবে।

আমরা ও'কে সমর্থন করলাম। উনি যথার্থ কথাই বলেছেন। আউটডোর শুটিং-এ 'মব্' ট্যাকেল করাটাই হচ্ছে বড় কথা। ছবির বাজেট অনেকাংশে এর ওপরই নির্ভর করে।

শ্যামল মিত্তির আর দ্বিরুক্তি না করে স্থানীয় মস্তানদের যারা পান্ডা তাদের সংগে মুখোমুখি আলোচনায় বসলেন।

ওরা বলল—গুরু গান শোনাতে হবে—

শ্যামল মিত্তির অমায়িক হেসে—নিশ্চয় শোনাব। তবে সেসব তো এখন নয় পরে—

ওরা জানতে চাইল—আজ সন্ধেয়?

না না আজ কি করে হবে? আজ তো রাত্রে আমি ক.....ি ফিরে যাচ্ছি। হবে যে

কোন একদিন। সাত আটদিন ধরে আমার ছবির কাজ তো হবেই এখানে—

ওরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। স্পষ্ট করে প্রতিশ্রুতি পেতে চায়। অনুপকুমার ওদের বুঝিয়ে বললেন ভাই শ্যামল যখন কথা দিয়েছে তখন গান একদিন ও নিশ্চয় তোমাদের গেয়ে শোনাবে। এখন আমাদের অনুমতি দাও আমরা কাজ শুরু করি—

ওরা তখন এটু তফাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কিসব আলোচনা করল। তারপর ফিরে এসে বললে ঠিক আছে আপনারা শুটিং আরম্ভ করুন আমরা লঞ্চ ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি—

শ্যামল মিত্তির বললেন—দেখ ভাই তোমাদের ওপর ভরসা করে এত টাকা পয়সা খরচ করে এত আর্টিষ্ট নিয়ে তোমাদের এখানে শুটিং করতে এসেছি এখন তোমরা যদি কো-অপারেট না করো তাহলে ধনে-প্রাণে মারা পড়ব—

ওদের একজন মুখপাত্র কতকটা ছেবো মস্তানের মত দেখতে—এগিয়ে এসে ছেঁড়ে গলায় রাজকীয় ঘোষণা করল—দেখি কোন শ্লা আপনাদের ইয়ে করে মেরে শ্লার তবলা খিচে দেব না—বলেই হাতের গুলি ঘুলিয়ে দেখাল তার নজরটা পাড়ার মেয়েদের দিকেই বেশী। স্পষ্ট দেখলাম স্থানীয় কলেজের চার-পাঁচটি মেয়ে ওকে পটাপট মুখ ভ্যাংচাল। তাতে ছেবোর বয়েই গেছে।

আর একটি মস্তান শ্যামল মিত্তিরের সামনে হঠাৎ এক চক্কর নেচে নিয়ে বললে—গরু তোমার 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেব' শুনে মাইরি বলছি আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল শেষে বদু ডাক্তারের ওষুদ খেয়ে খেয়ে রোগ সেরেছে তুমি মাইরি ওই গানটা আমাদের গেয়ে শোনাবে, কথা দাও গরু কথা দাও—

শ্যামল মিত্তিরের মুখটা তখন রীতিমত একটা স্টাডি। হাসবেন না কাঁদবেন সম্ভবতঃ স্থির করতে পারছিলেন না। শেষে ছেবো মস্তান ছেঁড়ে গলায় বললে—এই পোরতোস শ্লা ইদিকে আয়। আগে সুটিং পরে গান যা-বে রাস্তা গার্ড দে গে। লঞ্চ ঘাটে যেন একটা লোক আমাদের পারমিশান ছাড়া গলতে না পারে—

পরিতোষ তখন রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল—আর তুই বুনি এখানে দাঁড়ো রেলা করবি? সেটা হচ্ছে না চাঁদু আমরা ট্রাফিক কন্ট্রোল করব আর উনি এখানে পরিচালনা করবেন হ্যাঃ যা-যা—

এইরকম একটা অকৃত্রিম লঘুক্রিয়ার মাধ্যমে তো আমাদের বায়োস্কোপের কাজ শুরু হল। লঞ্চের সারেঙ্গ ওঁয়াদের মৌখিক সম্মতি নিয়ে তখে সিটি বাজালেন।

মাঝ নদীতে আমাদের কাজ। সেদিন অনুপকুমার আর জ্ঞানেশ মুখার্জিকে নিয়ে আমাদের চিত্রগ্রহণ। মাঝি সাজলেন জ্ঞানেশ আর অনুপকুমার খেয়ার যাত্রী। খেয়ার মাঝি গান গাইছে আপনমনে মাঝপথে দেখা গেল অনুপকুমারও সেই গানে গলা মেলাচ্ছেন। মাঝি দুঃখু করে গাইছে যে আর কতদিন এরকম পারাপার করব। ঈশ্বর তোমার কোন বিচার নেই আমার এই হাড়ভাংগা মেহনতের কোন পুরস্কারই আমি পাই না। আর অনুপকুমার প্রত্যুত্তরে গাইছেন যে তুমি নিজেকে সাধারণ মানুষ ভেব না তোমার অনুগ্রহে এপারের মানুষ নিত্য ওপারে যাচ্ছে আসলে নদীর দু কূলকে তুমি যেন ঠিক মালার মত গেঁথে রেখেছ তোমার এই অবদান কেউ কখনও ভুলবে না—ইত্যাদি কত কথা।

হেনকালে ফট ফট; পেছনে বিকট শব্দ শুনে আমাদের লঞ্চের গতি নিমেষে রুদ্ধ হল। সারেঙ্গ সাহেবের ভাবগতিক দেখে মনে হল নিশ্চিত কেলেঙ্কারী কিছু হয়েছে।

দেখতে দেখতে একটা স্পীডবোট তীর-বেগে এসে বোঁ করে ঘুরে গিয়ে আমাদের লঞ্চকে ভীষণ ডজ করতে আরম্ভ করে দিল সেই সঙ্গে তীব্র হুটিং-এর শব্দ। আমরা সবাই তো থতমত।

সারেঙ্গ সাহেবের চক্ষুস্থির। স্খলিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল—খেয়েছে মিলিটারী—

—মিলিটারী! তার মানে? অনুপকুমারের প্রশ্ন।

সারেঙ্গ সাহেব তার লাগিং সামলাতে সামলাতে বললে ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না হঠাৎ মিলিটারীর লঞ্চ ধাওয়া করে এল কেন? আপনারা কেউ কোন মালপত্তর স্মাগলিং করছেন না তো?

—স্মাগলিং! বিস্ময়ে আমাদের সবার তো চোয়াল ঝুলে যাবার দাখিল—এর মধ্যে আবার স্মাগলিং ফাগলিং-এর প্রশ্ন আসে কি করে? এ্যাঁ?

সারেঙ্গ বিচলিত কণ্ঠে বললে—তা নাহলে তো ওঁয়ারা পেছনে পড়বে না—

ততক্ষণে আমাদের লঞ্চের সঙ্গে মিলিটারী স্পীড বোট সেঁটে গেছে। কয়েকজন সৈনিক রাইফেল উঁচিয়ে শটাশট আমাদের লঞ্চে নেমে পড়ল সঙ্গে এক ঝাঁক হুঙ্কার। সবার শেষে এলেন একজন ক্যাপ্টেন। সর্দারজী। হাতে রিভলবার। নেমেই বললে—ব্যাটা সারেঙ্গ কো বোলাও—

সারেঙ্গ সাহেব সাক্ষাৎ বিনয়ের অবতার হয়ে হাত কচলে সর্দারজীর সামনে দাঁড়াল—হুজুর!

ক্যাপ্টেনের প্রশ্ন—যাচ্ছ কোথায়?

—আজ্ঞে?

—বলি এদিক পানে চলেছ কোথায়?

—আজ্ঞে তেমন কোথাও না।

—গান-বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম তোমার লঞ্চে মাইফেল-টাইফেল হচ্ছে নাকি? এসব লোক-জনই বা কারা?

সারেঙ্গ সাহেব ঢোক গিলে বললে—হুজুর এঁয়ারা সব বায়োস্কোপের লোক ছবি তুলছেন আমরা ভাড়া খাটছি।

ক্যাপ্টেন তাকে এক পিলে চমকানো ধমক দিয়ে বললে—আর এটু হলে তো সব সমেত পাকিস্থানের জেলে যেতে বসেছিলে—জল বাইতে বাইতে কদ্দুর পর্যন্ত এসে পড়েছ—সে-খেয়াল আছে?

বলতেই সারেঙ্গ সাহেব ফ্যাল ফ্যাল করে একবার চতুর্দিক তাকিয়ে নিল। আই বাপ।

ক্যাপ্টেন বলল—আর মাত্র দু-কিলো-মিটার এগিয়ে গেলে সব্বোনাশের মাথায় বাড়ি পড়ত। বায়োস্কোপের লোকজন সমেত তোমরা যেতে পাকিস্থানের জেলে আর আমার যেত চাকরী। উঃ ভাগ্যিস গান-বাজনা শুনতে পেয়েছিলাম। আজ একটা ইন্টারন্যাশনাল কেলেঙ্কারী হতে বসেছিল আর কি? আমি তোমাকে অ্যারেস্ট করলাম—

বলতেই দুজন হোংকা মতন সোলজার বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে সারেঙ্গ সাহেবকে ধরে ফেলল—চল্ বক্তেমিজ—

সারেঙ্গ সাহেব নিমেষে ভ্যাক—ছেড়ে দাও ক্যাপ্টেন সাহেব এই আমি নাকে-কানে মলা খাচ্ছি। আর জীবনে এ-রকম ভুল করব না এযাত্রা ছেড়ে দাও দাদা—

আর ক্যাপ্টেন তাকে কিছুতেই ছাড়বে না।—ব্যাটা আমাকে কোর্ট মার্শাল করবার ধান্দায় ছিল—ওকে ছাড়ব? কভি নেহি, আভি হম উসকো কোর্টমার্শালমে ডালেঙ্গে—

শ্যামল মিত্তির অনুপকুমার থেকে শুরু করে সবাই ক্যাপ্টেন সাহেবকে সমানে কিছুক্ষণ তদ্বির করলেন—ছেড়ে দিন ভাই নাকে কানে মলা তো খাচ্ছেই আর মার্শাল করে কি লাভ! ছেড়ে দিন—

সর্দারজী এবার যেন এটু নরম হলেন। —ঠিক আছে দিচ্ছি ছেড়ে কিন্তু সাবধান ভবিষ্যতে আর কখনও যেন এমনটা না হয়—

ক্যাপ্টেন সাহেব সকলের সঙ্গে হ্যান্ড-শেক করে চলে গেলেন। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এবার ফেরার পালা। ততক্ষণে রোদ পড়ে গিয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও আর শুটিং করার উপায় নেই। মিলিটারীর বেওঁার সিকিউরিটি ফোর্স) সঙ্গে কচকচিতে বলটা দুয়েক অনর্থক বয়ে গেছে সবার মেজাজই খারাপ। অনেকে বললে—ধুস শালা নদীতে চান করে নেওয়া যাক—

সারেঙ্গ সাহেব শাসানীতে বললে—না না ও কম্মো করবেন না। কুমীর ধরবে। মিলিটারীর খপ্পর থেকে ছাড়া পেলাম। কিন্তু আপনারা কেউ কুমীরের পেটে গেলে এবার খুনের দায়ে পুলিশ আমার ধরবে—।

রঞ্জন মজুমদার

কলকাতার বাইরে থাকেন এমন কয়েকজন সাহিত্য প্রেমিক তরুণ তরুণী সক্রিয়ভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে গল্প।কবিতা প্রকাশের সুযোগ নেওয়ার জন্য লিখুন—

চুমকী

(দিলে সাহিত্য মাসিক)

সম্পাদক : অজয় চৌধুরী

১০৮বি, রায় বাহাদুর রোড, কাশি-৩৪

রাজশ্রী বসু

কিছুক্ষণ

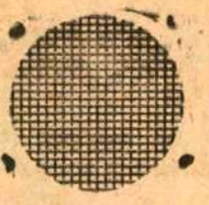

রাজশ্রী বসু পরিচয়ের প্রথম দিনই ঘণ্টাখানেক আড্ডার পর বলেছিলো—'যে-কোনোদিন যে-কোনো সময়ে আপনি আসতে পারেন।' ওঁর বাড়ীতে ফোন নেই। 'আগে থেকে তো আর জানাতে পারবেন না।' এই কথায় সায় দিয়েছিলেন ওঁর বড়দা কাম সেক্রেটারী অর্থাৎ পৃথ্বীরাজবাবু।

সেইমত বহুদিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি ওঁর কথা। হুটহাট করে বাড়ীতে হাজির হয়েছি। কোনোদিন রাজশ্রীর দেখা পেয়েছি। কোনোদিন পাইনি। যেদিন পাইনি সেদিন দাদা বা মাকে পেয়েছি দরজার গোড়ায়। কষ্ট করে আর ওপরে উঠতে হয়নি আমাকে। কি ব্যাপার, কি বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে 'আচ্ছা ও এলে বলে দেব' ইত্যাদি কথা শুনিয়েছেন।

'কিছুক্ষণের জন্য আড্ডা মারতে যাব এমন নয়, ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম রাজশ্রীর সঙ্গে একবার দেখা করার দরকার। বাংলা ছবির নায়িকার অভাব কিছুটা মেটাচ্ছে তো মেয়েটি। 'শমি'লা' রিলিজ হয়েছে। এ ছবিতেও ওঁর অভিনয় বেশ ভালো। কনগ্রাট করতেই যাব ভাবছিলাম।

আর যেই ভাবা সেই অ্যাকশন শুরু। শনিবারের বারবেলায় সোজা সতীশ মুখার্জি রোডের পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাড়ীর সামনে হাজির সশরীরে। হয়তো জানেন ওঁদের দরজায় যাবার মুখে একটা কানাগলি মতো আছে। আর সেই কানাগলির মুখেই তালকানার মত দেখা হোল রাজশ্রীর দাদা-কাম-সেক্রেটারী পৃথ্বীরাজবাবুর সঙ্গে।

আমাকে দেখেই উনি হেসে উঠলেন। বললেন—'কি ব্যাপার? এই অসময়ে!'

আমার ছোট্ট জবাব—'এই এলাম আর কি! বোন আছে ওপরে?' উত্তর দিতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন মনে হোল—'হ্যাঁ আছে। কি...তবু এখন তো...

কথা শেষ করতে না দিয়েই বললাম—'বেশীক্ষণ লাগবে না, একটা কথা জেনে চলে যাব।' লেখা টেখার ব্যাপার কিনা জানতে চাইলেন তিনি। বললাম—'না একটা

তবুও পৃথ্বীরাজবাবু কেন বুঝলাম না একটু দ্বিধাগ্রস্ত। উনি বিব্রত বোধ করছেন বুঝতে পারছি। তাই আর ওঁর সামনে না দাঁড়িয়ে পা চালালাম দরজার দিকে। চলতে চলতে বললাম—'দেখি না উনি কি বলেন?'

আমায় ঘরের দিকে এগোতে দেখে পৃথ্বীরাজবাবু হেঁকে সম্ভবত রাজশ্রীকেই বললেন—'নির্মলবাবু যাচ্ছেন, তাড়াতাড়ি কথা বলে নে।

তাড়াতাড়ি কথা সেরে নেওয়া বা সময়াভাবের ব্যাপারটা আমার অবশ্য অজানা ছিল না। পরের বেস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারী) পৃথ্বীরাজবাবুর বিয়ে। তাই বাড়ীতে স্বাভাবিকভাবেই একটু ব্যস্ততা ছিল। সময় নষ্ট করতে চাইছিলেন না আর কি!

যাইহোক সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে কলিং বেল টেপবার আগেই কানে এলো 'ওপরের ঘরে যান, আসছি আমি।'

কোথা থেকে শব্দটা এলো বুঝতে পারিনি। তবে রাজশ্রীই যে বলেছে সেটা নিশ্চিত।

ওপরের বসার ঘরের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি কয়েক মাসে। সোফার কভারগুলো শুধু বদলেছে। বই রাখার টেবিলটা মাঝখান থেকে সরে পেছনে চলে গেছে। শুনেছিলাম এঁরা 'অমৃত' রাখেন। কপি খুঁজলাম, পেলাম। চুপচাপ বসে পাতা ওলটাতে লাগলাম। একটু পরে দেখলাম, সামনের দেয়ালে কাগজে লেখা একটা ইংরেজী কবিতার কয়েকটা লাইন। বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায়—

একদিন যখন নির্বান্ধব আমি
বসেছিলাম একা, ভারাক্রান্ত মনে,
একটা অদৃশ্য স্বর বলে গেল
'জেগে ওঠো, সময় আরও
খারাপ হতে পারে।
জেগে উঠে দেখি সময়টা
সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে।

এই কবিতা রাজশ্রী বসুর ঘর আলো করে কেন আছে বুঝলাম না। 'প্রান্তরেখা'র সাফল্যের পর ছ/সাতখানি ছবি এখন হাতে। প্রায় প্রতিদিনই লেগে আছে আউটডোর অথবা ইনডোরের কাজ। মেয়ে হিসেবেও ওঁর মত জলি মেয়ে বোধহয় খুব কমই আছে।

পরিচয়ের দেয়ালটুকু খসাতে পারলেই একবারে অন্য মূর্তিতে দেখা যাবে রাজশ্রীকে। কি প্রাণখোলা হাসিখুশী মেয়ে। এককথায় বললে বলতে হয় ডিয়ার বন্ধু হবার যোগ্য পাত্রী সে। স্টুডিও ফ্লোরে দেখেছি (অবশ্যই কাজের পর) জমিয়ে আড্ডা মারতে। সামনে দিয়ে হয়তো কোনো বেশ ভারী নিতম্বিনী কেউ যাচ্ছে। সঙ্গী পুরুষদের মন্তব্য ছাপিয়ে হয়ত সে-ই বলে উঠল—'দেখছিস পেছনখানা, শুয়ে পড়বি নাকি?' অনেকেই একথা শুনে 'থ'।

এহেন মেয়ের ঘরে এই বিষাদের কবিতা। বেমানান। আবার ভাবলাম 'কার মনে কি লুকিয়ে আছে কে বলতে পারে।'

আমার চিন্তাকে আর বেশীদূর এগোতে দিতে পারলাম না। রাজশ্রী বসু গালে লেবু ঘষতে ঘষতে এসে হাজির। মুখের হাসি অবশ্যই ফেলে আসেননি। পরনে স্লি গাউন। গালে ছোট্ট একটি টোল বললে—'এই চান করতে যাচ্ছিলাম।'

এবার আমার বিব্রত হবার প বললাম—'ঠিক আছে আপনি চান আসুন।' রাজশ্রী নারাজ। আমার প সোফায় ততক্ষণে পায়ের ওপর পা বসে পড়েছে। 'ঠিক আছে, তাতে কি— না হয় চান করব। এখনতো আড্ডা ম বুঝলাম এখন মুডে আছে রাজশ্রী।

আড্ডার সুযোগ পেলে সে এক খাড়া। অথচ পর্দার দেখেছেন তো ইনট্রোভার্ট মেয়ে। ভাবাই যায় না এই রাজশ্রী। জানতাম বম্বের আউটডোর কাল সন্ধ্যেবেলা ফিরেছেন কেমন কা হোল জানতে চাইবার আগেই ও বল 'কাজ হয়েছে খারাপ না, বেশ ভালোই। কাল আসার সময় ফ্লাইট যা গণ্ড করেছে না এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা কাল কিরকম ঝড়জল হয়েছে জানেন তে আবহাওয়ায় আমাদের প্লেন প্রায় তি চক্কোর মেরেছে আকাশে দমদমে করতে পারছিল না কিছুতেই।'

চোখে মুখে বুঝতে পারছি ভয়ে বেশ স্পষ্ট। গত রাত্রের স্মৃতি এখনও করেও ভুলতে পারছে না সে—'কল আসার কিছুক্ষণ আগেই এয়ার হ যখন বলল 'ফাসেন ইওর বেল্ট' তখনই অবস্থা কাহিল। মা বুঝতে প ব্যাপারটা। আমি তাড়াতাড়ি মার লাগিয়ে দিয়ে আমারটাও লাগিয়ে

বসে আছি প্রায় কাঁপছি। মাকে অবশ্য কিছু বুঝতে দিইনি।' পালসের রিট তখন বোধহয় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল।

গায়ের জ্বর ছেড়েছিল ল্যান্ড করার পর। লাউঞ্জের কাছে আসতে দাদা-ভাইকে দেখে তবে স্বস্তি।

বম্বেতে রাজশ্রী এই প্রথম যাওয়া। ওর শুটিং এর পর সময় পেলে ওখানের বাসিন্দা এক দাদা—বৌদির সঙ্গে খুব ঘুরেছে।

—'কোনো ফিল্ম পার্টিতে যানটাননি?'

প্রশ্নটা শুনেই সে বলল—পার্টিফার্টি আমার ভাল্লাগে না।' বুঝতে পারলাম না—এইরকম উচ্ছল প্রাণখোলা আড্ডাবাজ মেয়ের কেন পার্টি ভালো লাগে না। তাছাড়া ও'র নাকি স্টারদের দেখার তেমন কোনো ইচ্ছে নেই। হয়তো বা নিজেই স্টার বলে।

'পার্টিতে না গেলেও শান্তাক্রুজ এয়ার পোর্টে শাম্মী কাপুরের ছেলে, প্রেম চোপরা, কিশোরকুমারের ছেলে অমিতকে দেখেছি।' আলাপ অবশ্য সে করেনি। যেচে আলাপ করার ইচ্ছে রাজশ্রীর কোনদিনই নেই।

বম্বেতে রাজশ্রী গিয়েছিল নায়ক রণজিৎ মল্লিকের সঙ্গে 'অপরাজিতা' ছবির আউট-ডোরের কাজে। মেইন কাজ ছিল অবশ্য একটা গানের সঙ্গে কিছু রোমান্টিক সিনের পিকচারাইজেশন। রণজিৎ মল্লিকের লজ্জার ব্যাপারটা ইন্ডাস্ট্রির সবাই জানে। সেটা মনে ছিল বলেই বললাম—'রণজিৎবাবু কেমন ক্যা-অপারেট করেছিলেন?' উত্তরে বেশ চোখ বড়ো করে রাজশ্রী বলল—'দারুণ করেছে। একটা সিনের যা সাজেশন ও দিয়েছে—আমি ভাবতেই পারিনি ওর মত লাজুক ছেলের মধ্যে এরকম রোমান্টিক সেন্সও আছে।'

অনেকেই বলছেন লজ্জা ভাবটা নাকি আস্তে আস্তে রণজিতের কেটে যাচ্ছে। কেটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। পর্দায় যখন তখন প্রেমিক-বাদশা-ফকির সাজতে হবে, তার ওপর আবার ন্যাকা-ন্যাকা প্রেমও করতে হবে, সুতরাং লজ্জার মাথা না খেয়ে উপায় আছে! রোমান্টিক সিনে সবচাইতে বেশী কো-পারেটিভ কে জানতে চাওয়ায় রাজশ্রী দ্বিধাহীনভাবে বললো—'টিটো—আই মিন। দীপঙ্কর দে। ও'র সঙ্গে আমার অভিনয়ে দারুন ক্যাজজাটমেন্ট। 'মোহন-বাগানের মেয়ে'তে যা রোমান্টিক সিন করেছি দেখবেন!'

সত্যিই, প্রেমের সিন করতে গিয়ে আড়ষ্ট থাকলে বা প্রতিপক্ষ যদি ঠিকমত সাড়া না দেয় (অন্ততপক্ষে অভিনয়ের সময়টুকুতো বটেই) তা হলে কাজ করে আরাম পাওয়া যায় না। অভিনয়ও বাজে হয়। একথা সব শিল্পীরাই বলেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পারস্পরিক কো-অপারেশনটা বিশেষ দু-একটা জুটির যেমন থাকে, সবার সঙ্গে তেমন হয় না। এটা বুঝি ঐ অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার। রাজশ্রীর সঙ্গে দীপঙ্কর দের যেটা হয়তো আছে।

শুটিং-অভিনয়-প্রেমের পর্ব ছেড়ে 'কিছুক্ষণ'র জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা তুলতে রাজশ্রী বলল—আমাদের কাজ (দাদার বৌভাত আরকি) মিটছে শনিবার। আপনি রোববার সকালে আসুন। শুটিং আছে কিনা জানি না, দাদার কাছে ডায়রীটা রয়েছে। কাজ না থাকলে কিছুক্ষণ গল্পই না হয় করা যাবে। কি আছে তাতে!

আমার কোন আপত্তির কারণ নেই। উঠি উঠি ভাবছি। অথচ কথার শেষ তখনও হয়নি। কোন কাগজে তাকে নিয়ে কিসব লেখা হচ্ছে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার মোড় ঘুরছিল অন্যদিকে। ঘড়ির কাঁটা তখন কয়েক পাক ঘুরে গেছে। আড্ডাও থামেনি। গায়ের স্লিপিং গাউন আরও ভালো করে জড়িয়ে মৌজ করে বসেছে রাজশ্রী।

ইতিমধ্যে সিঁড়িতে শব্দ তুলতে তুলতে দাদা এসে হাজির। 'কিরে এখনো চান করিস নি'—রাজশ্রীকে বলেই আমার দিকে চোখ ফেরালেন দাদা-কাম-সেক্রেটারী পৃথ্বীরাজ-বাবু। 'এই হোল আর কি!' বলে আমি উঠতে যাচ্ছি, এমনি সময় রাজশ্রী বলল, 'দাদা, আগামী রোববার কি আমার কাজ আছে? নির্মলবাবু আসবেন বলছিলেন।

তখনও দ্বিধা ও ক্লান্তি কোনোটাই তার যায়নি বুঝতে পারছি। উত্তর দিতে হবে তাই দিচ্ছেন এমনি ভাব করে বললেন—হ্যাঁ। 'শুভ সংবাদ'-এর বোধহয় আউটডোর আছে।' বললাম—'কোথায় বলতে পারেন?' আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে পৃথ্বীরাজবাবু বললেন—'আপনি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে জগন্নাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করুন না। উনিই সব ডিটেলস বলতে পারবেন, চেঞ্জ-টেঞ্জও হতে পারে তো।' এবার রাজশ্রীকে একটু আদেশের সুরেই বললেন—যা তাড়াতাড়ি চান করে নে। ভদ্রলোককে এই কথাটা বলার জন্য এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিস। কি যে করিস!' শেষের কথা-গুলোয় সেই বিরক্তির ছাপ। রাজশ্রী সিচুয়েশনটা বুঝতে পেরে নিজের গায়েই দোষটা চাপিয়ে নিল বললে—শুটিং কবে কি আছে, আমি জানি নাকি? তোমার কাছেই তো ডায়রী!' আর কোনো কথা নয়। বললাম 'আসি।' দাদা আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত নীচে নেমে এলেন। আমি একবারে নীচে নেমে যেতে যেতে শুনলাম আমাকে বলছেন—'আবার আসবেন।'

নির্মল ধর

তপন সিংহ পরিচালিত
রাজা
মহুয়া রায়চৌধুরী

ফেরত থেকে বলছি

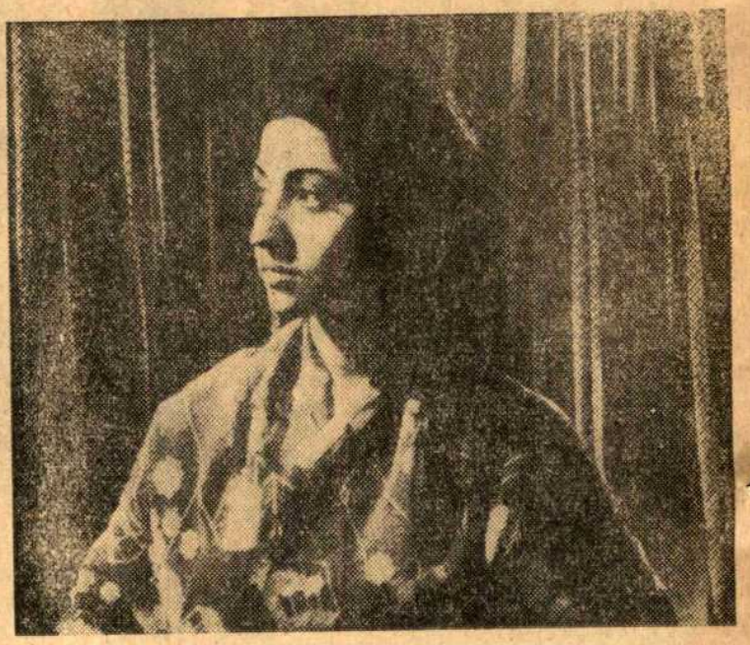

মোরের মধ্যে দারুণ হট্টগোল। মরে গেলাম। ডুবে গেলাম। থার্ড ক্লাশ ওয়েটিং-রুম। হুড়মুড় করে একদলের আগমন। এরা হচ্ছেন গিয়ে শুটিং পার্টি। পরিস্থিতি দেখে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে তো বিস্মিত হবেনই আমরা শুটিং দর্শনার্থী-রাও যুগপৎ বিস্মিত। মুখে চোখে সকলেরই প্রশ্নবোধক চিহ্ন কি হয়েছে মশায়' থাকতে পারে। কিন্তু হারাধনবাবু হঠাৎ মৃদু হাসি হাসলেন। ব্যাপারটা তাঁর জানা আছে। ওরা বাড়ি পাচ্ছেন না। 'আপনারা বাড়ি পাচ্ছেন না এই তো।' বেশ ভাল কথা। ভাল কথা! একটা অপরিচিত জায়গায় এসে বাড়ি না পাওয়া কোনক্রমেই ভাল কথা নয়। যদি একটা ভাল ব্যবস্থা হয়। হবে নাকি? রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জি সহ আরো কয়েকজন পাড় কি নারি হলেন। হারাধনবাবু কাগজ চাইলেন। কলম চাইলেন। ফটাফট কাগজ ও কলম সাপ্লাই করা হল। কিন্তু টাকাটা? সে হবে-খন। না না তা কি করে হয়। টাকাটাই তো সবচেয়ে বড় কথা--কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না চিন্ময়। ততক্ষণে চোখ তুলে তাকিয়েছেন হারাধনবাবু। ভাবটা তাঁর এমন আমি যখন ব্যবস্থা করছি, দায়িত্বটা আমার। আবার মুখের ওপর কথা হচ্ছে। সামলে নিলেন রবি ঘোষ। হারাধনবাবু অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে লিখে দিলেন। কাগজের টুকরো পকেটস্থ করতে করতে রবি-চিন্ময় পরিকল্পনার ফাঁদ পাতলেন। যথারীতি পা দিলেন জাঁদরেল এস এন চ্যাটার্জি—এই মেক-আপ-এ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে বসে মুচকী হাসছিলেন গীতা দে। রবি-চিন্ময় জুটি এখন যথাক্রমে চিত্র পরিচালক প্রকাশ লাহিড়ী এবং আলোকচিত্রশিল্পী অবনীশ রায়। সঙ্গে তিন চার দিনের একটি ইউনিট। এই ইউনিট এখনই শুটিং শুরু করতে চান। কি ভাবে? ঐ জাঁদরেল ভদ্রলোকের গোঁফের একটা ক্লোজ-আপ দিয়ে শুভসূচনা হতে পারে। উত্তম প্রস্তাব। গোঁফের ছবি তোলা হবে। সম্মত হলেন মিঃ চ্যাটার্জি। সঙ্গে সঙ্গে চিত্র পরিচালক শট ডিভিশন ভেবে ফেললেন। শিল্পীকে দৃশ্যটা বিস্তারিত করা দরকার। করলেন এইভাবে ঃ একটা ভিখিরি যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। কাট। বাস যাচ্ছে ট্রাম যাচ্ছে। কাট। সিম্বলিক—ফেলিনির স্যাড়ে আট। কাট।

এত কাটাকাটি কিসের?

ওসব কিসসু না। ফিল্ম। ফিল্ম কাটাকাটি হয়।

দেখতে দেখতে শুটিংয়ের মধ্যে শুটিং শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ ফাটাফাটি কাণ্ড। যা ইচ্ছে তাই। কখনো এই অ্যাঙ্গেল থেকে, কখনো ঐ অ্যাঙ্গেল থেকে শটের পর শট টোকিং আর কাট। ওদের গলা ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত মূল পরিচালক স্বদেশ সরকারের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি করল। কাট।

কেটে পড়ার জো আছে। জানতে হবে। আপনাদের জানাতে হবে 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' এই ছবির নাম যখন কোন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে এল তখন কি সাংঘাতিক ব্যাপার। সাংঘাতিক কোন ঘটনা নয়। কিম্বা অ্যাডভেঞ্চারও নয়। এই বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে হুলস্থুলু ব্যাপার। এর সাক্ষী কাহিনীর নায়ক অতীশ রায়। যখন সে তার দাদামশায়ের নির্দেশ মত পাহাড়গড়ের বাড়িটির দখল নিতে গিয়েছিল। বাড়ির দখল নিতে গিয়ে দেখল সেখানে প্রমীলা রাজ্যের এক সুন্দরী ও তার পিসিমা বহাল তবিয়তে বসবাস করছেন। অতীশ একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি বলতে পারে সে। কিই বা করতে পারে। সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাটম বোমার চেয়ে ভয়ংকর সুন্দরী। প্রথম দর্শনেই অতীশ রায় হাড়ে হাড়ে বুঝে গেল। অনুভূতিটা তীব্র হল। মানে মানে কেটে পড়া অনেক ভাল। কেটে পড়লে বাড়ি সত্যি সত্যি জবরদখল না হয়ে যায়। মনের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বের সংঘাত চলল। অতীশ রায় মহামুস্কিলে পড়ল। সে এগিয়েও যেতে পারছে না আবার পিছিয়েও আসতে পারছে না।

বুদ্ধিমান অতীশ অবশেষে গোলমাল কাটিয়ে উঠতে পারল। ফলে প্রমীলা ও তার পিসিমার সঙ্গে সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। বলতে গেলে ওরা যেন অতীশের পরিবারভুক্ত। বাইরে থেকে এই পরিবেশে দেখলে এটাই ভাবা স্বাভাবিক। এরপর কাহিনীর গতি কখনো বামে, কখনো ডাইনে যাচ্ছে। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের পর এক নাটকীয় পর্বে এসে উপস্থিত হল। এলই পর্বে অতীশের আক্কেল গুড়ুম হবার দাখিল। ভাগ্যিস পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল অকৃত্রিম বন্ধু অরুণ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে এসে পড়লেন প্রমীলার সাহেবীভাবাপন্ন বাবা জাঁদরেল এস এন চ্যাটার্জি। মাঝখানে আরেক কাণ্ড—ঐ শুটিং পার্টি। মধ্যমণি মল্লিকা সেন। অতীশ রায় আর প্রমীলার মাঝখানে মল্লিকা সেন চন্দ্রমল্লিকা হয়ে ফুটতে পারল কিনা সেটা বলা যাচ্ছে না। এই পর্যন্ত এসে কাহিনী বড্ড লজ্জা পাচ্ছে। সবই যদি বলে দেওয়া হয় তাহলে রাগারাগি হবে। কাটাকাটি থেকে ফাটাফাটি এখন আবার রাগারাগি। থাক, তবে থাক।

তবে এইটুকু মনে রাখবেন এ কাহিনী গভীর গভীরতর কিছু বলতে চায় না। সে-রকম প্রিটেনশানও নেই। এ কাহিনী হাসির কলতানে মুখর করে রাখতে চায় কিছুক্ষণ। পরিচালক স্বদেশ সরকার, অজয় করের সংযোগ্য সহকারী প্রথম স্বাধীন প্রয়াস 'শান্তি'। উচ্চমানের শিল্প কর্মের নিদর্শন এই ছবি স্বদেশ সরকারকে খ্যাত করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। ছবিটি বকস অফিসের আনুকূল্য পায় নি। অতএব যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে—পরিচালক সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকদের কথা ভেবে গতানুগতিক পথে হাঁটতে শুরু করেন। পরপর দুটি ছবিতে সাফল্য—'জীবন সৈকতে' এবং 'হারায়ে খুঁজি'। এটি তাঁর চতুর্থ প্রয়াস। মাঝখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন যে রকম' চলচ্চিত্রায়িত করছিলেন রঞ্জিত মল্লিক ওয়াহিদা রেহমান বসন্ত চৌধুরী অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে কাস্ট করে। ছবিটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হবে শুনছি। কথাপ্রসঙ্গে জিগ্যেস করতে শ্রীসরকার আমাকে জানালেন, 'আশা করছি আবার শুরু করতে পারব। ওয়াহিদা রেহমান ডেটস দিয়েছেন। হয়তো মার্চ মাসেই শুটিং হতে পারে।

এদিকে হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ ছবির শুটিং শেষ হয়ে এসেছে। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ থেকে জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানা শুটিং করেছেন আউটডোরে। লোকেশন ছিল শিমুলতলা। এখানেই ছবির অনেকটা অংশ চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া কলকাতারও আশে পাশে কিছু শুটিং হয়েছে। বর্তমানে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে শুটিং চলছে। এই প্রস্থ শেষ হলে অবশিষ্ট থাকবে মাত্র কয়েক দিন।

এ ছবির অতীশ : দীপঙ্কর দে। পুতুলী : সন্ধ্যা রায়। মল্লিকা সেন : আরতি ভট্টাচার্য। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন : ছায়া দেবী, অনুপকুমার, কালীপদ চক্রবর্তী, ধীরাজ দাস ডি ডি নাথ এ কে চৌধুরী, কে পি নাথ, রতন ব্যানার্জি বীরেন চ্যাটার্জি যোগেশ সাধু প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণ ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও গৌর পোদ্দার। রূপসজ্জাকর : ভীম নস্কর। প্রধান সহকারী পরিচালক : অমিয় সান্যাল। গান এ ছবির অন্যতম সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। তরুণ সুরকার মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এটি দ্বিতীয় ছবি। প্রথম ছবি 'আলো আঁধারে'। প্রথম ছবিতেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ছবিতেও তার কিছু ব্যতিক্রম হবে না। ছ খানা গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্রাবন্তী মজুমদার, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরতি মুখোপাধ্যায় এবং ভাস্কি বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাহিনীকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় : স্বদেশ সরকার। নির্মীয়মাণ ত্রিমূর্তি শিল্পম নিবেদিত এ ছবি প্রযোজনা করছেন কে পি নাথ।

স্টুডিও সংবাদদাতা

জীবন মরুর প্রান্তে
সমিত ভঞ্জ

স্টুডিও সংবাদ

ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর স্কোরিং-এ পরিচালক দীনেন গুপ্ত তাঁর নতুন ছবি **নিশিমৃগয়া-র** শুভ সূচনা করলেন। শুভ সূচনা হল সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে। সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে দুখানি গান রেকর্ড করা হল। কণ্ঠ দিলেন : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন : কুণাল মুখোপাধ্যায়। নায়িকা : সুচিত্রা সেন। নায়ক : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বহুদিন পর অর্থাৎ 'সাত পাকে বাঁধা'-র পর এই জুটির নতুন ছবি। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন : বসন্ত চৌধুরী উৎপল দত্ত দিলীপ মুখোপাধ্যায় কাজল গুপ্ত প্রভৃতি। বলা বাহুল্য চিত্রগ্রহণ করবেন পরিচালক স্বয়ং। শিল্প নির্দেশক : সূর্য চট্টোপাধ্যায়।

পরিচালক শচীন অধিকারী সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'দুই বোন' ছবির শেষ পর্যায়ের দৃশ্য গ্রহণ করলেন। দুই বোনের ভূমিকায় রূপদান করলেন : সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং বিদ্যা রাও। শৈলেশ দের কাহিনীর ভিত্তিতে নির্মীয়মান এ ছবির নায়ক নবাগত প্রণব বসু। চিত্র গ্রহণ করছেন নিমাই রায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন : মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে 'তাসের দেশ' নির্মিত হচ্ছে শ্যামল গুহর পরিচালনায়। সেদিন এক প্রস্থ শুটিং হয়ে গেল। শিল্পীদের মধ্যে অংশ নিলেন : প্রতুল গুহ, রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রুবী চট্টোপাধ্যায়, মালা মুখোপাধ্যায় গৌরী ঘোষ এবং শ্যামল গুহ। এছাড়া এ ছবিতে রাজপুত্রের ভূমিকায় রূপদান করছেন সন্তু মুখোপাধ্যায়। সদাগরপুত্র : উজ্জ্বল সেনগুপ্ত। ছবিটি নির্মিত হচ্ছে কলারে। এর কস্টিউম ডিজাইনিং এবং সেট ইরেকটিং-এর বিশেষ বিশেষ কাজগুলি করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী নিতাই ঘোষ। ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তায় নির্মীয়মান এ ছবির শিল্পনির্দেশক বম্বের সুধেন্দু রায়। সম্পাদকও বম্বের—অমিত বসু। চিত্রগ্রহণ করছেন স্বনামখ্যাত রামানন্দ সেনগুপ্ত।

পরিচালক তপন সিংহ 'হারমোনিয়াম'-এর শুটিং দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। শুটিং হচ্ছে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ। স্বরচিত কাহিনী চিত্রনাট্য এবং সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন শ্রীসিংহ। বলা বাহুল্য এ ছবিতে গানের বিশেষ ভূমিকা আছে। অনেকগুলি গান থাকছে। রেকর্ডিং পর্বও প্রায় সমাপ্ত। বিরাট ভূমিকালিপিতে আছেন : সমিত ভঞ্জ, আরতি ভট্টাচার্য স্বরূপ দত্ত ভীম গুহ-ঠাকুরতা সোনালী গুপ্ত কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, ছায়া দেবী, সন্তু মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বসু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরুন্ধতী দেবী। চিত্রগ্রহণ করছেন : বিমল মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনা করবেন : সুবোধ রায়।

পরিচালক অমিতাভ দাশগুপ্ত বম্বেতে 'অপরাজিতা' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ করে ফিরেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন বম্বের রাস্তাঘাটে এবং কয়েকটি বাড়িতে শুটিং করা হয়েছে। কোনো অসুবিধা হয়নি। শিল্পীদের মধ্যে অংশ নিয়েছেন নায়ক রঞ্জিত মল্লিক এবং নায়িকা রাজশ্রী বসু। ছবির শুটিং অবশিষ্ট আছে আর মাত্র কয়েকদিন।

স্টুডিও সংবাদদাতা

ফয়সলা
রমন খান্না / শাবানা আজমী

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

আজকাল হেমার রকম সকম বোঝা বড়ই মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর আম্মাও মুস্কিলে পড়েছে। কিন্তু মুস্কিল আসান কিভাবে? অভিজ্ঞদের মতামত হচ্ছে এই যে হেমা বিয়ে না করা অবধি এরকমই চলবে। অর্থাৎ আজ ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে, কাল রাজেশ খান্নার সঙ্গে পরশু ফিরোজ খাঁর সঙ্গে গসিপ চালু থাকবে। রাজেশের সঙ্গে হেমার সম্পর্কটা কোনদিনই বড় একটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যায়নি এবং যাবেও না কারণ ডিম্পল। ওর প্রথম থেকেই ভয় কিন্তু হেমাকে। হেমার সঙ্গে শুটিং থাকলে ডিম্পল তার রাজকে কখনই একা ছাড়ে না। আগলে রাখে সর্বক্ষণ। বিয়ের আগেও নাকি ডিম্পল শুটিং দেখার নাম করে সেটে বসে থাকত সারাক্ষণ। রাজেশ অবশ্য ছুপ্পা রুস্তম। সে যা করে তার সিকিভাগও প্রকাশ করে না। মমতাজের সঙ্গে কত কান্ড করেছে কিন্তু কত কান্ড কি তার কিছু জানতে পেরেছেন আপনারা? পারেন নি আর পারবেনও না। তবে একটা গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছিল—রাজেশ যখন মস্ত্রীক লন্ডনে বেড়াতে গিয়েছিল তখন মমতাজ ওরফে মুমু তখন স্বামীর ঘর করছে। সেই না শোনা রাজেশ এসেছে অমনি টেলিফোন। কি ভাগ্য রাজেশই রিসিভার তুলল। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল। রাজেশ কি একটা ছুতো করে ডিম্পলের চোখের নাগাল পেরিয়ে মুমুর সঙ্গে দেখা করতে চলে গিয়েছিল। এরকম ঘটনা নাকি হেমা-ধর্মেন্দ্রর ক্ষেত্রেও ঘটেছে। সেটা অবশ্য চালু হয় নি। হেমার সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর কোন গোপন ব্যাপার নেই। সব কিছুই সোজাসুজি। রমানন্দ সাগরের ছবি 'চরস'-এর আউটডোরে ভারতের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ওরা প্রেম করেছে হেমা অস্বীকার করলেও ধর্মেন্দ্র করে না। বলে ঃ বেশ করেছি। হেমাকে আমার ভাল লাগে, তাই ওর সঙ্গে গল্প করি, ঘন্টার পর ঘন্টা কাছাকাছি থাকি।.....হেমা, ধর্মেন্দ্রকে পছন্দ করে। গল্প করে। প্রেম করে না। কোনো আউটডোর শুটিংএ গেলে ওদের ভাবসাব দেখে কি ধারণা হয় সেটা না বলাই ভাল। ইদানীং হেমা সাংবাদিকদের ওপর বড্ড চটেছে। কোনো একটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকার স্বনামধন্য প্রতিনিধির সঙ্গে সে কথা বলছে না। জীতেন্দ্রর 'খুশবু' ছবির আউটডোরে গিয়ে উক্ত সাংবাদিক হেমার যে দুর্ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছেন সেটা লিখেছেন। শোনা যায় সবটুকু লেখা হয় নি জীতেন্দ্রর সুন্দর আতিথেয়তার জন্য। এক্সক্লুসিভ সাংবাদিকের সঙ্গে আবার হেমা খুব ভাল ব্যবহার করেন। অথচ তিনি হেমা-ধর্মেন্দ্র কেচ্ছা লিখে সম্প্রতি বিখ্যাত হয়েছেন। সে যাই হোক, হেমা বিয়ে করছেন কবে? এই প্রশ্নটার সমাধান হলেও হেমাঘটিত সব ঘটনা এবং রটনার নিষ্পত্তি হবে। কাকে বিয়ে করছেন? আপাতত ধর্মেন্দ্র ছাড়া ধারে পাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ফিরোজ খাঁর কি খবর? 'ধর্মাত্মা' ছবিতে যে কারণে সে হেমাকে নিল সেই উদ্দেশ্য ক সফল হয়েছে? বলা যায় না সঠিক কিছু। হেমা ভয়ানক ধড়িবাজ। সে ফিরোজের সঙ্গে কয়েকদিন খুব মেলামেশা করেছিল। ফলে ছবিটা হাতছাড়া হয়ে যায় নি। অন্যদিকে হেমার মতো এক নম্বরী নায়িকাকে ফিরোজও হাতছাড়া করতে চায় নি। কিছু না হোক ছবির পয়সা তো ঘরে আসবে। সেই আশায় দিন গুনছেন ফিরোজ। কেন না হেমা তার ঘরে আসে নি। আসবে ছবির পয়সা। তার জন্য হেমা জান লড়িয়ে অভিনয় করেছেন। ধর্মাত্মা হচ্ছে মারিয়া দুজোর বিখ্যাত রচনা গডফাদার-এর হিন্দি সংস্করণ। বিদেশী ছবির হিন্দি হলে যা হয়। গল্পের গরু যথারীতি গাছে উঠেছে। আর বিস্তারিত করা কি ঠিক হবে। ফিরোজ বেচারা নিরাশ হবে—আপনারা ছবিটা দেখুন।

আমীর গরীব ছবির অসামান্য সাফল্যের পর প্রযোজক-পরিচালক মোহন-কুমার নতুন ছবি শুরু করলেন এম কে ফিল্মসের ব্যানারে। এবারেও শ্রীকুমার দেবআনন্দ-হেমা মালিনী কাস্টিং-এ ছবি করার চেষ্টায় ছিলেন। শেষমুহূর্তে ভূমিকালিপি পরিবর্তন করা হল। দেব-

দুলহন : জীতেন্দ্র/হেমা মালিনী

দিওয়ার
শশী কাপুর/নীতু সিং

আনন্দ-এর স্থানে এলেন শশীকাপুর। অতএব শশী-হেমা কাস্টিং। এছাড়া দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে থাকছেন অশোককুমার ও প্রেম চোপড়া। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

সুচিত্রা সেন কি আবার হিন্দি ছবির জগতে ফিরে আসছেন? বম্বেতে এখন অনেকের মুখেই এ প্রশ্ন। এর উত্তর দিতে পারেন প্রযোজকরা। বহুদিন পরে সুচিত্রা সেনকে কলকাতা থেকে এনেছেন জে ওম প্রকাশ বিখ্যাত প্রযোজক। তাঁর প্রযোজনায় গুলজারের পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে আঁধি। মানে ঝড়। সত্যি কথা বলতে কি সুচিত্রা সেনের বম্বেতে, হিন্দি ছবিতে আগমন ঝড়েরই সৃষ্টি করেছে। এই ঝড়ে অনেক তাবড় তাবড় নায়িকারই উড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাহলে শ্রীমতী সেনের পরবর্তী ছবি কি? কয়েকজন পরিচালক যোগাযোগ করছেন সাইন করাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু শ্রীমতী সেন চটপট কিছু করতে চান না। তিনি স্ক্রীপ্ট শুনে গল্প শুনে পরিচালক দেখে তবেই অফার অ্যাকসেপ্ট করবেন। একটি অসমর্থিত সংবাদ এই যে সুচিত্রা সেন-রাজেশ খান্না কাস্টিং-এ একটি ছবি করার তোড়জোড় করছেন একজন বিখ্যাত পরিচালক। কে তিনি? ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়? অসিত সেন?

বিগত উনিশশো চুয়াত্তর দেব আনন্দের কাছে আনন্দ বেদনার বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলো। তিনি এই বছরে অনেকগুলি ছবিতে কাজ করেছেন। প্রায় প্রতি কটাতেই সফল হয়েছেন। কিন্তু নিজে যে প্রোডাকশন করেছেন—ইশক ইশক ইশক—ভীষনভাবে ফ্লপ করেছে। ক্ষতির পরিমাণ ষাট লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গত দেব বলেছেন : নেভার মাইন্ড, দিস ইজ নট মাই লাস্ট পিকচার।

অভিজিত

শতবর্ষের স্মরণীয়

নাট্যরথী অমর দত্ত—৩

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারী 'প্রেমের পাথার'-এর সঙ্গে শেকসপীয়রের 'কমেডি অফ এররস'-এর অনুসরণে রচিত 'কোনটা কে?' মঞ্চস্থ হলো। নতুন করে অমরেন্দ্রনাথ উজ্জীবিত হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। গিরিশচন্দ্রের 'সংসার' মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি চলছিল। চুণীলাল দেব-ও এসে যোগ দিলেন ক্লাসিকে। ১৮ ফেব্রুয়ারী মঞ্চস্থ হলো প্রেমের পাথার ও সংসার।

৪ মার্চ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো অমরেন্দ্রনাথ রচিত শিবরাত্রি। এই সঙ্গে হারানিধিও অভিনীত হয়।

২ এপ্রিল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রবিবার অমরেন্দ্রনাথের স্বত্বাধিকারীত্বে এমারেল্ড থিয়েটারে ক্লাসিক থিয়েটারের শেষ রজনীতে অভিনীত হলো হরিরাজ সোনার স্বপন শ্রীকৃষ্ণ। তাছাড়া হীরালাল সেন কর্তৃক প্রদর্শিত হয় চলচ্চিত্র।

অমরেন্দ্রনাথ ৩ এপ্রিল বিদায় নিলেন এমারেল্ড থিয়েটার থেকে তার নিজের হাতে গড়া ক্লাসিক থিয়েটারের সমস্ত স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে।

ভগ্ন মন। ভগ্ন স্বাস্থ্য। আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত অমরেন্দ্রনাথ মনে করলেন আর থিয়েটারের ছায়া মাড়াবেন না। কিন্তু কিছুদিন বাদেই নতুন করে অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব সংবাদ নাট্যমোদীদের সচকিত করে তুলল।

গ্র্যান্ড থিয়েটার নাম নিয়ে ৯১, হ্যারিসন রোডস্থিত কর্জন রঙ্গমঞ্চে অমরেন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ প্রস্তুতি শুরু হলো।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বাংলা শনিবার ১৬ বৈশাখ ১৩১২) মনোমোহন গোস্বামীর পৃথ্বীরাজ আর অমর দত্ত রচিত মধু গ্র্যান্ড থিয়েটার-এর প্রযোজনায় কর্জন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলো। অভিনয়ে ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ—পৃথ্বীরাজ। চুণীলাল দেব—জয়চাঁদ। নাট্যকার মনমোহন গোস্বামী—যোধমল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু—ছত্রপতি। নিখিলকৃষ্ণ দেব — বক্তিয়ার খিলিজি। কুসুমকুমারী—সংযুক্তা। হরিসুন্দরী (ব্লাকী)—যমুনা। তিনকড়ি দাসী—বিমলা প্রভৃতি। পৃথ্বীরাজের মধ্য দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ নিজেকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

২৯ জুলাই মঞ্চস্থ হলো অতুলকৃষ্ণ মিত্রের বাপ্পারাও। নামভূমিকায় ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। বাপ্পারাও আশানুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হলো। ১৬ অকটোবর বঙ্গভঙ্গের ওপার বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ অভিনীত হলো।

ওদিকে এমারেল্ড থিয়েটারে ধর্মদাস সুর প্রভৃতির নেতৃত্বে ক্লাসিক নাট্যমোদিদের অভিবাদন জানালো। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে তার নিজের হাতে গড়া ক্লাসিক পূর্ব সুনাম ফিরিয়ে আনতে পারলো না। ক্লাসিকের পক্ষ থেকে অমরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা হলো ক্লাসিকে যোগদানের জন্য। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। মাসিক ৫০০ টাকা মাইনেতে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকে যোগদান করলেন।

চুণীলাল দেব গ্র্যান্ড থিয়েটার পরিচালনা করতে লাগলেন।

অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকের বেতনভুক্ত শিল্পী হিসেবে ২১ অকটোবর পৃথ্বীরাজ নাটকের নামভূমিকায় অভিবাদন জানান।

৪ নভেম্বর সুরেন্দ্রনাথ বসু রচিত দেশাত্মবোধক নকসা 'হলো কি'-তে অমরেন্দ্রনাথ মিঃ নেলার চরিত্রে অভিনয় করেন। ২৩ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হলো অমরেন্দ্রনাথ রচিত 'প্রণয় না বিষ'। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রণয় পরিণাম উপন্যাস থেকে আখ্যানভাগ গৃহীত। রম্মা পাগলার চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথ ভিন্নধর্মী অভিনয়-কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রিন্স অব ওয়েলসরূপে কলকাতায় আগমন উপলক্ষে 'এস বুবরাজ' মঞ্চস্থ হলো ৩০ ডিসেম্বর। ২৭ জানুয়ারী, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা অভিনীত হয়। নামভূমিকায় থাকেন অমরেন্দ্রনাথ আর করিমচাচা চরিত্রে অভিনয় করেন হরিভূষণ ভট্টাচার্য। মিনার্ভা থিয়েটারেও ২৭ জানুয়ারী সিরাজদ্দৌলার অভিনয় হয়। করিমচাচা—গিরিশচন্দ্র। অর্ধেন্দুশেখর—মিঃ ড্রেক আর সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে থাকেন দানীবাবু। দানীবাবুকে ম্লান করা কারোর পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

অমরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। মনও ছিল বিক্ষিপ্ত। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ক্লাসিক থেকে বিদায় নিলেন তিনি। কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে নিউ ক্লাসিক নাম দিয়ে আবার কর্জন মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের নাট্যরূপ কুন্দ নিয়ে। ৪ আগষ্ট; ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কর্জন মঞ্চে কুন্দ অভিনীত হলো। নগেন্দ্রনাথ-অমরেন্দ্র কুন্দ-হরিসুন্দরী আর সূর্যমুখী চরিত্রে ছিলেন কুসুমকুমারী। কুন্দ সুনাম অর্জন করলেও অমরেন্দ্রনাথ ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য বেশীদিন অভিনয় করতে পারলেন না। তিনি কাশী, মধুপুর বৈদ্যনাথ পুরী প্রভৃতি স্থানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গমন করেন। এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় বম্বেতে গিয়ে একটা চাকরীও যোগাড় করেছিলেন কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের পক্ষে সে চাকরীতে বহাল থাকা সম্ভব হয় না।

ইতিমধ্যে স্টার থিয়েটারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। স্টার থিয়েটারের অনুরোধে অমর দত্ত কুসুমকুমারী-সহ ১৮ মে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে যোগদান করলেন। ১৯ মে 'সরলা' নাটকে বিধুভূষণ চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন অমরেন্দ্রনাথ। স্টারে কিছুদিন অভিনয় করে অমরবাবু মিনার্ভায় যোগদান করে ২১ জুলাই ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজ চরিত্রে অভিবাদন জানান।

গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা পরিত্যাগ করে কোহিনুরে যোগদান করলে অমরেন্দ্রনাথের নাম ম্যানেজার রূপে বিজ্ঞাপিত হয়। তখন কোহিনুর আর মিনার্ভায় প্রচন্ড প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ২৫ জানুয়ারী মিনার্ভায় অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয়। অভিনয় না করলেও ম্যানেজার হিসেবে অমরেন্দ্রনাথের নাম বিজ্ঞাপিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ পুনরায় স্টার থিয়েটারে যোগদান করেন এবং ২৬ এপ্রিল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশেখরে প্রতাপ রূপে নাট্যমোদীদের অভিবাদন জানান। এখানে পুরোন নাটক ছাড়া যৎকিঞ্চিৎ কামিনী ও কাঞ্চন, জীবন সন্ধ্যা, কেয়া মজাদার ইন্দিরা কর্মফল কুসুমে কীট আশাকুহুকিনী রজনী কনে বদল দশচক্র রাণীভবানী, বেহুলা প্রভৃতি আরো বহু নাটক অভিনয় করবার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারী অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্টার থিয়েটারের সমস্ত সম্পর্ক ছেদ হয়।

স্টার পরিত্যাগ করে অমরেন্দ্রনাথ নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। বেঙ্গল থিয়েটারের তদাণীন্তন মালিক অনাথ দেব মহাশয়কে নানা ভাবে বুঝিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারকে পুনরুজ্জীবিত করান। বলতে গেলে নতুন করে নির্মিত হলো বেঙ্গল থিয়েটার। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে বেঙ্গল মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করলেন অমরেন্দ্রনাথ। ২৭ জুন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জীবনে মরণে ও আহামরি নাটক মঞ্চস্থ হলো। আহা মরি'র অভিনয় ৯ই জুনের পর বন্ধ করে দেওয়া হয় পুলিশী নিষেধাজ্ঞায় বেজায় রগড় রজনী মেঘনাদ বধ বাজীরাও প্রভৃতি নাটক জনপ্রিয়তার সঙ্গে গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চে অভিনীত হয়। বুধবার ৮ নভেম্বর, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সুশীলাবালার বেনিফিট নাইট উপলক্ষে বলিদান ও বিল্বমঙ্গল অভিনীত হয়। গ্রেট ন্যাশনালে বলিদান ও বিল্বমঙ্গলে ঘথাক্রমে করুণাময় আর বিল্বমঙ্গল চরিত্রেই অমরেন্দ্রনাথের শেষ আত্মপ্রকাশ।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

আঁধি :: সুচিত্রা সেন ঃ সঞ্জীবকুমার

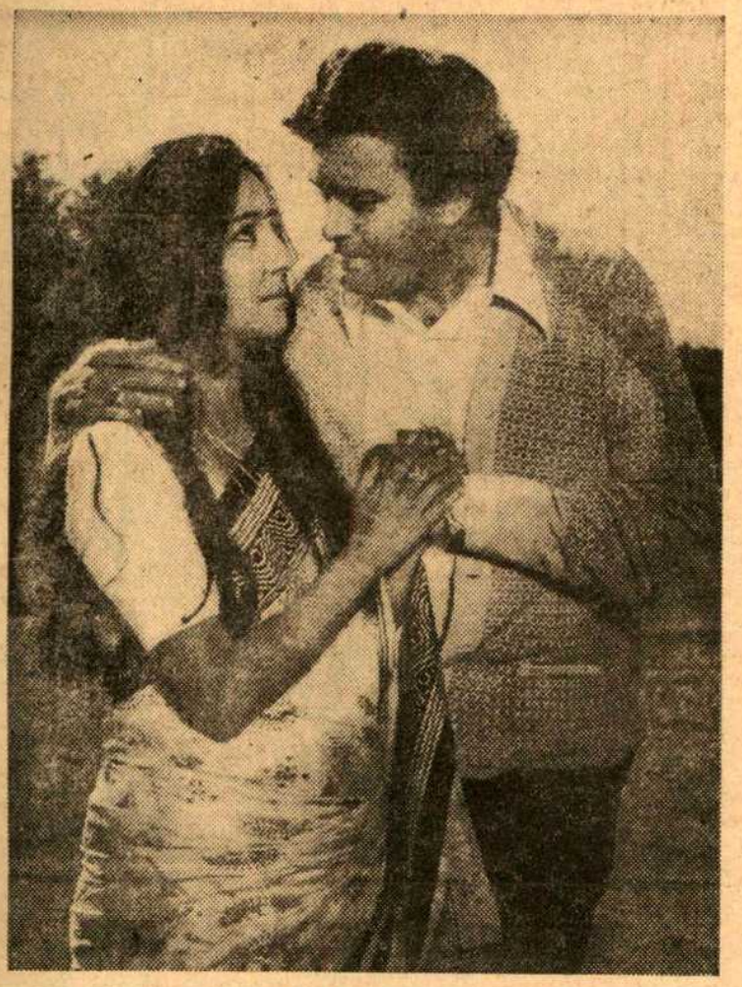

আঁধি

প্রযোজনা : ফিল্মযুগ প্রাঃ লিমিটেড

কাহিনী, অভিনয় ও আঙ্গিকে বিশিষ্ট ছবি হিসাবে বিবেচিত হবে

শহরের মেয়র এবং বিশিষ্ট নেতা ও রাজনীতিবিদ পি কে বোসের একমাত্র কন্যা আরতি। মিস্টার বোস চেয়েছিলেন মেয়েকে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত করবেন। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর আদরের কন্যা আরতি শহরের এক হোটেলের সহকারী ম্যানেজার জে-কে-কে মনেপ্রাণে ভালবাসে। আচমকা এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ওরা খুব নিকটে আসে, তারপর শুরু হয় ঘনিষ্ঠতা এবং পরে পিতার অজ্ঞাতে বিয়ে। বিয়ের পর যথারীতি এক কন্যাসন্তানের জনক হোলেন জে কে। কিন্তু আরতি 'মা' হবার পরেও নিজেকে সংসারের মধ্যে বেঁধে না রেখে রাজনৈতিক ব্যাপারে বাবাকে সাহায্য করবার জন্যে ঘন ঘন বাপের বাড়ী যায়। আর বাড়ীতে একমাত্র কন্যাসন্তানের দেখাশোনা করে পাড়া-প্রতিবেশী। তাই নিয়ে প্রথমে ভুল বোঝাবুঝি, তারপর শুরু হোল স্বামী-স্ত্রীতে সংঘাত। আরতি স্বামী ও কন্যাকে ছেড়ে বাধ্য হয়ে বাবার কাছে চলে এলো তার সঙ্গে দেশসেবার জন্যে।

ঘটনাচক্রে একবার ভোট সংগ্রহ করবার ব্যাপারে শহরের আশিয়ানা হোটেলে আশ্রয় নেয় আরতি ও তার দলের লোকেরা। এখানেও চন্দ্রসেন ও অন্যান্য দলগুলি সেই হোটেলের ম্যানেজার (জে কে) ও আরতিকে নিয়ে রসালো কাহিনী শুরু করে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে চন্দ্রসেনের এক বক্তৃতা সভায় গিয়ে আরতি জে কে-কে নিজের স্বামী হিসাবে পরিচয় দেয়। ভোটেও আরতি চন্দ্রসেনকে হারিয়ে দেয়। এবং তার পর সে স্বামীর ঘর করতে চাইলেও দেশসেবার ও জনসাধারণের উন্নতিবিধানের জন্যে আবার তাকে ফিরে যেতে হয় রাজনীতিতে।

কাহিনীকার 'কমলেশ্বর' ('ফিরিভি' খ্যাত) কাহিনীর মধ্যে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর জীবনের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে সন্নিবেশিত করেছেন। সেদিক থেকে লেখক অন্যান্য গতানুগতিক হিন্দী ছবির চেয়ে নতুন কিছু দেবার চেষ্টা করেছেন। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনায় গুলজার হিন্দী ছবিতে নবাবাস্তবতা ও বলিষ্ঠ পরিচালন ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে ছবির শেষদিকের দৃশ্যগুলির মন্থরতা এড়াবার জন্যে ছবির বেশ কিছু অংশ বাদ দিতে পারতেন।

অভিনয়ে—আরতির জীবনের বিভিন্ন দিক (তরুণীরূপে, বধূরূপে এবং মহিলা রাজনীতিবিদ ও দেশসেবিকার ভূমিকায়) শ্রীমতী সুচিত্রা সেন মরমী অভিনয় করেছেন। জে কে'র ভূমিকায় সঞ্জীবকুমারের অভিনয়ও চরিত্রানুগ। অন্যান্য ভূমিকায় এ কে হাঙ্গল, ওমপ্রকাশ, ওমশিবপুরী রেহমান মনমোহন ও বেবী শিল্পিক অপূর্ব অভিনয় করেছেন। কলাকৌশলের কাজ এবং আলোকচিত্রগ্রহণের কাজ খুবই উচ্চাঙ্গের। সুরসংযোজনায় আর ডি বর্মনের কাজ প্রশংসনীয়।

-চিত্রদূত

নাটমঞ্চ

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'ভূতের বেগার' যখন লেখা হয় তখন এ দেশে বৃটিশ রাজত্ব প্রখর সূর্যের মত প্রতাপান্বিত। তাই স্বভাবতই ভাবতে অবাক লাগে এমন একটা নাটক কি করে তখন লেখা হয়েছিল এবং তা অভিনীত হয়েছিল।

'ভূতের বেগার' আপাতে ব্যঙ্গ নাটক হলেও, এর অন্তরালের তীব্র কষাঘাতটুকু স্পষ্ট।

সেকালে, অর্থাৎ মহামান্য বৃটিশ সরকার যখন ভারতের ভাগ্যবিধাতারূপে পাকাপোক্ত হয়ে বসেছেন এদেশে, তখন একজাতের কর্তাভজার সৃষ্টি হয় অনিবার্য ভাবেই। অর্থাৎ তাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয় নিজেদের স্বার্থপরতার অভিলাসে। ফলে সৃষ্টি হোল এদেশে 'বাবু' শ্রেণী। এরা কালক্রমে একসময় ধ্যান ধারণায় ইংরেজ হবারও স্বপ্ন দেখেছিল। বাবুজের আজও এদেশে বিদ্যামান।

এই বাবু জাতির কৃপায়ই একদা এদেশের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রূপান্তর আসে। ফলে এক রকমের বিকৃতি আমাদের সুস্থ চেতনাকে গ্রাস করে ফেলে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ এই শ্রেণীর পরগাছা বাবুজাতিকে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কষাঘাত করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর 'ভূতের বেগার' নাটকের মাধ্যমে।

তবে মূল নাটকের কিছু কিছু সংস্কার করেছেন এ যুগের নাট্যকার জ্যোছন দস্তিদার। যাকে তিনি বলেছেন 'বিকৃতি।' (এ নাটকের পরিচালকও তিনিই।) কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি বলেছেন, 'ধৃষ্টতার সহিত তাঁহার সৃষ্টির উপর আমরা কলমের খোঁচা লাগাই নাই। তাঁহার নাটকের মূল সুর বজায় রাখিয়া তাঁহার লিখিত অনুচ্চারিত স্থানগুলিকে সোচ্চারিত করিয়াছি মাত্র।

ষ্টার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ফোন : ৫৫১৯৩৯
প্রতি বৃহঃ ৬টা
শনি, রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬টায়

পরিচয়

পরিচালনা বঙ্কিম ঘোষ
নাটক : কুণাল মুখোজী
প্রতীন্দ্র, শমিতা বিশ্বাস, অলোক, ছন্দা, অনামিকা, বঙ্কিম ও হরিধন।

ভূতের বেগার নাটকের দৃশ্য

রূপান্তরীর ভূতের বেগার

.....'ভূতের বেগার' বাবুজাতির মুকুর। যুগের গতিতে মুকুরের পারা স্থানে স্থানে খসিয়া গিয়াছিল, আমরা তাহাতেও কিছু কিছু পারা সংযোগ করিয়া বাবুজাতির প্রতিনিধি হইয়া বাবুজাতির সম্মুখে মেলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র।

বৃটিশ এদেশে আসার পর সাহেবী আদব কায়দার সঙ্গে আর একটি জিনিষ আমরা তাদের কাছে পেয়েছি। সেটা হোল ব্যবসা বুদ্ধি। যে ব্যবসা বুদ্ধি আদৌ ভারতীয় মেজাজের নয়, অর্থাৎ বেনের ব্যবসা নয়। সাহেবী কায়দার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। এবং যে ব্যবসা সম্পূর্ণতই দোয়াত কলম, কাগজ, ফাইল, টেবিল চেয়ার এবং সই ভিত্তিক।

নাটকের নায়ক আনন্দ ব্যানার্জী ও খোদ ইংরেজ সাহেব মিঃ বাউয়েলের কৃপা ও অনুপ্রেরণায় সেই রকমের ব্যবসা করেছিল। এবং ব্যবসা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করল স্বপ্ন দেখার। স্ত্রীকে সে বোঝাল এবার সে একাধারে বড়লোক এবং জাতে উঠবে। এ জাতে ওঠা তাদের পারিবারিক বনেদীয়ানা নয়, সাহেবের কাছাকাছি থাকার যোগ্যতা।

ফলে নায়ক আনন্দও একদিন পৈতৃক পোষাক ছেড়ে প্যান্ট কোটের বাবু হোল, ইংরিজি বিদ্যা রপ্ত করার জন্য সচেষ্ট হোল, ছেলে মেয়েকে ইংরিজ শেখাবার জন্য সেকালের বিদ্যা দিগ্‌গজ, মাষ্টার রেখে দিল। এমন কি স্ত্রীকেও ইংরেজ সমাজে মেলামেশার সুবিধার জন্য ইংরিজি শেখাতে ও ইংরেজ ললনাদের মত গাউন পরা শেখাতে লাগল।

কিন্তু আনন্দ ব্যানার্জী ইংরিজি ঢঙে ব্যবসা এবং ইংরেজ-ই হতে চেয়েছিল, জাত ব্যবসায়ী ধুরন্ধর ইংরেজের কূট চাল সে ধরতেও পারেনি, আয়ত্তও করতে পারেনি। ফলে অনেককে সর্বস্বান্ত করে একসময় নিজেকেও ডুবতে হোল। ততক্ষণে তার এবং তার স্ত্রীর যা কিছু ছিল সবই চলে গেছে সাহেবের অদৃশ্য হাতে।

'ভূতের বেগার' নাটকের মূল বিষয়ের ছক এটাই।

নাটকের শুরু চারণ দলের গায়েন দিয়ে। অনেকটা পালা গানের অগ্রদূতরা যেভাবে পালা গানের প্রস্তবনা করে শুরুতে, অনেকটা সেই ঢঙে। ঘটনার পরিবর্তনের প্রস্তাবনা এদের মুখে ব্যঙ্গের

দৃশ্যে পরিবেশন করা হয়েছে। নাটকে এই সংযোজন বড় ভাল লেগেছে। গায়ক দল (সংগীত দেবাশীষ দাশগুপ্ত, গেয়েছেন সত্যব্রত দাশগুপ্ত, প্রণবসাধন কর, গৌতম ব্যানার্জী, শ্যামল সেনগুপ্ত ও পাপিয়া চক্রবর্তী) গেয়েছেনও সুন্দর।

অভিনয়ে প্রথমেই, যিনি দর্শকদের বিস্মিত করেছেন তিনি আনন্দের স্ত্রীরূপী চন্দ্রা দস্তিদার। যেমন উনি বাঙ্গালী ঘরের বৌয়ের রূপে, তেমনি গাউন পরে মেম হবার চেষ্টায়—সেই সঙ্গে তাঁর অনবদ্য অভিনয়।

এর পরেই নাম করা যায় আনন্দ ব্যানার্জীরূপী জোছন দস্তিদার ও পিসের ভূমিকাভিনেতা পার্থ মিত্রর। জোছনবাবু দুই ভূমিকায়। (খাঁটি বনেদী বাঙ্গালী ও সাহেবী পোষাকে) মর্যাদা সম্পন্ন এবং আশ্চর্য স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।

সরকারের ভূমিকায় কুমারেশ মুখার্জী কোন কোন দৃশ্যে চমৎকার। তবে তিনি অতি নাটকীয়তার ঝোঁক আর একটু সামলে নিলে চরিত্রটি আরও হৃদয়গ্রাহী হোত।

প্রশান্ত ঘোষের মিঃ বাউয়েল এবং সুজিত ঘোষের খুড়ো ভাল। নিতাইয়ের স্ত্রীর ভূমিকায় মণিকা চক্রবর্তী অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ এবং সুন্দর। সমীর লাহিড়ীর চাকরও স্বচ্ছন্দ।

অন্যান্য ভূমিকায় মদন দেব, কমল রায়, শিখা রায় ইত্যাদি স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।

আনন্দের কন্যা পাটনীর ভূমিকায় ছোট মেয়ে খেয়ালী দস্তিদার এবং পুত্ররূপী নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালো লেগেছে। একটি ছোট্ট ভূমিকায় ক্ষিতীন দাস সুন্দর। শ্যামল সেনগুপ্তর মঞ্চ পরিকল্পনায় নূতনত্ব আছে। একই স্টেজের ওপর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপনার পরিকল্পনা তার সুসিয়ানারই পরিচায়ক।

যাত্রাপালায় ব্রেখট নাটক

শৌখিন যাত্রার আসরে ব্রেখটের সর্বপ্রথম পদার্পণ ঘটলো গত ৯ ফেব্রুয়ারী জ্ঞানভারতী হলে সান্ধ্য নাট্য সংঘের প্রযোজনায়। বের্টোল্ট ব্রেখটের একটি জনপ্রিয় নাটক অবলম্বনে রচিত সুধাংশু দাশগুপ্তের 'বহুবল্লভা' আসরস্থ হয় প্রদীপ ঘোষের নির্দেশনায়। দলগত অভিনয়ে সমৃদ্ধ এই যাত্রাভিনয়ে বিশিষ্ট যাত্রা সংযোজন করেছেন নাট্যনির্দেশক। আর সেই সঙ্গে সুরবৈচিত্র্যের বন্যায় আসর মেতে ওঠে পরেশ ধরের সুরসংযোজনার কৃতিত্বে।

সুজনের 'মা'

অসহনীয় যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ সমাজের বুক থেকে শোষণ বঞ্চনা নির্যাতন চিরবিদায় দিয়ে আগামী দিনগুলোকে সুন্দর করে গড়ে তোলার সঠিক নিশানা দিয়েছেন ম্যাকসিম গোর্কি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'মা' উপন্যাসে। অদৃশ্য পরিকল্পনামত আজ যখন সুগভীর এক জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনকে অভিশাপ ভারাক্রান্ত করে তুলছে তখন তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম প্রতিবাদ হোল 'মা'। সুজন নাট্যগোষ্ঠী পয়লা এপ্রিল রঙ্গনায় নাটকটি মঞ্চস্থ করছেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। সামগ্রিক প্রযোজনাকে আঙ্গিকের মাধ্যমে আরও সাফল্যমণ্ডিত করতে সংগীত ও আলোক পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং তাপস সেন। নির্দেশনায় জ্যোতিপ্রকাশ। অভিনয় শুরু সাড়ে ছটায়।

থিয়েটার সেন্টারের (কলকাতা) নাট্যোৎসব

থিয়েটার সেন্টারের বিংশতিতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৪ই মার্চ থেকে সপ্তাহব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবে বিভিন্ন দিনে অথচ সংযুক্ত, সেদিন দুজনে, পরাজিত নায়ক প্রহসন (উনবিংশ শতাব্দীর), কেঁচো খুঁড়তে সাপ, ষোড়শী ও ক্ষুধিত পাষাণ মঞ্চস্থ হবে। একাডেমী মঞ্চে।

নাট্য সমালোচক

বিবিধ সংবাদ

শ্রেমাবতার শ্রীনিতাই চাঁদের স্মরণে মুগান্তর পত্রিকা ভবনে উৎসব : ১০ ফাল্গুন সন্ধ্যায় শুভ অধিবাস অনুষ্ঠিত হয় এবং ১১ ফাল্গুন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ জন্মতিথি উপলক্ষে দিবামঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন হয়। সন্ধ্যায় বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠানে ভক্তি গীতি পরিবেশন করেন মনোজ মিত্র, নিবেদিতা নাথ, জয়া দাশ, ভোম্বল দাস পরিতোষ দাশগুপ্ত আশীষ গুপ্ত, অজিতকুমার সাহা এবং খোল সংগতে অসিতকান্তি ঘোষ।

ধর্মীয় ও বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীপাদ গোবিন্দগোপাল গোস্বামী ভাগবতশাস্ত্রী। প্রধান অতিথি নরেন্দ্রনাথ পাল। ১২ ফাল্গুন মাঘী পূর্ণিমা কলিযুগোৎপত্তি উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি কমনায় শ্রীচণ্ডী পাঠ পূজা হোম অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ইরমা ভক্তিমতী শ্রীমতি বীণা ঘোষ এবং প্রধান উদ্যোক্তা বাবু সেনা।

স্বদেশী ছবি

জার্মান ছবির খবর

বিখ্যাত জার্মান চিত্রপরিচালক আলেকজেন্ডার কুজের সর্বশেষ ছবির আগের ছবির নাম গিলেজেন-হিতসারবেত এনার স্কালাডিন। ফ্রাঙ্কফুর্টের পটভূমিতে তোলা হলেও তার গন্ডী সীমাবদ্ধ ছিল কিছু উঁচুতলার জীবনযাপন ইত্যাদি এবং শহরের স্থানীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে।

কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক ছবি (ঐ শহরের পটভূমিতেই তোলা) ব্যাপকতার দিক থেকে অনেক আকর্ষণীয়। এই ছবিতে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তরকালের মোট ৩০ বছরের সময়সীমার মধ্যে ঐ শহরের যে পরিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এতে তাই পুলিশ থেকে ঐ শহরের প্রেমিক প্রেমিকা কার্নিভ্যালের আনন্দ এবং উত্তেজনাপূর্ণ পটভূমি, গায়ক-গায়িকা ধর্মঘটী মেকানিক্যাল শোভেল অপারেটার অর্থাৎ শ্রমিক শ্রমিকদের ওপর পীড়ন, ডেলিগেট প্রফেসার ও শিল্পপতিদের জীবনের নানা দিক এবং কর্মজীবন ইত্যাদি রয়েছে।

এ ছাড়াও জনজীবনের নানা দিক এ ছবিতে স্থান পেয়েছে। ভাল এবং মন্দ। যেমন এ ছবিতেই এমন একটি মেয়ের কথা আছে, যে পুরুষদের প্ররোচিত করে, মুগ্ধ করে বিছানা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং পরে তাদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ছে। অথচ ঐ মেয়েকেই পথে অন্য রূপে দেখা যায়।

পূর্বে জার্মানীর একটি মেয়ে গুপ্তচর সুস্থ জীবনের আশায় তার পেশা ছেড়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে এলো। কিন্তু সেখানে সে তার নিজস্ব স্বত্তাটিকেই হারিয়ে বসল।

এমনি নানা চরিত্র ও মানসিকতা ভীড় করেছে এ ছবিতে যারা ফ্রাঙ্কফুর্টকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে বা বেঁচে থাকতে চায়।

সর্বমোট ১০টি দিনের ফ্রাঙ্কফুর্টকে ধরে রাখা হয়েছে এই ছবিতে। ছবিটি ৯০

মিনিটের। এই জনজীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে এই শহরের করুণ জীবনের দিক কাব্য-মণ্ডিত এবং পরিবেশ ও তথ্যাভিত্তিক শহরের অন্যদিকও ছবিতে স্থান পেয়েছে। তবে সবের পেছনেই একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ যেন সর্বদা কাজ করেছে।

একটা বিখ্যাত শহরকে কেন্দ্র করে এমন ছবি করা দূরদর্শিতা এবং দুঃসাহসের সন্দেহ নেই। যাতে খুঁটিনাটিভাবে ধরা পড়েছে একটা আন্তর্জাতিক শহরের বৈচিত্র্য তার জীবনধারণ, তার বিপরীত দিক সব জড়িয়ে যে নিজেই একটা স্বতন্ত্র সত্তার কাজ করেছে।

•

ইদানিং জার্মান সাহিত্য থেকে যৌনতা এবং হিংস্রতা (ভায়োলেন্স) যেন ক্রমশই বিদায় নিতে দেখা যাচ্ছে। একালের লেখকরা যেন সেই প্রবণতাকে কাটিয়ে ক্রমশ সুস্থ জীবনের বাস্তব জীবনের ওপর গল্প উপন্যাস লেখার দিকে ঝুঁকছে।

এবং এর প্রতিচ্ছবি অনিবার্যভাবেই ছায়াছবির ওপরও পড়ছে। নারী, তার যৌনাচার নগ্নদেহ ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্যের মত চলচ্চিত্রেও যে প্রচণ্ডতার ঢেউ এক সময় প্রবল হয়ে উঠেছিল হালে তা অনেকটা স্তিমিত। এবং পূর্বেকার ঐসব ছবি ও সাহিত্যসৃষ্টির বিরুদ্ধে রীতিমত জোরালো আন্দোলন ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে। জর্মান যেন আবার তার পুরনো ফর্মে অর্থাৎ গভীরতার দিকে ফিরে যাচ্ছে।

এতে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, সাধারণ মানুষ বেশীদিন উত্তেজনা বা উৎক্ষিপ্ততার বশবর্তী হয়ে থাকে না।

এ ব্যাপারে সরকারও পেছিয়ে নেই। তাঁরাও এখন শক্ত হাতে এ সবের মোকাবিলা করছেন এবং এ ব্যাপারে সরেজমিন তদন্ত এবং সংশোধনের জন্য তাঁরা একটা উপদেষ্টা মণ্ডলী দ্বারা সমালোচনা বোর্ড ও তৈরী করেছেন।

সিটিজেন কেন

পুরনো ছবি যে এখনও আমাদের কাছে ভালো লাগে সম্প্রতি তার প্রমাণ পেলাম ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে অরসন ওয়েলসের 'সিটিজেন কেন' ছবিটি দেখে।

উইলিয়ম কেনের নাটকীয় এবং ঘাত-প্রতিঘাতে সমৃদ্ধ এই জীবনভিত্তিক ছবি দেখতে বসে কোথা দিয়ে যে প্রায় দুটো ঘণ্টা কেটে যায় তা টেরই পাওয়া যায় না।

ছবির কাহিনী ফ্ল্যাশব্যাকে বলা হয়েছে।

অরসন ওয়েলসের অসাধারণ অভিনয় এ ছবির প্রধান সম্পদ। এখানে ওয়েলস এবং কেনকে কোন সময়ই পৃথক করে ভাবা সম্ভব হয়নি।

এ ছবির প্রযোজক এবং পরিচালকও স্বয়ং অরসন ওয়েলস।

শাঃ রঃ চ

চালনা

সি এল টির স্মরণীয় পুতুলনাচ : সি এল টির পুতুল নাচ চিরকালই জনপ্রিয়। আর এ জনপ্রিয়তার ব্যাপ্তি আজ ভারত-ব্যাপী। সম্প্রতি রৌরকেল্লায় উৎকল মেসি নারী কোম্পানীর এবং হায়দরাবাদে জহর বাসভবনের আমন্ত্রণে এঁরা পরিবেশন করেছিলেন 'আলাদিন' পুতুলনাটক। এই দুটি জায়গায় এবং তমলুকেও এঁরা সকল শ্রেণীর শ্রোতার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছেন। তমলুকেও এঁদের পুতুলনাটক উচ্চ প্রশংসিত হয়।

সি এল টির উদ্যোগেই ভারতে সর্ব-প্রথম পুতুলনাচের আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা হয় গত ষাটের দশকে। সেই থেকে এনিয়ে তাঁরা অবিরাম পরীক্ষানিরীক্ষায় রত থেকে ভারতের এই প্রাচীন শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে ইয়ুথ পাপেট থিয়েটারের উদ্যোগও উল্লেখযোগ্য। এঁদের নূতন প্রযোজনা 'মুগলী'—প্রস্তুতির পথে। এ বছরই মঞ্চস্থ হবে সি এল টির রজত-জয়ন্তী উৎসবে।

মূর্ত অতীত :

গত সপ্তাহে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অরোবাহারের একটি অনুষ্ঠানে বহুদিন বাদে শোনা গেলো কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বীণ। রাগ দরবারী কানাড়া ও পাহাড়ী ঝিঁঝিট ধ্রুপদী ঐতিহ্য-মণ্ডিত এই যন্ত্রটি প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। দক্ষিণ ভারতের শিল্পীরা এবং দিল্লীতেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী এই যন্ত্র বাজিয়ে থাকেন। তাও বেশীর ভাগ বিচিত্র বীণ। পশ্চিম বাংলায় এ যন্ত্র শোনাই যায় না।

সেদিন কুমার সাহেবের বীণে এক হারিয়ে যাওয়া যুগের সাধনা ও বেদনা যেন মুহূর্তের জন্য মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। মনে পড়ছিলো জাঁকজমক ভরা রাজদরবার শিল্পীদের শিল্পকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে রাজারা যখন সিংহাসন থেকে নেমে এসে নিজের গলার মুক্তামালা গুণীর গলায় পরিয়ে দিলেন।

বিরাট যন্ত্রহাতে বাদনরত বীরেন্দ্র-কিশোরকে যেন স্বপ্নজগতের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছিলো। আর আন্দোলিত গান্ধার রেখাব ধৈবতের অনুরণন যেন রুদ্ধ কণ্ঠের জগতের অন্তরালের কোনো জগতের রুদ্ধ-বেদনার স্পন্দন। মনে হোলো যতদিন কুমার সাহেবদের মত গুণী মানুষ আছেন মরে মরেও বেঁচে থাকবে রবার বীণ সুররবাব? তারপর? এসব মর্যাদাগম্ভীর যন্ত্রের ভাষা কি স্তব্ধ হয়ে যাবে? এবারের তরুণ শিল্পীগোষ্ঠি কেন এঁদের কাছে শিক্ষা নিচ্ছেন না? সেতার সরোদ আজ এত জনপ্রিয় অথচ তাদের আদি উৎস অবহেলিত।

আসর সুরু হয় বীরেন্দ্রকিশোরের শিষ্য জগন্নাথ মুখার্জির কণ্ঠসংগীত দিয়ে। ইমন রাগের খেয়াল ও ভক্তিমূলক গান দিয়ে ইনি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

সংগীত শিল্পীর জন্মোৎসব : রাগ-সংগীতে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সুভাষ চাকলাদার একটি বিশিষ্ট নাম। সংগীত সাধনার সঙ্গে সঙ্গে ইনি সংগীত শিক্ষকতার দায়িত্বও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে আসছেন। উত্তর শহরতলীর রাগচক্র সংগীতায়ন তাঁরই প্রতিষ্ঠান। এই রাগচক্র সংগীত সম্মেলনের প্রাক রজত জয়ন্তী বৎসরের পটভূমিকায় গত সপ্তাহে বেলঘরিয়ার শান্তিভিলায় শ্রীচাকলাদারের জন্মোৎসব পালন করেন তাঁরই শিষ্য-শিষ্যারা।

আলোচনাসভায় শিল্পীর সংগীত-জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করেন সংগীতবিদ ডঃ বিমল রায়, সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল সংগীতজ্ঞ অরুণ ভট্টাচার্য অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার শিল্পী ও সংগীতের পৃষ্ঠ-পোষক কালিদাস সান্যাল। শিল্পীকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন ডাঃ রমা চৌধুরী স্বামী প্রজ্ঞানন্দ বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী এবং গুণীমহলের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কিশোর শিল্পী সুবর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের খেয়াল দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু। ইনি রাগচক্রের ছাত্র। ইমন রাগের খেয়াল এবং ঠুংরীতে শিক্ষা ও রেওয়াজ সুস্বাক্ষর ছিলো।।

বিমল মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত সেতারে শোনা গেলো বেহাগ ও ধন। দুটিতেই তাঁর মননশীলতা সু-অনুভূত। কণ্ঠ-সংগীতের অনুষ্ঠানে ভি জি যোগের বেহালাসংগতে যোগ যোগকোষ ও দেশরাগ গেয়ে শোনা রবি কিচলু ও বিজয় কিচলু। এ অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। কালি-দাস সান্যাল গীত দরবারী কানাড়ায় শিল্পীর অনাড়ম্বর এবং বাহুল্যবর্জিত গায়কীর মধ্যে অনেক ঘরানার চকিত আভাস বেশ কয়েকটি সরস মুহূর্তের সৃষ্টি করে-ছিলো। ঠুংরীটিও বেশ মেজাজী। সেতারে জনাব আখতার আলি খাঁর ভৈরবী সারা-রাতের অনুষ্ঠানকে মধুর পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে দিয়েছে। সকল অনুষ্ঠানে তবলা ও সারেংগীতে সুযোগ্য সহায়তা করেন ওস্তাদ শওকৎ আলি খান, চণ্ডীদাস সরকার এবং কানাই মিশ্র।

চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলি-কাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শুধুই
কেশ তৈল নয়
একটি
কেশ রসায়ন

সাধনা আমলা

সুবাসিত আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল

অতুলনীয় গুণাবলীর
জন্য যুগ যুগ ধরে
সুবিদিত

আমলকীই ইহার
প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্বতা রোধ ক'রে ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-৫

SA-2/69

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 14th March, 1975
Phone 55-5231 (14 lines)

12 MAR 1975

শতবর্ষেরও বেশী সবার প্রিয়
নিপুণা গৃহিণীর চাই-ই চাই
কুকমী
গুঁড়ো
মশলা

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-০৯৯৫,
ফ্যাক্টরী—কাশীপুর

ad/KDS/75

মুদ্রণ-পরিচালনা : এম. সি. পাবলিশার্স এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-সৃষ্টি

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

সুভাষ সমাজদারের স্মরণীয় সৃষ্টি

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ৮.

নারায়ণ সান্যালের নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস

বিহঙ্গ বাসনা ১০.

শক্তিপদ রাজগুরুর চিরকালের উপন্যাস

গৌড়জন বধূ ১২.

চিরঞ্জীব সেনের নতুন রহস্যোপন্যাস

মিরানজিয়া রহস্য ১০.

নিখিলচন্দ্র সরকারের নতুন ধ্রুপদী উপন্যাস

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০.

আবদুল জব্বারের নতুন রচনা

জনপদ জীবন ৮.

শঙ্কু মহারাজের শ্রেষ্ঠতম ভ্রমণ-কাহিনী

মধু-বৃন্দাবনে (তিন পর্বে সম্পূর্ণ)

ব্রজ পর্ব ১০. * বন পর্ব ১০. * মহাবন পর্ব ১২.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের স্মরণীয় উপন্যাস

পূর্ব পুরুষ (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ)

প্রথম খণ্ড ৮. * দ্বিতীয় খণ্ড ১২.

শৈলেশ দে'র অপ্রতিদ্বন্দ্বী রচনা

আমি সুভাষ বলছি (৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

মূল্য ঃ প্রতি খণ্ড কুড়ি টাকা

"আমি সুভাষ বলছি" বইটির প্রতি খণ্ডের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠালে রেজিঃ ডাকে বই পাঠান হয়। ডাকমাশুল আমরা বহন করব।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

আর এক সাজে ৬.

শ্রীহংস-এর

লাস্ট ওয়ার্ড ৮.

পরিতোষ মজুমদারের

অগ্নিলতা ৫.

দ্বারেশ শর্মাচার্যের

পিছু ডাকে ৫.

নিগূঢ়ানন্দের

হৃদয়ে নাবিক ৮.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

স্বাতী ও দীপু ১০.

ফণীভূষণ আচার্যের

হা রে কলকাতা ৬.

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

রূপসী প্রতিবেশী ১২.

(নেপাল ভ্রমণ কথা)

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

যুগ স্বাক্ষর ১০.

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১২.

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

গন্ধ পেলেন পরাশর বর্মা ৫.

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবর্নশিরি ২০.

সুনীলকুমার ঘোষের

কারা প্রাচীর ১০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক কলম!

FIRITE
ফাইরাইট
৯২৩

মনে রাখবেন:
• স্কেচ পেনগুলি পাওয়া যায় ১২ টি রঙে আর ফাইরাইট পেনগুলি পাওয়া যায় ৭ টি রঙে।
• আবার কালি ভরার জন্যে পেছনের প্লাগটি খুলুন।
• ডগ একেবারে শুকিয়ে যাওয়ার আগেই কালি ভরুন।
• ফাইরাইটে রয়েছে মজবুত সিন্থেটিক টিপ— ভাঙ্গার ভয় নেই।
• স্কেচ পেনগুলির টিপ সিন্থেটিক রেজিন-মেশানো ফাইবার দিয়ে তৈরী—তাই স্কেচ করার সময় চাপ পড়েনা।
• ফাইরাইট ও স্কেচ পেনের জন্যে সব রঙে আবার ভরার কালি পাওয়া যায়।

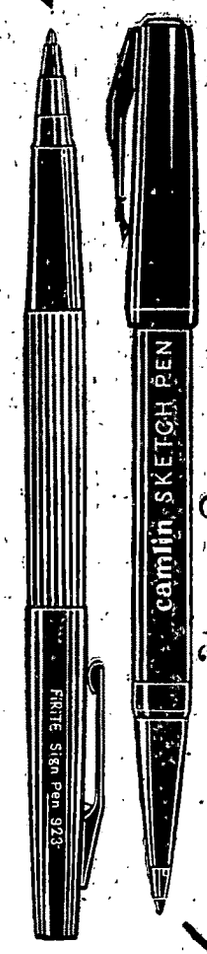

ক্যামলিন

স্কেচ পেন ও ফাইরাইট পেন

ক্যামলিন প্রা লি.
আর্ট মেটেরিয়াল ডিভিশন,
জে. বি. নগর,
বোম্বাই-৪০০ ০৬৯, (ভারত)

স্কেচ পেন
৯২১.

Visisn 751 Ben.

নেপুন

সেরা পেন্সিল

ক্যামলিন যুবক HB

ত্রিবেনী HB

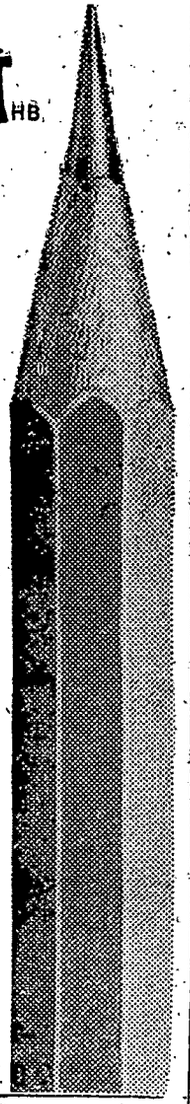

ক্যামলিন এখন বার করল—
যুবক ও ত্রিবেণী; উৎকৃষ্ট পেন্সিল ও পরীক্ষিত পেন্সিল গ্যারান্টাপ্রদত্ত পেন্সিল।
হ্যা, সে গ্যারান্টী হ'ল ক্যামলিনের।
কাঠ···সীসা···দাম সবই অর্থসাশ্রয়ের প্রতীক

যুবক ও ত্রিবেণীর প্রস্তুতকর্তা হ'ল ক্যামলিন—যারা এযাবৎ নানাবিধ ফাউন্টেন পেন, কালি এবং আর্টমেটেরীয়াল, ওয়াটার কালার, পোস্টার কালার, অয়েল কালার, ক্রাইলিন এবং ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স প্রভৃতি তৈরী করে আসছে।

ক্যামলিন প্রাইভেট লিমিটেড
আর্ট মেটেরিয়াল ডিভিশন,
বোম্বাই ৪০০ ০৬৯

ডাকযোগে ওয়াটার কালার পেন্টিং, ক্রাইলিন কালার পেন্টিং এবং কার্টুন এখন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে—আজই তাতে যোগ দিন। উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

Vision 753 Ben.

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪৫ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 21st March, 1975 শুক্রবার ৭ই চৈত্র, ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	ঈশ্বরের পুত্র	(গল্প)	শ্রীদেবল দেববর্মা
১১	পটভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১২	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৪	দেশে বিদেশে		শ্রীপুণ্ডরীক
১৫	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
১৭	ভুল স্থূল ভুল	(কবিতা)	শ্রীবিষ্ণু দে
১৮	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
২০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রীউপগুপ্ত
২২	বিমানবিহারী মজুমদার—একটি স্মরণ		শ্রীসুবল গঙ্গোপাধ্যায়
২৪	গোয়েন্দা ধাঁধা		শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
২৫	চিঠিপত্র		
২৮	ঢাকা থেকে ফিরে		শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৩১	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে		শ্রীদিলীপকুমার রায়
৩৩	রূপসজ্জা		শ্রীনিরুপমা
৩৫	অঙ্গনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৩৭	রান্না করে দেখুন		শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৩৯	রূপসীর খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী
৪০	পুনশ্চ		শ্রীক্ষপণক

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

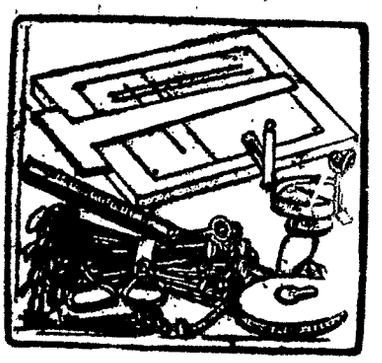

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম : অরারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কামলিন প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন
কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম
মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন
প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না,
ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকএ
মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক
তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না
করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায়
আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
(কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪,
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAN—KCC-74

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক অন্তায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

CMDA এর চিঠি

প্রিয় পাঠক,

কিছুদিন আগে একটা খোলা চিঠি পাঠিয়েছিলাম বৃহত্তর কলকাতাবাসীদের উদ্দেশ্যে। প্রদর্শনী মণ্ডপগুলিতেও আপনাদের মন্তব্য পড়েছি। অভিভূত হয়েছি আপনাদের সাড়াতে।

আরও অভিভূত হয়েছি হাওড়ার নতুন সাবওয়ে বা সুড়ঙ্গপথ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে না-চাইতে-পাওয়া অভিনন্দনে। অবাক হয়েছি যে, তাঁরা নিজেরাই এই সাবওয়ের রক্ষণাবেক্ষণে এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার সবচেয়ে বেশী উৎসাহী।

আমাদের যাঁরা কঠোরতম সমালোচক, তাঁদের নিয়েও সকলেই চান বৃহত্তর কলকাতার উন্নতি হোক—সঙ্গে সঙ্গে, তাঁরা চান কাজটা তাড়াতাড়ি হোক। কাজ শেষ করতে এত সময় লাগছে দেখে তাঁরা অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। বিশ্বাস করুন আমরাও অধৈর্য—কম নয় বেশী অধৈর্য। যেখানে আমাদের দোষ সেখানে ক্ষমাপ্রার্থী। যেখানে দেরী হওয়ার কারণ আছে সেখানে আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী।

যেমন হাওড়া সুড়ঙ্গ পথের বেলা। চার বছর সময় লাগলো বটে কিন্তু লক্ষ লক্ষ নিত্য যাত্রী এবং হাওড়া ষ্টেশন ব্যবহারকারীরা তো সব অসুবিধা সহ্য করেছেন এতদিন। কেন?

কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে একটা ভালো কাজ হতে চলেছে। বৃহত্তর কলকাতাবাসীদের কাছেও আমাদের একই প্রার্থনা। সি এম ডি এ আপনাদের অসুবিধা করছেন বটে—বড় রকমের এবং দীর্ঘস্থায়ী হলেও, সেটা ভালোর জন্যই হচ্ছে। যাঁরা কলকাতাকে ভালো বাসেন, তাঁরা কি জানেন না, কলকাতা মরতে বসেছিলো? তাঁরা কি জানেন না যে, জল সরবরাহ, জল ও মল নিষ্কাশন, রাস্তাঘাট চওড়া করা আর বস্তী উন্নয়নে আমরা যেটুকু করেছি সেটুকু না করলে আজ কলকাতার হাল কি হ'ত প্রশ্ন হতে পারে কি করেছি আমরা। আপনারা যদি জানতে চান, আমাদের কাছে লিখুন। শুধু হাওড়া সুড়ঙ্গ পথই নয়, ভালো কাজের ফিরিস্তি বেশ কিছু আছে। ডায়মণ্ড-হারবার রোডে গেছেন সম্প্রতি? অবশ্য স্বীকার করেই নিচ্ছি যে আমাদের কাজ সম্বন্ধে অভিযোগের ফিরিস্তিও বেশ দীর্ঘ।

সহযোগিতার কথা কেন বলছি জানেন? বৃহত্তর কলকাতায় কয়েক হাজার খাটা পায়খানা আছে। বস্তীগুলি আমরা নিজেরাই বিন পয়সায় পালটে দিচ্ছি স্যানিটারী পাকা পায়খানা বানিয়ে, শুধু কলকাতা কর্পোরেশন এলাকাতেই নয়, হাওড়া, ডোমজুর, সাঁকরাইল, জগাছা, বালী এবং টালীগঞ্জ থানার অধীনে অঞ্চলগুলিতেও বাড়ীর মালিকরা ৪০০ টাকা দিলেই আমরা ১২০০ টাকার মত ভরতুকী দিয়ে চারদিনের মধ্যে স্যানিটারী পাকা পায়খানা করে দেবো। কিন্তু সবাই কি এই সুযোগ নিচ্ছেন? আমরা জানতে চাই কেন নিচ্ছেন না।

সেই জন্যই বলছিলাম, কলকাতাকে যাঁরা ভালোবাসেন এবং আমরা যাঁরা বৃহত্তর কলকাতাকে ভালো করতে চাইছি, তাঁরা যেন এক সঙ্গে থাকেন, অভিযোগ থাকলেও অসহযোগিতা যেন না থাকে।

শেষ করবার আগে কয়েকটা খবর দিয়ে রাখি। হাওড়ার নতুন বাকল্যান্ড ব্রীজের কাজ আরম্ভ হয়েছে, ব্র্যাবোর্ণ রোড এবং শিয়ালদায় উড়ালপুলের প্রথমিক কাজ চলছে। যেমন এগিয়েছে উল্টাডাঙ্গা আর কসবা ওভার ব্রীজের কাজ। কলকাতার অনেকগুলি রাস্তা মেরামত করে দেওয়া হয়েছে; আর নতুন রাস্তাতে কাজ আরম্ভের তোড়জোড় চলছে। টালা পাম্পিং ষ্টেশনের কাজ শেষ, অকল্যান্ড স্কোয়ার আর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ভূগর্ভে জলাধার নির্মাণ চলছে। গার্ডেনরীচ, হাওড়া আর বরানগরে জল সরবরাহ কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে। বিস্তীর্ণ এলাকায় নর্দমা খোড়ার কাজ চলছে।

আপনারা বলবেন, খোড়াখুড়ির কাজ যে চলছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তা' হলে আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখি? সি এম ডি এ আসার আগে কলকাতা উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ দেখেছেন কি? অর্থাৎ প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অবহেলা আপনারা সহ্য করেছেন বিনা প্রতিবাদে। ত' হলে উন্নয়ন প্রচেষ্টার কয়েক বছর কেন প্রতিবাদমুখর হবে? প্রায় ২৩ লক্ষ বস্তীবাসীর মধ্যে ১১ লক্ষ আজ কিছু কিছু স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার সুযোগ পাচ্ছেন। বস্তীবাসীদেরই জিজ্ঞাসা করুন তারপর অভিযোগ তুলুন।

শেষ করবার আগে আবার অনুরোধ, বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন সম্বন্ধে সচেতন থাকুন। সর্বসাধারণের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ব্যক্তিগত অসুবিধা বা ক্ষতি স্বীকার করে নিন। নমস্কার নেবেন।

ভোলানাথ সেন
চেয়ারম্যান—সি এম ডি এ
৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস,
কলকাতা—৭০০০১৭

সূচীপত্র

৪০	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান		
৪১	শেষ বিচার	(উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪৬	সেকালের সঙ্গীতগুণী		শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৪৭	ঝোলানো কুমীর	(গল্প)	শ্রীশান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়
৫১	খেলাধুলো		শ্রীদর্শক
৫২	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৩	দেশবিদেশের খেলা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৪	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীঅময়
৫৬	রঙ্গনী আলোয়		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৯	ফ্লোর থেকে বলছি		
৬১	স্টুডিও-সংবাদ		স্টুডিও সংবাদদাতা
৬২	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা		শ্রীঅভিজিৎ
৬৪	বাংলাদেশের ছবি		আনওয়ার আহমদ
৬৫	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৬৭	বিদেশী ছবি		শ্রীশ-র-চ
৬৮	নাটমঞ্চ		নাট্যসমালোচক
৬৯	প্রেক্ষাগৃহে ঃ চিত্রসমালোচনা		শ্রীচিত্রদূত
৭২	জলসা		শ্রীচন্দ্রাংগদা

প্রচ্ছদ ঃ কুমারী কুমুদ

আবদুল জববারের নতুন উপন্যাস

রাত পাখির ডাক ১২

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস — নিখিলচন্দ্র সরকারের উপন্যাস

দুজন একাকী ৫ — স্বপ্নের ধ্বনি ৮

সুশীলকুমার নাগের উপন্যাস — সুবোধ ঘোষের উপন্যাস

দ্রৌপদী প্রেম ৬ — পুনর্নবা ৪

বাসুদেব বসুর উপন্যাস — শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

রাজগৃহে রাজা নেই ৪ — বনে বনান্তরে ৭

কাঁদিছে মৃত্তিকা ৫ — স্বর্ণমৃগয়া ৪

বহুরূপীর হাস্যরস কাহিনী — নিশাচরের রহস্য কাহিনী

লৌকিকতার পরিবর্তে ৭ — তিন তাসের খেলা ৫

একটি শিশির বিন্দু ৫ — রক্ত ঝরা সন্ধ্যায় ৫

দৃষ্টিহীনের মিষ্টিমধুর উপন্যাস — হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মধুগন্ধে ভরা ৪ — এই জীবন ৫

পরিচয় গুপ্তের গোয়েন্দা কাহিনী — এ সি সরকারের যাদু কাহিনী

রহস্যের ধোঁয়া ৫ — আনন্দ চমকী ৮

সন্তোষ ঘোষের নতুন সাড়াজাগানো উপন্যাস

গুড়ু-বাই ক্যালিফোর্ণিয়া ২০

পূর্ণ প্রকাশন ঃ ৮এ টেমার লেন কলিকাতা-৯ ।। ফোন ঃ ৩৪-৯৫৯২

শিশিরকুমারের

কয়েকখানি

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

কালাচাঁদ গীতা
৪র্থ সংস্করণ ৩-০০

নিমাই সন্ন্যাস
(নাটক) ২য় সংস্করণ ২-০০

নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ২-০০

লর্ড গৌরাঙ্গ
(২২টি খণ্ডে) (ইংরাজী)
প্রতি খণ্ড ৩-০০

নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ২-০০

নরোত্তম চরিত
(হিন্দী) ২-০০

সর্পাঘাতের চিকিৎসা
(৮ম সংস্করণ) ১-৫০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE
De-luxe Ed. — Rs. 6.50

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE
Popular Ed. — Rs. 5.50

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও
বিশিষ্ট পুস্তকালয়

সম্পাদকীয়

আত্মানুসন্ধান চাই

সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশের নেতৃত্বে গত সপ্তাহে দিল্লীতে যে বিশাল মিছিল পার্লামেন্ট ভবনে গিয়েছিল তার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে মতবিরোধ থাকলেও এটা ঠিক যে রাজধানীকে তা অভূতপূর্ব নাড়া দিয়ে গেছে। তার আগেই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে মোহন ধারিয়ার অপসারণকে কেন্দ্র করে কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। বিরোধী দলগুলো পরস্পরের মধ্যে কলহ করতেই অভ্যস্ত আমাদের দেশে। জনসাধারণও তাদের সম্পর্কে খুব উচ্চাশা পোষণ করে বলে মনে হয় না। দুর্বল বিরোধী দল শাসক পার্টির সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এঁটে উঠতে পারবে না, এটাও ঠিক। কিন্তু বিরোধী দলের বক্তব্য এবং অভিযোগ সবই অসত্য বা অর্থহীন, একথা মনে করা অযৌক্তিক। জয়প্রকাশ নারায়ণের কৃতিত্ব এই যে, তিনি কোনো দলের নেতা না হলেও এবং পরিপূর্ণভাবে অহিংসায় বিশ্বাসী হয়েও নানান বিরোধী দলকে তিনি তাঁর আদর্শানুযায়ী আন্দোলনে একত্রে মেলাতে পেরেছেন। স্বাধীনতার পর আর কোনো নেতা সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিরোধীদের এই ঐক্য ঘটাতে পারেন নি বললে অত্যুক্তি হয় না। এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সার্থক হবে কিনা কিংবা পাঁচমিশেলী বিরোধী দলগুলোকে তিনি বাস্তবিকই দলহীন গণতান্ত্রিক পরীক্ষায় রাজি করাতে পারবেন কিনা তা এখনই বলা যায় না। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্নীতি অপদার্থতা এবং জনগণের জীবনের ব্যর্থতা ও যন্ত্রণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তার প্রতিকারের জন্য সংঘবদ্ধ দাবী তুলতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। বিহার দিয়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। আজ এই আন্দোলনকে সারা ভারতে তিনি ছড়িয়ে দিতে চান। জনসাধারণের মধ্যে এতদিন যে অসন্তোষ চাপা ছিল তাই আজ যেন ফুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

লক্ষ্যণীয় যে ৬ মার্চের মিছিলে কয়েক লক্ষ জনসমাবেশ হলেও তাতে কোনো পার্টি পতাকা ছিল না, কোনো জঙ্গী আওয়াজও তোলা হয় নি। সম্পূর্ণ শান্তভাবেই তা রাজধানীর রাজপথ পরিক্রমা করে লোকসভার অধ্যক্ষ ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে দাবীপত্র পেশ করেছে। এটাও নিশ্চয়ই রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে শিক্ষণীয়। কারণ, রাজনৈতিক হিংসা আমাদের দেশে আজ যথেষ্ট প্রবল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতার লোভে পারস্পরিক বিরোধ নগ্ন রূপ গ্রহণ করেছে। কিভাবে রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা যায় এবং প্রশাসন ও সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করা যায় তা আজ সরকার এবং বিরোধী সকলকেই ভাবতে হবে। কেননা দুর্নীতি আজ সর্বত্রই। সকলের সহযোগিতা না পেলে সরকারের পক্ষেও আজ দুর্নীতি দূর করা সম্ভব নয়। জনসাধারণের জীবনে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক নিশ্চিতি আনতে হলে অপচয় দূর করতে হবে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে হবে যাতে উঁচুতলা ও নীচুতলার ফারাকটা কমে। জাতীয় উৎপাদনের মোটা অংশটাই যেন মুনাফাখোরদের মুঠোতে গিয়ে না পড়ে। এই সমস্ত বক্তব্য অযৌক্তিক নয় কিংবা তা নিয়ে কোনো বিরোধও নেই। প্রশ্ন হল কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক দুর্গতির অবসান ঘটিয়ে আমাদের উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

নির্বাচনের প্রশ্নে কতকগুলো সংস্কারের দাবী জয়প্রকাশ করেছেন। বিরোধী দলের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সংলাপ করতে সরকার পক্ষ অনাগ্রহী নয়। প্রধানমন্ত্রী নিজেই সংসদে বলেছেন, তিনি সব সময়েই আলোচনায় প্রস্তুত। সংসদীয় গণতন্ত্র একদলীয় শাসন নয়। বিরোধী দলের সম্মতি ও সমালোচনাতেই সংসদীয় গণতন্ত্র তার সার্থকতা পায়। এটা খুবই দুঃখের যে, ভারতবর্ষে সত্যিকারের বিকল্প বিরোধী দল গড়ে ওঠে নি যারা নির্বাচনে বিকল্প সরকারের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। জয়প্রকাশজী একটা প্রতিবাদকে ভাষা দিয়েছেন জনগণের ক্ষোভকে সংঘবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তিনিও কোনো বিকল্প দিতে পারবেন কি? তাঁর সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তা ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এক নয়। শাসক পার্টির বিরুদ্ধে তাঁরা একটি ছাতার তলায় এসে মিলেছেন। কিন্তু নির্বাচনের সময়ে, প্রার্থী বাছাইয়ের সময়ে এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঠিক করার সময়ে তাঁদের মধ্যে যে ঐক্য থাকবে তা জোর করে বলা যায় না। জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল সংগঠন কংগ্রেস কিংবা সি পি এম কোন কর্মসূচীতে এক থাকবে এবং কতদূর এক সঙ্গে যাবে, সেটাও নিশ্চয়ই ভাববার। তবে এই মিছিল এবং আন্দোলন শাসক পার্টিকে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করতে পারলে সেটাই হবে বড় কাজ। কেননা দেশের সত্তর শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করলে শাসক পার্টিই কি বড়াই করে বলতে পারবে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল? অথচ এইদেশেই তো লুকোনো সোনা ও কালো টাকার ছড়াছড়ি।

অশরীর পুত্র

পৈল দেববর্মা

ইদানীং এমনি চৌহদ্দী। প্ল্যানচেটে বসে একটি অশরীরি আত্মাকে আহ্বান করলে যেমন ভৌতিক নিঃস্তব্ধ পরিবেশ হয়, প্রায় তেমনি। বিকেল মরে এলেই রাস্তাটা নির্জন। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের মত শূন্য,—খাঁ খাঁ করে। আর অন্ধকার একটু গাঢ় হলে কথা নেই। তখন পথটা অতিকায় পাইথন অজগরের মত স্তব্ধ,—তার মোটা শরীর নিয়ে বুঝি নড়তে পারে না।

অবশ্য আলো আর অন্ধকারে ফারাক কই? দিন-রাত্তির সব সমান। চাঁদ আর সূর্যের তফাৎ বোধ হয় মুছে যাচ্ছে। কারণ গণ্ডগোলের কোনো সময়-অসময় নেই। সকাল-সন্ধ্যে, দ্বিপ্রহর কিম্বা নিশীথ রাত যখনই হোক মারামারি লাগলেই হল। অমনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর হুংকারের মত পিলে চমকানো আওয়াজ করে বোমা ফাটবে। তারপর আর তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজন নেই। পলকের মধ্যে রাস্তাঘাট ফাঁকা। মানুষজন সব কর্পূরের মত হাওয়া। যেন এইমাত্র বিনা নোটিশে তড়বড়িয়ে বিষ্টি এল। মাথা বাঁচাতে যে যেখানে হোক আশ্রয় নিয়েছে।

সামনের রাজপথটা নো ম্যানস ল্যাণ্ডের মত।...

দুই পাশে দুই রাস্তা। এপারটা হেমুদার এলাকা। হেমু অর্থাৎ হেমচন্দ্র দত্ত। এ তল্লাটে তাকে সবাই চেনে। ডাকসাইটে ব্যক্তি। চেলাচামুণ্ডা অগুণতি না হলেও সংখ্যায় অনেক। এখন যাকে বলে পিলীর বা স্তম্ভ গোছের মানুষ। কেষ্টবিষ্টু লোক। অথচ এককালে কে চিনত হেমু দত্তকে? শুধু ট্রেড ইউনিয়নের কাজ। কারখানায় গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করত হেমু দত্ত। তখন জীবনের অনেকগুলি দিন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কেটেছে।

রাস্তায় ওপারটা বরদা সর্বকারের দখলে। এককালে বরদা অবশ্য হেমু দত্তের দলে ছিল। শুধু দলে নয়,—ট্রেড ইউনিয়নের কাজে হেমুরই কাছেই তার হাতেখড়ি। তারপর যা হয় তাই। চিন্তাধারা কি চিরকাল একখাতে বয়? নদীর স্রোত যেমন শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি করে, বরদার নিজস্ব মত ভাবনা তেমনি ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করল। তখন ধীরা পড়ল হেমু দত্তের সঙ্গে তার পদে পদে অমিল। প্রথমে মতান্তর —পরে মনান্তর। হেমচন্দ্রের দল ছেড়ে বরদা নতুন দল গড়ল।

দুই দলে ধুন্ধুমার ঝগড়া। তাই বলে মারামারি করতে হেমু দত্ত স্বয়ং যায় না। আর রাজা-রাজড়ারা কি নিজে লড়াই করে?

তারা শুধু দাবার ঘুঁটির মত সৈন্য সাজায়। পিছন থেকে নির্দেশ দেয়। আর হেমু দত্তের কত কাজ। এত বড় একটা পার্টির সে প্রায় একজন কর্ণধার, তার নিজের এলাকাটিও কিছু ছোট নয়। কত সাঙ্গোপাঙ্গ অনুচর। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। তাদের সমস্যা, অভিযোগ সবই আছে। তাছাড়া ঈশান কোণের মেঘের মত বরদা সরকারের দলবল দিন দিন বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত তার দলের লোকেরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে। তবু বিশ্বাস নেই। তলে তলে বরদা হয়তো শক্তি বাড়িয়ে নিচ্ছে। হঠাৎ একদিন রাস্তা পেরিয়ে এপারে হামলা করবে। হেমু দত্তের এলাকার ওপর ওদের শোন দৃষ্টি। তাকে এখান থেকে হটাতে পারলেই একশ মজা। বরদা সরকারের তখন পোয়া-বারো। এতবড় একটা এলাকার সর্বেসর্বা—প্রায় মুকুটহীন নৃপতি হয়ে বসবে।

ভরভর্তি দুপুরবেলা। ভূত প্রেতের তখন ঢেলা মারবার কথা। কিন্তু ঢেলা নয়—রাস্তার উপর বিকট শব্দে বোমা ফাটতে শুরু করল। এপারে হেমু দত্তের দল। ওপারে বরদার সাঙ্গোপাঙ্গরা। নতুন কিছু নয়। এমন শক্তি পরীক্ষা হামেশাই হচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে রাস্তাঘাট ফাঁকা। দুপুরে এদিককার দোকানপাট সাধারণত বন্ধ থাকে। তবু যে কয়েকটা খোলা ছিল, সেগুলি ঝপাঝপ বন্ধ হল। পূর্বদিক থেকে একটা বাস, দু-তিনটে ট্যাকসি এবং কয়েকটা রিকশ আসছিল। বেগতিক বুঝে তারা দুশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে গেল। এদিকে আর এগিয়ে এল না।

উল্টোদিক থেকে পুলিশের একটা কালো গাড়ি এসে থামতেই দুই পক্ষ রণে ভঙ্গ দিল। পুলিশ মানে সি. আর পি। অন্তত জনকুড়ি রাইফেলধারী। মধ্যযুগীয় হাবসী খোজার মত ভাবলেশহীন মুখ। এখন বোমা হাতে সামনে দাঁড়ানোর নিশ্চিত পরিণতি মৃত্যু। নিপুণ শিকারীর মত অব্যর্থ ওদের টিপ। ট্রিগারে হাত রাখলেই মরণ অনিবার্য।

ছুটতে ছুটতে অনেকদূর এসে ওরা থামল। সমীর, হাবুল আর হাতকাটা পচা। তিনজনে হেমু দত্তের দলের লোক। বয়স কারো বেশী নয়। সমীর আর হাবুল দুজনে তরুণ। সতেরো কিম্বা আঠারোর মত। পচা ওদের চেয়ে কিছু বড়। বয়স দু-তিন বছর বেশী হতে পারে। চমৎকার স্বাস্থ্য। কিন্তু বেচারী! বাঁ হাতটার অনেকখানি নেই। বছর দুই আগে বোমা তৈরি করতে গিয়ে আচমকা দুর্ঘটনা। পচার হাতের মুঠোর মধ্যে বোমা সশব্দে ফেটে গিয়েছিল। তারপর হাসপাতাল, থানা-পুলিশ। এক বিশ্রী কেলেঙ্কারী। অনেক তদ্বির-তদারক কাঠ-খড় পুড়িয়ে হেমু দত্ত তাকে খালাস করে আনল। মাস দেড় পরে পচা যখন পাড়ায় ফিরে এল, তখন তার দেড়খানা হাত। বাঁ হাতের প্রায় অর্ধেকটা হাসপাতালে কেটে বাদ দিয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পচা বলল,—থাম শালারা। আর দৌড়তে হবে না। তোর সি আর পিদের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। তাড়া করে এতদূর আসবে?'

তবু সমীর আর হাবুল একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে নিশ্চিত হতে চাইল। পুলিশকে আর সাপকে বিশ্বাস নেই। কখন ছোবল মারবে কে বলতে পারে? আর ওই কালো গাড়িগুলো এমন নিঃশব্দে চলে। দূর থেকে আওয়াজ পর্যন্ত বোঝা যায় না। হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে যমদূত দেখার মত চমকে উঠতে হয়।

মাথার উপর ধোয়ামোছা পরিষ্কার নীল আকাশ। জানুয়ারী মাসের প্রথম পক্ষ ফুরোতে চলল। এ বছর শীত প্রায় নেই। নইলে দুপুরের রোদ্দুর আরো মিষ্টি লাগত। বাঁদিকে একটা পুকুর। মখমলের মত নরম ঘাস। পিঠোপিটি ভাইবোনের মত দুটো নারিকেল গাছ অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছায়া বিছিয়েছে।

পরিষ্কার একটা ঠাঁই দেখে পচা বসল। তার দেখাদেখি হাবুল এবং সমীরও। ঘাসের একটা শীষ অনায়াসে ছিঁড়ে নিয়ে পচা দাঁতের উপর চেপে ধরল। উল্টোদিকে পুকুর-ঘাটে একটি অল্প বয়সী মেয়ে স্নান করছিল। সে একবার পানকৌড়ির মত ডুবল, আবার ভেসে উঠল। খানিকটা দূর থেকে হলেও পচা জুলজুল চোখে ওর সিক্ত বসন এবং সুঠাম শরীরের উপর কিছুক্ষণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

বেশ জায়গা। মাথার উপর নরম ছায়া। পুকুরের বুক থেকে ঠাণ্ডা, ফুরফুরে বাতাস গায়ে এসে লাগছে। রিকশতে চড়ে একটা বুড়ো মতন লোক যেতে যেতে তাদের দিকে বারবার আড়চোখে তাকাল।

হাবুল বলল—'ওদের দলে আজ অনেক-গুলো নতুন ছেলে দেখলাম।'

—'শালারা আমদানী করেছে।' পচা হিংস্র পশুর মত দাঁত কিড়মিড় করে প্রতি-হিংসার ভঙ্গি করল।

সমীর শুধোল,—'বিকেল বেলায় হেমুদা আসবে নাকি? দরকার হলে আমাদের নতুন ছেলে আনতে হবে। নইলে ওদের সঙ্গে লড়ব কেমন করে? শেষ পর্যন্ত ওরা যদি দলে ভারী হয়ে যায়...'

হাবুল নরম ঘাসের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ে বলল,—'অ্যাই শালা, তোর বন্ধু ক্ষিতীশকে দেখলি? ক্ষেপুর দোকানটার আড়ালে দাঁড়িয়ে কেমন দমাদম বোমা ঝাড়ছিল।'

—'দেখেছি।' সমীর মুখ গম্ভীর করে জবাব দিল।

হাবুল মুচকি হাসল। বলল,—'এককালে ক্ষিতীশ তোর প্রাণের বন্ধু ছিল রে, তখন ওদের বাড়িতে ঘন ঘন যেতিস। সে এখন তোর দিকেই বোমা ছুঁড়ছে?'

হাবুলের ঠোঁটে বাঁকা হাসি। কণ্ঠস্বরে গোপন অর্থ, প্রচ্ছন্ন কৌতুক। সে কী বলতে চায়, সমীর বুঝতে পারল। তার লক্ষ্য ক্ষিতীশের ছোট বোন সুরমা। মেয়েটা এবার ক্লাস টেন এ উঠেছে। বৌবাজারে একটা স্কুলে পড়ে। এই কয়েক মাস আগেও ক্ষিতীশদের বাড়িতে সে প্রায় যেত। তখন সুরমা তাকে চা এনে দিত। মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসত। শেয়ালদ-র কাছে কিম্বা বাসস্টপে দেখা হলে দু-পাঁচ মিনিট কথা বলত।

ব্যাপারটা আন্দাজ করে পচা ধমক দিল—'অ্যাই, ফালতু দিল্লাগী করছিস কেন? ক্ষিতীশ সেন এখন বরদা সরকারের লোক। ও শালা বোমা মারবে, না তোদের দিকে রস-গোল্লা ছুঁড়ে দেবে?'

হাবুল শেয়ালের মত ধূর্ত চোখে তাকাল। বলল—'দেখিস, ভুল করে আবার বন্ধুর বাড়ির দিকে পা বাড়াস নে। তোকে একলা পেলে স্রেফ হিসহিস। সে পকেট থেকে একটা ইঞ্চি চারেক ছুরি বের করে নিজের গলার উপর বসিয়ে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করল।

বেলা একটার মত। সূর্য মাথার উপরে। খিদের জ্বালায় সমীর আর বসতে পারছিল না। পেটের ভিতরটা গনগনে কয়লার মত উত্তাপ ছড়াচ্ছে। বয়সের ছেলে। খিদে যখন পায়, তখন আর সহ্য হয় না। সেই কখন সকালবেলায় একটুকরো পাউরুটি আর চা খেয়ে বেরিয়েছে। তারপর দু-তিন কাপ চা গিলেছে শুধু। এখন দানাপানির জন্য পেটটা মাঝে মাঝে গুলিয়ে উঠছে।

গাছের ছায়া ছেড়ে সমীর রোদে এসে দাঁড়াল। পচা বলল—'চল, আমিও যাব। রুরোটার পর মেসে আর খাওয়া যায় না। হাঁড়ির ভাত কড়কড়ে ঠাণ্ডা। ঠিক আসেদ্ধ চাল। ঠাকুর হতচ্ছাড়া থালায় করে তাই ধরে দেয়।'

পচা ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর কাজ জানে। একটা দোকানে কাজকর্ম করত। বাঁ হাতটা অকেজো হবার পর থেকে ইলেকট্রিকের কাজ তেমন ভালো পারে না। এখন হেমুদা ওর খরচপত্র চালায়। পার্টির জন্য বোমা বানাতে গিয়ে বেচারীর বাঁ হাতখানা গেছে। সুতরাং ওর দায়িত্ব আমাদের। হেমুদা প্রায় সে-কথা সগর্বে ঘোষণা করে।

কপালে একটা ইঞ্চি দুই কাটা দাগ। কবে হাতাহাতি, মারামারি করতে গিয়ে কপাল ফেটেছিল। সেই স্মৃতিচিহ্ন আজও বহন করছে। গত বছর হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় পাশ করেছে সমীর। কানঘেঁষা হলেও সেকেন্ড ডিভিসন। মোটামুটি নম্বর। ইচ্ছে ছিল কলেজে পড়ে। কিন্তু পয়সা কোথায়? তার বাবা বড়বাজারে এক মাড়োয়ারীর দোকানে সামান্য কাজ করে। অল্প মাইনে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। অথচ বাড়িতে চার-পাঁচটা মুখ। তার পরেই একটা বোন। মোটে দেড় বছরের ছোট। বেশ লম্বা, বাড়ন্ত গড়ন। মাঝে মাঝে মা ওর বিয়ের কথা বলে। তার বাবা, দাদা সমীর বাড়ির সবাই চুপ করে শোনে। ব্যাপারটা ধীরে ধীরে সে বুঝতে শিখেছে। মা যখন এসব কথা বলে, মনের ইচ্ছেগুলি ডালপালার মত চারপাশে ছড়িয়ে দেয়, তখন বাধা দিতে নেই। একটু ক্লান্ত হলে মা নিজের মনে বকবক করবে। তারপর দম ফুরিয়ে-যাওয়া খেলনার মত নিজেই ক্ষান্ত হবে। তখন মায়ের সব ইচ্ছেগুলো ফুঁ দিয়ে ওড়ানো ছাইয়ের মত কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসে ফের কোথায় মিলিয়ে যায়।

সে কলেজে পড়তে চায়, শুনে তার

বাবা বরং বিরক্ত। 'কী হবে পড়ে? আজকাল বি-এ, এম-এ পাশ করে তো সব বেকার। তাছাড়া আমার ক্ষমতার কথা জানিস নিশ্চয়? নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছে। শেষদিকে বাবার গলা নরম শোনাল।

সমীর চুপ। কয়েক মুহূর্ত পরে জিজ্ঞাসা করল,—তাহলে কি করব এখন? পাশ করে স্রেফ বসে থাকব?'

—'না, না। তা কেন?' তার বাবা বোঝাতে চেষ্টা করল।। 'তুই কিছু শেখ! এই ধর মোটর ড্রাইভিং মানে গাড়ি চালানো শিখতে পারিস। আজকাল একটা কেরানীর চেয়ে মোটর ড্রাইভার অনেক বেশী কামায়। আমাদের বাবুর যে গাড়ি চালায়, সে মাস গেলে কড়কড়ে তিনশ' টাকা ঘরে নিয়ে যাচ্ছে।'

তবু মোটর ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হওয়া গেল না। সেই এক সমস্যা। সেখানেও তিন মাসের টাকা একসঙ্গে গুণে দিতে হয়। তাছাড়া আরো খরচপত্র আছে। কিন্তু তার বাবা নিতান্ত অক্ষম। সুতরাং কি করবার আছে? পাশ করে তাকে স্রেফ বসে থাকতে হয়।

অবশ্য ঠিক বসে থাকতে হল না। হেমুদা তাকে ডেকে নিল। বলল,—ঘরে বসে থাকলে মন-মর্জি নষ্ট। শরীর খারাপ হবে। তার চেয়ে আয় আমাদের সঙ্গে কাজ কর। দেখবি দু-দিনেই মন-মেজাজ কেমন চাঙ্গা হয়ে গেছে।'

তারপর হেমুদা তাকে অনেকক্ষণ বোঝাল। এই পৃথিবীর কথা। দুঃখ, দারিদ্র্য। যুগের যন্ত্রণা। অবক্ষয়। চারিদিকে শোষণ। সমস্ত দেশটা দিন দিন অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। সমীর একা নয়। তার মত হাজার হাজার ছেলে পরীক্ষায় পাশ করে চুপচাপ বসে। তাদের পড়বার সঙ্গতি নেই। আর যদি সঙ্গতি থাকে তাহলে স্কুল-কলেজে ঠাঁই হয় না। চারদিক থেকে নিরন্ধ্র অন্ধকার ঘিরে ধরছে। একটা কানা-গলির মধ্যে সবাই হাঁটছে। কিন্তু বেরোতে পারছে না। তবু এর থেকে বেরোবার পথ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তার জন্য চাই প্রস্তুতি এবং সংগঠন। আর সেই সংগঠনকে জোরদার করতে প্রয়োজন সমীরের মত তরতাজা ছেলেদের। তারাই হবে আগামী দিনের নতুন পৃথিবীর রূপকার।

সমীর একা নয়। এই পাড়ার হাবুল ভোম্বল নরেন সুকু কেষ্ট আরো কত ছেলে হেমুদার ডাকে সাড়া দিয়েছে। কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে হেমুদা। প্রত্যেকটি শব্দ যেন বুকের মধ্যে গিয়ে ধাক্কা মারে। মগজের ভিতর কথাগুলো ঘুরপাক খায়। তারপর কখন এক সময় সে আবিষ্কার করল হেমুদার চিন্তার ধরন ভাব-ভাবা সব তার মনের মধ্যে সেঁটে গিয়েছে। ঠিক জল-ছবির মত,—এখন আর কিছুতেই মুছবে না।

তারপর থেকে সমীর হেমুদার দলে। ধীরে ধীরে অনেক ছেলের সঙ্গে মিশে বোমা তৈরি পাইপগান নিয়ে ঘোরা সব শিখল। এখন ভয়ডর নেই। নিশ্চিন্তে বোমা প্রথম যেদিন বোমা হাতে নিল, সেদিন কিরকম অবস্থা। বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করে কাঁপছিল। নার্ভাস লাগছিল নিজেকে। সেসব কথা ভাবলে এখন সমীরের হাসি পায়।

বাড়িতে ঢুকতেই মা চিৎকার করে উঠল। 'এতক্ষণে ফেরা হল কুরুক্ষেত্তর যুদ্ধ

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন
লীলা মজুমদার

শেষ করে?' ফের বাঁ হাতের করতল কপালে ঠুকে সখেদে বলল,—'হ্যাঁরে খুনোখুনী করতে যাবার আগে আমাকে খুন করে যেতে পারিস না?'

সমীর মাথা নীচু করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। মায়ের এসব কথার উত্তর দিতে নেই। আসলে গণ্ডগোলের পর সে ঘরে ফিরলেই মা এমনি চেঁচামেচি করে। সংসারের হাঁ-করা অভাব-অনটন বেকার-বাউণ্ডুলে ছেলের জন্য আষাঢ়ে মেঘের মত এক বোঝা দুশ্চিন্তা, অক্ষম স্বামীর প্রতি বক্র কটূক্তি এবং সব শেষে এক কলসী নোংরা জলের মত জীবনের প্রতি গভীর ধিক্কার ছুঁড়ে মারে। বাথরুমে রং-চটা তেলের টিনে তৈরি একটা সস্তা মগ আছে। সমীর সেটা চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে মাথায় জল ঢালে। আর ভাবে, সত্যি সে যদি একটা কাজ পেত।.....এই কলকাতা থেকে অনেক দূরে। যেখানে হেমুদা, পচা হাবুল তার সঙ্গীসাথীরা কেউ নেই। মাসের শেষে মাইনে পেয়ে সে তার মাকে টাকা পাঠায়। গভীর রাত্তিরে চিঠি লেখে,—শত কোটি প্রণাম পরে মা.....।

কয়েকদিন পর। শিয়ালদহ বাসস্টপে আচমকা সুরমার সঙ্গে দেখা। মায়ের জন্য কী একটা ওষুধ কিনতে এসেছিল সমীর। ছোট একটা দোকানে পাওয়া গেল না। তাই সে বৌবাজারের একটা বড় দোকানের দিকে হাঁটছিল। বাসস্টপে সুরমাকে দেখে সে ভ্রু কোঁচকাল। ক্ষিতীশের সঙ্গে তার যা সম্পর্ক এখন। সুরমা কি মুখ তুলে তাকাবে?

কিন্তু আশ্চর্য! তাকে দেখে সুরমা নিজেই এগিয়ে এল। বলল,—'সমীরদা শোনো।'

অবনীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড ১৪-০০ ২য় খণ্ড ২২-৫০

গ্রাহকেরা যথাক্রমে ১২-০০ ও ১৮-০০ টাকায় পাবেন। ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বরযাত্রী ও বাসর দাম ঃ ১০.০০ — **আরোগ্য নিকেতন** দাম ঃ ১৫.০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর — বিমল মিত্রের

জাগরী দাম ঃ ৭.০০ — **দিগ্‌ভ্রান্ত** দাম ঃ ১০.০০ — **কথা চরিত মানস** দাম ঃ ৬.০০

Languages and Literatures of Modern India 20/-

বৈদেশিকী ৫.৫০ ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাংলা গল্প বিচিত্রা ৫.০০ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন ১২-০০ ॥ বিমলকৃষ্ণ সরকার
আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা ১৫-০০ ॥ ডাঃ বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়
কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় ৬.০০ ॥ অমল মিত্র

চাণক্য সেনের

রাজপথ জনপথ ১০: — **সমুদ্র শিহর** ৮:

জরাসন্ধ-র — গোপাল হালদারের

লৌহকপাট ৩য় খণ্ড ৬.০০ — **উত্তরাধিকার** ২য় মুদ্রণ ১২.০০ — **ভাঙানী কূল** ৪.০০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের — বনফুলের — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

শ্রেষ্ঠ গল্প দাম ঃ ১২.০০ — **সন্ধিপূজা** দাম ঃ ৬.৫০ — **মন্দাক্রান্তা** দাম ঃ ৬.০০

প্রকাশ ভবন ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

সুরমাকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হল। ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করতে না পেরে সমীর শুধু জিজ্ঞাসা করল,—'কিছু বলবে?'

চারপাশে তাকিয়ে সুরমা মৃদুকণ্ঠে কথা কইল,—'তোমার সঙ্গে একটু দরকার আছে আমার। ওদিকে চল।'

রীকরো অতিক্রম করে সুরমা তাকে একটা পার্কে এনে হাজির করল। আশ্বিনের দিন। পার্কের কোণে একটা শিউলি গাছে এ বছর অজস্র কুঁড়ি। বৃষ্টির জলে ধোয়া আকাশ ফটফটে নীল। পেঁজা তুলোর মত এক টুকরো সাদা মেঘ কোন কুচবরণ রাজ-রাজকন্যার দেশে উড়ে যাচ্ছে।...বেলা প্রায় সাড়ে-দশটা হবে। রোদ্দুরের ঝাঁঝ আছে, কিন্তু তত তেজ নেই। হাঁটতে হাঁটতে তারা দুজনে একটা গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল।

—'জানো, কাল রাত দুপুরে আমাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছিল?' সুরমা বলল।

—'পুলিস?'

—'হ্যাঁ, দাদার খোঁজে।'

—'তারপর?'

'দাদাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেত। কিন্তু পায় নি।' সুরমা এক নিঃশ্বাসে কথা শেষ করল। তারপর মুখ নীচু করে বলল,—'সমীরদা, কাল সন্ধ্যের পর থেকে দাদা আর বাড়ি ফেরেনি।'

সমীর নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে কী যেন তলিয়ে চিন্তা করছিল।

সুরমা প্রায় কাঁদ-কাঁদ মুখে বলল,—'কাল রাত্তির থেকে মা উপোষ করে আছে। খায় নি, দায় নি। চিন্তায়-ভাবনায় আমরা দু'চোখের পাতা এক করতে পারি নি।'

সমীর জিজ্ঞাসা করল,—'এদিকে কোথায় এসেছিলে?'

—'পটলডাঙ্গায় আমার মেসোমশায়কে একটা খবর দিতে। লালবাজারে তার একজন জানাশুনো লোক আছে। তাকে ধরে যদি একটা সন্ধান মেলে। দাদাকে কি সত্যি ওরা অ্যারেস্ট করে জেলে পুরে রেখেছে?'

সমীর নির্বাক। কী উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না।

সুরমা ফের বলল—'দাদার দলের ছেলেরা কিন্তু তোমাদের সন্দেহ করছে?'

—'তার মানে?' সমীর প্রায় চমকে উঠল।

—'আমি বিশ্বাস করি না!' সুরমা দুর্বল কণ্ঠে জানাল। কিন্তু ক্ষেপু আর গজেন দুজনেই বলছিল। এ সম্ভবত তোমাদের দলের কাজ। দাদাকে কোথাও গায়েব করে লুকিয়ে রেখেছ। হয়তো তোমরা ওকে শেষ পর্যন্ত—'

—'না, অসম্ভব। এ মিথ্যে কথা—' সমীর তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

সুরমা ছলছল চোখে তাকাল। বলল—'মিথ্যে হলেই ভালো সমীরদা। কিন্তু অসম্ভব কেন বলছ? এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে। অথচ তোমরা এসব কি করছ? দু-দলে মারামারি, হানাহানি। অহি-নকুলের চেয়েও বিচ্ছিরি সম্পর্ক। এমনি করেই তোমরা গরীব মানুষের দুঃখের অবসান করবে?

সমীর চুপ করে রইল। হেমুদা,—অর্থাৎ হেমু দত্তের বক্তৃতার অংশগুলি সে মনের ভিতরে আতিপাঁতি করে খুঁজছিল। যদি সুরমার প্রশ্নের একটা জুৎসই জবাব মেলে? কিন্তু আশ্চর্য! দিনের আলোর মত স্পষ্ট সুরমার এই ছোট্ট জিজ্ঞাসার উত্তর সে বের করতে পারল না।

সমস্ত পার্কের মাঠে রোদ এখন আসর জাঁকিয়ে বসেছে। গতকাল রাতে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল। তাই এখানে সেখানে জল জমে আছে। সুরমা চলে যেতে সমীর একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে বসল। এখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না তার। হয়তো পচা, হাবুল, দু-তিনবার তার খোঁজ করে ফিরে গেছে। দূর ছাই! কী হবে ওদের সঙ্গে গিয়ে? একদল ছোট ছেলে একটা রবারের বল নিয়ে পার্কের এক কোণে খেলা শুরু করল। সমীরের মনে পড়ল, পাঁচ-ছ বছর আগে ক্ষিতীশ, পল্টু, অনিল, তপেন আরো অনেকের সঙ্গে মিশে সে অমনি বল খেলত। তখন ক্ষিতীশের সঙ্গে কী দারুণ বন্ধুত্ব ছিল তার। আর আজ? সে কথা ভেবে সমীর শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বাড়ি ফিরে অবেলায় সে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন চোখ খুলল, তখন সন্ধ্যে নামতে দেরি নেই. সমীর শুনতে পেল বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা খুশীর সুরে কী যেন সব কথা বলছে। বিছানা থেকে নামতেই সে তার বাবাকেও দেখতে পেল। মার হাতে একটা মাঝারি সাইজের ইলিশ। মাছটার কানকো, তারপর পেটের কাছটা টিপে টিপে পরীক্ষা করে বেশ প্রশংসার সুরে মা বলল,—'মোটে ছ-টাকা? খুব সস্তায় পেয়েছ গো?'

সমীর তার ছেলেবেলার কথা ভাবছিল! তখনও বাবা ইলিশ মাছ হাতে করে ঘরে ফিরত। হয়তো বর্ষাকাল। প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যা। সে খুশির আতিশয্যে সমস্ত ঘরময় লাফিয়ে বেড়াত। তার মা বলত,—'ছেলেটা পাগল। ইলিশ মাছের নামে ওর জিভ দিয়ে জল পড়ে।'

রাত আটটার সময় জানালায় মৃদু টোকা পড়ল। সঙ্কেত বুঝতে পেরে সমীর উৎকর্ণ হল। তারপর বিড়ালের মত নিঃশব্দে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। ও ঘরে বাবা বিছানায় শুয়ে। দাদা বোধহয় খবরের কাগজের পাতায় কর্মখালির বিজ্ঞাপন খুঁজছে। মা রান্নাঘরে। ভাজা ইলিশের আশ্চর্য সুঘ্রাণ এখন সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে। আর একটু পরে মা নিশ্চয় তাকে রান্নাঘরে ডাকত। ডিসে করে একটা ভাজা দিয়ে বলত,—'নে, মাছটা নরম কিনা বল দিকি?'

দরজা খুলে বেরোতেই হাবুল তাকে নিঃশব্দে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

সমীর ফিসফিস করে শুধোল,—'কোথায় যেতে হবে?'

—'রেললাইনের ওপারে। হেমুদা আমাদের সকলের জন্য অপেক্ষা করছে।

মুহূর্তে সমীরের হাতে শীতল অথচ কঠিন কী একটা বস্তু গুঁজে দিল হাবুল। বিষধর সাপের মত ঠান্ডা গা,—একটা অটোমেটিক রিভলবার। তারপর ঠিক প্রেতাত্মার মত তারা দুজনে অন্ধকারে হাঁটতে লাগল। নিঃশব্দ গতি। চারপাশে ঘুমন্ত ঘরবাড়ি। দূরে কোথায় একটা রেল ইঞ্জিন রাতজাগা পাখির মত ভয়ার্ত ধ্বনি দিয়ে উঠল। রেল লাইনের উঁচু খাড়াই অতিক্রম করে তারা এবার নীচে নামবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সশব্দে একটা বোমা ফাটল সমীরের কাছেই। হাবুল চিৎকার করে বলল,—'পালিয়ে যা সমীর। পুলারা আমাদের ঘিরে ফেলেছে।'

কিন্তু পালাবার আগেই কে একজন ঠিক যমদূতের মত তার সামনে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার হলেও মানুষটাকে চিনতে পারল সমীর। তার ছেলেবেলার বন্ধু,—ক্ষিতীশ। ওর পিছনে আরো দুজন রয়েছে।

কুৎসিৎ একটা মুখভঙ্গি করে ক্ষিতীশ দাঁত খিঁচিয়ে উঠল,—'পুলিসের কাছে আমার নামে কি লাগিয়েছিস? এখন কোথায় পালাবি বল?'

সমীর এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সুরমার ছলছলে দুটি চোখের কথা মনে পড়ল তার। ওরা তাকে সমস্ত কলকাতা শহরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখনই একবার ক্ষিতীশের নিশ্চয় বাড়ি যাওয়া দরকার। নইলে আজ রাত্তিরেও সুরমার মা হয়তো উপোসী রইবে।

কিন্তু আশ্চর্য! সমীরের ভিতর থেকে যেন অন্য মানুষ কথা কইল। প্রায় আহত বাঘের মত সে গর্জে উঠে বলল—'পুলিসে আমরা খবর দিতে যাই না। সে বরং তোদের কাজ।'

—'তাই নাকি?' ক্ষিতীশ হিংস্র শার্দুলের মত পা টিপে টিপে তার দিকে এগিয়ে এল। তার হাতে সাপের ফণার মত উদ্যত চকচকে ছোরা। সে অতর্কিতে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করতেই সমীর গুলি করল। প্রথমে একটা, তারপর আরো একটা। ক্ষিতীশ মাটির উপর লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে দেখবার আগেই সমীর পিঠের উপর একটা তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করে প্রচন্ড আর্তনাদে কেঁপে উঠল। এক অজ্ঞাত আততায়ীর ছুরি তার পিঠে আমূল গেঁথে গেছে।

এখন পৃথিবী শান্ত। স্তব্ধ রাত্রি। মাথার উপর গ্রহ-তারকা,.....নাম-না-জানা নক্ষত্রের দল। কটিবন্ধে তরবারি এঁটে কালপুরুষ জ্বলজ্বল করছে। আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছায়াপথ। দূরের ওই ফিকে লালচে রঙের জ্যোতিষ্কটা বোধহয় মঙ্গলগ্রহ। তার মা এতক্ষণ রান্না সেরে এঘর-ওঘর তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার বাবাকে বলছে,—'হ্যাঁগো, ছেলেটা কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তুমি জানতেও পারলে না?'

.....কবে কতদিন আগে ঈশ্বরের পুত্র এই পৃথিবীতে ক্রুশবিদ্ধ হন। এমনি নক্ষত্র-শোভিত অন্ধকার রাতে ছায়াপথ বেয়ে তিনি কোথায় যেন চলেছেন। দেখা পেয়ে তার ভক্তের দল প্রশ্ন করল—'কোয়া ভাডিস ডমিনি?' অর্থাৎ কোথায় চলেছ প্রভু?

ঈশ্বরের পুত্র উত্তর দিলেন,—'টু রোম।' তারপর এক অনির্বচনীয় স্নিগ্ধ হাসিতে তার মুখমন্ডল উদ্ভাসিত হল। অনুরণিত উদার কণ্ঠে তিনি সেই পরম সত্য উচ্চারণ করলেন,—'টু বি ক্রুশিফায়েড এগেন।'

পটভূমি

সুনীতিবাবু আর মোহন ধারিয়া এক নন!

এ সপ্তাহে দিল্লীর খবরের মাথায় মোহন ধারিয়ার নাম উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে জয়প্রকাশের নামকে ছাপিয়ে কোন কোন জায়গায় প্রাক্তন মন্ত্রীর কথা শোনা গেছে। প্রায় সবাই বলছেন তিনি পার্লামেন্টে বেশ সুরুচিসম্পন্ন বক্তব্য রেখেছেন। আজেবাজে কথা নেই। যে সকল যুক্তি তিনি তুলে ধরেছিলেন তা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। দিল্লীর মত কলকাতাতেও গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রাক্তন উপমন্ত্রী সুনীতি চট্টরাজের সংবাদ হচ্ছে গরম তাজা খবর। এ কথা সবাই জানে, সন্তোষ রায় ও সুনীতি চট্টরাজ ওয়াংচু কমিশনের রায় বেরুবার পর রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। সন্তোষবাবু কংগ্রেসের নেতা অর্থাৎ অরুণ মৈত্র, সিদ্ধার্থ রায় প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে চলেছেন। তাঁর এখন যত কাজ সবই প্রায় পর্দার অন্তরালে। তারই ফলে খবরের কাগজের পাতায় তিনি বেশী দেখা দিচ্ছেন না। দেবকান্ত বড়ুয়ার অনুমতি নিয়ে সন্তোষ বাবু রাজ্য বিধান সভার সদস্যপদ থেকেও পদত্যাগ করলেন। সিদ্ধার্থ বাবু, অরুণ বাবু তদ্বির করে এই অনুমতি সংগ্রহ করে দেন। কারণ উপ-নির্বাচনে এই প্রাক্তনমন্ত্রীকে কংগ্রেসের টিকিট দিতে হবে। অবশ্য কোন কোন মহলে এই নিয়ে গুঞ্জন উঠেছে। ওয়াংচু কমিশনের জন্য যিনি পদত্যাগ করলেন, তাঁকে কোন নীতিতে আবার টিকিট দেওয়া হবে? তবে এ যুক্তি ধোপে টিকবে না। কংগ্রেস টিকিট তিনি পাবেনই। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি তাঁর পক্ষে। ইতিমধ্যেই সন্তোষ বাবুকে একটা বিরাট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশনের বৈঠক দিল্লীতে সুরু হয়েছে। সন্তোষবাবু বেসরকারীভাবে কমিশনের সহযোগী সদস্যদের এই রাজ্যের কংগ্রেস দলের হয়ে ব্রীফ করছেন। তিনি এখন দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতেই আছেন। অর্থাৎ প্রাক্তন মন্ত্রীর স্ট্র্যাটেজি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, তিনি ধীরে চল নীতির ওপর ভিত্তি করে নিজের পুরনো সম্মান ফিরিয়ে আনার চেষ্টাকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য কোচবিহারে সংঘটিত সম্প্রতিকালের একটা ঘটনা হয়তো কংগ্রেসের অন্য মহলের উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা এখন সন্তোষ বাবুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। তবে প্রাক্তনমন্ত্রী কিন্তু দমেননি, কারণ তাঁর খুঁটির জোর আছে। তবে এখন কথা হচ্ছে: তিনি যদি উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসী টিকিট পান, তাহলে তিনি নির্বাচনী সভায় জনসাধারণকে কি বলবেন? তিনি যে কি বলবেন, তাও ঠিক হয়ে আছে। তিনি বলবেন, ওয়াংচু কমিশন তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলেও তাঁর পার্টি অর্থাৎ কংগ্রেস তা স্বীকার করে নেয়নি। তাই তাঁকে নির্বাচনে টিকিট দেওয়া হয়েছে। অতএব গণতন্ত্র রক্ষার জন্য তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, ভোটদাতারা তার জন্য সাধুবাদ জানিয়ে তাঁকে জয়মালা পরিয়ে দেবেন।

কিন্তু সুনীতি বাবুর ভাগ্যে অন্য ফল দেখা যাচ্ছে। অবশ্য তিনি এম এল এ পদ থেকে পদত্যাগ করেননি। তিনি বরং সিউড়ির মাটিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। সিদ্ধার্থবাবু সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকিওরমেন্ট-এর নামে ১৬ মার্চ তারিখে সিউড়ি যাচ্ছেন। সুনীতি বাবুর সত্যিই কপাল খারাপ বোধহয় তাঁকে বুদ্ধি দেবার কেউ নেই। পেছন থেকে কেউ কেউ তাঁকে উস্কানী দিয়ে থাকতে পারেন, তবে তিনি যখন বিপদে পড়েন, তখন দেখা যাচ্ছে কেউ এগিয়ে এসে তাঁকে রক্ষা করতে চাইছেন না। হয়তো তাঁরা বলবেন, সুনীতিবাবু রাজনীতির দিক থেকে বালক। যা হোক রাজ্য বিধানসভায় প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে ইঙ্গিত করে তিনি কত কথাই বললেন কাগজে তা ছাপাতে চেয়েছিল কিন্তু যেই রাজ্য কংগ্রেসী পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকা হলো, অমনি তিনি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাঁর ইমেজ কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, তা বোধহয় প্রাক্তন উপমন্ত্রী নিজেও বুঝতে পারলেন না। যদিও পরিষদ দলের নেতা অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার কথা বলেই এই জরুরী সভা ডেকেছিলেন। কিন্তু অধিবেশে তাঁর মনের কোনে ছিল সুনীতি বাবুকে পার্টি থেকে বহিষ্কার বা সাসপেন্ড করতে গেলে হয়তো পার্টির মধ্যে তাঁর বিরোধী ছড়িয়ে থাকা শক্তিগুলি জোট বাঁধতে পারে। তাই যে মাত্র সুনীতিবাবু ক্ষমা চাইলেন, তখনই সব ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু দিল্লীতে মোহন ধারিয়াকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হয়নি। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তাঁকে ক্ষমা চাইতে বা তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার কথা এখন পর্যন্ত বলতে পারেননি? এর কারণ কি? এর একটাই কারণ প্রথম কথা হচ্ছে মোহন ধারিয়া পশ্চিম বাংলার সুনীতিবাবুর চেয়ে রাজনীতি বেশী ভাল বোঝেন। দ্বিতীয় কারণ মোহন ধারিয়ার পেছনে ছোটবড় মিলিয়ে অনেক নেতা আছেন। তাঁরা এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করেননি। তবে বড় বাড়াবাড়ি কিছু হলে তাঁদের চীৎকার নিশ্চয় শোনা যাবে এবং এই চীৎকারের বেশ বড় একটা ধাক্কা থাকবে। প্রধানমন্ত্রীও বোধ হয় এটা বুঝতে পেরেছেন। তাই মন্ত্রিসভা থেকে তাঁকে বাদ দিয়ে তিনি চুপ হয়ে যেতে চাইছেন। পার্টি থেকে তাঁকে বহিষ্কারের কথা তাঁর মনে নেই। এর একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের যে বৈঠক ৬ তারিখে হবার কথা ছিল, তা জগজীবন রামের অনুপস্থিতির জন্য পেছিয়ে ১১ তারিখে ঠিক করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ধরে নেওয়া হচ্ছে, পার্টির মধ্যে উত্তেজনা অনেকটা কমে আসবে। পশ্চিম বাংলায় সিদ্ধার্থবাবুও সুনীতিবাবু সম্পর্কে প্রথমে ঐ দিল্লীর লাইনেই ভেবে ছিলেন। কিন্তু এখন দেখলেন, তা ভুল পার্টির বড়রা প্রকাশ্যে এক জোট হয়ে সুনীতিবাবুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাধা দিতেন না। তাঁর বড় কারণ হচ্ছে মোহন ধারিয়ার কিন্তু ওয়াংচু কমিশনের রিপোর্টে চাকুরী যায়নি। সুনীতিবাবুকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানানোর ব্যাপারে অসুবিধে আছে বলে অনেকেই ভয় পাচ্ছেন। যা হোক সিদ্ধার্থবাবু ভুল চিন্তা করে সুনীতি বাবুকে ক্ষমা করেছিলেন। তাই সেই ভুলের মাশুল দেবার জন্য তিনি এখন সিউড়ির চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে যাচ্ছেন।

কৌটিল্য

গত সংখ্যায় পটভূমির লেখকের নাম ভুলবশতঃ চাণক্যের জায়গায় কৌটিল্য ছাপা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

এই বাংলার খবর

শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশন নতুন যে বেতনক্রম (৭০০—১৬০০ টাকা) সুপারিশ করেছেন পশ্চিম বাংলা সরকার তা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বিধানসভায় এই কথা ঘোষণা করেন মার্চের ডিন তারিখে, অর্থাৎ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েক দিন পরে। এই বেতনক্রম চালু হবে আসছে এপ্রিল থেকে। তবে বিধানসভায় সিদ্ধার্থবাবুর ঘোষণা শিক্ষকদের কাছে কিছুটা অসন্তোষ মনে হয়। কারণ তিনি বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছেন যে, রাজ্য সরকার ইউ জি সি নির্ধারিত বেতনক্রম চালু করতে পারেন অথবা ইচ্ছে করলে ঐ বেতনক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোনো বেতনক্রমও প্রবর্তন করতে পারেন। শিক্ষক প্রতিনিধিরা তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি চান। পর দিন মুখ্যমন্ত্রী একটি চিঠিতে জানান যে, কলেজ শিক্ষকদের বেতনক্রম হবে ৭০০—১৬০০ টাকা। এই চিঠি পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও শিক্ষক সমিতি তাঁদের আন্দোলন আপাতত বন্ধ রেখেছেন।

নতুন বেতনক্রম চালু হবে অবশ্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক নির্দিষ্ট কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা '৭৪ সালের জানুয়ারী থেকে অন্তর্বর্তী অতিরিক্ত ভাতা পাচ্ছেন ৭৫ টাকা করে। '৭৩ সালের জানুয়ারী থেকে '৭৫ সালের মার্চ পর্যন্ত তাঁদের যে বাড়তি টাকা পাওনা হবে তা থেকে ঐ ভাতা বাবদ প্রদত্ত টাকা কেটে নেওয়া হবে। কেটে নেওয়ার পর যদি তাঁদের আরো কিছু পাওনা থাকে তবে তা মিটিয়ে দেওয়া হবে দুই কিস্তিতে। প্রথম কিস্তি মেটানো হবে '৭৬ সালের এপ্রিল নাগাদ। অধ্যক্ষদের বেতনক্রম হবে ১৫০০—২৫০০ টাকা। তবে এই বেতন শুধু তাঁরাই পাবেন যাঁরা '৭৩ সালের পয়লা জানুয়ারী পর্যন্ত অন্তত সাত বছর অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন। আর তাঁরা যে-সব কলেজের অধ্যক্ষ সেখানে '৭২-৭৩ সাল থেকে প্রতি বছর ছাত্রসংখ্যা কমপক্ষে ৭৫০ হওয়া চাই।

শুধু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকই নয়, রাজ্যের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের এবং বিভিন্ন শিক্ষায়তনের অ-শিক্ষক কর্মীদের নতুন বেতনক্রমও এপ্রিল থেকে চালু হবে। সেই বেতনক্রম কী হবে তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক মনোনয়ন ও নিয়োগের জন্যে একটি সার্ভিস কমিশন গঠন করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বেতনহার সংশোধনের জন্যে রাজ্যের বাড়তি খরচ হবে সাত কোটি টাকা। কলেজ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বাড়তি খরচের অধিকাংশ খরচই বইবেন কেন্দ্রীয় সরকার, তবু রাজ্য সরকারের খরচ হবে ৩৫ লাখ টাকা।

সরকারি কর্মীদের জন্য

যেদিন শিক্ষকদের বেতনহার সংশোধনের সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন সেদিন তিনি রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের বাড়তি মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করলেন। আসছে এপ্রিল থেকে তাঁরা প্রতি মাসে বাড়তি ভাতা পাবেন আট টাকা। তা ছাড়া এই বছর মে থেকে আসছে বছর জুন পর্যন্ত প্রত্যেক আগাম পাবেন মাসিক চার টাকা। সেই আগাম আবার পাঁচটি কিস্তিতে কেটে নেওয়া হবে। সেই কাটা শুরু হবে আসছে বছর জুন থেকে। সরকারি কর্মচারীদের জন্যে এর আগে বাড়তি মহার্ঘ ভাতা বরাদ্দ হয়েছিল '৭১ সালের অকটোবরে এবং ৭৪ সালের জানুয়ারী আর এপ্রিলে। ঐ মহার্ঘ ভাতা এখন মূল বেতনের অংশ বলে গণ্য হবে। তবে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা এই বাড়তি ভাতা পাবেন না, কারণ তাঁদের বেতনহার সংশোধিত হচ্ছে। সরকারি কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির জন্যে বাড়তি খরচ হবে বছরে সাত কোটি টাকা।

বর্ধিত ভাতার হার সরকারি কর্মীদের খুশি করতে পারে নি। কর্মীদের কয়েকটি সংস্থা এই সামান্য ভাতা বৃদ্ধির নিন্দা করেছেন। এই বাড়তি আট টাকার মধ্যে চার টাকা জমা পড়বে সরকারের কাছে আবশ্যিক জমা প্রকল্প অনুযায়ী। মহাকরণে এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য অফিসে এই সামান্য ভাতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং সরকারি কাজকর্ম একরকম বন্ধ হয়ে যায়। বিধানসভায়ও কয়েকজন সদস্য বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের কর্মীদের ভাতার হারে বৈষম্য বাঞ্ছনীয়। ভাতা বৃদ্ধির হারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুধু সাধারণ কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের অফিসারেরাও রীতিমতো অসন্তুষ্ট। তাঁরা স্থির করেছেন, তাঁরা এই বাড়তি ভাতা নেবেন না। তাঁদের দাবি কলেজ শিক্ষকদের সমান বেতনক্রম তাঁদের দিতে হবে।

পরীক্ষায় গণ্ডগোল

পরীক্ষা নিয়ে গণ্ডগোল এই বাংলায় মোটেই নতুন নয়, কিন্তু এবারের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা অনেককেই অবাক করেছে। এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দুই লাখ। এই বিরাট সংখ্যক পরীক্ষার্থী সামলাতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ রীতিমতো হিমসিম খেয়ে যান। প্রথমেই গণ্ডগোল দেখা দেয় এডমিট কার্ড নিয়ে। মার্চের পাঁচ তারিখে পরীক্ষা শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত সব পরীক্ষার্থী এডমিট কার্ড পান নি। তার ওপর শেষ মুহূর্তে পরীক্ষা কেন্দ্র বদলের ফলেও অনেক জায়গায় রীতিমতো বিভ্রান্তি দেখা দেয়, ছাত্রছাত্রীদের দৌড়োদৌড়ি করতে হয়। কয়েকটি কেন্দ্রে আবার প্রশ্নপত্র কম পড়ে যাওয়ায় দেখা দেয় অন্য ধরনের ঝামেলা। প্রথম দিনে কলকাতার যাদবপুর এলাকায় চারটি কেন্দ্রে পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায় কিছু লোকের বিক্ষোভের ফলে। হালিশহরেও একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা হতে পারে নি। অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে সি আর পি টহল দেয়। মেদিনীপুরে সব পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পরীক্ষার্থীদের নকল করতে সাহায্য করার অভিযোগে নদীয়ায় গ্রেপ্তার হয় ২৯ জন।

ইংরাজি পরীক্ষার দিন অশান্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল আসানসোল। রাণীগঞ্জের কয়েকটি কেন্দ্রের আসন আসানসোলে কয়েকটি কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়ার ফলেই গোলযোগের সূত্রপাত। এই গোলযোগের ফলে আটটি কেন্দ্রে পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়। জহরলাল জালান কেন্দ্রে পরীক্ষার্থিনীদের মারের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে পুলিশকে আট রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়। পরীক্ষার্থিনীরা পরীক্ষায় বসতে না পেরে একের পর এক কেন্দ্রে

হামলা চালায়। তাদের সাহায্য করে এক দল যুবক। ঐ দিন কলকাতাতেও একটি স্কুলে পরীক্ষার্থিনীরা এডমিট কার্ড না পেয়ে জোর করে বসতে গেলে গণ্ডগোল হয়। পুলিশের হাতে পরীক্ষার্থিনী লাঞ্ছিত হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঐ দিন উত্তর বাংলার রায়গঞ্জে একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে পুলিশকে গুলি চালাতে হয় বলে জানা গেছে। তবে এর ফলে কেউ আহত হয়নি। গ্রেপ্তারের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ।

বাজেট বিতর্ক

পশ্চিমবাংলা সরকারের ৭৫-৭৬ সালের বাজেট নিয়ে বিধানসভায় সাধারণ আলোচনার পালা শেষ হয়েছে। বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা তো বটেই, কংগ্রেসী সদস্যদের অনেকেও বাজেটের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন কাশীকান্ত মৈত্র। তিনি বলেন, এটি নিছকই চমক-লাগানো বাজেট। বাজেটে যে উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে তা আসলে উদ্বৃত্ত নয়। কংগ্রেসেরই তুহিন সামন্তের মন্তব্য : 'এই বাজেট আমাদের কাছে মোনালিসার হাসির মতো দুর্বোধ্য।' আর এস পি নেতা বেস্টারউইচের অভিযোগ, তপশীলী ও আদিবাসীদের জন্যে বাজেটে অনেক টাকাই বরাদ্দ হয়, কিন্তু এই টাকা তাদের উন্নতির জন্যে ঠিকমতো খরচ হয় না। বাজেট উদ্বৃত্ত দিয়ে ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরের অবস্থার উন্নতি করা হবে বলে অর্থমন্ত্রী যে প্রস্তাব করেছেন তা কতো দূর সম্ভব হবে সে-সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন কম্যুনিস্ট নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। সংগঠন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন অর্থমন্ত্রীকে বলেন, এই বাজেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এমন একটা কিছু তৈরি করুন যাতে পশ্চিমবাংলার মানুষ খেতে পায়, চাকরি পায়।

আলোচনার জবাব দিতে উঠে অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, পরিকল্পিত পথে রাজ্যের উন্নয়নের জন্যেই রাজ্য সরকার অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করছেন। উন্নয়নের এই কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে তিনি সব পক্ষের কাছে আবেদন জানান। তিনি বলেন, নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভার আমলে রাজ্যের সবক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে গোটা দেশে উন্নয়নের হার ছিল শতকরা তিন ভাগের সামান্য কিছু বেশি, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় ঐ হার ছিল শতকরা পাঁচ ভাগ।

মিসায় বন্দী কতো ?

এই বাংলায় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন বা মিসায় বন্দীর সংখ্যা কতো ? স্বরাষ্ট্র বিভাগের নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ মোতাহার হোসেনের হিসেব অনুযায়ী, এ বছর ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মিসায় আটক হয়েছেন ৫৩২ জন। এর মধ্যে ২৩৫ জনকে আটক করা হয়েছে চোরাকারবারি আর মজুতদারির অভিযোগে। ১৯৭৪ সালে এই আইনে গ্রেপ্তার করা হয় মোট প্রায় চার হাজার লোককে। '৭২ সালে এই আইন চালু হওয়ার পর গত বছরেই এই আইনবলে সবচেয়ে বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ চার হাজারের মধ্যে মজুতদারি আর কালোবাজারির অভিযোগ ছিল ৭০২ জনের বিরুদ্ধে।

কিন্তু রাজনৈতিক কারণে কাউকে মিসায় আটক করা হয়নি, ডঃ হোসেনের এই মন্তব্যে বিধানসভায় রীতিমতো প্রতিবাদ ওঠে। প্রতিবাদ করেন কংগ্রেস সদস্যরাও। পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি অন্তত এমন পৌনে দুশ লোকের কথা জানেন যাঁদের রাজনৈতিক কারণে মিসায় আটক করা হয়েছে। তিনি ডঃ হোসেনের মন্তব্যকে অসত্য আখ্যা দেন। কম্যুনিস্ট পার্টির বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, মিসায় কাদের আটক করা হয়েছে তা এই রাজ্যের মানুষ ভালোভাবেই জানে। যাদের আটক করা হয়েছে তাদের রাজনৈতিক মতামতও অজানা নয়। বৃটিশ আমলের মতো পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে কাউকে এইভাবে আটক করা অন্যায়।

দেবদত্ত

দেশ বিদেশে

জয়প্রকাশের অভিযান

সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গত ৬ মার্চ তারিখে নয়াদিল্লীতে যে গণ-অভিযান পরিচালিত হয়েছিল তার আকার ও প্রকার সম্পর্কে খুব স্বাভাবিক-ভাবেই নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন। ডেপুটি কমিশনারের মতে সংসদ অভিমুখে যে মিছিল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাতে যোগদানকারীদের সংখ্যা লাখখানেকের বেশি হবে না। অন্যদিকে জনসংঘের সংগঠন সম্পাদক নানাজী দেশমুখের হিসেবে এই সংখ্যা ১৫ লাখ।

এই গণ-অভিযানের আকার নিয়ে যেমন বিভিন্ন পক্ষ নিজের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মত প্রকাশ করেছেন, তেমনি এই অভিযানের প্রকৃত চরিত্রের বিশ্লেষণেও ভিন্ন ভিন্ন মহলের ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। জয়-প্রকাশ নিজে এই অভিযানকে আমাদের দেশের ইতিহাসের একটি নতুন গতিপথের সূচনা বলে অভিহিত করেছেন এবং এই অভিযানকে ঐতিহাসিক ডান্ডী অভিযানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন এই অভিযান স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের সেই নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল যে অধ্যায়ে জনতা তার আওয়াজ তুলবে।

অন্যদিকে পার্লামেন্টে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, এই অভিযান সংগঠন করার জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে বিদেশী সূত্র থেকে অর্থসাহায্য নেওয়া হয়েছে।

মতভেদ যাই থাকুক না, এই অভিযানের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করে উপায় নেই। তা হল এই যে অভিযানটিকে একটি জাতীয় অভিযান হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সচেতন প্রয়াস হয়েছিল। 'জাতীয়' অর্থে প্রথমত সর্বভারতীয়। দীর্ঘ প্রস্তুতি করে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে লোক জড় করে এই মিছিলে সামিল করা হয়েছিল। মিছিলে বিভিন্ন ভাষায় শ্লোগানও দেওয়া হয়েছিল।

'জাতীয়' অর্থে দ্বিতীয়ত দলনিরপেক্ষ। এই মিছিলে কোন দলীয় পতাকা ছিল না। কোন দলের নামে অথবা কোন দলীয় নেতার নামে জিগির দেওয়া হয় নি। জিন্দাবাদ ধ্বনি দেওয়া হয়েছে একমাত্র লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর নামে।

তৃতীয়ত সংসদ ভবনে এই মিছিল নিয়ে গিয়ে 'ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে' লোক-সভার স্পীকার ও রাজ্য সভার চেয়ারম্যানের কাছে যে দাবী সনদ পেশ করা হয়েছে সেটাও এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে দাবীগুলির ভিত্তিতে একটা ব্যাপকতম জাতীয় জনমত সংগঠিত করা যায়।

বিহারের চৌহদ্দি থেকে টেনে তুলে এসে জয়প্রকাশের আন্দোলনকে জাতীয় চেতনার দিগন্তে বিস্তৃত করে দেওয়ার এই প্রয়াস কতখানি সফল হয়েছে তা নিয়ে অবশ্য তর্ক উঠতে পারে। যেমন দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে মিছিলের লোক নিয়ে আসার চেষ্টা হলেও এই মিছিলে বিহার উত্তর প্রদেশ রাজস্থান ও হরিয়ানার মতো হিন্দী-ভাষীদের প্রাধান্য লক্ষণীয় ছিল। মিছিলের নির্দলীয় রূপটা যে ছিল তার নিতান্ত উপরকার চেহারা তার প্রমাণ ছিল এই মিছিলে জনসঙ্ঘ সংগঠন কংগ্রেস ভারতীয় লোকদল প্রভৃতি পার্টির নেতাদের উপস্থিতির মধ্যেই। এইসব দলের অনুগামীরাই বিশেষ করে জনসঙ্ঘের সমর্থকরাই যে মিছিলটিকে পুষ্ট করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। দিল্লিতে জনসঙ্ঘের বিংশতিতম জাতীয় সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত এই অভিযান সংগঠনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল জন-সঙ্ঘ। যদিও এস ইউ সি বা আর এস পি-র মত দুয়েকটি বামপন্থী দল তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে এই মিছিলে সামিল হয়েছিল তাহলেও বিশেষ করে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির অনুপস্থিতি দক্ষিণপন্থী দলগুলির উপর জয়প্রকাশের আন্দোলনের নির্ভর-শীলতা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে।

দিল্লির অভিযান থেকে তফাতে থাকার এই সিদ্ধান্ত সি পি এম শেষ মুহূর্তে গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্তের জন্য জয়প্রকাশ সি পি এমকে ভর্ৎসনা করেছেন। তাঁর ধারণা সি পি এম-এর ভিতরে একটি গোষ্ঠী চাপ দিয়ে দলকে দিয়ে এই সিদ্ধান্ত করিয়েছে এবং তিনি মনে করেন তাদের সিদ্ধান্ত সি পি এম-কে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

ইতিমধ্যে মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে মোহন ধারিয়ার অপসারণ প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ জগ-জীবন রাম ও ওয়াই বি চ্যবনকে দলের ভিতরে থেকে বিদ্রোহ করার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই আহ্বান দুদিক থেকে বুমেরাং হয়ে তাঁর উপরেই ফিরে এসেছে। প্রথমত জগজীবন ও চ্যবন দুজনেই এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতি শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন দ্বিতীয়ত সি পি আই কংগ্রেসকে দু টুকরো করতে চাইছে বলে এতদিন যে অভিযোগ করা হয়েছে সেই অভিযোগ এখন জয়প্রকাশের উপরই ফিরে আসছে।

*

নাগাল্যাণ্ডে পটবদল

নাগাল্যাণ্ডে মন্ত্রিসভার বদল হওয়ায় নয়াদিল্লি সম্ভবত খুশী হবে। ঐ রাজ্যে কংগ্রেস নেই। কিন্তু ওখানকার নাগা ন্যাশনালিষ্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক ভাল। ১৯৬৩ সালে নাগাল্যান্ড পৃথক রাজ্য হিসাবে মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে গত নির্বাচন পর্যন্ত নাগা ন্যাশনালিষ্ট অর্গানাইজেশনই সেখানে মন্ত্রিসভা চালিয়ে এসেছে। ঐ মন্ত্রিসভার সঙ্গে নয়াদিল্লির ভাল বোঝাপড়া ছিল। কিন্তু ১৯৭৪ সালের নির্বাচনে এন এন হেরে যায় এবং বিরোধী দল সংযুক্ত গণ-তান্ত্রিক ফ্রন্ট ক্ষমতা লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী হন ভিজোল। ভিজোল সরকারের সঙ্গে নয়াদিল্লির কিন্তু ঠিক সেই ধরনের বোঝা-পড়া গড়ে ওঠে নি। বিদ্রোহী নাগাদের সম্পর্কে কি মনোভাব অবলম্বন করা হবে তা নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে ভিজোল সরকারের মতভেদ হয়েছে। কেন্দ্র যখন এবিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছে রাজ্য সরকার তখন 'অপোষ মীমাংসার' কথা বলেছেন। সম্প্রতি চীন-অভিমুখী দুই দল বিদ্রোহী নাগা ধরা পড়ার পর নয়াদিল্লি ও কোহিমার দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈষম্য কিছুটা বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠেছিল।

বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারজন মন্ত্রীসহ মোট ১১জন সদস্য সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ছেড়ে যাওয়ায় বিধান সভায় ভিজোল সরকার সংখ্যালঘু হয়ে গেছেন। যাঁরা দলত্যাগ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিধান সভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারও আছেন।

এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে ভিজোল সরকার পদত্যাগ করেছেন। এরপর নাগা ন্যাশনালিষ্ট অর্গানাইজেশন ক্ষমতায় ফিরে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। দল ইতিমধ্যে জন বেকো লাসোকিকে নেতা নির্বাচিত করেছে। ১৯৭৪ সালের বিধান সভা নির্বাচনের আগে লাসোকি ছিলেন হোকিশে সেমার মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী।

*

ইন্দোচীনে শেষ প্রহর

কাম্বোডিয়ার রাজধানী নম পেন শহর এখন সরকার-বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতের মুঠোয়। যে কোন মুহূর্তে লন নল সর-কারের পতন ঘটতে পারে। অবরুদ্ধ শহরের উপান্তে দাঁড়িয়ে মুক্তি বাহিনী সরাসরি হামলা না চালিয়ে শুধু চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তারা শহরের অধিবাসীদের ক্রমাগত উস্কানি দিচ্ছিলেন নল সরকারকে উৎখাত করার জন্য। প্রেসিডেন্ট লন নলের একমাত্র ভরসা এখন মার্কিন বিমানে যোগান দেওয়া রসদ। কিন্তু এই রসদ পাঠানোও ক্রমশ দুরূহ হয়ে পড়ছে। কেননা নম পেনের বিমানঘাঁটি এখন মুক্তি বাহিনীর রকেটের পাল্লার মধ্যে। বিদেশী নাগরিকরা ইতিমধ্যে নম পেন ছাড়তে আরম্ভ করেছেন।

দূরে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সরকার এখন একটি মার্কিন-আশ্রিত সর-কারের শেষ প্রহর গণনা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কেননা তাঁদের হাত-পা বাঁধা। মার্কিন জন-মত আবার নতুন করে ইন্দোচীনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ভয়ানক বিরুদ্ধে।

পুণ্ডরীক

উপন্যাস

মনোজ বসু।

সেই সব মানুষ

পুজোর পর পরই রাখীবন্ধন। এগাঁয়েও তার ঢেউ এসে লেগেছে। ভবনাথ পুজোর পরে গ্রামে এসেছে। সে এসেই রাখী উপলক্ষে স্বদেশী দল করেছে। ফলে খোদ ভবনাথের ভিতর বাড়িতেই 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনি। সেই উপলক্ষে হাটখোলায় সভা পর্যন্ত হয়ে গেল। এই সময়টার গ্রামের লোকেদের মধ্যে ব্যস্ততা বাড়ে। কামারদের কাজ বেড়ে যায়। সামনে ধান কাটার মরশুম। তাই কাস্তে গড়ার তাড়া। তাছাড়া গাছ কাটা দা গড়ার কাজ তো আছেই।

পুজোর পর গ্রাম একটু নিস্তরঙ্গ হলেও একদিন আবার জমজমাট হয়। সহর থেকে বাকসকল এসে রকমারি ছবি দেখায়। আর তাই দেখার জন্যে গ্রামে হুড়োহুড়ি। এই সময় গ্রামে ঠাকুর মশায়েরও পদধূলি পড়ে। চার-পাঁচ মাস পরে আসা। ব্রাহ্মণ বিদায়ের তোলা খাজনা আদায় করতে আসেন তিনি।

ক্ষেতে ধান পাকতে লেগেছে। কাটাও শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্মীঠাকরুণ বিল ছেড়ে গৃহস্তের উঠানে গুটি গুটি আসন নিচ্ছেন। আঁটির গায়ে সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ। দেখতে দেখতে সব ধান পেকে গেল। তেপান্তরের বিলে সবুজের একটা গোছাও নেই কোন দিকে। চতুর্দিকে সোনা। যতদূর নজর চলে, দেখা যায় পাকা ধানের সোনা ঢেলে দিয়েছে যেন প্রকৃতি। সেই সঙ্গে হিমের আমেজ।

ভবনাথের উঠোনে ধান উঠে গেছে। তাই ছেলেদের বায়না নতুন চালের ফ্যানসা ভাত খাবে। কিন্তু পুজো না দিয়ে নবান্ন না করে খাবার নিয়ম নেই। একদিন তাই পুরুত ডেকে পুজো আচ্চাও হয়ে গেল।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বুড়ো হয়ে ভবনাথ শীতকাতুরে হয়ে পড়েছেন, অঘ্রাণেই লেপ নামাতে হয়েছে। কমল জেঠামশায়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে গুটি-সুটি হয়ে আছে। 'ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী—' ভবনাথ স্তব পড়ছেন। সে কি একটা দুটো—একের পর এক পড়ে যাচ্ছেন : 'প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্ আপদস্তস্য নশ্যন্তি—'। কমলের সব মুখস্থ, সুরে সুরে মিলিয়ে সে-ও পড়ে যায়। সব পড়ার পর কৃষ্ণের শতনাম দাতাকর্ণ গঙ্গাবন্দনাজএক একদিন এক এক রকম

সলের শেষে প্রশ্নোত্তর : মনু তোমার নাম কি?

শ্রীযুক্ত বাবু—

এই বুঝি! নিজের নামের সঙ্গে বাবু চলে না। শুধু 'শ্রী' বলতে হয়।

কমল সংশোধন করে বলল শ্রীকমললোচন ঘোষ।

ব্যস হয়ে গেল? বড্ড তুই ভুলে যাস মনু। নাম জিজ্ঞাসা করলে নিজের নামের সঙ্গে বাপের নামও বলতে হয়। শ্রীকমললোচন ঘোষ আমার ঠাকুর হলেন গে—

কমল পূরণ করে দিল : শ্রীযুক্তবাবু দেবনাথ ঘোষ।

বেশ হয়েছে। পিতামহের নাম কি বলো এবারে—

শ্রীযুক্ত বাবু—

উঁ হুঁ-হুঁ করে উঠলেন ভবনাথ : তিনি যে স্বর্গে গেছেন। শ্রীযুক্ত নয়, বলতে হবে ঈশ্বর। ঈশ্বর হরেশ্বর ঘোষ।

তারপর প্রপিতামহের নাম? বৃদ্ধ প্রপিতামহ? অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ? কোন গোত্র তোমাদের? আহা ঘোষ মাত্রেই সৌকালিন—এ নিয়ে ভাবাভাবির কিছু নেই। কোন সাঁই? কার সন্তান?

চলল একের পর এক।

পৈকিশালে পাড় পড়ছে ধাপর—ধুপর ধাপর—ধুপর। আওয়াজ পেয়ে উমাসুন্দরী চলে গেলেন সেখানে : সরো আমি একটু এলে দিই।

তরঙ্গিনীর ঘোর আপত্তি : না দিদি কখনো নয়। একবারের সেই আঙুলে ভেঙে আছে। একটুকু বড়ি কোটা—এলেই বা কি দেবার আছে? তুমি নিজের কাজে যাও।

দাঁড়াতেই দিল না ঢেঁকিশালে। এই এক কাণ্ডর বড় গিন্নি কাজ করতে এলে বাড়িসুদ্ধ আড় হয়ে পড়ে। বলে বয়স হয়েছে তার উপর বাতের দোষ। চিরকাল খেটেছ শুয়ে বসে আরাম করো এবার।

যেন শুয়ে থাকা এবং উঠে বসার মধ্যেই যত আরাম। কাজ না করে বড় গিন্নি থাকতে পারেন না। উঠানের উনুনে সকালের ফ্যানসাভাত রান্না হয়—সেই কাজটা তিনি নিয়ে নিয়েছেন। ঢেঁকিশাল তাড়া খেয়ে উমাসুন্দরী এইবার উনুন ধরানোর উদ্যোগে গেলেন।

পুবের কোঠায় এতক্ষণে প্রশ্নোত্তর সারা। ভবনাথ শ্যামাসংগীত ধরলেন : আমায় দাও মা তবিলদারি, আমি নিমকহারাম নই শংকরী। সুরজ্ঞান আছে ঊষাকালে খালি গলায় নেহাত মন্দ শোনায় না। গান ধরার মনেই নাকি তামাক সাজার হুকুম—মিনি সেইরকম জেনে বুঝে আছে। গায়ে আঁচল জড়িয়ে টেমি ধরিয়ে নিয়ে শীতে তুরতুর করতে করতে সে এলো।

ভবনাথ বলেন, উনুন ধরে নি?

ঘাড় নেড়ে নিমি বলে, ধরলে কি হবে? ধাঁশের চেলার আগুন কলকেয় তুললেই নিভে যায়। নুড়ি ধরিয়ে দিচ্ছি।

তামাক সাজল নারকেলের ছোবড়া পাকিয়ে গোল করে নুড়ি বানাল। টেমিতে নুড়ি ধরিয়ে কলকের ফুঁ দিতে দিতে হুঁকোর মাথায় বসিয়ে নিমি বাপের হাতে দিল। বিছানা ছেড়ে উঠলেন ভবনাথ। গায়ে বালাপোষ জড়িয়ে জলচৌকিতে উবু হয়ে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকো টানছেন।

পুঁটি মেয়েটা তরঙ্গিনীর বটে কিন্তু মায়ের চেয়ে জ্যেঠির সে বেশী ন্যাওটা। কমল হবার সময় তরঙ্গিনী আঁতুড়-ঘরে গেলেন, মেয়ের খাওয়া-শোওয়া আবদার-অভিমান সমস্ত সেই থেকে উমাসুন্দরীর কাছে। দরদালানে জ্যেঠির কাছে সে শোয়। কমলকে এসে ডাকছে : উঠে পড় কমল, রস নিয়ে আসিগে।

রবিবার আজ। প্রহ্লাদ মাস্টারমশায় বাড়ি চলে গেছে। পাঠশালার ঝামেলা নেই। বুঝেসুজেই পুঁটি এসেছে। ডুরে শাড়িটা পরে তৈরি সে। দোলাইখানা কমলের গায়ে ভাল করে জড়িয়ে ভাই-বোনে বেরিয়ে চলল।

সুমুখ উঠানে ধানের পালা, পা ফেলবার জায়গা নেই। পাছ-দুয়ারের আঘোকখানি জুড়ে লাউ-কুমড়ো ঝিঙেগে-বরবটির মাচা। নিচেটা পরিপাটি করে নিকানো, সিঁদুর-টুকু পড়লে তুলে নেওয়া যায়। বেশ দিব্যি খর-খর লাগে। মাচার বাইরে উনুন-আগুনের আঁচে গাছের যাতে ক্ষতি না হয়। বড়গিন্নি কড়াইতে ফ্যানসাভাত চাপিয়েছেন ভাত টগবগ করে ফুটছে। বড়ি কোটা সেরে অলকাবউ রান্নাঘরে গোবরমাটি দিতে লেগেছে। শীতের সকালে জল-কাদা ছেনে আঙুলের চামড়া ঠরসে গেছে, উনুনের ধারে এসে হাত সেঁকে যাচ্ছে এক একবার।

পুঁটি-কমলের দিকে বড়গিন্নি হাঁক দিয়ে বললেন তাড়াতাড়ি আসিস রে। দেরি হলে ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ইঙ্গিতে।

কাল্লু গাছি রসের ভাঁড় বাঁকে করে এনে বাইনশালায় নামাল।

রস দাও কালু চাচা—

কালু বলল জ্বর এয়েছিল—গন্ডা-চারেক মাত্র গাছ কেটেছিলাম কাল। কুলো এই ছ-ভাঁড় রস। পরশু তরশু এসো এক-দিন রস নিয়ে যেও।

অতএব অন্য বাড়ি যাচ্ছে। কালুর মা বুড়ি কুঁজো দেহটা কোমর থেকে ভেঙে মাটির প্রায় সমান্তরাল। অবিরত মাথা নাড়ে লাঠি ঠুকঠুক করে বেড়ায়। কোন দিক দিয়ে বুড়ি এসে সামনে পড়ল। মুখের সামনে লাঠি তুলে ধরে আবার মাটিতে ফেলে। খোনা খোনো গলায় বলে আল্লা শুধু-মুখে যাচ্ছ তোমরা? বানশালে এসে পড়েছ—নিদেন পেটে খেয়ে তো যাবে! বোসো আমার যাদুরা।

দু-খানা চাটকোল ফেলে দিল তাদের দিকে। দুটো খালি ভাঁড়ে কিছু রস ঢেলে পাটকাঠি হাতে দিয়ে বলল খাও। পাটকাঠির নলে চোঁ-চোঁ করে টানে ভাই-বোন। রস খেয়ে তবে ছুটি।

আর এক বাড়ি—কুঞ্জ ঢালির বাড়ি। বটকেরা করে কুঞ্জ বলে রস দেবানে তার জন্যে কি। দোলাইখানা একবার তোল দিকিনি খোকনবাবু। কী-পেড়ে ধুতি পরে এয়েছ দেখি।

বছর দুই আগে কমল বড্ড বেকুব হয়ে-ছিল এই কুঞ্জর কাছে—তা বলে আজ। এখন বড় হয়ে গেছে না। বলা মাত্রই সে দেমাকভরে দোলাই তুলে ধরল। সত্যিই ধুতি পরনে—পাক্কা পাঁচ হাত ফুলপেড়ে ধুতি। দোলাইয়ে যখন পা পর্যন্ত ঢাকা নিষ্প্রয়োজনে ধুতি পরার ঝামেলায় যেতে যাবে কেন? এই অভ্যাস কমলের ছিল এবং কুঞ্জ সেটা জানত। দোলাই তোলার কথা তাই বলেছিল সেবারে। শোনা মাত্র কমলের চোঁচা-দৌড় দোলাই চেপে ধরে। ধর্ ধর্ করে কয়েক পা পিছনে ছুটে কুঞ্জ ঢালি হাসিতে ফেটে পড়ে-ছিল। কিন্তু সেবারে যা হয়েছিল এখন তা কেন হতে যাবে। বড় হয়ে গেছে কমল এখন।

চোর চোর—কলরব উঠেছে নটো গুনীনের বাড়ি। একেবারে লাগোয়া বাড়ি—এ-উঠোন আর ঐ-উঠোন। চোর দেখতে পুঁটি-কমল ছুটেছে কুঞ্জও গেল। চোর ধরা পড়েছে—তা হাসাহাসি কিসের অত?

কনে চোর? কুঞ্জ ঢালি জিজ্ঞাসা করল।

রস জ্বাল-দেওয়া বাইনের পাশে দোচালা খোড়োঘর। হাসতে হাসতে নটো সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে চোর বেকায়দায় পড়ে গেছে পালাবার জো নেই।

পাড়ার আরও কজন এসেছে—চোর দেখে হেসে কুটি-কুটি। গাছ থেকে সন্ধ্যাবেলা ওলার রস পাড়ল রাত-দুপুর অবধি জ্বালিয়ে দুটো ভাঁড়ে ঢেলেছে আজকের হাটে গুড় দু-খানা বেচবে—গন্ধে গন্ধে পাগল হয়ে সিঁধ খুঁচে চোর ঘরে ঢুকে পড়েছে। সিঁধের কী বাহার দেখ—

দেখাচ্ছে নটো। কাচনির বেড়ার নিচে বাঁশের গবরাট। তারই ঠিক নিচে গর্ত খুঁড়েছে সিঁধকাঠি বিহনে নখ দিয়ে। এদিক-সেদিক নখের মেলা দাগ। ঘরে গিয়ে ভাঁড়ে মুখ ঢুকিয়ে গুড় খেতে গেছে ভাঁড় মুখে আটকেছে। মুখ বের করে আনতে পারে না দেখতেও পাচ্ছে না চোখে। এই এখনই দোর খুলে দুর্গতি দেখতে পেলাম চোরের—

ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে অন্যেরাও দেখছে—হরি হরি! চোর হল শিয়াল একটা।

ফ্যানসাভাত নামিয়ে থালায় থালায় ঢালা—বাঁচকেলা-ভাতে এক এক দলা তার উপর। ভাটিয়াল চালের মিষ্টি ভাত লোহার কড়াইয়ে রান্না হয়ে সবুজের আভা ধরেছে। ভাত তাতে আরও মিষ্টি হয়েছে যেন। শিশুবর ও অটলের ভাত মাচার নিচে কলা-পাতায় দেওয়া হয়েছে। অন্য সকলে উনুনের ধারে গোল হয়ে বসল— কালীময় নিমি এবং পশ্চিম পাড়ার বিধুর ছেলে-মেয়ে দুটো। বিধুর পিসি সম্পর্কীয় দৈবঠাকরুন—খুন-খুনে বুড়ি—রোজ সকালে একটাকে কাঁখে তুলে নিয়ে আসেন আর একটা তাঁর হাত ধরে পাশে পাশে আসে। দৈববুড়িও তাদের মাঝখানে বসেছেন, একবার এর গালে একবার ওর গালে ভাত তুলে তুলে দিচ্ছেন। কালীময় দেওর হলেও অলকা তার সামনে থাকে না, নিজের ভাত নিয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকেছে।

রসের ভাঁড় নিয়ে পুঁটি ও কমল দেখা দিল। তাদের থালা দুটো দেখিয়ে কালীময় বলল, বসে যা তোরা। এত দেরি করলি কেন?

পুঁটি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, রস না খেয়ে বসে গেছ যে তোমরা? বলে গেলাম, রস আনতে যাচ্ছি।

কালীময় বলে, ভাতের পর খাব। খালিপেটে পেট-কনকন করে।

বড় গিন্নি রান্নাঘরের দাওয়ায় কোরণ পেতে নারকেল কোরাচ্ছেন, উঠানের নিভন্ত উনুনে তরাঙ্গণী খোলা-হাঁড়িতে চিঁড়ে ভাজছেন।

দৈবঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন : সাত সকালে চিঁড়ে ভাজা কে খাবে?

বড়গিন্নি জবাব দিলেন : বিলে যাবেন উনি এখন। আল-ঠেলাঠেলি চলেছে—রাতারাতি আল সরিয়ে ধানশুদ্ধ জমি চুরি করে নিচ্ছে। তাই বললাম, বাসিমুখে যেও না—চাট্টি চিঁড়েভাজা মুখে দিয়ে যাও। বিলের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়লে কি হবে।

একটু থেমে বেজার মুখে আবার বলেন, কপাল—বুঝলে ঠাকুরঝি? সমর্থ ছেলেপুলে থেকেও জমাজমির ঝামেলায় কেউ মাথা দেবে না, বুড়ো মানুষকে জলকাদা ভেঙে খালে-বিলে ছুটোছুটি করতে হয়। উপায় কি—নয়তো মুখে যে ভাত উঠবে না!

তিন ভাইয়ের মধ্যে অন্য দু-জন বাড়ি ছাড়া। এখন কাকার সংগে থাকে। চণ্ডলা যেবারে মারা যায়, সে-ও বেরিয়ে পড়েছিল। এস্টেটের সদর কাছারিতে বুড়ো খাজাঞ্চির সহকারীরূপে দেবনাথ তাকে বসিয়ে দিয়েছেন। হিরুও নেই—নিষ্কর্মা ভাত মারবে ও নতুন বাড়ির আড্ডখানায় তাস পেটাবে—দেবনাথের কাছে অসহ্য হয়েছিল। ফরেস্টার অম্বুজ দাসের হেপাজতে হিরুকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন, ভদ্রলোক বনকরের চাকরিতে হিরুকে ঢুকিয়ে নেবেন, কথা দিয়েছেন। ছেলেদের মধ্যে কালীময়ই এখন একা রয়েছে। ঠেঁশটা অতএব তার উপর ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে বলে, জলকাদা ভাঙেন বুড়ো মানুষ নিজের দোষে। জমাজমি ওঁর প্রাণ—কাউকে ছুঁতে দেবেন না। আমি না থাকি, আর দু-ভাই পড়ে ছিল তো বাড়িতে, পড়ে পড়ে ভেরেণ্ডা ভাজত। তিতবিরক্ত হয়ে তারা বেরিয়েছে।

কালীময় যথারীতি শ্বশুরবাড়ি ফুলবেড়েয় ছিল। ভবনাথ সকালবেলা হন্যে যাবেন আল-ঠেলাঠেলির ব্যাপারে—শিশুবর হাটঘাট সেরে কাল রাত্রে খবরটা দিল।

শুনেই কালীময় চলে এসেছে। দৈব-ঠাকরুণকে সালিশ ধরে সেইসব বলছে : ভোর ভোর থাকতে রওনা হয়েছি। বাদ্যি, হাঙ্গামা না হোক, বচসা কথা-কথান্তরের ভয় আছে—বাবার একলা যাওয়া ঠিক হবে না। বাড়ির সব না উঠতেই এসে হাজির দিয়েছি। আর কী করতে পারি, বলো পিশি।

(ক্রমশঃ)

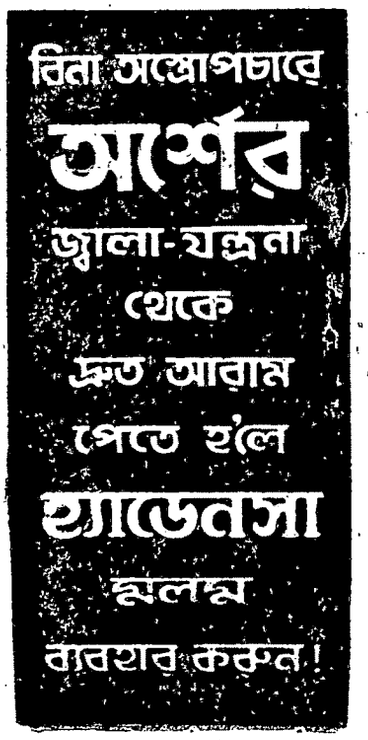

কবিতা

ভুল, স্থূল, ভুল

বিষ্ণু দে

দীর্ঘায়ু? তা বটে,
দীর্ঘায়ুর দুঃখও বিপুল।

অনাত্মীয় স্বার্থের চর্চায়
আমাদের সকলেরই কম-বেশী অনেক পাতক।
লক্ষ লক্ষ অপ্রাকৃত মৃত্যুর করচায়
বাঁচা-মরা লেখে একই ভুল।
সব কিছু সবারই খাতক—
দীর্ঘকাল ধ'রে তার পরম্পরা রটে, আর সর্বত্রই ঘটে।

মানুষ কি খ্যাতনামা সেই দুটি পাখী? যেন দুই জাতি
তাই মানো এই বিশ্ব বিস্তৃত ও বিখ্যাত পিপুল?

একা একা খায় আর অন্যকে ঠোকরায়, গান গায়
আর মারে স্বজাতিকে ধার-করা লাথি!
যেন শুধু তারাই স্নাতক আর দুনিয়া ইস্কুল!
আর বাকি সব শ্মশানের চাখানায় বেঞ্চি চৌকি টুল!

ধোঁয়ায় দূষিত শতাব্দীরা মরে, ঝরে, উড়ে যায়!
ইতিহাস কেন এই কলুষিত ভুল, স্থূল ভুল?

ফাদার দ্যতিয়েন রোজা নামচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোনো কোনো নাম আংটিতে খোদাই করে আগুলে রাখতে হয়; কোনো কোনো নাম আবার তাবিজ করে বাহুতে পরিধান করলে তবে ফল মেলে...। ফুঁকেরও প্রয়োজন আছেঃ ধরুন আস্সালামু নামটা তিন হাজার আঠার বার পাকা মিঠাইয়ের উপর ফুঁক দিয়ে শত্রুকে খাওয়ালে প্রাণের বৈরী হলেও সে শত্রুতা ভুলে দোস্ত হয়ে উঠবে...

আমাদের চারিদিকে এবার ভিড় জমেছেঃ আমার উপদেষ্টার বক্তব্য কেউ কেউ সমর্থন করে, কেউ কেউ সংশোধন করে, আল্লার নামমাহাত্ম্য বিষয়ে কারও মতান্তর কিংবা দ্বিধাবোধ নেই। একজন বলে, এই কুড়ি বছর সাদি করে তালাক দিয়ে নিকা করে এক গাদা বেটার জন্মদাতা হলেও সে যখন কোনো বেটীর বাপ হতে পারল না, প্রসিদ্ধ এক পীরের পরামর্শে সাত দিন ধরে মধ্যরাত্রে গাত্রোত্থান করে পঞ্চাশটিবার ঐ আল মাতিলু নামটা সে উচ্চারণ করল... ন মাস যেতে না যেতেই তার পুত্রবহুল সংসারকে অভিশাপ-মুক্ত করতে এল তিন সেরের আর সোয়া তিন সেরের দু-দুটি উত্তরাধিকারিণী—না, যমজ মেয়ে নয়, বড় বিবির আর মেজো বিবির গর্ভোপহার। ভাবতে কৌতূহল হয় চৌদ্দ দিন কিংবা একশবার নামটা উচ্চারণ করলে সেজো বিবির আর ছোট বিবির কি গতি হত।

...ঐশনামভক্ত ভিখারিয়া উঠেছে, জিকির থামিয়ে। ওদের কিছু দেব ভেবে ট্যাঁকে হাত গুঁজেই বুঝলাম, আমিও এবার ওদেরই মতন ফকির হয়েছি! সহৃদয় উপদেষ্টা অভয়মুদ্রা এঁকে নির্লিপ্ত সুরে বললেনঃ 'কোন বস্তু অপহৃত হলে 'অল হাকক্' নামটা উচ্চারণ করবেন, দুশটিবার আকাশের দিকে তাকিয়ে...'

বহু দেশভ্রমণে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে বলি, শুনুনঃ যে-মুলুকে আপনি ঘুরতে চান, পাসপোর্ট, ভিসা আর টুথব্রাশ ছাড়ও উদ্দিষ্ট গন্তব্যের দুয়েকজন বাসিন্দার নাম-ঠিকানা নিয়ে যেতে ভুলবেন না। বলতে গেলে ওরাই আপনার ভরসা। ওরাই—আর ওদের আত্মীয়বান্ধবেরা—আপনাকে ঘোরাবে খুব, খাওয়াবে খুব, আদর করবে অফুরান।

সত্যের খাতিরে স্বীকার করব, প্রতিটি দেশে টেকনিকটা সমানভাবে কার্যকরী নয়। এই ধরুন না বাংলাদেশে আমার ঐ সফরের কথা।

ঢাকায় পৌঁছেই দৌড়েছিলাম পয়লা নম্বর ঠিকানায়—বাংলা আকাডেমিতে; ভদ্রলোক বললেন 'ঘড়িটা দেখুন দুটো বাজতে দশ, অফিস বন্ধ হবেখন...আপনি বরং কালকে আসুন, দশটার সময়; আপনার ভার আমি নিলাম...!" ছুটেছিলাম, প্রতিশ্রুত এই সম্ভাবনার মধুর আস্বাদনে, দু নম্বর ঠিকানায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকার গৃহে; ভদ্রমহিলা বললেন, 'ঘড়িটা দেখুন, তিনটে বাজবেখন, মোহরাওয়ার্দির দশম মৃত্যু-বার্ষিকীতে আমাকে উপস্থিত হতে হবে... আপনি বরং কালকে আসুন, বারোটার সময়; আপনার ভার আমি নিলাম...বাড়ি ফিরে-ছিলাম, আগামীকালের মধ্যাহ্নভোজের বিরিয়ানির স্বপ্ন দেখে।

পরের দিন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় পৌঁছে শুনলাম, আকাডেমির আমার সেই মুমিন শুভাকাঙ্ক্ষী অফিসে আসেন নি... কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় পৌঁছে দেখলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার সেই মুমিন শুভা-কাঙ্ক্ষীনী গাড়ি হাঁকিয়ে কোথায় চলেছেন...

শেষ ঠিকানা চেক করে পা বাড়ালাম, মন্দীকৃত পদক্ষেপে, তেজগাঁও শহরতলিতে। গৃহের ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগও হল না। গৃহের ভিতর থেকেই খবর এলঃ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করতে ওরা অপারগঃ 'আমরা তো পুলিশের লোক...আর আমাদের বাসও ভালো নয়।' স্থির করলাম, কল-কাতায় ফিরে আমার ইনফর্মারদের আমি স্যাক করব।

আর তখনই আল্লাতালার এক ফেরেস্তা (ফেরেস্তা ছাড়া উনি আর কে হবেন, বলুন) আমার কানে এক আশ্চর্য বুদ্ধি দিলেন। 'এদেশের লোকদের সঙ্গে মিশতে চান? আমাদের হাসপাতালে আসুনঃ এখানে কত মুমিন রোগী আছে, নৈরাশ্যে দিন গোনে... ওরা তো আর পুলিশের লোক নয়, আর বাড়িটাও, দেখবেন, লজ্জা পাওয়ার মতো নয়।'

সেই বেহেস্তি সূত্রেই আলাপ হল হাসিনা বেগমের সঙ্গে। হাসিনা বেগম অসুস্থ নন, অন্তঃসত্ত্বা। দু-দুবার আক-স্মিক গর্ভপাতের পর, ডাক্তারের, ভাইজানের ভাবীর আর স্বামীর পরামর্শে তিনি নিজেকে—আর অজাত সন্তানটিকে—দু সপ্তাহের বিশ্রাম দিতে রাজি হয়েছেন। বাড়ির জন্য মন কেমন কেমন করছে।

হাসিনা মানে সুন্দরী (অতিরিক্ত বিজ্ঞা-পনটার প্রয়োজন ছিল নাঃ নামধারিণীর মুখশ্রী লাবণ্যে উপচীয়মান) আর বেগম—কিংবা খাতুন—শ্রীমতীর তুর্কী সংস্করণ।

হাসিনা বললেন, পরশুদিন ওরা আমাকে ছাড়বে; আমাদের বাড়িতে অবশ্যই আসবে, বাড়ির সবাই আপনাকে পেলে নিজেদের ধন্য বলে মনে করবে।' বাড়ি বলতে ভাড়ার বাড়িঃ ৭৭, নিউ সার্কুলার রোড, মগবাজার।

পরের দিনের পরের দিন ছুটি, অনেক আশা আর ক্যালেন্ডার-গোছের এক মানচিত্র নিয়ে, সাইকেল চড়ে বেরোলাম বাড়িটার খোঁজে।

মিথ্যা কথা বলব না, নিউ সার্কুলার রোডের পথচারীরা—আর মগবাজারের বাসি-ন্দারাও—সাহায্য দিতে কসুর করে নিঃ জানা গেল, ওদের অধ্যুষিত এলাকায় কম করে দেড় ডজন বেগম আছেন হাসিনা নামে যাঁরা দীক্ষিতা। কেউ আছেন বৃদ্ধা, কেউ আছেন অনূঢ়া একজন আছেন দৈনা-সাইজের বিপুলাঙ্গনা, একজন আছেন মন্ত্রী টাইপের কেউকেটা। সবার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ নয়, কারও আছে সর্দি, কারও আছে জ্বর, তবে না, এই গত দু সপ্তাহে হাসপাতালে কেউ যায় নি।

—আচ্ছা বলুন তো, ঐ পল্লীতে এই রাস্তাটা আছে?

—তা আছে।

—ঐ রাস্তাটায় এই নম্বরটা আছে?

—তাও আছে।

—ঐ পল্লীতে, ঐ রাস্তাটায় এই নম্বরটা আছে?

—নেই।

নিস্তব্ধতা... জুম্মা-নমাজ-সুলভ নিস্তব্ধতা...একেকজন যেন আপন আপন মস্তিষ্কের প্রতিটি প্রবাহ-কোষ মুচড়িয়ে নিচ্ছে মানসিক কসরতে। হঠাৎ অন্তর্জ্ঞান নিজেকেই বলতে শুনলাম ঃ এদিকে কাকে কিম্বা লুম্বিনী বলে কোনো জায়গা আছে? ...শ্রোতারা প্রশ্নটির শ্লেষ বুঝল না।

অনন্যোপায় হয়ে ফোন করলাম। ফোন ধরল হাসিনার ভাবীজি, রোকেয়া। অনেক অনেক অ্যাপলজি সহকারে রোকেয়া জানালেন, ননদের প্রদত্ত ঠিকানায় ছিল তিনটে ভুল ঃ নম্বরটা ৭৭ নয়, ৫৭; রাস্তাটা নিউ নয়, আউটার; পল্লীটা মগবাজার নয়, মালীবাগ...তবে হ্যাঁ, খোদাতালাকে অনেক শোকর (শোকর মানে ধন্যবাদ), ফোন-নম্বরে ভুল ছিল না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বুঝুক—আর বোঝাক—সুস্থমস্তিষ্ক একটা জীব কেমন করে নিজের ভাইজানের ঠিকানা লিখতে গিয়ে এত বিভ্রমে ভুগতে পারে।

শুভাকাঙ্খীদের সতর্কবাণী এখনও কানে বাজে ঃ ও-দেশে যাবেন? ...এমন সব লোকের সঙ্গে মিশবেন, বিদেশে যারা ঘুরেছে কিংবা অন্তত—মিশনারি স্কুলে পড়ে—বিদেশের ছোঁয়াচ যাদের গায়ে লেগে আছে, বাকি সব, দেখবেন, বার্লিন ওয়াল...'

হাসিনারা কেউই জীবনে কালো পানি পার হয় নি আর হাসিনারার ছোট বোনও কলম্বাসের এই কলিযুগে বোরখা পরেই পাঠশালায় যায়...কিন্তু বার্লিন ওয়াল কোথায়?

জর্মন সহজেই আর জমল চমৎকার—অকল্পনীয় আন্তরিকতায়। মেঝেতে দস্তরখান বিছিয়ে স্ত্রী-পুরুষ পাশাপাশি উপবেশন করে আস্বাদন করলাম মেঘনার ইলিশ, মাস-কলাই ডাল আর মোষের দুধের দই। এ কিন্তু আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

কলকাতার কত বাড়িতে, চিড়িয়াখানার আহার-রত সিংহের মতো একা বসে (কিংবা পুরুষ ও শিশুদের সঙ্গে বসে) আমাকে খেতে হয়েছে খোদ গিন্নীর (আর গিন্নীর কন্যাবাহিনীর) সহানুভূতিপূর্ণ পাহারায় ঃ 'হা, বেচারী সাহেব। এখনও কাঁটা বাছতে শেখে নি!' কিংবা হা, হা, বেচারী সাহেব! মাছের পরে—মেটে ভেবে—খোড় খাচ্ছে!...'মুমিন-ভোজে কিন্তু তত্ত্বাবধায়িকার কোনো স্থান নেই, আছে শুধু সহভোক্তার শান্ত্রে বলেঃ একসঙ্গে খাওয়াতে বরকত হয়;' ইসলাম যেমন সামাজিক ধর্ম', খানার মজলিসেও (ভোজসভা' কথাটা নাকি ইসলামী রুচিবিরুদ্ধ) সামাজিক আনন্দের অংশ নগণ্য নয়।

এটিকেট অবশ্য আছে ঃ 'বেহেস্তি সাহিত্য' মানতে হলে পানি এক নিঃশ্বাসের পান করবেন না। তিনবারে করবেন, প্রত্যেক শ্বাস ফেলবার সময় পাত্রকে মুখ থেকে সরিয়ে দেবেন, যাতে পানিতে শ্বাস না লাগে ..ভাত সালন (সবজি) কিছু ঠাণ্ডা করে খাবেন...ভালো করে চিবিয়ে খাবেন কিন্তু চিবোবার সময় চপ চপ শব্দ যেন না হয়... খাওয়ার শেষে বরতন (অর্থাৎ কিনা প্লেট টাকে) পরিষ্কার করে হাত চেটে খাবেন এবং—জানতেন কি?—সম্পূর্ণ উদর পূর্তি না করে দু-চার লোকমা-র ক্ষুধা থাকতে থাকতেই খাওয়া সারবেন (লোকমা মানে গ্রাস)। ঐ শেষ আদেশটা অবশ্য রোকেয়ার আমাকে মানতে দিল না।

না, অটোগ্রাফ ওরা নিল না, টেপ রেকর্ডার বের করে শুধু বলল, 'নজরানা চাই...গান করুন...' কোনো খালা-ফুফু, ভাতিজা-ভাতিজীকে প্রাণ গেলেও ওরা শোনাবে না, এই প্রতিজ্ঞা আদায় করে আমার সদ্য-শেখা প্রিয় গানটা করলাম ঃ

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা...। টেপটা যত খারাপ হবে বলে মনে করেছিলাম ততটা খারাপ হয় নি তবে হ্যাঁ পুনরাবৃত্তি সেই তৃতীয় 'তোমার'টার উপর যে-মীড় পড়ে, তার সূক্ষ্মতা অল্প। উদারচিত্ত ওরা বলল ঃ 'মেশিনের দোষ'।

পৌঁছিলাম যখন লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর যাজকালয়ে, তখন দেখি রাত বারোটা প্রায়, আর দরজাও বন্ধ। কারও নিদ্রাভঙ্গ না করে ভোরের নমাজের অপেক্ষায় থাকলাম দরদী দরোয়ানের খাটে, এক ঝাঁক মশার অবাঞ্ছিত সাহচর্যে।

(ক্রমশঃ)

প্রকাশিত হলো

কথাসরিৎসাগর আশাপূর্ণা দেবীর নবতম উপন্যাস

হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা ১০·০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় — আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সব ফুল কিনে নাও ৮·০০ — ফেরারী অতীত ৭·০০

বীরেন্দ্রনাথ সরকার — সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

গৌরী গঙ্গা ৯·০০ — একক প্রদর্শনী ৪·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সুখের আড়াল ৫·৫০ — ঘরের পথ ৬·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার আমার ৪·০০ — নীল লোহিতের চোখের সামনে ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবী

ভালবাসার মুখ ৬·০০ — তরঙ্গহীন ৫·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত — শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

মন জানে না ৫·০০ — সরমা ও নীলকান্ত ৬·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

একবোন পারুল ৭·০০ — বনকরবী ৬·৫০

চিরঞ্জীব সেন — অনিল রায়

রাশিয়ান রুবির রহস্য ৭·০০ — সোনার পাতায় রক্ত ৭·০০

সাহিত্য সংস্থা ॥ ১৮সি টেমার লেন ॥ কলিঃ—৯

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শরৎচন্দ্রের প্রাক-জন্মশতবার্ষিকী সম্মেলন

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র জন্মোৎসব সাব কমিটির উদ্যোগে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রাক জন্মশতবার্ষিক সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে রয়েছে শরৎ রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ, পূর্ণ জীবনচিত্র নির্মাণ দেবানন্দপুরের টুরিস্ট মানচিত্রে অন্তর্ভুক্তি বসতবাটী জাতীয়করণ ইত্যাদি। একটি বিশেষ প্রস্তাবে শতবর্ষ পূর্তি উৎসব রূপায়ণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

কবি সম্মেলন

ইয়ং ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব সম্প্রতি তরুণ কবি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে বহু তরুণ কবি নানা স্বাদের কবিতা পাঠ করে অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। সভাপতিত্ব করেন সুসাহিত্যিক তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী। তাঁর ভাষণে আধুনিক বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব

ফুলিয়া গ্রামে আদি কবি কৃত্তিবাসের স্মরণোৎসব কবির স্মৃতি-স্তম্ভের পাদমূলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কৃত্তিবাস স্মৃতিরক্ষা সমিতি আয়োজিত এই স্মরণোৎসবে স্থানীয় অনেক কবি-সাহিত্যিক ও অনেক গুণীজন অংশ নেন। অনুষ্ঠানে রামায়ণ গানও হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

আগামী ২২ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। ত্রিবৃত্ত পরীক্ষার তরফ থেকে এই উপলক্ষ্যে যে সব সাহিত্যিকদের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হবে তাঁরা হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায় জীবন সরকার শিশির ভট্টাচার্য হরিশচন্দ্র পাল। এই সাহিত্য সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য কোচবিহারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে।

টাকী রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে বিশেষ অনুষ্ঠান

সম্প্রতি টাকী রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগারে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। উপলক্ষ ছিল রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন। বিচারপতি সলিল রায়চৌধুরী প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। বিশিষ্ট অতিথি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু স্থানীয় মনীষীদের ব্যবহৃত দ্রব্য চিঠি দলিলের একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করতে বলেন।

গঙ্গোত্রী আয়োজিত আসানসোল কবি সম্মেলন

সম্প্রতি ডুরান্ড ইনস্টিটিউটে গঙ্গোত্রী পরিষদ (আসানসোল শাখা) এবং বিকাশ-এর উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ২রা মার্চ প্রাতঃকালীন অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গীতা ঘটক। সভাপতি জগৎপতি নন্দীর ভাষণের পর উপস্থিত কবিদের পরিচয় করিয়ে দেন গঙ্গোত্রীর মুখ্য সম্পাদক শান্তনু দাস। সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রান্তিক এবং মুদ্রিত ব্যাজ গোলাপকুঁড়ি চন্দনে কবিরা একে একে সমাগত দর্শকদের সামনে অভিনন্দিত হন। তরুণ কবিদের কবিতা পাঠ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে এই দিন কথিকা পাঠ করেন—ডঃ সুশীল রায়। মধুকবির গান এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যকে নৃত্যনাট্যে পরিবেশন করেন লীলা রায় সম্প্রদায়।

বৈকালিক অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন—অর্ঘ্য সেন, গীতা ঘটক। কবিতা পাঠে অংশ গ্রহণ করেন—দীনেশ দাস সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শরদিন্দুকুমার মুখোপাধ্যায় সুনীলকুমার নন্দী পূর্ণেন্দু পত্রী সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় শান্তনু দাস গৌতম গুহ মৃণাল বসু চৌধুরী শান্তি সিংহ কবিরুল ইসলাম অনন্য রায় হরিপদ দে পলাশ মিত্র বিজয়া মুখোপাধ্যায় প্রদীপ রায়চৌধুরী প্রফুল্ল মিশ্র মতি মুখোপাধ্যায় প্রফুল্ল অধিকারী দিলীপ পাত্র ভোলানাথ শীল প্রমুখ ১৫০ জন কবি। এছাড়া আসানসোল বাঁকুড়া বীরভূম পুরুলিয়া বিহার ধানবাদ রাণীগঞ্জ বর্ধমান দুর্গাপুর বার্ণপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তরুণ কবিরা এই সভাগৃহ অলংকৃত করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে ছিল রবীন্দ্র নজরুল রজনীকান্ত পুরাতনী গানের অনুষ্ঠান। অর্ঘ্য সেন এবং গীতা ঘটকের সেদিনকার অনুষ্ঠান স্মরণীয় হয়ে থাকবে দীর্ঘকাল।

হাবড়ায় সারা বাংলা সাহিত্য মেলা

সম্প্রতি দেউটি সাহিত্য পাক্ষিক আয়োজিত সারা বাংলা সাহিত্যমেলা হয়ে গেলো হাবড়া বালিকা বিদ্যালয়ে। উঃ অনুষ্ঠানে সারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক কবি সাহিত্যিক এবং লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা এসেছিলেন। মেলা প্রাঙ্গণে লিটল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী এবং আধুনিক কবিতার চিত্ররূপ ছিল বিশেষ আকর্ষণ। এই সাহিত্যমেলাকে দুটো অধিবেশনে ভাগ করা হয়। প্রথম অধিবেশন উদ্বোধন করেন শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র সভাপতি এবং ভবানী মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা হয়। আধুনিক কবিতার গান করেন ঋষিন মিত্র এবং অজিত পাণ্ডের গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। সাহিত্যমেলার সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব চন্দের বক্তব্য দিয়ে সভা সুরু হয়েছিল।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বেলা তিনটায়। এতে ছিলেন ডঃ সুশীল রায় শ্রীমতী বাণী রায় ডঃ অমিয়কুমার সেন। কবিতা পাঠ করেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত অমিতাভ দাশগুপ্ত বাসুদেব দেব স্বদেশ-রঞ্জন দত্ত রাণা বসু কার্তিক মোদক মিহির মুখোপাধ্যায় শান্তনু দাশ ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় এছাড়া বহু নামীদামী কবিরা। বিপ্লব চন্দের কবিতা আবৃত্তি দিয়ে সাহিত্যমেলার অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কৃষি মেলায় সাহিত্য সভা:

স্বাস্থ্য প্রদর্শনী কমিটি ও সীমান্ত সাহিত্যের উদ্যোগে রাণাঘাটের স্বাস্থ্যোদ্যানস্থিত ময়দানে সম্প্রতি একটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি এবং প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে দীনেশ দাস এবং শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা পাঠ করেন যাঁরা, তাঁরা হলেন তারাপদ রায় শরৎ মুখোপাধ্যায় গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রণব মুখোপাধ্যায়, শিশির ভট্টাচার্য অমিতাভ চক্রবর্তী

রত্নেশ্বর হাজরা যোগব্রত চক্রবর্তী ভোলানাথ শীল, কার্তিক মোদক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ মৈত্র স্বপন চক্রবর্তী। গল্প শোনান সুজন চন্দ।

এই দিনে যাঁদের সীমান্ত সাহিত্য পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করা হয় তাঁরা হোলেন সত্যরঞ্জন বিশ্বাস অমিতাভ চক্রবর্তী প্রমোদবিকাশ ভট্টাচার্য বিপ্লব চন্দ জয় গোস্বামী স্বপন চক্রবর্তী জীবন সরকার সমর মুখোপাধ্যায় সমীরকান্তি বিশ্বাস কালী চক্রবর্তী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভোলানাথ শীল কণা বসু মিশ্র।

অভিনব হিন্দী অভিধানের পরিকল্পনা : কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে চারজন সদস্যের একটি কমিটি সংগঠিত হয়েছে। এই সদস্য চতুষ্টয় হলেন সর্বশ্রী গঙ্গাশরণ শর্মা সুধাকর পাণ্ডে এম-পি আর পি নায়ক কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দী উপদেষ্টা এবং গোপাল শর্মা কেন্দ্রীয় হিন্দী ডাইরেকটরেট-এর অধিকর্তা। কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দী কমিটির সুপারিশক্রমে এই নতুন কমিটিটি সংগঠিত হয়েছে। এই কমিটির কাজ হবে যথা শীঘ্র সম্ভব একখানি অভিনব হিন্দী অভিধান সংকলন-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে প্রতিটি হিন্দী শব্দের সরকারী স্বীকৃতি-প্রাপ্ত প্রতিটি ভারতীয় ভাষার প্রতিশব্দ পাওয়া যাবে। বলাই বাহুল্য এই কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সুবৃহৎ হিন্দী অভিধান সংকলন করা হবে তার প্রকাশনার সম্পূর্ণ ব্যয়ভারই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন।

উপগুপ্ত

নতুন বই

রবীন্দ্রোত্তর কাল। ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা-১২। সাত টাকা।

রবীন্দ্রোত্তর কাল রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে আদৌ মুক্ত নয়। দ্বিতীয় কথা রবীন্দ্রোত্তর কালের সীমা ঠিক সেই কারণেই নির্দিষ্ট করায় অসুবিধে থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি—একথা নতুন করে বলার নয় নিশ্চয়ই কিন্তু ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার রচিত 'রবীন্দ্রোত্তর কালে'র সূচীপত্র দেখে কথাটা মনে হল। কবি রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের কিছু বিষয় আলোচনা করতে বসে ডঃ মজুমদার প্রধান অর্থে ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিকের আলোচনাতেই নিবিষ্ট থেকেছেন। লেখক বিষয় নির্বাচনে শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) উপন্যাসের সূত্রে শরৎচন্দ্রকে নিয়েছেন নিয়েছেন ঔপন্যাসিক তারাশংকরকে আর প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী অবনীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথকে।

লক্ষণীয় কবি রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের বিষয় নির্বাচনে কবিরা অনুপস্থিত। স্বভাবতই সন্দেহ হতে পারে বিষয়গুলি 'অ্যাকাডেমিক' গতানুগতিকতায় বিরক্তিকর। কিন্তু আশ্চর্যভাবে তা হয়নি। কোন মোহ বা ভাবালুতা থেকে যে প্রবন্ধগুলি লেখা হয়নি ছাত্রদের ছকে-বাঁধা চিন্তাকে গুছিয়ে দেবার উপযোগী করে যে বিষয়গুলি ভাবা হয়নি তার প্রমাণ গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধেই আছে। ডঃ মজুমদার নির্মোহ দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের মানসিকতা বিশ্লেষণ করেছেন। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি যথার্থ প্রাবন্ধিকের। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বেশ কিছু দুঃসাহসিক মন্তব্য আছে—যেগুলি অনড় যুক্তি ও বিশ্লেষণের ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত।

প্রমথ চৌধুরী মূলত প্রাবন্ধিক তবু আলোচ্য প্রবন্ধকার তাঁর গল্প কবিতা নিয়েও আলোচনা করেছেন। স্বল্পপরিসরে আলোচনা থাকায় কোন কোন মন্তব্য ত্বরিত স্বভাবে পাঠকদের অতৃপ্ত রাখতে পারে তবু এ প্রবন্ধে সামগ্রিকভাবে প্রমথ চৌধুরীকে বোঝার সহজ পথ আছে। সম্ভবত অবনীন্দ্রনাথ এখনো ছাত্রপাঠ্য হননি বলেই ডঃ মজুমদারের রচনাটি যথেষ্ট মৌলিক চিন্তায় চকিত থেকেছে। তারাশংকর ও বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনায় লেখক পূর্বসূরীদের প্রথানুগ আলোচনার ধারায় আঘাত দিতে পেরেছেন।

বিষয়টি বলার ভঙ্গি লেখকের নিজস্ব। বোঝা যায় কোথাও তাঁর বক্তব্যকে অস্পষ্ট রাখেননি কোন মন্তব্যকে অকারণ চমক সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবেও উপস্থাপিত করেননি। একজন গবেষকের মত পর্যবেক্ষণ ও একজন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকের মত কল্পনাশক্তি—ডঃ মজুমদার প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই পথেই পদচারণা করেছেন। তাই কোথাও রচনাগুলি এতটুকু নীরস মনে হয়নি একবারও মনে হয়নি রবীন্দ্রোত্তর কালকে এই পাঁচটি ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে বোঝায় কোন ব্যাঘাত ঘটছে। বস্তুত 'রবীন্দ্রোত্তর কাল' গ্রন্থটি ডঃ উজ্জ্বল মজুমদারের সমালোচনা দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা স্থায়ী নির্মল নীল আকাশের মত দৃঢ় সিদ্ধান্তের যথার্থতাকে স্মরণ করায়।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

দেয়ালা—শুদ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯।৪ ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলকাতা-২৬।

ছোটদের রংচঙে গ্লাসিক দেয়ালা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটি সুসম্পাদিত। বিলম্বে প্রাপ্ত শারদ সংখ্যাটি নামকরা লেখকদের রচনা সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। লিখেছিলেন মনোজ বসু প্রেমেন্দ্র মিত্র তারাশংকর রায় সত্যজিৎ রায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ণেন্দু পত্রী পুণ্যলতা চক্রবর্তী পরিমল গোস্বামী লীলা মজুমদার অজয় বসু বিমল কর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শিবরাম চক্রবর্তী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেক নামী ও অনামী লেখক।

দৃশ্য : সম্পাদনা : অমর বসু ও দিলীপ পাল। ৬ পিয়ারী মোহন সরে লেন কলকাতা-৬। দাম : এক টাকা।

লেখক তালিকায় রয়েছেন বিমল কর অসিত চট্টোপাধ্যায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত নির্মলকুমার সুলতা চৌধুরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বীরেন্দ্র দত্ত।

নন্দিনী : সম্পাদনা : সঞ্জীব চৌধুরী ও ভ্রমর বিশ্বাস। এইচ ৮৭ নেতাজী কলোনী কলকাতা-৫০। দাম : তিন টাকা।

ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির এই সংখ্যায় যাঁদের লেখা পড়ে ভালো লাগে তাঁরা হোলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রাম বসু গৌরাঙ্গ ভৌমিক কৃষ্ণ ধর তরুণ সান্যাল।

বিবেক—ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা নবম সংখ্যা। সম্পাদক শংকর সেনগুপ্ত ও সুশান্ত বিশ্বাস। ৩৪ আবদুল লতিফ স্ট্রীট কলঃ-৫৬।

নিছক একটা কবিতার পত্রিকা নিয়মিত বেরোচ্ছে এটা ভাবতেই অবাক লাগে। ছোট মাপের এই পত্রিকায় মূলতঃ নবীন কবিদের সমাবেশ ঘটেছে যাঁদের আন্তরিক সাধনা একদিন পরিপূর্ণতায় বিকশিত হবে। কয়েকটি কবিতা মনে খুব দাগ কাটে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে
সম্পূর্ণ নূতন ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা বই

নেতাজী ও কুইসলিং প্রসঙ্গ

লেখক : বঙ্গজ ভারত-নাগরিক **প্রকাশ ভট্টাচার্য**

দাম : ১৮ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

বিমানবিহারী মজুমদার—একটি স্মরণ

সুবল গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলায় বহুমুখী প্রতিভাবানদের যে যুগ অবসান হয়ে গেছে তার মধ্যে বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনীতি-বিদ ও অর্থনীতি-বিশারদ অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার ছিলেন অন্যতম। ১৯৬৯ সালের ১৮ নভেম্বর পাটনায় তাঁর পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগের অবসান হয়ে গেছে। তাই আজ সাহিত্য-সাধনায় উৎসর্গীকৃত এই মহান জীবনের স্মরণ ও আলোচনা বর্তমান ও ভাবীকালের জন্য বিশেষই প্রয়োজন।

বিমানবিহারী মজুমদারের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২১ ডিসেম্বর। নবদ্বীপে তাঁর মাতামহ কীর্তনসম্রাট অদ্বৈতদাসবাবাজীর গৃহে তাঁর জন্ম হয়। অদ্বৈতদাস ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত, এবং বাংলাদেশে ভক্তিমূলক মার্গসঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট রীতি তিনি প্রবর্তিত করেন। বিমান-বিহারীর পিতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারও একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন এবং এক ধনী জমিদার পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। বিমানবিহারীর মাতা কৃষ্ণপ্রিয়া ছিলেন যথার্থ বৈষ্ণব-কন্যা। তাই মাতা কৃষ্ণপ্রিয়ার কোলে বসেই শিশু বিমানবিহারী পদাবলী কীর্তন ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোচনা শুনতেন।

বিমানবিহারীর শিক্ষালাভ হয় ওসমান-পুর, জঙ্গীপুর ও নবদ্বীপ হাইস্কুলে। নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই তিনি মাতামহের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ছেলে-বেলা থেকেই বৈষ্ণব-সাধনা ও ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। তাই ছাত্রাবস্থাতেই ১৯১৪ সালে 'নবদ্বীপ সমাজে'র প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে এক সময়ে বিমানবিহারী শ্রীখণ্ডের বড়গঙ্গার নির্জন মন্দিরে নিভৃত সাধনায় রত হন এবং শিখা ও তুলসীর মালাও ধারণ করেন।

বিমানবিহারী নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করার পর ১৯১৯ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে আই-এ পাশ করেন। এর পরে ১৯২১ সালে ঐ কলেজ থেকেই ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি-এতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯২৩ সালে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে এম-এ পাশ করেন।

এরপর ১৯২৪ সালে হেতমপুর কে, সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে বিমানবিহারী যোগদান করেন। হেতমপুর কলেজে থাকাকালীন তিনি বিখ্যাত বৈষ্ণব-পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের দুজনের মধ্যে সখ্যতা ছিল জীবনের শেষ দিন অবধি।

বিমানবিহারী হেতমপুর কলেজ থেকে ১৯২৫ সালে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে পাটনায় বি এন কলেজে আসেন। সেই থেকে পাটনায় তাঁর চিরস্থায়ী বসবাস।

পাটনায় ইতিহাসের অধ্যাপক থাকা-কালীন ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বিমানবিহারী অর্থনীতিতে এম-এ পাশ করেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য তিনি মাত্র সাতটি পেপারে পরীক্ষা দিতে পারেন। তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯৩১ সালে বি এন কলেজেই তিনি অর্থশাস্ত্রেরও অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯৩২ সালে বিমানবিহারী পি আর এস উপাধি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'হিস্ট্রি অফ পলিটিক্যাল থট ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ'। এই গবেষণা-গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেন এবং এটি সর্বত্র সমাদর লাভ করে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বিমানবিহারী

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিমানবিহারী ছিলেন অগাধ পণ্ডিত। ভক্তিমার্গের সাধক হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্যের সমালোচনা লেখেন। অধ্যাপক ভবতোষ দত্তর ভাষায় 'পিতা ছিলেন শান্ত, মাতা ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব ভক্তের কন্যা। বিমানবিহারীর জীবনের বিদ্যা-চর্চায় বৈষ্ণব-ধর্মালোচনা একটি মুখ্য স্থান অধিকার করে থাকলেও বিনয়ের সঙ্গে দৃঢ়তা, রসচর্চার সঙ্গে প্রবল যুক্তিবাদ ভক্তির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চেতনার মিশ্রণ তাঁর পাণ্ডিত্যকে দিয়েছিল বিশিষ্টতা। বিদ্বান আছেন আমাদের দেশে সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু বহুমুখী বিদ্যাকে অবলীলায় বহন করেন অলংকারের মত, এমন পণ্ডিতের সংখ্যা বেশী নয়।'

১৯৩৫ সালে বিমানবিহারী 'গ্রিফিথ মেমোরিয়্যাল প্রাইজ' লাভ করেন তাঁর 'সংস্কৃত-সাহিত্যে চৈতন্য সম্বন্ধীয় উপকরণ' নিবন্ধ লিখে।

১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন বিমানবিহারী। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'চৈতন্যচরিতের উপাদান।' বাংলার লিখিত এই নিবন্ধ ছিল ভারতবর্ষে আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম থিসিস। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই থিসিসের পরীক্ষক। এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সভাপতি। ১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে। এই গ্রন্থটি ইতিহাসচর্চার এক অমূল্য নিদর্শন। এতে ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের সমন্বয়কারী বিমানবিহারীর স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরম-বৈষ্ণব বিমাবিহারী ইতিহাসের বিশ্লেষণ করেছেন, এবং শ্রীচৈতন্যকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্য গবেষণায় বিমান-বিহারীর অবদান ছিল বহুমুখী। প্রথমত তিনিই সর্বপ্রথম বস্তুমুখী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চৈতন্যদেবের জীবনের বিভিন্ন উপাদানের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করেন। দ্বিতীয়ত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তির যথাযথ কালনির্ণয়ের প্রয়াস তিনিই সর্বপ্রথম করেন। তৃতীয়ত বৈষ্ণব পদাবলীর সমালোচনাধর্মী মূল্যায়ন এবং কবিদের নামে প্রচলিত রচনাবলীর ঐতিহাসিকতা নির্ণয়ে তিনিই সচেষ্ট হন। চতুর্থত বাংলা আসাম উড়িষ্যা এবং ভারতের অন্যান্য অংশে বৈষ্ণবধর্মের ক্রম-বিকাশের তুলনামূলক অধ্যয়ন সর্বপ্রথম করেন বিমানবিহারী। এবং সর্বশেষে বিদ্যা-পতি গোবিন্দদাস ও অন্যান্য পদকর্তাদের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে পদোন্নতি

পাটনার বি এন কলেজে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনার পর বিমানবিহারী আরায় এইচ ডি জৈন কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ঐ কলেজটি বিহারে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত তিনি বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ ইন্সপেকটর ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ইউ জি সি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে সমাসীন ছিলেন। ১৮ নভেম্বর ১৯৬৯ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিমানবিহারী পাটনায় তাঁর বাসগৃহ 'কৃষ্ণপ্রিয়া'য় পরলোকগমন করেন। ঠিক যে সময় তাঁর সত্তর বৎসরপূর্তি উপলক্ষে কলকাতা বিশ্বভারতী প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করছিল সেই সময় বিমানবিহারীর আকস্মিক মৃত্যু গভীর বিষাদ ও দুঃখের সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাবলী

১৯৫০ সালের পর যখন তিনি বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ইন্সপেকটর সেই সময় থেকে বিমানবিহারী খ্যাতি ও

সম্মানের শীর্ষে স্থানলাভ করেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে তাঁর সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' ১৯৫২ সালে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর পরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ সালে তাঁকে খৈতান-বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানান। বিষয় ছিল 'বিদ্যাপতির মন ও শিল্প'। ১৯৬৩ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে তিনি বক্তৃতা দেন। বিষয় ছিল 'গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস ও বলরামদাস'। ১৯৬৪ সালে আবার আসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবেদিতা বক্তৃতার আহ্বান। বিষয় 'সোস্যাল এন্ড পলিটিক্যাল আইডিয়াজ অফ বিবেকানন্দ এন্ড নিবেদিতা'। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আহ্বান করে ১৯৬৫ সালে। বিষয় 'মিলিট্যান্ট ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া'। কলকাতার সেন্টার অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি ইন হিস্ট্রি তাঁকে ১৯৬৭ সালে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করে। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'কৃষ্ণ ইন হিস্ট্রি এন্ড লেজেন্ড'। এই বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা দেন 'হিরোইনস অফ টেগোর'। অসাধারণ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ এই বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে বিমানবিহারীর এক নতুন পরিচয় প্রকাশ করে। একাধারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বৈষ্ণব-সাহিত্য ইতিহাস রবীন্দ্র-সাহিত্য—সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বিমানবিহারী ১৯৬৮ সালে জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে বিশেষ বক্তৃতা দেন 'ইভোলিউসন অফ দ্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি ইন দ্য নাইনটিনথ সেঞ্চুরী'। কিন্তু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতামালার আহ্বান আসে ১৯৬৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ঐ বছর তিনি স্টেফানোজ নির্মলেন্দু বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হন। এই সিরিজের বক্তৃতাবলী প্রতি তিন বছরে একবার আয়োজিত হয়। বিমানবিহারীর পূর্বসূরীদের মধ্যে ছিলেন অলডাস হাকসলে এ এ ম্যাকডোনেল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এবং অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বিমানবিহারীর এই বক্তৃতামালায় বিষয় ছিল রিলিজিয়ন অফ লাভ—। কমপ্যারাটিভ স্টাডি অফ বৈষ্ণবিজম ক্রিশিয়ানিটি এন্ড সুফিজম।

বিভিন্ন গৌরব

বৈষ্ণব-সাহিত্য রবীন্দ্রসাহিত্য ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিমানবিহারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং হায়দ্রাবাদে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সায়েন্স কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

এ ছাড়া তিনি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি ছিলেন।

১৯৬৫ সালে বিহার রিসার্চ সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

বিমানবিহারী ১৯৬৭ সালে কলকাতায় ইনস্টিটিউট অফ হিসটোরিক্যাল স্টাডিজের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ঐ বছরই তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্টোরিক্যাল এন্ড আরকেয়োলজিক্যাল সোসাইটির হীরক-জয়ন্তী সমারোহে সভাপতির অভিভাষণ দেন।

মনুষ্য বিমানবিহারী

বৈষ্ণব-জনোচিত স্বাভাবিক বিনয় ছিল বিমানবিহারীর মজ্জাগত গুণ। কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর জীবনে ছিল তাঁর অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তা। ভক্তি ও বৈজ্ঞানিকমননের সার্থক সমন্বয়। পাটনার জন-সমাজে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। পাটনা হরিসভার সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং যখনই পাটনায় কোন কীর্তন, ভক্তিমূলক গানের আসরের ব্যবস্থা হতো, সকলেই বিমানবাবুর দ্বারস্থ হতেন। তিনি নবদ্বীপ থেকে বড় বড় গায়ক-গায়িকাদের প্রায়ই পাটনায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন। পাটনায় যে কোন কীর্তনের আসর বিমানবাবুর উপস্থিতি ছাড়া কল্পনাই করা যেতো না। আর তাঁর সঙ্গে থাকতেন পাটনার আর এক যশস্বী শিক্ষাবিদ অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার। পাটনায় তাঁকে বিভিন্ন সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে খুব কাছ থেকে দেখেছি। পাটনায় তাঁর বাসগৃহ 'কৃষ্ণপ্রিয়া'য় যখনই গিয়েছি, তাঁকে অজস্র বই-পত্র ও পুঁথির মধ্যে ডুবে থাকতে দেখেছি।

জীবনের শেষভাগে ১৯৬৮-৬৯ সালে বিহার-এর বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশনের তিনি সভাপতি ছিলেন। বিহারে বাংলা-শিক্ষা ও অধিকার রক্ষণের জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। মধুর ব্যবহার, দরদী এবং উদারচেতা বিমানবিহারী ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয়। তাঁর মৃত্যুতে শিক্ষাজগত হারিয়েছে এক বিশিষ্ট মনীষীকে, যাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গেই দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত হবে।

সদ্য প্রকাশিত হ'ল

গী দ্য সোপাসাঁর / অনুবাদ—ইন্দুভূষণ দাশ

এক নায়ক অনেক নায়িকা ১০,

অমিতাভ দাশগুপ্তর
সেই লোকটি ৭,

সরোজ প্রভাকর-এর
মিণ্টুর খেলা ৩,

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর
সামনে আড়ালে ৮, সমুদ্রের সামনে ৬,

চিরঞ্জীব সেন-এর
প্রেমিক দস্যু ৭, চেকি বেঁচে আছে ৭,

নিশাচর-এর রহস্য উপন্যাস
কুহেলিকা ৬, জিঘাংসা ৬,

অনিল রায়-এর উপন্যাস
ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর ৮, নগ্ন প্রহর ৮,

সুবোধ ঘোষ-এর উপন্যাস
দুই গন্ধর্ব ৮,

আব্দুল জব্বার-এর উপন্যাস
মাতালের হাট ৮,

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ধূপের ধোঁয়ায় ৮,

অবধূতের উপন্যাস
সুমেরু কুমেরু ৭,

নীহার রঞ্জন গুপ্তর উপন্যাস
সুভদ্রা হরণ ৬,

গজেন্দ্রকুমার মিত্র-এর উপন্যাস
রাতের বাসা ৬,

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ নবীন কুণ্ডু লেন ॥ কলিকাতা-৯

গোয়েন্দা ধাঁধা

বে-আক্কেলে বুলেট।।

ডকটর প্রীস্টলী।।

জন রোড

ইন্সপেক্টর হ্যালডেনকে প্রায় বলতেন ডক্টর প্রীস্টলী—'ওহে, ঘটনার ওপর জোর দিও, অনুমানের ওপর নয়।'

ঠিক উল্টোটা বলত ইন্সপেক্টর। সে চাইত অনুমান থেকেই ঘটনায় আসতে। ফলে, বিভ্রাট লেগেই থাকত।

এই কেসটাও সেইরকম একটা বিভ্রাট নিয়ে।

মিস্টার ফার্কুহারসন শহরের নামকরা ব্যবসাদার। ভদ্রলোক টিলবারি যাচ্ছিলেন ট্রেনে চেপে। স্টেশনে ট্রেন পৌঁছোলে একজন কুলী দেখল, তিনি ফার্স্ট ক্লাস কামরায় হেলান দিয়ে বসে আছেন এক কোণে। মুখ ইঞ্জিনের দিকে। ডানদিকের খুলি যেন গাঁইতির ঘায়ে চূর্ণ। দেহ নিষ্প্রাণ। তখন বিকেল তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট।

খবরের কাগজে খবরটা বেরোনোর পর ইন্সপেকটর হ্যালডেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডক্টর প্রীস্টলীকে বললে—'মামুলী কেস। হয় কেউ ডান্ডা মেরেছিল মাথায়—ট্রেন স্টেশনে ঢোকবার আগেই পালিয়েছে—অথবা জানলা দিয়ে ঝুঁকেছিলেন—উল্টোমুখো। চলন্ত ট্রেনে ধাক্কা লেগেছে, নয়ত অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে ঠোক্কর গেলেছে। অনুমানে কিনা হয়।'

মুখটিপে হাসলেন ডক্টর প্রীস্টলী। তিনি গাণিতিক সমাধানের ভক্ত—অনুমানের নয়। সেক্রেটারীকে বললেন—'হ্যালডেনের কাছে যা ডালভাত, সেইসব কেস নিয়েই ওকে ল্যাজেগোবরে হতে হয় সবচেয়ে বেশী। দেখা যাক এবার কি হয়।'

এ ঘটনা ঘটল শনিবার। মঙ্গলবারে তুর্কীনাচ নাচতে নাচতে হাজির হল ইন্সপেক্টর। ব্যাপার কী? না, খুনীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখন শুধু হাতকড়াটা পরাতে বাকী। খুনীর নাম—

'দাঁড়াও। নামটা পরে শুনব। আগে বল ঘটনাগুলো, বললেন ডক্টর প্রীস্টলী।

ব্যঙ্গের হাসি হাসল হ্যালডেন। কেসটা সত্যিই জলের মত সোজা। মোটিভ পেলেই খুনীর কান পাকড়ে টেনে আনা যায়। এখনেও জবরদস্ত মোটিভ রয়েছে। ফার্কুহারসন নিজের বোনের টাকা খাটিয়ে ব্যবসা করতেন। বোন মারা যাওয়ার সময়ে মজার উইল করে যান। একমাত্র ছেলে ব্যবসা থেকে টাকা তুলতে পারবে না ফার্কুহারসন মারা না যাওয়া পর্যন্ত। শনিবার সকালে মামা-ভাগ্নেতে তুমুল ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েন মামা। একমাত্র মেয়েকে বলে যান, বাইরে খেয়ে নেবেন। লাঞ্চ খেয়েছেন রেস্তোরাঁয়। আড়াইটের ট্রেন ধরেছেন। তিনটে কুড়িতে পাওয়া গেল তাঁর মৃতদেহ।

একই ট্রেনে ভাগ্নেও যাচ্ছিল কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে। সে আবার টেরিটোরিয়াল স্কোয়াডে নাম লিখিয়েছে। ডাহা আনাড়ি। টিপ করে গুলী ছুঁড়তে একদম পারে না। তাই যাচ্ছিল পুরফ্লিট রাইফেল রেঞ্জে প্র্যাকটিস করতে।

চলন্ত ট্রেনে ইউনিফর্মধারী একব্যক্তিকে পাদানীর ওপর দিয়ে যেতে দেখেছিল লাইনের এক কর্মচারী। ভাগ্নেকে জেরা করতেই থতমত খেয়ে স্বীকার করেছে—হ্যাঁ, সে-ই যাচ্ছিল বিপজ্জনক ভাবে ঝুলতে ঝুলতে। হঠাৎ অন্যকামরায় একজন টেরিটোরিয়াল বন্ধুর মুখ দেখতে পেয়েছিল বলেই যাচ্ছিল। বন্ধুকেও জেরা করা হয়েছে। কথাটা সত্যি।

ইন্সপেক্টর বলল—'এখন বুঝলেন তো ব্যাপারটা? পাদানীর ওপর দিয়ে গিয়ে আগে জানলা দিয়ে গুলী করেছে মামা-কে। তারপর গেছে বন্ধুর কাছে। নিহত ব্যক্তির মাথার মধ্যে বুলেটটাই তার প্রমাণ।'

'তোফা!' হাত কচলে বললেন ডক্টর। কিন্তু দোহাই তোমায়! ভাগ্নেকে গ্রেপ্তার করার আগে আমাকে কনসাল্ট করে নিও।'

'দেখা যাবে।'

এর ঠিক পরেই হন্তদন্ত হয়ে হাজির হল ফার্কুহারসনের মেয়ে। সুন্দরী, চটপট, কিন্তু উদ্বিগ্ন। ডক্টর প্রীস্টলী এ-মামলায় মাথা ঘামাচ্ছেন শুনে দৌড়ে এসেছে। হ্যালিডে, মানে তার পিসতুতো দাদা মোটেই খুন করেনি। ইন্সপেক্টর হ্যালডেন ভীষণ ভুল করছেন।

ডক্টর প্রীস্টলী বললেন—'আমি জানি সে খুন করেনি। কিন্তু মামার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল।

মুখ লাল হয়ে গেল মিস ফার্কুহারসনের। চোখ নামিয়ে নিয়ে বললে 'বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে তো ঝগড়া করেনি—ঝগড়া করেছিল আমাকে বিয়ে করার জন্যে। আমরা দুজনেই দুজনকে ভালবাসি। কিন্তু বাবা ধাঁ করে রেগে গেলেন।'

'আচ্ছা দেখি কি করা যায়।' বলে মিস ফার্কুহারসনকে বিদেয় করলেন ডঃ প্রীস্টলী। বসলেন একগাদা ম্যাপ নিয়ে। লন্ডন থেকে টিলবারি পর্যন্ত গোটা তল্লাটটা খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর সেক্রেটারীকে নিয়ে বেরোলেন সরেজমিন তদন্তে।

ট্রেনে চাপলেন। ফার্স্ট ক্লাশ কামরা। ট্রেন জোরে ছুটতেই বন্দুকবাজ সেক্রেটারীকে বললেন—'ওহে, এই নাও আমার ছড়ি। আমি বসলাম ডানদিকের কোণে ইঞ্জিনের দিকে মুখ করে। তুমি ঐ কোণ থেকে ছড়িটাকে আমার ডান চোখের দিকে টিপ করো। বাস, বাস। চলে এসো। তোমার দ্বারাও হল না দেখছি!'

টিলবারি স্টেশনে নেমে মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন ডকটর। গেলেন পুরফ্লিট রাইফেল রেঞ্জে। জিজ্ঞেস করলেন, শনিবার বেলা আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে রাইফেল প্র্যাকটিস হয়েছিল কিনা।

রেঞ্জ ওয়ার্ডেন বললে—'হয়েছিল। কিন্তু তিনটের পরে।'

দমবার পাত্র নন ডকটর। হাঁটতে হাঁটতে গেলেন দূরে আর একটা রাইফেল রেঞ্জে। সেখানেও একই প্রশ্ন করলেন।

সেখানকার রেঞ্জ ওয়ার্ডেন বললে—হয়েছিল বইকি। কিন্তু এলোপাতাড়ি গুলি চলবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কেননা, তিনপায়া স্ট্যান্ডে হাল্কা মেশিনগান ফিট করে একদিকেই ফায়ার করছিল আর্মির লোক। গুলি ফসকালেও সে গুলি পড়বে নদী আর জলার জলে।'

মুখ চুন হয়ে গেল ডকটরের। তবুও দূরবীণ হাতে উঠলেন ঢিবির ওপর। দূরবীণের মধ্যে দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চমকে উঠলেন একটা লোহার ডান্ডা দেখে। ছুটে নেমে গেলেন ডান্ডার কাছে। খুঁটিটা পতাকা ওড়ানোর। রং চটে গেছে ওপরে।

উদ্ভাসিত মুখে বাড়ী ফিরলেন ডকটর। পরদিন ইন্সপেকটরকে নিয়ে গেলেন আর্মি ক্যাম্পে। জিজ্ঞেস করলেন—'গত শনিবার রাইফেল রেঞ্জে কি ভাবে গুলি চালিয়েছিলেন দেখাবেন?'

অফিসার ভদ্রলোক সকৌতুকে বললেন—'ঐ তিন পায়া স্ট্যান্ড থেকে। নিরানব্বইটা গুলি পরপর একই পয়েন্টে ছুটে যাওয়ার পর ক্ল্যাম্পটা হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছিল। মেশিনগানের মুখ নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। পরের বুলেটটা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

তিনপায়া স্ট্যান্ডটা দেখিয়ে ইন্সপেকটরকে বললেন ডকটর—'ঐ হল ফার্কুহারসনের হত্যাকারী।'

'অসম্ভব।' তেড়ে উঠে বলল ইন্সপেকটর' 'একশ নম্বর বুলেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও জলার দিকে গিয়েছে—বেঁকে রেললাইনের দিকে যাবে কেন?'

আপনি বলুন দিকি, কেন?

অদ্রীশ বর্ধণ

ধাঁধার সমাধান ৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

অহীন্দ্র চৌধুরী ও শতবর্ষের স্মরণীয় প্রসঙ্গে

(লেখক উত্তর)

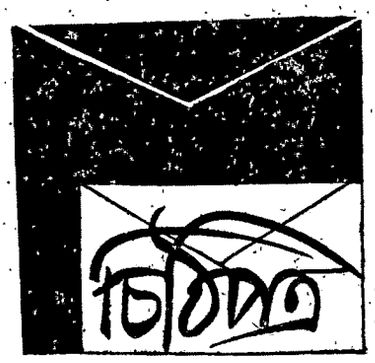

বিগত ১১ অকটোবর ও ১৫ নভেম্বর অমৃত পত্রিকায় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ও অহীন্দ্র চৌধুরী সম্পর্কিত আমার রচনার বিরুদ্ধে জনৈক পত্রলেখকের একটি আক্রমণাত্মক পত্র ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রলেখকের হীনতা এবং দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠলেও আমি উত্তর দিয়েছিলাম সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কথা চিন্তা করে—যাতে তাঁরা আমায় ভুল না বোঝেন। আমার উত্তরটি বিগত ১০ জানুয়ারী ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উত্তর পাবার পরও উত্তরের জের টেনে ঐ প্রসংগে পত্রলেখকের আর একটি পত্র বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারী এবং ভিন্ন প্রসংগের তৃতীয় পত্র বিগত ৭ মার্চের অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পত্রে যে সন্দেহ জেগেছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে তা বদ্ধমূল হয়েছে। অমৃত পত্রিকার নিয়মিত পাঠক-পাঠিকা বা যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির তিনটি পত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসলেই বুঝতে পারবেন পত্রলেখক ভুল সংশোধনের সহজ মনোবৃত্তি নিয়ে কোন পত্রই লেখেননি। আত্মপ্রচারের সস্তা পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। আর আমাকে আপনাদের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছেন। কেন? কারণ নিজেকে কোন মতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি বা পারছেন না। তাই অমৃত পত্রিকায় একটি বিতর্কের ফ্রন্ট খুলে সেই কার্যসিদ্ধির ফিকিরে আছেন। আমার ওপর তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশ। নানানভাবে দীর্ঘদিন ধরে আমার সাহায্য নিয়েছেন অথচ আমি তাকে স্বীকৃতি দিইনি। এসব কথার লিখিত কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু সাক্ষী আছে।

'শতবর্ষের স্মরণীয়' নিবন্ধে নতুন কোন গবেষণা তুলে ধরা হচ্ছে না। ব্যক্তি ও ঘটনার মধ্য দিয়ে পুরাতনকেই নতুন করে তুলে ধরা হচ্ছে। এবং সীমিত পৃষ্ঠার কথা চিন্তা করে আমাকে আলোচনার সীমারেখা মেনে চলতে হচ্ছে। আমার গবেষণালব্ধ বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্র ভিন্ন। বর্তমান আলোচনা সীমিত হলেও অসাবধানতা বা মুদ্রণ ভ্রান্তি নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। তথ্য সংক্রান্ত ভ্রান্তির সম্ভাবনা এই জন্য নেই যে বর্তমান বিভাগে আমি নতুন কিছু বলছি না। অপরের কাছে না হলেও অন্তত আমার কাছে নয়। পুরাতনকে নতুন করে সহজ এবং সংক্ষিপ্তভাবে বলছি।

তবু বলবো ইতিহাস কখনই একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না। পুরাতনের গহ্বর থেকে যে ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে বা হচ্ছে—তাও একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে না। তাছাড়া অনুমান বা অনিশ্চিত নজিরের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত অভিমত থাকাও স্বাভাবিক। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে যিনি অতীতের যতবেশী তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন তিনি ততবেশী নতুন নতুন সম্পদ দিতে পারবেন। বিগত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি মূল নজির যত বেশী উদ্ধার করতে পেরেছি আর কেউ তা পারেন নি। জাতীয় শিল্প সংস্কৃতির এই সব মহামূল্য সম্পদ ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার আরকাইভস অফ ইণ্ডিয়ার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। অনেকেই এর সুযোগ গ্রহণ করেছেন। উদ্যোক্তাদের আর্থিক অসংগতির জন্যই বর্তমানে জনসাধারণ সংগ্রহশালার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমার পূর্ববর্তী আচার্যগণকে আমি অন্ধের মত মেনে নিইনি। তাঁরা যে উপাদানগুলির সাহায্য নিয়েছেন সেগুলি ছাড়াও নতুন নতুন সংগৃহীত নজিরের সাহায্য আমি নিয়েছি। তাই পরিচিত তথ্য বা তারিখের সংগে আমার কোন কোন তথ্য বা তারিখের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। অনেক কিছু আমি গ্রহণ করেছি—অনেক কিছু বর্জনও করেছি। অবশ্য সম্ভাব্য সংগৃহীত নজিরের ওপর নির্ভর করে। আজ যা বলছি—নতুন নজির আবিষ্কার করার পর—ভিন্ন কথা বলাই স্বাভাবিক। নির্ভরযোগ্য বা প্রকাশিত কোন পুস্তকের কোথায় কোন ভ্রান্তি আছে—তা নিয়েও বর্তমানে আলোচনা করবো না। তার ক্ষেত্র পৃথক।

তথ্যগত অসাবধানতা বা মুদ্রণ বিষয়ক ভ্রান্তি সম্পর্কে লেখক সর্বাগ্রে সুনিশ্চিত হন। ভাল গবেষণার সংগে যখন লিপ্ত আছেন তখন গভীর জলে ডুব দিন। অংপ জলের মধ্যে পুঁটি মাছের মত ফরফর করবেন না। লেখকের অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে নিজের কথাও এসে পড়াতে আমি লজ্জিত। কারণ আমার অতীত বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনদিনই নিজেকে জাহির করতে চাইনি বা চাইবো না—অন্তত অমৃতের পৃষ্ঠায়।

বিহারীলাল সম্পর্কে লেখক আত্মপ্রচার করতে গিয়ে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর রচনার নজির উত্থাপন করেছেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের শারদীয়া রূপা-মঞ্চে বিহারীলাল এবং অন্যান্যদের সম্পর্কিত আলোচনার জন্য পত্রলেখক যে কতবার

অমর সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থরাজি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	অশনিসংকেত	১০৲
বিমল মিত্রের	আমি	১০৲
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের	কাজলের রঙ	৫৷৷
আশাপূর্ণা দেবীর	নীল পর্দা	৫৲
বিমল করের	যাদুকর	৫৷৷
নীহাররঞ্জন গুপ্তর	রাত্রি নিশীথে	৭৷৷
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের	তিন সঙ্গিনী	৩৷৷
সুমথনাথ ঘোষের	জলধিতরঙ্গে	৫৲
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের	বিদেশিনী	৪৲

অমর সাহিত্য প্রকাশন ঃ ৭ টেমার লেন, কলিকাতা—৯

এসে অভিনন্দন জানিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। এসব কথা অস্বীকার করলেও ১৯৫৬ নিশ্চয়ই ১৯৬৬ নয়। শিশিরকুমার সম্পর্কিত আলোচনায় অনেকেই আসর বাজীমাৎ করেছেন—কিন্তু রূপ-মঞ্চের শিল্পীর শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বে কে কতটুকু তথ্যের অধিকারী ছিলেন তা আমার জানা আছে। সেসব অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা করবো না। ১৯২০ থেকে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মঞ্চ বিষয়ে কে কতটুকু বলেছেন না বলেছেন এবং কার কতটুকু বলার অধিকার ছিল বা আছে আমি তা জানি। এবং জীবিত সকলের চেয়ে বেশী জানি। তাই অহেতুক বাগাড়ম্বরের প্রশ্রয় দেব না।

অহীন্দ্র চৌধুরী বা বিহারীলাল প্রসঙ্গে লেখকের প্রথম পত্রের উত্তরে বিগত ১০ জানুয়ারী আমার যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তাই শেষ এবং অভ্রান্ত। ২৮ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত লেখকের আত্মপ্রচার-ধর্মী বাতুলতার প্রশ্রয় আমি দেবো না।

৭ মার্চ ১৯৭৫ তারিখে লেখকের তৃতীয় পত্রের মধ্যেও একই মনোবৃত্তি ফুটে উঠেছে।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রসংগতই বিনোদিনীর কথা এসে পড়েছে; বিশেষভাবে নয়। উক্ত সংখ্যার ৬৩ পৃষ্ঠার মুদ্রিত হয়েছে।

বিনোদিনীর আনুমানিক জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ বেণীসংহার নাটকে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মঞ্চজগত থেকে যখন বিনোদিনী বিদায় গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ২৩। বিনোদিনীর মঞ্চজীবন আট বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে বিনোদিনীর মৃত্যু হয়। জীবিত থাকাকালীন সময়ে দুবার তার গৃহে বিনোদিনীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। মৃত্যুর পরও বিনোদিনীর বংশধরদের সংগে আমার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়নি। বিনোদিনীকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। কিন্তু এই সব আলোচনায় বহু ভ্রান্তি দেখা যায়। বিনোদিনী সংক্রান্ত পৃথক আলোচনায় এই সব ভ্রান্তির নিরসন করা হবে।

বেণী সংহারের অনুসরণে শত্রু সংহার লিখিত বলে শত্রু সংহার বেণী সংহার নামেই পরিচিতি পায়। তাই বিনোদিনী আমি বা আর কেউ যদি শত্রু সংহার স্থলে বিনোদিনী প্রসংগে বেণী সংহার উল্লেখ করেন তাতে ভ্রান্তি নেই। আবার গ্রেট ন্যাশনাল ন্যাশনাল নামে পরিচিতি পেত বলে বিনোদিনী তাঁর জীবনীতে অনুরূপ ব্যবহার করাতেও তাঁর ক্ষেত্রে ভুল নয়। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক যখন তথ্যমূলক কিছু লিখতে যাবেন—তখন তাঁকে ওটা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। শিল্পীদের ক্ষেত্রে রহস্যস্থানে এমনি বিভ্রান্তি দেখা দেয়। পূর্বে বড় ছোট বেঁটে খোঁড়া বেড়াল মোটা এমনি নামে এক একজনকে পার্থক্য করা হতো। কোন লেখক এই বিশেষণগুলি যদি নামের সংগে না রাখেন তবে মারাত্মক ভুল হবে না—কিন্তু পরবর্তীকালের লেখকেরা বিভ্রান্তির মধ্যে হাবুডুবু খাবেন। মঞ্চ এবং মঞ্চলোকবাসী-দের সংগে যাঁরা নিবিড় সংস্পর্শে আসতে পারেন না তাঁরাই এমনি ভুল করে থাকেন। তবু এই ভুলগুলি মারাত্মক নয়—যত মারাত্মক হবে বিনোদিনীর ধারণার উপর নির্ভর করে যাঁরা লিখবেন—বিনোদিনী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ-দান করেছিলেন এবং তাঁর কার্যকাল ১৮৭২ থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সীমিত ছিল—অর্থাৎ ১৪ বছর অভিনয় করেছিলেন। আশ্চর্য পত্রলেখক এরূপ তথ্য-বাহী সংকলনটির কথা উল্লেখ করেছেন। এই ভুল সম্পর্কে সম্পাদকদ্বয়ের জনৈক বন্ধুর আমিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম প্রযোজক বিমল দের কার্যালয়ে এক আলোচনা বৈঠকে। তারপর শিব ভট্টাচার্য রূপ-মঞ্চ পত্রিকায় এক আলোচনা প্রকাশ করেন।

বিনোদিনীর আত্মজীবনী তাঁর প্রতিকৃতি-১৯৪০ থেকে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সর্বপ্রথম রূপমঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং আমি বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখি। বিনোদিনী তাঁর পুস্তকটির একটি খণ্ড ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে উপহার দিয়েছিলেন—সেই খণ্ডটি থেকেই রূপমঞ্চে প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া নটীমন্দির রূপ ও রঙ্গ থেকেও। শ্রদ্ধেয় তুষারকান্তি ঘোষের বরাবরই এ-বিষয়ে আগ্রহ। তাই তিনি ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে অতর্কিতে যখন একবার রূপমঞ্চ কার্যালয়ে পদার্পণ করেন, তখন উক্ত খণ্ড আর রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা তাঁকে আমরা উপ-হার দিই। আমাদের সংগ্রহে যে খণ্ডটি আছে তা উপহার দিয়েছিলেন হেমন্তকুমারী। বিনোদিনী সংক্রান্ত আলোচনা পত্রলেখকের আলোচ্য সংকলনের ৭।৮ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়—তিনি সে-বিষয়ে নির্বাক। পরে প্রকাশিত ভুল তথ্য সম্পর্কিত সংকলন কথাটির কথা উল্লেখ করাতে তাঁর অনুসন্ধিৎসার দৌড় এবং এসম্পর্কিত হীন উদ্দেশ্যও প্রকটিত।

আমার রচনায় পরিষ্কার মুদ্রিত হয়েছে ১৮৭৪ থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিনোদিনী মঞ্চজগতে ছিলেন। যোগবিয়োগ সম্পর্কে লেখকের সাধারণ জ্ঞান থাকলে নিশ্চয়ই ১২-র স্থলে ৮ মুদ্রিত হবার মুদ্রণ-ভ্রান্তিকে নিয়ে তিনি উত্তেজিত হতেন না। দানীবাবুর জীবনীতেই তাঁর সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্যাদি আলোচনার জন্যই অন্যান্য আলোচনা করা হয়নি। চণ্ড নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গেই দানীবাবুর কথা টানা হয়েছে। চণ্ড নাটকে বুদ্ধদেব চরিত্র যে নেই, সেটুকু পাঠকসাধারণ বুঝতে পেরে রঘুদেব স্থানে বুদ্ধদেব-এর মুদ্রণ-ভ্রান্তিকে মেনে নেবেন। চন্দ্রহাসের অভিনেতা শরৎ-কুমার সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা চলে। আর্য নাট্য সমাজের সঙ্গে রাজকুমার রায়ের বিরোধ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। বীণা স্টেজে চুণীলাল দেবের যোগদান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। এর মাঝে স্টার থিয়েটারে রাজকুমার রায়ের যোগদান নিশ্চয়ই ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে হতে পারে না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দেই হবে। রাজকৃষ্ণ রায় সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য বিতর্কিত—তাই সন্দেহাতীত তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র এবং অমরেন্দ্রনাথ লিখিত 'দোললীলা'র পরিচিত তথ্যাদি আমার কাছে থাকাতেও গিরিশচন্দ্রের নামোল্লেখ করার কারণ আছে। এমনকি অমর দত্ত সংক্রান্ত আলোচনায়ও করেছি। গিরিশচন্দ্রের আলো-চনায় যখন আসবো, তখন সব উদ্ঘাটন করবো—তার পূর্বে নয়। তাই লেখক বা অন্যান্যরা যাই ভাবুন—সঠিক না হওয়া পর্যন্ত এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু আমার কাছে ভিন্ন নজির আছে। বীণা থিয়েটার কোথায় অবস্থিত ছিল—সে-কথা বোঝাতেই বহুদিন থেকেই বর্তমান ঠিকানা অনুসৃত হয়ে আসছে। কলকাতার রাস্তার ইতিহাস লিখতে গেলে এগুলির প্রয়োজন, নাট্য-ইতিহাসের ক্ষেত্রে নয়।

সর্বশেষে পাঠকসাধারণের কাছে আমার অনুরোধ, 'অমৃত' পত্রিকার পাঠক সেজে যাঁরা নিজেদের ঢক্কানিনাদ বা ব্যক্তিগত ক্ষোভের ঝাল মেটাতে আসবেন—তাঁদের দ্বারা যেন বিভ্রান্ত না হন। অন্যমনস্কতা ও মুদ্রণ-ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। সে-বিষয়ে আমাদের অসহায়তার কথা বার বার বলছি। মুদ্রণ-ভ্রান্তিতেও তথ্যভ্রান্তি হওয়া অস্বা-ভাবিক নয়। প্রতি সংখ্যার ভ্রান্তি যদি পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করবার সুযোগ থাকতো—আমি তা করতাম। কিন্তু আমি নিজেই সুনিশ্চিত নই যে, কোন সংখ্যায় কতটুকু লেখা যাবে বা যাবে না। তাই বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় এবং মারাত্মক মুদ্রণ-ভ্রান্তি অর্থাৎ যেসব ভ্রান্তিতে তথ্য-গত ভ্রান্তির আশংকা থাকবে—তা নিয়ে পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী এক একটি যুগের আলোচনা শেষে সংশোধনী আলোচনা তুলে ধরবো। এর পর স্বনামে বা বেনামে এসম্পর্কিত কোন পত্রের উত্তর আমি দেবো না।

কালীশ মুখোপাধ্যায়।

(এ সম্পর্কে আর কোনো চিঠি প্রকাশ করা হবে না। অঃ সঃ)

সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে

২১শে ফেব্রুয়ারী অমৃতে প্রকাশিত 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে' শিরোনামায় বারিদবরণ ঘোষ মহাশয়ের চিঠিটি আগ্রহ-সহকারে পড়লাম।

পত্রলেখক লিখেছেন 'অনেক পাঠকের মনে এই, ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মতবাদকে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না, তাঁকে তিনি তেমন পছন্দ করতেন না এবং এরই পরিণাম-স্বরূপে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে পরিত্যাগ

করেন।' প্রমাণস্বরূপ তিনি নেতাজীর কিছু উক্তি (ইংরাজীতে) ব্যবহার করেছেন। এর সাহায্যে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, গান্ধীজীর প্রতি নেতাজীর কত আস্থা ছিল, ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে কিছু লেখবার আগে আমি নেতাজীর কিছু উক্তি তুলে ধরছি। সিভিল সার্ভিস পরিত্যাগ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবার আগে নেতাজী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং স্বরাজ অর্জনের কর্মপন্থার বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানতে চান সেগুলি তিনি তাঁর বই 'ভারতীয় সংগ্রাম'-এ লিখেছেন। বইটিতে তিনি লিখেছেন—বিলাতে থাকতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী নেতাদের সংগ্রাম-পথ ও কর্মকৌশল সম্বন্ধে আমি কিছু পড়াশুনা করেছিলাম এবং সেই পড়াশুনা অর্জিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গান্ধীজীর পরিকল্পনা কিভাবে ধাপে ধাপে বিদেশী সরকারের হাত থেকে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব করায়ত্ত করতে সক্ষম হবে।

(Ultimate seizure of power from the foreign bureaucracy),

তার বিভিন্ন পর্যায়ের একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা আমি জানতে চেয়েছিলাম। প্রথমত, কি করে কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মধারা খাজনা বন্ধ আন্দোলনের অন্তিম পর্যায়ে পর্যবসিত করা হবে? দ্বিতীয়ত কি উপায়ে শুধুমাত্র খাজনা বন্ধ করে অথবা আইন অমান্য করে সরকারকে শাসন-কর্তৃত্ব পরিত্যাগে বাধ্য করে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্ভব হবে? তৃতীয়ত, কিভাবে গান্ধীজী এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জন করতে সক্ষম হবেন?

বিদেশী বয়কট...খাদি প্রচার...সরকারকে আক্রমণের সুযোগদান এবং শেষে সরকারী আইন অমান্য করে স্বেচ্ছায় সরকারী কারাগার প্লাবিত করার কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে এসে চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের চরম অবস্থায়। এমনিভাবে গান্ধীজী প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক মনে হল। কিন্তু বাকি প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর আমার বোধগম্য হল না। আমি গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, বয়কট আন্দোলন কি ল্যাংকশায়ারে, এমন দুর্দশা ঘটাতে পারবে যার ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার উপর চাপ পড়বে? এ-প্রশ্নের উত্তরেও গান্ধীজীর মতামত আশাপ্রদ মনে হল না। ...আমি নিজেকে সে-সময় অনেক বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, আমারই হয়তো বুঝবার ভুল রয়েছে কিন্তু আমার বিচার-বুদ্ধি বারবার বলতে লাগলো যে, গান্ধীজীর পরিকল্পনায় অনেক গুরুতর ত্রুটি রয়েছে এবং কি করে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে এই আন্দোলন ভারতবর্ষকে তার অভীষ্ট স্বাধীনতার দ্বারদেশে পৌঁছে দেবে, সে-সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিজেরও বোধহয় সুস্পষ্ট ধারণা নেই।' গান্ধীজী আপোষবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বস্তুত, তাঁর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল আপোষ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। এই প্রসঙ্গে নেতাজী বলেছিলেন—

"Independence admits of no compromise. Freedom has only one connotation, namely, that the British must quit India for good".

সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে নেতাজী বলেছিলেন—

"I believe that this method will not succeed in bringing us complete independence."

নেতাজীর রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করে দেখলে আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাব যে, তিনি রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদকে ভারত থেকে উৎখাত করতে অস্ত্রধারণ করতেই হবে। তাই তিনি বলেছিলেন—

"Compromise with Britain means compromise with slavery".

তিনি জানতেন—

"It is midsummer madness that we should expect the Englishman to voluntarily give up their Empire".

জানি না বারিদবাবু এ-ব্যাপারে কি বলবেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এই দেখে যে, তিনি নেতাজীর যে উক্তিগুলি ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে কিন্তু কোথাও দেখা যাচ্ছে না যে নেতাজী গান্ধীজীর রাজনৈতিক কর্মপন্থায় আস্থাবান ছিলেন। নেতাজী ব্রিটিশ শক্তি বিতাড়নে তাদের বিরোধী সবরকম গোষ্ঠীর সাহায্য চেয়েছিলেন। সেইজন্যই তো তিনি হিটলারের মতন লোকেরও সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে কি আমরা মনে করে নেব যে তিনি হিটলারের ফ্যাসীবাদকে শ্রদ্ধা করতেন বা তার উপর তাঁর আস্থা ছিল? নিশ্চয়ই নয়। নেতাজী গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তাই বলে যে নেতাজী গান্ধীজীর আন্দোলন অভ্রান্ত ভেবেছিলেন এ-কথার কোন যুক্তি নেই। (কেউ যেন না ভাবেন আমি হিটলার ও গান্ধীজীকে এক ভেবে এইরূপ তুলনা করলাম)। বারিদবাবুর চিঠিতে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, তিনি গান্ধীজীর প্রতি নেতাজীর কেন বিরূপ ধারণা (আন্দোলনের প্রতি) সহ্য করেন না এবং সেই হেতু তিনি বোঝাতে চেয়েছেন গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রতি নেতাজীর পূর্ণ আস্থা ছিল। কিন্তু প্রথমদিকের উক্তিগুলি যে এরূপ বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, সে আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি। পরিশেষে একটা কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি। নেতাজী মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ, ফ্যাসীবাদ প্রত্যেক বাদকেই সমালোচনা করেছেন। এবং প্রতিটি বাদেরই কমবেশী ত্রুটি দেখিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তো তিনি কারও কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে দাঁড়াননি। তবে কেন তিনি কিছু অপ্রয়োজনীয় উক্তি ব্যবহার করে নেতাজী সম্বন্ধে অন্য ধারণা জাগাবার চেষ্টা করছেন? গান্ধীজীর প্রতি নেতাজীর আস্থা ছিল না এ-কথা অন্যায় ভেবে?

অমিতাভ ঘোষ
হালিসহর ২৪ পরগণা।

সাহিত্য সংসদ -এর

রচনাবলী গ্রন্থমালা

মধুসূদন রচনাবলী

চিঠি ও ইংরেজিসহ সমগ্র রচনা একখণ্ডে। (২২-৫০)।

দীনবন্ধু রচনাবলী

দীনবন্ধু মিত্রের সমগ্র রচনা একখণ্ডে। (১৫-০০)

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৭-৫০)। দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য-অংশ (২২-৫০)। তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি রচনা (১৫-০০)।

দ্বিজেন রচনাবলী

সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে (১ম খণ্ড ১৫-০০; ২য় খণ্ড ১৭-৫০)

গিরিশ রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত। (প্রতি খণ্ড ২৫-০০)। পঞ্চম খণ্ড যন্ত্রস্থ।

প্রতি রচনাবলীতে জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯

ঢাকা থেকে ফিরে

নিমাই ভট্টাচার্য

আচ্ছা মা, আমার জীবনে কী সবকিছুই হঠাৎ ঘটবে? তুমি জান আমার ঢাকা যাবার ইতিহাস? কাহিনী?

তোমাদের অর্থমন্ত্রী ডকটর মল্লিক এইত সেদিন পর্যন্ত আমাদের এখানে সেনিার বাংলার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। রাষ্ট্রদূতের জীবনধারাই বিচিত্র। সম্মান আর প্রাচুর্যের মধ্যেও ডকটর মল্লিক অধ্যাপনা জীবনের সারল্য ও মাধুর্য হারাতে পারেন নি। কবে যেন কিভাবে ওঁর সঙ্গে আলাপ হলো। তারপর একদিন আবিষ্কার করলাম আমাদের দুজনের মাঝখানের দূরত্ব হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। একাকার হয়ে গেল ভাবীজির ঔদার্যে। ঢাকা যাতায়াতের পথে অগণ্য মানুষ ওদের উদার আতিথ্য উপভোগ করতেন আর আতিথ্য আপ্যায়নের প্রথম উপকরণ ছিল আমার বই। মেমসাহেব, ডিপ্লোম্যাট উইং কমান্ডার বা অন্য কোন বই। মল্লিক পরিবারের সঙ্গে আমার হৃদ্যতার ইতিহাস দীর্ঘ দিনের না হলেও ঘটনাবহুল। পরে একদিন সময় সুযোগ মত তোমাকে বলব। শুধু জেনে রাখো ডকটর মল্লিক একবার আমার 'মেমসাহেব' আর 'ডিপ্লোম্যাট' বঙ্গবন্ধুকে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর গত বছর মে মাসে যখন বঙ্গবন্ধু দিল্লী এলেন তখন হঠাৎ আমার তলব পড়ল রাষ্ট্রপতি ভবনে। জরুরী কাজে বেরিয়ে ছিলাম। তাই সেখানে যখন খবরটা পেলাম তখন ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। বাড়ী এসেই টেলিফোন করলাম। বঙ্গবন্ধুর সেক্রেটারী বললেন, এক্ষুনি চলে আসুন। ছুটে গেলাম। শুনলাম পনের মিনিট সময় কিন্তু কতক্ষণ পরে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে ছুটি পেলাম জান? এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে বঙ্গবন্ধু বললেন, নিমাইবাবু, ঢাকা আসুন। দেরী করবেন না। ডকটর মল্লিককে বললেন, নিমাইবাবুকে তাড়াতাড়ি ঢাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মনে মনে খুশী হলেও তখন ঢাকা যাবার অবকাশ ছিল না। অমৃতে আমার ধারাবাহিক পিকাডিলি সার্কাস ছাড়াও পূজা সংখ্যার দু-তিনটি উপন্যাস লিখছিলাম।

ঢাকা যাবার স্বপ্ন বহুদিনের। সেই ছোটবেলা থেকে বহুজনের কাছে ঢাকার গল্প শুনেছি। পড়েছি বহু ইতিহাস, জেনেছি নানা কাহিনী। রমনা, সদরঘাট, মিটফোর্ড হাসপাতাল, কার্জন হল, জগন্নাথ কলেজ ও আরো কত কি সম্পর্কে মনের মধ্যে নানা ছবি ভীড় করেছিল। গোয়ালন্দ থেকে ষ্টীমারে চড়ে তোমাদের বরিশালে যাবার ইচ্ছা বহুদিনের। দেশ-বিদেশ

স্মরণীয় একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে বাংলা একাডেমীর সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ভারত সরকার শ্রীঅন্নদাশংকর রায়ের নেতৃত্বে এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল পাঠান। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্য-সদস্যা ছিলেন—শ্রীমনোজ বসু, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী শ্রীমতী লীলা রায় শ্রীসচী রাউথ রায় জরাসন্ধ ডকটর সুশীল রায়, ডকটর নরেশ গুহ ও শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য।

এই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফরের পটভূমিকায় এই লেখাটি প্রকাশ করা হলো।

ঘুরেছি বহুবার কিন্তু জাহাজ-ষ্টীমারে চড়ার সৌভাগ্য আজো আমার হয়নি। তাইতো এবার ঢাকা গিয়ে একবার সামান্য কিছুক্ষনের জন্য ছুটে গিয়েছিলাম সদরঘাট। একটা ষ্টীমারেও চড়েছিলাম।

যাই হোক অর্থমন্ত্রী হবার কয়েক দিন আগে ডকটর মল্লিক আর ভাবীজি হঠাৎ আমার আস্তানায় এসে হাজির। অনেকক্ষণ গল্পগুজব করার পর ডকটর মল্লিক বললেন, নিমাইবাবু, এবার আপনাকে ঢাকা যেতেই হবে। বললাম, নিশ্চয়ই যাব। কয়েক দিন পর তোমাদের দূতাবাসের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডকটর সিরাজুল ইসলাম বললেন, পাসপোর্ট ঠিক করে রাখুন। তারপর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসান্সের ডেপুটি সেক্রেটারী ও আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু শ্রীনিবাসনের টেলিফোন, নিমাই ইউ মাষ্ট গো টু ঢাকা।

কবে?

দু একদিনের মধ্যেই।

দু একদিনের মধ্যে যাওয়া তো বোধহয় সম্ভব হবে না।

নো, নো, ইউ মাষ্ট গো...

অনেকবার বলেও ফল হলো না। শ্রীনিবাসনের কাছে স্বীকৃতি জানাতেই হলো। তারপর আমার কিছু দৌড়দৌড়ি আর দিল্লী-কলকাতা-ঢাকার মধ্যে কয়েকবার টেলেকস-টেলিফোন-টেলিগ্রাম বিনিময়ের পর আঠারই সকালে সত্যিই আমি ঢাকা পৌঁছলাম।

আমি সাংবাদিক। হঠাৎ একদিন গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করলাম। ঢাকা যাবার কদিন আগেই 'নাচনী' বেরুল। এটি আমার পঁচিশ নম্বর বই। মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখলেও সাহিত্য-টাহিত্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই। সময় ও পয়সা ব্যয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অ্যানাটমি বা ডিসেকশন ক্লাস করার দুর্লভ সুযোগ আমার জীবনে আসে নি। ষোল-সতের বছর বয়স থেকে টিউশানি করতে হলে কী ওসব বিলাসিতা সম্ভব? তুমি শুনলে অবাক হবে যে কলকাতার বহু সাহিত্যিককেই আমি দেখি নি। আমাদের প্রতিনিধি দলের নেতা অন্নদাশংকর রায়ের পথে প্রবাসে পড়ে মুগ্ধ, স্তম্ভিত হয়েছি, আমার বেসুরো গলায় তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো তোমরা যে ভাই ধেড়ে খোকা বলা ভেঙে ভাগ করো তাঁর বেলা? গেয়েছি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। 'তোমাকে' লেখার

সময় উড়িষ্যার ঢেংকানলে গিয়ে তাঁর জন্ম-স্থান দেখে এলেও এই এবার ঢাকাতেই অন্নদাশংকর রায়ের সংগে আমার প্রথম দেখা, প্রথম আলাপ। দিন ভরে ওঠে স্বাদে, ভরে রাত, তুমি কাছে নাই। বসন্তের জানালার 'মাঘের রাতের শীত একলা পোহাই' পড়ে আনমনা হলেও কবি নরেশ গুহকে প্রথম দেখলাম। তোমাদের বাংলা একাডেমীর চত্বরে। ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে গুরুগম্ভীর হয়ে মঞ্চ থেকে ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের মত তত্ত্ব বা উপদেশ বিতরণ আমার ভাল লাগে না বলেই ওসব কারবার থেকে আমি দূরে থাকি। এবারও মঞ্চ থেকে ভাষণ দেবার লোভে ঢাকা যাই নি, গিয়েছিলাম বন্ধু সন্দর্শনে, তোমাদের একটু কাছ থেকে দেখতে, নিজের শূন্য ঝুলিতে কিছু রসদ ভরে নেবার লোভে।

শিয়ালদ স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাট-ফর্ম থেকে ই বি আরের কুলীন মেল ট্রেনে চড়ে, গোয়ালন্দে ইলিশ মাছের ঝোল খেয়ে পদ্মা-মেঘনা-বুড়ীগংগার কোলে দুলতে দুলতে সোজন বাদিয়ার ঘাটে নেমে নকসী কাঁথার মাঠ মাঠের ধান—গাছের আম খেয়ে আমি ঢাকাকে ভালবাসতে পারি নি। আমি এ যুগের মানুষ। আমি শিয়ালদ স্টেশনের পাশে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশে জন্মেছি বৈঠকখানা বাজারের দোকানদারদের খিঁচুনি অগ্রাহ্য করেও সিদ্ধ সন্ন্যাসীর ঔদার্য দেখিয়ে ছোট্ট তেলের শিশিটা ভরে এনেছি দিনের পর দিন। তাইতো ঢাকা আমার রসনা তৃপ্তির তীর্থক্ষেত্র নয়; আমার কাছে আধুনিক আন্তর্জাতিক ইতিহাসের পাতায় ঢাকা একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। আলজিরিয়া, ভিয়েতনামের পাশাপাশি তার আসন।

তুমি তো জান মা, পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী ভরা। এখনও আকাশের রং লাল বাতাসে বারুদের গন্ধ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতার জন্য কত যুদ্ধ হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে, তার ঠিকঠিকানা নেই, কিন্তু মাতৃভাষার জন্য, 'নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়' যে দুখিনী বর্ণমালা তার জন্য তো শুধু তোমরাই হাজারে-হাজারে লাখে-লাখে সন্তানস্নেহে শত্রুর বুলেটগুলো বুকের মধ্যে তুলে নিয়েছ। না মা না, পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় এ নজীর আর নেই, বোধহয় আর হবেও না। কদিন ঢাকায় কাটিয়ে প্রাণ মন দিয়ে উপলব্ধি করেছি সত্যিই তোমরা দুখিনী বর্ণমালাকে রাজরাজেশ্বরীর স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছ। মন্দির-মসজিদের চাইতে বাংলা একাডেমী যদি সত্যি বেশী পবিত্র না হতো তাহলে একুশে ফেব্রুয়ারীর সপ্তাহব্যাপী উৎসবে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে কত অঘটন ঘটতো। পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে বাঙালী ভাবাবেগের প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। বহু ইংরেজি কেতাবে লেখা আছে বেঙ্গল ইজ হোম অফ রিভলিউশনারিজ, জুট অ্যান্ড প্যোয়েটস), কিন্তু তারা তো জানে না এত ভালবাসা পৃথিবীর আর কোন দেশের মানুষের মনের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বাঙালী সাম্রাজ্য বিস্তার করে নি, পরের দেশ লুণ্ঠন করে নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করেনি, সম্পদ-সম্ভোগের ধ্বজা উড়িয়ে অত্যাচার-অবিচার-ব্যভিচারে পৃথিবীর মুক্ত বায়ু দূষিত করে নি ঠিকই কিন্তু দারিদ্র্যকে খৃষ্টের সম্মান দিয়েছে, অশিক্ষিত অর্ধনগ্ন মাঝির গলায় ভাটিয়ালী গান শুনিয়েছে। শুধু বাহবা পাবার লোভে এসব ভাবাবেগের কথা বলছি না। বলছি এই জন্য যে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' দেখার জন্য বাংলা একাডেমীর প্যান্ডেল উপচে পড়েছে মানুষের ভীড়ে। দেশে কেরোসিন নেই, ঘর অন্ধকার কিন্তু মন অন্ধকার হতে পারে নি বলেই 'তৈল সংকট' নাটক দেখে তোমাদের হাজার হাজার মানুষকে হাসতে দেখেছি। এ রস-জ্ঞান, এ জীবনবোধ যাদের আছে তারা ইতিহাসের পাতা থেকে কোনদিনই মুছে যাবে না। যেতে পারে না। তাই না মা?

দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করার ফলে পৃথিবীর কত ঐতিহাসিক ঘটনা দেখেছি, টাইপরাইটার খটখট করে সেসব সংবাদ পাঠিয়েছি আমার কাগজের দপ্তরে কিন্তু বিশে-একুশে ফেব্রুয়ারীর সন্ধিলগ্নে শহীদ মিনারে যে বিনম্র বিমুগ্ধ জাতিকে আমি দেখেছি, যেভাবে শহর-নগর-গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষকে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি' গাইতে গাইতে খালি পায়ে তীর্থ পরিক্রমা করতে দেখেছি, দেখেছি শহীদ বরকতকে কোলে নিয়ে ঢাকার সমস্ত মানুষকে রাত জাগতে, তার তুলনা সত্যি বিরল। রাত তখন বারোটা। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালিকা ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিমের পিছনে ভারতীয় সাহিত্যিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখা শিরোমাল্য নিয়ে আমি আর ধ্রুপদী সম্পাদক কবি সুশীল রায় আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখলাম কামাল নীলিমাদির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বললো আপা বংগবন্ধুর পরই আপনারা এগিয়ে আসবেন। টেমস-এর পাড়ে কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেই কুইনের পরে অকসফোর্ড-কেম্ব্রিজের ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের স্থান নেই। রাষ্ট্রপ্রধানের পাশেই শিল্পী-সাহিত্যিকের স্থান নেই পৃথিবীর অন্য কোন দেশে, কিন্তু ঢাকার মাটিতে বংগবন্ধুর পাশে দাঁড়াবার অধিকার আছে বাংলা একাডেমীর কর্ণধারের। মন্দির-মসজিদ দর্শনের চাইতে এ দৃশ্য দেখা আমার কাছে অনেক পবিত্র, স্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক।

মা অনেক কথাই লিখতে ইচ্ছা করছে কিন্তু কত কথা লিখব? তুমি, তোমরা নতুন যুগের মানুষ। অতীত দিনের বাঙালীর জীবনের দৈন্য তোমরা দেখনি কিন্তু আমি, আমরা কিছু কিছু দেখেছি। সে দৈন্য, হীনতা হয়ত আজও আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। তাইতো শহীদ মিনারের অনুষ্ঠানে শত-শত সহস্র-সহস্র মেয়েকে লাল ব্লাউজ, লালপেড়ে শাড়ী পরে শহীদ তর্পণের গান গাইতে দেখে অবাক হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি বুলবুল একাডেমীর সারা রাত্রিব্যাপী সংগীতানুষ্ঠানের মঞ্চে বরণ-ডালা আর প্রদীপ দেখে। পুরানো দিনের মরচে পড়া মানুষগুলোর কথা বাদ দাও। এই পৃথিবীতে আর কদিনই বা তাদের মেয়াদ! তোমরা যারা নতুন যুগের মানুষ, যাদের কণ্ঠে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কামানের গর্জনকে স্তব্ধ করেছে, যারা যুগ যুগ সঞ্চিত ধর্মের কুসংস্কার নোংরা আবর্জনার মত বর্জন করে কল্যাণের প্রতীক বরণডালা হাতে তুলে নিয়েছ, যারা আলাউদ্দিন আল আজাদের 'বৃষ্টি' পড়ে বহু বিবাহ প্রথাকে উপহাস করেছ, তারা আমার নমস্য, তারা ইতিহাসের পাতায় নতুন আশার আলো।

তুমি তো দেখেছ আমার পাশেই জরা-সন্ধ থাকতেন। লৌহকপাট ভেঙ্গে উনি আমাদের সবাইকে এক নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেও বাকস-পেটরা ঠিক-ঠাক করে দেশে দেশে-ঘুরে বেড়াবার ক্ষমতা ওঁর নেই। বৌদি ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে গেলাস গেলাস হরলিকস আর কড়া পাকের সন্দেশ খাইয়ে ওঁর কর্মদক্ষতার আরো বারোটা বাজিয়েছেন কিন্তু ঢাকায় গিয়ে দাদার আমার কোন কষ্ট হয়নি। কেমন করে যে অতগুলো মেয়ের কাকাবাবু হলেন তা আমি জানি না। ভাইঝিরাই দাদাকে নিয়ে ঘুরল, বাকসটাকসী গোছগাছ করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিল। অন্নদাশংকর-লীলা রায় যে কত শত ছেলেমেয়ের কাকা কাকিমা তা আমি জানি না। অতো অনার্স না থাকলে অত ভাইপো-ভাইঝির হিসাব রাখা সম্ভব নয়। ভাইপো-ভাইঝিদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি ঠাট্টা করে দাদাদের বলতাম আমিও কাকাবাবু হবো। বল তো মা, নিজের মাতৃ-ভাষাকে কত গভীরভাবে ভালবাসলে এভাবে সাহিত্যিকদের আপন করে নেওয়া যায়। কবিগুরুর স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে স্রোতের ধারার মত ছেলেমেয়ে আসত কবির গল্প শুনতে। আমি হিংসায় জ্বলে-পুড়ে দিদিকে বিরক্ত না করে পারতাম না। ভুলি নাই-এর মনোজদা বাংলাদেশে সত্যি ভুলি নাই। নবীন-প্রবীণ সবারই মনোজদা। এমন কী বঙ্গবন্ধুরও মনোজদা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় ওড়িয়া কবিতা লিখে কলিংগের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সচীরাউথ রায়ও কি তোমাদের ওখানে কম সমাদৃত!

মা, ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের কনিষ্ঠতম সদস্য ছিলাম আমি। শিক্ষা-দীক্ষা-অভিজ্ঞতা সব দিক থেকেই আমি লাইনের শেষে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু তোমার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে নিয়ে কী কাণ্ডটা করল বলতো। নীলিমাদির বকুনি আর বাংলা একাডেমীর রহমান সাহেবের টানাটানি অগ্রাহ্য করে রোকেয়া হলের মেয়েরা মৌমাছির মত আমাকে যেভাবে ঘিরে ধরে-ছিল তা দেখে আমাদের প্রতিনিধি দলের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা সত্যি দুঃশ্চিন্তায় পড়ে-ছিলেন, কিন্তু আমি কি করব? মাতৃতুল্যা কবি সুফিয়া কামাল থেকে শুরু করে কলেজ-ইউনিভার্সিটির হাজার হাজার ছেলে-মেয়েরা যদি আমার কালো মেমসাহেবকে ভালবাসেন, তার জন্য চোখের জল ফেলেন, তাহলে আমি তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখব কিভাবে? অটোগ্রাফ দিতে দিতে দুটো কলমের কালি আর কোথাও কী ফুরিয়ে যাবে? জানি না। জানি না আর কোথায় আমার অবর্তমানে মেয়েরা অমন সুন্দর করে আমার ঘর গুছিয়ে দেবে, জানি না আর কারা কোথায় আমাকে নিয়ে এমন বেহিসেবী পাগলামি করবে।

ঢাকার কথা যত ভাবছি ততই অবাক হচ্ছি। আমি মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের কাহিনী মনে রাখলেও ভুলে গেছি কচের কাহিনী, কিন্তু তোমাদের জ্যাকোরিন সাহেব কিছুই ভোলেন নি। আমাদের সম্মানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত ভোজ-সভায় সে কাহিনী সবিস্তারে শুনে চুপ করে থেকেছি। মোকাম্মেল হক সাহেবের সংগে প্রাণভরে গল্প করার জন্য মনটা সত্যি ছটফট করছে। ভুলতে পারছি না ডকটর জালালুদ্দিনের অমায়িক আন্তরিকতা। কদিন ধরে দিনরাত্রি বকুনি দেবার পর নীলিমাদি তাঁর 'বাংলা কবি মধুসূদন' বইটি আমাকে উপহার দিয়ে কী লিখেছেন জান? লিখেছেন, মধুসূদন বলেছেন, নিম কি কখনও মধু হয়? নিমচাঁদকে দেখলে বলতেন, হয়। এমন বকুনি খাবার লোভ কত দিন সম্বরণ করে রাখব? এই কদিনের ঢাকার কাহিনী নিয়ে আরো কত কি লিখতে পারি কিন্তু লিখব না। সব সম্পদ বিলিয়ে দেব না কিছু কিছু মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে ইচ্ছা করছে। পূজা সংখ্যা পঞ্চাশ টাকায় বিক্রী হয় শুনলে কি কেউ এখানে বিশ্বাস করবে?

আচ্ছা মা, একটা কথা বলবে? আমি শৈশবেই মাতৃস্নেহ থেকে চিরজীবনের মত বঞ্চিত হয়েছি জেনে তুমি আমার সেই শূন্যতা ভরিয়ে দেবার জন্য কেন এভাবে এগিয়ে এলে? কেন সন্তানস্নেহে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করলে? কেন, কেন ঢাকা ছাড়ার আগে অমন করে আমাকে কাঁদালে? তুমিই বা কেন বিষণ্ণ করুণ জল-ভরা চোখে আমাকে বিদায় দিলে? দেশে-দেশে দিগ-দিগন্তে কত হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি, কিন্তু তোমার মত আর কোন সুন্দরী অরক্ষণীয়া যুবতী এভাবে আমাকে মাতৃত্বের অধিকার বিলিয়ে দিতে পারেনি। তুমি সত্যি অনন্যা। কিন্তু মা, এবার যে ভিসা নেবার সময় লিখতে হবে, টু অ্যাটেন্ড মাদার্স ম্যারেজ! তোমাদের সরকার ভিসা মঞ্জুর করবেন তো?

ঐ যে সুন্দর শিক্ষিত ভদ্র নম্র ছেলেটি—যে তোমার-আমার গাড়ীর ড্রাইভারী করছিল, তাকে বলো আমার মায়ের দেশ বরিশাল নিয়ে যেন আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। হাসিদ সানজিদা মাজলী মনু জাহাংগীর ও আমার হাজার তরুণ-তরুণী ভাইবোন বন্ধু-দের বলো বেশী দিন দিল্লী থাকতে গৌরব না ঢাকা আমাকে প্রতিনিয়ত ডাকছে।

আমার প্রণাম নিও।

তোমার স্নেহধন্য ছেলে নিমাই

মিস মাহমুদা বেগম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা; বাংলাদেশ

॥ আজকের দিনের বই ॥

মৃত্যুঞ্জয়ী জুলিয়াস ফুচিকের
ফাঁসীর মঞ্চ থেকে
অনুবাদ ঃ অশোক গুহ
সম্পাদনা ঃ সুশীল জানা ৪-০০

ডাঃ বি কে বসু ও অসিত সেনের
নতুন চীনের নতুন মানুষ ৪-০০

সুপ্রকাশ রায়ের
মাও সে-তুঙ ৫-০০

অন্যান্য বই ॥ প্রতিবেশী সূর্যের রক্তাক্ত দিনগুলি (ফ্যাসিবাদী বিরোধী গল্প সংগ্রহ) ৯-০০ ॥ সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঃ রেবতী বর্মণ ১০-০০ ॥ মে দিবসের কাহিনী ও ঐতিহ্য ঃ কেদারনাথ ভট্টাচার্য ৪-০০ ॥ সভাপতি মাও সে-তুঙ-এর উদ্ধৃতি ২-২০ ॥ দর্শন কি ও কেন ঃ মনোরঞ্জন রায় ২-৫০ ॥ হে স্বদেশ, অগ্নিময় স্বদেশ (কাব্য সংকলন) ঃ কমলেশ সেন সম্পাদিত ৩-০০ ॥ যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ কমলেশ সেন ৪-০০ ॥ ভিয়েতনামের কবিতা ঃ সম্পাদিত কমলেশ সেন ৩-০০ ॥

নিউ বুক সেণ্টার
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

—পঁয়ত্রিশ—

১৯৩৪ সালে গুরুদেবের জন্মোৎসবের দু-চারদিন আগে আমি চ্যাড়ুইককে পড়ে শোনাচ্ছিলাম তাঁর একটি সদ্যোজাত চিঠিঃ সনেট? আমার সনেট লেখার ফুর্সৎ নেই। নানা জরুরী কাজ আছে চিঠি লেখা ছাড়াও—ছন্দ নিয়ে লীলাখেলা এখন অসম্ভব।...ইত্যাদি।

ঠিক এই সময়ে শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত আমাকে এক তার দিয়ে গেলেনঃ '১৫ আগস্ট আপনার দর্শনের অনুমতি প্রার্থী। দিলীপ আমাকে জানে—অরবিন্দ।'

টেলিগ্রামের উপরে গুরুদেবের প্রশ্ন স্বহস্তে লেখাঃ দিলীপ জানাও ইনি কিনি আর এঁকে অনুমতি দেওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা।

হঠাৎ আমার কলমের পরে দুষ্ট সরস্বতী ভর করলেন—আমি লিখলাম উত্তর ইংরাজী ছড়ায়— যেটি আমার SRI AUROBINDO CAME TO ME-তে ছাপা হয়েছে।

তারি ভাবানুবাদ দিচ্ছি—কিছু কিছু বদলে ও সংক্ষেপেঃ

চাইলে গুরু জানতে তুমি—এ কোন
অরবিন্দ যে চায়
আসতে তোমার জন্মদিনে। কিন্তু বলো
বলব কী হায়?
চারটি অরবিন্দে জানি আমি। তোমার
আদেশে তাই
বাখানি সংক্ষিপ্ত ছড়ায় কারণ তোমার
সময় যে নাই।

পয়লাটি এক মস্ত বাবু—প্রসাধনেই
থাকেন লেগে,
সিঁথি সাবান বেশভূষা তাঁর কতরকম—
জানে সে কে?
বেকার—তবু গুমর ভারি সব কিছুতেই
দেন তিনি রায়
বনিতাটি পতিব্রতা—ওঠেন বসেন
স্বামীর কথায়।

দোসরাটি এক প্রেমের ফকির ভালোবাসেন
যাকে তিনি
সে—সুন্দরী চায় না তাঁকে মালা
দিতে বিদেশিনী।
আমার গলা জড়িয়ে বন্ধু তাই
কাঁদতেন ঘাঁড় ঘাঁড়ঃ
'মন তার না পেলে দিলীপ কেমন
করে জীবন ধরি?'

তেসরাটি এক সর্বজান্তা থাকেন রোমে
এক হোটেলে
সেখানে ভোজ দিতেন সোমরসের
দীপালিকা জ্বেলে।
হয়ত রেস্ত ফুরিয়ে গেছে—কেউ তাঁকে
ধার দেয় না আজ আর
তাই চান আবার কুবের হতে অতিমানস-
ছোঁওয়ায় তোমার।

চৌঠাটি এক মহাপ্রবীর—ঘোষেন
মন্দ্র অঙ্গীকারেঃ
'এক গুলিতেই বাঘসিংহ সাবাড়
করি বারে বারে
বিতৃষ্ণা তাঁর এসে গেছে হয়ত আজ
এ-বীর্যলীলায়
শুনে তোমার অতিমানস-তূর্য
বিষণ্ণ ধরায়।

এঁদের মধ্যে তার করেছেন কে গুরু
নেই আমার জানা
অতিমানস-টেলিস্কোপে দেখে লিখো
তাঁর ঠিকানা।

চ্যাড়ুইক ইংরাজী ছড়াটি পড়ে হেসে কুটি কুটি। কিন্তু তারপরেই বলল গম্ভীর হয়েঃ 'কিন্তু বৃথা দিলীপ You won't be able to draw him out (তিনি সাড়া দেবেন না) তিনি তো লিখেইছেন—তাঁর একটুও সময় নেই।'

আমি হেসে বললামঃ 'বন্ধু আমার অভিজ্ঞতা এই যে এ যুগেও অঘটন ঘটে।

*

পরদিন আমি শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘপত্রটি পতাকার মতন উড়িয়ে চ্যাড়ুইককে বললামঃ 'বলি নি? দেখ এবার—নয়নভরে দেখ বন্ধুবর!'

আমরা দুজনে মহোল্লাসে পড়লাম (অনুবাদ)ঃ

'দিলীপ তোমার অরবিন্দ-চতুষ্টয়-মহাকাব্যটি দীপ্যমান তথ্যপূর্ণ রোমহর্ষক। ইনি নিঃসন্দেহ চতুর্থ মহাজন— ভীমকর্মা বৃকোদর। কিন্তু অভব্য ঠাট্টা রেখে সভ্য সুগম্ভীরের পালাগানে নামা যাক।

'তাঁর ঠিকানা? কেমন করে জানব আমি? আশ্চর্য! টেলিগ্রামে আছেঃ অরবিন্দ বম্বে—যেমন আমার ঠিকানাঃ 'অরবিন্দ পণ্ডিচেরী'। এর আগের পত্রে তিনি লিখেছিলেন—বম্বে থেকে নাত্যভঙ্গে পণ্ডিচেরি এলেন বলে। নলিনী হয়ত জানবে তাঁর ঠিকানা। আমি জানি না—তিনি আশ্রমেই থাকতে চান কিনা মনে তো হয় না কারণ তাঁর নাম অরবিন্দ হলেও ইনি অরবিন্দ এই তিনি অরবিন্দের বিন্দুবিসর্গও জানেন না তো। যাই হোক আমি তোমাকে তাঁর রিপ্লাই-প্রি-পেড টেলিগ্রাম ফর্ম পাঠাচ্ছি আমার দায় তোমার স্কন্ধে চাপিয়ে। তুমি তোমার অরবিন্দ সংকুল প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা-সম্ভূত জ্ঞানালোকে বিচার করে ঠিক কোরো কিংকর্তব্যম। তুমি যা ভালো বোঝো কোরো—আমি নিষ্ক্রান্ত এখন থেকে। উপসংহারে আমার বক্তব্য শুধু দুটি কল্লোলিত আলেকসান্ড্রাইন শ্লোকে জ্ঞাপন করছিঃ

বদান্য ভঙ্গিতে শির হেলায়ে করিও তারঃ
স্বাগত এখানে

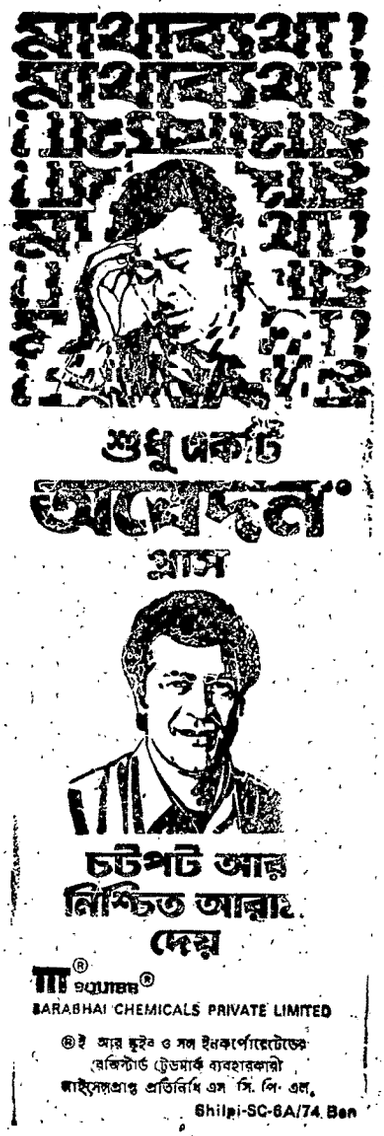

কিম্বা যান যেথা চান—শ্রীকান্তের কিম্বা
কৃতান্তের সন্নিধানে।'

এ-অচিন অরবিন্দ তরে চাও যে নির্দেশ
দিও হে সুমতি।

শুধু অরবিন্দনাম-বন্যায় এ মজ্জমানে
দিও অব্যাহতি।'

মূল পত্রটি থেকে কিছুটা পেশ করিঃ

Tell him, by wire : 'Come on' with a benignant nod,
Or leave him journeying to the devil or to God,
Decide for the other Aurobindo what you please,
This namesake-flooded Aurobindo leave at ease.'

"In fact my Supermind is almost staggering helpless to make any decision under the weight of all these Aurobindos and others I am told there will be 400 of them in families and singles apart from the 200 who are here, and so unless the divine mercy descends with a greater force than the 'gentle dew' from Heaven, we may be still there receiving people till past three o'clock in the afternoon. So one Aurobindo more or less can make no difference to me. It is you who will rejoice or suffer — according as he falls on you like a ton of bricks or envelops you like a soothing zephyr in the spring.

"As for the explanation, your epic of the four Aurobindos has suddenly revealed to me why the name Aurobindo has spread and why its bearers are heading for Pondichery. I have it — eureka! And I am released from all kshobha at the violated uniqueness of my name. Your description shows that each Aurobindo represents a world type and it is of the conglomeration and sublimation of great world types that the supramental-terrestrial will be made. You may not have appreciated their greatness, but that is not their fault

"Your 'epistolary frivolity' was all right. There is laughter in the Kingdom of Heaven, though there may be no marriage there".

(ভাবার্থঃ বলতে কি আমার সুপার-মাইন্ড আজ টলমল টলমল করছে এতগুলি অরবিন্দের ও আরো অনেকের গুরুভারে। শুনছি এখানে যে-দুশোজন সাধক আছেন তাঁরা ছাড়াও আরো ৪০০ দর্শনার্থী আসছেন সপরিবারে। তাই যদি দৈবী করুণা সুভদ্র শিশিরের চেয়ে খরধারে না নামেন তাহলে হয়ত দর্শনপর্ব শেষ হতে বেলা তিনটে বেজে যাবে। সুতরাং আর একটি অরবিন্দ বেশি বা কম হলে বিশেষ কিছু যাবে আসবে না আমার। হাসতে বা কাঁদতে হবে খতিয়ে তোমাকেইঃ হাসবে—যদি তিনি তোমাকে আলিঙ্গন করেন মলয়ানিলের মতন কাঁদবে যদি তিনি তোমার মাথায় ভেঙে পড়েন পাষাণ-প্রপাতের মতন।...

হঠাৎ তোমার অরবিন্দ-চতুষ্টয়-মহাকাব্যের ভাষ্য আমার মনে ঝিকিয়ে উঠল—সাফ হয়ে গেল—কেন অরবিন্দ নামে জগৎ ছেয়ে গেছে। আমি ধরেছি ধরেছি ধরেছি—ফলে আমার নামের অদ্বিতীয়তা খুচে যাবার দরুন সব ক্ষোভ থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছি। তোমার বর্ণিত প্রতি অরবিন্দই এক-একটি জাগতিক টাইপ, আর অতিমানস-পার্থিব অভিব্যক্তি ও ঘনিমা গড়ে উঠবে যাবতীয় জাগতিক টাইপের যোগফলের প্রসাদে। তুমি হয়ত তাঁদের মহিমার মর্মজ্ঞ হতে পারছ না কিন্তু সেজন্যে তাঁরা দায়ী নন।

তোমার লৈপিক প্রগলভতা অনিন্দনীয়। স্বর্গরাজ্যে বিবাহ না থাকতে পারে কিন্তু হাসির স্থান আছে।*)

(st. Mathews 22.30)

—ছত্রিশ—

শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী প্রতিভা ও লোকোত্তর মহিমার বর্ণনা অসম্ভব। আমাকে তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেনঃ

"Sobody can write about my life, because it has not been on the surface for man to see"

মানি। কিন্তু তবু বলব তাঁর সম্বন্ধে আমরা যত বেশি আলোচনা করব ততই লাভবান হব—বিশেষ করে এই জন্যে যে এ স্বার্থসর্বস্ব যুগে যে এহেন ষোলো আনা নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ জন্মাতে পারেন যিনি কেবল মানুষের হিতসাধনাকেই জীবনসাধনা বলে বরণ করতে পারেন অক্লান্ত ধ্যান-সাধনায় যিনি দিয়ে প্রতিদান চান না ভালো-বাসেন কেবল প্রেমেরই টানে জানতে চান শুধু জ্ঞানের তৃষ্ণায়—সর্বোপরি যিনি দুঃসাধ্যকেও সুসাধ্য করতে ধনমানযশ এমন কি জীবন পর্যন্ত পণ করতে পারেন—এ বিরল সত্যকে কালেভদ্রেও এক আধবার দেখলে দুঃখবাদের কিছুটা অন্ততঃ নিরসন হয়। অনেক বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিকের মুখেই শুনি তাচ্ছিল্যভরা বাণীঃ তিনি কী এমন অসাধ্য সাধন করেছেন শুনি? অতি-মানসের অবতরণ—এও কি একটা কথা হল! কে নামল কোথায় নামল কবে নামল শুনি—যার কোনো প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়— দেখানো যায় মনুষ এ সাধনা থেকে অমুক লাভ করেছে?...'

এ ধরনের ভ্রষ্টদৃষ্টি যুক্তির উত্তর দিতে চাওয়া বিড়ম্বনা। আমাকে তিনি একটি চিঠিতে কিছু আভাষ দিয়েছিলেন আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝায়। লিখেছিলেন (১৯৩৫) যে অধ্যাত্ম সত্য-লোকের নানা ক্রিয়া বা ফলাফল আশু প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয় কেননা

"Even in ordinary, non-spiritual things the action of invisible or subjective forces is open to doubt and discussion in which there could be no material certitude — while the spiritual force is invisible in itself and also invisible in its action. So it is idle to try to prove that such and such a result was the effect of a spiritual force. Each must form his own idea about that —for it is accepted it cannot be as a result of proof or argument, but only as a result of experience, of faith or of that insight in the heart or the deeper intelligence which looks behind appearances and sees what is behind them. The spiritual consciousness does not claim in that way, it can state the truth about itself but not fight for a personal acceptance".

(ভাবার্থঃ এমন কি সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষেত্রেও অদৃশ্য বা ব্যক্তিগত শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না বা বহু আলোচনা করেও কোনো বাস্তব নৈশ্চিত্যে পৌঁছন যায় না। অথচ অধ্যাত্মশক্তি শুধু যে অদৃশ্য তাই নয় তার ক্রিয়াপদ্ধতিও চাক্ষুষ করা অসম্ভব। কাজেই প্রমাণ করা বা চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা যে অমুক অমুক ফল ফলেছে তমুক তমুক অধ্যাত্মশক্তির ক্রিয়ায়। সচরাচর প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের ধারণা মেনে চলে চলুক না। কারণ আত্মিক শক্তিকে মানুষ সত্য বলে বরণ করে কোনো প্রমাণ বা যুক্তির এক্তিয়ারে নয়—করে তার উপলব্ধি বিশ্বাস বা হার্দিক অন্তর্দৃষ্টির রায়ে কিম্বা কোনো গভীরতর বুদ্ধির নির্দেশে যে উপরভাসা নয় ডুবারি হতে শিখেছে। এক কথায় অধ্যাত্ম চেতনা বলে না কোনোদিনই—'আমাকে মানতেই হবে।' সে তার আত্মসত্য সম্বন্ধে সোচ্চার হতে পারে কিন্তু বলে না হুহুংকারে যে তার সত্যঘোষণা প্রামাণিক বা অপ্রতিবাদ্য।)

(ক্রমশ)

*খৃষ্টদেব বলেছিলেন যে স্বর্গরাজ্যে বিবাহ হয় না সবাই দেবদূত

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ----- ১৪·০০
২। গুল বাগিচা----৩·৫০, ৩। কাব্য আমপারা--৪·০০
৪। পুবের হাওয়া----২·০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি--২·০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৯৯ কলিকাতা-৭

রূপসজ্জা

মেয়েদের 'বক্ষ সৌন্দর্য' ফ্যাশনের অঙ্গ

বিদেশে শাড়ি নিয়ে অনেক প্রচলিত পরিহাস আছে। ওখানে তো এক সময় 'মিনি' পাগলামী ছিল। কিছুদিন বেশ ভালই কাটল। ক্রমশঃ কমতে কমতে একটা জায়গায় এলো, সেখান থেকে আর তো মিনিকে মিনি করা যায় না। অতএব আবার শুরু হল একটু একটু করে নামানো। ফ্যাশন নিয়ন্তরা কিন্তু এখন হাঁটুর ওপর অবধি ঝুল নামিয়েই খুশী নন, তাঁরা চাইছেন আরো নামাতে। এই নবতম পোষাক শাড়িকেও ছাপিয়ে যেতে চায়। সেখানে শাড়ির কদর তাই বেড়েছে। এখন আর পরিহাস নয়, এখন নানান ধরনের শাড়ির প্রশংসা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। অথচ এখানে আমরা শাড়ির সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ছেদ করিনি। ভিন্ন ভিন্ন ধরনে শাড়ির ব্যবহার চালু হয়েছে। মডেল সবিতা দেব শাড়িকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তবে তার আগে তিনি বলেন, বক্ষ-সৌন্দর্য্যের দিকে নজর দিন। আমাদের বাঙালী মেয়েদের দেহের সঙ্গে বুকের সামঞ্জস্য—অনেকেরই নেই। কিন্তু দেহের সঙ্গে বুকের সামঞ্জস্য না থাকলে নারী সর্বাংগসুন্দর হয় না। যেসব মেয়েদের বুক স্বাভাবিকের তুলনায় বড়, তাদের বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধা ভোগ করতে হয়। আজকাল অনেক মেয়ে ব্রা ব্যবহার করেন না। ও-দেশের দেখাদেখি এটা এখানে চালু হলেও খারাপ কিছু হয়নি। অনেকের মতেই ফলাফল ভাল। ব্রা ব্যবহারের নিয়মকানুন না জেনে ব্রা ব্যবহার করার চেয়ে না করাই ভাল। এতে ক্ষুদ্রাকৃতি বক্ষও অনেক সময় সুউন্নত হতে পারে।.....

শাড়ি-গয়না অন্যান্য সাজ-পোষাকের সঙ্গে ফ্যাশনের অঙ্গ হচ্ছে বক্ষ-সৌন্দর্য্য। যতই আপনি সাজুন না, পুরুষদের চোখে আগুন জ্বালতে পারবেন না।

নিরুপমা

৩২টি জোরালো অপরিহার্য্য কারণ ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ® খাওয়ার পক্ষে

৩২টি শক্ত উজ্জ্বল দাঁত এবং মজবুত হাড়ও।

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের পক্ষে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম প্রয়োজন তার চেয়ে দ্বিগুণ ক্যালসিয়াম-এর দরকার হয় শিশুদের দাঁত ও হাড়ের জন্য। সুস্বাদু রাজবেরির স্বাদগন্ধযুক্ত ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ আপনার বাচ্চাকে খাওয়ান।

মাত্র ৪-৬টি ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ বড়ি রোজ খেলে আপনার বাচ্চার দাঁত আরো শক্ত সুন্দর এবং হাড় আরো মজবুত হবে। তাছাড়া ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ বড়িতে পাওয়া যায় ভাইটামিন সি, ডি ও বি১২। স্যাণ্ডোজ-এর উপর নির্ভর করুন—বিশুদ্ধ ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে বিশ্বে পথ প্রদর্শক।

ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ®
প্রতিদিন প্রত্যেকের জন্য

SANDOZ

সমস্ত বড় বড় ওষুধের দোকানে ২০০ বড়ির দাম ৫০ বড়ির শিশিতে এবং সিরাপ হিসেবেও পাওয়া যায়।

শরীর গঠনে ক্যালসিয়াম

বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা ৪ বছরেই যে সবাশিশুরা নিয়মিত ক্যালসিয়াম খেয়েছে তারা, যারা খায়নি তাদের চেয়ে লম্বা হয়ে উঠেছে।

ACP/DS/19 4 Eng.

একটি অনন্য স্মৃতি

লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরীর বাড়ীতে বসে সীতা দেবী ও তাঁর সুদীর্ঘ একান্ন বছরের ঘনিষ্ঠ জীবনের ইতিহাস জানার সৌভাগ্য একদিন আমার হয়েছিল। তবশ্য তার আগেই চুয়াত্তর সালের বিশে ডিসেম্বর সীতা দেবী পার্থিব জগতের সকল বন্ধন মুক্ত হয়েছেন। ঘরোয়া কথার ফাঁকে ফাঁকে সুধীরবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'আপনাদের দুজনের কেমন করে আলাপ হল?'

উঃ ঃ ১৯১৯-এর সেপ্টেম্বর মাস। আমি 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ নিই। ১৯২১-এর ৮ এপ্রিল সীতা দেবীর সঙ্গে আমার প্রথম নমস্কার বিনিময় হয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বাড়ীর ছাদে একটি 'মিকসড ক্লাবে'র প্রতিষ্ঠা দিবসে। সপ্তাহে একদিন এই ক্লাবে আমাদের দেখা হতো। ক্লাবটির নাম ছিল 'সোস্যাল ফ্র্যাটারনিটি'। সীতা ছিলেন এর সেক্রেটারী। আর একদিন পরে একই জায়গায় এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশেরই উদ্যোগে আর একটি ক্লাবের উদ্বোধন হয়। এটির নাম দেওয়া হয় 'লিটারারি ফ্র্যাটারনিটি' আমাকে করা হয় এর সেক্রেটারী। অনেকবারই দুটো ক্লাবের সাপ্তাহিক অধিবেশন একই সঙ্গে হত এবং ক্রমে দুটো একসঙ্গে হয়ে মিশে যায় সীতাই সেক্রেটারী থাকেন।

১৯২২ সালে আমি প্রবাসীর কাজ ছেড়ে দিয়ে সীতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করি এবং সে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর অব্যবহিত পরেই তাঁর পিতার সম্মতি প্রার্থনা করি এবং অচিরেই তা লাভ করি। এরপরেই আমি ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মদেশে চলে যাই এবং এক বৎসর পর ফিরে এসে সীতাকে বিবাহ করে সস্ত্রীক সেই দেশেই ফিরে যাই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন বৌভাতেও এসেছিলেন। একটি পাতিলেবু হাতে করে এসে সীতার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'সুফলতা লাভ কর।'

প্রঃ আপনাদের বিয়েটা কেমন করে সম্পন্ন হয়েছিল?

উঃ পুত্রশোকাতুরা মনোরমা দেবী (সীতার মাতা) অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন বলে বিবাহে কোনরূপ সমারোহ হোক এটা আমি ইচ্ছা করিনি বলে আমার দিককার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের প্রায় কাউকেই বিবাহের দিন ডাকিনি বৌভাতে সকলকে ডেকেছিলাম তাছাড়া আমি সেসময় নিরামিষাসী ছিলাম বলে আমার সেই মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শ্বশুরমহাশয় বিবাহের ভোজে নিরামিষ খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। এর থেকে লোকের মনে ধারণা হয়ে থাকবে আমাদের বিবাহে সীতার বাড়ীর লোকেদের অসম্মতি ছিল। কিন্তু তা ঠিক নয়।

আমরা দেশ ছেড়ে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ সীতাকে বলেছিলেন 'তোমার কবিটিকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে এস, ব্রহ্মদেশে গিয়ে কি লাভ হবে?' লাভ বাস্তবিকই কিছুই প্রায় হয়নি। তাঁর পরামর্শ যদি আমরা শুনতাম হয়তো জীবনের একটা ঐশ্বর্যময় দিকের সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেত।

প্রঃ রেঙ্গুনে বসবাসকালে আপনারা কতবার রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন?

উঃ আমাদের ব্রহ্মপ্রবাসের সময় রবীন্দ্রনাথ চারবার রেঙ্গুনে এসেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম দুবার আমি রেঙ্গুনে ছিলাম, সীতা ছিলেন অন্তর্বত্নী অবস্থায় পিতৃগৃহে কলকাতায়। একবার আমরা দুজনেই সেখানে ছিলাম, তখন একদিন দ্বিপ্রহরে আমাদের বাড়ীতে তিনি আহার করেছিলেন। যে চেয়ারটিতে তিনি বসেছিলেন সেটিকে সীতা সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন আর সব ফার্নিচার বেচে দিয়ে। সেটি এখনো বাড়ীতে আছে। শেষ একবার আমি বা সীতা কেউ রেঙ্গুনে ছিলাম না, আমার ভাই এবং অন্য আত্মীয়রা তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতিকে একদিন আহার করিয়েছিলেন। তখন আমরা পাঁচতলার একটা ফ্ল্যাট-এ ছিলাম এবং সিঁড়ি উঠতে উঠতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটবে না ত?'

প্রঃ ব্রহ্মদেশে থাকতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের কাছে আপনারা ও আপনাদের সাহিত্য-কৃতিত্ব কতটা সমাদৃত হয়েছিল?

উঃ ব্রহ্মদেশে আমাদের কয়েকটি সহৃদয়বন্ধু লাভ ঘটেছিল এঁরা প্রায় সকলেই বাঙালী। কিন্তু ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীরা সাধারণভাবে আমাদের সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বলেই মনে হয়। আমি সস্ত্রীক রেঙ্গুনে ফিরে যাবার বৎসরখানিক পরে সেখানকার বাঙালীদের এক সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক মন্তব্য করেছিলেন যে, কালে কালে কতই যে দেখবেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাও সিনেমার অভিনেত্রী হয়েছেন। সীতা দেবী ছদ্মনামে একটি এ্যাংলো ইন্ডিয়ান তরুণী সেসময় সিনেমায় বাংলা ছবিতে অভিনয় করতেন। অবশ্য স্বদেশেও সীতা দেবী সম্বন্ধে বাঙালীরা খুব যে কিছু জানেন তা

ময়। যদিও ১৯৩০ সাল থেকে চুয়াল্লিশ বৎসর একাদিক্রমে তিনি কলকাতাতেই বাস করতেন। সে সংগে গভীর ক্ষোভের সংগে সুধীরবাবু বলেছিলেন '১৯৬০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে সীতা দেবী ছিলেন সভানেত্রী অথচ এবারকার আন্তর্জাতিক মহিলা বৎসরে তাঁর নামোল্লেখ কোথাও কেউ করেছেন বলে জানি না।'

সীতাদেবী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ' প্রভৃতি কাগজগুলির প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সীতা দেবীর পিতা। মাতা ছিলেন মনোরমা দেবী। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বাঁকুড়ায়।

সীতা দেবীর ছ' মাস বয়সকালে রামানন্দ এলাহাবাদে একটি কলেজের অধ্যক্ষের কাজ নিয়ে সপরিবারে সেখানে চলে যান। সীতাদেবী তেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত সেখানেই বাস করেন।

এলাহাবাদে প্রদীপ প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ এই তিনটি কাগজেরই জন্ম। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ রামানন্দ নিজে প্রকাশ করেন। প্রদীপ ছিল অন্যদের কাগজ। কিন্তু তিনটি কাগজেরই সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ নিজেই সেই সূত্রে রামানন্দের এলাহাবাদের বাড়ীতে বাঙালী ও অবাঙালী অনেক বিখ্যাত লোকের সমাগম হত। শৈশব থেকেই বিদগ্ধজনের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এলাহাবাদেই তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, অন্যদের মধ্যে ছিলেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মেজর বামনদাস বসু লালা লাজপত রায় মদনমোহন মালবীয় তেজবাহাদুর সাপ্রু সি ওয়াই চিন্তামণি নিরালম্ব স্বামী প্রভৃতি। এলাহাবাদে তাঁদের বাড়ীতে যাঁরা একাধিকবার গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও শিবনাথ শাস্ত্রী।

তখনকার দিনে এলাহাবাদে মেয়েদের জন্য ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না তাই সীতা দেবী ও তাঁর দিদি শান্তা দেবীর শিক্ষা জীবন শুরু হয় বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাছে। রামানন্দের সংগৃহীত নানা বিষয়ের ভাল ভাল বই এবং মেজর বামন দাস বসুর বিরাট লাইব্রেরী তাঁদের শিক্ষালাভে সহায়তা করেছিল। মাতা মনোরমা দেবী রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন এবং রবীন্দ্র-কাব্য মেয়েদের পড়ে শোনাতেন। ওঁদিকে সাংবাদিক পিতাকে ঘিরে যে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল পুত্রকন্যারা তাতেই নিঃশ্বাস নিয়ে বড় হয়ে উঠেছিলেন। আর সেই আবহাওয়াতে দেশপ্রেম কিভাবে মিশে গিয়েছিল তা ত সকলেরই জানা।

১৯০৮ সালে রামানন্দ এলাহাবাদের বাস উঠিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। এই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত। দুই বোনে মিলেমিশে হিন্দুস্থানী উপকথার অনুবাদভিত্তিক গল্পগুলি লিখতে থাকেন। সীতা দেবীর যখন ষোলো বৎসর বয়স তখন লেখা শেষ হয় এবং তারও দু বৎসর পর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায় অঙ্কিত চিত্রে অলংকৃত হয়ে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে বইটির প্রকাশকদের কাছ থেকে একটি চেক পেয়ে দৌহিত্রদের তিনি বলেছিলেন 'ষোলো বৎসর বয়সে যা লিখেছি তার জন্যে আশী বৎসর বয়সেও টাকা পাচ্ছি তোমরা দেখ।'

কলকাতায় এসেই সীতা দেবী দিদির সংগে বেথুন স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে বেথুন কলেজে আই-এ ও বি-এ পড়া সমাপ্ত করেন। ১৯১৬ সালে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেন। এরপরে সীতা দেবী ও শান্তা দেবী দুজনেই প্রবাসীতে গল্প লেখা শুরু করেন। অল্পকাল পরে দু বোনে মিলে তাঁদের প্রথম উপন্যাস 'উদ্যানলতা' রচনা করেন—সংযুক্তা দেবী রচিত বলে বইটি প্রকাশিত হয়। এরপর শিশুপাঠ্য নানা পুস্তক রচিত হতে থাকে।

১৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯১৯-এর এপ্রিল পর্যন্ত রামানন্দ দুই কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বাস করেছিলেন। ফলে সীতা দেবী পিতৃবন্ধু রবীন্দ্রনাথের নিকট সংস্পর্শ পান এবং ঠাকুর পরিবারের সংগে গড়ে ওঠে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। মুখ্যতঃ এই দুটি বৎসরের মনোরম স্মৃতি নিয়ে লেখা সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থটি আজ বহু সমাদৃত।

১৯২৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সুধীরকুমার চৌধুরীর সংগে সীতা দেবীর যখন বিয়ে হয় তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত লেখিকা। শিশুপাঠ্য আজব দেশ তিনটি গল্পই নিরেট গুরুর কাহিনীর গল্পের বই : বজ্রমণি ছায়াবীথি আলোর আড়াল উপন্যাস রজনীগন্ধা সোনার খাঁচা পথিক বন্ধু প্রকাশিত হয়েছে। গল্পের অনুবাদ ছাপা হয়েছে বিলাতের মাসিক পত্রে, দেশে 'প্রবাসী' ছাড়াও অন্য নানা কাগজে তাঁর গল্প ছাপা হচ্ছে। 'মডার্ন' রিভিউতে নিজেই ইংরেজীতে নিজের গল্প অনুবাদ করেছেপেছেন। এ ই রাউন কৃত 'সোনার খাঁচা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই 'পথিক বন্ধু'র তাঁর নিজের করা ইংরেজী অনুবাদ বই হয়ে বেরোয়।

বিয়ের অব্যবহিত পরেই সীতা দেবী স্বামীর সংগে রেংগুন যাত্রা করেন। কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর সেখানে কাটিয়ে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন। এই সময়কার সাহিত্যকীর্তি অন্ততঃ পঞ্চাশটি গল্প—পরভৃতিকা মহামায়া ও ক্ষণিকের অতিথি নামক তিনটি উপন্যাস নিজের ও শান্তা দেবীর কয়েকটি গল্পের ইংরেজী অনুবাদ উদ্যানলতা উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ। ইংরেজী গল্পগুলির কয়েকটি অকসফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস থেকে 'টেলস অফ বেঙ্গল' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি উপন্যাস লিখেছেন বিভিন্ন সময়ে বন্যা জন্মস্বত্ব মাতৃঋণ মাটির বাসা ঘূর্ণীর মাঝখানে রংগমল্লী বজ্রের আলোতে ঘর জামাই সবার উপরে।

('বন্যা'-র অনুবাদ) এলাহাবাদের লিডার কাগজে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল। পরভৃতিকার ইংরেজী অনুবাদও তিনিই করেছিলেন।

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন ছিল সীতাদেবীর। জমিয়ে গল্প করতে পারতেন। গল্পের হাসিটুকুকে তিনি যেমন উপভোগ করতেন তেমনি অন্যদেরও উপভোগ্য করে তুলতে পারতেন।

জীবনের সুখ ও দুঃখ দুটোকেই তিনি সমানভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর একটি মেয়ে এগারো বছর বয়সে ও একটি ছেলে এক বৎসর বয়সে মারা যায়। রেংগুন ছেড়ে আসার পর কিছুদিন অর্থকষ্টও ভোগ করেছেন। সুধীরবাবু একসময় বলেছিলেন 'সীতা ছিল আমার সর্বক্ষণের বন্ধু। সীতা আমার চেয়ে আড়াই বছরের বড় ছিল। অথচ রাজনীতি সাহিত্য ধর্ম ও সংসার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের দুজনের ছিল গভীর মিল।

সুধীরকুমার চৌধুরীর সৃষ্টিও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'একান্তা' ও 'জলের লিখন' তাঁর বহুখ্যাত কবিতার বই। 'শৃঙ্খল' উপন্যাসটি প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে বেরোয় পরে 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' নামে বই হয়ে প্রকাশিত হয়। অলৌকিক ঘটনা নিয়ে লেখা 'আবছায়া' উপন্যাসটি পাঠকমহলে বিশেষ সমাদৃত। 'মাসী' গল্পটি প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'তে ভাষা শব্দের ও বাংলা বানান ব্যবহারের উপর তাঁর একটি মনোজ্ঞ রচনা বেরিয়েছে।

যে অসামান্য সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে, সীতা দেবী জন্মেছিলেন তার এক দশমাংশ স্বীকৃতিও তিনি পেয়ে যান নি। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায় ২৭-১২-৭৪ তারিখে একটি চিঠিতে তাঁর স্বামীকে লিখেছেন 'তাঁর মতো একজন ব্রিলিয়ান্ট লেখিকার তুলনা এ যুগের বাংলা সাহিত্যে নেই।' অথচ এঁরই অনেক লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। সাহিত্য ক্ষেত্রে সীতা দেবী তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি পান নি, সুধীরবাবুও পাচ্ছেন না—এতে হয়তো তাঁদের ক্ষোভ না থাকতে পারে কিন্তু গুণীজনের পূর্ণ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়ে আমরা দেশবাসীরা আমাদের আরাধ্য কাজ করবো তাহলেই তাঁদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব হবে।

অঞ্জলি চৌধুরী

আমি খাদ্য তালিকা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। মেদবহুল শরীরের জন্য খাদ্য—যা পুষ্টি দেবে আর সেই সঙ্গে দেবে ত্বক ও মুখে উজ্জ্বল্য আর সুন্দরতা।

মুগ বা মুশুরী ডাল নানা তরকারী টমেটো গোটা পেঁয়াজ ও আদা কুচি দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়ে পাতিলেবুর রস দিয়ে ও গোলমরিচ নুন দিয়ে বেশ এক বাটি খেয়ে নিলে (পেট ভরে) প্রোটিন ও অন্যান্য ভিটামিনও পাওয়া যায়। এতে স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো আবার ত্বকের মসৃণতাও বাড়ায়। (মুশুরীর ডাল বেটে গায়ে মেখে নাওয়ার প্রথা আজকের নয়।) তবে তেলে সম্বার না দেওয়াই শ্রেয়। তেল ঘি যতটা সম্ভব না খাওয়া ভাল। সেদ্ধর ওপর থাকাই সবচেয়ে ভাল।

ডালের আর এক রকম হয়ঃ যেমন ছোলা বা দালিয়া (গম আধ ভাঙ্গা করে) বেছে ঠান্ডা জলে অন্তত ৪—৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর ওতে নুন গোলমরিচ লেবুর রস টমেটো ও শশার ছোট ছোট টুকরো ক্যাপসিকাম ইত্যাদি মিশিয়ে খাওয়া যায়। অনেক সময় কিছু সস্‌ও মিশিয়ে নেওয়া যায় স্বাদের জন্য।

আর কতকগুলি কথা মনে রাখা খুব প্রয়োজন। যেমন আসল খাদ্যের মাঝে কখনও টুকটাক খাওয়া উচিত না। এতে সামান্য সামান্য করে কতো যে চর্বি জমা হয় বলার নয়। শুধু তাই নয় এতে খিদে নষ্ট হয় আর আসল খাদ্যটা খাওয়া যায় না। ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। আর খিধে পেলে যদি কিছু খেতেই হয় তাহলে কাঁচা গাঁজর টমেটো ও শশা ইত্যাদি খাওয়া চলতে পারে। অনেকে বিট খান। কিন্তু বিট খাওয়া মোটাদের পক্ষে ভাল না। কারণ বিট-এ শর্করা পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে। কড়াই শুটি আর শুকনো মুড়ি খুব ভাল জল-খাবার। কতকগুলি ভুল ধারণার ফলে বহু লোকের প্রচুর ক্ষতি হতে দেখা গেছে। যেমন চর্বি কমানোর জন্য অনেকে একেবারে না খেয়ে থাকেন অথবা প্রায়ই উপোস করেন। এতে রোগা হয় ঠিকই কিন্তু চেহারায় ছাপ পড়ে যায় কালি পড়ে যায় মুখে ভাঁজ পড়ে মুখের চামড়ায় শরীরের চামড়া ঝুলে যায় আর বয়সের কঠিন ছাপ পড়ে। এই সবের জন্য আমাদের প্রয়োজন ঠিক মতন খাওয়া। তেল ঘি মশলা ভাজা পোড়া ইত্যাদি না খাওয়াই সবচেয়ে ভাল। এতে পেট ও শরীর সুস্থ থাকে ও সেই সঙ্গে চেহারায় স্নিগ্ধতা ফোটে। একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ফলের রস ছানা দুধ দই এগুলি ত্বকের জন্য মহৌষধ। ত্বক ভাল রাখতে হলে এই সব খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল থাকতে পারলে রং পর্যন্ত সুন্দর হয়। কাঁচকলাতে প্রচুর আয়রণ। কাঁচকলা সেদ্ধ নুন ও গোল মরিচ দিয়ে খেতে পারলে খুব উপকার হয়। একটু স্বাদে জন্য সঙ্গে সামান্য মাখনও খাওয়া যায়। গরম দুধে লেবুর রস দিয়ে ছানা কাটিয়ে সেটা চিনি ছাড়া খেতে পারলে খুবই ভাল হয়। একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। তা হল ভাজা বা তেল ঘি দিয়ে বেশী মশলার রান্না কোন কারণেই খাওয়া ভাল না। আমাদের খাওয়ার অভ্যাসটা শুধু বদলান দরকার তাহলেই অনেক সুফল পাওয়া যাবে। বিশেষ করে বাঙালীদের বা যারা মাছ খান তাদের পক্ষে কতকগুলি সুবিধা আছে। একই পরিমাণের মাংসের চেয়ে মাছের মধ্যে প্রোটিন পদার্থ অনেক বেশী আছে। তাছাড়া মাছ খাওয়ার আর একটা গুণ হল নখের রং গোলাপী হয় আর নখও শক্ত হয়। এছাড়া মাংস বেশী খেলে ত্বকের অনেক সময় ক্ষতি হয়। তাছাড়া পেটও কষে যায়। আগেও আলোচনা করেছি যে পেট কষে গেলে ত্বকের পক্ষে সমূহ বিপদ। গোটা ছোপ ইত্যাদি নানা উপসর্গ মুখে দেখা যায়। এছাড়া মাংস খারাপ হলে বা বাসি হলে চট করে বোঝা যায় না ফলে সেই মাংস খেয়ে নানা ব্যাধি হতে দেখা গেছে। মাছ একটু পচা হলেই টের পাওয়া যায়। অবশ্য কতকগুলি মাছ আছে যাতে প্রচুর তেল থাকায় সেই মাছ বেশী খেলে মেদ হওয়ার ভয় থাকে। যেমন ইলিশ। তাই যাঁরা খুব মোটা তাঁরা ইলিশ মাছ না খেলেই ভাল।

তাহলেই বোঝা যাচ্ছে খাওয়ার ব্যাপারেও সচেতনতা বিশেষ দরকার। একটু খেয়াল করে এবং ভেবে চিন্তা করে খেলে পুষ্টিও হয় আবার সৌন্দর্যও থাকে।

সব সময় ভাল ফল পাওয়া যায় না বা বেশী দামী ফল খাওয়া যায় না বলে মন খারাপ হয়। কিন্তু এটা জেনে রাখা ভাল যে সাধারণ সময়ের ফলগুলির মধ্যেও যথেষ্ট উপকারীতা আছে। যেমন পেয়ারা। ডাঁসা বা পাকা পেয়ারা যে ভাবেই হোক খাওয়া ভাল। জানলে হয়তো আশ্চর্য লাগবে যে পেয়ারা খেলে ত্বকের উজ্জ্বল ভাব আসে। কলা দিনে একটা খাওয়া ভাল। এতে পেট পরিষ্কার থাকে এবং সেই সঙ্গে চেহারায় নরম ভাব আনে। আর দুধ? এমনি ফুটিয়ে ওপর থেকে সর তুলে খাওয়া যায় গরম অবস্থায় লেবুর রস দিয়ে ছানা কাটিয়ে তাই খাওয়া যায়। দই পেতেও খাওয়া যায়। বাড়ীর পাতা দই অনেক বেশী উপকারী। প্রতিদিন বিশেষ করে গরমকালে বাড়ীর পাতা দই খেলে শরীর ও ত্বকের পক্ষে অতি ভাল।

এছাড়া প্রতিদিন সকালে এক গেলাস লেবুর জল খেয়ে তারপর যদি পাকা বেল খাওয়া যায় তাহলে রং ফর্সা হতে সাহায্য করে। তার ফলে মুখে গোটা বা দাগ হয় না। তাহলেই দেখা যাচ্ছে রূপচর্চা করতে হলে শুধু মুখের বা শরীরের ওপরে কি ব্যবহার করা যাবে সেই চিন্তা ছাড়াও কি কি খাদ্য খেলে ভাল ফল পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। তবে একটা কথা মোটা মানুষদের শুধু মাত্র খাদ্য তালিকা সম্বন্ধেই লক্ষ্য রাখলে হবে না সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে চামড়া ঝুলে গেলে তাকে ব্যায়াম ও ম্যাসাজ দ্বারা ঠিক রাখা। এই ব্যায়াম সম্বন্ধে আগে মোটামুটি আলোচনা করেছি।

এরপর কতকগুলি প্রশ্ন এসেছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব।

বরবর্ণিনী

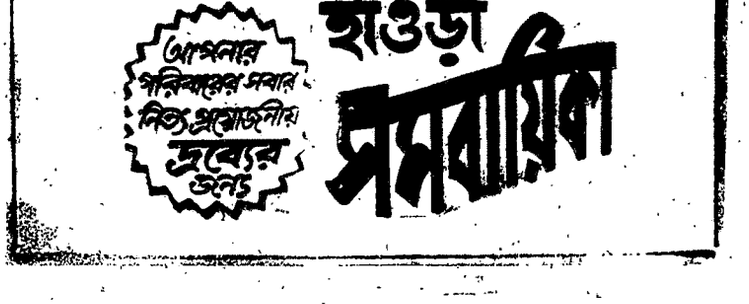

পুনশ্চ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও ব্রহ্মবিদ্যা

'তুমি আমার কেশ চাও? আচ্ছা এই গ্রহণ কর।' এই বলিয়া মাদাম স্বীয় মস্তক হইতে একগুচ্ছ পককেশ ছিঁড়িয়া লইয়া শিশিরকুমারের হস্তে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমার দেখিলেন সেই কেশগুচ্ছ শুভ্র নহে তাহা সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি মাদামের অলৌকিক শক্তির কথা চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সুমধুর ঘন্টাধ্বনি তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। তিনি শেষে দেখিলেন যে মাদাম অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টাধ্বনি হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে মাদাম অঙ্গুলি সঞ্চালন বন্ধ করিয়া বলিলেন 'বাস।' সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুর ঘন্টাধ্বনিও থামিয়া গেল।

বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে শিশিরকুমার মাদামের অলৌকিক শক্তির বহু পরিচয় পাইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের সহিত থিওজফি বা ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় মাদাম তাঁহার বিচারশক্তি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকট ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের সমিতির কার্য্য প্রচারের জন্য একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা শিশিরকুমারের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার পরামর্শ অনুসারে 'থিওজফিষ্ট' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

শিশিরকুমার জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন না। মাদাম ব্লাভাৎস্কি কিন্তু জন্মান্তর-বাদিনী ছিলেন। একদিন এই জন্মান্তর-রহস্য লইয়া উভয়ের মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম।

শিশির। আপনার জন্মান্তরে বিশ্বাস, ভারতবর্ষে আপনার প্রবর্তিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের অন্তরায় হইবে।

মাদাম। কেন?

শিশির। আপনি যদি ব্রহ্মবিদ্যার সহিত জন্মান্তরবাদ সংযোগ করেন তাহা হইলে আপনাদের সমিতির উন্নতি হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

মাদাম। কি কারণে?

শিশির। মৃত্যু মানব-হৃদয়ে যে ভীতি-সঞ্চার করিয়া থাকে তাহা প্রেতাত্মবাদ দ্বারা দূর হইয়া যায়। আপনার ব্রহ্মবিদ্যার সহিত যদি জন্মান্তরবাদ সংযোগ করেন তাহা হইলে লোকে ব্রহ্মবিদ্যার পরিবর্ত্তে প্রেতাত্ম-বাদই সাদরে গ্রহণ করিবে।

মাদাম। আত্মার ধ্বংস নাই এবং মৃত্যুর পরও আত্মা বর্ত্তমান থাকে একথা তো আমরা বিশ্বাস করি।

শিশির। পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস দ্বারা মানবের মৃত্যুভয় যে কিরূপে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। মানব যদি বুঝিতে পারে যে মৃত্যু একটা পতিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছু নহে এবং এই পরিবর্ত্তনের পর তাহারা পর জগতে গমন করিয়া আত্মীয়স্বজনগণের সহিত মিলিত হইবে তাহা হইলে তাহারা মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারিবে। কিন্তু মানব যদি জন্মান্তরবাদী হয় তাহা হইলে তাহার মৃত্যুভয় দূর হইতে পারে না বরং মৃত্যুর পর তাহার স্বরূপত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহার স্বজনগণের সহিত মিলন হইবে না এই সকল চিন্তা তাহার হৃদয়ে ভীতি ও অশান্তি উৎপাদন করিবে।

শিশিরকুমারের যুক্তিতর্ক মাদাম ব্লাভাৎস্কির নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। তিনি শিশিরকুমারের উপর বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন 'ছি ছি তুমি হিন্দু হইয়া জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস কর না!'

শিশির। বর্ত্তমানে হিন্দুগণ জন্মান্তর বিশ্বাস করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারগণের অনুমোদিত নহে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণই জন্মান্তরবাদের প্রবর্ত্তক।

মাদাম। প্রমাণ কোথায়?

শিশির। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে স্মৃতি ও পুরাণ এই দুয়ের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষিত হইলে পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া স্মৃতিই গ্রহণ করিতে হইবে। আবার স্মৃতি ও বেদের মধ্যে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হইলে স্মৃতি পরিত্যাগ করিয়া বেদ-নির্দ্দিষ্ট মত গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষে বেদই সর্বপ্রধান; বৈদিক মতের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগের কোনও কার্য্য করা সম্ভব নহে। মানব মৃত্যুর পর পরজগতে বর্ত্তমান থাকে ইহা বেদ-প্রচারিত এবং অধ্যাত্মবাদও সেই মতে অনুসরণ করিয়া থাকে।

মাদাম। তুমি বেদ হইতে যাহা বলিলে আমাকে তাহা দেখাইতে পার?

শিশির। বেদের শ্লোকগুলি আমার স্মরণ নাই কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

শিশিরকুমার তিন সপ্তাহকাল বোম্বাইয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার বোম্বাই পরিত্যাগের ঠিক দুইদিন পূর্ব্বে মাদামের সহিত তাঁহার জন্মান্তর-রহস্য লইয়া উক্তরূপ তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে শিশিরকুমার বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় মাদামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইলেন। তিনি মাদামের সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিলেন 'জননী আমাকে ক্ষমা করুন...আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।'

তিনি সজল নয়নে সস্নেহে শিশির-কুমারের মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া বলিলেন 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

শিশিরকুমার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভারতবর্ষে থিওজফিক্যাল সোসাইটি বা ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি প্রতিষ্ঠার সময় মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকট শিশিরকুমারের নিকট যে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহারা আজীবন স্মরণ করিতেন। মাদাম ও কর্ণেল শিশিরকুমারকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহারা অনেক সময় কলিকাতায় শিশিরকুমারের বাটীতেই থাকিতেন। একেশ্বরবাদী শিশির-কুমার প্রেতাত্মবাদ ও ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনার দ্বারা স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্রকে ধর্ম্মবীজ বপনের উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

ক্ষপণক

প্যারী, ক্যান ক্যান, মে ফ্লাইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোরেসেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
সম্পৎ সেরামিক্স প্রাঃ লিঃ
১৯, ধোমক স্ট্রীট, কলিকাতা-১

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

লোহার ডাণ্ডায় লেগে ঠিকরে গিয়েছিল বলে। ঠিকরে যাওয়া গুলি ডিগবাজী খেতে খেতে ছোটে। তাই, ফার্কুহার্সনের খুলি ঐভাবে ভেঙ্গে গিয়েছিল। অনেকখানি পথ ওড়বার পর লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেটের তখন গতি-বেগ ফুরিয়ে এসেছে—তাই করোটির মধ্যে ঢুকে আর বেরিয়ে যেতে পারে নি। জানলা থেকে গুলি ছোঁড়া হলে গুলি খুলি ফুটো করে বেরিয়ে যেত। সেই কারণেই বাড়ী বসেই ডকটর বলেছিলেন, ভাগ্নে খুন করে নি। মোক্ষম প্রমাণ পেলেন চলন্ত ট্রেনে। বন্দুকবাজ সেক্রেটারীকে বললেন ছাঁড়াটাকে ডান চোখের দিকে তাগ করতে। কিন্তু কিছুতেই লক্ষ্য ঠিক রাখা গেল না। সুতরাং আনাড়ি ভাগ্নের পক্ষেও চলন্ত ট্রেনের জানলা থেকে গুলি ছুঁড়ে খুলি চূর্ণ করা সম্ভব নয়।

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বঙ্কিম দত্ত যা চান রঞ্জু তা নয়। তার চিন্তার জগৎ পরিবেশ সবই স্বতন্ত্র। আর যুঁইদি এসে যেন ষোল বছরের রঞ্জুর মানসিক জগৎকে পর্যন্ত আমূল পাল্টে দিয়েছে। বিবাহিতা যুঁইদি যেন তাকে কাঁচপোকার মত আকর্ষণ করছে। বঙ্কিমবাবুর মত কি অমিয়ই হতে পেরেছে? শুধু একটা ভয় তার বাবার মতই। তার বন্ধু রুদ্রেন্দু গরীব এবং বিপ্লবী মেজাজের বলে তাকে সেও এড়িয়ে চলতে চায় ভয় করে। সেই রুদ্রেন্দুর সঙ্গে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল অমিয়র। প্রথমটা সে খুব বিব্রত হলেও পরে সামলে নিল এবং বেশ ঠাট্টার মেজাজেই ঠুকে ঠুকে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। যেন একটা মজার লোকের সঙ্গে কথা বলছে সে।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ রঞ্জুও দেখে ফেলল দূর থেকে। বাবার পাশে এক ঝাঁক টিয়ের মত টুটুলদের দলটা। সবাই আজ শাড়ি পরেছে। বাবাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বুড়ো ভালুক। তার পাশে বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে মনে হচ্ছে ভীরু রোগা তাড়া খাওয়া শেয়াল। বাবার পাশে গোপাও আছে। তার সঙ্গে গোপার একটা নীরব সম্পর্ক আছে। যেটা কেউ জানে না। কাল রঞ্জু যুঁইদির সঙ্গে কেষ্টনগর চলে যাবে বেশ কিছুদিনের জন্যে। সেই খবরটা ওকে দেবার জন্যে ভেতরে ভেতরে চঞ্চলতা অনুভব করে রঞ্জু।

অমিয়বাবু সেখান থেকে মেয়েদের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এলেন। ঘরে বসে মেয়েদের গানও হোল রাত পর্যন্ত। আর তাই নিয়ে একটু অশান্তিও হয়ে গেল বাড়িতে।

— একুশ —

খাওয়া-দাওয়া শেষ। রাত দশটা এখন। বা একটু বেশি হতে পারে। বাইরে একাদশীর জ্যোৎস্নার ধার বেড়েছে। চড়া শিউলির গন্ধে অম্বুজা-নিলয় ভুরভুর করছে। যে-কোন জানালা বা দরজা দিয়ে ফুলের গন্ধ দোতলার এঘরে ওঘরে কিলবিল করে ঢুকে পড়ছে।

কেউ ঘুমোয় নি।

সবাই এখনও জেগে।

দরজা জানালা খোলা।

এক একদিন এমন হয়। রাতের মনে রাত বাড়তে থাকে। বাড়ীর লোক ঘুমের কথা ভুলে থাকে। যেন কাজের আর শেষ নেই যেন কথার—জরুরী কোন বিষয়ে আলোচনার শেষ হতে অনেক দেরি।

অন্তত পড়শীরা তাই ভাবে।

এখন রাত দশটার পর কী কথা হচ্ছে জজের বাড়ীর মানুষদের বা কোন দরকারী কাজটি সারা হচ্ছে কে আর উঁকি দিতে আসে খোঁজ করতে আসে।

তবে এক একদিন এমন হয়। অনেক রাত অবধি বাড়ীটা জেগে থাকে। আবার কোনদিন দেখা যায় রাত নটার আগেই সব ঠাণ্ডা নিঝুম। কোথাও আলোটালো নেই সাড়াশব্দ নেই। হয়তো কিছু জানালা-টানালা খোলা থাকে। গরম কালে জানালা বন্ধ করে কে। তবে দোতলার ও একতলার কোন দরজা খোলা থাকে না। শীতকালে যদিও জানালা দোর খুলে রাখার প্রশ্নই ওঠে না! বুঝি এ-বাড়ীর সব কটি মানুষের শ্লেষ্মার ধাত। কম্বল মুড়ি দেওয়ার মতন সব ফাঁক-ফোকর তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোন জানালার কাঁচ ভাঙ্গা থাকলে কাগজ দিয়ে জায়গাটা বেশ করে এঁটে দেওয়া হয়। বা কনকনে হাওয়া রুখতে কাপড় গুঁজে রাখা হয়।

তবে ভেন্টিলেটার বা এক আধটা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলোর ইসারা ইঙ্গিত দেখে লোকে বুঝতে পারে ঠাণ্ডার রাতেও অম্বুজা-নিলয় জেগে আছে। জরুরী কাজ হচ্ছে বা দরকারী কথা হচ্ছে। এটা ভাববার কারণ অদরকারে ঘরে বারান্দায় সিঁড়িতে আলো জ্বলবে—বঙ্কিম দত্ত কখনই তা হতে দেবে না। বেজায় হিসেবী লোক। গুনে গুনে পা ফেলে হাঁচি দেয়। কেবল নিজে না। বাড়ীর সবাই যাতে সেভাবে চলে বুড়োর কড়া নজর। যেমন নিয়মের বাইরে একটা পয়সা বাজে খরচ দেখলে বঙ্কিম দত্ত মাথা গরম করেন তেমনি কোন ঘরে খামকা আলো জ্বলছে কি পাখা ঘুরছে দেখলে ভীষণ হৈ-চৈ বাধিয়ে দেন। কি যদি দেখেন কেউ ট্যাপ খুলে রেখেছে ঝরঝর জল পড়ে জল নষ্ট হচ্ছে।

এসব পাঁচটা দেখে-শুনেই অবশ্য বঙ্কিমবাবুর কিপটে বদনামটা বেশি করে রটেছে।

যা বলা হচ্ছিল আজ রাত দশটার পরেও অম্বুজা-নিলয়ে আলো জ্বলছে। সব কটা দরজা জানালা হাঁ-খোলা। আশ্বিন হলেও এখনও তেমন একটা ঠাণ্ডা পড়ে নি। বাগানে সদ্য-ফোটা শিউলির গন্ধ কিলবিল করে প্রত্যেকটা ঘরে ঢুকে পড়ছিল।

আবার চৈত্র মাসে বঙ্কিম দত্তর বাগানে হাস্নাহেনা ফুটতে আরম্ভ করলে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়ী এভাবে গন্ধে মাত হয়ে যায়।

এখন দেখা যাচ্ছে রঞ্জুর পড়ার ঘরেও আলো জ্বলছে। একটা চেয়ারে যুঁই বসে আছে। চোখ দুটো করমচার মতন গোলাপী লাল। চেয়ারের পিঠে মাথাটা রেখে ঢুলু-ঢুলু করে এক একবার তাকায় পরক্ষণে চোখ আপনা থেকে বুজে আসে। রঞ্জুর খাটটার ওপর একদিকে জলপাই রঙের একটা প্রকাণ্ড সুটকেশ। ডালাটা খোলা। ওটা যুঁইয়ের। সুটকেশের ভিতর থেকে রাজ্যের জিনিস বের করে রঞ্জু বিছানার ওপর ছড়িয়ে রেখেছে। শাড়ী সায়া ব্লাউজ ব্রেসিয়ার থেকে আরম্ভ করে তেল সাবান স্নো পাউডার চুলের কাঁটা ফিতে ফলস নেল-পালিশ চিঠি লেখার প্যাড খাম রং-বেরংয়ের কয়েকটা অ্যালবাম এবং মেয়েরা ব্যবহার করে হাবিজাবি আরও কত কি।

আর একটা সুটকেশ খাটের নিচে রঞ্জুর পায়ের কাছে। ওটাও যুঁইয়ের। ওটা গুছোনো হয়ে গেছে। এখন ডালা বন্ধ। তবে চাবি লাগান হয় নি। ব্রাউন কালারের ওই বাকসটা শাড়ী জামায় ঠাসা। আর ধরে না, যে কটা জামা কাপড় ধরে নি সেগুলো রঞ্জু বিছানার ওপর রেখেছে। এখন জলপাই রঙের সুটকেসটার ভিতর ঢোকান হবে। দু দিনে তো কম কেনাকাটা হয় নি। দোকান থেকে আনা হয়েছে আর এক একটা সুটকেসে এলোপাথাড়ি সব ঠাসা হয়েছে। আজ কেনাকাটা শেষ। এবার সব গোছ-

গাছ করে সুন্দর করে সাজিয়ে সুটকেসে তুলতে হবে। কাল বেলা এগারোটায় ট্রেন। সকালে এত সব গুছোবার সময় কোথায়।

এতক্ষণ রঞ্জুর সঙ্গে যুঁইদিও হাত লাগিয়েছিল। এখন যেন যুঁইদির আলসেমি এসেছে, ঘুম পেয়েছে। মানুষটা যেন একটু ঘুমকাতুরে এই দু রাত্তিরে রঞ্জু বেশ বুঝে গেছে। এর আগে এখানে এলেও রাত্রে বড় একটা থাকে নি। একবার বুঝি থেকেছিল। কিন্তু তখন এতটা খেয়াল করে নি রঞ্জু। আজ দু রাত ধরে—দু রাত কেন হিসেব মতন অম্বুজা-নিলয়ে তিন দিন যুঁইয়ের রাত্রিবাস হবে। রঞ্জুর পড়ার ঘরে তার শোবার জায়গা হয়েছে। টুটুন যেখানটায় শোয় সেখানে জায়গা কম। রঞ্জুকে বলা হয়েছিল দাদুর ঘরে শুতে। রঞ্জু একদম রাজী হয় নি। ঘুমের মধ্যে নাকের বিচ্ছিরি ঘরঘর আওয়াজ করে বুড়ো। তা ছাড়াও এম নও সে ওঘরে শুতে না। তার রাগ পড়ে নি। কাজেই টুটুন এসে শুচ্ছে যুঁইয়ের সঙ্গে আর রঞ্জুকে শুতে হচ্ছে টুটুনের ছোট খাটে। তবু ভাল। বুড়োর ঘরে শোয়ার চেয়ে টুটুনের ওই খুপরিটার মধ্যে শুয়ে অনেক বেশি আরাম। একটা কেমনতর মিঠে মিঠে মেয়েলী গন্ধ হয়ে গেছে জায়গাটার। তা হলেও বুড়োর খরখরে নাক ডাকার শব্দের চেয়ে সেটা ঢের ভাল অনেক বেশি শান্তির।

তবে এই এক মস্ত জ্বালা বাড়ীর ছেলেমেয়েদের। সব বাড়ীতেই। বন্ধু-বান্ধবের মুখে শোনে তো রঞ্জু খুব বড়-লোক ছাড়া কলকাতার বাড়ীতে জায়গা বাসা সকলেরই কম। অতিথি বা আত্মীয় কেউ এলে শোয়াশুয় নিয়ে সাংঘাতিক হাঙ্গামা বাধে। আর তার ঠেলা সামলাতে হয় বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের—কেমন ছেলেমেয়ে — যাদের বিয়ে হয় নি। বিয়ে হয়ে গেলে তোমার সাত খুন মাফ। তখন তোমাকে আর তোমার শোবার জায়গা থেকে কে সরায়। তা হলে যে তোমার বৌকে বা বরকেও সঙ্গে সঙ্গে আর এক জায়গার ঠেলতে হয়। তাতে হাঙ্গামাটা বাড়ে বেশী। সুতরাং ঠেলাঠেলি চলে বাড়ীর আইবুড়ো ছেলেদের নিয়ে মেয়েদের নিয়ে। আজ দাদুর সঙ্গে কি দিদিমার সঙ্গে শোও কাল কাকার ঘরে নয়তো পিসীর সঙ্গে শোবে পরশু—যদি আরও বেশী লোকজন বাড়ীতে আসে তোমাকে ছাদে বারান্দায় ঠেলে দিতে পারে বা বাথরুম ও কিচেনের লাগোয়া প্যাসেজেও মাদুর বালিস নিয়ে তোমাকে রাতের শোয়ার ব্যবস্থা করতে বলা হতে পারে। কিছু ঠিক নেই। দাবার ঘুঁটির মতন তোমাদের চালাচালি করা বাড়ীর লোকের সুবিধে। শোবার জায়গার নড়চড় রঞ্জুর একেবারে অপছন্দ। ভাল ঘুম হয় না। তবু যা-হোক যুঁইদি। আজ যদি অন্য কোন অতিথি আত্মীয় তার ঘরে এসে শুত আর তাকে টুটুনের জায়গায় কম্বল বালিস নিয়ে সরে যেতে বলা হত তো বিচ্ছিরি কাণ্ড বাধিয়ে দিত রঞ্জু। ঘুমোত না। জেদ করে সারারাত জেগে কাটাত। দুপ-দুপ শব্দ করে সিঁড়ি বারান্দায় পায়চারি করত। কিন্তু এই তিন রাত সেসব কিছুই করছে না সে। ভয়ানক সুবোধ ছেলে হয়ে গেছে। যুঁইদির জন্য ঘুমের এই কষ্টটুকু হাসিমুখে সে সহ্য করছে। দরকার হলে আরও সাত রাত্তির যুঁইদির জন্য নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে টুটুনের ঐ মেয়েলী মিঠে গন্ধে ভরা ঘুরচি ঘরটায় ইচ্ছে করে শোবে। সাত রাত যুঁই অবশ্য এখানে থাকছে না। কাল সোওয়া এগারোটায় তার কেষ্টনগরের ট্রেন।

খাওয়ার আগে চটপট হাত চালিয়েছিল এখন কিন্তু রঞ্জু ইচ্ছে করে যুঁইদির জিনিসপত্তর গুছোতে দেরি করছে। তার নিজের সার্ট প্যান্ট গেঞ্জি পাজামা অতিরিক্ত একটা দুটোর বেশী কোনদিনই নেই—তবু যে কখানা আছে বেঁধেছেঁদে নিতে হবে। কদিনের জন্য আর একটা জায়গায় যাচ্ছে। টুটুনের একটা ব্যাগে ভরে সব নেবে। মেয়েরা আলাদা ব্যাগ বাকসের মালিক আগেই হয়ে যায়। এদিক থেকে তারা লাকী। রঞ্জুর নিজের একট সুটকেস বা বাকস যে কবে হবে ঈশ্বর জানে। এই জন্য তার চুল দাড়ি পাকাতে না হয়। পার্থ শোভেন সোমেনদের অবস্থাও তাই। কারো নিজস্ব সুটকেস ট্রাঙ্ক বা ব্যাগ বলতে কিছু নেই। অথচ ছোট ছোট বোনগুলির নাকি অনেক-দিন আগেই সে সব হয়ে গেছে। নিজের জামা-কাপড় একটু পরে গুছোলে চলবে ভাবল সে যুঁইয়ের অলিভ কালারের ঢাউস সুটকেসটা গুছোনোর এখনও কিছুই হয় নি। ইচ্ছে করে রঞ্জু দেরি করছে। টুটুনের ঘরে শুতে যাবার আগে এই ঘরে তার নিজের পড়ার ঘরে যুঁইদির সঙ্গে যতটা সম্ভব বেশি রাত করে সে জেগে থাকতে চায়। তার ভাল লাগছিল। যুঁই অবিশ্যি একবার জাগছে একবার ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে তার পাকা করমচার মতন গোলাপী লাল চোখ দুটো প্রজাপতির পাখার মতন আস্তে আস্তে কেমন ঝিমিয়ে আসছে এক একবার ঘাড় তুলে অবাক হয়ে রঞ্জু দেখ-ছিল। যেন চোখজোড়া আর যুঁইদির নেই। বনে জঙ্গলে ঘোরা আনমনা প্রজাপতির মতন হয়ে গেছে।

উঁহু, কেউ জানে না যুঁইও জানে না এটা আর একটা প্রমাণ রঞ্জুর মতন চাপা ছেলে পৃথিবীতে দুটি নেই—এখন একটা চোখ দিয়ে পিটপিট করে লুকিয়ে কেষ্ট-নগরের যুঁইকে যেমন সে খুঁটিয়ে দেখছে তেমনি তার আর একটা চোখের আগায় অন্য একটি মুখের ছবি চুপিচুপি টলটল করে ভাসছে। তা বলে মনে মনে দুটো মুখের যে সে তুলনা করছে তা নয়।

দুটো মুখ একেবারে আলাদা জাতের। একটা একটু চৌকোণ ছাঁদের উঁচু চোয়াল গোল চিবুক ভরাট তেজী বেড়াল বেড়াল দেখতে। যেন এখনি লাফিয়ে পড়ে পাতের ভাজাটা তুলে নেবে। একটু বেশি সময় তাকালে বুক ঢিবঢিব করে। অথচ দারুণ সুন্দর। চোখদুটোর ভিতর হাঙর কুমীরের লোভা আর একটা মুখ অবিকল পানপাতা। সরু লম্বাটে চিবুক। যেন সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে আছে। চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা। ছোট্ট হাঁ। দেখলে মনে হয় একটা চামচ ঢুকবে না। গাছের লুকোনো বুনো ফুলের মতন মাণদুটো সময় সময় রাঙন হয়ে ওঠে কিন্তু খুব অল্প সময়ের ঝিকিমিকি আবার দু চোখ ছায়ার অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ে। যেন কোথা থেকে চাপ চাপ ভয় না লজ্জা জাতের কিছু একটা এসে মুখখানাকে আগের চেয়েও বেশি সরু শুকনো করে দেয়। যদিও সেটাও আর এক ধরনের সৌন্দর্য অন্য বিউটি। রঞ্জু আর তার বন্ধুরা পরীক্ষার পর অবসর এই কটা মাস এই নিয়েই বেশি আলোচনা করছে। বিয়ে-হওয়া আর বিয়ে-না হওয়া মেয়ে—ম্যারিড ও ভার্জিন—একেবারে আলাদা দুটো চরিত্র। দুজনের চালচলন তাকানো হাঁটা এমন কি নিশ্বাস ফেলাও উল্টো। বিয়ের পর একটা মেয়ের গায়ের টেম্পারেচার বদলে যায় গ্ল্যান্ড হরমো থেকে নানারকম ব্যাপার নাকি ঘটতে থাকে। খায় বেশি ঘুমোয় বেশি কথা বলে বেশি হাসে বেশি। অর্থাৎ রঞ্জুরা চোখের ওপর যা দেখে। তাদের এই ওল্ড বালি-গঞ্জেই ফি বছর মাঘে ফাল্গুনে বা আষাঢ় শ্রাবণে—কোন কোন সময় আশ্বিন কার্তিকে এমন কি বোশেখ জৈষ্ঠের চড়া গরমেও কম করে ডজন ডজন মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আজকাল তো কেউ কেউ মূল মাস-টাসও মানছে না। বিয়ের পর দিনকতক শ্বশুরবাড়ী ঘুরে এলেই পরিবর্তনটা চোখে পড়ে। আর এদিকে এক একটা পাড়ায় গুচ্ছের কুমারী। চিরকালই থাকে ওরা। রাস্তায় ঘাটে ট্রামে বাসে ছাদে বারান্দায় হামেশা চোখে পড়ে বা স্কুলের গাড়ী থেকে নামছে কলেজে যাচ্ছে চাকরী করতে ছুটছে কি পার্কে খেলাধুলো করছে। তারা কি হাসে না কথা বলে না ছুটোছুটি করে না। করে। কিন্তু চোখে মুখে একটা ভীরুতা আড়ষ্টতা লেগে আছে। বৃষ্টিভেজা শালিক টুনি পাখির মতন। লক্ষ্মীছাড়া ছন্নছাড়া ভাবটা কিছুতেই যেন এড়াতে পারে না। দেখলে কেমন মায়া লাগে। অবশ্য ঐ মায়াটাই ওদের অস্ত্র। শোভেন বলে—ঐ যে ওদের দেখলে আমাদের ছেলেদের মনে একটা কান্না কান্না ভাব জাগে, বুকের ভিতরটা তিরতির করে—ওটাই ওদের বিউটি। বিয়ে না হওয়াতক ঐ পুঁজি নিয়ে ওরা বেঁচে থাকে।

সত্যি, হয়তো দেখতে খুব সুন্দর। সেজেগুজেও থাকে। তবু রঞ্জু লক্ষ্য করে —সব সময় কেমন একটা কষ্ট যেন ওদের সারা গায়ে জড়িয়ে আছে। শোভেন বলে—গায়ের জামা-কাপড়ের মতন ওটাও ওদের আর একটা পোশাক।

আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে বাবা ওদের পাখি দেখিয়ে এনেছে। তারপর সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে সবাইকে নিয়ে নিজের ঘরে জোর গানের আসর বসিয়েছিল। এইতো কিছুক্ষণ আগে আসরটা ভাঙ্গল। উঁহু, যুঁই যায়নি। এ ঘরে রঞ্জুকে নিয়ে সুটকেশ গুছোচ্ছিল। যুঁইদিকে বাবা খুব ডাকাডাকি করছিল মাঝে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা রবিন্দ্র দত্ত। যুঁইদি একবার উঠে গিয়ে হাসতে

হাসতে বলে এসেছে আমি গানটান বুঝি না। তারপর তাকে আর ডাকা হয়নি। আসলে যুঁইদি কেন ওঘরে যায়নি রঞ্জুর চেয়ে কে আর তা বেশি ভাল জানে। গানের মধ্যে গিয়ে বসলে রঞ্জুকে নিরিবিলি এ-ঘরে এতক্ষণ পেত না যে।

রঞ্জুকে কিন্তু দুবার উঠে ওদিকটায় যেতে হয়েছিল। না গিয়ে পারেনি সে। বাবার ঘরে ঢোকেনি। জলখাবার ছুতো করে দরজার সামনে দিয়ে বারান্দা পার হয়ে সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে। ঠিক তখন ও-ও থুথু ফেলার ছুতো করে গানের আসর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। ও-ও যে ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিল রঞ্জু কি জানত না। কিন্তু কথা বলার সুবিধে হল না। ঠিক সেই সময়টায় বুড়ো এদিকে ঘাড় ফেরায়। একেবারে দরজার গোড়ায় গ্যাঁট হয়ে বসে গান শুনছিল। এত রাগ হয়েছিল রঞ্জুর। তার ইচ্ছে করছিল পাকা চুলের মাথাটায় আচ্ছা করে একটা ঘুষি বসিয়ে দেয়। রঞ্জুর সঙ্গে কথা বললে দাদু যদি দেখে ফেলে। আর এক সেকেণ্ড থেকে বারান্দায় দাঁড়াল না। রেলিং গলিয়ে একটু থুথু ফেলে তক্ষনি আবার ভয়কাতুরে খরগোসটার মতন ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। জল খেয়ে মন খারাপ করে রঞ্জু তার পড়ার ঘরে ফিরে আসে। যুঁইয়ের জিনিস-পত্তর সে গুছোচ্ছিল ঠিকই এবং সঙ্গে সঙ্গে টুকটাক কথাও চালিয়ে যাচ্ছিল। কথা বলছিল যুঁইদিই বেশি। সে শুধু হুঁ-হাঁ করছিল। কিন্তু তার কানটা ছিল ও-ঘরে। সব মিলিয়ে আজ পাঁচটা ভজন গেয়ে 'শুনিয়েছে' ও। সারাদিন বনবাদাড়ে ঘুরেটুরে এসেছিল। টায়ার্ড হয়েছিল জানা কথা। আহা, তবু গলার কী টান! আর একবার পেচ্ছাব করার নাম করে রঞ্জু বেরিয়ে বারান্দায় যায়। তখনও মা বাড়ি ফেরে নি। এবারও কী করে ও টের পেয়ে যায়। যেন রঞ্জুর মনের কথা বুঝতে পেরে গানের আসর থেকে উঠে এসে বাথরুমের অন্ধকার প্যাসেজটায় আগেই গিয়ে অপেক্ষা করে। এর নাম টেলিপ্যাথি। এবার বুড়ো শকুনটার চোখে ধুলো দিতে পেরে তারা দুজনেই খুব খুশি হয়। অবশ্য অন্ধকার প্যাসেজে এক মিনিটের বেশি তারা মুখো-মুখি হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। রঞ্জু সংক্ষেপে কোনোরকমে তার কেন্টনগর যাবার কথাটা সেরে নেয়। অন্ধকারে ওর চোখের মণি-দুটো কেমন ঝিকিয়ে উঠেছিল। ঝোপের আড়ালে লুকোনো বুনো ফুলের মতন। দু-একবার ঝিকঝিক করে তখনি আবার নিবে যায়। উত্তেজনায় রঞ্জু কাঁপছিল। আর ও—রঞ্জু ঠিক বুঝতে পারছিল—স্রেফ ভয়ে কাঁপছিল। ভয় ভয় ভয়। যাকগে, তবু যে কথাটা ওকে বলতে পারা গেল। কাল সকালে রঞ্জু এক ফোঁটা সময় পাবে না জানা কথা। তাঁদের যাবার তাড়াহুড়ো লেগে যাবে। হয়তো সকালে আবার কিছু গোছগাছও করতে হবে। হয়তো আবার একটা কিছু কিনতে যুঁই তাকে দোকানেই পাঠাবে—কিছুই বলা যায় না। কাঁকুলিয়া রোড সে যায় কখন!

ওরা দুজন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যখন চুপিচুপি কথা সারছিল তখন বাবার ঘরে গৌরী নামের মেয়েটা খুব গলা খেলিয়ে নজরুল গাইছিল। উঁহু অত কায়দাটায়দা করলে হবে কি—ওর গলার কাছে গৌরীর গলা কিছুই নয়। রঞ্জুর একদম ভাল লাগেনি। আসরের মাঝখানে বসে রঞ্জুর বাবা—আর একদিকটায় দোরগোড়ায় বসে আশী বছরের বুড়ো বঙ্কিম দত্ত গৌরীর গাওয়া গজল শুনে মাথা নেড়ে খুব আহাটাহা করছিল যদিও। ভাগ্যিস রঞ্জুর মা বাড়ি ছিল না। সন্ধ্যার পর বেশির ভাগ সময়টা ছিল না। ভবানীপুর গিয়েছিল। ফিরে এসে অবশ্য আসরের কিছুটা দেখতে পায় এবং তা থেকেই বুঝতে পারে সন্ধ্যার পর থেকে কী কাণ্ডটাই না চলছিল দোতলার বড় ঘরে। একটু আগে খেতে বসে রঞ্জু টের পেয়েছে মা ভীষণ চটে আছে। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছিল না। টুটুনের মুখটাও খুব থমথমে। কি নিয়ে কি হয়েছে কে জানে! অথচ টুটুনও ওই দলটির সঙ্গে বটানিকস-এ পাখি দেখতে গিয়েছিল। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে এসেছে। আসর ভাঙার পর ওর বন্ধুরা যখন বাড়ি ফেরে, টুটুন যেন মা-র সঙ্গে রান্নাঘরেই ছিল একবারও বেরোল না—বন্ধুদের বিদায় দিতে নিচে নামল না। ওরা চলে যাচ্ছে টের পেয়ে রঞ্জু পড়ার ঘরে যুঁইকে বসিয়ে রেখে, আবার জলতেষ্টা পেয়েছে ছুতো করে বেরিয়ে আসে। এসেই বারান্দার পুবে কোণায় অন্ধকার রেলিংটা ধরে দাঁড়ায়। নিচে দাঁড়িয়ে টুটুনের বন্ধুরা জ্যোৎস্নার বাগান দেখছিল। শিউলি ফুল কখন ফুটতে আরম্ভ করে কখন বা আবার ঝরতে আরম্ভ করে—এই নিয়ে যেন বাবার সঙ্গে ও বুড়োর সঙ্গে খুব কথাটথা বলছিল সবাই। তখন এক ফাঁকে টুপ করে ঘাড় তুলে আবছা অন্ধকারে রেলিং ধরে দাঁড়ান রঞ্জুকে ও দেখতে পায়। টের পেয়ে রঞ্জুর শরীরটা শিরশির করে ওঠে। আশ্চর্য, রঞ্জু ভেবে পাচ্ছিল না, কি করে ও বুঝতে পারল ওপরে বারান্দার অন্ধকারে একজন ওর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। যেন বাগান থেকে উঠে-আসা ভুরভুরে শিউলির গন্ধ নাকে না লেগে রঞ্জুর নিশ্বাসের গন্ধটা ওর নাকে লেগেছিল। এটা

ডক্টর অমিয়কুমার সেনএর

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ৮

উত্তমপুরুষ-এর উপন্যাস
জীবনের খেলাঘর ১০
কৌটিল্য গুপ্ত-র উপন্যাস
ব্যুরোক্র্যাসী ১০
চৌরঙ্গী কনট সার্কাস ৬
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
কালরাত্রি ৮
অশোক মুখোপাধ্যায়
ফ্যাসীবাদ দেশে দেশে ৬
অনিল রায়-এর উপন্যাস
হীরাঝিলের জলসাঘরে ৬
জীবন থেকে দেয়া ৫
রাত্রির নরক ৬
ব্যভিচার যুগে যুগে ৮
নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র উপন্যাস
রিপু সংহার ৬ **সূর্যমহল** ৮
মায়া বসুর উপন্যাস
দূরবগাহিনী ৬
কুমারেশ ঘোষ
দমদম থেকে দামাস্কাস ৫
শৈলেশ দে
ফাঁসি মঞ্চ থেকে ৫
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ :
কার্ল মার্কস ১০

সুনীল চক্রবর্তীর উপন্যাস
আমি মন্ত্রী হব ১০
চৌধুরী তোফাজ্জল হোসেন
বর্গী এলো বাংলায় ১০
রক্তাক্ত নৌ-বিদ্রোহ ৬
জরাসন্ধ
জরাসন্ধ বিচিত্রা ৮
প্রবোধ সরকার
রূপ-পসারিণী ১২
অবধূত-এর উপন্যাস
বিশ্বাসের বিষ ১০
স্বামীঘাতিনী ৫
তুমি ভুল করেছিলে ১২
একটি মেয়ের আত্মকাহিনী ৮
কণিষ্ক-র উপন্যাস
জঙ্গল জ্বলছে ৮
শেখর সেনগুপ্ত
রেজি দ্যরে ৫
বেদ্‌উইন
ওরা নকশালপন্থী কেন ? ১০
অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ
শত শহীদের রক্ত ৬
নকল মূল্যে মুক্তি ৮
নকশাল বাড়ি ১০ **মুক্তিফৌজ** ১০

তুলি-কলম, ১ কলেজ রো কলকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৮১৮০

খিদের টান? এতটা দূরে দাঁড়িয়েও এক জনের শ্বাস আর একজনের বুকে গিয়ে ধাক্কা দেয়। যেন বিদ্যুতের মতন একটা অদৃশ্য শক্ত সারাক্ষণ দুজনের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। অথচ বাইরের কেউ টের পাচ্ছে না—কেউ না। ঘাড় নিচু করে রঞ্জু তখনই ওর কালোয় ভাইওলেট-এ মেশান চোখের মণিদুটো এক সেকেন্ডের জন্য জ্বলে উঠতে দেখেছিল। পরক্ষণে চোখদুটো নিবে গেছে। ঐ যে! ভয়। ত্রাস। এই জন্যই রঞ্জু এখন ওই মুখের সংগে যুঁইয়ের ঘুমো ঘুমো মুখটা তুলনা করছে। ম্যারিড ভার্জিন। পানপাতা সরু শুকনো মুখের ভয় কিছুতেই কাটে না। আর বেড়াল বেড়াল চোকোণ গোল ভারি ভরাট এই মুখটায় কত তেজ দীপ্তি—তার ওপর সারাক্ষণ একটা রাক্ষুসে ক্ষুধা। একজন বাথরুমের প্যাসেজের নিরিবিলি অন্ধকারেও ভাল করে তাকাতে গিয়ে বাঁশপাতার মতন কাঁপে। আর একজন চড়া আলোয় চার-পাঁচটা বয়স্ক চোখের সামনে ভাত খেতে বসে টেবিলের তলা দিয়ে পা বাড়িয়ে রঞ্জুর পায়ে ঠেকা লাগায় —ঠোকর লাগায়। এই ঠোকরের কত ভাষা, কত ইঙ্গিত!

তা বলে ভার্জিনের মধ্যে কি আর অন্যরকম নেই। টুবলিটা কী! ভয়ডর লজ্জা-সরম বলতে কিছু নেই। পার্থকে কেমন নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। নিশ্চয়—এখন দেখা যায় টুবলিরই জিত হচ্ছে। পার্থ হেরে যাচ্ছে। তার এত সাধের গার্ল-ফ্রেন্ড —ডোভার লেনের বন্দনা—পিংকু এবার ছায়ার আড়ালে নির্ঘাৎ ঢাকা পড়বে! টুবলির টোপ গিলছে পার্থ। আজ সকালে

২'টি ফসফোমিন টনিক...

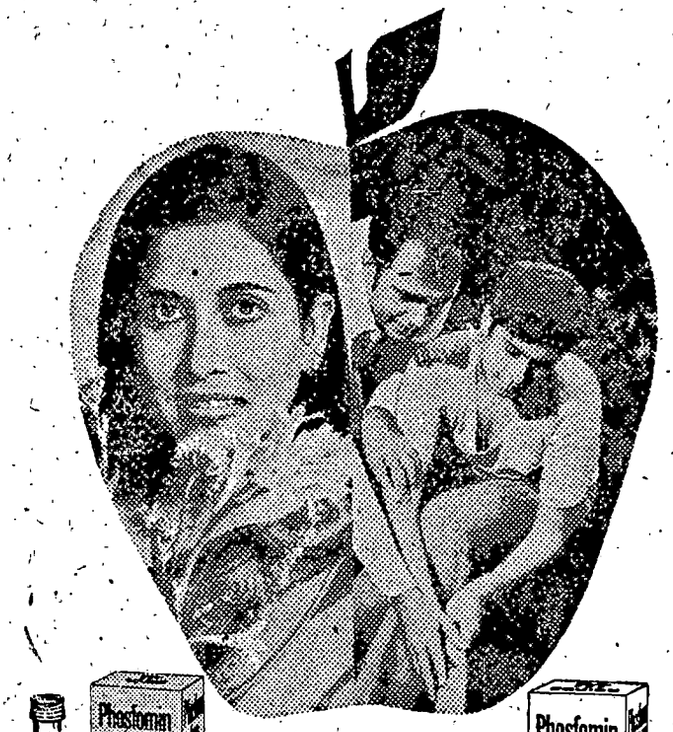

ফসফোমিন আয়রন

মেয়েদের জন্যে আয়রন টনিক

ফসফোমিন আয়রন শরীরে আয়রন বাড়াবার এক অতিরিক্ত উপায় যা রক্তকে লাল করতে আর শরীরে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। প্রত্যেক দিন নিন মেয়েদের জন্যে তৈরী এক আয়রন টনিক—ফসফোমিন আয়রন।

ফসফোমিন ভিটামিন

পরিবারের সকলের জন্যে ভিটামিন টনিক

ফসফোমিন-এ আছে বি কমপ্লেক্স ভিটামিন আর পুরো মাত্রায় গ্লিসারোফস্‌ফেট্‌স যা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে ২'টি ফসফোমিন টনিক

ফসফোমিন টনিক খিদে বাড়ায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যোগায় আর প্রফুল্ল করে তোলে।

®ই. আর স্কুইব ও সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এস. বি. এল.

SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS LTD.

Shilpi SC 8A/74 ben

'মিলনী' রেস্টুরেন্টে কী কাণ্ডটা হল শেষ পর্যন্ত! অমিতকে তো খেলার টিকিট আনতে হবে বলে কোনোরকমে বিদেয় করা গেল। তার সঙ্গে সোমেনও দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। পার্থ তাই চাইছিল। ওরা দুজন বেরিয়ে যেতেই শোভেন ও রঞ্জুকে বাইরের টেবিলে বসিয়ে রেখে পার্থ পর্দা ঘেরা খুপরিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। টুবলির সঙ্গে তার ফাইন্যাল কথা হবে। শোভেন ও রঞ্জু আশা করছিল আজ ওদের মধ্যে চূড়ান্ত কিছু একটা হবে। হয়ে যাওয়াই উচিত তারা চাইছিল। দশ মিনিট, পনেরো মিনিট। দেখতে দেখতে আধঘণ্টা পার হয়ে গেল। আরও বেশি। পার্থ আর খুপরি থেকে বেরোয় না। বিরক্ত হয়ে শোভেন শেষটায় দোকানের বয়কে ডেকে দুটো হাফ-চায়ের অর্ডার দেয় ও বয়কে দিয়েই দু'শলা চারমিনার আনায়। চা-সিগারেট তারা খাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু দুজনের কান ছিল পর্দাঘেরা কামরাটার দিকে। তারা দেখতে পাচ্ছিল পর্দাটা মাঝে মাঝে হাওয়ায় নড়ছে। কিন্তু ভিতরটা যেন বড্ড বেশি চুপচাপ। এদিকে দোকান তখন একেবারে ফাঁকা। এত বেলায় দোকানে বসে কে আর চা খায়। অফিস কাছারির সময়। চৌকাঠ ডিঙিয়ে যেটুকু রোদ ঘরে ঢুকেছিল, ততক্ষণে সরে গেছে। টেবিলে টেবিলে মাছি বিজবিজ করছিল। রঞ্জুদের চা-সিগারেট এক সময় শেষ হয়ে আসে। আধ কাপ চা ও একটা সিগারেট হাতে নিয়ে কতক্ষণই বা বসে থাকা যায়। দুজনে অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। এতক্ষণ পার্থ করছে কি। তার গলাটলা একেবারেই শোনা যাচ্ছিল না। অথচ যেমন একটা রাগ নিয়ে খুপরিটার মধ্যে সে ঢুকে পড়েছিল—রঞ্জু ও শোভেন প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল পার্থর শাসানি বা তর্জনগর্জন শোনা না গেলেও একটা গুমগুমে ধরনের অভিযোগ-টভিযোগ বা হিসহাস ধমকটমক নিশ্চয়ই শোনা যাবে। এভাবে লম্বা লম্বা চিঠি লিখে টুবলি তাকে রোজ জ্বালাচ্ছে। টুবলি কি জানে না পিঙ্কু ছাড়া পার্থ আর কাউকে—

বাইরে দুটো শূন্য চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসে থেকে শোভেন ও রঞ্জু অনেক কিছু ভাবছিল। হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল একটা ডিসে বেশ লালচে করে ভাজা এই মোটা একটা অমলেট সাজিয়ে বয় পার্থদের খুপরিটার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। রঞ্জুরা অনুমান করল অন্তত চারটে মাদ্রাজী হাঁসের ডিম একসঙ্গে ফেঁটিয়ে এত পেঁয়াজকুচি ও কাঁচালঙ্কা ছড়িয়ে ওই অমলেট ভাজা হয়েছে। রঞ্জুর দিকে চোখ বড় করে তাকাল শোভেন। রঞ্জু ফ্যালফ্যাল করে শোভেনকে দেখল। কেননা তারা জানত পার্থ ডিম ছোঁয় না। ডিমে তার এলার্জি আছে। কাজেই এখন আবার ওই ডিস কার জন্য ভিতরে গেল এক সেকেণ্ডেই তারা বুঝে নিল।

—আরো আধঘণ্টা আমাদের বসে থাকতে হবে। শোভেন ফিসফিসিয়ে উঠল। এতবড় একটা ডিমের বড়া তারিয়ে তারিয়ে খেতে টুবলির পাকা আধঘণ্টা লাগবে দেখিস।

—হুঁ, তাই তো। রঞ্জু ঘাড় কাৎ করল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না যে। এর আগে পার্থ ছ'টাকার মতন খাইয়েছে টুবলিকে বললি না তুই?

—আমার মাথায় কিছু আসছে না। শোভেন ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। এত রেগেমেগে ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পার্থ যে আবার ওকে খাওয়াবে—বিশ্বাস করতেও আমার কেমন যেন লাগছে।

—দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত। রঞ্জু আস্তে বলল।

আশ্চর্য, আধঘণ্টা না। দশ মিনিটও না। পাঁচ-সাত মিনিট পরেই দেখা গেল টুবলিকে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে পর্দার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। পিছনে পার্থ। পার্থর মুখটা থমথম করছে। কিন্তু টুবলির চোখেমুখে ভারি একটা তৃপ্তির উজ্জ্বলতার ছাপ। ভাল খাওয়াদাওয়ার পর মানুষের চেহারা যেমন হয়। টুবলি দাঁড়ায় না। চটর চটাস চটাস শব্দ করে দোকান থেকে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে পার্থ। থমথমে চেহারা নিয়ে টুবলিকে যেন এগিয়ে দিতে রাস্তায় নামল। রঞ্জু ও শোভেন ঘাড় বেঁকিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল। টুবলির গোলগাল উঁচু টিলার মতন প্রকাণ্ড পিছনটা। হলদে ডোরাকাটা বাঘছাল রঙের স্কার্ট পরনে। গায়ে টকটকে লাল জামা। রাস্তার রোদ লেগে নাদুস-নুদুস পুষ্ট শরীরটা কেমন ঝকমক করছিল।

—রাকসম গার্ল। শোভেন ফিসফিসিয়ে বলছিল। এই জাতের শরীরের মেয়েদের ইংরেজীতে তাই বলা হয়। জানিস?

রঞ্জু শব্দ করল না। ঠিক তিন মিনিট পর দেখা গেল পার্থকে। ফিরে আসছে। একলা। কেমন যেন টলটলে হাঁটছিল। দোকানে ঢুকে রঞ্জুদের সঙ্গে একটা কথাও বলল না। তাদের সামনের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ল। তারপর টেবিলে দু হাতের ভিতর মাথাটা গুঁজে রেখে চুপ করে থাকল। শোভেন চোখ তুলে রঞ্জুকে দেখল। রঞ্জু শোভনের দিকে চেয়ে রইল। টুবলির হাত থেকে পার্থ কিছুতেই নিস্তার পাবে না—এ আর তোদের বে দিতে হল না। রঞ্জু ও শোভেন একসঙ্গে বড় করে নিশ্বাস ফেলল। ডোভার লেনের পিঙ্কুর জন্য তাদের বুক টনটন করছিল। (ক্রমশঃ)

Eminent Historian Dr. R.C. MAJUMDAR'S

Latest works

(1) HISTORY OF ANCIENT BENGAL : 52.00

(2) HISTORY OF MEDIAEVAL BENGAL : 35.00

হিন্দুযুগের একমাত্র ঐতিহাসিক কহ্লণ বিরচিত ও বর্তমান ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত।

রাজতরঙ্গিণী ২০.০০

—অসামান্য গ্রন্থাবলী—

আশাপূর্ণাদেবীর রচনা সম্ভার

প্রথম খণ্ড ২০.০০ দ্বিতীয় খণ্ড ২০.০০

অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত

ময়ূরভট্ট-ধর্মমঙ্গল ১২.০০

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম

২২.০০

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

বনফুলের

পিতামহ ১১.০০ সপ্তর্ষি ৭.০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র-এর সর্বাধুনিক উপন্যাস

বড়, ছোট এবং মাঝারি ১২.০০

জি ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং : ২২-এ কলেজ রো কলিকাতা—৯

সেকালের সঙ্গীতগুণী

সেতারে তিনপুরুষ

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

জিতেন্দ্রনাথের সেইসব লেখা লক্ষ্মণ পেলেন না বটে। হয়ত সেই সঙ্গে বামাচরণের রাগ সংগ্রহও অনেক হারিয়ে গেল। কিন্তু পুঁথিপত্র যাঁরা অধিকার করলেন কি লাভ হল তাঁদের? সে পরিবারের কেউ কি প্রতিষ্ঠা পেলেন সঙ্গীতজগতে? এ কি পুঁথিগত বিদ্যা? প্রতিভা না থাকলে ভারতীয় সঙ্গীতে ডিগ্রি নিয়ে শিল্পী হওয়া যায় না!

তবে কিছু ক্ষতি তাঁদের দ্বারা ঘটল। সেতার হল অনেক দুর্লভ রাগ-পরিচয়। যেমন আগে কত হয়ে গেছে।

কিন্তু লক্ষ্মণ তখন রীতিমত তৈরি হয়ে গেছেন। সেগুলি পেলে সদ্ব্যবহার আরো হত তাঁর হাতে।

লক্ষ্মণের শেখা আরম্ভ হয় ৬।৭ বছর বয়স থেকে। জিতেন্দ্রনাথ পিতার শিক্ষা যা পান, পুত্রকে তার চেয়ে বেশি দিতে পারেন। কারণ লক্ষ্মণ থাকতেন তাঁর সঙ্গেই। ছেলেবেলা থেকে পিতার বাজনা নিত্য শোনবার সুযোগ পেতেন। আর সহজাত প্রতিভা। তাই তরুণ বয়সেই হন সঙ্গীত-প্রবীণ। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনীতে ত ১৭।১৮ বছর বয়সেই বাজিয়েছিলেন। আর তাও পিতার সেই পরিণত পর্যায়ে। তাঁর যুগলবন্দী অনুষ্ঠান পৌনে একঘণ্টার। আলাপ জোড় থেকে গৎ তান তোড়া ঝালার কি মুন্সিয়ানা। সেই বৃহৎ আসর থেকেই বন্ধুর ক্ষেত্রে লক্ষ্মণের স্বীকৃতি। আর কি অল্প বয়সেই তাঁর পরিণতির সার্থকতা দেখা যায়। বেনারস কনফারেন্সে যখন বাজালেন, তখনও ত জিতেন্দ্রনাথ জীবিত। অর্থাৎ লক্ষ্মণের বয়স তখন ২০ বছর মাত্র।

পিতার বাজনার গণ সবই লক্ষ্মণ পেয়েছিলেন। ওইরকমই বিলম্বিত লয়ে সিদ্ধ। হাত যেমন তৈরি তেমনি সুমিষ্ট সুরেলা। হাতের টিপে সুর একেবারে বসে গেছে, বলা যায়। গৎ বাজাবার সময় যেমন তান বিস্তারে রাগের সম্পূর্ণ আলাপ-চারিতেও তেমনি পারদর্শী। কিন্তু জিতেন্দ্রনাথের মতন তিনি সুরবাহার বাজাতেন না, যদিও সুরে তেমনি ভরপুর। বাজনার ধরণধারণেও যথেষ্ট সাদৃশ্য। সেইসব দীর্ঘ মিড়ের সঙ্গে সুরের কত সূক্ষ্ম কারুকর্ম!

অথচ লক্ষ্মণকে কেউ কখনো পরিশ্রম করে রিয়াজ করতে দেখেননি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়েছেন বটে। কিন্তু সেসব যেন অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে আসছে। সাধন যেন হয়ে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। তরুণ বয়সেই সুপরিণত শিল্পী।

সেতারেই আলাপ থেকে গতের শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণ শোনাতেন। আর জিতেন্দ্র-নাথের সেই ছোট (বামাচরণের তৈরি) সেতারে নয়। তরফদার বড় সেতার তাঁর। আরো একটি সুরের সখ ছিল। আসরে বাজাবার সময় হাতের যন্ত্রটির সঙ্গে এক-সুরে-বাঁধা আর একটি তরকদার সেতার থাকত পাশে। তাঁর বাজনার সঙ্গে সেটিরও নিরন্তর শোনা যেত। পূর্ণ প্রতিভার সময় তাঁর অনেক আসরেই ছিল এমনি প্রিয় ছিল একটি রেওয়াজ।...

বামাচরণ জিতেন্দ্রনাথ, লক্ষ্মণ। তিন পুরুষে সেতারে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা। প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার দৃষ্টান্ত তিন প্রজন্মে। তা ছাড়া, তিনজনেরই বংশের অতিরিক্ত শিষ্যমণ্ডলীও গড়ে উঠেছিল। সব দিক দিয়েই পরিপূর্ণ সঙ্গীতজীবন। এমনি করেই ত এক একটি ঘরাণার পত্তন হয়েছে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে পশ্চিমাঞ্চলে। বাংলাতেও সেতারে একটি নিজস্ব ঘরাণা এক্ষেত্রেও দেখা দিত। যদি লক্ষ্মণ দীর্ঘজীবী হতেন...এবং সুস্থ দেহে মনে গড়পড়তা আয়ু পেতেন...।

হায়...যদি এমন কত যদি'র জন্যে কত অপূর্ণতার ছেদ পড়ে গেছে সঙ্গীত-জগতে। লক্ষ্মণের বিয়োগ—বাংলারই দুর্ভাগ্য। বামাচরণে যার পত্তন, জিতেন্দ্রনাথে যার বর্ধন, লক্ষ্মণেই তার অকাল বিসর্জন। এতখানি প্রতিশ্রুতি এমন অতলে নিমজ্জিত হয়ে গেল। সে দুঃখের কথার আগে সুখের প্রসঙ্গও আছে বলবার মতন।

তাঁর বড়ই আশা ভরসা ছিল লক্ষ্মণের ওপর। লক্ষ্মণ নামটিও তাঁর দেওয়া আদরের ডাকনাম। চার পুত্রের মধ্যে ও দ্বিতীয়। তাই লক্ষ্মণ বলতেন। আর সেই নামেই সুপরিচিত হয়ে যান তিনি সঙ্গীতজগতে। না হলে আসল বা পোষাকী নাম তাঁর অমরনাথ।

পুত্রের সেই নামে জিতেন্দ্রনাথ একটি চতুরঙ্গ গানও রচনা করেছিলেন। তাঁরই একটি অতি প্রিয় রাগ পরজের সেই চতুরঙ্গ—

অমর গাওবে চতুরঙ্গ চতুর গুণী
রঙ্গ ঢঙ্গ গাওবে তরাণা।
কওল কালবানা রাগমালা
গুলন কুশ যৎ জাঠ বিষ্ণুপদ
সাগম কড়খা ত্রিবট রং।...

লক্ষ্মণের জন্ম হয় কলকাতাতেই ১৯১৭ সালে পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর মাত্র। তবে সঙ্গীতক্ষেত্রে তখনই বেশ পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সংসারে কোন স্থিতি আসেনি তাঁদের। লক্ষ্মণের পরে আরো দুটি কনিষ্ঠ ভাই। দুজনেই নাবালক বলা যায়। লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভাইও উপার্জনের দিক থেকে ধর্তব্য নয়। শিল্পী জিতেন্দ্রনাথ সংসার গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি নানা কারণেই। কন্যা দুইটি পাত্রস্থ করেছিলেন এই রক্ষা। সেকালে অনেক পেশাদার বড় বড় গুণীরই বাস্তব অবস্থা এমনিই হত।...

লক্ষ্মণ সেতার ভিন্ন অন্য সব বিষয়েই অনভিজ্ঞ। সুতরাং সঙ্গীত প্রতিভাকেই অর্থকরী করলেন। কিন্তু তাঁর মহা খেয়ালী স্বভাব। বাস্তবজ্ঞান বর্জিত নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরের জগতে থাকতেন নিজের শিল্পী সত্তা নিয়ে। সুতরাং অতি প্রতিভাধর হলেও পেশাদার জীবনে সফল হতে পারলেন না। লক্ষ্য কিংবা চেষ্টাও ছিল না সেদিকে।

(ক্রমশঃ)

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.,ডি.জি.ও
ডাঃ এস. এন. পাণ্ডে এম.বি.,বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

বোশেখ কুমারী

শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

উত্তরের জানলাটা খুলে দেখতে ইচ্ছে করে বরুণের, পাশের বাড়িতে কে এল অথবা নৈঋতের আকাশে কোন তারা ফুটলো কিনা। কিন্তু জানলা খুললেই যদি অপরিচিত কোন মানুষকে দেখা যায়? বরুণের কেমন লজ্জা করে।

আবার খুলতেও ভয় করে জানলাটাকে। এখন অঘ্রায়ণের হিমেল বাতাস সহ্য হয় না। জানলাটা খুলে দিলেই হিংস্র দাঁতাল বাতাস ঢুকে পড়বে আর তার খর নখের আঁচড়ে বরুণকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইবে। পাঁচ বছর আগের মতন থাকতো যদি তার শরীরটা তাহলে অবশ্য কোনও অসুবিধা হত না তার।

ভাবতে অবাক লাগে, দেখতাই অমন লোহার মত শক্ত শরীরটা কেমন পুঁয়ে পাওয়ার মতন রুগ্ন ভগ্ন হয়ে একেবারে শীর্ণ জিরজিরে হয়ে গেল। সতীশ ফ্যাকটরীর শিক্ষানবীশ থাকার সময় হাতুড়ি চালাতে চালাতে হাতের পেশীগুলোকে তার মনে হত যেন এক-একটা রাজহাঁসের ডিম!

অথচ এই পৃথিবীকে যখন মনে হত সবুজ শাড়ীর আবরণে সুন্দরী মানুষী তখন বরুণ কেন তাকে কাছে ডাকলো না? নাকি আরো গাঢ় বন্ধনে বাঁধবে বলে তখন দুষ্টুর ছলনায় শুধু সময়ের সুতো খুলছিল?

যাই হোক। যে যাই বলুক না কেন, কিছু করা আর কিছু বলা যে এক নয়, সে কথা বরুণের খুব ভাল করেই জানা আছে। না হলে পরিতোষদা দেড় বছর ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শেষে কখনও বলতে পারে—বরুণ তোর জন্যে কিছুই করতে পারলাম না রে।

বরুণ বুঝতে পেরেছিল, পরিতোষদা কোন দিনই চাকরী করে দেবে না। কারণ সে তার নিজের চাকরী সামলাতেই দিনরাত হিমসিম খাচ্ছে। তবু বোধহয় শুধু একটা ক্ষীণ আশা মাঝে মাঝে উঁকি দিত বরুণ-এর মনে, যখন শুনতো পরিতোষদার অফিসে লোক নিচ্ছে।

মরুক গে, শুধু শুধু ভেবে মন খারাপ করে কি হবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন বরুণের মনে হল, পৃথিবীর গায়ে জড়ানো সেই সবুজ শাড়ীটা কেমন যেন ধূসর! কি আশ্চর্য, কেন এমন হল?' উত্তর খুঁজতে খুঁজতে বারবার তার মনে পড়ছিল, বাবা মারা গেছেন তাই?

বি-এ পরীক্ষার ফল বেরুলো। বরুণ পাশ করেছে। 'তোর দরখাস্তটা কোথায় দে, টাইপ করাতে হবে না?' বরুণের সুন্দর কথা

বলতে বলতে অংশু সুধার দিকে তাকালো। "একটু দাঁড়া" বলে বরুণ তার ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

ঘরে ঢোকার মুখে বরুণ শুনতে পেল সুধা অংশুকে বলছে—এখন তোমার অফিসের দেরী হচ্ছে না বুঝি? এক-বছরের বড় দাদার স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকবে না বৌদি বলে ডাকবে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারে না বরুণ। দাদাকে সে নাম ধরেই ডাকে। ফলে সুধার সঙ্গে কথাবার্তার সময় সম্বোধনটা আলগোছে সেরে নেয়।

বরুণ অংশুকে কাগজপত্তরগুলো এনে দিল। অংশু অফিস যাবার সময় ভাইকে টাকা দিয়ে বলে গেল, সুধাকে তুই দুটো ম্যাটিনি শো-র টিকিট এনে দিস আলো-ছায়া থেকে।

বেটুনটা কোথায় ছিল ছুটতে ছুটতে বরুণের কাছে এসে বলল, কাকামণি চার আনা পয়সা দাওনা এখুনি। ভাইপোর মুখের দিকে চেয়ে বরুণ মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, পয়সা কি হবে? বেটুন বলল, বললে তুমি দেবে না, সেই জন্যে বলছি না। আর কিছু না বলে বরুণ ভাই-পোর হাতে চার আনা পয়সা দিল।

ভাইপোটাকে বরুণ ভালবাসে। এই বাড়িতে কোন প্রাণী বাস করে কিনা বুঝতে কষ্ট হত যদি বেটুন না থাকতো। সবসময়ে ওর দুষ্টুমি দৌরাত্ম্যে আর হাসি কান্নায় প্রাণের একটা রেশ খুঁজে পাওয়া যায়।

বর্ষীয়ান অথবা বর্ষীয়সী কেউ আর নেই এ বাড়িতে। তিনজন প্রায় সমবয়সী নরনারী তাদের প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কখন সখনও একত্রে মিলিত হয় সামান্য সময়ের জন্যে। তারপর পূর্ববৎ অখণ্ড নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরে বাড়িখানাকে।

এবাড়ির যতিহীনতায় তাই যতি এনে দেবার জন্যে কেউ বোধহয় বেটুনকে পাঠিয়েছিলেন। নানান কাজের মাঝে বরুণ একবার ভাইপোর সঙ্গে খেলা করছে না-হলে তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুচ্ছে। বাড়িময় নির্ভীক নীরবতাকে নিমিষের মধ্যে ভেঙে-চুরে প্রাণের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে বেটুন।

বেটুনকে পয়সা দিয়ে বরুণ বেরিয়ে গেল। বন্ধুবান্ধবেরা কেউ কাজে বেরিয়ে গেছে, নাহলে কাজের ধান্ধায় এদিক ওদিক ঘুরোঘুরি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে এখন। সুতরাং বরুণকে এই সময়ে একাই সময় কাটাতে হয় কোথাও বসে অথবা হেঁটে।

শিক্ষানবীশির কাজটা মন্দ ছিল না। কিন্তু এত পরিশ্রম সহ্য করতে পারলো না সে। শরীরটা সহসা গোলমাল শুরু করে দিল। আসলে ছোটখাটো কলকারখানায় সুযোগ সুবিধা খুবই কম। তারা যেন শিক্ষানবীশের থেকে উৎপাদনের দিকেই দৃষ্টি রাখে বেশী। অবশ্য বরুণের কারুর ওপর বিদ্বেষ নেই। কারণ তার নিজের শরীরই সহ্য করতে পারলো না।

ঘুরতে ঘুরতে আলোছায়ার কাছে এসে মনে পড়ল, অংশু তার বৌ-এর জন্যে দুখানা টিকিট কেটে দিতে বলে গেছে। বরুণ ভাব-ছিল, দুখানা টিকিট কি হবে? সিনেমা দেখবে তো সুধা একা, নাকি অংশু অফিস থেকে সিনেমায় আসবে? অথচ তাহলে সে নিজেই তো টিকিট কেটে নিতে পারতো। তাহলে কি ভিড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নিবিড় সুখে স্বামী-স্ত্রীতে বায়োস্কোপ দেখবে বলে তাকে বলে গেল?

বরুণ ভাবলো, যা ইচ্ছে করুক গে। অংশুর আয়েতেই যখন সংসার চলে, ওর পয়সায় ও যা ইচ্ছে করুক গে। কিন্তু এই সক্কাল বেলায় সিনেমার লাইনে এত ভিড় কেন? দেশের মধ্যে কল-কারখানায় অফিসে প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র 'চাকরী নেই' বোর্ড ঝুলছে। অথচ দোকানে বাজারে, হোটেলে রেস্তোরাঁয় আর সিনেমা থিয়েটারে এত ভিড় কেন?

কম্বিনেশনে অর্থনীতিটা থাকলে কি বুঝতে পারতো? কিন্তু যা হয়নি, তা নিয়ে কি ভাবনা করা সাজে! তার থেকে অংশুর টিকিট দুটো কি করে কেনা যায় সেই ভাবনা এখন আরও প্রয়োজনীয়।

ইতিউতি ভাবতে ভাবতে একটা লম্বা চক্কোর দিয়ে ফেলল বরুণ। কিন্তু ফিরে এসে দেখল তখনও সেই ভিড়ের এতটুকু কমেনি। কাউন্টারের সামনে ভিড়টাকে বরুণের মনে হচ্ছিল ঠিক যেন একটা মৌচাকের গায়ে ঘনসন্নিবদ্ধ কিছু মৌমাছি চলাফেরা করছে। তফাৎ শুধু, মৌচাকের গায়ে মাছিগুলোকে চেনা যায় না, আর এখানে ঘোঁৎনাটাকে চেনা গেল।

কাছাকাছি না গিয়ে বরুণ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। যদি ঘোঁৎনাটাকে চোখের ফাঁদে ফেলতে পারে একবার তাহলেই কাজটুকু সমাধা হয়ে যাবে। অর্থাৎ অংশু আর তার স্ত্রীর অথবা সুধা এবং তার কোন বান্ধবীর জন্যে দুখানা টিকিট ঠিকই জোগাড় হয়ে যাবে।

যা ভেবেছিল বরুণ তাই হল। টিকিট নিয়ে বাড়ি ফিরলো তখন বারোটা বেজে গেছে ঘড়িতে। রোদ চচ্চড় করছে। ঘরে ঢুকে উত্তরের জানলাটা খুলে দিল। একটা ঠাণ্ডা ভাব ঘরখানায় ছড়িয়ে পড়লো। বাড়িটা এখন শান্ত নিস্তব্ধ। বেটুন এখন খেয়েদেয়ে ঘুমুচ্ছে নিশ্চয়।

ভাইপোটা জেগে থাকলে ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে যা হোক কিছু তবু একটু খেয়ে নেওয়া যায়। না হলে বরুণের ভাল লাগে না তার খাওয়ার জন্যে আলাদা করে কারুর সময় নষ্ট হোক। মা থাকলে অন্য কথা ছিল।

বরুণের খিদে পেয়েছিল। সে ভাবছিল সুধাকে ডাকবে কিনা। কাঁচাঘুম ভেঙে গেলে সারাদিন আবার মানুষের মন-মেজাজ নাকি বিষিয়ে থাকে। কিন্তু খাবারের জন্য না ডাকলেও টিকিটের জন্যে ডাকতে হবে যে? একটা সমস্যা ছাড়ে তো আর একটা এসে ধরে।

খুট করে একটা আওয়াজ হল। বরুণের মনে হল, এবারে তাহলে সুধা উঠেছে। তার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। সেদিকে একবার তাকালো বরুণ। কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না সে। ভাবল, শব্দটা তাহলে অন্য কিছুর। বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি গেলেও অমন শব্দ ওঠে মাঝে মাঝে। হয়তো তাই হবে।

উত্তরের বাড়িটার দক্ষিণমুখী ঘরখানার একটা জানলার পাট একটুখানি ফাঁক হল। সূর্য নিশ্চয় এখন পশ্চিম পানে হেলছে। রোদের টান দেখে তাই মনে হচ্ছিল। জানলার অন্য পাটটাও এবার খুলে গেল। বরুণের সঙ্গে যার চোখাচোখি হল, তাকে সে চিনতে পারলো না। ভাবলো, চিন্তাহরণ-বাবুর কোন আত্মীয়া এসেছে হয়তো।

অপরিচিত এক যুবককে জানলা খুলে বসে থাকতে দেখে মেয়েটিও তাড়াতাড়ি জানলার পাটটাকে ভেজিয়ে দিল সামান্য একটু ফাঁক রেখে। কিন্তু মুস্কিল হল বরুণের। কারণ সেই সামান্য ফাঁকটুকু দিয়ে মেয়েটি তাকে দেখতে পাবে, অথচ বরুণ তার অত বড় খোলা জানলা দিয়ে ও-বাড়ির কিছুই দেখতে পাবে না।

মনটা হঠাৎ খারাপ হল বরুণের। সেও হাত বাড়িয়ে তার জানলাটা ভেজিয়ে দিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গেই ও-বাড়ির ভেজানো জানলাটা আরও একটু উন্মুক্ত হলো যে! বরুণ ভাবলো, আচ্ছা চালু মেয়ে তো। সেও তার জানলাটাকে খুলে দিল।

খেলাটা সবে শুরু হয়েছে এমন সময়ে সুধার গলা পাওয়া গেল। সে বলছিল, ডাকোনি কেন কতক্ষণ এসেছো? খাবে না তুমি?

সিনেমার টিকিট দুখানা দেবার সুযোগ পেয়ে বরুণ উঠে বলল, কোন কিছু করছো অথবা বেটুনকে ঘুম পাড়াচ্ছো ভেবে বিরক্ত করেনি। এই নাও টিকিট দুটো, অংশু বলে গিয়েছিল।

সুধা টিকিট দুটো নিয়ে বলল, দেরী করো না—আমি ভাত বাড়ছি।

একটু পরে বেরুবার মুখে সুধা বরুণের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে গেল, বেটুন ঘুমুচ্ছে উঠলে কৌটো থেকে ওকে দুটো বিস্কুট দিও।

বাড়িটা এখন 'টাওয়ার অফ সাইলেন্স'। কোথাও কোন শব্দ নেই। মধ্যাহ্নের এই সময়ে রাস্তায় গাড়িঘোড়াও মন্থর। নিস্তব্ধতা ভাল লাগে না বরুণের, অথচ হৈ-চৈ মুখর হবার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

ইচ্ছে হচ্ছিল একটু ঘুমতে। কিন্তু দুপুর বেলায় ঘুম কেমন যেন মেয়েদেরই মানায়। শিক্ষানবীশির কালটুকু বেশ ছিল। কিন্তু শরীরে সইলো না বলে কপালেও টিকলো না। মাঝ রাস্তায় ঘোড়া বদল করে এখন যত শাস্তি।

কম করেও সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় বরুণকে এখন চৌকিদারী করতে হবে। তারপর অংশু অথবা সুধা যে-কেউ ফিরে এলে তার ছুটি। অবেলায় খেলে শরীরটা আবার কেমন আটটাই করে। এটা-সেটা ভাবতে ভাবতে উত্তরের বাড়িটায় দেখা মেয়ে-টার কথা মনে পড়লো বরুণের।

জানলাটাকে একটু খুলে দেখতে ইচ্ছে করছিল। মধ্যাহ্নের অলস আচ্ছন্নতায় যন্ত্র-চালিতের মতন ধীরে সন্তর্পণে খাট থেকে

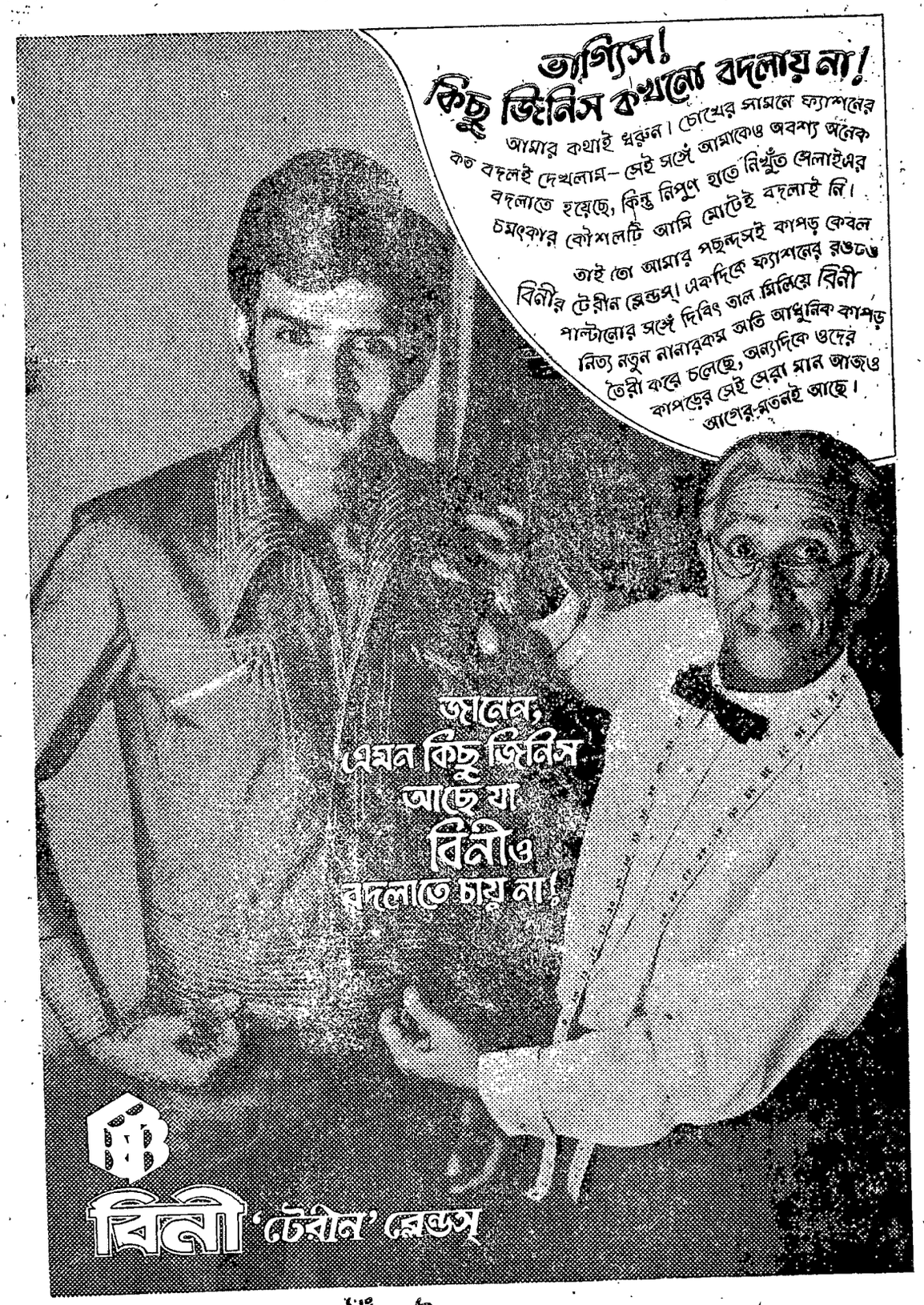

Interpub BB/53/75 Ben

নেমে বরুণ আস্তে আস্তে জানলার পাল্টাকে খুলছিল। তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠছিল। সে যেন ভীষণ কোন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে।

অবশ্য মুহূর্তেই সেই আতঙ্ক দূর হয়ে গেল। কিন্তু কিছু পূর্বের বাতাবরণ সরে গেছে। সম্মুখে সাগর নিঃসঙ্গ! সতীশ ফ্যাকটরীর সাইরেন বাজছিল। দুটোর সিফট শেষ হল। ইথার তরঙ্গে যন্ত্রবাশীর সেই সুর নিথর দুপুরকে বিদীর্ণ করছিল। বরুণের মনে হচ্ছিল, কিসের যন্ত্রণায় পৃথিবী কাঁদছে!

সামনের বুধবার আবার হাসপাতালে সেই বিরক্তিকর এক পরিবেশের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। অপরিষ্কার নোংরা লাইন ঠেলাঠেলি। শুনতে হবে অসীম ঔদাসীন্য ভরা কিছু ঘরুণাঘন কথাবার্তা। তারপর চিকিৎসার ইতি-অসুখের প্রগতি!

ও-বাড়ির জানলাটা খোলাই ছিল। মেঝেতে এক চিলতে রোদ খেলছিল। ঘরের ভেতরটায় লালচে আভা। বোধহয় লাল মাঝের গায়ে রঙ্গরের বর্ণাভা। বেশ কিছুক্ষণ সময় বয়ে গেল। বরুণ ভাবলো দালান থেকে একবার ঘড়িটাকে দেখে আসবে।

উঠতে যাবে এমন সময়ে সে এল। মুখখানা ক্লান্তিতে নত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে চুলের জল শুকোচ্ছিল। একবার সমস্ত চুলগুলোকে বেঁধে নিংড়োচ্ছিল আবার খোলা চুলের ওপর দুহাতে গামছাটা ধরে আছড়াচ্ছিল। চিন্তাহরণবাবুর এই আত্মীয়াটি কে? বরুণ নিজেকেই প্রশ্ন করলো।

বরুণের সঙ্গে পাড়ার লোকের বেশী মেলামেশা নেই এখন। হয়তো তার অসুখের কথা মনে রেখেই বন্ধুবান্ধবেরা প্রয়োজন ছাড়া তাকে এড়িয়ে চলে। অথবা অংশু আর তার স্ত্রী সুধার হামবড়াইয়া ব্যবহারের জন্যে প্রতিবাসী পরিচিতেরা এ-বাড়ির মানুষজনদের ওপর অন্য কোন ধারণা পোষণ করে।

মেয়েটার চুল শুকানো হয়ে গেল। জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। আকাশে আলোতে ছায়াতে মাখামাখি। বেলা পড়ছিল তখন। চোখাচোখি হল বরুণের সঙ্গে। মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলল। বরুণও হাসলো। কিন্তু চকিতে বন্ধ হয়ে গেল জানলাটা।

ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার করছিল বেটুন। বরুণ উঠে গেল। কিন্তু কাণ্ড দেখে সে হতবাক! এখন কি করবে এই ভাবনায় ছটফট করতে শুরু করলো সে। অতখানি কেটে গেল হাতখানা। কি করে কাটলি? আঙুল দিয়ে খোলা বঁটিটাকে দেখিয়ে দিল বেটুন।

দুষ্টু ছেলেটা এবারে গালমন্দ খাওয়াবে বরুণকে। ক্ষণপূর্বের বাতায়ন-কাব্য বরুণ গদ্যে রূপান্তরিত হল। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল বরুণ, অংশু আর সুধা দুজনে মিলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ধিক্কার-ভরা দৃষ্টিতে।

সুধা ফিরে এলো সিনেমা দেখে। ছেলের হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখে হাউমাউ করে উঠলো সে। সমস্ত বাড়িখানায় একটা বোবা কান্না ডুকরে উঠলো। বরুণ শুনতে পাচ্ছিল। সুধা বেটুনকে জিজ্ঞাসা করছে কেমন করে সে হাত কাটলো। কিছু পরে তার অনুচ্চ ক্রোধের প্রতীক একটা খেলনা কুমীর বরুণের ঘরের মেঝের ওপর ছিটকে পড়ল।

একটু একটু করে সন্ধ্যা নামলো। অংশু বাড়ি ফিরলো। একটু জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়লো বাড়িটা। দুর্নিবার অনাসক্তি, বিরক্তি আর বিষণ্ণতা ঘিরে ধরলো বরুণকে। সে ভাবছিল, যন্ত্রণাময় এই পরিবেশ থেকে মুক্তি আর কত দূরে?

অন্ধকার ছেয়ে গেছে ছোট্ট ঘরখানাতে। হাতের কাছের বইপত্তর, জামাকাপড় সব সেই অন্ধকারে ডুবে গেছে। এমনকি নিজের দেহটাকেও বরুণ দেখতে পাচ্ছিল না। এই গাঢ় তমিস্রায় সাগরজলের ডুবুরীর মতন সে চেষ্টা করছিল নিজেকে নিরাপদ একটা দূরত্বে টেনে তোলার জন্যে।

কতক্ষণ পরে কে জানে বরুণ শুনতে পেল অংশু তার নাম ধরে ডাকছিল। বুঝতে পারলো মুক্তি খুঁজতে খুঁজতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অংশুর পায়ে লেগে কিছু একটা ছিটকে গেল। ততক্ষণে বরুণ উঠে বসে ঘরের আলো জেলে দিয়েছে। অংশু মেঝের ওপর চোখ রেখে বলল, সেই কুমীরটা। বরুণও একবার তাকালো মেঝের ওপর।

অংশু বলল, সন্ধ্যেবেলায় ঘুমুচ্ছিস? বরুণ বলল, বেটুনকে আজ আর পড়তে ডাকিনি। অংশ কি ভাবলো। তারপর বলল, খেয়ে নিগে যা। সুধার শরীরটা খারাপ. অংশু চলে গেলে বরুণ উঠে পড়ল। ও-বাড়ির ঘরখানাতে আলো জ্বলছিল তখনও।

সুধার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া খেলনা কুমীরটা বরুণেরও পায়ে লাগলো এবার। আঘাত পাওয়ায় সেটার হাত পা গলা নড়ছিল। কুমীরটাকে তুলে নিয়ে বরুণ দেওয়ালের পেরেকে টাঙিয়ে রাখলো। বেটুন যখন খুঁজবে তখন, ওকে দিয়ে দেবে। বেচারা ওটার জন্যেই হাত কাটলো, মায়ের কাছে মার খেল, আবার বাবার কাছে বকুনি খেল। ছেলেমানুষ, ওর কি দোষ?

কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল না বরুণের। শরীরের মধ্যে উত্তাপ বোধ করছিল সে। বন্ধুদের কথা মনে পড়ছিল। এলোমেলো অসংলগ্নভাবে স্মৃতিগুলো বারবার এসে বিরক্ত করছিল তাকে। মাথার মধ্যে ভার ভার কেমন শূন্যতা। ঘরের বাইরে এসে বরুণ দেখলো অংশুর ঘরের দরজা বন্ধ। দালানের অনুজ্জ্বল বাতিটার দিকে একবার তাকালো সে। ওটা সারারাত জ্বলবে। ঘরে ফিরে অলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো সে।

কে বলেছে অন্ধকার শুধু মূক আর নিঃসঙ্গ? একটা দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি বরুণকে সঙ্গ দিল মুখর হয়ে। অন্ধকারের গাঢ় আলিঙ্গনে ভালবাসার কি লোভনীয় উষ্ণতা! আলস্য ত্যাগ করে বরুণের মনে হল, এই বাড়িটা তাকে অকারণ করুণায় ধরে রেখেছে। তার উপস্থিতি এখানে অপ্রয়োজনীয়।

অথচ সঠিক কোন ঠিকানাও খুঁজে পাচ্ছিল না বরুণ যেখানে সে মনের মত করে পৃথিবী, ভালবাসা আর জীবনের সখাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে তার ইচ্ছে-অনিচ্ছাগুলিকে। তবে কি তার অসুখই সকল সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী? কিন্তু এত প্রিয়জন, কত প্রতিশ্রুতি, সুখের সহচর হয়েও কেন তারা সবাই স্বার্থপর?

ভোরের আলো ফুটছিল। উত্তরের জানলাটা খুলে গেল। ঘুমভাঙা সূর্যের আলোর মতন মিষ্টি হাসিতে মেয়েটা এসে দাঁড়ালো তার ঘরের জানলায়। বরুণকে সে দেখছিল। তার দু চোখে সুখের পশরা। বরুণের ইচ্ছে হল ডেকে বলে, দেবে আমায় ওই সুখ? কিন্তু কে যেন তখুনই সামনে এসে তাকে বলে উঠলো, পারবে তুমি লোহার গরাদ কেটে ঐ সুখের ঝাঁপি উঠিয়ে নিতে?

সেই দুষ্টু নিষ্ঠুর লোকটাকে প্রচন্ড ঘৃণা আর ক্রোধে ধরে ফেলতে গেল বরুণ। কিন্তু একটা শক্তিহীন, অর্থহীন প্রচেষ্টা তাকে সহসা বিষণ্ণ করে দিল। আজ সেই বুধবার! একটু পরেই বরুণকে যেতে হবে তারই কাছে করুণা প্রার্থনা করতে!

মেয়েটার হাসির উৎসে যেন কোন বিরতি নেই। নেই বিঘ্ন। এমন প্রভাত কতদিন দেখেনি বরুণ। আকাশ ভরে আলোর ঝরণা ঝরছিল। অংশু আর সুধা বরুণের পাশে এসে দাঁড়ালো। অংশু জিজ্ঞাসা করলো, রাতে খাসনি কেন। কেমন আছিস?

অনেক দূরে যেতে যেতে যেন কারুর ডাকে পিছন ফিরে তাকালো বরুণ। সুধা তাকিয়ে আছে তার চোখে চোখ রেখে। বরুণের মনে হল বৌদির চোখের কোলে ওটা কি জল নাকি সকালের বাসি চোখ? অংশুর দিকে চোখ ফেরালো সে। দেওয়ালের গায়ে রাখা বাবার ছবিটাকে দেখছিল অংশু।

অসহ্য তৃষ্ণায় বরুণের গলা শুকিয়ে আসছিল। তার ঠোঁট দুটো ঈষৎ উন্মুক্ত হল। কিছুটা উষ্ণ খুন গড়িয়ে পড়লো তার ওষ্ঠ বেয়ে। সুধা আর অংশু সরে দাঁড়ালো। চিন্তাহরণবাবুর বাড়িতে কারা শানাই বাজাচ্ছে? বরুণের চোখ দুটো নিবদ্ধ হল দেয়ালে ঝোলানো কুমীরটার ওপর। অবাক হয়ে দেখছিল সে কুমীরটার চোখ দুটোও কেমন সুধার চোখের মতন জলে ভেজা চিকচিকে!

খেলাধূলা

দর্শক

ওয়েষ্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্থান

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

করাচীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তানের শেষ দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই দুই দেশের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলাতেও জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। সুতরাং ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তানের ১৯৭৫ সালের টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে গেল।

প্রথম দিনে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৭১ রান সংগ্রহ করেছিল। ওপনিং ব্যাটসম্যান মজিদ খাঁ ২৩০ মিনিট খেলে ১০০ রান করেন। বাউন্ডারী মারেন ৯টা।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৪০৬ (৮ উইকেটে)। ওয়াসিম রাজা শতরান পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার দর্শক তাঁকে অভিবাদন জানাতে মাঠে নেমে পড়েন। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে দর্শকদের একহাত লড়াই হয়ে যায়। মাঠের চারদিকে নেবুর খোসা, লাঠি, ইট-পাটকেল এবং চেয়ার ভাঙার টুকরো পড়তে থাকে। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ক্লাইভ লয়েভ তাঁর দলবল দিয়ে প্যাভিলিয়নে চলে যান।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তান আর ব্যাট করেনি, পূর্বদিনের ৪০৬ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় দিনে ৪ উইকেট খুইয়ে ৩১৯ রান সংগ্রহ করেছিল—পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের থেকে তখনও ৮৭ রান কম। কালিচরণ ১০৩ রান করে নটআউট থেকে যান। তিনি ২১৩ মিনিট খেলে তাঁর ১০৩ রানে ১৬টা বাউন্ডারী করেছিলেন। কালিচরণ ২২টা টেস্ট খেলে এই নিয়ে ৬টা সেঞ্চুরী করলেন। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে লয়েড (৭৩ রান) এবং কালিচরণ দলের ১৩৯ রান তুলে দিয়েছিলেন ১১৫ মিনিটের খেলায়।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ৪৯৩ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৮৭ রানে এগিয়ে যায়। এইদিন তাদের জুলিয়েন সেঞ্চুরী করেন (১০১ রান)। চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৯০ রান করেছিল। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনুকূলে খেলাটা ঘুরে যায়।

শেষ পঞ্চম দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস যখন ২৫৬ রানের মাথায় শেষ হয় তখন মাত্র ২৫ মিনিট খেলার সময় ছিল। এই সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭৮ রান সংগ্রহ করা শিবেরও অসাধ্য ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের ১ রানের মাথায় (কোন উইকেট না পড়ে) খেলাটি শেষ হয়।

পাকিস্তানের সাদিক মহম্মদ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করে শেষ পর্যন্ত দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি ৩১৫ মিনিট খেলে ৯৮ রান করে নটআউট থাকেন। মাত্র ২ রানের জন্যে তিনি তাঁর চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরী করতে পারেননি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ৪০৬ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মজিদ খাঁ ১০০, ওয়াসিম রাজা ১০৭ নটআউট এবং ওয়াসিম বারি ৫৮ রান। গিবস ৮৯ রানে ৩, রবার্টস ৮১ রানে ২ এবং হোল্ডার ৬৬ রানে ২ উইকেট)

ও ২৫৬ রান (সাদিক মহম্মদ ৯৮ নটআউট এবং আসিফ ইকবাল ৭৭ রান। গিবস ৪৯ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৪৯৩ রান (ফ্রেডরিকস ৭৭, কালিচরণ ১১৫, লয়েড ৭৩, জুলিয়েন ১০১ রান। আসিফ মাসুদ ৭৬ রানে ২ এবং ইন্তিখাব আলম ১২২ রানে ৩ উইকেট)

ও ১ রান (কোন উইকেট না পড়ে)

ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ডের শেষ দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। অকল্যান্ডের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৮৩ রানে জিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় (ড্র ১) 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে নিউজিল্যান্ড আজও একটা খেলাতেও জিততে পারেনি।

বৃষ্টির জন্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনে একটা বলও খেলা সম্ভব হয়নি। ঐ একই কারণে তৃতীয় দিনে দুঘন্টা দেরীতে খেলা আরম্ভ করে নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৪০ রান সংগ্রহ করেছিল। গ্লেন টার্নার ৬২ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

চতুর্থ দিনে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৪২ রানের মাথায় শেষ হয়। টার্নার ৯৮ রান করে আউট হন। চতুর্থ দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড কোন উইকেট না খুইয়ে ৫৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৭২ (২ উইকেটে)। ডেনিস অ্যামিস ১৬৪ এবং মাইক ডেনেস ৫৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, আগের টেস্টের চারটি ইনিংসে ডেনিস অ্যামিস ব্যাটিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন—তিনটে গোল্লা এবং ১৯ রান।

শেষ ৬ষ্ঠ দিনে বৃষ্টির জন্যে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

নিউজিল্যান্ড : ৩৪২ রান (টার্নার ৯৮ এবং ওয়াডসওয়ার্থ ৫৬ রান। আরনল্ড ৮০ রানে ৩, হেডব্রুক ৮৯ রানে ২ এবং আন্ডারউড ৩৫ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ২৭২ রান (২ উইকেটে। ডেনিস অ্যামিস নটআউট ১৬৪ এবং মাইক ডেনেস নটআউট ৫৯ রান)

রোভার্স কাপ

বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাব বনাম গোয়ার ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের ফাইনাল খেলাটি সমাপ্তির ৬ মিনিট আগে দর্শকদের হামলায় পরিত্যক্ত হয়। রেফারী গোয়া দলের একটি গোল প্রথমে মঞ্জুর করেন, কিন্তু টাটার খেলোয়াড়দের দাবীতে লাইন্সম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করে অফসাইডের কারণে তা নাকচ করে দেন। রেফারীর এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে গোয়া দলের সমর্থকেরা প্রতিবাদ হিসাবে মাঠের মধ্যে প্রচন্ডভাবে সোডার বোতল এবং ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকেন। এমনকি গ্যালারীতে আগুন লাগাবার চেষ্টাও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে মাঠের মধ্যে পুলিশবাহিনী নামে। খেলা বন্ধের আগে পর্যন্ত টাটা স্পোর্টস ১—০ গোলে এগিয়ে ছিল।

সেমি-ফাইনালে টাটা স্পোর্টস ক্লাব ২—০ গোলে স্থানীয় মহীন্দ্র অ্যান্ড মহীন্দ্র দলকে এবং গোয়ার ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব ১—০ গোলে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাবকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। টাটা স্পোর্টস ইতিপূর্বে দুবার (১৯৪৭ ও ১৯৭৪) রোভার্স কাপের ফাইনালে খেলে রানার্স-আপ হয়েছিল; অপরদিকে গোয়ার ডেম্পো স্পোর্টস দলের পক্ষে রোভার্স কাপের ফাইনালে এই প্রথম খেলা।

বিশ্ব হকি প্রতিযোতা

কুয়ালালামপুরে তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় পাকিস্তান 'এ' গ্রুপের এবং ভারত 'বি' গ্রুপের শীর্ষস্থান লাভের সূত্রে মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। সেমি-ফাইনালে পাকিস্তান খেলবে বি গ্রুপের রানার্স-আপ অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে; অপরদিকে ভারত খেলবে এ গ্রুপের রানার্স-আপ দলের সঙ্গে।

লীগ পর্যায়ের খেলায় একমাত্র পাকিস্তানই কোন দলের কাছে হার স্বীকার করেনি—লীগের ৫টা খেলার মধ্যে জয় ৩ এবং ড্র ২। অপরদিকে ভারতের জয় ৩, ড্র ১ এবং হার ১ (৫ম স্থান অধিকারী আর্জেন্টিনার কাছে ১—২ গোলে)।

১৯৭২ সালে অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী বি গ্রুপের লীগ খেলার তালিকায় ২য় স্থান পেয়েছে। তাদের জয় ৩, ড্র ১ এবং হার ১ (ভারতের কাছে ১—০ গোলে)।

চিত্রপরিচিতির সংশোধন

গত ৪২ সংখ্যার (ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯৭৫) ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছবির পরিচিতির শেষ দিকে একটি শব্দ বাদ পড়েছিল। দল-এর জায়গায় হবে অন্য প্রতিনিধি।

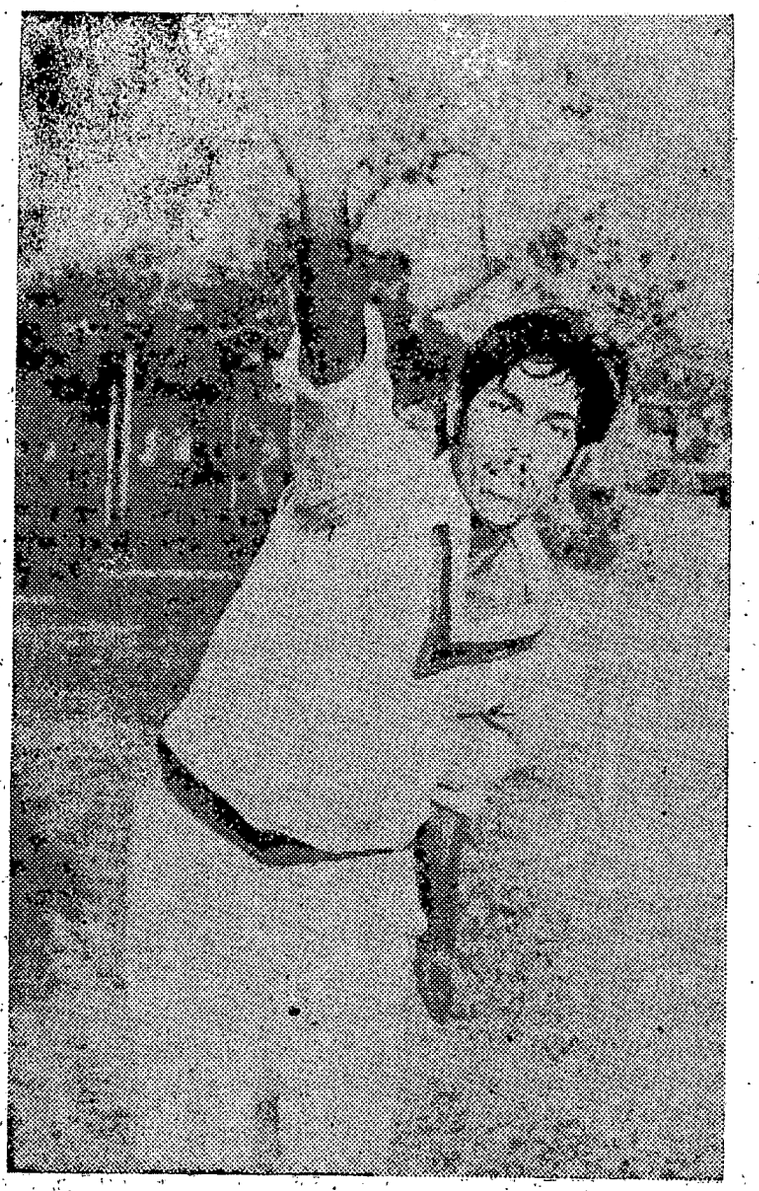

মাঠের নায়ক

জীবন ঘোষ

'মায়ের মুখখানি আমি ভুলিনি। মায়ের কথাও না। মা বলতেন : যা করবি, ভাল করে করবি, মন দিয়ে করবি। মা আজ নেই; আজ কেন, বহুদিনই নেই। শৈশবেই তাঁকে হারিয়েছি কিন্তু মায়ের সেই কথা আজও মনে আছে, আগামীকালও থাকবে। 'যা করবি, ভাল করে করবি'।

'কিন্তু সব কিছুই কি ভাল করে করতে পারছি? পারলে তো আমি আজ ঐ মাঠে থাকতুম, গ্যালারীতে বসে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হোত না'।

কথা হচ্ছিল পোর্টকমিশনার্সের চৌকস খেলোয়াড় জীবনকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে। জীবন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান, দক্ষ বোলার, পটু ফিল্ডার। বিরাট বিপুল নিষ্ঠা, নিখাদ সাধনার সূত্রে জীবন তাঁর ক্রিকেট জীবনের উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করেছেন ধীরে ধীরে, একদা হঠাৎ উদিত হন নি। যোগ্য মূল্য দিয়েই—নামভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। দীর্ঘ, সুপুষ্ট চেহারা জীবন ঘোষের। টানাটানা কালো দুটি চোখ, মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া চুল। হৈ-হট্টগোলে নেই, সিন্ধুর মধ্যে একটি বিন্দুর মতই স্বতন্ত্র। জীবনের জন্ম স্বাধীনতার জন্মলগ্নে উত্তর কলকাতার কুমারটুলিতে। বাবা শ্রীঅনিলকুমার ঘোষের সঙ্গে খেলাধূলোর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ক্রিকেট খেলতেন তালতলায় এবং জোড়াবাগানে। নিজে খেলোয়াড় ছিলেন বলেই খেলাধূলোর ক্ষেত্রে ছেলেকে কখনই নিরুৎসাহ করেন নি। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে সাধ্যমত সংসারের চতুর্থ পুত্রকে উৎসাহ দিয়েছেন। জীবনরা এখন সব বড় হয়েছেন। বড় ভাই জীবনের মতই পোর্টকমিশনার্সে চাকুরে, একজন আছেন ফুড কর্পোরেশনে, চতুর্থ ভাই কমল প্রাক্তন 'ভারতশ্রী' জুনিয়ার (১৯৭১-৭২)। নিয়মিত কুস্তি লড়েন কমল আর সঙ্গে চাকরীর চেষ্টা চালান। জীবন পোর্টে ঢুকেছেন ১৯৬৫ সালে। অফিস গার্ডেনরীচে (চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স দপ্তর)।

ছেলেবেলায় জীবনকে খেলার মাঠে নিয়ে এসেছিলেন প্রথম বাবাই। তালতলা ক্লাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় ওখানেই অজিত কর্মকারের কাছে অকস্মাৎ 'নাড়া' বাঁধা হয়ে গেল একদিন। সুরু হোল ক্রিকেটের প্রথম পাঠ ব্যাটিংয়ে, বোলিংয়ে এবং ফিল্ডিংয়ে। অবশ্য তার আগে অন্যান্যদের মত পাড়ার অলিগলিতে,

জোড়াবাগান ক্লাবেও ক্রিকেট চলেছে জীবনের জীবনে। গোড়ার দিকে অর্থাৎ ছেলেবেলায় জীবন কিন্তু বোলিংয়ের দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। ব্যাটিং সম্পর্কে উৎসাহী হয়েছেন স্কুলে (এ ভি স্কুল) এসে। খেলার সঙ্গে পড়া বা পড়ার সঙ্গে খেলা চলতে চলতে ১৯৭০ সালে জীবন হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষাও পাশ করে ফেললেন। স্কুলের গণ্ডী পার হওয়ার পর কলেজে আর ঢোকেন নি ইচ্ছে করেই শুধু ক্রিকেট নিয়ে পড়ে থাকবার জন্য। পরিচয় হোল পংকজ রায়, অম্বর রায় এবং নিমাই রায়ের সঙ্গে। পাড়ারই তো লোক ওঁরা। তাই মিশে গেলেন ওঁদের সঙ্গে। পংকজ রায়, অম্বর রায়, সুহৃদ মিত্র ব্যাট ধরা শেখালেন, ক্রিকেট-ব্যাকরণের প্রাথমিক পাঠ দিলেন। নিখুঁত স্কোয়ার কাট; ড্রাইভ মারতে শিখলেন, শিখলেন আউট-সুইং-অফকাটার দিতে। শিখলেন শিলপে দাঁড়িয়ে সাহসের সঙ্গে ফিল্ড করতে।

গড়ের মাঠে প্রথম ক্রিকেট খেলেছেন ১৯৬৩-৬৪ সালে লীগ—নক আউটে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে। নামমাত্র খেলা, মাত্র তিনটি। প্রথম দুটি মনে রাখার মত নয়, তৃতীয়টি বুক ফুলিয়ে বলার মত। খেলা ছিল পুলিশের সঙ্গে নকআউটে। জীবন রান করেছিলেন সত্তরটি। উইকেট পেয়েছিলেন সাতটি। মহামেডানের পর যোগ দিলেন রাজস্থানে, এক বছরের জন্য। পরের বছর পোর্টে। খেলার সূত্রে চাকরী হোল জীবনের। ৬৮-৬৯, ৬৯-৭০, ৭০-৭১'এর ক্রিকেট মরশুমে পোর্টের দলনায়ক ছিলেন তিনিই। ১৯৬৬ থেকে ৭০-৭১ পর্যন্ত রণজি ট্রফিতে খেলার সুযোগ হয়েছে জীবনের। ৬৭-৬৮ সালে পূর্বাঞ্চলের হয়ে খেলেছেন দলীপ ট্রফি দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলায়। রান করেছিলেন উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে ২৭, উইকেট পেয়েছিলেন দুটি যার ভেতর একটি গোকুল ইন্দর দেবের। ৬৬ থেকে ৭১ পর্যন্ত রণজি ট্রফি খেলার সুযোগ অনেক স্মরণীয় কৃতিত্বের নজীর রেখেছেন জীবন। ৬৯-৭০ সালে রাউরকেলায় ও ওড়িশার বিরুদ্ধে ৯৫ রান তার ভেতর একটি। ৬৭-৬৮ সালে জোড়হাটে আসামের বিরুদ্ধে ৯২ রান এবং প্রথম ইনিংসে ১৫ রানে সাতটি উইকেট পাওয়ার ঘটনাটিও উপেক্ষণীয় নয়। প্রথম ইনিংসে পংকজ রায় করেছিলেন ২৩৯। বাংলার তপন জ্যোতি ব্যানার্জি দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন ছটি উইকেট। ১৯৬৬ সালে বিহারের বিরুদ্ধে জীবন প্রথম যেবার খেলেন, সেবার চার চারটি উইকেট জুটেছিল তাঁর ভাগ্যে। শুধু বাংলার হয়েই নয়, পোর্টে চাকরী করার সুবাদে রেলের হয়েও রণজি ট্রফি খেলেছিলেন জীবন ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪'এর মরশুমে জম্মু-কাশ্মীর ও পাঞ্জাব, দিল্লী ও হরিয়াণার বিরুদ্ধে।

ঘরোয়া সি, এ বি লীগ ও নকআউট ক্রিকেটে জীবন ঘোষের অতীত ও বর্তমান ভূমিকাটিও রীতিমত উজ্জ্বল। রান সেঞ্চুরী করেছেন অগুণতি। উইকেট ঝুড়ি ঝুড়ি। কিন্তু ঐ সার্থকতায় জীবন ঘোষ আত্মতুষ্ট নন, নন অহংকারী। পক্ষান্তরে জীবন বিনয়ী, এখনও শিক্ষার্থী এবং আজীবন ঐ শিক্ষার্থী হয়েই থাকার পক্ষপাতী। স্ত্রী (মিনতি), পুত্র (জয়ন্ত) নিয়ে ভরা সংসারের মধ্যেও জীবনের অনুশীলনের বিরাম নেই, ছেদ নেই কারণ তাঁর বিশ্বাস অনুশীলনের বিকল্প বিরল। মায়ের সেই কথা আজও মনে আছে ঃ 'যা করবি, ভাল করে করবি।'

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক রঙে বোনা

মানুষের জীবন একটা পথ চলার মত। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই সে হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলতে চেষ্টা করে। তারপর এক সময় স্বনির্ভর হয়ে দুই পায়ে ভর করে পথ চলে। এই অন্তঃহীন পথ পরিক্রমা চলে জীবনের অনেক আঁকাবাঁকা আলোছায়ার পথ পেরিয়ে। তারপর এক সময় জীবন খুঁজে পায় সদর রাস্তার দরজা। জীবন স্রোত বইতে থাকে এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে। টলস্টস এর জীবন কাহিনী এই ধরনেরই। এই মানুষটির উৎসাহ ও প্রবণতা নানারঙে বোনা। জীবনের উষালগ্নে ভলিবল, টেবল-টেনিস, দাঁড়, কুস্তি, ওয়েললিফটিং প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগকে বাস্তবে রূপ দিতে কঠোর অনুশীলন করেছেন একাগ্রনিষ্ঠায়।

অজস্র প্রশংসা কুড়িয়েছেন প্রতিটি খেলায় সাফল্যের সুবাদে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টলস্টসের মনের চারিত্রে কল্পিত ছবিগুলো ক্রমশ সংকুচিত হতে লাগল। অনেক খেলায় সন্নিবিষ্ট থেকে চরম উৎকর্ষতা লাভ সম্ভবপর নয়—এই

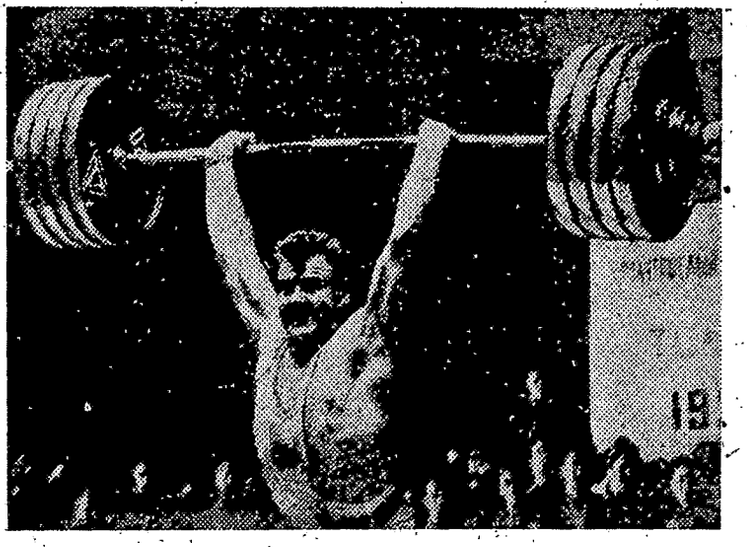

দেশবিদেশের খেলা

উপলব্ধি টলটসের মনে দৃঢ় হবার পর তিনি সব ছেড়ে ভারোত্তোলনই বেছে নেন ষোল বছর বয়সে। সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে ভারত্তোলনের অনুশীলনে আত্মমগ্ন হয়ে যান। প্রথমে শুরু করেন লাইট-ওয়েট দিয়ে। দশ বছর অনুশীলনের মধ্যেই মিডলওয়েট ছাড়িয়ে হেভিওয়েট লিফটার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের অনেক প্রতিযোগিতায় অনেক কীর্তি ও গৌরবের অধিকারী হন অতি স্বল্পসময়ের মধ্যে।

১৯৬৬ সালে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় খ্যাতনামা টলটস কিন্তু তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। ব্যর্থতার গ্লানি লতার মত জড়িয়েছিল তার সারা মনে। পরাজয়ের কালিমাকে মুছে ফেলবার জন্যে তিনি পুনরায় অবিচল নিষ্ঠায় অনুশীলনে ধ্যানমগ্ন হন। এই সময় তার লক্ষ্য ছিল অনেক বড়। আশা ছিল আকাশছোঁয়া। টলটস চেয়েছিলেন সব ব্যর্থতাকে ধুয়ে মুছে মিউনিখ অলিম্পিকের আসরে নিজেকে সোনালী সাফল্যে প্রকাশ করতে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে টলটস কি তার আশাকে সত্যে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন? কারণ মিউনিখ অলিম্পিকের প্রাক মুহূর্তেও এক বিরাট জিজ্ঞাসা বিশেষজ্ঞদের মুখে মুখে ফিরছিল। কে জিতবে? কোন দেশের ভাগ্যে পদক ঝুলছে কে জানে। কেউ বা টলটসের স্বপক্ষে অভিমত পোষণ করেন। আবার কেউ বা আলেকজান্ডার ক্রাইচেভের সাফল্যের প্রত্যাশা করেন। আবার কেউ কেউ পূর্ব জার্মানীর স্টিফেন এর জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে ওঠেন।

আশা নিরাশার দোলায় যখন সবাই দুলছেন তখন বিশ বছরের ইন্দোলিয়াস্থ রুশ নন্দন জান টলটস ৫৮০ কেজি ভারোত্তোলন করে প্রথম হয়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আগেই বলেছি টলটস এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বুলগেরিয়ার আলেকজান্ডার। আলেকজান্ডার কিন্তু আশানুরূপ প্রতিযোগিতা গড়ে তুলতে পারেননি। তিনি জান টলটসের চেয়ে ১৮ কেজি কম অর্থাৎ ৫৬২ কেজি ভারোত্তোলন করে দ্বিতীয় হন। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন পূর্ব জার্মানীর স্টিফেন ৫৫০ কেজি ওজন তুলে। চতুর্থ স্থানও ধরে রাখেন পূর্ব জার্মানীর হেলমুট। হেভিওয়েট বিভাগে প্রথম হওয়ার সূত্রে স্বর্ণ জয় করে জান টলটস স্বদেশের সঙ্গে নিজের সুনামকেও অক্ষুণ্ণ রাখলেন ঐকান্তিক নিষ্ঠায়।

ব্যক্তিগত জীবনে জান টলটস একজন আদর্শ কৃষিবিদ। ছেলেবেলা থেকেই কৃষির প্রতি আকর্ষণ এবং কৃষি শিক্ষা গ্রহণ করেন গভীর উৎসাহে। কৃষি শিক্ষা শেষ করে এগ্রিকালচারাল টিচার ট্রেনিং শিক্ষা গ্রহণ করে এখন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃষিবিদ। নলটস এর সারাদিন কাটে ছকেবাঁধা রুটিনে। অবসর সময়ের অধিকাংশ কাটে শরীর চর্চা ও ভারোত্তোলনের কঠোর পরিশ্রমের সাধনায়। সত্যি বলতে কি অ্যাথলেট টলটস এর জীবন নানান বৈচিত্র্য অনেক রঙে বোনা। এক সন্তানের জনক জান টলটস অবশিষ্ট সময়টুকু অতিবাহিত করেন সুন্দরী স্ত্রীর সান্নিধ্যে সুখীগৃহকোণে।

প্রশান্ত দাঁ

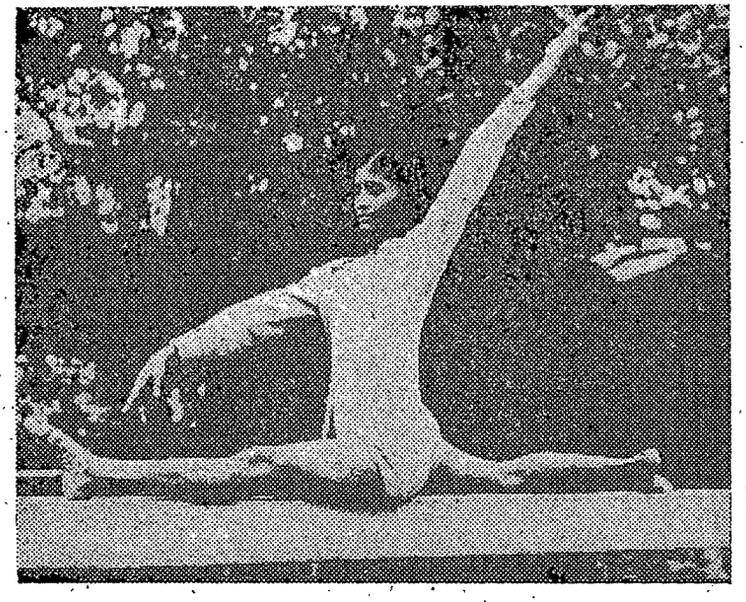

খেলার জগতে মেয়ে

ক্ষুদে জিমন্যাষ্ট মেয়ে শবরী চৌধুরী

ছোট ফুটফুটে মেয়ে শবরী চৌধুরী প্রায় তিন বছর যাবৎ জিমন্যাষ্টিক অনুশীলন করছে। ১৯৭৪ সালে বহুবাজার ব্যায়াম সমিতির এই ছোট্ট জিমন্যাস্টকুশলী কিশোরী রাজ্য জিমন্যাষ্টিকের আসরে ১৬ বছরের অনূর্ধ বিভাগে ভল্টিং হর্সে তৃতীয় স্থান পায়। কিন্তু ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত জাতীয় জিমন্যাষ্টিক প্রতিযোগিতায় শবরী ঐ একই বিভাগে শীর্ষস্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদকের অধিকারিণী হয়। প্রশিক্ষক সন্তোষ ওঝাও বললেন শবরী বেশ ভালভাবেই উন্নতি করছে। কেবল ভল্টিং হর্সেই নয় এখনও আনইভিন বার এবং ফ্লোর একসারসাইজেও ভালভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। এ-বছর রাজ্য প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগেই তৃতীয় স্থান পেয়েছে। আনইভিন বারে দক্ষিণ কলিকাতা ফিজিক্যাল কালচার-এর শ্যামশ্রী ঘোষ প্রথম হয়। আর বহুবাজার ব্যায়াম সমিতিরই চামেলী দাস ও শ্যামশ্রী যুগ্মভাবে ফ্লোর একসারসাইজে প্রথম স্থান অধিকার করে। শবরী এই সঙ্গে বীম ব্যালেন্সও পটু হয়ে উঠেছে। ৭৪ সালে কালীঘাটে

আন্তঃ ক্লাব প্রতিযোগিতায় বীম ব্যালেন্স আর ফ্লোর একসারসাইজে তৃতীয় স্থান পায়। বহুবাজার ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গনে সেদিন শবরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিদেশী জিমনাস্টকুশলীদের কথা পড়?

—না। ইংরেজীতে লেখা সব বিষয় এখনও পড়তে পারি না। তবে ছবি দেখে বোঝবার চেষ্টা করি।

—ঐ সব জিমনাস্টের ফিগার তুলতে পার?

—না, পারি না এখনও। তবে প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে বুঝতে চাই।

—তোমার জিমনাস্টিকে এত আগ্রহ কেন?

—এই খেলাটা আমার খুব ভাল লাগে, তাই।

ওর প্রশিক্ষক শ্রীওঝাও বললেন, শবরী সবে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছে। কিন্তু জিমনাস্টিকের কলাকৌশল আয়ত্ত করার জন্য ওর চেষ্টার অন্ত নেই। তবে মেয়েটি খুব মেজাজী। যদি কোন একটা ফিগার ভাল লেগে যায়, তাহলে তা নিখুঁতভাবে করার জন্য গভীরভাবে চেষ্টা করে, আর মনেরমত নাহলে ওর অন্যরূপ।

এর সম্পর্কে প্রশিক্ষকরা খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। ও'দের বিশ্বাস শবরী যদি ঠিকমত সুযোগ-সুবিধা পায়, তাহলে অদূরভবিষ্যতে দেশে একজন কুশলী মেয়ে জিমন্যাস্ট গড়ে উঠবে। প্রসঙ্গতঃ এদেশে জিমন্যাস্টিক ক্রীড়া অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের বাধা-বিঘ্নের কথাও উঠলো। শবরীর ক্ষেত্রে বাড়ীর বাধা নেই। ওর বাবা শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরীর কলকাতায় রংয়ের ব্যবসা আছে। মেয়েকে পড়াচ্ছেন লী মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে।

—বাবা আমার জিমনাস্টিক শেখার বিষয়ে খুবই উৎসাহ দেন। ছোট্ট কিশোরী নানা প্রশ্নের উত্তরে ছাড়া ছাড়া ভাবে যেসব কথা বললে তা থেকে বোঝা যায় এই ব্যায়াম সমিতির ভাল ভাল আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকলে ওর জিমনাস্টিক চর্চার আকাঙ্ক্ষা অনেক পরিমাণে পূরণ হত। বিদেশী জিমনাস্টদের ছায়াচিত্র দেখাবার সুবিধা থাকলে—শবরী বলে—

—আমাদের পক্ষে আধুনিক রীতির ফিগার করার কৌশল রপ্ত করা বোধহয় আরও সহজ হত।

—তুমি বাংলার বাইরে কোথায় কোথায় গেছ?

—আমি ত্রিপুরায় গেছি।

—ত্রিপুরা তোমার কেমন লাগল?

—খুব ভাল। ওখানকার আসরে দেশের নানা জায়গার মেয়েদের খেলাধুলো দেখলাম। খুব ভাল লাগল।

—ওখানে তোমাদের দলের দেখাশোনার ব্যবস্থা কিরকম হয়েছিল?

—দেখাশোনার ব্যবস্থা ভালই হয়েছিল। ত্রিপুরাগামী দলে মেয়েদের ম্যানেজার ছিলেন শ্রীমতী শোভারানী চক্রবর্তী। উনি আমাদের জন্য ঐ ক'দিন খুব করেছেন। আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জনে জনে জিজ্ঞাসা করে জানতেন। প্রতিদিন আমাদের অনুশীলনের ব্যবস্থা, তাছাড়া সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খাওয়া থাকা বেড়ানো সবসময় চোখেচোখে রাখতেন।

শবরী পড়াশোনাতেও বেশ ভাল। অনেকের ধারণা জিমনাস্টিক চর্চা করলে মস্তিষ্ক স্থূল হয়ে যায়। এসব কথা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তা এমন সবই উপলব্ধি করেছেন।

ও দৈনিক দুই তিন ঘণ্টা অনুশীলন করে। সপ্তাহে দুদিন বিশ্রাম নেয়। আমাদের সামনে বেশ কয়েকটি সুন্দর-সাবলীল ফিগার করে দেখাল।

ওদের ব্যায়াম প্রশিক্ষকরা জানালেন তাঁদের অসুবিধার কথা। মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিতে হলে যেসব বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জাম দরকার তা না থাকায় এমন সব সপ্রতিভ, উৎসাহী এবং কুশলী মেয়েদের (ছেলেদেরও) ঠিক ঠিকভাবে শেখান যাচ্ছে না বলে ওঁরা আফশোস করেন। আগেকার দিনে খেলাধুলোর এখনকার মত বিস্তার না হলেও ব্যায়াম ও জিমনাস্টিকের ক্লাব বেশ ভালভাবেই গড়ে উঠেছিল। একদিকে জনকয়েক নিষ্ঠাবান একাগ্র শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা 'মাষ্টার মহাশয়' অখ্যায় জনপ্রিয় হতেন। এখনও ঐ সব প্রাচীন প্রবীণ শিক্ষক দুচারজন বর্তমান আছেন। এঁরা নিঃস্বার্থভাবে ছেলেমেয়েদের জিমন্যাস্টিক ও ব্যায়াম শিক্ষা দেন। এঁদের আচার-আচরণের আদর্শ নতুন প্রশিক্ষকদেরও অনেক পরিমাণে অনুপ্রাণিত করে। এই শহরেই যে কয়েকটি ব্যায়ামাগার ও জিমন্যাস্টিকের আখড়া এখনও টিমটিম করছে, সেখানে প্রাচীন গুরু-শিষ্যের চমৎকার সম্পর্ক উপলব্ধি করা যায়। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বেশ কিছু সংখ্যক ধনী ব্যক্তি বা বড় চাকুরে বিভিন্ন ব্যায়াম-ক্লাব ও জিমন্যাস্টিকের 'আখড়া' চালাতে স্বেচ্ছায় অর্থসাহায্য করতেন, কোনরকম প্রতিদানের চিন্তা না করেই। কিন্তু বর্তমানে এই শ্রেণীর বদান্য ব্যক্তির সংখ্যা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। এর পিছনেও কারণ আছে অনেক। পুরনোরা অপসৃত হচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের জায়গায় নতুনদের দেখা নেই কেন? দেশে এখন ধনী ও অর্থবান ব্যক্তির তো অভাব নেই। উপরন্তু বর্তমানে যখন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারত বিশ্বের দরবারে সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থান করে নিতে চাইছে, তখন দেশের অর্থবান সম্প্রদায় অন্যান্য নানা বিভাগে উৎসাহদানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ছেলেমেয়েদের শরীর-স্বাস্থ্য-চর্চার ব্যাপারেও তো অর্থসাহায্য করতে পারেন। সে কাজে বাধা কোথায়? একাজ তো দেশসেবারই অঙ্গ। রুশিয়া জাপান চেক বা জর্মানীর জিমন্যাস্টিক সংগঠনগুলি হয় সরকারী না হয় বেসরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়ে দেশের ছেলেমেয়েদের শিল্পকুশলী করে তুলছে। অবশ্য এদেশে এখন কিছু কিছু সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা আস্তে আস্তে হচ্ছে। বাণীপুরের শারীর শিক্ষণ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলোয় প্রশিক্ষক শিক্ষণ চলছে। এখানে জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও হয়েছে। তবে তা খুব স্বল্পকালীন। বছরে মাত্র দুমাসের জন্য পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তন থেকে আগত জিমনাস্টিক প্রশিক্ষক বাণীপুরের সরকারী বিদ্যালয়ে ভাবী শারীর-প্রশিক্ষকদের শিক্ষণ দেন। পাঞ্জাবে অবশ্য ব্যবস্থা আরও ভালো। ওখানে রাজ্য সরকার জিমন্যাস্টিককেও স্কুল পাঠক্রমের মধ্যে নিয়েছেন। তাই কাজও চলছে স্কুলপর্যায় থেকে—এবং দ্রুততালে। যাইহোক্, শবরীর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। শবরীর খুব ইচ্ছা ভবিষ্যতে নামী জিমন্যাস্ট হয়ে ওঠে। সেজন্য এখন থেকে তার চেষ্টায় ক্লান্তি নেই।

জয়

রঙ্গনী আলোয়

লণ্ঠটা জলে থাকতে থাকতে আর একটা ব্যাপার বলে নেবার তাগিদ অনুভব করছি। সেদিন স্টুডিও থেকে ফিরছি, বাস থেকে দেখলাম টালীগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সামনে একদল লোক একটা পকেটমারকে ধরে বেদম ঠ্যাঙাচ্ছে। আর লোকটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার পটলের কথা মনে পড়ে গেল। ওর কথা কি আপনাদের স্মরণ আছে? আমি একবার ওর সম্পর্কে লিখেছিলাম—মৃণাল সেনের ছবির জন্যে হিরোইন খুঁজতে গিয়ে বেচারি প্রচণ্ড ধোলাই খেয়েছিল এবং সেই ঘটনার পর ও ফিল্ম লাইনের হিরোইনদের ভয়ঙ্কর ইয়ে করতো।

আমাদের এই পটল ছিল মৃণাল সেনের গুটিকতক ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজার। ইন্দর সেন তখন মৃণাল সেনের সহকারী। ইন্দরই প্রথম বুঝতে পারে যে পটলের আর কাজ-কর্মে তেমন উৎসাহ নেই। সব সময়ই কেমন একটা আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব। অথচ পটল সব সময়ই করিৎ-কর্মা মানুষ, যখন যা বলা হয় সুচারুভাবে তা তো করেই, বরং ক্ষেত্রবিশেষে এটু বেশী বেশীই করে ফেলে। পটলকুমার বরাবরই সৌখীন এবং মেজাজী মানুষ। পোশাকে-আশাকে টিপটপ। প্রায়ই পমেটম মেখে স্টুডিওতে আসে। চোখে সুদৃশ্য লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমা। সুন্দরী মেয়ে দেখলে পটল অল্পেই কাতর হয়। আর এহেন পটলের সহসা এমন নিরাসক্তি দেখে বন্ধুবর চাঁদু ওরফে ইন্দর একদিন ওকে প্রশ্ন করল—হ্যাঁরে পটল, তোর কি হয়েছে বল তো?

—কই কিছু না—পটলের নিরাসক্ত উত্তর।

—উহুঁ, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। খুলে বল। যদি প্রেমে পড়ে গিয়ে থাকিস, গোপন করিসনে, আমি তোকে তোলবার ব্যবস্থা করব। ডাক্তারের কাছে কিচ্ছুটি গোপন করতে নেই ভাই পটল—

পটল ঘাঁৎ করে শেষে বলল—প্রেমে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, ওটা নয়, আসলে—

—আসলে?

—মানে দেখ চাঁদু, আমি অ্যাদ্দিন ফিল্ম লাইনে রয়েছি অথচ একটা ছবিতে পার্ট করারও সুযোগ পেলাম না। আমি তো এখানে শুধু প্রোডাকশন ম্যানেজারী করতে আসি নি, আমি আর্টিস্টও হতে চাই।

চাঁদু মুচকি হাসল।—অ, তাহলে এই ব্যাপার! তা সে কথা তো আগে বলবি। আমি এক্ষুনি মৃণালদাকে বলে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তুই ছবিতে পার্ট করবি এতো খুব সামান্য কথা—

তখন পটল অভিমান-রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—না না ভাই মৃণালদাকে আর বলতে হবে না। আমি বলে বলে হদ্দ হয়ে গেছি। শুনে মৃণালদা শুধু মুচকি মুচকি হাসে—

চাঁদু ওকে আশ্বস্ত করে বলল—সে তোকে চিন্তা করতে হবে না। আমি ঠিক রাজী করিয়ে নেব। এখন তুই বল পার্টের ব্যবস্থা করলে তোর সব মনের দুঃখু ঘুচে যাবে তো?

—হ্যাঁঃ।

এর দিন কতক পরে চাঁদু পটলকে ডেকে বলল—পটল, তুই তো ক্যারেকটার অ্যাকটিং করতে ভালবাসিস?

পটল অবাক। বলল—কে বলল রে?

—ধর আমিই বলছি।

—ঠিক ধরেছিস মাইরি—পটল গদগদ কণ্ঠে বলল—ঠিক ছবিদার মত। আমি রোজ রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ছবিদার মত পার্ট করি, তুই ঠিক ধরেছিস কিন্তু। তা হ্যাঁ, কি পার্ট দিবি আমাকে?

—ধর একটা পকেটমারের চরিত্র?

শুনে পটলের মুখের চেহারা ফিউজ হয়ে যাওয়া ডুমের মত দাঁড়াল।—পকেটমার? ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্সেই পকেটমার হওয়াটা কি ভাল দেখাবে চাঁদু? মানে বাড়ির লোকজন দেখবে তো, তাই বলছিলাম আর কি।

চাঁদু ওকে প্রবল উৎসাহ দিল—ধুস তুই মিথ্যেই চিন্তা করছিস, মৃণালদার ছবিতে একটা পকেটমারের চরিত্রেও কিছু করবার থাকে। আমি অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি, তুই আর 'না' করিসনে—

অগত্যা, নেহাৎ চাঁদুকেই বাঁচিয়ে দিচ্ছে এমন একটা ভঙ্গী করে পটল বলল—ঠিক আছে, তুই যখন অত সাধাসাধি করছিস, তখন না হয় করেই দেব পার্টটা। ইয়ে, ডায়লাগ-ফায়লাগ আছে তো?

—আলবৎ, তুই করবি অথচ জম্পেশ ডায়লাগ থাকবে না, এ কখনও হতে পারে। মৃণালদা বলেছে তোর মুখে চমৎকার চমৎকার সব ডায়লাগ দেবে। আফটার অল পটলকুমার বলে এট্টা কথা!

পটল তৎক্ষণাৎ এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক এনে চাঁদুকে দিয়ে বলল —আপাততঃ এটা রেখে দে, তোকে আমি একটিন ফাইভ ফাইভ ফাইভ প্রেজেন্ট করব বলে মনস্থ করেছি। ইয়ে, মৃণালদাকে এটু গুছিয়ে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোকে কিছু চিন্তা করতে হবে না, ফার্স্ট ক্লাশ পার্ট, ওটা করলে স্বয়ং ছবি বিশ্বাসও তোকে খাতির করে কথা বলবে—

পটল বলল—চাঁদু, তোকে, প্রমিজ করছি, একদিন চ্যাংগওয়াতে ভরপেট্টা চাইনীজ খাওয়াবো—

এলগিন রোডের মুখে একটা বিরাট বাড়ির ছাতে ক্যামেরা তোলা হয়েছে, ক্যামেরার মুখ ট্রাম স্টপেজের দিকে। মৃণাল সেন চাঁদুকে বলে দিয়েছেন, হাজরা থেকে গুনে গুনে চারখানা ট্রাম ছেড়ে ফিফথ ট্রামে তুমি পটলকে নিয়ে উঠবে। ভেতরে যাবে না, পাদানিতে দাঁড়াবে। তারপর এই স্টপেজে ট্রাম যেই থামবে তুমি যেন হঠাৎ পাকড়াও করেছ এমন একটা ভঙ্গী করে 'পকেটমার পকেটমার' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে পটলের কলার ধরে নামাবে। বাস, শটটা আমরা ওখানেই কেটে দেব। অন্যান্য শটগুলো পরে নেওয়া হবে, অন্য লোকেশানে—

চাঁদু পটলকে নিয়ে সোজা হাজরায় চলে গেছে। গুনে গুনে ট্রাম ছাড়ছে। এমন সময় উদ্বিগ্ন পটল চাঁদুকে জিগ্যেস করল—হ্যাঁরে চাঁদু, ক্যামেরা চড়েছে তো বাড়ির ছাতে, ওখান থেকে শট নিলে আমাদের চেনা যাবে তো?

চাঁদু আশ্বস্ত করল—জুম ক্যামেরা,ইয়া-বড় বিগ ক্লোজে তোর শট নেওয়া হবে। খবদ্দার তাকাবি না, তুই শুধু পকেটমারের মত অ্যাকশান দিয়ে যাবি, নইলে সব বরবাদ হয়ে যাবে—

—আরে সে তোকে ভাবতে হবে না—পটল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল—সে আমি যা অ্যাকশান দেব—আসল পকেটমাররাও চমকে উঠবে। ওসব আমার ভাল জানা আছে। তুই কিন্তু বেশ জাম্পা করে আমার কলার চেপে ধরবি, তারপর দেখনা আমি কি লঙ্কাকাণ্ড আজ করি—

তখন অফিস টাইম। ট্রাম বাসে মানুষ বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে ডালহৌসির দিকে। পঞ্চম ট্রামে ওরা দুজনে কোন গতিকে ঝুলে পড়ল। পটল একজনের পা মাড়িয়ে দিতে সে ভদ্রলোক তো খাপ্পা করে উঠলেন। তার সঙ্গে পটলের খানিকটা বচসা হলো। চাঁদু ইশারাতে থামাল। আসলে পটল অ্যাকশান দেবার জন্যে খানিকটা জায়গা খুঁজছিল। তাছাড়া উল্টোদিক হয়ে পড়ায় তার আশংকা হচ্ছিল যে ক্যামেরায় ওর মুখ ভালভাবে উঠবে না। যাই হোক, বেশ ঠেলেঠুলে পটল শেষ পর্যন্ত কিছু জায়গা দখল করে চাঁদুকে ডাকল—চাঁদু, এদিকে সরে আয়,

নইলে ব্যাক-টু-ক্যামেরা হয়ে যাব—। আর ইয়ে, বেশ ভালভাবে নামাবি—

চাঁদু ইঙ্গিতে ওকে যত থামতে বলে ও ততই বেড়ে যায়। চাঁদুর আশংকা, এই বুঝি সব মাঠে মারা যায়।

এরপর এল সেই এলগিন স্টপেজ।

ক্যামেরা গোপন, কেউ বুঝতেই পারছে না যে ছবির শুটিং হচ্ছে। ট্রাম ঘাহাতক দাঁড়িয়েছে, চাঁদু আর তিলার্ধ অপেক্ষা না করে হঠাৎ—ব্যাটা পকেটমার, চল—বলেই পটলের জামার কলার ধরে এক হ্যাচকা টানে নামিয়ে ফেলল ফুটপাতে।

তারপর একটা ঘা মুহূর্তেরই ব্যাপার, দেখা গেল নিমেষে ট্রাম খালি করে লোক নেমে এসে পটলকে দমাদ্দম পিটতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ করে সেই লোকটা, পটল যার পা মাড়িয়ে দিয়েছিল। মার শালাকে, মেরে পাট পাট করে ফেল' রবে চতুর্দিক মুখর। পটল এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভ্যাবা-চাকা খেয়ে অস্থির। দু হাতে আত্মরক্ষা করতে করতে ও যত বলে—আরে মারছেন কেন? আমি আসল পকেটমার নই—লোকে তত ক্ষিপ্ত হয়, বেদম ঠ্যাঙায় এবং বলে—শালা তুমি নকল পকেটমার, এয়ার্কি মারবার জায়গা পাওনি? মার শালাকে।

চাঁদু প্রথমে ওকে বাঁচাবার জন্যে রীতি-মত চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওই ফিউরিয়াস মবের সামনে আর একা কতক্ষণ দাঁড়াবে? সে রণেভঙ্গ দিয়ে তখন ছুটল মৃণালদাকে খবরটা দিতে!

মৃণাল সেন যে ছাতের ওপর ক্যামেরা রেখে চিত্রগ্রহণ করছিলেন, তিনি এসব ঘটনার বিন্দু-বিসর্গ টের পান নি। এসব তাঁর চোখের আড়ালেই ঘটছিল। চাঁদু হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে তাঁকে 'পটল ফিনিশ' বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নেমে এলেন নীচেয়। কিন্তু ততক্ষণে ড্যামেজ যা হবার বেশ ভাল রকমই হয়ে গেছে।

ট্রাম বহুক্ষণ আগে চলে গেছে, ক্রুদ্ধ জনতা পটলের শরীরের প্রতি সেন্টিমিটারে যে যার মনের ঝাল মিটিয়ে হাতের সুখ করে গেছে, পটলের চশমা ভেঙেছে, নাকের ডগা বেঁকে গেছে, শার্ট ছিঁড়েছে, প্যান্ট ছিঁড়েছে, চটি জুতোর এক পাটির কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না, একদল কৌতূহলী নিরীহ দর্শক তখনও পটলকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে—গুরু, ব্যাগটা তাহলে কোথায় সরালে? কারও হাতে 'পাস' করে দিয়েছ তো? দেখো সে ব্যাটা আবার তোমায় বিট্রে করে কিনা!

মৃণাল সেনকে দেখেই সম্ভবতঃ পটলের সংযমের যেন বাঁধ ভাঙলো। সটান ভ্যাঁক করে কেঁদে উঠে বলল—শালারা আমায় বিনা নোটীশে পিটে গেছে দাদা আর চাঁদু আমায় ওদের হাতে গুঁজে দিয়ে কেটে গেছে দাদা, এ-পার্ট আমি আর করব না। আপনি আর কাউকে দিয়ে দিন...

এরপর বহুবার পটলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে স্টুডিওতে। এই প্রসঙ্গে কথা উঠলেই পটল গম্ভীর কণ্ঠে বলেছে—ওটা থাক, তারচেয়ে যেটা চাইছ এই নাও—বলে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়েছে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে।

এবার আইনতঃ কিন্তু আমার লণ্ডে ফিরে যাবার কথা, কারণ টাইম অ্যান্ড স্পেস অনুযায়ী এতক্ষণে লণ্ডের ডাঙ্গায় ফিরে আসারই কথা, কিন্তু তার আগে দুম করে একখানা গৌরীপ্রসন্ন উপাখ্যান এসে পড়বে, বুঝতে পারিনি।

সেদিন গেছি স্টুডিওতে, টালীগঞ্জের রেসকোর্সে তখনও ঘোড়ারা দুদ্দাড় দৌড়াচ্ছে, অধিকাংশ রেসুড়ের মুখ গভীর উত্তেজনায় থমথম করছে অথবা হাতপা ছুঁড়ে কিছু-না-কিছু বলছে, আমি সটান স্টুডিওর গোলঘরে। পায়তাড়া করে গেছি যে রেসের এহেন অবস্থার একটা বারো-স্কোপিক ধারাবিবরণ ছাড়ব, কিন্তু তার আগেই দেখি গীতিকার গৌরীপ্রসন্নকে সবাই ঘিরে ধরেছে, বেশী ধরেছে আমাদেরই ফিচেল সহকর্মী কালি বাড়ুজ্যে, গৌরী-প্রসন্ন'র মুখ ভীষণ অপ্রসন্ন, কালি তাঁকে বিব্রত মুখে কি-যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে, গৌরীপ্রসন্ন কেবল ধুস্ ধুস্ করে যেন মাছি তাড়াচ্ছেন, ব্যাপারটাকে এড়াবার চেষ্টা করছেন, তক্ষুনি আমি নগদ হাজির হয়ে গেলাম।

কালি আমায় দেখেই বলল—এই যে তুমি যথাসময়ে এসে পড়েছ। গৌরীদা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না—

কি বিশ্বাস, কি অবিশ্বাস, আগু-পিছু ঘটনার কিছুই জানি না, বোকার মত হেসে কি বলব ভাবছি, হঠাৎ গৌরীপ্রসন্ন বললেন—কালিটা ইদানীং মহা ফাজিল হয়ে উঠেছে, ট্যাকসি থেকে নেবেছি কি নামিনি, হঠাৎ দৌড়ে এসে বলল—

কালি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বত্রিশপাটি হেসে বলল—না না দাদা, সত্যি সত্যিই আপনাকে আবগারীর অফিসাররা খুঁজছে—

গৌরীপ্রসন্ন আবারো খচিতং।— খুঁজছে না ঢেঁড়শ, যত্তো সব বাজে কথা।

—আরেঃ, এই নিয়ে আবগারীর লোকেরা আজ দু-ক্ষেপ স্টুডিওতে এসেছে, ওদের নাকি কি বিশেষ একটা দরকার আছে আপনার সঙ্গে—

—গৌরীপ্রসন্ন অমনি কালিকে—ধুস্ ধুস্ এয়ার্কি আর মেরো না কালি, অন্য কাউকে লেগপুল করোগে যাও—

ঘটনা বিস্তারিত হতে, মানে কালিকে আমার একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে যখন প্রেসার দিলাম, তখন বলল—ইটস্ এ গ্রেট অনার দাদা। আপনি গান লিখেছেন 'বিপিনবাবুর কারণ-সুধা মিটায় জ্বালা মিটায় ক্ষুধা'—দাদা বিলকুল সুপার হিট গান, বাংলা মালের বিক্রী ডবল হয়ে গেছে, যত বাজছে রেকর্ড তত বাড়ছে সেল, ফ্যান্টাস্টিক, তাই আবগারী ডিপার্টমেন্ট ভয়ঙ্কর প্রীত হয়ে আপনাকে একখণ্ড অভিনন্দন জানাবার জন্যে স্রেফ হন্যে হয়ে উঠেছে। খুঁজছে—

ওঃ, শুনে গৌরীপ্রসন্নর কি অসাধারণ রি-অ্যাকশান। প্রায় সাতফুট লম্বা মানুষটা খানিকক্ষণ গুম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে এক-সময় বললেন, হ্যাঁরে, তোরা আমায় কেউ এক গেলাস জল খাওয়াতে পারিস?

কালি অপরাধীর মত মুখ করে বললে—দাদা আমার ওপর কুপিত হলেন? আমি না। আসলে মনীশের সঙ্গেই আবগারীর মিটিং হয়েছে। ওরিজিন্যাল প্রস্তাবটা ব্যাটা মণীশই ওদের দিয়েছে মনে হচ্ছে।

গৌরীপ্রসন্ন গম্ভীর মুখে বললেন—আমি তোদের এই বেঞ্চিতে এটু বসব?

সবাই তৎক্ষণাৎ বেঞ্চির ধুলো ঝেড়ে দিয়ে মিনতি করে গৌরীপ্রসন্নকে বললে—আমাদের কৃতার্থ করুন। সিগ্রেট? চা? কফি?

গৌরীপ্রসন্ন কি-যেন একটা কথা অস্ফুট কণ্ঠে বললেন। কথাটা অবশ্য আমাদের কানে পৌঁছাল না। শুধু কালি অপ্রতিভ ভঙ্গীতে বলল—না দাদা, কুপিত হবেন না।

জল এল।

গৌরীপ্রসন্ন বেঞ্চিতে বেশ জমিয়ে বসে বললেন—তোরা আর আমার পেছনে কতটুকু লেগেছিস, ওরে আমি যে এর চেয়েও মারাত্মক বিপদে পড়ে হেঁচকি তুলছি। ওঃ, কি কুক্ষণে যে এই গান লিখেছিলাম...

গৌরীপ্রসন্ন ফোঁস করে একখানা ইয়ে ছাড়লেন অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস। তারপর আমরা আরও কিঞ্চিৎ তৈল দিতে উনি বলতে আরম্ভ করলেন—

...গৌরীপ্রসন্ন সেদিন সকালে বেশ প্রসন্ন মেজাজে তাঁর লেখার টেবিলে বসেছেন, ইচ্ছে, একখানা জম্পেশ করে বায়োস্কোপের গল্পো লিখে ফেলবেন। বোম্বেতে ইদানীং ওঁর গল্পের বেশ চাহিদা হয়েছে, পার্টিকুলারলি শক্তি অব দি সামন্তস্ তাঁর একখানা গল্পো ক্রয় করে তুঙ্গো বেপত্তি করে ছেড়েছেন, হেনকালে দরজায় আঘাত, উহুঁ, নকিং সাউন্ড নয়, কিলিং সাউন্ড (অর্থাৎ দরজায় কিল্ মারা), গৌরীপ্রসন্ন ভীষণ অপ্রসন্ন হলেন। চাকরকে পই পই করে বলা আছে—সকালবেলায় নো ভিজিটার, মেল তো নয়-ই, ফিমেল হলে মাত্র এক আধজন। তাও বিউটিফুল হলে। তা সে ব্যাটা কি করছে? গাঁজার দম দিয়ে কোথাও আড্ডা দিচ্ছে নাকি?

আবার কিলিং সাউন্ড।

এবার সদর দরজা যেন কেঁপে উঠল।

গৌরীপ্রসন্ন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। গল্পের আইডিয়াটা সবে মাথায় এসেছে, এখনও পর্যন্ত তার একটা হুব্বও লেখা হয়নি, এর মধ্যে উৎপন্ন।

গেলেন। গিয়ে বেশ গম্ভীর মুখে দরজা খুললেন।

দেখেন এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, পরণে ধুতি-পাঞ্জাবী, বেশ শক্ত-সমর্থ-চেহারা, ক্রুদ্ধ বে-পরোয়া ভাব-ভঙ্গী।

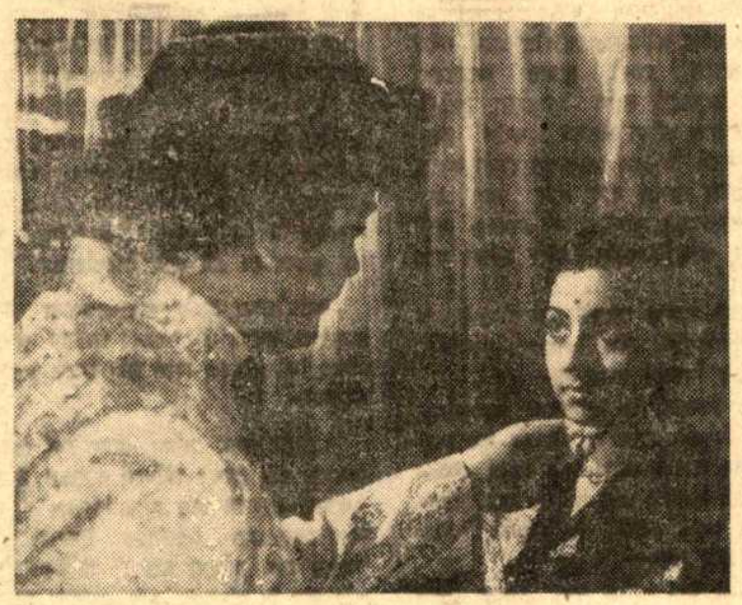

হারমোনিয়াম
দেবিকা দাস ঃ সোনালী গুপ্ত

*

সেই চোখ ঃঃ উত্তমকুমার ঃ মহুয়া

গৌরীপ্রসন্ন হঠাৎ কেমন যেন বিব্রত বোধ করলেন।—ককে চাই ?

—আপনাকে। ভদ্রলোক হেঁড়ে খরখরে গলায় ঘোষণা করলেন—আপনার নাম কি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ?

—আ্যাঁ...ইয়ে, হ্যাঁ আমারই নাম। কেন বলুন তো ?

—বলছি। সেকথা বলার জন্যেই তো আমি কদিন হন্যে হয়ে আপনার খোঁজ করে বেড়াচ্ছি। মাত্তর গতকাল রাত্রে আপনার বাড়ির ঠিকানাটা পেলাম, আর এই ভোর বেলায় ছুটে এলাম—

গৌরীপ্রসন্ন সবিনয়ে বললেন—আসুন আসুন, ভেতরে আসুন—

—না আর ভেতরে যাবো না বাইরে দাঁড়িয়েই যা বলার বলব।

—বলুন।

—আচ্ছা মোশাই, আপনি আমার নাম নিয়ে এই কেচ্ছা ছড়াচ্ছেন কেন ? আমি আপনার কি ক্ষতি করেছি ? অ্যাঁ ?

গৌরীপ্রসন্ন হতভম্ভ।—আপনার নামে আমি কেচ্ছা করছি ! কি বলছেন আপনি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

—পারবেন, ভাল করে বুঝিয়ে দিলে ক্রমে ক্রমে সবই বুঝতে পারবেন, আমি মোশাই আমার বয়স যখন আঠারো তখন থেকে বেঙ্গল খাই, আজ আমার চুয়াল্ল ব্যায়লায় হেন লোক নেই যে আমায় চেনে না, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে মাতলেমো করেছি বা উত্তমকুমারের মত কোমর বেঁকিয়ে এক চক্কর কখনও নেচেছি। এসেছি, বসেছি, একপাট বেঙ্গল টেনেছি, ব্যাস, ভদ্দরলোকের মত হেঁটে বাড়ি গিয়ে ভরপেট্টা খেয়ে শয্যা নিয়েছি, কিন্তু এদ্যান্তে আপনি আমার তেইশটা বাজিয়ে দিয়েছেন। ঘরে নিস্তার নেই, বাইরে নিস্তার নেই, মালের দোকানে নিস্তার নেই, যেখানে যাই সেখানেই আমার ইয়েতে লোকে আঠার মত সেঁটে থাকে। বলি এটা কি ব্যাপার অ্যাঁ ?

গৌরীপ্রসন্ন কি যে বলবেন স্থির করতে পারছিলেন না। শুধু বিনয়ের সঙ্গে একবার যাঁহাতক বলবার উদ্যোগ করেছেন, লোকটা প্রায় ধমকে উঠে বলল—হ্যাঁ মশাই আমার নামই বিপিন হোড়, আপনি বেছে-বুছে শেষ পর্যন্ত আমার নামটাই লাগিয়ে দিলেন মোশাই কেন আকুকেলে ? পাড়ার ছোঁড়া এখন আমায় নিয়ে যা কাণ্ড করছে, বলার নয়—

বলতে বলতে বিপিন হোড় হঠাৎ ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেললেন।

—আরে করেন কি করেন কি—শশব্যস্তে গৌরীপ্রসন্ন তাকে সামলাতে সচেষ্ট হল, কিন্তু বিপিন হোড় থামবার পাত্র নয়, কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল—আপনি যখন আমার জীবন মরুভূমি করেছেন তখন আমিও আপনাকে ছাড়ছি না। আমি খুব শিঘ্রী আপনার নামে একখানা গান বাঁধবো, বড় একজন কাউকে দিয়ে গাওয়াবো এবং মাইরি বলছি সেই রেকর্ড ফ্রী ডিস্ট্রিবিউট করব চতুর্দিকে। বলি আপনি ভেবেছেন কি ?

গৌরীপ্রসন্ন বললেন—ভাই সেই ভয়ে আছি। বেহালার একজনকে খবর করতে বলেছিলাম, সে বলেছে বিপিন হোড় বাস্তবিকই কলকাতার গীতিকারদের দিয়ে নাকি গান লেখাতে আরম্ভ করেছে, ব্যাটা ছাড়বে না। অথচ বিশ্বাস করো ভাই, সেই বিপিন হোড়কে কত বুঝিয়ে বললাম, আরে মশাই আপনি আমায় খুব ভুল বুঝেছেন, আমি আপনার নামও কখনো শুনিনি, দেখার কথা তো অবান্তর। আসলে গানটা আমি বোম্বেতে বসে লিখেছিলাম। যে হোটেলে বসে লিখি সেখানে বিপিন নামে একটা লোকের সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হয়ে যায়, লোকটা বেশ ভাল, হঠাৎ বসিয়ে দিলাম নামটা। ওটা আপনার নাম নয়, আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না, তা সে বিপিন হোড় আমার কোন কথাই শুনল না, হড়বড় করে চলে গেল, এখন দেখ আমার কোন আগ্নিষ্ট পার্টি দুম্ করে একটা গান রেকর্ড করে বসে.....

নাঃ, এরপর লণ্ডে, অনিবার্য।

রঞ্জন মজুমদার

দীক্ষাগৃহ

রাত্রি যাদের দিন ঃঃ ঝুমুর গাঙ্গুলী

ফের থেকে বলছি

দীপংকর দে একেবারে গ্যাংস্টার হিরোর মত দাঁড়িয়েছিলেন এক নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও-র ফ্লোরে। এই ফ্লোরের একটা অংশ এখন দেশী মদের দোকানে রূপান্তরিত হয়েছে। সারি সারি শূন্য বোতল এবং পূর্ণ বোতল। বেশ উঁচু একটা কাউন্টার। কাউন্টারের মাঝখানে একজন নাদুস-নুদুস ভদ্রলোককে দেখা গেল। দুটো নয় চারটে চোখ লাগিয়ে তিনি মদ বিক্রী করছেন আর মাতালদের কাণ্ড-কারখানা দেখছেন। শুটিং জোন তখন খুব একটা বড় নয়। এরই মধ্যে মাতালরা বসে আছেন। একদিকে একটা লম্বা টেবিলের মাঝখানে গিয়ে বসলেন দীপংকর। মুখে চোখে ক্লান্তির ভাব ফুটিয়ে চুপ করে বসেই রইলেন। তিনি অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য এইভাবে নিজের মধ্যে বসবাস করতে চেয়েছিলেন। পরিচালক তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। ইতাবসরে আলো করা হল। অন্যান্য শিল্পীদের পজিশন ঠিক করা হল। অন্যান্য শিল্পী বলতে বাংলাদেশ থেকে আগত স্বনামখ্যাত আনোয়ার হোসেন, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ছিলেন দিলীপ বসু, দিলীপ সেন এবং পরিতোষ রায়। ওঁরা সব কাছাকাছি বসেছিলেন। ওঁদের একটা দল। টেবিলে কয়েক বোতল রাখা হল। এদিকে অর্থাৎ দীপংকরের টেবিলে বোতল শূন্য। তিনি মাথা নীচু করে একটা একটা করে ছোলা মুখে দিচ্ছিলেন। কনুইয়ে ভর দিয়ে তিনি একবার মাথা তোলবার চেষ্টা করলেন। মাঝখানে কিছু সংলাপ থাকছে। দৃশ্যটা সাজানো হয়ে গেল। পরিচালক একটা মনিটর দেখতে চাইলেন, চলতি কথায় যা হচ্ছে রিহার্সাল। ততক্ষণে

দীপংকর এবং অন্যান্য শিল্পীরা যে যার চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ফলে পরিবেশটা সৃষ্টি হয়েছে চমৎকার। দেয়ালের ক্যালেন্ডারে, আসবাবপত্রে টিমটিমে আলোয় এবং লোকজনদের আচার-ব্যবহারের মধ্যে মধ্যে এও মনে হতে পারে ফ্লোরে নয় দেশী মদের দোকানে চলে এসেছি। এতক্ষণ যা হয়েছে এই মুহূর্ত থেকে কিছুক্ষণের জন্য সায়লেন্স, অ্যাবসলিউট সায়লেন্স দরকার। পরিচালকের কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠল। উপস্থিত শুটিং দর্শনার্থীরা তটস্থ হলেন। দেখতে দেখতে সব আলো জ্বলে উঠল। ক্যামেরার জন্য যে আলো প্রয়োজন। শেষ বারের মতো স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রধান সহকারী পরিচালক। অন্যতম সহকারী পরিচালক ক্ল্যাপস্টিক দিলেন। মনিটর নয় একদম টেকিং। এত বাই এত নম্বর শট। ফার্স্ট টেক। দীপংকরকে দেখে মনে হল এতক্ষণ ধরে মাল টানছিলেন। বুঁদ হয়ে বসে আছেন। ওদিকে আনোয়ার হোসেন তাঁর চ্যালাচামুণ্ডাদের নিয়ে মাল টানা শুরু করবেন উদ্যোগ করছেন। মদের বোতল টেবিলে রেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার কোন মানে হয় না। আনোয়ার ওঁদের এক ধমক দিলেন! ওঁরা ঢলাঢলি আরম্ভ করে দিল।। আসলে ওঁরা দীপংকরকে দেখছিল। এই অঞ্চলে অপরিচিত মুখ—দীপংকর বর্তমানে যে চরিত্রের মধ্যে রয়েছেন। আনোয়ারও বেশ কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দেখতে দেখতেই সিগারেটের প্যাকেটটা ওপেন করলেন। প্যাকেটের ওপর সিগারেটটা ঠুকলেন অতঃপর দুই ঠোঁটের মাঝখানে রাখতেই খেয়াল পড়ল দেশলাই নেই। দেশলাই তিনি অন্য কারুর কাছে চাইতে পারতেন কিন্তু চাইলেন না। চাইলেন দীপংকরের কাছে। হয়তো ওঁকে ভাল করে লক্ষ্য করার জন্য গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করলেন :

কি মশাই দেশলাই আছে নাকি?

দেশলাই নেই সেটা ঠিক ওইভাবেই মাথা নুইয়ে প্রথমে ঘাড় নাড়িয়ে পরে কথায় জানিয়ে দিলেন দীপংকর। আপটু দিস—এই পর্যন্তই। দৃশ্যটা কাট হল। কিন্তু ক্যামেরার পজিশন একই থাকল। আলোর বিন্দুমাত্র রদবদল হল না। রদবদল হল শিল্পীদের পজিশনে। দীপংকর ক্যামেরার জোনের বাইরে বসে রইলেন। কিউ দিতে হবে কিনা জানতে চাইলেন। পরিচালক জানালেন তার আর দরকার হবে না। অতএব অতিদ্রুত পরবর্তী শটটি টেক করা যেতে পারে। অন্যতম সহকারী ক্ল্যাপস্টিকে নতুন নম্বর লিখে ফেললেন। ক্যামেরার সুইচ অন করা হল যথারীতি। ক্ল্যাপ পড়ল। এখানে এখন দেখা যাচ্ছে আনোয়ার হোসেন অন্য একজনের হাত থেকে দেশলাই নিচ্ছেন। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে সংলাপ উচ্চারণ করছেন। ঠিক এইভাবেই থাকবে। পরিচালক শব্দযন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন। সিগারেট মুখে কথা এর চেয়ে স্পষ্ট হতে পারে না। সুতরাং ঠিকই আছে। শট টেক করা যেতে পারে। পরিচালকের নির্দেশমত শটটা টেক করা হল। এবারে ক্যামেরার পজিশন চেঞ্জ করা হবে। সময় লাগবে। ফ্লোরের মধ্যে গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। আমরা সবাই বাইরে এলাম। দীপংকরের সঙ্গে কথা হল। ওঁর নতুন ছবি সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য'। এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুটিং শুরু হচ্ছে। এই শুটিং শেষ হতে না হতে ছুটতে হবে হাজারিবাগ। সেখানে ইন্দর সেন 'অসময়' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করবেন এ মাসের সতেরো থেকে তিরিশ। দীপংকর যোগ দেবেন বাইশ তারিখে। এ মাসে প্যাকড প্রোগ্রাম।

সংঘর্ষ :: আনোয়ার হোসেন : আরতি ভট্টাচার্য। পরিচালনা :: রতীশ দে সরকার : অমৃত

বাংলাদেশের অভিনেতার সঙ্গে নতুন করে আলাপ করিয়ে দেবার উদ্যোগ করছিলেন ছবির পরিচালক। কিন্তু তা আর করে দিতে হল না। আনোয়ার চিনতে পারলেন। আরে—আপনার সঙ্গে তো আলাপ আছেই।...মনে পড়েছে? লিটন হোটেলে বসে একবার আমি আপনাকে ইন্টারভিউ করেছিলাম।...বলতে না বলতে আনোয়ার হাত চেপে ধরলেন। 'সব সব মনে পড়েছে।' আমি হঠাৎ হেসে ফেললাম 'আমিও কি প্রথম দর্শনেই আপনাকে চিনতে পেরেছি। পারিনি। কে যেন আমার কানের পাশে বলছিলেন আপনার কথা। ভাল করে লক্ষ্য করতেই হিসেব মিলে গেল। এ ভদ্রলোক আনোয়ার হোসেন না হয়ে যায় না।...তা তো হল চেহারাটা এত খারাপ হল কি করে? সেইজন্যই তো আমার চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল।...

আনোয়ার বললেন : ইচ্ছে করেই করিয়ে ফেলেছি। মোটা হয়ে গেলে কাজ করতে অসুবিধা কাজ পেতে অসুবিধা।

আনোয়ার ঘটনাচক্রে এই ছবি 'শঙ্খবিষ'-এ অভিনয় করতে এসেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কাহিনী থেকে নিমীয়মান এ ছবির প্রবীণ পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী। পরিচালনা করছেন তাঁরই সুযোগ্য সহকারী রথীন দে সরকার। এই তাঁর প্রথম স্বাধীনভাবে কাজ। তাই বোধহয় প্রত্যেকটি ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন। শিল্পী নির্বাচন কলাকুশলী নির্বাচন এবং কাহিনী নির্বাচনের অনেক ক্ষেত্রে এই তরুণ পরিচালকের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

এ ছবিতে নায়ক দীপংকর দে-র বিপরীতে নায়িকা আরতি ভট্টাচার্য। একটি বিশেষ নারী চরিত্রে থাকছেন সোমা দে। অন্যান্য চরিত্রে শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন : বসন্ত চৌধুরী রবি ঘোষ বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং বিকাশ রায়।

চিত্রগ্রহণ করছেন আশু বসু। শিল্পনির্দেশক : প্রসাদ মিত্র। সম্পাদনা করবেন : সুনীল ব্যানার্জি। সঙ্গীত পরিচালক : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রিল মাসে গান রেকর্ড করা হবে। প্লেব্যাক করবেন : মান্না দে আরতি মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত পরিচালক স্বয়ং।

বি আর মুভিজ-এর ব্যানারে এই ছবি নির্মিত হচ্ছে।

প্রযোজনা করছেন : বিকাশ চ্যাটার্জি। এই নিয়ে নাদিন শুটিং অতিবাহিত। প্রথম পর্যায় শেষ। দ্বিতীয় পর্যায় সম্ভবতঃ আগামী মাসে।

স্টুডিও সংবাদ

সংসার সীমান্তে
শেলী পাল ঃ পলিন চট্টোপাধ্যায়

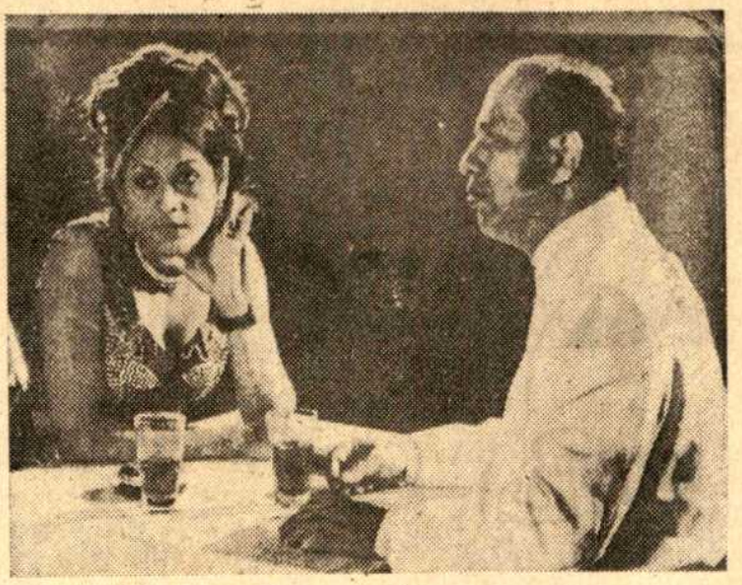

অপরাজিতা ঃঃ রাজশ্রী বসু ঃ সুরজিৎ ঘোষ

বিগত তেসরা মার্চ কলকাতার কলাকুশলীরা দাবী দিবস পালন করেন। অল ইন্ডিয়া কনফেডারেশনের ডাকে স্থানীয় ফেডারেশন অফ ফিল্ম টেকনিসিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এখানে এই দিবস পালনের ব্যবস্থা করেন। অন্যতম মুখপাত্র সোসাইটি অফ সিনেমাটোগ্রাফার্সের যুগ্ম সম্পাদক পঙ্কজ দাস এক সাক্ষাৎকারে এই মর্মে আরো জানান যে বম্বেতে কলাকুশলীরা কর্মবিরতি পালন করেছেন। আমরা তাঁদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। এই সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে দাবী দিবসে স্থানীয় কলাকুশলীরা 'ব্যাজ' পরিধান করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই ডাকে সাড়া দিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন চলচ্চিত্র-শিল্প কেন্দ্র থেকে অসংখ্য কলাকুশলী।

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ পরিচালক অমিতাভ দাশগুপ্ত বর্তমানে 'অপরাজিতা' ছবির শেষ পর্যায়ের দৃশ্য-গ্রহণ করছেন। বম্বে থেকে ফেরার পর এই শুটিং হচ্ছে। বম্বেতে শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর ইউনিটসহ গিয়েছিলেন ফেব্রুয়ারী মাসে। সপ্তাহব্যাপী শুটিং করেছেন বম্বের রাস্তা-ঘাটে এবং বাড়িতে। তারই কিছু অবশিষ্ট অংশ সেট-এ এসেছে। শিল্পীদের মধ্যে অংশ নিচ্ছেন নায়ক রঞ্জিত মল্লিক ও নায়িকা রাজশ্রী বসু। এছাড়া এ ছবিতে আছেন ঃ উৎপল দত্ত শিপ্রা মিত্র তরুণকুমার রুবী দত্ত তনিমা বিশ্বাস এবং নবাগত বিজু। চিত্র-গ্রহণ করছেন ঃ বেনু সেন। সংগীত পরিচালক ঃ সুধীন দাশগুপ্ত। প্রযোজনা করছেন প্রখ্যাত প্রচারবিদ রঞ্জিত মিত্র।

অনেকদিন পর পরিচালক গুরু বাগচীর সংগে দেখা ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। এখানে চলতি সপ্তাহে তিনি সৃষ্টিছাড়া ছবির শেষ পর্যায়ের দৃশ্যগ্রহণে ব্যস্ত আছেন। ফ্লোরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি শট দিচ্ছেন বিকাশ রায় দিলীপ রায় এবং পার্থ মুখোপাধ্যায়। শেষোক্ত শিল্পীর বিপরীতে এ ছবির নায়িকা মহুয়া রায়চৌধুরী। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন ঃ পদ্মা দেবী শিবানী বসু আনন্দ মুখোপাধ্যায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় গৌর শী শুক্লা প্রভৃতি। চিত্র-গ্রহণ শিল্পনির্দেশনা ও সংগীত পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে বিজয় দে বিজয় বসু এবং কালীপদ সেন।

প্রযোজক-অভিনেতা সুখেন দাস সম্প্রতি বম্বে থেকে ফিরলেন। এক সাক্ষাৎকারে জানালেন যে 'অনজানে মেহমান' ছবির এডিটিং পর্ব ছিল। বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে এডিট করা হয়। অনেক অসুবিধের মধ্যে কাজ যে শেষ হয়েছে এই রক্ষে। ছবির মুক্তি কবে। আর বেশী দেরী নেই। কলকাতার স্টুডিও থেকে কালার হিন্দি কলকাতার শিল্পী ও কলাকুশলীদের দ্বারাই নির্মিত অনজানে মেহমান সর্বাগ্রে মুক্তি পাচ্ছে শহর কলকাতায়।

তাপস বানার্জির রচনা চিত্রনাট্য ও পরিচালনা। ছবির নাম 'ব্যতিক্রম'। টি টি ফিল্মসের ব্যানারে এই ছবির শুভ সূচনা হয়েছে কদিন আগে। ক্যামেরা ফেস করলেন ছায়া দেবী। সুইচ অন করলেনঃ যমুনা বড়ুয়া। একটি মনোরম পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পৌরোহিত্য করেন একাকালের চলচ্চিত্র প্রতিভা ডি-জি— বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাগীশ্বর ঝা। জানা গেল অনতিবিলম্বে শুটিং আরম্ভ হবে।

পরিচালক অজিত লাহিড়ী তাঁর নতুন ছবি 'সম্রাট'-এর শুটিং প্রায় শেষ করে এনেছেন। শ্রীমতী গৌরী মিত্রের কাহিনী। মৃগাঙ্কশেখর রায়ের চিত্রনাট্য। অনেক নতুন মুখের সঙ্গে দুটি বিশেষ ভূমিকায় আছেন ঃ অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া দেবী। চিত্র-গ্রহক ঃ বিজয় দে।

স্টুডিও সংবাদদাতা

শোলে ঃঃ হেমা মালিনী

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

শত্রুঘন সিনহার ঘন ঘন প্রেমে পড়া কমেছে। বোলচালও কিছু কমেছে। এটা খুবই স্বাভাবিক কেননা শত্রুর বয়স বাড়ছে। ফলে ছবির সংখ্যা বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে পঞ্চাশ ছাপিয়ে গেল সবে। পঞ্চাশটা ছবিতে কাজ করলে কোন শিল্পী বুড়ো হয়ে যায় না। বরং অভিজ্ঞতা বাড়ে। হয়তো সেই কারণেই শত্রু এখন বেশ 'শোচ-সমঝ' করা চলছে...বলছে। সাংঘাতিক কথা বলতে পারে এই সুনামটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুনাম যায় যাক ফিল্মে থাকা দায় হয়ে উঠেছে—জনান্তিকে শত্রু বলেছে। এদিকে জিনি বেবীকে নিয়ে খবরের ফেক্টলী সে আবার ফুটতে শুরু করেছে। অনেকের ধারণা শত্রু জিনাত জিনাত করে দিবানা হয়ে গেছে। ওর মাথায় অন্য কিছু আর ঢুকছে না। অভিনয় করবে কি এটা ওর সারাক্ষণের ব্যাপার। জিনিও কিছু কম যায় না। ছেলেদের উসকে দিতে তার মতো চালু মেয়ে সারা ভারতে খুব কমই আছে। যেই শত্রু বলেছে তোমাকে মিয়া ফারোর মতো দেখতে চুলটা কেটে ফেলো, ভীষণ সুন্দর দেখাবে—অমনি জিনি বেবী বিউটি পারলার-এ ছুটেছে। একদম মিয়া ফারো হেয়ার কাট দিয়ে চলে আসে। শত্রু ভারী খুশী। কি ভাল মেয়ে। কত কথা শোনে। খুব ভাল। খুব ভাল।

দক্ষিণ ভারতের উঠতি নায়িকা লক্ষ্মী বম্বেতে এসে ঝড় তুলেছে। ও নাকি খুবই ন্যাচারাল। কথা বলে স্পষ্ট। কোন ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। দেখতে অপরূপা বললেও বোধকরি কম বলা হল। অনেকে বলছেন মেয়ে যদি সেট এবং সেটের বাইরে ভাল অভিনয় করতে পারে—ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তা না হলে ফটুর ডুম মানে ফিউচার ডুম। এতসব শোনার পরও কি লক্ষ্মী লক্ষ্মী-মেয়ের মতো চুপটি করে বসে থাকবে। বসে থাকলে ভাগ্যও বসে থাকবে। তাই লক্ষ্মী দাঁড়াতে চান। নতুন বম্বেতে এসেছেন। অনেক সাহায্য পাচ্ছেন। কেউ কেউ মনে করেন এরকম সাহায্য পেলে আর দেখতে হবে না। রাতারাতি ড্রিম গার্ল—হেমা মালিনী। লক্ষ্মীর সঙ্গে হেমার মিল আছে। রূপে গুণে অনেক ক্ষেত্রে। সেইভাবে ফোর-কাস্ট অবশ্য বোধে টিকবে না।

'কলগার্ল' ছবির হিরোইনের চেয়ে হিরো কল পাচ্ছে ভালই। ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছে সে আত্মবিশ্বাস। সে বিক্রম। ওই তার প্রথম ছবি। বিক্রম এই মুহূর্তে অধীরভাবে অপেক্ষা করছে—কবে 'জুলি' মুক্তি পাবে। জুলি হচ্ছে বি নাগী রেডডির ছবি। বিক্রম অন্যতম নায়ক। বিপরীতে নায়িকা ঃ লক্ষ্মী। কালার হিন্দি ছবি। মাদ্রাজের স্টুডিও থেকে তৈরি। কবে মুক্তি পাবে এখনই বলা যাচ্ছে না।

রণধীর কাপুর ওরফে ডাব্বু যখন যাকে পায় ধরে বিয়ার খাইয়ে দেয়। বিশেষ করে ওর সমসাময়িক যে সমস্ত নায়ক আছে। ইতিমধ্যে বিনোদ খান্না একদিন ডাব্বুর বাড়িতে গিয়েছিল। রবিবার। ফলে শুটিং ফুটিং নেই। বিকেল বেলা থেকে ডাব্বু বিয়ারের বোতল বের করা শুরু করল। বিনোদ কিছুতেই খাবে না। ডাব্বু জোর করে খাওয়াবেই। বিনোদ আবার এসব ভীষণ মেনে চলে কেন না ওর স্ত্রী গুছন্দ করে না বিনোদ একজন স্থূলকায় অভি-নেতায় পরিণত হোক। ডাব্বুর সাইকোলজি হচ্ছে এমনিতে তো কারুর সঙ্গে পারছি না অন্যভাবে যদি কাবু করা যায়। বিনোদ সেদিন বিয়ার না খাওয়াতে ডাব্বু মনে মনে খুব চটে গেছে।

'লায়লা মজনু' চিত্রায়িত করছেন এইচ এস রাওয়েল। অনেক দিন ধরে লায়লা এবং মজনুর সন্ধান করে অবশেষে এই রোমান্টিক লিডে রাওয়েল সাহেব হৃষিকাপুর এবং রঞ্জিতাকে নিয়েছেন। রঞ্জিতা নিজস্ব সিনেমাক্ষেত্রে নবাগত। আগে তিনি মডেলের কাজ করেছেন। অনেকের মতে এমন সুন্দরী অভিনেত্রী বম্বের ফিল্ম ল্যাণ্ডে কদাচিৎ ল্যাণ্ড করে। যাই হোক ইতিমধ্যে এ ছবির ন' দিন শুটিং অতিবাহিত। অন্যান্য শিল্পী-দের মধ্যে অংশ নিয়েছেন ঃ জ্যানী, আস-বানী, প্রীতি গাঙ্গুলী, ইমতিয়াজ, ইফতি-কার এবং সাড়ে তিনশ জুনিয়র আর্টিস্ট। প্রচলিত কাহিনী থেকে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন আরবার আলভি। শিল্প নির্দেশক সুধেন্দু রয়। চিত্রগ্রহণ করেছেন ঃ জি সিং। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ঃ মদনমোহন।

বম্বের অনেক স্টারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন ইনকামট্যাকসওয়ালারা। একটা বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছেন কোন্ কোন্ অভিনেতার কত ইনকাম ট্যাকস বকেয়া। এই বিবরণে দিলীপকুমার, প্রদীপ-কুমার, জয় মুখার্জি, হেমা মালিনী এবং পরলোকগতা মীনা কুমারীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। একটি সাপ্লিমেন্ট লিস্টে আছেন— প্রাণ, মেহমুদ এবং রাজেন্দ্র কুমার। ভার-প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে অতিসত্বর যে যার বকেয়া শোধ করে দেন। বকেয়া শোধ করার খবর এখনও পাওয়া যায়নি। বরং আরেকটা লিস্ট বেরুচ্ছে সেই খবর আছে।

অভিজিৎ

এদেশের চলচ্চিত্র দর্শকদের মাঝে যারা তানহা ছবিটি দেখেন নি, তাদের অনেকেই জানেন না, বেবী ইসলাম একজন চিত্র-পরিচালক উল্লেখ্য, আজ থেকে বারো বছর আগে তানহা ছবিটি মুক্তি পায়।

মূলতঃ বেবী ইসলাম, এদেশের চলচ্চিত্র দর্শক সমাজের কাছে একজন দক্ষ ক্যামেরা-ম্যান বা চিত্র-গ্রাহক হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু তিনি চিত্র-পরিচালকও বটে। চরিত্র-হীন তার পরিচালিত প্রথম ছবি নয়। তানহা তার প্রথম পরিচালিত ছবি। ছবিটি আজ থেকে বারো বছর আগে মুক্তিলাভ করেছিল।

বাঘবন্দী ঃঃ উত্তম ঃ পার্থ

আপনারা
যাঁরা আয়কর দেন
তাঁরা আয়কর দেবার সময়ে
আয়ের ৩০% পর্যন্ত
কর-রেহাইএর সুবিধা
পুরোপুরি নিয়েছেন কি?
না নিয়ে থাকলে
১৫ বছরের
সরকারী ভবিষ্য নিধির মাধ্যমে
(ক) অন্যান্য অনুমোদিত প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে
কর-এ অনুরূপ রেহাই পেতে পারেন এবং
(খ) বছরে আয়করমুক্ত ৭% সুদ পেতে পারেন
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার যে কোনও শাখায়
মার্চ ৩১, ১৯৭৫ এর আগে
ভবিষ্যনিধির খাতা খুলুন।
২০,০০০ টাকা পর্যন্ত জমা করা চলে।
জাতীয়
সঞ্চয়
সংস্থা
জিএসপি-৭৪/৪৮৫

দীর্ঘদিন বাদে বেবী ইসলাম পরিচালক হিসেবে পুনরায় আমাদেরকে আরে একটি ছবি উপহার দিলেন। ছবির নাম চরিত্রহীন।

উল্লেখ থাকে যে, বারো বছর আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি তানহা একটি ব্যতিক্রমধর্মী ছবি হিসেবে প্রশংসা অর্জন করে এবং চরিত্রহীন ছবিটিও ব্যতিক্রমধর্মী ছবি হিসেবে চিহ্নিত হবে।

চরিত্রহীন ছবিতে মীনা খান ও সুবর্ণা নামে দুজন নতুন নায়িকা অভিনয় করেছেন। ছবিতে অন্যান্য ভূমিকায় আছেন—প্রবীর মিত্র, মোস্তফা, রওশন জামিল, আনোয়ার হোসেন তন্দ্রা ইসলাম। ছবির সুরকার হলেন লোকমান হোসেন ফকির।

সূর্যগ্রহণ

আরো একজন দক্ষ চিত্রগ্রাহক জনাব আবদুস সামাদ চিত্র পরিচালক হিসেবে অচিরেই আত্মপ্রকাশ করছেন। সামাদ সাহেব তার নিজস্ব ছবি সূর্যগ্রহণের চিত্রগ্রাহক ও পরিচালক। ছবির কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। এ ছবিতে আছেন রোজী সামাদ, আনোয়ার হোসেন। হাসান ইমাম, রওশন জামিল প্রমুখ। সঙ্গীতে রাজা শ্যাম।

হরজিত

বাচসাস চলচ্চিত্র পুরস্কার '৭৪

গত ৭ ফেব্রুয়ারী বাচসাসের এক সভায় ১৯৭৪ সালের পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য ১৫টি ছবি মনোনীত হয়েছে।

বাচসাসের এবারের নীতি ঃ সামাজিক অঙ্গীকার ঃ সৃজনশীল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। নকল ছবিগুলোর মনোনয়ন পরিহার করা হয়েছে।

মনোনীত ছবিগুলো ঃ চোখের জলে (আজিজ আজহার), সংগ্রাম (চাষী নজরুল) ইসা খাঁ (মহিউদ্দিন), আলোর মিছিল (মিতা), জেহাদ (কাসেম), মাসুদ রানা (মাসুদ পারভেজ) শনিবারের চিঠি (এফ এ ফিরুমস), বাংলার চব্বিশ বছর (এম আলী) বেইমান (রুহুল আমিন), গোপাল ভাঁড় (বজলুর রহমান), অবাক পৃথিবী (মোস্তফা মেহমুদ), ভাইবোন (আলী কাওসার), ত্রিরত্ন (প্রমোদ কার) মালকাবানু (ফয়েজ চৌধুরী), কার হাসি কে হাসে (আনন্দ)।

মনোনীত ছবিগুলি বাচসাসের বিচারক-মণ্ডলী দেখবেন এবং পুরস্কার প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করবেন। সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। আগামী ৩০শে মার্চ বাচসাসের এক অনুষ্ঠানে পুরস্কারের ফলাফল ঘোষিত হবে এবং উক্ত অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

সূর্যকন্যা
রাজশ্রী বসু

জীবন নিয়ে জুয়া

শিবলী সাদিক পরিচালিত ছবি জীবন নিয়ে জুয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

ছবির নায়ক বুলবুল আহমদ। নায়িকা ববিতা। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে—কাজী এহসান, মিনু রহমান, বেবী জামানা খলিল প্রমুখ।

সুরারোপে আছেন আলী হোসেন।

চিত্রায়ণে আবদুল লতিফ বাচ্চু। পার-বেশনায় বনলতা চলচ্চিত্র।

তালবেতাল

আজিজুর রহমান একটার পর একটা ছবি করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি যে ছবিটি করছেন তার নাম তালবেতাল।

এ ছবির নায়িকা সুচরিতা। অন্য অন্যান্য চরিত্রে যারা অভিনয় করছেন, তারা যথাক্রমে শুভা দে, ফরহাস, বাবর, খান মোহাম্মদ, আনিস ও রেজী। সঙ্গীত পরিচালক সত্য সাহা। চিত্রগ্রাহক সিরাজুল ইসলাম। ছবিটি এখন মুক্তির দিন গুনছে।

উপহার

কামাল আহমদ পরিচালিত ছবি উপহার এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক সুবল দাস, চিত্রগ্রাহক আবদুল লতিফ বাচ্চু। নায়ক নায়িকা রাজ্জাক কবরী। অন্যান্যরা হলেন মোস্তফা, শবনম, হাসমত, টেলি সামাদ প্রমুখ।

ছুটির দিন ঃ উৎপল দত্ত ঃ অপর্ণা সেন

আনওয়ার আহমদ

কিছুক্ষণ

স্বরূপ দত্ত

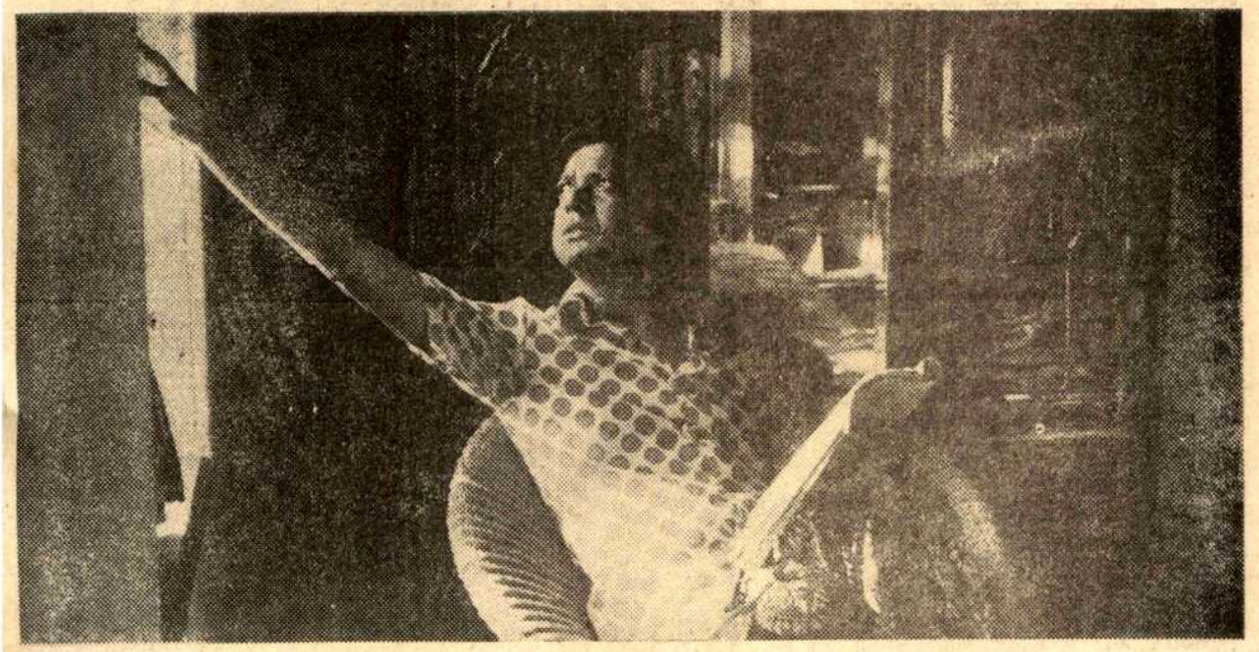

টেকনিসিয়ানস স্টুডিওর শানবাঁধানো চাতালের কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন স্বরূপ দত্ত। আসছে বুধবার ওঁর বাড়ীতে আড্ডা জমাতে যেতে হবে। আরও জনাকয় বন্ধু থাকবে। আড্ডাটা নাকি জমাবও ভালো। 'সুতরাং আপনার লেখার মেটিরিয়াল পাবেন প্রচুর।' বলেছিলাম 'যাব।' তাতেও বিশ্বাস করতে না পেরে আমার ডায়রীতে নোট করিয়ে দিয়েছিলেন দিনক্ষণ সব।

কিন্তু এপ্রিল মাসের এত আগেই যে তিনি আমাকে এপ্রিল ফুল করবেন ভাবিনি। প্রায় হন্তদন্ত হয়ে যথাসময়ে বুধবার যখন তাঁর বালীগঞ্জের বাড়ীতে হাজির হলুম সন্ধ্যের কিছু বাদে, তখন দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালেন মিসেস দত্ত স্বরূপবাবু নন। আমার পরিচয় ও আসার কারণ জানাতে তিনি বললেন—'কথা যখন দিয়েছে, ও নিশ্চয়ই আসবে। একটু বসুন।' বসলাম। কিছুক্ষণ নয়, অনেকক্ষণ।

ইতিমধ্যে আমার সাথী হলেন মিউজিক ডিরেকটর কালীপদ সেন ও শৈলেশ রায়। ওঁরাও এসেছিলেন 'দেবু' ওরফে স্বরূপের সন্ধানে। রাত ন'টা পর্যন্ত আমরাই আড্ডা জমালাম। মিসেস দত্ত এসে কয়েকবার 'ও' না আসার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে গেলেন। চা-ও হলো এক রাউন্ড।

তারপর আমরা তিনজনই স্বরূপবাবুর বসার ঘর খালি করে রাস্তায় নামলুম। পরে অবিশ্যি ফোনে স্বরূপবাবু তাঁর সেই-দিনকার অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আর আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন—'রোববারে সকালে আসতে পারেন।' হাতে সময় কম, তাই 'না' বলিনি।' শুধু বলেছিলাম—'বন্ধু-বান্ধবরা থাকবে তো!' —হ্যাঁ হ্যাঁ ডেকে নেবোখন।

অভ্যেসের বশেই বোধহয় রোববার পৌঁছতে দেরী হলো আধঘণ্টাটাক। ঘরে ঢুকে দেখি মাত্র দুজন লোক বসে আছেন ঘর আলো করে। স্বরূপবাবু নিজে আর তাঁর ছবি 'অসময়'এর পাবলিসিটিম্যান। নো বন্ধু, নো আদার ম্যান। তখনই মনে হলো আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাও বোধহয় স্বরূপবাবুর মনে নেই।

আমার মনে হওয়াটা সত্যি প্রমাণিত হোল কয়েক মিনিট বাদেই। পাশের চেয়ারে গিয়ে বসার পরই তিনি বললেন—'তাইতো আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না কার সঙ্গে যেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। একজন পাওনাদার আসবে মনে আসছে আরেকজনের কথা কিছুতেই মনে আসছিল না।' বুঝলাম আমিই তাহলে সেই বিস্মৃত হতভাগা।

'অসময়' ছবির আউটডোরে যাচ্ছেন স্বরূপবাবু পনের/ষোল তারিখ নাগাদ। তাই প্রিপারেশন নিয়ে ব্যস্ত। সেইসব ব্যাপার নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর পাবলিসিটির ভদ্রলোক বিদায় নিতে আমার দিকে ফিরলেন স্বরূপবাবু।

গত বুধবার না থাকার জন্য আবার দুঃখ প্রকাশ করলেন—'আই অ্যাম ভেরি সরি—ওদিন থাকতে পারিনি।' এবার আমার বিব্রত হবার পালা। ইজি হবার চেষ্টা করলাম। 'ঘরে কাউকে দেখছি না। কি ব্যাপার?'

—ওতো অমলাশংকরের স্কুলে নাচতে গেছে।

'ওঃ তাই কোন যেন ফাঁকা ফাঁকা।' গা এলিয়ে দিয়ে বসেছিলেন স্বরূপবাবু। পরনে আধময়লা পাজামা, আর উল্টো করে পরা একটা গেঞ্জী। চোখে মুখে বেশ চিন্তার ছাপ। প্রোডাকশনের ব্যাপার নিয়েই চিন্তিত মনে হোল। কথাও বলছেন খুব কম। প্রশ্ন করলেই জবাব পাচ্ছি, নইলে নয়। প্রোডাকশনের ঝামেলা কেমন লাগছে জানতে চাইলুম। বললেন—'মন্দ কি? খারাপ লাগে না।' ইতিমধ্যে 'খাবার দিয়েছি দাদা' বলে গেল বাড়ীর কাজের লোকটি। আমার কাছ থেকে কয়েক মিনিট ছুটি নেবার আগে বললেন—'এখনও ব্রেকফাস্ট করা হয়নি। কাইণ্ডলি দু' মিনিট বসুন অ্যাঁ।'

আমি বসিনি। ঘুরে দেখছিলাম ঘরটা। ডানদিকের বুকসেলফের ওপর রাখা 'উপহার'-এর সিলভার জুবলীর মেমেন্টো। সেলফের মধ্যে রবীন্দ্র রচনাবলী, লেনিনের বই, ভারতবর্ষের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি চে গুয়েভারার একখানা ছবি আর রাষ্ট্রপতির দেওয়া 'আপনজন' ছবির নায়ক হিসাবে পাওয়া একখানা রুপোর স্ট্যাচু রয়েছে।

'সাগিনা মাহাতো'র সিলভার জুবলীর ফলকটা নীচের তাকে। 'দি আমেরিকান সিনেমা' বইটাও রয়েছে দেখলাম। ও নিয়ে পড়াশুনো করেন প্রচুর তার প্রমাণ এই বুকসেলফটাই।

খাওয়া সেরে আসতেই স্বরূপবাবুকে বললাম—নায়ক হিসাবে আপনার জনপ্রিয়তা যতখানি পাওয়ার কথা, আপনি কেন পেলেন না বলতে পারেন? ভেবেছেন কখনো এই ব্যাপারটা নিয়ে?' ওঁর সাফ জবাব—'পাইনি বলে নিরাশতো হইনি। কাজতো করে যাচ্ছি, পাবো নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনোদিন। সময়তো এখনও শেষ হয়নি।' গলায় প্রত্যয়ের সুর বেশ গভীর।

তবে এই ফিল্ম জগতে তিনি কিছু অবিচারও পেয়েছেন, কিছুটা সেই কারণেও তাঁর এই পিছিয়ে পড়া। বললাম—'বলুন না কিছু ঘটনা শুনি।' স্বরূপবাবু নারাজ। কাউকে আঘাত দিতে চান না তিনি বললেন—'কি হবে বলুন বলে? কিছু লোক চটবে এইতো! অবশ্য কারও চটাচটিতে আমার কিছু যায় আসে না।'

—তাহলে বলছেন না কেন?

চাপে পড়ে অবশ্য তিনি বলেছেন কিছু কথা। তবে আমি নামগুলোর উল্লেখ না করে ঘটনাটা বলছি। (বুদ্ধিমান পাঠক যদি পারেন, বুঝে নেবেন।)

স্বরূপ দত্ত তখনও 'আপনজন' এর ইমেজ ছাড়িয়ে দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারেন নি। অফার যা আসছে নিচ্ছেন। চরিত্র বাছবার ব্যাপারে তখন তিনি খুব বেশী সিলেকটিভ নন। অ্যাভারেজ খ্যাতি পাওয়া একজন পরিচালকের ছবিতে তিনি কাজ করছেন। নায়িকা মাধবী। দার্জিলিংয়ে সুটিংটুটিং করে ছবির কাজ শেষ। বেশ সুন্দরভাবেই শেষ হয়েছে কাজ। পরিচালকও খুশী। অন্ততঃপক্ষে স্বরূপবাবু সেইরকমই জানতেন। যথাসময়ে ছবিখানা একদিন রিলিজও করল। স্বরূপের মিসেস ছবিখানা দেখে বাড়ীতে ফিরে বললেন—'কি ব্যাপার, তোমার ভয়েস সব ডাব্ করেছে কেন?'

স্বরূপ দত্ত-র তো আকাশ থেকে পড়ার পালা। 'কি বলছ কি-' বলেই ছুটে গেলেন ছবি দেখতে। সত্যিই তাই। মিসেস মিথ্যে বলেনি। সারা ছবিতে স্বরূপের ভয়েস ডাব করেছেন পরিচালক নিজের গলায়।—'খুব খারাপ লাগছিল ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে ডিরেকটরকে জানাতে তিনি কোনো সঠিক জবাব দিলেন না।'

স্বরূপবাবুও এই নিয়ে আর জল ঘোলা করেননি। ইচ্ছে করলে তিনি গণ্ডগোল করতে পারতেন, 'করেননি।' 'কেন?' জিজ্ঞেস করায় বললেন—'নোংরা লোকের সঙ্গে নোংরামি করাটা আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয়নি। ধরে নিয়েছি ওটা একটা পথচলতি দুর্ঘটনা।'

এই হচ্ছেন স্বরূপ দত্ত। স্বরূপের রূপ। সবচাইতে আনন্দের ব্যাপার, ছবিটা মাত্র তিন সপ্তা বুঝি চলেছিল কলকাতায়। একেবারে ড্যাম ফ্লপ। দর্শকরাও তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল—এ-কথাটা জানাতে উনি বললেন—'হতে পারে। ফ্লপ ছবিগুলোয় আমার কোনো ত্রুটি নেই এ-কথা বলছি না, কিন্তু ছবি ব্যাপারটা তো কালেকটিভ, সেখানে সবার দায়িত্বই সমান।'

নিজের সম্পর্কে তিনি নিজে মোটেই ক্রিটিক্যাল নন মনে হোল, নিজের কাজের দোষ ত্রুটি অবশ্যই সংশোধন করেন তিনি। কিন্তু নিজের অ্যানালিসিস নৈব নৈব চ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবশ্য তিনি প্রচণ্ড আশাবাদী। যদিও কাজ করছেন মুস্ত তিনখানা ছবিতে। অর্জুনের কাজ তো শেষ। 'হারমোনিয়াম' আর অসময় চলছে। তবুও এতখানি আশাবাদী হচ্ছেন কি করে জানতে চাইলে তিনি হাসলেন একটু ছবির সংখ্যা দিয়ে কি অভিনেতার কাজের বিচার আপনি করবেন, না কাজ দিয়ে?'

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ড প্লেয়ার

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়।
মেরামতেরও সুবন্দোবস্ত আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৬৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪৭২৩

কাজের বিচার নিশ্চয়ই হবে অভিনয় দিয়ে, ছবির সংখ্যায় নয়, তবুও সংখ্যাকে একবারে নেগলেক্ট করা কি যায়? স্বরূপ-বাবু বললেন—এইতো গত ছ মাসে আমার কাছে তিন-চার খানা অফার এসেছিল একটাও নিই নি।' কারণ চরিত্রগুলো তাঁর পছন্দ হয়নি। স্কোপ খুব কম, আলতু-ফালতু চরিত্র নিয়ে কি লাভ?' বলে দীর্ঘ-শ্বাস ফেললেন একটা। অতীতের কোনো ঘটনা হয়তো বা মনে এলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার বলে উঠলেন—স্বরূপ দত্ত ইজ রাইজিং ভেরি ফাস্ট—বলে রাখলুম—দেখবেন।'

এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন জানি না। প্রত্যয় আছে এটা নিশ্চিত। এবং এই আত্ম বিশ্বাসই তাঁকে নিয়ে যাবে সাফল্যের দরজায়। যে দরজার কাছাকাছি গিয়েও এখনও চাবিটা খুলতে পারছেন না তিনি।

ইস্পাত-দৃঢ় এমনতরো বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে আমি খুব কম শিল্পীকেই শুনেছি। আজও যাঁরা স্বরূপ সম্পর্কে খুব একটা আশা করেন না তাঁরা স্বরূপের এই কথাটা নোট করে রাখুন। হয়তো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। অর্জুন হার-মোনিয়াম' আর অসময়' এই তিনটে ছবিতেই তিনি হয়তো এমন কাজ করেছেন যা অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। ক্ষমতা তাঁর নেই একথা বলা যাবে না। একাধিক ছবিতে তিনি সে নজির রেখেছেন। তবুও সাফল্য তাঁর হাতের মুঠোয় আসেনি। আসতে চলেছে।

আসলে অভিনয়কে তো তিনি ভাল-বাসেন মন-প্রাণ দিয়ে। ছবি হাতে নেই তো পরোয়া নেই। করেছেন নাটক। এখনও রঙমহলে অভিনয় করছেন। নিজের দল 'পাদপ্রদীপ' আছে। নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝেই নাটক করেন নিজের দলে। এই তো ক'দিন আগে 'মধ্যাহ্নের সূর্য' নাটকটা করলেন। 'নতুন নাটক আবার করছি।' জানালেন তিনি। সম্ভবত 'ফানুস' নাম।

অভিনয় স্বরূপবাবুর রক্তে। একটা-দুটো ছবি ফ্লপ করেছে বলে তিনি মুখ গোমড়া করে বসে থাকার মানুষ নন। কাজ তিনি করতে চান। শুধু অভিনয়ে মন ভরছিল না, তাই এসেছেন প্রোডাকসনে। লোকে কি নিয়ে কি ভাবলো বা বললে—তাই নিয়েই তিনি বিব্রত নন মোটেই। 'ওসব গালগপ্পোতে কান দিলে তো কাজ করা যাবে না! কান দিয়েই বসে থাকতে হবে। আমি ওসব থোরাই কেয়ার করি।' বললাম না—স্বরূপ ইজ কামিং।'

একই কথার পুনরুক্তিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল। সত্যিই আপ্রাণ খেটে চলেছেন তিনি। সাফল্য তাঁকে তাই বুঝি শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

নির্মল ধর

বিদেশী ছবি

আজকের যুগোশ্লাভ ছবি

আজ যুগোশ্লাভিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পে যে আধুনিকতার হাওয়া বইছে বলাই বাহুল্য সব দিক থেকেই সেটা পুরনো ট্রাডিশন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজকের ছবিতে সেদেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থা রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে প্রায় সর্ব-স্তরের বাস্তবতাবোধকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। এবং তা থেকে একালের নরনারীর জটিল সম্পর্কের কথাও বাদ যায় নি। আর এই পরীক্ষানিরীক্ষাই (এবং এটাই সত্য) আজ তাদের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে বিদেশে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজকের যুগোশ্লাভিয়ার ছবি বিদগ্ধ জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার এই বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য।

সমসাময়িক কালে তোলা ছবিগুলির মধ্যে ভেলজকো বুলাজিকের সীটিং সিটি, জোজা বাবিকের ভেসেলিকা ব্রাংকো বুয়েরের ফেস টু ফেস, আলেকজান্ডার পেট্রোভিকের থ্রি ভেটেরোশ্লাভ মিমিকার প্রমেথিয়াস ফ্রম দি আইল অব ভাইস ভিজা, পুরিসা জর্ডজেভিকের ইয়ং গার্ল ও ড্রিম দুসান মাকাভেজেভের ম্যান ইজ নট এ বার্ড আণ্ডো বাবারে বার্চ জে ট্রি ভ্যাদান শিলেপসেভিয়ার প্রোটেজ ইত্যাদির মধ্যে আধুনিক যুগশ্লাভিয়ার সমাজ চরিত্র মনস্তত্ত্ব-বোধের মাপকাঠি, আদর্শ দেশাত্মবোধ সর্বোপরি জটিল মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির বিভিন্ন দিক মোটামুটি ভাবে স্পষ্ট করেই ধরা পড়েছে। এবং প্রায়শই তা নতুন আঙ্গিকে।

সদ্য আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত আন্ত-র্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যুগোশ্লাভিয়ার যে ছবিটি দেখানো হয় তার নাম পার্টি-জানস। ছবিটি শুনেছি দর্শক এবং বিচারক-দের দ্বারা প্রশংসিতও হয়েছে। এ ছবির পরিচালক স্টোল জানকোভিক।

হলিউড টুকিটাকি

প্যারামাউন্টের সাম্প্রতিক ছবি দি প্যারালাকস ভিউ যার মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ওয়ারেন বিটি, লেখক লোরেন সিগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে সাল সাবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিয়ে (গত বছর ১৪ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঐ উৎসব চলে) উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

ছবিটির প্রযোজক এবং পরিচালক এলান জে পাকুলা।

•

পল নিউম্যান রবার্ট রেডফোর্ড ও রবার্ট শ অভিনীত ইউনিভার্সালের ছবি দি স্টিং চলচ্চিত্র জগতে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি ও বিস্ময়করভাবে দর্শক আকর্ষণ করেছে। ইদানিং কালের মধ্যে আমেরিকা বা সেদেশে বাইরে আর কোন ছবি এত বিপুলভাবে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেনি। ছবিটি ইতিমধ্যেই লণ্ডন, প্যারিস মিউনিখ মাদ্রিদ স্টকহোম সিডনী মেলবোর্ণ টোকিও এবং সাও পোলোয় দারুণভাবে সম্বর্ধিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মানসহ সাতটি একাডেমী পুরস্কার বিজয়ী এই ছবিটির প্রযোজক টনি বিল ও মাইফেল এবং জুলিয়া ফিলিপস। চিত্রনাট্য রচয়িতা ডেভিড এস ওয়ার্ড এবং পরিচালক জর্জ রয় হিল।

•

ইউনিভার্সালের আর একটি সাড়া-জাগানো ছবির নাম এয়ারপোর্ট ১৯৭৫। এ ছবিটিও স্বদেশে এবং বিদেশে প্রচুর প্রশংসা ও অর্থ কুড়িয়েছে।

এ ছবির বড় আকর্ষণ প্রখ্যাত অভিনেতা চার্লটন হেস্টন, কারেন ব্ল্যাক জর্জ কেনেডি ওলিভিয়া সোয়ানসন সুসান ক্লার্ক ইত্যাদি।

প্রযোজকের নাম উইলিয়ম ফ্রী এবং পরিচালক জ্যাক স্মাইট। আর্থার হেইলের এয়ারপোর্ট উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত হয়েছে।

শা র চ

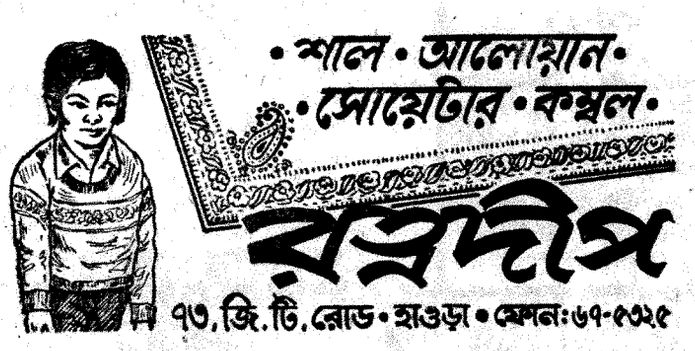

নাট্যমঞ্চ

পি এন বি-র 'দুই মহল'

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লায়ন্স রেঞ্জ স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব গত ১৪ই জানুয়ারী বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় সদস্যবৃন্দ কর্তৃক শ্রীজোছন দস্তিদারের দুই মহল নাটকের সার্থকভাবে পরিবেশন করেন অভিনয়াংশে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবী রাখেন সুধীর সান্যালের ভূমিকায় স্বপন দে, অতীনলালের ভূমিকায় ভানুপ্রতাপ সিং, মনুয়ার ভূমিকায় স্বপন ঘোষ ও ছোনেরামের ভূমিকায় বংশনারায়ণ পান্ডে।

অন্যান্য ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেন রঞ্জন সান্যাল, চন্দ্রনাথ ব্যানার্জি—ভজহরি অরিন্দম সরকার, রমাপ্রসাদ ঘোষ, সুনীল পোদ্দার স্বদেশ দত্তচৌধুরী কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অপূর্ব মন্ডল, দিলীপ দত্ত (১), শান্তিব্রত নন্দী, মনীন্দ্র চক্রবর্তী, বিজয় দাস ও কপিলেশ্বর সিং। ওসমানীর ভূমিকায় মমতা চ্যাটার্জির অভিনয় সুন্দর।

সল্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের কেরাণীর জীবন

সম্প্রতি রঙমহলে সল্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা অভিনয় করলেন ছবি ব্যানার্জির কেরাণীর জীবন। মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন যন্ত্রণা ও তার অবশ্যম্ভাবী বিয়োগান্ত পরিণতি এই নাটকে সফলভাবে দেখানো হয়েছে। সফল অভিনেতাদের মধ্যে অসিত বসু (পটলা, রমাপদ ভট্টাচার্য (বিধুবাবু), শিবকৃষ্ণ মুখার্জি (রবীন), দেবীকা দাস (মা), কল্পনা দাস (বুলু), মীনা রায়চৌধুরী (মাধুরী) ইত্যাদির নাম করা যায়। ছোট চরিত্রের রূপায়ণে যতীন রায়, অমিয় ঘোষ, বিমল ঘোষ, কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, এস পি বিশ্বাস মোহিত ঘোষ, নূপুর ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। নায়িকার ভূমিকায় কাজল হালদার কিছুটা আস্থার অভাব নিয়ে অভিনয় করেছেন।

ষ্টার
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ফোন : ৫৫১১৩৯
প্রতি বৃহঃ ৬টা
শনি, রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬টায়

পরিচয়
পরিচালনা বঙ্কিম ঘোষ
নাটক : কুণাল মুখার্জী
সতীন্দ্র, শর্মিতা বিশ্বাস, অলোক, গীতা, অনামিকা, বঙ্কিম ও হরিধন।

অন্যান্য ভূমিকায় নারায়ণ গাঙ্গুলী, রসময় সিংহ, সুভাষ বানার্জি, হরেন্দ্র চক্রবর্তী, গোপাল মন্ডল, এস এম রায় ইত্যাদি ভালো করেছেন।

বহ্নিশিখা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ব্যবসায়ী প্রমোদ সমিতির প্রযোজনায় এবং শ্রীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রঙমহল প্রেক্ষাগৃহে বহ্নিশিখা নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

নাটকটির বিভিন্ন পুরুষ চরিত্রে সার্থক রূপদান করে সুখ্যাতি পান পূর্ণেন্দু সুরু শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ শীল, অনিল দাস, রতন দাঁ, পূর্ণ শীল শম্ভু চক্রবর্তী অমল সেনগুপ্ত, নিমাই বড়াল তুলসী মুখোপাধ্যায়, গোপাল দাঁ, নবগোপাল মুখোপাধ্যায়, দীনেশ সাউ, রতীন্দ্র রায়চৌধুরী ও স্ত্রী চরিত্রে সবিতা মিত্র রাণু রায়, আরতি মল্লিক পপিতা গঙ্গোপাধ্যায় দীপালী চৌধুরী। সঙ্গীতে নমিতা মন্ডল ও নৃত্যে শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়। দর্শকদের আনন্দ দেন।

টাকী সম্মিলনীর রজত জয়ন্তী উৎসব : গত ২২ ফেব্রুয়ারী টাকী সম্মিলনীর সভ্যবৃন্দ কর্তৃক টাকী ঘোষবাবুদের বাড়ীতে সাজাহান নাটকটি অতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন দুটি অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার রায়চৌধুরী এবং বিশ্ব বরেণ্য সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

অভিনয়ে—সাজাহান, ঔরংজীব, দারা ও দিলদার-এর ভূমিকায় যথাক্রমে অসিত রায়চৌধুরী, স্নেহময় রায়, শান্তিময় ঘোষ ও সমীর রায়চৌধুরী। উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেন। স্ত্রী চরিত্রে রাজলক্ষ্মী (ছোট) দেবীর জাহানারা ও নমিতা মন্ডলের পিয়ারার অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অপরাপর চরিত্রে—হিরন্ময় মুন্সী (জয়সিংহ), দেবাশীষ রায়চৌধুরী (সুলেমান), প্রদীপ ঘোষ (মহম্মদ), প্রবোধ ঘোষ (মোরাদ), সনৎ রায় (সুজা), অশোক রায়চৌধুরী (মিরজুমলা), পান্নালাল ঘোষ (জিহন আলি) কমল বসু (যশোবন্ত সিংহ), প্রদীপ বসু (দিলীর খাঁ), দিপ্তী ভট্টাচার্য (নাদিরা) ও পাপিতা গাঙ্গুলী (জহরৎ) এদের নিজ নিজ চরিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নৃত্যে মিস কুট্টি নাটকে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

অভিনয় শেষে সম্মিলনী যুগ্ম সম্পাদক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দর্শক ও শিল্পীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

যুগসূর্য : গত ৯ মার্চ ৫৯বি, চৌরঙ্গী রোডের কংগ্রেস ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালেখ্য নিয়ে রচিত গীতিনাট্য 'যুগসূর্য' সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রূপশ্রী। নাটকটি রচনা ও সুর সংযোজনায় ছিলেন যথাক্রমে নাট্যকার হরিপদ বসু ও রাজেন বসু। বিভিন্নাংশে যারা সেদিন অভিনয়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী পরিমল সেন আশু ভট্টাচার্য বিশ্ব চট্টোপাধ্যায় মানব দে প্রণব দে শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় (শ্যামুদা) ঝর্ণা হালদার, তৃষা হালদার ও বিবেকানন্দ জননীর চরিত্রে নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী। নাট্য নির্দেশনা ও গিরিশচন্দ্র চরিত্রে দর্শকদের মুগ্ধ করেন মনি দে। কংগ্রেস ভবনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক পদ্মরাজ রায় অশোককৃষ্ণ দত্ত বুলবুল চ্যাটার্জি ও কমলা সরকার প্রমুখ। শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রে গদাই মুখার্জির অভিনয় ও গান ভাবের বন্যা বইয়ে দেয়।

অভ্যুদয়-এর নাট্যানুষ্ঠান : গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী বনগাঁ এস ডি ও স্টাফ ড্রামাটিক ক্লাব-এর সভ্যবৃন্দ মহকুমা শাসক শ্রীঅরুণকুমার লস্কর সভাপতিত্বে সেমসাইড ও ফেরা নাটক দুটি স্থানীয় অফিস প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয় কুশলতার আঙ্গিকের অভিনবত্বে আলোক সম্পাতের চাতুর্যে আবহসংগীতের সুষ্ঠু প্রয়োগে এবং সর্বোপরি নির্দেশনার নিপুণতায় দুখানি নাটকই উপস্থিত হাজার হাজার দর্শকের প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও সত্যব্রত দত্তর। রেবতী দাস জয়গোপাল পালিত সত্য ঘোষ জীবন মজুমদার প্রভৃতিও অত্যন্ত সুঅভিনয় করেন। নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা : সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরে দেশপ্রিয় ইনস্টিটিউট কর্তৃক নন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত রাঠোর বিপ্লব যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। তরুণদের সিরিয়াস অভিনয়পুষ্ট যাত্রাটি সারা রাত দর্শকদের ধরে রাখতে সমর্থ হয়। অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য রাধানাথ চ্যাটার্জী নীরোদ দে বাদল বাসু সন্তোষ সেন সুমিতা মুখার্জী লিলি চক্রবর্তীর নাম।

নাট্যসমালোচক

সঞ্জীবকুমার

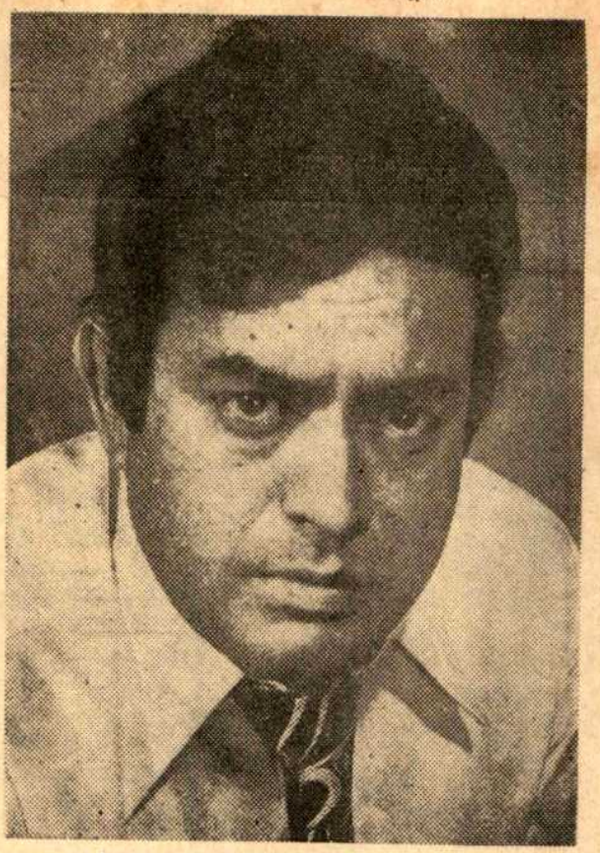

চরিত্রহীন

প্রযোজনা : শ্রীলোকনাথ চিত্র মন্দির

অভিনয়ে, আঙ্গিকে ও পরিচালনায় একটি আনন্দদায়ক ছবি।

দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে ইন্দ্রজিতের পরিচয় হয় রমার সঙ্গে। মেয়েটির সৌন্দর্য ও সরলতাকে সহজে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না ইন্দ্রজিৎ। তবু হঠাৎ একদিন বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে তাকে কোলকাতা চলে যেতে হয়।

বাবা অবশ্য বাঁচে না। উপরন্তু পিতার অনেক ঋণ তার ঘাড়ে এসে পড়ায় দীর্ঘকাল তার আর রমার খোঁজখবর নেওয়া হয় না। অথচ রমা তাকে জড়িয়ে ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন দেখেছিল।

একদিন ব্যবসার ব্যাপারে টাকা ধার করে ফেরার পথে আলাপ হয় অজিতের সঙ্গে। ধূর্ত অজিত ঐ টাকাটা আত্মসাৎ করার লোভে এক পতিতাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় করিয়ে দেয় ইন্দ্রর সঙ্গে।

টাকা খোয়া যাবার পর সন্দেহ বশে এক সময় অজিতের বাড়ি যায় ইন্দ্রজিৎ। সেখানেই সে হঠাৎ আবিস্কার করে রমাকে। তার কাছে জানতে পারে যে, সে স্বামীর অত্যাচারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। সব শুনে ইন্দ্রজিৎ তাকে ওর মার কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু সে বিবাহিতা ও সন্তান সম্ভবা জেনে রমাকে তিনি নিজের সংসারে আশ্রয় না দিয়ে উপরন্তু কাশীগামী গাড়িতে উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।

এদিকে ইন্দ্রর বিয়ে হয় কমলার সঙ্গে। এরই কিছুকাল পরে ব্যবসায়ের কাজে ইন্দ্রজিৎ দিল্লী যেতে সেখানে আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যায় রমার সঙ্গে। রমা এখন শহরের সেরা বারবণিতা। কোন অভাবই তার নেই। শুধু তার মনে একমাত্র দুঃখ কন্যার ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

সেই রমাই অন্য নামে এক সময় তার মূল্যবান অলঙ্কার ও অর্থ দিয়ে ইন্দ্রর ব্যবসা বাঁচায়। বাড়িতে সে খবর পৌঁছতেও দেরী হয় না। ফলে সবাই তাকে ভুল বোঝে।

শেষ পর্যন্ত এক নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে রমা তার কন্যাকে ইন্দ্র ও তার স্ত্রী (তাদের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে) কমলার কাছে রেখে জন্মারণ্যে হারিয়ে যায়।

পরিচালক শক্তি সামন্ত ও সলিল দত্তর চিত্রনাট্যটি 'কলঙ্কিত নায়কের' মত ভাবাবেগ ও মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ না হয়ে একটি উপভোগ্য ছবি হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে।

আঙ্গিক তথা কলাকৌশলের কাজ খুবই উচ্চাঙ্গের। অন্তর্দৃশ্য ও বহির্দৃশ্য গ্রহণে আলোক দাসগুপ্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ে বাংলা ছবির শিল্পীর সঙ্গে কোন তুলনা না করেই বলা যায়, সঞ্জীবকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, যোগিতা-বালী, (যেসব ভূমিকায় উত্তমকুমার অপর্ণা ও সাবিত্রী অভিনয় করেছেন) সুন্দর অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় মদনপুরী, আসরাণী, অসিত সেন, মনমোহন, অপর্ণা চৌধুরী; উৎপল দত্ত; চন্দ্রশেখর, কুলদন, মুরাদ, নন্দিতা ঠাকুর ও অনিতা গুহর অভিনয় চরিত্রানুযায়ী। রাহুল দেববর্মণের সুর সুন্দর।

শশীকাপুর । নিতু সিং

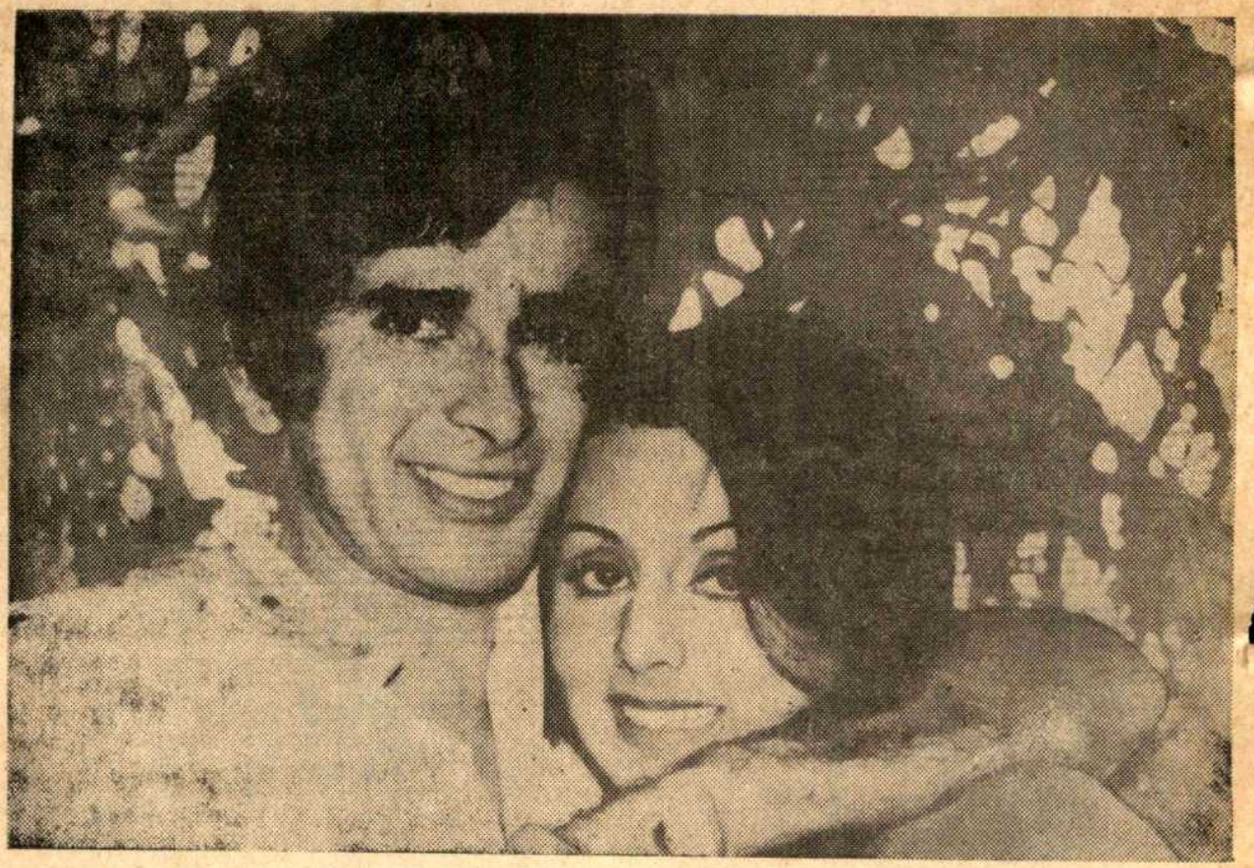

দীবার

প্রযোজনা : ত্রিমূর্তি ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

বিদেশী কাহিনীর ছায়ায় তোলা উপভোগ্য ছবি

প্রযোজনা—ত্রিমূর্তি ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

ইতিপূর্বে মালিক, শ্রমিক, স্মাগলার, পুলিশ এবং ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে একাধিক ছবি বম্বেতে নির্মিত হয়েছে। কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার সেলিম ও জাভেদ এবার সরাসরি বিদেশী ছবির কাহিনী থেকে। অনুপ্রাণিত হয়ে বিদেশী উপন্যাসের ভারতীয় সংস্করণের মাধ্যমে ছবির গল্প তৈরী করেছেন। এমনকি সংলাপের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যকেও বহন করবার চেষ্টা করেছেন।

মালিকের ষড়যন্ত্র থেকে স্ত্রী ও পুত্রদের রক্ষা করতে গিয়ে শ্রমিক দলনেতাকে আদর্শচ্যুত হয়ে 'চোর' অপবাদ নিয়ে দেশত্যাগ করতে হয়েছে। অসহায় স্ত্রী দুই শিশুপুত্র বিজয় ও রবিকে নিয়ে বম্বের মত শহরে কায়ক্লেশে মজুরাণীর কাজ করে তাদের মানুষ করবার চেষ্টা করেছেন। বিজয় ভাইকে লেখাপড়া এবং মাকে সাহায্য করবার জন্যে বুট পালিশ করেছে। পরে ডকে কুলির কাজ করেছে। ও'র সৎসাহসের জন্যে এক বিশিষ্ট স্মাগলার দলের নেতা বিজয়কে আশ্রয় দেয় এবং সেখানেই সে বড় হয়। তারপর সে অর্থ উপার্জন করে বাড়ী কিনেছে, গাড়ী কিনেছে। কিন্তু তবুও মা ও ভাইয়ের মন টলাতে পারেনি। কালক্রমে রবি অনেক কষ্ট আর সাধ্যসাধনার পর পুলিশ অফিসার হয়েছে। ও'র উপরেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শহরের কুখ্যাত 'স্মাগলার' দলকে গ্রেপ্তার করার। সেই তালিকার মধ্যে বিজয়ের নামও আছে। রবি বিজয়কে অনুরোধ করলে কিন্তু সে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হয় নি। তাই বাধ্য হয়েই রবি বিজয়ের অবৈধ কাজের প্রতিবাদ করেছে এবং অসম সাহসিকতার জন্যে 'পুলিশ পদক' পেয়েছে।

এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ অভিনয় ও কলাকৌশলের কাজ। অভিনয়ে—বিজয়ের ভূমিকায় অমিতাভ বচ্চন অপূর্ব অভিনয় করেছেন। রবির ভূমিকায় শশী কাপুর এবং মার ভূমিকায় নিরুপা রায়ের অভিনয়ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ। অন্যান্য ভূমিকায়—নীতু সিং, প্রবীণ বাবি মনমোহন কৃষ্ণ, এ কে হাঙ্গল, দুলারী, ইফতিকার; জগদীশ রাজ, মদনপুরী, অরুণা ইরানী, সুধীর ইত্যাদির অভিনয় চিত্রনাট্যের দাবী অনুযায়ী এ্যাকশনধর্মী কাহিনী রূপায়ণে পরিচালক যশ চোপরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সম্পাদকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে ছবির গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের। বিশেষ করে কে জীর আলোক-চিত্রগ্রহণ ও দেশ মুখার্জীর শিল্পনির্দেশনা। সঙ্গীত রচনায় আর ডি বর্মণের কৃতিত্ব আশানুরূপ নয়, নেপথ্যসঙ্গীত অত্যন্ত উচ্চগ্রামের এবং গানের সুর গতানুগতিক।

জীতেন্দ্র । হেমা মালিনী

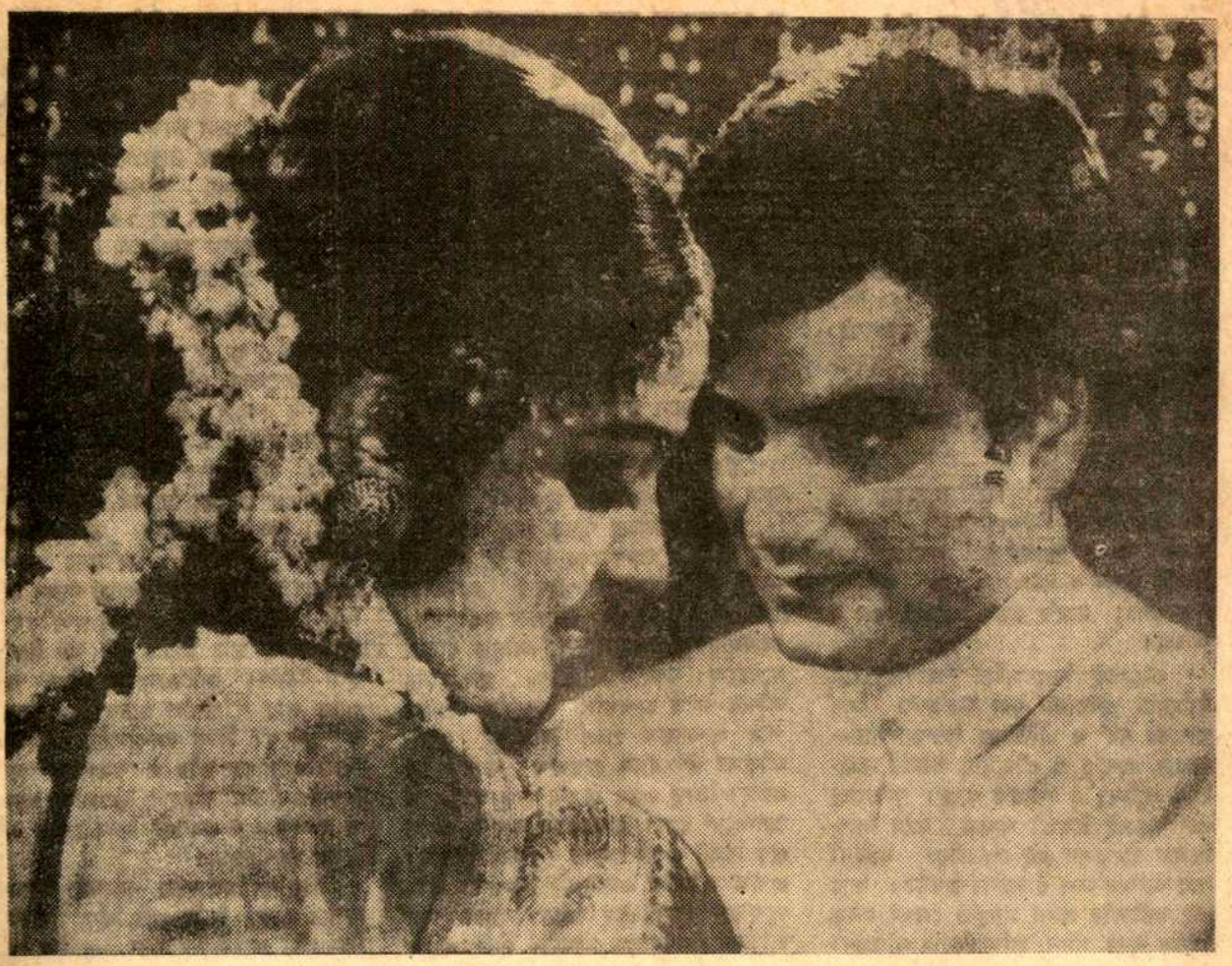

দলহন

প্রযোজনা ঃ সুজাতা ইণ্টারন্যাশনাল (মাদ্রাজ)

'রাধা' গ্রামের প্রাণ ছিল, ওঁর একমাত্র ভাই 'কেশব' কেবল বোনের সৎ কাজের প্রশংসা করে বেড়াতো না; গ্রামের সকলেই ওকে ভালবাসতো। গ্রামের মুখোজ্জ্বল করা ছেলে 'বিজয়' ডাক্তার হয়ে গ্রামে ফিরে এল। 'রাধা'ই গ্রামের সকলকে জানালো, 'বিজয়' গ্রামে হাসপাতাল স্থাপন করবে। সরল রাধাকে বিজয় ভালোবেসে ফেলল। শুভদিন দেখে 'রাধা'র দাদা বিজয়ের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করলো। বিবাহের রাত্রেই বিজয়কে দূরের এক গ্রামে রুগী দেখতে যেতে হোল, রুগী দেখে ফেরবার সময় খেয়াপারের নৌকাটি জলের স্রোতে ডুবে যায়। কিন্তু বিজয়কে পাওয়া গেল না, ওঁর লাসের সন্ধান মিললো। 'রাধা' অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায়, ওঁকে ওঁর স্বামীর মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়নি।

'রাধা'র ধারণা ওঁর স্বামী বেঁচে আছে, কাজ শেষ করে ফিরে আসবে। 'অশোক' শহরের গণ্যমান্য ডাক্তার, স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে ওঁর সুখের সংসার। এক বন্ধুর বিয়েতে সেই গ্রামে এসে জানতে পারলো অশোক 'রাধা'র স্বামী হারানোর কাহিনী। চেহারার মিলের জন্যে 'রাধা'ও ওঁকে স্বামী বলে মনে করলো। বাধ্য হয়ে অশোক রাধার ভাইকে বললো, ওঁকে বম্বে নিয়ে চিকিৎসা করাবার জন্যে। অশোকের স্ত্রী পদ্মা রাধার দুঃখের কাহিনী শুনে বাড়ীতে এনে, স্বামীকে ফিরে ওঁর চিকিৎসা করাবার চেষ্টা করলো। অশোকের সম্পর্কিত এক মাসী এসে উত্তেজনার বশে 'রাধা'র স্বামীর মৃত্যুর কথা বলে ফেললো। এর পরে বিধবা 'রাধা'ই 'কেশবের' সঙ্গে গ্রামে ফিরে আসবার জন্যে রওনা হোল। গ্রামের কাছে আসতেই স্বামীর 'স্মৃতি-স্তম্ভের' কথা মনে পরলো। 'রাধা' শোকে দুঃখে জর্জরিত হয়ে, আচমকা মারা গেল, ভাইয়ের কাঁধে মাথা রেখে।

পরিচালক সি ভি রাজেন্দ্রনের বোঝা উচিত ছিল, দক্ষিণ ভারতীয় ছবির অনুকরণে, হিন্দী ছবি পরিচালনা করেছেন। কিন্তু উনি বুঝলেন না, দক্ষিণ ভারতীয় ছবির ভাবাবেগ কখনও, কখনও মেলো—ড্রামা সৃষ্টি করতে পারে? শ্লথগতির জন্যে ছবির বেশ কিছু অংশকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যেত, কাহিনী ও চিত্রনাট্যের দিকটায় খুব বেশী নজর দেননি। এই ভাবাবেগপূর্ণ কাহিনীর আকর্ষণীয় দিক হোল এর অভিনয়। 'রাধা'র ভূমিকায় হেমা মালিনী নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। অশোক ও 'বিজয়ের' উদ্ধত চরিত্রে জিতেন্দ্রকে অনেকেরই ভালো লাগবে, ওঁর রোমান্টিক অভিনয় মন্দ নয়। ভাই 'কেশবের' চরিত্রে প্রধান অশোককুমার, 'পদ্মা'র ভূমিকায় যমুনা, মুনিমজীর চরিত্রে নাজির হুসেনের অভিনয় সকলেরই ভালো লাগবে। অন্যান্য ভূমিকায় পেন্টাল, আগা, মেহমুদ ও মনোরমার অভিনয় যথাযথ। আলোকচিত্র গ্রহণ, শব্দগ্রহণ ও অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন। ভাবাবেগ কাহিনীর দিকে লক্ষ্য রেখে সুরসংযোজনা করেছেন লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল।

'চিত্রদূত'।

চিত্রাঙ্গদা

সীতা স্বয়ংবরা ও যুগছন্দ : উদয়শঙ্করের নৃত্যভাবনাকে আবার দেখলাম উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টার প্রযোজিত **'সীতা স্বয়ংবরা'** ও **'যুগচ্ছন্দ'** নৃত্যনাট্যে। নৃত্যপরিকল্পনা ও রচনা শ্রীমতী অমলা-শঙ্করের। সংগীত রচয়িতা যথাক্রমে রবীন দাস ও আনন্দ শঙ্কর। পরিবেশিত হয়েছে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে।

আপাতদৃষ্টিতে 'সীতা স্বয়ংবরা' ও 'যুগছন্দ' দুটি পরস্পরবিরোধী ভাবনার বাহক। কিন্তু বিষয়বস্তুর গভীরে মন দিলেই উপলব্ধি করা যায় যে তফাৎটা বহিরংগের। মর্মের বার্তা উভয়েরই এক ও অভিন্ন।

প্রারম্ভেই ছিল সীতা স্বয়ংবরা। এই কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছিলো যেন ভারতের ধর্ম ও ঐতিহ্যের চিরন্তন সত্য—অন্যায়, অশুচি ও ভীরুতার পরাজয় ন্যায়-বোধ, শুচিতা ও শৌর্যের কাছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই শ্রীমতী শঙ্কর বেছে নিয়েছিলেন রামায়ণের এই পৌরাণিক কাহিনী যার আবেদন দেশ ও কালের অতীত। আর এই কাহিনীর সংগে সংগতি রেখেই রচিত হয়েছে নৃত্য, সজ্জা, অভিব্যক্তি ও পরিবেশ। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা যেন অযোধ্যা মিথিলার সেই সরল একরোখা মহত্বের রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম আর একাত্ম হয়েছিলাম সেইসব আশ্চর্য চরিত্রের হাসি, কান্না, আনন্দ ও বেদনার সংগে।

নৃত্যরচনায় শ্রীমতী শঙ্কর কোনো গতানুগতিক নিষ্প্রাণ পদ্ধতি অনুসারে চলেননি। প্রতিটি শিল্পীকে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আপনাপন আবেগ ও রূপকল্পনার ছন্দে নৃত্যাভিনয়ের স্বাধীনতা দিয়েছেন। সেইজন্যই প্রতিটি চরিত্রের বক্তব্য এত স্বতঃস্ফূর্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো। রামের রাজকীয় মর্যাদা, উদারতা, শৌর্য, করুণা মমতাশঙ্করের ললিত-গম্ভীর নৃত্যে মূর্ত, লক্ষ্মণ ও সীতাকে যথাযোগ্য রূপ দিয়েছেন শুক্লা ঘোষ ও ঊর্মিলা মুন্সী। দশরথের স্নেহকরুণ রূপ ও তারকার ভয়ংকরতার যুগ্মরূপ চিত্রণে সার্থক হয়েছেন তনুশ্রী শঙ্কর। অহল্যার ভূমিকায় সুমিতা গুপ্ত, বশিষ্ঠের ভূমিকায় মণিকা সাহা, বিশ্বামিত্রের চরিত্রে প্রদীপ্ত নিয়োগী সুভদ্রার চরিত্রে প্রদীপ ধর প্রতিষ্ঠানের উচ্চমান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। জনকের ভূমিকায় অমলাশঙ্কর সীমিত পরিসরেও অপূর্ব। শাস্ত্রীয় ও লোকসংগীতের সমন্বয়ে রবীন দাসের আবহ সংগীত।

সীতাস্বয়ংবরার উন্নত ভাব গরিমার পটভূমিকায় যুগছন্দ যেন নেচে ছুটে এলো—বর্তমান যুগের অস্থিরতার অন্তহীন ঢেউ-এর মালার মতই। জীবনের ক্ষণভংগুর, মোহমদিরার কৌতুক পরিবেশিত হয়েছে যুগছন্দে। আজকের যুগের প্রতিদিনের জীবনে আছে অসংগতি ছন্দচ্যুতি প্রতিপদে পাশ্চাত্যের প্রবল হুমকি, প্রাচ্য-জীবনের ঐতিহ্যকে লন্ডভন্ড করে দেবার প্রয়াস। কিন্তু এসব হোলো খণ্ড মুহূর্তের অসম্পূর্ণ রূপ। এসবের সম্পূর্ণতা মেলে এক বিরাট অখণ্ড প্রশান্ত পরিসমাপ্তিতে। এখানে জীবনের নানামুখী দিকগুলি যখন পূর্ণতার বৃত্তে এসে মেলে তখনই যেন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনারও মানে খুঁজে পাওয়া যায়।

ব্যঞ্জনাগভীর নৃত্য ছাড়াও যুগছন্দের বক্তব্যের সুষ্ঠু রূপায়ণের একটা মস্তবড় অংশ প্রাপ্য আনন্দশঙ্করের। প্রথম দৃশ্যে ভীমপলাশীর পটভূমিকায় পুরাংগনাদের প্রদীপ হাতে সন্ধ্যা প্রণাম এবং শেষদৃশ্যে নৃত্য চঞ্চল নানারঙা আলো—যেন জীবনের দুটি খন্ড। আর এই দুইএর মিলনেই সম্পূর্ণ জীবন যে জীবন সকল অসংগতি সত্ত্বেও স্থান, কাল ও বিচ্ছিন্নতার উর্দ্ধে।

রবীন্দ্র-সদন আয়োজিত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান : সংস্কৃতি-লোকের অন্যতম আলোকস্তম্ভ এবং রবীন্দ্রসদনের এক সক্রিয় সদস্য সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণার্থে এক সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ গত ১০ ফাল্গুন। এই উৎসবে পরিবেশিত হয়েছিলো সৌমেন্দ্র ঠাকুর রচিত কথা ও সুরের গান।

সৌমেন্দ্রঠাকুরের ব্যক্তিত্বের প্রতি আলোকপাত করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অমিয়-কুমার মজুমদার তাঁদের সুচিন্তিত এবং সুললিত ভাষণে। শ্রীমিত্র বলেন রাজনীতি ও সমাজনীতির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বলে সাধক মানুষের পরিচয় পটে রাজনীতিক সৌমেন ঠাকুরের ছবিটিই বেশী স্পষ্ট। কিন্তু এ হোলো তাঁর বহুমুখী প্রতিভার একটি দিক। জীবনের সূক্ষ্ম সুকুমার রূপটিও তিনি সযত্নে লালন করেছিলেন এবং সেইজন্যই সাহিত্য সংগীত দর্শন সকলদিকেই তাঁর রসসমৃদ্ধ মন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সৌমেন্দ্রনাথের রচিত গানগুলি তাঁর সৃষ্টিশীল মনের এক বিস্ময়কর প্রকাশ। কিন্তু রস-সমুদ্রে অবগাহন করলেও সাগর তীর ও জনপদের গদ্যময় দিকটিও তিনি অবহেলা করেননি। বাস্তব ও কল্পনা দুই লোকেই তিনি মনের গতি অবাধ রেখেছিলেন।

শ্রীঅমিয় মজুমদার বললেন, সৌমেন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি রোমান্টিক, সেইজন্যই বিদ্রোহী। রোমান্টিক মানে এ নয় যে, জীবন ও জগৎ থেকে তিনি পলাতক। জীবনকে ভালবেসেছিলেন বলেই তিনি চেয়েছিলেন সকল ধূসরতা রুক্ষতা রঙিন ও সরস হয়ে উঠুক। সেই জন্যই অসুন্দর ও কুশ্রীতার বিরুদ্ধে সৌমেন্দ্রনাথ ছিলেন চিরবিদ্রোহী।

এরপর সংগীতাসরে বৈতানিক পরিচালিত সৌমেন্দ্র ঠাকুরের গানগুলি উচ্ছলিত হোলো এক বৈচিত্র্যের স্বাদ নিয়ে। সম্মেলক এবং এককভাবে পরিবেশিত প্রতিটি শিল্পীর গানই শ্রোতাদের ভাল লেগেছে।

বৈতানিক শিল্পী গোষ্ঠীর গানগুলি পরিচালনা করেন সুধীর চট্টোপাধ্যায়। মনে থাকবে অমিয়া ঠাকুরের 'জ্বালিয়াছি কতনা আলো'—কণ্ঠে বয়সের আক্রমন সত্ত্বেও মুন্সিয়ানার উজ্জ্বল স্বাক্ষর দীপ্যমান তাঁর গায়নশৈলীতে। সাগর সেন (এত সোনা এত নীল ওগো ললনা) সুমিত্রা সেন (বাইরে তোমায় পাব নাকি') ও প্রসাদ সেনের গান তাঁর পরিবেশনা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। দ্বিজেন মুখার্জি দুটি গান শোনান।

সব মিলিয়ে এ অনুষ্ঠান প্রাণস্পর্শী।

চিত্রাঙ্গদা

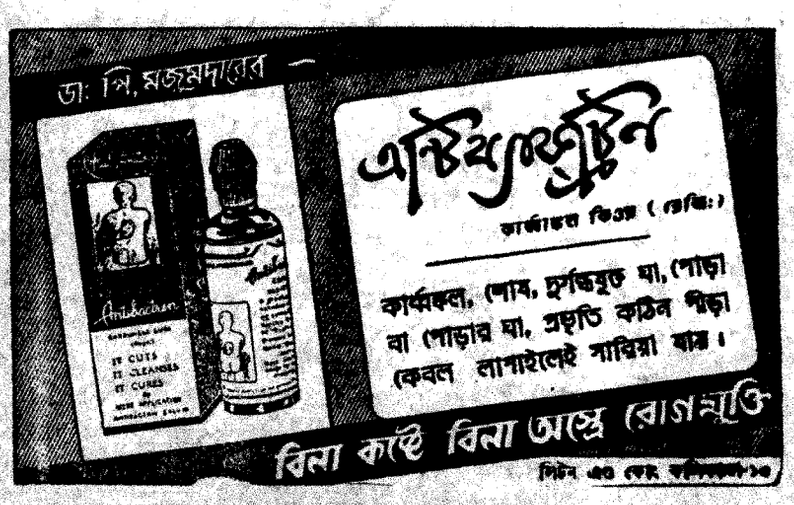

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /
২৮ মার্চ ১৯৭৫ ॥
মূল্য ৬৫ পয়সা

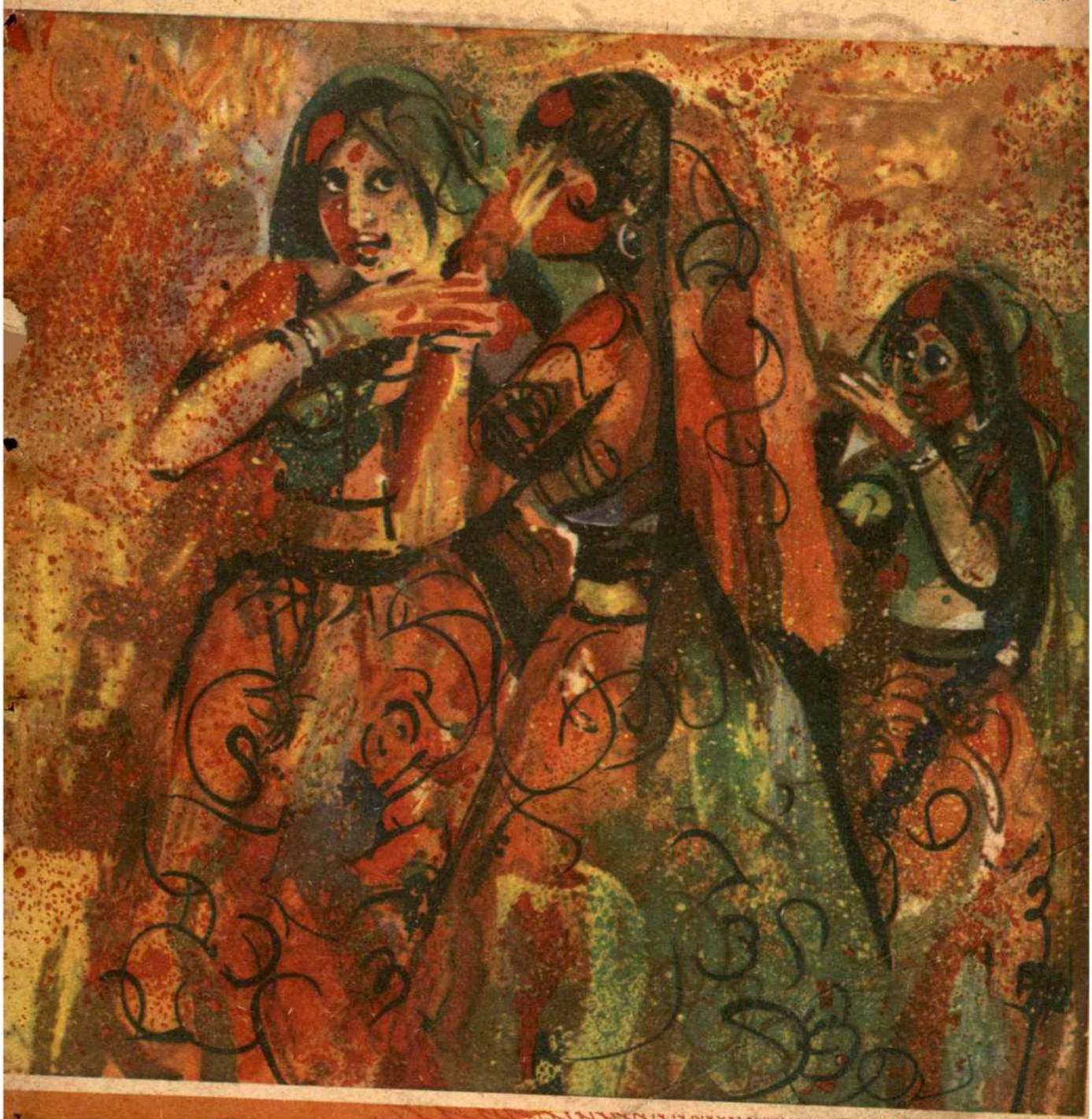

ারোলীন যার সহায়
ম তার ভয় কি?

যদিও বাজে আপনাকে সারাদিন এই অকৃপণ সূর্যের
নিচেই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সূর্য
তাপে ঝলসে যাবে। দেখা দেবে ফোড়া, ফুসকুড়ি ও সবচেয়ে
বেশি অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব ক্ষতগুলো দুষিত
হ'য়ে ওঠে বাইরের ধুলো-ময়লা বা রোদ-জলে।

লীন ঔষধিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের স্বাভাবিক
টা-ছেঁড়া-কাটা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

সুপার ৭৭৭

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মুলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার!

shilpi hpma 6A/73 BEN

॥ মিত্র ঘোষের বই শ্রেষ্ঠ উপহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ॥

বিমল মিত্রের
সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

কড়ি দিয়ে কিনলাম

১ম—২০, ২য়—২০,

আসামী হাজির

১ম—২০, ২য়—২৫,

সমরেশ বসুর
নবতম উপন্যাস

অবরোধ ১০,

তরুণকুমার ভাদুড়ির নূতনতম

কাগজের নৌকো ১০,

বিমল মিত্রের
নূতনতম—অসামান্য

তিন নম্বর সাক্ষী

॥ বারো টাকা ॥

নফর সংকীর্তন

(যন্ত্রস্থ)

শংকরের

সীমাবদ্ধ ৮, স্থানীয় সংবাদ ৮,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বহ্নিবন্যা ১৩, শ্রেষ্ঠ গল্প ৫॥

আকাশের সীমা নাই ৫,

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর ৮, শ্রদ্ধাস্পদেষু ৫,

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগর পারে রূপ নগর ২৫,

কাল তুমি আলেয়া ১২॥

শতরূপে দেখা ২০,

আশাপূর্ণা দেবীর

প্রথম প্রতিশ্রুতি ২৫,

বকুলকথা ২০,

জরাসন্ধের

নিশানা ৮,

চলতি মেঘের ছায়া ৮,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অমৃত পাত্রখানি ৮,

অপারেশন ১৬,

হাসপাতাল ১৮,

সেই মরুপ্রান্তে ১৩,

আশাপূর্ণা দেবীর

যেযার দর্পনে ৮, যার যা দাম ৭,

শঙ্কু মহারাজের

তমসার তীরে তীরে ১৬,

গঙ্গাসাগর ৮॥

প্র. নাবি-র

বেনিফিট অফ ডাউট ১০,

নিমাই ভট্টাচার্যের

নাচনী ৭,

শুভেন্দ্রকুমার মিত্রের

বৈজ্ঞানিক অভিধান ২৫,

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

১ম—১০, ২য়—১০, ৩য়—১২,

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

গত ১১ বছর ধরে
র‍্যালিফ্যান
সবচেয়ে
দামী
টেবিল ফ্যান

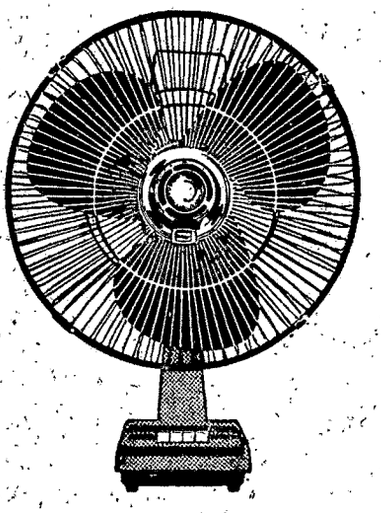

গত ১১ বছর ধরে
র‍্যালিফ্যান
সবচেয়ে
বেশী
কাটতির পাখা

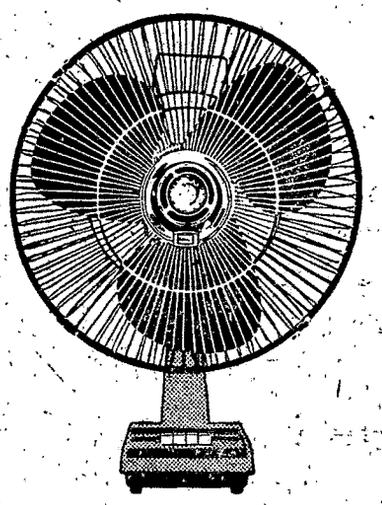

তার নিশ্চয় বিশেষ কারণ আছে-

হ্যাঁ, আছে। র‍্যালিফ্যানই হল একমাত্র পাখা যা এমন ভাবে তৈরী আর পরীক্ষা করা হয় যাতে তার কাজটি হয় সবসময় উঁচু দরের।

- অদ্বিতীয় 'ব্লেড কর্টুর'-এর দরুন অনেকটা জায়গা জুড়ে বেশী হাওয়া করে।
- গতিশীল অবস্থাতেই সুষম ক'রে বসানো ব্লেডের দরুন এই পাখার মোটর অনেক দিন চলে।
- নিখুঁতভাবে তৈরী স্ট্যাণ্ডের দরুন যে-কোন আড়ে কাত করলেও অবাধে চলে।
- সঠিক ক'রে বানানো পাখার দরুন হালকা অথচ স্থির।
- বিশেষ পদ্ধতির 'ষ্টোভ এনামেলিং' দিয়ে লাগানো এর পেণ্ট অনেক কাল ধরে নতুনের মতই ঝকঝক করে।

র‍্যালিফ্যানের এই সব গুণের জন্যেই র‍্যালিফ্যানের এত কদর।

এই সব কারণেই র‍্যালিফ্যানের জন্যে পাঁচ-দশ টাকা বেশী খরচ করতে কেউ ইতস্তত করেন না।

র‍্যালিফ্যান

সময়কেও হারমানায়-সুন্দর সবসময়

U-RTF-10 BEN

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪৬ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 28th March, 1975 শুক্রবার ১৪ই চৈত্র, ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়	
৭	পারগমন (গল্প)	শ্রীলীলা মজুমদার
১০	এই বাংলার খবর	শ্রীদেবদত্ত,
১২	পটভূমি	শ্রীচাণক্য
১৩	দেশে বিদেশে	শ্রীপুণ্ডরীক
১৪	রোজনামচা	ফাদার দ্যতিয়েন
১৬	গোয়েন্দা ধাঁধা	শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
১৭	সেই সব মানুষ (উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
২০	বোঝা গিল না (কবিতা)	শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
২০	চলো উঠে দাঁড়াও সোজা হয়ে (কবিতা)	শ্রীঅজয় সেন
২০	ঐ কাগজের মুখ (কবিতা)	শ্রীসুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়
২১	সমাজবিবর্তনের একটি অধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
২৭	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	শ্রীউপগুপ্ত
৩০	চিঠিপত্র	

গৌতমধারা প্রকাশিত

সব চরিত্র-ই কাল্পনিক : বাস্তব যদি কোথাও থাকে তা আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র। রত্নাকর, তীরু, রিটা, হাবা মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে কঠিন যুদ্ধের।

শংকর মিত্রের

যুবকা/যুবতীদের জন্য নতুন উপন্যাস **পরবাসে**

দাম ছয় টাকা

জার্নাল-২ বেরুলো/সাহিত্যকর্মের সংবাদ

সম্পাদক : সৌমিত্র রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী, মণীষা, দে বুক স্টোর্স, বুকমার্ক

এ-১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

সদ্য প্রকাশিত

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

চাঞ্চল্যকর ঐতিহ্যাসিক কিশোর উপন্যাস

হট যাও হার্মাদ

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

একদম করমুক্ত—
এমন কোনও
নিরাপদ
বিনিয়োগের কথা
কখনও শুনেছেন কি?

ভারত সরকার 1975-এর জানুয়ারী 7 তারিখে একটি বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী করেন। ঐ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী **শুধু ইউনিট থেকে অর্জিত** 2000 টাকা পর্যন্ত আয় কর থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাবে। ইউনিট এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট প্রকল্প থেকে অর্জিত 3,000 টাকা পর্যন্ত আয় তো আগেই করমুক্ত ছিল; ঐ 2,000 টাকার সুবিধা তার অতিরিক্ত।

কর-রেহাইএর নতুন প্রকল্পের প্রকৃত অর্থ হল এই যে, আপনি 23,500 টাকার ইউনিট কিনে তার থেকে বরাবর নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ আয় করে যেতে পারেন এবং এর জন্যে আপনাকে কোনও কর দিতে হবে না।

1-4-74 থেকে 31-3-75 পর্যন্ত সময়ের জন্যে আয়ের যে বিবরণ 1975-76এ পেশ করতে হবে, তার হিসেবের সময়ে এই রেহাইএর সুবিধা পাওয়া যাবে।

ইউনিটে বিনিয়োগ যেমন নিরাপদ তেমন তার থেকে আয়ও হয় নিয়মিত। আর, যদি বিক্রী করতে চান তাহলে যে কোনও সময়ে ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার কাছেই নিজের ইউনিট বিক্রী করতে পারেন।

আর সময় নষ্ট করবেন না
পারলে এখনই
ইউনিট কিনে ফেলুন

আবেদনপত্র পাবার ঠিকানা:
ইউনিট ট্রাস্ট
অফ ইণ্ডিয়া
- 45 বীর ন্যারিম্যান রোড, বোম্বাই-400023
- 8 কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলকাতা-700001
- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলডিং, কোর্ট ম্যানসিস, সাউথ বীচ রোড, মাদ্রাজ-600001
- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলডিং, 6 পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নতুন দিল্লী-110001

davp 74/453

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৩	আর্থিক প্রসঙ্গ		শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৩৫	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে		শ্রীদিলীপকুমার রায়
৩৭	বিজ্ঞানের কথা		শ্রীঅয়স্কান্ত
৩৯	অঙ্গনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪০	রান্না করে দেখুন		শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৪১	রূপসীর খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী
৪৩	শেষ বিচার	(উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪৮	বিয়োগ	(গল্প)	শ্রীগিরিধারী কুণ্ডু
৫২	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান		
৫৩	খেলাধুলো		শ্রীদর্শক
৫৫	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৬	দেশবিদেশের খেলা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৮	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীঅময়
৬০	রঙ্গনী আলোয়		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬৩	ফ্লোর থেকে বলছি		
৬৪	স্টুডিও সংবাদ		স্টুডিও সংবাদদাতা
৬৫	চিত্র সমালোচনা		শ্রীচিত্রদূত
৬৬	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৬৮	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৬৯	ন্যাটমঞ্চ		মঞ্চসমালোচক
৭০	বিবিধ		
৭১	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা		শ্রীঅভিজিৎ
৭২	জলসা		শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজের শ্রদ্ধার্ঘ

বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ

দুই বাঙলার পঁয়ত্রিশজন বুদ্ধিজীবীর মননশীল ও মনোজ্ঞ রচনায় সমৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের কাল, জীবন ও কর্মকৃতির উপর মৌলিক প্রবন্ধের পাশাপাশি আছে বিদ্যাসাগরের জেলা মেদিনীপুর সম্পর্কে কিছু লেখা এবং ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণাধর্মী নিবন্ধ। লেখকদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিরুজ্জামান, মুহম্মদ আবু তালিব, আহমদ শরীফ, গোলাম সাকলায়েন, ভবতোষ দত্ত, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, ক্ষেত্র গুপ্ত, রাজ্যেশ্বর মিত্র, অনিমেষ পাল, সুরেশ চন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীনীহাররঞ্জন রায়।

সম্পাদনা : আজহারউদ্দীন খান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায়

ডিমাই অকটেভো ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা ৬৫০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থ। প্রকাশিত হল। দাম কুড়ি টাকা।

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা কলকাতা ৯

হারজিৎ

শ্রীসুরপতি ঘোষ। ৫-০০

ছেলেরা বিয়ের কথায় না, না ক'রে ওঠে। তাদের মনে ভয় যে বিয়ের ফলে তাদের এক নারীর কাছে দাসখত লিখে দিতে হবে। তারা যখন নিজেরা নিজেদের ভাগ্যবিধাতা হ'য়েছে ভেবে মনে মনে সৌধ রচনা করে, প্রকৃতি অন্তরীক্ষ থেকে হাসে। তারপর প্রকৃতি কোন এক অশুভ মুহূর্তে তাদের কোলে ক'রে তুলে নিয়ে কোন এক নারীর বাহুযুগলের মধ্যে সমর্পণ ক'রে দেয়। সে তার অবশিষ্ট জীবন সেই নারীর এবং তার সন্তানদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করে।

ভারতজ্যোতি প্রকাশনী

প্রাপ্তিস্থান—ডি এম, লাইব্রেরী কলিকাতা—৬

ডঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.ডি.জি.ও
ডঃ এস. এন. পাণ্ডে এম.বি.বি.এস

যৌবনের রহস্য

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬.

যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।

মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯

অগ্রিম ৬.টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

অফিস এবং ইন্‌জিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

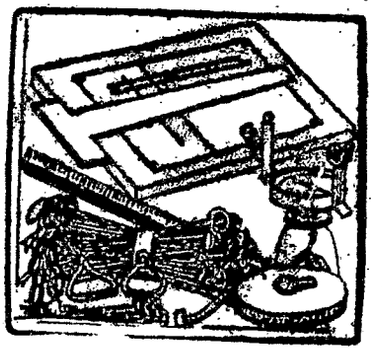

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪

গ্রাম : অয়ারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া

পরিবেশক : কামলিন প্রডাক্টস (ষ্টেশনারী বিভাগ)

সম্পাদকীয়

সর্বোদয় ও জয়প্রকাশ

বিহার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সর্বসেবা সংঘে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে তা অপ্রত্যাশিত নয়। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ এবং তাঁর অনুগামী কর্মীরা সর্বসেবা সংঘ থেকে পদত্যাগ করে এই আন্দোলন চালাবার স্বপক্ষেই মত দিয়েছেন। সংঘের কার্য নির্বাহক কমিটিতে জয়প্রকাশপন্থীরাই ছিলেন মেজরিটি, ২৪ জনের মধ্যে ২০ জন। ইচ্ছা করলে তাঁরা পদত্যাগ না করে সংখ্যালঘুদেরই পদত্যাগ ঘটাতে পারতেন। কিন্তু তা না করে বিহার আন্দোলনের পক্ষপাতীরা সর্বসেবা সংঘকে বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করলেন এবং নিজেদের বিচার অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতাও অর্জন করলেন। পদত্যাগকারীরা সংঘের সদস্য হিসেবে আপাতত থাকছেন। কিন্তু কার্যত সর্বসেবা সংঘে এবং সর্বোদয় আন্দোলনে একটা মতভেদ ঘটে গেল যা ভবিষ্যতে উভয় পক্ষের সমবিচার ছাড়া জোড়া লাগানো সহজ কাজ হবে না। বিহারে প্রথম যখন সরকার-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় এবং জয়প্রকাশ তাঁর নেতৃত্ব দেন তখনই বিনোবাজীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ দেখা দিয়েছিল। স্থির হয় যে, সর্বোদয়ের নাম না নিয়ে কর্মীরা ব্যক্তিগতভাবে জনগণের স্বার্থরক্ষার এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু বিহার আন্দোলন এখন নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে এবং জয়প্রকাশজী নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। সর্বোদয় কর্মীরা এই নির্বাচনের প্রশ্নেই দ্বিধা-বিভক্ত। সর্বোদয় কর্মীরা নির্বাচনী রাজনীতিতে যেতে পারেন না, এই হল বিনোবাজীর মত। সর্বোদয়ের কাজ হল সামগ্রিক উন্নতি এবং তার জন্য স্থিতাবস্থার অবসান ঘটানো। বিনোবাজী মনে করেন বিহার আন্দোলনের লক্ষ্য হল খারাপ সরকারের পরিবর্তে ভাল সরকার গঠন। কিন্তু সর্বোদয়ীরা মনে করেন এই কাঠামোর মধ্যে কতটুকু ভাল সরকার গঠন সম্ভব?

সর্বোদয় সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বা রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তারা সর্বসম্মতি বা কনসেনশাসে বিশ্বাসী। সর্বসেবা সংঘে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। সকলে ঐকমত্য হলেই তার সিদ্ধান্ত পাকা, নইলে নয়। তাই যত ভাল সরকারই হোক তারা তো সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নিয়ে চলবে, সর্বসম্মতিতে নয়। তা সত্ত্বেও বিহার আন্দোলনে বিনোবাজী সর্বোদয় কর্মীদের সর্বসেবা সংঘ থেকে ছুটি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লি অভিযানের পর এবং জনসংঘ সম্মেলনে জয়প্রকাশজীর ভাষণ দেবার পর সর্বোদয় কর্মীদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয় এই আন্দোলন বাস্তবিকই দলহীন গণতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছুবে কিনা। জয়প্রকাশজী মনে করেন তা সম্ভব। সর্বোদয় আন্দোলন যে উদ্দেশ্যে শুরু করা হয়েছে তার সঙ্গে ভোটাভুটির রাজনীতির যোগ নেই। অথচ জয়প্রকাশজীর আন্দোলন সেদিকেই যাচ্ছে। তিনি যদি মনে করেন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের অবসান ঘটানো বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সর্বোদয়ীর কর্তব্য তাহলে সে-মত প্রকাশের অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ যেভাবে দেশের প্রশাসনের বিচার করেন বা তা পাল্টাবার কথা ভাবেন, সর্বোদয়ীরা কি সেভাবে ভাবেন? দলহীন গণতন্ত্র যাঁদের লক্ষ্য তাঁরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন বিরোধী দলের সাহায্য নিয়ে আন্দোলনে নামতে দ্বিধা করবেন। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলোর মত ও পথের পার্থক্য আছে তারা অহিংসাকে সাময়িক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করলেও তাকে আদর্শ হিসাবে স্বীকার করে কিনা এ সম্পর্কেও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

জয়প্রকাশজী আশা করেন যে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও নেতৃত্বের ফলে এই আন্দোলনকে সংযত রেখে সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। কিন্তু সর্বোদয়ের আদর্শ সত্যি সত্যিই রক্ষা করা যাবে কিনা তা বাস্তবিকই সন্দেহের বিষয়। রাজনৈতিক প্রশ্ন আলোচনার সর্বসেবা সংঘে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে তা থেকেই অনুমান করা যায় রাজনীতির পথ কত জটিল ও দুর্গম। ভোটাভুটির রাজনীতি সে-কারণেই সর্বোদয়ীরা বর্জন করতে চেয়েছিলেন। জয়প্রকাশজীর মুস্কিল এই যে, তিনি অতীতে পার্টি-রাজনীতি করেছেন। সুতরাং শাসক পার্টির কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি আবার সেই রাজনীতিরই আকর্ষণে আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। অথচ হৃদয়বান ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তিনি সর্বোদয়ের প্রতি আনুগত্যও বিসর্জন দিতে পারেন না। তাই তিনি সাধারণ লোকসেবক হিসেবে তাদের সঙ্গে থাকেন এবং অন্যদিকে বৃহত্তর জন-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লক্ষ্য করার, তিনি সত্য, অহিংসা ও আত্মসংযমের সর্বোদয়ী নীতিকে এই আন্দোলনে কিভাবে তিনি কাজে লাগান। অথবা আবার সুযোগসন্ধানী রাজনীতিকরা জয়প্রকাশকে সামনে রেখে নির্বাচনে তাঁদের সুবিধা [illegible]।

পারগমন

লীলা মজুমদার

দুস্তর পথ পেরিয়ে ছেঁড়া ময়লা চোঙা-পেন্টেলুন পরা সাতজন যখন বন্ধ ফটকের সামনে গিয়ে পৌঁছল ততক্ষণে ওদের জ্বালা-যন্ত্রণাগুলো, নিজেদের অজান্তেই সব মিলিয়ে গেছে। চারদিকে চেয়ে দেখে ওদের চক্ষুস্থির। যেদিকে তাকায় নীল নীল ধোঁয়া ধোঁয়া; মুখে-চোখে শীতল বাতাস লাগছে; তাতে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ আর সামনে বিশাল বন্ধ ফটক।

ফটকটা সোনালী রঙের। ফেলা তাতে আঙুল ঘষে বলল, 'আলমুনি রঙের বদলে পেতলের রং দিয়েছে, যাতে সহজে মরচে না ধরে।' ফেলা একবার একটানা তিন মাস বিল্ডিং কোম্পানীতে কাজ করেছিল, তাই ওর কথা বাকিরা সবাই মেনে নিল। ফেলা বলল, 'এর চাইতে কত বড় বড় ফটকে আলমুনি রং দিয়েছি। তখন আম্মাদের বাড়িতে রোজ দু বেলা রান্না হত।' তাই শুনে সবাই হি-হি করে হাসতে লাগল, ফেলার যত লম্বা-চওড়া কথা। দু বেলা কারো বাড়িতে রান্না হয় নাকি, নাকি কেউ দু-বেলা রান্না খাবার খায়! এক সেই ভোটা-ভুটির সময়। কি ভালো সময়ই না গিছল তখন, মাইরি! দুই বিরোধী পক্ষের হয়ে কি খাটনিই না খেটেছিল সবাই, আর সে কি খাওয়া! একদিন পোনা মাছ পর্যন্ত— থাক না সেসব কথা, এখন ভাবলে শুধু মন কেমন করে। শেষ পর্যন্ত অত ঢাকঢোল পিটিয়ে, অত ঠ্যাঙ্গা-ঠেঙিগ, গায়েব-গুমের পরে, কেন পক্ষ যে জিতেছিল, সেটা ওরা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারে নি। আগেও যেমন চারদিকে শুধু নেই-নেই ছিল, এখনো তাই। তবু একসঙ্গে দুই বিরোধী দলের হয়ে সমানে খেটেছিল ওরা।

দরজাটা হঠাৎ খুলে যাওয়াতে এইখানে ওদের চিন্তায় ছেদ পড়ল। খোলে নি ঠিক, একটা পাল্লা একটুখানি ফাঁক করে রবীন্দ্রনাথ মুখ বের করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাও তোমরা?' অবিশ্যি সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ নয়, যদিও ছবিতে যেমন দেখা ঠিক তেমনি সাদা লম্বা চুল, ফরসা রং, উঁচু নাক আর তেমনি জ্বলজ্বলে গায়ে। তবে হাতে একটা মস্ত চাবি আর গলা বেজায় বসে যাওয়া মতো, ভোটাভুটির সময় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওদের গলা যেমন [illegible]

রবীন্দ্রনাথ নাকি স্বর্গে গেছেন, অন্ততঃ তাই শুনেছিল ওরা; চিনত না তো তাঁকে, কাজেই সঠিক জানবে কোত্থেকে। চেতলার মন্টুদা অবিশ্যি সেটা বিশ্বাস করে না; বলে, মরেই যদি যাবেন তো অপ্রকাশিত রচনা-গুলো লিখছেটা কে? আর স্বর্গ? ছো। ছো! চাঁদে গেল মানুষরা, স্বর্গ-টর্গ তো কোথাও দেখল না। এক যদি—। এই মনে করে বুড়ো লোকটির দিকে ওরা চোখ ফেরাল।

সন্দেহের সঙ্গে ফটকের দিকে আবার তাকাতেই জোব্বা পরা লোকটি নরম গলায় পিলুকে বললেন, 'তোমার নাম কি?' মনে হল ঐ একটু বিশ্রাম পেয়ে কিঞ্চিৎ খুশিই হয়েছেন, লোকটাকে খুব ক্লান্ত মনে হল। স্রেফ কিচ্ছু না করে করে পিলুরাও যেমন বেজায় ক্লান্ত। পিলু নাম বলল, 'পিলেশ্বর'। শুনে লোকটি অবাক! 'পিলেশ্বর আবার একটা নাম হল নাকি? ঠাকুরের নাম কি?'

পিলু বলল, 'আমরা ঠাকুর-টাকুরে বিশ্বাস করি না।' 'আহা পিতার নাম কি?' 'আমার পিতা টিতা নেই—তাছাড়া সব ঠাকুরকে কি আর অবিশ্বাস করি। মা কালীকে তো আর অবিশ্বাস করি না। লোকটির বোধহয় কৌতূহল হল, বললেন, 'ওনাকেই বা বাদ কেন?' 'কি জানি, চেপে ধরেন যদি। আবার কেন? দেন না তো কিছু কোনো দিন।' 'পিতার নাম বললে না? বললাম তো নেই। কি মুস্কিল, ছিল তো একদিন।' 'না মশাই, ছিলও না কোনো দিনও, এক যদি আমি জন্মাবার অনেক আগে মরে গিয়ে থাকে। ছিল বলে কখনো শুনিও নি।' 'মা আছে তো?' 'মা? কি যে বলেন! এরপর বলবেন ঘরবাড়িও ছিল। না মশাই, কিছুই ছিল না, ফুটপাতে মানুষ।' কি যেন একটু ভাবল পিলু। তবে একটা ছোট ভাই ছিল। তার নাম ছিল নালু, সারা-ক্ষণ খালি খাই-খাই করত। রোগা টিং-টিঙ্গে কুচকুচে কালো, কি বিশ্রী দেখতে কি বলব। সারাক্ষণ আমার গলা জড়িয়ে ঝুলে থাকত। ভারি জ্বালাত। পেট আর ভরত না। সেবার ক্যান্টিনে খিচুড়ি খেতে নিয়ে গেলাম। পাশেই বসালাম। ও মা! আমাকে পর্যন্ত খিচুড়ি দিয়ে বলে কিনা আর নেই! বাকিদের ঠেলে-ঠুলে উঠিয়ে দিল। তা নালু কিছুতেই যাবে না। ওদের আঁচড়াতে কামড়াতে লেগে গেল। শেষটা কলাপাতা শুদ্ধ খিচুড়ি পকেটে ভরে আমি উঠে পড়ে আর নালুকে খুঁজে পাইনে। বিকেলে হাসপাতালে গিয়ে দেখি মরে রয়েছে।' একবার নাক টেনে পিলু বলল 'আর কেউ কোনো দিনও ছিল না আমার। পোড়াই নি ওকে, অমনি ফেলে রেখে চলে এসেছিলাম, কে পোড়াল তাও জানি না। নাকি সবাইকে একসঙ্গে মাটিই দিল। রাতে আমরা দলেবলে গিয়ে সরকারি আপিসের সব জানলার কাচ ভেঙ্গে দিয়েছিলাম।'

জোব্বা-পরা লোকটির মুখটা কেমন গম্ভীর মনে হচ্ছিল। জোব্বার ভিতর থেকে একটা লম্বা তালিকা বের করে বললেন, 'ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। তোমাদের সকলের পার।' পিলেশ্বর, জটেশ্বর, ফেলারাম, পটো জঞ্জাল, আলি আর স্টিফেন।

বাকিদের যা বুদ্ধি, অমনি পিলপিল করে সব ঢুকতে যাচ্ছিল হয়তো ভেবেছিল ভেতরে গেলেই শালপাতা পেতে দেবে! ভাগ্যিস ফেলা তাদের আটকাল। অমনি গেলেই হল আর কি! কে কবে কোন ভালো জায়গায় তোদের গায়ে পড়ে ডেকে নিয়ে গেছে তাই বল? এই যে স্টিফেন, বলে তুই নাকি মিশন স্কুলে তিন বছর পড়েছিলি, তুই পর্যন্ত যদি লোকের কথা বিশ্বাস করবি তো আর কি বলব! দেখুন, বুড়ো-মানুষ, আপনার নিজের নামটা তো কই বললেন না?'

'আমার নাম পিতর, আমি স্বর্গের দরজা পাহারা দিই। সকলের নাম মিলিয়ে নিয়ে, তবে ঢুকতে দিই।' স্টিফেন অবাক হয়ে বলল, এরা কেউ কিশ্চান নয়, এদের কেন ঢুকতে দেওয়া হবে? আমি মাথায় জল ঢেলে কিশ্চান হয়েছি, অবিশ্যি ফাদাররা পরে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তবু আমার কথা আলাদা।

কাষ্ঠ হেসে পিতর বললেন, 'ঐ হল, তুমিও যা ওরাও তাই, এখানে সবাই এক। দাঁড়াও একটু পরখ করে নিই; তোমরাই না দেওয়ালীর রাতে কুড়িজন লোককে জ্বলন্ত প্যান্ডেলের তলা থেকে টেনে বের করতে গিয়ে নিজেরা পুড়ে-ঝুড়ে একাকার হয়ে-ছিলে? তাহলেই হল সবাই ঢুকে পড়। এখানে হিন্দু খৃশ্চান মুসলমান ইত্যাদি সাতশো নামে কোন তফাৎ নেই। এসো।'

ওরা তবু বাইরে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে লাগল। 'স্বর্গ বললেই স্বর্গ হল? স্বর্গে আছেটা কি? দুবেলা হাঁড়ি চড়ে? সবাই চাকরি পায়? ভোটাভুটি হয়?'

পিতর হাসলেন, 'না, বাছারা এখানে ওসব পার্থিব জ্বালা-যন্ত্রণার বালাই নেই। সবাই দুধ আর মধু খায়, কাউকে খাটতে হয় না, অনন্তকাল আরামে বসে থাকে, কোনো দলাদলি নেই, সকলে একজনের সেবা করে চিরদিন সুখে থাকে। এসো তোমরা, তোমাদের অভ্যর্থনার জন্য বাজনা বাজছে শুনতে পাচ্ছ না?'

বাজনার দু-একটা কলি কানে যেতেই ওরা কানে হাত দিয়ে সাত হাত পেছিয়ে গেল। ওসবে আমরা ভুলছি না, বাবাঠাকুর। যেখান থেকে এসেছি, সেখানে দেখে এসেছি, হাঁড়ি না চড়ার কত সুখ। অত দুধ আর মধু দেখাবেন না বলছি। এক সায়েব আমা-দের কালো কালো চকোলেট দিয়েছিল না! খালিপেটে খেয়ে বমি করে মরি। আর বলে কিনা চিরকাল বসে কাটাতে হবে। কেন, আমরা আঠারো কুড়ি বছর ধরে বসে আছি না, তার কি জ্বালা জানি না আমরা? দুঃ, দুঃ, স্বর্গ না ছাই!'

পিতর তালিকা গুটিয়ে অমায়িকভাবে বললেন 'এখানে কোনোক্রমে সেঁদোবার জন্য পৃথিবীর লোক কি না করে! আর তোমাদের কিনা পছন্দ হল না! জান, এখানকার পথ-ঘাট সোনা দিয়ে বাঁধানো?'

শুনে ওরা শিউরে উঠে বলল, 'অত সোনা বাঁধা বেআইনী তাও জানেন না? আমাদের পুলিশে খবর পেলে ধরে নেবে। খেতে দেবে না, চাকরি দেবে না, আবার বলে কিনা পথঘাট সোনা দিয়ে বাঁধানো?'

পিতর বললেন, তাহলে অন্য ফটকে গিয়ে দেখতে পার কোনো সুবিধা হয় কি না। সেখানে সব উল্টো রকম শুনে ওরা হাতে চাঁদ পেল।

তা এতক্ষণ বলতে হয়। চল, চল, অন্য ফটকে চল!

পিতর নিশ্চিন্তভাবে দোর বন্ধ করে দিলেন। জঞ্জাল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'অত ভালো কাপড়-চোপড় পরে যারা, তারা কখনো আমাদের মতো লোকদের চাকরি দেয়? অন্য ফটকটা কদ্দুর কে জানে। মাইরি ভাই, পোড়ার জ্বলুনিগুলো আর কিন্তু টের পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত সেরেই গেল বোধ হয়।"

আলি বলল, লোকগুলো বেঁচে গিছল তা হলে! একটা ছোট মেয়েকে তুলে এনেছিলাম। মা-টা বোধ হয় পুড়েই গেল না কি—মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়।"

স্টিফেন বলল, 'যা যা বড়লোকদের জন্য অত দুঃখু কিসের রা্যা? ওর বড়লোক মাসিপিসি ওকে পালবে। দুবেলা পেট ভরে খেয়ে সুখে থাকবে। সুখী হবার জন্য ওর স্বর্গে যাবার দরকার করবে না।"

জঞ্জাল বলল, যা বলেছিস। দুবেলা খাব, এই ছেঁড়া পেন্টেলুনটা বদলাব, বিষ্টি হলে একটা ছাদের তলায় মাথা গুঁজব। ব্যস! আবার কি চাই! আমি বলি কি দলবল ডেকে ঘেরাও করে স্বর্গটাকে তুলে নেওয়া যাক। —ই কি! এই নাকি উল্টো ফটক?"

উল্টো ফটক হাঁ করে খোলা, তাতে কবাট নেই। দরজায় কোনো পাহারাও নেই। মনে হল যার ইচ্ছে ঢুকে পড়লেই হল। মন্দ নয় জায়গাটা, গাছপালাগুলো যেমন খুসি বেড়েছে। এক জায়গায় কয়েকটা লোক বসে তাস পিটছে। জটার বড় সন্দেহ বাতিক—ওদের মধ্যে কার-ই বা নয়?—লোককে বিশ্বাস করলে সব ছাল ছাড়িয়ে নেবে না? ঐ তো সেবার চাকরি দেবে বলে অমন ভালো কাপড় চোপড় পরা কালো সায়েবটা ওদের দিয়ে ভেড়ির বাঁধ কাটাল, মাছ সব আঘাটায় উঠল। তারপর চাকরি তো দূরের কথা, একটা পয়সা দিল না। নাকি সবাই বে-আইনী কাজ করেছে, পুলিশকে যে সায়েব বলে দিচ্ছে না সেটা ওরা নিতান্ত দয়ালু বলে। দদ্দত্তোর! দয়ার নিকুচি করেছে। মনে আছে মায়ের সঙ্গে যখন থাকত, তখন মা কেবলি বলত নাকি মুনিববাড়ির লোকরা ভারি দয়ালু, হেনা দেয় তেনা দেয়! তারপর পুজোর সময় মুনিবদের দেওয়া লাল জামা গায়ে দিয়ে ফেলনা আর জঞ্জাল তাদের বাড়ি উদয় হতেই সে কি হাসাহাসি টিটকিরি। 'হ্যাঁরে, তোদের বাবার নাম কি আস্তা-কুঁড়?' ইত্যাদি। দয়া-টয়াতে ওর দরকার নেই। না খেয়ে চলে এসেছিল দুজনে। তবে ঠিক না খেয়েও নয়। আসবার সময় যেখানে ঠাকুরের ভোগ সাজানো ছিল, পুরুত

আসার অপেক্ষায়, সেখান থেকে গোছা-গোছা লুচি সন্দেশ তুলে নিয়ে পালিয়ে গেছল। এখনো ভাবলে হাসি পায়। মা ফিরে এসে ঠ্যাঙ্গার বাড়ি মেরেছিল।" ঠাকুরকে তোদের নোংরা ছোঁয়া খাওয়াবি, এতবড় আস্পদ্দা তোদের!"

জঞ্জাল তেড়িয়া হয়ে উঠেছিল, বেশ করব, এ'টো খাওয়াব! থুতু দিইনি সেই ঢের!" তবে এটা সত্যি যে যদি মা-কালী হত, তবে অত তেজ দেখাবার সাহস হত না। কি হিংস্র দেখতে রে বাবা! গলায় কাদের মুণ্ডু ঝুলিয়েছে কে জানে। কির-পাণটা থেকে দরদর করে রক্ত ঝরে! একবার যদি ধরে তো আর ছাড়াছাড়ি নয়! পালিয়ে বাঁচা ছাড়া উপায় নেই। সেই ইস্তক পালিয়েই বেড়াচ্ছে জঞ্জাল! খেতে পরতে পায় না, অথচ বাঁচবার কি ইচ্ছা! তাই দেখে নিজেই অবাক হয়।

গুজু মিয়ার দলে ঢুকেছিল। গুজুরে চর বলেছিল ঃ কিছু না, জঞ্জাল কুড়িয়ে আনবি, বুঝলি জঞ্জাল তার বদলে দুবেলা খেতে পাবি, একটা গাড়ি-বারান্দার নিচে শুয়ে থাকবি, রোজ নগদ পঁচিশটা পয়সা পাবি—মন্দ কি, কি বলিস রে রাবিশ?" লেখাপড়া জানত না জঞ্জাল, কিন্তু রাবিশ কথাটার মানে বুঝতে পেরেছিল। তবু বলেছিল, 'যদি ফেলনাকেও দুবেলা খেতে দাও তো খাটতে রাজি আছি।" লোকটার কি হাসি! না হে, রাবিশ, ড্রেণ-নর্দমা সব পরতে গেলে আমাদের চলবে কি করে?"

জঞ্জাল তাকে এমনি পিটেছিল যে পুলিশের ভয়ে এক মাস গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছিল। এক বেলাও কেউ পেট ভরে খেতে দেয়নি। নিজেরাই খেতে পায় না তো দেবে কোত্থেকে।

তাস খেলোয়াড়দের জঞ্জাল জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি মা-কালী থাকেন?" লোকগুলো তো অবাক! ওদের দিকে তাকিয়ে যে-যার নিজের পয়সাকড়ি সরিয়ে বলল, মা-কালী, বাবা-শিব কারো সাধ্যি আছে এ-ফটকের কাছে মুখ দেখায়? এ-সব হল গিয়ে মন্দ জায়গা। কি চাও তোমরা? ঘুরে দেখ না, এখানে যে যা খুসি তাই করে। আমাদের খেলা মাটি কর না। আজ পর্যন্ত কোনো ঠাকুর-দেবতর মুখ দেখিনি, ব্যস! যাও।"

ততক্ষণে চারপাশে এক দল লোক জড়ো হয়ে গেছিল। তাদের দিকে ফিরতেই তারা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ এ জায়গা ভালো নয় আমরা সবাই মন্দ লোক, জুয়াড়ে, নেশাখোর ধাপ্পাবাজ, ঘর যা খুসি করি। তবে তাতে কারো ক্ষতি হয় না, আমাদেরো কোনো লাভ হয় না।' লাভ হয় না শুনে ওরা বড় মুষড়ে পড়ল। পেট ভরে খেতে দেয় তো?" তাতে হা-হা হো-হো হাসি। খাওয়া? সেনেয় ভয় নেই, এখানে খিদেই পায় না তো খাবারের কি দরকার!" ওরা দু-পা পেছিয়ে গেল। তবে কি খিদে মেটাবার সুখটুকুও পাবে না?

পটের খুব বুদ্ধি। দেয়ালে লেখা স্লোগান দেখে দেখে লিখতে পড়তে শিখে গেছিল। শেষটা কত স্লোগান ও নিজেও বানিয়ে লিখেছে, কিছু পয়সাও পেয়েছে। সে বলে বসল, শিব কালী নেই তো যে আছে তার সঙ্গেই দেখা করব। আমাদের চাকরি দরকার। আর হন্যে হয়ে ঘুরতে ভালো লাগে না।"

একটা লোক বলল, দেখা করব; আবার কি! তাকে দেখাই যায় না।' এ্যাঁ, বলে কি লোকটা কি গুম, না গায়েব! নাকি ও-সব কিছুই না, তবে কেউ তাকে দেখেনি কোনো দিন।

তবে কি অ-দর্শন হয়ে এই সব চালাচ্ছে? আশ্চর্য কথা। একজন বলল,

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

'আশ্চর্য কিছুই না; চালাবীর আবার আছেটা কি! যে যেমন ইচ্ছা করছে আর তার যা ফল তাই পাচ্ছে। তবে থাকাটাও কিছু আশ্চর্য নয়, নইলে নিয়মগুলো বানাল কে? তবে কিন্তু দেখিনি কেউ। বললাম না আমরা খারাপ লোক।' পটো বলল, 'বরং ও ফটকটাই ছিল ভালো; পরিষ্কার ছিম-ছাম, ফুলের গন্ধ, বাজনাবাদ্যি দূরে সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি!"

ওরা বলল, চেয়ে দেখ, চাঁদ ভালো করে চেয়ে দেখ তারপর বাজে কথা বল।"

ওরা চেয়ে দেখে বাস্তবিকই এ-ও যে সেই একই জায়গা। ওটা ছিল সামনের দিক; এটা হল গিয়ে পিছনের দিক। ওদিক দিয়ে দেখেছিল সদর আর এটা হয়তো অন্দরে যাবার পথ। তা হলে সেই অদর্শন লোকটা গেল কোথায় যে বলে কয়ে একটা সুরাহা করে নেবে?

কাষ্ঠ হেসে পিলে বলল চিরকাল জানি আমাদের তরানো ঠাকুর-দেবতার কম্ম নয়। এখন তাঁরা নিজেরাই আছেন কি না, তার জন্য বসে না থেকে, চল আরেকবার সেই পুরনো জায়গাতেই চেষ্টা দেওয়া যাক। লোকরা বোধহয় নিজেরাই যে যার ঠাকুর গড়ে। চল্‌তো দেখাই যাক, কি করা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা ফিরে চলল। সাতটা কিম্ভূত কিমাকার মূর্তি। ছেঁড়াখোঁড়া জামা পেন্টেলুন পরণে—কে-ই বা ধুতি পরে আজকাল, আর পরলেও ওদের দিচ্ছেই বা কে? —পায়ে সাত তালি দেওয়া চপ্পল, রুক্ষ আ-ছাঁটা চুল দাড়ি, গায়ে ঘামের গন্ধ—আঃ ঘামের গন্ধটা কিন্তু বেড়ে ভাই, তা তোরা যাই বলিস"—আড় চোখে দূরে দেখবার চেষ্টা। সেই সুদূরটা যেখানে নীল দিগন্তের সঙ্গে নীল আকাশের তফাৎ নেই, সেটা আবার কেমন সরে সরে কেবলি এগিয়ে যাচ্ছে!

হাসপাতালের যে-ওয়ার্ডে কালী-পুজো প্যাণ্ডেল দুর্ঘটনার সাত দুঃসাহসিক বাহাদুর নোংরা জামা গায়ে দশদিন অসাড় হয়ে পড়েছিল, সেখানকার ডাক্তার নার্সরা হঠাৎ চমকে দেখেন তারা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠছে!

প্রকাশিত হয়েছে

কথা সরিৎসাগর আশাপূর্ণা দেবীর
নবতম উপন্যাস

হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা

১০·০০

লেখিকার অন্য দুটি উপন্যাস

ভালবাসার মুখ ৫·০০ তরঙ্গহীন ৫·০০

সাহিত্য সংস্থা, ১৮ সি টেমার লেন, কলিকাতা — ৭০০০০৯

এই বাংলার খবর

খুন, অবরোধ

শিবরাত্রিতে কলকাতার অদূরে নিমতায় দুই যুবকের খুন হওয়ার খবরে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দেয়। ঐ দুই যুবক খুন হন সমাজবিরোধীদের গুলিতে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শিবরাত্রির উৎসবের সময় এক যুবকের মাতলামিকে কেন্দ্র করে গোলযোগ শুরু হয়। তার মাতলামির ফলে মহিলারা বিরক্তি প্রকাশ করলে রবি ঘোষ নামে একজন যুবক তাকে বাধা দেয়। মাতাল ছেলেটি পাইপ গান বার করলে রবি সেটি কেড়ে নেয়। পরে মাতাল ছেলেটি ফিরে আসে সদলবলে এবং সশস্ত্র হয়ে। তারপর গুলি করে রবি আর রবির ভাইকে খুন করে।

এই খুনের ঘটনার দুদিন পরে বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ ওঠে। নিমতা এলাকা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য তপন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য থেকে জানা যায় গত এক বছরে ঐ অঞ্চলে ন'জন খুন হয়েছে। প্রতিবেশী এলাকার সদস্যেরাও ঐ অঞ্চলে এই ধরনের খুনখারাবির ঘটনার নিন্দে করে অবস্থার প্রতিকার দাবি করেন। রবি ও তার ভাইয়ের খুনের পর ছ'-সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু তপনবাবুর অভিযোগ, আসল অপরাধীদের তখনও ধরা হয় নি।

এদিকে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকায় কয়েকদিন ধরে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে-সংঘর্ষ চলছিল তা নিয়ে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে মার্চের তের তারিখের মাঝরাতে। শরিকী সংঘর্ষ বেড়ে চলার ফলে পুলিশ ৫৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। তার প্রতিবাদে একটি গোষ্ঠীর অনুগামীরা পরদিন সকাল থেকে ঐ এলাকায় রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। রাস্তায়-রাস্তায় অবরোধ তৈরি করা হয়। কলকাতায় যানবাহনের এবং পথঘাটের যা অবস্থা তাতে এক জায়গায় রাস্তা বন্ধ হলে গোটা শহরের রাস্তায় বিভ্রাট দেখা দিতে বিশেষ দেরি হয় না। এর ফলে শহরের মানুষ, বিশেষ করে অফিসযাত্রীরা এবং ছাত্রছাত্রীরা রীতিমতো অসুবিধেয় পড়েন। সকালের দিকে উত্তর ও মধ্য কলকাতার নানা এলাকায় ঘণ্টা পাঁচেক গাড়িঘোড়া চলতে পারেনি। পুলিশ রাস্তার অবরোধ সরাতে গেলে, বিক্ষোভকারীরা বাধা দেয় এবং পাইপ গান, সোডার বোতল, ইটপাটকেল নিয়ে পুলিশের ওপর চড়াও হয়। পুলিশ ১৮ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে, পরে ১১ রাউন্ড গুলিও চালায়। তবে এই গুলিতে কেউ আহত হন নি। মুখ্যমন্ত্রী ঐ দিনই বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে বলেন এই ধরনের পথ অবরোধ সরকার ভবিষ্যতে আর কখনোই বরদাস্ত করবেন না।

অন্য সংঘর্ষ

কংগ্রেসী তরুণদের দুই গোষ্ঠী যখন রাস্তায় নেমে নিজেদের বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করছিলেন তখন কংগ্রেসের আর এক সংঘর্ষও প্রকাশ্যভাবেই শুরু হয়ে যায়। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা বিজয়সিং নাহার সেদিন মন্তব্য করেন, কংগ্রেস এবং সংগঠন কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শের দিক দিয়ে কোনো তফাৎ নেই। বিভিন্ন জেলায় সফরের সময় কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর এই ধারণাই হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মতো সংগঠন কংগ্রেসের নেতা হলেন মনেপ্রাণে কংগ্রেসী, গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী। কংগ্রেসের মধ্যে এখন অনেক সি পি আই-পন্থীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ঐ অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে পারলে প্রফুল্লবাবু এক দিন কংগ্রেসে ফিরে আসতেও পারেন। এদিকে প্রফুল্লবাবুও কংগ্রেসের মধ্যে সি পি আই বিরোধীদের বিভিন্ন প্রয়াসের কথা উল্লেখ করে বলেন তাঁদের এই প্রয়াস যদি সফল হয় তবে তাঁর কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ায় কোনো বাধা থাকবে না।

কিন্তু দিল্লি থেকে ফিরে দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেন, প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কংগ্রেস আর সংগঠন কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শের ব্যাপারে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অন্তত পশ্চিমবাংলায় দুই কংগ্রেসের মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজয়বাবুর বিরুদ্ধে দল-বিরোধী কাজকর্মের অভিযোগ আনেন। তিনি বিজয়বাবুর এইসব কাজকর্মের কথা দিল্লিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে জানিয়েছেন। বিজয়বাবুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা তা ঠিক করবেন এ আই সি সি। কিন্তু ১৪ মার্চ এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজয়বাবু তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেন, দুই কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শের দিক দিয়ে যে কোনো তফাৎ নেই তা দুই দলের গঠনতন্ত্র থেকে স্পষ্ট। তিনি দুটি দলের গঠনতন্ত্র থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠ করেও শোনান। বিজয়বাবু বলেন, অরুণবাবু বেশিদিন কংগ্রেসে আসেন নি। সিদ্ধার্থবাবুও এদিক ওদিক ঘুরে কংগ্রেসে এসেছেন। তাঁরা হয়ত কংগ্রেসের আদর্শ সম্পর্কে বেশি কিছু জানেন। কিন্তু আমি কংগ্রেসকে ভাঙার জন্যে কিছু করি নি, যা কিছু করেছি কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্যেই করেছি।

বাম জোটে ভাঙন

পশ্চিমবাংলার বামপন্থী জোটে ভাঙন ধরেছে। নয় বাম থেকে এক বাম, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার বেরিয়ে এসেছে। ফলে বাম জোটে এখন রইল বাকি আট। নয় বামের মধ্যে সাম্প্রতিক মতবিরোধের শুরু সংগঠন কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি দলের সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্যে মিলিত আন্দোলন করা নিয়ে। ইতিমধ্যে সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু এবং বামপন্থীদের আরো কয়েকজন নেতা সংগঠন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে বার কয়েক আলোচনা করেছেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সভায় একই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করেন প্রফুল্লবাবু, জ্যোতিবাবু এবং জনসঙ্ঘের হরিপদ ভারতী। এস ইউ সির আপত্তি এইসবের বিরুদ্ধে। দলের পক্ষ থেকে বাম জোটের বিশেষ করে সি পি এমের এইসব কাজকর্মের তীব্র নিন্দে করে প্রচার চালানো হতে থাকে। নয় বামের শেষ সভায় অপর আট দলের মুখপাত্রেরা বলেন, জোটের অপর শরিকদের এইভাবে নিন্দে মোটেই সহ্য করা যায় না। এস ইউ সি-কে এই ধরনের প্রচার বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ঐ বৈঠকে এস ইউ সি-র প্রতিনিধি বলেন, কোনো বিষয়ে মতবিরোধ থাকলে তা প্রকাশের অধিকার তাঁদের অবশ্যই আছে।

পরদিন এক বিবৃতিতে এস ইউ সি নেতা নীহার মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, সি পি এম রাজনৈতিক সমালোচনার অধিকার কেড়ে নিতে চায়। কোনো দলই এই অবস্থা মেনে নিতে পারে না। এস ইউ সি এখন থেকে পৃথক পথে চলবে। এই ব্যাপারে সি পি এম বা অন্য কোনো দলের সঙ্গে আপসের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এদিকে আট বাম ঠিক করেছে, খাদ্য সমস্যা, জিনিসপত্রের চড়া দাম, বেকার সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে নানা দাবি নিয়ে আসছে মে মাস থেকে তারা আন্দোলন শুরু করবে। ব্লক থেকে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়ে শেষ হবে বাংলা বন্ধের মধ্যে দিয়ে।

শিল্পের প্রসার

সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভার আমলে এই বাংলায় শিল্প প্রসারের একটা ছবি পাওয়া গেল বিধানসভায় শিল্পমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের বিবৃতি থেকে। গত তিন বছরে শিল্পোন্নয়নে লগ্নীর মোট পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকা। ১১৪টি নতুন প্রকল্পে কাজ চলছে। '৭৫-৭৬ সালে আরো ৮৬টি প্রকল্প চালু হওয়ার কথা আছে। এর মধ্যে ৫০টিতে কাজ শুরু হতে পারছে না বিদ্যুৎ পাওয়া যায় নি বলে। ২৮০টি প্রকল্প চালু করার জন্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে। যৌথ উদ্যোগের একটি কারখানায় ইতিমধ্যেই টেলিভিসন সেট তৈরি শুরু হয়েছে। টায়ার টিউব স্কুটার এবং সিমেন্টের তিনটি কারখানার কাজ অগ্রসর হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে হিন্দুস্থান ল্যাটেকসের একটি কারখানা (ফরাক্কায়) এবং লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেশন প্ল্যান্ট (ডানকুনিতে) স্থাপন করতে রাজি হয়েছেন। যৌথ উদ্যোগে উত্তরবঙ্গে স্থাপিত হবে সিগারেট, ঘড়ি, নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি কারখানা। এ ছাড়া বেসরকারি উদ্যোগেও নানা প্রকল্প চালু হবে।

তরুণবাবু বলেন, আমরা শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে এই রাজ্যে বিরাট একটা কিছু করতে পেরেছি, এমন দাবি করব না। কিন্তু যেটুকু করতে পেরেছি তা সম্ভব হয়েছে এই রাজ্যের উন্নয়নে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আগ্রহ থাকার জন্যেই। বেসরকারি পুঁজির সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, এইসব ব্যাপারে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব দিল্লির। তাঁর দপ্তরের কাজ হলো রাজ্যে শিল্পের প্রসারের ব্যবস্থা করা। লাখ লাখ মানুষের চাকরির ব্যবস্থা করাই সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন। শিল্প সরকারি বা বেসরকারি সেই প্রশ্ন সবচেয়ে বড় নয়।

পৌর নির্বাচন

পৌরমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই রাজ্যে বিভিন্ন পৌরসভার নির্বাচন এই বছরেই অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতা সহ মোট পৌরসভার সংখ্যা ৯০টি। কয়েকটি পৌরসভা এলাকায় নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ হয়ে গেছে সেখানে আগামী বর্ষার আগেই নির্বাচন হবে। পৌর নির্বাচন ত্বরান্বিত করার জন্যে সম্প্রতি বঙ্গীয় পৌর আইন সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে দুই মাস আগে নোটিশ দিয়েই নির্বাচন করা যাবে। বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা তৈরি থাকলে পৌরসভা নির্বাচনের জন্যে পৃথক ভোটার তালিকা প্রকাশের দরকার হবে না। এদিকে কলকাতাসহ বিভিন্ন পৌরসভার কাঠামো ঢেলে সাজানোর জন্যে বঙ্গীয় পৌর আইন এবং কলকাতা পৌর আইন সংশোধনের উদ্যোগ চলছে। নতুন পৌর কাঠামো সংক্রান্ত প্রস্তাব এখন মন্ত্রি-সভার একটি সাব-কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে। ঐ প্রস্তাবে পৌরসভার কর নির্ধারণ, কর আদায়, জঞ্জাল সাফাই প্রভৃতি বিভাগের আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।

১৭।৩।৭৫ দেবদত্ত

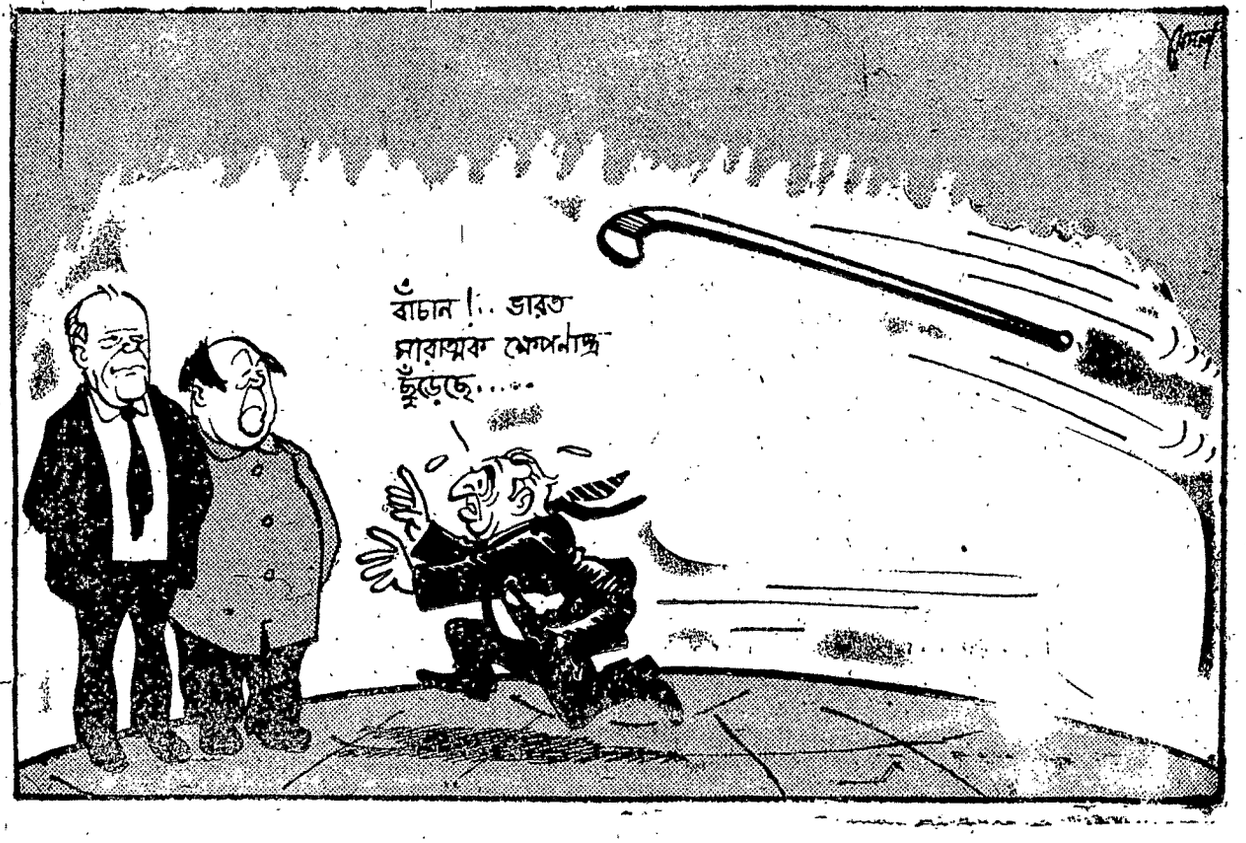

রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন প্রবাহ

রাজ্যের রাজনীতি নতুন খাতে বইছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভেতরে প্রবীণে-প্রবীণে নবীনে-নবীনে, ছাত্রে-ছাত্রে আবার কোন্দল অন্যভাবে উপস্থিত। প্রবীণ নেতা বিজয়সিং নাহারকে এবার একাংশ দলীয় শৃংখলা ভংগের অভিযোগে আসামী হিসাবে ধরেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অরুণবাবু বিজয়বাবুর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ এনেছেন। প্রকাশ সিদ্ধার্থবাবুরও এতে সম্মতি আছে। সি পি আই ঘেঁষা অংশ বিজয়বাবুকে জয়প্রকাশ আন্দোলনের সমর্থক বলে বর্ণনা করছেন। অপরদিক থেকে বিজয়বাবু অরুণবাবুর বিরুদ্ধেও গুরুতর কতগুলো অভিযোগ এনেছেন, অভিযোগ এনেছেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রতিকারের দাবীতে তিনি সোচ্চার। বিজয়বাবুর এই সোচ্চার সংগঠনের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বহুদিন ধরেই পছন্দ করছেন না।

বিজয়বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সংগঠন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে শাসক কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনতে চান। সংগঠন ও প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করার জন্য জেলায় জেলায় তাঁর সাম্প্রতিক সফরে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ।

পরিষদীয় দলে বিজয়বাবুর সমর্থক নগণ্য; যাঁরাও পাশে আছেন তাঁরা মুখ খুলতে বা প্রকাশ্যে সমর্থন জানাতে ভয় পান। কিন্তু জেলায় জেলায় বহু কর্মী ও নেতার তিনি সমর্থন পেয়েছেন বলে তিনি দাবী করেছেন। কারণ কংগ্রেসের সংগঠনে তিনি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নেতা হলেও তাঁকে এখনও অনেকে পছন্দ করেন। দুর্ভাগ্য, কংগ্রেস ভাঙ্গা ও নতুন কংগ্রেসের জন্মলগ্নে এই রাজ্যে যিনি প্রদেশ কংগ্রেসের কর্ণধার ছিলেন সেই বিজয়সিং নাহারকে বর্তমানের রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্রের হাতে নাজেহাল হতে হচ্ছে। এটা দুঃখের হলেও খুব নতুন ব্যাপার নয়। একদিন ক্ষমতাসীন বিজয়বাবুর হাতে অজয়বাবুকেও নাজেহাল হতে হয়েছিল। তেমনি সেই বিজয়বাবুকেও রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে সরে আসতে হয়েছিল যুব-ছাত্রদের চাপে। যাঁরা বিজয়বাবুকে সেদিন নাজেহাল করেছিলেন, যাঁদের অংগুলি হেলনে সেদিন তিনি কংগ্রেস অফিস ছেড়ে চলে এসেছিলেন, তাঁরা এখনও কংগ্রেসের কলকাঠি নাড়ছেন। অবশ্য যুব ও ছাত্রদের সেই অংশের রাগ আজও বিজয়বাবুর ওপর আছে কিনা জানি না। তবে কংগ্রেসকে যাঁরা ভালবাসেন এমন বহু প্রবীণ বিজয়বাবুর বক্তব্য একেবারে ফেলে দিতে পারছেন না। কারণ খাই খাই গোষ্ঠীর কবল থেকে কংগ্রেসকে বাঁচান আজ প্রথম কর্তব্য।

*

কংগ্রেসের ভেতরে সি পি আই ঘেঁষা গোষ্ঠী বনাম সি পি আই বিরোধী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব বিজয়বাবু ও সিদ্ধার্থবাবুর সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিয়েছে।

বিজয়বাবু সম্প্রতি অরুণবাবুর অভিযোগের উত্তরে বলেছিলেন যে, বিহারের সংগঠন কংগ্রেস নেতা রামসুভগ সিং, তারকেশ্বরী সিংহকে ফিরিয়ে সেনকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার কোন পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় কোন দোষ নেই; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার কোন কথা বলাই কি মারাত্মক অপরাধ?

এর জবাব অরুণবাবুরা এখনও দেননি। কিন্তু কংগ্রেস পরিষদ দল প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ফিরিয়ে আনা হবে না। তাঁকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিলে কি শাস্তি হবে? তা অবশ্য প্রস্তাবে কিছু বলা হয়নি।

বিজয়বাবু নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির সদস্য। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে সহজে শাস্তিবিধান সম্ভব নয়। নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটিই শাস্তিবিধান করতে পারেন। কাজেই বিজয়বাবু প্রসঙ্গ আর বেশী দূর অগ্রসর হবে না বলেই মনে হচ্ছে। কারণ দিল্লী এ-ব্যাপারে কিছু করতে তৎপর নয়।

কিন্তু প্রফুল্লবাবুকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না প্রস্তাব পাশ করে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব পরোক্ষে শ্রীসেনকে সি পি এম-এর হাতেই তুলে দিলেন। জে পি আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে তিনি ইতিমধ্যেই সি পি এম-এর সংগে এই রাজ্যে কাজ করতে শুরু করেছেন। জ্যোতিবাবুও পার্টিকে বুঝিয়ে প্রফুল্ল সেনের সংগে আঁতাতে আসছেন। কারণ, লোকসভা নির্বাচনে সি পি এম প্রফুল্ল সেন ও জয়প্রকাশকে পশ্চিমবঙ্গে ও কেরলে পেতে চায়।

*

দুর্ভাগ্য, কংগ্রেসের যুব ও ছাত্র কোন্দল মারপিট এখনও কমছে না। যুক্ত বৈঠক বহুবার হয়েছে, আরও হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল মনের মিল কখনই হবে কী? ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টা চললে ঐক্য কখনই হবে না। তবে যুব ও ছাত্র নেতৃত্বের অনুগামী কংশের কিছু পালা বদল চলছে। যুব ও ছাত্রদের সংযত, শৃংখলাপরায়ণ আদর্শবাদী হিসাবে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ সার্থকভাবে দেওয়া হলেই ঐক্য ও সংহতি আসবে। অন্যথায় গোষ্ঠী-ঝগড়া চলবেই।

চাণক্য

দেশ বিদেশে

দাউদের ভারত সফর

একটা লক্ষণীয় যোগাযোগ। ভুট্টো যে নয়াদিল্লিতে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন সেই সংবাদটা নয়াদিল্লির সরকারি মহল থেকে সমর্থিত হয় ১০ মার্চ তারিখে। সেই দিনই রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন আর রেডিও পাকিস্তান থেকে তাঁর বক্তব্য ফলাওভাবে প্রচার করা হচ্ছিল। আবার ঐ দিনই ভারত সফরের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লি এসে পৌঁছলেন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ দাউদ এবং নয়াদিল্লির বিমান বন্দরে প্রথমেই তাঁকে সম্বর্ধনা করার জন্য যাঁরা এগিয়ে গেলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট দাউদ যে কয়দিন ভারতে ছিলেন সে কয়দিন ভারত সরকারের তরফ থেকে তাঁর দেখাশুনা করার জন্য যাঁকে তাঁর সঙ্গে রাখা হয়েছিল তিনিও আর একজন কাশ্মীরী নেতা—মহম্মদ শফি কুরেশি। কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে পাকিস্তান যখন নতুন করে মাতামাতি আরম্ভ করতে যাচ্ছে তখন পাকিস্তান তার নিজের দেশের পাঠান ও বালুচদের প্রতি কি ব্যবহার করছে সেকথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আফগান নেতা দিল্লিতে এসে হাজির হলেন এবং বিশেষ করে শেখ আবদুল্লা ও কুরেশীর মত কাশ্মীরী নেতাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে দহরম-মহরম করলেন, এটা নিশ্চয়ই ভুট্টো সাহেবের মনঃপূত হয়নি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে নি। পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে হাজার হাজার বালুচ যে এখন আফগানিস্তানের আশ্রয় নিচ্ছে এবং পাখতুনদের উপর নির্যাতন চালিয়ে, আওয়ামী পার্টির ওয়ালি খাঁ ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করে ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে পাকিস্তানই যে আফগানিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষিয়ে তুলছে সেকথাটা আফগান নেতা শুধু ভারতেই নয়, বাংলাদেশেও বলে গেছেন। তিনি খোলাখুলিভাবেই এই মতও প্রকাশ করে গেছেন যে, উপমহাদেশে অশান্তি বজায় রাখার জন্য একমাত্র পাকিস্তানই দায়ী।

করুণানিধির হুমকী

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি এই বলে হুমকি দিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাঁদের মনোভাব না বদলায় তাহলে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় করার জন্য শান্তিপূর্ণ ও সংবিধান-সম্মত সংগ্রামের পথ ছেড়ে 'অন্য পথ' গ্রহণ করা হতে পারে।

জাতীয় পতাকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সার্কুলারের সুযোগ গ্রহণ করে তামিলনাড়ু সরকার রাজ্যের একটি পৃথক পতাকা চালু করার চেষ্টা করছেন। সেই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের দাবিটা আবার জোরালোভাবে তুলে ধরছেন।

রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক হিসাবে পৃথক পতাকা ব্যবহার করার দাবি তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকার বেশ কিছুকাল যাবতই জানিয়ে আসছেন। জাতীয় পতাকার তিন রং ও দক্ষিণ ভারতের গোপুরমের ছবি দেওয়া একটি রাজ্য পতাকার নকসাও দীর্ঘদিন যাবৎ তৈরি করা আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি হননি। কিছুকাল আগে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে প্রশ্নটি আলোচিত হয়। তখন অন্য কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমনকি অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরাও ডি এম কে সরকারের প্রস্তাবে সায় দেননি। ডি এম কে যুক্তি দিয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের যেখানে আলাদা পতাকা ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, সেখানে রাজ্যগুলির নিজস্ব পতাকা থাকতে দোষ কি। কেন্দ্রীয় সরকার এই যুক্তি অংশত মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের পৃথক পতাকার ব্যবহার তুলে দিয়েছেন, কিন্তু রাজ্যের নিজস্ব পতাকার দাবি মেনে নেননি। কাশ্মীর হচ্ছে এ-বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম। কাশ্মীরের জন্য আলাদা সংবিধান আছে বলে সেখানে আলাদা পতাকাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

শেখ আবদুল্লার সঙ্গে নয়াদিল্লির সমঝোতা হওয়ার পর থেকেই করুণানিধি কাশ্মীরের অনুরূপ স্বায়ত্তশাসনের দাবি নতুন করে তুলে আসছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সার্কুলার তাঁকে সুযোগ জুটিয়ে দিল। তিনি মাদ্রাজে ইনস্পেকটর জেনারেল অব পুলিশের অফিসের উপর রাজ্যের প্রতীকসম্বলিত পতাকা উড়িয়ে দিলেন। আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সার্কুলারে জাতীয় পতাকার ব্যবহার সম্পর্কিত প্রচলিত বিধি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল যে, সরকারি ভবনগুলির মধ্যে শুধু সচিবালয়, আদালত, আইনসভা জেলা সদর পৌর সংস্থা ইত্যাদিতে সারা বছর জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে অন্যান্য সরকারি ভবনে শুধু স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলিতে জাতীয় পতাকা তুলতে হবে।

কেন্দ্রীয় সার্কুলারের ভুল ব্যাখ্যা করে এভাবে রাজ্যের পৃথক পতাকা চালু করার চেষ্টার বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু বিধানসভা ও বিধান পরিষদে কংগ্রেস ও সি পি আই সদস্যরা আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁদের ঐ আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকারকে ক্রমাগত অপদস্থ করে চলেছেন। তামিলনাড়ু সরকার তাঁদের সচিবালয়কে সুন্দর করে সাজাতে চাইলেও দিল্লির অনুমতি নিতে হয়। (সচিবালয় গৃহটি একটি পুরান সৌধ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের রক্ষণাবেক্ষণে আছে।) তাঞ্জাভুরের মন্দিরে রাজা রাজ চোলের একটি মূর্তি স্থাপন করতে চেয়ে তামিলনাড়ু সরকার কেন্দ্রের অনুমতি পান নি, অথচ সেখানে একটি বরাহ মূর্তি সংস্কার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। করুণানিধি প্রশ্ন করেছেন মহাবলীপুরমের পুরাকীর্তি কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ববিদদের অধীনে থাকবে কেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী নায়ককে যেভাবে সরে যেতে হল সেই ঘটনাটিকে করুণানিধি রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের ব্যবহারের একটি নমুনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কেন্দ্র মহারাষ্ট্রের প্রতি যেসব অবিচার করেছেন সেসব বিষয় উল্লেখ করে পুস্তিকা প্রকাশ করার দশ দিনের মধ্যে নায়ককে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে মাদ্রাজে একটি বিবৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তামিলনাড়ু বা অন্য কোন রাজ্যের পৃথক নিজস্ব পতাকা ব্যবহার করার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হবে না।

সহকর্মীর লোকান্তর

আমাদের সকলের প্রিয়জন শ্রীসমর রায় গত ১৩ মার্চ অফিস আসবার সময় এক আকস্মিক ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তিনি অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং মধুর স্বভাবের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন।

ফাদার দ্যতিয়েন
রোজা ও নামচা

তিন হাজার টাকা যার মাসিক আয় সে কি ইচ্ছে করলে পুনর্বিবাহ করতে পারে না? পারে। ওসমান গনি কিন্তু আর করবে না নিকা করার ওর ইচ্ছে নেই।

ওর বৌটির নাম ছিল মমতাজ। মমতাজ ইন্তিকাল করেনি (ইন্তিকাল মানে মৃত্যু) চলে গিয়েছে সরে পড়েছে—ওসমানের দিন-দুনিয়াকে অন্ধকার করে ওসমানকে সে ছয় বছরের অবিমিশ্র আনন্দ দিয়েছিল: সকালে নিজেই ওকে অফিসে ড্রাইভ করে নিয়ে যেত আর বারোটা বাজতে না বাজতে নিজেই রোজ টিফিন নিয়ে আসত...হায়দারকে বরং সাওয়াল করুন ছোকরাটা আপনাকে বলবে জানালার এক ভাংগা কাঁচের সুযোগ নিয়ে কেমন করে সে দেখেছে (একদিন নয় একাধিকবার) ভাত সালন মেখে হাঁ কর বলে সাহেবের মুখে বিবিজান গ্রাসের পর গ্রাস তুলে দিচ্ছে... না সন্ধ্যায় সে আর যেত না ওসমানের জন্য ইন্তিজার করত গরম চা টাটকা হালুয়া আর অনেক আদর-যত্ন নিয়ে। যুগল মূর্তিকে দেখে প্রতিবেশীরা বলত: 'এত পেয়ার দেখে হিংসে হয়...হা হা আল্লা ওদের আওলাদ দেননি কেন?...

বিচ্ছেদান্ত গল্পটা শুনলাম ওসমানেরই মুখে। প্রথম থেকে বলি শুনুন:

মমতাজ আসিফ নামে ওর এর ফুফুতো ভাইকে ভালোবাসত। উভয়ের আব্বার মত ছিল দাদারাও উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন 'তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিয়ে দাও সাদি দেখে আমরা হজে যাই'...আমাদের মতামতের খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ না করে আব্বারা তাই কুলো-ডালা সাজানোর কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। নিয়মটা এই: বিয়ের কিছু দিন আগে ছেলের আব্বা কুলির মাথায় করে মেয়ের আব্বার কাছে খানপোশ-আবৃত এক কুলো পাঠাবেন: তাতে থাকবে সোহাগ-পুরা (বারো রকম মশলা সমেত) চুলি ওড়না আর বাসন্তী রঙের শাড়ি দুটো সোনালি রাখি একটা সোনালি মালা জরির ফিতে দু গজ সুরমাদানি আর মেহেদির বাটি খোঁপার জন্য মেথি আর সোঁদা (হলুদের সঙ্গে গায়ে লেপ)...ফেরৎ ডাকে মেয়ের আব্বা পাঠাবেন এক ডালা তাতে থাকবে সোহাগ-পুরা বিয়ের পাগড়ি আতর একটা রুপালি রাখি একটা সাদা মালা...কিন্তু ওসব বলে কি লাভ?...কুলোটা পাঠানো হল না।

কুলো পাঠানোর পূর্ব দিবসে নমাজ সেরে মমতাজের আম্মা সাজেদা ঘোষণা করে বসলেন পরিকল্পিত সাদিতে তাঁর মত নেই। আসিফের বংশ নাকি ভালো নয়: ওর দাদীর হয়েছিল শ্বেতী ফুফুর হয়েছিল মৃগীরোগ বড় জেঠা ভুগেছিল যক্ষ্মায়। সাজেদার অমতের প্রকৃত কারণ কিন্তু তা নয় সাজেদার অমতের প্রকৃত কারণ স্বয়ং ওসমান...সদ্য বিলাত ফেরত ওসমান গনি—আর তার রোজগার: ওসমানের বেতন আসিফের মাইনের পাঁচ গুণ।

তোষামোদে খোশামোদে কোনো ফল হচ্ছে না, দেখে তিরস্কারে ভৎর্সনায় কোনো ফল হবে না জেনে মমতাজের আব্বা—আর চাচারা—হার মানলেন।

আর মমতাজ?...মমতাজের ব্যবহার কেউ বুঝল না। প্রথম দিন অবশ্য ভেউ ভেউ করে কান্নাকাটি করে মেয়েটি দাড়ি-কলসীর কথা তুলেছিল হু-হু করে ফুঁপিয়ে আমরণ নিরম্বু অনশন করবে বলে শাসিয়েছিল। তার সংকল্প কিন্তু দিনে দিনে ঢিলে হতে শুরু করল। তাকে ঘিরে বাড়িতে যে অশান্তির সৃষ্টি হবে তা সে চাচ্ছিল না মাকে দুঃখ দিয়ে সে যে সুখী হবে না কথাটা তাকে বোঝানো হল বুঝলও সে। মেয়েটি বোধ হয় আসিফকে সত্যকার প্রেমে কোনোদিনই ভালোবাসেনি শুধু ভালো-বাসতে ভালোবাসত। কুলোটা পৌঁছনো হল—ওসমানের বাড়িতে:

প্রকৃত প্রেম যে কাকে বলে মমতাজ তা বুঝতে শিখল ওসমানের সাহচর্যে। ওসমান পরস্পরের ভালোবাসাকে সতেজ রাখত নিত্য নতুন আবিষ্কারে। মমতাজ ফুল ভালো-বাসে? পরাগে ওর নিজের অ্যালার্জি সত্ত্বেও ওসমান বন্ধুদের বাড়ি থেকে আনে টবে বসানো হরেক রকম ফুলের গাছ। মমতাজ ফিলিম দেখতে পছন্দ করে? ঘরকুনো ওসমান প্রতিটি রোববারে বৌকে নিয়ে যায় সিনেমায়...এই ধরনের নিষ্কাম কর্ম কিন্তু সংক্রামক: অল্পদিনের মধ্যে মমতাজের মা এসে দেখেন বেগুনভাজা পাঁকাল মাছের ঝোল প্রভৃতি যে সব রান্না হাজার বকুনি খেয়েও শিশুকাল থেকে মেয়েটি খেতে চাইত না সেই সব অন্নব্যঞ্জন আজ নিজের হাতেই সে রাঁধে—আর দিব্যি খায়—ওসমানের ফেভারিট ডিশ্ বলে। ছুটি এলে ঝগড়া হয়: মমতাজ সমুদ্রপিয়াসী বলে ওসমান চায় কক্সবাজারে যেতে আর এদিকে ওসমানকে পাহাড়প্রিয় জেনে মমতাজ বলে: রাংগামাটি যাওয়া যাক!

ওই বছরে কিন্তু কোথাও আর যাওয়া হল না: সম্পূর্ণ ছুটিটা ওসমানের—আর মমতাজের—কাটল ঢাকার সদর হাসপাতালে। অদ্ভুত এক অসুখ ওসমানের: চোখে ক্যানসার জাতীয় এক টুমার...দীর্ঘদিনের চিকিৎসা চলল বিদেশী ওষুধ—আর বিদেশী ডাক্তার—করাচী থেকে আমদানি হল। ওসমানকে মমতাজ এক মিনিটও ছাড়ল না: ওর ক্যাবিনেই মাটিতে মাদুর পেতে সে ঘুমোত। না ঘুমোত না অতন্দ্র নয়নে রাত কাটাত। মেয়েটির ফেকাসে চেহারা আর কোলা চোখ দেখে বুড়ো ডাক্তার হাফিজুল্লা আদর করে জিগ্যেস করতেন 'এ ক্যাবিনে কার অসুখ?

ওসমান একদিন বলেছিল 'একবার বাড়ি ঘুরে এলে হয় না? তোমার একটু বিশ্রাম দরকার...তীব্রবেগে উত্তর এসেছিল: আর যাই বল না কেন হাত জোড় করে বলি ওসমান ও অমন কথা আর মুখে এনো না লাগে!' রোগীটি কৈফিয়তের সুরে বলেছিল 'তোমার গাছগুলো যে শুকিয়ে যাবে...

'আমার গাছ?...দুলোর বাবা আমার গাছ? এ দুনিয়ায় আমার আর কিছু নেই—তুমি ছাড়া' মমতাজের হঠাৎ দুঃখ হল যে নগদ টাকার তার কোনো অভাব নেই। কত আনন্দের ছলে সে তার বাবতীয় গয়না বিক্রি করে হাসপাতালের বিল মেটাত।

ইতিমধ্যে তার মাথায় এক আশ্চর্য বুদ্ধি খেলেছে বাড়ি গিয়ে গয়নার বাকস থেকে সে তার সবচেয়ে দামী হার—পাঁচ ভরির এক স্বর্ণহার—বের করে আঞ্জুমনের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে বলল 'ওর সদ্ব্যবহার করুন—দরিদ্র রোগীদের খিদমতে।' বিবাহিত জীবনে এই প্রথম মমতাজ স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো কাজ করে ফেলল। আল্লার কাছে সে প্রার্থনা করল তার উদার ব্যবহারের বিনিময়ে তিনি যেন ওসমানের প্রতি মেহেরবানি-পূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন।

দু মাসের মধ্যে দেশী-বিদেশী চিকিৎসকদের স্তম্ভিত করে ওসমান আরোগ্য লাভ করল ঃ রক্তাদি পরীক্ষা করে বোঝা গেল রোগের জীবাণু নিশ্চিহ্ন। আল্লাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে মমতাজ অর্ধ শুষ্ক ফুলের গাছে পানি দিতে শুরু করল।

...ওসমান আসলে পুরোপুরি সেরে ওঠে নি ওর সেই অসুখের এক অভাবিত পরিনাম ও বয়ে চলেছেঃ ওর সব আছে পৌরুষ নেই। অতিরিক্ত শীর্ষাসন করলে নাকি যা হয় কোন ওষুধের কোন প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ওসমান আজ পুংশক্তিহীন।

মমতাজ ঘাবড়ে গেল না...ঘাবড়ে গেল না বাক্যে ভঙ্গিতে ঘাবড়ে গেল মনে মনে। গোটা ব্যাপারটা ঠাট্টার ছলে উড়িয়ে দিয়ে সে বলল 'প্রেমকলাটা তাহলে আমাদের প্রথম থেকেই নতুন করে শিখতে হবে...।' তারপর বেহেস্তি সাহিত্যের এক পুস্তক থেকে ওসমানকে শেখাতে লাগল পদ্মিনী চিত্রাণী শঙ্খিণী হস্তিণী নারীভেদ। ওষ্ঠাধরে অতিকষ্টে এক স্মিতহাসি এঁকে ওসমান বলল 'আরও আছেঃ মর্দামুখী বাঁদরামুখী পেঁচামুখী হাড়িমুখী কুকুরচোখী কুলো পাছা কাকঠেঙ্গী.....

খেলাটা আর কতদিন টিকবে, বলুন? মমতাজ আর কতদিন লুকোতে পারবে তার আশঙ্কা? কতদিন চাপা রাখতে পারবে দুর্বহ রহস্যটা? তার মা যে আজকাল—যেন নিষ্ঠুর উপহাসে—সময়ে অসময়ে পাড়েন তাঁর নানী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

মমতাজ আশা ছাড়ল না একদিন ছোট পুঁটলি বেঁধে নিয়ে সে রওনা হল। না প্লেনের ভাড়া সে সঙ্গে নিল না আর পাঁচজন মিস্কিন মুসাফিরের মতো ট্রেনে চেপেই সে আজমীরে তীর্থ করতে গেল। মাজার শরিফে পুরো এক সপ্তাহে নফল নমাজ পড়ে নফল রোজা করে সে ধর্ণা দিল শেষদিন তার বিয়ের দুটি কঙ্কন মানত করে রেখে গেল। আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা পেল সে স্বামীকে সারাতে পারল না।

একদিন ওসমান বৌ যাতে 'মাতৃত্বের আনন্দ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হয় সেজন্য অনাথাশ্রমের এক বাচ্চাকে পোষ্য করার প্রস্তাব করল। মেয়েটি বাঘিনীর মতো গর্জন করে বলে উঠল যে বাচ্চা তোমার বাচ্চা নয় সে বাচ্চাকে আমি চাই না...' পরে একটু শান্ত হয়ে অভিমানভরা কণ্ঠে সে বলল 'আমাকে তুমি সন্তান দেবে বলে নয় নিজেকেই দেবে বলে তামাকে আমি বিয়ে করেছি ওসমান।'

দিন গেল মাস গেল কাটল তিন বছর। প্রতিবশীদের চোখে ধুলো দিয়ে আর নিজেকেও প্রতারণা করে অতিরিক্ত আদর-যত্নের মধ্য দিয়ে স্বামীর কাছে—আর নিজের কাছেও—মমতাজ তার প্রণয়ের অকৃত্রিমতার প্রমাণ স্তূপীকৃত করতে লাগল ওসমান বাড়ি ফিরলেই শশব্যস্ত হয়ে সে ওর কোট আর টাই খুলে দিত জুতো ছাড়িয়ে দিত চটি পরিয়ে দিত...। মুখে কিছু না বললেও ওসমান মনে মনে প্রশ্ন করতঃ ফুলদানিতে ফাটল না ধরলে এত সাবধানে ফুলদানি নাড়ে চাড়ে কে? দাম্পত্য যন্ত্রাবলী চলছিল মসৃণ গতিতে আর তবু একেক সময় ওসমানের অন্তঃকর্ণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল অদৃশ্য কোন এক চাকাতে কিসের যেন কড়কড়ে আওয়াজ...

একদিন মোরগ ডাকল অ্যালার্ম বাজল চারদিকের মসজিদ থেকে ঢেউয়ের মতো ভোরের আজান সহরতলী ছেয়ে ফেলল, মমতাজ তবু উঠল না। বলল শরীর ভালো নেই ওসমান তার জন্য যেন না ভাবে নিশ্চিন্তে অফিসে যাক। বৌয়ের কাছে থেকে নিজের হাতে তার শুশ্রূষা করার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও ওসমান বুঝল মমতাজ তা চায় না অনন্যোপায় হয়ে শাশুড়ীকে ফোন করে ডেকে আনিয়ে ও রওনা হল। গাড়িতে উঠতেই মমতাজের আসনে ড্রাইভারকে দেখে ওর সারা দেহ কেঁপে উঠল অনির্বচনীয় আশঙ্কায়। অফিস থেকে কতবার ফোন করতে চেষ্টা করল ওসমান মমতাজের ফোন সর্বদাই এনগেজড।

সন্ধ্যায় ফিরে ওসমান দেখল মমতাজ বাড়ি নেই তার আলমারিগুলোও শূন্য। চাকর বলল ডাক্তার এসেছিলেন বলেছিলেনঃ মানসিক রোগ অবিচ্ছিন্ন বিশ্রামের প্রয়োজন। বিবিসাহেবের আম্মা নাকি সাহেবকে বলতে হুকুম দিয়েছেন সাহেবের পক্ষে কিছুদিনের জন্য না যাওয়া ভালো ফোন না করাও ভালো তিনি রোজই খবর পাঠাবেন।

মমতাজের আম্মা কোনোদিনই খবর পাঠান নি আর মমতাজও ফোন পর্যন্ত করল না। একদিন তাঁদের বাড়ির এক মৌলবীর মধ্যস্থতায় তাঁরা ওসমানকে তালাক দিতে অনুরোধ করেছিলেন। ওসমান বলেছিল এতদিন এত সুখ আমাকে যে দিয়েছে তালাক কি তার প্রকৃত পুরস্কার? মমতাজ নিজ থেকেই ডাইভোর্সের আয়োজন করল সরকারী বন্দোবস্তে।

মিসিং লিঙ্কের খোঁজে জিগ্যেস করলামঃ শাশুড়ীর প্ররোচনায় ওসমান কোনো উত্তর না দিয়ে বললঃ তার স্মরণে আমি রোজ টবে বসানো গাছগুলোতে জল দিই সন্ধ্যায় এসে তার ছবির অ্যালবাম দেখি রাতে দেখি তার স্বপ্ন...সিনেমায় যাওয়া বন্ধ করেছি। এক বছর হয়েছে আজ আমি তাকে হারিয়েছি। শুনেছি শীগগিরই নাকি নতুন বিয়ে করে সে বিলেত যাচ্ছে। ভাবছি গাড়িটা পাঠাব নিকার উপহার।

(ক্রমশঃ)

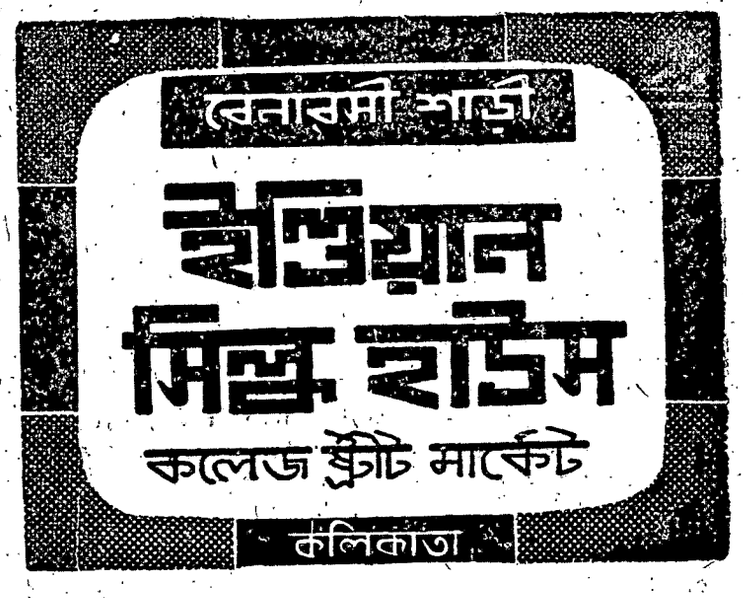

গোয়েন্দা ধাঁধা

ভাঙা দেউলের খুনী প্রতিমা ॥ মিস্ মার্পল ॥ আগাথা ক্রিষ্টি

ভাঙা দেউলের খুনী প্রতিমা। মিস মার্পল। আগাথা ক্রিষ্টি

ক্লাবের নাম টুইসডে নাইট ক্লাব। উদ্দেশ্য —রহস্য গল্প বলা এবং তার সমাধান করা। সেদিন গল্প বলছেন পাদ্রী পেনডার।

ডার্টমুর জায়গাটা রহস্যময়, ভয়ংকর অথচ সত্যিই দর্শনীয়। ডার্টমুরের প্রান্তে বেশ খানিকটা জায়গা জমি কিনলেন স্যার রিচার্ড হেডন। প্রাসাদের পাশেই প্রস্তর-যুগের সারি সারি গুহা, দিগন্তবিস্তৃত জলাভূমি এবং জংগলাকীর্ণ পর্বতশ্রেণী।

এই বাড়ীতেই একদিন একটা পার্টি দিলেন স্যার রিচার্ড। অনেকেই এলেন সেখানে—অভ্যাগতদের মধ্যে রইল মিস ডায়না —ডাকসাইটে সুন্দরী।

সবাইকে নিয়ে স্যার রিচার্ড গেলেন প্রস্তরযুগের গুহা অঞ্চলে। নিওলিথিক কুঁড়ে দেখিয়ে বললেন—এ-জায়গার নাম সাইলেন্ট গ্রোভ।

সাইলেন্টই বটে। থমথম করছে চারি-দিক। নির্জন, নিস্তব্ধ। এবড়োখেবড়ো পাহাড় ন্যাড়া ন্যাংটা। আর কিছু নেই।

অদূরে অনেকগুলো গাছ মাথা ঠোকা-ঠুকি করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকদিনের মরা গাছ—নতুন করে পুঁতে রাখা হয়েছে শুধু মাঝের দেউলটাকে ঘিরে রাখার জন্যে।

ভাঙা দেউল। ফোনিসিয়ানদের ডাকিনী মন্দির। মন্দিরে পাথরের প্রতিমা। মনে হয় যেন জীবন্ত। মাথায় জোড়া শিং।

গা শিরশির করে উঠল অভ্যাগতদের। মেয়েরা ভয় পেল। পুরুষরাও স্বীকার করলে—জায়গাটা আতঙ্কগ্রস্ত। যেন একটা অশুভ শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে এখানকার বাতাসে। পরিবেশ মোটেই সুবিধের নয়।

মিস ডায়না কিন্তু লাফিয়ে উঠে বললে—তাই কি হয়? আসুন আজ চাঁদনী রাতে সবাই মিলে নাচগান করি— দেবীপ্রতিমার সামনে।

রোমাঞ্চিত হল সবাই। রাজীও হল।

প্রাসাদের হলঘরে খাওয়ার টেবিলে সব শেষে হাজির হল মিস ডায়না। এসে দেখলে তার মন জোগাতে প্রত্যেকেই অদ্ভুত সাজে সেজে এসেছে। স্যার রিচার্ড প্রস্তরযুগের গুহাবাসী সেজেছেন—তাঁর খুড়তুতো ভাই জংলী সর্দারের ছদ্মবেশ নিয়েছেন। লেডী ম্যানারিং সেজেছেন হাসপাতালের নার্স—তাঁর মেয়ে হয়েছেন হারেমের বাঁদী ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফুর্তিতে নেচে উঠে মিস ডায়না বললে —চলুন বেড়িয়ে আসা যাক।

বাইরে চাঁদের আলো। মায়াময় পরি-বেশ। অভ্যাগতরা সকলেই ফুর্তি উচ্ছল। হঠাৎ দেখা গেল মিস ডায়না নেই।

শুতে গেল নাকি? বললেন স্যার রিচার্ড।

না না। মন্দিরের দিকে যেতে দেখেছি বললে ভায়োলেট ম্যানারিং।

এত রাতে মন্দিরের দিকে? ভুরু কুঁচকোলেন স্যার রিচার্ড। মতলবটা বোঝা যাচ্ছে না তো। ডাইনী সাজবে নাকি?

মন্দিরের দিকে রওনা হলেন সবাই। দূর থেকেই দেখা গেল ভয়াবহ সেই দৃশ্য।

মন্দিরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে অপার্থিব একটি মূর্তি। সারা দেহ চকচকে বস্তুতে আচ্ছাদিত। মাথায় এক জোড়া সিং।

প্রতিমা কি জাগ্রত হয়েছে?

ডায়না! ডায়না! তীক্ষ্ণস্বরে বলল ভায়োলেট।

মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ভায়োলেট ঠিকই চিনেছে। ডায়নাই বটে। ভীষণা দেবীর মতই চন্দ্রালোকরণে দাঁড়িয়ে অকম্পিত দেহে—

ডায়না! চমকে উঠলেন স্যার রিচার্ড। অন্য রকম মনে হচ্ছে না?

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে এক হাত শূন্যে তুলল ভয়ংকরী।

বলল—আমি এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কাছে এস না। আমার হাতে মৃত্যু।

সর্বনাশ! হেসে উঠে বললেন স্যার রিচার্ড। কি ছেলেখেলা জুড়েছো ডায়না! বলেই পা বাড়ালেন সামনে।

এগিয়ো না এগোলেই মরবে।

হাঃ হাঃ হাঃ! খুব ভয় দেখাচ্ছো দেখছি।

বারণ করছি আর এগিও না। আমার হাতে মৃত্যু।

ছুটে গেলেন স্যার রিচার্ড।

সহসা শূন্যে উত্থিত হাতটা নামিয়ে আনল মিস ডায়না—সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন স্যার রিচার্ড।

আর নড়লেন না।

দৌড়ে গেল তাঁর খুড়তুতো ভাই ইলিয়ট হেডন। হাঁটু গেড়ে বসে চিৎ করে শোয়ালো দাদাকে।

পরক্ষণেই দাঁড়িয়ে উঠে বললে—ডাক্তার ডাকুন। দাদা মারা গেছেন।

স্যার রিচার্ডের বুকে ছুরি মারার চিহ্ন ...রক্ত...কিন্তু ছুরি নেই কোথাও।

পুলিশ এল। মাথা নেড়ে বললে অসম্ভব! অশুভ প্রেতাত্মা এসে ছুরি মেরে গেল।

তাই কি হয়?

সমস্ত রাত কারো ঘুম হল না। স্যার রিচার্ডকে সত্যি সত্যিই মরতে দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ডায়না। ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে—পুলিশ তাকে জেরা না করা পর্যন্ত কোনো কথা বলতে রাজী নয়।

সব চেয়ে আশ্চর্য ছুরিটা কোথায়? অভ্যাগতদের মধ্যে কেউ বললে ডায়নার হাতে সত্যিই যেন কি চকচক করে উঠেছিল। কেউ বললে চোখের ভুল। সত্যিই ডায়নার হাতে কিছু দেখা যায় নি—ক্ষত স্থানেও নয়।

ছুরিটা খুঁজে বার করার জন্যেই ইলিয়ট হেডন ফের গিয়েছিল মন্দিরচত্বরে। ভোর-রাতেও তাকে ফিরতে না দেখে টনক নড়ল প্রত্যেকের। পাদ্রী সাহেবের ওপর ভার পড়ল তাকে খুঁজে আনার।

একজন সঙ্গী নিয়ে পাদ্রী গেলেন অকুস্থলে। স্যার রিচার্ডের লাশ আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে আরও একটা দেহ।

ইলিয়ট হেডন। তখনও নিঃশ্বেস পড়ছে। কাঁধে বিঁধে আছে একটা ছুরি।

জ্ঞান ফেরার পর ইলিয়ট যা বলল তা সত্যিই রোমাঞ্চকর। মন্দিরের সামনে পৌঁছোনোর পর থেকেই কেন জানি তার মনে হচ্ছিল কে যেন তাকে প্যাট প্যাট করে দেখছে গাছের আড়াল থেকে।

আচমকা কিসের আঘাত লাগল রগের ওপর। মাথা টলে পড়ে যাওয়ার সময়ে একটা ছুরি উড়ে এসে গেঁথে গেল কাঁধে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

গল্প শেষ হল। ক্লাবের কেউ বললে ডায়নাই খুনী। অপরজন বললে—দূর! ডায়না স্যার রিচার্ডের কাছেই আসে নি। দূর থেকে ছুঁড়ে মেরেছে? কেশ বেশ ছুরিটা কি হাওয়ায় গলে মিলিয়ে গেল? অন্য এক সদস্য বললে—গাছের আড়ালেই কেউ লুকিয়ে ছিল। ইলিয়ট নিজেও তা টের পেয়েছে। বুকে ছুরি নিয়ে পড়ে যাওয়ার সময়ে হাতের টানে ছুরি টেনে নিয়ে নিশ্চয় দূরে ফেলে দিয়েছিলেন স্যার রিচার্ড। সেই ছুরি দিয়েই হত্যাকারী খতম করতে চেয়েছে তাঁর খুড়তুতো ভাইকে।

মিস মার্পল বললেন—তোমাদের মাথা আর মুন্ডু।

আর কি বললেন বলুন তো?

অদ্রীশ বর্ধন

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৫২ পৃষ্ঠায়)

উপন্যাস

সেই সব মানুষ

পুজোর পর গ্রাম একটু নিস্তরঙ্গ হলেও একদিন আবার জমজমাট হয়। সহর থেকে বাকসকল এসে রকমারি ছবি দেখায়। আর তাই দেখার জন্যে গ্রামে হুড়োহুড়ি। এই সময় গ্রামে ঠাকুর মশায়েরও পদধূলি পড়ে। চার-পাঁচ মাস পরে আসা। ব্রাহ্মণ বিদায়ের তোলা খাজনা আদায় করতে আসেন তিনি।

ক্ষেতে ধান পাকতে লেগেছে। কাটাও শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্মীঠাকরুণ বিল ছেড়ে গৃহস্তের উঠানে গুটি গুটি আসন নিচ্ছেন। আঁটির গায়ে সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ। দেখতে দেখতে সব ধান পেকে গেল। তেপান্তরের বিলে সবুজের একটা গোছাও নেই কোন দিকে। চতুর্দিকে সোনা। যতদূর নজর চলে, দেখা যায় পাকা ধানের সোনা ঢেলে দিয়েছে যেন প্রকৃতি। সেই সঙ্গে হিমের আমেজ।

ভবনাথের উঠোনে ধান উঠে গেছে। তাই ছেলেদের বায়না নতুন চালের ফ্যানসা ভাত খাবে। কিন্তু পুজো না দিয়ে নবান্ন না করে খাবার নিয়ম নেই। একদিন তাই পুরুত ডেকে পুজো আচ্চাও হয়ে গেল। ভাটিয়াল চালের মিষ্টি ফ্যানসা ভাত গরম গরম পাতে পড়তেই বাচ্চাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। দেবুবুড়িও তাদের মাঝখানে বসেছেন। একবার এর পাতে একবার ওর পাতে ভাত তুলে দিচ্ছেন। যেন উৎসব লেগে গেছে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রোয়াকের উপর রোদ পিঠ করে বসে সবাই বড়ি দিচ্ছে। দৈব ঠাকুরুনও এসে বসলেন। হাঁ-হাঁ করে ওঠেন তিনি ঃ কী হচ্ছে ছোটবউ, এক্ষুনি কেন? আরও ফেনাও, না ফেনালে বড়ি মচমচে হয় না।

তরঙ্গিনী হেসে বলেন, ফাঁপা বড়িতে তেলের খরচা কত। তেলের-ভাঁড় তেলের-বোতল এমনি তো আছড়ে আছড়ে ভাঙেন, আর ফাঁপা বড়ির তেল জোগাতে বটঠাকুর ঠিক লাঠি ঠেঙা নিয়ে মেরে বসবেন।

টুকটুকি এসে পড়েছে, বড়ি সে-ও দেবে। এদিকে হাত বাড়ায়, ওটা থাবা দিয়ে ধরে। তরঙ্গিনী আরও এলাকাড়ি দেন ঃ বটেই তো, বাড়ীর মেয়ে হয়ে সে-ই বা কেন বাদ থাকবে। একটুখানি কাই নিয়ে বাচ্চার হাতে দিলেন ঃ যাও, ঐ পিঁড়ি-খানার উপর বড়ি দাওগে তুমি। টুকটুকির বড়ি সকলের চেয়ে ভাল হবে দেখো।

কিন্তু ভবী ভোলে না। আলাদা পিঁড়ে সে নেবে না—সকলের মধ্যে একসঙ্গে বড়ি দেবে। বড়ি দেবার নামে লেপটে নয়-ছয় করে দিচ্ছে। অলকা টেনে সরিয়ে নিতে গেল তো কেঁদে পা-দাপিয়ে অনর্থ করে।

তরঙ্গিনী বললেন, বাড়ীর মধ্যে একজন এই হয়েছেন—আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে সকলে তোমরা মাথায় তুলেছ।

পুঁটিকে বললেন, ওঠ তুই পুঁটি, বড়ি দিতে হবে না। নিয়ে যা ওকে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখ্।

জোর করে পুঁটি বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল। টুকটুকি নিদারুণ চেঁচাচ্ছে। পুঁটি মিছামিছি আঙুল দেখাচ্ছে ঃ জামগাছে কেমন ঐ ন্যাজঝোলা পাখি, দেখ্। 'আয়রে পাখি ন্যাজঝোলা, টুকিকে নিয়ে করোসে খেলা।' ছড়া বকছে আর মেয়ে নাচাচ্ছে।

এক স্ত্রীলোক এসে দর্শন দিল। শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়ে আধেক-দেহ জড়ানো বিড়-বিড় করে আপন মনে কি সব বকছে। কারো পানে তাকায় না, কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে না, নিজেরই ঘরবাড়ী যেন। কাটারিখানা প্রায়ই চালের বাতায় গোঁজা থাকে—ঘাড় কাত করে সেখানটা সে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তরঙ্গিনী দেখতে পেয়ে ঘরের মধ্য থেকে কাটারী ছুঁড়ে দিলেন। হাসি-হাসি মুখে বলেন, যাক, গুণমণির মতি হল। গামড়াগুলো শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে আছে, রান্না করে সুখ হবে আজকে।

পোয়ালগাদার আড়ালে স্তূপীকৃত নারকেলের গামড়া, গুণমণি তলায় তলায় কুড়িয়ে ঐখানে জড় করে রেখেছে। এক-একটা টেনে কাটারী দিয়ে চিরছে, মুখে অবিশ্রান্ত গালি। যত পরিশ্রান্ত হবে গালির জোর তত বাড়বে। যখন কাজ করবে না, তখন বিড় বিড় করে গালি।

মাথায় ছিট আছে। তা সত্ত্বেও কাজকর্ম ভারী পরিষ্কার। গাঁয়ের সব বাড়ীতে গুণের আদর-খাতির সেইজন্য। ডাকাডাকি করে আনা যাবে না, মর্জি মতন হঠাৎ এসে পড়ে। এসেই কাজে লাগবে, বলে দিতে হবে না। বললেও সেই জিনিস যে করবে মানে নেই। বঁটি পেতে হয়ত বসে গেল, নারকেল পাতা চিঁকিয়ে ঝাঁটার শলা বের করছে। অথবা চিঁড়ের ধান ভিজান আছে—ধানের কলসী কাঁখে নিয়ে গুণো ঢেঁকিশালে চলল। চিঁড়ে কুটবে, অতএব অন্য কেউ তাড়াতাড়ি যাও এলে দেবার জন্য। চিঁড়ের পাড় দেওয়া বড় কষ্টের কাজ, দুজনের এক-সঙ্গে দুখানা পা লাগে। কিন্তু গুণমণির লিকলিকে দেহ হলে কি হয়, একলাই সে পুরো কলসী ধানের চিঁড়ে নামিয়ে দেবে। তবে শালির বন্যা বইয়ে দেবে সেই সময়টা কোন অলক্ষ্য শত্রুর উদ্দেশে।

কাঁধে চাদর ফেলে ছাতা ও লাঠি হাতে ভবনাথ হন হন করে বিল মুখো চললেন। কালীময় পিছনে। জোয়ান যারা ছেলে বুড়ো বাপের সঙ্গে হেঁটে পারে না। এক-গোয়াল গরুর মধ্যে তিনটে গাই এখন দুধাল। দোওয়ার সময় হয়ে গেছে, খোঁয়াড়ে আটকানো ক্ষুধার্ত নলে বাছুর হাম্বা-হাম্বা করছে। রমণী দাসী দু বেলা গাই দুয়ে দিয়ে যায়। বড্ড দেরী কলল আজ। এসে পড়তে উমাসুন্দরী রে-রে করে উঠলেন ঃ বলি, আক্কেলটা কি, রমণী? বাছুর মেরে ফেলে গোবর্ধর দায়ে ফেলবি নাকি। আমার বড় বউমারও দিব্যি বাঁটে হাত চলে। বিকাল থেকে আর তোর আসতে হবে না, বড়-বউমা যেটুকু পারে তাতেই হবে।

অপরাধী রমণী দাসী ছুটোছুটি করে খোয়াড়ের বাছুর খুলে দেয়। মিন-মিন করে দেরীর কৈফিয়ত দিচ্ছে। ধান কাটার সময় ধান কিছু কিছু ঝরে পড়ে। ঝরা-ধান অনেকে ক্ষেতে ক্ষেতে কুড়িয়ে বেড়ায়, কপালে থাকলে এক পালি দেড় পালি হওয়াও বিচিত্র নয়। সেই কর্মে গিয়ে আজকে রমণী দাসীর—

বলে পা তুলে দেখাই কেমন করে ঠাকরুণ। ডান পায়ের তলা শামুকে কেটে অর হয়েছে। রক্ত থামেই না মোটে, কি করি—

কিন্তু দুধে যে বিভ্রাট। বুধি-শুঁটকি ঠিক আছে, তারা যেমন দেয় তেমনি দিল। পুণ্যের কি হয়েছে—ঘটির কানা অবধি দুধে ভরে যায়, আজকে তলার দিকে একটুখানি, পোয়াটাক হবে বড়জোর। নুলেবাছুরে পিইয়ে খেয়েছে, তা-ও নয়—বাছুর ঠিকমত আটকানো ছিল, বড়গিন্নি নিজে খোঁয়াড়ে

চুকিয়েছিলেন, সকাল থেকে কতবার দেখে এসেছেন।

রমণী দাসী প্রণিধান করে বলল, বুঝেছি, দাঁড়াস সাপের কম্ম বাঁট কানা করে গেছে। হচ্ছে এই রকম আজকাল। নটে গুনীন আসুক—সে ছাড়া হবে না।

দাঁড়াস সাপ ভারী চতুর। মাঠে গরু বাঁধা, গরুতে ঘাস খাচ্ছে, দাঁড়াস গড়াতে গড়াতে এসে পিছনের দুই পায়ে জড়িয়ে যায় দড়ি দিয়ে পা বেঁধে ফেলার মতন। গরুর আর চাটি মারার উপায় রইল না। সাপ তারপরে মাথা তুলে বাঁটে মুখ লাগিয়ে টেনে টেনে মজা করে দুধ খেতে লাগল। খেয়ে চলে যায়। এমন টানা টেনে গেছে দুধ আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই বাঁটে। বাঁট কানা করা বলে একে। ঝাড়ফুঁকের ওস্তাদ নটোর শরণ না নিয়ে তখন উপায় থাকে না।

রমণী বলে গুনীন এসে জল পড়ে দেবে। ফ্যানের সঙ্গে জলপড়া খাইয়ে দিলে বাঁটে ফের দুধ আসবে। মোড়লপাড়ার যদুর গাইয়ের ঠিক এই হয়েছিল।

বুধিকে আশফল তলায় বেঁধে শিশুবর বুধি শুটকিকে নিয়ে মাঠে চলল। গাইয়ের পিছনে পিছনে বাছুর। ধান কেটে-নেওয়া দেদার মাঠ। খুঁটো পুঁতে পুঁতে সকাল-বেলা সেখানে অন্যগুলোকে বেঁধে এসেছে। দুধাল এই তিনটে কেবল বাড়ী ছিল। গোয়াল খালি এবার, বড়গিন্নি গোয়াল বাড়াতে ঢুকলেন। খালি গোয়াল বলা অবশ্য ঠিক নয়, ঘোড়ারা আছে। কমলের ঘোড়া, গুণতিতে দশটা-বারোটা হবে। ঘোড়া বের করে কমল বোধনতলায় রাখল।

গোয়ালে গরুর সঙ্গে ঘোড়া মিশাল—একটি-দুটি নয় ডজনের কাছাকাছি। তা বলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ঘোড়ারা নির্জীব—খেজুর-ডেগোর দু-হাত আড়াই হাত মাপের এক এক খণ্ড। ডেগোর মাথার দিকটা চওড়া, এবং বাঁকাও বটে—কাটারী দিয়ে সামান্য সুচাল করে নিলেই ঘোড়ার মুখের আদল এসে যায়। এক জোড়া কলার ছোটার এক মাথা ঘোড়ার মুখের সঙ্গে, আর মাথা পিছন দিকে বাঁধা। দুই কাঁধের উপর দিয়ে দুই ছোটা তুলে দিলেই ঘোড়ায় চড়া হয়ে গেল। ঘোড়ার আর সওয়ারে সেঁটে রইল—পড়ে যাবার বিপদ নেই। আস্তাবলের ঘোড়া আপাতত বোধনতলায় এসে রইল—ঘাস নেই ওখানটা, ভুঁইচাঁপার ঝাড়। খায় তো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঐ ভুঁইচাঁপা ফুলই খেয়ে নিক।

বেলা হয়ে গেছে। দোওয়া দুধ বাটি-খানেক অলকা-বউ তাড়াতাড়ি বলক দিয়ে নিল। এই বারে সবচেয়ে যা কঠিন কাজ—দুধ খাওয়ানো টুকটুকিকে। আস্ত একখানি কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার। আসন পিঁড়ি হয়ে কোলের উপর মেয়েকে শুইয়ে ফেলেছে। তার পর জোরজার করে পিতলের ঝিনুকে গলার ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে—ফেলার কায়দা না পেয়ে বিচ্ছু মেয়ে গ্যাড়-গ্যাড় করে আওয়াজ তোলে গলার ভিতরে। কিছুতেই গিলবে না তো নাক চেপে ধরতে হয়। নিশ্বাস নেবার জন্য তখন হাঁ করে, দুধ ঢুকে যায় অমনি।

দুধ খাইয়ে অলকা আঁচলে মেয়ের মুখ পরিপাটি করে মুছে পুঁটির কোলে তুলে দিল। পুঁটি বলে, চলো টুকি, পাড়া বেড়িয়ে আসি আমরা। কাচপোকা ধরে টিপ কেটে কেটে রেখেছে—ঘরে নিয়ে বড় একটা টিপ এঁটে দিল টুকির কপালে। পুঁটে বলছে টিপ বড় না হলে নজরে আসবে না। রুপোর নিমফলটা খোলা ছিল, কোমর বেড় দিয়ে পরিয়ে দিল সেটা। পায়ে আলতা পরাল। এক ফোঁটা মেয়ে কতই যেন বোঝে, সারাক্ষণ চুপ করে আছে। সাজসজ্জা সমাপন করে মেয়ে নিয়ে পুঁটি পাড়ায় বেরুল।

বড়িতে কাকে এসে ঠোক না দেয়, নিমি পাহারায় আছে। রোয়াকে চাটকোল পেতে কাঁথার ডালা নিয়ে বসেছে—কাঁথা সেলাই ও বড়ির পাহারা এক সঙ্গে হচ্ছে। সেলাই করতে করতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আঙুলে সুচও বেঁধে কখনো-সখনো। দুই বোনের এই বাড়ীর উপরেই এক রাত্রে বিয়ে হয়েছিল—গরিবনী বুড়ি ড্যাং-ড্যাং করে চলে গেল, তার নামে সকলে আজও নিশ্বাস ফেলে। আর পোড়া নিমির মরণ নেই—বাপের বাড়ী দাসীবৃত্তি চেড়ী-বৃত্তির জন্য বেঁচেবর্তে রয়েছে। আজ না হোক, মা-বাপের অন্তে হবে ঠিক সেই জিনিস—বিনোর মতন হয়ে থাকতে হবে। এই সমস্ত ভাবে নিমি—ভেবে ভেবে খ্যাপাটে হয়ে যাচ্ছে, একটুখানি ছুঁয়ে কথা বলার জো নেই। হাতের চুড়ি-খাড়ু কথায় কথায় ভেঙে ফেলে বলে, বিনোদিদি যা, আমিও তাই। পাতের মাছ বিড়ালের মুখে ছুঁড়ে দেয়। ব্যাধিও ঢুকেছে—মাঝে মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মৃগী রোগের লক্ষণ মিলে যায়। গিরিশ সেল হেন বৈদ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে গেছেন। দেখে-শুনে তেমন গা করলেন না। বললেন, গোঁসাইগঞ্জে পাঠিয়ে দাও, অষুধপত্তোর যত কিছু সেখানে। গিরিশ কবিরাজের রোগনির্ণয়ে কখনো ভুল হয় না। কিন্তু জামাই দুলালচন্দ্রের ঐ দশা—কেটে কুচি কুচি করে ফেললেও নিমি শ্বশুরবাড়ী মুখো হবে না।

একজোড়া কাঁথা সেলাই করছে সে—টুকটুকিকে দেবে। বউদির কোলের প্রথম সন্তান—গয়না জামা জুতো খেলনা কত জনে কত কি দিচ্ছে। দামের জিনিস নির্মলা কোথায় পাবে—ছেঁড়া-কাপড় জোগাড় করে তার উপরে নানা রংয়ের সুতোয় কল্কা

•ঘড়ি•
•জড়োয়া গহনা•
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
ঘড়িওয়ালা ও ওয়াচমেকার্স
৪ জালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

সমস্ত বয়স্কদের জন্য
ওকাসা গ্রহণ করুন বিশ্ববিখ্যাত বলবর্দ্ধক টনিক ট্যাবলেট যা আপনাকে ৬টি বায়োকেমিকাল, ১০ টি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও ৬টি খনিজ উপাদানের মাধ্যমে নতুন শক্তি এনে দেবে।
ওকাসা টনিক ট্যাবলেট
(পুরুষদের জন্য—"রূপালী")।
প্রধান সব ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।
OKASA CO. PVT. LTD.
12 Gunbow Street,
P.O. Box No. 396,
Bombay 400 001.

ফুল পাখি গাছ ঘোড়া মানুষ ইত্যাদি তুলছে। শিল্পকাজে নিমির জুড়ি নেই—কাঁথা সেলাই দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে হয়, পলক ফেলতে মনে থাকে না। লেখাও তুলবে, কয়লা দিয়ে কাপড়ের উপর ছকে নিয়েছে ঃ আদরের টুকুরাণীকে অভাগিনী পিশিমার উপহার। দেখে অলকা রাগ করেঃ কক্ষনো না। অভাগিনী মুছে দাও ও আমি লিখতে দেবো না। তোমার জিনিস সকলের সেরা। কাঁথায় আমি মেয়ে শোয়াবো না, পাট করে তুলে রেখে দেবো। মেয়ে বড় হয়ে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবে, সকলকে দেখাবে ঃ পিসিমা আমায় এ জিনিষ দিয়েছিল।

বোতলের নারকেল তেল গলানোর জন্য রোয়াকে রেখেছে। চুল খুলে দিয়ে অলকা খানিকটা তেল থাবড়ে চুলের উপর দিল। চানে যাবে, চান করে এসে হেঁসেলে ঢুকবে।

তরঙ্গিনী বললেন, মেঘের মতন ঘন এক পিঠ চুল তোমার বড়বউমা। কিন্তু বিধাতা দিলেই তো হল না, পাটসাট করে রাখতে হয়। সাজগোজের বয়স তোমাদের তা তোমার সে সব কিছু নেই, উদাসিনী যোগিনীর মতন বেড়াও। চুল ছাড়িয়ে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি—ছটফট কর না, ঠাণ্ডা হয়ে বসো।

কবলে পড়ে গিয়ে বড়বউর ঠাণ্ডা হয়ে না বসে উপায় কি। চুল জটা-জটা হয়ে গেছে, তার ভিতর দিয়ে তরঙ্গিনী তৈলাক্ত আঙ্গুল চালাচ্ছেন। ঢেলে টান পড়ে আঃ আঃ করছে সে, আর যন্ত্রণায় হাসছে। বলে, কাঁচা চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে ছোটমা।

নিষ্ঠুর তরঙ্গিনী বললেন, যাক। যত্ন করবে না তো কি দরকার চুল রেখে। চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাথায় টাক করে দেবো। এয়োস্ত্রীর মাথায় ক্ষুর ঠেকান যায় না, নয়ত নন্দ পরামাণিককে দিয়ে মাথা ন্যাড়া করে দিতাম।

বলে হেসে পড়লেন তিনি।

কাঁখে ভরা-কলসি ভিজে-কাপড়ে সপসপ করতে করতে বিনো পুকুরঘাট থেকে ফিরল। এঁরা চানে যাচ্ছেন, তারই তোড়জোড় হচ্ছে—একলা সে ইতিমধ্যে কখন গিয়ে পড়েছিল, সেরেসুরে ফিরে এলো।

রান্নাঘরের দাওয়ায় কলসি নামিয়ে বিনো গামছায় মাথা মুছছে। তরঙ্গিনী বললেন, পাথরের গেলাসে রস রেখেছি। পেঁপে কলা মুগের অংকুর বাতাসা আছে। খেয়ে নে আগে। আমরা চান করতে চললাম। ততক্ষণ তুই লাউটা কুটে রাখিস। বেশ জিরা-জিরে করে কুটবি, ঘণ্ট রাঁধব।

যা ভাবা গিয়েছিল—বিনো বলল, রাঁধব তো আমি।

তাই বই কি। কাল একাদশীর কাঠ—কাঠ উপোস গেছে—সাত তাড়াতাড়ি নেয়ে-ধুয়ে এসে উনি এখন উনুনের ধারে চললেন। আমরা যেন কেউ নেই, হাতে যেন কুড়িকুষ্ঠ আমাদের—

বিনো বলে, একদিনের উপোসে মানুষ মরে না। তা-ও জলপানের তো গন্ধমাদন গুছিয়ে রেখেছ।

তরংগিনী অধীর কণ্ঠে বললেন, ওসব জানিনে। কথার অবাধ্য হবি তো—আমি বলে যাচ্ছি বিনো, ফিরে এসে তোর এ-কলসিসুদ্ধ জল উনুনে উপুড় করব। বুঝবি তখন।

বিনো কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, নিত্যি-দিন তোমার একটা করে অজুহাত ছোট-খুড়িমা—

তরংগিনী কিঞ্চিৎ করুণার্দ্র হয়ে বললেন, আচ্ছা, রাতে রাঁধবি আজ তোরা—তুই আর নিমি দুজনে। নিমিটাও প্যান-প্যান করে। কথা হয়ে রইল, বাস। এখন গোলমাল করতে যাবিনে।

একই রান্নাঘরের এদিকটা আঁশ হেঁসেল, ওদিকটা নিরামিষ। আঁশে-নিরামিষে কদাপি না ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। খুব সামাল! মুক্তকেশী মাঝেমধ্যে আসেন—এ বাবদে বড় কঠিন পাত্র তিনি। আঁশের ছোঁয়া লাগলে নিরামিষ হেঁসেলের উনুন পর্যন্ত দুবে যাবে, ঐ উনুনের রান্না ইহজন্মে তিনি মুখে তুলবেন না। আর ঐ যে সেদিনকার মেয়ে বিনো—নিমির চেয়ে সামান্য পাঁচটা সাতটা বছরের বড়—মুক্তো ঠাকরুনের উপর দিয়ে যায় সে। তিলেক অনাচারে রেগে কেঁদে অনর্থ করবে। তরংগিনী নিজে তাই নিরামিষ হেঁসেলে থাকেন, আঁশ দিকটায় বড় বউ অলকা।

(ক্রমশঃ)

প্রকাশিত হ'ল

সৌরীন সেন-এর

এক অসাধারণ গ্রন্থ

চিলি

সান্তিয়াগোতে তিয়াত্তরের এগারোই সেপ্টেম্বর। ট্যাঙ্ক আর আর্মার্ড কার সাধারণ মানুষকে অতর্কিতে ধরেছে। রুটীন লাইন ভেঙে প্রাণভয়ে লোক দৌড়তে থাকে। দপ্তর-মুখো ব্যস্ত মানুষ সামরিক ব্যারিকেড আর কার্ফু দেখে হতভম্ব। কিন্তু ততক্ষণ এয়ারপোর্ট জুন্তা চক্রের হাতে চলে গেছে। রেডিও স্টেশনের দখল নিয়ে সিঁড়িতে সিঁড়িতে যুদ্ধও প্রায় সমাপ্তপ্রায়। চিলির মহান নেতা ডাঃ আলেন্দে ঐতিহাসিক যুদ্ধ চালিয়ে নিহত হয়েছেন। ক্যু-ডেটা সফল হয়েছে। শুরু হলো ভয়াবহ পার্জ। হাজার হাজার মানুষ চলে বন্দী শিবিরে। সারা দেশব্যাপী রক্তস্রোত আর সন্ত্রাস। সেইসঙ্গে অবিশ্বাস্য প্রতিরোধ সংগ্রাম। এ এক অসাধারণ দলিল চিত্র। দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহে ভরাট। **সৌরীন সেনের চিলি কভারেজ নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ গ্রন্থ। দাম ১৪·০০ টাকা**

॥ এই লেখকের আরও দুটি গ্রন্থ ॥

কঙ্গো থেকে ফেরা ১০·০০

অপারেশন হাইতি ১০·০০

নতুন পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন ঃ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা—৯

কবিতা

বোঝা গেল না ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ঐ তো চৈত্র, ঐ আমার বয়স হারানো মাস।
ধুলো, ক্লিষ্ট পাতা ঝরা পরাগের উত্তরফাল্গুনী,
আমার তো পায়ে না তাকিয়ে হাঁটার অভ্যাস
তাই নিজের চিহ্নও চোখে পড়ে না; কেন যে আমি
মেঘের প্রথায় উঠে ফিরতে পারি না নদীটিতে! শুনি
অনেকেই নাকি পারে।
যেমন অরণ্যরাত্রে খুনী
বাঘ তার হিংসাকে খোঁজে, আমি তেমনই নৃশংস
খুঁজলাম একটি ক্ষুধা, তীব্র মুখর শরীরের নীরব মানুষী অংশ;
হাতে পেলেই তাকে ছুঁড়ে মারি আকাশে, সে
মৃত্যু শিখে নক্ষত্রদীপনে হাসে.
তাকে শুশ্রূষার মতো নিসর্গের পাশে
নামিয়ে আনলেই বন্দকণ্ঠে যায় শোনা
ওকি এলো ও কি এলো না, বোঝা গেল না।

সত্যি কি যায় নি বোঝা?: দ্যাখো
প্রতিটি অধীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েও আর
উৎসে ফিরছে না, হয়তো আমি অধিকার
করতে পারতাম পাহাড়, অথচ একা
খর্ব টিলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি জীবনের
গ্রহণ বর্জনহীন দীন সূর্যাস্তের!
বয়স বাড়ছে হে পৃথিবী আমি তো প্রায় প্রবাসী
হয়ে এলাম; এখন
কার না ধুলোয় শুতে সাধ হয় অভিমানী শিশুর মতন।

চলো, উঠে দাঁড়াও সোজা হয়ে ॥ অজয় সেন

ক্রমশঃ তারা দৌড় শুরু করে, বিচিত্র শস্যক্ষেত্রের ভিতরে
পড়ে যায় ব্যবহৃত কাগজ, প্রয়োজনীয় চিঠি
তাদের গোপন জায়গা থেকে
স্বভাবক্ষিপ্ত অন্য মানুষরা হেঁটে আসে কুড়োনর জন্যে
রঙীন জীবনের লোভে—
ঠিক এভাবেই হয়তো কবিতা লিখতে পারি, লিখতে পারি সেইসব
মানুষদের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা।

এক সন্ধ্যেবেলা অন্ধকার ঘরের কোণে জ্বলে ওঠে শাদা মোমবাতি,
মাথার আনাচে কানাচে ঘুরপাক খায় অসহ্য ধ্বনি,
একরাশ শব্দের সংসারে "মানুষ, মানুষ" চেঁচিয়েছি এতকাল—অথচ
কি দিয়েছে অই মানুষরা আমাকে?
মুঠোভর্তি বিষণ্ণ শব্দ ও তাদের নিকোনো চরিত্তির—যা আমাকে
সেই মানবসকলের বিপক্ষে দাঁড় করায় আজ।

এই আমি, দুর্দান্ত, বেপরোয়া, যে আমি আমার কাছেও
নত হইনি কোনদিন,
অথচ অদ্ভুত এক আগন্তুকের কাছে খুলে রাখছি
আমার সমস্ত আবরণ
তার পায়ের কাছে রেখে দিচ্ছি আমার অহং আর চশমা
অই নিঃশব্দপ্রিয় আগন্তুক এ সময় পথ দেখায় আমাকে—বলে—
"চলো, উঠে দাঁড়াও সোজা হয়ে"।

ঐ কাগজের মুখ ॥ সুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ক্যালেণ্ডারটা সরিয়ে নাও
ঘড়িটা উল্টে রাখ
চেয়ারটা পশ্চিমে ঘোরাও
পর্দাটা ছিঁড়ে ফেল।
টেবিলের ঐ ছবি সরিয়ে ফেল ওখান থেকে,
ইচ্ছে হলে কাউকে উপহারও দিতে পার।
নাম সই যখন আছে, তখন ওটা নিতে
অনেকেই হাত বাড়াবে।
আমারও খুব লোভ ছিল,
ওর চোখের মধ্যে সাঁতরে বেড়াবার
ওখানে তো অনেক জল
রোদ পড়লে চকচক করে
তখন দেখতে সত্যিই সুন্দর লাগে।
তোমরা ভাবো ও হলো মনীষীর মেধার রঙ।
যাক যা ভাল বুঝবে তাই ভাববে।
তবু নীল নাকি ওর খুব প্রিয়
তাই সারাদিন আমি আকাশ দেখি না
শুধু পাখিরা যখন নীড়মুখো
সমুদ্র পেরিয়ে উড়ে যাই
ওর আলিঙ্গনে ডুবতে।
ঘড়ি দেখলে কান্না পায়।
ক্যালেণ্ডার দেখলে জ্বলন্ত যন্ত্রণায় পুড়তে থাকি
মুখ দেখবো কার?
ও তো কাগজের মুখ।

সমাজ বিবর্তনের একটি অধ্যায়

হেমচন্দ্র ঘোষ

কায়স্থ জাতির উৎপত্তি নিয়ে অনেক বাক-বিতন্ডা আছে। ব্রাহ্ম পাদাংশ থেকে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি এ মত এক পক্ষের। আবার কারো মতে কায়স্থরা ক্ষত্রিয়াচার-সম্পন্ন চিত্রগুপ্তের বংশজ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। আপাতত সেই বিসংবাদে আমরা যাচ্ছি না।

মধ্যএশিয়া থেকে এদেশে এসে আর্যরা তাদের সাধনা ও কৃষ্টি স্থানীয় জনগণের মধ্যে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা শুরু করে। এটাকে বলা হয় বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগের শক্ত খুঁটি নড়িয়ে দেয় বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত্ত সহজ কর্মসূচী। বৌদ্ধধর্মের সংগঠন দক্ষতা ও প্রশাসন সহযোগিতা জনচিত্তে যে অনুপ্রেরণা এনে দেয় তার তুলনা বিরল। বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম এখনও ভারতের এক পুণ্যতীর্থ। অশোকের রাজত্ব কালে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হলেও বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর থেকেই বৌদ্ধধর্মের উজ্জ্বলতা ম্লান হতে থাকে। দ্বিধাবিভক্ত সঙ্ঘ পতনের মুখে এগিয়ে চলে। মানুষ ফিরে আসে বৈদিক ধর্মে। যাগযজ্ঞের পুনঃ প্রতিষ্ঠা গিরিরাজের ক্রোড় থেকে সারা ভারতে নতুন ক্ষেত্র গড়ে তুলল। উত্তর ভারতে যে ধর্মের অভ্যুত্থান সেই উত্তর ভারতের বৌদ্ধধর্মের হল চিরঅবলুপ্তি। বাংলাদেশে তখনও বৌদ্ধধর্মের ছোঁয়াচ ছিল। উত্তর ভারতের রাজশক্তি বাংলাদেশে চিরআধিপত্য বিস্তার করে। সেই রাজশক্তি ধ্বংস করেন শূর বংশের প্রতাপশালী রাজা আদিশূর। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের চিরবিশ্বাসী। যাগযজ্ঞের বৈদিক অনুষ্ঠান দেশের নৈতিক ক্রমোন্নতি সফল করার উদ্দেশ্যে আদিশূর কান্যকুব্জ (কনৌজ) থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনেন। তাদের সাহচর্যের জন্য পাঁচজন কায়স্থকে এদেশে আনেন আদিশূর। পাঁচজন কায়স্থ কেন এলেন একথা চিন্তা করলে এটাই মনে হয় কান্যকুব্জ থেকে অতিদূরে থাকতে হবে এবং রাজশক্তির সাফল্যের সংশয়তা চিন্তা করে ব্রাহ্মণ কায়স্থ পাঁচজনকে সঙ্গে নিলেন। ভৃত্য বলে নয় ধর্মকর্মে সহযোগী বা সহকর্মীর প্রয়োজন পড়ে। এই পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে কায়স্থ সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। আদিশূর বেশী দিন রাজত্ব করতে সক্ষম হন নি। উত্তর ভারত বাংলাদেশে আসার হুলুস্থুল দিল—শূর বংশের পতন সুনিশ্চিত হল। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আর দেশে ফিরলেন না। বাংলাদেশেই রয়ে গেলেন। এঁরাই হলেন উত্তর-বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের জনক। যশোর খুলনার ইতিহাসে সতীশবাবু বলেছেন রাঢ় কথা আড়ের অপভ্রংশ। গঙ্গার পশ্চিম আড় অর্থাৎ পাড়ে রাঢ়দেশ। আদিশূরের কায়স্থরা রাঢ়দেশের উত্তরাংশে বসতি স্থাপন করলে তারা উত্তররাঢ়ী কায়স্থ বলে পরিচিত হল। শূর বংশের পতনের বহু পরে শশাঙ্ক হলেন বাংলার রাজা। অতিপরাক্রান্ত শশাঙ্ক উত্তর ভারতের রাজশক্তি দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। বাংলাদেশ নিষ্কন্টক হল। তখনকার দিনে মানুষের ধর্মপ্রবণতা ছিল অতি প্রবল। সনাতন ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠায় শশাঙ্ক উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। সারা ভারতে কান্যকুব্জ তখন জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল—যশোবর্মন রাজা—ভবভূতি তাঁর সভাকবি। যশোবর্মন শশাঙ্কের বিশেষ বন্ধু। পাঁচজন সহচর পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাংলাদেশে আনা হল। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ বর্তমান মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে—তৎকালীন বাংলার উত্থান-পতনের পটভূমি। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ, তাঁদের বংশ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বেশীদিন একত্রে রাজধানীতে অবস্থান করা সম্ভব হয় নি। রাঢ়দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা বসতি স্থাপন করেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণের গোত্র নিয়ে কায়স্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৌদ্ধ যুগের অবসান ঘটলে বৈদিক ধর্মের সংঘাতে অথবা উৎপীড়নে যারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে কায়স্থদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরা সামাজিক মর্যাদা পেলেন বটে, কিন্তু শশাঙ্কের আনিত ও আশ্রিত পঞ্চ কায়স্থদের সমকক্ষ হতে পারেন নি কিম্বা তাদের মত সম্মানের অধিকারী হতে পারেন নি। সৌকালীন ঋষির গোত্রে ঘোষ, গৌতমে বসু, বিশ্বামিত্রে মিত্র ভরদ্বাজে দত্ত ও গুহরা হলেন কাশ্যপ গোত্র পরিচিত। তখনকার দিনে সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা অত্যন্ত কঠোর ছিল। পঞ্চজন ব্রাহ্মণরাও রাঢ় দেশে রইলেন এবং তাদের বেদজ্ঞ সন্তানরা নবানীত কায়স্থদের মধ্যে আধিপত্য স্থাপন করে তাদের গোত্রে দীক্ষা দিলেন। গোত্রে বংশলতা নির্ধারণ করার অসুবিধে নেই। ব্রাহ্মণরা যেমন যাগযজ্ঞ নিয়ে ব্যস্ত কায়স্থরা অসিজীবী ছিলেন ও তাদের মসিজীবী বৃত্তি বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার আদর্শে তারা গৌরবান্বিত হন। দেশ জয়রূপে রঘুনন্দন চিরবিখ্যাত হয়ে আছেন। এই অসিজীবী বৃত্তি পরবর্তী কালে বহু কায়স্থদের রাঢ় দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল।

শশাঙ্কের পর প্রায় তিনশ বছর কায়স্থ সমাজের কোন কর্ম প্রচেষ্টার কথা জানা যায় নি। এটাই কায়স্থ সমাজের অন্ধকার যুগ। শুধুমাত্র এইটুকু জানা যায় যে শশাঙ্ক বাসকী গোত্রের রামনাথ নামে এক শক্তিশালী ব্যক্তিকে দেগঙ্গার রাজা করে পাঠান। এই রামনাথের পরবর্তী বংশধররা রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে প্রতাপের পতনের পর চোদ্দটি পরগণার অধিকার নিয়ে বরিশালের রায়ের কাটিতে বসতি স্থাপন করেন। এই সময়ে তারা পূর্বের গোত্র বদল করে বাসকী গোত্র গ্রহণ করেন। সুন্দরবনের উত্থান-পতন গঙ্গার বুকে নতুন নতুন দ্বীপের উৎপত্তি দেশ ও সমাজকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য হলেও বর্তমানে তার উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন—রাজার যে রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নট; এই ছিল এই নাই। এগার শতকে বাংলার এই দশা ঘটে। শশাঙ্কের পর ছোট-বড় রাজ্যের উত্থান-পতনের পর বাংলাদেশে স্থায়ী রাজ্যের অধিপতি রাজা বিজয় সেন। বল্লাল সেন তাঁর কীর্তিমান পুত্র। কায়স্থদের মধ্যে সেন পদবী এখনও বর্তমান আছে। বল্লাল সেন বৈদ্য না কায়স্থ সে কথা উল্লেখের এখানে কোন প্রয়োজন নেই। রাজা যে বংশে জন্মান না কেন তার কুলের শ্রেষ্ঠত্ব সকলকে মেনে নিতেই হতো। বল্লাল সেনের রাজত্ব বিরাট-বিশাল। সুশাসনের প্রয়োজনে তিনি পাঁচ ভাগে ভাগ করলেন তাঁর রাজ্য—রাঢ় বরেন্দ্র বাগড়ী বঙ্গ ও মিথিলা। নবদ্বীপ গৌড় রামপাল হলো রাজ্ঞ বসতি। বল্লাল নবদ্বীপকে বেশী পছন্দ করতেন। কল্লোলিনী গঙ্গা তাঁর ছিল বিশেষ আকর্ষণ। গঙ্গার বিক্ষুব্ধ বুকে চন্দ্রা নৃত্যের মনোরম দৃশ্য বল্লালকে অভিভূত

করে ফেলতো। রাজকার্যের মধ্যে অবসর-বিনোদনে বল্লালের এই ছিল নৈমিত্তিক ব্যবস্থা। সেদিন বল্লাল গঙ্গার কূলে—একাকী। সূর্য তখনও গঙ্গার বুকটা রাঙিয়ে রেখেছে। বল্লাল দেখলেন—এক তরুণী তরণী বেয়ে তাঁর দিকেই আসছে। ক্রমে তরণী নিকটে এলো—তার বাহিকা এক নারী—উদ্ভিন্নযৌবনা—পড়ন্ত সূর্যের রক্তাভ আলোকছটায় উদ্ভাসিত তার ঋজু দেহলতা। বল্লাল মেয়েটির দিকে তাকালেন অপলক নেত্রে। ভুলে গেলেন তাঁর বিবাহের অতিক্রান্ত বয়ঃসীমা—তরুণীর উন্মুক্ত বক্ষের সম্মোহন শক্তি তাঁকে অভিভূত করে ফেললো—গঙ্গার সঙ্গে শান্তনুর পরিণয় সমুজ্জ্বল হয়ে বল্লালের চোখে ফুটে উঠলো।

—তুমি রাজরানী হতে চাও?

টোল-খাওয়া সুন্দর গোলাপী মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো—কেন হব না। কিন্তু আমার জন্ম যে নীচ কুলে। আমি জেলের মেয়ে।

রাজা ভাবলেন—কুল! ওটা তো মানুষের সৃষ্টি। নীচ বা উঁচু কুলের মাপকাঠি হতে পারে না।

রাজা মেয়েটিকে নিয়ে প্রাসাদে এলেন। অন্তঃপুরে প্রতিবাদের প্রবল ঝড় উঠলো—নবদ্বীপের পণ্ডিতরা বিক্ষুব্ধ—রাজপুত্র লক্ষ্মণ সেন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন।

ব্রাহ্মণরা রাজার নিকট অসামাজিক বিবাহের কৈফিয়ৎ চাইলো। ক্রুদ্ধ রাজা তাদের বিতাড়িত করলেন। বললেন—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। কুলের মর্যাদা বিবেচিত হবে কৃষ্টির ভিত্তিতে—বল্লালের এই অনুজ্ঞা রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হলো। সবাই নিশ্চুপ, রাজ-অনুগ্রহে মর্যাদা—মর্যাদাই তো কুলের গৌরব। রাজার বিরুদ্ধে সকল প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে গেল। ধীবর-রানী মহাখুসী। রানীর পরামর্শে যে এতখানি সুফল হবে বল্লাল তা ভেবে উঠতে পারেন নি। ধীবন-কন্যা বিবাহ বল্লালের হলো সমাজ সংস্কারের মূল নীতি। নবদ্বীপে হবে সর্বজাতির সমাবেশ। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বৈশ্য আমন্ত্রণ করা হল। কারো মতে এই সম্মেলন বল্লালের আর্থিক সংকট মোচনের এক অভিনব পন্থা। এটা ঠিক সমর্থনযোগ্য নয়। তখনকার দিনের ব্রাহ্মণ কায়স্থদের আর্থিক সঙ্গতির স্বচ্ছতা একরূপ নিশ্চিত ছিল। বৈশ্যরা অর্থশালী। বল্লালের যদি অর্থ গ্রহণের মতলব থাকতো, তাহলে বৈশ্য সম্প্রদায়কে তিনি অর্থের বিনিময়ে সমাজে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক প্রভৃতি সম্প্রদায় তখনকার দিনে অজস্র ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন। কৃষ্টিই বিবেচিত হয়েছিল। আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নয়টি গুণের অধিকারীকে কৌলীন্য দেওয়া হল। কায়স্থদের মধ্যে ঘোষ বোস মিত্তির ও গুহ ক্রমিক শ্রেষ্ঠতায় কুলীন হলেন। কান্যকুব্জ থেকে আগত দত্তরা দুর্বিনীত বলে বিবেচিত হন। তাঁরা কৌলীন্য পেলেন না। তাঁরা অন্তর্দাহে আত্মহারা হয়ে পড়লেন কিন্তু কিছু করার নেই। নিষ্ফল আক্রোশে কুলীনদের হেয় করার উদ্দেশে দত্তরা এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করলেন। তাঁরা দেশময় রটিয়ে দিলেন—

—'দত্ত কারো ভৃত্য নয় শুন মহাশয়,
সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি এই পরিচয়।'

কুলীন কায়স্থরা তার উত্তর দিলেন—

'ঘোষ বোস মিত্তির কুলের অধিকারী
অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি।'

দত্তরা পরবর্তী কালে কায়স্থ সমাজের অনুগ্রহ লাভ করেছিল। জীবনদর্শনে মানসিক উৎকর্ষ ও কৃষ্টির মান বৃদ্ধির উন্নাতকল্পে অকুলীন ঘরের মেয়েদের কুলীনের বাড়ী এনে তাদের সামাজিক শিক্ষার পথ নির্ধারণ করে দিলেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কিন্তু অকুলীন কন্যা বিবাহ করার নির্দেশ পেলেন না। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বেলায় বল্লালের অনুশাসন-বাক্য—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি অকেজো হয়ে রইলো। যারা অকুলীন তারা মৌলিক। তারা কায়স্থ সমাজে মূলীভূত ব্যক্তি। বল্লাল সমাজে তাঁদের স্থান দিয়ে গেছেন। দত্তরা কুলীন হতে পারেননি বটে কিন্তু তাঁরা মৌলিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

সেকালে যৌথ পরিবার ছিল বাংলার এক বৈশিষ্ট্য। যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তিনি পরিবারের কর্তা। কর্তার নির্দেশ অমান্য করার শক্তি কারো ছিল না—কর্তার ভ্রূকুটি সন্ত্রাস সৃষ্টি করতো। গণতান্ত্রিক যুগে হিটলারী ব্যবস্থা অচল। তখনকার দিনের সেই যৌথ পরিবার এখন নেই। বল্লালের কুলীন মৌলিক ব্যবস্থা সমাজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেনি বরং সামাজিক জীবন দূরপনেয় কালিমা লিপ্ত করে তুলেছিল। কুলীন মাত্র চার ঘর। বাহাত্তর ঘরের সৃষ্টি ও তাদের কন্যাদের জন্যে কুলীন ছেলে কেমন করে পাওয়া সম্ভব হবে? সমাজ-পদ্ধতি রক্ষে করবার জন্যে মৌলিক মেয়েদের বুড়ো কুলীন বরের গলায় মালা দিতে হতো। বুড়ো কুলীন বর ছাঁদনা-তলায় কনের কচি মুখ দেখে বেশ কিছু খুসী হতো নিশ্চয় কিন্তু বর দেখে কনের অবস্থা কি হত? কুলীনের ছেলের বহু-বিবাহের কুফলে এসব মেয়েদের জীবনে ডেকে আনত সামাজিক গ্লানি।

উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজদের মধ্যে বিয়ের প্রচলন ছিল না। সামাজিক বিপ্লব ঘটানো খুব সহজ কথা নয়। পিতৃ-পিতামহের অনুষ্ঠিত পথ রক্ষণশীল দেশে এক কঠিন শৃঙ্খল। চিন্তাশীল শিশিরকুমার সমাজ-কল্যাণে পিতৃপুরুষের পথে এক বিরাট বিপ্লব আনেন হৃদয়বত্তার পূর্ণ বিশ্বাসে। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ সম্প্রদায়ের এক সুপাত্রের সঙ্গে শিশিরকুমার নিজের বোনের বিবাহ দেন। উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীর মধ্যে এই বিবাহই প্রথম অনুষ্ঠান। মাতৃভক্ত শিশিরকুমার বিয়েতে মায়ের সম্মতি নিলেন কিন্তু মেয়েটি কি সংস্কারমুক্ত ছিল? শিশিরকুমারের সম্ভাব্য মতবাদ কি? মানব্য জাতির ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করার কিম্বা সমালোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে মনীষীদের মতে বাঙালী এক সংমিশ্রণ জাতি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের বহির্ভূত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জাতির আগমন ও আক্রমণ তাদের সঙ্গে সহ-অবস্থান বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে বুদ্ধি-মত্তার ক্রমবিকাশ সহজভাবে সম্ভব হয়েছিল। নদীর দুটি শাখার পুনর্মিলনে স্রোতের প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীর মিলন কায়স্থ সমাজকে সর্বগরিষ্ঠতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা শিশিরকুমারের এই চিন্তাধারা

অদ্বিতীয় ফরমুলা...অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে

প্রেপারেশন এইচ*

আমেরিকান ডাক্তারদের পরীক্ষা করে দেখা

- কয়েক মিনিটেই চুলকানি বন্ধ করে
- সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয়
- খুব বাড়াবাড়ি না হলে, অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে পিচ্ছিল ক'রে মলত্যাগের কষ্ট কমিয়ে দেয়

বিনামূল্যে! অর্শ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকার জন্যে আজই এই ঠিকানায় লিখুন (সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন): ডিপার্টমেন্ট PH-38 পোঃ অঃ বক্স ১০১৩, বম্বে ৪০০০০১

*Regd. User of TMs. Geoffrey Manners & Co. Ltd.
743-PH-92 BEN

উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ পাত্রের সঙ্গে নিজের ভগ্নীর বিবাহে প্রণোদিত করেছিল।

শিশিরকুমারের আর একটি সম্ভাব্য চিন্তাধারার কথা মনে আসে। জাতির অপ্রসর মনোবৃত্তি অজ্ঞতার অন্ধকারে মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীর মধ্যে আদানপ্রদানের স্নিগ্ধতা কল্যাণকর সমাজ গঠনের সহায়ক হবে। শিশিরকুমারের চিন্তাধারার আংশিক সাফল্য অস্বীকার করা যায় না। রাঢ়দের সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের বঙ্গজ কায়স্থদের কোন আদানপ্রদান সংমিশ্রণ ছিল না। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ রাঢ় দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল। পূর্ব বাংলায় মুসলমান অভ্যুদয় তাদের শাসন-কেন্দ্র হিন্দুদের সাহচর্যে অর্থনীতির কাঠামো গড়ে উঠেছিল। পূর্ববঙ্গীয়দের রাঢ় দেশে না আসার এই ছিল প্রধান কারণ। পূর্ববঙ্গ সচ্ছলতার দেশ। মুসলমান শাসনে উভয় জাতির এক আন্তরিক হৃদ্যতা উভয়-জাতির ধর্মকর্মে প্রতিফলিত হত। ওরংজীবের পৌত্র আজিম হিন্দুদের বসন্তোৎসবে যোগ দিতেন। ওরংজীব গোঁড়া মুসলমান। তাঁর কানে কথাটা উঠলো। তিনি আজিমকে ভর্ৎসনা করলেন। শাসক শ্রেণীর সদ্ব্যবহার হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ না করার অপর কারণে বঙ্গজ কায়স্থরা পূর্ব-বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবাস করতে থাকে।

১৬৯৫ সালে রাঢ় দেশের এক অবিস্মরণীয় বিপ্লব তথাকার কায়স্থ সমাজকে বিচূর্ণ করে দেয়। রাজা কিষণ রায় তখন বর্ধমানের অধিপতি। শোভা সিং তার অধিনস্থ এক ক্ষুদ্র জমিদার। রাজার সঙ্গে শোভা সিং-এর বিরোধ বাধলো। তখন মোঘল সাম্রাজ্য কায়েম হলেও আফগানরা স্থানে স্থানে বেশ শক্তিশালী ছিল। উড়িষ্যার আফগান প্রধান রহিম খাঁ শোভা সিং-এর আমন্ত্রণে রাঢ় দেশ আক্রমণ করে। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর যশোর-ধুমঘাটের পরিবর্তে কসবা-যশোর (বর্তমান যশোর) মুঘল অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র রাঢ় দেশ যশোর ফৌজদারের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। রহিম খাঁ ও শোভা সিং-এর বীভৎস অত্যাচারে গঙ্গার পশ্চিম কূল পর্যন্ত বিধ্বস্ত হতে থাকে। কায়স্থরা সাধারণতঃ অসিজীবী। তাদের ওপর নির্দেশ হল বিদ্রোহী সেনা-বাহিনী যোগ দিয়ে পূর্ণ গরিষ্ঠতা সম্ভব করতে হবে অন্যথায় জীবন নিয়ে কোন কায়স্থ আর রাঢ় দেশে থাকতে পারবে না। খণ্ড যুদ্ধে বর্ধমানের রাজা নিহত হলেন। তাঁর পুত্র জগৎ রায় পালিয়ে গেলেন। রাজার ধন সম্পত্তি শোভা সিং দখল করল। রাজ পরিবারে সকলে বন্দী হয়ে রইলেন। রাজকুমারী অপ্সরা সুন্দরী। শোভাসিং-এর লালসা-নিষ্ঠুর বিক্রমে রাজকুমারীর ওপর ধর্ষণের প্রচেষ্টা তার জীবন হানির কারণ হল। সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজকুমারীর নিভৃত কক্ষে শোভাসিং-এর অনুপ্রবেশ রাজ-কুমারীকে চাঞ্চল্য করে তুললো বক্ষ্যভ্যন্তরে লুকানো তীক্ষ্ণধার ছুরিকা রাজকুমারী শোভা সিং-এর হৃদপিন্ড বিদীর্ণ করে দিল।

সেই লোকটি ৭

অমিতাভ দাশগুপ্ত

অমিতাভ দাশগুপ্ত শুধু একালের একজন প্রধান কবি নয়, সৃজনশীল গদ্য-সাহিত্যেরও তিনি কতবড় নিপুণ শিল্পী, তার ভাস্বর চিহ্ন এই গ্রন্থটি। অসংখ্য বিচিত্র মানুষের মুখের মেলায় আলোকিত এই বইয়ের অনবদ্য ফিচারগুলো রংসরাধিকারলু ধারাবাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় বেরিয়ে পাঠকমহলে তুমুল আলোড়ন এনেছিল।

গী দ্য মোপাসার/ভাষান্তর—ইন্দুভূষণ দাশ

এক নায়ক অনেক নায়িকা ১০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস চলচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে সরোজ প্রভাকর

তিন পরী ছয় প্রেমিক ৪
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মিণ্টুর খেলা ৩
নিশাচর রহস্য উপন্যাস

সামনে আড়ালে ৮

রাত্রি গভীরে ৬

সমুদ্রের সামনে ৬

জীবন রহস্য ৬
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রহস্য উপন্যাস
বহুরূপীর রম্য রচনা

ধূপের ধোঁয়ায় ৮

সানাই ৬
আবদুল জব্বার-এর উপন্যাস
দীপক চৌধুরীর উপন্যাস

মাতালের হাট ৮

স্বাদ ৭

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ নবীন কুণ্ড লেন ॥ কলিকাতা—৭০০০০৯

শিশিরকুমারের

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

নিমাই সন্ন্যাস

(নাটক) ২য় সংস্করণ ২·৫০

নরোত্তম চরিত

৩য় সংস্করণ ২·০০

লর্ড গৌরাঙ্গ

(২২টি খণ্ডে) (ইংরাজী) প্রতি খণ্ড ৩·০০

নরোত্তম চরিত

(হিন্দী) ২·০০

প্রাপ্তিস্থান :—
পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও
বিশিষ্ট পুস্তকালয়

রাজকুমারীও আত্মঘাতিনী হলেন। শোভা-সিং-এর মৃত্যুতে রহিম খাঁ হলো বিদ্রোহী দলনেতা। তার অমানুষিক অত্যাচারে দলে দলে মানুষ রাঢ় দেশ ত্যাগ করতে সুরু করে। এব্রাহিম খাঁ তখন ঢাকার নবাব—অপদার্থ শাসনকর্তা বিদ্রোহ দমন করার জন্যে যশোরের ফৌজদার নুর আল্লার ওপর আদেশ দিল। রাঢ় দেশ তখন যশোর ফৌজদারের কর্তৃত্বাধীনে। নুর আল্লা নামে ফৌজদার। তার কাজ ছিল ব্যবসা করে অর্থ সঞ্চয় করা। সামরিক শৌর্য-বীর্য তার একটুও ছিল না। নুর আল্লা রাঢ় দেশে এলো বটে কিন্তু রহিম খাঁর বিরাট সৈন্য সমাবেশে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাত্রের অন্ধকারে যশোরে ফিরে এলো। কায়স্থদের একটা বড় অংশ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশে রয়ে গেল। যারা বিদ্রোহীদের সাফল্যে সংশয়ান্বিত ছিলেন তাদের মধ্যে সন্ত্রস্ত রাঢ় দেশের অধিবাসীরা গঙ্গা পার হয়ে মোগল আশ্রয়ে নিরাপদ হবেন এই আশায় দেশ ছেড়ে চলে এলেন। রাঢ়বাসীদের দুর্দশার সীমা রইলো না। উচ্চ গভর্ণর লোকের দুর্দশায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

এই সময়ে গঙ্গার উপকূলে বহু গণ্ডগ্রাম বা শহরের সৃষ্টি হল। এটাই হাবিলি শহর পরগণা। অনেকে গঙ্গার উপকূলে থাকা নিরাপদ নয় বিবেচনা করে যশোরের ফৌজদারে কাছে থাকা স্থির করেন। ভৈরব, কপোতাক্ষ, চিত্রা প্রভৃতি নদীর উপকূলে বসতি স্থাপিত হল। এই সব নদীর কূলে

২'টি ফসফোমিন টনিক...

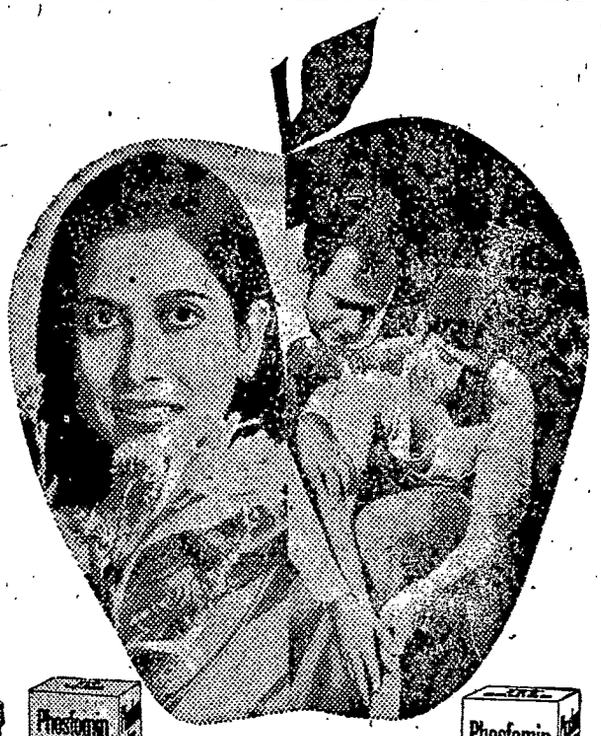

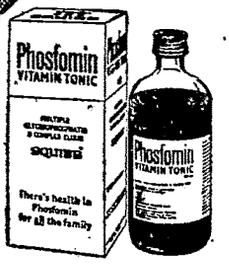

ফসফোমিন আয়রন

মেয়েদের জন্যে আয়রন টনিক

ফসফোমিন আয়রন শরীরে আয়রন বাড়াবার এক অতিরিক্ত উপায় যা রক্তকে লাল করতে আর শরীরে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। প্রত্যেক দিন নিন মেয়েদের জন্যে তৈরী এক আয়রন টনিক—ফসফোমিন আয়রন।

ফসফোমিন ভিটামিন

পরিবারের সকলের জন্যে ভিটামিন টনিক

ফসফোমিন-এ আছে বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন আর পুরো মাত্রায় গ্লিসারোফস্‌ফেট্‌স যা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে ২'টি ফসফোমিন টনিক

ফসফোমিন টনিক খিদে বাড়ায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যোগায় আর প্রফুল্ল করে তোলে।

®ই. আর স্কুইব ও সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী

SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS LTD. লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এস, পি, এস,

Shilpi SC 8A/74 ben

যাঁরা বসতি করলেন তাঁরা অধিকাংশই দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজভুক্ত। কাকচক্ষু কপোতাক্ষের কূলে যেসব কায়স্থ বসতি স্থাপন করেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই উত্তরকালে বংশগৌরবে সুবিখ্যাত হয়ে আছেন। কপোতাক্ষ তীরে পলুয়া মাগুরা গ্রাম। এই গ্রামে রাঢ় দেশের বালি থেকে আগত ঘোষ বংশ দেশমাতৃকার সেবাধর্মে জগতে সুপরিচিত হয়ে আছেন। শিশির-কুমার যশোরের উকিল হরিনারায়ণ ও মাতা অমৃতময়ীর তৃতীয় সন্তান অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। নিজের জীবন বিপন্ন করে দেশের শত্রু নীলকর সাহেবদের উপদ্রব থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করেন—দেশ থেকে নীলের চাষ উৎখাত হয়। পত্রিকার আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা ভারত তথা পৃথিবীর সাংবাদিক জগতে পত্রিকার সুদৃঢ় আসন একমাত্র তুষারবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টা, দেশপ্রীতি ও মানবতার পূর্ণ আদর্শে সম্ভবপর হয়েছে। শ্রীতরুণকান্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ণ মন্ত্রী, প্রফুল্লকান্তি রাষ্ট্র-মন্ত্রী—এঁরা এই বংশের কৃতী সন্তান। অনেকের ধারণা এই ঘোষ বংশ বর্গীর হাঙ্গামার সময় যশোরে বসতি করেন কিন্তু গড়ে প্রতি পুরুষের পরমায়ু পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত মোটামুটি তিনশ' বছর হয়। বাংলাদেশে বর্গীয় হাঙ্গামা হয় ১৭৪০-৪১ সালে। ঐ সময় থেকে তিনশ' বছর যোগ দিলে ইংরেজের আমল এসে পড়ে। কাজেই ঘোষ পরিবার বর্গীর হাঙ্গামার পর যশোরে এসেছিলেন এটা ঠিক নয়। কপোতাক্ষের উভয় কূলে প্রতিষ্ঠাবান কায়স্থ পরিবারের বসতি এই সময়ে স্থাপিত হয়। ষোলযাদা, বল্লা, বিদ্যানন্দকাটী সাগরদাঁড়ি প্রভৃতি কায়স্থ-প্রধান গ্রামগুলি পরস্পর সামাজিক বন্ধনে সংযুক্ত হল। সাগরদাঁড়ি সাহিত্য জগতে অতি সুপরিচিত গ্রাম—মাইকেল মধুসূদনের জন্মভূমি। বিদ্যানন্দ-গ্রাম বহু কৃতী পুরুষের জন্মস্থান। হাই-কোর্টের জজ স্যর চারুচন্দ্র ঘোষের পিতা স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ এই গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি আলিপুর জজকোর্টের সরকারী উকিল ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী স্বর্গতঃ ডাঃ জীবনরতন ধর তাঁর অনুজ সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ নীলরতন ধর ঘোষ বংশের এ্যাটম এনার্জি বোর্ডের জিওলজিক্যাল শাখার ডিরেকটর ডঃ প্রকৃতি-কুমার ঘোষ ও অধুনা বিলাতে গবেষণারত ডঃ নীতীশচন্দ্র ঘোষ এঁদের সকলের পিতৃ-ভূমি ষোলযাদা গ্রামে। নেবুতলা মিত্র বংশের পারিবারিক ইতিহাস উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে পূর্ণ। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর মিত্র ও আইনসভার ডেপুটি স্পীকার নেতাজীর সহকর্মী স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রখ্যাত যোদ্ধা শ্রীহরিদাস মিত্র এই গ্রামের সন্তান। ইতিবৃত্ত লেখক শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার মিত্র মহাশয় বর্গীর হাঙ্গামার যে তারিখ দিয়াছেন সেটা সঠিক নয়। বঙ্গাধিপ প্রতাপের বিরুদ্ধে মানসিং-এর অভিযান ও পরবর্তীকালে কুশারীর মাঠে বঙ্গসৈন্যের পরাজয় স্বাধীনতাসংগ্রামের সকল আশা নির্মূল করে দিল। প্রতাপের অধিকৃত সমুদয় ভূভাগ মোগল কর্তৃত্বাধীনে এলো ও কর্মস্থল হল বর্তমান যশোর শহরে। খুলনার তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ-নামের সঙ্গে কারো তখন কোন পরিচয় হয়নি। রাঢ় দেশ হতে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থরা তখনকার দিনের যশোর ভূভাগে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সমগ্র যশোর জেলা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের কুলীন ও বংশজদের বিরাট ঘাঁটি হল। কৃষ্টি, প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা যশোরের বৈশিষ্ট্য। বিশ্ববরেণ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পিতৃভূমি যশোরের দক্ষিণডিহী গ্রামে। প্রতাপের বিরুদ্ধে মানসিং-এর অভিযান—প্রতাপের আংশিক বশ্যতার স্বীকৃতি যশোর অধিপতির কয়েকজন নগণ্য কর্মচারী প্রভুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ বিরাট জমিদারীর পত্তন করে। কৃষ্ণনগরের ভবানন্দ ও বড়িষার লক্ষ্মীকান্ত নিজ নিজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান নদীয়া জেলা তখন যশোরের একটা অংশ। রাঢ় দেশ থেকে বহু কায়স্থ রাষ্ট্রবিপ্লবে সন্ত্রস্ত হয়ে যশোরের এই অংশে বসতি করেন। হাঁসখালির বিশ্বাসরাও এই সময়ের লোক। নবাবের আস্থাভাজন ব্যক্তি তাই তাদের বিশ্বাস উপাধি। শিশিরবাবুর স্ত্রী কুমুদিনী এই বংশের মেয়ে। নীলদর্পণের সমাজচিত্র দীনবন্ধু মিত্রকে বাংলাভাষার জীবনকাল পর্যন্ত তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। ষোড়শ শতাব্দীর অন্তঃকাল। বঙ্গেশ্বর দাউদ শাহ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করলেন। মোগল-পাঠানে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলো। দাউদের বিশ্বস্ত কর্মচারী শ্রীহরি ও বসন্ত রায়কে সমুদয় ধনরত্ন অর্পণ

শরৎ রচনাবলী

(জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শরৎ সমিতি শিল্পীর সমগ্র রচনাবলী মোট পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করছেন। প্রতি খণ্ডের আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা সাতশত। একটি করে আর্ট প্লেট। ঝরঝরে লাইনোটাইপে ছাপা। সুন্দর কাপড়ের মজবুত বাঁধাই ও সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া। কেবল গ্রাহকদের জন্য পাঁচ খণ্ডের সহজ কিস্তিতে দেয় মোট মূল্য একশত টাকা। বর্তমান বছরের জুন/জুলাই থেকে পুস্তক বিতরণ করা শুরু হবে এবং আশা করা যায় ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সবক'টি খণ্ড বিতরণ করা সম্ভব হবে। বিশদ বিবরণ ও গ্রাহক হবার আবেদন পত্রের জন্য নীচের যে কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন অথবা নাম, ঠিকানা ও ২৫ পয়সার স্ট্যাম্প সহ ৯"×৪" আকারের খাম পাঠান। আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৫।

সম্পাদক	শ্রীসুপ্রিয় সরকার	শ্রীসন্তোষ দাস
শরৎ সমিতি	এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ	শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩১ অশ্বিনী দত্ত রোড	১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট	৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ২৯	কলকাতা ১২	কলকাতা ৯

করলেন—যুদ্ধ জয় হলে ফেরৎ দেবার নির্দেশ দিলেন। সুন্দরবনের যমুনা ইছামতীর উত্তাল তরঙ্গে অতি দুর্গম স্থানটি শ্রীহরি অতি উপযুক্ত বিবেচনা করেন। নগর গঠনের কাজ শুরু হয়।

পূর্ববঙ্গ থেকে তাদের বহু আত্মীয়স্বজন নতুন শহর যশোরে এলে শহর জমজমাট হয়ে ওঠে। এরা সব বঙ্গজ কায়স্থ—টাকী সমাজের অন্তর্ভুক্ত। স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সমাজের লোক ছিলেন। নবাবী আমলে পার্সী রাজভাষা। পার্সী জানলে নবাব সরকারে চাকুরী মিলতো। টোলে চলত পণ্ডিতদের তর্ক-বিতর্ক। পার্সী জানা ব্রাহ্মণ জাতে কুলে অপাংক্তেয় হতেন। ব্রাহ্মণদের নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মই ছিল জীবনের আদর্শ। কায়স্থ সমাজ পার্সী ভাষা গ্রহণ করল নবাব দরবারে নবাব সরকারে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হন। ১৬৯০ সাল। এর আগেই ডাচ ফরাসী ইংরেজ এসে গেছে—তাদের উদ্দেশ্য বাংলার ধনরত্ন লুঠ করে নিজের দেশকে সমৃদ্ধশালী করা। সপ্তগ্রাম ছিল বাণিজ্যের রাজকীয় কেন্দ্র। রোমক (ইটালিয়ান) এই বাণিজ্য কেন্দ্রকে বলতেন

'Ganges Regia' Asiatic Researches

কলকাতার মত সপ্তগ্রাম তখনকার দিনে ছিল বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র। ডাচ ফরাসী এদের সঙ্গে সংযোগ রেখে কায়স্থ সমাজের এক বিরাট অংশ হাওড়া হুগলীর সন্নিকটের গ্রামগুলি ভরে তুলল। ইংরেজের ঠাঁই এখানে ছিল না। বাণিজ্য করা তাদের গৌণ উদ্দেশ্য মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের রাজনীতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। নবাব দরবারে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালেও তাদের ওপর কেউ সন্তুষ্ট ছিল না। গঙ্গার পশ্চিম পাড় হতে ইংরেজ তাই বিদায় নিল। জব চার্ণক তখন পাটনার ফ্যাকটারীর অধিনায়ক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যেটুকু ব্যবসা ছিল তাতে কর্মচারীদের মাহিনা মেটান যেত না। চার্ণক জায়গা খুঁজতে বেরুলো। সপ্তগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনও ছিল। গঙ্গার পূর্ব কুল বর্তমান কলকাতা চার্ণকের হল পছন্দমত স্থান। জলা-জঙ্গলে ভরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কুঁড়ে ঘর—তাঁর বাসিন্দা ধীবরকুল। বাঘা জঙ্গলে বাঘ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ—হাঙ্গর কুমীর ভরা গঙ্গার কোলে তারা রোদ পোয়াতে ডাঙ্গায় আসে। চার্ণক এখনে বসতি করল। এখানকার নিমতলা ঘাট ওটাই সুতানটীর ঘাট। গরমের দিনে চার্ণক তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে বৈঠকখানায় বেচাকেনা শুরু করে দিল। বিরাট অশ্বত্থ তলায় মাঝে মাঝে বাজারের বৈঠক বসত—জায়গাটাকে এখনও বৈঠকখানা বলে। জঙ্গল পরিষ্কার করা শুরু হল—জলা ভরাট করাও চলল। গোল পাতার ঘরে কলকাতার ইংরেজদের প্রথম বসতি। বুদ্ধিমান চার্ণক নরম মাটিতে ফসল করার পদ্ধতি জানত। এই জলা জঙ্গলে কেউ এল না। এঁড়েদার এক অতিসুন্দরী অল্প বয়েসের বউকে সতী করতে শ্মশানে এনেছে। চার্ণক তাকে ধরে আনল কলকাতায়। ঐ বউটাকে চার্ণক বিয়ে করে সংসার পাতল কলকাতায়! ধীরে ধীরে কলকাতা গড়ে উঠছে। দিল্লীর দরবার থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কতকটা সুযোগ-সুবিধে নিয়ে সারা বাংলায় ফলাও করে ব্যবসা শুরু করে দিল। কোম্পানীর কর্মচারীরাও ব্যবসা করার অনুমতি পেল কিন্তু তাদের অর্থের সম্বল ছিল না। দেশীয় লোকদের মুচ্ছুদ্দী বানিয়ে তাদের ঘাড় ভেঙ্গে ব্যবসার টাকা সংগ্রহ করে ইংরেজ কর্মচারীরা নানা রকম ব্যবসার সংস্থা গঠন করল। দেখতে দেখতে কলকাতা জাঁকিয়ে উঠল। ব্যবসার ধান্ধায় বহু লোক এসে পড়ল কলকাতায়—তাদেরও গোলপাতার ঘর। সুতানটি গোবিন্দপুর ও কালিঘাট এই তিনখানি গ্রামের সংযুক্ত নাম কলকাতা। বাগবাজার হতে দক্ষিণ কালিঘাট ও গঙ্গার কোল হতে সার্কুলার রোড পর্যন্ত আট মাইল দৈর্ঘ্য ও তিন মাইল প্রস্থের শহর।

চৌরঙ্গীর কোল থেকে পশ্চিমে গঙ্গা পর্যন্ত ইংরেজদের বড় বড় বাড়ী গড়ে উঠল—পার্ক এভিনিউ রোপওয়ে হোটেল নাচ-গানের ব্যবস্থায় শহর জমকে উঠল। তখনকার দিনের ইংরেজরা ধার্মিক না হলেও ধর্মের ধ্বজা—গীর্জেয় গিয়ে উপাসনায় উপস্থিত হত। কলকাতার এই অংশটাকে বলা হত হোয়াইট টাউন—নেটিভরা এখানে বাস করার অনুমতি পায় নি। মুচ্ছুদ্দীরা যাদের পয়সায় সাহেবরা ব্যবসা করে ধনবান হয়ে উঠল সেই সব মুচ্ছুদ্দীদের সন্ধ্যার আগেই হোয়াইট টাউন থেকে চলে আসতে হত। কলকাতার বাকী অংশটুকু ছিল নেটিভ টাউন। ১৭১৭ সালে দিল্লীর বাদশা ফরোক শাহ ইংরেজদের কিছু জমি দিলেন—কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকা। কিন্তু ইংরেজরা ফরোক শাহের নির্দেশমত জমিদারদের নিকট হতে ঐ শহরগুলি নিতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

(ক্রমশঃ)

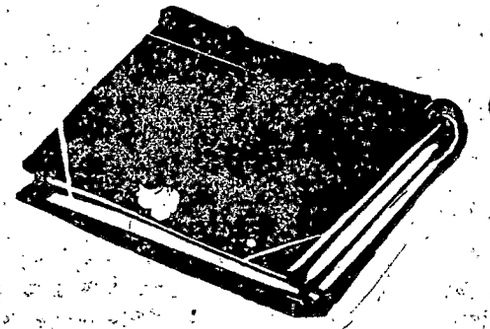

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সারা বাংলা গল্প প্রতিযোগিতা

'অঙ্গীকার' পত্রিকাগোষ্ঠীর পরিচালনায় সারা বাংলা ছোটগল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। যোগাযোগের শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সুভাষ বালিয়াল, গ্রাম ও পোঃ সোনারপুর, ২৪-পরগণা।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের পরিচালনায় সম্প্রতি চতুর্থ বার্ষিক নিখিল বঙ্গ বিতর্ক প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হোল। বিতর্কের বিষয় ছিল সভার মতে দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি প্রতিরোধে জনসাধারণের ভূমিকা বিশেষভাবে পালিত হয় নি। বিচারক-মণ্ডলীতে ছিলেন অশোক ঘোষ, সলিল রায়, অজিত মজুমদার, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মা, তপতী বসু ও রূপরতন দাশগুপ্ত।

পরলোকে মনোরম গুহঠাকুরতা

বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক মনোরম গুহঠাকুরতা সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। শিশু সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা যৌবনের প্রারম্ভেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং বাংলা সাহিত্যমহলে তাঁর পরিচিতি ঘটে। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা শহরে অবস্থানকালে আশুতোষ লাইব্রেরীর ও প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। রবিনহুড, বনেজঙ্গলে, দেশবিদেশের লেখা, স্বামী বিবেকানন্দ, রিপভ্যান উইনকল প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।

শিশু মেলা

তিনদিনব্যাপী এক শিক্ষামূলক শিশু-মেলা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হোল বালিগঞ্জ সরোজনলিনী প্রাকটিশি, স্কুলে। প্রায় ষাটটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মেলায় অংশ নেয়। মেলার উদ্বোধন করেন শ্রীমতী আরতি দত্ত ও সভানেত্রী ছিলেন ডাঃ রমা চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী পরুল সেনগুপ্ত। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় এই মেলার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

পঞ্চকোটে মধুসূদন জন্মোৎসব

পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট রাজ কাশীপুরে শ্রীমধুসূদন দত্তের ১৫১তম জন্মবার্ষিকী সম্প্রতি একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিপালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅশোক চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যে শ্রীমধুসূদনের অসাধারণ অবদানের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন শ্রীবিমলকান্তি ভট্টাচার্য। কবিতা ও সংগীত পরিবেশনে অংশ নেন কমল চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখী চট্টোপাধ্যায় ও পঞ্চকোট রাজ হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকটি এই উপলক্ষে অভিনীত হয়।

পরলোকে কবি যতীন্দ্র ভট্টাচার্য

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য সম্প্রতি কলকাতায় ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

'শর্মিষ্ঠা' এখন সাগরপারে

শ্রীমধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের পাণ্ডুলিপি এখন চলে এসেছে আমেরিকায়। জানা গেছে জনৈক মার্কিন নাগরিক এদেশে সাহিত্যের গবেষণা করতে এসে মাত্র ৩০ হাজার টাকায় 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের পাণ্ডুলিপি কিনে নিয়ে গেছেন। এব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়েছে।

বাঙালী সমিতির অধিবেশন

২৮ ফেব্রুয়ারী বিহার রাজ্য বাঙালী সমিতির ১৭তম বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়। সমিতির প্রতিনিধি ও সদস্যদের উদ্দেশ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ বলেন সম্মেলনের উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। তিনি বলেন এই সম্মেলন কেবলমাত্র বাঙালীদেরই নয় অন্যান্য সংখ্যালঘু শ্রেণীর অভাব-অভিযোগও প্রকাশ্যে তুলে ধরতে সচেষ্ট।

সম্মেলনের প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীঘোষ বলেন আমাদের সংবিধান সংখ্যালঘুদের কতকগুলি অধিকার দিয়েছে। অতীতে যাঁরা ক্ষমতাসীন ছিলেন তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়ে এই অধিকার বোধকে জোরদার করেছিলেন।

শ্রীঘোষ আশা প্রকাশ করেন যে মাঝে মাঝে এই ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠান করে সংবাদপত্রে প্রচারের সাহায্য নিয়ে এবং যেখানেই সম্ভব সেখানেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে যদি পরিস্থিতি যথাযথভাবে বোঝানো যায় তাহলে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফল হয়ে উঠবে।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

ও

আরও বিচিত্র কাহিনী

পড়ে' আনন্দ পাবেন

সম্মেলনে সারা রাজ্য থেকে চার শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন।

শ্রীঘোষ সম্মেলনে ছোট সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। উদ্যোক্তাদের এই ধরনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীঘোষ প্রস্তাব দেন প্রদর্শনীটি কিছুদিন ধরে চলুক। সম্ভব হলে আবার যেন এ জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

শ্রীঘোষকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন পাটনা কমার্স কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ গুরুচরণ সামন্ত।

পরে সম্মেলনে ভাষণ দানকালে শ্রীঘোষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বিহার নাগরিক পরিষদের সভাপতি শ্রীরামলক্ষ্মণ সিং যাদব বলেন বিহারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে বাংগালীদের দান না থাকলে এক বিরাট ফাঁক থেকে যেত। বিহারের উন্নয়নে বাংগালীরা অংশ গ্রহণ করছেন না বলে যে অভিযোগ করা হয় তার প্রতিবাদ করে তিনি বলেন বাংগালীদের দান না থাকলে বিহারের বর্তমান অগ্রগতি সম্ভব হত না।

সভাপতির ভাষণে শ্রীবি মুখোপাধ্যায় বলেন সংখ্যালঘু ভাষাভাষী হিসাবে বাংগালীদের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা আছে।

হিন্দীতে সঞ্চয়িতার অনুবাদক শ্রীহংসরাজ তেওয়ারী দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সকলকে এক হয়ে কাজ করতে আহ্বান জানান।

পরে সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বিহারের উন্নয়নে বাংগালীদের আন্তরিকভাবে কাজ করতে অনুরোধ জানান হয়। ঐ সংগে তাঁদের দাবী আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করার আহ্বানও জানান হয়।

সম্মেলনে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডঃ শরদিন্দুমোহন ঘোষাল।

সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচীতে ভারতের সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের অধিকার সম্পর্কে এক আলোচনাচক্র। এতে অংশ গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

উপগুপ্ত

নতুন বই

বাঙালী জীবনে বিবাহ ঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত ৩, আবদুল হামিদ (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান) স্ট্রীট কলিকাতা-১. ১৯৭৪। মূল্য ৩০ টাকা।

বাঙালীর সংস্কার মুক্তির জন্য কিছু সমাজতান্ত্রিক জ্ঞান দরকার। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে সমাজাচার এবং বিবাহের প্রথা ও পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও সার্থকতা বিচারও দরকার। বিশেষ করে প্রাক-বিবাহ ও বিবাহোত্তর যৌন-জীবনের রীতিনীতি সম্পর্কিত তথ্য জানা দরকার যা প্রায়শই সাধারণ আলোচনার অন্তর্গত হয় না। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বাঙালী জীবনের উষাকাল থেকে অত্যাধুনিক যুগ অবধি সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকল্পের মূল তাৎপর্য দ্বিধাহীন চিত্তে এবং ঋজুরেখ ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন নয়টি পর্বে। প্রত্যেকটি পর্ব তথ্যচয়নের নৈপুণ্যে ও মনোজ্ঞ বিশ্লেষণে অনবদ্য হয়েছে। আলোচনা কালে লেখক কোন বিশেষ মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেননি, কিন্তু বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা করেছেন। অবশ্য এরূপ আলোচনায় দোষ-গুণ দুই-ই থাকা স্বাভাবিক তবে বর্তমান গ্রন্থে গুণই বেশী কোনো মতবাদ পক্ষপাত-দুষ্ট নয়। এটা নিশ্চয়ই গুণ।

বৈদিক যুগ থেকে উত্তর বৈদিক যুগের বাঙালীর ধ্যান-ধারণা এবং কর্মকাণ্ডের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখি তার পিছনে আছে এক বৃহৎ ঘটনা। অর্থাৎ অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের সাক্ষাৎ ও সমন্বয়। সমন্বয়ের প্রক্রিয়ায় একদিকে আর্যরা যেমন অন্যদের থেকে গ্রহণ করেছে অন্যদের তেমনি নিজেদের বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু হারিয়েছেন। এই সমন্বয়ের প্রক্রিয়ায় কিভাবে বাঙালী একটি বিশিষ্ট জাতি হিসাবে গড়ে উঠেছে কিভাবে সে তার সমাজ ও পরিবার সংগঠনকে একটি বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছে তার সুন্দর সরস তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন লেখক সমাজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভংগী থেকে। কৌতূহলী পাঠক সাধারণের জন্য তথ্যভিত্তিক সুরচিত এই গ্রন্থটি ছিল প্রতীক্ষিত।

গ্রন্থের সূচীপত্রের উপর চোখ বুলালে বাঙালীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের যে সামগ্রিক রেখালেখ্য দেখি তা আলোচ্য বিষয়ের উপর ভাল দখল না থাকলে বর্তমান অবয়বে প্রকাশ করা যেত না।

শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত অধ্যায় পরিকল্পনায় ও তথ্যবিন্যাসে তৃপ্তিকর মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বহু তথ্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে উত্থাপিত করেছেন আবার বহু বিষয় বিশ্লেষণ ও বিচারের মারফৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। 'বাংলার সুখ' যিনি দেখেছেন তাঁর রচিত গ্রন্থ যে এরূপভাবে বাঙালীর আন্তরজীবন নির্মজ্জিত হবে তা বলাই বাহুল্য এ গ্রন্থের সর্বত্রই আছে লেখকের পরিশ্রমী ও পরিণত বুদ্ধির প্রকাশ আছে নিষ্ঠার স্বাক্ষর।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রথম পর্বে বাংলা ও বাঙালীর বর্ণনা, বিবাহ প্রথার উৎপত্তি ও বিকাশ। দেশে দেশেও বাঙালী জীবনে বিবাহের একটি ছক পাই। পরবর্তী পর্বে জাতি বর্ণ ও শ্রেণী পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নবশাখ সাহা শুঁড়ি নবশূদ্র কৈবর্ত মাহিষ্য হাড়ি বাগ্দী বাউরী চণ্ডাল উগ্র ক্ষত্রিয় ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় যুগী নাপিত প্রভৃতি ও বৌদ্ধ বৈষ্ণব মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম প্রভৃতির শ্রেণী বিন্যাস মর্যাদাবোধ ও ছোট-বড়োর ভেদাভেদের কথা তুলে ধরেছেন সামাজিক পটভূমিকা বিশ্লেষণান্তে। তৃতীয় পর্বটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এখানে বর্ণ বিভাগ ও সমাজ শৃঙ্খলা নিম্ন ধর্মীয়দের মর্যাদাবোধ বা কৌলিন্য কুলজী গ্রন্থমালা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ কুলজী সমীকরণ ও মেল বন্ধন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নবশাখ আদি জাতিসমূহের শাখা গোত্র প্রবরাদি বিষয়ক আলোচনা বাঙালীর পদবী বিষয়ক আলোচনা পঞ্জিকার শাসন লগ্ন দিন শুদ্ধাশুদ্ধ কালাদি নির্ণয় হৌটক-বিচার এবং বিবাহ ব্যাপারে ঋতুবীয় নির্দেশ ও আদেশ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই আলোচনা থেকে শুধু এটাই জানতে পারি না যে কিভাবে হিন্দু বাঙালী পঞ্জিকা ও কৌলিন্য দ্বারা শাসিত এটাও জানতে পারি যে কিভাবে পঞ্জিকা ও মর্যাদাবোধ দ্বারা বাঙালী মুসলমানের বিবাহাদি কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও যে কিভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রবল তাও আলোচ্য গ্রন্থে অনুল্লেখিত থাকেনি। সমাজ সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক বাঙালী মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ ব্রাহ্মণসমাজীদের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন বলেই এ গ্রন্থের সমাজ-ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্ব অবধি লেখক যথাক্রমে হিন্দু বিবাহ বৌদ্ধ বিবাহ মুসল-

মানী বিবাহ খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজী বিবাহ এবং আদিবাসী ও অন্যান্যদের বিবাহ তথা সাঁওতাল মুণ্ডা মহালী লোধা শবর খেড়িয়া ওঁরাও বাউরী রাজবংশী কোচ লেপচা রাভা টোটো ও কুর্মী মাহাতোদের বিবাহের আচার-আচরণ ও বিবাহের বিধি পদ্ধতির বিবরণ পেশ করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে পাত্র-পাত্রীর বয়স বিবাহের প্রকার ভেদ পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন রেজেস্ট্রী বিবাহ, কালীঘাট বিবাহ প্রেমজ-বিবাহ কণ্ঠীবদল বিবাহ বিবাহ-চ্ছেদ নারীর উত্তরাধিকার ও অধিকার অ-বিবাহিত যুবক-যুবতীদের সমস্যা আচার আচরণ ও মন্ত্র স্ত্রী-পুরুষের অধিকার পর্দা তালাক পতিসেবা মনমালিন্য শয্যা-আচরণ দাম্পত্যকলহ এবং প্রেম-ভালবাসা দাম্পত্য-সুখ পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত এমন সব আলোচনা স্থান পেয়েছে যা তত্ত্ব ও তথ্যের আকর হিসাবে পরিগণিত হবে এবং পাঠক সাধারণের অভিনন্দন পাবে।

এযাবৎ কোন একখানি বাংলা গ্রন্থে সমগ্র বাঙালীর বিবাহের তথ্য সহ ইদৃশ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থ একদিকে যেমন বিবাহের উপহারে একটি সার্থক চয়ন তেমনি এটি প্রত্যেকটি শিক্ষিত সংস্কৃত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বাঙালীর, অবশ্য পঠিতব্য। এ গ্রন্থ রচনা করে শ্রীশংকর সেনগুপ্ত পুনরায় স্বাদেশিকতার ও জাতি-প্রেমের যে পরিচয় দিলেন তার জন্য তিনি দীর্ঘদিন বাঙ্গালী মনে অটুট থাকবেন বলে মনে করি।

ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র

সেই উন্মোচন : রমেন আচার্য। বই ঘর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। চার টাকা।

পশ্চিমবাংলার তরুণ কবি রমেন আচার্যের প্রথম বইটি বার করেছেন বাংলাদেশের প্রকাশক। তরুণ কবিদের কবিতার প্রতি তাদের অনুরাগের পরিচয় রয়েছে বইটির শোভন মুদ্রণে ও প্রচ্ছদ পারিপাট্যে। রমেন আচার্য পরিচ্ছন্ন কবিতা লেখেন। নিজের অনুভূতিকে আধুনিক শব্দের কারুকার্যে তা উপস্থিত করতে পারেন কুশলীর মতো। কবিতায় তিনি বুদ্ধিবাদী শব্দপ্রয়োগে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য পান। তাঁর কবিতায় নাগরিক ছিমছাম ভাবটিও বেশ সুন্দর ফুটে ওঠে। খুব মৌলিক হবার চেষ্টা যে তাঁর খুব বেশি তা নয়। তবে কোথাও অক্ষম অনুকরণও নেই। আধুনিক কবিতার মেজাজ তিনি আয়ত্ত করেছেন এবং সব ক'টি কবিতায় তিনি দক্ষতার সঙ্গেই তা প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি একটু বেশি সপ্রতিভ : লাগসই কথা বলার জন্য যেন সব সময়েই প্রস্তুত। তার চেয়ে আত্মমগ্ন নির্লিপ্ততাও কি কবিতার কাছে কম লোভনীয়? 'বড় অনটন' তাই গচ্ছিত নিশ্বাস ভেঙে ভেঙে হাত খরচ চালানো।' —একটু বেশি সাজানো বৈকি। তার চেয়ে 'ফুলের মালায় সাপ। বেদনা এনেছো কেউ ভুল করে ভালোবাসা ভেবে।' এইসব পংক্তি কবির হৃদয়কে অনাবৃত করে চেনায়।

সংকলিতা (কাব্য সংকলন)। সম্পাদক—কাশীনাথ ঘোষ। সন্দীপন প্রকাশনী, চাঁপদানী বৈদ্যবাটী হুগলী। ছ টাকা।

একটি বড় আকারের আধুনিক কবিতার সংকলন গ্রন্থ হল কাশীনাথ ঘোষ সংকলিত 'সংকলিতা' নামের গ্রন্থটি। গ্রন্থের প্রথম কবিতা স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার পর থেকেই যে সব কবি স্থান পেয়েছেন তাঁরা হলেন অন্নদাশঙ্কর রায় প্রেমেন্দ্র মিত্র দক্ষিণারঞ্জন বসু শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কিন্তু সংকলনটির প্রথম থেকে বহু নামী কবির কবিতা স্থান পেলেও গোটা সংকলনের কৃতিত্বের কোন পরিচয় পেলাম না। বহু অপরিচিত, সদ্য পরিচিত কবির কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। অপাঠ্য বহু কবিতা থাকায় গ্রন্থটি বিরক্তি সৃষ্টি করে। কবিতাগুলি কিভাবে সাজানো হয়েছে? শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পর স্বর্গত বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দের কবিতা স্থান পায় কেন? রতীশ্বর হাজরা, অভিজিৎ ঘোষ ইত্যাদির পর মণীন্দ্র রায় কেন? ছাপা খুবই খারাপ, অজস্র ছাপার ভুল। কোন আধুনিক কাব্য সংকলন গ্রন্থ এভাবে হয় না করা উচিত নয়।

এখন এই রকম (গল্প সংকলন) : সমীরকান্তি বিশ্বাস। অধুনা সাহিত্য হালিশহর ২৪-পরগণা। চার টাকা।

মোট তেরোটি ছোট ছোট গল্প নিয়ে লেখক শ্রীসমীরকান্তি বিশ্বাস তাঁর 'এখন এই রকম' গল্প সংকলনটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। গল্পগুলিতে লেখককে চেনা যায়। আত্মকেন্দ্রিক ভাব ও ভাবনা এবং আত্ম-অনুগত ভাষা শব্দ ও প্রতীক প্রয়োগ করে লেখক গল্পের ভাষার আধুনিকতাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ছোট গল্প যে আত্মকথন অনেকাংশে গীতিকবিতার মত স্বগতভাষণ লেখকের ছোট ছোট গল্পগুলি তা প্রমাণ করে। মানুষ মুখোশ ও মণিময়; আয়নায়; দুঃখী; অপেক্ষা; সত্তর দশকের কড়চা গল্পগুলি বুদ্ধিমান পাঠকদের রসবোধ তৃপ্ত করতে সহায়ক।

পুরুষের প্রতি নারী (কাব্য সংকলন)। বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়, পোঃ পুরুলিয়া জেলা—পুরুলিয়া। ছ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লেখিকা বীণা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতার পাঠকদের কাছে পরিচিত নাম। বিভিন্ন বিখ্যাত কাব্য সংকলনে আলোচ্য কবির কবিতা স্থান পেয়েছে।

দীপন (উৎসব সংখ্যা) : সম্পাদক—শ্রীরতিরঞ্জন দত্ত। কারেন্ট বুক শপ ৫৭সি কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২। চল্লিশ পয়সা।

বিশেষ বুলেটিন হিসেবে 'দীপন' পত্রিকার উৎসব সংখ্যাটি সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। এতে বিজয়া দশমী উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাণী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের একটি দীর্ঘ কবিতা যেমন আছে তেমনি ঠাকুর সম্পর্কিত ও অন্যান্য শিক্ষা ও ধর্মমূলক বিষয় নিয়ে রচনা লিখেছেন পদ্মশ্রী কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মাপদ দাস অধ্যাপক গৌতম চক্রবর্তী প্রদীপ দাস। পত্রিকাটি ধর্ম ও শিক্ষামূলক।

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্যের—

খুঁজিতে মন নিজেরে হারাই ৬·৫০ পয়সা

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর ভাষায়— শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্যের লেখা একখানি আত্মবিশ্লেষণমূলক, তাই অনেকটা যেন আত্মচরিতভিত্তিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে কালের ছবি যথার্থভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ যুগ সুবিধাবাদের যুগ। যে সব যুবক আদর্শবাদকে আঁকড়ে থাকতে চায় সাংসারিক সুখ-শান্তির আশা তাদের কাছে সুদূরপরাহত। বর্তমানে সমাজের চারদিকে যা ঘটছে ঝরঝরে ভাষায় গ্রন্থকার তারই একখানি কথাচিত্র এঁকেছেন। সে হিসেবে উপন্যাসখানিকে যুগসাক্ষী বলে বর্ণনা করা চলে। এই লেখকের কাছে এমনি আরও রচনা প্রত্যাশা করি।'

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক ষ্টোর, ১৩, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ চাহিদা ও সরবরাহ

স্বল্পমেয়াদী হলেও গত কয়েকদিনের লোড শেডিং বা কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে ঘটনা কলকাতার বিদ্যুৎ চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে আবার কয়েকটা মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছে। গত চার পাঁচ মাস যাবৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ও বন্টনকারী সংস্থাগুলির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগে অবস্থার সন্তোষজনক উন্নতি হয়েছিলো সন্দেহ নেই। বর্তমানের ঘটনাগুলো দুর্ঘটনা হলেও দুঃখ ও উদ্বেগজনক। বিশেষত দুর্গাপুরে যখন অস্বাভাবিকভাবে ঘন ঘন এ রকমটি ঘটছে। আগামী কয়েক বছরে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমাদের কতটা উদ্যোগী হতে হবে এটা তারই ইঙ্গিতবাহী।

প্রথমতঃ ধরা যাক চাহিদার দিকটা। পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত চাহিদা কত এবং কিভাবে তা বাড়তে পারে সে সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। অবশ্য প্রকৃত চাহিদা বা বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা যথেষ্ট দুরূহ। যথা অনেক শিল্পপতি হয়ত বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থার উন্নতি ঘটলে তবেই শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হতে পারেন কিংবা সরবরাহ বাড়লে অনেকে হয়ত স্টোভ বা উনুনের বদলে হীটার ব্যবহার করবেন। এ ধরণের চাহিদার প্রকৃত পরিমাণ আগে থেকে ঠিক করা কষ্টসাধ্য। আজকাল বিদ্যুতের প্রায় ৭০% ব্যবহৃত হয় কলকাতা, দুর্গাপুর ও তার আশেপাশের শিল্পাঞ্চলগুলিতে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের যা কিছু খবর দেখছি তাতে আগামী কয়েক বছরে এইসব অঞ্চলেই শিল্প স্থাপনের হার বেশী হবে। জেলাগুলিতে কিছু ক্ষুদ্র শিল্প বা মিনি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হলেও বৃদ্ধির সিংহভাগ যাবে এতদিনের ব্যবহারকারীদের কাছেই। সম্প্রতি সিদ্ধার্থবাবু বঙ্গীয় বণিকসভায় যে প্রায় ১১৬টি চলতি বা পরিকল্পিত উদ্যোগের কথা বলেছেন যেগুলি বিদ্যুতের অভাবে সম্প্রসারিত হতে বা উৎপাদন চালু করতে পারছে না তার অধিকাংশই কলকাতার আশে পাশে। কারণ, জেলাগুলিতে বা দুর্গাপুরের কাছাকাছি যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বা ডি পি এল ও ডি ভি সি-র সেখানে গত কয়েক মাস বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রায় অব্যাহত রয়েছে। বর্ধমান কমিশন কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা বলতে গিয়ে এদিকটা তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ বাংলার বিদ্যুৎ চাহিদার কথা বলতে গেলে স্বভাবতই এবং যুক্তিযুক্তভাবেই কলকাতার কথাটাই প্রধান বলে মনে হয়। কলকাতার বর্তমান পূর্ণ চাহিদা (অর্থাৎ যদি ব্যবহারের কোনো বিধিনিষেধ না থাকে) দৈনিক গড়ে ৪৮০—৪৯০ মেগাওয়াট। গত কয়েক বছরে (১৯৬৮—১৯৭২ যখন লোড শেডিং শুরু হয়) চাহিদা বৃদ্ধির হার ৬—৮%। তবে ১৯৭২-৭৩ সালে বিদ্যুতের ব্যবহার (২৭৯৬ মিঃ ইউনিট) ১৯৭১-৭২এর তুলনায় (২৫০৪ মিঃ ইউনিট) বাড়ে মাত্র ৩%। যদি বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের দিকটাও ধরি তাহলেও বৃদ্ধির হার শতকরা ১০ এর বেশী নয়। কারণ (১) গত কয়েক বছরে এর বেশী বৃদ্ধি কখনও হয় নি। (২) গত কয়েক বছরে শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার (চাহিদার) শতকরা ৮-৬ এবং কৃষিক্ষেত্রে শতকরা ১০—১২ এবং কলকাতায় কৃষির জন্য কোন বিদ্যুৎ লাগেই না প্রায়। তাহলে শতকরা ১০ বৃদ্ধির হার হলে ৭৮।৭৯ নাগাদ চাহিদা দাঁড়াবে প্রায় ৮৫৫ মেগাওয়াট। শতকরা ১২ হলে ৯৪৩ মেগাওয়াট অর্থাৎ পাঁচ বছর বাদে কলকাতার প্রায় ৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। সি ই এস সি সম্প্রতি বলছেন যে চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ৭৫০ মেগাওয়াট। কিন্তু কিছুদিন হল বিদ্যুৎ পর্ষদ হিসেব করেছিলেন এটি দাঁড়াবে প্রায় ১০২০ মেগা-

ওয়াটে। পূর্বে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ৯০০ মেগাওয়াট সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করাই বিধেয়। তাছাড়া 'অধিকন্তু ন দোষায়'। হিসেবগুলো অবশ্য মেগাওয়াটে না দিয়ে ইউনিটে দিলে ভাল হয়। কারণ বিভিন্ন সংস্থা এক কিলোওয়াট স্থাপিত ক্ষমতা থেকে বিভিন্ন পরিমাণ বিদ্যুৎ পেয়ে থাকেন। যথা দুর্গাপুরে ২৮৬০ সি ই এস সি ৩৭২০ প্রভৃতি। (১ কিলোওয়াট ইউনিট বছরে শতকরা ১০০ কার্যকারিতায় ৮৭২০ ইউনিট উৎপন্ন করতে পারে)। সি ই এস সি জানাচ্ছেন যে ৭৮।৭৯ নাগাদ তাঁরা ৪৫০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারেন। নতুন যে সব ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছেন তার ফলে এবং সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে সুসাধ্য বলে মনে হতে পারে। হয়তো পুরনো ইউনিটগুলিকে ঠিক মত মেরামত করতে পারলে আরও বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। তাইলে বাইরে থেকে সরবরাহ প্রয়োজন ৪৫০ মেগাওয়াটের মতন। ডি ভি সি ডি পি এল ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গড়ে দৈনিক প্রায় ২০০—২১০ মেগাওয়াট মতন সরবরাহ করেন কলকাতায়। আগামী কয়েক বছরে ডি ভি সিতে প্রায় ৫৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতা স্থাপন করা হবে। তা থেকে প্রায় ৩৩০ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ক্ষমতা স্থাপিত হবে আরও কম। ক্ষ ৪৪০ মেগাওয়াট (সাঁওতালডিহি ৩ দুটি ২×২২০ মেঃ ওয়াট ব্যান্ডেল ২০০ মেঃ ওয়াট)। ডি পি এল-এর ৬ষ্ঠ ইউনিট সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আর যন্ত্রপাতির যা অবস্থা তাতে হয়তো এ থেকে সরবরাহ আরও কমে যেতে পারে। কিন্তু তা হলেও বাকী দুটি থেকে বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে কমপক্ষে ৬০০ মেগাওয়াট। (যেহেতু সব ইউনিটগুলিকেই এক সঙ্গে চালানো যাবে না।) তার থেকে বাড়তি মাত্র ২৫০ (বা শতকরা ৪০) মেঃ ওয়াট কলকাতায় সরবরাহ করতে হবে। বাকীটা অন্যত্র চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট। আর তা যদি নাও হয় ১৯৮০ নাগাদ সাঁওতালডিহির ৪র্থ ইউনিট কোলাঘাটের প্রথম ইউনিট ও ফরাক্কার ইউনিট থেকে আরও প্রায় ৫২০ মেঃ ওয়াট বাড়তি ক্ষমতা পাওয়া যাবে। কিছুদিন আগেও ডি ভি সির মোট সরবরাহের শতকরা ৪৪ পেতাম আমরা। বর্তমানে এটি কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় শতকরা ২৯ বা তার কমে। আর তাছাড়া আগামী কয়েক বছরে বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে যা ক্ষমতা স্থাপন করা হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে ডি ভি সি এই বাড়তি বিদ্যুৎটুকু দিতে পারবেন আশা করা যায়। যেমন সালানপুরে রেল তার নিজের বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং টিসকো তার নিজের কেন্দ্র খুলবে। কোল মাইনস অথরিটিরও নিজেদের কাজে (captive use) লাগানোর জন্য ঝরিয়ার কাছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র খোলবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। যদিও ডি ভি সির উৎসাহব্যঞ্জক কাজের (গত কয়েক মাসে এটি তার ক্ষমতা ব্যবহারের হার বাড়িয়েছে প্রায় শতকরা ৭০) ফলে এটি শেষ পর্যন্ত হবে কিনা বলা শক্ত।

তাহলে এখন এখন দুটি কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। (১) বর্তমান কেন্দ্রগুলো থেকে যাতে আরও বেশী (অথচ প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে—যা অবহেলা করলে আখেরে ভুগতে হবে) বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা। যেমন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ব্যান্ডেল কেন্দ্র গড়ে তার ক্ষমতার শতকরা ৫২—৫৪ কাজে লাগাতে পেরেছে। সি ই এস সিও জানিয়েছেন যে, শ্রমিক অসন্তোষ না থাকলে তাঁরা বর্তমানের ২২০ মেগাওয়াটের জায়গায় দৈনিক প্রায় ২৫০ মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারেন। (২) উপযুক্ত পরিবহণ বা Transmission এর ব্যবস্থা। গত কয়েক বছরে মোট বিনিয়োগের মাত্র শতকরা ১৯ নিযুক্ত হয়েছে এই ক্ষেত্রে। ফলে বাড়তি বিদ্যুৎ থাকা সত্ত্বেও কলকাতায় সরবরাহ করা যাচ্ছে না। শুধু তাই নয় ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে এখনকার ২২০ কিলোভোল্ট অ্যাম্পিয়ার-এর চেয়ে বেশী শক্তিসম্পন্ন লাইন বসানো যায় কিনা তাও ভাবতে হবে। সম্প্রতি ডি ভি সি-র ভূতপূর্ব সাহেব বলেছেন ব্যান্ডেল-হাওড়া লাইন বসানো হলে অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হয়ত অনেকটা শিথিল করা যেতে পারে। এর থেকেই এর গুরুত্ব অনুমান করা যেতে পারে।

সন্দেহ নেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমস্যা কেবলমাত্র 'paper capacity creation' বা 'Cold Statistics' -এর নয়। উপযুক্ত কয়লা শ্রমশান্তি প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সব আছে। তবুও আমাদের দক্ষ কুশলী কর্মীরা যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে যে-কোন দায়িত্ব পালনে সক্ষম তা তো দেখেছি। আর আগামী পাঁচ বছরে যে অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করব তার পরিপ্রেক্ষিতে কাজের দুঃসাধ্যতা নিশ্চয়ই কমবে। সুপরিকল্পিতভাবে ও সুসমন্বয়ের মাধ্যমে অনেক অসুবিধে দূর করা যেতে পারে। যেমন এপ্রিল—মে মাসেও দৈনিক গড়ে সরবরাহ ছিল ৪২০—২৫ মেঃ ওয়াট। অথচ তখন গড় উৎপাদন ক্ষতি ছিল ১৫ কোটি টাকা মাসে। উপযুক্ত ও সুপরিকল্পিত চেষ্টার ফলে অক্টো-নভেম্বর নাগাদ এটি কমে দাঁড়ায় মাসে ৮০ লক্ষ টাকায়। সমাধান অবশ্যই করা সম্ভব বিদ্যুৎ সরবরাহ সমস্যার। আর এটুকু না করতে পারলে চিরকাল অনুন্নতির অন্ধকারেই থাকতে হবে যে আমাদের।

দেবাদিত্য চক্রবর্তী।
পদার্থ-বিদ্যা বিভাগ।
আই-টি-আই
খড়গপুর

টুসু গানে সমাজমন ও প্রেম চেতনা প্রসঙ্গে

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী অমৃত-এ শান্তি সিংহের টুসু গানে সমাজমন ও প্রেমচেতনা প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। শান্তিবাবু পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। শস্যোৎসব টুসু-গানে কিভাবে সমাজমন ক্রিয়াশীল তা তিনি তথ্যসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে নতুন আলোকে বিচার করেছেন। এজন্য তিনি সকলের কাছে ধন্যবাদার্হ।

পুষ্পরাণী মাহাতো
প্রধান শিক্ষিকা
কেন্দা আদিবাসী বালিকা বিদ্যালয়
পুরুলিয়া

(২)

গত ৮ই ফাল্গুন ১৪ বর্ষ ৪১ সংখ্যা অমৃতে শান্তি সিংহ লিখিত টুসু গানে সমাজমন ও প্রেমচেতনা প্রবন্ধটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। হুগলী জেলা ধনিয়াখালী থানার যেখানে এই টুসু উৎসবের প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। সেইখানকার বাসিন্দা হয়ে এই টুসু উৎসব সম্বন্ধে যত-টুকু জেনেছি বা দেখেছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য রাখছি। যে প্রসঙ্গটি এ প্রবন্ধে দেখলাম না তা হল—

লেখক লিখেছেন টুসু মূলত মেয়েদেরই পরব। কিন্তু টুসু উৎসবে পুরুষরা বিশেষ-ভাবে ছেলেরা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে। মেয়েদের গানের সঙ্গে পুরুষরা হারমোনিয়াম ঢাক ঢোল করতাল এবং মাদলও ব্যবহার করে। কারণ উৎসবটি মূলত নিম্নশ্রেণী বা সম্প্রদায় অর্থাৎ কুর্মী ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই ব্যাপকভাবে পালিত হয়।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন সারা রাত্রি-ব্যাপী তিন থেকে সেল বার পূজা করা হয়। লেখক লিখেছেন, টুসু হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। কিন্তু শুধু তা নয়, লক্ষ্মীদেবী টুসুকে কন্যারূপে আবাহন করা হয়, পরে গানের মধ্য দিয়ে মাতার আসনে টুসুকে বসানো হয়। বাঙালীর ঘরে মাতা ও কন্যার মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে দেবী টুসুও সেই-রূপই এই মানুষদের কাছে। কারণ টুসু গানেই প্রকাশিত। যেমন—"আম গাছে আম বকুল দেখে/টুসু গেল কোলকাতা/আম পেকে আম ফরিয়ে গেল/তাও তো টুসু এলো না। আবার ছোট্ট মেয়ে টুসুকে উদ্দেশ করে গাওয়া হয়—চল টুসু চল্ খেলতে যাবো/রাণীগঞ্জের ঘটতলা/ফির-বার বেলা দেখিয়ে আনবো/কয়লা খাদের জল তোলা। দেশের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তাদের গানও। তাই মূল্য-বৃদ্ধিও স্থান পায় ওদের গানে—টুসু তোমা ধনে/কি দিয়ে পূজিব এই দুর্দিনে/খাদ্য-ভাবে সবাই ভাবে/তোমার কথা নাই মনে" লেখক সমাজমন ও প্রেমচেতনার কথা বললেও টুসু গানের মধ্য দিয়ে এই অশিক্ষিত মানুষদের ভিতরে কি করে পৌরাণিক কথা শোনানো হয় বা শেখানো হয় তা উল্লেখ করলেন না। একটি উদাহরণের সাহায্যে তা বোঝান যেতে পারে। যেমন অশোকবনে পাতের কুড়ে/সীতা পাশা খেলেছে/যোগীর বেশে রাবণ এসে/সীতা হরে নিয়েছে/সীতার অন্বেষণে/সোনার লঙ্কা পোড়াল হনুমান। অথবা—রাম না কিরে বনে যাবি/হাতে নেরে ধনুর্বাণ/চৌদ্দ বছর বনে থাকবি। চেয়ে দেখরে ময়ের প্রাণ। টুসু ভাসান উৎসবের দিন দলীয় ঝগড়ায় গানে যে সামাজিক চিত্র ফুটে ওঠে তা কবিগানেরই লড়াই অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। টুসু গানের ভিতর দিয়েই এরা পায় জাগরণের মন্ত্র। বিমূর্ত করে তোলে প্রেম-বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছাকে মনের মত করে।

অনেকেরই মতে টুসু গান প্রাক্ আর্য সভ্যতার দান। কেউ কেউ বলেন মঙ্গল-কাব্যের সময়ও এর সূচনা হয়নি। এই সম্প্র-দায়ের সাধারণ মানুষ জানে বা বলে এবং গবেষকদেরও ধারণা টুসু হল মোগল আমলে নিম্নশ্রেণী বা সম্প্রদায়ের এক সুন্দরী নারী বা কন্যা যার উপর অত্যাচার করেছিল বাদ-শাহী সৈন্যরা। তাকে কেন্দ্র করেই নিম্ন সম্প্র-দায়ের লোকেরা গড়ে তুলেছে এই অপূর্ব সংগীতাবলী। কিন্তু এই সংগীতধারাকে

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রাখার এবং উপহার দেবার মতো

বিশ্বভারতীর বই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত

কবিতা
খাপছাড়া। সচিত্র শোভন ১২.০০
নদী। সচিত্র শোভন ২.৫০
পলাতকা। শোভন ২.৭৫
বীরপুরুষ। সচিত্র শোভন ২.২০

নাটক
নটীর পূজা ২.৫০
ফাল্গুনী ১.৮০
বিসর্জন ৪.০০
বৈকুণ্ঠের খাতা ১.০০
লক্ষ্মীর পরীক্ষা। সচিত্র ৪.৫০

সংগীত
সংগীত-চিন্তা ৭.০০

বিবিধ
বিচিত্রা ১৮.০০, শোভন ২০.০০

অন্যান্য গ্রন্থকার-রচিত

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আলোর ফুলকি ৫.৫০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরানী চন্দ
ঘরোয়া ৫.০০
জোড়াসাঁকোর ধারে ৬.৫০

উইলিয়ম পিয়রসন
শান্তিনিকেতন-স্মৃতি ২.৫০

শ্রীমলিনা রায়
চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ ১০.০০

শ্রীলীলা মজুমদার
অবনীন্দ্রনাথ ২.০০

শ্রীরানী চন্দ
হিমাদ্রি ৪.০০

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
রবীন্দ্রসংগীত ১০.০০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয়ঃ ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬
বিক্রয়কেন্দ্রঃ ২ কলেজ স্কোয়ার। ২১০ বিধান সরণী

রক্ষা করার দায়িত্ব কি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নয়? এ গান তাদেরই গান যারা আছে মাটির কাছাকাছি।

চঞ্চল সিংহরায়
রোহিয়া, হুগলী।

বঞ্চিত গীতিকারের পক্ষে

গত ৭-২-৭৫ তারিখে জনৈক গীতিকারের লেখা 'আকাশবাণীর বঞ্চিত গীতিকার' শীর্ষক চিঠিখানিতে বেতার কর্তৃপক্ষের চরম ঔদাসীন্য ও অবহেলার যে সুস্পষ্ট পরিচয় বিশদভাবে পরিস্ফুট হয়েছে জানি না আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের সুপ্ত বিবেককে তা কতটুকু জাগ্রত করতে সক্ষম হবে।

আমি নিজেও একজন আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার। আমার অভিজ্ঞতাও উক্ত বিষয়ে পত্রলেখকের অনুরূপ। ১৯৭৩ সালে ১৪ই জুন তারিখে আমি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অধিকর্তার সঙ্গে গীতিকারদের রয়ালটি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ পাই। উক্ত আলোচনার অংশবিশেষ কিছুদিন পর দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গীতিকারদের রয়ালটির ব্যাপারে কেন্দ্রাধিকর্তা যে তাঁর প্রতিশ্রুতিমত কাজ করতে পেরেছেন তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেল। হঠাৎ রেডিও থেকে একটি অবাক-করা মণি অর্ডার আমার নামে আসে (৩১-১-৭৫) যাতে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত রয়ালটি পাঠানো হলো বলে উল্লেখ থাকে। আশ্চর্যের কথা ১৯৭৩ সালের পূর্ববর্তী বছরগুলির রয়ালটির কোন হিসাব উক্ত কুপনে উল্লেখ ছিল না। অমৃত-তে প্রকাশিত আকাশবাণীর বঞ্চিত গীতিকার চিঠিটি দেখার পর গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ তারিখে কেন্দ্রাধিকর্তার সঙ্গে দেখা করি এবং বেতারের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে রয়ালটি প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়। আলোচনা করে বুঝলাম যে রয়ালটির বিষয়টি রীতিমত গোলমেলে ও ধোঁয়াটে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ গীতিকার বন্ধুর কাছে শুনলাম যে তাঁদেরও অবস্থা একই রকম। এঁদের মধ্যে একজন গত ১৯৬৫ সাল থেকে আকাশবাণীর গীতিকার তালিকাভুক্ত। সুগীত শিক্ষার আসরেও এর অনেক গান প্রচারিত হয়েছে অথচ গত ১০ (দশ) বছরের মধ্যে ইনি একটি পয়সাও পাননি। প্রসঙ্গত আরো একটি মজার কথা বেতার দপ্তর থেকে শুনে এলাম যে সুগীত-শিক্ষার আসরে প্রচারিত কোন গীতিকারের গানের জন্য নাকি কোন রয়ালটি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় না। অথচ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত চুক্তিপত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা হয়েছে।

অমৃত ৭-২-৭৫ তারিখে প্রকাশিত পত্রটির জন্য অজ্ঞাত গীতিকার বন্ধুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই অমৃত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে।

অরুণ সেন
কলি-৪।

রান্না করে দেখুন

৩৯ সংখ্যা অমৃত সাপ্তাহিকে শ্রীযুক্তা সাধনা মুখোপাধ্যায় কাঁচকলার দধিবড়া রান্না করে দেখতে বলেছেন। কাঁচকলার দধিবড়া করা যায়, কিন্তু তা খাওয়া যায় না। কারণ কাঁচকলার বড়ার মধ্যে দই ঢুকে সেটা কখনই নরম হয় না। দধিবড়া মুখে দিলে তার যে একটা বিশেষ স্বাদ পাওয়া যায় সেটা কাঁচ কলার বড়াতে কখনই পাওয়া সম্ভব নয়। কাঁচ কলা বেটে বড়া করলে সেটা বেশ শক্ত হয়। কাজেই দই-এর মধ্যে ফেললেও সেটা কখনই নরম হয় না।

আর একটি বিষয় লিখছি। গত সপ্তাহে বোধহয় শ্রীযুক্তা মুখোপাধ্যায় পেয়ারার জেলি ও জ্যাম-এর বিষয় লিখেছেন। দুটোতে তো কোন তফাৎ দেখছি না। একটাতে শুধু পেয়ারার দানা ফেলে সেদ্ধ করতে বলেছেন, আর একটাতে দানাসুদ্ধ সেদ্ধ করতে বলেছেন। আর লাল রং দিতে বলেছেন। পেয়ারা সেদ্ধ জল চিনি দিয়ে জাল দিলেই লাল রং হয়। পরে লেবুর রস বা সাইট্রিক এসিড দিলে জমে গিয়ে রংটা আরও লাল হয়ে যায়। সুতরাং আলাদা রং দিয়ে জেলি কখনও করিনি। আশা করি এ সমালোচনার জন্য শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় কিছু মনে করবেন না। তিনি রান্না করে দেখতে অনেক জিনিসই লেখেন কিন্তু আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারে ইচ্ছা থাকলেও যে সব রান্না করে দেখার সুযোগ হয় না। পড়তে ভালই লাগে।

বাণী রায়
কলিকাতা-৪৮

আশাপূর্ণা দেবীর গল্প

অমৃত' পত্রিকার গত ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৫ (১৭ মাঘ, ১৩৮১) সংখ্যায় শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর 'অথচ অবনীশ খারাপ ছিল না।' গল্পটি নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর ছোট গল্প। গল্পটি পড়া শেষ করার পরও তার করুণ সুরটি আমাদের মনের তন্ত্রীতে অনুরণিত হতে থাকে। অবনীশের অসহায়তার ছবি আমাদের মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। ভদ্র ও শিক্ষিত অবনীশের মত আমাদেরও অনেক সময় এই রকম নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

আশা করব এ রকম সুন্দর গল্প 'অমৃত' সম্পাদক মহাশয় আমাদের আরও উপহার দেবেন।

সুবিমল ভাদুড়ী
কলকাতা—৪১

বর্তমান লেখকগণের প্রতি আবেদন

গত ১৩৭৮ সাল থেকে প্রকাশিত প্রতি বছরের 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী' মারফৎ আমি বর্তমান সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশ করে আসছি। এবারে আমি স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত তথ্য স্বাক্ষর ও ছবিসহ জীবিত সাহিত্যিকদের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। তথ্যগুলি যাতে নির্ভুল হয় তার জন্য একটি ছাপানো ফর্মা সাহিত্যিকদের পাঠিয়ে থাকি এবং তাঁরা সেটি আমাকে পূরণ করে পাঠান। এ পর্যন্ত প্রায় এক-হাজার ফর্ম আমি পেয়েছি। কিন্তু আমার ধারণা এখনো অনেকের সম্বন্ধে তথ্য আমি যোগাড় করতে পারিনি। অথচ এই জাতীয় ব্যয়বহুল গ্রন্থ একবার প্রকাশের পর পুনঃ প্রকাশে দেরী হতে পারে ও অসম্পূর্ণ তথ্যাদি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। তাই বর্তমান লেখকদের সমাজের প্রতি আমার আবেদন, যাঁরা এখনো আমাদের ফর্ম পূরণ করে পাঠান নি তাঁরা যেন অবিলম্বে আমার ঠিকানায় চিঠি দিয়ে ফর্ম চেয়ে পাঠান ও বৈশাখ মাসের মধ্যে তা পূরণ করে পাঠান। পাঠ্য পুস্তক ছাড়া সমস্ত ধরনের বাংলার গ্রন্থরচয়িতার ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের বাঙ্গালী লেখকও আমাদের পরিকল্পনার অঙ্গীভূত।

আশা করি বর্তমান লেখকসমাজ এ জাতীয় একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমাকে তথ্য পাঠিয়ে সাহায্য করবেন।

অশোক কুণ্ডু
সম্পাদক—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী
পোঃ ফুলনগর হাওড়া
পঃ বঙ্গ

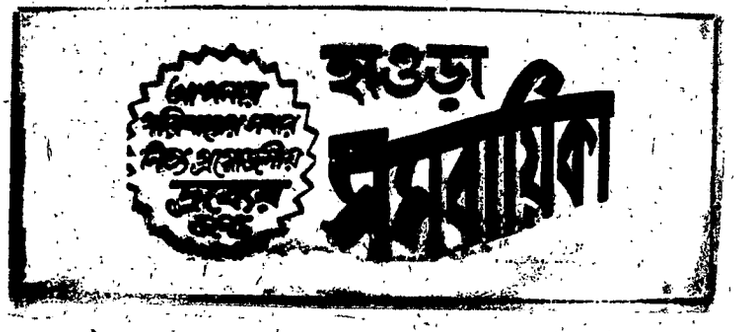

আর্থিক প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট বিচার

—কিরে গণশা, তুই বড় বেঁচে গেলি—লা।

ডাকনাম গণশা হলেও সম্বোধিত ব্যক্তিটি দেখলাম বেশ জ্ঞানবান। কারণ, উত্তর এল ঃ কালকের দিনটা যাক, তারপর বলিস।

ঘটনাটি কলকাতার এক কাঁচা বাজারের এবং সংলাপ হল দুজন সবজি-বিক্রেতার মধ্যে। দুজনই আমার চেনা, তবে কারও নাম তখন পর্যন্ত জানতাম না। সাধারণত আমি সন্ধ্যার পর বাড়ী ফেরবার মুখে বাজারটা সেরে নিই। উদ্দেশ্য ঃ সকালের ভিড় ও অপেক্ষাকৃত মহার্ঘতা উভয়কেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া। তা ছাড়া রাত্রে বাজারটা সেরে রাখলে আশ্রমপীড়ার অন্যতম কারণও দূরীভূত হয়।

রাত্রে অনেকদিন বাজারে ঢুকে জ্ঞানবান গণেশবাবুকে ঠিক তুরীয় বা মত্ত না হলেও খানিকটা বেসামাল অবস্থায় দেখেছি। তবে তাতে যে তাঁর ব্যবসায়ী-চরিত্রের কোন রকম হানি ঘটেছিল বলে মনে হয়নি।

গণশার দোকানের পাশেই অপর ব্যক্তিটির পসড়াসম্ভার। ব্যক্তিটির মুখে সর্বদাই একটি আধপোড়া বিড়ি। নিশ্চয়ই এক সময় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু সব সময় নির্বাপিত অগ্নিই দেখেছি।

ধূম্রসেবী, না দারুপায়ী—কে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন জানি না। তবে আমি যখন এসে পৌঁছুলাম তখন সবেমাত্র রেডিওতে বাজেটের সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। সুতরাং আলোচনা হচ্ছিল নতুন কেন্দ্রীয় করভার নিয়ে।

আধপোড়া বিড়ির মালিকেরই পার্শ্ববর্তী পসারীকে উদ্দেশ্য করে উক্ত ঃ কিরে গণশা, তুই বড় বেঁচে গেলি—লা।—অর্থাৎ মদের ওপর করভার বাড়ল না, কিন্তু মারা পড়ল বিড়ি—অর্ধদগ্ধ অবস্থায় যা বক্তার একরকম অঙ্গীভূত।

গণেশবাবুর উত্তর ছিল ঃ কালকের দিনটা যাক, তারপর বলিস। ধূম্রপায়ীর ধারণা না থাকলেও গণেশবাবু সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন যে মদের ওপর কর ধার্যের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের —কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। তাই তিনি বলেছিলেন কালকের দিনটা যাক...। কালকের দিনটা মানে ১লা মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারে বাজেট পেশের ধার্য দিন।

১লা মার্চ রাত্রেই শুনলাম মদের ওপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। সুতরাং গণেশবাবুর আশঙ্কাই ঠিক—সেও বাঁচল না। কিন্তু বেঁচে গেল অহিফেন-গঞ্জিকা-সেবীরা। এইসব মৌতাতের ওপরও উৎপাদন-শুল্ক ধার্যের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের। এদের বলা হয় নিষিদ্ধকরণ উৎপাদন-শুল্ক —প্রহিবিটিড একসাইজেস। উদ্দেশ্য ঃ কর ধার্যের ফলে দাম বৃদ্ধির দরুন এদের ভোগ বা কনজামসান হ্রাস পায়। এ বছর কিন্তু এই রাজস্ব বহির্ভূত উদ্দেশ্য নিয়ে কোহল পানীয়ের ওপর কর বৃদ্ধি করা হয় নি, কর বৃদ্ধি করা হয়েছে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। মনে হয়, নীতিটিকে অহিফেন-গঞ্জিকার ক্ষেত্রে প্রসারিত করলে রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেত। তবে হয়ত করব্যবস্থায় গতিশীলতারও কিছুটা হানি ঘটত। কারণ, এইসব মৌতাত সাধারণত দরিদ্র শ্রেণীর ভোগ-পরিধির আওতায় পড়ে।

মোট করবৃদ্ধি ঃ

আগামী বছরের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট করবৃদ্ধির মাধ্যমে ১২ কোটি টাকার

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাস্তব থ্রিলার

শৃগালের শেষ প্রহর ২৫.০০

ফ্রেডরিক ফরসাইথ-এর দি ডে অফ দি জ্যাক্যাল

দি কার্পেটব্যাগার্স ও অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিনের "আতঙ্ক সেই সঙ্কেত" অসাধারণ অনুবাদের পর বিশ্বের অদ্বিতীয় এই বাস্তব থ্রিলারটির অনবদ্য ভাষান্তর করেছেন সৌরীন রায়।

দি কার্পেটব্যাগার্স

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ২০.০০

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর

কোন পথে ?

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ১৮.০০ প্রথম খণ্ড ॥ ১২.০০

গর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রথম খণ্ড—৩৩টি গল্প/ভাষান্তর ঃ অসিত সরকার ॥ ২০.০০

এরিখ মারিয়া রেমার্ক
প্রেম মৃত্যু ভালবাসা ১৪.০০

নিমাই ভট্টাচার্য
শেষ পারানির কড়ি ৭.০০

সৌরীন রায়
ওয়াটারগেট কলঙ্ক ৭.০০

জুলিয়াস ফুচিক
ফাঁসীর মঞ্চ থেকে ৫.০০

প্রকাশক—পত্রপুট / পরিবেশক—কথা ওকাহিনী ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ১২

মত অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উত্তরপ্রদেশের বাজেট অনুমিত ২০ কোটি টাকার ঘাটতি মেটাবার জন্যে কোন করবৃদ্ধি বা নতুন কোন কর ধার্যের প্রস্তাব করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে কৃষি আয়কর পর্যন্ত। আর প্রস্তাবিত নতুন কর ধার্যের মধ্যে আছে বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকার ওপর কর। এই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ সমর্থনীয়। সরকারী আয়-ব্যয় শাস্ত্র বা পাবলিক ফিনান্স আজ বিবিধ উদ্দেশ্যসাধক। অন্যতম উদ্দেশ্য হল আর্থিক বৈষম্যের সংকোচন। কর-ব্যবস্থাকে বিস্তৃততর করার দাবিও আজ সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁ বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকা ইত্যাদির ওপর কর যে কাম্য গতিরই নির্দেশ করে তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে। কৃষি আয়করের বেলায় বলা যায়, রাজ কমিটি প্রভৃতির সুপারিশ অনুসারেই কাজ করা হয়েছে। অপর দিকে যে পেন্সিল-নানচিত্র-ইনস্ট্রুমেন্ট বকস প্রভৃতির বিক্রয় কর থেকেও অব্যাহতির ছাত্রদের কিছুটা সুবিধা হবে তাও তর্কাতীত। কিন্তু পুস্তক-পত্রিকার জন্যে ব্যবহৃত প্যাকিং-এর জিনিসপত্রকে যে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তার নীট ফল কিছুই অনুভব করা যাবে না, কারণ কেন্দ্রীয় বাজেটে ঐসব দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়েছে। তবে দাম হয়ত আরও বাড়ত, তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নতুন করের ব্যাপারে বলা যায়, তামিল নাড়ুর মত বৃত্তির ওপর কর ধার্য করলে কি রকম হত? মহারাষ্ট্র সরকার যদি আমাদের দেখে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁর ওপর কর বসাতে পারে, তবে আমরাও হয়ত তামিলনাড়ুর ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারতাম। অর্থাৎ, প্রথমটা বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও কর-ব্যবস্থাটা আরও একটু উৎপাদনশীল করে তোলা সম্ভব হত।

শিল্পায়নে সহায়তা :

এই সূত্র থেকে সংগৃহীত অর্থ শিল্পায়নে, বেকার-সমস্যার মোকাবিলা নগরাঞ্চলের উন্নয়নে—নানাভাবে ব্যয় করা যেত।

এই দিকে অবশ্য বেশ কিছুটা করা হয়েছে। যেমন, বিক্রয়করের অব্যাহতির সীমা ১০ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং নতুন প্রতিষ্ঠানদের বেলায় প্রথম বিক্রী থেকে ৩ বছর কোন বিক্রয় কর দিতে হবে না। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ সিল্কের উৎপাদকদের এই করের ব্যাপারে আরও কিছুটা সুবিধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা অর্থমন্ত্রী অভিহিত দৈত সমস্যার—দারিদ্র্য ও বেকারত্বের —কতদূর মোকাবিলা করা সম্ভব হবে জানি না।

উদ্বৃত্ত বাজেট :

১৩ বছরের মধ্যে বাজেটে প্রথম উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে, যদিও উদ্বৃত্তের পরিমাণ অতি সামান্য—মাত্র ২৭ লক্ষ টাকা। ১৩শ কোটি টাকার মোট বাজেটে ২৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের অনুমান অর্থনীতির ভাষায় প্রান্তিক বলে অভিহিত হতে বাধ্য, তবুও কিন্তু এ নিয়ে বিশেষ হৈ-চৈ করা হয়েছে। কারণ এদেশে উদ্বৃত্ত বাজেটের দৃষ্টান্ত আজকাল বড় একটা মেলে না। এবছর কেন্দ্রীয় বাজেট, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বাজেট—সবই ঘাটতি বাজেট। তবে ঐসব ক্ষেত্রে ঘাটতি বাজেটই রাখা হয়েছে, আর পশ্চিমবঙ্গে উদ্বৃত্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে ১২ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত কর-রাজস্বের ব্যবস্থা করে। আগেই বলেছি, উত্তরপ্রদেশের বাজেটে ২০ কোটি টাকার ঘাটতি সত্ত্বেও কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয় নি।

নতুন কর ধার্যের ব্যবস্থা না করেও বিরাট উদ্বৃত্তের ব্যবস্থা করে এ বছর কাজ চালানো যেত যদি অবশ্য ১৩০ কোটি টাকার মত বকেয়া কেন্দ্রীয় ঋণ শোধের ব্যবস্থা না করা হত। বলা যেতে পারে, পরিশোধ্য ঋণের ব্যবস্থা ত করতেই হবে। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যই তা করেনি, এবং অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এইভাবে জমা ঋণ শেষ পর্যন্ত অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মকুফ করা হয়। অন্যান্য রাজ্য এই সুবিধের আশায় বসে আছে বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেও এই পথ অবলম্বন করলে ক্ষতি ছিল কি?

প্রত্যেকটি সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর লোকসান হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন যে এইভাবে করদাতার স্কন্ধে সরকারী উদ্যোগাধীন সংস্থাসমূহের ভার কতদিন এবং কতদূর রাখা যেতে পারে? নিয়োগ-সংস্থানের দিক দিয়ে এর প্রয়োজন হলে বাছাই-এর প্রশ্ন ওঠে। পর্যটক-নিবাসের কোনগুলো রাখা হবে আর কোনগুলো বন্ধ করা হবে—সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের দিন কি আসে নি?

উপসংহার :

অর্থমন্ত্রীর হাতে ভার ছিল বাজেট-প্রণয়নের। সে ব্যাপারে তিনি অনেক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। আর কেরামতি দেখিয়েছেন কর-সংগ্রহের ব্যাপারে। সংগ্রহ ব্যবস্থায় তাঁর ফাঁক পূরণের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবুও কিন্তু তিনি বাজেটকে গতিশীল সমাজ-ব্যবস্থার উপযোগী করে তুলতে পারেন নি—দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে দুই প্রধান দুশমন বলে বর্ণনা করলেও তাদের প্রতিরোধ করার কোন নতুন পন্থার সন্ধান বা জোরালো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। নিরাময় নয়, কিছুটা উপশমই তাঁর লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়।

৭-৩-৭৫ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যিক বীরেন্দ্র দত্তের

পাহাড়ে সমুদ্রে	৮·০০	চতুর্দশী	৪·০০
খেলার ছলে	৫·৫০	ঘণ্টাঘড়ি	৪·৫০

কবি হরপ্রসাদ মিত্রের

হৃদয়ে চকিতে কে সে ৪·০০

আশা প্রকাশনী ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯

ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

১৩৮২—সন্দেশ—১৩৮২

লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায় ও নলিনী দাশ সম্পাদিত

বৈশাখ সংখ্যা এপ্রিল ১৯৭৫-এ প্রকাশিত হবে।

বার্ষিক সডাক মূল্য ১৭·০০ পূজা সংখ্যা হাতে নিলে ১৬·০০

সমস্ত সংখ্যা হাতে নিলে ১৫·০০

এখনই গ্রাহক/এজেন্ট হবার জন্য দরখাস্ত করুন

১৭২।৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯ ফোন ৪৬-৪৯১৯

নিউ স্ক্রিপ্ট, এ-১৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলি-১২

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই কথাটি তিনি আরো প্রাঞ্জল ভাষায় আমাকে বলেছিলেন ৪-২-৪৩ তারিখে—যেদিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে অনেকক্ষণ কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম নানা নৈপথ্য-শক্তি ও ধ্যানপদ্ধতি সম্বন্ধে। আমার AMONG THE GREAT -এ কথালোপের বিবৃতি দিয়েছি। তা থেকে এখানে অল্প একটু অনুবাদ দিই গুরুদেবের বক্তব্য পরিস্ফুট করতে। তিনি বলেছিলেন ঃ

"যখন আমি কিছু বলি বা লিখি তখন আমি শুধু চাই আমার উপলব্ধি বা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করতে—বলি না আমার কথা সবাইকে মেনে নিতে হবে। এত বৎসর ধরে আমার পরিচয় পাওয়ার পরেও কি তুমি মনে করতে পারো যে আমি আমার জীবন-দর্শন আর সবাইকে বরণ করতে বাধ্য করব? আমি কোনো দিনই সর্বেশ (dictator) হতে চাই নি, বা বলি না সকলের মতামতই আমার মতামতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই,—যেমন আমি বলি না যে, সকলেই আমার অনুচর হয়ে আমার যোগে দীক্ষিত হোক।"

অথচ একদিকে তিনি ছিলেন যেমন নির্বিবাদী, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল অন্যদিকে, ছিলেন তেমনি হিমালয়ের মতন অটল অচল, দ্রষ্টা ঋষি—একান্তী, অকুতোভয়। দেশের জন্যে প্রাণদান তাঁর কাছে কোনোদিনই কঠিন মনে হয় নি। যখন তিনি আলিপুর জেলে ছিলেন তখন অনেকেই তো ভেবেছিলেন যে তাঁর প্রাণদণ্ড হবেই হবে। কিন্তু তিনি ছিলেন বিনিঃশঙ্ক, নিত্যধ্যানমগ্ন—অনেক সময়ে এমন কি নাওয়া খাওয়াও ভুলে যেতেন তন্ময় সমাধিতে। সাধে কি কবিগুরু সে দুর্লক্ষণে তাঁকে নমস্কার করেছিলেন এই বলে

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভর বাণী
উদার মৃত্যুর!

গুরুদেবের এক সতীর্থ শিষ্য বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দামানে বারো বৎসর কাটিয়ে ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন ঃ 'ভাই, কোনো মহৎ আদর্শের জন্যে এককথায় প্রাণকে বলিদান দেওয়া কঠিন মানি। কিন্তু সে আদর্শের জন্যে একান্তী হয়ে বাঁচা ঢের বেশি কঠিন। আবেগ, উচ্ছ্বাস, উন্মাদনার ঝোঁকে হাজার হাজার সৈন্য বা শহীদই প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সমস্ত মনের প্রাণের শক্তি সামর্থ্যকে কোনো মহৎ আরাধনার জন্যে একমুখী করতে পারেন কজন, বলবে আমাকে?—মাত্র দুচারজন বিরল মহাপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ এই যুগের ক্ষণজন্মা—তাঁকে অনুসরণ করা তো দূরের কথা—চিনতে পারাও সম্ভব নয় চোখের ঠুলি না খসলে।'

আমি উপেন্দ্রনাথের কথাগুলি নিজের ভাষায়ই সাজিয়ে বললাম কিন্তু তাই বলে তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নিইনি যা তিনি বলতে চাননি। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য বিকাশের অপূর্ব দৃশ্য দেখে আমার নিজেরও অনেক সময়েই মনে হয়েছে যে, তাঁর যথার্থ তর্পণ হতে পারে না এ বস্তুতান্ত্রিক, বুদ্ধিবাদী, বৈজ্ঞানিক যুগে যার ভিত্তি ইন্দ্রিয়লব্ধ তথা বুদ্ধি-সমর্থিত উপরভাসা প্রত্যয়ের পরিসংখ্যানী এজাহার — Statistics : তার জন্যে চাই (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়) আন্তর দিব্যদৃষ্টি যে বলে (দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অপরূপ বাউলের ভাষায়)

এতদিন তো ঢেউয়ে ভেসে
দিলি সাঁতার উপর দেশে
ডুব দিয়ে আজ চাই দেখা চাই—
কতখানি গভীর জল।

এ-দৃষ্টি স্বভাববিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল কীভাবে তার কিছু পরিচয় দিতে তাঁর একটি প্রখ্যাত পত্রের উদ্ধৃতি দিই। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আমাকে একদা লিখেছিলেন—তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের জন্যে একটি প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতে চান বিলেতে, তাতে শ্রীঅরবিন্দের নিবন্ধ চাই-ই চাই।

শ্রীঅরবিন্দ এ-হেন সুগম্ভীর প্রস্তাবকে আমলই দিলেন না। লিখলেন আমাকে ঃ

"Philosophy ! Let me tell you in confidence that I never, never, never was a philosopher—although I have written philosophy which is another story altogether. I knew precious little about philosophy before I did the Yoga and came to Pondichery — I was a poet and a politician not a philosopher ! How I managed to do it and why? First, because Paul Richare proposed to me to cooperate in a philosophical review—and as my theory was that a Yogi ought to be able to turn his hand to any thing I could not very well refuse : and then he had to go to the war and left me in the lurch with sixty-four pages a month of philosophy all to write by my lonely self. Secondly, because I had only to write down in the terms of the intellect all that I had observed and come to know in practising Yoga daily and the philosophy was there, automatically. But that is not being a philosopher !

I don't know how to excuse myself to Radhakrishnan—for I can't say all that to him. Perhaps you can find a formula for me ? Perhaps : "so occupied, not a moment for any other work, can't undertake because he might not be able to carry out his promise". What do you say ?"

(ভাবার্থ ঃ দর্শন? তোমাকে চুপি চুপি বলছি শোনো—আমি কস্মিনকালেও দার্শনিক ছিলাম না, ছিলাম না, ছিলাম না—যদিও আমি দার্শনিক তত্ত্বকথা লিখেছি। আমি পণ্ডিচেরি আসার ও যোগসাধনা সুরু করার আগে দর্শন সম্বন্ধে খুব কমই জানতাম। আমি ছিলাম কবি ও রাজনৈতিক

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম ---- ১৪·০০
২। গুল বাগিচা ---- ৩·৫০. ৩। কাব্য আমপারা ---- ৪·০০
৪। পুবের হাওয়া ---- ২·০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি ---- ২·০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

—দার্শনিক না। তবে কেমন করে দর্শনরাজ্যে প্রবেশ করলাম? বলি প্রথমে হল কি, পল রিশার এক দার্শনিক ম্যাসিক প্রকাশ করার প্রস্তাব করল, আর যেহেতু আমি বলতাম যোগী সব কিছুই করতে পারে, সেহেতু না বলতে বাধল। তারপরে সে আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়ে চলে গেল যুদ্ধে —ফলে আমাকে একাই লিখতে হল প্রতি মাসে চৌষট্টি পাতা দার্শনিক তত্ত্বকথা। দ্বিতীয়তঃ আমি শুধু বুদ্ধির পরিভাষায় লিখে চললাম যা আমি দিনের পর দিন যোগে উপলব্ধি করেছি। কাজেই সেখানে স্বতঃই হল দর্শনের অভ্যুদয়। কিন্তু এ-কীর্তিকে দার্শনিক কীর্তি নাম দেওয়া যায় না।

কিন্তু এসব কথা তো রাধাকৃষ্ণনকে বলা চলে না। ভেবে বার করো উপায়। ধরো, যদি বলা যায়—আমি মহাব্যস্ত, হয়ত ভার নিয়ে কথার খেলাপ হয়ে যেতে পারে। কী বলো?)

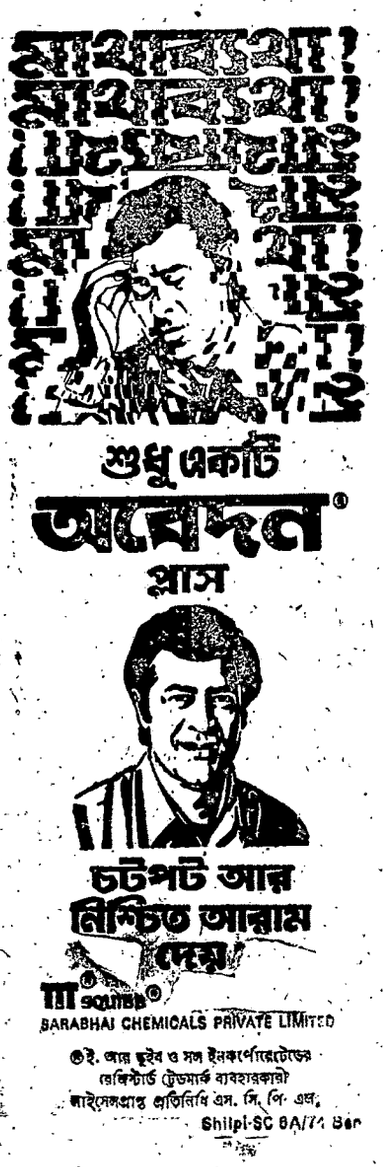

উত্তরে আমি লিখেছিলাম তাঁকে ঘোর আপত্তি করে যে, তিনি নিজেকে ফিলসফার উপাধি দিতে চান না এ অন্যায়। কারণ—লিখেছিলাম আমি—এ-যুগে যে তাঁর মতন প্রতিভাধর দার্শনিক আর জন্মায় নি একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। আমার এ-আপত্তির উত্তরে তিনি কিছু লিখেছিলেন কি না মনে করতে পারছি না, তবে মনে আছে আমি লিখেছিলাম যে, আপনি নিজেকে রাজনৈতিক (politician) না বলে বিপ্লবী বললে আমরা সবাই সানন্দে সায় দিতে পারতাম।

তবে তিনি যে শুধু কবি নন, মহাকবি, এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মতভেদ ছিল না। পরে যখন তাঁর 'সাবিত্রী' প্রকাশিত হয়, তখন এ-সম্বন্ধে আরো বহু কাব্যরসিক সায় দিয়ে তাঁর কবিপ্রতিভার জয়ধ্বনি করেছিলেন। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ছাত্রদের এক উৎসাহী সভায় সাবিত্রী সম্বন্ধে ভাষণ দিতে আহূত হয়ে বলেছিলাম ঃ 'আজকের দিনে শ্রীঅরবিন্দ সাধারণতঃ মহাবিপ্লবী মহাদার্শনিক ও মহাযোগী বলেই প্রখ্যাত, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে লোকে মানবেই মানবে যে তিনি মহাকবিও বটে—যেহেতু সাবিত্রী আসলে শুধু মহাকাব্যই নয়, এপিকবর্গীয় কাব্য।'

কিন্তু সে যাক, কিছুদিন পরে স্যার রাধাকৃষ্ণন আমাকে আবার ধরলেন। তখন আমি বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়েই লিখলাম গুরুদেবকে ঃ গুরু! কিন্তু বেচারা আমাদের কেন বিষণ্ণ করছেন অকারণ? আমরা চাই ও-দেশেও আপনার নামডাক হোক। তাই আমি বলবই বলব যে, স্যার রাধাকৃষ্ণন ঠিকই বলছেন—আপনার লেখা উচিত। আমি তাঁকে লিখেছি একথা যে তাঁর অনুরোধ মাদৃশ বহু সুবোধের সুযুক্তিরই সায় আছে।'

কিন্তু গুরুদেব হিমালয়ের মতন অটল! খলেন ঃ

"Dilip,

As to Radhakrishnan, I do not care whether he is right or wrong in his eagerness to get the contribution from me. But the first fact is that it is quite impossible for me to write philosophy to order If something comes to me of itself, I can write, if I have time..... And the second fact is that I do not care a button about having my name in any blessed place. I was never ardent about fame even in my political days; I preferred to remain behind the curtain, push people without their knowing it and get things done. It was the confounded British Government that spoiled my game by prosecuting me and forcing me to be publicly known as a "leader" Then again I don't believe in advertisement except for books, and in propaganda except for politics and patent medicines. But for serious work it is poison. It means either a stunt or a boom, and stunts and booms exhaust the thing they carry on their crests and leave it lifeless and broken, high and dry on the shores of nowhere—or it means a movement. A movement in the case of a work like mine means the founding of a school or a sect or some other damned nonsense. It means that hundreds or thousands of useless people join in and corrupt the work or reduce it to a pompous farce from which Truth that was coming down recedes into secrecy and silence. It is what has happened to the "religions" and is the reason of their failure. If I tolerated a little writing about myself, it is only to have a sufficient counter-weight in that amorphous chaos, the public mind, to balance the hostility that is always aroused by the presence of a new dynamic Truth in this world of ignorance. But the utility ends there and too much advertisement would defeat the object. I am perfectly "rational", I assure you, in my methods and I do not proceed merely on my personal disi of fame. If and in so far as publicity serves the Truth, I am quite ready to tolerate it. but I do r find publicity for its own sake desirable. (2-10-34).

(ভাবার্থ ঃ রাধাকৃষ্ণনের অনুরোধ যৌক্তিক না অযৌক্তিক এ-প্রশ্ন অবান্তর। প্রথম কথা হচ্ছে, কারুর উপরোধে তত্ত্বকথা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।...দ্বিতীয় কথা, আমার নাম কোথাও হল বা না হল এ নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। এমন কি বিপ্লবী যুগেও আমি কোনোদিনই যশমান চাই নি। আমি পর্দার আড়ালে থেকে একে ওকে তাকে এগিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলাম। এই অর্বাচীন বৃটিশরাজন্যেরাই আমার ফন্দি ধরে ফেলে আমাকে গ্রেপ্তার করে নেতা হতে বাধ্য করল। অপিচ বিজ্ঞাপনের ধুমধামে আমার আস্থা নেই, না প্রপাগাণ্ডায়—কেবল রাজনীতিতে বা পেটেন্ট দাওয়াইয়ে ছাড়া। সত্যিকারের কাজে বিজ্ঞাপন প্রপাগাণ্ডার ক্রিয়া বিষের মতন। এর পরিণাম হয় একটা প্যাঁচ বা হট্টরোল যার ফল হয় নিষ্প্রাণ ছত্রাকার—কিম্বা কোনো দল-গড়া। হাজার হাজার বাজে হুজুগেরা এসে হাজির হয়—যার ফলে আন্দোলনটা হয়ে দাঁড়ায় এক জাঁকালো প্রহসন। সঙ্গে সঙ্গে যে-সত্য প্রকাশ হচ্ছিল সে পিছিয়ে গিয়ে নিশ্চুপ হয়ে যায়। চিরকাল এইই হয়ে এসেছে নানা ধর্মের দাপাদাপিতে—অর্থাৎ নিষ্ফলতা। আমার সম্বন্ধে একটু আধটু প্রচার আমি সয়ে থাকি শুধু তথাকথিত গণমনের নামে যে-অনামী গণ্ডগোল ফুলে ওঠে তার উল্টো দিকে একটু ভার চাপিয়ে গণমনের বিরোধিতা বাতিল করতে। অজ্ঞানের এ বিশ্বমঞ্চে প্রতি জীবন্ত সত্যের অভ্যুদয়েই এই ব্যাপক অবোধ বিরোধিতা জেগে ওঠে)

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানীর জগৎ!

আমাদের মতো গরীব দেশেও প্রতি বছর গোটাকতক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বেশ ঘটা করেই হয়ে থাকে, বিশেষ করে শীতকালে। গত শীতেও বেশ বড়ো মাপের ও প্রচুর প্রচার সহ একটি হয়েছে দিল্লীতে (আন্তর্জাতিক শারীরবিজ্ঞান কংগ্রেস), আরেকটি কলকাতার বরানগরে (আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান কংগ্রেস)। উপরন্তু ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন তো আছেই। আর সীমিত পরিসরের বৈজ্ঞানিক সম্মেলন তো অনবরত হয়ে চলেছে। দেখেশুনে দুজন বিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছেন, প্রচুর খরচসাপেক্ষ সমস্ত বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের প্রকৃতই কি কোনো সার্থকতা আছে? নাকি, এগুলো অর্থহীন বাহ্যানুষ্ঠানে পর্যবসিত? গত সংখ্যার বিজ্ঞানের কথায় বিষয়টি তোলা গিয়েছিল মাত্র, এবারে দুই বিজ্ঞানীর বক্তব্য কিছুটা বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করতে চাই।

প্রথমে ডঃ এস এস রাও-র কথা শোনা যাক। অবসর নেবার আগে ইনি ছিলেন বোম্বাই হফকিন ইনস্টিটিউটের ইমিউনোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ। কর্মজীবনে প্রচুর আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, বৈজ্ঞানিক সম্মেলনগুলিতে উপস্থাপিত অধিকাংশ নিবন্ধের মান নিচু। এবং তার ফলে সম্মেলনে বসে থাকাটাই একটা ক্লান্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দূরদৃষ্টিসম্পন্নরা তাই সাধারণত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও চায়ের আসর ছাড়া অন্য কিছুতে থাকেন না।

গরীব দেশগুলিতে বিজ্ঞানের উন্নতি নিয়ে যাঁরা ভাবিত এবং তার পরিচালনার সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁরা মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে থাকেন। সেখানে অনেক কিছু প্রকাশ পায় বটে কিন্তু শেষপর্যন্ত কাজের কাজ কিছু হয় না। কারণ, দুই সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে সম্মেলনে উপস্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে অগ্রসর হবার লক্ষণ সামান্যই চোখে পড়ে। অথচ একই ধরনের ব্যক্তিরা সম্মেলনগুলিতে যোগ দিয়ে থাকেন।

বিজ্ঞানের উন্নতি নিয়ে আন্তর্জাতিক

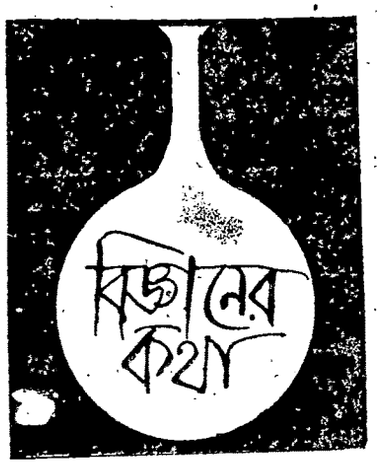

সম্মেলন প্রথম অনুষ্ঠিত হয় সম্ভবত ইজরাইলের রেহোভোৎ-এ। এশিয়া ও আফ্রিকার বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনেতারা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। উন্নতিশীল দেশগুলিতে বিজ্ঞান যে কত কাজের হতে পারে সে-সম্পর্কে সম্মেলনে অনেক আশার কথা শোনানো হয়েছিল। সম্মেলনের পরে অনেক খরচ করে একটি বই প্রকাশিত হয় যাতে সম্মেলনের আলোচনা প্রবন্ধ ইত্যাদি সংকলিত ছিল।

কিন্তু এই সম্মেলন ও সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত বইয়ের উল্লেখ মাত্র শোনা গেল না ১৯৬২ সালে 'সেন্টো' কর্তৃক সংগঠিত লাহোর সম্মেলনে। শেষোক্ত সম্মেলনের বিষয় ছিল পাকিস্তান ইরান ও তুরস্কে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতিসাধনের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগ।

এবং এই দুটি সম্মেলনের কোনোটিই উল্লিখিত হল না ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত জেনিভা সম্মেলনে। শেষোক্ত সম্মেলনের বিষয় ছিল অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকাগুলির কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ। সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ছিয়ানব্বইটি দেশের প্রতিনিধি-দল এবং সম্মেলনে উপস্থিত করা হয়েছিল দুই হাজার পেপার! আর সমস্ত কিছু একত্রিত করে সম্মেলনের পরে আটখণ্ডের বিরাট বই প্রকাশিত হয়েছিল।

জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিপুলমর্যাদাসম্পন্ন সম্মেলনও কিন্তু অনুল্লেখিত থেকে গেল ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার ও উন্নতির জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ক নয়াদিল্লীর আলোচনা-সভায় (সংক্ষেপে 'কাউন্ট')। এই আলোচনা-সভার উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং জওহরলাল নেহরু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৯৪৭ সালে) ভারতীয় বিজ্ঞান-কর্মী সমিতি।

১৯৬৭ সালে ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার বিজ্ঞান ও নভশ্চারণবিদ্যা বিষয়ক কমিটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা গোষ্ঠীর সামনে সাক্ষ্য দিতে এলেন নরওয়ে নেদারল্যান্ডস, জাপান, ব্রেজিল ও ভারতের বিজ্ঞানীরা। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শুধু শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের। ভারত থেকে এসেছিলেন বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (সি এস আই আর) অধিকর্তা হুসেন জহীর, যিনি ছিলেন ১৯৬৬ সালের 'কাউন্ট' আলোচনা-সভার উদ্যোক্তা। এমনি ধরনের সীমাবদ্ধ একটি সম্মেলন হয়ে গিয়েছে নয়াদিল্লীতেও ১৯৬৭ সালে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে ও উপস্থিতিতে।

১৯৬৮ সালে য়ুনেস্কোর (জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'কাস্টেশিয়া' নামে খ্যাত এশিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সম্পর্কিত একটি বৃহৎ সম্মেলন। ভারতের পক্ষ থেকে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বিজ্ঞান-পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। অন্যান্য দেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও তাই। সম্ভবত এই কারণেই সম্মেলনে শুধু কতকগুলো মামুলি প্রস্তাব পাশ হয়েছিল।

পঞ্চম সম্মেলনের স্থান পুনরায় রেহোভোৎ, ১৯৬৯ সালে। এবারে আলোচনার বিষয়, উন্নতিশীল দেশগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক। বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল আফ্রিকার ওপরে। এশিয়ার দেশগুলি নিয়েও আলোচনা উঠেছিল কিন্তু সেটা তুলনামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য। এই সম্মেলনে আফ্রিকার বাইশজন শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে এনে পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা উপদেশ দিয়েছিলেন কিভাবে তাঁরা স্ব-স্ব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নতুন করে গড়ে তুলতে পারেন। অথচ এই পশ্চিমী বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই ছিলেন আফ্রিকা সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁরা কোনোকালে আফ্রিকায় যাননি। সম্মেলনের শেষে যথারীতি প্রচণ্ড চড়া দামে সম্মেলনের আলোচনা সম্বলিত বই প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭০ সালে সি এস আই আর-এর উদ্যোগে নয়াদিল্লীতে পুনরায় একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বিষয়, সত্তরের দশকের প্রযুক্তিবিদ্যা। সভায় গৃহীত ছটি প্রস্তাবের একটি ছিল প্রাযুক্তির নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্পর্কে এবং প্রস্তাবটি তুলেছিলেন সি এস আই আর-এর অধিকর্তা ডঃ আত্মারাম। ১৯৭১ সালে ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে এশীয় বিদ্যাচর্চা সমিতির সভায় এশিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলে। আশ্চর্যের বিষয়, এই একই প্রশ্ন নিয়ে ১৯৬০ সালে রেহোভোৎ-এ যে-ভাষায় ও যেভাবে আলোচনা চলেছিল এখানে হুবহু তার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

•

ডঃ রবার্ট অ্যান্ডারসন যে-প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তার নাম 'গরীব দেশগুলিতে বিজ্ঞানবিষয়ক সম্মেলন কি অর্থহীন অপব্যয়?' জবাবে বলেছিলেন, অবশ্যই তাই। এবং এই জবাবের সমর্থনে অকাট্য তথ্য উপস্থিত করেছিলেন।

• ডঃ অ্যান্ডারসনের বক্তব্য এই রকম ঃ

এক দেশের বিজ্ঞানীর রাজনৈতিক মতামত অপর দেশের বিজ্ঞানী নাও মানতে পারেন। রাজনীতিকরা কিন্তু দুই দেশের বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক সম্পর্কের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রায়শই সন্দিহান। এমন কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে বিজ্ঞানের উন্নতি বিষয়ক সম্মেলন বৈজ্ঞানিক সম্পর্ককে উন্নত করে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে সন্দেহ কমে।

কথাটা শুনতে খুব ভালো কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালে বিশ্বাস করা শক্ত। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯৬৬ সালের রকফেলার সম্মেলনে আবদুস সালাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে ছিল ট্রিয়েস্ত-এর আন্তর্জাতিক তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রের কাজ সম্পর্কে প্রচুর প্রশংসা, কিন্তু ছিল না এই কথাটি যে সম্মেলন হচ্ছে পাকিস্তান

ও ভারতের বহু বিজ্ঞানীর মধ্যে বন্ধুত্বের উৎস। অবস্থা দেখে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান-উপদেষ্টা ডোনাল্ড হরীনিগ বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা খুবই দুঃখের যে এই দুটি দেশের মধ্যে এতগুলো সাধারণ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সহযোগিতা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে, কিছুতেই সরাসরি পরস্পরের সঙ্গে নয়।' পাকিস্তান ও ভারতের প্রবীণতম বিজ্ঞানীরা এই বিবৃতি শোনেন বটে কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। পরের বছর (১৯৬৭) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় লো এনার্জি পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক আলোচনা-সভা। সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিতে আসেন দূর দূর দেশের বিজ্ঞানীরা, কিন্তু মাত্র ২৯০ কিলোমিটার দূরের অতি কাছের যে কলকাতা সেখান থেকে কেউ নয়। অথচ ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে কি পদার্থবিদ্যার শিক্ষণে কি গবেষণায় সম্পর্ক ছিল অতি গভীর। দুই শহরের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা পরস্পরকে খুব ভালোভাবে চিনতেন এবং পূর্ববাংলার কিছু বিজ্ঞানী ভারতে এসে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। যে-সময়ে ঢাকায় এই লো এনার্জি পদার্থবিদ্যা বিষয়ক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন কলকাতায় এই একই বিষয়ে গবেষণা ও অধ্যয়নরত বিজ্ঞানীর সংখ্যা বড়ো কম ছিল না। তবুও ১৯৬৬ সালের কাউন্ট ও রকফেলার সম্মেলনে সহযোগিতা বিষয়ক অনেক আশাব্যঞ্জক কথা শোনা যাবার পরেও ১৯৬৭ সালে এই দুটি শহরের মধ্যে কোনো যোগাযোগ হতে পারে নি। এবং পরমাশ্চর্যের বিষয়, ১৯৬৮ সালের কাস্টেশিয়া সম্মেলনে সেই একই শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা ও রাজনীতিকরা একই ভাষায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের সকল স্তরে সহযোগিতা গড়ে তোলার আবেদন জানান।

একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে সম্মেলন মাত্র উল্লিখিত কয়েকটিই হয়েছে। কিন্তু যেখানে যেভাবেই হয়ে থাকুক না কেন, তার চেহারা মোটামুটি একই ধরনের। সমাবেশে উপস্থিত থাকেন বিজ্ঞানীরা পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা বিজ্ঞান-বিষয়ক সংবাদদাতারা ও রাজনীতিকরা। পালা করে অনুষ্ঠিত হয় প্লেনারি অধিবেশন, সামাজিক উৎসব, সর্বদিক বাঁচিয়ে-চলা বিতর্ক ইত্যাদি। সম্মেলনের যে মহৎ উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়—দারিদ্র্য দূরীকরণ—কখনো-সখনো তারও পরোক্ষ উল্লেখ যে ঘটে না তা নয়। তবে দরিদ্র দেশের প্রতিনিধিরা ধনী দেশের প্রতিনিধিদের প্রতাপের সামনে একটু যেন মিইয়ে থাকেন—কেননা সম্মেলন প্রতাপের তারতম্যে কখনো সমতা আনে না, বরং তাকে আরো প্রকট করে তোলে। তবে তাতে কিছু আটকায় না। অবারিত দেখাসাক্ষাৎ ও গল্পগুজব চলতে পারে, উৎসহ অবাধ ককটেল এবং অবশ্যই প্রচুর বক্তৃতা। নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে গ্রহণ করার অপেক্ষা শুধু তাহলেই গরীব দেশগুলির কপাল খুলে যাবে।

কপাল যে একেবারে খোলেনি তা অবশ্য নয়। দরিদ্র দেশগুলির মানুষের অবস্থায় কিছুটা যে উন্নতি হয়েছে তাও বিজ্ঞানের কল্যাণেই। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। সম্মেলনে এই বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। বারে বারে শুধু গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলা হয় যে গবেষণাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে হবে জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে। আর অত্যন্ত সহজেই ধরে নেওয়া হয় যে গরীব দেশগুলির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পক্ষে বাধাস্বরূপ। ভবিষ্যৎ কিভাবে পরিকল্পিত হতে পারে তাই নিয়েও সম্মেলনে মতভেদ থেকে যায় এবং তা থেকে নেতৃত্বের সমস্যা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়ে থাকে।

*

সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারে দায়িত্ব ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সক্রিয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সম্মেলনে এসে যাঁরা জোরালো দাবি তোলেন যে বিজ্ঞানকে সাহায্য করার জন্য শক্তিশালী নেতৃত্ব চাই, তাঁদের একটা কথা মনে রাখা দরকার। গরীব দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যদিও রাষ্ট্রের সহায়তার ওপরে অনেকখানি নির্ভরশীল, কিন্তু জওহরলাল নেহরুর মতো বিজ্ঞানমনস্ক রাষ্ট্রনেতাও বিদেশী সহযোগিতার ওপরে নির্ভরশীলতার সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি কিংবা ঝুঁকি নেবার আশংকার মীমাংসা করতে পারেন নি। সমস্যার সমাধানের জন্য আরও চাই বিজ্ঞান-এর প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি এবং এ-কাজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের উৎসাহদান, যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে হাত লাগিয়ে অবিশ্বাস ও অনাস্থার আবহাওয়া দূর করতে সমর্থ।

গরীব দেশগুলিতে বিজ্ঞানের বিপ্লব বলতে তিনটি জিনিস বোঝায়ঃ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে কায়েমী স্বার্থ ও সুবিধা ভোগ করার অবস্থার অবসান, নতুন নতুন ধ্যানধারণা ও বুদ্ধিকৌশল প্রবর্তন, সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আরও বেশি ব্যবহার।

*

এই সম্মেলনগুলিতে তাঁদেরও উপস্থিতি চাই যাঁরা বৈদেশিক সহায়তা ও পরামর্শের উপযোগিতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে থাকেন, এমনকি যেসব অনুমান থেকে বৈদেশিক সহায়তা ও পরামর্শকে গ্রাহ্য করা হয় তা নিয়েও। একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বাইরের উপদেষ্টারা হতাশা নিয়েই আসেন। কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ তাঁদের কাজের অবস্থার দরুণ যে ইতাশায় ভোগেন তার বেলা কী করা যায়? সম্মেলনগুলিতে উল্লেখ করা হয় যে, বিজ্ঞানের কোনো নীতি নেই, জনসংখ্যার মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটছে স্বাস্থ্যব্যবস্থা যথাযথ নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয় না। শুধু উল্লেখমাত্র করে সম্মেলনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের উন্নতি বিষয়ক এইসব সম্মেলন অন্তর্গত ক্ষেত্রের কাঠামোটিকেও প্রকাশ করে থাকে। প্রকাশ করে শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে, বিভিন্ন আকাদেমির মধ্যে ও রাজনীতিকদের মধ্যে একটা চুক্তির অবস্থা—গরীব দেশগুলির বৈজ্ঞানিক গ্রহলের প্রয়োজন হিসেবে যে-বিষয়গুলো ধরে নেওয়া হয় তৎসম্পর্কিত চুক্তি। প্রকাশ করে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের প্রসার ঘটার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সামাজিক প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের নীতির রাজনৈতিক দিক। রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানের মধ্যে এইসব সম্পর্ক দেখতে পাওয়াটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু মুশকিল বাধে যখন আমরা তার সত্যিকারের প্রকৃতি অনুধাবনে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হই। এইসব সম্মেলনকে অন্য একভাবেও দেখা চলে—অ্যাকাডেমিক প্রকাশনার অংশ হিসেবে, অ্যাকাডেমিক উপনিবেশবাদের অংশ হিসেবে।

বাধ্য হয়েই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, এই সমস্ত সম্মেলনকে সমন্বিত করার কোনো ইচ্ছা বা প্রয়াস কোথাও নেই, যদিও সম্মেলনের উদ্যোক্তারা একই আন্তর্জাতিক বৃত্তে ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরা করে থাকেন। আর এই সমন্বয় না থাকার ফলে সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আর একই চক্র সম্মেলন থেকে সম্মেলনে চলাফেরা থাকে—আরও ব্যাপক অংশকে সম্মেলনে টেনে আনার কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। অথচ এই মানুষদের ওপরেই সমন্বয় ও রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত। সমালোচনার জবাবে অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে যে সম্মেলনের জন্য যে খরচ হয় সেটা গরীব দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। এখানে দুটি কথা বলার আছে। প্রয়োজন কিছুটা পূরণ হতে পারে যদি সম্মেলনগুলিতে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁদের কাছে সম্মেলন হয়ে ওঠে নিজেদের কাজ ব্যাখ্যা করার একটা সুযোগ। ব্যাখ্যা করা হয় তাঁদের কাছে যাঁরা এই উন্নতি সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক। কিন্তু সম্মেলনের শেষে কোনো পক্ষেরই কোনো দায় থাকে না। প্রস্তাবগুলো কিভাবে সমন্বিত করলে গরীব দেশগুলো উপকৃত হয় তা দিয়ে কারও কোনো উদ্যোগ নেই। মোট কথা সম্মেলনে যাঁরা যোগ দেন তাঁরা কদাচিৎ গরীব দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। তাঁরা যোগ দেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে গরীব দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োগ করার ব্যাপারে কতকগুলো ভুল ধারণা নিয়ে। সম্মেলনের পরে যে-সব বিপুল-কলেবর বই প্রকাশিত হয় সেগুলো লাইব্রেরির তাকে বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে। সচরাচর সে-সব বই কেউ পড়েন না, পড়ার প্রয়োজন বোধ করেন না।

অয়স্কান্ত

উপন্যাস

ভেংচি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বঙ্কিম দত্ত যা চান রঞ্জু তা নয়। তার চিন্তার জগৎ পরিবেশ সবই স্বতন্ত্র। আর যুঁইদি এসে যেন ষোল বছরের রঞ্জুর মানসিক জগৎকে পর্যন্ত আমূল পাল্টে দিয়েছে। বিবাহিতা যুঁইদি যেন তাকে কাঁচপোকার মত আকর্ষণ করছে। বঙ্কিমবাবুর মত কি অমিয়ই হতে পেরেছে? শুধু একটা ভয় তার বাবার মতই। তার বন্ধু রুদ্রেন্দু গরীব এবং বিপ্লবী মেজাজের বলে তাকে সেও এড়িয়ে চলতে চায় ভয় করে। সেই রুদ্রেন্দুর সঙ্গে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল অমিয়র। প্রথমটা সে খুব বিব্রত হলেও পরে সামলে নিল এবং বেশ ঠাট্টার মেজাজেই ঠুকে ঠুকে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। যেন একটা মজার লোকের সঙ্গে কথা বলছে সে।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ রঞ্জুও দেখে ফেলল দূর থেকে। বাবার পাশে এক ঝাঁক টিয়ের মত টুটুলদের দলটা। সবাই আজ শাড়ি পরেছে। বাবাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বুড়ো ভালুক। তার পাশে বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে মনে হচ্ছে ভীরু রোগা তাড়া খাওয়া শেয়াল। বাবার পাশে গোপাও আছে। তার সঙ্গে গোপার একটা নীরব সম্পর্ক আছে। সেটা কেউ জানে না। কাল রঞ্জু যুঁইদির সঙ্গে কেষ্টনগর চলে যাবে বেশ কিছুদিনের জন্যে। সেই খবরটা ওকে দেবার জন্যে ভেতরে ভেতরে চঞ্চলতা অনুভব করে রঞ্জু। রঞ্জুও সুযোগ পেল ড্রীতে যখন গানের আসর বসিয়েছিলেন বাবা। রঞ্জু যখন তার পড়ার ঘরে যুঁইদির সামনে বসে কেষ্টনগরে যাবার জন্যে গোছগাছ করছিল। তার মধ্যেই সে ফাঁক বুঝে কথাটা বলে ফেলল বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

—বাইশ—

নিজেকে একটা টিকটিকির মতন মনে হচ্ছিল রঞ্জুর। যেন সে সব কিছু দেখছে, সবাইকে দেখছে, অথচ তাকে কেউ দেখছে না। দেখতে পাচ্ছে না।

নিঃশব্দে দেওয়াল ধরে হাঁটছে সে। এই বারান্দা থেকে সেই বারান্দায় যাচ্ছে। তার পায়ের শব্দ নেই। টিপে টিপে হাঁটছে।

যুঁইদি শুয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত জলপাই রঙের চাউস সুটকেসটা ভাল করে আর গুছোনই হল না! থাক গে, কাল সকালে যা হয় হবে— ভাল লাগছে না আর। অর্থাৎ যুঁই নিজেও বাকসটা গুছোল না। রঞ্জুকেও কাজটা শেষ করতে দিল না। আধখেঁচড়া হয়ে রইল।

তাতে অবশ্য রঞ্জুর দুঃখ নেই। সুটকেস গুছোনটা বড় কথা নয়। বরং যুঁইদি যে এখন আরাম করে শুয়েছে। যেমন মুহুর্মুহু হাই ভাঙতে আরম্ভ করেছিল শেষ দিকটায়। কালো চোখ সোনালী হয়ে হয়ে পরে যেমন রক্তজবার মতন টকটকে ভয়ঙ্কর চেহারা ধরল। এক একবার বোজা চোখ মেলে রঞ্জুকে দেখছিল। আর রঞ্জুর হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠেছিল। তার মনে হচ্ছিল মানুষটা আর নিজের মধ্যে নেই। বোধ বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছে।

বুঝি একটা রক্তারক্তির গোঙানি তাকে পেয়ে বসবে এখনি। যদি চেয়ার থেকে ছিটকে লাফিয়ে যুঁইদি বিছানায় রঞ্জুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

তাই তো, মানুষের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেছে দেখলে কতসব সর্বনাশের কথাই মনে হয়। অসংখ্য আ-ডাক কু-ডাক ডাকে মনে।

একদিন রঞ্জুর বাবার জ্বর হয়। চোখ দুটো এমন লাল হয়ে গিয়েছিল বাবার। মা খাটের পাশে একটা টাব বসিয়ে জল ঢেলে বাবার মাথা ধুইয়ে দেয়। রঞ্জু তখন পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে। বেশ কিছুক্ষণ জল ঢালার পর বাবাকে মা জিজ্ঞেস করেন আর জল ঢালব কি? বাবা কিন্তু কথার জবাব দিল না। এইবার মাথাটা একদিকে কাত করে মার মুখটা দেখল। ওফ রঞ্জুর মনে আছে সেই রক্তবর্ণ চোখে বাবা যখন মাকে হঠাৎ দেখছে রঞ্জুর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে চলে আসে। কেমন একটা গ্লাস নিয়ে মার হাত ধরে খাটের পাশ থেকে টেনে সরিয়ে আনতে গেল সে। মা চমকে উঠল। কি হচ্ছে! বাবা চমকে উঠল না। ঠোঁট ফাঁক করে একটু শুধু হাসল। রঞ্জু তক্ষনি তার হাতটা গুটিয়ে নেয়। এমন লজ্জা পেল সে। —কি হল খোকন! মা তাকে জিজ্ঞেস করে। লাল চোখ নিয়ে বাবা ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। —আমাকে কিছু বলবি তুই। মা ফের প্রশ্ন করে।

কি আর উত্তর দিত সে। রঞ্জু এত লজ্জা পেয়েছিল সেদিন। সেখানে আর দাঁড়ায়নি। মা ভেবেছিল রঞ্জু বুঝি কিছু বলতে গিয়ে এভাবে তাঁর হাত ধরে টানল।

কিন্তু রঞ্জু কি করে মুখ ফুটে মাকে তার ভিতরের কথাটা বলত।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একা বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কথাটা অনেকক্ষণ সে চিন্তা করেছিল। এত খারাপ লাগছিল না তার! নিজেকে যা-তা করে গালাগাল করতে ইচ্ছে করছিল। ছি ছি ছি! এমন দিল-খোলা সরল সাদাসিধে মানুষ বাবা। আর সে কিনা ভাবল—বাবা রক্তবর্ণ চক্ষু মেলে মাকে যখন দেখছিল—বাবা বুঝি তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে বসে মার ঘাড়টা মটকে দিত।

প্রায় আট দশ বছর আগের ঘটনা। খুবই ছেলেমানুষ ছিল রঞ্জু। তাই বাবাকে দিয়ে সেদিন এমন যাচ্ছেতাই একটা আতঙ্কের ভাবনা তার মনে জেগেছিল। এখন অবশ্য মনে পড়লে সে হাসে!

একটু আগে যুঁইদির রক্ত ছোপানো চোখ দেখে হঠাৎ আজ আবার একটা গ্লাস তাকে এভাবে আক্রমণ করল। ঘাড় মটকে দেওয়া নয়। যদি তাকে বিছানায় জড়িয়ে ধরে যুঁই! জানালাগুলি খোলা দরজাটা হাঁ-খোলা। বাড়ির সবাই জেগে। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। এই অবস্থায়—

ত্রাসটার মধ্যে একটা সুখের চাপা উত্তেজনা ছিল, রোমাঞ্চও খুব ছিল। আবার ফাঁপড়ে পড়া ভাবটাও কম ছিল না। কে জানে যুঁইদি সত্যি, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলছে কিনা। বলা যায় কি।

ভেবে রঞ্জু তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়ে। —তুমি শুয়ে পড়, তুমি আর বসে

থাকতে পারছ না। ফিসফিসিয়ে বলেছিল সে।

—তাই দাও। কাতর গলায় যুঁই বলেছিল আমায় শুইয়ে দাও লক্ষ্মীটি। আর একটুও জেগে থাকতে পারছি না।

—সুটকেশটা গুছোনো হল না তোমার।

—যাক গে কাল সকালে যা হবার হবে। আর ভাল লাগছে না। শিগগির আলো নিভিয়ে দাও।

—হুঁ দিচ্ছি।

বিছানা পাতাই ছিল। চট করে দোরটা ভেজিয়ে দিল রঞ্জু। তারপর যুঁইদির হাত ধরে আস্তে টেনে তুলে তাকে খাটে শুইয়ে দিল। আঃ, যুঁই একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়ল। রঞ্জু তখনই আলো নেবায় না। এখনও যে সে এ-ঘরে আছে এই অবস্থায় ঘর অন্ধকার করা যায়! বাড়ির সবাই ভাববে কি! অন্ধকার বাথরুমে ঢুকে রঞ্জুর চোখ মুখ ধুইয়ে দেওয়া আলাদা জিনিস। এটা শোবার ঘর।

আলোর জন্য যুঁই আর তাকাচ্ছিল না। রঞ্জুর ভাল লাগল। ওর ভয়ঙ্কর চোখ দুটো আর তাকে দেখতে হচ্ছে না। দুটো গোলাপী পাপড়ির নিচে চোখের বেসামাল রক্ত ঢাকা পড়েছে।

কিন্তু যুঁইয়ের সবটা শরীরই গোলাপী না। খানিকটা খানিকটা বাদামী। যেখানে রোদ বেশি লাগে সেখানটা বাদামী। রঞ্জু চিন্তা করল। এবং যেখানে একেবারেই কোনোদিন রোদ লাগে না? শরীরের সেসব টুকরো টুকরো লুকোনো অংশ গোলাপী না হয়ে স্রেফ দুধ-সাদা হবে অনুমান করতে রঞ্জুর একটুও কষ্ট হল না। যুঁইদির শরীরের ওপর ঝুঁকে মশারীটা খাটিয়ে দেয় সে।

টুবলির গায়ের রং ঠিক গোলাপী বলা যায় না। কাঁচা মাংসের রং। টুবলির শরীরে রক্তের পরিমাণ অনেক বেশি। ওফ, টুবলির যখন ঘুম পায় আর তার দু চোখ লাল হতে থাকে সেই লাল একসময় কী ভয়ংকর হয় ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয় রঞ্জুর।

যদি গোলাপী বলতে চাও, আসল গোলাপী রঙ, যা দেখলে চোখ জুড়োয়, —কেবল চোখ জুড়োয় নয়—বুকের মধ্যে গোলাপের মতন একটা মিষ্টি ঘুমেভরা গন্ধ জাগে তবে ফ্লেমিংগোর দিকে তাকাও—কিছুক্ষণ আগে ভজন গেয়ে এ বাড়ীর সবাইকে যে মাত করে দিয়ে গেল।

মশারী খাটিয়ে রঞ্জু আলো নিভিয়ে দিল। যুঁইদি এখন সাত হাত ঘুমের নীচে তলিয়ে গেছে। ফুরুৎ ফুরুৎ নাক ডাকছে। খুব অল্প শব্দ। এই জন্য খারাপ লাগে না। ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে করে দোরটা ভেজিয়ে রঞ্জু বারান্দায় দাঁড়াল। এক গলা শিউলির গন্ধ নিয়ে বাড়ীটা মাতাল হয়ে আছে। যেন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ প্যাসেজের আলোটা জ্বলছে।

রঞ্জু হাঁটছে। তার পায়ের শব্দ হয় না। সব কিছু সে দেখছে। যেন তাকে কেউ দেখছে না। যে জন্য এই মাত্র নিজেকে টিক-টিকি ভাবতে তার মোটামুটি খারাপ লাগল না।

অবাক হল সে বাবার শোবার ঘরের দরজায় পৌঁছে। পাল্লা দুটো অল্প ভেজান। বাবা নেই। বাবা তা হলে কোথায়। মা-কেও দেখছে না তো। তবে কি খালি ঘরে আলো জ্বলছে! অম্বুজা-নিলয়ের ইতিহাসে এমন আর ঘটে নি। ঘরে লোক নেই, আলো জ্বলছে। কেউ হাঁটাচলা করছে না প্যাসেজে আলো জ্বলছে। বুড়ো তবে কোথায়!—হৈ-চৈ চেঁচামেচি নেই কেন আজ।

পুবের বারান্দা ছেড়ে দক্ষিণের বারান্দায় এসে রঞ্জু আরও বেশী অবাক হল। বঙ্কিম দত্তর ঘর হাঁ-খোলা হয়ে পড়ে আছে। কর্তা নেই ঘরে। এখানেও মিছিমিছি আলো জ্বলছে। তাজ্জব কাণ্ড।

তা হলে বাপ বেটা এখনও নীচে। রঞ্জু অনুমান করল। খাওয়ার আগে একতলার বারান্দায় কি নিয়ে যেন খুব কথা-বার্তা হচ্ছিল ওদের। খেয়েদেয়ে আবার বুঝি দুজন নীচে নেমে গেছে জরুরী আলোচনা সারতে। কি নিয়ে আলোচনা?

তারপর রঞ্জুর মনে পড়ল টুটুন এখনও যুঁইদির কাছে শুতে যাচ্ছে না! টুটুন গিয়ে ও ঘরের দরজা বন্ধ করবে। রঞ্জু শুধু পাল্লা দুটো ভেজিয়ে রেখে এসেছে। আর সে যাচ্ছে এখন টুটুনের ছোট্ট মেয়েলী গন্ধেভরা ঘরটায় শুতে।

কিন্তু কারো যেন শোয়াটোয়ার গরজ নেই আজ। কেবল যুঁইদি ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল রঞ্জু ওর সঙ্গে কেন্টনগর পাড়ি দিচ্ছে।

কয়েক পা এগোবার পর রঞ্জু থমকে দাঁড়ায়। এখানেও আলো জ্বলছে। দরজার পাল্লা দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। টুটুনের ছোট খাটের ওপর মা বসে আছে। টুটুন দাঁড়িয়ে। যেন ঘাড় গুঁজে নখ খুঁটছে।

এদেরও কি জরুরী আলোচনা? ব্যাপারটা কি! ভিতরে ঢুকতে গিয়ে রঞ্জু কাঠ হয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। মা-র কপালের রগ দপদপ করছে। মা-র মুখের রঙটা কেমন তামাটে তামাটে দেখাচ্ছে। তিতিবিরক্ত হয়ে হয়ে মহিলার এই দশা হয়েছে। টুটুনটা দরজার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে। যে জন্য ওর মুখটা দেখছে না রঞ্জু। মুখ না দেখে সে অনুমান করছে নীচের দিকে থুতনি রেখে টুটুন হাতের নখ খুঁটছে। না কি কিছু নালিশ করছে মা-র কাছে। কারো নামে কিছু লাগাচ্ছে? এই এক দোষ মেয়ের। ভেতরটা ভয়ানক কুটিল। বাইরে থেকে বুঝবে কার সাধ্য। ভারী নিরীহ পুতুল পুতুল চেহারা। যেন ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না। অথচ কত অন্ধকার মনে। কার নামে লাগাবে? রঞ্জুর? যুঁইদিকে নিয়ে? ভাল। মনে মনে রঞ্জু হাসল। সেই রাস্তা যুঁই একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। ওকে নিয়ে আমাকে নিয়ে তুমিও খুকি মুখ খুলতে পারছ না, মা-ও কিছু বলতে পারছে না। মা-কে কত দাম দিয়ে শাড়ী কিনে দিয়েছে। এক কাঁড়ি টাকা ফেলে তোমাকে বাহারের ফ্রক কিনে দিল। বাবার রোজগার নেই। কিপটে বুড়ো বঙ্কিম দত্তর পেনসনের পয়সায় এই জীবনে এত ভাল ছিটের ফ্রক পরেছ কোনদিন? আর এই যে দু দিন ধরে রঞ্জুকে দিয়ে যুঁইদি গাদা গাদা কসমেটিকস কেনাচ্ছে, তার থেকে এটা-ওটা তোমাদের দুজনকেও কি বিলিয়ে দিচ্ছে না। আজ সকালে যুঁইদির দেওয়া পীয়ার্স সোপ মেখে মুখখানাকে ফুলের মতন ফরসা করে ও যুঁইদির দেওয়া টকটকে লাল রীবন জড়িয়ে হর্স-টেল বেণী বেঁধে বন্ধুদের নিয়ে বাবার সঙ্গে পাখি দেখতে বেরিয়েছিলে না! কত বছর পরে মা-র মুখে গলায় আজ পাউডারের ছোপ দেখা যাচ্ছে। তা-ও যুঁইদির দেওয়া। ভবানীপুর যাবার আগে মা সে ডিবি উপুড় করে বেশ খানিকটা ঢেলেছিল বোঝা যায়। কাজেই যুঁইদিকে জড়িয়ে আমাকে নিয়ে তোমরা ফিসফাস করবে না জানা কথা। তা হলে এতটা রাত অবধি ওই একটা ঘরে আমাদের দুজনকে একলা ছেড়ে দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে না। এর মধ্যে অন্তত দশবার রঞ্জুর ডাক পড়ত—এই শুতে আয় শুতে আয়, ওঘরে তো আজ শুবি না তুই, তোর অন্য জায়গা। যুঁইকে বিশ্রাম করতে দে। ওর ঘুম পেয়েছে।

তবে? তা হলে!

রঞ্জু ঠিক বুঝতে পারছিল না। কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে আর একটু

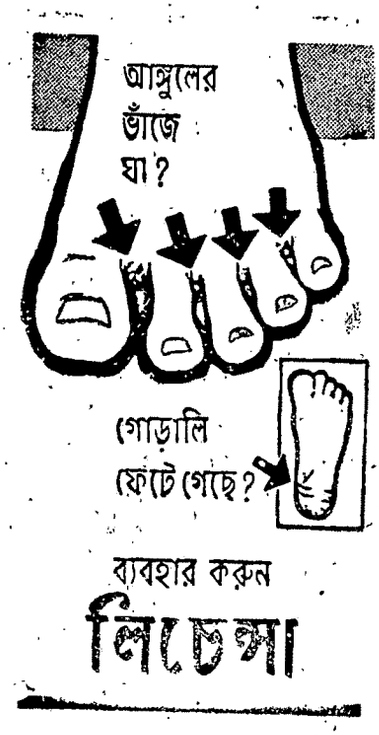

বেশী টিকটিকি হয়ে গেল সে। আর একটু বেশী সামনের দিকে ঝুঁকে দরজার একটা পাল্লার সঙ্গে শরীরটা লেপটে রাখল, যাতে একটা মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে আছে বোঝা না যায়। তারপর চোখ দুটোকে দু পাল্লার মাঝখানের ফাঁকটুকুর কাছাকাছি একটা জায়গায় জাগিয়ে রেখে শ্বাস বন্ধ করে থাকল।

—হুঁ, তারপর, তারপর কোথায় গেল দুজনে? মার গলা।

—একটা ভীষণ বড় গাছ, সেই গাছটার আড়ালে চলে গেল। টুটুন বলল, ওটা যে কি গাছ আমি চিনতে পারি নি মা।

—গাছ চিনতে তোমাকে কে বলছে বোকা মেয়ে। যে-কথা বলছি তার উত্তর দাও। ভুরু কপাল কুঁচকে মা টুটুনকে ধমক লাগায়। বটানিক্যাল গার্ডেনে কি গাছের অভাব। হাজারটা গাছ হাজারটা নাম। জিজ্ঞেস করছি ওখানে গেল কেন ওরা, মোটা গাছের আড়ালে কি করছিল দুটিতে।

টুটুন কি ঘাড় গুঁজে আবার নখ খুঁটছে। রঞ্জু নিজের মনে হাসল। এবার সে নিশ্চিন্ত। তার নামে যুঁইদির নামে নালিশ হচ্ছে না। বটানিকস-এর কোন ব্যাপার। পাখি দেখতে গিয়ে কিছু হয়েছে। একটা সাংঘাতিক বড় গাছের আড়ালে চলে গেছে দুজন। কারা দুজন? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ সেখানে। গুঁড়ি মোটা শাল সেগুন বট অশ্বত্থ নিম সুঁদরি জারুল তেঁতুল। গাছের কি শেষ আছে। আকাশ অন্ধকার করে জটলা করে এক একটা জায়গায় গাছেরা দাঁড়িয়ে। একবার যদি কেউ সে সব গাছের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে খুঁজে বার করা মুস্কিল। এই সেদিনও রঞ্জুরা ঘুরে-ফিরে সবটা বাগান দেখে এসেছে। না, একটিও মেয়ে ছিল না তাদের দলে। পার্থ শোভেন এই নিয়ে সারা দিন আফসোস করল। পরে মন খারাপ করে পেন-নাইফ দিয়ে এক একটা গাছের গুঁড়িতে শুধু নিজেদের নাম খোদাই করে সন্ধ্যেবেলা তাদের ফিরে আসতে হল। নামগুলি কেমন ন্যাংটো ন্যাংটো দেখাচ্ছিল। এখানে তো তবু ওদের একজন পুরুষ সাক্ষী ছিল। বাবা। হুঁ। তারপর! নালিশটা শুনতে রঞ্জু কান খাড়া করল।

—কতক্ষণ ছিল ওরা গাছের আড়ালে? মা তাড়া লাগায়। টুটুন আবার চুপ। যেন একটা কথা ওর মুখ থেকে বেরোয় তো তিনটে কথা ঢোকের সঙ্গে পিছলে পেটের ভিতর ঢুকে পড়ছে। কতক্ষণ ছিল? মা-র মুখের তামাটে রঙ প্রায় কালো হয়ে যাচ্ছিল।

—দশ পনেরো মিনিট। আন্দাজ করে টুটুন বলল।

—কি করছিল ওরা ওখানে? মা-র গলা ক্রমশ ধারালো হচ্ছিল।

—আমরা ঠিক বলতে পারব না। যেন মার চোখের দিকে তাকাতে ভয়। টুটুন আবার থুতনিটা নামায়।

—তোরা বাকী মেয়েরা কোথায় ছিলি ঐ সময়টায়? মা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে।

—একটা বকুল গাছের নীচে ঘাসের ওপর বসে।

—বকুল গাছের নীচে ঘাসের ওপর বসে। মা চোখের সামনে বকুল গাছ ও বকুলের ছায়ায় বড় বড় ঘাস দেখছিল। আর সেই সঙ্গে কটমট করে নিজের মেয়েকে দেখছিল। হঠাৎ মা-র গলা থেকে হুম একটা শব্দ বেরোল। দেওয়ালের ব্র্যাকেটে এলোমেলো করে রাখা টুটুনের একটা জামা ঝুলছিল। হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে ভাঁজ করে মা সেটা আবার ব্র্যাকেটে তুলে রাখল। —বেশ তো। যেন ইচ্ছে করে গলার স্বরটা এবার খানিকটা ভোঁতা করে নিয়ে মা বলল, গাছের আড়ালে ছিল ওরা। গুঁড়ি মোটা গাছ। এধারে ঘাসের ওপর বসে থেকে তোরা কিছুই দেখছিলি না। ভাল কথা। দশ পনেরো মিনিট পরে যখন দুটিতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তখন তোরা জিজ্ঞেস করলি না কিছু ওদের?

টুটুন আবার ঘাড় গুঁজল। বা গুঁজতে যাবে—খপ করে মা ওর মাথাটা ধরে ফেলে ঝাঁকুনি লাগাল।

—এই, এদিকে আমার দিকে তাকিয়ে কথার উত্তর দে। তোরা কেউ কি জিজ্ঞেস করেছিলি ওরা কি করছিল ওখানে?

—হুঁ। টুটুন থুতনি নাড়ল।

—কে জিজ্ঞেস করেছিল। তুই?

—গৌরী।

—কাকে জিজ্ঞেস করেছিল গৌরী? তোর বাবাকে!

—না, গোপাকে। হুস করে টুটুন বলে ফেলল।

ভাল রে ভাল। রঞ্জু পা বদল করে দাঁড়াল। যদিও তার পায়ে-হাতে বড় বড় মশা কামড় বসাচ্ছিল, গ্রাহ্য করল না সে। মশা মারার সময় না এটা। বা মশার কামড় খেয়ে এখান থেকে সরে যাবার মতন অবস্থাও না। মনে মনে সে বলল। দারুণ ইন্টারেস্টিং খবর শুনছি। বাবাকে নিয়ে ফ্লেমিঙ্গোকে নিয়ে কেস। কানটান গরম হয়ে যাবার কথা। কিন্তু আমি তোমার মতন বোকা না টুটুনমণি। বা চট করে মা-র মতন আমার মাথাও গরম হয় না। সবটা তো আগে শোনা যাক। তারপর বিচার করা যাবে।

—হুঁ, কি বলছিল গোপা? মা-র মুখের চামড়া তামাটে থেকে কালো হতে হতে এবার ঝপ করে ফ্যাকাশে হলুদ রঙ ধরেছে। কি করছিল ওরা মোটা গাছটার আড়ালে এতটা সময়?

—হরিয়াল পাখি দেখছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় টুটুন বলল,— গোপা শব্দ করছিল না। বাবা আমাদের বোঝাল, গোপা আজও হরিয়াল চিনল না। ওকে সুন্দর পাখিটা দেখিয়ে আনলাম।

—সুন্দর পাখিটা দেখিয়ে আনলাম! যেন বাবাকেই একটা বড় করে ভেংচি কাটল মা, এমন চোখ মুখ করে টুটুনকে দেখল। তোরা বাকী মেয়েরা সবাই হরিয়াল চিনতিস?

—হুঁ। টুটুন ঘাড় কাত করল।

মা-র গলায় আবার হুম শব্দটা শোনা গেল। দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে একটু যেন কি ভাবল। তারপর মেয়ের দিকে তাকাল।

—আলাদা করে ওই মেয়েকে ডেকে নিয়ে আর কি পাখি দেখিয়েছে ও?

—আর পাখি দেখায় নি। কি এক জাতের ক্যাকটাস দেখিয়েছে।

—পাখি ছেড়ে হঠাৎ ক্যাকটাস কেন! রঞ্জু দেখল মা-র চোখের মণি মার্বেলের মতন গোল হয়ে উঠেছে। যেন শ্বাস ফেলছিল না। —তোরা তখন কোথায়?

—একটা শিমুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে।

—ক্যাকটাস দেখার ছুতো করে ওরা দুজনে এবার কতটা দূরে গেল?

—অনেকটা। খানিকটা এগিয়ে একটা ঝাঁকড়া মাথা জলপাই গাছের পেছনে ফণী মনসার জঙ্গল। সেই জঙ্গল পার হয়ে গোপাকে নিয়ে বাবা আর একটা বড় ঝোপের কাছে চলে গেল।

—কী সাংঘাতিক কথা! বড় ঝোপের কাছে চলে গেল না কি ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। রঞ্জু দেখল মা যেন বটানিকস-এর সেই ঝোপঝাড়ের কাছে ছুটে গেছে। যেন সাপের মতন চকচকে চোখ করে ফণা

খুকু বড় হইয়ে শ্বশুরালয় গেল কিন্তু
এই ফটোই তার শৈশব স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

প্রতি ১২০ রোলের ফিল্মে আপনি ১২টি বড় সাইজের (৬x৯ সেঃমিঃ) ছবি পাবেন।
সব সময়ে ব্যবহারযোগ্য চামড়ার খাপ, পোর্ট্রেট লেন্স এবং ফ্ল্যাশগান—
এ সবই পৃথক মূল্যে পাওয়া যায়।
শুধু, পরিষ্কার প্রিন্টের জন্য এবং এনলার্জমেন্টের জন্য সর্বদা আগফা-গেভার্ট
ফোটো পেপার ব্যবহার করুন।
প্রত্যেক অনুমোদিত আগফা-গেভার্ট ডিলারের কাছে পাওয়া যায়।

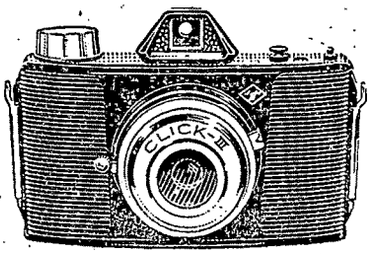

একমাত্র পরিবেশক : আগফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড
মর্চ্যান্ট চেম্বার্স, ৪১, নিউ মারীন লাইন্স, বোম্বাই ৪০০ ০২০
শাখা : বোম্বাই ● নিউ দিল্লী ● কলকাতা ● মাদ্রাস।
ও ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় যাবতীয় উৎপাদনের প্রস্তুতকর্তা আগফা
গেভার্ট অ্যাক্টিওয়ার্ফ / লিভারকুসেন এর ট্রেডমার্ক
ভারতে প্রস্তুতকারক : দি নিউ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

SIMOES/AG/2/73 BEN

বাগিয়ে গোপাকে ও বাবাকে খুঁজছে। এভাবে কিছুক্ষণ ঘরের দেওয়ালটা দেখল মা। পরে টুটুনের দিকে তাকাল। —অ্যাঁ, তোরা বলছিস কি, ফণীমনসাও তো এক ধরনের ক্যাকটাস। আবার কোন ক্যাকটাস দেখাতে একলা করে এত বড় মেয়েকে নিয়ে তোর বাবা জঙ্গলে ঢুকল।

এবার রঞ্জু পরিষ্কার দেখতে পেল—টুটুন—বাবার আদরের টুনটুনি মোটেই হাতের নখ খুঁটছে না, যেন এর পর কি বলতে হবে ঘাড় গুঁজে তাই ভাবছে। ওফ, বাবার বিরুদ্ধে কেমন লাগানই না লাগাচ্ছে পুতুল পুতুল চেহারার ওই ভালমানুষ খুকি। এত বিষ তোমার মনে! রঞ্জুর ইচ্ছে করছিল ঘরে ঢুকে ঠাস করে ওর দু গালে দুটো চড় বসিয়ে দেয়।

মা হাঁসফাঁস করছে। তা তো করবেই। সরল মনে বাবা কি করতে গিয়ে কি করেছে আর সেটাই যাচ্ছেতাই কালার দিয়ে পাজী মেয়েটা বাড়ী এসে মা-র কাছে লাগাচ্ছে।

—কতক্ষণ ছিল ওরা ওই জঙ্গলের মধ্যে?

—বারো চোদ্দ মিনিট। আমার ঘড়ি নেই। রুমি ওর হাতঘড়ি দেখছিল।

—ইস, কাকে আমি এসব কথা বলি—কাকে আমি বোঝাই কেমন এক অপদার্থ পুরুষ আমার স্বামী। মা ঠোঁট কামড়ায়। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে দেওয়ালের একটা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকে। টুটুনের এক সখী উপহার দিয়েছিল। যশোদা দুলাল ননী চুরি করে খায়। ছবিটা দেখা শেষ করে মা টুটুনের দিকে ঘাড় ফেরায়। ওরা কিছু বলল না? গৌরী রুমি কুমি-ঝুমি চামেলী! আলাদা করে কাঁকুলিয়া রোডের ওই মেয়েকে পাখি দেখাচ্ছিল অ্যাকটাস দেখাচ্ছিল আমাদের ঘরের বুড়ো হাতি।

বাবার ওপর বেশী চটে গেলে মা ওই শব্দ দুটো ব্যবহার করে। রঞ্জু শব্দ না করে হাসে।

—মুখ ফুটে কিছু বলে নি। টুটুন মা-কে বোঝাল। তবে গোপার হাত ধরে বাবা যখন জঙ্গলটা থেকে বেরিয়ে আসছিল আমি ঠিক দেখলাম গৌরীর পিঠে রুমি চুপটি করে একটা চিমটি কাটছে।

—কাটবেই চিমটি। এই নিয়ে ওরা মুখেও অনেক কিছু বলাবলি করবে। বড় বড় মেয়ে। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কেউ কিছু সারতে পারে?

রঞ্জু দেখল বড় বড় দুটো শ্বাস ছেড়ে টুটুনের ছোট টেবিলের ওপর রাখা ঢাকনা-দেওয়া রঙিন কাচের গ্লাসটা তুলে মা ঢকঢক করে এতটা জল খেয়ে নিল। থুতনির কাছে পেপের বীচির মতন দু-তিন ফোঁটা জল লেগে থেকে চিকচিক করে। আঁচল দিয়ে মুখটা মোছারও যেন সময় থাকে না মা-র। রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে মহিলা। —অ্যাঁ! আর ওই মেয়েই বা কেমন, ভেংচি কেটে মা বলল, তোদের সব কটা বান্ধবীকে ফেলে রেখে একলা তোর বাবার সঙ্গে ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে হরিয়াল পাখি আর ক্যাকটাস দেখতে লজ্জা করছিল না ওর। বেরিয়ে এসে তোদের কী বলছিল ও শুনি?

—কিসসু না। আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছিল।

—পেটে পেটে শয়তানি ওই মেয়ের। এখন আমি বুঝি। বাড়িতে আসে। দেখে মনে হয় যেন সাত চড়ে রা বেরোবে না।

—আমারও একদম ভাল লাগে না গোপাটাকে। পুচকে টুনি টুটুনরাণী কেমন করে মা-র বুকের আগুনটা আরও বেশি করে জেবলে দেয় তাজ্জব হয়ে রঞ্জু কান পেতে শোনে। বুঝলে মা—এখন আর মা-র চোখের দিকে তাকাতে টুটুনমণির লজ্জা নেই। হাত নেড়ে বলে, এখানে এলেই কেমন যেন একটু বেশি আহ্লাদেপনা করে ওই মেয়ে। যেন দাদুর ও বাবার আদর খাওয়ার মতন ভাল জিনিস এই জগতে আর কিছু নেই। বিচ্ছিরি!

—আমি বুঝি, আমি সব বুঝি। মা এবার চোখ বুজে উত্তর করে। এ-বাড়ির পুরুষদের আমার চিনতে বাকি নেই। শ্মশানের দিকে চলছে এক একজন। তবু রসের আর শেষ নেই। বাড়িতে পা দিয়েই কত বড় গানের আসর দেখলাম আজ।

বলতে বলতে মা হাতের মুঠো শক্ত করে ফেলল। তারপর এক সময় চোখের পাতা খুলে হাতটা শূন্যে ছড়িয়ে দিল।

—আমার ইচ্ছে আছে একদিন ওপাড়ায় যাবার। মাথা ঝাঁকিয়ে মা বলল, কাঁকুলিয়া রোড আমি চিনি। মিসেস গাঙ্গুলীর মেয়ে না তোদের এই গোপা! আমি ঠিক বলব,—মেয়েকে একটু শাসনটাসন করুন, এত বেশি বাড়ি থেকে বেরোতে দেন কেন—

বলতে বলতে মা—রঞ্জু দেখল, আবার চুপ করে গেছে। আবার যেন নিজের মনে কিছু ভাবে। তারপর বড় করে একটা শ্বাস ফেলে।

—উঁহু, বলে কিছু লাভ নেই। এবার মা বিড়বিড় করতে থাকে।—আছে কোনো কোনো মা এমন। মেয়েকে শাসন করুন শুনলে উল্টে রাগারাগি করে—খুব অভিমান টভিমান আরম্ভ হয় তখন। যেন আমাদের বলতে যাওয়াটাই একটা অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়।

—কিসসু বলো না তুমি গোপার মা-কে —কেন তুমি ওবাড়ি যাবে! তোমার বলার কী দায়। যা খুশি করুক ওর মেয়ে।

একটু থেমে থেকে এবাড়ির কুচুটে মেয়েটা মা-কে বোঝায়—ঝোপ থেকে বেরিয়ে বাবা আমাদের কি বলছিল জান?

—কি বলছিল?

—গোপার গানের গলা সবচেয়ে ভাল। ওর মতন ভজন তোমরা কেউ গাইতে পার না। তাই একটু স্পেশ্যাল করে ওকে একটা চমৎকার ক্যাকটাস দেখিয়ে আনলাম।

—অ্যাঁ, স্পেশ্যাল করে! এর উত্তরে তোরা কি বললি শুনি?

—আমাদের কিছু বলার সময় দিলে নাকি বাবা। দেখতে সাদাসিধে বোমভোলা মানুষ হলে হবে কি—বাবা কিছু কম চালাক নয়—তক্ষুনি আবার রুমির দিকে গোপার দিকে চেয়ে হেসে বললে বাবা—ঠিক আছে। আজ খুব একটা বেলা নেই। এখনি সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আর একদিন। তোমাদের সবাইকে কেবল ওই একটা ক্যাকটাস নয়—একসঙ্গে আরো ক' জাতের ক্যাকটাস দেখাব। দেখবে কতরকম ক্যাকটাস আমাদের এই যোটানিক্যালের গার্ডেনে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে।

টুটুন চুপ। —মা একটা গরম নিশ্বাস ছাড়ল।

—আবার কবে যাওয়া হবে সেখানে শুনি?

—সেটা অবিশ্যি এখনো ঠিক হয়নি। আসতে আসতে বাবা বলছিল, তার আগে গভর্নমেণ্ট হর্টিকালচারেল গার্ডেনে আমাদের নিয়ে গিয়ে চন্দ্রমল্লিকা প্রদর্শনীটা দেখিয়ে আনবে। এই ডিসেম্বরেই সেটা আরম্ভ হচ্ছে।

—খবরদার! রঞ্জু দেখল কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মা-র চোখ মুখ খঞ্জর মতন ধারাল হয়ে উঠেছে। হাত নেড়ে মা বলছে, ওই দলের সঙ্গে আর একদিনও আমি তোমাকে বেরোতে দেব না। দরকার নেই আমার পাখি দেখে ক্যাকটাস হর্টিকালচারেল গার্ডেনের প্রদর্শনী দেখে। ইস্কুলটি ছাড়া কাল থেকে তুমি আর এক পা ঘর থেকে নড়তে পারবে না।

আ কী মজা! রঞ্জুর লাফাতে ইচ্ছে করছিল। বাবার নামে নালিশ করে কেমন একখানা টাউস বালিশ মা-র কাছে উপহার পেলে এবার দ্যাখো টুটুনমণি। বাড়ি থেকে বেরোনো তোমার বন্ধ হয়ে গেল। বগল বাজিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল রঞ্জুর।

(ক্রমশঃ)

নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে
সম্পূর্ণ নূতন ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা বই

নেতাজী ও কুইসলিং প্রসঙ্গ

লেখক ঃ বঙ্গজ ভারত-নাগরিক **প্রকাশ ভট্টাচার্য**

দাম ঃ ১৮ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

গিরিধারী কুন্ডু

একি—অশোক! ওর-পাশে বসে বছর চোদ্দর ছেলেটা—ওই বা কে? সুসিত না!

মুখ পেছনে করে ওই দূরে, দেয়ালের কাছে তাকাতে গিয়ে চোখ চমকায়। অবাক হয় সরমা। ছ্যাঁত করে ওঠে বুক। অশোক, সুসিত এখানে আসবে, একথা ও শোনে নি। সরমাকে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সে-ই আবার এদেরকে ডাক দিয়েছে? আগে থেকে জানতে পারলে, শরীর খারাপ লাগছে, অসুবিধে রয়েছে এ জাতীয় কিছু বলে আসা বন্ধ করা যেত। এখন? এখন কি উঠে পড়বে সে? তা কি করে সম্ভব! পেছনে ঠাসাঠাসি অবস্থা। বেরোবার দরজা পর্যন্ত মানুষের ঠাসা চাপে ভীষণ ভাবে বুজে গেছে।

অনেককে আসতে বলেছেন মিস্টার চক্রবর্তী। বছর ঘুরলেই মেয়ের জন্মদিন পালন করেন ঘটা করে। পয়সাওয়ালা লোক—এমন দশ-বিশ হাজার হঠাৎ ফুরিয়ে গেলে কিছু এসে যায় না। ডেয়ারী, কাপড়ের প্রকান্ড দোকান, চা-বাগান, সিনেমা হাউস—সব ব্যবসাতে জড়িয়ে রেখেছেন নিজেকে। নোটের বাড়তি তাড়া আগাম দিয়ে বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকাকে ডেকে এনে গান শোনেন নিজে, আর অন্য পাঁচজনের তোয়াজ রাখতে তাদেরকেও ডেকে গান শোনান। সেই সঙ্গে মেলা-মেশার বিরাট এক বন্দোবস্ত। অর্থাৎ মেলা-মেশার ধরন—যত ইচ্ছে গ্লাস গ্লাস পানীয় ঢালার পর্ব চলছে কোণের মুখোমুখি চেয়ারে বসা মানুষদের। পানীয় নিয়ে অস্থির ভাবে নাড়ানাড়ি চলে আর গ্লাসে গ্লাস ঠোকায় জলতরঙ্গ বাজল যেন। কিছুক্ষণের আনন্দ-ফুর্তির খাসা উদ্যোগ। যাকে বলে মিলিমিশি হই-চই করা। ওই এক আনন্দ পুরুষদের।

এবার নিয়ে সুরমা তিনবার গান শোনাতে এল। অশোক, সুসিত—ওরাও এখানে গান গাইবে? গেলবার দুজনের একজনও আসে নি। এই প্রথম দেখল। অশোকের নাম-ডাক সুরমার চেয়ে বেশি। এলাহাবাদে থাকে। গানের কলেজ খুলেছে ওখানে। ওই নিয়ে মেতে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। আর এখন-তখন ছেলে সুসিতকে নিয়ে আজ বোম্বাই কাল দিল্লী কলকাতায় পরশু ঝটিকা সফর করে গান গাইবার জন্যে।

কি করবে সুরমা? উঠে পড়বে? চলে গেলে মিস্টার চক্রবর্তী কি ভাববে। সুরমার এখনকার স্বামী, যে হৃদয় জুড়ে রয়েছে ওর তার সঙ্গে চক্রবর্তীর মেলামেশা খুব গভীর যে!

অশোক উঠে দাঁড়াল। দেয়ালের খানিক দূরে গিয়ে চেয়ার ঘুরিয়ে বসল। একজনের সংগে নিচু গলায় কথা বলছে কানের কাছে মুখ রেখে।

বারবার পেছনে তাকিয়ে ঘাড় ধরে গেছে মনে হল। কখন সুরমার আঁচল পড়ে গেছল নিচে, খেয়াল করে নি। হাত কাত রেখে তুলে নিল কোলের ওপর।

পরার কাপড়টা সবুজ সবুজ দেখতে। ব্লাউজের রংও তা-ই সবুজ। হাতা কাটা। সিল্কের। উজ্জ্বল আলো পড়তে ঝলমল করছে। এদিকে ফিনফিনে পাতলা কাপড়ের নিচ ফেটে দেখা যাচ্ছে—পেটের সামনাদিকে মেদের মোটা ভাঁজ। সংখ্যায় অনেকই। মেদ জমেছে দু-বুকেও।

বয়স হয়েছে সুরমার। এই বত্রিশ-পয়ত্রিশের মত। গলা ঘেঁষে মুক্তোমালা। কানেও মুক্তো। বাঁ হাতের আঙুলে আংটি একটা। সাদা কুট্টি হীরা পাথরের হবে হয়ত। ওপর থেকে জোর আলো নেমে এসেছে, বারবার তাই আলো লেগে ঝিলিক মারছে।

পিঠ ঢেকে রাখা চাদরটা খদ্দরের। ছাড়াছাড়িভাবে চুমকি বসানো। হালকা বেগুনি, নীল, হলুদ সুতোয় সোজা দাগ টেনে সুন্দর কাজ করা। দু হাতে দু গাছা সোনার চুড়ি। ডান হাতে বাড়তি শুধু লাল ডায়ালের চৌকো ঘড়ি।

মুখ ঘুরিয়ে খাড়া চোখে আবার অশোককে দেখে। মুখ শুকনো রেখে বসে। আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছে। সময়ে খায় না মনে হয়। পুরনো অভ্যেস ঠিক রেখেছে। চোখ লাল ডগডগে, মদ গিলে কি আর আসে নি? এ ছাড়া কি মানায়। মেজাজ আসবে না যে বাবুর। যখন গলায় ঢালে, এক আধটুকুতে গলা ভেজে না। ঢক ঢক করে বোতলের শেষ ফোঁটা জিভের ডগায় চেটে তবে শান্তি।

অশোক ওর দিকে সোজা তাকিয়ে। খুব কাছ থেকে এক মনে চেয়ে আছে। এরকমই স্বভাব। একবার তাকালে, চোখের পাতা বুজে আসে না সহজে। কত বকেছে এভাবে না তাকাবার জন্যে। অভিযোগ অভিমান সব কিছু ও স্বাভাবিক প্রবণতা বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন—

ওরকমভাবে তাকিও না। অসভ্য কোথাকার।

প্রশ্ন অশোকের গলার স্বরে।

তাকাব না কেন? আমার ইচ্ছে যখন খুশি, যত খুশি তাকাব।

তবু আপত্তি তোলে সুরমা।

তাকাবার সময় এটা নয়। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা বন্ধ করো। কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে?

অশোকের পালটা প্রশ্ন আবার।

কে দেখবে? দেখার আগেই তার চোখ দুটো গুলী করে উড়িয়ে দেব না।

হয়েছে, অনেক বকবক করেছ। এবার চুপ থাকো। কোথায় যাবে বলেছিলে, সেখানে সটান রওনা হও।

এক পা-ও বাড়াচ্ছি না, যতক্ষণ না তোমাকে দু চোখ ভরিয়ে দেখে নিচ্ছি।

আরে, রাতটা পড়ে রয়েছে। তখন যত-খুশি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখো।

রাত হতে ঢের দেরি। তার ওপর তোমার ত আবার রাত বারটার আগে ঘরে ফেরা হয় না।

যাও, দুষ্টু কোথাকার।

বলতে বলতে অশোকের রোগা শরীর সুরমা ধাক্কা দেয় আস্তে-ই।

তুমি ধাক্কা দিলে!

লাগবে না ত জানি। এ মারে কিছু হবে না।

তুমি বার করে দিচ্ছ? আমি চললাম।

শাড়ি ভাঁজ করে এক ঝাপটা দিতে দিতে বলে ওঠে সে-ও।

আমি তাহলে বেঁচে যাই।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে চেয়ার থেকে। আর এক টুকরো অভিমান নিয়ে গানের স্কুলের দিকে সোজা হাঁটতে লাগে। অশোক এমনই। গানের স্কুল বলতে ওর প্রাণ। যত রাজ্যের গানে অস্থির ছেলে-মেয়েরা ভিড়ে যেত কাছে। দরদ দিয়ে গান শিখিয়েছে।

শুধু গান শিখিয়ে সাংসারিক টুকি-টাকি প্রতিশ্রুতি টিকিয়ে রাখা কোন মতেই ওর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। একে তাকে অনেক বলতে সিনেমায় অভিনয় করার সুযোগ জুটে গেল। গানও গেয়েছিল নিজের গলায়। সে-ছবিটা তুলে ধরল অশোককে। ফিরিয়ে দিল ভাগ্য।

সারাক্ষণ সুটিং নিয়ে দৌড়ঝাঁপ, রাত ছাড়া খবর নেওয়া হত না। অশোক জানত সুরমার উগ্র রূপ আছে। কথা বলার ভঙ্গিমা যে কোন নায়িকার থেকে কমতি নয়। গানের গলা ওরও চমৎকার।

স্টুডিওতে একদিন গেছে, সেটের কাজে আটকে ছিল অশোক। সুরমার একা-মন উশখুশ করে উঠল। নিজে থেকে এক-জনের সঙ্গে গা ঘেঁষে আলাপ জমিয়ে দিল। ভদ্রলোক নতুন অভিনেত্রী খুঁজছেন।

সুরমার সব কিছু—দেহের বিভিন্ন অংশের ভূগোল, সহজভাবে কথা বলা, উজ্জ্বল বড় বড় চোখ কাছে টানে। নায়িকা সাজাতে মনে ধরে যায়।

সুরমা অশোকের কানে পাঠিয়ে দিল কথাটা। আপত্তি থাকতে পারে না। এটা খুব স্বাভাবিক কথা, একজনের আয়ে সংসার এখন সচল থাকে না। তাছাড়া ফ্লোর আলাদা হলেও এক সঙ্গে স্টুডিওতে যাওয়া যাবে, ফেরাও হবে দুজনে।

বেশ চলছিল এলোমেলো দিনগুলো। দিন-রাত্তির বাইরে যখন তখন যেতে হয়। সুরমাকেও।

হঠাৎ চিন্তা কেটে গেল। সমবেত অতি-থির ধারাবাহিক কথা বলাবলি ক্রমশ কমে আসছিল।

সুরমার চোখে পড়ে—মিস্টার চক্রবর্তী গিলে করা-পাঞ্জাবীর হাতা পেছনে সরিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে। ভারী গলায় গড়গড় করে বলতে থাকে।

ডিয়ার লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন—

অশোকের গান দিয়ে আজকের শুভ সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। অশোক আমার বিশেষ বন্ধু। সব কাজ ফেলে দিয়ে কথা রাখতে ছুটে এসেছে গান শোনাতে। শুধু আমাকেই নয় আমার প্রিয় বন্ধুদেরও। সেই সঙ্গে আরেকটা খুশির খবর হল—অশোকের ছেলে সুসিতও এসছে। আপনা-দের ভাল লাগবে নিশ্চই। তাছাড়া সুরমা রায় অন্যান্য বছরের মত গান শোনাতে এসছে। আগে অশোকের গান শুনুন। তার-পর অন্য সবার।

কথার শেষে একটানা হাততালি বেজে ওঠে।

কাছে এলেন মিস্টার চক্রবর্তী। ঘাড় ছোট করে সুরমার মুখের কাছে মুখ রেখে বললে ঃ

মিসেস রায়, আপনি কিছু মনে কর-বেন না। ওদের বাপ-বেটাকে ছেড়ে দিয়ে আপনাকে বসাবো। বলতে গেলে আপনি আমার ঘরের। আমার যাবতীয় আবদার রাখবেন জেনেই ওদেরকে আগেভাগে ছেড়ে দিচ্ছি।

অশোক সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দুর্ঘটনার মত ওর শরীর দিয়ে সুরমার কাঁধে ধাক্কা লাগে একটুখানি।

সুরমা মুখের দিকে চোখ রেখে বলে ওঠে, সরি।

অশোকের কান স্বরাহত হয়। সে-ও মুখ ফিরিয়ে একটু হাসি হাসি মুখ করে বলে—

তুমি! কি, ভাল আছ?

হ্যাঁ। তুমি?

অশোক সামান্য ঘাড় দুলিয়ে সামনে, সাদা চাদরের উঁচু বেঁদি মত জায়গায় এসে পা ভাঁজ করে বসল। পকেট থেকে এক-গোছা কাগজের ভাঁজ ভেঙে মেলে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়মের রীডগুলো অস্থির হয়ে উঠল হঠাৎ-ই।

সেদিকে চোখ নেই। ক্রমশই আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সুরমার মন। বোঝা যাচ্ছে গান শোনায় মন নেই। ভাবছে, অশোক আর ওর বিগত সম্পর্কটা।

সম্বন্ধ খোঁজা হচ্ছিল। একে তাকে বলে রেখেছে সুরমার বাবা-মা। যার কথা বলে, মনে ধরে না সুরমার। দিনকে দিন পিছিয়ে যায় তারিখ।

বি-এ পড়ছিল। সবাই ভেবে-টেবে ঠিক করল, পড়াটা তাহলে শেষ করুক আগে।

কলেজে যায়, আসে। বেশ দিন কাটছিল। সমুদ্রের মত সকাল পড়ে থাকে সামনে, ভাল লাগে না। ছেলে বন্ধুদের সঙ্গ পেতে চায় সুরমার মন। ত্রিদিব, অশোক সুরমা চৈতী অরুন্ধতি এই পাঁচে মিলে নির্ভেজাল এক গ্রুপ তৈরি করল। ক্লাস না থাকলে সাঙ্গুভ্যালিতে আড্ডা বসত ওদের।

ছাত্র ধর্মঘটের দরুন কলেজ ছুটি হয়ে গেছে, পাঁচজন হই-হই করে বেরিয়ে পড়ে। এদিক-সেদিক ঘুরতে ফাঁকা এক রেস্তোঁরায় বসল সব সময় কাটাতে। ওই দিন-ই ওরা খুব বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

সুরমা প্রথম নির্জনতা ভাঙে।

একটার পর একটা খাওয়া হয়ে যাচ্ছে আজ।

চৈতী আর সুরমার দিকে তাকিয়ে ত্রিদিব বলে।

ওরা দুজন কি খাইয়েছে? এবার চায়ের মধ্যে কোন কনস্ট্রিবিউট করবে ত।

সুরমা—

আরে, খাওয়ালেই খাওয়ালাম। আমাদেরটা পরে বরং হবে। জমা থাকা ভাল। এতক্ষণে অশোকের মুখ খোলে—

সে ত হবে-ই। বিরাট ভবিষ্যত পড়ে আছে সবাইকার। একদিন না একদিন নিজেদের বিয়ে বৌয়ের সাধ ছেলে-মেয়ের অন্নপ্রাশন ইত্যাদি ইত্যাদি অবশ্যই হবে।

ওর কথায় সবাই এক হয়ে হাসে।

সুরমা—

অনেক বাজে কথা হয়েছে এবার থামো তুমি।

অশোক দোকানের ছেলেটাকে ডেকে বলে—

এই, কত করে চা এখানে?

তিরিশ পয়সায় এক কাপ।

কলেজ ক্যান্টিনে দশ পয়সা চা বললে চোখ আঁতকে ওঠে! পয়সা পরে দেব বলে কেটে পড়ে। তিরিশ পয়সা? তা হোক এখানে এখন তিরিশ পয়সার এক কাপ চা নিয়ে ঘন্টা দু-তিন সময় উতরে দিতে পারলে, মন্দ কি!

ত্রিদিব হাসতে হাসতে বলে—

এই যে পাঁচজন একসঙ্গে আছি হাসছি পরের দিন মন কষাকষি হয়ে যেতে পারে।

সুরমা ওর কথার উত্তর দিল—

হতে পারে। মন কষাকষি হওয়াটাই স্বাভাবিক। না হলে সেটা ভাববার বিষয় হবে।

চৈতি চায়ের চিনি নাড়াতে পেয়ালায় শব্দ বাজল। চোখ নিচু করতে প্রায় আঁতকে ওঠার গলায় বলে—

অ্যাঁ! চায়ের রংটা এত কালো কেন?

সুরমা সায় দেয়—

হ্যাঁ তাই ত!

চৈতি—

দুধ কম কেন?

অরুন্ধতী যে ছেলেটা চায়ের কাপ রেখে গেছে ওকে ডেকে বলে—

গায়ের রং পরিষ্কার চায়ের রং কালো? যা যা একটু একটু দুধ ঢেলে নিয়ে আয়।

পাঁচের বন্ধুত্ব বেশিদিন টিকল না। চৈতি চুপিচুপি ত্রিদিবের মন গেঁথে ফেলল। পুজোর ছুটি কাটাতে দেশে গেল অরুন্ধতী। সুরমা-অশোক আলাদা হয়ে পড়ল। একা বোধ করে সুরমা। মনে মনে বিরক্ত হয়ে পড়ে। তাই অশোককে আকর্ষিত করার জন্যে সব-সময় আজকাল সাজে।

সুরমা সেদিন অশোককে ছুটির পর থাকতে বলে পাঠালো ক্যান্টিনের বয়কে দিয়ে। এতদিন পর হঠাৎ সুরমা বলেছে অশোক তাই কলেজ গেটের সামনে পা দুটো গুণ চিহ্নের মত রেখে দাঁড়িয়ে। চোখ ফেলে রেখেছে কখন আসে। সুরমা ঠিক-ই এল অনেক দেরিতে।

পরিচিত সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে চেয়ারে কোমর রেখে সোজাসুজি ও বলা শুরু করল।

অশোক, বাড়ির সব আমার বিয়ে দেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। এখন একটা কিছু ঝটপট বাতলে দাও।

এ ত উত্তম কথা। তোমার কাছে খাওয়া পাওনা আছে। এবার তাহলে পাওনাটা মিটে যাবে।

দূর, যত বাজে বকছ তুমি। আমার বিয়ে ছাড়া কি আর তোমাকে খাওয়াতে পারি না!

আরে বিয়েটা কি খারাপ? বয়েস কি তোমার কম হয়েছে খুকুমণি?

প্রতিবাদ জানাবার বদলে সুরমা বলে।

বাড়িতে একদন্ড বসে থাকলে কানের কাছে ঘ্যানোর-ঘ্যানোর শুরু করবে মা-ঠাকুমা। কি রে সুরমা তোর এ ছেলে পছন্দ হয়, বল না? ওই চিন্তা করে করে আমার মাথার বারটা বেজে যাবে একদিন। বয়সের কথা বলছ—আমার বিয়ের সময় হয়ে থাকলে তোমারও বিয়ের বয়স হয়েছে দাদাবাবু!

অশোক নির্মল হাসি হাসে।

অফকোর্স, বয়স হয়েছে। কিন্তু আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ঘটকালি করবে কে? বাপ গন্ মার একমাত্র পুত্র তাই স্কলারশিপ নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়ছে। আপত্তি না থাকলে অনায়াসে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি। এ বিষয়ে তোমার এতটুকু চিন্তা থাকতে পারে না আশা করি।

সামান্য এ ঠাট্টার কথা কানে আসতে কুড়ি বছরকার শরীরে রীতিমত কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

সুরমা মুড়ে ছিল, শুনিয়ে দেয়—

যা! তোমাকে বিয়ে করতে যাবে কে! সুন্দর গলা আছে। গান গাইতে পার। এছাড়া আর কি অ্যাকটিভিটিস আছে? তোমাকে বিয়ে করলে নির্ঘাত দু বেলা পেট খালি থাকবে আমার। কবে কোন ফাংশনে গান গাইবেন বাবু তবেই ঘরে উনুন জ্বলবে!

অনেক কথা একজন আরেকজনকে নিভৃতে শোনায়। চোখের ধরাধরি শুরু হয়। উচ্ছ্বাস সেই সঙ্গে উথলে পড়ে!

বিল মিটাতে ব্যাগ ধরে সুরমা। অশোক হাত থামিয়ে দেয়। কোন আপত্তি শোনে না। চাপ দেয় একটু। তবু ইচ্ছে থাকলেও কিছুতে হাতের মুঠো শক্ত হয় না। থর-থরিয়ে কাঁপে অশোকের হাত। সুরমারও।

ওই হাতের স্পর্শটুকু রোমাঞ্চিত করল কুমারী দেহের বিভিন্ন অংশের ভূগোল। এক ক্লাসে পড়ে, সময় সময় এমনিতে কত গা ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যায়, হাতে হাত লাগে। এমন হয়নি কোনদিন! দৈহিক যে উত্তাপ অশোক শরীরের ভেতর ছড়িয়ে দিল তা যেন কাল হয়ে দাঁড়ায়। মনে বেশ দাগ কেটে ছিল। সারা রাত তাই কষ্ট দেয় অশোকের মুখটা। রাত ভোরেই অশোক অশোক বলে মন অস্থির! সাংঘাতিক সব রঙীন অনুভূতি মনের ভেতর তরতরিয়ে খেলে গেল!

বাড়ি নিয়ে এল একদিন অশোককে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে ওর মাকে চিনলেন সুরমার মা। এক জায়গায় দেশের বাড়ি ছিল দু মায়ের। স্বভাবতই তাই ঘরে-বাইরে স্বাভাবিক আনাগোনা, অবাধ মেলা-মেশা, কাছের ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ে।

অনেক কথা একজন আরেকজনকে শোনায়। উচ্ছ্বাস সেই সঙ্গে উথলে পড়ে।

fragrance, and freshness of a morning flower
captured for you in this luxury afghan talcum powder
Feel the heady yet soothing fragrance wafting about you the whole day
luxury
AFGHAN
talcum powder
NOW!
AVAILABLE IN
4
COLOURFUL CONTAINERS
From the makers of AFGHAN SNOW Beauty Aids

সুরমার চেহারায় উন্মাদনা আছে। সত্যি সত্যি বাহার এনে দেয় মনে। একদিন তাই অশোক খোলামেলা জায়গায় বেড়াতে বেড়াতে বিয়ের কথা পাড়ে। সে-ও রাজী।

একদিন খুব হই-চই-এর ভেতর বিয়ে হল ওদের। দিনের চাকা বেশ ঘুরছিল। কিন্তু একটা ঝড় ঠিকই এগিয়ে এল। সে ঝড় সব ভেঙেচুরে দিতে চাইল যেন।

একের পর এক প্রক্ষিপ্ত ঘটনার ভিড়। সেই পরিচালকের সঙ্গে মাখামাখি ভাব ছাড়াতে চেয়েছিল অশোক। তাতে কোন ফল হয় না।

নিজের কষ্ট অনেক সময় চেপে রাখে অশোক। কারণ রয়েছে, সুরমার শরীরে যে জন্ম নিচ্ছে ওর ভবিষ্যত!

সেদিন রাত অনেক, এই দশটার মত, ফোন পেয়ে ঝটপট শাড়ি পালটে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অমনি মনকে বিষিয়ে তোলে।

অশোকের গমগমে গলার স্বর প্রকাশ পায়—

কোথায় যাওয়া হবে এত রাত্রে?

কথাগুলো সুরমার পা থামিয়ে দেয়। তবু ও বেরিয়ে গেল ঠিক-ই। ফিরল রাত বারটা বাজিয়ে।

শাশুড়ি, অশোকের মা ঘুমায় নি। জেগে জেগে বই পড়ছিল। দরজায় শব্দ পড়তে অশোককে ডাকে দরজা খুলে দেবার জন্যে।

সুরমা ভেতরে ঢুকে আসে। ঝাঁঝ ঝাঁঝ গলায় বলে—

আরো কিছুক্ষণ বাইরে থাকতে পারতে।

জিজ্ঞাসার সুরে সে-ও বলে—

তুমি যখন রাত করে ফের? তখন আমি মুখ খুলি না, এটাও তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।

হিল তোলা জুতো দিয়ে সিঁড়ির ধাপে খটাস খটাস শব্দ তুলে সুরমা ওপরে চলে গেল।

ভাঙা গলায় অনুযোগের সুরে মা বলে—

এই আমাদের লক্ষ্মী বউমার কথা! কি বউ আনলি, নিজের খেয়াল-খুশি মত চলতে ফিরতে চায়। একবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। আমাকে মানুষ বলে-ই মনে করে না বুঝি? বউমা এখনকার মেয়ে হতে পারে, কিন্তু আমরা সেই সেকেলেরই। আর পাঁচজনের সঙ্গে এক পাড়ায় থাকি। তারা কি ভাবে? কি বলাবলি করে তা ত কানে যায় না তোদের! আমার হয়েছে যত জ্বালা!

একটু থেমে নিয়ে ফের বলতে থাকে—

এরকমভাবে চললে, হয় আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, নয়ত বউমাকে - অন্য কোথাও—

কথা শেষ হয় না। ঝুলে বারান্দার ওপর থেকে সুরমার মুখ ঝুঁকে পড়ে, বলে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি আপনার ছেলে নিয়ে এ বাড়িতেই থাকুন। আমিও আমার ছেলে নিয়ে চলে যাব।

অশোক এখনকার ছেলে হলেও ভীষণ সেন্টিমেন্টাল।

ঘরে তিন বছরের বাচ্চাটা যে একা থাকে, সে কথা মনে থাকে কতক্ষণ! আবার বলা হচ্ছে—ছেলে নিয়ে চলে যাব।

বনিবনা হয় না। প্রতি মুহূর্তেই কথা কাটাকাটি লাগে সামান্য কিছু নিয়ে। একটা অস্থির অবস্থা অশোকের বাড়িতে। কারণ একটাই। শুতে-উঠতে-বসতে দুশ্চিন্তা দুজনেরই। বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে দু মন থেকে।

এর মধ্যে আবার আরেক বিপদ। কদিনের অসুখে অশোকের মা সংসারের সব দায়দায়িত্ব ছেড়েছুড়ে চলে গেল। তাই এর পরের দিনগুলো খুব সুখের হল না।

চোখের সামনেই অল্পবয়সী এক গায়কের হাত ধরাধরি করে মার্কেটিং সারতে বেরিয়ে গেল একদিন। এতে অশোকের মন ভীষণ বিরক্ত হয়। সব সময় সচেতন থাকে সে এখন। তবু সব কিছুতে এলোমেলো করার দিকে সুরমার ঝোঁক বেশি।

মেজাজ বিগড়ে গেল ওর। এভাবে আর কদিন চলতে পারে। দুজন দুজনের থেকে দূরে সরে থাকার কথা তুলল। ঝামেলা দেখা দিল তিন বছরের ছেলে সুসিতকে নিয়ে।

অশোক বলল—

না, ও আমার কাছেই থাকবে।

সুরমার তাতে যথেষ্ট আপত্তি।

তা হবে কেন? আমি ওকে পেটে ধরেছি, ও আমার সঙ্গেই থাকবে।

আদালত কিন্তু সুরমার মাতৃত্বকে হারিয়ে দিল। কারণ অশোক ত, সরাসরি বিচারককে সুসিতের প্রতি অবহেলার কথা বলেছে।

সুরমা হেরে গেল। অশোকের জীবন থেকে সরে দাঁড়ায় নিঃশব্দে একদিন।

চিন্তা থেমে দাঁড়াল। অশোকের গান শেষ। হাততালি পড়ছে ঘনঘন। সুরমা শুনতেই পেল না গান। মন অন্যদিকে ছিল। কি করবে। ওর গান অন্য সবাইকে আনন্দ দিয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

একজন শ্রোতা নেশার মাত্রা জানাতে অশোকের গান আওড়াতে থাকে।

বা। অশোক বেশ গাইল—মুছে যাওয়া দিনগুলো আমারে .....

এ কি, অশোক? অশোক উঠে পড়েছে আসর থেকে, সুসিতের শরীরের পেছনটা দেখতে পেল। আর চুপ হয়ে স্থির বসে থাকতে পারে না। সুরমা উঠে দাঁড়ায়। মিস্টার চক্রবর্তী এগিয়ে এসে বলে—

একি, আপনি কোথায় চললেন? এখুনি আপনার গান গাইবার পালা যে সুরমাদেবী।

একটু আসছি।

বাইরে সন্ধ্যা ঘন হয়ে নেমেছে।

অশোক গাড়িতে উঠে বসে। বাঁ-হাত পেছনে রেখে দরজা খুলে দেয়। সুসিত চটপট ভেতরে ঢুকে গিয়ে জানলার কাচ নাবাতে থাকে।

গাড়ির রাক্ষুসে চোখ—হেড লাইটের আলো সামনের ধোঁয়াশার ভেতর ছড়িয়ে পড়ে। গাড়ি স্টার্ট দেবার জন্যে চাবি ঘোরায় অশোক। সুরমা দৌড়তে দৌড়তে এসে পড়েছে। দাঁড়িয়ে না থেকে, কোমরে গুঁজে রাখা ছোট রুমাল টেনে বার করে। আর তারপরেই সুসিতের দু-চোখ, সারা মুখে বুলিয়ে নিজের চোখের সামনে চেপে ধরে রাখে। অমনি নিজের চোখ থেকেই অসময়ের মত ছটফটিয়ে বৃষ্টি।

এদিকে লাল ফিয়াট গাড়িটা গা ঝাঁকিয়ে, মাটি কাঁপিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগোয়। গাড়ির পেছনের নিষেধের মত লাল আলো সেই ধোঁয়া রং অন্ধকারের ভেতর নিভে নিভে, অল্পক্ষণ জ্বলেই মিলিয়ে গেল।

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

মিস মার্পল বললেন—তোমাদের মাথা আর মুন্ডু। মেয়েছেলে দেখলে সব ব্যাটা-ছেলেই কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে ছোটে। স্যার রিচার্ড ও ডায়নার রূপে পাগল হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন সামনে—নিশ্চয় হোঁচট খেয়েছিলেন গাছের শেকড়ে। মাথা ঠুকে বেহুঁশ হয়ে যেতেই সবার আগে একজনই গিয়েছিল তাঁর কাছে—খুড়তুতো ভাই ইলিয়ট। তার পরণে জংলী সর্দারের পোশাক। তার মানে কোমরে গোটা চার পাঁচ ছুরি থাকা আশ্চর্য নয়। ঝোঁকের মাথায় চট করে খুন করে ফেলে দাদাকে—সম্পত্তির লোভে উপাধির লোভে ডায়নার লোভে। বুকে ছুরি বিঁধিয়েই লুকিয়ে ফেলে বেল্টের মধ্যে। পরে নিজের কাঁধেই ছুরি মেরে সাধু সাজতে চেয়েছিল। প্রেমের আগুনে পুরুষ-পোকারা পুড়ে মরে এইভাবেই।

খেলাধূলা

দর্শক

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরের মারডেকা স্টেডিয়ামে তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারত ২—১ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্ব হকি কাপ জয়ী হয়েছে। ভারত বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে (১৯৭১) **৩য় স্থান** এবং দ্বিতীয় বছরে (১৯৭৩) দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল। বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় এশিয়ার দুটি দেশকে নিয়ে ফাইনাল খেলা এই প্রথম হল। ১৯৭১ সালের ফাইনালে খেলেছিল পাকিস্তান ও স্পেন এবং ১৯৭৩ সালের ফাইনালে হল্যান্ড ও ভারত। এবারের বিশ্ব কাপ হকির সেমি-ফাইনালে চারটি দেশের মধ্যে এশিয়ারই ছিল তিনটি দেশ—ভারত, পাকিস্তান এবং মালয়েশিয়া। দীর্ঘ দিন পর আন্তর্জাতিক হকি খেলার আসরে ভারত তার হৃতগৌরব ফিরে পেল। ভারতের শেষ অলিম্পিক হকি খেতাব জয় ১৯৬৪ সালে এবং শেষ এশিয়ান গেমসের হকি খেতাব জয় ১৯৬৬ সালে।

ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধের ১৮ মিনিটের মাথায় পাকিস্তানের লেফট আউট সফদার আব্বাসের কাছ থেকে বল পেয়ে লেফট ইন মহম্মদ সয়িদ প্রথম গোল করে দলকে ১—০ গোলে এগিয়ে দেন। খুবই অতর্কিতে গোলটি হয়। অনেকের মতে আব্বাস অফসাইডে থেকে বলটি ধরে সয়িদকে দিয়েছিলেন। এর আগে খেলার ১৩ মিনিটের মাথায় পাকিস্তানের অতি নির্ভরশীল খেলোয়াড় শমীউল্লা একটা বল ধরতে গিয়ে আহত হন এবং খেলা থেকে বিদায় নেন। তাঁর শূন্যস্থানে খেলতে নামেন সফদার আব্বাস। খেলার ২৯ মিনিটের মাথায় পাকিস্তানের গোল-লাইন থেকে মুনাব্বর জামান একটা বল প্রতিরোধ করে একটি অবধারিত গোল রক্ষা করেন। বিরতির সময় পাকিস্তান ১-০ গোলে এগিয়েছিল।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সূচনা থেকে ভারত জোর আক্রমণ চালিয়ে খেলতে থাকে। খেলার ১০ মিনিটের মাথায় ভারতের লেফট ব্যাক সুরজিৎ সিং পেনাল্টি কর্ণার থেকে গোল শোধ করেন (১—১)। এর পাঁচ মিনিট পর অশোককুমার চমৎকার ফ্লিকে ভারতের জয়সূচক গোলটি দেন। সমস্ত খেলায় পেনাল্টি কর্ণার পায় ভারত ৬টি, অপরদিকে পাকিস্তান মাত্র একটি।

ফাইনালে দুই দলই প্রাণপণ করে খেলেছিল। তবে পাকিস্তান তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। পাকিস্তানের কোচ এবং ম্যানেজার আনোয়ার আমেদ খাঁ স্বীকার করেন ভারত ভাল খেলে জিতেছে।

ভারতের এই বিশ্ব হকি কাপ জয় উপলক্ষে সারা দেশে আনন্দ এবং অভিনন্দনের বন্যা বয়ে চলেছে। বিহার বিধানসভায় বিশ্ব হকি কাপ বিজয়ী ভারতীয় হকি দলকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে সরকারীভাবে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী সংগত কারণেই সব থেকে বেশী গর্বিত এবং আনন্দিত। তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ভারতীয় হকি দলের দু'মাসের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প বসেছিল। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন 'প্রতিটি খেলোয়াড়ের বাপ-মার হাতে পাঁচ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে।'

ইউরোপীয় প্রাধান্য খর্ব

ভারতের এই বিশ্ব হকি কাপ জয়ের ফলে আন্তর্জাতিক হকি খেলার আসরে ইউরোপীয় প্রাধান্য লুপ্ত হল। ১৯৭২ সালে পশ্চিম জার্মানী অলিম্পিক হকি খেতাব এবং ১৯৭৩ সালে হল্যান্ড বিশ্ব হকি কাপ জয়ের সূত্রে আন্তর্জাতিক হকি খেলার আসরে ইউরোপীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

ফাইনালের পথে

ভারত : লীগ পর্যায়ের খেলায় ইংল্যান্ডকে ২—১ ঘানাকে ৭—০ এবং পশ্চিম জার্মানীকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের খেলা ১—১ গোলে ড্র ছিল। আর্জেন্টিনার কাছে ভারত ১—২ গোলে হেরেছিল। মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ভারত ৩—২ গোলে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

পাকিস্তান : লীগ পর্যায়ের খেলায় পাকিস্তান অপরাজিত ছিল। তারা মালয়েশিয়াকে ২—১ গোলে, স্পেনকে

অজিত পাল সিং
অধিনায়ক—ভারত

সুরজিৎ সিং

অশোককুমার

৫—০ গোলে এবং নিউজিল্যান্ডকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। তাদের খেলা পোল্যান্ডের সঙ্গে ২—২ গোলে এবং হল্যান্ডের সঙ্গে ৩—৩ গোলে ড্র হয়েছিল। মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে পাকিস্তান ৫—১ গোলে পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

লীগ পর্যায়ের খেলায় পাকিস্তান অপরাজিত ছিল—পাঁচটা খেলায় জয় ৩ এবং ড্র ২। মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে তারা ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানীকে শোচনীয়ভাবে ৫—১ গোলে হারিয়ে স্বপক্ষে দ্বিতীয়বার বিশ্ব কাপ জয়ের সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল করেছিল। সেমি-ফাইনাল খেলার পর পুরো দু'দিন জিরিয়ে নিয়ে পাকিস্তান খেলতে নামে। অপরদিকে ফাইনালে ভারত খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে খেলতে নেমেছিল—উপর্যুপরি দু'দিন সেমি-ফাইনাল খেলার পরই ফাইনাল খেলা, মাঝে একদিনও বিশ্রাম পায়নি। নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেরই কাছে পাকিস্তান ছিল বিশ্ব হকি কাপ জয়ের পক্ষে একান্ত নির্ভরযোগ্য দল। ফাইনালে কিন্তু পাকিস্তান তাদের সুনাম বজায় রেখে খেলতে পারেনি। অপরদিকে ভারত আশাতিরিক্ত ভাল খেলেছিল। উত্তেজনা এবং উৎকর্ষতার দিক থেকে খেলাটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

যোগ্যতার ক্রমপর্যায় তালিকা

তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বারটি দেশের খেলার ফলাফলের ভিত্তিতে এইভাবে যোগ্যতার ক্রমপর্যায় তালিকাটি তৈরি হয়েছে : ১ম ভারত, ২য় পাকিস্তান, ৩য় পশ্চিম জার্মানী ৪র্থ মালয়েশিয়া, ৫ম অস্ট্রেলিয়া, ৬ষ্ঠ ইংল্যান্ড, ৭ম নিউজিল্যান্ড, ৮ম স্পেন, ৯ম হল্যান্ড ১০ম পোল্যান্ড, ১১শ আর্জেন্টিনা এবং ১২শ ঘানা।

বিশ্ব হকি কাপ

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯৭১ (বার্সিলোনা) : ১ম পাকিস্তান, ২য় স্পেন, ৩য় ভারত।

১৯৭৩ (আমস্টারডাম) : ১ম হল্যান্ড ২য় ভারত, ৩য় পশ্চিম জার্মানী এবং ৪র্থ পাকিস্তান।

১৯৭৫ (কুয়ালালামপুর) : ১ম ভারত, ২য় পাকিস্তান, ৩য় পশ্চিম জার্মানী এবং ৪র্থ মালয়েশিয়া।

ভারত বনাম পাকিস্তান

অলিম্পিক গেমস এশিয়ান গেমস এবং বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা—এই তিনটি আন্তর্জাতিক বড় আসরে ভারত এবং পাকিস্তান এপর্যন্ত ১৩ বার পরস্পরের সঙ্গে হকি ম্যাচ খেলেছে। এই তেরটি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ভারতের জয় ৫, পাকিস্তানের জয় ৭ এবং খেলা ড্র ১।

অলিম্পিক গেমস

১৯৫৬ (ফাইনাল) : ভারত ১ : পাকিস্তান ০; ১৯৬০ (ফাইনাল) : পাকিস্তান ১ : ভারত ০; ১৯৬৪ (ফাইনাল) : ভারত ১ : পাকিস্তান ০; ১৯৬৮ : পাকিস্তান ১ : ভারত ০; ১৯৭২ (সেমি-ফাইনাল) : পাকিস্তান ২ : ভারত ০।

এশিয়ান গেমস

১৯৫৮ : ভারত ০ : পাকিস্তান ০; ১৯৬২ (ফাইনাল) : পাকিস্তান ২ : ভারত ০; ১৯৬৬ (ফাইনাল) : ভারত ১ : পাকিস্তান ০; ১৯৭০ (ফাইনাল) : পাকিস্তান ১ : ভারত ০ এবং ১৯৭৪ (ফাইনাল) : পাকিস্তান ১ ও ২ : ভারত ১ ও ০।

বিশ্ব হকি কাপ

১৯৭১ (সেমি-ফাইনাল) : পাকিস্তান ২ : ভারত ১; ১৯৭৩ (সেমি-ফাইনাল) : ভারত ১ : পাকিস্তান ০ এবং ১৯৭৫ (ফাইনাল) ভারত ২ : পাকিস্তান ১।

রঞ্জি ট্রফি

সেমি-ফাইনাল খেলা

হায়দরাবাদের লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে বোম্বাই প্রথম ইনিংসে ১৭৭ রান বেশী করার সুবাদে হায়দরাবাদকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বোম্বাই : ৫০০ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রামনাথ পার্কার ১৯৭, এ ভি মানকাদ ১৪২, অজিত পাই ৬৩ এবং পি ট্যান্ডন অপরাজিত ৫০ রান। জ্যোতিপ্রসাদ ৯৭ রানে ৪ উইকেট)।

ও ১৫৬ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কারসন ঘাবড়ি ৫০ নট-আউট)

হায়দরাবাদ : ৩২৩ রান (নরসিং রাও ৭৫ অপরাজিত এবং আব্বাস আলি বেগ ৫২ রান। সিভালকার ১০৫ রানে ৪ এবং ট্যান্ডন ১০৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৪৯ রান (৭ উইকেটে। আবিদ আলি ৭৭ রান)

গতবারের রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী কর্ণাটক ৭ উইকেটে দিল্লীকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দিল্লী : ২২০ রান (সুন্দরম ৬৭ এবং গিদওয়ানী ৫৪ রান। চন্দ্রশেখর ৭৪ রানে ৬ এবং প্রসন্ন ৬৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৭১ রান (এম অমরনাথ ৬০ রান। প্রসন্ন ৫৪ রানে ৫ এবং চন্দ্রশেখর ৬৫ রানে ৪ উইকেট)

কর্ণাটক : ৩০০ রান (বিজয়কুমার ৭২, ব্রিজেস প্যাটেল ৫৬ এবং সুধাকর রাও ৫৪ রান। বেদী ৯৭ রানে ৭ উইকেট) **ও ৯৫ রান** (৩ উইকেটে)

রোভার্স কাপ

রোভার্স কাপের দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে গোয়ার ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব ১—০ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করেছে। ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব রোভার্স কাপের ফাইনালে প্রথম খেলেই কাপ জয়ী হল। গত বছরের রোভার্স কাপ জয়ী ইস্টবেঙ্গল এ-বছরের খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি।

পরলোকে নেভিল কার্ডাস

বিশ্ব বিশ্রুত ক্রিকেট এবং সঙ্গীত সমালোচক স্যার নেভিল কার্ডাস তাঁর ৮৫ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। তিনি হৃদ-রোগে সামান্য আক্রান্ত হয়ে লন্ডনের এক হাসপাতালে যান এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৮৮৯ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের এক অতি দরিদ্র বস্তি পরিবারে তাঁর জন্ম। এক দূর আত্মীয়ের কাছে তিনি প্রতিপালিত হন। বাল্যকালে স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা লাভেরও তিনি সুযোগ পাননি। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি সঙ্গীত এবং ক্রিকেট খেলার সমালোচক হিসাবে বিশ্ব খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ক্রিকেট এবং সঙ্গীত বিষয়ে তিনি বেশ কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন।

১৯৬৭ সালে তাঁকে সরকারী স্যার' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।

নিখিল ভারত কাবাডি প্রতিযোগিতা

রবীন্দ্র কাননে আয়োজিত নিখিল ভারত আমন্ত্রণমূলক কাবাডি প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের ফাইনালে ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন ৬—৪ পয়েন্টে হায়দরাবাদকে পরাজিত করে। মেয়েদের ফাইনালে মহারাষ্ট্র ২৭—১৩ পয়েন্টে ক্যালকাটা খো-খো এবং হা-ডু-ডু ক্লাবকে পরাজিত করে।

মাঠের নায়ক

তপনজ্যোতি ব্যানার্জি

জীবনে কখনো কখনো এমন ঘটনা ঘটে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। ঐ ঘটনাস্রোতে জীবন নদীর গতিপথ যায় পাল্টে, পাল্টে যায় জীবনদর্শন। টি জে'র ক্ষেত্রেও এমনতর ঘটনা কিছুটা নাটকীয়ভাবেই ঘটে গিয়েছিল।

গোটা পশ্চিম বাংলার ক্রিকেট রসিক মহলে টি জে আজ আর অপরিচিত নন। টি জে তপনজ্যোতি ব্যানার্জি।

যে কথা বলছিলাম। অপ্রত্যাশিত ঘটনার কথা। জীবনের মোড় নেওয়ার কথা। ১৯৬৫ সালে টি জে গেছেন পাটনায় আঞ্চলিক আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট খেলতে। খেলার মাঝখানে একদিন বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে দেখলেন বাবার ছবি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলের গ্রুপ ফটোর মাঝখানে বসে আছেন তাঁর বাবা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। দলনায়ক রবীন্দ্রনাথ। ফটো দেখে তপন উৎসাহে, উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন সেদিন। অজ্ঞাতেই যেন প্রতিজ্ঞা করলেন তপনজ্যোতি ওরফে বা সংক্ষেপে টি জে—বড়ো তাঁকে হতেই হবে।

বলা বাহুল্য টি জে-র প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হতে চলেছে কারণ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে তিনি আজ পশ্চিমবঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ টি জে যে ক্রিকেট খেলোয়াড় হবেন একথা তিনি কি নিজেও ভেবেছিলেন? ইস্টার্ন রেলের সিনিয়ার ট্রান্সপোর্ট অফিসার (সেফটি) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও প্রকৃতি দেবীর একমাত্র পুত্র হাওড়া গোলমোহর এলাকায় রেল কোয়ার্টার্সে থাকার সূত্রে সঙ্গ পেয়েছিলেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বন্ধুদের। হকির হাতে-খড়ি ওঁদের কাছেই। জীবনে ক্রিকেট এলো পরে, অনেক অনেকদিন পরে।

কিন্তু ক্রিকেট পরে এলেও, ঐ ক্রিকেটই টি জের জীবনের 'প্রথম প্রণয়'। হকি খেলেছে সিনিয়ার ডিভিসনে মোহনবাগানে

খেলেছেন। এখনও গ্রীয়ার স্পোর্টিংয়ের জামা গায়ে দিয়ে খেলেন বটে তবে তা নেহাৎই সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে যাই হোক, টি জে ক্রিকেটের অনেক আগে হকিতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার আসরে (১৯৬৪)। স্মৃতির অ্যালবামে সে সব ছবি টি জে-র থরে থরে সাজানো আছে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে তাঁর জন্ম মামাবাড়ী কানপুরে (উত্তর-প্রদেশ)। পৈতৃক ভিটে হুগলীর গুপ্তি-পাড়ায় আছে বটে তবে ও'রা ঐ গুপ্তি-পাড়ায় কোনদিন যান নি। লেখাপড়া গোড়ায় খাণ্ডেল রেলওয়ে হাইস্কুলে, তারপর বর্ধমান টাউন স্কুলে, সালকিয়া স্কুলে এবং কলকাতার হেয়ার স্কুলে। অর্থাৎ বাবা রবিবারের যখন যেখানে পোস্টিং, সেখানেই পড়াশুনা। হেয়ার স্কুল থেকে ফাইনাল পাশ করার পরই (১৯৬০) প্রকৃতপক্ষে টি জে-র ক্রিকেটে হাতেখড়ি। সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গবাসী এবং আশুতোষ কলেজে পড়ার ফাঁকে সৌভাগ্যবশত যোগাযোগ হোল সার্বজনীন ভিমুপেদার (অনিল সেন) সঙ্গে। তিনি লাগিয়ে দিলেন নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিট্যুটে। সন ১৯৬৩-৬৪ ইনষ্টি-ট্যুট সি এ বি জুনিয়ার ডিভিসন প্রতিযোগী। ৬৪—৬৫ সালে খেললেন মিলন সমিতির হয়ে। পরবর্তী পর্বে অর্থাৎ ৬৬-৬৭ সাল থেকে কালীঘাটে সুনীল দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়। ১৯৬৬ সাল তপনজ্যোতির জীবনে নূতন দিগন্তের সন্ধান আনলো। খেললেন রণজি ট্রফিতে। নবাগত তপনজ্যোতির হাত ধরে এক সঙ্গে দলে এলেন সুব্রত গুহ, সুপ্রকাশ সোম, রুসি জিজিবয় আর গণপতি বসু। এই প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতির জন্য টি জে প্রখ্যাত তারা ব্যানার্জি এবং এস রায় ওরফে বাতুদার প্রতি কৃতজ্ঞ। বোলার টি জে বোলিং কলাকৌশলের প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন শ্রীতারা ব্যানার্জির কাছ থেকে। ইনসুইং, আউটসুইং লেগকাটার বল কিভাবে দিতে হয় তা শিখিয়েছিলেন শ্রীতারা ব্যানার্জি এবং বাতুদা। ১৯৬৬ সালে কটকে জীবনের প্রথম রণজি ট্রফির আঞ্চলিক খেলায় দু ইনিংস মিলিয়ে উইকেট পেয়েছিলেন সাতটি। ১৯৬৬-৬৭ মরশুমে দলীপ ট্রফিও খেললেন টি জে, কিন্তু উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে (স্থান দিল্লী) বুক ফুলিয়ে বলার মত তেমন কিছু ঘটাতে পারেন নি।

টি জে-র সঙ্গে কথা হচ্ছিল ওঁদের ড্রয়িংরুমে বসে বসে। হঠাৎ দপ্ করে সব আলো নিবলো। লোড শেডিং। ঐ ঘুরঘুটি অন্ধকারের মধ্যে মোমের আলো জ্বালিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের ডিম্যান্ড ড্রাফট বিভাগের হবু অফিসার টি জে বললেন : '১৯৬৬ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত রণজি ট্রফির আসরে দলের পনেরজনের মধ্যে আমাকে রাখা হয়েছে। ৬৫-৬৬ সালে আসামের আটটি (৫+৩), ৬৭—৬৮ সালে ছটি (৫+১) উইকেট পেয়েছি। ১৯৭৪-৭৫-এ মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইডেন উদ্যানে সাতটি উইকেট (৪+৩) পেয়েছি আমি। এবার বিহারের বিরুদ্ধে পেয়েছি দুটি উইকেট। রান ৪০। ইডেনে সদ্য সমাপ্ত রণজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে কর্ণাটকের তিনটি (১+২) উইকেট আমার। প্রথম ইনিংসে রান ছিল আমার ২২। দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্টম উইকেট জুটিতে অম্বর রায় এবং আমি ৭৪ রান দিয়েছি বাংলাকে। স্কোর বোর্ডের দিকে তাকিয়ে তখন আমরা অনেকে জয়ের ক্ষীণ আশাও করেছিলাম, কিন্তু বরাত খারাপ ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা আমাদের সফল হোল না, হেরে গেলাম তপনজ্যোতি ওখানেই থেমে গেলেন। চেখে মুখে দেখলাম চাপা অভিমান। অভিমান অযৌক্তিক নয় মোটেই। যে ছেলে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে জামসেদপুরে হোমি মোদী ক্রিকেটে সেঞ্চুরী করলো (১০১ অপরাজিত), দীপংকরের (৮১ অপরাজিত) সঙ্গে জুটি বেঁধে দলের রান নিয়ে গেল ৭ উইকেটে ১৬৫ থেকে ৩৫০-এ, ম্যাচ জিতলো, সর্বোপরি সুটে ব্যানার্জির মত লোকের নজর কাড়লো, সে ১৯৭৪ সালে বাংলা দল থেকে বাদ পড়লো কোন্ অপরাধে?

কথা থামতেই ঘরে বাইরে আলো জ্বলে উঠলো। লোড শেডিং শেষ। টি জে-র স্ত্রী মোমের আলোটা নিভিয়ে দিলেন। তপনের জীবনে এবার হয়তো অন্ধকারের পালা শেষ। এখন শুধু তপনের নূতন সূর্যের তপস্যা।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের খেলা

চূড়ান্ত লড়াইয়ের অপেক্ষায়

সারা বিশ্বে দাবা অনুরাগীদের মধ্যে উত্তেজনা আবার চরমে উঠেছে আনাতোলি কারপভের বিজয়কে কেন্দ্র করে। স্মরণ করা যেতে পারে ইতিপূর্বে ফিশার স্পাসকির লড়াইকে ঘিরেও উত্তেজনার উত্তাপে সারা পৃথিবী উষ্ণ হয়ে উঠেছিল।

এবারের দাবা যুদ্ধে সেই দুই দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। তবে মার্কিন খেলোয়াড় ববি ফিশারের বিরুদ্ধে আসন্ন বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনালে স্পাসকির পরিবর্তে মুখোমুখি হবেন রুশ নন্দন আনাতোলি কারপভ। তেইশ বছরের সোভিয়েত গ্র্যান্ড মাষ্টার আনাতোলি কারপভ আগের খেলাগুলিতে যথাক্রমে লেভ পোলুগেভস্কিকে ৩—০ গেমে, প্রাক্তন বিশ্ব চাম্পিয়ান বরিস স্পাসকিকে ৪—১ গেমে এবং সেমিফাইনালে স্বদেশীয় খ্যাত ভিকটর করচনোইকে ৩—২ গেমে হারিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

প্রাক্ ফাইনাল পর্বের খেলায় আনাতোলি তার জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন। খেলেছেনও অতি সহজ ভঙ্গীতে। সময় সময় এমন তাচ্ছিল্যভরে চাল দিচ্ছিলেন যে মনেই হচ্ছিল না তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলছেন। কুড়িটি চালের পর পাকা দাবাড়ু কারপভের শাণিত চালের কাছে পদে পদে প্রতিহত হয়ে অবশেষে করচনোই মরিয়া হয়ে চালের মারপ্যাঁচে পরাজয়কে এড়াবার বৃথা চেষ্টা করেন। ফলে শেষের দিকে উচ্চমানের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। আনাতোলির নিজের কথায় বলি—করচনোই সৃজনশীল খেলার গতিকে গতানুগতিক চালে আবদ্ধ রেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করতে চেয়েছিলেন। কখনওবা খেলা অমীমাংসিত রেখে আবার কখনওবা আমার স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তার ক্রীড়া পদ্ধতির মধ্যে তেমন কোন

উচ্চমার্গের সৃজনশীলতার আভাস আমি পাই নি।

আনাতোলি কারপভের জন্ম ১৯৫১ সালের ২৩ মে রাশিয়ার ছোট্ট শহর জ্লাটাউটে। দাবা খেলার সঙ্গে পরিচয় হয় মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এই খেলার প্রতি নিবিড় অনুরাগ জন্মায়। খেলার সঙ্গী বাবা। বাবা কাজ থেকে ফেরার আগেই আনাতোলি বোর্ড সাজিয়ে বসে থাকে গভীর উৎকণ্ঠায়। আসন্নে দেরী দেখলে একক অনুশীলন করে। স্বল্পকালের মধ্যেই দাবার ক্রীড়া কৌশল গভীর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে রপ্ত করে। স্কুলে দাবা চ্যাম্পিয়ান হন। এবং মাত্র এগার বছর বয়সে 'গ্রান্ড মাস্টার' প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী হয়।

ছাত্রাবস্থাতে আনাতোলির হাতে ঘটনাচক্রে একটি দাবার বই এসে পড়ে। বালক আনাতোলি পরম উৎসাহে বইটি পড়েন। এবং ধীরে ধীরে ঐ সিরিজের সব কটি বই কেনেন। বইগুলি জোস রাউল কাপাব্লানকার লেখা। এই বইটি দাবার টেকনিক ও ক্রীড়াশৈলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ আনাতোলিকে নতুন আলোর সন্ধান দেয়। প্রথম রুশ দাবা চ্যাম্পিয়ান বটভিনিকের লেখার দ্বারাও আনাতোলির অনুসন্ধিৎসু মন গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়। বিশেষতঃ বটভিনিকের ক্রীড়া আঙ্গিকের ব্যাখ্যা আনাতোলির মনে নতুন ছায়া সঞ্চারিত করে। এবং তিনি বটভিনিকের স্কুলে ভর্তি হন। প্রাক্তন গ্রান্ড মাস্টার বটভিনিক এই কিশোরের দাবা দক্ষতায় মোহিত হন এবং তার গৃহে অবাধ গতায়াতের ছাড়পত্র দেন। নিষ্ঠাবান ছাত্র গুরুর দেওয়া কাজ আন্তরিকতার সঙ্গে করতেন এবং তার নির্দেশিত পথে চলতেন। বটভিনিক ও কাপাব্লানকা উভয়েরই প্রচণ্ড প্রভাব আনাতোলির দাবার দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিফলিত ও প্রভাবিত।

দাবাড়ু আনাতোলির জীবনপঞ্জীর বেশ কয়েকটি পাতা সোনালী আখরে লেখা। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত দশম জুনিয়ার বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আনাতোলি কারপভ

এই বিজয়ের অব্যবহিত পরেই উনিশ বছরের ছেলে ভেনেজুয়েলার কারাকাসে আয়োজিত দাবা প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর কনিষ্ঠতম গ্রান্ড মাস্টার হিসেবে বিজয়ী হন। তাছাড়া আনাতোলি প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান রুশ দাবাড়ু মিখাইল টইলকে সোজাসুজি পরাস্ত করেন। এছাড়া দাবার রাজা রবার্ট জয়েরনার, পূর্ব জার্মানীর উলফগ্যাং আলেমান যুগোশ্লাভাকিয়ার গিলোরিক ও ডেনমার্কের বেন্ট লারসেন প্রমুখ খ্যাতিমানদের দাবাযুদ্ধে স্বচ্ছন্দে হঠিয়ে দেন। ১৯৭২ সালের এক প্রতিযোগিতায় প্রখ্যাত স্বদেশীয় স্পাসকিকেও হার স্বীকার করতে হয়েছে আনাতোলির হাতে। ১৯৭৩ সালে পৃথিবীর সেরা দাবাড়ুরূপে আনাতোলি ওসকার পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন।

সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সততসচল মন, গতিশীল শান্ত মেজাজ, লোহের মত শক্ত স্নায়ু আনাতোলির দাবা সাফল্যের মূল উৎস।

আনাতোলি কারপভের সমগ্র জীবন কিন্তু দাবার ছকে হারিয়ে যায় নি। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে কারপভের নামডাক কিছু কম নয়। তুলার এক মাধ্যমিক স্কুল থেকে গ্রাজুয়েট হন। কলেজের চৌকাঠ পেরিয়ে লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কৃতী মেধাবী ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোনার পদক পেয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

শহরের ছেলে আনাতোলি প্রকৃতিপ্রেমিক বলে গ্রামের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। সময় পেলেই ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়েন গ্রামের পথে। আনাতোলি বলেন—অধিকাংশ সময়ে নিরুদ্দিষ্টের মত লক্ষ্যহীন পথ পরিক্রমা আমার প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান অঙ্গ। চাকচিক্যময় শহর জীবন মাঝে মাঝে আমার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। তখন আমি ঘুরে বেড়াই মস্কোর গ্রামে গ্রামে খোলা বাতাসে মুক্ত আকাশের নীচে সবুজ প্রান্তরে।

ফিশার কারপভের মধ্যে আসন্ন বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াইকে ঘিরে বিভিন্ন মহল আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। সবাইকার একই প্রশ্ন—কে জিতবে? চলতি বছরের পয়লা জুন তারিখে খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। উভয় প্রতিযোগীকেই তাদের খেলার পছন্দমত স্থান নির্ণয় করে কর্তৃপক্ষকে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে। যদিও ইতিমধ্যেই ম্যানিলা, মেকসিকো, ফিলিপাইনস, মিলান প্রভৃতি দেশসমূহ স্বেচ্ছায় তাদের দেশে বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার দায়িত্বভার নেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। এসম্পর্কে অবশ্য কোন স্থির সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা হয় নি।

ববি ফিশারের জয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা সন্দিহান। কেননা গত দুবছর তাকে কোন দাবা আসরে দেখা যায় নি। ফিশার অবশ্য এই মন্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন তিনি পুরোদমে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তার জয় সম্পর্কে তিনি প্রায় নিশ্চিত। অপরদিকে কারপভ বলেছেন—ফিশারের বিরুদ্ধে আমি জিতবই এমন কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি না, তবে যথেষ্ট আশা রাখি। কারপভ এখন সেই আশা নিয়ে ফিশারের অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

প্রশান্ত দাঁ

রেকর্ড সৃষ্টিকারিণী

সুটার রীতা সিংহ

—গুলী বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই আমার খুব ভয় হত। অথচ সেই আমিই এবছর চন্ডীগড়ে বিংশতিতম জাতীয় রাইফেল সুটিং-এর আসরে -২২ স্ট্যান্ডার্ড প্রোন পজিশনে মেয়েদের বিভাগে নতুন জাতীয় রেকর্ড করেছি। কথাটা মনে হলে এখনও আমার বেশ আশ্চর্য লাগে। কথা-গুলি বলছিলেন বেলগাছিয়া রাজবাড়ীর বধূ শ্রীমতী রীতা সিংহ।

এবছর জানুয়ারীতে চন্ডীগড়ে জাতীয় রাইফেল সুটিং প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী সিংহ পশ্চিমবাংলার পক্ষে যোগ দিয়ে নিজ বিভাগে ৬০০-র মধ্যে ৫৭৯ পয়েন্ট অর্জনের সূত্রে ১৯৭২-এ দিল্লীতে শ্রীমতী গীতা রায়ের অর্জিত ৫৭৩ পয়েন্টের রেকর্ড ম্লান করে নতুন নজীর গড়েন।

—কি করে এটা সম্ভব হল?

—শ্বশুরবাড়ীর একান্ত উৎসাহে। সেন্ট-মার্গারেট স্কুলের ছাত্রী হিসাবে একটু-আধটু স্পোর্টসে যোগ দিতাম। তারপর বেথুন থেকে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ করি। বিয়ের পর শ্বশুর-বাড়ীতে এসে দেখলাম আমার স্বামী শ্রীদেবাশীষ সিংহ বাড়ীর সংলগ্ন উত্তর কলকাতা রাইফেল সংস্থার সদস্যরূপে ১৯৬৫ সাল থেকে নিয়মিত জাতীয় সুটিংয়ে যোগ দেন। আমার শ্বশুরমহাশয়ই এই ক্লাবের সভাপতি। এখানে ওলিম্পিক খ্যাত সুটার হরিচরণ সাউই আমাকে সুটিং শিখতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি প্রায়ই বলতেন বৌমা সুটিং অভ্যাস করলে খুব ভাল হবে। আর আমার স্বামী স্বয়ং নিজের রাইফেল আমার হাতে তুলে দিয়ে হাতে-খড়ি দিয়েছেন। এঁদের চেষ্টাতেই আমার বন্দুকের ভয় ভেঙে যায়। শ্রীসাউকে উনিও গুরুর মত শ্রদ্ধা করেন। স্বামী আর শ্বশুর-মহাশয়ের উৎসাহ না পেলে আমাদের মত বাঙ্গালী পরিবারের বধূর পক্ষে এভাবে সুটিং শেখা সম্ভবই হত না। যাই হোক স্বামীর সঙ্গে সুটিং রেঞ্জে গিয়ে ওঁর দেখে দেখেই রাইফেল চালনার কলাকৌশল অভ্যাস করতে থাকি। মনে ভয় থাকলেও কেবলই ভাবতুম ছেলেরা যখন পারে আমিই বা কেন পারব না?

—প্রথম কোন আসরে নামলেন?

—প্রথম নামি গোমিয়ায় ১৯৭১-এ [illegible] পূর্ব [illegible] চ্যাম্পিয়ানশিপের আসর। জানেন, আমি মাত্র ১৩ দিন অনুশীলন করেই ঐ আসরে নেমে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। প্রথম হন বহু অভিজ্ঞা গীতা রায়। এই আসরে পুরুষ বিভাগে আমার স্বামীর সংগ্রহ থেকে আমি দু পয়েন্ট বেশী পাই (৫৬১ পয়েন্ট)। এতেই আমার একাগ্রতা খুব বেড়ে যায়।

এই সাফল্যের ফলে ১৯৭২-এ সপ্তদশ জাতীয় সুটিং-এর আসরে শ্রীমতী রীতা পশ্চিম বাংলার দলে স্থান পান এবং দিল্লীর নিকলসন রেঞ্জে -২২ বোর ফ্রি রাইফেল প্রোন পজিসন ও স্ট্যান্ডার্ড রাইফেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। এরপরের বছরই লক্ষ্ণৌর ক্যান্টনমেন্ট রেঞ্জে প্রোন পজিশনে ৬০০-র মধ্যে ৫৬৯ সংগ্রহ করে চ্যাম্পিয়ান হয়ে জর্জ ভিন্ট ও ভাল্লাট্রফি লাভ করেন। বাংলার এই গৃহবধূর জয়ধ্বনিতে সেদিন লক্ষ্ণৌর আকাশ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ১৯৭৪-এ আবার দিল্লীতে। এবারের জাতীয় আসরেও ভাল্লা ট্রফি শ্রীমতী সিংহেরই হাতে রইল কিন্তু তখনও নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ার স্বপ্ন সফল হয়নি। সেবার ফ্রি রাইফেলে (প্রোন) জাতীয় চ্যাম্পিয়ানের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রীমতী সিংহ মনোরম এইচ এন সরকার স্মৃতি ট্রফিটি লাভ করেন। এই সময় তিনি ছমাসের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রতিযোগিতার আসরে।

১৯৭৩-এ লক্ষ্ণৌ-এ স্বামী-স্ত্রী একই সময়ে গুলী ছোঁড়ার ডাক পড়ায় শ্রীমতী সিংহকে অন্যের রাইফেল নিয়ে নামতে হয়।

খেলার জগতে মেয়ে

—জাতীয় রেকর্ড করার জন্য আমি মনে মনে অনেকদিন ধরেই বাসনা করে চলেছি। সুটিং-এ সাফল্যের জন্য অনেক পদক ও ট্রফি পেয়েছি। কিন্তু আমার সাফল্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিয়েছেন আমার শ্বশুর মহাশয়। তিনি আমার জয়ে আনন্দিত হয়ে একটি ঘড়ি উপহার দেন।

বেলগাছিয়ার রাজবাড়ীর দোতলায় বসবার ঘরে শ্রীমতী রীতা ও তাঁর স্বামী শ্রীদেবাশীষ সিংহের সঙ্গে সুটিংয়ের বিষয়ে আলোচনা করতে করতেই জানতে পারলাম মহারাষ্ট্র গুজরাট বা দক্ষিণ ভারতের সুটাররা তাঁদের সুটিং সংস্থা ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পান। স্ট্যান্ডার্ড সুটাররা বিনামূল্যে গুলী পান, তাছাড়া সুটিংয়ের আধুনিক সাজ-সরঞ্জামও তাঁরা সহজে সংগ্রহ করতে পারেন। সেনাদল বি-এস-এফ বা নৌবাহিনীর সুটাররা নিয়মিত অনুশীলনের জন্য ঢালাওভাবে প্রতিযোগিতার মানের গুলীও পান। অন্যদিকে আমরা একটা স্পার্টিকোপও পাই না। অনুশীলনের গুলী সংগ্রহ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে শ্রীসিংহ মেজর অরুণ চক্রবর্তী শ্রীঅজিত সাধু খাঁ ও শ্রীমিহির সেনের নাম সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করলেন। শ্রীসেন সুটারদের নানাভাবে সাহায্য করেন বলে তিনি জানালেন। শ্রীমতী সিংহও বললেন আমাদের সরকারও যদি এদিকে একটু সহযোগিতার নজর দেন তাহলে এই পশ্চিম বাংলাতেও অনেক ভাল ভাল সুটার তৈরী হতে পারে। কথায় কথায় শ্রীসিংহ জানালেন শ্রীমতীর সাফল্যে তিনি খুবই আনন্দিত। সম্প্রতি শ্রীমতী রীতাকে তিনি একটি ভাল রাইফেল কিনে দিয়েছেন।

—জাতীয় রেকর্ড করার পর আপনার কি রকম মনে হয়?

—দারুণ আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু প্রথমে ত জাতীয় রেকর্ড বলে বুঝিনি। কেউই বলেননি। ট্রিবিউনের এক ক্রীড়া সাংবাদিকই আমাদের প্রথম বললেন এটা জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। তারপর ট্রফি নেবার সময় জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল। তখন যে কি আনন্দ সে আর কি বলব। আমার স্বপ্ন এতদিনে সফল হল।

সম্ভ্রান্ত প্রাচীন ঐতিহ্যময় পরিবারের কন্যা ও বধূর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শ্রীমতী রীতা উত্তর কলকাতার প্রাচীন বসু বংশের কন্যা রায়বাহাদুর এন সি বসুর নাতনী শ্রীসনৎকুমার বসু ও'র বাবা। দাদা টেবল টেনিস খেলোয়াড় ছোট ভাই ও ছোট বোন আছে। বাড়ীতে এককালে ইস্ট ক্লাব নামে খেলাধূলার সংগঠন ছিল। বাড়ীতে সব কাজেই মায়ের উৎসাহ ছিল সর্বাধিক।

—সুটিং এখন কেমন লাগে? আর একটা কথা—ভাল সুটার হতে গেলে কি কি করতে হয়?

—প্রথম প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা শ্বশুরবাড়ীর সবাই যখন সুটিংয়ের সঙ্গে যুক্ত তখন আমার ভাল লাগা স্বাভাবিক উপরন্তু এই রকম সাফল্যের পর। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি—সুটিং সম্পূর্ণরূপে সাধনার ব্যাপার। মনে কোনভাবে উদ্বেগ উচ্ছ্বাস বা হতাশার লেশমাত্র থাকলে সুটিংয়ে সফল হওয়া যায় না। সেই যে মহাভারতে আছে দ্রোণাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বললেন——আমি শুকপাখীর কেবল চোখটি দেখছি? আমার মনে হয় সুটিংয়ে এই মনোভাবই সঠিক। কেবলমাত্র লক্ষ্যবিন্দুটি দেখতে হবে। সে সময় কোন চিন্তা-ভাবনা মনে থাকা চলবে না। মন হবে একেবারে নিস্পৃহ নির্লিপ্ত। আমি ঠিক এই রকম মন নিয়ে সুটিং করার সাধনা করি। এবার যখন জাতীয় আসরে যাই তখন আমার শাশুড়ীমাতার দেহে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা হচ্ছে। চণ্ডীগড়ে ট্রাঙ্ককলে সে খবর পেলাম প্রতিযোগিতার দিন সকালবেলা। ভাবুন কি রকম উদ্বেগ আশঙ্কা মনে জমেছিল। কিন্তু আসরে নামবার সময় মনকে একেবারে শূন্য করে নিতে হল। ১৯৭৩-এ লক্ষ্ণৌ-এ জাতীয় আসরে যাই তখন চার মাস অন্তসত্ত্বা, কিন্তু মন দৃঢ় করে চলে গেছি প্রোন পজিশনে ৫৬৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ট্রফি জয় করেছি। এসবই সম্ভব হয়েছে প্রথমত শ্বশুরবাড়ীর অকুণ্ঠ সমর্থন স্বামীর সাহচর্য শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা আর দ্বিতীয় সাফল্য লাভের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাপ্য সুযোগের সদ্ব্যবহার। জাতীয় রেকর্ড ভাঙ্গার গভীর আগ্রহ মনে মনে ছিল। এখন আরও উন্নতি করার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে - আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সুটিংয়ে আন্তর্জাতিক মানের সমকক্ষ হবার।

—প্রতিযোগিতায় নামার আগে কতদিন নিয়মিত অনুশীলন করেন?

—কমপক্ষে দু সপ্তাহ। কিন্তু তাতে ঠিক হয় না। অথচ আমাদের হাত-পা বাঁধা। উপযুক্ত পরিমাণে গুলি সংগ্রহ করা কিরকম ব্যয়সাধ্য তাত আগেই শুনেছেন। উন্নত ধরনের অনুশীলনের জন্য গুজরাট বা মহারাষ্ট্রের সুটাররা রাজ্য সরকারের আনুকূল্যে বিদেশে পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা করতে পারে বিদেশী রাইফেল গুলী পায়। আমার বিশ্বাস বছরে অন্তত চার মাস ভালভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করতে পারলে আমরা বিশ্বমানে পৌঁছোতে পারব।

পাইকপাড়ার কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহের একমাত্র পুত্রবধূ শ্রীমতী রীতা এক কন্যার জননী ও আদর্শ গৃহিণীও বটেন। ঘরে ছবি আঁকা ও বাটিকের কাজ করেন অবসর সময়ে (অবসর সামান্যই পান)। আর আকাশবাণী কলকাতার সঙ্গীতের আসরেও নিয়মিত শিল্পী। প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের এই পরিবারে ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশেছে আধুনিক উদারচেতনা উগ্রতা নয় শান্ত সপ্রতিভতা। তাই পরিবারের বধূর পক্ষে জাতীয় আসরে সাফল্যের স্মারক জয় সম্ভব হয়েছে। শ্রীমতী রীতা মহিলা ক্রিকেট সংস্থার গভর্নিং বডিরও সদস্য। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিসেও সংগঠনার কাজে এঁর ডাক পড়েছিল কিন্তু সেই সময়েই ওঁকে চণ্ডীগড়ে যেতে হয় জাতীয় সুটিংয়ে যোগ দিতে। বললেন—আমার এখন সব খেলাই ভাল লাগে।

সামনের সেপ্টেম্বরে (?) কুয়ালালামপুরে এশীয় সুটিংয়ের আসর বসবে। এই প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধি বাছাইয়ের যোগ্যতার মান ধরা হয়েছে জাতীয় সুটিংয়ে ৫৭৫-এর বেশী পয়েন্ট। চণ্ডীগড়ে শ্রীমতী সিংহের সংগ্রহ ৫৭৯ পয়েন্ট। সুতরাং আশা করা যায় এই আসরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ পেয়ে শ্রীমতী রীতা সাফল্যের আরও একধাপ উপরে উঠে যাবেন এবং ভারতীয় সুটারদের নতুন সম্মান এনে দেবেন।

অনয়

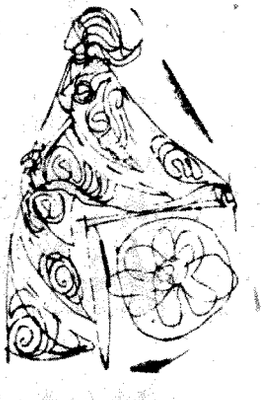

রঞ্জনী আলোয়

তাহলে আরও কিছুক্ষণ লণ্ঠটা জ্বলেই থাকুক কারণ পিনাকী মুখার্জির এই ঘটনাটা পরে হয়ত বিস্মরণ হতে পারি, সুতরং টাটকা-টাটকা বলে ফেলতে চাই।

পানুদা মহাশ্বেতা ছবির আউটডোরে শুটিং করতে গেছে সেই বসিরহাটের দিকে না কোথায় যেন। সংগে আর্টিস্ট আর টেকনিশিয়ান মিলিয়ে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন মানুষ, সেই অনুপাতে লটবহর। সেখানে নাগাড়ে কদিন শুটিং চলবে, তাই কলকাতা থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন ছবির বিভিন্ন রিকুইজিশানের মধ্যে ছিল একটা কাক—

—কাক? ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজারের বিস্মিত প্রশ্ন।

—হ্যা কাক। কা-কা কাগ। বুঝতে পেরেছেন? ওটা আমার চাই—পানুদার হুংকার—একটা শটে লাগবে, মনে থাকে যেন—

—আর?

—আর ইয়ে লাগবে একজন মানে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেব একজন, তাকেও লোকেশানে নিয়ে যাবেন—

বলে পানুদা বেরিয়ে গেলেন।

এখন এই পানুদার ক্যারকটার না বুঝলে এই গল্প বোঝা যাবে না। পানুদা এমনিতে মানুষ দারুণ ভাল, সককলের সংগে ভীষণ মাইডিয়ার, কিন্তু কাজের সময় একেবারে ভিন্ন মানুষ। পান থেকে চুন খসলে আর রক্ষে নেই। ভীষণ মেথোডিক্যাল, ফাঁকি-জুকির কোন ব্যাপারই নেই ওঁর চরিত্রে। ফলে ওঁর সংগে কাজ করা অনেকের ক্ষেত্রেই অসম্ভব, সে কিবা শিল্পী আর কি বা টেকনিশিয়ান। পানুদা যখন ছবির শুটিং করতে নামে তখন স্রেফ উন্মাদের মত কাজ করে যায়, অন্য কোন দিকে তখন তাঁর আর নজর থাকে না। আর এই সময় কেউ যদি সামান্য একটু ভুল-ত্রান্তি করে বসে তো তার আর সেদিন রক্ষা নেই, পানুদা এমন ঝাড়ে তাকে সেদিন যে মানে সে আর বলা যাবে না। বলুন না আপনি, আমিই কতদিন যে পানুদার গজালি খেয়েছি তার আর লেখাজোখা নেই। প্রথম প্রথম আমার খুবই রাগ হতো কিন্তু পরে যখন দেখলাম মানুষটাই ওই রকম, অত ছিদ্রান্বেষী কথার পরমুহূর্তেই আমার গলে জল তখন আর কি! পানুদা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে আর যাকে উদ্দেশ্য করে সেটা হচ্ছে হয়ত মুখ ফিরিয়ে ফিকফিক করে হাসছে। অথচ হাসিটা যে সব সময় পানুদার নজর এড়িয়ে যায়—তা-নয়, সেক্ষেত্রে পানুদার সরব এবং হতাশ মন্তব্য—ছোঁড়াটা একেবারে নির্লজ্জ, বেহায়া। এত অপমানেও দেখ ওর কিছু হচ্ছে না—

আর সহকারী প্রোডাকশন ম্যানেজার শৈলেন সেটা ভাল করেই জানত। তাই পানুদার অমন বিদ্ঘুটে রিকুইজিশন শুনে ওর মনে আতঙ্ক হল—এইরে, এখন শালা কাগ কোথায় পাই? অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নিয়ে কোন চিন্তা নেই, ফিরিঙ্গী পাড়ায় গিয়ে এক-জনকে ধরে নিলেই চলবে, কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট কাগ?

সব শুনে একজন শৈলেনকে আশ্বস্ত করল—তুই ওর জন্যে চিন্তা করিসনে, ও ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে—

—কি করে? আকাশের কাগ তুই ধরবি কি করে শুনি?

—আর ধুস্? তুই পাণ্ডেকে ডেকে একটা কাগের অর্ডার দিয়ে দে, ও ঠিক জোগাড় করে দেবে। পাণ্ডের অসাধ্য কোন কাজ নেই। অতএব সেই ভাল। শৈলেন পাণ্ডেকে খুঁজে পেতে বলল—পাণ্ডে একটা কাগ সাপ্লাই দিতে পারবে?

—জ্যান্ত?

—হ্যাঁ, ধর দাঁড়-কাগ, এই রকম বড় একটা সাইজের—

—পেয়ে যাবেন তবে খর্চাটা এটু বেশী পড়বে। কাগ তো, এটু হ্যাপা আছে—পাণ্ডে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল—টাকা পনের লাগবে।

—ভ্যাট্—শুনে শৈলেন ক্ষেপে অস্থির—গোটা পাঁচেক দেব, যদি পার তো কাল সকালে মালটা পৌঁছে দিয়ে যেও, আমরা বিকেলে আউটডোরে বেরিয়ে যাব। আর একটা সাদা হেব লাগবে—

পাণ্ডে এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল—কাগের রেটটা আর এটু বিবেচনা করে দেবেন স্যার নইলে দুধে হাত পড়ে যাবে...। ঠিক আছে সকালে পৌঁছে দেব—

সবাই জানে পাণ্ডের কথার বড় নড়নড় হয় না।

পরদিন সকালে বাস্তবিক একটা দাঁড়-কাগ নিয়ে এসে হাজির। বলল—উঃ, শালা ঠুকরে ঠুকরে আমার তেইশটা বাজিয়ে দিয়েছে, বললো তো আপনারা বিশ্বাস করেন না। গোটা সাতেক টাকা ধরে দেবেন স্যার।

শৈলেন কাগটাকে দুপায়ে দাঁড় বেঁধে টিং করে ফেলে রাখল এবং অস্ফুটে মন্তব্য করল—বাপরে, পানুদার যতোসব বিটকেল রিকুইজিশনা! শোন পাণ্ডে, সাহেবকে নিয়ে তুমি কাল রাত্রে লোকেশানে পৌঁছে দিয়ে আসবে এবং সেদিনই বিকেলে ফেরৎ নিয়ে আসবে, পানুবাবুর হুকুম।

বলে শৈলেন তাকে লোকেশানের ঠিকানা ইত্যাদি বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দিল। পাণ্ডে দাঁত দেখিয়ে চলে গেল।

প্রথম দিনই লোকেশানে এক তুমুল কণ্ড। এখন হয়েছে কি, একটা দৃশ্য ছিল, রৌদ্রে বসে বসে মামা তেল মাখবে, মাখিয়ে দেবে ভাগ্নে। জহর রায় মামা আর ভাগ্নে হচ্ছে সুখেন দাস। রিকুইজিশান অনুযায়ী প্রোডাকশনের একজন এক বাটি সরষের তেল লোকেশানে এনে দিয়েছিল সেই কোন্ সাত-সকালে, কেউ খেয়ালও করেনি, বারান্দার একপাশে চড়া রোদের মধ্যে বাটিটি পড়ে পড়ে গর্মাগর্ম হচ্ছিল। এখন সেই তেল মাখার দৃশ্য করবার জন্যে পানুদা যখন প্রস্তুত তখন সূর্যদেব মধ্য গগনে।

শটের কম্পোজিশান হল।

জহর রায় খালি গায়ে বসে, গুণধর ভাগ্নে এসে তাঁকে আহ্লাদের সংগে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে, শরীর মর্দন করে দিচ্ছে, অরামে মাতুল উঃ আঃ শব্দ করতে করতে কিছু কিছু ভাষণ দিচ্ছেন।

শুটিং জোনের মধ্যে শিল্পীরা গিয়ে বসে যেতেই পানুদা হুংকার দিল—তেল কই তেল?

তখন একজনের স্মরণ হলো—এইরে, তেলের বাটি যে বলে দেওয়া হয়েছিল, এনেছে তো?

শৈলেন তাকে আশ্বস্ত করে বলল—আনা হয়েছে বাপু আনা হয়েছে, ওই তো বারান্দায় পড়ে আছে। সুনীল এনে দে তো বাটি-টা।

সুনীল দৌড়ে গিয়ে বাটিটা এনে খাটের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে চলে এল, কেমন যেন কিন্তু কিন্তু মুখে। শৈলেনকে সে কিছু বলার বার উদ্যোগ করছিল এমন সময় পানুদা হেঁকে বলল—অ্যাই শৈলেন কাগ এনেছিস তো? এর পরই কিন্তু কাগের শট। মনে থাকে যেন।

শুনে শৈলেন দৌড়ুলে সেই কাগটা আনতে।

স্বচক্ষে কাগ দেখে পানুদা নিশ্চিন্ত—ভেরি গুড। দাঁড়া আগে এই স্নানের শট্-টা নিই, তারপর তোরটা নেব।

শৈলেন-ভাবল শটের এখনও তো বেশ দেরী আছে তাহলে এট্টু কাজ করা যাক কাগটার পায়ে লম্বা একটা দাঁড় বেঁধে এটকে আপাততঃ ছেড়ে দেওয়া যাক, ব্যাটা এট্টু চরে বেড়াক—বলে মস্ত লম্বা এক কাতার দাঁড় পায়ে বেঁধে কাগটাকে উড়িয়ে দিল শৈলেন। একটা প্রান্ত ধরে রাখল হাতে। কাগটা ছাড়া পেয়ে হুস করে উড়ে বসলে একটা উঁচু গাছের মগডালে। পালাবার উপায় নেই, পায়ে কষে দাঁড় বাঁধা। শৈলেন টেনেটুনে দেখল—নাঃ ঠিক আছে।

ওদিকে শট হচ্ছে। মণিটারের সময় সুখেন তেল মাখাবার ফলস্ অ্যাকশান করল, জহর রায় তেড়ে ডায়লাগ দিলেন, বাস, মণিটার ও, কে, এবার টেকিং, পানুদা বলল—তাহলে জহরদা শট-টা নিয়ে নিই—

—নাও ভাই তাড়াতাড়ি নাও। এই তেল মেখে শটের পর আবার পুকুরে নাইতে যেতে হবে। সুখেন, এট্টু ভাল করে মাখিয়ে দিস্ বাবা—

সুখেন আশ্বস্ত করল—ঠিক আছে জহরদা ও আমি ফাসকেলাশ করে মাখিয়ে দেব। তারপর চলুন দুজনে মিলে স্নান করতে যাব। এই শট্টার জন্যে আমি আজ সকালে স্নানই করিনি—

শুরু হল টেকিং। ক্যামেরা-সাউন্ড সাড় হতেই পানুদা হেঁকে বলল—অ্যাকশান—

দাঁত বের করে আহ্লাদিত ভাগ্নে এসে তেলের বাটি তুলে নিল হাতে, তুলেই সে চমকে উঠল, আরিপবাপ, এ-যে আগুন হয়ে আছে বাটি, কিন্তু তখন আর উপায় নেই, ক্যামেরার পেছন থেকে পানুদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এখন শট কেটে দিলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড বেঁধে যাবে, ধেত্তেরি, আমার কি ভেবে ভাগ্নে ডবল দাঁত বের করে এগিয়ে গেল। মামা পিঠ এগিয়ে দিয়ে বসে আছে—দেরে, তেলটা মাখিয়ে দে—তার ভাব খানা,ভাগ্নে আর কি, হাতের চেটোয় পোটেক তেল মানে চড়া রোদ্দুরেরর তাপে যেটা ইতিমধ্যেই টগবগে গরম হয়ে উঠেছে—ঢেলে নিয়ে চোখ বুঁজে মামার পিঠে বসিয়ে দিল সাপ্টে—

মাত্র এক লহমার বিরতি তারপরই মাতুল তীব্র আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠে—পানুদা দেখল জহরদা 'মরে গেলাম মরে গেলাম' করতে করতে শটের বাইরে আসার উপক্রম করছে পানুদা বো করে ধরে জহরদাকে ঠেলে দিল শটের মধ্যে, ভাগ্নে ততক্ষণে বিকৃত মুখে আর এক খামচা তেল তুলে নিয়েছে হাতে—মামাকে মর্দন করার অভিপ্রায়ে, জহর রায়ের প্রাণ যায় আর কি, একদিকে ডিরেকটর তাকে বেরুতে দিচ্ছে না অন্যদিকে ন্যাকা ভাগ্নে তাকে ওই তেল মাখাবার জন্যে হন্যে হয়ে আছে, এই রকম একটা পরিস্থিতিতে কোন গতিকে উনি শটটা উৎরে দিলেন, বাপ!

শটের পর 'আনো বানর্ল, আনো এটা আনো সেটা' ধ্বনিতে বেশ কিছুক্ষণ মুখর হয়ে রইল লোকেশন। জহর রায় কাতর কণ্ঠে বললেন—পানু পিঠে ফোস্কা ফেলে দিলে শেষ পর্যন্ত, তোমার ভাই জবাব নেই—পানুদা ভীষণ ক্ষিপ্ত, তেল গরম হবার জন্যে যারা দায়ী তাদের খুব একচোট নিল, তারপর আবার যে-কে-সেই।

নেক্সট শট্—কাগ্!

হল্লা শুনে শৈলেন স্লাইট নার্ভাস বোধ করছিল, এবার সে উৎসাহের সঙ্গে বলল—পানুদা, কাগ্ রেডি আছে, আপনি শট্ নিতে পারেন।

ক্যামেরা বসে গেল—কাগ্ শটের মধ্যে কিসব যেন করবে। ক্যামেরাম্যানকে পানুদা সব ভালভাবে বুঝিয়ে দিল—এক টেকেই ও-কে করা চাই কিন্তু একটাই কাগ্ উড়ে বেরিয়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার হবে না, মশাই। ক্যামেরাম্যান বিজয় ঘোষ শান্তশিষ্ট মানুষ। বললেন ঠিক আছে তাই হবে পানুবাবু।

শৈলেন ঘন ঘন গাছের মগডাল দেখছে, হাতের দাঁড় জাব্দা, কাগ বাবাজীর আজ পালাবার পথ নেই, এখন হুকুম করলে এক হ্যাঁচকা টানে কাগকে মাটিতে নামিয়ে এনে শটের মধ্যে ছেড়ে দিলেই শৈলেনের দায়িত্ব খালাস।

—শৈলেন, কাগ আছে তো?

—আছে পানুদা।

—বেশ। ধরে রাখ। বলা মাত্তর যোগান দিবি কিন্তু। কেমন?

—আচ্ছা পানুদা।

ওদিকে হয়েছে কি, ধূর্ত কাগ বাবাজী কখন যে তলে তলে ঠুকরে তার পায়ের বাঁধন ছিন্ন করে ফেলেছে, শৈলেন তা বুঝতেই পারেনি। তার হাতে দাঁড়, সে মহানন্দে আছে যে কাগ যথাস্থানেই, চিন্তার কোন কারণ নেই। ওদিকে সে ব্যাটা তো পগার পার।

কিছুক্ষণ পর পানুদার হুঙ্কার।—শৈলেন?

—দাদা।

—কাগ!

—আনছি! বলেই দাঁড়তে হ্যাঁচকা টান। শুধু দাঁড়টাই খসে এল। কাগ কোথায়?

ব্যস, শৈলেনের রক্ত যেন স্রেফ হিমক্রিম। সত্যনাশ। খচরাটা পালিয়েছে। এখন শৈলেন কোথায় পলায়ন করে? পানুদা তো আজ রক্ষে দেবে না। বলা যায় না, রাগের চোটে হাত-ফাত না চালিয়ে দেয়। এট্টু আগে সরষের তেল নিয়ে একটা লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেছে। এখন উপায় শৈলেনের মন বলল, যদি বাঁচতে চাস তো সটান গাছে উঠে গা-ঢাকা দে। নইলে তোকে প্যাদাবে। শৈলেন অতএব আর দেরী না করে ধাঁ করে গাছে উঠে ঘন ডালের আড়ালে ভ্যোম হয়ে বসে পড়ল।

—শৈলেন, অ্যাই শৈলেন, কাগটা নিয়ে আয়—

—কিরে, কানে শুনতে পাচ্ছিস না নাকি? শৈলেন—

তক্ষুনি একজন দৌড়ে গেল শৈলেনের খোঁজে। অদূরে একটা বড় আম্র বৃক্ষের তলায় সে ছিল, তাজ্জব কাণ্ড, গেল কোথায়?

সেখান থেকেই সে চেঁচিয়ে বলল—ও পানুবাবু, শৈলেন যে হাওয়া!

—অ্যাঁ? হাওয়া মানে? কাগ কোথায়?

শৈলেন মগডাল থেকে এবার আর্তনাদ করল—কাগ-ও হাওয়া!

তারপর সে এক কুরুক্ষেত্তর। পানুদা গাছের তলায় এসে—অ্যাই নেমে আয়, আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন...একটা

উমনো ও ঝমনো : কল্যাণী মণ্ডল ও রূপা চৌধুরী

এই ছিল মনে : ঘুঁই, পদ্মা দেবী

কাগ রাখতে দিলাম আর উনি অনুগ্রহ করে সেটিকে ছেড়ে দিলেন? নাম, নেমে আয় ওই—

শৈলেন সভয়ে আরও দু'ডাল ওপরে—পানুদা বিশ্বাস করুন, ব্যাটা পায়ের দড়ি কেটে পালিয়ে গেছে, আমি দড়ি টেনে দেখি সে নেই. এবারের মত মার্জনা করে দিন দাদা, কথা দিচ্ছি আর কোনদিন আমার হাত থেকে কাগ পালাতে পারবে না দাদা এখন আমাকে নামতে অনুমতি দিন দাদা ভীষণ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে এখানে, টিকতে পারা যাচ্ছে না পানুদা।

ঘোড়া?...

হ্যাঁ, মনে পড়ে যাচ্ছে 'রাজদ্রোহী' ছবির কথা। নরেন (বেণু) লাহিড়ী ছিলেন সে-ছবির পরিচালক। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে রাজদ্রোহীর শুটিং হচ্ছিল, তখন আমারও কি-যেন একটা ছবির কাজ চলছিল ওই স্টুডিওতে। একদিন স্টুডিওর চাতালে বসে আমরা আড্ডা মারছি, হঠাৎ দেখি বুবু

নেতাজী মঞ্চ (নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট)
(শিয়ালদহের উত্তরে কাইজার ষ্ট্রীটে প্যারামাউন্ট সিনেমার সামনে)
প্রতি বৃহঃ ৬॥টা শনি, রবি : ৩টা ৬॥টা
সমরেশ বসুর
বিবর
পরিচালনা- রবি ঘোষ
অসিতবরণ, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, জয়শ্রী রায়, চিন্ময় রায় হারাধন ব্যানার্জী, প্রমোদ গাঙ্গুলী, গীতা দে, ছলা দেবী রত্না ঘোষাল, সুব্রত সেন এবং গৌরীশঙ্কর ও রবি ঘোষ।
নাটক : সমর মুখার্জী
আলো : কার্তিক সেন, মঞ্চ : শৈলেন দে
সঙ্গীত : আনন্দশঙ্কর
নির্দেশনা : রবি ঘোষ
অভিনয়ের ৬ দিন [illegible] থেকে হলে টিকিট পাওনা। (৮টা)

গাঙগুলী নেংচে নেংচে আসছে। জয়ন্ত বলল, কী ব্যাপার, বুবুর হলো কী?

একজন হেসে বলল—নিশ্চয় কোথাও হুজ্জত করতে গিয়েছিল, ধরে ঠেঙিয়ে দিয়েছে।

বুবু উঃ, একটা ক্যারেকটার, এমন ডাঁহা গুলবাজ মানুষ কদাচিৎ চোখে পড়ে। তবে বিশেষ ক্ষতিকারক নয়, ঝেড়ে দিল একখানা, লাগল তো ভাল আর না লাগল তো বয়েই গেল। ফিল্মে আসা অব্দি একজন নামজাদা অভিনেতার শ্যালক বলে পরিচয় দিয়ে আসছে। অথচ তার ফলে যে ও খুব সুযোগ-সুবিধা কখনও পেয়েছে—জানা নেই। বরং, কিছু কিছু জায়গায় উল্টো ফলই হয়েছে। তবুও বুবু অমুকের শ্যালক—এই পরিচয় দিতে ভুল করে না।

জয়ন্ত বলল—কি বুবু পায়ে কি হলো?

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃতি করে বুবু বলল—যা হবার তাই হয়েছে। আমরা রাঁচী আউট-ডোরে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে এই হয়েছে।

পরে সব জানা গেল। রাজদ্রোহী ছবিতে কিছু অ্যাকশন ছিল—ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছোটছুটি দৌড়দৌড়ি। বেণুদা কলকাতার ঘোড়া ভাড়া করে এনে সেই সব দৃশ্য গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কলকাতার ঘোড়ার সাধ্য কি ওই সব রোমহর্ষক দৃশ্যের শট দেয়? স্বভাবতই ট্রায়াল শো দেখে কেউ খুশী হননি। তখন স্থির হয়েছিল, পরবর্তী রাঁচী আউটডোরে মিলিটারী ঘোড়ার সাহায্যে ওই সব দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। ঘোড়-সওয়ারদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমার, কমল মিত্র এবং অন্যান্যরা। বুবু-ও একজন ঘোড়-সওয়াড়।

বেণুদা একদিন জানতে চেয়েছিলেন—কিহে বুবু, ঘোড়ার ব্যাপারে তোমার এলার্জি নেই তো?

ব্যস, বুবুর সেকি লেকচার।—বেণুদা, ঘোড়া দিয়েই তো আমার দিনের শুরু এবং শেষ। ঘোড়া চিনতে চিনতে আমার একখানা বাড়ি গেছে যাক। তবুও আমি চিনে যাব। আমাকে আবিষ্কার করতেই হবে যে কোন ঘোড়া বিট্রেয়ার আর কোন ঘোড়া আমার ফ্রেন্ড। আমায় ঠাট্টা করতে পারেন কিন্তু মাই হর্স ইজ অলওয়েজ মাই হর্স—

বলতে বলতে সহসা বুবুর চোখ ছলছল করে উঠল। তারপর কিঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করে বলল—হঠাৎ ঘোড়ার কথা কেন দাদা?

বেণুদা স্বভাবসুলভ হেসে বললেন—বাবারে তুমি দেখছি ঘোড়ার ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর। যাই হোক, ঘোড়ায় চড়তে জান? জানলে একটা ভাল পার্ট তোমায় দিতে পারতাম।

পার্টের কথা শুনে বুবু এক লাফ!—বিলক্ষণ জানি, ওই ঘোড়া চড়তে গিয়েই তো ইয়ে হ'ল আর কি, মানে ল্যাণ্ড-স্লাইড। আগে নিজে চড়তাম, এখন অন্যকে চড়াই—এই যা ডিফারেন্স।

কমল মিত্তির সম্ভবতঃ অত ন্যাড়া করে জানতেন না যে তাঁকে রাঁচী আউটডোরে অত ঘন ঘন ঘোড়া মানে মিলিটারী ঘোড়ায় চড়তে হবে। লোকেশানে পৌঁছে তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হলো। ইউনিটের সবাই কথায় কথায় ঘোড়ার কথা উল্লেখ করছে, কি-ভাবে চালাবে তাঁর পায়তারা কষছে দেখে কমল মিত্তির স্লাইট দমে গেলেন। শুধু বুবু গাঙ্গুলীরই যা উৎসাহ। যেন কতদিন পরে একটা প্রকৃত সুযোগের সম্মুখীন হয়েছে সে!

কমল মিত্তিরকে বলল—দাদা, একেবারে মিলিট্রি ঘোড়া, চড়বেন যখন তখন বুঝবেন, স্রেফ তুলো যেমন বাতাসে উড়ে যায়—তেমনি করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে—

—তোরা চড়ছিস নাকি?

—আলবৎ। সেইজন্যেই তো এখানে আসা। রাঁচীর মিলিট্রি ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে দু' ডজন ট্রেণ্ড হর্স আনা হচ্ছে। উত্তম-কুমার, আপনি, আমি সবর্দাই চড়ব।

কমল মিত্তির বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বেণু লাহিড়ীর সুযোগ্য সহকারী মানু সেনকে ডেকে জিগ্যেস করলেন—কিহে মানু, বুবু যা বলছে সব সত্যি নাকি? আমি কিন্তু একবার চড়ব, দ্বিতীয়বার নয়, হাজার অনুরোধ করলেও নয়—

মানু সেন বললেন—বুবুর কথা ছাড়ুন তো কমলদা...

কমল মিত্তির তখনকার মত থামলেন বটে কিন্তু মনে তাঁর ভয় ঢুকে গেল। কল-কাতার ঘোড়াগুলো মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু রাঁচীর মিলিটারী ঘোড়া? সেগুলো কি-রকম বিহেভ করবে কে জানে!

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

ফ্লোর থেকে বলছি

গনগনে রোদ্দুরের দুপুরে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর ফ্লোরে সেদিন হয়তো ইতিহাসের কোন একটি কালোরাত। এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারে। অথচ শুটিং জোনের মধ্যে আলোর বন্যা। হাজার হাজার কিলোওয়াট জ্বলছে। জ্বলছে সারি সারি ঝাড়লণ্ঠন। তিনদিকে কারুকাজ করা দেওয়াল। একদিক উন্মুক্ত। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরানো যায় না। বড় বড় আয়না। মেঝের ওপর লাল গালিচা পাতা। তার ওপরেও অনেক নকসা করা। মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন চিন্তামণি। তাঁর গানের সুরে মুগ্ধ অতিথিরা বসে আছেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বিশেষ অতিথি নীলধ্বজ। তিনি একটি তাকিয়ার ওপর হেলান দিয়ে চিন্তামণির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি চিন্তার সারা শরীরটাই ঘুরে ঘুরে আসছিল। অপরূপা চিন্তামণিকে কে বলে একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষ। অসামান্য তাঁর রূপ। তাঁর গলায় সুরের যাদু। তানপুরায় হাত রাখতেই যেন আকাশ-বাতাস আন্দোলিত হল। পাখীরা সব কলতানে মুখর হল। চিন্তামণির সুরের মূর্চ্ছনায় কোথায় যেন একটা ব্যথা—উপস্থিত সবাইকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। ব্যথার কথার রেশ ছুটে চলেছিল দূরে, অনেক দূরে। বোধ করি বিল্বমঙ্গলের কাছে এসেও পৌঁছেছিল :

আমারও মন রয়েছে,
মনে যে মধু ভরা
সে মধু চাইবে এসে
জানি না কোন্ ভ্রমরা
বুঝি সে ভালবেসে ফোটাবে মনের মুকুল...

চিন্তামণির এই গানের সুরে সুরে পথ মিলিয়ে এসে পড়ে বিল্বমঙ্গল। চিন্তামণিকে ভালবেসে মনের মুকুল ফোটাতেই তার আগমন। কিন্তু এই ভরা দুপুরবেলায় বিল্বমঙ্গলের রূপকার সমিত ভঞ্জ স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ থেকে এখানে চলে এসেছেন স্রেফ গাজাতে। তোমরা কিরকম শুটিং করছ দেখতে এলাম। কাজ করছ না ফাঁকি দিচ্ছ? সমিত ওরফে বুবুর ফ্লোরে পদার্পণ এইভাবে। শট-এর ফাঁকে ফাঁকে, অতঃপর নানাবিধ গল্প। আমার সঙ্গে কথা হল পরবর্তী ছবি নিয়ে। এখন বলতে গেলে প্রতিদিনই শুটিং করতে হচ্ছে। শনিবার, রবিবারেও ছুটি নেই। আজ হারমোনিয়ামের শুটিং চলছে। তপন সিংহের ছবি হারমোনিয়াম। এ ছবিতে সমিত একটা নতুন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করছে।—'আপনজন'-এর মত তপনবাবুর ছবিতে আবার ওরা একত্র হয়েছেন। তবে এখানে রাইভাল নয়। স্বরূপ, মাস্তানের ভূমিকায়। সমিত সাদা-সিধে গ্রামের ছেলে। একদা সে তার এক পাতানো মাসীর সঙ্গে বেড়াতে এসে এক পল্লীতে রয়ে গেছে। বারবণিতাদের বাস এখানে। শ্যামা নামে একটি মেয়েকে রতনের ভারী পছন্দ। শ্যামা ভাল গান করে সেটা রতনের আরও ভালো লাগে। তাই সে, বলা নেই, কওয়া নেই, একটা হারমোনিয়াম কিনে এনেছিল। এইভাবেই গল্পের বিস্তার। মাসী এবং শ্যামার মধ্যে রতন বেশ সুখেই থাকে।

আপাততঃ সুখে থাকতে পারছে না। ফ্লোরের মধ্যে বড্ড গরম লাগছে। মার্চ মাসেই যা গরম পড়েছে। এর ঠ্যালাতেই অস্থির কাণ্ড। সমিত দরদর করে ঘামছিলেন। একটু পরেই আবার গিয়ে শুটিং করতে হবে। ফ্লোরের মধ্যে বসে থাকা। তাই মুক্ত-বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে সমিত এই মুহূর্তে ফ্লোরের বাইরে আসছেন।

এদিকে শুটিং জোনের মধ্যে দ্রুতযজ্ঞ চলছে। ক্যামেরার পজিশন দ্রুত পরিবর্তন করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অড-অ্যাংগেল থেকে শট টেক করা হচ্ছে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী। চিন্তামণির রূপসজ্জায় সোমা দে এবারে মেক-আপ রিটাচ করছেন। কারণ যা গরম পড়েছে। ক্লোজ-আপ কম্পোজিশন। সোমা, সেই একইভাবে। তানপুরায় হাত রেখে প্লে-ব্যাকের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন। একটা রিহার্সাল দেখা হল। ফাইন। অতএব শটটা টেক করা যেতে পারে। প্রধান সহকারী অমিতাভ, মিঠু সহ (আরেকজন সহকারী) স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রশিল্পী দীপক দাশ 'অল লাইটস' উচ্চা-

হারমোনিয়াম : আরতি ভট্টাচার্য, স্বরূপ দত্ত — ফটো : অমৃত

রূপ করে ক্যামেরা চালু করে দিলেন। দৃশ্যটা হুবহু ধরে রাখা হল।

এইবার আসুন গল্পে। এখানেই আসছে বিল্বমঙ্গল। চিন্তামণির রূপে গুণে আর গানে পাগল বিল্ব তার জীবনের সবটুকু সম্ভার উজাড় করে দিতে চাইল।

আত্মোপলব্ধির পর চিন্তামণি বলে : আমার জন্যে। এই একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষ-এর জন্য।

বিল্বমঙ্গল : অমন করে বোল না। তোমার রূপ—

চিন্তামণি : রূপ। তুমি তো অনেক লেখাপড়া শিখেছ। তুমি জান না রূপ দুদিনের...তাছাড়া তুমি বোঝ না? আমি নটী। সারাক্ষণ তুমি ঘরে থাকলে অন্য লোকজন আসবে কি করে? আমার রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে না? তোমার তো পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই। ...আমি কি উপবাস করে মরবো? তোমায় মিনতি করে বলছি তুমি যাও। আর এস না।

বিল্বমঙ্গল : আসব না? আমি যে তোমাকে ভালবাসি।

চিন্তামণি : ভালবাসি ভালবাসি। তোমার এমন পাগলকরা ভালবাসা আমার মত সামান্য নারীকে দিয়ে কেন নিজেকে এত ছোট করছ?

বিল্বমঙ্গল : ছোট করছি?

চিন্তামণি : হ্যাঁ শোননি? তোমাকে সবাই লম্পট, বেশ্যাসক্ত বলে। চুপ করে আছো কেন? যাও চলে যাও। তোমার কি লজ্জা নেই?

বিল্বমঙ্গল : বেশ আমি চলে যাচ্ছি চিন্তামণি। কিন্তু আমার যে কেউ নেই। কোথায় যাবো?

চিন্তামণি : কেউ কারো আপন নয়। যিনি সবচেয়ে বেশী আপন তাঁরই স্মরণ নাও।

বিল্বমঙ্গল : কে সে?

চিন্তামণি : ভাল করে তাকিয়ে দেখ—যাঁর চেয়ে আপন কেউ নেই। যিনি অসহায়ের সহায়। ...রূপ...এ রূপের কোন তুলনা আছে নাকি?

আপাতত, এইটুকুই জানবেন। বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি—প্রচলিত প্রেম-কাহিনী।

বাণী চিত্র মন্দিরের ব্যানারে 'বিল্বমঙ্গল' নামে এই ছবি স্বরচিত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন গোবিন্দ রায়। এক কালের বিখ্যাত প্রযোজক এবং পরিচালকও বটে! বহুদিন বিরতির পর তিনি ছবি করছেন। প্রবীণ এই কুশলী একদল নবীন কুশলীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছেন, এটা একটা দেখার মত বিষয়। এই পর্যায়ের শুটিং নিয়ে ছবির অনেকখানি অংশ সুসম্পন্ন হল। আগামী পর্যায়ে বহির্দৃশ্য গ্রহণ। এই পর্যায়ের শুটিংএ শিল্পীদের মধ্যে অংশ নিলেন : সমিত ভঞ্জ, সোমা দে, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, নীনা মুখার্জি এবং গীতা দে। সুর-সংযোজনা করছেন, প্রবীণ সুরকার অনিল বাগচি। গান এ ছবির অনাতম সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। এই পর্যায়ে প্রণব রায়ের লেখা আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া উপরিলিখিত গানটি পিকচারাইজ করা হল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই ছবির পরিবেশনা ভার নিয়েছেন সাহা ফিল্মস।

স্টুডিও সংবাদ

এই সপ্তাহে কলকাতার স্টুডিওর সবচেয়ে বড় খবর সত্যজিৎ রায় তাঁর নতুন ছবির শুটিং শুরু করেছেন। অন্তর্দৃশ্য-গ্রহণ করছেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। শংকর-এর রচনা থেকে স্বরচিত চিত্রনাট্য-পরিচালনা করছেন শ্রীরায়। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন নবাগত প্রদীপ মুখার্জি দীপংকর দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, আরতি ভট্টাচার্য পদ্মা দেবী রবি ঘোষ এবং উৎপল দত্ত। এই পর্যায়ে নায়কের বাড়ির সেট পড়েছে। একটানা সতেরো-আঠারো দিনের সিডিউল। চিত্রগ্রহণ করছেন : সৌমেন্দু রায়। সম্পাদনা করছেন : দুলাল দত্ত।

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ পরিচালক তপন সিংহ 'হারমোনিয়াম' ছবির শুটিং দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এই পর্যায়ে বারবণিতার ঘরের সেট পড়েছে। শিল্পীদের মধ্যে অংশ নিচ্ছেন : ছায়া দেবী, আরতি ভট্টাচার্য, সমিত ভঞ্জ ও স্বরূপ দত্ত। চিত্রগ্রহণ করছেন : বিমল মুখোপাধ্যায়। স্বরচিত কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন শ্রীসিংহ স্বয়ং। অনেকগুলি গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। এরা শিল্পচারাইজও।

এই সপ্তাহ থেকেই ক্যাল মুভি-টোন স্টুডিওতে দয়াশংকর সুলতানিয়ার

রাজা : আরতি ভট্টাচার্য

কলার হিন্দি ছবি 'কিতনে পাশ কিতনে দূর'-এর অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ করার কথা ছিল। অনিবার্য কোন কারণে সেটা হয়নি। আসছে সপ্তাহ থেকে এই পরিকল্পিত পর্যায় শুরু হবে। এই পর্বে বম্বে থেকে অশোককুমার ও প্রাণ আসছেন শুটিং করতে। ছবির দুটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করবেন—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল। ছবির গল্প দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের কাজ শেষ হয়েছে। এখানে অংশ নিয়েছেন : সমিত ভঞ্জ, হিনা কৌসর, অনুপকুমার, রবি ঘোষ চিন্ময় রায় এবং সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ করছেন : সত্য রায়। শিল্প-নির্দেশক : বিজয় বসু।

পরিচালক পীযূষ বসু 'বাঘবন্দীর' শুটিং শেষ করেছেন। 'সন্ন্যাসী রাজা'র শুটিংও শেষ করে এনেছেন। শুরু করবেন নতুন ছবি, তার পরিকল্পনা চলছে। পরপর কয়েকটি ছবি হতে পারে। এই মুহূর্তে কি শুরু করবেন প্রশ্ন করা হলে ঘনিষ্ঠ মহলের উত্তর : 'যার যেথা ঘর'। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্প। এ ছবির দুটি প্রধান পুরুষ চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপ রায়ের থাকার কথা। নায়িকা কে? অপর্ণা সেন?

স্টুডিও সংবাদদাতা

নির্দোষ

একটি গতানুগতিক উপভোগ্য ছবি!

প্রযোজনাঃ নব সমাপ্তি প্রডাকসন্স

জেলা জজ দ্বারকাপ্রসাদ-এর ছেলে রবি এবং গ্রামের জমিদারের মেয়ে রূপা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারে ছেলেবেলা থেকেই অঙ্গীকারবদ্ধ। রবি ও'র পিতার মতোই আইন অধ্যয়ন করে যখন শিক্ষিত হয়ে বাড়ী ফিরে এল, তখন আর সেই অশিক্ষিত গ্রাম্য তরুণী রূপাকে বিবাহ করতে রাজী হোল না। তখন দ্বারকা-প্রসাদ রবিকে বললেন—গ্রামে গিয়ে যদি সে বোঝে, রূপা তার মনের মতো পাত্রী নয়, তাহলে সে এই বাগদান নাকচ করে তার পছন্দমতো মেয়েকে বিবাহ করতে পারে।

গ্রামে গিয়ে রবি রূপাকে দেখেই চমকে উঠলো, কারণ তার পরিধানে তখন ছেলেদের পোষাক। ও'র বাবা সেই গ্রামের জমিদার, ছেলেবেলা থেকেই ও'কে সেইভাবে মানুষ করেছেন। এজন্যে আইনজ্ঞ রবি রূপাকে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলে দিতে পারলো না।

রূপা তার বন্ধু ভিক্টো ও তার ভাই শঙ্করের সঙ্গে শহরে গিয়ে, সেখানকার লোকেদের সঙ্গে মিশতে চাইলে, বাবা ও'কে মেয়েদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করবার জন্যে উপদেশ দিলেন। রূপার বাবারও ইচ্ছা ছিল শহরে পৌঁছে, ধুমধামের মধ্যে দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু আচমকা বর্ষা এসে সমস্তই ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল। গ্রামের বন্যাতে রূপার মা ডুবে গেলেন এবং পিতাও মারা গেলেন। এসময় কোন সহৃদয় ব্যক্তি রূপার সাহায্যের জন্যে এল না। কয়েকজন কুচক্রী ও অসৎ ব্যক্তি এসে রূপাকে বোঝালো—শহরে ও'র আত্মীয়ের কাছে তাঁরা পৌঁছে দেবে, এই অছিলায় তাকে পতিতালয়ে নিয়ে যেতে চাইলো ও'রা, কিন্তু রূপা ও'দের উচিত শিক্ষা দিল। এ'দের হাত থেকে রেহাই পেলেও, অপর চার কুচক্রী ও'র উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। বালাবন্ধু ভিক্টো ও'কে সেবার বাঁচায়। কিন্তু রবি রূপার প্রতি পাশবিক অত্যাচারের কথা বিশ্বাস করলো না। রবির মা রূপাকে ঘরে তুলতে রাজী হলেন না, কারণ তখন সে অন্তসত্ত্বা। রূপা ওখান থেকে বেরিয়ে কুচক্রীদের হত্যা করে তার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। রবি তার ভুল বুঝে রূপাকে বিবাহ করতে রাজী হোল অবশেষে।

কাহিনী ও পরিচালনা গতানুগতিক। ইতিপূর্বে পরিচালক এস এম সাগর ওজাতীয় ক্রাইম ছবি পরিচালনা করেছেন। এ-ছবির সম্পদ হোল অভিনয় আঙ্গিক ও সুর সংযোজনা। অভিনয়ে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় বিনোদ মেহরা ও যোগিতাবলীর কাজ মন্দ নয়। অন্যান্য চরিত্রে—সুজিতকুমার, পদ্মা খান্না, ইফতেকার, নাজনীন, কুলজিৎ, মোহন চটী, মুমতাজ বেগম ও ললিতা কুমারী চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। আলোকচিত্রগ্রহণে দারা ইঞ্জিনিয়ার এবং সম্পাদনায় পি এস সায়গলের কাজ উচ্চাঙ্গের। সঙ্গীতে লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল উপভোগ্য সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন।

চিত্রদূত

কিছুক্ষণ

ঝুমুর গাঙ্গুলী

সেকি প্রচন্ড জোরে হাসি! বাইশ বছরের যৌবন ছলকে ছলকে উঠছিল যেন হাসির মধ্যে কিন্তু সেই সঙ্গে রিনরিন করে বাজছিল চাপা কৌতূহল। হাসি আর থামে না কিছুতেই। অবশ্যি হাসবার মতই ঘটনা বটে। ডিরেক্টর-প্রোডিউসার-ক্যামেরাম্যানের সামনে দিল্লীর চোস্ত্ এক আপ-টু-ডেট মেয়েকে যদি কনে সাজার মত পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে সে হাসবে না তো করবে কি! যৌবন কাঁপানো হাসি যখন থামল তখন ডিরেকটার সুনীল বাঁড়ুজ্জে সবাইকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন—'এ হাসি তো বসনের নয়, ঠাকুরঝিকেই মানাবে ভালো।'

আর এই কথাতেই ফাইনাল হয়ে গেল। দিল্লীর তুখোড় মেয়ে ঝুমুর গাঙ্গুলী হয়ে গেল 'কবি'-র ঠাকুরঝি। অন্নাশঙ্করের ঠাকুরঝি! প্রায় অতর্কিতেই জীবনের পথটা গেল পাল্টে। দিল্লী ইউনিভার্সিটির এম-এ ঝুমুরকে আসতে হোল কলকাতায়। পাল্টে গেল আরও অনেক কিছু।

যে মেয়ে এই বাইশটা বছর ধরে মিনি-ম্যাকসি-শালোয়ার-কামিজে সাজাতো শরীর-টাকে তাকে যদি হঠাৎ এগার-বারো হাত শাড়িতে প্যাঁচ কষতে হয় বুঝুন ব্যাপারখানা। 'বীরভূমের লোকেশনে সুটিং-এর সময় কত-বার যে শাড়ীতে জড়িয়ে ছরদার পড়েছি তার ঠিক নেই!' বলেই আবার সেই যৌবন ছড়ানো হাসি ছড়ালেন ঘরটায়।

ঝুমুরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় দিল্লীতেই। ও'দের ডিফেন্স কলোনীর বাড়ীতে যেদিনই আড্ডা বসেছে শেষ হতে রাত্তিরের কয়েক প্রহর যে কেটে গেছে বুঝ-তেই পারিনি। ও'র মা-বাবা দুজনেই ভয়ানক মানুষ ভালোবাসেন। কলকাতার লোক পেলে তো ছাড়তেই চান না। আর সেই আড্ডার মধ্যমণি হয়ে ঝুমুর ইংরেজী-বাংলা হিন্দীর চচ্চড়ি ভাষায় তাঁর প্রথম অভিনয়ের অভিজ্ঞতা, ব্যবসা-ভাই বিল্টুর সঙ্গে ছোট-খাট খুনসুটির কথা বলে গেছে। বম্বের গাঙ্গুলী ফ্যামিলি (অশোককুমারদের ফ্যামিলি আর কি!) সুবোধ মুখার্জিরা নাকি ও'দের খুব নিকট সম্পর্কেরই আত্মীয় রাজকাপুর দিল্লী গেলে ও'র বাবার সঙ্গে দেখা না করে যান না ইত্যাদি আরও হাজারো গল্পের সঙ্গে কখন যে সদ্য পরিচিত ঝুমুরকে অতি-পরিচিত মনে হয়ে উঠেছে বলতে পারব না। কথা দিয়েছিলাম কলকাতায় এলে দেখা করব। তাই যেদিনই শুনেছি যাত্রিকের 'সেনা ফর ক্যাবারে' ছবিতে কাজের জন্য ঝুমুর এসেছে কলকাতায় ফোন করেছি ছায়া দেবীর বাড়ীতে। (কলকাতায় ঝুমুরের ঠিকানা এইটাই)

আর যথারীতি যথাসময়ে হাজির হতেই হাতে একখানা পত্রিকা নিয়ে ঢুকলেন ঝুমুর। হাসি ছিল মুখে। তবে এবারে নিঃশব্দ হাসি। পরণে ম্যাক্সি। এই দু মাসে চেহারার কোনো পরিবর্তন নজরে পড়লো না। চোখে আলতো করে লাগানো কাজল। কোনো মেক-আপ নেই। এসেই বললেন 'দিল্লী থেকে এসে

আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। আসলে আপনার কার্ডটাই আমি আনতে ভুলে গেছি কিছু মনে করেন নি তো!' হাসির ঢেউ তুলে কোনো ফিল্ম অ্যাকট্রেস এইভাবে কথা বললে কি আর কিছু মনে করা যায়! যায় না বুঝি। তাইএকটু বিব্রত হয়েই বললাম—'না না তা কেন?'

বসলেন সামনের চেয়ারে। হাতের বই হাতেই রইল। দিল্লীতে তোলা নিজের কিছু ছবি দেখালেন। বাড়ীর খবর জানতে চাইলাম। 'এই তো কদিন আগে বাবা এসেছিলেন কলকাতায়! দু-তিন দিন ছিলেন। আবার আসবেন হয়তো!'

—কলকাতা কেমন লাগছে?

: মন্দ কি ভালোই। তবে মাঝে মাঝে মা-বাবা ভাই-এর জন্য মনটা কেমন যেন করে!

তাই প্রতিদিন দিল্লী থেকে ফোন আসে ঝুমুরের মা-বাবাও একমাত্র মেয়েকে ছেড়ে বোধ হয় ওখানে স্থির থাকতে পারছেন না। রোজই বাড়ীর কারো-না-কারো সঙ্গে কথা হয়। বেশীক্ষণ কথা বলতে পারেন না বলে মনটা আরও খারাপ হয়ে যায় অনেক সময়।

কি আর করা যাবে! কলকাতায় অবশ্য ঝুমুর এখনও থাকবেন কিছুদিন। 'স্নো ফক্স ক্যাবারে' শেষ করে তবে যাবেন। 'এইজন্যেই জানেন আমার বম্বে যাওয়া হচ্ছে না—বলেই একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যেন। রাজকাপুর-সুবোধ মুখার্জি-কিশোরকুমার আরও অনেকেই নাকি 'ঝুমার'কে (ওখানে ওঁকে এইভাবেই ডাকেন সকলে) অফার দিয়েছেন বম্বে যাবার জন্য। কিন্তু যেতে পারছেন না।

—কেন?

যাবটা কি করে বলুন? বম্বেতে আমার সঙ্গে থাকবে কে? এখানে তো তবু ছায়াপিসিকে পাচ্ছি! ওখানে কাকে পাব? বাবা বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত। মা সংসার নিয়ে—একটু অনুযোগের সুরও বাড়ল যেন গলায়। বললাম—কেন আপনার ভাই বিল্টু রয়েছে তো?

—ওর কথা আর বলবেন না। এই তো কমাস আগে ফরিদাবাদে ও ফ্যাকটরি করেছে। আমার সঙ্গে যাবে কি করে?

সত্যিই বিমর্ষ হবার মতই ঘটনা বটে। বম্বেতে ছবিতে কাজের জন্য সারা ভারতের সব মেয়েরা যখন হুটোপাটি করছে কি-না-করছে অনেকে! আর সেখানে কাজের অফার পেয়েও কাজ করতে না পারাটা দুঃখজনক ঘটনা তো বটেই।

যাই হোক বম্বে যখন আর যাওয়া হচ্ছে না বম্বের কথা বাদ দিই। চলে আসি কলকাতাতেই। কবির ঠাকুরঝি এখন 'স্নো ফক্স ক্যাবারে'র একটি মেয়ে। বারো হাত শাড়ীর প্যাঁচ-পোঁচ এখন ঝুমুরের হাতের মুঠোয়। চাই কি কাপড় দিয়ে আরও বেশী শরীরটাকে খোলাতে পারে সে। আর ককটেল-পার্টি ইত্যাদিতে তাঁর অভিজ্ঞতা বলার দরকার হয় না।

এহেন ঝুমুরকে যাত্রিকের দিলীপ মুখার্জি যখন টেকনিসিয়ানের এক নম্বর ফ্লোরে বলেছিলেন—'দেখো এই সিনে তোমাকে ড্রাঙ্কার্ড মানে মাতালের অভিনয় করতে হবে। কথাটা শুনে শুধু তাঁর যৌবন নয় ফোর কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল ঝুমুর। 'ড্রাঙ্কার্ড হতে হবে আমাকে ভাবতেই পারছি না। লোককে ড্রিঙ্ক করতে দেখেছি ড্রাঙ্কার্ড হতে দেখেছি। আমাদের বাড়ীতেই এমন বহু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমি নিজে তো কখনো ড্রাঙ্কার্ড হইনি। তাই দিলীপবাবুকে আমি বললাম—আই নো হাউ টু ড্রিঙ্ক বাট অই ডোন্ট নো হাউ টু গেট ড্রাঙ্ক। দিলীপবাবু সেজন্য তাঁকে ছেড়ে দেননি। ছবির ভাইটাল সিন। ঝুমুর করেওছে কাজ। কেমন করলেন জিজ্ঞেস করাতে বললেন—'জানি না কি করেছি, হাত-পা ছুঁড়ে মাতাল হতে গিয়ে আমার প্রচন্ড হাসি পাচ্ছিল। উত্তমবাবু আমায় যখন ধরেছেন তখন আর প্রায় হাসি সামলাতে পারছিলাম না। যাই হোক কোনমতে ম্যানেজ। আর শটটা টেকিং-এর পর প্রাণ খুলে হেসে নিয়েছি।'

ও আরও জানাল এ ছবি করেই হয়তো সে কলকাতা ছাড়তে পারবে না! ইতিমধ্যে উৎপলবাবুর নাটকের গ্রুপে নাকি রিহার্সালও শুরু করে দিয়েছে। পরের নাটকেই একটা ভালো রোল করছে। 'তাহলে তো আর কলকাতা ছাড়তেই পারবেন না আপনি। ভালোই হোল। একে বাংলা ছবিতে তো নায়িকার প্রচন্ড অভাব। আপনি থাকুন তবুও একটা নতুন মুখ পাওয়া যাবে।'

কথাটা বোধহয় মনে লাগল ঝুমুরের। কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে চাইলেন না। মিষ্টি হাসি বুলিয়ে বললেন—'মন্দ হয় না কিন্তু ঝরা-মাকে ছেড়ে তো আর থাকতে পারবো না!'

ইতিমধ্যে নীচ থেকে ছায়া দেবী উঠে এসেছেন। সম্ভবত যাত্রিকের প্রোডাকসন অ্যাসিস্টেন্ট প্রদীপবাবুও এসে গেছেন। আগামীকাল আবার শুটিং আছে। তারই

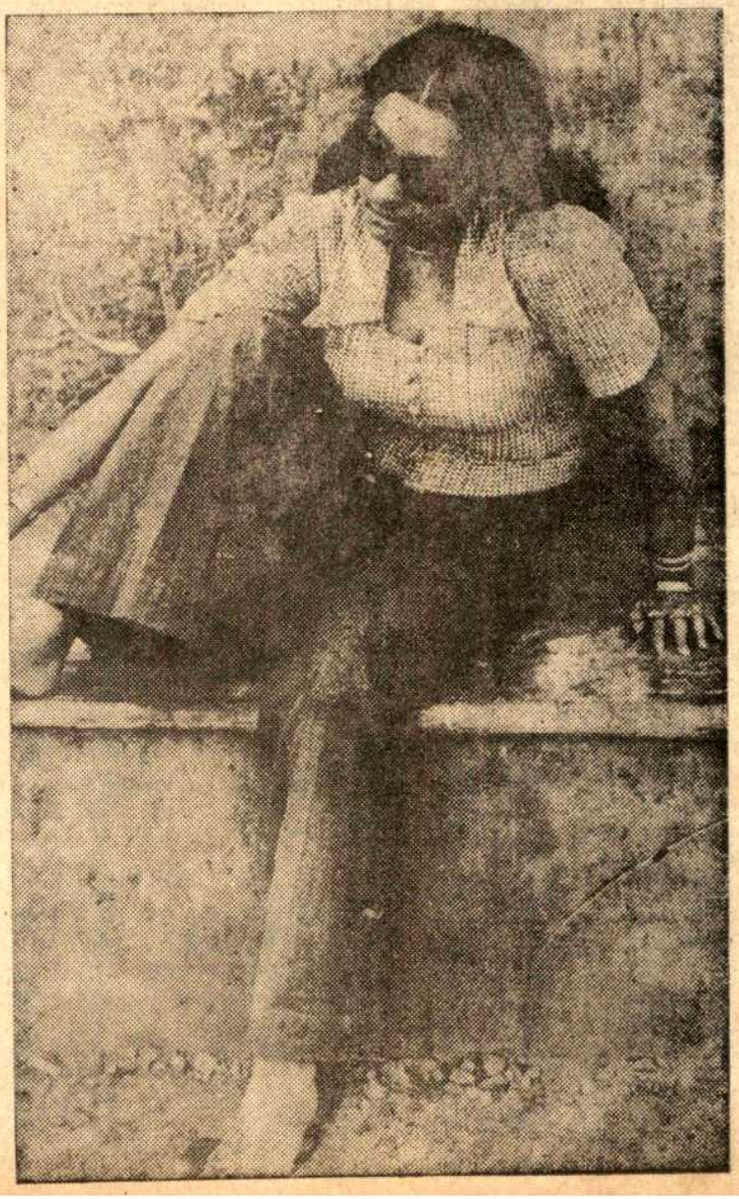

সময় জানিয়ে গেলেন তিনি। কখন রেডি থাকতে হবে বলে গেলেন। আর প্রদীপ-বাবুকে সামনে পেয়ে ছায়া দেবী বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে বললেন—'আচ্ছা ভাই তোমাদের নগরদর্পণে ছবিতে ছায়া দেবী কি কাজ করেছেন? অমনি ভদ্রলোকের তো কাঁচুমাচু অবস্থা। কেন কেন কেন, কেন বলছেন একথা দিদি।

—তোমাদের বড় বড় ব্যানারে তো ভদ্রমহিলার নামটা দেখতে পাচ্ছিলাম না তাই।

আমরা দুজন তখন ভয়ানক রেলিশ করছি প্রদীপবাবুর অবস্থাটা। ঝুমুরও এই ফাঁকে বলে দিলেন—'দেখবেন আমার নামটাও যেন এইরকম বাদ না চলে যায়।' ভদ্রলোক চুপ! ইতিমধ্যে আড্ডার লিডিং পার্টটা ঝুমুরের কাছ থেকে চলে গেল ছায়াদেবীর মুখে। ছবি - শুটিং - আউটডোর - ইন্ডাস্ট্রির অব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে আলোচনা গড়িয়ে যখন আবার ঝুমুরের মুখে ফিরল সংলাপ তখন সে বলল—ফিল্মে আসব কোনদিন ভাবিই নি। পাকা বিজনেস কেরিয়ার নেব ভেবেছিলাম। তোমাদের ইন্ডাস্ট্রির এইসব পার্সোন্যাল পলিটিক্সে কে মাথা গলাতে আসতো?

আ্যাঁ! বিজনেস, পার্সোন্যাল পলিটিক্স!! ব্যাপারটা কি! খোলসা করতে হয় তাহলে! চেপে ধরবার আগেই ও বলল—বাবাকে জানাইনি। আমি আর ভাই চামড়ার ওপর প্রিন্টিং-এর বিজনেস শুরু করেছিলাম এক-সময়। আমি ডিজাইন করে দিতাম। ম্যাড্রাস থেকে প্রিন্ট হয়ে আসত সব। জানেন, বেশ লাভও হচ্ছিল। ফরেনে এই সব জিনিসের বেশ চাহিদা। কিন্তু ব্যাঙ্ক লোনে কি একটা গণ্ডগোল হওয়ায় বন্ধ করে দিতে হোল বিজনেস।'

—এটা তো গেল বিজনেসের ব্যাপার। পার্সোন্যাল পলিটিকস কি বলছিলেন যেন।

কথার জবাব দিতে চাইছিলেন না প্রথম-টায়। কি হবে এসব কথা বলে—এগুলো তো আপনারা জানেনই—ইত্যাদি বলে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন ব্যাপারটা। এড়াতে অবশ্য শেষ অব্দি পারেন নি।

সেনা ফকসের হিরোইন মিঠু মুখার্জীর নাকি ও'র সম্পর্কে খুব অ্যালার্জি আছে। ব্যাপারটা কতখানি সত্যি জানি না, তবে ঝুমুর বললেন—ও'র সুটিংয়ে আমি আর কোনদিন যাব না। একটা স্যাড ইনসিডেন্ট নাকি হয়েছিল কিছুদিন আগে, (মাফ করবেন ঘটনাটা বলতে পারলুম না।) সেই থেকেই এই কোল্ড ওয়ার চলছে দুজনার। অথচ 'কবি'তে একসঙ্গে দুজনেই কাজ করেছেন! বসন আর ঠাকুরঝিকে তো কাজ করতেই হবে। ঝুমুর বললেন—আমার সঙ্গে তো কোনো কিছু হয়নি ও'র, ভয়ানক বন্ধুই ছিলাম দুজনে। কি যে হোল বুঝতে পারছি না।' আমিও পারিনি। হয়তো তৃতীয় কোনো হাত আছে!

তবে ঝুমুর স্পোর্টিং চরিত্রের মেয়ে। এসব ব্যাপারে মাথাই ঘামান না। প্রয়োজনটা কি আর?

কলকাতা ছেড়ে দিল্লী গিয়ে তো শুরু করবেন পড়াশুনো। ইচ্ছে আছে ইণ্ডিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিকে ডকটরেট করার। এখানে বসে প্রিপারেশনও চলছে!

এসব আলোচনা করতে গিয়ে কেমন যেন মেঘলা হয়ে এলো ঘরটায়। কফির কাপ ভর্তিই রয়ে গেছে। কফি ঠাণ্ডা। আর ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে দশটা।

নির্মল ধর

শতবর্ষের স্মরণীয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অমরেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল পরিত্যাগ করে স্টার থিয়েটারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধ এবং পরামর্শেই অনাথবাবু বহু অর্থব্যয়ে থিয়েটার গৃহটিকে নতুন করে নির্মাণ করেন। তাই অমরবাবুর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তার বিরুদ্ধে আইনগত পন্থা গ্রহণেও অগ্রসর হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তা থেকে বিরত হন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর থেকে অমরেন্দ্রনাথ স্টার থিয়েটারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। অমরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় স্টারের প্রথম নাটক সংসঙ্গ। পরবর্তী নাটক গুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের হরিনাথের 'শ্বশুরবাড়ী যাত্রা (১৫ নভেম্বর) নরেন সরকারের জীবনসংগ্রাম (২৩ ডিসেম্বর) নরমেধ যজ্ঞ, খাসদখল, বলিদান প্রভৃতি নাটক অভিনয়ের পর অমরেন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যোন্ধারের জন্য প্রায় মাসখানেক বম্বে ও সিমলা প্রভৃতি স্থান ঘুরে আসেন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে ১৩ জুলাই ১৯১২ খৃষ্টাব্দে খাসদখল ও রাজা ও রানীতে মোহিত ও বিরুমদেব এবং কুমারসেন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৭ আগস্ট মঞ্চস্থ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরপারে। বিশ্বেশ্বর চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথ অভিনয় করেন। ১৬ নভেম্বর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আনন্দবিদায় মঞ্চস্থ হবার পর অমরেন্দ্রনাথ বর্মায় যান। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে কালপরিণয়ে মণীন্দ্র চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ মার্চ মনমোহন গোস্বামীর ধর্মবিজয় নাটকে কালাচাঁদ, ৩ মে স্বরচিত কিসমিস রঙ্গনাট্যে স্থূল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চরিত্রে অভিনয় করেন।

মঙ্গলবার ১৩ মে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী হেমনলিনী দেবী পর-লোকগমন করেন। স্ত্রীবিয়োগে অমরেন্দ্রনাথ উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়লেও, নতুন শক্তিতে অভিনয়ে আত্মনিয়োগ করেন। স্ত্রীবিয়োগের পর ২৪ মে মাধবীকঙ্কনে নরেন্দ্রনাথ চরিত্রে অভিনয় করেন। এবং বেশীর ভাগ পুরোন নাটকের প্রধানাংশে অভিনয় করে স্টার থিয়েটারকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যান।

স্ত্রীবিয়োগের পর অমরেন্দ্রনাথের মানসিক অস্থিরতা খুবই বৃদ্ধি পায় তাছাড়া স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ে তাই প্রায়ই কলকাতার বাইরে গিয়ে কাটিয়ে আসতেন।

২৪ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়পতাকা। অমরেন্দ্রনাথ প্রিয়লাল রায় চরিত্রে অভিনয় করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন গীতি-নাট্য মায়াপুরী মঞ্চস্থ হবার পর আবার স্টার থিয়েটারে পুরোন নাটকই অভিনীত হতে দেখা যায়। বলাই বাহুল্য অমরেন্দ্রনাথ প্রধানাংশেই অংশ গ্রহণ করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩০ মে মঞ্চস্থ হয় অমরেন্দ্রনাথের নতুন গীতিনাট্য 'বড় ভাল-বাসি'। ১৩ জুন রবীন্দ্রনাথের শাস্তি অব-লম্বনে রচিত অভিমানিনী মঞ্চস্থ হয়।

১৫ আগস্ট অভিনীত হয় মণিলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অহল্যাবাঈ। ৩১ অকটোবর রবীন্দ্রনাথের দিদি অবলম্বনে তার নাট্য-রূপ। ৫ ডিসেম্বর ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষত্রবীর এবং ২৬ ডিসেম্বর অমরেন্দ্রনাথ রচিত অভিনেত্রীর রূপ স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারী অমরেন্দ্রনাথ রচিত প্রেমের জেপলিন এবং রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলোয়ারী মঞ্চস্থ হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারী মঞ্চস্থ হয় ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাইন অফ দি ক্রস'।

১৭ জুলাই কল্যাণী এবং ২১ আগস্ট মঞ্চস্থ হলো রাজা চন্দ্রধ্বজ। ১৮ সেপ্টেম্বর ব্রত উদ্যাপন, ৯ অকটোবর রত্নমঞ্জরী-র পর ৭ ডিসেম্বর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলো ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সওদাগর নাটক। সওদাগর নাটকে কুলীরকের চরিত্রই অমর দত্ত অভিনীত শেষ চরিত্র।

১২ ডিসেম্বর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ সর্বশেষ আত্মপ্রকাশ করেন স্টার রঙ্গমঞ্চে সওদাগর নাটকের কুলীরক চরিত্রে। বাংলা ২১ পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩২২, ইংরেজী ৬ জানুয়ারী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাত ৪টা ১০ মিনিটে অমরেন্দ্র-নাথ হাতিবাগানের গৃহে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা মনীষী হীরেন্দ্র-নাথ ছিলেন স্বনামধন্য ব্যক্তি। হীরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ। মধ্যম পুত্র হরীন্দ্রনাথ অমর দত্তের জীবনীকার।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

নাটমঞ্চ

চেতনার ভাল মানুষের পালা

বাঙলা নাট্যজগতে একই নাটকের একাধিক বঙ্গানুবাদ হলেও একাধিক প্রযোজনা খুব বেশী হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সেদিক থেকে বার্টোল্ট ব্রেখটের (অন্য মতে ব্রেশট্) 'ডেয়ার গুটে অ্যালস্ ফন সেৎজুয়ানে'র বাঙলায় রূপান্তরণ নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম।

এর সাম্প্রতিক প্রয়োজক প্রখ্যাত 'চেতনা নাট্যগোষ্ঠী'। এবারকার রূপান্তর সুরারোপ ও প্রয়োগ অরুণ মুখোপাধ্যায় কৃত।

পৃথিবীতে এখন ভালোমানুষের বড় অভাব। যারা আছেন তাদের সবারই প্রায় মুখে মুখোস আঁটা। পৃথিবী রসাতলগামী। অথচ এই পাকি থেকে মর্ত্যলোককে উদ্ধার না করলে বোধকরি সৃষ্টিই বৃথা হয়ে যাবে এবং কালক্রমে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হবে। তাই স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্যাপারটার সরেজমিন তদন্ত এবং মানুষের এই অসৎ প্রবৃত্তির দিকে ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহের মূল কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনজন দেবতাকে মর্ত্যে পাঠালেন।

তাঁরা দেবতা হয়ে এলেও বস্তুত অসহায় অবস্থার মধ্যেই পড়লেন। হাঁটায় পথশ্রান্তি থাকবার স্থানাভাব এবং ক্ষুধায় কাতরতা যেন মর্ত্যবাসীর জীবনযাপনকেও হার মানায়। তাঁদের সঙ্গে প্রথমে দেখা হল একজন ভিস্তিওলার সঙ্গে। যার ব্যবসা টিনে করে পয়সার বিনিময়ে লোকের বাড়ি জল দেওয়া। দেবতারা ভাবল এই লোক যথার্থ অর্থে ভালোমানুষের প্রতীক। কিন্তু দেখা গেল সেও চতুর। সেই চতুরতা মানুষকে ফাঁকি দেবার।

তবু তার দৌলতেই দেবতারা রাত্রি যাপনের জন্য এমন একজনের আশ্রয় পেলেন যে জাতে বারবণিতা। তবু তার সেবা, যত্ন ও সারল্যে মুগ্ধ হয়ে দেবতারা তাকে আশীর্বাদ স্বরূপ এমন একটি জিনিস দিলেন যার বিনিময়ে মেয়েটি সৎ ভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখল।

সেই মূল্যবান দ্রব্যটির বিনিময়ে মেয়েটি তার দেহোপজীবীনীর ব্যবসা ছেড়ে একটা ফুলের দোকান করল। কিন্তু রাত পোহাতে না পোহাতেই দেখা গেল টের পেয়ে অর্দ্ধ চেনা, অচেনা দুঃস্থ, অভাব গ্রস্তের ভীড় শুরু হয়ে গেল তার ঠিকানায়। কালক্রমে দেখা গেল তাদের আধিপত্য আর আদিখ্যেতার ঠ্যালায় সে বিপর্যস্ত। শেষ পর্যন্ত সে সেই পরিবেশ থেকে নিজেকে কাটিয়ে তুলবার জন্য ছলনার আশ্রয় নিল। সে পুরুষের বেশ ধারণ করল। এবং পুরুষের ঋজুতা দিয়ে সেই সব অকর্মণ্য, স্বেচ্ছা-অলস, স্বার্থপর, সুবিধাবাদী মানুষকে শ্রমের বিনিময়ে জীবন ধারণের আওতায় টেনে আনল।

কিন্তু বাদ সাধল শেষ পর্যন্ত তার নারীত্ব। সৎ পরোপকারী, সরল নারী থাকার সময় সে একটি চতুর আত্মসুখ সর্বস্ব পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিশ্বাস করে তার কাছে (যে পরে কার্যকারণে তারই কারখানার ম্যানেজার পদে পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিল) ভালোবাসার অভিনয় বুঝতে না পেরে দেহদান করেছিল এবং মাতৃত্বের অধিকারী হয়েছিল। ফলে সেটাই তার কাল হোল।

শেষ পর্যন্ত একদিন সে তার স্বরূপে ফিরে এসে দেবতাদের কাছে তার বিচার চাইল।

এই আপাত ভালোমানুষদের স্রোতেই আজ পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ (অর্থাৎ সেই সব সুবিধাবাদীরা) গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে থেকে সত্যিকারের ভালোমানুষদের আলাদা করে চিহ্নিত করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

পৃথিবীর সব মানুষই সাধারণভাবে সৎ, ভালোমানুষ। পরিবেশ এবং শ্রম

বিমুখতাই তাদের জীবনে ভালোমানুষ হয়ে থাকার সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক, নাট্যকার হয়তো এই কথাটাই নাটকে বলতে চেয়েছেন। আমরাও বিশ্বাস করি পৃথিবীতে মানুষগুলি কম বেশী ভালো-মন্দ মিশিয়েই বিরাজমান। যতটুকু ব্যতিক্রম তা শুধু পরিবেশের জন্য। সেখানে আমরা স্বার্থের ক্রীড়নক বা ক্রীতদাস।

এরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আমরা ব্রেখটের নাটক 'ভালোমানুষের পালা'য়।

সমস্ত নাটকটিই রূপকের আঙ্গিকে (মানুষগুলি এবং পরিবেশ অবশ্যই বাস্তব ভিত্তিক) পরিবেশন করেছেন 'চেতনা' নাট্যগোষ্ঠী।

এই নাটকের যিনি মূল কেন্দ্র সেই প্রথম জীবনে বারবণিতা এবং পরে সৎ-ভাবে বেঁচে থাকার বাসনায় রূপান্তরিত চরিত্র নয়নতারার ভূমিকায় ছবি তালুকদার যতক্ষণ তিনি নারী থেকেছেন আবেগে সহৃদয়তায় ও সলাজতায় সত্যি ভাল অভিনয় করেছেন। কোন কোন দৃশ্যে অপূর্বও। কিন্তু সেই অনুপাতে পুরুষ চরিত্রের বলিষ্ঠতা বা আপাত কাঠিন্যভাব তাঁর অভিনয়ে ফুটে ওঠেনি। কণ্ঠস্বর পরিবর্তনও সতেজ নয়।

ভিস্তিওয়ালা হলধরের ভূমিকায় নির্মল চক্রবর্তী ও অনিল সেনের ভূমিকায় সমর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অনুপাতে ম্লান। বরং সেদিক থেকে বাবু-রূপী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বোনপোর ভূমিকায় পল্লব-কেতন চক্রবর্তী অপূর্ব।

রূপ মুখোপাধ্যায়ের বিরুম হালদার সহজ। অলোক দত্তর পুরোহিতও ভাল।

দেবতাদের রূপসজ্জায় নতুনত্ব আছে। অভিনয়ও মোটামুটি স্বাভাবিক।

এ নাটকে আর একজন অভিনেত্রীকে মাঝে মাঝে অতি অভিনয়ের ঝোঁক থাকলেও ভাল লেগেছে। তিনি উমা পিসি রূপী মঞ্জু ব্রহ্মচারী। অন্য দুটি মহিলা চরিত্রে কুমকুম দাস ও অনিতা দত্ত মোটা-মুটি স্বচ্ছন্দ।

'ভালো মানুষের পালা'র দৃশ্য

সেই অনুপাতে তাদের কাছাকাছির পুরুষ চরিত্রগুলি যেন সখের দারিদ্য নিয়ে অভিনয়ের বিলাস করছেন বলে মনে হয়েছে। ছুতোর (সমীর মুখোপাধ্যায়) অবশ্য ব্যতিক্রম ও অপূর্ব।

গানের সুরে অনেক প্রচলিত গানের ছোঁয়া থাকা সত্ত্বেও গানগুলি মোটামুটি সুগীত। গানের কথা আরো একটু সমৃদ্ধ করবার বোধহয় অবকাশ ছিল। হিমাংশু বিশ্বাসের আবহসংগীত এফেকটিভ।

তবে টোটাল টিমওয়ার্ক বলতে আমরা যা বুঝি, পরিচালকের সেদিকে আরো কিছুটা সতর্ক দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

কারণ 'চেতনা'র 'মারীচ সংবাদ' এবং 'স্পার্টাকাস' নাটক দুটিতে শুনেছি যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বচ্ছন্দ গতি থাকার দরুণ দর্শকদের সপ্রশংস বাহবা কুড়িয়েছে তার বোধহয় কিছু অভাব রয়ে গেছে এ নাটকে। এইদিকে দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়। কারণ ব্রেখটের এই নাটকেরই আর এক নাট্যরূপ (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত) বর্তমানে অন্য এক মঞ্চে নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে। তাই অনিবার্যভাবেই একটা তুলনামূলক সমালোচনা দর্শকদের মধ্যে হতেই পারে।

তবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং ত যোগ্যতার খাতিরও বোধ করি সবার কা স্বীকৃত। অতএব তাঁর কাছে ভালো না পাবো এটাই ধরে নেয়া যায়। তবু বল চেতনার ভালো মানুষের পালা ও সে তুলনায় উৎকৃষ্ট। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় নীহার ভট্টাচার্যের (মূল জার্মান থে অনুবাদ) সংলাপ ক্ষেত্রবিশেষে আমাদে বিস্মিত করেছে।

তাপস সেনের আলোক পরিকল্পনা ত সুনাম রেখেছে। সুবিমল রায়ের মঞ্চ পরি কল্পনায় নতুনত্ব আছে।

নাট্যসমালোচক

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে প্রণতি ভট্টাচার্য

প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী প্রণ ভট্টাচার্য ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৪৫ বৎসর। বাল্যশিক্ষা ঢাকার শ্রীনগরে। ১৪ বছরে শ্রীসুভাষচন্দ্র ঘোষের সংগে প্রথমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হন পরে বরিশাল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একমাত্র পুত্র শ্রীমান মুকুল ঘোষের বয়স যখন বছর দুই তখনই প্রথম রাধা ফিল্ম স্টুডিওর সংগে চুক্তিবদ্ধা হন এবং পরে স্বর্গতঃ বিমল রায় 'তথাপি' চিত্রের নায়িকারূপে নির্বাচন করেন। তথাপি স্বর্গতঃ রায় পরিচালনা করলেও পরিচালক হিসেবে মনোজ ভট্টাচার্যের নাম প্রচারিত হয়। তার পর থেকে ১৯৬৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৫ খানা ছবিতে প্রণতি দেবী অভিনয় করেন। এর মধ্যে হিন্দীও ছিল। সর্বশেষ ছবি 'পাড়ি'। বম্বেতে প্রণতি দেবীর প্রথম হিন্দী ছবি পরিচয়। সম্পদ হানাবাড়ী রাত্রির তপস্যা পাত্রী চাই কপালকুণ্ডলা বিষ-বৃক্ষ কবি চন্দ্রাবতী মালঞ্চ ফুলওয়ালী শুভলগ্ন মধ্য রাতের তারা ভোর হয়ে এলো —প্রণতি দেবী অভিনীত চিত্রগুলির মধ্যে

দীঘা চলুন

লাক্সারি কোচে যাতায়াত ৩০ টাকা

কোচে বসেই পাবেন ফ্রি-স্ন্যাক্স, দেশী-বিদেশী পত্রপত্রিকা ও গান।

যেদিন খুশি চলুন ● যেদিন খুশি ফিরুন

মেট্রোর উল্টোদিকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে রোজ সকালে বাস দীঘা যাচ্ছে।

সৈকতাবাস· টুরিস্ট লজ, ফ্ল্যাট কটেজ, চিপ ক্যান্টিন এবং হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

অফিস ক্লাব, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি গ্রুপের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

মেট্রো সিনেমার উল্টোদিকে ট্যাক্সি এ্যাসোসিয়েশন বুথে বুকিং হচ্ছে।

ট্যুরিস্ট সার্ভিসেস ইণ্ডিয়া

১০ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট (হাইকোর্টের পাশে) কলকাতা ১

যেতে পারে। প্রখ্যাত অভিনেতা ভট্টাচার্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিণয়-আকাঙ্ক্ষী হন। প্রায় ১০ বছর অভিনয়-র বাইরে ছিলেন। প্রণতি দেবী স্বীয় প্রতিভায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে-ন।

কিউরিও লেক (পোল্যান্ড)

গত ১০ ফেব্রুয়ারী কলকাতার পোলিশ কনসুলেট ভারতের পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের প্রতিযোগী বিভাগে প্রদর্শিত ১৭শ ছবি 'কিউরিও' লেকএর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন নিজস্ব সদনে।

মার্থা হায়ার সেকেণ্ডারী ক্লাশের ছাত্রী ও অন্যান্য সহপাঠীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওর মনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ব্যক্তিগত জীবনে সে সুখী নয়। ওর দুঃখে সমবেদনা জানাবার মতো কেউই নেই। কিছুদিন বছর আগে মার্থা বাবাকে হারিয়েছে। মাও আবার নতুন কার ঘরণী হতে চলেছে এমন একজনের, যাকে (মিশেল) মার্থা নিজের বলে ভাবতে পারে তারই বাবাকে ওর মা বিয়ে করছে। ওর মার এই আচমকা ভালবাসার বিয়েকে সুনজরে দেখতে পারছে না মার্থা। এর ফলে নিজেও সুখী হতে পারছে না—মার সুখী জীবন ওকে যেন আরো পীড়ন করছে। মিশেলকে ও মনে মনে ভালবাসে সেটা প্রকাশ করতে না পেরে সে তার এক বন্ধুর প্রতি সাময়িক-ভাবে আকৃষ্ট হয়। এর ফলে মার্থাকে ভুল বোঝে মিশেল। ও তখন স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যেন সে তার মা সৎ পিতা ও মিশেলকে শিক্ষা দিয়ে যায় সুখী জীবন কীভাবে গড়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে।

পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের ছবিতে এ-জাতীয় কাহিনী নতুন নয়। সেদিক থেকে কাহিনীটি গতানুগতিক ও দুর্বল। এমনকী হলিউডের ছবির প্রতি কাহিনীকারের আক-র্ষণও সহজে অনুমেয়। কিন্তু অভিনয় ও আঙ্গিকে কিউরিও লেক একটি বিশিষ্ট ছবি। মা ও মেয়ের চরিত্র চিত্রণে আঙ্গিকে ক্যামেরা প্ল্যানিং মন্তাজ এডিটিং কাটিং ও মিক্সিং-এ পরিচালক জনবাত্যেরী এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়েছেন।

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

রেখা এখন ধীরে ধীরে দেব আনন্দের মনে যাতে রেখাপাত করা যায়, তার চেষ্টায় আছেন। দেব সাহেব নায়িকা বদল করেন পোষাক বদলের মতন। মানে যখন তখন। এটা মোটেই ভাল লাগেনি জিনি বেবী আর জাহিদার। জিনি বেবী, জিনত আমন, দেব আনন্দের হরে রাম...ছবিতেই লাইম-লাইটে এসেছেন। এর জন্য তিনি গ্রেটফুল কৃতজ্ঞ। মাঝে মাঝে বলে থাকেন দেব সাহেব আমার ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। ইতিমধ্যে জিনিকে অনেক ছবিতে কাজ দিয়েছেন দেব। সেটাও কৃত-জ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে জিনি। তবুও কোথায় যেন একটা কিন্তু রয়ে গেছে। এত করেও লোকটা আজ ওঁর কাছে অপ্রিয় কেন। কেন সেটা বোঝা যাবে দেব সাহেবের পরবর্তী প্রোডাকশনে। আবার হেমা মালিনী এসেছেন। ছবির নাম : জানেমন। এ ছবিতেও স্থির ছিল জিনি বেবী নায়িকা হবেন। ইশক ইশক যেভাবে চিৎপটাং হল, তাই দেখে দেব সাহেব ঠিক সাহস পেলেন না। পরপর ছবিতে জিনি, অরুচি ধরে যেতে পারে নিজের এবং দর্শকদের—এইসব সাতপাঁচ ভেবে জিনি অকস্মাৎ বাদ। তার আগে জাহিদা বরবাদ। এই নায়িকাকে নিয়ে দেব খুব আশা করে-ছিলেন। অন্য কেউ জানতে পারেন নি, দেব সাহেব জানতে পেরেছিলেন জাহিদার মধ্যে বড় অভিনেত্রী হবার প্রবল সম্ভাবনা। কিন্তু দুখানি ছবিতে কাজ করার পর বিদায় নিলেন। স্বেচ্ছায়? মোটেই না। দেব সাহেবের বোধকরি জরুরৎ ফুরিয়ে গেল। এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা দুই নায়িকা রেখাকে দেখা হলেই উপদেশ দিচ্ছে। না ভুল দেব সাহেবের খপ্পরে পড়ো না ভুল করেও। তাহলে লাইফ হেল হয়ে যাবে। রেখা এসবে কান দিচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে দেবও বেশ ঝুঁকছেন রেখার দিকে। কি একটা ছবিতে বর্তমানে দেবের বিপরীত নায়িকা রেখা। শুটিংএর ফাঁকে ফাঁকে দেবের মেক-আপ রুমে রেখাকে তার আম্মাসহ দেখা যাচ্ছে। কবে রেখাকে একা দেখা যাবে এই প্রশ্ন অনেকেরই। প্রশ্নো-ত্তরের ধার ধারে না রেখা। সে জোর গলায় বলে : যার সঙ্গে খুশী ঢলাঢলি করে। যার মেক-আপ রুমে খুশী যাব। যাকে ভালো লাগে তার সঙ্গে প্রেম করব। ...কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড়ে নেই। রেখা এখন স্ট্রেট-কাট এ-রকম কথাবার্তা বলছে। আই মিন বুলি ছাড়ছে। এই বুলবুলির বুলি শোনার জন্য অবশ্য চামচার অভাব নেই।

কথায় কথায় যখন চামচাদের কথা উঠল তখন বলতেই হয় বম্বের এখন সবচেয়ে বড় চামচারা হাতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। নায়ক-নায়িকাদের থেকে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি কিছু কম নয়। তাঁরা দরকার হলে স্ক্রিপ্ট্ চেঞ্জ করাতে পারেন। নায়ক পরিবর্তন করাতে পারেন। নায়িকার রোল ছোট করে দিতে পারেন। এখন আবার ছবি প্রডিউস করার কাজে নেমেছেন এইসব হাতারা। শত্রুর সেক্রেটারী কাম ফ্রেন্ড ছবি করতে চলেছেন। অমিতাভ জয়ার সেক্রেটারী যুগ্মভাবে ছবি করেছেন অভিমান। আবার কর-ছেন ওদের নিয়ে। রাজেশের পূর্বতন সেক্রেটারী পরের ধনে পোদ্দারি করে ছবি করে ফেলেছেন। রাজেশের অনেক টাকা নিয়ে কেটে পড়ে এক ছবি নির্মাণ করেন। সেটা অবশ্য ধোপে টেঁকে নি। আগে একটু রেখেঢেকে হত। এখন তো বলে কয়ে নায়ক-নায়িকাদের নানাভাবে কায়দা করে তাদের সেক্রেটারী ওরফে হাতারা নিয়মিত ছবি করছেন।...

বম্বেতে কমেডিয়ানদের বাজারও খুব খারাপ।। এঁরাও বোধকরি একটা অভি-শপ্ত রাজ্যে বসবাস করছেন। জনিওয়াকার নামটি আজ বিস্মৃতপ্রায়। রাজেন্দ্রনাথ, ভগবান, মোহন চোটি, দিলীপ দত্ত, জনি হুইস্কির নামও কদাচিৎ শোনা যায়। মেহ-মুদও এই দলে পড়েছেন। একমাত্র আসা-রাণীর বাজারই রমরমে। এছাড়া কেষ্ট মুখার্জিও মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছেন। অত-এব তাবড় তাবড় কমেডিয়ানদের হাতে কাজ না থাকার ফলে অনেকে প্রযোজক হয়েছেন। মেহমুদ, পরিচালকও।

অভিজিৎ

প্যাট্রী, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোর্সেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
সম্পৎ সেরামিকস প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

আলোচনা

পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্স

সম্প্রতি কলামন্দিরে মণ্ডস্থ তিন দিন-ব্যাপী অনুষ্ঠানে (এর মধ্যে একটি সারা-রাত্রির অনুষ্ঠানও ছিলো) পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্সের উদ্যোক্তারা তাঁদের পরিবেশনার উচ্চমান বজায় রেখেছেন। সংঘ-সচিব শ্রীসতীন সেন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জানান যে উচ্চাংগ সংগীতকে সকল শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলবার সংকল্পে এঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছেন বলেই টিকিটের হার বৃদ্ধি করেননি।

কণ্ঠসংগীতের আসরের প্রধান তিন আকর্ষণের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন দিনের আকর্ষণ ছিলেন যথাক্রমে সুনন্দা পট্টনায়ক (গোয়ালিয়র ঘরানা); পণ্ডিত যশরাজ (মেওয়াতী ঘরানা) ও শরাফৎ খাঁ (আগ্রা ঘরানা)। আপনাপন গায়নশৈলীর বৈশিষ্ট্যে পরিবেশিত এঁদের অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মন ভরে দিয়েছে। সরস্বতীর মত কঠিন রাগকে সংবেদনশীল অন্তরের দাক্ষিণ্যে সুনন্দা এক নিমেষেই যেন সংগীত রসিকের অন্তরংগ মহলে পৌঁছে দিলেন। দাপট ও মাধুর্যের অপরূপ সম্মেলনে তুলনাবিহীন কণ্ঠ তানের বৈচিত্র্য ত্রি-সপ্তকের সুরক্রিয়তার সবার ওপর সুর ও শ্রুতির মায়াময় রেশ সারা প্রেক্ষা-গৃহকে যেন স্তব্ধ করে রেখেছিলো। তারাণার ত্রিবট ও পার্শী বোলের সংগে অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত লয়ের মুহূর্তেও সুরের শুদ্ধতা সেতার সরোদের ঝালাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ অনুরোধে শ্রীমতী পট্টনায়ক দুটি ভজন গেয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয় ভজনটি 'যোগী মত যা' যে গানের আবেদন ওংকারনাথের পর তিনিই অনাহত রেখেছেন এর প্রতিটি সম্মেলনে এ গান না গেয়ে তাঁর ছাড়ান নেই।

পণ্ডিত যশরাজের কণ্ঠের পরিসর সীমিত—তানের বহুধা বিস্তৃতিও হয়ত নেই। কিন্তু সুবিন্যস্ত পরিবেশনার শিল্প-কৃতিতে তাঁর গোরখ কল্যাণ খাম্বাজ বাহার ও আড়ানার প্রতিটি মুহূর্ত আমরা যেন আস্বাদ করেছি। আমীর খাঁর বিস্তারের ঢং বড়ে গোলাম আলি খাঁর তানশৈলীর সংগে মিলিত তাঁর নিজস্ব সংগীতভাবনা শ্রোতা-দের মনে একটা অনুপনের আবেদনের ছাপ রেখে যায়।

সরাফৎ হোসেন খাঁর প্রধান সম্পদ তাঁর কণ্ঠের ভরাট গাম্ভীর্য। এই গাম্ভীর্যের ছোঁয়াতেই জমে উঠেছিলো তাঁর রামকেলী। কড়ি মধ্যমের শ্রুতির ছোঁয়াও সুন্দর। তবে আলাপের সংগে মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি-মূলক একঘেঁয়েমো এসে যায়। তানের সংগে আগ্রা ঘরানার বৈশিষ্ট্য সযত্নে রক্ষিত।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে জয়ন্তী বাগচী অনেক আশ্বাস দিয়েছেন।

সকলমানের যন্ত্রীরাই তাঁদের আপনাপন মানে সু-প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিখিল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের আহির ভৈরবের আলাপ অনেক-দিন মনে থাকবে। বিলম্বিত ও দ্রুত গতে ধ্রুপদী ও কলাবন্তীর গাম্ভীর্য ও সূক্ষ্ম কারুকৃতির বৈচিত্রে ভাববিস্তারের বিভিন্ন পর্যায় খুবই চমকপ্রদ।

সরোদে সকলকে চমকে দিয়েছেন আশীষ খাঁ। মালকোষের আলাপে-দৃপ্ত স্বরবিন্যাস যেমন শুদ্ধ ও গম্ভীর তেমনই মধুর নট-ভৈরবের ধ্যান আকৃতি। ভাস্কর বসু সরোদে আর এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি।

মণিলাল নাগ তাঁর ক্রমপরিণত সুসংগীত ভাবনার সুস্পষ্ট ছাপ রেখেছেন পুরিয়া কল্যাণের আলাপ গত বিস্তার ও তানে।

বিরজু মহারাজ

বিমল মুখোপাধ্যায়ের সেতারে শোনা যে ইমন।

সারা সংগীত উৎসবে মুকুটমণির ম জ্বলজ্বল করেছে—বিরজু মহারাজের ক নৃত্য। বয়স তাঁর নৃত্যলাবণ্য ও ভ লালিত্যের ওপর এতটুকুও ছায়াপাত ক পারেনি। নৃত্যের গতি চাঞ্চল্য ভাবনায় বি চমক বিভোলতা এমন এক আশ্চর্য আ রচনা করে যা বিরজু মহারাজ মত শিল্প পক্ষেই সম্ভব। অবশ্য পণ্ডিত কিষ রাজের তবলা সংগত শিল্পীকে তাঁর ধর্মী নৃত্যে উদ্দীপ্ত করেছে।

সারেংগী ছিলো না কোনো অনুষ্ঠা সোহনলালের কুশলী হাতের হার্মোনিয়ম অভাবের অনেকটা ক্ষতিপূরণ ঘটিয়ে তবলা সংগতে ছিলেন কেরামৎ খাঁ সা শংকর ঘোষ, স্বপন চৌধুরী—সকলেই তাঁ নিজের জায়গায় সগৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন

কাজী অনিরুদ্ধ স্মরণে

হাওয়াই এবং কাজী অনিরুদ্ধ একাডেমি যুগ্ম উদ্যোগে গত ২২ ফেব্রুয়ারী সকাল রংগনায় কাজী অনিরুদ্ধর মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপিত হোলো। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুজিত নাথ। গান ও ভাষণ নিয়ে শিল্পীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সর্বশ্রী আংগুরবালা দেবী ভি বালসারা ডা অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় বিমান ঘোষ মুকুল দাস রজত নন্দী প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপ ঘোষ ও অভিজিৎ নাথ। কিশোর সেনের পরিচালনায় সমবেত গীটার বাদনে অং গ্রহণ করেন কাজী অনিরুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত হাওয়াই সংস্থার ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

চিত্রাংগদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

লক্ষ লক্ষ লোক আজ ব্যবহার করেন

লক্ষ লক্ষ লোক আজ
সাধনা দশন ব্যবহার করেন
কারণ অতি উৎকৃষ্ট
দাঁতের মাজন ব'লে
এর সুনাম ও জনপ্রিয়তা
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।
অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
সাধনা দশন বহুদিন ধরে
দেশের সর্বত্র প্রচুর সমাদর
লাভ করে আসছে।
সাধনা টুথ পেস্টও বহুগুণ-
বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও
উপকারী। যাঁরা পেস্ট পছন্দ
করেন তাঁদের অনুরোধেই
প্রস্তুত করা হয়েছে।

SD.5/70

সাধনা দশন

সাধনা টুথপেস্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন)
এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

শতবর্ষেরও বেশী সবার প্রিয়
নিপুণা গৃহিণীর চাই-ই চাই
কুকমী
গুঁড়ো
মশলা

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-০৯৯৫,
ফ্যাক্টরী—কাশীপুর

ADS/KCD-75

আর্ট-ওয়ার্কটি : এন. কে. প্রোডেস প্রাঃ কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

৪ এপ্রিল ১৯৭৫ ॥ মূল্য ৬৫ পয়সা

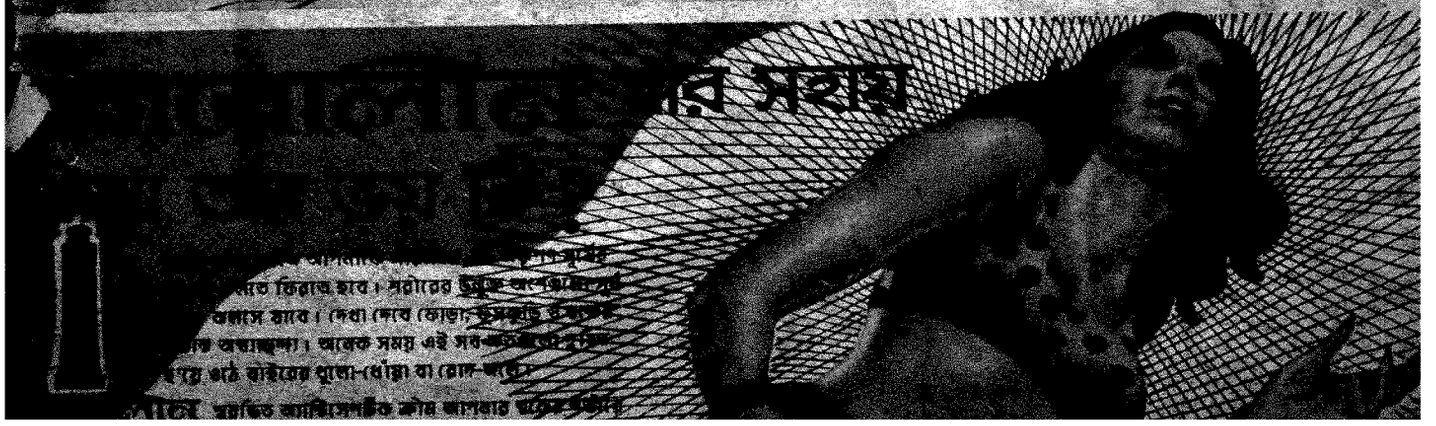

শুধুই কেশ তৈল নয় একটি কেশ রসায়ন

সাধনা আমলা

সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকীই ইহার প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্বতা রোধ ক'রে ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-৫

SA-2/69

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক উপন্যাস

থৈ থৈ হাহাকার ১৮৲

ভেঙে-পড়া নবাবী আমলের কোন এক সময়ে নিম্ন-বঙ্গের একটি গ্রাম থেকে পোর্তুগীজ জলদস্যুরা একটি বাঙালী ছেলেকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। কালক্রমে সেই বালক ক্রীতদাস-জীবনে ফরাসী রাজ-পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরবর্তীকালের ফরাসী-বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক-জীবনের সর্ববৃহৎ প্রয়াস, বহু ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ এই গ্রন্থে পাঠক-সমাজকে এমন এক অনাস্বাদিত সাহিত্য-সুধা পরিবেশন করেছেন—যা বাংলা সাহিত্যে এ যাবৎ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সুভাষ সমাজদারের অপূর্ব সাহিত্য-কীর্তি

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮৲

১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে গৌড়বঙ্গের এক রেশম ব্যবসায়ী ভিখু শেখ তিন জাহাজ বোঝাই মালদাই সিল্কের পসরা সাজিয়ে সুদূর রাশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল বাণিজ্যের আশায়। সেই দুঃসাহসী বাঙ্গালী যুবকের রোমাঞ্চকর বাণিজ্য-যাত্রার মধ্য দিয়ে লেখক সেই সময়কার ভারতীয় ও রুশ ব্যাপারীদের ব্যবসায়িক লেনদেন, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার—পরস্পরের মৈত্রী বন্ধনের কথা ও কাহিনী মূর্ত করে তুলেছেন। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর পটভূমিকায় এ-জাতীয় উপন্যাস কোন ভারতীয় ভাষায় আজও লিখিত হয়নি।

নারায়ণ সান্যালের সর্বাধুনিক গ্রন্থ

বিহঙ্গ বাসনা ১০৲

চিরঞ্জীব সেনের নতুন রহস্যোপন্যাস

মিরানজিয়া রহস্য ১০৲

শঙ্কু মহারাজের সার্থক ভ্রমণ কাহিনী

মধু-বৃন্দাবনে (তিন পর্বে সম্পূর্ণ)

ব্রজ পর্ব ১০৲ * বন পর্ব ১০৲ * মহাবন পর্ব ১২৲

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উপন্যাস

সুবর্ণশিরি ২০৲

শ্রীহংস-এর নতুন উপন্যাস

লাস্ট ওয়ার্ড ৮৲

গাইনিক ওয়ার্ড ৮৲

ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের

নৌবিদ্রোহের ইতিকথা ৮৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

আর এক সাজে ৬৲

নিগূঢ়ানন্দের

হৃদয়ে নাবিক ৮৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১২৲

নিখিলচন্দ্র সরকারের

দুঃখে সুখে বাঁচা ১২৲

পরিতোষ মজুমদারের

অগ্নিলতা ৫৲

আবদুল জব্বারের

জনপদজীবন ৮৲

দীপক চৌধুরীর

কুমারী কন্যা ৮৲

প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা কাশীকান্ত মৈত্রের শ্রেষ্ঠতম রচনা

রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি ২০৲

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

আর সব পাখা থেকে পাঁচ-দশ টাকা বেশী দিয়ে র‍্যালিফ্যান কিনেছে বলে গত বছর মুখুজ্জে মশায় অশোকের ওপর দারুণ চটে যান। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, র‍্যালিফ্যান বিনাঝামেলায় তাঁর ঘরের সবজায়গায় বেশ হাওয়া করে তখন পাড়াশুদ্ধ লোকের কাছে বলে বেড়াতে লাগলেন— র‍্যালিফ্যানের মত পাখা আর হয় না! ওপর তলার সেন মশায় তো র‍্যালিফ্যান কিনতে রাজী ছিলেন না — কারণ, র‍্যালিফ্যানের দামটা একটু বেশী। তবে এখন ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করার ঘরে সারারাত বিনা আওয়াজে র‍্যালিফ্যানকে হাওয়া করতে দেখে তিনি খুশী হয়ে বলেন, দু-চার পয়সা বেশী দিয়ে র‍্যালিফ্যান কিনলে লাভ বই লোকসান নেই। জালিটা দেখতে সুন্দর হলে আর রঙটা মানানসই হলে আমাদের আবদুল ভাই দামের কথা চিন্তাই করেন না। তাঁর বড় গর্ব যে, তাঁর র‍্যালিফ্যান আজও দেখতে সেই নতুনের মত, আর চলেও সেই নতুনের মত।

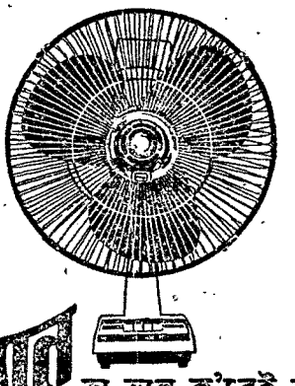

ভাল পাখা নিতে হলে
আপনি কোন পাখা নেবেন র‍্যালিফ্যান তা ভাল ক'রেই জানে।

U-RTF-23 BEN

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪৭ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 4th April, 1975 শুক্রবার ২১ চৈত্র, ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	স্বর্ণমৃগ	(গল্প)	শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
১৪	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৬	পটভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১৭	দেশেবিদেশে		শ্রীপুণ্ডরীক
১৮	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
২০	সমাজবিবর্তনের একটি অধ্যায়		শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
২৫	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
২৮	শুধু কবিতার জন্যে বেঁচে থাকা	(কবিতা)	শ্রীশান্তনু দাস
২৮	কবির স্বীকারোক্তি	(কবিতা)	শ্রীফণিভূষণ আচার্য
২৮	ক্লিওপেট্রার প্রতি	(কবিতা)	শ্রীমানস চক্রবর্তী

সদ্য প্রকাশিত আবদুল জব্বারের নতুন উপন্যাস

রাত পাখির ডাক ১২-০০

ব্যর্থতার নয়, জীবনোত্তরণের উপন্যাস। গঙ্গার মতো পবিত্র, জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ এবং বিভাময়—প্রেম-ভালবাসার এই অপূর্ব কাহিনী বিস্ময়-বিমুগ্ধ করবে।

সন্তোষ ঘোষের সাড়াজাগানো উপন্যাস

গুড্-বাই ক্যালিফোর্ণিয়া ২০-০০

চলচ্চিত্রে রূপায়িত কবিতা সিংহের আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস

চারজন রাগী যুবতী ৬-০০

ফণিভূষণ আচার্যের মনমাতানো উপন্যাস

জ্যোৎস্নায় বাঘবন্দী খেলা ৫-০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের অনন্যসাধারণ উপন্যাস

আসা যাওয়ার পথের ধারে ৫-০০

অমলেন্দু ঘোষ রচিত সাড়াজাগানো গ্রন্থ

মার্কসবাদই শেষ কথা নয় ৬-০০

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অসাধারণ ভ্রমণকাহিনী

হিমালয়ের তিন সঙ্গী ১২-০০

অমরনাথ রায়ের সেরাগল্পগ্রন্থ

রাশিয়ার ভালো ভালো গল্প ৩-০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস **দুজন একাকী** ৫·

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস **বনহরিণী** ৩·

পূর্ণ প্রকাশন ৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ ॥ ফোন: ৩৪-৯৫৯২

নববর্ষ সংখ্যা **প্রসাদ**

দুইটি উপন্যাস ...

নিমাই ভট্টাচার্য

প্রফুল্ল রায়

রহস্য উপন্যাস

শ্রীহর্ষ মল্লিক

দুইটি গল্প

শংকর

আশাপূর্ণা দেবী

সাড়া জাগানো

সম্পূর্ণ নভেলেট লিখছেন

প্রমর

নামের আড়ালে

সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন আগন্তুক

দুইটি রম্যরচনা

শিব্রাম চকরবরতি

বহুরূপী

বিশেষ রচনায়

কবিপত্নী মৃণালিনী

ধারাবাহিক রচনায়

কালকূট

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এ ছাড়া অন্যান্য সব বিভাগ

কলকাতা বোম্বের

রঙীন ছবি ও ছবির ফিচার

বেরুচ্ছে এপ্রিলের গোড়ায়

দাম সাড়ে চার টাকা

৪২ ইণ্ডিয়ান মীরর স্ট্রীট

কলকাতা ১৩

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

বাহির হইল!
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত ঐতিহাসিক
'ভারততত্ত্বভাস্কর'
আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের
বাংলা দেশের ইতিহাস
[আধুনিক যুগ]
॥ নূতন তথ্যসম্বলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ॥
পৃষ্ঠা সংখ্যা—৬৭৩ : আর্ট প্লেট—১৬ : দাম ৩৫ টাকা
প্রাচীন যুগ (৬ষ্ঠ সং)—১৫ টাকা : মধ্য যুগ (২য় সং)—২৫ টাকা
[জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]
জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২

রামানুজ সম্প্রদায়ের
॥ কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ ॥

স্বামী যতীন্দ্র রামানুজাচার্য অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সংকলিত

ভগবদ্‌রামানুজ বিরচিত
ব্রহ্মসূত্র শ্রীভাষ্যসহ
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ৬-৫০
২য় খণ্ড (১ম ও ২য় অধ্যায়) ১৫-০০
৩য় খণ্ড ২০-০০
গীতাভাষ্য ৭-৫০
বেদান্তসার ৬-০০
বেদার্থসংগ্রহ ৫-০০
নিত্যারাধন গ্রন্থ ১-৫০
গদাত্রয় ২-০০
শ্রীযামুনাচার্য বিরচিত
শ্রীমদ্‌গীতার্থসংগ্রহ ১-৫০
শ্রীআলবন্দার স্তোত্র ১-২৫
শ্রীলোকাচারী স্বামী ও
শ্রীবরবরমুনি কৃত বা ব্যাখ্যাত
শ্রীবচনভূষণ ৮-০০
শ্রীবচনভূষণসার ২-৫০
তত্ত্বত্রয় ৪-৫০
অর্থপঞ্চক ০-৩৭
উপদেশরত্নমালা ২-০০
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৫-০০
শ্রীঅণ্ডাল আড়বার বিরচিত ও
শ্রীকৃষ্ণপাদস্বামী ব্যাখ্যাত
শ্রীব্রত (তিরুপ্পাবৈ) ৩-০০
শ্রীশঠকোপ আড়বার বিরচিত
সহস্রগীতি (তিরুবায়মোড়ী) ১২-০০

শ্রীবিষ্ণু আড়বার বিরচিত
তিরুপ্পল্লাণ্ড ১-৫০
শ্রীপরাশর ভট্টর ব্যাখ্যাত
শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম ১-৭৫
শ্রীরঙ্গরামানুজমুনি ব্যাখ্যাত
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ভাষ্যম ২-৫০
শ্রীবলরামস্বামী বিরচিত
প্রতিমাগুণদর্পণ ০-৭৫
শ্রীরামজয়ন্ত্যাদি দিক্‌প্রদর্শন ০-৫০
শ্রীযতীন্দ্র রামানুজাচার্য বিরচিত
গুরুবর বলরাম (১ম খণ্ড) ১০-০০
(২য় খণ্ড) ৬-০০ (একত্রে) ১৫-০০
শ্রীবৈষ্ণব দর্শন ও ধর্ম (১ম) ৮, (২য়) ১০
বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ও
ইহার প্রাচীনতা ১-৫০
মানব-উজ্জীবন ২-৫০
আড়বার ২-২৫
তত্ত্ব ও তথ্য ৪-৫০
অন্তিম বার্তা ২-২৫

: অন্যান্য :
রামায়ণসার ৬-৫০
ব্রহ্মসূত্র ৪-০০
প্রপন্নপারিজাত ২-২৫

: নবপ্রকাশিত গ্রন্থ :
ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার সম্পাদিত
সহস্রশ্লোকী ভাগবত (১ম খণ্ড) ৩-০০
ঐ (২য় খণ্ড) ৪-০০

পোঃ বলরাম ধর্মসোপান খড়দহ (২৪ পরগণা) শ্রীবলরাম প্রকাশনী ১০১ বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬
(বিস্তারিত বিবরণ-তালিকার জন্য লিখুন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৯	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রীউপগুপ্ত
৩২	চিঠিপত্র		
৩৩	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে		শ্রীদিলীপকুমার রায়
৩৫	রান্না করে দেখুন		শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৩৭	রূপসীর খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী
৩৮	পুনশ্চ		শ্রীক্ষপণক
৩৯	শেষ বিচার	(উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪৩	বিজ্ঞানের কথা		শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৫	অথ আলমারী ঘটিত	(গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ পালিত
৪৮	গোয়েন্দা ধাঁধা		শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
৪৯	সেকালের সঙ্গীতগুণী		শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৫২	খেলাধুলো		শ্রীদর্শক
৫৪	জাতীয় অ্যাথলেটিক্স		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৬	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীঅময়
৫৭	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান		
৫৮	ফ্লোর থেকে বলছি		
৬০	ঢোলের রাজা ক্ষীরোদ নট		শ্রীকৃষ্ণ দেবনাথ
৬০	স্টুডিও সংবাদ		স্টুডিও সংবাদদাতা
৬২	বেলজিয়াম চলচ্চিত্র উৎসব		
৬৩	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা		শ্রীঅভিজিৎ
৬৫	রঞ্জনী আলোয়		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬৭	প্রেক্ষাগৃহ		শ্রীচিত্রদূত
৬৮	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৭০	নাটমঞ্চ		নাট্যসমালোচক
৭১	বাংলাদেশের ছবি		আনওয়ার আহমদ
৭২	জলসা		শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

কুমারেশ ঘোষের উপন্যাস :

কলকাতা কলকাতাই	৩·৫০
নীল ঢেউ সাদা ফেণা	৪·০০
সাগর নগর	৫·০০
জলযৌবনা	২·৫০
বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস	২·৫০

গ্রন্থগৃহ
৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

রামেন্দ্রসুন্দর
রচনাসমগ্র
৪ খন্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খন্ড ২০৲
গ্রাহকরা প্রতি খন্ড ১২৲ পাবেন।
প্রথম খন্ড ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হবে।
গ্রাহকভুক্তি ৬৲ টাকা। সীমিত সংখ্যক ছাপা হচ্ছে।
গ্রন্থমেলা,
এ ১২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

সম্পাদকীয়

এই যুবশক্তি

প্রতীচীর এক আধুনিক দার্শনিক বর্তমানকালের সমাজবিপ্লবের প্রধান ভূমিকায় স্থান দিয়েছেন ছাত্র ও যুবশক্তিকে। তাঁরই ভাষ্য অনুযায়ী এই স্টুডেন্ট পাওয়ার বা ইয়ুথ পাওয়ার অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীশক্তিকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবে এবং সামাজিক পরিবর্তন সাধনে এদেরই দায়িত্ব হবে সর্বাধিক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ষাটের দশকের শেষে প্যারিসে ছাত্রশক্তি বিদ্রোহ করে সমস্ত কাজকর্ম অচল করে দেবার চেষ্টা করেছিল। ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল ইয়োরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অতলান্তিকের ওপারে আমেরিকায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সমাজ বিপ্লব তারা আনতে পারেনি। কেননা শুধুমাত্র উদ্দেশ্যহীন বিক্ষোভ দ্বারা কোনো বিপ্লব সাধিত হয় না। দ্বিতীয় শুধুমাত্র ছাত্র বা যুবস্বার্থের ভিত্তিতে বৃহত্তর সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হবার নজির নেই। তবে ছাত্র বা যুবকদের শক্তি নিশ্চিতই উপেক্ষণীয় নয়। আগামীকালের সমাজ তারাই গড়ে তুলবে এবং তাদের জন্যই আজকের সমাজকে পরিবর্তনের চেষ্টা। ভারতবর্ষে এই ছাত্রশক্তির জাগরণ দেখা গিয়েছিল গত বৎসর গুজরাটে বিধানসভা বিরোধী আন্দোলনের সময়। তাকেই অনুসরণ করে গড়ে ওঠে বিহারের আন্দোলন যাতে ছাত্র ও যুবশক্তির একটা বৃহৎ ও গণনীয় ভূমিকা আছে।

সম্প্রতি আমাদের এই রাজ্যে ছাত্র ও যুবদের কার্যকলাপ দেখে মনে নিরাশাই জাগে। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে এই যুবশক্তি একদিন জাগ্রত হয়ে পশ্চিম-বাংলায় একটা স্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে সহায়তা করেছিল। আশা হয়েছিল এদের দ্বারাই রাজ্যের বহুবিধ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। কিন্তু তারা সে আশা পূর্ণ করার কি কোনো সুযোগ দিচ্ছে? ছাত্র সংগঠনগুলো গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জর্জরিত। যুবশক্তি অনৈক্যে বিদীর্ণ। এমতাবস্থায় কাদের কাছে গেলে দেশবাসীর প্রত্যাশা পূর্ণ হবে? সম্প্রতি কলকাতা শহরে এই বিভ্রান্ত যুবশক্তির দ্বারা দুটি ঘটনা ঘটেছে যা বিচার করলেই বোঝা যাবে, কেন দেশবাসী তাদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ছেন। একটি ঘটনায় সমস্ত রাস্তা অবরোধ করে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। নাগরিকদের দুর্দশার আর সীমা ছিল না। সাধারণ মানুষ, স্কুলের ছাত্রছাত্রী অফিসযাত্রী, হাস-পাতালের রোগী কিংবা ডাক্তার সকলেই এই পথ অবরোধের শিকার। কোনো একজনকে যদি ভুল করেও গ্রেপ্তার করে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার পথ কি শহরের যানচলাচল বন্ধ করে দেওয়া? অবরোধ বা সত্যাগ্রহ এত বড় একটা অস্ত্র যে তাকে যখন তখন ব্যবহার করলে তার কোনো ধার থাকে না। দুঃখের বিষয় এই যে, এই অবরোধকারীরা শাসক দলেরই অনুগামী। কিন্তু অনুগামীদের যদি নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ন্ত্রণে রাখা না যায় তাহলে সেই উচ্ছৃংখল শক্তি নিজেদেরই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জনসাধারণের অশেষ দুর্ভোগ ছাড়াও এ ধরনের আচরণের দ্বারা সমাজের ভিতরে অশুভ শক্তিকেই উস্কানি দেওয়া হয় যারা সুযোগ পেলেই আইন তুলে নেয় নিজের হাতে এবং যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো অছিলায় গুণ্ডামি করতে উদ্যত। যুবশক্তির মধ্যে এই প্রবণতা নিয়মশৃংখলাকে দিচ্ছে জলাঞ্জলি এবং সমাজের অগ্রগতিকে করছে ব্যাহত।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাও এই ছাত্র ও যুবশক্তির ভিতরকার দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ। দুঃখের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথের বাসভবনে এবং তাঁরই নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা গুণ্ডামি মারামারি করতে একটু দ্বিধা করল না। কেন এই উৎপাত এবং এই ব্যাধির উৎস কোথায় তা অবশ্যই খুঁজে বার করতে হবে। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই আজ কোনো না কোনো কারণে অশান্তি নিত্যই লেগে আছে। ছাত্রদের পড়াশোনা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। পরীক্ষা গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রহসনে পরিণত। এ নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে, বহু পরামর্শ ও সুপারিশও পেশ করা হয়েছে শিক্ষাবিদদের তরফ থেকে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলো ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির বাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদের ক্ষোভের কারণও প্রত্যাশিত। এই রাজ্যে সাড়ে ষোল লাখ বেকারের মধ্যে শিক্ষিত বেকার সাড়ে সাত লাখ। সুতরাং ওদের সামনে খুব রঙীন ভবিষ্যতের চিত্র আমরা তুলে ধরতে পারিনি। তা ছাড়া নেতারা রাজনীতিতে এই ছাত্র ও যুবদের নিয়োগ করছেন বড়রাই। আজ তারা যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে থাকে তাহলে সে দোষ তাদের একার নয়। ভারতবর্ষের মানুষের অনেক আশা ছিল তার যুবশক্তির ওপর। নিষ্কলুষ ও নিঃস্বার্থ যুবশক্তি ইচ্ছা করলে সমাজের অনেক আবর্জনা দূর করতে পারে। কিন্তু আমরা কি যুবশক্তিকে তা থাকতে দিচ্ছি? তাহলে আশাই বা করব কোন মুখে?

ট্যাকসিটা ছেড়ে চলে গেল. সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতেই টের পেলেন হৈমবতী। আর কেউ রইল না বাড়িতে। মানে কোন ছেলেমেয়ে রইল না। অবশ্য হ্যাঁ, একটি ছেলে আছে, সুনীল আছে। কিন্তু সুনীলের থাকাটাকে—এবাড়ির কোন ছেলে থাকা হিসেবে কেউ গণ্য করে না। এমন কি তার মা স্বয়ং হৈমবতীও তাকে হিসেবে ধরতে ভুলে যান এক এক সময়। ও আছে, মানে ও তো থাকবেই। বুঝুন, জন্মাবধি অসুস্থ; লেখাপড়া শেখেনি; স্নায়ুর দোষ আছে, টেনে টেনে কথা বলে—দু একজন ছাড়া ওর সব কথা বুঝতে পারে না লোকে; উপার্জন করে খাবার শক্তি নেই; চিরদিনই ও—মানে সেই ষোল সতেরো বছর বয়স থেকেই—দিনরাতের বেশির ভাগ সময় ওর বাবার আপিসঘরে বসে থাকে চুপ করে—আজও তাই বসে আছে।

স্বর্ণমৃগ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ওর অস্তিত্বকেই কেউ কোনদিন হিসেবের মধ্যে ধরে না। আজই বা ধরবে কেন? চাকরবাকররাও ওর কথা ভুলে যায় এক একদিন। শুধু পুরনো ঠাকুর বনমালী মনে করে রাখে, সে-ই হুঁশ করে খেতে দেয় দুবেলা। চা জলখাবারও দেয়। সে না দিলে বোধহয় অর্ধেকদিন খাওয়াই হত না বেচারীর। মারই মনে থাকে না যার কথা—তার কথা অপরে খেয়াল করবে সর্বদা, এতটা আশা করা যায় না। আর, ও যা ছেলে, খাওয়া হয়নি—এ কথাটাও কোনদিন নিজে থেকে বলবে না, অমনি চুপ করে বসে থেকে থেকে এক সময় ওর সিঁড়ির পাশের স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে গিয়ে ঝুপ করে শুয়ে পড়বে। তাই কি সে বিছানাটার দিকেও কেউ নজর দেয়? অনেক সময় একমাস দেড়মাসই হয়ত—চাদর ওয়াড় বদলানো হয় না। সাধারণভাবে নিত্য ঝাড়াঝুড়ি তো হয়ই না। সেটাও—বনমালীরই মনে পড়লে কিংবা চোখে পড়লে যখন খুব বকাবকি করে তখন হয়ত

হৈমবতীরও হুঁশ হয়, ঢাকরকে ডেকে ধমকান, বলেন পালটে দিতে। বনমালীর বড় ছেলে আগুনে পুড়ে মারা গিছল দেশে, তারই ঠিক ন' মাস পরে নাকি এই ছেলে জন্মেছে। বনমালীর ধারণা সেই ছেলেই এসেছে এখানে—বনমালীর কাছাকাছি থাকবে বলে।

এখন এ বাড়িতে থাকার মধ্যে রইল বনমালী, পুরনো চাকর গিরিধারী আর একটা ঠিকে ঝি। কেউ না থাকলে সে এসে গিন্নিমার ঘরে মেঝেয় শোয়, তার জন্যে দৈনিক চার আনা অতিরিক্ত দিতে হয় তাকে। আজও তাকেই খবর দিতে হবে। নইলে রাতবিরেতে মুশকিল বাধবে! বাতের শরীর—এক এক সময় কব্জা আটকে যাবার মতো হাত পা ধরে যায়।

ঝি চাকর ছাড়া ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজন—আর কেউ রইল না। অথচ অশৌচ এখনও কাটেনি। আরও দুদিন বাকি আছে! ঘাটকামানো, শ্রাদ্ধ সবই পড়ে রয়েছে; করতেও হবে যেমন করেই হোক, তাকেই করতে হবে। করবেনও, নিয়মমতো যেটুকু করবার। পুরুতকে খবর দিয়েছেন, তাকেই টাকা ধরে দেবেন, যা-যা দরকার সেই নিয়ে আসবে বাজার-হাটও। সুনীলকে দিয়েই করাবেন। ব্রাহ্মণ ভোজনটাও পুরুতবাড়িই টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করবেন। ছেলেরাও করবে অবশ্য—বলেই গেল বড় ছেলে শুদ্ধোদন—তার পাটনার বাড়িতে সবাই মিলে। শুদ্ধ হবে। কিন্তু হৈমবতীর সঙ্গে সে সবের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

হাসি পায় হৈমবতীর। অদৃষ্টের পরিহাস বুঝি একেই বলে। মরে হেজে গিয়েও সাত ছেলে তাঁর, চার মেয়ে। ছেলেরা সকলেই অল্পবিস্তর কৃতী। বড় ছেলেই বেশি সম্পন্ন, চাকরি এবং ব্যবসা দুইই করে পাটনায়—তা হলেও বাকি কেউই দরিদ্র কি অক্ষম নয়। মেয়েরাও মোটামুটি ভাল ঘরেই পড়েছে। সবাই এসেছিল এই খবর পেয়ে। তিনটি ছেলে জেজ সলিল, ন সরল ছোট শুভাশিস—এরা তো এখানেই থাকত, এই বাড়িতেই—সরল আর শুভাশিস বিয়ে করেনি, সলিল তো স্ত্রীপুত্র নিয়েই থাকত। কাল অবধিও ছিল। —বাবা মরণাপন্ন খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল। না বাবার প্রতি অত্যধিক টানে নয়—এখন যা দেখাচ্ছে—কেন এসেছিল তা হৈমবতী জানেন। ওদের বাবা রূপকথার যক্ষ ওদের কাছে, পুরাণের কুবের; রহস্য আর অনুমানে গড়া। বাবার টানে এসে এমন ভাবে সবাই চলে যেত না অন্তত, বাবা যেখানে মরেছেন শ্রাদ্ধটা সেখানেই করে যেত।

সবাই একে একে চলে গেল, তাঁকে গঞ্জনা ধিক্কার দিয়ে। 'পতিঘাতিনী' আকারে ইঙ্গিতে একথাও বলতে দ্বিধা করেনি তারা। শুধু ঐ সুনীল অক্ষম অর্ধনর, যার অস্তিত্ব তার মায়েরও মনে থাকে না সব সময়, যাকে সন্তানদের তালিকায় গণনা করে না কেউ, সেই রইল। তার অন্য জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয় বলেই। কিম্বা অন্য ছেলেদের যা বক্তব্য তা তার মাথায় ঢোকে না বলে।

দোষ? অবশ্যই তাঁর।

অন্তত তা-ই বলবে লোকে। তাঁকেই দোষ দেবে, হৈমবতীকে।

কিন্তু কেন? কেন তিনি চিরদিন এমন ভাবে সকলের কাছে মাথা নুইয়ে নিজের সব ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে পরের মতে গা ভাসিয়ে চলবেন? কেন তাঁর দুর্বল ভাগ্যের সুযোগ নেবে সকলে; তাঁর মাথায় পা দিয়ে নিজেদের দিন কিনে নেবে? কেন তিনি এত অবিচার সহ্য করবেন?

এতকাল তো করে এসেছেন, এখন মরবার সময়ও কি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন না? জীবনের এই শেষ প্রান্তে এসেও!

ভাগ্য। ভাগ্যই সবচেয়ে বেশি অবিচার করেছে, প্রতারণা করেছে তাঁর সঙ্গে। বাবা বলতেন সৌভাগ্য—হৈমবতী জানেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছেন গরিবের ঘরে অসামান্য রূপ নিয়ে জন্মানোর মতো দুর্ভাগ্য আর নেই। এই রূপের জন্যেই উনিশ বছরের, স্নেহময়—তখনও বি-এ পড়ছেন উনি—দেখে পাগল হয়ে বিয়ের প্রস্তাব করে লোক পাঠিয়েছিলেন। ওঁর বাবাও হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়ে-

আগামী সংখ্যায় গল্প লিখবেন মহাশ্বেতা দেবী

ছিলেন। স্নেহময় বাপের এক ছেলে, মা নেই—আর কেউ নেই সংসারে—অগাধ ঐশ্বর্য—কাশীতে তিনখানা বাড়ি, কলকাতার বেলেঘাটা-নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে খানচারেক, কলিয়ারী ব্যাঙ্কে লাখকতক টাকা, এঁদের স্বপ্ন কল্পনার রাজপুত্র ছাড়া কি? ছেলে রূপবান না হলেও সুদর্শন, সবচেয়ে বড় কথা, বড়লোকের একমাত্র ছেলে হওয়া সত্ত্বেও সচ্চরিত্র।

হৈমবতীর বাবা দ্বিধা করবেন না সে তো জানা কথাই, হৈমরও তখন আনন্দই হয়েছিল। স্নেহময়ের বি-এ পরীক্ষা শেষ হবার পরই মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেল। সে সমারোহতেও খুশী হয়েছিলেন হৈমবতী এ তো তাঁদের ঘরে আশাতীত শুধু নয়—কল্পনারও অতীত। এর সিকি কেন এক দশমাংশও খরচ করার মতো অবস্থা নয় তাঁদের। বাবা অবিনাশবাবুর থাকার মধ্যে ছিল তিলডেঙ্গেশ্বরে একখানি একহারা তিনতলা বাড়ি, য়্যাংলো বেঙ্গলী ইস্কুলে রাইশ টাকা মাইনের চাকরি—আর দু এক ঘর যজমান। পুজো বিয়ে শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে কিছু কিছু কাপড়চোপড় চাল-ডাল আসত তাতে—এই পর্যন্ত। সেখান থেকে লাকসার দামী দামী আসবাবে সাজানো অত বড় বাড়িতে এসেই মনে হয়েছিল রাজপ্রাসাদে এলেন, সত্যি সত্যিই রাজরাণী হলেন তিনি।

বিয়ের পরও অতটা বুঝতে পারেন নি। পরে বুঝলেন।

স্নেহময় বি-এ পাসটা করেছিলেন কোনমতে, তারপর আর কিছুই করলেন না। না চাকরি না উপার্জনের অন্য কোন চেষ্টা। বাবা মরার পর সব সম্পত্তি হাতে পেয়ে দালাল মারফৎ শেয়ার মার্কেটে ফাটকা খেলেছিলেন কিছুদিন লাখ তিন চার টাকা লোকসান দিয়ে সেটা বন্ধ করেন। তারপর আর কিছুই করেন নি। কিছু ভাল শেয়ার পুরো টাকা দিয়ে কিনে রেখেছিলেন, তার ডিভিডেন্ড, কোম্পানীর কাগজ আর ব্যাঙ্কের সুদ, আর বাড়ি ভাড়া—এতেই চলে যেত। কলিয়ারীর আয় আগে হত বাবা মধ্যে মধ্যে যেতেন, গিয়ে দু চার মাস থাকতেন, টাকা আদায় করে আনতেন—তাঁর মৃত্যুর পর আর কিছু পাওয়া যায় নি, দেদার চুরি করেছে সবাই। দু চার বছর দেখে সেটাও বেচে নিশ্চিন্ত হলেন স্নেহময়। জলের দামেই বেচলেন, বলতে গেলে এখন সে কলিয়ারী থেকে বছরে লাখ টাকা আয় হচ্ছে নাকি—তবু স্নেহময় একবার দুদিনের জন্যেও যেতে রাজী হলেন না।

আসলে বাড়ি ছেড়ে নড়তেই চাইতেন না। বিয়ের পর আট বছর কাশীর বাইরে পা দেন নি। শেষে হৈমবতী জোর করে ব্যবস্থা করতে, তিনি একাই চলে যাবেন নইলে ভয় দেখাতে—কলকাতা এসেছিলেন। সেই ভাবেই একবার পুরী আর দার্জিলিঙ গেছেন। তারপর এই যে বছর কুড়ি আগে কলকাতা এসেছেন—আর বিশেষ কোথাও যান নি, এ বাড়ি থেকে বার হন নি। ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে যা বেরিয়েছিলেন তা গুনে দেখলে ত্রিশ দিনের বেশি হবে না বোধ হয়।

শুধু শুয়ে থেকেছেন, ভাল ভাল খাবার খেয়েছেন আর স্ত্রীকে সম্ভোগ করেছেন। এতেই শরীর নষ্ট হয়েছে ইদানীং কিছুই হজম হত না প্রায়। শেষ পর্যন্ত উদ্বুরীতে দাঁড়িয়ে গেল। তবু কখনও পাঁচ মিনিটের জন্যেও একটু হাঁটতে রাজি হন নি। শেষ আট বছর দোতলা থেকে একতলাতেই নামেন নি। এই নিউ আলিপুরের জমি হৈমর শ্বশুর সত্যবাবু খুব অবহেলাভরেই কিনে ছিলেন এক সময়। তখন হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স জমি ডেভেলপমেন্টের ব্যবসা শুরু করেছে—নলিনী সরকারের অনুরোধে অনিচ্ছাতেই কিনেছিলেন—কিছু টাকা পড়ে থাকলেও ক্ষতি হবে না এই বোধে—ফেলা থাক, না হয় কিছু লোকসান দিয়েই বেচবেন পরে।

এ জমির অস্তিত্বও স্নেহময় জানতেন না। হৈমই প্রথম আবিষ্কার করেন। তারপর তাঁর ক্রমাগত উৎপীড়ন বাক্যযন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে কাশীর দুটো বাড়ি বেচে, হৈমর এক ভদ্রলোক কনট্রাকটর তাকে বাড়ি করার ভার দিয়েছিলেন। সে ভদ্রলোক মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা চুরি করে বাড়িটা করে দিয়েছিলেন তাই হয়েছে, নইলে স্নেহময় কোন-দিনই উদ্যোগ করে শেষ করাতে পারতেন না।

সে চুরির জন্যে হৈমর মনে কোন ক্ষোভ নেই। আজ এ বাড়ির যা দাম দাঁড়িয়েছে—তাতে অমন বহু পাঁচ হাজার টাকা উশুল হয়ে যাবে। এ বাড়ির হৈমই মালিক, একেশ্বরী। বছর আষ্টেক আগে একরকম জোর করেই স্বামীকে দিয়ে দানপত্র লিখিয়ে নিয়ে কর্পোরেশনে নিজের নামে খারিজ করিয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু স্নেহময়ের এ পরিশ্রমবিমুখতা কেন? এই স্বেচ্ছাবন্দী দশা?

এ কি শুধুই আলস্য? শুধু আরামপ্রিয়তা?

না স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি পত্নীপ্রেম?

তাই এক মুহূর্তও তাঁকে চোখের আড়াল করতে মন চাইত না। করেন নি কখনও? তাই কুড়ি বছরে আঠারোটি সন্তান গর্ভে ধরতে হয়েছে তাঁকে। জরায়ু কেটে বাদ দেবার প্রয়োজন হয়েছিল তাই—নইলে বোধহয় তখনও অব্যাহতি পেতেন না।

না, তিনি জানেন—প্রেম এর কারণ নয়। আর যেদিন থেকে জেনেছেন সেদিন থেকেই স্বামীতে, এইসব সন্তানে এই ঐশ্বর্যে—অপরিমিত ঘৃণা তাঁর। ঘৃণা—তার সঙ্গে মনের অবচেতনে একটা ক্রূর প্রতিশোধ-স্পৃহা। সে স্পৃহা একই সঙ্গে দাবানলের মতো জ্বলে ওঠেনি, নিমেষে বাঘিনী করে তোলেনি—একটু একটু করে পিশাচীতে পরিণত করেছেন বিকচোন্মুখ কৈশোরের যে কোমল নির্মল মন নিয়ে এসেছিলেন গৃহস্থ ঘরের একটি সাধারণ মেয়ের মন—কৌতূহলে বিস্ময়ে, কল্পনায়-দেখা-আসন্ন-প্রণয়লীলার স্বপ্নমাধুর্যে ভরা—যা সংসার বাঁধার ও স্বামী সেবার আগ্রহে অধীর—তাকে একটু একটু করে দানবীয় মনে পরিণত করেছেন স্নেহময়।

আসলে অসামান্য রূপসী এই স্ত্রী সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার আশঙ্কার অবধি ছিল না। কি যেন বলে তাঁর বড় ছেলে, কথাটা খুব ব্যবহার করে—ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স—হীনমন্যতা—মানেটা জানেন না আন্দাজে আন্দাজে বুঝতে পারেন—স্নেহময়েরও এ অকারণ আশঙ্কার মূলে বোধহয় সেই মনোভাবই ছিল।

—হারাবার ভয়, হাত ছাড়া হবার ভয়।

না, ভুল ধারণা না তাঁর। কুটিল সংশয়টা দেখা দেবার পর একটু একটু করে বাজিয়ে দেখেছেন স্বামীকে নানা আলোচনায় তাঁর মনের কালিমাটা টেনে বার করার চেষ্টা করেছেন। আশঙ্কাটা ব্যাধির মতো পেয়ে বসেছিল স্নেহময়কে, তাই এক মুহূর্তও চোখ ছাড়া করতে চাইতেন না, একমাসও অবসর দিতেন না একটি গর্ভ ধারণ থেকে আর একটির মধ্যে। প্রথম দিকে কিছু বন্ধু-বান্ধব আসত বাড়িতে নিজেরাই আসত গরজ করে, তারপর বিরক্ত হয়েই আসা বন্ধ করেছে—তারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বই কিনে দিয়েছে, কেউ কেউ প্রয়োজনীয় আসবাবও রেখে গেছে বিছানার পাশে। সেসব বই পড়েওছেন স্নেহময়, কিন্তু কাজে লাগান নি, মুখ বিকৃত করে বলেছেন, ও আমার ভাল লাগে না।'

হয়ত ভেবেছিলেন এই ভাবে পর পর সন্তান হতে থাকলে দশ-বারোটির পরই বুড়ি হয়ে যাবেন হৈমবতী, অকাল বার্ধক্যে তাঁর রূপের দীপ্ত লোপ পাবে, আর কারও কামনার কারণ থাকবে না! কিন্তু স্বাস্থ্যবতী হৈমার লাবণ্য তাতেও ক্ষুণ্ণ হয়নি, দেহের বাঁধন থেকেছে অটুট—আর তার ফলে স্নেহময়ের উদ্বেগও কমে নি। সে উদ্বেগের মূল্য যোগাতে হয়েছে হৈমকেই—আরও আরও সন্তান গর্ভে ধারণ করে।

সেই প্রায়ান্ধকার খালি ঘরে সহসাই হেসে ওঠেন হৈমবতী, বেশ সরবেই।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই যেন চমকে ওঠেন সে হাসির শব্দে।

এ কার হাসি? কোন প্রেতিনীর? তিনিই হাসলেন নাকি এই রকম শব্দ করে?

হ্যাঁ তিনিই। আর তো কেউ নেই এখানে।

এ হাসির কারণ একটা আছে বৈ-কি। বিজয় গর্বেরই হাসি বুঝি এটা।

সে-ই প্রথম প্রতিশোধ নেওয়া তাঁর—স্বামীর ওপর।

যেদিন থেকে বুঝলেন, নিঃসংশয়ে জানলেন কেন তাঁকে এই ক্রমাগত সন্তান-বহন করতে হচ্ছে গর্ভে সেই দিন থেকেই

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের নৃ-তত্ত্বমূলক ভ্রমণ সাহিত্য

দন্ডকারণ্যের অন্ধকারে (রোমাঞ্চপর্বী) ১০৲

দিবজেন্দ্রলালের প্রহসন ৮৲

শ্রীসনৎকুমার মিত্রের

পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি বিচিত্রা ১০৲

আশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস

হারানো খাতা ১২৲

শিকলি কাটা পাখি ৫৲

চিরঞ্জীব সেনের

হাইজ্যাক ৮৲ পারিজাত রহস্য ৬৲

কৃশাণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিশিরে রক্তের ফোঁটা ৭৲

শক্তিপদ রাজগুরুর নতুন উপন্যাস

কয়লার রং কালো ৮৲

মাটির পুতুল ৬৲ পথের পানে চেয়ে ৫৲ তমসা ৬৲ মুক্ত ত্রিবেণী ৫৲

সদ্য প্রকাশিত বেদুইনের

বিচিত্র এই কলকাতা ৯৲

আমায় বাঁচতে দাও ৮৲ বিক্ষোভ বিদ্রোহ বিপ্লব ৮৲ মোজাম্বিক ৬৲

রাজনীতির পটভূমি ৮৲ কলকাতার ইতিকথা ৬৲ নর্তকীর আত্মকথা ৮৲

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় নবতম গ্রন্থ

শৈলেশ দের

যেন ভুলে না যাই ৮৲

বিনয়-বাদল-দীনেশ ৫৲ ক্ষমা নেই ৪৲ রক্তের অক্ষরে ৯৲

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

তিনি যেন একটা দিকদাহকারী রোষে পাগল হয়ে উঠলেন, এক সময় পাগলের মতোই কাজ করে বসলেন একটা। যে সতীধর্ম বংশ পরম্পরায় তাঁর অস্থিতে মজ্জাতে রক্তে মিশে রয়েছে—তার প্রভাব এড়ানো সু-কঠিন, কিন্তু পাগল বলেই তিনি সেটাও করতে পারলেন অনায়াসেই।

সুনীল বনমালীর সন্তান। বনমালীও ব্রাহ্মণ, সুপুরুষ—তখন সু-পুরুষই ছিল—কিন্তু ঈশ্বর জানেন সে জন্যে মনে কোন লালসা জাগে নি। একান্ত নিষ্কাম হয়েই কাজটা করেছিলেন—হিসেব মেলাবার মতো করে। তাঁর মতো রূপবতীর (তখনও তাঁর রূপের মোহিনী শক্তি অটুট) একটা সামান্য পাচককে মোহগ্রস্থ করতে একদিনও লাগে নি। ওর নিজেকে প্রবোধ দিতে বরং অনেক সময় প্রয়োজন হয়েছিল। সেই দুঃসহ মানসিক দ্বন্দ্বের ফলেই সম্ভবত অবিরাম সেই অন্তর্জ্বালার জন্যেই সুনীল রুগ্ন, দুর্বল, অপুষ্ট মস্তিষ্ক জড়বুদ্ধি হয়ে জন্মেছে।

তবে তাঁর যতই কষ্ট হোক, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। স্নেহময় বুঝতেও পারেন নি সুনীল তাঁর সন্তান নয়।

অবশ্য সেটা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি স্নেহময়ের জ্ঞান থাকতে থাকতেই,—নইলে শোধটা পুরো হয় না—মৃত্যুর এই ক'দিন আগে ঘরে কেন ওপর তলাতেও কেউ নেই দেখে, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের কথা। মেয়ে-ছেলে ব্যভিচার করবে মনে করলে তাকে কেউ আটকাতে পারে না। সিন্দুকে তালা দিয়ে রাখলেও না, ক্রমাগত তাকে গর্ভধারণ-দশদিশায় আবদ্ধ রাখলেও না। আরও অনেকবার এ কাজ করতে পারতেন তিনি—সে কথাও বলেছেন। মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো দেওর বা ভাইয়েরা অনেকেই মাঝে মধ্যে এসেছে, দু-একদিন থেকে গেছে। তারা প্রায় সকলেই লোলুপ উৎসুক ছিল তার সম্বন্ধে—কিন্তু হৈমবতীর সে প্রবৃত্তি ছিল না। সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম, স্বভাব-অসতী নন তিনি, শুধু দুঃসহ অবিচারের চরম প্রতিশোধ তুলতেই তিনি এ কাজ করেছেন। বাড়ির চাকর কি মেথর হলে শোধটা আরও ভাল উঠত, তবে অত নিচে নামতে পারেন নি।...আর এতে একটা উপকারও হয়েছে, ঐ ছেলেটার টানে বনমালী এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে না কোন দিনই, পাচক-সমস্যার দায় থেকে নিশ্চিন্ত।

কথাটা সজ্ঞানেই শুনে গেছেন স্নেহময়। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই হৈমবতীর। বৃথাই এতকাল সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর স্বামীর সঙ্গে বাস করেন নি তিনি, চল্লিশটা বছরের প্রতিদিন প্রতিরাত। একদিনও কাছ ছাড়া হতে পারেন নি। বাবা মা মরবার সময়ও ছুটি পাননি। তিনি গেলে স্নেহময়ও সঙ্গে যাবে জানতেন বলে—ঘৃণায় তিনিও যান নি।

সে-ই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিছলেন স্নেহময়। আর একটি কথাও বলেন নি কারও সঙ্গে; কারও কথার উত্তর দেন নি। খানও নি আর কিছু। খাওয়ার অবস্থাও বিশেষ ছিল না। শেষের দিকে মকরধ্বজ মধু দিয়ে মেড়ে জিভে লাগাতে গেলে মুখ সরিয়ে নিয়েছেন, দু চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে।

প্রতিশোধ বা কলহ একতরফা হলে আশা মেটে না। অন্য তরফ থেকে জবাব না পেলে মনের উত্তাপ বরং বেড়েই যায়।

হৈমবতীরও গিয়েছিল।

তিনি সত্যি সত্যিই যেন পাগল হয়ে গিছলেন পিশাচীতে পরিণত হয়েছিলেন। স্বামীকে এই শেষ অবস্থায় এত বড় আঘাত দিয়েও তৃপ্তি পান নি। স্নেহময় কষ্ট প্রকাশ করতে পারলে, ছটফট করলে, রূঢ় কথা বললে—শান্তি হত তাঁর, প্রতিহিংসায় সাধ মিটত।

শেষের দিকে ছেলেরা বড় ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিল; বাড়ির ডাক্তার বলেছিলেন নার্সিং হোমে পাঠাতে। হৈমবতী রাজী হননি। বামনগাছিতে কে সিদ্ধ তান্ত্রিক আছেন তাঁকেই ডেকেছিলেন, প্রসাদীফুল চরণামৃত তাবিজ কবচ এইসব শুরু হয়েছিল। অবশ্য কম খরচেই। ঠাকুরমশাইকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন তিনি, বেশী দোহন করার চেষ্টা করলে কোন ফল হবে না। যা রয়-সয় তাই যেন করেন। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, ঠাকুরমশাই হৈমবতীকে চিনেছিলেন, বহুদর্শী তন্ত্র-ব্যবসায়ী হয়ত মনের চেহারাটাও দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর—সেই মতোই বলেছেন। এই তান্ত্রিকের দোহাই দিয়েই বড় ডাক্তার ডাকা বা নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব ঠেকিয়ে ছিলেন। যা করবার ঠাকুরমশাই করবেন। ও'র শরণ নেওয়া হয়েছে, পূর্ণ বিশ্বাস রাখা দরকার। এখন ডাক্তার হাসপাতালের ব্যবস্থা মানে ও'র প্রতি অনাস্থা দেখানো। তাতে উনি অসন্তুষ্ট হবেন। বিশেষ তিন দিন তিন রাত্রি

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা; নিউ দিল্লী
IK 318/75 BEN

উপবাসী থেকে মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ করছেন, তার ফলটা নষ্ট করা ঠিক নয়।

আর, নার্সিং হোম বা হাসপাতালে নিয়ে গেলেই যে সেরে উঠবেন উনি এমন নিশ্চয়তা কি দিতে পারে কেউ—এই শেষ অবস্থায়?

তা যখন পারে না, তখন খামোকা আর কেন ব্যস্ত হওয়া? ওর চেষ্টার ওপর বিশ্বাস আছে, সেই ব্যবস্থাই ধরে থাকতে চান উনি।

এর ওপর আর কথা বলবে কে?

শেষ দুদিন অসহ্য কষ্ট পেয়েছেন স্নেহময়, শ্বাস কষ্ট। ছেলেরা ছুটে গিয়ে অক্সিজেন এনেছে হৈমবতী ব্যবহার করতে দেননি। কঠিন ও শক্ত হয়ে উঠেছেন। বলেছেন, মার চেয়ে ব্যথিনী তারে বলে ডাইনী। গেলে আমারই যাবে, আর কারও কোন ক্ষতি হবে না। বিয়াল্লিশ বছর ঘর করেছি, এর প্রতিটি দিন—দিন-রাত একসঙ্গে কাটিয়েছি—আমার স্বামী, তার ভাল-মন্দ আমি বুঝি না তোরা বুঝিস?...কষ্ট হচ্ছে ঠাকুরমশাইকে ফোন কর, যা করবার তিনি করবেন।'

তারপর, একটু থেমে আবার বলেছেন, কতকটা আপন মনেই যেন ওসব অস্বাভাবিক জিনিস উনি কোন কালে দেখতে পারতেন না, এখন কথা কইতে পারছেন না বলেই জোর করে চাপাব—তাতে আমি রাজী নই।'

ছেলেরা কেউ কেউ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কড়া কথা বলেছে, উনি গ্রাহ্য করেননি। যে-দুটি ছেলে বেশী বাড়াবাড়ি করতে গিছল, বড় আর সেজ—তাদের আর স্নেহময়ের ঘরে ঢুকতে দেননি। বলেছেন, 'তোমরা ওঁর সামনে অশান্তির সৃষ্টি করছ। এই শেষ সময়টা শান্তিতে থাকতে দাও ওঁকে।'

তারা মনে করতে গেছে—এই শেষ সময়টা ছেলেদেরও কিছু কর্তব্য আছে। হিন্দু ব্রাহ্মণের বংশ, ভগবানের নাম শোনানো, গীতা শোনানো, মুখে গঙ্গাজল দেওয়া এসব ছেলেদের কাজ। বিশেষ বড় ছেলের থাকা দরকার।'

হৈমবতী জবাব দিয়েছেন, 'শেষ সময়টা ঠিক কখন—কী করে বুঝছি? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। মাঝখান থেকে যদিবা বাঁচত, কানের কাছে নাম শোনাতে শুরু করলে—তবে বুঝি মরে যাচ্ছি ভেবে আঁৎকে হার্ট ফেল করবে। এতকাল যা করেছে—পাপই করুক আর পুণ্যই করুক, তারই ফলভোগ করবে। মরার কালে দুবার হরিনাম শোনালেই যদি স্বগগে যেত মানুষ তাহলে আর ভাবনা ছিল না। জ্যান্তে কখনও ভগবানকে ডাকেনি যে, বাড়িতে পুজো-আচ্ছা করতে দেয়নি, মন্তর নেয়নি, তাকে মরবার সময় বিরক্ত না করাই ভাল।'

তারা ঘরে ঢুকতে পারেনি। পারবে না তিনি জানতেন। এত সাহস কারও হবে না যে জোর করে তাঁকে ঠেলে ঢুকবে।

ওঁকে দীক্ষা নিতে দেননি স্নেহময়—সেও সবাই জানে। কাজেই ওঁর যুক্তির কাছে চুপ করেই যেতে হল।

বাইরে থেকেই শ্বাসের শব্দ শুনে বড় ছেলে ছুটে গিয়ে সেই ঠাকুরমশাইকে ফোন করেছে 'বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন বাবা।'

ঠাকুরমশাই উত্তর দিয়েছেন, 'সন্ধ্যের মধ্যেই কমে যাবে, ভয় নেই।'

সন্ধ্যের মধ্যেই কমে গেছে। একেবারেই কমে গেছে।

তখন উনি দরজা ছেড়েছেন। ছেলেদের বলেছেন, 'যা করবার করো এখন। আমার দায়িত্ব শেষ।'

মরার সময় উনিও কাছে ছিলেন না। সে-সময়টায় মুখে জল দিতে ভগবানের নাম শোনাবার বৃথা চেষ্টা করতে মন চায়নি। যা-অবস্থা জল দিতে গেলে হয়ত নিশ্বাস আটকে যাবে। ভগবানের নামও কানে পৌঁছবে না। ও আদিখ্যেতায় আর কাজ নেই।

আসলে সেই কষ্ট, সেই মুখ বিকৃতি—উনিও সহ্য করতে পারছিলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ বুজে দরজার কাছে বসেছিলেন, স্বামীর দিকে পিছন ফিরে।

শেষ সময় যে ছেলেদের কাছে যেতে দেননি, তার কারণ ছিল। তিনি জানতেন, ওরা কেন বাবাকে ঘিরে থাকতে চায়; ওঁকে বাদ দিয়ে। ছেলেমেয়ে সবাই। একই প্রশ্ন সকলের মনে, একই উৎকণ্ঠা।

সেই কুবেরের ঐশ্বর্য। অন্তত সেই রকমই তাদের বিশ্বাস। যার খবর শুধু তাদের বাবাই রাখতেন; কখনও কোন ছেলে-মেয়েকে জানতে দেননি—তার হিসেব, তার অবস্থা ও অবস্থান। কারও সঙ্গে কোনদিন আলোচনা করেননি। কোথায় কীভাবে আছে, কতটা—সেইটে তাদের জানা দরকার। কোন উইল আছে কিনা, কোন ভাগ করে দিয়ে গেছেন কিনা।

স্নেহময় মরার সময় চেষ্টা করেছেন কথাটা বলতে, কথাবার্তা বন্ধ হবার আগেই চেষ্টা করেছেন। হয়ত যে-ছেলেরা অপেক্ষাকৃত কম উপার্জন করে, তাদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট করে দিতে চেয়েছেন। স্ত্রীর অসাক্ষাতেই বলতে চেয়েছেন। স্ত্রীর রুক্ষ নির্মম মনের চেহারাটা নজরে পড়েছে তাঁর অনেকদিনই। সেটা হৈমবতীরও বুঝতে দেরি হয়নি। সেই কারণেই সে-সুযোগ তিনি দেননি।

কেন?

ছেলেদের ওপর বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা?

বাপের অপরাধে ছেলেদের শাস্তি দিতে চেয়েছেন?

না, বাপের ঐ সামান্য শাস্তিটুকুও হরণ করতে চেয়েছেন, শেষ ইচ্ছায় বাধা দিয়ে?...

কে জানে। তিনি নিজেই জানেন না, কেন এই জেদ চেপেছিল তখন মাথায়। তখন কেন, তার পরেও।

প্রকাশিত হয়েছে

কথা সরিৎসাগর আশাপূর্ণা দেবীর
নবতম উপন্যাস

হে ঈশ্বর,
তোমার যবনিকা

১০·০০

লেখিকার অন্য দুটি উপন্যাস

ভালবাসার মুখ ৫·০০ তরঙ্গহীন ৫·০০

সাহিত্য সংস্থা, ১৮ সি টেমার লেন, কলিকাতা — ৭০০০০৯

শ্মশান থেকে ফিরে এসেই বলতে গেলে—সেই প্রশ্ন তারা করেছে, যা বাবাকে করতে পারেনি, তাঁর জীবদ্দশায়।

কোথায় কী আছে, কে কী পরিমাণ পাবে, তার জন্যে কী করণীয় এখন—উকিল এ্যাটর্নী ব্যাঙ্ক—কোথায় জানানো দরকার, বাবার কাজের জন্যে নগদ কতটা পাওয়া যাবে মায়ের কাছে—ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই মোটা তথ্যগুলো জানতে চেয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠেছেন হৈমবতী।

এক রকমের নিরানন্দ ঠাণ্ডা হাসি হেসেছেন।

বিনা উত্তরে উঠে গিয়ে বার করে দিয়েছেন, কাগজপত্র যা ছিল।

ছেলেরা সেগুলো উল্টে দেখে হতবাক হয়ে গেছে।

টাকাকড়ি কিছুই নেই আর, উল্লেখযোগ্য কোন অঙ্ক।

সেই অপরিমিত টাকা—তারা যার স্বপ্ন দেখেছে দীর্ঘকাল—তার আর কোন অস্তিত্বই নেই।

শেয়ার বাবা সব বিক্রী করে দিয়েছেন নগদ টাকায়। কোম্পানীর কাগজও। ব্যাঙ্কের আমানত স্ত্রীর নামে করে দিয়েছেন। কারেন্ট এ্যাকাউন্ট যন্তু ন্যমে আছে। সে বেশী কিছু নয়। এখনও যে-কখানা বাড়ি আছে, তা উইল করে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে দিয়ে গেছেন।

ওদের পাবার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

'এত টাকার ওঁর কী দরকার পড়ল। সব তুললেনই বা কেন?...সে-টাকা কী হল? কোথায় রেখেছ—?' অতিকষ্টে এক-জন প্রশ্ন করল।

'সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাদের কাছে দিতে বাধ্য নই বাবা। চিরদিন এ-সংসার আমিই চালিয়েছি। কোথা থেকে কি আসছে, এত খরচ কে চালাচ্ছে, কৈ, কোন-দিন তো খবর নাওনি।'

'সে বাবার সংসার, বাবা চালাচ্ছেন জানতুম। তার মধ্যে নাক গলাতে যাবো কেন?' উত্তপ্ত শুদ্ধোদন উত্তর দিয়েছে।

'কথাটা যে কত বড় মিথ্যে তা তোমরা সবাই জানো। তোমাদের বাবা মধ্যে মধ্যে দরকার মতো দু'-একটা সই করেছেন শুধু—আমি যখন বলেছি, যেখানে করতে বলেছি। তাও শুয়ে শুয়েই করেছে। শেষে একটা বছর তো বাথরুমে পর্যন্ত যেতে পারেননি। তিনি সংসার চালিয়েছেন। কোনকালেই তিনি চালাননি। বাবা যতদিন ছিলেন, তোমাদের ঠাকুর্দা তিনিই চালিয়ে-ছেন। তারপর টাকাকড়ির হিসেবটা উনি রেখেছিলেন কিছুদিন, পরে তাও পারেননি। সংসারে কোথা দিয়ে কি হচ্ছে, রাঁধুনী চাকর-ঝি—বাজার রেশন ধোপা গয়লা—কোন খবরই জানতেন না। নেনও নি কোন-দিন। শুধু খাবার ফরমাসটা করতেন মধ্যে মধ্যে যখন যা খেতে ইচ্ছে করত। তোমাদের স্কুল-কলেজের খরচ, কাপড় জামা বিছানা, গাড়ি ভাড়া, বিয়ে-পৈতে এসব কে করেছে টাকা বার করেছে জানো না, দ্যাখোনি?'

'তাহলে এখন কী বলতে চাও?' প্রশ্ন করেছে ছেলেরা।

'কিছুই বলতে চাই না। খরচ আমি যা দরকার বুঝে করব, যতদিন পারব। দরকার বুঝলে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করব। তোমরা যে যা দিয়েছ তা যে খরচের তুলনায় কিছুই নয়—সে আশা করি তোমরাও মানবে। এখন টাকার হিসেব চাইতে লজ্জা করছে না?

কথায় কথা বেড়ে গেছে।

মেয়েরা এক সময় বলেছে 'ভাইয়েরা তো তোমার সংসারে না হয় খেয়ে উশুল করেছে, আমরা তো কিছুই পাইনি।'

হৈমবতী বলেছেন, 'দুদিন অপেক্ষা করো, আমি মলে ভাগ নিও ওদের কাছ থেকে। আর তোমাদের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে মাসকল, বিশ হাজারের কমে কেউ বিদেয় হওনি। কুড়ি বছর আগের বিশ হাজার—এখনকার ষাট হাজার, তাই না?'

শেষে, ছেলেমেয়েদের মুখোশ খসে পড়তে তিনিও মুখোশ খুলেছেন। বলে-ছেন, 'এক পয়সার হিসেব কি কৈফিয়ৎ আমি দোব না। তিনি ছেলেদের চিনেছিলেন বলেই সব বেচে-কিনে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। টাকা আমার আমি যা-খুশি করব। বুঝি তেমন কোনদিন, তোমাদের জানিয়ে যাবো কি দিয়ে যাবো। মানে যদি সদ্ভাবে চলো। নইলে কিছুই কোনদিন পাবে না। বাড়ি আমার, টাকা আমার—যা ভাল বুঝব করব। আমার তাঁবে থাকা ন পোষায়—দরজা খোলা আছে, পথ দেখতে পারো।'

তারপর বিচিত্র দৃষ্টিতে সামনের দেওয়ালটার দিকে চেয়ে বলেছেন 'এই টাকার লোভেই বাবা আমাকে একটা অমানুষের হাতে দিয়েছিলেন, সে-টাকা ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করতে পারিনি। স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারিনি। কেনা বাঁদীর মতো জীবন কাটিয়েছি—তারও অধম। সারাজীবনই তো গেল একভাবে—কিন্তু আর নয়। এ-টাকাটা যে আমার যার জন্যে নিজেকে বিক্রী করেছি সেটা হাতে পেয়েছি—সেটা কিছুদিন অন্তত বুঝতে চাই। তোমাদের প্রত্যেককে মানুষ করে দিয়েছি, দাঁড়াতে পেরেছ, আমার কর্তব্য শেষ—টাকায় লোভ থাকে রোজগার করে নাও। আর যদি কেউ বোঝ ঠিক নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার মতো হওনি—এসে থাকো, ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না, বাড়ি-ভাড়া লাগবে না, এমনকি বাড়ির কোন ঝঞ্ঝাটও পোয়াতে হবে না। তবে তার বেশী চেয়ো না।'

সে বন্দোবস্তে রাজী হয়নি কেউ। নিজেদের বঞ্চিত নয়—প্রবঞ্চিত বোধ করেছে। সে-প্রবঞ্চনা কে করেছে তার সঙ্গে কী সম্পর্ক, কেউ ভেবে দেখেনি। পথই দেখেছে তারা। একে একে সবাই চলে গেছে এবাড়ি থেকে। রাগ করে তাঁকে গালাগালি দিয়ে, অভিসম্পাত করে—ভয় দেখিয়ে, শাসিয়ে।

তিনি মা মানুষ করেছেন, এতদিন সর্বতোভাবে তাদের কল্যাণ দেখেছেন, তারা যে মানুষ হয়েছে, বিড়ি পাকিয়ে কি মোট বয়ে জীবিকার্জন করতে হয়নি—সেও তাঁরই জন্যে। ওদের বাবা কিছুই করেননি, করতেন না তাতেও তিনি বিচলিত হতেন না—আর কেউ করবার না থাকলে উচ্ছন্নয় যেত—সে-কথা যদি তারা ভুলতে পারে, মা-ছেলের সম্পর্কের থেকে যদি টাকাই বড় হয়—তাহলে তিনিই বা ওদের ওপর ভরসা করে টাকা হাতছাড়া করবেন কেন?...অনেক দেখেছেন তিনি জীবনভর, অনেক মা-বাবাকেই দেখেছেন—ছেলেদের হাতে সব তুলে দিয়ে ভিখিরীর জীবন-যাপন করছে লাঞ্ছনার ভাত খাচ্ছে। সে-পথে যেতে উনি রাজী নন। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্তমান ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য যৌবন পরমায়ুর অধিকাংশর বদলে আজ পেয়েছেন ক'টা টাকা—সেটাও ছেড়ে দেবেন? না, এত সহজে নয়।

দিন শেষ হয়ে গেছে কখন, অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, টের পাননি হৈমবতী।

প্যাম্পী, ক্যান ক্যান, মে ফ্লুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অপ্রণ স্টোরেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
সম্পৎ সেরাগিকস প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

আপনার পরিবারের সবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য
হাওড়া সমবায়িকা

চাকর এসে আলোটা জেবলে দিতে চমক ভাঙ্গল। দেখলেন ঠিক সেই একভাবে একখানা শূন্য ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। সেজ ছেলের ঘর এটা। সব নিয়ে চলে গেছে কেবল খাটটা নিতে পারেনি, মানুষের কঙ্কালের মতো ব্যাটম বার করে পড়ে আছে।...

আবারও হেসে উঠলেন একবার। তেমনি আগের মতো, হা-হা করে।

আবারও শিউরে উঠলেন সে-হাসির শব্দে। এ কি হাসি।

বিদ্রূপের হাসি হাসতে চেয়েছেন? কঠিন বিদ্রূপ। কিন্তু এ-বিদ্রূপ কাকে করছেন তিনি? নিজেকেই করছেন না তো?

শোধ উঠেছে, জীবনের দাম বুঝে পেয়েছেন, এবার তো পরিতৃপ্ত হবার কথা।

কিন্তু—

প্রবল একটা 'কিন্তু' কেন মনের মধ্যে এমনভাবে মাথা তুলছে বার বার?

কেন সন্দেহ দেখা দিচ্ছে সজ্ঞান মনের প্রবল বাধা সত্ত্বেও যে কিছুই শোধ হল না, জীবনের কোন পাওনাই পাননি কোনদিন, আজও পেলেন না। বরং যেটুকু পেতে পারতেন, সেটুকুও হারালেন। সেই লোকটাই জিতল শেষ পর্যন্ত নিঃশেষে তার জীবনরস শুষে নিয়ে চলে গেল।

তাঁকে আবারও ঠকিয়ে গেল সে, খানিকটা মূল্যহীন সম্পদ দিয়ে, ভুলিয়ে রেখে চলে গেল, বাকী জীবনটা যাতে মরুভূমি হয়ে থাকে—তারই ব্যবস্থা করে গেল।

এ-টাকা নিয়ে কী করবেন তিনি কী কাজে আসবে আর?

সম্ভোগ? আর কোন দিকেই তো কিছু ভোগের উপায় নেই।। যৌবন, স্বাস্থ্য, অবস্থা—কোনোটাই নেই। বিধবা বিগতযৌবনা আর কি ভোগ করতে পারে?

টাকাটা এখন একমাত্র যা কাজে আসতে পারে, তা হচ্ছে ওর লোভ দেখিয়ে কতকগুলো লোককে পায়ের নিচে রাখা। ছেলেরা যদি ঐ টাকার মুখ চেয়ে তাঁকে খোসামোদ করে চলত তবুও কিছু স্বাদ পেতেন জীবনে, শান্তির স্বাদ। কিন্তু ওরা চলে গেল; সেটুকুও পেলেন না, পাবেনও না। উনিই তাদের মানুষ করে দিয়েছেন, ওঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দরকার হবে না।

তবে কী করবেন তিনি ও-টাকা নিয়ে, কী ক্ষতি পূরণ হবে তাঁর?

এ-উত্তরটা কোনদিনই হয়ত পাবেন না, বাকী সারা জীবনে।

শুধু পরিতাপ। নিরুপায় ক্ষোভ, ব্যর্থ বিদ্বেষে জ্বলে মরবেন এর পর থেকে—যতদিন বাঁচবেন। চোখের জলই সার হবে—যে অবাধ্য চোখের জল এখনই ধারায় ধারায় গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

১লা বৈশাখ বেরোবে

অজাতশত্রু **নীল ডুংরি** কুড়ি টাকা

সুনীল চৌধুরী **হিমালয়ের মানুষ** দশ টাকা

সদ্য প্রকাশিত

মাটি আর নেই — প্রফুল্ল রায় ॥ ১২·০০

দেওবনের দিগন্তে (২য় মুঃ) — সুনীল চৌধুরী ॥ ১০·০০

জানু ভানু কৃশানু (২য় মুঃ) — কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৫·০০

ঝলসানো বরাভয় — শেখর সেনগুপ্ত ॥ ৯·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি দশ টাকা

সনাক্তকরণ — প্রলয় সেন ॥ ৯·০০

দেহপট — হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৭·০০

কে ডাকে আমায় — তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ॥ ৭·০০

হায়নার হাসি — কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১১·০০

কপিল চৌধুরী **বাতাসে বিষ** সাত টাকা

না নিষাদ — সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৮·০০

নীল সায়রে — তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ॥ ৭·০০

রক্তাক্ত খাইবার (২য় মুঃ) — কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১২·০০

আলাপ থেকে প্রলাপ — বাসুদেব বসু ॥ ৫·০০

নিশাচর **আরক্ত রাত্রি** ছয় টাকা

এক বিন্দু সুখ (২য় মুঃ) — প্রফুল্ল রায় ॥ ৭·৫০

সঙ্গী তিনজন — অজাতশত্রু ॥ ৯·০০

চরকাশেম — অমরেন্দ্র ঘোষ ॥ ৬·০০

তখন হেমন্তকাল — অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬·০০

হৃদয় জ্বালা — জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ ৫·০০

মাকিনী ষড়যন্ত্র — চিরঞ্জীব সেন ॥ ৬·০০

মোহনা — বিমল কর ॥ ৪·৫০

বিস্ময়কর বহুরূপী — বীরু চট্টোপাধ্যায় ॥ ৮·০০

সাহিত্য প্রকাশ ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

এই বাংলার খবর

মুক্ত ফুটপাতের জন্য

বুধবার ১৯ মার্চ সকালে কলকাতার হগ সাহেবের বাজারের সামনে নাগরিকেরা দেখতে পান এক অভিনব দৃশ্য। কলকাতা পৌরসভার প্রশাসক শিবপ্রসাদ সম্মাদ্দার লিণ্ডসে স্ট্রিটের ওপর সত্যাগ্রহ করছেন। তাঁর দু পাশে পৌরসভার আরো কয়েকজন হোমরাচোমরা অফিসার। তাঁদের এই সত্যাগ্রহ এক হিসেবে পুলিশেরই বিরুদ্ধে। কারণ পুলিশ একটি স্টলের মালিককে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ঐ বাজারের সামনে ফুটপাথের দখল দিতে চায়। সাধারণ পৌরকর্মীরা পুলিশকে বাধা দিতে গেলে বচসার সূত্রপাত। তারপর ঘটনাস্থলে শিবপ্রসাদ-বাবুর আবির্ভাব। তাঁর অভিযোগ, আসার পথে পুলিশের কাছে তিনি বাধা পান। তারপর সহকর্মীদের নিয়ে তিনি বেআইনীভাবে ফুটপাথ দখলের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। পৌর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ঐ স্টলটি অস্থায়ীভাবে বসাবার জন্যে স্টলের মালিককে (প্রাক্তন সৈনিক, বিকলাঙ্গ) অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুমতির তারিখ পার হয়ে গেছে। এখন পুলিশের সাহায্যে এইভাবে ফুটপাথ জবরদখল রুখতে চান পৌরকর্তারা। ঘণ্টা চারেক এই রকম সত্যাগ্রহের পর লালবাজার থেকে পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনার এসে পৌঁছলেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর শিবপ্রসাদবাবু রাস্তা ছেড়ে চলে যান। ইতিমধ্যে রাস্তা অবরোধের কারণ দেখিয়ে ঐ অস্থায়ী স্টলটিকে পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যায়।

শিবপ্রসাদবাবুর এই নাটকীয় ধর্ণার ফলে কলকাতার ফুটপাথ বেদখলের সমস্যার দিকে সকলের নতুন করে দৃষ্টি পড়ে। পর দিনই পূর্তমন্ত্রী ভোলানাথ সেন ও পৌরমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় পৌরসভা পুলিশ এবং সি এম ডি এ-র কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। ঐ বৈঠকে ঠিক হয়, ফুটপাথকে মুক্ত করার জন্যে নতুন করে ব্যবস্থা শুরু হবে অবিলম্বে। কলকাতাকে বাঁচানোর জন্যেই এটা করা দরকার। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর দিনই পুলিশ মধ্য কলকাতার কয়েকটি বিশেষ এলাকায় ঢোল পিটিয়ে হকারদের হটে যাবার নোটিশ দিতে শুরু করে। ভোলানাথবাবু এবং সুব্রতবাবুর মতে, হকারদের জন্য বিকল্প কাজের পুরো ব্যবস্থা করে তবেই হকার উচ্ছেদ করা হবে, এটা সম্ভব নয়। কারণ, কিছু লোকের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা করার পর আরো নতুন লোক এসে পড়ে।

নতুন পৌর কর

কলকাতা পৌরসভার ১৯৭৫-৭৬ সালের যে বাজেট পৌর প্রশাসক পেশ করেছেন তাতে ঘাটতির অনুমিত অঙ্ক চার কোটি ৩৪ লাখ টাকার ওপর। আয় ২১ কোটি ৮৯ লাখ টাকার কিছু বেশি। ব্যয়ের অঙ্ক ২৬ কোটি ২৩ লাখ টাকার ওপর। এছাড়া আছে বকেয়া ঘাটতির বোঝা ১৫ কোটি ১৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ঘাটতির পরিমাণ বিশ কোটি টাকা ছুঁইছুঁই! এই ঘাটতি পূরণ হবে কীভাবে? সে-জন্যে পৌরসভার প্রশাসক কিছু কিছু পথের হদিশ দিয়েছেন। তার মধ্যে কতকগুলো তেমন নতুন নয়। যেমন বাড়ির ওপর করের হার বাড়াতে হবে, মোটর ভিহিকিলস আইন অনুযায়ী প্রাপ্য বখরার হার বাড়াতে হবে, প্রমোদ কর বাবদ রাজ্য সরকারের আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ পৌরসভাকে দিতে হবে ইত্যাদি। এছাড়া প্রস্তাব করা হয়েছে দুটি নতুন করের। তার মধ্যে একটি হলো চাকুরিজীবীদের ওপর কর। যাঁদের বার্ষিক আয় ছয় হাজার টাকার ওপর তাঁদেরই এই কর দিতে হবে। কোম্পানি মাইনে থেকে এই করের টাকা কেটে নিয়ে পৌরসভাকে পাঠিয়ে দেবে। এই সূত্রে বাড়তি আয় হতে পারে এক কোটি টাকা। দ্বিতীয় নতুন করের প্রস্তাব হলো, বাইরে থেকে যাঁরা মহানগরীতে প্রবেশ করবেন তাঁদের কাছ থেকে কর আদায়। রোজ লাখ দশেক লোক কলকাতায় আসেন নানা কাজে। তাঁরা মহানগরীর নানা পৌর সুযোগ-সুবিধে নেন। সুতরাং যাঁরা ট্রেনে বা অন্যান্য যানে কলকাতায় আসবেন তাঁদের মাথাপিছু পাঁচ পয়সা এবং যাঁরা বিমানে আসবেন তাঁদের প্রতিবার এক টাকা করে প্রবেশ কর দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। অবশ্য এই সব করই রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ। এখন যেসব কর চালু আছে তার পুনর্বিন্যাস করে বাড়তি আয় হতে পারে পাঁচ কোটি টাকা। পৌরসভায় আয় বৃদ্ধির জন্যে যে-সব প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলো যতো দিন গৃহীত না-হচ্ছে ততো দিন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বার্ষিক ছয় থেকে আট কোটি টাকা অর্থ সাহায্য চেয়েছেন পৌর প্রশাসক। কারণ পৌরসভার এখন রীতিমতো অর্থসংকট। চলতি কর থেকে যে টাকা আদায় হবে বলে বাজেটে ধরা হয়েছে তার চেয়ে বেশি আদায় হওয়া সম্ভব নয়।

অশান্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি মোটেই নতুন ঘটনা নয়, তবু ১৭ মার্চের ঘটনা আগের সব নজিরকেই ছাড়িয়ে গেল। ঐ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। বৈঠক শুরু হওয়ার আগে এক দল ছাত্র কর্মসমিতির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে দেখা করে উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনেন। তাঁরা বলেন, উপাচার্য ছাত্রদের মধ্যে ঝগড়া বাধাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ যে অরাজকতা চলছে তার জন্যে তিনিই দায়ী। এই সময় আরো কিছু ছাত্র ঐ জায়গায় এসে হাজির হন। তাঁরা উপাচার্যের হয়ে কথা বলতে শুরু করেন। তারপরেই শুরু হয় বচসা। প্রকাশ, এই দুই দল ছাত্রই ছাত্র পরিষদের সমর্থক। ছাত্রদের হাতে ছুরি, বোমা ইত্যাদি ছিল বলে প্রকাশ। বচসা থেকে সংঘর্ষ। ঘণ্টাখানেক সংঘর্ষের ফলে অন্তত পাঁচজন আহত হন। উপাচার্যের ঘর তছনছ হয়। তারপর একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা আটক করেন। তাঁদের দাবি, অপরাধীদের ধরতে হবে।

দু দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সভা বসে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। ঐ সভায় স্থির হয়, ২৯ মার্চ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। ১৭ তারিখের ঘটনায় কর্মসমিতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ছাত্র, শিক্ষক সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে সমিতির তরফ থেকে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত

পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করুন। অবশ্য কর্মসমিতির সব সদস্য বৈঠকে হাজির ছিলেন না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদ ও ছাত্র সংসদ স্থির করেছেন, তাঁদের দাবি না-মেটা পর্যন্ত তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে দেবেন না। তাঁদের প্রধান দাবি হলো, উপাচার্য পদ থেকে ডঃ রমা চৌধুরীকে সরাতে হবে।

তিন বছর পরে

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভার তিন বছর পূর্ণ হলো ২০ মার্চ। এই তিন বছরে এই মন্ত্রিসভা পশ্চিমবাংলার জন্যে কী করেছেন, তার বিবরণ জানিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নাম—'পশ্চিম বাংলার পুনর্গঠন'—জনগণের কাছে রিপোর্ট। এই রিপোর্টে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে যেসব উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে, তার ওপর। মন্ত্রিসভার দাবি, তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরীদের তুলনায় শুধু আরো বেশি অর্থ সংগ্রহই করেন নি, সেই অর্থ উন্নয়নের কাজেও লাগিয়েছেন আরো বেশি করে। নানা পরিসংখ্যান আর রেখাচিত্র দিয়ে দেখানো হয়েছে, ১৯৬৬-৬৭ সালে অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিসভার শেষ বছরে যোজনা খাতে বরাদ্দ করা হয়ছিল ৬৭ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। কিন্তু আসলে ৫৩ কোটি টাকার বেশি খরচ হয়নি। প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে খরচ হয় আরো কম—৫১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে এই খাতে খরচের পরিমাণ আরো হতাশাজনক, মাত্র ৪৫ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। কিন্তু সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই যোজনাখাতে বরাদ্দ বাড়তে থাকে। ১৯৭২-৭৪, এই দু বছরে শুধু বরাদ্দই বাড়ে নি, শেষ পর্যন্ত খরচ হয়েছে বরাদ্দের চেয়ে বেশী। ১৯৭৪-৭৫ সালে যোজনার জন্যে বরাদ্দ হয় ১৫০ কোটি টাকা। আর আগামী আর্থিক বছরে বরাদ্দের পরিমাণ ১৭০ কোটি টাকা। পুস্তিকার ভূমিকায় সিদ্ধার্থ বাবু বলেছেন, আমরা সবকিছু করতে পারি নি ভুলত্রুটিও হয়েছে। কিন্তু সে জন্যে কোনো অজুহাত আমরা দেখাতে চাই না। আমরা আগের মতো অক্লান্ত-ভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

স্থানীয় লোকের দাবি

এই বাংলায় কাজকর্মের ব্যাপারে স্থানীয় লোককে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি আবার উঠলো সেদিন বিধানসভায়। সদস্যদের দাবি ছিল, পাঁচশ টাকা পর্যন্ত বেতনের সব চাকরিতে এই রাজ্যের মানুষের নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে। সাধারণ সদস্য তো বটেই, শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপালদাস নাগও স্থানীয় লোকের চাকরির হালে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, বৃটিশ যুগে যে-সব অফিসে শতকরা ৯০ জনই ছিলেন স্থানীয় লোক, এখন ঐ হার শতকরা দশ জনও হবে কিনা সন্দেহ। এই ব্যবস্থার প্রতিকার করতেই হবে। ক্রমাগত বাইরে থেকে শ্রমিক আসার ফলে এই রাজ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। নিয়োগের ব্যাপারে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যে সরকার বিভিন্ন বণিক-সভাকে অনুরোধ করেছেন। তাছাড়া এ বিষয়ে বিস্তৃত নীতি রচনার জন্যে মন্ত্রিসভা একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন। সেই কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পরেই রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

দেবদত্ত

২২।৩।৭৫

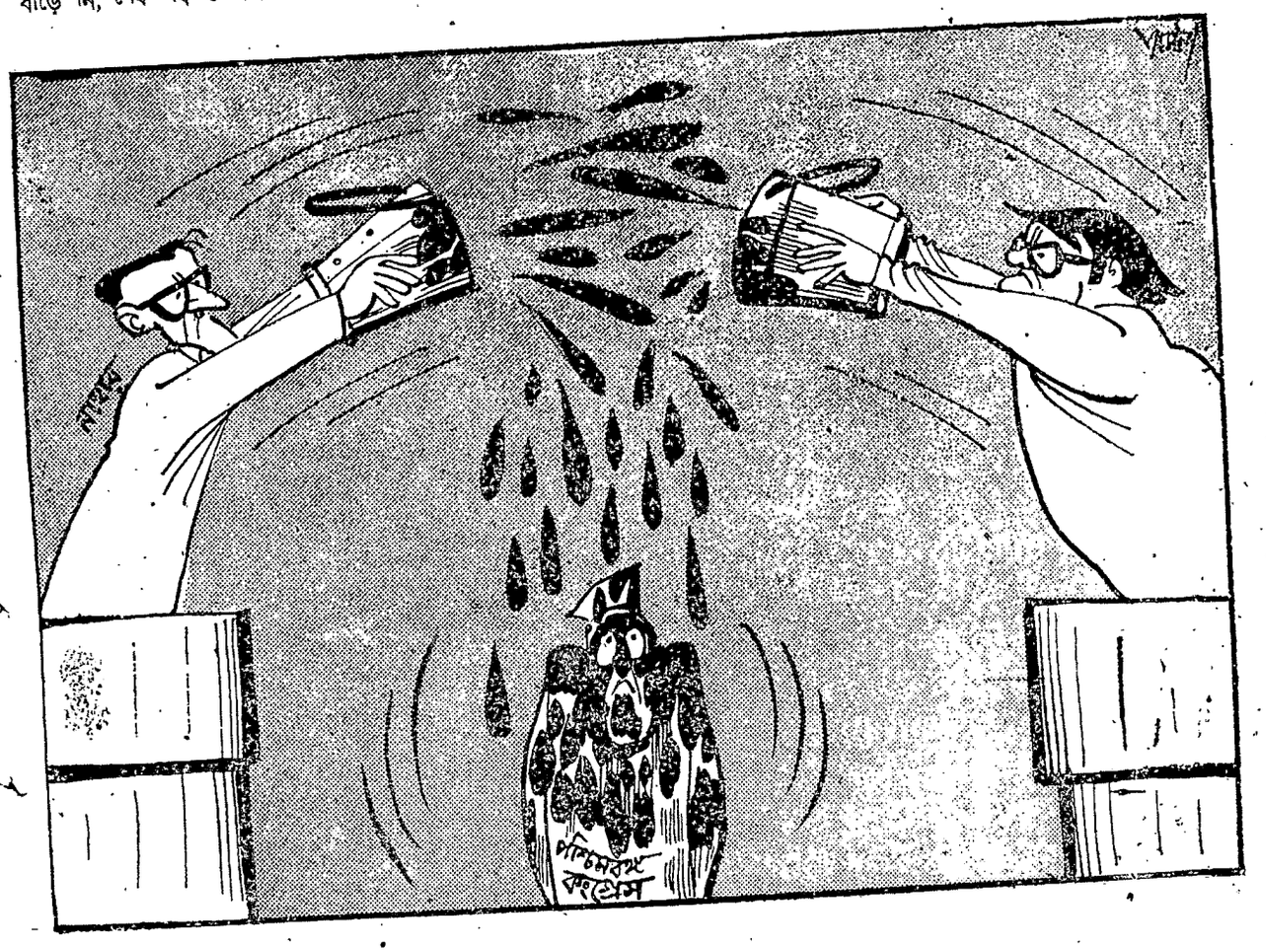

পটভূমি

পতাকা নিয়ে যাব, নাহলে সঙ্গে নেই—মাঃ কঃ পাঃ

মার্কসবাদী নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্ব মনেপ্রাণে স্বীকার করতে পারছেন না। কিন্তু চোখের সামনে অন্য পথও আপাততঃ দেখতে পাচ্ছেন না। সি পি এম-এর পক্ষে এগিয়ে গিয়ে আন্দোলন করা সম্ভব নয়। তাই একটা কিছু করতেই হবে। জয়প্রকাশজী বলেছেন, তাঁর আন্দোলনে কেউ পার্টি ফ্ল্যাগ নিয়ে যেতে পারবে না। তিনি ছাড়া আর কেউ বক্তৃতা দেবে না। প্রমোদবাবু মন্তব্য করেছেন সে কি করে সম্ভব? আমরা তো পার্টির ফ্ল্যাগ ছাড়া যাবই না। দ্বিতীয়ত আমাদের নেতারা বক্তৃতা দেবেই। অর্থাৎ এখন যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে মনে হয়, সি পি এম জয়প্রকাশজীর আন্দোলনে পুরোপুরি যোগ দিচ্ছেন না। তবে এ সুযোগ তাঁরা হাতছাড়াও করতে প্রস্তুত নন। দেশের চতুর্দিকে এখন সর্বোদয় নেতার নামে ঢেউ উঠেছে, তাই এর মধ্য দিয়ে কম্যুনিস্টরা তাঁদের আন্দোলনকেও দানা বাঁধিয়ে তুলতে চাইছেন। শোনা গেছে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো আর কেন্দ্রীয় কমিটি উভয়েই প্রফুল্ল সেন এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনে যোগদান করা বা না করার ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত। অনেক আলোচনা বা তর্কাতর্কির পর প্রমোদবাবু ও জ্যোতিবাবুর দল ঠিক করেছেন, নব নির্মাণ সমিতি বা অন্যান্যরা জয়প্রকাশজীর নাম করে যেদিন বা যখন আন্দোলন শুরু করবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথকভাবে তারাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কারণ এই গেলযোগের মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার সাধারণ মনুষের রাগ যদি একবার বিস্ফোরণের রূপ নিতে পারে, তাহলে খেলা জমবে।

ফ্ল্যাগ ও বক্তৃতাসর্বস্ব এই পার্টির এখনও কংগ্রেসের 'ঠেঙানী বাহিনীকে' বড় ভয়। শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলাতেই পার্টির পাঁচ হাজার কমরেড গৃহহারা হয়ে অন্যত্র রয়েছেন।

এই মার্কসবাদী পার্টিকে ফ্ল্যাগ সর্বস্ব পার্টি বলার সাহস তিন বছর আগেও কারোর হতো না। কারণ হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় এই পার্টির কর্মীরা নিজেদের সাধারণের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম ছিলেন। কোন কোন এলাকায় হয়তো তাঁরা কিছু বাড়াবাড়ি করেছেন। কিন্তু মোদ্দা কথা তাঁদের যে অস্তিত্ব আছে, তা পরিষ্কার ছিল। কিন্তু আজ অন্য চিত্র। তাঁরা কোথায় তা কেউ বলতে পারে না। শুধু যে কংগ্রেসের আক্রমণের জন্য তাঁদের এই অবস্থা, এটা মনে করা ভুল। এখন তাঁদের নেতৃত্বকে দেখা যাচ্ছে, বিরোধী গোষ্ঠীর কর্মীদের সাসপেন্ড করতে বা পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিতে ব্যস্ত। পুরনো নেতৃত্ব এখনও আসন দখল করে রাখতে চাইছেন ফলে পার্টির ক্যাডারদের মধ্যে হতাশা ফুটে উঠেছে। তাঁদের ভেতরে অনেকেই বসে পড়েছেন।

সত্যি বলতে কি ভাগ্য বলতে সিদ্ধার্থবাবুর বরাত। কংগ্রেস পার্টির মধ্যে এতো ঝগড়া বা মারামারি, এমনকি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল যাঁরা সরকারের ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও প্রচন্ড মতভেদ। গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ভেঙে গেছে। এত অসহায় অবস্থা, এর ওপর জিনিসপত্তরের দাম অগ্নিমূল্য হওয়ায় সাধারণ মানুষের ভয়ংকর রাগ। কংগ্রেস পার্টির এতো অসুবিধে আর বিরোধী দলগুলির সুযোগ সুবিধে থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর রথ চালিয়ে যাচ্ছেন। বরং সি পি এম দিনের পর দিন তলিয়ে চলেছে। একে বরাৎ ছাড়া আর কি বলা যায়?

বামপন্থী আন্দোলনের ধারা বা গতি বোঝা দুষ্কর। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নীতির বিশ্লেষণ দিয়ে যেভাবে চলতি আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে যান, তা সাধারণ মানুষ আজকাল সন্দেহের চোখে দেখছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারেঃ নয় বাম পার্টির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের ভূমিকা। নিশ্চিতই তা সমালোচনার যোগ্য। এক কথায় বলতে গেলে তাঁরা ধীরে ধীরে বাম আন্দোলন থেকে সরে গেছেন। তাঁরা বলতে চাইছেন, তাঁরাই একমাত্র সাচ্চা বাম পার্টি, বাকি সব পার্টিগুলি এমনকি মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে নীতিভ্রষ্টতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তা না হলে, একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রফুল্লচন্দ্র সেন বা জনসঙ্ঘের হরিপদ ভারতীর সঙ্গে তাঁরা লড়তে চলেছেন। কিন্তু রাজ্যের রাজনীতিবিদদের কথা হচ্ছে, এটা এস ইউ সি-র চালাকি। যেখানে এই রাজ্যে শাসক পার্টি কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন দানা বাঁধতে পারছে না, সেখানে প্রফুল্লবাবু প্রমুখদের নিয়ে তবুও একটা কিছু হতে চলেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এস ইউ সি নীতির কচকচানি তুলে তা ভেস্তে দেবার চেষ্টা করছেন? কারণ কি?

ঠিক একই সময়ে আবার দেখা যাচ্ছে, জয়প্রকাশজীর আন্দোলন নিয়ে মার্কসবাদী পার্টি এখন নতুন সুরে কথা বলতে শুরু করেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন কোনরকমে সারা ভারতে যেখানে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি একত্রিত একটা কিছু করার চেষ্টা করছেন সেখানে সি পি এম প্রত্যক্ষভাবে না এগিয়ে এলে অবশ্যই সেই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই পার্টি এখনও বেশ শক্তিশালী। তবে এসব বুঝেও সি পি এম নেতারা এ ধরনের কথা বলছেন কেন? আন্দোলনে তাঁদের ফ্ল্যাগ থাকতে দিতে হবে!—এটাই কি একমাত্র দাবী? না অন্য কারণ আছে। তাই সাধারণ মানুষ চিন্তিত। রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে বাম পার্টিগুলি যে হঠাৎ হঠাৎ নীতি পরিবর্তন করে চলেছেন, তা কি সাধারণ মানুষের স্বার্থে না নিজের দলের সুবিধের জন্য? এখন এমন সময় এসে গেছে রাজনৈতিক নেতাদের এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে। এবং তাঁদের উত্তরও তৈরী রাখতে হবে।

কৌটিল্য

সন্ত্রাসবাদের লক্ষণ?

সমস্তিপুরে বোমার আঘাতে রেলওয়ে মন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র খুন হয়ে যাওয়ার পরই এলাহাবাদে ও নয়াদিল্লীতে দুটি ঘটনা সারা দেশে গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে। যদি ঐ দুটি ঘটনার কোনটিতেই কেউ হতাহত হয় নি এবং এলাহাবাদে পুলিশের প্রশংসনীয় তৎপরতায় এক ব্যক্তি গুলীভরা রিভলবারসহ ধরা পড়েছে তাহলেও সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে গেলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি অথবা হয়ত বিরোধী নেতাদের কারও কারও জীবনা বিপন্ন হতে পারত সমস্তিপুর রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের ঘটনা, এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সাক্ষ্য দিতে আসার আগে আদালত কক্ষের বাইরে গুলীভরা রিভলভারসহ এক তরুণের গ্রেপ্তার এবং দিল্লীর রাজপথে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অজিত-নাথ রায়ের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ—এই সব ঘটনার মধ্যে কোন যোগাযোগ থাকতে পারে এমন একটা সন্দেহের কথা পার্লা-মেন্টে তোলা হয়েছে এবং এ বিষয়ে অনু-সন্ধানের দাবী জানান হয়েছে। আমাদের দেশে কি এক ধরনের সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, যার লক্ষণ এই ঘটনাগুলী?

যে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একদা তাঁর পিতা ও পিতামহ আইনজীবী হিসাবে কাজ করে গেছেন সেই আদালতে শ্রীমতী গান্ধী গিয়েছিলেন তাঁর নিজের নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় সাক্ষ্য দিতে। বিচারপতি জগমোহন-লাল সিং-এর আদালত কক্ষে শ্রীমতী গান্ধী সাক্ষ্য দিতে আসার এক ঘণ্টা আগে ঐ কক্ষে প্রবেশ পথের অলিন্দে গোবিন্দ মিশ্র নামে ৩০ বছর বয়সের যে তরুণটি ধরা পড়ে সে তার জবানবন্দীতে বলেছে যে শত্রুদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে নিজের সঙ্গে কিছুকাল যাবৎ একটি রিভলভার রাখছে। আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য লাইসেন্স চেয়ে সে পায় নি, ৬০ টাকা দিয়ে এই দেশী রিভলভার সে কিনেছে একজন গুণ্ডার কাছ থেকে। সে শ্রীবজয় নামে এলাহাবাদের একটি দৈনিক পত্রের সম্পাদক। সে ও তার ভাই কিছুকাল আগে একটা খুনের মামলার আসামী হয়েছিল। নিম্ন আদালতে তাদের ফাঁসীর হুকুম হয়ে গিয়েছিল, পরে হাই-কোর্ট থেকে খালাস পায়।

গোবিন্দ মিশ্র আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আদালতে ঢুকবার চেষ্টা করছিল কেন? সে কি কাউকে হত্যা করতে চেয়েছিল? যদি সেটাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তার আক্রমণের লক্ষ্য কে ছিল? প্রধান-মন্ত্রী? বিচারপতি জগমোহনলাল সিংহ? ঐ নির্বাচনী মামলায় ফরিয়াদী রাজনারায়ণের পক্ষের উকিলের সাহায্যকারী হিসাবে পার্লামেন্টের যে সব বিরোধী নেতা (জ্যোতির্ময় বসু, পিলু মোদী, রবি রায় ও মধুলিমে সেদিন আদালতকক্ষে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কেউ?

এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি। ইতিমধ্যে যে ব্যাপারটি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে সেটা হল গোবিন্দ মিশ্রের রাজনৈতিক পরিচয়। সরকারীভাবে এ বিষয়ে কিছু বলা না হলেও বেসরকারী-ভাবে একজন তাঁকে সোস্যালিষ্ট পার্টির লোক, অন্য পক্ষ তাকে কংগ্রেসের লোক বলে অভিহিত করেছেন।

দিল্লীর রাস্তায় প্রধান বিচারপতি অজিতনাথ রায়ের গাড়ীর খোলা জানলা দিয়ে দুটো সামরিক ধরনের পুরানো ও কিছুটা মরচে-ধরা গ্রেনেড ফেলে দিয়ে যে লোকটি পালিয়ে গেছে তাকে পুলিশ এখনও ধরতে পারে নি। সামরিক বাহিনীর বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বলেছেন যে, স্প্রিং কমযোরী হওয়ায় শক্তিশালী গ্রেনেড দুটি ফাটে নি তাই রক্ষা, তা না হলে সাংঘাতিক কাণ্ড হত।

এই দুটি ঘটনা নিয়েই পার্লামেন্টে আলোচনার সময় দলনির্বিশেষে সব সদস্য এক বাক্যে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী ঘটনার নিন্দা করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি প্রভৃতির নিরাপত্তার কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানিয়েছেন।

করুণানিধির ক্ষোভ

পতাকা প্রসঙ্গ মিটতে না মিটতেই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করার আর একটি কারণ হয়ে গেছেন। এবার তিনি ঝগড়ায় নেমেছেন সি সুব্রহ্মণীমের সঙ্গে, যিনি কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী হলেও তামিলনাড়ুর মানুষ। সুব্রহ্মণ্যম মাদ্রাজে গিয়ে বলে-ছিলেন খরাত্রাণের জন্য তামিলনাড়ুকে ইতিমধ্যে কেন্দ্র থেকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তার খরচের হিসাব পরীক্ষা না করে কেন্দ্র এই বাবদ রাজ্য সরকারকে আর টাকা দেবে না। বাস, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই কথাতেই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছে। কেন্দ্র যে রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের কেনা গোলামের মত দেখে, সুব্রহ্মণ্যমের এই কথায় করুণানিধি তার প্রমাণ পেয়েছেন। করুণানিধির ক্ষোভটা অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে সুব্রহ্মণ্যমের উপরই বেশী। তিনি বলে-ছেন সুব্রহ্মণ্যম যতদিন কেন্দ্রের অর্থ-মন্ত্রী থাকবেন ততদিন তিনি কেন্দ্রের কাছ থেকে ত্রাণের টাকা নেবেন না। সুব্রহ্মণ্যম নিজে একজন তামিল হয়ে তামিলনাড়ুর টাকা পাওয়ার পথে এভাবে বাগড়া দিচ্ছেন, এতে ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, চ্যবন অর্থমন্ত্রী থাকার সময় মহারাষ্ট্রকে কেন্দ্র থেকে প্রচুর টাকা পাইয়ে দিয়েছেন। তামিলনাড়ুর বেলায় টাকার হিসাবের কথা উঠছে অথচ উত্তরপ্রদেশে যে চোরাগোপ্তাভাবে কেন্দ্র থেকে ৯০ কোটি টাকা ঢালা হয়েছে তার বেলায়? রাজ্যের মানুষ যে টাকা দেয় তা-ই কেন্দ্রের টাকা। এই টাকা রাজ্যের প্রয়োজনে না দেওয়ার অধিকার নেই। আর হিসাবের কথা? কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা তহবিলে তামিলনাড়ু যে ৬ কোটি টাকা দিয়েছিল তার হিসাব কি কেন্দ্র দেবে? ডি এম কে দল যে সুব্রহ্মণ্যমকে তামিলনাড়ু থেকে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়ে দিল্লী যেতে সাহায্য করে-ছিল এখন দেখা যাচ্ছে, সেটাই ভুল হয়েছিল।

সুব্রহ্মণ্যম এই বলে করুণানিধিকে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন যে, তিনি অর্থ কমিশনের কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মাত্র। অর্থ কমিশন তাঁদের সুপারিশে এই কথা বলেছিলেন যে, ত্রাণ বাবদ যে টাকাটা খরচ হয় সেটা ঠিকমত কাজে লাগান হচ্ছে কিনা এবং ঐ টাকায় কোন স্থায়ী সম্পদ তৈরী হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনের ঐ সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করতে চাইছেন। শুধু তামিলনাড়ুতে নয় অন্যান্য সব রাজ্যেই তাঁরা এই নীতি অনুসরণ করছেন।

*

ব্যাপক দলত্যাগের ফলে এক পক্ষ কালের মধ্যে পর পর দুটি সরকার বিপন্ন হওয়ায় নাগাল্যান্ডে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল তার অবসান করতে চাওয়া হচ্ছে মন্ত্রিসভাকে আপাতত কিছুকাল সাসপেন্ড রেখে ও রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করে।

বিধানসভা অধিবেশনের ঠিক প্রাক্কালে ইউ ডি এফের সদস্যদের ভাঙিয়ে এনে নাগাল্যান্ড ন্যাশনালিষ্ট অর্গানাইজেশন (এন এন ও) ভিজোলের মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। এন এন ও দলের জাসোকি তাঁর দলের ৩৭ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জনকেই মন্ত্রিসভায় নিয়েছিলেন। কিন্তু তবু তিনি শেষরক্ষা করতে পারলেন না। তিনজন মন্ত্রীসহ ১০ জন এন এন ও এম এল এ-র দলত্যাগ করে ইউ ডি এফে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল। কিন্তু জাসোকি বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার পথ এড়িয়ে গেলেন। বিরোধী পক্ষ তাঁর দলের কয়েকজন সদস্যকে জোর করে আটকে রেখেছে, এই যুক্তিতে মুখ্যমন্ত্রী স্পীকারকে দিয়ে বাজেট অধিবেশনের মধ্যপথে বিধান-সভা মুলতুবী করিয়ে দিলেন।

প্রকাশ, রাজ্যপাল এল পি সিং দিল্লীতে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাতে তিনি রাজ-নৈতিক পরিস্থিতিটা সুস্থির হওয়ার জন্য কিছু সময় নেওয়ার সুপারিশ করেছেন।

২১-৩-৭৫

পুণ্ডরীক

ফাদার দ্যতিয়েন
বেড়া নামচা

ইকবালের দাদাজান আমজাদ আলি পাঠারি এক দৌলতমন্দ তালুকদার ছিলেন। চাচাতো, ফুফুতো ভাই কেন, আপন ভাইদের কাছ থেকেও অম্লানবদন আমজাদ নিঃসংকোচে খাজনা নিতেন।

দরিদ্র পরিবারে, কাঁচা মাটির এক কুটিরে আমজাদের জন্ম; কাদা-মাখা পায়ে টাক-পড়া মাথার ঘাম ফেলে মাটি কেটে পুকুর ছেঁচে দু-পয়সা কামিয়ে বকর-ইদের দিনে তাঁর একমাত্র বিবির চরণকমলে তিনি উপহার রাখতেন কৃষ্টার্জিত মোটা সুতির এক শাড়ি। এদিকে বিবিজান—নাদিরা তার নাম—বাজার থেকে খরচা বাঁচিয়ে উক্ত দিনে লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙে কর্তাসাহেবের পদপঙ্কজে উপহার রাখতেন আটপৌরে ধরনের এক রঙিন লুঙ্গি। দিন কাটত তাঁদের অনুজ্জ্বল আনন্দে, সীমিত প্রয়োজনে; আল্লাতালার বরকতে দম্পতি থাকত সহজলব্ধ দুটি ভাতে—আর রোববারে রোয়াল মাছে। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান।

আমজাদের ছিল এক ইয়ার, আকমল খাঁ। ধৈর্যশীল ও দীর্ঘসহিষ্ণু হলে কি হবে, আকমল খাঁ একেকদিন সহধর্মিণী তাহমিনার উগ্রস্বভাবে এতই অতিষ্ঠ হয়ে উঠত যে তার গালিগালাজ ও ঘুষিবর্ষণ এড়াতে গিয়ে আমজাদদের ওখানে তাকে আশ্রয় নিতে হত। মাঠ-ফেরৎ চাষীরা প্রায়ই দেখত, দু-ইয়ারে এক আসনে বসে হুঁকো টানছে, এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে একই পদক্ষেপে আল বেয়ে ভ্রমণ করে বিশ্রম্ভালাপ করছে। একদিন—শাবান মাসের এক অশুভ সন্ধ্যায়—ইয়ারদ্বয়ের হল মৈত্রচ্ছেদ।

মৈত্রচ্ছেদের কারণ আর কিছু নয়—এক নবাবিষ্কৃত গুপ্তধন...। সেদিন, শুক্লপক্ষের প্রতিপদের শুভ্রালোকে চলতে চলতে আকমল খাঁ ওর নিষণ্ণ দিল-কে উজাড় করছিল আমজাদের দরদী ক্রোড়ে। আমজাদও কামেল-পীর-সুলভ অভিজ্ঞ কণ্ঠে, পুণ্য শাস্ত্রের উপযুক্ত আয়াত উদ্ধৃত করে উক্ত দিলের ক্ষতস্থলে আধ্যাত্মিক প্রলেপনে তৎপর ছিলেন ঃ 'জেনে রেখো, বিশ্বাসীগণ, ইহলোক এক লীলাক্ষেত্র, অসারতা, বহির্বাস...' হঠাৎ এক প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে নর্দমায় পড়ে বক্তৃতা থামালেন আমজাদ ঃ ইয়া বড় এক কালসাপ কোন্ জাহান্নামের গর্ত থেকে বেরিয়ে ফোঁস্ ফোঁস করে এগিয়ে আসছিল অমিত্রসুলভ বপুভঙ্গিতে।

ইঁটপাটকেল তুলতে গিয়ে আমজাদ লক্ষ্য করলেন, এক কাঁঠাল গাছের তলায় মাটি ফেটেছে, সেই ফাটলের সুযোগ নিয়ে আপন জাহান্নামের গর্ভে ফিরে গিয়েছে বিষধর। আর তখনই দমকের মতো তিনি বুঝলেন, ঐখানেই এক গুপ্তধন পোঁতা আছে।

আপন আব্বা কাজিমুদ্দিনের মুখেই আমজাদ শুনেছিলেন, চাটগাঁয়ের সেই অঞ্চলে, একবার নয় একাধিকবার, গুপ্তধন পাওয়া গিয়েছে ঃ কোন এক পলায়মান পরাজিত সুলতানের লুক্কায়িত মোহরের কলসি। কাজিমুদ্দিন নিজেই রমজানের এক রাত্রে খোয়াব-যোগে অমন কলসির হদিস পেয়েছিলেন; পীরসাহেব কিন্তু সতর্কবাণী শুনিয়ে বলেছিলেন ঃ 'মোহর, খুঁড়ে তোলে যে, পয়লা বেটা খোয়ায় সে.. কাজিমুদ্দিনের পয়লা বেটা আমজাদ ঃ আব্বার লোভ সংবরণের জন্যই বাঁচল সে—আর বাড়ির সবাই দিন কাটাতে থাকল অর্ধভুক্তনে।

আমজাদের আর কোনো সন্দেহ নেই যে আব্বার উল্লিখিত সেই গুপ্তধন তার পায়ের তলার নীচ থেকে তাঁকে উদ্দেশ করে বলছে ঃ যে-বেটা যার হয় নি, ঐ বেটা তার খোয়া যায় কেমন করে? আকমলকে তিনি আদেশ দেন তাঁর বিবি নাদিরার কাছ থেকে শাবল চেয়ে নিয়ে আসতে। আকমলের কাছে আমজাদ আলি পাঠারি গুরুপ্রতিম, তাঁর আদেশমাত্রই তার শিরোধার্য; খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাই (জন্ম থেকেই; ধাইয়ের কিসের গাফিলতির দরুন, উভয় ঠ্যাংই তার খোঁড়া) আকমল আমজাদের বাড়ির অভিমুখে পা বাড়াল।

এবার আমজাদের চাতুরী দেখুন ঃ নাদিরা অবশ্য বাড়ি আছে, শাবল কিন্তু আজ ঘরে নেই ঃ পাশের গ্রামের কায়সার নামে এক দূরাত্মীয় দুদিনের জন্য ধার নিয়ে গিয়েছে। একে তো আকমল ভায়া পঙ্গু আর শাবলটার ওজনও কম নয়...ঐ দূর গ্রাম থেকে তা নিয়ে আসতে আড়াই ঘন্টা লাগবেই; সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমনিভাবে অপসারিত করে আমজাদ, অসামান্য উৎসাহে, তারের বেড়ার এক লোহার খুঁটি উপড়িয়ে কাজে নামলেন...।

মোহরের কলসি ছিল ঠিকই, তবে একটা নয়, দুটো। লুঙ্গি গুটিয়ে কাঙারুর পকেটের মতো এক থলি বানিয়ে দৈবলব্ধ সম্পদ সতর্কে সামাল দিয়ে হঠাৎ-আমীর আমজাদ তাঁর গরীবখানার দিকে অগ্রসর হলেন...

শাবল কাঁধে বয়ে আকমল ফিরে এসে দেখে, কাঁঠাল গাছের তলায় সদ্যখনিত এক গর্ত, পরিত্যক্ত শূন্য কলসযুগল, ফেলে-যাওয়া লোহার খুঁটিটি আর দিগন্তে, আস্বচ্ছ জ্যোৎস্নালোকে, আমজাদের ক্ষীয়মাণ লম্বোদর সিলুয়েট।

ওজনদরে বেচার মতো শৃগালবুদ্ধি আকমলের ঘটে ছিল না, তবে যা বোঝার সে বুঝল সহজেই। যন্ত্রটা আর খোঁড়া পায়ের ব্যথা পিছনে ফেলে 'শাবল এনেছি, ভায়া...' চেঁচাতে চেঁচাতে আমজাদের পিছু নিল সে। আমজাদের বুঝতে দেরি হল না যে আকমল তাঁর নাগাল পেলে গুপ্তধনের অর্ধাংশ সে দাবি করবেই...আর এদিকে তার গর্জন থামাতে না পারলে কৌতূহলী গৃহস্থেরা এসে লুঠে ভাগ বসাবে। তিনি তখন করলেন কি? এক মুঠো মোহর পিছনে

দিলেন ছুঁড়ে। প্রান্ত টোপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রাপ্য ধন হারাল আক্‌মল।

গ্রামবাসীরা মোহরের কলসির প্রথম ইঙ্গিত পেল সেইদিন যেদিন দেখল, আমজাদ আলি বাড়ি তুলছেন আর আক্‌মল খাঁ-ও এক জোড়া বলদ হাট থেকে কিনে এনেছে...। প্রতারিত আক্‌মল আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার জন্য আমজাদের সান্নিধ্য খুঁজত না আর; বরং লাঙ্গল কাঁধে জোড়া বলদ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকটার অট্টালিকার সামনে দিয়ে যেতে যেতে তাঁর চতুর্দশ পুরুষকে স্মরণ করার লোভ সামলাতে পারত না। ইতিমধ্যে আমজাদের মিনি-সংসার বৃদ্ধিলাভ করেছে; আরেক বিয়ে করে তিনি হয়েছেন হৃষ্টপুষ্ট এক পুংসন্তানের গর্বিত বাপ।

আমজাদ ও আক্‌মল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন একই সপ্তাহের মধ্যে, ওলাউঠার আক্রমণে, পুনর্মিলিত না হয়ে। মৃত্যুশয্যায় উত্তরাধিকারস্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে আক্‌মল রেখে দিয়ে গেল অনির্বাপিতব্য সেই হিংসানল।

আগুনটা কিন্তু তৃতীয় পুরুষে সঞ্চারিত হতে পারল না : পিতামাতার নির্দেশাজ্ঞা অমান্য করে, ভর্ৎসনা অগ্রাহ্য করে, যষ্ট্যাঘাতও পৃষ্ঠে পেতে বহন করে আক্‌মলের পৌত্র রফিক আমজাদের পৌত্র ইকবালের সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছে আজ অবিচ্ছেদ্য সৌহার্দ্য বন্ধনে।

রফিক ছেলেটি বিকলহস্ত, তবে জন্ম থেকে নয়, সেইদিন থেকে যেদিন ইকবালের দুরভিসন্ধিতে দশমবর্ষীয় মানিকজোড় মানজার হোসেনের আম্রকুঞ্জে চৌরবৃত্তিতে হাত পাকাতে গিয়েছিল। রফিকের হাতটা পাকল না, ভাঙল। উচ্চ এক শাখায় ঝুলছিল ভোঁ-ভোঁ গুঞ্জিত মধুকর বেষ্টিত রসনাসরসকারী এক লেংড়া। ইকবাল বলেছিল, আমার কাঁধে পা দিয়ে ওঠ...ভয় কি রে, জানিস না, জন্মাদিনে মৌমাছি হুল ফোটায় না? ইকবালের আশ্বাসবাণীতে আশ্বাসিত হয়ে রফিক ছোকরা বন্ধুর কাঁধে উঠেছিল। মৌমাছিরা জন্মার নিষেধাজ্ঞা মানে নি...। ভগ্নহস্ত বন্ধুকে মাটিতেই শুইয়ে রেখে দৌড়ে গিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ইকবাল বলেছিল, 'আমাকে আর যা শাস্তি দেবে, দাও, আব্বা, কিন্তু ওকে বাঁচাও, ওকে বাঁচাও...'

ইকবালের বাপ সেদিন রফিকদের দ্বিপুরুষ-অলঙ্ঘিত চৌকাঠ মাড়িয়ে রফিকের আব্বাকে বলেছিলেন, 'খোকাকে শহরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন, সেরা ডাক্তারসাহেবের হাতে ওর চিকিচ্ছের ভার দিন, সব খরচ আমি মেটাব।' রফিকের বাপ হিমশীতল ভদ্রতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, 'মুস্তাফা হাকিম থাকতে ডাক্তারের কি প্রয়োজন?'

মুস্তাফা হাকিমের মলম মালিশের সাহায্যে রফিকের ভাঙা হাতটা আজ বিদঘুটেভাবে বেঁকে চির-অবশ হয়ে গিয়েছে : ওর কোটের ডান আস্তিনটা ঝুলতে দেখে বাচ্চারা হাসে।

হাসে না কিন্তু ইকবাল, মনে মনে কাঁদে : রফিক এখন ওর প্রাণের বন্ধু। দুজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র, তবে রফিক চাটগাঁয় আর ইকবাল রাজধানী ঢাকায়। পত্র বিনিময় অব্যাহত। বাঁ হাতে লেখা চিঠি পড়তে পড়তে ইকবালের চোখে পানি আসে।

...ইকবালের সঙ্গে আমার দেখা হয় জহুরুল হক নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হস্টেলে : ওর মুখ থেকেই শুনেছি ওর দাদা আমজাদের আর ওর নিজের গল্প।

ইকবালের বাপের ইচ্ছা, ইকবাল এবার সাদি করুক। কত রায়বার লাগিয়েছেন ইকবালের বাপ (রায়বার মানে ঘটক), কত সুন্দরী ষোড়শীর খবর তিনি পেয়েছেন। ইকবাল কিন্তু নাছোড়বান্দা; ওর পণ : 'এমন এক মেয়ে বিয়ে করব, যার জেন হাত-ভাঙ্গা রফিককে বিয়ে করবে।'

(ক্রমশ)

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করলে আর মাড়ি মালিশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

নিয়মিত ফরহান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করেন এমন অনেকে অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন :

"বারো বছর বয়েস থেকেই আমি ফরহান্স ব্যবহার করে আসছি। এখন আমার বয়েস প্রায় কুড়ি। প্রথমবার ফরহান্স ব্যবহার করার সময়, আমার মাড়ির কিছু গোলযোগ ছিল। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, কোনো ঝামেলাই নেই। ...আগে আমার রাত্রে দাঁত ব্রাশ করার অভ্যেস ছিল না। কিন্তু পরে, রাত্রে পড়াশুনো করার সময় ১০টা বাজলেই আমার মনে পড়ে যেত আপনাদের বিজ্ঞাপনে লেখা "একটি নতুন অভ্যাস"-এর কথা!"
(স্বাঃ) এস. মিট্টল,
বি. ই. (ইলেক্ট্র) পাতিয়ালা

"...যদিও আমি ধূমপান করিনা, বছর খানেক আগে লক্ষ্য করলাম—আমার দাঁত হলদে হয়ে যাচ্ছে। ...আমার বাবা, যিনি গত তিরিশ বছর ধরে "ফরহান্স" ব্যবহার করে আসছেন, আমাকে টুথপেষ্ট বদলে "ফরহান্স" ব্যবহার করতে রাজি করালেন...আশ্চর্য্য ফল পেলাম! আজ, আমার দাঁত যেমন হওয়া উচিৎ— ঠিক তেমনি। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনারা আপনাদের অপূর্ব টুথপেষ্ট—ফরহান্স-এ যে সব গুণ আছে বলে দাবী করেন—তা সত্যি! অন্যান্য টুথপেষ্টের সঙ্গে এর তফাৎ তো হবেই—এ যে এক দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট!"
(স্বাঃ) এস. এস. চ্যাটার্জি,
এম. এ., কোয়েম্বাটোর

(এই প্রশংসাপত্রের প্রতিচ্ছবি (ফটোস্ট্যাট) জেরক্স মানায় এও কোং লিঃ-এর যেকোনো অফিসে দেখতে পারেন।)

ভালোভাবে দাঁতের যত্ন নিতে হলে রোজ রাত্রে আর সকালে ফরহান্স টুথপেষ্ট ও ফরহান্স ডুবল অ্যাকশন টুথব্রাশ ব্যবহার করুন...আর নিয়মিত আপনার দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বিনামূল্যে! তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা "আপনার দাঁত ও মাড়ির যত্ন"। এই পুস্তিকা পেতে হলে অনুগ্রহ করে এই কুপনের সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান, এই ঠিকানায়: মানার্স ডেন্টাল অ্যাডভাইসরী ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বম্বে ৪০০ ০০১।

নাম _____ বয়েস _____

ঠিকানা _____

অনুগ্রহ করে যে ভাষায় চান তার নীচে দাগ কেটে দিন—ইংরিজী, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উর্দু, পাঞ্জাবী, বাংলা, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কানাড়ী।

ফরহান্স টুথপেষ্ট এক দাঁতের ডাক্তারের তৈরী

এ—৭

ASP F-182 BEN

সমাজ বিবর্তনের একটি অধ্যায়

হেমচন্দ্র ঘোষ

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে কলকাতায় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের গোড়া পত্তন হয়। বিবাহ ব্যাপারে এদের রাঢ়দেশে যেতে হত মেয়ে খুঁজতে। হোয়াইট টাউনের মত নেটিভ টাউন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল না। অপরিচ্ছন্নতা জঙ্গল জলা রাতে মশা দিনে মাছি নিয়ে কলকাতার নেটিভ টাউন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। ব্লীক-রো-এর অপ্রশস্ত খালের মত কিছু নোংরা প্রতি বছর স্বল্প জনসংখ্যার কিছু অংশের জীবনহানির কারণ হয়ে উঠত। তবুও লোকে কলকাতা ছাড়তে না। ইংরেজরা ধীরে ধীরে কলকাতা গড়তে লাগল। মুর্শিদাবাদ অতি দূরে—সরকারের অগোচরে একটা ছোট মত ফোর্ট হল। এখন যেখানে জি পি ও সেইখানেই ইংরেজদের প্রাক্তন ফোর্ট। নবাব সরকার টুপিওয়ালাদের বিশ্বাস না করলেও কিছু করার ছিল না। হিন্দুদের সঙ্গে বাণিজ্যের সহযোগিতায় ইংরেজরা ফেঁপে উঠল। তখনই হল কলকাতায় আভিজাত্যের সৃষ্টি, এতটুকু কলকাতা হঠাৎ এতখানি বিত্তশালী কেন হল? দিল্লীর নির্বুদ্ধিতা ইংরেজদের শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। শুল্ক না দিয়ে সারা দেশে অবাধ বাণিজ্য করার যে অধিকার ইংরেজ পেল—দেশকে শোষণ করার যে সুযোগ তার চাতুর্যে করায়ত্ত হল অদূর-ভবিষ্যতে পলাশী যুদ্ধের পরাজয় তার একমাত্র মুখ্য কারণ। কলিকাতার 'নেটিভ' অধিবাসীরাও ইংরেজের গোলামী করে বিত্তশালী হলেন। দিল্লীর দরবার নড়বড়ে—উৎকোচ অন্তর্দ্বন্দ্ব আর অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপে কণ্টকাকীর্ণ।

কোম্পানীর কর্মচারীরা কলকাতার লোকদের সঙ্গে বাণিজ্যের ফাঁদ পেতে বসলো—ইংরেজ বা নেটিভরা প্রচণ্ড ধনবান হয়ে ওঠে। এই সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থরা কলকাতায় নিজেদের সমাজ গঠনে উদ্যোগী হয়। মুর্শিদাবাদের অবস্থা তখন খুব শোচনীয়। কুলী খাঁর জামাই সুশাসক সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ নবাব হলেন। যে একদিন নবাব বাড়ীর কাপড়িশ ধুয়ে জীবিকার্জন করতো, সরফরাজের মা জিন্নাৎ বেগমের দয়ায় যে ব্যক্তি পাটনার অধিকর্তা নিযুক্ত হল সেই আলিবর্দীই প্রভুপুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঘেরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হলে মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করে আলিবর্দী। ১৭৪০ সাল। ভারতে মারহাট্টা শক্তি প্রবলতর হয়ে ওঠে। শক্তিহীন দিল্লীর মসনদ ভীত সন্ত্রস্ত কম্পমান। সম্পদে ভরা বঙ্গভূমির ওপর মারহাট্টাদের নজর পড়লো। রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে বাংলার চৌথ আদায়ের জন্যে উপস্থিত হলেন। ভাস্কর সমগ্র রাঢ়ভূমি সমগ্র মালভূমি বর্ধমান হুগলী মেদিনীপুর বালেশ্বর বীরভূম রাজশাহী রাজমহল দখল করে নিলেন। রাঢ়ভূমির বহু নাগরিক কলকাতায় ইংরেজদের কাছে আশ্রয় চায়। অতি ক্ষুদ্র কলকাতায় কায়স্থ সমাজের যাঁরা এলেন তাঁরা সংখ্যায় অতি নগণ্য। কম্বুলেটোলার মিত্তিররা এই সময়ে কোলকাতায় আসেন।

কলকাতা পার হলেই সমুদ্র পর্যন্ত সুন্দরবন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই বিস্তৃত সুন্দরবন অঞ্চল বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রতাপাদিত্য সব সময়ে সুন্দরবন সুরক্ষিত রাখতেন। বারুইপুরে মেদমলে প্রতাপের সেনানিবাস ছিল। বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশে জলা জঙ্গল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের এক বিরাট অংশ কেমন করে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় এসে পড়ে, প্রতাপের রাজস্বমন্ত্রী শঙ্কর মুর্শিদাবাদের কাঁথি অঞ্চলের লোক। রাজস্ব সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্য তাঁর পরিচিত রাজস্ব নিপুণ কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যাঁদের যশোরে আনেন তাঁরাই দক্ষিণ অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার পেলেন এবং তাঁরাই সেখানকার বসতি হয়ে প্রতাপের পতনের পর রাজপূজারী বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারপ্রাপ্ত বাড়ষার সার্বর্ণচৌধুরীদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্তের অধীনে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র জমিদার হয়ে গেলেন। বারুইপুরের চৌধুরী মজিলপুরের দত্ত জয়নগরের মিত্তির এঁরা প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের এক বিরাট অংশের কর্তৃত্ব এঁদের হাতে এসে গেল। এঁদেরই আত্মীয়স্বজন কায়স্থ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী—ঘোষ বোস মিত্তির দত্ত এই সমাজভুক্ত হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। ভাঙ্গড় থানার দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থরা রাজারহাট থানার মিত্তির ও বিষ্ণুপুরের ঘোষ এঁরা কলকাতায় নতুন করে সমাজগঠনের পূর্বে দক্ষিণাঞ্চলে যুক্ত ছিলেন। নেতাজী সুভাষ স্যার রমেশ মিত্তির ডাঃ নীলরতন সরকার ডাঃ কার্তিক বোস প্রভৃতি এই অঞ্চলের স্বনামধন্য পুরুষ। শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণবাবু প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ কলকাতায় সমাজগঠনের সহায়ক ছিলেন এবং পরে তাঁর বিষয় আলোচিত হবে। রাজীবপুরের ঘোষবংশ ও ছোট জাগুলিয়ার বোসেরা যশোহর থেকে ও চৌগাছির প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এঁরা যশোরের লোক। এঁদের পূর্বপুরুষরা যখন রাঢ়দেশ ত্যাগ করে আসেন তখন ইংরেজের সৃষ্ট নদীয়া জেলার কোন অস্তিত্ব ছিল না।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজের কলকাতার গৌরব সহস্রগুণে বৃদ্ধি পেলো। মুর্শিদাবাদের মসনদ ভিখারীর মত করুণনেত্রে কলকাতার দিকে চেয়ে থাকতো—অনুকম্পায় মসনদে বসা নবাব করজোড়ে ভিক্ষের ঝুলি এগিয়ে দিত। পলাশীর যুদ্ধের আগে ক্লাইভ ও মীরজাফরের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তখন কলকাতার পরিধি এত সংকীর্ণ ছিল যে বর্গীর হাঙ্গামায় রাঢ়দেশ থেকে পলাতক বাসিন্দাদের কলকাতার বুকে ঠাঁই দেবার মত কোন জমিই ছিল না।

উত্তর চব্বিশ পরগণার সমগ্র অঞ্চল প্রতাপাদিত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর দক্ষিণ রাঢ়ীর বহু পরিবার কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বসতি করেন। আড়বেলিয়ার নাগচৌধুরীদের পূর্বপুরুষ ঢাকায় নবাব সরকারে চাকরী করার পর এদেশে বসবাস আরম্ভ করেন। কারণ পূর্ববঙ্গে তাঁদের সামাজিক জীবনের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ এসে গেল। ক্লাইভের চাতুর্য স্বার্থান্বেষী দেশীয় রাজশক্তি চরম চরম বিশ্বাসঘাতকতার ডুবিয়ে দিল দেশের স্বাধীনতা। মুর্শিদাবাদের পতন সমগ্র জাতির দাসত্ব বরণ. ইংরেজের বিজয় কলকাতার সামাজিক অর্থনৈতিক ও ভবিষ্যতের সমুজ্জ্বল গৌরবের সূত্রপাত ঘটায়।

ব্যবসাদার ছাড়া তখন কলকাতায় বড় একটা কেউ সপরিবারে বাস করতে সাহস করত না। পরবর্তী কালেও বর্তমান পার্ক ষ্ট্রীটের সান্নিধ্যে ইলাইজা ইম্পের বাড়ী রাত্রে বাঘের গর্জনে কেঁপে উঠতো। লর্ড

ক্লাইভের স্নেহধন্য মুৎসুদ্দী নবকৃষ্ণ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। ১৭৬৫ সালে কোম্পানী পেলো বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী কিন্তু মেদিনীপুর ও হুগলীর কিছু অংশ বাদে সমগ্র উড়িষ্যা মারহাট্টাদের দখলে ছিল এই সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের বহু পরিবার কলকাতায় চলে আসে। ক্লাইভ দেশে চলে গেলে হেস্টিংস হল কোম্পানীর কর্তা। প্রথমে গভর্নর পরে গভর্নর জেনারেল। হেস্টিংস-পত্নীর পূর্বস্বামীর দোকানে সরকারি করতেন রামলোচন ঘোষ। তিনি পাথুরিয়াঘাটা ঘোষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই সময়ে বাংলা ও বিহার আঠারটি জেলায় বিভক্ত হল ও রাজস্ব আদায়ের জন্যে প্রতি জেলায় একজন কালেক্টার নিয়োগ হলেন। ক্লাইভের ষাট টাকা মাইনের মুৎসুদ্দী নবকৃষ্ণ হেস্টিংসের অতি প্রিয় হয়ে উঠলেন। হেস্টিংসকে তিন লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের অন্নাহারের হাত থেকে রক্ষে করে—পুরস্কার পেলেন বর্ধমানের রাজার নাবালক পুত্রের গার্ডিয়ান নিযুক্ত হয়ে। বাৎসরিক মাহিনা ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। নবকৃষ্ণ শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সামাজিক কাজে নবকৃষ্ণ জাতি কাছারীর কর্তা হলেন। হেস্টিংসের কৃপায় নবকৃষ্ণের সবই হল—সুতানটীর জমিদারী—রামের ধন শ্যামকে দিয়ে প্রচুর অর্থসম্পদ নবকৃষ্ণের হাতে এল। নবকৃষ্ণের কিন্তু কলকাতায় সামাজিক প্রতিষ্ঠা হল না। বহু অর্থশালী বহিরাগত ব্যক্তি কলকাতায় ব্যবসা আরম্ভ করে প্রভূত অর্থসম্পদের অধিকারী হন। কলকাতার হাটখোলার দত্তরা গঙ্গার পশ্চিম কূল থেকে কলকাতায় এলেন। কাশীনাথ দত্ত নবকৃষ্ণের সহায়তায় হেস্টিংসের অনুগ্রহে খড়দিয়া পরগণা হস্তগত করলেন। জমিদারী উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরগণা দত্তদের হাতে ছিল। কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কলকাতার অর্থলোলুপ ব্যবসায়েরা সহজলভ্য জমিদারী হস্তগত করে রাজোচিত সম্মানের অধিকারী হলেন। জোরবাগানের মিত্তির হোলেন কাশীনাথ ঘোষেরা ছাতুবাবু লাটুবাবুর পার্শ্বপাবরে রামদুলাল সরকার অকূর দত্ত কীর্তি মিত্তির পদবি অর্থবান ব্যক্তিরা কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন।

এই সময়ে কলকাতায় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন তারকেশ্বরের নিকট গোপীনগরের গোপীকান্ত সিংহ। নবকৃষ্ণ পুত্র রাজকৃষ্ণের বিবাহের উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। শ্রেষ্ঠ কুলীন কন্যার প্রয়োজন। কলকাতায় বসতিস্থাপনকারী কায়স্থদের মধ্যে পাত্রী মিললো না। খানাকুলের রামানন্দ বসু সর্বাধিকারীর কন্যাকে কলকাতায় এনে বিবাহ দেওয়া হলো। বিয়ের ঘটা হয় অভাবনীয়। দেশ থেকে কারবারেরী সৈন্যরা বরের সঙ্গে আসে। নবকৃষ্ণকে সকলে ধন্য ধন্য করলো কিন্তু কখনও নবকৃষ্ণ গোষ্ঠীপতি হতে পারেন নি। গোপীকান্ত গোষ্ঠীপতি। পৌত্র রামকান্ত নবকৃষ্ণের কাছে ঋণী মৌলিক গোষ্ঠীপতির কন্যা মৌলিক পাত্র বিয়ে করলে কন্যাকর্তার গোষ্ঠীপতি নষ্ট হয়ে বরের বংশ গোষ্ঠীপতি হয়—এটা দক্ষিণ রাঢ়ী মৌলিক কায়স্থদের 'মেলকাটা' বিয়ে বলে। সুচতুর নবকৃষ্ণ রামকান্তের কন্যার সঙ্গে পৌত্র রাধাকান্তের বিয়ে দিয়ে গোষ্ঠীপতি হলেন। 'মেলকাটা' এখন আর প্রচলন নেই।

গোষ্ঠীপতি হয়ে নবকৃষ্ণের প্রতিপত্তি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। কুলীন কায়স্থরা 'কুলমর্যাদা' পেয়ে নবকৃষ্ণকে মাথায় তুলে নিল। এই 'কুলমর্যাদা' মৌলিক কন্যার বিবের সময় কুলীনরা এখনও দাবী করে আসছেন। নবকৃষ্ণ গোষ্ঠীপতি — নবকৃষ্ণ সমাজপতি—কলকাতার কায়স্থরা নবকৃষ্ণের বংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। শোভাবাজার দেববংশে মেয়ে আনা ও মেয়ে দেওয়া হয়ে উঠলো একটা পরম সৌভাগ্যের কথা। এ সত্ত্বেও মেয়ে নিতে কলকাতার কায়স্থরা রাঢ় দেশে ছুটতো। খানাকুলের সর্বাধিকারীরা প্রখ্যাত এটর্ণী ভূপেন্দ্রনাথ বোস এঁরা এই সূত্রে কলকাতায় আসেন। শোভাবাজারের দেববংশের তখন প্রবল প্রতিপত্তি বিশেষত রাজা রাধাকান্ত কলকাতার সর্বসমাজে সর্ব প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়ে যশের অধিকারী হলেন। এরপর রাজা বিনয়কৃষ্ণ অনুরূপ সমাদৃত হন।

সুতানটী গঙ্গামঙ্গল পরগণার রাজারা এখন হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছেন। ইংরেজ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব চিরকায়েম করার উপায় উদ্ভাবনে ইংরেজরা সজাগ হয়ে ওঠে। কুখ্যাত হেস্টিংস কালেক্টারদের ব্যবসাদার করে তুলেছিল—তারা আবার জমিদারদের প্রভু পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেল। কলকাতার বাহিরে মালের খরিদ বিক্রী আইনতঃ চলতো না। এই সময়ে হলো কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট। প্রথম দিকে এটর্ণী ব্যারিস্টাররা এরা সকলে ছিল সাহেব। ক্রমে দক্ষিণ রাঢ়ীর বহু কায়স্থ এটর্ণী হয়ে সুনামার্জন করেন। পরে হাইকোর্টের অনেক উকিল কায়স্থ সমাজকে গৌরবান্বিত করেছেন। হেস্টিংসের বহু প্রিয়পাত্রের অন্যতম

হরি ঘোষ। এঁর সম্বন্ধে চলতি কথা—হরি ঘোষের গোয়াল। হেস্টিংস এই হরি ঘোষকে মুঙ্গেরের দেওয়ান করে দেয়। হরি ঘোষের নামে কলকাতায় রাস্তা আছে। কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ব্যারিস্টারদের মধ্যে কায়স্থ সমাজকে যাঁরা গৌরবান্বিত করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছে—স্যার রাসবিহারী ঘোষ স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার দার্শনিক হীরেন দত্ত এটর্নী যতীন্দ্রনাথ বোস শ্রীনাথ দাস গণেশচন্দ্র চন্দর স্যার বি সি মিত্র প্রভৃতি। পটলডাঙ্গার শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ছিলেন বিদ্যোৎসাহী স্বনামধন্য পুরুষ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্রীশ্চান মিশনারীরা খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। স্কটীশ চার্চ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আলেকজান্ডার ডফ কয়েকজনকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন তার মধ্যে কায়স্থ সমাজের কালিচরণ ঘোষ প্রথমে খৃষ্টান হলেন। হেনরী ডিরোজিওর জন্মস্থান কলকাতায়—প্রসিদ্ধ দার্শনিক। কিছুদিন হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেন। তাঁর প্রভাবে ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে। রাজানারায়ণ বোস প্রভৃতি ডিরোজিওর ভক্ত হয়ে ওঠেন রাজানারায়ণ শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ। শ্রীঅরবিন্দের পিতৃপুরুষ কোন্নগরের অধিবাসী।

প্রত্নতত্ত্ববিদ এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম স্রষ্টা শুড়োর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তখনকার দিনে বিদ্যৎসমাজে বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। পুরা তত্ত্ব সংগ্রহে রাজেন্দ্রলালের দান অবিস্মরণীয়। প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নামে অধিক পরিচিত। 'আলালের ঘরের দুলাল' রচয়িতা টেকচাঁদ 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রেততত্ত্বে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। পশুক্লেশ নিবারণ আইন তাঁর প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরী মিত্র 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' নামক একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক হন। এই সময়ে হ্যালিডে সাহেব তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করেন। বিজ্ঞান জগতে দিকপাল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাড়ুলি কাটিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এস-সি হয়ে দেশে গবেষণা আরম্ভ করেন। গন্ধক দ্রাবকের সঙ্গে তাম্র লৌহ প্রভৃতি মিশ্রণে যৌগিক পদার্থের উৎপাদন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার ফল। তাঁর প্রচেষ্টায় বেঙ্গল কেমিক্যাল ঔষধের কারখানা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যশোরের ডঃ নীলরতন ধর ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞানজগতে অমূল্য জীবন। চিকিৎসাজগতে সূর্যকুমার সর্বাধিকারী নীলরতন সরকারের অবদান কলকাতার লোকে ভুলতে পারে না। এটর্ণি ভূপেনবাবু ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যতীনবাবু কলকাতার বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত। দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের মধ্যে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত অমূল্য বিদ্যাভূষণ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রসন্ন সর্বাধিকারী ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী প্রভৃতির স্মৃতি বিলীন হবার নয়।

দুঃস্থ বলাক রামদুলাল সরকার সততার গুণে তখনকার দিনে কলকাতায় কেমন করে কোটিপতি হয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। হাটখোলার দত্ত মদনমোহনের গৃহে রামদুলালের মাতামহী কর্মরতা ছিলেন। রামদুলালও মাতামহীর সঙ্গে থাকতেন। মদনমোহন রামদুলালকে তাঁর সহকারী করেন। ডুবো জাহাজ কিনে তা এক সাহেবকে বিক্রী করে রামদুলাল এক মুহূর্তে লক্ষ টাকা লাভ করেন। লাভের টাকা মদনমোহনের নিকট রেখে তাঁর বিনানুমতিতে জাহাজ কিনেছেন সেজন্য ক্ষমা চাইলেন। মদনমোহন সেই টাকা রামদুলালকে দান করেন এবং এই টাকায় ব্যবসা করে রামদুলাল কোটিপতি হন। অর্থবান রামদুলাল কখনো তাঁর পুরোনো মনিবের বাড়ীর সামনে দিয়ে গাড়ী চড়ে যেতেন না এবং আমরণ চাকরের প্রাপ্য ধুতি উড়ানি তিনি শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করতেন। সততা ও কৃতজ্ঞতা তাঁর মূল্য মাপকাঠির বহির্ভূত রামদুলালের এই ছিল চিন্তাধারা। তাঁর সন্ততি ব্যবসাগিরি করে অর্থ অপচয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কীর্তি মিত্তির ও অক্রুর দত্ত ব্যবসা করে প্রচুর ধনশালী হন। এই বংশে উমেশচন্দ্র দত্ত ১৮২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংবাদ প্রভাকরের লেখক ছিলেন। হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপিত হল। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন অধ্যক্ষ ও উমেশচন্দ্র এর সম্পাদক হন। মজিলপুরের উমেশ দত্ত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, সিটি কলেজ ও মুকবধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কর্মপটুতার পরিচয় দেন।

কলকাতার রামবাগানের দত্তবংশ জ্ঞানবিদ্যায় তখনকার দিনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই বংশের তরু দত্ত ফরাসী গীতিকবিতার ইংরিজী অনুবাদ করে বিখ্যাত হন।

রামবাগানের দত্তবংশ অলঙ্কৃত করেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শাসন বিভাগে কার্য করেন। জীবন প্রভাত জীবন সন্ধ্যা, মাধবী কঙ্কণ প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিরাট অবদান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি প্রথম সভাপতি।

ঝামাপুকুরের দিগম্বর মিত্র কাশিমবাজার এস্টেটের ম্যানেজার হন। রাজা কৃষ্ণনাথ তাঁকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। এই টাকার সাহায্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ে উন্নতি করেন। সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। তিনি কলকাতার প্রথম শেরিফ।

২৪ পরগণা জেলার হরিনাভী গ্রামে জানকীনাথ বসুর জন্ম। কটকে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জানকীবাবুর পুত্র শরৎচন্দ্র বসু দেশকর্মী হিসাবে বিখ্যাত। সুভাষচন্দ্র বসু জানকীবাবুর অপর পুত্র। তিনি আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও তিনি তা গ্রহণ না করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর দেশসেবা সর্বজনবিদিত।

স্যার রমেশ মিত্র রাজারহাটের বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাইকোর্টের জজ এবং দুইবার প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। স্যার রমেশ মিত্রের বংশে বহু কৃতী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। স্যার বি সি মিত্র ও স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

গণেশ চন্দ্র কলকাতার বিখ্যাত এটর্নি তাঁর বংশে দেশকর্মী নির্মল চন্দ্র ও প্রতাপ চন্দ্র সর্বজনপরিচিত ব্যক্তি। বিডন স্ট্রীটের নিমাই বসু ও ঠনঠনিয়ার আর সি দেব ও তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ এবং দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কম্বুলেটোলার মিত্রবংশ ও চোরবাগানের মিত্রবংশ প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী। কম্বুলেটোলার অভয়চরণ মিত্র দানশীল ও রূপেন্দ্র মিত্র হাইকোর্টের জজ হন। জজ দ্বারিক মিত্র কায়স্থসমাজের গৌরব হিন্দু আইনে সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজা সুবোধ মল্লিকের নামের পার্ক তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। হোম সিভিলিয়ান সুবোধ মল্লিক দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

ভবানীপুরের প্রিয়নাথ মল্লিক ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক আইনজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

শ্যামবাজারের মোহনলাল মিত্র কায়স্থ সমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি। রায় রামসুন্দর মিত্র এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁদের পূর্ব বাসস্থান বারাসাত। পাটনায় বিরাট জমিদারীর মালিক। রায় ললিত মিত্র বড়লাটের আইন পরিষদের সভ্য ছিলেন। মিত্রদের দৌহিত্র বংশ বাগবাজারের সুবিখ্যাত বসুরা। নন্দলাল ও পশুপতি বসু গয়ায় বিস্তৃত জমিদারীর মালিক ছিলেন। বাগবাজারের বাড়ীর সামনে তাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্বদেশী মিটিং হত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ জমিদার। ইনি মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করে বিখ্যাত হন। 'হুতোম পেঁচার নকসা' তৎকালীন সমাজচিত্র কালীপ্রসন্ন সিংহের অবদান। পরিদর্শক নামক দৈনিক পত্র ও হিন্দু পেট্রিয়ট তিনি পরিচালনা করেন। নীল দর্পণের বিখ্যাত মামলায় পাদ্রী লং সাহেবের জরিমানার টাকা তিনি দিয়ে দেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম চিরপ্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণরাম বসু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে হুগলির দেওয়ান ছিলেন। লবণের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কৃষ্ণ রায় মাহেশের রথযাত্রার প্রবর্তক।

তখনকার দিনের খ্যাতনামা বক্তা রামগোপাল ঘোষ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডিরোজিও সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়

ছাত্র ছিলেন। ইনি কিছুদিন ছোটলাটের শাসন পরিষদের সভ্য ছিলেন।

নন্দকুমার বসু দেওয়ান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাটনা কুঠীরের দেওয়ান ছিলেন। পরম বৈষ্ণব নন্দকুমার বৃন্দাবনে গোবিন্দজী, গোপীনাথ ও মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় দেন।

পরমানন্দ দাস কাঁচরাপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। কবিত্বশক্তির জন্য শ্রীচৈতন্য এঁকে 'কবিকর্ণপুর' উপাধি প্রদান করেন। সংস্কৃতে চৈতন্যচরিতামৃত এঁর রচনা; ১৪৪৬ শকে জন্ম।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র কোমগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রগাঢ় আইনজ্ঞ ছিলেন। তিনি 'টেগোর ল'এর অধ্যাপক ও ইংলণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন।

গুরুপ্রসন্ন ঘোষ জোড়াবাগানের বিখ্যাত ঘোষ বংশে এঁর জন্ম। সাহিত্যে ও বিজ্ঞানের অনুরাগী গুরুপ্রসন্ন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের বিদেশে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে এইজন্যে চারি লক্ষ টাকা দেন।

রাম শর্মা, আসল নাম নবকৃষ্ণ ঘোষ। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ বংশে এঁর জন্ম। বাংলাদেশের এ্যাসিস্টেণ্ট একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের পদ লাভ করেন। সম্ভবত এই পদে প্রথম বাঙ্গালী তিনি। জ্যোতিষ প্রকাশ তাঁর বাংলা ভাষায় জ্যোতিষের গ্রন্থ।

এ প্রসঙ্গে বরদাচরণ মিত্র, বরদাপ্রসাদ মজুমদার চন্দ্রনাথ বসু, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রমথনাথ বসু, মনমোহন বসু, অমৃতলাল বসু যোগীন্দ্রনাথ সরকার, যোগীন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু, গিরীশ বসু, দীনবন্ধু মিত্র শ্রীশাওরাজকুমার সর্বাধিকারী হরিনাথ দে, নন্দলাল বসু গিরীশচন্দ্র ঘোষের নামও স্মরণযোগ্য।

বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরীশ বসু বিজ্ঞানাচার্য ছিলেন। এই কলেজের একদা অধ্যাপক পান্নালাল বসু ভাওয়াল মামলার বিচারক হিসাবে যশস্বী হন। দীনবন্ধু মিত্র নদীয়ার চৌবেড়ে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের নতুন করে পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। নীলদর্পণ ভারতের বহু স্থানে অভিনীত হয়েছে। রচনানৈপুণ্যে দীনবন্ধু ছিলেন অদ্বিতীয়। কবিতাশক্তিও তাঁর ছিল প্রচুর। 'সধবার একাদশী' নাটক রঙ্গমঞ্চে খ্যাতিলাভ করে। ইংরাজী নীলদর্পণের ভূমিকা লিখে রেঃ লং মানহানির দায়ে একমাস কারাদণ্ডে ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। দীনবন্ধু নাট্যজগতে একজন দিকপাল। নাট্যজগতে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেন তাঁদের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণীয়। ইনি প্রসিদ্ধ এটর্ণি ও দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা। চিত্রমঞ্চে গৈপুরের মধু বোস ও তাঁর স্ত্রী সাধনা বোসের নাম উল্লেখযোগ্য। কালীঘাটের শম্ভু মিত্র ও তাঁর স্ত্রী তৃপ্তি মিত্র রঙ্গজগতের সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ও অভিনেত্রী। চিত্রজগতে চির-পরিচিত সত্যজিৎ রায় নদীয়া জেলার কায়স্থকুলে জন্ম কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সমাজ সাংবাদিকতায় এবং সংবাদপত্র পরিচালনার মাধ্যমে দেশ-সেবার আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হন। বেলগাছিয়ার কলেজ ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর স্থাপন করেন। এই কলেজের বহু ছাত্র পাশ করে সুবিখ্যাত হয়েছেন। ডাঃ দুর্গাপদ কর তাঁর পিতা—এঁরা শ্যামবাজারের লোক।

সিমলার কাশীনাথ ঘোষের পৌত্র গিরীশচন্দ্র বেঙ্গল রেকর্ডার নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন পরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নাম হয়। 'বেঙ্গলী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার ইনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।

এখন কয়েকটি বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের পরিচয় প্রয়োজন যাঁরা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজভুক্ত ও সমাজের গৌরব।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ ছিলেন যশোরের উকিল। মাতা অমৃতময়ী আদর্শ হিন্দু গৃহিণী। শিশির-কুমার নিজ অধ্যবসায় বলে বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করে জ্ঞানার্জন করেন। হৃদয় ছিল কোমল এবং দয়াপ্রবণ। পরদুঃখকাতরতা শিশির-কুমারের এক মহৎ গুণ। তাঁর যৌবনে দেশে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি আত্মোৎসর্গ করেন। নীলকর সাহেবরা তখন দেশের কৃষককুল ধ্বংস করে দিয়েছে। শাসকশ্রেণী নীলকর সাহেবদের সহায়ক। শিশিরকুমার প্রথমে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন কিন্তু বিশেষ কার্যকরী হল না। তিনি যশোর থেকে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করলেন। প্রথমে যশোরের সাহেব ম্যাজিস্ট্রেরা তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন কিন্তু যখন তাঁর পত্রিকা নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে আরম্ভ করল তখন সাহেবরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের সংকল্প করল। তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করা হল—জেলে আটকাবার চেষ্টা চলল। সাহেবরা তাঁকে চাকরী দিতে চাইল কিন্তু শিশির-কুমার সে চাকরী প্রত্যাখ্যান করলেন। যশোর তখন ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান। মহানদপুরে ম্যালেরিয়া সর্বপ্রথম দেখা দিল। এর পর ম্যালেরিয়া সমগ্র দেশে পরি-ব্যাপ্ত হল। শিশিরকুমার ম্যালেরিয়ায় বার বার আক্রান্ত হলেন তখন অন্য কোন উপায় ছিল না। তাঁকে দেশ ছাড়তে হল

॥ সদ্য প্রকাশিত হল ॥

গীদ্য মোপাসাঁর "বেল-আমি" পৃথিবীখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ

এক নায়ক অনেক নায়িকা ১০

অমিতাভ দাশগুপ্তর সরোজ প্রভাকর-এর উপন্যাস

সেই লোকটি ৭ সুচরিতাষু ৬

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সামনে আড়ালে	৮
সমুদ্রের সামনে	৬
নীহাররঞ্জন গুপ্তর উপন্যাস	
সুভদ্রা হরণ	৬
অসীমানন্দ মহারাজ-এর উপন্যাস	
বারবধূ	৭
চিরঞ্জীব-এর খেলার বই	
স্পোর্টস ডায়েরী	৮
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য-উপন্যাস	
ধূপের ধোঁয়ায়	৮

নিশচর-এর রহস্য উপন্যাস

রাত্রি গভীরে	৬
জীবন রহস্য	৬
সুবোধ ঘোষ-এর সাড়া জাগানো উপন্যাস	
দুই গন্ধর্ব	৮
বৈতালিক-এর নতুন গ্রন্থ	
রিক্ত বসন্ত	৭
দীপক চৌধুরীর নতুন স্বাদের উপন্যাস	
স্বাদ	৭
গজেন্দ্রকুমার মিত্র-র উপন্যাস	
রাতের বাসা	৬

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-র আলোড়ন সৃষ্টিকারী যে উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে

তিন পরী ছয় প্রেমিক ৪

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ নবীন কুণ্ডু লেন ॥ কলিকাতা—৯

এবং প্রথমে বহুবাজার ও পরে বাগবাজারে বাসা নিলেন। এখান থেকে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হল। পুরাতন মুদ্রণযন্ত্রটি এখনও পত্রিকা অফিসে সযত্নে রক্ষিত আছে। শিশিরকুমারের প্রচেষ্টায় দেশ হতে নীল চাষ উচ্ছেদ হল। দেশের এত বড় মহাউপকার আর কারও দ্বারা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয় না। অমৃতবাজার জাতীয়তাবাদী পত্রিকা এবং জগতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত পত্রিকা। শিশিরকুমারের অর্থলালুপতা ছিল না। লাট সাহেবদের প্রিয়পাত্র শিশিরকুমার ইচ্ছা করলে তাদের সহায়তায় বিশেষ অর্থশালী হতে পারতেন। তাঁহার লেখা 'অমিয় নিমাই চরিত' সমাদৃত বৈষ্ণব গ্রন্থ। তাঁহার অনুজ মতিলাল পত্রিকার সম্পাদনা করে যশস্বী হন। অমৃতবাজার পত্রিকা আজ পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত। ইহার মূলে তুষারবাবুর দান অপরিসীম। অতি অল্প বয়েসে তুষারবাবু পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। দেশের সকল সমস্যা স্বদেশী যুগে ইংরেজদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপন্থী আচরণ অমৃতবাজার পত্রিকা দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদের স্বর্ণলেখনী দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই রাজরোধে হল তুষারবাবুর কারাদণ্ড। তুষারবাবু পিতার বহু গুণের অধিকারী। সর্বজীবে দয়া তাঁর বৈষ্ণবত্বের মহৎ পরিচয়। বাংলাদেশের বহু সংস্থার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট। শিশিরকুমারের গৌরাঙ্গ মূর্তি বৃন্দাবনে স্থাপন করে তিনি কীর্তিমান। দেওঘরে কুমুদিনী ঘোষের নামে যে রাস্তা তিনিই তুষারবাবুর মাতা। একমাত্র পুত্র তরুণকান্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী এবং পিতামহের মতো গোরক্ষাতপ্রাণ। কন্যা শ্রীলেখা সুলেখিকা এবং সাহিত্যের অধ্যাপিকা। সুপ্রচারিত দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা এই ঘোষ পরিবার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। সাপ্তাহিক পত্রিকা অমৃত তার সম্পাদক তুষারবাবু। যুগান্তর পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক এই ঘোষ বংশের সুকোমলকান্তি ঘোষ।

কান্যকুব্জের পঞ্চ-কায়স্থ যাঁরা রাঢ়দেশে এসেছিলেন তাঁদের সন্ততিগণ ও দক্ষিণ-রাঢ়ী সমাজভুক্ত কায়স্থ সম্প্রদায় কৃষ্টি ও সর্বাধিক উন্নতির মূল সোপানে আরূঢ় হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয়েছেন এবং তাদের কর্মপ্রচেষ্টায় দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ রুমোন্নতি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বৈষ্ণব ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে কায়স্থ সমাজের উপর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভাব যেমন বিস্তৃতি লাভ করেছে, তেমনি শক্তির উপাসক এই সমাজ ভক্তির নিগড়ে চির আবদ্ধ। দুটি অসুর নিধন করে যে দেবী তিনিই দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা—বঙ্গের সেই চির আরাধ্যা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেশের অপর সম্প্রদায়ের মত দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজ দুর্গাপূজায় বিলাসবিভবে টেক্কা দিয়ে চলিত। চন্দননগরের নিকট গোঁদলপাড়ার বারজন বন্ধু চাঁদা তুলে গোঁদলপাড়ার হাটখোলায় প্রথম সার্বজনীন দুর্গাপূজা করেন। তাদের লোকে বলতো বার-ইয়ার। এই বার-ইয়ার বারোয়ারী হয়ে এখন সর্বত্র বারোয়ারী পূজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঠনঠনের শঙ্কর ঘোষ লেনের ঘোষেরা বনেদী কায়স্থ। ঠনঠনের কালীবাড়ী তাঁদের প্রতিষ্ঠিত। এই বংশে ডাঃ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। বৈষ্ণব মতের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যকে অনেকে পূর্ণ ব্রহ্ম মনে করেন। তাঁর নিমাই নাম অনেকের কাছে অতি প্রিয়। মহাত্মা শিশিরকুমার তাই তাঁর গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের নিমাই নাম গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরপুরী তাঁকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেন, এবং পরে কাটোয়ার দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যের মতবাদ কায়স্থ সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত হয়ে আছে। এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে তান্ত্রিক যোগী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের অভ্যুত্থান, তন্ত্রোক্ত সাকার দেবীমূর্তির তিনি প্রবর্তন করেন। স্বপ্নাদেশে তিনি আলুলায়িত কুন্তলা শ্যামাঙ্গী শ্যামা মূর্তি গঠন করে পূজোর ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর নির্ধারিত নীতি অনুসারে শ্যামাপূজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। নবদ্বীপে তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব মতবাদের সংঘর্ষের কথা সর্বজনবিদিত। রাজশক্তি প্রথমে শ্রীচৈতন্যের বিরোধিতা করেন কিন্তু অবশেষে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কাজী শ্রীচৈতন্যের মতবাদে আকৃষ্ট হন। কায়স্থ সমাজের সর্বস্তরের জনগণ উভয় মতবাদের বিশ্বাসী। জগদ্ধাত্রী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুষ্ঠিত পূজা। চন্দননগরের অধিবাসিগণ কৃষ্ণনগরের মতই মহাধুমধামে এই পূজো প্রতিপালন করেন। কান্যকুব্জের পঞ্চ-কায়স্থ বঙ্গদেশে কায়স্থ কুলের শিরোমণি হয়ে সমাজের শক্তিবৃদ্ধি ও প্রসারের প্রচেষ্টায় সমকৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে তাঁদের গণ্ডীভুক্ত করে নিয়েছিলেন। বল্লালী কৌলিন্যের প্রবর্তনের পূর্বাবধি এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। 'নবধা' কুল লক্ষণ কৌলিন্যের মাপকাঠি হল বটে কিন্তু পঞ্চ-কায়স্থদের বংশধরগণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত অপর কায়স্থগণকে উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও কৌলিন্য মর্যাদা দানের বিরোধিতা করে তাঁদের 'মৌলিক' আখ্যায় নামাঙ্কিত দিলেন। কৌলিন্যের নয়টি গুণ কি কোন মৌলিক কায়স্থের ছিল না? পঞ্চ-কায়স্থদের বংশধরগণ কি কৌলিন্যের সকল গুণের অধিকারী ছিলেন? কান্যকুব্জের অধিপতি যশোবর্মদেবের বন্ধু রাজা শশাঙ্ক সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। বল্লাল সেনের রাজত্বকাল এগার শতক। উভয় রাজত্বের একশ' বছর বাদ দিলে শশাঙ্ক হতে বল্লাল সেন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে চারশ' বৎসর ধরা যেতে পারে। দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থদের পূর্বপুরুষ বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের ৪০০ বৎসর পূর্বে এদেশে বসবাস করেন। যাঁরা কান্যকুব্জ হতে এসেছিলেন তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে এনেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। না আনারই বিশেষ সম্ভাবনা, কারণ তাঁদের পঞ্চ-ব্রাহ্মণের সাহচর্যই ছিল এদেশে আসার উদ্দেশ্য। এই সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর তাঁদের বংশ বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছিল বৌদ্ধ কিংবা অপর বংশোদ্ভূত কন্যাদের বিবাহ করে। তখন বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তি হয়েছে। যাঁরা বৌদ্ধ, তাঁরা কায়স্থদের সঙ্গে সমকৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন বলে সহজে কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করতে সক্ষম হন। ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের আমল দিল না কাজেই তাঁরা সমাজের দ্বিতীয় স্তরে ঠাঁই করে নিলেন। নবনীতা বৌদ্ধ-কন্যারা পঞ্চ কায়স্থদের সন্তান-সন্ততিগণের গৃহিণী হয়ে গেলেন। কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অনড় ছিল। বল্লালী কৌলিন্য রাজকৃপায় সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল—নবাগত বৌদ্ধদের কায়স্থ সমাজে ঠাঁই হল বটে কিন্তু তাঁরা মৌলিকত্বে চিহ্নিত হয়ে কুলিনদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন। আবার যাঁরা মৌলিক তাঁরাও আবার কৃষ্টিগত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হলেন। মৌলিকদের ওপর কুলিনদের আধিপত্য চিরবিদ্যমান। এখনও মৌলিকের কন্যার বিবাহে কুলিনকে কুলমর্যাদা দিতে হয়। এখনকার যুগে পাশ্চাত্যের অভিযানে বল্লালী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। পাত্র-পাত্রীর উপযুক্ততাই বিবাহের মাপকাঠি। কৌলিন্য-চক্র এখন ক্রমশঃ অচল হয়ে আসছে এবং কৌলিন্য প্রথা দ্রুত অবলুপ্তির পথে। এখন রক্তধারার পথে নয়, কৃষ্টিই হবে কৌলিন্যের মূল সূত্র। দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজ সেই পথে এগিয়ে চলেছে। কায়স্থ সমাজের অনেকেই বিদেশিনী গৃহিণী এনে সমাজভুক্ত হয়ে আছেন। ইংরেজের রাজত্ব চলে গেছে, হয়তো এ-সুযোগ আর সম্ভব হবে না।

উপন্যাস

মনোজ বসু।

সেই সব মানুষ

ক্ষেতে ধান পাকতে লেগেছে। কাটাও শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্মীঠাকরুণ বিল ছেড়ে গৃহস্তের উঠানে গুটি গুটি আসন নিচ্ছেন। আটির গায়ে সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ। দেখতে দেখতে সব ধান পেকে গেল। তেপান্তরের বিলে সবুজের একটা গোছাও নেই কোন দিকে। চতুর্দিকে সোনা। যতদূর নজর চলে, দেখা যায় পাকা ধানের সোনা ঢেলে দিয়েছে যেন প্রকৃতি। সেই সঙ্গে হিমের আমেজ।

ভুবনাথের উঠোনে ধান উঠেছে গেছে। তাই ছেলেদের বায়না নতুন চালের ফ্যানসা ভাত খাবে। কিন্তু পুজো না দিয়ে নবান্ন না করে খাবার নিয়ম নেই। একদিন তাই পুরুত ডেকে পুজো আচ্চাও হয়ে গেল। ভাটিয়াল চালের মিষ্টি ফ্যানসা ভাত গরম গরম পাতে পড়তেই বাচ্চাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। দেবুবুড়িও তাদের মাঝখানে বসেছেন। একবার এর গালে একবার ওর গালে ভাত তুলে দিচ্ছেন। যেন

উৎসব লেগে গেছে। এদিকে ভুবনাথের বিলে যাবার তাড়া। ছেলেরা সব লায়েক হয়েছে। জলকাদা ভাঙগতে তাদের বয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই তিনি কাঁধে চাদর ফেলে ছাতা ও লাঠি হাতে হন হন করে বিলমুখো চললেন। উঠোনে তখন বাড়ির মেয়েদের বড়ি দেবার ধুম লেগেছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এক পাঁজা চেরা-গামড়া গুণমনি রান্না-ঘরের দাওয়ায় ঝপ্ করে এনে ফেলল। গোয়াল বাড়ানো গোবরে ঝুড়ি ভর্তি করে তক্ষুণি আবার বেড়ার ধারে চলে গেল। কাঞ্চিচর গায়ে মশালের মতন গোবর চেপে চেপে বেড়ার গায়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। শুকনো মশাল পোড়াতে বড় ভাল। কোনটার কি করবে গুণমনিকে বলে দিতে হয় না। বললে হয় তো করবেই না আর-কিছু ফরফরিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। যতক্ষণ আছে হাত দু-খানা চলছেই। উপরওয়ালা কোথায় যেন চোখ পাকিয়ে রয়েছে ত্রিলোক জিরান নিলে সে রক্ষে রাখবে না।

ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে গ্রাম পথে—সামাল সামাল। মস্ত বড় দল—পদো নিমু পটলা বদ্যিনাথ যতীন ইত্যাদি এবং কমল তো আছেই। আগে পিছে লাইন বন্দী হয়ে জঙ্গলে সুঁড়ি পথে দুরন্ত বেগে ছুটেছে। পথ ছাড়ো পাশে গিয়ে দাঁড়াও না। সওয়ারের দল চকিতে ছুটে বেরিয়ে যাবে আবার তখন পথ চলবে।

আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙ্গে চাবুক করে নিয়েছে নির্মমভাবে চাবুক মারছে জোর ছুটানোর জন্য। ঘোড়া যেহেতু খেজুর-ডেগো-যতই মারো ক্ষেপে যাবার শঙ্কা নেই। মানুষজন সামনে পড়লে হাসতে হাসতে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। তারিপ করে ঃ বাঃ খাসা ঘোড়া তোমাদের কদম চালে ছুটেছে। একদিন কোন দরকারে থানা থেকে দারোগা এসেছিলেন। ঘোড়সওয়ার কমল, টের পায় নি—ছুটতে ছুটতে একেবারে সামনে পড়ে গেল। দারোগাও ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। বললেন ঘোড়া একটুখানি দাঁড় করাও খোকা দেখি বাঃ লাগাম-টাগাম সবই তো ষোল-আনা আছে। আমার ঘোড়ায় তোমার ঘোড়ায় বদলা-বদলি করি এসো। আমার ঘোড়া দু-আনার দানা খায় নিত্যিদিন তোমার ঘোড়ায় একটি পয়সা খরচা নেই। রাজি থাকো তো বলো। কমল আর নেই সেখানে। জোর ছুটিয়ে ঘোড়া সহ পালিয়ে গেছে।

জোর কদমে চলবার মুখে মাঝে মধ্যে ঘোড়া চিঁ-হি-হি ডাক ছাড়ে। ক্লান্ত ঘোড়ার পক্ষে যা করা উচিত। ডাকটা বেরোয় অবশ্য সওয়ারের মুখ দিয়ে। নতুন বাড়ির বাঁধা-ঘাটের সামনে কামিনী ফুল-তলায় সওয়ারেরা কাঁধের ছোটা নামিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। জল খাইয়ে নিচ্ছে ঘোড়াগুলোকে—ডেগোর মাথা সিঁড়ি দিয়ে জলে নামিয়ে দিয়েছে। দূরের পথ বিশ্রামের সময় নেই তক্ষুনি আবার রওনা। তেলির-ভিটে হরি-তলা টেপুর-মাঠ ভারি ভারি দুর্গম জায়গা পার হতে হবে। তারপর আক্রমণ লুঠপাট—'বর্গি এলো দেশে' বর্গিদের গল্প শুনেছে সে প্রহ্লাদ-মাস্টারমশায়ের কাছে—সেই বর্গিদের মতন।

তীর বেগে ছুটেছে। লক্ষ্যভূমে পৌঁছে গেল অবশেষে। মটর ক্ষেত। লকলকে সবুজ মটর লতা—শুঁটি সামান্যই ধরেছে আফুরন্ত বেগুনি ফুল। আতশত কে দেখতে যাচ্ছে—ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্বারোহী দল। দু-এক গোছা সবে উপড়ে নিয়েছে—

ক্ষেতের মধ্যে কারা?

তাজুগাছি পাশের খেজুর বনের ভিতর থেকে হুংকার দিয়ে উঠল। দেড় প্রহর বেলায় খেজুর বনে মানুষ কে ভাবতে পেরেছে। ভাঁড় পোড়াচ্ছে তাজু। খেজুর রস ঢেলে নেবার পর খালি ভাঁড়গুলো এমুখ-ওমুখ করে সাজিয়ে দিয়েছে—বিচালির লম্বা বোঁদা মাঝখানটায়। বোঁদার দুই প্রান্তে আগুন-ধরানো ধিকি-ধিকি জ্বলতে জ্বলতে আগুন এগুচ্ছে ধোঁয়া প্রচুর। ধোঁয়া ভাঁড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। ভাঁড় পোড়ানো এর নাম। ভাঁড়ে ধোঁয়া দেওয়া না হলে রস গেঁজে ওঠে।

ঝিউতপাল (ঝি-পুতের পাল?) কারা এসে পড়লি—দাঁড়া দেখাচ্ছি তোদের—

মুখের তড়পানি মাত্র নয়—কাজ ফেলে তাজু সর্দার মটর ক্ষেতে লম্ফ দিয়ে পড়ল, হাতে বাঁক। এহেন গোলমেলে জায়গায় তিলার্ধকাল থাকতে নেই। যে যা তুলতে পেরেছে লুঠের মাল নিয়ে বর্গি দল ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আবার। ঘোড়ার সঙ্গে মানুষ কি করে ছুটে পারবে—তাজু সর্দার ক্ষেতের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বিজয়ীরা এক-একবার মুখ ফিরিয়ে দেখে নেয়। পরাজিত সর্দার হি-হি করে হাসছে ঃ উৎপাত তো আছেই—গরু-ছাগল এসে পড়ে, শজারু-খরগোস আসে রাত্তির বেলা সেই একবার পঙ্গপাল পড়েছিল। আর আছে তল্লাটের এইসব ছেলে-পুলে। এই তো আর ক'টা দিন—কলাই খোলাটে উঠে গেলে আর কেউ ক্ষেতে আসবে না।

ছুটছিল ধুপ করে কমলরা ঘোড়া থামিয়ে দিল। মজার পরে মজা—পাখি-ধরা এসেছে। গাছে গাছে মেলা পাখি—আজকে ঘুঘু ধরবে যেহেতু খাঁচার মধ্যে ঘুঘু পাখি দেখা যাচ্ছে।

পাখি-ধরার এক হাতে সাতনলা আর এক হাতে খাঁচা। সাতখন্ড বাঁশের নল দিয়ে সাতনলা হয়। একেবারে সরু তার চেয়ে সামান্য মোটা তারও চেয়ে মোটা—এমনি সাতখানা। নলের গর্ভে অন্য নল ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে শেষমেশ একখানা লম্বা লাঠি হয়ে দাঁড়ায়। আর বাঁশের শলায় বানানো ছোট্ট খাঁচা। খাঁচার মধ্যে বাখারির দাঁড়ের উপর তালিম দেওয়া পোষা ঘুঘু। দাঁড়ের খানিকটা বেরিয়ে আছে খাঁচার বাইরে—অতিথি পাখির আসন হয়ে ওখানে।

এ-ডালে ও-ডালে ঘুঘু ডাকছে। পাখি-ধরা পা টিপে টিপে গাছের তলায় চলেছে। জল্লাদ দেখা যায় এখানেও মাতব্বর। হাত তুলল—অর্থাৎ নিঃশব্দ আদেশ ঃ এগোবি নে কেউ এদিকে। ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল—অর্থাৎ ঃ মুখ দিয়ে এতটুকু শব্দ না বেরোয় পাখি না ওড়ে। পাখি-ধরার হুয়ে জল্লাদের কেন খবরদারি এত? পরে জানা গেল সাগরেদ হয়ে পাখি-ধরা বিদ্যেটাও ষোলআনা রপ্ত করে নিতে চায় সে। এই বিদ্যেয় কিছুটা সে কমজোরি আছে।

কর্মারম্ভ। সরু নলের মাথায় ঘুঘুর খাঁচা বাঁধা। গর্ভগত নল একের পর এক বেরিয়ে যাচ্ছে খাঁচা উঁচুতে উঠছে ক্রমশ। উঠতে উঠতে উঁচু ডাল একটা ছুঁয়ে ফেলল। ব্যস স্থিতি। খাঁচার পাখি ঘুঘুউউ-ঘুঘু ডাকছে ডাকের ভিতরে আদর গলে গলে পড়ছে বেশ বোঝা যায়। ডেকেই চলেছে। কথা হল না—বনের ঘুঘু উড়ে এসেছে একটা চক্কোর দিল একটু তারপর বেরিয়ে-আসা দাঁড়ের উপর বসে পড়ল। তখন খাঁচার জন ডাকছে বনের জনও ডাকছে। অবস্থা ক্রমশ আরও সঙ্গিন—খাঁচার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে পোষাজনের গায়ে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে বনের জন। সাতনলা ওদিকে দ্রুত গুটিয়ে নিচ্ছে—নলের মধ্যে নল ঢুকিয়ে বনের ঘুঘু একেবারে পাখি-ধরার নাগালে এসে গেল। দাঁড়ে আঠা মাখানো আঠায় পা এঁটে গেছে উড়ে পালাবে সে উপায় নেই। আরও আছে। খাঁচার গায়ে ফাঁস ঝুলানো—আদর করার মুখে সেই ফাঁসের মধ্যে গলা ঢুকে গেছে। যত টানছে ফাঁস এঁটে যাচ্ছে।

জল্লাদ পাখি-ধরার সব কায়দা জানে শুধু ঐ আঠা বানানো শিখে নিলেই হয়। সেই দরকারে লোকটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

রাজিবপুরে পোস্টাপিস সোনাখড়ি তার অধীনে। পিওনঠাকুর যাদব বাঁড়ুয্যে রবিবার আর বিষ্যুৎবার সোনাখড়ি এসে চিঠি বিলি করেন। হাটবার এই দু-দিন—হাটেও কিছু চিঠি বিলি হয়। সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে হাটে মাছ তরকারি কিনে প্রহর খানেক রাত্রে হাটুরে দলের সঙ্গে পিওনঠাকুর বাড়ি ফিরে যান। পিওন-ঠাকুরের পদরেণু আজ পুব বাড়িতে পড়ল। বাইরের উঠান থেকে সাড়া দিচ্ছেন ঃ কই গো কোথায় সব?

রান্নাঘরে অলকা-বউ উসখুস করছে। এ-বাড়ির চিঠি এসেছে—চিঠি না থাকলে পিওনঠাকুর আসতে যাবেন কেন? কল-কাতার চিঠি বিস্তর কাল আসেনি—হতে পারে চিঠি সেখানকার। টুকটুকির বাপই হয়তো বা লিখেছে টুকটুকির মাকে। মানুষটার বিচিত্র স্বভাব। বাড়ি এলে আর নড়তে চায় না। দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করে বাইরের ঘরে উঠল কোন এক ছলছুতোয় যাত্রা ভেঙে নিজস্ব পশ্চিম ঘরে ঢুকে পড়ে আবার। বারম্বার এমনি যাত্রা করা এবং যাত্রা ভাঙা চলতে থাকে। শেষটা হুড়ো আসে কাকামশায় দেবনাথের কাছ থেকে। চিঠি পাঠান ঃ এই হপ্তার ভিতরে হাজির না পেলে বরখাস্ত করব। নিজের ভাইপোকে চাকরি দিয়ে বদনামের ভাগী হয়েছি এর উপরে কাজের গাফিলতি একটুও সহ্য করব না। তখন যেতে হয়। আর গিয়ে পৌঁছল তো বাড়ির কথা সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। চিঠির পর চিঠি দিয়ে এক ছত্র জবাব মেলে না। অলকার কথা ছেড়ে দাও কিন্তু ননীর পুতুল এক ফোঁটা এই টুকটুকি আধো-আধো বুলিতে বা-বা বা-বা করে এর কথাও কি এক লহমা মনে উঠতে নেই? এই সমস্ত ভাবে অলকা ভেবে ভেবে নিশ্বাস ফেলে।

সেই যে সেবার দুর্গোৎসবের মধ্যে হরিষে-বিষাদ ঘটে গেল। কান্নায় কান্নায় বাড়ি তোলপাড়—একটি মানুষের চোখেই কেবল জল নেই। তিনি দেবনাথ। নিজে তো কাঁদেন না অধিকন্তু তরংগিনীকে বোঝাচ্ছেন ঃ ও মেয়ে আমাদের নয় আমাদের হলে নিশ্চয় থাকত অতিথি হয়ে দু-দিনের জন্য এসেছিল।

ভাবগতিক দেখে ভবনাথ ভয় পেয়ে যান। বলেন ভাই আমার ভিতরে ভিতরে কাঁদে। এ বড় সর্বনেশে জিনিস। ডাক ছেড়ে কান্না অনেক ভাল বুক তাতে অনেকখানি হালকা হয়ে যায়।

কালীপুজো অবধি দেবনাথ বাড়ি থাকবেন—কোজাগরীর দিন সন্ধ্যাবেলা এই পিওনঠাকুর রাজীবপুর থেকে এসে পাশায় বসবেন, চিপিটক-নারিকেলোদক খেয়ে সারা রাত অক্ষক্রীড়া চলবে। পঞ্জিকা মতো কোজাগরী নিশি-জাগরণের যে বিধি। এত সব কথাবার্তা হয়ে আছে। কিন্তু মা-কালী মাথায় থাকুন—কোজাগরীরও দু-দিন আগে ত্রয়োদশীর দিন-সর্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী কোন সিদ্ধির তল্লাসে দেবনাথ যাচ্ছেন কে জানে—কিছুতে আর তাঁকে বাড়ি আটকানো গেল না।

উমাসুন্দরী ভবনাথের কাছে নালিশ জানাচ্ছেন ঃ ঠাকুরপো চলে যাচ্ছে।

ভবনাথ বললেন তাড়িয়ে দিচ্ছ তোমরা না গিয়ে করবে কি?

'তোমরা' ধরে বললেন—কিন্তু আর সবাই চুপ হয়ে গেছেন এখন একলা তরংগিনী। কাজ করতে করতে আচমকা থেমে সুর করে কেঁদে ওঠেন ঃ ওমা বুড়ি কোথায় গেলি রে—পুজোয় আসবি কত করে তুই বলে গেলি ক্ষণে ক্ষণে আমি যে বাদামতলার পথে গিয়ে দাঁড়াতাম—।

উমাসুন্দরী ছুটে এসে পড়েন ঃ চুপ করো ছোটবউ, কেঁদে কি করবে সে তো ফিরে আসবে না। কতজন্মের শত্তুর ছিল—বুকের মধ্যে ছ্যাঁকা দিতে এসেছিল কাজ সেরে বিদায় হয়ে গেছে।

অলকা-বউও বলে চুপ করো ছোটমা কমল কী রকম চোর হয়ে আছে দেখ। ভুলিয়ে ভালিয়ে কমলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। বলে সাপ-ঘুঁড়ি বানিয়ে দেবো তোমায়। ঝাঁটার-শলা আছে রঙবাবাসী কাগজ আছে শিশুবরকে দিয়ে দুটো বেল পাড়িয়ে বেলের আঠা করে নেবো—ব্যস।

সভয়ে ভবনাথ ভাইয়ের পানে চেয়ে চেয়ে দেখেন। আদরের মেয়ের জন্য এ ক'দিনের মধ্যে একটা নিশ্বাস ফেলতে কেউ দেখল না। এখনও তিনি নিরাসক্ত তৃতীয় পক্ষের মতন চুপচাপ দেখে যাচ্ছেন—সন্দেহ হয় একটু সূক্ষ্ম হাসিও যেন মুখের উপর।

ভবনাথ উমাসুন্দরীকে বলেন শুধু বউমাকে বলো কেন দেবও কি কম যায়? জায়গা থাকলে আমিও কোনোখানে চলে যেতাম।

রওনা হবার খানিক আগে কৃষ্ণময় বলল কাকা আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

দেবনাথ ভেবেছেন নাগরগোপ অবধি গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসবে। দাদার কান্ত-ভাইকে একলা ছাড়তে চান না সঙ্গে ছেলে পাঠাচ্ছেন। এ জিনিস আগেও হয়েছে।

কৃষ্ণময় আরও বিশদ করে বলল, কল-কাতায় যাচ্ছি কাকামশায়।

কেন, কলকাতায় কি?

বাড়ি বসে বসে ভাল লাগে না। কোন একটা কাজকর্মে লাগিয়ে দেবেন।

দেবনাথ সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়লেন। এমন সুবুদ্ধি হঠাৎ? তিনিই কতবার এমনি প্রস্তাব তুলেছেন। ক্ষেতের ধান বিল-পুকুরের মাছ প্রজাপাটকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে টাকাটা-সিকেটা আদায় খেয়ে পরে মান-সম্ভ্রম নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে বেশ একরকম কেটে যায়—ধানী-মানী গৃহস্থ বলে এদের। জোয়ানমরদ ছেলেগুলো গ্রামে পড়ে থেকে গজালি পেটে। এ জীবন দেবনাথের চক্ষুঃশূল। দিনকাল দ্রুত পালটাচ্ছে—নিষ্কর্মার পেটে ভাত জুটবে না, তাদের দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদবে। কৃষ্ণময়কে দেবনাথ কতবার এসব বলেছেন—হুঁ-হুঁ দিয়ে সে সামনে থেকে সরে পড়ে। সেই মানুষই এবারে উপযাচক।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেবনাথ বললেন, ব্যাপারখানা কি বল তো।

কৃষ্ণময় থতমত খেয়ে বলল, বাবা বলছিলেন বাসায় আপনি তো একলা থাকেন আমি থাকলে তবু একটু দেখাশুনো করতে পারব।

দেবনাথ নিজের মতন অর্থ করে নিলেন ঃ দাদা ভেবেছেন মনের এই অবস্থায় আমি যদি কোন কান্ড করে বসি। তোকে তাই পাহারাদার পাঠাচ্ছেন।

আসল ব্যাপারটুকু কৃষ্ণময় চেপে গেছে। দেবনাথের সঙ্গে যাবার কথা ভবনাথ একবার দু-বার বলতে পারেন—যেমন বরাবর বলে আসছেন ঃ গিয়ে পড়লে কোন একটা ব্যবস্থা দেবনাথ নিশ্চয় করবে, কিন্তু তুই যে উঠোন-সমুদ্দুর পার হতে একেবারে নারাজ।

প্রায়ই ভবনাথ এমনিধারা বকাবকি করেন—বিশেষ করে হাটবারে হাটে যাবার মুখটায়। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্যে। দেখ না কেন, সর্ষের তেলের সের একেবারে পুরো সিকিতে উঠে গেছে—আর ফি হাটে তেল কিনতে হবে, তৈলের ভাঁড় এনে হাজির করবে। ভবনাথ দুম করে ভাঁড় ছুঁড়ে দেন মাটির ভাঁড় শতচুর হয়ে যায়। ফল এই হল হাটে গিয়ে তেল তো কিনলেনই সেই সঙ্গে নতুন তেলের ভাঁড়। ভাঁড় এতাবৎ কত যে ভাঙলেন আর কিনলেন লেখাজোখা নেই। কী করবেন মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। সেই সময়টা কৃষ্ণময় সামনে পড়ে গেলে রক্ষা নেই ঃ একটা ভাইটি কত দিকে কত সামলাবে। মাসে দশটা টাকা রোজগার করলেও তো বিস্তর আসান। গায়ে কালি মেখে কাঠবিড়ালিও সেতু বন্ধনের কাজে লেগেছিল।

কৃষ্ণময় সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া সে দিগরের মধ্যে আর নেই। বেশ খানিকক্ষণ গজর-গজর করে ভবনাথ শিশুবরকে নিয়ে হাটে চলে গেলেন।

বাপের বকাবকি নতুন কিছু নয়, গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। এবারে অলকা-বউ ঘাড়ে লেগেছে ঃ বেরিয়ে পড়ো চাকরি-বাকরি করোগে। যেমন তেমন চাকরি দুধ-ভাত, কথা চলতি আছে। চাকরে-মানুষের বউয়ের মেয়ে মহলে আলাদা খাতির—অলকার ভারি ইচ্ছে সকলে তাকে চাকুরির-বউ বলবে। এই একঘেয়ে গাঁয়ে পড়ে থাকা নয়—মাঝে মধ্যে বাড়ি আসবে কৃষ্ণময় গরুর-গাড়ি নাগরগোপে পাকারাস্তার পাশে বাসের ছাত থেকে মালপত্র নামছে তো নামছেই। যতদিন সে বাড়ি আছে সকাল-বিকাল লোকের ভিড়ের অন্ত নেই—এ আসছে সে আসছে নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন লেগে আছে, দেবনাথ বাড়ি এলে যেমনটি হয়। অলকা-বউ ভাবে এইসব, আর অতিষ্ঠ করে তোলে কৃষ্ণময়কে। একদিন রাত-দুপুরে অন্ধকার ঘরে কানে কানে কথাটা বলেই ফেলল ঃ মা হতে যাচ্ছি—একটা পয়সার জন্যে শ্বশুর-শাশুড়ির হাত-তোলা হয়ে থাকা এখন আর চলে নাকি? তুমি যাও।

অলকার তাড়নার কথা কাকামশায়ের কাছে বলা যায় না, কৃষ্ণময় সম্পূর্ণ বাপের দোহাই পাড়ল। দেবনাথের দেখাশুনো হবে মনে করে ভবনাথই যেন পাঠাচ্ছেন।

(ক্রমশঃ)

পরবর্তী সংখ্যা

অমৃত

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংখ্যা

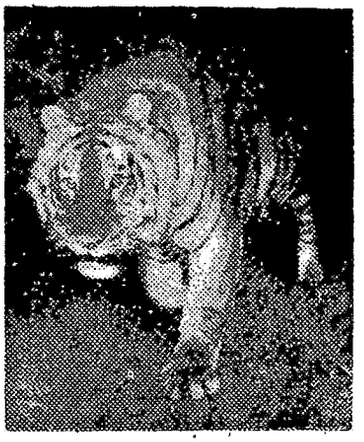

ভাবতে অবাক লাগে, মানুষও একদিন বন্যপ্রাণী ছিল। তখন তার প্রথম দায়িত্ব ছিল নিজেকে রক্ষা করা। লক্ষ বছর ধরে চলেছে তার এই সংরক্ষণের কাজ। কিন্তু এই আত্ম-রক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে সংহারের কাজও। খাদ্য আর নিরাপত্তার জন্যে নির্বিচারে প্রাণীহত্যা করে চলেছে মানুষ। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আজ দেখা যাচ্ছে, হাজার হাজার বছরের ধ্বংসলীলার পর অনেক বন্যপ্রাণী যা কিছুকাল আগেও সগৌরবে বিচরণ করত বনে, তারা অবলুপ্তির পথে। যেমন আমাদেরই এই পশ্চিমবঙ্গের সুবিখ্যাত রয়াল বেঙ্গল টাইগার, কিম্বা গণ্ডার, অথবা কুমীর, এবং আরো কতো ছোটখাটো পশু ও পাখী।

কিন্তু এ অবস্থা ঘটতে দেওয়া উচিত কি? কখনোই নয়। এটা কেবল ন্যায় বিচারের বা সৌন্দর্যবোধের ব্যাপারই নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য—যা নাকি শেষ পর্যন্ত মানুষের নিরাপত্তার জন্যেও বিশেষভাবে দরকার—তাও বিপর্যস্ত হতে পারে এর ফলে। তাই এইদিকে যাতে সর্বসাধারণের সচেতনতা বাড়ে এবং আমরা সাবধান হতে পারি, সেজন্যেই নিয়োজিত হবে অমৃতের এই বিশেষ সংখ্যা। নানা সুখ-পাঠ্য রচনা ও তথ্যেই কেবল নয়, এই সুঅলংকৃত সংখ্যাটির ছবিগুলিও হবে দেখবার মত।

কিন্তু দাম থাকছে ৬৫ পয়সাই

কবিতা

শুধু কবিতার জন্য বেঁচে থাকা ॥ শান্তনু দাস

আমার সামনে এ'টো শালপাতা—দৈনিক-খবর,
প্রতি রবিবার থেকে রবিবার।
আমার সামনে লিফট স্কাইক্রাপার,
প্রতি রবিবার থেকে রবিবার।
আমার সামনে তুমি—
একই উরু, একই ভাঁজ একই অবয়ব,
প্রতি রবিবার থেকে রবিবার।

আর এই অচ্ছুৎ বস্তীতে ঃ
একেকটা দিন আসে হৃদপিণ্ডে রক্ত চুঁইয়ে
আমার ঝুপড়ী ভেঙ্গে বেশ্যার টিপের মতো—
সূর্য।
একেকটা প্রহর গর্ভযন্ত্রণায় মচড়ে ওঠে সারারাত,
নিয়ত ধর্ষণ চলে নিজের গভীরে।
কিছু নেই
আমার দিবস রজনী বলে কিছু নেই,
নেই কোনো বিকল্প জীবন,
শুধু বেঁচে থাকা,—
লাথি খাওয়া
সম্রাটের শিরস্ত্রাণ পায়ে পিষে চলে যাওয়া দিকচক্রবালে,
প্রতি রবিবার থেকে রবিবার।

আমার রক্তের মধ্যে বেড়ে ওঠে ক্ষণ,
প্রতিদিন জন্ম-শিশু যেভাবে নাভিতে নেয় শ্বাস
বারোমাস নড়েচড়ে.....
বুলোই রোমের গায়ে হাত।
সে কি তুমি?
সে কি আমি?
সে কি ঐ খবর টবর?
না কি জামদানী শাড়ি কিংবা বেড়ে ওঠা স্তব্ধ ইমারত?
নাকি জীবন জীবন থেকে সরাসরি পথে মিশে যাওয়া।

কিছুই কিছুই নয়।
আমার সামনে থাকে বুকের জরুল হয়ে অন্ধকার,
প্রতিদিন জন্মদিন,
প্রতিটি সকাল—
বেশ্যার টিপের মতো পবিত্র নিটোল হয়ে ওঠে।
শুধু বেঁচে থাকা—আতুড় সম্রাট হয়ে
আমার বুকের ওমে নোনা ঘামে, রক্তে ভেজা
কবিতার কাছে।।

কবির স্বীকারোক্তি ॥

ফণিভূষণ আচার্য

এখন বুকের পাশে আর কোন নদী নেই নারী
আকাশে প্রস্থান করে অন্ধকারে অনুর্বর রমণের শেষে
ঠোকরানো মগজ থেকে ফুটে ওঠে জ্যোৎস্নার ঘামাচি
প্রতিটি রোমকূপে দ্যাখো বসে আছে মাংসলোভী ঈশ্বর ঈশ্বর
নোবাল ধানের জমি সোনা ধান চাঁদ ডুবে যায়
হে বিষাদ হে আমার অক্ষয় খনিজ
যেখানে ডুবেছে সেই নক্ষত্র জোনাকিচষা রাত সেখানেই আমি
আত্মঘাতী হেমলক কণ্ঠে রাখি ভালোবাসা আহা সেই
দুচোখের বালি
বালি দিয়ে জলাধার বানিয়েছি এখন বুকের পাশে
চেয়ে দ্যাখো আর কোন নদী নেই স্রোতস্বিনী নারী
আকাশে প্রস্থান করে অন্ধকারে প্রতিবার অনুর্বর রমণের শেষে

এইভাবে দিন যায় প্রতিদিন কবিতার খাতা
কানায় কানায় ঠাসা শুকনো পাতাঝুরি
অযোনিসম্ভব সেই আগুনের প্রতীক্ষায় পড়ে থাকে
ভালোবাসা আহা সেই দুচোখের বালি...
আত্মঘাতী হেমলক কণ্ঠে রাখি
প্রতিটি রোমকূপে দ্যাখো বসে আছে মাংসলোভী ঈশ্বর
ঈশ্বর

ক্লিওপেট্রার প্রতি ॥

মানস চক্রবর্তী

মিশরীয় সুবর্ণ পাত্রে
স্বর্ণালী ফেনোচ্ছ্বসিত সুরায়
গলিয়ে নিলে একটুকরো ঐশ্বর্যবান
মুক্তো। পৃথিবীর সর্বকালের দামী
মদে। স্বাস্থ্যপান করলে তুমি
মার্ক এ্যান্টনির। ঐশ্বর্যে ডোবানো
নেশাগ্রস্ত একটুকরো ভালবাসাকে
অমরত্ব দিলে বিষের পাত্রে।

আর ঐ দ্যাখো আমার
প্রেয়সীকে, পাত্রে তুলে নিয়েছে
আমার হৃৎপিণ্ডটা দু বিন্দু শাদা
অশ্রুতে শুদ্ধ করে পান করছে
আমার মৃত্যু। এর চেয়ে দামী
এক পাত্র ভালবাসা তুমিও কি
দিতে পেরেছ, ক্লিওপেট্রা?

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাগরপারের শহীদ দিবস উদযাপন ঃ প্রবাসী সাহিত্য পত্রিকা 'সাগরপারে'র পক্ষ থেকে লণ্ডনের বেসওয়াটারের ওডিয়ন সিনেমা হলে সম্প্রতি শহীদ দিবস উদযাপিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্য অমর শহীদ সালাম, বরকত জব্বার রফিজলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর আবেগদীপ্ত ভাষণে বলেন, শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলা সাহিত্যও ঐইসব শহীদদের কাছে ঋণী। তাঁদের আত্মদানের ফলেই আজ বিশ্বের দরবারে বাংলাভাষার রাজনৈতিক স্বীকৃতি।

বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলর জনাব এম আর আকতার বলেন দুই বাংলায় মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পৃথিবীর বুকে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি আরো বলেন—বাংলার গ্রামে গ্রামে যে সব সঙ্গীত আজও প্রচলিত সুরে এবং ভাবের গভীরতায় তা পৃথিবীর অন্যান্য পল্লীগীতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলা শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, জনাব রাজাক ও অরুন্ধতী বিশ্বাস।

ঃ কবি কুমুদরঞ্জনের জন্মবার্ষিকী ঃ

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ৯৩তম জন্মোৎসব তাঁর কুমুদ গ্রামে অজয় ও কুন্তুর নদীর সঙ্গমস্থলে সম্প্রতি উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে সাহিত্য-তীর্থ এক সাহিত্য সভার আয়োজন করেন এবং এই সভায় বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা কবির বিশিষ্ট অবদানের কথা আলোচনা করেন। বিচারপতি সমরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। কবিপুত্র জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক কুমুদরঞ্জনের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন।

ঃ নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভাগৃহে সম্প্রতি নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কলিকাতা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। ১৯৭৪-৭৫ সালের কার্যনির্বাহক সমিতিও এই সভায় গঠন করা হয়। সভাপতি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু সহসভাপতি ডঃ নরেন্দ্রকুমার পাল শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীসুনীল জানা, সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রুদ্র, কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅমিয় লাহিড়ী।

ঃ কবি সম্মেলন ঃ

সম্প্রতি নিউ ব্যারাকপুরের মাইকেল নগরে বেশ কিছু তরুণ কবির সমাবেশে একটি বিকেল উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। এই প্রাণচঞ্চল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন 'আলোর যাত্রী' ও মাইকেল সমবায় উপনিবেশ। মাইকেল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত কবিরা উপস্থিত না থাকলেও ভাবগভীরতার অভাব এতটুকুও পরিলক্ষিত হয়নি।

ঃ শরৎ জন্মশতবার্ষিকী ঃ

সম্প্রতি পুরুলিয়ার মানবাজারে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুবোধ বসু রায়। বিশেষ বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন বিমলকান্তি ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক দিলীপ বসু।

ঃ অন্নদাশঙ্কর রায়ের ৭১তম জন্মোৎসব ঃ

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের একসপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী কয়েকদিন আগে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ উদযাপিত হোল। যোধপুর পার্ক আলোচনা চক্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রাণময় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। আলোচনা চক্রের পক্ষে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন সচিব শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীধীরেন্দ্ররঞ্জন ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে শ্রীঅন্নদাশঙ্করের বহুমুখী অবদানের কথা আলোচনা করেন। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর অসুস্থতা সত্ত্বেও সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীবসু অন্নদাশঙ্করের সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকসম্পাত করেন।

ঋক্ ও চর্যাপদ আয়োজিত কবি সাহিত্যিক সম্মেলন

গত ১৫ মার্চ '৭৫ সাহিত্য ত্রৈমাসিক ঋক্ ও কবিতা ত্রৈমাসিক চর্যাপদের যৌথ উদ্যোগে বেহালা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি অনাড়ম্বর পরিবেশে এক সাহিত্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায়। আধুনিক কবিতা ও সাহিত্যের উপর তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যটি ছিল মূল্যবান পত্রিকা দুটির সম্পাদকও তাঁদের বক্তব্যে পত্রিকা দুটির পরিচিতি ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। আলোচনায় আর যাঁদের বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য তাঁরা হলেন ফণিভূষণ আচার্য পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও দুর্গাদাস সরকার। পাঠের আসরে অংশ গ্রহণ করেন গৌতম গুহ অভিজিৎ ঘোষ, উজ্জ্বল সিংহ মুনীষা

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্যের—

খুঁজতে নিজেরে হারাই ৬·৫০ পয়সা

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর ভাষায়— শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্যের লেখা একখানি আত্মবিশ্লেষণমূলক তাই অনেকটা যেন আত্মচরিতভিত্তিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে কালের ছবি যথার্থভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ যুগ দ্বিধাদ্বন্দ্বের যুগ। যে সব ধ্রুবক আদর্শবাদকে আকড়ে থাকতে চায় সাংসারিক সুখ-শান্তির আশা তাদের কাছে সুদূরপরাহত। বর্তমানে সমাজের চারদিকে যা ঘটছে ঝরঝরে ভাষায় গ্রন্থকার তারই একখানি কথাচিত্র এঁকেছেন। সে হিসাবে উপন্যাসখানিকে যুগসাক্ষী বলে বর্ণনা করা চলে। এই লেখকের কাছে এমনি আরও রচনা প্রত্যাশা করি।'

প্রাপ্তিস্থান ঃ দে বুক ষ্টোর, ১৩ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অধিকারী জ্যোৎস্না ভৌমিক, মলয় সিংহ, তেজেশ অধিকারী ও আরো অনেক তরুণ কবি। অনুষ্ঠানটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঋষিণ মিত্রের গান। কয়েকটি আধুনিক কবিতার সংগীতরূপ গেয়ে শোনান তিনি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

উপগুপ্ত

নতুন বই

আকাশ ও পৃথিবী—মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। পনেরো টাকা।

রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত এই বিজ্ঞানের বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রচুর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে যাঁরা বিশদভাবে জানতে চান তাঁরা এই একটি-মাত্র বই পড়েই বর্তমান কালের একজন বুদ্ধিমান ও সমকালীনতালাভেচ্ছু পাঠকের পক্ষে যতোটুকু জানা প্রয়োজন এবং তার চেয়েও কিছু বেশি জানতে পারবেন। বিশেষ করে এই বইয়ে প্রাচীনকালের জ্যোতিষীয় চিন্তা—ধর্মশাস্ত্রে ও পৌরাণিক কাহিনীতে তার উল্লেখ, শিল্পকর্মে তার প্রকাশ, ঐতিহ্যের অব্যাহত ধারায় তার অনুসরণ কাব্যে ও সাহিত্যে তার প্রস্ফুটন—ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিকভাবে ও অনেকটা সাহিত্যের ভঙ্গিতে উপস্থিত করা হয়েছে। এমনিভাবে একই সঙ্গে অনেকগুলি দেশের ধর্মশাস্ত্র পৌরাণিক কাহিনী এবং কাব্য ও সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগও এই বইয়ে লভ্য যেটা এক অতিরিক্ত আকর্ষণ। এ-কারণে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যাঁদের আগ্রহ নেই তাঁরাও অনায়াসে 'মানুষ ও প্রকৃতি' বিষয়ক প্রথম পরিচ্ছেদটি কৌতূহল বজায় রেখেই পড়ে ফেলতে পারবেন এবং উপভোগও করবেন। আবার বিজ্ঞানের যাঁরা অতিমাত্রায় হিসাবী ও বিষয়ানুসারী পাঠক তাঁরা, হয়তো এই পরিচ্ছেদের বহুচারী উচ্ছ্বাসকে বিজ্ঞানের বইয়ের পক্ষে অসার্থক ও অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যানবিশীর তুল্য মনে করতে পারেন। এবং এই বিচার থেকে সম্ভবত পরবর্তী বংশের অতি-সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণত-নিবদ্ধ বিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যেও কিছু কিছু লাইনকে মনে করতে পারেন সাহিত্যিক ভাবালুতা-দুষ্ট (যেমন একটি দৃষ্টান্ত শুরু কিন্তু অসূর্যম্পশ্যা নারীর মতো মেঘের ঘোমটা খুলে সে কখনও পৃথিবীর দিকে তাকায় না।' পৃঃ ৯৬-৯৭। এখানে বক্তব্য এই যে অসূর্যম্পশ্যা নারী মানে এই নয় যে, সে সব সময়ে ঘোমটা দিয়ে থাকে, ইত্যাদি তাছাড়া অন্য বক্তব্য তো আছেই, উপমাটি এখানে বিভ্রান্তিকর। এমনি দৃষ্টান্ত ৪৭৬ পৃষ্ঠার এই বইয়ে বড়ো কম নয়।)

আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই বইটি, প্রথম পরিচ্ছেদটি বাদ দিলে, আলোচ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপস্থাপনা ও বিস্তারের দিক থেকে অতিশয় সুপরিকল্পিত এবং যেটা বিশেষ প্রশংসার বিষয়—ভারাক্রান্ত না হয়েও বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ। লেখকের আরও কৃতিত্ব, এ-ধরনের পপুলার সায়েন্সের বইয়ের পক্ষে যা সাধারণত অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয় তজ্জাতীয় কিছু কিছু অগ্রসর গবেষণার বিবরণও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন।

অবশ্যই এই বইয়ের সবচেয়ে বড়ো গৌরব তার বিষয়-গৌরব—আকাশ ও পৃথিবী। তাই এই বইয়ের সবচেয়ে বৃহৎ আলোচনা সৌরজগৎ নিয়ে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৬৫—১৮৫), তারপরে ৭৫ পৃষ্ঠার আলোচনা পৃথিবী ও চাঁদ নিয়ে ১০৩ পৃষ্ঠার আলোচনা মহাকাশ-জয়ের পরিকল্পনা নিয়ে, ৭৯ পৃষ্ঠার আলোচনা নক্ষত্রলোক নিয়ে এবং অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরে বিওয়ানুগ আলোচনা নীল আকাশের রহস্য মেরুজ্যোতি ও মহা-জাগতিক রশ্মি নিয়ে। পরিশিষ্টে আছে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শব্দ-সূচী ও পারি-ভাষিক শব্দাবলী। শুধু বিষয়গুলোর উল্লেখ থেকেই বোঝা যাচ্ছে নির্ভুল-ভাবে যদি লিখিত হয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সমন্বিত হয় তাহলে এমন একটি বই অনবহিতরা তো তদগত হয়েই পড়বেন প্রাজ্ঞরাও হাতের কাছে রাখতে পারেন। 'আকাশ ও পৃথিবী' এমনি একটি তদ্গত হিয়ে পড়ার মতো বই ও সর্ব সময়ের প্রয়োজনের জন্য হাতের কাছে রাখার মতো বই। মহাকাশ গবেষণার এই অতিদ্রুত-অগ্রসর যুগে যে-সব কথা না জানলে যুগ থেকে পিছিয়ে পড়তে হয়, যে-সব কথা জানতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করা দরকার—এখানে তা একটি মাত্র বইয়ের মাধ্যমে বাঙালী পাঠকের কাছে অনায়াস-লভ্য হয়ে উঠেছে।

বইয়ে অজস্র চিত্র সংযোজিত—মোট ২৩২টি, তদপরি কয়েকটি বহুবর্ণ আর্ট-প্লেট। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার জন্য যেমন দরকার যতগুলো দরকার চিত্র সংযোজনের ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য করা হয়নি (এমনকি মহাকাশচারী কুকুরেরও একাধিক চিত্র পাওয়া যায়)। তবে এই চিত্রের ব্যাপারেও বিজ্ঞানের পাঠক যদি একই সঙ্গে শিল্পানুরাগী হন কোনো কোনো চিত্র সম্পর্কে খুঁতখুঁত করতে পারেন। যেমন বইয়ের শুরুতে প্রথম বহু-বর্ণ চিত্রটি—ও জবাকুসুম সঙ্কাশং ইত্যাদি। বিজ্ঞানের বইয়ে এটির কোনো প্রয়োজন ছিল? লেখক মনে করতে পারেন আছে—তাহলে বটতলা মানের চিত্র না দিয়ে শিল্প-সার্থক কিছু দেওয়া যেত না? একটা কথা চিত্র নং ৩২ সম্পর্কে—এসেছে বরষা এসেছে নবীনা বরষা। কোনো দরকার ছিল? যদি থাকেও তো আগত বর্ষার এমন একটা খেলো চিত্র কেন? একই কথা এ-জাতীয় অন্যান্য চিত্র সম্পর্কে।

ব্যাখ্যাগত কিছু অসতর্কতার দিকেও লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেমন, বুধগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলছেন 'সূর্যের খুব কাছে থাকায় এ খুব উত্তপ্ত অবস্থায় আছে, কাজেই বুধে কোন আবহমণ্ডল থাকা সম্ভব নয়।' (পৃঃ ৯৩) এই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ এবং কিছুটা ভ্রান্তও। বুধে যে আবহমণ্ডল নেই তার কারণ বুধের মাধ্যাকর্ষণ এতই কম যে আবহাওয়া তৈরি করে যে-সব গ্যাস তার পরমাণুগুলো অনা-য়াসেই মহাশূন্যে উধাও হয়ে যেতে পেরেছে। উত্তপ্ত অবস্থায় থাকার দরুণ উধাও হওয়ার ব্যাপারটি আরো জোর পেয়েছে মাত্র। তাছাড়া, 'এ খুব উত্তপ্ত অবস্থায় আছে'—এমন ঢালাও মন্তব্য বিজ্ঞানের বইয়ে চলে না। পরের পৃষ্ঠায় তাঁকে বলতেই হচ্ছে বুধের 'বিপরীত পিঠ হিমশীতল'। এ-জাতীয় ব্যাখ্যাগত অ-সম্পূর্ণতা ও কিছুটা ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত বইয়ে খুব কম নয়।

বইটি উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে এমন এক বিরাট প্রয়াস—সার্থকও বটে—এবং লেখকের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রচুর পরি-শ্রমের এমন এক সমৃদ্ধ ফসল যে নির্দ্বিধায় উচ্চতম প্রশংসা দাবি করতে পারে। এত বড়ো একটি কাজে ছোটখাটো ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয় তাই পরের সংস্করণে যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই দু-একটি ত্রুটির উল্লেখ করা হল মাত্র।

অয়স্কান্ত

দ্বিতীয় অন্তর। নীলকণ্ঠ মুসাফির। সাহা বুক স্টল, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'নীলকণ্ঠ মুসাফির' ইতিপূর্বে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থের লেখক। 'দ্বিতীয় অন্তর' একটি নিটোল কাহিনী-নির্ভর উপন্যাস। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসের বিষয় উচ্চকিত। নবনীতা নামের এক নায়িকার করুণ আত্মহত্যার ইতিহাস এই উপন্যাসের কাহিনীটির একমাত্র উপ-জীব্য। নবনীতার চরিত্র ন্যায়-রক্ষিত। লেখকের ভাষা পাঠকমন ধরে রাখে।

জাতক। সম্পাদনা : সত্যানন্দ গুহ, নকুল মল্লিক। বিশ্বজ্ঞান ৯।৩, টেমার লেন, কলকাতা-৯। মূল্য চার টাকা।

গল্পহীন গল্প, নিমসাহিত্য বা চাকর-বিরোধী গল্প বলে কিছু বোঝেন না গল্প-গ্রন্থের প্রকাশক আনন্দ রায়। তবু অর্থ-সমস্যা, বিদ্যুৎ বিভ্রাট কাগজের সংকট এবং নানাবিধ সমস্যাকে অতিক্রম করে প্রকাশ করেছেন ...৮১ পৃষ্ঠার এই গল্প সংকলন। এজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

দৈনন্দিন জীবনের ছেঁড়া ছেঁড়া ঘটনাকে ঘিরে প্রায় গল্পেরই কাঠামো গড়ে উঠেছে। যেমন 'কখনো বা বৃষ্টি নেমেছিল' গল্পে পুরনো পাড়ার মেয়ে বকুলকে বৃষ্টি-ভেজা বিকেলে কাছে পেয়ে নায়ক অতনু সান্যালের অতীত স্মৃতি রোমন্থন পিওনের হাত থেকে চিঠি পেয়ে বুকের মধ্যে ধক-

ধকানি (গল্প/নিরুদ্দেশ) ঝি ছবি পাকা বাড়ীর দোতলায় বাস করার অফটে ইচ্ছে কি করে পূর্ণ হল (গল্প/স্বপন) এসবই চেনা চরিত্রের গল্প মনে হয়। 'মেঘলা মন' ছোট গল্পের ভেতর লেখক খুব বেশি করে ধর্ম বা বিজ্ঞানের কথা না বললে গল্পটা আরো জোরালো হতে পারত। সূর্যকান্ত চন্দন-জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দাও, ফেরা, চোর পুলিশ খেলা জনম জনম—এ-গল্প-গুলোতে পরিণত মনের পরিচয় পাওয়া গেল।

জাতকের গল্পকাররা হলেন শান্তনু দাস সত্যানন্দ গুহ, উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়, নির্মল আচার্য, নকুল মল্লিক, সন্ধ্যাশ্রী চক্রবর্তী নির্মল বিশ্বাস বিনয় দাস, পবিত্র জানা রায়, দেবাঞ্জলি মিত্র ভোলানাথ শীল বিপ্লব চন্দ গোপাল সামন্ত।

শতরূপা। ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ষষ্ঠ বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। ১৩৮১। সম্পাদনা ঃ নির্মলকুমার খাঁ। ১৪, মাকড়দহ রোড কদমতলা, ব্যাটরা হাওড়া-১।

একশ'-র বেশি মহিলা কবির কবিতা খুব যত্ন নিয়ে ছাপা হয়েছে। সংখ্যাটির নাম রাখা হয়েছে 'বীরাঙ্গনা'। ওভিডের 'হিরোয়িক এপিসলকে' মনে রেখে বীরাঙ্গনা নামে মধুসূদন অভিনয় কাব্য লিখেছেন—সে-কারণেই এ-সংখ্যার নাম এরকম রেখেছেন সম্পাদক।

এতগুলো কবিতা ঝড়ের চোখে মাত্র কমিনিটে পড়ে ভাল-মন্দ বলা যায় না। অনেক কাঁদন সময় পেলেও তা সম্ভব হয় না। কারণ মাথার ভেতর রক্তক্ষরণ হবার পর যে-কবিতার জন্ম—তা অনায়াসে মেজাজ তৈরি করতে গেলে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। তবু ওই ঝড়ো চোখেই যাঁদের কবিতা পড়ে মনকে নাড়া দিল তাঁদের নাম—গিরিবালা দেবী রাধারাণী দেবী মৈত্রেয়ী দেবী বেলা দেবী রাজলক্ষ্মী দেবী সাধনা মুখোপাধ্যায় বিজয়া মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন সুতপা মিত্র, প্রতিমা সেনগুপ্ত মণিকা রহমান বন্দ্যোপাধ্যায়, শুচিস্মিতা দাশ-গুপ্তা জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাঞ্জলি মিত্র। তাছাড়া আরো অনেকেই। আশাপূর্ণা দেবী প্রতিভা বসু গল্পকার হিসাবে নাম করলেও ওঁরা যে এত সুন্দর কবিতা লেখার কথা ভাবতে পারেন, তা সত্যি আশ্চর্যের।

৬৩ পৃষ্ঠায় 'তখন অমল তুমি' কবিতায় কবির নাম কবিতা সিংহ ছাপা দেখে চোখ বিশ্বাস করতে পারল না সূচী-পত্রে অবশ্য কবিতা সিংহ ছাপা হয়েছে। এ-ধরনের মারাত্মক ভুল সত্যি খুব লজ্জার। আরেকটা কথা—এ-সংকলনের ওপর পাতায় 'অথচ লুকাতে চাও ভালবেসে' কেন রাখা হল তা বোঝা গেল না চুল ছিঁড়েও; কারণ ঠিক এর পরের পাতায় স্পষ্ট বড় বড় হরফে লেখা আছে শতরূপা কবিতা সংখ্যা। তবে কি প্রকাশিকা বাণী চট্টোপাধ্যায়-এর কবিতার নামকে জ্বলজ্বলে তারার মত মনে রাখার জন্যে?

সম্পাদককে ধন্যবাদ। সংখ্যাটি সংগ্রহ করে রাখবার মতো।

কণিকা (সাহিত্য ত্রৈমাসিক)। সম্পাদনা ঃ চন্দন দত্তগুপ্ত। বীরেশ পল্লী। মধ্যম-গ্রাম। ২৪ পরগণা।

ছোট পত্রিকা হলেও রুচিশীল পাঠককে এটি অনিবার্যভাবেই আকর্ষণ করবে। কবিতা গল্প, প্রবন্ধগুলি সবই নির্বাচিত। রণজিৎ সিংহ, যুগল সেন, ফরহাদ মজাহার আশিস খাস্তগীর গৌতম সেনগুপ্তের কবিতা, মৃণাল সেনগুপ্ত এবং সুনীল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, বুলবুল ইসলাম অরুণ ইন্দু এবং দেবাশিস চক্রবর্তীর গল্প পত্রিকাটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। ছাপার ভুল সম্পর্কে একটু সচেতন হওয়া দরকার।

সূচনা। সম্পাদক প্রশান্ত ভবাই। শান্তি-পুর। নদীয়া। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে বেশ কিছু সুনির্বাচিত গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ রয়েছে। লেখকসূচীতে রয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী ভবঘুরে, বিষ্ণু দে, বিনায়ক সান্যাল এবং আরো অনেকে। মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত এই ধরনের রুচি-শীল এবং মার্জিত পত্রিকা সহসা চোখে পড়ে না।

নৈবেদ্য ঃ সম্পাদনা—সুবীরকুমার দে শ্রীমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। ৪৭ রাজ-বল্লভ সাহা লেন রামকৃষ্ণপুর হাওড়া। দাম—১-০০।

কয়েকটি ছোট গল্প দু-একটি প্রবন্ধ পড়ে পত্রিকার এই সংখ্যাটি সম্পর্কে আশা পোষণ করা সম্ভব। যাঁদের লেখা স্বকীয় চিন্তার আলোয় আলোকিত তাঁরা হলেন শিশিরকুমার মাইতি শংকর মিত্র সমরেন্দ্র দাশ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও শিবেন চট্টোপাধ্যায়।

নির্ঝর ঃ সম্পাদক—নির্মল সাহা। ৪১।এ বেলতলা রোড কলকাতা—২৫। দাম—১-৫০।

পত্রিকাটির এই সংখ্যায় যে কটা লেখা স্থান পেয়েছে তার অনেকগুলোই গভীরতর শিল্পচিন্তায় উজ্জ্বল। আশাপূর্ণা দেবী শংকু মহারাজ নির্মলেন্দু গৌতম বিষ্ণু দে দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় কৃষ্ণ ধর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তারাপদ রায় বীথি সেন প্রভৃতির লেখা বিষয়ের গভীরতা ও প্রকাশ-ভংগীর সাবলীলতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

সম্রাট ঃ সম্পাদক—তারাপদ পাল। প্রতিভা সাহিত্য মন্দির; আতাবাগান গাড়িয়া, ২৪-পরগণা। দাম—১-৫০।

সংকলনটি পড়তে গিয়ে শুধু হাল্কা মুহূর্তের আমেজেই মন ভরে না; বেশ কিছু সিরিয়াস চিন্তা উপলব্ধিকে দোলা দেয়। শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনা' শ্যামল সেনগুপ্তের আধু-নিকতা ও চলচ্চিত্র দাসুগোপাল মুখো-পাধ্যায়ের লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতি সূক্ষ্ম চিন্তার স্বাক্ষর বহন করছে। কুবের ও নচিকেতা ভরদ্বাজের দুটি কবিতা ও সংকলনটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

কেতন ঃ সম্পাদক—অজিতকুমার বাগ। নূতন ডাঙ্গা বর্ধমান। দাম—১-৫০।

দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকার এই সংখ্যাটি খুব বেশী একটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে নি। কয়েকটি লেখার মধ্যে অপরিণত মননের ছোয়া আছে।

লেখনী ঃ সম্পাদক—সুবীর সাহা। ৮৮।৩বি মৃণাল পার্ক কলকাতা-৩৫। দাম—১-০০।

লেখক তালিকায় আছেন অরুণ সান্যাল মণীন্দ্র রায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বাণী রায় অমিয় মিত্র।

বোম্বাই বিচিত্রা। রেখা দত্ত মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায় শালটি ঘোষ সম্পাদিত। বিচিত্রা কালচারাল এসোসিয়েশন। ২ প্রদীপ ওরলিহিল। বোম্বাই ৪০০০১৮

সুদূর বোম্বাই থেকে প্রবাসী বাঙ্গালী-দের উৎসাহে প্রকাশিত বোম্বাই বিচিত্রা নামের কাগজটি ইতিমধ্যেই সাহিত্যরসিক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পরিচিত এবং নতুন সব লেখকই এই পত্রিকার লেখকসূচীতে রয়েছেন। জানুয়ারী সংখ্যায় উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সত্যানন্দ গুহ এবং ক্ষমা মুখোপাধ্যায়ের গল্প কথা-সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র শান্তি চট্টো-পাধ্যায় নচিকেতা ভরদ্বাজ তুলসী মুখো-পাধ্যায়ের কবিতা ছাড়াও রম্যরচনা এবং বোম্বাই সংবাদ এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। সলিল ঘোষের লেখা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বোম্বাই প্রবাস রচনাটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

কথাসাহিত্যিক বীরেন্দ্র দত্তের

পাহাড়ে সমুদ্রে	৮·০০	চতুর্দশী	৪·০০
খেলার ছলে	৫·৫০	ঘণ্টাঘড়ি	৪·৫০

কবি হরপ্রসাদ মিত্রের

হৃদয়ে চকিতে কে সে ৪·০০

আশা প্রকাশনী ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯

ঢাকা থেকে ফিরে

২১ মার্চের 'অমৃতে' নিমাই ভট্টাচার্যের 'ঢাকা থেকে ফিরে' রচনাটি ভারী চমৎকার লাগলো। সুন্দর সাবলীল ভাষা ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী সত্যিই মন কেড়ে নেয়। মিষ্টি কলমের ছোঁয়া যেমন ওঁর কিছু উপন্যাসে হৃদয় স্পর্শ করে ঠিক তেমনি ঢাকার বর্ণনায় ওঁর ভাষার মাধুর্য মনকে মুগ্ধ করে মিষ্টি এক আনন্দের স্পর্শ জাগায়। নিমাইবাবুর এই 'মা'-এর কথা অবশ্য জরাসন্ধর কাছে এ রচনা প্রকাশনের আগেই শুনেছিলাম, কারণ ২ মার্চ জরাসন্ধ দিল্লির 'সাহিত্য একাডেমীর' সভা শেষ করে আমাদের এখানে আসেন এবং ৩ মার্চ পর্যন্ত থাকেন। সেই দুটি দিনে জরাসন্ধের কাছে নিমাইবাবুর ঢাকার 'মায়ের' ও আরও নানা গল্প আমরা শুনি এবং তখনই ইচ্ছে হয়েছিলো ও বিষয়ে নিমাইবাবুর কাছ থেকে আরও কিছু শোনবার। সেই অদম্য আগ্রহ আজ পূর্ণ হলো। নিমাইবাবুকে আমার প্রাণভরা অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাই। এবং ওই মিষ্টি রচনাটি আমাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে আপনাদেরও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি আরো এরকম রম্যরচনা প্রকাশে আমাদের অনাস্বাদিত আনন্দ দিতে কার্পণ্য করবেন না।

(ডাঃ) শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়
অলিগড়।

শিশু-মন বিকাশে অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অমৃত ১৪ই মার্চ, ৭৫ সংখ্যায় 'অঙ্গনা' ফিচারে 'শিশুমন বিকাশে অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' সম্পর্কে শ্রীমতী অঞ্জলি চৌধুরীর অভিমত যথার্থ এবং সময়োপযোগী। সোভিয়েট রাশিয়ার একটি স্কুলের অধ্যক্ষার উদাহরণ দিয়ে তিনি বর্তমান একদেশে শিক্ষার প্রতি যে কটাক্ষ করেছেন তাতে সত্যোপলব্ধি আছে।

বই পড়ে পরীক্ষা দিয়ে কতকগুলি কাগজে ডিগ্রি অর্জন করার দিন চলে গেছে। ডিগ্রিজ্ঞান দিয়ে এখন আর কোন চাকরী পাওয়া যায় না। তবু আমরা এই শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে আছি। আমরা ভুলে যাই শিশুদের একটা নিজস্ব জগৎ আছে। সেখানে খেয়ালখুশীতে যা সৃষ্টি হয় তা অনেক সময় আমাদের অবাক করলেও আমরা উৎসাহ তো দিই না বরঞ্চ বই পড়া অবহেলা করার জন্য তিরস্কার করি। এতে শিশুর মন সংকুচিত হয়। যে উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সে সৃষ্টি করেছিল নতুন কিছু একটা তা ফেলে রাখে অনাদরে। আনমনে সে যে বই পড়ে তা তার মগজে ঢোকে না ঠোঁটেই সীমাবদ্ধ থাকে।

শ্রীমতী চৌধুরী কিণ্ডারগার্টেন এর মতো শিক্ষাব্যবস্থা করতে বলেছেন; কিন্তু ক-জন অভিভাবক এর সুযোগ পান, ক-জন এর খরচ বহন করার ক্ষমতা রাখেন। আর স্কুলে ক-জন শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখেন? গ্রামের বেকার শিক্ষিত যুবকগণ চাকরীর জন্য নিজেদের খরচায় কোনরকমে দুচালা ঘর করে বাড়ী বাড়ী ছেলে-মেয়েদের জুটিয়ে 'এনে সরকার থেকে স্কুলের মনোনয়ন পাওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য দেবার চাইতে কিভাবে বেতন পাওয়া যেতে পারে—সেদিকে বেশী লক্ষ্য থাকে। গতানুগতিকভাবে এখানে ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়; কাগজে বিদ্যা পড়ে জ্ঞানার্জন করে শিশুমনের প্রতিভা বিকশিত হওয়ার কোনো অবলম্বন থাকে না।

আজ যুবকদের মনে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে তার মূলে রয়েছে সেই শিশুমন অনুযায়ী বেড়ে না ওঠার সমস্যা। শিশুরা ছাত্রাবস্থায় যদি তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেত তাহলে আজ তারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে জীবনধারণ করতে পারতো।

শুধু শিক্ষাখাতে টাকা বাড়ালেই হবে না; শিক্ষাব্যবস্থার আমূলে পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। শিশুমন যদি প্রথম থেকেই বিকৃত হয় তাহলে সেই বিকৃত মনোভাব পরবর্তীকালে পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয়।

প্রাইমারী স্কুল যে অবস্থার মধ্যে চলে তা অবর্ণনীয়। ঘরের অবস্থা সংগীন। ছাত্র সংখ্যা বাড়ানোর জন্য শিক্ষকগণ বাড়ী বাড়ী ছেলেমেয়ের সন্ধান করেন। কারণ ছাত্রসংখ্যা কমে গেলে তাদের চাকরী থাকে না। তাদের বেতন যৎসামান্য।

সরকার-এর তরফ থেকে শুধুমাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বেতনহীন করলেই হবে না যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ, পড়াশোনা করার পরিবেশ এবং শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করানোর চেষ্টাও তাদের করতে হবে। অভিভাবকরা শিশুর মন অনুযায়ী তাদের প্রতিভার বিকাশ করতে সহায়তা করবেন। তবেই দেশের শিশুরা ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক হতে পারবে।

কার্তিক ঘোষ,
বসিরহাট ২৪ পরগণা।

রাধাকৃষ্ণন প্রসঙ্গে

ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের টেম্পলটন ফাউন্ডেশান পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমরা ভারতবাসী হিসেবে আনন্দিত। ঐ সংস্থা রাধাকৃষ্ণণকে পুরস্কৃত করে ন্যায়বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। যাঁরা ভারতের মহান সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা বিশ্বের কাছে প্রচার করে স্বদেশের সম্মান বাড়িয়েছেন ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁদেরই একজন।

তাঁর এই পুরস্কারপ্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঘটনা সবিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি মিশনারী কলেজে পড়ে খৃষ্টধর্মকে খুব ভালো করেই জেনেছিলেন। কিন্তু তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি প্রবল আস্থা ছিল। মিশনারী অধ্যাপকেরা তাঁর এই মনোভাবের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। রাধাকৃষ্ণণ অধ্যাপকদের ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ণ হন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি দর্শনে এম-এ পড়ার সময় 'এথিক্স অব বেদান্ত' গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনা করেন এবং সেই প্রবন্ধ পাঠ করে মিশনারী অধ্যাপক এ, জি, হগ ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সেইজন্য টেম্পলটন ফাউন্ডেশান পুরস্কার ডঃ রাধাকৃষ্ণণের যোগ্য স্বীকৃতি।

প্রবীরগোপাল মুখোপাধ্যায়
শিবপুর, হাওড়া-২।

হোস্টেল জীবন

গত ৭ মার্চের অমৃত পত্রিকার 'যুবক-যুবতী' বিভাগে প্রকাশিত 'হোস্টেল জীবন' শীর্ষক আলোচনাটি পড়লাম; যদিও লেখক বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আলোচ্য প্রসঙ্গটির একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাঠক-পাঠিকা মহলে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন, তবুও মনে হয় আলোচনাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি।

বলাই বাহুল্য, থাকা এবং খাওয়াকে কেন্দ্র করেই হোস্টেল জীবন নয়; হোস্টেল জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকা-খাওয়া নয়। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার স্বার্থেই হোস্টেলে আসেন ও থাকেন। আর সেই জন্যেই হোস্টেলের অভাব নিয়ে এত আন্দোলন—অভিযোগ, সীটের জন্যে ধরাধরি—ঘোরাঘুরি কতকিছু। সুতরাং হোস্টেল জীবনের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে পড়াশুনার ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা-আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। অবাধ স্বাধীনতা যেটা বাড়ীতে, অভিভাবকদের উপস্থিতিতে সাধারণত খাটে না, সেইসব নিয়মের শিথিলতা, বোতল-গাঞ্জিকার উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে অনেক রাত করে নীড়ে ফেরা প্রভৃতি অভিযোগগুলো হোস্টেলে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় কতটুকু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ও তার সামগ্রিক ফল কিরকম—আলোচনার মাধ্যমে এদিকটাতে আলোকপাত করা, মনে হয়, প্রয়োজন ছিল।

সুব্রতকুমার চৌধুরী
দমদম রোড, কলকাতা।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(সাইত্রিশ)

এই আন্তর প্রেরণা তথা অন্তর্দৃষ্টিই ছিল তাঁর মনোবলের ভিত্তি তথা তীর্থ-পথের দিশারি। আমাদের উপনিষদে বলেছে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়েরা স্বভাবে বহির্মুখী, কিন্তু বিরল কয়েকজন মহাভাগ প্রত্যগাত্মাকে দেখতে চেয়ে আবৃত্তচক্ষু হন অমৃতের অধিকারী হতে।* আত্মা আমাদের কাছে সাধারণতঃ একটা কথার কথা হয়ে দাঁড়ায় প্রত্যক্ষবোধের এলাকায় তার দেখা মেলে না বলে—মিললে সে হত প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ আত্মা। তাই বলেছেন উপনিষদ বারবারই আবৃত্তচক্ষু অর্থাৎ অন্তর্মুখী না হতে পারলে বস্তু-লাভ হয় না। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন স্বধর্মে যোগী স্বভাবে আবৃত্তচক্ষু। এ-শ্রেণীর ঋষিকল্প মহাপুরুষকে গণমন বুঝতে পারে না বলেই বহির্মুখী বুদ্ধির নির্দেশে ছোট করতে চেয়ে থাকে—শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই। এর একটা কারণ অন্তত দুর্বোধ্য নয়; অহঙ্কার ঘা খেলে প্রত্যাঘাত করতে চায় মান বাঁচাতে। তাই মহামানবেরা যুগে যুগে ক্ষুদ্রমানবদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নিশানা হয়ে এসেছেন—তাঁরা যা প্রত্যক্ষ করেছেন, ক্ষুদ্রমতিরা তা করতে পারেনি বলে। আমি প্রায়ই শুনতাম—অনেকে আমাকে চিঠিতেও লিখতেন যে শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী হতে চেয়েও লড়ে চলতে পারলেন না বলেই শেষে যোগের অজুহাতে রণছোড় পলাতক হলেন। শ্রীঅর-বিন্দের চরিত্রকে যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বুঝতে চেয়েছেন, তাঁরা এ-হেন ক্ষুদ্র-বুদ্ধিদের নিন্দাবাদে সায় দিতেই পারেন না। তাঁরা শ্রীঅরবিন্দকে মহাতেজস্বী ও সত্যনিষ্ঠ বলে ভক্তি করেন বলেই বিশ্বাস করে এসেছেন—যে-কথা তিনি আমাকে লিখেছিলেন ঃ যে, তিনি রাজনীতির রণাঙ্গন ছেড়ে এসেছিলেন এজন্যে নয় যে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তাঁর কাজ ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রস্থান করেছিলেন, কারণ তিনি সে-সময়ে একটি স্পষ্ট আদেশ পেয়ে-ছিলেন ঃ

> "I did not leave politics because I could do nothing more there. Such an idea was very far from me. I came away because I got a distinct adesh in the matter.....October 1932".

আলিপুর জেল থেকে বেরিয়ে তিনি একটি জনসভায় বক্তৃতায় বলেছিলেন—তাঁর বিখ্যাত "Uttarpara Speech"-এ—যে, কারা-গৃহে তিনি যোগসাধনার সময়ে ভগবানের কাছে করেছিলেন এই প্রার্থনা ঃ

> "Thou knowest that I do not ask for Mukti. .....I ask only to be allowed to live and work for this people whom I love. .....Give me Thy Adesh. I do not know what work to do or how to do it. Give me a message. In the communion of Yoga two messages came. The first message said, 'I have given you a work and it is to help to uplift this nation.' .....The second message came and it said, 'Something has been shown to you in this year of seclusion..... It is the truth of the Hindu religion It is this religion that I am raising up before the world, it is this that I have perfected and developed through the Rishis, saints and Avatars, and now it is going to do my work among the nations. I am raising up this nation to send forth my word. This is the Sanatan Dharma, this is the eternal religion which you did not know before, but which I have now revealed to you. ..This is the one religion that can triumph over materialism ..It is the one religion which impresses on mankind the closeness of God to us. ....It is the one religion which shows the world what the world is, that it is the Lila of Vasudeva. It is the one religion which shows us how we can best play our part in that Lila, its subtlest laws and its novlest rules."

(ভাবার্থ ঃ তুমি জানো প্রভু যে আমি মুক্তিকামী নই। আমি শুধু চাই—আমি যেন আমার দেশবাসীদের সেবায় জীবন নিয়োগ করতে পারি। আমি জানি না আমার কী কর্তব্য ও কেমন করে তা সাধন করতে হবে। আমাকে তোমার আদেশ দাও।' উত্তরে দুটি বাণী এল। প্রথমটি বলল ঃ 'আমি তোমাকে যে-কর্মভার দিচ্ছি সে হচ্ছে—তোমার স্বজাতিকে তোলো।' .. দ্বিতীয় বাণীটি বলল ঃ জেলে তোমার কাছে আমি খুলে বলেছি অনেক কিছু... বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের সত্যতা—যে-শাশ্বত সত্য আমি যুগে যুগে ঋষি অবতারদের মধ্যে দিয়ে প্রকট করেছি নিখুঁৎ করে—এই সনাতন ধর্ম যার মর্ম তুমি জানতে না। কেবল এই ধর্মই বস্তু তান্ত্রিকতাকে পরাস্ত করতে পারে...আমাদের চোখের ঠুলি খুলে

* পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ
পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।।
কঠ ২।১।১

অর্থাৎ বিধাতা ইন্দ্রিয়দের বহির্মুখ করেই সৃষ্টি করেছিলেন, তাই জীব বাইরেকেই দেখে ভিতরকে নয়। কখনো কখনো কোনো বিবেকী অমৃতত্ব চেয়ে অন্তর্মুখী দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করে থাকেন

দেখিয়ে দিতে পারে—ভগবান আমাদের কত কাছে...এ-বিশ্ব বাসুদেবের লীলা... আর কেমন করে আমরা পারি এ-লীলার নিখুঁৎ বাহন হতে—তার সূক্ষ্মতম ও মহত্তম বিধান মেনে।')

ভারতের বর্তমান দুর্দিনে এ-ভাগবতী বাণী শুনলে আমাদের সকলেরই আশ্বস্ত হওয়া উচিত—একশোবার—শুধু এ জন্যে নয় যে, এ-মহাবাণীতে ধর্মের শাশ্বত ঝঙ্কার বেজে উঠেছে যে-ঝঙ্কার হাজারো আসুরিক অভ্যুদয় নিষ্ঠুর বিদেশীদের হত্যাকান্ড ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও আজও লক্ষ লক্ষ আস্তিকের বুকের তারে বাজে—শুধু তীর্থে মন্দিরে দেবতাত্মা হিমালয়ের দৈবপ্রভায় নয়—বাজে একের পর এক মহামানব, মহাপুরুষ মহাজন, সাধু সন্ত ভক্ত, পূজারী ধর্মার্থীর মৃত্যুহীন প্রাণে, নিত্য নব আনন্দ জ্যোতির উচ্ছলনে। কবি কীটস বলেছেনঃ শ্রুত রাগমালা মধুর, কিন্তু অশ্রুত রাগমালা আরো মধুর। আমরা চর্ম চক্ষে কতটুকু দেখতে পাই মনজ্ঞী বুদ্ধিতে কতটুকু বুঝতে পারি, ভাগবত সাধনায় তাঁর কৃপায় কতটুকু বিদগ্ধদাম আহরণ করতে পারি? এ-বিশাল ব্রহ্মান্ডের লক্ষ কোটি গ্রহ তারা সূর্য চন্দ্র নীহারিকার নিরন্ত নৃত্য-লীলার কতটুকু আনন্দ-স্পন্দন অন্তরে ধারণ করতে পারি? কবিগুরু গেয়েছেনঃ

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চিরসারথি তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিনরাত্রি
এ কি শুধু কল্পনার ক্ষণফুলে মিথ্যা-সান্ত্বনার মালা গাঁথা?

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে কি অলীক ক্ষণরঙ্গ আলেয়ার দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন ঃ

অফলো যদি ধর্মঃ স্যাচ্চরিতো ধর্মচারিভিঃ।
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেতৎ জগৎ
মজ্জেৎ অনিন্দিতে।।

ধার্মিকের ধর্ম যদি বন্ধ্যা হত ভবে,
অন্ধ অমানিশায় যেত ধরণী ডুবে করে।

শ্রীঅরবিন্দের অভয়বাণী কি শত শত দ্রষ্টা ঐতিহাসিকের মর্মবীণায় আজো ঝঙ্কৃত হয় না ঃ

The spirit rises mightier by defeat.
Its godlike wings grow wider with each fall,
Its splendid failures sum to victory. (6/2)

প্রতি পরাজয় অন্তে অন্তরাত্মা
আরো ঊর্ধ্বে ওঠে
হয় আরো বলীয়ান — মহীয়ান
পূর্ণ তার হয়
প্রতি স্খলনের পরে আরো
প্রসারিত, অভ্রভেদী
প্রতি দীপ্ত বিফলতা রচি'
নব সোপান—সাধকে
অন্তিমে উত্তীর্ণ করে,
বিজয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে।

শ্রীঅরবিন্দ কোনোদিনই সে-জাতের স্বপ্নালু কবি ছিলেন না যাঁরা বলেন—ভগবান যখন নিয়ন্তা তখন তাঁর সৃষ্টিতে অকল্যাণ দুঃখ শোক থাকতেই পারে না—যাকে দুঃখ মনে হয় সে স্রেফ মায়া—মনঃকল্পিত ভয়ের ছায়াপাত। উত্তরপাড়া ভাষণে তিনি অকপটেই বলেছেন—যখন তিনি যোগসাধনা শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর মধ্যে কোনো জ্বলন্ত আস্তিক বিশ্বাসই ছিল না ঃ

"The agnostic was in me, the atheist was in me, the sceptic was in me.....

(আমার মধ্যে নাস্তিক অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়ী সবাই একসঙ্গে ঘরকন্না করত)।'

এ-হেন সত্যাশ্রয়ী জিজ্ঞাসু যে শেষে ভগবানের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে হয়েছিলেন তাঁর প্রিয় বাহন তার শুধু একটি কারণ ঃ তাঁর সত্যার্থী অন্তর শুধু ভগবানকে সত্য জেনেছিল বলে নয়, চিনেছিল বিশ্বলীলাকে তাঁর সৃষ্টিলীলা বলে। তিনি আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন ঃ 'তিনি ধর্মার্থী হয়ে যোগপন্থী হননি—কিন্তু ভাগবতী ইচ্ছায় তাঁর চোখের ধূলি খসে পড়ল—তিনি প্রত্যক্ষ করলেন এক বিরাট ভাগবতী কৃতি, আশ্চর্য লীলা। এই দিব্যদর্শনের ফলেই তাঁর সমগ্র সত্তার রূপান্তর হল তিনি দেখতে পেলেন (সাবিত্রী ২।৬) ঃ

Nothing is truly vain the one has made
In our defeated hearts God's strength survives
And Victory's star still lights our desperate road.

কিছুই নিষ্ফল নয়
সৃজিলেন যাহা ভগবান,
দৈবশক্তি আমাদের পরাস্ত প্রাণেও
রহে জাগি,
জয়তারা ধরে আলো আজো
দুর্বিষহ মরুপথে।

যখন শ্রীঅরবিন্দ এ-বাণী শুধু বাহ্যকর্ণে শোনা নয় অন্তঃশ্রুতিতে শুনেছিলেন কেবল তখনই তিনি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বাণীকে আন্তর অনুভূতির বাণীর এজাহারে নাকচ করতে চেয়েছিলেন—তার আগে নয়। এই দ্বিবিধ দৃষ্টি বা শ্রুতিভঙ্গির মধ্যে গভীর দৃষ্টির রায় বেশি প্রামাণিক হলেও বাহ্য দৃষ্টির রায় সম্পূর্ণ নামঞ্জুর হয় না। যাঁরা কথায় কথায় বলেন, 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে'—তাঁদের এ-ছেলেমানুষি প্রবোধ বাক্যে প্রবুদ্ধ মন সান্ত্বনা পায় না। সান্ত্বনা পায় কেবল তখন—যখন ভূয়োদর্শনের ফলে মানুষ দেখতে পায় যে, উপরভাসা দর্শন বা শ্রবণ আংশিক সত্য হলেও পূর্ণ সত্যের দেখা পায় না—যেমন পায় দিব্যদৃষ্টি দিব্যশ্রুতি। যখন এই গভীরতর বোধের লোকে সাধক ছাড়পত্র পায়, তখনই কেবল সে কিছুটা আভাস পায় ভগবানের আশ্চর্য কৃতির, অঘটনী চাতুরীর। আর পায় বলেই সে চর্মচক্ষেদেখা দুঃসহ দৃশ্যের মধ্যেও দেখতে পায় এক মহাশক্তিকে যে আবহমানকাল দুঃসহ দুঃখের মধ্যে দিয়েই অভিযান করে চলে এসেছে মানুষকে নিচে থেকে উপরে টেনে প্রতিপদের উন্মেষ থেকে পূর্ণিমা-পরিণতিতে। শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে তাঁর এই উপলব্ধিটিকেই আমার কাছে পেশ করেছিলেন—ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে, ১৭-১২-৩৬ তারিখে।* এ-সুদীর্ঘ পত্রের সবটুকুর উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই কেবল তাঁর বাণীটি গভীর ও মূলবান বলে এখানে কিছুটা উদ্ধৃতি দিই। তিনি আমাকে লিখেছিলেন ঃ

"Napoleon, when asked why he believed in Rate, yet was always planning and acting, answered : 'Because it is fated that I should work and plan.' In other words, his planning and acting were part of Fate, contributed to the results Fate had in view. Even if I foresee an adverse result I must work for the one that I consider should be; for it keeps alive the force, the principle of Truth which I serve and gives it a possiblility to triumph hereafter so that it becomes part of the working of the future favourable Fate, even if the Fate of the hour is adverse. Men do not adandon a cause because they have seen it fail or foresee its failure; and they are spiritually right in their stubborn perseverance. Moreover, we do not live for outward result alone; far more the object of life is the growth of the soul, not outward success of the hour or even of the near future. The soul can grow against or even by a material destiny that is adverse."

(ভাবার্থ ঃ একদা একজন নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তিনি নিয়তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও নিরন্তর ছক কাটেন কেন কখন কী করতে হবে, না হবে? উত্তরে নেপোলিয়ন বলেছিলেন ঃ 'কারণ আমার ছক কাটাও নিয়তি-নির্দিষ্ট' ঃ অর্থাৎ, তাঁর অতন্দ্র কর্মসাধনা তথা ছক কাটাও ঘটে থাকে নিয়তির নির্দেশেই ভবিতব্যকে ফলিয়ে তুলতে। ধরো আমি যদি দেখি—আমার কোনো সাধনা ফলপ্রসূ হবে না, তখনো আমি চেষ্টা করব যাতে আমি কৃতকৃত্য হই কেন না কেবল এই শুভ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কর্মশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, যে-সত্য আমার লক্ষ্য, তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব—এমনকি যে-নিয়তি আজ প্রতিকূল তাকেও অনুকূল করা যেতে পারে। সাধনা সফল হবে না জেনেও যে-মানুষ সাধনা থেকে বিরত হয় না, দুর্দম অধ্যবসায়কে বরণ করে চলে—এরই তো নাম মনুষ্যত্ব। অপিচ, আমরা কর্মব্রতী হই তো কেবল বাহ্য ফলাফলের কথা ভেবে বা কোনো ক্ষণিক সাফল্য কি নগদবিদায়ের লোভে নয়—অন্তরাত্মার প্রগতির জন্যেই কর্মযোগ। অন্তরাত্মার শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে বাহ্য নিয়তি প্রতিকূল হলেও, এমনকি প্রতিকূল হওয়ার জন্যেই।')

(ক্রমশঃ)

SRI AUROBINDO CENTENARY LIBRARY, VOL. 22, P. 467

গ্রীষ্মকাল গরম হাওয়া গরম ভাব সর্বত্র। কোথাও যেন আরাম নেই—না খেয়ে না সেজে না ঘুমিয়ে আর সবচেয়ে অশান্তি হচ্ছে শরীরের ঘাম নিয়ে। আমাদের প্যাচপেচে ঘামে শরীর শুধু ক্লান্তই হয় না বিরক্তিকর অবস্থাও হয়। প্রথমতঃ প্রচন্ড ঘামে দুর্গন্ধ হয় জামা কাপড়ের রং নষ্ট হয় শরীরের ওপর একটা জোলো ভাব ফোটে। বহু সুন্দরীকে এই কারণে সর্ব-সমক্ষে লজ্জিত বোধ করতে হয়। তাছাড়া এটা সত্যি যতোবড় সুন্দরই হোক পাশে এলে যদি সুগন্ধই না পাওয়া যায় তাহলে সৌন্দর্য ম্লান হয় বহুল পরিমাণে।

সাধারণত ঘাম হওয়ার প্রধান কারণ শরীরের ভেতরের হাজারো গ্ল্যান্ডস থেকে জল বেরোয় যা নুন নিয়ে আসে। এটা কোন শারীরিক শক্তি ক্ষয় বা আবহাওয়ার ফলে হয়ে থাকে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্গন্ধ হয় বিভিন্ন কারণে। প্রথমতঃ আমাদের শরীরের উর্ধ ভাগে রোমকূপের মুখে ময়লা ও বীজাণু জমে যা ঘামের সংগে মিশে আটকে থাকে ফলে পচে গন্ধ বেরোয়। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে নোংরা মানুষদের গায়ে দুর্গন্ধ হয় বেশী। নিয়মিত পরিস্কার করে স্নান করলে বা শরীর পরিষ্কার রাখলে দুর্গন্ধ কোন কারণেই হতে পারে না। কিন্তু আরও একটা কারণে ঘামে দুর্গন্ধ ও জামায় দাগ হয় তা হল এ্যাসিড। শরীরে প্রচুর পরিমাণে এ্যাসিড ও অম্ল জাতীয় জিনিষ থাকলে ঘামের সংগে তা বেরিয়ে আসে ও তার ফলে দুর্গন্ধ হয়। এইসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে উপযুক্ত ওষুধ খাওয়া দরকার। শুধু তাই নয় নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা একটি বিশেষ দরকারী অভ্যাস—যেটা উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। সভ্যতার সুরু থেকেই দেখা গেছে যে স্নান ও বিশেষ ধরণের স্নানের প্রাচুর্যের প্রতি রাজা-মহারাজাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রোমান ও গ্রীক রাজারা রীতিমত ঘটা করে স্নান পর্ব সারতেন। তারপর বিশ্ব সুন্দরীর অন্যতম ক্লিওপেট্রাও খুব সমারোহ ও ঘটা করে নানা সরঞ্জাম দিয়ে স্নান করতেন। শোনা যায় গাধার দুধ গোলাপরস ও নানান সুগন্ধি পাতা ও গাছের শিকড়ের রস দিয়ে স্নান পর্ব সারা হোত। আজকাল অনেকে স্নানের টবে সুগন্ধি স্নানের মশলা জলে মিশিয়ে স্নান করে থাকেন। এছাড়া সুগন্ধি সাবান গোলাপ জল ইত্যাদিও ব্যবহার করে থাকেন।

ঘামের দুর্গন্ধ বন্ধ করার আসল উপায় তো ভালভাবে পরিস্কার করে দুবেলা স্নান করা বা গা ধোয়া। এছাড়া মনে রাখতে হবে যে শরীরের যে সব অংশে চুল হয় সেখানে বীজাণু ও ময়লা উভয়ই বেশী তাড়াতাড়ি জমতে পারে—তাই সেই সব জায়গা পরিস্কার রাখা খুব প্রয়োজন। এছাড়া গ্রীষ্মকালে স্নানের পর বডি পাউডার মাখা ভাল। স্নানের শেষে জলে একটু গোলাপ জল, লেবু পাতা চটকিয়ে মিশিয়ে সেটা শেষ বারের মতন ঢেলে নিয়ে গা মুছে ফেল্লে সারাদিন শরীরে একটা ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন সুগন্ধ পাওয়া যায়। আরও একটি ব্যাপারে সচেতন হওয়া খুব দরকার। তাহল তোয়ালে বা গামছা যা দিয়ে গামোছা হবে প্রাতবারে স্নানের পর সেটা ধুয়ে মেলে রেখে দিতে হবে যাতে ভেজা গন্ধ বা ময়লা জমে না থাকতে পারে। এটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে নয় তবুও বলছি যাদের অর্থ আছে তারা যদি স্নানের শেষ জলটুকুতে —ধরুন তিন মগ জলে দুই চামচ আঙ্গুরের রস ও আধকাপ গোলাপ জল মিশিয়ে গায়ে ঢেলে নেন তাহলে সারাদিন শরীরে খুব সুন্দর তাজা সুগন্ধ থাকে। এছাড়া অবশ্য আজকাল বহু রকমের পারফিউম কোলোন ইত্যাদি বেরিয়েছে সেগুলি ব্যবহার করা যায়। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার কোন কিছুই ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যাবে না যদি না ভাল এবং পরিস্কার করে স্নান করা যায়।

আরও একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, পোষাক সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া দরকার। বেশী চড়া রং-এর জামা পরলে গরম বেশী হয় ও ঘাম হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া যে জামা পরে একবার খুব ঘেমে গেছেন সেই জামা ভাল করে না ধুয়ে পরলেও দুর্গন্ধ হয়। জামা ধুয়ে ভাল করে ছায়ায় শুকিয়ে নিলে রংও নষ্ট হয় না আবার কোন রকমের দুর্গন্ধও থাকে না। যে সব জামা বা অন্তর্বাস শরীরের সংগে লেগে থাকে সেগুলি নিয়মিত ধুয়ে কেচে পরা উচিত। অনেক সময় দেখা গেছে বাইরের পোষাকের চটক আছে অথচ ভেতরের না কাচা অপরিচ্ছন্ন জামা কাপড়ের জন্য সুগন্ধ থাকছে না।

তাহলে পোষাক তাররঙ পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদিই সৌন্দর্য ও সুগন্ধ রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এসব বিষয়ে সচেতনতা থাকা উচিত ও তা বাঞ্ছনীও—বিশেষ করে যাঁরা সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন।

এরপরই প্রশ্ন জাগে যাঁরা পারফিউম বা কোলোন ব্যবহার করেন তাঁরা তা কিভাবে ব্যবহার করবেন এটাও কিন্তু জানা উচিত। অনেকে মনে করেন কড়া গন্ধ দিয়ে গ্রীষ্মের পচা গন্ধ ঢাকা যায়, সেটা কিন্তু ভুল। বেশী কড়া গন্ধের দেশী কমদামী সেন্ট ব্যবহার করার চেয়ে না করা অনেক ভাল। ওতে স্নিগ্ধ ভাব ফোটে না বরং আরোও খারাপ হয়।—

পারফিউম ব্যবহার করার সময় মনে রাখতে হবে যে সেটা দিনের বেলা না সন্ধ্যেবেলা করবেন। দিনের বেলার পারফিউম ও সন্ধ্যার মধ্যে তফাৎ এই—প্রথমটির একটু তেজ থাকা উচিত ও সন্ধ্যেবেলার গন্ধে মৃদু মিষ্টত্ব থাকা দরকার। এমন অনেক ক্রিম পারফিউম আছে যা একান্ত পাশে না এলে পাওয়া যায় না। কোন সান্ধ্য ভোজ বা সেই ধরণের পার্টিতে গেলে ওই সব ক্রীম পারফিউম মাখা ভাল। ওতে আকৃষ্ট হয় প্রতিটি ব্যক্তি। মধুরতা ও স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্যের সংগে বিশেষভাবে জড়িত।

সৌন্দর্য তখনই উচ্চ পর্যায়ের বলে ধরে নেওয়া হয় যখন তার মধ্যে থাকে স্নিগ্ধতা ও সুগন্ধি মাধুর্য। অনেকে আতর ব্যবহার করে থাকেন। সেখানেও একই কথা আতর কড়া গন্ধের হলে ব্যবহার করবেন না অবশ্য যদি খুব সামান্য করেন তাহলে অন্য কথা। তবে এটাই সার কথা সুগন্ধ রাখতে হলে শারীরিক পরিচ্ছন্নতাই সবচেয়ে দরকারি জিনিষ।

বরবর্ণিনী

পুনশ্চ

বই-এর পোকা বললে সাধারণতঃ আমরা বই নিয়েই দিনরাত যাঁরা কাটান এমনি 'রামপড়ুয়া' গোছের লোকদেরই মনে করে থাকি। কিন্তু সত্যি-সত্যি যে বইয়ে পোকা ধরে এবং বুক লাভার্স-এর দিক থেকে এটা যে একটা দারুণ ক্ষতিকর ও অভিশাপ বিশেষ তাতে আর ভুল নেই।

এই বই-এর পোকা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ একসময় বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বাসন্তী' নামক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সালের ২৯শে বৈশাখ সংখ্যায়। যাঁরা বই ভালবাসেন এবং বহু বই একত্রে রাখার সমস্যায় যাঁদের বইয়ে পোকা ধরছে এই নিবন্ধটি তাঁদের প্রভূত উপকারসাধন করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। / রচনাটির লেখক ধীরেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা।

।। বই-এর পোকা ।।

"কথায় বলে বই বাজারেও কাটে আবার পোকায়ও কাটে। যাদের অদৃষ্ট ভাল তাদের বই বাজারে বেরুতে না বেরুতে শেষ হয়ে যায়, আর যাদের নিতান্ত দুরদৃষ্ট তাদের কারু কারু জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রথম সংস্করণের বই ক'খানাও কাটতি হয় না। এই শেষোক্ত গ্রন্থকারদিগের অবস্থা যে কি হয়ে দাঁড়ায় তা যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরাই বুঝতে পারবেন। বেচারাদের বই বাজারে তো কাটেই না, অত খরচ করে বই ছাপিয়ে অযত্ন করে ফেলে রাখাও চলে না। যত্ন করে আলমারী বোঝাই করে রেখেও নিশ্চিন্ত নেই...কখন পোকায় কেটে সব নষ্ট করে ফেলে!...

বাস্তবিক গ্রন্থকার কেন বড় বড় বিদ্যান বুদ্ধিমান এমন কি প্রায় লেখাপড়া জানা লোকই বই-এর পোকার জ্বালায় বিব্রত হয়ে পড়েন। লাইব্রেরীয়ানদের তো কথাই নেই, অন্ততঃ যেখানে ৫০খানা বইও একত্রে রাখা হয় সেখানেই পোকার উপদ্রব টের পাওয়া যায়।

ইন্দুর, উই ইত্যাদি ছাড়া বইয়ের আরও অনেক শত্রু আছে। তাদের খাদ্য শুধু মলাট বা কাগজ। একরকমের পোকা আছে যেগুলো ছোট ছোট ছিদ্র করে মলাট থেকে পিছন দিক পর্যন্ত একেবারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়। কোন কোনগুলি আবার বাঁকা পথ ধরে ডানদিক থেকে বাঁদিকে খেতে খেতে চলে। এসব পোকার খাদ্য শুধু বই-ই নয়—বেত কাঠ শুকনো তরকারি ইত্যাদি সবই এরা খায়, তবে বইটাই এদের সবচেয়ে প্রিয়। এদের চেহারা বাদামী রঙের। খুব ছোট ধরনের। হাত-পা সবশুদ্ধ ছয়টি, দুইটি শুঁড়। বই-এর ভিতর এরা ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। বাচ্চাগুলো প্রথম অবস্থায় থাকে কৃমির মত তারপর হাত-পা ক্রমে ক্রমে গজাতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে এদের দাঁতের শক্তি পরীক্ষা চলতে থাকে বই-এর উপর। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এসব পোকা আমদানী হয়েছে ইউরোপ থেকে।...

বই-এর আর একটি বড় রকমের শত্রু হচ্ছে আরশুলা বা তেলাপোকা। এদের বই-এর মলাটের উপর বেজায় টান, বিশেষ করে লাল রঙটার উপর। মলাটের রঙগুলিকে খেয়ে খেয়ে একেবারে বিশ্রী করে দেয়। এরা ডিম থেকে বেরিয়ে আর কৃমির অবস্থায় কাটায় না, একেবারে তেলাপোকা হয়ে জন্মায়।

যেসব বই খুব ঘনঘন নাড়াচাড়া পায়, সেসব বই-এর ভিতর প্রায়ই পোকা দেখা যায় না। যদি দু'একটাও দেখা যায় তবে সব বই একেবারে ঝাড়া মোছা করা ছাড়া এদের হাত থেকে আর বাঁচবার উপায় নেই, করণ এরা ক্রমেই বেড়ে চলতে থাকে। যদি আক্রমণ খুব বেশীরকম হয় তবে সব বই আলমারী থেকে নামিয়ে একটা কাঠের বাক্সে বন্ধ করে, গন্ধক দ্রাবক ঢেলে দিতে হয়। গন্ধক দ্রাবক জিনিসটা বাতাসের সংস্রবে আসামাত্র উড়ে যায় আর বইয়ের সব পাতার ভিতর ঢুকে পোকাগুলোকে মেরে ফেলে। তখন আলমারীগুলোকে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তার পরে বই সাজিয়ে রাখলে শীগ্‌গির আর পোকা আক্রমণ করে না। গন্ধক দ্রাবক দিয়ে বই-এর পোকা নষ্ট করার নিয়ম হচ্ছে ২০০ কিউবিক ফুট জায়গায় ১ পাইন্ট দ্রাবক ঢালা। আর অন্ততঃ ২৪ ঘন্টা এর ধুয়ার ভিতরে বইগুলোকে ডুবিয়ে রাখতে হয়। তেলাপোকার অত্যাচার যেখানে খুব বেশী, সেখানে এক ভাগ সোহাগা দুই ভাগ সিরাপের সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে টিনে বা কার্ডবোর্ডে মেখে বই-এর আলমারীর কোণায় রেখে দিলে তেলাপোকাগুলো খাওয়া মাত্র মরে যায়। তেলাপোকার পক্ষে সোহাগা মহা বিষ।

আর এক রকমের পোকা আছে দেখতে লম্বা ধরনের, রূপার মত রং। এরা কাগজের চকচকে ঝকঝকে পালিশগুলি আর বই জোড়া দেবার আঠা খেতে খুব ভালবাসে।

এ সবের হাত থেকে পুস্তকগুলি রক্ষা করবার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখলে ও একটু যত্ন নিলে দামী দামী বইগুলো আর পোকার হাতে পড়ে বছর বছর নষ্ট হবে না।

১। বইতে বাঁধাই করতে বা পাতা জোড়া দিতে কখনো তুঁতে মাখান আঠা ছাড়া শুধু ময়দার আঠা বা অন্য কোন আঠা ব্যবহার না করা।

২। আলমারীটি মজবুত ও পরিষ্কার থাকা দরকার। বইগুলিকেও একটু ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়ে ন্যাপথলিন দিয়ে রাখতে হয়।

৩। মাসান্তে না হলেও, অন্ততঃ তিন মাস অন্তর বইগুলিকে আলো-হাওয়া লাগান ভাল।

৪। বর্ষাকালেই বই বেশী খারাপ হয় ও পোকায় কাটে। তাই বর্ষার আগে নীচের লেখা যে কোন একটা ওষুধ দিয়ে বইগুলি মাখিয়ে রাখা উচিত। বইখানিকে বন্ধ করে শক্ত করে চেপে ধরে মলাটের সবটা বইয়ের পাতার মুখ ও পিছনের বাঁধাই জায়গা বিশেষ করে ওষুধ লাগাতে হয়। যে কোন একটি লাগালেই যথেষ্ট।—

(ক) মেথিলেটেড স্পিরিট—৪ আউন্স
কারবলিক এসিড—১ আউন্স
করোসিভ সাবলিমেট—১ আউন্স

(খ) মেথিলেটেড স্পিরিট—১ কোয়ার্ট
কর্পূর—১ আউন্স
ফটকিরি ভস্ম—½ আউন্স
করোসিভ সাবলিমেট—১ আউন্স

দুটো জিনিসই খুব বিষাক্ত। হাতল-ওয়ালা ব্রাশ দিয়ে লাগানোই নিরাপদ। গরমের দিন লাগালে মাঝে মাঝে আলমারী খুলে হাওয়া লাগান ভাল।

(গ) কেরোসিন তেল—১ পাইন্ট
ন্যাপথলিন—২ আউন্স

শেষোক্ত ওষুধটি বিষাক্ত নয়। এটা লাগানোই সবচেয়ে ভাল। তবে বইয়ে ওষুধ লাগিয়েও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা ভাল নয়। মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে দেখলে পোকা ধরার কোন আশঙ্কা থাকে না।

(বর্তমান সময়ে অনেকে 'গ্যামাক্সিন' বা অন্যান্য কীটনাশক ওষুধও বই-এর পোকা মারার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। নীমপাতা শুকনো করেও বই-এর মধ্যে দেন অনেকে।)

ক্ষপণক

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম ----- ১৪·০০
২। গুল বাগিচা----৩·৫০ ৩। কাব্য আমপারা--৪·০০
৪। পুবের হাওয়া----২·০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী--২·০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন ষ্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

উপন্যাস

মেঘবিচ্ছুরণ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বঙ্কিম দত্ত যা চান রঞ্জু তা নয়। তার চিন্তার জগৎ পরিবেশ সবই স্বতন্ত্র। আর যুঁইদি এসে যেন ষোল বছরের রঞ্জুর মানসিক জগৎকে আমূলে পাল্টে দিয়েছে। বিবাহিতা যুঁইদি যেন তাকে কাঁচপোকার মত আকর্ষণ করছে। বঙ্কিমবাবুর মত কি অমিয়ই হতে পেরেছে? শুধু একটা ভয় তার বাবার মতই। তার বন্ধু রুদ্রেন্দু গরীব এবং বিপ্লবী মেজাজের বলে তাকে সেও এড়িয়ে চলতে চায়, ভয় করে। সেই রুদ্রেন্দুর সঙ্গে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল অমিয়র। প্রথমটা সে খুব বিব্রত হলেও পরে সামলে নিল এবং বেশ ঠাট্টার মেজাজেই তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। যেন একটা মজার লোকের সঙ্গে কথা বলছে সে।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ রঞ্জুও দেখে ফেলল দূর থেকে। বাবার পাশে এক ঝাঁক টিয়ের মত টুটুলদের দলটা। সবাই আজ শাড়ি পরেছে। বাবাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বুড়ো ভালুক। তার পাশে বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে মনে হচ্ছে ভীরু রোগা তাড়া খাওয়া শেয়াল। বাবার পাশে গোপাও আছে। তার সঙ্গে গোপার একটা নীরব সম্পর্ক আছে। যেটা কেউ জানে না। কাল রঞ্জু যুঁইদির সঙ্গে কেষ্টনগর চলে যাবে বেশ কিছুদিনের জন্যে। সেই খবরটা ওকে দেবার জন্যে ভেতরে ভেতরে চঞ্চলতা অনুভব করে রঞ্জু। রঞ্জু সুযোগও পেল বাড়ীতে যখন গানের আসর বসিয়েছিলেন বাবা। রঞ্জু তখন তার পড়ার ঘরে যুঁইদির সামনে বসে কেষ্টনগরে যাবার জন্যে গোছগাছ করছিল। তার মধ্যেই সে ফাঁক বুঝে কথাটা বলে ফেলল বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। সেই রাত্রেই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার শুনল সে। মা চেপে ধরায় টুটুন বোটানিকেলে গিয়ে তার বাবা তারই বান্ধবী গোপাকে ছুতো করে গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল, এই কথাটা কবুল করতেই মা'র মুখ চোখ রাগে কঠিন হয়ে উঠলো। তাহলে বাবাকে কি মা সন্দেহ করে?

— তেইশ —

মায়ের পেটের বোন বলে কি কখনো ওই মেয়েকে সে ভাল চোখে দেখবে—নেভার।

একটা ঝড়ো নিশ্বাস রঞ্জুর বুক ঠেলে উঠে এল।

আর দাঁড়ায় না সে!

টিকটিক হয়ে আবার চুপচাপ বারান্দা ধরে হাঁটে। আসল কথা হল—চিন্তা করল সে—ওই মেয়েটার মধ্যে ভালবাসাটাসা কোনোদিনই জন্মাল না। এই জন্যই ওর ভেতরটা এত অন্ধকার হয়ে আছে। মনটা এত ছোট হয়ে আছে। ওর এক-আধটা বয়-ফ্রেন্ড থাকত—এসব ছোটখাট জিনিসের দিকে কখনই মনোযোগ দিত না।

মা যতই গৌরী রুমি ঝুমেবামে কি টুটুনের আরও দু-একটি বন্ধুর কথা ভাবুক—ওরা কেউ এমন নয়—টুটুনের মতন নয়। যেহেতু বাবা আলাদা করে গোপাকে ডেকে নিয়ে একটা পাখি বা ক্যাকটাস দেখিয়েছে—তাই নিয়ে তাদের মনে চুলবুলি আরম্ভ হবে বা গোপাকে নিয়ে বাবা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে গৌরীর কাঁধে রুমি চুপি চুপি চিমটি কাটবে—আহা মিথ্যা কথা। এ-বাড়ির কুটনী মেয়েটার বানানো কথা সব।

নিজের মেয়ের কথা মা বিশ্বাস করতে পারে। রঞ্জু করে না। ওরা কেউ ওই কুটনী টুটুনের মতন নয়। একটিও না। তবে আর বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফিরে বাবার সঙ্গে সোজা এ-বাড়ি চলে আসত না। একলা গোপা ছাড়া। আর আমাদের এই টুনটুনি পাখি ছাড়া বাকি সবাই মাঝরাস্তা থেকেই কেটে পড়ত। যে-যার বাড়ির রাস্তা ধরত। রাত নটা পর্যন্ত অম্বুজা-নিলয়ের গানের আসরে বসে থাকত না। গৌরীও নজরুলের গান গেয়ে শোনাত না।

আহা, টুটুনমণি শিগগির তুমি একটি বয়-ফ্রেন্ড জুটিয়ে ফেল। তোমার এক-ডালিয়া রোডের বন্ধু গৌরীর বয়-ফ্রেন্ড আছে সে-খবর রাখ? রঞ্জু নিজের চোখে দেখেছে। কালো গগলস-পরা লাল-সবুজে চেক-মারা একটা সার্ট গায়ে বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একজনের সঙ্গে পর পর দু'দিন লেকের ধারে গৌরীকে রঞ্জু ঘুরতে দেখেছে। তোমার আর এক বন্ধু রুমিরও সে একটি মস্তবড় লাভার আছে—সেই খোঁজও কি তুমি রাখ টুটুন? কলেজ স্ট্রীটের একটা চায়ের দোকানে একদিন রুমিকে ওর চেয়ে ঢের বেশি বয়সের একটি ছেলের সঙ্গে ঢুকতে দেখেছিল রঞ্জু! সেদিন শোভেনও তার সঙ্গে ছিল। রঞ্জুর কানে কানে শোভেন বলছিল ঐ ভদ্রলোক শ্যামবাজার থাকে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ছাত্র ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা।

বোঝ টুটুনমণি! রুমি ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় একটি ছেলের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে। কোথায় ও সাউথের মেয়ে। রিজেন্ট পার্কে বাসা। আর কোথায় শ্যাম-বাজারের ছেলে। স্টুডেন্টস লীডার। তা-ও রুমি এখনও কলেজের দরজাও মাড়াল না। তবে রুমির মামাবাড়ি যে শ্যামবাজার এটা সবাই জানে। ও-পাড়ায় যাওয়া-আসা করতে করতেই এটা হয়েছে রঞ্জুদের অনুমান। তোমার আর এক বন্ধু অসিতের বোন—ফার্ণ রোডের টুবলির বয়-ফ্রেন্ড আছে কিনা ওকে একদিন তুমি নিজে জিজ্ঞেস করবে। কেমন কান মলে মলে পাথর পকেট থেকে ওই মেয়ে টাকা খসাচ্ছে আর রোজ মজা করে চপ-কাটলেট মাংস পরটা বাজলো রাবড়ি খাচ্ছে। হি-হি। তোমার মতন ওরা কেউ বোকা নয়।

আর তোমার ওই যে বন্ধু ঝুমেবামে—লেক গার্ডেনের বসন্তবউরি—ও-ও চুপ করে নেই। দারুণ প্রেম করছে ওদের পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে। অরুণাভ না কি যেন নাম। কবিতা-টবিতা লেখে। অবিকল মেয়েদের মতন দেখতে। বাঁশীর মতন নাক। খুব ফরসা রং। পাতলা ছিপছিপে শরীর।

মেয়েলী সুরে কথা বলে। হাতে লেখা একটা ম্যাগাজিন বার করে। সোমেনের জেঠামশায়রা ও-পাড়ায় থাকেন বলে সোমেনকে প্রায়ই ওদিকে যেতে হয়। সোমেনের জেঠামশায়ের ছেলে হীরেনের কাছ থেকে সোমেন ঝুমঝুমের ব্যাপারটা জানতে পেরেছে। এবং মেয়েদের মতন চাল-চলন মেয়েদের মতন দেখতে কবি অরুণাভ নাকি বেশ গর্ব করে বন্ধুদের কাছে বলে বেড়াচ্ছে লেক-গার্ডেনের ঝুমঝুমের সঙ্গে তার যে প্রেম চলেছে সেটা খাঁটি ইন্টলেক-চুয়্যাল প্রেম। বডির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। সবটাই মনের ব্যাপার। ঝুম-ঝুমও নাকি কবিতা লেখে। ওর একটা কবিতা অরুণাভর হাতে-লেখা ম্যাগাজিন 'নক্ষত্রলোক'-এ বেরিয়েছে। আরও দুটো কবিতা বেরোবে।

কাজেই তোমার বন্ধুরা সবাই একটি একটি জুটিয়ে নিয়েছে টুটুন।—আর তোমার কাজ হল কিনা মা-র কাছে এসে বাবার নামে নালিশ করা। বাঙ্গাল কথায় কুটনামী করা। কিন্তু যাকে জড়িয়ে বাবার নামে কুটনামী করছ তার একটা দাঁতের খুদ্ধি যদি তুমি রাখতে। হুঁ এ-বাড়ি ওকে ঘন ঘন আসতেই হবে। তুমি ওর বন্ধু। আসার সুযোগও রয়েছে। বাবা ওর ভজন শুনতে বড্ড ভালবাসে। যেজন্য তোমার আর পাঁচটি বন্ধুর চেয়ে ওকে বাবার বেশি পছন্দ। তাতে ওর আরও সুবিধে হয়। উঠতে-বসতে বাবার মন রাখছে। বাবার সঙ্গে আলাদা করে ঝোপেঝাড়ে ঢুকে পাখি দেখছে এই গাছের ফুল দেখছে, সেই গাছের পাতা চিনছে। বাবা আর্টিস্ট। ছবি আঁকতে পারে না, কবিতা বা লেখার অভ্যাস নেই যদিও। কিন্তু মনটা পুরোপুরি কবির —শিল্পীর। যেজন্য বাবা যে-চোখ দিয়ে হরিয়াল বা তিতির পাখি দেখে ক্যাকটাস দেখে বনের ঘাস, গাছের পাতা, আকাশ মেঘ তারা রোদ বৃষ্টি প্রজাপতি মাছ ঘাসের শিশির ইত্যাদি দেখে সেই চোখ দিয়ে বাবা—বুঝেছ টুটুনরানী—তোমার বয়সের ফুটফুটে মেয়েদেরও দেখে। তাই বাবা তোমাদের এক-একটির ফুলের নাম, পাখির নাম দিতে পেরে খুশি হয়। কাঁকুলিয়া রোডের ফ্লেমিংগো—গোপা বাবার মনটা সবচেয়ে বেশি বুঝতে পেরেছে। নিজের গরজে ওর বুঝতে হয়েছে বাবাকে—চিনতে হয়েছে। যদি আজ ক্যাকটাস দেখতে গিয়ে ঝোপের ভিতর ঘাসের ওপর বসে বাবা একটু জিরিয়ে নিতে চাইত, গোপাকেও বাবার পাশে বসতে হত। দরকার হলে বাবার হাত-পা টিপে দিত ও। বাবার মাথার পাকা চুল বেছে দিত। কেননা গোপা জানে বাবাকে খুশি করা, বাবার মন জয় করা অর্ধেক রাজ্য জয় করার সামিল। মা-কে সুবিধে করতে পারছে না। রাসভারি মানুষ। লোকের "সঙ্গে মেলামেশা একেবারে অপছন্দ—তা না হলে দেখতে পেতে এবাড়ি ঢুকেই মা-র মাথাটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে তাঁর প্রায় পেকে-আসা চুলের একটি-দুটি খুঁজেপেতে বের করে গোপা কেমন পটপট তুলে আনছে বা গরমকালে মা-র পিঠের জামা সরিয়ে টুসটুস ঘামাচি গালছে। কেননা, ও জানে মা-র মন জয় করতে পারলে বাকি অর্ধেক রাজত্ব ওর হাতের মুঠোয় এসে গেল। রঞ্জুকে পেতে তখন আর ওর কোনোদিকে তাকাতে হত না।

কাজেই তোমার যখন কোনো বয়-ফ্রেন্ড নেই টুটুন তখন গোপাকে বিচার করতে যাওয়া—গোপাকে জড়িয়ে বাবার নামে নালিশ করতে যাওয়া একদম সাজে না। এতে তুমিই ঠকবে, তুমিই হেরে যাচ্ছ। হেরে গেছ। বাবা ঠিক দলবল নিয়ে চন্দ্র-মল্লিকা প্রদর্শনী দেখতে যাচ্ছে। হয়তো সেদিনও গোপাকে নিয়ে বাবা আগে আগে হাঁটবে। তোমার বন্ধুরা পিছনে থাকবে। মা বাধা দিতে পারবে না। মাঝখান থেকে তুমি ঘরে আটকা পড়ে গেলে। বাড়ি থেকে তোমার বেরোনো বন্ধ হল। চুক-চুক-চুক।

তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে আশ্চর্য একটা শব্দ করতে করতে রঞ্জু দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে থমকে দাঁড়াল।

ছেলের সঙ্গে একতলার বারান্দায় বসে বুড়ো নিশ্চয় জরুরী কথা বলছে। খুব একটা শব্দ না হয়—বাড়ির আর কেউ না শোনে—চাপা গলায় বাপ-বেটার মধ্যে আলোচনা। বুড়ো একটা কথা বলছে আর ছেলে শুনছে। আবার ছেলে বলছে, বাপ শুনছে। যেন শুকনো কাঁঠালপাতা খসে পড়ার টুপটাপ আওয়াজ। বেশি চড়ায় উঠছে না কারো গলা। কিন্তু আলোচনাটা কি নিয়ে কাকে নিয়ে? আবার রঞ্জুকে শ্বাস বন্ধ করে প্যাসেজের দেওয়ালের সঙ্গে লেপটে দাঁড়াতে হয়। নিচেও আলো জ্বলছে। সে পরিষ্কার দেখল কি একটা কথা বলে শেষ করে বাবা ঘাড় নিচু করে হাত দুটো আঙুলে আঙুলে জড়াজড়ি করে কোমরের পিছনে ধরে রেখে খানিকটা পায়চারি করল, তারপর একসময় বুড়োর চেয়ারের সামনে দাঁড়াল।

—রুজিরোজগার টাকা-পয়সা। এই চিন্তা ছাড়া এখন আর মানুষের অন্য চিন্তা নেই—অন্য ভাবনা নেই তাই না বাবা! রঞ্জুর বাবা প্রশ্ন করছে। বুড়ো চুপ। রঞ্জুর বাবা তখন আবার বলছে একটা মানুষের ইনকাম দেখে তার উপার্জনের পরিমাণ দেখে

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকার-কর্তৃক সরকারি এবং সরকারি সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়-সমূহের গ্রন্থাগারে রাখার ও পুরস্কার দেবার উপযোগী বিবেচিত

রবীন্দ্রনাথের

॥ কবিতা ও গান ॥

কণিকা ১·০০, শোভন সংস্করণ ৩·০০
ছড়া ২·৫০
ছড়ার ছবি ৫·০০
নৈবেদ্য ১·৩০
শিশু ২·৬০ বাঁধাই ৪·০০
শিশু ভোলানাথ ৩·০০
সংকলন ও স্বদেশ ২·৮০

॥ গল্প ও উপন্যাস ॥

গল্পসল্প ৪·৫০
রাজর্ষি ৩·০০
কুরুপাণ্ডব । রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ৩·০০

॥ স্মৃতিকথা ॥

ছেলেবেলা ২·৫০

॥ জীবনকথা ॥

আত্মপরিচয় ২·০০
ভারতপথিক রামমোহন রায় ৪·৫০
মহাত্মা গান্ধী ১·৫০
চারিত্রপূজা ২·২৫
বিদ্যাসাগরচরিত ২·০০

॥ গদ্যনাট্য ॥

অচলায়তন ২·০০, বাঁধাই ৩·০০
ডাকঘর ১·৫০
মুকুট ১·০০
মুক্তধারা ২·০০
শারদোৎসব ২·৫০
হাস্যকৌতুক ২·৮০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট । কলিকাতা ১৬
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

এখন লোকে তার মনুষ্যত্বের তার বিবেক-বুদ্ধি মেধা ও যাবতীয় যোগ্যতার বিচার করে—কেমন?

—হুঁ, উপার্জন চাই। কিছু কিছু উপার্জনের দরকার বৈকি। কথাটা বলে বুড়ো ঘাড় তুলে ছেলের মুখের দিকে তাকায়। তাকিয়ে তখনি আবার বাগানের দিকে চোখ ফেরায়। তারপর স্বগতোক্তির ঢঙে বলে—যেমন দিনকাল পড়েছে—হার্ড টাইমস। বৌমার রাগারাগি করাটা খুব একটা অস্বাভাবিক না।

রঞ্জু নিশ্চিন্ত হল। ব্যস। একটা কথায় সব সে বুঝে গেল। তাকে নিয়ে আলোচনা না। সারাদিন মেয়েদের নিয়ে বাবার পাখি দেখা। তারপর বাড়ি ফিরে ওদের নিয়ে গানের আসর জমানো। তার ওপর বোটানিক্যাল গার্ডেনে বাবার চালচলন। কুটনী মেয়েটা যা সব রিপোর্ট দিচ্ছে—শুনে মা যে খাওয়ার আগে থাকতেই রাগারাগি করছিল বুড়ো নিশ্চয় সেটা লক্ষ্য করেছে। মা-র চেহারা দেখে বাবাও বুঝতে পেরেছে। তাছাড়া গানটান শেষ করে নিচে নেমে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোপারা যখন শিউলি ফুল নিয়ে বাড়ির দুটি বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কথা বলছিল মা তখন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এবং তখন যেমন একটা বিশ্রী গলার সুর করে মা ওদের বাড়ি চলে যেতে বলল—সব দেখেশুনে বুড়ো ও বুড়োর ছেলে ধরে নিয়েছে রঞ্জুর মা-র রাগের আসল কারণ হল রোজগারপাতির দিকে রঞ্জুর বাবার মন নেই।

এটা বেশ কিছুদিন ধরে চলছে। রঞ্জু দেখছে, মা যখনই বেশি রাগটাগ করে—বাবার সঙ্গে বুড়োর আলোচনাটা ঠিক এই একটা খাতেই বইতে শুরু করে। টাকা-পয়সা। ঘরের পুরুষ প্রচুর উপায় না করলে মেয়েরা সন্তুষ্ট থাকে না। কোনো সংসারেই থাকে না। দিনকাল ক্রমেই যেমন খারাপ হচ্ছে। তোমার ছেলেমেয়েদেরও ভবিষ্যৎ আছে অমিয় সত্যরাং—অনেক কিছু বুড়ো বাড়ির বড় ছেলেকে তখন বোঝাতে থাকে।

আজও এই নিয়ে বাপ-বেটার কথা হচ্ছে। রঞ্জু মনে মনে হাসল। দু-কান খাড়া করে পরের কথাগুলি শুনতে লাগল।

হার্ড টাইমস। বুড়োর মুখে ইংরেজী শব্দ দুটো শুনে রঞ্জু দেখল—বাবা হঠাৎ গুম মেরে গেছে। তারপর আবার একটু সময় পায়চারি করে বাবা তাঁর বুড়ো বাপের সামনে এসে দাঁড়াল।

—হুঁ, যার হার্ড টাইমস তার। হাত নেড়ে বাবা বুড়োকে বোঝায়। যদি সেকথা বলো সত্যিকার হার্ড টাইমস যাচ্ছে রুদ্রেন্দুর। রাত-দিন পাগলের মতন তার কেবল এখন রুদ্রুর রোজগারের ভাবনা। ইনকাম বাড়াবার চিন্তায় লোকটার মাথা খারাপ হবার দাখিল। যদি আজ আবার রুদ্রেন্দুর কথাবার্তা শুনতে—

—আজ আবার কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা! বঙ্কিম দত্ত ভয়ানক চমকে উঠল।

এটা দেখবার মতন। রঞ্জুর খিকখিক করে হাসতে ইচ্ছে করছিল। রুদ্রেন্দুর নাম শুনেই বুড়োর আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাই তো! তার মনে পড়ল সন্ধ্যের দিকে রুদ্রেন্দুর সঙ্গে রাস্তার সেই বকুলগাছটার কাছে বাবার আবার দেখা হয়। ফুটপাথের একপাশে দাঁড়িয়ে দুজন কথা বলছিল। টুটুনদের দলটা একটা বকুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। রঞ্জু ছিল উল্টোদিকের ফুটপাথে। অনেক আগেই সে বাড়ি ফিরে আসত। ঘুঁইদির আরও দু একটা জিনিসের অর্ডার ছিল। কেনাকাটা সেরে সে চলে গিয়েছিল সোজা মার্কেটের কাছে সেই চ্যাটার্জি ব্রাদার্সের ক্যামেরার দোকানে। শোভেন আজ সকালে বলছিল নতুন এক ধরনের জাপানী ক্যামেরা ওই দোকানে এসেছে। হ্যান্ড-ক্যামেরা। দারুন সস্তা। অথচ জিনিস খুবই ভাল। ঘুঁইদির কথায় বোঝা গেছে কেষ্টনগর গিয়েই রঞ্জুকে একটা ক্যামেরা কেনার টাকা দেবে। যাতে কলকাতা ফিরেই সে ক্যামেরাটা কিনে ফেলতে পারে। চ্যাটার্জি ব্রাদার্সের দোকান অবশ্য খোলা দেখল না রঞ্জু। বিষ্যুৎবার না। তবু কি কারণে যে হঠাৎ আজ দোকানটা বন্ধ দেখল সে বুঝতে পারল না। জাপানী ক্যামেরা অবশ্য সে কিনবে না। তবু জিনিসটা কেমন কৌতূহল নিয়ে দেখতে গিয়েছিল। ওখান থেকে যখন ফিরছে, হঠাৎ বাবার সঙ্গে টুটুনদের দলটাকে সে দেখতে পায়। সবাই কেন জানি বকুল গাছটার কাছে অপেক্ষা করছিল। রঞ্জু ততক্ষণ

অমর বই

বিমল মিত্রের

আমি ১০ তিন ছয় নয় ৮

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

রমনীর মন ৫॥ পাও নাই পরিচয় ৫

শংকুমহারাজের

গঙ্গাসাগর ৮॥ গিরিকান্তার ৯

আশাপূর্ণা দেবীর

ঝিনুকে সেই তারা ৯ নীল পর্দা ৫

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের

অমল তাস ৫ লগ্ন ৪

॥ রহস্য উপন্যাস ॥

মাণ দত্তর

রঙ্গীন পাতার লিখন ৩॥

জয়ন্তকুমারের

অভিনেত্রী খুন নায়িকার প্রতিহিংসা

চার টাকা চার টাকা

॥ জ্যোতিষ ॥

ভৃগুজা তকের

হাত দেখতে শিখুন ৪

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

কিরীটী অমনিবাস

খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।

অমর সাহিত্য প্রকাশন ॥ ৭, টেমার লেন, কলি-৯

একা কিয়স্ক-এর আড়ালে দাঁড়ায়। সকলকে দেখতে কি সে ওখানে এভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিল! তার চোখ ছিল একজনের দিকে টিয়ে রংয়ের শাড়িতে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল গোপাকে। ফিগার। তার ওপর এত ভাল গায়ের রং। দলের আর একটি মেয়েকেও সবুজ শাড়িতে এত ভাল মানাচ্ছিল না। শরীরটাকে কিয়স্ক-এর পিছনে লুকিয়ে রেখে খুঁটিয়ে সে ফ্লেমিওকে দেখছিল। ঠিক তখন বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে সে দেখতে পায়। বাবা খুব হেসেটেসে কথা বলছিল। বাবার মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল রঞ্জু। আর রুদ্রেন্দু এদিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছিল বলে তাঁর মুখটা সে মোটেই দেখছিল না। কি নিয়ে দুজনের কথা হচ্ছিল কে জানে—এমন সময় একটি মেয়ে রাস্তা ক্রশ করে রুদ্রেন্দুর পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। খুবই আটপৌরে শাড়ি জামা পরা, কিন্তু মুখটা এত মিষ্টি—দেখে রঞ্জু একেবারে থ। তার মনে হচ্ছিল বিউটি কম্পিটিশন হলে ওই মেয়ে টটনদের দলটাকে হারিয়ে দিত। যেমন চেহারা তেমনি ফিগার। তেমনি গায়ের রং। একমাত্র গোপা ওই মেয়ের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারত। তবে এটা তো সত্যি নয়। জানে না রঞ্জু মেয়েটির—চেহারা রং ফিগার চুল হাঁটা বা হাসি—অর্থাৎ বিউটি কম্পিটিশনে যে যে জিনিসগুলি খুঁটিয়ে দেখা হয়—মেয়েটি যদি এর যে-কোনো একটার বিচারে গোপাকে হারিয়েও দেয় তবু রঞ্জুর চোখে গোপা—ফ্লেমিওগোই বেশি সুন্দর থাকবে। পারশ্যালিটি—পক্ষপাতিত্ব? তা তো হবেই। কিয়স্ক-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের দুটিকে তখন তুলনা করতে গিয়ে মনে মনে সে বলেছিল—যে তোমাকে ভালবাসে এবং তুমি যাকে ভালবাস—তার রূপ অন্য যে-কোনো মেয়ের রূপের চেয়ে তোমার চোখে চিরকাল উঁচুতে থাকবে। রূপ গুণ সবকিছু। এখানে তোমাকে পারশ্যাল হতেই হবে। এর অন্যরকম হলেই বুঝতে হবে তোমার লভ-এর ডেপথ কম—প্রেমের গভীরতা কম। তোমার ভালবাসা যে-কোনো সময় পিছলে আর এক জায়গায় সরে যেতে পারে। তখন তোমাতে আর পার্থিতে কিছু তফাৎ থাকবে না। যেমন পিঙ্কুকে ছেড়ে পার্থ দিব্যি টুবলির দিকে ঝুঁকতে শুরু করল। কাজেই তখন রুদ্রেন্দুর পাশে দাঁড়ান মেয়েটিকে ভয়ানক ভাল লাগলেও রঞ্জু সেই ভাললাগাটাকে বেশি প্রশ্রয় দিল না। বতটা সময় পারে, চোখ দুটোকে গোপার দিকেই সে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিল।

এখন রুদ্রেন্দুর সঙ্গে বাবার কি নিয়ে কথা হচ্ছিল শোনা যাক। রুদ্রেন্দু নামটা শুনেই বুড়ো যেমন একটা চেহারা করল না!

—আজ আবার এপাড়ায় সে এসেছিল। বাবা বলল এই তো টটনদের নিয়ে বাড়ি ফিরছি—স্ট্রীম থেকে নেমেই রুদ্রেন্দুকে দেখলাম।

—কি বলছিল? বঙ্কিম দত্তর ভুরু কুঁচকে উঠল। এ-তল্লাটে কি সে বাসা খুঁজছে। রোজ এদিকে আনাগোনা করার উদ্দেশ্য?

—মেয়ের জন্য চাকরি খুঁজছে। রঞ্জা বসন্ত রায় রোডে নাকি তার এক প্রাক্তন বিপ্লবী বন্ধু আছে। আমাদের বাড়ি থেকে সেদিন বেরিয়ে বাস-স্ট্যান্ডে হঠাৎ দেখা। নাম মুরারী ভদ্র। এক সঙ্গে দেউলি-ক্যাম্পে ছিল।

—তারপর? বুড়ো খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে কপালের কুঁচকোনো ভাবটা কমিয়ে দিল। আজ সে ওখানেই এসেছিল বুঝি? সেই ভদ্রের কাছে?

—হুঁ। রঞ্জু দেখল এবার বাবার মুখে একটু বাঁকা হাসি যেন উঁকি দিয়েছে। ছেলে বলছে, মুরারী এখন মস্তবড় মানুষ। ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা। চাকদা-বনগাঁ রাস্তায় দুখানা ট্রাক চালু আছে। একটা প্রেসও নাকি করেছে বৌবাজারে। কি একটা বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ বেরোয় সেখান থেকে। মিনিস্টার এম-এল-এ-দের সঙ্গে খুব দহরম মহরম।

—তা হবে। বঙ্কিম দত্ত বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল করিৎকর্মা লোক! গুছিয়ে নিয়েছে আর কি: একস-ফ্রীডম ফাইটারদের মধ্যে কেউ কেউ তো শুনি মন্ত্রীটন্ত্রীও হয়ে গেছে। তা তোমার মহা-বিপ্লবী বন্ধু রুদ্রেন্দু কি কোনো সুবিধেই করতে পারল না।

—বোকা মানুষ হলে যা হয়। একটা লজঝড় ইস্কুলে পড়ে আছে। বছরের অর্ধেক মাস মাইনে দেয় না। তোমায় সেদিন বলেছি।

—বোকা কি ওর বাপ সতীশ বাঁড়ুয্যে কম! মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ডাকে কত লোকই তো নন-কোপারেশন করে কোর্ট কাছারী যাওয়া বন্ধ করেছিল। সে কি আন্দোলনের ঢেউ। হিমালয়ের মতন উঁচু ঢেউ। কিন্তু সেই ঢেউ ঠাণ্ডা হতেও বেশি দেরি হল না। জান তো, চিরকালই এটা হুজুগের দেশ। সুড়সুড় করে যে যার মতন কোর্টে কাছারী করতে আবার লেগে গেল। আমাদের বুদ্ধির ঢেঁকী সতীশ কোন্যোদিনই আর ঐ রাস্তায় গেল না। সারাটা জীবন ঘরে বসে চরকা ঘোরাল আর ভেরেণ্ডা ভাজল। আর কচু সেদ্ধ কলমীশাক সেদ্ধ দিয়ে ভাত খেল।

কথাটা রঞ্জুর বাবা আগেও অনেকবার শুনেছে। তা হলেও বুড়োর মুখে আজ আবার নতুন করে শুনে হাসল। বলল, সতীশ কাকার রোকামী আজও পুরোপুরি বজায় আছে। রুদ্রেন্দুর মুখে ঘটনাটা শুনলাম। একস ফ্রীডম-ফাইটারদের নাকি আমাদের এখনকার গভর্নমেণ্ট খুব সম্মান-টম্মান দেখাচ্ছে ডেকে ডেকে পেনসন দিচ্ছে, আত্মপত্রটত্র দিচ্ছে। মুরারীর সঙ্গে দেখা হতে রুদ্রেন্দুকে পেন্সনের কথাটা বলেছিলেন এবং রুদ্রেন্দুর হাতে দুখানা ফর্মও তুলে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। ফর্ম পিন-আপ করে পাঠালেই পেনসনটা মঞ্জুর হয়ে যেত। মাস মাস দশ টাকা।

—তারপর! পাঠায়নি সে?

—না। সতীশ কাকা নাকি সব শুনে ফায়ার। রুদ্রেন্দুকে গালিগালাজ করেছে। দেশের অভাব অনটন ক্ষুধা দারিদ্র্য দূর হয়নি। বেকার সমস্যার সুরাহা হয়নি। এখনও চোরাকারবারী ভেজালদারদের রাজত্ব পুরোপুরি চলেছে দেশে। তার অর্থ এ-দেশ আজও স্বাধীন হয়নি। প্রকৃত স্বাধীনতা আমাদের আসেনি। এই অবস্থায় কোনো বিপ্লবীরই কোনোরকম সম্মান বা পুরস্কার হাত পেতে নেওয়া উচিত নয়। বিপ্লবীদের কাজ শেষ হয়নি। তাদের কর্তব্য অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

—তারপর?

—ফর্ম দুটো ছিঁড়ে ফেলেছে রুদ্রেন্দু। রঞ্জু দেখল বাবা আর হাসছে না। গম্ভীর হয়ে গেল।

—মূর্খ মূর্খ! বুড়ো মাথা নাড়তে লাগল। একটা অকথা কুকথার বিস্তুকা গলায় নিয়ে বলল, পাগলও বলা যায় ওদের বাপ বেটা দুজনকেই। একটু চুপ থেকে বঙ্কিম দত্ত আবার মাথা নেড়ে বলল, তা হলে রুদ্রেন্দু এখন কি করবে ঠিক করেছে!

—ওই যে বললাম, মেয়ের চাকরি খুঁজছে। ওদের দমদমে একটা নতুন দুধের ডিপো খোলা হচ্ছে। ওখানে মেয়েকে ঢোকান যায় কিনা তার চেষ্টা করছে। মুরারী ভদ্রের নানামহলে হাত। তাই একেবারে মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই আজ চলে এসেছে মুরারীর সঙ্গে দেখা করতে!

রঞ্জুর চোখের সামনে সেই অদ্ভুত মিষ্টি মুখটা ভাসতে লাগল। সে ভাবতেই পারছিল না টাটকা টগর ফুলের মতন নরম শরীর নিয়ে ওই মেয়ে কি করে রোজ সকালে একটা মিল্ক-ডিপোতে চাকরি করবে। কম করেও দু তিনশ লোকের হাতে দুধের বোতল তুলে দেওয়া কি মুখের কথা। দশ মিনিটেই ও টায়ার্ড হয়ে পড়বে যে। গোপাকে দিয়ে এই জিনিস সে কল্পনাও করতে পারে না।

বাবা আবার পায়চারি করছে। বুড়ো চুপ করে বসে আছে।

সন্ধ্যেবেলা বন্ধুর মেয়েকে দেখে বাবা নিশ্চয় মনে মনে ওর একটা নাম দিয়েছে। সেটা পাখির নাম হতে পারে। ফুলের নামও হতে পারে। রঞ্জু ভাবল।

(ক্রমশঃ)

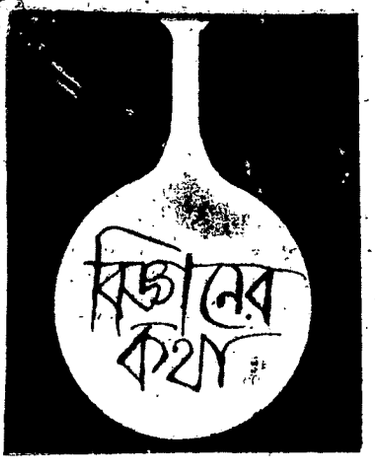

পদ ও পাদুকা এবং বিবিধ

পদ ও পাদুকা

ছাব্বিশটি হাড় নিয়ে মানুষের পা। তার তিনটি অংশ সহজেই চোখে পড়ে—পিছনের দিকে গোড়ালি সামনের দিকে আঙুল, আর এই দুয়ের মাঝখানে ইনস্টেপ বা পদপৃষ্ঠ। গোড়ালিতে আছে সাতটি হাড় (টার্সাল), আঙুলে আছে চোদ্দটি হাড় (ফ্যালাঞ্জ) ও পদপৃষ্ঠে পাঁচটি হাড় (মেটাটার্সাল)। হাড়গুলো শক্তভাবে জোড়-বাঁধা থাকে যে জিনিসটির সাহায্যে তাকে বলা হয় লিগামেন্ট বা অস্থিবন্ধনী। হাড়-গুলোর নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে মাংসপেশী।

ছাব্বিশটি হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত মানুষের এই পা অতি সূক্ষ্ম এক যন্ত্র বিশেষ। আর এমনই নিখুঁত তার সমন্বয় যে পুরো একটি শরীরের প্রকাণ্ড ওজন অনা-য়াসে বহন করতে পারে।

এই হাড়গুলো এমনভাবে বিন্যস্ত যে দুটি আর্চ বা খিলান তৈরি হতে পেরেছে। একটি খিলান গোড়ালি থেকে আঙুলের দিকে—এটিকে বলা চলে লম্বালম্বি খিলান। আরেকটি খিলান পদপৃষ্ঠের একদিক থেকে অন্যদিকে—এটিকে বলা চলে আড়াআড়ি খিলান। লম্বালম্বি খিলানটি থাকার দরুন পদপৃষ্ঠে ঝাঁকুনি লাগতে পারে না। হাঁটা বা দৌড়বার সময়ে শরীরের ভর যখন এক পা থেকে অন্য পায়ে নিয়ে যেতে হয় তখন কাজটি অনায়াসে করা চলে।

সমতল পা : কোনো কোনো মানুষের পায়ে এই খিলানের গড়ন তেমন ভালো নয়—ঠিক যেন খিলান হতে পারে নি। এই ধরনের পা, যাতে খিলান নেই, 'ফ্ল্যাট ফুট' নামে পরিচিত। বাংলায় বলা যেতে পারে সমতল পা।

পা সমতল হওয়াটা অবশ্যই পায়ের গড়নের ত্রুটি। সমতল পা নিয়ে হাঁটতে-চলতে আরো বেশি শক্তিক্ষয় করতে হয়।

কারও কারও ক্ষেত্রে এই ত্রুটি জন্মের সময় থেকেই থেকে যেতে পারে, তবে অধি-কাংশ ক্ষেত্রেই এই ত্রুটির কারণ সাময়িক।

সাধারণত দেখা যায়, জন্মের সময়ে সব বাচ্চারই পা সমতল। কিন্তু বাচ্চা যখন হাঁটতে শুরু করে তখন কিন্তু বাচ্চার পায়ে খিলান তৈরি হয়ে গিয়েছে। অন্য সময়ে খিলান পড়ে যাবার একটা বড়ো কারণ, সাধারণ দুর্বলতা। কেননা সাধারণ দুর্বলতা থাকলে মাংসপেশীর জোর কমে যায় এবং তখন আর খিলানকে ধরে রাখবার ক্ষমতা তার থাকে না। দীর্ঘকাল রোগগ্রস্ত থাকলে বা অনবরত বোঝা বইতে হলেও এ-ব্যাপারটি ঘটতে পারে। শরীরের ওজন যদি আচমকা বেড়ে যায় তাহলে পা সমতল হয়ে যেতে পারে। মধ্যবয়সে পৌঁছে অনেকে আচমকা মোটা হয়, তখন পাও সমতল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। মেয়েরা গর্ভবতী হলেও এ-ব্যাপারটি ঘটতে পারে। গর্ভবতী হলে শরীরের ওজন তো বাড়েই, তাছাড়া অস্থি-বন্ধনীও আলগা হয়ে যায়। দুই-ই পায়ের সমতল হওয়ার পক্ষে কার্যকর কারণ।

সমতল পায়ের লক্ষণ কি? ক্লান্তি, ব্যথা ও যন্ত্রণা। ব্যথাটা টের পাওয়া যায় যতো-ক্ষণ হাঁটবার সময়ে, তার চেয়ে বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে হলে। দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে অস্থি-বন্ধনীর ওপরে চাপ পড়ে। হাঁটার সময়ে মাংসপেশীর ক্রিয়াশীলতা খিলানে জোর আনে।

সমতল পা হলেই তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা ও যন্ত্রণা থাকতেই হবে এমন নাও হতে পারে। তবে তা যদি থাকে তাহলে পাদুকা এমন হওয়া দরকার যাতে খিলানে বিশেষ ঠেকা পড়ে। তাছাড়া, যাদের কাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—যেমন, নার্স, ট্রাম-বাসের কন্ডাকটর, শিক্ষক-শিক্ষিকা—তাদের উচিত এমন জুতো পায়ে দেওয়া যাতে খিলানে জোর পায়। গর্ভবতীরা ও চল্লিশোত্তীর্ণরা তো অবশ্যই এই দলে পড়েন। সাধারণ জুতোতেও বিশেষ ভিতরকার সোল লাগিয়ে খিলানে ঠেকা দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্যান্ডেল বা চপ্পলের বেলাতেও একই কথা—বিশেষ ব্যবস্থাটি থাকা চাই। বাজারে এমন স্লিপারও কিনতে পাওয়া যায় যা এমনিতেই এমন বাঁকানো ধরনের যে খিলানে সহজেই ঠেকা পড়ে।

পাদুকা : পাদুকা নানা ধরনের হতে পারে। মেয়েরা হাইহিল জুতো পরে সুচ্ছন্দ দোলা আনবার জন্য। ব্যালে-জুতো আঙুলের ওপরে ভর দিয়ে নাচবার জন্য। স্পাইক দেওয়া জুতো দৌড়বার জন্য। আরো নানা ধরনের জুতো নানা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তবে এগুলো সবই বিশেষ উদ্দেশ্যে। জুতোর সাধারণ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পা-কে রক্ষা করা—ঠাণ্ডা থেকে ও গরম থেকে, ধুলো থেকে ও ময়লা থেকে, জল-কাদা থেকে ও শক্ত জমি থেকে। জুতো যদি ঠিক-মতো হয় তাহলে এই উদ্দেশ্যগুলো ভালো-ভাবেই সাধিত হতে পারে। আর জুতো যদি বেঠিক হয় তাহলে ক্ষতিও বড়ো কম হয় না।

বিশেষ করে ছোটদের বেলায়। নিখুঁত পা নিয়ে সব বাচ্চা জন্মায় না। কিন্তু নিখুঁত পা নিয়ে জন্মাবার পরেও বেঠিক জুতো পরবার ফলে পায়ে মারাত্মক খুঁত এসে গিয়েছে এমন বাচ্চার সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। বিলেতের স্কুলে সমীক্ষা চালিয়ে একজন ডাক্তার দেখেছেন, স্কুলে ভর্তি হবার সময় শিশুদের পায়ে খুঁত থাকে সামান্যই (সেসবই জন্মের সময় থেকে) কিন্তু স্কুল থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে খুঁত প্রচুর—কড়া পড়া থেকে শুরু করে নখ দুমড়ে যাওয়া পর্যন্ত (সবই বেঠিক জুতো পরার জন্য)। শিশুর পায়ের গড়ন ও বাড়বৃদ্ধি এমন হয়ে থাকে যে দু-এক সাইজ ছোট মাপের জুতোও তার পায়ে পরিয়ে দিতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু তার ফল হয় খুবই খারাপ। শিশুর পায়ের জুতো অবশ্যই হবে এমন যে তার স্বাভাবিক বাড়-বৃদ্ধি যেন ব্যাহত না হয়। সেই জুতো হবে হালকা নমনীয় ও নরম, সেই জুতোর ভিতরের দিকে যেন চামড়ার ভাঁজ বা সেলাই না থাকে, সেই জুতো হওয়া চাই এমন যথেষ্ট চওড়া যাতে আঙুল দুমড়ে না যায় ও

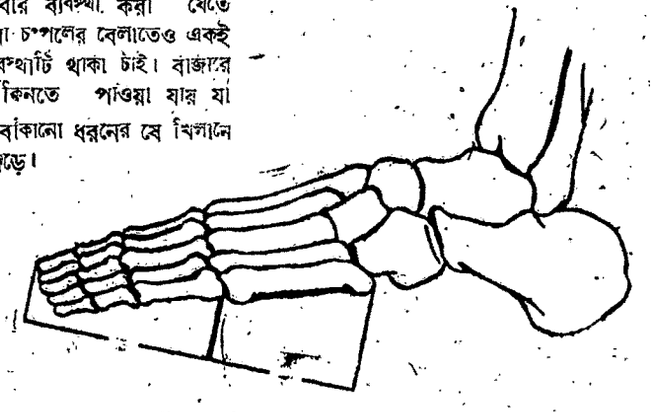

ছাব্বিশটি হাড়ে মানুষের পা গঠিত। তিনটি অংশ সহজেই চোখে পড়ে—আঙুল, গোড়ালি ও দুয়ের মাঝখানে ইনস্টেপ বা পদপৃষ্ঠ। আঙুলে আছে চোদ্দটি হাড়—ফ্যালাঞ্জ। পদপৃষ্ঠে পাঁচটি হাড়—মেটাটার্সাল। গোড়ালিতে সাতটি হাড়—টার্সাল। হাড়ের বিশেষ বিন্যাসের ফলে দুটি খিলান তৈরি হয়েছে—একটি লম্বালম্বি ও অপরটি আড়াআড়ি। খিলান যাদের পায়ের নিচে নেই তাদের পা ফ্ল্যাট বা সমতল।

ছুঁচলো জুতো পরার ফলে আঙুলে কি দশা হয় তা নীচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে। চওড়া মাথাওলা জুতোয় পায়ের স্বাভাবিক চেহারা নীচের ছবিতে।

সিধে বেড়ে উঠতে পারে। সেই জুতো যেন গোড়ালির দিকে শক্তভাবে পায়ের সঙ্গে এঁটে থাকে—এজন্য বেল্ট থাকা বা ফিতে থাকাটা সুবিধের।

বিশেষ করে শিশুদের বেলায় জুতো সম্পর্কে খুবই সাবধান হওয়া দরকার। সব সময়ে সতর্ক থাকা দরকার যেন পায়ের চেয়ে জুতো ছোট মাপের না হয়। সাধারণত দেখা যায় জুতো পুরনো হবার আগেই শিশুর পা জুতোর চেয়ে বড়ো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তখনো সেই জুতো বাতিল করা হয় না, ফলে ক্ষতি যা হবার হয়েই যায়। এ-কারণে প্রতি তিন-চার মাস অন্তর পরখ করে দেখা উচিত শিশুর পায়ের জুতো ঠিক মাপের আছে কিনা। যদি না থাকে তবে সেই জুতো যতোই নতুন থাকুক না কেন সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করা উচিত। শিশুর জুতো আরামদায়ক হচ্ছে কিনা সেটাই বড়ো কথা—দেখতে সুন্দর হচ্ছে কিনা বিবেচনা না করলেও চলে।

আরো একটি প্রশ্ন—শিশুর পায়ে কখন জুতো পরানো উচিত? শিশু যখন থেকে দাঁড়াতে শেখে বা হাঁটতে শেখে তখন থেকে হলেই ভালো। স্লিপার নয়, পুরোপুরি ঢাকা জুতো হওয়া চাই। তবে শুকনো বালি বা তাজা ঘাস যদি হয় তো শিশুর পা খালি থাকাটাই ভালো।

মেয়েদের হাইহিল জুতো এখনো আমাদের দেশে চালু ফ্যাশন নয়, এটা মস্ত রক্ষে। হাইহিল জুতো পরলে চলনে একটা দোলায়িত ছন্দ আসে ঠিকই, কিন্তু ক্ষতিও হয় মারাত্মক। সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি—শিরদাঁড়া বেঁকে যাওয়া। হাইহিল জুতোয় অভ্যস্ত মেয়েরা গর্ভবতী হলে প্রসবের সময়ে দারুণ কষ্ট পেয়ে থাকেন। হাইহিলের ক্ষতি ও অসুবিধে আরো অনেক, তবে আমাদের দেশে এখনো তা ভাবনার বিষয় নয়।

যাই হোক, কি ছেলেদের কি মেয়েদের জুতো সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা হল জুতো যেন ঠিক ঠিক মাপের হয়—শুধু লম্বায় নয়, ঘেরেও। পুরনো জুতো সম্পূর্ণ বাতিল করার আগেই নতুন জুতো কেনা দরকার—যাতে নতুন জুতো পায়ে সইয়ে নেবার সময় পাওয়া যায়।

ধূমপানের বিপদ

যিনি ধূমপান করছেন তার বিপদ তো আছেই, উপরন্তু তাঁর ধূমপানের দরুন আশেপাশের বাচ্চার বিপদও বড়ো কম নয়। লণ্ডন মেডিকেল স্কুলের একজন ডাক্তার প্রায় সোয়া দু'হাজার বাচ্চাকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করার পরে বাচ্চার ধূমপায়ী বাবা-মার উদ্দেশে কড়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

তিনি দেখেছেন, সিগারেটের ধোঁয়ায় বাচ্চাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের পীড়া হয়ে থাকে, এমনকি নিউমোনিয়া ও ব্রংকাইটিস পর্যন্ত। বিশেষ করে বাচ্চার বয়স যদি এক বছরের কম হয় তাহলে এইসব রোগ প্রাণঘাতীও হতে পারে—কোনো চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না।

বিপদটা সবচেয়ে বেশি বাচ্চার এক বছর বয়স পর্যন্ত। তারপরে স্বাভাবিক সুস্থ বাচ্চাদের বেলায় ততোটা আর নয়। কিন্তু এক বছর বয়স পর্যন্ত যে বাচ্চা পীড়ায় ভুগেছে তার বেলায় পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সিগারেটের ধোঁয়া সমান মারাত্মক।

অতএব তিনি ধূমপায়ীদের সাবধান করে দিয়েছেন। বাচ্চা যদি ঘরে থাকে, বিশেষ করে এক বছর বয়স হয়নি এমন বাচ্চা, তাহলে সেই ঘরের মধ্যে কদাচ ধূমপান করবেন না—না, না, না।

যাঁরা মা হতে চলেছেন তাঁরা যেন পাহাড়ে না ওঠেন :

কথাটা বলেছেন পশ্চিম জার্মানির মাইনৎস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। ১,৫০০ মিটার উচ্চতায় রক্তের অক্সিজেন স্তর কমে যায় এবং তার ফলে ভ্রূণের মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকে। ২,০০০ মিটার উচ্চতায় ভ্রূণের শিরার রক্তচাপ এতই কমে যায় যে মস্তিষ্কের টিস্যুর কাঠামো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ২,৫০০ মিটার উচ্চতায় ভ্রূণের মস্তিষ্কের কোষগুলো মরে যায়। তবে যে-সব মহিলা আগে থেকেই উচ্চতায় অভ্যস্ত তাঁরা গর্ভবতী হবার পরেও উচ্চতায় থাকতে পারেন—ভ্রূণের ক্ষতি হয় না। কিন্তু সমতলের মহিলারা যাঁরা মা হতে চলেছেন তাঁরা যেন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার আগে পাহাড়ে বা পর্বতে না ওঠেন।

মেয়েদের শরীর আরো বেশি জলে ভাসে :

চামড়ার নিচের চর্বি পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের শরীরে বেশি, এ-কারণে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের শরীর আরো বেশি জলে ভাসে। ফলে অন্ততপক্ষে সাঁতার দেবার সময়ে মেয়েদের পক্ষে এটা একটা অতিরিক্ত সুবিধে। সাঁতার দেবার সময় মেয়েদের পা জলে ভাসে, ফলে পায়ের ঠেলার সবটুকুই সাঁতারের জোর হয়ে ওঠে। কিন্তু পুরুষদের পা জলের নিচে থাকে, ফলে সেই পায়ের ঠেলার খানিকটা খরচ হয়ে যায় পা ভাসিয়ে রাখার জন্য, মাত্র বাকিটুকুই সাঁতারের জোর হতে পারে। এই আবিষ্কার নিউইয়র্কের একদল বিজ্ঞানীর। মেয়েদের তাঁরা এই একটি ক্ষেত্রে জিতিয়ে দিয়েছেন। নারীবিদ্বেষে এটি একটি সুখবরও বটে।

কর্ক বা ছিপির তুলনা নেই :

শিশি বা বোতলের মুখে যে ছিপি আঁটা থাকে তার নাম কর্ক (যে যন্ত্র দিয়ে এই ছিপি খোলা হয় তার নাম কর্ক-স্ক্রু)। এই কর্ক প্রকৃতিজগতের এক অসাধারণ ও অদ্বিতীয় উপকরণ—যদি তুলনা দিতে হয় কর্কের তুলনা কর্ক নিজেই।

কর্কের গুণাবলীর একটি তালিকা করতে হলে অনেক কিছুই বলতে হয়—ওজনে খুবই হালকা, চাপ দিয়ে অনেকখানি ছোট করা চলে, নমনীয়, জলে ভেজে না জলে ভাসে, তাপ চলাচলে অতি নিচুমানের সহায়ক, ঝাঁকুনি সহ্য করার ক্ষমতা প্রচুর, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিঃসাড়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এত যার গুণ তার চেহারাটিও কিন্তু কম মনোরম নয় এমনকি তার স্পর্শও আরামদায়ক।

কর্ক নতুন কোন আবিষ্কার নয়, বহুকাল থেকেই মানুষের কাছে পরিচিত। তবে ছিপি হিসেবে কর্কের ব্যবহার ১৬০০ খৃস্টাব্দ থেকে।

কর্ক হচ্ছে এক রকম গাছের ছাল, গাছটিকে বলা হয় কর্ক ওক্। ভারি সুন্দর দেখতে এই কর্ক ওক্। গোল ঝাঁকড়া মাথা পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে, চিরসবুজ, ১২০ বছরের মতো আয়ু। প্রচুর পরিমাণে জন্মায় ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায়—স্পেনে, দক্ষিণ ফ্রান্সে ও ইতালিতে। সংখ্যায় এত প্রচুর যে কর্ক ওকের অরণ্য বলা চলে। একমাত্র স্পেনেই কুড়ি লক্ষ একর জমিতে কর্কের অরণ্য রয়েছে। উত্তর আফ্রিকাতেও কর্ক ওক গাছ দেখতে পাওয়া যায়। অন্যান্য অনেক জায়গাতেও কর্ক ওকের গাছ জন্মাবার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, সফল হয়েছে ভারতে ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়।

সারা বছরে প্রায় তিন লক্ষ টন কর্ক উৎপন্ন হয়। মোট উৎপাদনের অর্ধেকটাই চলে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

সাধারণত দেখা যায় গাছের ছাল ছাড়িয়ে নিলে গাছ বাঁচে না। কিন্তু কর্ক ওকের বেলায় একটা অসাধারণত্ব লক্ষ্য করা যায়। কর্ক তৈরি করার জন্য এই গাছের যে ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয় সেটি আসলে ছাল নয়, বাইরের একটা আবরণ মাত্র। যে আবরণ ছাড়িয়ে নিলেও গাছের কোনো ক্ষতি হয় না। আসল ছাল জন্মায় দুই স্তরে, ভিতরের স্তরটি হয় জীবন্ত এবং তারই উপরে প্রতিবছরে একটি নতুন স্তর পড়ে। বাইরের এই স্তরটি গাছের জীবন্ত অংশ হয় না, একটা আবরণ মাত্র হয়ে থাকে এবং ঠাণ্ডা বা গরম বাতাস থেকে গাছটিকে বাঁচায়।

প্রথম ছাল ছাড়ানো হয় গাছের বয়স বছর কুড়ি হবার পরে। প্রথমবারের ছাল তেমন সুবিধের হয় না। তারপরে প্রতি আট থেকে এগারো বছর পরে পরে ছাল ছাড়ানো চলতে থাকে। কুড়ি বছরে ছাড়ানো ছাল হয় এক থেকে ভালো জাতের ও কর্ক করার উপযোগী।

অয়স্কান্ত

মিঃ খাসনবিশ শেষ অবধি আর পারলেন না। স্ত্রী এবং ইঁদুরের যুগপৎ আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে ভদ্রলোক পড়ার টেবিল থেকে ছুটলেন কাঠগোলায়।

খাসনবিশ সাহেবের বদলীর চাকরি। সুতরাং বিয়ের পর সেই যে ট্রাঙ্ক সুটকেশ আর বউ বগলদাবা করে এ শহর সে শহর ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার আর ফুলস্টপ নেই, শুধু কমা আর সেমিকোলন। ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী ধেড়ে নেংটি গেছো মেঠো ইত্যাদি হরেক-রকম গণেশবাহনের সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীরও সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। এবং সে অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে রোমহর্ষক। তার খবর শিব্রামবাবু পেলে হর্ষবর্ধন গোবর্ধন অ্যান্ড কোম্পানির অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে সময় নষ্ট না করে ভদ্রলোক খাসনবিশের পেছু পেছু দৌড়তেন।

সে যাক। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি বদলীর চাকরির দৌড়ঝাঁপে খাসনবিশ খাট আলমারির ঝামেলা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। এ নিয়ে মিসেস প্রথম প্রথম গুনগুন করে অনুযোগের গুঞ্জন তুলতেন। ছেলের মা হবার পর অভিযোগের সরব রাগিণী ব্রডকাস্ট শুরু করলেন। এখন স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে কোলে পেয়ে মিসেস যা করছেন তা একেবারে শুম্ভ, নিশুম্ভ রাগে, বদখেয়াল সঙ্গীত, টেলিকাস্টের উপযুক্ত। মাঝে মাঝে বিশেষ দৈহিক মুদ্রা ও বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে মিসেস ডালিয়া খাসনবিশ যখন সে সঙ্গীতের আলাপ প্রলাপ এবং বিলাপ শুরু করে দিতেন তখন শ্রীযুক্ত খাসনবিশ এহেন গুণবতী রমণীর স্বামী হওয়ার সৌভাগ্যে যার-পরনাই পুলকিত এবং স্ত্রীর গুণপনা সন্দর্শনে চমৎকৃত হয়ে ভাবতেন অহো ঊনি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের আদিম নৃত্যকলায় সবিশেষ পারদর্শিনী। এদিকে গণেশবাহন আলনার ওপর গণেশজননীর সযত্নে রক্ষিত বস্ত্রাদি চিকন কাজ করবার উপযুক্ত করে রাখছে। বাবা মহাদেবের গরম কোটও রাম-চিকনে উপযোগী হয়ে পড়ছে।

এ হেন পরিস্থিতিতে খাসনবিশ সাহেবের বস বেণুকুঞ্জের একখানি বেণু তাঁকে সাদরে সমর্পণ করলেন অর্থাৎ কিনা বাঁশ দিলেন। সি সি আর-এ বেণু (বা রামসিঙ্গা) বাজিয়ে বস ভদ্রলোক বোধহয় পরিতৃপ্ত হন নি। তাই খাসনবিশকে সস্ত্রীক এক পার্টিতে নেমতন্ন করে বসলেন।

সস্ত্রীক! তার বসের নেমতন্ন। অফিসের থেকেও যেখানে অ্যাটেনডেন্স স্ট্রীক্ট এবং মেডিকেল গ্রাউন্ড চলে না। অতএব এরু মুঠো ডালমুঠ একটা সন্দেশ একটা সিঙ্গাড়া তার এক কাপ চা খাওয়ার সঙ্গিনী হবার

জন্য মিসেসকে বিনীত আবেদন জানালেন হার ম্যাজেস্টির্স মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। হার ম্যাজেস্টি উপযুক্ত শাড়ী গয়নার অর্জুহাতে ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্টের আবেদন যথারীতি নামঞ্জুর করলেন। মিস্টার কাকুতি মিনতি করলেন। (বোধহয় এরকম কাকুতি-মিনতি উপযুক্ত স্থানে করতে পারলে ভদ্রলোকের আর সি সি আর নিয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হত না)। মিসেস কর্ণপাত করলেন না।

অবশেষে এই খাতে ভবিষ্যতে দরাজ হাতে চেক্ কাটার প্রতিশ্রুতি দিলেন খাসনবিশ। পাষাণী ঈষৎ দ্রবীভূত হলেন। তারপর পাঞ্জাব সিন্ধু থেকে শুরু করে দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ প্রভৃতি বহু স্থানের বহু কুলির শিরোভূষণ সেই বিখ্যাত বিয়ের ট্রাংকখানি খুললেন।

বাস। তারপরই আর্তনাদ। একমেবাদ্বিতীয়ম্ বিয়ের বেনারসীখানা একেবারে লক্ষ্মী চিকন হয়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে চিকন-শিল্পী চিকন গা নিয়ে লাফ দিলেন শ্রীমতীর কোলে। শ্রীমতীর 'মাগো' আর্তনাদ এবং ট্রাংকের ডালা পতনের শব্দ বুঝে নিয়ে খাসনবিশ আক্রমণের আগেই আহত হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে বাথরুমে আশ্রয় নিলেন। ওদিকে তখন ট্রান্সফারেবল জব সার্ভিস কন্ডিশন ডিরেকটার জেনারেল এমন কি তাঁর ভাগ্যবান পিতার অবধি পিন্ডদানের ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেছে।

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম

এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

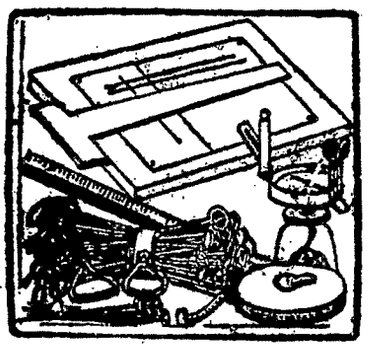

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন ঃ ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪

গ্রাম ঃ অয়ারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া

পরিবেশক ঃ কামলিন প্রডাক্টস (ষ্টেশনারী বিভাগ)

অতএব আলমারী চাই। চুলোয় যাক্ বস, তাঁর পার্টি আর তাঁর সাব-অর্ডিনেটের সি-সি-আর। আলমারী বোলাও।

কাঠগোলায় ঘুরতে লাগলেন খাসনবিশ। সংগ্রহ করলেন নানারকম কাঠের কুল-কুলুজি। শাল পিয়াশাল শিশু সেগুন আমা আমলকি গায় আমড়া গাছ অবধি তাঁর চেনা হয়ে গেল। মাথা ঘামাবার মত একটা সাবজেক্ট পেয়ে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তিনি। নিজেকে এবিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলে ভাবতে লাগলেন। এমনকি একজন দোকানদারের সঙ্গে আম এবং আমড়া কাঠের বিশেষত্ব এবং সেগুন ও বেগুন কাঠের পার্থক্য নিয়ে গবেষণা তর্ক জুড়ে দিলেন। এই অবস্থায় তাঁর অফিসের ছুতোর মিস্ত্রী নকুল তাঁকে নিয়ে গেল ওড়িশা ফরেস্ট করপোরেশনে। সেখানে তিনি পেয়ে গেলেন পঞ্চাশ বছর বয়সের এক সেগুন গাছের গুঁড়ি। চিল্কার তীরে যার জন্ম। গুঁড়ির ব্যাস থেকে বয়স মাপার কৌশল খাসনবিশ শিখেছিলেন। এখন সে বিদ্যা প্রয়োগ করে একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। কাঠ তো পছন্দ হলই তাছাড়া এই কাঠটার সঙ্গে চিল্কার এবং চিল্কার সঙ্গে চিংড়ির (অহো সেই নধরকান্তি চিংড়ি) এ্যাসোসিয়েশান হেতু মিসেসেরও যে কাঠটা নিশ্চয়ই পছন্দ হবে এতে তিনি স্থিরনিশ্চয় হলেন।

অতঃপর কাঠ ক্রীত হল।

নকুল মাপজোক করে মিনমিন করে বলল স্যার এই কাঠ দিয়ে চারটে আলমারি হয়ে যাবে। তাই কি বানাব?

শুনে তো মহাখুশী খাসনবিশ। তাই নাকি! তাহলে তাই বানাও।

কি বললে হুংকার দিলেন মালকিন।

নকুল তো সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাগশুদ্ধ যন্ত্রপাতি হাতে তুলে নিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

খাসনবিশ ঢোঁক গিললেন। চশমার ফাঁক দিয়ে একবার মহাদেবীকে দেখলেন। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে জিগেস করলেন কেন কি হল?

কি হল? কলি চারটে আলমারিতে রাখবে কি। আনাজপাতি চাল ডাল কেরোসিন—এই সব?

মন্দ কি। ইঁদুরগুলোতো বলছ তোমার মাথার চুল অবধি—

হ্যাঁ তাই বলছিলাম কি গোটাকতক কফিন বাক্স বানাও।

তাহলে?

তুমি চুপ কর। এই ভীম না অর্জুন এদিকে এস।

দরজার ফাঁক দিয়ে মাথাটা একটু বাড়িয়ে নকুল বলল আজ্ঞে আমি নকুল।

ওই হল। এই কাঠ দিয়ে একটা আলমারি ছাড়া দুটো সিঙ্গল খাট হবে না।

একগাল হেসে নকুল ঘরে ঢুকল।

আজ্ঞে হবে বই কি। একটা টেবিল দুটো চেয়ারও হয়ে যাবে।

বটে বটে! উৎসাহিত হয়ে উঠলেন শ্রীমতী। আর দেখ ঐ যে সব টুকরো-ফাকরো বের হবে তাই দিয়ে আমার কুজো রাখবার টুল পিঁড়ি এগুলো সব করতে হবে।

আজ্ঞে সব হয়ে যাবে। না হলে আরও কাঠ কিনে করে দেব।

খাসনবিশ গ্রস্তভাবে মজুরীর হিসেব কষতে কষতে ভাবছিলেন মেয়েছেলে তো পিঁড়ির কথা ঠিক মনে আছে। এখন নকুলের কথায় হিসেবের হালে আর পানি না পেয়ে হতাশকণ্ঠে বললেন দেখসি তো নকুল একটা ইজিচেয়ার বার করা যায় কিনা।

হ্যাঁ ঐটাই শুধু বাকি আছে। ওটা হলেই তো ষোল কলা পূর্ণ হয়। এমনিতেই জগন্নাথকে নড়ানো যায় না, তায় আবার ইজিচেয়ার। একটা রাতদিনের লোক এ্যাপয়েন্ট করে ইজিচেয়ারের অর্ডার দিও।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন শ্রীমতী।

ইজিচেয়ারের অর্ডার দেওয়া ইজি নয়। নিঃশ্বাস ফেললেন খাসনবিশ। এরপর আসল কাজ অর্থাৎ কিনা মেজারমেন্ট। কাগজ পেনসিল নিয়ে বসে গেলেন খাসনবিশ। গিন্নীর বেনারসী ব্লাউজ কর্ডিগান নিজের কোট প্যান্ট টাই। বাচ্চা দুটোর জামাকাপড় সব কিছুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ ক্ষেত্রফল ঘনফল কাঠাকালি বিঘাকালি ইত্যাদি পাঠশালায় গণেশ স্যারের কাছে শেখা যাবতীয় শিক্ষা উজাড় করে ফেললেন। বাকি রইল শুধু নোকাকালি। তার বদলে উনি শুরু করলেন এক ভয়াবহ আলমারিকালি। গিন্নী তাঁর ফরমাশ ছুঁড়তে লাগলেন। নকুল মেঝেয় বসে কালিনাম জপ করতে লাগল।

মাপজোক করে যা দাঁড়াল তাতে দেখা গেল আলমারির ওপরের তাকে হাত পেতে হলে একটা মইও বানাতে হবে।

খাসনবিশ পেনসিল রেখে ঠান্ডা গলায় বললেন ভালোই হল। চোরকে ভালুয়েবল জুয়েলারী চুরি করতে হলে মই ঘাড়ে করে আনতে হবে। সেটা বাছাধনের পক্ষে সোজা হবে না। তোমার একভরির মফচেন আর ছআনা ছআনা বারো আনার মকরমুখো বালা ঐ ছাদদুটি আলমারির ভোল্টে বেশ সেফলিই থাকবে।

বোধহয় বিয়ের পর এই প্রথম শ্রীমতী স্বামীর এতবড় বক্তৃতা নীরবে হজম করলেন। তারপর হাঁক দিলেন অর্জুন। নাও তো কাগজ পেনসিল।

আজ্ঞে—আমি—ভায়ের গৌরবে গৌরবান্বিত নকুল আর অপরিচয়ের পাঁচালী গাইবার সাহস পেল না।

আবার মাপজোক হল। শ্রীমতী বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে উচ্চতাকে খাটো করতে লাগলেন। ফলে সেটা একটা জলহস্তীর আকার ধারণ করল। নকুল মেপে দেখাল সেটা দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা। খাসনবিশ ঠান্ডা গলায় বললেন, দরকার পড়লে ওপরটায় শোয়া যাবে। এক কাজ কর নকুল, ওটা আর একটু নীচু করে দে। একেবারে টেবিল তক্তাপোষ র‍্যাক আলমারি —সব কিছুর কম্বাইন্ড একটা মাল্টিপারপাস আলমারি হয়ে যাবে।

অবশেষে স্বয়ং মাল্টীনন্দন আসরে

অবতীর্ণ হল। এবং তার ক্লাস টু-এর বিদ্যে দিয়েই মোটামুটি একটা নকশা খাড়া করলেন। অন্দরে এম এস সি এবং বাংলায় অনার্স সাবস্ময়ে দেখলেন তার মধ্যে তাঁদের ইপ্সিত লকার, ওয়ার্ডরোব, টাই-র‍্যাক ব্লাউজ র‍্যাক ইত্যাদি সব কিছুই রয়েছে।

খাসনবিশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নকশাটা দেখলেন। তারপর খুশীর সুরে বললেন, হ্যাঁরে নকুল, এতবড় আলমারিটা আমি ঘাড়ে করে ঘরের ক্যামনে।

আপনি কিছু ভাববেন না স্যার! সে আমি ফোল্ডিং করে দেব।

ফোল্ডিং!

হ্যাঁ স্যার। সব খুলে ছোট ছোট প্যাকেট করে নিয়ে যাবেন। আবার লাগিয়ে নেবেন।

বটে বটে। মাথা ঘামাবার মত নতুন একটা প্ল্যান পেয়ে খাসনবিশ নতুন করে উৎসাহিত বোধ করেন।

সেটা কি ভাল হবে! শ্রীমতী সন্দেহ প্রকাশ করেন।

আজ্ঞে সেটা খুব ভালো হবেন।

শ্রীমতী দ্বিধাগ্রস্থ চিত্তে অর্ডার প্লেস করেন।

এরপর সুরু হয়, কিগো কন্দুর?

ওহো, আজ তো জিগেস করা হয়নি। তোমাকে দিয়ে যদি কোন কিছু কাজ হয়। সামান্য একটা কথা তো জিগেস করা। তাও তোমার মনে থাকে না।

গিন্নী দুমদুম করে চলে যান। খাসনবিশ গুম হয়ে বসে থাকেন। সত্যি, অফিসে ঢুকলেই স্তূপীকৃত ফাইল, বসের ঘনঘন টেলিফোন আর জুনিয়ারদের অক্ষয় ক্যাজুয়েল লিভ তাঁকে এমন বিপর্যস্ত করে দেয় যে তিনি ক্রমাগত আত্মরক্ষা করতে করতে আর সব কিছু ভুলে যান।

খাসনবিশ ছোট্ট একটা চিরকুটে লিখলেন, নকুলকে প্রশ্ন—রিগার্ডিং ফার্ণিচার। তারপর সেটা অফিস যাবার শার্টের বুক-পকেটে রেখে দিলেন।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে গিন্নীর মুখোমুখি হতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। ঐযাঃ চিরকুটটা এ্যাজ ইট ইজ বুকপকেটে রয়ে গেছে।

গম্ভীর চিন্তাগ্রস্ত মুখে খাসনবিশ চেয়ারে বসে পড়লেন।

গিন্নী জিগেস করলেন, কি, অফিসে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?

খাসনবিশ শুধু বললেন, হুঁ।

পরদিন অফিসের বারান্দায় হঠাৎ নকুলের সঙ্গে মুখোমুখি।

কিরে আর কদ্দিন?

আজ্ঞে কাঠ চেরাতে দিয়েছি।

সে কিরে এখনও শুরু হয়নি?

আজ্ঞে, এইবার ধরব।

কাঠ চেরা হল। দেখা গেল কাঠে খুব রস। সুতরাং শুকোতে সময় লাগল। মাঝে আবার কদিন বৃষ্টি হয়ে গেল। শ্রীমতী বৃষ্টির মুণ্ডপাত করতে লাগলেন। তারপর শোনা গেল কাজ শুরু হয়েছে। শ্রীমতী সেদিন সন্ধ্যেবেলা শ্রীমানকে দু-কাপ চা দিলেন এবং হাত থেকে খবরের কাগজটা টেনে ফেলে দিয়ে গল্প করতে বসলেন। কি রকম পালিশ হবে, কি রকম ফিনিশ হবে, কি রকম হ্যান্ডেল লাগানো হবে। এইসব নিয়ে সেদিনের বিশ্রম্ভালাপ বেশ জমে উঠল।

পরদিন অফিসে গিয়েই খাসনবিশ শুনলেন, ট্রান্সফার্ড টু ক্যালকাটা।

টি এ এ্যাডভান্স, টিকিট, বুকিং রিলিজ অর্ডার ইত্যাদি সব কিছু ফেলে খাসনবিশ ছুটলেন নকুলের খোঁজে।

নকুলের সঙ্গে দেখা হতেই সে একগাল হেসে বলল, আজ্ঞে আপন ঘরকু ফিরবে। শুনু শুনিছি।

বটেই তো। আট বছর পরে কলকাতায় ট্রান্সফার। কোথায় একটু উৎফুল্ল হবেন তা না ফার্ণিচারের ফেউ এখন চিন্তায় লেগে রইল।

কি হবে বল দেখি ওগুলোর।

আজ্ঞে তাইতো ভাবছি স্যার। আজ থেকে আরও তিন-চার জন মিস্ত্রীকে লাগিয়ে দিই, কি বলেন।

কি আর বলবেন খাসনবিশ। তাঁর এখন সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। কাঠটা বিক্রী করে দিতে চাইলে নকুল সেটা শস্তা দরে বেচে দেবার ব্যবস্থা করবে। হয়তো নিজেই নিয়ে নেবে। তা না হলে ও-যা মিস্ত্রী মজুরের ফরমাশ দেবে তাই মেনে নিতে হবে।

খাসনবিশ বসকে বলে রিলিজ হবার তারিখটা একটু পেছিয়ে নিলেন। বস হেসে বললেন, কি ব্যাপার, কলকাতায় যেতেও দেরী করছেন!

কথাটা সত্যি। রবিন বোস সকালে ট্রান্সফার অর্ডার পেল। বিকেলেই কলকাতার গাড়ী ধরল। শীল নোড়া জোড়া-খাট সব পেছনে পড়ে রইল। তারপর কলকাতা থেকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে মণি ঘোষকে চিঠি লিখল। ভাই হে মেঝেয় শুয়ে শুয়ে আমার তো পলুরিসি হবার উপক্রম। যদি দয়া করে খাটদুটো পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

মণি ঘোষ তো খেপে লাল। একে তো পরে এসে বোস আগে ট্রান্সফার বাগিয়ে কেটে পড়ল। তার ওপর আবার এই উৎপাত।

এদিকে বাড়ীতে খাসনবিশের লেফট এ্যান্ড রাইট গণ্ডনা। এতদিন কেন চুপচাপ বসেছিলে! বটেই তো। খাসনবিশ যেন চিৎকার ধারে সেগুনের চারা পুঁতে হাওয়া খাচ্ছিলেন। রাগ হলেও ঢোঁক গিলে যান সাহেব।

একে একে ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, হোল্ডল ভর্তি হল। বালতি এবং থলেতে বাসনপত্র বেঁধে মিসেস খাসনবিশ ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কপালে নেই কো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি!

এহেন সময় নকুল একগাল হেসে দরজায় এসে দাঁড়াল।

বিস্তর দুঃখে পাথর। মিসেসের মুখ দিয়ে বাক্য নিঃসরণ হল না।

হয়ে গেছে আজ্ঞে।

কই? একটা উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

এই তো।

চট দিয়ে মোড়া কতকগুলো ছোট-বড় মোড়ক।

এখনই গিয়ে পার্সেলে বুক করে দিচ্ছি। কলকাতায় গিয়ে জোড়া লাগিয়ে নেবেন। পাঁচশো তেরোটা ইসকুরুপ আর তিনপো পেরেক লেগেছে আজ্ঞে। দেখবেন আজ্ঞে কি রকম জিনিসটা হয়েছে।

প্যাকেটগুলো কলকাতায় এলে হুতোর মিস্ত্রি ডাকিয়ে সেগুলো জোড়া হল। নকশা ধরে খাসনবিশ বসে রইলেন। একটু একটু করে চোখের সামনে সেই অদ্ভুত আলমারি রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল। কিন্তু একি! কাঠ তো সব শেষ হয়ে গেল। অথচ ওপরের তাকের ডান পাশটা খোলা রয়ে গেল যে।

অনেক খোঁজাখুঁজি হল। অনেক রকমের রিসেটিং নিয়ে মাথা ঘামান হল। কিন্তু কিছুই হল না।

বোধহয় নকুল এক পীস কাঠ দিতে ভুলে গেছে। কিংবা রেলওয়ে পার্সেলে একটা প্যাকেট হারিয়ে গেছে। তাড়াতাড়িতে তো আর গুনে গেঁথে আনা সম্ভব হয়নি।

মিসেস খাসনবিশ এবার আর পঞ্চপাণ্ডবের কাউকেই রেহাই দিলেন না। আর তাদের অনুপস্থিতিতে যথারীতি একা খাসনবিশই ভীষ্মের ন্যায় শরাঘাত সহ্য করতে করতে চশমার ফাঁক দিয়ে ফোকরটার দিকে তাকিয়ে শান্ত, নিরুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ভালোই হল আলমারিটা না খুলে ঐ ফোকর দিয়ে সব কিছু বের করা যাবে।

নূতন উপন্যাস মনোরম প্রচ্ছদ

দিশারা ১০৲

গোপালদেব চট্টোপাধ্যায়

ওরা কজনে ১০৲

মলয় সান্যাল

রোদ্দুরের স্বাদ ৬৲

দিলীপ দত্ত

সতী ৫৲

হেমপ্রভা দেবী

শিকারের বিচিত্র কাহিনী ৮৲

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা—

নীল সমুদ্র লোনাজল ৩·৫০

সমাজবিজ্ঞান ও কৃষি—

Some Studies on the Farmer & his change Agent — Rs. 15.00.

by

A. K. Mazumder, D. Dasgupta & M. Roy.

নব সাহিত্য প্রকাশ

১২১ সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯

গোয়েন্দা ধাঁধা

রু মর্গের হত্যাকান্ড ॥ সি অগাস্তে দুপি ॥ এডগার অ্যালান পো

খবরটা বেরোলো সান্ধ্য কাগজে ঃ

অভূতপূর্ব হত্যাকান্ড—ভোর তিনটায় রু মর্গের বাসিন্দাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় বিকট চীৎকারে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল পাশের পাঁচতলা বাড়ীতে। বাড়ীতে থাকেন এক বুড়ি আর তাঁর মেয়ে। বেজায় ধনবতী দুজনেই।

শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে পুলিশ আর প্রতিবেশীরা ওপরে উঠতে উঠতে শুনতে পেল দু-তিনটে রুদ্ধ কন্ঠস্বর। মাঝের চাতালে উঠতেই কিন্তু নিস্তব্ধ হয়ে গেল সারা বাড়ী।

পাঁচতলার পেছন দিকের একটা ঘরে দেখা গেল ভয়ংকর সেই দৃশ্য। দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। জিনিসপত্র তছনছ। আসবাবপত্র এলোপাতাড়ি নিক্ষিপ্ত। খাটের বিছানা মেঝেতে পড়ে। চেয়ারে পড়ে একটা রক্তমাখা ক্ষুর। উনুনের কাছে তিন চার গোছা লম্বা রক্তমাখা মানুষের পাকা চুল। মাথা থেকে উপড়ে আনা হয়েছে যেন। মেঝের ওপর চারটে স্বর্ণমুদ্রা, পোখরাজের একটা দুল রুপোর চামচ আর একটা ব্যাগ-ভর্তি চার হাজার মুদ্রা। ড্রয়ারগুলো লন্ডভন্ড।

উনুনের সামনে অনেক কালিঝুলি আর চিমনীর মধ্যে থেকে মাথা নীচের দিকে করে ঝুলছে বুড়ির মেয়ে। চিমনীর সংকীর্ণ মুখের ভেতর অমানুষিক শক্তিতে তাকে ঠেসে দেওয়া হয়েছে। শরীর তখনও গরম। ছালচামড়া উঠে গেছে। মুখে আর গলায় আঁচড়ের দাগ। গলায় গলা-টেপার কালো দাগ।

বাড়ীর পেছনে বাঁধানো চত্বরে পাওয়া গেল বুড়ির মৃতদেহ। গলাটা এমনভাবে কাটা হয়ে ধড়টা তুলে ধরতেই মুন্ডু খসে পড়ল মাটিতে। সারা দেহ বীভৎসভাবে ক্ষত-বিক্ষত। মানুষে বলে চেনা ভার।

হত্যাকান্ডের কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি।

পরের দিন আরো খবর বেরোলো কাগজেঃ

রু মর্গের হত্যাকান্ড—সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে কোনো সূত্র বার করা যায় নি। বুড়ি আর তাঁর মেয়ের টাকাকড়ির অভাব ছিল না। অতবড় বাড়ীতে দুজনে থাকতেন না ভাড়া দিতেন না ভাড়াটেদের অত্যাচারের জন্যে। রাস্তায় বেরোতেন না। ডাক্তার আর মুটে ছাড়া বাড়ীতে কেউ ঢুকত না।

শাবল দিয়ে দরজা ভাঙার আগে পর্যন্ত আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল বাড়ীর ভেতরে। তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দুটো কন্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। একটা কর্কশ আর মোটা অন্যটা বেশ তীক্ষ্ন। যেন কথা কাটাকাটি চলছে দুজনের মধ্যে। মোটা গলার মানুষটা বোধহয় ফরাসী। দু একটা শব্দও বোঝা যাচ্ছিল। যেমন পবিত্র শয়তান হা ভগবান!

যত গোল লেগেছে তীক্ষ্ন গলার অধিকারীকে নিয়ে। ফরাসী সাক্ষী বলছে স্প্যানিয়ার্ড। ডাচ সাক্ষী বলছে ফরাসী ইংরেজ সাক্ষী বলছে জার্মান স্প্যানিয়ার্ড বলছে ইংরেজ ইটালিয়ান বলছে রাশিয়ান। সাক্ষীদের প্রত্যেকেই কিন্তু যে-ভাষা আঁচ করছে সে-ভাষার সঙ্গে পরিচিত নয়। আন্দাজে মনে হয়েছে অমুক ভাষা। কারণ ভাষাটা অজানা।

পাঁচতলার কামরা ভেতর থেকে চাবী দেওয়া ছিল। দরজা ভেঙে ঢুকে কাউকে দেখা যায় নি। জানলাগুলো বন্ধ ভেতর থেকে।

চিমনীটা এত সরু যে বেড়াল ছাড়া কেউ ওপথে ঢুকতে পারে না। বাড়ীর পেছন দিকে নেমে যাবার কোনো সিঁড়িও নেই। চিমনীর ভেতরে খোঁচা মেরেও কাউকে পাওয়া যায়নি। ভিতর থেকে মেয়েটাকে টেনে নামাতে হিমসিম খেয়ে গেছে চারপাঁচজন জোয়ান।

ডাক্তারের মতে মেয়েটাকে গলা টিপে মারা হয়েছে। গলায় আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। জিভটা আধখানা দাঁতের চাপে কেটে গেছে। তলপেটে বীভৎস ক্ষত—হাঁটু দিয়ে ঠেলা মারার দরুণ। খুব সম্ভব এক বা একাধিক ব্যক্তি গলা টিপে খুন করেছে তাকে।

বুড়ি মা-য়ের মৃতদেহ ভীষনভাবে বিকৃত। ডান পায়ের আর হাতের সব কটা হাড় ভাঙা। খুব শক্তিমান কোনো পুরুষ যেন লোহার ভারী ডান্ডা বা কাঠের নড় মুগুর দিয়ে পিটে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ক্ষুরের এক কোপেই মাথা আলাদা হয়ে গিয়েছে ধড় থেকে।

রহস্যের আর কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি।

রহস্যজনক হত্যাকান্ড নিয়ে সারা প্যারিস শহর যখন গরম হয়ে উঠেছে দুপি তখন বিলকুল শান্ত। পুলিশের মুরুব্বীর অনুমতি নিয়ে গেল রু মর্গের দিকে। বাড়ীটাকে আগে দেখল পেছন দিক থেকে। তারপর উঠল পাঁচতলার কামরায়। মৃতদেহ থেকে শুরু করে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। গেল একটা খবরের কাগজের অফিসে। সেখান থেকে নিজের আস্তানায়। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত এ-প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোনো কথা হল না লেখক-বন্ধুর সঙ্গে।

সেইদিন দুপুরে দুপি তার অসাধারণ বিশ্লেষণী যুক্তি দিয়ে স্তম্ভিত করে দিল বন্ধুবরকে। রহস্য আর রহস্য নেই তার কাছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে হত্যাকান্ডের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত একটি লোককে ডেকে পাঠিয়েছে। সে এল বলে। ততক্ষণ বসে না থেকে যুক্তিগুলো পরপর সাজিয়ে ধরল বন্ধুর সামনে।

আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! দুপি বললে—খবরের কাগজওয়ালারা ভেবেছেন এ-রহস্যের সূত্র আবিষ্কার সম্ভব নয়। তাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আর পুলিশ নৃশংসতা দেখেই হকচকিয়ে গিয়েছে—অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হল তীক্ষ্ন স্বরের মালিকানা নিয়ে পাঁচমিশেলী মন্তব্য। প্রত্যেকেই বলছে অমুকে ভাষাটা আমার জানা নেই সুতরাং ভাষাটা নিশ্চয় তাই। এ-থেকেই অবরোহী প্রথায় সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলাম আমি। সিদ্ধান্তটা কি এখন তা বলব না।

তারপর ধর ঘরের অবস্থা। মানুষই হত্যা করে পালিয়েছে—ভুতে নয়। মানুষ পালায় কিভাবে? পুলিশ আর প্রতিবেশী যখন মাঝ-সিঁড়িতে তখনও হত্যাকারী পাঁচতলার কামরায় ছিল। তারপর হেন উবে গেল দরজা-জানলা বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে। এত তাড়াতাড়ি কোথায় গেল? কিভাবে গেল?

ঘরের দুটো জানলাই পেরেক দিয়ে বন্ধ দেখে পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি মনে করলাম ঐ দুটোর একটা জানলা দিয়েই হত্যাকারী চম্পট দিয়েছে। স্প্রিং নেই তো?

খুঁজতে খুঁজতে সত্যিই একটা গোপন স্প্রিং পেলাম। বাইরে গিয়েও স্প্রিংয়ের দৌলতে জানলা বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরের পেরেক ঠোকা কি সম্ভব? অসম্ভব।

পুলিশ শুধু পেরেকের মাথা দেখেই ছেড়ে দিয়েছিল। আমি পেরেকটাকে দেওয়াল থেকে খসিয়ে আনলাম। দেখলাম জং ধরে মাঝখান ভেঙে গেছে।—মাথাটুকু বেরিয়ে আছে বাইরে। অর্থাৎ নামেই পেরেক দিয়ে বন্ধ। পেরেকের ভাঙা অংশ সমেত জানলা ওপরে উঠে যায় নেমেও আসে।

একটা জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। হত্যাকারী জানলা দিয়েই বাইরে বেরিয়েছে জানলার পাশের লোহার পাইপ বেয়ে নেমে এসেছে। গায়ে অসুরের জোর আর অসাধারণ ক্ষিপ্রতা না থাকলে এ-কাজ সম্ভব নয়। সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে তীক্ষ্ণস্বরের ভাষাটা যে কি তা ইউরোপের পাঁচ-পাঁচটা বড় ভাষাভাষীও ধরতে পারেনি।

হত্যাকারী যে-পথে পালিয়েছে নিশ্চয় ঢুকেওছে সেই পথেই। অথচ ঘরের মধ্যে থেকে সোনাদানা টাকাকড়ি কিছু নিয়ে যায় নি।

এতগুলো বৈশিষ্ট্য চোখ এড়িয়ে গেল পুলিশের। অস্বাভাবিক শক্তি, অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অকল্পনীয় নৃশংসতা এবং হত্যার উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি—সবই একই সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে চলেছে।

এভাবে মানুষ খুন করার কথা ভাবাও যায় না। মেয়েটাকে গলা টিপে মারার পর ঠেসে দেওয়া হয়েছে চিমনীর মধ্যে। অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। বুড়িকে এক কোপে গলা কেটে মারবার পর ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে নীচের তলায়—হাড়গোড় গুঁড়িয়েছে ঐ কারণেই—ডাক্তার কিন্তু ধাঁ করে বলে দিল মুগুর বা ডাণ্ডা দিয়ে পেটানো হয়েছে। আসলে শরীরটা থেঁতলে গিয়েছে অত উঁচু থেকে পড়ার দরুণ।

ঘরের ভারী ভারী জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে যেদিকে খুশী। কিন্তু লুঠ করা হয়নি কিছু। উদ্দেশ্যহীন নরহত্যা কখন হয় বলো তো?

শিউরে উঠে বললেন লেখকবন্ধু—'পাগল নাকি?'

'মনে হয় তাই। কিন্তু এই লোমগুলো কি পাগলের?' একমুঠো আমাকে লোম বাড়িয়ে ধরল দর্পি। 'বুড়ির মুঠোর মধ্যে থেকে উদ্ধার করেছি। মেয়েটার গলায় আঙুলের ছাপ, আর নখের দাগ দেখে ছবি একেছি আলাদা কাগজে। এই নাও একটা কাঠ—মানুষের গলার মতই মোটা। আঙুলের ছবি-আঁকা কাগজটা কাঠের ওপর জড়িয়ে নিয়ে নিজের আঙুল তার ওপর রাখো—মনে করো গলা টিপছো। কি হল? ছবির ছাপের সঙ্গে তোমার আঙুল মিলছে না কেন?'

'এ কার আঙুল, দর্পি?' সভয়ে বললেন লেখক বন্ধু।

'আপনি বলতে পারেন?

অদ্রীশ বর্ধন

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৫৭ পৃষ্ঠায়)

সেকালের সঙ্গীতগুণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জিতেন্দ্রনাথের সুরে মশগুল থাকার স্বভাব পুত্রের মধ্যে আবার অনেক বেশি। সুরের শিল্পী লক্ষ্মণের চরিত্রে খাম-খেয়ালী-য়ানার চূড়ান্ত। বাজনার মেজাজ না বলে বাজাবেন না। আর সে-মেজাজ কখন দেখা দেবে, তাও অনিশ্চিত। হয়ত আসরের ডাক এসেছে। বাজালেই মুজরো পাবেন ভাল। কিন্তু তখন বাজাতে যাবার মেজাজ এল না। অতএব সে ছেড়ে দিলেন সে মুজরো। অথচ টাকার তখন যথেষ্ট প্রয়োজন। অভাব ত বলতে গেলে সব সময়েই। প্রতিভার সঙ্গে পিতার দারিদ্র্যেরও উত্তরাধিকারী হয়েছেন। তবে আরো বেশি পরিমাণে। কারণ জিতেন্দ্রনাথের বাস্তব বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পুত্রে তার একান্ত অভাব। ইচ্ছা না থাকলে, আসরে বাজিয়ে টাকা পাবার আশা ছেড়ে দিতেন লক্ষ্মণ। আবার লোকদের বিনামূল্যে সেতার শোনাবার জন্যে ডাকতেন। তাঁর বাজনার মেজাজ আসত বেশির ভাগই গভীর রাত্রে।

বলতেন, 'আমার বাজনা শুনতে চাও ত রাত্তিরের খাওয়া সেরে এস। সারা রাত শোনাব, ভোরের রাগ পর্যন্ত।'

সত্যি তা শোনাতেনও। অতি উচ্চ মানের তাঁর কত আসর বিনা পয়সায় শুনে নিয়েছে তাঁর জানা-শোনা লোক। তিনি সারা রাত জেগে তন্ময় চিত্তে বাজিয়েই সুখী। পরম পরিতৃপ্ত। পরের দিন আহার্য কেনবারও সামর্থ্য হয়ত নেই।

আজিবাট চন্দ্রনাগরে অন্যান্য এমনি কত ঘরোয়া আসরে আছে তাঁর স্মৃতি। পিতার মতন তিনি ভাটপাড়াতেও যেতেন। সেখানেও নানা আসরে বাজাতেন প্রাণের আরামে। সেখানে ন্যায়ালঙ্কার পাড়ায় একবার প্রায় সমস্ত রাত শুধু পুরিয়া বাজিয়েছিলেন। সে কি শোনবার মতন অপরূপ বাজনা। তার সাক্ষ্য দেবার যোগ্য শ্রোতা এখনো আছেন। তাঁদের মতে, অতি উচ্চ অঙ্গে বাজিয়ে গেছেন এই আপনভোলা খেয়ালী শিল্পী।

শুধু ঘরোয়া আসর নয়। প্রকাশ্য বা বড় আসরও অনেক তাঁর হয়েছিল কলকাতায়। এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজনাও তাঁর হয়। নামী কলাবৎদের সামনে। ভারত-প্রসিদ্ধ গুণীর সঙ্গে লয়কারীতে লড়াই। তাও হয়েছে যদিও লড়াকুর স্বভাব তাঁর ছিল না আদৌ। তেমন দু-একটি আসরের বর্ণনাও শেষে দেওয়া যাবে। আগে তাঁর স্বভাব চরিত্রের কথা। আর সংগীত-জীবনের কিছু সংবাদও।

অতি তরুণ বয়স থেকেই লক্ষ্মণ ছোট-বড় নানা আসরে ত বাজাতেনই। বেতার-কেন্দ্রেরও নিয়মিত শিল্পী হন সেই বয়সেই। প্রতি মাসেই বেতারে তাঁর অনুষ্ঠান হত। কোন মাসে একবার, কখনো দুবার। নামী শিল্পীরা সে যুগের বেতারে এত সময়ই পেতেন। কারণ তাঁদের সংখ্যায় স্বল্পতা। এমনিভাবে লক্ষ্মণ বছরের পর বছর সেতার বাজিয়েছেন কলকাতা কেন্দ্রে। প্রচলিত অপ্রচলিত কত রাগ তিনি বেতার শ্রোতাদের যে শুনিয়েছেন!

একখানি গ্রামোফোন রেকর্ডও তাঁর হয়েছিল। ভৈরবী ও ভীমপলশ্রী। স্মৃতি-চিহ্ন সেইটুকু মাত্র।

কয়েকজন শিষ্যও করেছিলেন: অপরেশ চট্টোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার বসু, কুমারকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রভৃতি।

পরমায়ু ত মাত্র ৩৭ বছর। তার শেষের ৫।৬ বছরও একেবারে বিপর্যস্ত জীবন-যাত্রা। অনিয়ন্ত্রিত অসংযত রাহুগ্রস্ত তখন শিল্পীসত্তা। সে পর্বে বেতারের বাজনাই শুধু হত। আর অমিয়ভূষণের মতন কোন অতি-ঘনিষ্ঠ শিষ্যের ঐকান্তিকতায় কিছু শিক্ষাদান। সেতার বাদক বলে আর কোন ঠিক-ঠিকানা তাঁর ছিল না তখন। গুণী বলে সে প্রতিভার পরিচয় সবই ২৮।৩০ বয়সের মধ্যেই। কিংবা আরো ২।১ বছর আগে। যত সব বড় আসর বা সম্মেলন ওই বয়সেই করে গেছেন। কিংবা কটি শ্রেষ্ঠ আসরও। যেমন মরারি সম্মেলনে। বা তবলিয়া ফিরোজ খাঁর সঙ্গে বাজনা, ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনীতে। বলতে গেলে ২৭।২৮ বছরের আগেই সেতারে দুর্লভ গুণপনা দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর কেন এই অকালমৃত্যু? তার প্রধান কারণটি বলে নিতে হয় এখানে। তাঁর সেই দোষের উল্লেখ করবার প্রবৃত্তি লেখকের আদৌ ছিল না। কিন্তু জীবনী-লেখকের কর্তব্য শুধু নয়। অতীতে অনেক বড় বড় প্রতিভার অপঘাত ঘটেছে এই দুর্বলতায়। আর যেন কীটদুষ্ট হয়ে কোন কুসুমের মাস অকালে শেষ না হয়, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও লক্ষ্য। সামাজিক দায়িত্ব হিসেবেও এটি পালনীয়। লক্ষ্মণের জীবন-ট্র্যাজেডি যদি শিল্পীদের বিপদ-সঙ্কেতের চৈতন্য জাগায়—এমন আশাতেও বলা। একটি মাত্র দোষেই সমস্ত মহৎ গুণ অতলে ডুবে যায়। মহাকবি কালিদাসের ভাষায় একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে। (মহাকবি অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেছেন)।

হ্যাঁ, সেই সর্বনাশী নেশাই তাঁর কাল হয়েছিল। ছেলেবেলায় ভুগতেন উদরাময়ে। তাই ওষুধ হিসেবে সামান্য মাত্রায় অহিফেন দেওয়া হত। তাতে নিরাময় হল বটে রোগ। কিন্তু তা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। জিতেন্দ্রনাথও ছিলেন অহিফেনসেবী। কিন্তু তাঁর মাত্রাজ্ঞান ছিল। আর লক্ষ্মণ হলেন বেহিসেবী। তিনি সেই যৌবনেই তাঁর মাত্রা ছাড়িয়ে আচ্ছন্ন হতেন মাদকতায়। কম আরো মোতাত আরো তুরীয়ানন্দের লোভ হলেন। তারপর জলপথে বিচরণ আরম্ভ। তখন মাত্রা, কালাকাল, শরীর, সংগীত কিছুই সবই গেল রসাতলে। এসব অবশ্যই পিতার মৃত্যুর অনেক পরের কথা। সংসারে কোন শাসন বন্ধন কিছু নেই। নিজের পরিবার

গড়ে ওঠেনি। অবিবাহিত থাকেন শেষ পর্যন্ত। আর তিনিই সব চেয়ে উপার্জনশীল। নিজের অন্যান্য প্রয়োজন এত অল্প যে সেতারের পেশাদারি জীবনেই এসরের সংস্থান হয়ে যেত। আফিংটাও ছিল কলেরার। মৃত্যুর মাত্র কয়দিন আগে আফিং ছেড়েছিলেন। তখন ছাড়া না-ছাড়ার পার্থক্য ছিল না কিছু। শেষ পর্যন্ত শিল্পীসত্তা ও ক্ষীণ শরীর বিশৃংখলায় কিভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেল সে বিবরণের আর প্রয়োজন কি? জীবনের শেষ ক'বছরের বৃত্তান্ত এসব—যখন সংগীতসমাজ থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে গেছেন।

তাঁর কিন্তু অন্য কোন চরিত্রদোষ ছিল না। বরং অন্য সব বিষয়ে লক্ষ্মণ দুর্লভ সুচরিত্রের অধিকারী। অবিবাহিত থেকেও অকলুষ জীবন। সরল নিরহঙ্কার আত্মসন্তুষ্ট। উচ্চ-মনা পরদুঃখকাতর। সকলের সংগে একাত্ম। নির্বিকার অথচ আশ্চর্য দরদী এক দার্শনিক চিত্ত তাঁর ছিল। তার একটি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করা যায় এখানে। নেশার শিকার হবার সময়কার ঘটনা নয় এটি। অর্থাৎ স্বাভাবিক চরিত্রের পরিচয়।

তখন লক্ষ্মণ নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটের বাসায় থাকেন। মাঘ মাসের শীতকাল। সকালে এক ছাত্র এলেন তাঁর কাছে শিখতে। বরাবরের মতন ঘরের দরজা সেদিনও অনর্গল। কারণ চোরের চিন্তায় কখনো দ্বার রুদ্ধ করতেন না। মানুষের ওপর বিশ্বাস ছিল আন্তরিক।

ছাত্রটি এসে দেখেন তিনি তখনো নিদ্রিত। কুণ্ডলীকৃত শরীর। লেপ বা কম্বল কোন আচ্ছাদনই নেই অত শীতে। ডাকতেই উঠলেন লক্ষ্মণ।

'এ কি, গায়ের লেপ কোথায়? সারা রাত কিছু গায়ে দেননি নাকি?'

উত্তরে এমন সরলভাবে লক্ষ্মণ বিবরণটি দিলেন যেন অসামান্যতা কিছু নেই: 'না, না। রাত্তিরে বাজনার পর লেপ ত গায়ে দিয়েই শুয়েছিলুম। ঘুম ভেংগে গেল মাঝ রাতে। চোখ চেয়ে দেখি একটা লোক আমার গায়ের লেপ ধরে টানাটানি করছে। কাল খুব ঠাণ্ডা ছিল ত। বেশ করে জড়িয়েছিলুম লেপটা। পাশে দাঁড়িয়েই সে লেপ টানছে দেখে চোখ বন্ধ করে ভেবে নিলুম। লোকটা এই শীতে কষ্ট পাচ্ছে বলেই হয়তো লেপ চুরি করতে বেরিয়েছে। আর কিছু নিয়ে ত পালায়নি ঘর থেকে। এর লেপের দরকার দেখছি আমার চেয়েও বেশি। এই ভেবে আলগা হয়ে শুয়ে রইলুম। এবার লোকটা আমার গায়ের লেপ খুলে নিয়েই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।'

আবার খেয়ালী স্বভাবও অদ্ভুত রকমের ছিল। জিতেন্দ্রনাথ ত সারা রাত কানাড়ার বিস্তার লিখেছিলেন রাস্তার গ্যাসের আলোয় বসে। অক্ষুণ্ণের খামখেয়ালীপনা আরো উদ্ভট। সেসব কারণেও বাস্তব জগতের সংগে, এমন কি সংগীত সমাজেও অনেক সময় রফা হত না। 'বাজনার মেজাজ না এলে বাজাব না,' যখন মেজাজ আসবে সমস্ত রাত বাজনা চলবে, মেজাজ কখন আসবে তার সময় অসময় নেই—এসব ত ছিলই। আরো একটি মানসিকতা দেখা যেত যা অভাবিত। সুরের ধ্যান ও মননে চিত্ত এক এক সময় এমনই তন্ময় থাকত যে মুখের কথা পর্যন্ত বন্ধ। ঘন্টার পর ঘন্টা কিংবা একাধিক দিন তখন বিনা বাক্যে কাটত। নেহাৎ বলতে হয় ত দু-একটা মাত্র উচ্চারণ করতেন। তার ফলে অন্যেরা কি মনে করতে পারে তাঁর বিষয়ে, সে সম্পর্কেও উদাসীন। আপন খেয়ালেই একেবারে আত্মমগ্ন। বাজনার যন্ত্র হাতে না থাকলেও এমন হত। অন্তরে যে সুরের জগৎ আদিগন্ত স্পন্দমান তখন। তাই বাহ্য পরিবেশে নির্বিকার।

এমন এক দিনের দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়। সে সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে। বৃটিশ পক্ষের একটা সংকট-সংকুল পরিস্থিতি। কলকাতায় তারই করাল ছায়া। সন্ধ্যা থেকেই শুধু নিষ্প্রদীপ নয়। আরো নানা প্রকার জরুরিকালীন বিধিনিষেধ। সন্দেহজনক বা সমাজবিরোধী মনে এলেই পুলিশ চালান করে দিচ্ছে কলকাতার বাইরে। রাস্তায় রাস্তায় রাত্রে কড়া পাহারা। আর মুসলীম লীগের অমল। '৪৬ সালের সেই 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর বছর তিনেক আগেকার কথা। পুলিশ বিভাগের নানা গুরু-পদেও তখন লীগপন্থী মুসলমান।

অথচ এসব কোন কারণেই লক্ষ্মণের খামখেয়ালী স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ এসব জাগতিক ব্যাপারের খবরও রাখতেন না তিনি। তার ওপর সেদিন আবার সেই মৌনী মেজাজ।

সেদিন সবে মাত্র সকাল হয়েছে। এমন সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতে লাগল, তাঁর এক প্রিয় ছাত্রের বাড়িতে।

দরজা খুলতেই দেখা গেল: কল্পনাতীত দৃশ্য। দুদিকে দুই পাহারাওলা। আর মাঝখানে লক্ষ্মণবাবু দাঁড়িয়ে।

স্তম্ভিত ছাত্রের মুখে কোন কথা ফোটবার আগেই তিনি বললেন, 'দুটো সিগারেট দিন ত।' বেশির ভাগ শিষ্যকেই 'আপনি' সম্বোধন করতেন। কারণ তাঁরা অনেকেই তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বা সমবয়সী।

তাড়াতাড়ি সিগারেট এনে দিয়ে ছাত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কি হয়েছে? সঙ্গে পুলিশ এসেছে কেন?'

তাঁর উত্তর নেই। পুনরায় প্রশ্ন। তবুও নির্বাক। ঘনিষ্ঠ ছাত্র বুঝতে পারলেন—এখন তাঁর সেই প্রকার মানসিকতা। জবাব পাবার আশা বৃথা।

তখন পুলিশদের জিজ্ঞেস করতে এই বৃত্তান্ত পাওয়া গেল—'রাত দুই বাজে' অর্থাৎ রাত্রি আড়াইটার সময়। তিনি পথ চলছিলেন। দেখতে পেয়ে পুলিশরা জিজ্ঞাসা করে—এত রাতে কোথায় যাচ্ছেন? কেন যাচ্ছেন? বাড়ি কোথায়? নাম কি? ইত্যাদি কোন প্রশ্নের জবাব না পেয়ে তারা পাকড়াও করেছে। এখন এঁকে থানায় জমা করে দিলেই তাদের কর্তব্য শেষ। সেপাইদের কাছে লক্ষ্মণবাবু এই মাত্র কথা জানান, যেন তাঁকে এই ঠিকানায় একবার আনা হয়। পকেট একেবারে শূন্য। অথচ সিগারেট খাবার ইচ্ছা হয়েছে। তাই পুলিশদের নিয়ে এসেছেন শিষ্যের বাড়িতে।

ছাত্রের বহু চেষ্টাতেও পুলিশরা তাঁকে মুক্তি দিলো না। আঙ্গুলের ধাক্কায় যে ক্ষীণ শরীর উল্টে পড়ে যাবে, সে যে গুণ্ডা হতে পারে না, একথাও বোঝানো গেল না তাদের। সন্দেহে তারা অটল রইল। আর তিনি নিঃশব্দে তাদের সংগে চলে গেলেন সিগারেট মুখে।

এ কি বিপদ! আবার দুদিন পরেই রেডিওতে তাঁর বাজাবার কথা। নাম পর্যন্ত ছাপা। চুক্তিবদ্ধ।

ছাত্রটি কজন বন্ধুকে নিয়ে থানায় খোঁজ খবর তদ্বির করতে লাগলেন। প্রথমে ভবানীপুরে। তারপর লালবাজারে। কর্তাদের অনেক বোঝানো হল, 'ইনি একজন বড় সেতার বাজিয়ে। এঁর নাম দেখুন বেতার-জগৎ পত্রিকায়। দুদিন পরেই রেডিওতে বাজাবেন। ওরকম ধরনের লোকই নন। খামখেয়ালী স্বভাব। তাই নিজেকে বোঝাতে পারেন নি', ইত্যাদি।

আরো এক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নিয়ে পরের দিন পুনরায় অভিযান হল। জানা গেল—এই ব্যাপারে কর্তৃস্থানীয় হলেন শ্রীশোরহান নামে এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। এবার তাঁর কাছে দরবার করা হল। তাঁর লাউডন স্ট্রীটের কার্যালয়ে।

সমস্ত শুনে বেতার জগতের অনুষ্ঠান লিপি দেখে অনুগ্রহ করলেন তিনি। বললেন আচ্ছা আমি দেখছি। আমাকে এঁর বাজনা শোনাতে হবে কিন্তু।

নিশ্চয়।

শ্রীশোরহানের আদেশে লক্ষ্মণকে ফিরিয়ে আনা হল কলকাতায়। শিল্পীর বাজনাও তিনি শুনলেন। মুক্তি পেয়ে পরের দিন বেতারেও অনুষ্ঠান করলেন লক্ষ্মণ।...

এমনি অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। একেবারে নিয়ম শৃংখলাবহির্ভূত ব্যক্তিজীবন। একালের বাস্তব জগতের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তাছাড়া শরীর-যন্ত্রও এত অনিয়ম বরদাস্ত করতে পারে না। আহার নিদ্রা বিশ্রামের নিত্য অসংগতি। দেহধারী যত বড় শিল্পী হোন যত নির্বিকারই থাকুন দেহ দীর্ঘকাল বিকার সহনে অক্ষম। আর শরীর তাঁর এমনিতেই শীর্ণ দুর্বল ছিল। তার ওপর ২৯।৩০ বয়স থেকেই পান-দোষের কবলে পড়লেন। বিফল হল শুভার্থীদের সব চেষ্টা।

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.(বি.এস.)
ডাঃ এস. এন. পাণ্ডে এম.বি.(বি.এস.)
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও কৃষ্ণচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫২, সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৩৲ টাকা পাঠাইলে ভি.পি.তে পাঠান হয়।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হেন। এমন অবস্থার ত সীমা আছে। অবশ্যম্ভাবী নিয়তি তাঁকে চিরতরে ঢেকে নিয়ে গেল। ১৯৫৪ সালে। বয়স তখন চলছিল ৩৭ বছর। মধ্যমগ্রামে এক ভগ্নীর বাড়ী। সেখানেই লক্ষ্মণের সব দুঃখ সুখের অবসান ঘটল।

কোন শোকসভা কোন স্মরণ অনুষ্ঠান তাঁর মৃত্যুর পর হয় নি। কিন্তু সঙ্গীত জগৎ থেকে এভাবে লুপ্ত হয়ে যাবার মতন নাম নয়—লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। অথচ পিতৃ-পিতামহের মতন তাঁর নামটিও আজ বিস্মৃত!

এখন তিনটি আসরের উল্লেখ করা হবে। এ থেকেই ধারণা হতে পারে কি ধরনের প্রতিভাধর ছিলেন লক্ষ্মণ। তাঁর বাজনার বৈশিষ্ট্যও এই বিবরণ থেকে লক্ষ্য করা যাবে।

একটি আসর মুরারী সম্মেলনে। মৃদঙ্গী মুরারীমোহন গুপ্তের স্মৃতিতে যে মুরারী সম্মেলন উত্তর কলকাতায় হত যাতে কয়েকবার সেতার সুরবাহার বাজিয়েছিলেন জিতেন্দ্রনাথ—সে আসর নয়। এই মুরারী সম্মেলন হয় দক্ষিণ কলকাতার চেতলায়। অকালগত প্রতিভা মুরারীমোহন মিশ্রের বার্ষিক স্মৃতি বাসর। এ সম্মেলনও কলকাতার একটি শ্রেষ্ঠ আসর ছিল সে সময়। গোলাম আলী রবিশঙ্কর প্রমুখ নানা স্বনামধন্য কলাবৎ এখানে যোগ দিয়েছেন। মুরারীর পিতা সঙ্গীতগুণী মোহিনীমোহন মিশ্র তখন স্বয়ং পরিচালনা করতেন এই আসর। দুটি দীর্ঘ আসর হত। সকাল থেকে প্রায় দ্বিপ্রহর। তারপর সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত।

সেবার লক্ষ্মণকে আনিয়েছেন মোহিনীমোহন। সকালেই তাঁর সেতার বাজাবার কথা। অন্য গায়কও কজন আছেন।

লক্ষ্মণকে বড় ভালবাসতেন মোহিনীমোহন। সকালের প্রথম দিকেই বললেন লক্ষ্মণ এবার তুমি বাজাও।

এখন অন্য কাউকে গাইতে বলুন। আমি পরে বাজাব।

একজন দুজনের গান হয়ে গেল। মোহিনীমোহন আবার ডাকলেন এসো লক্ষ্মণ। এখন ধরো।

আরো কিছু হোক। আমার বাজাতে ভাল লাগছে না এখন।

এমনি করতে করতে সকালের অনুষ্ঠানই শেষ হয়ে গেল। বাজনার মেজাজ এল না লক্ষ্মণের।

একেবারে বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হঠাৎ মোহিনীমোহনকে বললেন এখন বাজাব।

আসরে তখন শ্রোতারাও বেশী আসেন নি। অন্য শিল্পীরাও অনুপস্থিত। কোন তবলচীও নেই। মোহিনীমোহন তবু বললেন বেশ ত আরম্ভ করো।

লক্ষ্মণ জিজ্ঞেস করলেন আমার সঙ্গে তবলা কে বাজাবেন?

বলুন কাকে চাই? তাঁর এক শিষ্য বললেন।

তারাপদবাবুকে নিয়ে আসতে পারবেন?

অর্থাৎ সুপরিচিত সুকণ্ঠ-গায়ক তারাপদ চক্রবর্তী। কিন্তু সে সময় তারাপদবাবুর কৃতী তবলাবাদক বলে কদর ছিল সঙ্গীত সমাজে। তবলায় তাঁর দস্তুরমত সাধা হাত। সঙ্গত করতেন গান যন্ত্র সবের সঙ্গেই।

আচ্ছা চেষ্টা করে দেখি। কোথায় তাঁকে পাব জানি না। বাড়ীতে না পেলে খুঁজতে হবে সময় লাগবে।

লক্ষ্মণ বললেন আমি আলাপ ধরছি। দেখুন চেষ্টা করে। দেরী হলেও ক্ষতি নেই।

শিষ্য ট্যাকসি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ীতে পাওয়া গেল না তারাপদবাবুকে। আরো কয়েক জায়গায় খোঁজ করা হতে লাগল।

এদিকে লক্ষ্মণবাবু আরম্ভ করে দিয়েছিলেন ভীমপলশ্রী। অপরাহ্ণকালীন তাঁর অতি প্রিয় রাগ। রীতিমত বিলম্বিত লয়ে তিনি আলাপ করতে লাগলেন। ধ্রুপদাঙ্গে সম্পূর্ণ আলাপচারী। ধীর মন্থর গতিতে সুর পূর্ণ করতে লাগল আসর। আর তাঁর বাজনার আকর্ষণে শ্রোতারাও আসর ভরে আসতে লাগলেন। সুরের সূক্ষ্ম কারুকর্মে উপভোগ্য হয়ে উঠতে লাগল অনিবন্ধ অংশের অঙ্গ পরম্পরা। প্রতিভা ও সাধনার কত সমুজ্জ্বল নিদর্শন। সুরের কাজে কৃন্তন ও মীড়ের কি বাহার!...

ওদিকে তারাপদবাবুকে উদ্ধারমান গায়ক সুখেন্দু গোস্বামীর বাড়ীতে পাওয়া গেল। তারাপদবাবু যখন আসরে এলেন তখন সাতটা বেজে গেছে। লক্ষ্মণবাবু বাজাচ্ছেন জোড়ের শেষ পর্যায়। দ্রুত লয়ের ছন্দের ঐশ্বর্যে আসর জমজমাট। আলাপের বিভিন্ন অঙ্গ শুনিয়ে এতক্ষণ শ্রোতাদের মোহিত করে রেখেছিলেন। এবার খানিক পরে। ধরে নিলেন গৎ। ভীমপলশ্রীতেই অতি তিমা লয়ের গৎ বাজাতে আরম্ভ করলেন। তবলা সঙ্গতে তারাপদ চক্রবর্তী। আবার নতুন ধরণে জমে উঠল আসর। তান বিস্তারের নানা বৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রকারের তেহাই। সঙ্গে তবলায় সুযোগ্য সহযোগিতা। যেমন সেতারে তেমনি তবলায় চলতে লাগল লয়কারির চমকপ্রদ মুন্সিয়ানা। লক্ষ্মণের প্রাণের বা মেজাজের বাজনা। বিলম্বিত ও দ্রুত দুই লয়েই পর পর গৎ বাজালেন। এক একটি বড় বড় চক্রদার তেহাই ঘুরে ঘুরে পড়তে লাগল সমে। কি রুদ্ধশ্বাস আগ্রহ জাগিয়ে তাল মাত্রার হিসাব সেতারে তবলায় ঝঙ্কৃত হতে লাগল। এক একবার সাথ সঙ্গতের জোলুষ উদ্দীপনা জাগতে লাগল আসরে। কি প্রাণবন্ত ঝঙ্কনা! শ্রোতারা দুর্লভ উপভোগের স্বাদ পেতে লাগলেন। এমনিভাবে বাজনা যখন শেষ হল তখন রাত প্রায় নটা।

দুই শিল্পীর সুখ্যাতিতে আসর উত্তাল হয়ে উঠল। লক্ষ্মণের পরে গাইবার জন্য অন্য গায়কও ছিলেন। কিন্তু একটি মন্তব্য শোনা যেতে লাগল তাবৎ শ্রোতা এবং সেই গায়কদের মুখেও। মোহিনীমোহনও তাতে সায় দিলেন।

আজ আর গান-বাজনার দরকার নেই। সুর আর ছন্দে চূড়ান্ত হয়ে গেছে এ আসরে।

প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা লক্ষ্মণ প্রাণবন্ত রেখেছিলেন সে আসরকে।...

এবার তাঁর কালীঘাটের একটি আসর। তার ভূমিকায় যন্ত্রী লক্ষ্মণের আর একটি গুণের কথা বলে রাখতে হয়। তাঁর হাতে সুর ত বসেছিল আশ্চর্য রকম। তিনি শুধু বাম হাতের আঙ্গুলের আঘাতে কৃন্তন করে দেখাতেন। অর্থাৎ ডান হাত বন্ধ রেখে মেজরাব দিয়ে তার স্পর্শ না করে। আর এক কৃতিত্ব ছিল। সেতারেই সৃষ্টি করতেন বিভিন্ন ধ্বনি। যেমন—পাখির ডাক ঝর্ণার সুর ঝড়ের আওয়াজ (সেতারের অনেকগুলি তারে এক সঙ্গে ঝঙ্কার তুলে। সঙ্গীত-প্রবীণ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে ওস্তাদ সেতারী এমদাদ খাঁও এমনি ঝড়ের ধ্বনি একাধিক দিন শুনিয়েছিলেন) রেল গাড়ীর শব্দ (অতি দ্রুত দিরি দিরি বোল্ বাজিয়ে) ইত্যাদি। সঙ্গীতশাস্ত্রী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভবনে লক্ষ্মণের একাধিক আসর হয়েছিল। তখন লক্ষ্মণের সেতারে এমনি নানা প্রকার আওয়াজ বার করতে শোনেন বীণকার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। এ সবের সাঙ্গীতিক মূল্য এমন কিছু নয় অবশ্য। তবে লক্ষ্মণের শিল্পী সত্তার বিষয়ে বীরেন্দ্রকিশোরের এই অভিমত উল্লেখনীয়ঃ অল্পবয়সী হলেও লক্ষ্মণ অতি প্রতিভাবান সেতারী ছিলেন। যেমন সুরে তেমনি তাল লয়ে। পিতার কাছে যা শিখেছিলেন তার অতিরিক্ত তাঁর নিজস্বও অনেক কিছু ছিল। লক্ষ্মণের বাজনায় রাগ-রূপ খুব ভাল ভাবেই দেখা যেত।

এখন তাঁর সেতারে যে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের কথা হচ্ছিল। নানা যন্ত্রের এমন কি অর্কেস্ট্রার ধরনের আওয়াজও নিজের বাজনার মধ্যে লক্ষ্মণ আনতেন ইচ্ছা করলে।

একদিন এক ছাত্রকে বললেন আজ আমার রেডিও প্রোগ্রামটা শুনবেন ত। অর্কেস্ট্রার কাজ দেখাবার ইচ্ছে আছে।

লক্ষ্মণ সেদিন বেহাগ খাম্বাজ বাজালেন বেতারে। আর ছাত্রটির এক এক সময় মনে হতে লাগল—যেন বিলিতী যন্ত্র বাজছে। অর্কেস্ট্রার ধরনেরই আওয়াজ। কখনো বা রাগের মধ্যেই যেন ট্রাম্পেট বেজে উঠছে। বেহাগ খাম্বাজ ঠিকই অথচ অর্কেস্ট্রার আমেজ।

কালীঘাটের সেই আসরেও এ ধরনের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল শ্রোতাদের।

(ক্রমশঃ)

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় বিশ্ব হকি কাপ বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

খেলাধূলা

দর্শক

অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

১৯৭৫ সালের আন্তর্জাতিক অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ডেনমার্কের স্বেন প্রি দীর্ঘ দশ বছরের চেষ্টায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গত সাত বছরের (১৯৬৮-৭৪) চ্যাম্পিয়ান ইন্দোনেশিয়ার বিশ্ববিশ্রুত রুডি হার্তোনো। স্বেন প্রি এই প্রতিযোগিতার আসরে হার্তোনোকে এই প্রথম হারালেন। অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ইতিহাসে রুডি হার্তোনোর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বেসরকারী বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আসরে হার্তোনো ১৯৬৮ সালে প্রথম সিঙ্গলস খেতাব পান তখন তিনি স্কুলের ছাত্র—বয়স মাত্র সতের। পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ীদের তালিকায় তিনি আজও সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। তাছাড়া তিনি পরপর ৭বার (১৯৬৮-৭৪) সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার এই আসরে সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছেন।

বেশী দিনের কথা নয়, এই মার্চ মাসেরই দ্বিতীয় সপ্তাহে হার্তোনোকে ১২-১৫, ১৫-০ ও ১৫-৭ পয়েন্টে স্বেন প্রিকে হারিয়ে ডেনিস সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছিলেন।

এবারের আসরে পাঁচটি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিল এই পাঁচটি দেশের খেলোয়াড়রা—ডেনমার্ক জাপান ইন্দোনেশিয়া ইংল্যান্ড এবং পশ্চিম জার্মানী। ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড়রা তিনটি বিভাগের ফাইনালে খেলেছিল—পুরুষদের সিঙ্গলস পুরুষদের ডাবলস এবং মেয়েদের ডাবলস। পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে চারজনই ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড়। শেষপর্যন্ত প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে জাপান (২টি) ডেনমার্ক ইন্দোনেশিয়া এবং ইংল্যান্ড। জাপানের কুমারী জুনকি এই নিয়ে তিনবার মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন (১৯৬৯, ১৯৭৪-৭৫)। এবারের প্রতিযোগিতায় এশিয়ার খেলোয়াড়রা তিনটি খেতাব জয়ী হন—জাপান ২টি এবং ইন্দোনেশিয়া ১টি। অপর দুটি খেতাব যায় ইউরোপের ডেনমার্ক এবং ইংল্যান্ডের হাতে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : স্বেন প্রি (ডেনমার্ক) ১৫-১১ ও ১৭-১৪ পয়েন্টে গত সাত বছরের বিজয়ী রুডি হার্তোনোকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : গত বছরের বিজয়িনী হিরো জুনকি (জাপান) ১১-৫ ও ১১-৯ পয়েন্টে গত বছরের রানার-আপ গিলিয়ান গিলকসকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : টিজুন এবং ওহাজুডি (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-১১ ও ১৫-৫ পয়েন্টে স্বদেশের চন্দ্রা এবং কিশিচরানকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : মাচিকো আইজোয়া এবং এনসুকো তাকেনাকা (জাপান) ১২-১৫

১৫-১২ ও ১৫-৯ পয়েন্টে থেয়েস উইডিয়াসটুটি এবং আইমেলডা উই-গেনাকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : ইলিয়ট স্টুয়ার্ট এবং নোরা গার্ডনার (ইংল্যান্ড) ১৫-৯ ও ১৫-৩ পয়েন্টে রোলান মেওয়াল্ড এবং ব্রিগিটকে (পশ্চিম জার্মানী) পরাজিত করেন।

বিবিধ রেকর্ড

অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড :

সর্বাধিক খেতাব জয়

পুরুষ বিভাগ : ২১টি খেতাব—স্যার জর্জ টমাস বার্ট (ইংল্যান্ড)। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স্যার জর্জ টমাস ২১টি খেতাব এ ভাবে পেয়েছিলেন—সিঙ্গলস ৪টি, ডাবলস ৯টি এবং মিক্সড ডাবলস ৯টি।

মহিলা বিভাগ : ১৭টি খেতাব—কুমারী এম লুকাস (ইংল্যান্ড)। বিবাহিত জীবনে তিনি শ্রীমতী কিং এ্যাডামস। ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইনি ১৭টি খেতাব এইভাবে পান—সিঙ্গলস ৬, ডাবলস ১০ এবং মিক্সড ডাবলস ১।

সর্বাধিক সিঙ্গলস খেতাব

মহিলা বিভাগ : ১০টি—কুমারী জুডি হাসম্যান (আমেরিকা)

৬টি—কুমারী এম লুকাস (ইংল্যান্ড)

পুরুষ বিভাগ : ৭টি—আরল্যান্ড কপস্ (ডেনমার্ক)

৭টি—রুডি হার্তোনো (ইন্দোনেশিয়া)

সর্বাধিক উপর্যুপরি সিঙ্গলস খেতাব

৭বার (১৯৬৮-৭৪)— রুডি হার্তোনো (ইন্দোনেশিয়া)

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

কলকাতায় প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ১৮টা খেলায় ৩৫ পয়েন্ট। তাদের ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের সঙ্গে খেলা ড্র করে একটা পয়েন্ট নষ্ট করেছে। লীগের ১৮টি খেলায় তারা ৫৮টি গোল দিয়ে মাত্র একটি গোল খেয়েছে। তাদের সেন্টার ফরোয়ার্ড মমতাজ কুকুওয়ালিয়া দুটি হ্যাটট্রিকসহ ২০টি গোল দিয়েছেন। এ মরসুমে তিনিই সর্বোচ্চ গোলদাতা। তার পরই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অমিত দাশগুপ্তের একটি হ্যাটট্রিকসহ ১৮টি গোল উল্লেখযোগ্য।

এখানে উল্লেখ্য মোহনবাগান এবার নিয়ে মোট ১৪ বার প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র মোহনবাগানই উপর্যুপরি চারবার করে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দুবার (১৯৫৫-৫৮ এবং ১৯৬৯-৭২)।

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা

পাতিয়ালায় জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব দুই বিভাগেই খেতাব জয়ী হয়েছে। পুরুষ বিভাগের ফাইনালে পাঞ্জাব ১৫-৭, ১৭-১৯, ১০-১৫, ১৫-১ ও ১৫-২ পয়েন্টে হিমাচল প্রদেশকে এবং মেয়েদের ফাইনালে পাঞ্জাব ১৫-১, ১৫-০ ও ১৫-৭ পয়েন্টে গুজরাটকে পরাজিত করে।

রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসে সুব্রত ব্যানার্জি মেয়েদের সিঙ্গলসে অনিতা ভট্টাচার্য এবং বালকদের সিঙ্গলসে ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে সুব্রত ব্যানার্জি ১৫-৩ ও ১৫-১ পয়েন্টে কাজল সাহাকে পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন।

১৯৭৫ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান।

সুব্রতা দেবনাথ

শিখেছি তবে টেকনিক্যালি অনেক ভুল থেকে যাচ্ছে অজ্ঞাতেই। মেয়েদের জন্যে পৃথক সাজঘর নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলো আমার কাছে পুরনো গানের রেকর্ডের মত শোনাল। কারণ ঠিক একই কথা শুনেছিলাম সুব্রতার মুখে চার বছর আগে। নতুনত্বের মধ্যে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে সুব্রতা পাল থেকে দেবনাথ হয়েছে। কিন্তু সট-পুটে সে এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ বছরে ইন্টারস্টেট মিটে নিজের পুরনো রেকর্ড ভেঙ্গে (১২-৫২ মিটার) নতুন রেকর্ড গড়েছে। অ্যাথলেটিকসে আরও কিছু নতুন চিহ্ন রেখে যাবার জন্যে সুব্রতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বললে—বাঙালী মেয়েদের নাকি বিয়ের পর কিছু হয় না। আমি আমার জীবন দিয়ে

সুনির্মল ঘোষ

রুবন রায়

জাতীয় অ্যাথলেটিক্স

ভারতীয় অ্যাথলেটিকসের সামগ্রিক রূপ বহুকাল ধরে প্রায় অপরিবর্তিত হয়ে রয়েছে বলা যায়। একথা নিঃসংকোচে বলা যায়। সেই সনাতন সমস্যাগুলো অক্টোপাশের মত শক্ত প্যাঁচে এখনোও অ্যাথলেটিকসকে জড়িয়ে আছে। আন্তর্জাতিক আসরে আমাদের কৃতিত্ব যখন ক্রমশই ম্লান হয়ে আসছে তখনও আমরা অক্টোপাশের বাহুবন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্যে বিন্দুমাত্র প্রয়াসী নই। এর চেয়ে পরম পরিতাপের আর কি হতে পারে? এ যেন মৃত্যুর আগে নিজের হাতে নিজেরই কবর খোঁড়ার মত।

কিংবা বলা যায় আমাদের এ্যাথলেটিকসের চেহারা ঠিক যেন ভারতীয় চাষীর মত। রকেটের যুগে মানুষ যখন তার পদাঙ্ক এঁকে দিয়েছে রূপকথার চাঁদের বুকে তখনও আমাদের চাষী ভায়েরা মান্ধাতা আমলের একজোড়া বলদ ও লাঙ্গল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ রকেটের মত দ্রুত এগিয়ে চলেছে সেই সময় ভারতীয় অ্যাথলেটিকস পুরনো সমস্যা কণ্টকিত ছায়াম্লান ছবি বুকে নিয়ে অনড় প্রস্তরের মত অনন্তকাল যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

অন্যান্য প্রদেশগুলোর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের চিত্র অধিক বেদনাদায়ক। অ্যাথলেটিকসের অভাব অভিযোগ চির পুরাতন হয়েও চিরনতুন হয়ে আছে। ছোট দুঃখটুকু মনের কথা সহজ করে বলি। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে সিঙ্গাপুরে পেস্তা-সুকান প্রতিযোগিতা থেকে সটপুটে দ্বিতীয় হয়ে ফিরে আসার পর সুব্রতার শুষ্ক কণ্ঠে যে অভাব অভিযোগের কথা শুনেছিলাম আজও তাই শুনি। ম্যাটের অভাব, প্র্যাকটিসের নানা প্রবলেম, কোচের অভাব, ইকুইপমেন্ট নেই। সুব্রতার নিজের কথায় বলি—নিজে নিজেই অনুশীলন করি। উপযুক্ত কোচের অভাবে যা শিখছি তা

দেখাবো বাঙালী বধূরা ইচ্ছে করলে সব পারে। আমাকে নিয়ে মাঠে কিছু কানাকানি হচ্ছে। অর্থাৎ বিয়ের পর আমার চরিত্র নিয়ে কথা উঠেছে। আমার স্বামী এবং আমার মধ্যে কোন অশান্তি নেই। তাই নিন্দুকের ওসব কথায় কান না দিয়ে আমি ইভেন্ট করে যাচ্ছি। [illegible] বলার সময় উত্তেজনায় সুব্রতার ঠোঁট কাঁপছিল।

রঞ্জয় রায় ১১০ মিটার হার্ডেলস-এ এক প্রতিশ্রুতিময় প্রতিভা। হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিকসে ১১০ মিটার হার্ডেলসে (১৪-৮ সেকেণ্ড) প্রথম হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মান রেখেছে। ফাইনালে রঞ্জয়কে এগিয়ে আসতে হয়েছে চৌকস এথলেট চৌহানকে পেছনে ফেলে (১৫-০০ সেকেণ্ড)।

রঞ্জয়ের অভিযোগ চিরায়ত—অনুশীলনের সুযোগ একেবারেই নেই বললেই চলে। সারা পশ্চিমবঙ্গে হার্ডেলস রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে। তাও সব সময় মেলে না। ১১০ মিটার হার্ডেলসে প্রতিযোগীর সংখ্যা কম বলে রঞ্জয়কে একা-একাই অনুশীলন করতে হয়। ষ্টেট মীট-এর পূর্বে কোন ক্যাম্প থাকে না। প্রশিক্ষক ও প্রতিযোগীদের নামের তালিকা ঘোষণা করা হয় ষ্টেট মিট-এর দু-চার দিন পূর্বে। ফলে অনেক সময় এমন হয় যে আমরা আমাদের প্রদেশের অনেক কম্পিটিটারকে পরস্পর চিনতে পারি না। প্রতিবছরই দেখি অন্যান্য প্রদেশগুলো অনুষ্ঠান ভূমিতে উপস্থিত হয় প্রতিযোগিতার সাত দিন আগে সেখানকার জল মাটি ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানানসই করে নেবার উদ্দেশ্যে। এমন আরও অনেক অভিযোগের কথা একে একে মেলে ধরছিল রঞ্জয় অস্বস্তি ও বেদনাহত চিত্তে।

বিভাগ	নাম	ইভেন্ট	
পুরুষ বিভাগ	রঞ্জয় রায়	১১০ মিঃ হার্ডেলস	১৪-৮ সেকেণ্ড
মহিলা বিভাগ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
জুনিয়ার বয়েজ	সুনির্মল ঘোষ	লং জাম্প	৬-৫৫ মিটার
"	নটকুমার কর্মকার	৩০০ মিঃ রান	৩৬-৭ সেকেণ্ড
সাব জুনিয়ার বয়েজ	প্রতাপ ব্যানার্জি	ডিসকাস	৩৯-১০ মিটার
"	প্রতাপ ব্যানার্জি	সটপুট	১৩-৭৯ মিটার
"	ইমামুল হক	হাই জাম্প	১-৭৬ মিটার
বালিকা	দেবীকা বিশ্বাস	ডিসকাস	২৯-৩৬ মিটার
"	দেবীকা বিশ্বাস	সটপুটে	৮-০৬ মিটার

লং জাম্পে উদীয়মান তরুণ সুনির্মল ঘোষ বললে—আমাদের সবচেয়ে আগে চাই ইভেন্ট উপযোগী স্পেসালাইজড কোচ ও প্র্যাকটিশের জন্যে মাঠ। ইনডোর ষ্টেডিয়াম থাকলে গ্রীষ্ম বর্ষা নির্বিশেষে অনুশীলনের সুযোগ পেতাম। ফলাফল নিঃসন্দেহে আরও ভাল হত। চিকিৎসার সুযোগ একেবারেই নেই। এমন অবস্থায় আমরা যতটুকু সফলতা অর্জন করেছি তা সম্পূর্ণ আমাদের একক প্রচেষ্টায়।

বস্তুতঃ উপরিউক্ত প্রতিকূল পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা যে কৃতিত্ব বয়ে এনেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সম্প্রতি হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত রাজ্য এ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ানশিপে মোট স্বর্ণপদক জয়ের তালিকায় পাঞ্জাব প্রথম স্থান অধিকার করলেও পশ্চিমবঙ্গ মোট পদক জয় ও মোট পদক সংগ্রহের বিচারে শীর্ষাসন লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ৪২টি পদক ও ১২৬ পয়েন্ট লাভ করেছে। পাঞ্জাব ৩২টি পদক এবং ১১০ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয়। পশ্চিমবঙ্গের স্বর্ণপদকধারীদের তালিকা নিম্নরূপ—

১৪-৮ সেকেণ্ড	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৬-৫৫ মিটার	সুনির্মল ঘোষ	লং জাম্প	
৩৬-৭ সেকেণ্ড	নটকুমার কর্মকার	৩০০ মিঃ রান	
৩৯-১০ মিটার	প্রতাপ ব্যানার্জি	ডিসকাস	
১৩-৭৯ মিটার	প্রতাপ ব্যানার্জি	সটপুট	
১-৭৬ মিটার	ইমামুল হক	হাই জাম্প	
২৯-৩৬ মিটার	দেবীকা বিশ্বাস	ডিসকাস	
৮-০৬ মিটার	দেবীকা বিশ্বাস	সটপুটে	

এছাড়া সিনিয়ার বয়েজ বিভাগে ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম হয়ে স্বর্ণ সঞ্চয় করেছে। পদকের খতিয়ানে পশ্চিমবঙ্গের নামের পাশে রয়েছে আরও ১৩টি রৌপ্য পদক ও ১৮টি ব্রোঞ্জ পদক। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা চলতি বছরের এই ত্রয়োদশ আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় তিনটি রেকর্ড গড়েছে। মহিলা বিভাগের সটপুটে সুব্রতা দেবনাথ ১৯৭৪ সালে তার নিজের গড়া রেকর্ড (১২-২৪ মিঃ) ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড (১২-৫২ মিঃ) রচনা করেছে। বালিকাদের বিভাগে দেবীকা বিশ্বাস ১৯৭৩ সালে আসামের টাবুনিসার রেকর্ড (২৯-৩২ মিঃ) অতিক্রম করে নয়া রেকর্ড (২৯-৩৬ মিঃ) গড়েছে। এছাড়া ৪×১০০ মিটার রিলে রেসের বালিকা বিভাগে ১৯৭৩ সালের (৫২-৫ সেকেণ্ড) নিজেদের রেকর্ড ভঙ্গ করে এ-

হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তরাজ্য অ্যাথলেটিক্স নয়া রেকর্ড

		নতুন রেকর্ড		আগের রেকর্ড
পুরুষ বিভাগ				
সটপুট	জগরাজ সিং (বিহার)	১৭-৫৪ মিটার	জগরাজ সিং	১৬-৬৫ মিটার (১৯৭২)
লং জাম্প	টি সি জোহানন	৭-৭০ মিটার	লাভ সিং (ইউ পি)	৭-৫৫ মিটার (১৯৬৮)
মহিলা বিভাগ				
সটপুট	সুব্রতা দেবনাথ (পঃ বঙ্গ)	১২-৫২ মিটার	সুব্রতা দেবনাথ	১২-২৪ মিটার (১৯৭৪)
ডিসকাস	ভি অনুসুয়াবাই (তামিলনাড়ু)	৪১-৫০ মিটার	ই দেবেনপোর্ট (পাঞ্জাব)	৩৯-৭৬ মিটার (১৯৬৮)
২০০ মিটার দৌড়	মেরী ভারগীজ (কর্ণাটক)	২৫-৯ সেকেণ্ড	কে জো সিন্ধু (পাঞ্জাব)	২৫-২ সেকেণ্ড (১৯৭১)
হাই জাম্প	উর্বারাণী মিশ্র (উড়িষ্যা)	১-৬০ মিটার	এল গোমেস (মাদ্রাজ)	১-৫৭ মিটার (১৯৬৮)
লং জাম্প	বীণা ওমেন (তামিলনাড়ু)	৫-৬৫	আই সালদানা (মহীশূর)	৫-৪০ (১৯৭১)
৪×১০০ রিলে (হিটে)	মহারাষ্ট্র	৪৯-৭	কর্ণাটক	৫০-৩ (১৯৭২)
৪×১০০ রিলে	কর্ণাটক	৪৯-১	মহারাষ্ট্র	৪৯-৭
	মহারাষ্ট্র	৪৯-৪		
বালিকা বিভাগ		**নতুন রেকর্ড**		**আগের রেকর্ড**
ডিসকাস	দেবীকা বিশ্বাস (পঃ বঙ্গ)	২৯-৩৬ মিটার	টাবুনীসা (আসাম)	২৯-৩২ (১৯৭৪)
৪×১০০ রিলে	(পঃ বঙ্গ)	৫২-১ সেকেণ্ড	পঃ বঙ্গ	৫২-৫ (১৯৭৩)

নতুন জাতীয় রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ			
১০,০০০ মিটার দৌড়	শিবনাথ সিং (অন্ধ্র)	২৯ মিঃ, ৩৩-২ সেকেণ্ড	কৃপাল সিং (সার্ভিসেস) ২৯ মিঃ ৩৪-০ (১৯৬৭)
মহিলা বিভাগ			
১০০ মিটার দৌড়	মেরী ভারগিজ (কর্ণাটক)	১২-২ সেকেণ্ড	জাতীয় ও মীট রেকর্ড স্পর্শ
বালিকা বিভাগ			
২০০ মিটার দৌড়	এম ফারনাণ্ডেজ (মহারাষ্ট্র)	২৬-৪ সেকেণ্ড	নির্মলা উথিয়া (মহীশূর) ২৬-৫ সেকেণ্ড (১৯৬৯)

বছরে পশ্চিমবঙ্গ (৫২-১ সেকেণ্ড) নতুন রেকর্ড করেছে। খেলাধূলার ক্ষেত্রে পরগাছার মত অপাংক্তেয় অ্যাথলেটদের অভাবনীয় সাফল্য অবলোকন করে মনে হয় যেন তারা গভীর অন্ধকার, নিদারুণ বঞ্চনা হতাশার জ্বালা ও অবক্ষয়ের গহ্বর থেকে অমিত আত্মিক শক্তিবলে কুড়িয়ে এনেছে সোনা-রূপা-ব্রোঞ্জ।

ভারতবর্ষে অ্যাথলেটিকসের সূত্রপাত সুপ্রাচীন কালেই। ১৯১৯ সালে ডোরাবজী টাটার নেতৃত্বে এদেশে অলিম্পিক মুভমেন্ট শুরু হয়। ডোরাবজী অগ্রণী হয়ে একটি অলিম্পিক কমিটি গঠন করেন এবং এণ্টুয়ার্পে অনুষ্ঠিত সপ্তম অলিম্পিকে (১৯২০ সালে) পি সি ব্যানার্জিকে ৪০০ মিটার দৌড়ে অংশ গ্রহণের জন্যে প্রেরণ করেন। অলিম্পিকে পি সি ব্যানার্জিই প্রথম বাঙালী যোগদানকারী। প্রথম ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালে দিল্লীতে ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ ও ৯ তারিখে। দ্বিতীয় ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক গেম অনুষ্ঠিত হয় ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ সালে। অলিম্পিকে প্রথম বাঙালী মেয়ে নীলিমা ঘোষ। তিনি ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ৮০ মিটার হার্ডেলস-এ যোগদান করেন। নীলিমার পর মহিলাদের বিভাগে রুবী নন্দীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর ইভেন্ট ছিল লং জাম্প ও ১০০ মিটার দৌড়। তিনি দীর্ঘ দশ বছরের অধিক

দেবিকা বিশ্বাস

ট্রাক এণ্ড ফিল্ড-এ থাকলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন আন্তর্জাতিক আসরে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভে বঞ্চিত। এরপর ১৯৭২-এ সিঙ্গাপুরে পোস্তাসুকান প্রতিযোগিতায় সুব্রতা পাল (এখন দেবনাথ) এবং ১৯৭৬এর এশিয়ান গেমসে বাংলার শ্রীরূপা চ্যাটার্জি রিলে ও ১০০ মিটার দৌড়ে যোগদান করেন।

১৯৭৫ সালের ইণ্টার স্টেট মিট-এর সংক্ষিপ্ত দলগত পরিসংখ্যান নীচে তুলে ধরছি—

পুরুষ বিভাগ সাব জুনিয়ার বয়েজ বিভাগ

বিহার ৭৫	—
কর্ণাটক ৩০	পশ্চিমবঙ্গ ২৬ (চ্যাম্পিয়ান)
পঃ বঙ্গ ১১	ওরিষ্যা ১৫

সিনিয়ার বয়েস বিভাগ বালিকা বিভাগ

পাঞ্জাব ৪৩	পশ্চিমবঙ্গ ৩৪ (চ্যাম্পিয়ান)
রাজস্থান ২৩	ত্রিপুরা ১৮
পঃ বঙ্গ ১৩	

মহিলা বিভাগ জুনিয়ার বালিকা বিভাগ

কর্ণাটক ৩৯	পাঞ্জাব ৩৫
মহারাষ্ট্র ৩০	পশ্চিমবঙ্গ ২২
পঃ বঙ্গ ১৪	ত্রিপুরা ১০
	কর্ণাটক ৯
	পশ্চিমবঙ্গ ৫

ওপরের খতিয়ান থেকে পশ্চিমবঙ্গের আলোকোজ্জ্বল ছবিটি অনায়াসে চোখে পড়ে। কিন্তু এই বর্ণোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবিটিকে এই অন্ধকারময় বিপরীত পরিবেশে আরও কতদিন অম্লান রাখা যাবে? অনেক সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল গ্রামীণ প্রতিভা সুযোগের অভাবে অকালে ঝরে পড়ছে। অন্যান্য খেলাধূলার মত এথলেটিকস গোষ্পদের মত শহরকেন্দ্রিক হয়ে রইল। বহুমুখী সমস্যার ভারে ক্লিষ্ট হয়ে ক্ষয়িষ্ণু সূর্যের মত দিনে দিনে তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছে। এই অবক্ষয়রোধে যাদের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল তারা আরও কতদিন কাঠের নীরব পুতুলের মত নিঃশব্দ হয়ে থাকবেন?

প্রশান্ত দাঁ

খেলার জগতে মেয়ে

জিমন্যাস্ট পরিবারের চামেলী দাস

চামেলী দাসের জিমন্যাস্টিক শিক্ষার সূত্রপাত হয় বাড়ীতেই বাবার কাছে। ১৯৭০ সালেই ওর জিমন্যাস্টিক শুরু। ঐ বছরই লক্ষ্ণৌ-এ আয়োজিত স্কুল ক্রীড়ায় বাংলা দলে স্থান পায়।

চামেলীদের বাড়ী খড়দায়। খড়দায় এদের পরিবারকে জিমন্যাস্টিক পরিবার বলে সবাই চেনে। এই পরিবারের অনেকেই জিমন্যাস্টিক ক্রীড়ায় দক্ষ হয়ে বাংলা দলে স্থান পেয়েছে। বাংলার অন্যতম কুশলী জিমন্যাস্ট আরতি দাস চামেলীর বৌদি হন। আর আরতির বোন ভারতী এ বছর রাজ্য আসরে ব্যক্তিগত বিভাগে বিজয়িনীর সম্মান অর্জন করে। চামেলীরা চার ভাই দুই বোন—সকলেই অল্পবিস্তর কৃতী জিমন্যাস্ট।

চামেলী খড়দার শিয়ুনাথ বালিকা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। ছোট বয়স থেকেই বাবা ফণীন্দ্রনাথ দাসের কাছে জিমন্যাস্টিক শিখতে শুরু করে বাড়ীর কাছে নিত্যানন্দ ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে। ফণীবাবুই ব্যায়াম সমিতির প্রবীণ প্রশিক্ষক। ওঁর হাতে অনেক জিমন্যাস্ট তৈরী হয়েছে।

মাত্র পাঁচ বছর অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ লাভের মাঝেই চামেলী রাজ্য প্রতিযোগিতার আসরে সাফল্য অর্জনের ফলে জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার লাভ করে। ১৯৭৩-এ রাজ্য প্রতিযোগিতায় ১৬ অনার্ধ বয়সীমা বিভাগে বীম ব্যালেন্সে শীর্ষস্থান লাভ করে। সে বছরই চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় জিমন্যাস্টিক ক্রীড়ায় বাংলার বালিকা দলে

প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। পরের বছরও রাজ্য আসরে ভল্টিং হর্স ও বীম ব্যালেন্সে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। ৭৪-এ ত্রিপুরার জাতীয় আসরে বাংলা দল চ্যাম্পিয়ান হয়। এই দলে চামেলী দাসও ছিল। ও বীম ব্যালেন্স এবং আনইভিন বার-এ পদক বিজয়িনী হয়।

—তুমি খড়দার ব্যায়াম সমিতি থেকে এখানে এলে কেন?

—বাবার ইচ্ছানুসারে। বাবাই আমাকে উচ্চপর্যায়ের প্রশিক্ষণ দেবার উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে আসেন।

—এখানে কিরকম সুবিধা হচ্ছে?

—বাবা নিজেই আমাকে রোজ এখানে নিয়ে আসেন। খড়দার ক্লাবের চেয়ে এখানে সাজ-সরঞ্জাম ও আধুনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বেশী।

—খড়দা থেকে রোজ এখানে আসতে অসুবিধা হয় না?

—হ্যাঁ, তা হয়। ট্রেন ঠিক নিয়মিত নয়। তা ছাড়া, স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ী হয়ে এখানে সময়মতো রোজ পৌঁছতেও অসুবিধা হয়।

—এখানে তোমায় কে প্রশিক্ষণ দেন?

—এই সমিতির দুই প্রশিক্ষক সন্তোষ ওঝা ও দিলীপ ওঝা। ওঁরা দুজনেই আমাদের নানা কায়দা-কৌশল শিখিয়ে দেন। বারবার দেখিয়ে দেন। তাই আমাদের ফিগার তুলতে খুব একটা অসুবিধা হয় না।

চামেলীর যে বেশ উন্নতি হয়েছে তার প্রমাণ ও এ বছর রাজ্য প্রতিযোগিতায় বীম ব্যালেন্সে দ্বিতীয় ও ভল্টিং হর্সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ঝাঁসীতে আয়োজিত জাতীয় জিমন্যাস্টিক আসরে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবার উদ্দেশ্যে চামেলীও একনিষ্ঠভাবে অনুশীলন করে চলেছে। আর নিষ্ঠা থাকবে না-ই বা কেন? ওর বাবা হলেন সেই যুগের 'গুরু' যাঁরা শিষ্য আর সন্তানের মধ্যে কোন প্রভেদ না রেখে প্রশিক্ষণ দেন। এঁদের সংখ্যা এখন ক্ষীয়মান। দু একজনের দেখা এখনও পাওয়া যায়। এঁদের নাম কেউ জানেন না। জানতে চানও না। এই 'নীরব গুরুর' চেষ্টাতেই এখনও এই ক্রীড়ার চর্চা এদেশে চলছে এটা অত্যুক্তি নয়। অন্তত এই শহরেই যে কটি জিমন্যাস্টিক ও ব্যায়াম ক্লাব আছে, সেগুলিতে এই শ্রেণীর বর্ষীয়ান গুরুর দেখা পাওয়া যায়, যাঁরা নিঃস্বার্থ-ভাবে প্রশিক্ষণ, উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে নবাগতদের উৎসাহিত করেন।

চামেলীদের পরিবারও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। ওর বাবা সে কথা জানালেন। জিমন্যাস্টিকে শরীরের যে ক্ষয় হয় তা পূরণের জন্য কি কি খাবার তিনি খেতে পরামর্শ দেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন, ভিজে ছোলা, কলা এবং ডিম। তা ছাড়া কিছু কিছু ফল মাংস মাছ ও দুধ খাওয়াতে পারলে ভালই হয়। তবে আমাদের মত সাধারণ মধ্যবিত্তদের পক্ষে এই খরচ নিয়মিতভাবে করা শক্ত। তাই মাঝে মাঝে ওসব ব্যবস্থা করা হয়।

চামেলীকেই আরও প্রশ্ন করি

—জিমন্যাস্টিক শেখার ইচ্ছা কেন হল তোমার?

—প্রথমত আমাদের বাড়ীতে জিম-ন্যাস্টিকের চর্চা বহুদিন যাবত চলছে। দ্বিতীয়ত আমার বাবা স্বয়ং আমাকে শেখাতে আরম্ভ করেন। সুতরাং আমার পক্ষে জিমন্যাস্টিক শেখায় কোন বাধা নেই। উপরন্তু, জিমন্যাস্টিক করলে শরীর আর স্বাস্থ্য যে খুব চমৎকার আর মজবুত হয়ে ওঠে তা তো নিজের চোখেই দেখছি।

—অন্য অন্য জায়গায় মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে কি বুঝলে?

—খুব বেশী আলাপের সুযোগ না হলেও, কিছু কিছু কথাবার্তায় বুঝেছি যে ত্রিপুরা বা চণ্ডীগড়ে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের রাজ্যের নানা সুযোগ-সুবিধা পায়। অন্য সব রাজ্যেই জিমন্যাস্টিক শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হয়।

চামেলী প্রশ্ন করে—আমাদের এখানে ভাল ব্যবস্থা হয় না কেন? এখানে তো রাজ্য সরকারের খেলাধুলা বিভাগ আছে? স্কুলে খেলার খরচ বাবদ টাকা নেওয়া হয়।

এ প্রশ্নের কি জবাব দেব? যাদের হাতে ক্ষমতা ও সংগতি আছে, তারা যদি ডাকের অপেক্ষায় না থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে না আসে তো, দেশের ছেলেমেয়েদের শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বাস্তবে কি করে হবে?

এতসব বাধা সত্ত্বেও যাঁরা জিমন্যাস্টিক ক্রীড়াকে এ রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার সংকল্প নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আর আশার আশ্বাস দিয়ে ফিরে আসি।

অমর

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

ওরাংওটাং-এর।

বোর্ণিও থেকে বিপুলাকৃতি, ভীষণ শক্তিধর আর ভয়ানক হিংস্র প্রাণীটিকে প্যারিসে নিয়ে এসেছিল এক ফরাসী নাবিক। ওরাংওটাংরা খুব অনুকরণ করতে পারে। একদিন এক নাপিতকে ক্ষুর হাতে দাড়ি কামাতে দেখে ঘর খালি হতেই ক্ষুরটা নিয়ে পালালো বাড়ী ছেড়ে। চাবুক হাতে নাবিক তাড়া করল প্যারিসের রাস্তায়। রাত তিনটের সময়ে রুমগের্র পাঁচতলা বাড়ীর জানলায় আলো দেখে পাইপ বেয়ে সরসর করে উঠে গেল ওরাং-ওটাং। পেছন পেছন উঠল নাবিকও। তার-পর ওরাংওটাং বুড়ির চুলের মুঠি ধরে খোলা ক্ষুর হাতে নাপিতের অনুকরণে দাড়ি কামাতে যেতেই চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি —ক্ষেপে গিয়ে গলাটাই কেটে দিল ওরাং-ওটাং। রক্ত দেখে আরো ক্ষেপে গেল। গলা টিপে মারল মেয়েটাকে। চাবুক হাতে নাবিককে জানলায় দেখে ভয়ের চোটে দুষ্কর্ম ঢাকবার জন্যে মেয়েটাকে ঢুকিয়ে দিল চিমনীর মধ্যে।

নাবিক আর সইতে পারল না। নেমে এসে পালালো বাড়ী থেকে। বুড়ির লাশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উধাও ওরাংওটাং।

দুঁপি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—হারানো ওরাংওটাং খুঁজে পাওয়া গেছে।

ফাঁদে পা দিয়েছিল নাবিক।

ফেরার থেকে বলছি

এই ভরা দুপুরে এক বারবনিতার ঘরে আমার আগমন হয়েছে। ঠিক ঘরের মধ্যে বলা যাবে না। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম একপাশে। চৌকাঠ পেরিয়ে খানিকটা কোনা-কুনি। অন্দরে ক্যামেরা—আপাততঃ কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে। একটু পরেই মুখ খোলা হবে। এখন আলো করা হচ্ছে। শুটিং জোন মস্তবড় নয়। ক্যামেরার দূরদৃষ্টির আওতা ছেড়ে স্ক্রীপ্টের খাতায় গভীর মনোনিবেশ করেছেন অভিনেত্রী আরতি ভট্টাচার্য যিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্যামা—অঞ্চলের বিখ্যাত বারবণিতায় রূপান্তরিত হবেন। শ্যামার রূপসজ্জায় আরতি এইবার একটা মনিটর দিচ্ছেন। ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেই পরিচালক তপন সিংহ মহাশয় স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নীরবে কটি মুহূর্ত অতিবাহিত হলে পরিচালক সংলাপসূত্র ধরিয়ে দিলেন। অভিনেত্রী তা যথাযথ অনুসরণ করলেন। অতএব টেকিং। আলোকচিত্রশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায় অললাইটস্ রেডি করে ফেললেন। ফ্লোরের মধ্যে যে যেখানে দাঁড়িয়ে শুটিং দেখছিলেন দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ কথা বলবেন না, সায়লেন্স, প্রধান সহকারী পরিচালক বলাই সেনের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি করল। এক অদ্ভুত নীরবতা ঘিরে ফেললো শুটিং জোন। শুটিং জোন-এর মধ্যে অভিনয়, অভিনয় নয় এইভাবে আরতি ওরফে শ্যামা চরিত্রের মধ্যে কখন যে অন্তর্লীন হয়েছেন।

ভেবেছিলাম আমি এলে তুই খুশী হবি।

কোনদিন খুশী করার মতো কিছু করেছ!

একদিন তো আমাকে ছাড়া থাকতে পারতিস্ না—

হ্যাঁ, সেই সুযোগ নিয়ে তুমি আমার কম সর্বনাশ করনি। একদিন তোমার সঙ্গে পরিচিত করে পথে বেরিয়েছিলাম, তার ভাল ফল পেলাম। এখন গা-গতর বিক্রীর অর্ধেক টাকাও তুমি নিয়ে যাও!

সেটা মাসির সঙ্গে আমার করার।

তোর ভাগ তুই পাচ্ছিস না। ওই বুড়ি শালী তার থেকেও মারছে।

ঃ না, মাসি তোমার মত চামার নয়।

এই কথোপকথনের শেষভাগে হারান, শ্যামার আঁচলের খুঁট ধরে টানে এবং খাটের ওপর নিজের কাছাকাছি আনতে চায়। কিন্তু পারে না। অথচ এমন কাজ নেই যা হারান পারে না। এক সময়ের ঘোর রং বাজ। সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছে। সোজা চলে এসেছে শ্যামার কাছে। শ্যামার সঙ্গে হারানের একদা বেশ ভালই মেলামেশা ছিল। কম ফ্লিস্টনস্টি হয়নি। হারানের ওপর বেশী নির্ভর করে ফেলেছিল শ্যামা। বুঝতে পারে নি.....।

শ্যামা গ্রামের মেয়ে। একই গ্রামের মাসী আর রতন। রতন, আপনভোলা, রসিক ও সুগায়কও বটে। শ্যামা গান ভালবাসে। ভাল গান গাইতে জানে। হঠাৎ কি খেয়াল হল রতন একখানা হারমোনিয়াম কিনে ফেললো। নতুন নয়, হাত ঘুরতে ঘুরতে এসে গেল রতনের কাছে। রতন সেটা নিয়ে এল। রতন হারমোনিয়ামটা কিনেছে শ্যামার কথা ভেবে। শ্যামা গান ভালবাসে। একসঙ্গে দুজনে গান গাইতে পারবে। শ্যামার জন্য রতনের নিরুচ্চার অনুভব অপ্রকাশিতই রয়ে গেল। রতন, অনেকদিন ধরে এখানে আছে। বলা বাহুল্য এখানে থেকে গিয়েছে। গ্রাম থেকে জীবিকা অন্বেষণে কলকাতায় এসে আর ফিরে যেতে পারে নি। মাসী ওকে রেখে দিয়েছে। এখানে টুকটাক কাজকর্ম করে। বাবুদের গান শুনিয়ে মনোরঞ্জন করে। হারমোনিয়াম এসেছে। রতনকে এখন আর পায় কে! সারাটা দিন গান বাজনা নিয়ে আছে। শ্যামার ঘরে রোজ গান বাজনার আসর বসে। মাসী এসে যোগ দেয়। এক-কালে মাসীর গানের গলা ছিল, বেশ বোঝা যায়। মাসী গান করে। মাসীর গানের সঙ্গে সঙ্গ হারমোনিয়া বাজায় রতন।

উৎপল দত্ত

জুই ব্যানার্জী

সেলাম মেমসাহেব

সোমা দে

বলতে গেলে হারমোনিয়াম এই ছবির মুখ্য বিষয়। সেই কারণে ছবির নাম করা হয়েছে হারমোনিয়াম। একটা হারমোনিয়াম, প্রথমে দেখা যাচ্ছে ক্রয় করছেন এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের জন্য। মেয়েকে ভাল করে গান না শেখালে বিয়ে দেওয়া কঠিন। সুপাত্র পাওয়া যাবে না। হারমোনিয়াম আসবার সাথে সাথে এই বাড়িতে একজন গানের মাস্টার এল। বয়সে নবীন। সুদর্শন গানের মাস্টার, ছাত্রীর সঙ্গে মন দেয়া নেয়া করল। ক্রমে জানাজানি হল। বাড়ি থেকে প্রবল আপত্তি। কর্তা এ রকম সুপাত্রের হাতে কখনই তিনি তাঁর কন্যাকে দান করবেন না। এর চেয়ে জলে ফেলে দেওয়া ভাল। এইসব ভাবনা চিন্তার মাঝামাঝি সময়ে মাস্টার আর ছাত্রী ভিসমিস্ নিয়ে ফেলেছে ওরা পালাবে। ত্রিসীমানা ছেড়ে ওরা চলে যাবে অন্য কোথাও। সেইমত একদিন সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ওরা পালাল। মানুষ-জনের ভীড়ে মিশে গেল। এদিকে দুই পক্ষের কর্তাব্যক্তিরা থানা পুলিশ খোঁজখবর করতে করতে হয়রান। কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খুঁজতে খুঁজতে ওদের পাওয়া গেল কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে। তখন মাস্টার আর ছাত্রী, নীল আকাশের নীচে মনের আনন্দে গান গাইছিল।

গৃহকর্তা হারমোনিয়াম বিক্রি করে দিলেন। এলো পুরানো জিনিসপত্রের দোকানে। এইভাবে এক পরিবেশ থেকে আরেক পরিবেশে। পরিচালক তপন সিংহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে সমাজের বিভিন্ন অবস্থার ছবি তুলে ধরতে সচেষ্ট। উপলক্ষ্য হারমোনিয়াম। কাহিনী রচনা, চিত্রনাট্য এবং সঙ্গীত পরিচালক শ্রীসিংহ নিজেই। ছবিতে অনেকগুলি গান থাকছে। গানগুলি রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। চলতি পর্যায়ে পিকচারাইজ করা হচ্ছে একখানি গান যেটি গেয়েছেন স্বয়ং ছায়া দেবী।

ছায়া দেবী, এই পর্যায়ের শুটিং-এ অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি মাসীর ভূমিকাটি রূপায়িত করছেন। রতন : সস্মিত ভঞ্জ। হারান : স্বরূপ দত্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আপনজন-এর পর তপনবাবুর ছবিতে সস্মিত স্বরূপ একত্রিত। এছাড়া নতুন শিল্পী ভীষ্ম গুহঠাকুরতা। তিনি রূপায়িত করছেন গানের মাস্টারের চরিত্রটি। বিপরীতে নায়িকা সোনালী দীনেন গুপ্তের কন্যা। সোনালী ইতিমধ্যেই অনেক পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আগামীদিনের নায়িকা হবার মত সম্ভাবনা আছে ওঁর মধ্যে। এছাড়া এ ছবির অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, কাজল গুপ্ত, শিউলি মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, দেবিকা দাশ, অলকা গাঙ্গুলী এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়।

শিল্পনির্দেশনার দায়িত্বভার সুনীতি মিত্রের। সম্পাদনা করবেন সুবোধ রায়। ছবির শুটিং শুরু হয় কেঁদুলি মেলায় বহির্দৃশ্য গ্রহণের মাধ্যমে। এই পর্যায়ে একটানা অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ চলছে। শুটিং অবশিষ্ট থাকবে আর মাত্র কয়েকদিন।

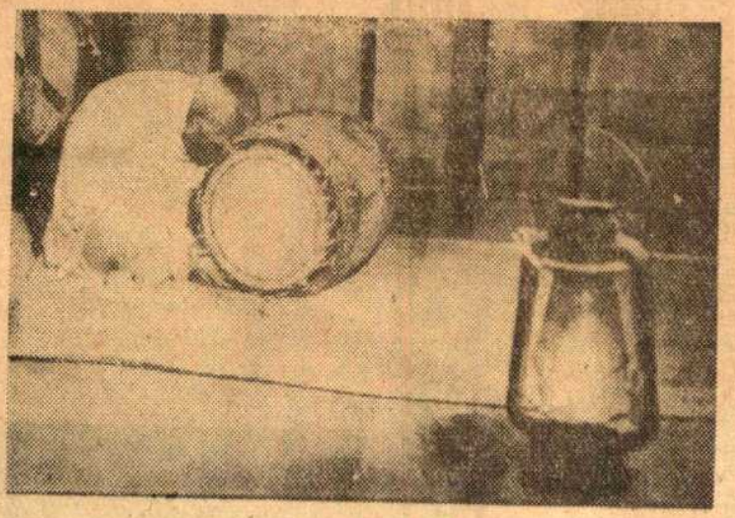

ঢোলের রাজা ক্ষীরোদ নট্ট

ধা তেটে ধিন ধা.....তেটে ধিন ধিন ধা। ঢোলের গায়ে কাঠি পড়তেই কথা কয়ে ওঠে প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রটি। শিল্পী বাঙ্ময় করে তোলেন প্রতিটি বোল প্রতিটি ধ্বনি। ঢোলের গায়ে আঙুলের দ্রুত লয়ে ওঠানামা আর সেই তালে হাতের কাঠির বিদ্যুৎ সঞ্চরণে যে সুর মূর্ছনা সৃষ্টি হয় শিল্পের সেই সূক্ষ্ম জগতের স্রষ্টা একজনই—ঢোলের রাজা ক্ষীরোদ নট্ট। শতবর্ষ অতিক্রান্ত সেই রাজা আপন রাজ্যপাট ছেড়ে বিদায় নিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৭ বছর। দিনটা ছিল ২৭শে ফাল্গুন ১৩৮১। ইংরেজীর ১২ই মার্চ ১৯৭৫।

রাজ-অভিষেক হয়েছিল অনেকদিন আগে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে কলকাতায় যেবার কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসেছিল পার্ক সার্কাস ময়দানে সেইখানে হাজার হাজার মানুষের সামনে। বিশাল মঞ্চে গান্ধী মহারাজ মালা আর খদ্দরের উত্তরীয় দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন তাঁকে। জনতা হাততালি দিয়ে সেই অভিষেক অনুমোদন করেছিল। সেবার কংগ্রেস অধিবেশনে অশ্বিনী দত্ত উপঢৌকন দিয়েছিলেন বরিশালের তিনটি জিনিস—বালাম চাল, মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গান আর ক্ষীরোদ নট্টের ঢোলের বাজনা। মঞ্চে ছিলেন মতিলাল নেহরু। পিঠ চাপড়ে তিনি তারিফ করেছিলেন বাজনার। সুভাষচন্দ্র তুলে দিয়েছিলেন একখানা খদ্দরের রুমাল। সেই থেকে তিনি রাজার আসনে অধিষ্ঠিত।

রাজ-সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তিনি রাজবাড়িতেই। কাশিমবাজার রাজবাড়িতে রাজকীয় মর্যাদায় তাঁকে সম্মান জানিয়েছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ঢোল বাজাবার আহ্বান এসেছিল রাজার কাছ থেকে আর এক রাজার দরবারে। তিনি ঢোলের রাজা। ঢোল কাঁধে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন রাজবাড়িতে। রাজা নজরানা দিয়েছিলেন কারুকার্যখচিত পদক।

এক রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় অন্য রাষ্ট্র। রাজার স্বীকৃতি দেয় আর এক রাজা। ঢোলের রাজা এমনি স্বীকৃতি পেয়েছেন বহু রাজআমন্ত্রণে। সেটাই তাঁর রাজকীয় সম্মান। তাঁর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর রাজযাত্রা ছিল মগের মুলুকে রাজবাড়ির উদ্দেশে। হাতির পিঠে চড়ে ঘন অরণ্য পেরিয়ে তিনি রাজবাড়িতে রওনা হন। উপলক্ষ্য ছোট রাজার বিয়ে। রাঙামাটির দেশে এই মগদের রাজত্ব। স্বয়ং রাজা এসে ঢোলের রাজাকে অভ্যর্থনা জানান। আপ্যায়নও সেই রকম। মগরাজার সখ হয়েছিল ভাইয়ের বিয়েতে ঢোল-সানাই সহরত হবে। দূত এসেছিল সেখান থেকে। তাই দূর দুর্গম রাজ্যে যাত্রা করেছিলেন তিনি।

সেই আমলে ক্ষীরোদ নট্টের ঢোলের খ্যাতি তখনকার রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। হামেশাই আমন্ত্রণ আসত এখান সেখান থেকে। কখনও হাতি কখনও পালকি, কখনও পানসিতে চড়ে ক্ষীরোদ নট্ট যেতেন এ রাজ্য সে রাজ্য। পদক পোশাক উত্তরীয় শিরোপা নিয়ে ফিরতেন আপন রাজ্যে। কাঠের খোলের উপর চামড়ার ছাউনির এই বাদ্যযন্ত্রটি যখন তাঁর কাঁধে চড়ত তখন তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন। ভুলে যেতেন বাইরের জগৎ। কেবল দেখা যেত তালে তালে মাথা মুখ দুলছে। আর দুখানা হাতে যেন বাজনার খই ফুটছে।

নট্টমশাইয়ের জন্ম হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। পুরানো চালচলন, ঐতিহ্য বনেদিয়ানা তখন জাঁকিয়ে। সেটা বাংলা সন ১২৭৫। তারিখ ১৫ই অগ্রহায়ণ।

স্টুডিও সংবাদ

মুক্তি প্রতীক্ষিত বাংলা ছবির সংখ্যা নেহাত কম নয়। বাংলা ছবি ঊনিশশো বাহাত্তর সালে তৈরী হয়ে এমনকি তিয়াত্তর সালেও তৈরী হয়ে পড়ে আছে রিলিজ চেন-এর অভাবে। একাধিকবার বলা হয়েছে, লেখা হয়েছে বাংলা ছবির রিলিজ চেন না বাড়লে চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট দূরীভূত হবে না। কিভাবে হবে তার কোন পজিটিভ পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত নেই। এই টালমাটাল অবস্থার মধ্যেও বাংলা ছবি তৈরী হচ্ছে। মুক্তি পাচ্ছে। তৈরী হচ্ছে তাসের দেশ। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে স্বরচিত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন শ্যামল গুহ। তিনি নিজেই সংগীত পরিচালক। বলা বাহুল্য এ ছবিতে গানের সংখ্যা বেশী। কিছু কিছু অংশে নাচ থাকছে। কালারে তৈরী হচ্ছে। ছবিতে বেশীরভাগ নতুন শিল্পীদের আগমন ঘটেছে। সেট ডিজাইন করেছেন বম্বের বিখ্যাত শিল্পনির্দেশক : সুধেন্দু রায়। কস্টিউম ডিজাইন করেছেন : নিতাই ঘোষ। সম্পাদনা করবেন বম্বের অমিত বসু। চিত্রগ্রহণ করছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। গত সপ্তাহে এই ছবির এক প্রস্থ শুটিং হয়ে গেল। তৈরী হচ্ছে যান্ত্রিক-গোষ্ঠীর পরিচালনায় স্নো ফকস ক্যাবারে। পার্থপ্রতিম চৌধুরীর চিত্রনাট্য। প্রধান তিনটি চরিত্র রূপায়িত করছেন উত্তমকুমার, মিঠু মুখোপাধ্যায় এবং শর্মিলা বিশ্বাস। নায়িকা মিঠু, বিগত পর্যায়ের শুটিং শেষ হতেই বম্বে পাড়ি দিয়েছেন। সেখানে তিনি এখন দুলাল গুহ পরিচালিত একটি ছবিতে অংশ নিচ্ছেন। বিরাট শিল্পী তালিকায় মিঠুর বিপরীতে উক্ত ছবির নায়ক জীতেন্দ্র। মিঠু সেখানে একটা সিডিউল শেষ করে কলকাতায় ফিরে আসবেন। এখানেও তাঁর হাতে আছে কয়েকটি ছবি। তৈরী হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় শংকরের জন অরণ্য। ইনদাস ফিল্মসের পতাকাতলে এই ছবির শুটিং শুরু হয়েছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। প্রধান চরিত্র সোমনাথ রূপায়িত করছেন নবাগত প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রে নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া যাবে। এছাড়া আছে বিরাট ভূমিকালিপি : উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, দীপঙ্কর দে, লিলি চক্রবর্তী আরতি ভট্টাচার্য, সন্তোষ দত্ত এবং সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (লিটল থিয়েটার গ্রুপের)। ছবিখানি পরিচালনা করছেন সুবীর গুহ। চিত্রনাট্য ও প্রযোজনা পরিচালনা শ্রীরায়ের। চিত্রগ্রহণ সংগীত পরিচালনা : সুধেন্দু রায়। শিল্পনির্দেশক : অশোক বসু। সম্পাদনা করবেন : দুলাল দত্ত। এই তথ্য যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন প্রথম পর্যায়ের শুটিং শেষ। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবার মুখে।

অনতিবিলম্বে মুক্তি পাচ্ছে ফুলু ঠাকুরমা। হাসির ছবি। পরিচালনা করেছেন সাধন সরকার। সংগীত : শ্যামল মিত্র। নায়িকা জয়শ্রী রায়। নামভূমিকায় আছেন : মলিনা দেবী। এছাড়া আছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, অনুপকুমার প্রভৃতি। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত অগ্নিশ্বর আসছে। বনফুল রচিত কাহিনীর প্রধান চরিত্র রূপায়িত করছেন উত্তমকুমার। বিপরীতে আছেন মাধবী ও সুমিত্রা

বরিশালের গাভায় তিনি ভূমিষ্ঠ হন। বাবা রূপচাঁদ। মা তারামণি। শৈশবেই বাবা মারা যান। গুরুরূপে ঢোলের তালিম নেন মাছরাং-এর যজ্ঞেশ্বর নট্টর কাছে। পুরনো দিনে কৃষ্ণনগরে যে সংগীত সম্মেলন বসেছিল সেখানেও ডাক পড়েছিল নট্ট মশাইয়ের। বিদগ্ধজনেরা সেখানে হাজির। ধ্বনি লহরার ছন্দে সবাই অভিভূত। সেই আসরে আসীন ওস্তাদ আলাউদ্দীনও। ক্ষীরোদবাবুর বিষম চৌতালের সূক্ষ্ম শিল্পকলায় তিনি তখন হতবাক।

এমন একদিন ছিল যখন হাজার এক টাকার বায়না তাঁর বাড়িতে এসে সাধাসাধি করত। সকলেরই আবদার ঃ তাঁদের সেখানেই যেতে হবে। কিন্তু মানুষ তিনি একা। হাজারজন হয়ে'ত ছড়িয়ে পড়তে পারেন না। তাই বাজনার রাজা রাজার চালে হাজির হতেন রাজবাড়িতে। পুজোয় যেতেন ত্রিপুরায়। ব্রজেন্দ্রকিশোর মহারাজ বা বীরেন্দ্র মাণিক্য সমাদর করতেন তাঁকে। সেই ভালবাসা ঠেলে ফেলতে পারতেন না' রাজপুরীতে তাঁর আসন ছিল পাকা। একবার সেখানে রাজকুমারের অভিষেক। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ গুরুজনদের আশীর্বাদ আর ভিনদেশী রাজাদের শুভেচ্ছা ছিল যেমন অনুষ্ঠানের অঙ্গ তেমনি ঢোলের রাজার বাদ্যানুষ্ঠানও ছিল একটি প্রধান ভূমিকায়। সেদিনের সে বাজনা সেখানে সৃষ্টি করেছিল তালতরঙ্গের সুরলোক। মুগ্ধ মহারাজ। মুগ্ধ মহারাণী। রাজা উপহার দিলেন পশমের শাল। রাণী দিলেন রুপোর জরির রুপালী বেদন। অর্থাৎ ঢোলের গায়ের ঢাকনি চাদর। নট্টমশাই যখন আসরে দাঁড়াতেন তখন সর্বাঙ্গে ঝিল মিল করতো থরে থরে সাজানো সোনা-রুপোর পদক পিতলের প্রশস্তিপত্র ও শিরোপা। কারুকার্যমণ্ডিত ঢোলের গায়ের ঢাকনায় খেলত ঝিলিক।

ক্ষীরোদ নট্টর ঢোলের অপূর্ব এই জাদুছন্দে মোহিত হয়েছিলেন নাটোরের মহারাজা। সাধ হয়েছিল তাঁরও অঙ্গুলি স্পর্শে ঢোল যেন তালে তালে ঝঙ্কার তোলে। ধরে বসলেন ওস্তাদকে। রাজ-সাধে রাজি হলেন রাজা। শুরু হল শিষ্যের শিক্ষা। কিন্তু সবার-ত হবার নয়। নট্ট কুলেও তো কত মানুষ সারা জীবন সাধনা করেও বোলকে বশে আনতে পারলেন না। কিন্তু নাটোর-রাজ শিখেছিলেন স্বল্প কিছু। সে ঢিমে একতালা অব্দি। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন আরও একজন রাজা। তিনি গড় কাশিমপুরের সারদাকান্ত ভট্টাচার্য। ওস্তাদের ভূমিকা ছিল সারাটা জীবনভর। কিন্তু তাঁর দেওয়া গুরু বিদ্যা পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত করতে পারল না কেউ। এক সময় পুরোপুরি শিক্ষারতীর ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। এই সূক্ষ্ম শিল্পের উত্তরাধিকারী আবিষ্কারের কাজে করলেন আত্মনিয়োগ। নবদ্বীপ বঙ্গবাণীতে বাদ্যযন্ত্রের গুরুপদে বৃত হলেন। প্রায় এক যুগ একটানা অধ্যাপনা চালালেন এই সংগীত মহাবিদ্যালয়ে। কিন্তু মনের মত শিষ্য পেলেন না তিনি।

দেশ ভাগের পর পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে যেদিন এপার রওনা হন সেদিন পাকিস্তানীরা ছিনিয়ে নিয়েছিল তাঁর পুরস্কার পদক আর শিরোপাগুলি। দ্বারভাঙ্গার রাজা কাশিমবাজারের রাজা ত্রিপুরার রাজা নাটোরের রাজা মগরাজা আর অসংখ্য জমিদার তালুকদারের দেওয়া রাজকীয় সম্মান এইভাবে লুণ্ঠিত হয়েছিল। কেবল ছাড় পেল সংগী ঢোলটি। তাই নিয়ে ক্ষীরোদবাবু এপারে এলেন। সেটা বাংলা ১৩৫৭-র কথা। সর্বস্বান্ত হয়ে ক্যাটালেন কিছুদিন উদ্বাস্তু শিবিরে। তারপর ২৪ পরগণার হাবড়া এলাকায় কয়াড়াঙ্গায় নতুন বসতি বসল। গড়ে উঠল নট্টপল্লী। সেখানকার পাকা বাসিন্দা হলেন তিনি।

শেষ সম্বল শুধু ঢোলটা নিয়ে নতুন জীবন শুরু করলেন নট্টমশাই। কিন্তু আবার আঘাত এল তাঁর জীবনে। একবার পাকিস্তানীরা কেড়ে নিয়েছিল তাঁর সারা জীবনের পাওয়া রত্নগুলি। এবার নিয়তি উপড়ে নিয়ে গেল তাঁর হৃৎপিন্ডটাকে। একমাত্র পুত্র নারায়ণ তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। ত্রিশ বছরের জোয়ান ছেলে বাঁশিতে সুর-লহরি তুলতে পারত। একটি পেশাদার নামকরা যাত্রাদলে ছিল নিয়মিত বাদ্যশিল্পী। ঢোলের হাতও বেশ চোস্ত। কিন্তু সে অকালে চলে যাওয়ায় বার্ধক্যে জরাজীর্ণ শিল্পীকে দুঃখ-দৈন্যে শোকে-তাপে জর্জরিত হতে হয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের বৃদ্ধা স্ত্রীর ও হারিয়ে যাওয়া পুত্রের রেখে যাওয়া স্ত্রী ও পুত্রকন্যার ভার তাঁকে বইতে হয়েছে। ভাঙা টালির ঘর দরমার বেড়া আর সামান্য একটু মাটির উপর শেষ জীবনটা কাটিয়ে গেছেন তিনি।

জীবনের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামান্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। বড় কষ্টে চলত দিন। এর আগে পশ্চিমবঙ্গ সংগীত কলা অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকেও তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়। বঙ্গ সাংস্কৃতি সম্মেলন দেন তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা। কলকাতা মহানগরীতে সেদিন তাঁকে নিয়ে পালকিতে করে বেরিয়েছিল শোভাযাত্রা। মঞ্চে নিয়ে থালায় সাজিয়ে কাঁচা টাকার নগদ নজরানা দেওয়া হয়েছিল। দেওয়া হয়েছিল ঢোল বাজাবার রুপোর কাঠি। আর তুলে দেওয়া হয়েছিল তাঁর হাতে ধুতি-উত্তরীয় উপঢৌকন। এছাড়া আরও অনেক প্রতিষ্ঠান সম্মান জানিয়েছেন তাঁকে। পেয়েছেন মানপত্র আর নানান উপহার। কিন্তু উপোসের হাত থেকে রেহাই পান নি।

আকাশবাণী রবীন্দ্র সদন বহু গুণগ্রাহী মানুষ আর অনেক চলচ্চিত্র পরিচালকের সংগ্রহ রয়েছে তাঁর কিছু বিরল বাজনা। এই সব একত্রে সংগ্রহ করে রেকর্ড বের করতে পারলে তা হতে পারে দেশের একটি সুন্দর সম্পদ। তার মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকতে পারে তাঁর স্মৃতি—বেঁচে থাকতে পারে হারিয়ে যাওয়ার মুখে ঢোলের একটি বহু নন্দিত ঘরানা।

কৃষ্ণ দেবনাথ

এছাড়া আছেন ঃ অসীমকুমার, দিলীপ রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জহর রায়, পার্থ মুখোপাধ্যায় এবং নবাগতা দেবিকা দাস। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আরেকটি ছবি আসছে প্রেমের ফাঁদে। চিন্ময় রায় কাহিনীকার এবং অন্যতম চরিত্রের শিল্পী। পরিচালনা করছেন নবগঠিত চিত্রদূত গোষ্ঠী। উদ্দাম হাসির ছবি। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন ঃ সস্মিত ভঞ্জ, আরতি ভট্টাচার্য, চিন্ময় রায়, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, সুজাতা দত্ত, কনক মিত্র, সাধনা রায়চৌধুরী, দিলীপ বসু এবং নবাগতা শর্মিলা দাস। সংগীত ঃ ওয়াই এস মুলকী।

স্টুডিও সংবাদদাতা

সেই চোখ মহুয়া রায়চৌধুরী। অনুপকুমার

বেলজিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব

জিন অ্যান্ড জোসি

ল অম্যারেউস

গ্লোব সিনেমায় গত ৬ মার্চ থেকে ১২ মার্চ ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়া দ্বিতীয় বেলজিয়াম চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উৎসবে প্রদর্শিত হয় ৬টি ফিচার এবং ৬টি অল্পদৈর্ঘ্য চিত্র। সবকটি ছবিই রঙীন। কাহিনী বৈশিষ্ট্যে ১৯৭৩ সালে আয়োজিত বেলজিয়ান উৎসবের ছবিগুলি উন্নত ধরনের। বিশেষ করে ল্যাডুপার্টে এবং গ্রেট বেরিয়ার রিফ-এর মতো উচ্চমানের ছবি নেই। সম্প্রতিকালে প্রদর্শিত বেলজিয়ামের ডেথ অফ দি পেসান্ট ব্রুনো এসব ছবি (১৯৭০-৭২)এর চেয়েও উন্নত ধরনের ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এবারের ৬টি ছবির মধ্যে বেলজিয়ামের ইয়ং সিনেমা বা নব তরঙ্গ ছবির নামে নগ্নতাকেই দেখা যায় অন্য কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং একাধিক ছবিতে গল্প বা কাহিনীর প্রয়োজনের চেয়ে বকস অফিসের দিকে চেয়েই ছবিতে যৌন-আবেদন নগ্নতা ও শয্যাদৃশ্যকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে সবকটি অল্প দৈর্ঘ্য চিত্র আঙ্গিকে ও কাহিনীর দিক থেকে অভিনব। (১) র‍্যাদেভু অ্যাট ব্রে (১৯৭০)—পরিচালক আঁদ্রে ডেলভক্স একটি রহস্যের আমেজ সারা ছবির মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। যদিও উনি গভীর ভালবাসা ও বন্ধনত্বের কাহিনীর মধ্যে যৌনতা ও নগ্নতাকে কেন প্রশ্রয় দিলেন বোঝা গেল না। ছবির ফ্ল্যাশব্যাকের তাৎপর্যকে অর্থহীন মনে হয় তবে আঙ্গিকের কাজ উচ্চাঙ্গের। (২) মালপেরতুই (১৯৭২)—পরিচালক হ্যারিকুমেল আঙ্গিকে অভিনয়ে বিষয়বস্তুতে চমক সৃষ্টি করেছেন। আহত নায়ক বিভীষিকার রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে একাধিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। এ ছবিটিতেও যৌনাবেদনমূলক দৃশ্যকে সংযমের সঙ্গে দেখানো যেত। অরসন ওয়েলসের চিত্রপরিকল্পনা ও অভিনয়কে অবশ্যই প্রশংসা করা যেতে পারে। (৩) **জিন অ্যান্ড জোসি** (১৯৭২)—পরিচালক উইস অ্যান্ডারসন রোমান্টিক মেলোড্রামার মধ্যে দিয়ে একটি তরুণীর বয়স্ক নায়কের সঙ্গে প্রণয় এবং তাঁর পুরুষবন্ধুদের সমসাময়িক দ্বন্দ্ব ও হঠকারিতার চিত্র পরিবেশন করেছেন। (৪) **ল অম্যারেউস** (১৯৭২)—ক্রিস্টিয়ান মেসনিল পরিচালিত ছবিতে দেখানো হয়েছে নায়িকা কামনা ও বাসনায় অতৃপ্ত বলেই বোধ হয় সে নিউরোটিক। স্বপ্ন দৃশ্যে তাঁর কামনাকে প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রৌঢ় নায়ককে হত্যা করে হিচককের ছবির মতো সাসপেন্স সৃষ্টি করা হয়েছে। (৫) **দ্য রেড রুম** (১৯৭৩)—পরিচালনা জ্যাঁ গিয়ের বার্কম্যান। ছবির নায়িকা ফ্রি লভে বিশ্বাসী তাঁকে নিয়ে তার প্রেমিক ও হবুস্বামীর ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার এবং সকামিতাকে এড়াতে পারেনি নায়িকা। (৬) **লুইজা** (১৯৭২)—পরিচালনা পোল কোলে পিয়ের দ্রুও। নায়িকা দুই বন্ধুর প্রতি আসক্ত। বিয়ে না করেই তাদের উপভোগ করতে চায় সম্ভোগের মধ্য দিয়ে।

সাজিস/সায়রা

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

কলকাতা থেকে দুই নায়িকা এসে বম্বে বেশ সরগরম করে তুলেছেন। এর মধ্যে একজন হলেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। আরেকজন সুপর্ণা সেন। মিঠু কিছুদিন আগে একবার কলকাতা থেকে এখানে এসেছিলেন প্রমোদ চক্রবর্তীর ছবিতে কাজ করার বাসনা নিয়ে। কিন্তু অনিবার্য কোন কারণে মিঠু ঐ ছবিতে কাজ করতে পারেন নি। তখন ওঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন হৃষি। হৃষি মিঠুর ব্যাপারে বেশ কৌতূহলী। কথায় কথায় কলকাতার এই হিরোইনের নাম উচ্চারণ করছে। হৃষির এই বাড়াবাড়ি পছন্দ করছে না জীতেন্দ্র। জীতু মিঠুর সঙ্গে কাজ করছে দুলাল গুহর ছবি খান দোস্ত-এ। এর মধ্যে কয়েকদিন শুটিং অতিবাহিত হয়েছে। যেখানে যাচ্ছে জীতু, মিঠুর প্রশংসা করছে। বলছে এমন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর সঙ্গে আমি খুব কমই কাজ করেছি। মিঠু অবশ্য বিশেষ কিছু বলছেন না প্রেসের এবং ইণ্ডাস্ট্রির সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলছেন, মিষ্টি হাসি দিয়ে ভুবন ভরিয়ে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে মিঠু আরো কয়েকটি ছবির অফার পেয়েছেন। শোনা যাচ্ছে সে ওমপ্রকাশের আগামী একটি ছবিতে রাজেশের বিপরীতে নায়িকা হবেন মিঠু। সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে আমি মিঠুকে প্রশ্ন করি ঃ তাহলে কি বম্বেতে পাকাপাকিভাবে চলে আসছেন।

ঃ আশা করছি। কারণ কলকাতায় আমি আর নতুন ছবি নিচ্ছি না। যা যা কমিটমেন্টস ছিল কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেরকম কোন চরিত্র পেলে নতুন বাংলা ছবির কনট্রাক্ট সাইন করব। নচেত বম্বেবাসী হবার ইচ্ছেই আছে।

সুপর্ণা সেন গত সপ্তাহে বম্বেতে এসেছেন। তিনি বলতে গেলে, বেশ কিছুদিন আগেই বম্বেতে এসেছেন এসেছেন বি আর চোপরার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়াতে। কলকাতায় এক পার্টিতে বি আর চোপড়ার সঙ্গে শ্রীমতী সুপর্ণার আলাপ। সেই সূত্র ধরে তাঁর বম্বেতে আসা। বম্বেতে এসে তিনি কিন্তু আজ পর্যন্ত শ্রীচোপরার ছবিতে কাজ করেন নি। শোনা যাচ্ছে তিনি করবেন। স্ক্রিপ্ট তৈরী হচ্ছে। সুপর্ণার বিপরীতে কে নায়ক হবেন তাও এখনো ঠিক হয় নি। ইত্যবসরে সুপর্ণা কাজের কাজ করেছেন। অন্যান্য পরিচালকদের ছবি সাইন করেছেন। অন্ততঃ ছখানি ছবিতে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রযোজক-পরিচালক অর্জুন হিংগোরাণী। অর্জুনের সঙ্গে সুপর্ণাকে আজকাল ইতিউতি দেখা যাচ্ছে। এই নিয়ে গালগল্প হচ্ছে প্রচুর। সুপর্ণা বদনাম অথবা স্ক্যাণ্ডালের পরোয়া করেন না। তাঁকে কখন কিভাবে কার সঙ্গে দেখা যাবে সেটা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনা। কেউ বলেন হৃষির সঙ্গে সুপর্ণা বেশ জমিয়েছে। কেউ বলেন ধর্মেন্দ্র-এর সঙ্গে একটা হোটেলে প্রায়ই ওঁকে দেখা যায়। আবার কেউ বলেন শৈলেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন সুপর্ণা। একমাত্র ঈশ্বরকে স্মরণ করাই, এক্ষেত্রে শ্রেয়।

বাংলা ছবির নায়িকাদের বম্বেতে যেমন কদর তেমনি বাংলা হিট ছবির। শক্তি সামন্ত বাংলা হিট ছবি দেয়া নেয়ার হিসি

করছেন রাজেশ খান্না আর সিম্পল বাপাদিয়াকে নায়ক-নায়িকা করে। ছবির মহরত হয়ে গেছে। শুটিং আরম্ভ হল বলে। স্বয়ং উত্তমকুমার বাংলাতে ছিলেন শোনা যাচ্ছে হিন্দিতেও তিনি করবেন। এ ছবিরও পরিচালক শক্তি সামন্ত। আরো শোনা যাচ্ছে শক্তিবাবু বাংলা হিট ছবি বালিকা বধূর হিন্দি রাইট কিনেছেন। হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ছদ্মবেশীর হিন্দি করেছেন ছুপকে ছুপকে নামে। এ ছবি আশু মুক্তি প্রতীক্ষায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন : ধর্মেন্দ্র, শর্মিলা ঠাকুর, অমিতাভ বচ্চন ও জয়া ভাদুড়ী। পরিচালক-শিল্পনির্দেশক সুধেন্দু রায়, সত্যজিৎ রায় কৃত গুপী গাইন বাঘা বাইন এর হিন্দি করতে পারেন। পরিচালক অনিল গাঙ্গুলী, কোরা কাগজখ্যাত একদা হিট বাংলা ছবি বালুচরীর হিন্দি প্রস্তুত করবেন। শচীন অধিকারী পরিচালিত কলকাতার সদ্য হিট করা ছবি রৌদ্র ছায়া হিন্দিতে করার পরিকল্পনা করছেন প্রযোজক-পরিচালক ফিরোজ খাঁ।

অলকা আর সতীশ কাউলের প্যার মোহাব্বতের ঘটনা বম্বের ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে অজানা নয়। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে। ওরা বিয়ে করবে, তাও মাঝে মাঝে শোনা যায়। এখন আর নয়। আর যাবে বলে মনে হয় না। বেচারা! সতীশ কাউল অলকার কথার ওপর নির্ভর করে সতীশ তার ঘর-বার ছেড়ে চলে এসেছিল অলকার হোটেলে। অলকা, বম্বের একটি নামকরা হোটেলের একটি ঘর নিয়েছিলেন। সতীশ সেখানে মিলিত হওয়ায় প্রেম কাহিনী বেশ জমে উঠেছিল। সকলের মোটামুটি ধারণা হয়ে গিয়েছিল এবার ওরা বিয়ে করবেন। বিয়ে, সে অনেকদূরের কথা। শোনা যায় বিয়ে না করেও ওরা বিবাহিত জীবনযাপন করছিলেন। সতীশ মাঝে মাঝে আউটডোর শুটিং উপলক্ষে বাইরে চলে গেলে অলকা একাই থাকত। সেটা সতীশ বিশ্বাস করলেও অলকার ঘনিষ্ঠরা বিশ্বাস করতে চান না। পরে পরিষ্কার হয়েছে সতীশের কাছে। সে এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। অলকা উধাও। হোটেলের একটা মোটা অংকের বিল কে দেবে? হোটেল কর্তৃপক্ষ সতীশকে ছাড়ছেন না। সমস্ত টাকা চুকিয়ে না দিলে সতীশ হোটেল ত্যাগ করতে পারছেন না। শুটিং ক্যান্সেলের পর ক্যান্সেল হচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে সতীশ কাউল নিজেই ক্যান্সেল হয়ে যাবেন। এই অভাবনীয় কাণ্ড নিয়ে বম্বেতে এখন অনেক আলোচনা অনেক তর্কবিতর্ক। দোষী কে? নির্দোষ কে? কেউ স্থির বিশ্বাসে বলতে পারছেন না, নাকি চাইছেন না?

—অভিজিৎ

দূসরী সীতা : সিমী

ভাড়াটে বাড়ী।
কবিতা ও নবাগত জনৈক শিল্পী

রঞ্জনী আলোয়

ভারত-সীমান্তের সেই শহরে আমরা আছি ক্যাম্পে থাকি শুধু রাতটা আর দিনের বেলাটা কাটে নদীতে। যাতায়াতের পথে শহরের দেয়ালে হঠাৎ একদিন সবার চোখে পড়ল কিছু ছাপানো পোস্টার অবাক বিস্ময়ে আমরা পড়লাম তাতে লেখা বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান। অমুক দিন অমুক মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। গান গাইবেন শ্যামল মিত্র মাধবী মুখার্জি অনুপকুমার তরুণকুমার জ্ঞানেশ মুখার্জি প্রভৃতি শিল্পী। তারপর টিকিটের মূল্য লেখা।

অনুপকুমারের চক্ষুস্থির। —আমি গান গাইব। সে কি ভাই! জ্ঞানেশ মুখার্জিরও তথৈবচ অবস্থা। জীবনে কখনও কোথাও গান গাইনি হঠাৎ এখানে ফাংশনে গান গাইব তার মানে? এ নিশ্চয় কিছু বদলোকের কাজ।

কিন্তু এসব পোস্টার দিল কারা? কি তাদের উদ্দেশ্য? লণ্ড-ঘাটায় প্রশ্ন করতে একজন সবিনয়ে জানাল—আপনারা সেদিন গান গাইবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তাই পাড়ার ছেলেরা একটা ফাংশন করবে বলে স্থির করেছে—

শ্যামল মিত্র সব শুনে মহা বিরক্ত।—এ কি ধরণের অসভ্যতা এ্যা? আমি বলেছিলাম একটা ঘরোয়া আসরে কিছু গান গেয়ে শোনাব। কখনও বলিনি ফাংশনে গান গাইব। তারপর অনুপ জ্ঞানেশ আর তরুণ—এরা গান গাইবে দেখলাম হোয়াট ইজ দিস?

জ্ঞানেশ মুখার্জি তো হেসেই অস্থির। আমায় বললে—ঠিক আছে আমায় যদি গান গাইতে একান্তই পীড়াপীড়ি করে তো তোমরা প্লে-ব্যাক মেসিন চালু করবে আমি ডায়াসে উঠে শুধু শ্যামলের গানের সঙ্গে লিপ মিলিয়ে যাব—

অনুপকুমার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্থন করে বলল—আমি সম্পূর্ণ একমত। এ ছবিতে হেমন্তবাবুর যে গানের সঙ্গে আমি লিপ মেলাচ্ছি সেই গানটাই তাহলে গাইব। তবে প্লে-ব্যাক সিস্টেমে সে-সব ব্যবস্থা যেন থাকে রঞ্জন।

ভাবখানা যেন আমিই এই ফাংশনের ব্যবস্থা করছি। সারাদিন শুটিং করে সেদিন ক্যাম্পে ফিরে দেখি মাধবী খুব হাসছেন। কি ব্যাপার?

প্রোডাকশন ম্যানেজার শান্তিবাবু বললে আর বলবেন না কারা যেন দেয়ালে পোস্টার দিয়েছে মাধবী দেবী এখানকার কোন একটা ফাংশনে নাকি গান গাইছেন। সেটা পড়ে উনি তো তো হেসেই অস্থির।

মাধবী আমায় বললেন পড়েছেন পোস্টার? আমি তো অবাক। আমি গান গাইব কেন বুঝতে পারলাম না।

তরুণকুমার অর্থাৎ বুড়োদা একমাত্র মানুষ গম্ভীর কণ্ঠে বলল—তা এ নিয়ে এত চিন্তা কি? গেয়ে দিলেই হবে একখানা মালকোষ।

অনুপকুমার সহাস্যে জানতে চাইল—বুড়ো বুঝি আজকাল ক্ল্যাসিকাল চর্চা করছো—

—হ্যাঁ করছি। গানের আর্টিস্টদের অনেক বেশী খাতির টাকাও ভাল মতন পাওয়া যায়। তাই ইদানিং ক্ল্যাসিকাল নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছি। শুনে আবার জেলাস হয়ে পড়ো না যেন।

আগে অনুপকুমারের সঙ্গে আমার প্রায়ই বচসা হতো—কেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিস্টদের সাক্ষাৎ কোন যোগাযোগ থাকবে না?

শুনে অনুপকুমার শুধু মুচকি হাসত বড় জবাব দিত না। পাবলিকের সঙ্গে যোগসূত্র না থাকলে শিল্পীরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—এটাই ছিল আমার তখনকার ধ্যান-ধারণা।

এ-সম্পর্কে বেশী খোঁচাখুঁচি করলে অনুপকুমার হয়ত বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেছে—তুমি পাবলিক বলতে কি বোঝো?

আমি অনুপকুমারের প্রশ্নে হতবাক হয়েছি। —তার মানে? পাবলিক ইজ পাবলিক। মানে দর্শক। যারা টাকের নগদ পয়সা খরচ করে তোমাদের ছবি দেখে তারাই পাবলিক—

—অ। তা দর্শকদের সঙ্গে আমার তো সব সময়ই যোগাযোগ রয়েছে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি নেই—

—আঃ আমি সে কথা বলছি না ঝগড়া-ঝাঁটি হতে যাবে কোন দুঃখে আমি বলছি আর্টিস্টস রিলেশানশিপ উইথ দি পাবলিক—

—আমিও তো সেই কথাই বলছি... রয়েছে। খুব ভালভাবে রয়েছে।

—কি করে থাকবে? যাতায়াত করো গাড়িতে করে। যেতে যদি ট্রামে-বাসে আমাদের মত বাদুড়ঝোলা হয়ে তাহলে পাঁচজনের সঙ্গে ধকলতাধকলস্তি হতো রিলেশানটা থাকত লোকে একজন আর্টিস্টের কাছ থেকে কি চায় আর না চায় সহজেই বুঝতে পারতে—

অনুপকুমার হেসে আমায় বলেছে তোমাকে একদিন বুঝিয়ে দেব রঞ্জন চিন্তা করার কিছু নেই।

এখানে প্রতিদিন লোকেশানে যাতায়াতের ফাঁকে আমাদের পাবলিকের সঙ্গে যেটুকু রিলেশান হয় তাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত এক একদিন গাড়িতে অনুপকুমার থাকলে শ্লেষের হাসি হেসে জানতে চেয়েছে—কি রকম বুঝছো রঞ্জন? এই রকম রিলেশান হলে চলবে?

রিলেশানগুলো কি রকম ভাবুন ধাঁই করে একখানা ডাবের খোলা এসে পড়ল চলন্ত গাড়িতে। মেক-আপম্যান কুনো হালদার ধরাশায়ী। এটু ব্রেক কষেছে গাড়ী দু চাট্টে অশ্লীল মন্তব্য হঠাৎ কানে এসে বাজল। রাস্তায় প্রতিদিনই ব্যারিকেড। গাড়ি থামিয়ে নেমে গরুর গাড়ি ঠেলে রাস্তা পরিষ্কার করে তবে যাতায়াত করতে হয়েছে। উহু এ-রকম রিলেশানের কথা আমি কখনও ভাবিনি।

—তাহলে কি ভেবেছো? কপালে চন্দনের ফোঁটা আর গলায় ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করে যে রিলেশান—সেটার কথা বলছ? অনুপদার সহাস্য প্রশ্ন —রঞ্জন তোমার চাইতে বয়সে আমি বড় আমি সেই ছোটবেলা থেকে পাবলিক স্টেজে অভিনয় করছি আমি যত পাবলিক চিনি আর পাবলিক আমায় যত চেনে বাংলাদেশে বোধ হয় তেমন আর কাউকে চেনে না। আজ আমার না হয় গাড়ি হয়েছে কিন্তু জীবনে অনেকগুলো বছর আমি ট্রামে-বাসে ঝুলে স্টেজ করেছি সিনেমা করেছি পাবলিক আর আমায় চিনিও না। আমি ওটা হাড়ে হাড়ে চিনি—

হয়ত বা তাই।

একটা ঘটনা আমার স্মরণে আছে পশ্চিমবাংলা বিহার সীমান্তে একটা পাহাড়ী জায়গায় আমরা শুটিং করছি। কি একটা

যেন কারণে সেখানে একদিন বিশ্রাম পাওয়া গেল। আমরা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম একদল, সিউড়ী শহরের পথে। অনুপকুমার দিলীপ রায় মাধবী পদ্মা দেবী আর হারাধন বাড়ুজ্যে। সকলে তখন দশটা হবে। আমরা টাউনে ঢুকে সকলের অলক্ষ্যে কেনাকাটা করছি। অনুপদা মাধবী আর পদ্মাদিকে নিয়ে গেছে একটা ওষুধের দোকানে ওঁরা কি যেন একটা দরকারী ওষুধ কিনবেন এই ফাঁকে আমি আর দিলীপ গেলাম সিগারেট কিনতে। গাড়ীগুলো রয়ে গেল শহরের একটা পেট্রল পাম্পে।

যাবার আগে হারাধনদাকে বললাম—কি মশায় আপনি কি করবেন?

হারাধনদা মাথার ওপর দু হাত তুলে একটা হতাশ ভঙ্গী করে বললেন—নাঃ আমি বরং এখানে থাকি তোমরা ঘুরে এসো।

আমি আর দিলীপ গল্প করতে করতে চলে এলাম বাজারের কাছে। পাইকারী দামে কার্টুন ধরে সিগারেট কিনতে হবে আমাদের। কোথায় পাওয়া যাবে?

দিলীপ বলল—যে কোনও পানের দোকানে জিগ্যেস করলেই ওরা বলে দেবে।

তাই বটে। গেলাম একটা পানের দোকানে। রাস্তা তখন জনপ্লাবিত। লোকে রীতিমত বাজার-হাট নিয়ে ব্যস্ত। দিলীপ পানের দোকানের আয়নায় নিজের উস্কো-খুস্কো অবস্থা দেখে বিপন্ন বোধ করে আমায় বললে—চিরুনি হবে তোর কাছে?

দিলাম। দিলীপ বেশ মোলায়েম করে নিজের চুল আঁচড়ে নিতে লাগল। সেই ফাঁকে আমি একটা পান খেয়ে আমার জিজ্ঞাসাবাদ সেরে নিতে থাকলাম।

পানের দোকানের পাশে একদল ছেলে আড্ডা দিচ্ছিল। তারা আমাদের দিকে খেয়াল করেনি। আমাকে করার তো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু দিলীপ বেশ পপুলার ফিল্ম আর্টিস্ট আমার ভয় হচ্ছিল ওকে যদি চিনে ফেলে তো আজ কপালে আমাদের দুখু আছে।

এমন সময় দুটি ছেলে সাইকেল চালিয়ে এসে পানের দোকানের সামনে নামল। তাদেরই একজন আবার পকেট থেকে চিরুনি বের করে এলো চুল ফিরিয়ে নিতে। দিলীপ তখনও আঁচড়ে যাচ্ছে।

ছেলেটি চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে দিলীপকে এক নজর দেখে নিয়ে সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে খাটোগলায় বললে—ল্যাকে দেখতে মাইরি একদম দিলীপ রায়ের মত—

সঙ্গী ছেলেটি চাঁকতে ঘাড় ফিরিয়ে দিলীপকে এক নজর দেখে নিল। তারপর হেসে বলল—ঠিক বলেছিস একেবারে দিলীপ রায় আশ্চর্য মিল আছে কিন্তু—

শুনে দিলীপের অবস্থা শোচনীয়। আর আমি মনে মনে প্রমাদ গুনতে আরম্ভ করেছি।

এবার প্রথম ছেলেটি গলা খাঁকারি দিয়ে দিলীপকে উদ্দেশ্য করে বলল—দাদা যেন একেবারে বসানো দিলীপ—

দিলীপ আর কি বলবে শুধু হেঁ হেঁ করে দেঁতো হাসি হেসে কোন গতিকে সরে পড়বার ধান্দা।

এই সময় পাশের সেই দঙ্গলটি এসে পড়ল। তারাও অবাক। —আরে এ-যে মাইরি দিলীপ রায়—

দিলীপ খেঁকিয়ে উঠে বলল—কোন শালা বলছে আমি দিলীপ রায় আমি দিলীপ না আমি ইয়ে—

আর না বললে কি ওরা শোনে পেছনে আঁঠার মত সেঁটে গেল ওরা। আমরা ততক্ষণে দ্রুত পা চালাতে আরম্ভ করেছি পেট্রোল পাম্পের দিকে। ছেলেগুলো হো-হো হি-হি করতে করতে আমাদের পেছনে পেছনে চলেছে হঠাৎ বাজারের দিকে হৈ-চৈ শোনা গেল। দেখি অনুপদা ফুলফোর্সে পা চালিয়ে আসছে পেছনে এক দঙ্গল মানুষ। অনুপদা যেন এই মাত্তর পাঁচন গিলেছে তবে মুখভঙ্গীটা খানিকটা সেইরকম।

এদিকে দিলীপকে ওরা কষে ল্যাংগুয়েজ দিচ্ছে। আমাকে যা-তা বলছে। আমরা যত বলি এবার ক্ষ্যামা দাও দাদা কিন্তু কে কার কথা শোনে!

অনুপদা কাছে এসে বললে কেলেঙ্কারী সেই তখন থেকে পিছনে লেগে রয়েছে বলে পলাতকের গান শোনাতে হবে যাচ্ছেতাই কান্ড।

পেট্রোল পাম্পে এসে হারাধন বাড়ুজ্যের দেখা পাওয়া গেল না। উঃ তিনি আবার কোথায় গেলেন। অনুপদা একজন ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিল—ওমুক ওষুধের দোকানের মধ্যে মাধবী আর পদ্মাদি গা ঢাকা দিয়ে আছে কায়দা করে গাড়ী নিয়ে গিয়ে এখন তাদের উদ্ধার করে আনো গে যাও—

আমাদের স্টুডিও লাইনের ড্রাইভার নাম বুড়ো বললে—তাহলে স্যার আমি এদিকে আসব না ওনাদের নিয়ে সোজা লোকেশানে চলে যাব—

বলে বুড়ো ফুলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। কয়েকজন পিছনে দৌড়ে ছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তারা ফিরে এল।

আমরা যাব এই গাড়িটায় কিন্তু হারাধনদা না এলে কি করে যাই? তিনি আবার কোথায়— এই সব বলতে না বলতে দেখি উল্টো দিকের রাস্তা ধরে হারাধনদা অলিম্পিক স্টাইলে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। তাঁর পেছনেও একদল মানুষ। তারাও ছুটছে।

গাড়ী স্টার্ট দেওয়া হল হারাধনদা আসতেই তাঁকে ঝট করে তুলে নিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে দে-দৌড়। মাইল তিনেক অগ্রসর হতে বুড়োর গাড়ি পাওয়া গেল নাঃ মাধবী আর পদ্মাদি নিরাপদেই আছেন। হারাধনদা বলল আমি ভাই প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ একদল ছোকরা আমার পেছনে এমন লাগল যে কি বলব ছ্যাঃ—

অনুপদার প্রশ্ন—তোকে কেউ চিমটি কাটেনি তো হারাধন?

হারাধনদা খুব রসিক প্রকৃতির মানুষ। বললেন—কেটেছে বৈকি তবে তোদের যেমন হুলোরা কেটেছে আমার ক্ষেত্রে কিন্তু পরীরা।

নদীতে রোজ শুটিং হচ্ছে। অবশ্য বেশ নির্বিঘ্নেই। লোকাল মস্তানরা কথা দিয়েছে কেউ বেগড়বাই করলে তার লাশ নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ওই সাংঘাতিক পোস্টারটা? ওটার কি হবে?

শ্যামল মিত্তির সেদিন একজনকে ডেকে বলে দিলেন—বাপু ফাংশন করতে কিন্তু পারব না এমনি গান শুনতে চেয়েছো হয়ের আগে একদিন শুনিয়ে দিতে পারি। আর তাছাড়া এত কাজ এখনও আমাদের হাতে রয়েছে যে হয়ত এই লোকেশানে আমাদের আরও একবার আসতে হতে পারে। তাই এবার যদি নাও শোনাতে পারি পরেরবার এসে নিশ্চয়ই শুনিয়ে দেব—

ব্যস অমনি মুখ ব্যাজার ওদের।

শশব্যস্তে অনুপকুমার বললে ঠিক আছে ঠিক আছে এবারই শুনবে—

কিন্তু বিধি বাম।

পরদিন থেকে শুরু হল মেঘলা আকাশ।

ফলে শুটিং-এর দফা গয়া। মাঝে মাঝে যদি বা রোদ্দুর বেরোয় তার স্থায়িত্ব অল্প সময়ের। আমাদের সাজগোজের পালা মিটতে না মিটতেই রোদ পালিয়ে যায়। ফলে আবার হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।

এইভাবে পর পর তিন দিন কাটল।

তৃতীয় দিন রাত্রে আমরা কনফারেন্সে বসলাম—নাঃ এভাবে লোকেশানে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না টাকার শ্রাদ্ধ তার চেয়ে আপাততঃ কলকাতায় ফিরে যাওয়া হোক এই লোকেশানে আর একবার তো আসবারই কথা তখন এসে সব কাজটা তুলে নেবার চেষ্টা করলেই হবে।

শ্যামল মিত্তির তোমরা যা ভাল বোঝো করো বলে গাড়ি হাঁকিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। প্রোডাকশন ম্যানেজারকে বলে গেলেন কালই লোকেশান প্যাক-আপ দেনা-পাওনা মিটিয়ে সবাইকে নিয়ে চলে এসো।

তখন স্থির হলো সকালে ব্রেকফাস্ট করে কলকাতায় ফেরা হবে। প্রোডাকশন ম্যানেজার টাকা নিয়ে বাজারে গেলেন এ-কদিনের দেনা-পাওনা মেটাতে আর আমরা বসলাম আড্ডায়।

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

দি চিট

প্রযোজনা মোনাসিলা ফিল্মস
দুর্বল ও গতানুগতিক
কাহিনীর আঙ্গিকসমৃদ্ধ
চলচ্চিত্ররূপ !

স্বপ্ন সৌধ নির্মাণ এবং মিষ্টি কথায় লোককে ঠকিয়ে অর্থ রোজগার করে কায়ক্লেশে দিন কাটছিল শঙ্করের। জীবনে একদিন লক্ষ টাকা রোজগার করে শঙ্কর তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারবে।

আচমকা এক ধনী বিধবা উর্মিলা দেবীর দুই আত্মীয় (মামা ও ভাগ্নে) ওঁর কাছে এল। ওঁদের বক্তব্য যে বিধবার একমাত্র পুত্র অল্প বয়সেই মার সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় দেশত্যাগ করেছে। এখন ওঁরা শঙ্করকে রণজিৎ (পুত্র) সাজিয়ে উর্মিলা দেবীর কাছে উপস্থিত করে, তাঁর স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি লিখিয়ে নেবে রণজিতের নামে। আর এই কাজের জন্যে ওঁর পারিশ্রমিক দিয়ে বাকী সবটাই গ্রাস করবে দুই কুচক্রী (মামা ও ভাগ্নে)। অনেক দিন অদর্শনের পর রণজিতকে দেখে অর্থাৎ শঙ্করকে নিজের ছেলে মনে করে, আদর যত্নের বন্যা বয়ে গেল। সময় মতো উইল করা হোল নতুনভাবে, সবকিছুই রণজিতের নামে লিখে দেওয়া হোল। কিন্তু শঙ্কর 'ঠগ' হয়েও এভাবে এক বিধবাকে ঠকিয়ে তার অর্থ কুচক্রীদের হাতে তুলে দিতে রাজী হোল না। যাঁর প্রাপ্য তাঁকেই সে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে, কুচক্রীদের অন্যভাবে 'চিট' করে অর্থাৎ ঠকিয়ে দিল। গতানুগতিক ও দুর্বল কাহিনী, প্রেম প্রণয়, নাচ-গান, খল নায়ক মোহময়ী রমণী সব কিছুই একাধিকবার এ ধরনের ছবিতে পরিবেশিত হওয়ায় পরিচালক সুদেশ ইশারের করবার বিশেষ কিছু ছিল না। বরং উনি দুর্বল কাহিনীকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে নতুন কিছু দর্শকদের সামনে উপস্থিত করতে পারতেন।

অভিনয়ে অর্থাৎ নাম ভূমিকায় বিনোদ খান্না এবং প্রণয়ীর বালিকাসুলভ মুহূর্তে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়কে ভালো লাগবে। মোহময়ী রমণীর ভূমিকায় 'ফরিয়াল' একাই একশো, সেখানে বিন্দুর খুব বিশেষ একটা প্রয়োজন নেই। অন্যান্য ভূমিকায়—নিরুপা রায়, আনোয়ার হোসেন, রণজিৎ জানকী দাসের অভিনয় যথাযথ। কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের, বিশেষ করে আলোকচিত্র গ্রহণে কাকা ঠাকুর ও বসন্ত ব্রোকারের সম্পদনা উল্লেখ্য। সংগীত রচনায় লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলালের কাজ প্রশংসনীয়।

চিত্রদূত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

কিছুক্ষণ

সৌমিত্র চ্যাটার্জির মুখে গোঁফ। স্বপ্ন দেখছি নাকি? বেলা তখন তিনটে। বাইরে ঠা ঠা রোদ্দুর। তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে উপরে এসে তখনও হাঁপাচ্ছি প্রায়, কপালে কয়েক ফোঁটা ঘামও জমে গেছে। স্বপ্ন দেখার পরিবেশ বিলকুল নয় তাহলে!

বেশ মোটা গোঁফটা সৌমিত্র চ্যাটার্জির নাকের তলায় আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে থমকে যেতে দেখে সৌমিত্রবাবুই বললেন—কি ব্যাপার?

কি বলব কি বলব ভাবতে ভাবতেই বললাম—ব্যাপার ট্যাপার পরে হবে খন। আপনি গোঁফ রাখছেন কেন? আগে সেটা বলুন। তরুণবাবুর 'সংসার সীমান্তে' ছবির জন্য নাকি! হেসে উঠলেন সৌমিত্র ঠিক অপুর মত বা 'চারুলতা'র অমলের মতও বলতে পারেন।

'না এমনিই। আপাতত। দু চারটে দিন বিশ্রাম নিচ্ছি। কাজ নেই, তাই গোঁফ। বলেই আবার একই রকম হাসির পুনরাবৃত্তি ঘটল। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন দীপা চ্যাটার্জি মানে সৌমিত্রবাবুর বেটার হাফ, মানে আমাদের বৌদি আর কি! জানেন তো, হাসি সংক্রামক ব্যাধি। স্বামীর হাসি তাই ছড়িয়ে পড়ল স্ত্রীর মুখে। আর আমার কথাতো বলাই বাহুল্য।

এতক্ষণে আমি হাতের খাতাপত্তর টেবিলে রেখে বসে পড়েছি সোফায়। স্তূপীকৃত বইয়ের আড়ালে পড়ার টেবিলটায় বসে আছেন সৌমিত্রবাবু। এ ড্রয়ার ও ড্রয়ার টেনে কি যেন খুঁজছেন। পাশে বসা দীপা বৌদি বলে উঠলেন—কি ব্যাপার। তুমি কেন হঠাৎ? লেখাটেখার কোনো মতলব আছে বুঝি। উত্তর আমি কিছু দিইনি। সৌমিত্রবাবুই চেয়ার থেকে বললেন 'বিনা কারণে কি আর নির্মল আসে?'

যতই আমি ওঁদের দুজনকে বোঝাতে চাই না কোনো লেখার জন্য নয়, এমনিই এলুম। বিনা কারণে কি আসতে নেই'—কিন্তু কে কার কথা শোনে? গোঁফের পর্ব চুকে গিয়ে শুরু হোল আমার আসার কারণ নিয়ে গবেষণা।

বেশীক্ষণ নয় অবশ্য একটু বাদেই উঠে গেলেন দীপা বৌদি। সৌমিত্রবাবুও ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে আমার সামনের সোফায়। পরনে খাদির পাঞ্জাবী আর বিরাট বিরাট ছাপা মাচাজো লুঙ্গি। একটু রিল্যাকসিং মুডে বসে ক্যাপস্টেন ট্যোবাকো দিয়ে পাইপটা ধরিয়ে তাতে আগুন দেবার আগে বললেন—সত্যি বলতো কি ব্যাপার?

বুঝলাম এখনও মাথা থেকে আমার আসার কারণটা যায় নি। কি উত্তর দেব? ভাবছি। এমন সময় এক গ্লাস লেবুর সরবৎ এসে গেল। বুঝলাম আমারই জন্য পাঠিয়েছেন দীপা বৌদি। যতবারই এসেছি এই ব্যাপারটা আমার আশ্চর্য লেগেছে। জিজ্ঞাসপত্র কিছু না করেই কখন যে উনি উঠে গিয়ে এই সরবৎটি পাঠিয়ে দেন বুঝতে পারি না।

ওর প্রশ্নটাকে বেমালুম ভুলে গিয়ে আমিই বললাম—ছবি টবি খুব কম করছেন মনে হচ্ছে। কি হোল?

জবাব দেবার আগে একটু হাসলেন। একটু গর্বের হাসি যেন। 'এইতো' সংসার সীমান্তে শেষ করলুম। সতের তারিখ থেকে আবার খোকাবাবুর (দীনেন গুপ্ত) কাজ শুরু করছি। 'নিশি মৃগয়া'। সুচিত্রা সেন হিরোইন। অজয় করের ছবিও আসছে মাসে শুরু হবে বোধ হয়।'

—তা এত অল্প কেন?

পাইপে দু-চারটে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। 'কোনদিনইতো আমি ভাই, বছরে তিন চার খানার বেশী ছবি করি না। কথাটা আংশিক অসত্য। একটা সময় গেছে যখন তিনি পাঁচ ছ খানা ছবিও করেছেন। সম্ভবতঃ আর্থিক স্টেবিলিটির জন্য। তাছাড়া বন্ধু বান্ধবের ব্যাপার তো থাকেই। আমি একথা বলতেই তিনি বলে উঠলেন—'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নানা ধরণের অবলিগেশনের কথাতো জানো, করতেই হয়। তবে এখন আর করব না। বছরে দু তিন খানা ভালো চরিত্র পেলেই চলবে। ব্যস্।

কথা বলতে বলতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে কপালে। উঠে দাঁড়িয়ে পাখাটাকে ফুল স্পিডে চালিয়ে দিলেন তিনি। এ ঘরে বসে তবুও কথা বলতে পারছি, বেডরুমে বসাই যায় না। কি ভয়ানক গরম। তাও তো দেখছো এখনও গরম পড়েই নি।' বলে ঘাম মুছলেন কপালের। বাধ্য হয়ে এয়ারকুলার বসাতে হয়েছে শোবার ঘরে। বললাম ফ্ল্যাট বদলান তাহলে। উনি মৃদু হাসলেন। বললেন—'এর চাইতে কত কষ্টে লোক রয়েছে। আর আরাম দরকার নেই।

শুনেছিলাম মধ্য কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কিনছেন তিনি। 'ওখানেই চলে যান না কেন—বলতেই তিনি বললেন —ওটাতো আমার ভবিষ্যতের ভরসা। এইতো ফিল্ম লাইনের অবস্থা দেখছো। ভবিষ্যতের জন্য ওটা রইলো। ভাড়া দিলেও কিছু পয়সাতো পাবো। না খেয়ে মরবো না অন্তত।'

'কি যে বলেন'—হাসি পেল কথাটা শুনে। যদিও জানি কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। এতদিন ধরে যা রোজগার করেছেন খরচে কার্পন্য করেন নি। দীপা বৌদির হাততো আরও দরাজ। পড়ার ঘরটায় বসলে বোঝা যায়—শুধু বই কিনে কতটাকা খরচ করেছেন। বেশীর ভাগই বিদেশী বই। সিনেমা থিয়েটার সাহিত্য শিল্পকলা সব রকমের বই-এ ঠাসা ঘরখানা রাত্রিবেলা খাবার রাখবার সময় দীপাবৌদি ঠিকই বলেছিলেন 'বই দিয়ে ঘরখানা যে-রকম করে রেখেছো কোথায় কি রাখি বলতো।

সন্ধে কখন নেমে এসেছে বুঝতে পারিনি; বাইরে জানলা দিয়ে তাকাতে অন্ধকার এসে লাগল চোখে। ইতিমধ্যে সৌমিত্রবাবুর প্রিয়বন্ধু ন্যাপাদা এসে গেছেন। আড্ডাটা জমেছে মন্দ না। ছোট মেয়ে কবিতা আবৃত্তি করে গেল কিছুক্ষণ। লন্ডনের ওল্ডভিক রয়েল শেক্সপীয়র কোম্পানী দলের নাটক পল স্কফিল্ডের অভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা বললেন সৌমিত্রবাবু। থিয়েটার ফর্ম আর টেকনিকের মার-প্যাচ সিনেমার সত্যজিৎ-মৃণালের কাজকর্ম আর ন্যাপাদার উৎসাহে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির শোকাবহ অবস্থার আলোচনা চলতে চলতে দু-এক রাউন্ড চা আর ঘড়ির কাঁটা কত রাউন্ড যে ঘুরে গেছে টের পাইনি।

দীপা বৌদিও আলোচনায় ওয়ান অফ দি পার্টিসিপ্যান্টস্। কথায় কথায় তিনিই বললেন—তোমার কবিতার বইটি দেখিয়েছো নির্মলকে? দেখলাম বইটা। নাম : জল-প্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে। দীপা-বৌদিকেই উৎসর্গ করেছেন বইখানা। উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। চোখ বোলানো আর কি। কবি হিসাবে সৌমিত্র চ্যাটার্জির আলাদা পরিচয় দেবার বুঝি দরকার নেই। বহু পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে তাঁর অনুভূতির কিছু লাইন। বইখানা আমার দেখার আগ্রহ দেখে তিনি বললেন—'আমার কাছে এখন একটা কপি নেই পরে তোমায় দেবোখন।

শুধু এই বই নয় খুব শিগগির রাজ-কুমার নাটকটাও বই আকারে বেরোচ্ছে। ইতিমধ্যে এই বিশ্রামের সময়টুকুতে নতুন দুখানা নাটক লিখে ফেলেছেন তিনি। একটার পান্ডুলিপি তো আমার সামনেই পড়ে আছে দেখলাম। নাম : প্রতিধ্বনি। দু-চার পাতা উল্টে দেখেছি। সৌমিত্রবাবু তাই-না দেখে বললেন—'উঁহু। রান্না কমপ্লিট না হলে খাওয়া চলবে না। এখন তো তরকারী দেখতে দেবো না। নাটকটা স্টেজ হচ্ছে তখন দেখবে।' শুনলাম বৌদিদের নাটকে দল প্রতিকৃতিই' নাকি এটাকে স্টেজ করছে। 'বরং একদিন রিহার্সালে এসো। নাটক পড়াও হবে দেখাও হবে—বললেন তিনি। আলোচনা চলছে তখনও।

ছেলে এসে 'বাপী আমি শুতে যাচ্ছি' যখন বলে গেল তখন আমরা চৈতন্যদেবকে নিয়ে পড়ছি। সৌমিত্রবাবুর মতে সর্বকালের সেরা চরিত্র নাকি চৈতন্যদেব। 'কেন?' প্রশ্ন করতে উনি অধ্যাপকের ভঙ্গিতে তাঁর লাইন নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। একটা দেশের সমাজ আর সংস্কৃতিকে এমন করে নাড়া দিয়েছেন তিনি ভাবতে পারেন না। 'রবীন্দ্র-নাথ সাহিত্য নিয়ে অনেককিছু করেছেন মানছি, কিন্তু সমাজটাকে এমনি করে নাড়াতে পেরেছেন কি? পারেননি।' বলে থামলেন না। চৈতন্যদেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।

তবে তাঁর একটা মত আমার কাছে আশ্চর্য লাগল। তিনি বললেন—চৈতন্যের যেসব ছবি বাজারে দেখা যায় সেগুলো তাঁর মনের মতো নয়। কারণ যে লোক সারা বাংলাদেশটা পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন তাঁর চেহারাটা অমন কোমল হবে কেন। বেশ পুরুষালি চেহারা হবে। অন্ততঃপক্ষে ছফুট লম্বা হবে চেহারা। তাই না?

চৈতন্যপর্ব ছেড়ে তখন অন্য টপিকসে যাবার তোড়জোড় চলছে। রাত সাড়ে দশটা। গা তুলতে হয়। তাই বিদায় নিয়ে বেরোবার সময় সৌমিত্রবাবু দরজা খুলে দিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন বললেন—'সাবধানে নেমো সিঁড়িটা অন্ধকার।

সর্বশেষ সংবাদ : আমাদের ফটোগ্রাফার সুকুমার রায় গিয়ে দেখেন পুরস্টু গোফটার গলগাপ্রাপ্তি ঘটে গেছে।

নির্মল ধর

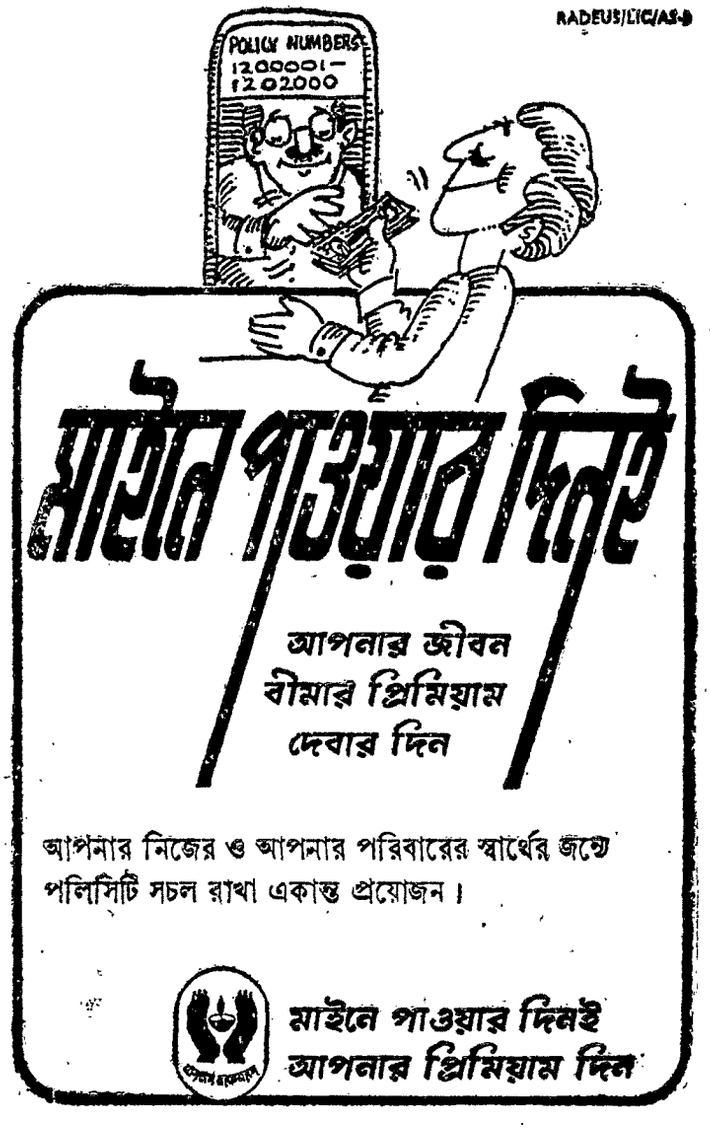

নাটমঞ্চ

চারনিকের 'রেল ধর্মঘটের নেপথ্যে'

এ নাটকের পটভূমি সাম্প্রতিক রেল ধর্মঘট। যে ধর্মঘটকে সে সময় কেন্দ্র করে একদিকে রেলকর্মচারীরা তাঁদের দাবী পূরণ করার স্বপ্ন দেখেছিল অন্য দিকে যার, এই ধর্মঘট সংগঠন করেছিলেন সেই সব নেতাদের বিভ্রান্তিকর (?) নীতি নাটকের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁদের জন্যই রেল ধর্মঘট বানচাল হয় এবং ধর্মঘটীরা পরাজয়ের সম্মুখীন হন) ও আর একদিকে সরকারী মনোভাব বা বলা যায় নাটকের ভাষায় অনমনীয় কঠোরতা—ধর্মঘটের এই তিনদিক বাস্তব এবং রূপক — পাশাপাশি এই দুই রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এতে ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রস্তাবনা বা প্রস্তুতি পরে, ধর্মঘটে ঝাঁপিয়ে পড়া সরকারী কঠোরতা ইউনিয়ন নেতাদের প্রথমে পৃষ্ঠপোষকতা পরে নেপথ্যে নিজেদের মধ্যে মতভেদ, পরে ক্রমে ক্রমে ধর্মঘটীদের কাছ থেকে সরে গিয়ে যার যার দলের অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টায় মূল লক্ষ্য এবং শর্ত থেকে গোপনে সরে আসা এবং শাসকগোষ্ঠীর কাছে প্রকারান্তরে আত্মসমর্পণ করে ধর্মঘটকে দুর্বল করে দেওয়া সেই সঙ্গে অন্যদিকে শাসক শ্রেণীর কাল্পনিক বৈঠক মন্তব্য ইত্যাদি দেখানো হয়েছে।

নাটকের বক্তব্য যাই হোক না কেন, এর উপস্থাপনা পরিকল্পনা (একই স্টেজে প্রায় মঞ্চের মত করে দু-পাশে এবং পেছনে স্টেজ করে পর পর আলোক পাতের সাহায্যে প্রায় একই সময়ে একটি দৃশ্য শেষ হবার পর (কখনও টুকরো টুকরো ভাবে) অন্য দৃশ্যে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়) এবং দীর্ঘ সময়ের নাটক দ্বারা দর্শককে টেনে রাখা বড় কম কথা নয়।

তবে একটা ব্যাপার নৈরাশ্যজনক মনে হয়েছে। সেটা হোল একই গন্ডীর মধ্যে ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের চলাফেরা বাক্যালাপ নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণার অবকাশ স্বল্প ভুলবোঝাবুঝি ইত্যাদি। এই দৃশ্যগুলি আরো কিছু সীমিত ও গঠনমূলক, ক্ষেত্র-বিশেষে প্রতিকীতে চিহ্নিত করা যেত বলে মনে হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, একদম প্রথম দিকে একটি ছোট এবং ভীরু প্রেমের দৃশ্যে অজয়ের (প্রভাত শিকদার) অপ্রস্তুত অভিনয়টুকু বড় ভাল লেগেছে। যদিও দৃশ্যটি অনুল্লেখ্য এবং খুবই তুচ্ছ। ঐ দৃশ্যটির মাধ্যমে যেন নিম্নমধ্যবিত্ত একটি যুবকের ভীরু স্বপ্ন এবং তার অসহায়তা ফুটে উঠেছে।

আর বিস্মিত করেছে মন্দিরা দেবীর (ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য) মেক আপ বাচনভঙ্গী, ম্যানারিজম (?) 'সহ গতিবিধি, বসার ধরন' ইত্যাদি।

এছাড়া ইউনিয়নের নেতাদের ভূমিকায় ভাল লেগেছে অনুপ ব্যানার্জি, ননীগোপাল দে তপন পাল রবি বোস নীতিন চন্দ ইত্যাদি ভূমিকা নেতাদের।

অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী ইত্যাদি পর্যায়ের ভূমিকায় অলোক দত্ত, অরুণ চক্রবর্তী প্রবুদ্ধ ব্যানার্জি (মিঃ তপেন নাগচৌধুরী শংকর দা) সতীশ কর্মকার দেবকী বোস আর অমর মল্লিক সুন্দর। পুলিশ অফিসাররূপী প্রশান্ত চক্রবর্তী (নাট্যকার পরিচালক ও সরকার) কোন কোন দৃশ্যে মর্যাদার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তবে অভিব্যক্তি প্রকাশের দু-একটি দৃশ্য যথোচিত গুরুত্ব আরোপিত হয়নি অভিনীত চরিত্রটিতে। যেটা ঐ চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে প্রায় অপরিহার্য।

পুলক রায়ের সত্যেশ্বর আগাগোড়াই সুন্দর এবং সাবলীল।

অন্যান্য চরিত্রে রথীন গাঁইন বাসু দত্ত সুকুমার কর্মকার প্রভাস ক্ষেত্রী রথীন্দ্র নাগ চৌধুরী, রথীন সিকদার, শেখর সেন, অঞ্জন সরকার, বাদল ইত্যাদি চরিত্রানুযায়ী করেছেন। (উৎক্ষিপ্ত তিন যুবকের ভূমিকাভিনেতার অভিনয় সুন্দর)।

স্ত্রী ভূমিকায় মণিদীপা হালদারের রত্না অঞ্জলি দত্তর নিত্যানন্দের স্ত্রী ভূমিকায় অভিনব স্বাভাবিক। তবে শেষোক্ত অভিনেত্রীর চরিত্র চিত্রণে একটু অতি নাটকীয়তার ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে।

মঞ্চ ও আলো (হীরক মুখার্জি) এ নাটককে সার্থক করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার ভূমিকা পালন করেছে।

এ নাটকে কিছু কিছু স্ব-কল্পিত (?) দৃশ্য। সংলাপ সংযোজন ব্যতীত, এর মোটামুটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একটি সমস্যাকে উপস্থাপিত করার নিষ্ঠা বা প্রবণতা ভাল লেগেছে। অহেতুক ব্যঙ্গ করার চেষ্টাও এতে নেই।

তবু কয়েকটি কথা থেকেই যায়। যেমন রেল কর্মচারীদের আগাগোড়াই অত্যন্ত নিষ্প্রাণ, নিরীহ এবং মার খাওয়া অসহায় চরিত্র রূপে নাটকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

হিন্দ মোটর-এ 'ক্ষীরের পুতুল' ও 'বাঘ'

গত ৮ই মার্চ সন্ধ্যায় হিন্দ মোটর দেবাইপুকুর এলাকায় স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে শিশু-শিল্পী কর্তৃক শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষীরের পুতুল ও সমর মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘ' নাটক অনুষ্ঠিত হয়। অভিনয়ে দর্শকদের মনে দাগ কাটতে পেরেছে শিশুশিল্পী সর্বশ্রী সুপ্রতিম মুখোপাধ্যায়, চৈতালী নন্দী মৌসুমী দাস ও সুপর্ণা মুখোপাধ্যায়। আবহসংগীতের গানগুলি সুপ্রযুক্ত। রামপদ মাঝির আলোকসজ্জা প্রশংসনীয়। নাটকদ্বয় পরিচালনা করেন শ্রীবলাই চ্যাটার্জি ও অনুপ কানুনগো। শ্রীসুনীল দত্ত ও রণজিৎ নিয়োগীর প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সর্বাংগসুন্দর হয়।

মাহেশে 'বঙ্গেবর্গী' ও 'সাজাহান'

হুগলী জেলার মাহেশ আর্য সমাজের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি দুই দিনের অনুষ্ঠানে 'বঙ্গেবর্গী' ও 'সাজাহান' নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক-সম্রাট সেন এবং প্রধান অতিথি প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায়। রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে শ্রীতুলসীচরণ পাল, শ্রীদুলাল মান্না ও ভুবনচন্দ্র কুণ্ডুকে গুণীজন সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বঙ্গেবর্গী নাটকে ভাস্করের ভূমিকায় শ্রীসুধীর পাল তানোজীর ভূমিকায় শ্রীসত্যব্রত রুদ্র, আলিবর্দীর ভূমিকায় শ্রীশংকর আদিত্য ও মোহননলালের ভূমিকায় শ্রীস্বপন মুখার্জির অভিনয় সুন্দর। 'সাজাহান' নাটকে সাজাহানের ভূমিকায় জিতেন সেনগুপ্ত, দারার ভূমিকায় শ্রীবিভাস কুণ্ডু যশোবন্ত সিংহের ভূমিকায় ডাঃ সুব্রত রুদ্র এবং ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় শ্রীবামনদেব ভট্টাচার্যের অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। স্ত্রী চরিত্রে গীতশ্রী দেবী, জ্যোৎস্না নিয়োগীর অভিনয় ভাল। দুটি নাটকই পরিচালনা করেন শ্রীউষাবতী ভট্টাচার্য।

নাট্য সমালোচক

নেতাজী মঞ্চ (নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট)
(শিয়ালদহের উত্তরে কাইজার ষ্ট্রীটে প্যারামাউন্ট সিনেমার পূর্বদিকে)
প্রতি বৃহঃ ৬॥টা শনি, রবি : ৩টা ৬॥টা

সমরেশ বসুর
বিবর
নির্দেশনা- রবি ঘোষ

অসিতবরণ, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, জয়শ্রী রায়, চিন্ময় রায় হারাধন ব্যানার্জী, প্রমোদ গাঙ্গুলী, গীতা দে, ছন্দা দেবী রত্না ঘোষাল, সুব্রত সেন এবং গৌরীশংকর ব্যানার্জী ও রবি ঘোষ।

নাটক : **সমর মুখার্জী**
আলো : **কণিষ্ক সেন**, মঞ্চ : **শৈলেন দে**
সংগীত : **আনন্দশংকর**

শো-এর ৬ দিন আগে হলে বুকিং (৮টা—৮টা)

অভিনয় পুরস্কার—১৯৭৪

১৯৭৪-এ কলকাতা ও মফঃস্বলের অপেশাদার মঞ্চে প্রযোজিত নাটকগুলির উৎকর্ষতার মান বিচার করে নিম্নলিখিত সংস্থা ও ব্যক্তিকে 'অভিনয়' পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ঃ লু-সুনের গপ্পো (পালাওয়ালা)। পরিচালক ঃ শ্যামাকান্ত দাস (আলিবাবা পাঁচালী) পি এ টি। অভিনেতা ঃ আশিস দাশগুপ্ত (বিদ্রোহী সংবাদ) অঙ্গিরা। অভিনেত্রী ঃ শুভ্রা ঘোষ (ন্যায়-অন্যায়) কার্টুন থিয়েটার ও গীতা ভট্টাচার্য (উল্টোরথের ভেপু) অনুভব। নাট্যকার ঃ মধুময় রায় (গোধা) পপ্ থিয়েটার। মফঃস্বল—শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ঃ রণক্ষেত্রে আছি (অন্বেষক)। পরিচালক ঃ আশিস চট্টোপাধ্যায় (লাস বিপণি) ইউনিট থিয়েটার। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ঃ সত্যেন ভদ্র (মিস খেঁদিবালা) শিল্পায়ন।

বিদেশী ছবি

একাডেমীতে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ছবি

ওয়ার্নার ব্রাদার্সের নিম্নোক্ত ছবিগুলি ৪৭তম বার্ষিক একাডেমী পুরস্কারের জন্য নির্বাচন পেয়েছে ঃ দি টাওয়ারিং ইনফার্নো—শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা (ফ্রেড এস্টায়ার) শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশনা (উইলিয়াম ক্লেবার ওয়ার্ড প্রেসটন) সেট ডেকোরেশন (রাফেল ব্রেটন) শ্রেষ্ঠ সিনেমাটোগ্রাফী (ফ্রেড কিনেক্যাম্প) শ্রেষ্ঠ চিত্র সম্পাদনা (হ্যারল্ড. ক্রেস, কার্ল ক্রেস) শ্রেষ্ঠ মূল নাট্য উপাদান (জন উইলিয়মস,) শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত (উই মে নেভার লাভ লাইক দিস এগেন—আল কাশা ও জোয়েল হারসবর্ন) শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রী (টি সোডেরবার্গ এইচ লুইস)।

এলিস ডাজ নট লিভ হিয়ার এনি মোর—শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, (এলেন বারস্টীন) শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী (ডায়না ল্যাড) শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য (রবার্ট গেবেল)।

এমারকর্ড—শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভাষার ছবি। ভারতে অনুষ্ঠিত ৫ম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত।

ব্রেজিং স্যাডেলস—শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্র (মেডেলিন কন) শ্রেষ্ঠ চিত্র সম্পাদনা (জন সি হাওয়ার্ড ড্যানফোর্ড গ্রীন) শ্রেষ্ঠ সংগীত (ব্রেজিং স্যাডেলস—জে মরিস ও মেল ব্রুকস)।

ডে ফর নাইট—শ্রেষ্ঠ পরিচালক (ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো), শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব চরিত্রাভিনেত্রী (ভেলেন্টিনা কর্টিজ) শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য (ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো, জীন লুইস রিচার্ড ও সুসান চিফম্যান)।

হার্টস এ্যান্ড মাইন্ড—শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র।

পরলোকে সুশান হেওয়ার্ড

বিদেশী চিত্রজগতের প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুসান হেওয়ার্ড গত শুক্রবার ১৪ই মার্চ মারা যান। তার মস্তিষ্কে টিউমার হয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫।

আই ওয়াস্ট টু লিভ' নামক বিখ্যাত ছবিতে দন্ডিত খুনীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তিনি ১৯৫৮ সালে অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন।

১৯৭৪-এ ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের সাফল্যঃ বিদেশে, বিশেষ করে ইউরোপে ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশনার মাধ্যমে ইউনাইটেড আর্টিস্ট গত ১৯৭৩ সালে প্রচুর অর্থ লাভ করে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭৪-এ বিদেশের অর্থাৎ মার্কিন ছবি প্রযোজনা ও পরিবেশনা ছাড়া ইউরোপীয় ছবি প্রযোজনা ও পরিবেশনার মাধ্যমে অন্যান্য বছরের চেয়ে বকস অফিসের সমস্ত পূর্ববর্তী রেকর্ড ভঙ্গ করে দিয়েছে। ওয়ার্ণার ব্রাদার্স সম্প্রতি ইউরোপে প্রদর্শিত দি একসরসিস্ট ম্যাগনাম ফোর্স এনটার দি ড্রাগন ব্লেজিং স্যাডলস দি মার্সেল কনট্রাকট আই বেস্টোনি এবং ভারতের পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত ফেলিনি পরিচালিত এ্যামার কোর্ড ছবির প্রদর্শনের মধ্যে সেই বকস অফিস রেকর্ড সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

বাঙলা দেশের ছবি

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির ১৯৭৪ সনের চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী ৩০শে মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় হোটেল ইন্টারকনে এক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পুরস্কারের ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

তথ্য ও বেতার মন্ত্রী জনাব কোরবান আলী উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সমিতির ১৯৭৪ সনের চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য মনোনীত ছবি, পরিচালক, শিল্পী ও কুশলীদের তালিকা নীচে দেওয়া হলেঃ

চলচ্চিত্রঃ আলোর মিছিল, সংগ্রাম ও শনিবারের চিঠি।

পরিচালকঃ মিতা (আলোর মিছিল), চাষী—নজরুল ইসলাম (সংগ্রাম) ও এফ-এ ফিল্মস ইউনিট (শনিবারের চিঠি)।

চিত্র-নাট্যকার—কাজী আনোয়ার হোসেন (মাসুদ রাণা), আশীষকুমার লোহ (অনেকদিন আগে) ও মিতা (আলোর মিছিল।)

গীতিকারঃ গাজী মাহফুজুল আনোয়ার (ভালবেসে আরও আসবো কাছে—বেইমান), মুস্তাফিজুর রহমান (এই পৃথিবীর পরে—আলোর মিছিল) ও আজাদ রহমান (মনের রংয়ে রাঙ্গাবো—মাসুদ রাণা)।

প্রধান অভিনেতা—রাজ্জাক (আলোর মিছিল), সোহেল রাণা (মাসুদ রাণা), উজ্জ্বল (শনিবারের চিঠি ও দারাশিকো—সংগ্রাম)

প্রধান অভিনেত্রী—ববিতা (আলোর মিছিল) কবরী (বেইমান) ও শাহানা চৌধুরী (শনিবারের চিঠি।)

চরিত্রাভিনেতাঃ সলিল (আলোর মিছিল), অলিভিয়া (মাসুদ রাণা) ও সুচন্দা (শনিবারের চিঠি)।

গায়কঃ আবদুল্লর রউফ (কে তুমি পুকুর ঘাটে—মালকা রাণু)।

আবদুল জব্বার (আমিতো বন্ধু মাতাল নই—বেইমান), ও খুরশীদ আলম (মনের রং-এ রাঙ্গাবো (মাসুদ রাণা)।

গায়িকাঃ সাবিনা ইয়াসমীন (ওরে ময়না পাখী—মালিকা রাণু) এবং এই পৃথিবীর পরে—(আলোর মিছিল), সেলিনা

সিনেমার অন্তরঙ্গ কাহিনী
পর্দার বিখ্যাত মানুষেরা লেখার পাতায় পাতায় এখন
যত হাসি তত হাসি হাসাহাসি
বায়োস্কোপিক
রঞ্জন মজুমদার
বারো টাকা
সাহিত্যপ্রকাশ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

জাজাদ (মনের রং-এ রাংগাবো—মাসুদ রাণা) ও আঞ্জুমান আরা বেগম (ইস্কাপনের টেককারে দুই পর্ব।)

চিত্র-সম্পাদকঃ বশীর হোসেন (সংগ্রাম এবং মাসুদ রাণা), ফজলে হক (অনেকদিন আগে) ও শহীদুল ইসলাম (মালকা রাণু)।

চিত্রগ্রাহকঃ এম, এ, সামাদ (সংগ্রাম), আবদুললতীফ বাচ্চু (মাসুদ রাণা এবং অনেকদিন আগে) ও রফিকুল বারীচৌধুরী (আলোর মিছিল)।

শিল্প-নির্দেশকঃ হাসান আলী (অনেকদিন আগে ও এম এ সবুর (মাসুদ রাণা)

সঙ্গীত পরিচালকঃ সুবল দাস (অনেকদিন আগে), সত্য সাহা (আলোর মিছিল) ও আজাদ রহমান (মাসুদ রাণা)।

শব্দগ্রাহকঃ মোজাম্মেল হক (মালকা রাণু) ও হারুনুর রশীদ (অনেকদিন আগে এবং আলোর মিছিল।)

সুচন্দার বিয়ে

অনেকদিন থেকে বাজার গরম, জোর গুজব, চিত্র নায়িকা সুচন্দা বিয়ে করছেন। কিন্তু 'গুজব' এতোকাল গুজবই ছিল। এবার বুঝি-গুজব আর গুজব থাকছে না। হ্যাঁ চিত্র নায়িকা সুচন্দা এবার বিয়ে করছেন। কার সঙ্গে? আগামীতে তা আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

সুচন্দা কিন্তু এখনও বিবাহিতা। তিনি চিত্র পরিচালক নিখোঁজ জহীর রায়হানের স্ত্রী। জহীর রায়হান নিখোঁজ আছেন, দীর্ঘ দিন থেকে। স্বাধীনতার পর থেকেই। অনেক দিন হয়ে গেল।

তবে কি জহীর রায়হান মৃত?

কে জানে। হয়ত নায়িকা, জহীর বধূ সুচন্দা জানেন। আর তাই কি তিনি দ্বিতীয় ঘর বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন?

আনওয়ার আহমদ

তানপুরা

ইমরাৎ খাঁর স্মরণীয় অনুষ্ঠানঃ গত কমাস ধরে ওস্তাদ ইমরাৎ খাঁর বাজনা শুনলাম নানা আসরে এবং নানান উপলক্ষে। কিন্তু সাম্প্রতিক দুটি অনুষ্ঠানে শিল্পীর সংগীত মানসের এক নতুন দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। একটি হোলো পার্ক স্ট্রীটের সারা-রাত্রিব্যাপী সংগীতাসর। অন্যটি গলফ ক্লাব রোডে উদয়শংকরের বাসগৃহে শ্রীমতী অমলাশংকর আয়োজিত এক সংগীত সভায়। তবলায় ছিলেন যথাক্রমে লতিফ খাঁ ও শংকর ঘোষ। দুটি আসরই সুরু হয় বিলায়েৎ ও ইমরাৎ খাঁ সাহেবের বালক পুত্রদ্বয় সুজাদ খান ও নিষাদ খাঁর যুগ্ম সেতার বাদন দিয়ে। প্রথমদিন ছিলো রাত্রের অনুষ্ঠান। বাজালেন রাগ মালকোষ। দ্বিতীয়দিন সান্ধ্য অনুষ্ঠানে পরিবেশিত রাগ ছিলো—পুরিয়া কল্যাণ।

চাইল্ড প্রডিজি—কথাটিরই যেন জীবন্ত নিদর্শন এঁরা। সেতার নিয়ে যখন আসরে আসেন সবাই কৌতুকভরে চেয়ে থাকে অনেকটা পিঠ-চাপড়ানোর ভাব নিয়ে। কিন্তু বাজনা সুরু হলেই কৌতুক ধীরে ধীরে—বিস্ময় থেকে শ্রদ্ধার দিকে মোড় নেয়। এতটুকু ছেলেরা এত তৈরী? মীড় গমক তান—সব কটি অংগ এত নির্ভুল নিখুঁত দ্রুতলয়ের মুহূর্তের এমন শুদ্ধ যে চোখ বুজে শুনলে মনে হয় কোনো ওস্তাদের বাং না শুনছি। সেতারের ওপর দখল দুজনেরই সমান। সুজাদ খাঁর বাজনা (বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের ছেলে) কল্পনার রং স্থিরবুদ্ধি ও সুপরিকল্পিত স্বর সমন্বয়ে চিত্তহারী। নিষাদ খাঁর (ইমরাৎ খাঁ সাহেবের ছেলে) ঝোঁক চমকপ্রদতা সৃষ্টির দিকে। তার বাজনার গীত কোন পরিণতিতে স্থির হবে সে সম্বন্ধে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

তবে সাধনার একনিষ্ঠতায় করোরই খাদ নেই।

ইমরাৎ খাঁনের সুরবাহারে দুদিনের অনপ্রষ্ঠানে শোনা গেলো যথাক্রমে দরবারী কানাড়া ও মালকোশ। সুরবাহার যন্ত্রটি এখন অপ্রচলিত হতে হতে লুপ্তপ্রায় পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এ যন্ত্রকে আবার আসরে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা ভারতের ধ্রুপদী সংগীত ধারার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন সন্দেহ নেই। দরবারী কানাড়ার সুগম্ভীর বেদনা এবং মালকোষের দৃপ্ত মর্যাদার ছবিটি সুরবাহারের ভারী আওয়াজ দীর্ঘস্থায়ী মীড়ের রেশ গমক ও ঝালায় সুমন্বিত। শ্রীমতী শংকর ও অন্যান্য শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে ইনি সুরবাহারের পর সেতার বাজান মাঝখাম্বাজে।

ইমরাৎ খাঁর সেতার এর আগে অনেক শুনেছি। রেওয়াজী হাতে সুরের সুস্পষ্ট অনুরনন বাজের দীপ্ত তানের দক্ষতা এসব ত এঁদের পারিবারিক 'সম্মক্তির মতই।

কিন্তু যে বস্তুটি এবার প্রথম থেকে শেষ অবধি শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলো সে হোলো আত্মপ্রকাশের তাগিদে আংগিকদক্ষতাকে অতিক্রম করার একটা উতলা আকুলতা। এই সন্ধ্যায় ইনি যাকে বলে একেবারে খানদানী ঘরানা চীজ। অন্যান্যবারের বাজনায় নানা যন্ত্রী ও গায়কের পরিবেশনাশৈলীর ছায়া পড়ে এবারে পাওয়া গেলো ঘরানার মৌলিকতা। বিলম্বিত মধ্যলয় ও দ্রুত গতে বন্দেজী ছন্দের মাদকতা জেন চুম্বনের মতই প্রতিটি রসিক-চিত্তকে আবিষ্ট করেছিলো। প্রতিটি শ্লৌক ঝজু দপটে জুড়িকে সামান্য স্পর্শ করে এক আকর্ষণীয় ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি করে মনের দুয়ারে ধাক্কা দিয়ে সকলের অকুণ্ঠ সাধুবাদ আদায় করে নিয়েছে।

ঝালার সংগে সংহত আওয়াজের রেশও মনে রাখবার মত। মোট কথা ইমরাৎ খাঁর এরকম বাজনা এর আগে শুনিনি। বাজনার শেষে শিল্পী বললেন আজ আমার এক মহা সৌভাগ্যের দিন। এখানে আসবার আগে ভাইয়া (বিলায়েৎ খাঁ সাহেব) আমায় হঠাৎ ডেকে বললেন তোমার সেতারটা আজ ভালো বলছে না। আমার যন্ত্রটাই নিয়ে যাও অথচ দাদার যন্ত্র কাউকে ছুঁতে দেন না। এতটা সৌভাগ্য করা যতটা আনন্দদায়ক ঠিক ততখানিই কষ্টের। এই আনন্দ ও কষ্টই কি তাঁর সেদিনের বাজনার প্রেরণা যুগিয়েছে?

চিত্রাংগদা

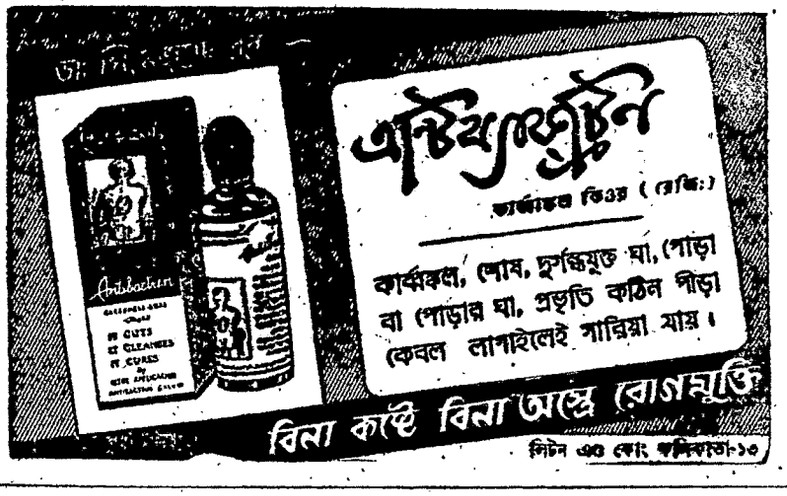

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত
সম্পাদক প্রফুল্লকান্তি ঘোষ / বন্যপ্রাণ / পরেক্ষণ পত্রিকা
১১ এপ্রিল ১৯৭৫ ॥ মূল্য ৬৫ পয়সা

আপনি কি জানেন ?

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার অনুপাতে বনভূমির পরিমাণ নগন্য আর, বনজাত দ্রব্যের চাহিদা খুব বেশী—

—কিন্তু—

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে ৪৫,০০০ হেক্টর গভীর বনভূমি এখনও অগম্য এবং সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় বন পরিচালনা সম্ভব নয়

তাই

উদ্জলতর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে আমাদের

—পরিকল্পনা—

* পার্বত্য বনাঞ্চলের অরণ্য সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার এবং সমৃদ্ধি সাধন
* বনসম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে অন্ততঃ ৫০০ কিলো-মিটার নূতন সড়ক নির্মান
* আধুনিক যান্ত্রিক প্রথায় কাষ্ঠ সংগ্রহ এবং পরিবহনের ব্যবস্থা
* বনজ দ্রব্য ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসারের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা
* উত্তরবঙ্গে কাগজের কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে আগামী দশ বছরে ৯০০০ হেক্টর অতিরিক্ত জমিতে বিশেষ জাতের বৃক্ষের চাষ
* বনাঞ্চলে পর্য্যটন শিল্পের প্রসারে সহায়তা
* উত্তরবঙ্গের অনুন্নত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

আপনার বনজদ্রব্য ভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালের জন্য যোগাযোগ করুন

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

কৃষি সংবাদ

আপনার নিজের জমির বীজ পরীক্ষা করিয়ে নিন

প্রত্যেক ফসল চাষ করার আগে আপনার নিজের রাখা বীজ পরীক্ষা করিয়ে নিন। আপনার এলাকার বীজ পরীক্ষাগারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নমুনা সংগ্রহের নিয়মাবলী জেনে নিন। প্রতিটি নমুনা পরীক্ষা করানোর জন্য দেড় টাকা ফি লাগবে। তবে বি-ডি-ও বা এ-ই-ও মারফৎ বীজের নমুনা পাঠালে কোন ফি লাগবে না।

বীজ পরীক্ষাগারের ঠিকানা	কোন কোন জেলার জন্য
১। বীজ পরীক্ষণ সংস্থা ২৩৮, নেতাজী সুভাষ রোড, টালিগঞ্জ, কোলকাতা-৪০	কলিকাতা, ২৪-পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর।
২। আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষণ কেন্দ্র জেলা কৃষি খামার, কালনা	বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া
৩। আঞ্চবিক বীজ পরীক্ষণ কেন্দ্র গৌর রোড, মালদা।	মুর্শিদাবাদ, মালদা, পঃ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার।

একমাত্র ভাল বীজ থেকেই ভাল ফলন পাওয়া যায়

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

সুস্থ ও সবল পশুসম্পদ কৃষিভিত্তিক এই
দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ!

* * *

পশুচিকিৎসা বিভাগ এই অমূল্য সম্পদের
রক্ষণাবেক্ষনের অতন্দ্র প্রহরী।

* * *

জনসাধারণের সেবায় রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে
রয়েছে বহু সংখ্যক পশুচিকিৎসা কেন্দ্র।

* * *

নিকটবর্ত্তী পশুচিকিৎসা কেন্দ্রের সহিত
যোগাযোগ করে সুযোগ গ্রহণ করুন।

* * *

আপনাদের সেবায় এঁরা সব সময়েই প্রস্তুত।

* * *

প্রচার শাখা
পশুচিকিৎসা অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রচারিত

প্রকাশিত হয়েছে !

বিমল মিত্রের
উপন্যাস

তিন নম্বর সাক্ষী ৮.

শঙ্কু মহারাজের
ভ্রমণ কাহিনী

তমসার তীরে তীরে ১৬.

জরাসন্ধের
উপন্যাস

নিশানা ৮.

শুভ নববর্ষে আমরা পাঠক-সাধারণ আমাদের পৃষ্ঠপোষক গ্রাহক, উৎসাহদাতা ও এজেন্ট বন্ধুদের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাচ্ছি। আশা করছি বাংলা সাহিত্যের এই দুর্দিনে তাঁদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা আমাদের সংকট উত্তরণে সহায়ক হবে।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
অভিশপ্ত চম্বল খ্যাত

তরুণকুমার ভাদুড়ীর
নবতম উপন্যাস

কাগজের নৌকো

দশ টাকা

প্রকাশিত হয়েছে !

নিমাই ভট্টাচার্যের
উপন্যাস

নাচনী ৭.

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
উপন্যাস

অমৃত পাত্রখানি ৮.

আশাপূর্ণা দেবীর
উপন্যাস

যে যার দর্পণে ৮.

সমরেশ বসুর
সর্বাধুনিক উপন্যাস

অবরোধ ১০.

* * * * * * * * * * * * * * *

প্রমথনাথ বিশীর নাট্যোপন্যাস

বেনিফিট অব ডাউট ১০.

তারাশঙ্কর রচনাবলী

নবম খণ্ড—কুড়ি টাকা

সৈয়দ মুজতবা আলী
রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড—২০.

শুভেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত

বৈজ্ঞানিক অভিধান ২৫.

যাযাবরের

হ্রস্ব ও দীর্ঘ

মিত্র ও ঘোষ পরিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
ফোন ঃ ৩৪-৩৪৯২
৩৪-৮৭৯১

ডেট কাপড় ধোয়ার কেক

অন্যান্য সাবানের তুলনায় ১½ গুণ বেশী কাপড় ধোয়—তা সে জল যে ধরণেরই হোক।

ডেট কাপড় ধোয়ার পাউডার

সাদা কিম্বা নীল — যে কোন সাইজে পাবেন। কেবল ডেট গোলা জলে চুবান আর ধুয়ে নিন। এটি আপনার হাতের পক্ষেও নিরাপদ।

এন-ডেট

দাগ ধুয়ে পরিষ্কার করার এনজাইমযুক্ত পাউডার, সক্রিয় কিন্তু ক্ষতিকর নয়।

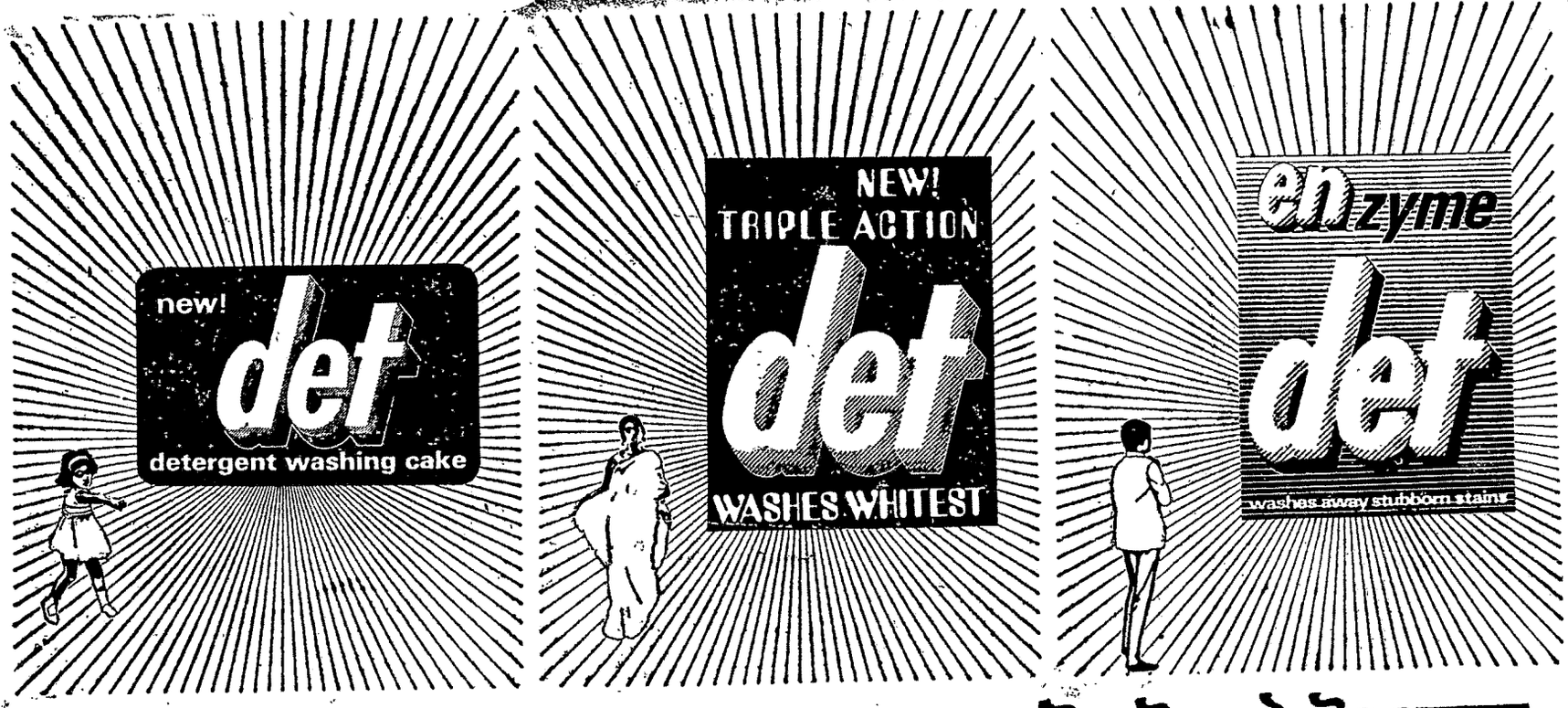

না কখনও ছিল,না পাবেন—এমন শুভ্রতা ডেটের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

Shilpi HPMA 5A/74 Ben

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪৮ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ" নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

Friday, 11th April, 1975 শুক্রবার ২৮ চৈত্র, ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৮	সম্পাদকীয়	
৯	বৃক্ষ বন্দনা (কবিতা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে	জওহরলাল নেহরু
১২	আরণ্যক থেকে	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫	প্রাচীন ভারতে বন্যপ্রাণী	শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত
১৯	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংখ্যা	শ্রীবংশী মান্না
২৪	মানুষের ভয়ে ও অভয়ে বন্যপ্রাণী	শ্রীঅমল দাশগুপ্ত
৩২	বাংলার পাখিরালয়	মহঃ সফিউল্লা
৩৬	বাংলার লুপ্তপ্রায় পাখি	শ্রীঅজয় হোম
৪৩	টাঁড়বারো	শ্রীবুদ্ধদেব গুহ

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক
চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল
হোমিও বই

মূল বিক্রয়কেন্দ্র — আমাদের কলিকাতার চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় ও হেড অফিস।

চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় : ১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি-২৫ এবং ৫৩ গ্রে স্ট্রীট, কলি-৬

হেড অফিস : ৩৬বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫।

পাইকারী ক্রেতা / বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করিবেন

একখড়্গ গণ্ডার তৃণভোজী বলিষ্ঠ এই বন্যপ্রানী এক সময় পৃথিবীতে হাজার হাজার পাওয়া যেত। কিন্তু এখন মাত্র তিনটি দেশে পাওয়া যায়। তাই যে দেশে এই গণ্ডার বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে সে দেশ এ নিয়ে গর্বিত।

আমাদের পশ্চিম বাংলাও সেই গর্বের অংশীদার।

বনের পশু-পাখীদের বাঁচিয়ে রাখার কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

বন অধিকরণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৪৬	জাতীয় পশু বাঘ	শ্রীবিশ্বনাথ বসু
৫২	বিরল প্রাণী সংরক্ষণে পশু উদ্যানের ভূমিকা	শ্রীরামকৃষ্ণ লাহিড়ী
৫৫	বন্যপ্রাণী সংখ্যা নিরূপণে পরিসংখ্যানে বিজ্ঞানের ভূমিকা	শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী
৫৯	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজন	শ্রীজগদীপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য শ্রীনির্মল সরকার
৬১	বন্যপশুপক্ষী সংরক্ষণে জনগণের ভূমিকা	শ্রীসুনীতিপ্রসন্ন মল্লিক
৬৪	বাঘের প্রেম ও বাৎসল্য	শ্রীশের ভঙ্গ
৬৮	খেলাধূলা	শ্রীদর্শক
৬৯	প্রেক্ষাগৃহ : চিত্র সমালোচনা	শ্রীচিত্রদূত
৭০	নাটমঞ্চ	মঞ্চসমালোচক
৭২	জলসা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীপরিমল চৌধুরী

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে ১৬ই এপ্রিল

মপাসাঁ রচনাবলী

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ। অনুবাদক : শেখর সেনগুপ্ত

শেকস্‌পীয়ার রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি রচনাবলীরই প্রতি খণ্ডের মূল্য দশ টাকা। অনুবাদক : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হোন।

ডক্টর অমিয়কুমার সেন — প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ১০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — অভিনেত্রী ৬
অবধূত — বিশ্বাসের বিষ ১০
উত্তমপুরুষ — জীবনের খেলাঘর ১০
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ — মুক্তিফৌজ ১০, কার্ল মার্কস ১০
কৌটিল্য গুপ্ত — ব্যুরোক্র্যাসী ১০, ফুল ও স্ফুলিঙ্গ ৭
নীহাররঞ্জন গুপ্ত — সূর্যমহল ৮, দরবারী ৫
কণিষ্ক — জঙ্গল জ্বলছে ৮
মায়া বসু — দূরবগাহিনী ৫
সুনীল চক্রবর্তী — আমি মন্ত্রী হব ১০

তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা—৯; ফোন : ৩৪-৮১৮০

"শিকারের বিচিত্র কাহিনী"

প্রকাশে যিনি পাঠক মহলের হৃদয় জয় করেছেন—সেই দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নতুন গ্রন্থ

বাঘ ও বাঘিনী ১১

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে

নব সাহিত্য প্রকাশ
১২১সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯

সদ্য প্রকাশিত

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

চাঞ্চল্যকর ঐতিহাসিক কিশোর উপন্যাস

হট যাও হার্মাদ

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক স্টেশনারী স্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন : ৬২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪

গ্রাম : অয়ারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া

পরিবেশক : কামলিন প্রডাক্টস (স্টেশনারী বিভাগ)

সম্পাদকীয়

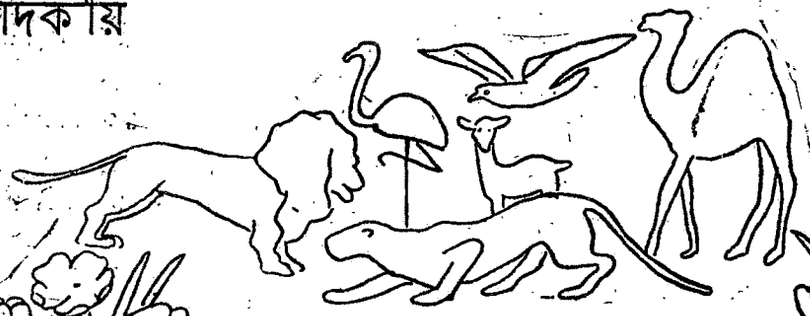

বন্যপ্রাণী ও আমরা

বন্যেরা বনে সুন্দর—বাংলা সাহিত্যের এই বিখ্যাত উক্তিতে বন্যপ্রাণীর প্রতি লেখকের মমতা ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বহু প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরেও বিদায় নিতে হয়েছে অনেক প্রাণীকে। একথা আজ বিশ্বাস করা শক্ত যে এক সময়ে আমাদের সুন্দরবনে গণ্ডার ছিল প্রচুর। মানুষ তাদের বিনাশ করেছে নিজের লোভে। ভয় থেকে যতটা নয় নিজের স্বার্থ এবং নিছক হত্যার আনন্দের কারণে বহু প্রাণী বিনষ্ট হয়েছে মানুষের হাতে।

সিংহ তো আমাদের দেশে প্রায় নিঃশেষিত। গির অরণ্যে সিংহকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে অনেক যত্ন করে। হিংস্র কিন্তু অতীব সুন্দর জন্তু বাঘকে তো শিকারীরা মেরে শেষ করেই ফেলেছে। অবশিষ্ট যা আছে তাকে এখন সংরক্ষণের চেষ্টা হচ্ছে। তৈরি হয়েছে অভয় অরণ্য। বাঘ, গণ্ডার, হাতীকে রক্ষা করার জন্য চলছে প্রয়াস। সভ্য মানুষ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পশুদের না বাঁচায় তাহলে তাদের বংশ নির্মূল হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। সে কারণেই এখন সব দেশেই চলছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আন্দোলন, ভারতবর্ষেও।

বন কেটে বসতি স্থাপনের জন্য এমনিতেই বন্যপ্রাণীর চরে বেড়াবার জায়গা হয়ে আসছে সীমিত। মানুষ যদি এখন সযত্ন মমতায় এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে বন্যপ্রাণী রক্ষায় এগিয়ে না আসে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। প্রকৃতি সমস্ত জীব জগতের মধ্যে ভারসাম্যের পক্ষপাতী। মানুষের পাশাপাশি তাই বন্যপ্রাণীদেরও স্থান আছে প্রকৃতিতে। যেহেতু মানুষই সমস্ত জীবজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বন্যপ্রাণীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ষা করার দায়িত্বও তাকেই নিতে হবে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নানাদিক নিয়ে আলোচনার জন্য তাই এই বিশেষ সংখ্যার আয়োজন। বন্যপ্রাণীদের বিষয়ে আমরা জানব এবং তার জায়গায় তাকে থাকতে দেব, এটাই সভ্য মানুষেরসাম্প্রতিক চেতনা। অমৃত-র এই বিশেষ সংখ্যার রচনাবলী সেই চেতনা থেকেই সৃষ্ট।

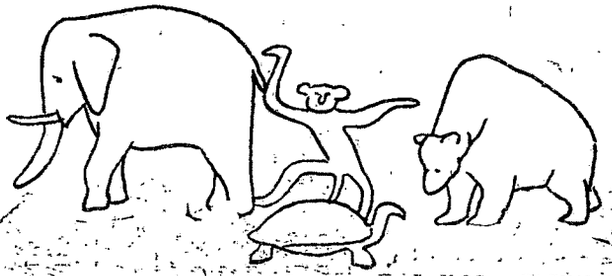

বৃক্ষ বন্দনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদি প্রাণ—
ঊর্ধ্ব শীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।।.....

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়;
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ; চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।।... ...

ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিন ধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎ-জয়ী, দিলে তারে পরম সম্মান,
হয়েছে যে দেবতার প্রতিস্পর্ধী—সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্ন বাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব তারি দূত হয়ে,
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য লয়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে

জওহরলাল নেহরু

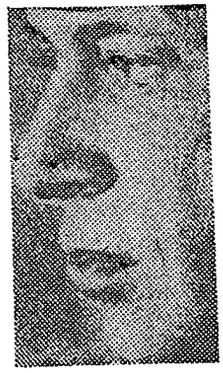

'বন্যপ্রাণী'? সেভাবেই আমরা জঙ্গলের আশ্চর্য সব পশু এবং সুন্দর যে সব পাখি আমাদের জীবনকে উজ্জ্বলতর করে তোলে তাদের বিষয় বলে থাকি। মাঝে মাঝে আমার ভাবতে ইচ্ছে হয়, এইসব জন্তু এবং পাখিরা মানুষের সম্বন্ধে কি ভাবে এবং যদি তাদের ক্ষমতায় কুলতো তাহলে মানুষের সম্বন্ধে তারা কি বলত। সন্দেহ হয়, তাদের বর্ণনা মানুষের পক্ষে খুব প্রশংসার হয়তো হোত না। আমাদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সত্ত্বেও মানুষ এখনও অনেক দিক থেকে কেবল যে বন্য আছে তাই নয়, এইসব তথাকথিত বন্য জন্তুদের চাইতে বেশী বিপজ্জনকও রয়ে গেছে।

প্রকৃতিকে বলা হয় নখর দন্তে রক্তাক্ত এবং অরণ্য বিপদসঙ্কুল। যারা সবল তারা দুর্বলকে শিকার করে, এবং দুর্বলেরা নিজেদের বাঁচাবার জন্যে নানারকমের কৌশল ও আচরণের আশ্রয় নেয়। কিন্তু অরণ্যের এই পদ্ধতি দেখা দিয়েছে, প্রধানত খাদ্যসংগ্রহের জন্যে। মানুষ মানুষকে খায় না, মানুষ মানুষকে খুন করে অন্য কারণে। এমন কি যখন দেহে মারে না তখন সে আত্মায় মারে। ভালমন্দের এক অদ্ভূত মিশ্রণ হলাম আমরা। আমাদের মধ্যে মিশে আছে সভ্যতার সঙ্গে বর্বরতা, দেবত্বের সঙ্গে ঘৃণ্যতা। কথা বলি আমরা একরকম এবং কাজ করি আমরা অন্যরকম। মহৎ সব আদর্শকে শূন্যে আন্দোলিত করে বহু শ্লোগান দিই আমরা, কিন্তু ব্যবহারের দ্বারা সেগুলিকে মিথ্যা করে দিই। আমরা শান্তির কথা বলি, কিন্তু যেভাবে তা বলি তা অনেক সময়েই হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক ও জঙ্গী।

পৃথিবীর অন্য দেশে যত না হোক, সম্ভবত ভারতে নীতি এবং কর্মে এই রকম পার্থক্য রয়ে গেছে। নীতিগতভাবে আর কোন দেশেই ভারতের মত জীবনকে এত মূল্যবান মনে করা হয় না, এমন কি অনেক মানুষ নগণ্যতম এবং ক্ষতিকর প্রাণীকেও মারতে দ্বিধান্বিত। কিন্তু বাস্তবে জীবজগৎকে আমরা অবজ্ঞা করি।

অন্য অনেক দেশে এমনকি শিশুরাও জন্তু জানোয়ার ও পাখির বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করে থাকে। সেসব দেশে প্রাণীজগতের বিষয়ে অগুন্তি বই আছে, এবং লোকেরা কোনো কোনো দুষ্প্রাপ্য পাখি দেখতে যথেষ্ট কষ্টস্বীকার করে ভ্রমণে বেরোয়। অজস্র 'বার্ড ওয়াচার সমিতি' গঠিত হয় সেসব দেশে, পাখিগুলোকে হত্যা করার জন্যে নয়, তাদের দেখতে এবং তাদের আচার আচরণ লক্ষ্য করতে। আমাদের দেশের ক'জন লোক অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত পাখিদের নামগুলি পর্যন্ত জানে? পাখি আর জীবজন্তু সম্বন্ধে আমাদের দেশে বইয়ের সংখ্যাই কত কম।

ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দিকে এই যে এখন নতুন আগ্রহ দেখা দিয়েছে আমি তাকে স্বাগত জানাই। এটা অবশ্য আমি বলতে পারি না যে, সেইসব বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করা আমাদের উচিত হবে যারা লোকালয়ের পক্ষে বিপজ্জনক কিংবা যারা আমাদের শস্য নষ্ট করে। কিন্তু এইসব আশ্চর্য প্রাণী এবং পাখিদের যদি আমরা দেখতে না পাই কিংবা তাদের নিয়ে যদি খানিকটা সময় কাটাতে না পারি তাহলে আমাদের জীবন সম্ভবত খুবই একঘেয়ে এবং বিবর্ণ হয়ে যাবে। কাজেই আমাদের উচিত হবে বন্যপ্রাণীদের মধ্যে সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাদের সংরক্ষণের জন্যে যতো বেশী সম্ভব অভয়ারণ্য স্থাপনের দিকে উৎসাহ দেওয়া। নানাদিক থেকেই আমাদের অরণ্যগুলি আমাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সেগুলিকে সংরক্ষণ করা দরকার। এখন যা অবস্থা তাতে দেখা যাচ্ছে আমরা বড়ো বেশি ধ্বংস করে ফেলেছি আমাদের অরণ্যগুলিকে। এটা অবিশ্যি সত্যি, জনসংখ্যা যত বেশি বাড়তে থাকছে তত বেশি খাদ্য উৎপাদন দরকারী হয়ে পড়ছে। কিন্তু সেটা করা উচিত আরও বেশি করে নিবিড় চাষের ভেতর দিয়ে, অরণ্যগুলিকে ধ্বংস করে নয়, কেননা সেগুলিও আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

.....বন্দুক দিয়ে শিকার করার চাইতে ক্যামেরা দিয়ে (বন্যপ্রাণী ও পাখিদের) ছবি তোলা অনেক বেশি উত্তেজনাকর এবং কঠিন। আমি চাই আমাদের দেশের অনেক অনেক দুঃসাহসী রোমাঞ্চপ্রিয় যুবক বন্দুক নামিয়ে রেখে হাতে ক্যামেরা তুলে নিক। আমাদের বনজঙ্গলের যেটুকু অবশিষ্ট আছে আমাদের উচিত সেগুলিকে রক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে সংরক্ষণ করা উচিত অরণ্যচারী প্রাণীগুলিকেও। (অনূদিত)

মুখোমুখি একশৃঙ্গ গণ্ডার দেখতে হলে চলে আসুন

জলদাপাড়া

তোর্ষা নদীর তীরে
জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে দেখতে
পাওয়া যায় দুষ্প্রাপ্য একশৃঙ্গ গণ্ডার। শুধু গণ্ডারই
নয়, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখবেন আরো
কত কী! যেমন বাইসন, বাঘ, রন-মোরগ, বন্যবরাহ, বিভিন্ন
ধরনের হরিণ এবং অন্যান্য জীবজন্তু।
রেল বা সড়ক, যে কোন পথেই জলদাপাড়া যাওয়া যায়।
বাগডোগরা বিমানবন্দর বা শিলিগুড়ি থেকে মোটরে মাত্র
৩ ঘণ্টার পথ। অভয়ারণ্যের গভীরে সুসজ্জিত হলং ফরেস্ট লজে
আরামদায়ক আতিথ্যের ব্যবস্থা। অভয়ারণ্য ঘুরে বন্য জন্তু
দেখার জন্যে পোষা হাতি পাবেন।
জলদাপাড়া যাওয়ার জন্যে দার্জিলিঙ, শিলিগুড়ি বা বাগডোগরা
বিমানবন্দরে ট্যুরিস্ট কোচের ব্যবস্থা আছে। মাঝে মাঝে
আয়োজিত ভ্রমণের ব্যবস্থাও করা হয়।

প্রসঙ্গত ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত
দার্জিলিঙ এলাকায় যে কোন
ট্যুরিস্ট লজে বিশেষ সুবিধাজনক
হারে ঘর পাওয়া যায়।

বুকিং ও বিশদ বিবরণের জন্যে
যোগাযোগ করুন:

ট্যুরিস্ট ব্যুরো
দার্জিলিঙ, ফোন: ৫০
গ্রাম: DARTOUR বা
ফরেস্ট ইউটিলাইজেশন অফিসার, কলিকাতা
বা ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, কুচবিহার

স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TC/179 ASTR

আরণ্যক থেকে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

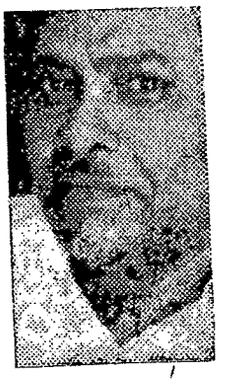

নিস্তব্ধ দুপুরে দূরে মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গল অপূর্ব রহস্যময় দেখাইত। কতবার ভাবিয়াছি একবার গিয়া পাহাড়টা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিব কিন্তু সময় হইয়া উঠে নাই। শুনিতাম মহালিখারূপের পাহাড় দুর্গম বনাকীর্ণ শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা বনমোরগ দুষ্প্রাপ্য বন্য চন্দ্রমল্লিকা বড় বড় ভাল্লুকঝোড়ে ভীর্ত। পাহাড়ের উপরে জল নাই বলিয়া বিশেষত ভীষণ শঙ্খচূড় সাপের ভয়ে এ অঞ্চলের কাঠুরিয়ারাও কখনও ওখানে যায় না।

দিকচক্রবালে দীর্ঘ নীল রেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে বিকালে সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। একে তো এদিকের সারা অঞ্চলটাই আজকাল আমার কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয় এর জ্যোৎস্না, এর বন-বনানী, এর নির্জনতা এর নীরব রহস্য এর সৌন্দর্য এর মানুষজন পাখীর ডাক বন্য ফুলশোভা—সবই মনে হয় অদ্ভুত মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয় জীবনে যাহা কোথাও কখনও পাই নাই। তার উপরে বেশী করিয়া অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখারূপের শৈলমালা ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা: কি রূপলোক যে ইহারা ফুটাইয়া তোলে দুপুরে বৈকালে জ্যোৎস্না রাত্রে—কি উদাস চিন্তার সৃষ্টি করে মনে!

একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। ন' মাইল ঘোড়ায় গিয়া দুই দিকের দুই শৈলশ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি। দুই দিকের শৈলসানু বনে ভরা পথের ধারে দুই দিকের বিচিত্র ঘন বনঝোপের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে কখনও উঁচু-নীচু মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্বত্য ঝরণা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই কারণ তখন শরৎকাল চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয় কিন্তু কি অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্বত্র ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে বৃক্ষতলে শিলাখণ্ডে ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে। আরও কত কি বিচিত্র বন্য পুষ্প ফুটিয়াছে বর্ষাশেষে পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন, অর্জুন ও পিয়াল নানা-জাতীয় লতা ও আর্কিডের ফুল বহু প্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিলিত হইয়া মৌমাছিদের মত মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিতেছে।

এতদিন এখানে আছি এ সৌন্দর্যভূমি আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। মহালিখারূপের জঙ্গল ও পাহাড়কে দূর হইতে ভয় করিয়া আসিয়াছি বাঘ আছে সাপ আছে ভাল্লুকের নাকি লেখাজোখা নেই—এ পর্যন্ত তো একটা ভাল্লুকঝোড় কোথাও দেখিলাম না। লোকে যতটা বাড়াইয়া বলে ততটা নয়।

ক্রমে পথটার দুধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে যেন দুদিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বড় বড় গাছের ডালপালা পথের উপর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘন-সন্নিবিষ্ট কালো কালো গাছের গুঁড়ি তাদের তলায় কেবলই নানাজাতীয় ফার্ণ কোথাও বড় গাছেরই চারা। সামনে চাহিয়া দেখিলাম পথটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে বন আরও কুক্ষায়মান সামনে একটা উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া তাহার অনাবৃত শিখরদেশের অল্প নীচেই যেসব বন্যপাদপ এত নীচু হইতে সেগুলি দেখাইতেছে যেন ছোট ছোট শেওড়া গাছের ঝোপ। অপূর্ব গম্ভীর শোভা এই জায়গাটায়। পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপরে অনেক দূর উঠিলাম আবার পথটা নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে, কিছুদূর নামিয়া আসিয়া একটা পিয়াল তলায় ঘোড়া বাঁধিয়া শিলা-খণ্ডে বসিলাম—উদ্দেশ্য শ্রান্ত অশ্বকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া।

সেই উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া হঠাৎ কখন বামদিকে গিয়া পড়িয়াছে পার্বত্য অঞ্চলের এই মজার ব্যাপার কতবার লক্ষ্য করিয়াছি কোথা দিয়া কোনটা ঘুরিয়া গিয়া আধ রশি পথের ববধানে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যের সৃষ্টি করে, এই যাহাকে ভাবিতেছি খাড়া উত্তরে অবস্থিত হঠাৎ দু-কদম যাইতে না যাইতে সেটা কখন দেখি পশ্চিমে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরণার কলমর্মর সেই শৈলমালা বেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া তাদের মাথায় শরতের নীল আকাশ। কতকাল হইতে এই বন পাহাড় এই এক রকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্যেরা খাইবার গিরিবর্ত পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন এই বন তখনও এই রকমই ছিল; বুদ্ধদেব নব বিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন সেই অতীত রাত্রিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রা-লোকে আজকালের মতই হাসিত; তমসা

তীরের পর্ণকুটীরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য অস্তাচল-বলম্বী তমসার কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে আশ্রমমৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে সেদিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙ্গা আলোয় মহালিখারূপের শৈল-চূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কতকাল আগে সেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন; গ্রীক রাজ হেলিওডোরাস গরুড়-ধ্বজ স্তম্ভ নির্মাণ করেন; রাজকন্যা সংযুক্তা যেদিন স্বয়ংবর সভায় পৃথ্বীরাজের মূর্তির গলায় মাল্যদান করেন; সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে হিল্লী পলাইলেন চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তন করেন যেদিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—মহালিখা-রূপে ঐ শৈলচূড়া এই বনানী ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এই সব জঙ্গলে? জঙ্গলের অনতিদূরে একটা গ্রামে দেখিয়া আসিয়াছিলাম কয়েকখানি মাত্র খড়ের ঘর আছে মহুয়াবীজ ভাঙ্গিয়া তৈল বাহির করিবার জন্য দু-খণ্ড কাঠের তৈরী একটা ঢেঁকির মত কি আছে আর এক বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলাম তাহার বয়স আশী-নব্বুই হইবে শণের-নুড়ি চুল গায়ে খড়ি উড়িতেছে রৌদ্রে বসিয়া বোধ করি মাথার উকুন বাছিতেছিল— ভারতচন্দ্রের জরতী-বেশধারিণী অন্নপূর্ণার মত। এখানে বসিয়া সেই বুড়িটার কথা মনে পড়িল—এ অঞ্চলের বন্য সভ্যতার প্রতীক ওই প্রাচীন বৃদ্ধা—পূর্বপুরুষেরা এই বন-জঙ্গলে বহু সহস্র বছর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। যীশু-খৃষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেদিনও উহারা মহুয়াবীজ ভাঙ্গিয়া মেরূপ তৈল বাহির করিত আজ সকালেও সেইরূপ করিয়াছে। হাজার হাজার বছর নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অতীতের ঘন কুঞ্ঝটিকায় উহারা আজও সাতনলি ও আঠাকাঠি দিয়া সেইরূপই পাখী শিকার করিতেছে ইশ্বর সম্বন্ধে জগৎ সম্বন্ধে উহাদের চিন্তাধারা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। ঐ বুড়ির দৈনন্দিন চিন্তাধারা কি, জানিবার জন্য আমি আমার এক বছরের উপার্জন দিতে প্রস্তুত আছি।

বুঝি না কেন এক এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কি বীজ লুক্কায়িত থাকে তাহারা যতদিন যায় তত উন্নতি করে—আবার অন্য জাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই একস্থানে স্থানুবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে কেন? বর্বর আর্যজাতি চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে বেদ উপনিষদ পুরাণ কাব্য জ্যোতির্বিদ্যা জ্যামিতি চরক-শ্রুত শিখিল দেশ জয় করিল সাম্রাজ্য পত্তন করিল ভেনাস দ্য মিলোর মূর্তি পার্থেনন তাজমহল কোলোঁ ক্যাথিড্রাল গড়িল দরবারী কানাড়া ও সিকথ সিমফোনির সৃষ্টি করিল—এরোপ্লেন জাহাজ রেলগাড়ী বেতার বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিল—অথচ পাপুয়া নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধি-বাসিরা আমাদের দেশের, ওই মুণ্ডা কোল নাগা কুকিগণ যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর?

অতীত কোন দিনে এই যেখানে বসিয়া আছি এখানে ছিল মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্বিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।

পুরা যতঃ স্রোতঃ পুলিনমধুরা
তত্র সরিতাম।

এই বালু-প্রস্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ ঊর্মি-মালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না এ ধরণের গাছপালাও ছিল না যে ধরণের গাছপালা জীবজন্তু ছিল পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে যে কোনো মিউজিয়ামে গেলে দেখা যায়।

বৈকালের রোদ রাঙ্গা হইয়া আসিয়াছে মহালিখারূপ পাহাড়ের মাথায়। শেফালি বনের গন্ধভরা বাতাসে হেমন্তের হিমের ইষৎ আমেজ আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হইবে না সম্মুখে কৃষ্ণা একাদশীর অন্ধকার রাত্রি বনমধ্যে কোথায় একদল শিয়াল ডাকিয়া উঠিল। ভালুক বা বাঘ পথ না আটকায়।

ফিরিবার পথে একদিন প্রথম বন্য ময়ূর দেখিলাম বনান্তস্থলীতে শিলাখণ্ডের উপর। একজোড়া ছিল আমার ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়া ময়ূরটা উড়িয়া গেল! তাহার সঙ্গিনী কিন্তু নড়িল না। বাঘের ভয়ে আমার তখন দেখিবার অবকাশ ছিল না তবু একবার সেটার সামনে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বন্য ময়ূর কখনও দেখি নাই লোকে বলিত এ অঞ্চলে ময়ূর আছে আমি বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু বেশীক্ষণ বিলম্ব করিতে ভরসা হইল না! কি জানি মহালিখারূপের বাঘের গুজবটাও যদি এ রকম সত্য হইয়া যায়।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বাংলার কীট-পতঙ্গ

আমাদের দেশে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু ইংরেজীতেই লিখেছেন এবং আজো লেখেন। কিন্তু গোপালচন্দ্র একমাত্র ব্যতিক্রম। কীট-পতঙ্গের আচার-ব্যবহার বিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতে কাজ শুরু করেন গোপালচন্দ্রই প্রথম। তিনি লিখেছেন পিঁপড়ের লড়াই, ব্যাঙের সাপ খাওয়া, কীট-পতঙ্গের প্রণয়রীতি, শোঁয়া-পোকার মৃত্যু অভিযান—বিচিত্র বিষয়ের অসংখ্য কাহিনী। যা লেখককে দিয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি। বিজ্ঞান লেখকের সুনির্বাচিত প্রবন্ধের এই সংকলন বাঙলা ভাষায় এক অসামান্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে। সচিত্র ॥ দাম কুড়ি টাকা

কমল চৌধুরী

সায়গনের নরকে

কন সন, চি হোয়ো, তান হিয়ে প, থু ডাক, কে দুয়া—সায়গনের এই সব কুখ্যাত জেলখানা—যা হিটলারের বর্বরতাকে হার মানায়। তা ছাড়া আজ সায়গনের বুকে ছড়িয়ে আছে অগুন্তি মানুষ হত্যার কেন্দ্র। সেখানে বছরের পর বছর ধরে আটক রয়েছে অসংখ্য নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ। দীর্ঘদিন মাটি আর সূর্যের আলোর বাইরে বেঁচে থাকা—মৃত্যুপথযাত্রী ক্ষয়রোগ ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত অন্ধ পঙ্গু মানুষ—যারা একদিন স্বপ্ন দেখেছিল সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের—আজ তারা পৃথিবীর আলোয় সেই চিরপরিচিত জগতকে খুঁজে পায় না। দক্ষিণ ভিয়েতনামের শ্মশান ভূমির ওপর মার্কিন তাঁবেদার থিউ-এর অমানবিক কার্যকলাপের নগ্ন আলেখ্য। সচিত্র ॥ দাম বারো টাকা

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ ।। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম কুড়ি টাকা

প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ দাম সাত টাকা

আশা

আশা প্রকাশনী ॥ ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশুপালন অধিকার

অধিক দুধ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে
ডিম মাংসের উৎপাদন বাড়াতে
গ্রামীন অর্থনীতি জোরদার করতে
এবং
কৃষি কর্মসূচীর বহুমুখী প্রয়াস সার্থক করতে
পশুপালন বিভাগ

* সংকর প্রজননে গো-উন্নয়ন
* মুরগী উন্নয়ন
* শূকর উন্নয়ন
* মেষ উন্নয়ন
* গো-খাদ্য সবুজ ঘাসের চাষ
* সুষম খাদ্য উৎপাদন
* প্রশিক্ষণ ও
* জনসংযোগের মাধ্যমে

জাতীয় অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে সাধারণ কৃষক, দরিদ্র চাষী, নিম্নবিত্ত গৃহী, শহরতলীর গৃহস্থ এবং বেকার যুবকদের সামনে অর্থ আয়ের সম্ভাবনাপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করছে।

বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ — জেলা ও মহকুমাভিত্তিক পশুপালন আধিকারিক/প্রচার আধিকারিক, পশুপালন অধিকার, মহাকরণ, কলি-১

অভিযোগের জন্য ঃ — যুগ্ম অধিকর্তা (পশুপালন), 'এফ' ব্লক, মহাকরণ, কলি-১
পঃ বঙ্গ।
অথবা
অধিকর্তা, পশুপালন, পঃ বঙ্গ, 'এফ' ব্লক, মহাকরণ, কলি-১

বন্য মহিষ

প্রাচীন ভারতে বন্যপ্রাণী

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

বর্তমানে বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে আমাদের যে উৎসাহ তা দেখে হয়তো মনে হতে পারে যে, বন্যপ্রাণী সম্পর্কে এই জাগ্রৎ চেতনা একান্তভাবেই আধুনিক। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ক বহু আইন হাল আমলে চালু হয়েছে। জওহরলাল নেহেরু বন্যপ্রাণী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিতভাবে যে সব কথা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, বন্যপ্রাণী না থাকলে মানুষের জীবন হবে একঘেয়ে ও বিবর্ণ। বন ও বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে আধুনিককালে যে সব গ্রন্থাদি লেখা হয়েছে সেগুলিতে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভিতর দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, পরিবেশের সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য ও দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে বন্যপ্রাণীর দান কী অপরিসীম। বছরখানেক আগে সারা ভারতে প্রযোজ্য বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ আইন কার্যকরী করা হয়েছে। সুতরাং এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বন প্রাণীকে বোধহয় আমরা আধুনিককালেই ভালোবাসতে শিখেছি। কিন্তু একথা ভারা ঠিক নয়। প্রাচীন ভারতে বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণভাবে চিন্তা করা হতো ও প্রবীণ-দের চিন্তাধারা আমাদের চিন্তাধারার চাইতে অনেক বেশি মৌলিক ও আত্মিক ছিল। আমাদের বর্তমান বিচার প্রয়োজনভিত্তিক, কিন্তু প্রাচীনেরা বিশ্ব বোধের পরিপ্রেক্ষিতে বন, বন্যপ্রাণী, মানুষ ও সমাজকে দেখে-ছিলেন।

ইংরেজিতে ফরেস্ট কথাটি এসেছে ফরিস থেকে যার অর্থ বাহির। অর্থাৎ বনকে সমা-জের প্রত্যন্ত প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে বন ছিল তপোবন বা অরণ্য। আত্মাকে জানার সত্যকে জানার জন্য যে অনলস তপস্যা তার প্রাণকেন্দ্র ছিল বন। অরণি মানে যজ্ঞ কাষ্ঠ। তপোবন ছিল তপস্যা ও যজ্ঞের কেন্দ্রভূমি। তাছাড়া তখন জীবনের চারটি আশ্রমের মধ্যে তিনটি আশ্র-মের ভিত্তিভূমি ছিল বন। শুধু গার্হস্থ্য জীবনের জন্য ছিল গ্রাম নগর ইত্যাদি। আর এই গার্হস্থ্য জীবন ও তপোবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। শ্রেষ্ঠপুরুষ রাজাকেও তপোবনের

ঋষির কাছে অবনত মস্তকে যেতে হতো উপদেশ গ্রহণ করার জন্য। সুতরাং প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে বন্যপ্রাণী চেতনা ছিল একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। এই দৃষ্টিভঙ্গি চরম সত্যকে খণ্ডভাবে না দেখে অখণ্ডভাবে দেখতে শেখত এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে

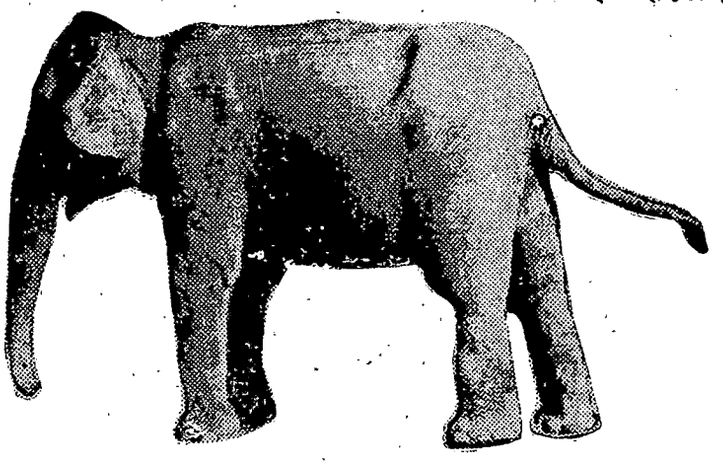

হাতী

গাছপালা, পশুপাখি ও মানুষ একটি নিবিড় ও নিগূঢ় আত্মিক মন্ত্রের বন্ধনে সংযুক্ত ছিল। প্রাচীন ঋষিরা তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছেন যে যে-দেবতা অগ্নিতে ও জলে যিনি বিশ্বভুবনে সমাবিষ্ট এবং যিনি ঔষধিতে ও বনস্পতিতে সেই দেবতাকে নমস্কার। তপোবনের ঋষিদের সাধনা ছিল বিচিত্রের পটভূমিকায়, বিরাটের নাড়ীর স্পন্দনে, জীবনের অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতার মধ্যে সেই পরম প্রাণের সন্ধান—যার থেকে সব কিছুর সৃষ্টি, সব কিছুর বিকাশ : যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে দশাবতার কল্পনায় দেখি প্রথমে শৈবাল ও জলজ প্রাণী মাছ তারপর কাদটে জলে কূর্ম। তারপর শক্ত মাটিতে বরাহ এবং গাছপালায় পৃথিবী যখন অরণ্যসঙ্কুল তখন এল সিংহ ও অন্যান্য জন্তু ও সবশেষে মানুষ। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে সৃষ্টিতে বন্যপ্রাণী থেকে সুরু করে মানুষ একই শক্তির বিকাশ। প্রাচীনেরা এই আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বন্যপ্রাণীকে দেখতেন। বন্যপ্রাণী ও মানুষ ছিল তাঁদের কাছে সহযাত্রী। তাঁদের জীবনের তিনভাগই কেটে যেত বনের মধ্যে বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে। সুতরাং আমাদের চাইতে তাঁদের বন্যপ্রাণী চেতনা ছিল আরো গভীর, আরো নিকট এবং আরো অকৃত্রিম। প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাদিতে এই মনোভাবের অজস্র সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। বাল্মীকি রামায়ণের সেই শ্লোকটি তো সর্বজন পরিচিত 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ অগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কাম্য মোহিতম্'। ক্রৌঞ্চমিথুনকে তাদের মিলন মুহূর্তে বধ করা এমন একটি দুষ্কর্ম যা বিশ্বনীতির প্রতিকূল। তাই সমগ্র বিশ্ব শোকাভিভূত। বিশ্বচেতনার যে শোকসঞ্জাত বিক্ষোভ তারই উপরে ফুটে উঠল কবি হৃদয়ের শ্লোক শতদলটি। সমগ্র রামায়ণ এই শতদলটির পাপড়ি উন্মোচন। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে দেখি রাজাকে কতর মিনতি জানিয়ে তরুণ তাপস বলছে ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোইয়মাস্মিন্। মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশা বিবাগ্নিঃ'। মৃদু এ মৃগ দেহে মেরো ন শর। আগুন দেবে কে হে ফুলের পর' (রবীন্দ্রনাথ)।

পশুপাখির সঙ্গে, তরুলতর সঙ্গে মানুষের যে যোগ তার চূড়ান্ত নিদর্শন পাই কালিদাসের এই নাটকটিতে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সেই করুণ শাশ্বত দৃশ্যটি মনে মনে ভাবা যাক। শকুন্তলা কন্বমুনির আশ্রম থেকে বিদায় নিচ্ছে দেখে সমগ্র অরণ্য প্রকৃতি বিমর্ষ ও কাতর। মৃগরা আহার পরিত্যাগ করেছে। ময়ূর নৃত্য থেকে বিরত। পিছন থেকে শকুন্তলার কাপড় ধরে টানছে একটি মৃগ শিশু। এটি তার পালিত হরিণ শিশু, কারণ প্রসবের পরই তার হরিণী-মা মারা গিয়েছিল শকুন্তলাই মাতৃস্নেহে তাকে পালন করেছে। তার কুশক্ষত মুখে ইঙ্গুদির তেল দিয়েছে। শকুন্তলা আরো একটি হরিণীর সংবাদ নিচ্ছে। এটি আসন্নপ্রসবা। তাও কন্বকে কাতরভাবে জানাচ্ছে নির্বিঘ্নে প্রসবের খবর তাকে যেন জানানো হয়। তাত কন্বও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই নাটকে যে দুটি আশ্রমের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ কন্বমুনির আশ্রম ও মরীচি মুনির আশ্রম, তাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তপোবন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন : '.....একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠেছেন। মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদি তৈল্য মাখিয়ে শুশ্রূষা করেছেন এই তপোবনটি দুষ্মন্ত শকুন্তলায় প্রেমকে সারল্য সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। আর সন্ধ্যা মেঘের মতো কিম্পুরুষ পর্বত যে হেমকূট সেখানে সরাসুর গুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন। লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামন্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বী বালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদ দুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।'

এখন হয়তো প্রশ্ন উঠবে যে প্রাচীন ভারতে বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে যদি এতোই মমতা ছিল তবে

ডঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.,ডি.জি.ও
ডাঃ এস. এন. পাণ্ডে এম.বি.,বি.এস
জীবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
নিকিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে
অতি আধুনিক সংস্করণ
ইন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
গ্রন্থাগার ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

নতুন

ক্ষীর-ক্রীম এর

নতুনত্ব

কিসে ?

নামে তো বটেই

খেয়ে দেখুন
বুঝবেন কত
মোলায়েম,
কত মধুর
আস্বাদে ভরা

আর দামে বাজারের
সমশ্রেণীর আইসক্রীমের
তুলনায় অনেক কম !

ডিরেক্টরেট অফ ডেয়ারী ডেভলপমেন্ট,
পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রস্তুত।

সে যুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ কেন ছিল, কেনইবা রাজাদের জন্য মৃগয়ার বন্দোবস্ত ছিল এবং কেন অতিথিকে বলা হতো গোঘ্ন। একথা অবশ্য ঠিক যে, রাজা, রাজপুরুষ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে মৃগয়া উপলক্ষ্যে পশুহত্যা চালু ছিল যজ্ঞে পশুবধ শাস্ত্রসম্মত ছিল। প্রাচীন ভারতে গোহত্যা করা হতো কিনা এবং গোঘ্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ কী, তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। যদিও মৃগয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে চালু ছিল, এ বন্দোবস্ত কিন্তু ঢালাও বা অবারিত ছিল না। তপোবনে ও অভয়াশ্রমে মৃগয়া ছিল নিষিদ্ধ। সব ঋতুতে সব রকম পশু মৃগয়া স্থলে হনন করা চলতো না। মৃগয়া করতে গিয়ে দশরথের যে বিপদ হয়েছিল তা আমরা সকলেই জানি। অন্ধমুনির পুত্রকে হস্তীভ্রমে শরবিদ্ধ করার জন্য তাঁকে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হয়েছিল। পাখিকে হত্যা করার জন্য যিনি ব্যাধকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তিনি দশরথের প্রতি অন্ধমুনির অভিশাপের ভিতর দিয়ে এই কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, প্রকৃতি মায়ের কাছে বন্যপ্রাণী তেমনি আদরের মাতা পিতার কাছে যেমন পুত্র।

অশ্বমেধ যখন হতো কালে ভদ্রে এবং সে যজ্ঞে একটিমাত্র পশুকে বলি দেওয়া হতো। অন্য যজ্ঞে পশুবধ সবন্ধে ভিন্নমতের অবকাশ আছে। আর্যদের কাছে অহিংসা ছিল পরম ধর্ম। তাই যজ্ঞ ছিল অধ্বর, অর্থাৎ অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রের অনুশাসন, 'অজৈঃ যজ্ঞেষু যষ্টব্যম্'-এর অর্থ এই যে শস্যের দ্বারা যজ্ঞ করবে। অজৈঃ শব্দের অর্থ শস্যের দ্বারা ছাগলের দ্বারা নয়। মাংস বলতে প্রাচীনেরা বুঝতো সব চাইতে যা সুখাদ্য, পশু বা পাখির মাংস নয়। আর যে গো ছিল তাঁদের কাছে গোমাতা তাকে তাঁরা অতিথি সৎকারের জন্য বধ করতেন, এও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। গোঘ্ন শব্দের অর্থে যে পদব্রজে পৃথিবী পরিক্রমা করেছে, যার জন্য গোবধ করা হয়েছে, সে নয়।

প্রাচীন ভারতে বন্যপ্রাণী প্রীতির পরিচয় আমরা অন্যভাবেও পাই। সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ যেসব শীলমোহর পাওয়া গেছে সেগুলির কোনো কোনোটাতে ষাঁড়, গণ্ডার, হাতি ও বাঘের প্রতিকৃতি আছে। আর্যসভ্যতার উন্মেষের ভিতর দিয়ে পশুপ্রীতির পরিচয় সম্যকভাবেই পাওয়া যায়। অথর্ব বেদে এমন সব মন্ত্র আছে যেগুলিতে যে-ভূমিতে আমরা বাস করি তার সঙ্গে কৃষি ও যে সমস্ত পশু আমাদের উপকারী তাদের নিবিড় সম্বন্ধ বারবার বলা হয়িছে। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'হে পৃথিবী আমাদের সেই সুগন্ধ ও শক্তি অজস্রভাবে দাও যা নর-নারীর মধ্যেও আছে। হস্তী ও অশ্বের মধ্যেও আছে, অন্যান্য পশু ও যোদ্ধাদের মধ্যেও আছে।' আর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'মা ধরিত্রী পক্ষপাতশূন্য। তিনি ভালো ও মন্দকে নির্বিশেষে আশ্রয় দেন। তিনি বন্য বরাহেরও খোঁজ রাখেন আবার বন্য শূকরের প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি।'

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অন্যান্য নানা বিষয়ের মতো বন্যপ্রাণী ও পশু সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা আছে। বনজ সম্পদ যিনি সংগ্রহ করতেন তাঁর নাম ছিল কুপাধ্যক্ষ। ইংরেজি coupe শব্দের সঙ্গে 'কূপ'-এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কুপাধ্যক্ষ সংগ্রহ করতেন সাপের বিষ, পশুচর্ম, হাড়, দাঁত ইত্যাদি। এই গ্রন্থে শূনাধ্যক্ষ নামে আধিকারিকের কথা আছে। তাঁর কাজ ছিল অভয়াশ্রম ও তপোবনে যেসব বন্যপ্রাণী থাকতো বা যেসব প্রাণী সংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত ছিল তাদের হত্যা আটকানো বা অন্য উপায়ে তাদের প্রতি সহিংস ব্যবহার যারা করতো তাদের শাস্তিবিধান করা। সংরক্ষিত শ্রেণীর বন্য-প্রাণীর তালিকা ছিল দীর্ঘ। এছাড়া এ-গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায়ে গো, অশ্ব ও হস্তী সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। গোরুর কল্যাণ যিনি দেখতেন তাঁকে বলা হতো গো-অধ্যক্ষ, ঘোড়ার কল্যাণ যিনি দেখতেন, তাঁকে বলা হতো অশ্বাধ্যক্ষ এবং হাতির কল্যাণ যিনি দেখতেন তাঁকে বলা হতো হস্ত্যধ্যক্ষ। প্রাচীন মন্ত্রে ও সাহিত্যে দেখি পশুপ্রীতির আত্মিক দিক আর অর্থশাস্ত্রে পরিচয় পাই এই প্রীতির ব্যবহারিক দিকের।

আমরা আশা করব যে প্রাচীন ভারতের এই মহান আদর্শ বর্তমান যুগেও অব্যাহত থাকবে এবং প্রাচীনদের বন্যপ্রাণী প্রীতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা বলতে পারব, 'মাধবীর্গাবো ভবন্ত নঃ'; আমাদের পশু-সমূহের শ্রীবৃদ্ধি হোক। আমাদের নিজেদের কল্যাণে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করলেই চলবে না, বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে এমন একটি দৃষ্টি-ভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে যা প্রকৃত আত্মিকবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব-সৃষ্টিতে বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের শান্তি-পূর্ণ সহাবস্থান প্রমাণ করতে হবে প্রীতি ও প্রসন্নতার মধ্য দিয়ে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য।

বাংলা মাসিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংখ্যা

ভারতের অধিকাংশ মানুষের কাছে কৃষিজাত পণ্যের অভাব শিল্পজাত উৎপাদনের মূল্যবৃদ্ধি ও অভাব, যানবাহনের অভাব এই সব জিনিসই সমস্যা বলে মনে হয়। বন্যপ্রাণীর অভাবও যে একটা সমস্যা এটা আমাদের অনেকেরই ধারণার বাইরে। অথচ বাস্তব বিচারে দেখা গেছে যে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণও এখন এদেশের অন্যতম জরুরী সমস্যা এবং যত তাড়াতাড়ি এ সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে ততই দেশের মঙ্গল হবে।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, সমস্যাটা ঠিক কি। আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে স্বাভাবিক পরিবেশে যত জীব-জন্তু সেই আদিকাল থেকে যুগে যুগে ধরে পাওয়া যেত এখন সেই সব জীবজন্তুর সংখ্যা খুব কমে গেছে। এতো কমে গেছে যে সেটাই এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব বেশী দিন নয় মাত্র তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও আমাদের দেশে বন্যপ্রাণী যত ছিল তার তুলনায় এখন বন্যপ্রাণী ভয়নক রকম কম। কেবল বাঘের সংখ্যাই ধরা যাক, তখন ভারতবর্ষের বনে-জঙ্গলে বাঘ ছিল প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো। এখন সেই বাঘের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র দু' হাজার। ঠিক এমনিভাবে কমেছে হাতী, গণ্ডার, হরিণ পাখী-টাখী ইত্যাদি সব রকমেরই জীবজন্তু। সিংহতো ভারত থেকে প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে, কমতে কমতে ইতিমধ্যেই একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে চিতা সুন্দরবনের বুনো-মোষ, গণ্ডার এমনি কত সব প্রাণী। যদি এখনই কোনো সঠিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে ভারতের সমস্ত রকমের বন্যপ্রাণীই কমতে কমতে একদিন অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

বোঝা গেল যে বন্যপ্রাণী কমেছে, কিন্তু এদের বাঁচিয়ে রেখে আমাদের লাভ কি হবে? এদের বাঁচাতে গেলে যে টাকাপয়সা খরচ হবে সেটা অনায়াসে চাষবাসের কাজে লাগানো যেতে পারে। যখন এদেশের মানুষের খাবার জোগানোই একটা সমস্যা তখন আবার বন্যপ্রাণীদের বাঁচানোর দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়া কেন? এই সব প্রশ্নের জবাবে খুব কম কথায় বলা যায় যে আমাদের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো দরকার নিশ্চয়ই, তবে সেই সঙ্গে আমাদেরই স্বার্থে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণও দরকার। এই প্রয়োজন কেন তা বুঝিয়ে বলার জন্যে এটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার, এখানে আমরা সেই চেষ্টাই করব।

ভারতের বন্যপ্রাণী সম্পদ চিরকালই (এখনও) ভারতবাসীদের গর্ব। কারণ এমন অমূল্য প্রাণী পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম বন্যপ্রাণীগুলি যেমন বাঘ সিংহ, বুনোমোষ, হাতী, গণ্ডার, হরিণ, ময়ূর এই সব প্রাণী স্মরণাতীত কাল থেকে যুগ যুগ ধরে এদেশের প্রাকৃতিক বনে-জঙ্গলে দেখা গেছে। একই দেশের বনে বাঘ ও সিংহ—এটা পৃথিবীর আর কোনো দেশেই নেই। তাছাড়া বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এশিয়ার গর্ব এই বাঘ প্রাণীটির বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত বন এই ভারত ছাড়া এখন আর কোনো দেশেই নেই। কাজেই বন্যপ্রাণী সম্পদ নিয়ে গর্ব করতে হলে কিছু কিছু দায়িত্বপালনও আমাদের কর্তব্য—সেটা হল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণ অর্থাৎ বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারলে কি অবস্থা হবে তার একটা বাস্তব প্রমাণ আমাদের হাতের কাছেই আছে। শ'খানেক বছর আগে সুন্দরবনে এক খড়্গ গণ্ডার ও বুনো মোষ প্রচুর পাওয়া যেত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখায় প্রমাণ আছে যে, তাঁর বাল্যকালে সুন্দরবনের স্থানীয় অধিবাসীরা তখন ওখানকার বনের গণ্ডার মেরে তার মাংস শহরে বিক্রি করতে আসত। বর্তমান লেখকের মাতামহ তাঁর জীবদ্দশায় উত্তর মেদিনীপুরের বনাঞ্চলে গোটাদশেক চিতা-বাঘ ও প্রচুর হরিণ মেরেছিলেন বলে লোকে বড় শিকারী বলে তাঁকে খুব খাতির করত। সেই খাতির আরো পাঁচজনকে শিকারে প্রেরণা দিয়েছিল। ফলে এখন সুন্দরবনের গণ্ডার, বুনোমোষ এবং মেদিনীপুরের বনের চিতাবাঘ, হরিণ ভালুক সবই চির-দিনের মতো নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এই ভাবেই বন্যপ্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তবে বন্য-প্রাণীদের বাসস্থান বন-জঙ্গল কমে যাওয়াও বন্যপ্রাণী কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি। বিশ্ব-প্রকৃতিতে প্রাণীজগৎ একটা অদৃশ্য ভার-সাম্যের সূত্রে বাঁধা আছে যাকে বলে ব্যালান্স অফ নেচার। এক দলের প্রাণী হয়ত অন্য দলের খাদ্য। মানুষ যদি কোনো জাতের প্রাণীর সংখ্যা বেহিসাবীর মতো জোর করে কমিয়ে দেয় তাহলে সেই ভার-সাম্যের সূত্র নষ্ট হয়, জীব-জগতে নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। যার ফলে হয়ত শেষ পর্যন্ত মানুষেরই ক্ষতি হয়। কয়েক বছর আগে মধ্যপ্রদেশে বাঘ মারার ঢালাও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অনুমতি পেয়ে

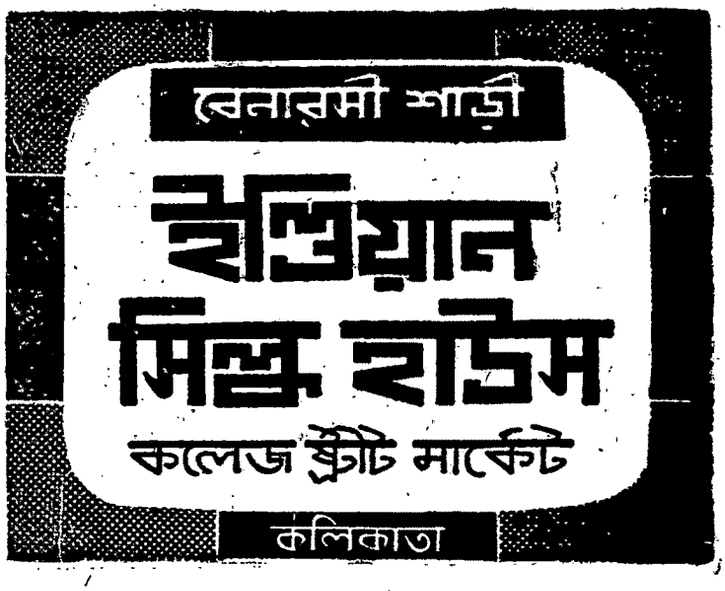

পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারণ্য

অভয়ারণ্যের নাম এবং আয়তন	কোন জেলায় অবস্থিত	নিকটতম রেল ষ্টেশন বা বাস ষ্টপের নাম	অভয়ারণ্যের উল্লেখযোগ্য পশুপক্ষী ইত্যাদি	অভয়ারণ্য পরিদর্শনের প্রকৃষ্ট সময়।
১। সিঞ্চল (৩৯·৫৫ বর্গ কিঃ মিঃ)	দার্জিলিং	ঘুম রেল ষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ।	গোরাল, কাকরহরিণ ভাল্লুক (হিমালয়ের) , সেরো ও বিভিন্ন জাতের পাখী।	এপ্রিল মে অকটোবর এবং নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ।
২। মহানদী (১২৭·২২ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	শুকনা রেল ষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ।	বাঘ হাতী গৌর কাকর হরিণ সম্বর বরাহ হরিণ চিতল?) বুনো শুয়র ও বিভিন্ন জাতের পাখী যেমন জংলী মুরগী তিলে ঘুঘু কণ্ঠী ঘুঘু হরিয়াল ধনেশ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া কয়েকটি উল্লুকও ছাড়া হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার মাছও দেখা যায়।	নভেম্বর হইতে এপ্রিল।
৩। গরুমারা (৮·৬২ বর্গ কিঃ মিঃ)	জলপাইগুড়ি	চালসা অথবা লাটাগুড়ি রেল ষ্টেশন এবং বড়দিঘী বাস ষ্টপ।	একশৃংগী গণ্ডার হাতী বাঘ চিতাবাঘ গৌর সম্বর কাকর হরিণ বরাহ হরিণ বুনো শুয়র ময়ুর জংলী মুরগী ও বিভিন্ন জাতের পাখী।	জুলাই হইতে ডিসেম্বর।
৪। জলদাপাড়া (৯৩·২৪ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	মান্দারহাট এবং হাসিমারা রেল ষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ।	ঐ	ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল।
৫। চাপড়ামারি (৮·৮১ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	চালসা রেল ষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ।	হাতী বাঘ চিতাবাঘ গৌর সম্বর কাকরহরিণ বারহা-হরিণ এবং বিভিন্ন জাতের পাখী যেমন ময়ুর জংলী মুরগী লাল টিটিভ ইত্যাদি।	অকটোবর হইতে এপ্রিল।
৬। লোথিয়ান আইল্যাণ্ড (৩৮ বর্গ কিঃ মিঃ)	২৪-পরগণা	ডায়মণ্ডহারবার রেল ষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ অথবা নামখানা এবং রায়দিঘী বাস ষ্টপ।	চিতল ভোঁদড় শৃগাল বুনো শুয়র কুমীর শুশুক এবং নানা প্রকারের জলচারী পাখী যথা বক ওয়াক বক শামুখ-খোল শংখচিল ডাহুক লাল টিটিভ বালুবাটান হরিয়াল কণ্ঠী ঘুঘু কাস্তেচরা মাছরাঙ্গা পানকৌড়ি ইত্যাদি।	ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী।
৭। হ্যালিডে আইল্যাণ্ড (৫·৯৬ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	ঐ	ঐ এবং বাঘ।	ঐ
৮। সজনেখালি (৩৬২·৩৯ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	পোর্ট ক্যানিং রেল ষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ।	ঐ এবং লোহা সারস ও গগনবেড় (পেলিক্যান)	জুলাই হইতে ডিসেম্বর।

শিকারীরা পাগলের মতো বাঘ শিকারে মেতে উঠল. অসংখ্য বাঘ মারা পড়ল, কয়েকটা জঙ্গলে বাঘ একেবারে নির্মূল হয়ে গেল। ফলে পরের বছর সেই জঙ্গলগুলোতে হরিণ খুব বেড়ে গেল আর পালে পালে হরিণ গিয়ে আশে-পাশের খেতের ফসল খেয়ে ফেলতে লাগল। চাষীরা খেত থেকে আর ফসল তুলতেই পারল না। মানুষ স্বেচ্ছায় বাঘ মারার ফলে শেষ পর্যন্ত মানুষেরই বিপদ হলো। তাই সেখানে তখন আবার আইন করে বাঘ মারা বন্ধ করা হয়। আর ফসল তুলতেই পারল না। মানুষ ক্ষতিকারক হরিণগুলোকে মারার ব্যবস্থা করা হল—এইভাবে বনের সব হরিণগুলোকে মেরে ফেলা হল। তখন হয়ত সেই বনাঞ্চলে বুনো লতাপাতা, ঘাস, আগাছা ইত্যাদি যেগুলো হরিণের খাদ্য ছিল সেগুলো এতো বেড়ে যাবে যে বনের বড় বড় গাছ, যা থেকে দামী কাঠ পাওয়া যায় সেগুলোর ক্ষতি হবে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সেই মানুষেরই ক্ষতি। নির্বিচারে বন্যপ্রাণী মেরে ফেলার ফলে প্রকৃতির ভারসাম্যের সূত্র নষ্ট হয়ে এইভাবে শেষ পর্যন্ত মানুষেরই ক্ষতি হয়—এ ক্ষতি এড়াবার জন্যেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দরকার। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা রাশিয়া আফ্রিকা বা পৃথিবীর এই সব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এমনি নানা ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। ফলে, ওই সব দেশে এখন কড়া আইন করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় আহৃত সম্পদ হয়ত আমরা ইচ্ছেমত খরচ-নষ্ট করতে পারি। কিন্তু দেশের বন্যপ্রাণী সম্পদ তো কারুর ব্যক্তিগত অর্জিত সম্পদ নয়, এগুলো আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে। সুতরাং এ সম্পদকে নষ্ট করা বা নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়, বরং আমাদের উচিত এই সম্পদ ঠিকমত সংরক্ষণ করে বাঁচিয়ে রেখে আমাদের উত্তরপুরুষদের হাতে তুলে দেওয়া। এটাই হবে একজন যোগ্য ভারতীয় নাগরিকের কাজ।

প্রাণীবিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণার জন্যেও বন্যপ্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। ধরা যাক আজ কোনো গবেষক পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত দৌড়বাজ-প্রাণী চিতা সম্বন্ধে এদেশে বসে গবেষণা করতে চান। তাহলে তাঁকে নিরাশ হতে হবে। কারণ, চিতা এদেশ থেকে নির্মূল হয়ে গেছে। অথচ শোনা যায় যে সম্রাট আকবর তাঁর শিকারের সঙ্গী হিসাবে বহু সহস্র চিতা পুষতেন।

বন্যপ্রাণী দেশের বিদেশী মুদ্রার আয় বাড়ায়। আজকাল বিদেশে চিড়িয়াখানায় ভারতের বন্যপ্রাণী বেশ ভালো দামে বিক্রি হয়, যেমন একটা বড়-সড় গণ্ডারের দাম

প্রকাশিত হল

আখের স্বাদ নোনতা

সৌরীন সেন

ক্যারিবিয়ন সাগরের বুকে ছোট্ট একটা দেশ কিউবা। কিন্তু খবরের বাজারে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে এল বিপ্লব। বিদেশী রিপোর্টার ঝাঁকে ঝাঁকে নামছে হাভানায়। টেলিপ্রিন্টারে খবর ছোটে অবিশ্রান্ত ফ্ল্যাশ, ফ্ল্যাশ, ফ্ল্যাশ!

ফিদেল কাস্ত্রো ও চে-গুয়েভারার নেতৃত্বে গেরিলাদের সংগ্রামের তথ্য কিউবার বিপ্লবের এবং বিশ্বের ভয়াবহ গুপ্তচরদের প্রতিবিপ্লবের প্রচেষ্টার এক অসামান্য ইতিহাস—আখের স্বাদ নোনতা। সৌরীন সেনের অদ্বিতীয় সৃষ্টি। ১৭-০০

শঙ্খ প্রকাশন ॥ ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড,কলিকাতা-৯

পশ্চিম বাংলার শ্রী এবং শ্রীমতী রায় বলেনঃ

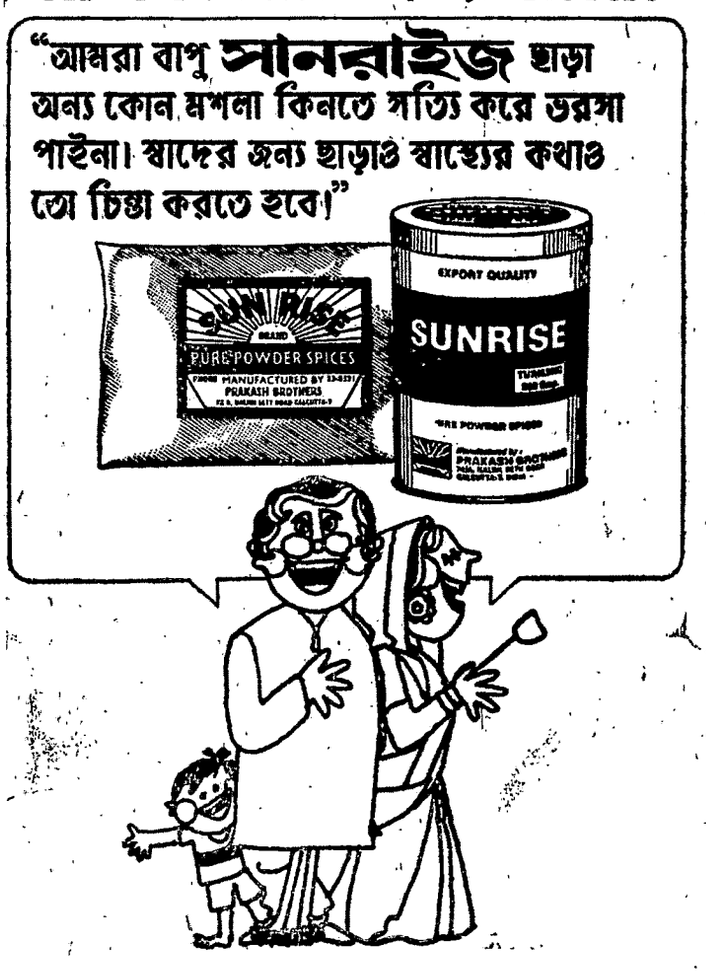

সময় সময় এক লাখ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায় তেমনি একটা হাতী পঁচিশ হাজার টাকা রয়্যাল বেংগল বাঘের বাচ্চার দামও হাজার পনেরো ইত্যাদি। ময়ূর, ময়না, টিয়া কাকাতুয়া, মুনিয়া ইত্যাদি পাখীরও বেশ ভাল দাম পাওয়া যায় বিদেশের বাজারে। তাছাড়া দেশে বন্যপ্রাণী থাকলে সেগুলো দেখতে দলে দলে বিদেশী ভ্রমণকারী আসেন— বিশেষতঃ অভয়ারণ্যগুলোতে। এভাবেও বহু বিদেশী মুদ্রা আসে, হোটেল, যানবাহন ইত্যাদিরও আয় বাড়ে। কেবল বিদেশী ভ্রমণকারীই নয় আজকাল দেশের মানুষরাও খুব বেড়াতে বেরোচ্ছেন। বেড়ানোর জায়গা হিসাবে সবাই বনাঞ্চলই বেশী পছন্দ করেন। কারণ শহরের কৃত্রিম পরিবেশে একটানা বাস করলে মানুষ দেহে-মনে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানুষের জীবনে যেমন কাজের প্রয়োজন তেমনি বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে, সেই বিশ্রামের জন্যে মানুষ চায় প্রকৃতির উদার পরিবেশ—বনাঞ্চল। আর বনে যদি বাঘ ভালুক, হরিণ এ-সব না থাকে তাহলে সে বন মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। বন্যপ্রাণীদের প্রত্যক্ষ উপযোগিতা এমনি আরো অনেক আছে।

বন্যপ্রাণী আবার আমাদের অনেক উপকার করে পরোক্ষভাবে। প্রাচীনকাল থেকে বনের পশু-পাখী ভারতের কবি, লেখক, ভাস্কর চিত্রকর ইত্যাদি শিল্পীকে সৃষ্টি-প্রেরণা দিয়ে এসেছে। আমাদের আদিকবি বাল্মীকির কবি-প্রতিভা স্ফুরিত হয়েছিল এক বন্য পক্ষী ক্রৌঞ্চীর দুঃখকাতর আর্তরব শুনে। সাঁচী কোনারক, খাজুরাহো, মহাবলিপুরম ইত্যাদি জায়গার অপূর্ব ভাস্কর্যে বিধৃত রয়েছে সমসাময়িক বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে শিল্পীদের নিবিড় পরিচয়ের কথা। বৌদ্ধজাতক কাহিনীতে, প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটকেও সেই একই পরিচয়ের কথা, যে পরিচয় শিল্পীকে নূতন নূতন শিল্পসৃষ্টিতে প্রেরণা দিয়েছিল।

অবশ্য, সংরক্ষণ মানে এ যেন কেউ মনে না করেন যে এতে দেশের বন-জঙ্গলের প্রত্যেকটি প্রাণীকেই অবধ্য বলে ঘোষণা করার কথা বলা হয়েছে। ঠিকমত বৈজ্ঞানিক প্রথায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা হলে দেখা যাবে যে দেশের বন্যপ্রাণী বেড়ে চলেছে এবং তখন অঞ্চল বিশেষে কোনো কোনো প্রাণী শিকার করার অনুমতিও দেওয়া যাবে—সেটাও সংরক্ষণের নীতিরই অঙ্গ। আসল কথা হল সঠিক নিয়ন্ত্রণ এবং সে কাজে দেশবাসীর সচেতনতা ও সক্রিয় সহযোগিতা। এটার প্রয়োজনীয়তা ভারতের অধিকাংশ মানুষ যতদিন পর্যন্ত বুঝতে না পারছেন, ততদিন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সার্থক হয়ে উঠতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের মৃগ উদ্যান

মৃগ উদ্যানের নাম	কোন জেলায় অবস্থিত	নিকটতম রেল ষ্টেশন ও বাস ষ্টপের নাম।	মৃগ উদ্যানের আয়তন	হরিণের সংখ্যা এবং অন্যান্য পাখী যা সচরাচর দেখা যায়	পরিদর্শনের প্রকৃষ্ট সময়
পাড়াপান	২৪-পরগণা	বনগাঁ রেল ষ্টেশন মল-ডুঙ্গারি বাস ষ্টপ (বনগাঁ-দত্তফুলিয়া পাকা সড়কের উপর)।	৬৪·৭৫ হেক্টর	চিতল (৪৮টি)। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের পাখী যথা—শামুকখোল শঙ্খচিল ডাহুক পানকৌড়ি লাল টিটিভ বালুকাটান হরিয়াল কণ্ঠীঘুঘু তিলেঘুঘু টিয়া ফলটুসি মাছরাঙ্গা নীলকণ্ঠ বসন্ত বৌরী সোনালী কাঠঠোকরা ইত্যাদি।	সারা বৎসর কিন্তু বর্ষাকালে যাতায়াতের একটু অসুবিধা আছে।
বেথুয়াডহরি	নদীয়া	বেথুয়াডহরি রেল ষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ (কৃষ্ণনগর-বহরমপুর জাতীয় সড়কের উপর)।	৫৪·৬৩ হেক্টর	চিতল (৩৩টি) কাকর হরিণ (৪টি) সম্বর (৬টি)। ইহা ছাড়া নানা জাতের পাখী যথা—হরিয়াল তিলেঘুঘু কণ্ঠীঘুঘু টিয়া ফুলটুসি নীলকণ্ঠ মাছরাঙ্গা বসন্তবৌরী বেনেবৌ দোয়েল বুলবুল সাতভাই ইত্যাদি।	সারা বৎসর।
বল্লভপুর	বীরভূম	বোলপুর রেল ষ্টেশন এবং শান্তিনিকেতন বাস ষ্টপ।	১৪১·৬৪ হেক্টর	চিতল (২৫টি) কৃষ্ণসার (৪৫টি)। ইহা ছাড়া নানা প্রকারের পাখী যথা—ফুলটুসি টিয়া লক্ষ্মীপেঁচা বেনেবৌ ফিঙে গোসাঁ গৌরিকদামা দোয়েল শ্যামা বুলবুল ফুটকি-জল গাংশালিক সাতভাই বা ঘাতারে দুধরাজ হরিয়াল কণ্ঠীঘুঘু তিলেঘুঘু চোখ গেল পাপিয়া মোহন-চূড় নীলকণ্ঠী ইত্যাদি।	ঐ

১৯৭২ সালের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনের ৪৪(২) ধারা অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যবসায়ীর দ্বারা রক্ষিত বন-জন্তু ও বন্যজন্তু থেকে তৈয়ারী দ্রব্যাদির তালিকা।

সিডিউল

(ক) জীবন্ত জন্তু	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য (টাকা)
(১) চিতা বিড়াল	২	
(২) লাল পান্ডা	৬	
(৩) নেকড়ে বাঘ	২	
(৪) কৃষ্ণসার	৩	
(৫) ময়ূর	১	
(৬) বড় বাজ, বড় সাহিন ছোট সাহিন তুরমতি	৩২	
(৭) মারলিন	১৪	
(৮) বাজা	১	
মোট	৬০	১৫,১৭৫

(খ) ট্রোফি		
(১) বাঘের চামড়া ইত্যাদি	৩৭	
(২) চিতা বাঘের চামড়া ইত্যাদি	১৪২	
(৩) লাল পান্ডার চামড়া	২	
(৪) কুমীরের চামড়া ইত্যাদি	৯২	
(৫) সোনা বিড়াল	৩	
(৬) লিংকস	১	
(৭) মেছো বিড়াল	২	
(৮) বিবিধ	৪৩৯	
মোট	৭১৮	১,৩১৬৫০

(গ) নিম্নলিখিত বন্য জন্তুর চামড়া থেকে তৈয়ারী দ্রব্যাদির তালিকা

জন্তুর নাম	লেডিস হাতব্যাগ	সিগারেট কেস ইত্যাদি	বেল্ট —	মাথার টুপি	গলা বন্ধ	কোট —	চটিজুতা —	বিবিধ —	মোট —	আনুমানিক মূল্য
(১) কুমীর	৫৬৯	৬৬১	৩৮০	—	—	—	—	৮	১৬২৮	
(২) বাঘ	২০	৬৭	৪০	—	—	—	—	—	১২৭	
(৩) চিতাবাঘ	২৫	৮৯	৩৬	১৫	২	৬	৩০	৬	২০৯	
(৪) লিংকস	—	—	—	—	—	৪	—	২	৬	
মোট	৬১৪	৮১৭	৪৫৬	১৫	২	১০	৩০	১৬	১৯৭০	৯৮২২০

নন-সিডিউল

(ক) জীবন্ত জন্তু ... ... ১৪৩৯৮৩ সংখ্যা
(খ) সাপ গোসাপ বিভিন্ন জন্তুর চামড়া ইত্যাদি ৪৪৫৮৫৪৪ সংখ্যা

১৯৭২ সালের বন্য প্রাণী আইনের ৪৪(২) (এ) ধারা অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের দেয় অনুমতিপত্র।

(১) ধৃত বন্যজন্তু	৬৪
(২) বন্যজন্তু হইতে তৈয়ারী দ্রব্যাদি	৩২
(৩) ট্রোফি	৭২
(৪) টেক্সিডারমি	৪
(৫) ধৃত বন্যজন্তুর ক্ষুদ্র ব্যবসাদার	১১
মোট	১৮৩

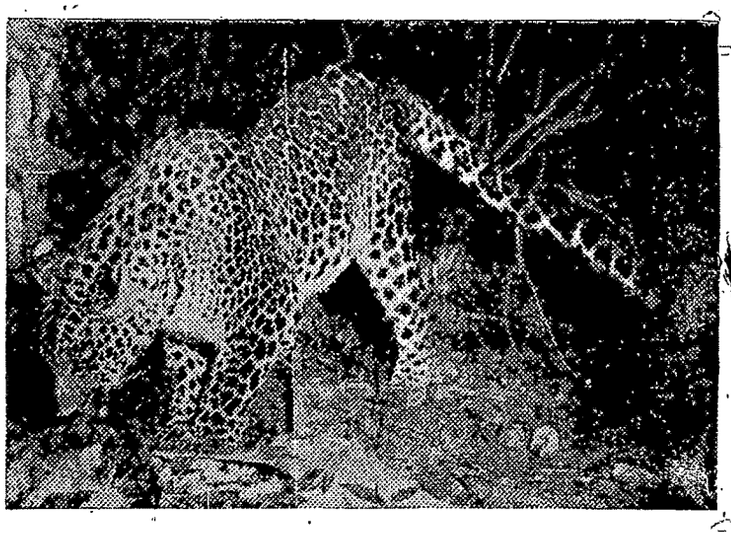

মানুষের ভয়ে ও অভয়ে বন্যপ্রাণী

অমল দাশগুপ্ত

এই পৃথিবীতে মানুষ আসার আগেও প্রাণী ছিল, নানা যুগে নানা রকমের। সব প্রাণীই গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত টিকে আছে তাও নয়। এক-একটা যুগের প্রাণী গোটাকতক ফসিলে নিজেদের অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন রেখে পৃথিবী থেকে একেবারে লুপ্ত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও কম নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত, সবাই জানেন ডাইনোসর। বাইশ কোটি বছর আগে থেকে প্রায় পনেরো কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে ডাইনোসরদের আধিপত্য ছিল। তাদের চেহারাও ছিল অতি প্রকাণ্ড। যেমন, ডিপ্লোডোকাস—লম্বায় ২৭ মিটার, ওজনে ৩০ টন। যেমন টাইরানোসরাস—লম্বায় ১৬ মিটার, উচ্চতায় ৬ মিটার, ওজনে ১০ টন। তাদের চলাফেরায় পৃথিবীর মাটি কাঁপত। তা সত্ত্বেও স্তন্যপায়ীদের যুগে এসে দেখা যাচ্ছে, এই অতিকায় সরীসৃপদের আর কোনো অস্তিত্বই নেই—আধিপত্য করছে তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্তন্যপায়ীরা। আবার স্তন্যপায়ীদের মধ্যেও প্রাণের সমস্ত ধারা পূর্বাপর টিকে আছে তাও নয়। পরিবেশের সঙ্গে যারা মানিয়ে নিতে পারেনি তারা অবলুপ্ত (যেমন ম্যামথ)। অবশ্যই তাদের জায়গা জুড়ে বসেছে অন্যরা, যারা জয়ী। এমনিভাবে রঙ বদলেছে, আদল বদলেছে কিন্তু জলে-জঙ্গলে-বাতাসে প্রাণের সমারোহ কখনো মুছে যায়নি।

তারপরে পৃথিবীতে এল মানুষ যে-মানুষ জীব হিসেবে অতি নিরস্ত্র ও অসহায়—তার গায়ে হাতির মতো জোর নেই, ভালুকের মতো পশম নেই, খরগোশের মতো ছোটার ক্ষমতা নেই, পাখির মতো ডানা নেই, শকুনির মতো ধারালো চোখ নেই, বাঘের মতো থাবা নেই—তবুও অন্য এক জোরে জোরদার হয়ে এই মানুষই জীবজগতে আধিপত্য কায়েম করে বসল। কিসের জোর? হাতিয়ারের জোর। মানুষ কিসে বড়ো? এককথায় হাতিয়ারের জোরে।

এই হাতিয়ারের জোরেই মানুষ এমন পশুও শিকার করতে পারত যার শরীরের বল প্রচণ্ড শরীরের অস্ত্রসজ্জা মারাত্মক। লক্ষ লক্ষ বছর মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রেখেছিল শুধু শিকার ও সংগ্রহের ওপরে নির্ভর করে।

মানুষ পশুপালন করতে শিখেছে, এই মাত্র সেদিন—সময়ের হিসেবে আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে। তার পোষা জীব সবার আগে ছিল কুকুর, তারপরে গোরু ঘোড়া ভেড়া ছাগল ইত্যাদি। তবুও পোষ-না-মানা জীব থেকে গেল বহু। তারা হয়ে থাকল বন্য, ইংরেজিতে ওয়াইলড। বলা বাহুল্য, বনের প্রাণী মাত্রই বন্য, এবং বন্যরা বনেই সুন্দর, আর এই বন্যপ্রাণীরাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

খানিকটা প্রাণধারণের তাগিদে, খানিকটা দেমাকে, খানিকটা লোভে শিকারের সুযোগ হাতছাড়া করা মানুষের স্বভাবে নেই। আর প্রাণ ধারণের তাগিদটা প্রধান হলে তো কথাই নেই, তখন হন্যে হয়ে শিকার খুঁজে বেড়াতে হয়। তাতে অবশ্য কিছুদূর পর্যন্ত ক্ষতি হবার আশংকা ছিল না, প্রাণ ধারণের তাগিদে এক জন্তুও তো অপর জন্তুকে শিকার করে থাকে প্রকৃতিজগতের নিয়মই তাই। এই নিয়মরক্ষার জন্য কিন্তু গোটা প্রাণিজগতের ভারসাম্যটি টলে ওঠে না। সেখানে সংখ্যার দিক থেকে এমন একটা মিল থাকার ব্যাপার আছে যে সম্ভাব্য সমস্ত হননের পরেও ক্ষতি এমন মাত্রায় পৌঁছতে পারে না যার ফলে বংশলোপ হওয়া সম্ভব। বরং উল্টোটাই ঘটে—সংখ্যাধিক্য হয়ে বেসামাল চাপ সৃষ্টি হবার অবস্থা ঘটে না। বনের হরিণ বনে, বনের বাঘ বনে, একে অপরের শিকার, তবুও দুই-ই থেকে যায়। আসলে দুই-ই যে থাকে তার শর্তটাই এই। পরিবেশ যদি ঠিক থাকে, প্রকৃতিজগতে আচমকা যদি অদলবদল ঘটে না যায় তাহলে বন্যরা একে অপরের শিকার হবার পরেও টিকে থাকেই। কিন্তু এই অবস্থা বরাবর বজায় থাকেনি। কতকগুলো কারণে ভারসাম্য টলে উঠেছে, কোনো কোনো বন্যপ্রাণী লুপ্ত, কোনো কোনো বন্যপ্রাণী লুপ্ত হবার মুখে। অতএব

দূরদৃষ্টিসম্পন্নরা সামাল সামাল রব তুলেছেন।

রবটা যদিও অতি-সম্প্রতিকালের, কারণগুলো কিন্তু ঘটতে শুরু করেছে দু-হাজার বছর আগে থেকে। তখন থেকেই মানুষ অতিমাত্রায় সংহারক শিকারী, বন্য-প্রাণীদেরও যে টিকে থাকার অধিকার আছে তা যেন মানতেই রাজী নয়! ভাবখানা এই যে ওরা বেঁচে থেকে তার কী কাজে লাগছে অতএব নিপাত যাক। সভ্য মানুষের এই খৃষ্টীয় যুগেই বহু প্রজাতির প্রাণীর নিপাতে যাওয়ার পথ অবিরাম একটানা খোলসা করে যাওয়া হয়েছে। আর ব্যাপারটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে ১৮০০ সালের পর থেকে। এখন খুব কম করে হিসেব করলেও অন্তত হাজারটা প্রজাতির ও উপ-প্রজাতির অস্তিত্ব মারাত্মক রকমের বিপন্ন। এবং আগামী দু-তিন দশকের মধ্যে অনিবার্যভাবেই বেশ কিছুসংখ্যক বিপন্ন প্রজাতির জীব বিলুপ্ত হতে চলেছে। মানুষের লোভ দুর্দমনীয়, বন্যপ্রাণীর প্রতি নিষ্করুণ হওয়াতেই তার স্বার্থসিদ্ধি অতএব বন্য-প্রাণীর সংহার ও নিধন বন্ধ হবে এমন আশা করার কোনো কারণ নেই।

প্রকৃতিজগতে সংহার ও নিধনের কি কিছু কমতি আছে? কারণ তো অনেক—আছে খাদ্যাভাব আছে মাংসাশী জন্তু আছে রোগ, আছে প্রাকৃতিক দুর্বিপাক। প্রত্যেকটি কারণের জন্য বহু প্রাণীকে প্রাণ দিতে হয় হচ্ছে। তবুও যে-কথা আগে বলেছি, এতগুলো প্রাকৃতিক কারণ একসঙ্গে হবার পরেও একটা ভারসাম্য বজায় থাকত, থেকে এসেছে। যতো জীব জন্মাতে পারে আর যতো জীবকে মরতে হয়—দুয়ের মধ্যে পাওয়া যায় বেশ একটা মিল থাকার ব্যাপার। যাকে বলা হয় প্রকৃতির ভারসাম্য। সংহারক মূর্তি নিয়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটার আগে পর্যন্ত তাই বন্যপ্রাণী লোপ পাবার মতো অবস্থা তৈরি হতে পারেনি।

বন্যপ্রাণীরা যে শুধু মানুষের হাতে নিহত হবার জন্য নয়, নিজস্ব অধিকারে তাদেরও যে টিকে থাকার অধিকার আছে, এবং বন্যরা বনে প্রকৃতই সুন্দর—এই উপলব্ধি নিয়ে কিছু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবিত হয়েছিলেন এই শতকের গোড়ার দিকে। তার ফলও কিছু পাওয়া গিয়েছে। কোথাও কোথাও বাধা-নিষেধ আরোপ করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যখন-খুশি যেমন-খুশি শিকার ও কোথাও-বা গোটা এলাকায় শিকার, নিষিদ্ধ করা হয়েছে ফাঁদ পেতে বন্যপ্রাণী ধরা বা বন্য-প্রাণীর চামড়া বা পালক নিয়ে ব্যবসা করা, ও এমনি আরো কিছু ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা ইতিমধ্যেই এত বিরাট ও ব্যাপক যে তুলনায় অবলম্বিত ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি বন্যপ্রাণীর ব্যাপারে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই দেশের গভর্নমেন্ট নির্বিকার দেশের জনসাধারণ উদাসীন। ফলে সমস্যার সমাধানের দিকে খুব একটা অগ্রসর হওয়া গিয়েছে তা যেমন নয়, অগ্রসর হওয়া যাবে তার লক্ষণও তেমন নয়। কিছুসংখ্যক প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর আগ্রহ ও অনুভব থাকতে পারে, কিন্তু সমস্যার সমাধানের জন্য চাই জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে গভর্নমেন্ট ও জন-সাধারণের মিলিত তৎপরতা। তা নেই, কদাচ হবে কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

অথচ ক্ষতি হয়ে গিয়েছে অনেকখানি। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তই দেওয়া যেতে পারে। আফ্রিকাকে বলা যেতে পারত বন্যপ্রাণীর বিরাট এক আড়ৎ। কিন্তু তা থাকে না, দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়ররা আসার পর থেকেই নিষ্ঠুর সংহারকার্য শুরু হয়ে যায়। কৃষ্ণসার মৃগ ও জেব্রার দল যে আফ্রিকার জঙ্গলে ছড়াছড়ি ছিল, অবিশ্বাস্য রকমের কম সময়ের মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। মাত্র কয়েকটা বছর, দেশের ভিতরে ঢুকতে বুয়ররা যতোটুকু সময় নিল, তারই মধ্যে লক্ষ লক্ষ মৃগ ও জেব্রা এদের হাতে প্রাণ হারাল। তারপর আফ্রিকার আরও উত্তরে ইউরোপীয়দের দখল যতোই কায়েম হতে থাকে ততোই বেড়ে চলে সাদা-চামড়ার শিকারীদের নৃশংস তাণ্ডব। হাতির দাঁতের জন্য ও অন্য নানা লোভে আফ্রিকার বন্যপ্রাণীর অতি-সমারোহপূর্ণ সমাবেশকে অল্প সময়েই মধ্যে তারা প্রায় শেষ করে আনে। সরকার থেকেও এই শিকারীদের ঢালাও অনুমোদন দেওয়া হয় যাতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য এক-একটি গোটা এলাকা থেকে সকল বন্য-প্রাণী ঝাড়েবংশে শেষ হতে পারে। রাজ-নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এতই দ্রুত ছিল যে সেই বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে বন্যপ্রাণীর নিধনকার্যে স্থানীয় অধিবাসী-দেরও যোগ দিতে বিলম্ব ঘটে না। তুলনীয় এমনি আর এক হত্যাকাণ্ডের নজীর আছে উত্তর আমেরিকায়, গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে—যার ফলে লুপ্ত হয়েছে বিপুলসংখ্যক বাইসন।

এশিয়ায় বন্যপ্রাণীর সংহারকাণ্ড শুরু হয়েছিল আরো অনেক পরে, আফ্রিকায় ও উত্তর আমেরিকায় প্রধান প্রধান বন্যপ্রাণীর দল শেষ হয়ে যাবার পরে। উপনিবেশিক যুগে দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকার শাসন করত ইউরোপীয় জাতিরা কিংবা স্থানীয় রাজারা। বলা বাহুল্য, এই ইউ-রোপীয়রা ও স্থানীয় রাজারাও প্রচুর শিকার করত। কিন্তু যতোই তারা শিকার করুক সেটা সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের রূপ নিতে পারে নি যেমন নিয়েছিল কৃষ্ণসার জেব্রা বাইসনের বেলায় আফ্রিকায় ও উত্তর আমে-রিকায়। এখানে বলা দরকার যে এশিয়ার বন্যপ্রাণী ছিল টুকরো টুকরো অংশে ছড়ানো-ছিটনো, আফ্রিকার মতো ব্যাপক এলাকা জুড়ে একটানা নয়। আফ্রিকায় যে-হারে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল তেমনি হলে এশিয়ার বন্যপ্রাণীও টিকে থাকতে পারত না। তবে এশিয়ার বেলায় বন্যপ্রাণীদের অনেকখানি বাড়িয়েছিল তাদের বাসস্থানের প্রকৃতিও। আফ্রিকায় ও উত্তর আমেরিকায় বন্যপ্রাণীদের আবাস ছিল উন্মুক্ত সমতলে, কিন্তু এশিয়ায় ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিরাট উপনিবেশিক শাসন শেষ হয়ে যায়, বহু এলাকায় শুরু হয় অস্থিরতা ও লড়াইয়ের

সোনার কাঠি

॥ছোটদের মাসিক পত্রিকা॥

১লা বৈশাখ ১৩৮২ থেকে আবার নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে

এ সংখ্যায় যাঁরা লিখছেন: সর্বশ্রী ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ অলোক চক্রবর্তী, গোপাল ভৌমিক, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, স্বপনবুড়ো, ধীরেন্দ্রলাল ধর, ইন্দিরা দেবী, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীবিন্দু বেরা, নির্মলেন্দু গৌতম মোহিত ঘোষ, পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, কমলকৃষ্ণ ভাণ্ডারী ও আরো অনেকে। তাছাড়া থাকছে সুনির্মল বসুর অপ্রকাশিত কবিতা।

বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রতি সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

আপনার বাড়ীতে যিনি খবরের কাগজ দেন তাকে বললেই তিনি পৌঁছে দেবেন "সোনার কাঠি"—ঠিক সময়ে আপনার হাতে। সবচাইতে ভালো গ্রাহক হয়ে যাওয়া। তাহলে "সোনার কাঠি" পেতে আর কোন ভাবনা থাকবে না।

প্রতি সংখ্যা : ১·২৫ পয়সা পূজা ও নববর্ষের বিশেষ সংখ্যা । বার্ষিক সংখ্যা সহ সডাক সতের টাকা।

প্রতিষ্ঠাতা : প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীসুকুমার রায়

প্রকাশক : শ্রীসঞ্জীব দত্তচৌধুরী সম্পাদক : শ্রীহরিবন্ধু মুখটী

দত্তচৌধুরী এণ্ড সন্স এম টি ৭২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

যুগ। সর্বপ্রকারের ব্যাপক ধ্বংসকান্ড চলতে থাকে বর্মায়, মালয়ে, ইন্দোচীনের নতুন দেশগুলিতে ও ইন্দোনেশিয়ায়। এখনো চলছে। তার মধ্যে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে বন্যপ্রাণী। তুলনায় ভারতে কিন্তু অস্থিরতা ছিল না। যে-ধরনের যুদ্ধ ও অরাজকতার দরুন দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলিতে বন্যপ্রাণী লুপ্ত হচ্ছিল, ভারতে সেটি ঘটেনি। কিন্তু ভারতের অন্য যে-ব্যাপারটি ঘটেছে তা আরও মারাত্মক। ভারতে বিরাট বিরাট উন্নয়নমূলক পরিকল্পের রূপায়ণ ও জনবসতির বিপুল বিস্তারের ফলে বনজঙ্গল প্রায় লোপাট হয়ে এসেছে বলা চলে। সঙ্গে সঙ্গে বন্যপ্রাণীরও প্রায় লোপ পাবার মতো অবস্থা। বিশেষজ্ঞদের মতে যেখানে দেশের মোট এলাকার শতকরা ৩৩ ভাগ হওয়া উচিত বনজঙ্গল সেখানে ভারতে আছে মাত্র ২৩ ভাগ—পশ্চিমবঙ্গে তার চেয়েও কম, মাত্র ১৩ ভাগ। এ কারণে, পঁচিশ বছর আগেও ভারতে বন্যপ্রাণীর যে সমারোহ ছিল, এখন তার অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র কোনোক্রমে টিমটিম করছে। এবং যে হারে ভারতের জনসংখ্যা বাড়ছে ও জনবসতির প্রসার ঘটছে, এমনি চললে অচিরেই গোটা দেশের সমস্ত বনজঙ্গল একেবারে সাফ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তখন বন্যপ্রাণীর বিপুল সমারোহের এই দেশে বন্যপ্রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে (হয়তো) মাত্র গোটাকতক অভয়ারণ্য ছাড়া আর কোথাও নয়।

*

ভারতে বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি বিপন্ন করেছে বড়ো বড়ো নদী উপত্যকা প্রকল্প। বাঁধ ও জলাধার তৈরি হবার ফলে এককালের বহু বিখ্যাত বন্যপ্রাণীর এলাকা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। তদুপরি আরো বৃহৎ বৃহৎ এলাকা জুড়ে চাষ ও জনবসতির পত্তন হয়েছে, পশ্চিম ও পুব থেকে শরণার্থীরা এসে জঙ্গল সাফ করে ঘরবাড়ি তুলেছে ও এমনি আরো নানা উন্নয়নমূলক কান্ড-কারখানার দরুন ভারতের বহু জঙ্গল ও সেই সঙ্গে তৎস্থানীয় বন্যপ্রাণী সম্পূর্ণ লুপ্ত। রাষ্ট্রের উদ্যোগে ও সমর্থনে সম্পাদিত এই সমস্ত কান্ডকারখানা দেশের উন্নয়নের পক্ষে বৃহৎ বৃহৎ পদক্ষেপ হিসেবেই অভিনন্দিত হয়ে থাকে। তার দরুন বন্যপ্রাণী যে লোপ পাচ্ছে, দু-একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছাড়া সেজন্য আক্ষেপ করার কেউ নেই। কারও মুখে এমন কথা শোনা যায় না যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা করার সময়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টিও চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত ছিল, হতে পারত, এবং হলে পরে ভারতের বন্যপ্রাণীর জগতে এমন অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটা বিপর্যয়কর ধ্বংসকান্ড সাধিত হত না।

একটি বাঁধ বা জলাধার যখন তৈরি হয় তখনকার সাধারণ ছবিটি কি রকম? হাজার হাজার লোক সহসা এমন এক এলাকায় এসে হাজির হয় যেখানে আগে কোনো জনবসতি ছিল না। তারপরে অল্প সময়ের মধ্যেই আশেপাশের গোটা এলাকা কাঠ ও জ্বালানীর প্রয়োজনে নিষ্পাদক হয়ে যায়, বন্যপ্রাণীরা হয় আশ্রয়চ্যুত ও শিকারীদের শিকার। বাঁধ ও জলাধারের কর্মীরা তাদের খাদ্যের প্রয়োজনেও বহুদূর পর্যন্ত একটা অতি ব্যাপক এলাকা জুড়ে নির্বিচারে বন্যপ্রাণী হত্যা করতে থাকে। বাঁধ বা জলাধারটি তৈরি হতে সাধারণত কয়েক বছর সময় লাগে, নির্মাণকার্য শেষ হলে দেশের উন্নয়নের পক্ষে মস্ত একটি কাজ সম্পন্ন হয় ঠিকই কিন্তু সেখানকার বন্যপ্রাণীদের চিরকালের মতো হারাতে হয়—সেখানে বন্যপ্রাণী ফিরে আসার মতো অবস্থা কদাচ থাকে না।

অন্ধ্রপ্রদেশে যেখানে তুঙ্গভদ্রা বাঁধ তৈরি হয়েছে সেখানে এক সময়ে দলে দলে কৃষ্ণসার ঘুরে বেড়াত। বাঁধের কাজ শুরু হতেই শুরু হয়ে গেল ব্যাপক কৃষ্ণসার হত্যা। স্থানীয় বাজারে ডাঁই করে কৃষ্ণসারের মাংস বিক্রি হতে লাগল। দূরদৃষ্টি, সচেতনতা ও চেষ্টা থাকলে বাঁধের কাজ চালিয়েও কৃষ্ণসারদের একাংশ বাঁচানো যেত। কিন্তু তার কোনোটাই ছিল না, ফলে বাঁধের কাজ যখন শেষ হয়েছে তখন শুধু কৃষ্ণসার নয় বন্যপ্রাণীর ছিটেফোঁটাও গোটা এলাকায় অবশিষ্ট থাকে নি।

এমনি অবস্থা হয়েছে ও হতে চলেছে আরো বহু নদীর বাঁধ নির্মাণে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বন্যপ্রাণীর টিকে থাকার দিক থেকে, এককথায়, ভয়াবহ। সারা রাজ্য থেকে জঙ্গল ও জলাভূমি লোপ পাচ্ছে, সেইসঙ্গে বন্যপ্রাণীও। এই রাজ্যে জনবসতি এমনিতেই যথেষ্ট বেশি তার ওপরে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী এসে আশ্রয় নিয়েছে। এই বাড়তি মানুষের চাপ পড়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। উন্নয়নমূলক কাজের অঙ্গ হিসেবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন রেলপথ রাস্তা ও বিমানবন্দর, স্থাপিত হয়েছে প্রকান্ড প্রকান্ড সামরিক শিবির—তার ফলে বন্যপ্রাণীর আশ্রয় হওয়ার মতো জঙ্গল আর বিশেষ থাকছে না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে নেপাল সিকিম ভুটান থেকে যে-সব বন্যপ্রাণী উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে চলে আসত তারাও আর আসতে পারে না যদি-বা আসে তো জনবসতির ওপরেই তাদের হানা দিতে হয় ও তখন তারা গুন্ডা নামে আখ্যাত হয়ে শিকারীদের শিকার হয়। আরেক বিপদ হয়েছে চা-বাগানের দেশীয় মালিকরা, ইংরেজ প্ল্যান্টাররা চলে যাবার পরে যারা তৎস্থানে অধিষ্ঠিত। আনাড়ীর শিকার করে চলাটা এদের কাছে চিত্ত-বিনোদন, জীপ হাঁকিয়ে হেডলাইটের আলোয় বেপরোয়া বেহিসেবী ও বেসামাল গুলি চালাতে চালাতে বাচ্চা-ধাড়ী নির্বিশেষে হত্যাকান্ড সম্পন্ন করার নাম এদের কাছে শিকার। কোথাও কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকার দরুন ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলির কয়েক লক্ষ কর্মীও চোরা-শিকারে রীতিমতো রপ্ত, আদিবাসীরাও তাদের তীরধনুক নিয়ে বড়ো কম যায় না। সব মিলিয়ে উত্তরবংগ থেকে বন্যপ্রাণী লোপ পাবার মুখে।

রাজ্যের মধ্যবর্তী এলাকায় শরণার্থীদের চাপ সবচেয়ে বেশি, ফলে এই এলাকায় বনজঙ্গল বা ঝোপঝাড় বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই এবং বন্যপ্রাণীও প্রায় সম্পূর্ণভাবেই লুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণে থাকার কথা বিশ্বের এক অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় অরণ্য—সুন্দরবন। হুগলির মোহানা থেকে নোয়াখালি পর্যন্ত বিস্তৃত এই অরণ্যের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দেশ-ভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় পড়েছিল (আয়তনে ১৬২৯-৪ বর্গমাইল)। কিন্তু বন কেটে কেটে বসত হতে হতে এবং বনবিভাগীয় অন্য নানা তৎপরতার ফলে সুন্দরবন যেমন ছোট হয়ে আসছে তেমনি তার বনত্বও খোয়া যেতে বসেছে। ফলে এমনকি সুন্দরবনের অতিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও গোনা-

দীঘা চলুন

লাক্সারি কোচে যাতায়াত ৩০ টাকা

কোচে বসেই পাবেন ফ্রি-স্ন্যাক্স, দেশী-বিদেশী পত্রপত্রিকা ও গান।

যেদিন খুশি চলুন ● যেদিন খুশি ফিরুন

মেট্রোর উল্টোদিকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে রোজ সকালে বাস দীঘা যাচ্ছে।

সৈকতাবাস, ট্যুরিস্ট লজ, ফ্ল্যাট কটেজ, চিপ ক্যান্টিন এবং হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

অফিস ক্লাব, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি গ্রুপের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

মেট্রো সিনেমার উল্টোদিকে ট্যাক্সি এ্যাসোসিয়েশন বুথে বুকিং হচ্ছে।

ট্যুরিস্ট সার্ভিসেস ইণ্ডিয়া

১০ গুড্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট (হাইকোর্টের পাশে) কলকাতা ১

ল্যাক্মে
এক্সাটিকা
ট্যাল্ক
এক্সটিকার মন মাতানো সৌরভ দিকে
দিকে ভেসে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে
চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
ল্যাক্মে

গুনতি যে কটি অবশিষ্ট আছে তাই নিয়ে বন্য অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো বন্য-প্রাণীর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা এই রাজ্যে নতুন নয়। যেমন, অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের একশৃঙ্গ গণ্ডার। যেমন বুনোমহিষ। এই দুটি প্রাণীর কোনোটিই পশ্চিমবঙ্গে আর নেই, শেষোক্ত প্রাণীটি আরো অনেক আগেই সারা ভারত থেকে লুপ্ত। বৃহৎ একশৃঙ্গ গণ্ডার এখনো অবশ্য কোনোক্রমে উত্তরবাংলার কয়েকটি সীমিত এলাকায় ধুকপুক করছে।

উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়িত করার ফলে অরণ্য ও উদ্ভিজ্জের এলাকা লোপ পায়, এ তো দেখাই যাচ্ছে। অরণ্য ও উদ্ভিজ্জের সঙ্গে সঙ্গে বন্যপ্রাণীও লোপ পায়। আমাদের দেশে কোনো প্রকল্প রচনার সময়েই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচিত হয় না। বছরে একবার বন্যপ্রাণী সপ্তাহ অবশ্য ঘটা করেই উদযাপিত হয়। অরণ্য মন্ত্রী বেতারে ভাষণ দেন এবং বন্য-প্রাণীকে গুলী করে হত্যা না করার জন্য আবেদন জানান। তারপরের বছরের অন্য সময়ে অন্য মন্ত্রীদের বেতার-ভাষণে অরণ্য ও বন্যপ্রাণীর লোপ পাওয়াটাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের জয়লাভের নিদর্শন হিসেবে প্রচারিত হয়ে থাকে।

জলাভূমি থেকে নিকেশ করা বা জলা-ভূমি ভরাট করাটাও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। কলকাতার কাছে লবণহ্রদ এলাকায় এমনি একটি কাণ্ড ঘটছে। কিন্তু একবারও ভাবা হয় নি এই লবণহ্রদের এলাকা যে বিভিন্ন জাতের ২৪৮ রকমের স্থানীয় ও যাযাবর পাখি ও ২২ রকমের নানা জাতের স্তন্যপায়ী জীবের আশ্রয় ছিল তাদের দশা কী হবে। জলাভূমির দক্ষিণদিকে ৪০ বর্গমাইল এলাকা এখনো অবশ্য উন্নয়নের কবলে পড়ে নি, এবং পাখিরা সেখানেই অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। আর শুধু তো স্থানীয় পাখিরা নয়, শীতকালে উত্তর থেকে যে হাজার হাজার পাখি আলিপুরের চিড়িয়াখানায় হাজির হয় তারা রাতটুকু কাটাতে আসে এই লবণহ্রদে—এদের সকলের এতকলের এই আশ্রয় এবার বোধহয় শেষ হয়ে গেল। একদল পক্ষীপ্রেমিক চেষ্টা করছেন বটে লবণহ্রদের যেটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে সেখানে একটি পক্ষী-আলয় গড়ে তুলতে, সবিস্তারে প্রস্তাবও রেখেছেন, কিন্তু কতদূর কী হবে বলা শক্ত।

তবে সরকারের দিক থেকে কিছুই করা হয় নি বা হচ্ছে না এমন কথা বলা সত্যের অপলাপ হবে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যখন বৃহৎ বৃহৎ নদী-পরিকল্পনা এবং জলবিদ্যুৎ ও সেচ পরিকল্পনা রচিত হচ্ছিল তখনই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথাও মাঝে মাঝে শোনা যেতে থাকে। যথারীতি কতক-গুলো বোর্ড ও কমিটি গঠিত হয়, পরে স্থাপিত হয় কেন্দ্রীয় বন্যপ্রাণী বোর্ড—এখন যার নাম ভারতীয় বন্যপ্রাণী বোর্ড। কয়েকটি রাজ্যেও এমনিধারা বোর্ড গঠিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভায় ও কেন্দ্রীয় লোকসভায় বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ আইন গৃহীত হয়েছে। তার আগে থেকেই সারা দেশ জুড়ে গোটা পঞ্চাশেক অভয়ারণ্য গড়ে তোলার কথা হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আটটি অভয়ারণ্য, একটি টাইগার পার্ক ও তিনটি মৃগদাব।

তবে এই সমস্ত অভয়ারণ্য সম্পর্কে একটি কথা বলার আছে। বৃহৎ একটি এলাকা জুড়ে থাকা বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক আস্তানা লোপ পাবার পরে ক্ষুদ্র একটি পরিসরে অভয়ারণ্য স্থাপন করলে সদিচ্ছার পরিচয় দেওয়া হয় বটে কিন্তু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রকৃত ব্যবস্থা করা হয় না।

যেমন, পশ্চিমবঙ্গেরই দুটি অভয়া-রণ্য—গোরুমারা ও চাপড়ামারি। দুটিই উত্তরবঙ্গে। গোরুমারার আয়তন ৩-৩ বর্গ-মাইল। সরকারী বিবরণ অনুযায়ী এই অভয়ারণ্যে আছে হাতি, গণ্ডার, গউড়, বাঘ সম্বর কাকর হরিণ বরা হরিণ ও বুনোশুয়োর, এমনকি বুনোমহিষ পর্যন্ত (বুনোমহিষ থাকতেই পারে না, গোটা রাজ্যে একটিও নেই)। চাপড়ামারির আয়তন ৩-৪ বর্গমাইল, সরকারী বিবরণ অনুযায়ী এখানে গোরুমারার সবকটি বন্যপ্রাণীর থাকার কথা। এখন এতগুলো বন্যপ্রাণীকে যদি এতটুকু এক-একটি এলাকায় পোরা হয়েই থাকে তাহলে পরিণতিটা কী দাঁড়াবে? যেসব বন্যপ্রাণীর নাম করা হয়েছে তারা কেউই সামান্য নয়, স্বাভাবিক আস্তানায় থাকলে বিরাট এলাকা জুড়ে চক্কর দিয়ে থাকে—তারা এভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকবে কেন? অভয়ারণ্য ঘিরে রয়েছে চা-বাগান ও লোকালয় বন্যপ্রাণী-গুলো সেখানে গিয়ে হাজির হবে এবং অনিবার্যভাবেই নিহত হবে। সম্ভবত এই দুটি অভয়ারণ্যে বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব শুধু কাগজেকলমে, বাস্তবে নয়। এমনকি এই দুটি অভয়ারণ্যের চেয়ে আয়তনে আরো বড়ো জলদাপাড়া অভয়ারণ্য সম্পর্কেও একাধিক পর্যটক লিখেছেন যে সারাদিন বনবাদাড় চুঁড়ে একটিও গণ্ডার বা বাঘের সাক্ষাৎ তাঁরা পান নি—শুধু হরিণ আর ময়ূর দেখেই ফিরে এসেছেন।

এই এলাকায় যে সীমাহীন অজ্ঞতার সঙ্গে যে অপরিণামদর্শী ধ্বংসকার্য সাধিত হয়েছে তার মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন বনপাল এ সি গুপ্ত, জার্নাল অব দ্য বেঙ্গল ন্যাচারাল হিস্টরি সোসাইটি এপ্রিল ১৯৫৮ সংখ্যায় প্রকাশিত (বালকৃষ্ণ শেষাদ্রীর দ্য টোয়াইলাইট অব ইণ্ডিয়াস ওয়াইল্ড লাইফ পুস্তকে উদ্ধৃত) ঃ

'জলঢাকা নদীর পশ্চিমে ভুটান সীমান্ত থেকে দক্ষিণের দিকে লম্বা জিভের মতো যে অরণ্য চলে গিয়েছে তার নাম তন্তু রিজার্ভ আর এই তন্তুর দক্ষিণার্ধে (নিম্ন তন্তু) গোরুমারা অবস্থিত। গোরুমারার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত গিয়ে মিশেছে হিমালয়ের পাদদেশে কুমানি অরণ্যের সঙ্গে। কুমানি অরণ্যে নকসাল খোলার বাম তীরে ১নং রঙ্গো ব্লকে রয়েছে একটি সল্ট-লিক (যেখানে জন্তুজানোয়াররা লবণের জন্য হাজির হয়)। অতীত থেকে পুরুষানুক্রমে এই সল্ট-লিক হয়ে আছে বহুসংখ্যক তৃণভোজী জন্তুর মিলন-স্থান—তারা আসে পার্শ্ববর্তী ভুটান, কালিম্পংএর পাহাড়-তলি অরণ্য ও তন্তু অরণ্যের দূর দূর অংশ থেকে। এখানে অন্য কোনো সল্ট-লিক নেই যা এই সমস্ত অরণ্যের জন্তুদের

শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বর শিব ও নবগ্রহ মন্দির

তান্ত্রিক আচার্য পণ্ডিত
শ্রীপুরুষোত্তম শাস্ত্রী
১২০-এ, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬
(কালীঘাট দমকল অফিসের সম্মুখে)
(ভক্তবৃন্দ কর্তৃক প্রচারিত)
সময় ঃ সকাল ৯—১২টা
বিকাল ৬—৮টা

কোষ্ঠী এবং ঠিকুজী প্রস্তুত ও বিচার, হস্তরেখা বিচার, ললাট গণনা এবং যে কোন সমস্যা সমাধান ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। বিরুদ্ধ গ্রহ-শান্তি, তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া ও রত্ন নির্বাচন করা হয়। মহাফলপ্রদ, পুনশ্চরণাসিদ্ধ, জাগ্রত তন্ত্রোক্ত কবচ—ত্রিশক্তি ত্রিপুরা কবচ (কর্মে উন্নতি), বগলা কবচ (সর্বশত্রু জয়), মহানবগ্রহ কবচ (সর্বশান্তি), মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ (সর্বব্যাধি ও অকাল মৃত্যুরোধ) ধনদা কবচ (ব্যবসায় উন্নতি ও সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি) এবং আকর্ষণী কবচ (শত্রু ও অভীষ্ট ব্যক্তির আকর্ষণ)। নীল সরস্বতী কবচ (বিদ্যা উন্নতির জন্য)।
১৬/এইচ, মণ্ডল টেম্পল লেন, আনন্দ-ময়ীর মন্দির, নিউ আলিপুর (সার্কুলার রোড, স্টেট ব্যাঙ্ক), কলি-৫৩।
সময় ঃ ৩টা থেকে ৫টা

Standard

প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত এই সল্ট-লিক-এর কৌলিন্যে হাত পড়ে নি— গণ্ডোয়ানা অরণ্যের ভিতর দিয়ে নানাদিক থেকে জন্তুজানোয়ারের চলাচলের অনেকগুলো পদশব্দ-মুখর পথ এসে মিশেছিল এই সল্ট-লিক-এ। বন্য জন্তুজানোয়ারের বিপুল এক সমাবেশ ঘটত এখানে, সল্ট-লিক-এর কিনারে দেখা যেত হাতি গণ্ডার সম্বর চিতল ও অন্যান্য প্রাণী। প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমি এ-অঞ্চলে কাজ করতাম সরকারী বনপাল হিসেবে, আমার মনে আছে সল্ট-লিকের ধারেকাছে যেতেও আমার তখন ভয় করত। যুদ্ধ, দেখা গেল, অনেক কিছুই ওলোটপালোট করে দিতে পারে, যেসব জিনিস ওলোটপালোট করে দিয়ে তার মধ্যে একটি হচ্ছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ। অরণ্য ও বন্যপ্রাণী পরিচালনা করার যেসব মূলনীতি আছে সেগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হল, অরণ্যের সর্বত্র প্রবেশসাধ্য এলাকাগুলোয় চূড়ান্ত শোষণকার্য চলতে লাগল আর বড়ো বড়ো এলাকাকে সাফ করে ফেলা হল শ্রমিক-বাহিনীর ডেরা স্থাপন করবার জন্য। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হবার পরেও কয়েক বছর ধরে এই বেহিসেবী কার্যকলাপ বেপরোয়া চলেছে। বর্তমান বিষয়ের (অর্থাৎ গোরুমারা অভয়ারণ্যে) প্রসঙ্গে বলতে পারা যায়। চতুষ্পার্শ্বের বহু মাইলব্যাপী এলাকার বন্যপ্রাণীর কাছে নক্‌শাল খোলার সল্ট-লিকের যে গুরুত্ব ছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হল, জন্তুজানোয়ারের চলাচলের পথ বরাবর কুমানি ব্লকের ব্যাপক অংশ নিষ্পাদপ করা হল, সল্ট-লিকের বেশ কাছেই অনেকখানি এলাকায় জংগল একেবারে সাফ করে ফেলা হল, সেখানে গড়ে তোলা হল একটি অরণ্যের গ্রাম। এবং পরিশেষে, সল্ট-লিকের অবস্থান যে রংগো ব্লকে, সেটিকে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হল বাণিজ্য ও শিল্প অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে। ভাবতে অবাক লাগে যে কালিম্পং অরণ্যের পরিচালনার জন্য যে কার্যকরী পরিকল্পনা ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে রচনা করা হয়েছিল যাতে ছিল কুমানি ব্লকের সাফাই-নিষ্পাদপীকরণের ব্যবস্থাও সেখানে সল্ট-লিকে বাবার করিডর হিসেবে জন্তুজানোয়ারের চলাচলের স্থায়ী পথ বরাবর অরণ্যের ফাটল বজায় রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। প্রকৃতির সঙ্গে কারবার করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময়েই এমন সব কাজ করে বসে যার পরিণতি হয় দূরপ্রসারী, এবং একবার যে ক্ষতি হয়ে যায় তার সংশোধন পরে দুষ্কর হতে পারে। উপরে যে-সব তথ্যের উল্লেখ করা হল তা থেকে বোঝা যাবে, কয়েক বছর ধরে যে-সব কাজ করা হয়েছে তার মূলে না ছিল নির্ভরযোগ্য স্থানিক জ্ঞান না প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান।'

এই লেখাতে তিনি আরও বলেছেন,

'যদিও প্রায় কুড়ি বছর আগে এই এলাকাকে অভয়ারণ্য করে তোলা হয়েছে, কিন্তু বন্যপ্রাণীর পরিচালনা বলতে বর্তমানে যা বোঝায় সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে এমন কিছুই কখনো করা হয়নি—না এখানে না এর উত্তরে অবস্থিত তেন্ডু অরণ্যের অন্য অভয়ারণ্যে (চাপড়ামারী)। কাজ বলতে মাত্র এটুকুই হয়েছে যে এই এলাকায় বন্দুক চালনা নিষিদ্ধ আর কয়েকজনের ছোট একটা দল রক্ষাকার্যে নিযুক্ত, যে-দলের কারোরই বিশেষ জ্ঞান বা বিশেষ প্রশিক্ষণ নেই। বলা বাহুল্য, চোরা-শিকারীর বন্দুকচালনার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারেনি বরং বাইরের অরণ্যের চেয়ে অভয়ারণ্যের জন্তুজানোয়ারের দিকেই তার মনোযোগটা বেশি করে পড়ে।'

আমাদের দেশে বন্যপ্রাণী কেন লোপ পেয়েছে লোপ পেতে চলেছে, তার কারণগুলো এই উদ্ধৃতিতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে উপস্থিত। মোটামুটি এই হচ্ছে সাধারণ অবস্থা। একমাত্র সুন্দরবন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও স্বাভাবিক অরণ্য বিশেষ কিছু নেই। ফলে একমাত্র সুন্দরবন ছাড়া অন্য কোথাও স্বাভাবিক বিচরণশীল বন্যপ্রাণীও বিশেষ নেই। আছে শুধু গোটাকতক অভয়ারণ্য। সেখানে কতখানি অভয় আর বন্যপ্রাণীর পরিপোষক কতখানি অরণ্য তা ঘোরতর সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সুন্দরবনও ক্রমবিলীয়মান। সব মিলিয়ে এমন দিনও আসতে পারে যখন আর এ-বিষয়ে অবহিত হয়েও কোনো লাভ নেই যে কাগজপত্তর সব ঠিক আছে বটে কিন্তু আসল তোতারই প্রাণ নেই।

*

অতঃপর লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীদের একটি তালিকা দিয়েই এই লেখা শেষ হতে পারে। কিন্তু তার আগে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারণ্যগুলি সম্পর্কে কিছু বিবরণ জানিয়ে রাখলে অতি-উৎসাহীরা হয়তো লাভবান হতে পারেন। কারণ এখনো হয়তো কোনো কোনো অভয়ারণ্যে এমন কোনো কোনো রক্তমাংসের চেহারা দেখা যেতে পারে যা কিছুকালের মধ্যেই মিউজিয়মের খোপে খড়গাদা মূর্তি হয়ে উঠতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে অভয়ারণ্য আটটি— উত্তরবঙ্গে পাঁচটি ও সুন্দরবনে তিনটি। উত্তরবঙ্গের পাঁচটির মধ্যে তিনটি জলপাইগুড়ি জেলায় ও দুটি দার্জিলিং জেলায়।

জলপাইগুড়ি জেলার তিনটি অভয়ারণ্যই সমতলভূমিতে— জলদাপাড়া, গোরুমারা ও চাপড়ামারী। শীলতোর্ষা নদীর তীরে জলদাপাড়ায় রয়েছে বিখ্যাত বৃহৎ একশৃংগ গণ্ডার তাছাড়া অন্যান্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে গউড়, বাঘ, হাতি সম্বর বারাসিংগা চিতল কাকর হরিণ বরা হরিণ গয়াল বা মিথুন। গোরুমারা ও চাপড়ামারীর অভয়ারণ্য সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা চলে বৃহৎ একশৃংগ গণ্ডার সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আছে আসামের কাজিরাংগায় (৪০০) আরো কয়েকটি (১২৫) আসামের মানস সোনাই-রূপা লাওখোওয়া এবং ইত্যাদি অভয়ারণ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে ৫৫টি। সব মিলিয়ে ভারতের বৃহৎ একশৃংগ গণ্ডারের সংখ্যা সম্ভবত ৭৪৫।

দার্জিলিং জেলার দুটি অভয়ারণ্য হচ্ছে মহানন্দা ও সিঙ্গল। প্রথমটি তিন হাজার ফুট উঁচুতে সুফলা থেকে তিনধরিয়া পর্যন্ত সেখানে হরিণ বাঘ হাতি ও ময়ূর দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি দার্জিলিং-এর কাছেই আট হাজার ফুট টাইগার হিলে, সেখানে বন্যপ্রাণী বলতে আছে ভালুক, জংলী ছাগল ও হরিণ।

সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য— সজনেখালি, হ্যালিডে দ্বীপ ও লোথিয়ান দ্বীপ।

সজনেখালি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো অভয়ারণ্য আয়তনে ৩৬২-৪২ কিলোমিটার (১৪০ বর্গমাইল)। এটির খ্যাতি পাখির আশ্রয়স্থল হিসেবে। গত বছর এখানে প্রায় কুড়ি প্রকারের চল্লিশ হাজার পাখির আগমন ঘটেছিল। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় শামুকখোল, প্রায় একুশ হাজার। তাছাড়া বক, পানকৌড়ি দাঁড়কাক তিতি হাটিমাটিম ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ছোট অভয়ারণ্য হ্যালিডে দ্বীপ (৫-৯৬ কিলোমিটার বা ২-৯৩ বর্গমাইল)। বন্যপ্রাণী বলতে গোটাকতক বাঘ বুনো শুয়োর ও চিতল। লোথিয়ান দ্বীপের আয়তন ১৫ বর্গমাইল, সেখানেও প্রায় একই ধরনের বন্যপ্রাণী।

অভিনন্দন গ্রহণ করুন

—oo—

কলিকাতা রেপ্‌টাইল স্কীন শিপার্স এ্যাসোসিয়েসন্‌

৪, কানাই শীল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০১

পশ্চিমবঙ্গে মৃগ-উদ্যান আছে তিনটি— শান্তিনিকেতনের বল্লভপুরে, নদীয়া জেলার বেথুডহরিতে ও ২৪ পরগণার পাড়মাদনে।

তাছাড়া ভারতের নবম ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপিত হতে চলেছে সুন্দরবনে। এই প্রকল্পের সদর দপ্তর গোসাবায় এবং দেড় বছরে তিন লক্ষ টাকা খরচ করার পরেও কাজ বিশেষ হয়নি। এমনকি সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কত সেই সংখ্যাটিও এখনো পর্যন্ত নির্ণীত—কারও মতে প্রায় ২০০০ কারও মতে ১০৮।

×

লুপ্ত বন্যপ্রাণীর মধ্যে সবার আগে উল্লেখ্য নাম চিতা। প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে, সম্ভবত ভারতের মাটিতে শেষ বন্য চিতা দেখা গিয়েছে ১৯৫২ সালের ২৮-২৯ মার্চের রাত্রিতে, দক্ষিণ ভারতের চন্দ্রগিরির কাছে একটি রাস্তায়। অথচ এক সময়ে সারা ভারত জুড়ে এই বন্যপ্রাণীটি ছড়ানো ছিল— বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত, উত্তরে বালুচিস্তান হয়ে পারস্য, তারপরে সিরিয়া তারপরে আফ্রিকা। রাজস্থান ও মধ্যভারত থেকে চিতা অদৃশ্য হয়ে যায় এই শতকের শুরুতে উত্তর ভারত থেকে ১৯২০ সাল নাগাদ। কিন্তু গত শতকের শেষদিকেও ভারতের কোনো কোনো অংশে প্রচুর চিতা ছিল। উত্তর ভারতের পরে বুন্দেলখণ্ড ও মহাদেও হিলস থেকে চিতা অদৃশ্য হয় ১৯৩৫ সাল নাগাদ উত্তর দাক্ষিণাত্য থেকে ১৯৪০ সাল নাগাদ। ১৯২০ সালের পরে সম্ভবত অল্প কয়েকটিই বন্য চিতা বেঁচেছিল, যতোদূর ধারণা করা যায় দাক্ষিণাত্যের দিকে। কিন্তু তুঙ্গভদ্রা বাঁধ নির্মিত হবার সময়ে শেষ চিতাও লোপ পেয়েছে। জনবসতির চাপে ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের দাপটে এমন বিপুলবিস্তৃত একটি বন্যপ্রাণীর এমনভাবে লুপ্ত হয়ে যাবার এ এক নির্মম দৃষ্টান্ত।

সিংহ হচ্ছে অপর এক বন্যপ্রাণী যার বিস্তার একসময়ে এশিয়ার বেশ ভালোই ছিল— এশিয়া মাইনর ও আরব থেকে পারস্য হয়ে ভারত পর্যন্ত। এখন গুজরাটের গির অরণ্যে অল্প কয়েকটিতে মাত্র এসে ঠেকেছে। যতোদূর ধারণা করা যায়, বন্যপ্রাণী হিসেবে সিংহ অদৃশ্য হয়েছে বিহারে ১৮১৪ সালে কচ্ছে ১৮৩০ সালে, দিল্লীতে ১৮৩৪ সালে, বাহাওয়ালপুরে ১৮৪২ সালে, বিন্ধ্য ও বুন্দেলখণ্ডে ১৮৬৫ সালে মধ্যভারত ও রাজস্থানে ১৮৭০ সালে, পশ্চিম আয়াবল্লীতে ১৮৮০ সালে। ১৮৮০ থেকে নতুন শতক শুরু হবার সময়ে গির অরণ্যে সিংহের সংখ্যা ছিল গোটা বারো। তারপরে অবশ্য সিংহ শিকার বন্ধ হয়েছে এবং গির অরণ্যে সিংহের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ন্ত পেয়েছে ১৯৬৮ সালে ছিল ১৬২টি।

লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় প্রাণীর একটি তালিকা এবারে উপস্থিত করা যেতে পারে (ব্র্যাকেটে ইংরাজি নাম) ঃ

স্তন্যপায়ী ঃ বিন্টুরং (ভালুক-বিড়াল (বিন্টুরং) কৃষ্ণসার (ব্ল্যাক বাক)। থামিন (ব্রাউ-অ্যান্টলাড ডীয়ার বা থামিন)। কারাকাল (শিয়াগোস) (ক্যারাক্যাল) চিতা (চিতা) চিত্রিত চিতাবাঘ (আমাচিতা) (ক্লাউডেড লেপার্ড)। সিন্ধুগাভী (সিন্ধু ধেনী (ডুগঙ্গা)। মেছো বিড়াল (ফিশিং ক্যাট)। সোনা বিড়াল (গোল্ডেন ক্যাট)। সোনালী হনুমান (গোলডেন ল্যাঙ্গুর)। বন্য শাসক (হিসপিড হেয়ার)। উল্লুক (হুলক)। সিংহ (ইন্ডিয়ান লায়ন)। জংলী গাধা (বুনো গাধা) (ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড অ্যাস)। নেকড়ে (ইন্ডিয়ান উল্‌ফ)। হাঙ্গাল (কাশ্মির স্ট্যাগ)। চিতাবিড়াল (বনবিড়াল) (লেপার্ড ক্যাট)। পান্ডা, লাল পান্ডা (লেসার বা রেড পান্ডা)। কেশরী বানর (কালবানর) (লায়নটেইল্ড ম্যাকাক্)। ছোট লজ্জাবতী বানর (লোরিস)। লিংকস (লোমশকর্ণ) (লিংক্স)। গন্ধ গকুল (মালাবারী) (মালাবার সিভেট)। দোসাল (চিত্রিত বিড়াল) (মার্বল্ড ক্যাট)। মারখর (মারখর)। কস্তুরী মৃগ (মাস্ক ডীয়ার)। নয়ান (ওভিস অ্যামন বা নিয়ান)। হাঁড়িমুখো বিড়াল (প্যালাসের বনবিড়াল) (প্যালাস্স ক্যাট)। বনরুই (প্যাঙ্গোলিন)। বামন বরাহ (বরাহক) (পিগ্‌মি হগ্)। ভারতীয় একশৃঙ্গ গণ্ডার (রাইনোসেরাস)। নীমাঙ্গি বিড়াল (রাস্টি স্পটেড ক্যাট)। বড় লজ্জাবতী বানর (স্লো লোরিস)। তুষার চিতাবাঘ (স্নো লেপার্ড)। চিত্রিত লিনসাং (স্পটেড লিন্‌সাং) বাবাসিঙ্গা (সোয়াম্প ডীয়ার)। মিশমি টাকিন বা মিশমি টাকিন)। তিব্বতী চিনকারা (টাইবেটান গ্যাজেল)। তিব্বতী জংলীগাধা, তিব্বতী ঘোরবন্য (টাইবেটান ওয়াইল্ড এ্যাস) বাঘ (টাইগার)। খরিয়াল (সোপু) (উরিয়াল বা শাপু)। বুনো মোষ (ওয়াইল্ড বাফেলো)। চিতাবাঘ (লেপার্ড বা প্যানথার)। নীলগিরি হনুমান (নীলগিরি ল্যাঙ্গুর)। নীলগিরি থর (নীলগিরি থর) (উভচর ও সরীসৃপে ঃ কুমির (ক্রোকোডাইল)। মেছো কুমির। নোনা কুমির। ঘড়িয়াল (ঘড়িয়াল) (পাখি) বাজা (বাজা)। চির (চিয়ার ফেজেন্ট)। লুকনা (গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড)। রাজধনেশ (গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিল)। জার্ডনের নুকরি (জার্ডন'স কোর্সার)। দেড়েল শকুন (ল্যামারগাইয়ার) বড় বাজ (লার্জ ফ্যালকন) বড় সাহিন ছোট সাহিন। তুরমতি। পাহাড়ী বটের (মাউন্টেইন কোয়েইল) নারকুন্ডি ধনেশ (নারকোন্ডাম হর্নবিল) কোঙ্গা (নিকোবার মেগাপোড) ময়ূর (পীফাউল)। গোলবসার (পিংকহেডেড ডাক্) হীরালাল শেলটারের মোনাল (সক্রেটারস মোনাল) তুণী, সাইবেরীয় সাদা সারস (সাইবেরিয়ান হোয়াইট ক্রেন) মতিলাল (ট্র্যাগোপান ফেজেন্টস) শ্বেতোদর সিন্ধু ঈগল (হোয়াইটবেলীড সী ইগ্‌ল) রূপাকানি ফেজেন্ট (হোয়াইট-ইয়ার্ড ফেজেন্ট) শ্বেতপক্ষ বুনোহাঁস (হোয়াইট-উইংগড উড ডাক) ('সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার বন্য প্রাণী সংখ্যা ১৯৭৩ থেকে এই তালিকা সংগৃহীত)

লক্ষ্য করবার বিষয় বাঘও এই তালিকা অন্তর্ভুক্ত। বাঘ লুপ্ত নয়, লুপ্তপ্রায়ও নয়, বলা যেতে পারে বিরল। এখন থেকে যদি বিশেষ সংরক্ষার ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে চিতার মতো বাঘও লুপ্ত হতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অনেক প্রাণী সম্পর্কেই এই কথা।

বন্যপ্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এখনো সময় আছে। বন্যপ্রাণী আর অরণ্য যদি না থাকে তাহলে সে এক অতি দীনহীন অবস্থা।

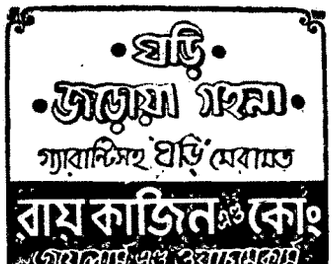

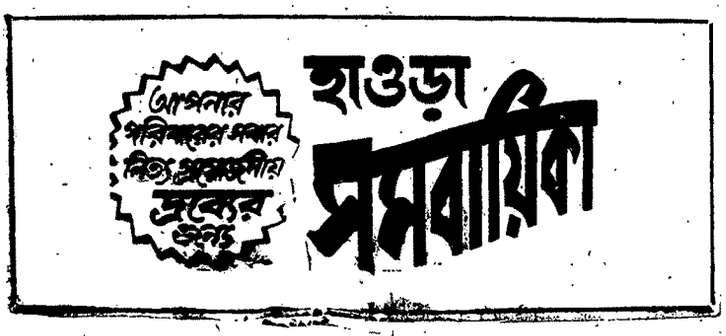

বাংলার পাখিরালয়

মহম্মদ সফিউল্লা

পশ্চিমবঙ্গে পাখিরালয় বলতে বোঝায় সুন্দরবনের পীরখালি ব্লকের সজনেখালি। এই পাখিরালয়টি স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে। ষাটের দশকে এখানে প্রথম পাখি আসা পরিলক্ষিত হয়। সজনেখালিকে অভয়ারণ্য বলে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১৯৬০ সালের ৭ মে।

পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও এত বেশী সংখ্যক জলচারীদের দেখা যায় না। সারা বছর ওরা ওখানে থাকে না। ওরা দলে দলে এসে বাসা বাঁধে বর্ষাকালে—প্রজনন ঋতুতে। সংখ্যায় কয়েক হাজার। প্রায় ২৮—৩০ প্রজাতির এদেশীয় পাখি সেখানে নীড় রচনা করে। লোহার জং, ছোট ও বড় কোর্চে বগলা, ছোট ও বড় পানকৌড়ি, ক্যায়েম, মানিক জোড়, শামুকখোল, মদনটাক প্রভৃতি হরেকজাতের হরেক রকমের পাখি। বর্ষায় মেঘ-মেদুর দুপুরে সবুজ বনানীর শীর্ষে শীর্ষে অজস্র শামুকখোলের বাসা দেখা যায়। সে ভারি চোখ জুড়ানো দৃশ্য। সজনেখালির গরান কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে কাঠের পাটাতনে উঠলে আপনি মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। অজস্র শামুকখোল বাইন, গরান, কেওড়ার সবুজ ডাল ভেঙ্গে মুখে করে উড়ে এসে নীড় রচনা করছে। কতক পাখি কাঁচা বাসায় ডিমে তা দিচ্ছে। সংখ্যায় শামুকখোলই বেশী। অন্যান্য পাখি সংখ্যায় কম, মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হেথা-হোথা বাসা বানায়। বেশীরভাগ গাছই নীচু এবং ঝাঁপড়ি। একই গাছের বিভিন্ন ডালে কয়েকটা করে বাসা। বাসার আকার চুপড়ির মত, ডালপালা দিয়ে তৈরী। ডিমের রং সাদা ফিকে গোলাপী বা হাল্কা নীল। আকার অনেকটা হাঁস ও মুরগীর ডিমের মতই। শামুকখোল বড়ই উদাসীন তার ডিম ও বাচ্চাদের সম্বন্ধে। কত ডিম যে নীচে পড়ে যায় কত যে কাকে নিয়ে পালায় কত বাচ্চা যে চিল কাকের পেটে যায় তার ইয়ত্তা নেই। সেদিকে শামুকখোলের ভ্রূক্ষেপ নেই— নির্বিকারভাবে ওরা ডিমে তা দিয়ে যায়। ওদের শত্রু সুন্দরবনের তারকেশ্বর বা সোনা গো-সাপ। ওরা গাছ বেয়ে উঠে বহু ডিম খেয়ে নষ্ট করে। শ্যালোয় ভরা প্যাচপেচে কাদায় নামলে অজস্র ভাঙ্গা ডিম ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিত্তিছান হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যাবে।

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ থাকায় অভয়ারণ্যটি নিরাপদও বটে। পক্ষীশাবকদের নরম মাংসের লোভে বড়মাপ্পা হামেশাই আশ-পাশে ঘুরঘুর করে বা হেতাল বনে ওৎ পেতে বসে থাকে। সুযোগ পেলে তাজা মানুষেরও ঘাড় মটকায়।

সজনেখালি অভয়ারণ্যটি স্থানীয় অধিবাসীরা পাখিরালয় বলে থাকেন। নামটি সংগত এবং শ্রুতিমধুর ও স্পষ্ট।

কয়েক বছর পূর্বে হুগলি জেলার ঝাউতলার মোড় পেরিয়ে যাওয়ার সময় শাহমাণিতলায় একটা পুকুরে অজস্র হাঁস দেখেছিলাম। কৌতূহলী হয়ে পুকুর ধারে যেতেই গ্রামের লোক হাঁ হাঁ করে তেড়ে এলেন— অবশ্য সংগত কারণেই। হাতে আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র না থাকলেও আমাদের আঁত আগ্রহ তাঁদের মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল।

পুকুরটির পাড়ে পীরের আস্তানা। মাজার সংলগ্ন মজা পুকুরের পাট শ্যাওলা ঝাঁজি হিঞ্চে, কলমি ও টোপা পলোর দামের মধ্যে অজস্র সরাল নীল-পাখা হাঁস বা জিরিয়া হাঁস। মরালগুলো বড় চঞ্চল আর ছটফটে। সারাক্ষণ মুখে ওদের পিঁক পিঁক ডাক লেগেই আছে, তাই ওদের আর এক নাম শিস দেওয়া হাঁস। কয়েকটা যাযাবর দিগ্-হাঁস পুকুরের মাঝ বরাবর ভেসে বেড়াচ্ছিল। কিছু নাকতা হাঁস ও গুগরাল অপর পাড়ে জলের কিনারে দেখা গেল।

তখন সারা ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপযোগী কোন একটা আইন প্রচলিত ছিল না। তথাপি স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় ও যত্নে ঐ জলাশয়টি জলচারীদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীদের আগ্রহ ও মমতার অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে পারিনি।

দুঃখের বিষয় শিকারীর বন্দুকের নল থেকে রেহাই পেলেও ব্যবসায়ীর লালসার হাত থেকে পাখিগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পুকুরের পশ্চিমদিকে কয়েকটা গভীর বালিখাদ থেকে বালি তোলার কাজ তখন চলছিল। পাম্পের ভটভটানি সহ্য করেও পাখিগুলি ওখানে টিকেছিল। কিন্তু যেদিন বালিখাদের অতল গহ্বরে পুকুরটি তলিয়ে গেল সেদিন দিশেহারা হাঁসের দল কতই বা মারা পড়ল কতক ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

ছোটখাট পাখির আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামেই দেখা যাবে। হুগলি জেলার একটা ছোট গ্রাম আউষবালি। গ্রামের ভিতরে বিশাল বিশাল বট অশ্বত্থ ও কাঠ বাদাম গাছের ঘন জটলা। ঐসব গাছের ডালে অজস্র বাকচা বংশানুক্রমে বসবাস করছে। গ্রামবাসীরা আজও যত্ন করে ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছেন। আসন্ন সন্ধ্যায় নিশাচর ঐসব ওয়াক বক যখন ডাকতে ডাকতে আহার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে তখন অতি বড় বেরসিকের তা ভাল লাগবে।

বাংলায় এমন জলাশয় বহু আছে যেখানে শীতের মরশুমে নানা জাতের যাযাবর ও দেশী-বিদেশী হাঁসের এবং অন্যান্য জলচর পাখিদের দেখা যায়। শীতকালটা ঐসব জলাশয়ে কাটিয়ে ওরা আবার যে যার দেশে ফিরে যায়।

যাযাবর জলচরদের মধ্যে ডুবুরি লালশির হাঁস (স্ত্রী) এবং এদের পুরুষ হাঁস বাংলায় যাদের ডুমার হাঁস বলে তারা ভূতি হাঁস গুলাবশর দিগহাঁস লালশির বাসুনিয়া হাঁস শান্তমুখি হাঁস বড় ও ছোট রাঙ্গা মুড়ি

হাঁস চিলহা হাঁস প্রভৃতিদের নির্জন জলাশয়ে দেখা যায়।

রাজহংসদের মধ্যে তিন ধারিয়া হাঁস এবং কালিদাসের কাব্যের বিখ্যাত কদম্ব রাজহংস বাংলায় যাকে জলহংস বলে তাদের দেখা যায়। শ্যোয়ান বা মরাল বাংলায় কেন ভারতবর্ষেও দুষ্প্রাপ্য।

দেশী হাঁস যেমন নাকতা, সরাল, ষড় সরাল গুগরাল বালি হাঁস প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গা থেকে উভয় বাংলায় জলাশয়ে উড়ে আসে। খালবিলে বা নির্জন দীঘির ইঁদুরকানি পানা, হিঞ্চে ও কলমিলতার ঘাসের মধ্যে ওদের আহার অন্বেষণে ব্যস্ত দেখা যায়।

যাবাবর অন্যান্য জলচারীদের মধ্যে শ্বেত মক বা কৃষ্ণ বক এদেশে দেখা গেলেও এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা নয়।

এদেশীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সাদা কাক সংস্কৃতে যাকে কঙ্ক বলে তারা লাল কাক কোঁচ বক খুন্তে বক মদনটাক মোনাজংঘা, শামুকখোল মানিকজোড় লোহারজং প্রভৃতিই প্রধান।

বাংলায় সাধারণত সোআন গুস ম্যার গ্যানস্যার ডাক টীল এসবকেই হাঁস বলা হয়। ইংরাজীতে ওদের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিভিন্ন অর্থদ্যোতক। বনফুল তার ডানায় এবং শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর বাংলার শিকার প্রাণী গ্রন্থে ওদের যে নামকরণ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। ওরা সেখানিকে মরাল গুসকে রাজহংস ম্যারগ্যানস্যারকে বিচিত্র হংস, ডাক এবং টীলকে শুধু হংস বলার পক্ষপাতী। এই নামগুলি বাংলায় চালু হওয়া উচিত। শুধু ম্যারগ্যানস্যারকে বিচিত্র হংস না বলে চিত্রিত হংস বললেই বোধ হয় ভাল শোনায়।

গগনবেড়। ফটো : সমরজিৎ

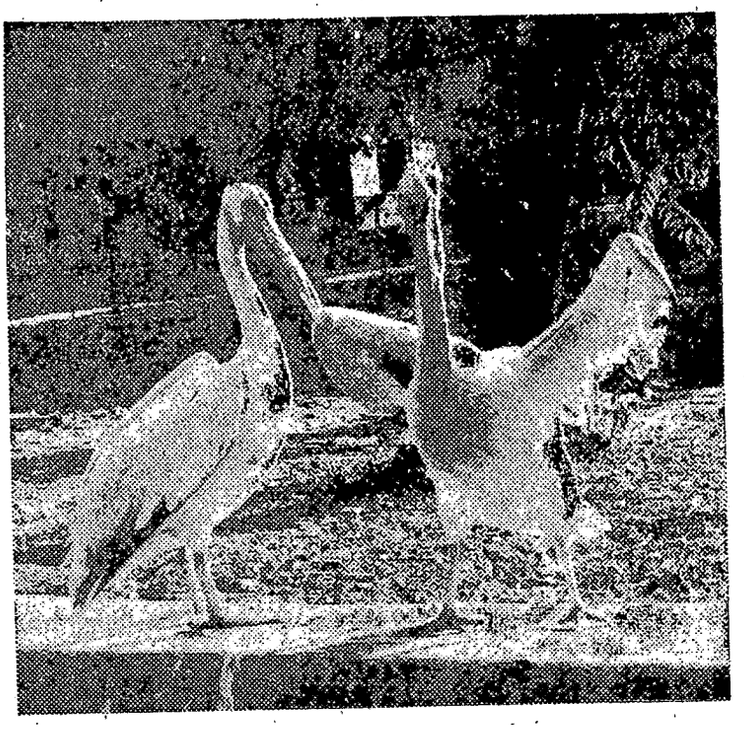

ঐসব দেশী-বিদেশী হাঁসের দল ও অন্যান্য জলচর পাখি সুদূর সুমেরু অঞ্চল ইউরোপ উত্তর এশিয়া সাইবেরিয়া চীন তুর্কিস্থান পারস্য কাশ্মীর লাদাক তিব্বত প্রভৃতি স্থান থেকে হাজার হাজার মাইল নির্ভুলভাবে আকাশপথে পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল ও উভয় বাংলার বিলে বাঁওড়ে ভীড় জমায়। শীতকালটা এদেশে কাটিয়ে ওরা যে যার দেশে ফিরে যায়। ঐসব জলাশয়গুলিকে একটু সংরক্ষিত করলে এবং ওদের যাতায়তের পথ নিষ্কণ্টক হলে বহু বিহঙ্গালয় গড়ে উঠতে পারে।

কলকাতার চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক হাঁসের দেখা পাওয়া যায় না। চিড়িয়াখানার লেকের পাখির উপনিবেশটিও স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে। লেকের আদি বাসিন্দা একদল কোঁচ বক। ওদের হটিয়ে জায়গা দখল করে নিশাচর ওয়াক বকের দল। তারপর আসে পানকৌড়ি ও তার জাতভাই গয়ার পাখি। ওরা আবার ওয়াক বকের কিছুটা জায়গা দখল করে নেয়। এখন ওদের মধ্যে এক অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী, যে যার আস্তানায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। পানকৌড়ি ও গয়ার লেকের দ্বীপগুলোয় স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। বাকচা দম্পতি তাদের কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে লেকের ধারে বট অশ্বত্থ, রবার কাঁটা মেহদি গাছে ঘরকন্না করছে।

চিড়িয়াখানায় পাখির উপনিবেশও তাদের গতিবিধি তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন ওখানকার তৎকালীন স্বনামধন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবু রামব্রহ্ম সান্যাল।

লেকের জলে কয়েক হাজার অতিথি পাখি দিগহাঁস নাকতা গুগরাল নীল পাখা হাঁস এবং বালিহাঁসদের শীতকালে দেখা যায়। দলে ভারি সরালের দল। দিগ হাঁস সংখ্যায় কম, নাকতা আরও কম। শেষের দিকে কয়েক হাজার যাযাবর নীলপাখা হাঁস (Garganey Teal) আসে। ওরা [illegible] সুমেরু ইউরোপ ও সাইবেরিয়ার

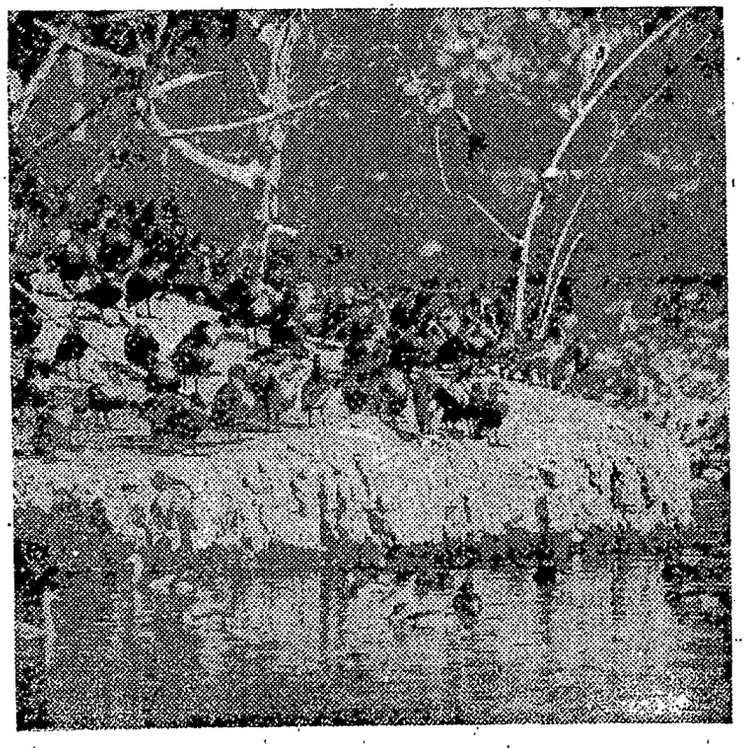

সরাল

অভিনন্দন গ্রহণ করুন

—ঃঃ—

ইষ্টার্ণ হাইড্ অ্যান্ড স্কীন্ এজেন্সী

১০, টিরাটা বাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

ফটকা

হরিয়াল

রাজ ধনেশ

তুষারাচ্ছাদিত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মাইল আকাশপথে পাড়ি দিয়ে লেকের জলে আসে। শীতকালটা এই লেকের জলে কাটিয়ে ওরা আবার ফিরে যায়। কাজেই চিড়িয়াখানার জলাশয়টি স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে আর এক বিহঙ্গালয়। সম্প্রতি এটির রক্ষণাবেক্ষণে চিড়িয়াখানা পরিচালন কমিটি তৎপর হয়েছেন।

পশ্চিম বাংলায় পর্যটন দপ্তরের সহায়তায় কয়েকটি ভাল পাখিরালায় গড়ে উঠতে পারে। নদীমাতৃক বাংলায় জলাশয়ের অভাব নেই—অভাব উদ্যমের এবং সরকারী তৎপরতার। হুগলি হাওড়া মেদিনীপুর চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি বাংলার প্রত্যেকটি জেলাতেই পাখিরালয় গড়ে তোলা যায়।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনটি সম্প্রতি সারা ভারতবর্ষে চালু হয়েছে। আইনটির প্রয়োগ এই রাজ্যে গত ১৯৭৩ সালের মে মাসে সুরু হয়েছে। এর ফলে নির্বিচারে পাখি শিকার বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত স্থানও প্রচুর চাই শুধু সুষ্ঠ পরিকল্পনা এবং বন ও পর্যটন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগ। ছোট রাজ্য হরিয়ানার সুলতানপুরে যদি চমৎকার বার্ড স্যাংচুয়ারী গড়ে উঠতে পারে, এই রাজ্যেই বা কেন গড়া যাবে না? পশ্চিম বাংলায় বা হরিয়ানার কাল তিতিরের (black Patridge) র মত বাংলার কেন নিজস্ব পাখিকে রাষ্ট্রীয় পাখি (State bird) র মর্যাদা কেন দেওয়া হবে না? পশ্চিমবঙ্গের জনগণের বিহঙ্গপ্রেমিক বলে খ্যাতি আছে। কিছু দৃষ্টান্ত আমরা দিয়েছি, পরিশেষে আর একটা উদাহরণ দেবো।

দেখা গেছে যেখানেই একটু সংরক্ষণের চেষ্টা করা গেছে, সেখানেই সে প্রয়াস সফল হয়েছে। এই রাজ্যে তিনটি মৃগদাবে প্রচুর পাখি আসে। বল্লভপুরের কৃষ্ণসার মৃগদাবে দেশী বিদেশী হাঁসের সমাগম হয়। পাড়ামাদন ও বেথুয়াডহরির মৃগদাবে ও অন্যান্য দেশী বিদেশী যাযাবর পাখি দেখা যায়।

আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি হুগলি জেলার পোলবা-দাদপুর ব্লকের রাজহাটির ময়ূরের উপনিবেশটি সম্বন্ধে কিছু না বলি। কয়েক দশক ধরে ময়ূরের দল রাজহাটির উত্তরপাড়ায় নীলমণি চক্রবর্তীর পড়ো ভিটেয় আশ্রয় নিয়েছে। ভাঙ্গাচোরা দালানের কুঠুরিতে কয়েক যুগ ধরে ময়ূরগুলি বাস করছে। আশপাশের বাঁশবন ও সিমুল গাছও ওদের আশ্রয়স্থল। গ্রামবাসীদের হিসাব অনুযায়ী ওখানে প্রায় ৫০-৬০টি ময়ূর আছে। বিহঙ্গপ্রেমিক গ্রামবাসী কঠোরভাবে জাতীয় পাখিকে সংরক্ষণ করে আসছেন। স্থানীয় অঞ্চল পঞ্চায়েতের সচীব আক্ষেপ করে জানালেন যে চোরাগুপ্তা শিকারে দুচারটে ময়ূর প্রায়ই মারা পড়ে। তিনি সরকারী উদ্যোগে সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার দাবী জানান। জাতীয় পাখির এই কদর নিঃসন্দেহে তাঁদের বিহঙ্গপ্রীতিরই নিদর্শন।

ময়ূরের বসবাস শুধু রাজহাটি অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মাইলখানেক এলাকার মধ্যে ওদের চলাফেরা। উত্তরে সরস্বতী নদীর কিনার পর্যন্ত ওদের বিচরণভূমি। তবে ওদের কেকাধ্বনি সাঁঝ সকালে দেবানন্দপুরের আমবাগানে, পটুস ঝোপে বা আসামলতার জঙ্গলে শোনা যায়। কখনো সখনো সরস্বতী নদীর ধারে ভাদ্রের মেঘলা দুপুরে পেখম মেলে ওদের সঙ্গিনীর মনোহরণ করতে দেখা যায়।

পশ্চিম বাংলায় সম্ভাবনাময় বার্ড স্যাংচুয়ারী গড়ার প্রচেষ্টা সরকারীভাবে হওয়া উচিত। পর্যটন দফতর ও বনবিভাগের যৌথ উদ্যোগে কয়েকটি পাখির অভয়ারণ্য গড়ে তুললে পর্যটনশিল্পের যেমন উন্নতি হবে, বৈদেশিক মুদ্রারও আমদানী বাড়বে। বাদার নোনামাটির অরণ্যে কি রাঢ় অঞ্চলের গৈরিক মাটিতে কি ডুয়ার্স ও তরাইয়ের বনভূমিতে সব জায়গাতেই এই ধরনের পাখিরালয় গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। একটু উদ্যোগী হয়ে আমরা কি সে সুযোগ গ্রহণ করবো না? বাংলার বিহঙ্গপ্রেমিকদের সে আকাঙ্ক্ষা কবে পূরণ হবে?

বউকথাকও

শালিক

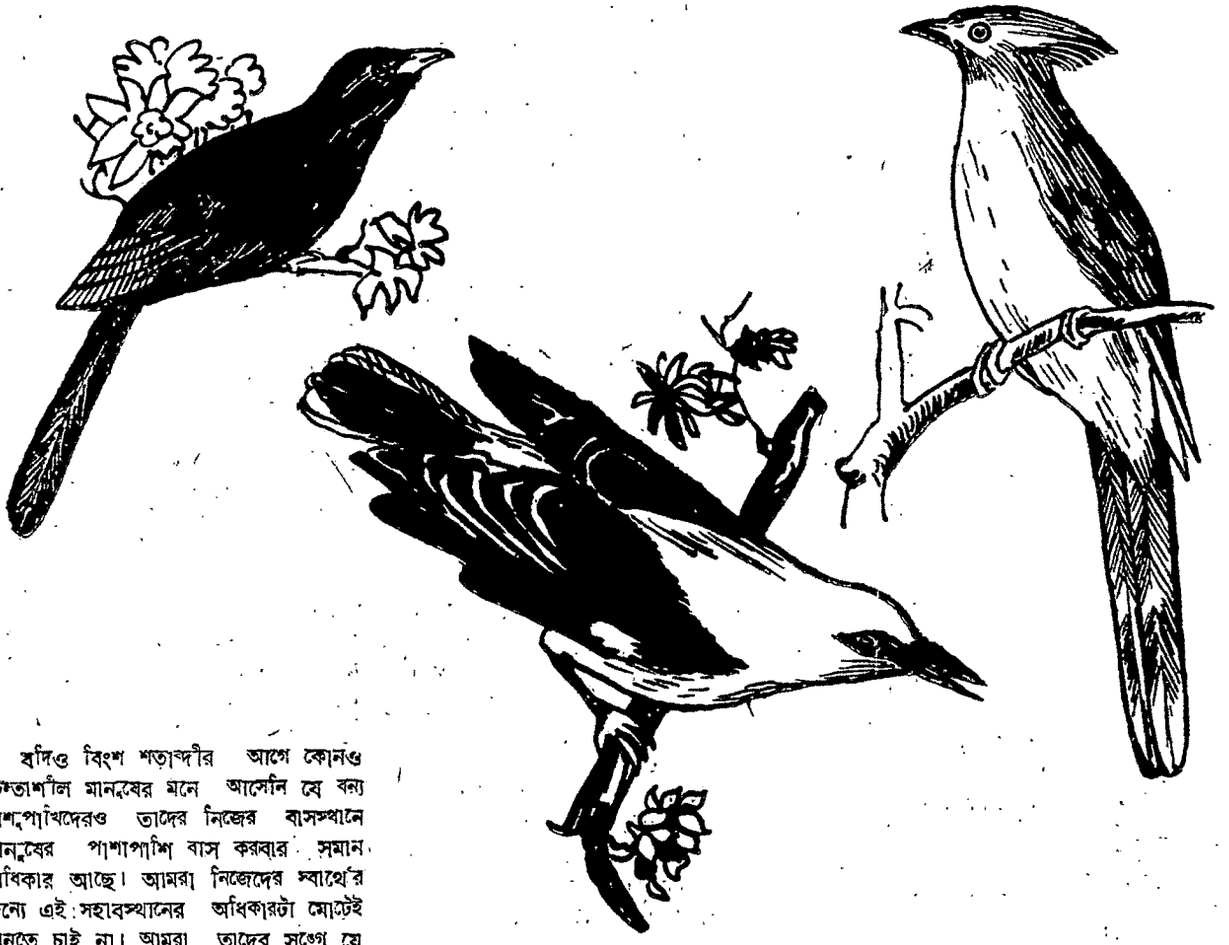

বাংলার লুপ্তপ্রায় পাখি অতীত হোম

যদিও বিংশ শতাব্দীর আগে কোনও চিন্তাশীল মানুষের মনে আসেনি যে বন্য পশুপাখিদেরও তাদের নিজের বাসস্থানে মানুষের পাশাপাশি বাস করবার সমান অধিকার আছে। আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্যে এই সহাবস্থানের অধিকারটা মোটেই মানতে চাই না। আমরা তাদের সঙ্গে যে যথেচ্ছাচার ব্যবহার করতে পারি না এই জ্ঞানটুকু অর্জন করার নিতান্ত প্রয়োজন। ভারত সরকার বর্তমানে স্বল্পমাত্রায় সচেতন হয়ে কিছু বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করছেন বটে কিন্তু তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা না থাকলে পশুপক্ষী সংরক্ষণ অসম্ভব।

যথেচ্ছাচার বলতে শুধু অযথা বন্দুক দেগে বা বিষপ্রয়োগে হত্যার কথা বলছি না বলছি বাঁধ ও নানাবিধ প্রকল্পের কথাও। সেখানেও চিন্তা করা হচ্ছে না সেখানকার বন্যপ্রাণীদের অবস্থার কথা। এই সব প্রকল্পের স্থান নির্বাচন করা উচিত জীব-বৃত্তান্তবিদ এবং পরিবেশ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁদের বিশেষ জ্ঞান আছে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও পশুপাখি সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় করতে হবে না হলে সেইসব প্রাণীদের আমরা চিরকালের মতো হারাব। ইতিমধ্যে বহু পাখির চিহ্নমাত্র নেই আমাদের এই পশ্চিমবাংলায়।

কলকাতার উপকণ্ঠে ছিল প্রকৃতির সৃষ্টি জলার পাখির দিগন্তব্যাপী এক অপূর্ব আবাসস্থল ও বিচরণভূমি। স্থানীয় পাখি ছাড়াও কত সহস্র সহস্র পাখি প্রতি বছর পরিযায়ী হয়ে যে আসত তার আর ইয়ত্তা নেই। আসতে শুরু করত অকটোবরের শেষে। শেষ পাখির দল যেত মার্চের শেষে। ওটা কিন্তু অভয়ারণ্য বা সাংচুয়ারি ছিল না তাই হাজার হাজার পাখি মারা পড়ত পাখি শিকারীদের হাতে নানাভাবে। তবু তারা আসত সুদূর উত্তর মেরু স্ক্যান্ডি-নেভিয়ায় শুরু করে বৈকাল হ্রদের তীর থেকে। আসতে তাদের হতোই। তাদের উপ-যোগী এমন আবাসস্থল পশ্চিমবঙ্গে আর তো বিশেষ ধারে কাছে ছিল না এক সুন্দরবনের খাল-বিল নদী ছাড়া। পাখিদের এই আবাসস্থলের নাম ছিল—বাদা লবণহ্রদ বা সল্টলেক।

এই বাদা বা লবণহ্রদ আমায় আকর্ষণ করত অদ্ভুতভাবে। শরতের শুরু থেকে গ্রীষ্মের আগে পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতাম পিকনিক করতাম শিকার করতাম। শিকার করলেও কোনোদিনই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হত্যা করিনি। আটটির বেশী গুলি কখনও সঙ্গে নিইনি। সূর্য ওঠার আগে ফিরতাম কখনও বেলা একটা দুটোয় কখনওবা সন্ধ্যের পর। পরিযায়ী হয়ে আসা অতিথি পাখির দল থেকে স্থানীয় পাখির আচার-ব্যবহার সব লক্ষ্য করতাম। অপূর্ব পরিবেশে অপূর্ব সম্পদে ভরা ছিল এই বাদা। প্রায় বাইশ বছর ধরে এই বাদায় ঘুরেছি।

তারপর একদিন শুনলাম এই বাদা আর রাখা হবে না কলকাতার জনসংখ্যাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। শুরু হয়ে গেল গঙ্গা থেকে পলিমাটি এনে ভরাট করার কাজ।

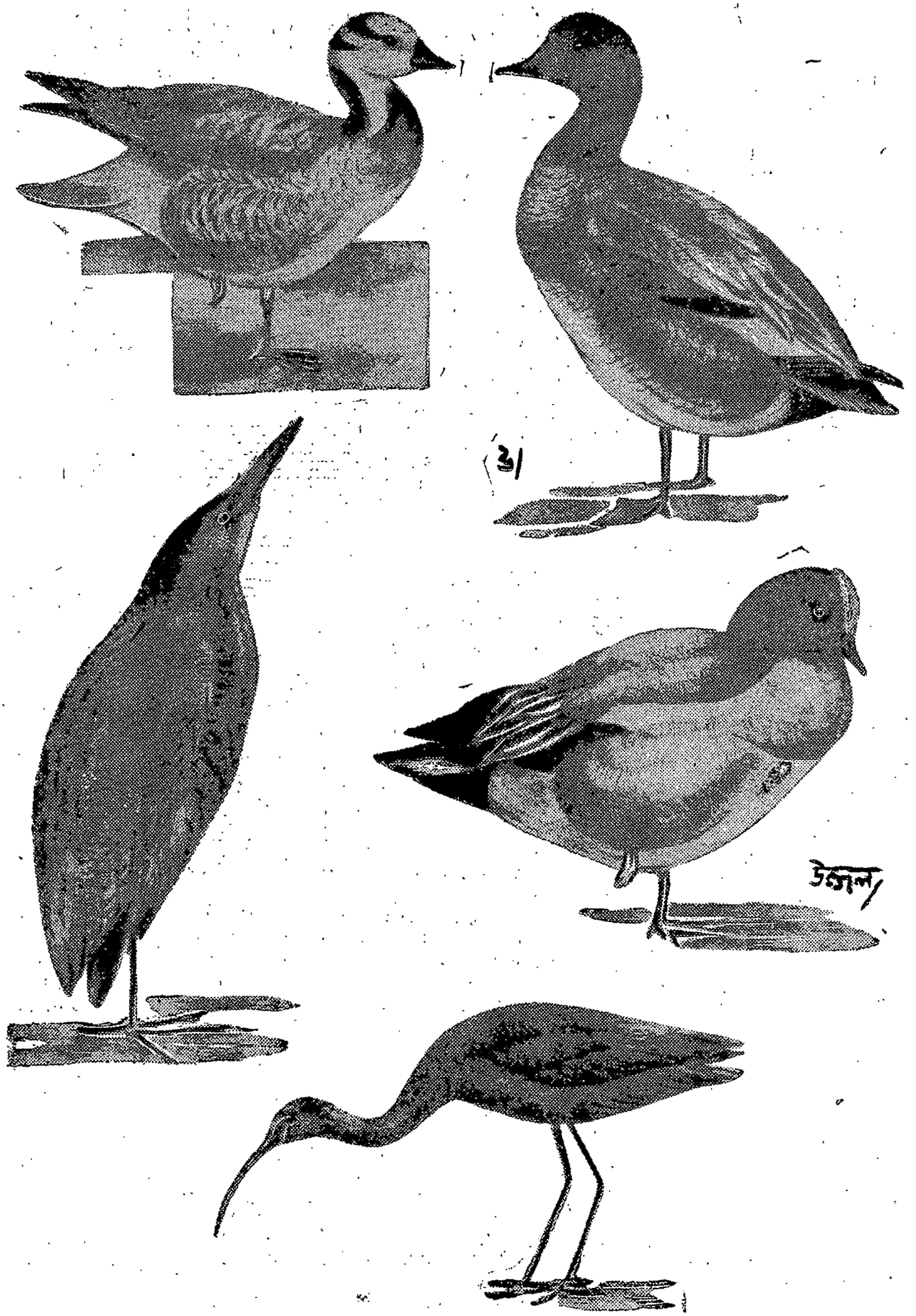

উপরের বাঁ-দিক থেকে—১। বুনো হাঁস ২। পাইং হাঁস ৩। খৈরি ৪। ছোটো লালশির ৫। কাচিরাতোরা

একবারও কেউ ভাবল না এইসব পাখিরা কোথায় যাবে। তাদেরও তো থাকবার সমান অধিকার আছে। অন্তত আধখানা ছেড়ে দিলেও তারা থাকতে পারত বেশ। মহাকরণে তদানীন্তন শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদনও করেছিলাম কিন্তু তা হয়েছিল অরণ্যে রোদন।

বড়ো শেষে আরম্ভ করেছিলাম হর্মোন-গ্রন্থির স্ফীতির কমাবাড়ার উপর পরিযায়ী হওয়ার কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা তা নির্ণয় করা। এক বছরেই সেই কাজ শেষ হয়ে গেল সেইসব সুদূরের অতিথি পাখিদের আর পেলাম না। আমার সেই কাজ অসমাপ্ত হয়েই রয়ে গেল।

এখন কিছু পশ্চিমবাংলার পাখির পরিচয় দেব যারা লুপ্তপ্রায় পর্যায়ে পৌঁছেছে। একটি দুটি তো লুপ্ত বলেই মনে করি কারণ তারপর থেকে সেই পাখিদের আর দেখিনি আর কেউ দেখেছে কিনা জানি নে।

গগনভেড়

গগনভেড়কে কোথাও কোথাও গগন-বেড়ও বলে। মোটাসোটা হাঁসের চেয়েও বড়ো পাখি। লম্বায় ৭২ ইঞ্চি। লম্বার অনুপাতে উচ্চতা কম। হাঁসের মতো পা। চারটি আঙুলই জাল দিয়ে সংযুক্ত। সাদা পালক কেবল বীরের পালকগুলি কালো। এই কালো পালক দেখে অন্য প্রজাতি থেকে সে এরা আলাদা তা বোঝা সহজ। পা ও পায়ের পাতা গাঢ় ধূসর অন্যান্য প্রজাতির কিন্তু গোলাপী। ডানার তলা ময়লাটে সাদা। চঞ্চু খুব লম্বা এবং নিচের চঞ্চুর তলায় গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটা বড়ো থলি। চঞ্চুর থলি মাছ ধরে রাখবার ঝুড়ি। থলি ভরে উঠলে অবসরমতো নিজে খায় এবং ছানাদের খাওয়ায়। লেজ ছোটো, আগার দিক গোলাকার। পাখা চওড়া কিন্তু খুব বড়ো নয়। গলা লম্বা সবটাই পালকে ঢাকা। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। বাচ্চাদের উপরটা বাদামী-ধূসর তলা সাদা থলি ধূসরাভ।

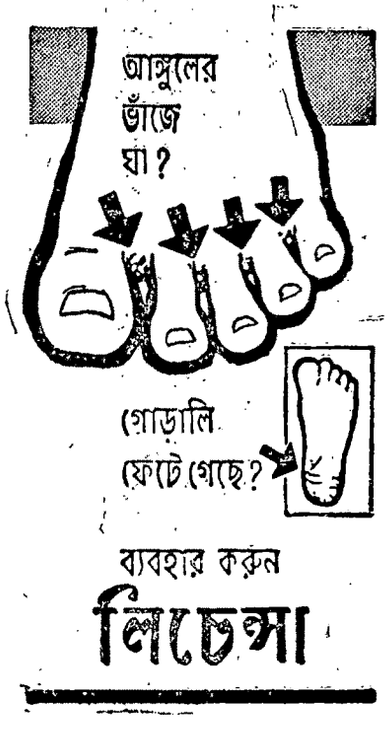

বাসস্থান—দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এশিয়া মাইনর ইরান উত্তর চীন মঙ্গোলিয়া। শীতে পরিযায়ী হয় উত্তর আফ্রিকা বেলুচিস্থান সিন্ধু বাংলাদেশে ভারতে পাঞ্জাব কচ্ছ সৌরাষ্ট্র গুজরাট উত্তরপ্রদেশ বিহার ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে।

আর একটি গগনভেড় লম্বায় ৬০ ইঞ্চি। চঞ্চু লম্বায় প্রায় ১৩ ইঞ্চি লেজ ৭ ইঞ্চি ডানা ২২ ইঞ্চি চঞ্চুর রং মাংসের মতো এবং তার প্রত্যেক পাশে এক সারি নীলাভ কালো বিন্দু।

বাসস্থান—সমগ্র ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং সিংহল। বাসা বানায় সিংহলে মাদ্রাজের তিরুনেলভেলি ও চিঙ্গলেপুট জেলায় অন্ধ্রে গোদাবরী জেলায় এবং আসামে কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্যে।

এই দুই প্রজাতির পাখিকে পশ্চিমবঙ্গে খুবই দেখা যেত। ১৯৩৭—৩৮ সালে বাদায় ও সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখেছি। বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার সুন্দরবন অংশে দেখেছি খুব বেশি। আমাদের সজনেখালিতেও দেখেছি। অনুকূল পরিবেশের অভাবে আর দেখা যায় না বলেই মনে হয়।

কখনও দেখেছি একা কখনও যুগলে আবার সময় সময় অল্পবিস্তর দল বেঁধে বিচরণ করতে। জলে বা ডাঙায় চলাফেরা দেখতে বিশেষ সুন্দর না হলেও আকাশে ওড়ার সময় এদের হালকা ও ললিত উৎপতনভঙ্গি সত্যিই বড়ো সুন্দর। বাতাসের সঙ্গে ডানার সংঘর্ষণে একরকমের শ্রুতিমধুর শব্দ শোনা যায়। মাছ এদের প্রধান খাদ্য। মাঝে মাঝে কিছু ব্যাঙ এবং সরীসৃপও খায়। মাছ ধরার পদ্ধতি খুব সুন্দর। জলে ডুবে মাছ ধরে না। ডানা দিয়ে তাড়িয়ে মাছকে অগভীর জলে নিয়ে গিয়ে চঞ্চুর সাহায্যে ধরে গলাধঃকরণ করে। এসময় চঞ্চু হাঁ-করে নিচের চঞ্চুর থলিটিতে বেড়া জালের কাজ করায়। দল বেঁধে থাকলে অর্ধচন্দ্রাকারে সারি বেঁধে ডানা নাড়িয়ে তাড়াতে তাড়াতে গভীর জল থেকে মাছকে অগভীর জলে নিয়ে যায়। স্বভাবত নীরব কেবল সাঁতার কাটবার সময় মাঝে মাঝে গলা দিয়ে একরকমের গম্ভীর শব্দ করে।

গগনভেড়ের মাংস আহারযোগ্য, চর্বি বাতের ওষুধরূপে ব্যবহার হয়।

কাঁক

সংস্কৃতে কংক। বাংলায় কাঁক, সাদা কাঁক অঞ্জন। লম্বায় প্রায় ৩৯ ইঞ্চি চঞ্চু ৫ ইঞ্চি ডানা প্রায় ১৮ ইঞ্চি। মাথা গলা বুক ও পেটের মধ্যাংশ এবং লেজের নিচের ছোটো পালক-গুলি সাদা। মাথা বুক ও পেটের দু পাশ কালো গলায় কালো ডোরা এবং টিকিরূপ ঝুঁটিটি কালো। দেহের বাকি অংশ মোটের উপর হালকা ধূসর। কনীনিকা ও চঞ্চু হলদে পা হলদেটে-বাদামী। স্ত্রীপাখি প্রায় একই রকম দেখতে কেবল আকারে ছোট ঝুঁটিও ছোট।

বাসস্থান—মধ্যপ্রাচ্য পাকিস্তান ব্রহ্মদেশ থাইল্যান্ড ইন্দোচীন মালয়েশিয়া পূর্ব সাইবেরিয়া পূর্ব চীন জাপান ফরমোসা এবং হাইনান বাংলাদেশ এবং সমগ্র ভারতে।

সাদা কাঁক সাধারণত একা অথবা যুগলে বিচরণ করে। প্রজননকালেও দলবদ্ধ হতে দেখা যায় না। এসময়ে একই জায়গায় বিভিন্ন জাতীয় বক পানকৌড়ি ইত্যাদি পাখির সঙ্গে কয়েক জোড়া সাদা কাঁক দেখা গেলেও তাদের পাশাপাশি বাসা বাঁধতে দেখি না। এদের বাসা পরস্পরের কাছ থেকে বেশ দূরে দূরে থাকে। বিশ্রামের সময় গাছের উপর কোনো নেড়া ডালে গলা ও চঞ্চু সোজা শূন্যে মুখ করে নিস্পন্দে বসে থাকাটাই এদের স্বভাব। তখন বড়ো মজার দেখায়।

সাদা কাঁককে বাদায় প্রচুর দেখা যেত। ভরাট হবার সময় থেকেই এদের দেখতে পাই কম। বর্তমানে এদের পশ্চিমবঙ্গে অন্যত্র কম দেখতে পাই।

বরং অপর প্রজাতি—লাল কাঁক পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। তাও কমে আসছে পরিবেশ না থাকাতে। লম্বায় প্রায় সাড়ে ৩ ফুট চঞ্চু সওয়া পাঁচ ইঞ্চি ডানা সাড়ে ১৫ ইঞ্চি। মাথার দুদিকে কতকটা জায়গা পালকহীন। মাথায় টিকি। এই টিকি বা ঝুঁটি সরু ও লম্বা। মাথার শিখা ও পেট কালো ডানা লেজ ও পিঠ ধূসর; দেহের বাকি অংশ মোটের উপর রক্ত-কপিশ। কনীনিকা ও চঞ্চু হলদে মাথার নগ্নস্থান হলদেটে-সবুজ পা রক্তাভ পিঙ্গল।

লাল কাঁক

ঘন শরবনে বা তার আশেপাশে থাকতে বেশি পছন্দ করে। কখনও কখনও গাছের উপরও বসে থাকে। অসম্ভব কৌতূহলী; শরবনের মধ্যে অথবা গাছের ডালে বসে থাকার সময় লম্বা গলা বাড়িয়ে চারিদিক দেখে। গাছপালার মধ্যে এদের দেহ লুকানো আর লম্বা গলাটি যখন দৃষ্টিপথে পড়ে তখন হঠাৎ সাপ বলে মনে হয়। একবার তো বাদায় শরবনের মধ্যে ওভাবে গলা বাড়াতে দেখে ভয়ই পেয়েছিলাম।

সব কাঁকেরই খাদ্য মাছ ব্যাঙ কীট-পতঙ্গ নেংটি ইঁদুর ইত্যাদি। সুবিধে পেলে ছোট ছোট পাখি ধরতে মোটেও দ্বিধা করে না

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইনক্রিমিন* দিয়ে

ছেলেবেলার দিন—
হেসে খেলে ঠিকমত বেড়ে ওঠার দিন! এই সময়ে ওকে ইনক্রিমিন সিরাপ নিশ্চয়ই দেবেন। তারপর দেখবেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে আলাতন তো দূরের কথা, ক্ষিদে বেড়ে গিয়ে যেমন খুশি হয়ে যাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে! ইনক্রিমিন উপকারী ভিটামিন আর আয়রনে ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড় কথা— এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

ইনক্রিমিন* টনিক

ড্রপস্—২ মাস থেকে ২ বছরের বাচ্চাদের জন্যে
সিরাপ—১৪ বছর পর্য্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের জন্যে

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে

ডাক্তারের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম Lederle সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ.
*আমেরিকার সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

Sista's INC-362 I/75-Ben

এবং ধরলে সরাসরি গলার মধ্যে চালান করে দেয়। ওড়ার সময় কর্কশ একটা আওয়াজ দেয়। উড়তে উড়তেও মাঝে মাঝে এই ডাক ছাড়ে।

খৈরি

খৈরিকে কোথাও কোথাও লাল, বুক খয়েরী বক বলে।

লম্বায় ১৫ ইঞ্চি। কোঁচ বক অপেক্ষা আকারে ছোট রোগাটে এবং জ্ঞাতিভাই। ঝাঁকড়া ঝুঁটি সমেত মাথা কপিশ-বাদামী ডানার পালক কপিশ। চিবুক গলা সাদাটে তার উপর লম্বা লম্বা টান নেমে এসেছে বুকের উপর দিয়ে। বুকের দু পাশে ডানার পালক কালো এবং হালকা কপিশের ছোপ। বাকি তলার পালক মলিন কপিশ। ডানার তলা হালকা কপিশ তার উপর গোলাপী আভা। কনীণিকা হলদে কমলা বা গোলাপী লাল। চঞ্চু সবজেটে-হলুদ বা হালকা কমলা-হলুদ। পা সবজেটে হলুদ।

বাসস্থান—পাকিস্তান ব্রহ্মদেশ থাইল্যাণ্ড মালয়েশিয়া ফিলিপাইন সানডা ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ; চীনদেশে মাঞ্চুরিয়া থেকে হাইনান রাইয়ুকিয়ু দ্বীপপুঞ্জ। ভারতের সর্বত্র বাংলাদেশ সিংহল আন্দামান নিকোবর ও মালদিভ দ্বীপপুঞ্জে। সর্বত্রই নির্ভর করে জলার অবস্থার উপর।

প্যাট্রী, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোর্সেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
সম্পৎ সেরামিক্স প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

খৈরি একা একাই বিচরণ করে। দিনের বেলা বিশেষত মেঘলা দিনে এক নলখাগড়ার ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে যেতে দেখা যায় বেশি। মাছ ব্যাঙ কবচী ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ অসম্ভব খেতে পারে। সাধারণত চুপচাপ থাকে। বসন্তকালে ডাক দেয় কোক-কোক - এক - এক - এক - এক - গুক - গুক-গুক।

ঝাদা বা অন্যান্য জলায় আগে খুব দেখা যেত। এখন পশ্চিমবঙ্গে আর বিশেষ দেখা যায় না। গত তিন বছরে একটি দেখেছি।

কাচিয়া তোরা

কাচিয়া তোরা অন্যান্য সাদা দোচরা বা কালো দোচরা অপেক্ষা দেখতে অনেক সুন্দর।

কাচিয়া তোরা লম্বায় ২৫ ইঞ্চি। মুখের কতকটা জায়গা ছাড়া বাকি মাথা পালকে ঢাকা। মাথা চিবুক রক্তনীল ও সবুজ আভাযুক্ত। পিঠের উপর দিক বাদামী নিম্নাংশ ও পিছন দিক রক্তনীলাভ পিঙ্গল। সবই ধাতব দ্যুতিপূর্ণ। ডানার মাঝখান বেগুনী ও অন্যান্য অংশ সবুজ। লেজ সবুজ ও বেগুনী দ্যুতিযুক্ত কালো। প্রজননকালে মাথা ঘাড় ও কাঁধের রঙে কিছু তারতম্য দেখা যায়। জঙ্ঘা পিঙ্গল সীসেপিঙ্গল চঞ্চু লম্বায় প্রায় সাড়ে ৪ ইঞ্চি ডানা ১০-১১ ইঞ্চি লেজ প্রায় ৪ ইঞ্চি। পা ও লম্বা সরু আঙুল কাঁসাভপিঙ্গল। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান—দক্ষিণ ইউরোপ ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্য বেলুচিস্তান তুর্কিস্তান আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ ব্রহ্মদেশ আফ্রিকা মাদাগাস্কার ও দক্ষিণ আমেরিকা। ভারতে উত্তরপ্রদেশ নেপাল গাঙ্গেয় উপত্যকা মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান কচ্ছ গুজরাট ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও মণিপুরে।

কাচিয়া তোরাকে দেখা যায় বড়ো ঝিলে জলাভূমিতে এবং নদীর চরে। বেশ কয়েক বছর আমার দৃষ্টিপথে পড়ছে না। সম্ভাব্য জায়গায় ঘুরেও দেখতে পাচ্ছি নে। অথচ আগে কত দেখেছি। সাধারণত এরা দলে থাকে। এক-একটা বড়ো দল প্রায় ৪০-৫০-এর হয়। পেট পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে বিচরণ করে। কখনও কখনও মাথাও ডুবিয়ে দেয়। ঝাঁকে ওড়ার সময় ইংরেজি 'ভি' আকারে ওড়ে। গাছের উপর রাত্রিবাস। প্রজননকালে পুরুষ প্রায় ভেড়ার মতো এক ডাক দিতে থাকে কখনও বা কাকের মতো গলার ভিতর আওয়াজ করে।

ঝাদি হাঁস

ঝাদি হাঁসকে কোথাও বা কড়ুহাঁস, ডোরাশির রাজহাঁস বলে।

লম্বায় প্রায় ৩০ ইঞ্চি। সাদা মাথার উপর এক চোখ থেকে অপর চোখ পর্যন্ত একটি চওড়া কালো ডোরা ঠিক সেরকম আর একটি অল্প ছোট ডোরা প্রথম ডোরার নিচে ঘাড়ের উপর। ঘাড়ের পাশে একটি সাদা রেখা তার পিছনের অন্যান্য অংশ পিঙ্গল। গলার সামনে ধূসরাভ পিঙ্গল বুক ধূসর বুকের দুপাশ পিঙ্গল তলার বাকি পালক সাদা। ডানার মাঝের কয়েকটা পালক গাঢ় পিঙ্গল বাকি সমস্ত পিঠ মোটের উপর ধূসর। কনীণিকা পিঙ্গল চঞ্চু হলদে নাক ও চঞ্চুর অগ্রভাগ কালো। পা গাঢ় হলুদ।

বাসস্থান—লাডাক মধ্য এশিয়ার তিয়েনশান থেকে কোকনর। শীতে পরিযায়ী হয় পাকিস্তান কাশ্মীর পাঞ্জাব রাজস্থান নেপাল ভুটান সমেত গাঙ্গেয় উপত্যকা আসাম বাংলাদেশ ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গে।

খাদ্য—সর্বভুক। শস্য কচি আগাছা ধানের ডগা গেঁড়িশামুক ইত্যাদি কবচী জলজ কীট সরীসৃপ প্রভৃতি। শোনা যায় শকুনদের সঙ্গে মিলে মরা পচা মাংসও নাকি খায়।

একসময় বাদায় ও অন্যান্য জলাভূমিতে ছোট দলে দেখা যেত। ১৯৪০ সালের পর আর দেখিনি। শেষ দেখেছি গঙ্গার তীরে মণিহারীঘাটে আসাম যাবার পথে। ওড়িশার চিল্কা হ্রদে ও কৈতরণী নদীর মোহনাতেও দেখেছি। ডাকে জোরে নাকিসুরে আ-ংগ আ-ংগ।

দিগ হাঁস

দিগ হাঁসকে কোথাও শোলঙ বা বড়ো দিঘর বলে।

লম্বায় ২২ থেকে ২৯ ইঞ্চি। চেহারা লম্বা ছাঁদের। পুরুষ পাখির মাথা পিঙ্গল ও অল্পবিস্তর উজ্জ্বল বেগুনী আভাযুক্ত; গলার দুদিকে একটা সাদা রেখা কাণের কাছ থেকে ক্রমে চওড়া হয়ে বুকের সাদার সঙ্গে মিশেছে; পিঠ মোটের উপর ধূসর সাদা ও কালো রঙের ঢেউ খেলানো রেখা। ডানার কয়েকটা জায়গা মলিন কাঁসাভ সবুজ বাকি মোটের উপর পিঙ্গলাভ ধূসর। ডানা লম্বা ও সুঁচাল শেষ পর্বের প্রথম বড়ো পালকটি সবচেয়ে বড়ো। লেজের মাঝের কয়েকটি পালক কালো দু পাশের বাকি পালক ধূসরাভ পিঙ্গল। লেজের নিচের ছোট পালকগুলি কালো তার পাশে দেহের দুদিকে অল্পমাত্রায় হলুদ চিহ্ন। লেজের বড়ো পালক সাধারণত ১৬টা তার মাঝের দুটি পালক সরু সুঁচাল এবং অন্যান্য পালক অপেক্ষা অনেক লম্বা। চঞ্চুর মূলদেশ কতকটা উঁচু সর্বত্র প্রায় সমানভাবে চওড়া কনীণিকা গাঢ় পিঙ্গল চঞ্চু ও পা সীসে রঙের। ওড়বার সময় লম্বা ছাঁদের আকৃতি সাদা বুক ও গলা কালো তলপেট লেজের সরু ও লম্বা পালক দুটো দেখেই সহজেই দিগ হাঁসকে চেনা যায়।

বাসস্থান—ইউরোপ এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ। শীতে পরিযায়ী হয়

গয়ার

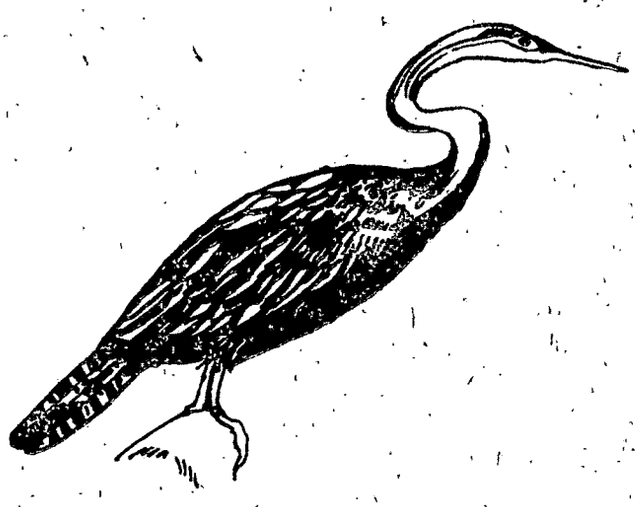

উত্তর আফ্রিকা নীল নদের তীরবর্তী স্থান-সমূহ ইথিওপিয়া পারস্য উপসাগর পাকিস্তান সমগ্র ভারত বাংলাদেশ সিংহল ব্রহ্মদেশ সিয়াম ও দক্ষিণ চীনে।

খাদ্য—প্রধানত সবজি যথা—ঘাস আগাছার কচি ডগা জলজগাছের বীজ ধান। কিছুটা কবচী জলজ কীটপতঙ্গ ও তাদের শূক।

দিগ হাঁসকে বাদায় দেখা যেত নভেম্বর থেকে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। একটু বড়ো জলাশয় হলেই দিগ হাঁসরা আড্ডা গাড়ে। খানিকটা খোলা ও চওড়া জলাশয় পছন্দ বিশেষত যার ধারে ধারে যথেষ্ট নলখাগড়া প্রভৃতি আগাছা এবং ভিতরে বেশ কিছু ভাসমান ঘাসের বা জলজগুল্মাদির চাপড়া থাকে। সকাল-সন্ধ্যায় এরূপ জলাশয়ের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যেতে দেখা যায়। এক-একটি ঝাঁক ২০-২৫ থেকে শতাধিকের হয়। ওড়ে ইংরেজি ভি-র আকারে কিংবা অল্পবিস্তর সরলরেখায় ঘন সারি বেঁধে। খুব সতর্ক। দিনের বেলায় সাধারণত জলের ধার থেকে অনেক দূরে মাঝ বরাবর বিচরণ করে। একবার বিরক্ত হলে সেই আশ্রয় ছেড়ে বেশ দূরে অন্য কোনো জলাশয়ে আশ্রয় নেয়। সেজন্যে এদের শিকার করতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। খেতে সুস্বাদু। বাদায় এদের প্রচুর দেখা যেত। এখন খুব অল্পই দেখতে পাই। জলাশয় প্রায় শেষ হয়ে আসছে মানুষের চাহিদা বাড়ায়। সুতরাং দিগ হাঁসের দেখা পাওয়া হয়েছে ভার।

পাইং হাঁস

পাইং হাঁসকে হিন্দীতে বলে ভূখার বেখুর।

লম্বায় ২০ ইঞ্চি। পুরুষ পাখির গায়ের রং মোটামুটি পিঙ্গল পেট সাদা তলপেট ও লেজের তলার ছোট পালকগুলি কালো। ডানার কয়েকটা জায়গা উজ্জ্বল কালো ও সাদা প্রায় সমস্ত দেহে আধখানা চাঁদের আকারে সাদা রেখা আঁকা। স্ত্রীপাখির রঙে কিছু তফাৎ আছে। প্রধান প্রভেদ এদের অর্ধচন্দ্রাকার রেখাগুলি হলদে বা হলদেটে লাল। পুরুষপাখির চঞ্চু কালচে-পিঙ্গল নিচের ওষ্ঠের রং কতকটা হলদে; স্ত্রীপাখির চঞ্চু সর্বত্র হলদেটে। চঞ্চু লম্বায় প্রায় মাথার সমান প্রায় সর্বত্র সমানভাবে চওড়া আগার দিকে অল্প সরু ওষ্ঠলতিকা বাইরে বেরনো ও অত্যন্ত কোমল। লেজের বড়ো পালক ১৬টা। উভয়ের পা হলদে এবং নখর কালো।

বাসস্থান—ইউরোপ এশিয়া এবং পশ্চিম উত্তর আমেরিকা। বাসা বাঁধে আইসল্যান্ড থেকে কামচাটকা দক্ষিণে ইংল্যান্ড হল্যান্ড জার্মানি মধ্য রাশিয়া কাসপিয়ান সেইস্তান ট্রান্সবৈকালিয়া। পরিযায়ী হয় উত্তর আফ্রিকা ইথিওপিয়া দক্ষিণ চীন পাকিস্তান নেপাল ভারতের সর্বত্র বাংলাদেশে। দক্ষিণ ভারতে দেখা যায় খুব কম।

খাদ্য—প্রধানত বীজ ছোট আগাছার ডগা জলজ উদ্ভিদ ধান। মাঝে মাঝে পোকামাকড় গেঁড়ি-গুগলি ইত্যাদি।

সাধারণত নভেম্বরের প্রথম থেকে ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত সর্বত্র অনুকূল খালে বিলে এদের দেখা যায়। এদেশে আসবার পর প্রথম দু মাস মুখ্যত ধান খায়। এসময় এদের মাংস অতি সুস্বাদু। অন্য সময় আঁশটে গন্ধ থাকে। মাংস গরম জলে ধুয়ে নিলে এই আঁশটে গন্ধটাও কম যায়। সাধারণত ১০ থেকে ৩০শের দলে থাকে। চলে ফিরে খাদ্য গ্রহণ করে। জলাশয়ের নিকটবর্তী ধানখেতই এদের পছন্দ। অল্প জলে পিছন উলটে কাদার মধ্যেও খাদ্য খোঁজে। কখনওবা জলের মধ্যে ডুব দিয়ে। আহত হয়ে ধরা পড়বার উপক্রম হলে দেখেছি ডুব সাঁতার দেবার ক্ষমতা অদ্ভুত। পুরুষের ডাক আস্তে ভাঙা গলায় 'উই' তারপরেই জোরে শিস। হংসীর ডাক অন্যান্য হাঁসের প্যাকের চেয়ে মৃদু।

পাইং হাঁসকে আজকাল পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ দেখা যায় না। একসময় প্রচুর দেখা যেত।

ছোটো লালশির

ছোটো লালশির লম্বায় ১৯ ইঞ্চি। পুরুষপাখির কপাল ও তার আশেপাশে কতকটা জায়গা হলদেটে। মাথার অবশিষ্টাংশ ও গলা মলিন বাদামী। ডানার কিছুটা সূচিক্কণ সবুজ তার দু দিক কালো, বাকি কিছুটা জায়গায় সাদার ভাব পরিস্ফুট। পিঠ মোটের উপর ধূসর এবং জায়গা বিশেষে সাদা অথবা কালচে-পিঙ্গল রেখা। বুকের উপর দিক ও পাশের কিছুটা লাল বাকি তলা সাদা লেজের তলার ছোটো পালকগুলি কালো। কালচে-নীল চঞ্চু লম্বায় সওয়া ইঞ্চি, মাথা থেকে ছোটো প্রায় সমান চওড়া কেবল গোড়াটা অল্প সরু। গোড়ার কাছে নখের মতো উপাঙ্গটি চঞ্চুর আয়তনের অনুপাতে বড়ো, চঞ্চুর ডগা কালো। লেজ ছোটো কীলকাকার এবং বড়ো পালক ১৪টা। কনীনিকা পিঙ্গল। পা সীসের উপর সবুজাভ, নখর কালচে।

বাসস্থান —মেরুপ্রান্ত, আইসল্যান্ড স্কটল্যান্ড থেকে কামচাটকা। শীতে পরিযায়ী হয় ব্রিটেন থেকে দক্ষিণে নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চল, ইথিওপিয়া এশিয়া দক্ষিণ চীন, জাপান পাকিস্তান ভারতের সর্বত্র এবং বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা-

প্রকাশিত হলো চতুর্মুখের

পলাশের রং নীল ৮·০০

নারী বিদ্বেষ ও নারীঘাতী এক নায়কের রহস্যঘন জীবনচিত্র।

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের

প্রথম প্রেম দ্বিতীয় পুরুষ

৬·০০

জীবনে প্রথম প্রেমের বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার এক আশ্চর্য রূপায়ণ।

আধুনিক পুস্তক প্রকাশন ৪০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

দেশে, আসামে, মণিপুরে এবং ওড়িশায় চিল্কা হ্রদে প্রতিবছর আসে না। যখন আসে তখন প্রচুর। যেমন বাদায় দেখলাম ১৯৪১ সালে তারপর ১৯৪৫এ। মাঝের চার বছর একদম আসে নি। ১৯৫০ সালের পর আর দেখিনি।

খাদ্য—প্রধানত শাকসবজি, নানাবিধ বীজ, জলজ উদ্ভিদ ধান। মাঝে মাঝে জলকীট ও তাদের শুক, গেঁড়িগুগলি ইত্যাদি।

দলবদ্ধ হয়েই ছোটো ল্যাজশির বাস করে। কখনওবা খুব বড়ো ঝাঁকে। সমগোত্রীয় অন্যান্য হাঁস যারা জলের মধ্যে ডুবসাঁতার দিতে পারে না তাদের মতোই ঝিলের ধারে বা ধানক্ষেতের ভিতর চরে বেড়ায়। বিপদাশঙ্কায় জল থেকে উড়ে ওঠে বেশ দ্রুত তবে বেলে সরাল বা বিগরি হাঁসেদের মতো অত তাড়াতাড়ি নয়। কিন্তু মুহূর্তে পার হয়ে যায় বন্দুকের সীমানার বাইরে। হাঁসশিকারীদের কাছে এর মাংস খুব প্রিয়। ডাকে সুমিষ্ট বাঁশির সুরে হুই-উ...। ওড়ার সময় যেমন ডাকে তেমনি ডাকে মাটিতে বিচরণ বা জলে সন্তরণ কালেও।

শাকনাল

১৯৩৭ সালের ১০ই অকটোবর রবিবার। মানিকতলার মোড় থেকে সবটা পথ হেঁটেই রাত সাড়ে চারটের সময় পৌঁছেছি বেঙ্গল কেমিক্যালের গেট পেরিয়ে খালের খেয়াঘাটের পারানির ঘরে। ওখানে সভ্যসমাজের বসন ছেড়ে নীল বনাতের থ্রি কোয়ার্টার্স প্যান্ট, মাথায় গামছা, গামছার ভিতর আটটি গুলি ১ থেকে ৪ নম্বর গলায় বাইনোকুলার। সঙ্গীর কাঁধে দোনলা বন্দুক হাতে ঝোলা, হাফপ্যান্টের পকেটে আমার নোটবই। এ বছরের বাদা অভিযানের প্রথম দিন।

খাল পার হয়ে চলেছি। আলোর আভাস পুব দিগন্তে তখনও দেখা যায় নি। সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে। ভিজে পথ, অত্যন্ত পিছল। ভারসাম্য হারালেই হয় এপাশের না হয় ওপাশের জলে পড়তে হবে। সেটা মোটেই সুখকর হবে না।

কেষ্টপুরের খোলের দিকে পৌঁছেছি। রোদ উঠছে। পরিষ্কার আকাশ। শরতের অমল মহিমা। ...একটা খোলের চারপাশ প্রায় বারো চোদ্দ হাত ঘন নলখাগড়ার জঙ্গল। তার ওপাশে কোরার কোক-কোক ডাক শুনেছি। জলে নেমে আস্তে আস্তে নলখাগড়ার দাম সরিয়ে সরিয়ে উন্মুক্ত জলাশয়ের কিনারায় পৌঁছলাম। কোরারা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, ডোমকুর বা দশারিরা জলে ভেসে বেড়াচ্ছে নিঃশব্দে ডুবুরি, ডুবডুবি বা পানডুবির দল জলে ডুবছে থেকে থেকে, ফতফত করে জল ছুঁয়ে ডানা নেড়ে চলছে, উড়ছে। বাঁদিকে এক লাইনে গোটা চারেক কোরাকে পেয়ে গুলি ছুঁড়ব বলে তাক করছি হঠাৎ একটু দূরে ওদের পিছন থেকে নলখাগড়ার দাম থেকে বেরিয়ে এল একটা হাঁস। মাথাটা উজ্জ্বল গোলাপী। চমকে গেলাম। ঠিক দেখছি তো? বড়ো রাঙামুড়ি বা হেরো হাঁস নয় তো? কিন্তু হেরো হাঁসকে তো গভীর জলে উন্মুক্ত খোলা জায়গায় জলের মাঝখানে দেখা যায়। সবে সকাল হয়েছে বলেই কি পাড়ের কাছে নলখাগড়ার ঝোপের ধারে? হাঁসটা জঙ্গলে ঢুকে গেল। আমি খুব সন্তর্পণে ফিরে এলাম। মুখে আঙুল দিয়ে সঙ্গীকে কথা বলতে বারণ করে বন্দুক রেখে তার কাছ থেকে দূরবীণ নিয়ে আবার সন্তর্পণে ফিরে গেলাম। হাঁসটা আবার এসেছে ঝোপ থেকে জলের কিনারায়। দূরবীণে দেখলাম—মাথা ঘাড় চঞ্চু উজ্জ্বল গোলাপী। লম্বায় ২৩-২৪ ইঞ্চি হবে। চঞ্চু লম্বায় খুব বড়ো মাথার চেয়েও বড়ো। গলা কালো পিঙ্গল, চঞ্চুর প্রান্ত নীলাভ। বাকি দেহ উজ্জ্বল গাঢ় পিঙ্গল, জায়গায় জায়গায় তিলক কাটা। ডানার কিনারায় চওড়া সাদা ডানার মাঝে কতকটা জায়গা উজ্জ্বল হলুদ।

নাঃ! কোনো সন্দেহই নেই। কেতাবি বিদ্যায় আর আবদ্ধ নেই। চোখের উপর দেখছি এক মহা মূল্যবান পাখি। ১০ই অকটোবর ১৯৩৭ সালের তারিখটা লাল অক্ষরের দিন!...দূরবীণটা রেখে বন্দুকটা আনতে ফিরে গেলাম। যদি মারতে পারি তবে ধর্মতলায় এডোয়ার্ডের দোকান থেকে স্টাফ করে রেখে দেব।

বন্দুকটা সঙ্গীর হাত থেকে নিলাম দূরবীণটা দিয়ে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। উৎসুক হয়ে চোখ নাচিয়ে বারবার জিজ্ঞেস কী? মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে বলে আবার ফিরে গেলাম। আমার যাওয়া আসায় কোরারা আমার উপস্থিতি বুঝে ফেলেছে। তারা ঝটপট উড়ে নলখাগড়ার বনে ঢুকে পড়ছে, ডোমকুররাও জলের উপর দিয়ে উড়ে বন্দুকের পাল্লার বাইরে যাচ্ছে, ডুবুরিরা উড়ে চলেছে। নলখাগড়ার বন থেকে উড়ল চারটে হাঁস। আমি উত্তেজিত হয়ে বন্দুকের দুটো ঘোড়াই টিপে দিলাম।...বলতে গেলে আমার মুখের উপর পুরীষ ত্যাগ করে উড়ে চলে গেল তারা। আমার সঙ্গীও তখন দেখল সেই পাখিদের। সে জানে না কী হাঁস। তবে বড়ো সুন্দর হাঁস। জিজ্ঞেস করে এত আগে পরিযায়ী হয়ে কি করে এল?

নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে আফশোস হয় কেন নিঃসন্দেহ হতে গেলাম। প্রথম-বারেই গুলি করলে নির্ঘাত পেতাম ওটাকে। প্রমাণ করতে পারতাম ওই পাখি কলকাতার পাশেই ছিল বা এসেছিল। প্রমাণ ছাড়া এ-দেখার কোনো মূল্যই নেই।

হাঁসের নাম—শাকনাল, লালশির। হিন্দী—ডুমাস, ডামরার।

বাসস্থান—বর্তমানে খুব সম্ভবত লুপ্ত। শেষ দেখেছেন যা রেকর্ড করা আছে, সি এম ইংগলিস ১৯৩৫ সালে জুন মাসে বিহারের শ্বারভাঙ্গায়। মনে হয় আসামের বাসিন্দা। খুব বেশি দেখা যেত নওগাঁ জেলায়, মণিপুর বিহার ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু শীতে দেখা গেছে শাখনো, পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার রূপানগর দিল্লী মধ্যপ্রদেশে মহো মহারাষ্ট্রের আমেদনগর, অন্ধ্রের নেলোর এবং মাদ্রাজের পুলিকাট হ্রদে। ভারতের বাইরে ব্রহ্মদেশে। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলায় এক সময় প্রচুর দেখা যেত।

খুব বেশি পরিচয় শাকনালের পাওয়া যায় না। এরা লাজুক ও আত্মগোপনকারী। ৬ থেকে ৮ এর দলে বাস করে যখন প্রজননকাল নয়। ৩০-৪০এর দলও দেখা গেছে। প্রজননকাল জুন-জুলাই মাস। আমি ৪টে দেখেছিলাম হয়তো বাকি দুটি বা চারটি নলখাগড়ার বনে আত্মগোপন করে ছিল। মালদহের এক প্রবীণ শিকারীর মুখে শুনেছি, তিনি অনেক শাকনাল মেরেছেন তাঁর মতে সব জাতীয় হাঁসের মধ্যে শাকনালের মাংস শ্রেষ্ঠ। হয়তো সে কারণেই আজ লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়।

বাদায় আর একটি হাঁস এইরকম পরিবেশে দেখেছিলাম ২৮শে অকটোবর ১৯৫০ সালে তা হল বড়ো ভূতি হাঁস। এও প্রায় লুপ্ত। কয়েকটি লুপ্তপ্রায় পাখির নাম বলে এই নিবন্ধ শেষ করব। সুন্দরবন ও বাংলাদেশের বড়ো বড়ো নদীর মোহনায় এক সময় দেখা যেত—কানঠুটি, তরাই অঞ্চলে শীতের শুরুতে গৃহপালিত হাঁসের উদ্ভব যার থেকে যে রাজহাঁস চই হাঁস বামনিয়া হাঁস? ঝালি হাঁস।

এদের কি আর দেখতে পাব না? এদের জন্যে কি পরিবেশ তৈরি করা একান্তই অসম্ভব?

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ----- ১৪·০০
২। গুল বাগিচা ---- ৩·৫০. ৩। কাব্য আমপারা --৪·০০
৪। পুবের হাওয়া ---- ২·০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী -- ২·০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

টাঁড়বারো

বুদ্ধদেব গুহ

চন্দ্রালোকিত রাতে গভীর বনের মধ্যে শিশির-ভেজা ঘাস আর দুধুলি ফুলফোটা প্রান্তরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নীল গাই-এর দলকে জাবর কাটতে বা চিতল হরিণের ঝাঁককে দৌড়ে যেতে দেখতে দেখতে বারে-বারে মনে হয়েছে 'টাঁড়বারোর' মত কোনো বনপুরুষের অস্তিত্ব সত্যিই যদি আমাদের দেশের বনে-পাহাড়ে থাকত তবে বোধহয় খুবই ভাল হত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' টাঁড়বারোর কথা প্রথম পড়বার পর ভারত-বর্ষের বনে-পাহাড়ের যে-অঞ্চলেই গেছি, যে কোনো বুনো শিকারীদের সঙ্গেই দেখা হয়েছে, প্রত্যেককেই টাঁড়বারোর সম্বন্ধে শুধিয়েছি, অথবা টাঁড়বারোর সমগোত্রীয় কোনো বনপুরুষ সম্বন্ধে। জবাবে যা জেনেছি তা দিনের আলোর মত স্পষ্ট নয়।

বনের গহন ঘন অন্ধকারের রাতে যেসব কথা শোনা যায়, তা বোধ হয় কখনোই দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয় না।

যাই-ই হোক, লেখাপড়া জানা বিজ্ঞান-বিশ্বাসী কোনো লোক হয়ত টাঁড়বারোর অস্তিত্বে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু তবুও বলি, টাঁড়বারোরা থাকলে এ দেশের বিচিত্র বনের বিভিন্ন পশু-পাখী, হয়ত বন-ও বা বেঁচে যেত।

টাঁড়বারো থাকলে বন্য মোষরা মরত না। টাঁড়বারোর মত অন্য কেউ থাকলে চিংকারা চেশিঙ্গা, মাউস-ডিয়ার, কালো-চিতা, কালো-তিতির, বাঘ ইত্যাদি ইত্যাদি এমন ভাবে কমে যেত না দেশ থেকে। জঙ্গলাচ্ছাদিত জমির পরিমাণও এমন করে কমতো না।

বন সংরক্ষণ ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে অনেক তথ্য-টথ্য দিয়ে অনেক ভারী ভারী শব্দ ব্যবহার করে যাঁরা প্রবন্ধ লিখতে পারেন তাঁদের মত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান আমার নেই তা প্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার করছি। কিন্তু লিখতে যখন হলই, তখন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে নিজের চোখে যতটুকু দেখেছি ও নিজের ক্ষুদ্র ও সীমিত বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝেছি তত-টুকুই আমার মত করে আমারই মত সীমিত জ্ঞানের যাঁরা পাঠক-পাঠিকা তাঁদের কাছে নিবেদন করি। তাঁরা যদি এ লেখা পড়ে, এই ক্রমশঃ-ক্ষয়গ্রস্ত বনসম্পদ ও বনপ্রাণীর ক্রমবর্ধমান সমস্যা সম্বন্ধে কিছু ভাবেন তাহলেই যথেষ্ট পুরস্কৃত হব।

বহু দিন আগে এমার্সনের একটা কবিতা পড়েছিলাম :

> ....."But these young scholars,
> who invade our hills
> Bold as the Engineer who feels
> the wood,
> Love not the flower they pluck
> and know it not
> And all their botany is Latin
> names....."

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, বন-জঙ্গল ও পশু-পাখী সংরক্ষণের চেষ্টার মূলে তাদের প্রতি মমত্ববোধ; তাদের ভালোবাসা। এ ভালবাসা যেমন শুধু বই পড়ে জন্মায় না, মানে পুরোপুরি জন্মাতে পারে না, তেমন সারাজীবন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেই আপনা থেকে তা গজিয়ে ওঠে না। সারাজীবন বনে-জঙ্গলে কাটানো অনেক বন-বিভাগের অফিসার, বন-জঙ্গলের ঠিকাদার এবং বুনো লোককে আমি দেখেছি যাঁরা মনে-প্রাণে বন-জঙ্গলের সব কিছুকে ঘৃণা করেন, ভয় করেন; আর কিছু লোক আছেন Arm-chain-conservators ব্যালিস্টিকস্ ও ট্যাক্সেকটাইলস্-এর উপর শহুরে বিশেষজ্ঞদের মতন, জীবনে বনে কখনো পা না দিয়েই তাঁরা বন-জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে এমন ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠেন যে তাঁদের কাছে কথা বলার দুঃসাহস আমার মত অর্বাচীনের আদৌ হয় না।

বন-জঙ্গলের ও বন্য পশু-পক্ষী ইত্যাদির ক্ষয় এবং বনাচ্ছাদিত অঞ্চলের কমে যাওয়াকে প্রধানত নিম্নলিখিত কারণের জন্য দায়ী করা যেতে পারে।

১। জ্যামিতিক ক্রমানুপাতে বর্ধমান লোক-সংখ্যার চাপে চাষের জমির জন্যে বনভূমির উপর নিরন্তর হস্তক্ষেপ।

২। দেশের লোকের সাধারণ দারিদ্র এবং বন ও গ্রামাঞ্চলের চরম দারিদ্র্য।

৩। মূঢ়তা ইত্যাদি দোষ। আপাতঃ শিক্ষিতরাও এ দোষে দুষ্ট।

৪। যে হারে বন ও বনসম্পদ ক্ষয় হয়েছে সেই হারের তুলনায় অনেক কম হারে বৃক্ষ ও বনরোপণ।

৫। সরকারী আমলা, বে-সরকারী জন-সাধারণ ও ব্যবসায়ীদের অসাধুতা ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা।

৬। বুনো ও অশিক্ষিত শিকারীদের এবং শহুরে শিক্ষিত শিকারীদের অবাধে চোরা-শিকার এবং অতি-শিকার।

৭। চোরা কাঠ ও চোরা-শিকার বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারী নিশ্চেষ্টতা।

২। সমস্ত পর্যায়ে লাল ফিতের দৌরাত্ম্য এবং দরদ ও কর্তব্যজ্ঞানের অভাব।

কিছুদিন আগে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের বন-জঙ্গল দেখার সুযোগ হয়েছিল। সেখানের বন-জঙ্গলের যেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয়, সেভাবে পশু-পাখীর যত্ন নেওয়া হয় সেই সমস্ত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ও পরিবেশের সঙ্গে আমাদের দেশের পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও পরিবেশের তুলনা হয় না। হয় না, কারণ ওদের দেশের অবস্থা আর আমাদের দেশের অবস্থা এক নয়।

কানাডাতে বিনানুমতিতে একটি গাছ কাটলে দশ বছর জেল হয়। এদেশে আপনার যদি পয়সা অথবা রাজনৈতিক খুঁটির জোর থাকে, তাহলে দশটা মানুষকে কেটে ফেললেও আপনার কিছুমাত্র না-ও হতে পারে।

তফাৎটা এইখানে। অন্যান্য দেশের লোকরা শিক্ষিত ও স্বচ্ছল। মানে, একটা ন্যূনতম শিক্ষা ও ন্যূনতম আর্থিক স্বাচ্ছল্য তাদের প্রধান অংশের আছে।

আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্র—বোধ হয় একমাত্র সুন্দরবনের কিছু অংশ ছাড়া—বনের

ধ্যে মধ্যে গ্রাম ও লোকবসতি আছে। এবং স্বাভাবিক কারণে, সমস্ত বনভূমির উপরে কালের চাপ ক্রমাগত বনকে, হটিয়ে দিচ্ছে। যে কোনো বনে দু বছর পরে গেলেই চোখে পড়ে কতখানি জায়গায় বন কাটা হয়েছে—আবাদ করা হয়েছে, ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে। গভীর বনের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ে কিছুদিন পরে পরে চলে।

এখানে দারিদ্র্য, বনাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে ত চরম যে আমার চোখে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের এ-সব ব্যাপারে মূঢ়তার কোনো দোষ চোখে পড়ে না। শীতে যাদের রম জামা তো দূরস্থান, রাতে শোওয়ার ময় একটি কম্বলও জোটে না, যারা ঘরের ধ্যে আগুন জেবলে সেই আগুনের পাশে কবল বুকে দিয়ে একবার পিঠ দিয়ে সারারাত শুয়ে থাকে—চৈত্র-বোশেখ মাসে যাদের শীয়র ঝলসে যাওয়া চামড়া সাপের খোলসের তো এক পরত উঠে যায়, তারা আইন মান্য করে রাতের একটু উষ্ণতার জন্যে দি বনের কাঠ কাটেই, তবে দোষ দেওয়া য় না।

যারা খেতে পায় না, আফিং-এর গুঁড়ো জলে সেদ্ধ করে, বুনো ফলমূলে কুড়িয়ে খায়ে বাঁচে থাকে, ভাত যাদের কাছে স্বপ্ন, াংস সুখ-কল্পনা; তারা যদি তীর-ধনুক কে ফাঁদ কি বিষ দিয়ে জানোয়ার ও পাখি মারে তা যায়, তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

বন, বনের পশু-পাখিকে ভালোবেসে, যারা শহরে মিটিং ডেকে, সেই মিটিং-এর বিবরণী সংবাদপত্রে ছাপিয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন আমি তাঁদের চেয়েও হয়তো বেশী ছাড়া কম ভালোবাসি না জঙ্গলকে। তবুও, যেহেতু আমি মানুষকেও ভালোবাসি—আমার মনে হয়, যে-দেশে মানুষ এখনও জীবজন্তুর পর্যায়ের জীবন যাপন করে, সেদেশে মানুষের চেয়েও বেশী প্রাধান্য জীবজন্তুকে দেওয়া যায় না। দেওয়া সম্ভবও নয়।

কিন্তু এই চরম—দরিদ্র গণ্ডগ্রাম ও গভীর বনাঞ্চলের ভারতীয়রা যে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয় সেটা ক্ষমা করা যায়, ক্ষমা করা যায় না আপাত শিক্ষিত সরকারী ও বে-সরকারী লোকেদের অর্থলিপ্সাসুতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। যে গাছ কাটার নয়, সে গাছ কাটা হয়, যে জঙ্গলে পারমিট নিয়ে বহু দূর থেকে আসা নিরীহ মানুষ শিকারীকে সবরকম অসহযোগিতা ও যন্ত্রণার মধ্যে ফেলা হয়, সেই জঙ্গলেই অনেক সময় কে জানে হয়তো আমলাদের সহযোগিতাতেই অভয়ারণ্যের মধ্যে শিকার হয়। যত গাছ প্রতিবছরে এদেশে বন-জঙ্গল থেকে কাটা হয়, তার এক-তৃতীয়াংশ বে-আইনীভাবে।

তবে বন বিভাগের আমলাদের মধ্যে এমন এমন লোকও দেখেছি যে তাদের পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে। অন্যান্য দেশের কর্মীদের তুলনায় এঁদের কত বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধার মধ্যে এ-দেশে কাজ করতে হয়, তবু এঁদের কর্তব্যপরায়ণতা ও দরদের সঙ্গে কাজ, এবং এঁদের মধ্যে কারো কারো বন-জঙ্গল ও পশুপাখি সম্বন্ধে যা মমতা প্রত্যক্ষ করেছি, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

এক ধরনের শিকারী আছেন, যাঁরা তাঁদের হাত ভালো বলেই, সেই ভালো হাতের গর্হিত গর্বে গরবী হয়ে একদিনে দুশো-তিনশো পাখি মারেন। এক হাঁকোয়ায় দশ-বারোটা জানোয়ার মেরে দেন। আমার জানা কিছু ভারতবিখ্যাত শিকারী আছেন, যাঁরা ট্র্যাপ ও স্কিট শুটিং-এ দারুণ ভালো। ভালো বলেই তাঁরা এক-এক দিনের ছুলোয়া শিকারে এই কয়েক বছর আগেও মুরগী, তিতির হরিয়াল, কালা-তিতির মিলিয়ে একদিনে শতাধিক পাখি মেরেছেন। পাখি ডানা মেললে—এবং তাঁদের বন্দুকের পাল্লার মধ্যে সে থাকলে, তার আর প্রাণ নিয়ে ফেরার কোনো উপায় নেই। একফালি ঝাঁটি জঙ্গলে একশো মুরগী তিতির জন্মাতে ও বড় হতে হয়তো পাঁচ বছর লাগে, কিন্তু তারা নিঃশেষিত হয়ে যায় আধ ঘন্টার মধ্যে।

এ-ব্যাপারে যারা আমাদের উপর প্রভুত্ব করেছিল, যারা এই দেশকে শোষণ করেছিল, তাদের কাছে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু শেখার ছিল। দুঃখের বিষয় এইটুকুই যে তাদের ভালোটুকুকে সযত্নে ত্যাগ করে আমরা খারাপটুকুকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি। তারা বিদেশী হয়েও অত্যাচারীর ভূমিকা নিয়েও, এ-দেশের আইন-শৃঙ্খলা, মানুষ-বন-ও-বধের জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে যে দায়িত্বজ্ঞান ও মমত্ববোধ নিয়ে তাদের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল—তা নিঃসন্দেহে অনুধাবনযোগ্য।

দেশ স্বাধীন হবার পর পরই বিদেশীদের দিয়ে বাঘ মারিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের হিড়িক পড়ে গেল। বলতে গেলে, কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহেই। বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডারে ঘাটতি হওয়ায়, বাঘ মারিয়ে বিদেশী মুদ্রা রোজগারের বুদ্ধি জোগাতে কেন্দ্রীয় আমলাদের উর্বর মস্তিষ্কে একটুও দ্বিধা হল না। সেইসব সংস্থার বেশীর ভাগই রাজা-মহারাজা বা রাজা-মহারাজার বশংবদ শিকারের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কিছু লোকের দ্বারা চালিত ছিল। আমাদের দেশের বাঘের সংখ্যা হ্রাসে রাজা-মহারাজাদের ভূমিকা কম ছিল না। রাজপরিবারের ছেলে-মেয়েরা আট বছর বয়সেই বাঘ মারতেন—না মারলে তাদের ইজ্জৎ থাকত না। বহুদিন থেকে মোষ বেঁধে বেঁধে বাঘকে প্রায় বেঁধে রাখার অবস্থায় এনে ফেলে ছেলে কি মেয়েকে মাচার উপর বসিয়ে মনোগ্রামকরা বহুমূল্য ডবল-ব্যারেল রাইফেল হাতে তুলে দিয়ে বাঘ মারানো হত। এ-দেশের বেশীর ভাগ রাজা-মহারাজারা তাঁদের প্রজাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করতেন, বাঘদের সঙ্গেও তার চেয়ে বেশী ভালো ব্যবহার করতেন না।

স্বাধীনতার পর পর বিদেশী-মুদ্রা অর্জনের জন্যে অসংখ্য বাঘ মারানো হল বিদেশীদের দিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। শতশত বাঘের ও লেপার্ডের চামড়া বিক্রি হল, রপ্তানি হল সেই একই কারণে। আমার জানা এমন অনেক শিকারী ছিল আসামে, বিহারে, উড়িষ্যায় ও বাংলায় যাদের একমাত্র পেশা ছিল বাঘ, চিতা ও অন্যান্য জানোয়ার মেরে তাদের চামড়া ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা। যে-কোনো ফাইভ-স্টার হোটেলের আর্কেডের দোকানে এই সেদিনও বাঘ লেপার্ডের চামড়া পাওয়া যেত বিক্রির জন্যে।

বছরের পর বছর এ ব্যবসা চলেছে—তখন কারোরই নজরে পড়ল না। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় শিরোনামায় কিছু কিছু লোক বারবার চিঠি লিখে এ ব্যাপারে সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন—কিন্তু সরকারের হাতে কত শত গুরুত্বপূর্ণ গঠনধর্মী কাজ থাকে—সেই সব কাজ ফেলে এ ব্যাপারে নজর দেওয়ার সময়ই হল না কারোর।

বাঘ যখন প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এল তখন টনক নড়ল সরকারের—গেল গেল রব উঠল।

এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের আনুকূল্যে বিহারের পালামৌতেও ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বাঘ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। পাঁচ বছর জঙ্গলে শিকার বন্ধ কাঠ কাটা বন্ধ লোকজনের যাতায়াত বন্ধ। পালামৌতে গিয়ে দেখলাম। বন বিভাগের অনেক সড়ক খুঁটি-গেড়ে ও নালা কেটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের বাঘ প্রকল্পের কথা ত আমেরিকান ভদ্রলোক, যিনি এখানে বাঘ-ঘুমু-পাড়াতে এসেছিলেন তাঁর কথা বিভিন্ন সংবাদপত্রের দৌলতে আপনারা সকলেই পড়েছেন। যে মানুষখেকো (?) এবং দাগী (?) বাঘটি নিয়ে এত আলাপ-আলোচনা চলল— তাকে (?) অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্য-জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে তাকে বাঁচাবার জন্যে বিস্তর অর্থব্যয় ও সময় ব্যয় করে তাকে অন্য বাঘ দিয়ে খাওয়ানো হলো—এসব আপনারা সকলেই জানেন। ঐ সব বিবরণ পড়ে ও শুনে আমার কেবলই মনে হয়েছে যে যে টাকায় আমেরিকান ভদ্রলোক প্লেনে এলেন-গেলেন যে টাকা এই হাস্যাস্পদ লজ্জাকর ব্যাপারটার জন্যে খরচ করা হল সেই টাকায় বাদা অঞ্চলে একটা ছোটখাট হাসপাতাল করা যেত—যে হাসপাতালে প্রতি বছর বাঘের ও সাপের হাতে সুন্দরবনের যে সব বাউলে-মৌলে-জেলেদের প্রাণ যায় তাদের কিছু লোকের সময়মত চিকিৎসা হতে পারত।

সৌভাগ্যক্রমে পালামৌ বিভাগের জঙ্গল সম্বন্ধে ও সুন্দরবনের জঙ্গল সম্বন্ধে আমার মোটামুটি ধারণা আছে। এই দুই জঙ্গলে যে বাঘ-প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। এতে বাঘের বংশ কিছু বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই। যদিও এই বিপুল অর্থব্যয়ে ভারত সরকার এদেশের মানব বংশের জন্মহারের কিছু হ্রাস ঘটাতে পারলে দেশের উপকারটা আরো স্পষ্ট হত এবং স্থায়ীও হত।

বাঘ-প্রকল্প সম্বন্ধে—এ দু জায়গারই আমার কিছু বিনীত বক্তব্য আছে। পালামৌর জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে হাজার হাজার গ্রাম আছে। যে সব গ্রামে বুভুক্ষু কিছু সরল লোক বাস করে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই জোত-জমি বলতে কিছুই নেই। এবং পালামৌর বনে-জঙ্গলে আবাদ করা যে কি কঠিন তা যাঁরা নিজের চোখে দেখেছেন তাঁরাই জানেন। সুন্দরবনের ভীরে বসতি বলতে তেমন না থাকলেও আশ-পাশের বাদা অঞ্চল থেকে প্রতি বছর বহু মৌলে বাউলে ও জেলে ছোট্ট-বড় নৌকো নিয়ে সুন্দরবনের গভীরে ঢোকে। বন-বিভাগ আর তাদের সংখ্যাতত্ত্ব যাই বলুন না কেন সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কমে ও প্রতি বছর বহুসংখ্যক লোক বাঘের হাতে এখনও প্রাণ হারায়। প্রাণ হারানো সত্ত্বেও তারা প্রতি বছরই সুন্দরবনে আসে—কারণ না এলে তারা না খেয়ে মরবে। কোলকাতার লোকেরা যেমন মেনে নিয়েছেন যে কোলকাতায় ট্রাম-বাসে যাতায়াত করলে যে কোনো দিন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং ঘটেও, তেমন ওঁরাও মনে নিয়েছেন যে সুন্দরবনে মাছ ধরতে, মধু পাড়তে, কি কাঠ কাটতে গেলে বাঘের পেটে কিছু লোককে যেতেই হবে প্রতি বছর।

আমার বক্তব্যটা এই লোকদেরই সম্বন্ধে। পালামৌর ও সুন্দরবনের। বাঘ-প্রকল্প চলাকালীন যেহেতু জঙ্গলে সবরকম কাজ বন্ধ থাকবে পালামৌ জেলার জঙ্গল-সন্নিহিত গরীব লোকেরা (যারা নানারকম বাঁশ ও কাঠের ঠিকাদারের কাছে কাজ করে—জোর সময় থেকে বর্ষারম্ভ পর্যন্ত যা রোজগার করবে সেই রোজগারে বছর কোনোক্রমে বাঁচে) তখন কি তাদের অন্তর্বর্তীকালীন ভরণ-পোষণের কোনো বন্দোবস্ত বাঘ-প্রকল্পে আছে আমার জানা নেই। এইটুকুই শুধু পাঁচ বছর রক্ষণা-বেক্ষণ করা যাবে পাঁচ বছরে বেড়েছে হয়ত বাঘ, মানুষ মরেছে দ্বিগুণ হবে হয়ত। তখন বাঘপারারা কি করবে? খেয়ে মারা যাবে!

যদি এ ব্যাপারটার দিকে ইতিমধ্যেই নজর দেওয়া হয়ে থাকে—তাহলে খুবই আনন্দের কথা। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে অবিলম্বে দেওয়া উচিত।

বন সংরক্ষণ ও বন্য পশু সংরক্ষণ বিষয়ে এত কথা বলার আছে যে তা নিয়ে পুরো একটি বই সহজেই লেখা যেতে পারে। কিন্তু এ পরিসরে সব কথা বলা সম্ভব নয়।

কোনো রাজ্যের বন বিভাগের সঙ্গেই আমার বিরোধ নেই বিরোধ করতে চাইও না কারণ তার কর্মীরা আমার আত্মীয়। যে আত্মার কাছে থাকে সেই আত্মীয়। তাঁদের কাজ বনকে ভালোবাসা বনের পশুকে পাখিকে ফুলকে লতাকে ভালোবাসা। সেটা আমার কাজ না হলেও সেটা আমার নেশা অপ্রতিরোধ্য; প্রচণ্ড নেশা। ইচ্ছে হয় আমাদের সব রাজ্যের বন বিভাগে একাধিক কর্মচারী থাকুন যাঁরা বিভূতিভূষণের 'আরণ্যকে'র যুগলপ্রসাদের মতো বন বনের পশু-পাখি ও গাছ-গাছালিকে ভালোবাসবেন।

আপনাদের সকলেরই হয়ত যুগল-প্রসাদের কথা মনে আছে যে সরস্বতীকুন্ডে নানা জায়গা থেকে বুনো ফুল-লতা সংগ্রহ করে এনে লাগাতো লোকে যাকে পাগল বলত, যে লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বনভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের সময় ও পয়সা ব্যয় করিতেছে যে বনে তাহার নিজের ভূ-সত্ত্ব কিছুই নাই—কি অদ্ভুত লোকটা।' বানোয়ারীলাল মুহুরী যার সম্বন্ধে বিভূতি-ভূষণকে বলেছিল—'তার নানা বাতিক হুজুর এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক। কিছু করে না বিয়েসাদি করেছে সংসার দেখে না বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় অথচ সাধু-সন্নিসীও নয়, ঐ এক ধরনের মানুষ।'

বন সংরক্ষণের সমস্যাটা আজকে অনেক অনেক যুগলপ্রসাদকে খুঁজে বের করার সমস্যা। এই সমাধানই এই বিশেষ সমস্যার একমাত্র ও গভীর সমাধান। পাতা-ভরানো ছবি-ছাপানো কোনো জ্বালাময়ী বক্তৃতাতে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

আমাদের প্রকাশিত রচনাবলী

মানিক গ্রন্থাবলী বনফুল রচনাবলী

১১শ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত। ১২শ খণ্ড বৈশাখের শেষে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। অন্যান্য খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি খণ্ড ২০ টাকা।

৫ম খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত। ৬ষ্ঠ খণ্ড বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমান সংস্করণে প্রতি খণ্ডের দাম ২০ টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর রচনাবলী

১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দাম ২০ টাকা। ১০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে। গ্রাহকরা প্রতি সংস্করণের প্রতি খণ্ডের সাময়িক মূল্যের উপর ২০% কমিশন পাবেন।

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দাম ২০ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। ১০ টাকা জমা দিয়ে এখনও গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে। গ্রাহকরা প্রতি সংস্করণের প্রতি খণ্ডের সাময়িক মূল্যের উপর ২০% কমিশন পাবেন। গ্রাহক হবার নিয়মাবলীর জন্য যোগাযোগ করুন।

অন্যান্য কয়েকখানি চিরায়ত উপন্যাস ও গল্পসাহিত্য

বিমল মিত্র
চাঁদের দাম এক পয়সা ৮, ঘুণি ৪, পদসঞ্চার ৮,

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
জনপদবধূ ৫, তীরভূমি ৫,
নগরনন্দিনীর রূপকথা ৬,

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
অনাগত ৬,

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
পিপাসা ৫,

নিরঞ্জন চক্রবর্তী
কাঠগোলাপের গন্ধ ৪,
শেষ বসন্ত ৬

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
আবছা আলোর জাল ৭,

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড / বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিশ্বনাথ বসু

জাতীয় পশু বাঘ

শেষ পর্যন্ত চন্দ্রপুরা গ্রামে অঘোষিত কার্ফু জারি হয়েছিল। কোন সরকারী নির্দেশে নয়। কিংবা কোন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বা রাজনৈতিক হাঙ্গামাবাজির কারণেও নয়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে গৌহাটি থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরের এই এলাকার বাসিন্দাদের আর ঘরের বার হতে সাহসে কুলোতো না। কারণ? কারণ একটি ডোরা-কাটা বাঘিনীর দৌরাত্ম্য। শেষ পর্যন্ত সেই বাঘিনীকে ফাঁদে বন্দী করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তার পূর্বে সে একনাগাড়ে পাঁচ-ছ মাস ধরে মানুষ ও গরু মোষের ওপর হামলা চালিয়ে সন্ত্রাস্ত গ্রামবাসীদেরও গৃহবন্দী করে রেখেছিল।

শুধুই কি গৃহবন্দী—বিশেষ কারণে ডোরাকাটাদের উৎপাতে কোথাও কখনও বা শত শত লোক নিহত হয়েছে অরণ্যাঞ্চলের গ্রামের পর গ্রামের ভীতিবিহ্বল অধিবাসীরা উদ্বাস্তু হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে সে ঘটনাবলী বিবৃত আছে জিম করবেট প্রমুখ প্রখ্যাত শিকারীদের শিকার কাহিনীতে। তবুও সেই জিম করবেটের মতো ব্যাঘ্র-বিশারদরা বাঘকে বলেছেন—'জেন্টলম্যান অফ দ্য ফরেস্ট'। আমিও বলি অমিত বিক্রম ও শৌর্যের অধিকারী হয়েও এরা অরণ্যের অতি অমায়িক বাসভারী ভদ্রলোক। আনন্দের কথা এ হেন বন্যপশুটি আজ আপন যোগ্যতায় 'জাতীয় পশু'রূপে সরকারী স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তাই পাঠক মহলে এর আবির্ভাব ও আদি বাসস্থলের ইতি-হাস জানার কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।

বাঘ ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা নয়। গবেষণালব্ধ বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে যে তথ্য আজ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায়—ভিনদেশীয় এই বন্যপশুটির যাযাবর জীবনের সর্বশেষ গন্তব্যসীমা হয়ত এই ভারতবর্ষ পর্যন্তই। দীর্ঘ ও বক্রদন্ত বিশিষ্ট অতিকায় প্রাচীন বাঘের বাসভূমির ভৌগোলিক অবস্থান সবটা না হলেও প্রধানত এশিয়া মহাদেশের বেশিরভাগ অংশে ও তৎসংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত ছিল।

অতিকায় ব্যাঘ্র অধ্যুষিত এশিয়া মহা-দেশের উত্তরাঞ্চল অনুকূল আবহাওয়ার দরুন একসময় ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল। সেখানে বাঘের খাদ্যোপযোগী ছোট বড় বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য তৃণভোজী বন্য-প্রাণীও বিচরণ করতো। কালক্রমে সেই অঞ্চলের আবহাওয়ার গুরুতর পরিবর্তন ঘটে এবং তুষার যুগের ক্রমবর্ধমান বরফ-পাতের ফলে তৃণভোজী বন্যপ্রাণীরা অদৃশ্য হয়—অথবা বেঁচে থাকার তাগিদে নতুন আবাসস্থলের খোঁজে স্থান ত্যাগ করে। এদিকে বাঘও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাধ্য হয়ে পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় সমসাময়িককালে

বাঘের বসবাসের পশ্চি
আরারাত ও ককেসাস
বাধা পায় এবং সেখান থেকে দিক পরি
বর্তন করে কাস্পিয়ান সাগরের উপক
বর্তী অরণ্যাঞ্চল ধরে উত্তর পারস্যের ভে
দিয়ে তুরস্ক ও আফগানিস্থানে গিয়ে
আবির্ভাব ঘটে।

এই স্থানে উল্লেখ্য যে প্রখ্যাত গবেষক
মিঃ ব্ল্যানফোর্ডের মতে আফগানিস্থান ও
বেলুচিস্থানে বাঘের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ
নেই যেমন নেই এলবার্জ পর্বতমালার
দক্ষিণাংশ-সংলগ্ন পারস্যে (দি রয়্যা
ন্যাচারাল হিস্টরী গ্রন্থের ৩৭৫
দ্রষ্টব্য)। আফগানিস্থান সম্বন্ধে মিঃ
ডি স্ট্রেসি অবশ্য ভিন্নমত পোষণ
(টাইগার্স গ্রন্থের ৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বাঘের দেশ দেশান্তরের বংশ
দীর্ঘ পরিক্রমার যে চিত্র আমু
বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে ধরা
বলা বাহুল্য অতি
আর্কটিক বল
বেরিয়া দ্ব
অতিকায়
দেহাবশেষ
পূর্বোক্ত
এবং পর
জাভা

আলোচ্য বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত করে।

যা হোক—তুরস্ক থেকে মধ্য এশিয়ার দীর্ঘ বিস্তৃত বিশাল ভূভাগ ও দক্ষিণ সাইবেরিয়ার অরণ্যপথ অনুসরণ করে বাঘ মঙ্গোলিয়ায় এসে হাজির হয়। তারপর তাদের একদল গিয়ে অনুপ্রবেশ করে পূর্বদিকে মাঞ্চুরিয়ার বনাঞ্চলে। অন্যদল দক্ষিণে পাড়ি জমায় চীন কোরিয়া বার্মা শ্যাম ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে। সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপপুঞ্জও তাদের পরিক্রমায় বাদ পড়েনি। যদিও বোর্নিও দ্বীপকে বাঘ কি জানি কেন এড়িয়ে গেছে।

বাঘের শিলীভূত দেহাবশেষগুলি পর্যালোচনা করলে তাদের যাযাবরী পদপরিক্রমার একটি অচ্ছলভিত্তিক ধারাবাহিক সংযোগসূত্র আবিষ্কার করা যায় যা থেকে প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্মদেশ হয়ে আসামের ভেতর দিয়ে অনুপ্রবেশ করে বাঘ শেষ পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতের সমগ্র বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও সিংহলে বাঘের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। এ থেকে অনুমান করা যায় যে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সিংহলের ভৌগোলিক ভূমি সংযোগ সমুদ্রের জলস্রোতে ছিন্ন হয়ে যাবার পরবর্তী সময়ে হয়ত ভারতে বাঘের উপস্থিতি ঘটেছিল যার ফলে স্থলচারী এই পশুটির পক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত সিংহলে প্রবেশ সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিক খাদ্য ও জঙ্গলাকীর্ণ উপযুক্ত আশ্রয়স্থলের অভাবেই হয়ত তিব্বতের উন্মুক্ত উচ্চ অধিত্যকা অঞ্চলেও বাঘের উপস্থিতি ঘটেনি।

শিলীভূত ব্যাঘ্রকঙ্কাল যা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার যথাযথ বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার ফলাফলে ব্যাঘ্রকুলের বাধ্যতামূলক যাযাবরী জীবনের গন্তব্যপথের মোটামুটিভাবে কিছুটা হদিস পাওয়া যায়। এবং তা থেকে তার দক্ষিণ-পূর্বমুখী এশিয়া অভিযানের শেষ অধ্যায়ে মালয় বর্মা ও ভারত প্রবেশের একটি তথ্যসিদ্ধ ধারাবাহিক ভৌগোলিক মানচিত্রেরও প্রমাণ মেলে।

কিন্তু বাঘ ভারতভূমিতে অনুপ্রবেশের জন্য অন্য দিক ছেড়ে বর্মার ভেতর দিয়ে আসামের পথ বেছে নিল কেন? বাঘ প্রকৃতিগতভাবেই একটু আয়েসী ও লাজুক তথা আড়ালপ্রিয় প্রাণী। তাই হয়ত আসামের সহজসাধ্য বনপথের নিরাপদ পদযাত্রা সে পছন্দ করেছিল এবং সে পথের আবহাওয়াও তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল ও আরামদায়ক ছিল। অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত কারণেই বাঘ উক্ত উদ্দেশ্যে তার দক্ষিণমুখী অগ্রগমনের পথে সোজা উত্তরের সিংকিয়াং মরুভূমি তিব্বতের উন্মুক্ত প্রান্তর ও দীর্ঘ বিস্তৃত সুউচ্চ হিমালয় পর্বতকে সভয়ে এড়িয়ে গিয়েছিল—যেভাবে ঠিক অনুরূপ কারণেই সে এড়িয়ে গিয়েছিল উত্তর-পশ্চিম দিককার হিন্দুকুশ পর্বতমালা তথা পারস্য ও বেলুচিস্থানের বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ব্যাঘ্র অধ্যুষিত বহুধাবিস্তৃত অঞ্চলাদি তথা তার অন্তর্দেশীয় সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার মানচিত্রের সতর্ক পর্যালোচনায় একথাটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বাঘ কেবলমাত্র ট্রপিক্যাল আবহাওয়া মণ্ডলের প্রাণী বলে বহুল প্রচারিত যে ধারণাটা আছে তা ঠিক নয়।

ভারতবর্ষে বাঘ তার ভবঘুরে আরণ্যক জীবনের শেষ আগন্তুক হলেও স্থানীয় সামাজিক লোকাচার ধ্যান-ধারণা সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে সে জড়িত যে যুক্তিসঙ্গত কারণেই এদেশের জন মানসে সে আজ এক বিশেষ প্রতীকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সিংহলে বাঘের অনুপস্থিতিতে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে উত্তর ও মধ্য ভারতের বনাঞ্চলে তাদের বসবাস সুসংহত করার বহুকাল পরে ব্যাঘ্রকুল সম্ভবত ধীরে ধীরে দক্ষিণ ভারতে অনুপ্রবেশ সুরু করেছিল। এটা এই কারণেই মনে আসে যে দক্ষিণ ভারতে বাঘের উপস্থিতির বহু পূর্ব থেকেই পাক-প্রণালীর উভয় দিকে বিভিন্ন জাতি ও প্রজাতির অসংখ্য বন্য-প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ছিল না শুধু বর্তমান ভারতের ডোরাকাটা এই জাতীয় পশুটি।

বলা বাহুল্য বাঘের সাইজ বিশেষ করে দৈর্ঘ্যের বিষয়টি একটি বহু-বিতর্কিত প্রশ্ন। পৃথিবীর প্রখ্যাত শিকারীগণ কর্তৃক এ বিষয়ে বহু তথ্যের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর। অনেক তথ্য অবিশ্বাস্যও মনে হয়। অবশ্য দৈর্ঘ্যের মাপ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মাপবার পদ্ধতির ওপর। নিহত বাঘের ক্ষেত্রে মাপবার পদ্ধতি তিন রকমের: (১) দেহটিকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে থুতনি ও লেজ টান টান করে রেখে নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত সরল রেখায় মাপা (২) নাকের ডগা থেকে কপাল ও পিঠের উপর দিয়ে লেজের ডগা পর্যন্ত দৈহিক বকতা বরাবর মাপা—শিকারীরা সাধারণত এই পদ্ধতিতেই মাপেন এবং (৩) চামড়া ছাড়ানোর পর তা টেনে বিস্তৃত করে নাক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত সরল রেখায় মাপা। এই পদ্ধতিতে প্রকৃত মাপের চেয়ে অনেক বেশী মাপ ওঠে।

রয়্যাল ন্যাচারাল হিস্টরী গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যে বাঘের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১২ ফুট থেকে ১২ ফুট ২ ইঞ্চি পর্যন্ত উল্লিখিত আছে। রাওল্যান্ড ওয়ার্ড প্রণীত 'রেকর্ডস অব বিগ গেম' গ্রন্থে সর্বোচ্চ মাপ ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত দেখানো আছে। ১৮৭১ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত কুচবিহারের তৎকালীন মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের শিকার রেকর্ডে নিহত বাঘের সর্বোচ্চ মাপ পাওয়া যায় ১০ ফুট ৫ ইঞ্চি। আসামের গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ১৯৩৯ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে দরং জেলায় একটি বাঘ শিকার করেন যার মাপ ছিল ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি। দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত এই সব তথ্য ছাড়াও বিশাল আকৃতির বাঘের আরো বহু বর্ণনা অন্যত্র পাওয়া যায়।

প্রাথমিকভাবে পায়ের গড়ন অনুযায়ী দুই জাতীয় বড় বাঘের হদিস মেলে—যথা (১) প্রশস্ত পায়ের চৈনিক-সাইবেরীয় ও (২) সরু পায়ের জাভা জাতীয়। শিলীভূত কঙ্কালাদি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কালক্রমে বাঘ আন্তর্দেশীয় পরিক্রমার যত দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছে তত তার মূল আকৃতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। এবং অনুমিত হয় যে বাঘ তার বর্তমান আকৃতি পেয়েছে সুদূর অতীতে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে। যদিও একমাত্র মঙ্গোলিয়া ছাড়া অঞ্চল ভেদে তাদের আকৃতি গায়ের রং ও ডোরার মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্যই ধরা পড়ে। মঙ্গোলীয় ও মাঞ্চুরীয় বাঘের আকৃতি অস্বাভাবিক ধরনের বড় যদিও তার গায়ের রং হালকা ও ডোরার সংখ্যাও কম। ভারতীয় বাঘের আকৃতি মালয় দেশের বাঘের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় এবং উত্তর এশীয় জাতের চেয়ে সামান্য ছোট। কিন্তু মাঞ্চুরীয় ও রালী দেশের বাঘের মধ্যে তুলনামূলকভাবে আকৃতিগত বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। বলা বাহুল্য মহাদেশীয় মূল ভূখণ্ডের বাঘ ও তৎসংলগ্ন দ্বীপাঞ্চলের বাঘের এই লক্ষ্যণীয় আকৃতিগত পার্থক্যের সঠিক কারণ আজও নির্ণীত হয়নি।

এইরূপ তথ্য পাওয়া যায় যে এক সময় ১২ ফুট ও তদূর্ধ্ব বাঘের অস্তিত্ব মাঞ্চুরিয়ায় প্রচুর ছিল। রুশীয় শিকারীরা নিয়মিতভাবে বেছে বেছে এইসব বাঘ শিকার করতেন। কিন্তু একথাও জানা যায় যে মাঞ্চুরিয়ার অনেক বাঘ বৃহৎ আকৃতির ভারতীয় বাঘের চেয়ে কোন দিক দিয়েই ব ছিল না। এ থেকে এই ধারণা করা যায় ভারতীয় ঐসব বড় বাঘ হয়ত বা বৈরিয়ার লুপ্ত বড় বাঘের বংশধর। ব ব্লাডিভোস্টক শহর যেখানে অব অঞ্চলে নাকি একসময়ে মঙ্গোলী দ্বারা পরিচালিত বিশাল পশু এই উদ্যানে নির্বাচিত প্রজ বড় বাঘের বিপুল বংশবৃ ঐ উদ্যান উঠে গেলে পেয়ে উত্তরে সাখ কোরিয়ার দিকে জাদের অনেক হয়। কিন্তু বড় জাতে ব্যাপক স সমর্থিত ইয়াঙে রুশ এও ও

টেলিগ্রাম : HARNESS স্থাপিত : ১৮৩৭ টেলিফোন : ২৩-২৫২৮
২৩-৫৭৬৭

কাথবার্টসন অ্যাণ্ড হারপার (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ

১০, গভর্নমেণ্ট প্লেস ইস্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯

ট্যানিং ও ট্যাক্সিডার্মি, চামড়া এবং
সর্বপ্রকারের চামড়ার দ্রব্যের
অগ্রণী সংস্থা।

অপেক্ষাকৃত বড়। সুন্দরবনের বাঘের নাম-ডাক থাকলেও এরা কিন্তু দৈহিক গড়নে স্থলেকায় নয়। শূলয়ভরা ঠাসা ঝোপঝাড়ের কাদা জংগলের বাসিন্দা বলেই হয়ত এরা একটু অনুচ্চ লম্বাটে গড়নের। যদিও শক্তিশালী পেশীবহুল দেহের অধিকারী এরা অত্যন্ত একরোখা চতুর ও কষ্টসহিষ্ণুও বটে।

অঞ্চল আবহাওয়া ও উদ্ভিদাদির প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে বন্য পশু-পাখীর গায়ের রং ও স্বাস্থ্যের ওপর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বাঘও তার পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। শুধু তাই নয় বাঘ হলে পর বাঘও যে তার নতুন আবাসস্থলের অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে নিবিড়ভাবে মানিয়ে নিতে পারে সুন্দরবনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রাকৃতিক প্রভাবে গায়ের রঙের কিছুটা পার্থক্য ঘটলেও সে রং সাদা বা কালো হওয়াটা কিন্তু ঐ একই কারণে নয়। স্বাভাবিক রঙের এই রূপান্তর নিশ্চিতই অন্য বৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়াজনিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত যতটা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে প্রমাণিত হয় যে প্রধানত রেওয়া এস্টেট তথা পূর্বতন মধ্যপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলির অরণ্যাঞ্চল হচ্ছে সাদা বাঘের উৎপত্তিস্থল। যদিও ভারতের আরো বিভিন্ন এলাকায়ও যে সাদা বাঘের অস্তিত্ব ছিল এরূপ তথ্যও অতীতে পাওয়া গেছে। জানা যায় ইংরেজী ১৮২০ সালে ভারত থেকে একটি জীবিত সাদা বাঘ ইংলন্ডে নিয়ে গিয়ে জনসাধারণকে দেখানো হয়েছিল। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মেজর ডি রবিনসন নামে এক বিদেশী ভদ্রলোক পুণায় পূর্ণবয়স্ক একটি সাদা বাঘ পেয়েছিলেন। সম্প্রতি সাময়িককালে তৃতীয় একটি সাদা বাঘের খবর ছিল কর্নেল এইচ এইচ গডউইন অস্টেন নামক এক ভদ্রলোকের কাছে।

১৯৫১ সালে মধ্যপ্রদেশে রেওয়ার জংগলে একটি বাঘিনীকে একটি সাদাসহ তিনটি বাচ্চা নিয়ে ঘুরতে দেখা যায়। জংগল খেদিয়ে সাদাটিকে ধরা হয়। অন্য দুটি গুলিতে নিহত হয়। কিন্তু সাদা বাচ্চাটি এক ফাঁকে পালিয়ে গেলেও আবার ধরা পড়ে এবং রেওয়ার মহারাজার গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে বন্দী থাকে। নামকরণ করা হয় তার 'মোহন'। এই বিরল জাতীয় সাদা বাঘের বংশবৃদ্ধি ঘটানোর উদ্দেশ্যে উঠতি বয়সের মোহনের সংগে নানানসই বয়সের স্বাভাবিক রঙের একটি কিশোরী বাঘিনীকে রাখা হয়। বন্দী জীবনে তাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং ১৯৫৫ সালে মোহনের ঔরসে তার সঙ্গিনীর গর্ভে স্বাভাবিক রঙের তিনটি বাচ্চা হয়। ১৯৫৮ সালে ঐ মোহনের দ্বারা তারই পূর্বোক্ত ঔরসজাত এক কন্যা গর্ভবতী হয় এবং চারটি সম্পূর্ণ সাদা রঙের বাচ্চা প্রসব করে। দু বছর পর ঐ একই জুড়ির মিলনে দুটি সম্পূর্ণ সাদা স্ত্রী-শিশু ও একটি স্বাভাবিক রঙের পুরুষ-শিশু এবং ১৯৬২ সালে সম্পূর্ণ সাদা একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী ব্যাঘ্র শিশুর জন্ম হয়।

উপরোক্ত ঘটনার পর শ্বেত ব্যাঘ্রের বংশবৃদ্ধির দিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং রেওয়ার মহারাজার সংগে একটি চুক্তির ভিত্তিতে প্রথমে দিল্লী ও পরে কলকাতার চিড়িয়াখানায় মোহনের ঔরসজাত বাঘ বাঘিনীদের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে আন্তর্বংশীয় প্রজনন প্রকল্প চালু হয়। বলা বাহুল্য সাদা বাঘের বংশবৃদ্ধি সংক্রান্ত সেই প্রকল্পের সাফল্যের কথা আজ সর্বজনবিদিত ঘটনা।

কিন্তু কুচকুচে কালো রঙের বাঘের অস্তিত্বের ঘটনা বিরল হলেও একেবারে অবাস্তব নয়। বোধহয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মিঃ সি টি বাকল্যান্ড নামক এক ভদ্রলোক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম জেলার এক স্থানে সম্পূর্ণ কালো রঙের একটি মৃত বাঘের কথা জানা যায়। ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ ব্রহ্মদেশেও ঐ সময় কালো বাঘের অস্তিত্ব ছিল। আরো ছিল চীনদেশের দক্ষিণাঞ্চলে 'ব্ল্যাক ডেভিল' নামে পরিচিত নীল রঙের বাঘ। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে বাঘেরও একটি লক্ষ্যণীয় ভূমিকা আছে।

এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘ বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চলে প্রকৃতির মুক্ত অংগনে এই বিশিষ্ট ও বিচিত্র প্রাণীটির যে বিপুল সমাবেশ ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে তার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়। গত শতাব্দীতেও ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পূর্ব থেকে পশ্চিম বরাবর বিশাল ও দুর্গম বনভূমির সর্বত্র অসংখ্য বাঘের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষের বেপরোয়া হস্তক্ষেপের ফলে বর্তমানে বাঘের উল্লিখিত আদি বাসভূমির কয়েকটি মাত্র বিক্ষিপ্ত অঞ্চলেই তারা কোনরকমে টিকে আছে যার সংখ্যা পঞ্চাশ ষাটটির বেশী নয়। একমাত্র মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত সংলগ্ন উসরী অঞ্চল ছাড়া অন্য স্থান থেকে তাদের অস্তিত্ব ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। আশার কথা যে সোভিয়েট সরকার বর্তমানে অতি কঠোর আইন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাদির মাধ্যমে ঐ কয়টি বাঘকে সযত্নে সংরক্ষণ করে তাদের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করছেন। একমাত্র পশুশালার প্রয়োজনে ছাড়া সেখানে বাঘের বাচ্চা পর্যন্ত ধরা আজ নিষিদ্ধ হয়েছে।

কৌতূহলজনক খবর হচ্ছে বিগত দশকে ককেশাস ছাড়িয়ে ইরান সংলগ্ন আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে পর্যন্ত কয়েকবার বাঘের অস্তিত্ব চোখে পড়েছে। ১৯৫৬ সালে তাদের একটি ফাঁদে ধরাও পড়ে। কিন্তু নানাবিধ কারণে তাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে এখন মাত্র দশ বারোটিতে এসে ঠেকেছে এবং কাস্পিয়ান সাগরে দক্ষিণ-পূর্ববর্তী কোণে ইরানের জংগলে তারা আজ বিলুপ্তির অপেক্ষায়।

জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জের জংগলে একসময় অগুনতি বাঘ ঘুরে বেড়াতো। ১৮৯১ সালে সুমাত্রার একজন ওলন্দাজ ব্যবসায়ীর রিপোর্টে জানা যায় যে ঐ বছর বন পথে চলাচলকারী কফি-বাগিচার কুলিদের ওপর ক্রমাগত এমনই প্রচণ্ড বাঘের আক্রমণ ঘটেছিল যে তাদের পঞ্চাশজনেরও বেশী লোক নিহত হয়। যার ফলে কফি রপ্তানীও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বলা বাহুল্য নানাবিধ বাস্তব কারণে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার মাঞ্চুরিয়া কোরিয়া এবং চীন দেশের ফুকিয়েন তীরভূমির বুকের বনের বাঘের বসতিও দ্রুত সংকুচিত হয়ে আজ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত এলাকায় এসে ঠেকেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় বাঘ যে আজ নিঃসৌমিত-প্রায় একথা সেখানকার সবাই জানে। লাওস ও ভিয়েৎনামের জংগলে এখন কদাচিৎ বাঘের দেখা মেলে। প্রাণীবিদদের ধারণা ইন্দোনেশিয়ার বাঘও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাবে। ব্রহ্মদেশের পরিস্থিতি জানা না গেলেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বলা যায় সংরক্ষণ আন্দোলন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি জোরদার করতে পারলে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে এদেশে বাঘের অস্তিত্ব রক্ষা করা হয়ত বা সম্ভব হবে। হবে হয়ত—কিন্তু অবশ্য অতীতে কি ছিল বর্তমানে কি কেনই বা এমনটি হোল এবং সংরক্ষণমূলক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে জনসাধারণেরও পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

মনে হয় ৫০০০ খৃষ্ট পূর্বের নব্য-সাময়িককালে আসামের পথে বাঘের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। শুধু প্রাক-বৃটিশ যুগ বা মুসলমান শাসনকালে নয়—তারও আগে সুদূর অতীত থেকে ভারতে বাঘের উপস্থিতির তথ্যসিদ্ধ প্রমাণ আছে। যা হোক, আর্য শাস্ত্রগ্রন্থ 'ঋগ্বেদে' কিন্তু বাঘের অস্তিত্বের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর্য সাহিত্য গ্রন্থ অথর্ব বেদেই প্রথম বাঘের উল্লেখ দেখা যায়। ৪৭০ খৃঃ পূর্বে বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি বিশেষ অধ্যায়েও এর উল্লেখ আছে।

'ইন্ডিয়া ইজ দি হোম অব মডার্ন টাইগার্স'—এইরূপ একটি বহুল প্রচারিত কথা শোনা যায়। যদিও তার যথামথ ঐতিহাসিক স্বীকৃতি নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের বনাচ্ছাদিত ভূমিভাগের বিশালতা ও বহুধা বিস্তৃতির বিচারে, বাঘের তৎকালীন প্রাচুর্য অনুমান করা কঠিন নয়। সে যুগের জনসংখ্যা কৃষি ও জনবসতির স্বল্পতা—অপরদিকে ছোট বড় বহু শ্রেণীর তৃণভোজী অসংখ্য শিকার প্রাণী-অধ্যুষিত বনের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে বাঘের তৎকালীন সংখ্যা সংক্রান্ত সর্বাধুনিক ধারণাগুলি যে অযৌক্তিক একথাও বলা চলে না।

অতীতে বাঘ তথা বন্যপ্রাণী বিষয়ক নির্ভরযোগ্য কোন সমীক্ষা না থাকলেও বৃটিশযুগে সে বিষয়ে কতো শিকারী পর্যটক ভৌতাত্ত্বিক জরীপ কর্মী ও বিজ্ঞানীদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক যে তথ্য পাওয়া

যায় তাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সমসাময়িককালে ভারতের বনাঞ্চল অপর্যাপ্ত বন্যপ্রাণী সম্পদে ভরা ছিল। কিন্তু যন্ত্র-যুগের আবির্ভাব ও আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কার সেই সম্পদের সামনে অভিশাপরূপে দেখা দেয়। অবিচ্ছেদ্য দীর্ঘ বিস্তৃত যে বনাঞ্চল একসময় বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বিচরণভূমি ছিল রাস্তাঘাট তৈরী রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও যানবাহনের প্রবর্তনে সেই বন-ভূমির নির্জনতা বিঘ্নিত হয় এবং বিব্রত ও শঙ্কিত বন্যপ্রাণী ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যেতে থাকে।

বৃটিশ আধিপত্য পাকাপোক্তভাবে বিস্তৃত হবার পর সামরিক ও প্রশাসনিক অফিসারদের মধ্যে দেখা দেয় প্রতিযোগিতা-মূলক শিকার প্রবণতা। বিদেশী শাসকদেরই অনুমোদিত ও অনুগ্রহভাজন বিপুলে ধন-দৌলত ও বৈষয়িক প্রতিপত্তির অধিকারী দেশীয় রাজা মহারাজা নবাব বাদশা জায়-গীরদার জমিদার প্রভৃতির মধ্যেও বায় ও বিলাস বহুল খানদানী নেশা ও সুখের সঙ্গে সঙ্গে বন্যেদী মৃগয়াপ্রীতিরও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এর পাশাপাশি আরো ঘটতে থাকে শিল্পোন্নতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত অপরিহার্য সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বন কেটে কলকারখানা কৃষি ও বসতি অঞ্চলের সম্প্রসারণ। যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে বন-হারা বন্যপ্রাণীর ব্যাপক বিপর্যয়।

এই বিপর্যয়ে সর্বাধিক ক্ষতি হয়েছে বাঘের বংশে। কেন? কারণ—সিংহ ও ব্যাঘ্র শিকার প্রাচীনকাল থেকেই অসীম শৌর্য ও কৃতিত্বের নিদর্শনরূপে ভারতীয় সমাজে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে।

সিংহ একদা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল। তার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও আছে—যদিও সিংহ বাঘের মতন বিপুলে সংখ্যায় ছিল না কখনও। ছিল না তার প্রধান কারণ হচ্ছে ভারতে তুলনামূলক-ভাবে সিংহের বাসোপযোগী বনাঞ্চলের স্বল্পতা। কিন্তু শিকার প্রাণী হিসেবে শিকারীদের কাছে বাঘের ন্যায় সিংহের আকর্ষণও কম ছিল না। তাই সংখ্যালঘুতার কারণে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে তাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আরো কমে গিয়ে বর্তমানে মাত্র দুই শোতে এসে ঠেকেছে।

কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে বাঘের সংখ্যা অতি দ্রুত ও উদ্বেগজনকভাবেই কমে গিয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী মহলের এইরূপ একটি আন্দাজ ছিল যে ১৯৫০ সাল নাগাদ ভারতে বাঘের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজারের মত। ১৯৬১ সালে সব রাজ্যের বন-দপ্তরগুলি যে আভাস দেয় তার ভিত্তিতে সারা দেশে সর্বসাকুল্যে বাঘের সংখ্যা ধরা হয় কম-বেশী আড়াই হাজার। বলা বাহুল্য উপরোক্ত কোন গণনাই পর্যাপ্ত ও যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভিত্তিক ছিল না। তা ছাড়া ঐ সংখ্যার মধ্যে কুল কাদার জঙ্গল সুন্দরবন এবং কাজিরাঙ্গা ও জলদাপাড়ার ন্যায় উঁচু ও গভীর ঘাসবনের বাসিন্দা বাঘদের ধরা সম্ভব হয়নি। হয়নি তার কারণ ঐ ধরনের জঙ্গলে বাঘের হদিস পাওয়া এবং তার উপযোগী পূর্বপরিকল্পিত অভিযান সংগঠিত ও কার্যকরী করা কঠিন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে খণ্ডিত এই দেশে বাঘের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। প্রথম থেকে এর কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক অর্থাগমের লোভ মগজে ঢুকবার অনেক আগে থেকেই বনের ব্যাপক বিনাশ ও সৌখীন শিকারীদের বেপরোয়া বন্দুকবাজী বন্যপ্রাণীকে বিশেষ করে বাঘ ও চিতাবাঘের বংশকে নির্বংশ করার দিকে বিপজ্জনকভাবে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। এটা কোনরূপ অমূলক রটনা বা উদ্দেশ্যমূলক কল্পনাও নয়। বন কেটে শিল্প কৃষি ও বসতির পত্তন ও তার ক্রম-সম্প্রসারণের সত্যতা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এটা সর্বজন-বিদিত ঘটনা। এবং এই ঘটনার ফলাফলে বিশেষ করে বনহারা কোণঠাসা বাঘ সৌখীন শিকারীদের হাতে যে কি পরিমাণে ধ্বংস হয়েছে তার অসংখ্য উদাহরণের মধ্য থেকে মাত্র দু-একটি পাঠক মহলের অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করছি।

বিহারের অধুনালুপ্ত কোন একটি দেশীয় রাজ্যের প্রাক্তন নৃপতি (বর্তমানে লোকসভার সদস্য) স্বীয় শৌর্য ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য সারা জীবনে নাকি হাজার দুই-এর মত বাঘ ও চিতাবাঘ শিকার করেছেন। ছোট বড় দেশীয় রাজ্যগুলির নৃপতিবর্গের অধিকাংশই অনুরূপে আরণ্যক সখের অনুরাগী এবং লক্ষণীয়ভাবে কম বেশী শিকার কৃতিত্বেরও অধিকারী।

হিমালয়ের নিভৃত বুকে অবস্থিত ভারত সীমান্ত সংলগ্ন বন ও বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ নেপাল ও ভুটান রাষ্ট্রদ্বয় এক সময় অপরিসীম ব্যাঘ্র ভাগ্যের অধিকারী ছিল। ভুটানের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা ও আইনানুগ অধিকারে একমাত্র রাজাই জঙ্গলে শিকার করতে পারেন। ঐ আইন অমান্যের শাস্তি অতি কঠোর ও নির্মম। তাই ভুটানের বনে বাঘের সংখ্যা নাকি এখনও নেহাৎ কম নয়—যদিও সেখানে চোরা-শিকারীদের সাহস বেশ বেড়েছে ও বন্য-জন্তুও যথেষ্ট মারা পড়ছে শুনেছি।

এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে নেপালে বাঘের সংখ্যা কি পরিমাণ ছিল নেপালের ভূতপূর্ব মহারাজা স্বর্গত যুদ্ধা সমশের জং বাহাদুর রানার শিকার তালিকায় আংশিক উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে মহারাজার একদিনের সর্বোচ্চ শিকার রেকর্ড হচ্ছে—বাঘ ৭টি গণ্ডার ৫টি এবং ভালুক ৫টি।

৬৮ দিনের এক অভিযানের শিকার—বাঘ ১২০টি গণ্ডার ৩৮টি চিতাবাঘ ২৮টি ভালুক ১৫টি কুমীর ১১টি।

২১ দিনের এক অভিযানে—বাঘ ৪১টি গণ্ডার ১৪টি চিতাবাঘ ২টি।

সমসাময়িককালে উপরোক্তগুলি সহ পর পর ছোট বড় সাতটি শীতকালীন অভি-যানের মোট শিকার রেকর্ড—বাঘ ৪৩৩টি গণ্ডার ৫৩টি চিতাবাঘ ৯৩টি ভালুক ২২টি কুমীর ২০টি।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় নেপাল অরণ্য একসময় কি পরিমাণ বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু শিকারের ফলে দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু বন্য প্রাণী যৎসামান্যই আজ প্রাণে বেঁচে আছে সেখানকার রাপতী নদীর দক্ষিণ তীর সংলগ্ন রয়্যাল চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্কের নিরাপদ আশ্রয়ে। আর বাঘ? এই পার্কের উত্তর-পূর্ব কোণের সব চেয়ে ঘন ৩৫ বর্গমাইলের মত সৌরাহা নামক বনাঞ্চলে মাত্র দশ এগারোটি বাঘ চলাচলের আভাস পাওয়া গেছে। এই এলাকায় ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড তাঁদের বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প চালু করেছেন এবং এই এলাকায়ই সুন্দরবনের 'সুন্দর' খ্যাত নায়ক ডঃ সিডেনস্টিকার বাঘ ও চিতাবাঘের ওপর তাঁর ঘুম-পাড়ানি ওষুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বন্যপ্রাণী নিধন কার্যক্রমের পরবর্তী শরিক হয়েছে অর্থলোভী বেনিয়ার দল। সেই সঙ্গে সৌখীন শিকারীদের দ্বারা উপরোক্তরূপে ধ্বংস যজ্ঞের শেষ পর্যায়ে তাতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে কালোবাজারী ও দুর্নীতিপরায়ণ বন্য-প্রাণী ব্যবসায়ী মহলের পৃষ্ঠপোষিত চোরা শিকারীরা। বিশেষ করে বাঘ শিকার এবং বাঘের চামড়া বিদেশে রপ্তানি নিষিদ্ধ হবার পরও সরকারী আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে গত পাঁচ সাত বছরের মধ্যে শত শত বাঘ চিতাবাঘের চামড়া গোপন পথে বিদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে।

এ দেশের কালোবাজারে যে বাঘের চামড়াটির দাম চার পাঁচ হাজার টাকা বিদেশের বাজারে তার দাম বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা। নিখুঁত চামড়ায় সর্বোচ্চ দাম মেলে। তাই ব্যাঘ্র হত্যায় আগ্নেয়াস্ত্রের স্থান নিয়েছে এখন রং ও গন্ধবিহীন বিষ ইঁদুর মারা 'ফলিডল'। অরণ্য পল্লীর অধিবাসীদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে দু একশত টাকা বকশিসের লোভ দেখিয়ে তাঁদের মধ্য থেকে দালাল নিযুক্ত করা হয় যারা কিনা জঙ্গল ঢুঁড়ে বাঘের দ্বারা নিহত অর্ধভুক্ত জানোয়ারের মাংসে বিষপ্রয়োগ করে বাঘ মারে ও তার চামড়া গোপনে ব্যবসায়ীর ঘরে পৌঁছে দেয়।

বাঘের বিলুপ্তিমুখী অস্তিত্ব এক বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে বুঝতে পেরে কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয় বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা পর্ষদ কয়েক বছর আগে সভা হন এবং সরকারকে বাঘ সংরক্ষণ উদ্যোগ

হতে উপদেশ দেন। ১৯৬৯ সালে আন্তর্জাতিক প্রকৃতি-সংরক্ষণ সংস্থা অর্থাৎ আই ইউ সি এন-এর দিল্লী অধিবেশনে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাবে ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃত পরিস্থিতি না জানা পর্যন্ত বাঘ শিকার বন্ধ রাখার সুপারিশ করা হয়। সেই সুপারিশ গ্রহণ করে ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ সমস্ত রাজ্যগুলিকে অন্তত পাঁচ বছরের জন্য বাঘ শিকার নিষিদ্ধ করতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্যক্তিগতভাবে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অবহিত হতে বলেন—যার ফলে ১৯৭০ সাল থেকে ভারতের সর্বত্র বাঘ শিকার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়।

এরপর ১৯৭২ সালে সুরু হয় সারা দেশব্যাপী ব্যাঘ্র গণনা। ফলাফলে রাজ্যভিত্তিক সংখ্যা মেলে নিম্নোক্তরূপে—

অন্ধ্রপ্রদেশ—৩৫ অরুণাচল—৬৯ আসাম—১৪৭ বিহার—৮৫ গুজরাট—৮ কেরালা—৬০ মণিপুর—১ মধ্যপ্রদেশ—৪৫৭ মেঘালয়—৩২ মহারাষ্ট্র—৭৪ মহীশূর—১০২ নাগাল্যান্ড—৮০ উড়িষ্যা—১৪২ রাজস্থান—৭৪ তামিলনাড়ু—৩৩ ত্রিপুরা—৭ উত্তরপ্রদেশ—২৬২ পশ্চিমবঙ্গ—৭৩। মোট—১৮২৭।

উল্লেখযোগ্য গোয়া হরিয়ানা ও মিজোরামে বাঘের অস্তিত্ব মেলেনি।

এখানে পশ্চিমবঙ্গের ফরেস্ট ডিভিশন ভিত্তিক বাঘের সংখ্যার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

উত্তরবঙ্গের বকসা—১৭ জলপাইগুড়ি—৬ কুচবিহার—৭ বইকুন্ঠপুর—৭ কার্সিয়াং—৭ কালিম্পং—২ এবং দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনে—২৭। মোট ৭৩। এই ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার দুর্গমতার দরুন সুন্দরবনের মাত্র এক পঞ্চমাংশ এলাকায় ১৯৭২ সালে সরকার কর্তৃক বাঘ গণনা সম্ভব হয়েছিল যার সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল ২০টি। কিন্তু এ অঞ্চলের তৎকালীন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার শ্রীএ বি চৌধুরী ও তাঁর সহকারী অফিসার শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী নিজেদের উদ্যোগে কয়েক বছরের কষ্টসাধ্য চেষ্টায় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা পেয়েছিলেন ১১২ থেকে ১১৫।

সর্বভারতীয় পর্যায়ে ব্যাঘ্র বংশের এই দুরবস্থা কেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করেছি।

উপরোক্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে বাঘের বংশ যাতে নির্বংশ হয়ে না যায় তার জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের আর্থিক সহযোগিতায় ভারত সরকার সারা দেশে কয়েকটি টাইগার রিজার্ভ বা ব্যাঘ্র-অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠার মনস্থ করে এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য একটি পর্যবেক্ষক দল নিযুক্ত করেন। ঐ পর্যবেক্ষক দল নিম্নোক্ত ৮টি স্থান টাইগার রিজার্ভ প্রতিষ্ঠার উপযোগী বলে জানান—

স্থান	প্রস্তাবিত এলাকা	বাঘের সংখ্যা
মানাস (আসাম)	২৯০০ বর্গ কিঃ মিঃ	৪০
পালামৌ (বিহার)	১৫০০ কিঃ মিঃ	৩৭
সিমলিপাল (উড়িষ্যা)	৩০০ (অনির্দিষ্ট)	আলোচ্য সময়ে সংখ্যা পাওয়া যায়নি।
করবেট ন্যাশনাল পার্ক (উত্তরপ্রদেশ)	৩৬০ কিঃ মিঃ	৩০
রনথম্বোর (রাজস্থান)	৩০০ কিঃ মিঃ	১৭
কানহা (মধ্যপ্রদেশ)	১৩৮০ কিঃ মিঃ	৪২
মেলঘাট (মহারাষ্ট্র)	৯০০ কিঃ মিঃ	৪২
বন্দীপুর (মহীশূর)	২৬৪ কিঃ মিঃ	১৮

দুর্ভাগ্যবশত প্রথমাবস্থায় উপরোক্ত তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোন টাইগার রিজার্ভ নির্দিষ্ট ছিল না। ছিল না তার কারণ এ রাজ্যের তৎকালীন সর্বোচ্চ বনবিভাগীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যোগ নেননি। এমন কি আগ্রহ প্রকাশও পর্যন্ত করেননি। করেননি একথা সত্যই। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পর্যবেক্ষক দলের রিপোর্ট সম্বলিত ভারতীয় বন্য-প্রাণী পর্ষদ কর্তৃক প্রজেক্ট টাইগার নামক পুস্তকটি তন্নতন্ন করে খুঁজেও পঃ বঙ্গ বনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অনুরূপ কোন উদ্যোগ আগ্রহ বা প্রস্তাবের বিন্দুমাত্র চিহ্ন আমি পাইনি।

এই পরিস্থিতিতে ভারতের আদি ও সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যাঘ্র-অরণ্য সুন্দরবনে একটি টাইগার রিজার্ভ অনুমোদনের জন্য আমাদের সংস্থা পূর্বভারত বন্যপ্রাণী সংরক্ষন সমিতির পক্ষ থেকে ভারতীয় বন্যপ্রাণ্য পর্ষদের চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ করণ সিংকে সরাসরি একটি জরুরী অনুরোধপত্র পাঠাই। উল্লেখযোগ্য যে ডঃ করণ সিং অতি তৎপরতার সঙ্গে গুরুত্ব-সহকারে প্রস্তাবটি বিবেচনা করেন—যার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সুন্দরবন ভারতের নবম টাইগার রিজার্ভ হিসেবে ঘোষিত হয়।

বলা বাহুল্য সুন্দরবনের মত নদী-বহুল জলকাদা শূলোয় ভরা দুর্গম বন পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাছাড়া বাঘের সংখ্যার বিচারে ভারতের অন্য যে কোন একক ফরেস্ট ডিভিশনের চেয়ে সুন্দরবন ডিভিশনে বাঘ বেশী। এই বাঘ রক্ষা করতে পারলে সুন্দরবন তার নিজস্ব তাৎপর্যে সারা পৃথিবীর প্রকৃতি-প্রেমী পর্যটক গবেষক বিজ্ঞানী ও অভিযাত্রীদের আকৃষ্ট করবে ও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মর্যাদা বাড়বে। এই মহারণ্যের উদ্ভিদ ও ব্যাঘ্রসহ গোটা প্রাণীজগতকে সংরক্ষণের কাজ সেই কারণেই আজ এত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী।

জাতীয় পশু বাঘ বাঁচানো ও তার সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হবে কিনা এটি একটি সর্বজনীন প্রশ্নরূপে আজ দেখা দিয়েছে। উত্তরে বলবো জনসাধারণের সচেতনতা বাড়িয়ে সর্বস্তরের সরকারী ও বে-সরকারী মহলের নিষ্ঠাভরা যৌথ উদ্যোগকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করে আলোচ্য সমস্যার সফল সমাধান করা নিশ্চয়ই সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

বিরলপ্রাণী সংরক্ষণে পশু উদ্যানের ভূমিকা

রামকৃষ্ণ লাহিড়ী

সারা পৃথিবীতেই আজ মানুষের সব থেকে বড় সমস্যা খাদ্যের এবং আশ্রয়ের। এই সমস্যা সৃষ্টির মূলে আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাবার জন্যে আমরা সকলেই একমত। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের নজর দিতে হবে, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে ফসলের যে ঘাটতি দেখা দেয়—তা থেকে কিছুটা অন্ততঃ রেহাই কিভাবে পাওয়া যায় এবং ফসলের উৎপাদন কি উপায়ে বাড়ান যায়। ফসল হয় মাটীতে, কিন্তু তার পরিমাণ নির্ভর করে আকাশের সহৃদয়তার উপর। আসলে ফসল ফলানোর উপযোগী আবহাওয়া বেশী রকম নির্ভরশীল অরণ্যসম্পদের উপর।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বনাঞ্চল কমে গিয়ে পত্তন হচ্ছে সহরের আর গ্রামের। জনসংখ্যার হার কমার সঙ্গে সঙ্গেই নজর দিতে হবে বনাঞ্চল বৃদ্ধির দিকে।

বনাঞ্চল, বন্য পশুপাখীর জীবনের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এদের আশ্রয় বন আবার এরাই বনকে বাঁচিয়ে রাখে হিংস্রতা

সিংহ

দিয়ে, নিজেদের দেহনিঃসৃত পদার্থ দিয়ে, ফুলে ফলে বনের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

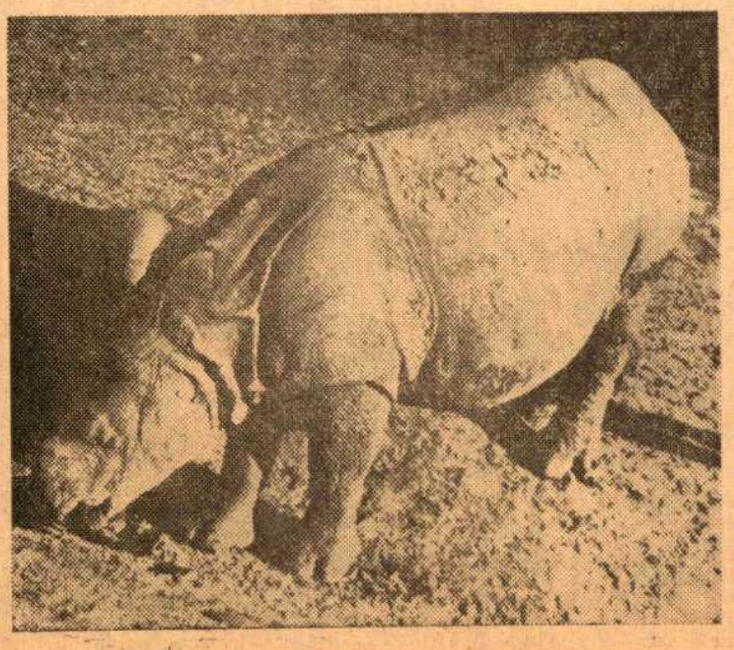

মুণ্ডার

কিন্তু আজকের মানুষ হাতিয়ারের জোরে হয়ে দাঁড়িয়েছে পশুর থেকেও হিংস্র। মজা করে পশুমারা, বন্যপশু ও তার দেহের অংশ নিয়ে ব্যবসা করা ইত্যাদি নানা কারণে এবং সেই সঙ্গে নিজের আবাসভূমি ও চাষের জমির এলাকা বাড়ানোর তাগিদে মানুষ আজ নিজেই নিজের লোভের ও দৌরাত্ম্যের শিকার হয়ে পড়েছে। আজকের মানুষকে মাথা খাটিয়ে ধৈর্য ও প্রচেষ্টার সঙ্গে সন্তর্পণে তার অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাকে আজ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে নজর দিতে হবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দিকে। আমাদের অবহেলায় বহু প্রাণী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কতগুলি প্রাণী এখন নিশ্চিহ্ন হবার পথে। সবার আগে এখন আমাদের ভাবতে হবে এদের কথা। আর একটুও সময় হাতে নেই। বন্যপ্রাণীদের প্রথমেই আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। এক হল যেসব প্রাণীর কথা আমরা খুবই শুনি অথচ তারা কেউই আজ আর পৃথিবীর কোথাও নেই। যেমন—ডো ডো পাখী, একশৃঙ্গবিশিষ্ট সুন্দরবনের ছোটজাতের গণ্ডার ইত্যাদি

দ্বিতীয়ত যে সব প্রাণী আজ নিশ্চিত বিলুপ্তির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে যেমন বাঘ, খামিন হরিণ, আরবীয় ওরিকস, আনোয়া অতিকায় পাণ্ডা ভারতীয় সিংহ, গ্যালাপেগস দ্বীপের অতিকায় কচ্ছপ। তৃতীয়তঃ অদূরদর্শী এ মানুষ জাতটার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে যারা আজও কোন রকমে নিজেদের মেরুটর ওপর একটা সংখ্যা বজায় রেখেছে।

যেসব প্রাণী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন শত আলোচনায়ও আর তাদের একটিকেও ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবুও তাদের আলোচনা এই জন্য দরকার যে, কেন তারা নিশ্চিহ্ন হল, মানুষের কোন অবহেলা তার মূল, সময়মত কি করতে পারলে তাদের বাঁচান যেত তার অনুশীলনের জন্য। সেই অনুশীলন থেকেই সারা পৃথিবীব্যাপী সভ্যমানুষের নজর পড়েছে আজ একটু চেষ্টা করলেই যাদের আমরা বাঁচাতে পারি তাদের দিকে। এদেরই আমরা নাম দিয়েছি বিরল প্রাণী। পৃথিবী জুড়ে বহু জাতের পশুপাখীর সংখ্যা এতই কমে গিয়েছে যে তাদের বনাঞ্চলে বাঁচিয়ে রাখা দুরূহ ব্যাপার। বিগত পয়লা মে, ১৯৭৩ সনে সে ভারতীয় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন পশ্চিমবঙ্গে বলবৎ হয়েছে তার প্রথম তালিকায় এবং দ্বিতীয় তালিকার দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৪টি স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২৩টি পাখী ও তিনটি সরিসৃপ বিরল পর্যায়ভুক্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে। স্তন্যপায়ীর মধ্যে বাঘ ভারতীয় সিংহ কৃষ্ণসার কস্তুরী-মৃগ বামন বরাহ খামিন হরিণ হাঙ্গুল উল্লুক আফ্রিকা বুনোমোষ ইত্যাদি পাখীদের মধ্যে ময়ূর রাজধনেশ দেড়েল শকুন তুরমতি পাহাড়ী বটের মতিলাল শ্বেতপক্ষ বুনো হাঁস গোলাবসার ইত্যাদি এবং সরিসৃপের মধ্যে মেছো কুমীর নোনা কুমীর ও ঘড়িয়াল উল্লেখযোগ্য। এদের সকলেরই জীবন মূল পরিবেশে বিপন্ন।

এই বিরল প্রাণী সংরক্ষণের কতকগুলি উপায় পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আছে পশু-উদ্যান, জাতীয় পশু উদ্যান মৃগদাব ও বন্য-প্রাণী খামার। এ ছাড়াও অভয়ারণ্য ব পশু-হনন সম্পর্কিত বিধিনিষেধেরও বড় ভূমিকা এ ব্যাপারে রয়েছে। এখানে আমরা আলোচনা করব পশুউদ্যান বা সমগোষ্ঠীর সমষ্টিগত-ভাবে পশু উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা নিয়ে।

এইসব সংস্থায় প্রথমত বিরল প্রাণীদের আচার ব্যবহার বংশ প্রজননের অনুকূল অবস্থা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। যে সব কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ সাম-ঞ্জস্য রক্ষা করে তারা আর নিজেদের বাঁচাতে পারছে না সেগুলো লক্ষ্য করা এবং সে সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় এবং আবার তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে বহুজাতের বন্যপ্রাণীর জীবন নানা কারণে বিপন্ন হয়েছিল কিন্তু আজও তারা অবলুপ্ত হতে পারেনি তার একমাত্র কারণ এইসব সংস্থার মাধ্যমে তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে বাঁচানর মত অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ও যথামথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমেরিকার বাইসন, কোরোলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। অনেক জাতের বন্যপ্রাণী আজও আছে যা প্রাকৃতিক পরিবেশে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কিন্তু আবদ্ধ অবস্থায় আজও বিদ্যমান যেমন ইউ-রোপের বাইসন ওয়াইল্ড হর্স বারবারি লায়ন ইত্যাদি।

জাতীয় পশু উদ্যান ও অন্যান্য পশু-সংরক্ষণ কেন্দ্র পশুশালা বা পশুউদ্যানের কাছে থেকে বিশেষভাবে সাহায্য পায়। বিরল প্রাণীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এইসব স্থানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বন্যপ্রাণী বিশেষ করে বিরল প্রাণী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য এই পশুশালার মাধ্যমেই আহরণ করার প্রকৃষ্ট উপায় আর এই বিশেষ জ্ঞানই বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে। এ ব্যাপারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে যেমন—

চীন দেশের পিয়ার ডেভিড ছিলেন। তার আদি বনভূমিতে শান রাজত্বকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আবে আরমন্দ ডেভিড ১৮৬৫ সালে পিকিং-এর কাছে

ঃ শুভ নববর্ষে জ্যোতি প্রকাশনের সশ্রদ্ধ নিবেদন ঃ

জরাসন্ধ-র সাড়া জাগানো নতুন বই

নদীর এপার কহে ৮

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর নতুন গ্রন্থ

নবীন যৌবন ৮

নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র নতুন বই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে

পালঙ্ক ৮

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত সমস্ত নামী লেখকের লেখায় শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

জলছবি ১২

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর নতুন গ্রন্থ

সাঁঝের বেলা ৮

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নতুন উপন্যাস

চারু ইন্দু এবং কলকাতা ৮

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর নতুন বই

নীলশূন্য ১০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র নতুন উপন্যাস

নীল যমুনার তীরে ১০

মানস গুহ-র উপন্যাস

নিকট নিবিড় ৭

দীপঙ্কর ঘোষ-এর উপন্যাস

সাহানা ৮

চিরঞ্জীব-এর সর্বাধুনিক খেলার বই

ফুটবলের শিরোনামা ৭

অভিযাত্রী-র সাড়া-জাগানো উপন্যাস

উৎস থেকে মোহনা ১৬

সরোজপ্রভাকর-এর উপন্যাস

বৃন্দাবন বাগচীর রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

সুচরিতাষু ৬

আঁধারের আলো ৩

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ নবীন কুন্ডু লেন ॥ কলিকাতা-৯

রাজকীয় মৃগদাবে এদের দেখতে পান। ১৯২১ সালে চীনদেশে এই রাজকীয় উদ্যানের শেষ জীবিত দলটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ ভাগে কয়েকটি এই জাতের হরিণ ইউরোপে পাঠান হয়েছিল। ডিউক অব বেডফোর্ড তার ১৬টি হরিণকে বেডফোর্ডশায়ারের উবার্ন পার্কে রেখেছিলেন। এই উবার্ন পার্কের দলটি ১৯২২ সালে ৬৪টিতে দাঁড়ায় এবং বেডফোর্ডের ডিউক বিভিন্ন পশুউদ্যানে তা বিতরণ করেন এবং ১৯৬৩ সালে ইউরোপে এই জাতের হরিণের সংখ্যা চারশর বেশীতে দাঁড়ায়। এই জাতের হরিণকে ১৯৬৪ সালে লণ্ডনের চিড়িয়াখানা থেকে চীনদেশে ফেরত পাঠান হয়। এখন পিকিং-এর চিড়িয়াখানায় তা রয়েছে এবং বংশবৃদ্ধিও করছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত আরবদেশের অরিকস যা এক সময় সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে পশ্চিমে সিনাই, উত্তরে সিরিয়ার মরুঅঞ্চল এবং পূর্বে ইরাক পর্যন্ত বিচরণ করত। কিন্তু ১৯৬৯ সালে তাদের সংখ্যা দুশর নীচে নেমে যায়। আই ইউ সি এন ও ফাউনা প্রিজারভেশন সোসাইটি ১৯৬২ সাল থেকে অপারেশন অরিকস প্রকল্প স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সাহায্যে চালু করেছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী বন্য অরিকস ধরে তাদের আবদ্ধ অবস্থায় পালন করে একটি জু-ব্যাঙ্ক গঠন করা। মোট ৪৭টি অরিকস ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এরিজোনাতে ১৬টি, ক্যালিফোর্নিয়ায় ৭টি, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের স্লামিতে ২৩টি, কোয়েতে ১টি এবং আরও কয়েকটি রিয়াদ ও তফিজ পশুশালায় পালন করা হয়। এই প্রকল্পের কাজ পরিকল্পনা মতই এগিয়ে চলেছে। উদ্দেশ্য আবদ্ধ অবস্থায় এদের সংখ্যা বাড়ান এবং উপযুক্তকালে জাতীয় পশু উদ্যান ও অভয়ারণ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা।

হাওয়াই দ্বীপের ইল মিনেকে নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচান আরও চমকপ্রদ কাহিনী। এটা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র আবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে। নিনে বিরল পর্যায়ভুক্ত হাঁস। এখন কেবল হাওয়াইতেই পাওয়া যায় কিন্তু জঙ্গলে মলোই এবং দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপেও পাওয়া যেত। ১৯৪৭ সালে এদের সংখ্যা পঞ্চাশেরও নীচে ছিল। ১৯৫৭ সালে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একশরও কিছু বেশী আবদ্ধ অবস্থায়। এক-তৃতীয়াংশ বৃটেনে ছিল। পিটার স্কট ১৯৫২ সালে স্লিমব্রিজে এদের বাঁচানর জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেন। ১৯৫৮ সালে এই জাতের হাঁসের এক জোড়া যুক্তরাষ্ট্রে ডাঃ ভিলন রিপ্লেকে পাঠান হয়। তিনি ১৯৬৫ সালের ভেতরে তা ২৫টিতে বাড়িয়ে তোলেন। ১৯৫৫ সালে পোহাকুলাও অঞ্চলে ২৮টি নিনেকে দেখা যায়। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে এই জাতের হাঁসের বংশ বৃদ্ধি এবং তার আদি বাসস্থানে নিনে প্রকল্প চালু করা হয়। ২০ বর্গমাইল বিস্তৃত হালিয়াকালার সুপ্ত আগ্নেয়গিরি এলাকায় ৯৩টি স্লিব্রিজের ওয়াইল্ড ফাউল ট্রাস্ট থেকে, ২৬টি হাওয়াই-এর নিনে প্রকল্প থেকে এবং ৭টি ডাঃ রিপ্লের কাছ থেকে নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। একটি সাম্প্রতিক গণনায় হালিয়াকালার এলাকাতে ৫০০টি নিনে দেখা গিয়েছে। যে পাখী নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে চলেছিল আজ তা তার বাসভূমিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত।

আমরা সকলেই জানি হাতীর দাঁত ব্যাসায়ীদের কাছে একটি অতি লোভনীয় বস্তু। বহু প্রাচীনকাল থেকেই হাতীর দাঁত সংগ্রহকারীরা আফ্রিকার অরণ্যাঞ্চলে, সব থেকে বড় এবং শক্তিশালী দাঁতাল হাতীগুলোকেই আগে হনন করেছে। আমরা জানি যে, বড় বড় এবং উচ্চগুণসম্পন্ন দাঁত একমাত্র বিশাল এবং শক্তিশালী হাতীর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু বেছে বেছে বহুকাল ধরে এদেরই হনন করার ফল দাঁড়িয়েছে—হাতীর পরবর্তী পুরুষ, পুরুষানুক্রমে ক্রমশই ক্ষীণবল এবং ক্ষুদ্রাকার হয়ে এসেছে।

অথচ এই ব্যবসায়ের চিন্তাটাই পশু-হননের পথে না গিয়ে যদি যেত সংরক্ষণের কোনও উপায়ের দিকে ব্যবসায়ী লাভের ক্ষেত্রে তারও যে মূল্যে খুব কম হত তা নয়।

পৃথিবীর সব জাতেরই কুমীর আজ বিপন্ন। থাইল্যাণ্ডের যে লোকটির নাম উ যাই ইয়ং প্যাপাকর্ণ খুবই সাধারণ অবস্থার মানুষ মাত্র কয়েক বছর আগে তার নজর পড়লো কুমীরের দিকে। উ যাই এর খামারের নাম সামুথ প্রাকন কুমীর খামার চাওফিয়া নদীর মুখে উ যাই এর নিজের মালিকাধীনে পরিচালিত। এই খামারের আজ বিশ্বজোড়া নাম। এখানে কুমীর ছাড়া অন্য কিছু রাখা হয় না। এক দিনের বাচ্চা থেকে ৫০ বছরের বয়স পর্যন্ত সব বয়সের এবং সব জাতের যথা মিঠেজল বা নোনাজল কুমীর, থাইল্যাণ্ডের তিন জাতের কুমীর দক্ষিণ আমেরিকা কাইমন আফ্রিকার নীল নদের কুমীর ঘড়িয়াল ইত্যাদি সযত্নে আবদ্ধ অবস্থায় পালিত হচ্ছে। উ যাই মিঠেজল এবং নোনাজলের কুমীরের বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৯৫০ সালে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই খামারের গোড়াপত্তন কিন্তু আজ এটা থাই-

শকুন

ল্যাণ্ডে পর্যটকদের বিরাট আকর্ষণের বস্তু। এই খামারটি বিশ্বের অন্যতম বিরল কুমীর প্রজনন কেন্দ্র। উ যাই এক বছরে তিন হাজার পাঁচশরও বেশী বাচ্চা কুমীর ডিম থেকে ফুটিয়েছেন। এখন তার খামারে কুমীরের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশী এবং তার আয়ও বহু লক্ষ টাকা। থাইল্যাণ্ডের এই কুমীর উদ্যানে আবদ্ধ অবস্থায় কুমীর পালন ও তার বংশবৃদ্ধি এবং বিরল পর্যায়ভুক্ত কুমীরদের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংরক্ষণের উপযোগীতা ছাড়াও আর্থিক দিক দিয়ে এটা একটা মহামূল্যবান সম্পদ। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে ভারতে যে তিন জাতের কুমীর আছে তাদের জীবনও আজ বিপন্ন। ভারত সরকার কয়েকটি রাজ্যে থাইল্যাণ্ডের খামারের অনুরূপ কুমীর প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন। সুখের বিষয় এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গেও চালু করা হবে। দেখা যাচ্ছে প্রাণী সংরক্ষণ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও একটি সহায়ক পন্থা।

বিগত কয়েক দশক ধরে দেশ বিদেশের বহু বিরল পর্যায়ভুক্ত প্রাণীদের পশু উদ্যান বা বন্যপ্রাণী খামারের মাধ্যমে নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচান হয়েছে। এমন কি এই সব পশু উদ্যানে সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে এমন অনেক প্রাণী যা আজ বন্য প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। পশু উদ্যান বা বন্যপ্রাণী খামার সংরক্ষণের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইতিমধ্যেই নিয়েছে। আশা করা যায় খুব শিঘ্রই আমাদের দেশেও এই সব সংস্থার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে আর তার মাধ্যমে আমাদের দেশের বিরল পর্যায়ভুক্ত প্রাণীদের নিশ্চিত ধ্বংস রোধ করে বনাঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারা যাবে।

বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিরূপণে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ভূমিকা

কল্যাণ চক্রবর্তী

বন্যপ্রাণী গবেষণায় পরিসংখ্যান বিজ্ঞান এক অপরিহার্য অঙ্গ তা আজ সকলেই বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেন। আর পরিসংখ্যানভিত্তিক বন্যপ্রাণী গবেষণার প্রাথমিক ও আবশ্যিক উপাদান হোল বন্যপ্রাণী সংখ্যার বিজ্ঞানসম্মত নিরূপণ। বন্যপ্রাণীর সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপিত না হোলে কিন্তু বন্যপ্রাণী গবেষণাক্ষেত্র অতি শোচনীয়ভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন : (১) যে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিরূপণ করা হচ্ছে তার সম্পর্কে সম্যক ব্যবহারিক জ্ঞান (২) উক্ত বন্যপ্রাণীর সংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (৩) বন্যপ্রাণীর আগমন-নির্গমনের [illegible] আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, সংজনন ক্ষমতা [illegible] নশ্বরতাসূচক। তাই স্বাভাবিক এক এক প্রকার বন্যপ্রাণীর [illegible] কটি বিশেষ পদ্ধতিই বিজ্ঞানসম্মত। যে কোন বন্যপ্রাণীর সংখ্যা [illegible] ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটি মৌলিক [illegible] করা হোয়ে থাকে :

(১) বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিরূপণের জন্য [illegible] সংগ্রহের সময় উক্ত প্রাণীর নশ্বরতা [illegible] পুনরুদ্ধার অতি সামান্য অথবা ঐ [illegible] পকীয় অনুমতি উপাত্ত নিরূপণ দুটি [illegible] বিষয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে সংশোধিত হয়েছে। বন্যপ্রাণীর নির্গমণ ও আগমনকে যথাক্রমে প্রাণীসংখ্যার নশ্বরতা ও পুনরুদ্ধার হিসেবে ধরা হয়।

(২) বন্যপ্রাণী সমষ্টির অন্তর্গত প্রতিটি প্রাণীর সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে এক অভিন্ন (বা জ্ঞাত) সম্ভাবনা থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিরূপণ পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ কোন বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিরূপণের জীবন্ত ফাঁদ পদ্ধতিতে বন্যপ্রাণীর ফাঁদ ভীরুতা বা ফাঁদ আসক্তি বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায়। সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণীর সমষ্টির সঙ্গে মিশ্রণ লক্ষ্যহীন হওয়া দরকার। বয়স, স্ত্রী-পুরুষ প্রভেদ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে বন্যপ্রাণীর উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে দলবদ্ধ না

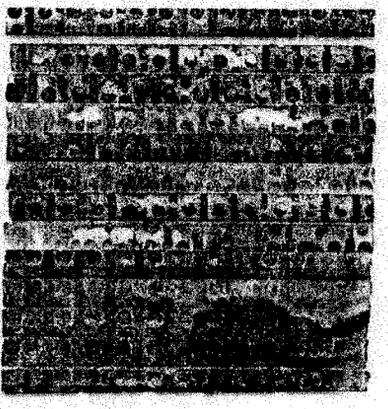

থাকা বিজ্ঞানভিত্তিক সংখ্যা নিরূপণে আর একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান।

'সংখ্যা গণনা' শব্দটি স্ত্রী পুরুষ প্রভেদ ও বয়স ইত্যাদি বিষয়ে কোন একটি প্রদত্ত ক্ষেত্রের সংখ্যাই সূচিত করে। বন্যপ্রাণী সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রকৃত গণনা প্রায়শঃই অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাই সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে 'নমুনা সমীক্ষা'র সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এরূপ গণনার একটি আপেক্ষিক সুবিধা এই যে, এরূপ নমুনা সমীক্ষাভিত্তিক রাশির সংখ্যাতাত্ত্বিক ভ্রমশূন্যতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও 'নমুনা সমীক্ষা' পূর্ণ সমীক্ষা অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। যে কোন সংখ্যা নিরূপণের পূর্বে তাই একটি আবশ্যিক কর্তব্য হোল ঐরূপ সংখ্যা নিরূপণের আপেক্ষিক ভ্রমশূন্যতা ও অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ। বন্যপ্রাণী সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে একটি অধিকতর জটিল উপাদান হোল বন্যপ্রাণী সমষ্টির নির্ধারণক্ষম ভগ্নাংশ নিরূপণ। ভিন্ন ভিন্ন জাতি-প্রজাতির পাখীর সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে এরূপ নির্ধারণক্ষম ভগ্নাংশ নিরূপণের প্রয়োজন হয়। যেমন, 'ফেজ্যান্ট' বা 'ঘুঘুর' কেবলমাত্র আহ্বানসূচক স্বর থেকে যদি সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়ে থাকে তবে ঐ প্রজাতির পাখীদের শব্দ না করার ভগ্নাংশটি সম্পর্কে অজানা হলে সঠিক সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব হয় না।

বাইসন

কাঠবেড়াল

লালপাণ্ডা

বন্যপ্রাণীর সমষ্টিগত পঠনপাঠনে প্রচুর শ্রম ও সময় ব্যবহার করা হয় মূলতঃ দুটি বিষয়ে। একটি হল ঐ বিষয়ের উপাও সংগ্রহে ও সংগৃহীত উপাত্তের বিস্তারিত করণে। কিন্তু এ সকল পদ্ধতির মূল ও অন্তর্নিহিত অনুমান সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ বা পঠন-পাঠনের এখনও যথেষ্ট অবকাশ আছে। একটা মৌলিক অনুমানের দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটার আর একটু পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন ধরা হয়ে থাকে যে অজানা অনুপাতটি জানা অনুপাতের সমান। ধরা যাক কোন একটি পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা সম্ভব হল যে একটি মোরগ প্রতি ঘন্টায় ১৫ বার করে ডাকে। তারপরে বন্যপ্রাণী সংখ্যা নিরূপণের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোন এক বিশেষ প্রাকৃতিক পরি- বেশে শোনা গেল যে এক ঘন্টায় ৪৫টি মোরগ ডাকার আওয়াজ। অতঃপর যদি মোরগের সংখ্যা ৩ (তিন)টিতে নির্ধারণ করা হয় তবে আমরা নিঃশব্দে একটি অনুমান করলাম যে পূর্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত 'জানা' অনুপাতটি পরের 'অজানা' পরিবেশের অনুপাতের সমান। তাই যে জীববিজ্ঞানী বন্যপ্রাণী সম্পর্কে গবেষণায় ব্রতী আছেন তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এই সকল অনুমানের পরিসখ্যান- ভিত্তিক যথার্থতা নির্ধারণ।

জীববিজ্ঞানী ভাইস (১৯৫২) সমষ্টি- গতভাবে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিরূপণের পদ্ধতিগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেণ্ডেই (১৯৪৪) বিভিন্ন প্রজাতির পাখীর সংখ্যা নিরূপণের উপরে গবেষণা করেছেন। বিজ্ঞানী ব্রিকার (১৯৫৮) মাছের সমষ্টিগত গবেষণার পদ্ধতির উপরে আলোকপাত করেছেন। বিজ্ঞানীদ্বয় ডর্ণ (১৯৫৪) ও ডেভিস (১৯৫৬) বন্যপ্রাণী সংখ্যা নিরূ- পণের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান যুগিয়েছেন। বন্যপ্রাণী সংখ্যা নিরূপণের পদ্ধতিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :— (১) প্রকৃত সমষ্টি গণনা (২) নমুনা সমীক্ষা ও (৩) কোন সূচক গণনা।

(১) প্রকৃত সমষ্টি গণনা :

সমষ্টি নির্ণয়ের এটি একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি। কিন্তু বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এরূপ পদ্ধতি ব্যবহারের কতকগুলি অসু- বিধা আছে, যেমন (১) অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা খরচ অনেক বেশী (২) একসঙ্গে অনেক গণনাকারীর প্রয়োজন হয় (৩) পদ্ধতির স্বাভাবিক কারণেই দ্রুত সম্পাদন সম্ভব নয় (৪) এই পদ্ধতিটির পরিসংখ্যান ভিত্তিক ভ্রমশূন্যতা নির্ধারণ প্রায়শঃই সম্ভব হয় না।

তবে এ পদ্ধতিটির কিছু কিছু সুবিধাও আছে : (১) পদ্ধতির ব্যবহার সহজতর (২) পদ্ধতি সাধারণ গণনাকারীর পক্ষে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। (৩) কোনও বিশেষ স্থানের পক্ষে এ পদ্ধতির ব্যবহারও সহজসাধ্য।

যে কোন সমষ্টি গণনা পদ্ধতিতে যেখানে সরাসরি গণনা হয়ে থাকে সেখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে এরূপ সরাসরি গণনাকার্য যথেষ্ট সমান অবস্থার মধ্যে করা প্রয়োজন যাতে একের সঙ্গে অপরের তুলনা- মূলক বিচার সম্ভব। এই সকল সমান অবস্থাদির নির্বাচনও পরিসংখ্যান ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবে এরূপ নির্বাচনের মাপকাঠি হিসেবে দেখা দরকার যে কোন অবস্থা থেকে উদ্ভূত রাশির গ[illegible] অন্যটি অপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ রূপে[illegible] না হয়। এ ব্যাপারে পরিসংখ্যানের [illegible] গুলি পরীক্ষিত উপাত্তের সাহ[illegible] প্রয়োজন।

(২) ও (৩) : নমুনা সমীক্ষ[illegible] গণনা :

নমুনা সমীক্ষা পরিসংখ্যানে[illegible] যুগান্তকারী পরীক্ষিত সত্য। এ প[illegible] ব্যবহার বন্যপ্রাণী গণনার ক্ষেত্রে ব্যবহা[illegible] হয়। এ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র বন্যপ্র[illegible] সরাসরি গণনা করা ব্যতিরেকে কোন বি[illegible] চিহ্নেরও নমুনা সমীক্ষা স্বাভাবিকভাবেই[illegible] করা হয়ে থাকে। সুন্দরবনের বাঘের ক্ষেত্রে এরূপ পদচিহ্নের নমুনা সমীক্ষা এক

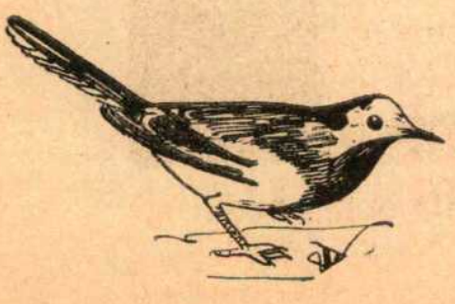

খঞ্জন

সারস

কাঁদাখোচা

ফ্যাশন দুরস্ত অথচ টেঁকসই—এমন কাপড় যা শুধু বিনীই বানাতে পারে।

Interpub BB/54/75 Ben

পানকৌড়ি

বিশেষ ও উপযুক্ত পদ্ধতি বলা যায়। কারণ সুন্দরবনের বাঘ চোখে দেখার সম্ভাবনা এত কম যে এর উপরে ভিত্তি করে কোন সংখ্যা নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। তাই পদচিহ্নের নমুনা সমীক্ষার উপরে নির্ভর করাই পরিসংখ্যানসম্মত।

বন্যপ্রাণী গণনার নমুনাভিত্তিক পদ্ধতিতে কিংয়ের পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে ঃ এ পদ্ধতির ব্যবহার অবশ্য কোন সরু লম্বা ফালির ক্ষেত্রে করা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি পূর্ব নির্ধারিত সরল রেখা গণনাকারী অতিক্রম করে এবং সে সরল রেখার দু দিকে মৃত বন্যপ্রাণী দেখা যায় সেটা গণনাকারী লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর বন্যপ্রাণীর ঐ উল্লিখিত ফালি থেকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়। তখন উক্ত দ্রষ্টব্যস্থানের বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিম্নলিখিত গাণিতিক সমীকরণ থেকে নির্ণয় করা হয় ঃ

$$\text{পি} = \frac{\text{এ এন}}{২ \text{ ডি এল}}$$

যেখানে পি—বন্যপ্রাণীর সংখ্যা

এ— দ্রষ্টব্য ক্ষেত্রের মোট ক্ষেত্রফল।

এন—ধাবিত বন্যপ্রাণীর সংখ্যা।

ডি—বন্যপ্রাণীর ধাবন করার দূরত্বের গড়।

এল—উল্লেখ্য সরলরেখার দৈর্ঘ্য।

জীব বিজ্ঞানী ডেভিস (১৯৪২) বন্যপ্রাণী গণনার এক পরিসংখ্যান ভিত্তিক পদ্ধতি নির্ণয় করেছেন। সেটা নিম্নে দেওয়া হোল। কোন জানা রাস্তায় যেতে যেতে যতগুলো বন্যপ্রাণী দেখা গেল সেটা লিপিবদ্ধ করা হল। অতঃপর সেই জানা রাস্তায় একটা বিশেষ সময়ে পুনঃ পুনঃ যাওয়ার পর তার গড় ও স্বাভাবিক বিচ্যুতি করা হল। অতঃপর বিবর্তনের সহগ নির্ধারণ করা হল প্রতিটি প্রজাপতি ও স্থানকে ভিত্তি করে ও অতঃপর তুলনা করা হল কোন জানা বন্যপ্রাণী সমষ্টির বিবর্তনের সহগ নির্ধারণের সঙ্গে। যদি অজানা সহগ উক্ত নির্ধারিত সহগর বেশী হয় তবে সেই প্রজাপতিকে বাদ দেওয়া হয় বন্যপ্রাণী গণনা থেকে কারণ সেটা অতিমাত্রায় ত্রুটিপূর্ণ সংখ্যা দেবে। এ পদ্ধতিতে বস্তুগত ভিত্তিতে কোন প্রজাতিকে বন্যপ্রাণী গণনা থেকে বাদ দেওয়া বা যোগ করা সম্ভব।

জীব বিজ্ঞানী হাওয়েল (১৯৫১) ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির সংযোজন করে একটি পদ্ধতি নির্ণয় করেন। এ পদ্ধতিতে বন্যপ্রাণীর সুস্পষ্টতার একটি গাণিতিক অনুমান নির্ণয় করা হোয়েছে।

মাছ ধরার পরিমাণ থেকে মাছের সমষ্টিগত পরিমাণ নির্ণয় করা যেতে পারে। প্রাণী বিজ্ঞানী জিপিনের (১৯৫৬) পদ্ধতি অনুসারে যদি সি-১ ও সি-২ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মাছ ধরার পরিমাণ হয় একই জলাশয়ের তবে মাছের সমষ্টিগত পরিমাণ নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় ঃ

এন—সি২ যেখানে এন মাছের
সি১ সি২ সমষ্টিগত পরিমাণ।

হাড়গিলা

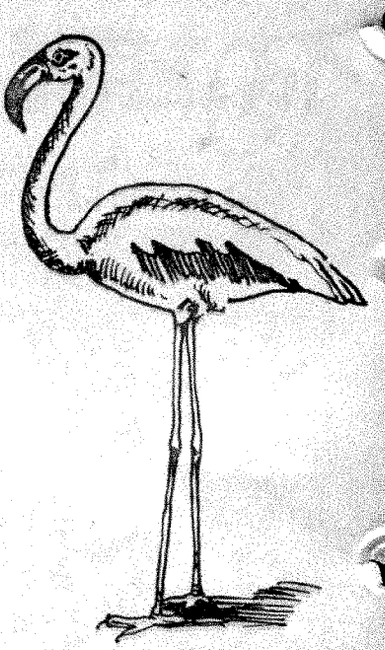

কানহুঁটি

এ পদ্ধতির ভ্রমশূণ্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করার প্রথমেই বলা যায় যে এ পদ্ধতিতে প্রথম বারের মাছ ধরার পরিমাণ (অর্থাৎ সি১) যদি দ্বিতীয় বারের মাছ ধরার পরিমাণের (অর্থাৎ সি২) সমান বা অপেক্ষাকৃত কম হয় তবে এ সমীকরণ ব্যবহার কর[illegible] অসম্ভব হয়ে যায়। তাই এ পদ্ধতি ব্য[illegible] একটি পূর্ব প্রয়োজন হল যে উ[illegible] জলাশয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান [illegible]

আনুপাতিক পরিবর্ত[illegible] করেও বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নি[illegible] যেমন কোন বিশেষ স্থানে[illegible] গমনের সংখ্যা হোল ঃ [illegible] ধরা যাক সে স্থান থে[illegible] করা হোল, তার সংখ্যা ঃ [illegible] যে স্থানের হরিণের গ[illegible] নির্ণয় করা হল, ধরা য[illegible] এখন যদি অপসারণ করার [illegible] সংখ্যা যদি এন১ ও পরে এ[illegible] সমীকরণটি জীব বিজ্ঞানীদের [illegible] করা যায় ঃ

$$\frac{\text{ডবলু ১—ডবলু ২}}{\text{এন}}$$

$$\frac{\text{ডবলু ১—ডবলু ২}}{\text{এন ১—এন ২}}$$

উপরি উক্ত সমীকরণের সাহায্যেও বন্যপ্রাণী সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব।

বন্যপ্রাণী গণনা সম্পর্কে স্থান, ক[illegible] ও শ্বাসস্থান ভিত্তিক আরও মৌলিক গবেষণার অবকাশ আছে সেখানে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানীকে নিতে হবে মুখ্য ভূমিকা। সে সব নতুন নতুন পদ্ধতি মানব সভ্যতার ইতিহাসকে যে নতুন যুগের সন্ধান এনে দেবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজন

জগদিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য / নির্মল সরকার

নাগাসাকি ও হিরোসিমাতে পরমাণু বোমা ব্যবহার করার কথা চিন্তা করলে মনে হয়, আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা থাকলেও অনেক দিক দিয়েই আমরা যে শুধু বন্য থেকে গিয়েছি, তা নয়, যে কোন তথাকথিত বন্যপশুর চাইতে এখনও মানুষ বেশী বিপদজ্জনক জীব হয়ে রয়েছে। আমাদের বনজঙ্গলের চমৎকার প্রাণীগুলিকে এবং সুন্দর সুন্দর যে পাখীরা আমাদের জীবনকে মধুর করে তোলে তাদের তো আমরা বুনোজীব বলেই উল্লেখ করি। ভাবতে গেলে অবাক লাগে যে, এই পশুপাখীরা মানুষের বিষয়ে কি মনে করে, আর সাধ্য থাকলে তারা মানুষকে যে কী বলে বর্ণনা করতো, তাদের সে বর্ণনা মানুষের পক্ষে খুব প্রশংসাসূচক হোত কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

গত পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে শিকারযোগ্য বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে; এমনকি স্থান বিশেষে কোন কোন প্রাণী একেবারে লোপ পেয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গের কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, অবিভক্ত বাংলার সুন্দরবনে একশৃঙ্গ গণ্ডার ও বন্য মহিষ প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন এদের কোন অস্তিত্বই নেই। আরও শোনা যায়, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগে মালদহ জেলায় নীলগাই, পশ্চিমবঙ্গে কৃষ্ণসার ও উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে ডাহরপাখী (ফ্লোরিকান) যথেষ্ট দেখা যেত কিন্তু আজ এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

অরণ্য জীবন সত্যিই সঙ্কট-সঙ্কুল। সেখানে প্রবলেরা দুর্বলদের শিকার করে, আর দুর্বলেরা নিজেদের বাঁচাবার জন্য নানান ফন্দি আর ছদ্মবেশ উদ্ভাবন করে নেয়। কিন্তু অরণ্যের এই চিরাচরিত প্রথার উৎপত্তি হয়েছে প্রধানত খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে। মৃগয়া ও খাদ্যের জন্য এবং মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কতক পরিমাণে বন্যপ্রাণীর হত্যা প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু হিংস্র পশুদেরও অবাধ হত্যা ও তার শেষ ফল বংশলোপ কোন মতেই সমর্থন করা যেতে পারে না। বন্য-প্রাণীর সংখ্যা কমতে থাকলে এর পরিণাম যে কি হবে তা ধীরভাবে চিন্তা করার দিন এসেছে। আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও অবাঞ্ছিত মনে হলেও জগতে প্রত্যেক প্রাণীরই একটা না একটা সার্থকতা আছে। এবং প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট নিয়মে যে যার কর্তব্য যথাযথ সম্পাদন করে প্রকৃতির সাম্যা-বস্থা রক্ষা করছে। স্মরণাতীত কাল থেকে নির্বিচারে হত্যা করে করে ভারতের বন্য-প্রাণীদের একে একে নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তির মুখে টেনে নিয়ে এসেছি আমরা। দুশিংগা গণ্ডার, শিকারী চিতা ইত্যাদি অনেক জীবই আধুনিক কালের মধ্যেই ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

চিন্তা করা যাক ভবিষ্যতের কথা। ২০০০ খৃস্টাব্দের কথাটা ভেবে দেখুন। শুধু শেয়াল, ইঁদুর, শকুনি, চিল শঙ্কচিল কাক আর চড়াই পাখীর মত এমন সব বুনো জীবই তখন অবশিষ্ট থাকবে। যারা ঘন মনুষ্য বসতিপূর্ণ লোকালয়ের মধ্যে নিজে-দের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

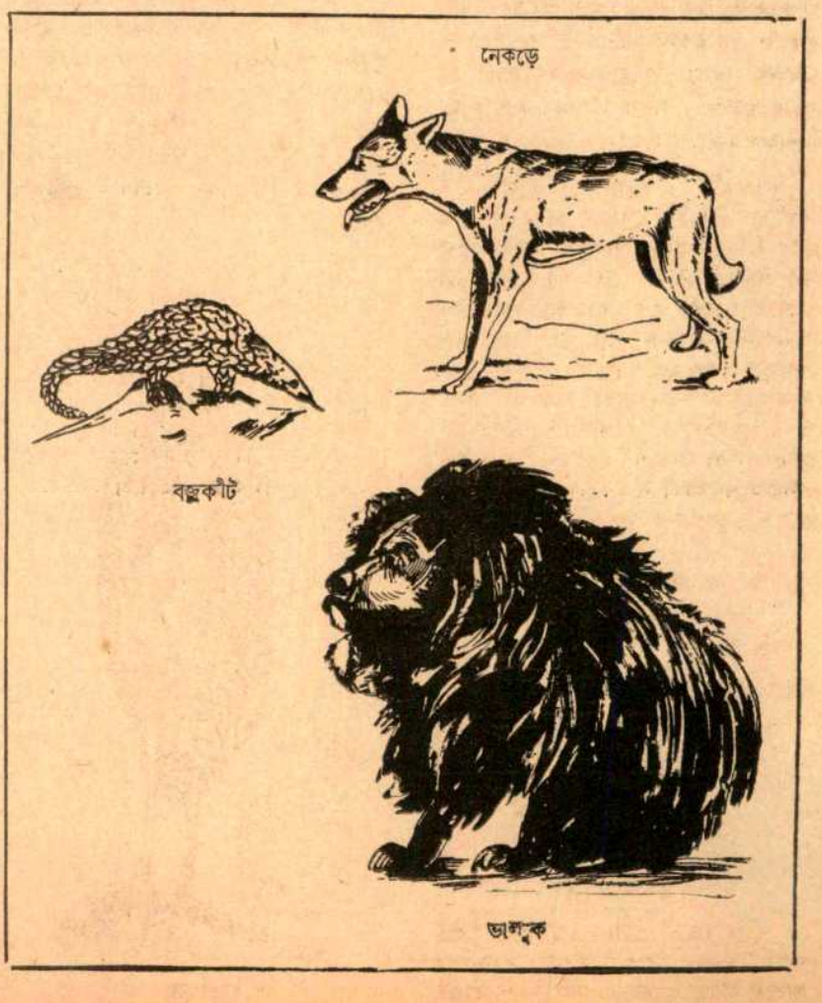

জাম বাঘ গর্বস্ফীত ময়ূর এবং বনাঞ্চলের তৃণভূমি অঞ্চলের অন্যসব অপরূপ অধিবাসীরা যদি লুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে মানুষের জীবন কত নিরানন্দই না হয়ে যাবে। এ সবই হতে পারে এবং অতি অবশ্যই হবে—যদি না সময় থাকতে এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এ সমস্যা শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, সারা পৃথিবীর সমস্যা। তারই জন্য পাশ্চাত্যদেশে ভবিষ্যৎবংশীয়দের জন্য বন্যপ্রাণী এবং জনহীন স্থানগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য সযত্নে পরিকল্পনা হচ্ছে। তারই জন্য পাশ্চাত্যদেশে একটি বিশ্ব বন্যপ্রাণী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কীয় প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ বিধানের দাবী ভারতবর্ষেই করতে পারে, কারণ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে অশোকস্তম্ভে খোদিত সম্রাট অশোকের একটি ঘোষণায় এরূপ একটি বিধানের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ ঘোষণায় বহু চতুষ্পদ পশু, পক্ষী, মৎস্য ইত্যাদি হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নির্দিষ্ট কয়েক পর্যায়ের পশু পাখী, মৎস্য প্রভৃতির জন্য স্থানে স্থানে নিরাপদ বা অভয়ারণ্যের প্রতিষ্ঠা ও সুনাধক্ষ্য নামে বিশেষ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। সংরক্ষণের নিয়মভঙ্গে শাস্তিরও ব্যবস্থা ছিল। পুরাকালে ধর্মভাবের জন্য ভারতবর্ষে যে সকল স্থানে শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল তার মধ্যে এমন কতকগুলি স্থান আছে (হরিদ্বার) যেখানে আজ পর্যন্ত কোন প্রাণী এমনকি মাছ পর্যন্ত হত্যা করতে দেওয়া হয় না। অন্যান্য স্থানে কঠিন আইন থাকা সত্ত্বেও গোপন শিকার করা সম্ভব হলেও, এই সকল পুণ্যস্থানে জনমত এত প্রবল যে সেখানে কোন প্রাণী হত্যা করা সম্ভব নয়।

যদি ৩০০ খৃস্টপূর্বাব্দে এবং ২৪২ খৃস্টপূর্বাব্দের মত দূর অতীতকালের ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানকালে সে বিষয়টি নিশ্চয় প্রথম শ্রেণীর অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য বলে স্বীকৃত হবে। আগেকার দিনে প্রথাই ছিল কেষ্টবিষ্টু লোকেরা যেমন বড়লাট সাহেব—সত্যিকার একটা বড় বাঘ মারবেনই। বৃটিশ রাজত্বেও দ্রুতক্ষীয়মাণ অরণ্যজীবকুলকে রক্ষার একটা চেষ্টা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু মানুষের সংসারে অবিরাম ও ভয়াবহ বৃদ্ধির সংগে এঁটে উঠতে পারলো না সেই প্রচেষ্টা।

দুঃখের বিষয় এই যে, এত সুবিবেচিত ও কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও একমাত্র সরকারী সংরক্ষিত বনগুলিতে অল্পবিস্তর বিধি-নিষেধ বলবৎ সম্ভব হলেও এ-দেশে অন্য সর্বত্র বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় বর্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। এর প্রধান কারণ এই যে, সরকারী বনের বাইরে এই আইনগুলি কার্যকরী নয়। এছাড়া নিম্নলিখিত কারণগুলিও বিশেষ বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে অনেক চর্মসংস্কারক কারখানা স্থাপিত হয়েছে, ফলে সকল প্রকার চর্মের চাহিদাও বেড়ে গেছে।

২। আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা ও ধ্বংসকারীর শক্তিবৃদ্ধির সংগে সংগে দেশের রাস্তাঘাটেরও বিশেষ উন্নতি হয়েছে। ফলে চোরাশিকারীদের উৎপাত বেড়েছে।

৩। সরকারী সংরক্ষিত বনের এবং বাইরে খণ্ডজঙ্গলের অত্যধিক সংকোচন হয়েছে, ফলে বন্যপ্রাণীর পর্যাপ্ত আশ্রয়ের অভাব ঘটেছে।

৪। ক্রমবর্ধমান সহরের চাহিদা মেটানোর জন্য যাযাবর পক্ষীর সংখ্যা কমে গেছে।

৫। বনজসম্পদের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় সেই বিশেষ চাহিদা মেটানোর জন্য বনসংকোচন ঘটে।

৬। সরকারী বনভূমির সৃজন ও রক্ষার সংগে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিশেষ সরকারী কর্মচারীর অভাব, ফলে অবৈধ শিকারের নিবারণার্থে উপযুক্ত কার্যকরী কর্মচারীর সংখ্যা কম।

এই সকল অবস্থা উন্নতির পরিপন্থী এবং বন্যপ্রাণীদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, ফলে বন্যপ্রাণী ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। তাতে সারা দেশের অকল্যাণই হবে। বৃটিশ রাজত্বকালে প্রধানত বড় আর ছোট শিকারের জন্তুগুলি যাতে ফুরিয়ে না যায়, তা ঠিক রাখবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে তাদের রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই একই উদ্দেশ্যে অনেক দেশীয় রাজ্যের রাজারা ১৯৩৫ সালের সংরক্ষণের আরো বেশী ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার আবির্ভাবের সংগে সংগে জনসাধারণ এই সৎ কাজের অনেকটাই নষ্ট করে ফেলল। তারাই এখন মালিক এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম উপলব্ধি করেও তারা প্রায়ই বনেজঙ্গলে গিয়ে যা পেত তাই হত্যা করত। এই অবস্থা যাতে চলতে না পারে ১৯৫২ সালে প্রথম ভারতীয় ইন্সপেকটর জেনারেল অব ফরেস্টস হিসাবে শ্রী এম ডি চতুর্বেদী সর্বপ্রথম বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ব্যাপারটা প্রবর্তন করেন এবং একটি ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ গঠন করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই প্রচেষ্টা খুব কার্যকরী হয় না। এই সব কারণেই ভারত সরকার ১৯৭২ সনে একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। পশ্চিম বাংলায় ঐ আইন ১৯৭৩ সালে চালু করা হয়। অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বন্যপ্রাণী শিকার ব্যবসা ও রপ্তানী যাতে না ঘটতে পারে তারই জন্য এই আইন চালু করা হয়েছে। এই আইনে পশু ও পাখীর প্রয়োজনীয় ভিত্তিতে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাধারণের অবগতির জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের পাঁচটি তপশীলভুক্ত পশুপক্ষীর বাংলা নাম দেওয়া হল যেসব পশুপাখীর বাংলা নাম সাধারণত পাওয়া যায় না তাদের আঞ্চলিক নামে বা ইংরেজী নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

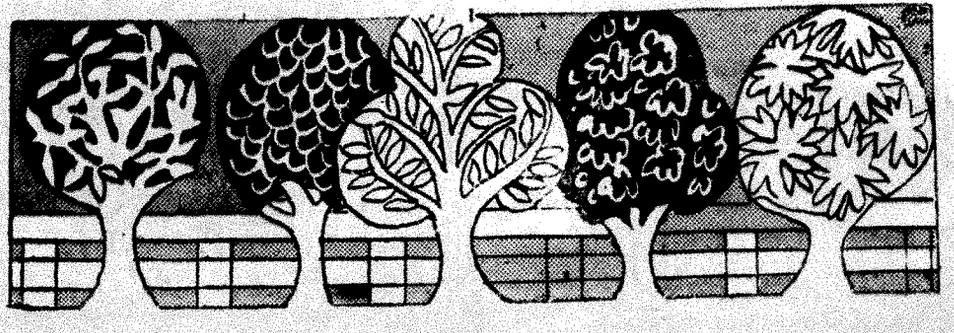

'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য
শ্যামলাং মাতরম

বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত উক্তি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়—সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেন না ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বন্য পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের কৃষির ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা আছে। কারণ গাছগাছড়া প্রভৃতি ভূমিক্ষয় রোধ করে বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করে জমির জল ধরে ও উপরের দিকে রাখে ইত্যাদি। আর এই গাছগাছড়া নিয়ন্ত্রিত করে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ। সর্বোপরি বন্য পশুপক্ষী প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখে। সুতরাং বন্য পশুপক্ষী মনুষ্য সমাজের খুবই প্রয়োজনীয় যদিও আমাদের অনেকের ধারণা যে এরা আমাদের ক্ষতি ছাড়া আর কোনও কাজে লাগে না। প্রাণীজগতে আমাদের সবাই-এর খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ—এমনকি উদ্ভিত গাছগাছড়াও এর আওতায় পড়ে। এই খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে অনেক সাহায্য করে। তাই মানবসমাজ ও প্রাণীজগতে এক নিবিড় সম্বন্ধ আছে এবং এর যে কোনও একটিকে ছাড়া কোনও সৃষ্টি গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই বন্য পশুপক্ষী সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য সারা বিশ্বের এক অপূর্ব বিস্ময়—তাই তো দিগ্বিজয়ী সম্রাট বলেছিলেন 'কি বিচিত্র এই দেশ'। এই প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য পৃথিবীতে অতুলনীয়—তাই প্রাচ্য ও পশ্চাত্য জগতের বণিক সম্প্রদায় ও পর্যটকরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে আসে ও এর থেকে আমাদের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়।

আমাদের বন ও বনজ সম্পদ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম। আমাদের অবহেলায় এই মূল্যবান বনজ সম্পদ বিশেষ করে পশুপক্ষী আমরা হারাতে চলেছি। এখনও সচেতন না হলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো চিরদিনের জন্য আমরা এই মূল্যবান জাতীয়সম্পদ হারাবো। সুতরাং এই ক্ষয়িষ্ণু জাতীয়সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব জনগণের। যদিও ভারত সরকার এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন তবুও জনগণের সহায়তা ছাড়া এই গুরু দায়িত্ব বহন করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি সরকারের এককভাবে এই দুর্লভ সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হতো তাহলে বন্য পশুপক্ষীর সংখ্যা এত কমতো না। এমন কি নিম্নবর্ণিত আইনগুলি চালু থাকা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয়সম্পদ আমরা ঠিকভাবে রক্ষা করতে পারিনি যথা :—

১। ভারতীয় বন আইন—১৯২৭

২। হস্তী সংরক্ষণ আইন—১৯৩২

৩। গণ্ডার সংরক্ষণ আইন—১৯৩২

৪। বন্য পশুপক্ষী সংরক্ষণ আইন—১৯১২

৫। পশ্চিমবঙ্গ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন—১৯৫৯

কারণ এই ৫ নং আইনটি ছাড়া অন্য আইনগুলি কেবলমাত্র বন এলাকাতেই সীমিত ছিল ও বনের বাইরে এর কোনও প্রয়োগ ছিল না। এমনকি সরকারী কর্মচারীরাও বন এলাকার বাইরে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন না। সেজন্য চোরা-শিকারী ও চোরাকারবারী এই ছিদ্রপথের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দেশের মূল্যবান পশু-পাখী শিকার করতেন—তাদের নিজেদের সাময়িক কৌতূহল ও লাভের জন্য। তাছাড়া উপরোক্ত আইনগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল—যার জন্য কর্মচারীরাও কঠোরতার সঙ্গে এই আইন ব্যবহার করতে পারতেন না। সেজন্য আমাদের চলতি আইনগুলি অযোগ্য প্রমাণিত হয়।

কিন্তু ১৯৩৫ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্মেলনে বন্যপ্রাণী রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় আলোচনা করে ঠিক হয় যে চলতি আইন-গুলির বদলে আর একটি অধিক ক্ষমতাযুক্ত আইন বাংলাদেশে প্রচলন করা হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন—১৯৫৯' নামে একটি আইন অনুমোদিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নানা অজুহাতে এই আইন আমাদের দেশে অর্থাৎ বিনা পশ্চিম-বঙ্গে কখনও চালু করা হয়নি। সুতরাং দেখা যায় যে 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন—১৯৫৯' (৫ নং তালিকাভুক্ত) অঙ্কুরেই বিনাশ হয়।

এসব কারণের জন্য আমাদের দেশের জনসাধারণ একটি সবল ও সরল এবং কঠোর আইন প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তাই ভারত সরকার ভারতীয় সংবিধানের ২৪৯ ও ২৫০ ধারার বলে ১৯৭২ সালে আমাদের লোকসভায় 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন' নামে একটি আইন অনু-মোদন করেন। এখনও ভারতের অনেক রাজ্যে এই আইন প্রচলন হয়নি যার ফলে আমাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই জনসাধারণের অবগতির জন্য 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন—১৯৭৪'-এর প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ

ডায়কোটা হায়না

সুনীতিপ্রসন্ন মল্লিক

বন্যপশুপক্ষী সংরক্ষণে জনগণের ভূমিকা

সামরু

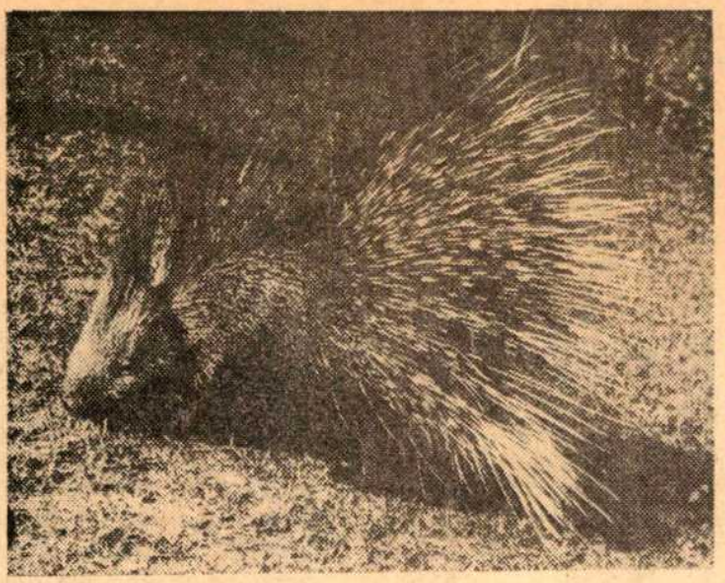

প্রয়োজন বলে দিয়েছে। এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৭৩ সালের ১লা মে 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন—১৯৭২' সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত করা হয়। এই আইন অন্যান্য প্রচলিত আইনের মতো কেবলমাত্র বনেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি বনের বাইরে গ্রামে গঞ্জে শহরে এমন কি বন্দরেও প্রযোজ্য। তাছাড়া এই আইনে এমন কয়েকটি ধারা আছে যাতে বন্য পশুপক্ষী শিকার জীবিত বা মৃত পশু-পাখীর ব্যবসা এমন কি মৃত পশুপাখীর অংশ বিশেষের কেনা বেচাও এই আইনের আওতায় পড়বে ও এই আইনে নিয়ন্ত্রিত হবে। সুতরাং এতদিন যে বাধা ছিল—এই আইন চালু হওয়াতে সে বাধা দূর হল।

বনাপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে পশু ও পাখীকে দুষ্প্রাপ্যতা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১ নং তালিকা বা তপশীল—বাঘ-গণ্ডার সিংহ কুমীর রাজ ধনেশ ময়ূর ইত্যাদি নিষিদ্ধ প্রাণী অর্থাৎ এদের শিকার ধরা ব্যবসা জীবিত বা মৃত সব সময়ের জন্য বন্ধ।

২ নং তালিকা বা তপশীল—ভারতীয় বাইসন বা গউর হাতী গোসাপ বন্য কুকুর চিতাবাঘ ইত্যাদি বিশেষ প্রাণী অর্থাৎ এদের শিকার ধরা ব্যবসা অনুমোদিত হবে তবে তার জন্য নির্ধারিত সংস্থা বা অফিস থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে।

৩নং তালিকা বা তপশীল—শূকর হরিণ (চিতল সম্বর কাকর) ভাল্লুক হায়না ইত্যাদি বড় শিকার অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুমতি নিয়ে এর শিকার বা ব্যবসা বাণিজ্য করা যাবে।

৪ নং তালিকা বা তপশীল—খরগোস ভোঁদড় লাল খ্যাঁক শিয়াল নানাজাতের ও রকমের পাখী ইত্যাদি 'ছোট শিকার' অর্থাৎ এর ব্যবসা ও শিকার অনুমোদিত, তবে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে।

৫ নং তালিকা বা তপশীল—কাক-শিয়াল বাদুড় ইঁদুর ইত্যাদি ক্ষতিকারক পশুপাখী ও তা শিকারের জন্য কোনও অনুমতির প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া তপশীল বহির্ভূত পশুপাখীকে তালিকাভুক্ত করা ও তপশীলভুক্ত পশুপাখীকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং এক তালিকা থেকে অন্য তালিকাভুক্ত করার ব্যবস্থাও এই আইনে আছে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় অনেক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে যারা এই আইন সুষ্ঠুভাবে চালু করার দায়িত্ব নেবেন তাঁদের অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার ফলে তাঁরা বনের বাইরে গ্রামে গঞ্জে শহরে এমনকি বন্দরেও পশুপাখীর লেনদেন শিকার ও কারবার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজন মত বন্ধ করতে পারবেন। অতএব এখন হয়তো আমাদের মূল্যবান ও দুর্লভ পশুপাখীর অবাধ শিকার ও হত্যার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

এই আইনের বলে রাজ্য সরকার একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করার ক্ষমতা রাখেন। এই পর্ষদ রাজ্য সরকারকে অভয়ারণ্য, জাতীয় পশু উদ্যান মৃগদাব ইত্যাদি সৃষ্টি করার ছাড়পত্র বা অনুমতি দেওয়ার এবং পশুপাখীর তালিকা সংশোধন করার বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেবেন।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের বলে ভার-প্রাপ্ত কর্মচারীরা (দ্বিতীয় খণ্ড বাদে) ২ ৩ ও ৪ নং তপশীলভুক্ত পশুপাখীর লেনদেন শিকার বা ব্যবসা ও ওদের অংশ বিশেষের তৈরী জিনিসপত্রের ব্যবসা করার অনুমতি দিতে পারেন—তবে এর জন্য নির্দিষ্ট কর (রাজস্ব বা ফি) জমা দিয়ে নির্দিষ্ট সরকারী অফিস থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে। এবং প্রতি বৎসর তা নতুন করতে হবে। বিনা ছাড়পত্রে কোনও কাজ করলে তা দণ্ডনীয় হবে এবং দণ্ডও আগের আগের আইনের চেয়ে কঠোর ও বেশী অর্থাৎ কিনা দুই বৎসর পর্যন্ত জেল বা ২০০০ টাকা জরিমানা কিংবা উভয়ই একত্রে হতে পারে কিন্তু ১ নং তালিকাভুক্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে ৬ বৎসর পর্যন্ত জেল হতে পারে। ৫ নং তালিকাভুক্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে কোনও ছাড়পত্রের প্রয়োজন নেই কিন্তু এর জন্য নির্দিষ্ট কর বা রাজস্ব দিতে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১ নং তপশীলভুক্ত পশুপাখীর শিকার লেনদেন ইত্যাদি সব সময়ের জন্য বন্ধ তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও প্রয়োজনবোধে মুখ্য—বন্যপ্রাণী সংরক্ষক এটা অনুমোদন করতে পারেন।

এই আইনে ভারত সরকার ১ নং তালিকাভুক্ত প্রাণীর বিষয়ে নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা রাখেন। এর লেনদেনের সময় আগম ছাড়পত্র নিতে হবে। আইনে সে ব্যবস্থা আছে। আর এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নেওয়ার সময় ভারত সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন।

মানুষখেকো বাঘ অত্যাচারী পশুপাখী ইত্যাদি মারার অনুমতি মুখ্য বন্যপ্রাণী

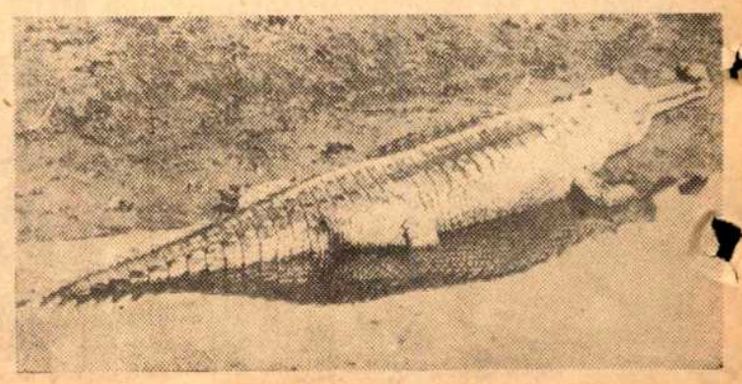

কুমীর

সংরক্ষক দিতে পারেন। তিনি অভয়ারণ্য চিড়িয়াখানা গবেষণা ইত্যাদির জন্য ১ নং তপশীলভুক্ত পশুপাখী জীবিত অথবা মৃত ধরার অনুমতি দিতে পারেন। এই আইনে এর ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আত্মরক্ষার জন্য যদি কেউ ১ নং তপশীলের পশুপাখী শিকার করেন তা দণ্ডনীয় হবে না কিন্তু মৃত জন্তুটি সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

নির্ধারিত ফি দিয়ে ২ ও ৪ নং তপশীলের পশুপাখীর শিকারের ব্যবস্থা এই আইনে আছে কিন্তু শিকারের নিয়মকানুন না মানলে শিকারীর ছাড়পত্র বাতিল হবে। ছাড়পত্রের ফি ছাড়া পশুপাখীর জন্যও নির্ধারিত রাজস্ব জমা দিতে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের দেশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে শিকার এখন বন্ধ যেহেতু পশুপাখীর সংখ্যা এখনও কম। তাছাড়া ভগবান মহাবীরের ২৫০০তম নির্বাণ বৎসরের জন্য ১২ নভেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত সব রকম শিকার বন্ধ। ১ নং ও ২ নং তালিকার দ্বিতীয় অংশের তালিকাভুক্ত সকল পশুপাখী জীবিত বা মৃত (ট্রফি) রাখবার জন্য প্রত্যেককেই মালিকানা প্রমাণপত্র নিতে হবে—আইনে সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তবে চিড়িয়াখানা ও যাদুঘরের সম্বন্ধে এই আইন শিথিল করা হয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত সকল প্রাণীর (জীবিত বা মৃত) বৈদেশিক রপ্তানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ।

এই আইনে সব পশুপাখী তাদের অংশ বা অংশ বিশেষের তৈরী বস্তু বনজ-সম্পদ হিসাবে গণ্য। সুতরাং বনের বাইরেও এর লেনদেন ও ব্যবসা এই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ব্যবসায়ীরা যে এতদিন বিনা ছাড়পত্রে ব্যবসা করতেন এবার তাঁদেরও সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে নির্ধারিত ফি দিয়ে লাইসেন্স নিতে হবে ও তাঁদের দোকানের নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে। যাঁরা বন্য পশুপাখীর চর্ম সংরক্ষণের কাজ করেন তাঁদেরও লাইসেন্স নিতে হবে। এতে পশুপাখীর অবাধ লেনদেন নিয়ন্ত্রিত হবে। বিনা লাইসেন্সে পশুপাখীর কেনাবেচা বা লেনদেন দণ্ডনীয় বলে গণ্য হবে। এতদিন যে সব আইন চালু ছিল তাতে দোষীর দোষ প্রমাণের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল কিন্তু এই আইনের আওতায় নির্দোষিতা প্রমাণের দায়িত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর দেওয়া হয়েছে। সকল প্রকার বনজ সম্পদের বিশেষত পশুপাখীর মালিকানা সত্ব ও প্রমাণের দায়িত্ব মালিকের উপর ন্যস্ত হওয়ায় এই সমস্ত অপরাধ অনেক কম হবে বলে মনে হয়।

এই আইনে সকল প্রকার অপরাধের শাস্তি অনেক কঠোর ও বেশী করা হয়েছে। এমনকি এই আইনে ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা দুই বৎসর পর্যন্ত কারাবাস অথবা উভয় দণ্ডই এক সাথে দেওয়ার ক্ষমতা বিচারককে দেওয়া হয়েছে এবং এই আইনের কঠোরতা আগেকার চালু আইনের তুলনায় অনেক গুণ বেশী।

এই আইনের দ্বারা সরকারকে প্রয়োজনবোধে বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য যে কোনও অঞ্চলকে জাতীয় পশু উদ্যান, অভয়ারণ্য ইত্যাদি ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই আইনে বৎসরের যে কোনও সময় যে কোনও পশুপাখীর শিকার বা ধরার নিয়ন্ত্রণ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর উপর দেওয়া হয়েছে।

অভয়ারণ্যের দশ কিলোমিটার গণ্ডীর মধ্যে যারা বাস করবেন তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র থাকলে সেই সব আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য পশুপাখী সংরক্ষকের অফিস থেকে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে ছাড়পত্র নিতে হবে। যদিও তাঁরা জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগেই সেই সব আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য লাইসেন্স নিয়েছেন।

যারা অভয়ারণ্যের কাছে থাকেন বা ছাড়পত্র নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে যাওয়া-আসা করেন তাঁদেরও বন্য পশুপাখী রক্ষা করার দায়িত্ব আছে এবং তা যথাযথভাবে পালন না করলে শাস্তির ব্যবস্থা এ আইনে আছে। আমরা আশা করি এ আইন সুষ্ঠুভাবে চালু হলে চোরাকারবার ও চোরা শিকার অনেকাংশে কমে যাবে এবং আমাদের এই ক্ষয়িষ্ণু জাতীয়সম্পদ সম্পূর্ণরূপে বিলোপের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে পূর্বেকার আইনের থেকে এই আইন অর্থাৎ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ—১৯৭২ আইন অনেক সবল কঠোর এবং ত্রুটিহীন। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে সরকার যত কঠোর আইনই চালু করুক না কেন এককভাবে সরকারের পক্ষে আমাদের দেশের এই মূল্যবান ও দুর্লভ জাতীয়সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব যথোচিতভাবে পালন করা সম্ভব নয়। সেজন্য চাই জনগণের সমর্থন ও সাহায্য। সুতরাং জনসাধারণেরও উচিত এগিয়ে এসে সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে এই গুরু দায়িত্ব ভার বহন করা। কেন না বন্যপ্রাণী আমাদেরই কল্যাণ সাধন করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে একে অপরকে ছাড়া বাঁচতে পারে না—সুতরাং বন্যপ্রাণীর উচ্ছেদ আমাদেরও লোপ পাওয়ার সামিল হবে।

অতএব জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মচারী যাদের উপর এই আইন রূপায়িত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে—তাঁদের কাজ হবে জনসাধারণকে এই আইনের উদ্দেশ্য সহজ সরল ভাষায় বোঝানো যাতে ভারতের জনগণ সরকারের পাশে এসে দাঁড়ান এবং এই দায়িত্ব পালন করেন। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় কোন কাজ হবে না—এটা আমাদের সকলের বোঝা উচিত। এ বিষয়ে এখনও সচেতন না হলে এ আইনও পূর্বেকার আইনগুলির মত অচল হয়ে যাবে। সেজন্য আমি আমাদের দেশের জনগণের সাহায্য কামনা করে এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

বাঘের প্রেম ও বাৎসল্য

শের জঙ্গ

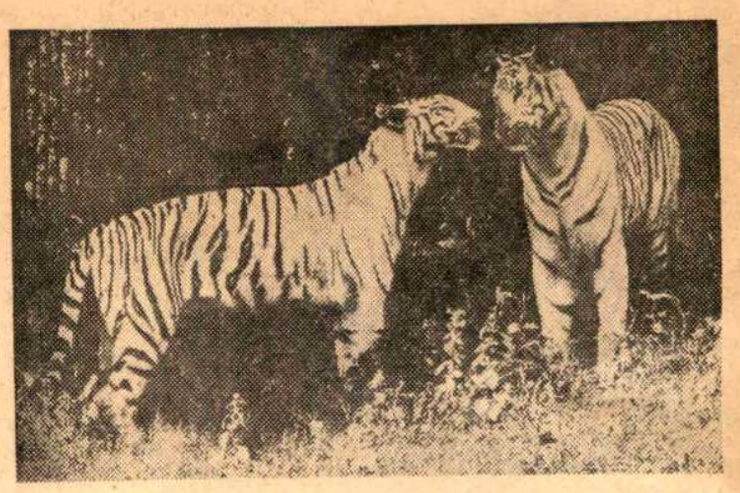

বাঘের পূর্বরাগ রীতিমত একটা হট্টগোলের ব্যাপার, গৃহপালিত বেড়ালদের 'প্রেমালাপ' থেকে ভিন্ন নয়—তবে বাঘের বেলায় সেটা আরো একশো-গুণ স্নায়ু-বিদারী। যেন একটা বিসদৃশ কর্কশ কনসার্ট—তার মধ্যে আছে চড়া গাঁক-গাঁক, বিশ্রী ফ্যাঁশ-ফ্যাঁশ কখনো-সখনো গর্জন, চেরা গলায় চিৎকার, দীর্ঘ একটানা আর্তনাদ। সব মিলিয়ে সে এক বিকট জগাখিচুড়ি। বাঘ কিন্তু চালিয়েই যায়, সারা রাত রাতের পর রাত, প্রায় সপ্তাহভোর। জীব হিসেবে বাঘ অতি সতর্ক গা ঢাকা দিয়ে থাকা তার মজ্জাগত, কিন্তু এই উন্মত্ত প্রেমে দুই-ই ছাপা পড়ে মনে হয়।

কাণ্ডটা ঘটতে শুরু করে যখন বাঘিনীর সময় হয়। এই সাড়া-জাগানো অবস্থা বাঘিনী ঘোষণা করে ভরাট গলায় গর্জন

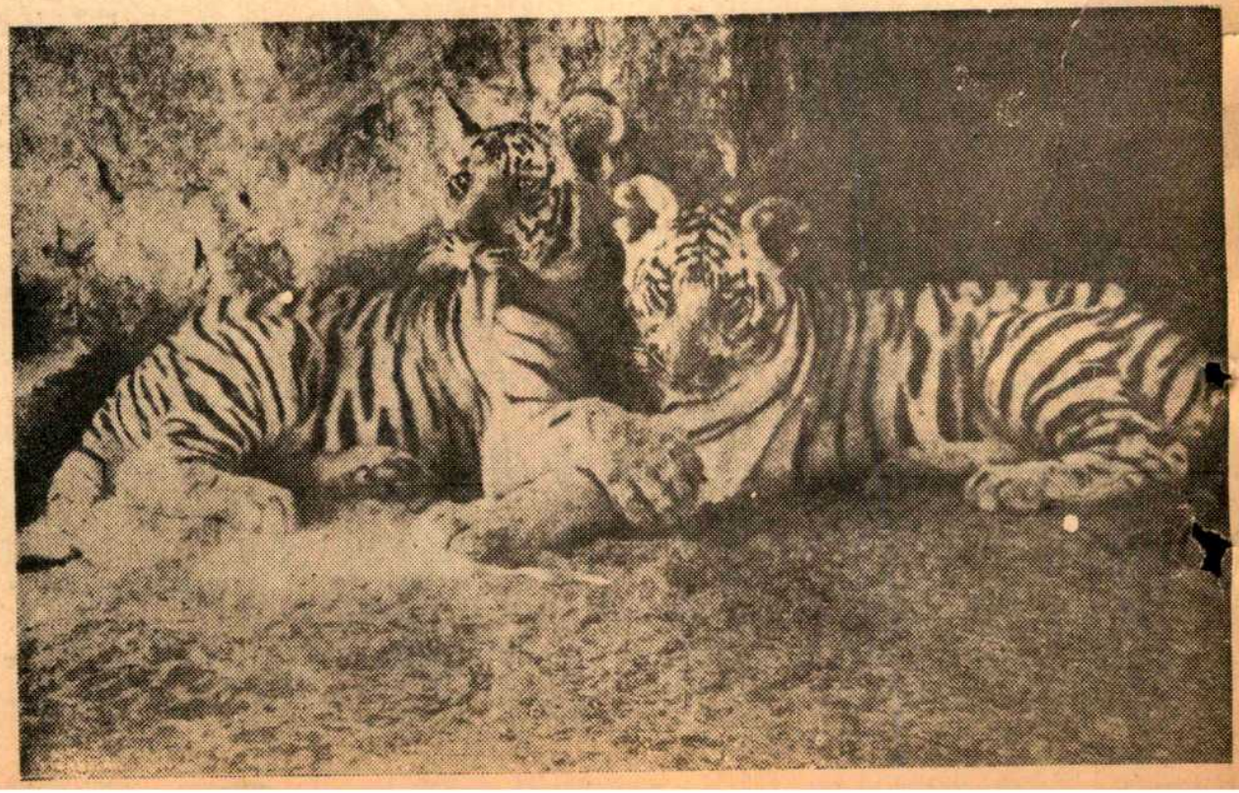

এ কলপ গড়িয়ে ছড়িয়ে যায়না

নতুন ট্রু-টোন জেল

চুলে সমানভাবে কলপ লাগানোর সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট উপায়, কারণ ট্রু-টোন জেল জেলির মত ঘন।

এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন—
জে.কে. হেলীন কার্টিস,
বোম্বাই ৪০০ ০৩৮

ই আর ডেভেলপার মেশানোর পর ট্রু-টোন জেল গাঢ় হয়ে
বলে চুল থেকে গড়িয়ে পড়েনা...আর একেবারে চুলের গোড়া
ত পৌঁছে যায় বলে চুলের রঙ স্বাভাবিক লাগে। চুলের যত্নের
ারে অগ্রণী মার্কিন কোম্পানী হেলীন কার্টিস-এর
জ্ঞ কারিগরীর সাহায্যে তৈরী।
-টোন কলপ একেবারে তরলও পাওয়া যায়

বিনামূল্যে
রবারের গ্লাভস্
এই বিশেষ উপহার
স্টক ফুরোনো পর্যন্ত
পাওয়া যাবে।

-টোন জেল-এও হেয়ার কণ্ডিশনার মেশানো রয়েছে!

পূর্ব ভারতের পরিবেশক: জি. এথ্যারটন এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

everest/39 JKH-

খেলাধুলা

দর্শক

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালোরে ২১তম জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল এগারটি বিভাগেরই ফাইনালে খেলে দশটি খেতাব জয়ের সূত্রে উপর্যুপরি ১৯ বার দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এবারের আসরে সার্ভিসেস দল ৫১ পয়েন্টে প্রথম স্থান, রেলদল ২২ পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থান এবং অন্ধ্র ১০ পয়েন্টে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। এগারটি খেতাবের মধ্যে একমাত্র লাইট হেভিওয়েট বিভাগের খেতাবটি পেয়েছেন রেলদলের গোপকুমার, সেনাদলের মেজর সিং-কে হারিয়ে।

সার্ভিসেস দলের পক্ষে ১০টি খেতাব জয়ী হয়েছেন ঃ দিলবাহাদুর (লাইট ফ্লাই) সার্কারাম সুব্বার (ফ্লাই) চন্দ্রনারায়ণ (ব্যান্টম), এস কে রাই (ফেদার), বকশিস সিং (ওয়েলটার) মণিকুমার রাই (লাইট মিডল), ভগবান সিং (মিডল) এবং মহম্মদ আসলাম (হেভি)।

নক-আউট ক্রিকেট

সি এ বি পরিচালিত সিনিয়ার বিভাগের নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৩১ রানে কালীঘাটকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে।

প্রথম দিনে স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ২০২ রান সংগ্রহ করেছিল। কে পামানী ৯টি বাউণ্ডারী-সহ ৭৪ রান করে আউট হন।

দ্বিতীয় দিনে স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রথম ইনিংস ২২৩ রানের মাথায় শেষ হয়। এবং খেলার বাকি সময়ে কালীঘাট প্রথম ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে ১৭৫ রান সংগ্রহ করেছিল। কালীঘাট তাদের ৮৬ রান তুলতেই ৭টা উইকেট হারিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৮ম উইকেটের জুটিতে রণবীর সেন (৪৬ রান) এবং তপনজ্যোতি ব্যানার্জি দলের অতি মূল্যবান ৮৫ রান যোগ করে দলের পতন রোধ করেন।

তৃতীয় দিনে কালীঘাটের প্রথম ইনিংস ১৯২ রানের মাথায় শেষ হলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৩১ রানে জিতে যায়। স্পোর্টিং ইউনিয়নের দিলীপ দোসী এই খেলায় ৬৩ রানে ৭টা উইকেট পান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

স্পোর্টিং ইউনিয়ন ঃ ২২৩ রান (পামানি ৭৪ রান। রবি ব্যানার্জি ৪৯ রানে ৫ এবং দীপঙ্কর সরকার ৩৭ রানে ৩ উইকেট)

১৯৭৪ সালের সুলিভ্যান পুরস্কার বিজয়ী আমেরিকার রিক হোলহাটার। ইনি ৮৮০ গজ এবং ১,০০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড করেন। প্রতি বছর ভোট মারফৎ আমেরিকার অ্যাথলেটকেই এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

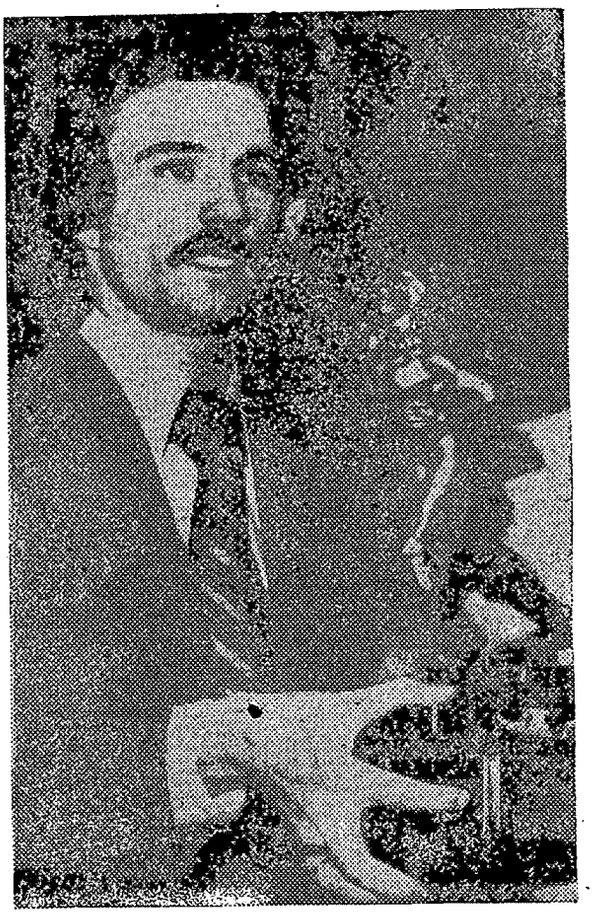

কালীঘাট ঃ ১৯২ রান (রণবীর সেন ৪৬ এবং তপনজ্যোতি ব্যানার্জি ৪২ রান। দিলীপ দোসী ৬৩ রানে ৭ উইকেট)

রাজ্য তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় রাজ্য তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে দ্রোনাচারী ক্লাব। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন পুরুষ বিভাগে দাশনগরের চন্দ্রকান্ত দাস এবং মেয়েদের বিভাগে ভারতী চক্রবর্তী (অর্জুন আচর্যারী)।

চন্দ্রকান্ত দাস পুরুষদের ৭০ মিটার এবং ৫০ মিটার অনুষ্ঠানে জাতীয় রেকর্ড ভাঙেন। তিনি ৭০ মিটারে ২২৮ পয়েন্ট এবং ৫০ মিটারে ১৯৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিলেন।

রাজ্য রোয়িং প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রোয়িং প্রতিযোগিতায় ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব ৩৯ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। লেক ক্লাব এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব সিনিয়র ফোরস, সিনিয়র পেয়ার্স এবং সিনিয়র স্কালস বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ী হয়। তাছাড়া রৌপ্যপদক পায় জুনিয়র ভাল এবং জুনিয়র স্কালসে।

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ

ক্লিভল্যাণ্ডে বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের বি ওয়েট বিভাগের চ্যাম্পিয়ান্ মহম্মদ নিউজার্সির চেক ওয়েপনারকে টেকনি নক আউটে হারিয়ে তাঁর বিশ্ব কোনরকমে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়ে শেষ ১৫শ রাউণ্ডের অন্তিম লগ্নে পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। ৯ম রা ওয়েপনারের এক প্রচণ্ড ঘুষিতে মহ আলী মুহূর্তের জন্যে ভূতলশায়ী ছিলেন। মহম্মদ আলী তাঁর ৪৮টি লড় এই নিয়ে মাত্র চারবার ভূতলশায়ী হ এর আগে সনি ব্যাঙ্কস হেনরী কুপার জো ফ্রেজার তাঁকে ভূতলশায়ী করেছি

অকসফোর্ড-কেম্ব্রিজ বোট

ঐতিহাসিক অকসফোর্ড বনাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বো কেম্ব্রিজ ১৯ মিনিট ২৭ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে অকসফোর্ডকে পরা করেছে। এই নিয়ে কেম্ব্রিজ ৬৮ বার হল। অকসফোর্ড জিতেছে ৫২ বার। একবার ১৮৭৭ সালে বোট রেস ড্র ছিল।

অভিনন্দন গ্রহণ করুন

মেসার্স বেঙ্গল রেপ্‌টাইল এক্সপোর্টিং কোম্পানী (১৯৫৮) পাঃ লিঃ—কলিকাতা

,, লতিথসন্স অ্যাণ্ড কোম্পানী—কলিকাতা

,, পি. প্যাগ্‌নন্ অ্যাণ্ড কোম্পানী-কলিকাতা

,, সৈয়দ আবদুল আহাদ অ্যাণ্ড কোম্পানী কলিকাতা

,, মাসুদ আলম অ্যাণ্ড কোম্পানী—কলিকাতা

,, শাহ্ ফার অ্যাণ্ড রেপটাইল এক্সপোর্টিং কোঃ পাঃ লিঃ—কলিকাতা

,, ইষ্টার্ণ রেপ্‌টাইল এক্সপোর্টিং কোঃ কলিকাতা

,, আবদুল গফুর অ্যাণ্ড সন্স—কলিকাতা

,, র‍্যানেটস্ ইষ্টার্ণ এক্সস্পোর্টস—কলিকাতা

,, লেদারওয়ার অ্যাণ্ড এলায়েড্ এজেন্সী কলিকাতা

,, স্কীন এজেন্সী—কলিকাতা

,, এ. জি. ট্যানারী—কলিকাতা

,, সিজন ট্রেডিং কোম্পানী—কলিকাতা

,, রোটাস্‌গড় এক্সপোর্ট কর্পোরেশন-কলিকাতা

নাটমঞ্চ

নাট্যায়নের

'হা হা স্বদেশ'

আজকের থিয়েটার গ্রুপগুলি শুধুমাত্র দর্শককে আনন্দ দেবার জন্যেই নাটক করে না, তাদের নাটক আজ দর্শকদের ভাবায়ও; একথা বোধহয় আর বলার অবকাশ রাখে না। যে কোন আধুনিক নাটক দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

যে কারণে একদিকে যেমন এইসব নাটক দেখার দর্শক ক্রমশ বাড়ছে তেমনি নব নাট্য আন্দোলনের ঢেউ সোচ্চার হয়ে উঠছে। কি বক্তব্যে, কি ফর্ম বা আঙ্গিকে আজকের নাট্য ভাবনা নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছে তাদের নাটকে। সভ্য অর্থে তাই এদের 'প্রচেষ্টা' বলাই বোধ-হয় সংগত।

'হা হা স্বদেশ' প্রথম আকর্ষণ করে তার নামকরণের বৈচিত্র্যে। এটা অত্যন্ত আধুনিক নামকরণ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সঙ্কোচের সঙ্গেই জানাই এর বক্তব্য ভাবনায় চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নভাবে তার উপ-স্থাপনার জন্যে ঠিক ততটা আকর্ষণ করেনি।

সংশোধন

৩৬ পৃষ্ঠার উপরের বাঁদিকের পাখিটি কোকিল। ডান দিকের পাখির নাম শাহী-বুলবুল। মাঝের পাখিটি হুলদে পাখি নামে পরিচিত।

তার একটা বড় কারণ সম্ভবত ফ্ল্যাশব্যাকের প্রয়োগ নাটকে অত্যন্ত বেশী করা হয়েছে বলে। যার জন্য সমস্ত বক্তব্য সহ নাট্যরস দানা বাঁধতে পারেনি।

অথচ নাটকের কোথাও তেমন কোন ত্রুটি নেই যার ফলস্বরূপ নাটকটি দর্শক-গ্রাহ্য হবে না।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। সেটা হোল নাটকের শ্লথগতি। যে ত্রুটিটাও নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাঘাতের সৃষ্টি করেছে।

মনে হয় ফ্ল্যাশব্যাক এবং শ্লথগতি—এই দুই দিকে আরও একটু সচেতনভাবে দৃষ্টি দিলে 'হা হা স্বদেশ' একটি স্মরণীয় নাট্য-সৃষ্টি হয়ে থাকবে। বলাই বাহুল্য নাট্যকার ও নির্দেশকের কাছে (অনিল দে) মাত্রই সবিনয় পরামর্শ।

তবে এই আপাত দুর্বলতাট অভিনয় দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন অ

আর যে কথা গভীরভাবে বলা এ নাটকে সেই যুগ-যন্ত্রণা, যু অনিশ্চিত ভবিষ্যত, শিক্ষার ক্ষেত্রে চ্যুতি যুবশক্তির অবক্ষয়—যার বেশীর দাঁড়িয়ে আছে অর্থনৈতিক ও কাঠামোর ওপর—যেটা একদিকে যে যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা এ সমাজের এই জাতীয় নাটকের অবশ্যই আছে আমাদের জীবনে। কারণ এ পড়া সমাজ ব্যবস্থায় ঘা দিয়ে স্থ পড়া মধ্যবিত্ত মানুষগুলির ঘুম

অভিনয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ অনিল দে এবং সুশান্ত ভট্টাচ অন্যান্য ভূমিকায় লোকনাথ রায় শ দার অসীম মুখার্জি রথীন ভট্টাচ দে শেখর সেনগুপ্ত ঘোষ দেবব্রত ভট্টাচার্য গীতেশ চক্রবর্তী চরিত্রানুগ। তবে মধ্যে দু একজনের অভিনয়ে কিছু লক্ষ্য করা গেছে। যেটা এমন নাট আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। একমাত্র স্ব কাজল চৌধুরী সুন্দর। কয়েকটি মুহূর্ত তিনি দর্শকদের উপহার

সঙ্গীতের সুর যোজনায় বে নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তারতম্যে সেটা যেন মনকে আচ্ছ (সঙ্গীতঃ দেবাশিস দাশগুপ্ত)।

চিত্ত সরকারের আলোর কাজ

নাটকের সংলাপ স্থানবিশে আকর্ষক। এতে নাট্যকারের বক্তব্য মত ভাষার ওপর দখলেরই পরিচায় প্রয়োগে পরিমিতিবোধ সম্পর্কে সচেতন সেটা বোঝা যায়। তবু ক্ষেত্র বিশেষে সংলাপকে আরও এ কাট করলে বোধহয় নাটকের গ পক্ষে সেটা সহায়ক হয়।

'হা হা স্বদেশ' ভাল নাটক নাটক বলেই কিন্তু এত কথা বলা

নটপীঠ-এর দুটি

নটপীঠ নাট্যসংস্থার দুটি নাট পত্র' (নাটক ও নির্দেশনা মানবব্রত পাধ্যায়) এবং 'বিনিময়ে কিছু' বয়েজ ওন লাইব্রেরী হলে অভিনী

ছাড়পত্র নাটকে কিছুকা বাংলাদেশে যে খুনের রাজত্ব চ সেই সঙ্গে জমিদার জোতদারদের সংঘটিত হতে দেখা গেছে তার এ দেখানো হয়েছে। এ জাতীয় নাটক অভিনীত হলেও এঁদের নিষ্ঠা এ ভাল লেগেছে।

ছদ্মনামের আড়ালে শক্তিমান লেখকের

মিষ্টিমধুর উপন্যাস

বুম্বাজী এর

মানস - কমল ৫.০০

এই লেখকের রূপবন্যা ৬.০০

পরিবেশক ঃ অনন্য প্রকাশন • ৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল), • কলিকাতা-১২

রিডাকশন সেল

শাড়ী • ধুতি • পোষাক • বেডসিট • তোয়ালে • কাটপিস

৭৩, জি.টি. রোড (সাউথ) হাওড়া • ফোন: ৬৭-৫৩২৫

রত্নদীপ

ছেড়ে। আর যতোই তার অধৈর্য বাড়তে থাকে ততোই তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গর্জনের পর্দা চড়ায়—ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দিনে দিনে। এই সময়ে তার গা থেকে নিঃসৃত হয় অদ্ভুত একটা কস্তুরিকা গন্ধ যা এক সপ্তাহেরও বেশি সময় বজায় থাকে। এই সময়ের মধ্যে আশেপাশের এলাকা থেকে পুরুষ-বাঘ সাড়া জাগিয়ে ডাক ছাড়বেই ছাড়বে। তখন সেই অরণ্যে শুরু হয়ে যায় এক-পরিণয়কালীন অতি-চিত্তাকর্ষক দ্বৈত তানের উৎসব।

অল্প সময়ের মধ্যেই এই দ্বৈততান পরিবর্তিত হয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে। বেধড়ক ব্যবহার করা হয় দন্ত ও নখর, রণ-হুংকারে আকাশ দীর্ণ হয়, আর প্রতিদ্বন্দ্বীদের রক্তে মল্লভূমির মাটি ভিজে যায়। ইপ্সিত পুরস্কারের জন্য এত কিছু সেই দয়িতা দূরে দৃশ্যটি অবলোকন করে—যতোক্ষণ না একটা ফয়সালা হয়, যতোক্ষণ-না বিজয়ী তার একাধিপত্য কায়েম করতে পারে। বিশেষ কৌতূহলের বিষয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে এই যুদ্ধ যদিও চূড়ান্ত নির্মম রূপ নিয়ে থাকে কিন্তু কদাচ মৃত্যুতে তার শেষ হয়। যে-মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বী মাটিতে পিঠ দিয়ে চিৎপটাং হয়ে থাবাদুটো অসাড়ভাবে আকাশের দিকে তুলে দিয়ে পরাজয় মেনে নেয় তাকে আর পীড়া না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। গোষ্ঠীর মধ্যে আচরণের এই সভ্য রীতি সকল বন্যপ্রাণী মেনে চলে—কি মাংসাশী, কি তৃণভোজী। বন্য জগতে কদাচিৎ কোনো সওয়াল মর্মান্তিক পরিসমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়—পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার নিজেরই প্রজাতির অন্য একজন খুন করেছে এমন ঘটনা না-থাকার মতো।)

'বাতিল করার লড়াই' চলতে পারে তিন-চার দিন ধরে, সেটা শেষ হলে শুরু হয় আসল প্রেম। এই মার্জারীয় সংস্করণের প্রেম হয়ে ওঠে একটা সর্বগ্রাসী ব্যাপার তীব্রতা উদ্দীপনাপূর্ণ ও বেপরোয়া—কোমল কোনোক্রমেই নয়। প্রণয়ী তার মধ্যে আমদানী করে কিছু আগেকার দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমুদয় ব্যাপারগুলো, আর তারপরে প্রকৃতই সম্পূরণের সময় আসে তা প্রকৃতই ওঠে এক রাজকীয় রণ। শুরু হয় সে-হিস ঘড়-ঘড় আওয়াজের একটা সোরগোল তুলে, তারপরে বিকট গাঁক-গাঁক ও গর্জন। মাঝেমধ্যে খেলা বিলাপ, লাফা-

হরিণ

লাফি, ছুটোছুটি—তার মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে অগ্রসর হওয়া এবং সমাপ্তিতে বেসামাল ঘষাঘষি কামড়াকামড়ি, ঘড়ঘড় ও মিয়াও-মিয়াও। কোনটা কখন তা নির্ভর করে—বাঘিনী বিরক্ত না গদগদ সেই মেজাজের ওপরে।

প্রেমের পর্বগুলো অনেকটা এই রকম ঃ বিজয়ী পুরুষটি ক্রমে গা-সওয়া হয়ে এলে বাঘিনী করে কি, বাঘের লম্বা শক্ত গোঁপে নিজের গোঁপ ঠেকিয়ে দেয়। আর জবাবে যদি শোনে যে, বাঘ নরম সুরে ঘড়-ঘড় করছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই সে রাশ কিছুটা আলগা করে নিজেকে ছেড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরেই মাটিতে পিঠ দিয়ে চিৎপটাং হয়ে থাবাদুটো শূন্যে আন্দোলিত করতে থাকে—অনেকটা সেই পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো। পুরুষ বাঘ তখন অটল অনড় ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বাঘিনীর দিকে তাকিয়ে আছে। বাঘিনী বারেবারে মিয়াও-মিয়াও ডাক ছাড়ে, তারপরে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পিঠটা উঁচিয়ে ধরে। বজ্রের মতো গর্জন তুলে বাঘ তখন বাঘিনীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত দিয়ে বাঘিনীর ঘাড় কামড়ে ধরে, তারপরে চড়াও হয়। এই 'প্রেমের দৃশ্যের' স্থায়িত্ব ১৫ থেকে ২০ সেকেণ্ড, দৃশ্যটি প্রতিদিন বহু ডজন বার ফিরে ফিরে ঘটে। অনুষ্ঠানটি চলে ৫ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত।

দুই 'প্রেমের দৃশ্যের' মধ্যবর্তী সময়ে ছেড়ে-দেওয়া রণ আবার শুরু করা হয় অরণ্য আবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে গর্জনে ও হুংকারে। তারপরে শেষ-পর্যন্ত যখন মঞ্চে যবনিকা-পতন ধ্বনিত হয়—বা, আরো সঠিক ভাষায় বলতে হলে—গর্জিত হয় অভিনেতৃরা বেরিয়ে আসে নেতিয়ে-পড়া শীর্ণ চেহারা নিয়ে, তাদের সারা মুখে গভীর কাটাছেঁড়া ও দগদগে ঘা, সারা গা রক্তমাখা।

বাঘের বাচ্চা

ভারতে বিশেষ একটা বাছাই-করা সময়ে বাঘের বাচ্চা হয়ে থাকে তেমন মনে হয় না। বাঘিনীর সময় হওয়ার চক্র সারা বছর ধরেই ৪৫ থেকে ৫৫ দিনের গড় ব্যবধানে ঘটে যেতে পারে। একমাত্র যখন বাঘিনীর সঙ্গে তার বাচ্চারা থাকে (দু-বছরেরও বেশি সময় বাচ্চারা মায়ের সঙ্গে থাকে), তখন তার সময়-হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণত বন্ধ থাকে। কিন্তু কোনো দুর্ঘটনায় যদি তার বাচ্চাগুলো মারা যায় অমনি তার সময়-হওয়ার ব্যাপারটি আবার ঘটতে শুরু করে আবার সে গর্ভধারণ করার জন্য তৈরী হয় এবং পাঁচ মাসের মধ্যে নতুন একপাল বাচ্চা প্রসব করে বসে।

চার বছর বয়স থেকে বাঘিনী সঙ্গম শুরু করে, পাঁচ বছর বয়স থেকে বাঘ। শেষদিন পর্যন্ত তাদের বাচ্চা হয়ে চলে। গর্ভধারণের কাল ১০০ থেকে ১১০ দিন পর্যন্ত, কিন্তু স্তন্যদানের কাল এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি—বিশেষ করে বন্য অবস্থায়।

যদিও সারা বছর ধরেই বাঘের সঙ্গম চলতে পারে তবে উত্তর ভারতে সম্ভবত তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। ফলে বাচ্চারা সাধারণত জন্মায় মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে তখন আর চূড়ান্ত আবহাওয়ার কষ্টের মধ্যে তাদের পড়তে হয় না। সাতটি বাচ্চা একসঙ্গে হওয়ার ঘটনা একেবারেই বিরল, সাধারণত তিনটি থেকে চারটি পর্যন্ত হয়ে থাকে। নানা কারণে অধিকাংশ বাচ্চা একেবারে শিশু অবস্থাতেই মারা যায়। সবচেয়ে বেশি মারা যায় সাধারণত ব্যাধিতে তারপরেই ফুসফুস ও অন্ত্রের গোলযোগে। মাংসাশীরা সাধারণত মা হিসেবে সুবিধের হয় না মায়ের অবহেলার জন্য বহু বাচ্চাকে প্রাণ দিতে হয়। অন্য ব্যাপারও আছে, বাচ্চাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য একা ও অরক্ষিত ফেলে রেখে মাকে বাধ্য হয়ে শিকারে বেরোতে হয় আর তার অনুপস্থিতির সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে। হয়তো তারা পায়ে পায় ছটকে পড়ে ও ধ্বংস হয়; হয়তো তারা ক্ষুধায় ও ঠাণ্ডায় মারা পড়ে; হয়তো

তাদের খেয়ে ফেলে অন্য মাংসাশী জন্তু—যেমন হায়েনা শেয়াল এমনকি পুরুষ বাঘ পর্যন্ত। মোট ফল এই দাঁড়ায় যে, প্রাথমিক শৈশবের ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে বেঁচে থাকে মাত্র হিসেবমতো ৫০ শতাংশ। আর এটাই হচ্ছে কারণ যে অরণ্যের মধ্যে মায়ের সঙ্গে সাধারণত দেখা যায় একটি বা দুটি বাচ্চা—দুটি কম, একটিই বেশি।

বাচ্চারা জন্মায় কোনো একটা ঘন আড়ালে গুহার মধ্যে উদ্গত পাথরের নিচে কিম্বা অনুরূপ কোনো বিচ্ছিন্ন স্থানে। প্রসূতি-আলয়টি সবসময়েই হয় অতি গোপন ভিতরটা অন্ধকার, আর এমন একটা জায়গা যা সহজেই রক্ষা করা সম্ভব। জন্মের সময়ে বাচ্চারা অন্ধ থাকে আর ৯ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত এই অন্ধত্ব থেকে যায়। এমনকি চোখ ফোটার পরেও আরো প্রায় দু-সপ্তাহ কাল তারা চোখের দৃষ্টি ঠিকমতো নিবদ্ধ করতে পারে না। উপরন্তু আলোর দিকে তাকাতে কষ্ট হয় এবং চোখের মণির 'বোধ-নীল' তাদের দৃষ্টিকে ক্ষীণ করে। ফলে এই পর্বে তারা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অসহায়, নিজের থেকে নড়াচড়া করতে পারে না অন্ধকার কোণে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে থাকে।

সম্ভবত এটা প্রকৃতিরই একটা উপায়, যাতে নিরাপত্তার খাতিরে তাদের আবদ্ধ ও লুককায়িত রাখা যায়। এই উদ্দেশ্যকে আরও পরিপূরণ করে মা নিজে—ঘন ঘন সে বাচ্চাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যায় আর প্রতিবার সরাবার আগে নতুন জায়গা সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করে—যাতে বাচ্চারা সেখানে পুরোপুরি লুকনো থাকতে পারে। বাচ্চা সরাবার পদ্ধতি গৃহপালিত বেড়ালের মতো— বাচ্চার ঘাড়ের কাছে আলগা চামড়া দাঁতে কামড়ে ধরে মা একটি একটি করে বাচ্চা সরিয়ে নিয়ে যায়। প্রথম কয়েকটা দিন মা সবসময়েই বাচ্চাদের সঙ্গে থাকে তারপরে ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে তাকে খদ্যের সন্ধানে বেরোতে হয়। বাচ্চাদের এমনভাবে শেখানো হয় (কিংবা হয়তো এটা তারা স্বভাব বশেই করে থাকে) যে মায়ের অনুপস্থিতির সময়ে বাচ্চারা তাদের লুকনো জায়গায় চুপটি করে পড়ে থাকে। মা বাচ্চাদের কতদিন দুধ দেয় আমরা জানি না; কিন্তু পুরোপুরি মাই ছাড়বার আগেই দেখা যায় মায়ের আনা হাড় থেকে তারা মাংসের কুচি চেটে চেটে তুলে নিতে শুরু করেছে। এই হচ্ছে মাংস খাওয়ায় তাদের হাতেখড়ি এবং জন্মের পরে বেশ তাড়াতাড়িই এটা হয়ে যায়। পরে মা তাদের খাওয়ায় পুরোটাই মাংস। এই মাংস প্রথমে সে শিকারের গা থেকে বড়ো একটা দলায় নিজ গলাধঃকরণ করে, তারপরে বাচ্চাদের কাছে ফিরে এসে উগরে বার করে দেয়। এইভাবে খাওয়ানো বাচ্চাদের পক্ষে আরো নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর। প্রথমত বাইরে বেরোতে হচ্ছে না বলে তাদের বিপদের মধ্যে পড়তে হচ্ছে না, দ্বিতীয়ত মাংসের দলাটি উগরে দেবার আগে মায়ের পাকস্থলীতে পাচকরসে জারিত হচ্ছে এবং যতোই শক্ত হোক না কেন তার ফলে সহজে পাচ্য হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

শিকার করা ও গোপনে অনুসরণ করে শিকার ধরার ব্যাপারটা খুবই জটিল প্রসূতি আলয়েই এই জটিল ব্যাপারে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যায়। বাচ্চারা গুঁড়ি মেরে একে অপরের দিকে এগিয়ে আসে ও একে অপরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আড়ালে লুকোয় একে অপরকে আক্রমণ করে— এমনকি মাকেও। মায়ের লেজ নিয়ে বাচ্চাদের খেলা করাটা এমনিতে মনে হতে পারে অর্থহীন আসলে এটাও কিন্তু সম্মুখীন হওয়া ও আক্রমণ করার দক্ষতা-অর্জনে একটা অনুশীলন। দ্রুত সঞ্চারমান লেজের ডগাটিকে তারা ধাওয়া করে, ঝাঁ করে সরিয়ে নেওয়া মাত্রই লেজের ডগাটির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরে ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এটা করতে গিয়ে স্বভাবগতভাবেই অনুশীলন করে যে- কাজ তাদের করতে হবে তার কলাকৌশল। ঘুরে বেড়াবার মতো শক্তি গায়ে এলেই মা তাদের 'বাইরের' মহড়ায় নিয়ে যায়। মাঠের কলাকৌশল-এর মূল বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষণদানের প্রথম কয়েকটা দিন কাটার পরে মা তাদের সামনে একটা বিকলাঙ্গ জন্তু হাজির করে এবং সেটাকে মেরে ফেলার জন্য তাদের ওস্কায়। বেচারা জন্তুটাকে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে তারা নাকালের একশেষ করে, জন্তুটার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায় এবং আরো বেশি তাগদ দিয়ে লড়বার জন্য মায়ের কাছ থেকে উৎসাহই পেয়ে চলে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাই এগিয়ে আসে ও জন্তুটাকে মারতে খানিকটা সাহায্য করে।

দেখতে দেখতে বাচ্চারা আকারে গায়ের জোরে বড়ো হয়ে ওঠে আর সেটা এ অল্প সময়ের মধ্যে যে অবাক হতে হয়। ঠিক একমাস বয়স হলেই তারা মায়ের সঙ্গে শিকারে বেরোতে শুরু করে, যদিও গোড়ার দিকে নিজেদের পায়ে খাড়া হয়ে চলার ক্ষমতা তখনো তাদের হয়নি। তারপরে তারা যতোই বড়ো হয়, পরিবারের শিকারের এলাকা বাড়তে থাকে এবং প্রতিটি শিকার কম জন্তুর কাছাকাছি এলাকায় দিন কয়েকের জন্য থাকতেও শুরু করে দেয়। ক্রমে ক্রমে বাচ্চারা শিকারকর্মে আরও বেশি বেশি অংশ নিতে থাকে এবং অপরের সাহায্য ছাড়াই শিকার মারতে পারে। কিন্তু দু—তিন বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তারা পুরোপুরি স্বাধীন হয় না—দুয়ে নয়, বরং তিনেই। বাচ্চারা এই বয়সে পৌঁছলে (যখন তারা নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে সক্ষম) পরিবার ভেঙ্গে পড়ে, মা চলে যায় নতুন আরেক দল বাচ্চা পেটে ধরবার জন্য। (প্রকাশিতব্য একটি ইংরাজী পুস্তকের পাণ্ডুলিপি থেকে লেখাটি নেওয়া হয়েছে।)

লক্ষ লক্ষ লোক আজ ব্যবহার করেন

লক্ষ লক্ষ লোক আজ
সাধনা দশন ব্যবহার করেন
কারণ অতি উৎকৃষ্ট
দাঁতের মাজন ব'লে
এর সুনাম ও জনপ্রিয়তা
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।
অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
সাধনা দশন বহুদিন ধরে
দেশের সর্বত্র প্রচুর সমাদর
লাভ করে আসছে।
সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-
বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও
উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ
করেন তাঁদের অনুরোধেই
প্রস্তুত করা হয়েছে।

SD.5/70

সাধনা দশন

সাধনা টুথপেষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 7th February,
Phone 55-5231 (14 lin

নতুন ফরমুলায় সুন্দর প্যাকে

কুকমী
গুঁড়া মশলা

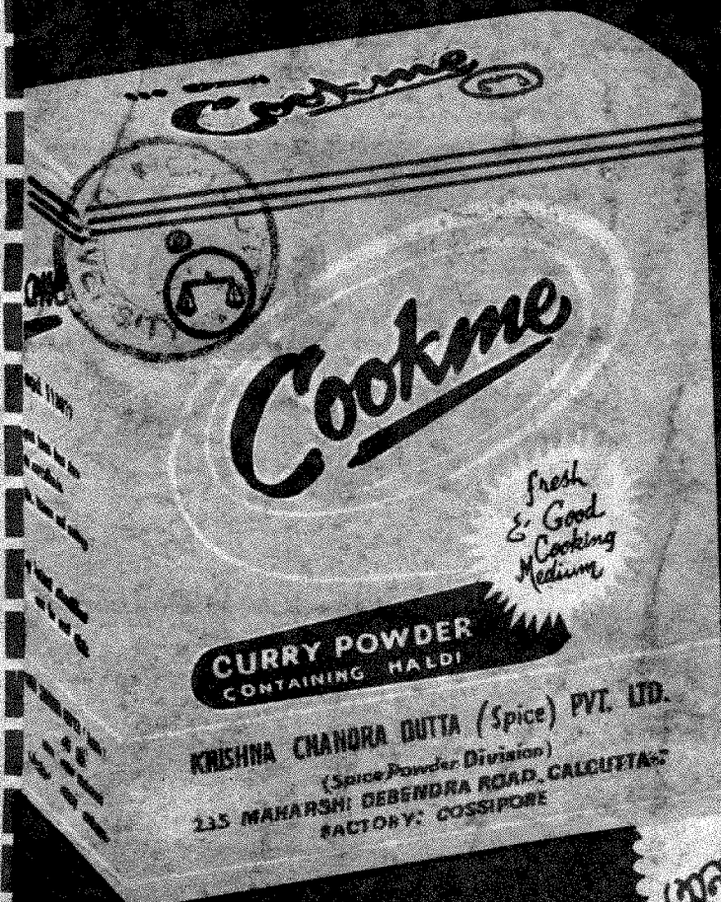

হ'লো সেই আসল জিনিষ যার পেছনে রয়েছে ১২৫ বছরের অভিজ্ঞতা

১। সর্বাধুনিক মশলা প্রযুক্তি বিস্তার ফল নতুন প্যাক আরও উন্নত ধরনের কুকমী গুঁড়া মশলা।

২। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের গবেষণা।

৩। বাজারের অন্যান্য পাঁচটা গুঁড়া মশলা থেকে কুকমী গুঁড়া মশলা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ও খাদ্যপ্রাণ ভরপুর।

আমাদের অন্য কোন ব্র্যাণ্ড নেই

প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)
১৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭ : ফোন : ৩৩-৩৯৯৫ ফ্যাক্টরী—কাশীপুর

188/KCD-74

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ড প্লেয়ার

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়। মেরামতেরও সুবন্দোবস্ত আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৬৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

কিন্তু নারী চরিত্রাভিনেত্রী দুজনেই আমাদের বিস্মিত করেছেন। স্বপ্না সরকারের সরলা দুটি দৃশ্যে ছেলের মৃত্যু সংবাদ শুনে ও তার আগের একটি দৃশ্যে অত্যন্ত দরদ দিয়ে অভিনয় করেছেন। ঐ দৃশ্যে তাঁর অভিনয় মনকে স্পর্শ করে। তবে ভাষা প্রয়োগে একটু তারতম্য রয়ে গেছে।

আর স্বপ্না ব্যানার্জির মালতী আমাকে অবাক করেছে তার অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে। তেমনি এর এক্সপ্রেশন। চেষ্টা করলে এবং একটু সযত্ন হলে ভবিষ্যতে ইনি খ্যাতনামা অভিনেত্রী হতে পারবেন। কোন কোন দৃশ্যে তাঁর পাশে তাঁর আদর্শবাদী প্রেমিককে বেশ নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। সাজসজ্জা ভাল। আলো ও শব্দ প্রক্ষেপণ (প্রশান্ত চক্রবর্তী) সম্পর্কে সচেতনতার অবকাশ আছে। (নারায়ণ ঘোষাল গৌরচন্দ্র ঘোষাল) সুরের দিক থেকে পরিবেশনায় আরো কিছুটা উচিত বলে মনে হয়েছে।

সব মিলে সমগ্র নাটকটি দর্শক সাধারণকে ভাবনায় সমর্থ হবে। তবে নাটকটি ছোট এবং গতিশীল করলে ভা

তবু বোলবো ধল্লরীর 'উৎস বলিষ্ঠ প্রয়াস তাতে কোন সং মতবাদ যাই থাক না কেন।

নাট্য

নেতাজী সদন (নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউট)
(শিয়ালদহের উত্তরে কাইজার ষ্ট্রীটে প্যারামাউন্ট সিনেমার পূর্বদিকে)
প্রতি বৃহঃ ৬॥টা শনি, রবি : ৩টা ৬॥টা

সমরেশ বসুর
বিবর
নির্দেশনা- রবি ঘোষ

অসিতবরণ, শুভেন্দু চ্যাটার্জী জয়শ্রী রায়, চিন্ময় রায় হারাধন ব্যানার্জী প্রমোদ গাঙ্গুলী, গীতা দে, ছন্দা দেবী রত্না ঘোষাল, সুব্রত সেন এবং গৌরীশঙ্কর ব্যানার্জী ও রবি ঘোষ।

নাটক : সমর মুখার্জী
আলো : কণিষ্ক সেন, মঞ্চ : শৈলেন দে
সংগীত : আনন্দশঙ্কর

শো-এর ৬ দিন আগে হলে বুকিং (৮টা—৮টা)

তালেনা

ভানু সিংহের পদাবলী, মণিপুরী নৃত্যে

উপান্তে অবস্থিত হলেও নিরীহ মণিপুরবাসীকে অনেক বিরোধী শক্তি বৈরী এবং যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছে, তাদের প্রাণের বস্তু শিল্পকলা বার বার বিধ্বস্ত হয়েছে। তাই বিধর্মী শাসকের নির্মম কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে অতিসংগোপনে অন্তরের নিভৃতলোকে ধ্যানের মতই সঞ্চিত রেখেছিলেন শিল্পপ্রাণ মণিপুরবাসী। ক্রমে ক্রমে এতবড় শিল্প লোকচক্ষুর অন্তরালেই নির্বাসিত হতে বসেছিলো। এ বিড়ম্বনার হাত থেকে এতবড় শিল্পকে বাঁচালেন স্বয়ং কবিগুরু। তিনিই এমন ভাবনি সমৃদ্ধ শিল্পকে বিশ্বের স্বসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রতি তাঁদের সেই-শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞ নৃত্যের দীপান্বিতি হয়ে জ্বলে 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে? দশ ও কলাবতী দেবী পরিকল্পিত বিপিন সিং পরিচালিত নৃত্য এ এই মর্মগ্রাহী রূপসৃষ্টি একটি সকলকে মনোরম করে তুলেছিলে অফ্ ফাইন্ আর্টস প্রেক্ষাগৃহে। বেশক সৌমেন চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ।

ভানুসিংহের পদাবলীর গান ভরা আবেগে গেয়েছেন মঞ্জরী লা প্রকাশের প্রশস্ত অবকাশের তিনি দক্ষতায় ভরে দিয়েছেন।

ভানুসিংহের নৃত্যরূপটি ত শ্রীরাধার অভিসার প্রতীক্ষা ব্যর্থ ও প্রিয়মিলনের প্রতিটি অনুভ বঞ্চনা জাভেরীর রাধিকারূপে চরণ শ্রীকৃষ্ণের চপলতার আড়া প্রেমের ছবি হয়ে উঠেছেন দ অন্যান্য শিল্পীরা ভাবের এই তাঁদের ললিতনৃত্যে পত্রপুষ্পে ছেন।

অন্যান্য নৃত্যের সবকটিই কিন্তু মৃদঙ্গচালনে—দেহলীন দুই করাঘাতের তালে তালে ক্ষেপ, দেহভঙ্গির মনোহরলীল নৃত্যের তালে তালে শিল্পীর চিত্র যেন উদ্ভাসিত।

মৃদঙ্গ বাদনের মনোহর কলাবতী ও শান্তি দেবী অজ উঠেছেন।

ডাঃ পি, মজুমদারের

এন্টিফাঙ্গাস্টিন
কার্বোহল কিউর (রেজিঃ)
কার্বাঙ্কল, শোথ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।
বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে রোগমুক্তি
সিটন এণ্ড সন্স, কলিকাতা-১৩

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

16 APR 1975

...বিভিন্ন ভূমিকায় (যমরাজ, ...) মানবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ...ত্বব্যঞ্জক অভিনয় মনে রাখবার ...সুর চিত্রগুপ্তা, নায়েব ইত্যাদি ...অনুপাতে পরিমলের ভূমিকায় ...মুখোপাধ্যায় কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ মনে

...যমদূত সোনাগোপাল সাউকে ...মানিয়েছে এবং তিনি অভিনয়ও ...ভাল। দীপক ভৌমিকের দুটি ...অভিনীত।

...ভূমিকায় জহর বিশ্বাস শংকর ...ক বিশ্বাস যথাযথ। নাটকে ...স্ত্রীভূমিকা। শিপ্রা ঘোষ তাতে

...নাটক সম্বন্ধে দু-একটি কথা ...ছে। সেটা নাটকের বাঁধুনি ...দিকে আর একটু লক্ষ্য রাখলে ...নাটপীঠ গোষ্ঠী সুনাম অর্জন

...থেকে বিনিময়ে কিছু অনেক ...অভিনয়ও স্বচ্ছন্দ। বিশেষ করে ...শ্য এবং চরিত্র যেন মনে দাগ

...য়ে প্রথমেই নাম করা যায় মানব- ...াধ্যায়ের। তাঁর অভিনয়ে একটা ...ভাব আগাগোড়াই লক্ষ্য করা গেছে। ...ভূমিকায় সমীর কর প্রদীপ বসু ...মিক অসীম রায় চৌধুরী জয়ব্রত ...য় শুভেন্দু মাইতি মিহির সেন- ...ক বসু ইত্যাদি স্বচ্ছন্দ অভিনয়

...জা (শুভেন্দু মাইতি) উভয় ...সুন্দর। সংগীতের প্রয়োগ স্থান- ...নাটকের দৃশ্য রচনায় সহায়ক

...রীর 'উৎসন্ন'

...এ যুগের যুবকরা নানা ...ন্তি এবং হীনমন্যতায় ভুগছে ...নো কখনো বিদ্যুৎ ঝলক দেখলে ...বই কি।

...সেটা সংখ্যায় কম। কিন্তু এ ...দের মধ্যেও সামাজিক সচেতনতা ...ুগে আদর্শবাদও যে আজও ...প্রমাণও আমরা পাই বই কি। ...কম বেশী জীবনের সব ক্ষেত্রেই। ...আমার মনে হয়েছিল নতুন নাট্য ...ীর 'উৎসন্ন' নাটক দেখতে বসে। ...টকের অভিনেতারা সবাই কলেজের ...র চোখে এখনও উজ্জ্বল ভবি- ...ষ্যৎ আঁকা। যাদের চেতনায় ...দৃঢ়তা।

...এ কালের নাটক। কিছুটা ...হলেও চরিত্রগুলি মোটামুটি ...না। যাদের মধ্যে একাধারে ...বাদী লম্পট অত্যাচারী থেকে ...প্রতিনিধিত্ব ঘটেছে। তাই ...সমাজের (অবশ্যই যার

মানুষগুলি তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা অনিচ্ছা দারিদ্র্য সুকুমার বৃত্তি উদভ্রান্ত কামনা বাসনা শৃংখলা রক্ষার নামে অত্যাচারীতে রূপান্তরিত) একটা সমস্যা এবং ভাববার মত কথা এ নাটকে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। (নাটক নির্দেশনা ও মানব এবং অন্য একটি চরিত্রে ভক্তি সাহা)।

নাটকের শুরু চারণদলের গান দিয়ে। যেখানে অভিনীত সব কটি চরিত্রই উপস্থিত। এই অংশের সংযোজন সুন্দর। কিন্তু সেই অনুপাতে গানের কণ্ঠস্বর সোচ্চার নয়।

অভিনয়ে প্রথমেই যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন অনিমেষ (রবীন দাস) মানব (ভক্তি সাহা) এবং কেলো (বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য)। প্রথম দুজন অভিনেতা অভিনেয় চরিত্রের সংগে একাত্ম হবার আন্তরিক চেষ্টায় ত্রুটি রাখেন নি। কিন্তু বিস্মিত করেছেন শেষোক্ত শিল্পী (কেলো)। প্রথম থেকেই ইনি তাঁর চরিত্রটিতে বলিষ্ঠতা আরোপের চেষ্টা করে গেছেন। একটু আবেগ বেশী থাকলেও কোন কোন দৃশ্যে সত্যি সুন্দর অভিনয় করেছেন। এ প্রসংগে স্বপনের দৃশ্যটি উল্লেখ্য। ঘুমের মধ্যে তার মানসিক যন্ত্রণার প্রকাশ এবং তার পাশাপাশি একটা অসহায়তার আকুতি তিনি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন।

অনিমেষের রূপকার আগাগোড়া সংযত এবং মর্যাদাসম্পন্ন অভিনয় করেছেন।

মানবের চরিত্রকার কোন কোন অতি-ব্যক্তিতে দর্শককে বিস্মিত করেছেন। এ প্রসংগে একটা জিজ্ঞাস্য আছে—শেষ দৃশ্যে মানব জেলখানা থেকে পালাতে চেষ্টা করল কেন। এতো একরকমের পিছিয়ে যাওয়া।

জোকার (শেখর দাস) স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন। কিন্তু তার অভিনয়ের ঝোঁকের দরুন দর্শককে তিনি খুব বেশী আকর্ষণ করতে পারেন নি। আর চরিত্রটাও যেন সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়।

গগন (বরুণ পাইন) অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও দরদ দিয়ে অভিনয় করেছেন। শ্যামল (স্বপন দাস) ও শম্ভুর (অসীম চক্রবর্তী) অভিনয়ে এখনও জড়তা রয়ে গেছে। ইন্সপেকটর (অলক সুর) সম্পর্কেও ঐ কথাই বলা যায়। সেদিক থেকে সহ-ইন্সপেকটর (গৌর সিনহা) কিন্তু সুন্দর। অরুণ লাহা তপন সরকার ও সুব্রত দত্তগুপ্ত চেষ্টা করেছেন।